ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৭ম বর্ষ ॥ তৃতীয় খণ্ড

শুক্রবার, ১৬ কার্তিক, ১৩৭৪—শুক্রবার, ১২ মাঘ, ১৩৭৪

Friday, 3rd November, 1967 —Friday, 26th January, 1968

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক — বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক | বিষয় ও পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 22nd Nov., 1968 শুক্রবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ 40 Paise.

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০·০০	টাকা	২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা	১০·০০	টাকা	১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫·০০	টাকা	৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

প্রচ্ছদ : শ্রী আর কিশোর যাদব

ভারতীয় হকি

অমৃতের ২৫ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ভারতীয় খেলাধূলোর যে অবনতির কথা আলোচিত হয়েছে, তা সত্যাই ভেবে দেখার সময় এসেছে। সমগ্র বিশ্বে অন্যান্য দেশ খেলাধূলোয় যতো উন্নতির দিকে পা বাড়াচ্ছে, আমরা যেন ততই পিছু হটে চলেছি। এ যেমন দুঃখের, তেমনি বেদনার।

অন্যান্য খেলা দূরে থাক, আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত হকির কথাই ধরা যাক্। ১৯২৮ সাল থেকে যে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের করায়ত্ত ছিল, তা আমরা হারিয়েছিলাম রোমে। কিন্তু এই সর্বপ্রথম আমরা ফাইনাল খেলার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারলাম না। এর জন্য যতটা না দুঃখ হয়, তার চেয়ে বেশী হয় ক্ষোভ। এবার স্বর্ণশিকার যে ব্যর্থ হবে ভারতের খেলা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল; আর পাঁচটা দলের মতই ছিল আমাদের খেলার মান—বিশ্বজয়ীর মত নয়। তবু আশা ছাড়তে পারছিলাম না। কিন্তু ফাইনালেই উঠতে পারবো না,—না এতটা আশা করিনি।

কেন এমন হোলো? অন্যান্য দেশ উন্নতি করছে ঠিকই, তা বলে আমাদের অবনতির পথে যেতে হবে? স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের হকির মান কতটা উন্নত হয়েছে, কয়টা ভাল খেলোয়াড় তৈরী হয়েছে? আজ এসব সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। স্কুল পর্যায় দূরে থাক, অনেক কলেজ ছাত্রদেরও হকি খেলার সৌভাগ্য হয়ে ওঠে না। খেলোয়াড় হঠাৎ গজায় না; এর জন্য সাধনার প্রয়োজন—প্রয়োজন প্রশিক্ষণের, উৎসাহের ও প্রতিভার স্বীকৃতির। যতদিন না এসব হচ্ছে ততদিন আমাদের খেলার মান উন্নত হবে না।

আর যে একটি কারণ আমাদের অবনতির মূলে, তা হোলো আত্মতুষ্টি। আমরা বিশ্বজয়ী—এই মধুর স্বপ্নে আমরা মগ্ন থাকাকালে অন্যান্য দেশ হকি খেলায় প্রভূত উন্নতি করেছে আমাদেরই ধারা অনুসরণ করে। অথচ আমাদের মান আমরা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। মেক্সিকোর শিক্ষায় সে স্বপ্ন টুটেছে, না ব্রোঞ্জের স্নিগ্ধদ্যুতি এখনও মুগ্ধ করে রেখেছে—কে জানে।

অন্যান্য খেলার কথা না বলাই ভালো। ও সবে তো আমরা আন্তর্জাতিক মানের কাছেও নেই। ফুটবলের মান নামতে নামতে এখন শূন্যের কোঠায় পৌঁছেচে। অ্যাথলিটিকদের কথা আর নাই বা তুললাম।

আসল কথা, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও একাগ্রতার অভাবের জন্যই এই অবস্থা। ভাল খেলোয়াড়রা ঠিকমত সাহায্যও পাচ্ছেন না। রাজনীতির ছায়া খেলার জগৎ থেকে দূরে করতে হবে। বাইরে দল পাঠাবার সময় ব্যক্তিবিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে খেলোয়াড়কেই প্রাধান্য দিতে হবে। তা যদি হতো,

গত অস্ট্রেলিয়া সফরে হনুমন্ত সিং, কুন্দরণ বাদ পড়তেন না—সুব্রত গুহ ফোটার আগেই ঝরে পড়তেন না।

ভারত যতই অলিম্পিকে খারাপ ফল করুক, তবুও পরের অলিম্পিকে ভারতের আশা ছাড়তে পারি না—কারণ আমরা ভারতীয়রা আশাবাদী। ভারতের সোনার সূর্য মিউনিকে ১৯৭২ সালে দেখার আশা নিয়ে রইলাম।

রথীন্দ্রনাথ সামন্ত,
কালিপাহাড়ী,
বর্ধমান।

॥ নতুন ঠগী ॥

পড়াশোনার জন্য আজ সকলেই উৎসাহী। সময় এবং সুযোগের অভাবে তা সকলের ভাগ্যে হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। চাকুরী করার পর অনেকেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে চান। সকালে বা রাত্রিরে যদি কলেজ চলে তাহলে সে সুযোগ অনেকেই নিতে পারেন। প্রাইভেট পরীক্ষার ব্যবস্থা ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। আর প্রাইভেটে অনিয়মিত পড়াশোনার জন্য সবক্ষেত্রে সাফল্য লাভও হয়ে ওঠে না। চাকুরীর অবসরে রাতে বা সকালে কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ভারতের কিছু বড় শহরে আছে। তাই যদি হঠাৎ স্থানীয় কোন পত্রিকায় নতুন কলেজ খোলার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় স্বভাবতই বহু ছাত্রছাত্রী উৎসাহিত হয়। পাটনার দুটো ইংরেজী দৈনিকে হঠাৎ প্রথম পৃষ্ঠায় এধরনের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল নতুন কলেজ খুলছে। প্রাইভেটে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে এম-এ পড়ানো হবে উক্ত কলেজে। সেক্রেটারী জনৈক টি রায়চৌধুরী। পড়ানো হবে তিন বিষয়ে এম-এ। পাটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। দেখা গেলো উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেক চাকুরীজীবী দস্তুরমতো উৎসাহী। পর পর ৩ দিন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো। ৪র্থ দিন নতুন বিজ্ঞাপনে উপযুক্ত অধ্যাপক চাওয়া হলো। আর উক্ত শিক্ষাপ্রাণ ভদ্রলোক পাটনায় তাবৎ শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকীলের সংগে দেখা করে সকলকে মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বোঝাতে লাগলেন। এদিকে ভর্তি শুরু হলো। কলেজ সংক্রান্ত নানা সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকল। পাটনার নামকরা অনেকেই সে সব সভায় উপস্থিত থাকলেন। পড়ুয়া এবং শিক্ষামহলে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

হঠাৎ খবরের কাগজের চাঞ্চল্যকর খবরে সবাই চমকে উঠলো। শ্রীটি রায়চৌধুরী ১৫,০০০ টাকা নিয়ে উধাও। কলেজ বন্ধ। বাড়ীতে তালা। খবরে প্রকাশ পেল প্রায় ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। দুজন ex-Vice-Chancellor কলেজ কার্যকরী সভার সভ্য হতে রাজী হয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের খবর উক্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের প্রায় ৩০০০ টাকাও বাকী পড়ে আছে। অর্থাৎ কোনদিনই আর সে টাকা কাগজের আয় খাতে আসবে না। মঞ্চে তখন পুলিশের আগমন। ঘটনাটা খুব বেশীদিন আগের নয়—গত সেপ্টেম্বর '৬৮-তে ঘটেছিল পাটনায়।

আপনাদের 'নতুন ঠগী' পর্যায়ের ফিচারে সাহায্য করবে, তাই এই নতুন ঠগীর কাহিনীটি জানালাম। এ ধরনের শিক্ষাবিদরা নিশ্চয়ই ভারতের অন্যান্য বড়-ছোট শহরে এই একই পদ্ধতিতে অজস্র উচ্চশিক্ষার্থী গরীবদের পকেট কেটে চলেছে। আপনাদের প্রচেষ্টায় এ সবের বহুল প্রচারে হয়ত সাধারণ মানুষ সতর্ক হবেন।

জীবনময় দত্ত
পাটনা—১

'পাতালের আলো' প্রসংগে

অমৃতের ২০শ সংখ্যায় শ্রীসংকর্ষণ রায় লিখিত 'পাতালের আলো' রচনাটি পড়ে সত্যিই খুব আনন্দ পেলাম। অমৃতের নিয়মিত পাঠক ছাড়াও ভূতত্ত্বের একজন ছাত্র হিসাবে শ্রীরায়কে রচনাটির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিভিন্ন অতিপ্রয়োজনীয় ধাতুর পুরোন ইতিহাস তিনি যেভাবে ছোট ছোট কাহিনীর মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন তা খুবই রসগ্রাহী। শুধু তাই নয় কাহিনীগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্যও রয়েছে। শ্রীরায়ের মত আমাদের দেশের অনেক নামকরা ভূতাত্ত্বিকেরও মত যে ভারতের মাটিতে অনেক দামীদামী খনিজ দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে মিশে আছে। তবে তার বড়রকমের সন্ধান বা সমীক্ষা চালানো হচ্ছে না। অনেক বিদেশী ভূতাত্ত্বিকও এবিষয়ে আগ্রহ নিয়ে দেখতে হবে যার এবিষয়ে আগ্রহ নিয়ে দেখতে হবে। যার ফলাফলের উপর দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। রচনাটির প্রকাশের জন্য অমৃত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অজিতকুমার বিশ্বাস
শিলচর-২
আসাম।

লোকসভার অধিবেশন

লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্ক দিয়ে। কিন্তু বিতর্কের পরিচিত রীতিটি পালন করা হল না। বিরোধী পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ যা-কিছু, সেগুলি বর্ষণ করা হল বটে, কিন্তু তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যা বলার ছিল, তা বলতে দেওয়া হল না। অবশ্য তা সত্ত্বেও ভোটাভুটি হল, এবং প্রস্তাবটি পরাজিত হল। কিন্তু শুধু এই কাজটুকুর জন্যেই তিনদিন ধরে বিতর্ক চালানোর কি সার্থকতা ছিল তা বোঝা দুষ্কর। কেননা, অভিযোগের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কি ছিল, তা জানতে না পারায় সমস্ত আলোচনাটিই হয়ে রইল অসম্পূর্ণ এবং একপেশে। তার ফলে বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়ার যে সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। অথচ, বিরোধী পক্ষের জনৈক বক্তার মতে অন্তত, অনাস্থা প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য নাকি লোকসভার বিগত অধিবেশনের পর থেকে অন্তর্বর্তীকালের সমস্যাবলীর বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। কিন্তু প্রায় প্রতিটি সমস্যারই যে কমপক্ষে দুটি চেহারা পাওয়া সম্ভব, এ-কথা কে না জানেন? কোনো সমস্যাকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে আলোতে দেখা হবে, সরকার পক্ষ থেকেও যে সেই চিত্রই পাওয়া যাবে তা বলা যায় না। বাস্তবতাকে এই বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ পাওয়া যায় বলেই সাধারণ মানুষের কাছে সংসদীয় বিতর্কের এত কদর। সে মর্যাদা যে ক্ষুণ্ণ করা হল এবার তাতে কেউই খুব স্বস্তি বোধ করবেন না। অবিলম্বে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দ একত্রে আলোচনা করে ভবিষ্যতে লোকসভার অধিবেশন-কক্ষে কি আচরণ অবলম্বিত হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

দ্বিতীয়ত, বিতর্কের শুরুতে এবার দেশের বহুবিচিত্র সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এ প্রতিশ্রুতি থাকলেও শেষপর্যন্ত তা রক্ষিত হয়নি। আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিষয়ে। বিরোধী পক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সেই ধর্মঘটের সময় ঘোষিত অর্ডিন্যান্সটির উপর আক্রমণ চালান, এবং সরকারের কার্যাবলীরও সমালোচনা করেন। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐ ধর্মঘট ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। স্বীকার করতেই হবে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অনেকেই ধর্মঘটের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সরকার যে কর্মচারীদের বিষয়ে উদাসীন—এ-অভিযোগের মধ্যেও অতিশয়োক্তির খাদ আছে। কিন্তু দেশে যে দুর্মূল্য বাড়ছে এবং বাজার-দরের সঙ্গে উপার্জনের পার্থক্য যে ক্রমবর্ধমান, তাও স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া বেকারের সংখ্যাও যেমন বাড়তির দিকে, তেমনি আর্থিক জগতেও দেখা দিচ্ছে ক্রমে এক অচলাবস্থা। দেশের বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলে এসব কথাও মনে রাখতে হবে বৈকি! কারণ সমস্যা আজ তো কেবল সরকারী কর্মচারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, সমস্যা দেখা দিচ্ছে সারা দেশেরই আর্থিক জীবনে। সেইভাবে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির ভিত্তিতেই পরিস্থিতির জটিলতাকে আয়ত্তে আনা সম্ভব।

অবশ্য এ-কথা অত্যন্তই ঠিক যে, ভারতের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশে সমস্যার জটিলতা অকল্পনীয় নয়। পৃথিবীতে সমস্ত দেশকেই উন্নয়ন-পর্বের মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা পার হতে হয়েছে। আজকের সুউন্নত দেশগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। কাজেই ভারতেই যে শুধু আমরা দুর্গতির মধ্যে রয়েছি এমন মনে করার কারণ নেই। তবু লক্ষ্য রাখা দরকার, সমস্যা যেন আয়ত্তের বাইরে না যায়। জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় ভিত্তিটুকু যেন অটুট থাকে। সারা দেশের যেখানে যেটুকু সম্পদ ও উদ্যোগ রয়েছে, তা যেন অকার্যকর অবস্থায় না থাকে এবং তার অপচয় না ঘটে। দুর্নীতি এবং কালোবাজার যেন আমাদের জাতীয় জীবনকে নিরক্ত এবং অকেজো করে না তোলে। এ আলোচনাগুলিই দেশের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি। আমরা চাই ভবিষ্যৎদৃষ্টি এবং বলিষ্ঠ আশাবাদ।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১ই সেপ্টেম্বর জাহাজ থেকে নামার পর মার্সেই-এ গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যে-প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমার বোন লিখে শেষ করেছেন। সেই বিবরণ হতে আমি একটি আংশিক চিত্র এখানে তুলে ধরছি, যা আমার আগে দেওয়া বর্ণনাটি সম্পূর্ণ করবে :

"গান্ধী তাঁর খাটের উপর বসে (স্নানঘরের পাশে তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে), শরীর আবৃত বড় এক সাদা কম্বলে পা-দুটো হাঁটু থেকে মোড়া। মাঝে মাঝে একটা রোগা পা-কে বেরোতে দেখছি, আবার তখুনি তা বিছানার চাদরের মধ্যে লুকোচ্ছে। হাতদুটোও রোগা, তবে বেশ সূক্ষ্ম অর্থাৎ একেবারেই স্থূলে নয়, এবং ঠান্ডা। বাহুদুটো তো প্রায় মাংসহীন। গায়ের রঙ ফর্সাই বলা চলে। গোল মাথাটি কামানো, শুধু অল্প একগোছা কাঁচাপাকা চুল একেবারে মাথার মধ্যিখানটায়। নাকটা লম্বা ও তলার দিকে মোটা, গোঁফে ঢাকা ঠোঁটের উপরিভাগে এসে তা পড়েছে—দাঁত কম (সামনের দিকে তো রীতিমত ফোকলা—তবে সে-ফোকলা দাঁত তিনি সর্বক্ষণই দেখাচ্ছেন, যখনি লোকের মুখের দিকে চেয়ে হাসেন)। ধাতব ফ্রেমের চশমার মধ্যে চোখদুটো খুব জীবন্ত। চেহারাটা না তেমন আকর্ষণ করার মত, না তেমন ঘৃণা ধরানোর মত—কিন্তু শীগ্‌গিরই বুঝব এ-সবের কিছুতেই কিছু যায় আসে না।—আসলে তিনি যেমন, সেটাই যেন ভালো : তাঁর এই বাইরেটা দেখতেই আমাদের সময় যায়।

"কী নামে তাঁকে ডাকি ভেবে না পেয়ে বলে বসি : 'আপনাকে কি বাপু বলে ডাকতে পারি? অবশ্য আমি তেমন খুকী আর নই, কিন্তু......' উনি তখন মধুর হেসে বাঁ হাত দিয়ে আমায় বুকের কাছে টেনে নিলেন—হাতটা রোগা হলেও বেশ শক্ত—কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মাথাটাকে বুকে ঠেকিয়ে রাখলেন। আমি খুব অভিভূত বোধ করছিলাম।

"(মার্সেই-এ ছাত্রদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময়) তিনি অনায়াসে টেবিলের উপর উঠে একটা বেতের চেয়ারে বসলেন। পরে গম্ভীর পরিষ্কার স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন—আগে যেমন শুনেছিলাম, কণ্ঠ তেমন ক্ষীণ একেবারেই নয়, কারণ সব কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তবে তাঁর শক্তির অপব্যয় না করতে যে তিনি শিখেছেন, সেটা বোঝা যায়।

"প্রিভা দেবদাসের (গান্ধীর ছেলে) কাছে জানতে চান, আশ্রমে তাঁর অন্যান্য যুবকদের প্রতি গান্ধীর ব্যবহারে কিছু তারতম্য আছে কি না। দেবদাস জানান, 'উনি আমাদের সকলকেই ও'র নিজের ছেলের মত দেখেন।' 'তাঁর বিরুদ্ধে কি কখনো সত্যাগ্রহ করেন গান্ধী?' দেবদাস ভাবলেন বেশ কিছুক্ষণ, পরে তাঁর স্মরণ হল : 'হ্যাঁ, একবার। আমি মিথ্যাকথা বলেছিলাম। উনি জানতে চান, কেন, তখন তাঁকে বলি যে, তাঁকে আমার ভয় করে। তা শুনে তিনি নিজের গালে সজোরে এক চড় মারেন—আমায় শাস্তি দিতে চানান বলেই নিজেকে শাস্তি দেন'।"

লিওনেৎ ভিলায় থাকাকালীন গান্ধীর খাবার-দাবার সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা :

১। সকাল ছ'টা বা সাতটা না'গাদ : গরম গরম এক বড় গেলাস ছাগলের দুধ (কখনো কখনো দু'বার জাল দেওয়া) এবং (তার কিছু আগে) চারটি কমলালেবুর রস।

২। সকাল দশটায় : মধু ও লেবু মিশ্রিত বা গুঁড়ো দারচিনি মিশ্রিত গরম জল।

৩। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ : একগুচ্ছ আঙুর (কখনো আরো বেশি), এক বড় গেলাস জল-দেওয়া ছাগলের দুধ এবং খেজুর (ত্রিশ থেকে চল্লিশটা)।

৪। সন্ধ্যা ছ'টা-সাতটা নাগাদ : ছোট কয়েক প্লেট নুন মিশিয়ে কাঁচা শাকসব্জী কুচি কুচি করে কাটা, বিশেষত গাজর, পাতাওলা সেলেরি (এটি গান্ধীর বিশেষ প্রিয়), শালগম (অনেকগুলো), কাঁচা টোম্যাটো। পরে কাটা দুটো বড় বড় আপেল।

যাঁরা সর্বদা বহন করেন বাদাম—ক্রীম ও মধুর শিশি। (উপরন্তু আখরোটের খোলাও ভাঙেন তিনি—আখরোট খেতে বড্ড ভালোবাসেন গান্ধী।)

এখানে যা বিশেষ দ্রষ্টব্য, আহারের সময় তিনি ভাত, রুটী, বা গমে প্রস্তুত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। (এটা গান্ধীর ধাতের সঙ্গে মেলে—কোষ্ঠকাঠিন্যে তিনি কখনোই বিচলিত বোধ করেন না।)

১লা জানুয়ারী গান্ধীর এক চিঠি পেলাম, লেখা 'পিলসুনা' জাহাজ থেকে ২০শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ তাঁর মিশরে পেঁছোনোর একটু আগে। চিঠি পড়ে সন্দেহ হল, ফ্যাশিস্টরা হয়তো গান্ধীকে বেশ ঘিরে ধরে ইতালীতে এবং তাঁর ভার দিই যে বন্ধুদের হাতে, তাঁরাও হয়তো তাঁকে বিপদের সময় তেমন আগলাননি।

"প্রিয় বন্ধু ও ভাই, আপনি কি অনুগ্রহ করে টলস্টয়ের কন্যাকে (আসলে নাতনীকে—এ'র সঙ্গে গান্ধীর পরিচয় হয় রোমে) লিখবেন এবং বলশেভিজম সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করবেন? সস্ত্রীক জেনারেল মরিস আমাদের সকলের সঙ্গেই অসাধারণ ভালো ব্যবহার করেন,—তাঁদের বাড়ীতে ঢোকার পর থেকে যেন আমরা তাঁদেরই পরিবারের লোক, এমন মনে করতে থাকি। মুসোলিনীকে আমার প্রহেলিকার মত ঠেকল। এমন অনেক সংস্কার তিনি করেছেন যা আমায় আকৃষ্ট করে—চাষীদের জন্য তো অনেক কিছু করেছেন বলেই মনে হল। অবশ্য আসলে তাঁর লৌহ হস্তের পরিচয় সর্বত্রই। কিন্তু যেহেতু সারা পাশ্চাত্য সমাজেরই ভিত্তিতে শক্তি বা হিংসা, আমার তো মনে হয় মুসোলিনীর সংস্কারগুলিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত। দরিদ্রদের নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা, অতিনগরীকরণে তাঁর আপত্তি, মূলধন ও শ্রমের মধ্যে

সহযোগিতার সংস্থাপনে তাঁর প্রচেষ্টা, এর প্রত্যেকটিই বোধহয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। আপনি যদি এ সম্বন্ধে আমায় একটু আলো দেন তো বাধিত হই। আমার আসল ভয় যেখানে, সেটা হচ্ছে এই সংস্কারগুলো হয়তো বাধ্যতামূলক—কিন্তু ... এ-সত্য প্রযোজ্য গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিই। বাইরে মুসোলিনীর দুর্দান্ত ভাবটা থাকলেও ভিতরে তিনি তাঁর দেশবাসীর সেবা করতে চান—সেইটেই আমাকে বিস্মিত করেছে। এমন কি তাঁর টেবিল-চাপড়ানো বক্তৃতাগুলোর মধ্যেও তাঁর দেশবাসীর প্রতি একটা আন্তরিকতার ভাব ও প্রেমের বহ্নি লুকানো থাকে। এটাও আমার মনে হয় যে ইতালীর সাধারণ লোকেরা মুসোলিনীর লৌহশাসনই পছন্দ করে। আপনি পত্রপাঠ আমায় উত্তর দিতে বসবেন, সেটা চাই না—অনুগ্রহ করে আপনার সময় নিন। বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্যই আমি এখুনি প্রকাশ করতে চাই না—শুধু এই প্রশ্নগুলি আপনাকে করছি এখন, কারণ আমার চেয়ে এ-বিষয়ে আপনার জ্ঞান অনন্তগুণে বেশি। —এবার অন্য কথা। আপনি যদি শীতের সময় আসতে পারেন, অর্থাৎ জানুয়ারী ও মার্চের মধ্যে, তবে আমাদের জলবায়ু নিয়ে আপনাকে বেগ পেতে হবে না, বরং হয়তো তাতে আপনার স্বাস্থ্য ভালোই হবে। প্লেনে আপনি নিশ্চয়ই আসতে পারেন, যদিও আমি পরামর্শ দেব সমুদ্রযাত্রার। যদি এ-প্রস্তাব আপনার মনে ধরে তো পরে একটি ভ্রমণসূচী তৈরি করে পাঠানো যাবে আপনার বিবেচনার জন্য।

গভীর প্রীতিসহ আপনাদের
এস, এস, 'পিলসনা', এম, কে, গান্ধী"
২০।১২।৩১

গান্ধীর বন্দী হওয়ার আগে মীরাকে যে-প্রথম চিঠিটি লিখি, তাতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার মতামত খোলাখুলি জানাই।

ইতালী এবং ফ্যাশিজম সম্বন্ধেও গান্ধীকে উত্তর লিখতে শুরু করি, যখন তাঁর বন্দী হওয়ার খবর এসে পোঁছোয়। তখন মনে হয়, এ-মুহূর্তে পরিস্থিতি এত প্রচণ্ড যে ভারতের সমস্যা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করার সময় এটা নয়, তাই চিঠিটা শেষ না করেই রেখে দিই। ৭ই জানুয়ারী গান্ধীকে একটি ছোট চিঠি পাঠালাম—চিঠিটার দুটি নকল করতেও বাধ্য হলাম—একটি পাঠালাম মীরাকে, অন্যটি সবরমতীতে এদম' প্রিভাকে। সে-চিঠিতে গান্ধীকে জানালাম আমাদের সকল শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা ভারতীয় লক্ষ্যের সাফল্যের জন্য, কারণ ভারতের সমস্যা আজ জগতের সমস্যা। চিঠির শেষে এটুকুও যোগ করলাম যে ইতালীতে তিনি ছিলেন খুব কম সময়—সব সুদ্ধ চারদিন, যার দুদিন তো ট্রেনেই কাটে—সুতরাং সেইটুকু সময়ে আজকের ইতালীকে বোঝা যা বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার রোমস্থ বন্ধু যাঁরা তাঁকে আশ্রয় দেন, তাঁরাই যদি তাঁকে এ-সব কথা ব'লে থাকেন তো সেটা আমার পক্ষে বড় দুঃখের হবে। কারণ গত গ্রীষ্মে তাঁদের সঙ্গে যখন আলোচনা আমার হয় লুগানোতে (যেটা একটা নিরপেক্ষ জায়গা) তখন তো তাঁদের সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কথাবার্তা বলতেই শুনি—তখন তাঁদের মধ্যে ফ্যাশিজম ও মুসোলিনী সম্বন্ধে ভয়ংকর এক বিরুদ্ধ ও তিক্ত ভাবই লক্ষ্য করি। আজ যদি তাঁরাই রোমে এইরকম ভিন্ন সুরে কথা বলতে শুরু করে থাকেন, তা হলে এটাই বুঝব যে যা তাঁরা বলছেন, তা বাধ্য হয়েই, সভয়ে। ফ্যাশিস্ট ইতালী সম্বন্ধে, বিশেষত গান্ধীর কর্তৃক উত্থিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আমি তথ্যাদিহলে যেসব লেখা সংগ্রহ করেছি, তা গান্ধী যদি চান তো তাঁকে পাঠাতে পারি—তাঁর কারাগারের কর্তৃপক্ষ সে লেখাগুলি তাঁর হাতে পোঁছে দিতে

স্বীকৃত হবেন কি না, সেটাও জানার দরকার।

প্যারীতে 'লিবের্তা'-কে বিদেশে ফ্যাশিজম-বিরোধী ইতালীয়দের মুখপত্র) লিখলাম, তাঁরা যেন সম্ভব হ'লে ঐ প্রবন্ধ-বহুল রচনাগুলির ইংরেজী [illegible] আমায় পাঠান—বা সেটা সম্ভব না হ'লে কোথায় তা মিলতে পারে, তা যেন আমায় জানান।

জানুয়ারী ১৯৩২—ভারতে এখন সামরিক আইন জারী হওয়া সত্ত্বেও আজ ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত গান্ধীর সঠিক খবরাখবর আমরা সমানে পেয়ে চলেছি সরাসরি ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে (প্রথম মহাদেব দেশাই, পরে তিনি বন্দী হ'লে তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে)।......

ভারত সম্বন্ধে ইউরোপীয় মতবাদ জাগিয়ে তুলি, এমন অনুরোধ আমায় সেল্লার অ্যাডিসন (কোথায় গেল ওয়েলস এবং বার্ণার্ড শ'র স্বর? হায়, ই, ডি, মরেল এর মৃত্যু এমন এক ফাঁকের সৃষ্টি করেছে যা পূরণ হওয়ার নয়!) নামক এক ইংরেজ জানান। তাঁকে লিখলাম : "আজ যে লক্ষ লক্ষ লোক বর্তমান সমাজকে অসহ্য মনে ক'রে তার পরিবর্তনের দৃঢ়সংকল্প—হয় তার পরিবর্তন, নয় তাদের মৃত্যুবরণ—তাদের চোখে ভারতের সত্যাগ্রহের পরীক্ষা এক শেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। একমাত্র *এই পরীক্ষাতেই হিংসা ব্যতীত মনুষ্য সমাজের রূপান্তর সম্ভব। এ-পরীক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, যদি তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিংসা একদিন ধ্বংস করে, অথবা ভারত যদি নিজেই তাকে গ্রহণ করতে সমর্থ না* হয়, তা হ'লে হিংসা ব্যতীত মানুষের ইতিহাসে আর কোনো সমাধানই থাকবে না, এবং একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই তখন সে-হিংসার পথ নির্ধারিত ক'রে দেবে। হয় গান্ধী, নয় লেনিন—যাই ঘটুক না কেন, সামাজিক ন্যায়কে জয়যুক্ত করতেই হবে। সেই কারণেই ভারতের দৃষ্টান্ত আরো করুণ হ'য়ে জাগে আমাদের চোখে। এবং সেই একই কারণে সামাজিক সংগতি যাঁদের হৃদয়ের স্বপ্ন, শান্তির খৃষ্টীয় বাণীর যাঁরা প্রেমিক, আজ তাঁদের সকলের প্রাণপণে ভারতকে সাহায্য করার দরকার। কারণ যদি সত্যাগ্রহের ভারত যুদ্ধে ভূপতিত হয় তো তা হবে শেষ আঘাতে ক্রুশবিদ্ধ [illegible] যীশুরই মৃত্যু—এবং [illegible] এবার আর পুনরুজ্জীবিত হবেন না। তবে কি খৃস্টানদের আজ এমনি ক'রে ডাক দিতে হবে এক অখৃস্টানকে (খৃস্টান হ'য়ে যদিও জন্ম আমার, মনে আমি আর খৃস্টান নই)?"

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩২—রোম থেকে হেলবিগ হঠাৎ এসে হাজির—বলছেন, এসেছেন শুধু আমারই সঙ্গে দেখা করার জন্য।...গান্ধীর রোম-ভ্রমণের এই বিবরণ তিনি দিলেন :

প্রথমেই, খানিকটা অবিবেচকের মত আমি জেনারেল মরিসকে টেলিগ্রামে যে-প্রস্তাবটা ক'রে বসি—যাতে তিনি রোমে গান্ধীকে তাঁর বাড়ীতে তুলতে স্বীকৃত হন—সেটা পেয়ে নাকি মরিস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে যান। টেলিগ্রামটাও নাকি আবার তাঁর হাতে এক গুপ্তচর এনে দেয়। ইতালীতে গান্ধী অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হবেন কি না, সেটা পর্যন্ত তিনি জানতেন না। (মরিসের জানা ছিল না, গান্ধীকে কোণঠাসা করার জন্য সরকারই তাঁকে *আমন্ত্রণ জানিয়ে আনছেন, এবং বিশেষত সেই কারণেই আমি মরিসের শরণাপন্ন হই।) যাই হোক, ভদ্রলোককে নাকি আমি* একেবারে ভয়ংকর বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিই, যেটা আমি কল্পনা করতে পারিনি। তিনি তখন হেলবিগ-এর পরামর্শ নিতে ছোটেন—কী করা যায়? হেলবিগ বলেন, মরিস তাঁর কর্তার পরামর্শ নিন—যেটা মরিস করেন। কর্তা তাঁকে উত্তরটা পরের দিন জানান, 'আসল কর্তার' সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করার পর। পরের দিন সকালে রাষ্ট্র পরিষদের জরুরী বৈঠক বসে এবং 'আসল কর্তা' রাজী হন। আমার টেলিগ্রামের উত্তর পেতে তাই ত্রিশ ঘণ্টা দেরী হয়।

মিলানে গান্ধী পৌঁছোলেন রাত্রে, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। স্টেশন মাস্টার তাঁকে নমস্কার জানাতে এলেন, বললেন, ইতালীতে তাঁর অবস্থানের আগাগোড়া সময়টিতে সরকারের অতিথি তিনি। প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা তাঁর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হ'ল—অথবা তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরা, যদি সেটাই তিনি পছন্দ করেন। প্রথম শ্রেণীরটিই গান্ধী নিলেন, 'কারণ খরচের দায়িত্ব তাঁর নয়।' (এ-ব্যাখ্যাটা অবশ্য হেলবিগই দিচ্ছেন, কেমনা এটাকেই তাঁর একমাত্র স্বাভাবিক মনে হয়। আসলে, গান্ধীর উপায় ছিল না, কিন্তু তিনি আমাদের বলেছিলেন, এ-ব্যাপারে কোনো আপত্তি তিনি তুলবেন না, কারণ তাঁর কিছু বলার নেই এতে—ইতালী সরকার যদি তাইতেই খুশী হন তো হন, প্রশ্নটা এমন কিছু বড় নয়।) শুধু তাঁকে একটি ভারী সুন্দর কামরাই দেওয়া হ'ল না (সাধারণ প্রথম শ্রেণীর কামরা এ একেবারেই নয়), সারা ট্রেণটাও অসাধারণ -অন্যান্য এক্সপ্রেস থেকে তা রোমে কুড়ি মিনিট আগে পৌঁছোল। মরিস ও হেলবিগ সাধারণ সময়-সূচী মনে রেখেই স্টেশনে তাঁকে নিতে আসেন, তাই তাঁরা দেরীতে পৌঁছোন। এবং এটাই তো ফ্যাশিস্ট শৃগালেরা চেয়েছিল, যাতে গান্ধী তাঁদের *হাতছাড়া হ'য়ে যান। গাড়ী থামতেই গান্ধী দেখেন, সিঁড়ির কাছে দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তাঁরা বলেন, গান্ধীকে তাঁরা নিতে এসেছেন। কোনো এক ব্যক্তি নাকি তাঁর প্রাসাদে গান্ধীকে রাখতে চান, গান্ধী তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করুন, এমন অনুরোধও তিনি পাঠাচ্ছেন এই দুই মহিলার মাধ্যমে—মহিলারা তাই গান্ধীকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী* এনেছেন। প্রাসাদটির অধিকারী আর কেউ নন, স্কার্পারই বন্ধু—যে-স্কার্পা হ'লেন ভারতে ইতালীর রাষ্ট্রদূত এবং একমাত্র যিনিই গান্ধীকে এভাবে ইতালীতে আনার পরিকল্পনার পিছনে। এদিকে মরিসের তখনো দেখা নেই, গান্ধী ব্যতীত অন্য কেউ হলে মহিলাদ্বয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে বসতেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ তো কম সেয়ানা নন, তা ছাড়া আমিও তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি আগেই—তিনি রাজী হলেন না। তিনি তাঁর কামরার কোণটিতে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে রইলেন—বললেন, রম্যাঁ রলাঁর বন্ধু জেনারেল মরিসের বাড়ীতে তাঁর ওঠার কথা আছে, এবং মরিস না আসা পর্যন্ত তিনি কামরা থেকে নামছেন না। স্টেশন কর্তৃপক্ষও কম বিড়ম্বিত নন, কারণ ট্রেণটাকে অন্য কোনো লাইনে সরাতে তাঁরা পারছেন না, ফলে অন্যান্য ট্রেণ দাঁড় করাতে হচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

ভেস্টিবিউলের কামরায় উঠে কাচের জানালার পাশে নিজের সিটটা দেখে ব্রজকিশোরের মন নতুন করে খুশি হয়ে উঠলো। নতুন করে, কারণ আগে থেকেই তার মনে অনেক খুশি ছিলো। বছরে একবারই পুজোর ছুটিতে দিল্লী থেকে তার কলকাতায় আসা হয়ে ওঠে। সারা বছর দিল্লীর নিউ সেক্রেটারিয়েটের সেই পুরনো চেয়ার-টেবিল আর নোংরা কাগজের স্তূপের সামনে তাকে থাকতে হয় চাকরির দায়ে, পুজোর ছুটিতে কলকাতায় সে ছোটে প্রাণের টানে, নাড়ির টানে।

উপরের র‍্যাকে টুকিটাকি জিনিসগুলো সে রাখলো। বড় বাক্স আর বিছানাটা আগেই কুলি মাল রাখার জায়গায় রেখে তার

মুক্তো ঝরান হাসি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পিছনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে মজুরির জন্য। তাকে এক টাকা দিয়ে, কী মনে করে সে না চাইতেই আরো একটা আধুলি বকশিস দিলো। এক মুখ হেসে নতুন করে আবার সেলাম জানিয়ে এক মুখ হেসে সে নেমে গেলো।

তারপর ব্রজকিশোর তার ঘড়ির দিকে তাকালো। ট্রেন ছাড়তে এখনো প্রায় চল্লিশ মিনিট।

জয়ন্তী ঠাট্টা করে বলেছিলো, 'অত তাড়া তোমার কীসের? নাকি এখন থেকেই আমাকে চোখের আড়াল করতে পারলে বাঁচো? সিট তো রিজার্ভ করাই আছে!'

'না-না, তা নয়। এটা আমার ছেলেবেলার অসুখ—ট্রেন ফিবার।'

হাসলে জয়ন্তীর সুন্দর দাঁতগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেন মুক্তো ঝরে।

সেই মুক্তো ঝরিয়ে জয়ন্তী বলেছিলো, 'আমি কিন্তু ট্রেন ছাড়ার দশ মিনিট আগে

কিছুতেই ইস্টিশানে পেঁছাতে পারবো না। চাঁদনি-চকে ডেন্টিস্টের কাছে বাবাকে দেখিয়ে বাড়ি পেঁছে, ইস্টিশানে গিয়ে হয়তো দেখবো ট্রেন ছেড়ে গেছে—দশটা মিনিটও হাতে পেলে হয়—'

'তোমার বাবা তো সাবালক। একা তিনি ডেন্টিস্টের কাছে যেতে পারেন না?'

'না, পুরুষরা কখনো সাবালক হয় না। বাবা'রা তো নয়ই!' বলে মুক্তো ঝরিয়ে আবার হেসেছিলো জয়ন্তী।

প্ল্যাটফর্মে নেমে বুক স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা পত্রিকার পাতা ওল্টালো জয়ন্ত। কিন্তু ছাপা হরফগুলো তার মগজে কোনো রকম রেখাপাত করলো না। বিরক্ত হয়ে এক ভাঁড়ের চা-ওলার কাছে এসে এক ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিয়ে আবার যখন সে হাতঘড়ির দিকে তাকাতে যাবে এমন সময় পিঠে মৃদু টোকা অনুভব করে আর নীচু স্বরে, 'এই বি-কে' শুনে সে চমকে ঘুরে দাঁড়ালো।

বি-কে—অর্থাৎ ব্রজকিশোর। পৃথিবীতে এই নামে একজনই তাকে ডাকে।

দেখলো সেই মুক্তো ঝরিয়ে জয়ন্তী হাসছে। বললো, 'ঘাবড়াবেন না মশাই। এখনো পাক্কা তিরিশ মিনিট আছে। ও-রকম বোকার মতো তাকাচ্ছো কেন? অন্তত এক ভাঁড় চা তো ভদ্রমহিলাকে অফার করতে পারো—'

চা-ওলা দু' ভাঁড় চা এগিয়ে দিলো। টিফিন-কেরিয়ারটা বাঁ হাতে নিয়ে, ডান হাতের প্যাকেটটা ব্রজকিশোরের হাতে তুলে দিয়ে জয়ন্তী ভাঁড়টা নিলো।

ব্রজকিশোর বললো, 'টিফিন-কেরিয়ার, প্যাকেট—ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার এই—জয়ন্তী চাটুজ্জে জাতে ব্রাহ্মণ। ব্রজকিশোর সেন জাতে বদ্যি। অতএব টিফিন-কেরিয়ারে যে পোলাও আর মাংসের কোপ্তা ব্রাহ্মণ-কন্যা রেঁধে এনেছে ট্রেনে যেতে-যেতে সেগুলো খেলে বদ্যি-পুত্রের জাত যাবে না। আর এই প্যাকেটে রয়েছে দিদির জন্যে ডালমুট—'

'আরে, কী কান্ড দেখো দিকিনি! দিদির ডালমুট দিদি দারুণ ভালোবাসে। দিল্লি থেকে যখনই কলকাতায় গেছি এই ডালমুট নিয়ে যেতে কখনো ভুল হয়নি। কী কান্ড! ভাগ্যিস তোমার মনে ছিলো—'

খুশি হয়ে মুক্তো ঝরিয়ে জয়ন্তী আবার হাসলো।

তারপর এক সময় ঘন্টা বাজলো। ট্রেন ছাড়লো। সিটে বসার আগে র‍্যাকের উপর ডালমুটের প্যাকেটটা রাখতে রাখতে দিদির কথা ভাবতে লাগলো ব্রজকিশোর।

ব্রজকিশোরের চেয়ে তার দিদি অমিয়া ঠিক পনের বছরের বড়। ব্রজকিশোরের বয়েস যখন তিন, তার দিদি বিধবা হয়ে তাদের বাড়িতে ফিরে আসেন। আট বছর বয়সে ব্রজকিশোর ইস্কুলে ভর্তি হয়। তার দশ বছর বয়সে বাবাকে সে হারায়, মা চলে গিয়েছিলেন তাকে ন' দিনের শিশু রেখে। ব্রজকিশোরের বয়স যখন এগার তার দিদি এম-এ, বি-টি, পাশ করে আনন্দময়ী হাই-ইস্কুলে ইংরিজির শিক্ষিকার চাকরি পান। ছেলেমেয়েদের জন্যে তাদের বাবা রেখে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জে একটি চার কামরার একতলা বাড়ি আর ইন্সিওরেন্স ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ব্যাঙ্কে নগদ কয়েক হাজার টাকা। এ্যাকাউট্যান্ট জেনারেলের অফিস থেকে রিটায়ার করার আগে নীচু কেরানী থেকে উন্নতি করে বছর খানেকের জন্যে তিনি সুপারিনটেনড্যান্ট হয়েছিলেন। অত-এব তাঁর পক্ষে এই সম্পত্তিটুকু রেখে যাওয়াই যথেষ্ট। তাঁর পরিবেশের কতনই বা মানুষ এতোটা পারে?

অমিয়া বুদ্ধিমতী, পরিশ্রমী ও হিসেবী। বাবার মৃত্যুর পর নিজেদের জন্য দুটো ঘর রেখে আর দুটো ঘর এক কেরানী পরিবারকে তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন। সেই সামান্য ভাড়া এবং নিজের সামান্য বেতনের টাকায় তিনি সংসার চালিয়ে এসেছেন। নগদ টাকায় অমিয়া হাত দেননি। ব্রজকিশোরকে বলতেন সে যখন বৌ নিয়ে আসবে তখন তার জন্যে দোতলায় দুটো ঘর তাঁর বাবার ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে তুলে দেবেন।

ব্রজকিশোরের মনের খুশির সঙ্গে কোথা থেকে যেন একটা অস্বস্তি এসে জুড়ে বসলো। ফিকে নীল রঙের শার্শির কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তার মনে হোলো পৃথিবীটা যেন হুড়মুড় করে পালিয়ে যেতে ব্যস্ত। অকারণে দাঁড়িয়ে র‍্যাক থেকে ডালমুটের প্যাকেট নামিয়ে খানিক নড়া-চাড়া করে আবার সেটাকে র‍্যাকে তুলে রাখলো। জয়ন্তীর মুক্তো-ঝরানো হাসিটা মনে পড়লো আর সেই সঙ্গে মনে পড়লো তার দিদির কাপড়ের কালো পাড় আর কালো ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমাটার কথা।

ইস্কুলে যতদিন ব্রজকিশোর পড়েছে ততদিন দিদির কাছেই পড়েছে। ম্যাট্রিকের পর সায়েন্স নেওয়ায় দিদির কাছে সে আর বিশেষ সাহায্য পায়নি। তবে অংকে তার বরাবরই মাথা পরিষ্কার। নিজের চেষ্টাতেই ম্যাথম্যাটিক্স-এ বি-এস-সি ও এম-এস-সি'তে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হবার পর দিল্লির নয়া সেক্রেটারিয়েটে জুনিয়ার স্ট্যাটিশটি-শিয়ানের কাজ যখন সে পেয়ে গেলো সেটা পাঁচ বছর আগেকার কথা। এখন তার আঠাশ বছর। তা হলে তার দিদির—?

তার মার কথা মনে করতে গেলেই দিদির শীর্ণ মুখটার কথা মনে পড়ে যায় আর তাঁর শাড়ির কালো পাড় আর কালো ফ্রেমের মোটা লেন্সের চশমাটার কথাও। গতবার যখন দেখেছিলো তখন তাঁর নাকের দু'পাশ থেকে স্পষ্ট দুটো রেখা নেমে আসতে সে লক্ষ্য করেছে আর ডান কানের পাশে কয়েকটা পাকা চুল।

পৃথিবীটা যে-রকম হুড়মুড়িয়ে ট্রেনের পাশ দিয়ে পালিয়ে যেতে ব্যস্ত, জীবন কি সে-রকমই তার সমস্ত রূপ-রস নিয়ে তার দিদির পাশ দিয়ে একটা অশোভন ক্ষিপ্রতায় পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে? নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। বাস্তবিকই ভারি একলা তার দিদি। জীবন তাকে কালো-পেড়ে শাড়ি আর কালো ফ্রেমের চশমা, নাকের দু'পাশে গভীর রেখা আর কানের পাশে কয়েকটা চুল ছাড়া আর কিছুই দেয়নি।

প্রথমে ভেবেছিলো জয়ন্তীর কথাটা অনায়াসে খুশির সঙ্গেই দিদিকে সে বলতে পারবে। কিন্তু ট্রেন যতই কলকাতার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো ততই ব্রজকিশোরের মনে হতে লাগলো সেটা অতি দুরূহ কাজ।

দিদি নিশ্চয়ই যে খুব খুশি হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর খুশি হয়ে হাসবার সময় চোখ থেকে পুরু লেন্সের চশমাটা আঁচলে যে-রকম ঘষে থাকেন, সে-রকম করেই নিশ্চয় ঘষবেন। আর সে, ব্রজ-কিশোর, লক্ষ্য করবে তাঁর নাকের দু'পাশের রেখাগুলো আরো গভীর হয়ে উঠেছে এবং কানের পাশের আরো কতকগুলো চুল পেকেছে।

তখন জয়ন্তীর মুখ আর তার মুক্তো-ঝরানো হাসির কথা মনে পড়লে ব্রজকিশোর কি মনে মনে অস্বস্তি অনুভব না করে পারবে? দিদি ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে আর আমি ক্রমাগত জিতে যাচ্ছি—ব্রজকিশোরের মনে হোলো এটা অতিশয় খাপছাড়া, অর্থ-হীন, বেয়াড়া একটা কান্ড।

রাতে টিফিন কেরিয়ার খুলে জয়ন্তীর রাঁধা পোলাও আর মাংসের কোপ্তা চামচ দিয়ে খেতে খেতে ব্রজকিশোর হঠাৎ ভাবতে চেষ্টা করলো জীবনে তার দিদির কোনো শখ আছে কিনা, কোনো অবসর আছে কিনা। কথাটা এর আগে কখনো ভাবেনি বলে তার অবাক লাগলো। বাস্তবিকই তো, তার দিদির জীবনে অবসর কোথায়, শখ কোথায়? সেই কবে থেকে, যখন তাঁকে কিশোরীই বলা চলে—জামা-কাপড়ের শখ তাঁর ঘুচে গেছে। কালো-পাড় শাড়ি আর শাদা ব্লাউজে জামা-কাপড়ের শখ কোনো মেয়ের মিটতে পারে না। সিনেমা দেখলে

মাথা ধরে, তাই সিনেমায় তিনি যান না। আর অবসর? দিদির জীবনে অবসরটা কোথায়? সকালে তো নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই—এ ঘর, ও ঘর, রান্নাঘর করতে করতেই তো তাঁর ইস্কুলের সময় হয়ে যায়। সন্ধ্যায় অন্য লোকদের যখন অবসর তখন তো তিনি হয় ব্রজকিশোরের জামায় বোতাম বা ঘরের-পরা নিজের ছেঁড়া শাড়ি সেলাই বা ঐ জাতীয় কাজ নিয়ে বসেন। নইলে একগাদা ইস্কুলের খাতা। বছরের পর বছর ধরে শখহীন, অবসরহীন, অর্থহীন জীবন একটা মানুষের যে কেটে যাচ্ছে, সে-কথা মনে হলে যে-কোনো লোকই দমে যায়।

ব্রজকিশোরও দারুণ দমে গেলো। পোলাও আর মাংস'র কোপ্তার স্বাদ হারিয়ে ফেললো। বুঝি বা জয়ন্তীর সেই মুক্তো-ঝরানো হাসির কথাও গেল ভুলে।

তবু, পুজোর সময় সে যখন কলকাতায় আসে—তার দিদির মুখে তখন হাসি ফোটে। সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে চা-সহযোগে যখন দিল্লির ডালমুট কুড়মুড় করে চিবোন তখন তাঁর মুখটা অন্যরকম দেখায়। কী রকম যেন ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ!

রাতে ভালো ঘুম হোলো না। ভেস্টি-বিউলে বসে বসে কারই বা ঘুম আসে? সে মনে করতে চেষ্টা করলো এটা যেন প্লেনের সিট। প্লেনে তো সবাই এই রকম চেয়ারেই বসে। তিন-ঘণ্টা চার-ঘণ্টা ছাড়া-ছাড়া এক দেশ ছাড়িয়ে অন্য দেশে পৌঁছয়—যে-সব দেশের ভাষা আলাদা, পোশাক আলাদা, এমন কি সময়ও আলাদা।

সকালে কোন একটা ইস্টিশান থেকে সে পর পর দু ভাঁড় চা খেলো। কিন্তু মুখ একেবারে বিস্বাদ। গতকাল জয়ন্তীর রান্না সেই পোলাও-কোপ্তা না খেলেই বুঝি ভালো হোতো। খবরের কাগজ কিনলো। কিন্তু কোনো খবর মন দিয়ে পড়তে পারলো না। জানালার বাইরের হুড়মুড়িয়ে পালানো পৃথিবীটাকে দেখতেও তার ভালো লাগলো না। সে চোখ বুজলো। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে ভেসে এলো, 'এই বি-কে! অত তাড়া কিসের?' আর সেই মুক্তো-ঝরানো হাসি। আর তারপরেই তার দিদির সেই কালো-পেড়ে শাড়ি, সেই কালো-ফ্রেমের চশমা আর সন্ধ্যায় সেই পুরনো মাদুরে বসে তার জামার বোতাম বসাবার ভঙ্গীটা।

সমস্ত রাত তার একটুও ঘুম হয়নি। আজ দিনের বেলায় সত্যি-সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

আর সে কী ঘুম! তার সুরু নেই, শেষ নেই! বসে বসে কেউ ও-রকম ঘুমতে পারে?

তার জন্ম-দুঃখী দিদিকে কী করে জয়ন্তীর কথা সে বলবে?—দিদি কি হেসে বলবেন, 'এইবার তোদের জন্যে দোতলায় সেই দুটো ঘর তুলবো?'

আর, দিদি, তুমি—তুমি কি চিরকালই একতলায় সন্ধ্যেবেলায় মাদুরে বসে মোটা লেন্সের চশমা পরে আমার জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে যাবে?

'অ মশাই, শুনছেন! উঠুন। হাওড়া এসে গেছে। দয়া করে আমার সুটকেশের ওপর থেকে পা-টা নামান!' পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্রজকিশোরকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন।

ধড়মড় করে জেগে উঠলো ব্রজকিশোর।

দিল্লি না কলকাতা প্রথমে ঠাহর করতে পারলো না।

কামরার অর্ধেক লোক নেমে গেছে।

এক কুলি জানতে চাইছে তার মাল-পত্রের টিকিট কোথায়।

আর আশ্চর্য, জয়ন্তী তার সামনে দাঁড়িয়ে এক মুখ হাসছে—মুক্তো-ঝরানো হাসি। আর বলছে, 'আশ্চর্য ছেলে যা হোক—হাওড়ায় এতোদিন পরে পৌঁছেও বেহুঁশ ঘুম!'

হ্যাঁ জয়ন্তী।—না জয়ন্তী নয় দিদি! কিন্তু সেই কালো ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমাটা? আর সেই কালো-পেড়ে শাড়ি? মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করলো জয়ন্ত।

যেন তার মনের প্রশ্ন বুঝতে পেরেই দিদি পাশের ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দিলেন। 'অরিন্দমকে মনে আছে তোর? আমাদের ইস্কুলের সেক্রেটারি। আমার সেই চশমা-জোড়া কেড়ে-বিগড়ে কনট্যাক্ট লেন্স করে দিয়েছেন। আর বলেন হালকা নীল রঙের শাড়ি ছাড়া আমি নাকি আর কিছু পরতে পারবো না। দ্যাখ দিকিনি—এই বুড়ো বয়সে কী জ্বালাতন।—পুরুষরা কখনো সাবালক হয় না!' তারপর ব্রজকিশোরের হাত ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'তোকে মস্ত একটা সারপ্রাইজ দেবো।—গতকাল আমাদের রেজেস্ট্রি হয়ে গেছে—'

চোখের ধর্ম দেখা। চোখের সেই ধর্ম দিয়ে ব্রজকিশোর নতুন দৃষ্টিতে চাইলো তার দিদির দিকে। কে তাঁর নাকের দুপাশের সেই গভীর রেখা দুটো মুছে দিয়েছে? আর কানের পাশের সেই পাকা চুলগুলোই বা পালালো কোথায়?

তার দিদির জীবন তা হলে পড়ন্ত দিনের মতো শেষ হয়ে আসেনি? গোধূলির পরেও প্রতিপদের চাঁদ তাহলে সেখানে উঠছে!

'দিদি, এই তোমার পাওনা সেই দিল্লির ডালমুট', প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলো ব্রজকিশোর।

আর দিদির হাসি দেখে জীবনে এই প্রথম দারুণ অবাক হোলো ব্রজকিশোর। তাঁর হাসিতেও মুক্তো ঝরছে।

জয়ন্তীর কথা আজ আর তাঁকে বলা হবে না।

জুডি ক্লাইভ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, কিছুতেই নয়। এই ত' চব্বিশ ঘন্টা আগেও সে ছিল সুন্দরী তরুণী— এখন সে লোলচর্মা বৃদ্ধা, মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে। এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে নিস্কৃতি নেই, আর ত' মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকী এ বিষয়ে জুডি নিঃসন্দেহ।

আর হিউ—ওঃ তার কথা ভাবতেও যেন গা শিউরে ওঠে। তাকে বাঁচানোর কোনো পথ নেই, কিছুই সে করতে পারবে না। হয়ত ও বুঝবে, বুঝতে পারবে, তখন কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। হিউ কি বুঝতে পারবে যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসত সে একটা কুৎসিৎ ডাকিনীর পাল্লায় পড়ে রূপান্তরিত হয়েছে! কি কুক্ষণেই নির্বোধের মত সে কলহ করেছিল।

হিউ-র সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে আসার মতলবে এই পল্লী অঞ্চলে চাকরী নিয়ে চলে এসেছিল, এক রকম কোনো খোঁজ-খবর না নিয়েই। মা ও বাবা দুজনেই নতুন চাকরী নেওয়ার বিরোধী ছিলেন, তাঁরা অনেক করে বারণ করেছিলেন, কিন্তু বাড়ির আবহাওয়া সইছিল না জুডির, সব যেন কেমন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইন্টারভিউর জন্য যখন গিয়েছিল তখন ওপর ওপর চাকরীটা ভালোই ত' মনে হয়েছিল। একজন পল্লীবাসী লেখক সেক্রেটারীর কর্মখালি জানিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। উইলট সায়রের শেষ প্রান্তে এই প্রাচীন বাড়িটা খুঁজে বার করেছিল জুডি। গ্রাম থেকে একটু দূরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

জুডিকে পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, লেখক জেরোম হ্যালকেট তার অপেক্ষায় ছিলেন। লোকটি বেশ লম্বা, গায়ের রঙ কিঞ্চিৎ অনুজ্জ্বল, মুখে লাজুক ভঙ্গী।

করমর্দন করে ভদ্রলোক বলেছিলেন— আপনার ত' বয়স অনেক কম, আর এই পল্লী অঞ্চলের শান্ত পরিবেশ কি আপনার ভালো লাগবে? একটু একা-একা ঠেকতে পারে।

জুডি সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছিল—লণ্ডনের জনাকীর্ণ শহরতলীর হট্টগোলের চেয়ে অনেক ভালো, বেশ একটা চেঞ্জ হবে, আর তা ছাড়া সপ্তাহান্তে হয়ত বাড়ি যেতে পারব?

লেখক ভদ্রলোক বলেছিলেন—নিশ্চয়ই। আপনার রেফারেন্স ত' দেখছি বেশ

ছায়া কালো কালো

পি. ফেন্টন নব-কলেবরে ডাকিনী

ভালোই—তারপর প্রশংসাপত্রটি নাড়াচাড়া করতে করতে বলে উঠলেন—তবে আপনার ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে পারে। আগে থেকে আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া ভালো মনে হল। জুডি বলেছিল—ক'দিন না হয় করেই দেখাই যাক।

লেখক বলেছিলেন—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আমি আপনাকে এক মাসের ট্রায়ালে নেব—যদি তার ভেতর কারো দিক থেকে কোনো অসুবিধা হয় তখন অন্য ব্যবস্থা করতে ক্ষতি কি!

জুডির কাজটা এইভাবে হয়ে গেল। কিন্তু বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিল তখন কেমন একটা বেয়াড়া অনুভূতি মনে জাগল, কে যেন ওর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে। হয়ত লেখক ভদ্রলোক পড়ার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন, তখন মনে পড়ল যে পড়ার ঘরের জানলাগুলি পিছন দিকে।

মরুকগে যাক—এই ভেবে এই উদ্ভট চিন্তাকে তখনকার মত মন থেকে বিসর্জন দিয়েছিল জুডি।

পরের রবিবার মার্কেট চেয়ারিং-এ যাবার ট্রেন ধরেছিল জুডি। তার আশা ছিল মিঃ হ্যালকেট হয়ত স্টেশনে হাজির থাকবেন। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে কেউ-ই ছিল না। জুডি স্টেশন গেটের দিকে এগিয়ে গেল। গেটের কাছাকাছি পৌঁছাতে স্টেশন গেটের সামনের বেঞ্চিটায় যে বৃদ্ধা মহিলা বসেছিলেন তিনি উঠে পড়ে তার দিকে এগিয়ে এলেন।

গভীর গম্ভীর গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন—মিস ক্লাইভ, তাই না?

জুডি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিহ্বল ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছিল—হাঁ।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি —হেসে বৃদ্ধা বললেন—আমি মিসেস হ্যালকেট।

জুডি একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিল—ও, তা আমি জানতাম না, মিসেস আছেন। মানে, সেদিন কিছু শুনিনি!

ভদ্রমহিলা সংশোধন করে বললেন—আমি জেরেমির মা। আমি আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। আমাদের গাড়িটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মিসেস হ্যালকেট আর কোনো কথা না বলে গেটের দিকে এগিয়ে চললেন। জুডির তখনও ন যযৌ ন তস্থৌ ভঙ্গী। কেমন একটা আবেগ মনে জেগেছিল। ও'কে অনুসরণ না করে ফিরতি ট্রেনেই বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক। বৃদ্ধার চোখ দুটো যেন গিলছে। কী ভয়ানক চোখ রে বাবা। কিন্তু পর মুহূর্তেই হাসি পেল, সেই হাসির হিল্লোলে সারা অঙ্গ কেঁপে উঠল।

স্টেশনের বাইরে একটা প্রকাণ্ড হামবার স্নাইপ গাড়ি দাঁড়িয়ে, স্টীয়ারিং-এ বসেছিলেন জেরেমি, জুডিকে দেখে তিনি নেমে এলেন। প্রশ্ন করলেন—কই আপনার লগেজ-পত্র কই?

জুডি বলেছিল—প্ল্যাটফর্মে রাখা আছে।

জেরেমি বললেন—মার ঐ এক খেয়াল, কেউ এলেই স্টেশনে আসা চাই, সব ভালো করে দেখা চাই। তারপর একটু সলজ্জ ভঙ্গীতে মৃদু গলায় বললেন—বোধহয় কৌতূহল নিবৃত্তি হয়। আজকাল কিছুই ত' তেমন করার নেই।

জুডি ক'দিনেই বুঝল জেরেমি হ্যালকেট লোকটি মন্দ নয়, ও'র সঙ্গে কাজ করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, বেশীক্ষণের কাজও নয়।

মার্কেট চেয়ারিংস জায়গাটা চমৎকার, তার ওপর সুন্দর বসন্তকাল। স্থানীয় টেনিস ক্লাবে এবং উইমেনস ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিল জুডি। এইখানেই স্থানীয় যাজকের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। ভদ্রমহিলা চায়ের আসরে আমন্ত্রণ করলেন।

মিসেস হ্যালকেটকে তেমন বেশী দেখা যেত না, নিজের ঘরে বসেই তিনি ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ সেরে নেন আর তিনটের আগে ঘর থেকে ওঠেন না।

জেরেমি একদিন সেক্রেটারিকে বলেছিল—মার হার্টটা একটু দুর্বল, তবে খুব সাবধানী মানুষ। সাবধানে থাকেন সব সময়।

জুডি তাঁর উপস্থিতিতে একটু অস্বস্তি বোধ করে। মিসেস হ্যালকেট এমনি বেশ ভদ্র তবে ওর ভেতর কতকগুলি এমন বস্তু আছে যা জুডিকে উৎপীড়িত করে।

যাজকের স্ত্রী যাজকের অপরিচ্ছন্ন অথচ সূর্যালোকিত আবাসে চায়ের টেবিলে বসে আলোচনা প্রসঙ্গে জেরেমির জননীর কথা তুললেন।

বললেন—মিসেস হ্যালকেটকে কেমন লাগে?

জ্যুডি সতর্ক ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছিল—ওঁর জন্য আমাকে তেমন বিশেষ কিছুই করতে হয় না, উনি ত' বেশ ভালো মানুষ মনে হয়। তা ছাড়া রোগে একরকম অথর্ব।

যাজকের স্ত্রী মিসেস স্কট শুকনো গলায় বললেন—হাঁ, তাই ত' শুনে আসছি অনেক কাল ধরে। শরীরের ওপর বেশ যত্ন আছে। আচ্ছা তোমার কাছে চেয়ারিংসটা একটু বেশী নিরিবিলি মনে হয় না?

জ্যুডি জবাব দিয়েছিল—না, তেমন আর কি—আমি প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাই, তা ছাড়া স্থানীয় টেনিস ক্লাবে ভর্তি হয়েছি, একরকম কেটে যায়।

চিন্তিত ভঙ্গীতে যাজক পত্নী মৃদু গলায় বললেন—কিন্তু তোমার মত একজন অল্প বয়সী মেয়ের পক্ষে একটু বেশী পীড়াদায়ক নয় কি। তোমার আগে আরো অনেকে সেক্রেটারির কাজ নিয়ে এসেছে কিন্তু বেশী দিন টিঁকতে পারেনি, বলেছে, বড্ড নিরিবিলি, ভারী নিরালা। কিংবা মিসেস হ্যালকেটের সঙ্গে বনিবনা হয়নি।

জ্যুডি কাঁধ নেড়ে একটু হালকা সুরে বলেছিল— যারে—উনি ত' আর আমার মনিব নন। আর জেরেমি মানুষটাও মন্দ নয়।

গৃহস্বামিনী বললেন—হাঁ, জেরেমি মানুষ ভালো। তারপর আবার অন্য অনেক প্রসঙ্গ আলোচিত হল।

জ্যুডি যখন বিদায় নিচ্ছে তখন আবা

ঘুরে ফিরে ঐ কথাটাই তুললেন যাজক-পত্নী, বললেন—মা, যদি কখনও কোনো রকম সাহায্যের দরকার হয় আমার কাছে চলে আসবে। ইতস্ততঃ করবে না। তোমার বয়সটা বড় কাঁচা, নিজের পায়ে পা দিয়ে দাঁড়ানোর সামর্থ্য এখনও হয়নি।

জুডি জবাবে বলেছিল—ধন্যবাদ। আপনার করুণা আমি ভুলব না।

বাড়ি ফেরার পথে জুডি মনে মনে ভেবেছে মিসেস স্কটের এত মাথা ব্যথা কেন। বাড়িতে পা দেওয়ার মুখে জেরোম দাঁড়িয়েছিলেন বললেন—কি রকম টি-পার্টি হল? কেমন লাগল?

জুডির মনে হল ভদ্রলোক ওর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। সে জবাবে বলেছিল—ধন্যবাদ। মিঃ হ্যালকেট আজ এখন কি কিছু কাজ আছে?

—না, না, তেমন কোনো কাজ নেই। তবে মার একটা আদেশ আছে, তিনি আপনাকে আজ নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন—ওঁর সঙ্গেই একত্রে খাবেন।

—কেন? কেন বলুন ত'? হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল জুডি!

জেরোম বললেন—আপনার সঙ্গে ত' ওঁর তেমন দেখা-শোনা হয় না। একটু আলাপ-টালাপ করতে চান এই আর কি!

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে জুডি বলে—ও তাই নাকি! তারপর মনের দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে মনের কথা চাপা দেওয়ার জন্যই জড়ানো গলায় প্রশ্ন করে—মিসেস হ্যালকেট কোন সময় সাপার খান?

—এই আধঘন্টা পরে আর কি! আমি আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দেব।

অতএব আধ ঘন্টা পরে জুডি মিসেস হ্যালকেটের দরজায় টোকা দিল—তারপর ভেতরে প্রবেশ করে দেখল যে আমন্ত্রণ-কর্ত্রী জানলার ধারে একটা কোচে গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে আছেন আর ঘরটা আলোয় আলোকিত। প্রকান্ড সেকালের ঘর।

মিসেস হ্যালকেট মধুর ভঙ্গীতে হেসে বললেন—মাই ডিয়ার, তুমি বড় ভালো মেয়ে, তুমি যে এসেছ ভারী ভালো লাগল।

তারপর পাশের সোফাটি এগিয়ে দিয়ে বললেন—এসো এইখানে আমার পাশটিতে বসো। এই বলে প্রায় টেনে বসালেন নিজের পাশে।

এরপর বললেন—শুনলাম নাকি আমাদের এখানকার যাজক মশাই-এর স্ত্রী মিসেস স্কটের ওখানে তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ হল। মিসেস স্কট ভারী চমৎকার মানুষ, তবে দোষের মধ্যে বড় পরচর্চা করেন, মিথ্যা রটনায় ওঁর জুড়ি নেই। যাই হোক, তোমার বেশ বন্ধু-বান্ধব হচ্ছে, পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে—এই সব বেশ ভালোই ত'।

ঠিক সেই মুহূর্তে দাসী নৈশভোজের উপকরণাদি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

খেতে খেতে বৃদ্ধা বেশ কৌশল সহকারে মেয়েটির পেটের ভেতর থেকে কথা টেনে বার করতে লাগলেন। বাড়ির কথা, বাপ-মার কথা, সেই একমাত্র সন্তান কিনা এই সব নানান কথা।

জুডি জানালো যে পনের বছর বয়সের একটি ছোট ভাই আছে তার।

মিসেস হ্যালকেট একটু টিটকিরি ভরা সুরে বললেন—তা, মালক্ষ্মী, তোমার মত এমন কাঁচা বয়েসে কোনো পুরুষ বন্ধুটন্ধু জোটেনি?

জুডি একটু ইতস্ততঃ করে, কাউকে হিউর কথা বলতে চায়, কিন্তু তবু—। সে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল—আমার এক-জনের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল, তারপর ভেঙে গেছে—

—আহা-হা! কী দুঃখের কথা। তা নিশ্চয়ই সেই নিয়ে তোমার মনে বেশ কষ্ট আছে।

জুডি জবাব দেয়—তা আছে। তবে ব্যাপারটা আপনাকে বলি—

এই বলে সংক্ষেপে জুডি আগাগোড়া বৃত্তান্ত বলে যায়।

মিসেস হ্যালকেট আবার বলে উঠলেন—আহা-হা। তা তুমি কেন সেই ছোকরাটিকে সব বুঝিয়ে শুঝিয়ে একটা পত্র দাও না কেন!

জুডি প্রশ্ন করে—তা, আপনি কি মনে করেন একটা চিঠি দেওয়া উচিত?

—নিশ্চয়ই। তোমরা দুজনেই ছেলে-মানুষ। প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ—নিশ্চয়ই তোমার কোনো রকম অসুখ-বিসুখ নেই। দেখে ত' ভালো স্বাস্থ্যই মনে হয়।

কথাগুলি এমনই হঠাৎ বললেন মিসেস হ্যালকেট যে জুডি সচকিত হয়ে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, উত্তর দিতে পারল না বটে, তবে জেরোমের মার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবশেষে সে দম নিয়ে বলে—না, অসুখ থাকবে কেন? কোনো অসুখই নেই। মানে, কখনও কোনো রকম সাংঘাতিক অসুখ করেনি. ত', টাইফয়েড, পক্স, হাম ইত্যাদি?

—জুডি জোর গলায় বলে—না কখখনো নয়। আমি একেবারে টাট্টু ঘোড়ার মত শক্ত সমর্থ।

মিসেস হ্যালকেট তবু বলে চলেছেন—তোমাদের ফ্যামিলি ইতিহাস কেমন, দুদিক দিয়েই, অর্থাৎ পিতৃকুল ও মাতৃকুলে সবাই বেশ সুস্থ ত?

জুডি এইবার ক্ষেপে যায়। সে বলে ওঠে—মিসেস হ্যালকেট, আমি আপনার ছেলের সেক্রেটারীর কাজ নিয়ে এসেছি, তা আমার যোগ্যতার হিসাব নিতে গিয়ে আমার পিতৃকুল-মাতৃকুলের স্বাস্থ্যের হিসাবের প্রয়োজন আছে?

বৃদ্ধা রমণীর চোখটা সহসা জ্বলে উঠল—একেবারে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জুডির মুখের দিকে তাকালেন। অন্ধকারে সহসা যেন একটা টর্চের আলো চোখে এসে পড়ল। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন—আহা। আমাকে মার্জনা করো। আমি বুড়ো মানুষ।

এই দৃষ্টির সামনে জুডির বুকটা কেঁপে ওঠে। কী ভীষণ এবং কী ভয়ংকর! বুড়ো অথচ জ্ঞানের সাগর। জুডির মুখের ওপর সেই জ্বলন্ত চোখ মেলে বললেন—আমাকে ক্ষমা করো, আমি নিজে রুগ্ন মানুষ। শরীর নিয়ে কথা বলা আমার একটা বাতিক। সারাজীবনই ত' ভুগে মরছি।

মিসেস হ্যালকেটের চোখ দুটো কালো হীরের মত জ্বলন্ত, তার ভিতর জ্যোতি-বিন্দু, যেন জুডির মস্তিষ্কের ভিতর গিয়ে হাতুড়ি পেটা করছে। জুডির মনে হল সে যেন চেতনা হারিয়ে ফেলছে, মাথা ঘুরছে, পায়ের নীচে মাটি নেই, সে শূন্যে প্রলম্বিত। সে ভীষণ আতংকিত হয়ে

পড়ল। তার গলা শুকিয়ে গেছে, বুকটা কেমন করছে, অতি দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এখনই একবার যাজকদের বাড়ি যাওয়া দরকার। এ যেন এক ভীষণ আবর্তের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এই আত্মসংগ্রাম সত্ত্বেও একটা প্রচণ্ড দৌর্বল্য তাকে গ্রাস করছে, সে কেমন যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে।

—মিস ক্লাইভ, আমার দিকে তাকাও। আমার চোখের দিকে তাকাও, হাঁ, এই বেশ।

জুডি সংগ্রাম করছে, আত্মরক্ষার সংগ্রাম, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হল। ব্যর্থ হল তার সকল সংগ্রাম। বৃদ্ধা নিষ্ঠুর কণ্ঠে হেসে উঠলেন—বীভৎস হাসি, যেন প্রেতিনীর অট্টহাস্য।

বললেন—ঠিক যা খুঁজছিলাম তাই পেয়েছি এতদিন পরে। বেশ স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী। বয়সটাও কাঁচা, একেবারে ঠিক বয়স। খুব ছোট নিয়ে কাজ নেই—কিভাবে গড়ে উঠবে কে জানে। একেবারে কুড়ি-বাইশ বছরই ভালো। সব দিক থেকে বাড়টা সম্পূর্ণ হয়েছে. শারীরিক গড়নটা ঠিক হয়ে গেছে। অন্য সেক্রেটারিগুলোর বয়স বেশী ছিল। একটা ভালো ছিল, তবে বড় ক্ষীণজীবী। তোমার শরীরটা একেবারে নিখুঁত, এমন পারফেকট মেয়েই ত' খুঁজছিলাম এতদিন।

একটু ঝুঁকে পড়ে জুডির দিকে তাকিয়ে লোভীর ভঙ্গীতে হাসতে থাকেন মিসেস হ্যালকেট।

তিনি আবার সেই কুৎসিৎ হাসি হেসে বললেন—অনেকদিন ধরে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে আসছি আর বরাবরই আমার সাফল্য হয়েছে। আমার এই পরীক্ষা বড় ভীষণ। এইবার আমার এই এক্সপেরিমেন্টের অংশভাগী হবে তুমি।

আমি একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়েছিলুম। ভেবেছিলুম বোধহয় মেয়ে আর জুটবেই না। তারপর তোমাকে ট্রেন থেকে নামতে দেখলাম, আমার আশা হল।

আমার হার্টটা ঠিক নেই, বেশীদিন আর বাঁচার ইচ্ছা নেই, তাই তাড়াতাড়ি একটা কিছু ঠিক করা দরকার ছিল। আগের মেয়েটাকে নিয়ে একটু ভুল হয়েছিল, মেয়েটার একটা জন্মগত হৃদরোগ ছিল, আগে ধরতে পারিনি, যখন জানলাম তখন আর সময় নেই, দেরী হয়ে গেছে অনেক।

জুডি অতি কষ্টে প্রায় ফিস ফিস করে বলে—কি সব বলছেন আপনি?

একটা অদম্য শংকায় জুডির সারা দেহ কম্পমান—সে উঠে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু কি এক অদৃশ্য শক্তি তাকে যেন বেঁধে রেখেছে। সে যেন নিজের দেহ থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে, সেইখান থেকে দেখছে মিসেস হ্যালকেট আর তার নিজের দেহটাকে। দেখছে মিসেস হ্যালকেট কথা বলছেন আর সে কেমন নিষ্প্রাণ ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। যেন নিজের দেহটার দুটি বিভিন্ন অংশ হয়েছে। তাকে আর শত চেষ্টাতেও জোড়া লাগানো যাচ্ছে না।

মিসেস হ্যালকেট জানতে চান—আমার বয়সটা কত বলো ত?

জুডি বোকার মতো বলে—বয়সটা কত? —আমি জানি না, কত হবে ষাট-বাষট্টি—?

বৃদ্ধা নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে উঠলেন—ষাট—? এই তোমার আঁচ কেমন?

জুডি তেমনই ফিসফিসিয়ে বলে—হাঁ, তাই ত'। ষাট-ই হবে হয়ত।

ষাট—? ষাট শতাব্দী হতেও পারে? আমি পিরামিড তৈরী হতে দেখেছি জানো? আমার চোখের ওপর মিশর তলিয়ে গেছে! আমি মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার পথ আবিষ্কার করেছি, মৃত্যুকে ঠকিয়ে আমি বেঁচে আছি—দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে আছি, আর দেখছি, সব দেখছি—

সহসা হাতটা এগিয়ে নিয়ে জুডির কব্জিটা মুঠো করে ধরলেন মিসেস হ্যালকেট। বললেন—আমার এই গোপন শক্তির কথা কেউ জানে না। আমি মিশরীয় ঘরে। ওসাইরিসের পুরোহিতদের কাছ থেকে এই [illegible] আমার শিক্ষা করা। ওসাই[illegible] গোপন ডাকিনী তন্ত্রের দেবী। মাত্র কয়েকজন জানে, এই কাউকে বলা নিষিদ্ধ। অতি সা[illegible] চোখ-কানকে ফাঁকি দিয়ে এই দু-চারজনকে জানানো হয়েছিল

জুডির মস্তিষ্কে এ[illegible] প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—পাগল। পাগল। —কিন্তু ঘরটা কেমন হয়ে এল। চারদিক ঘন কুয়া[illegible] মিসেস হ্যালকেট সেই ভয়ং[illegible] বলছেন—

—এখন আমার সময় হ[illegible] কলেবর গ্রহণ করার—আবার [illegible] হব। মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন। সমস্ত সুখ লুটেপুটে খাবো।

যন্ত্রণায় অস্ফুট কণ্ঠে জ[illegible] ওঠে—না-না-না। শেষ চেষ্টা [illegible] শৃঙ্খল থেকে সে মুক্ত হবে। ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু নিবিড় তমসায় ঢাকা—খালি হ্যালকেটকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর চারপাশে কেমন একটা আলোর আভ[illegible] চোখ দুটো টর্চের মত জ্বলছে।

জুডি এই শেষবারের মত কথা[illegible] জুডি হিসাবে। সে যেন নগ্ন দেহে কলেবরে দাঁড়িয়ে আছে—আর দেখছে হ্যালকেটের পিশাচী মূর্তির ভেতর কি একটা চেয়ারের ওপর থেকে তো[illegible] দিকে এগিয়ে আসছে। এই কুয়া[illegible] বস্তুটা একটা প্রাণহীন নিস্পন্দ [illegible] দেহে প্রবেশ করছে—আর ঘন অন্ধকার প্রচণ্ড আতংক জুডিকে গ্রাস করল।

প্রচণ্ড শক্তিতে সে প্রাণপণ লড়[illegible] সোফার ওপরকার দেহটাকে সে ঠেলে যে[illegible] দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারপর—? তার[illegible] আর কিছুই সে জানে না……

ঘুম যখন ভাঙল তখন অনেকগুলি ঘণ্টা অতিক্রান্ত। জানলার পরদা ভেদ করে সূর্যালোক ঝরে পড়ছে।

একটা দারুন অস্বস্তির মধ্যে চুপ করে পড়ে আছে সে। মনের গহনে অস্পষ্ট মনে পড়ছে কি একটা যেন ঘটে গেছে—। যেমনটি শুয়ে থাকত নিজের ঘরে সেইখানে সে শুয়ে নেই। চেয়ারিং-এ নয়, মাথার নীচে অনেকগুলি বালিস দিয়ে অন্য কোথায় পড়ে আছে—সেই সাধারণ ঘরে নয়। এই ঘরট বেশ সাজানো গোছানো। একটা অপরিচিত শয়ন ঘর।

কি হয়েছিল? গত রাতে কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? মিসেস হ্যালকেটের ঘরে সাপার খাবার কথা আর কিছুই মনে নেই ঠিক সেই মুহূর্তে মিসেস হ্যালকেটের দাসী এসে ঘরে ঢুকল।

জুডি তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—গুড মর্নিং এমিলি। এ আমি কোথায় কাল কি অসুখ করেছিল!

এমিলি বিছানার কাছে এগিয়ে এল। জুডি দেখল তার হাতে একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। সে বেশ সবিনয়ে বলে ওঠে—গুড মর্ণিং ম্যাডাম। কাল রাত্তে আপনার আবার একটা হার্ট-এ্যাটাক হয়েছিল—মিঃ জেরোম ডাক্তারকে ফোন করে ডেকে পাঠালেন, সবাই মিলে আপনাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। এখন কেমন আছেন ম্যাডাম। ভালো ত'।

জুডি আমতা-আমতা করে বলে ওঠে—কিন্তু এমিলি, আমি ত' মিস ক্লাইভ, আমি ম্যাডাম নই—এ ভুল বিছানায় কেন আমি? আমার জীবনে কখনও হার্ট-অ্যাটাক হয়নি, কাল রাতে ত মিসেস হ্যালকেটের সংগে সাপার খেলাম—

এমিলির চোখ কপালে উঠল। এ কি রে বাবা! সে কোনোরকমে ট্রেটা টেবলে নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে পালালো আতংকিত হরিণের ভংগীতে। জুডি শুনতে পেল সে চেঁচাচ্ছে—নার্স ওয়েনী, মিঃ জেরোম—!

জুডি শুনতে পায় করিডোরে পদ-ধ্বনি—এমিলি উত্তেজিত গলায় বলছে—নার্স, ও'র মাথাটা গোলমাল হয়েছে। কী সব ভুল বকছেন। কালকের অ্যাটাকটা বোধহয় একটু বড় দরের। ও'র ধারণা উনি মিঃ জেরোমের সেক্রেটারি।

জুডি গলার আওয়াজ সপ্তমে তুলে বলে—আমি মিস ক্লাইভ। মিস ক্লাইভ।

এমিলি আর একজন অপরিচিতা রমণীকে নিয়ে ঘরে এল। তার গায়ে নার্সের ইউনিফর্ম।

জুডি চীৎকার করে—ব্যাপার কি! আমিই ত' মিস ক্লাইভ!

এরপর সুরু হল দুঃস্বপ্নের ঘোর। আতংকিত কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে জুডি আপনাকে সামলে নিয়ে উত্তেজিত গলায় কি যে সব ঘটেছে তা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে। সব শুনেও সে কিন্তু জানে যে তার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। এতক্ষণে জেরোম এসেছেন, আরও একজন অপরিচিত ব্যক্তি—ওরা বলছেন ডাক্তার।

জুডি কাঁদছে এবং বার বার বলছে মিস ক্লাইভকে আপনারা বাঁচান।

অবশেষে এলেন তিনি—বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে। সবাই ঘর থেকে চলে গেছে। ঘরের সব জানালার পরদা ওঠানো— ঘরটা সূর্যালোকে ভাসছে। জুডির দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন মিস ক্লাইভ। জুডি তার প্রাক্তন দেহটার দিকে তাকিয়ে চমকিয়ে ওঠে—কী সুন্দরী। কী অপরূপ রূপ লাবণ্য ভরা তরুণী। নিজের দেহের দিকেই দেখছে জুডি। নীল চোখ, রাঙা ঠোঁট, ভারী সুঠাম গড়ন, এই সুগঠিত সুন্দর তনু ও'র নিজের, শুধু চোখের দৃষ্টিটা কেমন নিষ্প্রভ। সেই চোখ দুটিতে প্রাচীনার পৈশাচিক কুটিলতা। অতীত কালের অগাধ অভিজ্ঞতায় জীর্ণ।

সেই মূর্তি বলল—আপনি, আমার সংগে দেখা করতে চেয়েছেন মিসেস হ্যালকেট।

জুডি মৃদু গলায় বলল—কেন আমার এই সর্বনাশ করলেন। ডাইনী পিশাচী।

জুডি রূপিণী শয়তানী ক্রূর হাসি হেসে বলল—আমি ত' তোমাকে সব খুলেই বলেছি। তবে, কি জানো যা হয়েছে এর আর নড় চড় নেই, মেনে নাও। চুপচাপ থাকো। বেশী দিন তোমাকে বাঁচতে হবে না, তোমার শেষ হয়ে এসেছে।

জুডির সারা দেহ কেঁপে উঠল। বলে কি! সে তখন অনুনয়ের ভংগীতে বলে, কিন্তু একটু বিবেচনা করুন—আপনাকে কত কি ত্যাগ করতে হচ্ছে। সন্তান, সম্পদ, সম্ভ্রম। এমন বাড়ি, এমন সম্পত্তি। কিন্তু এখন আপনাকে খেটে খেতে হবে। কষ্ট করতে হবে—

টিটকিরির ভংগীতে সেই মূর্তি বলে—কিন্তু পেলাম কি একবার ভাবো! স্বাস্থ্য, যৌবন, জীবন ও প্রেম। তোমার হিউর কাছ থেকে একটা চিঠি আজ সকালে পেয়েছি। সে আজই এসে পড়ছে—সব ভুলে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সে আমাকে বিয়ে করবে। আমিও বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেই চেষ্টাই করব।

জুডি যন্ত্রণায় আকুল হয়ে বলে—কখনই নয়, হিউকে তুমি পাবে না। সে আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি। হিউ, আমার হিউ—

এইবার তাচ্ছিল্যের ভংগীতে হেসে উঠল সেই মূর্তি, বলল—যখন সে আমাকে দেখবে তখন আমাকেই ভালোবাসবে হিউ—তোমাকে নয়। সে ত' তোমাকে চেনেই না। না।

ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে একটি রূপা বাঁধানো ভারী হাত-আয়না নিয়ে জুডির হাতে দিয়ে মূর্তি বলল—এই নাও, নিজের রূপটা একবার আয়নায় দেখে নাও—

তার গলার স্বরে সেই বিদ্রূপের ভংগী। বলল—কি গো। তোমার পীরিতের লোকটি কি তোমাকে পছন্দ করবে? চিনতে পারবে তোমাকে? আয়নায় জুডি দেখল। একটা কুঞ্চিত শীর্ণ জরাজীর্ণ মুখের দিকে বিহবল ভংগীতে তাকিয়ে রইল জুডি, আয়নায় প্রতিবিম্বিত মূর্তির দুটি চোখ জলে ভরা। মাথায় একরাশ শুকনো পাকা চুল, এ কি বীভৎস রাক্ষসীর মূর্তি। তবে চোখ দুটি সুগভীর, কালো এবং তরুণীর মমতাময়ী চোখ, এই ভীতিগ্রস্ত চোখ জুডির জরাক্লিষ্ট যন্ত্রণা-জর্জরিত মুখের দিকে আয়নার ভিতর থেকে তাকিয়ে দেখে।

বিছানার কাছে ঝুঁকে পড়ে পিশাচীনি বলে ওঠে—কি গো! তোমার হিউ পছন্দ করবে ত'! চিনতে পারবে?

সহসা, জুডির মনে তীব্র রাগের সঞ্চার হল। যাই কেন হোক এই দানবী কিছুতেই হিউকে বিয়ে করতে পারবে না—। ভয় এবং ক্রোধ ক্লান্ত জুডিকে শক্তি দিয়েছে। সে সেই ভারী হাত-আয়নাটা নিয়ে বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়া সেই পিশাচীর মাথায় সজোরে আঘাত হানলো। এতই আকস্মিক তার ভংগী যে মাথা সরানোর সময় ছিল না। মাথার ঠিক পাশটিতে গিয়ে সেই ভারী আয়নার হাতলটা লাগাল। সে আঘাতের তীব্রতা সহ্য করা সহজ নয়—

জুডির দেহে একটা সুতীব্র যন্ত্রণা সে আর দেখতে পারে না, বালিশে তার মাথাটা পড়ে গেল। বিছানায় তার দেহটা মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল।

জুডির মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে—কিন্তু এমনই যন্ত্রণা, যে সে কাতর কণ্ঠে কেঁদে ওঠে। একটা স্কার্টের খস-খস আওয়াজ শোনা যায় তারপর একটি স্ত্রীলোক দৃঢ় গলায় বলে—

—একটুও নড়া-চড়া কোরো না। চুপ করে থাকো।

জুডি আপন মনে ফিস ফিস করে—ব্যাপারটা কি। যন্ত্রণা একটু করে কমে আসে। চোখ খুলে জুডি চারপাশে তাকায়। চেয়ারিংসে নিজের ঘরেই শুয়ে আছে জুডি। তার পাশে নার্স ওয়েইন দাঁড়িয়ে।

নার্স সংক্ষেপে বলল—মাথায় একটা খুব জোর আঘাত লেগেছিল, তোমার জ্ঞান ছিল না অনেকক্ষণ।

কী—! তারপর সব কথা মনে পড়ল। জুডি চীৎকার করে বলে—কিন্তু আমি কে? কে আমি?

—মিস ক্লাইভ উত্তেজিত হবেন না বেশী কথা বলা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে চান ত' বলুন। তাহলে যা বলা হচ্ছে তাই করুন। আপনার বন্ধু এসেছেন, আপনার সংগে দেখা করার জন্য ব্যাকুল।

জুডি মৃদু গলায় বলে—হিউ? তাহলে সব ভালো—কিন্তু মিসেস হ্যালকেট! তিনি কোথায়—?

জুডির হাত দুটি বেশ জোরে চেপে ধরে নার্স বলে ওঠে—মিসেস হ্যালকেট মারা গেছেন। দু ঘণ্টা আগে হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল। নিন, এখন এইটুকু গিলে ফেলুন। এখন একটু শান্ত হয়ে ঘুমান দেখি।

জুডি বালিশে মাথা রেখে পরম প্রশান্তিতে চোখ বুজল।

ঘুমের ঘোরেই জুডি আপন মনে বিড়-বিড় করে বলে—হিউ......এখন আমি নিরাপদ কি বলো? কে আর বলবে যে আমি আমাকেই খুন করার চেষ্টা করেছি। তাতো আর হল না, কি বলো হিউ......?

দেশে বিদেশে

আর একটি অনাস্থা প্রস্তাব

স্বতন্ত্র দলের শ্রীমিনু মাসানি বলেছেন, লোকসভার প্রত্যেকটি অধিবেশন শুরু হয় একটা অনাস্থা প্রস্তাব দিয়ে। এটা একটা "অসার অনুষ্ঠানে" পরিণত হয়েছে।

এবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে যে-অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হতে হল সেটা অনুষ্ঠান হিসাবেও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কেননা, এই সরকারের যিনি প্রধান সেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্কে যোগ দেননি—অথবা, ঠিকভাবে বলতে গেলে, বিরোধী পক্ষের একাংশ তাঁকে যোগ দিতে দেননি। এর আগে আরও তিনবার শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভাকে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর আগে জওহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু লোকসভার নেতা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাব দেওয়ার সুযোগ পাননি—এই নজীর ভারতবর্ষের সংসদের ইতিহাসে এবার সর্বপ্রথম তৈরী হল।

বিরোধী পক্ষ থেকে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পরিণাম অবশ্য যা হবার তাই হয়েছে—প্রস্তাবটি ৮৫—২২০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা কোন দিকেই ভোট দেননি।

"লোকসভা মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছে"—এই এক লাইনের প্রস্তাবটি ছিল জনসংঘের সদস্য শ্রীবানোয়ারলাল গুপ্তের নামে। প্রস্তাবে অনাস্থার কারণ উল্লেখ করা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবের উপর বিতর্কে যোগ দিয়ে স্বতন্ত্র দল ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলের বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই সমালোচনাই জোরালোভাবে তুলে ধরেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের প্রতীক ধর্মঘট দমনের জন্য শ্রীমতী গান্ধীর সরকার যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ও এই ধর্মঘট থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তারপর তাঁদের আর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়।

বিরোধী পক্ষের বক্তারা তাঁদের বক্তৃতায় একই সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে নিন্দা করার, সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপ-প্রধানমন্ত্রীর মতপার্থক্য তুলে ধরার ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবেদন জানাবার চেষ্টা করেন। একজন সদস্য বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট এড়াবার জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই সেই চেষ্টায় বাধা দেন। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘটের পর জওহরলাল নেহরু ধর্মঘটীদের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন সে-কথা আর একজন সদস্য শ্রীমতী গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দেন।

শ্রী এস এম ব্যানার্জি (কম্যু) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ভেঙে দিয়ে শ্রীচ্যবন মনে করেছিলেন নিজেকে 'বিংশ শতাব্দীর শিবাজীরূপে প্রতিপন্ন' করবেন। ১৯ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল—কংগ্রেস পক্ষের বক্তাদের এই সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে শ্রী এস এ ডাঙ্গে (কম্যু) শ্লেষের সঙ্গে বলেন, "স্বাভাবিকভাবেই যেখানে ট্রেন চলাচলে ৩৬ ঘণ্টা লেট হয় সেখানে ২৪ ঘণ্টার জন্য ধর্মঘট করে রেল-কর্মচারীরা সরকার উচ্ছেদ করবেন কিভাবে?" প্রয়োজন-ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন দেওয়ার প্রশ্নটি সালিশীতে পাঠাতে সরকারী কর্মচারীরা প্রস্তুত ছিলেন, এ-কথা উল্লেখ করে শ্রীনাথ পাই (পি এস পি) বলেন, "ভারতের কোন অঞ্চল বিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপার" ভারত সরকারী সালিশীতে পাঠাতে রাজী, কিন্তু নিজেদের কর্মচারীদের বেলায় তারা "বিশ্ব-মিত্রের মত সব দায়িত্ব অস্বীকার করেন।"

বিরোধী পক্ষের দাবী ছিল : (১) ১৯ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য সরকারী কর্মচারীদের যেসব দণ্ড (সাসপেনসন, কর্মচ্যুতি, মামলা ইত্যাদি) দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। (২) ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের কর্মচারীদের উপর পুলিশী হামলায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। (৩) অত্যাবশ্যক কাজ চালু রাখা সংক্রান্ত অর্ডিনান্স বাতিল করতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন এই সব দাবীই অগ্রাহ্য করে দেন। তিনি বলেন যে, যে ১০ কি ১২ হাজার কর্মচারীর চাকরী গেছে, তাঁদের জন্য তিনি দুঃখিত, কিন্তু তাঁদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তাঁরাই যাঁরা তাঁদের ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিয়েছেন। ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনের ঘটনায় পুলিশ অন্যায় করেছিল, বিভাগীয় তদন্তে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে। এর জন্য তিনি দুঃখিত এবং এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। কিন্তু বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে কোন লাভ হবে বলে তিনি মনে করেন না। শ্রীচ্যবন এ-কথাও পরিষ্কার করে বলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার সরকার স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "প্রশাসন অচল করে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকলে কোন সরকারই নীরবে ও অসহায়ভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন না।"

শ্রীচ্যবনের কাছ থেকে যে-আশ্বাস আদায় করতে পারেননি সেই আশ্বাস তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করবেন, এমন কোন ধারণা নিয়ে যদি লোকসভায় বিরোধী সদস্যরা চাপ দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছেন।

বিতর্কের দিনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুই দফায় প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে তাঁর বক্তব্য বলার চেষ্টা করেন। যতবারই তিনি বলতে ওঠেন, ততবারই

বিরোধী পক্ষ থেকে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যরা দাবী করতে থাকেন, যেসব সরকারী কর্মচারীর চাকরী গেছে তাঁদের পুনর্নিযুক্ত করা হবে কিনা, যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে কিনা, সাসপেনসন আদেশ প্রত্যাহার করা হবে কিনা, এ-সব কথা প্রধানমন্ত্রী আগে বলুন। কংগ্রেস তরফ থেকে আপত্তি করা হয়, প্রধানমন্ত্রী কারও ডিকটেশন শুনে কথা বলবেন না। গণ্ডগোলের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। দুই কম্যুনিস্ট পার্টি ও এস এস পি-র সদস্যরা যখন হৈ-হট্টগোল করছিলেন তখন বিরোধী পক্ষের অন্যান্য সদস্যরা চুপচাপ বসেছিলেন এবং স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় স্পীকার বিরোধী পক্ষের কয়েকজন নেতার সঙ্গে সভাকক্ষের বাইরে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে কি হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ জানা যায়নি। কিন্তু ঐ বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিরোধী নেতাদের কিছুটা দেরী হয়েছিল। ইতিমধ্যে, মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর আবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। কম্যুনিস্ট ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির পিছনের সারির সদস্যরা ততক্ষণে একই দাবীতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেষপর্যন্ত জানালেন, তিনি বক্তৃতা দেবেন না। "আমার কিছু বলার ছিল। কিন্তু এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে কথাগুলি বলব কিনা তা আমাকে আবার ভেবে দেখতে হচ্ছে। কেননা, হুমকি দিয়ে আমাদের কাছ থেকে কোন কথা বের করে নিতে আমরা দিতে পারি না।"—বসে পড়ার আগে শ্রীমতী গান্ধীর এই ছিল শেষ কথা।

"কিছু বলার ছিল" বলতে শ্রীমতী গান্ধী কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? তিনি কি ধর্মঘটী সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কিছুটা উদারতা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন? সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইউ এন আই-এর একটি সংবাদে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে, তদন্তে যদি কোন গুরুতর অপরাধের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা চালান হবে না। তাছাড়া তিনি নাকি এই আশ্বাসও দিতে চেয়েছিলেন যে, সরকার কোন প্রতিহিংসামূলক নীতি গ্রহণ করতে চান না এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে চান।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সত্যি সত্যি প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের কোন ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিনা জানার উপায় নেই—যেমন জানার উপায় নেই মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় স্পীকারের ঘরে বিরোধী দলের বৈঠকে ঠিক কি বোঝাপড়া হয়েছিল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, শ্রী পি রামমূর্তি, শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী, শ্রী এস এম ব্যানার্জি ও শ্রী এস এম যোশী এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, স্পীকারের সামনে আলোচনার সময় সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের বিষয় আলোচনা
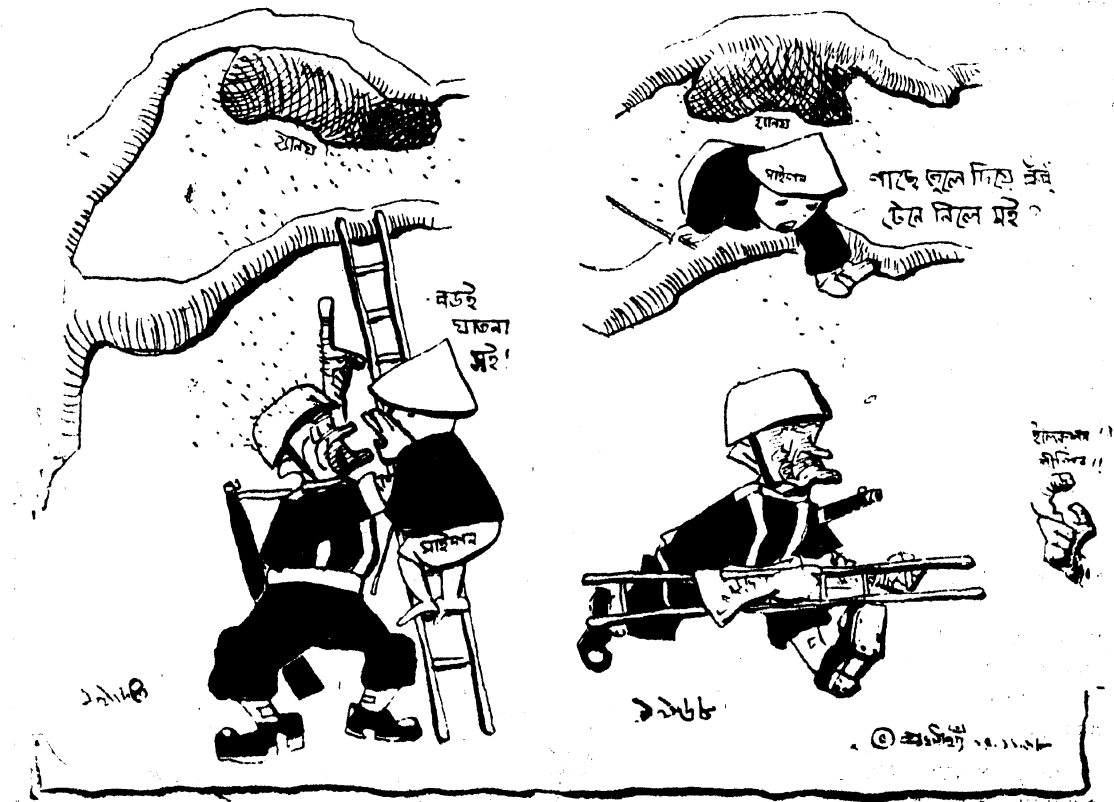
করার জন্য দুই-তিনদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তাঁরা আরও বলেছেন, এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই স্থির হয়েছিল যে, লোকসভার অধিবেশন স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া হবে। কিন্তু ডাঃ রামসুভগ সিং এরকম কোন আশ্বাস দেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেছেন যে, বিরোধী নেতারা লোকসভার কার্যসূচী সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে চান বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিতেই তিনি ঐ বৈঠকের কথা বলেছিলেন, সরকারী কর্মচারীদের কথা ভেবে বলেননি।

সে যাই হোক না কেন, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সরকারী কর্মচারীদের বিষয়টি আলোচনার জন্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর একটি বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে।

ইতিমধ্যে জনসংঘের নেতারা প্রকাশ্যেই কম্যুনিস্ট ও এস এস পি সদস্যদের আচরণের নিন্দা করেছেন। শ্রীবলরাজ মাধোক বলেছেন, কম্যুনিস্টরা সরকারী কর্মচারীদের ক্ষতি করেছেন। তাঁরাই সরকারী নীতি কঠোর করে দিয়েছেন।

পাকিস্থানে বিরোধের রাজনীতি

পাকিস্তানে নবগঠিত পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান (ও প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির চেয়ারম্যান (ও সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খানের দ্বিতীয় পুত্র) খান আব্দুল ওয়ালি খানসহ ১৭ জনকে পাকিস্তান রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করার ঘটনা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে একটা নূতন সরকার-বিরোধী রাজনীতিকে চাঙা করে তুলেছে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বহু দিনের, কিন্তু সুরাবর্দীর মৃত্যুর পর পশ্চিম পাকিস্তানে আয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে এত ব্যাপক বিক্ষোভ আগে আর কখনও দেখা যায়নি।

এবং বিচিত্র পরিহাস এই যে, যে জুলফিকার আলি ভুট্টো একদা এক মধ্যরাত্রিতে 'হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে হাজার বছরের যুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরই বিরুদ্ধে আজ এই বলে আওয়াজ তোলা হচ্ছে যে, তিনি নাকি প্রচ্ছন্ন ভারতীয় চর।

পাকিস্তানে এইসব গ্রেপ্তারের আগে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়ে গেছে, পুলিশের গুলীতে চারজন মারা গেছে, করাচী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, নৌশেরা প্রভৃতি স্থানে সৈন্যবাহিনী তলব করতে হয়েছে, পেশোয়ারের জনসভায় প্রেসিডেণ্ট আয়ুবকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়া হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এই সবকিছুর সূত্রপাত রাওয়ালপিণ্ডিতে ভুট্টো-সম্বর্ধনা করার জন্য জমায়েত ছাত্র-সমাবেশ নিয়ে। ১৯৬০ সালে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পাকিস্তানে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ। এখন ছাত্ররা সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবী জানাচ্ছে।

কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে ভুট্টোর এই জনপ্রিয়তার কারণ কি? গত কয়েক মাস ধরেই ভুট্টোর বিরুদ্ধে পাকিস্তানে ক্রমাগত প্রচার চলেছে। স্বয়ং পশ্চিম পাকিস্তানের গবর্ণর মহম্মদ মুসা তাঁর বিরুদ্ধে ২১ দফা অভিযোগ এনেছিলেন গত মাসের প্রথম দিকে। ভুট্টো নাকি তলায় তলায় পাকিস্তানে ভারতীয় হাই-কমিশনারের সঙ্গে যোগ রাখছিলেন। তিনি নাকি ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় কয়েকজন ভারতীয় অন্তর্ঘাতককে রক্ষা করেছিলেন। তিনি নাকি ইদানীং সিন্ধুর এমন একজন রাজনীতিকের চেলা হয়েছেন যাঁকে হাইকোর্ট দেশের শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। তিনি নাকি পাকিস্তানের গোপন সামরিক তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন ইত্যাদি। এরও আগে, পাকিস্তানের সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, তিনি গোপনে কয়েকজন মার্কিন নেতার সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন এবং তিনি আমেরিকার সি আই এ-র লোক। তাঁর নিজের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল (পরে হাইকোর্ট অস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন)। তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় তিনি সরকারী অর্থের অপব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ এনে তাঁকে একটি মামলায় জড়ান হয়েছে।

কিন্তু এইসব প্রচার সত্ত্বেও ও তাঁর দল মাত্র এক বছরের পুরানো হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা যেভাবে তাঁর সমর্থনে দাঁড়িয়েছে সেটা বিস্ময়কর ও অনেকটা অপ্রত্যাশিত। এটা ঠিক যে, ইদানীংকালে ভুট্টো পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ভাষা দিচ্ছিলেন। তিনি নিজে সিন্ধুর মানুষ। সেই সিন্ধুর নাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মিশে গেছে, সিন্ধী ভাষার অস্তিত্ব সেখানে নেই। সিন্ধীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা আছে। পাঠান ও বাঙালীদের মধ্যে ত আছেই। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে পেশোয়ারে যখন ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির একটি অংশ খান আব্দুল ওয়ালি খানকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করলেন (আর একটি অংশের চেয়ারম্যান মৌলানা ভাসানি) এবং ওয়ালি খান যখন ভুট্টোর দলের সঙ্গে হাত মেলালেন তখন থেকেই পাকিস্তানের পাঠান, সিন্ধী ও বাঙালীদের স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন একটা জায়গায় এসে মিলিত হল। ভুট্টো, ওয়ালি খাঁ ও তাঁদের অনুগামীদের গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ প্রমাণ করলেন যে, এই চ্যালেঞ্জকে অস্বীকার করা তিনি আর নিরাপদ মনে করছেন না।

শাদা চোখে

যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে আসন পুনর্বণ্টনের সমস্যা নিয়ে আবার কোন্দলের সূত্রপাত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার বিধানসভার ২৮০টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৭০টিতে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে যদিও বা ফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপিত হয়েছিল, নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার ফলে দলীয় মনোভাব পুনরায় প্রকট হয়ে উঠেছে।

মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়া এবং মুর্শিদাবাদের মুর্শিদাবাদ শহর আসনগুলিকেই কেন্দ্র করে এই বিরোধ মাথাচাড়া দিয়েছে। নেপথ্যের ঝগড়া লড়াই সংবাদপত্রে বিবৃতি ও প্রতিবিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ ধারণ করেছে। কুৎসা বিবর্জিত হলেও বয়ানগুলোর চেহারা দেখে মনে হয় "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"।

ইতিমধ্যেই, বাংলা কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে ফ্রন্টের জরুরী সভা তলব করা হয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের অভিযোগ পি-এস-পি চুক্তিসর্ত ভঙ্গ করে কাঁথি মহকুমার চারটি আসন ছাড়া আর একটি আসন "মুগবেড়িয়ায়" প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে। এবং এই প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারকার্য সুরু হওয়ার ফলে বাংলা কংগ্রেস বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এই অভিযোগের বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ফ্রন্টের আসন বণ্টনের পটভূমিকা পর্যালোচনা বিশেষভাবে দরকার। তা না হলে তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তির ফলে সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

যুক্তফ্রন্ট বর্তমানে যে সমস্ত শরিকদের নিয়ে গঠিত, পি-এস-পির নাম তার তালিকায় নেই। প্রশ্ন হতে পারে তবে কেন ফ্রন্টের সঙ্গে পি-এস-পির চুক্তি ভঙ্গের কথা আসছে? এর মধ্যেই একটা কিন্তু রয়ে গেছে।

পি-এস-পির প্রাদেশিক নেতৃত্ব ফ্রন্টের কর্মসূচী না মেনে কিছু আসনে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়ে যখন সরকার গঠনের প্রশ্ন আসবে তখন পি-এস-পির ভূমিকা কি হবে এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করেই বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অংশীদার পি-এস-পির সঙ্গে ফ্রন্টের সমঝোতার প্রশ্নও বানচাল হয়ে যায়। ঐ প্রশ্নের উত্তরে পি-এস-পি প্রতিনিধিরা বলেছিলেন, তাঁদের দল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আসতে দেবেন না। উত্তরটা শুধু নেতিবাচক নয় অধিকন্তু অস্পষ্ট। অতএব, যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এই আশ্বাসকে ভিত্তি করে সমঝোতা করতে রাজি হননি। ফলত, পি-এস-পিকে একলা চলার শ্লোগান নিয়ে নির্বাচনের কৌশল স্থির করার জন্য এগিয়ে যেতে হয়।

প্রাদেশিক পি-এস-পি নেতৃত্বের সঙ্গে ফ্রন্টের বিরোধ হওয়া সত্ত্বেও মেদিনীপুর জেলা ইউনিট প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীসুধীর দাসের নেতৃত্বে ফ্রন্টের সঙ্গে আঁতাত করেন, শ্রীদাস ফ্রন্ট নেতৃত্বকে একটি লিপির মারফৎ কর্মসূচী মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং কাঁথি মহকুমার কাঁথি উত্তর, দক্ষিণ, এগড়া এবং রামনগর আসনে ফ্রন্টকে প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান। শ্রীযুক্ত দাসের এই দৌত্য সফল হয়। কিন্তু পি-এস-পির প্রাদেশিক নেতৃত্ব এই সমঝোতাকে সুনজরে দেখতে কুণ্ঠাবোধ করেন। এবং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ যেখানে দলের সঙ্গে আঁতাত হয় নি, সেখানে যদি একটি ইউনিট এইভাবে শত্রুর সহযাত্রী হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্ন আসে। প্রাদেশিক নেতৃত্ব সাপের ছুঁচো গেলার মত এই অশুভ মিলনকে মেনে নিলেও অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। তাদের এই মানসিক উদ্বেগের উপর আরও চরম আঘাত এল যখন ফ্রন্ট কাঁথির চারটি আসন ছাড়া আর সমস্ত পি-এস-পি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবার কথা ঘোষণা করলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—"মুগবেড়িয়া" আসনে পি-এস-পি প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য যাঁর নাম শোনা যাচ্ছে—তিনি কার সমর্থনপুষ্ট? মেদিনীপুর জেলা কমিটির, না প্রাদেশিক নেতৃত্বের? কাজেই সুস্পষ্টভাবে এই প্রার্থীর কুলজি বিচার না করে যদি যুক্তফ্রন্ট সরাসরি শ্রীসুধীর দাসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপরাধী বলে রায় দেন তবে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক ভুল করবেন বলে মনে হয়।

গত সাধারণ নির্বাচনেই বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আপোষহীন সংগ্রাম হয়েছিল, কিন্তু জনতার হাতে মার খাওয়ার পর তাঁদের সম্বিত ফিরে এসেছিল। অবশ্য দুষ্টজনের মতে গদীর লোভেই তড়িঘড়ি করে এক জোড়াতালি দেওয়া কর্মসূচীর মাধ্যমে রাতারাতি লালদীঘির চত্বরে গিয়ে কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী বা এক কথায় সমস্ত অ-কংগ্রেসী দল হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এই সুবিধাবাদের অশুভ ফল ফলেছিল। তার ইতিহাসের রোমন্থনে প্রয়োজন নেই। অবশ্য এবারের নির্বাচনের পরেও যে কী রকম নাটক অভিনীত হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গণতন্ত্রকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হলে এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার নিরসন করার জন্যে দলের সংখ্যা যাতে সীমিত করা যায় সেইদিকে রাজনীতিবিদদের ধ্যান-ধারণা নিবদ্ধ কিনা? পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে সেই চিন্তাধারা এখনও জমাট বেঁধে ওঠেনি। তবে পারিপার্শ্বিকতা যে ক্রমেই তার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে চলেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আদর্শগত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিকল্প নেতৃত্ব দেওয়ার যে প্রচেষ্টা যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে তাকে সেইদিকে একটি নতুন পদক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এটাই স্থায়ী হবে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। নতুন করে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মিলনের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে, যদি সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এবং চলার পথে একাত্মতা আসে।

অধিকন্তু, কংগ্রেসের মত একটি বিরাট শক্তিশালী দলের মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা এককভাবে যে কোন বামপন্থী দলেরই নেই, একথা আজও অনস্বীকার্য। কাজেই তার বিকল্প হিসাবে যদি কোন ফ্রন্ট সুস্থ কর্মপন্থার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনসমক্ষে হাজির হয় তবে গণতন্ত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ আসে এবং জনসাধারণও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেদের রায় জাহির করবার সমূহ সুযোগ পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে চলা উচিত একথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোন সমস্যা অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিবৃতি মারফৎ তাকে মহীরুহে পরিণত করা হয় তবে তা আর যাই হোক রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় কি? তাছাড়া ফ্রন্টের অংশীদার হলেই যে দলীয় শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করা যাবে না এমন কথাও বোধহয় ঠিক নয়।

আসন বন্টনের নীতি হিসাবে ফ্রন্ট অলিখিতভাবে এক ফরমুলা গ্রহণ করেছিলেন। সেটা হচ্ছে গত নির্বাচনে যে কেন্দ্রে যে দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন সেই আসন এবারও সে দলেরই থাকবে। আর যে দলের প্রার্থী যে আসনে দ্বিতীয় হয়েছিলেন সেই আসনেও সেই দলেরই অধিকার থাকবে। অবশ্য দলছুটদের সম্পর্কে নতুন করে বিবেচনার কথাও ছিল।

কিন্তু আখেরে দেখা গেল যদিও বা বেশীর ভাগ কেন্দ্রেই এই ফরমুলা কার্যকর করা হয়েছে কতকগুলি আসনে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। মুর্শিদাবাদ শহর কেন্দ্র এমনি একটি আসন যার জন্য এস-এস-পির সঙ্গে ফ্রন্টের মধ্যে এখনও টানা-পোড়েন চলছে। গত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী কাসেম আলী মির্জা এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন আর দ্বিতীয় হয়েছিলেন এস-এস-পি প্রার্থী নবাবজান মির্জা।

কিন্তু এবার কংগ্রেস দলছুট কাসেম আলীকে এই আসনটি দেওয়ার জন্য ফ্রন্টের কিছু কিছু অংশীদার সরব হয়ে উঠেছিলেন। এস-এস-পি ফ্রন্ট ত্যাগের হুমকি দেওয়ার পর ঐ দলের অনুকূলেই আসনটিকে বন্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু ভেতর থেকে কলকাঠি নাড়ার ফলে এই কেন্দ্রটিকে নিয়ে আবার মন কষাকষি শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে যাঁরা দলছুটদের নিয়ে এত সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁদের তরফ থেকেই দলছুট এক ব্যক্তিকে নিয়ে ফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির প্রয়াস চালানো উচিত কি? কংগ্রেস যদি এহেন কাজ করত তবে বামপন্থীরা সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন। কংগ্রেস ত্যাগ করে বামপন্থীদের আশ্রয়প্রার্থী হলেই কেউ রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে ওঠেন, আর বামপন্থী দল থেকে কংগ্রেসে গেলেই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বেন এটা যে কি ধরনের চিন্তাধারা তা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর [illegible] করলে এহেন নীতিকে পরম সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। হয়ত, মুর্শিদাবাদ আসন নিয়ে একটি সুষ্ঠু ফয়সালা হবে, কিন্তু বর্তমানে এই কেন্দ্র নিয়ে যে তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে তা জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য।

আবার পি-এস-পির মেদিনীপুর জেলা কমিটির সঙ্গে কেন্দ্রদলের [illegible] হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ জেলার আরও কিছু আসন পুনর্বন্টনের প্রশ্ন তুলে এস-এস-পি নেতা শ্রীরাজনারায়ণ ইতিমধ্যেই শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে একদফা কথাবার্তা বলেছেন। শ্রীনারায়ণ তাঁর দলের জন্য মেদিনীপুরের খেজুরী, নয়াগ্রাম ও ঝাড়গ্রাম আসনগুলি দাবী করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ঐ কেন্দ্রগুলিতে তাঁর দলীয় সংগঠন সুসংহত ও অধিকতর শক্তিশালী। কাজেই পুনর্বন্টিত হলে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার ফলে জয়ী হওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা দরকার এস-এস-পি তা করতে সমর্থ হবে।

শ্রীরাজনারায়ণ দলীয় শক্তির যে কথাটি তুলেছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং নীতিগত প্রশ্ন। এবং এই বক্তব্য ফ্রন্টের আসন ভাগাভাগির আগে আর-এস-পি, এস-এস-পি, এস-ইউ-সি এমন কি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলও তুলেছিলেন। কিন্তু আখেরে তা ধোপে টেকে নি। সেটা নীতির দিক থেকে ভুল হবে সে যুক্তিতে নয়। সংগঠনের খতিয়ান নিতে গেলে দেখা যাবে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এমন দল আছে যাদের অস্তিত্ব প্রায় এদিক থেকে শূন্য। অতএব, ফ্রন্ট ভাঙবার ঝুঁকি না নিয়ে গোঁজামিল দিয়ে যুক্ত থাকার পথই শ্রেষ্ঠ—এই চিন্তাধারাই বড় শরিকদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আর ছোট অংশীদাররাও ভয়ে "অধীনতামূলক মিত্রতা" স্থাপন করে ঐক্যের জয়ঢাক বাজাতে সুরু করেছিলেন। কাজেই, এই পটভূমিকায় শ্রীরাজনারায়ণের দাবী কতটুকু সফল হবে তা বলা কঠিন। তবে একমাত্র আশা এই যে যদি কাঁথি মহকুমার চারটি আসনে পি-এস-পির বিরুদ্ধে ফ্রন্টের প্রার্থী দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তবে আসন-বন্টনের মাধ্যমে এস-এস-পির ভাগ্যে দু-একটা আসন জুটতেও পারে।

এই আসন পুনর্বন্টনের গোলকধাঁধা থেকে যুক্তফ্রন্ট মুক্ত হতে পারবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শেষ পর্যন্ত কিছু "ফ্রি-সিট" রেখে ফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখতে হবে। এবং এই সম্ভাবনাই অধিক।

কিন্তু বেশির ভাগ আসনের বোঝাপড়া হওয়া সত্ত্বেও দু-একটি আসনের জন্য যাঁরা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না, গদী পেলে তাঁরা যে নীতির লড়াই নিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন না, একথা জোর করে বলা যায় কি?

—[illegible]

আগের ঘটনা

[দিকনগর পেপার মিলের অপারেটার মিস তরঙ্গমালা এক রাতে খুন হল। তদন্তে এল সি আই ডি ইন্সপেকটর রাজীব সান্যাল। খুনী সন্দেহে তরঙ্গার প্রেমিক নিখিলেশ হাজতে বন্দী। তরঙ্গের রুমমেট সুজাতা দাস, প্রভা মুখার্জি এবং মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী প্রত্যেককেই জেরা করল তদন্তকারী ইন্সপেকটর। এরপর এল ভৈরব দত্ত। মিলেরই একজন কর্মী। খুনের কিনারায় সে-ও দিয়ে গেল এক নতুন সূত্র।]

(১২)

চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে সুব্রত বলল,—'মাপ করুন রাজীবদা। ও স্বামী-স্ত্রী খুঁজে বের করা আমার কম্মো নয়। কে কোথায় গোপনে কার পতিদেবতা সেজে বসে আছে, তা জানতে হলে খোদ বিধাতাপুরুষের কাছে যেতে হয়। বড়দারোগা কি সে কথা হাত গুনে বলবে?'

রাজীব সান্যাল চিঠিখানা হাতে নিয়ে নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করছিল। প্রথমে হাতের লেখা, কলমের কালি, পত্রের ভাষা লক্ষ্য করল। তারপর চিঠির বিষয়বস্তু ছেড়ে পত্রলেখা কাগজটাকে নিয়ে পড়ল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ কাগজটা নিরীক্ষণ করল রাজীব। কখনও কাছে, কখনও বা দূরে রেখে। অন্ধকারে ফেলে কিংবা আলোর রশ্মি ওর বুকে প্রতিফলিত করে পর্য-বেক্ষণের কাজ চলতে লাগল।

পরীক্ষা শেষ করে রাজীব বলল, 'স্বামীমশায়ের এ পত্রখানা আমাকে খুব বেকায়দায় ফেলে দিল সুব্রত। তদন্ত করতে নেমে এখন দেখছি এক জটিল ধাঁধার সামনে পড়ে গেছি।'

সুব্রত কপালে বাঁ হাতটা রেখে খুব হতাশ একটা ভঙ্গি করে বসল। ভাবখানা এই যে, রাজীবদা যেখানে হালে পানি পাচ্ছেন না, সেখানে সুব্রত অসহায় শিশু। সুতরাং এ ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করছে না।

রাজীব বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ সুব্রত? চিঠির কাগজটা ঠিক গোটা নয়। এর খানিকটা আগেই কেটে ফেলা হয়েছে।'

'তাই নাকি?' সুব্রত সোৎসাহে বলল, 'কই দেখি চিঠিটা আর একবার।'

চিঠিটা পরীক্ষা করে স্থির হল সুব্রত। রাজীবদার কথাই ঠিক। কাগজের মাথার দিকটা খানিকটা কেটে ফেলে পত্রখানার রচনা শুরু হয়েছে। এবং হয়ত খুব তাড়াতাড়ি আঙুলের সাহায্যেই খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলে চিঠির একটা প্রান্ত কেমন অসমান, কোথাও ঢেউ খেলানো। আতসকাচের সাহায্যে উঁচুনীচু ভাবটা আরো স্পষ্ট দেখায়।

রাজীব বলল, 'ভালো করে আর একবার

দেখ সুব্রত। কাগজটা দেখে আর কিছু মনে হয় তোমার?'

কিছুক্ষণ কাগজটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সুব্রত। হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, 'রাজীবদা, আমার মনে হচ্ছে এটা একটা লেটার প্যাডের কাগজ।'

ছাত্রের কৃতিত্বে গর্বিত মাস্টারমশায়ের মত মুখ উজ্জ্বল করে রাজীব বলল, 'সুন্দর বলেছ সুব্রত। আমি ঠিক এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম।' সুব্রতর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে রাজীব পুনরায় সেটা পরীক্ষা শুরু করল। বলল, 'কাগজটা বেশ দামী লক্ষ্য করেছ সুব্রত? এ দেশের মিলে এ কাগজ তৈরী হয় কিনা বলা শক্ত।'

'কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে লেটার প্যাডের মাথার দিকটা ছিঁড়ে ফেলা হল কেন?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'এর একটাই মাত্র উত্তর হয় সুব্রত। স্বামী ভদ্রলোক বোধহয় আত্মগোপন করে থাকতে চান। তাঁর মনে হয়ত আশংকা ছিল যে পত্রটা অন্য কারো হাতে পড়ে যাওয়া খুব অসম্ভব নয়। এবং তাহলে লেটার প্যাডের উপরের নাম ঠিকানা থেকে পত্রলেখকের পরিচয় জানা যেত।'

'কিন্তু রাজীবদা, চিঠি যাকে লেখা হল সে নিশ্চয়ই পত্রলেখককে জানত?'

রাজীব হো হো করে হাসল। পরিহাস-তরল কণ্ঠে সে বলল, 'কি যে তুমি বল সুব্রত! হাজব্যান্ড তার বৌকে চিঠি দিচ্ছে, আর বৌ কিনা সেই পরমগুরুর পরিচয় জানবে না!' হঠাৎ রাজীবের কপালে দু'-একটি কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। অল্প কিছুক্ষণ চিন্তিত দেখাল ওকে। কপালের কোঁচকান রেখা কটি মিলিয়ে যেতেই রাজীব বলতে শুরু করল, 'অবশ্য তুমি যা বলতে চাইছ সুব্রত, তাও খানিকটা ঠিক হতে পারে। তরঙ্গর বাক্সে এই হাজব্যান্ড ভদ্রলোকের চিঠি মাত্র একটাই। সন তারিখ নেই পত্রে, এবং খামের উপর শীলমোহরের দাগ থেকেও তারিখটা ঠিক পড়া যায় না। সম্ভবত তরঙ্গ বেশ লম্বা একটা ছুটি কাটাচ্ছিল ওর মায়ের কাছে। এই সময় চিঠিখানা লেখা হয়েছে তরঙ্গকে। ভুয়ো প্রেমিক সেজে কেউ তরঙ্গকে এমনি উড়ো চিঠি যে লেখেনি, একথা জোর করে বলা যায় না।'

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, আর একটা জিনিস মনে হয়েছে আপনার? চিঠিটা যেন বড্ড ছোট। অমন সুন্দরী মেয়েকে এই একরত্তি চিঠি লিখে কি মনের কথা জানানো যায়?'

সুব্রতর পিঠে একটা আলগা চাপড় মেরে রাজীব বলল, 'এটা ভারী সুন্দর বলেছ বড়বাবু। চিঠিখানা সত্যি বড় ছোট। লোকটা দেখছি শুধু হাজব্যান্ডই, তরঙ্গের প্রেমিক নয়। প্রেমিক কখনও এতটুকু চিঠি লিখে ক্ষান্ত হবে না। আর একটা কথাও আমার মনে আসছে। চিঠিখানা যেন এক নিঃশ্বাসে লেখা। এর থেকে দুটো সিদ্ধান্তে আসা যায়।—'

সুব্রত কৌতূহলের সঙ্গে রাজীবের সিদ্ধান্তের কথা জানবার জন্য তাকিয়েছিল।

গলা পরিষ্কার করে রাজীব বলল, 'চিঠি লেখার ধরন দেখে মনে হয় ভদ্রলোক ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, কোনোমতে দু' ছত্র চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। আর নইলে বাংলা গদ্যে পত্র রচনায় তাঁর অনভ্যাস। কলম দিয়ে কালি সরলেও অক্ষর যেন সরে না।'

'কিন্তু তদন্তের ব্যাপারে এই চিঠিটা কি খুব কাজে লাগবে রাজীবদা?'

'একটা কথা বলব সুব্রত?' রাজীব সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে শুরু করল, 'কোন্ বস্তুটি তদন্তে কাজে লাগবে আর কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয়, তা এখনই বলার সময় আসেনি।' একটু থেকে রাজীব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা সুব্রত, একটা প্রশ্ন তোমার মনে হয়?'

'কি প্রশ্ন রাজীবদা?'

'এই মার্ডার কেসের মূল কথা যেটা, অর্থাৎ মোটিভ বিহাইন্ড দি মার্ডার। আমার মনে হয় এর উত্তরটা এখন ঠিক পরিষ্কার হয়নি।' রাজীব আবার সিগারেটে টান দিল।

আপত্তি জানিয়ে সুব্রত বলল, 'মোটিভ পরিষ্কার হয়নি একথা জোর করে কি বলা যায় রাজীবদা? আপনি যদি নিখিলেশকে খুনী বলে সাব্যস্ত করেন তাহলে মোটিভ ফর মার্ডার ইজ অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ ডেলাইট।'

রাজীব হেসে বলল, 'তার মানে? তুমি আর একটু প্রাঞ্জল হও সুব্রত।'

'আমি বলতে চাই তরঙ্গের সঙ্গে নিখিলেশের বেশ ঘনিষ্ঠতা,—ইয়ে প্রেমটেম ছিল। এর যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তরঙ্গের মা স্বীকার করেছেন কলকাতায় নিখিলেশ এবং তার মেয়ে দুজনে এখানে ওখানে ঘুরত।'

বাধা দিয়ে রাজীব বলল, 'আমি স্বীকার করে নিচ্ছি সুব্রত, দুজনের মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।'

'বেশ, তাহলে আপনি একথাও স্বীকার করুন যে তরঙ্গ আরো অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করত। এবং অনেকেই তার সঙ্গকামনা করেছে। এদের কারো কারো সঙ্গে তরঙ্গ যে প্রেমের অভিনয় করেনি, একথা আপনি বলতে পারেন না।'

'আমি সেকথা বলতে চাই না সুব্রত।'

'অন্য পুরুষের সঙ্গে তরঙ্গের ঘনিষ্ঠতা, ভালবাসাবাসার গল্প নিখিলেশের কানে যে পৌঁছয়নি একথা কি বলা যায় রাজীবদা? বিশেষ করে এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আর একজনের সঙ্গে তরঙ্গের ঘনিষ্ঠতাটা প্রেমের অধিক হয়ে প্রায় দাম্পত্য সম্পর্কের রূপ নিয়েছিল। তরঙ্গের এই গোপন অভিসার এবং প্রেম-লীলার কথা নিখিলেশের কানে কি না গিয়েছে? আর প্রবঞ্চিত পুরুষের মনে যে দাহের সৃষ্টি হয়, তা কি উন্মত্ত প্রতি-হিংসার রূপ নিতে পারে না রাজীবদা?'

'পারে বৈকি সুব্রত। সেজন্যই তো বলছিলাম হাজব্যান্ডের লেখা এই চিঠিখানা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' রাজীব নরম গলায় কথাগুলি শেষ করল।

সিগারেটটা কখন নিভে গিয়েছিল। রাজীব খেয়াল করেনি। টেবিলে রাখা লাইটারটা তুলে সিগারেটের মুখে সে অগ্নিসংযোগ করল। প্রথম চোটে দম শেষ করা এক টানে বেশ খানিকটা ধোঁয়া উদরস্থ করে রাজীব তাকাল। সুব্রতের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার দিকে চেয়ে রাজীব বলল, 'নিখিলেশকে ধরো আমরা নির্দোষ বলে মেনে নিলাম। তাহলে খুনী কে? নিশ্চয়ই অন্য কেউ। এবং সম্ভবত তরঙ্গের পরিচিত কোনোজন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

বাধা দিয়ে সুব্রত যোগ করল, 'শুধু পরিচিত বললে হয়ত ঠিক বলা হবে না রাজীবদা। সে নিশ্চয়ই তরঙ্গের প্রণয়-প্রার্থীদের একজন। এবং খুবই স্বাভাবিক যে তরঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ সে পেয়েছে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে সে ক্ষেত্রেও খুনের মোটিভ একই। তরঙ্গ নিখিলেশের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত জেনেই প্রণয়ী তাকে খুন করেছে।'

সুব্রত মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

বেলা মরে গিয়ে কখন সন্ধ্যে নেমেছে বাইরে। অন্ধকার ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। কোথায় দূরে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে মেয়েরা। ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল রাজীব। চাকরকে ডেকে দু কাপ চায়ের জন্য বলে আবার চেয়ারে এসে বসল।

সুব্রতর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে

নিয়ে রাজীব বলল, 'মোটিভের কথা এখন থাক রাজ সুব্রত। শুধু মোটিভের দিকে তাকিয়ে খুনের তদন্ত করা ডিটেকটিভের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সব ক্ষেত্রেই মোটিভ সমান নয়। তদন্ত শেষ করে যে মোটিভ আবিষ্কার করা গেল, [illegible] যায় না। অনেক সময় দেখা গেছে যে খুনের পিছনে মোটিভের গুরুত্ব খুব বড় ছিল না। [illegible] মোটিভকে তদন্তের মধ্যে অবলম্বন করা উচিত নয়। আর মানুষের মনের কথা পুরোপুরিই অজানা। মোটিভ বা খুনের উদ্দেশ্যকে সঠিক আবিষ্কার করার পিছনে এটাই হল পর্বতপ্রমাণ বাধা।'

খুনের সঙ্গে খুনীর সম্পর্কটাকে ধরে নাড়া দিলে হত্যার উদ্দেশ্যটা কি পরিষ্কার হয় না রাজীবদা?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

রাজীব হেসে বলল, 'একটা কথা মনে রেখ সুব্রত। ডিটেকটিভ ট্রেনিং নেবার সময় আমরা শুনেছিলাম কথাটা। দি মোটিভ মেকস অ্যান ম্যান নট মিসেস দি ডার্ক সিক্রেট অফ দি মার্ডারার।। আর সম্পর্কের কথা বলছ? ধরো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। স্বামী যদি স্ত্রীকে খুন করে তাহলে খুনের উদ্দেশ্য বা মোটিভ কি হতে পারে? এক নম্বর বলতে পার যে স্বামী অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। সুতরাং স্ত্রীকে পৃথিবী থেকে সরানো প্রয়োজন। দু'নম্বর ধরো, স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে হয়ত স্বামীর বিত্ত, সম্পত্তি বা ইনসিওরেন্সের টাকা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব স্ত্রীকে শেষ করা হল। আর তিন নম্বর ধরো, দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান অথবা একজন রোগে অশক্ত এবং দাম্পত্য-জীবনে অপটু। এর ফলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল কর্তা কিংবা গিন্নির মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল রাজীব, 'মজার ব্যাপার কি জানো সুব্রত? এই তিন রকম মোটিভের কোনো একটি না থাকলেও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করছে কিংবা মহিলাই তার পতি-দেবতাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

অবাক হয়ে সুব্রত বলল, 'বলেন কি রাজীবদা? এ কেমন করে সম্ভব?'

'সম্ভব নিশ্চয় সুব্রত। আমেরিকাতে এক ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলেন। খুনের পিছনে তেমন কোনো মোটিভ বা উদ্দেশ্য বহু চেষ্টা করেও আবিষ্কার করা যায় নি। খুবই অবাক হবার কথা। কিন্তু মহিলা কেন গুলি চালিয়েছিলেন শুনলে তুমি নিশ্চয়ই আরো অবাক হয়ে যাবে। ব্রিজ খেলতে বসে ভদ্রলোক একটা ভুল করে বসেন। শেষে খেলায় হার, পরাজয়কে মেনে নিতে পারলেন না মহিলা। আর তারই ফলে স্বামীকে প্রাণ হারাতে হল স্ত্রীর গুলিতে।'

সুব্রত বলল, 'তাহলে বলছেন মোটিভকে বড় করে দেখার এখন প্রয়োজন নেই।'

'আমার তাই মনে হচ্ছে সুব্রত। অন্তত তরুণ মার্ডার কেসে মোটিভ নিয়ে মাতামাতি করা ঠিক হবে না। মোটিভ যাই হোক একটা ছিল। তা কতখানি যুক্তিযুক্ত, সম্ভব অসম্ভব,—সে নিয়ে এখনই আমাদের ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। মোটিভ ধরে খুনীকে বের করার চেয়ে, ঘটনার সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়াই এ ক্ষেত্রে ঠিক লাইন হবে বলে আমার ধারণা।'

সুব্রত হঠাৎ কি যেন মনে পড়েছে এমনি একটা ভাব করে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'ঘটনার কথা বলছেন রাজীবদা। শুনেছেন নিশ্চয়ই শেষ খবরটা?'

'কি শেষ খবর আবার?' রাজীব স্মিতমুখে চাইল।

'নিখিলেশ জামিনে খালাস পেয়ে সুদামডিতে ফিরে এসেছে।'

'ও, হ্যাঁ। এ খবর তো আমি কাল রাত্রেই পেয়েছি। শচীদুলাল স্টেশনে ছিল। ট্রেন থেকে নামতেই আমাকে খবরটা দিয়েছে।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল।

'ডিস্ট্রিক জজ জামিনে খালাস দিয়েছেন ওকে। পুলিশের তরফ থেকে যথারীতি আপত্তি জানানো হয়েছিল। কিন্তু জজসাহেব শুনলেন না। অবশ্য পুরোপুরি মুক্ত নয় নিখিলেশ। দিকনগর থানার চৌহদ্দী পেরিয়ে অন্যত্র সে যেতে পারবে না। এমন কি মধুরাপুর পর্যন্ত নয়। যতদিন তদন্তের কাজ শেষ না হচ্ছে, ততদিন নিখিলেশ সেনের যত্রতত্র যাবার স্বাধীনতা নেই।'

কথা শুনে রাজীবের চেহারায় কোন ভাবান্তর হল না। ঈষৎ হেসে সে বলল, 'এ তো ন্যায্য বিচারই হয়েছে সুব্রত। আমাদের তরফ থেকে আপত্তি করবার মত কোনো কারণ নেই। নিখিলেশ যদি চোখের সামনেই থাকে তাহলে [illegible] তাকে [illegible]? আর [illegible] জনসাধারণের [illegible] দেহাতই [illegible] ... [illegible]

[illegible] টেবিলের [illegible] চিনি নেড়ে দিতে [illegible] রাজীব বলল, 'তোমার [illegible] সুব্রত। তবু খেয়ে নাও [illegible]।'

স্মিতমুখে সুব্রত [illegible] ঠোঁট ঠেকাল।

রাজীব বলল, 'তুমি [illegible] পেপার মিলের টেলিফোন অপারেটর ভৈরব দত্তকে চেন সুব্রত?'

'চিনি মানে দু' একবার দেখেছি রাজীবদা। আলাপ পরিচয় একবার হয়েও হল না। কারণ ভদ্রলোক তখন—।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাজীব বলল, 'অপ্রকৃতিস্থ এই তো?'

'বাঃ। আপনি কেমন করে জানলেন?' সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল।

রাজীব উত্তর দিল, 'আন্দাজ করেছি সুব্রত। কিন্তু তারপর? তুমি থেম না,—বক্তব্য শেষ কর।'

সুব্রত বলল, 'ভদ্রলোককে একবার থানায় ধরে এনেছিল রামশংকর। রাতে বাজারের মোড়ে ডিউটি ছিল তার।'

'অপরাধ?'

'রাস্তার উপরে ভীষণ হৈ হল্লা আর মাতলামি শুরু করেছিল ভৈরব দত্ত। কে একজন সঙ্গীও ছিল। দুজনকেই থানায় এনে হাজির করে রামশংকর।'

'সারারাত থানায় আটক ছিল নিশ্চয়?'

'অতটা বাড়াবাড়ি করিনি। ম্যানেজার সাহেবকে টেলিফোনে জানাতেই উনি লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন।'

'সুদর্শন চক্রবর্তীর তাহলে ভৈরবের সম্বন্ধে একটা সফট্ কর্নার আছে?'

একটু চিন্তা করে সুব্রত উত্তর দিল, 'মনে হয় রাজীবদা। আমি শুনেছি মিল ম্যানেজারের অন্দরে পর্যন্ত ওর আনা-গোনা। বাড়ীর নানা কাজকর্ম ভৈরবই করে।'

'কাজকর্ম মানে? কি কাজ করে সে?'

'তেমন কিছু নয়। ধরুন ওষুধ টষুধের প্রয়োজন হলে ভৈরব দত্তকে ছুটতে হয় জেলা শহরে। এমন কি কলকাতা পর্যন্ত। নানা কাজে মধুরাপুরে আসা তো হামেশাই লেগে আছে। ম্যানেজার সাহেবের জামা-কাপড় কাচতে দিতে ভৈরবকে যেতে হয় স্টীম লন্ড্রীতে, অর্থাৎ আলোকপুরে। আবার ধরুন, বাংলোতে হঠাৎ কোন পার্টি বা ভোজভোজ হলে ভৈরবকেই সব ভার নিতে হয় বলে শুনেছি। আমের রাস্তা থেকে

হয়েছে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ধরনের [illegible] [illegible] কথা হচ্ছে। খুনের কেসে ডিটেকটিভের একটা মস্ত সুবিধে আছে যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুনী মৃতের পরিচিত হয়ে থাকে। অ্যান্ড দি মার্ডারার ইনভেরিয়েবলি লিভস হিজ ফুট প্রিন্ট।'

'কিন্তু লোকটা কে রাজীবদা?'

'বিবরণ শুনে মনে হয় কোনো ট্রাকের ড্রাইভার কিংবা পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টর হবে। হয়তো সুদামডি থেকে ফিরছিল অত রাত্রে। বিকনগর বাজারে কোথাও এসে রাতটা কাটাবে বলে।'

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত শেষ হল। হঠাৎ রাজীবকে উৎসাহিত দেখাল। সুব্রতের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি একটা কাজ কর সুব্রত। বিকনগরে পাঞ্জাবী-দের একটা ডেরা রয়েছে না?'

সুব্রত মাথা হেলিয়ে সায় দিল। বলল, 'শহরে ঢুকবার একটু আগে আড্ডাটা। একটা হোটেল মত রয়েছে। সাধারণত পাঞ্জাবী ট্রাক-ড্রাইভাররা এসে ওঠে। ইচ্ছে করলে একটা রাত কাটায়। হৈ, হল্লা, ফূর্তি-টুর্তি করে। নইলে খাওয়াপিনা শেষ করেই দৌড়।'

'আড্ডাটা সম্বন্ধে তোমার কাছে কোন রিপোর্ট হয়েছে?'

'কিছু না। লোকগুলি এমনিতে ভালো। কয়লা-ভর্তি ট্রাক নিয়ে বেপরোয়াগতিতে গাড়ী চালায়। ক্লান্তি বোধ করলে নিজেদের ডেরার কাছে নেমে পড়ে। দু-চার ঘণ্টা কিংবা বড়জোর একটা রাত কাটিয়ে আবার ঝড়ের গতিতে ছুটে চলে।'

'কাল একবার ওখানে খোঁজ নিও সুব্রত। রাত সাড়ে দশটার পর কেউ ওখানে এসে উঠেছিল কিনা। একটা কথা শুধু মনে রেখ, লোকটির সঙ্গে ট্রাক বা অন্য কোন গাড়ী ছিল না। সে পায়ে হেঁটে সুদামডির মোড় থেকে বিকনগর বাজারের দিকে যাচ্ছিল।'

'কিন্তু ভৈরব দত্তকে সে-রাতে কি কাজে যেন পাঠানো হয়েছিল না?'

'মিস দাস আমাদের সে-কথা বলে-ছিলেন। তোমার হয়ত তাই মনে আছে সুব্রত। কাজটা কিন্তু মিসের নয়, মিস ম্যানেজারের।'

সুব্রত মন দিয়ে শুনছিল।

রাজীব বলল, 'ঘটনার দিন রাত সাতটার ফাস্ট প্যাসেঞ্জারটায় মিসেস চক্রবর্তীর আসবার কথা ছিল কলকাতা থেকে। এবং সে-কারণেই ভৈরবকে পাঠানো হয়েছিল স্টেশনে। কিন্তু ভদ্রমহিলা ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারে আসেননি। ভৈরব সে-কথা ফোন করে জানিয়েছিল ম্যানেজারকে। নির্দেশ না থাকলেও নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে পরের ট্রেনটাও সে অ্যাটেন্ড করে। এবং রাত আটটার একসপ্রেসটায় ভদ্রমহিলা এসে হাজির হলেন স্টেশনে। তাঁকে নিয়ে ভৈরব বিকনগরে পৌঁছয় ঠিক সময়ে। তখন ন'টা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনদিন থেকে তৈরব দত্তের পাত্তা নেই। সে বিকনগর বাজারে খাঁটিয়ার দোকানে বসে থেকে যেতে পারে?'

'এমন কথা সুদর্শন চক্রবর্তী কিন্তু আমাদের বলেননি রাজীবদা।' সুব্রত বলল।

রাজীবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল।—'অবশ্য আমরা এসব প্রশ্ন করিনি ওঁকে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে সুব্রত।'

'কি প্রশ্ন রাজীবদা?'

'প্রশ্ন হচ্ছে মিসেস চক্রবর্তী কবে ফিরে গেলেন কলকাতায়?' ভৈরব দত্ত এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। অথচ ঘটনার দিন সন্ধ্যের পর সুদর্শন চক্রবর্তী আলোকপুরে গিয়ে-ছিল। এবং বাংলোয় ফিরে আসতে তার একটু রাত্তির হয়। প্রায় এগারোটার মত। এ-কথা সুদর্শন চক্রবর্তীর মুখ থেকেই শোনা। তাহলে দেখা যায় যে, মিসেস চক্রবর্তী এই ঘণ্টাদুয়েক সময় একাই ছিলেন বাংলোতে। অথচ পরের দিন তাকে কেউ দেখেছে বলে শোনা গেল না।'

সুব্রত বলল, 'এ-প্রশ্নের উত্তর তো সুদর্শন চক্রবর্তীর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে রাজীবদা?'

'তা হয়ত মিলবে। কিন্তু আর একটা ব্যাপার চিন্তা করেছ সুব্রত? ভরসা যে-সময়ে খুন হয়েছে বলে আমরা আন্দাজ করছি, ঠিক সেই সময়টির কথা একবার ভাব। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে, তারা তখন কে কোথায়? সুদর্শন চক্রবর্তী বলে, সে গিয়েছিল আলোকপুরে, হয়ত তখন আলোক-পুর থেকে ফিরছিল ম্যানেজার। শশাংক ভট্চায কোলিয়ারীতে ছিল, ডিউটি দিতে ব্যস্ত। সুজাতা দাস মথুরাপুর থেকে বেরিয়ে বিকনগরের দিকে আসছিল। কিংবা হয়ত বিকনগরে সবেমাত্র পৌঁছেছে। প্রভা মুখার্জি তখন বিকনগর থেকে অনেক-দূরে। এবং ভৈরব দত্ত মদের দোকানে মাল খেতে ব্যস্ত। বাকী থাকছে নিখিলেশ সেন। ঘটনার দিন রাত্রে সে কোথায় ছিল? বলা যায় না, তারও কোন অ্যালিবাই আছে। এ কাস্ট আয়রণ অ্যালিবাই—।' রাজীব স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল।

সুব্রত হেসে বলল, 'আপনি কিন্তু এক ছোকরাকে বাদ দিয়ে গেলেন রাজীবদা। বিশ্বনাথ বসু কি সন্দেহাতীত?'

'পাগল হয়েছ? খুনের তদন্ত হল দেওয়ানী মামলারও এক ধাপ উপরে। যত বেশী লোককে পক্ষ করবে, তিক্ত তত বেশী পোক্ত হবে। বিশ্বনাথ বসুকে কালই দরকার আমার। শুধু বিশ্বনাথ নয়, সুজাতাকেও দু-চারটি প্রশ্ন করব মনে করছি।'

সশব্দে দরজাটা খুলে গেল।

শচীদুলাল একরকম বিনা নোটিশেই ঘরে এসে উদয় হল। মনে হল ভীষণ ব্যস্ত সে। দ্রুত সাইকেলে প্যাডল করে এসেছে বলে একরকম হাঁপাচ্ছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শচীদুলাল সংবাদ দিয়ে বলল [illegible], 'খবর আছে স্যার। সেই [illegible] [illegible] রুমালটার হদিশ করতে পেরেছি।'

মুখ উজ্জ্বল করে রাজীব বলল, 'সত্যি?'

সুব্রত প্রশ্ন করল, 'কোন্ রুমালটা রাজীবদা? যেটা ঘটনাস্থলে পাওয়া গেল? নিখিলেশের নামের আদ্যক্ষর লেখা ছিল না ওতে?'

রাজীব বলল, 'রুমালে একটা লণ্ড্রী-মার্ক ছিল সুব্রত। মাত্র একবারই সেটা কাচানো হয়েছিল লণ্ড্রীতে। শচী বহু চেষ্টা করে ওর হদিশ করতে পেরেছে।'

শচীদুলাল খুব বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল, 'রুমালটা কে কাচতে দিয়েছিল জানেন স্যার?'

'কে?' রাজীব উৎসুক চোখে তাকাল।

'শশাংক ভট্চায। শুধু রুমাল নয় স্যার,—একটা ফুলপ্যান্ট, জামা আর ঐ রুমালটা।'

খুব গর্বিতভাবে শচীদুলাল এবার পকেট থেকে একটি জিনিস বের করল। লণ্ড্রীর রসিদ বই সেটি, মথুরাপুরের একটি ঠিকানা লেখা। এই শহরেরই লণ্ড্রী।

রাজীব শশাংকের নামে লেখা সেই রসিদটি পড়ল। একটা সবুজ কাপড়ের ফুলপ্যান্ট, একটা সাদা সার্ট এবং ঐ রুমালটার উল্লেখ রয়েছে রসিদে। ঘটনার পনের দিন আগের তারিখ। চারদিন পরে মালের ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে।

শচীদুলাল বলল, 'লণ্ড্রীওয়ালা একটা খবর দিল স্যার। পরশু দিন শশাংক নাকি আর এক প্রস্থ জামাকাপড় কাচতে দিয়ে গেছে। একটা সবুজ ফুলপ্যান্টও রয়েছে তার মধ্যে। হয়ত আগেরটা হতে পারে।'

রাজীব সোজা হয়ে বসল। 'ঐ ফুল-প্যান্টটা কালই এখানে নিয়ে আসবে শচী।' আদেশ করল সি আই ডি ইনসপেক্টর।

রাজীবের চোখের সামনে একটা সবুজ গোলাকার বস্তু ট্রেন ছাড়বার নির্দেশজ্ঞাপক আলোর সংকেতের মত স্থির হয়ে জ্বল-ছিল। চকচকে সবুজ বোতামটার কথা বার-বার মনে পড়ছিল রাজীবের। স্থানচ্যুত প্যান্টের বোতাম। এখন একটা আলোর সংকেত দিচ্ছে।

......সিনেমা হলে মাইকে গান দিয়েছে। দিশ-বাতাসে ভেসে আসা সংগীত আরো স্মৃতিমধুকর। মফস্বলের কলেজে পড়া-শুনো রাজীবের। শো ভাঙবার পর এমনি গান দিত সেখানেও। পড়া বন্ধ করে রাজীব গান শুনত।...কতদিন আগেকার কথা সব।

প্রথম যৌবনের গন্ধভরা মফস্বল কলেজের হাসি-উল্লাসের দিনগুলি কুয়াশা-ভরা নদীর ওপারের মত বহুদূরে...অস্পষ্ট।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আট বছরের লেখক-জীবন

স্টিফেন ক্রেণের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় অল্প। যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৩-র এপ্রিল মাসে উভয় বাংলায় তাঁর কয়েকটি গল্প সর্বপ্রথম অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। ক্রেণ কিন্তু মার্কিন সাহিত্যে এক বিস্ময়কর মনীষী। এডগার এলান পোর পর মার্কিন সাহিত্য ইতিহাসে যে-মানুষটির নাম উপকথার চরিত্রের সম্মান লাভ করেছে, সেই নামটি স্টিফেন ক্রেণ। তাকে জড়িয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য উপকথা আর উদ্ভট কাহিনী। "স্টিফেন ক্রেণ—এ রিভ্যালুয়েশন" গ্রন্থে রবার্ট উলুটার স্টলম্যান লিখেছেন—

"ক্রেণের সাহিত্যের সম্পর্কে এলে তাঁর বিরাটত্বে বিস্মিত হতে হয়। শুধু যে তাঁর রচনা-কৌশল ও রচনাধারার অনন্যতা বিস্ময়ের কারণ তা নয়। মাত্র আট বছরের সংক্ষিপ্ত লেখক-জীবনে একটি অপরিণত বয়সের তরুণ, যার মৃত্যু ঘটেছে মাত্র আটাশ বছর বয়সে, কি করে যে অসামান্য লিপি-কুশলতা ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে উনিশ শতকের প্রায় আধ-ডজন মহৎ কথাশিল্পীর মধ্যে নিজস্ব আসন অধিকার করেছিলেন, তা ভেবে আমরা অবাক হয়ে যাই। শুধু যে ন্যাথানিয়েল হথর্ন বা হারমান মেলভিল কিংবা হেনরী জেমসের সঙ্গে প্রথম সারিতে তাকে বসানো যায় তা নয়, এডগার এলান পো, উইলিয়াম ডীন হাওয়েলস বা মার্ক টোয়েনের সঙ্গে দ্বিতীয় সারিতেও তাঁকে আসন দেওয়া যায়।"

রবার্ট উলুটার স্টলম্যান 'স্টিফেন ক্রেণের জীবনী ও সাহিত্যের একটি বিশ্লেষণী গ্রন্থ রচনা করেছেন সম্প্রতি। পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাসের সঙ্গে লেখকের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দান করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

স্টিফেন ক্রেণ বিখ্যাত হয়েছেন চব্বিশ বছর বয়সে, স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন পঁচিশে, আর তাঁর মৃত্যু হয়েছে আটাশ বছর বয়সে। মাত্র আট বছরের লেখক-জীবন। উনিশ শতকের মার্কিন সাহিত্যকে যাঁরা দাঁড় করিয়েছেন, স্টিফেন ক্রেণ তাঁদের মধ্যে একটা বিরাট প্রতিভা। সব ব্যাপারে ভাগ্যহীন হলেও লেখক-জীবনে ক্রেণ এসেছিলেন পরিপূর্ণ প্রতিভার দীপ্তি তেজে উদ্ভাসিত হয়ে। শিল্প এবং শিল্পী-সত্তা ক্রেণের জীবনে একীভূত হয়েছিল।

ক্রেণের অকালমৃত্যুকে নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস না বলে বলা যায় এক সন্ধান-সূচক পরিণতি। ১৯০০ খৃঃ ব্ল্যাক ফরেস্টের এক হোটেলে যখন যক্ষ্মা রোগে ক্রেণের মৃত্যু হয়, তখন তিনি পিছনে রেখে গেলেন অসামান্য খ্যাতি এবং এক দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্ত্রী।

রবার্ট স্টলম্যানের এই পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথায় সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ভক্তির উচ্ছ্বাস নেই। তরুণ লেখকের ব্যথা ও বেদনার সঙ্গে জীবন-সংগ্রাম আর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা অতি সুন্দর ভঙ্গীতে বিধৃত।

স্টলম্যান দীর্ঘকাল ক্রেণ সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যুদ্ধোত্তরকালে ক্রেণের পুনরুজ্জীবনে স্টলম্যানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ফলে ক্রেণের এই জীবনী শুধু তথ্যবহুল জীবনপঞ্জী নয়, একটি সুন্দর পাঠযোগ্য জীবন মূল্যায়ন হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছে।

ক্রেণের সম্পূর্ণ জীবনকালে একটি শারীরিক ক্লেশে তাকে ক্লিষ্ট হতে হয়েছে তার নাম দারিদ্র্য। অথচ যে-বংশে ক্রেণের জন্ম, সেই বংশটি রীতিমত অভিজাত শ্রেণীর। এই বংশে কয়েকজন বিপ্লবকালীন জেনারেল এবং কমোডোরের আবির্ভাব ঘটেছে। বিপ্লবকালে প্রথমতম স্টিফেন ক্রেণ ছিলেন ঔপনিবেশিক পরিষদের সভাপতি। ক্রেণের মাতৃকুল মেথডিস্ট প্রচারক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত। ক্রেণের পিতৃদেবও ছিলেন মেথডিস্ট যাজক। পোর্ট জারভিস এবং নিউ জার্সীর গির্জাশালাতেই ক্রেণের বাল্যজীবন কেটেছিল। আনুষ্ঠানিক ধর্মমতে অনাসক্তি ছিল ক্রেণের এবং তাঁর রচনায় তার পরিচয় আছে। অবিশ্বাস ও ঘৃণা থাকলেও সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি ক্রেণ।

যখন ন' বছর বয়স তখন পিতৃবিয়োগ হল। পাবলিক স্কুলে পড়ার সময় বেসবল খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি হল ক্রেণের, এই সময় নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের সংবাদদাতা হিসাবে কিছু কিছু রোজগার হত, ল্যাফায়েত কলেজ ও সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় পর্যন্ত এই কাজ করেছেন। দুটি কাজই অবশ্য ছেড়ে দিতে হয় স্কুল সংক্রান্ত অন্য কাজের চাপে।

সিরাকিউজের ডেল্টা ক্রেটানিটিতে থাকার সময় "ম্যাগী—এ গার্ল অফ দি স্ট্রীটস" রচিত হয়। 'মাদাম বোভারী' পড়ার পর ক্রেণ এই কাহিনী রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। সেই কালটির পক্ষে দৃঢ় বাস্তববাদী কাহিনী 'ম্যাগী'—অথচ এই কাহিনী বস্তী-জীবনের আলোকচিত্র নয় বরং একটি রঙীন আলেখ্য। ক্রেণের এই গল্প ফ্রাঙ্ক নরিস, থিওডোর ড্রেইসার, জেমস টি ফ্যারেল প্রভৃতি লেখকদের জন্য নতুন পথ উন্মুক্ত করে দিল। সমাজতান্ত্রিক বাস্তব-বাদের ধারা এই প্রথম মার্কিন সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করল।

শরীরের ওজন মাত্র ১২৫ পাউণ্ড অথচ বেসবলের টিমের ক্যাচার হিসাবে সুদক্ষ ক্রেণ যে লেখক হতে পারেন, এ কথা কেউ ভাবেনি সেদিন। সিরাকিউজে অসফল হওয়ার পর ক্রেণ 'হেরাল্ড ট্রিবিউনে' কিছু কিছু নকসা পাঠাতেন, এই নকসাগুলির নাম 'সুলিভ্যান স্কেচেস'। এই সময় সুরা আর নারীতে সব রোজগারই ব্যয় হয়ে যেত। 'হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এ মাঝে মাঝে লিখে যা পেতেন, তাও এইভাবে খরচ হত। এই সময় 'ম্যাগী' আবার নতুন করে লিখলেন ক্রেণ। কবিতা এবং গদ্য রচনায় নতুন রীতির পরীক্ষাও করতে শুরু করেছিলেন এই কালে।

আমেরিকার প্রকৃতিবাদী আন্দোলনের একটি মূল এবং আদর্শ রচনা হিসাবে ক্রেণের 'ম্যাগী' আজো অনন্য। ১৮৯৩ খৃঃ ক্রেণ কাহিনীটি যখন নিজের খরচে ছাপালেন, তখন তার মাত্র একশ' কপির কম বিক্রী হয়েছিল। হ্যামলিন গারল্যাণ্ড কিন্তু গল্পটি পছন্দ করেছিলেন এবং প্রভাবশালী সমালোচক উইলিয়াম ডীন হাওয়েলসকে তিনি সমালোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। হাওয়েলসের সমালোচনার আরো অনেকে সমালোচনা করলেন এবং 'দি ব্ল্যাক রাইডার্স' নামক কবিতা-গ্রন্থটি বিশেষ প্রশংসিত হল। এই ১৮৯৫ খৃঃ 'দি রেড ব্যাজ অব দি কারেজ' প্রকাশিত

হয় এবং প্রশংসালাভ করে। "দি রেড ব্যাজ অব দি কারেজ" কয়েকখানি প্রভাবশালী সংবাদপত্রে একযোগে ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার ফলে চব্বিশ বছর বয়সেই ক্রেণ সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের স্বীকৃতি পেলেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যখন সংগ্রাম চলছিল, তখনকার কালের কথা লিখলেন এমন একজন মানুষ যুদ্ধের অবসানেও যাঁর জন্ম হয়নি। ক্রেণ বলতেন যে বেসবল খেলার সময় যুদ্ধকালে মানুষের মনের অবস্থা কেমন হয় তা তিনি অনুভব করেছেন।

দারিদ্র্য ক্রেণের কাছে সামান্য মনে হয়েছে, মানব-জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে যখন তার তুলনা করা হয়েছে, তখন তা তুচ্ছ হয়ে গেছে। ক্রেণ এইভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে বৃহত্তর জীবন-সমস্যার বিনিময় ঘটিয়েছেন। অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হল, জীবন চলছে দ্রুততালে। যুদ্ধের সংবাদদাতা হিসাবে তখন তাঁর প্রচুর খ্যাতি, সব পত্রিকায় তাঁর রচনার প্রচণ্ড চাহিদা। ১৮৯৮ খৃঃ কিউবার যুদ্ধ উপলক্ষে 'কমডোর' জাহাজে যখন সেখানে যাচ্ছিলেন তখন ফ্লোরিডার উপকূলে সেই জাহাজ ডুবে যায়। তখন একটা দশ ফুট ডিঙিতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সমুদ্রের ওপর কাটাতে হয় ক্রেণকে। যখন সেই ডিঙি থেকে ডাঙায় উঠলেন তখন তাঁর দেহ একেবারে জীর্ণ কিন্তু এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে রচিত হল তাঁর পৃথিবীখ্যাত কাহিনী 'দি ওপেন বোট'—এই সময় একটি সাধারণ মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে পেলেন, তার নাম কোরা। সে জ্যাকসনভিলে একটি প্রমোদশালা পরিচালন করত। এই মেয়েটির কিন্তু ধারণা ছিল তার পেশা অন্য ধরনের এবং সাহিত্য রচনায় তার আগ্রহ ছিল। কি করে কে জানে সে একটি ব্রিটিশ ব্যারনেটের স্ত্রী হয়েছিল। ব্যারনেট ধর্মীয় কারণে কোরাকে কিছুতেই ডিভোর্স করবেন না। কিন্তু তার জন্য কিছু এসে যায় না। ক্রেণের পদবী গ্রহণ করে কোরা তাঁর স্ত্রী হিসাবেই তাঁর সঙ্গী হলেন। গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের পর কোরা ও ক্রেণ ইংলণ্ডে বসবাস করতে লাগলেন এবং রেডস্ প্লেসে এক ব্যয়বহুল বাড়িতে বাসা বাঁধলেন। এইখানে হেনরী জেমস ও এইচ জি ওয়েলসের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং জোসেফ কনরাডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। কোরা কিন্তু অতিশয় বাউণ্ডুলে এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিল। ক্রেণের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে এল এবং দেনা মেটানোর জন্য প্রচুর লিখতে লাগলেন; জীবনের শেষ বছরটি যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটল—ব্ল্যাক ফরেস্টে কোরা তাঁকে নিয়ে গেল শরীর সারানোর জন্য। ক্রেণের মৃত্যুর পর কোরা একজন বন্ধুকে তার পাঠালো—

> "God took Stephen at eleven five. Make arrangements for me to get the dog home."

এরপর কোরা লিখতে শুরু করলেন। দু' বছর চেষ্টায় সাফল্য এলো না, ফলে আবার জ্যাকসনভিলে ফিরে গিয়ে প্রমোদশালার কারবারে আত্মনিয়োগ করলেন, এরপর আরো দশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন।

ক্রেণের 'দি ব্লু হোটেল', 'ওপেন বোট' এবং 'দি ব্রাইড কামস টু ইয়েলো স্কাই' বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্প একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য শোকাবহ ঘটনার ভিত্তিতে, একটি সর্বনাশা বৈপরীত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। লেখক যে-পদ্ধতি ও প্রকরণ ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনায়, ক্রেণের রচনাশৈলীও সেই ধারানুসারী। তিনি কাহিনী গড়ে তোলেন এক ভয়ংকর পতন বা সংকটের মুহূর্তে. ক্রেণের গল্পগুলির মধ্যে 'ব্লু হোটেল' ছিল হেমিংওয়ের প্রিয় গল্প। হেমিংওয়ে ক্রেণের পদ্ধতি অনুসরণ করেই তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত গল্প রচনা করেন, উইলাক্যাথার এই গল্পটিকে নির্বাচন করেছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে। মাত্র আট বছরের লেখক-জীবনের এবং বর্ণাঢ্য অভিব্যক্তি বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। রবার্ট স্টলম্যানের গ্রন্থটি তাই উপভোগ্য এবং মূল্যবান।

—অভয়ংকর

(1) STEPHEN CRANE: A Revaluation: bv Robert Wooster Stallman. Published bv: The Ronald Press Co.. N. York.
(2) STEPHEN CRANE: A Biography: By Robert Woos'er Stallman: Published bv: George-Braziller. Price $12-50 only.

ভারতের বাইরে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রাচীন ও আধুনিক — উভয় সাহিত্যেরই অনুবাদ এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি এরকম একটি সংবাদ এসেছে রুমানিয়া থেকে। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ ভিমিট্রিয়ান রামায়ণের অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। মাত্র ছ' মাস আগে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যেই ৬০,০০০ কপি গ্রন্থটির বিক্রয় হয়ে গেছে। অনুবাদক এই জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে বলেছেন — 'রামায়ণে এমন কিছু উপাদান আছে, যা প্রবীণ এবং নবীন সকলকে সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে। ডঃ ভিমিট্রিয়ান দীর্ঘদিন ভারতে ছিলেন গবেষণার কাজে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে তিনি যুক্ত ছিলেন। এই সময়েই তিনি রামায়ণ অনুবাদের কাজে মনোনিবেশ করেন। একটি রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্যে তিনি রুমানিয়ান ভাষায় এই অনুবাদ করেন। রুমানিয়ান ভাষায় এটিই রামায়ণের প্রথম অনুবাদ।

এ সপ্তাহের সাহিত্য সংবাদের অন্যতম হল প্রখ্যাত তামিল সাপ্তাহিক 'কল্কি'র দেওয়ালী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। বাংলা দেশে শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের যেমন হিড়িক দেখা যায়, তা আর কোথাও দেখা যায় না। তবে ভারতের কয়েকটি ভাষায় দেওয়ালী সংখ্যা বেরোয়। 'কল্কি'র বর্তমান দেওয়ালী সংখ্যাটি নানা কারণে উল্লেখ্য হয়ে উঠেছে। গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ এতে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি খুবই প্রশংসনীয়। লিখেছেন শ্রী কে ভি জগন্নাথম, শ্রী কে শান্তনম ও শ্রী টি এম পি মহাদেবম। কবিতা লিখেছেন — কোথামঙ্গলম সিব্বু, আজা ভালিয়াপ্পা, সিদ্ধানন্দ ভারতিয়ার প্রমুখ। এ ছাড়াও গল্প এবং ছবিও সংখ্যাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

অসমীয়া সাহিত্যের এ সপ্তাহের একটি বিশেষ খবর হল শ্রীপরেশমল্ল বড়ুয়ার নতুন কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ। গ্রন্থটির নাম 'আরণ্যক'। শ্রীবড়ুয়া আধুনিক অসমীয়া কবিদের মধ্যে অন্যতম। তরুণতর কবিদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে পাঠক সমাজে পরিচিত। তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থের নাম 'সান্ধ্য-আরতি'। এ ছাড়াও অসমীয়া কবিতার বার্ষিক সঙ্কলন 'বছরর কবিতা' ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালের শ্রীনবকান্ত বড়ুয়ার সঙ্গে সম্পাদনা করেন।

শ্রীপরেশমল্ল বড়ুয়ার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর রোমান্টিক আমেজ। প্রেম, সমাজ ও ইতিহাস তাঁর প্রতীকী উচ্চারণে বিধৃত হয়েছে।

উত্তর বাংলার দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য 'উত্তরবঙ্গ লেখক সমিতি' বেরিয়েছিলেন গত ৫ নভেম্বর বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের জন্য। এই সাহায্য সংগ্রহ

অভিযানে ছিলেন সর্বশ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সমিতির সম্পাদক জীবন সরকার ও সজিৎ খাঁসহ আরও কয়েকজন তরুণ লেখকও এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রাজনীতিতে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের অনেকের পক্ষেই দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। একথাটা অনেক রাজনীতিবিদই স্বীকার করতে চান না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোজাসুজি কথাটি স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, যাঁদের জীবন কাটায় তারা তাঁদের কাছে ফুলের কোনও দাম নেই। কথাটি বলেছেন তিনি বোম্বাইয়ে কয়েক দিন আগে হিন্দি ও উর্দু লেখক কিষাণ চন্দরের জন্মদিবসে আয়োজিত এক সাহিত্য সভায় এসে।

এ সপ্তাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর হল 'সোভিয়েট দেশ নেহরু পুরস্কার' ঘোষণা। এবার ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী ২২ জন লেখক সম্মানিত হয়েছেন। সম্মানিত লেখকদের মধ্যে বাংলা দেশ থেকে আছেন শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মৌলিক সাহিত্যকর্মের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বাংলার কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ। অক্টোবর বিপ্লব, প্রগতি ও শান্তির উদ্দেশ্যে রচিত কাব্য সংকলন 'উত্তর আকাশের তারা' বইটির জন্য তিনি নগদ আট হাজার টাকা ও পনেরো দিন বিনা ব্যয়ে সোভিয়েট দেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেছেন। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের অন্যান্য প্রাপকদের মধ্যে আছেন বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার ও সাংবাদিক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গর্কির 'মা' উপন্যাসের বাংলা নাট্যরূপ দানের জন্য নগদ এক হাজার টাকা মূল্যের পুরস্কার লাভ করেছেন। ওড়িশার কবি শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র পুস্কিনের সম্পর্কে একটি গ্রন্থ অনুবাদ করে এবং অসমীয়া লেখক শ্রীশশী শর্মা ম্যাক্সিম গর্কি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে অনুরূপ নগদ এক হাজার টাকা লাভ করেছেন।

এ বছরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিশিষ্ট পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন—হিন্দির শ্রীবৃন্দাবন শর্মা, কানাড়ী লেখক শ্রীমানববাজ কাটিমানি, পাঞ্জাবীর শ্রীসর্দার মোহন সিং, উর্দুর কুমারী কুররাত-উল-আইন হায়দর, গুজরাটির জয়া ঠাকুর এবং মালয়ালম ভাষার লেখক শ্রী কে পি জি নাম্বুদিরি। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সম্পর্ক বিষয়ক আলোকচিত্র সিরিজের জন্য শ্রীখজা-দেব রহেজা পুরস্কার পেয়েছেন।

বই চুরি সম্বন্ধে অনেকরকম কথা শোনা যায়। কেউ কেউ অবশ্য চুরি করেন না, কিন্তু বইয়ের কিছু অংশ সযত্নে কেটে নেন। আবার এমনও দেখা গেছে, একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কয়েকটি পাতা আঠা দিয়ে আটকান থাকে, যাতে কোনক্রমেই তা পড়া যায় না। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, এইসব কাজ যারা করেন, তারা কেউ অশিক্ষিত নন। দুষ্প্রাপ্য বই একমাত্র গুণী, জ্ঞানী, গবেষক ছাড়া পড়েন না। তাহলে ধরে নিতে হয়, যাঁরা আমাদের সমাজের নমস্য ব্যক্তি, তাঁরাই এসব কাজ করছেন। আমরা কোন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। সম্প্রতি জনৈক ছাত্র বৃটিশ কাউন্সিল থেকে বই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ছাত্রটি লাইব্রেরীর আলমারী থেকে কয়েকটি মূল্যবান বই তার পরিচ্ছদের নীচে লুকিয়ে ফেলে। বেরিয়ে যাবার সময় দারোয়ানের সন্দেহ হয় এবং তার পরিচ্ছদ থেকে বইগুলি বের করে। তখন ছাত্রটিকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। বিচারে ছাত্রটির ছয় মাস দণ্ড হয়েছে। বেচারা ছাত্রটি হঠাৎ ধরা পড়ে গেছেন। কিন্তু যাঁরা বইয়ের পাতা কেটে রাখেন, বা পাতা আঠা দিয়ে জুড়ে দেন, তাদের বিচারের ব্যবস্থা কোথায়?

সম্প্রতি হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে 'সাহিত্য-প্রয়াসী' নামে একটি নতুন সৃজনশীল সাহিত্য সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সংস্থাটি ইতিমধ্যেই কয়েকটি সাহিত্য অধিবেশনের মাধ্যমে হাওড়ার সকল সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিরলস সাহিত্যসাধনা ও সংস্কৃতির চর্চাই এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত সাহিত্য অধিবেশন, আলোচনা সভা, বিতর্ক সভা, সাহিত্য প্রতিযোগিতা ও একটি সম্পূর্ণ প্রথামুক্ত মার্জিত রুচির মুখপত্র প্রকাশ করাই এই সংস্থার বর্তমান কার্যসূচী।

বিদেশী সাহিত্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস্তব প্রয়োজনের প্রেরণায় ও তাগিদে বহু সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সমকালীন জীবনপ্রবাহের পরিচয় ও অভিপ্রায় ফুটে ওঠে এসব বইয়ের মাধ্যমে। আমাদের দেশে এ-জাতীয় সঙ্কলনের সংখ্যা কম নয়। সম্প্রতি মিস এলিজাবেথ গজ 'এ বুক অব পিস' নামে একটি সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। তাঁর মতে, আজকের মানুষ নানা ভাবে বিপর্যস্ত—চতুর্দিকে উত্তেজনা ও হাহাকার। সেজন্যেই—"আজ আমরা শান্তির জন্য যতটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছি এর আগে কখনো এতটা ছিল না।" কয়েক বছর আগে তিনি 'কমফোর্ট' নামে আরেকটি সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় সম্পাদিত গ্রন্থ।

ব্রাউনিং ভক্তদের জন্যে একটি সুখবর আছে। সম্প্রতি বারবারা মেলকিয়োরি তাঁর ওপরে একটি আলোচনার বই লিখেছেন—'ব্রাউনিংস পোয়েট্রি অব রেটিসেন্স' নামে। বইটি গবেষণামূলক। এ গ্রন্থে তিনি ব্রাউনিংয়ের সমগ্র কবিতার আলোচনা করেননি কিংবা প্রবেশ করেননি তাঁর কবিতার জটিল তত্ত্বে। বরং তাঁর কবিতার কাঠামো, ছন্দনির্মাণ ও আঙ্গিক কুশলতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন প্রসঙ্গক্রমে। কয়েকটি কবিতাকে ভিত্তি করেই সমগ্র বইটি লেখা। তার মধ্যে আছে—'আন্দ্রেয়া ডেল সারতো' 'চাইল্ড রোলাণ্ড' 'প্যারাসেলসাস' প্রভৃতি কবিতার আলোচনা। এই গ্রন্থে লেখিকা তাঁকে বিশ্লেষণ করেছেন সমকালীন ভাবপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে। কিছুটা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তে আস্থাশীল থেকেই অবশ্য আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তবু তাঁর আধুনিক মন সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকেনি বিশ্লেষণের সময়। বরং কোথাও কোথাও ফ্রয়েডীয়ান মনস্তত্ত্বের প্রভাব এবং অসম্ভব রকমের নতুন ব্যাখ্যার কথাও তিনি ভেবেছেন নিজের অজ্ঞাতসারেই।

কবিতা নির্বাচন করা খুবই কষ্টকর। বিশেষত কয়েক শতাব্দীর কবিতাকে যখন কোনো একটি সঙ্কলনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়, তখন বাধে আরো বিভ্রাট। সম্পাদকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার ওপরই এ ধরনের সঙ্কলনের সার্থকতা নির্ভর করে।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে একটি কাব্য সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'দি সেঞ্চুরীজ অব রাশিয়ান পোয়েট্রি'। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত মোট ছিয়াশিজন কবির কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। পরিশেষে প্রত্যেক লেখকের একটি করে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

মার্গারেট ডুরাকে আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিক হিসেবে অনেকে গণ্য করে থাকেন। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বাইরের জগতেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি একটি নৃশংস হত্যাকাহিনীকে ভিত্তি করে তিনি "লামান্তে অ্যাঁ গ্লেইস" নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। এর আগেও তিনি যেসব উপন্যাস লিখেছেন—তার অধিকাংশই হত্যা, অপরাধ এবং জঘন্য ষড়যন্ত্রের পরিবেশে লেখা। পত্নীহত্যা এবং হিংসুটে স্বামীদের কার্যকলাপে তাঁর বহু উপন্যাস কণ্টকিত। তা ছাড়া রয়েছে খুন-খারাবি, কান্না, উৎপীড়ন প্রভৃতি নারকীয় কাহিনী। তাঁর চরিত্রগুলি অস্থির, নায়কেরা দুর্ধর্ষ, নায়িকারা চঞ্চলা এবং বিক্ষুব্ধা। এ উপন্যাসের নায়িকা তাঁর এই দীর্ঘতম চরিত্রমালার সর্বশেষ নিদর্শন। তার নাম ক্লেয়ার লেনে। সে তার বৈমাত্রেয় ভাইকে পছন্দ করে না। একদিন প্রায় বিনা কারণে সে তাকে হত্যা করে। এবং খণ্ড খণ্ড করে তার মৃতদেহটিকে রেলওয়ে ব্রীজ থেকে নিচে ফেলে দেয়। এককালে তার রূপ ছিল, যৌবন ছিল। এখন সেই তারুণ্য নেই। সকলের কাছেই সে উপেক্ষিতা—স্বামীদের দ্বারা প্রতারিতা। হয়তো এই বোধই তাকে উন্মাদিনী করে তোলে। তাই যাকে প্রথম সামনে পেয়েছে—তাকে হত্যা করেই সে তার আক্রোশ প্রকাশ করেছে। যৌবনে সে ছিল ভয়ঙ্কর রকমের প্রেমিকা।

আমাদের দেশে বিশেষ কোনো কবি-সাহিত্যিকের রচনাবলীর প্রচার ও অনুশীলনের জন্য তেমন কোনো ব্যাপক সংগঠন নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের জন্য বিশ্বভারতী থাকলেও অন্যান্য সাহিত্যিকরা মৃত্যুর পরে কম-বেশী উপেক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের নামে সংস্থা আছে, কিন্তু উপযুক্ত প্রচার-ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে হুগো বন হফমানসথাল সোসাইটি নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। তার প্রথম অধিবেশন হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। সভাপতি ছিলেন সুইস ঐতিহাসিক কার্ল বার্কহাউস। হফমানসথালের অসম্পূর্ণ রচনাবলীর ওপর আলোচনা করেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড আলেউইন। এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হফমানসথালের রচনা সম্পর্কে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রচার ও অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। হফমানসথালের গ্রন্থাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্বও তাঁরাই গ্রহণ করবেন। সংস্থাটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত ফ্রাংকফুর্টে।

পোলিশ লেখকদের উদ্যোগে সম্প্রতি "বিদেশে পোলিশ সাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় ওয়ারশতে। প্রায় তের শ' বই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। অবশ্য তার তিন গুণেরও বেশি ছিল বিদেশী ভাষায় অনূদিত পুস্তক-পুস্তিকা। ১৯৪৫ থেকে ৬৭ সালের মধ্যে বিদেশী ভাষায় চার হাজারেরও বেশি পোলিশ গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি দেশের প্রায় আটাত্তরটি ভাষায় এসব অনুবাদ হয়। প্রদর্শনীতে পোলিশ সাহিত্যের যে সকল সংকলন গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—তাও দেখাবার ব্যবস্থা হয়। তার মধ্যে প্রায় ৪০০ বছর আগে প্রকাশিত বইয়ের প্রথম সংস্করণও ছিল কয়েকটি। শীঘ্রই লণ্ডনে অনুরূপ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন পোলিশ লেখক সঙ্ঘ।

মারিয়েল স্পার্কের উপন্যাসগুলি ফর্ম ও কনটেন্টের দিক থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর। অত্যন্ত সংযত, সংহত ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেন। তাঁর চরিত্রগুলি নানাশ্রেণীর—কেউ ধূর্ত কেউ বা হাস্যকর। প্রায়ই তিনি উপন্যাসের ঘটনাকে কোনো একটি সংকটের মধ্যে ফেলে সংশয় সৃষ্টি করেন। 'দি পাবলিক ইমেজ' নামে সম্প্রতি তাঁর একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। জনৈক বৃটিশ চিত্র-তারকার কাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। তার নাম এনাবেল ক্রিস্টোফার। সে চতুর নয়। বরং তার সামনে আয়না না থাকলে সে কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে পড়ে। অথচ অভিনয়ের সময় তার যৌন অঙ্গভঙ্গি দর্শকের মনকে পর্যন্ত যথেষ্ট উত্তেজিত করে। চিত্রপরিচালকের কায়দায় সে পর্দার 'লেডী টাইগার' হিসেবে পরিণত হয়। এনাবেলের স্বামী ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি স্ত্রীর এই নির্বোধ প্রকৃতিকে ভালোভাবেই জানতেন। এবং সবশেষে সংশয়ে পড়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। সমালোচকের ভাষায়, এতে কোনো 'থ্রিলিং' বক্তব্য নেই। এখানেই লেখিকার সার্থকতারও মূল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। নায়িকার জীবনে বিশেষ কোনো সমস্যা না থাকলেও অনেকের কাছেই সে মনোপীড়ার কারণ বলে মনে হয়।

অনন্যসাধারণ সঙ্গীতকোষ

সঙ্গীতচন্দ্রিকা—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬।৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। দাম পনের টাকা।

সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'সংগীতচন্দ্রিকা'-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর আগে। প্রবীণ সংগীতজ্ঞ ও গ্রন্থকারের সারা-জীবনের সাধনার্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলশ্রুতি এই পুস্তক সংগীত-রসিক সমাজের এক বিশেষ সম্পদরূপেই গৃহীত হবে। কারণ, সকল রকম পাঠকের আকর্ষণীয় উপাদান-প্রাচুর্যে পূর্ণ এই গ্রন্থ। শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থে পাবেন কণ্ঠ-সাধনা, স্বরসাধন ও সংগীতের বিচিত্র অলঙ্কারসাধনের নির্দেশ-পদ্ধতি। সংগীতানুরাগী, সন্ধানী গবেষক ডুবে যাবেন সংগীতের উৎপত্তি, শাস্ত্রীয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা, কাব্যশাস্ত্রের ছন্দের সঙ্গে সংগীতের তাল ও ছন্দের সমন্বয়ের অতলে। শিল্পীদের জন্য প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ, খেয়াল প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন ছাড়াও বাংলার সুপ্রসিদ্ধ গীতিকারদের গান সবিস্তারে স্বরলিপিসমেত সন্নিবিষ্ট। আর একটি মূল্যবান বস্তু তথ্যানুসন্ধানী-দের আনন্দদায়ক। সেটি হোল মহানির্বাণ-তন্ত্র, ছন্দোমঞ্জরী-র বহু সংস্কৃত স্তোত্রের সংকলন, বিভিন্ন তালের ঠেকা, মৌলাবক্স্, গুরুগুহ, অচপল ইত্যাদি সাধারণের অজ্ঞাত বহু গুণীর গান ও স্বরলিপি। এছাড়া সদারঙ্গ, অদারঙ্গ তানসেন, কদর, আনন্দ-কিশোর ব্রহ্মানন্দ, লক্ষ্মণদাস, শোভন খাঁ, দরিয়া খান, জগরাজ দাস, শ্যামদাস, নবল-কিশোর হরবল্লভ, চণ্ডলশশী, রূপরঙ্গ, ধীরজ প্রভৃতি সাধক-স্রষ্টা ছাড়াও যেসব গীতস্রষ্টার নাম হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয় প্রচলিত অপ্রচলিত বহু ধ্রুপদ ধামার গান ও স্বরলিপি এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পরিশেষে রাগ-পরিচয়, বিভিন্ন রাগের চলন, আরোহী, অবরোহী সংগীতজ্ঞ-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থটির শিল্প-সম্মত উপসংহারে পৌঁছে দিয়েছে।

এইরকম একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার ও দায়িত্ব বহন করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সুধী-সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধান চিত্তাকর্ষক।

রোদ রাজা মেঘ রাজা : (কিশোর-নাটিকা)—বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ।। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ১ শঙ্কর ঘোষ লেন কলকাতা—৬।। দাম : দুটাকা।

রূপকথার গল্প ভালোবাসে না এমন ছেলেমেয়ে নেই। তার স্বাদ আলাদা, রস আলাদা। বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ কিশোর মনের এই সহজাত আকর্ষণের মূল রহস্যটি জানেন। রূপকথার দুটি কাল্পনিক কাহিনীকে ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন দুটি নাটিকা। প্রথম নাটিকা "অল্পের জন্য" —সহজ পরিহাসের ভঙ্গিতে লেখা। কাট্-কাট্পুর আর লাগ্লাগ্পুরের বিবাদ নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। নানারকমের মজার ঘটনা দিয়ে এটি ঠাসা।

দ্বিতীয় নাটিকাটির নামেই এ বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে। ছয় থেকে দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্যে এটি লেখা। এখানেও আছে রাজা, রাণী, রাজকন্যা আর চাঁদের বুড়ির গল্প। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা বইটি পড়ে এবং নাটিকা দুটি অভিনয় করে আনন্দ পাবে।

• • • • • • • •

মাছরাঙা (ছড়া) — হরেন ঘটক। ভব-তারিণী বুক এজেন্সী। ৬২এ, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙলা ভাষায় ভাল ছড়ার বইয়ের অভাব নেই। শিশু-সাহিত্যের এই বিশেষ বিভাগটি বেশ সমৃদ্ধ। বিভিন্ন লেখকের রচিত ছড়ার সংকলন সমাদর লাভ করেছে। শ্রীহরেন ঘটক শিশুদের উপযোগী অনেক-গুলি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি তার সম্প্রতিকালে রচিত ছড়ার সংকলন। তার পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মত এই রঙিন ছবিতে সমুদ্রিত ছড়ার সংকলনটিও সমাদৃত হবে।

•

বসন্তে একাকী : উমাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়। সেতু সাহিত্য প্রকাশনী। রাজা রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দাম— তিন টাকা।

এই কবিতার বইটিতে মোট পঞ্চাশটি কবিতা সংকলিত। কিছু কবিতা ছন্দোবদ্ধ, কিছু গদ্যে লেখা, মোটামুটি অনেক-গুলিই সুখপাঠ্য। পরবর্তী প্রচেষ্টায় কবির সচেতন থাকা দরকার বলে মনে করি।

•

সংশপ্তক : সতীশচন্দ্র রায় বিরচিত। বাসুদেবপুর ন্যায়ভূষণপাড়া। খড়্গ-পুর। মেদিনীপুর।

সতীশচন্দ্রের এই আত্মচরিতে আছে বাঙলা দেশের এক সময়ের অজানা নানান তথ্য। উৎসাহী ব্যক্তিরা সংগ্রহ করতে পারেন।

•

জাতের ব্যবসা : কে ঘোষ। গ্রন্থগৃহ। ৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা— ১২। দাম দু টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

অল্প মূলধনে নানান ধরনের ব্যবসা কিভাবে আরম্ভ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সচিত্র আলোচনা করা হয়েছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

একাল। সম্পাদক। ভরত সিংহ ও নকুল মৈত্র। ২৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা —৩৫। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

'একাল' ছোট গল্পের দ্বিমাসিক। প্রকাশিত বিষয় হচ্ছে ছোটগল্প এবং তৎ-সংক্রান্ত আলোচনা। তাছাড়া পুরনো পত্র-পত্রিকা থেকে গল্পও এঁরা প্রকাশ করে থাকেন। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত পুরানো গল্পটি নেওয়া হয়েছে চুয়াম বৎসর আগে ভারতবর্ষ-এ প্রকাশিত পরিমলকুমার ঘোষের গল্প 'প্রতিদান'। তারাশংকরের ছোট গল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অরুণ দে। গল্প লিখেছেন সুখেন্দু ভট্টাচার্য, অজয় মুখোপাধ্যায়, ভরত সিংহ ও নকুল মৈত্র।

লোকশ্রুতি (৪) সম্পাদক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। কলিকাতা-৩৪। দাম এক টাকা

লোকশ্রুতির এই সংখ্যাটি গ্রাম-সমীক্ষা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত। বাংলার সমাজ-জীবনের বিবর্তনের ধারা অনুধাবনে গ্রাম-সমীক্ষা প্রয়োজন। এই সংখ্যায় পুরুলিয়া জেলার একটি আরণ্য গ্রাম-সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে যে গ্রাম-সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায় এই খণ্ডে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

আগের ঘটনা

[সত্যর বাল্যবন্ধু সুখেন এসে তছনছ করে দিল সত্যর সংসার। লীলাকে ভাসিয়ে নিল সুখেন। দুঃস্বপ্নের ছায়ায় সত্যচরণ। ঘরে এল যমুনাও, নব-যুবতী।

সুখেনের প্রেম কিনল লীলা। কিছুদিন বাদে ডিভোর্স হল সত্য আর লীলার। যমুনাকে ঘিরে সত্যর রঙিন স্বপ্ন। সে অন্তঃসত্ত্বা। তবু বিয়ে করতে পারছে না।

সুখেনকে নিয়েও জল অনেক ঘোলা হল। জুয়া, মদ আর মেয়েছেলে তার নিত্য সঙ্গী। এক রাতে পুলিশও অ্যারেস্ট করল। লীলা মুক্তির ব্যবস্থা করল। ছাড়া পেয়ে সুখেন কলকাতার অভিমুখে। সত্য লিপ্সা-স্বপ্নে ক্ষত-বিক্ষত। পাগল হয়ে গেল সে। যমুনা নার্সিং হোমে। সেখান থেকে বেরিয়ে লীলার মুখোমুখি। স্মৃতি তোলপাড়। সত্য ডাকল লীলাকে। বিশ্রী পরিস্থিতি।]

॥ ৪১ ॥

খাটিয়ায় থাকায় প্রবোধের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না রাত্রিবাসের। নীচের ঘরের ঢাকা বারান্দায় একটা ক্যাম্বিসের খাটিয়া আর বিছানার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রবোধের ঘুম আসবার কথা নয়। বারবার সে বাইরে উঁকি মেরে সত্যর প্রতীক্ষা করছিল। কখনও ওপরে উঠে গিয়ে যমুনার খবর নিচ্ছিল। যমুনার আসল যন্ত্রণা শুরু হতে নাকি দেরী আছে। চব্বিশ ঘণ্টা তো বটেই। তবে ভয়ের কথা—ভ্রূণ একে অপরিণত, তায় উল্টোভাবে অবস্থান করছে। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, আজকালের মধ্যে সম্ভবত খুব জোরালরকম একটা আঘাত লেগেছিল পেশেন্টের। সেটা মানসিকও হতে পারে।

ঠিক তাই। প্রবোধ রাত্রে স্পষ্ট দেখেছিল, যমুনা গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হতভাগিনী মরতে গিয়েছিল। মরতে না গেলে কি কঠিন মানুষ প্রবোধও এমন বিচলিত হতে পারত?

কিন্তু সত্যর কাণ্ড দেখে রাগে মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রবোধ ভাবতেই পারে নি—ও এমন করে কেটে পড়বে। একটু-আধটু পাগলামির আভাস থাকলেও এ দুঃসময়ে ফেলে পালানোর মত পাগল সত্য তো হয়নি। আসলে হাড়ে হাড়ে খচ্চর বদমাইস।

প্রবোধের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। তার চেয়ে যমুনার মরে যাওয়াই বোধ করি ভালো হবে। তার পেটের ছেলেটা যদি বাঁচে—আইনত সত্যর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। একটা জারজ ছেলে নিয়ে বাপের ঘরে কি গরবিনী হতে পারবে যমুনা? ওই ফুলের মত সুন্দর কচি মেয়ে। ছ্যাঃ।

দুলাল ডাক্তারকে স্লিপ পাঠিয়েছিল প্রবোধ। রাত তখন একটা। উনি শুতে যান রাতের দুটোয়। প্রবোধ একটু ইতস্তত করে সব ঘটনা জানিয়েছিল। গম্ভীরমুখে ডাক্তার বলেছিলেন, এমন অনেক হয়। আজকাল তো আকছার হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, এসব ভীষণ রিস্ক। পেশেন্টের শরীর যা দুর্বল দেখলাম, সাংঘাতিক কিছু কমপ্লিকেশান ঘটে যেতে পারে। কিছুদিন আগে হলে কথা ছিল না। প্রবোধ করজোড়ে বলেছে, যা হয় হোক—আপনি রিস্ক নিন ডাক্তারবাবু।

একটু হেসে ডাক্তার বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন না প্রবোধবাবু। একটা কথা বলছি। আফটার অল আমরা মানুষ। কোন সমস্যা এলে তার সমাধানের চেষ্টা করাও আমাদের অভ্যাস। সে-সমাধান সবসময় ভেঙে ফেলার ব্যাপার কেন হবে—যদি গড়ে তোলার আশা থাকে!

প্রবোধ জিজ্ঞাসু দৃষ্টে নীরবে তাকিয়েছিল মাত্র।

ডেলিভারী হতে দেরী হবে। যদি এখনও ঘণ্টা বারোচোদ্দর মধ্যে সত্যবাবুকে এখানে হাজির করাতে পারেন, একটা লিগ্যাল ম্যারেজ গোছ ধরনের কায়দা নেওয়া যাবে। আমি সাক্ষী থাকব। ডেটটা কয়েকমাস আগের বসিয়ে দিলেই চলবে। আপনার খাতিরে এটুকু আমি করতে পারি।

অধীরভাবে প্রবোধ বলল, সেটা অবশ্য পরেও করে নেওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে সমস্যাটা একটু অন্যরকমের। আমি যমুনার কথা ভাবছি। ওই হতচ্ছাড়া স্কাউন্ড্রেলটার হাত থেকে ওকে বাঁচাতে চাই ডাক্তারবাবু।

তাতে কি মেয়ে সুখী হবে? তার মতটাও তো জানা দরকার। এবং ছেলেটারও।

আইনত এখনও ও নাবালিকা। বুঝতেই পারছেন, অবোধ কচি মেয়ে।..... প্রবোধ আত্মসম্বরণ করল।

দুলাল ডাক্তার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ভেবে নিয়ে বললেন, ধরুন—আজকাল এমন তো অহরহ হচ্ছে—বাচ্চা যদি বেঁচে থাকে, কোন আশ্রমেও রাখা চলবে। পরে বাচ্চা বড় হলে মা যদি ভাল বোঝেন চলে আসবেন......

প্রবোধ কথা কাড়ল, ছেলে থেকে যাবে?

হ্যাঁ। অনেকই তো থাকে। মায়েরা ফের নতুন জীবন শুরু করেন।

জানাজানি হয় না?

কিছু হয়, কিছু হয় না। তাতেও কোন অসুবিধে হয় না আজকাল।

মাথা নেড়ে প্রবোধ বলল, আমি বিষয়ী মানুষ। গ্রামে থাকি। ওসব ব্যাপার ভাবতেও কষ্ট হয়। মা আর ছেলে—বড় পবিত্র গভীর একটা সম্পর্ক। কেউ কাকেও ছেড়ে থাকবে—একথা ভাবলে আমার মত শক্ত মানুষের ঘাড় মোচড় দেয়। ডাক্তারবাবু, যত টাকা লাগে আমার আপত্তি নেই—আপনি রিস্কটা নিন। আমি মেয়ের একমাত্র গার্জেন। বন্ডে সই করে দিচ্ছি। কই, বন্ড দিন।

খোঁৎ খোঁৎ করে হাসলেন দুলাল ডাক্তার।... মানুষ খুন করাবেন?

প্রবোধ হাসবার চেষ্টা করে বলল, এ তো আপনার কাছে নতুন কিছু নয় ডাক্তারবাবু। তাছাড়া শরীরের কোথাও ক্যান্সার হলে আপনারা কেটে বাদ দেন। এও তো তাই।

আপনি তো মেয়ের কাকা?

হ্যাঁ।

দুলাল মিত্র স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, আপনার নিজের মেয়ে হলে কী করতেন?

অসন্তুষ্ট হয়ে প্রবোধ বলল, কেন ওকথা বলছেন? কাকা-বাবায় খুব কি তফাৎ আছে।

আছে। শুধু সাইকোলজিক্যাল নয়—একেবারে বায়োলজিক্যাল তফাৎ।

বুঝতে পারছি না আপনার কথা। যমুনাকে আমিই মানুষ করেছি।

দুলাল মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। ডোণ্ট মাইণ্ড। ওটা থাক্। আমার সময় হয়ে এল।

তাহলে কী হবে?

দেখুন, আমরা আজকাল অনেক অসম্ভব সম্ভব করি। পেসেণ্টকে বাঁচিয়ে তার বাচ্চাটা নষ্ট করা আমাদের কাছে কঠিন কোন সমস্যা নয়। কিন্তু একটা কথা খুলে না বলে পারছিনে। পেসেণ্ট আমাকে বারবার বলেছে, তার যা হবে হোক, বাচ্চা যেন বেঁচে থাকে। এখন কথা হচ্ছে, আমি যা বুঝেছি, মেয়েটির যখন জ্ঞান হবে, সে বাচ্চার কথা জানতে চাইবে। তখন যদি জানতে পারে যে......

জানতে দেবেন না।

কিন্তু এক সময় সে জানবেই। তখন কিন্তু ভীষণ শক পাবে। ওই হেলথ দিয়ে তাকে বাঁচানো যাবে না। এমন অনেক কেস আমার হাতে এসেছে। এগুলো বেশ পিকিউলিয়ার কেস। —অনেকে যদি বা বেঁচেছে, সে বাঁচা মরার সমান।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে প্রবোধ বলল, তাহলে মরবে। দণ্ড তো দিতেই চাচ্ছি।

হেসে উঠলেন দুলাল ডাক্তার।...আইনে এমন কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া আগেই বলেছি মশাই, ডাক্তার

অল, আমি একজন মানুষ। মাফ করবেন প্রবোধবাবু, বাচ্চা নষ্ট করতে আমার আপত্তি নেই—অন্তত যেক্ষেত্রে তার মায়ের কোন আপত্তি থাকে না। আমি বারবার রিপোর্ট পেয়েছি, পেসেণ্ট তার বাচ্চার কথা জিগ্যেস করছে। এখন বলুন, আমার কী করা উচিত ?

প্রবোধ কোন জবাব দিতে পারল না।

প্রবোধবাবু, কথাটা আপনিও ভাবুন। অন্য ক্ষেত্রে প্রেমিক পালিয়ে যায় বা অস্বীকার করে বলেই মেয়েদের অবৈধ গর্ভের সমস্যাটা থেকে যায়। এখানে তো ঠিক তেমন কিছু নয়। ওরা তো স্বামীস্ত্রীর মত বাস করছে। লিগ্যাল কোন ব্যবস্থা করিয়ে নিতে অসুবিধে নেই। সত্যবাবুর সম্পত্তির শরীক কেউ আছেন নাকি ?

নাঃ।

তাহলে নির্ভাবনায় ঘুমোন গিয়ে। আচ্ছা প্রবোধবাবু, আপনি একজন বান্দু আইনজ্ঞ মানুষ। এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো ? যান, চুপচাপ ঘুমোন। সকালে যদি সত্যবাবু না আসেন, একবার খুঁজে দেখবেন। সম্ভবত একটা ইমস্যানিটি গ্রো করেছে ও'র মধ্যে। সেটা—যা শুনলাম, খুবই স্বাভাবিক। ওঁকে আমি ঠিক করে দেব'খন। হাজির করবেন আমার কাছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রবোধ অস্থির আর হতাশভাবে নেমে এল। কেউ বুঝছে না—সমস্যাটা কী। ভবিষ্যতে এ সমস্যার চেহারাই বা কী হবে, কেউ তাকিয়ে দেখছে না। প্রবোধ সংসারী অভিজ্ঞ মানুষ—তার চুলে পাক ধরতে চলছে, সে অনেকটা বুঝতে পারে।

যতক্ষণ না ঘুম এল, প্রবোধ কেবল চমকে উঠছিল—বুঝি সত্যর পায়ের শব্দ হল, বুঝিবা ওপরে যমুনার বাচ্চার কান্না শোনা গেল। ডাক্তারবাবু যাই বলুন, বাচ্চা হবার আগেই যদি মা মন্ত্রপাঠের ব্যাপারটা চুকে যায়, ও সন্তান শাস্ত্রমতেও অবৈধ। জারজ।

শাস্ত্র! প্রবোধের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছিল। শাস্ত্র নয়—একটা গভীর প্রাচীন অনুশাসন যেন রক্তের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই সংহিতার সূত্রাবলী কোনমতে মানুষের কাছে মিথ্যা হবার নয়। লীলারানীর কথা মনে পড়ছিল প্রবোধের। তার রক্তে—হ্যাঁ, একমাত্র তার রক্তেই সম্ভবত এটা নেই। কেন নেই, বুঝবার চেষ্টা করছিল সে। তারপর ঘুম তাকে স্বপ্নের দিকে ঠেলে দিতেই সে যেন সব সমস্যার সমাধান চোখের সামনে দেখতে পেল। সত্য আর লীলার বিয়ে হচ্ছে। টোপরপরা বরকনের সঙ্গে রাশভারী প্রবোধ রসিকতার চেষ্টা করছে। সত্যর কপালে চন্দনের আলপনা—সত্য দুহাতে মুখটা ঢেকে বলছে : মাইরি প্রবোধদা, মুখটা চক্‌চক্‌ করছে কেন ? কেমন যা হয়ে গেল দেখছ ? সত্যর সাজা মুখে বা। যমুনা কেঁদে বলল, ছোটবাবা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ? সিনেমা দেখবার খুব সাধ হয় আমার।

কে নিয়ে যাবে প্রবোধ ছাড়া ? সুভদ্রা তেড়ে এল। মেয়ের মুখ ভেঙে দেখ হতচ্ছাড়া মেয়ের। অত সাজগোজের চঙ কেন এই বয়েসে ? নিত্যি একগাদা স্নো-পাউডার ঢেলে সঙ সাজা চাই। ও মেয়ে নির্ঘাৎ কপাল ভাঙবে দেখে নিও। রাগে প্রবোধ অ্যাদ্দিন যা পারে নি, তাই করে বসল। গালে চড় মারল সুভদ্রার।

ঝাড়ুদার পায়ে ঠেলা দিচ্ছিল, স্বপন হউচি। উঠ, উঠ।

ভোর। ধড়মড় করে উঠে বসল প্রবোধ। যমুনা কেমন আছে ?

উপরে যেতেই চেনা নার্সটা নমস্কার করে বলল, দিদি ভালো আছেন। বাচ্চা হতে খুব দেরী নেই মনে হচ্ছে। বড় জোর ঘণ্টা তিনচার।

আর ঘণ্টা তিনচার মাত্র! বাসিমুখেই প্রবোধ বেরোল। উদ্‌ভ্রান্তের মত আরেক উদ্‌ভ্রান্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সে। সত্য সম্ভবত এখনও শহর ছেড়ে যায়নি। পথে আসতে আসতে বেশ কয়েকবার বলছিল, সুখেনের কাছে অনেক টাকা পাওনা আছে। এ-সুযোগে আদায় না করে ছাড়বে না। প্রবোধদা, তুমিও সঙ্গে থেকো কিন্তু।...প্রবোধ কথাটা কানে নেয়নি।

প্রথমে লীলা প্রেসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে সুখেনের। সুখেন প্রবোধকে চিনবে না। মামলার সময় দু-চারবার দেখেছে বড়জোর। সে কি মনে আছে তার ?

অত সকালে প্রেস খোলেনি। অস্থির প্রবোধ এলোমেলো ঘুরতে থাকল ভূতে-পাওয়া মানুষের মত। একবার ভাবল, আগে গিয়ে পুরুতমশায়কে সঙ্গে নেবে। তারপর দুজনেই ফের ঘোরাঘুরি করে খুঁজবে। পরক্ষণে ব্যাপারটা একটা সঙের মত মনে হল। রাশভারী হিসেবী মানুষটির এ-দশা দেখলে সুভদ্রা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না।

এক সময় হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। কী করতে যাচ্ছে ছেলেমানুষের মত ? কে পারে ? যে-অশুভক্ষণে যমুনা সত্যকে আত্মদান করেছে, তখনই পাপ যত্ন করে বিষের চারা রোপণ করেছে। সে বিষতরু যদি টিকে থাকে, কী ফল ছোটাছুটিব, কেনই বা এই তোলপাড় আকাশপাতাল ভোরের শহর।

প্রবোধ গঙ্গার ধারে এল শান্ত পা ফেলে।

যমুনার কাছে তার বাচ্চা অবৈধ নয়—সব মায়ের স্বাভাবিক বাৎসল্য আর তৎপরতায় সে তাকে লালন করবে। একটুকু কার্পণ্য থাকবে না নিশ্চয়। অথচ সংসার তাকে বলবে—অসিদ্ধ, জারজ। কী অধিকার আছে সংসারের ? প্রবোধেরই বা কী অধিকার ? যাদের ছেলে, তাদেরই। আর মানুষের জন্ম তো আগে-ভাগে জানিয়ে-শুনিয়ে হয় না। ওটা হয়ে যায়। সবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে।

গাছ থেকে ফুল ফোটে। ফুল থেকে ফল হয়। বীজ হয়। ফের গাছ জন্মায়। কী তোমার অধিকার যে তুমি আইন বেঁধে বৈধ-অবৈধর ফরমান জারী করো ? সবই প্রকৃতির হাতে। সে বড় রহস্যময়ী।

প্রবোধ সদ্য সূর্যের আলোয় রাঙা শান্ত চিকন স্বচ্ছ জলে স্নান করল। দু-হাত তুলে সূর্যপ্রণাম করল।

ওরা মা ও সন্তান বাঁচুক। বেঁচে থাক। পৃথিবীতে মানুষের জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী, বড় নিরানন্দ। তার মধ্যে স্নেহ আছে—আর আছে ভালবাসা। তাই মানুষের বেঁচে থাকাটা জরুরী মনে হয়। মনে হল, সবকিছুর চেয়ে দামী তার বেঁচে থাকা।

ভেজা গায়ে প্রবোধ এসে তার বিছানার নীচে থেকে ব্যাগ বের করছিল। গামছা একটা সবসময় সঙ্গে থাকে। প্রায়ই এখানে-ওখানে যেতে হয় তাকে। তহশীলদারী চাকরী। প্রজাদের ঘরেই স্নানাহার চুকিয়ে নিতে হয় অনেকসময়।

সেই সময় হাসিমুখে চেনা নার্সটা এসে কাছে দাঁড়াল।...মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

প্রবোধ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। জিভ দেখা যাচ্ছিল হাঁ-করা মুখের ভিতর।

আপনার নাতি হয়েছে। ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা।

প্রবোধ ব্যস্তভাবে গা মুছতে থাকল।

আগে মিষ্টি আনুন, তারপর বলব ছেলে, না মেয়ে।

প্রবোধ ঘড়ঘড় করে হাসল মাত্র।

আনবেন না তো! বেশ। কপট রাগ দেখিয়ে ফুলো ঠোঁট নিয়ে নার্সটা চলে যাচ্ছিল।

প্রবোধ ডাকল, শুনুন।

শুনব, আগে টাকা বের করুন।

সত্যি সত্যি ব্যাগ খুলে একমুঠো নোট বের করে প্রবোধ বলল, কই, কে যাবে মিষ্টি আনতে ?

দেহে নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে নার্সটি বলল, খোকা হয়েছে। ভারী সুন্দর। অবিকল দিদিমণির মত চেহারা। একেবারে পুতুলটি।

ঝাড়ুদারটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা আঁচ করছিল। এবার সামনে এসে হাত বাড়াতেই প্রবোধ তার হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল। নার্স বলল, সবুর। এখন দেখতে পাবেন না। এইমাত্র ডেলিভারী হল।

যমুনা, যমুনা কেমন আছে ?

এখনও জ্ঞান হয়নি অবশ্য। তবে ভাববেন না। ও ঠিক হয়ে যাবে।

হারামজাদা সত্যটা কোথায় থাকল কে জানে। প্রবোধ ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা টুকরো আয়না বের করে চুল আঁচড়াতে থাকল নিশ্চিন্তমনে।

কাল থেকে খাওয়াদাওয়া নেই। খিদের কথা একেবারে ভুলে বসেছিল। এখন স্নান করে খিদে জোর বেড়ে গেছে। প্রবোধ বেরোল। রাস্তার ওপাশেই পরিচিত হোটেল রয়েছে। বেশ ভালোই খাওয়ায়। রেটও বাজারের তুলনায় সস্তা।

প্রবোধ সোয়াসে খেল। বাইরে এসে পান কিনল। মেজাজে থাকলে সে সিগ্রেট খায়— নতুবা নয়। সিগ্রেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর এগোল। আরেকবার দেখবে নাকি খুঁজে? এতক্ষণে লীলা প্রেস খুলে গেছে নিশ্চয়।

তবে যদি সত্যি সত্যি সুখেনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে থাকে, সে একটা দুঃখের ব্যাপার হবে। আধুনিক তো একটুকু লজ্জা-সংকোচ নেই। ও সব পারে। সেইজন্যেই তো ওর এত দুর্দশা।

লীলা প্রেসের দরজার পাশে টুলে একজন কে পাহারার মত মানুষ বসে রয়েছে। মুখটা চেনা মনে হচ্ছিল প্রবোধের। প্রবোধ কিছু বলার আগেই স্প্রিঙের পুতুলের মত সে নমস্কার করে বলল, ছাপার কাজ আছে? ভিতরে যান। খগেনবাবু আছে, কানাইবাবু আছে। আর আধঘণ্টা পরে বড়দিদিমণিও এসে যাবে। ছোটদিদিমণি এইমাত্তর এসেছিল, বেরিয়েছে।

প্রবোধ একটু হেসে বলল, সুখেনবাবু আছেন? তাকেই চাই।

ঘণ্টা আকর্ণ হাসল।... তিনির কথা আর বলতে আছে? সে একমাস-দু'মাস হল, কলকাত্তা পালিয়ে গেছে না?

প্রবোধ সোজা হয়ে দাঁড়াল।...... পালিয়েছে মানে?

ক্যানে, জগদীশের মেয়েকে নিয়ে ভেগেছে সুখেনবাবু। ওরে বাবা, ক'দিন টাউন তোলপাড় হল না ওই নিয়ে! ছিলেন কোথায় গো?

ভিতর থেকে খগেন মুখ বাড়িয়ে বলল কার সংগে কথা বলছ ঘন্টুবাবু?

পলকে প্রবোধের মনে পড়ে গেছে। এ সেই লীলাদের বাড়ির চাকর ঘণ্টা। প্রবোধকে না চেনারই কথা তার। মাত্র বারকয় দেখেছে। প্রবোধ এগিয়ে বলল, আমি সুখেনবাবুর খোঁজে এসেছিলাম।

চশমার ওপর দিয়ে চোখ বের করে ফিক ফিক করে হাসল খগেন।... কোন পাওনাটাওনা আছে বুঝি।

প্রবোধ গম্ভীর মুখে বলল, আছে।

অল্পসল্প, না মোটা?

বিরক্ত হয়ে প্রবোধ বলল, দু' হাজার।

বুড়ো আঙুল নাচিয়ে খগেন বলল, ও' ঈশ্বরায় নমো করে দিন মশাই। পাখি উড়েছে। শুধু আপনার নয়—একগাদা লোকের পাওনা মেরে উড়েছে। তবে সব থেকে মেরেছে জগার। তার চালচুলো যা ছিল, সব গেছে। ও মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে গাছতলায়। কোর্টের ওধারে গিয়ে দেখুন সে না। কে বলছিল, জগা লোক পাঠিয়েছে খুঁজতে। ওর নাম বাবা জগদীশ গুণ্ডা। সহজে ছাড়বে না।

কানাই বেরিয়ে এসে বলল, কী সব আজেবাজে বকছ কাজকম্ম ফেলে! এই যে স্যার, কিছু বলছিলেন নাকি?

প্রবোধ বলল, না। সুখেনবাবুর জন্যে...

সে তো নেই। বলে কানাই ঢুকে গেল। প্রবোধ [illegible] এল। লীলা-রাণী এসে পড়লে তাকে এখানে দেখে কী ভেবে বসবে। হয়ত ভাববে, শালার জন্যে কী স্বার্থের কারচুপি নিয়ে ঘুরঘুর করছে লোকটা।

বাঃ চমৎকার হয়েছে তাহলে। প্রবোধ খুশী হল বিলক্ষণ। পাপীয়সী মুখের ওপর জুতোর ঘা খেয়েছে এতদিনে। কিন্তু প্রেসটা তাহলে সে নিজেই চালাচ্ছে। ভালোভাবেই চালাচ্ছে বোঝা যায়। চালাবে বৈকি—মুৎসুদ্দির মোক্তারবাড়ির মেয়ে, তার কুমুদের কন্যা—একবার পা টলেছিল, এবার সামলে নিয়ে যথারীতি হিসেবী চালে পা ফেলছে। ওই করেই সম্পত্তি করেছিল ওদের পূর্বপুরুষ।

লীলা ছিল তার শালার বৌ। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলে লীলা তাকে কত জ্বালাতনই না করত। বাগে পেলে প্রবোধও কিছু শোধ নিত। সেসব এক আশ্চর্য সহজ স্বাভাবিক দিন গেছে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রবোধ হাঁটতে থাকল। তবু মনের ভিতর একটুখানি কৌতূহল রয়ে গেল, আজকাল কেমন হয়েছে লীলার চেহারা? তাকে দেখলে কি আগের মতই কৌতুকময়ী হয়ে উঠবে সে?......সবই অভ্যাস। প্রবোধের মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠছিল। এই অভ্যাসের বশেই মানুষ যেন যা আপন হয়, আবার পর হয়ে যায়। অথচ স্মৃতি নামে একটা কিছু আছে। তার হাত থেকে উদ্ধার কোথায় মানুষের? লীলাকে এখনও তার কত আপন মনে হচ্ছে। কত মিষ্টি একটা আত্মীয়তা।

সতুর বুকের উত্তাপটা প্রবোধ অনুভব করছিল। লীলা—লীলা কি রাক্ষসী? পেরেছে স্মৃতির গলা টিপে মারতে? সেই বাসরঘর সেই ফুলশয্যা—সব এখনও প্রবোধের চোখে জ্বলজ্বল করছে।

দুপুর অব্দি এলোমেলো প্রায় সারা শহর ঘুরে বেড়াল প্রবোধ। চেনাজানা কারুর সঙ্গে দেখা হলেই সে সতার খবর জিগ্যেস করছিল। কোন খবর নেই।

অবশেষে ঘাটের দিকে এল সে। সত্য যদি রাণীচকে ফিরে গিয়ে থাকে, ঘাটে নির্ঘাৎ সেটা জানা যাবে। রিকশোওয়ালারা আছে, বাসের ড্রাইভার আছে—সকলেই একরকম চেনা মানুষ। সত্যকেও ওরা চেনে। চায়ের দোকানেও পরিচয় কম নেই দুজনের।

খেয়া পেরিয়ে ওপারে অনেক খোঁজখবর করল প্রবোধ। কেউ বলতে পারল না। এক ফাঁকে একটা লাভ হয়ে গেল অবশ্য। গ্রামের লোক পেয়ে সুভদ্রাকে খবর পাঠানো সম্ভব হল। এতক্ষণ সুভদ্রা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। তবে লোক মারফত সব খবর দেওয়া মুশকিল। প্রবোধ জানাল যে একটা জরুরী কাজে আটকে গেছে মহকুমা-পুরে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

কিন্তু গেল কোথায় সত্য?

[illegible] খেয়া পেরিয়ে এপারে এসে [illegible] এপাশে [illegible] প্রবোধ [illegible] বসে পড়ল। [illegible] হতচ্ছাড়াটা! প্রবোধ [illegible] মানুষ। সুভদ্রা যেমনই হোক, তাহলেও সুভদ্রা মানুষ তো বটে— বোকাটা বুঝবে না কেন? বমুনো আর তার ছেলেকে নিজের বাড়িই নিয়ে যাবে। রজব স্টেশনওয়াগন হাঁকিয়েই যাবে সোজা রাস্তায়। যে যা বলে বলুক, কান করবে না। আর, বলারই বা কী আছে। প্রবোধ তহশীলদারকে লোকে বিশ্বাস করে। বমুনার সিঁথির সিঁদুর মিথ্যা নয়—তার সাক্ষ্য প্রবোধ নিজেই দেবে।

চুপচাপ বসে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কল্পনা করছিল সে। কখন মুখটা হাসিতে ভরে উঠছিল, কখনও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। বিচিত্র আলো খেলছিল তার মুখে। আজ যেন হারানো প্রথম যৌবনের ঋতু ফিরে এসেছে প্রবোধের জীবনে।

কখন অগোচরে বেলা চলে গেছে। দিন ছোট হয়েছে। দক্ষিণায়নের সূর্য আড়চোখে তাকিয়ে ডুবে গেছে ওপারে আমবনের আড়ালে। হাওয়ায় ঠাণ্ডাভাব দেহকে শিরশিরিয়ে তুলছে। শীত পড়তে দেরী নেই। হাতধরাধরি পুরুষ ও মেয়েরা সন্ধ্যায় ঘাটে বেড়াতে বেরিয়েছে। শিশুরা বালির তটে খেলা করছে। বনে অজস্র পাখি ডাকছিল। চারপাশে নীলাভ কুয়াশা ঘনিয়ে আসছিল। প্রবোধ উঠল।

বারান্দায় পা দিতেই ঝাড়ুদারটা নিঃশব্দে আঙুলের ইশারায় তাকে ওপরে যেতে বলল। প্রবোধ ওপরে গিয়ে দেখল— কেমন একটা অপরিচ্ছন্ন স্তব্ধতায় নার্সিং হোমটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে যেন। কেউ কোন কথা বলছে না।

বমুনা কেমন আছে? একটা নার্সকে প্রশ্ন করল প্রবোধ।

সেও হাতের ইসারায় ডাক্তারের চেম্বার দেখিয়ে দিল।

ভিতরে পা বাড়ালে দুলাল মিত্র গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠেছে, বসুন। উঁই আর দেরি সয়নি প্রবোধবাবু। তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে।

প্রবোধ অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল, কী, কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

শেষঅব্দি পেসেন্টকে বাঁচানো গেল না। তবে বাচ্চাটা ভালোই আছে।

একটা ভারী পাথর যেমন করে জলে ডুবে যায়, প্রবোধ তলিয়ে যাচ্ছিল কোথায়।

—(ক্রমশঃ)

নতুন ঠগী
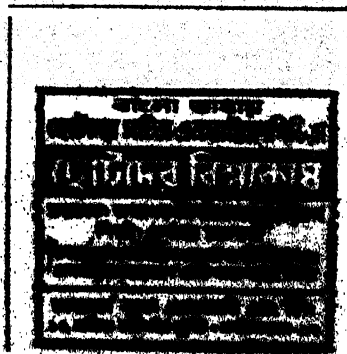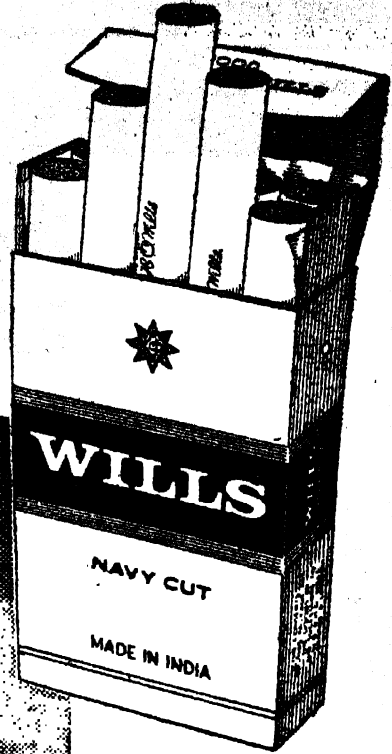
"আপনার গোপন ব্যাধি নির্মূল হইবে। সিফিলিস, গনোরিয়া, গর্মী, ধাতুপ্রদাহ যে কোন প্রকার দুরারোগ্য অসুখ সারবে। মাত্র তিন মাসের জন্য ডাক্তার টি ভি ভেঙ্কটরামন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইংলণ্ড, লণ্ডন, রোম, প্যারিস, আমেরিকা, বোম্বাই, মাদ্রাজের ডিগ্রী (গোল্ড মেডাল)। নীচের ঠিকানায় সত্বর দেখা করুন—

ডাঃ টি ভি ভেঙ্কটরামন, এম-ডি.
সি-এস-পি-সি-এ (লণ্ডন), ডি-
টি-এম (গোল্ড মেডাল)
২৯।সি, নিউ ভিউ রোড,
কলিকাতা-১৩।"

বাংলা, হিন্দী, ইংরাজীতে ছাপানো হলদে নিউজ প্রিন্টের এই জাতীয় লিফলেটের সংগে কলকাতার সকল পথচারীই পরিচিত। বিজ্ঞাপনের নীচে প্রেসের নাম ঠিকানা নেই। উপরে পুরোনো মুখোর টাকার সাইজের একটা মনোগ্রামে পাট করে আঁচড়ানো চুলের তলায় সাজনন্দরী কচুবনের মত একটা মুখ। সম্ভবত বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত কৃতবিদ্য ডাক্তারের সাবজ্ঞানদীপ্ত মুখের ফটোগ্রাফ।

বানান ভুল, ছাপার ভুল অজস্র। বাক্য রচনারীতি যে কোন একজন আধুনিক পাণিনির তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞাপন পড়ে ডাক্তার না ম্যাজিসিয়ান বোঝবার উপায় নেই—মাত্র তিনমাসের জন্য কলকাতা-বাসীদের তাঁর হাতের খেল দেখাতে এসেছেন। পয়সা হজম হলেই খেল খতম। তারপর গোহাটি, কি পাটনা বা কটকে নতুনভাবে খেল শুরু হবে।

নামের পাশে ডাবং ইংরাজী বর্ণমালা যদৃচ্ছভাবে বসানো হয়েছে। ছ'বছর হাড়-ভাঙা খাটুনী খেটে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির মুখোজ্জ্বলকারী ছেলেরা যেখানে সামান্য একটা এম-বি-বি-এস ডিগ্রী জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে, ডাক্তার ভেঙ্কটরামন তার ভগ্নাংশ সময়ের বিনিময়ে সারা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। অবশ্য ডিগ্রী-গুলি কোন কোন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট দিয়েছেন, বিজ্ঞাপন পড়ে তা জানা যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি দুঃসাধ্য আদ্যক্ষরগুলির প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা। সি-এস-পি-সি-এ শব্দটির সংগে কলকাতাবাসী দীর্ঘদিন পরিচিত—ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু দি এনিম্যালস। ডাক্তার ভেঙ্কটরামনের চোখে হয়ত তাঁর সকল রোগীই এনিম্যাল। তাই ইতর প্রাণীদের রোগ নিরাময়ের পবিত্র দায়িত্ব পালনার্থে মাত্র তিনমাসের জন্য মহাপ্রভুর কলকাতায় আগমন।

বিজ্ঞাপনের আর সব কিছু হয়ত ভুল বা অশুদ্ধ, শুধু ঠিকানাটি ছাড়া। পশ্চিমে জহরলাল নেহরু সরণী পূবে আচার্য জগদীশ বসু রোড, উত্তরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনু? দক্ষিণে পার্ক স্ট্রীট, এই চৌহদ্দীর মধ্যেই সাধারণত ভেঙ্কটরামনরা তাঁদের আস্তানা গাড়েন। এলাকাটা একেবারে শহর কলকাতার বুকের উপর। পূবে পশ্চিমে দু-দুটো রেল স্টেশন। উত্তর-দক্ষিণে ট্রাম, বাস সংযোগ রক্ষা করছে। রোগীদের যাতায়াতের সুবিধার দিকে তাকিয়েই ডাক্তার তাঁর চেম্বার খুলেছেন। নিউ মার্কেটের চারপাশের আলো ঝলমলে চওড়া রাস্তাগুলি যেখানে সরু সরু গলির গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে তারই কোন চতলা বাড়ির চারতলায় অন্ধকার সিঁড়ির পাশে ছাপটি মেরে বসে আছেন ডাক্তার। বারো বাই চৌদ্দ ঘরখানাকে পার্টিশন ওয়াল তুলে দুটি ভাগ করা হয়েছে। সামনের অংশে সোফা কৌচ ও মহারাণীর আমলের দুটি সেকেলে রাজকীয় চেয়ার। দেয়ালের টেবিলে প্যাস্টিকের ফুলের পাশে দুটি জার্নাল ইংরেজী ম্যাগাজিন।

সারাদিন দুবার ডাক্তার রুগী দেখেন। সকাল আটটা থেকে এগারোটা। বিকাল চারটা থেকে আটটা। রোজ নয়, সপ্তাহে তিন দিন

যায়। পড়ে নিলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি রুগী। ভোর থেকেই লাইন পড়ে। ময়দান হকার্স কর্ণারের স্টল থেকে কেনা কোন সেলরের পুরোনো বিবর্ণ স্যুট পরা দিশী সাহেব, জানবাজারের খানদানী মহিলা থেকে ছাটিঝুল কাপড় পরা গামছা কাঁধে দেহাতী সবাইকেই পাওয়া যাবে এই লাইনে। সন্ধ্যের দিকে এই অন্ধকার গলিতে গাড়ির সারি দাঁড়িয়ে যায়। অজস্র কালো টাকার বিনিময়ে যে আদিমতম রোগজীবাণু দেহযন্ত্রে বাসা বেঁধেছে তাকে গোপনে সারিয়ে তুলতে হবে—সে যত টাকাই লাগুক।

পার্টিশন ওয়ালের সামনে টুল টেবিল সাজিয়ে বসে আছে অ্যাসিস্টান্ট। স্যুটেড বুটেড ঝকঝকে চেহারা। বড় উকিলের যেমন জুনিয়র, বড় ডাক্তারের তেমনি অ্যাসিস্টান্ট। মক্কেলের কেস হিস্ট্রী লিখে ওস্তাদকে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। এতে সিনিয়রদের সময় বাঁচে। কম সময়ে বেশী মক্কেল অ্যাটেন্ড করা যায়। অ্যাসিস্টান্টরা নিজেরাও এক-একজন ডাক্তার। কিন্তু ভেঙ্কটরামনের সহকারী এর ব্যতিক্রম—গুরু নিজেই সম্ভবত চেলাকে অনারারী ডিগ্রীতে ভূষিত করেছেন। তাই রুগীর কেস হিস্ট্রী জানার প্রয়োজন চেলার নেই। ও ঠ্যালা গুরুই সামলাবেন। শুধু সিনেমার দশ আনার লাইনের দরোয়ান যেমন গেট ম্যানেজ করে, ইনিও সেরকম রোগীদের বৈতরণী পারানীর কড়ি গুনে নিয়ে সুইং ডোরের ওপাশে ঠেলে দিচ্ছেন।

ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়বে পেল্লায় সাইজের একটা টেবিল। পায়ের তলায় দামী কার্পেট, মাথার উপরে নিয়ন আলো। পেছনের দেয়ালে দেওয়ালজোড়া আলমারীর তাকগুলি বিভিন্ন সাইজের বোতলে ভরা। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ তরল অমৃত থরে থরে সাজান। টেবিল ও আলমারীর মাঝে হুইল চেয়ারে বসে ডাক্তার ভেঙ্কট-রামন।

সুইং ডোরের সঙ্গে হুইল চেয়ার অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে সাতনম্বরী ফুটবল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে কখনো জোড়হাতে নমস্কার কখনো হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক পর্ব শেষ করে চোস্ত ইংরাজী, বাংলো বা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করবে—

ঃ ট্রাবলটা কি?

ঃ সেটা জানতেই ত এসেছি। রোগী কি সহজে মুখ খুলতে চায়? কেমন করে যে হয়েছে তা পর্যন্ত জানা নেই।

ঃ কখনো হুরী-পরীদের সঙ্গে মহরম-মহরম ছিল কি?

ঃ তোবা! তোবা! কি যে বলেন ডাক্তার-বাবু। আপনি এ শহরে নবাগত। নইলে মক্কেলের নাম যে মহল্লার এক ডাকে সকলে জানে, তা আপনি জানতেন। এ যেন পাপ স্বীকারের জন্য গির্জায় গিয়ে ফাদারের সামনে দাঁড়িয়ে হলফনামা নিয়ে বেমালুম উল্টোপুরান আওড়ে আসা। গ্যাঁড়াকল যদি নেই তাহলে মিথ্যে মিথ্যে ভেঙ্কটরামনের দরজায় ভিড় করা কেন বাওয়া?

ট্রাবল-টাইরের মত ছাড়ানোয় সিদ্ধহস্ত ভেঙ্কটরামন কথার প্যাঁচে অতিথির ভাতের হাঁড়ির সন্ধান নিয়ে শেষে বলেন—

ঃ কিচ্ছু ভয় নেই। যদিও দেরী করে ফেলেছেন, তাহলেও মাত্র আড়াই মাসে সব ঠিক করে দেব। দশ সপ্তাহ ওষুধ খেতে হবে। ওষুধের আলাদা কোন দাম নেই। ফি সপ্তাহে একবার এসে দেখিয়ে যাবেন। ভিজিট মাত্র পঞ্চাশ টাকা। বিফলে মূল্য ফেরৎ।

হাসতে হাসতে রুগীকে দরজা দেখিয়ে 'বাজার' টিপবেন ডাক্তার। অর্থাৎ নেকস্‌ট।

দশ সপ্তাহে পাঁচশো টাকায় যৌবন ফিরে পাওয়ার আশ্বাসে রোগীর মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। উঠবার সময় চারতলার প্রতিটি ধাপ এক-একটা ভারী পাথরের মত মনে হচ্ছিল। নামবার সময় পকেট ও বুক হাল্কা হওয়ায় এক টুকরো সোনার মত হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে রুগী বিদায় নিলেন।

ভেঙ্কটরামন শুধু ডাক্তার নন—কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট তিনিই। তাঁর দাওয়াই এই শহরের কোন দাবাখানায় মিলবে না। রোগীদের সুবিধার জন্য ডাক্তার নিজে ওষুধ বানিয়ে রেখেছেন। রোগীর চেহারা, পোষাক, বোলচাল অনুযায়ী দাওয়াই বাৎলানো হয়। ছাটিঝুল কাপড় ও গামছা কাঁধেকে সঙ্গে সঙ্গে আলমারী থেকে বোতল বার করে ডাক্তার সাতদিনের ওষুধ শিশিতে ভরে দেবেন। গাড়ি হাঁকানো মক্কেলকে খাতির করে বলা হবে—কাল আসুন। স্পেশ্যাল দাওয়াই বানিয়ে রাখব। রোগীর কদর বোঝেন ডাক্তার। রোগীও খুশী হয় বিশেষ আয়োজনে। মাঝে মাঝে ডিসটিলড ওয়াটার ইনজেকশন দিয়ে রুগীর মেজাজ তরিবত করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। দাওয়াইটা স্পেশ্যাল, ফীও তাই স্পেশ্যাল।

আদিম রিপুজাত প্রাচীন ব্যাধির নিরাময়ের বিজ্ঞানসম্মত রাস্তা দীর্ঘদিন তৈরী হয়েছে। কিন্তু দিনের আলোয় চওড়া রাজপথে হাঁটতে মানুষের লজ্জা। জ্বর থেকে যক্ষ্মা কোন রোগেই মানুষ লজ্জা পায় না। কিন্তু গোপন ব্যাধি দেহমন্দিরে যতই সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলুক না কেন জানা রাজ-মিস্ত্রী ডেকে ফাঁক ফোকর ভাল করে বুজিয়ে নিতে মাথা কাটা যায়। তাই জেনে বা না-জেনে এক অন্ধবিশ্বাসে মানুষ ছোটে ভেঙ্কটরামনদের কাছে।

বছরের পর বছর একই খেলা চলেছে এই শহরের বুকে। রোগ, রুগী ও ঠগ নিয়ে এই খেলা। সময়মত শরণ নিলে ডাক্তার রুগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিতে পারে। কিন্তু শতকরা কটি রুগী সময়ে ডাক্তারের কাছে যায়। এই শহরে শতকরা নব্বইভাগ গোপন ব্যাধির শিকার গোপনে ভেঙ্কট-রামনদের শরণ নেয়। অন্ধকারে চোলাই চালানের ব্যবসায় এরা জাঁকিয়ে বসেছেন। সাধারণত দক্ষিণ ভারতীয় ও অবাঙালী পদবীর আড়ালে এরা ব্যবসা চালান। এদের স্থায়ী আস্তানার হদিস মেলা দুষ্কর। যখন যে শহরে তাঁবু পড়ে সেখানে এদের বাস কোন হোটেলে। শহরের বুকে ভাড়া করা ঘরে এদের চেম্বার। জমাট পসার হঠাৎ ফুৎকারে মিলিয়ে দিয়ে ধরা পড়বার আগেই এরা গা ঢাকা দেয়। কোন শহরেই দু-তিনমাসের বেশী এরা বসে না। শহর কলকাতার ভেঙ্কটরামনদের এক এক ঋতুর আয় কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা।

জাল-জুয়াচুরির বড় বড় রুই-কাৎলারা মাঝে মাঝে লালকুটির কু-নজরে পড়ে খাবি খায়। ফলাও করে সে সংবাদপত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। অথচ এতবড় জালিয়াতির কারবার বিজ্ঞাপন বিলিয়ে শহরের বুকে চলছে—এর কোন প্রতিকার নেই। যে কোনদিন হাওড়া, শেয়ালদা, ডালহৌসী, এসপ্ল্যানেড, শ্যাম-বাজার বা হাজরার মোড়ে এ ধরনের বিজ্ঞাপন বিলোতে দেখা যায়। যে যুগে ন্যাভিস্ট কলোনীর ডকুমেন্টারী ছবি টেলি-ভিসন ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে সে সময় একদল পেশাদার জুয়াচোর গোপনীয়তার বর্মে সুরক্ষিত হয়ে দুহাতে পয়সা লুটছে ভারতের বৃহত্তম শহরে। প্রতারিত রুগী কোনদিনও প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না এটুকুই এই ব্যবসার মূলধন। বাকিটা সেলস্‌ম্যানশিপ।

—সতীন্দু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিষ্ঠুর কৌতুকে তার ভাগ্য আশা দিয়েও সে সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আনা মরিয়া হয়ে টোলেডোর রাজ-দরবারেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছে সব অপরাধ স্বীকার করে সোরাবিয়ার অবিশ্বাস্য জালিয়াতি প্রকাশ করে দেবার সংকল্প নিয়ে। সেখানেই মেক্সিকো বিজয়ী কর্টেজের সঙ্গে তার দেখা। কর্টেজ নিজে তখন কর্ডোভায় এক প্রতারকের যথার্থ পরিচয় হঠাৎ স্মরণ করতে পেরে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে টোলেডোতে এসেছেন সে পাষণ্ডের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে।

রাজ-দরবারে অপরাধী হিসেবে আত্ম-সমর্পণের দরকার হয়নি। মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস রূপী সোরাবিয়ার জালিয়াতি ধরিয়ে দিয়ে কর্টেজ তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করিয়েছেন আর সেই সঙ্গে গানাদোর দাসত্ব থেকে মুক্তির সনদ নতুন করে রাজ-দপ্তর থেকে বার করিয়ে আনার হাতেই দিয়েছেন গানাদোর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।

সেই সনদ নিয়ে আনা একাই পানামায় এসেছে পরম দুঃসাহসে। একদিন যেখানে গানাদোর দেখা পেয়েছিল আবার সেখানে হয়ত পেতে পারে এই তার আশা। সে আশা এ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবু ধৈর্য ধরে ভেতরের কি যেন এক দুর্বোধ আশ্বাসে আনা পানামাতেই অপেক্ষা করেছে এতদিন।

অন্তরের আশ্বাস যে তার মিথ্যা নয়, কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সমস্ত সমস্যা মিটে গিয়ে সব মুশকিল এবার আসান হবে ধরে নেওয়া উচিত। আনার কাছে গানাদোর দাসত্বমোচনের ফরমান। তার জোরে গানাদো নির্ভয়ে কয়াকে নিয়ে পানামা যোজকের মাঝখানের পর্বতপ্রাচীর ডিঙিয়ে আটলান্টিকের উপ-কূলের প্রথম-বন্দর নোম্‌ব্রে দে দিয়স থেকে ইউরোপের দিকে যখন খুশি পাড়ি দিতে পারবেন।

কিন্তু তা সম্ভব হয় কই! আশাতীত সৌভাগ্যরূপে যা দেখা দেয়, নিরন্তর নিষ্ঠুর পরিহাসে তা-ই চরম দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায় দু'দণ্ড না যেতে যেতে। সেই গানাদোকে সে রাত্রেই চোরের মত কয়াকে নিয়ে পানামা ছাড়বার চেষ্টা করতে হয় কেন!

বন্দরের নাম নোমব্রে দে দিয়স অর্থাৎ ভগবানের নাম।

নাম ভগবানের হলেও জায়গাটা গানাদো আর তাঁর সঙ্গীদের কাছে শয়তানের মুল্লুকই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বন্দরে পুরো দু হপ্তা ধরে ছা-পিত্যেশ করে তাঁরা অপেক্ষা করে আছেন স্পেনে বা ইওরোপের যে কোন জায়গায় ফিরে যাবার একটা জাহাজের যাত্রী হবার সুযোগের জন্যে। তাঁদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন জাহাজে রওনা হওয়া দরকার ছিল। যত দিন যাচ্ছে ধরা পড়ার বিপদ তত বাড়ছে। কিন্তু কোন জাহাজে জায়গা পাবার আশাই আর দেখা যাচ্ছে না।

পানামা যোজকের পার্বত্য মেরুদণ্ড পার হবার সময় এই বিপদটার কথা গানাদো বা তাঁর দলের কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। নোমব্রে দে দিওস-এ পৌঁছলে আর কোন ভাবনা থাকবে না এই ছিল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দুর্গম পথে পানামা থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে লুকিয়ে ওপারের বন্দর নোমব্রে দে দিয়স-এ পৌঁছানো সত্যিই ছিল প্রায় অসাধ্য।

পানামা যোজকের এপারে-ওপারে যাওয়া-আসার একটা সরকারী পথ তখন চালু হয়ে গেছে। তৈরী করা বাঁধানো রাস্তা না হলেও তা আগাগোড়া চিনে যাবার মত করে চিহ্ন দেওয়া। দক্ষিণে পেরু আর উত্তরে ছোট ছোট রাজ্যে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে সে রাস্তায় অল্প-বিস্তর লোক চলাচলেরও কামাই নেই।

গানাদো আর তাঁর সঙ্গীরা সে রাস্তা ব্যবহার করতে ত পারেন নি। তার উপায় ছিল না। দুর্ভেদ্য বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাঁদের নতুন করে পথ খুঁজে নিয়ে পাহাড়ের ওপারে যেতে হয়েছে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখবার জন্যে। এই গোপনতার জন্যেই পানামার রাত্রের অন্ধকারে এমনি লুকিয়েই তাঁদের মোরালেস-এর বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু কেন এ গোপনতা, এ প্রশ্ন এবার উঠতে বাধ্য।

কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে অমন দৈবানুগ্রহে আনা-র দেখা হয়ে যাবার পরও পানামা ছাড়তে গানাদোর অমন লুকো-চুরির দরকার ত হবার কথা নয়।

স্পেনের রাজধানী টোলেডো থেকে গানাদোর যে মুক্তিপত্র আনা অত আগ্রহভরে সঙ্গে করে এনেছিল তাতে, কি তাহলে গলদ ছিল কিছু?

না, তা ছিল না। সে হুকুমনামা টোলেডোর রাজদরবারে মহামান্য কর্টেজ-এর সুপারিশে স্বয়ং সম্রাটের স্বাক্ষরিত।

আনা কি তাহলে শেষ পর্যন্ত গানাদোর হাতে এ মুক্তিপত্র দিতে কাপিতান সান-সেদোর সঙ্গে [illegible] মোরালেস-এর আস্তানায় ফিরে উঠতে পারে নি?

না, তাও সে গিয়েছিল। সেখানেও পৌঁছে-ছিল গানাদোর।

[illegible] তাঁর হাতে দেয় নি। [illegible] প্রান্ত- [illegible] পানাদোকে [illegible] প্রস্তুত [illegible] থেকে দৌড়ে গিয়েছিল।

[illegible] গহন রহস্য [illegible] বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

আনা আকুল আগ্রহে গানাদোর দেখা পাবার আশায় ছুটে এসেছিল মোরালেস-এর বাড়িতে। গানাদোর দেখা পেয়েছিল আর সেই সংগে কয়া-রও।

কয়া-র কোন পরিচয় তখনও কেউ দেয় নি। তবু আনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মোরালেস-এর বাড়ির ভেতর ঢুকে প্রথম তাকে দেখে। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ নীরব হয়ে গিয়ে বিবর্ণ মুখে ধরা গলায় গানাদোকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল শুধু—এ কে?

উত্তরের জন্যেও তারপর অপেক্ষা করে নি। হঠাৎ যেন বারুদের স্তূপের মত বিস্ফোরিত হয়ে হিংস্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল, এই তোমার পছন্দ-করা সুন্দরী? সাত সমুদ্র পারের দেশ থেকে একেই খুঁজে নিয়ে এসেছ তোমার ঘরনী করবে বলে? একে নিয়েই এখান থেকে লুকিয়ে পালাতে চাও? সে স্বপ্ন ভুলে যাও। ফেরারী একটা গোলামের সংগে বুনো বর্বর একটা বাঁদীর মিল অত সহজ নয়। তোমার পেয়ারের সঙ্গিনীকে নিয়ে পানামার এক পা বাইরে কেমন করে তুমি যাও আমি দেখছি।

আগুনের হল্কার মত কথাগুলো মুখ থেকে বার করে আনা আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ায় নি। যেভাবে সে ছুটে বেরিয়ে গেছে তাতে অদম্য ক্রোধ নয় দুঃসহ কোন যন্ত্রণাই যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে।

শুধু গানাদো আর কয়া নয়, সে ঘরে তখন কাপিতান সানসেদোর সংগে ডন মোরালেস আর ফিলিপিলিয়ো-ও উপস্থিত। সকলেই স্তম্ভিত বিহ্বল।

শোনো! শোনো আনা! কাপিতান সানসেদোই প্রথম চিৎকার করে মেয়েকে ফেরাবার জন্যে পিছনে ছুটে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন গানাদো।

বলেছিলেন, কোন লাভ নেই কাপিতান। ওকে এখন ফেরাবার চেষ্টা বৃথা। এখন ওর যা মনের অবস্থা সম্ভব হলে এখনই ও কোতোয়ালী থেকে সিপাই আনিয়ে আমায় ধরাবার ব্যবস্থা করবে।

করতে চাইলেও তা সম্ভব হবে না। ধীর গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন ডন মোরালেস, এখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পানামা স্পেন নয়। দিনের দায় চুকলে সারা রাত সজাগ পাহারার খোলা থাকবার মত কোতোয়ালী স্পেনের শহরেই মেলে না ত এখানে! কাল সকালের আগে কোতোয়ালী থেকে হামলার ভয় তাই নেই। যেমন করে হোক আজ রাত্রেই পানামা ছাড়বার ব্যবস্থা কিন্তু করতে হবে।

আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপদ বিদায় করতে চান, কেমন? — কাপিতান সানসেদো তিক্তস্বরে বলেছিলেন ডন মোরালেসকে।

তার উত্তরে এবার একটু হেসেছিলেন ডন মোরালেস। হেসে বলেছিলেন—ঠিকই বুঝেছেন কাপিতান। আপদ যাতে ঠিক মত বিদায় হয় তার জন্যে নিজেও সংগে গিয়ে মাঝখানের পাহাড়টা পার করে দিতে চাই।

আপনি আমাদের সংগে যেতে চান? সত্যিই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন গানাদো।

হ্যাঁ, এ পাহাড় পার হবার একটা গোপন রাস্তা নইলে তোমাদের চেনাবে কে?— প্রসন্ন কণ্ঠে বলেছিলেন ডন মোরালেস।

সত্যিই তাই চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ডন মোরালেস। দুর্গম হলেও সম্পূর্ণ অজানা একটি পথ। এ পথ ডন মোরালেস-কেও পুরানো স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে বার করতে হয়েছে। একদিন তিনি ফ্রানসিসকো পিজারোর সংগে এই পথেই পাহাড় পার হয়ে প্রথম পশ্চিমের অকূল সমুদ্র দেখে আবার ফিরে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা তার মনে ছিল। পথ হিসেবে এটি অবশ্য সহজ সুগম নয়। এর চেয়ে সহজ পথ তারপর আবিষ্কৃত হয়ে এপার-ওপার যাতায়াতের সুবিধে করে দিয়েছে। এ দুর্গম পথের একমাত্র সুবিধা এই যে, তা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ পথে কোন পাহারাদারের নজরে পড়বার কোন ভয় নেই।

ডন মোরালেস গানাদোর দলকে শুধু নিরাপদ পথ চিনতেই সাহায্য করেন নি, কয়া-র বাহন হিসেবে একটি ঘোড়াও সংগে আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু এত চেষ্টা এত কষ্ট সবই বৃথা মনে হয়েছে নোমব্রে দে দিয়স-এ কয়েকটা দিন কাটবার পর। স্পেনে ফিরে যাবার জাহাজের সমস্যা যে এমন নিদারুণ হতে পারে তাঁরা ভাবতে পারেন নি।

বন্দরে কোনো জাহাজ নেই এমন নয়। মাঝে মাঝে দু-একটা জাহাজ দেখলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জাহাজ [illegible] [illegible] দেখা জাহাজের লোক [illegible] [illegible] দিতে হয় তা প্রায় [illegible]।

[illegible] সোনা ছড়ানো সব জায়গা, বিশেষ করে প্রায় সোনায় বাঁধানো পেরুর মত দেশ আবিষ্কৃত ও লুণ্ঠিত হবার পর থেকেই এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আজ তারা সোনাদানা যারা লুট করে এনে দেশে ফিরছে জাহাজের মাঝিমাল্লা তাদের ওপর মায়া-দয়া করবে কেন? জাহাজে জায়গা পেতে হলে লুটের মালের বেশ কিছু ভাগ তাদের দিয়ে যেতে হবে।

সত্যিই লুট করে যারা ফিরছে তারা তাই দিতে খুব আপত্তি করে না। কিন্তু গানাদো সেরকম থলি মেটাবেন কোথা থেকে। দলের মধ্যে সামান্য যা একটু পুঁজি আছে তা কাপিতান সানসেদোর কাছে। জাহাজ-ভাড়ার সমস্যা এমন হতে পারে অনুমান করতে না পেরে তিনি সংগে বিশেষ কিছু আনেন নি। তবু যতটা পারেন তিনি সবই দেন কাপিতানের হাতে। গানাদো আর কয়া-র মূল্য বাবদ যা পেয়েছিল ফিলিপিলিও তাও প্রায় সবটাই ফেরৎ দেয়। সকলের কাছে সব কিছু কুড়িয়ে-বাড়িয়েও যা সংগ্রহ হয় তা কিন্তু একজনের ভাড়ার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

ভাড়া যা দিতে পারবেন না গতরে খেটে তা পুষিয়ে দেবার প্রস্তাব করেও দেখেন গানাদো। কাপিতান সানসেদো আর ফিলিপিলিওকে নিয়ে পুরুষ তাঁরা তিনজন। একমাত্র কয়াকে যদি যাত্রিনী হিসেবে জায়গা দেয় তাহলে তাঁরা তিনজনে মাল্লা হিসেবে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত বলে জানান।

নোমব্রে দে দিয়স বন্দরে আর যা কিছুর হোক জাহাজের মাঝি-মাল্লার অভাব নেই। গানাদোর দলের এ প্রস্তাবে রাজী হবার মত কোন জাহাজের কাপিতান পাওয়া যায় না।

প্রতিদিন অবস্থা যে গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা ভালো করেই বুঝতে পারেন গানাদো। এখন শুধু জাহাজের ভাড়া সংগ্রহই সমস্যা, পরে যে কোন দিন সমস্যা আরো সঙীন হয়ে উঠতে পারে। মার্কামারা ফেরারী গোলাম হিসেবে তখন জাহাজে ওঠাই অসম্ভব হবে।

আনা এ কয়দিনে তার খোঁজে পানামা তোলপাড় করে ফেলেছে নিশ্চয়। এপারের হুলিয়া যে এখনো এপারে পৌঁছোয় নি এই ভাগ্য। কিন্তু এ ভাগ্য আর কদিন টিঁকবে!

পানামার হুলিয়া নোমব্রে দে দিয়স-এ পৌঁছোলে ফেরারী গোলাম বলে চিহ্নিত হয়ে এ বন্দর থেকে বার হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হবে এই ভয় করেছিলেন গানাদো।

তার চেয়ে কত বড় অভাবিত নিদারুণ দুর্ভাগ্য যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে

[illegible] কল্পনাই করতে পারেন নি।

মোয়রে দে দিয়স-এ আরেক দিন [illegible] জাহাজে জায়গার [illegible] হতাশাজনক ঘটবার পর সেদিন [illegible] একটা [illegible] খবর এসেছে। সেদিন সন্ধ্যাতেই একটি ছোট 'কারাভেল' বন্দরে এসে ঢুকেছে। পানামা থেকে স্পেনে নিয়মিত সব জাহাজ যাতায়াত করে অবশ্য [illegible] নয়। এ 'কারাভেল'-এর বন্দর [illegible] হল নিকারাগুয়ার [illegible] গোরানা। সেখান থেকে রওনা হয়ে ঝড়ের মুখে [illegible] পথে এসে পড়ে মোয়রে দে দিয়স-এ [illegible] নিয়েছে শুধু দিনের বেলাটার কিছু মেরামতি সেরে নেবার জন্যে। সন্ধ্যে নামতেই আবার অনুকূল হাওয়ায় রওনা হবে।

এ অঞ্চলের জাহাজ নয় বলে হয়ত তাতে জায়গা পাওয়া অত কঠিন হবে না। কাপিতান সানসেদো আর ডন মোয়ালেসকে নিয়ে গানাদো তাই ভেবে জাহাজের নাখোদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছেন।

গিয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশই হতে হয়েছে। এজাহাজে কাপিতান সানসেদোকে নিয়ে তাঁর ও কয়ার জায়গা ছিল ঠিকই। ভাড়াও তাঁদের সাধ্যের অতিরিক্ত ছিল না। কিন্তু তাঁদের পৌঁছোতে দেরী হয়ে গেছে। সকালবেলা বন্দরে জাহাজ ভিড়বার কিছু পরেই এখানকার একজন সব কটি জায়গাই আগাম মূল্য দিয়ে নিয়ে রেখেছেন।

কে সে লোকটি? — না জিজ্ঞেস করে পারেন নি গানাদো। সেই সঙ্গে উৎসুকভাবে বলেছেন,—হয়ত তাঁর দরকার আমাদের মত জরুরী নয়। ঠিক মত বোঝাতে পারলে হয়ত আমাদের জন্যে জাহাজের জায়গা তিনি ছেড়েও দিতে পারেন। আপনি শুধু তাঁর নাম আর পরিচয়টা আমাদের দিন।

নাম আর পরিচয় কি আমি মুখস্থ করে রেখেছি! এবার যেন একটু অধৈর্যই ফুটে উঠেছে জাহাজের নাখোদার গলায়,—ভাড়া বুঝে পেয়ে জাহাজে জায়গা কবলে করে দিয়েছি, ব্যস ব্যাপার চুকে গেছে। তাছাড়া নাম-ধাম মনে থাকলেও আপনাদের বলতাম না। তার কারণ আছে।

আর কথা বাড়ানো বৃথা বুঝে গানাদো মোয়ালেস আর কাপিতানকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছেন। সামান্য একটু দেরীর জন্যে এমন একটা বিরল সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় মনটা খিচড়ে গেছে বড় বেশী। তিক্ত হতাশা নিয়ে তিনজনে বন্দর শহরের 'পুলকে' পান করবার একটা দোকানে গিয়ে খানিকক্ষণ বসেছেন। সেখান থেকে বার হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

'পুলকে' পানশালায় ওই সময়টুকু কাটানোই হয়েছে মারাত্মক ভুল। সর্বনাশ হয়ে গেছে ওই বিলম্বটুকুর মধ্যেই।

সর্বনাশের খবরটা প্রথম পেয়ে বিশ্বাসই করতে পারেন নি। বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত।

পানশালা থেকে বেরিয়ে নগর-সীমানার তখন নিজেদের আস্তানায় ফিরছেন তিনজনে [illegible] করে দিয়েছেন। [illegible] উঠেছেন আমাদের।

এ কি! এ ত আনা! কিন্তু আলুথালু বেশে [illegible] এমন উন্মাদিনীর মত চেহারা কেন?

উন্মাদিনীর মতই ছুটে এসে আনা গানাদোর একটা হাত ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে এক নিঃশ্বাসে যা বলেছে তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে?

সোরাবিয়া গানাদোদের আস্তানা থেকে কয়াকে জোর করে ধরে নিয়ে একটা জাহাজে পালাচ্ছে। এখনো বন্দরে ছুটে গেলে তাকে বাধা দেওয়া যায়। এই হল আনার উত্তেজিত যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠের নিবেদন।

বিশ্বাস করা যায় এরকম আজগুবি অসম্ভব সংবাদ!

সোরাবিয়া কোথা থেকে এল এখানে?—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন গানাদো,—তুমি হঠাৎ এ খবর দেওয়ার জন্যে ছুটে এসেছ কেন? কয়া ত অসাড় গাছ-পাথর নয়। তাকে এই দিনের আলোয় নগরের রাস্তা দিয়ে বন্দর পর্যন্ত নিয়ে গেল কি করে? জাহাজেই বা তুলল কি-ভাবে?

এসব প্রশ্ন এখন করবার নয়। আকুল অস্থির হয়ে উঠেছে আনা, তোমার কয়াকে যদি বাঁচাতে চাও এখনি বন্দরে গিয়ে ধরবার চেষ্টা করো সোরাবিয়াকে।

'কয়া'কে বাঁচাবার জন্যে এত ব্যাকুল কখন থেকে হলে!—তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলেছেন গানাদো,—সোরাবিয়া ত মন্ত্র পড়ে আমাদের হদিস পায় নি। আমাকে ও কয়াকে ধরিয়ে দেবার জন্যে তুমিই ত তাকে সব জানিয়েছ!

হ্যাঁ জানিয়েছি! কান্না চাপা গলায় বলেছে আনা,—ঈর্ষা আর প্রতিহিংসার জ্বালায় আমি তখন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করো আজ নিজের জীবন দিয়েও সে ভুল [illegible] তুমি এখনো বন্দরে গেলে হয়ত তাকে ধরতে পারবে। আমায় তুমি যত খুশি ঘৃণা করো ক্ষতি নেই; সেই ঘৃণার বোঝা নিয়েই [illegible] একটু জায়গা পেলে আমি এখন খুশি থাকব। কিন্তু আমায় তুমি অবিশ্বাস করো না। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে তুমি বন্দরে যাও!

গানাদো কিন্তু নিজের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না শুনে সেখান থেকে এক পা নড়েন নি। এমনি অদ্ভুত সর্বনাশা জেদ হয়েছিল তাঁর সেদিন।

অপ্রকৃতিস্থের মত [illegible] উত্তেজিত কণ্ঠে আনা এবার যা জানিয়েছে তার সার কথা হল এই যে, সোরাবিয়া কয়েক দিন আগে পেরু থেকে পানামায় ফেরে। আমার মত সেও [illegible] হিসাবে পানামায় গবেরনাডর-এর আশ্রয় হয় বলে দুজনের দেখা হয় আপনা থেকেই। আনার কাছে গানাদোর খবর জানতে পেরে সোরাবিয়া তখনই আনাকে নিয়ে মোয়রে দে দিয়স বন্দরে আসার ব্যবস্থা করে। এখানেই যে গানাদো আর কয়াকে সে ধরতে পারবে এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। আগেকার এক সপ্তাহের মধ্যে কোন জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়ে নি জেনে সে আরো নিশ্চিন্ত হয়। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সে গোপনে গানাদোর হদিস পাবার চেষ্টা করে। নগরের পথে একদিন ফিলিপিলিওকে দেখে তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে গানাদোর সন্ধান সে পেয়েও যায়। সেই সঙ্গে 'কয়া'কেও সে দেখে। এবার সে যে শয়তানী মতলব ভাঁজে তা বাহাদুরী করেই হিংস্র বিদ্রূপের সঙ্গে আনাকে জানায়। গানাদোকে ফেরারী গোলাম হিসেবে সে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু শুধু তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে না। কয়াকেও সে লুট করে নেবে। আনা যে তার বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও

গানালোর প্রেমে হাবুডুবু, এ লুণ্ঠন হবে তারই প্রতিশোধ। পানামা থেকে রওনা হবার পর থেকেই নিজের অপরাধের পরিমাণটা বুঝতে পেরে আনা অনুশোচনায় দগ্ধ হতে শুরু করেছে। এবার সে সোরাবিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বেঁকে দাঁড়ায়। গানালো যে আর গোলাম নয় মুক্ত স্বাধীন নাগরিক সম্রাটের সই-করা সনদ দেখিয়ে বন্দরের কোতোয়ালকে তা সে জানিয়ে দেবে বলে। হিতে বিপরীত হয় এ শাসানিতে। সোরাবিয়া প্রথমে আনার কাছ থেকে গানালোর মুক্তিপত্র জোর করে আদায় করবার চেষ্টা করে। কোথায় আনা সে সনদ লুকিয়ে রেখেছে জানবার জন্যে যতখানি সম্ভব শারীরিক উৎপীড়ন করতে সে দ্বিধা করে না। তা সত্ত্বেও বিফল হয়ে আমাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তাদের এখানকার আশ্রয় নিবাসের একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে সোরাবিয়া তার ভাড়াকরা গুণ্ডাদের নিয়ে গানালোর আস্তানায় হানা দেবার মতলব আঁটতে বসে পাশের ঘরেই। বেহুঁশ অবস্থাটা কেটে যাওয়ায় আনা প্রায় সমস্ত ষড়যন্ত্রটাই শুনতে পেয়েছে। গানালোর আস্তানায় হানা দিয়ে জোর করে হাত পা মুখ বেঁধে তারা কয়া-কে বার করে আনবে। তারপর কফিন-এর বাক্সে পুরে মৃতদেহের মত তাকে বয়ে নিয়ে যাবে বন্দরের দিকে। সেদিকের নির্জন রাস্তায় একবার পৌঁছোতে পারলে থলির মধ্যে ভরা কোন চালানীর মাল হিসেবে কয়াকে জাহাজে তুলে তখনকার মত সোরাবিয়ার নিজের ভাড়া-করা কেবিনে বন্দী করে রাখা মোটেই শক্ত হবে না। এই পরামর্শ করে ভাড়াটে গুণ্ডাদের নিয়ে সোরাবিয়া বেরিয়ে গেছে। প্রতিবেশীদের একজন আনার চিৎকার আর দরজার আঘাত শুনে যখন এসে তাকে মুক্ত করেছে তখন আনার নিজে থেকে কিছু করবার আর উপায় নেই। এইটেই তাঁর যাতায়াতের পথ জেনে আনা তাই আকুলভাবে গানালোর জন্যে এখানে অপেক্ষা করে আছে। সোরাবিয়ার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র শেষ মুহূর্তে যদি ব্যর্থ করা যায় সেই আশায়।

এত কথা শোনবার পরও যদি গানালো বন্দরের বদলে তার আস্তানাতেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে না ফিরে যেতেন!

আস্তানায় ফিরে গিয়ে নিজের চোখে অবশ্য তিনি রক্তাক্ত মুমূর্ষু ফিলিপিলিওকে দেখেছেন। শেষনিঃশ্বাস পড়বার আগে শুনেছেন তার ক্ষীণ স্তব্ধপ্রায় কণ্ঠে সোরাবিয়ার পৈশাচিক আক্রমণের কথা। সেই আক্রমণ ঠেকাবার জন্যেই প্রাণ দিয়ে ফিলিপিলিও তার দেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।

কাপিতান সানসেদো আর ডন মোরালেস-এর ওপর ফিলিপিলিওর উপযুক্ত সংকারের ভার দিয়ে গানালো তারপর বন্দরে ছুটে গেছেন।

কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে একটু বেশী।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে তখন নেমে এসেছে পৃথিবীর ওপর। সেই অন্ধকার উত্তর আকাশের ঈষৎ ফিকে পশ্চাৎপটে সোরাবিয়ার সঙ্গে বন্দিনী কয়া-কে যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই জাহাজটার গাঢ় কৃষ্ণ রেখাকৃতি আর তার মধ্যে একটা নাতি উজ্জ্বল আলোর বর্তিকা ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে দেখা গেছে। আর মাত্র কিছুক্ষণ আগে এলে বুঝি এ জাহাজের নোঙর তোলা বন্ধ করবার চেষ্টা করা যেত।

শ্রীঘনশ্যামদাস চুপ করলেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ককিয়ে উঠলেন কুম্ভোদর রামশরণবাবু,—ওই পাপিষ্ঠ সোরাবিয়া 'কয়া'কে অমন করে অবাধে লুট করে নিয়ে চলে গেল!

না, তা আর যেতে পারল কই! শ্রীঘনশ্যামদাস আর সকলের ত বটেই মর্মর মসৃণ যাঁর মস্তক সেই শিবপদবাবুর মুখেও অস্ফুট একটু প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে বললেন, বন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে খোলা দরিয়ায় পড়তে না পড়তে জাহাজের হালী গায়ের ওপর কয়েক ফোঁটা জল পড়ে চমকে উঠেছে।

মেঘের বাষ্প কোথাও নেই। এমন ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার আকাশ থেকে জলের ফোঁটা ঝরে কেমন করে?

ওপর দিকে চেয়ে শিউরে উঠেছে সে। শিউরে উঠেছে সোরাবিয়াও। জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়বার পর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত সে ডেকের ওপরেই আছে, নির্বিঘ্নে খোলা দরিয়ায় পৌঁছোনটুকু দেখে যাবার জন্যে।

খোলা দরিয়ায় পৌঁছোবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এবার সে তার বন্দিনীর খবর নেবার জন্যে ফিরতে যাচ্ছিল। কেবিনের মুখের ওপর থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়তেই সে চমকে উঠেছে হালীর মত, তারপর শিউরে উঠেছে ওপর দিকে চেয়ে।

ওপরে যা দেখেছে তাতে নিজের চোখকেই প্রথমটা সে বিশ্বাস করতে পারে নি। একেবারে জাহাজের মাথার কাছের পাল 'ফোর টপ সেল'-এর আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত আবছা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসেছে।

ছায়ামূর্তি নিছক ছায়া কিন্তু নয়। জলের ফোঁটাগুলো তার কাছ থেকেই যেন পড়ছে।

ফোর টপ সেল থেকে মাস্তুলের দড়ি বেয়ে ছায়ামূর্তিটা 'মিজেন' পালের দিকে নেমে এসেছে এবার।

কাঁপা হলেও তীক্ষ্ণ গলায় সোরাবিয়া জিজ্ঞাসা করেছে,—কে? কে ওখানে!

ছায়ামূর্তিটা তখন টপ মাস্ট মাস্তুলের কাছে। সেখানে থেকে বুকের রক্ত হিম করে দেওয়া গলার উত্তর এসেছে,—তোমার নিয়তি!

মিজেন মাস্তুল বেয়েই মূর্তিটা তারপর খানিকটা নেমে এসে লাফিয়ে পড়েছে ডেকের ওপর।

তুমি! তুই!—ভয় বিস্ময় আর হিংস্র উল্লাস মেশানো একটা অদ্ভুত চিৎকার বেরিয়ে এসেছে সোরাবিয়ার গলা থেকে। তারপর পৈশাচিক একটা অট্টহাসি।

হ্যাঁ আমি, সত্যিই তোমার নিয়তি,—সোরাবিয়ার অট্টহাসি থামবার পর জবাব দিয়েছে সে মূর্তি,—তোমার সঙ্গে শেষ হিসেব-নিকেশ বাকি ছিল এতদিন। সেই জন্যেই আজ এসেছি।

হিসেব চুকোবার সাধ তোর সত্যিই আজ মিটিয়ে দেব! কোমরের খাপ থেকে একটানে নিজের হিংস্র আক্রোশের মতই ধারালো তলোয়ারটা খুলে বার করে বলেছে সোরাবিয়া, তুই নিজেকে আমার নিয়তি ভাবছিস? নিয়তি নয়, তুই আমার নিয়তির উপহার। আমার অনেকদিনের দারুণ একটা সাধ মিটিয়ে দেবার জন্যেই তোকে এমন করে আজ পাঠিয়েছে। তা না পাঠালে বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া এ জাহাজ সাঁৎরে এসে ধরা তোর সাধ্যে কুলোত! নে এবার তৈরী হয়ে ইষ্টনাম যদি কিছু থাকে ত জপ করে নে!

এ আর চার দেয়ালের বন্ধ ঘর নয় যে, নাচের পা চালিয়ে বেঁচে যাবি। এ খোলা জাহাজের ডেক এই হালীকে সাক্ষী রেখে বলছি এই ডেকে তোর ঝাঁঝরা করা লাশ আজ শোয়াব!

সোরাবিয়া খোলা তলোয়ার নিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে এবার। তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়েছে সে মূর্তিও। কিন্তু দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথম দেখে মনে হয়েছে, আস্ফালন যা করেছে তাই সার [illegible]

সোরাবিয়ার নিপুণ আক্রমণে অষ্টিকে
র ধীরে পিছিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে
হাজের সামনের মাস্তুল ফোর ম্যাস্টের
ক। একেবারে প্রায় কিনারা পর্যন্ত গিয়ে
র পেছোবার উপায় নেই বলেই বোধহয়
র্তকে এবার সোরাবিয়ার মার ঠেকাবার
ক ফাঁকে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে
া গেছে।

পৈশাচিক উৎসাহে আনন্দে এবার
কার করে উঠেছে সোরাবিয়া। সে দক্ষ
বক। পাল মাস্তুলের রাজ্য তার চোখ
জ ঘোরা ফেরার জায়গা। ছায়ামূর্তি'র
ং করা নির্বোধ গানাদো সেই পাল
তুলের জটলায় মধ্যে তাকে এড়িয়ে
াতে পারবে ভেবেছে!

গানাদোর ধরন দেখে উদ্দেশ্যটা তার
় রকমই মনে হয়েছে। ফোর মাস্ট থেকে
ন টপ গ্যালান্ট মাস্তুলে গিয়ে উঠেছেন,
ানে থেকে 'রয়্যাল' পালের আড়াল দিয়ে
র রয়্যাল মাস্তুলে।

এরপর আর ওঠবার জায়গা নেই।
রাবিয়া তার হিংস্র উল্লাস আর চেপে
তে পারে নি। অনায়াসে রয়্যাল পালের
টা রশি বাঁ-হাতে ধরে তারই তলার
ড়া কানাতে পা রেখে তীব্র অবজ্ঞার
র বলেছে,—এখান থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ
র রক্ষা পাবি ভেবেছিস! ঝাঁপ দিতে
ত পারবি কিন্তু তার আগে এফোঁড়-
ফোঁড় না হয়ে নয়। মিছেই এতটা কষ্ট
ল!

না মিছে নয়—এতক্ষণ বাদে প্রথম কথা
ছেন গানাদো,—তুমি ডেকের ওপর
ার লাশ শোয়াতে চেয়েছিলে আমি
তু এ জাহাজ তোমার রক্তে নোংরা
ত চাই নি। তাই তোমায় লোভ
খয়ে উঠিয়ে এনেছি এই মাস্তুলের
য়। এখান থেকে তোমার লাশটা আর
াজের ডেকে পড়বে না, পড়বে সমুদ্রের
। যা অপবিত্র করার সাধ্য তোমার মত
তানেরও নেই।

গানাদোর কথা শেষ হবার আগেই
উন্মাদের মত তলোয়ার চালিয়েছে
সোরাবিয়া। সে তলোয়ার গানাদোর কাছে
ন্ত পৌঁছোয় নি। একটি অদ্ভুত আঘাতে
অনেক নিচের ডেকের ওপর ঝন-ঝন শব্দে
আছড়ে পড়েছে।

এইবার তোমার পালা।—বজ্রস্বরে বলেছেন গানাদো—আমার তলোয়ারটাও তোমার
রক্তে নোংরা করতে চাই না। শেষ যাত্রায়
গায়ে জড়াবার মত একটা চাদর শুধু
তোমার সঙ্গে দিচ্ছি।

গানাদো পালের মাথার রশিতে কোথায়
কি তলোয়ারের ঘা দিয়েছেন কে জানে।
সমস্ত পালটা খুলে সোরাবিয়ার ওপর পড়ে
তাকে জড়িয়ে নিয়ে বহু নিচের সমুদ্রের
জলের ওপর একটা শব্দ তুলে অন্ধকারে
অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেদিকে একবার চেয়ে গানাদো ধীরে
ধীরে মাস্তুলের মাথা থেকে ডেকের ওপর
নেমে এসে হালীকে সোরাবিয়ার ভাড়া-
করা কেবিনটা কোথায় জিজ্ঞাসা করেছেন।

সে যুগের জাহাজের মাল্লা, অস্ত্রবিদ্যার
চেয়ে মানুষের মূল্য আর মর্যাদা মাপবার
আরো বড় কোনো কিছু তারা জানে না।
কম্পিত সম্ভ্রমভরা হালী কয়া তখনো
যেখানে বন্দী সে কেবিনের নির্দেশ
জানিয়ে দিয়েছে।

তার মানে,—দাসমশাই থামতেই মাথার
কেশ যাঁর কাশের মত শুভ্র সেই হরিসাধনবাবু উৎসুক আশান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা
করেছেন—ওই কয়াকে নিয়ে গানাদো শেষ
পর্যন্ত দেশে ফিরতে পেরেছিলেন?

তা পেরেছিলেন বইকি!—অনুকম্পা-
মেশানো গাম্ভীর স্বরে বলেছেন দাসমশাই—
নইলে আমার নাম ঘনশ্যাম দাস হবে কেন?
আর কিছুর জন্যে না হোক কাপিতান
সানসেদোর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
রাখবার জন্যেই তাঁকে ফিরতে হয়েছিল।
ভাগ্যচক্রে ক্রীতদাস হয়ে যাঁকে স্পেনে
আসতে হয়। আর কাপিতান সানসেদো
যাঁকে প্রকারান্তরে মুক্তি দিয়ে গুরু হিসেবে
বরণ করেন ঋষিতুল্য পরম পণ্ডিত সেই
বৃদ্ধ ভারতীয় জ্যোতিষীর অন্তিম লিপি
গানাদো অর্থাৎ ঘনরাম দাস ঠিকই যথা-
স্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

কোথায়? কার কাছে?—মর্মর মসৃণ
যাঁর মস্তক সেই শিবপদবাবু জিজ্ঞাসা না
করে পারেন নি।

এখানকার কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর
বলে এক গ্রামে। —দাসমশাই শিবপদবাবুর
কৌতূহল মেটাতে জানিয়েছেন—কৃষ্ণদাস
নামে এক সজ্জনের কাছে।

কি ছিল সেই অন্তিম লিপিতে?—এ
জিজ্ঞাসা কুম্ভোদর রামশরণবাবুর।

যা ছিল তা যথাযথ বলতে পারব
না।— শ্রীঘনশ্যাম দাস এ কৌতূহলও
মিটিয়েছেন, তবে বৃদ্ধ জ্যোতিষী এই রকম
কিছু লিখেছিলেন বলে জানি। গণনায়
জানতে পারছি ১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ়
মাস সমস্ত পৃথিবীর এক দুঃসময়। বিশ্বের
অনন্য এক যুগাবতার তিরোহিত হতে
চলেছেন ওই সময়ে। পারেন ত সেই পরম
জ্যোতির্ময় সত্তার দীপ্ত দিব্যোন্মত্ত জীবন-
কথা অমর কাব্যে গেঁথে রাখবার চেষ্টা
করুন।

১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাস......?
কুম্ভোদর রামশরণবাবু একটু দ্বিধাভরে
জিজ্ঞাসা করেছেন।

হ্যাঁ, ১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাস হল
১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই! —উদার হয়ে
তারিখটার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়েছেন দাস-
মশাই,—নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিরো-
ধান ঘটে ওই সময়েই।

একটু থেমে দাসমশাই আবার
বলেছেন—কে জানে বৃদ্ধবয়সে বৃন্দাবন
প্রবাসী হয়ে তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখ-
বার প্রেরণা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ওই লিপি
থেকেই পেয়েছিলেন কি না!

(সমাপ্ত)

যৌবন-যন্ত্রণা ॥

পরিমল চক্রবর্তী

অপেক্ষায়-অপেক্ষায় রাত্রি কাটে, প্রেমিক আসে না।
দক্ষিণের গন্ধাতুর বাগানের বেলী চাঁপা হেনা
একে একে ঝ'রে যায় ফাল্গুনের বিহ্বল প্রহরে;
যৌবন-যন্ত্রণা কাঁদে আশাহত হৃদয়ের ঘরে।

মধ্য রাতে হাওয়া আসে দিগন্তের পরপার থেকে,
হাওয়া এসে ভেঙে পড়ে চোখে, মুখে, সমস্ত শরীরে—
পূর্ণিমার মত্ত জ্যোৎস্না বিরহার্ত স্বপ্ন দ্যায় এঁকে
চেতনার সুপ্ত সাধে, যৌবনের বাসনাকে ঘিরে।

প্রেমিক আসে না তবু। প্রতীক্ষার-প্রতীক্ষায় কাটে
দুঃখের প্রহরগুলো; কী-গভীর বিষাদের সুর
মনের সেতারে বাজে থেকে-থেকে দীর্ঘ রাত্রি ধরে!

অবশেষে সূর্য এসে স্পর্শ করে রাত্রির কপাটে।
সব সাধ মুছে ফেলে, স্নিগ্ধ ভোরে, বেদনাবিধুর
রৌদ্রালোকে তার অশ্রু শিশিরের মতো ঝ'রে পড়ে।।

সেই পাখী॥

বাসুদেব দেব

লক্ষ লক্ষ এরোপ্লেন আকাশ ছেয়ে ফেলে
লক্ষ লক্ষ বিমান বিধ্বংসী কামান পাতা হয়
লক্ষ লক্ষ বারুদ ভরা বাংকার
বাংকারের গা বেয়ে অবিশ্বাস্য সবুজ তেলকুচো লতার মত
তোমার স্পর্শ বৃষ্টির শব্দ অহল্যা
মেঘের বদলে এরোপ্লেন
ভাজীবনের বদলে এ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান
প্রতীকের বদলে দুঃখজাত সত্য
একমাত্র প্রার্থনা আজ বর্মের আড়ালে ভালোবাসা
বেঁচে থাকুক মুখের ভিতর

আমার দুঃখের পথে দীর্ঘজীবী বিশ্বাস এসো
হাজার হাজার মৃত কামানের ওপর শিশুদের খেলা
আর সেই পাখি
সবুজ তেলকুচো লতা
তোমার স্পর্শ
কোনো প্রতীক ছাড়াই বেঁচে থাকুক

অঙ্গনা

যোগ্যতার সদ্ব্যবহার

...খ্যাটা অবিশ্বাস্য। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ... ঘোষণা করেছেন, ইউ এস ন্যাশনাল ...ম ইজ ক্রাইং আউট ফর দি সার্ভিসেস ...উওমেন। অবস্থা এতই সঙ্গীন যে, ...দেশের আর্থিক কাঠামোর যথাযথ ...সের জন্য আগামী দশ বছরের প্রতি ... এক লক্ষেরও বেশি ট্রেইন্ড মহিলা ...—যারা কিনা শিক্ষকতা, কলেজ ইন...র, হেলথ সার্ভিস এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ...লিয়ান্স হিসেবে কাজ করবে।

...পৃথিবীর অনেক দেশের মতই আমে...ও মেয়েদের যোগ্যতাকে কাজে প্রয়োগ ... যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই প্রয়ো...যায়ী চাহিদার সৃষ্টি এবং তার পরি...র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেই শুধু ... না অথবা মাঝে মাঝে উদাত্ত আহ্বানে ...দ্রাতিকে এগিয়ে আসার আহ্বান ...লেই চলবে না। এ জন্য প্রয়োজন উপ...ব্যবস্থা করা। এসব গুরুত্বপূর্ণ পদের ...ক মহিলা কর্মী গড়ে তোলার জন্য ... এবং অন্যান্য সবকিছুর উপযুক্ত ... করতে হবে। না হলে আজকের ... আগামী দিনের অবস্থার খুব একটা ...র হবে না। বরং দিনকে দিন চাহিদা ... যাবে। ফলে সংকট আরো বাড়বে। ... উচ্চপদে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন ... নিম্নপদাধিকারীরা যে এগিয়ে ...ন সেরকম সম্ভাবনাও খুব কম। ... এখানেও প্রায় একই রকম অর্থাৎ ... এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ...ত অভাব।

...রপরেই যে কাজে মেয়েদের চাহিদা ... তিন-চার বছরের মধ্যে বেশ জাঁকিয়ে ... দেবে তা হলো কেরানীগিরি। যদিও ...রি সম্পর্কে মেয়েদের একটা স্বাভা...প্রবণতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও সেক্রেটারী, ...য়াকার, টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার, টেলি... অপারেটরস্ এবং শিপিং ও স্টক ... বিভাগে মুখ্যত কেরানীর চাহিদা ...বেড়ে চলেছে। এবং তা আরো বেড়েই ...।

...স্পষ্ট কথায় বলা যায় যে, মহিলাদের ... ও জীবিকার ভবিষ্যৎ খুবই ...ল।

...বাণিজ্য বিভাগে কাজের সুযোগ যেমন বাড়ছে তেমনি উৎসাহী মহিলা কর্মীরাও এসে নানা কাজে অংশ নিচ্ছে। আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার মহিলা কর্মীর সংখ্যাটা এখন কিরকম হাস্যকর মনে হবে। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি রীতিমত বিস্ময়কর। আঠাশ মিলিয়ন আমেরিকান নারী শ্রম-বিভাগে বর্তমানে কর্মরত। আজকাল আঠার থেকে চৌষট্টি বছরের মহিলাদের প্রায় অর্ধেকই কাজকর্ম করেন। এঁদের কেউ পান মাইনে, কেউ মজুরি।

তবে একটা কথা না বলে পারা যায় না, আঠার থেকে চৌত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মেয়েরা কাজকর্মে খুব একটা আগ্রহী নয় এবং জীবিকা সম্বন্ধে খুব একটা মাথাও ঘামায় না। তবে যেই কিনা চৌত্রিশ পেরিয়ে পঁয়ত্রিশে পা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজের আগ্রহ বেড়ে যায়। সবাই যেন ঘুম থেকে উঠে বসলো এমনি অবস্থা।

একটি পরিসংখ্যানে এ সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা হবে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে পঁয়ত্রিশ বৎসরের ওপরে মহিলা কর্মীর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে। চৌষট্টি বৎসর পর্যন্ত মহিলারা কাজ করে প্রায় অক্লান্তভাবে। মোটামুটিভাবে ১৮ থেকে ৩৪ বৎসরের মহিলা কর্মীর সংখ্যা সর্বত্রই কম। তারপর বয়স যতই বাড়তে থাকে জীবিকা সম্পর্কে তারা সচেতন হয়। তবে একটা ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ৪৫ থেকে ৫৪ বছরের মহিলাদের অর্ধেকই হচ্ছে শ্রমিক।

শিক্ষার প্রসার নারীমহলে যতই ঘটছে জীবিকাও তাকে ততই টানছে। অনেকেই অবাক হয়ে যায় যে, মাঝ মাঝি বয়সের মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগদান করায়। এসব নারী শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা আটজন হচ্ছেন গ্রাজুয়েট এবং শতকরা বাহান্নজন হচ্ছেন স্কুল গ্রাজুয়েট ট্রেনিং-প্রাপ্ত।

আমেরিকায় নারীজীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। জীবনের প্রথম দিকে সবাই কাজকর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে চায় না। এ সময় জীবনকে উপ-ভোগের অর্থে গ্রহণ করাই তাদের কাছে শ্রেয়। তাই প্রায়ই অল্পবয়সেই সবাইকে বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলতে দেখা যায়। একুশ বছরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাত মেলানো হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ায় ছেলেপুলেও হয় তাড়াতাড়ি। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ত্রিশ বছরের কাছাকাছি শেষ সন্তান প্রসব করছে। তবে নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না, তা নয়। কিন্তু একুশ যেমন বিয়ের বয়স তেমনি সন্তান ধারণের শেষ সীমাও হচ্ছে ত্রিশ।

তারপর ছেলেপুলেকে গুটি-গুটি স্কুলে পাঠিয়ে একা মায়ের আর সময় কাটিতে চায় না। বাড়িতে শুয়ে বসে সময় যখন আর কাটতে চায় না তখনই কাজে সে নিজেকে সঁপে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

সাংসারিক জীবন সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আজকের আমেরিকান রমণীদের কাছে শিক্ষার সুযোগ অনেক বেড়েছে। অনেকেই স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেয়। পারিপার্শ্বিক জীবন সম্পর্কেও তারা খুবই আগ্রহী। আগেকার দিনে অবশ্য এতটা আশা করা যেতো না। সুযোগও তখন ছিল অনেক কম। হাতে সময় থাকায় সুযোগকে তারা কাজে লাগাচ্ছে।

আমাদের দেশে মেয়েরা চাকরি করে আর্থিক অস্বাচ্ছল্য থেকে মুক্তির জন্য। ওদেশে কিন্তু মায়েরা চাকরি করে সন্তানের শিক্ষা, উন্নত জীবনমান বজায় রাখা এবং আর্থিক নিরাপত্তার জন্য। আবার যাদের এসব ভাবনা-চিন্তা নেই, তারা কাজ করায় আনন্দ উপভোগ করার জন্যই কাজ করে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইচ্ছুক ব্যক্তি-মাত্রেই যাতে চাকরি পায় সে রকম ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে করা হয়েছে। যদিও এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সাফল্য এখনও আসে নি তবে অদূর ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে পুরো গ্যারান্টি দেওয়া যাবে আশা করা যায়। ১৯৬১ সালের পর প্রায় পাঁচ মিলিয়ন নারী শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছে এবং বেকার হ্রাস পেয়েছে তিরিশ ভাগ। তাই মেয়েরা চাকরি করতে গেলে এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই যে তারা আর এক-জনের প্রাপ্যে ভাগ বসাচ্ছে। কর্মেচ্ছুদের

কাজের সুযোগ দেওয়ার নীতিতেই এগিয়ে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচিত্র অধ্যায়। তাই দেখা যাবে, ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে শত-করা সতেরোজন। এই সময়ে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে শতকরা নয়জন। আসলে ব্যাপারটা হলো, পুরুষদের অধিকাংশই কর্মে নিযুক্ত আর মহিলাদের কাজে নতুন আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।

মহিলাদের কাজে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'ইকুয়াল পে অ্যাক্ট' বিল অনুমোদিত হয়েছে। এর দ্বারা সমান কাজের জন্য সবাইকে সমান বেতন দেওয়া হবে। বেশি বয়সে চাকরির প্রবণতা লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ প্রদেশেই বয়স সম্পর্কিত বিধিনিষেধ হ্রাস করা হয়েছে। যদিও এই আইন বেশি বয়সে চাকরির ব্যাপারে সব সময় সহায়তা করে না তবুও দেশে বয়স্কদের চাকরি পাওয়া থেকেই সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। আজকাল বেকার-সমস্যা ৪৫ থেকে ৬৪ বছরের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে কম। তাছাড়া বেশি বয়স্ক কর্মীর কাছ থেকে কাজও পাওয়া যায় সন্তোষজনক। বেশি বয়সে কাজে এসে এঁরা ফাঁকিঝুঁকি দেন না। বরং সবটুকু সময় মন দিয়ে কাজ করেন। তাই 'মিডল-এজেড' কর্মী যে-কোন অফিসের মূল্যবান সম্পত্তিবিশেষ।

'মিডল-এজেড' কর্মীর তুলনায় তরুণ কর্মীরা চটপটে হলেও কাজে তাদের মন খুব একটা বসে না। তরুণরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে খুব একটা ভাবিত নয়। তাই অফিসে বা কলে-কারখানায় হামেশা তাদের বিপদে পড়তে হয়। এরা কামাইও করেন বেশি আবার কাজকর্মে ওদের পেরিয়ে যেতে পারেন না। যে-কোন প্রতিষ্ঠান তরুণদের বিপরীত আচরণগুলিই 'মিডল-এজেড'দের কাছ থেকে পায়। তাই তাদের সম্বন্ধে সকলেরই উৎসাহ বাড়ছে।

সবকিছু আলোচনার পর বলা যায় যে, মেয়েদের কাজ করার ব্যাপারে আমেরিকায় আজ আর কোন সংস্কার টিঁকছে না। দিনে দিনে মহিলা কর্মচারী নিযুক্ত করার ব্যাপারে অনেক সংস্থা উৎসাহ প্রকাশ করছে।

চাকরি সম্পর্কে আমেরিকান নারী-সমাজে ইদানীং একটা সাড়া এসেছে। সেই-সঙ্গে আরও একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, নানা সেবা প্রতিষ্ঠান (ভলান্টিয়ার সার্ভিস অর্গানাইজেশন) কর্মীদের কাজকর্মকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে নানারকম পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকেই এগিয়ে এসেছে। তারা স্বেচ্ছাশ্রমে দেহ-মন ঢেলে দিয়েছেন। স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং শিশু ও জনকল্যাণকর নানা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের তাঁরা যুক্ত করেছেন। সারা দেশে এ জন্য নানাভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। এসব স্বেচ্ছা-সেবীদের ট্রেনিং দেওয়া এবং যোগ্যতানুসারে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

—প্রমীলা

কটক-ভুবনেশ্বর

যখন কলেজে তাড়াতাড়ি ক্লাস থাকে তখন অফিস বাসেই যাই। বাস ছাড়ে সাড়ে নটায়। অতএব সকালে চায়ের পেয়ালাতে ঠোঁট ছুঁইয়েই স্নান এবং স্নানের পরেই খেতে বসা তবে খাওয়া নয়। প্রসাধন? করার সময় সেই—কেননা খোঁপাটাই তাড়া-তাড়িতে ঠিক মত হতে চায় না। ব্যাগটা খুলে একবার 'চেক' করে নিই—টিফিন কৌটো, খুচরো, বাসের পাস এবং অন্যসব ঠিক আছে কিনা। সেদিন কোনো একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে এক ভদ্রমহিলা লিখেছেন, আজকাল মেয়েরা পথে-ঘাটে যে প্রচণ্ড বড় বড় ব্যাগ ব্যবহার করেন তার মধ্যে কোনো সুরুচির পরিচয় নেই। কিন্তু তিনি বেমালুম 'ওয়ার্কিং গার্ল' বা সাদা বাংলায় 'খেটে-খাওয়া' মেয়েদের কথা ভুলে গেছেন। অতি বিনীতভাবে জানাচ্ছি, সকাল ন'টার সময় বা আরও আগে যাদের কাজে যেতে হয় এবং বাড়ী ফিরতে প্রায়ই যাদের সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়—যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ নেবার জন্য তাঁদের 'সুরুচিকে' ত্যাগ করেই বাস্তবের সঙ্গে আপোষ করতে হয়। ঘড়িটা দেখলাম, ইস্ আর পাঁচ মিনিট সময়—আজ আর বাস ধরতে পার-লাম না বোধহয়। অতএব রিক্সাতে বসে কাতর নয়নে তাকিয়ে আছি। ভাগ্যক্রমে বাসটা পাওয়া গেছে। কিন্তু জানলার ধারের সীটটি পাওয়া গেল না।

সবাই প্রধানতঃ অফিস-যাত্রী। মুখগুলি প্রায় চেনা হয়ে গিয়েছে। ওই যে রাজলক্ষ্মী আর তার মেসোমশায়, সে সুবাদে আমা-দেরও। রাজলক্ষ্মী স্কুল-টিচার। তারপর মোটাসোটা উর্মিলাদি—রংচটা অ্যালকাথিন ব্যাগ, আর ছাতা। সেই বিখ্যাত ছাতা যা ও'র সঙ্গে ভারত-ভ্রমণ করেছে—বেয়োনেটের মত করে ধরে উনি এগিয়ে আসেন। মাঝে মাঝে ভাবি, উনি যে কি করে সাত বছর যাওয়া আসা করার পর এখনও মাথায় গোলাপ বা বকুলমালা গোঁজার মত প্রেরণা পান। আর তারপরই রাণীহাটে—কে বলুন ত? নিভা ইঞ্জিনীয়ার—রজনীগন্ধার ডাঁটার মত সতেজ—লাবণ্যময়ী বেশবাসে আধুনিকা কিন্তু উগ্রতাবর্জিত।

ছেলেরা সিনেমা কিম্বা ফুটবল ম্যাচের আলোচনায় সরব। আরেক ভদ্রলোক সমানে বই পড়েন—আমার সঙ্গিনী কাশ্মীর যাবেন। তাই পরীক্ষার খাতা নিয়ে ব্যস্ত। আর আমি—যতক্ষণ কটক শহর চলে ততক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। দোকান-গুলি তাদের পণ্যসম্ভারের বর্ণাঢ্যতায় ঝলমল করে—দেখতে ভাল লাগে। মাঝে মাঝে তাকাই বাসের ভিতরে কত বিচিত্র মানুষ। ঠিক আমার পেছনের সীটেই আছেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক—মাঝে মাঝে 'বো-টাই' সমেত নিখুঁত সাজ করে আসেন—আবার কোনোদিন হয়ত ট্রাউজারের উপর ফুল-হাতা শার্ট। আর সামনে ওই জানলার পাশে মুখোমুখি বসে আছেন ঘন নীল কাঁচের চশমাপরা এক লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক—মাঝবয়সী, পরনে ডোরাকাটা শার্ট আর ধুতী। অতিশয় শাহেনশা লোক, একদৃষ্টে মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। একবার অন্য একটি বাসে দেখেছিলাম যে কন্ডাকটার লেডিস সিটে একাগ্রদৃষ্টি এক-জনের মাথা ধরে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আরেকজন কে জানি—সৌম্যদর্শন মাথার চুল পেকেছে চিনি না কিন্তু বাসের যেখানেই থাকুন হঠাৎ যদি কখনও অনিচ্ছাক্রমেও চোখাচোখি হয় হেসে তাকিয়ে থাকেন।

আমার সঙ্গে প্রায়ই যাওয়া আসা করেন এক বয়স্ক ক্রীশ্চান মহিলা। তিনি এসবের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে একটি পদ্ধতি বার করেছেন এবং আমাকেও 'রেকমেন্ড' করতে ভোলেননি। উনি বাসে উঠেই সবকিছু অগ্রাহ্য করে—চোখ বুজে ফেলেন। ও'র নিজের ভাষাতেই বলি—কে টেরেই টেরেই অনাউছি, কে মুরুকেই মুরুকেই হসুছন্তি, মুঁ দেখি পারিবি নাহিঁ'। (অর্থাৎ কে তেরছাভাবে তাকাচ্ছে, কে মুচকি মুচকি হাসছে আমি দেখতে পারব না।)

চোখ খুলতে ওর এতই বিতৃষ্ণা যে উনি ওই অবস্থাতেই কনুই-এর খোঁচার উত্তরে ছাতার খোঁচা অর্থাৎ বাসের ভীড়ের জন্য যে-সব ঠান্ডা যুদ্ধ করতে হয় করে চলেন।

আপনি যদি ভায়া বাণীহার বাসে যান তবে তার চেহারা অন্য। এখানে তারুণ্যের জোয়ার। ড্রাইভার নায়ার আর অটলকে বাদ দিলে 'বাণীবিহারের' বাসের কথা সম্পূর্ণ হতে পারে না। নায়ার নিখুঁত ভদ্র। বাণী-বিহারের ছাত্র আর প্রফেসারদের স্বার্থ সম্বন্ধে অটল অতন্দ্র প্রহরী। অটলবাবু, ছুটির পর ছাত্রদের নিয়ে বাড়ীতে ফেরে। সব বাসই বাস স্ট্যান্ড হয়ে বিভিন্ন দিকে যায়। পাছে কোনো অন্য যাত্রী উঠে পড়ে—সেইজন্যে 'অটলবাবু'-র বাস স্ট্যান্ডে ঢুকল—তাতে কোনো বোর্ড নেই। নেহাতই আমাদের মত ঝানু-যাত্রী না হলে কেউ জানতে পারে না বাসের গন্তব্য কোথায়... আর জিজ্ঞাসা করলেও অন্য উত্তর পায়—এহি বাস কটক যিব নাহিঁ' (এ বাস কটকে যাবে না) বাণীবিহার দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অটল গামছা বই, ইত্যাদি দিয়ে বেণী কেডামিটদের জন্য সিট 'রিজার্ভ' করে। ঘন্টা পড়ে ছেলেরা আসে। বাস বোঝাই হয়।—শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভব হ'লে অটল নিজের সিট এর অর্ধেক ওদের জন্য ছেড়ে দিতে দ্বিধা করত না।

কত ঘটনাই না মনে পড়ছে। পথের ধারে দুর্ঘটনা। হামেশাই লেগে আছে। আমরা ওগুলোকে গায়ে মাখি না। তু মজার ঘটনা মনে পড়লে একঘেয়ে-কথা মনেই থাকে না। যেমন ধরুন র প্রস্তাব। আপনারা যা ভাবছেন তা নিরাশ করার জন্য আন্তরিকভাবে খিত। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা লা সরাসরি তাঁর ভাইপোর সঙ্গে বিয়ের তাব দিলেন।

আরেকদিন লেডিস সিটে আমরা তিন-। বাসে বেজায় ভিড়—ফলে ধারে যে-মহিলাটি বসেছেন তিনি বিপর্যস্ত। প্রথমে বললেন—'ঘালুয়া গন্ধ'—অর্থাৎ ঘামের গন্ধ, আমি সায় দিলাম। দ্বিতীয়বারে বললেন—দেখছেন্তি মোর সীট কেমতি পড়ছেন্তি (দেখছেন আমার সীটের উপর এসে পড়ছেন কিরকম)। আমি বললাম যে আপনি ভালভাবে অনুরোধ করুন। উনি তাই করাতে কিছু ফলও হলো। হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়ালেন এক লম্বা ভদ্রলোক—পরনে গোলাপী শার্ট, টেরিলিনের ট্রাউজার—কিন্তু আন্ডারওয়্যার ডোরাকাটা এবং ডোরাকাটা ইজের অনেকটা বেরিয়ে আছে। তার উপরে ক্রমশই তিনি মহিলাটির কাঁধের উপর চলে আসছেন। অসহ্য দৃশ্য। আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। হঠাৎ পার্শ্ববর্তিনীর তপ্ত স্বর কানে ভেসে এল। পাশে তাকালাম ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে সেই লোকটিকে সোজা চ্যালেঞ্জ করেছেন—ইয়ে কন্ প্যান্ট পিন্ধিছি হেইছি' (এ কি প্যান্ট পরা হয়েছে আপনার)—তারপরের কথাগুলি হাসিতে আর শোনা গেল না। আর অল্পপরেই আমার স্টপেজ এসে যাওয়াতে নেমে পড়লাম।

—অনুতপা আনন্দ

আচার

নুন আম—বেশ সবুজ তাজা আম টাকতক। বাকরা ও আঁশযুক্ত না হওয়াই ।। আমগুলিকে খোসা ছাড়িয়ে জলে জিয়ে রাখতে হবে। তারপর দুভাগ র কোশি বাদ দিয়ে লম্বাদিকে চিরে নিয়ে ট ছোট টুকরো করে নেওয়া। টুকরো-ল বেশি ছোটও হবে না, বেশি বড়ও হবে এইবার টুকরো আমগুলি জলে ধুয়ে ঝরিয়ে একটি বড় কাচের বোয়েমে বা ভাল কলাই-এর বাটিতে রেখে, মের পরিমাণমত একটু বেশী নুন দিয়ে খ দিন। চার-পাঁচদিন পরে দেখা যাবে মগুলি রসে জল বেরিয়ে গেছে। এইবার টশুদ্ধ আমগুলি রোদে দিন। দিন দুই-র রোদে দেবার পর এইবার ঐ মজানো মগুলির মধ্যে ছটাকখানেক আদা সরু-করে কুচিয়ে দিন। তারপর আমের রমাণ অনুযায়ী কিছু গরমমশলা, কিছুটা চ, সামান্য একটু হিং গুঁড়িয়ে মিশিয়ে।। পরপর পাঁচ-ছ'দিন রোদে দেবার পর ন রাখুন। এই আচার খেতে বেশ ভাল। া একেবারে টক খেতে না পারেন, তাঁরা সঙ্গে চিনি অথবা গুড় মিশিয়ে ভাতের গ মেখে খেতে পারেন। রুটি, লুচি রও খেতে ভাল লাগে। যত দিন যাবে, এই আচার মজে বেশ রসরসে হয়ে বে। মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া দরকার। দেখা যায় আমের বাকরা বেশী হয়ে ছ, তাহলে আমের গা চেঁচে ছোট ছোট রো করেও করা চলে।

আমতেল—টাটকা কাঁচা আম গোটা-পাঁচ। একটু বাকরা হলে ভাল হয়। ন্ত আমের বোঁটাসমেত মুখটি বেশী টু কেটে জলে ভিজতে দিন। আঠা সব রয়ে যাবার পর খোসাশুদ্ধ এক-একটি মকে আটটি টুকরো করতে হবে। প্রথমে আধখানা, তারপর লম্বালম্বিভাবে চিরে, ড়াদিকে দুই টুকরো করতে হবে। টুকরো মগুলিকে নুন মাখিয়ে দু-তিনদিন চাপ র জারের মধ্যে রেখে দিন। দু-তিনদিন পরে দেখা যাবে আমগুলি বেশ একটু নরম হয়ে রসে গেছে। এইবার আমগুলির পরিমাণ অনুযায়ী হলুদ, কিছুটা পাঁচ-ফোড়ন এবং এক ছটাক আন্দাজ সরিষা, গোটা শুকনো লঙ্কা, একবেলা রোদে রেখে তাতিয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে। এই মশলাগুলি দেবার আগে কিছুটা ছোলা-মটর, বরবটি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে, তারপর একটু ভিজে গেলে একটা থালায় রেখে জলটিকে বেশ করে ঝরিয়ে ছোলা-মটর থেকে জল শুকিয়ে ঐ মশলামাখা আম-গুলির মধ্যে দিয়ে দিন। এইবার রোদে দিন। একদিন রোদে দেবার পর ভাল সরষের তেল মশলামাখা আমগুলির মধ্যে দিন। তেল যেন বেশী না দেওয়া হয়। বেশ মাখা-মাখা তেল আমগুলির মধ্যে যাতে লেগে থাকে, সেইমত তেল দেওয়া দরকার। ডুবন্ত তেল হলে সমস্ত মশলা তেলের মধ্যে চলে যাবে। সামান্য একটু হিং গুঁড়িয়ে আমতেলের মধ্যে দিতে হবে। এইবার চার-পাঁচদিন একবেলা করে রোদে দিয়ে তুলে নেবেন। শেষে দেখা যাবে, সমস্ত মশলা তেল মিশে একটা সুগন্ধ বেরিয়েছে। তখন বোঝা যাবে আচারটি ঠিক তৈরি হয়েছে। তুলে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। মাঝে মাঝে কিন্তু রোদে দেওয়া দরকার। মাস দুই-তিন পরে দেখা যাবে আমতেল মজে সুন্দর হয়েছে।

গুড়আম বা ফাঁকিয়া—বেশ পুরুষ্টু শাঁসালো টাটকা আম দরকার। একটু বাকরা আম হলে ভাল হয়। খুব বেশী বাকরা হলে কাটা যাবে না। যাতে দু-আধখানা করা যায় এইমত বাকরাওলা আম দরকার।

আমের বোঁটার মুখটি কেটে জলে ভিজতে দিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ ভিজে গেলে আঠা জলে ধুয়ে যাবে। যদি বড় বড় আকারের চারটে আম হয়, তাহলে গুড় লাগবে এক কিলো। এইবার আমগুলির খোসা ছাড়িয়ে দু-আধখানা কোরে লম্বা-লম্বি দিকে চারফালা করে একটি আম থেকে মোট আটটি আমের টুকরো হবে। যদি ছোট আম হয়, তাহলে একটা আম থেকে চারটি ফালা হবে। মাঝারি আম হলে ছ'টি ফালা হবে। আমগুলি কাটা হয়ে যাবার পর জলে ধুয়ে নিয়ে অন্য একটা পাত্রে ভাল জলে টুকরো আমগুলিকে ঘণ্টা-তিনচার ভিজিয়ে রাখুন। ঘণ্টা দুই-চার ভিজানো হয়ে গেলে এইবার একটি কলাই অথবা এনামেলের পাত্রে গুড় দিন ও উনানে চাপান। গুড়ের সঙ্গে সামান্য একটু জল দিন। গুড় গলে এলে আমগুলি জল ঝরিয়ে দিতে থাকুন। একটু নুন দেওয়া দরকার। বেশ খানিকক্ষণ ফুটতে থাকুক। মাঝে মাঝে কাঠ বা কলাই-এর চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন। তলা যেন ধরে না যায়। ফোটবার সময় দেখা যাবে গুড়ে আম মশে একটা ভাল গন্ধ বার হচ্ছে। দেখা যাবে আমগুলি গলে আসছে। গুড়টাও চটচটে হয়ে আসছে। মোট কথা গুড় ঘন হয়ে আম গলে এলে নামিয়ে নেওয়া। একটা কথা মনে রাখা দরকার, বেশী জল দিয়ে গুড় পাতলা হয়ে গেলে ঘন হতে সময় লাগবে এবং আমগুলি গলে মিশে যাবে গুড়ের সঙ্গে। একটু চেখে নিতে হবে। যদি দেখা যায়—টক রয়েছে, তখন আর একটু গুড় মিশিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া চলবে। কারণ, অনেক সময় আম খুব টক হয়। টকভাব থাকলে আচার গেঁজে উঠবার সম্ভাবনা থাকে। পরপর ক'দিন রোদে দেওয়ার পর আচারটির পরিমাণ অনুযায়ী কিছু পাঁচফোড়ন ও তার সঙ্গে গোটাকতক লঙ্কা ভেজে মিহি করে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিন। বেশ ক'দিন যাবার পর মশলা মিশে গিয়ে ফাঁকিয়া আচারটি মজে উঠবে। সকলকে খেতে দিন। রুটি, লুচি, পরটা সবকিছুর সঙ্গে খেতে খুব ভাল লাগবে। ভারী মুখরোচক এই আচারটি।

—হেমপ্রভা মল্লিক

সুয়েজ খাল

[illegible]বিতা দাশগুপ্ত

[illegible] [illegible] [illegible]টিকিট [illegible] [illegible] নিশ্চয়ই এতোদিনে খবর [illegible] [illegible]। অভিনব স্ট্যাম্প বেরিয়েছে একটি এবং পাওয়া সোজা নয়। কোন দেশের [illegible] থেকে বেরোয়নি এই টিকিট। আজব শোনায় কিন্তু সত্যি—অনেকটা সেই ম্যাকবেথের কোন "মায়ের পেটে হয়নি এমন বীর" জাতীয়। সুয়েজ খালের অন্তঃস্থেরা জল বয়ে ওয়ফে বীটার লেক থেকে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে এই টিকিট।

গত বছর জুন মাসে আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের ফলে বেশ কয়েকটি জাহাজ সুয়েজ খালের ভেতরে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। দুদিকেই এদের রাস্তা আটকে আছে বোমায় ঘায়ে ঘায়েল অন্য কয়েকটি জাহাজ। বছর গড়িয়ে গেছে কিন্তু খাল পরিষ্কার হয়নি—আটকে পড়া জাহাজগুলো বেরুতে পারেনি। আটটি দেশের পনেরোটি জাহাজ সতেরো মাস ধরে নিরুপায় অবস্থায় প্রার্থনা করছে যেমন করে হোক এই আরব-ইসরাইলি বিরোধের একটা ফয়সালা হোক, আবার খুলে যাক সুয়েজ খাল, তাদের বন্ধন মোচন হোক।

এদের সবকয়টিই মালবাহী জাহাজ এবং যাকিছু নিয়ে চলেছিল তার অনেকই গেছে বা যেতে বসেছে। ডিম মাংস আপেল কতদিন টেঁকে? মাল্লারাই বা কি করবে? একমাত্র যা করা সম্ভব তাই করছে—নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে যতদূর পারা যায় সদ্ব্যবহার করছে। আজ এই জাহাজ থেকে আপেল, কাল ঐ জাহাজ থেকে মাংস পাঠানো হচ্ছে অন্য জাহাজগুলোতে। যারা কায়রো থেকে কয়েদ জাহাজ দেখতে যাচ্ছেন, তাঁরাও শুনেছি চেখে দেখবার সুযোগ পাচ্ছেন। সবার যদি সুয়েজ খাল অবাধ যাবার অধিকার থাকত, তাহলে হয়তো চেখেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া যেতো। বর্তমান অবস্থায় খালের দিকে সাধারণের যাওয়া বারণ, কারণ ওপারেই ইসরাইলীরা এবং কখন এক পশলা গোলা-বিনিময় হয়ে যায় বলা যায় না। যেসব দেশের জাহাজ আটকে আছে, তাদের দূতাবাসগুলির লোকেদের মাঝে মাঝে যেতেই হয় আর সাংবাদিকরাও সুযোগ পেলেই ছোটেন। চারটি জাহাজ বৃটেনের, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, পোল্যান্ড, সুইডেন প্রত্যেকের দুটি করে এবং ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়ার একটি করে। সব চলেছিল উত্তর দিকে—কেবল একটি ছাড়া। আমেরিকান জাহাজ 'অবসার্ভার' যাচ্ছিল ভারতবর্ষে ২৭,০০০ টন মাইলো নিয়ে। এই মাইলো মিশর সরকার সস্তা দরে কিনে নেবেন বলছেন বহুদিন থেকে কিন্তু বেচাকেনার ব্যাপারটা কিছুতেই যেন হয়েও হচ্ছে না।

জাহাজের লোকেরা নিজেদের [illegible] [illegible] [illegible]। গ্রেট বিটার লেকস অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হয়েছে, তার [illegible] আছে গান আছে। গানের নাম 'ইয়েলো সাবমেরিন' বা হলদে ডুবোজাহাজ। প্রতি রবিবার সকালে সবাই জার্মান জাহাজ 'নর্ডউইন্ডে' যায় যীশুর ভজনা করতে। পোল্যান্ড বুলগেরিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট মাল্লারাও যায় কিনা এই খবরটা নিতে ভুলে গেছি। তবে জাহাজের ডেকে ফুটবল প্রতিযোগিতায় বোধ করি সবাই সামিল। পাঁচজন করে খেলোয়াড় এক-একদিকে। এরই একটি জাহাজে আছে একটি ছোট ছাপাখানা এবং সেখান থেকে জি বি এল-এর (গ্রেট বিটার লেক অ্যাসোসিয়েশন) তরফ থেকে গত জুন মাসে এক বছরের সালতামামি দাখিল করা হয়েছে অতি সংক্ষেপে এক ডাকটিকিট ছেপে। টিকিটে লেখা আছে—ওয়ান ইয়ার ইন বিটার লেকস্। বামপন্থীরা শুনে খুশি হবেন প্রতিবাদ আন্দোলনও আছে জি বি এল-এর। গত ৫ই জুন সবকটি জাহাজ তাদের ভোঁ বাজিয়ে আরব ও ইসরাইলীদের জানান যে, বন্দীদশার এক বছর পুরো হোল।

অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে মিশর সরকার সুয়েজ খালের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ডাকটিকিট বের করার কথা ভাবতেন এখন। সুয়েজ খাল কাটা শেষ হয়েছিল ১৯ অগাস্ট, ১৮৬৯ কিন্তু খোলা হয়েছিল তার তিনমাস পরে। সেই আমলের মিশরে যথাযোগ্য ধুমধাড়াক্কার পক্ষে তিনমাস এমন কি সময়? ফ্রান্সের ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপস্ খাল কাটলেন, সুতরাং প্যারী থেকে সম্রাজ্ঞী ওজেনীর আসা দরকার ছিল মহরত উপলক্ষে। কায়রোর জামালেক দ্বীপে নতুন প্রাসাদ তৈরী হোল তাঁর জন্য (কেউ কেউ বলেন অট্টালিকা আগেই একটি ছিল—সেটিরই শ্রীবৃদ্ধি করা হোল)। এবং ফরাসী সম্রাজ্ঞী আসবেন কিন্তু অপেরা থাকবে না? বানানো হোল শহরে অপেরা হাউস। এখনো কায়রো শহরে এই প্রেক্ষাগৃহই প্রধান। বিদেশ থেকে নাচগানের দল এসে এখানেই মিশরের মনোরঞ্জন করে। জামালেকের প্রাসাদ এখন ওমর খৈয়াম হোটেল। ১৮৬৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ওজেনী তাঁর 'এইগল' (ঈগল) জাহাজে চড়ে উদ্বোধন করলেন সুয়েজ খাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লেসেপস্ আর পেছনে সাতাত্তরখানা প্রমোদতরীতে ইয়োরোপের একদঙ্গল রাজারাজড়া। খাল কাটতে পুরো দশ বছর কুড়ি হাজার লোককে কোদাল চালাতে হয়েছিল। তাদের দিনমজুরি ছিল দশ নয়া পয়সা—তার থেকে ঠিকাদারেরা তৃষ্ণার জল যোগানোর জন্য পর্যন্ত কিছু কেটে রাখতো।

লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে একটা জলপথের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন

[illegible] [illegible] [illegible] পৌঁছেছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] আগে দুই [illegible] [illegible] অমরাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] চানিয়ো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] বন্ধ হয়ে [illegible] এবং [illegible] [illegible] শতাব্দীতে খাল [illegible] মজে। বিখ্যাত ফ্যারাও নিকোর একবার খেয়াল হোল খালটি পুনরুদ্ধার করা যাক এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকা লাখ কীতদাস কাজে লেগে গেল। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ফ্যারাওর মত গেল ঘুরে এবং খাল সংস্কার বন্ধ করে দেওয়া হোল। ফ্যারাও এক দৈববাণীর কথা শুনেছিলেন যে, এই খাল বেয়ে বিদেশীরা মিশর দখল করতে আসবে। নিকো খাল কাটলেন না কিন্তু বিদেশী আক্রমণ আটকে রইল না। শ'খানেক বছর পরেই দারিয়ুস মিশর জয় করলেন এবং সংস্কার করিয়ে আরো প্রশস্ত করালেন ফ্যারাওদের খাল। পরে তিনি নিজেই আবার খালের মুখ বুজিয়ে দিলেন কি কারণে তা অতো পুরনো ইতিহাসের ঝাপসা পাতা থেকে ঠিক বোঝা যায় না। তাঁর উত্তরাধিকারী জারেক্সসও মনে হয় অবাক হয়েছিলেন, কারণ তিনি আবার খুলেছিলেন খালের মুখ।

এই মরুভূমি দেশে কোন খাল বুজিয়ে দেওয়া ছিল প্রাচীন মিশরীদের চোখে সাংঘাতিক অপরাধ। অপরাধীকে ক্ষমা করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র দেবতা অসিরিসের। তবু দেখা যায় ফ্যারাওদের খাল খোলা হচ্ছে, বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অসিরিসকে মিশরীয়া নিজেরাই যখন অমান্য করতে থাকে, তখন বিদেশীরাও করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

রোমান আমলে ফ্যারাওদের খালের নতুন নাম হোল ট্রাজানের নদী, কারণ সম্রাট ট্রাজান খাল পরিষ্কার করালেন। আবার শ'তিনেক বছর চললো। কনস্টানটাইনের আমলে আবার খাল বন্ধ। সপ্তম শতাব্দীতে এলো আরবরা। খলিফা ওমরের অনুমতি নিয়ে মিশরের শাসনকর্তা অমরু জলপথটি খুললেন আরেকবার। দেড়শ' বছর না যেতেই খলিফা জাফর আলি মনসুর খাল একেবারে চিরদিনের জন্য বুজিয়ে দিলেন।

তখন থেকে মিশরের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য কমতে থাকে। পূর্ব এশিয়া দিয়ে ইয়োরোপ থেকে স্থলপথে ভারত ও চীনে যাবার রাস্তা দেখলেন মার্কো পোলো। কিছুকাল চালানোর পর এই রাস্তা ছাড়তে হোল তুর্কী দস্যুদের উৎপাতে। ইয়োরোপীয় বণিকদের সমস্যা সমাধান করলেন তখন ভাস্কো-ডা-গামা। মিশর পড়ে রইল সবার রাস্তা থেকে বহুদূরে।

...আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ...পোরোর ছিল উৎসাহ ... চতুর্দশ পরে ... ফিলাডেলফাস সুয়েজ থেকে ... সরাসরি খাল বানাবার কথা ভেবে-...ন কিন্তু তাঁর ভয় ছিল এশিয়া ও ...কার মধ্যে সংকীর্ণ ভূখণ্ডটিকে ...লেই লোহিতসাগরের জল এসে ভাসিয়ে ... মিশরের উত্তরাঞ্চল। এই ভুল নেপো-...নের কাঁধেও ভর করেছিল। নেপোলিয়ন ... জয় করেছিলেন প্রধানত লোহিত ...র দিয়ে ভারতবর্ষ যাওয়ার সোজা রাস্তা ... ইংরেজদের কাবু করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ...ু তাঁর ইঞ্জিনীয়ার লপায়ার অঙ্ক কষে ...ণ করে দিলেন যে, লোহিত সাগরের ... ভূমধ্যসাগরের থেকে তিরিশ ফুট উঁচু, ...এব যোজক কাটলে উত্তর মিশরের ধ্বংস ...বার্য। তারপরেও পঞ্চাশ বছর লাগল ... ভাঙতে।

...বিপ্লবোত্তর ফরাসী সরকার এবং ...পালিয়ন যা পারলেন না, ইয়োরোপের ...ত ধনতান্ত্রিক বণিককুল শেষপর্যন্ত ... করলেন বা করালেন। ইংল্যান্ডের সরকার ...সীদের সুয়েজ খাল কাটার চেষ্টাকে ...ন্ত ভয়ের চোখে দেখছিল গোড়া থেকে। ...ু ইংরেজ বণিকের দল ক্রমাগত হিসেব ...তে থাকে, সুয়েজ দিয়ে খাল কাটা হলে ...দের মুনাফা রাতারাতি কতোগুণ বেড়ে ...। তাদের সরকারকে তারা বোঝাতে ...ক যে, খাল কাটা হলেই যে ফরাসী জঙ্গী ...র আসবে তার কোন কথা নেই। বরং ...্যান্ডেরই টাকার কুমীর হয়ে বসার আশ। ...ছ। মিশরে বাসিন্দা ফরাসী বণিকেরা ...কদিন থেকেই মিশর জয় করে খাল ...বার কথা বলে আসছিল তাদের সরকারের ...ছ।

...বার বার মাপজোখ করে দেখা গেল যে, ...হিত আর ভূমধ্যসাগরের জলের উচ্চতার ...তম্যের থিয়োরীটা একেবারে বাজে। ...র্দিনান্দ দ্য লেসেপস্ তাঁর বন্ধু মিশরের ...কর্তা মহম্মদ সৈয়দের কাছ থেকে ...য়েজ খাল কাটার অনুমতি আদায় করেন। ...৬২ সালের ১৮ই অক্টোবর ভূমধ্য-...রের জল এসে ঢোকে তিমসা লেক-এ। ...পর খাল কাটা চলতে থাকে একযোগে ...সা থেকে দক্ষিণে এবং সুয়েজ থেকে ...রে। সাত বছর দুদিক থেকে কাটার পর ...হিত সাগরের জল ভূমধ্যসাগরের জলের ...গ মিশল বিটার লেকস্-এ। সার্থক হোল ...সপসের পরিকল্পনা।

এতোকাল ইংল্যান্ড খাল কাটায় বাগড়া ...র আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু ... যখন সত্যিই কাটা হয়ে গেল, তখন ... সংশোধনে এতোটুকু দেরী করল না। ...সপস্কে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নানা-...খেতাবে ভূষিত করা হোল। ভিক্টো-... তাকে দিলেন গ্র্যান্ড ক্রস অব দি স্টার ...ইণ্ডিয়া। তবে ঐখানেই থেমে রইল না। ... খোলার মাত্র ছ'বছর পরেই ডিসরেলী ...রের দেউলে খেদিভ ইসমাইলের থেকে চাল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে কিনে নিলেন সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার। আর [illegible] মিশরী [illegible] [illegible] ইংল্যান্ড [illegible] [illegible] সুয়েজ খাল। অনেক বিদেশী আরবেরা প্রশ্ন করেন ইসমাইলিয়া আর তেউফিকিয়া এই দুটো নাম এখনো বদলানো হয়নি কেন?

চুয়াত্তর বছর ইংরেজেরা দখল করে রইল সুয়েজ খাল এবং তাদের সমস্তে যখন করলেন গামাল আবদেল নাসের। শুধু তাই নয়, আসোয়ান বাঁধ বানাবার প্রতিশ্রুত অর্থ ঋণ দিতে বৃটেন আর আমেরিকা যখন অস্বীকার করল, সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করে নাসের সমুচিত জবাব দিলেন। সেজন্য ১৯৫৬ সালে ইংরেজ ফরাসী আর ইস-রাইলীরা জোট বেঁধে মিশর আক্রমণ করল কিন্তু বাকি দুনিয়ার ধমক খেয়ে তাদের পিছু হঠতে হোল।

রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর আরম্ভ হোল সুয়েজ খালের উন্নতি সাধন। প্রথম অধ্যায়ে নাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী খালের গভীরতা বৃদ্ধি পেল বেশ কিছুটা। আশা ছিল বাকি অধ্যায়গুলি শেষ হলে এক লাখ দশ হাজার টনের জাহাজ পুরো বোঝাই হয়ে অথবা এক লাখ ২৫ হাজার টনের জাহাজ আংশিক বোঝাই হয়ে খাল দিয়ে যেতে পারবে। প্রথম যখন খাল কাটা হয় মাত্র ১৭০০ টনের জাহাজ যেতে পারত।

১৯৩৬ সালে খালে জাহাজ যাতা-য়াতের মাশুল থেকে মিশর সরকারের রোজগার হয় ৯·১ কোটি মিশরী পাউন্ড বা ১৫৪ কোটি টাকা। আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের আগের হিসেব মত ১৯৬৭ সালে আয় হবার কথা ছিল ১০·৪ কোটি মিশরী পাউন্ড। অর্থাৎ বছরে ১·৩ কোটি পাউন্ড আয় বৃদ্ধির কথা ছিল এবং আশা ছিল ১৯৭৫ সালে খাল থেকে আয় দাঁড়াবে ১৫ কোটি পাউন্ড। মিশরের আয়ের ক্ষেত্রে তুলোর পরেই সুয়েজ খাল। ইদানীং মিশরে পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে, তবে কতো তেল থেকে কতো উপার্জন হবে—এখনো বলা যায় না। যতই পাওয়া যাক সুয়েজ খাল আরো অনেক দিন মিশরের মস্ত বড় সম্বল।

১৯৫৬ সালের পর এতো শীগ্‌গির সুয়েজ খাল আক্রান্ত হয়ে পড়বে প্রেসিডেন্ট নাসের কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল অন্যরকম। খালের আয়ের শতকরা ৭২ ভাগই আসছিল তেলবাহী জাহাজ চলাচল থেকে। কোম্পানীগুলোর অর্ডার অনুযায়ী জাপানে ক্রমশ এত বড় মাপের ট্যাঙ্কার তৈরী হতে আরম্ভ করেছে যে, তারা বোধহয় সুয়েজ খাল দিয়ে যাতা-য়াত করতে পারবে না। তাছাড়া ইসরাইলী-দের খালের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেওয়া হোত না বলে তারা এরই মধ্যে এক পাইপ-লাইন বসাতে আরম্ভ করেছে আকাবা উপ-সাগর থেকে ভূমধ্যসাগর অবধি। এই পাইপ-লাইনটি তৈরী হলে অনেকখানি তেল ঐ [illegible] এবং মিশরের আয় [illegible] তাই মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী পাইপ-লাইন বসানোর তোড়জোড় করতে হচ্ছে।

বর্তমানে পোর্ট সৈয়দের উল্টো পারে পোর্ট ফুয়াদ ছাড়া সুয়েজ খালের পূর্বকূল পুরোপুরি ইসরাইলীদের দখলে। পশ্চিম পারের ইসমাইলিয়া থেকে দেখা যায় মাত্র ১০০ মিটার জলের ওধারে ইসরাইলীদের নীল-সাদা পতাকা উড়ছে। ইসরাইলী সৈন্যদেরও দেখা যায়। দেড় বছর হোল খাল বন্ধ, কোন জাহাজ যায় না এবং আশঙ্কা হচ্ছে বালু পড়ে খালের গভীরতা যাচ্ছে কমে। ইংরেজেরা রোজ মিশরীদের ভয় দেখাচ্ছে। খাল যদি শীগ্‌গির খুলতে না পার, ওটা একদমই যাবে মজে। মিশর খাল খুলতেই চায়। তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে এখন মিশরের প্রতি সপ্তাহে। অবশ্য আরব সংহতির নামে খয়রাত করে এই ক্ষতি পুষিয়ে দিচ্ছে সৌদি আরব, কুয়েত আর লিবিয়া। কিন্তু কতোদিন এই খয়রাতি চলবে কেউ বলতে পারে না। গত বছর জুনের লড়াইয়ের আগে প্রেসিডেন্ট নাসের আর সৌদি আরবের রাজা ফৈজলের মধ্যে মুখ দেখাদেখি ছিল না। ইসরায়েল খাল খুলতে দেবে না তার নিজের শর্ত ছাড়া অর্থাৎ যতক্ষণ না ইসরাইলী জাহাজকে অবাধে খাল ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। বিরোধের মীমাংসা কবে হবে কেউ জানে না।

পনেরোটি জাহাজ নিশ্চল দাঁড়িয়েই আছে। সর্বশেষ খবর : তারা নতুন ডাক-টিকিট বের করেছে—তাতে লেখা আছে "কারাগারে পাঁচশ দিন" (ফাইভ হান্ড্রেড ডেজ্ ইন প্রিসন)। টিকিটের ছবিতে দেখানো আছে গরাদের পেছনে সমুদ্রের জল আর তাতে একটি নোঙর। নোঙরের ওপর লেখা ১৪, অর্থাৎ গ্রেট বিটার লেকস্ অ্যাসো-সিয়েশনের সদস্য সংখ্যা। মাইলোবাহী মার্কিন জাহাজটি পড়ে আছে একটু দূরে তিমসা লেকে। ১২ই অক্টোবর গ্রেট বিটার লেকস্ অ্যাসোসিয়েশনের নিজেদের অলিম্পিক প্রতিযোগিতাও হয়ে গেল এবং সেই উপলক্ষেও নতুন টিকিট বেরিয়েছে।

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[ঠিক আটাশ বছর আগের কথা। কলকাতা থেকে বিনু তার মা-বাবা আর দুই দিদির সঙ্গে এল পূব বাঙলায় রাজদিয়ায় দাদু হেমনাথের বাড়ি। আশ্চর্য মানুষ এই বৃদ্ধ হেমনাথ, আরো অবাক [illegible] বন্ধু সাহেব লারমোরকে। একজনের কাঁধে গাঁয়ের নানান ঝামেলা, [illegible] আয়ারল্যান্ড ছেড়ে এসে ভালোবেসে ফেলেছেন রাজদিয়ার মাটিকে, [illegible]। অনেক [illegible] অবশ্য বিনে পয়সায় চিকিৎসাও শুরু করেন [illegible]।

গাঁয়ের সব মানুষই বেশ আন্তরিক। [illegible] সবচেয়ে ভালো লাগল যুগল আর লারমোরকে।

প্রথম দিন রাজদিয়া ঘুরে বেড়াল। [illegible] সুজনগঞ্জের হাটে। জীবনে এই প্রথম নৌকোয় চাপল বিনু। [illegible] এল হাটে। লারমোর, হেমনাথ আর বিনুর বাবা, অবনীমোহন [illegible] অন্য নৌকোয়।]

।। তেরো ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নৌকোঘাটা থেকে যুগলের সঙ্গে ওপরে [illegible]ই বিনু অবাক। যেদিকে যতদূর চোখ [illegible] সারি সারি হাটের চালা।

চালা বলতে বাঁশের খুঁটির মাথায় একটু করে হোগলার ছাউনি; আর সব দিক খোলা, বেড়া-টেড়া কিছু নেই। সেগুলোর তলায় অস্থায়ী দোকান বসেছে। কোথাও একটানা অনেকগুলো চালা জুড়ে তরি-তরকারির বাজার, কোথাও তামাক হাটা, কোথাও মরিচ হাটা, কোথাও মাছের বাজার, কোথাও কাউনাইয়ের (এক জাতীয় শস্য) বাজার। আবার কোথাও বা রঙীন কাচের চুড়ি, লাল ফুলিস, আলতা-কাকুই-ফুলেল তেল, এমনি নানান মনোহরণ জিনিসের পসরা সাজানো।

দু ধারে হাটের চালা, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ দিগ্বিদিকে ছুটে গেছে।

দু দণ্ড দাঁড়িয়ে চোখ পেতে যে বিনু সুজনগঞ্জের হাটটাকে দেখবে তার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা যুগল তাকে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে দিচ্ছে না; একখানা হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

ছুটতে ছুটতে বিনু লক্ষ করল, সে আর যুগলই শুধু না, হাটের সব মানুষই ছুটছে।

ঢোলের শব্দ ক্রমশ আরো জোরালো হয়ে উঠছে। যুগল ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দিল, দেখাদেখি বিনুকেও বাড়াতে হল। পাশাপাশি যে হাটুরে লোকগুলো ছুটছিল তাদের ভেতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'আ রে বলা মিয়া, হইল কী? ঢেরা (ঢেঁড়া) পড়ে ক্যান?'

বলা মিয়াই খুব সম্ভব উত্তর দিল, 'নিকর (নিশ্চয়) রগোর (রংতামাসার) ব্যাপার আছে।'

'তাই মনে লয় (হয়)।'

আরেকজন বলল, 'অনেক কাল পর ঢেরা পড়ল সুজনগঞ্জে—'

অন্য একজন ব্যস্তভাবে বলল, 'হু; অখন দৌড়াও দেখি সোনাভাই—'

বেশ খানিকক্ষণ ছুটবার পর হাটের মাঝমধ্যিখানে এসে পড়ল বিনুরা। এখানে হাটের চালা নেই। একটা প্রাচীন বট তার বিপুল বিস্তার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর খুশিমতো যেখানে পেরেছে ঝুরি নামিয়েছে। এই দুপুরবেলাতেও, সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর, বটতলা শীতল— ছায়াচ্ছন্ন। তার একধারে পুরনো ভাঙাচোরা একটা মন্দির, কিসের মন্দির বিনু বুঝতে পারল না।

মন্দিরটার সামনের দিকে মস্ত পুকুর; তারপর অনেকখানি জায়গা খোলামেলা। সেখানে এই মুহূর্তে মেলা বসে গেছে যেন। অসংখ্য মানুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ঝকমকে চোখে মাঝখানে তাকিয়ে আছে। বিনুকে টানতে টানতে যুগল সেখানে নিয়ে এল। তারপর কনুই দিয়ে ঠেলে ঠেলে অদ্ভুত কৌশলে ভিড়ের ভেতর পথ করে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

ভেতরে বেশ খানিকটা জায়গা গোলাকার এবং ফাঁকা, মানুষের ভিড়টা তাকে ঘিরে। ফাঁকা জায়গায় তিনটে মোটে লোক। দুজনের মাথায় কোঁচকানো কোঁচকানো বাবরি; একেবারে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। বড় মোটা জুলপি তাদের, পাকানো গোঁফ। গায়ে জামা-টামা নেই, পরনে মালকোঁচা-দেওয়া খাটো ধুতি। দুজনেরই হাতে রুপোর চৌকো তাবিজ আর গলায় সোনাবাঁধানো বাঘনখ। গায়ের রঙ এত কালো আর চকচকে, মনে হয়, ঘামতেল মেখে আছে।

বাবরিঅলারা বেশ জোয়ান; লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। তাদের গলায় মস্ত ঢাক বাঁধা; এই মুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আর নেচে নেচে প্রচণ্ডভাবে পিটিয়ে চলেছে। ঢাকদুটো না ফাঁসানো পর্যন্ত থামবে না বোধ হয়।

দেখতে দেখতে বিনুর মনে হল, ওরা যেন যমজ। কুমোরের দোকানের মানিক-জোড় পুতুলের মতন একই ছাঁচে গড়া।

ওরা ঢাক বাজাচ্ছে আর তৃতীয় মানুষটি একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার শরীরে মাংস কিছু নেই। ঢ্যাঙা তালগাছের মতন চেহারা। আখমাড়াই কলে ফেলে সবটুকু সার বার করে নেওয়া হয়েছে, ফলে ছিবড়েটুকু পড়ে আছে। লোকটার গাল ভাঙাচোরা; চুল পাংশুটে রঙের। সেই চুলই তেলে জবজবে করে পরিপাটি টেরি কেটেছে। কত বয়েস, কে জানে। হাড় এমন পাকা, মনে হয়, টোকা দিলেই টং করে বেজে উঠবে। পরনে চিটচিটে ঢোলা পা-জামা আর রং-বেরং-এর হাজারটা তালি দেওয়া আলখাল্লা, খালি পা। সার্কাস দলের ক্লাউনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তার হাতে লম্বা একটা চোঙা।

এমন যার চেহারা তার চোখের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। সে দুটো যেমন রসালো তেমনি ঢুলুঢুলু।

লোকটা প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় হেলিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। যখন দেখল, হাটের প্রায় সব লোক চারপাশে জড়ো হয়েছে, হাতের ইসারায় বাবরিঅলা দুটোকে থামিয়ে দিল। তারপর মুখের কাছে চোঙাটা ধরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'হিন্দু ভাইরা, মিয়া ভাইরা, অনেক দিন পর আপনেগো (আপনাদের) সুজনগঞ্জে ঢেরা দিতে আইলাম (এলাম)।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে বলল, 'হ, অনেক দিন পর আইলা (এলে)। সেই যেন সনের (বছরের) আগের সন [illegible] আলে শীতল পূজার সময় আইছিলা। হেইর পর এই আইলা।'

আরেকজন বলল, 'এ্যাতোদিন আছিলা কই?'

ঢ্যাঙা লোকটা মুখ থেকে চোঙা নামিয়ে বলল, 'এই দ্যাড় বছরে কই কই ঘুরলাম! হেই নুয়োখালি জিলা, ফরিদপুরে জিলা, তিপুরো জিলা, কুমিল্লা, চাঁদপুরে (চাঁদপুরে), বরিশাল আর [illegible] ভাটির দ্যাশ—আ [illegible] কোথায়)?'

'জেরা (ঢেঁড়া) দিতে গেছ?'

'এ ছাড়া আর [illegible]). এই বিদ্যাই তো আমার [illegible] রুজগার, ভাত কাপড়!'

ভিড়ের মধ্যেকার প্রশ্নকর্তা লোকটা [illegible] নাড়ল, 'হু—'

বোঝা যায়, দেশে দেশে ঢেঁড়া দিয়ে বেড়ানোই ঢ্যাঙা লোকটার কাজ এবং জীবিকা।

যাই হোক, ভিড়ের অন্য সবাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তারা চেঁচামেচি জুড়ে দিল; 'গপ থুইয়া অহন আসল সম্বাদখান কও (গল্প রেখে এখন আসল কথাটা বল)। বুইনা যাই না। উইদিকে আবার হাটের বেলা যায়।'

'হ-হ', হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঢ্যাঙা লোকটা হাতের লম্বা চোঙাখানা মুখের কাছে আনল। তারপর কণ্ঠস্বর একেবারে চূড়ায় তুলে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মিয়া ভাইরা হিন্দু ভাইরা, আপনেরা নাজিরপুরের নাম শুনছেন?'

'কোন্ নাজিরপুর?'

'নবীগঞ্জ থানার ভিতরে পড়ে; পেল্লয় গেরাম (মস্ত গ্রাম)।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ জানাল, নাজিরপুরের নাম শুনেছে। তবে বেশির ভাগই শোনে নি।

ঢ্যাঙা লোকটা বলল, 'বাবু ভুবনমোহন দত্তচধুরি (দত্তচৌধুরী) নাজিরপুরের জমিন্দার (জমিদার)। বয়েস হইব ষাইট (ষাট)। তেনার (তাঁর) দারুণ দাপট। এমুন দাপট যে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। কিন্তুক—'

ভিড়টা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তুক কী?'

'গেল সন (বছর) জমিন্দারবাবু তেজপক্ষের (তৃতীয়পক্ষের) বিয়া সারছেন। এই পক্ষের বউ একেবারে লক্ষ্মী পরতিমার (প্রতিমা) লাহান (মত) দেখতে। বয়সখান'ও কম; মোটে ষোল। এই নিয়া একখান কথা রটছে—'

'চারদিক থেকে চড়বড়িয়ে খই ফোটার মতন অসংখ্য কণ্ঠস্বর ফুটতে লাগল, 'কী কথা? কী কথা?'

ঢ্যাঙা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে সেই ঢাকী দুটোকে চোখের ইসারা করল। কথাবার্তার ফাঁকে একধারে বসে তারা জিরিয়ে নিচ্ছিল; ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র দামড়া মোষের মতন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং উদ্দামভাবে বাবরি ঝাঁকিয়ে ঢাক পেটাতে লাগল।

উৎসাহ দেবার জন্যই যেন হয় ঢ্যাঙা লোকটা প্যাকিং বাক্স থেকে নেমে পড়ল। হাতে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে বলতে লাগল, 'জোরে, আরো জোরে—'

ঢাকী দুটো উৎসাহিত হয়ে এমন বাজাতে লাগল যে [illegible] যায় না।

[illegible] লোকটা [illegible] [illegible] বলতে লাগল, [illegible] ব্যাটারা, [illegible]—'

[illegible]

[illegible] দুটোকে থামিয়ে [illegible] প্যাকিং বাক্সের মাথায় উঠল ঢেঁড়াদার। ততক্ষণে সবার কৌতূহল চূড়ান্ত [illegible] পৌঁছেছে। চারধার থেকে ভিড়টা চেঁচাতে লাগল, 'কও এইবার কও—'

ধীরেসুস্থে চোঙাটা মুখের কাছে এনে ঢ্যাঙা লোকটা বলতে লাগল, 'নাজিরপুরের বাবু ভুবনমোহন দত্তচধুরির নামে যে কথাখান রটছে, তা হইল—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

'কী? কী?'

'তেজপক্ষের বিয়ার পর তেনি নিকি মাউগা হইয়া গেছেন (তৃতীয় পক্ষের বিয়ের পর তিনি নাকি স্ত্রৈণ হয়ে গেছেন)। কথাখান নারাণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ-মাণিকগঞ্জ—ম্যাগ্‌গ-মস্ত, সবখানে রইটা (রটে) গেছে।'

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর শীর্ষবিন্দুতে তুলল ঢেঁড়াদার, 'কিন্তুক কথাখান সত্য না। হিন্দু ভাইরা মিয়া ভাইরা, কেউ যদি এমুন কথা আপনেগো (আপনাদের) কয় (বলে) বিশ্বাস করবেন না।'

সবাই বলল, 'ক্যান, বিশ্বাস করুম না ক্যান?'

'শত্তুরে শত্তুরতা (শত্রু শত্রুতা) কইরা এই কথা রটাইছে। আপনেরা শুইনা রাখেন, সগ্‌গলে জাইনা (জেনে) রাখেন, নাজিরপুরের জমিন্দার বাবু ভুবনমোহন দত্তচধুরি মাউগা (স্ত্রৈণ) না—মাউগা (স্ত্রৈণ) না—'

লোকটা থামতে না থামতেই চারধারে হাসির রোল পড়ে গেল। রসিক কেউ একজন হরিধ্বনি দিয়ে উঠল 'বল হরি—'

জনকয়েক তার সঙ্গে গলা মেলাল, 'হরি বোল—'

ঢেঁড়া দেওয়া হয়ে গেছে। চারপাশের ভিড়টা জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতন এবার হাটের দোকানপসারের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

লোকগুলো যাচ্ছে আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, 'বড় বাহারের সম্বাদ, বড় সম্বাদ—'

একজন বলল, 'শালার বাপের জম্মে এমন কথা শুনি নাই।'

আরেকজন বলল, 'মাউগা (স্ত্রৈণ) না, হেই কথা হাটে হাটে ঢেরা (ঢেঁড়া) পিটাইয়া নি কইতে হয়!'

দেখতে দেখতে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল; দামড়া মোষের মতন সেই জোড়া বাবরিওলাকে নিয়ে ঢ্যাঙা লোকটাও কখন যেন উধাও হয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে যুগলও হাসছিল। হাসতে হাসতে তার ছিলছিলে বেতের মতন শরীর বেঁকেচুরে যাচ্ছে।

এতগুলো লোক যেন হাসছিল, ঢেঁড়াদারের ঘোষণায় কৌতুককর ব্যাপারটা কী ছিল—কিছুই বুঝতে পারেনি বিনু। সে শুধু বিমূঢ়ের মতন একবার এর মুখের দিকে একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

[illegible] বিনু যুগলকে বলল, 'এই, অমন হাসছ কেন?'

[illegible] ছুটোবাবু—' [illegible] এসে [illegible] দিল।

বিনু [illegible] তাকিয়ে থাকল।

হাসিটা [illegible] নিয়ে যুগল বলল, '[illegible] হাসনের কথা। তিরভুবনে (ত্রিভুবনে) কেউ শুনছনি শোনে নাই ছুটোবাবু। কয় কিনা জমিন্দারবাবু মাউগা (স্ত্রৈণ) না—' বলে হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে আর কি।

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল বিনুর। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, 'মাউগা' মানে কী? লোকটা বলছিল—'

'বোঝেন নাই?'

'না।'

হাসি থামিয়ে যুগল সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু চিন্তা করে বলল, 'আপনের না বুঝনেরই কথা ছুটোবাবু।'

কলকাতার ছেলে বিনু, ক্লাস সেভেনে পড়ে। যে কথা যুগল বুঝতে পারে, জলবাংলার এই অশিক্ষিত গেঁয়ো হাটুরে লোকগুলো বুঝতে পারে—সেই কথাটা সে বুঝতে পারবে না! অব্যয়ীভাব আর কর্মধারয় সমাস বোঝে সে, পাটিগণিতের বাঘা বাঘা অঙ্ক বোঝে, নেসফিল্ডের গ্রামার থেকে 'জিরান্ড' 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিসন' বুঝে বসে আছে, আর তুচ্ছ 'মাউগা' শব্দটা অবোধ্য থেকে যাবে! নাক-মুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় বিনু বলল, 'কেন, বুঝতে পারব না কেন?'

'আপনে পোলাপান যে।'

পোলাপান অর্থে ছেলেমানুষ। আষাঢ় মাসে বারো পেরিয়ে তেরোয় পা দিয়েছে বিনু; মাথায় ছোটদিকে ছাপিয়ে গেছে। তবু কিনা তাকে ছেলেমানুষ ভাবে যুগল! মনে মনে খুব রেগে গিয়ে সে বলল, 'ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ করবে না।'

তার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে যুগল চমকে উঠল। বলল, 'আইচ্ছা, আর কমু (বলব) না। এইবারটার লাখান (মতো) মাপ কইরা দ্যান।'

বিনু খুশী হল। সহজ সদয় গলায় বলল, ঠিক আছে। এখন 'মাউগার মানে বল।'

যুগল বলল, 'ছুটোবাবু 'মাউগা' তারেই কয় যে তমস্ত দিন (সারাদিন) বউয়ের আচলের (আঁচলের) তলে থাকে; তার 'পাছে পিছে বিলাইছানার লাখান (বেড়াল-বাচ্চার মতন) ঘোরে। বউ যা কয় তাই করে। মোট কথা বউ অন্ত পরাণ (প্রাণ)। একদণ্ড বউরে না দেখলে মুচ্ছা (মূর্ছা) যায়।'

তবু ব্যাপারটা বিশেষ বোধগম্য হল না। 'মাউগা' শব্দটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে

লোকগুলোর মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেই কথাটি মনে হতেই বিস্তর মতন একবার হেসে নিল বিন্দু। ভাবখানা, অ্যাংলো সব বুঝি, ছেলেমানুষ যা ভেবেছ, আমি তা আসলেই নই।

যাই হোক ফেরার পর্বটা শেষ হয়েছে। হঠাৎ হেমনাথদের কথা খেয়াল হল বিন্দুর। তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে সে বলে উঠল, 'দাদু, বাবা আর লালমোহনদাদুকে খুঁজে বার করবে না?'

যুগল বলল, 'হ। চলেন।'

'চল—'

দু পা এগিয়েছে এমন সময় উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'যুগল, এই যুগল—'

ডান দিকে তাকাতেই বিন্দুরা দেখতে পেল খানিকদূরে অবনীমোহন, লারমোর আর লারমোরের নৌকোর সেই মাঝি দুজন দাঁড়িয়ে আছে। মাঝিদের মাথায় দুটো বড় বড় টিনের বাক্স। চোখাচোখি হতেই লারমোর হাতছানি দিলেন।

বিন্দুরা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। লারমোর যুগলের উদ্দেশে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি রে হতভাগা, এত দেরি হল?'

নীচের দিকে তাকিয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে যুগল বলল, 'পথে এক কুটুমের লগে (সঙ্গে) দেখা, হ্যায় (সে) আমারে তার বাড়িত্ ধইরা নিয়া গেল। তাই টু দেরি হইছে।'

কুটুমবাড়ি যাবার কথাটা সত্যি। ত

ঙ্গে দেখা হওয়া এবং ধরে নিয়ে
র কথাটা ডাহা মিথ্যে। বিনু একবার
, যুগলের মিথ্যেটা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু
দিলে তার ফলাফল কী হবে ভেবে
রে থাকল।

লারমোর আবার বললেন, 'নৌকোর
, জল পেলে তুই আর মানুষ থাকিস
তোর তো কিছু হবে না। পদ্মা-
ধলেশ্বরী আর সারা বর্ষার জলের
নেই তোর কিছু করতে পারে। জন্ম
লাভাইটাকে নিয়ে—' আঙুল দিয়ে
ক দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমরা
আর সারাক্ষণ ওর কথা চিন্তা
।'

গেল ফিসফিসিয়ে বলল, 'চিন্তার
আছিল না। ছুটোবাবুরে আমার
(নৌকোয়) তুলছি; আমার একটা
নাই।'

লারমোর সকৌতুকে হাসলেন, 'আচ্ছে
। জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল।' বলতে
বিনুর দিকে ফিরলেন, 'তারপর
াই—'

বিনু তাকাল।

লারমোর বললেন, 'ঢেঁড়া শুনেছ?'

বিনু ঘাড় কাত করল, 'হাঁ।'

'কী শুনলে বল তো।'

'নাজিরপুরের জমিদার 'মাউগা' না।'

সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগল। হেসে
লারমোর শুধোলেন, 'মানে বুঝেছ?'

'হুঁ।'

হাসিটা হঠাৎ থমকে গেল লারমোরের।
সন্দিগ্ধভাবে শুধোলেন, 'কী?'

'মাউগা' শব্দের ব্যাখ্যা যুগলের কাছে
শুনেছিল, গড়গড় করে বলে গেল বিনু।

কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে রইলেন লারমোর।
নীমোহনেরও সেই একই অবস্থা।
ক্ষণ পর লারমোর বললেন, 'এতসব কথা
কেমন করে জানলে দাদাভাই? কে
য়েছে?'

শেখানোর কৃতিত্বটা আর যুগলকে দিতে
চাইল না; বিজ্ঞের মতন মুখ করে
ীর চালে বিনু বলল, 'কেউ শেখায় নি;
। নিজেই জানি।'

লারমোর আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন,
কগুলো হাটুরে লোক পুরনো ভাঙা
রটার দিক থেকে ডাকাডাকি করতে
ন, 'লালমোহন সাহেব লালমোহন
ব, তরাতরি (তাড়াতাড়ি) আসেন।
। যে যায়—'

লারমোর চঞ্চল হলেন। ব্যস্তভাবে
লেন, 'চল, চল সব—' বলে সামনের
ক পা বাড়িয়ে দিলেন।

ঐ লোকগুলো কেন লারমোরকে ডাকছে,
বুঝতে পারল না। যাই হোক লার-
। আর অবনীমোহন আগে আগে
ছেন। তাদের পেছনে বাক্স মাথায় সেই
। দুটো। সবার শেষে বিনু এবং
ল।

যেতে যেতে অবনীমোহনের গলা শুনতে
। বিনু। চাপা স্বরে তিনি লারমোরকে
লেন, 'এমন ঢেঁড়াও লোকে দেয়?'

লারমোর বললেন, 'মজার ব্যাপারটা সবাই জানল। অথচ তোমার মামাশ্বশুরই শুধু জানতে পারল না। হেমটা একেবারে পাগল। নৌকো থেকে নেমে সেই যে ঘাড় গুঁজে কোন্‌দিকে ছুটল!'

'মামাবাবু তো বললেন, নিত্য দাস না কার দোকানে যাবেন।'

'তুমিও যেমন অবনীমোহন; মামা-বাবুটিকে তো এখনও চেন নি। নিত্য দাসের দোকান পর্যন্ত একবারে ও পৌঁছুতে পারবে! তার আগেই হয়ত গোঁসাইদাস কুণ্ডুমণী ওকে নিয়ে নিজের দোকানে বসাবে। সেখানে এক দুপুর কাটিয়ে দেবে দেখে।'

হেমনাথ সম্বন্ধে ঠিক এইরকম কথাই অনুযোগ করেছিলেন স্নেহলতা। অবনী-মোহন হাসলেন।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে দেখছি হেমকে। ঐ একরকমই থেকে গেল। কোন পরিবর্তন নেই।'

হঠাৎ কি ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'তা হলে তো ভারি মুশকিল হবে লাল-মোহন মামা—'

'কিসের মুশকিল?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন লারমোর।

'এক জায়গায় যেতে গিয়ে আরেক জায়গায় যদি আটকে যান, বার করব কী করে?'

'খুঁজে বার করতে হবে না। হেমই আমাদের খুঁজে বার করবে।'

'আমরা কোথায় আছি, উনি কেমন করে জানবেন?'

লালমোর বললেন, 'ও জানে। সুজন-গঞ্জের হাটে এলে মন্দিরের পাশে ঐ বট-গাছটার তলায় আমি বসি। দেখো, ঠিক এসে পড়বে।'

এদিকে যুগল বিনুকে বলছিল, 'জানেন ছুটোবাবু, কয়দিনে আপনে বেশ চালাক-চতুর হইয়া উঠছেন।'

বিনু রেগে গেল, 'আমি আগেও চালাক ছিলাম।'

যুগল, 'হেয়া (সে) তো জানি, তবে এই কয়দিনে আরো চালাক হইছেন।'

ঈষৎ নরম হয়ে বিনু বলল, 'কী করে বুঝলে?'

'উই যে লালমোহন সাহেবরে যখন মিথ্যা কইরা কইলাম, রাস্তা থিকা অম্মান কুটুমে আমাগো (আমাদের) ধইরা নিয়া গেছিল তখন আপনে চুপ কইরা থাকলেন। সত্য কথাখান কইলে (বললে) লালমোহন সাহেব খুব রাইগ্যা (রেগে) যাইত।'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল আবার বলল, 'যহন যহন (যখন যখন) দরকার হইব, এইরকম বুদ্ধি খেলাই-বেন ছুটোবাবু।'

একসময় তারা মন্দিরের কাছাকাছি সেই ঝুপসি বটগাছটার তলায় এসে পড়ল।

খানিক আগে বিনুরা এই জায়গাটার ওপর দিয়ে ছুটে গেছে। তখন চোখে পড়ে নি, এখন দেখা গেল, একটা সস্তা ছোট টেবিলের মুখোমুখি দুখানা হাতল-ভাঙা চেয়ার সাজানো। সামনের দিকে জনাকয়েক লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের সবাই গরীব গেঁয়ো চাষী শ্রেণীর। সিকি-ভাগের মতন হিন্দু, বাদবাকি মুসলমান। চেহারা তাদের রুগ্ন, দুর্বল। চোখেমুখে অসুস্থতার ছাপ মাখানো। লারমোরকে দেখে সবার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এক-পলক চেয়ার-টেবিলের দিকে তাকিয়ে থেকে লারমোর বললেন, 'এতে তো হবে না; আরো দুখানা চেয়ার লাগবে।'

যে মাঝিদুটো মাথায় করে বাক্স নিয়ে এসেছিল তারা চঞ্চল হল। তাড়াতাড়ি বাকস্ নামিয়ে তারা হাটের দিকে ছুটল।

সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে লারমোর অবনীমোহনকে বললেন, 'বোসো অবনী—'

অবনীমোহন বসলেন। তাঁর মুখোমুখি বসতে বসতে লারমোর এবার বিনুকে বললেন, 'যতক্ষণ না চেয়ার আসে ততক্ষণ আমার কোলে বোসো দাদাভাই। এসো—' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কারো কোলে বসতে ঘোরতর আপত্তি বিনুর। কিছুতেই লারমোরের কাছে গেল না সে। নীচের ঘাসের ওপর যুগল বসে পড়েছিল, সে তার গা ঘেঁষে গিয়ে বসল।

বিনুর দিকে তাকিয়ে মধুর হাসলেন লারমোর, 'দাদাভাই, মস্ত বড় হয়ে গেছে। কোলে বসতে তার খুব লজ্জা!'

বিনু চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকল।

ওদিকে সেই গ্রাম্য অসুস্থ লোক-গুলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারা গুঞ্জনের মতন শব্দ করে বলতে শুরু করল, 'এইবার আমাগো (আমাদের) দ্যাখেন লালমোহন সাহেব।'

স্নেহময় সুরে লারমোর বললেন, 'এত-ক্ষণ বসে আছিস; আরেকটু সবুর কর বাবারা, চেয়ারটা আসুক। না এলে কোথায় বসিয়ে তোদের দেখব?'

লোকগুলো শান্ত হল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর একটু কি ভেবে গভীর স্বরে লারমোর ডাকলেন, 'অবনীমোহন—'

'আজ্ঞে—' অবনীমোহন তক্ষুনি সাড়া দিলেন।

'এটা কত সাল?'

'উনিশ শ চল্লিশ।'

'ঠিক চল্লিশ বছর আগে উনিশ শ সালে, তার মানে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সবে শুরু হয়েছে—সেই সময় আমি রাজদিয়ায় এসে-ছিলাম। তখন আমার বয়েস পঁচিশ। রাজদিয়ায় আসার পরের দিন থেকেই আমি সুজনগঞ্জের হাটে আসছি। এই যে বটগাছটা দেখছ, এর তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই যুবক বয়েসে আমি খৃস্টধর্ম প্রীচ্ করতাম।'

'এখন প্রীচ্ করেন না?'

'না।'

'তবে?'

লারমোর হাসলেন, 'এখন যা করি একটু পরেই দেখতে পাবে।'

(ক্রমশঃ)

হাসির মজলিস

শম্ভুবাবু—দেখ খোকা, তোমার কুকুরটা আমার হাঁটুতে কামড়েছে? এ-ধরনের অসভ্য কুকুর পোষার শখ দেখে অবাক হই।

অনন্ত—দেখুন, এই কুকুরটাকে আপনার অসভ্য বলা অন্যায়। ওইটুকু কুকুরের পক্ষে আপনার হাঁটুতেই কামড়ান সম্ভব। আপনি কি আশা করেছিলেন ও আপনার ঘাড়ে কামড়াবে।

●

স্ত্রী—উঠে পড়, ঘুমোচ্ছ কেন?

স্বামী (ধড়ফড়িয়ে উঠে)—কেন কি হোল, কি হয়েছে?

স্ত্রী—তোমার স্লিপিং পিলটা দিতে ভুলে গেছি যে।

●

—তোমার এত পয়সা হোল কি করে? তোমার বাবা তো মারা যাওয়ার সময় কিছুই রেখে যেতে পারেননি বলে শুনেছি।

—তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু তিনি আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন অভিজ্ঞতা। তারপরই আমি পেলাম এক বিত্তশালী বন্ধু।

—দুয়ে মিলে এই পরিবর্তন?

—হ্যাঁ, বিরাট পরিবর্তন। কারণ, তার এখন আছে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা, আর আমার আছে অর্থ।

●

ছেলে—বাবা, তুমি প্রতি বছর জন্মদিনে আমাকে এত টাকা খরচ করে আর প্রেজেনটেশন দেবে না।

বাবা—কেন, কি হোল?

ছেলে—প্রতি বছর এত টাকা খরচ করা ভাল লাগে না।

বাবা—তবে কি করব?

ছেলে—যা তোমাকে কিনতে হয় না, তাই দাও।

বাবা—সে আবার এমন কি দেওয়ার মত আছে?

ছেলে—কেন, ক্যাশ টাকা।

●

স্টুডিওর একধারে বসে পান করছিলেন দুজন বিখ্যাত অভিনেতা। তাঁদের পরিচয় এই প্রথম। একজন অভিনেতা বললেন—দেখুন, ওধারের ঐ মেয়েটাকে—লম্বামত ফর্সা—গোলাপী রঙের অপূর্ব শাড়ী-পরা—আপনার মনে হয় না ও আমার সঙ্গে একটু ইয়ে করবার চেষ্টা করছে?

তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—অপর অভিনেতা জানা

—আমি এইটুকু জানি ও এখনও আমার স্ত্রী।

●

ভোলানাথ বসু, কলকাতা ২৬ঃ

ছেলে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে।

বাবা—কিরে, এত পয়সাকড়ি খরচ করলাম, আর তুই শেষে ফে করলি?

ছেলে—তবে কি, পাশ করে বেকার হব?

●

—আমাদের দেশে কোন্ সাহেবের সংখ্যা বেশী?

—মোসাহেব।

●

—কোন্ ছেলে মারাত্মক?

—মেয়েছেলে।

●

স্ত্রী—তোমার স্মৃতিতে সব মুখই কেমন উজ্জ্বল হয়ে থাকে, তাই না?

স্বামী—নিশ্চয়, এটা আমার একটা অসাধারণ ক্ষমতা।

স্ত্রী—বাবাঃ বাঁচালে! কিছুক্ষণ আগেই আমি তোমার শেভ করবার ছোট আয়নাটা ভেঙে ফেলেছি কিনা।

●

—তুমি এখনও অবিবাহিত?

—হ্যাঁ।

—প্রায় চল্লিশ হোল, আর কবে করবে?

—ভাল পাত্রী খুঁজতেই এত বৎসর কেটে গেল।

—এখনও মেলে নি?

—হ্যাঁ পেয়েছিলাম দুজন। কিন্তু তারা ভাল পাত্র খুঁজছে।

●

—কুকুরের জিভ এত লম্বা কেন?

—লেজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য।

মন বুঝে দেখুন

আপনি কি হাসিমুখে হারতে পারেন?

…নুষের জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার …নেই, সব আশা মেটেও না। …ীতে এমন কোনও মানুষ বোধহয় …য় তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরো- …মিটিয়ে নিয়ে সুখ-শান্তি-আনন্দের …ুঁজে পেয়েছে। যতটা আশা করা …তটা সম্ভবত কেউ কখনই পায় না। …তা জাগে ব্যর্থতার হতাশা আর …য়র গ্লানি।

…ত্যেকের জীবনে এ এক পরম সত্য— …না-কখনো হারতেই হবে, হতাশ …হবে। কিন্তু ব্যর্থতার খুঁটিতে …করে সফলতার ইমারত গড়ে ওঠে, …নাভাব কজনেরই বা থাকে? অনেকের …ব্যর্থতা আনে গভীর বিষাদ, কখনো …দীর্ঘস্থায়ী এবং তার ফলে, দেহ- …স্বাস্থ্যের ক্ষতিও করে।

…র্থ হলেও হতাশায় ভেঙে পরবো …পেতে চাই তা না পেলেও কাঁদবো …ন মনোভাব গড়ে তোলাই হলো …শ্তি বজায় রাখার একটি পথ। একেই …খেলোয়াড়ী মনোভাব, স্পোর্টসম্যান …।

…পনার মধ্যে এই মনোভাব কতোখানি …তা খানিকটা বোঝা যাবে নীচের …নচর্চার মধ্যে দিয়ে।

…ন আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার …কিছু ঘটতে থাকে, তখন আপনার …ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগে? প্রসন্ন …জভাবে হার মেনে নিতে পারেন কি? …মর্যাদা এতটুকুও নষ্ট না করে …স্বীকার করে নেওয়ার দুরূহ …আপনি কি আয়ত্ত করতে …? যাঁরা সত্যি সত্যি সব হারিয়েও …াবে প্রশান্ত হাসিটুকু অটুট রেখে …শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন, আপনি …রই মতো একজন?

…সত্যি করে বলুন তো, এখন যেখানে কাজ করছেন, সেখানে কখনো কি মনে হয়েছে যে, …বদলে অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে …বা অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে (ক) না? (খ) হ্যাঁ, অনেক-বার? (গ) হয়তো একবার?

২। এই কাজগুলির মধ্যে কোনটি আপনার পক্ষে করা সবচেয়ে সহজ বলে মনে হয়ঃ (ক) যখন বিশেষভাবে আহত হয়ে হেরে যাবেন তখন হাসিমুখে সরে দাঁড়ানো? (খ) অন্যের দোষ খুঁজে দেখানো? (গ) যাতে ন্যায্য বিচার হয় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা?

৩। আপনি যে গল্পটি বলছেন সেটি আপনার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে যদি অন্য কেউ শেষ করতে থাকে, তখন, সাধারণত আপনি কি করেন? (ক) হাল ছেড়ে দিয়ে গা এলিয়ে বসে থাকেন? (খ) যেমন করে হোক জোর করে নিজেই গল্পের শেষটুকু বলে ফেলার জন্যে জিদ করতে থাকেন? (গ) আপনার গল্প বলার বাহাদুরীটা কেড়ে নেওয়ার প্রবঞ্চনাতে দারুন রাগ-বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকেন?

৪। আপনার প্রিয় কোনো ফুটবল টিম যদি খারাপ খেলে, কিংবা কোনো ছেলে পরীক্ষায় খারাপ ফল করে, তাহলে সাধারণত আপনিঃ (ক) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে কারণ জানতে চান? (খ) আর পাঁচটা মামুলী ঘটনার মতোই মনে করেন? (গ) পাঁচজনের কাছে দোষ ঢাকবার জন্যে নানারকম যুক্তি খাড়া করতে থাকেন?

৫। এগুলির মধ্যে কোনটি আপনি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেনঃ (ক) ইচ্ছে করে ঠকানো? (খ) লোকের ভরসাযোগ্যতার অভাব? (গ) শঠতা?

৬। কাল যদি অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার চাকরী চলে যায়, তাহলে প্রথমেই আপনার মনে যেসব প্রতিক্রিয়া জাগবে, তার মধ্যে কি একটি হলোঃ (ক) কোম্পানীর কর্তা-দের সম্পর্কে তিক্ত মনোভাব? (খ) কেবল ভবিষ্যতের জন্যেই দুশ্চিন্তা? (গ) সমস্যার মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে?

৭। ব্যর্থহতাশ লোকদের সঙ্গে আপনি কেমন মেলামেশা করেনঃ (ক) মোটেই না? (খ) খুব সামান্য? (গ) যথেষ্ট?

৮। আপনার কি মনে হয় আপনি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যে খুবই বিশ্বাস করেনঃ (ক) হয়তো করেন? (খ) মোটেই করেন না? (গ) ঠিক বলতে পারছেন না?

কিভাবে পয়েন্ট হিসাব করবেনঃ

১। (ক) ১৫, (খ) ৫, (গ) ১০
২। (ক) ১৫, (খ) ০, (গ) ৫
৩। (ক) ১০, (খ) ৫, (গ) ০
৪। (ক) ৫, (খ) ১৫, (গ) ০
৫। (ক) ৫, (খ) ৫, (গ) ১০
৬। (ক) ৫, (খ) ৫, (গ) ১৫
৭। (ক) ১০, (খ) ৫, (গ) ০
৮। (ক) ৫, (খ) ১০, (গ) ০

আপনি কতো পেলেনঃ

৯০-এর ওপরঃ আপনি নিশ্চয়ই চমৎকারভাবে প্রসন্নমনে পরাজয় স্বীকার করতে পারেন—কিন্তু প্রত্যেকটি পরাজয়কেই অলসভরে মেনে নেওয়া ঠিক নয়!

৮০—৯০ঃ আপনি হার মেনে নেওয়ার মনোভাবকে বেশ আয়ত্ত করেছেন, খেলাধুলোয় যেমন হার মানেন তেমনি ছোটখাটো ব্যাপারকে আমল না দিয়ে এড়িয়েও চলেন।

৬০—৮০ঃ দুঃখের বিষয়, আপনি খুশি মনে হার মানতে পারেন না, কারণ খেলোয়াড়ী মনোভাব আপনার খুব কম কিংবা ঈর্ষার উদ্বেগে আপনি জর্জর।

৬০-এর নীচেঃ আপনার অবস্থা খুব সুবিধে নয়। কারণ আপনাকে একটা সত্য মেনে নিতেই হবে যে, আপনি হার স্বীকার করে নিতে একেবারেই পারেন না; এবং সেইজন্যেই কোনো মহলে আপনাকে সত্যি সত্যি কেউ ভালো চোখে দেখতে পারে না। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে, জীবনটাকে অতো নীরস গুরুভার হারা-জেতার জগদ্দল বলে মনে করার অভ্যাস ছাড়তে সচেষ্ট হন।

কালো মরুক্তো

পিটার ওডোনেল

জান, কর্মবাদ হল পুণ্যার্জনের মাধ্যমে সংসার চক্র ভেদ করে দিয়ে পুনর্জন্মের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া

কিন্তু কাজ করলে
এখানে আসতে হত না

যাই হোক বাবাজীর কোন কাজ আছে তাই এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে আমরা সেটা করি!
1146

যদি যাও ত আমাকেও বলে নিও – যায়গাটা আমার চেনা আছে
তা কি ভাল

ডইলি যখন পেরেছে আমিও পারব

একটা ছুরি গরম করে নেব খন

ধীরার উত্তরে – মহেশ্বরীর রহস্যময় আদেশ পাওয়ার দশদিন পরে

আরেক জন রয়েছে

তিনজন অচেনা লোক প্রভু
না দুজন, মেয়েটি আমার চেনা
1148

আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে – কিন্তু আমি আমার ধ্যানের বিঘ্ন করব না

সাধু ধ্যানে বসলেন

কি কাজ?
আমার দেশ তিব্বতে গিয়ে কালো মুক্তো উদ্ধার করা!
1149
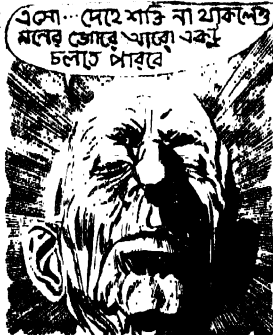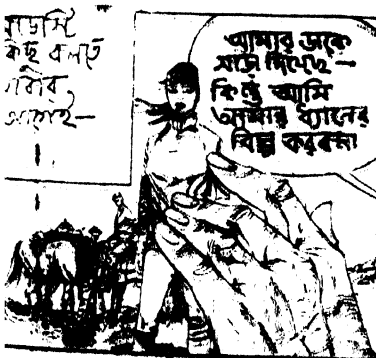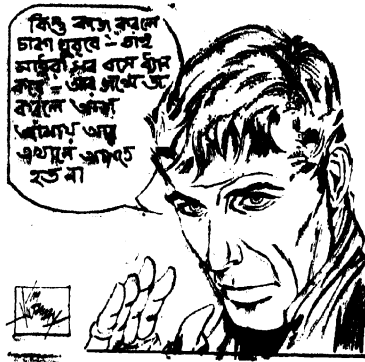
মানিকবাবু অল্প কিছু কাঁচা তরি-তরকারী ও পোয়াটাক চুনো মাছ কিনে তাড়াতাড়ি বাজার থেকে বেরোতে যাবেন, এমন সময় গেটের কাছে হেমবাবুর সংগে দেখা হোয়ে গেল—অর্থাৎ যা ভয় করছিলেন, তাই হোল।

হেমবাবু ইচ্ছে করেই একটু উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই যে মানিকবাবু, বাজার এরই মধ্যে হোয়ে গেল? কি মাছ কিনলেন?'

মানিকবাবু যৎপরোনাস্তি বিরক্তি বোধ করলেও, তাঁর বোঁচা-গোঁফজোড়াটার ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা টেনে এনে বললেন—'ভালো রুই সে-রকম আর আজকাল পাওয়াই যায় না মশাই, অথচ ছেলে-মেয়েরা কুঁচো-কাচা মাছ মোটেই পছন্দ করে না—অগত্যা একটা সের-দেড়েক কাৎলাই কিনতে হোল। কি আর করা যায় বলুন.—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কি! আচ্ছা. চলি হেমবাবু. একটু তাড়া আছে।' মানিকবাবু হেমবাবুর খপ্পর থেকে যাবার জন্য উস্-খুস্ করে উঠলেন।

হেম মুখুজ্জে কিন্তু অতো সহজ পাত্র নন। তিনি মানিকবাবুর হাতের শূন্য-প্রায় চ্যাপ্‌টা থলেটার ওপর তাঁর সন্দেহ-দৃষ্টিটা অলক্ষ্যে একবার বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'আরে মশাই. তাড়া আমাদেরও আছে। কিন্তু কি বললেন, সের-দেড়েক কাৎলা? উঁহু—।'

'উঁহু! তার মানে? কি বলতে চান আপনি?' মানিকবাবুর কন্ঠে বিস্ময় ও রাগ যুগপৎ প্রকাশ পেলো।

'না, না, আমি তা বলছি না; তবে দিনকাল বড্ড খারাপ কি না—এই বলছিলুম যে মানে, মাছটা আপনাকে পচা গছিয়ে দেয় নি ত? একবার দেখি, দেখি।'—বলে হেমবাবু মানিকবাবুর হাতের থলের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন।

মানিকবাবু সংগে সংগে তাঁর ডান হাত থেকে বাজারের থলেটি বাঁ হাতে স্থানান্তরিত করে চোখ দুটো কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত করে বললেন—'পচা মানে? টাট্‌কা কিনলুম, খাবি খাচ্চে—পচা হোতে যাবে কেন মশাই? আর তাছাড়া এ শর্মা যে বাজারের সেরা জিনিষ কেনে, সেটা ত আবার বাজারের মাছওলারা সবাই জানে কিনা—হে-হে-হে-হে!' বলে মানিকবাবু তাঁর শেষ কথাটায় একটু কাষ্ঠ-হাসি যোগ করে দিলেন।

হেমবাবু আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, মানিকবাবু—'আচ্ছা চলি হেমবাবু, একটু বিশেষ তাড়া আছে।' বলে হেমবাবুকে প্রায় একটা ধাক্‌কা মেরেই দ্রুতপদে বাজার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বড় রাস্তাটা পার হোয়ে. একবার পেছন ফিরে বাজারের লোকারণ্য গেটের দিকে চেয়ে জনান্তিকে বিড় বিড় করে বলে উঠলেন—'বেটা দরদের অবতার! আমি কি মাছ কিনি. পচা কি ভালো—তোমার অত দরকারটা কি হে বাপু? ছুঁচো কোথাকার।' তার পায়ের কাদামাখা জুতোটাকে ফুটপাথের ওপর দুম্-দুম্ করে বার দুই ঠুকে সামনেই কালীতারা অয়েল মিলে ঢুকে পড়লেন।

* * *

কালীতারার মালিক যোগেন দত্ত গদীতে বসে তামাক খেতে খেতে বকেয়া হিসেবের খাতা দেখছিলেন। চশমার ওপর দি... মানিকবাবুকে হন্ত-দন্ত হোয়ে ঢু... দেখে জিজ্ঞেস করলেন—'আসুন মানিকবা... আসুন। কি ব্যাপার বলুন তো? এ... তামাক খাবেন না কি?'

মানিকবাবু সে-কথায় কর্ণপাত ... কোরে, একটু উত্তেজিত হোয়ে বললেন... 'নাঃ, আপনার বাড়ীতে আর আমার থা... চলছে না; হয় হেমবাবু থাকবে, নয় আমি... এই আপনাকে সাফ্ কথা জানি... দিলুম।'

এ রকম 'সাফ-কথা' মানিকবাবু গ... পরশুও একবার জানিয়ে গেছেন। সুত... এই নিয়ে দু'বার হোল। যোগেনবা... বুঝলেন, তাঁর বহু-চিন্তিত ওষুধের ... এইবার ফলতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ—

অর্থাৎ, একটু খুলে বলা প্রয়োজন... যোগেনবাবুর বাগবাজার স্ট্রীটে যে বাড়ী... আছে, সে-বাড়ীতে তিনি নিজে থাকেন না... বহুকাল হোল তিনি ভাড়া দিয়েছেন... ওপরে থাকেন হেমবাবু, আর নীচে থাকে... মানিকবাবু। হেমবাবু ভাড়া দেন পঞ্চা... টাকা, আর মানিকবাবু দেন চল্লিশ টাকা... আগেকার আমলের ভাড়া, বর্তমানের বাজার... দরের তুলনায় কিছুই নয়। অথ... ও-রকম একটা বাড়ী থেকে আজকা... খুব কম করে হোলেও মাসে সাড়ে-তিনশ... টাকা নির্ভেজাল পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টা... করেও যোগেনবাবু বিশেষ কিছু ভাড়া... বাড়াতে পারেন নি; শুধু বছর পাঁচে... আগে মাত্র দশ টাকা করে বাড়াতে পেরে... ছিলেন—তা'ও প্রায় বছর খানেক ধরে... অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে. অবশ্য নিজেকে... বাঁচিয়ে। কিন্তু ইদানিং আর এক দফা ভাড়া...

যে তাঁর লোকসানের আংশিক প দেবেন, অথবা, ভালো কথায় ড়াটেরা বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র উঠে তেমন কোন আশা-ভরসা নেই; মণি-কাঞ্চন' উভয়েই যে সে-পাত্র া যোগেনবাবু বিলক্ষণ জানেন। কর্দমাও খুব সুবিধের নয়, তাতেও ঝামেলা, অর্থব্যয়, সময় নষ্ট ও সম্ভাবনা—এমন কি দরজা-জানালা খুলে নেবার যোগ দৃষ্ট হয়— জ্ঞতা যোগেনবাবু ইতিপূর্বে লাভ । অতএব এ-পথ নয়। সুতরাং াবু উপায়ান্তর না দেখে, অনেক রে বর্তমানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, দি ও অকৃত্রিম বৃটীশ নীতি চালু এবং এতে বেশ সুফল এরই মধ্যে নুরু করেছে।

কবাবুর কথায় যোগেনবাবু মনে লকিত হলেন। কিন্তু বাইরে দুঃখের ভান করে বললেন—"সে কবাবু, আপনি যে আমার অনেক-ভাড়াটে! আপনি চলে গেলে আমি ব্যথা পাবো যে। কি হোয়েচে তো? না, না, আপনি যাবেন না, াতে আমি দেবো না—হেমবাবুকেই মি—বসুন, বসুন, একটু তামাক

কবাবু নলচেটা ধরলেন, কিন্তু বার অবকাশ পেলেন না। পূর্বের ত্তেজিত হোয়ে বললেন,—'আমার বরে তার অত দরকারটা কি বলতে আমি কি খাই না খাই—ওর অত াটা কিসের? প্যাজ, ছু'চো !!... আরে মশাই, কাল অফিস কোত্থেকে একটা পচা হাঁসের ডিম য় ফেটে পড়লো—জামা-কাপড় সব —সেদিন আর অফিস যাওয়াই —কি অত্যাচার বলুন তো!'

কের আতিশয্য চাপতে গিয়ে বু বিপুলায়তন উদরের থাকে টা ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন উদ্বেলিত ল।

কবাবু কোন ভ্রুক্ষেপ না কোরে তে লাগলেন—'বিপদের ওপর ল ছিল অফিসের মাইনের দিন। বুঝতেই পারছেন, হাত একেবারেই র ঐ জন্যই আপনার গত মাসের াসের বাড়ী-ভাড়াটা আর তেলের কী পড়ে গেল। কবে যে দিতে ভগবানই জানেন, কি আর করা

নবাবুর পুলকিত চিত্ত মুহূর্তে াতঙ্কে শিহরিত হোয়ে উঠল স-শিহরন তাঁর উদরে একটা ুখী আন্দোলন তুলে থেমে গেল। কথার সূত্র ধরে মানিকবাবু কিন্তু বলতে লাগলেন—'এই দেখুন,

না কেন দত্ত মশাই, আজ কদিন ধরে আমার সদর-দরজার মুখে ওদের ঝি ডিমের খোলা, মাছের আঁশ, উনোনের ছাই ফেলতে আরম্ভ করেছে। সকালবেলা কোন ফাঁকে যে ফেলে দিয়ে যায়, কেউ টেরই পায় না— এ নিশ্চয়ই হেমবাবুর শিক্ষা; ঐ ইতরটা ছাড়া—না, না, আপনিই বলুন, এ রকম করে ঘরে-বাইরে উত্যক্ত করলে কোন ভদ্রলোক টিকতে পারে? কিন্তু আমিও বলে রাখছি যোগেনবাবু, ঐ হেম মুখুজ্যের টেকো মাথায় যদি ঘোল না ঢালতে পারি ত, আমি চাটুজ্যের ছেলেই নয়!'—বলে মানিকবাবু যোগেনবাবুর সেরেস্তার 'মেজ'-এর ওপর প্রচন্ড একটা ঘুঁষি মেরে সদর্পে এবং সবেগে প্রস্থানোদ্যত হলেন।

যোগেনবাবু আচমকা একটা চমক খেয়ে দমকে বলে উঠলেন—'আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—এ একেবারে চাটুজ্যের সন্তানের মতই উপযুক্ত কথা হয়েছে বটে, কিন্তু ঘোল ঢেলে পয়সা খরচা করার কোনই প্রয়োজন নেই, মানিকবাবু। এ অধমের পরামর্শ যদি নেন, তবে বিকেলের দিকে দু-একদিন আসুন—সব বন্দোবস্ত করে দেবো। থুড়ি—বিকেল নয়, বিকেল নয়, সকালেই আসুন—বুঝলেন, সকালেই আসবেন; কাল সকালেই একবার আসুন না।'

যোগেনবাবু ভুলেই গিয়েছিলেন যে বিকেল বেলাটা তিনি হেমবাবুর জন্য আগে থেকেই বরাদ্দ করে রেখেছেন। পাছে উভয়ের একই সময়ের মিলনযোগে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ না হোয়ে সমস্ত বানচাল হোয়ে যায়, এই ভয়ে 'মণি-কাঞ্চন'-এর যোগ ঘটাতে তিনি কোন ক্রমেই রাজী নন। অথচ, বিধাতাপুরুষের উপহাস এই যে, যোগেনবাবু নিজেই যুক্ত হোয়ে উভয়ের মধ্যে 'ডিভাইডার'-এর মত একটা বিয়োগাত্মক সেতু-বন্ধনের যে কাজ করে চলেছেন, সেখানে বন্ধনের ব্যবধানের নৈকট্য

...থলের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন

যতই কমবে, সেতুর বিপদের মাত্রা যে ততই বাড়বে—এটা কিন্তু যোগেনবাবুর তেল-বেচা বুদ্ধিতে একেবারেই জানা ছিল না।

* * *

সন্ধ্যেবেলা।

কালীতারা অয়েল মিল। ভেতরে গদীতে যোগেনবাবু আর হেমবাবু মুখো-মুখী সমাসীন। উভয়েই প্রফুল্ল চিত্ত ও সহাস্য বদন। অল্প কিছুক্ষণ আগে কোন আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তারই রেশ টেনে যোগেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন— 'গয়নার মধ্যে বালা, আর কুটুমের মধ্যে শালা—তাই বলুন, আপনার শ্যালক মশাই থাকবেন। তা এ আর এমন কি কথা; আপনার হাতেই ত সব। মানিকবাবুকে হটিয়ে দিয়ে একতলাতে আপনার শ্যালক মশাই স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। ভাড়া আপনার কাছে আর কি চাইব বলুন, যা হয় দেবেন, না হয় নাই—। কিন্তু যাই হোক, এ-গরীবের কথাটা ভুলবেন না কিন্তু; যেন-তেন-প্রকারেণ মানিকবাবুকে এ-মাসের মধ্যেই, বুঝলেন কি-না।

হেমবাবু গদ-গদ-চিত্ত হোয়ে উঠলেন। সম্ভাব্য সুখকর কল্পনার অমৃত সায়রে একবার চোখ বুজে ছোট্ট একটা ডুব দিলেন। সেখানে দেখতে পেলেন, নিম্ন-লোকে শ্যালকের অবস্থান হেতু ঊর্ধ্বলোকে তাঁর স্ত্রীর সদা-সর্বদা প্রফুল্ল আনন এবং সে রণ-চন্ডী মূর্তির অন্তর্ধান—আর সদা-সর্বদা প্রফুল্ল আননে পরম দাক্ষিণ্যময়ীরূপে সেবার প্রতিমূর্তি স্বরূপ সতত পার্শ্বে বিরাজিতা। হেমবাবু আশা, আনন্দ, উদ্দীপনা ও সংশয়ের ভাব সংহত করে একটা সুদীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন— "তারা ব্রহ্মময়ী!" —বলে গাত্রোত্থান করলেন।

যোগেনবাবু সংগে সংগে প্রতিধ্বনি করে বললেন—'তারা ব্রহ্মময়ী! তারা ব্রহ্মময়ী! কিন্তু যাই হোক মুখুজ্যে মশাই এ অধম-তারণের কথাটা ভুলবেন না যেন। যেন-তেন প্রকারেণ, বুঝলেন কি-না— মানিকবাবুকে এ-মাসের মধ্যেই, বুঝলেন কিনা। আর—"

গলাটা কিঞ্চিৎ খাটো করে যোগেনবাবু বললেন—'আর আমার ঐ বকেয়াটা—না, না, আমি তা বলছি না; গত দু-মাসের বাড়ী-ভাড়াটা একসংগে না হয় দু-চার দিন পরেই দেবেন—আপনার কাছে থাকাও যা, আমার কাছে থাকাও তা। তবে দু-মাসের তেলের দামটা, তা প্রায় পঞ্চাশ টাকা—আর পঞ্চাশ টাকা যেটা ও-মাসে ধার নিয়ে-ছিলেন পকেটমার হোয়ে যাবার পর— অর্থাৎ এই একুনে মোট একশোটা টাকা— না, না, ইয়ে—এক্ষুনি চাই না, কাল বিকেলে দিলেই হবে; কারণ, ওটা আবার মহাজনের প্রাপ্য কিনা—বেটারা বড্ড তাগাদা আরম্ভ করেছে আজকাল। সুতরাং—'

সুতরাং হেমবাবু দেখলেন সমূহ বিপদ। তিনি ধাঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে যেখানে মা-কালীর একটা বিরাট অয়েল-পেন্টিং সংলগ্ন ছিল, তারই নীচে এসে চোখ বুজে, মাথা নীচু করে, জোড়-হাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং যোগেনবাবুর কথাটা যেন তাঁর কানে যায় নি, এই রকম ভান করে বলে উঠলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী মা আমার, সবই তোমার ইচ্ছে, তোমারই ইচ্ছে পূর্ণ কর মা! অধর্ম-অনর্থম-এর থেকে দূরে রাখ মা—চিত্তে শান্তি দাও মা, চিত্ত-শুদ্ধি দাও।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢুলু-ঢুলু চোখে যোগেনবাবুর উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ, কি বলছিলেম যোগেনবাবু? ওরে বেচা, আমার তেলটা দিয়ে যা বাবা; ঐ যে ওখানে শ্রীঘির টিনটা রেখে এসেছি, ওতে দু-কিলোই দিয়ে দিস, মানিক আমার, তা না হোলে আবার হস্তার হিসেবটা ঠিক থাকবে না। টিনটা খুঁজে পাচ্ছিস না বুঝি? দাঁড়া যাচ্ছি—সবই ঐ বেটীর ইচ্ছে—তারা ব্রহ্মময়ী'—ইত্যাদি বলতে বলতে বেচার পরিবর্তে হেমবাবু নিজেই উপযাচক হোয়ে বেচারই উদ্দেশে মিল-এর অপর অংশে অগ্রসর হোলেন, অথবা গা ঢাকা দিলেন, ঠিক বোঝা গেল না।

যোগেনবাবু দাঁতে দাঁত চেপে, মনে মনে হেমবাবুর ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষের আদ্য-শ্রাদ্ধ করতে করতে, বকেয়া হিসেবের জাবদা খাতাটা খুলে, বাকীর খদ্দেরের বেলায় প্রায়ই যা করে থাকেন—এ ক্ষেত্রেও তাই করলেন; অর্থাৎ, হেমবাবুর নামে দু কিলোর জায়গায় তিন কিলো সরষের তেল খরচা লিখলেন—হেমবাবুর নিজের নামে দু কিলো, আর দফে এক কিলো—মারফৎ 'থাকমণি'।

* * *

পরদিন সকালবেলা।

আবার কালীতারা অয়েল মিল এবং গদীতে যোগেনবাবু আসীন; তবে সামনে হেমবাবুর বদলে, সজারু-গুম্ফ, কাষ্ঠ-দেহী মানিকবাবু সমুপস্থিত।

যোগেনবাবু বললেন—'আপনার জন্য ভেবে কাল সারারাত একটুও ঘুম হয় নি আমার। হ্যাঁ, কাল যা বলছিলুম, আমি যতক্ষণ আছি, ঘোল ঢেলে পয়সা খরচা করার কোনই প্রয়োজন হবে না, মানিকবাবু। এ অধমের কথা যদি নেন, তবে আপাততঃ ধোঁয়া দিন।'

'ধোঁয়া!' মানিকবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ; ধোঁয়া, ধূম্র, গ্যাস—মানে অগ্নির পূর্ব লক্ষণ।'

'বলেন কি! অর্থাৎ, পরবর্তী লক্ষণ কি তবে ভস্মে পর্যবসিত? একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি দত্তমশাই, ঠিক হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।'

মানিকবাবুর খোঁচা গোঁফ সজারুর মত সজাগ হোয়ে উঠলো এবং চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে এলেন।

অতঃপর দত্তমশাই মানিকবাবুকে হৃদয়ঙ্গম করাতে বসলেন। এ এক আধি-ভৌতিক কর্ম-কান্ড না হোলেও, প্রায় কাছা-কাছি। কারণ যোগেনবাবু মানিক-বাবুকে তন্ত্রমতে দীক্ষা দিলেন এবং মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন ইত্যাদি ষট-কর্মের অভিচার ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে সাবধানে বুঝিয়ে দিলেন। সাবধানতাটা তাঁর নিজের জন্যই; কারণ, কাজটা যত সহজ, ক্ষেত্র কিন্তু তত সহজ নয়। মন্ত্র-দীক্ষার হের-ফের হোলে ঐ 'মারণ'-এর বক্রী অবস্থায় 'বুমেরাং' হোয়ে দীক্ষাদাতার কাছে ফিরে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

যাই হোক, প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে তন্ত্র-মন্ত্র, গুহ্য-আলোচনা, শলা-পরামর্শ, ভূত-ভবিষ্যৎ বিচার শেষ করে, আশা-ভরসা ও একই ভাড়ায় দ্বিতলে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তির পর, মানিকবাবু উৎফুল্ল চিত্তে বাজারের পথ ধরলেন, আর যোগেনবাবু তাঁর মন-বাসনার দ্রুত বাঞ্ছিত পরিসমাপ্তির ইঙ্গিতে আজ অনেকদিন পর সেই বহু পুরোনো ও বহু-প্রচলিত রাম-প্রসাদের গানটার একটা কলি গুন্-গুন্ করে গেয়ে উঠলেন—

"তোমার কর্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।"

* * *

এদিকে সকালবেলার মন্ত্রের 'য়্যাকশন' সুরু হোতে কিন্তু তামাম দিনটা গড়িয়ে সন্ধ্যে হোয়ে গেল। প্রায় ছটার সময় মানিকবাবু অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে একটা রিক্সা করে মস্ত বড় একটা তোলা-উনোন নিয়ে হন্ত-দন্ত হোয়ে বাড়ী ঢুকলেন; ঢুকেই উঠোনের উত্তর কোণে অর্থাৎ যার ঠিক ওপরের দিকে হেমবাবুর শোবার ঘর, সেইখানে এসে উনোনটাকে বসালেন এবং নিজেই এক গাদা ঘুঁটে নিয়ে এসে, স্রেফ তাই দিয়েই উনোনটা ধরিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে গল্-গল্ করে দম-আটকানো ধোঁয়া কুন্ডলীর পর কুন্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে ঠেলে উঠলো এবং সময়টা তখন কার্তিকের শেষ বলে, ধোঁয়ার কুন্ডলীগুলো বেশী দূর ওপরে না উঠে, সমস্ত ধোঁয়াটাই হেমবাবুর দোতলাতে ছড়িয়ে গিয়ে আবদ্ধ হোয়ে গেল।

...ওপরের দিকে উঠবেই

হেমবাবুর স্ত্রী আর ঝি 'থাক' দুজনে মিলে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করার আগেই ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় সব ঘরগুলো ভর্তি হোয়ে গেল। হেমবাবু অফিস থেকে ফিরে এসে বিছানায় একটু শুয়ে বিশ্রাম কর-ছিলেন—হঠাৎ এ রকম অভাবনীয় ঘটনায় ধড়্-মড়্ করে উঠে পড়লেন এবং বিশ্রী দম-আটকানো ধোঁয়ায় কেসে, চোখের জ্বালায় ও জলে, কাছা-খোলা অবস্থায় বারান্ডায় এসে দেখলেন, নীচে মানিকবাবু একটা বিরাট তোলা উনোন ধরিয়ে পাখা দিয়ে সজোরে হাওয়া দিচ্ছেন, আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তাঁর দোতলাটা অন্ধকার হোয়ে যাচ্ছে।

দু' চোখ রগড়াতে রগড়াতে হেমবাবু ওপর থেকে বললেন—'এ কি, মানিকবাবু যে! কেমন আছেন? কি ব্যাপার বলুন তো? বাপ্‌রে বাপ্, কি ধোঁয়া! তোলা-উনোন আবার কবে আনলেন? কি বিপদ! নাঃ আরে মশাই উনোনটাকে একটু ওদিকে দয়া করে সরিয়ে নিয়ে যান না—মারা গেলুম যে, উঃ!'

হে-হে করে খানিকটা কাষ্ঠ-হাসি হেসে মানিকবাবু বল্লেন—'স্তম্ভন-এর ক্রিয়া একটু সহ্য করতেই হবে যে, হেমবাবু। ওর ওপর হাত? বাপ্‌রে বাপ্—!'

'কি বললেন, 'স্তম্ভন'? তার মানে?'

'অতো মানে করতে পারবো না মশাই। ধোঁয়া ঊর্ধ্বগামী—ওপরের দিকে উঠবেই—কি আর করা যায় বলুন?'

গাঢ় ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে হেমবাবু চোখ, নাক বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি বললেন? ধোঁয়া ঊর্ধ্বগামী? আপনার কোন হাত নেই? আচ্ছা, বেশ।' বলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে, যেমন কাছা-খোলা অবস্থায় এসেছিলেন, সেই অবস্থাতেই বারান্ডা থেকে প্রস্থান করলেন।

ন্ত্রের প্রতি-ক্রিয়ার সমূহ দ্রুত কার্য-
। প্রত্যক্ষ করে মানিকবাবু আশ্চর্য
হোলেন, পুলকিতও তেমনি হোলেন।

*   *   *

রদিন সকালে মানিকবাবু বাজারে
র সময় উঠোনে নেমে দেখলেন,
াত-সকালেই প্রায় সারা উঠোনটাতে
চঃ ডিমের খোলা; ছাই-পাঁশ ইত্যাদি
রয়েছে। অন্য দিন হোলে এই নিয়ে
অশান্তি ভোর থেকেই সুরু হোয়ে
কিন্তু আজ মানিকবাবু এ-সব
ঠিক দেখলেন না। তবে সদর-
দিয়ে বেরোতে যাবেন, এমন সময়
ক আচমকা ময়লা জল এসে গায়ে-
ঝর্-ঝর্ কোরে পড়ে জামা-কাপড়
ভিজিয়ে দিলে।

নতুন উপদ্রবে মানিকবাবু বেশ
ও বিরক্ত বোধ করলেন, কিন্তু
য় কোন চ্যাঁচা-মেচি করলেন না।
ওদিক চেয়ে আবিষ্কার করলেন—
রে দোতলার ড্রেনের পাইপটা, যেটা
াবুর সদর-দরজার পাশ দিয়ে
র কোণ ঘেঁষে মাটির নীচে নেমে
ন্টর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, সেটা
রজার কিছু ওপরে এবং দোতলার
র নীচে কে যেন ভেঙেছে। আর
াঙা মুখ দিয়ে হেমবাবুদের ময়লা
নবরত ছর্-ছর্ কোরে ঝরে পড়ে
াবুর প্রবেশদ্বারকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।
াৎ মানিকবাবুর মনে পড়লো,
। ঠক্-ঠক্ করে হেমবাবুর ওপরে
কেই একটা আওয়াজ হচ্ছিল বটে।
অবশ্য মাঝরাতে তন্দ্রার ঘোরে
করে খেয়াল হয় নি তাঁর; কিন্তু
একথা মানিকবাবুর বুঝতে বাকী
না যে, এই কু-কীর্তিটা হেমবাবুরই
মানিকবাবু দেখলেন, অনভ্যস্ত হাতে
তর অন্ধকারে খালি ড্রেনের পাইপটা
হয় নি, তার সঙ্গে বারান্ডার রেলিং
দওয়ালেরও অনেকখানি পলেস্তারা
ইঁট বার করে দেওয়া হোয়েছে।

াসময়ে সকালের আসরে সংবাদটি
মালিকের কানে পৌঁছতেই মালিক
ণ গম্ভীর হোয়ে থেকে হঠাৎ যেন
দ করে উঠলেন—'য়্যাঁ, বলেন কি!
আমার শেষকালে ড্যামেজ করে
ও-হো-হো, কি সর্বনাশই না আমার
গেল! না, না, আর দেরী নয়
াবু আপনার ক্রিয়া-কর্ম ভালো করে
যান মশাই—এ-মাসের মধ্যে যেমন
হোক হেমবাবুকে তুলতে হবে।
। বলেছি, দোতলাতে আপনিই
আপনি আমার আত্মীয়ের চাইতেও
াড়া যা দিচ্ছেন, তাই-ই দেবেন।
কথা, যে তোলা-উনোনটা আপনাকে
দিয়েছি, যদিও ওটা ধরতে গেলে
রই কাজে বেশী লাগচে বটে, তা
ওটার দাম আর আপনাকে দিতে
না। কিন্তু হেমবাবুর হিস্রেটা

এ-মাসের মধ্যেই যেন-তেন-প্রকারে একবার
করে দেন দেখি।'

এদিকে কিন্তু তোলা-উনোনের দামটা,
মায় তার রিক্সা ভাড়াটা পর্যন্ত যে
মানিকবাবুর তেলের বাকী হিসেবের মধ্যে
বাড়তি এক কিলো হোয়ে ঢুকে সুদে-
আসলে উসুল হোয়ে রয়েছে—সে কথাটা
কিন্তু যোগেনবাবু চেপেই গেলেন।

*   *   *

দিন-তিনেক পরের কথা। মানিকবাবুর
'স্তম্ভন' ক্রিয়া সমানেই চলছে এবং তন্ত্রের
নিয়মানুযায়ী সামনের একাদশী পর্যন্ত
আরও চারদিন চলবে। তারপর যথাক্রমে
'উচ্চাটন' ও 'মারণ' সুরু হবে। কিন্তু
ইতিমধ্যে প্রথমেই সমস্যা দেখা দিয়েছিল
উনোন ধরাবার ঘুঁটে নিয়ে; কারণ প্রথম
দিনেই যে পরিমাণ ঘুঁটে খরচা হোয়েচে,
তাতে মানিকবাবু হিসেব করে দেখেছিলেন
যে শেষ পর্যন্ত শুধু 'স্তম্ভন' করতেই
প্রায় পাঁচ-ছ টাকার ঘুঁটেই খরচা হোয়ে
যাবে। অথচ মুস্কিল এই যে, এর জন্য
যোগেনবাবুর কাছে পয়সা চাওয়াও যাবে

না অথবা, কাজ বন্ধ করাও যাবে না। যাই হোক, অবশেষে চিন্তা করে মানিকবাবু সমস্যার সমাধানও খুব সহজে বার করে ফেলেছেন এবং সেটাই গত তিন দিন ধরে কাজে লাগাচ্ছেন—এতে খরচাও বেঁচেছে আর ধোঁয়াও প্রচুর হচ্ছে।

ব্যাপারটা এই যে, মানিকবাবুর উঠোনের এক কোণে গুদোমঘরের মত একটা ভাঙ্গা ছোট টিনের ঘর ছিল। তার ভেতর যোগেনবাবু তার নিজের বসত-বাড়ীর দরজা-জানালা ও ফার্ণিচারের জন্য গত বছর প্রায় হাজার তিনেক টাকার সেগুনের তক্তা কিনে, সাইজ করে চিরিয়ে রেখেছিলেন এবং এ-বছর শীতকালে অর্থাৎ আর মাত্র দশ-বার দিন পরই ছুতোর লাগবার কথাও ছিল। কিন্তু এ-হেন সময় মানিকবাবু পরম নির্বিকার চিত্তে তাঁর 'ভস্মভস্ম' ক্রিয়ায় সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেললেন—অর্থাৎ, যোগেনবাবুর তিন-তিন হাজার টাকা এই বাজারে বে-মালুম পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। 'অগ্নির পূর্ব লক্ষণ' অবশেষে 'ভস্মেই পর্যবসিত' হোল—কিমাশ্চর্যমতঃপরম!

আজও সন্ধ্যের সময় মানিকবাবু বড়-ছোট নানা আকারের কতকগুলো সেগুণ কাঠের সাইজ করা কাটা টুকরো গুদোম ঘরটার ভাঙা দরজা দিয়ে বার করে নিয়ে এসে উনোনের পাশে স্তূপাকার করে রাখলেন। তোলা-উনোনে ঠিক সুবিধে হচ্ছিল না বলে, মানিকবাবু গত পরশু উঠোনে গর্ত করে বেশ বড় দেখে একটা কাঠের উনোন তৈরী করেছিলেন—এখন সেইটেতে কাঠগুলো সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে কালো ধোঁয়ার ঊর্ধ্বমুখী স্রোত অন্য দিনের মত আজও হেমবাবুর দোতলাকে গ্রাস করবার জন্য শত-সহস্র শাখা-প্রশাখা মেলে ওপরের দিকে ঠেলে উঠলো।

হেমবাবু আজ আগে থেকেই তৈরী ছিলেন; অর্থাৎ বড় এক বালতি জলে এক চাপড় বরফ গুলে বারান্ডার এক ধারে রেখে সুযোগের অপেক্ষা মাত্র করছিলেন এবং চোখের সামনে যোগেনবাবুর সাধের সেগুণ কাঠের শ্রাদ্ধ কীভাবে হচ্ছে, সেটাও লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ হেমবাবু সেই এক-বালতি বরফ-গোলা হিম-শীতল জল হেমন্তের ঠান্ডা সন্ধ্যের সময় মানিকবাবুর মাথার ওপর দোতলার বারান্ডার ওপর থেকে হুড়-হুড় করে সবটা ঢেলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক বালতি জল উনোনেরও ওপর ঢেলে দিলেন।

আচমকা বরফ-গোলা ঠান্ডা জল ঝপাৎ করে মাথায় পড়তেই, মানিকবাবু দুবার খাবি খেয়ে লাফিয়ে উঠে আর্তনাদ করে উঠলেন—'কে কে—আরে, আরে—একি, একি—ইস্। একেবারে জলে চান করিয়ে দিলে যে এ-হে-হে! ও, আপনি? এটা কি হোলো হেমবাবু?'

হেমবাবু ওপরের বারাদা থেকে মুচকি হেসে বললেন—'বিশেষ কিছুই নয়; আপনার ধোঁয়া যদি ঊর্ধ্বমুখী হয়, আমার জলটাও ত আবার নিম্নগামী হবে কি না—কি বলেন চাটুজ্যেমশাই?'

মানিকবাবু একেবারে চান করে গিয়ে-ছিলেন; রাগে, দুরবস্থায় ও অপমানের গ্লানিতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'কি বললেন? বটে, ঘুঘু দেখেছেন, ঘুঘুর ফাঁদ দেখেন নি? আচ্ছা, এর শোধ আমিও নেবো, তবে আমার নাম মানিক চাটুজ্যে! ওরে হেরো (পুত্র—হারাধন), বাঁশটা দিয়ে যা তো।"—বলে শূন্যে দুবার হস্ত আস্ফালন করে বংশদন্ডের অভাবে, সামনের সদ্য-নির্বাপিত আধ-পোড়া হাত-দুয়েক লম্বা সেগুণ-দন্ড কাঁধে করে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাইরে রাস্তার দিকে ছুটলেন এবং একটু পরেই সদর-দরজার কাছে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল জায়গায় ধপাস্ করে একটা আওয়াজ হোলো এবং একটা পোড়া চালা কাঠ রাস্তার ওপর ছিটকে এসে পড়লো।

এদিকে হেমবাবু ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে, নীচের সিঁড়ির দরজাটা তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি খিল দিয়ে এলেন এবং আধ-ঘন্টা চুপ-চাপ থাকার পর, জামা-কাপড় পরে যোগেনবাবুর তেলকলের উদ্দেশে সাবধানে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় নেমে একবার এদিক-ওদিক সন্তর্পণে চেয়েও নিলেন; সন্দেহজনক অবশ্য কাউকে দেখতে পেলেন না, তবে মানিকবাবুর সদর-দরজার সামনেকার ফুটপাথের ওপর একটা আধ-পোড়া সেগুন কাঠ পড়ে থাকতে দেখলেন। হেমবাবু মানিকবাবুর দরজা বন্ধ দেখে ধাঁ করে পোড়া কাঠটা তুলে চাদরের তলায় ঢেকে নিলেন এবং সামনের লন্ড্রী থেকে এক ফালি খবরের কাগজ চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে মুড়ে ফেললেন।

* * * *

যোগেনবাবু হেমবাবুকে একটু দ্রুতপদে প্রবেশ করতে দেখেই বেশ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি সমাচার বলুন হেমবাবু, সব মঙ্গল তো?'

যোগেনবাবু আশা করেছিলেন, ইদানিং মানিকবাবুর ক্রিয়া-কর্মের চাপে আজ হয়ত হেমবাবু অতিষ্ঠ হোয়ে, বাড়ী এই মুহূর্তে ছাড়ুন আর না ছাড়ুন, অন্ততঃ মানিক-বাবুর মত একটা নোটিশ দিয়ে যাবেন এ-মাসের শেষ নাগাদ তাল-বেতাল-একজন হয়ত তাঁর ঘাড় থেকে খসবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়া অন্য রকম। হেমবাবু মঙ্গল-সমাচার বিব করতে গিয়ে প্রথমেই বললেন কি করে ম তিনি মানিকবাবুকে পর্যুদস্ত করেছেন কিভাবে জল ঢেলে তাঁর ক্রিয়া-কলাপ পন্ড করে এমন নাস্তানাবুদ করেছেন কিছুদিনের মধ্যেই বাছাধনকে পাগল হো অন্যত্র রাস্তা দেখতে হবে।

এ-সব সত্ত্বেও যোগেনবাবু সম্পূর্ণভাবে আনন্দিত হোতে পারলেন বা, আশান্বিতও খুব হোলেন না। কা মনের কোণে আজ তিন দিন ধরে খট্‌কা লেগেছে সেটা আরও যেন পাকিয়ে উঠতে লাগলো—সমস্যার সমাধ যেন ক্রমেই সুদূরপরাহত হোয়ে উঠ অর্থাৎ যাদের সমূলে উৎপাটিত হও দরকার ছিল, তারা কেমন করে উল্টে-পা ঝড়-ঝঞ্ঝাকেই আশ্রয় করে দিব্বি শে গেড়ে চলেছে—আর যার থাকার কথা, তা মূলোৎপাটনের যেন আশঙ্কা দেখা দিয়ে এই সন্দেহের নিরসনও আজ সঙ্গে স হোয়ে গেল যখন হেমবাবু কাগজের মো খুলে একটা আধ-পোড়া সেগুন ক যোগেনবাবুর সামনে রেখে তাঁর মঙ্গল সমাচারের দ্বিতীয় পর্বে জানালেন কে করে তাঁর তিন-তিন হাজার টাকা মূ সিজনড করা সেগুন কাঠ মানিকব সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছেন এ একটা টুকরোও আর বাকী রাখে তাঁর নতুন বাড়ীর দরজা-জানালা করবা জন্য অথবা আগামী মাঘ মাসে মেয়ে বিয়ের দানের আসবাব তৈরীর জন্য।

মঙ্গলাচরণ শুনতে শুনতে হঠ যোগেনবাবুর বাঁ-হাত থেকে নলচেটা খ গিয়ে পাশের পিক্‌দানীর নিষ্ঠীব আকন্ঠ ডুবে গেল এবং ডান হাত থে কলমটাও খসে খাতার ওপর দিয়ে গড়ি গিয়ে নীচে মেঝেয় পড়ে তাঁর নিজে কাষ্ঠ-পাদুকায় নিবু গিঁথে শীর্ষাস হোয়ে রইলো।

যোগেনবাবু হার্ট-ফেল করলেন না বটে কিন্তু বুকের ওপর একটা হাত রেখে প্রচন্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সখেদে হাহুতা করে উঠলেন—"হায়-হায়-হায়-হায়, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল! সব জ্বলে পুড়ে ছাই হোয়ে গেল! বাড়ীটাও আমার ড্যামেজ হোলো! ও-হো-হো-হো, বুকে বড্ড ব্যথা! আঁ, শেষকালে বুমেরাং! উঃ, বোধ হয় জ্বর আসছে। হেমবাবু, শরীরটা আজ বড্ড খারাপ, আজকের মত আসুন তাহলে—ও-হো-হো! উঃ-হুঃ হুঃ!" বলে যোগেনবাবু নিজেই উঠে পড়লেন এবং বাড়ীর অন্দরমহলে প্রস্থান করলেন।

নাইট ইন লন্ডন/মালা সিনহা ও বিশ্ব

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

গৌরী (হিন্দী) : শিবাজী ফিল্মস্ (প্রা) লিমিটেড-এর নিবেদন; ৪,৭৩৭·০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৯ রীলে সম্পূর্ণ; **প্রযোজনা :** শিবাজী গণেশন; **পরিচালনা :** এ. ভীম সিং; **চিত্রনাট্য :** এ. ভীম সিং ও নানু চন্দ্র; **সংলাপ ও গীতরচনা :** রাজেন্দ্র-কৃষ্ণ; **সঙ্গীতপরিচালনা :** রবি; **চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা :** কে. এস. প্রসাদ; **চিত্রগ্রহণ :** আর. রাজন; **সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা :** মীনু কাত্রাক; **শিল্পনির্দেশনা :** সুধেন্দু রায়; **সম্পাদনা :** এ পল ডোরাই-সিঙ্গম্; **নৃত্যপরিচালনা :** চিন্নী সম্পৎ; **নেপথ্যকণ্ঠসঙ্গীত :** লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও মোহাম্মেদ রফী; **রূপায়ণ :** সুনীল দত্ত, সঞ্জীবকুমার, রাজেন্দ্রনাথ, প্রেম-প্রকাশ, অসীমকুমার, শিবরাজ, উমেশ শর্মা, নূতন, মমতাজ, লীলা মিশ্র, উর্মিলা, লক্ষ্মীছায়া প্রভৃতি। জগৎ এণ্টারপ্রাইজ-এর পরিবেশনায় শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর প্যারাডাইস, প্রভাত, দর্পণা, মেনকা, লোটাস, প্যারামাউণ্ট এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

বিবাহের আগে পর্যন্ত বাপ-মার সেবা করবে এবং বিবাহের পরে হবে 'স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান', আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে স্বামীর দাসী হবে—এই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের আগে পর্যন্ত ভারতীয় নারীর আদর্শ। এবং এই আদর্শকেই তুলে ধরেছে দক্ষিণ ভারতের সুখ্যাত অভিনেতা শিবাজী গণেশান্ প্রযোজিত নতুন ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত চিত্র "গৌরী"। ছবির নায়িকা গৌরীর যখন বিবাহ হয়, তখন সে ছিল অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। স্ত্রী অন্ধ, বিবাহরাত্রে এই কথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জীব ক্ষোভে, দুঃখে, উত্তেজিত অবস্থায় বিবাহসভা ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু বন্ধু সুনীলের যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে সে আবার সেই অন্ধ স্ত্রী গৌরীকেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়। এদিকে আধুনিক অস্ত্রোপচারের ফলে গৌরী যখন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেয়েছে, তখন ওদিকে সঞ্জীব দৈবক্রমে জলপ্রপাতের তীব্র স্রোতে ভেসে চলে যায়। সঞ্জীবের মামা মণিরামের দ্বারা গৌরীকে আকস্মিক মানসিক আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে সুনীল গৌরীর প্রথম দৃষ্টির সামনে সঞ্জীবের পরিচয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবার জন্যে সে গৌরী থেকে নিজেকে দূরেই রাখে মিথ্যা অজুহাতে। কিন্তু বেশ কিছুদিন কাটবার পরে একদিন আসল সঞ্জীব এসে হাজির

গৌরী প্রথমে তাকে সুনীল বলে ও পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানতে থন আদর্শ ভারতললনা গৌরীর াধান হল কি করে, তাই নিয়েই ংশ রচিত হয়েছে।

ও চক্ষুষ্মতী—উভয় গৌরীরূপেই াভিনয় করেছেন। চরিত্রটির ব্যথা, নন্দ, ভয়, সকল প্রকার ভাবই চ্ছন্দে প্রকাশিত করেছেন। কলেজ ছাত্রী গীতাবেশে মমতাজ জেই দর্শকদের আনন্দ দিতে সুনীল ও সঞ্জীব—দুই বন্ধুর াথাক্রমে সুনীল দত্ত ও সঞ্জীব বতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁদের ; অভিনয় করেছেন। অর্থগৃধ্নু শ ওমপ্রকাশ এবং তাঁর ম্যানেজার ূপে রাজেন্দ্রনাথ ছবির হাল্কো ভরাট রেখেছেন। গৌরীর াসন্তী, মণিরামের কন্যা ধনমন্তী, মা প্রভৃতি অন্যান্য ভূমিকাও ীত।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের ংসনীয়। বহির্দৃশ্য, বিশেষ করে ; সমেত শিকারের দৃশ্যটি বেশ সঙ্গে গৃহীত। চক্ষুর ওপর রের দৃশ্যটিও অত্যন্ত বাস্তব। থানি গানই সুগীত।

জী গণেশান্ প্রযোজিত "গৌরী" নারীর সনাতন আদর্শকে সাফল্যের পায়িত করেছে।

ন (মালয়ালাম): কানমানি ফিল্মস-বদন; প্রদর্শনী সময় : দু'ঘণ্টা মিনিট; প্রযোজনা : এসা ইসমাইল পরিচালনা : রামু কারিয়াত; : এস এল পুরম্ সদানন্দন; পরিচালনা : সলিল চৌধুরী; া : বায়ালার রামবর্মার; চিত্রগ্রহণ-না : মার্কাস বার্টলে; শব্দানুলেখন গোপাল; সম্পাদনা : হৃষীকেশ ধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : মান্না জেসু দাস, পি লীলা, উদয়ভানু, প্রভৃতি; রূপায়ণ : শীলা, আদুর লতা, রাজকুমারী, মধু, সত্যান্, নায়ার প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গ বন্যা-দের সাহায্যকল্পে বেঙ্গল ফিল্ম াস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ১৭ ়, রবিবার সকাল ১০৷৷টায় জ্যোতি য় প্রদর্শিত।

১৬৫ সালে ভারতে প্রস্তুত সকল াচিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত রাষ্ট্রপতি সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত এই ন মালয়ালাম ভাষায় রচিত। সেই একটি মাত্রও সংলাপ বোধগম্য না এই ইস্টম্যানকলার-রঞ্জিত ছবিখানি না দেখলে ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের সুন্দর শিল্পসৃষ্টির পরিচয়লাভে ঞ্চত হতুম, এ-কথা অনস্বীকার্য। ার সমুদ্রোপকূলবর্তী ধীবর-সমাজে ও মুসলমান, দুই ধর্মাবলম্বী য়রই বাস। প্রেম যেমন জাতি মানে তমনই ধর্মের গণ্ডীকেও স্বীকার করে না। কিন্তু অপরদিকে মানুষের মনে সংস্কারের কঠিন নিগড় আছে চাপানো। তাই হিন্দু চেম্বনকুঞ্জের মেয়ে কুরুথাম্মা সহৃদয় মুসলমান যুবক পরীকুট্টিকে মনে মনে ভালোবেসেও পাল্লানিকে বিবাহ করে সুখী দাম্পত্য-জীবনযাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। ওদের সমাজে সংস্কার বলে, স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হলে স্বামীর অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য। ওদের জীবনেও তাই হল। যে-রাত্রে পাল্লানি একা সমুদ্রবক্ষে মৎস্যশিকারে বহির্গত হল, সেই রাত্রেই দৈবের ছলনায় কুরুথাম্মার কাছে এসে হাজির হল পরীকুট্টি এবং যখন লোক-নিন্দার জ্বালায় জর্জরিত কুরুথাম্মা তার দীর্ঘদিনের সংযমের বাঁধনকে ভেঙে পরী-কুট্টির কাছে ধরা দিল, ঠিক তখনই পাল্লানির নৌকা তাকে নিয়ে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করল। লোকে দেখল, কুরুথাম্মা ও পরীকুট্টির মৃতদেহ পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে সমুদ্রতীরে পড়ে আছে।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' নামের গল্প অবলম্বনে ঐ একই নামের ছবিটা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীর পরিচালনায় প্রায় শেষ। গিরিবালা ও বিধুভূষণের সুন্দর প্রেমকাহিনী পরিচালিকা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে সেলুলয়েডে আঁকছেন। কাপুর প্রোডাকসন্সের পতাকা তলে এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রই নতুন মুখ নিয়ে করছেন। অবশ্য নায়ক স্বরূপ দত্ত নতুন ঠিক নয়, কোন ছবি না বেরোলেও ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচখানা ছবিতে কাজ পেয়েছেন। নায়িকা ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরী এখনও স্কুলের ছাত্রী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বঙ্কিম ঘোষ, অজিত গাঙ্গুলী, শমিত ভঞ্জ ও অন্যান্যরা। এ ছবির সংগীত পরিচালকও শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী নিজে।

বম্বের জনপ্রিয় নায়িকা তনুজা বাংলা ভাষা বেশ সুন্দরভাবেই আয়ত্ত করে ফেলে-

ছেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলেন বেশ। এ দেশের নায়িকা হিসাবে বক্স অফিসে উনি তো বেশ প্রতিষ্ঠাই পেয়েছেন। তনুজা এখন বাংলায় যে তিনটে ছবির কাজ করছেন তার নাম 'তিন ভুবনের পারে' (সতীর্থ প্রোডাকসন), 'প্রথম কদম ফুল' (ইকন্স ফিল্ম), 'পিতাপুত্র' (চিত্রযুগ)। এর মধ্যে 'পিতাপুত্র'র ওঁর বিপরীতে আছেন স্বরূপ দত্ত আর বাকি দুটোতেই নায়ক সৌমিত্র চ্যাটার্জি। 'তিন ভুবনের পারে'র অন্যান্য চরিত্রে আছেন তরুণকুমার, রবি ঘোষ, যমুনা সিংহ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র। এ ছবিতে সুর সৃষ্টি করেছেন সুধীন দাসগুপ্ত।

গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মত হিন্দী ছবির সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক কাহিনী, এক উদ্দেশ্য—অথচ শুধুমাত্র নাম আর ধামের ফারাকে বাজারে কি সুন্দর বিকিয়ে যাচ্ছে। মেহমুদ ও এ ভীম সিং-এর যুগ্ম প্রযোজনায় যে ছবিটি শিগ্গির এ শহরে আসছে সেটি হল 'সাধু আউর শয়তান'। কাহিনী যাই হোক, নায়ক নায়িকা যেই হোক না কেন শেষ অবধি

সাধু ও শয়তান/ভারতী ও মেহমুদ

শয়তানের পরাজয় আর সাধুর সাধুবাদ করতে করতে নায়ক নায়িকা কোমরে হাত দিয়ে চলবে সত্যের উদ্দেশে সূর্যের দিকে। এ ছবির পরিচালকও এ ভীম সিং। শয়তান ও সাধু এ দুটো চরিত্রে আছেন প্রাণ ও ওমপ্রকাশ। রাজেন্দ্র কৃষ্ণনের লেখা গানে সুর দিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল. দাগা পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষিত কলকাতায়।

বর্তমান যুব সমাজের এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন তপন সিংহ 'আপন জন'এ। আজকের রাজনৈতিক আবহাওয়া, নৈতিক অবক্ষয় কিভাবে যুব সমাজকে প্রভাবিত করছে, তারাই বা কি চোখে এ সমাজকে দেখে তাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততায় সংগে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন শ্রীসিংহ এ ছবিতে। এক বৃদ্ধার পারসপেক্টিভে আজকের সমাজকে দেখাতে গিয়ে পরিচালককে কাহিনীকার ইন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পটা থেকে অনেক বেশী এগিয়ে ও পিছিয়ে যেতে হয়েছে। তপনবাবুর এ ছবি নিঃসন্দেহে তাঁর শিল্পী-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হবে। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন স্বরূপ দত্ত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনাথ চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, ব্যোমি চৌধুরী, যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

পূর্ণেন্দু প্রোডাকসনের নতুন ছবি 'বৌদি' এ সপ্তাহে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। ঠাকুরপোর জন্য বৌদির সকরুণ আত্মত্যাগের কাহিনী এ ছবিতে বিধৃত। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দিলীপ বসু, প্রধান নারী চরিত্রে আছেন সন্ধ্যারাণী। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন কালী ব্যানার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, লিলি চক্রবর্তী, অনুপকুমার, মাঃ শংকর ও অন্যান্যরা, গানগুলোতে সুরারোপ করেছেন রবী চ্যাটার্জি।

সাংবাদিক খাজা আহম্মদ আব্বাস বোধ একমাত্র পরিচালক যিনি চিরাচরিত স্রোতে গা না ভাসিয়ে এখনো পর্যন্ত স্বকীয়তা বজায় রেখে ছবি তৈরী করে চলেছেন স্বভাবতঃই সংখ্যাও কম। সংখ্যা কম হো তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু 'ছবি' যেন হয় ওঁর 'নয়া সংসার' থেকে শুরু করে 'শেহ আউর স্বপ্না' পর্যন্ত সব ছবিতেই এক বিশেষত্ব ছিল এই যে কোথাও তিনি তা রুচিকে বিকৃত করে দর্শকদের কাছে খাঁ হন নি। ওঁর নতুন ছবি 'বোম্বাই রাত বাঁহো মে' তার বৈশিষ্ট্যই বজায় রেখেছে ব অনুমান। এক নিষ্ঠাবান সাংবাদিক আ তার পাশাপাশি এক দুশ্চরিত্রের কাহিনীে খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। ওঁর ছবিতে শিল্পী বা কলাকুশলীদের মধ্যে তথ কথিত খ্যাতনামা খুব কমই আছেন। ছবিতে গান লিখেছেন জালাল আগা ও হাস কামাল, সুর দিয়েছেন জেপী কৌশি সম্পাদনা করেছেন মোহন রাঠোর, শিল্প নির্দেশনায় আছেন আচারেকার, ও বিভি চরিত্রে রূপারোপ করেছেন বিমল আহমে মাধবী, ডেভিড, রবিকান্ত, হুগল,, আত্তহ সিরাজ, ইউনিস পারভেজ, নাজির কাশ্মির সুরিন্দর কৌশিক, মধুকর, ইরশ পানজাতন্। খাজা আহমদ আব্বাস নি ছবির প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকা চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ লেখক।

ভনয়

॥ শীশমহলে 'দ্বিধা'

দেশে নাটকের নবচিন্তা ও দেশ বিভাগের পর প্রবলভাবে শহরে ার তার সবটুকুই কোলকাতাকে প্রতি হাওড়ার একটি পেশাদার বাধন হয়েছে নাট্যকার বিধায়ক নাটক নিয়ে। একদা—বতসরে ১৯৩০ দশকে হাওড়া-শালকিয়ায় নামে একটি সাধারণ রঙ্গালয় হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর তার অকালমৃত্যু ঘটে। এতদিন হাওড়ায় কোন মঞ্চ ছিল না, অথচ কোলকাতার কেও কয়েক লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত টি উপেক্ষিত ছিল। নবনির্মিত নাট্যমঞ্চটি হাওড়ার নাট্যরসিক- দীর্ঘদিনের এই অভাবটি পূরণে সেছে সেজন্য এর উদ্যোক্তারা ।

মহল' নাট্যমঞ্চের প্রথম উপহার ভট্টাচার্যের 'দ্বিধা'। বিধায়কবাবু নাট্যকার, তাঁর নাটকে চমক এবং নতুনত্ব সবসময়ই বর্তমান থাকে। ধার বক্তব্যে নতুনত্ব নেই—চমক নাটকের উপস্থাপনার মধ্যেই এই কটি ভুল টেলিফোন সংযোগের এই 'দ্বিধা' নাটকের গল্পের এবং নায়িকার যন্ত্রণাময় দ্বিধা টকের সমাপ্তি।

কের প্রধান গুণ একটি সেটেই দৃশ্যের উপস্থাপনা। এর মধ্যে ত্বর স্পর্শ বর্তমান। অন্য গ্য দিক হোল, এই নাটকের অভি- নায়িকা নীতার ভূমিকায় তৃপ্তি অভিনয় অসাধারণ। বহুদিন অভিনয় দেখা যায়নি। নাট- ষের দিকের মুহূর্তগুলি শ্রীমতী অভিনয়গুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। াগরের চরিত্রে অসীমকুমার আমা- ক দিয়েছেন। অসীমকুমার তাঁর অভি- তার পরিচয় পূর্ণভাবে উপস্থিত আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা করে দিয়েছেন। স্বল্প অসিতবরণ মনে দাগ রেখে তরুণকুমারের অভিনয় সচরা- দেখা যায় তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর । বেশ সুন্দর। সীতা পারেখ বেশে দাশগুপ্ত দর্শকের মনকে বেদনার্ত তোলেন। চাকরের ভূমিকায় বন্দ্যোপাধ্যায়, সেবার ভূমিকায় বন্দনা র্যর অভিনয় এবং অন্যান্য অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

াটকের প্রথমদিকে অযথা সময়ক্ষেপ ফলে নাট্যমুহূর্ত জমে ওঠেনি। সুরেশ দত্তের মঞ্চ-সজ্জার প্রশংসা করতে হয়। সবকিছু মিশিয়ে 'দ্বিধা' আমাদের চমকিত করেছে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

●

৩০ সেপ্টেম্বর রঙমহল রঙ্গমঞ্চে ঋতায়ন নাট্যসংস্থা মনোজ মিত্র রচিত ও নির্দেশিত "নেকড়ে" নাটকটিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। নাটকটি অবশ্যই ইঙ্গিতধর্মী। আজকের সমাজে মানুষের শান্তিকে যারা অতর্কিতে বিঘ্নিত করছে, অন্ধকারের সুড়ঙ্গপথে চলে যারা অতর্কিতে আনছে বিভীষিকা, সেই সর্বনাশাদেরই চিহ্নিত করা হয়েছে 'নেকড়ে' রূপে। কিন্তু ইঙ্গিতের যে বলিষ্ঠতা থাকলে নাটক রচনা হিসেবে সার্থকতা লাভ করে, তার একান্ত অভাব থেকে গেছে নাটকখানিতে। তাই নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে সার্থকভাবে দর্শকচিত্তকে নাড়া দিতে পারেনি। অভিনয়ে কিন্তু শিল্পীদের ঐকান্তিকতা লক্ষণীয়। ওরই মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মমতা চট্টো- পাধ্যায় (সুখী), চিত্রিতা মণ্ডল (নীহারি), শান্তা সেনগুপ্ত (কালো বৌ), মনোজ মিত্র (হুক্কা), অধিপ বিশ্বাস (কংসারি ঠাকুর), অশোক চক্রবর্তী (যগো), দুলাল ঘোষ (শশাঙ্ক) প্রভৃতি। পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত আবহ-সঙ্গীত এবং আলোকনিয়ন্ত্রণ

আপনজন / কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, শমিত ভঞ্জ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়

গুপী গাইন ও বাঘা বাইন-এর দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে পরিচালক সত্যজিৎ রায় পূর্ণেন্দু বসু, ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় ও অনিল ঘোষ। ফটো : অমৃত

নাট্য কৌতূহল বর্ধিত করতে সাহায্য করেছে।

সম্প্রতি কল্যাণীতে স্পিনিং মিলের কোয়াটার্র কর্মীগণের উদ্যোগে 'কেদার রায়' নাটক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। স্পিনিং মিলে অফিসার, কর্মী ও কোয়ার্টারের অধিবাসী মহিলারা সোৎসাহে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকগণ মুগ্ধ হন এবং প্রতিটি চরিত্রই সু-অভিনীত হয়। নাটকটির অভিনয় সাফল্যের জন্য প্রযোজক শ্রীবি কে সাহা, শ্রীমতী এবং পরিচালক শ্রীশরদিন্দু সেন প্রভৃতি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

প্রতিবারের মত এবারও লক্ষ্ণৌয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা আসছে ১৪ই ডিসেম্বর থেকে সুরু হবে। ভারতের যে কোন নাট্য-দলই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা—২০ শিবাজী মার্গ লক্ষ্ণৌ।

পলতার 'প্রতিরূপ' সংস্থা এবারেও নাট্য প্রতিযোগিতার বিরাট আয়োজন করেছে। এ'দের পঞ্চম বার্ষিক একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে।

উত্তর কলকাতার নাট্যসংস্থা 'নক্ষত্র' 'বৃষ্টি! বৃষ্টি!' নামে একটি নতুন রীতির নাটক প্রয়োজনায় ব্যস্ত। ১০ নভেম্বর সকাল দশটায় 'বিশ্বরূপায়' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হল। প্রচন্ড খরার দিনে বাংলা দেশের কোন এক অঞ্চলে এক যাদুকর

উপায়ে বৃষ্টি এনে দেবার
ঘণা করায় যে প্রচণ্ড
ষ্টি হয়, উক্ত নাটকটি অসা-
ীয়তায় সেই কেন্দ্রবিন্দুতেই অব-
ভন্ন চরিত্র ও কথাকৌশলের
য়ত্বে আছেন নক্ষত্রের শিল্পী-
ট্যকার অসিত দে ও প্রয়োগ প্রধান
র।

টা আর্ট থিয়েটার আসছে
থেকে মুক্তাঙ্গন মঞ্চে নিয়মিত-
কসিম গর্কি অনুপ্রাণিত পার্থ
য়ের 'সূর্য-চেতনা' নাটকটি পরি-
বে। নাটকটি সোভিয়েত শিল্পী-
বন-সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে

সেপ্টেম্বর গোল্ডউইন অর্কেস্ট্রার
উৎসবে সদস্যরা লক্ষ্মীভবনে
একাঙ্ক নাটকটি অভিনয়
নাটকটি দিলীপ বসাকের রচনা।
মধ্যবিত্ত পরিবারের এক দিনের
ই নাটকের উপজীব্য। মধ্যবিত্ত
দৈনন্দিন আনন্দ, বেদনা, ক্ষোভ,
ই বিয়োগান্ত একাঙ্কিকার মধ্যে
য়ে উঠেছে। সামগ্রিক অভিনয়
নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়ে
টকটি পরিচালনা করেন শ্রীসুভাষ
শ গ্রহণ করেন—সুনির্মল দত্ত,
সিং, দ্বিজেশ ভট্টাচার্য, দিলীপ
সুভাষ দাস, দীপক বসুমল্লিক,
ত ও অপূর্ব বিশ্বাস।

ও প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে
নাট্য-সংস্থা 'বহুরঙ্গ' নিবেদন
টক 'অবশেষে'। নাট্যকার শ্রীসুধীর

নায় বহুরঙ্গের শিল্পীবৃন্দের দল-
ন্টা প্রশংসনীয়। তবে যাঁদের
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ রায়,
বাগচী, হরিপ্রসাদ দাস, নির্মলেশ
জ্যোতির ঘোষ ও ধর্মব্রত
। স্ত্রী চরিত্র রূপদানে সুধা
ধ্যায় ও সুতপা ভট্টাচার্যের
যথোচিত। অন্যান্য চরিত্রে দিলীপ
, রহ্মপদ মুখার্জীর অভিনয়
চাহিদা সুন্দরভাবে মিটিয়েছে।

। পরিচালনা ও সঙ্গীত নির্দে-
ছিলেন সুধীরকুমার সরকার।
অনেকস্থানেই নাট্য-মুহূর্ত গড়ে
নাট্য-পরিচালক যে সূক্ষ্ম শিল্প-
পরিচয় দেন তার জন্য শ্রীসরকার
র্হ।

রপুরের 'সংগঠনী' সংস্থা 'চম্বল
একাংক নাটক' প্রতিযোগিতার
ন করেছেন। যে কোন নাট্যসংস্থাই
তযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে
যোগদানের শেষ তারিখ ২৫শে
। ঠিকানা : 'সংগঠনী', উদয়পুর,
কাশিঃ-৪৯।

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে ডিরেক্টরেট অফ ড্রাগস্ কনট্রোল এমপ্লয়ীজ্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন ড্রাগ্-কন্ট্রোলার ডঃ বিভূতিভূষণ সরকার।

বিবিধ সংবাদ

পাণ্ড-এর সদস্যবৃন্দ গত ১০ নভেম্বর রাজ্যপালের সাহায্য তহবিলের জন্য একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন রবীন্দ্র-সদনে। প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যপাল ধর্মবীর ভাষণ দেন। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়, প্রযোজক নেপাল দত্ত, এস এন রায়, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কে জি সেনগুপ্ত, পি কে সেন এবং আরো কয়েকজন। অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে পাণ্ডের সভানেত্রী পূর্ণিমা দত্ত এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেন। রাজ্যপাল ধর্মবীর তাঁর ভাষণে এই মহিলা সংগঠনের সমাজসেবা-মূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি আশা করেন, এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যেরাও সমাজকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হবে। সম্পাদিকা রত্না দত্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এ উপলক্ষে একটি ফ্যাসন-প্যারেড-এর ব্যবস্থা করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পোষাক-আশাকে প্রদর্শনীটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৬ অক্টোবর বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় রবীন্দ্র-ভবনে নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক-গমনে এক শোক সভা হয়। সভায় পৌরো-হিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন এবং শহরের বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার-গণ উপস্থিত হয়ে নটশেখরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং কালিকা নাট্যম্, সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থা নটশেখরের ছবিতে মাল্যদান করেন। সকলেই নটশেখরের বহুমুখী প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করেন।

পুরী-প্রবাসে বাঙ্গালীরা পুরী হোটেলের স্বত্বাধিকারী শ্রীমাখন হালদার শ্রীমতী রাণী হালদারের সৌজন্যে বরাবরের মত এবারও তিন দিনের এক বিজয়া সম্মে-লনের আয়োজন করেন ৯ অক্টোবর পুরী হোটেল প্রাঙ্গণে। স্থানীয় ও বহিরাগত বহুজনের সমাবেশ ঘটে অনুষ্ঠানে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ শ্রীশচীন ভট্টাচার্য রচিত 'কাগজের নৌকা' নাটিকাটি সাফল্যের সহিত অভিনয় করে। প্রতিটি চরিত্রের অভিনেতা কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। নাটিকাটি পরি-

বসুশ্রী সিনেমায় মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত
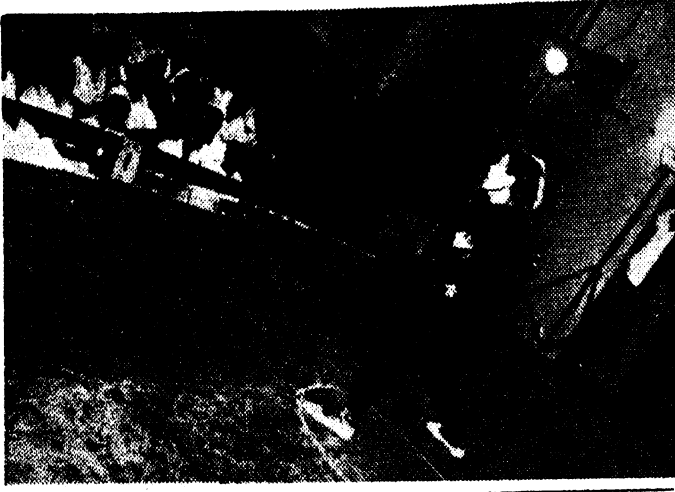
চালনা করেন শ্রীশ্যামল ঘোষ। সুন্দর আলোকসম্পাত শ্রীভ্রমর জেনার কৃতিত্বের নিদর্শন। শ্রীরাজ হালদারের মঞ্চ সজ্জা ভাল।

১০ অক্টোবর 'ঋতু রঙ্গ' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। কুমারী দীপিকা লাহা ও কুমারী মমতা হালদারের বর্ষা ও হেমন্ত নৃত্যে সাবলীল নৃত্যভঙ্গী দর্শকদের মুগ্ধ করে।

১১ তারিখে বকাসুর বধ নৃত্যনাট্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী বাণী হালদারের নৃত্য সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। এই দিন শ্রীমতী রমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপীনাথ বেহারা, মহম্মদ হাফিজউল্লা ও শ্রীমনোজিৎ মিত্রের উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীত, শ্রীকৃপাস নায়কের বাঁশী ও শ্রীদয়ানিধি পট্টনায়কের ক্ল্যারিওনেট বাজানোর অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় হয়।

তিন দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন কুমার হালদার, পরিতোষ ব্যানার্জি সুশীল নাগ, রঞ্জিত সরকার, অজিত সরকার, দিলীপ চক্রবর্তী, কুমারী বাণী হালদার ও শ্রীকৃপাসিন্ধু ত্রিপাঠী।

বাংলার বাইরে মূকাভিনয়ের প্রসার লাভ করেছে, তরুণ মূকাভিনেতা হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় গত ৩ অক্টোবর বোম্বাইয়ের 'কলা-সংগম'-এর এক অনুষ্ঠানে একক মূকাভিনয় দেখান, সেখানকার উপস্থিত দর্শকেরা তার বেকার, কিডস, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা ইত্যাদি ফিচারগুলি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। এর পর শ্রীচট্টোপাধ্যায় 'চেম্বুর, দাদার ও আমেদাবাদে তার মূকাভিন পরিবেশন করেন। বোম্বাইয়ের অনুষ্ঠানের পর বেনারস ও এলাহাবাদের তিনটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর, '৬৮ সকাল ৯টায় বড়িশার পুষ্পশ্রী সিনেমা প্রতিষ্ঠা দিবস বার্ষিকী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে গণসংগীত-নাটক-নাট্য আলোচনা হয়। বর্তমান নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নট ও নাট্যকার শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যে নাটক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে তাহাই যথার্থ গণনাটক হওয়া উচিত।" প্রবীণ চিত্রপরিচালক ও সমালোচক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দর্শক যেন উপস্থিত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সেই দিকেই নাট্যকারদের দৃষ্টি রাখতে হবে।" গণসংগীত পরিবেশন করেন রক্তিম নাট্যসংস্থা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি নাটক 'আনক্রেমড বডি"-র শ্বাবিংশতি রজনী ও শুভ মিত্রের শ্বাসরোধকারী "মার্ডার" নাটকটি অতীব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয়। "আনক্লেমড বডি"-র প্রথম পর্যায়ের শেষ অভিনয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আমন্ত্রিত নাট্যসংস্থা 'পাদপ্রদীপ' "আঁধার রাতে" নাটকটি অভিনয় করে।

১৪ই নভেম্বর বিশ্ব শিশু-দিবস উপলক্ষে কিশোর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরি হলে শিশু-কিশোর-দের একটি মনোজ্ঞ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীতে অংশ গ্রহণ করে ইভা ও রেবা পাল, সবিতা সাহা ও রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা; আবৃত্তিতে মিত্রা মুখোপাধ্যায়, মৃদুল শীল, সজল ভট্টাচার্য, মাধবী গুপ্ত ও স্বাতী ভট্টাচার্য এবং সমষ্টি ব্যায়াম ও ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শন করে সবুজ সাথী সব পেয়েছি আসরের ছেলেরা। 'কিশোরী' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সুধা সেন অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাকস্‌-মূলার ভবনের অধ্যক্ষ ডঃ গর্গ লেষনার।

কদিন আগে ইন্ডিয়ান ম্যাজিক ইনস্টি-টিউটের বাৎসরিক সম্মেলন মহাসমারোহে এবং বিপুল উদ্যমের সঙ্গে উত্তর কলকাতায় 'আগরওয়ালা ভবনে' (অরবিন্দ সরণি, কলকাতা-৫) অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সম্মেলনে বহু প্রবীণ ও নবীন ইন্দ্রজালবিদদের উপস্থিতিতে ভারতের প্রথম মহিলা জাদুকর শ্রীমতী উমা দাশগুপ্তকে 'জাদু-সম্রাজ্ঞী' অভিধায় সম্মানিত করা হয়। কিছুকাল আগে শ্রীমতী দাশগুপ্তকে জাদুকরদের আর একটি সংস্থা 'ইন্ডিয়ান ম্যাজিশিয়ানস ক্লাব' 'জাদু-ভারতী' উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন। শিক্ষিতা অভিজাত নৃত্যকুশলা ও জাদু-প্রদর্শনে অভিজ্ঞতা শ্রীমতী দাশগুপ্ত উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণ সাহায্য ভাণ্ডার ও বিবেকানন্দ শিলা-স্মারক সমিতির অর্থসংগ্রহের জন্যে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় দুটি সাহায্য প্রদর্শনীতে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে শীঘ্রই দর্শকদের অভিবাদন জানাবেন।

'দিশারী' আয়োজিত মধ্য ইস্টার্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলন ৫ই ডিসেম্বর থেকে ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে থাকবে শ্রীকাশীনাথ, অমিতাভ মজুমদার, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের মূকাভিনয়, "নটতীর্থম"-এর "আমি থামবো না" নাটক, ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূরবী ঘোষ, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, রজত ভট্টাচার্য, সৌরেন পাল, স্বপন রায় ও দীপক মজুমদারের রবীন্দ্রসংগীত এবং উচ্চাঙ্গ সংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যে অংশ নেবেন মালবিকা কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কানন, মুনাব্বর আলি খান, গৌতম রায়, রামচন্দ্র পাল, অজয়া রায়চৌধুরী, নীলিমা মজুমদার, জি এন গোস্বামী, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, মেরীলু বেনেডিক্ট, বলাই দত্ত, দবীর খান, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, ভি বালসারা, রবিন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন ঘোষ, সন্দীপ দেব, বন্দনা সেন ও মায়া চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সম্প্রতি কলকাতার অন্যতম সুখ্যাত নাট্যসংস্থা 'শিল্পী-মহল'-এর উদ্যোগে ও বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং তরুণ নাট্যকার লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পৌরহিত্যে সংস্থার নিজস্ব প্রাঙ্গণে এক নিরাড়ম্বর অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে "সৌখীন মঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি" উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে মঞ্চ এবং নাটক সম্পর্কে নানান বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দান করেন।

থিয়েটার ইউনিট নাট্য সম্প্রদায় আর একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করছেন। নাটকটি মৌলিক। এটির বিষয়বস্তু বাংলা দেশের কৃষক-জীবন। নাটকটির প্রথম অভিনয় হবে ২২শে নভেম্বর, শুক্রবার মিনার্ভা মঞ্চে। নাটকটির রচনা ও পরিচালনায় আছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জায় ও আলোকসম্পাতে আছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীখালেদ চৌধুরী ও শ্রীতাপস সেন। একটি গায়কের ভূমিকায় থাকবেন আই-পি-টি-এ খ্যাতনামা গায়ক মন্টু ঘোষ।

ল ৬টায় রেডিও খ্লেলে ঘন্টাধ্বনির পরে ঘোষক কিম্বা কণ্ঠে শোনা যাবে—"বন্দেমাতরম"। তারপর গ্র্যামোফোন ন্দমাতরম গানটি বাজবে। গানের পর ঘোষক কিম্বা লবেন, "আকাশবাণী, কলকাতা—আজ ১৭ই কার্তিক াব্দ, ইংরেজী ৮ই নভেম্বর ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ।"

নভেম্বর তারিখের অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে এই ার বিষয়ে শ্রীমতী গীতা কর্মকারের একটি চিঠি য়েছে। শ্রীমতী গীতা কর্মকার লিখেছেন, "...আমার না ধরুন আগামী সোমবার সকালে আপনার দরবারে ইসেব মতো দিনটা সোমবার ১১ই কার্তিক ১৩৭৫, ৮শে অক্টোবর ১৯৬৮। কিন্তু কলকাতা বেতার কেন্দ্র ত পাবেন—আজ সোমবার ৬ই কার্তিক ইত্যাদি। । চাইতে বিশ্রী কি মনে হয় জানেন, বাংলা নববর্ষের ত উঠেই যখন শুনতে পাই আজ রবিবার ২৫শে চৈত্র গুরুর জন্ম-প্রভাতের স্মরণীয় দিনটিতে আজ বুধবার । ইত্যাদি, বড়ই বেসুরা মনে হয়।...কলকাতা বেতার এতই সময়ের অভাব যে, ওই শকাব্দ আর খ্রীস্টাব্দের ব্দর দিন তারিখ ঘোষণায় সব সময় নষ্ট হয়ে যায়?... একুশ বছর চলে গেলো স্বাধীনতার পর, বাংলার জন- ন্দ পর্যন্ত কেউ কি শকাব্দের মাস গুনে নববর্ষ বৈশাখ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে?...'বেতারশ্রুতি' বিভাগে র্মভিমতের আশায় রইলাম।"

। রকম অভিমত প্রকাশের আগে শকাব্দের এই পুনঃ- তিহাসটা সংক্ষেপে বিবৃত করা দরকার।

বর্ষ যেমন বহুভাষীর দেশ তেমনি বহুপঞ্জিকার হুপঞ্জিকা যেমন সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত নয় তেমনি এর ৮ও সৃষ্টি হয়। ভারত সরকার তাই পঞ্জিকা সংস্কারের সালের নভেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠন করেন। র প্রচলিত বিভিন্ন পঞ্জিকা পরীক্ষা করে সমগ্র) একটি সঠিক ও একরূপ (ইউনিফর্ম) পঞ্জিকার ন। কমিটিতে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নাদ সাহা।

১৯৫৫ সালে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। া বৈশাখের পরিবর্তে চৈত্র থেকে বর্ষারম্ভ এবং ৩৬৫ বছর ধরে শকাব্দের ভিত্তিতে একটি জাতীয় পঞ্জিকা রিশ করেন। গ্রেগরীয় পঞ্জিকার দিনগুলির সংগে দিনগুলির একটা স্থায়ী ঐক্য আছে—সাধারণ বছরে ড় ২২শে মার্চ, আর অধিবর্ষে অর্থাৎ লীপ ইয়ারে

রাজ্য সরকারগুলির সংগে পরামর্শের পর ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত নেন তার ফলে সরকারী ও সরকারবিষয়ক কাজে গ্রেগরীয় পঞ্জিকার ব্যবহার পূর্ববৎ চলতে থাকে এবং সেই সংগে ১৯৫৭ সালের ২২শে মার্চ থেকে জাতীয় পঞ্জিকার ব্যবহারও শুরু হয়। ভারত সরকারের গেজেট, আকাশবাণীর সংবাদ প্রচার, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ক্যালেণ্ডার এবং জনসাধারণের কারও কাছে ভারত সরকারের লেখা পত্রে গ্রেগরীয় পঞ্জিকার সংগে জাতীয় পঞ্জিকার তারিখও ব্যবহৃত হতে থাকে।

রাজ্য সরকারগুলিকেও ক্রমে ক্রমে গ্রেগরীয় পঞ্জিকার সংগে জাতীয় পঞ্জিকা ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়।

রাজ্য সরকারগুলিও পৃথক পৃথক পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির সভাপতি ছিলেন বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী।

ভারত সরকার আর রাজ্য সরকার যতই কমিটি গঠন করুন আর খ্রীস্টাব্দের সংগে শকাব্দ ব্যবহার করুন, শকাব্দ তেমন কেন, মোটেই আদৃত হয় নি। জনসাধারণ দূরের কথা, সরকারী কর্ম-চারীরা, যাঁরা চিঠিপত্রে আর নোটে সর্বদা শকাব্দের তারিখ লেখেন তাঁরাও ক্যালেণ্ডার না দেখে এর তারিখ লিখতে পারেন বলে মনে হয় না। অবশ্য সেজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, যে বঙ্গাব্দের তারিখ আমাদের পুজো-আচ্চা, পাল-পার্বণ আর বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধে ব্যবহার করা হয় সেই বঙ্গাব্দের খোঁজও আমরা রাখি না। রাখার দরকারও হয় না। আমাদের জীবনে খ্রীস্টাব্দের অনু-প্রবেশ এত ব্যাপক ও গভীর যে, ক্রিয়াকর্মে স্বল্পব্যবহৃত বঙ্গাব্দও হারিয়ে গেছে—সম্পর্কহীন শকাব্দের সেখানে স্থান কোথায়?

তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আজকের দিনে পৃথিবী যখন দূর-নিকট ভেদাভেদ ঘুচিয়ে একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে, সব মাখামাখি মেশামেশি হয়ে গেছে, তখন সারা পৃথিবীতে ব্যবহারিক জীবনে একটি মাত্র অব্দেরই প্রচলন থাকা উচিত, এবং তা বহুলপ্রচলিত খ্রীস্টাব্দই হওয়া উচিত। ধর্মীয় আর ব্যক্তিগত জীবনে ভিন্ন অব্দের সাময়িক ব্যবহারে বিশেষ অসুবিধা না-ও হতে পারে। বাংলা দেশের মতো বিহারের প্রত্যন্ত দেশেও বিয়ে-পৈতে ইত্যাদি ব্যাপারে বঙ্গাব্দেরই ব্যবহার দেখেছি, অথচ অন্য সময় এই অব্দটির খোঁজও কেউ রাখে না। তাতে কোনো অসুবিধাও হয় না।

বাংলাদেশে খ্রীস্টাব্দ আর বঙ্গাব্দ দুটি অব্দের প্রচলন থাকাতে নতুন করে শকাব্দ আর চলবে বলে মনে হয় না, কারণ তার দরকার কেউ অনুভব করে না। সুতরাং এই শকাব্দ চালাবার চেষ্টা বৃথা, বলা যায়। আকাশবাণী থেকে তার ঘোষণাও অর্থহীন। তবু যদি আকাশবাণী থেকে শকাব্দ ঘোষণা অপরিহার্য হয় তবে বঙ্গাব্দও ঘোষণা করা উচিত—হোক না তা পোশাকী অব্দ।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৮ই নভেম্বর রাত ৮টায় প্রচারিত নাটকের নাম ‘মাধবীকঙ্কণ”। কাহিনী—রমেশচন্দ্র দত্ত। বেতার-নাট্যরূপ — মধু গুপ্ত। প্রযোজনা — প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্য রচনা ও প্রযোজনা যে খুব উচ্চ শ্রেণীর তা অবশ্য নয়—তবে এর মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা শ্রোতাদের সারক্ষণ ধরে রেখেছিল, শেষ পর্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে শুনতে বাধ্য করেছিল। সে জিনিসটা যে কী তা বার করতে একটু ভাবতে হয়, এবং একটু পরেই বার করা যায়। সে জিনিস নারীর সেই চিরন্তন অন্তঃসলিলা নিভৃত নিস্তব্ধ ভালোবাসা যে ভালোবাসার জন্য নারী নিজেকে পর্যন্ত শেষ করে দিতে পারে, ধর্মাধর্ম বিচার করে না, বিপদ-আপদ গ্রাহ্য করে না। এই অন্তঃসলিলা ভালোবাসা বিধর্মী এক নারীকে যে কোথায় নিয়ে গেল তা-ই দেখানো হয়েছে এই নাটকে।

জুলেখা ভালোবেসেছিল বন্দী নরেনকে। এই ভালোবাসার জন্য জুলেখার ও নরেনের চরম শাস্তিবিধান করেছিলেন শাহজাহান-কন্যা জাহানারা। কিন্তু জুলেখা তার ভালোবাসার টানে বন্দীশালা থেকে নরেনকে বার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কাল-স্রোতে, অনাগত বিপদের মাঝে। অনেক দুঃখ-কষ্ট জুটল তার কপালে—তবু সে তার দয়িতকে পেল না। এই পৃথিবী তাকে কিছুই দিল না, নিল তার কাছ থেকে অনেক। শেষ পর্যন্ত তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া তার আর উপায় রইল না।

জুলেখার এই নিভৃত ভালোবাসা, তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার এই আত্মক্ষয় সুন্দর ফুটেছিল শ্রীমতী নীলিমা দাসের অভিনয়ে। কোথাও এতটুকু আতিশয্য ছিল না, এতটুকু মন্থরতা না।

মন্থরতা ছিল নাটকে। নাটকের সংলাপে মাঝে মাঝে আড়ষ্টতা ছিল, স্বগতোক্তি বড়ো বেশি ছিল—এবং ক্লান্তি-কর ভাবেই ছিল। মাঝে মাঝে বিস্তার ছিল অনাবশ্যক রকম দীর্ঘ। শেষটা অপ্রয়োজনীয় ভাবে বিলম্বিত। জুলেখার মৃত্যু নাটককে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর অতি দ্রুত নাটকের সমাপ্তি টানা উচিত ছিল। কিন্তু নাট্যকার অনেক বিলম্ব করেছেন।

নাটকে কিছু উচ্চ মানের শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে, বিশেষ করে বন্দী-শালায়—কম কথায়, একক কথায়।

অভিনয়ে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শিল্পী শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়। নরেনের চরিত্রে রূপ-দান করেছিলেন তিনি। চরিত্রটি তিনি ফুটিয়েছিলেন ভালো। কিন্তু নবকুমারের ভূমিকায় শ্রীগণেশচন্দ্র শর্মা অত্যন্ত কৃত্রিম, আড়ষ্ট—তাঁর উচ্চারণও দোষমুক্ত নয়। হেমের ভূমিকায় শ্রীমতী লিলি চট্টোপাধ্যায় কাজ চালিয়ে গেছেন।

৯ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় মহিলা-মহলে প্রচারিত “হৈমন্তিকা” আলেখ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার শান্ত গম্ভীর পরিচ্ছন্ন রূপটির জন্য। রবীন্দ্ররচনা সঙ্গীত অবলম্বনে আলেখ্যটি নির্মাণ করেছেন শ্রীমতী বেলা দে। প্রযোজনা করেছেন তিনি।

আলেখ্যটির প্রথম ভাগে ছিল রবীন্দ্র রচনা পাঠ এবং শেষ ভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই যে বিভাগ, এতেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। সাধারণত দেখা যায়, রচনা পাঠ আর সঙ্গীত পাশাপাশি চলে—রচনা পাঠ আর সঙ্গীত পর্যায়ক্রমে থাকে, একটার পরে একটা, ইঁট গাঁথার মতো করে। তাতে অনেক সময় শিল্পরস ব্যাহত হয়, একঘেয়েমি আসে। এতে তা আসে নি। রচনা পাঠ যেমন স্বচ্ছন্দ গম্ভীর, সঙ্গীত তেমনি নির্মল মনোহর। রচনাপাঠে ছিলেন শ্রীমতী তপতী চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীদি[illegible] ঘোষ। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের র আর [illegible] কিন্তু একাকার হয়ে গেছে—তারা হয়ে[illegible] তাড়া, ভরত হয়েছে ভড়ত, আমরা হয়ে[illegible] আমড়া। এই দোষটা না থাকলে মুক্তকণ্ঠে তাঁকে প্রশংসা করা যেতে পারত।

আলেখ্যটির শেষ দিকটায় একটা [illegible] পড়েছিল—শেষ হবার আগেই গানের মা[illegible] খানে গানটাকে পিছনে ফেলে সমাপ্তি ঘোষণা করায় রসভঙ্গ হয়েছিল, শ্রুতি[illegible] লেগেছিল।

১০ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ১০ মি[illegible] মজদুরমণ্ডলীর আসরে "জল ও তর[illegible] নামে একটি নকশা শোনা গেল। কি[illegible] ঘোষণা করা হল নাটিকা বলে। নাটি[illegible] সঙ্গে নকশার যে প্রভেদ, কর্তৃপক্ষের [illegible] হয় তা স্মরণ ছিল না। কিম্বা নকশা [illegible] বলে নাটিকা বললে কৌলীন্য বাড়ে, ম[illegible] বাড়ে—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই [illegible] ঐ ঘোষণা করেছিলেন। নকশাটি অস্পৃ[illegible] বিষয়ে। প্রপ্যাগ্যান্ডা হিসাবে রচনাটি সা[illegible] বলা চলে। প্রপ্যাগ্যান্ডার উগ্র গন্ধ ছি[illegible] এতে।

নকশাটি রচনা ও প্রযোজনা করেছি[illegible] শ্রীসত্যচরণ ঘোষ। প্রথম দিকে বেশ গতি[illegible] ছিল, কিন্তু শেষ দিকে মন্থর হয়ে গি[illegible] ছিল, এবং এই মন্থরতা বিসদৃশ ঠেকেছি[illegible] জেলেদের সংলাপে বেশ খানিকটা সফি[illegible] কেশন ছিল এবং অভিনয়ে সেটা [illegible] স্পষ্ট হয়েছিল। যদিও আধুনিক কা[illegible] অনেক জেলে সফিস্টিকেটেড কথা [illegible] তবে এতটা নয়। অন্যদের সংলাপে কে[illegible] ঢংটা কমাতে পারলে ভালো হ'ত।

অভিনয় সকলেই ভালো করে[illegible] কিন্তু মা-মেয়ের নির্বাচন ঠিক হয় [illegible] গলা শুনে মা'র চেয়ে মেয়ের বয়েসই [illegible] মনে হয়েছে।

নকশাটির "জল ও তরঙ্গ" না[illegible] কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। যে অস্পৃ[illegible] এতকাল অবাধে আধিপত্য করেছে তা [illegible] বাধার সম্মুখীন হচ্ছে—অর্থাৎ নিস্ত[illegible] জলে তরঙ্গ উঠছে বলে? —শ্রব[illegible]

জার্মান ফেস্টিভ্যাল

র ভবনে আয়োজিত ইন্দো-স্টিভ্যালে প্রতিবারের মত নিবেদনের আয়োজনে কোন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ট ধারাই সমান্তরাল গতিতে সংগীতপিপাসুদের একাধারে অনুশীলন উভয়েরই সুযোগ শীলন বলছি এই জন্য যে, ছাড়াও 'প্রোবলেম অফ টেশন' এবং 'ইলেকট্রনিক। ইউরোপের সমসাময়িক ত সংগীতচিন্তা এবং মিঃ এর মত প্রাজ্ঞ সমালোচক বিশ্লেষণ উভয় দেশের নার দিকটির সংগে শ্রোতা-টাবার চেষ্টা করেছে।

র অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসংগীত। ন, শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস, এবং তাঁর 'রবিতীর্থে'র গীদের নিয়ে রচিত 'কয়ার'। তিতে পরিবেশিত গান ংগে সংগে কবির কাব্য-ণর চিত্রটি মেলে ধরেন একক সংগীতে দেবব্রত বলিষ্ঠ কণ্ঠে 'আকাশভরা', 'পুরানো সে দিনের কথা', ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনা মিত্রের 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই'। কয়ার পরিবেশিত অন্যান্য ঝরঝর মুখর' বাদল দিনের ঝরে ঝরঝর' ছন্দবৈচিত্র্যে রচনার কারিগরি মনকে।

ংগীত 'এবার তোর মরা সছে' আমাদেরও আনন্দ-নিয়ে গেছে। চৌতাল, কাহারবা ইত্যাদি বিভিন্ন বিপ্লব মন্ডলের সুদক্ষ তবলাসংগত গানের রস-। অনুষ্ঠানের আগে কল্যাণ ত ভূমিকা সুন্দর।

ন ঐ একই প্রেক্ষাগৃহে। আসরে ছিল ওস্তাদ সেতার। সংগতে ছিলেন খাঁ। খাঁ-সাহেব প্রথমে য়া'। বাকিংহাম হলে কুইন াহুত সেই বিখ্যাত বাজনার ফরে এই তাঁর দ্বিতীয় আগে সুরদাস সম্মেলনের বাজনা শুনে মন ভরে পের অনেকখানি পুরণ বারের বাজনা। সামগ্রিক বিচারে নিজস্ব পরিবেশনশৈলীর মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য তথা মীড়ের সংগে সূক্ষ্ম কারুকার্য, সাপট তান, এবং ত্রিসপ্তক তানের বাহার এক নিমিষে শ্রোতাদের মনকে যেন জয় করে নিয়েছে। রাগ-বিশ্লেষণ, মোটের ওপর শুদ্ধ, তবে 'পূরিয়া' রাগে মন্দ্র ও মধ্য-সপ্তকের বিস্তারেই জোর দেওয়া হয় রাগভাব বজায় রাখবার জন্য। কিন্তু বিলায়েৎ খাঁ-সাহেব মধ্যসপ্তকের কাজ কিছু দেখালেও মন্দ্রসপ্তকে নামমাত্র স্পর্শ করে বেশীর ভাগ সময় অন্তরা অংগের তানেই জোর দিয়েছেন। তার ফলে 'সোহিনী'র সংগে পার্থক্য তেমন সুস্পষ্ট হয় নি। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সম্যক পরিস্ফুট হয়েছে পিলু ঠুংরীতে যেখানে সুবিখ্যাত শিল্পীদের গায়কী একত্র করে নিজস্ব এক রসরচনায় শ্রোতাদের বিহ্বল করে রেখেছেন। এ অনুষ্ঠান কেরামতুল্লা খাঁর সংগতসমৃদ্ধ। আকর্ষণের এটাও অন্যতম কারণ।

পাশ্চাত্য সংগীতের অনুষ্ঠান ছিল গোল পার্কের 'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার'-এ। প্রথম দিন ছিল ডেনেস জিগমণ্ডের এবং আনেলিজো নিসেনের পিয়ানোয় ব্রামস, বীটোফেন ও মোজার্টের রচনা। ঐ দিন উপস্থিত থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় দিন প্রফেসর কোয়েলরয়েটারের পরিচালনায় সমসাময়িক জার্মান সংগীত, ক্যালকাটা চেম্বার অর্কেস্ট্রাও এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। শুরু হয় স্টক হর্ডসনের 'কনট্যাকটস ফর ইলেকট্রিক সাউণ্ড' দিয়ে। বর্তমান পাশ্চাত্য সংগীতের একটি বিশেষ ধারার সংগে পরিচিত হওয়া ছাড়া এ অনুষ্ঠানের অন্য কোন শিল্পমূল্য নেই। বহুপ্রকার শব্দের একক এবং মিলিত সমন্বয়ে—দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত অনেক পরিবেশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবে এর মধ্যে সংগীতমাধুর্য কিছুই ছিল না বললেই চলে।

এ এক প্রকারের 'এক্সপেরিমেন্টাল মিউজিক'—স্টেজ ব্যালে এবং এফেক্ট মিউজিকের উপযোগী, কনসার্ট-হলের শ্রোতাদের নয়। তবে বর্তমান যুগের ভারসাম্য হারানো মনের আর্তনাদ, চাঞ্চল্য এবং লক্ষ্যহীনতার ছবি যদি শব্দে আঁকা যায়, তবে কেমন হয়? —এইরকম একটি বিশ্লেষণ-প্রেরণাতেই এ সংগীতের জন্ম। —এর কোন সার্বজনীন আবেদন আছে কিনা সে বিচার মহাকালের।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রফেসর কোয়েলরয়েটারের "কম্পোজিশন '৬৮ ফর ফ্লুট সোলো"-র অর্কেস্ট্রা পার্টি ছাড়াও কোয়েলরয়টার একক বংশীবাদন ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এই অনুষ্ঠানে ক্লারিওনেট, বেহালা-তম্বুরার চেয়ে সিকি স্কেল নীচু সুরে বাঁধা এবং অর্কেস্ট্রার স্কেল সাধারণ। বিভিন্ন সপ্তকের কংকর্ড, ডিসকর্ড, বিষয়বস্তুর সুচারু রূপায়ণ এবং বলিষ্ঠতা এ অনুষ্ঠানকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

"কনাসার্টো" পিয়ানো এবং চেম্বার অর্কেস্ট্রায়—চেনামহলের সুরের জগতে

ম্যাক্সমুলার ভবনে রবীন্দ্রসংগীত অনুষ্ঠানের পর দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, ডঃ লেসনার এবং বিমান ঘোষ।

পেণছে যেন মনটা স্বস্তি-বোধ করল। এই সংগীতের রচয়িতা আজিম লইব একক পিয়ানো বাদনেও অংশগ্রহণ করেছেন।

"কস্তুরী"র অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রসদনের সেই উদ্বেল উৎসুক সন্ধ্যা রীতিমত উপভোগ্য যখন "কস্তুরী" নামক সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠানের তহবিলের অর্থ-সংগ্রহার্থে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, কিশোরকুমার প্রমুখ শিল্পীরা এগিয়ে এসেছিলেন।

অনুষ্ঠান সুরু হয়, আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-সঙ্গীত দিয়ে। তরুণ শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠে, "ঝর-ঝর-মুখর বাদল দিনে"—পূজো রেকর্ডের একটি গান এবং রাগ-সঙ্গীতে উৎসব সন্ধ্যা সুরুতেই জমে উঠেছিল।

ভি, বালসারার অর্কেস্ট্রাও রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে সুরু হয়ে সু-পরিকল্পিত, বাদ্য-রচনার প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে যখন রসসমৃদ্ধ উপসংহারে পৌঁছায়—ঠিক তখনই 'উত্তমকুমারের আবির্ভাব' বার্তা ঘোষিত হওয়ায় শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তার পরিবেশিত দুখানি রবীন্দ্র-সংগীতের "আমি যে গান গেয়েছিলাম মনে রেখো" এবং "তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী"—সমারোচিত এবং শিল্পীর রুচির পরিচয়-বাহক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'সেদিন দুজনে' ছাড়াও 'প্রাঙ্গণে মোর' বাঘিনীর 'জল আনিতে যাবেই রাধা' এবং আরো জনপ্রিয় বাংলা গানের গুচ্ছ সারা প্রেক্ষাগৃহে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছিল। 'কিশোরকুমার'-কে বোম্বাই ফিল্মের নায়ক এবং কৌতুক গানের গায়ক বলেই সবাই জানেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে সত্যিকার গায়কী আছে এবং ইচ্ছে করলে গম্ভীর ভাবের ভাবুকও ইনি হতে পারেন—তারই উজ্জ্বল প্রমাণ সেদিনের পরিবেশিত গান-গুলি 'চিনিগো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী', 'এই ত সেদিন কুঞ্জছায়ায়' 'একদিন পাখী উড়ে যাবে যে আকাশে'। তিনি হিন্দী গানও গেয়েছিলেন।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিখার কলক-ভিত্তিতে পরিবেশিত নৃত্যনাট্যে প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত।

গান বাজনার টুকরো খবর

'কিংশুকের' পক্ষ থেকে সম্প্রতি সুচিত্রা মিত্রের একক রবীন্দ্রসংগীতের একটি আসর বসেছিল গরচা লেনে। শ্রীমতী মিত্র একাদিক্রমে প্রায় ঘণ্টাধিকব্যাপী অনুষ্ঠানে স্ব-নির্বাচিত এবং অনুরোধে বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে তাঁর অনুরাগীদের খুশিতে ভরপুর করেছেন।

সুরেশ সংগীত সম্মেলনের মাসিক অধিবেশন হয়ে গেল 'উত্তরা' প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন চিন্ময় লাহিড়ী, রাধিকা মৈত্র এবং সুচিত্রা মিত্র।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার সর্বজনীন 'শিশু দিবস' পালন এবং 'পুরস্কার বিতরণ' উভয় উৎসবই পালন করলেন ১৪ নভেম্বর। পুরস্কার বিতরণ করেছেন মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।

ফরয়ার্ড ক্লাবের বিজয়া সম্মিলনী

গত ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় ফরয়াড' ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত 'বিজয়া সম্মিলনী' উক্ত ক্লাব প্রাংগনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত-আবৃত্তি-যন্ত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, নির্মলা মিশ্র, রুমা গুহঠাকুরতা, নির্মলেন্দু চৌধুরী, ইলা বসু, বটুক নন্দী প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরা। এই অনুপম আনন্দ-আসরটি উপহার দেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে আছেন বাসু দেব, জয়ন্ত চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সংগীত প্রতিযোগিতা

ভাতখণ্ডে কলেজ অফ মিউজিকের উদ্যোগে নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সংগীত প্রতিযোগিতা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়, ধ্রুপদ, খেয়াল, রাগ-প্রধান, ভজন, রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ, আধুনিক, শ্যামাসঙ্গীত, পল্লীগীতি ও গীটার।

বেঙ্গল মিউজিক কলেজ

২১ সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত বঙ্গ-ভাষা প্রসার সমিতির মঞ্চে বেঙ্গল মিউজিক কলেজ আয়োজিত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি ছিলেন শ্রীসুরেন চক্রবর্তী।

এ-অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাজী সব্যসাচী ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা দুজন আবৃত্তি ও সংগীতে অংশ নেন। তারপর সমবেত ধ্রুপদ, ছড়া গান, লোকসংগীত, আগমনী গান, ভজন, নজরুলগীতি, ভারতনাট্যম, কথাকলি ইত্যাদি নৃত্য ও সংগীত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নেন ছাত্রীরা। শেষে কবিগুরুর ... বর্ষণ' অবলম্বনে 'বর্ষা শেষে শরৎ ... সংগীতালেখ্যটি অনুষ্ঠিত হয়। অনু... পরিচালনা করেন শ্রীরাজীব রায় ... শ্রীদীপংকর চট্টোপাধ্যায়।

●

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মে... সহযোগিতায় আগামী ২২, ২৪ ও ... ডিসেম্বর রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে সুর... উদোগে তিন দিনব্যাপী সংগীত সম্মে... অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে উচ্চাঙ্গসং... ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত নজরুল... হিমাংশুগীতি, পল্লীগীতি, অতুলপ্র... গান, সেতার, গীটার ও নৃত্য পরিবে... হবে।

অপেক্ষাকৃত নবাগত শিল্পীদের ... দান ও জনসাধারণের নিকট উপ... করাই এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

রূপাঙ্কনের বিজয়া সম্মেলন

গত ১২ ও ১৩ অক্টোবর দু... ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠান পালন... "রূপাঙ্কন" নাট্যগোষ্ঠী।

প্রথম দিন অনুষ্ঠানে একক সে... বিভিন্ন রাগ বাজিয়ে শোনান মণিলাল... সংগে তবলায় ছিলেন তারক সাহা। দ্বি... দিনের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ... নাট্যকার তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাব... নুসারে শ্রদ্ধেয় নট নরেশ মিত্রের মৃ... শোকপ্রকাশ করে এক মিনিট নী... পালন করা হয়। পরে সংগীতানু... অংশগ্রহণ করেন—রীতা হালদার, ... গোস্বামী, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ভোলানাথ দাস। একক মূকা... অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মূকাভি... শ্রীকাশীনাথ। সংগতে সহযোগিতা ... তারক সাহা। দুইদিনব্যাপী এই অনু... পরিবেশন করেন শ্রীমতী বন্দনা দে।

সুরসজ্জার শারদোৎসব

গেল ৭ অক্টোবর বালিগঞ্জস্থিত ... তীর্থ ভবনে দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরসজ্জার শারদোৎসব ডা... ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ... এই উপলক্ষে আয়োজিত এক ... অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি ... অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন ... পূর্বা সিংহ, সুস্মিতা ঘোষ, চন্দ্রা ... পাধ্যায়, মমতা ঘোষ, পুতুল বসাক, ... বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী দে, প্রগতি ... গৌতম বসু, তপন রায়চৌধুরী ... আলোক বসু। সবশেষে উচ্চাঙ্গসংগীত... আসরে খেয়াল গেয়ে শোনান কান্তি ... (আভোগী), কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ... কল্যাণ) ও গৌর বসাক (শ্যাম কো... এঁদের সংগে তবলায় ও যন্ত্রসংগীতে ... সহযোগিতা করেন দুলাল ভট্টাচার্য ... বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজু), অবপম মুখোপা... শম্ভু পাল ও রথীন চৌধুরী।

—চিত্রা...

াওয়া বদলের আভাস

শঙ্করবিজয় মিত্র

্সিকো শহরে বিশ্ব ওলি-
শ আসরে ভারত তার মহা-
ট খুইয়ে এলেছে। ১৯২৮
গতা থেকে শুরু করে প্রায়
মধ্যে (১৯৬০ সাল বাদ
ভারত এতদিন শীর্ষাসনে
প্রতিযোগিতায় এই একটি
ভারত বুক ফুলিয়ে বলতে
় খেলায় জয়মাল্য আমাদের
সে প্রত্যয়, সে আত্মবিশ্বাস,
মাজ আর নেই। আমাদের
এবার আর বীরের সম্মান
কা থেকে ফিরলে বিমান-
় সাদর সম্বর্ধনার জন্য
ার ভিড় জমে নি। পরাজিত
ভাবে তাঁদের মানে মানে
য়েছে। ১৯৬৮ সালে ২৪
খটা বড় বেদনার দিনরূপে
ইলো ভারতের প্রতিটি
। সোনা ফেলে আমাদের
র পেতল (ব্রোঞ্জ) নিয়ে
। ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার
ভারত যখন বে-সামাল হয়ে
কাছে হেরে যায় তখনই
ালছায়া ঘনিয়ে এসেছিল।
আমাদের হকি দলের চৈতন্য
কভাবে টিম গড়ে খেলার
দেওয়াতেই চরম পরাজয়

ব খেলা যাতে ভারত এত-
তার প্রাধান্য ধরে রাখতে
ু এর জন্যে প্রস্তুতি বা
ছুই ছিল না। এর আগে
য়াড়দের ব্যক্তিগত ও মিলিত
াধান্য বজায় রাখা সম্ভব
াড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশ-
মাজকের মত এত অগ্রসর
কে নজর রেখে আমাদের
ারা বা সরকার তেমন কিছু
গ্রহণ করেন নি। বিশ্বে
আজ অক্লান্ত অনুশীলন,
ক্রীড়া ও সরকারী মহলের
দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন
সাধনের জন্য নতুন নতুন
র, বিভিন্ন দেশের প্রথাগত
খবার জন্যে অঢেল অর্থ
 সুযোগ-সুবিধার দরজা
য়েছে। একমাত্র ভারতবর্ষই
ৎপরতা গ্রহণ করে নি।
লার কর্তারা যেমন চিরা-
লেছেন, সরকারও তেমনি
র ব্যাপারে পরম উদাসীন।
কল্পনা গ্রহণ করে খেলা-
র পর্যায়ে দেশকে এগিয়ে

নিয়ে যাবার জন্যে এ পর্যন্ত কোন উদ্যমই দেখা যায় নি। দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার প্রভৃতি বিষয়ে ভারত অনেক পেছিয়ে থাকলেও, হকিতে কিন্তু সে সবার উপরেই ছিল। কর্মকর্তারাও তাই ধরেই নিয়েছিলেন যে চিরকালই ভারত হকিতে শ্রেষ্ঠস্থানে থাকবে। সেই স্থান বজায় রাখার জন্য যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা দরকার ছিল তার দিকে কোন লক্ষ্যই দেওয়া হয় নি। ১৯৬০ সালে রোম ওলিম্পিকে ভারত যখন ফাইনালে পাকিস্থানের কাছে হেরে গিয়ে সোনার বদলে রূপোর মেডেল নিয়ে এল তখন তা নিয়ে মহা সোরগোল উঠলো। ভারতের ক্রীড়ানুরাগী মহল খাপ্পা হয়ে গালাগাল দিলেন, আমাদের যত ক্রীড়া সমালোচক তাঁরা সকলে মতৈক্য হয়ে গঠনমূলক পন্থায় হকির ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সরকারও সাময়িকভাবে উত্তেজিত হলেন কিন্তু আসলে কোন উন্নতিই হলো না। তারপর টোকিও ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল আবার স্বগৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়ায় একটা আত্মতুষ্টির ভাব এলো। বেশ অবজ্ঞা ভরেই বলা হতে লাগলো আরে, পাকিস্থানই হোক, আর অস্ট্রেলিয়াই হোক হকিতে ভারতকে পরাজিত করা অত সহজ নয়। আর সেই আত্মতুষ্টির পুরস্কার স্বরূপ এবার সোনা ত নয়ই, রূপোও নয়—ভারত পেয়েছে ব্রোঞ্জ। ওলিম্পিক হকিতে এইবারই প্রথম ভারত ফাইনালে উঠতে পারে নি।

কেন এমনটা হল? এক কথায় এর কোন উত্তর নেই এবং তা হওয়াও সম্ভব নয়। ভারতের নির্বাচিত দল দেশের সম্মান রাখবার জন্যে যথাসাধ্য করেছেন, প্রাণপণ খেলেছেনও। তবুও সবটা আশানুরূপে চলেনি এবং তাই আশাও ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনীকুমার ওলিম্পিক খেলার সময় মেক্সিকোতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, নানাবিধ কারণে ঘোঁট পাকিয়ে ভারতীয় হকি দলের পরাজয় ঘটিয়েছে। তিনি বলেছেন যে, টেকনিক্যাল কমিটির তত্ত্বাবধানে মেক্সিকো ওলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন না। এই না-থাকাটা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। ইউরোপীয়ান আম্পায়ারিং-এর মান সম্পর্কেও তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। তবে এই সঙ্গে ভারতীয় দলে কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হয়ে পড়ায় এই দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলায় প্রথমে গোল করে খেলা ভাঙ্গার দশ-পনের মিনিট আগে পর্যন্ত ভারত এগিয়ে ছিল। তারপরেই দুর্ভোগের সূচনা—হারমিকের পায়ের হাড় ভাঙ্গলো, রাইট হাফব্যাক বলবীর সিং আহত হলেন। দু-দুজন হাফব্যাক অকেজো হয়ে পড়ায় খেলার মোড় ঘুরে গেল অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে। হাফব্যাকেরা অক্ষত থাকলে খেলার ফলাফল হয়ত অন্য রকম হত সন্দেহ নেই।

তাছাড়া বিভিন্ন দেশও অনেক এগিয়েছে এবং এবারকার ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার যে-কোন দলই বিজয়ী হতে পারতো। নিউজিল্যান্ড ভারতকে হারিয়েছে। বিজাতীয় লীগে তারা পরাজিত হয় নি, তবু চূড়ান্ত ক্রমপর্যায়ের তালিকায় নিউজিল্যান্ড অষ্টম বা নবম স্থান পেয়েছে। বিজাতীয় লীগে অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্থান ও ফ্রান্সের কাছে হেরেছে, তবু তারা শেষ পর্যন্ত ফাইনাল পর্যন্ত এগিয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীকে হারাতে পাকিস্থানের নব্বুই মিনিটের বেশি সময় লেগেছে এবং এই খেলার ফয়সালা হয় একেবারে শেষ সময়েই।

আর্জেন্টিনা আর ফ্রান্স হয়ত গায়ের জোরে খেলে কিন্তু এরা ছাড়া আর সব দলই প্রায় সমান মানের পরিচয় দিয়েছে।

অশ্বিনীকুমার বলেন, হকির উন্নতির জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। এবারে যে সকল দল মেক্সিকোতে অংশ নিয়েছে তারা দিনেনপক্ষে প্রশিক্ষণ নিয়েছে পুরো এক বছর। পাকিস্থান দল সাত-আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে আট মাস ধরে নিবিড়ভাবে অনুশীলন করেছে।

মেক্সিকো ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের যুগ্ম অধিনায়ক গুরুবক্স সিং-এর মতে দলের ফরোয়ার্ড লাইন আশানুরূপভাবে খেলতে পারে নি বলেই ভারতীয় দলের বিপর্যয় ঘটেছে। তিনি বলেন, এছাড়া বড় কারণ হল খেলার আম্পায়ারদের পক্ষপাতিত্ব। ওলিম্পিকে ভারতের কোন আম্পায়ার ছিলেন না। হকি টুর্ণামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন পাকিস্থানের মির দারা। জাজ এবং আম্পায়ার দিয়ে তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেছেন। এদিকে ভারতীয় দলের ফরোয়ার্ডদের মধ্যে একমাত্র হরবিন্দার সিং ছাড়া আর কেউ বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। অতিরিক্তদের মধ্যে ইনাম-উর-রহমন, গুরুবক্স সিং (দ্বিতীয়), বলবীরও (পাঞ্জাব) ব্যর্থ হয়েছেন। ফরোয়ার্ডরা যদি পঞ্চাশভাগও কার্যকর হতেন তাহলে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া কেন যে কোন দেশের বিরুদ্ধেই অনায়াসে ২।৩ গোলে

জেতা যেত। দুর্ভাগ্যও খানিকটা ছিল—তিনজন খেলোয়াড় আহত অবস্থাতেই খেলেছেন। প্রথম দিন পৃথিপালের মাথাই চাকিতে আঘাত, পূর্ব জার্মানীর সংগে খেলায় আহত হলেন বলবীর আর অস্ট্রেলিয়ার সংগে খেলায় প্রথমার্ধেই হরমিন্দর সিং-এর প্যারের হাড় ভেংগে যায়।

ভারতের ফরোয়ার্ডদের বল নিয়ে আস্তে খেলার নীতিও ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। অবস্ট্রাকশন ও স্টিকর্‌ল সম্পর্কেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঠিক অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে নি এবং এই জন্যেই ভারত প্রায় বারটি সর্ট কর্ণার পেয়েও চারটির বেশি কাজে লাগাতে পারে নি। আর বাং কর্ণার থেকে মাত্র দুটি গোল করেছে। তুলনায় ইউরোপীয়ান দলগুলি শতকরা পঞ্চাশটি সর্ট কর্ণার কাজে লাগিয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য দেশের গোলরক্ষকও ভাল ছিল। আর আমাদের গোলরক্ষকরা কোন সময় আশানুরূপ খেলতো পারে নি। কাজে কাজেই আমাদের পরাজয়টা কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়।

গুরুবক্স সিং-এর ধারণা হকিতে ইউরোপীয় দলগুলি এখনও অনেক পেছিয়ে আছে। ট্যাকটিক্স সম্পর্কে ওদের তেমন আগ্রহ নেই। তাঁর মতে টেকনিকের দিকে ভারত ও পাকিস্থান এখনও শীর্ষে। ভারতীয় হকি বলতে যা বুঝায় তা বজায় রাখতে পারলেই সোনার মেডেল ফিরে পাওয়া যাবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। ভাল কোচিং ও অন্যান্য সব ফললে মিউনিকে ভারত বিজয়ী হতে পারবে। তিনি বলেন দুজন দক্ষ ইনসাইড ফরোয়ার্ড গড়ে তুলতে হবে। এখন থেকেই দুজন ইনসাইড ফরোয়ার্ড তৈরী করা দরকার যাঁরা ভারতীয় পদ্ধতিতেই বল দেওয়া-নেওয়া করে পারস্পরিক বুঝা-পড়ার সৃষ্টি করতে পারবে।

হকি সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা প্রসংগে গুরুবক্স সিং-এর অভিমত হল স্কুল-কলেজ থেকেই নতুন মুখ বাছাই করা ছাড়া উপায় নেই। ভাল খেলোয়াড়দের জন্যে স্কলারশিপ চালু করলে ওদের আগ্রহ বাড়বে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া চাকরির সুযোগও চাই। বছরে ন্যূনপক্ষে ছ'মাস হকি মরশুমের প্রয়োজন হবে। এখনকার দু-আড়াই মাসের মরশুম এবং টুর্ণামেন্টের সংখ্যা কম বলে হকির জনপ্রিয়তা নষ্ট হচ্ছে। একটি মাত্র খেলা হকিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের কৌলিন্য বজায় রেখেছে। তবু কেন হকি স্বদেশে ও জনসাধারণের কাছে অবহেলিত? এই খেলার উন্নতির জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

ভারতের বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় হেলসিংকি ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক কে ডি সিং (বাবু) বলেন, মেক্সিকোতে দুর্ভাগ্যের জন্যে ভারতীয় হকি দলের পরাজয় হয়েছে এ মন্তব্য তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় অনুশীলনের অভাব, সুচিন্তিত পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ও খেলোয়াড়দের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ভারতীয় দলের পরাজয়ের বিশেষ কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

কর্মকর্তাদের বর্তমান কর্মধারায় তীব্র সমালোচনা করে তিনি জোরের সংগে বলেন, তাঁর অধীনে ২৫ জন করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলের উঠতি ছাত্র দেওয়া হলে তিনি তাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে আগামী চার বছর ধরে গড়ে তুলবেন। এই সব খেলোয়াড়দের হকি খেলা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলেই আগামী ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তাদেরই সাহায্যে ভারত হকি খেলায় প্রাধান্য ফিরে পাবে।

তিনি মনে করেন ভারতীয় দলের ত্রুটি ছিল পাচটি স্থানের পাচজন খেলোয়াড়ের—তাঁরা হচ্ছেন লেফট আউট, তিনজন হাফ-ব্যাক ও গোলরক্ষক। প্রতিযোগিতার গোড়ার দিকে পিটার যখন আশানুরূপ খেলতে পারছিলেন না, তখন গুরুবক্স সিং-কে তাঁর জায়গায় খেলান উচিত ছিল। ইনাম-উর-রহমনকেও গোড়ার দিকের খেলাগুলিতেই সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

ভারতীয় দলের রক্ষণমূলক খেলার নীতিও ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তিনি বলেন আজ বলা হচ্ছে যে ছ' সপ্তাহের অনুশীলন শিবির যথেষ্ট নয়। তাই যদি হয় তবে দীর্ঘ দিনব্যাপী শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়নি কেন?

মেলবোর্ণ ওলিম্পিকের ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক বলবীর সিং বলেছেন, "মেলবোর্ণ থেকে ফিরেই আমি বলেছিলাম স্কুল-কলেজে আমাদের হকির বনেদ গড়ে তোলা দরকার।" বস্তুতঃ ১৯৫৬ সাল থেকেই অন্যান্য দেশের রক্ষণভাগ বিশেষ করে গোলরক্ষকরা খেলায় প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছেন। আমাদের ফরোয়ার্ডরা আর আগের মত গোলের ছড়াছড়ি ঘটাতে পারছে না।

যাই হোক কালের সংগে তাল রেখে চলাই বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক। ভারতীয় হকির কর্ণধারদের তাই সচেতন হয়ে নতুন ছকে হকিকে গড়ে তুলতে হবে এবং প্রবীণদের উপর নির্ভর না করে তারুণ্য সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। তরুণ প্রতিভার অন্বেষণ এবং উপযু[ক্ত] দিয়ে তাদের প্রতিভার বিকাশ[ের] ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমরা [..] বলেছি। আবার আমরা ভারতে[র] কর্ণধারদের কল্পনায় স্বর্গরাজ্য [থেকে] বাস্তবের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে চিন্ত[া করার] জন্যে অনুরোধ করছি। ভারতে প্রতিভার অভাব নেই—তাদের [..] কাজে লাগানর চেষ্টার অভাবই বড় অন্তরায়।

আমাদের কর্মকর্তারা এবং এতকাল ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। ভাঙ্গানোর জন্যে একটা প্রচণ্ড প্রয়োজন ছিল—মেক্সিকোর পরাজয় ধাক্কা দিয়ে সকলকে সজাগ করেছে। ধূলার ব্যাপারে ভারত সরকার আ[র] দর্শকের ভূমিকায় থাকবে না বলে করেছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে এক উচ্চ[..] বৈঠকে খেলাধূলার জগতে [..] খেলোয়াড়দের নিম্নমান ও [..] ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে মোটামুটিভাবে স্থির হয়েছে যে অ[..] নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ পুনর্গ[ঠিত] হবে, পুনর্গঠিত ক্রীড়া পরিষদ প্রথম বৈঠকে ভারতীয় হকি দলের ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা [..]

ক্রীড়াবিষয়ক যে নিখিল ভারত গুলি রয়েছে, বিশেষ করে যেগুলি ব্যাপারে সরকারী সাহায্য পেয়ে সেগুলির ওপর কতকটা সরকারী [..] আছে। উক্ত বৈঠকে সেই সম্পর্কে আ[..] করে স্থির হয় যে সরকারী সাহা[য্য] নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থাগুলির অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হোক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হিসাবে [..] কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী [..] ঝা আজ্জাদকে নিখিল ভারত পরিষদের নতুন সভাপতি নিযুক্ত করা

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের একজন পাত্র বলেছেন, ভারতীয় হকি দলের উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধূলার জগৎ থেকে কায়েমী স্বার্থ দুর্নীতি দূর করা সম্পর্কে যেসব গঠ[নমূলক] প্রস্তাব করা হয়েছে ভারত সরকার নতুন ক্রীড়ানীতি নির্ধারণে সেগুলিকে গুরুত্ব দেবেন।

বিলম্ব হলেও হাওয়া বদলের [..] এসেছে। সুস্থ ও সুন্দর সংগঠনের [..] ভারতের ক্রীড়াধারাকে সার্থক করে [..] পারলে ভারতীয় তারুণ্য শক্তির [..] বিশ্বমানের পর্যায়ে পৌঁছাবেই [..] জোর করেই বলা যায়। কায়েমী স্বা[র্থ] দুর্নীতিমুক্ত হলে ভারতের হ[কি] বিশ্বের ক্রীড়াজগতে নিজেদের গৌ[রবের] আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সরকা[র] ক্রীড়া পরিচালকদের কল্যাণবুদ্ধি [..] হোক এই কামনাই জানাই।

খেলা ধূলা

দর্শক

ম্যানের অবসর

শবিশ্রুত ফাস্ট বোলার ম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা ন। ইয়র্কসায়ার কাউন্টি ৮ সালের খেলাই তাঁর ণীর ক্রিকেট খেলা। লে আমরা তাঁকে শেষ জিল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস র ২২শে জুন।

র জন্ম ১৯৩১ সালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তিনি সর্বকালের একজন টেস্ট ক্রিকেট খেলায় য়ে তিনি যে সর্বাধিক বিশ্ব রেকর্ড করেছেন ন্ত করতে পারেনি। তাঁর শ করা খুবেই সময়- যুদ্ধোত্তরকালে ইংল্যান্ডের ছলেন একমাত্র খাঁটি ফাস্ট র সমান বিপদজনক এবং র তাঁর সমসাময়িক কালে ছিলেন না। খেলার লোয়াড়দের তিনি বিন্দু- করতেন না—ঠিক শত্রুর াস্তি এবং নানা কৌশল ক্ষ দলের খেলোয়াড়দের খন তাঁর প্রধান লক্ষ্য, লোয়াড়দের উইকেট জয়। র কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ মিত্র ভেদ নেই—সদা- কে মশগুল ট্রুম্যান তখন এই সহজ সরল মানুষটি সংহার মূর্তি ধারণ বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানকেও তায় পড়তে হত। তাঁর জাজ এবং দাপট! ওভার কিন্তু শান্ত-শিষ্ঠ বালক ক্ষ ফিল্ডার হিসাবেও াতি ছিল। টেস্ট ক্রিকেটে ক্যাচ ধরেন।

ল ট্রুম্যান ভারতবর্ষের স্ট খেলোয়াড়-জীবনের মে কি বিরাট সাফল্যের ৪টি টেস্টে মোট ২৯টি ৩১) এবং ম্যাঞ্চেস্টারের থম ইনিংসে ৮-৪ ওভার ন ৮টা উইকেট।

নিজেই তাঁর টেস্ট খেলো- টি খেলাকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসাবে নির্বাচিত করেছেন—১৯৬১ সালে লিডস মাঠে অস্ট্রে- লিয়ার বিপক্ষে ৩য় টেস্ট এবং ১৯৬৩ সালে এজবাস্টন মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩য় টেস্ট খেলা। এই দুটি খেলায় ইংল্যান্ডের জয়লাভের মেরুদন্ড ছিল ট্রুম্যানের অসাধারণ বোলিং সাফল্য।

১৯৬১ সালে লিডস মাঠের তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া উভয় ইনিংসেই শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্রথম ইনিংসের খেলায় ২১ রানে ৭টা উইকেট (১৮৭ রানের

খেলার মাঠে রুদ্রমূর্তিতে ফ্রেডী ট্রুম্যান

হাস্য-কৌতুকপ্রিয় ফ্রেডী ট্রুম্যান

মাথায় ৩য় এবং ২০৮ রানের মাথায় ৯ম উইকেট) এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২১ রানে ৮টা উইকেট পড়ে যায় (৯৯ রানের মাথায় ২য় এবং ১২০ রানের মাথায় ইনিংস শেষ)। অস্ট্রেলিয়ার এই হাঁড়ির হাল করে- ছিলেন ট্রুম্যান—১ম ইনিংসে ৫৮ রানে ৫টা এবং ২য় ইনিংসে ৩০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে। প্রথম ইনিংসে চা-পানের পরই ট্রুম্যান তাঁর রুদ্র মূর্তি ধারণ করেন—৬ ওভার বল করে ১৬ রানে ৫টা উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার এক সময় ট্রুম্যানের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—২৪টি বল দিয়ে ৫টা উইকেট। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে তাঁর এই সাফল্য নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ নজির। অস্ট্রেলিয়া এই খেলায় ৮ উইকেটে হেরে যায়। নির্দিষ্ট পাঁচ দিনের খেলা তৃতীয় দিনেই শেষ হয়। ট্রুম্যান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোকে দুবারই শূন্য রানে বোল্ড আউট করেন। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ার কোন অধিনায়ককে একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে শূন্য রান করে খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়নি।

১৯৬৩ সালে এজবাস্টনের তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ড যে ২১৭ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করেছিল তার মূলে ছিল ট্রুম্যানের মারাত্মক বোলিং। ট্রুম্যান ১ম ইনিংসে ৭৫ রানে ৫টা এবং ২য় ইনিংসে ৪৪ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছিলেন। প্রথম ইনিংসে

একনজরে ট্রুম্যানের টেস্ট উইকেট

বিপক্ষে	খেলা	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
অস্ট্রেলিয়া	১৯	৬৪৫·১	৮৩	১৯৯৯	৭৯	২৫·৩০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬	২১৫·৩	৩৫	৬২০	২৭	২২·৯৬
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৮	৭৬৪	১৭৬	২০১৮	৮৬	২৩·৪৬
নিউজিল্যাণ্ড	১১	৩৬১·১	১১৩	৭৬২	৪০	১৯·০০
ভারতবর্ষ	৯	২৯৭·২	৭৮	৭৮৭	৫৩	১৪·৮৪
পাকিস্তান	৪	১৬৪·৫	৩৭	৪৩৯	২২	১৯·৯৫
মোট :	৬৭	২৪৪৮	৫২২	৬৬২৫	৩০৭	২১·৫৭

সোবার্স তাঁর ১৯ রানের মাথায় ট্রুম্যানের বলে বোল্ড আউম হন। ট্রুম্যান বলেছেন, আমার যে বলে সোবার্স বোল্ড আউট হন তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বল—জীবনে এ ধরনের বল আমি দ্বিতীয়বার দিইনি। সোবার্স, অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল (এই সময় সোবার্সের জুটি ছিলেন) এবং আম্পায়ার চার্লি ইলিয়ট কাণ্ড দেখে থ হয়ে গিয়েছিলেন।

টেস্টে ট্রুম্যানের সাফল্য

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট : ৩৪টি (৫টি টেস্টে), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৬৩

একটি ম্যাচে ১০টি উইকেট : ৩-বার

এক ইনিংসে ৫টি উইকেট : ১৭-বাব

ক্যাচ : ৬৪টি

মোট রান : ৯৮১ (গড় ১৩·৮১)

একটি খেলায় প্রথম ১০ উইকেট লাভ : ১১টি (৮৮ রানে), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, লিডসের ৩য় টেস্ট, ১৯৬১

বোলিংয়ে অসাধারণ নজির : ২৯টি বলে কোন রান না দিয়ে ৫টা উইকেট লাভ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ৩য় টেস্টের ২য় ইনিংস, এজবাস্টন, ১৯৬৩)

১০০তম উইকেট : ১৯৫৮-৫৯ সালে ক্রাইস্ট চার্চের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের ই সি পেট্রীকে এল বি ডবলউ করে ট্রুম্যান তাঁর ১০০তম উইকেটটি পান। এই ১০০ উইকেট পেতে তাঁকে ২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয়েছিল।

২০০তম উইকেট : ১৯৬২ সালে লর্ডস মাঠে পাকিস্তানের জাভেদ বার্কিকে বোল্ড আউট করে ট্রুম্যান তাঁর ২০০তম উইকেটটি পান। এই ২০০ উইকেট পেতে তাঁকে ৪৭টি টেস্টে ৯,৮৭৫টি বল দিতে হয়েছিল।

৩০০তম উইকেট : ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার এন জে এন হক ওভালের দ্বিতীয় টেস্টে কলিন কাউড্রের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হলে ট্রুম্যানের ৩০০ উইকেট পূর্ণ হয়। এই ৩০০ উইকেট পেতে তাঁকে ৬৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয়েছিল।

ডেভিস কাপ

পিওরটো রিকোর রাজধানী স্যান জুয়ানে আয়োজিত ১৯৬৮ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে আমেরিকা ৪—১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই নিয়ে আমেরিকা ৪৪ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠলো এবং বিগত ৪৩টি চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় আমেরিকার ডেভিস কাপ জয় ১৯ বার। সর্বাধিক ২২ বার ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার পরই আমেরিকার স্থান। আমেরিকার এই বিরাট সাফল্যের কাছে ভারতবর্ষের সাফল্য খুবই নগণ্য। ভারতবর্ষ মাত্র একবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে রানার্স-আপ হয়েছে (১৯৬৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে) এবং ৬ বার ইণ্টার-জোন ফাইনালে উঠেছে। এই ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার পরই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলা।

এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি ২৪ বছর (যুদ্ধের দরুণ ৬ বছর খেলা হয়নি) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ১৬ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে, বাকি ৮ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে আমেরিকা। এই ২৪ বারের খেলায় (১৯৩৮—৬৭) আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া একটানা ১৬ বছর (১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৪৬-৫৯) পরস্পর খেলেছে। এই ১৬ বছরের খেলায় ফলাফল — অস্ট্রেলিয়ার জয় ৯ বার এবং আমেরিকার জয় ৭ বার। এরপর এই দুই দেশকে আমরা চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে দেখতে পেলাম ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে। অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৩ সালে এবং আমেরিকা ১৯৬৪ সালে ডেভিস কাপ পায়। তিন বছর পর দীর্ঘ দিনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আজ মিলিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা শুরু হবে এডিলেডে আগামী ২৬শে ডিসেম্বর।

ডেভিস কাপের খেলায় আমেরিকার বিপক্ষে ভারতবর্ষ কোন দিনই জিততে পারেনি। সুতরাং ১৯৬৮ সালে আমেরিকার কাছে ভারতবর্ষের পরাজয়ে আমরা বি[illegible] হয়নি। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস [illegible] ফলাফল সমান ১—১ দাঁড়ায়। [illegible] দিনের ডাবলস খেলায় এবং তৃতীয় [illegible] দুটি সিঙ্গলসে আমেরিকা জয়ী [illegible] ভারতবর্ষকে ৪—১ খেলায় পরাজিত [illegible] ভারতবর্ষকে একটি সিঙ্গলস খেলায় [illegible] যুক্ত করেছিলেন প্রবীণ খেলোয়াড় রমনা[illegible] কৃষ্ণান। ৩১ বছর বয়সে কৃষ্ণান তাঁর দী[illegible] কালের অভিজ্ঞতার মূলধনে আমে[illegible] ২৫ বছরের যুবক ক্লার্ক গ্রাবে[illegible] পরাজিত করেন। এই বয়সেও কৃষ্ণান [illegible] ক্রীড়াকুশলতায় দর্শকদের চমৎকৃত ক[illegible] কৃষ্ণানের খেলা দেখে আমেরিকার ডে[illegible] কাপ দলের অধিনায়ক ডোনাল্ড [illegible] মন্তব্য করেন, চলতি বছরের ডেভিস [illegible] প্রতিযোগিতায় পাঁচজন বাছাই খেলোয়া[illegible] মধ্যে কৃষ্ণান একজন। ১৯৬৮ সালের আ[illegible] রিকান ডেভিস কাপ দলের প্রধান [illegible] হলেন আমেরিকার জাতীয় চৌ[illegible] চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার এ[illegible] ভারতবর্ষের বিপক্ষে তিনি দুটি সিঙ্গ[illegible] খেলাতেই জয়ী হন—তাঁর কাছে [illegible] স্বীকার করেন রমানাথন কৃষ্ণান [illegible] প্রেমজিৎ লাল।

পত্রিকা শতবার্ষিকী প্রদর্শনী ফুটবল

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ [illegible] উপলক্ষে গত মে মাসে মোহনবাগান, [illegible] বেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং [illegible] নিয়ে ত্রিদলীয় ফুটবল লীগ প্রতিযো[illegible] কলকাতা সহর এবং তার চারপাশের [illegible] অঞ্চলের জনসাধারণকে বিপুলভাবে [illegible] করেছিল। বিরাট রঞ্জি স্টেডিয়ামে এই [illegible] যোগিতার আয়োজন করেও টিকিটের [illegible] পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপ[illegible] আগামী ২৩শে নভেম্বর ইস্টে[illegible] এরিয়ান্স ক্লাবের এজমালি মাঠে রা[illegible] ডায়নামো মিনস্ক ক্লাব বনাম আই [illegible] একাদশ দলের এক প্রদর্শনী ফুটবল [illegible] আয়োজন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর [illegible] কাতার ময়দানে রাশিয়ার ফুটবল দল [illegible] আসছে বলে চারিদিকে খুব সাড়া [illegible] গেছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় [illegible] রাশিয়ার যথেষ্ট ঐতিহ্য আছে। [illegible] সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে [illegible] দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেই ফুটবল [illegible] যোগিতায় স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

DISTRICT LIBRARY
COOCH BEHAR

এই দেখুন এঁরা। যাকে বলে আবালবৃদ্ধ বনিতা।
আমার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখেরও বেশী।
রান্নায় আমার যে এত হাতযশ—
এই দেখুন তার চাবিকাঠিটা আমার হাতে।
সানরাইজ
গুঁড়ো মশলা। স্বাদে-গন্ধে এর জুড়ি নেই।
খাঁটি নির্ভেজাল জিনিষ। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী।
প্রকাশ ব্রাদার্স
গুঁড়ো মশলার
আদি প্রতিষ্ঠান।
৭৩/এ, নলিনী শেঠ রোড,
কলিকাতা-৭

৮ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

২৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 29th Nov. 1968 — শুক্রবার ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : রণজিত বরাট

'গৌরাঙ্গ পরিজন'

"অমৃত' পত্রিকায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় গৌরাঙ্গ-পরিজনদের সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করছেন। তাঁর সে-আলোচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু গত ২২শে কার্তিকের সংখ্যায় (৩য় খণ্ড—২৬ সংখ্যা) বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র পর্যায়ে তিনি শ্রীপাট বাঘনাপাড়া সম্বন্ধে যে-তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা প্রমাদপূর্ণ।

অচিন্ত্যবাবু উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন—"নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত ও মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তাঁর দুই ছেলে—গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ অপ্রকট হলে তাঁর দুই ছেলেকে জাহ্নবা দেবী পুত্রের মতো পালন করেন। কেহ কেহ বলেন, রামকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র জাহ্নবা দেবীরই দত্তকপুত্র।"

সেনগুপ্ত মহাশয় এ-তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন জানি না। তবে এটা যে একান্ত ভ্রমপূর্ণ, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি বাঘনাপাড়ার অধিবাসী এবং ঠাকুর রামচন্দ্রের বংশসম্ভূত ও তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবাইত। আমাদের বংশ-তালিকায় লিখিত আছে—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবিতকালে বর্ধমান জেলার পাটুলি গ্রামে মাধব চট্টোপাধ্যায় নামান্তরে ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় বাস করতেন। তিনি স্বগ্রাম পাটুলি ত্যাগ করে নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই তাঁর বিখ্যাত পুত্র বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলা হয়েছে। মহাপ্রভু এঁকেই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় শচী দেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে যান। এই বংশীবদনের দুই পুত্র ছিল—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্যের আবার দুই পুত্র ছিল—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশচীনন্দন। রামচন্দ্র বা রামাই প্রভুই বাঘনাপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনিই সেখানে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা সকলেই পাটুলির চট্টোপাধ্যায় বংশোদ্ভব। রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী ছিলেন বলে সহোদর ভ্রাতা শচীনন্দনকে কুলিয়া থেকে আনিয়ে বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করেন। শচীনন্দনের তিনটি পুত্র ছিল। বাঘনাপাড়ার বর্তমান গোস্বামী বংশ ঐ সকল মহাপুরুষদেরই বংশধর এবং কাশ্যপগোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয়। জাহ্নবা দেবী রামচন্দ্র ও শচীনন্দনকে পুত্ররূপে পালন করেছিলেন ও দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাঘনাপাড়া ও রামচন্দ্র সম্বন্ধে বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থে এই তথ্যই লিপিবদ্ধ আছে। উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করা হল—

১। শ্রীবংশী-শিক্ষা — শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র, সিদ্ধান্তবাগীশ — বৈষ্ণব নাম প্রেমদাস। ২। মুরলীবিলাস — শ্রীশচীনন্দন পৌত্র শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী। ৩। গৌরপদ-তরঙ্গিণী — শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র (সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত)। ৪। বংশীবিলাস — প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী (বংশীবদন-বংশসম্ভূত ও ভাগবতাচার্য)।

শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত মহাশয় যে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন, আমাদের বংশে ঐরূপ কোন পূর্বপুরুষ ছিলেন না। অচিন্ত্যবাবু এই তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানতে পারলে বাধিত হব। আশা করি আমার এই প্রতিবাদপত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করে পাঠকদের ভ্রমসংশোধনে সাহায্য করবেন।

বিনীত
শ্রীবনবিহারী গোস্বামী এম-এ,
সহকারী প্রধান শিক্ষক, শৈলেন্দ্র
সরকার বিদ্যালয় (সরস্বতী
ইনস্টিটিউশন) কলিকাতা-৪।

নায়ক-নায়িকা চাই

গত ১লা নভেম্বরের 'অমৃত'এ 'নায়ক-নায়িকা চাই' প্রসঙ্গ কাহিনীটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ। আজকের দুনিয়ায় মানুষ মানুষকে কতরকমভাবে প্রতারণা করছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আর সরল ও বিশ্বাসী লোকেরা এইসব প্রতারকদের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৬১ সালে প্রায়ই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরোতো অমৃতসরে অমুক প্রোডাকসন্স হিন্দী ও পাঞ্জাবী ছবি তুলবেন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই, ফটোসহ আবেদনেরও প্রস্তাব ছিল। আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানে পত্র লিখলে তাঁরা আমাকে নিয়মাবলী পাঠান—তাতে জনাকয়েক তরুণীর চিত্র ছাপা ছিল, যাঁরা নাকি অভিনয়ের জন্যে মনোনীত হয়েছে। একটা সামান্য ফিও ধার্য ছিল—এবং বলা হয়েছিল ঐ ছবিতে সুযোগ পেলে প্রথমবারেই লক্ষাধিক টাকা অর্জন করা যাবে। ব্যাপারটা আগাগোড়াই ঘোলাটে ছিল। সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও আমি একাধিকবার যোগাযোগ করার পর জবাব পাই যে আমাকেও মনোনীত করা হয়েছে ইন্টারভিউ-এ এবং ভারতবর্ষের প্রায় ১০-১২টি প্রধান শহরের যে কোনও কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। বলাবাহুল্য টাকাও খরচা করিনি এবং যাইওনি। পরে কলকাতার একটি পত্রিকায় এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এক আলোচনা ছাপা হয় আমার। হঠাৎ বম্বে ছেড়ে অতদূরে ছবি তোলার কি অর্থ তা আমার বোধগম্য হয়নি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি খাস কোলকাতার কাহিনী। এটাও ১৯৬১-৬২ সালের কথা। উত্তর কোলকাতার কোন এক প্রডাকসন্স তাঁদের নির্মীয়মান চিত্রের জন্য উদীয়মান অভিনেতা-অভিনেত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন, এবং আমি দরখাস্ত পাঠাই। জবাব পাই যে মনোনীত হয়েছি এবং সাক্ষাৎকা[illegible] ১৫০ টাকা লাগবে, উক্ত টাকা পাঠানো ভাল। কোলকাতার এক বহু [illegible] যখন [illegible] প্রডা[illegible] ব্যাপারটা [illegible] একটু মজা দেখবার জন্যই জিদ [illegible] পড়লাম সেখানে, একটা গ্রে[illegible] কর্মচারীর নির্দেশে যাঁর সঙ্গে দে[illegible] তিনিই স্বনামধন্য হিরো-বানানো[illegible] আমাকে দেখে বললেন, আমার ন[illegible] লাইনে সম্ভাবনা আছে, লেগে থা[illegible] তবে রাতারাতি সকলে উত্তমকুমার [illegible] পারেন না। বলাবাহুল্য ঐদিন আ[illegible] দেখিনি হিরোর ইন্টারভিউ দিতে। কাজের [illegible] এইরকম [illegible] প্রতিষ্ঠান লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে। জনৈক [illegible] ভাবে প্রতারিত হয়েছেন। 'অমৃত' জাতীয় আলোচনা দেখে নিজের [illegible] লিখে জানালাম। এখনও যাঁরা এ[illegible] পা দেন নি, তাঁরা সাবধান হবেন ব[illegible] নমস্কারান্তে। বিনীত—

[illegible]

''সাময়িককালের সমালোচক র[illegible]নাথ'' ও ''নতুন ঠগী'

গত ১৫ই কার্তিকের অমৃতের শ্রীঅমিয়সূদন ভট্টাচার্য রচিত 'সাম[illegible] সমালোচক রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক [illegible] খুবই আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। [illegible] মনে হয়, এটুকুই সমালোচক রবী[illegible] শেষ পরিচয় নয়। তিনি যদি এ স[illegible] গবেষণা চালিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধ[illegible] তাহলে কবি প্রতিভার আরও বড় বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ রূপ আমাদের উদ্ঘাটিত হবে। সাহিত্য জীবনে [illegible] বৃত্তি বড় একটা অগোচরে[illegible] বরং এ-থেকেই সম-সাময়িককালের সা[illegible] গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা স[illegible] ধারণা গড়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উ[illegible] করছি—সেটি হল শ্রী[illegible] রচিত [illegible] ঠগী শীর্ষক রম্য রচনাটির জন্য। ই[illegible] স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরু[illegible] মধ্যে যে উৎকট সিনেমাপ্রীতি লক্ষ্য ক[illegible] তা' খুবই পীড়াদায়ক। বিজ্ঞাপনের [illegible] দিয়ে যারা অবাধে মুনাফা লুটছেন [illegible] শাস্তির মাধ্যমে কিছুটা শিক্ষা দে[illegible] প্রয়োজন। না হলে তাদের এই উপদ্রব ঠ[illegible] অত্যাচারের মতই শহরের বুকে দেখা দে[illegible]

[illegible]
[illegible], কলকাতা

সম্পাদকীয়
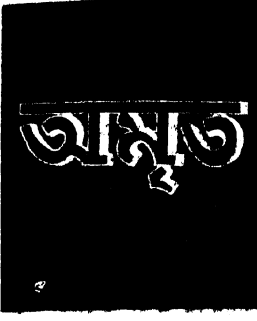
ম্যাকনামারার কলকাতা দর্শন

গত সপ্তাহে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা কলকাতা সফর করে গেলেন। এই শহরের বিশেষ কিছু তিনি দেখতে পারেন নি। ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখিয়ে, ট্রাম পুড়িয়ে, বাস জ্বালিয়ে ভদ্রলোককে বলতে গেলে রাজভবনেই বন্দী করে রেখেছিলেন। রাজনীতি নিয়ে ম্যাকনামারার অতীত কার্যকলাপই বিক্ষোভের কারণ বলা হয়েছে। কিন্তু এখন তিনি আর মার্কিন রাজনীতি বা পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নন। তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক কতটা সাহায্য করতে পারে তার একটা বাস্তব তদন্তের জন্য।

রাস্তার বিক্ষোভ সত্ত্বেও কলকাতার উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে ম্যাকনামারা পুরো দুদিন একনাগাড়ে আলোচনা করেছেন। বিক্ষোভ শান্ত হলে সতর্ক পুলিশ পাহারায় শহরের যতটুকু দেখার তিনি দেখেছেন। আমাদের দিক থেকেও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ, শিল্পপতি প্রমুখ বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতিকে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্গতি এবং কলকাতার শহরের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যই সবচেয়ে সমস্যা-ভারাক্রান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্যই কলকাতার দুর্দশার অবসান জরুরী প্রয়োজন। তিনি নাকি একথাও খোলাখুলি বলেছেন যে, ১৯৬২ সাল থেকে এই শহরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কেউই বিশেষ কিছু করেন নি। এই শহরকে বাঁচানো এবং তার সঙ্গতি, সচ্ছলতা বাড়ানো ও জীবনযাত্রা নির্বিঘ্ন করার প্রধান দায়িত্ব এদেশের লোকের। মূল কাজ করতে হবে রাজ্য সরকারকে, পৌরসভাকে। সাহায্য ও নেতৃত্ব দিতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার। নিশ্চয়ই এ-দাবী কেউ করবেন না যে, বিশ্বব্যাঙ্কের হাতে যখন অঢেল টাকা আছে, তার সভাপতির সদিচ্ছাও আছে তখন তিনিই আমাদের মুস্কিল আসান করুন। বিশ্বব্যাঙ্ক সারা দুনিয়ার চিন্তা নিয়ে কাজ করে—কোনো একটা বিশেষ দেশ বা বিশেষ শহরের প্রতি তার নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব নেই। তবে দেশবাসীর যদি আগ্রহ থাকে এবং শহরবাসীরা যদি নিজেদের সম্পর্কে আরও সচেতন হন তাহলে নিশ্চয়ই বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া দুষ্কর নয়।

দুঃখের বিষয়, এর কোনোটাই এদেশে লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত নয়। খাদ্য দপ্তরের কমিশনারই বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতিকে জানিয়েছেন যে, এই শহরে বিধিবদ্ধ খাদ্য রেশন ব্যবস্থা চালু থাকলেও একজন মানুষের গড়পড়তা প্রয়োজনীয় খাদ্য (পুরুষের জন্য দৈনিক ২৬০০ ক্যালরী এবং স্ত্রীলোকের জন্য ২১০০ ক্যালরী) সরবরাহ তাঁরা করতে পারছেন না। চতুর্থ পরিকল্পনায় কলকাতার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের ৫৪৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে নীরব। কতখানি সাহায্য তাঁরা দিতে পারবেন অথবা আদৌ দিতে পারবেন কিনা তা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় এই মুমূর্ষু শহরকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি তাঁর ডলারের থলে উজাড় করে দেবেন, এটা আশা করাই বাতুলতা।

তবে আশার কথা এই যে, কলকাতার মেট্রোপলিটান এলাকার জন্য সি এম পি ও যে উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান তৈরী করেছেন তা দেখে ম্যাকনামারা খুব খুশী হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এটি একটি শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। দুনিয়ার যত শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা তিনি দেখেছেন তাদের তুলনায় এটি খুবই উচ্চ শ্রেণীর। এই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে পেতে অসুবিধা হবে না বলে তিনি আশ্বাস দিয়ে গেছেন। এখন সেই অর্থ কীভাবে আসবে, কতখানি আসবে সেটাই বিচার্য। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বব্যাঙ্ক সরাসরি কলকাতার জন্য টাকা দিতে পারে না। তাদের দেয় অর্থ আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের মারফৎ। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে কতটা আগ্রহী এবং এই রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কলকাতার বিষয়ে কতটা মনোযোগী করাতে পারবেন তার ওপর নির্ভর করবে কলকাতার উন্নয়ন তথা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ।

কলকাতার উন্নয়নের কাজে সরকার ছাড়াও বেসরকারী শিল্পসংস্থাগুলোর দায়িত্বের কথা বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি স্মরণ করিয়ে গেছেন। সব দেশেই শিল্পনগরীর উন্নয়নে ও প্রসারে শিল্পপতিদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। কলকাতায় তার অনুপস্থিতিতে বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতির বিস্ময় সেহেতুই অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নয়। সরকারী তহবিলে যখন অর্থের অপ্রতুলতা এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক বনিয়াদ যখন মজবুত নয় তখন এটা কি আশা করা যায় না যে, শহরের শিল্পপতিরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে তাঁদের শহরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সাধ্যমত সাহায্য করবেন? কলকাতা নিয়ে বহু কথা বলা হচ্ছে, বহু রিপোর্ট তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। বিশ্বব্যাঙ্ক যদি সদয় হন তাহলে কাজ ত্বরান্বিত হবে। ম্যাকনামারার কথায় সেই আশ্বাস আছে। কিন্তু যদি সেই সাহায্য না আসে তাহলেই কি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব? কলকাতার দারিদ্র্য, কলকাতার বিক্ষোভ, তার তরুণ মনে হতাশা ও বিক্ষোভ, তার ১৫ লক্ষ বস্তিবাসীর অসহনীয় জীবনযাত্রা—এ সমস্তই বিপদের লাল সংকেত। ম্যাকনামারা তার খানিকটা আঁচ করে গেছেন। কিন্তু আমরা তো এর মধ্যেই বাস করি। এ থেকে মুক্তির উপায়ও বের করতে হবে আমাদেরই।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অকটোবর উদযাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবশেষে হেলবিগসহ মরিস এসে হাজির। তাঁর গাড়ীতে তিনি তুললেন গান্ধী, মীরা ও ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীটিকে—পিছন পিছন দ্বিতীয় একটি গাড়ীতে আসতে লাগলেন হেলবিগ ও অন্যান্য ভারতীয়েরা। দুটি গাড়ীর মধ্যে যে ব্যবধান, তা ভর্তি এক গাদা পুলিশে। মন্তে মারিও-র পাদদেশে পৌঁছে তবে হেলবিগের গাড়ী অন্য গাড়ীটির ঠিক পিছনে এসে পড়তে পারল, এবং পাহাড়ের উপরে ওঠার সময় মোড় নিতে গিয়ে হেলবিগ দেখেন, তাঁর গাড়ীর পিছনে সারি সারি আরো চার-পাঁচটা গাড়ী। এই সব সাংবাদিক ও অন্যান্যদের ভিড় থেকে তাঁর বন্ধুর বাড়ীটিকে হেলবিগ রক্ষা করার পথ ভাবতে লাগলেন—দুই গাড়ীর মধ্যে ব্যবধানটা কায়দা ক'রে কমিয়ে তিনি একেবারে মরিসের গাড়ীর ঠিক পিছনে এসে হাজির হ'লেন, অন্যান্য গাড়ীগুলিকে সরিয়ে। মরিসের ভিলা বড় রাস্তার উপর নয়, সেখানে যেতে গেলে ঢুকতে হয় এমন একটা সরু রাস্তায় যার উপর দিয়ে দুটো গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে না। রাস্তাটায় প্রথমে ঢুকল মরিসের গাড়ী, পরেই হেলবিগের গাড়ী। রাস্তাটায় ঢুকেছেন কি হেলবিগ গাড়ীটা থামালেন—সে-মুখ দিয়ে অন্য গাড়ীর ঢোকার পথ রইল না। পিছনের লোকেরা চেঁচামেচি সুরু করল, হেলবিগ কিন্তু নড়েন না। পুলিশের দল তখন তাঁর উপর ছুটে এল, তারাও চেঁচামেচি জুড়ে দিল—তখন হেলবিগ আবার চলতে সুরু করলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে মরিসকে তিনি এইভাবে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। পৌঁছোলেন যখন, দেখেন পুলিশও ঢুকছে বাড়ীতে। একজন পুলিশ এসে দাঁড়াল টেলিফোনের পাশে, আরেকজন বসবার ঘরের ঢোকার পথে—ফলে হ'ল এই যে গান্ধী যতদিন ছিলেন, আলোচনার একটি কথাও পুলিশের অগোচর রইল না। কোনো এক সময় বাগানের মধ্যে গান্ধী হেলবিগকে আড়ালে ডাকেন ও রীতিমত জোর দিয়ে (এত জোর দিয়ে গান্ধীকে কথা বলতে হেলবিগ ঐ একটিবারই শুনেছেন) বলেন : "এখন আমাকে সবই বলবেন আপনি, কিছু গোপন করবেন না।" হেলবিগ মুখ খুলতে যাবেন, এমন সময় অল্প দূরে গান্ধীর পিছনে মাদাম মরিসকে হঠাৎ দেখতে পেলেন — সে-ভদ্রমহিলা মরীয়ার মত তাঁকে সাবধান হওয়ার সংকেত করছেন। অতএব মুখ খোলা তাঁর অসম্ভব ঠেকল, শুধু কথা ঘুরিয়ে গান্ধীকে সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়ে বললেন, "কি সুন্দর আকাশ দেখুন, কী আশ্চর্য প্রকৃতি—আজো তা আমাদের, এখনো। এ যদি একদিন হারাতে বাধ্য হই তো সেটা কত বড় দুঃখের কারণ হবে......।" জেনারেল বৃদ্ধ, হৃদরোগে কষ্ট পান, তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভালো নয়, তাই তাঁর প্রতিও নজর তাঁকে রাখতে হয়। পাছে এমন কিছু ক'রে বসেন যাতে সেই স্ত্রীর অবস্থা বিড়ম্বিত হয় বা তিনি প্রচন্ড আঘাত পান বা তাঁর মাথায় 'আসল কর্তার' বজ্র ভেঙে পড়ে, সে-ভয়ে জেনারেল সর্বদাই মুহ্যমান। সুতরাং, মুখ বন্ধ। গান্ধী তাই যতদিন রইলেন তাঁদের সঙ্গে, একটি কথাও শুনলেন না, শুনতে পেলেনই না।

যে-ছত্রিশ ঘন্টা গান্ধী কাটান রোমে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হেলবিগ আমায় দিলেন। গান্ধীর প্রথম বাসনা ছিল ভাতিকান দর্শন করা (এবং আমার মনে হয়, ভাতিকানের প্রভুকেও দর্শন করা, যে-প্রভু তাঁকে সেই দর্শন দিতে কোনো চেষ্টাই করেন নি)। ভাতিকান মিউজিয়মের পরিচালকের সঙ্গে আগে থেকে বন্দোবস্ত ক'রে বিকাল বেলা সেখানে যাওয়া ঠিক হ'ল। একই সঙ্গে স্কার্পাও জানিয়ে রেখেছেন যে গান্ধীকে তিনি কোনো মন্তেসোরি বিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে যাবেন, পরে সেখান থেকে তাঁরা যাবেন কাউন্টেস কার্নেভালির কাছে, তারপর (বন্দুর আমার ধারণা) মুসোলিনীর কাছে। গান্ধী কি আর বলবেন— কৌতূহল জাগে নিশ্চয়ই, সুতরাং রাজী হন। হেলবিগ তাঁকে প্রথমে নিয়ে যান সিক্সটিন চ্যাপেল দেখাতে—তার ধনুকাকৃতি ছাদ, তাতে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর দেয়ালচিত্র, বত্তিচেলীর ছবিগুলি ইত্যাদি। গান্ধী হেসেই চলেন, ঘাড় নাড়তে থাকেন, যদিও তা একেবারেই অভিভূত তাঁকে করে না। শুধু তাঁর আগ্রহ জাগে তখন, যখন শোনেন যে এই কক্ষেই যুগ যুগ ধ'রে পোপের নির্বাচন হয়। বেরিয়ে আসার সময় বেদীর উপর চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর এক ক্রুশবিদ্ধ যীশু তাঁর নজরে পড়ে—চিত্রটি কঠিন ও দৃঢ় ছাঁচে তৈরি। এই একটিমাত্র জিনিষ যা তাঁকে অভিভূত করে। ভাস্কর্যের ঘরে তিনি দাঁড়ান সক্রেটিসের সামনে, চিনতেও পারেন। কিন্তু পরে সিলোনে-র এক মূর্তি দেখিয়ে বলেন, 'সক্রেটিস' (এবং ভুল তিনি করেন নি)। নীল নদ ও তার উৎপত্তি সংক্রান্ত ভাস্কর্যও তাঁর ভালো লাগে, এবং হয়তো লাওকুনের (গ্রীক পুরাণে কথিত এক ব্যক্তি, সাপ যাকে পিষে মেরে ফেলে) মূর্তিটিও পছন্দ হয়। (হেলবিগ অবশ্য শেষের মূর্তিটি সম্বন্ধে কিছু বলেননি, কিন্তু দেশাই 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে এ-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মূর্তিটির উল্লেখ করেন, কিছু হাস্যকর কথাও বলেন। এই বেচারা ভারতীয়দের যে সব বিবরণ শোনানো-টোনানো হয়, তা এঁরা সব গুলিয়ে একাকার ক'রে ব'সে আছেন— দেশাই যেমন সমবেত ভাস্কর্যটিকে এক গ্রীক ভাস্কর ও তাঁর দুই পুত্রের সৃষ্টি বলে বর্ণনা দিচ্ছেন!)

পরে হেলবিগ তাঁকে নিয়ে যান জানিকিউলে (রোমের পাহাড়), সেখান থেকে রোমের উপর সূর্যাস্তের আশ্চর্য আভা দেখান। সেখান থেকে গান্ধী সেদিন যেখানে যাচ্ছেন, হেলবিগ আর সঙ্গ নিচ্ছেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, কাউন্টেস কার্নেভালির বাড়ী সেদিন ফ্যাশিস্ট সংবাদপত্রের হোমরা-চোমরারা আসছেন ও যাঁদের অন্যতম ছিলেন রোমের প্রসিদ্ধ খবরের কাগজ 'জিওর্নালে দিতালিয়া'-র পরিচালক। এই শেষোক্ত ভদ্রলোকটি এক বর্ণ ইংরেজী জানতেন না, সুতরাং গান্ধী যা বলবেন,

তা বোঝা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল, তা সত্ত্বেও পরের দিন কাগজে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের এক প্রকাণ্ড বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন। সে-বিবরণে গান্ধীর যে-মনোভাব চিত্রিত, তা একেবারে পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট (এমন কি হিংসাকেও তাঁর যুক্তি-যুক্ত ক'রে তোলার প্রচেষ্টা)। প্রবন্ধটি বিতর্কের ঝড় তোলে, গান্ধীর প্রতি অনেকে রেগেও যান এই কারণে। গান্ধী অবশ্য প্রবন্ধটি সম্বন্ধে অবহিত হন ফেরার পথে জাহাজে, হয়তো মিশরে পৌঁছেই, এবং সেখান থেকে টেলিগ্রাম ক'রে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু সাংবাদিকটি তাঁর সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ অটুট রেখে দিলেন।

যদি ভুল না করি (ঠিক ক'টার সময় গান্ধী দেখা করতে যান, সে-বিষয়ে কিছু ভুল সম্ভব), তার পরেই মুসোলিনীর কাছে গান্ধী যান—সঙ্গে ছিলেন মীরা, মরিস এবং দেশাই। মুসোলিনী এগিয়ে আসেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ও তাঁকে ও মীরাকে বসতে অনুরোধ করেন—কিন্তু বৃদ্ধ জেনারেল ও দেশাইকে দাঁড় করিয়েই রাখেন। সেটা যেন তাঁর নজরেই পড়ল না, ভাবখানা এমন। এক সময় গান্ধী (আমার মনে হয়) জেনারেল মরিসকে দেখান, মুসোলিনী তখন সচকিত হ'য়ে তাকান ও নির্লিপ্তের ভাবে বলেন, "জানি, জানি...।" হেলবিগের মতে মুসোলিনী সর্বক্ষণ অত্যন্ত সতর্ক থাকেন—যত প্রশ্ন, তা তিনি একাই ক'রে যেতে লাগলেন, তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে মুখটি খুললেন না।

পরের দিন সকাল-সকাল স্কার্পা এসে হাজির গান্ধীকে 'বালিল্লায়' নিয়ে যাওয়ার জন্য—সেখানে বারো-তেরো বছরের কিশোরেরা গান্ধীর সম্মানে বন্দুকের আওয়াজ করালেন। (ছোট ছেলেমেয়েদের গান্ধী চির-কালই ভালোবাসেন, তাই ব্যাপারটাকে হয়তো তিনি ঠাট্টার ভাবেই নেন।) পরে পার্টির কর্তাদের সঙ্গে এক সভা বসে, যেখানে ফ্যাশিস্ট নেতা স্তারাচে মধ্যমণি হয়ে উপস্থিত থাকেন—আলোচনা নাকি চলে ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে। এই ভদ্র-মহোদয়গণ নাকি মিষ্ট হাসির সঙ্গে ভারতীয়দের পক্ষে অহিংসার উপযোগিতা স্বীকার করেন, কিন্তু স্বভাবতই, ইউরোপে তার প্রয়োগের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

এ-দিনটার ঠিক ঠিক ঘটনাক্রম বর্ণনা করা মুস্কিল—এখানে-ওখানে ভুল হ'তে পারে। শুধু এটুকু জানি, গান্ধীকে এ'রা সমাজ-সেবার কতকগুলি আদর্শ প্রতিষ্ঠান ঘুরিয়ে দেখান (দরিদ্র ও বৃদ্ধদের জন্য হাসপাতাল, ইত্যাদি), শিল্পবিষয়ক শিক্ষায়-তনেও নিয়ে যান, এবং তাঁকে ধাপ্পাও কিছু কম দেন না—কারণ এগুলিকে এ-ধরণের সহস্র সহস্র প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ব'লে গান্ধীর ধারণা যদিও জন্মায়, হেলবিগের মতে আসলে এগুলি সবেধন নীলমণি।

অপরিহার্য স্কার্পা তাঁদের মাননীয় ভারতীয় অতিথিকে আবার টেনে নিয়ে যান পূর্বোক্ত কাউন্টেস কার্লভালির কাছে, এবং হেলবিগ বলেন যে সে-ভদ্রমহিলা এবার নাকি তাঁর স্ত্রী-জাতি-সুলভ নির্বুদ্ধিতা ও হাঁসফাঁস ভাবের চরম পরিচয় দিয়ে ছাড়েন। যুবতী রাজকুমারী মারী নাকি মরিসের বাড়ীতে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চান, এ-যোগাযোগের ফলে আরো একবার কাউন্টেসের এই সভাও তাড়াতাড়ি সাঙ্গ হয়। রাজকুমারীর বয়স উনিশ হ'লেও বুদ্ধি পনের বছরের মত—গান্ধীকে তাঁর স্বদেশের কোনো স্মৃতিচিহ্ন উপহার দেওয়ায় এক মর্মস্পর্শী ও আন্তরিক আগ্রহে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। সেই উপহারের জন্য বেছে বেছে তিনি নিয়ে আসেন এক রকমের ফল, ইতালীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'ভারতের ডুমুর', যা ক্যাক্‌টসের মত কণ্টকাকীর্ণ ও যার সঙ্গে ঐ নামের ভারতীয় ফলটির কোনো সম্পর্কই নেই। তিনি বেশ লাল ফিতে-টিতে বাঁধা একটি সুদৃশ্য মোড়ায় ফলগুলি বহন ক'রে আনেন, যে-ফল উটের কঠিন কর্কশ জিহ্বারই উপযোগী। হেলবিগ বলেন যে সে এক আশ্চর্য মজা, যখন মোড়াটিকে সযত্নে খুলে গান্ধী তাঁর দুষ্টুমিভরা প্রশান্তির সঙ্গে ফলগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন।

রোমে গান্ধীর সম্বন্ধে শেষ যে-স্মৃতি হেলবিগ ধ'রে রাখেন মনে, এবং যে-স্মৃতিটি তাঁর পক্ষে প্রধানতম, সেটি হ'ল শেষ সন্ধ্যার—স্টেশনে, ট্রেণ ছাড়ার সময়। ট্রেণ ছাড়ার মিনিট দশেক আগে গান্ধী কামরায় উঠে জানালার ধারে বসেছেন, শত শত লোকের ভীড় তাঁর কামরার সামনে। হেলবিগ তাদের মধ্যে থাকায় তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। ভিড় যেহেতু লাতিন লোকের, কথাবার্তায় তাদের সংযমের গন্ধ নেই—সকলেই গান্ধীর কুৎসিত চেহারা নিয়ে উচ্চবাচ্য ক'রে চলেছে—এক মুখ থেকে অন্য মুখে শোনা যাচ্ছে ইতালীয় কথা 'ব্রুত্তো', অর্থাৎ কুৎসিত। ভিড়ের মধ্যে থেকে লোকেরা একে একে এগিয়ে আসছে ও গান্ধীর দিকে হাত বাড়াচ্ছে। গান্ধীও তাঁর প্রকাণ্ড দীপ্ত হাসির সঙ্গে তাদের করমর্দন করছেন। তাঁর হাসির সেই দীপ্তি ধীরে ধীরে কাজ করতে সুরু করল, এবং একে ভিড়ের সকলেই মুগ্ধ না হ'য়ে পারল না। শেষে তিনি প্রত্যেকের চিত্ত জয় ক'রে বসলেন—এটা ঘ'টে গেল মাত্র দশ মিনিটে, তাঁর সঙ্গে কারুর একটা শব্দ বিনিময়েরও দরকার পড়ল না। জনতার উপর গান্ধীর কী আশ্চর্য বশীকরণী শক্তি এই দৃষ্টান্তটিতে হেলবিগ তার পরিচয় পেলেন।

স্কার্পা প্রথমে কলম্বোতে ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের পদে মনোনীত হন, সেখান থেকে ঐ রাষ্ট্রদূত পদেই আসেন বোম্বাই-এ —এ-পেশার জন্য যে-গুণাবলী বা অভিজ্ঞতা তার দরকার, তা তাঁর ছিল না। এবং ভারতে এসে তিনি নিজের স্বার্থে গান্ধী-আন্দোলনের খুব সমর্থক হ'য়ে পড়ার ভান দেখাতে শুরু করেছেন, যাতে ইংরেজরা চ'লে গেলে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্তরাধিকার ইতালীর হাতে আসতে পারে।

৩রা মার্চ ১৯৩২—ভারত-সফর শেষ ক'রে এদম' প্রিভা ও তাঁর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সূর্যে ও সমুদ্রের হাওয়ায় তাঁদের চামড়া তামাটে হ'য়ে গেছে। দু-মাস ধ'রে ভবঘুরের মত ভারত পরিভ্রমণকালে যা কিছু তাঁরা দেখেছেন ও শুনেছেন, তা বলতে শুরু করলেন। তাঁদের বোম্বাই পৌঁছানোর আ... থেকে দশ-দিনের মধ্যে গান্ধী বন্দী হন—তিনি তাই তাঁদের জন্য বিশেষ কিছু ক'রে ওঠার সময় পাননি, শুধু তাঁর হিজিবিজি হস্তাক্ষরে দু-লাইন লিখে দেন ছাড়পত্রের মত—ভারতে যাঁরা কংগ্রেসের স্বপক্ষে তাঁদের প্রতি উদ্দেশ ক'রে তাঁর এই দু-লাইন, যাতে তাঁরা প্রিভা দম্পতিকে সাদর আপ্যায়ন করেন। কিন্তু যাদুর মত কার্যক...

হয় এই সামান্য ক'টি লাইন—এর কারণে যেখানে তাঁরা যান সেখানে সকল দরজা খুলে যায়, তাঁরা হাজির হ'তে পারেন সকল সভায়। এবং যেটা আশ্চর্য, সেটা হচ্ছে এই যে ব্রিটিশ সরকার ও তার পুলিশের কাছেও গান্ধীর এ-লাইন ক'টি সমীহ জাগায়। প্রিভা দম্পতি যে-খোঁজখবর নেন, তার সিম্ধান্ত অতি পরিষ্কার, এবং সেটা তাঁরা লাট সাহেব উইলিংডনকে নিঃসংকোচে জানাতেও পেছপাও হননি। উইলিংডন তাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোপ-আলোচনা করেন নতুন দিল্লীতে, এবং হাত দুটো তিনি আকাশে তোলেন তাঁদের এই বক্তব্য শুনে ঃ ভারতের শতকরা ৯৫ ভাগ পুরো-পুরি গান্ধীর পক্ষে। হিন্দু-মুসলমান-পার্সী নির্বিশেষে। এবং লাট সাহেবের হিংসাত্মক পদ্ধতির সব থেকে বিরোধী যাঁরা, আজ তাঁরা মধ্যমপন্থী—এ'রাই কাল পর্যন্ত ইংলন্ডকে সমর্থন করতেন। লর্ড উইলিংডন প্রিভা দম্পতির মনের উপর একটা দাগ কাটতে পেরেছেন, সে-দাগ কোনো দুর্বল মানুষের নয়, যদিও দুর্বলই তাঁকে লোকে ব'লে থাকে (আমিও বলেছি)—উল্টে তাঁদের মনে হয়েছে, লোকটা একটা একগুঁয়ে গাধা। তাঁর শ্রেণীগত পরিচয় দিতে গিয়ে প্রিভা বললেন, 'এক বুড়ো শিকারী'—তিনি যাতে পয়সা কামান, তাঁর হারানো ভাগ্য ফিরে পান, সেই কারণেই তাঁকে সেখানে বসানো হয়েছে। গ্রামীণ সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সুলভ সব সংস্কারই তাঁর আছে—গান্ধীকে তিনি ঘৃণা করেন, তাঁকে মনে করেন কুচক্রী ও প্রতারক। গান্ধী ও তাঁর শিষ্যদের যে তিনি সমূলে বিনষ্ট করতে পারবেন, এ-সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ নেই, অন্ততঃ সেরকমই মনে করতে চান। কিন্তু বোকা ব'লেই যেটা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না, সেই জিনিসটাই তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইমারসনকে ভয়ে কাঁপিয়ে তোলে। ইমারসন বুদ্ধিমান, বোঝেন কী প্রচন্ড ভুল করা হয়েছে—সে-ভুল শোধ-রানোর জন্য তাঁর ক্লান্তিকর চেষ্টার অন্ত নেই। গান্ধীর কংগ্রেস পার্টিকেই যে ভারতীয় রাজনীতির একমাত্র শক্তি ব'লে এরা জানেন, সেটা মানতে এদের আপত্তি নেই—কিন্তু তাই ব'লে তো তাকে গ্রহণ করা যায় না বা তার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া চলে না। সেটা করলে ইংলন্ডের ভারতীয় মিত্রপক্ষের (যেমন পোষ্যপুত্র রাজরাজড়ারা) প্রতারণা করা হবে। কিন্তু মালব্যের মত ইমারসনও স্পষ্টই জানেন যে সেদিন আসন্ন, যেদিন গান্ধীই দেশের সত্যকারের কর্তা হবেন। প্রিভা দম্পতি যেখানে গেছেন, পুলিশ তাঁদের পিছু নিয়েছে—নতুন দিল্লীতে তাঁদের সম্বন্ধে একটি গোটা ফাইল পর্যন্ত ছিল। অবশ্য এমনও হয়েছে যে পুলিশ কখনো কখনো তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, হেন কর্তব্য পালন ক'রেই তাদের জীবিকা অর্জন করতে হয়, এমন ইঙ্গিতও তাঁদের দিয়েছে। অন্যদিকে, অসহায় জনতার উপর পুলিশের যে-অমানুষিক লাঠিচার্জ—হাত ঘুরিয়ে যে-লাঠি তারা মারে সরাসরি জনতার মুখে ও যা জনতা সহ্য করে নীরবে, যতক্ষণ পারে, অর্থাৎ যতক্ষণ না সে-জনতা শক্তিহীন হ'য়ে ভূপতিত হয়—সেই লাঠি-চার্জ সম্বন্ধেও প্রিভা দম্পতি বললেন, প্রায় সবক্ষেত্রেই এমন ধরনের পাশবিক অত্যাচারে লিপ্ত হয় একমাত্র ইংরেজ পুলিশই (জনতার গায়ের উপর সেই পিতলমুখী লাঠি পড়ার ভয়ংকর বধির শব্দ প্রিভা দম্পতির কানে যেন এখনো বাজছে)। ভারতীয় পুলিশ শুধু লাঠি তুলে মারার ভান করে মাত্র, এবং তারা মারে শুধু পলায়নরত ভীরুকেই, কিন্তু বীরের মত শান্তিপূর্ণভাবে মুখ তুলে যারা প্রতিরোধ জানায়, তাদের ভারতীয় পুলিশ ছোঁয় না। এর থেকে অনুমান করা চলে যে যে-ভারতীয় বাহিনীকে ঘুষ দিয়ে ব্রিটিশরা বশে আনার চেষ্টা করছে, তারাই একদিন হঠাৎ বিদ্রোহ ক'রে উঠতে পারে। প্রিভা দম্পতি এটাও বললেন, সে-দেশে সংবাদপত্রের সব খবর নিষিদ্ধ সে-দেশে অজান্তে কত শীঘ্র যে কোনো ঘটনার কথা লোকে জানতে পারে—এই যেমন, তাঁরা যে কোনো বিশেষ শহরে এসেছেন, সেকথা আধঘন্টার মধ্যে সারা শহরে প্রচারিত হ'য়ে গেছে। শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গুপ্ত-চরের দ্বারা পরিবৃত হ'য়েও গোপন সভা-সমিতিতে তাঁরা যোগদান করতে পেয়েছেন, যে-সভা হয়তো প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা ডেকেছেন, পুলিশের নাকের ডগায়।—শান্তিনিকেতনে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখতে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহ্যের সীমায় এসে পৌঁছেছেন, আর পারছেন না, কোনো সংযমেরই তিনি আর ধার ধারেন না। তাঁর বিদ্রোহ তার প্রচণ্ডতায় গান্ধীবাদীদেরও ছাড়িয়ে যায়, ইংরেজ নাগরিক হ'য়ে তিনি আর থাকতে চান না—প্রিভাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, যাতে তাঁকে সুইস নাগরিকত্ব দেওয়ার বন্দোবস্ত এখুনি-এখুনি করা হয়—বেলুড়ের রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রিভা দম্পতি বৃদ্ধ শিবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—তিনি নড়তে চড়তে আর পারেন না, কথাও প্রায় বলেন না, কিন্তু প্রিভা-দম্পতির কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের নানান সুখবর শুনে তাঁর মুখ দীপ্তিমান হ'য়ে ওঠে। এ'দের মাধ্যমে আমাকে তিনি নমস্কার পাঠিয়েছেন—ভারতে সর্বত্র লোকে আমাকে জানে, ভালোবাসে। যেটা আশ্চর্য, গান্ধীর উপর আমার লেখাগুলির কথা কেউ তোলে না, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার রচনার প্রসঙ্গটাই খুব বেশি ক'রে পাড়ে। (ক্রমশঃ)

ফুলদানি

রমেন গঙ্গোপাধ্যায়

একটা নারকেল নিয়ে কান্ড। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়। কোন অঘটনই নয়। অভাবের সংসারের প্রতিদিনের যা ভাব তাই। ক্রমিক সংখ্যাটাই শুধু যা বাড়িয়ে তোলা। এক পুকুর জলে এক ঘটি জল ঢালা।

নিতান্ত সাধারণ চাকুরে নরোত্তম। শ' দুই টাকার মাইনেতে এতদিনে উঠেছে। ওতেই ঘর-ভাড়া, জলের ভারী, ঘুঁটে, কয়লা, ইলেকট্রিক আর একপোয়া দুধের দাম পর্যন্ত। ওই সব মিটিয়ে হাতে যা থাকে, তাতে চাল-ডাল, তেল-নুন, চা-চিনি কেনাকাটার পর তরকারীর বাজারের পয়সা আর কুলোয় না। আর একটা নারকেলের এ বাজারে দাম এক টাকার কম নয়। এক-মুঠো নারকেল কাঠির ঝাঁটার দামই ষাট পয়সা। দু'মাস অন্তর ঝাঁটা কিনতেই যা নারকেল গাছের সঙ্গে সম্পর্কটা বজায় আছে, নইলে তার বংশধরদের নাগাল পাওয়া অর্থাৎ সরাসরি নারকেলের দাম জিগ্যেস করে একটা নারকেল হাতে নিয়ে যে বাসায় ফিরবে এমন অবস্থা নরোত্তমের নয়। কিন্তু মিনতি সে কথা বুঝতেই চায় না।

—'এত বড় পুজো গেল একটা নার-কেলের মুখ দেখতে পেলাম না।' এ আক্ষেপ মিনতি গেল বছর বিজয়া দশমীর রাত্রি থেকে সুরু করেছিল।

তখন নরোত্তমের মাইনে অবশ্য আরো কম ছিল। কাজেই অজুহাতেরও একটা রাস্তা ছিল। —'বুঝতেই তো পারছ নতুন চাকরী। তাছাড়া এক জায়গার ঘর তুলে আর এক জায়গায় বসান চাট্টিখানি ব্যাপার নয় তো।'—মিনতির স্বরেই বলেছিল নরোত্তম। আর মোকা পেয়ে 'শালার' কোম্পানীও তাকে কম মাইনে দিচ্ছে। তার প্রতি অবিচারের কথাটাই মিনতিকে বলতে চেয়েছে। প্রমাণ করতে চেয়েছে যথার্থ মূল্য সে পায়নি। তার যোগ্যতার বিচার এ পৃথিবীর মানুষ কোনদিনই করতে পারল

...। নরোত্তমের ক্ষোভের ভঙ্গিটা প্রায় এই রকম।

চাকরীর প্রয়োজনটা অবশ্য সেদিন নরোত্তমেরই ছিল বেশী। যা নরোত্তমের মত সব মানুষেরই থাকে। পুরনো চাকরীটা হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিশে যাবার পর ভেঙে পড়বার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। মিনতিকে কথাটা বলতেই ককিয়ে উঠেছিল মিনতি—

—'কি হ'বে?'

—'হ'বে আর কি? আবার নতুন চাকরীর সন্ধান করতে হবে। আবার নতুন করে সংসার পাততে হবে।' নরোত্তমের চোখের দৃষ্টি, কপালের কুঞ্চন এবং জগতের এই নিত্য ভাঙা-গড়ার খেলা সম্পর্কে নরোত্তমের নিস্পৃহ ভাব সেদিন মিনতিকে চমকে দিয়েছিল।

—'কিন্তু যতদিন জোগাড় না হয় ততদিন?'

—'ভগবান মালিক।' চিরদিনের অবিশ্বাসী নরোত্তম সেদিন হঠাৎই ভগবানে পরম বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। মিনতির ভয় হয়েছিল। চাকরীর শোকে লোকটা কি শেষ পর্যন্ত সংসার-টংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবে নাকি?

—'তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু কাল বাদে পরশু কি হবে, তার ঠিক নেই। তখনই বলেছিলুম, কিছু বেশী চাল-ডাল আনতে, তা না জিনিস আনবে সব চারে-পোয়ে।' মিনতি হিসেব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নরোত্তমের হঠাৎ বিশ্বাসী মনটাকে খোঁচা মেরে যদি স্বাভাবিক করা যায়।

কাজেই নরোত্তম যখন এই চাকরীর সন্ধান পেল, তখন সামান্য কটা টাকার হিসেব করে চাকরীটা ফসকে যেতে দেয়নি। নরোত্তম তার নিজস্ব দূরদৃষ্টিতে এটুকু বুঝে নিয়েছিল, যে চাকরী তাকে সারা জীবনই করতে হবে। এমন নয় যে, দু'দশ টাকা বেশী মাইনের চাকরী করে দু'চার মাস পরে চাকরী ছেড়ে পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারবে। তাই সেদিন যে মাইনে তাকে দিতে চেয়েছিল, নরোত্তম তাতেই রাজি হয়েছিল। আশা ছিল, ক্রমশঃ মাইনে বাড়বে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিনতি সবই জানে। সমস্তই বলেছিল নরোত্তম। সেদিন মিনতি হাঁপ ছেড়ে বলেছিল, —'যাক বাবা, একটা চাকরী তো পেয়েছ।'

—'তা পেয়েছি, কিন্তু ওই মাইনেতে চালাতে পারবে তো?'

—'তোমার চেয়ে কম মাইনে বুঝি আর কেউ পায় না?—আমাদের তো মাত্তর দুটো পেট।' প্রকৃত সহধর্মিণীর মতই আবশ্যারা নরোত্তমের বুক ঘেঁসে বসে মিনতি কথাগুলো বলেছিল।

—তবু নরোত্তম আর একবার বাজিয়ে দেখতে চেয়েছে, বলেছে,—'ওই মাইনের মধ্যে ঘর-ভাড়া, জল, ইলেকট্রিক, কয়লা, ঘুঁটে সব কিছু করতে হবে।'

—'তিকে তো করতে হবে না।' এ কথার ওপর আর কথা চলে না। মিনতিকে এত সুখী বোধহয় নরোত্তম আর কখনও দেখে নি। না,—আগেও না, পরেও না।

মিনতি বলেছে,—'ভেবে ভেবে এই কদিনে তোমার চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছ আয়নায়?' নরোত্তমের চুলে বিলি কাটতে কাটতে মিনতি বলেছিল,—'আগে বসি, তারপর শোবার জায়গা ঠিক হয়ে যাবে।'

—'সে তুমি পারবে।' নরোত্তম আরও পুরনো ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।

লজ্জা লজ্জা মুখ করে মিনতি হেসেছিল। বলেছিল, 'বেশ যাও।'

—'যাবার উপায় আর কোথাও রেখেছো নাকি?' আদর করে মিনতির গাল দুটো টিপে দিয়েছিল নরোত্তম।

—'আমি একাই সব করেছি না? তোমার বুঝি ইচ্ছেই ছিল না?'

ইচ্ছে অবশ্যই ছিল নরোত্তমের। কিন্তু মুখচোরা নরোত্তম আড়াল থেকে মিনতির মুখের দিকে চেয়েই থেকেছে। মুখফুটে কিছু বলা দূরে থাক, মিনতি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, নরোত্তম তার সাত-হাত দূরের পথ দিয়ে ঘুরে গেছে।

সুযোগ বা যোগাযোগ ঘটলো একটা থিয়েটার নিয়ে। পুজো উপলক্ষে সখের থিয়েটার। সেই থিয়েটারে নরোত্তমকে মিনতির বিপরীতে অভিনয় করার জন্য বলেছিলেন মিনতির বাবাই। আর মিনতি বিদ্রূপ করেছিল,—

—'ও'কে তাহলে আমার পার্টটা দাও বাবা, আমি বরং ও'র পার্টটা করবো।'

সবাই অবাক চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছিল মিনতির দিকে—তার মানে?

—'বেশ লাজুক লাজুক ভাব, মেয়েছেলের অভিনয় ভালই করবেন।' হাসির রোল উঠেছিল মিনতির কথায় আর নরোত্তমের কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে উঠেছিল লজ্জায়।

রিহার্সালেও ঠিক বোঝা যায়নি। কিন্তু থিয়েটারের দিন আর একবার অবাক হতে হয়েছিল সবাইকে, মিনতিকেও। মুখচোরা নরোত্তমের মুখে যেন খই ফুটছে। শুধু অভিনয়ই নয়, গানের গলাও নরোত্তমের অপূর্ব। প্লের শেষে ফাঁক পেয়ে মিনতি নরোত্তমকে জিগ্যেস করেছিল,—'মুখচোরার ভাবটাও তাহলে আপনার অভিনয়।'

নরোত্তম জবাব দেয়নি। মৃদু হেসেছিল।

এর পরের যা কিছু করণীয় মিনতিকে অবশ্য একাই করতে হয়েছিল। নইলে নরোত্তমের ভরসা করলে মিনতিকে জীবন-যৌবন জলাঞ্জলি দিতে হত।

থিয়েটারের পর দিন দুই-তিন পথে-ঘাটে নরোত্তমকে কোথাও পাওয়া গেল না। কখন অফিসে যায়, কখন ফেরে কিছুতেই হদিশ পায় না মিনতি। শেষে মরিয়া হয়ে নরোত্তমের বাসায় গিয়ে হাজির। অজুহাত অবশ্য একটা দেখাতে হয়েছিল। ওই পাড়াতেই মিনতির বেড়াতে আসার মত বাড়ির অভাব ছিল না। কাজেই বেড়িয়ে ফিরবার পথে নরোত্তমের খবর নেওয়াটা এমন কি অন্যায় বলে ভাবতে পারে কেউ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল নরোত্তম। বাইরের দরজা খোলাই ছিল, ঘরে ঢুকেই মিনতি প্রশ্ন করেছিল,—

—'একরাত্রি থিয়েটার করে একমাস বিছানায় পড়ে কাটাবেন নাকি?'

নরোত্তম চমকে উঠেছিল। —'এ কি তুমি মানে আপনি?' বয়সে বড় হলেও বিশ বছরের মেয়েকে অনুমতি না নিয়ে তুমি বলাটা যে অশোভন সেদিকে টনটনে জ্ঞান নরোত্তমের।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল মিনতি।

—'কি ব্যাপার এত হাসির ধুম?' নরোত্তম বুঝতে পারে না।

—'আপনার ওই ভদ্রতা দেখে। পাকা একমাস রিহার্সালে তুমি তুমি করেও পুরনো অভ্যাসটা ঠিক রাখতে পেরেছেন।' নরোত্তমের একমাত্র সম্বল বিছানাতে বসে পড়ে বলেছিল মিনতি।

নরোত্তম সসম্ভ্রমে সরে বসতে মিনতি আর একচোট হেসে উঠেছিল। বলেছিল,—'গোটা কোলিয়ারীর লোকের সামনে পাশে বসে হাত ধরে কি কাণ্ড করেছেন আর আজ দেখছি ভারি লজ্জা।'

—'অভিনয় অভিনয়ই।' নরোত্তম কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছিল।

—'প্রাণের কোন সম্পর্ক তাতে রাখা উচিত নয়—না?' যুগপৎ অভিমান আর অপমান মিনতির ফরসা গালটায় যেন এক পোঁচ আলতা বুলিয়ে দিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল—'তাহলে যাই।'

—'না—না আমি অন্যায় করেছি মিনতি-দেবী।' কিছু না ভেবেই ওর হাত দুটো চেপে ধরেছিল নরোত্তম।

—'আবার হাত ধরলেন তো?' মিনতির কণ্ঠস্বরে কৌতুক।

নরোত্তম সে কথার জবাব না দিয়ে বলেছিল,—'একটু চা করি, বসুন।'

আর গরজ দেখায় নি মিনতি। বলেছিল,—'বসতে পারি, তবে ওই দেবী, বসুন, এগুলো ছাড়তে হবে।'

—'বেশ বলব।'

—'বলব নয় আগে বলুন।' সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি মিনতি।

কলে-পড়া ইঁদুরের অবস্থা তখন নরোত্তমের। চিঁ চিঁ করে বলেছিল,—'কি বলব বলে দিন।'

—'বলুন, বোস মিনতি—একটু চা খেয়ে যাও।' মাস্টারনীর মত ভঙ্গি করে বলতে গিয়ে হাসিটা বহু কষ্টে চাপতে হয়েছিল মিনতিকে।

তারপর যা ঘটে, তাই ঘটেছিল। দু'চার দিন পরে মিনতি একদিন লজ্জা-লজ্জা ভাব নিয়ে এসে বলেছিল, 'সবাই কি বলছে জান?'

—'না বললে জানব কি করে?' নরোত্তম এই কদিনেই মিনতির শিক্ষা-নবীশিতে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে তখন।

—'যাঃ আমার ভারি লজ্জা করে।' মিনতি নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে নরোত্তমের দিকে একবার চেয়েই মুখ নীচু করে ফেলে।

মিনতির এই ভঙ্গিটা বেশ লাগে নরোত্তমের। কাজেই নরোত্তম মিনতিকে বুকে টেনে নিয়ে জিগ্যেস করেছিল—'এই বল না, কি বলছিল সবাই।'

—'বলছিল [illegible] মানায়, কিন্তু দু'-জনকে।' মিনতি নরোত্তমের কোলে মুখ গ'ুজে দিয়েছিল।

জোরে হেসে উঠেছিল নরোত্তম আর মিনতি আরও লজ্জা পেয়ে বলে উঠেছিল—'আহা আমি বলেছি নাকি?'

বেশ চলছিল। সবই ঠিকঠাক। মিনতির বাবাই শেষ পর্যন্ত কথাটা পেড়ে বসলেন নরোত্তমের কাছে। খবরাখবর নিয়ে আগেই জেনেছিলেন ত্রিসংসারে একা নরোত্তম ছাড়া তার আর কেউ নেই। বিঘে কতক জমি আর একখানি মাটির ঘর আছে দেশে। এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের ওপর দেখাশোনা করার ভার দেওয়া আছে। বছরের শেষে অজন্মা, অতিবৃষ্টি না হয় অনাবৃষ্টি একটা না একটা কিছু ঘটেই। ধান কিংবা ধন কোনটাই তাই নরোত্তমের কপালে জোটে না। কাজেই নরোত্তমের মতামতই চূড়ান্ত।

সব কথা শোনার পর নরোত্তম বলে বসল,—'ভেবে দেখি।'

—'মানে?' দরজার আড়ালেই বসেছিল মিনতি। নরোত্তমের কথা শুনে হাড়-পিত্তি জ্বলে ওঠে। নিজেকেই তাই ধমকে ওঠে নিজের অজ্ঞাতে।

এবং প্রায় পিছনে পিছনেই ছুটে আসতে হয়েছিল মিনতিকে নরোত্তমের বাসায়।

'এটা কি রকম হল?' মিনতি তখন হাঁপাচ্ছে।

—'কোন্‌টা?' নরোত্তম মিনতির প্রশ্ন যেন বুঝতে পারে না।

—'এতদিন পরে তোমার আজ ভেবে দেখবার সময় হল বুঝি?' মিনতির নাকের পেটি দুটো ফণা তোলা সাপের পেটের মত ফুলে ফুলে ওঠে।

—'কেন, অন্যায়টা কি বলেছি?' নরোত্তম সহজ হতে চেয়েছিল।

—'না তুমি অন্যায় করবে কেন, অন্যায় আমি করেছি।'

মিনতির দুই কাঁধে দু'হাত রেখে নরোত্তম বলেছিল, 'কি হয়েছে? এত উতলা হচ্ছ কেন?'

—'আর একটা মাস পেরুলে আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর পথ নেই তা জান? অথচ মাঝে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, তিনটে মাসে কোন দিন নেই।'

'সেকি? আত্মহত্যা করবে কেন?' নরোত্তম অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছে।

—'এত ছেলেমানুষ তুমি নও, সেকথা তুমি নিজেও জান।'—কেঁদে-কেটে একসা করেছে মিনতি।

—'ওঃ এই কথা—ঠিক আছে এই মাসেই হবে।' যেন দেশের লোকের গরজেই ইলেকশানে দাঁড়ান। নরোত্তমের আশ্বাসের মধ্যে [illegible] একটা বদান্যতা-ভাব।

মিনতি বিশ্বাস করতে পারেনি তবু। বলেছে,—'না, তুমি এক্ষুনি বাবাকে বলে আসবে চল।'

অথচ সবটাই মিথ্যে। এত কাঁচা মেয়ে মিনতি [illegible] নরোত্তমের প্রশ্নের জবাবে নির্বিকার উত্তর দিয়েছে—'ওই কথা না বললে বুঝি তোমায় রাজি করাতে পারতুম?'

—'তাতে পৃথিবীটা এমন কি রসাতলে যেত শুনি?'

—'বারে, মেয়েছেলে বলে বুঝি দাবী-দাওয়া কিছুই থাকতে নেই? সুখের ভাগটুকু নিয়ে সরে পড়তে চায় সব পুরুষই।' নরোত্তমকে দু-চার কথা এখন শোনালেই বা কী?

—'পুরুষমানুষ সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখছি তোমার?'

—'অন্ততঃ তোমার মত পুরুষ সম্পর্কে নিশ্চয়ই।'

—'কিন্তু ঠকসে না জিতলে চিন্তা করেছ।' নরোত্তম মিনতির মনটা জানতে চেয়েছে।

—'বলব?' মিনতির কথার ভাঙ্গতে একটা রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এমন কি নরোত্তমের বুকটাও তখন ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করেছে মিনতির রায়ের অপেক্ষায়।

—'বল না।' তবু জোর করেই বলেছে নরোত্তম।

—'জিতেছি।'

হাঁপ ছেড়েছে নরোত্তম। বরং তখন একটা খেলায় পেয়ে বসেছে—

—'কি করে বুঝলে? রূপে তো কার্তিক, গুণেও সরস্বতী আর মালক্ষ্মীর কৃপা মাসকাবারী ওই একশ তিরিশ।'

'সবাই খুসী হয়েছে।' স্বপ্নের মত শুনিয়েছিল মিনতির কথাগুলো। স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল মিনতিকেও।

—'কিন্তু ওই কটা টাকায় এতদিন একটা পেটেই চালানো দায় হয়ে উঠেছে, দুটো পেট চলবে কি করে বলো তো?'

—হিন্দুর ঘরের মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়েও রাজপ্রাসাদের সুখে থাকে।' চিন্তিত নরোত্তমের সব চিন্তার অবসান হয়ে গেছে।

আরো বলেছে মিনতি। স্বপ্নের মত করেই বলেছে,—'আমাদের একজনের বিছানাই যথেষ্ট'—একটুকরো কাঁথা হলেও ক্ষতি নেই। আমি শোব কাঁথায় আর তুমি শয্যা পাতবে আমার বুকের পরে।

সেই মিনতি। আজ পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে তাদের। পাঁচ বছরে পাঁচটা বছর বেড়ে বিশ বছরের মিনতির পঁচিশ হবার কথা। কিন্তু হাবে-ভাবে আর ভঙ্গিতে মিনতি পঁয়তাল্লিশ সেজে থাকে। নরোত্তমের মাঝে মাঝে মনে হয়, এ যেন তাকেই ব্যঙ্গ করা। তার দৈন্যের প্রতি কটাক্ষ করা। যেন চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট দেখিয়ে দেওয়া নরোত্তমের মত মানুষের পঁচিশ বছরের বউ নিয়ে ঘর করার কোন অধিকার নেই।

নরোত্তম তা জানে। জানে বলেই ভাবে এবং দুঃখ পায়। জীবনটা নিয়ে যেন জুয়ো খেলতে বসেছে নরোত্তম। আর তার দানের ঘুঁটি সারা জীবনেও চিৎ হবে না, এ সত্যটা মিনতির কাছে ধরা পড়ে গেছে বলেই সে আরো বিচলিত। আনাড়ির মত এলো-পাথাড়ি খেলে হার মানতে থাকে।

অথচ এটা তার ভঙ্গি নয় মোটেই। মিনতিকে অসুখী করে রাখার ইচ্ছেও নয়। মিনতির মুখের হাসিটুকু দেখার সাধ তারও জাগে আর পাঁচজন মানুষের মত, সাধ্য না থাকলেও। মিনতি হয়ত সেটুকু বোঝে। হয়ত বোঝে না। অথবা বুঝে নরোত্তমের রাশ আলগা করতে চায় না। ছ্যাক্‌রা গাড়ির হাড় জিরজিরে ঘোড়াটাকে রেশের ঘোড়া বানিয়ে তোলার এক অদ্ভুত বোহিসেবী নেশায় যেন মিনতিকে পেয়ে বসেছে। আর সেই জন্যেই পাঁচ বছরে পাঁচটা ছেলেমেয়ের খোরাক-পোষাকের ভাগ মিনতি একাই দাবী করে বসে।

অর্থাৎ একটা চরম কিংবা পরম কিছু করতে চায় নরোত্তমকে। শতকরা নিরানব্বইটি মেয়ের মতই নরোত্তম যা নয় বা কোন দিনই হয়ত হয়ে উঠতে পারবে না, মিনতি ঠিক সেই জিনিসটি সন্ধান করে নরোত্তমের মধ্যে। একদিন যে নরোত্তম মিনতির জীবনে অপরিহার্য ছিল, আজ সেই নরোত্তমকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবা মিনতির প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়বস্তু। নরোত্তম হাঁপিয়ে ওঠে যত, মিনতি ক্ষুব্ধ হয় ততোধিক।

তাই ভালবাসা পঁচিশ বছরের মিনতির কাছে পুরনো শাস্ত্রবাক্য। ভালবাসার ভাব-বাচ্যের পৌনপুনিকতায় মিনতি তাই ক্লান্ত।

এর চেয়ে নরোত্তম যদি হাত পা ছ্ুঁড়ে কিছ্ু বলে, তাও সইতে পারবে মিনতি। অথচ এই বলতে গিয়েই কান্ড বাধিয়ে বসে নরোত্তম।

শনিবারের রাত্রে একটু রাত করেই খায় নরোত্তম। ওরা দ্ুজনেই একসঙ্গে। পরের দিন রোববার। তাড়াহ্ুড়ো নেই বিছানা ছেড়ে উঠার। এটা নরোত্তমেরই নিয়ম। ঘরে যখন শ্বশ্ুর-শাশ্ুড়ী এমন কি একটা বাচ্চা ননদ পর্যন্ত নেই, তখন এত বাছ-বিচার কেন। নরোত্তম খেয়ে উঠবে, তারপর মিনতি খেতে বসবে তারপরেও বাসন মাজা, ঘর ধোয়া—সে অনেক দেরী। তারচেয়ে দ্ুজনে একসঙ্গে খাওয়া ঢের ভাল। মিনতির আগে খাওয়া হয়ে গেলে জোর করেই উঠিয়ে দেয় নরোত্তম। মিনতির নিজের এ'টো বাসনগ্ুলো মাজতে মাজতে খাওয়া হয়ে যাবে নরোত্তমের। অনেকখানি সময় অনায়াসে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া যায়। একসঙ্গে এক থালাতেই খেতে চেয়েছিল নরোত্তম, কিন্তু মিনতিকে রাজি করাতে পারেনি কিছ্ুতে। মেয়েদের চরিত্র যেন গোলকধাঁধা। যে মেয়ে এক আসর লোকের সামনে হেসে-কে'দে, নেচে-গেয়ে থিয়েটার করতে পারে, সেই মেয়ে যে মনে মনে এতখানি মেয়েমান্ুষ, মিনতিকে বিয়ে না করলে সে অভিজ্ঞতা নরোত্তমের কোনদিনই হত না।

আর ঠিক ওই একই কারণে সকালবেলা বাঁটিতে কেটে যাওয়া আঙ্ুলটার ইতিহাস নরোত্তমের যদি জানা না থাকে এবং এত-খানি রাত্রিতে বাসন মাজতে গিয়ে মিনতির অমনি করে চে'চিয়ে ওঠার কারণ ব্ুঝতে না পারলে অপরাধটা কোথায় নরোত্তম ব্ুঝতে পারে না। মিনতিই কি বোঝে? নইলে সামান্য একটা আঙ্ুল কাটা নিয়ে অমন করে চে'চিয়ে ওঠে ব্ুঝি কোন ভদ্র-লোকের প'চিশ বছরের বউ?

—'মরণটা হয় না কেন ভগবান!'

—'কি হলো?' চমকে ওঠে নরোত্তম। আর একট্ু হলে গলায় র্ুটির ট্ুকরো আটকে যেত।

—'ঢের হয়েছে।' ছাই শ্ুধ্ু বাঁ হাত দিয়ে ডান-হাতের ব্ুড়ো আঙ্ুলটা চেপে ধরে কাতরাতে থাকে মিনতি। —'কালকে নিজেই বাজারে গিয়ে চারটি নারকেল ছোবড়া কুড়িয়ে নিয়ে আসব। ঘর যখন করতেই হবে।'

উপলক্ষটা সেই নারকেল এবং লক্ষ্য যে নরোত্তম সেটা ব্ুঝতে কষ্ট হয় না। তার অসন্তোষ এবং অকর্মণ্যতার প্রতি এই প্রচণ্ড ধিক্কারে বিমূঢ় নরোত্তম খাওয়া ভুলে কিছ্ুক্ষণ মিনতির দিকে নিষ্পলক হয়ে চেয়ে থাকে। পরক্ষণেই মিনতিকে নরোত্তমের অসহ্য মনে হয়। র্ুটির থালাটা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বলে ওঠে,—'তোমরা, বাঙালরা নারকেল আর মাছ ছাড়া আর কিছ্ু চেন না।'

তাদের বিবাহিত জীবনে নরোত্তম বোধহয় এমন কথা এই প্রথম বলল। এ ধরনের কথা নরোত্তম বলতেও চায়নি বরং বলতে পারা যায় ম্ুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। সামলে নেবার অবকাশ পায় না। কারণ গরম তেলে জলের ছিটে পড়লে সামলে নেবার অবকাশ থাকেও না। প্রায় স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে ওঠে মিনতি,—'ইতরের মত কথা বোলো না বলে দিচ্ছি'— রাগে আঙ্ুলের যন্ত্রণার কথা ভুলে যায় মিনতি,— 'বিয়ে করবার সময় জানতে না ব্ুঝি আমরা বাঙাল?—নাকি বাঙাল মেয়ের শরীরে বস্তু কিছ্ু কম পেয়েছো?'

—'কিন্তু মাস গেলে একটা করে নারকেল কিনতে হবে জানলে বিয়ে করতুম কিনা আর একট্ু ভেবে দেখতুম।' নরোত্তম হাতম্ুখ ধ্ুয়ে সোজা বিছানায় উঠে বসে।

তারপর আর কোন কথা হয়নি। মিনতি কাটা আঙ্ুল বাঁচিয়ে যতখানি পেরেছে জোরে জোরে এবং চেপে চেপেই বাসন মেজেছে। ঘর ধ্ুয়েছে, মশারী খাটিয়েছে এবং শ্ুয়েই নরোত্তমের দিকে পিছন ফিরেছে। শ্ুধ্ু তাই নয়, অসাবধানতাবশতঃ নরো-ত্তমের হাতখানা একবার মিনতির গায়ে ঠেকেছিল মাত্র মিনতি তাও সরিয়ে দিয়ে যতখানি সম্ভব নিজে দেওয়াল ঘে'সে সরে গেছে। এমনি করেই শনিবারের রাত ভোর হয়েছে। গোটা রবিবারটাও কেটেছে। মিনতি যথারীতি সংসারের সমস্ত কাজ করে গেছে এমন কি রবিবারে বাসায় থাকলে যে বেলা দশটার মধ্যেই তিনবার চা খায় সেট্ুকুরও ত্রুটী রাখেনি।

নরোত্তম মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়েছে। মিনতির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মিনতিও ম্ুখ ঘ্ুরিয়ে বসেছে।

সোমবার সকাল বেলায় নরোত্তমের অফিস যাবার সময়ে মিনতি যা একট্ু ম্ুস্কিলে পড়েছিল। অফিসে যাবার এই সময়টা মিনতি নরোত্তমের গা ঘে'সে এসে দাঁড়ায়। জামার কলারটা অবিন্যস্ত থাকলে ঠিক করে দেয় কিংবা অন্যমনস্ক নরোত্তম জামার এ ঘরের বোতাম ওঘরে লাগিয়ে ফেললে মিনতির দ্ুষ্টিতে ধরা পড়ে যায় ঠিক। এ অভ্যাসটা বিয়ের পর থেকেই আরম্ভ করেছিল। এখন নিয়মেই দাঁড়িয়ে গেছে। প্ুরনো অভ্যাস মতো মিনতি প্রায় এসে দাঁড়িয়েছিল আর কি। নরোত্তমও জ্ুতোর ফিতেটা ঠিক মতো বাঁধতে পারছিল না অনেকক্ষণ ধরে। মিনতি হয়ত শ্ুকনো ম্ুখেই শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াত— নরো-ত্তমের ব্ুক ঘে'সে না হক—কাছাকাছি। নরোত্তমও, আদর না করলেও অন্ততঃ চোখ মেলে চাইত মিনতির ম্ুখের পানে। কিন্তু বারান্দার কাছে ও বাড়ির নতুন বৌটি এসে ডাকতেই মিনতিকে ছ্ুটে যেতে হল বারান্দায় এবং কিছ্ুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, মিনতির কথা শেষ হবার কোন লক্ষণ না দেখে, চলে যেতে যেতে নরোত্তমের মনে হল, এ যেন প্ুর্ব-পরিকল্পিত আয়োজন। নয়ত এত কালের মধ্যে আজকেই বা নতুন বৌটি মিনতিকে ঠিক এই সময়টিতেই ডাকতে আসবে কেন?

অফিসেও মনটা স্ুস্থির করতে পারে না নরোত্তম অনেক চেষ্টাতেও। লেজারের খাতায় যোগবিয়োগের অঙ্কগ্ুলো মিলে-মিশে মিনতির ম্ুখের অবয়বটাই ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সাজলে-গ্ুজলে প'চিশ বছরের মিনতি যেন ঝলমল করে। কিন্তু নরোত্তম জানে মিনতি সাজে না। জানে ইচ্ছে করেই সাজে না। বরং দেখেছে নরোত্তমের পোষাক-আসাকের প্রতি মিনতি যতখানি দ্ুষ্টি দেয়, নিজের বেলায় তার শতাংশের একাংশও নয়। বলার মধ্যে একটা নারকেল কিনে দিতে বলেছিল। নারকেলের শাঁসট্ুকুও চায়নি, শ্ুধ্ু ছোবড়া কটা। শ্ুধ্ু হাতে বাসন মেজে মেজে মিনতির অমন নরম হাত দ্ুখানা কর্কশ হয়ে উঠেছে। নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে নরোত্তম।

বৌটির সঙ্গে কথা শেষ করে এসে মিনতি দেখে নরোত্তম চলে গেছে। একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে ব্ুক থেকে। সারা-দিনে এখন অফ্ুরন্ত সময় মিনতির হাতে। বৌটি যদি আর একট্ু পরে ডাকত কী বা ক্ষতি হত। মিনতি ঘর পরিষ্কারের কাজে হাত দেয়। ঝাঁটার কাজ শেষ করে আয়না চির্ুনী নিয়ে পড়ে। চির্ুনী ম্ুছতে গিয়ে দ্ুটো পাকা চুল আবিষ্কার করে মিনতি। নরোত্তমের মাথার। প'য়ত্রিশ বছরেই অর্ধেক চুল পাকিয়ে বসে আছে নরোত্তম। আজকাল পাকাচুল কাঁচা করার কত তেল বেরিয়েছে বাজারে, কিন্তু নরোত্তম আনবে না। নিজের দিকে চাইবার ফ্ুরসৎ আছে নাকি? আর সংসারের ভাবনায় এই বাজারে কটা বছরই বা মাথার চুল কালো রাখতে পারে মান্ুষ? মিনতি ঘরে বসে হ্ুকুম চালায়। দায়-ঝক্কি তার কতট্ুকুই বা।

নরোত্তম বসে বসে হিসেব করে। আট প্যাকেটে আশীটা চারমিনারের দাম দ্ুটাকা আর চার বান্ডিলে একশ'টা বিড়ির দাম একটাকা। বিড়ি খাওয়া মিনতি মোটেই পছন্দ করে না। কাজেই, বাড়িতে খাওয়ার পরে খাবার জন্যে গোটা দ্ুই-তিন সিগারেট নিয়ে গিয়ে বিড়ির বান্ডিলগ্ুলো অফিসের ড্রয়ারে রাখাই ঠিক করে নরোত্তম।

হিসেব মিলিয়ে বেশ বড়োসড়ো দেখেই একটা নারকেল কিনে বাসায় ফেরে নরোত্তম। এবং নিজের হাতে ছোবড়াগ্ুলো ছাড়িয়ে একপাশে জড় করে রাখতে রাখতে নরোত্তমের মনে হয়,—সেই তো নারকেল কেনাই হল, যদি দ্ুটো দিন আগে ব্ুদ্ধিটা মাথায় আসত।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নারকেল ছোবড়া দিয়ে বাসন মাজতে মাজতে মিনতিরও ঠিক অমনি কথাই মনে হল। নরোত্তমকে ওভাবে সেদিন কথাগ্ুলো তার বলা উচিত হয়নি। অন্ততঃ নরোত্তমের হাতখানা সেদিন সরিয়ে না দিলেও পারত। পরপ্ুর্ুষ তো নয়। শনিবারের রাত্রিটা নরোত্তমের বড় প্রিয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত মিনতিকে জাগিয়ে রেখে নিজেও জেগে থাকতে চায় নরোত্তম। শনিবার আবার পাঁচদিন পরেই ঘ্ুরে আসবে,—মিনতি জানে,—রাত্রিও হবে। কিন্তু যে শনিবারটা চলে গেল, জীবনের সেই শনিবারের রাত্রিটা কি তারা আর কোনদিন ফিরে পাবে— নরোত্তম কিংবা মিনতি?

দেশে বিদেশে

রতে ম্যাকনামারা

শ্বব্যাংক হচ্ছে ডাক নাম। পোশাকী টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ন ও উন্নয়ন ব্যাংক। ঐ ব্যাংকের রবার্ট ম্যাকনামারা সম্প্রতি ভারতবর্ষে রতে এলে সরকারী মহল তাঁর এই যে গুরুত্ব দিয়েছেন অন্য কোন রী বিদেশীকে ভারতবর্ষে আর ততটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা কিনা সন্দেহ।

র্ট ম্যাকনামারা এই বছরের গোড়ার র্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ছিলেন। কিন্তু গত এপ্রিল থেকে শুধুই বিশ্বব্যাংকের সভাপতি। অন্য রিচয় তাঁর নেই। নূতন পদে যোগ পর এই তাঁর প্রথম ভারতে আগমন। াগে গত বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি লক হিসাবে কিছুকাল কলকাতায় । ভারতে আসার আগে তিনি এই আফগানিস্থান ও পাকিস্থানেও ঘুরে । এবং পথে মস্কোতে কিছুকাল । করে রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের থা বলে এসেছেন।

য়ন পরিকল্পনার জন্য ভারতবর্ষকে েকের ঋণের উপর যে পরিমাণে করতে হয়, বৈদেশিক সাহায্য অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় ভারতের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে যে ার সৃষ্টি হয়েছে সেসব মনে রাখলে হবার কিছু থাকে না যে, বিশ্ব- প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার রকে ভারতের সরকারী মহল অভূত- রুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

সফরে ম্যাকনামারা নয়াদিল্লীতে ি, প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রীর থা বলেছেন, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে না করেছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা- সঙ্গে আলোচনা করেছেন, প্ল্যানিং- কমিশন, কৃষি দপ্তর, পেট্রোলিয়াম ও দপ্তর ইত্যাদির প্রতিনিধিদের সঙ্গে করেছেন। পূর্ণিমায় তিনি কৃষি দেখতে গেছেন, কলকাতায় এসে ী পরিকল্পনা সম্পর্কে [illegible] ং পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকল্পনার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।

উন্নয়নকামী দেশগুলিকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে উন্নত দেশসমূহের উৎসাহ এখন আগের চেয়ে কমেছে। তার ফলে বিশ্বব্যাংকের তহবিলে টান পড়েছে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা নামে বিশ্বব্যাংকের যে সহযোগী প্রতিষ্ঠান আছে (এই সংস্থার ঋণ দানের শর্তগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ) তার তহবিলে টান পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাংক থেকে উন্নয়নকামী দেশগুলিকে ঋণ দেওয়ার পরিমাণও কমেছে। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে, বিশ্বব্যাংক আগামী পাঁচ বৎসরে আরও বেশী ঋণ দেবে। ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি সিদ্ধান্তের কথা শোনা গেছে। এযাবৎকাল বিশ্বব্যাংক যে কর্জ দিয়েছেন তার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই পেয়েছে ভারত ও পাকিস্থানসহ পৃথিবীর মাত্র সাতটি দেশ। এর মধ্যে ভারত ও পাকিস্থানই পেয়েছে বিশ্বব্যাংকের মোট ঋণের ২৫ শতাংশ। এখন বিশ্বব্যাংকের লেনদেনের পরিধি বিস্তার করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে আফ্রিকা ও পশ্চিম আমেরিকার প্রয়োজনের দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল এই যে, ম্যাকনামারা ঘোষণা করেছেন, ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাংক থেকে কর্জ দেওয়ার ব্যাপারে চারটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে। সেই চারটি বিষয় হল—কৃষি, সার, পরিবার পরিকল্পনা ও রপ্তানী। এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের চাহিদার দিকেই বেশী নজর দিয়ে এসেছে। কৃষিতে বিশ্বব্যাংক ও আন্ত- র্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার ঋণের ভাগ মোট ঋণের ৯ শতাংশের বেশী নয়। এখন সেই অনুপাত বাড়াবার কথা হচ্ছে। তাছাড়া কৃষির খাতে ঋণের আওতার মধ্যে কৃষি গবেষণা, সার ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের লেন- দেনের ক্ষেত্রে এই সব নীতির ফলাফল কি হতে পারে তার আঁচ নেওয়া ভারতের পক্ষে একটা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে ম্যাকনামারার ভারত সফরের তাৎপর্য রয়েছে।

ম্যাকনামারা নিজেও এই সফরের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটা তাঁর মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। নয়াদিল্লীতে নেমেই তিনি বলেছেন, 'আমি বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই অনুভব করেছি যে, এই দেশে, বলতে গেলে সমগ্র- ভাবে এই উপমহাদেশে (ভারত ও পাকি- স্থানে) বিশ্বব্যাংকসহ উন্নয়ন সংস্থাগুলির পরীক্ষা চলছে।'

ম্যাকনামারার এই সফরের ফল বিচারের সময় হয়ত এখনও আসে নি। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

যেমন, প্রথম, বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যাপারে অতঃপর ভারতীয় উৎপাদকরা কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন। বিশ্বব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে এই যে, বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে বিশ্বব্যাপী টেণ্ডার ডেকে। এই নিয়মের সঙ্গে সর্ত যোগ করা হয়েছিল যে, ভারতে বিশ্বব্যাংকের সাহায্য- প্রাপ্ত প্রকল্পে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যাপারে ভারতীয় উৎপাদকরা যদি বিদেশী উৎপাদকের তুলনায় ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেশী দাম চান তাহলে ভারতীয় উৎপাদকের টেণ্ডার গ্রহণ করা যাবে। এবার ম্যাকনা- মারার সঙ্গে সরকারী মহল ও শিল্পপতি- দের আলোচনার পর এরকম আশ্বাস পাওয়া গেছে যে, ভারতীয় উৎপাদকদের জন্য দামের সুবিধা দেওয়ার এই সর্বোচ্চ মাত্রা বাড়িয়ে আমদানী শুল্কের সমান অর্থাৎ ২৭·৫ শতাংশ করার চেষ্টা করা হবে।

দ্বিতীয়, এরকম একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা তৈরীতে বিশ্বব্যাংকের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। বেসরকারী উদ্যোগ ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে কর্জ দেওয়া বিশ্বব্যাংকের সাধারণ নীতি নয়। ভারতবর্ষে সার কারখানা তৈরী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এই ব্যাপারে বিদেশী বেসরকারী লগ্নীকারকদের তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় বিশ্বব্যাংকের সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা, এই প্রশ্নটি ভারতবর্ষের

পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ম্যাকনামারা শুধু এইটুকু বলেছেন যে, এই ব্যাপারে মতাদর্শের প্রশ্নটা কোন বাধা হবে না। ইঙ্গিত হিসাবে তাঁর এই মন্তব্যই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ম্যাকনামারার এই সফরের তৃতীয় আর একটি ফল সম্ভবত এই হয়েছে, কলকাতার উন্নয়নের সমস্যাটির প্রতি বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। দুই দিন কলকাতায় অবস্থানকালে ম্যাকনামারা শহরের সমস্যা ও এই সব সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা সম্পর্কে পুংখানুপুংখভাবে খবর নেন। কলকাতার উন্নয়নের জন্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন ম্যাকনামারা তাকে 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য সরকার, সি এম পি ও'র কর্তৃপক্ষ, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পরামর্শদাতা, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটি ও ব্যবসায়ীদের কাছে বার বার একটা কথাই জানতে চান। তিনি প্রশ্ন করেন, কলকাতার অবস্থার যখন অবনতি ঘটছে তখন শুধু পরিকল্পনাই হচ্ছে, পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে না কেন। প্রকাশ যে, ম্যাকনামারার সঙ্গে আলোচনার সময় সি এম পি ও'র সঙ্গে যুক্ত ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রধান পরামর্শদাতা কহন্ রসার বলেছেন যে, পরিকল্পনা তৈরী হলেই উন্নয়ন কর্মসূচীর সাফল্যের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না; তবে পরিকল্পনা না থাকলে ব্যর্থতা ও বিশৃংখলা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আশা করা যায় যে, কলকাতায় আলাপ-আলোচনা করে ম্যাকনামারা বুঝেছেন যে, উন্নয়নের পরিকল্পনার অভাবে কলকাতা রসাতলে যাচ্ছে না, এই সব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার অর্থের অভাবেই কলকাতা শহর মরে যাচ্ছে। অর্থের অভাব বলতে যতটা না বৈদেশিক মুদ্রার অভাব তারচেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে স্থানীয় মুদ্রা অর্থাৎ টাকার অভাব। ম্যাকনামারাকে এই হিসাব দেওয়া হয়েছে যে, কলকাতার উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় যে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে সেই টাকা যদি এই শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে ট্যাক্স করে সংগ্রহ করতে হয় তাহলে গড়ে প্রতিটি কলকাতাবাসীর উপর বছরে ১৩·৫৮ টাকা বাড়তি ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। এখন তাঁরা যে ট্যাক্স দিচ্ছেন তার গড় মাথাপিছু পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩৭ টাকা। শহরের কিছুটা উন্নতি দেখাতে না পারলে শহরবাসীদের কাছ থেকে এই পরিমাণ বাড়তি কর আদায় করা অসম্ভব।

কলকাতায় ম্যাকনামারা বিরূপ সম্ব... লাভ করেছিলেন। যুক্তফ্রন্টের ... দশটি দল ও নকশালপন্থীরা প্রাক্তন মা... সচিব ও 'ভিয়েৎনামের জল্লাদ'-এর বিরু... বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন ... ছিলেন। এই উপলক্ষে ... কলকাতায় পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ... দফা সংঘর্ষ হল, লাঠি ও কাঁদানে ... চলল, খান-তিনেক ট্রাম ও গোটা-... বাস পুড়ল, ম্যাকনামারা কলকাতায় ... দর্শনের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখতে বাধ্য হ... কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর কলকাতা ... সম্ভবত একেবারে নিষ্ফল হয় নি। ... কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার ... তিনি বলেছেন, কলকাতার উন্নয়নে ... 'বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্য আসতে পারে ... আমার মনে হয়।'

একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ম্যাক... মারা যখন ভারতে ছিলেন সেই সম... পশ্চিম ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক ম... বাজারে সঙ্কট দেখা দেয়। এর ফলে আন... র্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটা ন... বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ... অবস্থায় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের প... ভারত ত্যাগের আগে সুনির্দিষ্টভাবে ... বেশী কিছু বলে যাওয়া সম্ভব হয় নি।
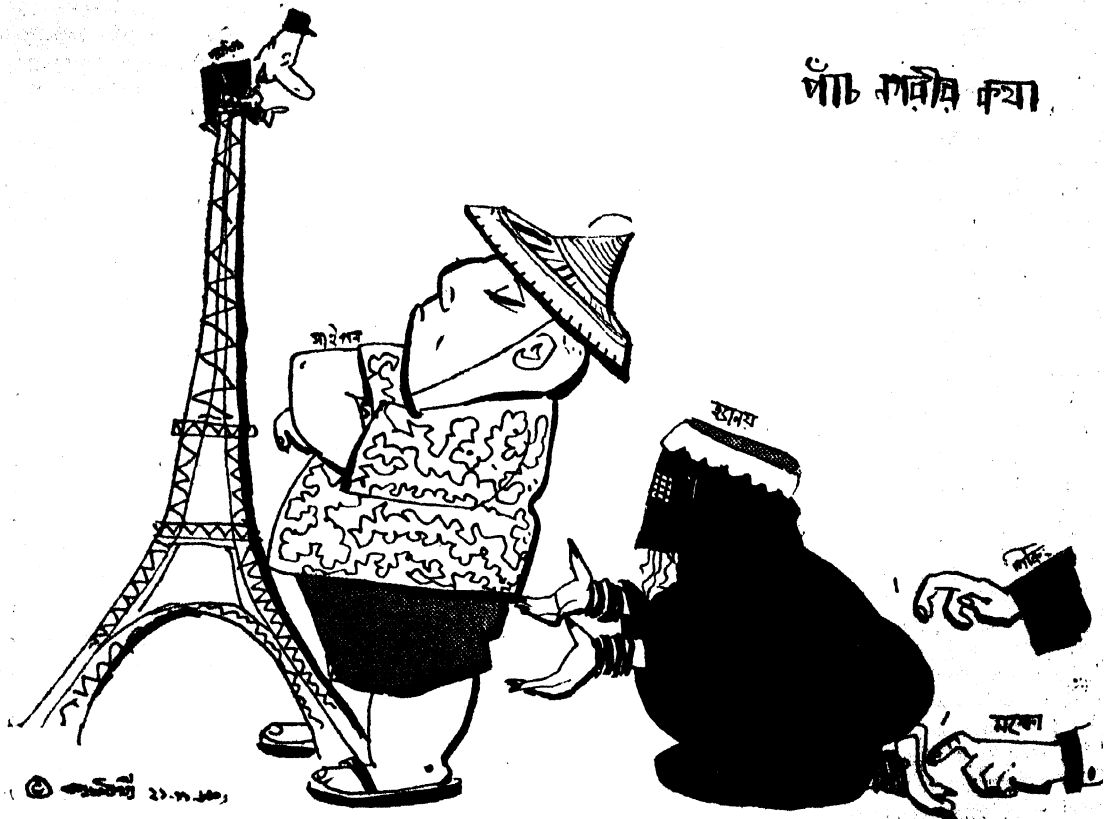
ম্যাকনামারার আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার সময় মেয়ো রোড ও রেড রোডের মোড়ে একটি সরকারী বাস জ্বলছে।
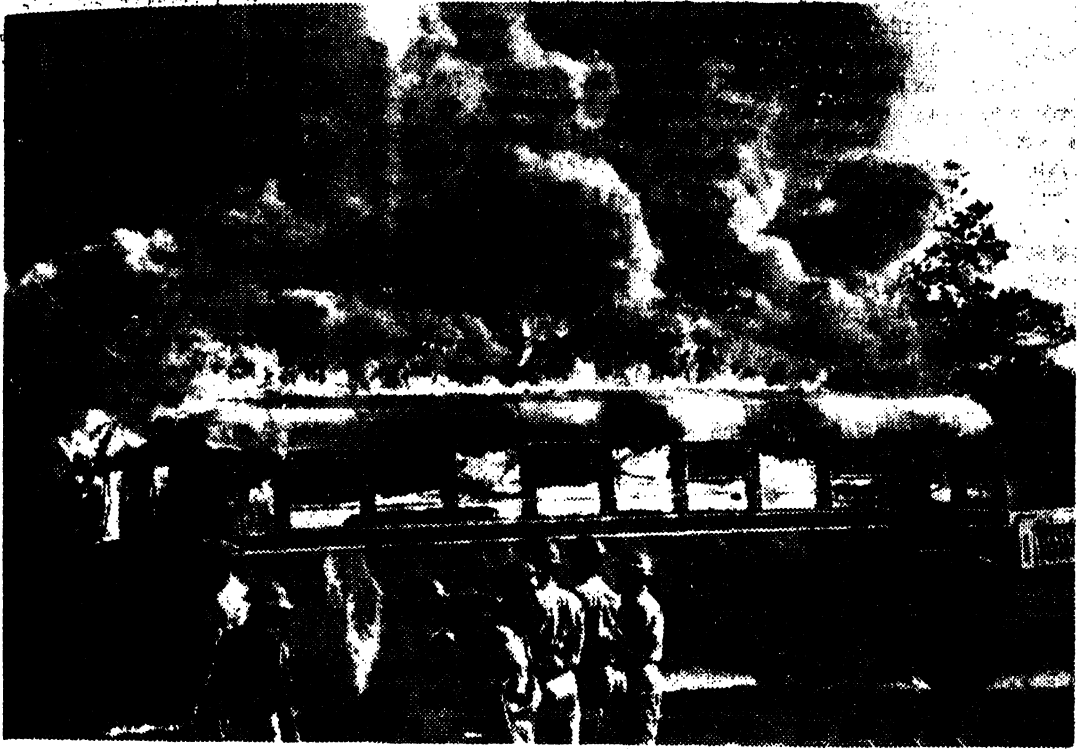
শাদা চোখে

…শ্ব ব্যাংকের সভাপতি মিঃ রবার্ট …মারার অবক্ষয়মান কলকাতা …রী পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম- …র বামপন্থী রাজনীতি একটু চিড় …ছ। অবশ্য মারাত্মক ফাটল ধরার … বোঝাপড়া একটা হবেই। কারণ, …ন সামনেই। কিন্তু এই নেপথ্যের মন …ষি আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণের প্রকাশ্য …পরিগ্রহ না করলেও যে তিক্ততার … করেছে তার একটি প্রতিক্রিয়া হওয়া …স্বাভাবিক। এবং এর প্রত্যক্ষ ফল …র অন্তরালে বৈরীভাব বজায় থাকলে …নী ফলাফলের উপর যে প্রভাব … এতে কোন সন্দেহ নেই।

…ঃ ম্যাকনামারার বঙ্গদর্শন কলকাতা … উন্নয়নকল্পে কতটুকু কার্যকর …গিতা যোগাবে জানি না, তবে তাঁর …নকে কেন্দ্র করে মহানগরীর জন- … যে চাঞ্চল্য এনেছে তা অনেকেই …র সঙ্গে বহুদিন স্মরণ করবেন। …-কানন থেকে বন্দিনী সীতার …কামী শ্রীহনুমান যেমন স্বর্ণলংকায় …নল দ্বারা বৈশ্বানরের তাণ্ডব … সৃষ্টি করেছিল তেমনি মিঃ ম্যাকনামারাকে কেন্দ্র করে সমস্যাজর্জর কলকাতায় আগুন জ্বলেছে। পার্থক্য শুধু এই, এক্ষেত্রে শ্রীহনুমান লংকাকাণ্ডের জন্য নিজে দায়ী নন। কলকাতার অধিবাসীরাই শ্রীহনুমানের চরিত্র বিশ্লেষণ করে প্রতিবাদ-স্বরূপ আত্মাহুতির পথ বেছে নিয়েছেন।

যে সমস্ত বামপন্থী দল বিক্ষোভের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা মিঃ ম্যাকনামারার সত্তা সম্পর্কে সন্দিহান। বিশেষভাবে তিনি যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী ছিলেন তখন তাঁর ভিয়েৎনাম নীতি প্রাচ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল। এই যুক্তিকে কেন্দ্র করেই এই বিক্ষোভ। কলকাতার অলিতে গলিতে তাই পোস্টার—"জহ্লাদ—ম্যাকনামারা ফিরে যাও"।

কিন্তু বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দেশহিতৈষী' তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আর একধাপ এগোয়ে গিয়ে লিখেছেন যে যুদ্ধসচিবের পদ থেকে বিদায় নিয়েও মিঃ ম্যাকনামারা রাজনীতি থেকে সরে পড়েন নি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের নূতন পদ পেয়েছেন তিনি। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হলেন মিঃ ম্যাকনামারা। বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে অনুন্নত দেশকে ডলার সাহায্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ায় নূতনভাবে ঘাঁটি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এবং এই কাজে সফলতা লাভ করবার উদ্দেশ্যেই অভিজ্ঞ ম্যাকনামারাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

দেশহিতৈষী লিখেছেন, "আসলে ম্যাকনামারা এসেছেন আত্মসমর্পণের আরও ঘৃণ্য দাবী নিয়ে। লক্ষ্য করবার বিষয় ভারতের অর্থনীতি পরিচালিত করতে গিয়ে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের বুর্জোয়া জমিদার সরকার বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত। তাই যত দিন যাচ্ছে ততই ভারত সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধানতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দাবীর কাছে এক এক করে নতিস্বীকার করছে। চতুর্থ পরিকল্পনা ও তার ঘোষিত লক্ষ্য বাতিল করে দেওয়া, মার্কিন পুঁজিপতিদের স্বার্থে টাকার অবমূল্যায়ন, মার্কিন কোম্পানীর সঙ্গে সারচুক্তি ইত্যাদি হচ্ছে আত্মসমর্পণের ধারার এক একটি যোগসূত্র।"

মিঃ ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে কেন এই বিক্ষোভ বামপন্থী কম্যুনিস্ট দল তা সাধারণ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারত সরকার বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত, সেই সরকার কি কখনও গণমুখী পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন? কম্যুনিস্ট দলের বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রথমে একটি প্রগতিকামী জনসর্বস্ব পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের চাপে পড়ে তার "ঘোষিত লক্ষ্য বাতিল করে" দিতে হয়েছে। ভারত সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র নির্ধারণে কম্যুনিস্ট পার্টির কোন বক্তব্য ঠিক এটা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মিঃ ম্যাকনামারা ভারত ও পাকিস্থান সফর সুরু করবার পূর্বে ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বিশ্বব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে কিছু কিছু উন্নতিকামী অনুন্নত দেশ থেকে নালিশ পেয়েছে যে ভারত ও পাকিস্থানকেই বিশ্বব্যাঙ্কের দেয় সাহায্যের বেশীর ভাগ দান করা হচ্ছে, ফলত, অভিযোগকারী দেশসমূহের জন্য চাহিদা মত ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না।

এই অভিযোগের তদন্ত এবং বিশ্বব্যাঙ্কের দেয় ঋণের উপর নির্ভর করে ভারত ও পাকিস্তানে যাতে কিছু কিছু "বিশেষ পরিকল্পনাকে" কার্যকর করা যায় এবং যাতে প্রয়োজন বুদ্ধির সহায়ক হয় মিঃ ম্যাকনামারা তার সরজমিনে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই এসেছেন। এই উক্তি মিঃ ম্যাকনামারার।

আসার পথে মিঃ ম্যাকনামারা রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোজিগিনের সঙ্গে দু'ঘন্টার এক পূর্ব-অনির্ধারিত গোপন বৈঠক সেরে এসেছেন। এই সাক্ষাৎকার কেন ঘটেছে তার সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা করে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যা প্রকাশিত হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে সোভিয়েট ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহকে কিভাবে বিশ্ব ব্যাঙ্কের শরিক করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই বৈঠক।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমেরিকান জল্লাদ ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে সাম্যবাদের পীঠস্থান রাশিয়ায় কোন বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় নি। অধিকন্তু মুখপত্র টাস ম্যাকনামারাকে "এক মহান আমেরিকান নেতা" বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে হো সরকারকে রাশিয়া আমেরিকান জল্লাদদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি মদৎ দিচ্ছেন। একটি অঘোষিত যুদ্ধের শরিক হয়েও রাশিয়া এই জল্লাদ-সম্রাটের বিরুদ্ধে কেন বিক্ষোভ প্রদর্শন না করে তাঁকে মহান আমেরিকান নেতা বলে উল্লেখ করলেন?

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি অবশ্য বলতে পারেন যে ভারতবর্ষে নীতি তাদের কি হবে সেটা তাঁরাই ঠিক করবেন। কোন দেশ কি করল তাতে তাঁদের কিছু এসে যায় না। অধিকন্তু, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁদের আদর্শগত পার্থক্য প্রায় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। অবশ্য সেটা আংশিক সত্য। কারণ রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের রাজ্যকে "State of the whole people" বলে এবং অর্থনীতিতে নূতন ভাবধারা চালু করে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়েছে। তবে তখন পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী নয় বলেই ভারতীয় মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা অন্তরে সোভিয়েটের জন্য কিঞ্চিৎ দরদ অনুভব বা সহানুভূতি পোষণ করে থাকেন। এবং এই সহানুভূতির জন্যই ত' রাশিয়া যখন চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে তখন "সমাজবাদ বিপন্ন" ধুয়ো তুলে সোৎসাহে মার্কসবাদীরা রাশিয়ার সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

আমেরিকার ভিয়েৎনাম গ্রাসের চেষ্টা আর রাশিয়ার চেকোশ্লোভাকিয়াকে পদানত করে রাখার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় কিনা—সেটা সুধীজনরা বলবেন। কিন্তু আক্রমণকে যতই তত্ত্বগত যুক্তির সাহায্যে মুক্তির অভিযান বলে অভিহিত করার চেষ্টা করা হোক না কেন, স্বরূপ তার একই থেকে যায়, এতটুকু বদলায় না।

এই গেল মার্কসবাদীদের কথা। আবার এদের চেয়েও যারা সাচ্চা বিপ্লবী বলে মনে করেন সেই নকশালবাড়ীওয়ালারা বলেছেন, "বিপ্লবীদের কিভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে ম্যাকনামারা তাই জানতে চায়"। তাঁদের সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছেন, "স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রী এস বি রায়ের কাছ থেকে রাজ্যের আইন ও শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি জানার বকলমে এই রাজ্যের বিপ্লবী আন্দোলন সেবাদাস সরকার কিভাবে মোকাবিলা করছে ম্যাকনামারা তারই বিস্তৃত বিবরণ জানবে। নকশালবাড়ীর বিপ্লবী আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই নয়া উপনিবেশের মানুষের মুক্তি আনার যে ঘোষণা করছে সেই সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ওয়াকিবহাল হতে চায়"।

এই সমস্ত বলার পরও নকশালবাদীরা আর একটু উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সেটা ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে নয়। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের নয়া সংশোধনবাদের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "ভারত সরকার আরোও বেশী বেশী করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকছে"—একথায় ম্যাকনামারার ভারত দর্শনের পর আরও তারস্বরে চীৎকার করে বলবেন। সংশোধনবাদী দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে নকশালপন্থীদের কোন বক্তব্য নাই। কারণ, তাঁরা ত' সাম্রাজ্যবাদের দোসর হয়েই গেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবাংলার কলকাতা মহানগরীতে দু'দিন ধরে যে বিপ্লবী কর্মকান্ড সংগঠিত হয়ে গেল তারপরও নকশালবাদীরা নয়া সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বেশ বিষোদ্গার করছেন কেন তা বোঝা কঠিন। কর্মে একাত্মতা বামপন্থা নিরূপণের নিরিখ নয় কি?

এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে ই ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছিল। এবং যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিক একমাত্র সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি বাদে ... —ইন্দেক বাংলা কংগ্রেস পর্যন্ত এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। যদিও প্রথমে যুক্তফ্রন্টের নামে এই বিক্ষোভ আয়োজনের কথা হয়েছিল, এস এস পি আপত্তি দেওয়ার ফলে আখেরে তা সম্ভব হয়নি। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ মত বদল করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী প্রণয়নের সময় আন্তর্জাতিক প্রশ্নের অবতারণা হয়েছিল। যেহেতু আন্তর্জাতিক নীতির প্রশ্নে শরিকদের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য ছিল, তাই রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসে ভিন্নমতাবলম্বী দলগুলি একত্রিত হয়েছিল, এবং প্রত্যেক দলকেই স্বীয় মতাদর্শ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বক্তব্য রাখা ও প্রচার করার দলীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কাজেই যুক্তফ্রন্টের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে দলগুলি আলাদাভাবে এই বিক্ষোভ করে নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এর মধ্যেও একটা "কিন্তু" থেকে গেছে। খবরে প্রকাশ, ফ্রন্টের কয়েকটি শরিক স্থানীয় দল প্রথমে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে ঠিক করেছিলেন যে, ম্যাকনামারার বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে ফ্রন্টের মাধ্যমে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করা হবে। যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে এই সভা ডাকা হয়নি, অতএব উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এস এস পি-র সঙ্গে দেখা করে তাদের সম্মতি আদায় করবার চেষ্টা করেন।

সংবাদে জানা যায়—এস এস পি এই "চাপিয়ে দেওয়া নীতির" সরাসরি বিরোধিতা করে, এবং যেহেতু ম্যাকনামারা বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি হিসাবে আসছেন সেইজন্য তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে রাজী নন। পরে এস এস পি-র রাজ্য পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি মারফৎ তাঁর দলের বক্তব্য আরও স্পষ্টভাবে জনসমক্ষে রেখেছেন। এবং তিনি যুক্তফ্রন্টের নাম এই বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িয়ে না ফেলার জন্য ফ্রন্টের শরিকদের প্রতি আবেদনও জানান।

যুক্তফ্রন্টের নামে এই বিক্ষোভ সংগঠিত না হওয়ার ফলে কিছু কিছু অংশীদারদের মধ্যে এস এস পি-র বিরুদ্ধে নাকি অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ নাকি এস এস পি-কে ফ্রন্ট থেকে কিভাবে বের করে দেওয়া যায়, সেই সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনাও করছেন। অবশ্য বাস্তবে তা সম্ভব হবে না। কারণ, দু-একটা ছোট ছোট দল এই আশা পোষণ করলেও বড় দলগুলি তা করবে না। মধ্যবর্তী নির্বাচন শুধু বাংলাদেশেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে না বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও হচ্ছে। সেখানে এস এস পি-কে বাদ দিয়ে বামপন্থী মোর্চা

কথা ভাবাও যায় না। এস এস পি সে-সমস্ত রাজ্যে সর্ববৃহৎ বামপন্থী দল। অতএব, হেনস্তা করবার জন্য যদি ঐ প্রশ্ন ওঠে তো উঠতে পারে, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে তা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়লেই ফ্রণ্টের পক্ষে মঙ্গল। নতুবা জনসাধারণের মনে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে—এ-কথা হলফ করে বলা যেতে পারে। অধিকন্তু এই প্রসঙ্গের অবতারণা ফ্রণ্টের "রাজনৈতিক শত্রুদের" যে একটি শক্ত হাতিয়ার যোগাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে মিঃ ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদর্শনের মূল কারণ হচ্ছে দুটি। প্রথমত, এটা রাজ্যের স্তিমিত নির্বাচনী আসরকে সরগরম করে তোলার একটি প্রয়াস মাত্র। আর দ্বিতীয়ত, মিঃ ম্যাকনামারা অসন্তুষ্ট হয়ে যদি বিশ্ব-ব্যাংকের সাহায্যের রাশ টেনে ধরেন, তবে কলকাতার সমস্যা সমাধান ত দূরের কথা, মহানগরীর জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। দারিদ্র্য যত প্রকট হবে, সাম্যবাদের পথ ততই প্রশস্ত হবে। অতএব, ম্যাকনামারা মিশনকে বানচাল করতে পারলে আখেরে কম্যুনিস্টদেরই লাভ।

এই দুই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। কিন্তু দু'দিনের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার পর কলকাতার পথচারীরা এখানে-সেখানে জটলা পাকিয়ে যে-সমস্ত আলোচনা করেছেন, কেউ যদি তার হদিস রাখেন, তবে রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মন্তব্যের সঙ্গে এর সঙ্গতি খুঁজে পাবেন। মিঃ ম্যাকনামারার নীতি সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সহায়ক এবং তিনি যুদ্ধবাজ দস্যু—এই সম্পর্কেও হয়তো অনেকে সহমত পোষণ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, মিঃ ম্যাকনামারার অন্তঃস্থলে যে-নীতিই থাকুক না কেন, প্রকাশ্যভাবে তিনি "শ্রীহনুমানের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভারতদর্শনে এসেছেন। কম্যুনিস্ট দলগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে ত এই বিক্ষোভের আয়োজন করেননি। নয়াদিল্লীতে তাঁরা কোথায় ছিলেন? অতএব, পশ্চিমবাংলার নির্বাচনী আসর সরগরমের উদ্দেশ্যে এই অভিযান হওয়া আশ্চর্য কি?

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, নির্বাচনী প্রচারে প্রাণ সঞ্চারের জন্য এই বিক্ষোভ সমারোহ, তবে কি তা ঠিক হয়েছে? ঘটনা-দৃষ্টে মনে হয়, উদ্দেশ্য মোটেই সার্থক হয়নি। কারণ, 'যে বা যারা' ট্রামে-বাসে অগ্নি-সংযোগ করে থাকুক না কেন, বামপন্থীরা তার দায়িত্ব এড়াতে সক্ষম হবেন কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্যের প্রতিবাদে কিম্বা উত্তরবঙ্গে বন্যার্ত-দের রিলিফের ব্যবস্থায় সরকারী অকর্মণ্য-তাকে কেন্দ্র করে যদি এই লঙ্কাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হত, তবে হয়ত জনসাধারণ বোঝার চেষ্টা করতেন যে, তাঁদেরই দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য বামপন্থীরা আজ মরণ-পণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও দরদীমন নিয়ে হয়ত তারা এই আন্দোলনের চরিত্র চিত্রায়নে ব্রতী হবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেমে পুলিশকে লাঠিপেটা করার সুযোগ দিয়ে যে নেতিবাচক আন্দোলন চালানো হল, তাতে জনসাধারণের আপাত-লাভের কিছু সম্ভাবনা আছে কি? যে সুদূরপ্রসারী ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে এই কর্মকাণ্ড সংগঠিত হল, সাধারণ মানুষ তার হদিস রাখেন কি? চোখের সামনে যা ঘটে, তাই নিয়ে তাঁদের বিচারবুদ্ধি চলে—তত্ত্বকথা নিয়ে নয়।

যা হোক, আন্দোলনের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে ভুল হয়েছে, পরিস্থিতি তার সাক্ষী দিচ্ছে। তবে একটা যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে যে, শান্তিপূর্ণ গণ-তান্ত্রিক বিক্ষোভই বামপন্থী দলগুলির পরিকল্পনা ছিল। ট্রামে-বাসে আগুন দেওয়া নিশ্চয় বামপন্থীদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু যে-কোন কারণেই বিক্ষোভ সংগঠিত হোক না কেন, তার সীমারেখা টানা খুবই অসম্ভব। বিশেষ করে কলকাতার মত অগ্নিগর্ভ মহানগরীতে, তা কোন রকমেই সম্ভব নয়। অতীতের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। অথচ নেতৃত্ব তখনই সফল হয় যখন আন্দোলনকে পরিকল্পনা-মত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পশ্চিম-বাংলার বামপন্থীরা কিন্তু এই ব্যাপারে প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়েছেন।

এবং যখনই ব্যর্থতা এসেছে, তখনই হতাশার সৃষ্টি হয়েছে এবং তত্ত্বগত ভুল-ভ্রান্তির অনুসন্ধান চলেছে। কিন্তু উত্তেজনা ও রোমান্টিকতায় দুষ্ট আন্দোলনের ফলে বামপন্থীর প্রতি সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে, এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার পথই সুগম করে দেয়। একথা ইতিহাস-পরীক্ষিত সত্য।

কাজেই মিঃ ম্যাকনামারাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সার্থকতা কি বামপন্থীরাই তা জনসমক্ষে বলবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের সভাপতি নতুন করে ভারতকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে আবদ্ধ করতে আসছেন এবং কলকাতা দর্শনের ফলেই প্রায় তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এমন ধারণা নতুন করে সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি? আর নকসালবাদীরা বলেছেন, শ্রী এস বি রায়ের কাছে থেকে বিপ্লবীদের কিভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করছেন মিঃ ম্যাকনামারা। শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে এরকম দুর্বল ধারণা পোষণ করা কি ঠিক? অবশ্য নকসালবাদীরা তা করতে পারেন। কেননা এরকম ধারণার বশবর্তী হতে না পারলে নকসালবাড়ী আন্দোলন কি আদপেই শুরু করা সম্ভব হত? যে সমস্ত যুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর জন্য মিঃ ম্যাকনামারার কলকাতা আসার দরকার ছিল কি?

ভারতবর্ষ উন্নতির জন্য ঋণ সংগ্রহ করবে। যিনি উত্তমর্ণ, তিনি স্বভাবত ঋণের টাকা যাতে মারা না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখেন। ঋণ কি শর্তে গৃহীত হল, তাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। দেশের স্বার্থের পরি-পন্থী হলে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের ও রাজ-নীতিক দলের আছে। বিশ্বব্যাংক যেভাবে ও হারে ঋণ দেয়, তার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদী বা সাম্যবাদী কোনো দেশই ভালো। শর্তে অর্থ প্রদান করে না। এমনকি সাম্যবাদী রাশিয়াও ঋণদানের ব্যাপারে শাইলকের মাসতুতো ভাই মাত্র।

কি জার্মানী, কি আমেরিকা, কি বৃটেন সকলেই ঋণ দিয়েছেন এবং প্রত্যেক দেশই তাঁদের নিজস্ব লোক পাঠিয়ে সুবিধা-মত বেতনের বিনিময়ে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করছেন। বোখারো ইস্পাত শিল্পের জন্যও নিদেনপক্ষে ৫৩৭ জন ভারতসেবী আসছেন, তাঁরা কেউ নিজের দেশ থেকে রুটি বয়ে আনবেন না। রুজি লাগিয়ে রুটি নিয়ে যাবেন। কাজেই অনুন্নত দেশের পক্ষে উন্নত দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। হালফিল, রাশিয়া জাপানের সহযোগিতায় সাইবেরিয়ার উন্নতিকল্পে চুক্তি করেছে। নিশ্চয় জাপান তার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সাইবেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানী হয়ে ওঠেনি। অতএব, চুক্তির গুণাগুণ বিচার না করে আগেই আন্দোলন করা যুক্তিযুক্ত কিনা বামপন্থীরা সে-কথা ভেবে দেখবেন। অনুন্নত দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন অন্তত যখন চাঁদে মানুষ যাচ্ছে, সেই পরি-প্রেক্ষিতে কিভাবে চালাতে হবে, তা নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। নয়তো আন্দোলন আঘাত খেতে বাধ্য।

মিঃ ম্যাকনামারা সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করাতে বামপন্থীরা বিক্ষুব্ধ। আজ যদি যুক্তফ্রণ্ট সরকার গদিতে আসীন থাকত এবং মিঃ ম্যাকনামারা কল-কাতা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে আসতেন, তখন বামপন্থীরা কি করতেন?

জেনারেল মোটরসের সভাপতি মিঃ রোশের মত একচেটিয়া পুঁজিপতির প্রতিভূ পশ্চিমবাংলায় সফর করে গেলেন, সে-সময় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে কোন তর্জনী প্রদর্শিত ত হলো না। কাজেই বামপন্থীদের কোন্ বক্তব্য ঠিক, সে সম্পর্কে জনতার মনে সংশয় সৃষ্টি হতে বাধ্য।

—সমদর্শী

ছায়াদানবী এলান স্টুয়ার্ট

ছায়া কালো কালো

[এলান স্টুয়ার্ট সাংবাদিক ও উপন্যাস লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি আনউইলিং এজেন্ট' বিশেষ প্রশংসালাভ করে। ক্যানাডা, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সমগ্র আফ্রিকা পর্যটন করেছেন। কিছুকাল বাংলাদেশে থাকার পর সিংহলে যান তারপরে পাকাপাকি লন্ডনে বসবাস করছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এক অলৌকিক কাহিনীর সংক্ষেপিত অনুবাদ করা হ'ল]

লন্ডন থেকে এক ক্লান্তিকর যাত্রার শেষে ওয়েসটার রস নামক একটি ছোট্ট স্টেশনে এসে যখন নামলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমার মেজাজটা ভালো ছিল না, আমি আশা করেছিলাম স্টেশনে কেউ থাকবে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য, একটা গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। কোনো কিছুই না থাকায় আমাকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে।

আগস্ট পার হয়ে সেপ্টেম্বর পড়েছে, স্টেশনটি থেকে বেরিয়ে স্টেশন মাস্টারের নির্দেশ মাফিক যখন হাঁটতে সুরু করলাম তখন মৃদু সৌরভে চারদিক ভরে ছিল। বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে, আমার ঘাড়ের ওপর গাছ থেকে জল ঝরে টপ্ টপ্ করে পড়ছে। কিছু ঝরা পাতা খানা-খন্দরে জমতে সুরু হয়েছে, অবশ্য ডাল এখনও একেবারে খালি হয়ে আসেনি।

শরৎকালটা বরাবরই আমার মনটা দমিয়ে দিয়েছে, যে রাস্তা ধরে চলেছি। সেই পথেরও এমন আকর্ষণ নেই যে আমার মন ভোলাতে পারে। পাহাড়ের নীচে নেমে গিয়ে একটা কুব্জদেহ পুরোন সাঁকোর ওপর উঠে পড়েছে এবং তারপর ডানদিকে চলে গেছে। আমার চারপাশে গাছপালা ঘনবদ্ধ এবং অন্ধকার, দ্রুত বিলীয়মান আলোক রেখায় এই অন্ধকার ভীতিময়। বাঁদিকের এক পাশে একটা নদী উচ্ছল হয়ে ছুটে চলেছে কঙ্করকঠিন পাহাড়ের পাথর ভেদ করে, এমনভাবে এধার ওধারে বেঁকে ঘুরে চলেছে যে তার কলনাদ মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে উঠছে, অন্য সব রকম ধ্বনি, তখন পাতার মরমর শব্দ পর্যন্ত এই তীব্রতার প্রাবল্যে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই, একটা খরগোস ছুটে যেতে যেতে, আমার দিকে তাকিয়ে থমকে থেমে দাঁড়াল, আমার গতিভঙ্গী লক্ষ্য করেই ঝোপের গভীরে পালাল। মাঝে মাঝে ক্লান্ত পাখির ডাক সান্ধ্য আকাশকে হালকা সংগীতে ভরে তুলেছিল কিন্তু তার অন্তবর্তীকালীন বিরাট দীর্ঘস্থায়ী।

সামগ্রিক নৈসর্গিক দৃশ্য আমার অন্তরে কাঁপন জাগিয়ে তুলছিল, আমি প্রাণভরে জন গ্রান্টকে শাপান্ত করছিলাম আমাকে তুলে নিতে না যাওয়ার জন্য,

গ্লেনগ্যারিয়ন এখান থেকে পাকা আট মাইল পথ।

গ্রান্টের জরুরী অনুরোধেই আমি এই দ্যাস্তিতকর যাত্রায় বেরিয়েছিলাম, ও নাকি কি একটা বিপদে পড়েছে। ওর আমন্ত্রণ-লিপি দীর্ঘ এবং এলোমেলো, অনেক অচলিত উধৃতিতে ভরা, এসব উধৃতি অজ্ঞাত গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা থেকে আহরিত আমি একজন পন্ডিত গ্রন্থাগারিককে দেখিয়েছিলাম তিনিও তার মাথামুন্ডু কিছুই ধরতে পারলেন না। আমাকে কিঞ্চিৎ আহত মনে করে, তিনি বললেন, এসব বই একশ বছরেরও ওপর প্রাচীন সাধারণ পাঠাগারে পাওয়া যায় না—এসব বই-এ অতি প্রাচীন ও অচলিত লোককথা ও পৌরাণিক বৃত্তান্ত আছে।

চিঠির সামগ্রিক সুর আমাকে বিস্মিত করল—আমার হাতে তেমন কাজ ছিল না, তাই ভাবলাম বেশী সময় অপচয় না করে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাক। জন গ্রান্ট আমার অনেক দিনের বন্ধু—তার যদি কোনো বিপদ ঘটে থাকে আমার কর্তব্য তাকে সাহায্য করা—কিন্তু সেই বেয়াড়া পথ ধরে যতই এগিয়ে চলেছি আর আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে আসছে ততই আমার মনে হতে থাকে স্বাচ্ছন্দ গৃহকোণ ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি, সেখানেই ফিরে যাওয়া যাক।

গ্রান্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব যুদ্ধের অনেক আগের থেকে, যুদ্ধে আমরা দুজনেই যোগ দিয়েছি। দুজনের প্রবৃত্তি ছিল বিপরীত কিন্তু আমাদের দুজনের জীবন একসূত্রে বাঁধা পড়েছিল আর যুদ্ধের ক'টি বছরে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে দিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বেড়ে গেল।

যুদ্ধান্তে লন্ডন সহরে আমরা দুজনে কিছুদিন উদ্দাম জীবন কাটালাম—তারপর গ্রান্ট দরাজ দিল নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল শীকার করতে আর মাছ ধরতে। প্রথম প্রথম ওর কাছে যাবার আমন্ত্রণের বাহুল্যে আমি যেন প্লাবিত হয়ে যেতাম, কিছুকাল পরে কিন্তু চিঠির স্রোত ক্ষীণ হয়ে এল। শেষে অনেকদিন আর কোনো খবর নেই, শুধু সংবাদপত্রে একটা প্যারাগ্রাফ দেখেছিলাম যে গ্রান্ট গ্লেনগ্যারিয়ন হাউসটা কিনে নিয়েছে। ওর পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের কিছু পরেই এই ঘটনা ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, এই বাসা বদলের পর থেকেই চিঠিপত্র একেবারে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ওর কথা প্রায় ভুলতে বসেছি এমন সময় এই পত্রাঘাত এবং তার ফলেই আমার এই যাত্রা সুরু।

বেশ কয়েক মাইল বৃক্ষপুঞ্জের মধ্যে হাঁটার পর প্রতিপদক্ষেপেই যেন আমার সুটকেশটার ভার বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে আমি উন্মুক্ত অঞ্চলে পৌঁছলাম। দুপাশে পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছে, মধ্যে উপত্যকাভূমি গ্লেনগ্যারিয়ন।

একটি সংকীর্ণ হ্রদ, তার ওপর চাঁদের আলো প্রতিবিম্বিত। চাঁদ এখন মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। সেই ম্লান আলোয় হঠাৎ একটা শাদা সারস উড়ে গেল দেখে আমি আঁতকে উঠলাম—হ্রদের ওপর দিয়ে উড়ে একটা বাড়ির দিকে চলে গেল সারসটা। আমার অবশ্য নিসর্গ দৃশ্য দেখার মত মানসিক অবস্থা নয়।

রাস্তাটা একটা সংকীর্ণ গলিপথে এসে পড়েছে, তার ওপর মাঝে মাঝে জল এবং কাদা জমেছে। আমার পা গর্তে পড়ছে, ফলে হোঁচট খেতে হচ্ছে প্রতি পদে পদে। অবশেষে হ্রদের প্রান্তে পেঁছিলাম, আমার অঙ্গে চাঁদের কিরণ ঝরে পড়ছে। চৌবন্দী প্রাসাদ, চার কোণে চারটি মিনার এবং মাঝখানের মিনারটি সবচেয়ে বড়ো যেন আকাশ ছুঁয়েছে। সমগ্র প্রাসাদটি ধ্বংসের মুখে তা দূর থেকেই বোঝা যায়। ঠিক হ্রদের কিনারায় প্রায় জলের ভিতর থেকেই প্রাসাদটি গাঁথা হয়েছে।

অবশেষে নগ্ন পাথরের তৈরী সেই বিরাট প্রাসাদের প্রাচীরের গায়ে এসে পেঁছিলাম, জানলাগুলি সংকীর্ণ এবং তেমন হর্ষ জাগায় না, মনে, তার গায়ে আমন্ত্রণের ইসারা নেই। আমার সামনের দরজাটি বিরাট, লোহার মরচে ধরা খিল দিয়ে আটকানো, আমি বাইরে থেকে শিকল ধরে প্রাণপণে টানলাম আওয়াজ যাতে ভেতর পর্যন্ত পেঁছয়। দূর থেকে একটা কর্কশ ঘন্টার ধ্বনি ভেসে এল, অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে মনটা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। এ একটা পড়ো বাড়ি, তাছাড়া চারিদিকে ধ্বংসের হাওয়া। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমার মনটা অজানা ভয়ে ভরে যায়, আবার সেই লোহার শিকল টেনে আওয়াজ করতে যাচ্ছি এমন সময় দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। আমি তখন কাঁপছি।

বাড়ির ভেতরটাও অন্ধকার, শুধু যে লোকটা দরজা খুলে দিল তার চারপাশে একটা হলুদ রঙের আলো। লোকটি একটি লণ্ঠন তুলে আমার মুখটা দেখল, আমার মুখে আলোটা পড়ল। লোকটা বেঁটে এবং যদি আলোর খেলা নয়, তাহলে বলতে হবে লোকটি বিকলাঙ্গ। লোকটার মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো মাথার চুলগুলি লালচে, আর চোখের ভ্রূ দুটি অস্বাভাবিক রকমের বড়ো। নাকটা ছুঁচালো এবং বাঁকা, ঠোঁট দুটি নিষ্ঠুরতায় ভরা। একটা ধূসর রঙের সুট তার গায়ে ঝুলছে।

লোকটা নীরবে একটু সরে দাঁড়িয়ে আমার যাওয়ার জন্য পথ করে দেয়। দরজা বন্ধ করে লোকটা সাময়িকভাবে যখন আমার চোখের ওপর থেকে সরে গেল তখন আমি যে রকম ভয় পেয়েছিলাম তার যথাযথ বর্ণনা করার মত শক্তি আমার নেই।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটি একটি সংকীর্ণ হল তার সামনে দিয়ে অন্ধকারের ভিতর একটা সিঁড়ি উঠেছে। আমি যদি বলি ঠিক চোখে না দেখলেও আমার মনে হল যেন সিঁড়ির ওপর ছিন্ন পতাকা উড়ছে, তাহলে আমার নার্ভাস মনোভংগীর কিছুটা পরিচয় দেওয়া হয়। অন্ধকারে আমি সেই বেঁটে মানুষটির পিছু পিছু চলতে থাকি—লোকটি সিঁড়িতে উঠে পড়েছে। সিঁড়ির ওপর পেঁছে একটি চাতাল তার ডানদিকে লোকটি বেঁকল, আমিও সেইভাবে যাচ্ছি, কিন্তু কি যে ভেবে শেষ পর্যন্ত তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। সেই পথ যেন অন্তহীন, মাঝে মাঝে এতই সংকীর্ণ যে আমার হাত দুটি দেওয়ালে ঠেকছে। আকাশটা বোধহয় পরিষ্কার হয়েছে, কারণ মাঝে মাঝে জানলার ফাঁকে যেটুকু চাঁদের আলো ভেসে আসছে তা অতিশয় স্বচ্ছ এবং সুন্দর। পাথরে আমার পায়ের আওয়াজ হচ্ছে এবং সেই স্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য লোকটির পায়ে এতটুকু শব্দ নেই। অদ্ভুত লঘু পদক্ষেপ। যেন মাটিতে পা

পড়ছেই না। তারপর যখন কোথাও গিয়ে পৌঁছানোর আশা প্রায় ত্যাগ করেছি তখন একটা দোর গোড়ায় থামল সেই বেঁটে লোকটি কোনরকম ধাক্কা না দিয়েই দরজাটা ঠেলে খুলে ভেতরে ঢুকল, আমিও পিছে পিছে সেই ঘরে ঢুকলাম। ঘরটি প্রায় অন্ধকার, অগ্নিকুন্ডের আলোয় যা হয় একটু জ্বল জ্বল করছে, একটা প্রকান্ড টেবলের ওপর অজস্র বই আর কাগজপত্র ছড়ানো, তার ওপর একটা তেলের ল্যাম্প অসতর্কভাবে রাখা। একটা উঁচু পিঠওলা চেয়ারে প্রায় কুঁকড়ে জড়ো হয়ে বসে আছেন সেই মানুষটি যাকে আমি দেখতে এসেছি।

অবশ্য অনেক চিহ্নই এখনও বোঝা যায়, তবে লোকটির আকৃতির ভীষণ পরিবর্তন হয়েছে। সে উঠে দাঁড়াতে আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

গ্রান্ট ছিল বেশ সতেজ, সুঠাম চেহারার মানুষ ছিল, তার শরীরে অদম্য সাহস আর প্রচন্ড উৎসাহ ছিল। আজ সে কঙ্কালসার, আর এই শীর্ণতা আরো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে তার অঙ্গের পোষাকগুলি আগের দিনের, তাই ঢল ঢল করছে। টুইডের পুরোন জামা ঝলঝল করছে। জায়গায় জায়গায় দাগ ধরেছে এবং ছিঁড়ে গেছে। প্যান্টটা ঝল ঝল করছে, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া। ওর চোখের সেই ঔজ্জ্বল্য আর নেই, সেই চোখ এখন আতংকে ভরা, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কপালে অসংখ্য কুঞ্চন রেখা, একটা চোখের ওপর কিছু চুল এসে পড়েছে। গাল ভেঙে গেছে, দাঁত বোধহয় সবকটি নেই, তাই চেহারাটা আরো করুণ হয়ে উঠেছে।

আমাকে দেখে ঠিক চিনতে পারছে মনে হয় না, কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কেমন যেন হতভম্ব ভাব। তারপর ধীরে ধীরে যেন সম্বিৎ ফিরে এল, তারপর হেসে আমার হাত দুটি চেপে ধরল, কী ঠান্ডা সেই দুটি হাত। আমি যেন ওর হাড়গুলি পর্যন্ত অনুভব করছি।

প্রচন্ড স্বস্তিভরে ও বলে উঠল—এলান! যেন অন্য কোনো ভয়ংকর ব্যক্তির প্রতীক্ষায় সে এতক্ষণ ছিল। গ্রান্ট আবার বলে ওঠে —এলান। এসো ভাই, আগুনের ধারে বসো। এখানে বড় ঠান্ডা।

তখনও আমার হাত দুটি ধরে আছে, যেন ছাড়তে চায় না, আমাকে একটা ইজি চেয়ারে নিয়ে বসালো—আমি বসতে পেয়ে যেন বাঁচলাম। নিজের চেয়ারটিতে ফিরে গিয়ে যেন অনেক স্বস্তিভরে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমার ভারী বিশ্রী লাগছিল। অবশেষে গ্রান্ট কথা বলল। যা বলেছে সে বিষয়ে বেশ সতর্ক হলেও মাঝে মাঝে ঘরের চারপাশের কোণে, বা দোরের দিকে শংকিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

—তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা। দেখা হয়ে ভালো হল। তেমন কষ্ট হয়নি ত। আমি জানতাম যে পুরনো বন্ধুর জন্যে এই কষ্ট তুমি করবে।

এইটুকু বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে দোরগোড়ায় তাকিয়ে রইল শূন্য নয়নে। তারপর আবার বলে উঠল—হ্যাঁ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ ভালো হল।

আমি কিন্তু ওর দৃষ্টিপথে তাকিয়ে দোরগোড়ায় কি আছে দেখার চেষ্টা করলাম। কিছুই দেখা গেল না। আমি বললাম—গ্রান্ট তুমি অসুস্থ। তোমার বিছানায় পড়ে থাকা উচিত।

প্রথমটা যেন আমার কথা বুঝতে পারল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর যেন অর্থ বুঝে হেসে উঠল।

—ডাক্তার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার দেহটা ভালো নয়। ভালো নয় ...

বারবার এই একই কথা বলে, শেষকালে ফিসফিস করে ঐ একই কথা বলে যায়। সমস্ত পরিবেশ আমার যেন শ্বাসরোধ করছিল। আমি মুক্তি চাই এই অবস্থা থেকে তাই বলে উঠি—ব্যাপারটা কি বলো ত

আমার কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা ছিল। আমি তবু বলি—কেমন যেন একটু আচ্ছন্নের ভাব, কি ব্যাপার, তোমার হয়েছে কি।

—হ্যাঁ এলান। আমি বড় অসুস্থ। আমাকে দেখে একটু বদলেছি মনে হচ্ছে না? সেইজন্যেই ত তোমাকে আসতে লিখেছিলাম। আবার সেই পুরোন জীবনে ফিরে যেতে চাই ভাই। অনেক দেরী হয়ে গেছে আর নয়, আর দেরী চলবে না। তবে একজন কেউ নর্ম্যাল মানুষ আমাকে সাহায্য না করলে হবে না।

স্পষ্ট বুঝলাম কথাগুলি বলছে বটে তবে ওর কোন আশা নেই মনে, কোনো বিশ্বাস নেই। সে সম্পূর্ণ পরাজিত তবু মনে মনে তার একটা ধারণা আছে যে এখনও হয়ত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে। আবার সাধারণ জীবনে ফিরে যাবে।

আমি বললাম —সত্যি করে বল দেখি কিসের মোহে তুমি এই বিরাট ধ্বংসস্তূপে এসে কবরস্থ হয়ে আছো?

তার সঙ্গে একরকম নির্বোধের মত যোগ করলাম এ অবস্থা আরামদায়ক ত নয়ই, স্বাস্থ্যকরও নয়, নিশ্চয়ই তোমার মাথার ঠিক নেই।

—মাথার ঠিক নেই, তাই না এলান, মাথার ঠিক নেই। সত্যি ভাই, আমার মাথাটা আর ঠিক নেই।

গ্রান্ট উঠে দাঁড়িয়ে ঘরটির এপাশ ওপাশ পায়চারী সুরু করতে করতে বলে —তবে, তুমি ত ভাই বসন্তকালের শেষের দিকে গ্লেন গ্যারিয়নের রূপ দেখনি—চারদিকে অজস্র বন্য ফুল ফোটে, আর এই হ্রদের জল যেন একটা নীল আয়না, আর তার ওপর বুনো হাঁস অলসভঙ্গীতে ভেসে বেড়ায়। কুয়াশা ভেদ করে সবুজ পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, আর পাখীরা গান গায়, সে কি আশ্চর্য লাগে তোমাকে কি বলব।

অতি দ্রুত অথচ মৃদু গলায় কথা বলছিল গ্রান্ট—এক এক সময় তার কথা এত অস্পষ্ট যে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল।

গ্রান্ট আবার বলে—বসন্ত শেষে কি গ্রীষ্মের গোড়ায় ত আর দেখোনি ভাই, আমাকে রোরী ম্যাকলিয়ড যখন এই সম্পত্তি অল্প দামে কিনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে তখন বসন্তের শেষ। তবে আমারও সেই শেষের সুরু, সর্বনাশের সূচনা সেইখানেই। এলান, আমি ভাই সূর্যালোক থেকে ধীরে ধীরে নেমে একেবারে অন্ধকার খাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, আমার কাছে সব অন্ধকার। আমিও অন্ধ হয়ে যাচ্ছি।

গ্রান্টের এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা আমি সবিস্ময়ে শুনে যাই—এ তার আগেকার ঝরঝরে কথা নয়—গ্লেনগ্যারিয়নের সৌন্দর্যের কথা বর্ণনার মধ্যে একটা ভয়ংকরত্ব ছিল।

গ্রান্ট বলে—প্রথমটা সব বেশ চলছিল। আমি কেনেডিকে রেখে দিতে রাজী হয়ে-

ছিলাম,—ঐ যে লোকটা তোমাকে নিয়ে এল—

এই পর্যন্ত বলে গ্রান্ট হাসতে লাগল —তার সেই ভয়ংকর ভঙ্গীতে অট্টহাস্য করে কাঁপিয়ে তোলে, গ্রান্ট বলে জানো, ঐ একটি মাত্র লোক বাড়িতে কাজ করতে পারে, আর কেউ এখানে কাজ করতে রাজী নয়। কেউ এর ভেতরে আসতেই চায় না। লোকটা রান্না করে, জামা কাপড় সেলাই করে, আমার দেখাশোনা করে—তবে ব্যাটা বোবা—

আমি ভাবলাম গ্রান্ট বোধহয় এইবার তার স্বভাবসুলভ খিদিতর ভাষা সুরু করবে—না, তা হল না। সহসা সে তার ভীতিজনক কুঞ্চিত মুখ আমার কানের কাছে এনে চুপি চুপি বলল—ওর বয়স কতো জানো? না জানিই বা কি করে জানবে—ওর বয়স দুশো বছর, তার বেশীও হতে পারে।

আমার ঘাড়ের ওপরকার চুলগুলি যেন খাড়া হয়ে উঠল। আমার সারা অঙ্গে শিহরন খেলে গেল। আমি বেশ ঘামছি, অথচ আমার হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ধরেছে। গ্রান্ট আবার সেই বিরামহীন পদচারণা সুরু করে। কেনেডির কথাটা ভুলে গেছে।

সে বিড় বিড় করে বলে—এই ঘর খানিই আমার এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রথম যখন আসি তখন সব বেশ ছিল, তারপর ঘরটা আমাকে পেয়ে বসল, আর ছাড়েনা। ভালো করে দেখ এলান, বেশ ভালো করে দেখে নাও—

বাহ্যত কোন গোলমালই নেই—তবে তেমন কোন আনন্দময় পরিবেশে বলা যায় না তা ছাড়া আলোহীন হাওয়ায় আরো নিরানন্দময়। সহজাত জ্ঞান থেকে আমি বুঝেছি যে একা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অলিন্দকে ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ছাদটা এতই উঁচু যে সেদিকে নজর চলে না, অন্ধকার মিলিয়ে গেছে। একটা ছোট্ট আকাশমুখী জানলার ভেতর দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সমস্ত দেয়ালগুলিতে গা আলমারি আর তাক বসানো। তার ভেতর চামড়া বাঁধানো অজস্র জীর্ণ পুস্তকের সার। যেসব আসবাবপত্র আছে তা মধ্যযুগ শতাব্দীর। খালি যে চেয়ারটিতে আমি বসেছিলাম সেটি বাদে।

সহসা গ্রান্ট আমার কাঁধটা চেপে ধরল —জামা ভেদ করে আমার অঙ্গে যেন ওর আঙুলের হাড় ফুটতে থাকে।

উত্তেজিত ভঙ্গীতে ভাঙ্গা গলায় গ্রান্ট বলে—আমার গোপন রহস্য তাহলে তোমাকে দেখাই।

এই বলে আমাকে একরকম চেয়ার থেকে টেনে সেলফের কাছে নিয়ে গেল। আলোটা উঁচিয়ে ধরে বই-এর তাকে কি খুঁজতে লাগল। আমি সেই সময় বইগুলির নাম লক্ষ্য করছিলাম কিন্তু এখন আর স্মরণ হয় না কি সব দেখেছিলাম। আমি কিছুকাল ধরে সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

উন্মাদের মত গ্রান্ট বইগুলি টেনে টেনে দেখতে থাকে। এরমধ্যে কতকগুলি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত, কিছু বাঁধানো পাণ্ডুলিপি, আবার কিছু বই এমন ভাষায় রচিত যা আমার জানা নেই। বই থেকে ধুলো উড়ে মেঘের মত চারদিক ছেয়ে যায়। কিন্তু ওর ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে।

এরপর আমাকে ও টেনে নিয়ে গেল টেবিলের কাছে, সেইখানে যে বইটি পড়েছিল তা দেখাল। আমি বইটি তুলে নিলাম —বেশ ভারী ফ্যামিলি বাইবেলের মত মোটা মোটা। বইটির পিছনে 'গ্লেনগ্যারিয়ন হাউসের মহাদেবী' এই নামটি সোনার জলে লেখা। গ্রন্থটি হস্তলিখিত পুঁথির মত এবং অতি প্রাচীন। আমি সাবধানে রেখে দিলাম। মহাদেবী যে কি বস্তু তা আমার জানা ছিল, পুরাণে বর্ণিত রহস্যময়ী দেবী। আমার মনে একটা মূর্তির আভাষ জেগে উঠল এবং আমার বন্ধুর মনটা কি অদৃশ্য রহস্যজালে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তা যেন বুঝতে পারি।

গ্রান্ট বলল—এটা লাইব্রেরী ঘর, এই ঘরটি আবিস্কার করে অবধি এইখানেই আমার আস্তানা করলাম। বইগুলি গোড়ায় গোড়ায় বেশ লাগত কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিটা পড়ার পর সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সব পরিবর্তিত হল।

আবার ঘরের কোণে ও কি খুঁজে বেড়ায় ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে। যেন একটা নীলবসনা ছায়ামূর্তি এখনই আত্মপ্রকাশ করবে। আমার শরীরটা কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল। ঘরের বাতাসে যথেষ্ট অক্সিজেন নেই।

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলি—তুমি নিশ্চয়ই এই সব বিশ্বাস করো না?

আমার দিকে ভয়ংকর ভঙ্গীতে তাকালো গ্রান্ট। বলল—যদি নিজের চোখে দেখো তাহলেও কি বিশ্বাস করবে না? নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে বলো? দিনের প্রতিটি মুহূর্তে যে আমার সঙ্গ ছাড়া নয়, এ কথা জানার পরও কি বিশ্বাস না করে পারবে?

এই বিরাট প্রাসাদের নির্জন পরিবেশ, সঙ্গীর অভাব এবং প্রতিদিন এই জাতীয় উদ্ভট গ্রন্থাদি পাঠ করে গ্রান্টের মাথাটাকে বিভ্রান্ত করেছে। এই অবস্থা থেকে যত তাড়াতাড়ি তাকে উদ্ধার করা যায় ততই মঙ্গল, নইলে এই অশুভ প্রভাব থেকে ওকে ত্রাণ করা যাবেনা। অশরীরি প্রেতের এই নিরন্তর অভিনিবেশ তার এই অবস্থার উন্নতির পক্ষে বিঘ্নকর। ওর মনে ভূতের ভয় আছে, এখান থেকে ওকে যে ত্রাণ করা সম্ভব এই বিশ্বাস ওর মনে সৃষ্টি করা যাবে না।

সে অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলল—এলান, তুমি বুঝছো না, ও কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। এখান থেকে যেতে দেবে না। যেখানে আমি যাবো ছায়ার মতো আমার সঙ্গ নেবে।

এই অত্যুজ্জ্বল আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা বৃথা। তখনকার মত আমি সেই চেষ্টা ত্যাগ করলাম। কেনেডি ট্রে সাজিয়ে কিছু আহার্য দিয়ে গেল, আর সঙ্গে এক বোতল ক্ল্যারেট। সবই উত্তম খাদ্য এবং পানীয় দুই-ই তাজা। আমার মনটা চাঙ্গা হল— কিন্তু রাতে শোবার সময় আমার আতংক আবার ফিরে এল।

গ্রান্ট আমার শোবার ঘর দেখিয়ে দিল। অসংখ্য সংকীর্ণ বারান্দা অতিক্রম করে আসতে হয়।

সে বলল—আপসকারি, তোমার অসুবিধা হবে না।

কথাগুলি বলল বটে, কিন্তু মনে মনে সে অসুবিধার কথা জানত। এই কথা বলেই আর এক মিনিট না দাঁড়িয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল ওর পড়ার ঘরের দিকে। আমার হাতে একটি বাতিদান দিয়ে গেল। এর পেতলের হাতলটা সাপের মত এবং বেশ ভারী। অনেক দিনের প্রাচীন সন্দেহ নেই। আমি সেটি বিছানার পাশে একটা ছোট টেবিলে রাখলাম। তারপর ঘরটা দেখতে শুরু করি।

ঘরটি ছোট্ট, দেয়ালের পরদাগুলি অতি প্রাচীন। তার গায়ের ছবিগুলি সব মুছে গেছে। দরজার দিকে মুখ করে একটি বিছানা পাতা, খাটটি চারপায়া। এই খাট, একটি চেয়ার এবং ছোট্ট টেবিলটি ছাড়া ঘরে আর আসবাবপত্র নেই। দেয়ালে একটি গা-সেলফ আছে, আগেকার দিনের বড় কুলুঙ্গির মত, তার ওপর একটি ছিটের পরদা। এই কুলুঙ্গিতেই আলনা আছে যেখানে জামা কাপড় রাখা হয়।

কেনেডি কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাভরেই আমার ব্যাগটা এনে ঘরের মেঝেতে রেখে দিয়েছে। লোকটির আকৃতি মনে পড়তেই তার সেই ভয়ংকর আকৃতিটা নজরে পড়ল। আমি তখনই দরজার দিকে তাকালাম এবং চাবী লাগিয়ে দিলাম। খিলটা বেশ মোটা সেটি হাঁসকলের ভঙ্গীতে লাগাতে হয়।

জামাকাপড় ছাড়ার আগে জানলার দিকে তাকালাম। জানলার সার্সি থেকে হ্রদটা দেখা যায়। তার ওপর চাঁদের আলো ভেঙ্গে পড়েছে। সমগ্র দৃশ্যটি বেশ শান্ত এবং স্তব্ধ। আমি জানলাটা খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটি নাড়ানো কঠিন।

একরকম মরীয়া হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। জানতাম ঘুম হব না একবিন্দু। কিন্তু বিছানাটা অনেক আরামদায়ক। এতটা আশা করিনি। অচিরাৎ আমার তন্দ্রা এলো। বাতিটা বেয়াড়াভাবে জ্বলছিল। তার শিখা এদিক ওদিকে আন্দোলিত। আমি ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। আর প্রায় তৎক্ষণাৎ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।

যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় রাত দুটো। কিসের জন্য যে ঘুমটা ভাঙলো তা বোঝা গেল না। কয়েকটি মুহূর্ত নীরবতা, তারপর নীচে কোথায় মৃতীর কলরব সুরু হল। কারা যেন থালাবাসান ছুঁড়ছে—তাদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। কোন বিশেষকণ

…খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম, …তু দেখলাম —ইঁদুর আর ছুঁচোর …শান্ত। তারাই রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভাঙছে।

…আমার হয়ত তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম— …নার ওপর উঠে বসেছিলাম —তারপর …আছে সেই অন্ধকারে দরজার দিকে …নেকক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে- …লাম। চোখে একবিন্দুও ঘুম ছিল না। …হল বিছানার চাদরটা নিয়ে কে যেন …ছে, টেনে বিছানার প্রান্তে নিয়ে চলেছে. …ং আমি একটা হাসির আওয়াজ শুনতে …লাম। এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। দর- …র কাছাকাছি কোনো ঘর থেকে এই …ওয়াজটা আসছে। আমি চোখ খুলে …লো করে দরজার দিকে তাকালাম। …রে ধীরে আমার পায়ে যেন ছুঁচ ফুটতে …কে। আমি চোখের পাতাটা বন্ধ করে …বার খুলি। আবার তাকাই বেশ স্পষ্ট …র দরজার দিকে। আমার মাথার চুল …ড়া হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট বুঝলাম, …মার গলা দিয়ে গোঁ গোঁ করে শব্দ হচ্ছে। …ন্তু কথা বলার শক্তি নেই। দরজার …পর আলো আঁধারের ভেতর একটা …কৃতি স্পষ্ট দেখা গেল।

…দরজা আগের মতই বন্ধ করা আছে। …ই মূর্তি আমার দিকে সোজা তাকিয়ে …ছে। নারীমূর্তি। দীর্ঘাকৃতি এবং শীর্ণ। …থার সোনালী চুল কোমরে এসে ভেঙে …ড়েছে।

…তার অঙ্গের আবরণ পাতলা সবুজ …ঙের ওড়নার মতো কোমরের কাছে জড়ো …। নারীমূর্তির মুখখানাতেই আমার …তংক গভীরতর হয়ে ওঠে। যেন ধূসর …ঙের মুখ। আমার দিকে ঐভাবে কিছুক্ষণ …কিয়ে থেকে নারীমূর্তি হাসল---- সামান্য …পা হাসিমাত্র নয়, কিন্তু মুখভঙ্গীর পরি- …র্তন নেই। তারপর আমার দিকে …র একবার অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি হেনে ধীরে …রে ঘর থেকে চলে গেল।

…আমি যুক্তিবাদী, কোনো ভাবাবেগের …র ধার ধারি না। বেশ কঠিনচিত্ত মানুষ। …াণ না পেলে কোনো কিছুই বিশ্বাস …র না। সহজে ভয় পেতে চাই না। আমি …ড়াতাড়ি বিছানাটা ঠিক করে দরজার …কে এগিয়ে গেলাম। আর এই সময়ে …মার মনে সংশয় জাগল। দরজাটা …লা ত নেই, বরং কিছুতেই খোলা যাচ্ছে …। বেশ ভালো করে খিল আঁটা। …নবিক কোনো কিছু এই সুদৃঢ় ওক …ছের ভেতর দিয়ে যাবে কি করে।

বাকী রাতটুকু ড্রেসিংগাউন পরা অব- …য় কাঁপতে কাঁপতে কাটালাম সেই …স্বস্তিকর চেয়ারে বসে। আমি স্থির কর- …ম যে ভোরে উঠেই চলে যাব। আর এই …তলোকে নয়।

এই আমার সংকল্প ছিল। পরে কত- … ভেবেছি যদি এই সংকল্পে অটল …তাম কত ভালো হত। কিন্তু গ্রান্ট আমাকে অনুরোধ করল থেকে যাওয়ার জন্য, এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। আর এই থাকার জন্যই ট্র্যাজেডির শেষ অঙ্ক পর্যন্ত আমাকে বাধ্য হয়ে দেখতে হয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার। সপ্তাহটি ঘটনাহীন অবস্থায় কাটল। দিনের বেলা আমরা অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাতাম। আমার বন্ধুকে ভালো দেখাচ্ছিল—তার মুখের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে রঙ ফিরে আসছিল। চোখের নীচে যেরকম থলির মতো মাংস ঝুলে পড়েছিল তা যেন অনেকটা সেরে গিছল। দিনের বেলা গ্রান্টের এই অবস্থা। আমার আশা ছিল যে তাকে এইখান থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সে আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে যেত। সেই প্রেতলোকে প্রবেশ করলেই সে অন্য মানুষ, বিশেষতঃ সেই পড়ার ঘর—তখন সে নার্ভাস হয়ে পড়ত—দিনের কথা সূর্যালোকে সবই বিস্মৃত হত। সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত যেন এক অন্তহীন খেলা চলেছে।

আমার নিজের দিক থেকে প্রথম রাত্রের সেই দুঃস্বপ্নের ঘোর আমার দুর্বলমস্তি- ষ্কের উদ্ভট কল্পনা বলে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তবে মনে জানতাম, এ আমার ভ্রান্তি নয়। সেই ঘটনা দুর্বল মস্তিষ্কের খেলা নয়।

অবশেষে সেই চরম ট্র্যাজেডির রাত্রি ঘনিয়ে এল। সেই রাত্রির সুরু অন্য অনেক রাতের চেয়েও ভালোভাবেই হয়েছিল। আমি গ্রান্টকে তার ঐসব ভুতুড়ে বই আর পুঁথি থেকে ভুলিয়ে রেখেছিলাম খানিকক্ষণ। নৈশ ভোজের পর একদান দাবা খেলা হল। তারপর দুজনেই শুতে গেলাম।

শোবার ঘরের আতংকটা আমার অনেকটা কেটে গিয়েছিল—একটু একটু ঘুমাতে পেরেছিলাম। জামাকাপড় পরেই শুয়েছিলাম, শুধু জুতোটা, জ্যাকেটটা খুলে রেখেছিলাম। গলার কলারটা খুলেছিলাম— এইভাবেই সেই বিরাট খাটটায় শুয়ে পড়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কি করে যে ঘুম ভেঙে গেল জানি না, জানতে পারিনি। বাতাসে কি যেন ছিল— আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়েছিলাম—আবার ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কোনরকমে ঘুম আর আসছিল না। আমি আমার ঘড়িটা দেখ- ছিলাম—এমন সময় একটা বিশ্রী চীৎকার শোনা গেল—আমি শপথ করে বলতে পারি —এই উৎকট আওয়াজ মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরোতে পারে না।

এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম আর পায়ে জুতোটা পরে নিলাম—গ্রান্ট আমার পাশের ঘরে শোয়, কিন্তু এমনই চওড়া দেওয়াল দুটি ঘরের মধ্যে যে কি যে হচ্ছে ঐ ঘরে তা জানার উপায় নেই। আমি আমার কোটটা গায়ে দিতে দিতে শুনতে পেলাম গ্রান্টের দরজা খোলা হল—কিন্তু আমি বারান্দায় পৌঁছতে পৌঁছাতে ও চলে গেছে। অনেক দূর থেকে তার চীৎকার শোনা যাচ্ছে। আর প্রতিটি চীৎকারের পর একটা পরিহাস ভরা প্রতিধ্বনিতে সারা প্রাসাদ ভরে উঠছিল। এই প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে ওপর থেকে। আমি সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। জানতাম এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরের একটা চাতালে দিকে পৌঁছানো যায় এবং সেইখান থেকেই ছদটা বেশ দেখা যায়। গ্রান্টের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে চলেছি। আমি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকি—কেবল ঘুরপাক খাচ্ছি কি যে হচ্ছে তা আর দেখতে পারছি না। অব- শেষে একেবারে পৌঁছলাম। চিলের ঘরে যাবার দরজায় চাবী লাগানো।

যতবার হাতল ঘোরাতে যাই ততই সে অলৌকিক চীৎকার ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ভয়ে, আতঙ্কে এ উৎকণ্ঠায় আমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছি, আমার সারা দেহ ঘামে ভাসছে ---দেহ থরথর করে কাঁপছে---আমি চীৎকার করছি, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি— গ্রান্টকে ডাকছি পাগলের মত। দরজা খোলার জন্য বলছি—কিন্তু দরজা জোরে আটকানো।

আমি স্পষ্ট শুনলাম গ্রান্ট যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। আমি ওর নাম ধরে আবার ডাকি চীৎকার করে— মনে হল একটু থামল যেন ওদের কথাবার্তা। তার- পর আবার সেই তীব্র চীৎকার—আবার। দরজার ওপাশে কি যে হচ্ছে তা ঈশ্বর জানেন।

দরজা খোলার চেষ্টা আর না করে আমি প্রাণপণে নীচে দৌড়ে নেমে গেলাম। দুএকবার পড়েও গেলাম, অবশেষে সদর দরজায় আমি পৌঁছলাম। সেই দরজাটা খোলা ছিল।

বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখন আমার দেহে দারুণ শিহরন খেলে গেল। প্রচণ্ড শীতের হাওয়ায় যেন হাড় কাঁপছে। কে যেন ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলল—অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি বাড়ির উত্তর দিকে হলের কোণে দৌড়ে গেলাম সেখান থেকে ওপরে ওঠা যায় কিনা চেষ্টা করার জন্য—এমন সময় কি একটা বস্তু আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। এই পিন্ডাকৃতি বস্তুটি গ্রান্টের দেহ, তার মুখে নিদারুণ আতংক ও তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন। আমি তখনই ওপর দিকে তাকালাম।

পাঁচিলের ওপর একখানি ধূসর মুখ উঁকি দিয়ে দেখছে। তার পিঠের ওপর সোনালী চুলের রাশ ছড়ানো। হাওয়ায় উড়ছে সেই অজস্র চুল যেন কতকগুলি সাপ ফণা উঁচিয়ে নৃত্য করছে। প্রথম রাত্রে আমার ঘরে যে উন্মাদিনীর হাসি

শুনেছিলাম—সেই অট্টহাস্য আবার শোনা গেল—পাঁজরা কাঁপিয়ে দেয় এই চীৎকার। তারপর সেই মুখ চকিতে মিলিয়ে গেল।

আবার যখন বন্ধুর সেই দলিত মথিত দেহটার দিকে তাকালাম তখন দেখি কেনোডি প্রভুর পাশে এসে বসেছে —আমি তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে শুনিনি— আমি চীৎকার করে উঠলাম, কিছুতেই চাপতে পারলুম না। সেই অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে বসে আছে কেনোডি, তার দেহ থেকে সমস্ত পোষাক খসে পড়ছে, একটা উন্দাম নিষ্ঠুরতার ছাপ তার মুখে, তার সারা দেহে অজস্র চুল—বিশ্রী জিভ বার করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার চোখ দুটি জ্বলছে। তার দাঁতগুলি যেন অনেক বড়ো মনে হচ্ছে, আর তার মুখে তীব্র ঘৃণার ছাপ।

আমি চীৎকার করে দৌড়াতে থাকি, কতবার পড়েছি, কত আছাড় খেয়েছি—মাঝে মাঝে কেনোডির বীভৎস চীৎকার শোনা যাচ্ছে—আমি প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছি। কতক্ষণ এইভাবে দৌড়েছি জানি না, একেবারে স্টেশন প্রান্তে এসে আমি অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। স্টেশনমাস্টার আমাকে তুলে এনেছিলেন ভেতরে।

এরপর অনেকদিন আমি ঘুমাতে পারিনি। স্প্লেনগ্যারিয়ন যতদিন না মন থেকে মুছে গেছে ভয়ে আতংকে আমার চোখে ঘুম আসেনি।

অমিতাভ মজুমদার
কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

উত্তরবঙ্গের বন্যার্ত : বাংলা বই

উত্তরবঙ্গে প্রলয়ংকর বন্যার প্রকোপে যে ধ্বংসলীলা ঘটে গেল, তা নিয়ে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে, তার হিসাবনিকাশ আজও নির্ণয়েরই চেষ্টা চলছে। এবং যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা পূর্ণ করবার জন্য চেষ্টা ও আকুতিরও শেষ নেই—এ আমরা প্রতিজনেই অনুভব করছি। বাংলাদেশের আদর্শভ্রষ্টতা সমাজ-শৃংখলাহীনতা প্রভৃতি যেসব দুর্লক্ষণের জন্য আমরা প্রতিজনেই চিন্তান্বিত হয়েছিলাম, এই মর্মান্তিক বিপর্যয়ের সংঘাতে, এই দুর্লক্ষণের মধ্য থেকে মহতী এই সেবাধর্মের আকুতি আজ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে নতুন একটি আশার দিগন্তকে প্রকাশিত করেছে। চারিদিক থেকেই বা দশদিক থেকেই বিধ্বস্ত দশদিককে নূতন করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। গৃহস্থের গৃহস্থালী, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়, মানুষের ব্যক্তি-জীবিকার ক্ষেত্র, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষায়তন সবই বিধ্বস্ত। এসবকেই আবার গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য চেষ্টাও হচ্ছে।

এরই মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক জীবনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় স্বনামধন্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল এম-এল-সি মহাশয়ের সঙ্গে পত্রযোগে ওখানকার সংবাদ নিতে চেয়েছিলাম। তার উত্তরে শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় জলপাইগুড়ির একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ-দিকটির কথা এপর্যন্ত কেউই কোনো আলোচনাতেই তোলেননি। এরজন্য তিনিও কারো প্রতি কোনো দোষারোপ করেননি, আমিও করছি না। কারণ এমন একটি খণ্ড প্রলয়ের পর—মানুষ যারা বাঁচে—তারা প্রথম চায় শ্বাসগ্রহণের স্বচ্ছ বাতাস—তারপর চায় দাঁড়াবার জন্য শুকনো জমি—তারপর তৃষ্ণার জল—তারপর খাদ্য—তারপর আশ্রয়। তারপর প্রয়োজন হয় জীবন পুনর্গঠনের খাদ্য বস্ত্র ঔষধ পথ্য ইত্যাদির পর সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন বড় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রকে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্য সংস্থা গঠিত হয়েছে; খাতা পেন্সিল বই সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে। সরকারও ছাত্রদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করছেন। এসম্পর্কে সান্যাল মহাশয় লিখেছেন—"এখন সারা ভারত থেকেই ত্রাণের বন্যা এসে গেছে, যার যেমন অভিরুচি সেইভাবে ত্রাণ চলছে।

কোথাও প্রাচুর্য, কোথাও অভাব। এগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

সবাই ব্যস্ত আহার, বাসস্থান ও পোশাক নিয়ে। কিন্তু মাথাটা যে হাহাকার করে মরে যাচ্ছে, এ-খেয়াল কারোরই দেখি না। শহরের বড় বড় পাঠাগারগুলি যে ধ্বংস হয়ে গেছে (এখানে শ্রীযুক্ত সান্যালের কথার সঙ্গে কয়েকটা আমার কথা জুড়ে দিয়ে বলি—পাঠাগার বড়-ছোট সবই বোধহয় গিয়েছে—কারণ, জল ও কাগজের সম্পর্কটা জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্কের মতোই বিরুদ্ধ) সেগুলিতে আবার প্রাণ সঞ্চার করতে না পারলে শহরের মানুষ যে আবার আদিম যুগে ফিরে যাবে। আমি মোটামুটি হিসেব করে দেখেছি, সব পাঠাগারগুলিতে প্রাণ দিতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দরকার।......এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারলে ভাল হয়। আপনি লিখেছেন, "অত্যন্ত ক্লান্ত রয়েছি।" এটার হাত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু কাজে নামতে অনুরোধ করছি।

এ-নির্দেশ জলপাইগুড়ির নির্দেশ—তাতে সন্দেহ নেই। সেই নির্দেশ বলেই আজ আমি বাংলাদেশের সমস্ত সাহিত্যিক-বর্গের কাছে তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলির এক-একখানি দান করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রকাশকবৃন্দের কাছেও প্রার্থনা করছি তাঁদের প্রকাশিত নিজস্ব পুস্তকগুলির এক-একখানি দানের জন্য এবং আমাদের পরলোকগত আচার্যগণের উত্তরাধিকারীদের কাছেও অনুরূপ প্রার্থনা জানাচ্ছি।

এছাড়াও আমার নিবেদন এই যে—এই বিষয়টি আলোচনার জন্য বাংলাদেশের দৈনিকপত্রের সম্পাদকবর্গ এবং প্রকাশকদের প্রতিনিধিবৃন্দ ও অগ্রণী সাহিত্যিকবৃন্দ যদি একত্র মিলিত হয়ে আলোচনা করে কোন একটি বিশেষ সংস্থা সংগঠন করেন, তাহলেই এর পথ সুগম হতে পারে। সকলজনকে নমস্কারান্তে ইতি—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন

ভারতীয় সাহিত্য

ভারতের বাইরে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসার লক্ষ্য করলে যে কোন ভারতীয়ই মনে মনে খুশি হন। সম্প্রতি ফরাসী দেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসারের জন্য একটি কবিতা পত্রিকা বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। পত্রিকাটির নাম বঙ্গানুবাদে দাঁড়ায় 'বৃক্ষ'। এই পত্রিকার একটি বিভাগই রয়েছে ভারতীয় কবিতা অনুবাদের। গত জুলাই অকটোবর সংখ্যায় পাঞ্জাবী কবি শ্রীমতী প্রাভজোত কাউর, হিন্দি কবি শ্রীঅশোক বাজপেয়ী এবং বোম্বাইয়ের শ্রীসেলিম পিরাদিনার কবিতা ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে সংকলিত হয়েছে। আগামী সংখ্যায় বাংলা দেশের কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ কবির কবিতা প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক জাঁ মেরি পাপা-পিয়েরো। পত্র-পত্রিকায় ভারত সম্পর্কে ফরাসী জাতির কেবল অনীহার কথাই শোনা যায়। কিন্তু এটাই যে একমাত্র চিত্র নয়, আশা করি এ সংবাদ তার কিছুটা ইঙ্গিত দেবে।

যুগোস্লাভিয়াতেও ভারতীয় গ্রন্থের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার একটি প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সাময়িকী বিভাগে নিয়মিতভাবে ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এই অনুবাদ করছেন প্রখ্যাত তরুণ লেখক ভৈর্তো কুজমাভিচ। এর মধ্যে যাঁদের লেখা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন পাঞ্জাবী কবি শ্রীমতী অমৃতা প্রিতম, হিন্দির 'অজ্ঞেয়', বাংলার প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আজিজ সান্যাল, গণেশ বসু, ওড়িশার কালিন্দী-চরণ পাণিগ্রাহী। শ্রীকুজমাভিচ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উপরেও একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের উপরেও তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারততত্ত্ব' বিভাগের কথাও প্রসঙ্গত এসে পড়ে। ভারতীয় সাহিত্যকে অস্ট্রেলিয়ায় প্রচার এবং প্রসারের ব্যাপারেও তাঁদের ভূমিকা নগণ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের অভিনয়ের কথা এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য, তা হল সেখানকার তরুণ লেখকদের ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। শ্রীমতী ম্যারিয়ান এ ভরমেট এর মধ্যেই জীবনানন্দ দাশের বেশ কটি কবিতার অনুবাদ করেছেন। জীবনানন্দের এত স্বচ্ছ ও সুন্দর অনুবাদ খুব কমই হয়েছে।

মস্কোর তরুণ কবি শ্রী এ আরুন অনুবাদ করেছেন প্রাচীন তামিলের 'শিলাপ্পাদিকম'-এর কিছু অংশ। আর্জেন্টিনার শ্রীকার্লস এ কুয়েব স্প্যানিশ ভাষায় ভারতীয় কবিতার একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। 'লেনিনগ্রাদ' বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী ভেরা নভিকভা এবং প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ দুশান জবাবিতেল্-এর কথা সকলেই জানেন। বিদেশে ভারতীয় ভাষার এই প্রচারের এবং বিদেশীদের এই আগ্রহের কথা শুনে অন্তত এটুকু আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যের ছবিই শুধু বিদেশীদের অন্তরকে আঘাত করেনি—তার মর্মো-পলব্ধি করবার জন্যও অন্তত কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন।

ইংলন্ডের প্রবাসী ভারতীয়দের সংবাদ এদেশে খুব কমই প্রচারিত হয়। একমাত্র রাজনৈতিক ভিত্তি অর্জন করলেই মাঝে মাঝে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের সংবাদ সম্বন্ধে প্রায় কোনও খবরই আমরা রাখি না। তাঁরাও সেখানে মাঝে মাঝে সাহিত্য সভায় মিলিত হয়। ভারতীয় ভাষায় দুই-একটি পত্র-পত্রিকাও তাঁদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের এলাইং টাউন হলে বিকেল ৪-৩০ মিঃ প্রবাসী পাঞ্জাবী কবিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌরোহিত্য করেছেন সর্দার যোগিন্দর সিং। কবিতা পাঠ করেছিলেন অর্পণ, আলোক, সাকি, সেবক, সাধু, দিলওয়ালি এমন আরো অনেকে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ভাগলপুরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। গত ১৭ নভেম্বর সেখানে বিহার প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গলি এসোসিয়েশন'-এর ১১শ সাধারণ বার্ষিক উদযাপনের জন্য একটি 'অভ্যর্থনা সমিতি' গঠিত হয়। সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও আহ্বায়ক সহ এগারটি উপ-সমিতি গঠিত হয়েছে। 'অভ্যর্থনা সমিতির' সভাপতি—শ্রীবিনয়-ভূষণ রায়; সহ-সভাপতি—অধ্যক্ষ সুকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীরামাশিস ঘোষ ও সত্যেন্দ্র-প্রসাদ বসু রায়, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ; যুগ্ম সম্পাদক সমীরকুমার ঘোষ, অধ্যাপক কমলু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামমোহন পত্র শ্রীপার্থসারথি ঘোষ ও শ্রীঅ মুখোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ — শ্রীজ মৈত্র নির্বাচিত হয়েছেন। আ ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ উৎ অনুষ্ঠিত হবে।

জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাত খাদ্য, গুঁড়োদুধ, ঔষধ, বস্ত্র, কম্বল ইত্য বিতরণ ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন বন্যার্ত পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করছেন। এর মিশন অধিকতর দুর্গম এলাকাতেই শুরু করেছেন। যেখানে প্রয়োজন সাহায্য এখনও পৌঁছোয়নি। পুনর্বাস পরিকল্পনায় মিশন থেকে কিষাণ কৃষি যন্ত্রপাতি, খাবার জলের জন্য খনন এবং সংস্কার, রান্নার জিনিস ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হ ছাত্রদের পাঠ্যবই এবং শিক্ষোপক দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে বন্যাপী এলাকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাছে তাঁদের প্রয়োজন সম্বন্ধে মিশ জানাবার জন্য অনুরোধ করা হয়ে স্কুল, কলেজে বুক-ব্যাংক স্থাপন ছাত্রদের বই দেওয়ার ব্যবস্থা করাই মিশ পরিকল্পনা। এই কাজের জন্য মিশন সাহ দিতে সচেষ্ট।

মহাপুরুষদের স্মরণীয় করে রাখ এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বিভিন্ন রাস্তা বা বিদ্যায়তনের নাম পুরুষদের নামে করা হয়ে থাকে। সম্প বঙ্কিমচন্দ্রের নামে একটি রাস্তার করবার প্রস্তাব এসেছে কাঁথি থেকে। দ পূর্ব রেলপথের কাঁথিচক স্টেশন দীঘা পর্যন্ত স্বল্প দৈর্ঘ্যের রাস্তাটি এ রামনগর রোড নামে খ্যাত। এই রাস্ মাত্র আঠার মাইল। 'এগরা রামনগর রা উন্নয়ন সমিতি' এই রাস্তার নাম বঙ্কি সরণী করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকা কাছে আবেদন করা হয়েছে। সমিতির থেকে শ্রীসমরেন্দ্র জানা ও শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ মহাপাত্র এই তথ্য পরিবেশন করেছেন।

সম্প্রতি 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' নামে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচ শ্রীবি এম ভাটিয়া প্রকাশ করেছেন বো 'এশিয়া পাবলিশিং হাউস'। যদিও গ্র দুর্ভিক্ষের উপর রচিত, তবু এতে ভার অর্থনীতি সম্বন্ধেও অনেক তথ্য আছে

বিদেশী সাহিত্য

"আপনারা কি সেনেটর গোল্ডওয়াটার সম্পর্কে মিথ্যে ধারণার সৃষ্টি করতে চান? আপনারা কি ইচ্ছে করে তাঁর মর্যাদাহানির চেষ্টা করেননি? আপনারা কি জ্ঞাতসারে মিথ্যে দুর্নাম ছড়িয়েছেন?"—প্রতিবাদী পক্ষের এটর্ণী এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন 'ফ্যাক্ট' পত্রিকার সম্পাদক ওয়ারেন বয়োসন এবং প্রকাশক রালফ গিনজ্‌বার্গকে। উত্তরে উভয়েই জোরের সংগে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন—'না'। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তাঁরা নাকি ব্যারি গোল্ডওয়াটারকে একজন ছিটগ্রস্ত, হোমোসেক্সুয়্যাল এবং পরবর্তীকালের হিটলাররূপে চিত্রিত করেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর অফিসিয়েল যোগ্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এ নিয়ে মার্কিনী আদালতে তুমুল হৈ-চৈ। প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত চাওয়া হয়। কিন্তু অনেকেই এ-ব্যাপারে নীরব থাকেন। গিনজ্‌বার্গ বলেন, "প্রবন্ধটি ভালোভাবেই সম্পাদিত হয়েছিল।"—কিন্তু জুরিরা তাতে সন্তুষ্ট হননি। একজন মানী ব্যক্তি সম্পর্কে কুৎসা রটনা এবং সত্যকে বিকৃত করার অপরাধে তাঁরা উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করে পঞ্চাশ হাজার ডলার জরিমানা করেন। এর অর্ধেক দিতে হবে সম্পাদককে। কিন্তু গিনজ্‌বার্গও ছাড়বার পাত্র নন। আপীল করেন উচ্চ আদালতে। এ নিয়ে লেখালেখিও শুরু করেন। 'এরস' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ও 'দি হাউসওয়াইফস হ্যান্ডবুক অন সিলেকটিভ প্রমিসকুইটি' নামে একটি বই বিক্রী করে তিনি অর্থোপার্জন করতে থাকেন। সুপ্রীম কোর্ট এবার নতুন আইনের খেলা দেখিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। পর্ণোগ্রাফি রচনার অপরাধে তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এখন গিনজ্‌বার্গ সুপ্রীম কোর্টের রায় মকুবের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

বিখ্যাত বইয়ের ব্যবসায়ী সুক্যাম্প ভারলেগ সম্প্রতি ব্রেখট-এর নাটকের বাজার চাহিদা সম্পর্কে একটি হিসেবনিকেশের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। ১৯৫০ থেকে ৬৮ সালের মধ্যে পেপারব্যাক সিরিজে তাঁর 'মাদার কারেজ' নাটকটি বিক্রী হয়েছে চার লক্ষ দশ হাজার কপি। অন্যান্য নাটকের বিক্রয়-সংখ্যাও কম নয়। 'লাইফ অব গ্যালিলিও' বিক্রী হয়েছে দু' লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার এবং 'দি গুড ওমেন অব সেৎজুয়ান' দু' লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার কপি। এই সময়ের মধ্যে 'মাদার কারেজ' অভিনীত হয়েছে ১০৫টি রঙ্গমঞ্চে, 'হের পুনতিলা অ্যান্ড হিজ ম্যান মাত্তি' ৮৭টি মঞ্চে, 'দি থ্রিপ্যানি অপেরা' ৭৪টি মঞ্চে এবং 'দি গুড ওমেন অব সেৎজুয়ান' ৭৩টি মঞ্চে। মোট পনের হাজার ন' শ' কুড়িবার এসব নাটক অভিনীত হয়। ব্রেখটের নাটকের মঞ্চসাফল্যও তাঁর বইগুলির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

ফরাসী কবি জাঁ-পল দ্য ড্যাডেলসেন-এর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'জোনা' ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়কে ভিত্তি করে কবিতাগুলি লেখা হলেও প্রত্যক্ষ কিছু বক্তব্য বলতে চেয়েছেন তিনি। এই গ্রন্থের আঙ্গিক প্রকরণে বহু নতুন বিষয়ের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। ভাব ও চিত্রকল্পে বাইবেলের বহু পরিচিত ঘটনার কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক কবিতাও তিনি লিখেছেন। নারী সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস রহস্যময়। এই সংকলনের কবিতাগুলিতে স্বর্গবাসী অ্যাঞ্জেলদের সংগে নারীর সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। ধ্বংসের একটি অনিবার্য ভীতি এবং অস্থিরতাও উপলব্ধি করা যায় তাঁর বহু কবিতায়। তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি লেখা শুরু করেন আর মারা যান আটত্রিশ বছর বয়সে। কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন এডওয়ার্ড লুসি-স্মিথ।

চেহারার সাদৃশ্যে দু'জন ব্যক্তিকে নিয়ে কি রকম ভুলভ্রান্তি ঘটে যেতে পারে, তার সাহিত্যিক নজির আছে শেক্‌সপীয়রের নাটকে এবং বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাসে। নাম-সাদৃশ্যেও এরূপ বিভ্রান্তির নিদর্শন প্রচুর। সম্প্রতি পাশ্চাত্য-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা দু'জন সাহিত্যিককে নিয়ে রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের দু'-জনেরই নাম জেমস বল্‌ডউইন। দুজনেই প্রতিভাবান সাহিত্যিক, সংযতবাক এবং আদর্শবাদী। ইদানীং তাঁরা দুজনেই প্রায় একই বিষয় নিয়ে সাহিত্যচর্চা করছেন। একজন কিছুদিন আগে 'দি ফায়ার নেক্সট টাইম' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। অপরজন লেখেন 'গো টেল ইট অন দি মাউণ্টেন নামে আরেকটি উপন্যাস। দ্বিতীয়জন মনে করেন, মানুষেরা এখন নিঃসঙ্গ এবং ব্যক্তিগত সমস্যায় ভারাক্রান্ত। অমনি প্রথমজন লিখলেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস—'টেল মি হাউ লঙ দি ট্রেন্‌স বিন গন'। হোমোসেক্সুয়্যাল অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু নাম-সাদৃশ্যে উভয় সাহিত্যিক পারস্পরিক নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত।

নতুন বই

রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান : (জীবনী ও সাহিত্য) — দেবীপদ ভট্টাচার্য।। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩।। দাম : ছ' টাকা।

ঊনিশ শতকের প্রথমে বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সার্থক প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, লালবিহারী দে ছিলেন সেই যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম পুরুষ। তাঁর 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল' এবং 'বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ বা গোবিন্দ সামন্ত' এককালে বাঙালির প্রিয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছিল। আজ লালবিহারী বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভা। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনীষা—স্বাদেশিকতা এবং বাঙালিত্ববোধ গবেষকের অনুসন্ধানের বিষয়। তাঁর কোনো গ্রন্থও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত নেই। স্বভাবতই ছাত্র-শিক্ষক মহলে তাঁর জীবন কিংবা রচনাবলীর উপযুক্ত অনুশীলন হচ্ছে না।

অথচ এককালে লালবিহারীর বুদ্ধিদীপ্ত রচনাবলী দেশী-বিদেশী সুধীজনের আলোচ্যবিষয় বলে গণ্য হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুর গ্রন্থ সমালোচনা করে তিনি সাময়িকভাবে উভয়েরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন। নিজে খৃস্টান হয়েও ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এবং একই সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার প্রায় সমকালে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' নামে একটি নকসাধর্মী কাহিনী রচনা করেন। তাঁর জীবনদৃষ্টির নিঃসংশয় অকৃত্রিমতা যে-কোন সৎ পাঠকেরই মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য এ-গ্রন্থের প্রথমার্ধে তাঁর সেই অপ্রকাশ্যপ্রায় জীবনের ধারাবাহিক পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন। একটি সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম নিয়েও কিভাবে তিনি সমকালীন যুগ ও জীবনের অন্যতম পুরোধা হয়ে উঠেছিলেন—তার পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রিত হয়েছে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'। লালবিহারী তাঁর স্ব-সম্পাদিত 'সম্বাদ অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রথমে এটি প্রকাশ করেন ধারাবাহিকভাবে। তখন লেখকের নাম ছাপা হয়নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ও লেখকের নাম ছিল গোপন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে বইটির ফটোস্টাট কপি আনিয়ে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। প্রথম প্রকাশের সময় বইটি বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা আমাদের জানা নেই। তবে শিক্ষিতজনের নীরবতা তাঁর সম্ভাবনাকে প্রায় অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল। আশা করা যায়, সত্যিকারের সাহিত্যানুরাগীরা এবার 'আলালের ঘরের দুলালের' সমকালীন এই রচনাটি সম্পর্কে অধিকতর দায়িত্বশীল আলোচনায় উৎসাহিত হবেন।

নৃত্যে ভারত : (আলোচনা) মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী। পরিবেশক—ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, বিধান সরণী। কলিকাতা—৬। মূল্য—১০্ টাকা।

শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী প্রণীত "নৃত্যে-ভারত" ভারতীয় নৃত্য-বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ। কলারসিক এবং নৃত্য-শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই এ গ্রন্থ সমাদরে গৃহীত হবে বলেই বিশ্বাস।

নৃত্য অথবা সঙ্গীত রসের কারবারী হলেও গ্রন্থ-রচনায় সময় বিষয়বস্তুর সরস অথবা প্রামাণ্য পরিবেশন সহজসাধ্য নয়। কারণ লেখক যদি শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ হন—তবে তথ্য উদ্ঘাটন ও ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের দিকেই তার মনোযোগের অনেকখানিই ব্যয়িত হয়ে যায়। তখন নৃত্যের রসভোগের দিকটি স্বভাবতঃই উপেক্ষিত থাকে। আবার তিনি যদি শিল্পী হন, তবে নৃত্যের ব্যবহারিক দিক তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যব্যঞ্জক সঞ্চালন ও শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভবের রসেই বিভোর মনের পক্ষে—তথ্যের প্রতি নিরপেক্ষ আলোকপাত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে শ্রীমতী রায়চৌধুরী একাধারে শিল্পী ও শিক্ষয়িত্রী, সুরসিকা এবং নৃত্যশাস্ত্রজ্ঞা হওয়ায় রস ও তত্ত্ব ভাব ও রূপ, শিল্প এবং তার পটভূমিকার ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, ভারতের এই প্রাচীন শিল্পের যথাযথ রূপটি নিবেদন করার কঠিন পরীক্ষায় অনায়াসদক্ষতায় উত্তীর্ণ হয়ে কলারসিকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অতীত-ভারতে নৃত্যশিল্প সগৌরবে এবং উন্নতমানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং নৃত্যচর্চাও ছিল ব্যাপক এবং বহুধাবিস্তৃত। রাজ-দরবার থেকে সুরু করে পূজার অঙ্গন অবধি ছিল নৃত্যের নূপুর গুঞ্জিত ছন্দ-মুখরতায় উন্মাদনা। অন্য ভাবে বলা যায় চিত্তবিনোদন ও আধ্যাত্মিকতা-উন্মীলন—উভয় ভাবেই উপযুক্ত আধাররূপে এই শিল্প বিভিন্ন রুচি, মতভেদ ও প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকারের মার্গনৃত্য ও আঞ্চলিক নৃত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এক সময় সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কারণে এই উজ্জ্বল গতি কিছু মন্দীভূত হয়ে আসে। তারপর সেই মুহূর্তের থেমে যাওয়া গতি স্বাভাবিক নিয়মেই উত্তাল ছন্দে নতুন প্রাণের স্পন্দনে জেগে উঠল। গুণীজনের সক্রিয় সহায়তা ও আগ্রহে এ শিল্প শুধু স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি—বিক[illegible] অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

ছিন্দু [illegible] গুরুমুখী বিদ্যা। বিদ্যার্জনে গুরুর নির্দেশ যেমন প্র[illegible] তেমনই প্রয়োজন উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকে[illegible] ষোলটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই মাঝা[illegible] গ্রন্থে, ভারতীয় নৃত্যের সামগ্রিক [illegible] ইতিহাস, নৃত্য বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব[illegible] শিল্পীর মৌলিক চিন্তা, রসশিল্প [illegible] নৃত্যের স্থান প্রাঞ্জল ভাষায় সু-বিশ্লেষি[illegible]

নৃত্যে দর্শন ও সাহিত্যের সম[illegible] মনুষ্য এবং পৌরাণিক দেবদেবী [illegible] নৃত্যের সামাজিক মর্যাদার তারতম্য, [illegible] মঞ্চ, রূপসজ্জা, তাল, মুদ্রা এবং কথ[illegible] কথাকলি, ভারতনাট্যম মণিপুরীর সামা[illegible] ও আধ্যাত্মিক পটভূমিকা লোকনৃত্য [illegible] আধুনিক নৃত্যের ক্রম-পর্যায় ও প্র[illegible] ভেদ প্রামাণ্য চিত্র এবং শিল্পীদের নৃ[illegible] ভঙ্গি সহকারে নিবেদিত। রবীন্দ্রিক নৃ[illegible] ধারা এবং উদয়শঙ্করী নৃত্য ছাড়াও এ[illegible] সম-সাময়িক অনুজ শিল্পীরা যথা—সা[illegible] বসু, মণি বর্ধন এবং বুলবুল চৌধু[illegible] অবদানও সকৃতজ্ঞে স্বীকৃত।

আধুনিক নৃত্যের 'মুড'-এর প্রতিও য[illegible] যথ আলোকপাত করা হয়েছে। নিজে শিল্[illegible] হয়েও লেখিকা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অ[illegible] শিল্পীদের মূল্য নিরূপণে এবং মন্তব্যে[illegible] বিষয়বস্তুকে যেভাবে তুলে ধরেছেন [illegible] গভীর চিন্তা ও অনুশীলন সাপেক্ষ।

এ গ্রন্থের জন্য লেখিকা শিল্পী, রসি[illegible] শিক্ষার্থী ও তত্ত্বজ্ঞ সকলপ্রকার পাঠকে[illegible] অকুন্ঠ অভিনন্দন লাভ করবেন। ভা[illegible] সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজ[illegible] ছিল।

—সন্ধ্যা সে[illegible]

নতুন দিগন্ত : (কাহিনীআশ্রয়ী ব্যক্তিগ[illegible] রচনা) — শেখর সেন।। লিটারারী গিল[illegible] ৬-ই, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলকাতা-২৯। দাম : তিন টাকা।

শেখর সেন ব্যক্তিজীবনে কতকম[illegible] পুরুষ। নানাপ্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতি[illegible] সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থেকে তি[illegible] জীবনের বেশির ভাগ সময়টা কাটি[illegible] দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তাঁর সেই কর্মচঞ্চ[illegible] চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থা[illegible] ইংলণ্ডে বাসকালে তিনি সেখানকার পারি[illegible] পার্শ্ববর্তী দেশের মানুষের সঙ্গে মিশবা[illegible] সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি ফার্ম-ক্যাম্পে[illegible] দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছে এ[illegible] গ্রন্থটি। লেখকের ভাষায় : "এর প্রতি[illegible] চরিত্র বাস্তব, ঘটনা সত্য, সংলাপ অবিক[illegible] রিপোর্টিং করা হয়েছে।" ভাষা সহজ, [illegible] এবং সুখপাঠ্য।

সাহিত্যসেবার কণ্টক পথ

সাহিত্য-তীর্থের পথিকদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের সাধনার পথ দুঃসাধ্য বাধায় সমাকীর্ণ। এ-পথে হঠাৎ সৌভাগ্যের ফলে অভাবনীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত কমই চোখে পড়ে। অনেক সময়েই হয়তো দেখা যায় লেখক পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সমস্ত জীবন সাহিত্য-সাধনায় উৎসর্গ করেছেন, তবু আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হননি। যাঁরা শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করেছেন তাঁদের জীবনও কম সংগ্রাম-সঙ্কুল নয়।

আমাদের দেশের প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে আমরা অনেকেই অল্পবিস্তর পরিচিত। প্রথম জীবনে তাঁকে যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে সংগ্রাম করে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে সেকথাও কারো অবিদিত নয়।

এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রচিত গ্রন্থ "পথের পাঁচালীর" চিত্ররূপ বিশ্বের দরবারে যে অভূতপূর্ব সাড়া সৃষ্টি করেছিল, সেই অসামান্য সাফল্য বিভূতিভূষণ নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেননি। এমন কি শোনা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পূর্বে অনেক সময়ে নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যেই তাঁর দিন কেটেছে।

জগতের অধিকাংশ সাহিত্যিকই ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হননি। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেজন্য অন্য অনেকের মত তাঁকে অন্ন ও অর্থাভাবে কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য দেশে এবং বিদেশে তাঁকে যে কঠোর এবং সুদীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছিল তার তুলনা বিরল। ১৯১৩ সনে তিনি যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন তাঁর বয়োক্রম তখন তিপ্পান্ন বৎসর।

বিদেশী সাহিত্যক্ষেত্রেও বীর সংগ্রামশীল সাধকের অভাব নেই। জর্জ বার্নার্ড শ' অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশব অবস্থায় তাঁর মাতা সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে যা সামান্য উপার্জন করতেন তাইতেই কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ হতো। তিনি নিজে জমিদারী সেরেস্তায় এক সামান্য কেরানীর চাকুরি দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চৌষট্টি বৎসর। এই সাফল্যের আড়ালে যে সুদীর্ঘ এবং বিপুল সংগ্রাম লুকোনো রয়েছে সেটা সহজে আমাদের নজরে আসে না।

নরওয়েজিয় সাহিত্যিক নুট হামসুনের নাম সর্বজনবিদিত। বিশেষতঃ "কল্লোল যুগের" নবীন বাঙালী সাহিত্যিকচক্রের তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। এই নুট হামসুনকে প্রথম জীবনে কী নিদারুণ দুর্ভাগ্যের সঙ্গেই না সংগ্রাম করতে হয়েছে! তিনি ছিলেন কৃষকের সন্তান। ক্ষেতে হাল দিয়েছেন, লোহার কামারের কাজ করেছেন, জীবিকা অর্জনের জন্য সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরেছেন। অবশেষে অভাবের তাড়নায় আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে ট্রাম-কন্ডাক্টরের কাজ করেছেন। অবিশ্যি সে চাকুরিও তাঁর টেঁকেনি। ১৯২০ সালে "গ্রোথ অফ দি সয়েল" গ্রন্থের ওপরে তিনি যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তাঁর বয়স তখন একষট্টি বছর।

মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের কথাই ধরা যাক। প্রথম সাহিত্য-সাধনা তিনি শুরু করেন প্যারিস শহরে। এক গরীব ছুতোরের কারখানায় সস্তা দরের একখানা কামরা ভাড়া নিয়ে মাথা গোঁজবার স্থান করেন। তখন পত্রিকায় যত লেখা পাঠাতেন তার বেশিরভাগই ফেরৎ আসতো। উত্তরকালে তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা ও লেখার উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য বারংবার দুঃসাহসিক সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। "মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন" শেষ পর্যন্ত এই তাঁর জীবনের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি দু'বার এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছেন, অবিশ্যি ভাগ্যের জোরে দুবারই রক্ষা পেয়েছেন। স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। আফ্রিকার জঙ্গলে বাঘ-সিংহের উপস্থিতি উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রের গুলি-বারুদ অগ্রাহ্য করে সংবাদ সংগ্রহ করতে ছুটে গেছেন। বিপুল অভিজ্ঞতা ও সুদীর্ঘ সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৫৪ খৃঃ তিনি যখন "ওল্ড ম্যান এন্ড দি সী" গ্রন্থের ওপরে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন তখন তাঁর বয়স ষাটের ঘর ছাড়িয়েছে।

বিখ্যাত রুশ-সাহিত্যিক দস্তয়েভস্কি যিনি "ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট" গ্রন্থ লিখে অমর হয়েছেন, তাঁর জীবনও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। জার প্রথম নিকলাসের রাজত্বে, রাজদ্রোহপূর্ণ রচনার অপরাধে তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। গুলীদ্বারা হত্যার জন্য তাঁকে বধ্যভূমিতে উপস্থিত করা হয় এবং জল্লাদও বন্দুক হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় প্রস্তুত হয়ে। ঠিক এমনি সময়ে একজন দূত ছুটতে ছুটতে এসে জানায়, সম্রাট তাঁর প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন এবং পরিবর্তে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ডের আদেশ হয়েছে। নির্বাসন কাল শেষ হবার পর দস্তয়েভস্কি অত্যন্ত অভাব এবং শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েন। অভাবের তাড়নায় তিনি জুয়া খেলতে আরম্ভ করেন এবং অতিরিক্ত পানাসক্ত হয়ে পড়েন। দেহের প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত মৃগী রোগে আক্রান্ত হন। এতো সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা নির্বাপিত হয়নি। ১৮৬৬ খৃঃ "ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট" গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু সুস্থ দেহে খ্যাতি ও সম্মান ভোগ করবার দিন তখন তাঁর গত হয়েছে।

আর একজন বিশ্ববিশ্রুত রুশ-সাহিত্যিকের কথা মনে পড়ে, কাউন্ট টলস্টয়। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও তিনি স্বেচ্ছায় সর্বত্যাগী হয়েছিলেন। একরকম নিঃস্বের মতই পথের পাশে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

সাহিত্যসাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তবু দুর্গমের আহ্বানে এপথে যুগে যুগে যাত্রীর অভাব হয়নি। যাঁরা এসেছেন কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথে চলতে চলতে বারংবার তাঁদের পদতল ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তবে সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রই সম্ভবত একমাত্র স্থান যেখানে অনুকরণ, সুপারিশ, পৃষ্ঠপোষকতা অথবা বিত্তের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। অনুকরণের সাহায্যে যেমন দ্বিতীয় কালিদাস অথবা দ্বিতীয় শেকসপীয়র কল্পনাতীত তেমনি নিজস্ব মৌলিক প্রতিভা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সুপারিশ অথবা বিত্তের প্রভাবে মানব-হৃদয়ে স্থান করে নেওয়াও অসম্ভব। সাহিত্যক্ষেত্রে কোন বাঁধা পথ নেই। প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজ নিজ পথিকৃৎ। জীবনের অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও রচনাশক্তির নৈপুণ্যে সাহিত্যিক নিজেই নিজের স্থান অধিকার করে নেন।

প্রশ্ন হচ্ছে সত্যকার সার্থক সাহিত্যের পরিচয় কী? এ বিষয়ে ফরাসী সমালোচক আঁদ্রে মরিস একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, "একমাত্র সময়ই নিরপেক্ষ বিচারক"। কোন একজন বিশেষ মানুষের বিচারে ভুল হতে পারে। কোন একটি বিশেষ যুগের মানুষ হয়তো সাময়িক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু সুদীর্ঘকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে সকল যুগান্তকারী লেখকের রচনা মানব হৃদয়ে নিজেদের মানের আসন অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে, তাঁদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কোন সংশয়ের কারণ থাকতে পারে না।

—অতুল চক্রবর্তী

নতুন ঠগী

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে তিনটি শর্ত ছিল—(১) প্রথম ছ'মাস প্রতি মাসে কমকরে দু'হাজার টাকার অর্ডার যোগাড় করাতে হবে; (২) ছ'মাস পরে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকার অর্ডার ঘরে আনতে হবে; (৩) প্রবেশন কাল ছ'মাস। তবে এই ছ'মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে কোন কারণ দেখিয়ে বা না-দেখিয়ে সাতদিনের নোটিশেই চাকরী নট হয়ে যেতে পারে। যদি শর্তগুলি মেনে চলতে পার, তাহলে মদনসেন ইনজিনিয়ারিং ইনডাসট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড মাস গেলে দু'শ পঁচিশ টাকা দেবে। স্বাক্ষরকারী স্বয়ং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর।

কোম্পানীর নাম বা গালভরা পদের উল্লেখে যদি কেউ মনে করেন সংস্থাটি বিদেশী তাহলে নিতান্তই ভুল হবে। আজ্ঞে না, লণ্ডন বা হাম্বুর্গ হেড-অফিস নয়। আমাদের এই শহরেই কোম্পানীর আদি অকৃত্রিম ও একমেবাদ্বিতীয়ম ফ্যাক্টরী-কাম অফিস—বেহালায়। মালিকের পিতৃ'ও নাম মদন সেন।

ট্রান্সফর্মার, চোক, কনট্রোল প্যানেল বানানো ছাড়া মোটর, ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সারানো হয় মদনসেন ইনজিনিয়ারিং ইনডাসট্রিজে। কাঠাখানেক জায়গার একটা দিক পিচের টিন দিয়ে ঘেরা। বাকি তিনদিক ঘিরে গড়খাই রচনা করেছে মিউনিসিপ্যালিটির খোলা নর্দমা। টিনের চালের নীচে এপাশে ওপাশে ছড়ানো গোটাকয়েক ওয়াইনডিং মেশিন, লেদ, ড্রাইভার, ড্রিলিং মেশিন, বল-প্রেস, কমপ্রেসার। আড়াইখানা লোক আর অধিকারী ঐ চালাটার নীচে সারাদিন কাজ করে। দুজন রোজমজুর। আধখানা ফাইফরমাশ খাটে—চা, জল, পান, বিড়ি, সিগারেট এনে দেয়। অধিকারী হেড-মিস্ত্রী—কোম্পানীর নামের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে বলা উচিত ওয়ার্কস ম্যানেজার।

টিনের ঘেরাটোপের আড়ালে কানে দেখা আলোয় ম্যানেজিং ডাইরেকটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে বললেন—

ঃ ইয়ংম্যান, কাজ করুন। আপনারা এগিয়ে না এলে দেশ বড় হবে কি করে। কোন চিন্তা করবেন না। সবরকম সাহায্য আমরা আপনাকে করব। শুধু একটা রিকোয়েস্ট। অবাঙালীদের হাত থেকে বাংলা দেশকে বাঁচাতে হলে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন।

আবেগে ম্যানেজিং ডাইরেকটরের নাকের ফুটো দুটো ফুলে ফুলে উঠছিল। থর থর করে কাঁপছিল চৌকো চোয়ালে আলতোভাবে বসানো নাগপুরী কমলালেবু দুটি। ঈষৎ থমকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ অর্ডার পজিশন কি রকম?

ঃ আশা করছি মাসখানেকের মধ্যে কিছু পাব। গত পনেরো দিনে সারাটা শহর চষে ফেলেছি।

ঠোঁটের কোণে দুই দাঁতের ফাঁকে সিগারেটের রোপট্রিক দেখাতে দেখাতে ম্যানেজিং ডাইরেকটর বললেন—

ঃ গুড, এই ত' চাই। উঠে পড়ে লাগুন। উইশ ইউ বেস্ট অব লাক।

বলেই হাতের কায়দায় ঢেউয়ের আলপনা ফুটিয়ে তুললেন। অর্থাৎ এবার এসো।

দু'শ পঁচিশ টাকার প্রতিশ্রুতি পত্রখানা বুকপকেটে রেখে স্বস্তিবোধ করেনি বিশ্বনাথ। যদি হারিয়ে যায়। তার মত আধ-লাখখানেক ডিগ্রীধারী ইনজিনিয়ার আজ বেকার। সরকারী অফিসে কারখানায় চাকরী নেই। আণ্ডারটেকিংগুলোর লোক টেকিংয়ের উপায় নেই। ব্যবসা ডকে উঠছে। বিশ্বনাথ বুকপকেট থেকে কাগজখানা বার করে পোর্টফোলিও ব্যাগের ইনসাইড পকেটে রাখল—এবার নিশ্চিন্ত। পনেরো দিন পরেই কড়কড়ে দু'দুটো বড় পাত্তি তার সঙ্গে আরো পঁচিশটা ঠন্‌-ঠনাঠন্‌। পয়সার আওয়াজ খালি পকেটেই বাজতে লাগল।

দু'সপ্তাহ ধরে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা ফ্যাকটরী থেকে হাইড রোড, এসপ্ল্যানেড, ডালহৌসী, মানিকতলা, শিয়ালদা ব্যাক টু ফ্যাকটরী করেছে বিশ্বনাথ। বড়, মেজ, ছোট কোম্পানীগুলোর দরজায় দরজায় ঘুরেছে অর্ডারের আশায়। প্রতিদিন সাতটায় বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে ফ্যাক্টরীতে পৌঁছেছে পৌনে আটটায়। কাঁচা নর্দমার গড়খাই পেরোনের মুখে চোখাচোখি হয়েছে, অধিকারী খুড়ো ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে। লোকটা অনাবশ্যক খুক খুক হেসে বলেছে—

ঃ ইঞ্জিনিয়ারবাবু এসে গেছেন।

দেখুন দেখি কি ঝামেলা। কমপ্রেসারটা চলছে না। রঙের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। অথচ আজই দুটো পাখা রং করে দিতে হবে।

হয় কমপ্রেসার নয় ফল-প্রেস রোজই অধিকারী একটা না একটা ঝ্যাঠাং বাধিয়ে রাখে। বোধহয় বিশ্বনাথের জ্ঞানগম্যি টেস্ট করতে চায়। অধিকারীর যে কি অধিকার এই ফ্যাক্টরীতে আজও তা বিশ্বনাথের কাছে ক্লিয়ার না। শুধু এইটুকু বুঝেছে যে মুনসেন ইনডাস্ট্রিজের খাতে খোলে অম্বলে অধিকারী অপরিহার্য। সারাদিনের টো-টো করে অর্ডার সিকিওরো গাড়ি ভাড়া অধিকারীর কাছ থেকেই হাত পেতে নিতে হয়। সারাদিনের বরাদ্দ মাত্র এক টাকা। একদিন অধিকারী বাসের টিকিট দেখতে চেয়েছিল।

দু-সপ্তাহ ঘুরে সামান্য আশার আলো দেখতে পেয়েছে বিশ্বনাথ। দু-দুটো বড় কোম্পানী ও ডিফেন্সের ছুটকো কাজের অর্ডার মাসখানেকের মধ্যেই জুটে যেতে পারে। সকাল থেকে দুপুর ফ্যাক্টরীর মেশিন সারাই থেকে মাল উঠানো নামানো, দুপুর থেকে সন্ধ্যে অফিসে অফিসে ঢু মেরে বেড়ানো, সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক কোটেশন, এনকোয়ারী-রিপ্লাই, ইনসপেকশন রিপোর্ট ড্রাফটিং, টাইপিং করে যখন বাড়ির দিকে পা বাড়ায় তখন শাদা ব্লটিং পেপারের চেয়েও শাদা হয়ে যায় বিশ্বনাথের মুখ। কিন্তু উপায় কি? দু-বছর আগে ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রী পেয়ে এতদিন বেকার বসেছিল। শেষে স্কুলের বন্ধু রামকৃষ্ণ খবরটা দিল। চাকরী খালি আছে। দিশী কোম্পানী কিন্তু রাইজিং। লেগে থাকলে উন্নতি আছে। বিশেষ করে যখন সত্তর-পঁচাত্তর টাকার অ্যাপ্রেনটিসশিপের আশায় ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া ছেলেরা কাতারে কাতারে লাইন লাগাচ্ছে সেখানে স্টার্টিংয়েই দুশ পঁচিশ—এত ভাবাই যায় না।

কিন্তু দিন সাতেকেই ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হল। গোড়ার দিকে লজ্জায় বলতে পারেনি। সপ্তাহ ঘুরতে চলল অথচ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কোন হদিশ নেই। তাই গত সাতদিন বারো ঘণ্টা ডিউটি দেওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ওভারটাইম খেটেছে ম্যানেজিং ডাইরেকটারের টেবিলের সামনে বসে। সেনমশায় একটা বিলিতি কোম্পানীতে কাজ করেন। কোম্পানীর কাজের সঙ্গে দুটো পয়সা বেশী উপায়ের ধান্ধাটি খুলেছেন বছর-তিনেক। গোড়ার-দিকে দুটো পয়সার মুখ দেখলেও আজ বছরখানেক অবস্থা খুব টাইট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়ার সময় দুঃখ করছিলেন—

ঃ এরকম চললে কোম্পানী তুলে দিতে হবে। কোন অর্ডার নেই। অথচ বসিয়ে বসিয়ে লোকগুলোকে মাইনে দিতে হচ্ছে।

অবশ্য অধিকারী ট্যারা চোখটা আরো একটু টেরিয়ে বলে—

ঃ মাইনে দিতে হচ্ছে না কচু। আমারই বাকি রয়েছে সাত মাসের। গত এক বছরে আপনার মত তিন-তিনটে ইঞ্জিনিয়ারবাবু এই ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছেন। বলুক দেখি কেউ একটা আধলাও বার করতে পেরেছে।

অধিকারীর কথাগুলোই বাঁকা বাঁকা। লোকটা সোজাসুজি কোন কথা বলে না। কাজের নামে অষ্টরম্ভা। অথচ এমন ভাব দেখায় যেন সব জানে। বিশ্বনাথ আসার আগে ঐ নাকি অর্ডার সিকিওর করত। তবে পাশকরা ইঞ্জিনীয়ারবাবুরা যেমন ইংরিজির তুবড়ি ওড়ায় তেমন পারে না বলে কোম্পানীগুলি কদর করে না। তাই মালিক ইঞ্জিনীয়ারবাবুকে রেখেছেন।

মালিকের মানও রেখেছে বিশ্বনাথ। মাসখানেকের পরিশ্রমেই মিরাক্যল দেখিয়ে দিল। যে কোম্পানী গত এক বছরে একসঙ্গে দু-হাজার টাকার কাজ জোগাড় করতে পারেনি, সেখানে এক ডিফেন্সের অর্ডারই বিশ্বনাথ এনেছে সাড়ে তিন হাজার টাকার। সেই সঙ্গে বড় বড় দুটি কোম্পানী পাঁচশো পাঁচশো হাজার টাকার কাজ দিয়েছে। কাজ ভাল হলে আরও অর্ডার মিলবে। অধিকাংশই রিপেয়ারিং জব। আর সারাইয়ের কাজে প্রফিটের পার্সেন্টেজ শতকরা তিরিশ। অর্থাৎ সাড়ে চার হাজার টাকার কাজ ঠিক সময়ে সারতে পারলে নীট প্রফিট মেরে কেটে বারোশ ত' বটেই।

আঠারো দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী গেল। মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেও মেশিন হয়ে গিয়েছিল বিশ্বনাথ। গতকাল কাজ শেষ হতেই আজ গেল মালিকের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজিং ডাইরেকটর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। আবেগভরা গলায় বললেন—

ঃ আপনারাই জাতির ভবিষ্যৎ। ইত্যাদি অনেক অনেক কথা। সেই সঙ্গে জানালেন যে বিশ্বনাথের দেড় মাসের পরিশ্রমের ফল ফলতে শুরু করেছে। ওয়াটারমেথ কোম্পানী সাড়ে বাইশ হাজার টাকার অর্ডার দেবে। পরশুদিন কোম্পানীর লোক আসবে ইনসপেকশনে।

ঃ আপনাকেই সব করতে হবে।

আনন্দে গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল বিশ্বনাথের। বাসে ফিরতে ফিরতে এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল আজ যে জন্য সে গিয়েছিল সেটাই বলা হল না। মাস আঠারো দিন আগে শেষ হয়ে গেছে। বারোদিন পরে শুরু হবে নতুন মাস। অথচ আজও সে গত মাসের মাইনে পায়নি। অবশ্য অধিকারী বলেছে মাইনে সে কোনদিনই পাবে না। মাইনে চাইলেই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। গত আঠারো দিন মালিকের জন্য রোজ কাজের শেষে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। কিন্তু দেখা হয়নি। উনি এ ক'দিন অফিসে আসেননি। অধিকারীর মাধ্যমে খবরাখবর নিয়েছেন। আজ এসেছিলেন দিনের শেষে। কিন্তু আজও বলা হল না। কাল নিশ্চয়ই বলব।

মুনসেন ইনডাসট্রিজ ওয়াটারমেথ কোম্পানীর অর্ডার পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বনাথ মাইনে পায়নি। দু'মাসের সকাল সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একদিন আর মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে বলেই ফেলল—

ঃ আর কতদিন ঘোরাবেন? আজ ন কাল ত' রোজই শুনছি। কিন্তু আজ মাইনে আমায় দিতেই হবে নইলে কাল থেকে আর আসব না।

ঃ বেশ ত' আপনার ইচ্ছা না হয় আর আসবেন না।

উদাস সুরে ম্যানেজিং ডাইরেকটর শব্দগুলি তালুতে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন।

ঃ ইঞ্জিনীয়ারের অভাব আছে নাকি দেশে? কিন্তু ইয়ংম্যান, জানা উচিত ছিল বসের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়। এর জন্য জীবনে পস্তাতে হবে। ঠিক আছে, আপনার ঠিকানা আমাদের অফিসে আছে—টাকাটা পোস্টে পাঠিয়ে দেব।

শিস দিতে দিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নর্দমা পেরিয়ে স্কুটারের পাদানিতে গোটা দুয়েক চাটি ঝেড়ে হুস করে উধাও হলেন ম্যানেজিং ডাইরেকটর।

বিশ্বনাথ আজও মাইনে পায়নি, কোনদিনই আর পাবে না। কারণ কলকাতা এবং শহরতলীতে অসংখ্য মুনসেন ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে উঠেছে। কুড়ি, একুশ, বাইশ সদ্য পাশ করা হাজার হাজার সোনার টুকরো ছেলে বেকারীর জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাপ্লাই ডিম্যান্ডের অসমান প্রতিযোগিতার সুযোগে মুনসেনরা এদের দিয়ে ষোল আনা খাটিয়ে নিয়ে ফাঁকি দিচ্ছেন। কিন্তু চাকরী নেই বলে চেয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করা যে সহজ। তাই এক দুয়ারে প্রতারিত হয়ে আমাদের বিশ্বনাথরা আর এক দুয়ারে ছুটছেন। প্রতারণার এই দুয়ারগুলি বন্ধ হোক—বিশ্বনাথদের প্রার্থনা।

—শ্রীমৎ

আগের ঘটনা

[তরুলতমালা খুন। খুনী সন্দেহে ওর প্রেমিক নিখিলেশ হাজত থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে। শশাঙ্ক ভট্টাচার্য নিখিলেশের বন্ধু। মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে রুমমেট সুজাতা, প্রভা, সকলকেই জেরা করা হল। ভৈরব দত্ত-ও কিছু সূত্র দিয়ে গেল। এর পর এল এক 'হাজব্যাণ্ডের' চিঠি। কে লিখেছে? এমন সময় তদন্তকারী অফিসার রাজীব সান্যালের সহকারী শচীদুলাল এসে হাজির। খুনের ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পাওয়া রুমাল সম্পর্কে দিল নতুন তথ্য।]

(১৩)

'আপনার নামই বিশ্বনাথ বসু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দিকনগর পেপার মিলের পারচেজ সেকশনে আছেন তো?'

এবারও একই উত্তর। অর্থাৎ, পারচেজ অফিসেই ভদ্রলোকের কাজ।

রাজীব সান্যাল অপাঙ্গে চেয়ে দেখল। প্রভা মুখার্জী ঠিকই বলেছিল। ভদ্রলোকের বয়স বেশী নয়। চব্বিশ, পঁচিশ কিংবা দু-এক বছর এদিক ওদিকও হতে পারে। রোগা রোগা শ্যামলা চেহারা। একমাথা কালো চুল। চোখ দুটি বেশ বড়, এবং

সে কারণেই উজ্জ্বল। কথাবার্তায় চটপটে এবং সপ্রতিভ। ময়নাতদন্তের ব্যাপারে হয়েছে বলে শুনেছিল। কিন্তু তাই বলে তেমন মুখচোরা বা লাজুক বলে মনে হল না ওকে।

সন্ধ্যে হতে অল্প কিছু বাকী। দিনের আলো মরতে বসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবু ডুবু। নীড়াভিমুখী বিহঙ্গকুলের কূজন থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে। কারো কিচির মিচির কাকলী, কারো বা কুক্ কুক্ ডাক। শেষ অপরাহ্নের নিস্তব্ধতা প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছে।

আধশোয়া ভঙ্গিতে চেয়ারের উপর বসেছিল রাজীব। মাথাটা চেয়ারের পিছনে হেলে পড়েছে। পায়ের পাতা চেয়ার থেকে দূরে মেজের উপর প্রসারিত। বাঁ হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, দুই আঙুলের মাঝখানে চেপে ধরে আছে।

'অফিস থেকেই সোজা আসছেন বিশ্বনাথবাবু?'—

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিকেল চারটের সময় থানার একজন এ, এস, আই গিয়ে হাজির সেক্সনে। আমাকে বললেন, সন্ধ্যের সময় একবার থানায় গিয়ে দেখা করতে হবে। বড়বাবু ডেকেছেন। অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবলাম, দেখাটা সেরেই যাই। নইলে সারাদিন অফিসে খেটে একবার ঘরে ফিরলে তখনই আর বেরিয়ে পড়তে পা ওঠে না।'

রাজীব বলল, 'বড়বাবু মানে আমিই আপনাকে দেখা করতে বলেছিলাম। অবশ্য ইচ্ছে করলে আমিও আপনার ওখানে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে সামান্য অসুবিধে দেখা গেল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটু নিভৃতে বসলে ভালো হয় বিশ্বনাথবাবু। বিশেষ করে এই ধরণের কেসে।' রাজীব ওর দিকে মুখ তুলে দেখল।

বিশ্বনাথ বলল, 'থানায় ডেকে পাঠিয়েছে শুনলেই মনটা কেমন বিদ্রোহ করে ওঠে। নইলে একবার এসে দেখা করে যেতে আপত্তি কিসের? যাই হোক, কিজন্য ডেকেছেন তা এবার নিশ্চয়ই বলবেন।'

রাজীব ঈষৎ হাসল। 'আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে কি প্রশ্ন করব, তা অবশ্য বলা শক্ত। কিন্তু কেন ডেকে পাঠিয়েছি তা কি একটুও ধরতে পারেন নি বিশ্বনাথবাবু?'

বিশ্বনাথ নিরুত্তর। কি যেন চিন্তা করছিল সে।

রাজীব বলল, 'আমার বিশ্বাস আপনি ব্যাপারটা ঠিকই আঁচ করেছেন। এবং কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি তা মোটামুটি জেনেও আপনার মনে একটা প্রচন্ড কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে আপনি এসে উঠেছেন থানাতে।' ভ্রূ কুঞ্চিত করে রাজীব যোগ করল, 'তরুণ মরেছে। কিন্তু আপনার কৌতূহল আর আকর্ষণ কিন্তু আজও অটুট, অমর।'

বিশ্বনাথকে বিমর্ষ মনে হল। কিছুটা আহত এবং [illegible] তারপরেই ঈষৎ উত্তেজিত। সে বলল, 'আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলেই দেখা করতে এসেছি। কিসের কৌতূহল, বা কোন আকর্ষণের কথা বলছেন আপনি?'

রাজীব হেসে ফেলল। 'এই বা! আপনি দেখছি বিবম খাপ্পা হয়ে গেছেন। অথচ দুদিন আগেই সুদর্শনবাবু বল-ছিলেন আপনার কথা। খুব আলাপী আর ঠান্ডা মেজাজের মানুষ আপনি।'

'কি বলছিলেন ম্যানেজারবাবু? আমার সম্বন্ধে হঠাৎ কথা হল কেন?'

রাজীব তেমনি হাসছিল। বলল, 'ম্যানেজারবাবুর কথা আবার বলে ফেললাম [illegible]। অথচ কথা দেওয়া ছিল যে বিশ্বনাথ শেপার মিলের কর্মচারীদের সম্পর্কে সম্বন্ধে ম্যানেজারবাবুর মতামত কাউকে জানাব না।'

বিশ্বনাথ এবার হাসল, 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। এ কথা আমি কাউকে বলছিনে। আর বলার কি কম ঝক্কি? তলে তলে কে কোথায় সর্বনাশটি করে রেখেছে, তা আগে থেকে জানার কোন উপায় নেই।'

'ব্যাপার কি বিশ্বনাথবাবু? কিসের সর্বনাশ? কোন আশংকা আছে নাকি আপনার?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল।

বিশ্বনাথ কণ্ঠস্বর কোমল করে বলল, 'আমাদের পারচেজ সেকশনে একজন সিনিয়ার ক্লার্কের পোস্ট খালি হচ্ছে। আমি অবশ্য অনেকের চেয়ে জুনিয়ার। কিন্তু তাতে কি বলুন? যোগ্যতা কি আমার কারো চেয়ে কম? শুধু পারচেজ সেকশন কেন, সমস্ত পেপার মিলে এম-কম পাশ জুনিয়র ক্লার্ক একটিও নেই।'

রাজীব বলল, 'আপনার তো বছর [illegible] হল এখনও?'

'এক বছরও এখনও পূর্ণ হয়নি' বিশ্বনাথ আবার হাসল, 'মাসখানেক এখনও বাকী। নইলে এত দুশ্চিন্তা কিসের? প্রমোশন দিলে আর সকলে এখনই হৈ হৈ করে উঠবে। বলবে ও হল কাঁচা কেরানী। এই তো সেদিন জয়েন হল অফিসে। এখনও আঁতুড়ের গন্ধ যায় নি। এর মধ্যেই ওর প্রমোশন হবে কেন? কিন্তু দেখুন একবার, আমার যে একটা এম-কম ডিগ্রী আছে, সেদিকে কেউ ফিরেও চাইবে না। তার কোন দাম নেই।

সহানুভূতি জানাতে রাজীব বলল, 'ভারী দুঃখের কথা।'

'অথচ সিনিয়র ক্লার্ক মানে কি জানেন? যত ম্যাট্রিক, আর আই-এ-র ভীড়। বি-এ পাশ চারজন আছে। কিন্তু মাস্টারস ডিগ্রী কারো নেই। খোঁজ করলে বরং দু-দশজন এন-এ-কিউ পেয়ে যাবেন।'

'এন-এ-কিউ না কি যেন বললেন। ওর মানে কি?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল।

'ওটা একটা কোড আমাদের। আপনি হয়ত ভাবছেন কোন ডিগ্রী টিগ্রী।' বিশ্বনাথ খুব মজার ভঙ্গি করে হাসল। বলল, 'এন-এ-কিউ অর্থাৎ নো অ্যাকা-ডেমিক কোয়ালিফিকেশন।'

রাজীব হেসে বলল, 'তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম এন-এ-কিউ আবার না জানি কি জিনিষ।' একটু থেমে সে যোগ করল, 'সুদর্শনবাবুর হাত থাকলে আপনার অবশ্য একটা চান্স আছে। আমার মনে হয়, ইউ আর ইন দি গুড বুক অফ দি ম্যানেজার।'

'হাত কি বলছেন? প্রমোশন দেওয়ার ব্যাপারে ম্যানেজারসাহেবের ইচ্ছেই তো সব। উনি মনে করলেই একজনকে ঠেলে তুলতে পারেন। আর দশজনে কে কি বলল, তাতে কিছু যায় আসে না।' বিশ্বনাথ তার জ্ঞানের থলির সবটুকু উজাড় করে দিল।

রাজীব বলল, 'একটু ধৈর্য ধরুন বিশ্বনাথবাবু। প্রমোশন বা উন্নতি সময়ে হবেই। মিথ্যে ছটফটিয়ে কোন লাভ নেই, বরং ওতে ঠকতে হয়।'

খুব হতাশ একটা ভঙ্গি করে বিশ্বনাথ বলল, 'ভগবান জানেন, কবে প্রমোশন টমোশন হবে। চেষ্টা তো কম করলাম না। আপনি ঠিকই বলেছেন, মিথ্যে ছটফটিয়ে কোন লাভ নেই।'

তাস খেলতে বসে রঙের কথা ঘোষণা করে খেলুড়ে যেমন প্রতিপক্ষের দিকে তাকায়, রাজীব তেমনি ভঙ্গিতে চাইল। বলল, 'আমি কিন্তু আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি খুনের কেসের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করব বলে।'

হঠাৎ এক ঝলক হিমেল হাওয়া এলে মানুষ যেমন শীতার্ত, শিরশির অনুভব করে বিশ্বনাথকে তেমনি সংকুচিত এবং ভীত দেখাল। উদ্বেগময় এবং আশাব্যঞ্জক একটি প্রসংগ ছেড়ে এ যেন কোন নিশীথ-শীতল দীঘির ঘাটে অবতরণ।

রাজীব বলল, 'বিশ্বনাথবাবু, গত শনিবার রাত্রে টেলিফোন অপারেটর তরঙ্গ মজুমদার নৃশংসভাবে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে। কে বা কারা তাকে মারল তা এখন রহস্যের আড়ালে। কিন্তু আমাদের সকলের কর্তব্য এই রহস্যজাল সরিয়ে খুনীকে খুঁজে বের করা।'

বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'সে ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা, মানে পেপার মিলের লোকেরা এবিষয়ে আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

'যা পারেন, যতটুকু পারেন', রাজীব হেসে বলল।

বিশ্বনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, সম্ভবত সে কিছু ভাবছিল কিংবা এই খুনের ব্যাপারে কিভাবে তার বক্তব্য রাখবে তাই নিয়ে ইতস্তত করছিল।

রাজীব বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু, খুনের সংবাদ প্রথম শুনে আপনার কি মনে হল?'

'খুনের সংবাদ?' বিশ্বনাথ চোখ বড় বড় করে বলল, 'কি জানেন, দিনটার কথা ভাবলে আমার এখনও গা শির শির করে ওঠে। বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা-আটটা তখন। আমাদের মেসের চাকরটা এসে হৈ চৈ শুরু করে দিল। খুন হয়েছে, খুন হয়েছে বলে সে এঘরে ওঘরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।'

'আপনি বুঝি মেসে থাকেন বিশ্বনাথবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচ ছ জনে মিলে একটা মেস করে আছি।'

'কোম্পানীর বাড়ী নিশ্চয়?'

'কোম্পানীর বাড়ী! কোথায় পাবেন মশাই? তার হিসেব নিকেশ আর এস্টিমেট কোনোদিনই শেষ হবে না। কবে নতুন বাড়ী তৈরী হবে, তা ভগবান জানেন।'

রাজীব বলল, 'আপনাদের মেস বাড়ীটা মিল থেকে কতদূর?'

'তা বেশ অনেকখানি পথ হবে। আধ-মাইলটাক হতে পারে। হেঁটে আসতে প্রায় পনের মিনিট সময় লাগে।'

'দিকনগর বাজারটা যে পথে, বাড়ীটা সেদিকেই নাকি?'

বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক উল্টোদিকে, মিল থেকে বেরিয়ে বাজারের রাস্তা ধরলে আমাদের মেসে কোনোদিনও পৌঁছতে পারবেন না।'

রাজীব প্রশ্ন করল, 'খুনের সংবাদ পেয়ে আপনি ডেড-বডি দেখতে ছুটেছিলেন তো?'

'বিশ্বাস করুন, খবরটা শুনেই আমার কেমন মাথা ঘুরে উঠল। হাতের পাতা, পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল। তরঙ্গার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। জানাশুনো কেউ একজন খুন হয়েছে শুনলে মনের কেমন অবস্থা হয় বলুন তো?'

'তাহলে মৃতদেহ দেখতে আপনি যান নি, তাই না বিশ্বনাথবাবু?'

'ঠিক তা নয়।' বিশ্বনাথ অস্বীকার করে বলল, 'একটু পরেই আমি গিয়েছিলাম। তখন অবশ্য সকলে ফিরে আসছিল। ওরা বলল ডেড-বডি তুলে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। ময়না তদন্তের জন্য লাশ মথুরাপুরে চালান দেবে।'

রাজীব বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু, একটু আগেই আপনি বলছিলেন যে তরঙ্গের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় ছিল। আলাপ পরিচয় মানে শুধু জানা-শুনো, না—?' রাজীব যেন কতকটা ইঙ্গিত এবং কিছুটা নিস্তব্ধতার সাহায্যে তার বক্তব্যের বাকী অংশটুকুকে প্রাঞ্জল করতে চাইল।

'তরঙ্গের সঙ্গে জানাশুনো মানে আলাপ পরিচয়, তা কিছুটা ছিল বৈকি।' বিশ্বনাথ খানিকটা স্বীকারোক্তি করল।

রাজীব হেসে বলল, 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো। তাতে দুপক্ষেরই সুবিধে। কি বলেন আপনি?'

বিশ্বনাথ আমতা আমতা করে জবাব দিল, 'তা তো ঠিকই। মানে কথাবার্তা খোলাখুলি বলাই তো উচিত।'

'তরঙ্গের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয়টা কতদূর গড়িয়েছিল বিশ্বনাথ-বাবু? দুটি যুবক যুবতীর জানাশুনো, পরিচয় একটু নিবিড় হলে হৃদয় বিনিময়ের মত একটা অঘটন ঘটে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। বিশেষ করে সে ক্ষেত্রে মেয়েটি যদি সুন্দরী বলে বিবেচিত হয়।'

বিশ্বনাথের কপালে কুঞ্চিত রেখা পড়ল। সে বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন? পুলিশ কি সন্দেহ করে যে তরঙ্গের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল?'

'একজ্যাক্টলি। আপনি ঠিক জায়গাটিতে এসে পড়েছেন। লোকে বলে তরঙ্গের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতা ছিল। এবং সম্পর্কটা মধুর প্রেমের বলে মনে করবার মত সঙ্গত

[...]ণও রয়েছে।' কথার শেষে রাজীব বাঁকা [...]ল।

প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে বিশ্বনাথ [...]ল, 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তরঙ্গের [...]ঙ্গ আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল এরকম [...]ন করবার কি কারণ খ'ুজে পেলেন [আ]পনি।' কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে [বি]শ্বনাথ সরাসরি জানতে চাইল, 'সেই [কা]রণটা কি, তা দয়া করে খুলে বলবেন [এ]কবার?'

রাজীব হেসে বলল, 'আপনি মিথ্যে [উ]ত্তেজিত হচ্ছেন। স্থির হ'ন বিশ্বনাথ-[বা]বু। কারণ যা জানতে পেরেছি তা [নি]শ্চয়ই আপনাকে বলব।' হাতের [পে]ন্সিলটা টেবিলের উপর বার দুই ঠুকে [...] যেন পরীক্ষা করল রাজীব।

বলল, 'প্রমাণ আছে বিশ্বনাথবাবু। [ক]চুদিন আগে তরঙ্গকে আপনি একটা [দা]মী কলম প্রেজেন্ট করেছিলেন। এমনিই—[হ]ঠাৎ উপহার দিলেন। আমাকে বুঝিয়ে [ব]লুন দিকি এবার। একটি অনাত্মীয়া, [রী]তিমত সুন্দরী মেয়েকে আপনি অকারণে [দা]মী কলম প্রেজেন্ট করতে গেলেন কেন?'

বিশ্বনাথ টেবিলের উপর হাত দুটি প্রসারিত করে এবং খানিকটা ঝ'ুকে একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল। বলল, 'উঃ। আপনি দেখছি সাংঘাতিক মানুষ। কিন্তু তরঙ্গকে কলম প্রেজেন্ট করার কথা আপনি কেমন করে জানলেন?'

রাজীব কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল।

বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করুন। তরঙ্গের সঙ্গে আমার প্রেমভালবাসা কোনোদিন হয়নি। দিকনগর পেপার মিলের জুনিয়র ক্লার্ক আমি। মাইনে-কড়ি যা পাই তা শুনলে আপনি হাঁ হয়ে যাবেন। সাকুল্যে এক'শ চুয়াল্লিশ টাকা মাইনে আমার। এর চেয়ে তরঙ্গও বেশী পেত। টিউশনী করে তিরিশ টাকা পাই বলে দেশে আশী টাকার মত পাঠাতে পারি। আমার টাকা না গেলে দুটো ভাই-বোন আর বিধবা মাকে উপোশী হয়ে থাকতে হবে।'

রাজীব বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু বিশ্বনাথবাবু। পন্ডিতেরা কি যেন বলে গেছেন না? ভালবাসা অন্ধ। টাকা-কড়ি বা অবস্থার দিকে সে ফিরেও চায় না।'

বিশ্বনাথ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমাকে ঠাট্টা করবেন না দয়া করে। তরঙ্গের সঙ্গে কোন মধুর সম্পর্ক আমার গড়ে ওঠে নি। একথা বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদের হাতে। তবে তরঙ্গের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। এবং হয়ত কিছুটা অন্তরঙ্গতাও হয়ে থাকবে। তরঙ্গের স্বভাবই ছিল অমনি। একবার আলাপ হলে ওর সঙ্গে ভাব জমানো কঠিন ছিল না।'

রাজীব বলল, 'তা না হয় মানলাম। কিন্তু কলম উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা আপনি এখনও পরিষ্কার করে বলেন নি।'

'আমি স্বীকার করছি আপনার কাছে। কলম উপহার দেবার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল।' বিশ্বনাথ নিজেকে ব্যক্ত করল।

'টিউশনীর পুরো একমাসের টাকা খরচ করে আমি ওর জন্যে কলম কিনেছিলাম। তিরিশ টাকার মত দাম নিয়েছিল। মনে ভেবেছিলাম কলমটা পেয়ে খুশী হবে তরঙ্গ। হয়ত আমার কাজটা করে দেবে। তাহলে অমন কত তিরিশ টাকা উঠে আসবে।'

'তাহলে কলমটা আপনার ঠিক উপহার নয়,—একটা ইনভেস্টমেন্ট।'

বিশ্বনাথ চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন। ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না।'

'তাহলে বলুন, ইনভেস্টমেন্টটা কিসের জন্য?'

বিশ্বনাথ ঠোঁট ফাঁক করে ছোট্ট একটুখানি হাসল। হাসিটা আনন্দের নয়, ঈষৎ লজ্জামেশানো হাসি। বলল, 'তরঙ্গ আমাকে বলেছিল যে আমার প্রমোশনের জন্য ও বিশেষ চেষ্টা করবে।'

'প্রমোশনের জন্য চেষ্টা করবে! এতে তরঙ্গের হাত কোথায়?'

'ঠিক হাত নেই। আবার ইচ্ছে করলে তরঙ্গ একজন কেরানীকে অনায়াসে একটা প্রমোশন পাইয়ে দিতে পারত।' সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে রাজীবের দিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথ বলল, 'ব্যাপারটা আপনি ধরতে পারছেন না?'

খানিকটা না বোঝার ভান করে রাজীব বোকার মত হাসল। বলল, 'নিজে থেকে বুঝে নেওয়ার চেয়ে বরং আপনি বলুন।'

বিশ্বনাথ বলল, 'কথাটা আমাদের ম্যানেজার সাহেবকে নিয়ে। আপনি নিশ্চয়ই কিছুটা জানেন। তরঙ্গ কি আমার মত ছোট কেরানীর প্রেমে পড়তে পারে? খোদ রাজাই ওর প্রেমের কাঙাল হয়ে হাত বাড়িয়েছিলেন। এক'শ চুয়াল্লিশ টাকার কেরানী ওর কৃপার পাত্র। বিশ্বাস করুন, মনে মনে আমি ওর কৃপাপ্রার্থী ছিলাম।'

রাজীব হাসল, 'তরঙ্গের সঙ্গে ম্যানেজার সাহেবের একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে আমি শুনেছি। কিন্তু কথাটা কতদূর সত্যি তা অবশ্য বলতে পারিনে।'

হাত তুলে সংবাদটার সত্যতা ইঙ্গিতে সমর্থন করল বিশ্বনাথ। বলল, 'কথাটা ঠিক। দিকনগর পেপার মিলে খবরটা অনেকেই জানে। অমন রাশভারী ম্যানেজার সাহেব। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পুরানো কেরানীরাও ভয় পায়। কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন মুখে ছেলে-ছোকরার মত হাসি।' গলা নামিয়ে বিশ্বনাথ যোগ করল, 'এতদিন পরে আপনার কাছে বলছি। কোনোদিন কারো কাছে ভাঙি নি। তরঙ্গকে কথা দিয়েছিলাম, কাউকে বলব না। এখন তরঙ্গ বেঁচে নেই, বলতে আর দোষ কিসের?'

আগ্রহ প্রকাশ করে রাজীব বলল, 'কি কথা বলুন তো?'

'তরঙ্গ আমার কাছে স্বীকার করেছিল। ম্যানেজার সাহেবকে দিয়ে ও ছোটখাট কাজ অনায়াসে করাতে পারে। আমাকে একটা প্রমোশন পাইয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিল তরঙ্গ। বলেছিল, সুযোগ পেলেই ও কথাটা ম্যানেজার সাহেবকে জানাবে।'

'কিন্তু তরঙ্গ আপনার উপকার করে নি, এই তো?' রাজীব হাসল।

বিশ্বনাথ বলল, 'মাস তিনেক ধরে আমি রীতিমত খোসামোদ করেছি ওর। তরঙ্গ কখনও আমাকে নিরাশ করে নি। বলেছে সুযোগ বুঝে কথাটা ও বলবে ম্যানেজারকে। আমি ভেবেছিলাম সিনিয়র ক্লার্কের ভেকেন্সিটা হলেই তরঙ্গকে ভালো করে ধরব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ বলল, 'সেই ভেকেন্সী এতদিনে হতে চলেছে। কিন্তু আজ ভেকেন্সী হলে আমার আর কতটুকু যায় আসে। কি আশা আছে আমার—?'

রাজীব বলল, 'কলমটা ওকে কবে উপহার দিলেন?'

'মাসখানেক হবে। কলমটা দিতে তরঙ্গ ভীষণ রাগ করেছিল কিন্তু। আমার অবস্থার কথা তো জানে। চোখ নাচিয়ে বলেছিল, এসব কি হচ্ছে আবার? এই টাকা দিয়ে তো ভালো একজোড়া জুতো কিনতে পারতেন।' কথা শেষ করে বিশ্বনাথ লজ্জিতভাবে হাসল। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জুতোটা একেবারে গেছে। সামনের মাসে এটা না বদলালে নয়।'

রাজীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু, ঘটনার দিন রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?'

আচমকা প্রশ্নে খানিকটা বিহ্বল হবার ভঙ্গি করে বিশ্বনাথ বলল, 'ঘটনার দিন রাত্রে, অর্থাৎ—'

'অর্থাৎ যে শনিবার রাত্রে তরঙ্গ খুন হল। সেদিন সন্ধ্যের পর কোথায় ছিলেন আপনি? কার কার সঙ্গে সময় কাটালেন?'

'কেন বলুন তো? সন্ধ্যের পর থেকে মানে শনিবার দিন সন্ধ্যের পর—।'

রাজীব বলল, 'বলে যান চটপট। থেমে থেমে বলবেন না'।

বিশ্বনাথ বলল, 'সন্ধ্যের সময় টিউ-শানীতে গেলাম।'

'টিউশনীর পর। সেখান থেকে—'

একটু চিন্তা করে বিশ্বনাথ বলল, 'এক জায়গায় তাস খেলতে গিয়েছিলাম। ফি শনিবারেই তাসের আড্ডা হয়।'

'তাস খেলতে গিয়েছিলেন?' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল, 'কি খেলা হল? ব্রিজ না অন্য কিছু?'

বিশ্বনাথ নিরুত্তর।

রাজীব বলল, 'বুঝতে পেরেছি মশায়। আপনি ভিন তাসে বসেছিলেন। কি হল খেলায়, হার না জিত?'

মুখ উজ্জ্বল করে বিশ্বনাথ বললে, 'জিত হয়েছিল শনিবারে। অনেক টাকার মত পকেটে করে উঠেছিলাম।'

'নেশাটা ভালো নয় বিশ্বনাথবাবু। ঘন ঘন যাবেন না তাসের আড্ডায়।' রাজীব মন্তব্য করল।

মাথা দিয়ে বিশ্বনাথ বলল, 'আমি খুব কম যাই ওখানে। মাসে একবার কিংবা দুবার। দশ বিশ টাকা জিততে পারলে একটু সাশ্রয় হয় আমার।'

'আর হেরে গেলে?'

বিশ্বনাথ হেসে বলল, 'কি জানেন? আমি খুব কম হেরেছি। হারলেও দু-তিন টাকার বেশী আমার পকেট থেকে কোনো-দিন যায় নি।'

'সেদিন মেসে ফিরতে কত রাত হয়েছিল আপনার?'

'সাড়ে দশটা এগারোটার মত।' বিশ্বনাথ উত্তর দিল।

'পথে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'কারো সঙ্গে দেখা? না, অত রাতে কাউকে পাইনি পথে।'

একটু থেমে বিশ্বনাথ যোগ করল, 'এদিকে রাত নটা বাজলেই পথঘাট নির্জন হয়ে আসে। সাড়ে দশটা মানে দুপুর রাত।'

'আর একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে?' রাজীব ওর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাল। 'এই খুনের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করল বিশ্বনাথ। 'সন্দেহ'? মাথা নাড়া সে বলল, 'মাপ করবেন। সন্দেহ করবার মত কাউকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

রাজীব উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, আপনি এখন মেসে যেতে পারেন বিশ্বনাথবাবু।'

বিশ্বনাথ উঠল। রাজীব দেখছিল ওকে। একটু চিন্তিত, অসহায় ভাবভঙ্গী। অর্থচিন্তায় এই বয়সেই ন্যুব্জ মনে হয়।

হঠাৎ রাজীব বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথ-বাবু। আপনার নাম ঠিকানা আর ঐ নতুন পোস্টটার কথা একটু কাগজে লিখে দিন তো।'

বিশ্বনাথ বিস্মিত। সম্ভবত সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

রাজীব বলল, 'দিন না লিখে। আমার আবার ভীষণ ভুলো মন। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে আপনার কথা বলব এক-বার। যদি কিছু উপকার হয়—!'

কলম আর কাগজ নিয়ে বিশ্বনাথ প্রস্তুত হল লিখতে। রাজীব বলল, 'পুরো নাম ঠিকানা লিখবেন কিন্তু। বাংলায় লিখে দিন। ইংরেজীতে লেখা হলে আবার অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে গুলিয়ে যাবে।'

বিশ্বনাথ কাগজটা এগিয়ে দিল রাজীবকে। একটু হেসে সেটি নিল রাজীব। বলল, 'আচ্ছা নমস্কার বিশ্বনাথবাবু। পরে আবার দেখা হবে।'

সুইচ টিপে আলোটা জ্বালল রাজীব। বিশ্বনাথের হস্তাক্ষরের উপর একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অক্ষরের সাইজ, লেখার ছিরিছাঁদ, অন্তের বিশেষ টানগুলি বারবার সে পরীক্ষা করছিল। আতসকাচের নীচে রেখে নানাভাবে দেখল।

পিছন থেকে সুব্রত বলল, 'অমন ঝুঁকে পড়ে কি দেখছেন রাজীবদা? আবার কোন চিঠিপত্র এসে গেল নাকি হাতে?'

মুখ না ফিরিয়েই রাজীব প্রশ্ন করল, 'তুমি কখন ফিরলে?'

'এই তো এলাম। উঃ, সেই দুপুর থেকে ঘুরে ঘুরে হয়রান রাজীবদা।'

বিশ্বনাথের লেখা কাগজটা পকেটস্থ করে রাজীব তাকাল।

'ও কাগজটা কি রাজীবদা?'

'তেমন কিছু নয়। সামান্য একটা হাতের লেখা। অবশ্য সামান্য বস্তুরও মাঝে-মধ্যে অসামান্য দাম হয়।'

ঠোঁট টিপে রাজীব বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল।

*

শুক্লপক্ষের রাত। সম্ভবত চতুর্থী তিথি। আকাশে ছোট্ট একফালি চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো বলতে নেই। চতুর্থীর চাঁদ আলো ছড়িয়ে পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তোলে না। বরং ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ধরিত্রী অপরিচিত রহস্যময় দেখায়।

রিকশ'তে উঠে রাজীব বলল, 'মিল অফিসের টেলিফোন অপারেটর ভৈরব দত্তের বাড়ী নিয়ে চল।'

'ভৈরব দত্ত? কোন্ ভৈরববাবু গো? সেই মাল-খাওয়া ভৈরববাবু?' রিকশওয়ালা সঠিক হতে চাইল।

'মালখাওয়া ভৈরববাবুকে চেন তুমি?'

'হুই? চিনি না মানে?' রিকশওয়ালা তর্ক করতে রাজী। বলল, 'কতদিন রেতে বেহুঁশ বাবুকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।'

পথে লোকজন। সাইকেল এবং রিকশর একচক্ষু আলো। দুপাশে গাছগাছালি, অন্ধকার,...কোথাও আলোছায়ার খেলা।

মিল এরিয়ার মধ্যে ভৈরব দত্তের বাড়ী। বাড়ী অর্থাৎ কোম্পানীর কোয়ার্টার্স। দিনের আলোয় হয়ত এ-পথে জীপ চালিয়ে এসেছে রাজীব। এখন রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত জায়গাটাই চোখে অপরিচিত ঠেকছে।

বড় রাস্তাটা থেকে অপেক্ষাকৃত সরু আর একটা রাস্তা বাঁদিকে গিয়েছে। সেদিকে খানিকটা গিয়ে রিকশটা একটা ছোট বাড়ীর সামনে দাঁড়াল।

রাজীব বুঝতে পারল, এটাই ভৈরবের বাড়ী এবং রিকশওলা বাড়ীটা চেনে। দরজায় কড়া নেড়ে রাজীব ভৈরবের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু পরেই দরজাটা অল্প একটু ফাঁক হল। তের-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে মুখ বের করে বলল, 'কাকে চান আপনি?'

'ভৈরববাবুকে। উনি আছেন বাড়ীতে?'

'বাবা তো আলোকপুরে গিয়েছেন।'

'আলোকপুরে?' একটু ভেবে রাজীব বলল, 'কেন গিয়েছেন বলতে পার তুমি? কখন ফিরবেন?'

মেয়েটি সঙ্কোচ সঙ্কোচ বলল, 'আলোক-পুরে গেছেন ম্যানেজার সাহেবের কাপড় কাচতে দিতে। এখুনি ফিরবেন। আপনি বসবেন একটু?'

রাজীব ঘরের মধ্যে ঢুকল। ছোট ঘর, বড়জোর দশ ফুট বাই দশ ফুট সাইজ। সম্ভবত এরকম তিনখানা ঘর আছে বাড়ীতে। কিংবা দুটোও হতে পারে। ঘরের আসবাবপত্র বলতে দুখানা বসবার চেয়ার, ছোট একটা কাঠের টেবিল। দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি। কোনোটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, কোনোটা পরিবারের লোকেদের বলে মনে হল তার। একপাশে কয়েকজোড়া জুতো। সেদিকে চোখ পড়তেই রাজীব হঠাৎ মনোযোগী হল।

ইতিমধ্যে মেয়েটি বাড়ীর ভিতর কি কাজে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে রাজীব ঘর-খানা দ্রুত পর্যবেক্ষণ করল। দেওয়ালের ছবিগুলি দেখল। তাকের উপর সাজানো বইগুলি খুব ব্যস্তভাবে নেড়েচেড়ে রাখল। এবং সবশেষে জুতোগুলির কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াল।

মেয়েটি ফিরে আসতেই রাজীব বলল, 'আমি বরং এখন আসি। তোমার বাবার

...না হয় কাল সকালে এসে দেখা ...।'

মেয়েটি একটু বিস্মিত হয়ে বলল, ...বেন না একটু? আচ্ছা কি নাম বলব ...নার?'

'নাম বলার দরকার নেই। বলো মিলের ...জন সাপ্লায়ার এসেছিলেন। তিনি ...র সকালে আসবেন।' কথা শেষ করে ...ব ফের রিকশতে গিয়ে বসল।

থানার কাছাকাছি আসতেই রাজীব অবাক হয়ে তাকাল। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। ভৈরব দত্ত থানার কাছেই দাঁড়িয়ে। একটু দূরে রিকশটা ছেড়ে দিয়ে রাজীব ধীরে ধীরে হাঁটল। ওর সম্মুখীন হয়ে খুব অবাক হবার ভাণ করে বলল, 'কি খবর ভৈরববাবু? হঠাৎ এখানে দাঁড়িয়ে?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি স্যার। মথুরাপুরে শুনলাম যে আপনি দিকনগরে এসেছেন। একজন সেপাই বলল যে, আপনি এখুনি ফিরবেন। জীপ দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।'

'কোনো খবর আছে নাকি ভৈরববাবু?' রাজীব স্মিতমুখে তাকাল।

'প্রাইভেটে আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম স্যার। দেখবেন, যেন পাঁচকান না হয়।' এদিক-ওদিক চেয়ে ভৈরব বলল, 'সুজাতা দাস রেজিগনেশন দিয়েছে। আজই ম্যানেজার সাহেবের কাছ থেকে খবরটা জানতে পেরেছি।' (ক্রমশ)

অঙ্গনা

ওরা চুল বাঁধে

বেলা পড়ে এলে জলকে যাওয়ার কথা আজ আর তেমন করে ভাবায় না। নগরজীবনের বদ্ধ জলাশয়ে সে সুযোগও কম। তাছাড়া ব্যস্ত জীবনের হিসেব কর। মুহূর্তের বজ্র আঁটুনিতে এই বস্তুধর্মী কল্পনাটি এক ফাঁকে গড়িয়ে যাচ্ছে। এরকম অনেক কিছুই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কাহিনী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে আমরা দেখছি পুরুষপরম্পরার ঐতিহ্য একে একে হারিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য কারো কোন খেদ নেই, যত আহা-উহু কাব্য-সাহিত্যে। ভীষণ ব্যস্ত মানুষের এসব নিয়ে ভাববার অবসর নেই।

কথায় কথা বাড়ে। তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও মনে পড়ে, মানুষের ব্যস্ততা লাঘবের জন্য কত চেষ্টাই না হচ্ছে। কিন্তু তা দিয়ে ঠিক তাদের বেঁধে ওঠা যাচ্ছে না। দিনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ততা যেন মাত্রাহীন হয়ে পড়ছে। আমি ভীষণ ব্যস্ত, হাতে মোটেই সময় নেই বা একদম সময় করে উঠতে পারছি না, এরকম কথা বলতে আমাদের সারা দেহমনে যে কি অসাধারণ পুলকের শিহরণ বয়ে যায় তা বক্তামাত্রেই উপলব্ধি করেন।

অথচ এভাবে ব্যস্ত হতে গিয়ে আমরা অনেক কিছু চিরতরে হারিয়ে ফেলছি। কোন অবসরে তার একটা টুকরো ছবি হয়তো মনের কোণে ভেসে ওঠে দু'দণ্ডের জন্য মনটাকে একটু বিস্বাদ করে তুলবে কিন্তু তারপরেই আবার সব ঠিক। কারণ সেখান থেকে আমরা এতদূরে সরে এসেছি যে তা আর ফিরে পাবার কোন উপায় রাখিনি। অতীত গৌরবে যেমন আর পুরোপুরি উপনীত হওয়া সম্ভব নয় তেমনি এই ফেলে আসা ছবিগুলিকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে নেওয়াও অসম্ভব। আসলে সে পরিবেশই আর নেই। আমরা ক্রমেই বদ্ধ হয়ে পড়ছি।

অবশ্য শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার মত একটা মাহেন্দ্রক্ষণ কখনো আসবে কিনা তা ঠিক এই মুহূর্তে বলা যায় না। তবে নগরজীবনে কেউ কেউ যে শ্বাসকষ্টে ভোগে না এমন নয়। অনেকটা জলের মাছ ডাঙায় এলে যা হয় আর কি। তবে সেরকম উপলব্ধি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এজন্য দায়ী হলো, জীবনের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য। জীবন সব সময়ই বিচিত্র। কিন্তু এখনকার মত আগে তা কখনো হাতে হাতে উপলব্ধি করা যেত না। এখন মনে হয় যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায় ততক্ষণই লাভ। জীবনের মাধুর্য উপভোগের সময়সীমা বড় ধরাবাঁধা। এরকম একধরনের আপশোষ আমাদের প্রতি মুহূর্তে বিদ্ধ করে। আর এরকম যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়মন নিয়েই আমরা জীবনের দাঁড় টেনে যাই।

জীবনে উপভোগের বস্তুসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নানাদিক থেকে শূন্যতা এসে জীবন-উৎসবের মহা-ভোজকে বিষাদমলিন করে তুলছে। তা হচ্ছে এই ছেড়ে আসার বেদনা। চলতে গিয়ে অনেক কিছুই ছেড়ে আসতে হয় তা বলে এরকমভাবে নিজের পূর্ব পরিচয় বিসর্জন দিয়ে কেউ চলতে চায় না। তবে আমরা যে সবরকম চলায় নিঃসর্ত সেরকম নজীর আমাদের চলার ধরন। অতীত গৌরব থাক আর না থাক সবকিছু ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাক তবু আমরা বেঁচে থাকবো শুধুমাত্র বর্তমানকে নিয়ে। এখানেই আমাদের সব ধ্যানজ্ঞান স্ফূর্তি পাবে, কল্পনাবিলাসের ফোয়ারায় নতুন মোহ গড়ে উঠবে। তাই বর্তমান আমাদের কাছে খুব সুখের।

জীবনে ব্যস্ততা খুব বেড়ে গেছে। একটি মুহূর্তও অপচয়ের সুযোগ নেই। আজকের জীবনে প্রতিটি দণ্ড পলের হিসেব রাখতে হয়। না হলে যুগের চোখ রাঙানিতে সব বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। আমরা নিজেদের টিকিয়ে পর্যন্ত রাখতে পারবো না। কোথায় হারিয়ে যাব, তলিয়ে যাব। তাই সময় থাকতে সবাই সাবধান। কোনরকম বেহুঁশ তাল এখানে চলবে না। [illegible]র দিন শেষ হয়ে এবার লগ্ন এসেছে অ্যাক-সনের। তাই সবাই সন্ত্রস্ত, কি রকম ব্যস্ত।

কি ভুলে থাকতে বললেই কি ভোলা যায়? কারো চোখ রাঙানিতে

[illegible] নিজের প্রবৃত্তিকে বিস-[illegible] দিতে পারে না। সাময়িকভাবে [illegible] হলেও আত্মপ্রকাশের পথ সে [illegible]জবেই এবং একদিন বেরিয়েও পড়বে। [illegible]তো পুরনো রঙ বা রূপ সেখানে [illegible]কবে না। নতুন চেতনার দীপ্তি পড়বে [illegible] উপর। নতুন রসে উজ্জীবিত হয়ে [illegible]পাতা এবং পুষ্পসম্ভারে তা উজ্জ্বল [illegible] উঠবে। সৌন্দর্যচেতনা মানুষের [illegible]জাত হওয়াই এই গোড়ায় গলদ থেকে [illegible]ছে। ঘটনাবিপাকে তা হয়তো প্রকাশের [illegible] হারিয়ে ফেলে কিন্তু চিরকাল একরকম [illegible]তে পারে না। অবশ্য প্রকাশের পথে [illegible]তুন চিন্তা খাত পরিবর্তন করে।

আজ আমরা ভীষণ ব্যস্ত। একটুকু [illegible] বসে থাকার উপায় নেই। কিন্তু [illegible]ন্দর্যচর্চা বা সৌন্দর্যবিলাস তা বলে [illegible]মরা এতটুকু ছাড়িনি। আর ইতিহাস [illegible]লপাড় করে ফেললেও এরকম নজীর [illegible]ওয়া দুর্লভ। জীবনের কোন স্তরেই [illegible]নুষ রূপচর্চা ছেড়ে থাকতে পারেনি।

[illegible] ব্যস্ত মানুষও নিজেকে সাজাতে [illegible]য়। এবং এজন্য সময় খরচেও সে কোন [illegible]র্পণ্য করে না। বরং আগের মতই বা [illegible]র চেয়ে বেশি করে সাজতে চায় সে। [illegible]গের দিন অতীত হয়ে গেছে। সেজন্য [illegible] ছাড়িয়ে কাঁদলে কোন সুফল হবে না। [illegible]তে বেদনা আরো বাড়বে এবং নতুন [illegible]ন্তার প্রকাশ-পথ বিলম্বিত হবে মাত্র। [illegible] সেসব স্মৃতিতে রেখে দিয়ে নতুন [illegible] ভাবতে হবে। যাতে বদ্ধ জলে [illegible]মরা ঘুরপাক খেয়ে না মরি। বর্তমান [illegible]ময়ে বসে আমরা এই শিক্ষালাভ [illegible]রেছি। তাই বর্তমান আমাদের কাছে [illegible]ত প্রিয়। অতীতকে মনে রাখতে চাই [illegible]ন্তু বর্তমানকে ছেড়ে অতীতে ফিরে [illegible]ওয়ার কোন বাসনা আমাদের নেই। [illegible] বার যে বর্তমান এই মুহূর্তে অতীত [illegible]য়ে যাচ্ছে তাকেও ধরে রাখতে চাই না। [illegible] যাচ্ছে যাক, আসুক নতুন অমৃত [illegible]ঠে আমরা নতুন জয় ঘোষণা করছি।

জীবনের গতি অত্যন্ত দ্রুত। [illegible]তীতকে শুধু ছাড়ি ছাড়ি করেও [illegible]ড়তে পারি না। অবশ্য সর্বত্র অতীতকে [illegible]য়ী করে লাভ নেই। সৌন্দর্যচর্চার [illegible]ত্রে আজো আমরা অনেকখানি অতীত-নির্ভর। সেদিনও বাড়ি বাড়ি নাপিত বৌ [illegible]সতো। গিন্নী থেকে শুরু করে [illegible]কলের পা আলতা দিয়ে [illegible] [illegible] করতো। [illegible] [illegible] ধরে তার মধুর বাক্যালাপ। [illegible] আলতা পরানো আর চুলে [illegible]রুনি চালানো ছিল নাপিত [illegible]য়ের নির্দিষ্ট কাজ। পরিপাটি কেশ পরিচর্যায় তার সাহায্য ছিল [illegible]অপরিহার্য। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাপিত বৌ সেদিন সকলের কানে কানে সৌন্দর্যের গোপন কথা শুনিয়ে আসতো। সকলেই অধীর হয়ে অপেক্ষা করতো আবার কবে নাপিত বৌ আসবে, চুলের খোপা সবাইকে টেক্কা দিয়ে চলবে।

নাপিত বৌ আজ প্রায় অদৃশ্য। নগরজীবনে তার সাক্ষাৎ কচিৎ মেলে। দেশে গাঁয়ে হয়তো সে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে নেহাতই টিমটিমে অবস্থায়। নাপিত বৌ কেশ পরিচর্যা করতো। মেয়েরা তার কাছ থেকে কেশ পরিচর্যা শিখে নিতো। আর কেশচর্চার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও আজো ঠিক সময়টিতে চুল বাঁধা চাই। জলকে চলার তাড়া না থাকুক কিন্তু চুল বাঁধায় কোনরকম শৈথিল্য নেই। বরং লক্ষণ অন্যদিকে। অতীত ঘেঁটে মেয়েরা এখন কেশসজ্জায় ব্যাপৃত।

এই দ্রুততার মধ্যেও সময় আবার কোথাও ধরা পড়ে আছে। সেখানে সময়ের নড়াচড়া বড় অস্পষ্ট। সহসা বুঝে উঠতে পারা যায় না; সময় এখানে চলছে [illegible]। ভারতের আদিবাসী জীবনের দিকে তাকালে একথায় সত্যতা বেশ উপলব্ধি করা যায়। অজস্র উন্নতির মধ্যেও কোন কোন ব্যাপারে আজো ওরা একান্ত অতীতাশ্রয়ী। সাধের জীবনকে ওরা সহজে ছাড়তে চায় না।

তাই আজো ওদের জলকে চলার তাড়া। আমোদ-প্রমোদ আর আনন্দ উৎসবে বিহ্বল হওয়ার সুযোগটিকে ওরা ছাড়তে পারেনি। দিনের শেষে জলকে চলার তাড়ার মতই ওদের সাজগোজের আকর্ষণ। আর সাজগোজের সবচেয়ে প্রথমেই তো হলো কেশ পরিচর্যা। চুল বাঁধার চাতুরালি ওদের খুব বেশি নয় কিন্তু এজন্য আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।

আদিবাসী জীবনে সাজসজ্জার বড় কথাই হলো কেশ প্রসাধন। দিনের যে-কোন সময় সুযোগ বুঝে ওরা চুল আঁচড়াতে বসে পড়ে। দীর্ঘসময় চুলে চিরুণি চালায়। সরু চিরুনিতে চুলের সব ময়লা কেটে যায়। চুল থাকে ঝকঝকে। তারপর পেছনমোড়া খোপা। ফিতে বা কাঁটার বাহার খুব একটা নেই। সেই খোপাতেই ওদের কেশ পরিচর্যার চরিতার্থতা। এর বাইরে ওরা ভাবতেও চায় না। তাই জটিলতা কোন কিছুতেই ওদের জীবনকে জড়িয়ে ধরতে পারেনি। আদিকালের সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অবিকৃত রেখে ওরা জীবনের ধারা বাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাই চিরকেলে পেছনমোড়া খোপায়ই ওদের তৃপ্তি। এর পরে হয়তো দেখা যাবে, কারো মাথায় আছে চিরুনি গোঁজা আবার কারো মাথায় লাল টকটকে জবা। তাতেই ওদের খুশি উপচে পড়ে।

একপাশে কৃত্রিম প্রসাধনের আড়ালে ওরা নিজেদের লুকিয়ে নিতে চায় আর [illegible] এই আদিবাসীদের [illegible] মন্থর জীবন আমাদের কল্পনায় [illegible] এক [illegible] রং চড়িয়ে যায়। হারাই হারাই করেও সেদিন হারিয়ে যায়নি। চোখ মেললে হয়তো সে দৃশ্য চোখে পড়বে না কিন্তু একটু খুঁজলেই দেখবো একজন আদিবাসী রমণী উঠোনে বসে চুল বাঁধতে বসেছে। মাথায় চিরুনির [illegible] আলাগোলা। পেছনমোড়া খোপা। হাতে গোঁজা জবা। আর অবশ্যই [illegible] [illegible] পূর্ণ উল্লাস।

—[illegible]

ফটো : মানসরঞ্জন কুণ্ডু চৌধুরী

সুজয়া গু

পাহাড়ে মেয়েরা

'ও দিদিরা ওটা কি হচ্ছে?' কামরার এক প্রান্ত থেকে হাঁক পাড়ে নিলু।

'এটা হচ্ছে ভোজন। কারও রসনা সিক্ত হলে চলে এসো। প্রসাদ পেতে পারো'। সিঙাড়া ভেঙে মুখে দিতে দিতে অজানা সহযাত্রিনী জবাব দেন।

যেতে হয় না। ঠোঙা ভর্তি গরম সিঙারা চলে আসে এপাশে। খাদ্যে ও বাক্যে মুখরিত কামরা। আশে-পাশের কামরার লোকজন উঁকিঝুঁকি মারছেন—ব্যাপারটা কী? এত সোরগোল কেন?

আপশোষ করে কোন লাভ নেই—কেন উঠেছিলাম পুজো স্পেশালে। কামরায় আলো নেই, জল নেই, পাখা নেই। এমনকি দরজার অর্গল পর্যন্ত নেই। সারারাত জায়োয়ানী করছি—ঘন্টায় ঘন্টায় শিফট বদলাচ্ছে। তবে এ ট্রেনে যা আছে, তা অন্য ট্রেনে নেই—থাকা সম্ভব নয়। দু দিকে ধু-ধু করছে মাঠ, জনপ্রাণী বলতে টেলিগ্রাফ লাইনের ওপর বসে আছে একটি নাম না জানা পাখি। তার সঙ্গে আলাপ জমাতে ট্রেন গেল দাঁড়িয়ে। পাখিটির সঙ্গে আমরাও পরিচিত হবার চেষ্টা করি। ট্রেনটিকে তার পছন্দ হলেও, আমাদের দলবদ্ধভাবে হেই-হেই করাটা সে অপমানকর বলে সাব্যস্ত করল। দু-এক বার আড় চোখে আমাদের দেখে নিয়ে, সোজা উত্তরের দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ট্রেনের তবু নড়বার নাম নেই। আবার এক সময় মর্জিমতো হেলে-দুলে চলতে শুরু করল।

আরে এ কি? ট্রেন আবার স্ট্রাইক করল কেন? ছবির মতো ছোট্ট একটি ফ্ল্যাগ স্টেশন। আদুর গায়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে একটি লোক ছোটাছুটি করছে। হাতে তার লাল ফ্ল্যাগ। ওই হল স্টেশনেশ্বর-রোবা জগদীশ্বরোবা। হলে কি হয়, স্পেশাল ট্রেনের মানভঞ্জন করা কি চাট্টিখানি কথা? খটাখট খটাখট করতে করতে একটি গতিমত্ত ট্রেন মুহূর্তের মধ্যে আমাদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল। স্পেশাল ট্রেনের টনক নড়ল। বোধহয় প্রেস্টিজেও লাগল। তাই দুলকি চালে চলা শুরু করল।

অফুরন্ত অবসর। আর অবারিত প্রকৃতির মাঝে চলন্ত এই ঘর। শুধু প্রকৃতিকে নিয়ে পড়ে থাকার মতো মেয়ে আমরা নই। কাজেই অপরিচিতা সহ-যাত্রীনীরা ছাড়াও পেছনের কামরার গার্ড-দাদাকে নিয়েও পড়ছি আমরা মাঝে মাঝে।

'ও গার্ডদাদা। পনেরো মিনিট ধরে ফ্ল্যাগ তো অনেক নাড়লেন। গাড়ী তো নড়লো না। ঠেলুন না একটু। আমরাও হাত লাগাবো নাকি?' কটমট করে তাকিয়ে, ফ্ল্যাগ দুটো বগলদাবা করে গার্ডদাদা ছুটলেন ইঞ্জিনের দিকে।

গার্ডদাদা হাতছাড়া হওয়াতে নজর ফেরে সহযাত্রীনীদের ওপর। এঁরা মহাকালী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। দল বেঁধে চলেছেন দেরাদুন, মুসৌরী, রাণীক্ষেত। পুজোর ছুটি কাটিয়ে ফিরবেন। আর আমরা এগারোটি মেয়ে চলেছি গোমুখে—পর্বতা-রোহণ শিক্ষা নিতে, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের পথিকৃত ক্লাবের উদ্যোগে। শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়েছেন নিম অর্থাৎ উত্তর কাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং, — ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহণ শিক্ষালয়।

২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৬৮) রওনা হয়ে হৃষীকেশ পৌঁছলাম ২৮ সেপ্টেম্বর রাত্রি সাতটায়। পৌঁছনোর কথা ছিল স দশটার মধ্যে। মোটে ন ঘন্টা দেরী হয় স্পেশাল ট্রেনের 'গো স্লো পলিসি'র জ এই রাতে ধর্মশালা ঠিক করা, খাও ব্যবস্থা ও বাজার করা আর কাল সা বন্দোবস্ত করা—সে এক ঝকমারি ব্যাপ তবু রক্ষে যে, গত বছর মোল্ট অভিব এখানে এসে আমি ও সুদীপ্তা এ ক গুলো করেছিলাম। তাই সব চেনা। অফিস কিছু দূরে। গিয়ে শুনলাম পাঁচটায় এসে টিকিট কাটতে হবে।

কোনও মতে ভোরে আমরা কাশী (৩৬৪০') রওনা হলাম। কাশী জেলা সদর। পাহাড়ী পথ। তাই ছোট। তার আমরা আবার নিম্ন শ্রে যাত্রী। পেছনের সীটে বসে সমানে ঝাঁ হজম করছি। তবে সহযাত্রীদের এক কেরোসিন সে ঝাঁকুনি হজম করতে হল না। চলকে চলকে আমার শাড়ী ভিজিয়ে দিল। শত হলেও তেল তো। দিলেও কিছু বলা যায় না।

বেলা তিনটের উত্তরকাশী পৌঁছ ক্লান্ত শরীর, সিক্ত বসন, কেরো সৌরভ। ইনস্টিটিউটের বাস স্টপে নাম এক ভদ্রলোক এলেন, 'মিসেস গুহ বে

জানালাম। তিনি নমস্কার করে বল 'আমি নিমের অস্থায়ী অধ্যক্ষ মেজর সিং। আপনাদের জন্য অপেক্ষা ক এতটা আশা করি নি। বলা বাহুল্য খুশী হলাম।

অফিসে পৌঁছতেই রেজিস্ট্রার শর্মা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানা তিনি আগে দার্জিলিং হিমালয়ান মা নিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ইন্স্ট্রাক্টর ছি

পাহাড়ে ওঠা শেখবার ক্লাস
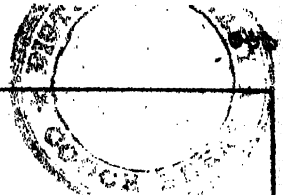
ছিলেন। সেই সূত্রে আমাদের অনেককেই চেনেন। তিনি নিজে গাড়োয়ালী। তাই দার্জিলিং ছেড়ে উত্তরকাশী চলে এসেছেন।

নিমে সেদিন নিদারুণ ব্যস্ততা। উত্তর প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী আসবেন সন্ধ্যে ছটায়। নিমের কোন পাকা দালান নেই। সে সব হবার কথা ছিল মাহিডাণ্ডায়। কিন্তু সেখানে জলাভাব। তাই এখানেই নদীর ধারে একটি জায়গা মনোনীত হয়েছে। চীফ সেক্রেটারী আজ সব দেখে তাঁর চূড়ান্ত মতামত জানাবেন।

তিন দিনের যাত্রার ক্লান্তি কাটাবার অবকাশ পেলাম না। ৩০ তারিখ ভোর থেকেই শুরু হল ব্যস্ততা। সকালে ফিজিক্যাল ট্রেনিং। জলযোগের পর রোপ-নট ক্লাস, যাদুঘর পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি চললো বেলা এগারোটা পর্যন্ত। স্নান-খাওয়া সেরে ভেবেছিলাম একটু গড়িয়ে নেবো। কিন্তু ডাক পড়ল ইকুইপমেণ্ট অফিসারের কাছ থেকে। পর্বতারোহণের পোশাক, শোবার সরঞ্জাম, শিবিরের টুকি-টাকি আর পাহাড়ে ওঠার উপকরণ সব বুঝে নিতে হল। প্রত্যেক জিনিস দেখে নিলাম। প্রয়োজন মতো বদল বা সারাই করলাম। পরে কিছু বদলে দেবে না। কান্না-কাটি করলেও নয়। এই অমোঘ অস্ত্রটিও সেখানে অচল।

এদিকে কোয়ার্টার মাস্টার স্বপ্না নন্দী ও কমলা সাহার করুণ অবস্থা। পাহাড়ে আমরা তিন সপ্তাহ থাকবো। সব রাশন বুঝে নিয়ে বস্তাবন্দী করতে হবে। সবাই মিলে বসে গেলাম অঙ্ক কষতে। ইউনিট ধার করে লোকসংখ্যা ও দিন দিয়ে গুণ করলাম...

চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছি। কেবলই মনে হচ্ছে কি যেন বাদ পড়ে গেল—সব কাজ বোধহয় শেষ হল না। রাত্রে স্বাস্থ্য-মূলক চিত্র প্রদর্শনী। ডিনারের পর রাত জেগে গোছগাছ করছি, আর গঙ্গার গর্জন শুনছি। মনে মনে ভাবি কলকাতা থেকে গঙ্গা চলেছে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু এর পর? গোমুখী পেরিয়ে, গঙ্গোত্রী হিমবাহ অতিক্রম করে, তপোবনে বাসা বেঁধে, আমরা যাবো শিবলিঙ্গের পাদমূলে। তখন কোথায় থাকবে চিরসাথী এই গঙ্গা?

পর দিন। ১ অক্টোবর। অ্যাডভান্স কোর্সের পাঁচজন — সুদীপ্তা সেনগুপ্তা (নেত্রী), সুজাতা মজুমদার, স্বপ্না নন্দী, কমলা সাহা ও আমি জীপে উঠলাম। ট্রাকে উঠলো বেসিক কোর্সের মেয়েরা—কল্পনা রায়চৌধুরী, সুতপা সেনগুপ্ত, নিলু ঘোষ, পারুল দে, শেফালী চক্রবর্তী ও অনুরাধা লাহিড়ী। দুজন ইন্সট্রাক্টরও সঙ্গে চলেছেন—জামীং সিং ও টোপগে।

'মেজর সাব ও আমরা ছেলেদের কোর্স পরিচালনা করছিলাম গোমুখে। তোমাদের খবর পেয়ে দু দিনে নেমে এসেছি। তোমা-দের ফেরৎ দিয়ে মাসের শেষে লেডিস কোর্সের মেয়েদের নিয়ে যাবো।' ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে টোপগে বলে, 'মাঝে হয়তো একটি দিনও ছুটি পাবো না।'

আমাদের জন্যে ওদের এই বাড়তি ঝামেলা। 'শিক্ষণ শিবিরটি কুমায়ুনের সুন্দরডুঙ্গা অঞ্চলে হবে বলে স্থির করে-ছিলাম গোড়ার দিকে। ইণ্ডিয়ান মাউন্টে-নিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের সম্পাদক শ্রীসোহিনী-মোহন চক্রবর্তী সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জানালেন যে, শিবিরটি পূর্ণ-পূর্ণ হতে হবে কোন মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় পরিচালনা করা উচিত। এদিকে শেরপা ও গাইডের অগ্রিম টাকা দেয়া হয়ে গেছে। তবু যেখানে শিক্ষা ভাল হবে সেখানেই যাওয়া ঠিক করলাম। শ্রীচক্রবর্তীর বিশেষ অনুরোধে নিমের কর্তৃপক্ষ, প্রায় বিনা নোটিশেই আমাদের ভার নিতে রাজী হলেন।

কিন্তু বাদ সাধলেন আমাদের রাজ্য শিক্ষাদপ্তর। যাত্রাক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁদের মতামত জানতে পারলাম না। প্রতিটি মুহূর্ত কাটলো অবর্ণনীয় উদ্বেগ আর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে। কি করি, কোথায় টাকা পাই। শেষ পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা কমিয়ে এগারোজন করতে বাধ্য হলাম। সেটা হল নিমের পক্ষে লোকসানের, আর আমাদের পক্ষে লজ্জার।

ধুলি ধূসরিত দেহে একে একে জীপ থেকে নামলাম। হরশিলে (৮৪০০') পৌঁছে গেছি। বেলা এখন সাড়ে বারোটা। উঠলাম সেই বিখ্যাত উইলিয়ামস সাহেবের ডাক-বাংলোয়। কিছুদিন হল মহাধুমধামে এই বাংলোর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এখানে ছিলেন কিছুদিন। বাংলো না বলে রাজ-বাড়ী বলাই উচিত। দোতলার ঘরগুলো আগেই দখল হয়েছিল। কাজেই নীচতলার নোংরা ঘরে আমাদের ঠাঁই হল। এক সময় ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই হরশিল। আজ সে সব ইতিহাসের বিষয়।

সঙ্গে ছিল শুকনো খাদ্য—রুটি আর তরকারী। চা সহযোগে কোনমতে সেগুলো গিলে ফেলেছি। এমন সময়—'চল চল ক্লাসের সময় হয়ে গেছে।' টোপগে তাড়া লাগায়। রককাইম্বিং ক্লাস হবে।

বাংলায় পর্বতারোহণ শিক্ষা বোঝান খুবই শক্ত। কারণ এত দিনেও বহু শব্দের কোন পরিভাষা তৈরি হয় নি। হিল, মাউন্টেন, ক্লিফ, ক্র্যাগ, রক—বাংলায় সবই পাহাড়। পেবল, স্টোন, বোল্ডার, স্ল্যাব—সবই পাথর। যাই হোক, আমরা সাধারণত দু ধরনের পাহাড় বেয়ে উঠতে শিখি—শিলাময় পাহাড় আর বরফের পাহাড়। দুটিরই গঠন সিরেট ও কঠিন—আরোহণও কষ্টসাধ্য। তবে পর্বতারোহণের নিয়মগুলো মেনে চললে অপেক্ষাকৃত সহজ।

হাঁটুতে ভর দিয়ে বা দু হাতে জড়িয়ে উঠতে নেই। উঠতে হবে পায়ের ওপর ভর করে। যে ফাটল, গর্ত বা খাঁজ অবলম্বন করে উঠবো, তার বহনক্ষমতা যাচাই করে ধীরে ধীরে উঠতে হবে। তাহলেই আরোহণ সহজ হবে।

প্রথম প্রথম নিয়মগুলো আয়ত্ত হতে চায় না। হ-ব-ব-র-রা করে কোনমতে উঠে পড়ছে কেউ কেউ। ইন্সট্রাকটারদের নজর এড়াবার উপায় নেই। ভুল হলেই আবার গোড়া থেকে শুরু। পুরো দেড় ঘন্টা বাদে ছাড়া পেলাম। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছি। পাতলা সুতির জামা পরে আছি। অকটোবরের শীত। জায়গাটা দার্জিলিং বা মুসৌরী থেকেও দু হাজার ফুট উঁচু।

পরদিন। চলেছি গঙ্গোত্রীর পথে। জংলা পুল পর্যন্ত জীপে এলাম। এবারে শুরু হল পদযাত্রা। খানিকটা গিয়েই পেলাম থেলুখাগা গিরিপথের (১৭৪৯০') পথ। এ পথে তেরো মাইল গেলে ভারতের শেষ বড় গ্রাম নেলাং (১১,৯৮৯')। থেলুখাগা আরও বত্রিশ মাইল। চীনা আক্রমণের আগে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের এটি ছিল অন্যতম পথ। নেলাং থেকে ছ মাইল এগিয়ে গেলে পড়ে জাহ্নবী ও দুলিং নদীর সংগম। সেখান থেকে দুলিং নদীর তীর ধরে গেলে বদ্রীনাথ পৌঁছন যায়।

আমরা সে পথে না গিয়ে সোজা এগিয়ে গেলাম। পৌঁছে এলাম ভাগীরথী ও জাহ্নবী নদীর সংগম—অপরূপ সংগম। অনেকে জাহ্নবী নদীকে জাত গঙ্গা বলেন। কিন্তু আসলে জাত গঙ্গা বেরিয়েছে নেলাংয়ের দশ মাইল উত্তরে জাডুং গ্রাম থেকে। তারপর দু মাইল নেমে এসে দোসুন্দুতে জাহ্নবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুন্দর নামে হল সংগম।

তারপরেই শুরু হল সেই বিখ্যাত ভৈরবঘাটির চড়াই। প্রায় আধ ঘণ্টায় সে চড়াই পেরিয়ে, ভৈরবঘাটিতে সামান্য জিরিয়ে নিয়ে, প্রশস্ত বাসপথ ধরে গঙ্গোত্রী (১০,৩২০') এসে পৌঁছলাম। পথ দেখে মনে হয়, আগামী বছরই হয়তো বাস আসবে এ পর্যন্ত।

অপরূপ নীড় গঙ্গোত্রী। দেওদারের ছায়া-ঢাকা সারি সারি সাধুদের কুটিরা। পরিবেশ প্রশান্ত। অশান্ত শুধু গঙ্গা—প্রায় পঁচিশ ফুট প্রশস্ত চাতালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তিরিশ ফুট নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই উচ্ছ্বসিত ফেনিল প্রস্রবণ দেখে আমরা মুগ্ধ।

'এখানে বসে তপস্যা করে ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন।' কুলিরা বোঝাল। বিশ্বাস করতে মন চায়। এর পরেই পাথরের দুই প্রাকারের শীর্ণ ধমনীর মধ্য দিয়ে গঙ্গা নেমে গেছে হরশিলের পথে। দেয়াল দুটি বেশ উঁচু আর মসৃণ।

বেশীক্ষণ দেখার সুযোগ নেই আমাদের। ক্রমাগত তাড়া। আমরা যে শিক্ষার্থী। শিবিরে পৌঁছে তবে আমাদের ছুটি। সবাই খুব ক্লান্ত। একে তো প্রথম দিনেই দশ মাইল হণ্টন, তার ওপর পিঠে বোঝা। রুকস্যাকে আছে হাওয়া-তোষক, থলি-বিছানা আর ব্যক্তিগত টুকিটাকি। কারও পা, কারও কাঁধ, পিঠ টনটন করছে। তবু খানিক বাদেই দেখি বেড়াবার তোড়জোড় চলেছে। বেরিয়ে পড়েছি—এমন সময় পেছন থেকে হাঁকডাক, 'তোমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে। মাউন্টেন টার্মস সম্বন্ধে লেকচার আছে।' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করলাম।

পরদিন আমরা গঙ্গোত্রীতেই কাটালো। সাধারণ কোর্সের ছাত্ররা এখানে তিন দিন থাকেন। উদ্দেশ্য, উচ্চতর আবহাওয়ার সঙ্গে শরীরকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করানো। সমুদ্র সমতা থেকে আট হাজার ফুট উঠে এলেই শরীরে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে—মাথাব্যথা, জ্বর ভাব, কম ঘুম, কম খিদে ইত্যাদি। এর প্রধান কারণ হল অক্সিজেনের অপ্রতুলতা। এর ওষুধ হল দিনে যথাসম্ভব ওপরে উঠে, রাতে নিচে নেমে ঘুমোনো; যথেষ্ট পরিশ্রম করা আর প্রয়োজন মতো খাওয়া। আমরা মাত্র তিন সপ্তাহের ট্রেনিংয়ে এসেছি। তাই তিন দিনের জায়গায় এক দিন থাকবো এখানে।

পরদিন। সকাল থেকে সুরু হয়েছে রোপ-নট ক্লাস বা রজ্জু-গ্রন্থি শেখানো, দড়ি ব্যবহার করতে হলেই বাঁধতে হবে। ব্যক্তি ও বস্তু বিশেষে বিভিন্ন ধরনের গিঁট পড়বে দড়িতে। কোমরে বাঁধলে এণ্ডম্যান, মিডলম্যান ও ওভারহ্যাণ্ড, ক্যারাবিনারে বাঁধলে টারবাক, অন্য দড়ির সঙ্গে জুড়তে হলে রীফ বা প্রুসিক, গাছের সঙ্গে টিম্বার হিচ আর খুঁটিতে বাঁধলে অ্যাঙ্কর নট। আর কতো রকমের গিঁট আছে।

তারপর হল রকক্লাইম্বিং বা শিলারোহণ। নানা রকমের শিলা নানা কৌশলে উঠতে হচ্ছে। বেশীর ভাগ শিলাই মসৃণ। যার মধ্যে খাঁজ নেই সেগুলোতে ওঠা আরও শক্ত। ঢালু পাথরে পায়ের চাপে ও ঘর্ষণে যে বাধাশূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার ওপর নির্ভর করে উঠছি। খাড়া পাহাড়ে ফাটলের সাহায্য নিচ্ছি—ফাটলের কিনারা আঁকড়ে (সাইড-গ্রিপ) উঠছি। ফাটল একটু প্রশস্ত হলে, কনুই বা জুতো ফাটলে আবদ্ধ (জ্যাম) করে উঠছি। আর ফাটল যদি তিন-চার ফুট চওড়া হয় তাহলে অন্য কৌশল—চিমনি ক্লাইম্ব। ফাটলের ভেতরে ঢুকে, এক দেয়ালে পিঠ আর অন্য দেয়ালে জুতো [illegible] ধীরে ধীরে উঠছি। আমরা এইভাবে [illegible] ধরনের শিলারোহণ করতে করতে [illegible] হাজার ফুটের ওপরে উঠে এসেছি। দেখছি দক্ষিণে যোগীন ও সুদর্শন, উত্তরে গঙ্গোত্রীর তিনটি শিখর।

চারদিকে শিখরের ভীড়। প্রশান্ত, ধ্যানমগ্ন, [illegible]। [illegible] প্রণয়ে তাদের মাথা অবনত হয়েছে। আকাশ নেমে এসেছে।

পরদিন। দক্ষিণে এগোচ্ছি। যাবো চীরবাসা (১১,৮৩০') মাত্র ছ মাইল। তবু কষ্ট হচ্ছে, প্রখর রোদ। পথে জল পাওয়া যাবে, এই ভরসায় কেউ জল বয়ে আনি নি। তাই আরও কষ্ট হচ্ছে তৃষ্ণায়। জল-নাম জপ করছি। জলের সব আশা জলাঞ্জলি দেবার পর দেখি, একটি পাথরের গা ঘেঁষে তিরতির করে জল গড়িয়ে চলেছে। সে জল পান করা সম্ভব নয়। তবে চাটা চলতে পারে। প্রাণের দায়ে তাই করলাম।

একটি পুল পেরিয়ে, দেওদার আর ভূর্জের ছায়াঘন পথ বেয়ে নেমে এলাম ভাগরথীর তীরে। পেলাম আমাদের ত্রাণ-কর্তা—চীরবাসা ডাকবাংলো। ধুপধাপ করে রুকস্যাক ফেলে মাঠে গা এলিয়ে দিলাম।

খানিক বাদেই আমাদের আলোচনা রোমের দিকে মোড় নিল। যথারীতি শুরু হল পরচর্চা, গঙ্গোত্রীতে আমাদের সঙ্গে বাঙালী সন্ন্যাসিনী মাতাজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তরুণী, সুন্দরী, সাহসিনী। অনায়াসে তিনি কালিন্দী খাল (১৯৫১০') গিরিপথ অতিক্রম করেছেন। বিদায় নেবার আগে বলেছিলাম, 'আশীর্বাদ করুন—যেন আপনার মহত্তর জীবনের প্রেরণা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।'

মোজা বদলাতে বদলাতে সুতপা বলে, 'ওঁর জীবন তোমার থেকে মহত্তর মনে করার কারণ কী? উনি তো সমাজ থেকে পালিয়ে, সব সমস্যা এড়িয়ে, নিজেকে নিয়েই মত্ত।'

মনে পড়ে গঙ্গোত্রীর কথা, স্বামী সারদানন্দজীর কথা। তিনি বলেছিলেন, 'যা করবে, তা যাচিয়ে নিয়ে করবে।' কথায় কথায় তিনি সুতপাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, 'তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। ভগবানের আশীর্বাদ তুমি পাবে। প্রতিদিন তুমি অন্ততঃ পাঁচ মিনিট মনঃসংযোগ করো। মনঃসংযোগ মানে ভগবানের আরাধনা মাত্র হতে পারে। শুধু ঘরের কোণে বসে মনকে কেন্দ্রীভূত করো।' দারুণ চমকে উঠেছিল সুতপা। এতো মেয়ে থাকতে নির্বাচিত হোল সে? কি অদ্ভুত এই মাদ্রাজী সন্যাসী—ভূতপূর্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। কিসের সাধনা করে চলেছেন গঙ্গোত্রীতে, পনেরো বছর ধরে?

'সমাজ সংস্কার বা জনসাধারণের জন্যে যা করতে যাবে, তাতেই আসবে হাজার বাধা আর সৃষ্টি হবে জটিলতার। [illegible]

সহ্য করতে পারে কেবল যশোলভী সাধারণ মানুষ আর মুক্তকাম মহাপুরুষ।"

"তাহলে ওকে অসাধারণ ভাবছ কেন?" নীলু, স্বপ্না, সুদীপ্তা একজোট হয়।

"ও যে ভগবানকে পাবার জন্যে সব ছেড়ে এসেছে।" অনুরাধা আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে সাধের তুলশয্যা ত্যাগ করে। আট বছর বয়স থেকে ও কনভেন্টে মানুষ। তবু স্বধর্মে ওর গভীর বিশ্বাস।

"তুমি কি ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারো।" সুতপা জবাব দেয়।

তারপর চলে সেই চিরন্তন তর্ক। যে তর্কের শেষ নেই। ফেনা ভাত রান্না হল, ঠান্ডা হল, দলা পাকিয়ে শুকিয়ে গেল। খাবার অবকাশ নেই। শেষ পর্যন্ত ইন্স-ট্রাকটাররা এসে বলল, "খেয়ে আর কাজ নেই। তাঁবু টাঙাও, তারপর রক-ক্লাইম্ব করতে চল।"

তিনটে থেকে শুরু রক ক্লাইম্বিং। আজকের ব্যাপারটা বেশ মজার। পার্কে বাচ্চাদের যেমন খেলার স্লিপ থাকে, তেমনি এক ঢালু মসৃণ পাহাড়। এক দৌড়ে উঠতে হবে, আর ধীরে ধীরে নামতে হবে। উলটো পুরান আর কি। তবে আজ প্রিন্সিপ্যাল নেই—কোনো এক সাধুর আস্তানায় গেছেন। ও'র তো তর্কের ভয় নেই, তাই নির্ভয়ে গেছেন। আর কি আশ্চর্য? উনি না থাকায় আমরাও নির্ভয়। প্রত্যেকের ওঠা-নামা বেশ ভাল হল।

গোধূলি লগ্নে আগুন জ্বলছে। অকৃপণ হাতে ইন্ধন যোগানো হচ্ছে। চীরবাসায় চীর গাছ অপর্যাপ্ত। আগুনের চারপাশে সাজানো হয়েছে পাথরের টুকরো। তৈরি হয়েছে আমাদের ওপেন-এয়ার লাউঞ্জ। কারও হাতে বই, কারও হাতে ডায়েরী, কারও হাতে চিরুনি। শেষে সে সব ছেড়ে শুরু হল গান।

ডিনার শেষ হল। ভাত-রুটি ডাল-তরকারী আর মাংস। রাঁধার লোক আছে, ব্যঞ্জনের কমতি নেই। বাদ সাধে স্বাদ। তাই এরপর থেকে আমাদের পার্মানেন্ট মেনু ছিল ফেনা ভাত আর আলুভাজা। পাচক মহাশয় মহা খুশী। অনেক পরিশ্রম কমে গেল তার।

খাওয়ার পর শোয়া? না। আগুন ছেড়ে ওঠা যায় না। ঢুকতে হবে তো সেই অন্ধকার তাঁবুর হিমশীতল গহ্বরে।

রাত বাড়ছে। পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি মারে কোজাগরী চন্দ্রমা। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, আসন্ন পূর্ণ-তার দীপ্তি নিয়ে। সেই রূপের ছটা ছড়িয়ে পড়ে শিখরে শিখরে, প্রান্তরের বনে বনে, আর পাথরে পাথরে। উজ্জ্বল পটভূমি—মাঝে মাঝে পাহাড়ের কালো ছায়ার রহস্য। ভুলে গেলাম আগুনের উষ্ণতা। চলে এসেছি ভাগীরথীর তীরে। গোমুখ থেকে নেমে এসেছে ঐ রূপোলী জলধারা। দেব-প্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়ে গঙ্গা নামে বয়ে চলেছে। ক্রমে বাংলার বুক ধুয়ে সাগরে গিয়ে লীন হয়েছে। আজ কলকাতার গঙ্গাও কি এমনি চন্দ্রস্নাত? চীরবাসায় বসে কলকাতার কটি মেয়ে তাই ভাবি, আর চেয়ে থাকি। আশ মেটে না।

সকালে উঠেই একপ্রস্থ পড়াশুনো। বিষয়, পাহাড়ের পথে হাঁটা, মাল বওয়া ইত্যাদি। প্রিন্সিপ্যাল ক্লাশ নেন। নটা নাগাদ আমরা চললাম র‍্যাপলিং করতে। দেখি ৯০ ডিগ্রি খাড়া একটি পাথরে দড়ি ঝুলছে। ঝকমকে মসৃণ পাথর—অনেক নিচে মাটি। দেখে আমাদের বুক কেঁপে উঠলো।

একটি নাইলনের দড়ি পাহাড়ের মাথায় পিটন গেঁথে আটকে দিতে হয়। সেই দড়ির প্রান্ত দুটি মাটি পর্যন্ত ঝুলবে। ঐ দড়ি ধরে যে কোন রকমের খাড়া পাহাড় থেকে খুব সহজে আর তাড়াতাড়ি নামা যায়। তবে দড়ি ধরে ঝুলে নয়, তাহলে দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে। পায়ের ওপর ভর দিয়েই নামতে হবে। দড়িটা হোল সাপোর্ট।

আমরা প্রথমে গেলাম একটি ছোট পাহাড়ে। অনুগমন রজ্জু বা র‍্যাপলিং রোপ ব্যবহার করার বহু রকমের কায়দা আছে। সবচেয়ে নিরাপদ হল স্লিং। স্লিং হল একটি গোল দড়ি, যার কোনও প্রান্ত নেই। কোমরে একটি স্লিং জড়িয়ে নিয়ে, তার সঙ্গে ক্যারাবিনার বা অ্যালু-মিনিয়াম ক্লিপ আটকে নিতে হয়। সেই ক্যারাবিনারের মুখ খুলে, তার গায়ে অনুগমন রজ্জু দুই প্যাঁচ জড়িয়ে নিতে হবে। তারপর পাহাড়ের গায়ে পা রেখে, কোমরের দড়িতে শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে তরতর করে নেমে আসতে হয়। তবে ঝোলানো দড়িটি বাঁ হাতে একটু সামলাতে হবে যাতে ক্যারাবিনারের সঙ্গে যে দুই প্যাঁচ জড়ানো আছে তা ঢিলে থাকে। তাহলে নামার গতি খুব দ্রুত হবে।

দ্বিতীয় পন্থা হোল, অনুগমন রজ্জু দিয়ে কাঁধ ও উরু জড়িয়ে নেয়া। তৃতীয় হোল দড়িতে কোন প্যাঁচ না দিয়ে কাঁধের কাছে ধরে একপাশ ফিরে নেমে আসা। চতুর্থ হোল, আড়াআড়ি ভাবে কোমরে জড়িয়ে নেমে আসা। মাটির দিকে মুখ করে পাহাড়ের সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি করে নেমে আসতে হবে। সব ক্ষেত্রেই হাঁটু সোজা থাকবে, হাতে থাকবে দস্তানা আর হাতের মুঠো থাকবে ঢিলে। প্রথম দিকে নতুন মেয়েরা একটু ভয় পেয়েছিল। পরে কিন্তু সবাই খুব ভাল করল—বিশেষ করে পারুল দে।

শেষের দিকে অনুরাধা এক কাণ্ড বাধালো বটে। শুরুতেই বলেছিল, "এই বেলা বন্ড সই করিয়ে নাও। আমার কিছু হলে কিন্তু তোমাকে হাইকোর্ট দেখতে হবে। মাসীর অমতে এসেছি। তিনি কিন্তু এই মর্মেই নোটিশ দিয়েছেন।'

তাই হোল বোধহয়। আমরা পাঁচজন সেই খাড়া পাহাড় থেকে অনুগমন শেষে নেমে আসছি। অকস্মাৎ চেঁচামেচি। দেখি অনুরাধা পাহাড়ের মাঝখানে দুলছে—ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। আমি আর সুদীপ্তা ছুটলাম। জিজ্ঞেস করি, "কি হয়েছে?"

"আমার সার্ট পেঁচিয়ে গেছে ক্যারা-বিনারের মধ্যে। তার সঙ্গে জড়িয়েছে দড়ির প্যাঁচ। আমি কিছুতেই খুলতে পারছি না।"

দড়ি উঠে গেছে ওর বুকের কাছে, আর পা নিচে ঝুলছে। কিছুতেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আরেকটি দড়ি বেয়ে, জামিং ওপর থেকে নেমে এল ওর কাছে। আমরা অন্য দড়িতে বেঁধে ছুরি চালান করলাম। ও এক হাতে ওর অনুগমন রজ্জু ধরে আছে, আর অন্য হাতে অনুরাধার সার্ট কাটছে। সাত-আট মিনিট কেটে গেল। তবু অনুরাধাকে মুক্ত করা গেল না।

"ওপর থেকে অনুগমন রজ্জু খুলে ফেল না। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দাও। আমরা নিচ থেকে অনুরাধাকে ধরে নেবো।" পরামর্শ দিই।

আমার কাঁধে মুখ রেখে মুক্ত অনু-রাধার সে কি ফোঁপানি, "আমার অতো সাধের জুয়েল থীফ সার্ট। নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে হৃষীকেশ থেকে সদ্য কেনা। কথা দিয়েছিলাম তিন সপ্তাহের মধ্যে ওটা আর গা থেকে নামাবো না। তার এই পরিণতি?'"

জড়িয়ে ধরি। অনুভব করি ওর পিঠে চামড়া উঠে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। আমাদের সবার চোখে জল ওর জন্যে। আর ওর চোখে জল সার্টের জন্যে।

শোকদৃশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। অ্যাডভান্স কোর্সের ছেলেরা নেমে আসছে। ট্রেনিং শেষ করে উত্তরকাশী ফিরছে।

ওরা এল। আটজন। ঋজু ভঙ্গিতে একে একে প্রিন্সিপ্যালকে স্যালুট ঠুকে দাঁড়ালো। প্রত্যেকেই দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, পিঠে বিরাট রুকস্যাক। ওরা থেলু, হিম-বাহে বিশ হাজার ফুট উঁচু একটি শিখরে আরোহণ করেছে। ওদের একজন মাত্র বাঙ্গালী—তাপস চক্রবর্তী। আমাদের সঙ্গে সবার আলাপ হল। চা আর আলুভাজা খেয়ে গঙ্গোত্রীর পথে পা বাড়ালো। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এরকম বলিষ্ঠ দেহ আর ঋজু ভঙ্গি বাংলার সব ছেলের যদি থাকতো।

যে পথ ধরে ওরা নেমে এসেছে, আমরা এগিয়ে যাবো সেই পথে। তবে ঠিক থেলু হিমবাহে নয়। যাবো গোমুখ আর তপোবন পেরিয়ে শিবলিঙ্গের পাদ-মূলে—উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে। ওদের মতো একই মন্ত্র আমরা পৌঁছে দেবো—বাংলার মেয়েদের কাছে,—ক্রমে সবার কাছে।

আগের ঘটনা

[সত্যার বাল্যবন্ধু সুখেন এসে তছনছ করে দিল সত্যার সংসার। লীলাকে ভাসিয়ে দিল সুখেন। রূপপুর ছাড়ল সত্যচরণ। ঘরে এল যমুনাও। মমমুরকী। সুখেনের প্রেম কিনল লীলা। কিছুদিন বাদে ডিভোর্স হল সত্য আর লীলার। যমুনাকে ঘিরে সত্যর রঙীন স্বপ্ন। সে অন্তঃস্বত্বা। তবু বিয়ে করতে পারছে না।

সুখেনকে নিয়েও জল বেশ ঘোলা হল। জুয়া, মদ আর মেয়েছেলে তার নিত্যসঙ্গী। এক রাতে পুলিশও অ্যারেস্ট করল। লীলাই মুক্তির ব্যবস্থা করে। ছাড়া পেয়ে সুখেন কলকাতার অভিমুখে। সত্য দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। পাগল হল সত্য। যমুনা নার্সিংহোমে। মারা গেল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৪২ ।।

পৃথিবীশুদ্ধ লোক জিতে যায় মরা মুখ দেখতে চায়, দিবারাত্র শাপমন্যি করে—ও মরুক, মরুক, তার বেঁচে থাকা না-থাকা সমান। জারজ ছেলে, পুরুষ কামার্ত উন্মাদ —পশুরও অধিক, সে মেয়ের মনের জোরটা রঙীন ফোলানো বেলুন ছাড়া কিছু নয়। ফাটতে দেরী হয় না। তবে একথা ঠিক—বন্যা একটা এসেছিল কোথা হতে। সব ভাসিয়ে উজাড় করে ফেলেছিল। সবকিছু জারজাখনল হয়ে কে কোথায় ছত্রখান। সব কিছু পচাটে মাটির ওপর নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। জল একদিন নামবে। কিন্তু যে-যেখানে, সে সেখান থেকে ফিরবে কি? পুনর্বাসনের দিব্যি মানুষকে কে দিয়েছে?

সারাজীবন ধরে প্রবোধের মনে শুধু একটি সাধ যত্ন করে পোষা ছিল। তা হচ্ছে, এলাকার ধনবান মানুষদের একজন সে হবে। এতদিন পরে মনে হল, কী লাভ! যমুনাকে পুড়িয়ে গঙ্গায় স্নান করার পর সে এপারে বাসে এসে চেপেছিল। তার নিজের সংসারটা বড় হাস্যকর আর ব্যর্থ মনে হচ্ছিল আজ। জীবনের কতকগুলো নিষ্ফল দিক সে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে এতদিন। আরো কত কী ধরবার বাইরে রয়ে গেছে, এমন করে টের পায়নি। আশ্চর্য, ওই ছোট্ট মেয়েটি—প্রবোধের চোখের সামনে জন্মাল—তারও মনে ছিল জন্ম দেবার একটা আকুতি। এই আকুতি বীজের মত প্রাণকোষে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল সে। সকলেই আসে। প্রবোধের চোখের সামনে পৃথিবী নিষ্ফল হয়ে উঠেছিল। বড় হায় হয়ে গেছে তার। লীলা তাকে হারিয়ে দিয়েছিল। এবার যমুনাও নিজে মরে গিয়ে তাকে হারিয়ে দিল। এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করার জন্যে কেন বিচলিত হয়েছিল প্রবোধ?

খুব দেরী হয়ে গেছে অবশ্য। যমুনার সর্বনাশের সংবাদ জানবার সঙ্গে সঙ্গে সে রাণীচকে গিয়ে পড়লে হয়ত সব সামলানো যেত।...যেত কি? এ তার মাটির মোকদ্দমা নয়, এ মোকদ্দমা হৃদয়ের।

বাসের ঝাঁকুনিতে ঘুম পাচ্ছিল প্রবোধের। জন্ম প্রেম স্নেহ বেঁচেথাকা মৃত্যু—কত কী মানুষের জন্যে বরাদ্দ হয়ে আছে পৃথিবীতে! কিন্তু কেন? কী লাভ, কী সুখ মানুষের? কে জানে কিসের নাম লাভ, কী সেই সুখ!

লালা মুছে সোজা হল সে। কী সব এলোমেলো ভাবছে! কন্ডাক্টর হাঁকছিল—রাণীচক বায়েনপাড়া! হঠাৎ মনে হল প্রবোধের, আরে, কী অবাক, তার নিজের তো কোন ছেলেপুলে নেই! বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেল। কবে হবে আর?...খুবই আচমকা এই অনুভব—এবং সে ধুড়মুড় করে উঠে বলল, এই রোক্‌কে নামব।

সে রাতে এখানেই নেমেছিল। যমুনা দাঁড়িয়েছিল ওই গাছটার পাশে। মধ্যরাতের শেষ বাস—সেই একই জায়গা একই সময়। বাসের আলোয় আজ কিছু দেখেনি প্রবোধ। অসংলগ্ন প্রলাপের বুদ্বুদ ফুটছিল মাথায়।

কয়েক পা অন্ধকারে এগিয়ে গাছটার কাছে যেতেই প্রবোধের গা কাঁপল। সেও কি সত্যর মত পাগল হয়ে যাচ্ছে? এখানে নেমে কী খুঁজতে যাচ্ছে সে?

দুপাশে হেমন্তরাত্রির কুয়াসায় ভরা মাঠ—অন্ধকার নীলাভ লাগে। শিশিরে ভিজে রয়েছে সবকিছু। আকাশভরা নক্ষত্র জ্বলছে। পায়ের পাশে সাপ চলে গেল সাঁৎ করে। ধানের জমি বা নয়ানজুলি থেকে জলঢোঁড়া সাপগুলো এখন উঠে আসে মসৃণ পথের আরামে। শামুক আসে। কাঁকড়া হাঁটে। তাই এদিকেওদিকে শেয়ালের গতিবিধি আছে। প্রবোধ এতদিন পরে দাদার জন্যে নিঃশব্দে কাঁদছিল। মজুমদার বংশ শেষ হয়ে গেল। আর কোন আশা নেই। দুলাল ডাক্তারের কী সাধ্য! যমুনার ছেলে তার কাছে আছে। বড় জোর আর দু-একটা দিন বাঁচবে। তারপর সব শেষ। বড় দেরী করে ফেলেছে প্রবোধ। এই অনুশোচনায় সে দাদার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করছিল। সেই সময় রাণীচকের ওদিকে তীব্র চিৎকার উঠেছে—ধর, ধর, মার, মার! ওই পালাচ্ছে, পালাচ্ছে!

শীতের প্রারম্ভে অভাবগ্রস্ত সৎ মানুষও অসৎ হয়ে ওঠে—প্রবোধ অনেক দেখেছে। অন্যের জমির পাকন্ত ধানের ডগা কেটে নেয় তারা। এ চুরি এক অসাধারণ চুরি। সম্ভবত তেমন কিছু ঘটেছে।

আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছিল। কিছু আলো দেখা যাচ্ছিল ইতস্তত। ক্রমশ বাজারের এদিকেও কোলাহল শোনা গেল। আলো দেখা গেল।

প্রবোধ দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে ততক্ষণে সারা রাণীচক তোলপাড় করে অন্ধকারে—মাঠে, চারপাশে, কাছে ও দূরে কান্না চিৎকার করছিল। ছোটাছুটি করছিল।

হাইওয়েতে খুব কাছেই একদল লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। টর্চের আলো এসে পড়ল প্রবোধের গায়ের ওপর। প্রবোধ গতিক দেখে চেঁচিয়ে উঠল—কী হয়েছে, কী হয়েছে?

কে ওটা? গোমস্তামশাই? এখানে কী করছেন গো?

ব্যাপার কী?

ওদের হাতে লাঠি সড়কি অস্ত্রশস্ত্র!... শুয়োর মারতে বেরিয়েছি।

ছুটে যেতে যেতে কে বলে গেল,-শুয়োর নয়, ক্ষ্যাপা ষাঁড়।

র কণ্ঠস্বর শুনল প্রবোধ, শালা-তি মিলে বেশ আছে হে নিরাপদ। খাতির করলাম সরকারী গোমস্তা

বোধ হনহনিয়ে বাজারের দিকে। প্রথমে নলিনীর আড়তে। নলিনী পায়চারি করছিল পথের ওপর। বন্দুক। প্রবোধকে দেখে সে ছুটে ...আপনি, আপনি কোত্থেকে প্রবোধদা?

রুদ্ধশ্বাসে প্রবোধ বলল, 'কী হয়েছে ?

নলিনী যা বলল, শুনে প্রবোধ স্তম্ভিত গেল। সন্ধ্যার আগে সত্য বাস থেকে। আড়তেও কিছুক্ষণ কাটিয়ে যায়। এইমাত্র, আধঘন্টা হবে বড় জোর, বাসে মোহিনীবাবুর মেয়ে আর তার ভাই বহরমপুর থেকে ফিরে এসেছিল। হিনীবাবুর বাড়ির এপাশে একটা পোড়ো গা আছে। সিংহবাহিনীর পুরনো দর আছে একপাশে। আগাছার জঙ্গল বড় বড় গাছে ভরা সেখানটা। শর্টকাটে ঢুকবে বলে ওরা সে পথেই যাচ্ছিল। গ আলো ছিল না। হঠাৎ সত্যচরণ ন থেকে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিয়ে যায় মন্দিরের পিছনে। টি সতুকে স্পষ্ট চিনেছে।...

তারপর ?

তারপর মেয়েটিকে প্রায় অজ্ঞান স্থায় পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লোক রয়েছিল, এই যা রক্ষে!

সবচেয়ে দুঃখের কথা, মোহিনী নীর দাদা। যে গাছে সতু আশ্রয় নিয়ে-তার গোড়ায় কোপ মেরে বসেছে! ন নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাকে বাঁচানোর মত কারুর নেই। প্রবোধ তো সামান্য ষ—তায় ভিন্নগ্রামের বাসিন্দা।

প্রবোধ মেয়েটিকে বাসের স্মৃতিতে জে দেখবার নিষ্ফল চেষ্টা করে আস্তে স্ত সরে গেল। হাঁটিতে লাগল। আল-বাড়ি ফিরছিল সে। বেশ কয়েক মাইল আলের ওপর উপচে পড়া ধানের। শিশিরে চকচক করছে। পাম্পসু যাচ্ছিল জেনে সে খুলে হাতে রাখল। য়ে হাঁটু অবদি কাপড় তুলল। ধানের ঘাসের ফুল খড়-কুটোয় ভরা ভারী দুটো থপথপ করে সে বাড়ি ফিরছিল। নে ক্রমশ সেই প্রচণ্ড আগ্রাসী কোলাহল ট হয়ে উঠেছিল। আজ সারারাত কার মাঠে-বিলে-জঙ্গলে ওরা একটা নায়ার খুঁজে বেড়াবে। তারপর তাকে দিক থেকে অস্ত্রবিদ্ধ করে ধানের জমির র টেনে এনে নলিনের আড়তের সামনে হাইওয়েতে ফেলে রাখবে। সকালে পৃথিবীর মানুষ ভেঙে পড়বে সেই জানোয়ারটা দেখতে।

সুভদ্রার চোখে ঘুম নেই। দুটো রাত দিন চলে গেল। প্রবোধ বাড়ি রনি। কী এমন জরুরী কাজে আটক ছে সে?

দরজা খুলেই চমকে উঠে প্রবোধের পায়ে হাত দিয়েছে সে।...এ কি! জ্বর, এত জ্বর তোমার! আর এই জ্বর গায়ে রাত্রিবেলা তিন ক্রোশ বন-বাদাড় ভেঙে হেঁটে এলে! নাঃ, বিষয়-বিষয় করে পাগল হয়ে যাবে তুমি!

কপালে করাঘাত করে সুভদ্রা বলল, কেন অত ধনের নেশা তোমার? কে খাবে?

প্রবোধ খাটে গড়িয়ে পড়ে অতি কষ্টে বলল, ভীষণ তেষ্টা। জল দাও।

॥ ৪৩ ॥

শীতের সুরুতেই লীলা প্রেসের বরাত ফিরে যাবে মনে হচ্ছিল। সেটা অবশ্য রমারই কৃতিত্ব বলতে হয়। আশাতীত পরিমান সরকারী কাজের অর্ডার সংগ্রহ করেছে সে। আপিসের হেডবাবুদের সঙ্গে ভীষণ জমিয়ে নিয়েছে বোঝা যায়— তা না হলে ওই পর্বতপ্রমাণ ভোটারলিস্ট আর রকমারি ফরমের কাঁপতে লীলা প্রেসের সংকীর্ণ পরিসর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠবে কেন? ওদিকের খগেন-কানাইদের নাভিশ্বাস। জনা চার নতুন কম্পোজিটরও রাখতে হল। সুখেনের ঘরটাতে আরেক সেট কম্পোজিং আসবাব—লীলা আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে-ছিল কিনা খগেন-কানাই বা রমা জানে না। বরং তার মুখখানা আরো নির্বিকার দেখাচ্ছিল। যেন সীসের হরফে ছাপানো পরিষ্কার একটা লাইন। অক্লেশে পড়া যায়। আর যার একটি মাত্রই অর্থ হয়। লীলা জেদী, একরোখা—একটা অন্ধ শক্তির মত বিপজ্জনক।

তাই বাসিনীর মনে গুরুতর ভয়। তার কাছে ক্রমশ নীলেরাণী পটের ছবি হয়ে গেল! রঙ দিয়ে 'র্মাসিনে' ছাপানো পট। চক্ষু জুড়োয়, মন ভরে না। তাই বাসিনীর ইচ্ছে, শীত এবার মারাত্মক রকমের বেশি হবে এবং বাসিনী মরে যাবে।

মরে যাবে, কারণ পৃথিবী ক্রমশ পাপে ভরে উঠছে। আর সেই পাপের কেন্দ্র তার খুব কাছেই। আগে ছিল সুখেনবাবু, এখন জুটেছে আরেক ছোকরা—রমার ভাই অহীন। সঙ্গে ছায়ার মত বেঁধেছে লীলা-রাণী। আ মরণ! বয়সের বাছ-বিচার নেই রে পোড়ারমুখী! বাসিনী কপালে করাঘাত করে। ঘন্টাকে সামনে পেলে লীলার ঘরের দিকে আঙুল তুলে ফিসফিসিয়ে বলে, কী করছে রে সব? নাকি তাসপাশা খেলছে! ঘন্টা রেগে যায়।......বয়স হয়ে তোমের চোখ হয়েছে নাকি? সাধ থাকে, তো দেখে এসো না। খেলছে লুডো!

সন্ধ্যা-সকাল অহীনের আসার অন্য কোন অর্থ খুঁজে পায় না বাসিনী। তেমনি পায় না রমাও। সময়-সময় তারও খুব খারাপ লাগে ব্যাপারটা। মুখ ফুটে বলতে পারে না অহীনকে—বলার সাহস তার নেই। এমন কি মায়ের কানেও কথাটা সে কদাপি তুলতে পারবে না। তার ধারণা, লীলা আর অহীন সম্ভবত চুটিয়ে প্রেম চালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নিজের ভাই বলেই এটা খারাপ লাগে।

অথচ লীলা প্রেস রমাকে শুধু কাজের নয়, অন্য কী গভীর বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে ততদিনে। নিজের জীবনকে সে যেন ক্রমশ প্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। লীলা তার ওপর আগের মত কর্ত্রীপনা দেখায় না। রমার অধিকার বেড়েছে। সত্যি বলতে কী, সুখেনের জায়গা সেই দখল করেছে অবশেষে। তাই পয়সা-কড়িও বেশ পাচ্ছে আজকাল।

একদিন এ পাড়ার দিকে এসে বাসিনীকে চুপিচুপি জিগ্যেসপত্তর করেছিল রমা। লীলা তখন প্রেসে। ঘন্টাও সেখানে হুকুমবরদার হাজির যথারীতি। রমা এটা-ওটা নানান কথার পর অহীনের প্রসঙ্গ তুলেছিল। অহীন কী করে এখানে?

ব্যস! বাসিনীর ততদিনের ভরাকুম্ভে যেন ঘা লেগে সব গলগল করে বেরিয়ে গেল। অহীনের সর্বনাশ করবে ওই সর্বনাশী। সত্যচরণের করেছে, সুখেনবাবুর করেছে, এবার অহীনের পালা। ও যে আগুনের ঢেলা—যার গায়ে লাগবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তার বিনাশ করবে। সাবধান বা, সাবধান। তারপর...রাক্ষসীর মত মুখভঙ্গী করে বাসিনী বলেছিল, এই যে তুমি... তুমি মালক্ষ্মী, এমন সোন্দর 'ছিক্ষিত' বড়-

ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকের মেয়ে, তোমারও...হুঁ-হুঁ...এটা আমি লিখে দোব, সাবধান বাছা...তবে বলবে, তুমি বাসিনী, তুমি কেন এখানে পড়ে রয়েছ?......তাহলে শোন খাঁটি কথা—হুপপুরে যাবো কোথা মা? পাজোড়া রাখব কোথায় বলো? সেই যে সাত বছরের মা-বাবাখাকী মেয়েকে কুমুদ খেলায় সাথি করেছিল, সেই তো পেথম সর্বনাশ গা! মাটিছাড়া পা দুখানা কুমুদের বাড়ি মাটি পেল। কিন্তু কুমুদের মেয়ে সে মাটি রাখলে না মা, বানের জলে ধুয়ে দিলে! আমি তাহলে যাই কোথা বলো!...তবে কাল আমার দয়াল হয়ে আসছেন—এ শীতেই আমি মরব, দেখে নিও...আর বাঁচব না!

কিছুটা হেসে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে রমা ফিরে এসেছিল। বাসিনীকে এসব জিগ্যেসপত্তর করল, লীলার কানে তুলে দেবে না তো সে? সপ্তাহ কেটে গেলেও লীলার ব্যবহার বদলায় নি দেখে সে আশ্বস্ত হয়েছিল। এবার ভেবেছিল, কোন ছলে অহীনকে কিছু বলবে এ প্রসঙ্গে। সাহসের অভাব তো আছেই—কিন্তু ওদিকে শোভার ট্রেনিং এখনও শেষ হয় নি, সংসারের সব খরচ এখন রমাই জোগাতে পারছে—যার ফলে বাড়িতে কিঞ্চিৎ প্রতাপও বেড়েছে রমার। অহীন যখন-তখন হাত পাতলে পয়সা পায়। তাই অহীনের পক্ষে হয়ত দিদিকে পাল্টা আঘাত করা সম্ভব না হতেও পারে।

বলবে-বলবে করে দিন কেটে যাচ্ছিল। লীলা সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে যায়।

রমাকে রাত নটা অব্দি থাকতেই হয়। সব উদ্যম যেন রমার ওপর রেখে লীলা নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। রমা আগে ভাবত, আহা বেচারী! জীবনে এত অশান্তির আগুন ওর! সে সমবেদনা ক্রমশ অহীনের ব্যাপারে উবে গেছে। এখন সকাল-সকাল লীলার বাড়ি ফেরার একটি মাত্র অর্থ আছে। তা হচ্ছে, অহীনের সঙ্গে দুপুর রাত্তির অব্দি আড্ডা দেওয়া। রমা বাড়ি ফিরেই তার খোঁজ করে। অহীন নেই। জগদীশের আড্ডা এখন কিছুদিনের মত ফাঁকা। এবং সে জেগে থাকে। অহীনের সাড়া পেলেই সে বলে, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ! ফের আজেবাজে জায়গায় যাওয়া সুরু করেছিস। একবার অনেক হ্যাঙ্গামা করে নিষ্কৃতি পেলি...অহীন শুধু হাসে। দিদিদের ওপর সে কোনদিনই রাগ দেখায় না। ছোট অনু অবশ্যি দাদাকে পরোয়া করে না কোনদিনই। সে একটু ঠোঁট কাটা মেয়ে। বলে, যেন পরমহংস এলেন। মুখে অনবদ্য হাসিটি...ইস! অহীন তবু হাসে। তারপর রমার কাছে এসে চাপা গলায় বলে, তোর বসের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। বাপস, তোর চাকরী বহাল রাখতে প্রতিদিন এক গ্যালন করে তেল খরচা হয়ে যাচ্ছে। সকালে পাঁচটা টাকা দিস তো। দিবি?

ভঙ্গী দেখে রমাকে হাসতে হয়। সকালে টাকাও দিতে হয়। দিয়ে বলে, তোকে যে বাড়ি দেখতে বলেছিলাম, দেখেছিস!

কিসের?

রমা অবাক হয়। কিসের মানে? প্রেসের।

অহীন মাথা চুলকে বলে, ওঃ, তাই তো! তোর বসও বলছিল আজ। দেখব'খন।

রমা গজগজ করে, শেষ অব্দি আমাকেই লাগতে হবে। একদম সময় পাইনে, যা ঝামেলা পড়ছে। এদিকে প্রেসে পা রাখবার জায়গা নেই।

অহীন সকৌতুকে বলে, লীলা প্রেসের সাইনবোর্ড বদলাবে মনে হচ্ছে।

তার মানে?

রমা প্রেস হবে, এই আর কী!

রমা আহত হয়। বলে, বেশ, ছেড়ে দেব প্রেসের চাকরী। তুই সংসারের দায়িত্ব নিবি।

ঝগড়ার আমেজ লক্ষ্য করে মা উঠে আসেন।......

কদিন পরেই অহীন খবর আনল বাড়ির। সদর রাস্তার ধারেই মস্তো বাড়ি। নীচে একটা প্রকাণ্ড হলঘর। ওপরে চারটে কামরা। ওপরে-নীচে লম্বা বারান্দা। প্রেসের পক্ষে আদর্শ বাড়ি। মামলা চলছিল শরিকে-শরিকে। সম্প্রতি একপক্ষ ডিক্রি পেয়েছে। তবে হলঘরে একটা পরিবার বাস করে—তাদের উচ্ছেদ করতে হবে নিজ দায়িত্বে। তা না হলে ওপরের ঘরগুলোই শুধু পাওয়া যাবে। সেলামীর রেওয়াজ আজকাল মফস্বলেও চালু হয়েছে। তবে এ বাড়ির মালিক খুব জানাশোনা লোক—সেলামী রেহাই পাবার চান্স আছে। কিন্তু করেক বছর ধরে মামলা চলায় অনেক খরচা হয়ে গেছে ভদ্রলোকের—কিছু বিবেচনা করতে হবে বৈকি।

রমা বলল, ঠিক আছে। লীলাদিকে বলব সকালে।

অহীন জানাল, আমি বলেছি। উনি রাজী। এইমাত্র আসছি ওখান থেকে।

রমা বিরক্ত হয়ে বলল, তুই আগে ওকে বলতে গেলি কেন? সবতাতে ফোঁপরদালালী তোর।

তার মানে? অহীন অবাক।...বাড়ি নেবে, তাঁকে বলায় কী অপরাধ হয়েছে বাবা!...পরক্ষণেই মুখ টিপে সে হাসল।...ও আই সী! বাঃ চমৎকার! এতকাল সুখেনদার সঙ্গে থেকেও লাইন পাই নি, তুই কেমন করে পেলি রে?

বাজে বকিস নে। তুই এসব বুঝিস কী?

অহীন আঙুল তুলে কপট গাম্ভীর্যে

াইণ্ড দ্যাট, চাকরীটা আমিই জুটিয়ে কিন্তু।

া কিনে নিয়েছিস! বলে রমা চুপ ল।

হীন বলল, ঠিক আছে বাবা। উ-কামিয়ে দে না, আমি খাগড়া দেব ভবে দেখিস, তোর বসটি বড় স!

নু বাজল, কী হচ্ছে সব রাতদুপুরে। একজামিনেশন সামনে। ডিসটার্ব না।

হীন অনুর চিবুকে ঠোনা মেরে লায় বলল, জানিস অনু, আমাদের এবার ভিলেনের ভূমিকায় নামছে!

দিন সকালে স্বয়ং লীলাই এখানে। আদর-অভ্যর্থনার ঘটা পড়ে গেল ড। রমার মা স্বভাবত গম্ভীর মহিলা। তিনিও অনন্তব কথা থাকলেন। শুধু চা খেয়েই রমাকে লীলা বেরোল। অহীন তখনও ঘুম ওঠেনি। লীলা যাবার মুখে ওর ঘরে উঁকি মেরে গেল। এইতে রমার মন ণের জন্যে কটু হয়ে গেছে।

চার্য্যিপাড়ার শেষদিকে ফেল্টুবাবুর সেকেলে ঢঙের বিরাট দোতালা। প্রকাণ্ড অ্যাঙ্গিনা, ঠাকুরবাড়ি—ছক-ঘর চারপাশে। বড় বড় থাম। সবখানে স্যাঁতসেঁতে জীর্ণতার ভাব। কাটা শ্যাওলা আর আগাছা গজিয়েছে। বা বটের চারা। অজস্র পায়রার কড়িকাঠে কিংবা ভেন্টিলেটারে। খড়খড়ি দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে বাইরের। অথচ তার মধ্যেই বাস করছে টি পরিবার। ওপরে-নীচে পায়রাদের সংখ্যা মানুষ গিজগিজ করছে খোপে-।

টের সামনে রিকসো দাঁড় করিয়ে ওরা নামল। সামনে একদঙ্গল ছেলে-ভীড়। রোগা হতশ্রী আধ-ন্যাংটো য়েগুলো চেঁচামেচি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে ওদের লক্ষ্য করছিল। ভিতরটা অপরিচ্ছন্ন তেমনি অন্ধকার লাগে। একটু ইতস্তত করে রমার দিকে। রমা একটু হেসে বলল, ভিতরে না খবর দেব?

লীলা বলল, থাক। খবর দাও।

মা ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে কিছু আগেই এক বর্ষীয়সী মহিলা থেকে হাঁটুতে হাত রেখে নীচে বলে উঠলেন, ফেল্টুর কাছে এসেছ পরক্ষণে মুখ ফিরিয়ে দোতলা লক্ষ্য চেঁচালেন, অ ফেল্টু, এই দ্যাখ কারা রে!

তারপর প্রশ্নবাণ: কী উদ্দেশ্য? থাকা হয়? ফেল্টুর কাছে কেন, আমাকে বললেই তো হয়।...হব না অ, তা তেমন কথা হলে ফেল্টুর গিয়ে বললেও চলত।

লীলা বিরক্ত হয়ে বলল, রমা, পরে খন।

ভদ্রমহিলা বললেন, এখানে আসবার দরকার কী, জলার দোকানে ওর দেখা পাবে। ও এখন ঘুমুচ্ছে। দশটার আগে উঠবে না।

ততক্ষণে আরও একদল নানা রকমের মেয়ে উঁচু বারান্দায় ভিড় জমিয়েছে। ওদের চাহনিগুলো বিঁধছিল গায়ে। রমাও বলল, তাই চলুন। বরং অহীনকে পাঠিয়ে দেব।

রিকসোর দিকে পা বাড়াতেই পিছনে ফেল্টুবাবুর চটির শব্দ আর অমায়িক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো রমা, হ্যালো ম্যাডাম।

দুজনে ফিরল।

ফেল্টুবাবু বাড়ির দিকে দু'হাত প্রসারিত করে বলল, চলে যাচ্ছেন কী! আপনারা আসছেন বলে আজ ভোর-ভোর শয্যাত্যাগ করেছি। অহীনের সঙ্গে সেই-রকমই কথা ছিল। আসুন, আসুন।

চলতে-চলতে ফের ফেল্টুবাবু বলল, অন্য কেউ হলে পাত্তাই দিতুম না। স্বয়ং আপনি। ওঃ, সুখোটা থাকতে কতদিন মনে লোভ হয়েছে—একবার আলাপ হচ্ছে না কেন? কী সৌভাগ্য দেখুন তো।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার সময় নীচের ভিড় থেকে একটা মন্তব্য কানে এল লীলার।...বাবা আসুন, তারপর মজা দেখাচ্ছি। এ-বাড়িটাকেও জগার আড্ডা ভেবেছে নাকি?

চকিতে মুখ ফেরাল লীলা। যে বলল, তার মুখটা আশ্চর্য সুন্দর। বয়সে লীলার চেয়ে কিছু ছোটই হবে। চোখে চোখ পড়লে মুখ ফেরাল সে।

রমাও শুনেছিল। লীলার হাতে আঙুলের স্পর্শ দিয়ে চাপা গলায় সে বলল, ছেড়ে দিন।

নীচে ফের মন্তব্য : মামলা জিতে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। পার্টিশান দেবার কথা তো ওরই, আমরা দেব না। পার্টিশান দিক, দিয়ে যা খুসি করুক বাড়ির মধ্যে।

অপমানবোধে অস্থির হয়ে লীলা ওপরের চওড়া বারান্দায় পৌঁছল। রমা আগে, তার আগে ফেল্টুবাবু। কোণের ঘরের দরজায় থেমে ফের হাতদুটো সামনে ছড়িয়ে ফেল্টুবাবু বলল, আসুন।

রঙ যখন টাটকা, তখন তার যে ঔজ্জ্বল্য বা রঙ, এ-ঘরের সবকিছু হয়ত একদিন তেমনি ছিল। রঙ পুরনো হলে যেমন ম্যাটমেটে আর কালচে হয়ে ওঠে, এখন অনেকটা সেইরকম দশা হয়েছে। বেশ বড় ঘর। প্রকাণ্ড পালঙ্ক। একটা ভাঙা-চোরা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে মাঝখানের ছাদে। মেহগিনি রঙের কয়েকটি দামী চেয়ার—সবগুলোর গদি শতছিন্ন। একটা আলমারী—খানকয় বাঁধানো ইংরিজী বই, শতবর্ষের প্রাচীন। বাকিটা শূন্য। মস্তো পাথরের টেবিলে একরাশ ক্রেডিট পুরনো কাগজপত্র আর ওষুধের শিশি। পালঙ্কের নীচে আর কোণ জুড়ে পুটিকয় এলুমিনিয়ম ডেকচি, কুকার, মায় বাটনাবাটা শিলনোড়া। মোজেককরা মেঝে জলে থপথপে। সেই জল মুছছিল এক মধ্যবয়সী মেয়ে—সম্ভবত ঝি। এদের ঢুকতে দেখে সে বেরিয়ে গেল। ফেল্টুবাবু বলল, সতী, কুকারটা বারান্দায় নিয়ে যা। চায়ের জল চাপিয়ে দে। নাকি কফি খাবেন?

লীলা মাথা নাড়ল। রমা বলল, থাক।

সে কি! ফেল্টুবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠল।...কী সৌভাগ্য আমার। স্বয়ং হিরোইন আমার ঘরে...বলেই সে জিভ কাটল।...সরি ম্যাডাম। খুব আপত্তিকর কথাবার্তা বলছি বেশ। ক্ষমা করবেন। মাতাল মানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলি। তবে আপনাদের অমর্যাদা করব না, আমি যতই বখে যাই, মেয়েদের প্রতি এখনও ভীষণ শ্রদ্ধা আছে। ওঁরা কি না স্বয়ং প্রকৃতিঠাকুরানী। কথাটা কে বলেছিল জানেন? পরমহংস-দেব।...এই বলে যুক্তকর কপালে ঠেকাল সে। পুনশ্চ বলল, আমি যে সুরা পান করি, তাও নাকি ওনার শক্তিকল। বড় অদ্ভুত, তাই না?

হাড়গোড়ার কামড়ে লীলা উসখুস করছিল। রমাটা কী নির্বিকার! লীলার অবাক লাগল। রক্তের নাকি তেজোশক্তি আছে। রমার রক্ত তেজো বুঝত। নাকি, দেখতে-দেখতে এর ভাড়াভাড়ি মুছিয়ে গেল, চামড়াও পুরু হয়ে গেল, হাড়গোড়ার দাঁত বসে না।

ফেল্টুবাবুর চোখ সতর্ক হিল সম্ভবত। বলল, অসুবিধে হচ্ছে বুঝতেই হবেই। বরং আপনি খাটে বসুন পা ঝুলিয়ে। ডোণ্ট মাইণ্ড, খাট আমার খুব পবিত্রই থাকে। পৈতৃক খাট কিনা—গঙ্গা-জলে ধোওয়া। তবে ওই কোণার টেবিল-চেয়ারটার দিকে যেতে বলবো না। ওখানে বসেই আমার মাতালামি হয় দুবেলা। হ্যাঁ, খাটেই বসুন বরং। আপনাকে ওখানেই মানায়। আঃ, সেই যে রূপকথায় আছে...কী আছে যেন?

হাসতে লাগল ফেল্টুবাবু। পাঞ্জাবীর হাতাটা গুটিয়ে নিল।

ওদিকে বাইরে সতী নামী মেয়েটি কুকার জেলেছে। আড়চোখে এদের লক্ষ্য করছে। সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রীতিকর

[illegible] লীলার কাছে। রমা কিন্তু [illegible]।

লীলা ওকে লক্ষ্য করে মৃদুকণ্ঠে [illegible], কথা বল। উঠব।

ফেল্টুবাবু বাইরে গেলে রমা বলল, সেলামীর কথাটা উঠলে আমি ম্যানেজ করব। আপনি আবার তাড়াতাড়ি ঝোঁকের মুখে রাজী হয়ে বসবেন না যেন। ফেল্টু-বাবুকে আমি ভালোই জানি। দরকার হলে [illegible] আসতে হবে। অমন বাড়ি পাওয়া যাবে না।

লীলা বলল, আসতে হয়, তুমি আসবে। আমি না। এরা কীরকম যেন।

সব শরিকের ঝামেলা। এমনি হয়। রমা মন্তব্য করল।

হঠাৎ মুখ একটু ঝুঁকিয়ে চাপাস্বরে লীলা বলল, আচ্ছা রমা, বাড়িটা উনি বেচে দেবেন না?

রমা অবাক হল।...একেবারে কিনে নেবেন?

ধরো, ভাই যদি...

দাম কিন্তু অনেক চাইবে। অতবড় বাড়ি। পুরনো হলেও এখনও মজবুত আছে। দেখেননি এখনও। ফেরার পথে দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

লীলা মুখ ফিরিয়ে বলল, দেখার দরকার কী। অহীন তো সব জানে।

রমা বলল, পঞ্চাশ-ষাট হাজার চেয়ে বসবে, দেখবেন।

অত বেশি?

রমা অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, তার চেয়ে ভাড়ায় পাওয়াতে ক্ষতি কিসের! আপনি কেনার কথা তুলবেন না যেন।

লীলা চিন্তিতমুখে চুপ করল। সত্যি সত্যি কি বাড়িটা কিনতে পারবে সে? রূপপুরে আর কয়েক বিঘে মাত্র ধানী জমি আছে। সজল সেটা দেখাশোনা করে। ধান নগদ দামে বেচে টাকা দিয়ে যাবার কথা। সে আর কত হবে! অবশ্য, একটা জলার কিছু অংশের মালিকানার দরুন সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। জলাটা এখন খাল। এই টাকাটার ব্যাপারে তদ্বির করার দরকার আছে। হয়ে ওঠে না। আর আছে মায়ের একরাশ অলঙ্কার। সব বেচেছে, ওগুলো বেচতে হাত ওঠেনি তার। এইগুলো সব মিলিয়ে বেচলে বাড়িটা কেনা হয়ত অসম্ভব হয় না। কিন্তু কেন? প্রেসের জন্যে সত্যি সত্যি কোন নেশা ছিল তার?

এখন ক্রমশ সব বিস্বাদ লাগে। সবই অর্থহীন। চারপাশে একটা বিকট শূন্যতা হাঁ করে আছে। মাঝে মাঝে সেই মুখ-ব্যাদান তাকে ভীত করে তোলে। অব-হেলায় সর্বকিছু ভাঙতে ভাঙতে এ কি করে ফেলছে সে?

ফেল্টুবাবু চায়ের কাপ হাতে এগিয়ে এলেন।...স্রেফ চা। আপাতত আর কিসসু দিতে পারছি না, দুঃখিত। একা মানুষ। কোনরকমে চালিয়ে নিচ্ছি এমনি করে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চা খেতে হল। লীলা বলল, বাড়ির ব্যাপারে কথা বলতে এসে ছিলাম।

খাটের নীচে থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে সামনে বসল ফেল্টুবাবু। বলল, হ্যাঁ, এবার একটু সিরিয়সলি আলোচনা করা যাক। দেখুন, আপনার প্রেসের পক্ষে ভারি উপযুক্ত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু মুশকিল আছে।

রমা প্রশ্ন করল, কী মুশকিল?

নীচের হলটাই আপনাদের দরকার হবে। অথচ ওখানে দাদা একদল ভাড়াটে ঢুকিয়ে রেখেছেন। ওদের সরানো এক ঝামেলা আছে।

সে আর ঝামেলা কী? আপনার আড্ডার লোকদের বললেই হবে। তাছাড়া, অহীনকেও বলব।...রমা হেসে উঠল।

লীলা একটু অবাক হয়ে রমার দিকে তাকাল। বলল, তা কেন? ওদের ওপরে ঘর দিলেই চলবে।

ফেল্টুবাবু হাসল।...সে আপনার দয়া। কিন্তু সব ভাড়া আপনাকেই গুনতে হবে মাইন্ড দ্যাট।

লীলা বলল, ওরা ভাড়া দেয় না:

কী দেয় না-দেয়, সে দাদাই জানত অ্যাদ্দিন। আমি এখনও ওদিকে পা বাড়াইনি। তবে যা বুঝেছি, খুব বেশি একটা নয়। ও তো দাদা জেদ করে দখল রাখবার জন্যে বসিয়েছিলো। বাবার আমলে ওখানে গানের আখড়া বসত দেখেছি। সে স্বর্গরাজ্যের কথা আর বলে লাভ নেই।... ফেল্টুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রমা বলল, সে দেখা যাবে। এখন কত কী চান-টান বলুন, ফেল্টুদা।

ফেল্টুবাবু ফের জিভ কেটে বলল, ফেল্টুদা নামেই সবাই ডাকে ম্যাডাম। আমার আসল নাম কিন্তু ইন্দ্রমোহন। ইন্দ্রমোহন ব্যানার্জী।

লীলা বলল, জানি।

জানেন? কে বলল? সুখেন বুঝি?

না, অহীন।

অহীন একটা আশ্চর্য ছেলে। ভেরি গুড বয়।

রমা বলল, বলুন ফেল্টুদা!

কী বলব?

বাড়ির কথা।

[illegible]

ফেল্টুবাবু [illegible] বলল, [illegible] তোমার [illegible] কিছু না। ওঁর কাছে [illegible] একটা জীবন-মরণ [illegible] স্কাউন্ড্রেলটা এমনি করে কতজনের সর্বনাশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এও জেনে রেখো রমা, যেখানেই থাক, [illegible] হাত থেকে ওর বাঁচোয়া নেই। [illegible] দুজনকে। (লীলার উদ্দেশ্যে) আশ্চর্য, [illegible] ম্যাডাম, হারামজাদা আপনার মত [illegible] এমন অবহেলা করল, ওর......

লীলা উঠে দাঁড়াল।

ফেল্টুবাবু দমে গিয়ে বলল, উঠ[illegible] সে কি! আমার যে অনেক বলবার [illegible] আছে।

রমা অধীরকণ্ঠে বলল, বাড়ির [illegible] আগে হয়ে যাক ফেল্টুদা।

বাড়ি? সে কি হতে আটকা[illegible] ফেল্টুবাবু বলল।...হয়েই আছে [illegible] স্বয়ং লীলাদেবী নিচ্ছেন, না করার [illegible] আছে?

কত কী লাগবে, সেটা বলুন।

কিস্যু লাগবে না। আজই প্রেস [illegible] নিয়ে এসো তোমরা।

তার মানে? মাসে কত [illegible] বলবেন না?

কিস্যু লাগবে না। ও আমার [illegible] পাওয়া ধন। ফেল্টুবাবু অমায়িক [illegible] হাসল।

বারে! তাই হয় নাকি? এ তামা[illegible] কথা নয় ফেল্টুদা।

আমি কি তামাসা করছি নাকি? [illegible] বিরাট সব সম্পত্তি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে[illegible] এতো একরত্তি। যাও, প্রেস এনে ফেলো।

রমা বিরক্তমুখে বলল, কাগজে-কল[illegible] সব সেটল্ করতে হবে তো। এমনি [illegible] যায় নাকি?

ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি।

এবার লীলা হাসিমুখে বলল, কী লি[illegible] দেবেন?

লিখে দেব, শ্রীমতী লীলা [illegible] যাবজ্জীবন প্রেস করিবেক, এই [illegible] মালিকানা তাঁহার উপর বর্তিয়া থাকি[illegible]

পাগল না কী! লীলা দম করে [illegible] বসল, বরং এক কাজ করুন না। ওটা [illegible] দিন। কত দাম লাগবে?

ফেল্টুবাবু আহত কণ্ঠে বলল, [illegible] দেব? কেন? এমনি দিলে নেবেন না?

বেশ বোঝা যায়, সকাল থেকে [illegible] গিলে মেজাজ দরিয়া হয়ে রয়েছে। [illegible] জাতমাতাল, পা টলে না বা কণ্ঠস্বর [illegible] যায় না। অহীনকেই পাঠাতে হবে [illegible] এ মাতাল সামলানো লীলার পক্ষে [illegible] নয়।

রমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না, [illegible] মিছেমিছি সময় কাটিয়ে দিলেন ফেল্টু[illegible] আমাদের সময়ের তো দাম আছে। [illegible] কত জায়গায় সব কাজ আছে। বরং [illegible] আসব, এখন যাই। আর...একটু [illegible]

ফিসফিস করে সে বলল, টাকা
গে? লীলা মাথা নাড়ল। তারপর
লে কয়েকটা দশ টাকার নোট বের
সে রমার ইঙ্গিতটা বুঝেছিল।
া দেখে ফেল্টুবাবু বিনয়ে বলে
টাকা দিচ্ছেন?
। বলল, হ্যাঁ। বায়না করে গেলাম।
ন, ভাড়া—লীজ দিতে রাজী থাকলে
দবেন, নয়ত বেচে......
গে মুখে ফেল্টুবাবু কথা কাড়ল,
বে? তাহলে তো উকিলবাবুর কাছে
করতে হয়। জানেন, এই মামলাপত্র
তিয়ে দেবার পেছনে তিনিই আছেন।
জিগ্যেস না করে কি কিছু করা

সি চেপে লীলা বলল, তাই নাকি?
উকিল বলুন তো?
নন নাকি? তা চিনবেন। আপনিও
নেছি, ও লাইনে অনেক হেঁটেছেন।
উকিলবাবু বেশ নামকরা লোক।
ভট্টাচায্যি। চেনেন? ওঁর জামাইও
র নামকরা ব্যারিস্টার। এক মেয়ে
এক মেয়ে পাইলট। উড়ো জাহাজ
বাপ্‌স্‌!
মোট মুখে লীলা মাথা নাড়ল।
বলল, কারুর কাছে যেতে হবে না।
াম দেখিনি এখনও। যাবার পথে
াচ্ছি। বিকেলে অহীনকে পাঠাবো
র কাছে।
ল্টুবাবুও উঠল হন্তদন্ত।...ঠিক
চলুন, আমিও সঙ্গে যাই। ভেতরের
াও দেখবেন।
নজনে নামবার পথে ফের সেই
লো ভীড় দেখতে পেল। ফের
ম মন্তব্য পিছনে। রিকশোওলার কথা
ড়ল এতক্ষণে। রমা বলল, ওকে বিদেয়
দই। লীলা মাথা নাড়ল।
রা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছে
। সারাপথ অসংলগ্ন কথাবার্তা
া ফেল্টুবাবু। কিছু সুখেনের, কিছু
। বড় একা, কিস্যু ভাল্লাগে না। চুলে
রে এলে পুরুষমানুষের জীবনে কী
াকি থাকে। বিয়ে-টিয়ে করতে পারলে
য় না। কিন্তু এ বয়সে সে আশাও
য়। জগার আড্ডা ভেঙে আর ওঠাবসার
নেই। শহরটাও যেন শ্মশান করে
গেল সুখেনটা। বন্ধুবান্ধব বলতে
রাই টিকে ছিল পরিশেষে। কে
গা ঢাকা দিল।
....বাড়ি যথোপযুক্ত। দেখে শুনে
জেদ চেপে গেছে মাথায়। রমার
মানতে রাজী নয় সে। মাসে-মাসে
গোনার চেয়ে কেনাই ভালো। এখন
াবুকে শঙ্কর ভটচায্যির কাছে
দেওয়া ঠিক হবে না। তার জন্যে
ক পিছনে লাগিয়ে দিতে হবে।
বাড়তি টাকা খসবে, খসুক।
ক বশ মানাতে দেরী হবে না।
াতের দিন। ইতিমধ্যেই দুপুর
ল। ফেল্টুবাবুর কানে রমা শেখ-
মত মন্ত্র শুনিয়ে বিদায় নিল।
বাড়ি। তবে নগদ টাকা একসঙ্গে

অনেক টাকা ফেল্টুদা ওই পায়রার খোপ ছেড়ে নির্বিঘ্নে কোথাও সুন্দর একটা বাড়ি করে নিতে পারবেন। একা মানুষ। তবে এইরকম বাড়ি করে ফেললে বিয়ে করতেই বা দোষ কী? নতুন বাড়ি, নতুন বৌ —একটা টুকটুকে অসাধারণ রূপসী মেয়ে। জুটবে? নিশ্চয় জুটবে। ফেল্টুদার চেহারা এখনও রাজপুত্রের মত। একটুও টসকায়নি।

কিন্তু ফেল্টুবাবুকে সঙ্গ ছাড়াতে বেশ খানিকটা সময় গেল। পথে দস্তুরমত সীন ক্রিয়েট হবার দাখিল। তবে লোকটা ভালো। অভদ্রতা করছে না। দুজনে ওকে ছেড়ে আসবার পর প্রাণখুলে একচোট হেসে নিল। তারপর লীলা বলল, আমি এখন বাড়ির দিকে যাব। তুমি?

রমা ঘড়ি দেখে বলল, প্রেসে। এতক্ষণ কী সব হচ্ছে কে জানে! কানাইটাকে একেবারে বিশ্বাস হয় না। টাইপ চুরি করার বদনাম আছে ওর। আচ্ছা, চলি।

স্নান-খাওয়া হয়নি যে তোমার!

স্নান করব না। শীত করছে। ওখানেই কিছু খেয়ে নেব'খন।

নাঃ। বাড়ি থেকে ফিরে এসো। অত কাজ-কাজ করে শরীর নষ্ট করতে আমি বলিনি।

শাসন-অনুযোগ না মেনে রমা হাঁটতে থাকল হন্তদন্ত হয়ে। লীলা কিছুক্ষণ ওর চলে যাওয়াটা দেখল। রমাই প্রেস চালাচ্ছে আসলে। চালাক্‌। বড় ক্লান্তি লীলার। কিছু ভালো লাগে না। রমাকে না পেলে কবে সব ভাসিয়ে দিত এতদিনে।

একসময় একটা রিকশো ডেকে বাড়ির পথে চলল সে। বাড়িটা কিনে নেওয়াই ঠিক হবে। নগদ টাকা আর অলঙ্কার একই কথা। চুরি-চামারির ভয় আছে। বাড়ি তো আর চুরি যাচ্ছে না। কিন্তু যদি সাধের অতীত দাম চেয়ে বসেন ফেল্টুবাবু।

না, তা চাইবে না। মাতাল মানুষ। বড় বংশের লোকগুলোর মন এমনি হওয়া উচিত। সত্যি, বড় অদ্ভুত লোকটা। সব-কিছুই ছিল একদিন, আজও অনেকখানি আছে—অথচ এমনকিছু একটা নেই—যা থাকলে ও অন্যমানুষের মত স্বাভাবিক হতে পারত। কারুর হাসির পাত্র হত না। কেমন একটা মৃদু মমতায় লীলার মনটা কিয়ৎক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকল। এমন সরল মানুষকে বড় সহজে ঠকানো যায়। রমা সেই ঠকানোর ষড়যন্ত্র করছিল—লীলা তা হতে দেয়নি, দেবে না।

কিন্তু মাতাল...মাতালকে সহ্য করা সত্যি অসম্ভব। ঘৃণা সংস্কার থেকে উঠে এসে মমতাটুকু নষ্ট করে দিচ্ছিল লীলার। কেন যে ওসব ছাইপাশ খায় মানুষ? যে খায়, তারই সর্বনাশ হয়। তবু বোঝে না!

বাড়ির সামনে রিকশো থেকে নামল সে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল। পরক্ষণে থমকে দাঁড়াল। বসবার ঘরে সোফায় বসে ছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে একটা লোক সামনে ঝুঁকে পত্রিকায় ছবি দেখছে। বড় বড় বিশৃংখল চুল মাথায়, গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন মুখ, ঠিক যেমন রাস্তার উদ্দেশ্যহীন লোকেদের দেখতে পাওয়া যায়। আর তার পাশে মেঝের বসে বাসিনী ক্রমাগত হাতমুখ নেড়ে কী কথা বলছে। লোকটা শুনছে কি না বোঝা যায় না।

মুহূর্তে লীলার সারা শরীর আগুন হয়ে উঠেছে। মাথা ঘুরে উঠেছে। দেয়াল ধরে সামলে নিচ্ছিল সে।

(ক্রমশঃ)

তবু সহজিয়া নয়

সংশয় ছিল মানি অনুরাগও রয়েছে বিস্তর
নিজেই, কি সব জানি? দেখা আছে প্রতিবেশী [illegible]
হীরার আংটির মতো জ্বল জ্বল শিখরে প্রণয়
আরও যা যা আছে, শুধু হৃদয়েই ছিল না আলয়॥

দেখেছি মেলায় ঘুরে মানুষ এবং পোষা টিয়া
লালে ও সবুজে নীলে চাল ও চলনে যেন এক
দেখেছি নূপুরও তার তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গিতে
দেয় শিহরণ উন্মোচন নিদ্রালু হৃদয়ে সহজিয়া॥

তবুও তোমার জন্য এই রাত্রি শাওন ঘন মেঘে
দেয়া গরজায় দেখি উদ্ভাসন নির্মম বিদ্যুতে
আকাশের মুখ-দেখা, বুকে তার সহিষ্ণুতা ঢাকা
সে কিছু বলে না শুধু প্রতীক্ষায় বসে থাকে জেগে॥

ভ্রমরের মতো মন অনুরাগে মাতে না যে আর
সঙ্গীতে চিত্রের রাজ্যে কিংবা এই কাব্যের আগুনে
যদিও অস্তিত্ব পোড়ে অন্ধকারে জ্বলে হয় ক্ষয়
হৃদয় কি খর নদী? অভিমানী উদ্ধত পাহাড়?

মীমাংসার চিহ্ন কই, এতো শুধু প্রশ্নের বলয়
ঘিরে রাখে চারিদিক, তৃষ্ণাও ভীষণ চোখে মনে
অন্ধ নয় চরাচর, অবারিত তোমার বীক্ষণ
আমাকেও দেখে নাকি? কী চেয়েছে তোমার হৃদয়?

অন্তিম কবিতা

প্রভাত চৌধুরী

তোমরা যে যতই চিৎকার কর না কেন
আমার অ্যাকরিয়ামের মাছগুলির নির্জনতা ভঙ্গ হবে না
কেননা জলের ভিতর সমস্ত শব্দই অশ্রুত থেকে যায়

রক্তের শব্দের অনুরণনে আত্মজিজ্ঞাসার কিছু উত্তর
ভয়াবহ দুর্ঘটনার শোকচিহ্ন
তবু আমার প্রত্যয়গুলি কোনোদিনই হারিয়ে যাবে না

আমি প্রতিটি দৃশ্যাবলীর স্পর্শ-গন্ধ-স্বাদ অনুভব করি
আমার পরিক্রমায় ঐ সব দৃশ্যাবলী মূল্যহীন নয়
তবু রক্তের শব্দ আমাকে বারবার অ্যাকরিয়ামে ডুবিয়ে দ্যায়

দীর্ঘতর ছায়ার মিছিলে আমার অন্বেষণ
অ্যাকরিয়ামের ভিতর শান্ত মাছগুলি
জলপ্রপাত থেকে বহুদূরে আমার নির্জনতা

বিজ্ঞানের কথা

লুইস ওয়াল্টার আলভারেজ

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

এবছর (১৯৬৮) পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল
কার প্রদান করা হয়েছে বার্কলের
ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ওয়াল্টার আলভারেজকে। পরমাণু
ক্ষুদ্র বস্তুকণা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ
ণার জন্যে অধ্যাপক আলভারেজ
ন-জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননা লাভ
ছেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৫৭ বছর।
অধ্যাপক আলভারেজের গবেষণার বিষয়
গেলে এ ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী ডঃ
ল্ড গ্লেসারের উদ্ভাবিত 'বাবল
রের কথা কিছু বলতে হয়। এই
ল্ চেম্বার আবিষ্কারের জন্যে ডঃ
ার ১৯৬০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে
ল পুরস্কার লাভ করেন। এই আবি-
র ফলে বিজ্ঞানীদের পক্ষে পরমাণুর
ক্লিয়াসের বা কেন্দ্রীনের রহস্যময় জগৎ
র্কে বহু নতুন তথ্য জানা সম্ভব হয়।
ল্ চেম্বারের সাহায্যে নিউক্লিয়াসের
ভ্যন্তরে পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর কণিকার
কৃষ্ট আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হয়। এর
হায্যে অনেক নতুন নতুন কণিকার সন্ধানও
ওয়া যায়।

বাবল্ চেম্বার আবিষ্কৃত হবার আগে
মাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের মধ্যে
দ্র কণিকা নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার কাজে
রণত দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হত।
টি হল ক্লাউড চেম্বার বা মেঘ-প্রকোষ্ঠ
রটি হল ফটোগ্রাফিক ইমালসন্
রা। কিন্তু এই দুটি প্রক্রিয়ার
নোটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ছিল
ফলে নতুন উন্নততর কোনো
টি পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি
ই অনুভূত হচ্ছিল। গ্লেসার অনুমান
িছলেন, তরল পদার্থ সম্বলিত কোনো
প্রক্রিয়াই সম্ভবত গবেষণায় আগের চেয়ে
বেশি সহায়তা করতে পারবে। পরে তিনি তাঁর
এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করেন।

১৯৫২ সালে ডঃ গ্লেসার পরমাণুর
চেয়েও ক্ষুদ্রতর কণিকার আলোকচিত্র গ্রহণের
উন্নততর পদ্ধতির সন্ধানে গবেষণা শুরু
করেন। আট বছর ধরে গবেষণা ও পরীক্ষা-
নিরীক্ষার পর তিনি বাবল্ চেম্বার উদ্ভাবন
করেন। প্রথমে তিনি এক ইঞ্চি লম্বা একটি
ক্ষুদ্র যন্ত্র নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রের নাম
তিনি দেন 'বাবল্ চেম্বার', কারণ এই যন্ত্রের
সাহায্যে ধাবমান কণাগুলি তাদের পথ
বরাবর যে বুদ্‌বুদ্ তৈরী করতে করতে যায়
তাদের দেখা যায়। তিনি দ্রুত ধাবমান কণিকা-
গুলির পথে এই যন্ত্রটি স্থাপন করেন।
কণিকাগুলি যখন তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে
চলতে থাকে তখন তারা এক সেকেন্ডের মাত্র
এক ভগ্নাংশ সময়ের জন্যে ক্ষুদ্রাকৃতি গ্যাস
বুদ্‌বুদ্ পিছনে ফেলে যায়। তখন সেকেন্ডে
তিন হাজার ছবি তুলতে পারে এরকম উচ্চ-
গতিসম্পন্ন ক্যামেরার সাহায্যে এই বুদ্‌বুদের
ছবি তুলে নেওয়া যায়। আজ পদার্থ-
বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বাবল্ চেম্বার একটি
অত্যাবশ্যক যন্ত্র। পরমাণু ভাঙার যন্ত্র
চালাতে গেলে বাবল্ চেম্বারের সাহায্য না
নিলে চলবে না।

অধ্যাপক আলভারেজের কৃতিত্ব, তিনি এই
বাবল্ চেম্বারের প্রভূত উন্নতি সাধন করে
পরমাণুর অভ্যন্তরে বস্তুকণিকা সন্ধানের পথ
বিস্তৃততর করেছেন। গ্লেসার যেখানে এক
ইঞ্চি লম্বা যন্ত্র নির্মাণ করে বাবল্ চেম্বারের
সূত্রপাত করেছিলেন, আলভারেজ আজ
সেখানে ৭২ ইঞ্চি লম্বা বাবল্ চেম্বার
উদ্ভাবন করেছেন। নতুন বস্তুকণিকার সন্ধানে
এর উপযোগিতা যে কতখানি তা সহজেই
উপলব্ধি করা যায়। বাবল্ চেম্বারে বস্তু-
কণিকার রশ্মি চালনার পূর্বে সেই রশ্মি
বিশুদ্ধীকরণের পদ্ধতিও আলভারেজ
আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতি অতি সূক্ষ্ম
এবং একমাত্র তাঁদের গবেষণাগার ছাড়া
পৃথিবীর অন্য কোনো গবেষণাগারে এই
পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত অনুসৃত হয় না।
বাবল্ চেম্বারের মধ্য দিয়ে চালনার পর
গৃহীত আলোকচিত্র যান্ত্রিক উপায়ে স্বয়ং-
ক্রিয়ভাবে বিশ্লেষণ করে বস্তুকণিকার গতি-
প্রকৃতি নির্ধারণের পদ্ধতিও আলভারেজ
উদ্ভাবন করেছেন।

অধ্যাপক আলভারেজ 'কে-মেসন' নামে
অভিহিত বস্তুকণিকা নিয়ে গবেষণা করেন।
এই কণিকা মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠে
মিলিয়ে যায়। এই জ্বলে ওঠা ও মিলিয়ে
যাওয়ার ফাঁকে এক সেকেন্ডের লক্ষ কোটি
ভাগের এক ভাগ সময়ে আরও হাল্কা কণিকা
ছড়িয়ে দেয়।

সূর্যের কক্ষপথ পরিক্রমায় নবম পায়োনিয়ার

আমরা জানি, সূর্যদেহে প্রায়ই ঝড়
ওঠে এবং সেসময় সূর্যদেহ থেকে নানা
তেজস্ক্রিয় পদার্থ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।
এই পদার্থগুলি চন্দ্র অভিযাত্রী মহাকাশ-
চারীর পক্ষে কোনো বিপদ সৃষ্টি করবে
কিনা তা অনুসন্ধানের জন্যে মার্কিন যুক্ত-
রাষ্ট্র সম্প্রতি পায়োনিয়ার-৯ মহাকাশ-
যানকে সূর্যের কক্ষপথ পরিক্রমায় প্রেরণ
করেছে।

সেইসঙ্গে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহকেও
পৃথিবীর চারদিকের কক্ষপথে পাঠানো
হয়েছে। একটি 'থর-ডেলটা' রকেটের সাহায্যে
পায়োনিয়ার-৯ এবং 'টেটর-২' কৃত্রিম উপ-
গ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করা হয়।

মার্কিন মহাকাশ ও মহাকাশ পরিক্রমা সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্যায়োনিয়ার-৯ মহাকাশ পথে সূর্য প্রদক্ষিণ করবে এবং সূর্য থেকে তার দূরত্ব থাকবে ৭ কোটি ৩০ [illegible] ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইলের [illegible] অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পায়োনিয়ার [illegible] এক বার মধ্যে পরে [illegible] অতিক্রম করে আরও দূরে চলে যাবে।

[illegible] রকেটটি নির্দিষ্ট দূরত্বে [illegible] টেটর-২ কৃত্রিম উপগ্রহকে বাঁধন [illegible] দিলে সে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমা শুরু করে। পৃথিবী থেকে তার কক্ষপথের দূরত্ব হবে ২০০ থেকে ৩০০ মাইলের মধ্যে।

টেটর-২কে ছেড়ে দিয়ে থর-ডেলটা রকেটটির তৃতীয় পর্যায় চালু হয় এবং সে তখন পায়োনিয়ার-৯কে নিয়ে সৌর কক্ষপথের দিকে অগ্রসর হয়।

অ্যাপোলো মহাকাশ কর্মসূচীর অংগ হিসাবেই টেটর-২কে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়েছে।

মার্কিন মহাকাশ সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর মাসে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানযোগে তিনজন মহাকাশচারী ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেমস লোভেল ও উইলিয়াম অ্যান্ডার্স চন্দ্র পরিক্রমা করে পৃথিবীর মানুষের কাছে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাবেন।

তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠের ৬৯ মাইল ওপর দিয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণের আশা করেন। তাঁরা মহাকাশযান থেকে পৃথিবী ও চন্দ্রের টেলিভিশন ছবি তুলবেন। চন্দ্রের কোনো কোনো স্থানের ছবিও তাঁরা নেবেন। বিশেষ করে দেখবেন, চন্দ্রের 'স্থির সমুদ্রের' কোনো স্থানে অবতরণ করা সম্ভব হবে কিনা।

আগামী বছরের (১৯৬৯) [illegible] দিকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের যে [illegible] [illegible] অ্যাপোলো [illegible] [illegible] [illegible] হবে কিনা। [illegible] তা পরীক্ষা করে দেখবেন। [illegible] আগামী ২১ ডিসেম্বর কেপ কেনে[illegible] যাত্রা করার কথা।

এদিকে রুশ মহাকাশযান [illegible] প্রদক্ষিণ করে ভারত মহাসাগরে [illegible] করেছে। অনেকে মনে করেন, [illegible] ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে (১২ [illegible] নাগাদ) সোভিয়েত রাশিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে [illegible] নামাবার চেষ্টা করতে পারে। কারণ [illegible] সময়টা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পক্ষে [illegible] অনুকূল।

বিজ্ঞান ও মানুষের সংস্কৃতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূমিকা

অধ্যাপক এস চন্দ্রশেখর

মার্কিনপ্রবাসী প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক এস চন্দ্রশেখর সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে জওহরলাল নেহরু স্মৃতিভাণ্ডার আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'বিজ্ঞান ও মানুষের সংস্কৃতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভূমিকা'।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বলেন, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে মানুষ যে চিরন্তন কৌতূহলী তা ব্যক্ত হয়েছে, সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের জ্যোতিষচর্চার মধ্য দিয়ে। এই বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান-কাল পর্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে। হিন্দুদের এবং গ্রীকদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। মিশর থেকে পারস্য পর্যন্ত মুসলমান জগতের পূর্বাঞ্চলে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা প্রাধান্য লাভ করেছিল, পক্ষান্তরে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার পদ্ধতি অনুসৃত হত।

ভারতে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বলেন, হিন্দুদের প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ 'সূর্য-সিদ্ধান্ত'-এ গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের পরিভাষা, একক নির্বাচন এবং গণনা পদ্ধতিতে গ্রীক প্রভাব প্রতিভাত হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা টলেমি প্রবর্তিত চন্দ্র তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে একটা কথা বলা প্রয়োজন, পশ্চিমী জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যা প্রভাবিত হলেও তাঁরা নিজেরাও মৌলিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় বৃত্তের জ্যার পরিবর্তে অধিকতর সুবিধাজনক ত্রিকোণমিতির পদ্ধতি অনুসৃত হত।

ডঃ চন্দ্রশেখর বলেন, বৈদিকোত্তর এবং প্রাক সূর্যসিদ্ধান্তের যুগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাবিলনীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু জ্যোতিষচর্চায় যে তিথি গণনার পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা ব্যাবিলনের চান্দ্রতত্ত্ব থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে সূর্যসিদ্ধান্ত এবং তামিল পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক্ টলেমীয় গ্রীক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত, অপরপক্ষে তামিল পদ্ধতিতে ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব দেখা যায়। তবে একথা বলতে হবে, প্রাচীন জগতে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার যথাযথ মূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত হয় নি। মৌলিক নথিপত্রের অভাবই এই কাজে বিশেষ বাধাস্বরূপ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক যুগ আলোচনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বলেন, সুদূর নক্ষত্ররাজির ক্ষেত্রে নিউটনের মহাকর্ষ নিয়মাবলীর প্রয়োগ আধুনিক বিজ্ঞানে একটি বিরাট বিপ্লব ঘটায়। বস্তুত, জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী কারশফ্ বিকিরণের সূত্র প্রবর্তন করে আধুনিক জ্যোতিঃ-পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করেন। তিনি যে যুগের সূচনা করেছিলেন আজও তা চলছে।

নক্ষত্ররাজির বর্ণালী এবং নক্ষত্র আবহ[illegible] পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় একটি অতি গু[illegible] পূর্ণ অবদান রেখে গেছেন আমাদের [illegible] প্রখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী [illegible] সাহা।

এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য [illegible] অধ্যাপক চন্দ্রশেখর উপসংহারে বলেন, [illegible] ধর্মে, সকল উপকথায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি[illegible] তত্ত্ব পাওয়া যায়।

আমরা সরলভাবে অনুমান করতে [illegible] নক্ষত্র গ্রহনিচয় সমন্বিত এই বিশ্ব[illegible] অনন্তকাল ধরে রয়েছে। অন্যভাবে [illegible] গেলে আমরা বলতে পারি, কিভাবে বা [illegible] এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল তা কোনোদিনই জানতে পারব না।

—[illegible]

জিজ্ঞেস করিনি। তবে এটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই। জানতাম, আমাকে এমন কাজ দেওয়া হবে না যা পারব না।

প্রথম দিন তিনি আমাকে কোন কাজ করতে দিলেন না। তাঁর ঘরে আমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলেন। অনেক কথা বললেন। সবটাই তাঁর নিজের কথা। এই অফিসে কবে তিনি ঢুকেছিলেন। তখন কজন কর্মচারী ছিল। তাঁকে কে সবাথেকে ভালবাসত। আর কিভাবে তিনি আস্তে আস্তে এত উঁচুতে উঠেছেন। এর জন্যে তাঁকে যে কত অপেক্ষা করতে হয়েছে, ধৈর্য ধরতে হয়েছে তাও বললেন। শেষে একসময় থামলেন। তারপর আমার সঙ্গে অনেকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় করানোর সময় প্রত্যেককে বললেন, আমার বাবা তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমার এটা ভাল লাগল। মনে হল, আমি যেমন তেমন নই। এই অফিসে এখন থেকে আমি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমার কাজ কি একবারও তিনি বললেন না। আর সেকথা কেউ জানতেও চাইল না।

প্রথম দিন এইভাবে কেটে গেল। বাড়ি ফিরে সকলকে অফিসের গল্প করলাম। গল্প করার সময় কেন যেন মনে হল গল্পের চেয়ে আমার ওপর তাদের মনোযোগ অনেক বেশী। আমি যেন তাদের চোখে একদিনেই অনেক উঁচুতে উঠে গেছি।

পরের দিন অফিসে যেতেই তিনি আগের দিনের মত গল্প করলেন না। আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা খুব ছোট। ঘরে একটা টেবিল আছে। টেবিলের পাশে দুটো চেয়ার আছে। দরজার দিকে মুখ করা চেয়ারটা আমার। আর অফিসের কাজে কেউ এলে সুবিধের জন্যে অন্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে তিনি বলে দিলেন, আমার চেয়ারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাউকে কোন সময়ের জন্যে এটা যেন ছেড়ে না দিই। এরপর তিনি আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। আমি তখন আমার চেয়ারটায় বসে পড়লাম। কিন্তু আমাকে কি করতে হবে তা এখনো বুঝতে পারলাম না। আমি অনেকের টেবিলে টাইপ-রাইটিং মেসিন দেখেছি। তারা বসে বসে টাইপ করে। অনেকের টেবিলে আমি অনেক ফাইল দেখেছি। তারা ফাইল খুলে কিসব যেন পড়ে। আবার অনেককে মাথা নিচু করে লিখতে দেখেছি। আমার টেবিলে টাইপ-রাইটিং মেসিন নেই। কোন ফাইল নেই। কোন প্যাড নেই। কি করব আমি? অথচ কিছু করতে হবে। চাকরির মানে কিছু করা। অন্তত বসে থাকা নয়। আমাকেও নিশ্চয় কিছু করতে হবে। তবে কি করব সেটা হয়ত একটু পরেই জানতে পারব। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকাল গড়িয়ে গেল। দুপুর গড়িয়ে গেল। কেউ এল না। কিছু বলল না। তাহলে? একবার তাঁর কাছে যাওয়া দরকার। কাজটা বুঝে নিতে হবে। কিন্তু আমাকে যেতে হল না। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমাকে একটু বসিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে?

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম, ভাল।

শুনে তিনি খুব খুশী হয়ে উঠলেন, জানি তোমার ভাল লাগবে। তুমি জান না, এই চাকরিটার জন্যে তিনশ দরখাস্ত এসে-ছিল। কিন্তু কাউকে নিই নি। আমি অপেক্ষা করেছি। খুঁজেছি এমন একজনকে যে আমার খুব প্রিয় হবে। এমনি একজনকে হয়ত নেওয়া যেত। কিন্তু কি লাভ তাতে?

আমি উত্তর দিলাম না। শুধু মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বসে রইলাম।

তিনি একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে আবার শুরু করলেন, তোমার বাবা আমার বন্ধু। কিন্তু সেইজন্যে তোমায় চাকরি দিইনি। দিয়েছি অফিসের কথা ভেবে। বুঝেছ?

কিছু না বলে মাথা কাত করে জানিয়ে দিলাম, বুঝেছি।

আর তখনই তিনি যেন হঠাৎ বলে উঠলেন, ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্ত।

এরপর আর বসে থাকা যায় না। উঠে পড়লাম। যে কথা শুনব বলে আশা করে-ছিলাম তা তিনি বললেন না। আর আমিও কিছু বলতে পারলাম না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। ভাবলাম, আজ হল না। হয়ত কাল কিছু হতে পারে।

কিন্তু কালকেও কিছু হল না। আমাকে কোন কাজ দেওয়া হল না। ঠিক সময়ে এসে চেয়ারে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে জল খেলাম। চা খেলাম। সিগারেট খেলাম। এমনি করে সকাল গেল। দুপুর গেল। বিকেল গেল। তিনি ডাকলেন না। আমিও যাব যাব করে যেতে পারলাম না।

এমনি করে আরো কদিন গেল। তাঁর আর দেখা পেলাম না। এক একবার নিজেই দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রত্যেকবার দরজার কাছ থেকে ফিরে এসেছি। তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সবসময় ব্যস্ত থাকেন। শেষে একদিন তিন মিনিটের জন্যে দেখা করার সুযোগ পেলাম।

তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর?

—ভাল।

—তাহলে?

—একটা কথা ছিল।

—কি?

—আমি কিছু করতে চাই। আমাকে কাজ দিন।

—তোমার কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগল। কাজ যে তোমার ভাল লাগে তা জানতাম। আর সেটা জানতাম বলেই তোমাকে চাকরিটা দেওয়া হয়েছে। অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। তারা কাজের নামে বসে থাকে। গল্প করে। আর আমি এসব একেবারেই পছন্দ করি না।

তিনি এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্ত।

শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু এবার আর আগের মত চলে গেলাম না। দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তিনি তখন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি হল?

আমি তখন খুব আস্তে আস্তে কোন রকমে বললাম, একটা কথা ছিল।

—সে ত শুনলাম।

—কিন্তু কি করব তাত বললেন না।

—মানে?

—মানে আমার কাজটা কি?

—তুমি যা করছ তাই তোমার কাজ। এটা জিজ্ঞেস করার কি আছে? আমি ত তোমাকে বুদ্ধিমান বলেই জানতাম। ঠিক আছে। যাও এখন। পরে কথা হবে।

এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বেরিয়ে এলাম। শেষের কথাগুলো বলার সময় তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন কিনা তা বুঝতে পারলাম না। তবে শেষের দিকে তাঁর মুখ যেন আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠছিল। এটা কি বিরক্তির জন্যে? হতেও পারে। প্রথমে তাঁর মুখ কিরকম ছিল? হাসিখুশি? না গম্ভীর? অত খেয়াল করিনি। হয়ত হাসিখুশি ছিল। হয়ত গম্ভীর ছিল। যাই থাক না কেন আমি তাঁকে বিরক্ত করেছি। এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কি দোষ? আমি

কাজ চাই। তাঁকে এটা জানিয়েছি। আর এতে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। অথচ তাঁকেও আমি বিরক্ত করতে চাইনি।

নিজের ঘরে ঢুকে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। কেবলি তাঁর মুখ মনে পড়তে লাগল। নাহ্, একটা কিছু করা দরকার। যে করেই হোক তাঁর মুখে আবার হাসি আনতে হবে। তাঁকে দেখাতে হবে, আমি কত কাজের। কিন্তু কাজটা কি, যে দেখাব। মাথায় কিছু এল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

এমনি করে আরো কদিন গেল। এই কদিন আমি কিছু করিনি। তাঁর ঘরে যাইনি। তিনিও আর ডাকেননি। এ ক'দিন শুধু বসে থেকেছি। আর ভেবেছি। আমি এর মধ্যে কোনদিন বই পড়িনি। কোনদিন ঘুমোইনি। তবু কথাটা আমাকে শুনতে হল।

একদিন তিনি হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু আমাকে বসতে বললেন না। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, যা শুনছি, সব সত্যি?

কি তিনি শুনেছেন তা বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে?

—মানে স্পষ্ট।

আমি তাঁর কথা বুঝতে পারলাম না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি তখন কথাটা স্পষ্ট করে বললেন, অফিসটা বই পড়া বা ঘুমোনোর জায়গা নয়।

এবার যেন কিছু বুঝতে পারলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, আমি তোমাকে ভালবাসতাম। সেটা এমনি এমনি নয়, আমি তোমার মধ্যে এই অফিসের একটা ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম। তাই তোমার কাছ থেকে এটা ঠিক আশা করিনি। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কথাটা এতজনের মুখ থেকে শুনেছি যে শেষপর্যন্ত আর অবিশ্বাস করতে পারিনি।

ইচ্ছে হল কথাটার প্রতিবাদ করি। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলাম না। তাকাতে সাহস হল না। আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিনি এবার যেন একটু ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হল? চুপ করে আছ কেন?

আমি এবার একবার কথা বলার চেষ্টা করলাম, না...মানে...দেখুন...।

—না, দেখার কিছু নেই। আমি জানি, তুমি বলবে কথাটা মিথ্যে। কিন্তু আমি জানি কথাটা মিথ্যে নয়।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। বলবার মত কোন কথা মুখে এল না।

তিনিও কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। একসময় শুধু বললেন, ঠিক আছে। এখন যাও দেখি কি করা যায়।

আমি বেরিয়ে এলাম। তারপর নিজের ঘরে গেলাম। চেয়ারে বসলাম। বসে অনেক-কিছু ভাবলাম। কিন্তু কি যে ভাবলাম তা পরে ভুলে গেলাম। ছুটির পর যাকে ভাল-বাসতাম তার সংগে দেখা হল। আমার মুখে কি ছিল জানি না। সে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? আমি বললাম, কিছু না। তারপর তার সংগে আর কথা হল না। বাড়ি চলে এলাম। বাড়িতেও মা জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? আমি আগের মতই বললাম, কিছু না।

পরের দিন অফিসে এসে ভাবলাম, তাঁর সংগে দেখা করব। আমার নামে যা শুনেছেন তা মিথ্যে। কিন্তু তাঁর সংগে দেখা হল না। তিনি ব্যস্ত। তখন ঘরে কিছুক্ষণ বসলাম। বসে জল খেলাম। সিগারেট খেলাম। এক-বার দাঁড়ালাম। একবার বসলাম। একবার টেবিলের ড্রয়ার টানলাম। একবার ঢুকিয়ে দিলাম। একবার কলম খুললাম। একবার বন্ধ করলাম। তারপর একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাকে কিছু একটা করতে হবে। তাঁকে কিছু দেখাতে হবে। একবার তিনতলায় গেলাম। একবার একতলায় গেলাম। আর যতবার পারলাম তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে গেলাম, এলাম। একসময় না একসময় তাঁকে ঘর থেকে বেরোতে হবে। তখন তিনি দেখবেন, আমি কত ব্যস্ত। তিনি তখন বুঝতে পারবেন, আমার নামে যা শুনেছেন তা মিথ্যে। তখন কি তাঁর রাগ চলে যাবে না?

তাঁর মুখে আবার সেই হাসি ফিরিয়ে আনতে হবে। না আনলে চলবে না। আমার ওপর অনেকে অনেক আশা করে আছে।

হাসির মজলিস

—গতকাল সন্ধ্যার পর পার্কে তো খুব মজা লুটছিলে। মেয়েটি কে?

—আমার স্ত্রীকে বলবে না তো?

—না, কথা দিচ্ছি।

—ও আমারই স্ত্রী।

●

ছোট্ট মিলি মার কাছে জানতে চাইল—আমি কোথা থেকে এলুম?

—একটা সারস তোমাকে ঠোঁটে করে এনেছিল।

—তোমাকে কে আনল?

—আমাকে পাওয়া গিয়েছিল একটা গোলাপ ফুলের মধ্যে।

—আর ঠাকুমা?

—একটি আতরের পুকুরে পাওয়া যায় তাকে।

—কি আশ্চর্য ব্যাপার, তোমাদের তিন পুরুষে শিশুর জন্মই ঘটে নি?

●

স্থানীয় জেপির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহিলা। তাঁর স্বামী জেলে। ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

জেপি—তোমার স্বামী জেলে কেন?

মহিলা—মাছ চুরির জন্য।

জেপি—স্বামী হিসেবে ও কি খুব সৎ?

মহিলা—মোটেই না। আমাকে মারধোর করে, ছেলে-মেয়েদের ছুঁড়ে ফেলে; এমন কি নেশা করে পর্যন্ত।

জেপি—তবে ওকে ছেড়ে দিতে বলছ কেন?

মহিলা—আজ সাত দিন আমরা মাছ খাই নি স্যার।

●

স্বামী—দুটো সিনেমার টিকিট এনেছি।

স্ত্রী—কি মজা! আমি কাপড়-চোপড় পরি তাহলে?

স্বামী—হ্যাঁ পরো, এখন থেকেই পরা শুরু করো, যদিও টিকিট দুটো আগামীকাল নাইট শোর।

শিক্ষক—আমরা প্রতিদিন নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করি।

ছাত্র—কিন্তু রাতের বেলায় কি গ্রহণ করি স্যার? নাইট্রোজেন?

●

—মশাই মাথায় ছাতা লাগিয়েছেন তো খুব, এদিকে আপনার পা দুটো একেবারেই ভিজে জবজবে?

—তাতে কি হয়েছে, পা দুটো আমার চল্লিশ বছরের পুরোন। কিন্তু মাথার টুপিটা আজই সকালে কেনা।

●

—তোমার একটা কথাই আমাকে পৃথিবীতে সব থেকে সুখী করবে। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

—না।

—যাক, এতেই আমি সুখী।

●

রাগত স্বামী—আমি যখন তোমায় বিয়ে করি, তখন একটা আস্ত গাধা ছিলাম নিশ্চয়।

স্ত্রী—মনে হয়। কিন্তু তখন আমি এত অন্ধ ছিলাম যে, একেবারেই দেখতে পাইনি।

●

—মেয়েটাকে চেনা-চেনা লাগছিল?

—হ্যাঁ চেনো বৈকি। ও আমার সেক্রেটারী ছিল।

—ছিল! এখন নেই! কেন?

—চাকরি গেছে।

—এমন সুন্দরীর চাকরি গেল?

—কি করব বল ভাই। ও আমার বেশ অনুগতই ছিল—একদিন ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব করি। ও কি করল জান? আমি যা বলেছিলাম তা ও সর্টহ্যান্ডে লিখে নেয়, তারপর পরিষ্কার টাইপ করে নিয়ে আসে আমার সই-এর জন্য।
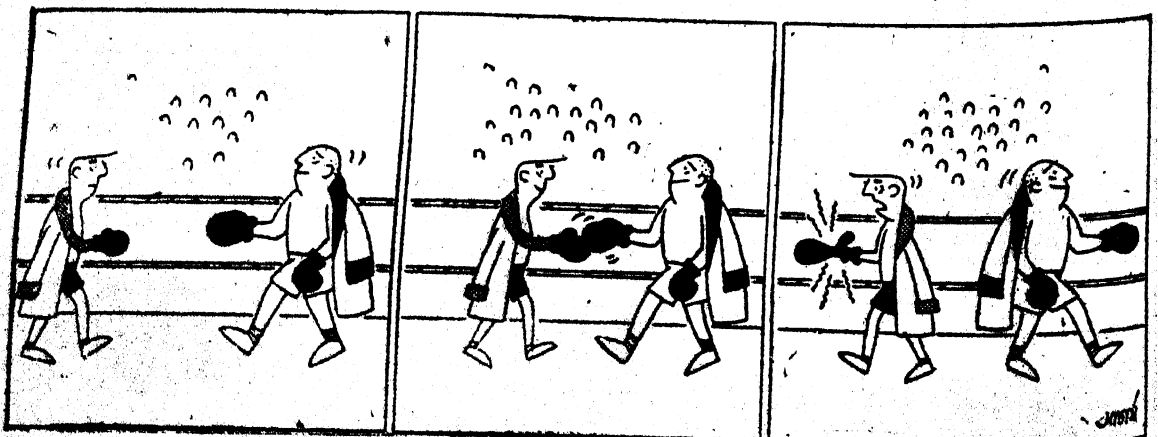
মন বুঝে দেখুন

আপনার যুক্তিক্ষমতা কতোখানি?

যুক্তিক্ষমতাকে বুদ্ধির একটি অত্যন্ত [ভ]ারী অংশ বলে মনোবিজ্ঞান চর্চার [গো]ড়ার যুগ থেকেই বিশ্বাস করা হয়ে [আ]ছে। সত্যিই, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং [মান]সিক সামর্থ্যের স্বরূপ জানতে হলে [যুক্তি]ক্ষমতা যাচাই করার চেষ্টা করতেই [হবে]। যুক্তিক্ষমতা হলো চিন্তাশক্তির একটি [বিশে]ষ রূপ। চিন্তার মাধ্যমে যখন মানুষ [কো]নো সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে, [ত]া বলি যুক্তি অনুসারে সে কাজ করতে [চল]ছে।

যুক্তিক্ষমতার প্রয়োগ করতে জানলে [তবে]ই আমরা শিখতে পারি। যুক্তি দ্বারা [কো]নো সমস্যার সমাধান করার পরে [মানু]ষের আচরণ ধারা দরকার মতো [বদ]লে নিতে হয়, সেই বদলে নেওয়াটাই [হ]লো নতুন কিছু শেখার ফলশ্রুতি। যার [যুক্তি]ক্ষমতা দুর্বল, সে কম শেখে, ধীরে [ধী]রে শেখে।

যুক্তিবিচার করতে হলে দুটি জিনিস [খু]ব দরকার : অন্তর্দৃষ্টি আর অতীত [অ]ভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট স্মৃতি। তিন-চার [বছ]রের ছেলেমেয়েরাও কোনো সমস্যার মুখে [পড়]লে যুক্তি বিচার করতে চায় এবং অতীত [অ]ভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে সমাধান খোঁজে। [মনো]বিদরা গবেষণা করে দেখেছেন, ঐ [অ]তি অল্প বয়সেও শিশুদের যুক্তি বিচার [ক্ষম]তা থাকে এবং বিশেষ যুক্তিক্ষমতা-[সম্প]ন্ন শিশুরা অনেক পাকা পাকা কথা বলে [অব]াক করেও দেয়। তবে সাত-আট বছর [বয়]স থেকেই শিশুদের যুক্তিক্ষমতার সত্যি-[কা]রের বিকাশ বেশ ফুটে উঠতে থাকে।

যুক্তিবিচার করবার সময়ে প্রথমেই [সমস্যা]টির পর একটি সম্ভাব্য সমাধানগুলি [মনে]র মধ্যে জেগে ওঠে। সেগুলিকে খুব [দ্রু]ত চিন্তার সাহায্যে একটি একটি করে [পরী]ক্ষা করে দেখা চলতে থাকে। এই যে [পরী]ক্ষা বা যাচাই করা হয়, সেটা কিন্তু [মনে]ন মনেই চলে এবং নানারকম প্রতীক বা [শব্দ]সমূহের সাহায্য নিয়ে ঐ মানসিক [পরী]ক্ষাময়কর কাজটা বিদ্যুৎগতিতে চলতে [থা]কে। এইভাবে চিন্তা করতে করতে [হঠা]ৎ যেন নির্ভুল সমাধানটি মনের চোখে [ভে]সে ওঠে। এমনি করে বারবার চেষ্টা [ক]রতে করতে অন্তর্দৃষ্টি জেগে ওঠে [এবং] বোঝা যায় এইটিই সমাধান। বড় [আ]শ্চর্য এই মনোপ্রক্রিয়াটি।

যুক্তিবিচারের চর্চা একান্ত দরকার [।] আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের [চে]ষ্টায় যে সব সমস্যা আসে সেগুলি [অতি]ক্রম করার জন্যে। তাছাড়া আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহলের ফলেও কিছু জানবার দরকার হলে যুক্তি ক্ষমতাকে কাজে না লাগিয়ে পারি না। সুতরাং যুক্তিবিচার ক্ষমতার অনুশীলন করতে হলে সমস্যা আর কৌতূহলকেই আদর করে কাছে টেনে নিতে হবে।

সমস্যা আর কৌতূহল ছাড়া আরও একটি জিনিস যুক্তিবিচারে খুব সাহায্য করে, সেটি হলো অনুমান অর্থাৎ ইনফারেন্স। জানা থেকে অজানার পথে এগুতে হলে অনুমান করেই চলতে হয়, তবেই নতুন পথ পাওয়া যায়, তাই নয় কি? অনুমান করতে গেলে ঠকে যাবার ভয়ে মনের এই গুণটিকে অবহেলা যিনি করেন, তিনি যুক্তিক্ষমতার চর্চায় নিশ্চয়ই পেছিয়ে পড়বেন।

তাই নির্ভয়ে সমস্যার সামনে এগিয়ে চলুন, কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখুন, অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি টনটনে করুন, আর সমাধানের সব পথ অনুমান করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

এবারে আপনার নিজের যুক্তিক্ষমতা একটু মেপে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বোধহয়! আসুন, তারই ব্যবস্থা করেছি।......

নীচের প্রশ্নগুলির জবাব দিতে হলে খুব অল্প চিন্তারই দরকার হবে। যদি একটু মজা করতে চান, তাহলে ঘড়ি ধরে দেখুন কতো সময় লাগে জবাব দিতে এবং তারপরে অন্য বন্ধুদেরও এই টেস্ট করতে দিন। যদি আপনি কম সময়ে করে ফেলতে পারেন এবং বেশি পয়েন্ট পান, তাহলে চুপচাপ থাকাই ভালো, আর যদি আপনার জবাব দিতে দেরী হয়ে থাকে, পয়েন্টও কম পেয়ে থাকেন, তা নিয়েও চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়!

১। ঘড়িতে সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। আয়নায় ঐ ঘড়িটা দেখলে কতো সময় দেখাবে?

২। একজনের সঙ্গে আত্মীয়তা বোঝাতে গিয়ে একজন বলছেন : "ভাইবোন আমার নেই, তবে এই লোকটির বাবা আমার বাবার ছেলে।" কি ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বলতে পারেন?

৩। এখানে পাঁচটি সংখ্যা রয়েছে, যুক্তিক্রম অনুসারে পরের দুটি সংখ্যা কি হবে? ৩৫, ২৭, ২০, ১৪, ৯, ...?

৪। কোন্ কথাগুলি নীচের কথা কয়টির মধ্যে ঠিক খাপ খাচ্ছে না? : টেনিস, গলফ, দাবা, সাঁতার, পাহাড়ে চড়া, ব্যাডমিণ্টন, তাস খেলা।

৫। নীচের বাক্যটি সম্পূর্ণ করার জন্যে ঠিক কথাটির নীচে দাগ দিন :

আগুনে যেমন থাকে না গর্জন, তাপে দেখায় দৃশ্যে তেমনি থাকে না......। (শব্দ, জল, অরণ্য, অগ্নিশিখা)

৬। যুক্তিক্রম অনুসারে নীচের অক্ষর-সমষ্টিগুলির পরের দুটি অক্ষরসমষ্টি বসাতে হবে :

অ ঔ অ, আ ও আ, ই ঐ ই, ? ? ?, ? ? ?

৭। মিলির বয়স আট বছর আর তার ভাই কল্যাণের বয়স বারো। যখন মিলির চেয়ে দ্বিগুণ বয়স ছিল, তখন কল্যাণের বয়স কত?

৮। ক'বছর পরে মিলি আর কল্যাণের বয়স যোগ করলে ৩২ হবে?

৯। মিলির তিন বছর বয়সে কল্যাণের যত বয়স ছিল, তার ঠিক দ্বিগুণ বয়স মিলির হবে ক'বছর পরে?

১০। কল্যাণ মিলির চেয়ে লম্বা। মিলি লিলির চেয়ে লম্বা। কে সবচেয়ে লম্বা?

সঠিক জবাব :

১। পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট।
২। যার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে সে হলো বক্তার ছেলে।
৩। ৫ এবং ২
৪। দাবা এবং তাস খেলা। অন্যগুলি দৈহিক পরিশ্রমের খেলা।
৫। শব্দ।
৬। ঈ এ ঈ, উ ঌ উ। স্বরবর্ণমালার শেষ থেকে শুরু করে একটি করে এগিয়েছে।
৭। আট বছর।
৮। ছ' বছর।
৯। ছ' বছর।
১০। কল্যাণ।

আপনি কতো পেলেন :

৮ থেকে ১০টি ঠিক হলে : আপনি যুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং মাথার কাজ ভালো করতে পারেন। ধন্যবাদ, আমাদের মনে হয় আপনি খুব স্মার্ট।

৪ থেকে ৭টি ঠিক হলে : আপনি খুব মাথা চুলকে অনেক হিসেব করে বড় আস্তে আস্তে সিদ্ধান্ত করেন, তবে মনে রাখবেন, চর্চা করলে মস্তিষ্কের চিন্তাক্ষমতা বাড়ানো যায়।

০ থেকে ৩টি ঠিক হলে : টেস্ট থেকে বোঝা গেল আপনার মানসিক যুক্তিক্ষমতা তেমন নেই, কিন্তু একটা কথা আমরা আপনি সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, মানুষের মানসিক সামর্থ্যের অনেকগুলি দিক আছে। এই টেস্ট থেকে কেবলমাত্র একটি দিকেরই বিচার হলো।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল

[উপন্যাস]

আগের
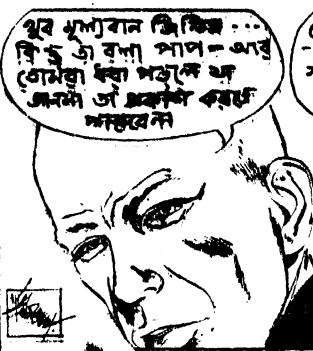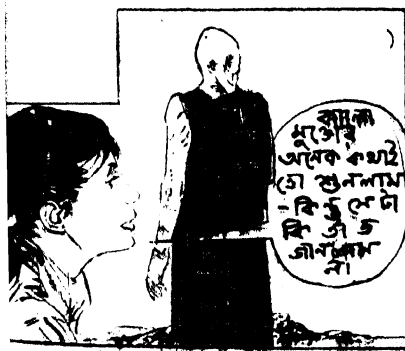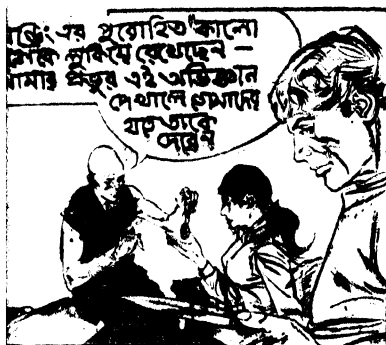
[সেটা উনিশশো চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু এল দাদু হেমনাথের সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। কাঁধে তাঁর গোটা রাজ্যের ঝামেলা। আরো আশ্চর্য তাঁরই বন্ধু লারমোর। সাদাসিধে, প্রাণবন্ত। আয়াল্যান্ড থেকে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে এসে পূব বাঙলার মাটি আর মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছেন। লারমোর বিনুর বিস্ময়, আর যুগলের সঙ্গে বিনুর বন্ধুর ভালোবাসা।

বিনু ঘুরে বেড়াল রাজদিয়া। নৌকোয় চেপেই পরদিন এল সুজনগঞ্জের হাটে। অদ্ভুত অনুভূতি। চারদিকে মুখের মেলা। হাটের একটা জায়গায় গিয়ে লারমোর বসলেন। ঘিরে ধরল গাঁয়ের গরীব মানুষ। বিনে পয়সায় রুগী দেখা শুরু

।। চোদ্দ ।।

অবনীমোহন শুধোলেন, 'এখন আর প্রীচ্ করেন না কেন?'

লারমোর হাসলেন। বললেন, 'খুব কঠিন প্রশ্ন করেছ অবনী। এর উত্তর তো এক কথায় দেওয়া যাবে না। দিতে গেলে আমার সারা জীবনের কথা বলতে হবে।'

উৎসুক সুরে অবনীমোহন বললেন, 'বেশ তো, বলুন না। আমার খুব জানবার ইচ্ছে।'

সামনের অসুস্থ উদ্বিগ্ন লোক-গুলোকে দেখিয়ে লারমোর বললেন, 'এখন যদি গল্প জুড়ে দিই ওরা আর আমাকে আস্ত রাখবে না। পরে আরেক দিন শুনো—'

'আচ্ছা।' অবনীমোহন বললেন, 'পরেই শুনব।'

যুগলের কাছে বসে উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে ছিল বিনু। লারমোর নামে এই মানুষটি সম্বন্ধে তার মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল। লারমোরের কথা জানবার জন্য প্রথম দিন থেকেই উন্মুখ হয়ে আছে সে। ভেবেছিল তার কৌতূহল এবার মিটবে। কিন্তু লারমোর নিজের সম্বন্ধে কিছুই বললেন না, ফলে বিনুর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল।

অবনীমোহন আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই মাঝি দুটো দুখানা হাতল-ভাঙা চেয়ার নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল।

লারমোর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিনুকে একটা চেয়ারে বসতে বলে ভিড়ের ভেতর থেকে একজনকে ডেকে অন্য চেয়ারটায় বসালেন। তারপর মাঝিদুটোর উদ্দেশে বললেন, 'বাক্স খোল্—'

মাঝিরা সেই বড় টিনের বাক্সদুটো খুলে ফেলল। বিনু দেখতে পেল তার ভেতর নানারকম ওষুধবিষুধ, নাক-কান-গলা-জিভ এবং বুক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, ইঞ্জেকসানের ছোট চ্যাপ্টা লম্বাটে বাক্স।

যন্ত্রপাতি আর ইঞ্জেকসানের বাক্সটা টেবিলের ওপর সাজিয়ে অন্য চেয়ারের লোকটার দিকে তাকালেন, 'কেমন আছিস রে জিগিরালি?'

লোকটা মধ্যবয়সী। মুখময় কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি খাড়া খাড়া হয়ে আছে, ফলে সজারুর কাঁটার মতন দেখায়। চোখদুটি ঘোলাটে এবং রুগ্ন। কাতর সুরে জিগি-রালি বলল, 'ভাল না সায়েব।'

লারমোর শুধোলেন, 'কী হল আবার?'

'তিন দিন ধইরা ধুম জ্বর। হেই (সেই) জ্বর আর ছাড়ে না।'

বুকটুক পরীক্ষা করতে করতে লারমোর বললেন, 'গেল হাটে দেখে গেছি, ভাল। এর ভেতর জ্বর বাধালি কি করে?' বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে গেল, 'এ কি!'

জিগিরালি বলল, 'কী সায়েব?'

'বুকে বিশ পাসারী (এক পাসারি—আড়াই সের) কফ জমল কি করে? গেল হাটে তো কফ দেখিনি।'

জিগিরালি চুপ।

লারমোর ধমকে উঠলেন, 'হারামজাদা, মুখ বুজে থাকলে চলবে না। বল্, কী করেছিলি—'

ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল জিগিরালি। অস্ফুট গলায় বলল, 'মাছ মারতে নদীতে নামিছিলাম তাই—'

নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন লারমোর। তারপর করে উঠলেন, 'তোকে না বলে ঠান্ডা-টান্ডা লাগাবি না—'

'কী করুম সায়েব। মাছ না হেই (সেই) মাছ হাটে হাটে গিয়া বেচলে সংসার চলব কেমনে? পোলা (ছেলেমেয়ে) খাইব কী?'

'কেন, তোর বড় ছেলেটা কয়েক দুটো দিন সংসার চালিয়ে নিতে না সে?'

জিগিরালির মুখে নৈরাশ্যের পড়ল। তিক্ত স্বরে সে বলল, 'তয় আমি বাইচা যাইতাম (বেঁচে হ্যায় (সে) চালাইব সংসার! তাইলে দুঃখু ঘুচব ক্যান? ভাবছিলাম ডাঙ্গর (ছেলে বড়) হইছে, এইবার লাগুর (নাগাল) পামু। আ আমার (অদৃষ্ট)—'কপালে একটা চাপড় আবার শুরু করল, পোলায় হইছে (গ্রাম্য কবিগান রচয়িতা এবং মাথায় গন্ধত্যাল (সুগন্ধি তেল) চোখে সুর্মা লাগাইয়া হ্যায় আসরে গান গায়। বাপের আসান করতে লামব (নামবে), মাছ মারব—এই তারে মানায়! সোম্মানে লাগে না!'

লারমোর রেগে গেলেন, 'বাপ মরছে আর উনি কবিদার হয়ে কোথায় সে উল্লুকটা?'

'আসনের সোময় (আসবার বাড়িতেই দেইখা আইছি।'

'কালই আমার কাছে তাকে দিবি।'

'হ্যায় (সে) কি আইব (আসবে) 'তার বাড় আসবে। আমার কথা

লারমোর সায়েব যেতে বলেছে।
দিয়ে তার কবিয়ালি ছুটিয়ে দেব।'
মোরের যে চেহারাটা বিনুর মনে
রেখায় আঁকা হয়ে গেছে সেটা মধুর
একটি মানুষের চেহারা। তার
য়ে তাঁর আরেকটা রূপ আছে,
এত রেগে যেতে পারেন, বিনু
নাই করতে পারে নি। অবাক হয়ে
চয়ে থাকল।

হোক পরীক্ষা-টরীক্ষা করে
লকে ওষুধ দিতে দিতে লারমোর
দিনে তিনবার খাবি। সকালে-
রাত্তিরে। আর সংসার রসাতলে যাক,
যাক, না খেয়ে গুষ্টিসুদ্ধ
দু ঘর থেকে বেরুবি না। যদি
ই জ্বর নিয়ে আবার জলে নেমেছ
য়ে পা দুখানা গুঁড়ো করে দিয়ে

গরালি মাথা নেড়ে জানাল তিনবার
ষুধ খাবে এবং ঘর থেকে বেরুবে
লল, 'অহন (এখন) তাইলে (তা
ই। আদাব লালমোহন সায়েব—'
। তো পথ্যের পয়সা আছে?'
রালি উত্তর দিল না। মাথা নীচু
চুয়ে থাকল।
মার বললেন, 'পয়সা চাইতে বুঝি
হেবের মানে লাগে।' পকেট
একটা সিকি বার করে দিতে
লেন, 'এই নে। বার্লি-টার্লি
স।'
রালি এবারও কিছু বলতে
। ঠোঁট দুটো থরথর করল শুধু
জ্ঞতায় চোখ সজল হয়ে উঠল।
রালি চলে গেলে ভিড়টার দিকে
লারমোর ডাকলেন, 'বুধাই পাল

উঠে এল তার বয়েস ষাটের কাছা-
খালি গা, খালি পা। গায়ের চামড়া
খই-ওড়া। গোল গোল হলদে
ঢাকের মতন মস্ত পেটের ওপর
জিরজিরে বুক। গলাটাও সরু,
ই প্রকাণ্ড মাথা— পাশুটে রঙের
ঝুপসি হয়ে আছে। আচ্ছাদন
টির চাইতে সামান্য বড় একটা
চিটে টেনি।
রালির খালি চেয়ারখানা দেখিয়ে
বললেন,'বোসো'—
পাল বসল না।

মার বললেন, 'কী হল, বোসো—'
চুলকোতে চুলকোতে বিনীত সুরে
ল বলল, 'আইজ্ঞা না, আপনের
আমি চারে (চেয়ারে) বইতে
।'
হে?'
নের সামনে চ্যারে (চেয়ারে)
পনের একটা সোম্মান নাই?'
তো ঠিকই তো।' রহস্য করে
সতে বুধাই পালের একখানা
চেয়ারে বসিয়ে দিলেন লারমোর।
ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল বুধাই পাল,

'এইটা (এটা) কী করলেন লালমোহন সায়েব, এইটা করলেন কী?'

'ভয় নেই। তুমি চেয়ারে বসলে আমার সম্মানের একটুও ক্ষতি হবে না।'

বাড়তি দুখানা চেয়ারের কী প্রয়োজন, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে বিনু। একটা তার জন্য, আরেকটা রুগীদের জন্য। প্রীচ় করার বদলে আজকাল হাটে এসে লারমোর কী করেন, তা-ও টের পাওয়া গেল। চারদিক থেকে সুজনগঞ্জের হাটে যত রুগী আসে তিনি তাদের চিকিৎসা করে থাকেন।

যাই হোক, লারমোর বললেন, 'তারপর পালমশাই, ক'মাস পর দেখা দিলেন?'

'আইজ্ঞা, দুই মাস।'

'এতদিন ছিলেন কোথায়?'

'গাওয়ালে গেছিলাম।'

এই সময় বিনু হঠাৎ বলে উঠল, 'গাওয়াল কী?'

লারমোর বিনুর দিকে ফিরে হাসলেন, 'কুমোররা বড় বড় নৌকো বোঝাই করে মাটির হাঁড়ি-পাতিল-কলসী নিয়ে চকের দিকে পাড়ি দেয়। হাঁড়ি-কলসীর বদলে

ওরা পয়সা নেয় না, ধান নেয়। দু-চার মাস পর নৌকো ভর্তি ধান নিয়ে তারা ফিরে আসে। একে বলে গাওয়াল করা।'

'ও।'

এতক্ষণ বুধাই পাল খেয়াল করে নি। এবার তার চোখ এসে পড়ল বিনু আর অবনীমোহনের ওপর। হাত-জোড় করে বলল, 'এনারা (এঁরা)?'

লারমোর বললেন, 'তোমাদের হেম কর্তার নাতি আর জামাই।'

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'পন্নাম (প্রণাম) হই গো জামাইবাবু নাতিবাবু? কি সুভাগ্য আমাগো (আমাদের), হ্যাম কর্তার নাতি আর জামাইরে দেখলাম।'

ঠিক এই সময় জিগিরালি আবার ফিরে এল। মুখ কাচুমাচু করে লারমোরকে বলল 'বড় অন্যায় হইয়া গেছে গো সায়েব।' অবনীমোহনদের দেখিয়ে বলল, 'এনাগো (এঁদের) কথা জিগাইতে (জিজ্ঞেস করতে) একেরে (একেবারে) ভুইলা গেছি।'

লারমোর অবনীমোহনদের পরিচয় দিলেন।

এরপর জিগিরালি আর বুধাই পাল, দুজনে মিলে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল। অবনীমোহনরা কোথায় থাকেন? কলকাতায় থাকেন শুনে বলল, এতকাল আসেন নি কেন? এসেছেন যখন দু-চার মাস অন্তত এই জলের দেশে থেকে যেতে হবে; ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্নোত্তরের পর সসম্ভ্রমে সেলাম করে জিগিরালি চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, 'শরীলটা ইট্টু (একটু) ভাল হইলে হ্যাম কর্তার বাড়িত্ যামু। আপনেগো লগে (সঙ্গে) দুইখান কথা কইলেও পরান জুড়ায়।'

অবনীমোহন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। একটা অসুস্থ রুগ্ন মানুষ শুধু তাঁদের পরিচয় জানবার জন্য জ্বর গায়ে আবার ফিরে এসেছে, আগে তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল বলে অসীম সংকোচে বিব্রত হয়ে আছে—ভাবতেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি। গাঢ় গলায় বললেন 'তোমার আসতে হবে না, আমরাই একদিন তোমার বাড়ি যাব।'

'যাইবেন তো, যাইবেন তো?' চোখ আলো হয়ে উঠল জিগিরালির।

'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

জিগিরালি চলে গেলে লারমোর বুধাই পালকে বললেন, 'আর অন্য কথা না, এইবার আপনার পেটের কথা বলুন পালমশাই। কেমন আছেন তিনি?'

মাঝে মাঝে বুধাই পালকে 'আপনি' করে বলছেন লারমোর। বিনু বুঝল, ওটা ঠাট্টা।

এদিকে পেটের কথায় মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল বুধাই পালের। নাকের ভেতর থেকে খুব দুর্বল একটা সুর বার করে সে বলল, 'প্যাটের গতিক (পেটের অবস্থা) সুবিধা বুঝি না লালমোহন সায়েব।'

'কেমন?'

বুধাই পাল চুপ।

লারমোর বললেন, 'সামনে এসো, পেটখানা দয়া করে দেখাও—'

ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বুধাই পাল। লারমোর পেটে হাত দিতে না দিতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'উ-উ, লাগে—'

'লাগে নাকি?'

'হ সায়েব, বেজায় (খুব) লাগে।'

পেটটা আস্তে আস্তে টিপে লারমোর আঁতকে উঠলেন, 'দু মাসে পেটটাকে করেছ কি!'

'আইজ্ঞা—'

'তোমার পেটে ক'টা পিলে হে?'

'সায়েবের যেমুন কথা!' বুধাই পাল ফোকলা মাড়ির ওপর ক'টা হলদে দাঁত বার করে হাসতে লাগল, 'মাইনষের আবার কয়টা পিলা (পিলে) হয়? একটাই পিলা আমার।'

লারমোর বললেন, 'একটাই ছিল, তবে এই দু' মাসে গাওয়ালে গিয়ে আরো গোটা পাঁচ-সাতেক জুটিয়ে এনেছ। আর একেকটা পিলে গায়েগতরে কোল-বালিশের মতন।'

বিনু-যুগল-অবনীমোহন, এমনকি অদূরে সেই অসুস্থ রোগগ্রস্ত লোকগুলোও হাসতে লাগল। সবার সঙ্গে বুধাই পালও পাল্লা দিয়ে হাসছে।

লারমোর শুধোলেন, 'পেটটার এমন দশা করলে কেমন করে? গাওয়ালে গিয়ে ভেবেছিলে, লালমোহন সায়েব তো সামনে নেই, কে আর বকাঝকা করবে। প্রাণের সুখে অপথ্য-কুপথ্য করে গেছ, না?'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে একসঙ্গে হাত এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বুধাই পাল বলল, 'গুরুর কিরা (দিব্যি) সায়েব, আপনে যা যা খাইতে কইছিলেন তার বাইরে দাঁতে কিচ্ছু কাটি নাই।'

'কিচ্ছু না?'

'না।'

'সরষে দিয়ে ইলিশ-ভাতে খাওনি?'

'ঐ জিনিসটা কি না খাইয়া পারি?'

'পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে শুঁটকি মাছ?'

'ঐটাও খাইতে চাই নাই। তয় (তবে)—'

'তবে খেলে কেন?'

কিছুক্ষণ হাত কচলে নিজের বুকে একখানা আঙুল রাখল বুধাই পাল। করুণ গলায় বলল, 'এইর ভিতরে যার বাস সেই আত্মায় চাইল যে। আমি কী করুম?'

'তাই তো, কি আর করা। তা হ্যাঁ হে পালমশাই, তেঁতুল দিয়ে পুঁটি মাছের টকের কথাটা বল—'

বুধাই পাল চুপ।

লারমোর বললেন, 'লজ্জা কি, লজ্জা কি, বলেই ফেল না। পুঁটি মাছের টকটাও নিশ্চয়ই পরমাত্মা চেয়েছিল?'

বুধাই এবার আর মুখে বলল না, আস্তে করে মাথা হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল।

লারমোর আঙুল দিয়ে তার চিবুকটা ঠেলে ওপর দিকে তুললেন; তারপর চোখের ভেতর তাকিয়ে বললেন, 'পালমশাই, ধন্বন্তরির বাপেরও সাধ্য নেই আপনার রোগ সারায়। এক কাজ করুন—'

বিপন্ন মুখে বুধাই পাল তাকিয়ে থাকল।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'যমরাজকে খবর দিন, খুব তাড়াতাড়ি তিনি যে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে একটা পুষ্পকরথ পাঠান।'

হঠাৎ উবু হয়ে বসে লারমোরের দু'খানা পা চেপে ধরল বুধাই পাল। কাতর মিনতিপূর্ণ সুরে বলল, 'আমারে বাচান (বাঁচান) সায়েব, প্যাটে বড় যন্তন্না (যন্ত্রণা)। এইবার থিকা (থেকে) আর আপনার অবাধ্য হমু না। যেমুন কইবেন তেমন চলুম।'

'তোমার কথায় বিশ্বাস নেই।'

'আরেকবার, খালি আরেকটা বার। গুরুর কিরা (দিব্যি), আর ঐ সগল খামু না।'

'ঠিক?'

'ঠিক সায়েব।'

ওষুধ-টোষুধ দিয়ে লারমোর বললেন, 'তেল-টেল পেঁয়াজ-রসুন, সব বাদ। তিন মাস শুধু দুধ-ভাত খাবে। নইলে পেটের ঐ পিলেই তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে।'

বুধাই পাল বলল, 'দুধ খাওনের ক্ষ্যামতা (ক্ষমতা) কি আমাগো (আমাদের) লাখান (মত) মাইনষের (মানুষের) আছে?'

লারমোর বললেন, 'না থাকে, দু' মাস তুমি আমার কাছে এসে থাকো। আমার তিনটে গরু আছে, সাত-আট সেরের মতন দুধ হয়।'

বিনুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্নেহলতা লারমোরকে তাঁদের বাড়ি গিয়ে থাকতে বলেছেন। তাই নিয়ে স্নেহলতার কত রাগ, কত অভিমান! আর লারমোর কিনা তাঁর কাছে গিয়ে থাকবার জন্য লোক জোটাচ্ছেন! ব্যাপারটা ভাবতেই ভারি মজা লাগল বিনুর।

বুধাই পাল বলল, 'বাড়িঘর ফালাইয়া (ফেলে) আপনের কাছে গিয়া কি থাকতে পারি? সংসার দেখব কে?'

'তাহলে এক কাজ কোরো, তোমার নাতিকে আমার ওখানে রোজ সকালে পাঠিয়ে দিও। দুধ দিয়ে দেব।'

'হেই (সেই) ভাল। তাইলে অখন যাই। পন্নাম সায়েব, পন্নাম জামাইবাবু নাতিবাবু—' বুধাই পাল চলে গেল।

বুধাই পালের পর ডাক পড়ল সোনা মিয়ার, তারপর চন্দ্র ভুঁইমালীর, তারপর রজবালি তালুকদারের। এইভাবে একের পর এক রোগী দেখা চলল।

বুক-পেট পরীক্ষা করতে করতে শুধু রোগ সম্বন্ধেই খোঁজখবর নিচ্ছেন না লারমোর, অন্য কথাও বলছেন। রজবালিকে তিনি হয়ত বললেন, 'এবার কত কানি (চার বিঘেতে এক কানি) জমিতে পাট বুনেছিলি?'

রজবালি জবাব দিল, 'আড়াই কানি।'

'গেল বার তো পাট বুনে লোকসান দিয়েছিলি। এবার লাভ থাকবে?'

'মনে তো লয়; অহন খোদার ইচ্ছা।'

'হ্যাঁ। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কী আর হয় বল—'

চন্দ্র ভুঁইমালীকে হয়ত বললেন

'এবারের বর্ষায় তোমার দক্ষিণের ভিটির ঘরখানা না পড়ে গিয়েছিল চন্দর ?'

'হু।' চন্দ্র মাথা নাড়ে।

'সেটা উঠিয়েছ ?'

'আপনেগো আশীর্বাদে উঠাইছি লালমোহন সায়েব। আগে চালে আছিল ছন, এইবার টিন দিছি—নয়া ঢেউ-খেলাইনা (ঢেউ-খেলানো) টিন। খুব পোক্ত হইছে ঘর।'

'খুব ভাল, খুব ভাল।'

'একদিন গিয়া দেইখা আইসেন সায়েব, হ্যামকত্তারেও কইছি (বলেছি) পায়ের ধুলা দিতে।'

'যাব যাব, নিশ্চয়ই যাব। হেমকে নিয়ে একদিন তোমার নতুন ঘর দেখে আসব।'

অসুখ আর অসুখের বাইরে অন্য সব কথার ফাঁকে রোগীরা অবনীমোহন এবং বিনুর সংগে যেচে আলাপ করে নিচ্ছে। হেমনাথের জামাই আর নাতি শুনে তাদের কি আনন্দ আর সমাদর!

যাই হোক দেখতে দেখতে ভিড়টা ফাঁকা হয়ে গেল। এখন আর একটিও রোগী নেই।

বিনু লক্ষ্য করেছে, রোগী দেখে একটা পয়সাও নেননি লারমোর। বরং বিনা পয়সায় সবাইকে ওষুধ দিয়েছেন, কারোকে কারোকে পথ্যের জন্য ফতুয়ার পকেট থেকে পয়সা বার করে দিয়েছেন। একেই সেদিন লাভের কারবার বলে ঠাট্টা করেছিলেন হেমনাথ।

ওদিকে অবনীমোহনও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবার বললেন, 'আপনি তো দেখলাম ঐ রুগীদের সবাইকে চেনেন।'

লারমোর হাসলেন, 'চিনি বৈকি।'

'নামও তো জানেন।'

'জানাই উচিত। পঞ্চাশ বছরের মতন এখানে কেটে গেল।' বলতে বলতে চোখের মণিতে যেন ঘোর লেগে গেল লারমোরের, 'যখন এসেছিলাম তখন আমি যুবক, আর আজ বৃদ্ধ।'

লারমোর যা বলে গেলেন, সংক্ষেপে এইরকম। রাজদিয়াকে ঘিরে ষাট-সত্তর মাইলের ভেতর যত গ্রাম, যত জনপদ, যত মানুষ, এমনকি প্রতিটি বৃক্ষলতা আর পাখি—সব, সব তাঁর চেনা। এই সজল বিশাল ভূখণ্ডে আয়ুর প্রায় সবটুকুই তো কাটিয়ে দিলেন। এখানে কোথায় কোন বাড়িতে নবজন্ম হচ্ছে, কোথায় মৃত্যু—সমস্তই জানেন লারমোর। জন্ম-মৃত্যু—কোনকিছুই তাঁর অগোচরে হবার উপায় নেই। পূর্ব বাঙলার এই কোমল মনোরম অংশের ওপর তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

বলতে বলতে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ ঘোরটা কেটে গেল। লারমোর চঞ্চল হলেন, 'ইস, বেলা হেলে গেল। এখনও হেমের দেখা নেই।'

সত্যি সত্যিই সূর্যটা এখন আর মধ্যাকাশে নেই, পশ্চিম আকাশের ঢালু দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকখানি

ফটো : সন্তোষ দত্ত
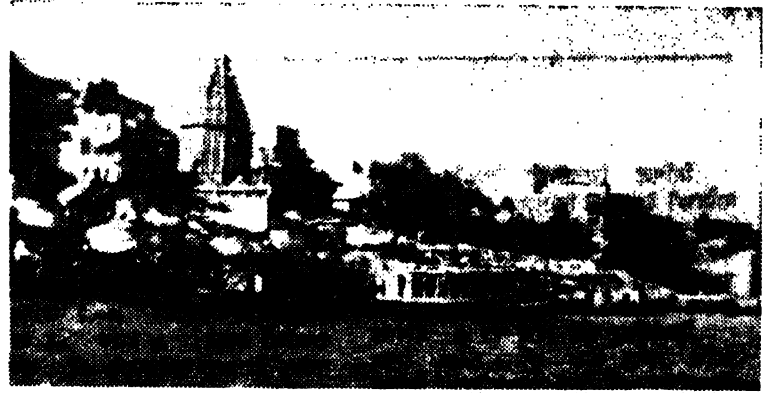
নেমে গেছে। রোদের রংও গেছে বদলে। তাতে নরম সোনালী আভা লেগেছে। ফলে চারদিকের গাছপালার পাতা সোনার ঝালরের মত হয়ে দুলছে।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে লারমোর বললেন, 'হেমের একটা খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। কোথাও বসে গেলে উঠবার নাম নেই তার।' বলতে বলতে বিনুর সম্বন্ধে সচেতন হলেন, 'আরে, দাদাভাইটার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। শুকোবার কথাই। কখন দুটি খেয়ে এসেছে! এই যুগল চট করে দাদাভাইয়ের জন্যে রসগোল্লা আর সন্দেশ নিয়ে আয়। মনা ঘোষের দোকান থেকে আনবি।' পয়সা বার করতে পকেটে হাত পুরলেন লারমোর।

এতক্ষণ দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসে ছিল যুগল, বলামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আর সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল বিনুর, সেটা ধরা পড়ে যাওয়াতে লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকল সে।

লারমোর কিন্তু পয়সা বার করতে পারলেন না। তার আগেই বাধা পড়ল। অবনীমোহন বলে উঠল, 'খাবার আনতে হবে না। আমি বরং বিনুকে খাইয়ে আনি; যুগলও সঙ্গে যাক।'

'তুমি আবার কষ্ট করে যাবে কেন?'

'কষ্ট কিছু না। আসলে—'

লারমোর জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী?'

অবনীমোহন বললেন, 'পূর্ব বাঙলায় এই প্রথম এলাম। এখানকার হাট-টাট কিছুই তো দেখিনি। বিনুকে খাওয়াতে নিয়ে হাটটা ঘুরে দেখব।'

লারমোর উৎসাহের সুরে বললেন, 'খুব ভাল। রোগীর কাছে বসে না থেকে একটু ঘুরে এসো।'

'তা ছাড়া—'

'কী'

'ঘুরতে ঘুরতে যদি মামাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—'

'তবে তো আরো ভাল। যাও—যাও—'

একটু ভেবে নিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'আপনিও চলুন না লালমোহন মামা—'

লালমোহন বললেন, 'আমি কি করে যাব?'

'আপনার রোগী-টোগী তো এখন নেই।'

'তা নেই। কিন্তু যে কোন সময় এসে পড়তে পারে। কত দূর দূর জায়গা থেকে ওরা আসে। সপ্তাহে একদিন মোটে হাট। আমাকে না পেলে ওদের কত কষ্ট হবে বল তো!'

দুচোখে অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সেবাব্রতী নিঃস্বার্থ মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অবনীমোহন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'কতক্ষণ এখানে থাকবেন?'

'সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত। হাট ভাঙলে উঠব।'

'আপনিও তো সেই সকালবেলা খেয়ে এসেছেন। আমি কিন্তু খাবার নিয়ে আসব।'

লারমোর মধুর হাসলেন, 'বেশ তো, এনো।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না; বিনু আর যুগলকে নিয়ে হাটের দিকে চললেন। [ক্রমশঃ]

প্রদর্শনী পরিক্রমা

নিখিল বিশ্বাসের দ্বিতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিখিলের বন্ধু এবং তাঁর পত্নী তাঁর ড্রয়িং-এর একটি স্মারক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১০ থেকে ১৬ই নভেম্বর প্রদর্শনী খোলা ছিল।

ত্রিশখানির মত ছোট বড় ও মাঝারি কালি কলম আর তুলির ড্রয়িং নিয়ে আয়োজিত এই ছোট প্রদর্শনীতে নিখিল বিশ্বাসের ড্রয়িং-এর সাবলীলতা, শক্তি ও মর্মবেদনার নিদর্শন দেখা গেল। খৃষ্টের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর দৃশ্যাবলীর মধ্যে নিপীড়িত সর্বমানবের যন্ত্রণা প্রতিফলনের প্রচেষ্টা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা প্রবৃত্তির উন্মাদনার কতকগুলি ছবিও নিখিল বিশ্বাসের ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থিত ছিল। আর তাঁর কয়েকটি জীবজন্তুর স্টাডি যেমন ষাঁড়, বরাহ মূর্তি ইত্যাদি তাঁর মুন্সীয়ানার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে রাখা হয়েছিল। তাঁর গোড়ার দিকের ক্লাউন সিরিজের ড্রয়িং থেকে শেষের দিকের কাজের ক্রমবিবর্তন এই অল্প কয়েকটি ছবির মধ্যেও বেশ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল।

●

অ্যাকাডেমি স্টুডিওর জুনিয়র গ্রুপের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশখানি জল রং প্যাস্টেল ও পেন্সিল ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী ৯ থেকে ১৫ নভেম্বর দক্ষিণের গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকৃতি নিসর্গ দৃশ্য, নগরের দৃশ্য এবং লাইফস্টাডি আর স্টিললাইফ নিয়ে এতগুলি কাজের মধ্যে ছাত্রসুলভ সাধারন কাজের নিদর্শন ছাড়া খুব বেশী কিছু চোখে পড়ল না। দু' একটি কাজের মধ্যে কিছুটা ব্যক্তিত্বের ছাপ কোনমতে নজরে পড়তে পারে কিন্তু সাধারণ মান একান্ত বৈচিত্র্যহীন ও অনুচ্চ।

●

১০ থেকে ১৬ নভেম্বর এখানেই সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের ৫১তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোভিয়েত দেশের জনগণ ও তার শিল্প সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানচর্চার একটি ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী করা হয়। শতাধিক ফটোগ্রাফের মাধ্যমে সোভিয়েট দেশের বিচিত্র জাতি, বিপ্লবের গোড়ার দিকের কয়েকটি ঐতিহাসিক ফটোগ্রাফ ও চিত্রের প্রতিলিপি, আধুনিক মহাকাশ জয়ের প্রচেষ্টা এবং শিল্প, সঙ্গীত, লোকনৃত্য ও খেলাধুলো ইত্যাদির মাধ্যমে সোভিয়েত জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্রাবলী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়। এই সঙ্গে সোভিয়েত বই ও তার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের একটি প্রদর্শনীও পুস্তকপ্রেমিকদের কাছে মূল্যোবান বলে বিবেচিত হয়।

●

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে ভারতের প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের একটি ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী করেন। ৯ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এই প্রদর্শনী ও অর্থসংগ্রহের আয়োজন হয়। যে সব ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তা ছাড়াও অনেক অপ্রকাশিত ছবি ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছাড়াও অসাংবাদিকদের তোলা ছবি এখানে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মত ছবি হয়েছিল প্রেম সিং আগরওয়ালের জলমগ্ন জলপাইগুড়ির কয়েকটি ছবি—শহরে কতটা জল উঠেছিল তার ফটোগ্রাফিক দলিলের বিরল নিদর্শন। এ ছাড়া দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, তিস্তা বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যার তান্ডবলীলা ও মানুষের আত্মরক্ষার অনেকগুলি বেদনাদায়ক ছবিতে ধ্বংসের রূপের একটা আংশিক চেহারা তুলে ধরা হয়েছিল।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনিমা রায় এবং নকুল দাস ১৩ থেকে ১৮ নভেম্বর দুটি আলাদা একক প্রদর্শনী করেন।

শ্রীমতী রায়ের ২১খানি অয়েলে কতকটা জ্যামিতি ঘেঁষা বিমূর্ততার পরীক্ষা দেখা গেল। কম্পোজিশনের দিকে তাঁর নজর অনেক বেশী। প্রতিটি চিত্রপট সুগঠিত করে তোলার দিকে অনেক পরিশ্রম করেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন একটা একরঙা পটভূমিকায় যেন এই ধরনের কম্পোজিশন সৃষ্টি করা হয়েছে।

নকুল দাস অন্যদিকে বিভিন্ন রকম আধুনিক রীতি (ফিগারেটিভ ও নন-ফিগারেটিভ) কাজ নানা রকমের উজ্জ্বল বর্ণপ্রয়োগে করতে গিয়ে কোন একটা বিশিষ্ট রীতিতে স্থিরভাবে কাজ করতে পারেন নি। বহু পূর্বসূরীর রীতির অনুসরণের ছাপও তাঁর কাজে পাওয়া গেল যেমন তাঁর "নুডিটি" "সানসেট", "মহামায়া", "রিফ্লেকশন" প্রভৃতি কাজ। রঙের ঔজ্জ্বল্য কোন কোন জায়গায় মন্দ লাগে না—উজ্জ্বল লাল হলুদের সঙ্গে কালো রেখার বৈপরীত্য প্যাটার্ন হিসেবে ভাল কিন্তু ছবির কর্মের দিকে এখনো যথেষ্ট মনোযোগ দিতে তিনি সক্ষম হননি।

●

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৫ থেকে ২১ নভেম্বর শ্রীমতী বাসন্তী সেন ও শ্রীশ্যামল লাহিড়ীর দুটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল।

শ্রীমতী বাসন্তী সেন ৩২খানি ছবির মধ্যে বহুধরনের বর্ণপ্রয়োগ করে নিসর্গ দৃশ্য, স্টিল লাইফ, গ্রামের চিত্র ইত্যাদি উপস্থিত করেছেন। কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে গিয়েছে। কিন্তু কাজের বাঁধুনি যথেষ্ট দৃঢ় নয়। কোথাও কোথাও এক একটি রঙকে প্রধান করে ছবি তৈরী করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও কোথায় যেন হারমনির একটা অভাব রয়ে গিয়েছে। কয়েকটি ফুলের ছবি দেওয়ালের কাগজের রূপ নিয়েছে।

শ্যামল লাহিড়ী কিছুদিন কলকাতার সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে এবং পরে দিল্লীর সারদা উকিল বিদ্যালয়ে কাজ শেখেন; বর্তমানে দিল্লীতেই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর টেলিভিশন বিভাগে কাজ করছেন। অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনীর ৩০খানি ছবি ও বাটিকের কাজে নব্যভারতীয় প্রথার কাজ করার দিকে তাঁর ঐকান্তিক আকর্ষণের নিদর্শন দেখা গেল। তাঁর কাজে সারদা উকিল, অসিত হালদার প্রমুখ শিল্পীদের প্রভাব অনেকখানি। ড্রয়িং এবং ওয়াশ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বিষয়বস্তু হিসেবেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পৌরাণিক কাহিনী বা কোন রোমান্টিক বিষয় চিত্রিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণ এবং বালকৃষ্ণ নিয়ে দু'-একটি ছবি চমৎকার লাগল। তাছাড়া নব্য-ভারতীয় রীতিতে একটি শিশু ও এক বৃদ্ধের মুখমণ্ডল অনেকখানি সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে তিনি চিত্রিত করেছেন। বাটিকের মাধ্যমে যে কয়েকটি চিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যেও এই রীতি পরিস্ফুট করবার দুরূহ চেষ্টা করা হয়েছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে বাটিকের মধ্যে টোনের আভাস সুন্দরভাবে ফোটান হয়েছে। বাটিকের একটি প্রতিকৃতি ও একটি রমণী মূর্তি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

●

সন্তোষকুমারী রোহাতগী ৭নং চৌরঙ্গীতে তাঁর ২০নং সুইটে ২০ খানি বাটিক চিত্রের প্রদর্শনী করেন।

বাটিকের ডেকরেটিভ কাজ শ্রীমতী রোহাতগীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তাই তিনি বাটিক মাধ্যমে নিসর্গ দৃশ্য ফিগার স্টাডি ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্যের কাজ যেমন "সেননদী", "স্প্যানিশ ব্যালকনি" "গুলমার্গ" ইত্যাদি ছবিতে বেশ একটা হাল্কা জল রঙের কাজের আমেজ এসেছে। ফিগারের কাজের মধ্যে "পেনসিভ" ছবির পোষ্য কোলে দণ্ডায়মান রমণী বেশ সুন্দর কাজ, এ ছাড়া দু একটি মুখমণ্ডল সুপরিকল্পিত কাজের নমুনা হিসেবে উল্লেখ করবার মত।

সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার

সংগীত নাটক আকাদেমীর 'সাধারণ পর্ষৎ ১৯৬৮ সালের আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের নাম ঘোষণা করেছেন। এবার আকাদেমীর ফেলোশিপ পেয়েছেন কালীচরণ পট্টনায়ক। যাঁরা সংগীতে পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁরা হলেন মুস্তাক আলি খাঁ, আলাতুর শ্রীনিবাস আয়ার, কে এস নারায়ণস্বামী, শ্রীমতী মনুভাই কুর্দিকর, নাটকে পুরস্কার পাচ্ছেন বাদল সরকার (বাংলা), মোহন রাকেশ (হিন্দী), যশোবন্ত থাকার (গুজরাটি), ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড়)। নৃত্যে পাচ্ছেন শ্রীমতী কমলা, শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী, কুরিচি কুঞ্জন পানিকর ও চিন্তা কৃষ্ণমূর্তি। খুব শিগ্‌গিরই সপ্তাহব্যাপী এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপরোক্ত শিল্পীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে। রাষ্ট্রপতি এ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

উদয়শংকর কালচারাল সেন্টারে রুমানিয়া নৃত্যশিল্পী

রুমানিয়ার সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী ইউগেনিয়া পান্কু জাজেথ্ সম্প্রতি তাঁর ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক সফর সমাপ্ত করে উদয়শংকর কালচারাল সেন্টারে এসেছিলেন। খ্যাতনামা ব্যালে শিক্ষক থেরাম্ পপ্‌সু জাজেজ-এর অবদানে ইনি যত্ন করেছেন প্রগতিশীল পদক্ষেপ সহযোগে এক নতুন আঙ্গিকসম্ভার। রুমানিয়া লোকনৃত্যের উজ্জ্বলতা ইনি বৃদ্ধি করেছেন। অতএব সৃষ্টিশীল শিল্পী হিসাবে উদয়শংকরের নিও-ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যধারার প্রতি এঁর আকর্ষণ থাকাটাই স্বাভাবিক।

'আপনি কি কথক, কথাকলি, মণিপুরী ভারতনাট্যম ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ নৃত্যের কিছু দেখতে চাইছেন? সবিনয়ে বিদেশিনী অতিথিকে প্রশ্ন করেন শ্রীমতী শংকর।

'না, না—উত্তর ভারত ভ্রমণকালে ওসব জিনিস প্রচুর দেখেছি। এখানে এসেছি শংকরের নৃত্যধারার সংগে পরিচিত হতে।' শিল্পী উত্তর দিলেন।

'তথাস্তু'। নাচ সুরু হওয়ার আগে শ্রীমতী শংকর উদয়শংকরের 'আইডিয়া ব্যাখ্যা করলেন। অর্কেস্ট্রা অথবা গুণী শিল্পীদের জন্য রচিত সংগীতের জন্য শংকর সম্প্রদায়ের খ্যাতি পৃথিবীময়। কিন্তু একটা খবর অনেকেই জানেন না যে, স্বরলিপি-নিবন্ধ সংগীতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও শংকরের ধারণা যে কোন শব্দই নৃত্যসংগীত হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতিতে নৃত্যছন্দ সদা প্রবহমান। এই ছন্দটি আমরা খুঁজে বার করে আমাদের অন্তরজাত স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দের সংগে মেলাবার চেষ্টা করি।' উদাহরণরূপে ঃ—কাছেই একটা টেবিলের ওপর শ্রীমতী শংকর বেশ কয়েকটি টোকা দিয়ে, ৫।৬ জন ছাত্রীকে একটি নৃত্যদল সৃষ্টি করে. ঐ শব্দের সংগে লাগসৈ অর্থাৎ 'যা প্রাণ চায়' তেমনি করে নাচতে বললেন। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই তাঁদের ঐ টোকার সংগে দেহছন্দ মিলিয়ে মনোহর-ভঙ্গীতে পদক্ষেপ চাউনী ও দেহভঙ্গীর রূপান্তর মুগ্ধ হয়ে দেখার মত।

তারপরই একটা ঘন্টা নিয়ে খেলাচ্ছলে বাজাতে সুরু করে আর এক দলকে বললেন, 'তোমরা কিছু কম্পোজ করো।'

আরও পাঁচটি মেয়ে দেহের উর্দ্ধাংগ দ্রুত সঞ্চালনে কল্লোচ্ছলা নদীরূপের ছন্দময় চিত্ররচনা করে দিলেন।

এইভাবে বিভিন্ন শব্দের অনুসরণে বিভিন্ন দলের টুকরো টুকরো নাচের একত্র সমাবেশ ঘটতেই সৃষ্টি হোল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক ব্যালে।

'এই হোল শংকরের নাচ'—অতিথির দিকে চেয়ে হেসে বললেন শ্রীমতী শংকর।

'আই হ্যাভ নেভার সীন নাচ বিউটি-ফুল ডানসারস—আই উইল নেভার ফর-গেট্, নেভার নেভার।' আবেগে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীমতীকে জড়িয়ে ধরে বললেন ইউগেনিয়া।

তারপর ওদেরই একজনকে রুমানিয়া নাচ শেখাবার জন্য ডাকলেন। সেই নাচে ধীরে ধীরে অন্যান্যরা যোগ দিলেন।

'এ মেয়েটির নাম কি? ভারী সুন্দর নাচে ত।' —শ্রীমতী শংকর সলজ্জমুখে নীরব।

'ঐ ত মমতা শংকর। অমলাদির মেয়ে'—ছাত্রীরা সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে।

'ওঃ তাই এমন প্রতিভাময়ী। কন-গ্রাচুলেশনস অমলা।' বলেই বিদেশিনী প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা তুমি শংকরের সংগে এবার ট্যুরে গেলে না কেন?'

'আমরা কাজ ভাগ করে নিয়েছি। উনি যখন ভারতীয় নৃত্যের প্রতিনিধি হয়ে বিদেশ পর্যটনে রত, আমি তখন ওঁরই নৃত্যচিন্তা অনুসরণ করে শিল্পী তৈরীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছি। শংকরের শিল্প ত এঁদের মাঝেই বেঁচে থাকবে। সবাই যদি মঞ্চশিল্পী হতে চায় নেপথ্যে প্রস্তুতির দায়িত্ব নেবে কে?'

—'ঠিক কথা—তুমি শংকরের যোগ্য সহধর্মিণী।'

উজ্জ্বল চোখে শ্রীমতীর দিকে চেয়ে বললেন বিদেশিনী।

রুমানিয়া নাচ শিক্ষা দিচ্ছেন শ্রীমতী ইউগেনিয়া

মেয়রের ত্রাণ ভান্ডারের সাহায্যার্থে রবীন্দ্র সদনে শিল্পী সংসদের বিচিত্রানুষ্ঠান।

বিদেশীর চোখে বাঙলা ছবি

●

ভদ্রলোকের জন্ম ফ্রান্সে, বসবাস করেন কানাডায়। একজন যেসুইট (এস, জে) হিসেবে ভারতে এসেছেন কিছুদিনের জন্যে। ক্যাথলিক বিশপরূপে ধর্মীয় শিক্ষাদান ছাড়াও একটি মিশনারী স্কুলে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন—চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ উপলব্ধি করা সম্পর্কেও ছাত্রদের মধ্যে স্পেশ্যাল ক্লাশ মারফত নিয়মিতভাবে শিক্ষা বিতরণ করেন। সিনেমাকে ভদ্রলোক ভালোবাসেন, প্রচুর ছবি দেখেন—ইংরাজী, বাঙলা এবং কিছু কিছু হিন্দীও। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স'ও পড়ে এসেছেন। ভদ্রলোকটির আরও গুণ আছে। ভদ্রলোক চমৎকার বাঙলা জানেন—লেখেন, পড়েন এবং বলেন। এবং বাঙলা ছবির নিয়মিতভাবে সমালোচনা করেন ইংরাজী ভাষায় "দি হেরাল্ড" নামক সাপ্তাহিকে। সমালোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তীক্ষ্ণ—বাঙলা ছবি সম্বন্ধে ভদ্রলোকের দৃষ্টিভঙ্গীর বেশ পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় ওদের মধ্যে।

"আদ্যাশক্তি মহামায়া" সম্পর্কে তিনি বলেছেন, পুরাণ ও ধর্মের সংগে সংস্রবহীনতার নিখুঁত নিদর্শন। এতে ভক্তিকে দেখানো হয়েছে পুরোপুরি ভাবপ্রবণতা বা আবেগরূপে। গানগুলি আনন্দদায়ক, কিন্তু ভক্তির পথে উদ্বুদ্ধ করে না। সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে, মহামায়ার চরিত্রচিত্রণ; চরিত্রটিকে এমনই পৃথিবীঘেঁষা করা হয়েছে যে, অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরিকত্বের ধারেকাছে যায় না। এ-চরিত্র মহাশক্তি কোন্‌খানে?

"বাঘিনী" কাহিনীর কিছুটা চিত্র-সম্ভাবনা ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। "এই ছবিতে একটি যুবকের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে; দুধরনের ভালোবাসা দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু ছবিটির সমগ্র উৎকর্ষ কেন্দ্রীভূত হয়েছে সৌমিত্রর চমৎকার অভিনয়ে—যেসব ছবিতে উত্তম-কুমার বা সৌমিত্র অবতীর্ণ হন, সেই সব ছবিতে প্রায়ই এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি স্পষ্ট যে তীব্র নাটকীয়তায় সৃষ্টি হতে পারত, ছবির মতো ছবিটি

ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর, গোবিন্দচন্দ্র দে, বিকাশ রায়, সুপ্রিয়া দেবী, উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অমলাশঙ্কর, নন্দিতা বসু, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, শিবানী বসু, বিদ্যা রাও, রোমি চৌধুরী সুলতা চৌধুরী কল্যাণী ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ, উৎপলা সেন, বেবী গুপ্তা, মান্না দে, তরুণকুমার ও নিমু ভৌমিক। ফটো : অমৃত।

গানকে জোর করে ঢুকিয়ে সেই নাটকীয় তীব্রতাকে যথেষ্ট জোলো করা হয়েছে।" এর পরে তিনি লিখেছেন, "দুর্গাকে বাঘিনী বলে ডাকা হলেও আসল বাঘিনীর সঙ্গে তার মিলন খুবই কম। এবং চিত্রটির আবেদন অতি সামান্য। বারবনিতা গৃহের নাচটিতে যৌন আবেদন পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলা যায়নি। দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারে মেয়ের ছবি সোজা ভাষায় ন্যক্কারজনক।"

"বালুচরী" সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, এটি একটি আর্ট ফিল্ম নয়; নিজেকে আর্ট ফিল্ম বলে জাহিরও করেনি ছবিটি।........ তবে আর্ট ফিল্ম না হলেই যে কোনো ছবি অপ্রয়োজনীয় হবে, এমন কোনো কথা নেই। ছবির একটি সামাজিক ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকার দুটি রূপ আছে : এক, আনন্দ বিতরণ করা; দুই, শিক্ষাদান করা। ......'বালুচরী'র আছে প্রমোদাত্মক ভূমিকা। কিন্তু ছবিটি কি চিত্তবিনোদক? ব্যক্তিগতভাবে ছবিটিকে আমার একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর লেগেছে।

একটি মেয়ে তার দুবোন এবং একমাত্র ভাইয়ের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে নিজের সুখ ও ভালোবাসাকে বিসর্জন দিল।

আদর্শবাদ সাধারণত অনিষ্টকর নয়। অবশ্য বাস্তবের সংঘাতে এই আদর্শবাদ খুব শিগ্‌গিরই স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই মেয়েটির প্রতি সমবেদনা বোধ করতে করতে এমন সময় আসে, যখন দর্শক নিজের প্রতিই সমবেদনা বোধ করে।

একটি যুবক ইঞ্জিনীয়ারিং (বি, ই) পাশ করে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করল। প্রতিষ্ঠানের মালিক ছেলেটির বিদ্যেবুদ্ধির বহর দেখে তার প্রতি এমনই প্রসন্ন হলেন যে, তাকে চাকরী তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের একমাত্র কন্যা এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বও তার ওপর অর্পণ করলেন। ব্যাপারটা এমনই আজগুবি যে, কোনো যুবকই তার অদৃষ্টে এমন সুযোগ আসতে পারে বলে বিশ্বাস করতে চাইবে না।

ছবিটি আর্ট নয়, শিক্ষাও নয়, প্রমোদ উপকরণও নয়। তাহলে কি?

চৌরঙ্গী" ছবিখানি সম্পর্কে ভদ্রলোক লিখেছেন : অধিকাংশ ভারতীয় ছবিই আর্ট ফিল্ম নয়। তবু ওদেরই মধ্যে যদি কোনো একখানি কিছুটা ভব্য ও মার্জিত হয়, তাহলে ছবিখানিকে 'আর্টিস্টিক' বা শিল্পীজনোচিত আখ্যায় ভূষিত করা হয়। কিছুটা সাধারণ শিষ্টাচারের কথা বাদ দিলে এই গুণটিকে সোজা ভাষায় হয়, কৃত্রিমতাহীনতা আর নয়ত, ধোঁকাবাজীর পর্যায়ে ফেলা যায়।

'চৌরঙ্গী'তে দেখানো হয়েছে প্রচুর, কিন্তু বক্তব্য আছে সামান্যই। যদি ছবিটির সঙ্গে কিছুটা একাত্ম হতে পারা যায়, তাহলে ছবি দর্শকের মধ্যে আবেগ জাগাবে : তিনি নিশ্চয়ই হাসবেন, কখনও হয়ত কাঁদবেনও।

কিন্তু 'চৌরঙ্গী' এর নির্মাতাদের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলে না, ছবিতে যে-সব চরিত্র, ঘটনা এবং স্থান তাঁরা দেখিয়েছেন, তাদের সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরা কি অনুভব করেন, তা ছবিটি থেকে জানতে পারা যায় না। [illegible] ছবি তৈরীর কৌশল যাদেরই জানা আছে, তাদের যে-কেউই [illegible] তৈরী করতে পারত। ছবিটিতে [illegible] অন্তর্নিহিত ভাবনা বা ভালবাসা বা [illegible] কোনো প্রেরণা-জাগানো ঐক্য [illegible] হয়নি। ছবিটি অপেক্ষাকৃত ছোট হতে পারত, আবার বড়োও হতে বাধা ছিল না। [illegible] এরোপ্লেন দীর্ণ হয়ে সুজাতার মৃত্যু না দেখালেও চলত, আবার শংকর ও রোজির মধ্যে একটি বিবাহ ঘটানো যেতে পারত এবং শেষ পর্যন্ত রোজিকে, ধরুন একটি পরিবর্তনের খাতিরে—বন্যায় প্রাণ হারাতে দেখালেও চলত।

—এই হচ্ছে বাঙলা ছবি সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনার নিদর্শন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলি কিন্তু তাঁকে অভিভূত করে। শ্রীরায়ের আগামী চিত্র "গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েন" সম্পর্কে তিনি খুবই আশান্বিত। বাঙালী সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনযাত্রা প্রণালী ভদ্রলোকটির কতদূর জানা আছে এবং বাঙালী জাতির বিশেষ মেজাজ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান কতখানি, তা জানবার অবকাশ পাইনি। সাধারণ বাঙলা ছবি যে তাঁকে বিশেষ খুশী করে না, তা তাঁর সমালোচনাগুলি থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না। একি তাঁরই দৃষ্টি-ভঙ্গীর দোষ, না আমাদের সাধারণ ছবি-গুলিরই অন্তর্নিহিত দোষ, এ প্রশ্ন না তোলাই বোধ করি সমীচীন হবে।

চিত্র-সমালোচনা

মাঝে মাঝে এমন কিছু হিন্দী সিনেমায় দেখা মেলে যাকে এক কথায় হয়তো অপূর্ব বলা চলে না, কিন্তু উপভোগ্য বলা চলে নিঃসন্দেহে। রূপালোক চিত্রের 'নীলকমল' অনেকটা সেই জাতের। এ-ধরনের কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও [illegible] কাব্য, [illegible] নাচের দৃশ্য, [illegible], ক্যামেরার কৃতিত্ব এবং একাধিক [illegible] দৃষ্টির সার্থক [illegible] 'নীলকমল' হয়ে উঠেছে উপভোগ্য। অবশ্য এ-কথা মেনে নেওয়া দরকার যে, 'নীলকমল' দেখতে দেখতে অনেকেরই একাধিক ভারতীয় ছবির কথা মনে পড়বে। ক্ষুধিত পাষাণ, মহল-ই শুধু নয়, আরো কয়েকটি চিত্রেরও কোন কোন দৃশ্য ভেসে উঠবে। এক আদর্শ প্রেমিকের অতৃপ্ত আত্মার যুগ যুগ ধরে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত দয়িতা-সদৃশ নারীর পিছনে ঘুরে বেড়ানো এবং তার ফলে এক আধুনিক যুবতী স্ত্রীর সাজানো সংসার কেমন তছনছ হয়ে গেল তারই চিত্রভাষ্য নীলকমল।

রাজদরবারের ভাস্কর চিত্রসেন ভালো-বেসেছিল নীলকমলকে। সে রাজকুমারী। ফলে ক্রুদ্ধ রাজা ভাস্করকে জীবন্ত কবর দিয়ে তার উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন। এই নীলকমলই বহু বছর পরে আধুনিকা সীতা। সম্ভাব্য এক রেল-দুর্ঘটনায় মৃত্যু থেকে সীতাকে রক্ষা করে রাম। সুপুরুষ। যুবক। বিত্তবান। এরই সঙ্গে সীতার বিয়ে। ঘরে শাশুড়ি আর ননদ। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে সে শুনতে পায় চিত্রসেনের কণ্ঠস্বর। ভেসে আসে গান। 'আ জা...'। চনমন করে ওঠে সীতা। বাইরে বেরোয়। রাত। এমনি করেই সময় ঘুরছে। শাশুড়ি-ননদের চোখ এড়ায় না। সন্দেহ। চরিত্র-ভ্রষ্টার অপবাদ। রাম কিন্তু প্রথমদিকে আমল দেয়নি। ঘটনাচক্রে তারও বিশ্বাস হল। সীতা ঘরছাড়া। ঘটনার আবর্তে ভুল বোঝাবুঝির অবসান।

সুন্দর অভিনয় করেছেন সীতার ভূমিকায় ওয়াহিদা রেহমান এবং তার বাবার ভূমিকায় বলরাজ সাহনি। স্নেহকাতর এক নির্বিরোধী পিতার [illegible]-আবেগ—সবকিছুই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। মনোজকুমার ও রাজকুমারের অভিনয় আদৌ রেখাপাত করেনি। বড্ড স্টিফ মনে হয়েছে। বরং মেহমুদ, ডেভিড, ললিতা পাওয়ার, শশিকলা যথাযথ অভিনয় করে-ছেন। মেহমুদ হাসিয়েছেন প্রচুর।

ক্যামেরার কাজ উঁচুদরের। গানগুলি সুগীত। পরিচালনা তৃপ্তিদায়ক।

মঞ্চাভিনয়

শর্মিলা : স্টার থিয়েটার-এর নিবেদন; রচনা ও নির্দেশনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত; সঙ্গীতপরিচালনা : কালীপদ সেন; গীত-রচনা : রবীন্দ্রনাথ ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; দৃশ্যপরিকল্পনা এবং আলোকসম্পাত; রূপায়ণ : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, তাপস চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, অশোকা দাশগুপ্ত, আশা দেবী প্রভৃতি। গেল ২৪ অক্টোবর, ১৯৬৮, বৃহস্পতিবার থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবিবার ও ছুটির দিনে অভিনীত হচ্ছে।

বাঙলাদেশের সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যময় সাধারণ রঙ্গালয় "স্টার থিয়েটার"-এর আধুনিকতম নাট্যনিবেদন, দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত "শর্মিলা"র কাহিনীর গড়ে উঠেছে বর্তমানকালের কলকাতা শহরের এক হঠাৎ বড়লোকের পরিবারকে ঘিরে, যে-বড়লোকের অর্থাগম হয় প্রধানত কালোবাজারের সুড়ঙ্গ পথে। স্বভাবতই পরিবারটি রক্ষণ-শীল নয়। তাই ধনী সুরজিৎ সরকারের তিন ছেলে ইন্দ্রজিৎ, বিশ্বজিৎ ও প্রসেনজিৎ বিবাহ করেছে যথাক্রমে মাদ্রাজী শুভলক্ষ্মী, ব্রাহ্মণকন্যা সুপর্ণা ও খাস বিলিতী মেম মেরী লরেন্সকে। আর একমাত্র মেয়ে শর্মিলা তার গৃহশিক্ষক সমীরণের সঙ্গে মন-দেওয়া-নেওয়া চালাচ্ছে পড়ার টেবিলে বসে। বাপের টাকার আমদানীরও যেমন হিসেব নেই, ছেলেদের খরচের হাতও তেমনই দরাজ—কালো টাকার সম্পত্তি নইলে হয় কি করে? কিন্তু এ অবস্থা চলল না বেশী দিন। সুরজিৎ সরকারের কালো টাকার ওপর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কালোছায়া পড়ল অতর্কিতে; ব্লাডপ্রেসারের রোগী সুরজিৎ সে ধাক্কা সামলাতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদায় হল অসৎপথে উপার্জিত সম্পদের অনেকখানি। গোড়া থেকেই উন্নাসিক মেজবৌ সুপর্ণার কথাবার্তা, চালচলনে সংসারে অশান্তির হাওয়া বইছিল। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে যাওয়ায় তিনি অসহনীয় উগ্র মূর্তি ধারণ করলেন; কারণ তাঁর আসল ভালোবাসা অর্থের প্রতি। ভাইয়েদের কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় মা-সর্বানী ও বোন শর্মিলা। কিন্তু সমীরণের সহায়তায় শর্মিলা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেমন করে ভাইয়েদের মধ্যে থেকে অশান্তি এবং অবিশ্বাসের হাওয়া দূর করে দিয়ে সরকার-পরিবারকে আবার অনুকূল হাওয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবার পথ দেখায়, তাই নিয়েই নাটকের শেষ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি।

"শর্মিলা" নাটকে চিত্রও আছে, চরিত্রও আছে। বড়বৌ, মাদ্রাজী মেয়ে শুভলক্ষ্মীর চরিত্র যেমন আমাদের সহানুভূতি নিংড়ে নেয়, মেজবৌ, বাঙালী ব্রাহ্মণকন্যা সুপর্ণার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচার ব্যবহার ঠিক তেমন-ভাবেই আমাদের মনকে তার ওপর বিরূপ করে তোলে। সুরজিতের বন্ধু সনাতনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রীত করে। বৃদ্ধের ছদ্মবেশে সমীরণের শর্মিলাকে পড়াতে আসা নিশ্চয়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এর ওপর আছে হাবা-সাজা ভৃত্য ভোমলা ও বালবিধবা পরিচারিকা চামেলীর হাস্য-পরিহাসময় প্রেমের উপভোগ্যতা।

আধুনিক শহুরে পরিবারের কাহিনী অবলম্বনে "শর্মিলা" নাটকটি কিন্তু গড়ে উঠেছে বাঙলা সামাজিক নাট্যরচনার সনাতন পন্থায়; এ ব্যাপারে নাট্যকার দেবনারায়ণ

...ন্তে গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত রীতির একান্ত অনুগামী। এ রীতিতে মানুষ অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্রগুলি ঘটনার দাস, তারা ঘটনার সৃষ্টি করে না। পরস্পরের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ চরিত্রাবলীর মনোবিশ্লেষণের ফলে একটি নাটকীয় বিস্ফোরণ এই রীতির নাটকে ঘটে না, এতে ঘটনার সাহায্যে আবর্তের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ দর্শক যে গিরিশ-পন্থী নাটকের সবিশেষ পক্ষপাতী, এ-কথা অভিজ্ঞ নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত বেশ ভালোভাবেই জানেন। নাটকের পৃষ্ঠপোষকেরাই নাট্যরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, কবি-সমালোচক ড্রাইডেন-এর এই প্রসিদ্ধ উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তিন অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকটির প্রথম অঙ্কটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্থায়ী একটিমাত্র দৃশ্যে সমাপ্ত। বাকী দুটি অঙ্কে আছে যথাক্রমে সাত ও চারটি দৃশ্য। প্রতিটি দৃশ্যই পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত।

উপস্থাপনা এবং অভিনয়গুণে 'শর্মিলা' হয়ে উঠেছে একটি অত্যন্ত উপভোগ্য নাট্যবস্তু। শ্রীগুপ্তের নির্দেশনায় সমস্ত নাটকটি একটি সুরে বাঁধা; প্রতিটি শিল্পী করেছেন আন্তরিক সু-অভিনয়। নবাগতা বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুমধুর বাচনের সাহায্যে শান্তিনিকেতনে পড়া মাদ্রাজী মেয়ে শুভলক্ষ্মীকে যেমন মূর্ত করে তুলেছেন, উন্নাসিক, স্বার্থান্ধ, অর্থপরায়ণ বজবো সুপর্ণাও তেমনই জীবন্ত হয়ে উঠেছে নীলিমা দাসের বলিষ্ঠ ঋজু অভিনয়ভঙ্গিমার মাধ্যমে। আধুনিক পরিবারভুক্ত সহৃদয় শিক্ষিতা মেয়ের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় অভিনীত শর্মিলা। মেরী লরেন্সরূপে জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে মানিয়েছে চমৎকার; তাঁর ইংরাজী বাচন আর একটু স্পষ্টভাবে শ্রুতিগ্রাহ্য হওয়ার অবকাশ আছে। পাড়া-গাঁয়ে দিদিমার ভূমিকায় আশা দেবী চমৎকার। পরিচারিকা চামেলীবেশে গীতা ...। ভোমল বেশী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ...ঙ্গে অফুরন্ত উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছেন। পিতা ও তিন পুত্ররূপে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রমাংশু বসু ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ভূমিকা-নুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন। শ্যালক ও ...পিনপতিবেশে নবাগত শুভেন্দু চট্টো-পাধ্যায় ও শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শক-মনে বেশ একটি ছাপ রাখতে পেরে-ছেন। অপরাপর ভূমিকায় অপর্ণা দেবী (...র্বাণী), অশোকা দাশগুপ্তা (সৌদামিনী), শ্যামল ভট্টাচার্য (শ্রীরাজগোপালন), ...হা (ঝুনঝুনওয়ালা) প্রভৃতি সবিশেষ ...থ্য অভিনয় করেছেন।

নাটকে দুখানি গান আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত "বসন্তে [illegible] [illegible]" [illegible] বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং পুলক বন্দ্যো-পাধ্যায় রচিত "জাল ফেলেছে মায়াবিনী" গানখানি গেয়েছেন তাপস চট্টোপাধ্যায়। দুটি গানই সুগীত।

সাধারণ নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দের কাছে পরম উপভোগ্য স্টারের নবতম নিবেদন "শর্মিলা" ইতিমধ্যেই অসাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

●

পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থার দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ২১ অকটোবর মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁদের নতুন নাটক 'কল্পাবপাদ নাটক' মঞ্চস্থ করেন। শ্রীকুইকসেটিক বিরচিত এই নাটক প্রচলিত নাট্যরীতির বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। বাংলা রংগমঞ্চে গতানুগতিক নাটক এবং নতুন রীতির নাটকের যে দুটি ধারা চলছে এই নাটককে এই দুই ধারার কোনটিরই অন্ত-র্ভুক্ত করা যায় না। নাটকটির একটি মূল কাঠামো থাকলেও কোনও নির্দিষ্ট কাঠা-মোর মধ্যে নাটক অগ্রসর হয় নি। এই নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলাদেশে প্রগতি নাট্য-আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থা। দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের ফলে নাট্যকারের মূল বক্তব্য তাঁরা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

বি পি ড্রামাটিক গ্রুপ (... পটারীজ লিঃ ... ...)এর [illegible] গত ৬ই [illegible] [illegible] [illegible] বার্ষিক [illegible] [illegible] [illegible]।
এই [illegible] [illegible] [illegible] রচিত "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] গ্রুপের [illegible] [illegible] [illegible] হিসাবে [illegible] [illegible]।

সর্বশ্রী [illegible] [illegible] সুদীপ্ত ঘোষ, [illegible] [illegible] অলোক ঘোষ [illegible] [illegible]। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় [illegible] সর্বশ্রী গোকুলচন্দ্র [illegible], [illegible] [illegible], ডি পি সেন, অমিত [illegible], [illegible] মূত্র, বিমলা ভ্যাটার্জি, [illegible], কালীদাস কর, সুনীল মজুমদার, [illegible]

শর্মিলা নাটকে জ্যোৎস্না বিশ্বাস

সোম, অনাদি সিংহ, শম্ভু চৌধুরী, অহীন্দ্র মণ্ডল, জয়শ্রী কর এবং সুপর্ণা চ্যাটার্জি। নাটক পরিচালনা করেন শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত।

লাইফ রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত শক্তিপদ রাজগুরু রচিত বাঁশ বেগম নাটকটি আসছে পয়লা ডিসেম্বর রবিবার লাইফ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেডের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে সন্ধ্যায় অভিনীত হবে। ডাঃ রথীন পাল নাটকটি পরিচালনা করবেন ও অভিনয়াংশে থাকবেন ননী মিত্র, প্রভাত দাঁ, পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, জগদীশ দাস, শংকর মিত্র, মিতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা নাগ, মীরা বসু ও পরিচালক নিজে।

১৬ নভেম্বর শিবাজী সংঘের সদস্যরা সিকদার পাড়ায় দীপ্তিকুমার শীল রচিত 'উত্তম পুরুষ' নাটকটি পুনরভিনয় করলেন। নাট্যকার হাসির সংলাপের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের চলমান মানুষের মনের কথা তুলে ধরেছেন। নাটকীয় সংলাপ ও শিল্পীদের দলগত অভিনয় সেদিনের প্রতিটি দর্শক বেশ তৃপ্তির সংগে উপভোগ করেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ বিমল চন্দ্র, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম সরকার, অশোক চন্দ্র, প্রশান্ত মজুমদার, মিহির চন্দ্র, ব্যোমকেশ ঘোষ, মদন মজুমদার, দিলীপ বসাক ও দীপ্তিকুমার শীল। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির পরিচালক ছিলেন।

গত ১২ নভেম্বর স্টার মঞ্চে উত্তর কলকাতার নাট্যসংস্থা যাযাবর কর্তৃক শচীন সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করে। সুনীতিকুমার দাসের পরিচালনায় এর নতুন করে নাট্যরসের আস্বাদন পেলাম। তটিনী ও বসন্তের ভূমিকায় যথাক্রমে শিপ্রা সাহা ও অরুণকুমার সেনগুপ্তের সাবলীল অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ডাঃ ভোসের চরিত্রে রূপদান করেছিলেন পরিচালক স্বয়ং। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দান করেন পূর্ণেন্দু চৌধুরী, মিহির সরকার, পূর্ণ শীল, নিলু দাশগুপ্ত, চিত্রিতা মণ্ডল, বেলা রায়, ঊষাবতী প্রভৃতি।

গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক ১৬ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটি অভিনীত হয়। দলগত সংহতি, শিল্পীদের অভিনয় কুশলতা মিলে নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। নাম-ভূমিকায় শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় গৌরচন্দ্র পাল, সতীশ দত্ত, শৈলেন্দ্র ব্যানার্জি, অনিল ঘোষ, সুব্রত দাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সলিল নিয়োগী, মদন সাবুই, ফণি কড়ুরি, ধীরেন চক্রবর্তী, সমীর ব্যানার্জি, প্রদ্যোৎ বসাক প্রভৃতির অভিনয় প্রশংসনীয়। নাট্য নির্দেশনায় সতীশ দত্ত ও সংগীত নির্দেশনায় গোপালচন্দ্র গোস্বামী কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সুরাঙ্গন-এর ছাত্র ছাত্রী এবং কর্মিবৃন্দ, সংস্থার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো' বাংলায় অভিনয় করলেন রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। ওথেলোর মত দুরূহ নাটক অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপনা করা প্রশংসার্হ। এক্ষেত্রে সুরাঙ্গন-এর সামগ্রিক প্রযোজনার মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং দলগত অভিনয় ঐক্য অনুষ্ঠানটিকে মনোরম করে তুলেছিল। স্বর প্রক্ষেপণে কয়েকটি শিল্পীর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তিগত অভিনয়কে প্রাধান্য না দিয়ে দলগত অভিনয়-মানকে উন্নত করায় যাঁরা অবশ্যই অভিনন্দন কুড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী প্রবীর ঘোষ, প... চক্রবর্তী, দিলীপ ভট্টাচার্য, অজয় ঘো... সুজিত কর, রবীন সেন, অপূর্ব ভট্টাচা... লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোরাজ, রমেন ঘো... ইন্দ্রাণী গোস্বামী, শুভ্রা শীল ও ... ভৌমিক। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত নাটকের মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়েছে। মঞ্চ ... রূপসজ্জা নিঃসন্দেহে শিল্পসম্মত। নাটকটির সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ গেল দু'বছরে দু... পূর্ণাংগ নাটক : 'কালিন্দী' ও 'ছায়ায় আলো' এবং এ বছরে দুটি একাংক নাটক 'জ...' ও 'ভিয়েতনাম' মঞ্চস্থ করার পর এবার একটি দুঃসাহসিক প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। বিশ্ব-বিখ্যাত নাট্যকার বার্টল্ট ব্রেশ্‌ট্ রচিত সেন্ট জেয়ান অব স্টকইয়ার্ডস

জীবন সংগীত / অনিল চট্টোপাধ্যায় ও রত্না ঘোষ

...অজিত গঙ্গোপাধ্যায় কৃত বাংলায় ...তর হবে থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর ...টি প্রযোজনা। আমেরিকার ফাটকা-...দের আসল চরিত্র উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে ... এই নাটকটি লেখেন। এই নাটকটিতে ...নীতির কতকগুলো জটিল বিষয় তুলে ...হয়েছে, যা কোন নাটকে এ পর্যন্ত ...বারনি।

...রেন্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পো-...এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পী-...সম্প্রতি 'স্টার' রংগমঞ্চে অমিলবরণ ...রচিত 'এ কি হোল' নাটকটি সার্থক-...মঞ্চস্থ করেছেন। সমাজ কল্যাণের ...াইন প্রণীত হয় তাকে প্রতিহত করলে ...ের সামগ্রিক রূপ বিঘ্নিত ও বিকৃত ... এই সত্যের পটভূমিকায় রচিত ...চ্য নাটকটির মঞ্চরূপায়ণে সেদিন ...ীরা আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে ...ছেন। এই প্রসংগে পরিচালক নির্মল ...টী সর্বাধিক প্রশংসার দাবী রাখেন। ...সৃষ্টিতে যাঁরা নৈপুণ্য দেখাতে ...ছেন তাঁরা হলেন—সুখময় দত্ত, মীনা ... মমতা চট্টোপাধ্যায়, মিস্ পলিন, ...প্রসাদ ভট্টাচার্য, সমীর চট্টোপাধ্যায়, ... ভাদুড়ী। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় ... বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ...োপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ... তরুণ বসু, কমল বসু, মুরলীমোহন ... নির্মল চক্রবর্তী, সতীপ্রসন্ন মুখো-...র, জ্যোতিভূষণ চৌধুরী, বিভূতি ...ক।

...ারুইপুরের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা ...দি ... থিয়েটার সাফল্যের সংগে শচীন ...র্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি মঞ্চস্থ ...। অভিনয়ে যাঁরা উন্নতধরনের বৈশিষ্ট্য ... করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে ...ন শংকর নন্দী (দেবব্রত), মায়া রায়-...রী (বহ্নি), প্রশান্ত রায়চৌধুরী, কৃষ্ণ-...শি, সঞ্জীব ঘোষ, স্বপন ভট্টাচার্য, ... দত্ত।

...উনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ...রী সমিতি (পার্কসার্কাস শাখা) ...দন আগে 'রঙমহল' মঞ্চে বীরু ...পাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক অভিনয় ...ান। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন ...কুসুম নাগ। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ ...কুমার দাস (হর্ষনারায়ণ), প্রশান্ত ...আদিত্য নারায়ণ), বিষ্ণু দত্ত (শংকরা-...), রাধাশ্যাম ব্যানার্জি (রঞ্জন), ...ভট্টাচার্য (নায়েব), রাজলক্ষ্মী দেবী ..., হিমানী গাঙ্গুলী।

...কিছুদিন আগে শিল্পীসংস্থার সদস্যরা ...ী নিবাস হলে সুনীলকুমার ঘোষের ... নাটকের অভিনয় পরিবেশন ...। সুঅভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন ... অংশ নিয়েছিলেন—সুশীল ঘোষ, ... বসু, পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়,

পিতাপুত্র/স্বরূপ দত্ত ও তনুজা। ফটো : অমৃত

সুখেন্দু মিত্র, সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস ঘোষ, সোমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ, ইন্দুকুমার মেহেরা, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, সবিতা সমাদ্দার, স্বপ্না মিত্র, বেলা দাস, অনুসূয়া মুখোপাধ্যায়।

লেক কমার্শিয়াল কলেজ প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র নাট্যরূপ পরিবেশিত হোল 'ত্যাগরাজ হলে'। নাট্যরূপ দিয়েছেন মন্মথ সরকার ও নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন অমর মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নাট্যরূপে অক্ষুন্ন থেকেছে এবং অভিনয়েও শিল্পসম্মত এক নতুন রীতির উপস্থিতি সেদিন লক্ষ্য করা গেছে। অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন 'অমিত' ও 'লাবণ্যে'র ভূমিকায় অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও মীনাক্ষী রায়। সিপ্রা চক্রবর্তী (কেটি) ও অঞ্জলি বাগচী (যোগমায়া)র চরিত্র-সৃষ্টিও প্রশংসার দাবী রাখে। আশুতোষ বড়ুয়ার আলোকসম্পাতে কল্পনাশক্তির নজীর মেলে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা শচীন ভট্টাচার্যের 'পাশের ঘরের ভাড়াটে' নাটকটি অভিনয় করলেন 'স্টার' রংগমঞ্চে। সুহৃদ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন—মনোজিত ঘোষ, অরূপ দত্ত, সুবল বসু, তরুণতপন বসু, প্রভাত বসু, শিশির রায়চৌধুরী, বীরেন মিত্র, মুরারী চক্রবর্তী, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত দাস, পরিতোষ মাইতি, মমতা চট্টোপাধ্যায়, ইরা মিত্র।

উত্তর কলকাতার জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা কেন্দ্রীয় সজ্ঞা উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে সম্প্রতি বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে শক্তিপদ রাজগুরুর 'মসনদ' নাটকটি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেন। এই উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থের ৫০১ টাকা মেয়র শ্রীগোবিন্দ দের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়।

নৈহাটির 'রূপ ও রংগ' এবারো একাংক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর।

দেশী ছবির খবর

পি এস পিকচার্স-এর বাস্তবধর্মী পারিবারিক ছবি "জীবন-সংগীত" আসছে সপ্তাহে শহর ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।

অর্থনীতির বন্ধু-বান্ধব স্বাস্থ্য পরিবৃত্ত এক ছন্নছাড়া বেকার যুবকের আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছবিতে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। নায়কের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় (মজুমদার) অভিনয় করেছেন এবং অন্যান্য চরিত্রে গীতা ঘোষ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন ও আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।

ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করেছেন এবং কণ্ঠসংগীতে আছেন তিনি নিজে ও মান্না দে।

অনেক দিন পর টালিগঞ্জের স্টুডিও-পাড়ায় আবার প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ খানা ছবির মহরৎ হয়ে গেলেও এতদিন মাত্র গুটিকয় ছবির কাজ ক্ষেত্রে হচ্ছিল। গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ানসে পুরো জোরেই কাজ হচ্ছিল। একটায় কাজ করছিলেন পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত সুচিত্রা সেন, পাহাড়ী সান্যাল, রুমি বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। আর একটায় কালাচাঁদের গলায় একটা গান রেকর্ড করা হল সেদিন। গানটি গেয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। চারু চিত্রের পতাকাতলে নির্মীয়মান এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন নির্মলকুমার ও উত্তমকুমার।

আরেকটা ফ্লোরে সেট পড়েছিল এক চিত্রকরের স্টুডিয়োর। ছবির নাম অনুরাধা পিকচার্সের 'বিলম্বিত লয়'। পরিচালনা করছিলেন কালোদা। সেটের শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার, তরুণকুমার, অসিতবরণ, সুপ্রিয়া দেবী ও আরও কয়েকজন। এন টি'র দু নম্বরে তখন চলছিল বিভূতি লাহার পরিচালনায় 'চিরদিনের' ছবির ব্যাক প্রোজেকশন। ওখানেও শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গীতবহুল প্রণয়মধুর কাহিনী ছবির মূল আখ্যান। নচিকেতা ঘোষ ছবিতে সুর দিয়েছেন। বছরে প্রায় দশ মাস যে স্টুডিওর তালা ঝোলে সেই ইন্দ্রপুরীতেও কাজ চলছিল গত সপ্তাহে 'পদ্মগোলাপ' ছবির। সেটে প্রধান শিল্পী ছিলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি। রাধা ফিল্ম স্টুডিও তো সেই কবে দীনেন গুপ্তের 'নতুন পাতার' নিকের কাজ হবার পর থেকে বন্ধ হয়েই পড়ে আছে। কেমন যেন একটা স্তব্ধতা রাধার চারদিকে।

কিন্তু কর্মচাঞ্চল্যের দিক থেকে ক্যালকাটা মুভিটোন একেবারে জমজমাট। ফাঁকা খুব কমই যায়। এইতো সোমবার থেকে এম জি প্রোডাকশনের 'দৃষ্টিদর্পণের' কাজ শুরু হয়েছে; তরুণ সাংবাদিক রঞ্জন মজুমদার এ ছবির পরিচালক, সুর দিয়েছেন শ্যামল মিত্র আর গান গেয়েছেন সুরকার নিজে ও আরতি মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা করছেন ভাইয়া ঘোষ।

কলকাতায় যে কত বাংলা ছবি আংশিক বা পূর্ণভাবে হয়ে স্টুডিওর অন্ধকারে পড়ে আছে তার একটা তালিকা দেখুন—সুধীর মুখার্জির 'আঁধার সূর্য', 'চৈতালী', আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিন ভুবনের পারে', সলিল দত্তর 'অপরিচিত', ইন্দোর সেন-এর 'প্রথম কদম ফুল', তপন সিংহের 'আপনজন', সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', জগন্নাথ চ্যাটার্জির 'দুরন্ত চড়াই', বিজয় বসুর 'আরোগ্য নিকেতন', হরিসাধন দাশগুপ্তর 'কমললতা', পীযূষ বসুর 'স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে', অজয় করের 'পরিণীতা', হীরেন নাগের 'চেনা অচেনা' ও 'সাবরমতী', অরবিন্দ মুখার্জির 'শীলা', মঞ্জু দে'র 'শজারুর কাঁটা', অরুন্ধতী দেবীর 'মেঘ ও রৌদ্র', সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ থেকে শুরু', তরুণ মজুমদারের 'রাহগীর', দীনেন গুপ্তর 'নতুন পাতা', অগ্রদূতের 'কখনো মেঘ', বিমল ভৌমিকের 'দিবারাত্রির কাব্য', গুরু বাগচীর 'তীরভূমি', সুশীল মজুমদারের 'শুকসারী', অজিত গাঙ্গুলীর 'দাদু', মঙ্গল চক্রবর্তীর 'আলেয়ার আলো', শিশুচিত্র 'পান্না হীরে চুণী', ও 'হীরের প্রজাপতি', দীপক গুপ্তর 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ও আরও প্রায় খান কুড়ি ছবি। এগুলোর মধ্যে হয়ত অনেক ছবিই শেষ হবে তবে বন্দীদশা কবে ঘুচবে তা কেউই জানে না—না প্রযোজক না দর্শক!

রবি বসুর পরিচালনায় মহিয়সী 'গৌরী মা'র জীবনালেখ্য চিত্রায়িত হচ্ছে 'গরীয়সী গৌরী' নামে। ভক্তিমূলক এ ছবিতে সুর সংযোজনা করেছেন অপরেশ লাহিড়ী ও বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী রায়, দীপ্তি রায়, মিতা মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা।

বসন্ত জোগলকরের নাম বম্বের চিত্রজগতে সুপরিচিত না হলেও অপরিচিত নয়। তবে তাঁর নতুন ছবি 'এক কালি মুসকায়ে' সারা দেশে আলোড়ন তুলবে এ বিষয়ে অনেকেই আশা প্রকাশ করছেন। নাটকীয় ঘটনা আর অতি নাটকীয় ঘনঘটায় এ ছবি তাকে পয়সাও দেবে সুনামও সঙ্গে সঙ্গে। প্রযোজনা ছাড়া জোগলকর এ-ছবি পরিচালনা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে আছেন জয় মুখার্জি, অশোককুমার, নিরুপা রায়, ললিতা পাওয়ার, মেহমুদ, ওমপ্রকাশ, নানা পলশিকর, সুন্দর ও নায়িকার ভূমিকায় নবাগতা মীরা। ছবিতে সুর সৃষ্টি করেছেন মদনমোহন রাজেন্দ্র কৃষ্ণের লেখা গানে। ছবিটা এ সপ্তাহে বম্বে মুক্তি পেল।

নির্মল পিকচার্সের পতাকাতলে শ্রীবিশ্বনাথপ্রসাদ শাহনাবাদী নতুন যে ছবির কাজ করছেন তার নাম 'রুঠ না করো'। ইস্টম্যান কালারে তোলা এ ছবির পরিচালনা, সংগীত, সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা, গীত রচনা বিভাগে আছেন যথাক্রমে সুন্দর ধর, সি রমাচন্দ্র, রাজ তলোয়ার, শান্তি দাস ও হযরত জয়পুরী। প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে এক অবিস্মরণীয় এ প্রেমের কাহিনী লিখেছেন পরিচালক নিজে। চরিত্রলিপিতে আছেন শশী কাপুর, নন্দা, রাজেন্দ্রনাথ, নাজ, লক্ষ্মীছায়া, অরুণা ইরাণী, সুলোচনা।

দেব আনন্দ পরিচালিত প্রথম ছবি 'প্রেম পুজারি' এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। এটির পরিচালনা ছাড়াও প্রযোজনা, কাহিনী রচনা ও নায়কের ভূমিকায় আছেন স্বয়ং দেব আনন্দ, ছবির নায়িকা হলেন ওয়াহিদা রেহমান। এ ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন জাহিদা, মদনপুরী, প্রেম চোপরা। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন শচীন দেববর্মন আর আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন ফলি মিস্ত্রী।

বম্বের এক বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীকে অনিল সরকার রচিত নির্মীয়মান অপরাধমূলক বাংলা ছবি "সূর্য পরশ"-এর জন্য চুক্তিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক খগেন রায় ২৭ অক্টোবর বম্বে গিয়েছেন।

দ্রুত অগ্রসরমান এ ছবির শ্রেষ্ঠাংশে রূপারোপ করছেনঃ মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়, অন্যান্য চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, অসিতবরণ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুখেন দাস, উদয়কুমার, কালিপদ চক্রবর্তী, কানু বন্দ্যোঃ, জহর রায়, দীপ্তি রায়, সুস্মিতা বিশ্বাস, মঞ্জুলী রায়, সন্ধ্যা কাপুর, পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এ ছবিটির বিভিন্ন গানের সুরারোপ একটি চমকপ্রদ অভিনয় সুরশৈলীর সমন্বয় করিয়েছেন অনন্য সুরকার সলিল চৌধুরী। এই সব ধরনের বাংলা গান ইতিপূর্বে আর কখনো গৃহীত হয়নি। এই গানগুলির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন আশা ভোঁসলে, সবিতা চৌধুরী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

ছবিটির প্রযোজনায় আছেন নিতাই দাস ফিল্মস।

তিন ভুবনের পারে|তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

গেল ১৬ই নভেম্বর, শনিবার ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের 'ফিল্ম ডিভিসনের পূর্বাঞ্চল শাখাসচিব জে আর হালদার সোসাইটি সিনেমায় ভারত-চীন সীমান্তসংঘর্ষ সম্পর্কিত দু'খানি তথ্যচিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করেন। প্রায় ৩,৬০০ ফিট দীর্ঘ "শ্যাডো অব দি ইস্ট" (৪০ মিনিট প্রদর্শনীকাল) এবং প্রায় ৭,২০০ ফিট দীর্ঘ "দি গ্রেট বিট্রেয়াল" (৮০ মিনিট প্রদর্শনী-কাল) নামক ছবি দু'খানির বক্তব্য হচ্ছে, প্রায় হাজার বছর ধরে সর্বতোভাবে স্বীকৃত ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক সীমারেখাকে চীন আজ সরাসরি অগ্রাহ্য করছে; এমন কি, এশিয়ার বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য সম্মিলিতভাবে "কলম্বো প্ল্যান" নামে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, ভারত তাকে সসম্মানে মেনে নিলেও চীন তাকে প্রথমে স্বীকৃতি জানিয়ে পরে তার প্রস্তাবগুলিকে পদদলিত করেছে। বহু মানচিত্র ও দলিলের সাহায্যে ভারত সরকারের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করা হয়েছে এই ছবি দু'খানিতে। কিন্তু একই বিষয়ে দু'খানি ছবি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য হল না। বিশেষ করে একই মানচিত্র, দলিল ও দৃশ্যের বহুল ব্যবহার করা হয়েছে ছবি দু'খানিতে। এমন কি, একই ছবিতে একই বিষয়ের পুন-প্রদর্শন দেখা গেছে। প্রযোজক-পরিচালক রাজবংশ খোসলা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান ব্যক্তি; নইলে একই বস্তুর দু'বার ব্যবহার করেও তিনি তাঁর ছবিগুলিকে অনুমোদিত করালেন কি করে?

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এক অভিনব চলচ্চিত্র মেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ডিসেম্বর মাসের ১৪ থেকে ২৩ পর্যন্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠান ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেয়ার নামে পরিচিত হবে। প্রতি শো-তে ৪ হাজারের অধিক দর্শকের ছবি দেখার ব্যবস্থা করা হবে এবং এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল খোলা হবে। এই দশদিনে বাঙলা, হিন্দীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামকরা ছবিগুলি দেখানো হবে।

এই ফিল্ম ফেয়ারের উদ্দেশ্য, ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা পৃথিবীর বিখ্যাত ও বিভিন্ন রীতির যে সব ছবি দেখতে পান, জনসাধারণকে সেই ছবিগুলি দেখার সুযোগ করে দেওয়া। এই ফিল্ম ফেয়ারের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র মেলা উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেয়ারের বিস্তারিত বিবরণ নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির অফিস ৬১ ধর্মতলা স্ট্রীটে পাওয়া যাবে।

পরলোকগত জননেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চলচ্চিত্র, নাট্য-মঞ্চ, সঙ্গীত ও নৃত্য-কলা সম্পর্কিত একটি সংগ্রহশালা প্রতি-ষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর 'ফিল্ম অ্যাণ্ড থিয়েটার আর্কাইভস্ অব ইণ্ডিয়া'র মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

বেতার শ্রুতি

প্রহেলিকা বা ধাঁধা বাংলার একটা বিশেষ সম্পদ। এক সময় এর বহুল প্রচলন ছিল। এই প্রচলন কেবল লোকমুখেই নয়, সাহিত্যেও। সাধারণ লোকের মুখ থেকে বিদগ্ধজনের সাহিত্যে ধাঁধা তার স্থান করে নিয়েছিল।

ধাঁধা লোকসাহিত্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে জাতির বিবিধ লৌকিক রসোপকরণ অবলম্বন করে লোকসাহিত্যের ভিত্তির উপর। সেই কারণেই মঙ্গলকাব্যে ধাঁধার প্রবেশ অনায়াস হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনীমাত্রেরই গ্রন্থি অতীব শিথিল। এই শৈথিল্যের অবকাশে জাতির বিবিধ রসোপকরণ এর অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে। সেই সূত্রে ধাঁধাও এসেছে। মূল কাহিনীর ধারাপ্রবাহে ধাঁধার প্রবেশ নিতান্ত অসংলগ্ন মনে হলেও একটা বিশেষ গুণের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। কোনো উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যই ধাঁধার অবতারণা ছাড়া সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু লোকমুখ থেকে সাহিত্যের পাতায় উত্তীর্ণ হবার পথে তার ক্ষতিও হয়েছে কিছু। মৌখিক স্তর থেকে লৈখিক স্তরে যাবার সময় এর সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনটি নষ্ট হয়ে গেছে। কবিদের পাণ্ডিত্যের স্পর্শে এদের স্বচ্ছ রূপটা অনেক ক্ষেত্রেই অনচ্ছ হয়ে পড়েছে।

ধাঁধা একদিন ভারতের অন্যান্য আদিম জাতির মতো বাঙালীর সমাজজীবনেরও অন্যতম প্রধান আচার ছিল। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া আছে।

কোনো কোনো আদিম সমাজে বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। বরপক্ষ ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে পারলে কন্যার বাড়িতে উপস্থিত হবার অধিকার অর্জন করে।

বাংলার যে সমাজ মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি রচনা করেছিল তার মধ্যেও এই আচার প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণও পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিরই মধ্যে।

এই সেদিনও বাংলার নগর ও পল্লীসমাজে বিবাহ উপলক্ষে ধাঁধার বহুল প্রচলন দেখা গেছে। বিবাহের পর বরকে শ্যালিকা সম্বন্ধীয়াদের হাতে ধাঁধা নিয়ে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। আজও এই আচার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি, যদিও তার ধারা ক্ষীণ হয়েছে। বাঙালী সমাজে বিবাহ উপলক্ষে এই আচারে কেবলই কৌতুক—নির্মল, আন্তরিক আনন্দ।

কিন্তু ধাঁধা কেবল কৌতুকই নয়, সেই সঙ্গে আরও কিছু। সে হচ্ছে বুদ্ধি। ধাঁধার উত্তরে ক্ষিপ্রগতিতে বুদ্ধিচালনার প্রয়োজন হয়। তাতে চিন্তার প্রসার হয়, মস্তিষ্কের বিকাশ হয়।

সেইজন্যই না হোক, অন্তত আমোদের জন্য হলেও এক-কালে এই ধাঁধা ছোটো বড়ো সকলের কাছে সমান আদৃত হয়েছে। কিন্তু আজ বড়োদের কাছে এর আদর নেই—তার কারণ হয়তো চিন্তায় অনীহা কিংবা আমোদের অন্য উপকরণ প্রাপ্তি। ছোটোদের মধ্যেও এর আদর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে—হয়তো একই কারণে। কিংবা বড়োদের আগ্রহের অভাবে। তবু আজও যে ছোটোদের পত্রিকায় আর রেডিওর শিশুমহলে ও গল্পদাদুর আসরে ধাঁধার একটা বিভাগ দেখা যায়, সে বোধহয় প্রথা হিসাবে।

কিন্তু ছোটোদের নির্মল আমোদের এবং সেই সঙ্গে তাদের বুদ্ধির বিকাশের ও চিন্তার প্রসারের জন্য ধাঁধার একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত—বিশেষ করে রেডিওর। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, ধাঁধা হচ্ছে মৌখিক জিনিস। মৌখিক স্তর থেকে লৈখিক স্তরে অতিক্রমণকালে তার স্বাভাবিক আবেদন নষ্ট হয়ে যায়, স্বাভাবিক সৌন্দর্যও ফিকে হয়। তাই এ ব্যাপারে রেডিওরই দায়িত্ব বেশি। কিন্তু রেডিওর এই দায়িত্ব খুব আন্তরিকতার সঙ্গে পালিত হয় বলে মনে হয় না। একটা গতানুগতিক ভাব দেখা যায়। অনেক সময় ধাঁধার নামে যা প্রচারিত হয় তা কোনো বিচারেই ধাঁধার পর্যায়ে পড়তে পারে না।

যেমন, গত ১৭ই নভেম্বর সকালে শিশুমহলের দেখাশোনে শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় শিশুদের উদ্দেশ করে বললেন : তোমাদের একটা মজার ধাঁধা বলব। তোমরা তো স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে তোমাদের পড়া বলো। তখন তো তাঁদের দিকে মুখ করেই বলো। কিন্তু বলো তো কোন্ দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের দিকে পিছন ফিরে পড়া বলে?... উত্তরটা তিনিই বলে দিলেন : চীনের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের দিকে পিছন ফিরে তাদের পড়া বলে। ঠিক তোমাদের উলটো।

কোন্ বিচারে এটা ধাঁধার পর্যায়ে পড়ে বোঝা কঠিন। বরং সাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ে পড়তে পারে। এর উত্তর জানা না থাকলে হাজার চিন্তা করে, লক্ষ বুদ্ধি খরচ করেও তা খুঁজে বার করা যাবে না। ধাঁধার বৈশিষ্ট্য তো তা নয়। ধাঁধার উত্তর অশিক্ষিত, নিরক্ষররাও চিন্তা করে, বুদ্ধির জোরে খুঁজে বার করতে পারে।

সত্যিকারের ধাঁধা উদ্ভাবনে ও পুরাতন ধাঁধার পুনরুদ্ধারে রেডিও কর্তৃপক্ষ যদি সচেষ্ট হন এবং তাদের প্রচারে সবিশেষ গুরুত্ব দেন তাহলে তাঁরা ছোটোদের একটা মস্ত উপকার করবেন।

১৫ই নভেম্বর তারিখের 'বেতারশ্রুতি'তে রেডিওর ছাত্র-সদন আণবিক যজ্ঞের সমালোচনা করা হয়েছিল। সমালোচনার পরেও সেই যজ্ঞ তো থামেই নি, বরং ভীম বিক্রমে তাতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। সমালোচনা প্রকাশের মাত্র দুদিন পরে এই ভীম বিক্রম দেখে মনে হয় এটি ইচ্ছাকৃত। অথবা তাঁরা মনে করছেন, তাঁরা ঠিকই বলছেন, অজ্ঞরা শুধুই চেঁচাচ্ছে। তাই কানে তীব্র বাক্যশলাকা ঢুকিয়ে তাঁরা অ্যাটমিক অর্থে আণবিক প্রচার করছেন।

অণু আর পরমাণু দুটি শব্দ বহুকাল থেকেই বাংলায় সসম্মানে বিরাজ করছে। বহু বাংলা বিজ্ঞান-লেখক এদের উপযুক্ত মর্যাদাসহকারে তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রাচীন পণ্ডিতও আছেন অনেক।

এখন রেডিওর পণ্ডিতদের জ্ঞাতার্থে অণু-পরমাণুর পার্থক্যটা অতি সংক্ষেপে সাধারণ ভাবায় বিবৃত করা দরকার।

কোনো পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থায় আনা যায় যখন প্রত্যেক সূক্ষ্মতম অংশে সেই পদার্থের ধর্ম বজায় থাকে। সেই সূক্ষ্মতম অংশের নাম অণু—ইংরেজীতে মলিকিউল। অণুর বৈশিষ্ট্য, এ হচ্ছে পদার্থের সূক্ষ্মতম কণা এবং স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে। এই অণুকে ভাঙলে ক্ষুদ্রতর কণা পাওয়া যায় এবং তাতে পদার্থের গুণ বা ধর্ম বজায় থাকে না। এই ক্ষুদ্রতর কণা হচ্ছে পরমাণু—ইংরেজীতে অ্যাটম। পরমাণুর বৈশিষ্ট্য, এ স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে না, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এই পরমাণুর কেন্দ্র থাকে প্রোটন আর নিউট্রন। নিউট্রনকে ভাঙলে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়, এবং সেই শক্তিকে আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন কাজে লাগাই। সুতরাং রেডিওর বক্তারা যাকে আণবিক শক্তি বলেন, আসলে তা নিউক্লিয়ার শক্তি। সাধারণভাবে পারমাণবিক শক্তি নামেও বলে প্রচলিত—ইংরেজীতে অ্যাটমিক এনার্জি। কিন্তু এই শক্তি কখনই আণবিক শক্তি বা মলিকিউলার এনার্জি নামে প্রচলিত নয়। বিভিন্ন দেশে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন আছে, আমাদের দেশেও আছে। আমাদের রেডিও বক্তারা তাকে আণবিক শক্তি কমিশন বলেন। ১৭ই নভেম্বর বেলা ১২টা ৫০ আর রাত ৫টা ৩০এর দিল্লীর বাংলা খবরে বলা হয়েছে, "আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডা বিক্রম সারাভাই বলেছেন......।"

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৬ই নভেম্বর রাত ৮টায় প্রচারিত নাটকের নাম 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। রচনা—শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ।

নাটকটির আরম্ভ শুনে মনে হল অতিপ্রাকৃত নাটক, কিন্তু শেষে প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত মিশে গেল। মেলাটা তেল-জলের মেলার মতো। তাই সেটা ভালো লাগল না। মনে হল সবটা অতিপ্রাকৃত হলেই যেন হত ভালো। সনাতনের চরিত্রে অতিপ্রাকৃত ভাবটাই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। এবং আবেদনের অংশে তার সম্পত্তিও ছিল অনেক।

এই নাটকে বর্তমান যুগের অনেকগুলি সমস্যা যুক্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের হিংসা দ্বেষ লোভ মোহ ত্যাগ সত্য মিথ্যা ছলনা কল্পনার একটা সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছে। সনাতন জীবনের অঙ্ক মেলাতে সংসার-গুহা থেকে বাইরের আলোয় বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু বাইরের আলোয় অধ্যাপক মানুষের অঙ্কের কথা ভাবেই নি—সে ভগবানের অঙ্ক নিয়েই ব্যস্ত। সনাতনের কাছেই অধ্যাপক মানুষের অঙ্কের সন্ধান পেল, তারপর সেই অঙ্ক কষাই তার জীবনের বড়ো কাজ হল।

নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের নিজের নিজের ফর্মুলায় জীবনের অঙ্ক কষেছে। কিন্তু মেলাতে পেরেছে কি? এই অঙ্ক কি মেলে? না কি পাতার পর পাতা শুধু কাটাকুটি করে শেষে এক জায়গায় হাল ছেড়ে দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে থমকে দাঁড়াতে হয়?

কাঁকসটা বড়ো জটিল। এই জটিলতা নাট্যকার ফুটিয়েছেন ভালো। কিন্তু ঘটনা-গুলি সব পার্কে ঘটার মতো নয়। গুহা থেকে একেবারে পার্কে এনে ফেলায় যেন মস্ত একটা ছন্দোপতন হয়েছে। কতকগুলি ঘটনা শহরের পার্কে কিংবা তার ধারেপাশে ঘটতে পারে বটে, কিন্তু অন্যগুলি ঘটার জন্য দরকার শহর থেকে দূরে খানিকটা অতিপ্রাকৃত জায়গার।

তবু 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছে, বৈচিত্র্যের স্বাদ দিয়েছে। এই নাটকের বড়ো সম্পদ এর অভিনয়াংশ। প্রায় সবক'টা চরিত্রই সু-অভিনীত। সনাতনের ভূমিকায় শ্রীগোবিন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। যদিও এই চরিত্রে আর একটু কম ভয়েস-এজের শিল্পীর প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় তবু তাঁর ঐ অতিপ্রাকৃতভাব-থাকা সু-অভিনয়ের গুণে সেটা বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারেনি। অধ্যাপকের ভূমিকায় শ্রীগৌরীশঙ্কর চৌধুরী, তরুণের ভূমিকায় শ্রীসুধীর ঘোষ, সজ্জন গুণ্ডার ভূমিকায় শ্রীপরিমল সেন এবং শিবানীর ভূমিকায় শ্রীমতী মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রশংসার্হ। অজিতের ভূমিকায় শ্রীদেবেন গঙ্গোপাধ্যায় আর কবিতার ভূমিকায় শ্রীমতী লতিকা দাসগুপ্ত কাজ চালিয়ে গেছেন।

নাটকে শব্দ-সংযোজনায় বাস্তব জ্ঞানের একটু অভাব লক্ষিত হয়েছে। সজ্জন রাহাজানি করে পাঁচ হাজার টাকার গয়না এনে পার্কে সনাতনের কাছে রাখতে দিয়ে চলে যাবার পরে যখন পুলিশ তার খোঁজে সনাতনের কাছে এল তখন যে বুটের শব্দ শোনা গেল তাতে মনে হল তারা পার্কের ঘাসে ছাওয়া মাটিতে নয়, শান বাঁধানো পাকা রাস্তার উপর দিয়ে মার্চ করে আসছে।

১৬ই নভেম্বর সকাল ৭টা ১৫য় শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্ত পদাবলী কীর্তন গাইছিলেন। সুন্দর গলা, কীর্তনেরই উপযোগী যেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোনা হল না। শেষ হবার আগেই ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরে রুদ্ধ করে দেওয়া হল। সাড়ে ৭টার খবরের সময় হয়ে গেছে!

১৭ই নভেম্বর সকালে শিশুমহলে বাগবাজার মাল্টিপার্পাস স্কুলের শিশুরা স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত নকশা 'নাক-কাটা রাজা' অভিনয় করে শোনাল। একটি স্কুলের ব্যবস্থাপনায় এই রকম একটি সুন্দর অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগ দেবার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। কিন্তু এতে তাঁদেরও একটুখানি টনক নড়া উচিত। বাইরের ব্যবস্থাপকরা তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, ভালো অনুষ্ঠান প্রচারে অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশি দরকার আন্তরিকতার—যার বড়ো অভাব রেডিও কেন্দ্রে।

'নাক-কাটা রাজা' একটি সার্থক অনুষ্ঠান। শ্রীমতী পূর্ণিমা রায় অতি দক্ষতার সঙ্গে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং পরিচালনা করেছেন। এর সুরসংগতিও প্রশংসনীয়। শব্দসংযোজনাও।

এই নকশাটিতে শিশুরা বেশ মজা করে তাদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য, চিন্তা, ভয়, আশঙ্কা, আর্তনাদ সব ফুটিয়েছে। অভিনয়ে কথার টানগুলি পর্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। টুনটুনির ছড়া অপূর্ব। গানের অংশের ঈষৎ দুর্বলতা অভিনয়াংশের বলিষ্ঠতায় ঢাকা পড়ে গেছে।

নকশাটির পিছনে একটা ভালো টিম-ওয়ার্ক ছিল, দীর্ঘ কঠোর মহলার পরিচয় ছিল।

অনুষ্ঠানটির আরম্ভে শিশুমহলের পরিচালিকা তাঁর ঘোষণায় স্কুলটির নাম উহ্য রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'একটি স্কুলের মেয়েরা অভিনয় করে শোনাচ্ছে তারা আমাদের বন্ধু।' এই উহ্য রাখার কারণটি বোঝা গেল না।

এইদিন বেলা ১টায় প্রচারিত সেবাস্টি-য়ানের রুমানীয় নাটক অবলম্বনে শ্রীমতী অমিতা রায় রচিত 'নাম না জানা তারা' নাটকটিতে কৃত্রিমতার ভাবটা বড়ো বেশি প্রখর হয়ে উঠেছিল। একে গল্পটি সাধারণ শ্রোতাদের থেকে অনেক দূরের, তার উপর সব কিছুই যেন সাজানো। বাস্তবের সঙ্গে তেমন যোগ না থাকায় শ্রোতাদের আকর্ষণও করতে পারেনি বিশেষ।

নাটকের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট—রচনায় ও প্রযোজনায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোকিলার উত্তেজনার কারণ জানা গেল না; গোড়ায় ট্রেনের শব্দ আর এঞ্জিনের হুইসল শুনে মনে হল তীব্র বেগের কোনো মেল কিংবা এক্সপ্রেস আসছে, কিন্তু সংলাপে জানা গেল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। অভিনয়াংশও উল্লেখযোগ্য নয়।

সন্ধ্যায় গল্পদাদুর আসরে শ্রীবিশ্বনাথ বসুর বাঘ শিকারের গল্পটিতে চমৎকারিত্ব ছিল, কিন্তু আর একটু ধীরে এবং গল্প বলার মতো করে কিশোরটি পড়লে ভালো হত।

—শ্রবণক

অলিম্পিকের লংজাম্প

ক্ষেত্রনাথ রায়

অলিম্পিক গেমসের লং-জাম্পে আমেরিকার বিরাট সাফল্য লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিগত ১৬টি অলিম্পিকে আমেরিকা একাই ১৪টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। আমেরিকার একটানা স্বর্ণপদক জয়লাভের পথে ১৯২০ সালে সুইডেন এবং ১৯৬৪ সালে বৃটেন যা বাধা দেয়। ১৬টি অলিম্পিকের মোট ৪৮টি পদকের মধ্যে আমেরিকা পেয়েছে ৩১টি পদক—স্বর্ণ ১৪, রৌপ্য ১২ এবং ব্রোঞ্জ ৫। এই তালিকায় সুইডেনের স্থান দ্বিতীয়—মোট পদক মাত্র ৩টি (স্বর্ণ ১ ও ব্রোঞ্জ ২)। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সুইডেনের থেকে আমেরিকার ২৮টি পদক বেশী—কি বিরাট ব্যবধান!

আমেরিকার এই বিরাট সাফল্যের মূলে আছে নিগ্রো এ্যাথলীটদের কৃতিত্ব। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত—৮টি অলিম্পিক গেমসে (যুদ্ধের ফলে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে অলিম্পিক গেমস হয়নি) মোট ৮টি স্বর্ণপদকের মধ্যে আমেরিকা যে ৭টি স্বর্ণপদক পেয়েছে, তা নিগ্রো এ্যাথলীটদের দৌলতেই। এই সময়ে যেখানে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা পেয়েছেন মোট ১২টি পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে), সেখানে আমেরিকার শ্বেতকায় এ্যাথলীটরা পেয়েছেন মাত্র ২টি পদক। ১৯২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক গেমস নিগ্রো এ্যাথলীটদের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্যারিস অলিম্পিক গেমসের লং-জাম্পে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ বছরের যুবক উইলিয়াম ডিহার্ট হাবার্ড স্বর্ণপদক জয়ী হন—অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে আমেরিকান নিগ্রো এ্যাথলীটদের পক্ষে এই প্রথম স্বর্ণপদক জয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক গেমসের আসরে ডিহার্ট হাবার্ড হলেন নিগ্রো জাতির পথিকৃৎ। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ১০টি অলিম্পিক গেমসের লং-জাম্পে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা পেয়েছেন ৮টি স্বর্ণপদক এবং বাকি দু'টি স্বর্ণপদক পেয়েছেন আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের শ্বেতকায় এ্যাথলীট।

অলিম্পিক গেমসের লং-জাম্পে একজন এ্যাথলীটের পক্ষে দু'বার স্বর্ণপদক জয় আজও সম্ভব হয়নি। লং-জাম্পে সর্বাধিক পদক জয় করেছেন আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট রাল্‌ফ বোস্টন—মোট ৩টি পদক (১৯৬০ সালে স্বর্ণ, ১৯৬৪ সালে রৌপ্য এবং ১৯৬৮ সালে ব্রোঞ্জ)। দু'টি করে পদক পেয়েছেন আমেরিকার মেয়ার প্রিনস্টিন (১৯০০ সালে রৌপ্য ও ১৯০৪ সালে স্বর্ণ), কানাডার ক্যালভিন বিকার (১৯০৮ সালে ব্রোঞ্জ ও ১৯১২ সালে রৌপ্য) এবং রাশিয়ার ইগর তার ওভানেশিয়ান (১৯৬০ সালে ব্রোঞ্জ ও ১৯৬৪ সালে ব্রোঞ্জ)।

বব্ বিমোন (আমেরিকা) ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের লংজাম্পে অবিশ্বাস্য দূরত্ব (২৯ ফিট ২½ ইঞ্চি) অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন।

একই বছরে তিনটি পদকই জয়

অলিম্পিক গেমসের একই বছরের আসরে লং জাম্পের তিনটি পদকই (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয় করেছে একমাত্র আমেরিকা—১৮৯৬ এবং ১৯০৪ সালে।

নিগ্রো এ্যাথলীটদের স্বর্ণপদক জয়

১৯২৪ উইলিয়াম ডিহার্ট হাবার্ড, ১৯৩২ এডওয়ার্ড গর্ডন, ১৯৩৬ জেসী ওয়েন্স, ১৯৪৮ উইলী স্টীল, ১৯৫২ জেরোম বিফ্‌ল, ১৯৫৬ গ্রেগরী বেল, ১৯৬০ রাল্‌ফ বোস্টন এবং ১৯৬৮ বব্ বিমোন।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের লংজাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী আমেরিকার রাল্‌ফ বোস্টন (ডানদিকে) এবং ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী রাশিয়ার ইগর তার ওভানেসিয়ান

লংজাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী

অব্দ	বিজয়ী	দেশ	ফিট	ইঞ্চি
১৮৯৬	ইলেরী ক্লার্ক	আমেরিকা	২০	১০
১৯০০	অলভিন ক্রায়েজেলিন	আমেরিকা	২৩	৬৮
১৯০৪	মেয়ার প্রিনস্টিন	আমেরিকা	২৪	১
১৯০৮	ফ্র্যাংক আয়রন্স	আমেরিকা	২৪	৬½
১৯১২	এলবার্ট গাটার্সন	আমেরিকা	২৪	১১¼
১৯২০	উইলিয়াম পিটার্সন	সুইডেন	২৩	৫½
১৯২৪	ডিহার্ট হাবর্ড	আমেরিকা	২৪	৫
১৯২৮	এডোয়ার্ড হ্যাম	আমেরিকা	২৫	৪½
১৯৩২	এডোয়ার্ড গর্ডন	আমেরিকা	২৫	০¾
১৯৩৬	জেসী ওয়েন্স	আমেরিকা	২৬	৫¾
১৯৪৮	উইলী স্টিল	আমেরিকা	২৫	৮
১৯৫২	জেরোম বিফল	আমেরিকা	২৪	১০
১৯৫৬	গ্রেগরী বেল	আমেরিকা	২৫	৮¼
১৯৬০	রাল্‌ফ বোস্টন	আমেরিকা	২৬	৭¾
১৯৬৪	লীন ডেভিস	বৃটেন	২৬	৫¾
১৯৬৮	বব বিমোন	আমেরিকা	২৯	২½

লংজাম্পে পদক বিজয়ী দেশ

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	১৪	১২	৫	৩১
সুইডেন	১	০	২	৩
বৃটেন	১	০	১	২
কানাডা	০	১	১	২
জাপান	০	০	২	২
রাশিয়া	০	০	২	২
হাইতি	০	১	০	১
অস্ট্রেলিয়া	০	১	০	১
পূর্ব জার্মানী	০	১	০	১
নরওয়ে	০	০	১	১
হাঙ্গেরী	০	০	১	১
ফিনল্যান্ড	০	০	১	১
মোট :	১৬	১৬	১৬	৪৮

এশিয়ার পক্ষে পদক জয়

১৯৩২ চুহার নাম্বু (জাপান) এবং ১৯৩৬ নাওটো তাজিমা (জাপান)।

বিভিন্ন দূরত্বের বেড়া প্রথম অতিক্রম

২৪ ফিটের বেড়া :

২৪ ফিট ১ ইঞ্চি : মেয়ার প্রিনস্টিন (আমেরিকা), ১৯০৪

২৫ ফিটের বেড়া :

২৫ ফিট ৪½ ইঞ্চি : এডওয়ার্ড হ্যাম (আমেরিকা), ১৯২৮

২৬ ফিটের বেড়া :

২৬ ফিট ৫¼ ইঞ্চি : জেসী ওয়েন্স (আমেরিকা), ১৯৩৬

২৯ ফিটের বেড়া :

২৯ ফিট ২½ ইঞ্চি : বব বিমোন (আমেরিকা), ১৯৬৮

মেয়েদের লং জাম্প

অলিম্পিক গেমসের তালিকায় মেয়েদের লং জাম্প অনুষ্ঠান প্রথম তিনটি আসরে (১৯২৮-৩৬) ছিল না। মেয়েদের লং জাম্প ১৯৪৮ সালে প্রথম যোগ করা হয়। বিগত ৬টি অলিম্পিকে (১৯৪৮-৬৮) কোন দেশই একবারের বেশী স্বর্ণপদক জয়ী হয়নি। স্বর্ণপদক পেয়েছে—১৯৪৮ সালে হাঙ্গেরী, ১৯৫২ সালে নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৬ সালে পোল্যান্ড, ১৯৬০ সালে রাশিয়া, ১৯৬৪ সালে বৃটেন এবং ১৯৬৮ সালে রুমানিয়া।

লং জাম্পে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ : দূরত্ব ২৯ ফিট ২½ ইঞ্চি—বব বিমোন (আমেরিকা), ১৯৬৮

মহিলা বিভাগ : দূরত্ব ২২ ফিট ৪½ ইঞ্চি—ভিওরিকা ভিসকোপোলিয়ান (রুমানিয়া), ১৯৬৮

স্ট্যান্ডিং লং জাম্প

অলিম্পিক গেমসে পুরুষদের স্ট্যান্ডিং লং জাম্প ১৯১২ সালে শেষ তালিকাভুক্ত হয়। চারটি অলিম্পিক গেমসের স্ট্যান্ডিং লং জাম্পে (১৯০০-১২) আমেরিকার আর সি ইউরি উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

জেসী ওয়েন্স (আমেরিকা) ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকের লংজাম্পে ২৬ ফিট ৫¼ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত রাশিয়ার মিনস্ক ডায়নামো বনাম আই এফ এ একাদশ দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলার প্রাক্‌কালে মিনস্ক ডায়নামো দলের সংগে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীঅক্ষয় বসু এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।

খেলা ধূলা

দর্শক

পত্রিকা শতবার্ষিকী প্রদর্শনী ফুটবল

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এরিয়ান্স—ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজিত প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় রাশিয়ার মিনস্ক ডায়নামো ২—০ গোলে আই এফ এ একাদশ দলকে পরাজিত করলেও স্থানীয় দলের পরাজয় খুব অগৌরবের হয় নি। রাশিয়ার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী মিনস্ক ডায়নামোর খেলা কিন্তু দর্শকদের খুশী করতে পারে নি। ইউরোপের প্রচলিত ক্রীড়া-পদ্ধতির নিখুঁত প্রতিকৃতি—জোলুষের যা ইতর-বিশেষ। মিনস্ক ডায়নামোর ক্রীড়াধারা ছিল ৪—৩—৩ পদ্ধতির। দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান-প্রদানে নিবিড় সংযোগ, মাপা সট, বল নিয়ন্ত্রণে সার্থক দক্ষতা, অরক্ষিত স্থানে দলের খেলোয়াড়কে বল পাশ করে বিপক্ষকে বিপর্যস্ত করা—এ সমস্তই তাঁদের দীর্ঘ দিনের অনুশীলন এবং নিষ্ঠার ফল। মিনস্ক ডায়নামোর খেলোয়াড়রা তাঁদের ক্রীড়া-পদ্ধতিকে মাঠের অগণিত দর্শকদের কাছে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরতে পারেন নি। এর কারণ, সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত মাঠ, অপরিচিত দর্শক পরিবেশ এবং আলো-বাতাস। বিদেশে খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক খেলার পক্ষে এ বিষয়গুলি প্রথমে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ্য, কলকাতা তথা ভারতবর্ষের মাটিতে মিনস্ক ডায়নামোর এই প্রথম খেলা। রাশিয়ার মত উন্নত দেশের সুশিক্ষিত একটি ফুটবল দলের বিপক্ষে আই এফ এ একাদশ দল কোন সময়েই পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে খেলেনি, সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল। মিনস্ক দ্বিতীয়ার্ধের ১৯ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল এবং মাত্র ২ মিনিট পরেই দ্বিতীয় গোলটি দেয়।

মিনস্ক ডায়নামোর পক্ষে সার্বস্তিকভ এবং আই এফ এ দলের পক্ষে চুণী গোস্বামী অধিনায়কত্ব করেন।

ভারত সফরে এম সি সি

১৯৬৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এম সি সি অশ্বেতকায় খেলোয়াড় বেসিল ডি'ওলিভিয়েরাকে দলভুক্ত করায় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের দেশের সরকারী বর্ণবৈষম্য নীতির মহিমায় গদগদ হয়ে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। ফলে জনমতের চাপে পড়ে এম সি সি কর্তৃপক্ষ ১৯৬৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে ভারত সফরের প্রস্তাব করেন। এই ভারত সফরে তাঁদের পাওনাগণ্ডার মোটা দাবী ছিল—জামানত হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রায় ২০,০০০ স্টার্লিং। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এই অর্থ মঞ্জুর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে সুপারিশ করেছিলেন তা অগ্রাহ্য হয়েছে। এই অর্থ মঞ্জুর না করার কারণ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক মুদ্রার একান্ত অনটনের কথা উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের মতে, তিনটি টেস্ট খেলা এবং একটি প্রথম শ্রেণীর খেলার জন্যে ২০,০০০ স্টার্লিংয়ের দাবী খুবই বেশী। তাছাড়া তাঁরা আরও লক্ষ্য করছেন—এম সি সি'র প্রস্তাবিত সফরটি বে-সরকারী এবং ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না ভারত সফরে এম সি সি'কে তাই দেওয়া হচ্ছে। ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলকেই তাদের যাতায়াত এবং রাহাখরচ সম্পূর্ণ বহন করতে হয়, অথচ ভারত সফরে এম সি সি'র এই বাবদ বিরাট খরচটা বহন করে থাকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। দুই দেশের সফরের সর্তে এ রকম বিরাট অসংগতির কারণ কি—আমরা অশ্বেতকায় না ১৯৩২ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের সংগে ১০৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেও এম সি সি কর্তৃপক্ষের চোখে ক্রিকেট খেলায় আমরা এখনও শিশু? সরকারী এবং বেসরকারী টেস্ট খেলার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য সে সম্পর্কে এম সি সি কর্তৃপক্ষের টনটনে জ্ঞান আছে বলেই তাঁরা প্রস্তাবিত ভারত সফরের গায়ে 'বে-সরকারী' ছাপ মেরে দিয়েছেন। টেস্ট খেলার ফলাফল ভারতবর্ষের অনুকূলে গেলেও ইংল্যাণ্ডের মুখে চুনকালির আঁচড় পড়বে না। বিদগ্ধ লোক বলবে বে-সরকারী টেস্ট খেলার আবার মূল্য! সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফলের হিসাবে বে-সরকারী টেস্ট খেলার কোন সম্পর্কই থাকবে না

বারের দিকে পীঠ ক'রে অর্থাৎ উল্টোভাবে লাফিয়ে পশ্চিম জার্মানীর সপ্তদশী এ্যাথলীট মনিকা হ্যার্ভালিজিক ৫ ফিট ১ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার ডিক ফসবেরী এইভাবে লাফিয়েই প্রুষ বিভাগে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেন (উচ্চতা ৭ ফিট ৪¼ ইঞ্চি)।

প্রস্তাবিত এম সি সি'র ভারত সফরে কেন্দ্রীয় সরকার ২০,০০০ স্টার্লিংয়ের বৈদেশিক মদ্রা মঞ্জর না করায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে 'খ্বেই লজ্জাজনক' আখ্যা দিয়েছেন। আর বোর্ডের সম্পাদক বলেছেন, এই কুড়ি হাজার স্টার্লিং মদ্রা সরকারের কাছে 'শিশ্ব দিবসের দান'। একুশ বছর স্বাধীনতা লাভের পরও যে ভারতবর্ষ খাদ্যের ব্যাপারে আজও বিদেশের মুখাপেক্ষী সেই দেশের দ্বই দায়িত্বশীল ব্যক্তির ম্খ থেকে এই রকমের উক্তিই লজ্জাজনক। ভারত সফরে এম সি সি আসবে না জেনে ভারতের প্রকৃত ক্রিকেট অনুরাগীরা সাময়িকভাবে দ্বঃখ পাবেন ঠিকই, কিন্তু কখনও এই রকমের উক্তি দ্বারা জাতীয় সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন না। কথা দিয়ে তা রাখতে না পারাটাই লজ্জাজনক। এম সি সি'র প্রস্তাবিত সফরটি পূর্ব নির্ধারিত নয়। তাদের ১৯৬৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হওয়ার পরই না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে ভারত সফরের প্রস্তাব এসেছে, তাও মাত্র সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে। ভারতীয় শিশ্বরা 'শিশ্ব দিবস' উপলক্ষে কবে ২০,০০০ স্ট্যার্লিং সরকারী দান হিসেবে পেয়েছে?

আহা ভারতীয় শিশ্বরা, তোমাদের জন্য দ্বঃখ হয়। কল্পনা করতে অস্ববিধ হয় না, বড়দের ব্যাপারে তোমাদের টেনে আনায় তোমাদের অনেকেরই ঠোঁট অভিমানে কেঁপে উঠেছে। বড় হয়ে তোমরা কখনও শিশ্বদের কটাক্ষ কর না।

সরকারী পরিকল্পনা

নানারকমের জটিল সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করি। যাদ্বদণ্ড-স্পর্শে দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ম্হ্তে স্বর্গরাজ্য রচনা করা যে সম্ভব নয় সে সম্বন্ধে দেশের লোকের যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান ছিল। সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বড় বড় সরকারী পরিকল্পনায় জলের মত টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফল যা পাওয়া গেছে তা পর্বতের ম্ষিক প্রসবের সামিল। দেশের জ্ঞানীগ্বণী ব্যক্তিরা গালভরা সরকারী পরিকল্পনায় বাস্তব দৃষ্টি এবং দ্বরদর্শিতার অভাবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও পরিকল্পনার কাঠামোয় রদবদল করতে পারেন নি। খেলাধ্লার ক্রীড়ামান উন্নত করার উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থ এবং উদ্যমে পাতিয়ালা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস এবং লক্ষ্মীবাঈ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন নামে যে দ্বটি বিরাট শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বহ্ব বির্প সমালোচনা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতীয় কাউন্সিল অব স্পোর্টস সংস্থার সভাপতি শ্রীভগত ঝা আজাদ এই দ্বই প্রতিষ্ঠানের বিফলতা স্বীকার করে বলেছেন, স্ব্ষ্ঠ্ব পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজস্থান বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার শ্রীরামনিবাস মিরধার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, খেলাধ্লার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বেশীদিন গদি আঁকড়ে থাকাও উচিত নয়। খ্ব ভাল কথা, কিন্তু যাঁরা গদি ছাড়তে চাইবেন না তাঁদের সম্পর্কে কি সরকারী ব্যবস্থা হবে?

জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা

চণ্ডীগড়ে আয়োজিত ২২তম জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে পাঞ্জাব ৩—১ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে এই প্রথম লেডী রতন টাটা ট্রফি জয়ী হল। ইতিপ্বর্বে পাঞ্জাব ৪ বার রাণার্স-আপ হয়েছে।

সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্র ৫—০ গোলে বাংলা এবং পাঞ্জাব ১—০ গোলে মহাকোশলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। বাংলা স্রেফ ভাগ্যের জোরে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। বাংলা বনাম মহীশ্বর দলের কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলাটি দ্বদিন ড্র যায়—প্রথম দিন গোলশ্ন্য অবস্থায় এবং দ্বিতীয় দিনে ১—১ গোলে। শেষ পর্যন্ত টসে জয়ী হয়ে বাংলা সেমি-ফাইনালে যায়। মহীশ্বরের খ্বেই দ্বর্ভাগ্য। কারণ মহীশ্বর গত ৮ বছরের চ্যাম্পিয়ান। কোন দল এ পর্যন্ত মোট ৮ বার চ্যাম্পিয়ানই হয়নি, উপর্য্বপরি ৮ বার জয়লাভ দ্বরের কথা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীস্বপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৩য় খণ্ড
৮ম বর্ষ

৩০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 6th December, 1968 শুক্রবার, ২ . অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ 40 Paise.

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপক চক্রবর্তী

গৌরাঙ্গ পরিজন

'গৌরাঙ্গ-পরিজন'-এর 'বীরচন্দ্র বা বীর-ভদ্র' পর্যায়ে আমি লিখেছিলাম : নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত ও মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তাঁর দুই ছেলে —গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ অপ্রকট হলে তাঁর দুই ছেলেকে জাহ্নবী দেবী পুত্রের মতো লালন করেন।'

শ্রীযুক্ত বনবিহারী গোস্বামী মহাশয় জানতে চেয়েছেন এই তথ্য আমি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছি। উত্তরে জানাই, আমি এই তথ্য সংগ্রহ করেছি 'বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী' গ্রন্থ থেকে। 'বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে :

'গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণের পিতা শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ভক্ত এবং মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পিতা-মাতার অপ্রকটের পর গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর দ্বারা পুত্র-নির্বিশেষে প্রতিপালিত হয়েন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কলিকাতা—২৬

"কুইজ" প্রসঙ্গে

বিষয় নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য এবং আধুনিকতার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যে যে কারণে 'অমৃত' আমাদের কাছে এত প্রিয় বোধ হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে অন্যতম কারণটিই বোধহয় এই সময়োপযোগী বিভাগীয় বেশ-পরিবর্তন। 'কুইজ", 'হাসির মজলিস' ইত্যাদি প্রসঙ্গে অনেক পত্র লেখকের আলোচনা ও প্রশস্তি ইতিপূর্বে পড়েছি এবং সেগুলি খুবই ভাল লেগেছে।

এই চিঠির মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র 'কুইজ' প্রসঙ্গে কতকগুলি ভুল-ত্রুটির জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও এই ভুল-ত্রুটি খুবই সামান্য ব্যাপার তবুও আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত এরকম সুন্দর একটি বিভাগে সামান্য ঐ ভুল-ত্রুটিটুকু যেন কি রকম লাগে।

যেমন 'আপনার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেন?'—এই প্রসঙ্গে ৭ পয়েন্টের নীচে কারও পয়েন্টে পাওয়ার মোটেই সম্ভাবনা নেই। অথচ ফলাফলে ৭ পয়েন্টের নীচের লোকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'আত্মবিশ্বাস যাচাই করতে পারেন?' —এতে নিয়মে দেওয়া আছে 'মন ঠিক করতে না পারলেও 'ভুল'এ দাগ দিন'; অথচ পয়েন্টের হিসাবে আছে 'কোনটির জবাব যদি বাদ দেন, সেখানে এক পয়েন্ট পাবেন'। 'একটু বাড়তি কিছু করতে চান' —এতে আমরা ২২ পয়েন্টের উপরে পেয়েছি। অথচ সর্বোচ্চ বিভাগকে ১৪-২২ পয়েন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

অন্যান্য প্রসঙ্গের কুইজগুলি যেমন 'আপনি কতখানি সামাজিক মনোভাবাপন্ন'? 'আপনার রসিকতাবোধ যাচাই করুন'—ইত্যাদি সত্যিই নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গ-সুন্দর।

'অমৃতে' 'কুইজ'এর মাধ্যমে আমাদের মনোপ্রশ্নচর্চার সুযোগ দেওয়ায় এবং বাংলা সাপ্তাহিক এরকম অভিনব একটা বিষয়ের সর্বপ্রথম প্রকাশনার জন্য কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন।

সনৎ সেন ও অমর সেন
শ্যামনগর
২৪ পরগণা

নতুন ঠগী

অমৃতের ২৮তম সংখ্যায় নতুন ঠগী নামক পর্যায়ে রোগ-রোগী ও ঠগ—নামে যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে তা এককথায় অপূর্ব। লেখককে ধন্যবাদ, তিনি কলকাতার এক গোপন জালিয়াতি কারবারের স্পষ্ট ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। এই রচনাটি দুর্বল চিত্তের মানুষকে সতর্ক করবে! ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের ওপরে বিজ্ঞাপন প্রচার করে এমন জালিয়াতি কারবার চলতে পারে!

লেখক এমন একজন ঠগীর কথা লিখেছেন যে, নিজেকে একজন যৌন বিশেষজ্ঞ বলে চালায় এবং প্রচারপত্র বিলি করে। নাম :—ডাঃ টি ভি ভেঙ্কটরমন, এস ডি এস পি সি এ (লণ্ডন) ইত্যাদি। রোগগ্রস্ত, সমস্যা জর্জরিত, দুর্বল মানুষেরাই এর শিকার। মানুষের দুর্বলতাই এর মূলধন।

আর একটা কথা জানুন যে, এরা আবার বহুরূপী। হ্যাঁ তাই। আমি নিজে জানি। লেখকের ডাঃ ভেঙ্কটরামনকে আমি বিলক্ষণ চিনি, তবে অন্য নামে তাকে আমি চিনি 'পৃথিবীর আশ্চর্য হস্তরেখাবিদ্ লণ্ডন প্রত্যাগত শ্রীকাঞ্জিভরম নামে। আমি তার সাথে এক ঘন্টা কাটিয়েছি গত মার্চ মাসে কলকাতার বিখ্যাত চৌরঙ্গী হোটেলে। কেন এবং কেমন করে তা একটু লিখছি।

গত মার্চ মাসে আমি সরকারী প্রয়োজনে কলকাতায় যাই। সন্ধ্যায় যখন চৌরঙ্গীর মেট্রো সিনেমার কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন এক ছোকরা আমার হাতে একটা লিফলেট গুঁজে দেয়। তাতে লেখা ছিল, 'পৃথিবীর আশ্চর্য হস্তরেখাবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন' ইত্যাদি।

আমি প্রভাবিত হই এবং ঠিকানায় পৌঁছে যাই। চৌরঙ্গীর এক বিখ্যাত হোটেলে উপস্থিত হই। একটি সুন্দরী তরুণী সহাস্যে আমাকে স্বাগত জানায় এবং করমর্দন করে। আমি মুগ্ধ হই ও অন্দরে প্রবেশ করি। সাজানো ঘর, সুগন্ধে ঘর ভরা, কিন্তু কেউ নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হস্তরেখাবিদ্ এক পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এবং সহাস্যে আমাকে বসতে বলে। ইতিমধ্যে তরুণীটি এসে আমার পাশে বসে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, মহাপুরুষকে দেখে আমি তাকে যাদুকর বলে ভুল করেছিলাম। কেন? তার রয়েল ড্রেস দেখে, শ্বেত-শুভ্র পোশাকের উপর মাথায় ঝকঝকে মুকুট সত্যিই চমকে যাবার মত। তারপর? মেয়েটি প্রশ্ন করে ইংরেজিতে—তোমার নাম কি? ইত্যাদি। মেয়েটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আমি ভীত হয়ে পড়ি। এবং তাড়াতাড়ি দর্শনী দিয়ে রাজপথে নেমে আসি। সেদিন আমার কাছে যা ছিল তা হারিয়েছি বটে, কিন্তু যা ছিল না তা পেয়েছি। টাকা আমি হারিয়েছি ঠিকই, তার বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করেছি তার মূল্যও কম নয়। সারা জীবনের জন্য সে অভিজ্ঞতা আমাকে পথ দেখাবে।

আশা করি এ কাহিনী শুনে অন্যরাও সতর্ক হবেন।

চন্দনকুমার হালদার,
রেলওয়ে কোয়ার্টার, নদীয়া।

বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে

দীর্ঘকাল পর অমৃত পত্রিকায় 'বেতারশ্রুতি' বিভাগটি চালু করার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অনেক দিন ধরে এই বিভাগটি প্রকাশিত হবার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন জানি না। আমার মতে এই বিভাগটি চালু রাখা একান্ত প্রয়োজন। আজকাল আকাশবাণীতে রীতিমত গলদ ঢুকে পড়েছে। যান্ত্রিক গোলযোগ তো লেগেই আছে। আপনি হয়ত গান কিংবা খবর শুনছেন হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর, কিছুক্ষণ বাদে অতি বিনয়ের সঙ্গে ঘোষণা করা হল 'বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য আমরা দুঃখিত'। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি এমন অনেক গায়কের গান আকাশবাণী মারফৎ শুনতে হয় যাঁদের গান গাইবারই যোগ্যতা নেই। এ সমস্ত ব্যক্তিরা 'ধরাধরি'র মাধ্যমেই উৎরে যান। অথচ এমন অনেক গুণী শিল্পী আছেন যাঁরা বহু সাধ্যসাধনা করেও রেডিওতে গাইবার সুযোগ পান না। তাঁদের কাছে প্রোগ্রাম পাওয়া আকাশকুসুম কল্পনামাত্র।

কাজেই আকাশবাণীর অযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের আলোচনার পুনর্প্রকাশ অশেষ প্রশংসার্হ। যদি এতে করে আকাশবাণীর-কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হন। ধন্যবাদান্তে—

—অনুপম ভট্টাচার্য,
তারা আশ্রম, কোচবিহার।

পশ্চিমবাংলার পরিকল্পনা ছাঁটাই

চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য পশ্চিম বাংলা সরকারের যত আশা-ভরসা ছিল, দিল্লীর কর্তাব্যক্তিরা সে আশার বেলুনটিকে চুপসে দিয়েছেন। বেকারী, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব ইত্যাদি নানাকারণে পশ্চিম বাংলার সমস্যা আজ পর্বতপ্রমাণ। অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিক্রিয়াতেও এই রাজ্যে বহু কলকারখানায় তালা ঝুলেছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৬২ কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন অনুমোদনের জন্য। পরিকল্পনা কমিশন জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যসমূহ যতটা আশা করছিলেন তা দেওয়া সম্ভব হবে না। হয় নিজের ট্যাঁকের জোরে পরিকল্পনা বজায় রাখুন; নয়তো কাটছাঁট করুন।

তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে পশ্চিম বাংলা মাত্র ২৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পেরেছিল। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য ৬৬২ কোটি টাকার খসড়া প্রস্তাব রাজ্যের প্রয়োজনের পক্ষে মোটেই বেশি নয়। কলকাতা উন্নয়নের জন্য ধার্য হয়েছিল আশী কোটি টাকা। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল সম্প্রতি বলে দিয়েছেন যে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের জন্য মোট সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পরিকল্পনা ছাঁটাই করা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ, রাজ্যগুলির পক্ষে নিজেদের ক্ষমতায় টাকা তোলা প্রায় অসম্ভব। যেমন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জানিয়েছেন যে, এই রাজ্যের অধিবাসীদের ওপর আর কর ধার্য করা সম্ভব নয়।

তার ফলে কাপড়ের মাপ দেখে কোটের ছাঁট তৈরী করাই বুদ্ধিমানের কাজ, অন্তত বাস্তববুদ্ধির কথা তো বটেই। তাই রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞরা স্থির করেছেন যে, আপাতত ৪১৫ কোটি টাকার পরিকল্পনাই গৃহীত হোক। তার মধ্যে কলকাতার ভাগ্যে ৪০ কোটি টাকা। আগামী পাঁচ বছরে এই টাকা ব্যয় হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন মাত্র ২৪৫ কোটি টাকা। বাকী টাকাটা রাজ্য সরকারকে ধার কর্জ বা কর চাপিয়ে যেমন করে হোক জোগাড় করতে হবে।

মোট কথা পরিকল্পনা ছাঁটাইয়ের অর্থ হল গোড়াতেই উন্নয়নের অনেক কাজ ছাঁটাই করা। নানা সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ জর্জরিত। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই তা জানেন। কলকাতার দিকে তো তাকানো যায় না। তার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যান মহোদয় স্বয়ং বলে গেছেন যে, কলকাতার জন্য এতদিন কিছুই করা হয় নি। এই শহরের উন্নয়ন গোটা রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই প্রয়োজন। রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন কলকাতার উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত ৮০ কোটি টাকা দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। সে আশা পূর্ণ হয় নি।

এই ছাঁটাইয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের গতি মন্থর হবে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে সরকার তেমন নজরই দিতে পারবেন না। বিশেষত সমবায়, পর্যটন, বন, ক্ষুদ্র শিল্প, সমাজকল্যাণ, সড়ক নির্মাণ, ভূমিক্ষয় নিবারণ, শ্রম, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগে বরাদ্দ অর্থ অনেক কাটা হবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার এই ছাঁট-কাট করা পরিকল্পনার কতখানি রাখতে দেবেন তা এখনও জানা যায় নি। ও'রা ২৪৫ কোটি টাকার বেশি দেবেন না। বাকী টাকার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

পরিকল্পনা নিয়ে এ ধরনের দরকষাকষি চলতে থাকলে এর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সকল রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এক নয়, প্রয়োজনেরও রকমফের আছে। পশ্চিম বাংলার ওপর দিয়ে সেই পার্টিশানের সময় থেকে একটার পর একটা ধকল যাচ্ছে। কলকাতা শহর তো আর বাংলা দেশের জন্যই অর্থোপার্জন করে না। তার শিল্প, তার বন্দর এবং তার শ্রম গোটা ভারতের জাতীয় আয়ের অংক স্ফীত করে। এমন একটি রাজ্যের উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন করে অবহিত করার কিছু নেই। তা সত্ত্বেও যদি কেন্দ্রীয় সরকারের মন না গলে তাহলে বলতে হবে যে, বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য সহজে দূর হবার নয়।

অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যায্যতই পশ্চিমবঙ্গ আরও বেশি টাকা দাবী করতে পারে। সমস্ত রাজ্যই তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনা বেশি। রাজস্ব খাতে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বাঁটোয়ারার বৈষম্য আছে। পশ্চিমবঙ্গ সেই হিসেবে সঙ্গতভাবেই তারই আয়-করা রাজস্বের একটা ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইতে পারে। রাজ্যপাল অবশ্য দিল্লীতে দরবার করতে গিয়েছিলেন। ফলাফল কী হবে তা পরে জানা যাবে। মোট কথা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের যে চিন্তা করছিলেন রাজ্য সরকার, ছাঁটাই-করা পরিকল্পনায় তার অনেকখানিই বাদ যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের কোলে ঝোল টানবেন আর এদিকে রাজ্যগুলিকে বলবেন, নিজের প্রয়োজনের টাকা নিজেরা জোগাড় করতে। এভাবে আর যাই হোক সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা হয় না, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝা উচিত।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গান্ধীর ইতালী-সফর সম্বন্ধেও প্রিভা আমায় খবরাখবর দিলেন—দেমোঁঞ হেলবিগ যা বলেছিলেন, সেটাই এবারও প্রমাণিত হ'ল। খুবই সত্য, শয়তানী ষড়যন্ত্রের ফলেই গান্ধীর ট্রেণ রোমে পৌঁছোয় পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চল্লিশ মিনিট আগে, এবং সেই চল্লিশ মিনিট ধ'রে শয়তানেরা তাঁকে মোটরে তুলে সমুদ্রের ধারে এক ভিলায় নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করে—এবং সেটা একবার করতে পারলে ফ্যাশিস্টদের মন ভোলানো বুলির পাল্লায় না পড়ে তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। এটাও সমানই সত্য যে গান্ধীর সঙ্গে সকল সাক্ষাৎকারের মিথ্যা বিবরণ ফ্যাশিস্ট সংবাদপত্রগুলি ছাপে, যেখানে তিনি অহিংসার কথা বলেছেন, সেখানে শুধু 'অ' অক্ষরটাকে তারা ইচ্ছে ক'রেই কেটে বাদ দেয়। এবং গান্ধী যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছোন, জাহাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এক ইংরেজ-মন্ত্রী ও স্যার স্যামুয়েল হোর-এর এক প্রতিনিধি। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ইতালীতে হিংসাত্মক যে-সব বাক্য তিনি বলেছেন ব'লে শোনা যাচ্ছে, তা সত্য কি-না। এবং গান্ধীর দৃঢ় প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই ফ্যাশিস্ট বিবরণের অজুহাত নিয়ে ইংরেজরা ভারতে নতুন অত্যাচার শুরু করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে (এবং প্রিভা সেটা মীরা ও দেশাইকে দুঃখ ক'রে বলেনও) একদিন সকালে প্রিভার নজর এড়িয়ে গান্ধী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পরে যে তাঁরা স্কার্পার খপ্পরে প'ড়ে নানান বিড়ম্বনাজনক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হন (যেমন বালিল্লার পত্রিকায় আপিসে) এবং সুযোগ বুঝে তখন ফ্যাশিস্ট কাগজের ফোটোগ্রাফাররা তাঁদের ছবিও তুলে নেয়, এ-সব কথা প্রিভার কাছে তাঁরা একদম চেপে যান। অবশ্য গান্ধী ও তাঁর ভারতীয় সংগীরা যে ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই দিতে চাননি, তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু কথাটা প্রিভার কাছে চেপে গিয়ে তাঁরা ভুল করেন (জানতে পারলে প্রিভা যে তাঁদের বকবেন, সেটা তবে তাঁরা বুঝেছিলেন)। প্রিভা বললেন যে জেনারেল মরিসের মন্তে মারিও-র ভিলায় গান্ধীকে দেখতে যাওয়ার সময় মনে হত যেন সামরিক কোনো শিবিরে প্রবেশ করতে হচ্ছে—সশস্ত্র সেনা চারিধার ঘিরে রয়েছে—গান্ধী স্বয়ং পোপকে অনুরোধ জানান, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে। পোপ এই ব'লে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন যে, রবিবার তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না এবং শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর অন্য কাজ রয়েছে। গান্ধী স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হন, কিন্তু তাঁর মনের ভাব তিনি ব্যক্ত করেন নি। পোপ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন, এমন আশ্বাস ওয়াকিবহাল মহল থেকে কে তাঁকে দেন জানি না, এবং খানিকটা পোপকে দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশাতেই তিনি রোমে আসেন। কী ঘটেছিল তবে, ভিতরে ভিতরে? শোনা যায়, যেসব ক্যাথলিক প্রতিনিধি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন, তাঁরা পরে ভাতিকানকে খবর দেন যে, গান্ধী ভারতে মিশনারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন—সুতরাং পোপের তাঁকে না দেখতে চাওয়াই সংগত হবে। এ-ব্যাপারে সব থেকে খুশী যিনি হন, তিনি নাকি মুসোলিনী। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় মুসোলিনী গান্ধীকে কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ দেন নি, উল্টে তিনিই একটার পর একটা প্রশ্ন করে গেছেন সারাক্ষণ, ভারতের ব্যবসায়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে থাকেন। ইংরেজরা চ'লে গেলে ভারতের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যে সেই শূন্যস্থান ইতালীয়রা পূর্ণ করতে ব্যগ্র, সেটা দেখাই যাচ্ছে—গান্ধীর আন্দোলন সফল হবে এবং তার ফলে ইংরেজরা ভারত ছাড়বে, এটা ইতালীয়রা ধ'রে নিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীও ইতালী দেখে রীতিমত মুগ্ধ হন, ইতালীকে অনেকটা তাঁর নিজের দেশের মতই মনে হতে থাকে। গান্ধী বলেন, রোম থেকে ব্রিন্দিসির আগাগোড়া পথটায় যা-কিছু নিসর্গ শোভা ও বাড়ী-ঘর-দোর তিনি দেখেন, তা তাঁকে কেবলি ভারতের কথা মনে করিয়ে দেয়। এবং সে-সাদৃশ্যটা যে সত্যিই কতখানি, তা প্রিভা দম্পতি স্বচক্ষে এবার দেখে এসেছেন।

মে, ১৯৩২ — (ভারত থেকে প্রত্যাগত প্রিভার সঙ্গে আলোচনার পরের অংশ)। (এলোপাথাড়ি স্মৃতির চয়ন)।

শ্রীমতী গান্ধী : ভদ্রমহিলা দেখতে ছোট, বেশ ছোট, একেবারে পুঁচকে। ছবি দেখে তাঁর অবয়ব সম্বন্ধে কোনো সত্য ধারণাই হয় না। যতটা বৃদ্ধা লোকে তাঁকে বলে, ততটা তিনি নন। অত্যন্ত মিষ্ট স্বভাব, একটু যেন শিশুর মতনই। মনটা সব সময়ই যেন তাঁর কোথায় পড়ে আছে, কেবলি ঘুরছেন এখান থেকে ওখানে। বন্ধুরা এবং অন্যান্যেরা তাঁকে একেবারেই সমীহ করে চলেন না (অবশ্য গান্ধী এর ব্যতিক্রম, তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি সর্বদাই ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহার করেন—তবে গান্ধী তো সারাক্ষণই ব্যস্ত)। যাঁরা কোনো রকম করুণা দেখান তাঁর প্রতি, তাঁদের কাছে ভদ্রমহিলা এসে আশ্রয় নেন, যেমন এক রাত্রে হঠাৎ প্রিভা দম্পতির ঘরে ঢুকে পড়েন ও অভিযোগের সুরে বলেন, 'কোথায় যাই জানি না, সব ঘরই ভর্তি।' তারপর তিনি জড়সড় হয়ে কোণটায় বসে পড়েন এবং ছোট্ট মেয়ের মত অচিরেই এক ঘণ্টা-দু ঘণ্টার মত ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙতে বিস্মিত হন ও নম্রভাবে প্রিভাদের ধন্যবাদ জানানে পরে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েন। গান্ধী যখন বন্দী হন, তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন, কত কষ্ট তাঁকে দিয়েছেন, সেই ভেবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

গান্ধীর যে-জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বিগড়ে গেছে, তার বয়স হবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ—মাথায় পাকা চুল, বেশ সুশ্রী মুখ। ভেবেছিলাম, পিতার ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সে গেছে এক বুর্জোয়া বিদ্রোহীর ভাবে—কিন্তু তা নয়। আসলে ছেলেটির স্বভাব ছন্নছাড়া, ভালো বা মন্দ কোনো পথেই জোরের সঙ্গে চলতে পারে না, এক কাজ হতে আরেক কাজ গ্রহণ করে, কোনোটাতেই মন বসাতে পারে না। মেয়েদের পিছনে ছোটে, তাদের যেন গিলে খায়, ধারধোর করে বেড়ায়, এক খণ্ড রুটি ভিক্ষা করতেও তার দ্বিধা নেই। বদমাশ নয় একেবারেই, শুধু দুর্বলচিত্ত। পরিবারের সকলে ও গান্ধীর বন্ধু-বান্ধবেরা তার প্রতি

অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন, তাকে ক্ষুধার চোখে দেখেন। শুধু গান্ধীর ব্যবহার ভালো, ছেলে সম্বন্ধে তিনি খবরাখবর নেন, জিজ্ঞাসা করেন তার খাওয়া হয়েছে কিনা। ছেলের সঙ্গে তাকে সস্নেহে কথাবার্তা বলতে দেখেছেন প্রিভা—গান্ধীর সে-কথাবার্তায় ছেলের প্রতি এতটুকু বিদ্বেষ ভাব নেই। অন্য তিন ছেলেই পিতার খুব ভক্ত—দ্বিতীয়টি দক্ষিণ আফ্রিকায়। কনিষ্ঠ দেবদাসকে আমরা ছিলনতে দেখি, সে নাকি (তাকে দেখে কে তা বলবে?) প্রকাণ্ড এক বক্তা, ভারতের জনসভায় যাঁরা খুব বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, তাঁদের অন্যতম।

মীরা যেমন গোঁড়া তেমনি সকলের সামনে কর্তৃত্ব ফলিয়ে বেড়ান — গান্ধীকে তিনি কেবলি চরম কিছুর দিকে ঠেলছেন। তাঁর অহিংসার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে তিনি হিংসা-প্রণোদিতা। তাঁর গুরু যদি অহিংসা না নিয়ে হিংসার পথ বেছে নিতেন তো মীরার সেই অন্তর্নিহিত হিংসার রূপ আরো কত বাড়ত কে জানে। মীরা একমাত্র সেই গুরুকেই মানেন ও শ্রদ্ধা করেন (হয়তো আমি আরেকটি ব্যক্তি যাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন)। প্রিভা বলছিলেন, পুলিশ যখন বোম্বাই-এ গান্ধীকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে, মীরার চোখ দুটো তখন ক্রোধে জ্বলতে থাকে, পুলিশের প্রতি অপমানসূচক কথা বলতেও তিনি ছাড়েন না। গান্ধীর প্রধান সহকারী ও দক্ষিণহস্ত মহাদেব দেশাই-এর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া লেগেই আছে। এ-ভদ্রলোকটি অতি বিজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও আত্মাভিমানী—তাই মীরা তাঁকে কর্ত্রীর মত আদেশ দিতে শুরু করেন, স্বভাবতই তিনি রেগে ওঠেন। মীরা তাঁকে বলেন, 'এটা করুন, ওটা করুন।' তিনি বলেন, 'করব না।' 'নিশ্চয় করবেন।' 'না, করব না।' তারপর দরজা দুম করে বন্ধ করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসেন ও তাঁর রাগের জন্য অনুতাপ করেন। (তাঁদের এ ধরনের কলহের দৃশ্য জাহাজে আসতে আসতেই প্রিভা দেখেন।) কিন্তু মীরা কিছুতে অনুতাপ করবেন না—তিনি মাথা উঁচু করেই থাকবেন অহংকারীর মত, তাঁর দৃঢ়ভাব বজায় রাখবেন। একমাত্র গান্ধীই জানেন তাঁর দেমাক চূর্ণ করতে। মীরাকে তো চেনেন তিনি, তাই তাঁর প্রতি রীতিমত কঠোরও গান্ধী হন, অবশ্য গান্ধীর স্বভাব-সুলভ পন্থাতেই। একদিন তো প্রিভার চোখের সামনেই গান্ধী মীরাকে একেবারে ধুইয়ে দেন—অবশ্য একবারও না চেঁচিয়ে। ধীর স্বরে, একেবারে ঠিক বুড়ী কোনো ঠাকমার মত, গান্ধী মীরাকে ঠেসে ধমক দিলেন—পরে কেঁদে লুটেপুটি খেতে থাকেন মীরা। প্রিভারা তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে বসেন, তার উত্তরে মীরা আবার বলেন, 'না, উনি ঠিকই বলেছেন — এটাই আমার প্রাপ্য ছিল।' (এই রকম একটা ঘটনা ঘটে মীরার সংস্কৃত পড়া নিয়ে—গান্ধীই তাঁকে সংস্কৃত পড়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু মীরা নানা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে পড়ায় অবহেলা করেন। আসলে পড়াশুনোয় ধাতই নয় মীরার, বই-এর প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। সেই কারণেই কোনো আশঙ্কা না করে সেদিকে তাঁর মনকে টানতে চান গান্ধী: যদিও দেশাই ও প্যারীলালকে বই-টই-এর অত্যধিক মনোযোগ দিতে তিনি বারণই করেন, কারণ এঁরা দুজন স্বভাবতই লেখা-পড়ার প্রতি বেশি আকৃষ্ট, সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত বই পেলেই পড়তে বসে যান। এঁরা তাই উল্টে সক্রিয় কর্মী হোন, গান্ধী তাই চেয়েছিলেন।)

গান্ধীর সেই একই বুড়ী ঠাকমার মত আদেশ দেওয়া কণ্ঠস্বরের পরিচয় প্রিভা অন্যত্র পেয়েছেন। বোম্বাই-এ একবার তাঁকে দেখেন লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে বক্তৃতা দিতে, নড়বড়ে এক বাঁশের মঞ্চে উঠে—গোটা ছয়েক লাউড স্পীকার এদিকে-ওদিকে। ঐ উঁচুতে দূর থেকে তাঁকে দেখাচ্ছিল এত-টুকু, বসে আছেন পা মুড়ে, হাত-পা নাড়াচ্ছেন না, শুধু তাঁর জরুরী বক্তব্য দীর্ঘ জপের মালার মত এক ঘণ্টা-দু ঘণ্টা ধরে গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন অতি দ্রুত গতিতে—গলার স্বরে কোথাও এতটুকু উত্থান-পতন নেই। এবং প্রকাণ্ড জনতা তা শুনছে টুঁ শব্দ না করে। যেন তাঁর পায়ে এই জনসমুদ্রের ঢেউ এসে পড়ছে ছলাত-ছলাত—ভিড়ের একটা অংশ মেয়েদের জন্য আলাদা করে রাখা, যাতে তারা উন্মত্ত জনতার সংস্পর্শ হতে একটু দূরে থাকতে পারে। একবার এমন হল, কয়েকশত গান্ধী-বিরোধী অস্পৃশ্য বোম্বাই-এ এসে হাজির হয় বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য। ঘোড়দৌড়ের মাঠের প্রান্তেই যেই না তাদের দেখা গেছে, মেয়েদের জন্য আলাদা জায়গার বেড়াটা নড়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাওয়া

আরই নীরবে কংগ্রেস সেবাদল চার-পাঁচ লাইনে জায়গাটা ঘিরে ফেলল—সবাই অল্প বয়সী যুবক, একে অন্যের হাত ধরে। একটি কথাও না বলে শ্রোতার ভিড়ের মধ্যে তারা ঢুকে পড়ল, শ্রোতাদের ঘিরে একটা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনো শব্দ না করে বিদ্রোহীদের সেবাদল হটিয়ে দিল—সব শেষ। বোম্বাই-এ পার্টির এমন শৃঙ্খলাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই—এক বছরের মধ্যে যে সেই শৃঙ্খলার এতটা উন্নতি হবে, তা দেখে পার্টির সভ্যরা পর্যন্ত বিস্মিত।

বন্দী হওয়ার আগের এই শেষ কদিন গান্ধীর মনোভাব সর্বক্ষণই অত্যন্ত প্রশান্ত। খুব খারাপ খবরের দিনও যখন আশে-পাশে সবাই চঞ্চল, গান্ধীর মুখে হাসি লেগেই আছে—তখনো তিনি প্রিভাদের খবরাখবর নিচ্ছেন, যে-যে জায়গায় তাঁদের ঘুরে যেতে বলেন, সেখানে তাঁরা গিয়ে উঠতে পেরেছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করছেন। শুধু যখন লাটসাহেবের চিঠি আসে, এবং তার উত্তর তাঁকে দিতে হবে, একমাত্র তখনই তিনি সম্পূর্ণভাবে চিন্তামগ্ন হন। তার আগে বা পরে এক মিনিটের জন্যও তিনি উদ্বিগ্ন নন। লাটসাহেবের দ্বিতীয় উত্তর পাওয়ার পর থেকেই বোঝা গিয়েছিল, গান্ধী বন্দী হলেন বলে। এবং তার জন্য সকলে প্রস্তুতও হতে থাকেন। সংগে নিয়ে যাওয়ার মত জিনিষপত্র গান্ধী গুছিয়ে নেন, শিষ্য ও বন্ধুর দল পালা করে রাত্রে পাহারা দিতে শুরু করেন—নজর রাখেন, পুলিশ কখন আসে। একটা রাত নির্বিঘ্নে কেটে গেল, কারণ পুলিশ ভুল করে ভেবেছিল যে গান্ধী হয়তো বোম্বাই থেকে আমেদাবাদের পথে কোথাও আছেন, এবং সেখানেই তাঁর অপেক্ষা তারা করছিল—অথচ বোম্বাই হতে নড়েন নি গান্ধী। দ্বিতীয় রাত্রে প্রিভারা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, দরজায় হঠাৎ সজোরে ধাক্কা মারার শব্দে জেগে ওঠেন : পুলিশ এসেছে। গান্ধী বাড়ীর ছাদের উপর শোন, সেখান পুলিশ তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ে ও তাঁকে আবিষ্কার করে—তাঁর চারপাশে বন্ধুজন রয়েছেন। পুলিশের কর্তা তাঁকে আধ ঘন্টা সময় দেন প্রস্তুত হয়ে নেওয়ার জন্য। (সেদিন আবার তাঁর মৌন থাকার দিন, রাত বারোটা পর্যন্ত। পুলিশ অফিসারটি তাঁর ঘড়িতে আঙুলে দেখিয়ে জানান, কখন গান্ধীকে উঠতে হবে।) দরজাটায় কড়া পাহারা. সহকর্মী সকলে অত্যন্ত বিচলিত, গান্ধীর পায়ে সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের ভঙ্গী তাঁদের। গান্ধীর স্ত্রী কাঁদছেন, মীরাও শোকাকুল (পরে অবশ্য শক্ত হয়ে পুলিশদের অপমান করতে তিনি উদ্যত হন), সকলেই হিন্দু রীতিতে গান্ধীর পদধূলি নিচ্ছেন। খুশী শুধু গান্ধীই, শোকাবেশ বন্ধ করার জন্য তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণত শিষ্য-শিষ্যার ঘাড়ে তিনি সজোরে চাঁটি মারলেন (এটা অবশ্য প্রিভার বর্ণনা—আসলে গান্ধীর এই আচরণের হয়তো অন্য অর্থ ছিল, যা ভারতীয়দের পক্ষে সহজবোধ্য)। চাঁটিটি কিন্তু একেবারেই বন্ধুর মত নয়, চাষার মত এক প্রকান্ড চড়, যা মীরাকে বিশেষত ধরাশায়ী করে দেয়। গান্ধী হেসেই চলেছেন — প্রিভারা ছিলেন কিছু দূরে, তাঁদের দেখতে পেয়েই তিনি অন্য সকলকে ঠেলে এগিয়ে এলেন, তাঁদের দিকে হাত বাড়ালেন, হাসতে হাসতেই। ভাবখানা যেন : 'যাক, আপনারাও রয়েছেন, এখন দেখলেন তো, সব দেখলেন? আরো অনেক দেখবেন।...' সবচেয়ে বেশি কাঁদছিল যে, সে (অপ্রত্যাশিতভাবে) এক নাম-করা ইংরেজী কাগজের সংবাদদাতা (যাকে মাদলেন-এর সামনে মার্সেই-এ গান্ধী একবার তেড়ে ধমক দেন, মাদলেন অবশ্য ছেলেটির আন্তরিক বিনয়ের পরিচয় আগেই পেয়েছিলেন। এবং প্রিভা বলেন, তখন থেকে ছেলেটি নাকি গান্ধীর পার্টিকে নানাভাবে সেবা করে চলতে থাকে—লাটসাহেবের উত্তরটি গান্ধীর হাতে পৌঁছনোর ২৪ ঘন্টা আগেই নাকি সে গান্ধীকে উত্তরটির বক্তব্য সম্বন্ধে জানায়)। গান্ধীকে মোটরে নিয়ে যাওয়া হল, সামনে-পিছনে পুলিশ চলল। সেই সময় প্রিভা জানালা দিয়ে ঝুঁকে বোম্বাই-এর এক বড় লম্বা রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। তারকাখচিত রাত, তুহিন শীতল (রাত্রির এই তুহিন শীতলতাটির উপর প্রিভা বিশেষ জোর দিলেন, দিনের প্রখর উত্তাপের সংগে তার তুলনা করে), আশে-পাশে সব বাড়ী অন্ধকার। হঠাৎ (ঝড়ের ধুলোর মত কী অসাধারণ ও রহস্যময় গতিতে খবর ছড়ায়, এটা তার উদাহরণ) সব বাড়ীর উপরে-নিচে আলো জ্বলে উঠল, সব জানালা খুলে গেল, জাতীয় পতাকা নড়তে লাগল, রাস্তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অসংখ্য বাহুর অরণ্য দুলতে লাগল, কত লোকের কত মাথা দেখা গেল, সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'জয়, গান্ধীজীর জয়!'

(প্রিভা বললেন, তাঁদের পৌঁছোনোর প্রথম কয়েক দিন ও রাত্রি ধরে রাস্তায় এবং বাড়ীর সামনে লোকের ভিড়ের অন্তহীন চেঁচামেচি—যেন প্রার্থনার জপের মত বা স্রোতের অনর্গল শব্দ, কিন্তু সে-শব্দ তীক্ষ্ন, তাতে অভ্যস্ত হওয়া কষ্টসাধ্য। এমন কি বেশ ভিতরের দিকের ঘরগুলিতেও সে-অবিরত শব্দ থেকে নিস্তার নেই, তাতে চিন্তার প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ণ, সব কথোপকথনের মধ্যবর্তী শূন্য সময় গম গম। একটির পর একটি শব্দ হয়েই চলেছে লক্ষ লক্ষ শব্দ। বহিরাগত যে-কোন ব্যক্তি ঘরে ঢুকবে, সে তো প্রথমত চেঁচিয়ে নমস্কার জানাবে এবং পরে রাস্তা থেকে লোকে তার প্রত্যুত্তর দেবে—ঠিক গানের প্রথম চরণ বার বার ফিরে আসার মত, কিছুতে কখনো এর ব্যতিক্রম হয় না।)

কোনো বিক্ষোভ প্রদর্শনার্থে বা সরকারী কোনো অন্যায় বা কারুর বন্দী হওয়ার খবরের বিরুদ্ধে প্রায় এক দিন অন্তর বোম্বাই-এর সব দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। প্রিভা ভেবে আকুল হন, এমন দেশে লোকে কী করে ব্যবসা করতে পারে।

(ক্রমশঃ)

দহন

কল্যাণ সেন

দূর থেকে একটানা শব্দ বাতাসে ভেসে আসে। মাইকের ঘোষণা শুনতে পাওয়া যায় ; আসুন......আসুন......ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল, মাস্টার গোপালের অভিনব যাদুর খেলা, বাঘে-মানুষে লড়াই, মরণ-ঝাঁপ, কুমারীর বুকের ওপর হাতীর খেলা, বাঘে-মানুষে লড়াই, আর মাত্র কদিন। দেখে যান, ছোটদের দেখান ; কুমারীর বুকের ওপর......। তারপর সামান্য একটু বিরতি। তখন হিন্দী ফিল্মের গান শোনা যায় আর একটা কালো পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে কাঠের পা লাগানো একটা লোক, মুখোস এঁটে, অবিশ্রাম হাত, পা নেড়ে কথা বলতে থাকে। সুবর্ণ সুযোগ, একবারই মাত্র পাবেন, কঙ্কালের ম্যাজিক, মাস্টার গোপালের......।

বাঁশের সঙ্গে তার টেনে একটা 'মার্কারি ল্যাম্প' ঝোলানো। সেই নীলাভ আলোয় লোকটাকেই অনেকটা কঙ্কালের মতো মনে হয়।

যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার কথা শুনতে শুনতে, হঠাৎ বেল-এর শব্দে তারা সজাগ হয়ে ওঠে। এইবার খেলা সুরু হবে। মরণ-ঝাঁপ, বাঘে-মানুষে লড়াই...। টিকিট না পেয়ে বোকার মতো বাইরে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের চোখের সামনে সামান্য হাওয়ায় শালুর বিজ্ঞাপনটা দুলতে থাকে—'গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস'। অভিনব !! অনবদ্য !! রাশিয়ান তারের খেলা...। তারপর টিকিটের হার।

সার্কাস এসেছে। রাসের মেলায় উৎসব। একমাস ধরে চলবে এই মেলা। ডাকঘরের পূর্বদিকে খোলা মাঠটাকে এই একমাস আর চেনা যায় না। যেন কিছুদিনের জন্য একটা নতুন শহর বসে যায় এই মাঠে। কত মানুষ, কত শব্দ, আনন্দ আর উৎসব।... খেলনার দোকান, গাছতলায় বাঁদর নাচ, বাসনপত্রের দোকান, গ্যাস-বেলুন আর পাঁপর ভাজা, বেল ডাঙ্গার কাঁচের চুরি, এমন কি শীতের চাদর, সব পাওয়া যাবে এই একমাসের মেলায়। হরিশপুর, বেলডাঙ্গা চণ্ডীতলার সব মানুষ যেন ভেঙে পড়ে এই মেলায়। পুলিশের পাহারা বসে যায়। ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায়। আর সমস্ত আকর্ষণকে ছাপিয়ে মাইক বাজতে থাকে—'শো' আরম্ভ হয়ে গেল। ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না... দুর্লভ ক্রীড়া কৌশল... কুমারীর বুকের ওপর......।

চণ্ডীতলায় সন্ধ্যায় গাড়িটা যখন এসে থামে, তারপর আবার যখন হুস্ হুস্ শব্দে হুইসিল্ দিতে দিতে চলে যায়, গ্যাসের টিমটিমে আলোয় সমস্ত স্টেশনটা যেন কুয়াশার চাদর জড়িয়ে ঝিমুতে থাকে। ঠিক তখন, চণ্ডীতলার রাতের নিস্তব্ধতা যেন মাইকের শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অনেক রাতে কার্তিকের ম্লান জ্যোৎস্না যখন চারিদিকের গাছপালায় ছড়িয়ে পড়ে, যদু তার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে হ্যারিকেনটা ফুঁ দিয়ে নেভাতে নেভাতে নিশ্চিন্ত মনে বিড়ি ধরিয়ে 'পার কর হে দীনবন্ধু' বলে শোয়ার আয়োজন করে, পয়েন্টস্‌ম্যান মনোহর স্টেশন-ঘরে তালা লাগিয়ে চলে যায়,

তখন 'গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসে'র আলো-গুলো একে একে নিভতে থাকে। শুধু জীবন ঘরে আলো জ্বললে, দু' একটি মুখ দেখা যায়, চলে সারাদিনের হিসাব নিকাশ। উনুনে আমা চড়ে...পোশাক খুলে, মুখের রঙ তুলে ফেলে যারা খেলা দেখায় তারা বিশ্রাম নেয়। ম্যানেজার ঘটকবাবু একবার রাউন্ডে বেরোন, আর মালিক সূর্যপ্রসাদের চোখের রঙ তখন ধীরে ধীরে পালটাতে থাকে, যেন রক্তের মধ্যে বাঘের গর্জন শুনতে পান তিনি। সার্কাস-কুইন রূপো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখে, পিঠের ওপর ছড়ানো বেনী নিয়ে খেলা করে, মকবুল তার ঘরে বসে হাতে মলম লাগায় আর জীবন তাকিয়ে থাকে রূপোর মুখের দিকে। চোখ তুলে রূপো তাকায় জীবনের দিকে, 'কী দেখছিস ?...'

জীবন কথা বলতে পারেনা, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—যা ভাগ্ এখন আমার ঘর থেকে, এখানে যদি তোকে এখন দেখতে পায়, মালিক কেটে ফেলবে।'

সূর্যপ্রসাদ গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবেন—না, দুটো বাঘই বুড়ো হয়ে গেছে, চলবে না আর ওদের দিয়ে, এবার নতুন জিনিষ চাই...নতুন খেলা দেখাতে হবে।

চন্ডীতলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলের পথে এই সার্কাসের মাঠে এসে ভীড় জমায়। টিনের শেড দেওয়া জায়গাটাকে তাদের মনে হয় এক আশ্চর্য রূপকথার জগৎ। কত আলো, কত মজার খেলা। টিকিট ঘরের মধ্যে বসে থাকা বুড়ো মানুষটাকে মনে হয় শয়তান, দয়া করে তাদের দু' চারটে টিকিট ভিক্ষে দিলেও তো পারে! তর্ক করে নিজেদের মধ্যে—আসলে, সব ফাঁকিবাজি, বাঘটা মোটেই সত্যি বাঘ নয়।

—তোকে বলেছে! আর একজন ঠোঁট ওল্টায়।

রাস্তা দিয়ে তারা হ্যান্ডবিল কুড়িয়ে আনে, হাতীর পেছন পেছন ঘোরে আর রাতে স্বপ্ন দেখে তাদের অঙ্কের মাস্টারমশাইকে বাঘের সঙ্গে লড়তে দেওয়া হয়েছে......জটলা চলে বড়দের আসরেও। স্টেশন-মাস্টার তারাপদ চায়ের আড্ডায় কথাটা তোলে—'যাই বল তুমি অনন্তদা, এ রকম সার্কাস খোদ শহরেই বড় একটা...' অনন্ত মোক্তার হাসেন। দোকানের মালিক গোকুলকে আর একটু চা দিতে বলেন। তারপর তারাপদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কী জান ভাই, বিয়ে তো করনি, করলে বুঝতে; দিনরাত ঘরের মধ্যে যে সার্কাস দেখছি, তারপর মাঠের খেলা দেখতে আর সাধ হয়না। আমাদের এই তো সময়, দু'বার কেন দশবার দেখবে......' তারাপদও না হেসে পারেনা।

অর্জুন সামন্তের মেয়ে শেফালি তার ভাই হারুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। চুপি চুপি দুটো টিকিট কেটে আনতে পারবি? তোকে তাহলে একটা লাট্টুর পয়সা দেবো। হারু ভয় পায়, বাবা যদি...। শেফালির অর বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখা হয় না। কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে যেন দেখতে পায় সার্কাস-কুইন রূপো তারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে...। হারুর কাছে খবর নেয় 'কী রকম দেখলি? সত্যি লোকটা বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়লো?'

—তবে না তো কী? হারু যেন মজা পায় দিদির কাছে গল্প করতে।

তারপর? ...

—তারপর দু'জনের কী লড়াই!...

—তোর ভয় করছিল না?

—ধেৎ ভয় কেন করবে? ও তো খেলা! ...হারু হাসতে থাকে, আর রাগে-দুঃখে শেফালির ইচ্ছে হয় হারুর গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়।

—তারপর জানিস দিদি, একটা লোক মোটর-সাইকেল নিয়ে—

থাক্, তোমাকে আর বক্-বক্ করতে হবে না। রোজের মতোই শেফালি শুনতে পায় মাইকের ঘোষণা...আসুন...আসুন, আর মাত্র কয়েকটি শো...রাশিয়ান তারের খেলা, মাস্টার গোপালের ...'গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস', কুমারীর বুকের ওপর...।

'গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসে'র টিনের বেড়া আর শালুর বিজ্ঞাপনের কাছাকাছি আর একটা লোককেও মাঝে-মাঝে ঘুরতে দেখা যায়। শূন্য দৃষ্টি মেলে লোকটা গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন ভীড়ের বাইরে একপাশে সে কারো প্রতীক্ষায় আছে। আশ্চর্য! কোনো দিন টিকিট কেটে লোকটা ভেতরে ঢোকে না, যেন এত বড় একটা সার্কাসের খেলার প্রতি তার কোনো আকর্ষণই নেই। শুধু যখন মাঝে মাঝে মাইকের ঘোষণাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, বেলু বাজতে থাকে, তখন যেন নিজের অজান্তেই লোকটা চমকে ওঠে। মার্কারি ল্যাম্পের নীলচে আলোয় যেখানে পোকারা উড়তে থাকে সেখানে, কুয়াশার মধ্যে একটা বিবর্ণ ছবির মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজই তাকে দেখা যায়, আর শেষ শো ভেঙে যাওয়ার পর চন্ডীতলা মেলার মাঠে যেন লোকটা হারিয়ে যায়। যেন অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, লোকটার ডানহাতের প্রায় অর্ধেকটা নেই, বাঁ পা-টাও বেশ টেনে টেনে চলে। পরনে শতচ্ছিন্ন ময়লা প্যান্ট, আর কার পরিত্যক্ত একটা তালিমারা কোট। লোকটার কত বয়স, কোথায় থাকে আর কোথায় চলে যায়, জানা যায় না কিছুই। শুধু কুয়াশা আর নীলাভ আলোয় বিবর্ণ ছবির মতো একটা মানুষ টিনের বেড়ার বাইরে যেন শেষ 'শো' ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত কার প্রতীক্ষায় থাকে।

শেষ 'শো' ভেঙে গেছে সেদিন। বাতাসে সামান্য শীতের আমেজ, কার্তিকের দুর্বল জোৎস্না দূরে মাঠের অন্ধকারে সরের মতো ভাসছে। সূর্যপ্রসাদ কিছুটা বিরক্ত। তিনটে লোক অসুস্থ, ফলে দুটো খেলা বাদ দিতে হয়েছে তাকে। ঘটকবাবু ছুটি চান, দেশে যাবেন তিনি। পীতাম্বর দল ছেড়ে দিতে চায়। 'শো'-এর পরই রূপো কয়েকদিন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। নাঃ, সূর্যপ্রসাদ গলা ভেজালেন। মনে মনে আওড়ালেন, দেখো দল ভেঙে, যত ঝকমারির পয়সা!

—কে? পরদা নড়ে উঠতেই রূপো চমকে উঠলো।

—ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ইন্দু। রূপো নিজে ক্লান্ত এখন। বিশ্রাম চায় সে। তাছাড়া সূর্যপ্রসাদ...

—এখন কী দরকার?

—ইন্দু কথা বলে না। ফুঁপিয়ে কাঁদে। রূপোর হঠাৎ কেমন হাসি পায়, এই তো কিছুক্ষণ আগেই জরির সাজ আর মখমলের টুপি পরে এই মেয়েটা তারের ওপর ছাতা ঘোরাতে ঘোরাতে খেলা দেখিয়েছে, দর্শক হাততালি দিয়েছে, সূর্যপ্রসাদ তারিফ করেছেন, ম্যানেজার ঘটকবাবু কতদিন আরও খেলা চালানো যাবে তার হিসেব কষেছেন আর এখন পরদার কাছে দাঁড়িয়ে ইন্দু কাঁদছে!

—কী রে কাঁদছিস কেন রূপো এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখে।

—ইয়াসিন,...ইয়াসিন আমার। ইন্দু খাটের ওপর বসে পড়লো।

—মালিক জানে?...রূপো এক ঝটকায় ওকে বিছানা থেকে তুলে আনলো।

—জানলে তো তাড়িয়ে দেবে।

—কেন তাড়িয়ে দেবে? ইয়াসিন তোকে সাদি করবে না?

—এবার ইন্দু জড়িয়ে ধরলো রূপোকে।...ইয়াসিনের তো দেশে বিবি আছে, বেটা আছে...

মালিক সূর্যপ্রসাদ আরও কিছুটা তরল পানীয় গলায় ঢাললেন। মনে হচ্ছে মাথা ছিঁড়ে পড়বে এক্ষুনি। রক্তের মধ্যে আবার সেই হিংস্র গর্জন। শীতের হাওয়াতেও কপালে ঘামের রেখা।

—কী আরম্ভ করেছে রূপো...তবে কী শালা জীবন আমাকে টেক্কা মারছে?... অন্ধকারে বাইরে তাকালেন সূর্যপ্রসাদ। মধ্যরাতের বিষণ্ণ আকাশ, তারারা মাঠের ওপর যেন আর এক খেলার আসর বসিয়েছে। দূর থেকে পাখির ডাক শুনতে পেলেন তিনি।

টিকিটের বই, খুচরো পয়সা সব তুলে রেখে আলো নেভাতে গিয়ে কাউন্টারের সামনে একটা লোককে ঘুরতে দেখে চমকে উঠলেন টিকিটবাবু মুকুন্দ হাজরা। কে লোকটা? চোর-টোর নয়তো?

—কী চাই তোমার? হাজরাবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। কাজটাজ খুঁজলে কাল সকালে এসো, এখন বিরক্ত করো না।

একটু হাসি দেখা দিল আগন্তুকের মুখে। কৌতুকের আনন্দ বিদ্যুতের মতো খেলে গেল দু' চোখে। যাক নতুন লোক, তাকে চিনতে পারে নি। গলাটা পরিষ্কার করে জবাব দিল, আমি একবার মালিক সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই—

—তাজ্জব ব্যাপার! তাড়াতাড়ি চশমাটা চোখে তুলে আনে মুকুন্দ হাজরা। এই এত রাতে হাত-পা ভাঙা আধপাগলা একটা লোক শতছিন্ন পোশাকে একেবারে খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়?

—যা দরকার আমাকেই বল; এত রাতে মালিকের সঙ্গে দেখা হবে না।

—একটু দরকার, মালিক কী ব্যস্ত আছেন?

মুকুন্দের কথা জড়িয়ে যায়। নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে, যত পাগলের কারবার!...মন ভালো নেই তার। তিনশো টাকার জন্য মেয়ের বিয়ে আটকে যাচ্ছে, সূর্যপ্রসাদকে একদিন বলেছিল কথাটা। সূর্যপ্রসাদ হেসেছেন 'পাড়ের কড়ি' কত পকেটে জমালে হাজরা?...আরে মেয়ের বিয়ে এমনিই হয়ে যাবে; দেখতে কেমন?... নিয়ে আস না এখানে, খেলাটেলা শিখুক!...ঘর কাঁপিয়ে হেসেছিলেন সূর্য-প্রসাদ।

—শালা মাতাল! রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুকুন্দ হাজরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন।

গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসে'র শেষ 'শো' ভেঙেছে একটু আগেই। যেন এক দুরন্ত শিশু ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে। দূরে মাঠের ভেতর অন্ধকার আর হালকা কুয়াশা, শিরীষ গাছের পাতায় রাতের হিমেল বাতাসের শব্দ। একটার পর একটা আলো নিভে আসতে থাকে সার্কাসের। আর সূর্য-প্রসাদ অন্ধকার, মাঠ আর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখের রঙ পালটে যাচ্ছে তার। ঘরের আলোটা যেন তার চারপাশে ঘুরতে থাকে, শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায়, চোখ বুজে ফেলেন—তার চারপাশে কেউ একজন নাচছে...ক্রমশ বস্তের মতো জড়িয়ে ধরছে, মনে হয় সূর্যপ্রসাদ পুড়ে যাবেন আগুনের তাপে। কে ঝুমকি?...প্রলাপ বকে ওঠেন সূর্যপ্রসাদ। তাড়াতাড়ি গলাটা ভালো করে ভিজিয়ে নেন। নাঃ সব ঠিক আছে। সব পরিষ্কার। হাসলেন তিনি। ঝুমকি তো কবে মারা গেছে। কী হয়েছিল তার? মা হতে চলেছিল ঝুমকি? কেন আত্মহত্যা করেছিল ঝুমকি? ধুর শালা! সূর্যপ্রসাদ যেন নিজেকে ধমক দিতে চাইলেন। তার চেয়ে রুপা অনেক তুখোড়, অনেক এলেম আছে।

—আসতে পারি?

—সূর্যপ্রসাদ চমকে উঠলেন। এই অসময়ে কে বিরক্ত করতে এসেছে তাঁকে? ম্যানেজার ঘটকবাবু? নাকি রুপা?...

চোখ তুলতেই যেন স্বপ্নের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসের মালিক সূর্যপ্রসাদ। কে তুমি?...

—চিনতে কষ্ট হচ্ছে আপনার?... আগন্তুক হাসল।

সূর্যপ্রসাদের মনে হলো, ঘরে বাতাস নেই, বাইরে বাতাস নেই। মনে হলো কাউকে [illegible], আলোগুলো জ্বালাও নি কেন? কার্তিকের কুয়াশায় খুব স্পর্শের মধ্যেও ঘামতে লাগলেন তিনি। যেন সামনে চতুর শিকারী, সাবধানে পা ফেলতে হবে তাঁকে। মুখটা মুছে নিলেন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। নিজেকে তৈরী করে নিলেন বহু দিনের বহু অভিজ্ঞ গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসের মালিক সূর্যপ্রসাদ।

—তুমি বেঁচে আছো হীরালাল?...

—আপনার আপসোস হচ্ছে?...তীক্ষ্ণ গলায় কথা বললো হীরালাল।

—না, মানে, আমি শুনেছিলাম—সূর্য-প্রসাদ দম ফেললেন।

আশ্চর্য! একটা হাত নেই, পা নেই, বিকৃত চেহারা হয়ে গেছে হীরালালের, তবু ফিরে এসেছে, তবু আশা নিয়ে বেঁচে আছে সে? ...কী চায় হীরালাল?

—চম্পা কোথায়? হীরালাল যেন জেরা করছে সূর্যপ্রসাদকে। পায়ের তলার মাটি বোধহয় আবার খুঁজে পেলেন সূর্যপ্রসাদ। চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি আবার ফিরে পাচ্ছেন তিনি।

—কে চম্পা?... অবাক হবার ভান করলেন সূর্যপ্রসাদ।

—কেন, আপনার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?...

চারদিকের মন্থর রাতের নিস্তব্ধতাকে দু টুকরো করে প্রচন্ড শব্দে হেসে উঠলেন সূর্যপ্রসাদ, এই হাসি দেখলে মনে হয় লোকটা বোধহয় 'আউট' হয়ে গেছে। একবার জরিপ করে নিলেন সামনের লোকটাকে, তারপর গলা নামিয়ে আনলেন—

—চিড়িয়া ভেসে গেছে।

—তার মানে? হীরালালের ইচ্ছে হলো লোকটার টুঁটি টিপে ধরে।

—মানে, এখানে চম্পা-টম্পা কেউ নেই, যে আছে সে এখন গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসের সার্কাস কুইন রুপা। সূর্যপ্রসাদ যেন একটু একটু করে ঘায়েল করে ফেলছেন সামনের কুৎসিত অস্তিত্বটাকে।

—আমি তার সঙ্গেই দেখা করবো।

—তার একটা আলাদা ইজ্জৎ আছে, একটা বাইরের ভিখারীর সঙ্গে সে দেখা করে না।

হীরালাল একবার চারপাশে তাকাল। শিরীষ গাছের আড়ালে এক টুকরো জ্যোৎস্নায় যেন দূরের মাঠটাকে স্বপ্নের মতো মনে হয়। মুখ শুকিয়ে গেছে তার, কোথাও শব্দ নেই। একটু একটু করে কুয়াশা যেন তাকে কোথায় টেনে নিচ্ছে। সব কথা স্পষ্ট মনে পড়ে, মনে পড়ছে এখন? কজন লোক নিয়ে সুরু হয়েছিলো 'জুয়েল সার্কাস'? সে ছিল, মকবুল ছিল, এখনকার ম্যানেজার ঘটকবাবু নিজে তখন ক্লাউন সাজতেন। আর ছিলো গোটা দুই অখাদ্য জানোয়ার, অন্য দলের বাতিল হয়ে যাওয়া জিনিষ, কম দামে কিনেছিল সূর্য-প্রসাদ। তখন কী ঝুমকি এসেছিল দলে?

অনিশ্চিত আয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, একটু যারা নাম করছে, কেটে পড়ছে বড় দলে। এক এক জায়গায় তাঁবু ফেলে 'জুয়েল সার্কাস'। দুদিন পর মিজেরাই দর্শক, সূর্যপ্রসাদ ভেবে পান না কী করবেন। দল নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরছেন তিনি। আজ মুর্শিদাবাদ, কাল শিলিগুড়ি, পরের দিন ভাগলপুর। টাকা চাই, ভালো খেলোয়াড় চাই, ভাজা মেয়ে চাই, যার টানে লোক আসবে। খেলা দেখার নামে চোখ দিয়ে গেলা যায়, এমন রসদ চাই দলে।

প্রচন্ড জ্বরে ঘরে পড়ে ছিল হীরালাল। দলের অবস্থা ভালো নয়, তারপর অসুখ, নাকি হীরালালও বেইমানি করবে? 'গোল্ডেন সার্কাস' তো ওৎ পেতে আছে তার জন্য?...ছেড়ে দেবে 'জুয়েল সার্কাস?'

দরজায় শব্দ হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু হীরালাল চোখ বুজে নিজের কথা দলের কথা ভাবছিল। শব্দটাকে সে আমল দেয় নি। কিন্তু আর পারল না। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। খুব শীত করছে তার। টলতে টলতে উঠে এসে দরজা খুলে দিল সে।

দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেছিল চম্পা। প্রথমটায় চমকে গিয়েছিল হীরালাল। আলো জ্বালাতেই দেখতে পেল দেয়ালে ঠেস দিয়ে চম্পা দাঁড়িয়ে আছে। দারুণ ভিজে গেছে সে, ঠোঁট নীল, সমস্ত শরীর কাঁপছে তার।...বাইরে কী বৃষ্টি হচ্ছে এখন?...

—এত রাতে কী ব্যাপার?...হীরালাল কিছু বুঝতে পারছিল না। বাতাসে, না ভয়ে কাঁপছে চম্পা? চম্পার শরীর দুলে উঠলো, ঠোঁট সামান্য ফাঁক হলো, ধীরে

ধীরে মাটিতে বসে পড়ল সে। সব বললো চম্পা। সব শুনলো হীরালাল।

গুছিয়ে কথা বলার মতো শরীর অথবা মন কোনোটারই সুস্থ অবস্থা ছিল না। তিনদিন পর কোনো প্রকারে পালিয়ে এসেছে চম্পা। ওর পাড়াতুতো এক দাদার টালিগঞ্জ পাড়ায় ঘোরাঘুরির অভ্যাস ছিল। একটু-আধটু নাচ জানতো চম্পা, তার চেয়েও বড় কথা, কাঁচ বেতের মতো চম্পার শরীর। চম্পাকে তার দাদা বুঝিয়েছিল একটা ছবিতে নাচের পার্ট পাইয়ে দেবে সে; কিছু না বুঝে, হঠাৎ চম্পা রাজী হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল তার দু হাতের মুঠোয় ধরা দিচ্ছে একটা কল্পনার রাজ্য, যেখানে নারকেলডাঙ্গার এই বস্তির অন্ধকার নেই, অনাহার নেই। সেই পাড়াতুতো দাদা তাকে প্রথমে নিয়ে যায় চৌরিঙ্গিবাজারের দিকে এক দোকানে, সেখানে আরও দুজন লোক ছিল, তারাই নাকি সিনেমার মাতব্বর। প্রচুর খিদে নিয়ে চম্পা প্রচুর খেয়েছিল, মনে হয়েছিল এই তার সুখের আরম্ভ, স্বাধীনতার স্বাদ। তারপর কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? সব কথা ভালো মনে পড়ে না তার। তখনও পা টলছে। চোখের ভেতর রঙিন খেলা সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এক সময় বুঝতে পেরেছিল 'ইলিয়ট রোডে'র এক রহস্যময় ঘরে সে একা। নীচু ছাদ, কেমন দম আটকে আসা গন্ধ আর...আর তার কাঁচ বেতের মতো তাজা শরীরটাকে তোলপাড় করে এক আদিম-উৎসব! তখন কী করেছিল চম্পা?...

হীরালালের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল তার মাথার ভেতর একটা ভয়ংকর যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে. বোধহয় ভালো করে একবার দেখল চম্পাকে, তার তাজা শরীর, তার কপালের দাগ, তার ক্লান্ত দুর্বল চোখ। মন ঠিক করে ফেললো সে।

—কাজ করবে একটা? হীরালালের ঠোঁট জ্বলছিল।

—যা বলবে তুমি; ওখান থেকে না পালালে আমাকে ওরা খুন করে ফেলবে। ...কাঁদছিল চম্পা।

কেমন মনে হয় হে তোমার? সূর্যপ্রসাদ ঘটকবাবুকে প্রশ্ন করেছিলেন। ঠোঁট ভিজিয়ে, যে রকম ক্ষিপ্রতায় কাঠবেড়ালী দুপুরের নির্জন মাঠে ছোটাছুটি করে, তেমনি ঘটকবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিল... আমাদের কপালে কী ও জিনিষ...সূর্যপ্রসাদ বলেছিলেন—বাজে কথা রাখো, পারবে তো মেয়েটি?

—কী যে বলেন স্যার! ওই রকম চেহারা, তারপর নাচতে-টাচতে পারে... কী যে বলেন...

সেই সুরু। 'জুয়েল সার্কাসে'র চাকা এবার সামনের দিকে চলতে আরম্ভ করলো। যেন মৃতপ্রায় মানুষ প্রাণ ফিরে পাচ্ছে ধীরে ধীরে। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ছিল জুয়েল সার্কাসের নাম। লোকের মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো জুয়েল সার্কাসের 'ওয়ান্ডার গার্ল' চম্পার।

আসানসোলে খেলার দিন বাড়াতে হয়, তাঁবু না তুলতে তুলতেই ডাক আসে বসিরহাট থেকে। বড়দিনের ছুটিতে তাঁবু পড়ে ঢাকুরিয়ায়। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন; খেলার প্রশংসা। সূর্যপ্রসাদের ঘরে পর্দা ওঠে, বোতল জমা হয়, গেলাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ঘটকবাবুর ঠোঁট ভেজানো হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে, নতুন নতুন জানোয়ার আসে, নতুন নতুন খেলোয়াড়। সূর্যপ্রসাদের চোখের রঙ পালটাতে থাকে।

বাঘের খাঁচার খেলা দেখাতে ঢুকে সব যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো হীরালালের। কী হয়? যদি সে আর এই খাঁচার থেকে না বেরিয়ে আসে? দুর্ঘটনায় মৃত্যু? এতো সার্কাসে হামেশাই হয়। হাতের জোর কমে আসে হীরালালের, অভ্যস্ত কৌশল ভুলে যেতে থাকে; হঠাৎ তার মনে হয় কার খাঁচায় ঢুকেছে সে? সূর্যপ্রসাদকে দেখলে কেমন যেন শিউরে ওঠে সে। যে প্রজাপতিকে আগলে রাখার দারুণ ইচ্ছে, তার তরফ থেকেও এল অভাবিত সাড়া। দেখতে পেয়েছে হীরালাল চম্পার মুখের রং এবার সত্যি পালটে যাচ্ছে, বোধহয় সেই কল্পনার জগতে এবার সত্যিই সে পৌঁছে গেছে। নিজেকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় হীরালালের, আগুন জ্বালিয়েছে সে। জরির পোশাক আর জরির কাঁচুলি পরে যখন দর্শকদের নমস্কার করে রিং-এ ঢোকে চম্পা, তখন হীরালাল দেখতে পায় একদিকে সূর্যপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছে, পাশে সেই ঘটকবাবু, তারের ওপর সমস্ত শরীর একটা পাখির মতো ভেসে যাচ্ছে চম্পার...হীরালালের মনে হয় যেন একটা 'হাউই' জ্বলতে জ্বলতে চলে যাচ্ছে তার চোখের বাইরে, মাথা ঘুরে ওঠে তার।

—তোমার সংগে কথা আছে, হীরালাল দম নিয়ে বলেছিল।

—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক খুলছিল চম্পা: মুখের রং আলোতে অস্বাভাবিক লাগছিল।

—কী কথা?...সামান্য ঠোঁট নড়েছিল চম্পার।

—আমি দল ছেড়ে দেবো।...

—হঠাৎ? গলার হার খুলছিল চম্পা।

—হঠাৎ নয়, আর তোমাকেও ছাড়তে হবে এই দল।

—এমন কোনো সর্ত আছে নাকি? কপালে ভাঁজ পড়েছিল চম্পার।

—হীরালাল কাছে এগিয়ে গিয়েছিল: মাথার ভেতর তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—এখানে থাকলে—চম্পাকে বুকের কাছে টেনে আনার চেষ্টা করলো সে।

—আমার এখন বিশ্রামের সময়, এখন এভাবে বিরক্ত করলে—

—কোনো কথা না বলে হীরালাল বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।

—কী হে ঘটক, পাখি খেলছে কেমন? পরিপূর্ণ মুখ তুলে সূর্যপ্রসাদ দেখছিলেন ম্যানেজারকে। মনে হচ্ছিল একটা মানুষ নয়, বেড়াল বসে আছে তাঁর সামনে।

—কী যে বলেন স্যার...আমার তো বায়না এসেছে পুরুলিয়া থেকে।

সূর্যপ্রসাদ গলা ভেজান। কাছে ডাকেন ঘটককে।

—হীরালাল যে এ সময়ে ছুটি চায়, বড় চিন্তার কথা...

তুমি জানো, ওর কী কোনো অসুখ-টসুখ...

আবার ঘরের ভেতর যেন কাঠবেড়ালী ছুটে বেড়ায়...হাসে ঘটক, তারপর চাপা গলায় মালিককে সাবধান করে।

—এই ব্যাপার? সূর্যপ্রসাদের চোখ ছোট হয়ে যায়; গ্লাসটা নামিয়ে রাখেন। ...তাহলে তো একটা...।

—এখানে নয়, চলুন দল নিয়ে বাইরে; তারপর—

খুশি হন সূর্যপ্রসাদ। 'এই জন্যেই তো তোমার সংগে কথা বলে এত সুখ। নাও হে, একটু চাংগা কর শরীরটা।'

—কী যে বলেন স্যার, আপনার প্রসাদ...

খেলা জমেনি আজ। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে কদিন ধরে। শালার বৃষ্টি! হীরালালের কিছু ভালো লাগছিল না। এখনো টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হীরালাল বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে এল। ঠান্ডা হাওয়া, বৃষ্টির গন্ধ, দূরে ব্যাঙের ডাক, তার স্বপ্নের কথা মনে হচ্ছিল। হীরালাল হাঁটতে থাকল। অন্ধকার। বাঘের খাঁচায় কোনো শব্দ নেই, রাত কত এখন?... হীরালালের হঠাৎ ঘুমের কথা মনে হলো। বেশি দূর যেতে হয়নি তাকে, রান্নার জায়গাটার পাশে যেখানে কাঠ, পুরনো সব জিনিষ বোঝাই হয়ে আছে সেখান থেকে দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসতে দেখলো সে। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হীরালাল। ছায়ামূর্তি দুটি এগিয়ে চলেছে। দেখলে মনে হয় যেন হাওয়ায় ভাসছে। জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছে গাছের পাতায়, মাঠের ঘাসে, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দুটোর শরীরে। হীরালালের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়, রক্তের ভেতর যেন একটা হিংস্র পশুর আর্তনাদ শুনতে পায় সে। তা হলে মকবুল সত্যি কথাই বলেছিল? পালিয়ে যাবে সে? নাকি এই মুহূর্তে গিয়ে সূর্যপ্রসাদের টুঁটি টিপে ধরবে। হাসির শব্দ শুনতে পেল সে; কে হাসছে? চম্পা?...

যেন একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মধ্যে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সূর্যপ্রসাদের বুকের মধ্যে চম্পাকে এখন ঠিক একটা পাখির মত মনে হয়।

জ্যোৎস্নায় চম্পার শরীর যেন গলে গলে পড়ছে, তার হাত, নিভাঁজ মুখ, দাগহীন মোমের মত মসৃণ বুক, মাথার ভেতর সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে থাকে হীরালালের। সূর্যপ্রসাদের শরীর টলছে। দেখতে পায় সে— সূর্যপ্রসাদ যেন একটা নরম মাংসের পুতুলকে দু হাতে তুলে নিচ্ছে বুকের মধ্যে, চম্পার হাত সূর্যপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরে আছে, মুখ নামিয়ে আনলো সূর্যপ্রসাদ।

তারপর ধীরে ধীরে চম্পাকে জড়িয়ে শুইয়ে দিল সূর্যপ্রসাদ। চারপাশে শব্দহীন মধ্যরাতের পৃথিবী; আর এই জ্যোৎস্নার দুটো শরীর এখন নিজেদের রক্ত-মাংস, মজ্জায় জোয়ার সুখের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না হীরালাল। ঝুপঝাপ অস্পষ্ট আবরণের ভেতর দিয়ে টলতে টলতে ফিরে এল সে।

মকবুল খোঁজাতে চেষ্টা করেছিল হীরালালকে। মুকুল, দুর্দিয়া বড় আজব জায়গা দোস্ত!...সব দুনিয়ার ভেলকি। চম্পা তোকে এখন সহ্য করতে—

—চুপ কর শালা কুত্তা। হীরালাল থুথু ছিটিয়ে দিয়েছিল চারপাশে। শালা সূর্যপ্রসাদ যদি আর বাড়াবাড়ি করে—মকবুল হাসছিল আর বিড়ি টানছিল।

ঠিক মনে নেই, কোথায় ঘটেছিল ঘটনাটা। বাইরে কোথায় খেলা দেখাতে গিয়েছিল জুয়েল সার্কাস। সেইখানেই খেলা দেখাবার সময় ওপর থেকে পড়ে যায় হীরালাল। দর্শকরা ভেবেছিল একটা সাধারণ দুর্ঘটনা, কিন্তু সূর্যপ্রসাদ জানতেন হীরালালকে সরাবার এর চেয়ে নিরাপদ রাস্তা আর খুঁজে পায়নি ঘটক। কেউ বুঝবে না, কেউ সন্দেহ করবে না এমন কী হীরালাল নিজেও নয়। শালার মাথা আছে। সূর্যপ্রসাদ বেশ মজা পেয়েছিলেন তখন।

প্রায় দু মাস হাসপাতালে পড়েছিল হীরালাল। একা। অসুস্থ। সূর্যপ্রসাদ দেখতে এসেছিলেন তাকে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, ঘটকবাবু তো কেঁদেই ফেলেছিলেন ছেলেমানুষের মতো। হীরালালই যদি পড়ে থাকে—

মকবুল এসে বসে থাকত চুপ করে। না, চম্পা কোনোদিন আসেনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হীরালালের মনে হতো যেন একটা নির্জন অচেনা জগতে সে একা ঘুরছে। তার পাশে কেউ নেই, শব্দ নেই, হাওয়া নেই।

সূর্যপ্রসাদ কলকাতার ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, ছুটি পেয়েই সোজা কলকাতা ফিরবে; সামনেই শীতের দিন। আমাদের সীজন।

—বোধহয়, সূর্যপ্রসাদ সাদি করবে চম্পাকে। এই প্রথম মকবুল তার কাছে চম্পার নাম উচ্চারণ করলেন। হীরালাল উত্তর দেয়নি।

হাসপাতালের বাইরে খোলা মাঠের সামনে ছাড়া পেয়ে যেদিন প্রথম সে দাঁড়ালো, সুখ নয়, দুঃখ নয়, কেমন এক ধরনের শূন্যতা তার বুকের ওপর চেপে ছিল। তার হাত কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তার পা টেনে টেনে চলতে হয়। সামনে শীতের মাঠ, নীল পেয়ালা যেন কেউ ঢেলে দিয়েছে আকাশে। ফিরতে হবে। এভাবে বসে থাকা চলে না। কিন্তু কলকাতায় এসে দেখল— কোথায় সূর্যপ্রসাদ? কোথায় জুয়েল সার্কাস? কোথায় চম্পা?...দল ভেঙে দিয়েছেন সূর্যপ্রসাদ। শুনেছে, অনেক দূরে অনেক খেলোয়াড় নিয়ে আবার দল গড়েছেন। হীরালাল। তারপর দিন গেছে। মাস, তারপর বছর। কতদিন হয়ে গেল হীরালাল? পাঁচ বছর?...

কলকাতায় তো তার একটা আলাদা ইজ্জৎ আছে, একটা বাইরের ভিখারীর মতো...

চমকে উঠলো হীরালাল। তাকাল চারপাশে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসের মালিক সূর্যপ্রসাদ। একটু যেন ক্লান্ত মনে হয় সূর্যপ্রসাদকে, মুখের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারদিকে হেমন্তের শান্ত জ্যোৎস্না, মাঠ আর শীতের শব্দহীন।

—আপনি কী সাদি করেছিলেন চম্পাকে?...

হাসলেন সূর্যপ্রসাদ। আমার পূর্বপুরুষরা ছিল রাজপুত সর্দার। একটা দলের মেয়েকে ঘরে তুলবো আমি?

—কিন্তু এক বিছানায় তোলা যায়!... হীরালাল হাসল।

—হীরালাল! সূর্যপ্রসাদ কেঁপে উঠলেন উত্তেজনায়।

রাসের মেলা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। দোকান উঠেছে, গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসের মাইকের ঘোষণা এখন আর ঘনঘন বাজে না— 'আসুন, আসুন ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল, মাস্টার গোপালের ম্যাজিক, মরণ-ঝাঁপ কুমারীর বুকের ওপর...আসুন—আসুন...'

খেলা চলছিল সেদিন। হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল—আগুন! আগুন! চীৎকার, ঠেলাঠেলি, একটা অস্বাভাবিক আর্ত কলরব। ছুটেছে সবাই, যে যেদিকে পারছে। ছোটদের কান্না, আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছে, ধোঁয়ার গন্ধ, বাঁশ ফাটছে শব্দে। স্টেজের ফ্রেম আগুনে জ্বলতে জ্বলতে নীচে পড়ছে। দু'হাত দূরের মানুষ ঠিক চেনা যায় না। জানোয়ারদের খাঁচায় গর্জন। একজন নাম ধরে ডাকছে আর একজনের। পুলিশ এলো। আগুন নেভাবার ব্যবস্থাটি শুরু হলো। ইলেকট্রিক তার শর্ট হয়ে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ রিপোর্ট নিল।

সার্কাসের মাঠটা এখন আর চেনা যায় না ছাইয়ের স্তূপ, ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছে তার মধ্যে। সূর্যপ্রসাদ চললেন মেয়েদের পোষাকের ঘরে, ওখানেই চম্পা ছিল। ঘটক দাঁড়িয়ে, টিকিট-বাবু, দুর্গা, দুর্গা নাম জপ করছে। না, ড্রেস-রুম ফাঁকা; ঘরেরই প্রায় চিহ্ন নেই। চম্পা তাহলে কোথায়? কোথায় চম্পা?

শেষ পর্যন্ত পুলিশের লোক খুঁজে বার করলো টিকিট-ঘরের কাছাকাছি দুটো অর্ধদগ্ধ দেহ। ঘটক চীৎকার করে উঠলো— আমদের সার্কাস-কুইন?...ছুটে এলেন সূর্যপ্রসাদ।

—কিন্তু জড়িয়ে ধরা লোকটা কে?... পুলিশ জানতে চাইল। একটা হাত নেই, পা নেই, স্ট্রেঞ্জ!......এগিয়ে গেল পুলিশের লোক।

—কে লোকটা? প্রশ্নটা ছড়িয়ে পড়ল। পড়তে থাকল। সূর্যপ্রসাদ দাঁড়িয়ে রইলেন, দেখলেন হীরালালের মুখ। ঝলসে গেছে তবু যেন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই; একটা ছোট পাখির মতো চম্পাকে জড়িয়ে আছে হীরালাল।

ফ্রান্সের নতুন নোট

© কাফী খাঁ ২৭.১১.৬৮

দেশে বিদেশে

নাম্বুদ্রিপাদের সংকট

অনেকগুলি ঘটনা এক সঙ্গে জড়িত হয়ে কেরলের ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের সরকারকে বিব্রত করে তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট প্রসঙ্গে নয়াদিল্লীর সঙ্গে ত্রিবান্দ্রমের বিরোধটা চাপা পড়ে যাওয়ায় কেরল সরকারের একটা বড় সঙ্কট যখন কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছিল ঠিক তখনই একটার পিঠে আর একটা এক সঙ্গে অনেকগুলি সঙ্কট এসে দেখা দিয়েছে। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মালাবারের দুটি থানায় হামলা করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির দলছুট (এবং হয়ত দলের ভিতরকারও) চরমপন্থীরা নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছেন, কেরলের কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীপনমপিল্লি গোবিন্দ মেনন রাজ্য সরকারের আইন ও শৃংখলা রক্ষার ক্ষমতায় অনাস্থা প্রকাশ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের জুলুমের প্রতিরোধ করার জন্য জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ আত্মরক্ষার আয়োজন করতে আহ্বান করেছেন, ঐ রাজ্যে কংগ্রেস ডিসেম্বর মাস থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, মালাবারে একটি পুরানো মন্দিরে পুজা করার অধিকারের দাবীতে সর্বোদয় নেতা শ্রীকেলাপ্পনের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে, মালাবারে একটি নতুন মুসলিম-প্রধান জেলা গঠনের সরকারী প্রস্তাব জনসঙ্ঘ ও অন্যান্য দলের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে, পুলিশের আচরণ সম্পর্কে ও পুলিশকে সংযত রাখতে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি, আর-এস-পি ও বিদ্রোহী এস এস পি গোষ্ঠীর বিক্ষোভ ঐ দলগুলিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকারের 'প্রকাশ্য বিরোধিতায় নামিয়েছে। সব মিলে কেরলের নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের এখন অভিমন্যু দশা।

সম্প্রতি রাজ্যের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সম্মেলনে বলা হয়েছে যে, "প্রতিক্রিয়াশীলরা ও চরমপন্থীরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করছে।" যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে

অন্ততপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারতেন তা হলেও তাঁদের হয়ত এতটা বিব্রত হতে হত না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন চারদিক থেকে আক্রান্ত ঠিক সেই সময়েই যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে কয়েকটি বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

এই বিরোধ এতদূর গড়িয়েছে যে, কেরল এস এস পি গোষ্ঠীর ও আর এস পি'র সদস্যরা একদিন বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করে গেছেন। অন্য একটি ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাবার জন্য দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট সদস্যরা একদিন বিধানসভা বর্জন করেছেন। আর এস পি ও বিদ্রোহী এস এস পি গোষ্ঠীর (যাঁরা কেন্দ্রীয় পার্টির নির্দেশ অমান্য করে যুক্তফ্রন্টে রয়ে গেছেন) ও আর এস পি'র নালিশ হচ্ছে, সম্প্রতি ত্রিবান্দ্রমের মানাকাড় এলাকায় যে সব পুলিশ নারীনিগ্রহ ও একজন কর্পোরেশন কাউন্সিলারের লাঞ্ছনা সমেত নানা রকম জুলুম করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ "ঔদাসীন্য প্রদর্শন" করেছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির অভিযোগ এই যে, পুজার অঞ্চলে একদল ধর্মঘটী তাড়ি-কাটা শ্রমিকের উপর পুলিশ জুলুমের তদন্ত করতে রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীমতী কে আর গৌরী অস্বীকার করেছেন। ইতিমধ্যে, কুইলন শহরের কাছে এক জায়গায় দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী কম্যুনিস্টদের মধ্যে এক সংঘর্ষে দু'জন মারা গেছেন এবং একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছেন।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, বিধানসভায় কম্যুনিস্ট, আর এস পি ও কেরল এস এস পি সদস্যরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

মালাবারে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে পুনর্নির্মিত মন্দির ও প্রস্তাবিত নতুন জেলা নিয়ে যে আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার মূলে রয়েছে এই অভিযোগ যে, জোটের ভিতরকার বিরোধের সমস্যায় বিব্রত হয়ে এই সরকার ক্রমেই বেশী করে মুসলিম লীগের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন এবং এই সমর্থনের দাম দেওয়ার জন্য লীগের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

পালঘাট জেলার অঙ্গাদিপুরমে একটি অনেক দিনের পুরানো মন্দির ছিল। এই মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। সংস্কার না হওয়ায় সেটি ভেঙ্গে পড়ছিল। মালাবারের আরও অনেক মন্দির এরকমভাবে যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। মন্দিরগুলি সংস্কার করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ কিছুকাল আগে উদ্যোগী হয়। তার ফলে অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাদিপুরমের মন্দিরটির মেরামত হয়। পুনর্গঠিত মন্দিরটিতে গত বছর আবার পুজো আরম্ভ হয়। ১৯২৪ সালের পর এই প্রথম আবার সেই অবহেলিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পুজো পেলেন। তখন থেকেই বিরোধ দেখা দিল। ঐ মন্দিরের কাছেই রয়েছে একটি মসজিদ। তাই নিয়েই বিরোধ বাধল। মন্দিরটি সরকারী জমির উপর এবং সরকারী জমিতে কোন ধর্মেরই কোন উপাসনালয় থাকতে পারবে না, এই যুক্তিতে করে রাজ্য সরকার অঙ্গাদিপুরমের মন্দিরে পুজো নিষিদ্ধ করে দিলেন। ঐতিহাসিক সৌধ হিসাবে সংরক্ষণ করার জন্য মন্দিরটির ভার সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ শিবলিঙ্গের চারদিকে দেওয়াল গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সর্বোদয় নেতা শ্রীকেলাপ্পনের নেতৃত্বে কয়েকদিন ধরে স্থানীয় অধিবাসীরা সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মন্দিরে পুজো দেওয়ার চেষ্টা করলেন। শ্রীকেলাপ্পন ও অন্যান্য অনেককে গ্রেপ্তার করা হল। আন্দোলনকারীরা সদ্য-নির্মিত দেওয়াল ভেঙ্গে দিলেন। শ্রীকেলাপ্পন থানায় অনশন শুরু করলেন। অঙ্গাদিপুরমে পুলিশ লাঠি চালাল। আন্দোলন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দলের সমর্থন লাভ করল। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, আদালত সরকারী নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দিয়েছেন।

মালাবারে পালঘাট ও কালিকট জেলার কতক অংশ নিয়ে "মালাপ্পুরম্" নাম দিয়ে চতুর্থ আর একটি জেলা গঠনের সরকারী প্রস্তাবের পিছনে সাম্প্রদায়িক কোন উদ্দেশ্য আছে, এই অভিযোগ সরকারীভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মালাবারের বর্তমান তিনটি জেলা অত্যন্ত বড় বলে এবং অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের সুবিধার জন্য এই জেলা পুনর্গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু সমালোচকরা এই দুটি যুক্তিই অস্বীকার করছেন। কেরলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে মালাবার মাদ্রাজে একটি অবিভক্ত জেলা ছিল। প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের পর জেলাগুলির আয়তনে ৫০০ বর্গ-মাইলের বেশী হেরফের হবে না। আর প্রশাসনিক খরচ বাড়িয়ে একটা নতুন জেলা গঠন করাই অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ পন্থা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। সমালোচকরা এটাও দেখাচ্ছেন যে, মালাবার অঞ্চলকে মুসলমান-প্রধান লক্ষাদ্বীপ, আমিনদিভি ও মিনিকয় দ্বীপ-পুঞ্জ নিয়ে একটি "মোপলাস্তান" গঠন করার যে পুরানো মুসলিম লীগ পরিকল্পনা রয়েছে তাকেই এই নতুন মুসলমান-প্রধান জেলা গঠনের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে জীইয়ে তোলা হচ্ছে। প্রস্তাবটি এসেছিল মুসলিম লীগের তরফ থেকে এবং একমাত্র মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া যুক্তফ্রন্টের শরিক অন্য কোন দল এই ব্যাপারে উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও এই বিষয়ে মতভেদ আছে বলে শোনা গিয়েছিল—যদিও সেই সংবাদ অস্বীকার করা হয়েছে। দলছুট কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীকে পি আর গোপালন সরকারকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, নতুন জেলা গঠন করলে সাম্প্রদায়িক সংঘাত হবে।

কেরল সরকারের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে কালিকট জেলায় তেলিচেরি ও পুলপল্লীতে দুটি সশস্ত্র হানার ঘটনা। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে এই দুটি ঘটনা ঘটেছে। দুটিই এক ধরনের ঘটনা। তেলিচেরি থানার উপর আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পুলপল্লী থানার সংলগ্ন বেতার ঘাঁটির উপর হামলায় পুলিশের একজন বেতার অপারেটর নিহত হয়েছেন। পুলপল্লীতে হামলা করে পালিয়ে যাওয়ার পথে হামলাকারীরা স্থানীয় দু'জন জমিদারের বাড়ীতেও হানা দেয় এবং সেখান থেকে প্রায় ১৫ হাজার টাকার জিনিসপত্র, খাদ্যদ্রব্য ও গহনাপত্র নিয়ে যায়।

কারা এই হামলা করেছে? তাদের উদ্দেশ্য কি?

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ এইসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে রাজী নন। কেরল বিধানসভায় যখন প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয় তখন তিনি বলেন যে, এই বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং তদন্তের অসুবিধা হতে পারে এমন কিছু তিনি বলবেন না। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করেছেন যে, একদল লোক রাজ্যের মধ্যে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করতে সংকল্পবদ্ধ এবং তারা যে দলেরই হোক না কেন, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বদ্ধপরিকর।

কেরলের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীএ কে গোপালন্ বলেছেন, তিনি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, "তেলিচেরি ও পুলপল্লীর ঘটনার পিছনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের হাত ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী চাবনের সমর্থন আছে।"

"একই সঙ্গে সংগ্রাম ও শাসন চালাবার যে তত্ত্ব মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ প্রচার করছেন তারই পরিণাম"—বলেছেন কংগ্রেস নেতা ও কেরল বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীকে এম জর্জ।

তেলিচেরিতে হামলাকারীরা হটে যাওয়ার সময় অস্ত্রশস্ত্র ও ইস্তাহারের সঙ্গে মাও সে তুঙের ছবিও ফেলে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই সংবাদের ভিত্তিতেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির (দক্ষিণপন্থী) সাধারণ সম্পাদক শ্রীসি রাজেশ্বর রাও মন্তব্য করেছেন: "মাও সে তুঙের পতাকার নীচে এদেশে যে-সব চরমপন্থী তত্ত্ব ও আচরণ প্রচার করা হচ্ছে এবং কিউবার বিপ্লবের ও বিপ্লবী গুয়েভারার তত্ত্বের শিক্ষার যে বদ হজম হয়েছে তারই ফল এই জাতীয় ঘটনা।"

এটা লক্ষণীয় যে, কেরলের চরমপন্থী মার্কসবাদীদের এক অংশ যখন এর্ণাকুলম্ জেলার তোড়ুপুড়ায় প্রথম রাজ্য সম্মেলনে মিলিত হয়ে বিপ্লবী কম্যুনিস্টদের একটি পৃথক দল গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন ঠিক সেই সময়েই তেলিচেরি ও পুলপল্লীর ঘটনা ঘটে। ঐ সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিধানসভার সদস্য (ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে সদ্য বহিষ্কৃত) শ্রীকে পি আর গোপালন এবং ঐ দুটি ঘটনা সম্পর্কে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন হলেন
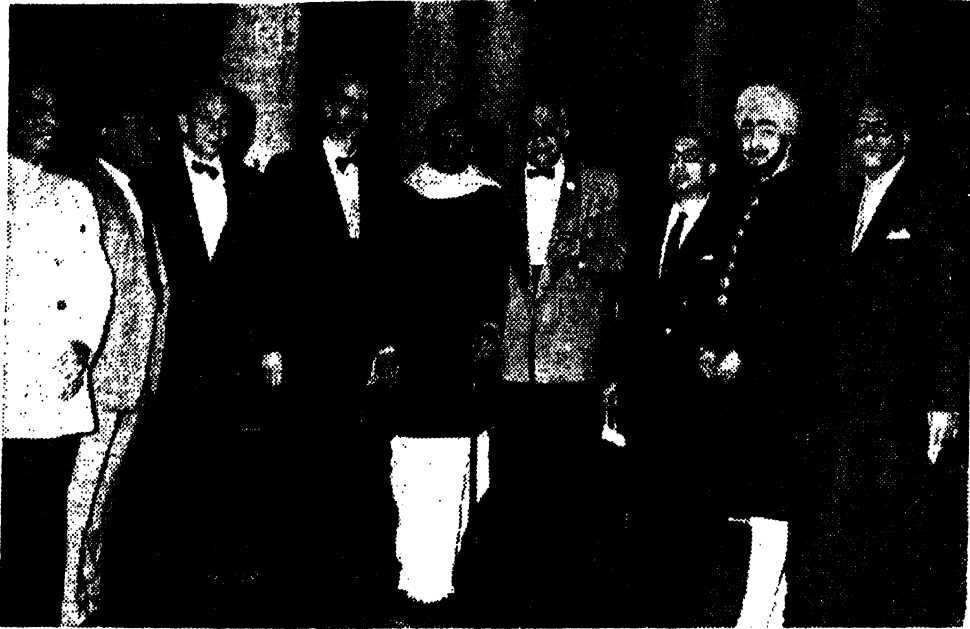
ইংলিশ স্পীকিং ইউনিয়ন বর্ধমান প্যালেসে কানাডার হাইকমিশনার মিঃ জেমস জর্জকে সম্বর্ধনা জানায়। ছবিতে (বাঁ থেকে ডানদিকে) দিনাজপুরের কুমার এস এন রায় দেববর্মা ; বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ জন ম্যাকেঞ্জি; অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ; বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ; রায়বাহাদুর জি ডি সোয়াইকা; শ্রীএইচ সিং ও শ্রী আর এম পোদ্দারকে দেখা যাচ্ছে।

তোড়ুপুড়া সম্মেলনের সমন্বয় কমিটির আহবায়ক। এই যোগাযোগ লক্ষ্য করে শ্রীগোপালন্ তাঁর বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর পুলিশ শ্রীকুন্নিক্কাল নারায়ণের দলকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোড়ুপুড়ার সম্মেলন বানচাল করে দেওয়া।

এই শ্রীকুন্নিক্কাল নারায়ণন্ কিছুকাল আগেও কেরলের নকসালপন্থীদের সংগে ছিলেন। সম্প্রতি অন্যান্য নকসালপন্থীদের সংগে তাঁর মতভেদ হয়। তারপর তিনি তাঁর কালিকট শহরের বাস উঠিয়ে দক্ষিণ ওয়াইনাদ পাহাড় অঞ্চলে চলে গিয়ে তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রচার করছিলেন বলে সংবাদ আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫০০ ফুট উ'চুতে জংগলে ঘেরা এই জায়গাটি কেরল ও মহীশূর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। চা, কফি, রবার ও গোলমরীচের বাগিচায় ভরা এই অঞ্চল প্রধানত পাহাড়ী উপজাতীদের বাসভূমি ও নকসালপন্থীরা যে ধরনের গেরিলা যুদ্ধের কথা বলে তার বিশেষ উপযোগী। পুলপল্লীর হামলা এই কুন্নিক্কল নারায়ণের দলেরই কাজ বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মনে করছেন। অনুমান করা হচ্ছে, এই হামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা ও পরে অর্থ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়টি কিছু পরিমাণে সফল হলেও প্রথম উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়েছে।

সংবাদে এটাও প্রকাশ পেয়েছে যে, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সম্প্রতি যে "সেনা" সংগঠন করেছেন তার অন্তত কিছু অংশ পুলপল্লীর ঘটনার সংগে জড়িত ছিল।

তেলিচেরির ও পুলপল্লীর হামলা নকসালপন্থীদের কাজ, একথা খুব জোর দিয়ে বলা কঠিন। তার একটা বড় কারণ এই যে, নকসালপন্থী বলতে কোন একটা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী বোঝায় না। যেমন কেরলেই তোড়ুপুড়ার সম্মেলনে শ্রীকে পি আর গোপালন্ যোগ দিলেও আর একজন চরমপন্থী শ্রীকোশলরাম দাস যোগ দেন নি। শ্রীদাস বিধানসভার সদস্য পদ ছাড়লেও শ্রীগোপালন্ ছাড়েন নি। সারা ভারতে নকসালপন্থীদের আলাদা দল তৈরী করার সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই যাঁরা কেরলে আলাদা দল তৈরী করলেন তাঁদের সংগে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীচারু মজুমদার (শ্রীমজুমদার কেরলের হামলাবাজীর নিন্দা করেছেন) বা অন্ধ্রের শ্রীনাগি রেড্ডীর কতখানি মতের মিল আছে বলা কঠিন। যাই হোক, এটা বলা যেতে পারে যে, "বিপ্লব—এখানে ও এখনই" তত্ত্ব প্রচার করার জন্য যাঁরা সম্প্রতি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন তাঁদেরই একটি গোষ্ঠী তেলিচেরি ও পুলপল্লীর ঘটনার জন্য দায়ী, একথা এখন অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কোন কোন পর্যবেক্ষকের ধারণা, ভারতে বর্তমানে একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি রয়েছে এটা দেখবার জন্য এবং "ভারতের ইয়েনান" তৈরী করার জন্য শ্রীকুন্নিক্কাল নারায়ণনের গোষ্ঠী দক্ষিণ ওয়াইনাদের পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়েছেন। তাঁদের এই উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁরা যে তাঁদের কাজের দ্বারা নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর দলকে যথেষ্ট বিব্রত করতে পারবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আর কিছু না হলেও অন্তত তাঁর নিজের দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নাম্বুদ্রিপাদকে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তিনি দিল্লীতে বলেছেন, সমস্যাটা নিছক আইন ও শৃংখলার নয়, রাজনৈতিক। কিন্তু তিনি তাঁর উগ্রপন্থীদের সংগে যতই রাজনৈতিক মোকাবেলা করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁকে প্রধানত প্রশাসনিক দমনের অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং যতই তিনি তা করবেন ততই এই দলছুট কমরেডরা নাম্বুদ্রিপাদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর দলাদাস করার অভিযোগ আনার ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে বিভ্রান্তি আনার সুবিধা পাবেন।

নিঃসন্দেহে পরিস্থিতিটা শ্রীই এম শংকরন্ নাম্বুদ্রিপাদের মত ঠান্ডা মাথার মানুষের পক্ষেও রীতিমত অস্বস্তিকর।

শাদা চোখে

নির্বাচন বয়কট করার ধ্বনি তুলে বাজার সরগরম করার চেষ্টায় নকশাল-পন্থীরা কোমর বেঁধে লেগেছেন। কলকাতা ও শহরতলীর ফাঁকা দেওয়াল ডাবরের বা সাধনা ঔষধালয়ের তেলের ও ওষুধের বিজ্ঞাপনের চেয়েও বড় হরফের অক্ষরে অক্ষরে ভর্তি হয়ে গেছে। শুধু একটি শ্লোগান—নির্বাচন নয় কৃষি বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পথ। তারপরই আর একটি শ্লোগান উৎকীর্ণ করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে 'চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং'-এর প্রদর্শিত মার্গই বিপ্লবের একমাত্র সড়ক।

নির্বাচন বয়কট করার জন্য নকশাল-পন্থীরা অবশ্য কখনো কখনো ছোটো ছোটো শোভাযাত্রাও বের করছেন। উদ্দেশ্য—শ্রমিক শ্রেণী আর সেই সঙ্গে সমস্ত মেহনতী মানুষকে বিপ্লবের কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্যক অবহিত করা এবং নির্বাচনের মোহভঙ্গে সাহায্য করা। আবার এঁদের তাত্ত্বিকরাও পত্র-পত্রিকা মারফৎ নির্বাচন বয়কটের জাতীয় প্রয়োজন এবং আন্ত-র্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে গণমানসে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার বীজ উপ্ত করার কাজে ব্যাপৃত আছেন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গ্রামে গ্রামে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য নকশাল-পন্থীরা যত না চেষ্টা করছেন তার চেয়েও বেশী সচেষ্ট আছেন তাঁদের মতে নির্বাচনী মোহ ভাঙ্গবার কাজে। এঁদের ধারণা, প্রচারের মাধ্যমে যদি সমস্ত মানুষকে নির্বাচন-বিরোধী করে তোলা যায় তবে সেই গণ-দেবতা রাতারাতিই ত বিপ্লবের অগুণতি সৈনিক হয়ে যাবেন। কাজেই গ্রামে গ্রামে শক্ত ঘাঁটির মাধ্যমে আপাতত যুদ্ধ স্থগিত রেখে যদি এ কাজ শৃংখলার সঙ্গে চালানো যায় তবে ভাবনার আর কোন কারণই থাকবে না।

নির্বাচন বয়কটের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে নকশালপন্থী তাত্ত্বিকরা বলতে চাইছেন যে, চেয়ারম্যান মাও-সে তুং-এর চিন্তাধারা যে আজকের দিনের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এটা স্বীকার করতে দ্বিধা থাকলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম দুর্বল হতে বাধ্য। তা হলে সংশোধনবাদকে আঘাত করার হাতিয়ারকেই করে দেওয়া হবে ভোঁতা। চেয়ারম্যান শিখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করতে হলে সংশোধনবাদকে আঘাত না করে এক পাও এগোনো যায় না।

তঁদের মতে—"আজকের যুগে অর্থাৎ যে যুগে সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যখন বিপ্লবী সংগ্রাম দেশে দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছে, যখন সোভিয়েত সংশোধনবাদ সমাজতন্ত্রের মুখোশ না রাখতে পেরে সাম্রাজ্যবাদের কৌশল পর্যন্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে, যখন বিশ্ববিপ্লব এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে—সেই যুগে সংসদীয় পথে পা বাড়ানোর অর্থ বিশ্ববিপ্লবের অগ্রগতিকে রোধ করার সামিল হয়ে দাঁড়ায়।"

তাঁরা আরও বলেছেন, "এটা ঔপনিবেশিক দেশের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, গনতান্ত্রিক দেশের পক্ষেও তা একই রকম সত্য। বিশ্ববিপ্লবের এই নতুন যুগে যখন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব জয়লাভ করছে তখন বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদী লেনিনবাদী-দের একটি কাজই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হোল, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে দৃঢ় ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা। তাই সমগ্র যুগ ধরে মার্কসবাদী-লেনিন-বাদীদের আওয়াজ হবে "নির্বাচন বয়কট করো"।

অতএব, নির্বাচন বয়কট করার শ্লোগানের পিছনে যে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা হচ্ছে,—চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সফল হচ্ছে এবং সে বিপ্লব আমদানি করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজে মার্কসবাদী ও লেনিনবাদীদের তখনই উচিত নির্বাচন বয়কট করে গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র ঘাঁটি গড়ে তোলা। কিন্তু এটাই ত কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সুবর্ণ পন্থা—অর্থাৎ ক্লাসিক রীতি। নকশালপন্থীরা নতুন কিছু বলেছেন বলে যদি কেউ মনে করে থাকেন তবে তাঁরা ভুল বুঝেছেন।

জাতীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এঁরা বলতে চান যে, ক্রমবর্ধমান বেকারী, ছাঁটাই, খাদ্যের জন্য হাহাকার এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান। অতএব, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই ধ্রুব সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে নির্বাচনী মোহ সৃষ্টি করার প্রয়াসের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে জোরদার করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাজেই সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি অন্তত মার্কসবাদীদের পক্ষে সাজে না।

এই সমস্ত বক্তব্য রেখেই নকশাল-পন্থীরা—মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে এক হাত নিয়েছেন। মার্কস ও লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বুর্জোয়া পার্লা-মেন্টকে 'শুয়োরের খোঁয়াড়' ও 'বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের বেশ্যাখানা' বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের প্রতি অনেক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে 'প্রমোদবাবুর মার্কসবাদী চেতনা কোন খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রেখেছেন" তা জানতে চেয়েছেন। উত্তর হয়ত প্রমোদবাবু দেবেন, এবং মার্কস-লেনিন-বাদ থেকেই উদ্ধৃতিসহযোগে করে দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে যাঁরা বিপ্লবের সুবর্ণমার্গ এড়িয়ে বুর্জোয়াদের অনুকম্পায়ী হয়ে পড়েছেন তাঁদের নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? অহেতুক মাতামাতি করে বিপ্লবী শক্তি ক্ষয় করা কি উচিত হচ্ছে?

আগেই বলা হয়েছে ক্লাসিক্যাল দৃষ্টি-ভংগী দিয়ে বিচার করলে নকশালপন্থীদের বিচারধারা 'প্রায়' ঠিক বলেই মনে হবে। কিন্তু একটি বক্তব্য রাখার অবকাশ এখানে আছে। সেটা হচ্ছে যে, নকশালবাড়ী আন্দোলন নিয়ে ততই নর্তনকুর্দন করুন তার পরিণতি কি হয়েছে? প্রথমে একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে নকশাল-বাড়ীর আন্দোলন ভূমিহীন চাষীদের জমি দখলের সংগ্রাম।

ভূমিহীন চাষীর জমির লড়াই বলেই যুক্তফ্রন্ট সরকার পরোক্ষে এই আন্দোলনকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, এবং তদানীন্তন ভূমিরাজস্বমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার তাঁর একদা কর্মসাথী নকশালবাড়ীর নেতা শ্রীকানু সান্যালের সঙ্গে বোঝাপড়া করে অবিলম্বে আইনের সাহায্যে পতিত জমি ও চা-বাগানের মালিকদের বে-আইনী দখলীকৃত জমিকে উদ্ধার করে পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এতেও নকশালবাড়ী আন্দোলনকারীরা সন্তুষ্ট হন নি। তীর-ধনুকের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন শুধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, সেখানকার তথাকথিত বড় চাষীদের বিরুদ্ধেও।

অবশেষে নকশালবাড়ীর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল, নায়কেরা কেউ বা ধরা পড়লেন কেউ বা সম্মুখ সমরে আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। আর গতবার যখন নকশালবাড়ীর জোতদারেরা বিনা-বাধায় ফসল কেটে ধান গোলাজাত করলেন তখনই নকশালবাড়ী আন্দোলনের স্মৃতি-ফলক অজান্তে প্রোথিত হয়ে গেল।

কিন্তু শ্রীকানু সান্যাল ধরা পড়ার পর বিপ্লবের ব্যাখান দিতে নিয়ে বলেছেন, ঐ লড়াই ছিল আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের লড়াই নয়। নকশালবাড়ী আন্দোলনের পোস্টমর্টেম করা উদ্দেশ্য নয়। পটভূমিকার উল্লেখ করে আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখাই এত কথা অবতারণার কারণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নকশাল-বাড়ীর আন্দোলন নতুন কিছু নয়। যুক্তফ্রন্টের আনুকূল্য পাওয়ার ফলে এক ভয়াবহ রূপ নিয়ে এই 'শিশুসুলভ চপলতা' বিশ্বদরবারে সাময়িক প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু অতীতে তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ—প্রভৃতি অঞ্চলেও এ ধরনের আন্দোলন হয়েছিল, তেলেঙ্গানায় রবি রেড্ডি আর কাকদ্বীপের কংসারি হালদারেরও অনেক কাহিনীকে রূপকথার রূপ দিয়ে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু কোথায় তেলেঙ্গানা, কোথায় কাকদ্বীপ! এই সমস্ত এলাকার বীর কিষাণ-কিষাণীরা যারা এক-দিন জোতদার, পুঁজিপতি, জমিদার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরা আজ কংগ্রেসঘেঁষা কেন? যাঁরা একদিন

অন্য ধরে প্রতিরোধ করেছিলেন তারা কেন আজ কংগ্রেসের জোট বাঁধার ভর্তি হতে সাহায্য করছেন? এর রাজনীতিক কারণ কি?

অন্যদিকে শ্রীকানু সান্যালের মত বীর বিপ্লবী ধরা পড়া সত্ত্বেও কোথায় হরতাল? কোথায় বিক্ষোভ, কোথায় লড়াই? নকশাল-বাড়ীর আন্দোলনের খাসখামারেও ত কারও অশ্রু-দোল-ক্রন্দন দেখতে পাওয়া গেল না।

কারণ অতি স্বচ্ছ। বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে যদি তাত্ত্বিক ভাবে বিভোর কেউ আকাশচারী হয়ে বিপ্লবী হবার চেষ্টা করেন তা ফলপ্রসূ হতে পারে না। সাগরের বুকে বুদবুদের মতই তা মিলিয়ে যেতে বাধ্য।

নকশালবাড়ীর আন্দোলনকারীদের আরও স্মরণে আনা উচিত ছিল দমদম, বসিরহাটের কাহিনী। ঐ ঘটনা যখন সংগঠিত হয়েছিল তখন ভারত অনেক দুর্বল ছিল। রোমাঞ্চিকতা সৃষ্টিতে ঐ দুঃসাহসিক কর্ম-কান্ড অনেক সাহায্য করেছে বটে, আখেরে কোন ফল লাভ হয়নি।

অধিকন্তু পারিপার্শ্বিকতা বলেও রাজ-নীতিক অভিধানে একটি কথা আছে। কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই অবস্থাকে অবজ্ঞা করে তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন বলে মনে হয় না। অবশ্য, নকশালবাদীরা যে তার পর্যালোচনা করছেন না একথা বলতে চাইছি না। কিন্তু আসল অবস্থাটা কি সেই সম্পর্কেই সাধারণভাবে চিত্র আঁকবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক ভূগোল বিশেষ-ভাবে প্রণিধান করা দরকার। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরাজনীতির ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রতিক্রিয়াও অনুধাবন করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। মনে হয়, যেকোন কারণেই ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি স্থান আছে। এবং এখানে তা চলবেও। যাঁরাই, অন্তত কৌশলের দিক থেকেও, এটা মেনে নেবেন না, এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে তাঁদের প্রভাব ক্রমশই সীমিত হয়ে পড়বে। জানি, অনেকেই এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন না, এবং গোঁড়া হিন্দুদের মত সব 'বেদে আছে' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত হবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। যে কোন পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে এর একটা প্রকৃতিগত বৈষম্য রয়েছে। গান্ধীজীর আন্দোলনের ফলে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর মনে শুধু একাত্মতা ও জাতীয়তাবোধের বীজই উপ্ত হয়নি, অসংখ্য গ্রামে-শহরে একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারারও বিকাশ ঘটিয়েছে। অধুনা গদীতে আসীন কংগ্রেস গান্ধী-আন্দোলনের সমস্ত রাজনৈতিক ফলকে ঐ দলের মূলধন করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই কংগ্রেসকে এক কথায় তুড়ি মেরে ধনবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েমের একটি প্রতিক্রিয়া-শীল যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করাটা রাজনৈতিক বাতুলতার নামান্তর হবে।

আর সনাতন রীতিতে বিপ্লব আমদানি করার চেষ্টা করলেও কংগ্রেসই শুধু তার সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখবে না—ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ একাত্ম হয়ে লড়বে। এবং এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বিগত চীনা আক্রমণের সময়। লাল চীনে চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে শুধু সোভিয়েট মদৎ ছিল না—চীনের অভ্যন্তরেও জনতা বিচ্ছিন্ন-ভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ভারত আক্রমণের সময় চীনের হয়ে কৈ একজন কম্যুনিস্টও ত সেদিন চীৎকার করতে সাহস করেন নি? নীরবে, চুপিসাড়ে আপন কাজ করেছেন, কিন্তু 'মুক্তি ফৌজকে' স্বাগত জানাতে কেউ মিছিল বার করেন নি। এর কারণ কি? কারণ, অত্যন্ত স্বচ্ছ। আসমুদ্র হিমাচল সেদিন ভারতের মানুষ এক হয়ে ঘৃণ্য চীনা দস্যুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এটাই ভারতবর্ষের গভীর জাতীয়তাবোধের প্রথম সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। গণরোষের বহ্নির সামনে সেদিন কোন অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিতে সাহস করে নি। কাজেই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাত্ত্বিক ভাবে বিভোর হয়ে কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেলেই তা বিফল হতে বাধ্য। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সজাগ না থাকলে রাজনীতিক চিন্তায় দৈন্যই প্রকট হয়ে উঠবে।

ভারতবর্ষে চার চারটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। অন্তত তিনটা সাধারণ নির্বাচন কম্যুনিস্টরা এক হয়ে লড়েছেন, এবং তাত্ত্বিক দিক থেকেও এখনো পর্যন্ত কোন মূলগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। অধিকন্তু, চতুর্থ নির্বাচনের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে কংগ্রেসকেও গদীচ্যুত করা যায়। জনসাধারণের মৌলিক অধিকার রূপায়ণে বর্তমান অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে অকংগ্রেসী সরকার দ্বারা কতটুকু কী করা সম্ভব সেকথা রাজনীতিবিদরা বলবেন। কিন্তু সরকার গঠনের মাধ্যমে যে বামপন্থীরা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবেন সেকথা অনেকাংশে সত্য। জনতার জন্যই রাজনীতি। জনতাকে বাদ দিয়ে নয়।

লেনিন যেমন নির্বাচন বয়কট করতে বলেছিলেন, এমন কি ভুল পার্লিয়ামেন্ট ভেঙেও দিয়েছিলেন, তেমনি নির্বাচনকে একটি কৌশল হিসাবে গ্রহণ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। কারণ তাঁর মনে গতি-শীলতা ছিল, এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিজ্ঞানসম্মত। সর্বোপরি তাঁর সমস্ত কলা-কৌশল রাশিয়ার দলিতমথিত জনসাধারণের মুক্তির চিন্তা করেই নির্ধারিত হত। এমন কি ঐ কলা-কৌশল অবলম্বনের ফলে চীনের কিছু লাভ হবে কিনা, তখনও পর্যন্ত সেই চিন্তাধারা নিশ্চয় মহামতি লেনিনকে আচ্ছন্ন করে নি। কাজেই সেই যুক্তির অবতারণা করে এবং তদানীন্তন রাশিয়ার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে একই বন্ধনীতে ভারতকে আবদ্ধ করে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা আদৌ বিজ্ঞান-সম্মত নয়। আর গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র ঘাঁটি গড়ে তোলার সঙ্কল্প পত্র-পত্রিকার বকুনির মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাবে, কার্যত সম্ভব হবে না। এর আধুনিকতম উদাহরণ হচ্ছে কেরালা। নকশালীর পন্থার সেখানেও থানা আক্রমণ করা হয়েছে, এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মহড়াও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের মোহমুক্ত শ্রীকোশলরাম দাস যিনি সম্প্রতি বিধান-সভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন সেই শ্রীকুশলরাম এহেন পন্থার তারস্বরে নিন্দা করেছেন। আর মার্ক্সিস্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন। অতএব, ঘাঁটি থেকে সশস্ত্র আক্রমণ কংগ্রেসীরা মোকাবিলা করছেন না, করছেন তাঁরা যাঁদের অবিচল নিষ্ঠা রয়েছে মার্কস-বাদ লেনিনবাদের প্রতি। সরকারী ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নকশালীয় আন্দোলন কেরালায় আর জোরদার হবে বলে মনে হয় না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে রোমাঞ্চিকতার আশ্রয় গ্রহণ করলে কোন ব্যক্তিবিশেষ রূপকথার রাজকুমার সাজতে পারেন মাত্র। বিপ্লবের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অধিকন্তু, নির্যাতনের ফলে হতাশার শিকার হয়ে অবশেষে অনেকে প্রতিক্রিয়াশীলও হয়ে পড়েন। এবং এহেন পরিবর্তনের বহু ঐতিহাসিক নজীর বিদ্যমান। কাজেই প্রতি রাজনৈতিক পদ-ক্ষেপের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সংযোগ থাকা একান্ত কাম্য। কিন্তু নকশালপন্থীরা 'নির্বাচন বয়কট' শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবেনই, কারণ চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার আগে নয়া সংশোধনবাদকে কামান দাগতে হবে। তাই বয়কটের শ্লোগান তুলে নয়া সংশোধনবাদী বাম কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে নকশালপন্থীরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

বামপন্থী কম্যুনিস্টরা বলেন নকশাল-পন্থীদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল কংগ্রেসকে নির্বাচনে জিতিয়ে দেওয়া। একথা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, নকশালপন্থী-দের তত্ত্বকথা এই বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন জানায়। তদুপরি তাঁরা মনে করেন মার্কসবাদীরা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে গেলে নির্বাচন সম্পর্কে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটবে। এবং এই মোহমুক্তির ফলে তাঁরা আবার ঠিক বিপ্লবের সুবর্ণমার্গে চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। কথাটা শুনলে মনে হয় যেন ফোর্ড কোম্পানীকে পুড়িয়ে দিলে অংশীদাররা প্রোলিতারিয়েত হয়ে যাবেন!

যে যতই তত্ত্বকথার অবতারণা করুন না কেন, ভারতবর্ষের জনসাধারণ নির্বাচন চায়, এবং এর মাধ্যমেই তাদের ভাগ্যের পরি-বর্তনও তারা কামনা করে। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে কোন দলের পক্ষেই অংশ-বিশেষ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দখল করে 'স্বপ্নরাজ্য' সৃষ্টি করার কথা স্বপ্নেও ভাবা অসম্ভব। একমাত্র বিদেশী রাষ্ট্র শক্তি-বলে যদি পদানত করতে পারে, তবেই সেই

রাষ্ট্রের সমর্থকদের পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব। নয়তো নয়। কিন্তু বিশ্বরাজনীতি এ অবস্থা [illegible] নয়। প্রত্যেকেই আপন রাজ্য বাঁচাবার জন্য হিমসিম খাচ্ছেন. তাই না রাশিয়াকে "সমাজতন্ত্র রক্ষার" জন্য চেকোশ্লাভাকিয়ায় সৈন্য পাঠাতে হয়েছে? তাই না লাল চীন সোভিয়েট সীমান্তে মাঝে মাঝে মহড়া দিচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়া নিজ রাষ্ট্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। যতই কম্যুনিস্ট দেশ হোক না কোন, স্ব স্ব রাষ্ট্রের সীমানারক্ষার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে কেউ কম যান না।

কিন্তু যে লাল চীনের "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" সূত্র ধরে ক্লাসিক্যাল মার্কবাদ-লেনিনবাদ অনুসরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই চীনের পক্ষ থেকেই কঠোরপন্থী নিক্সনের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব উঠেছে এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের জন্য পঞ্চশীল [illegible] জন্য প্রস্তাবও নাকি এসেছে। [illegible] তবে ভারত-[illegible] মরক্ত করার স্লোগান দিয়ে "চেয়ারম্যান মাও-কে" নয়া-নয়া-সংশোধনবাদী বলে অভিহিত করে দৃপ্ত মিছিলে পথ পরিক্রমা করবেন? ইতিহাস এর উত্তর দেবে।

—[illegible]

ছায়া কালো কালো

নাগকন্যা

জর্জ ভিলিয়ার্স

[জর্জ ভিলিয়ার্স তিরিশের দশকে কলকাতার য়ুরোপীয় বণিকদের অন্যতম ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসের পটভূমিতে আছে ভারত। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার একটি প্রাচীন মন্দিরে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিনি অভিভূত হন, নাগকন্যা সেই ঘটনার ভিত্তিতে রচিত।]

মনে হয়েছিল জায়গাটায় আমরা পৌঁছাতেই পারব না। তখন অপরাহ্ণ বেলা, প্রায় তিনটে বাজে। এই সময়টায় ভারতীয় সূর্যের উত্তাপ প্রচন্ড জ্বালাময়। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যালোক যখন চোখে এসে লাগে তখন মনে হয় যেন সূঁচ বিঁধছে। জলের ওপর আমাদের নৌকাযাত্রা শুরু হয়ে উঠেছিল, নৌকার পাল ছিল, দেশী ধরনের পাল, তবে সেটা লোক দেখানো শোভা মাত্র—বাতাস একদম নেই। আর সেই উষ্ণ দিনটিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নৌকা যেটুকু চলছিল তা ডাঙায় গুন টানা হচ্ছিল বলে, ভারতীয় মজুররা হাঁফিয়ে পড়ছিল।

বড়দিনের ছুটিতে আমরা এসেছিলাম বুনোহাঁস শিকারে, আমাদের দলে ছিল ছজন। আমরা সবাই পরিশ্রান্ত, এবং সেই শীতের বিকালেও গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি। অবশেষে নৌকা যখন ঘাটে এসে লাগল তখন সাড়ে পাঁচটা—তবে নৌকা থেকে আমাদের তাঁবু, বিছানাপত্র, রান্নার বাসন-কোসন, স্যুটকেস, বন্দুক এবং আর সব সাত-সতেরো যখন নামিয়ে আবার একটা গোরুর গাড়িতে ওঠানো হল তখন ছটা বেজে গেছে।

তাহলে—এখন কি করা যায়? সময় কাটে কি করে? কলকাতাগামী ট্রেন যদি একেবারে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছায় তাহলেও প্রায় চারঘণ্টা দেরী। এমন একটি ছোট পথ-প্রান্তিক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে সময় কাটানোর কোনো অর্থ হয় না। তাহলে এর বিকল্প শুধু গ্রামের দিকে একটু পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসা।

ভারতের এইসব অঞ্চলের অসংখ্য গ্রামগুলিতে অনেক পুরোন মঠ ও মন্দির এখনও মাথা উঁচু করে জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলে এমনই একটা আকর্ষণীয় মঠ বা মন্দির মিলে যেতেও পারে। তাহলে কলকাতায় ফিরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দম্ভ করা যাবে। কিন্তু আমাদের দলের সকলের কাছে প্রস্তাবটি জানাতে কেউ কিছু অতখানি ক্লেশ স্বীকার করতে রাজী হল না। শুধু সার্লি উৎসাহ দেখালো, সার্লির সংগে আমার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে, সে আমার বাগদত্তা হয়েছে সম্প্রতি।

আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি। সংগে একটি কুলি রইল, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে তাকে বখশিস দেওয়ার লোভ দেখিয়ে সংগে নিলাম।

রাঙা ধুলোভরা পথ অনেকখানি অতিক্রম করে গেলাম, প্রায় পৌনে এক মাইল পথ হাঁটলাম। গ্রামটির শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম কিন্তু মঠ-মন্দির ত' দূরের কথা তার কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে এমন কোনো ভগ্নস্তূপও নজরে পড়ল না। অবশ্য কিছু কিছু স্থানীয় লোকজনের সংগে দেখা হল।

এই গ্রাম ভারতের আরো লক্ষ লক্ষ গ্রামগুলির মতই। ভারতের সর্বত্র এমন গ্রাম ছড়ানো আছে। একটিমাত্র পথের ধারে সারি সারি মেটে বাড়ি, মাথায় তাল পাতার ছাউনি। প্রতিটি বাড়ির সামনে শীর্ণ ছাগল বাঁধা, তারা পরমানন্দে কাঁঠাল পাতা চিবোচ্ছে। অসংখ্য ছোট বড়ো মাঝারি ধরনের শিশুর দল, আদুল গা, পরনেও কিছু নেই, শীর্ণ দেহ, পেটগুলি বড়ো বড়ো। নির্বোধের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো কোনো বাড়িতে নেড়িকুত্তা ধুঁকছে দাওয়ায় বসে। তাদের গায়ে ভরা এঁটুলি পোকা। দুচারজন বৃদ্ধ আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে বসে আছে, আর তাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো জন কয়েক বুড়ি ঘুরছে। তাদের শরীর এমনই কুঞ্চিত যে হাতির পায়ের ওপরকার কুঞ্চিত চামড়ার কথা মনে পড়ে যায়।

জায়গাটি বেশ, অতি মনোরম শান্ত, ধীর স্থির পরিবেশ। প্রচুর অবসর চারদিকে। অনেক বাড়িতে উনান ধরানো হয়েছে, সন্ধ্যার আকাশে সেই ধোঁয়া উঠে একটা অদ্ভুত গন্ধ সৃষ্টি করেছে আর চারপাশের আবহাওয়াকে স্নিগ্ধ করে তুলেছে।

সার্লি বেচারী একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার শুখনো মুখ দেখে প্রশ্ন করি —এখন কি করা যায় বলো? এখানে ত' দেখছি তেমন কিছুই দর্শনীয় নেই। এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরর্থক ঘুরে বেড়ানোর

অর্থ হয় না—আবার যদি শুধু শুধু স্টেশনে ফিরে যাই তাহলে সবাই পরিহাস করবে। সব কেমন যেন ব্যর্থ মনে হবে। তার চেয়ে বরং ঐ আমগাছটার তলায় গিয়ে একটু বসা যাক, একটা সিগারেট ধরাই আরাম করে।

সার্লির কাছে এই প্রস্তাবটা তেমন রুচিকর হল না। সে বলে উঠল—জানো ত' এদিককার মানুষ কেমন। সব গাঁ শুদ্ধু লোক দৌড়ে আসবে মজা দেখতে, সবাই এসে ভীড় করে আমাদের দেখবে। তার চেয়ে বরং চলো একটু হাঁটি, গাঁয়ের মাঝখানে এইভাবে না বসে এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি ঠাঁই একটু খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওর কথা মেনে নিয়ে আমরা আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। আশ্চর্য সেই গাঁয়ের ভিতর নির্জন প্রান্তরে একটা গির্জা দাঁড়িয়ে। আমাদের চমক লাগিয়ে দিল এই পরিবেশে ছবির মতন এমন সুন্দর গির্জাঘর। ছোট্ট, আর পরিচ্ছন্ন, চালটা গোলপাতার কিন্তু চারপাশ ইঁটের গাঁথনি, সদ্য চুনকাম করা হয়েছে মনে হল। তবু কেমন যেন ধ্বংসোন্মুখ বাদুড়-চামচিকের বাসার মত দেখাচ্ছে। গির্জাবাড়ির চারপাশে কোনো রকমের প্রাচীর বা বেড়া দেওয়া নেই। কেমন যেন নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত মূর্তি। অরক্ষিত অবহেলিত গির্জা যেন বিদেশীর রাজ্যে অবাঞ্ছিত।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একদা এটি মিশন চার্চ ছিল। কেননা মিশন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে চারদিকে ছড়ানো। কোনো কারণে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে। আমরা চার্চের দিকে এগিয়ে গেলাম।

তখন একটা প্রার্থনা চলছে। কেননা সেই শান্ত সন্ধ্যায় আমরা প্রার্থনামন্ত্রের মত কি যেন একটা গুঞ্জন শুনলাম। আমাদের পাশ দিয়ে একটি ভারতীয় তরুণ চলে যাচ্ছিল তাকে ডাকলাম—

—ও বাবু শুনুন। নমস্কার। এটা কি চার্চ বলতে পারেন?

লোকটি সসম্ভ্রমে উত্তর দেয়—ওটা স্যর নাগাপুর মিশন চার্চ ছিল। কিছুকাল আগে মিশনটা এখান থেকে উঠিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি সেই মিশনের স্কুলেই পড়াশোনা করি।

আমি বললাম—কিন্তু এইখানে ত' দেখছি এখনও একজন পাদ্রী সাহেব আছেন। মনে হচ্ছে কোনো একটা উপাসনা চলছে গির্জার ভেতর। তাই না?

—ঠিকই ধরেছেন। এখানে একজন যাজক আছেন, তিনি অবসরপ্রাপ্ত। অনেক বয়স হয়েছে আর বোধহয় মাথাটাও তেমন ঠিক নেই। লোকে বলে অনেক বছর আগেই ওঁর এই অবস্থা হয়েছে। একমাত্র মেয়ে মারা যাওয়ার পর থেকেই উনি এক রকম হয়ে গেছেন।

—আহা বেচারী, বুড়ো মানুষের কত কষ্ট। আচ্ছা, বাবু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। শুভ নববর্ষের সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। নমস্কার।

সার্লি এইবার আমার হাতটা ওর বাহুতলে টেনে নিয়ে বেশ আবদারের ভঙ্গীতে বলল—চলো, আমরা চার্চটা দেখে আসি। এখনও ত' ক্রিসমাস সপ্তাহ চলছে—

আমি বললাম—তোমার কথাটি ঠিক, তবে কি জানো, মার্তণ্ড হয়ত উড়িয়া [illegible]। [illegible] যদি হয় তাহলে আমরা ওর একবর্ণও বুঝবো না। তবে কি জানো একটা [illegible] পরিবেশ মিলবে, একটু বসা যাবে।

সুতরাং আমরা সেই গির্জাঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

বাইরের আলো থেকে ভিতরে এসে ভিতরের এই ঘন অন্ধকারে চোখকে অভ্যস্ত করে নিতে কিছু সময় লাগল। বাইরে থেকে যে চার্চটি জীর্ণ, মুমূর্ষু মনে হচ্ছিল, ভিতরে এসে দেখি তার চেয়েও কিঞ্চিৎ বেশীমাত্রায় জর্জর এই প্রাচীন গির্জাঘর। দেয়ালের গা থেকে বালি খসে পড়ছে, জানলার পাল্লার কাঠ মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ আর সিলিং-এর যে চাঁদোয়া ঝুলছে সেটি অতি বিশ্রীভাবে জীর্ণ হয়ে স্থানে স্থানে ঝুলে পড়েছে।

পূর্বদিকে একটি আবরণবিহীন বেদী, এটা কাঠের তৈরী—তার বাঁ দিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটা জীর্ণ কাঠগড়া—দোর-গোড়ার কাছে ছ'খানি ভাঙা-চোরা চেয়ার আছে। এ ছাড়া আর কোনোরকম সীট নেই। ফলে ভারী ফাঁকা ঠেকছে চারদিক।

যারা প্রার্থনায় যোগ দিয়েছে সেইসব উপাসক দল গুনতিতে পঁচিশজনের বেশী হবে না। এরা সবাই মাটিতেই জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। যে ছয়খানি চেয়ার আছে তা দুভাগে ভাগ করা, ডানদিকে চারখানি, বাঁ পাশে দুখানি। মাঝখানে সংকীর্ণ পথ। সার্লি আর আমি ডানদিকের দুখানি চেয়ারে বসে পড়লাম।

পাশের দুটি চেয়ার আমাদের বামদিকে চেয়ার দুটির সমান্তরাল ভঙ্গীতে সাজানো। পাদ্রী সাহেব বলে চলেছেন, তবে তাঁর ভাষা উড়িয়া এবং আমরা তার একবর্ণও বুঝতে পারছি না। কি যে তিনি বলছেন তিনিই জানেন।

সার্লি আমার পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে দেখাল দুটি টিকটিকি কিভাবে মেঝের ওপর খেলা করছে, লুকোচুরি খেলা। একটি আরেকটিকে তাড়া করছে, আবার থমকে থামছে।

সহসা বৃদ্ধ পাদ্রী থেমে পড়লেন। চকিতের সেই বিরতি কিন্তু এমনই স্পষ্ট যে আমি চারদিকে তাকাই। পাদ্রী কিন্তু অকস্মাৎ আবার বলতে শুরু করেছেন। আমি দেখলাম পাদ্রীর দৃষ্টি আমার বাম-দিকের চেয়ারে। তিনি বেশ অভিনিবেশ সহকারে সেই চেয়ারের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই চেয়ার কিন্তু এখন আর...... মানে, এখন আর শূন্য নেই—

সেই বাঁ পাশের চেয়ারটিতে কখন একটি মেয়ে এসে বসে পড়েছে। কিভাবে কখন যে ভেতরে এল কে জানে, নিঃশব্দে এসেছে। আমরা যে দরজায় এলাম, সেই দরজা দিয়ে নিশ্চয়ই নয়। কারণ সেই দরজার কব্জার আর্তনাদ বড়ই করুণ। মরচে ধরা কব্জা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উৎকট শব্দ সৃষ্টি করে। দরজাটি খুলতেও আওয়াজ হচ্ছে, বন্ধ করতেও সেই একই অবস্থা।

মেয়েটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। এসব দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা এই বয়সে ভারী সুন্দরী দেখায়। এই মেয়েটিও ব্যতিক্রম নয়। তার মাথায় কোনো আবরণ নেই। সেই মৃদু আলোয়—ওর ঘন কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশদাম সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার পোশাক একেবারে ধব্‌ধবে শাদা—তবে কোমরের বেল্টটি একেবারে কালো রঙের। সামনের দিকে তাকিয়ে সে নিস্পন্দ ভঙ্গীতে বসে আছে।

আমি সার্লির দিকে তাকালাম। সে তখনও সেই টিকটিকির রঙ্গলীলা দেখছে কিনা তা দেখে নিয়ে আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। মেয়েটি সেইভাবেই সামনের দিকে চেয়ে আছে। তবে এখন আর সেই নিস্পন্দ ভঙ্গী নয়। তার কোলের ওপর রাখা কি একটা প্রাণীকে আদর করছে।

এই প্রাণীটা যে কি তা কে জানে। তবে একশ্রেণীর জন্তু আছে মাঝে মাঝে মাথা ওঠায় বা নিজের শরীরটা উঁচু করে মাথা ওঠায়, সেই জন্তু। কারণ মেয়েটির হাত ঠিক বুক পর্যন্ত উঠছে—তবে সব সময়েই অতিশয় মৃদুগতিতে—তার হাতটি কোলে এসে পড়ছে আর সেই চাপড়ানির বিরাম নেই।

প্রাণীটা যে কি জাতীয় তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। মাঝে মাঝে ওর শাদা জামার পশ্চাদপটে একটা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ কিছু একটা পদার্থ বোঝা যায়—কিন্তু কোনো কিছু পরিচিত বস্তুর সংগে সেই আকৃতির মিল নেই।

পরিশেষে মনে হল, নিশ্চয়ই পোষা বেজী নিয়ে এসেছে। চার্চের মধ্যে এই জাতীয় প্রাণী সংগে নিয়ে আসা অতিশয় গর্হিত ব্যাপার। কিন্তু পাদ্রী সাহেবই বা কিছু বলেন না কেন!

এমন সময় জানলা দিয়ে একঝলক আলো ভেতরে এসে পড়ল। ঘরের ভেতরকার অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল—বোধহয় ততক্ষণে চাঁদ উঠেছিল।

সেই আলোয় প্রাণীটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কী সর্বনাশ—। এ যে একটা জ্যান্ত গোখরো সাপ। ওর কোলে বেশ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। সাপের ফণাটা দু' পাশে দুলছে, আর মেয়েটি তাকে অতি মৃদু আঘাতে আদর করছে—

মাঝে মাঝে সাপটা মাথা উঁচু করছে আবার ওর কোলের ওপর চুপ করে পড়ে যাচ্ছে। আমি আমার চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। আমার নড়া-চড়ার অবস্থা নেই। আতংকে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এই জাতীয় বীভৎস কাণ্ড জীবনে আর দেখিনি।

সাপটা আবার একটু পরেই উঠে পড়ে। তবে এইবার ভঙ্গীটা অন্যধরনের—এইবার অনেকখানি উঁচুতে মাথা ওঠাল। সাপের ফণাটি মেয়েটির চোখের সমান স্তরে এসে থামল। এখন মেয়েটি ওকে আর সেইভাবে চাপড়াচ্ছে না বরং নিস্পন্দ ভঙ্গীতে সাপটির দিকে তাকিয়ে আছে, যেন পাথরের মূর্তি, তার হাত দুটি কোলের ওপর রাখা।

সাপটা জিভ বার করে মেয়েটির মুখ, চোখ, ঠোঁট সব চাটছে এমন কি ওর কান পর্যন্ত সেই শীর্ণ জিভ দিয়ে লক্‌লক্‌ করে চাটছে—মেয়েটির কিন্তু নড়-চড় নেই চোখের পলকও পড়ছে না—

অতি বেয়াড়া দৃশ্য। কি কুৎসিত কাণ্ড। এইভাবে সাপটি যে মেয়ের সমস্ত মুখটি লেহন করছে, এ আমার কাছে অতি বীভৎস মনে হল। আমার গা বমি বমি করতে থাকে।

ইতিমধ্যে উপাসনা শেষ হল। কারণ, শ্রোতারা সব আস্তে আস্তে উঠে পড়ল—সবাই নিঃশব্দে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল—তবে যাবার সময় তারা সবাই অসীম শ্রদ্ধাভরে আমাদের পাশের সেই চেয়ারের সামনে এসে সেলাম জানিয়ে যায়—মেয়েটি নিশ্চয়ই কোনো বড়ো সাহেবের মেয়ে হবে। ওরা সেলাম করে চলে যাচ্ছে—কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো কিছু বিস্ময় নেই তাদের চোখে।

শেষ পর্যন্ত আমি আর সার্লি পড়ে রইলাম, সবাই চলে গেল। চার্চ এখন শূন্য। শুধু আমাদের আসন থেকে মাত্র চার পাঁচ ফুট দূরে সেই লোমহর্ষক কাণ্ড তখনও অব্যাহত ভঙ্গীতে চলছে।

এতক্ষণে সাপটা ওর গলায় হারের মত জড়িয়েছে। আর তার কুৎসিত মুখটি মেয়েটির মুখের ওপর—মেয়েটি স্তব্ধ, নিস্পন্দের ভংগীতে বসে আছে।

কি যে করা যায় ভাবতে থাকি। এই অবস্থা অসহ্য। অথচ এতটুকু নড়াচড়া করলেই সাপটা ভয় পাবে আর একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যাবে। তার চেয়ে বরং চুপচাপ বসে থাকা ভালো। সাপটা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এই জাতীয় অশ্লীল প্রেমলীলার অবসান ঘটলেই আমরা উঠে পড়ব।

এই সময় বোধহয় অন্যমনস্কভাবে আমার চেয়ারটায় একটু আওয়াজ করে ফেলেছি—কারণ, পাথরের মেঝেতে একটা কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ হয়ে গেল। একমুহূর্তের মধ্যে সাপটার সেই কুণ্ডলীকৃত অবস্থার অবসান ঘটল। সাপটা গলা থেকে দেহটা বিস্তার করে মেয়েটির মুখের সামনে এসে ফণাটা একটু সরিয়ে নিয়ে তারপর ছোবল মারল।

এর পরের ঘটনা আমার জানা নেই। যখন জ্ঞান ফিরে এল দেখি কে আমার শরীরটায় ঝাঁকানি দিচ্ছে।

বৃদ্ধ পাদ্রী বলছেন—সাহেব! কোনো ভয় নেই। ওসব কিছু নয়। আপনি যা দেখেছেন তা একটা দুঃস্বপ্ন বলা যায়। ওটা একটা স্বপ্ন মাত্র, বাস্তব ঘটনা নয়। অনেক অনেক বছর আগে ঘটিত একটি দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখেছেন মাত্র—ও কিছু নয়।

সার্লির সারা অঙ্গ সাদা হয়ে গেছে। এগু জ্বরের রোগী যেমন কাঁপে, সার্লি সেইরকম কাঁপছে। সে হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করে—তুমিও দেখেছ নাকি! তুমিও দেখতে পেয়েছ? কী বীভৎস ব্যাপার। এই ঘটনা যে সত্যি নয় এ যে অনেক আগের কালের ঘটনা, সেইটুকুই ভালো। এই দৃশ্য কোনোদিন ভুলতে পারবো না। চলো এখন তাড়াতাড়ি এইখান থেকে পালাই। আর একমিনিটও এইখানে থাকা চলে না। এখনই বেরিয়ে চলো। বাইরে গিয়ে না দাঁড়ালে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

আমি সার্লিকে ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। আমাকেই কেউ ধরলে ভালো হত। আমার আতংকটুকুও কম নয়। আমরা বাইরে এসে বসলাম। বৃদ্ধ পাদ্রী একটি মগে করে শীতল জল নিয়ে এলেন।

এমন মধুর পানীয় জীবনে বোধহয় আর পাইনি। জলে যে কি অমৃত আছে তা সেইদিন বুঝেছি। কোনোদিন এই স্মৃতি মন থেকে আর মুছবে না।

আবেগভরা কণ্ঠে পাদ্রী সাহেব বললেন—সাহেব! যা ঘটে গেল তার জন্য আমি ভারী লজ্জিত। আমার দুঃখের সীমা নেই। আপনারা কষ্ট পেলেন। য়ুরোপীয়রা এখানে তেমন আসেন না, আর যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক মানুষই অবশ্য এই দৃশ্য দেখতে পান।

আমি বললাম—আপনি জল এনে দিলেন, ভারী মিষ্টি জল। পাদ্রী সাহেব দয়া করে কিন্তু ব্যাপারটি আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমাদের ভীষণ কৌতূহল জেগেছে মনে।

পাদ্রী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমাদের পাশে বসে পড়ে বললেন—সাহেব, আপনারা যা দেখলেন এতক্ষণ তা আমারই একমাত্র কন্যার মৃত্যু দৃশ্য।

চল্লিশ বছর আগে আমি এই মিশনের ছাত্র ছিলাম। যথাসময়ে আমার দীক্ষা হল। আমি যাজকের পদ পেলাম। আর এই মিশনেই জনৈক শিক্ষিকার সংগে আমার প্রেম হল। তাঁকেই আমি বিবাহ করেছিলাম। তিনি একজন সুইডিশ মহিলা।

আমরা বেশ ছিলাম। ঈশ্বরের নামগান করে আনন্দে ছিলাম। যথাসময়ে আমাদের একটি কন্যা হল। তার নাম দিলাম এলিজাবেথ। তবে আমার স্ত্রী প্রসবকালেই মারা গেলেন।

আমাদের মেয়েটির মৃগীরোগ ছিল। মাঝে মাঝে মূর্ছা হত—অন্ততঃ ডাক্তাররা ত তাই বলতেন। এপিলেপসীর লক্ষণ ত' জানেন। পাদ্রী থামলেন একটু। তারপর বললেন—বলা নেই কওয়া নেই সে মাঝে মাঝে যেন সমাধিস্থ হয়ে পড়ত।

অনেক রকম জিনিস দেখলেই এই অবস্থা ঘটত। তবে বিশেষ করে সাপ দেখলে আর রক্ষা নেই।

এখানকার স্থানীয় লোকরা বলত, মা মনসা ওকে দয়া করেছেন। নাগরাজ ওকে ভালোবাসে। নাগরাজ নাকি এমনই মাঝে মাঝে করে থাকেন।

অনেকে আবার—বিশেষ করে যারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত নন, তাঁরা ওকে পূজা করতেন।

তখনকার কালে, এখনও বোধহয় সর্প-পূজা এইসব অঞ্চলে বেশ প্রচলিত আছে।

একটি রবিবার প্রাতে আমি বেদীতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উপাসনা করছি, এমন সময় আপনারা আজ সন্ধ্যায় যা দেখলেন তা দেখতে পেলাম; তবে সেদিনকার ঘটনা স্বপ্ন নয়, রূঢ় বাস্তব।

সম্ভবত এই গোখরা সাপটা গরমের জ্বালায় গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসে পাথরের মেঝেতে একটু বিশ্রাম করছিল।

ঠিক যে কি ব্যাপার তা বলা কঠিন। তবে, একথা ঠিক আমার মেয়ের কোলে ঐভাবে কুণ্ডলীকৃত হয়ে বসেছিল আর আমার মেয়ের তখন মৃগী আক্রান্ত, যা সমাধিস্থ অবস্থা, সে ঠিক এইভাবে সাপটাকে চাপড়েছিল।

আমি ভয় পেয়েছিলাম, ভীষণ আতংকিত হয়েছিলাম। আমি জানতাম যাঁরা উপাসনায় যোগ দিয়েছেন তাঁরা কেউ যদি দেখেন আর একটু নড়াচড়া করে শব্দ করেন তাহলেই আমার মেয়ের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

আমি সকলকে অনুরোধ করলাম নিঃশব্দে চার্চ থেকে বেরিয়ে যেতে। সবাই আমার অনুরোধ শুনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়লেন। তবে যাওয়ার সময় চেয়ারকে সবাই নমস্কার জানাতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে চার্চ একেবারে শূন্য হয়ে গেল, রইলাম আমি আর এলিজাবেথ আর সেই সাপটি।

আমি নিস্পন্দ ভংগীতে অপেক্ষায় আছি। অবশেষে সাপটা ওর কুণ্ডলী খুলে আস্তে আস্তে পালাবে মনে হল। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি এইবার এলিজাবেথ মুক্তি পাবে।

আমি নিঃশব্দে এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে এলাম, ওকে টেনে তুলতে হবে—কিন্তু আমার পোশাকের কোনো একটা অংশ চেয়ারে আটকে গেছে—আমি একটু নড়তেই আপনার চেয়ারটার মতই সেদিনও চেয়ারের একটা কাচ্‌কোচ্‌ শব্দ হয়ে গেল।

বেশ জোর শব্দ। শূন্য হলঘরে সেই শব্দ বেশ প্রবল হয়ে উঠল। আর সেই মুহূর্তে সাপটা এলিজাবেথের মুখে ছোবল মেরেছিল। আজ যেভাবে দেখলেন ঠিক সেইভাবেই সেদিন সাপটা ছোবল দিয়েছিল। ঈশ্বরের অভিলাষ পূর্ণ হল। তিনিই সর্বনিয়ন্তা। যেটুকু দেন তা তাঁরই। যা নিয়ে গেল, সেও ত' তাঁর।

পাদ্রী সাহেব একটু থামলেন, তারপর ভদ্রভাবে একটু বিষন্ন হাসি হেসে বললেন—মিশন এর কিছু পরেই অন্যত্র স্থানান্তরিত হল, তবে এঁরা আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিলেন। আমি এখানেই পড়ে আছি।

এখানে সবাই আমাকে পাগলা পাদ্রী সাহেব বলে—বলুক, হয়ত সত্যি আমি পাগল, আমার মাথার আর ঠিক নেই। কে জানে?

তবে ঈশ্বর করুণাময়। আমি আছি তাঁর ডাকের অপেক্ষায়, ডাকলেই চলে যাব। মনে হয়, বেশীদিন আর আমাকে সেই ডাকের অপেক্ষায় থাকতে হবে না।
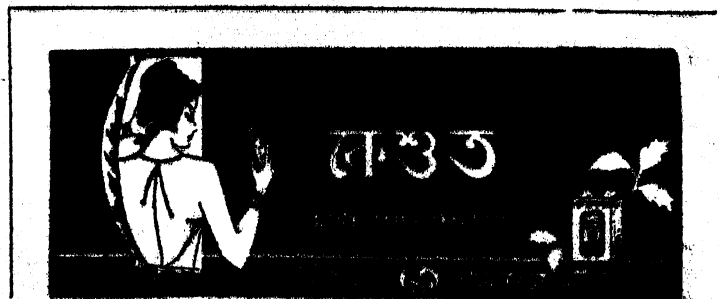
অমিতাভ মজুমদার কর্তৃক
সংক্ষেপিত ও অনূদিত।
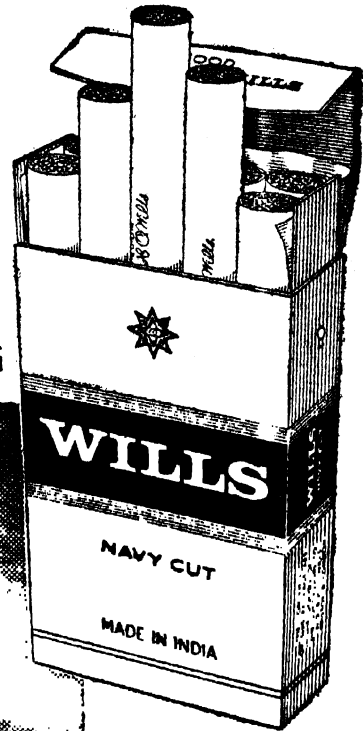
বাবা মারা গেলেন, তখন আমার আট বছর বয়স। কলকাতার কাছাকাছি এক জমিদার সরকারে নায়েব ছিলেন তিনি। সংসারের কর্তা জেঠামশায়। গাঁয়ের লোকের দৃষ্টিতে রীতিমত সচ্ছল অবস্থা আমাদের। জ্যেষ্ঠের নামে বাবা মাসে মাসে তিরিশ টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাতেন। দশ টাকা সংসার খরচ, বিশ টাকা মামলার খরচ। বিষয়ী হলেই মামলা করতে হবে, তখনকার নিয়ম। গোলা-ভরা ধান, ক্ষেত-ভরা তরি-তরকারি, গোয়াল-ভরা দুধাল গাই—তদুপরি খাজনাপত্তোর আদায় আছে প্রজাদের কাছ থেকে। বিশ-পঁচিশ জনের সামান্য সংসারে দশ-দশটা টাকাই বা কিসে লাগবে? সংসার-খরচা করে যা বাঁচত, তাও মামলা বাবদে চলে যেত। যশোর শহর বাড়ি থেকে মাইল কুড়ির মতন। সামান্য এই পথটুকু স্বচ্ছন্দে সবাই পায়ে হেঁটে চলে যেতেন। ঘোর থাকতে বেরিয়ে দশটার ভিতরে সদর কোর্টে হাজিরা। কোর্টের কাজ-কর্ম চুকিয়ে, এবং শহরে এসে পড়েছেন যখন—কিছু কেনাকাটা ও হাটবাজার সেরে, সওদার বোঝা কাঁধে ফেলে প্রহর দেড়েক রাত্রির মধ্যেই আবার বাড়ি এসে উপস্থিত।

অবসর মতন বাবা অল্পসল্প সাহিত্য-চর্চা করতেন। কবিতা-প্রবন্ধ লিখতেন, কাগজে ছাপাও হত। বইয়ের বেশ ভাল সংগ্রহ ছিল বাবার—রকমারি সাহিত্যের বই ও শাস্ত্রগ্রন্থ। অতিকায় ছাপবাক্সর মধ্যে বোঝাই হয়ে থাকত। বাবা যখন বাড়ি আসতেন, বইয়ের নাড়াচাড়া তখনই হত বেশি। ভাদ্র-মাসে যেদিন চড়া রোদ বেরুত, উঠানে পাঁচ-সাতটা মাদুর পেতে বাক্সর বই রোদ্দুরে বিছিয়ে দেওয়া হত। খেলুড়ে সাথীরা বাড়ির শিশুটিকে সেদিন আর ডেকে ডেকে পায় না। এ-বই উলটাই ও-বই উলটাই—খানিকটা পড়তে শিখেছি বটে কিন্তু ওসব বই পড়ার বিদ্যা হয় নি। উলটে-পালটে ছবি দেখি, আর বারম্বার নাকের কাছে নিয়ে আসি। সোঁদো-সোঁদো গন্ধ—কী মধুর যে লাগত!

বাড়িতে সাপ্তাহিক হিতবাদী আসত। এই ঢাউশ কাগজ। পাড়ার ছেলেপুলে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াত—কদিনে কর্তাদের পাঠক্রিয়া সমাধা হয়ে বাতিল গণ্য হবে, কাগজে ঘোরঘুড়ি বানিয়ে আকাশে বাজনা বাজাবে। হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের অনুরাগী ছিলেন বাবা, মৃত্যুতে শোক-কবিতা লিখেছিলেন— দু-এক ছত্র এখনো মনে আছে। গ্রামে পোস্টাপিস ছিল না তখন, মাইল তিনেক দূরবর্তী পাঁজিয়া পোস্টাপিসের এলাকায় আমরা। অটল চক্রবর্তী পিওনমশায় চিঠি বিলি করে যেতেন, হপ্তার ভিতর হাটবার দেখেই আসতেন তিনি। সকালবেলা এসে যে বাড়ি ইচ্ছা, অতিথ হয়ে পাকশাক করতেন। রান্নার খুব যশ ছিল পিওনঠাকুরের, ভোজের সময় এসে পোলাও-কালিয়া রেঁধে দিয়ে যেতেন। স্বপাকে পরিপাটি রকম সেবা নিয়ে চক্রবর্তীমশায় তারপর পাশায় বসতেন। সেই পাশাখেলাও তাজ্জব। প্রচণ্ড হাঁক পেড়ে দান ফেলতেন। পাশা যেন কানে শুনতে পেত, হাঁক শুনে সেই মতো দান পড়ত। সন্ধ্যা হল। গাঁয়ের চিঠিপত্তোর সকালবেলাতেই বিলি হয়ে গেছে, এবারে পিওনঠাকুর হাটে চললেন। বাদ বাকি চিঠি হাটে বিলি হবে। আমাদের হাটে মাছ-তরকারির আমদানি ভাল, দামেও সুবিধা। হাটঘাট সেরে অনেক রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরে যেতেন।

বাবার স্মৃতি বড় ঝাপসা। ফর্শা রঙ মাথায় টাক, লম্বা-চওড়া সুপুরুষ—চেহারার একটুকু আদল মনে পড়ে। ফোটো-গ্রাফ নেই বাবার, অনেক খোঁজ করেছি—তখনকার দিনে এ জিনিষ বেশি চালু হয় নি। কার্জন সাহেব বাংলাদেশ দুই খণ্ড করেছে, স্বদেশি আন্দোলন চলছে—তার প্রচণ্ড ঢেউ আমাদের ছোট্ট গ্রামেও এসে পৌঁচেছে। হাটে এসে স্বদেশি ছেলেরা বিলাতি কাপড় গাদা করে আগুন দেয়, ঝুড়ি ঝুড়ি বিলাতি নুন উলুবনে ফেলে দিয়ে আসে। বিলাতি বর্জন করে চটের মতন মোটা দেশি কাপড় লোকে পরছে, মেয়েরা কাচের চুড়ি ভেঙে শাঁখা আর গালা খাড়ু হাতে নিচ্ছে। পথেঘাটে সর্বত্র বন্দে মাতরম-ধ্বনি। বঙ্গ-ভঙ্গের তারিখ ৩০ আশ্বিন ঘরে ঘরে অরন্ধন। ঐদিন এ-ওর হাতে হলদে রাখি পরিয়ে লোকে রাখি-বন্ধন ব্রত পালন করছে। অর্থাৎ তোদের জবরদস্তির ভাগ মানি নে আমরা, হাতে রাখি বেঁধে আরও বেশি করে অভিন্ন হলাম। আমাদের গড়ভাঙার হাটেও স্বদেশি সভা। খোল বাজিয়ে স্বদেশি গান গাইতে গাইতে গ্রামমুখ্য মানুষ সার দিয়ে সভায় চলেছেন। শিশুর দল আমরা সকলের আগে—বন্দেমাতরম-লেখা নিশান উড়িয়ে খুব গর্ব ভরে আগে আগে চলেছি। মিটিঙে বাবাও একজন বক্তা। ইংরেজ সরকার স্বদেশিদের মাথা ফাটাচ্ছে, জেলে নিয়ে পুরছে ফাঁসিতে লটকাচ্ছে, অতএব আমরা কেউ ওদের তৈরি জিনিষ ব্যবহার করব না—প্রাণ গেলেও না—সমবেত কণ্ঠে সকলে প্রতিজ্ঞা নিলেন।

মিটিং থেকে ফিরে বাবার কাছে আছি। বাবা বললেন, শুনলি তো দেশের জন্য মানুষ কত কষ্টভোগ করছে, কত জনে প্রাণ দিচ্ছে। বড় হয়ে তুইও অমনি হবি। সেদিন যদি আমি নাও থাকি উপর থেকে তোকে আশীর্বাদ করব। পাঁচ-ছ বছরের শিশু আমি তখন, এত সমস্ত বোঝবার কথা নয়। কথাগুলো কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে।

চোখ বুজলে সেদিনের ছবিটাও ঝকমক করে ওঠে।

হাতে-খড়ি হয়েছিল দিনক্ষণ দেখে পাঁচ বছর বয়সে। পুরুতঠাকুর হাতে ধরে খড়ি দিয়ে চৌকো-গোল আঁকিচোক কেটে দিলেন। তারপরে দ্বারিক পাল মশায়ের হেপাজতে—তিনি বর্ণপরিচয় খুলে অ-আ, ক-খ শেখাতে লাগলেন। বর্ণমালা নাকি একদিনেই মুখস্থ করে ফেলেছিলাম, গুরুজনদের কাছে শুনেছি। আমি বিশ্বাস করিনে—স্নেহবশে নিশ্চয় বাড়িয়ে বলতেন। বর্ণপরিচয় শেষ করে প্রহ্লাদ-মাস্টারের পাঠশালায়। গুরুমশায় নন প্রহ্লাদ, মাস্টারমশায়—ইংরেজি পড়াতেন বলেই এই কৌলিন্য। ফার্স্টবুক কিং-রীডার রয়্যাল-রীডার নম্বর-টু তিনখানা ইংরেজি বই পর পর পড়িয়ে শেষ করে দিলেন। অঙ্কটা পণ্ডিতই ভাল শেখাতেন। হাই ইস্কুলে গিয়ে [illegible] তাঁর [illegible] তখনই পাটিগণিতের হেন অংক নেই যা কষতে পারি নে।

বাবার মৃত্যুরাত্রির কথা পরিষ্কার মনে আছে। হাঁপানি-কাশিতে ভুগতেন—বিকাল থেকে খুব বাড়াবাড়ি। ছোট্ট গ্রাম—পুরুষ-মানুষ আসতে কেউ বাকি নেই। বিপ্র-কাকা ডাকছেন: ও রামদা, চিনতে পারো? মেয়েরাও সব আসছেন, খানিক থেকে আবার ফিরে যান। ছেলেপুলে ঘর-বাড়ি কার উপর ফেলে পড়ে থাকবেন?

আটে পা দিয়েছি। জিনিষটা সঠিক বুঝিনে, আন্দাজে পাচ্ছি সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে আজ রাত্রে। গ্রামে আছেন ধনঞ্জয় কবিরাজ। বিদ্যা যৎসামান্য, কিন্তু বয়সে প্রবীণ—বহুদর্শীও বটে। সূচিকাভরণ প্রয়োগ হয়েছে। শ্বেত-আকন্দ পাতার সেঁক দিতে হবে, চৌখুপি লণ্ঠনের ভিতর টেমি ধরিয়ে নিয়ে জনা দুই আকন্দের খোঁজে বেরুলেন। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে আমার, আর বসতে পারছি নে। বড় বউদি বললেন, শুয়ে পড়ো খোকা, বসে আছ কি জন্যে? ভয় কি, বাবা সেরে যাবেন।

গাঁয়ে ঢুকতেই হরিতলা। বিশাল বট-অশ্বত্থের জোড়—ভারি জাগ্রত দেবস্থান। হরিঠাকুরকে অনেক করে কেঁদে বললাম, আমার বাবাকে সেরে তুলো তুমি ঠাকুর।

ঘুমিয়ে গেছি। অনেক রাত্রে কলরব, কান্নাকাটি। কে আমায় কোলে করে খোলা বারাণ্ডায় নিয়ে গেল। বাবাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে—ঘরের মধ্যে দেহত্যাগ করলে আত্মার নাকি মুক্তি হয় না, মায়াবদ্ধ হয়ে থাকেন। অন্তর্জলী খোঁড়া হয়েছে—অগভীর একটু গর্ত, তার মধ্যে জল। মৃতের পা দুটো সেই জলে চেপে দেওয়া হল, আমার হাত ছোঁয়া রয়েছে। মৃতের কানের কাছে নাম শোনানো হচ্ছে: হরেরাম হরেরাম রাম-রাম হরে-হরে—। নিশিরাত্রে অনেক কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি। আর তুমুল কান্না ও মাথা ভাঙাভাঙি। মা কাঁদছেন, জেঠাইমা কাঁদছেন, জেঠতুতু ভাই-বোন ও বৌদিদিরা কাঁদছেন। দেখাদেখি আমিও কাঁদি। দালানের মধ্যে অন্ধকার—সবগুলো লণ্ঠন বাইরে। অন্ধকারে জেঠামশায় বসে আছেন, গ্রামের মুরুব্বিরাও সেখানে। আমায় নিয়ে একজনে জেঠামশায়ের কোলের উপর দিল। জেঠামশায় হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। মুরুব্বিরা বলছেন, ধৈর্য ধরুন। আপনি ভেঙে পড়লে ছোট্ট ছেলেটার কী অবস্থা হবে, ভাবুন তো।

পরদিন বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। দূরের শ্মশান ছেলেমানুষ বলে আমায় নিয়ে যাবে না। তিন বছরের বড় দিদির সঙ্গে আমি ঘরের মধ্যে। দিদি বলছে, এই চলে যাচ্ছেন বাবা—ফিরে আসবেন না, কথা বলবেন না, আদর করবেন না আর আমাদের।

দিদির কথা আমার বিশ্বাস হতে চায় না। প্রশ্ন করি: কোনদিনও আসবেন না?

জেঠামশায়ের সেই থেকে বড় আদুরে হয়ে গেলাম আমি। দুপুরে তাঁর কাছে শুই। তিনি গান করেন—সেকালের নানা ভক্তিমূলক গান, আমি সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরি। যেখানে যান সেইখানে নিয়ে যান আমায়—চোখের আড়াল করতে চান না। দুই ভাইয়ে বড় সম্প্রীতি। কনিষ্ঠকে হারিয়ে বড় আঘাত পেয়েছিলেন তিনি, একলা থাকলেই চোখে ধারা গড়াত। ভাইকে ছেড়ে বেশি দিন আর রইলেন না, মাস দশেক পরে তিনিও মহাপ্রয়াণ করলেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

উদ্বোধনের ১৩৩৭ সালের একটি সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র বসু স্বামিজী প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। স্বামিজী প্রসঙ্গে তিনি অনেক লিখেছেন এবং সেইসব মূল্যবান বিশ্লেষণের সংকলন প্রকাশিত হওয়া উচিত। সুভাষচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—

"স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমাদের সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামিজীর রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যেরূপে প্রভাবিত হইয়াছিল সেরূপে আর কাহারও দ্বারা হয় নাই—তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামিজীকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামিজীর বাণীর মাধ্যমেই বর্তমানের মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসভূমি হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যে বাণী—ধর্মসমন্বয়—তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।"

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র স্বামিজীর বিশ্বমানবানুরাগ, সমাজহিতৈষা, সাহিত্যকর্ম প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অতি সংক্ষেপে অথচ মূল্যবান তথ্য ও যুক্তিসহযোগে। তাঁর রচিত "বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা" গ্রন্থটির পরিকল্পনা অভিনব। অতিশয় ক্লেশ ও অধ্যবসায় সহকারে তিনি বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মের একটি সংহত রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আরো অনেক আলোচনার প্রয়োজন আছে, নতুন দৃষ্টিকোণে বিচারের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। বর্তমান অবক্ষয়ের কালে স্বামিজীর আদর্শ, তাঁর ব্যক্তিচরিত্র, অসামান্য কর্মশক্তি, এবং সমন্বয় নীতি বিশেষভাবে অনুশীলিত হওয়ার প্রয়োজন সর্বাধিক। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র অসামান্য লিপিকুশলতায় স্বামিজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আগ্রহী পাঠকের জন্য সহজ এবং সরল ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন।

লেখক গ্রন্থারম্ভেই বলেছেন—"ঊনিশ শতকে বাংলাদেশে পুণ্যশ্লোক বিবেকানন্দের অভ্যুদয় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। দেশ-জাতি-ব্যক্তি তাঁর মধ্যে যেন একযোগে গভীর এক সার্থকতায় পোঁছেছিল—" সেইকালে ভারতের পূর্বগৌরব এবং লুপ্ত ঐতিহ্য উজ্জীবনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মনীষীদের অন্যতম, অথচ তিনি সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মানুষ। আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যাশিক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তথাপি তাঁর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান এ যুগে তুলনাহীন। ক্রিস্টোফার ইসারউড বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ একটি 'ফেনমেনন'—এই ফেনমেনন আরো ঘনীভূত ও রহস্যময়রূপে প্রকাশিত হল তাঁর উত্তরসাধক স্বামিজীর জীবনে। স্বামিজীর ঈশ্বর তাঁর দেশবাসী, তাঁর সাধনার ভূমি ভারত, মোক্ষ তাঁর কাম্য নয়—। তিনি বলেছেন—

"যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে সেত ভালই, কিন্তু তা হয় না। ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর তবে ত্যাগ হবে।" তিনি উদারপন্থী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য, তাই গুরুর বাণী—'যত মত তত পথ' এই আদর্শ তিনি অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁর চিত্তে যে চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছিল তা সমাজকল্যাণ চিন্তা। তিনি বলেছিলেন—

"জাতি-ধর্ম স্বধর্ম-ই সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়—মুক্তির সোপান।" ধর্মগুরুরা এই কথা কি বলেন—মুক্তির সোপান হিসাবে সামাজিক কল্যাণসাধনের শিক্ষা আর কে আমাদের দিয়েছেন? স্বামিজীর দৃষ্টিতে একই মহাশক্তি ফরাসী দেশে দিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরাজ চরিত্রে দিয়েছে বাণিজ্য ও সুবিচারবিস্তার আর হিন্দুর (ভারতবাসীর?) প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছা।

স্বামিজীর এই উপলব্ধির মধ্যে একালের ধর্মচেতনা ও সমাজচেতনার মর্মকথা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। ডঃ মিত্র 'ভারত-সাধকের বিশ্বভাবনা' নামক পরিচ্ছেদে কয়েকটি সামান্য উদ্ধৃতি ও তার ব্যাখ্যার দ্বারা স্বামিজীর চরিত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অন্তর দৃষ্টি ও আত্মসন্ধান, সমাজমনের অবসাদমুক্তি, সাহিত্য ও সমাজকথায় বিবেকানন্দ, লোকশ্রেয়ের জন্য কর্মযোগ, জীবনরক্ষা, স্বধর্মরক্ষা, আত্মরক্ষা, বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা, বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা প্রভৃতি বারোটি পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদে বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মের বিশেষ একটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে তাঁর নিজের রচনার উদ্ধৃতি এবং সমকালীন মনীষীদের উক্তি সহযোগে।

লেখক বলেছেন—

"বিবেকানন্দের সন্ধান ও সিদ্ধি বলতে যা বোঝায়, একদিকে ব্যক্তিগত কথা, অন্যদিকে মানবজাতিগত; একদিকে তাঁর সারা জীবনের তপস্যা. অন্যদিকে সে তপস্যার ফলাফলের জন্যে মানব-জগতের প্রস্তুতি বা সামর্থ্য। শিকাগো-পর্বের সূচনা অবধি তাঁর জীবন মোটামুটি এইভাবেই এগিয়েছে। তারপর তাঁর জগদ্ব্যাপী খ্যাতির অধ্যায়। নরেন্দ্রনাথ অতঃপর বিবেকানন্দ হয়েছেন।"

বিবেকানন্দের তপস্যা কি—এবং সে তপস্যার ফললাভ কি হয়েছে তার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ত বাঙালীর আছে, কিন্তু এই তপস্যার পিছনে কি নিরলস সাধনার ইতিহাস আছে তা সকলের জানা নেই। লেখক অশেষ শ্রমসহকারে অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য সন্নিবেশে সেই ইতিহাসের কথা জানিয়েছেন এবং সেই কর্মে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর স্বামিজী নির্জনতার সন্ধান করেছেন। হিমালয়, আলমোড়া, রুদ্র প্রয়াগ, হৃষীকেশ প্রভৃতি প্রতিটি স্থানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তপস্যার এই বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁর সাধনায় বাধা পড়েনি। পর্যটক বিবেকানন্দ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য জগত পরিভ্রমণে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৪ জুলাই বলরাম বসুর বাড়ি থেকে কাশীধামে প্রমদাদাস মিত্রকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন ডঃ মিত্র তাঁর গ্রন্থে সেই পত্রটির আংশিক উদ্ধৃতিদান করেছেন। এইকালে নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হয়েছে, জ্ঞাতিরা নানাপ্রকার উৎপীড়ন শুরু করেছে, বাড়ির অবস্থা বড়ই দুঃস্থ, 'এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়'—এই পারিবারিক যন্ত্রণা সাধারণ মানুষকে বিহ্বল করে তোলে, সাধনার পথ ছেড়ে সংসারের পথে নামিয়ে আনে. কিন্তু স্বামিজীর মনে—'রজোগুণের প্রাবল্যে অহংকারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনায়

পুণ্যশ্লোক বিবেকানন্দ

[illegible]—তাই তিনি [illegible] কাছে লিখেছিলেন—"আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মধ্যে ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূর-পরাহত হইয়া যায়—"

সাধারণ মানুষ এই মায়াকেই আরো নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে তার ভিতর [illegible] হয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু অনা-[illegible] স্বামিজী পতিত। তাঁর তখন [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ [illegible]। তাই তিনি [illegible] এই [illegible]—

"We have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen."

শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভার তিনি কাঁধে নিয়েছিলেন তা বহন করার শক্তি তাঁর ছিল [illegible] তিনি সেই মহৎ কর্তব্যভার পালনের জন্য শক্তির প্রার্থনা করেছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'কেনা গোলাম' হয়েছিলেন এবং মনেপ্রাণে তাই বিশ্বাস করতেন। বিবেকানন্দকে তাই লিখতে পেরেছেন যে—"আমা, রামকৃষ্ণ পরমহংসে যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নেই।" আর [illegible] লিখেছিলেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মে-ছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংসে, the latest and the perfect জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট, কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তের দাস। এই আমার পরম ভাগ্য—"

অন্তরদৃষ্টি ও আত্মসন্ধান পরিচ্ছেদে ডঃ মিত্র [illegible] সংক্ষেপে স্বামিজীর জীবনের আকুলতা, তপস্যা, ভক্তি এবং বিশ্বাসের [illegible] ইতিহাস অতি সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। আনু-পূর্বিক ইতিহাস এতখানি সংহতভাবে আর কোথাও দেখা যায়নি।

স্বাধীনতা ও কল্যাণকর্ম এই দুটি কুসুম একদা একই বৃন্তে ফুটেছিল। রামমোহন সম্পর্কে [illegible] একদা বলে-ছিলেন—হয় স্বাধীনতা, না হয় শান্তি—। এই সূত্রে লেখক বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—

> "বিবেকানন্দও তাই-ই। তিনিও সেইরকম। তাঁর সঙ্গে সমকালীন ও পূর্বগামী কারও কারও প্রভেদ বোধহয় এইখানে যে, তিনি কখনই জাতিত্যাগী নাস্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা কামনা করেন নি। বেদান্তে বিশ্বাসের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের গভীর যোগ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। কঠোপনিষদ আর মুণ্ডু-কোপনিষদের বাণী তিনি স্বদেশ-সাধনার প্রেরণা হিসেবে অনুভব করে গেছেন। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের অনুগ্রহে এই ব্রতপালনের জোর পেয়েছিলেন তিনি। রামমোহনের সময় থেকে জাতির যে অবসাদমুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, বিবেকানন্দের যুগে তার জগজ্জয়ী পরিণতি ঘটে।"

এই গ্রন্থের দুটি মূল্যবান পরিচ্ছেদ 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' ও 'বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা' দুটির বিষয়বস্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লেখক এই দুই পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বিবেকানন্দের সাহিত্য এবং সমাজচিন্তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দের সাহিত্য এক বিস্ময়কর বস্তু। বাংলা [illegible] স্বামিজীর [illegible] অসামান্য হয়ে উঠেছে, সেকালের মৌখিক ভাষাই তিনি ব্যবহার করেছেন অনেক গুরুতর [illegible], এদিকে তিনি [illegible] অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর কাব্য[illegible] সম্পর্কে একটি [illegible] পরিচ্ছেদ থাকলে ভালো হত। তাঁকে দিয়ে [illegible] জ্ঞান, [illegible] ছিল স্বামিজীর সমাজচিন্তার সবচেয়ে বড়ো কথা। স্বামিজী ভারতের প্রথমতম সমাজবাদী এই বিচারে আর একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছেদ আগামী সংস্করণে যুক্ত হলে আনন্দিত হব। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা'য় তাঁর পরিণত মানসের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তজ্জন্য তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।*

—অভয়ঙ্কর

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা : (আলোচনা)—হরপ্রসাদ মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা—১২। দাম—ছয় টাকা মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্য

তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে জাতীয় কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর অবদান অপরিসীম। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের মত তামিল সাহিত্যে ভারতীয়ের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সুব্রহ্মণ্য ভারতীর সাহিত্যের মাধ্যমেই আধুনিক তামিল সাহিত্য যেন প্রথম যৌবনের পত্র পল্লবে সজ্জিত হয়ে উঠেছে। তামিল সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবোধই ছিল মূল প্রেরণা। ভারতীই প্রথম এই জাতীয়তাবোধের প্লাবন ঘটান তামিল সাহিত্যে। তাঁর চেতনায় সমগ্র ভারতবর্ষ একসূত্রে গ্রথিত হয়ে ওঠে। সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কবিতায় জাতীয় সংহতির কথা বার বার ধ্বনিত হয়েছে। যদিও সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তাঁর লেখনী সমান সক্রিয় ছিল, তবু কবিতাই ছিল তাঁর প্রধান প্রকাশ। ধর্মীয় এবং দার্শনিক চৈতন্য তাঁর কবিতাকে নির্ধারিত করেছে। 'কান্নন পাট্টু' বা কৃষ্ণ-কীর্তন তাঁর স্মরণীয় রচনা। 'পাঞ্চালী শপথম' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে কোনও কোনও সমালোচক উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের কাহিনীকে নতুনভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। ভীমের শক্তির প্রতিই তাঁর আগ্রহ সর্বদা প্রকাশিত হয়েছে। 'কুইল পাট্টু' গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় তিনি চিন্তার যে পরিণতিতে উঠেছেন, তা যে কোনও কালের যে কোনও কবির ঈর্ষার বস্তু। সুব্রহ্মণ্য ভারতী বাঙালীর চিন্তা ধারণা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে-ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানটির তামিল অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা দেশ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তাতেই একথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হবে। ১৯০৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে এক ছাত্রসভায় তিনি স্বয়ং বাংলাদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি কবিতা পাঠ করে-ছিলেন। প্রধানত তাঁর উদ্যোগেই মাদ্রাজে একটি সভায় বিপিনচন্দ্র পালের ভাষণের আয়োজন হয়েছিল। ১৯০৬ সালে দমদমে তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে ভারতীয় নারীসমাজের বিভিন্ন সমস্যা তিনি নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং জানা যায়, নিবেদিতার ভাবাদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ১৯২১ সালের ২২ আগস্ট 'রবীন্দ্র দিগ্বিজয়ম্' নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্র-নাথের একটি প্রবন্ধও তিনি তামিলে অনুবাদ করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীর সম্পর্ক ছিল সত্যিই নিবিড়। এই কারণেই, বোধ করি, তামিলনাদের বাইরে কলকাতাতেই সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জন্মদিন সবচেয়ে বেশি জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় "তামিল লেখক সঙ্ঘ" কর্তৃক ১৯৬৪ সাল থেকে এই জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। তবু এবারের জয়ন্তী উৎসবটি নানা কারণেই উল্লেখ্য। প্রথমত এবার এই উৎসব

উদ্‌বোধনের জন্য এসেছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি। দ্বিতীয়ত এই সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে আরো কয়েকটি সাহিত্য সংস্থার আলোচনা অনুষ্ঠান পালনে অগ্রণী হন। গত ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার হলে ভারতীর ৮৭তম জন্মদিবস অনুষ্ঠিত হয়। উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন—[illegible] ও রবীন্দ্রনাথের মত ভারতীও ছিলেন মানবতার উদ্গাতা। ধর্ম, সমাজ এবং জাতিগত সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি সাহিত্যে একটি উদারতার ও আদর্শ ফুটিয়ে তুলেন। তিনি আশা করেন ভারতীর আদর্শ একালের সাহিত্যিকদেরও অনুপ্রাণিত করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বহু ভাষাভাষী ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে অধিকতর সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন—"এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আদানপ্রদানের দ্বারা ভাববিনিময়ের চেয়ে বিচ্ছেদপন্থাই বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।" এই সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন। প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী এস, ভি, নরসিংহম সকলকে স্বাগত জানান। তিনি ভারতীর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে বলেন—"এই সভা উদ্বোধনের জন্য যিনি আজ উপস্থিত হয়েছেন অর্থাৎ আমাদের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি—তিনি মাদ্রাজ মন্ত্রিসভায় সদস্য হিসেবে এক সময়ে যখন বৃটিশ শাসক কর্তৃক ভারতীর কবিতা নিষিদ্ধ হয়, তা প্রত্যাহার করে নেন।" শ্রী পি এন অ্যাপ্পাস্বামীও সকলকে স্বাগত জানান। ভারতী কবিতার বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন শ্রীমতী বিভা সরকার ও শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী[illegible] তামিলে ভারতীর একটি কবিতা পাঠ করে শোনান। কলকাতার বিশিষ্ট [illegible] অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই সপ্তাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর হল, দিল্লীতে অসমীয়া সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। গত ৫ অক্টোবর থেকে এই বৎসরব্যাপী বেজবরুয়া শতবার্ষিকী উৎসবের আরম্ভ হয়েছে। আসাম, কলকাতা এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে বেজবরুয়া শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সংবাদ এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ২৪ নভেম্বর। রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বেজবরুয়াকে নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও কবি হিসেবে অসমীয়া সাহিত্যের মহান পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—"জাতীয় চেতনার পক্ষে এটা খুবই দুঃখের কথা যে, আঞ্চলিক ও ভাষাগত সঙ্কীর্ণতার জন্য আমরা আধুনিক ভারতের স্রষ্টাদের কথা খুব কমই জানি। মনে হয়, শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এই চেতনা ক্রমশ বিস্তারলাভ করবে।" প্রখ্যাত অসমীয়া কবি ও রাজনীতিবিদ শ্রীহেম বরুয়াও লক্ষ্মীনাথের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য আকাদমী লক্ষ্মীনাথ প্রসঙ্গে শ্রীহেম বরুয়ার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সভায় দিল্লীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এবারের অপর একটি উল্লেখ্য খবর হল [illegible]

হাওড়ার বিশিষ্ট সাহিত্য সংস্থা সাহিত্য-প্রয়াসীর পঞ্চম সাহিত্য অধিবেশন গত ২৩শে নভেম্বর, '৬৮ তারিখে শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (শাখা)-এ অনুষ্ঠিত হল। এবারের অধিবেশনের বিষয় ছিল; সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার রূপ আলোচনা এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ। আলোচনা ও কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন—সর্বশ্রী ধনঞ্জয় দাস, [illegible] মুখোপাধ্যায়, সুনীল দাস, [illegible] বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন কর, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত দাস, প্রভাত চৌধুরী, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অমলকুমার ভৌমিক, বরুণ মজুমদার ও শৈলেশ শেঠ। সভা পরিচালনা করেন শ্রীসুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

বিদেশী সাহিত্য

মেকসিকো অলিম্পিক শেষ হয়েছে। কাগজে কাগজে এ নিয়ে লেখালেখির শেষ নেই। নিন্দা, কুৎসা, বাদপ্রতিবাদ ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও জয়পরাজয়ের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছে পৃথিবীর সর্বত্র। সম্প্রতি হ্যগ আটকিনসন 'দি গেমস' নামে একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন এসব বিচিত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সমালোচকের ভাষায় উপন্যাসটির বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠতাত্ত্বিক, চরিত্রগুলি সজীব এবং যথাযথ। সারা দুনিয়ার মানুষ এসে ভীড় করেছে গল্পের পাত্রপাত্রী হয়ে। কাহিনীভাগ কিছুটা জটিল। অনেক মনে করেন, রুপালি পর্দার দিকে চোখ রেখে এর কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

পোলিশ সরকারের সাম্প্রতিক হিসেব-নিকেশ থেকে জানা যায় গত মহাযুদ্ধের আগে পোল্যান্ডের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা ছিল একুশ মিলিয়ন। কিন্তু যুদ্ধের সময় পনের মিলিয়ন বই নষ্ট হয়ে যায়। তারপর বই প্রকাশের ব্যাপারে এদেশে বিপুল উৎসাহউদ্দীপনা দেখা যায়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যত বই প্রকাশিত হয়েছে তাতে ওখানকার আট হাজার তিনশ লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতচল্লিশ মিলিয়ন। এই বছরে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় মিলিয়ন। পোল্যান্ডের জনসংখ্যার ষোল শতাংশ মানুষ মাথাপিছু এখন ১৩১টি বই পড়ার সুযোগ পায়।

ন্যের তাঁর বয়স প্রায় ১০৫ মিলিয়ন গ্রন্থাগারী থেকে ধার নিয়ে বাড়ীতে আলোচনা করে। দূরে গ্রামাঞ্চলেও বহু লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া চৌত্রিশ হাজার স্কুল লাইব্রেরীতে আছে তিন মিলিয়ন বই।

বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন জোসেফ নুই। বহু প্রবন্ধনিবন্ধ লিখে তিনি পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এক সময়। সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন মানহাটানে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল উনাশি বছর। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছিলেন। তাঁর মতে, কোনো ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছুটিছাটার ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। ওটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য সার্বজনীন ছুটির ব্যবস্থা থাকে না—সেজন্যে ধর্মীয় ব্যাপারেও থাকা উচিত নয়। স্মৃতিদিন উপলক্ষে প্রতি বছর যে ডাকটিকিটের প্রচলন হয়—তিনি ছিলেন তারও ঘোরতর বিরোধী। এ নিয়ে তিনি সবশুদ্ধ তেরোটি বই লিখে গেছেন।

বৃটেনের মহিলা ঔপন্যাসিক মিস রেনা অ্যাখিলের সাম্প্রতিক উপন্যাসের নাম 'ডোন্ট লুক অ্যাট দি ন্যাইক ম্যান'। একজন মহিলাশিল্পীর জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। সে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্বামীর সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। অনেক ঘটনাই আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে। তার পরিবেশে রয়েছে 'ভিক্টোরিয়ান মানসিকতার প্রভাব। এককালে ভিক্টোরিয়ান যুবতীরা কোনো ভদ্রলোকের সামনে 'নাইট ড্রেস' শব্দটি উচ্চারণ করলে লজ্জিত হতো। এ উপন্যাসের নায়িকাও সেই পুরোনো রুচিবোধের অংশীদার। লেখিকার প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুন্দর এবং মনোরম। উপন্যাসটির জ্যাকেটের ছবি এঁকেছেন একজন ভারতীয় শিল্পী। তাঁর নাম সেলিম প্যাটেল। কলকাতার শিল্পীমহলেও তিনি অপরিচিত নন।

সাহিত্যিক হিসেবে ও'নীল কেবল মার্কিন মুলুকেই জনপ্রিয় নন, সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি অবিসংবাদিত। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি গ্রীক ট্র্যাজেডির একজন অনুরক্ত লেখক। সমালোচকেরা বলেন, গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিনি কার্যত নাট্যায়িত করতে পারেননি; তার চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়ে। মেরী ম্যাকার্থি তাঁর বিশ্রী গদ্য পড়ে বলেন, "ইউ ক্যান নর্থ রাইট এ প্ল্যাটোনিক ডায়লগ ইন দি স্টাইল অব কেজি অ্যাট দি ম্যাট।" তবু তাঁর শক্তিমত্তা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তাঁর মতো কর্কশ, অর্থবহ সংলাপ আর কোনো মার্কিনী নাট্যকার সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মূল্যও অপরিসীম। সম্প্রতি লুই শেফার তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন দুই খণ্ডে। বইটির নাম "ও'নীল : সন অ্যান্ড প্লেরাইট"। তিনি তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করে ও'নীলের নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের বাস্তবতা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন। শেফারের মতে ও'নীলের প্যাশনেট ইনটেনশনই হলো প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিভার একমাত্র নির্ণায়ক। ছেলেবেলায় তাঁকে মানুষ হতে হয় ক্যাথলিক চার্চে। হয়তো গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ না করলে তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরা শেষ পর্যন্ত পিউরিটান ক্যাথলিক স্কুলের প্রচারক হয়ে পড়তো। পনের বছর বয়সে তরুণ ও'নীল গীর্জার সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেন। ক্রমশ তাঁর প্রকৃতি উদ্দাম হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, "আমার নিজের মধ্যে স্বর্গ এবং নরক আছে।" আর "প্রতিহিংসাপরায়ণতা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্ধচেতন অভিপ্রায়।"

প্যাসিফিক ওয়ার রিসার্চ সোসাইটি সম্প্রতি 'জাপানস লংগেস্ট ডে' নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক লেখকই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনটির কথা স্মরণ করেছেন—যেদিন হিরোসিমা নাগাসাকি আণবিক বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাস জাপানীদের পক্ষে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সময়। তখন জাপান শুধু পরাজয়ের মুখোমুখি হয়নি—সর্বাত্মক ধ্বংসের দিকেও এগিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার কুড়িদিন আগে সানফ্রান্সিসকো থেকে ঘোষণা করা হয় : "এবার জাপানীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে......এখন আমাদের পালা। আমরা এক চুল এদিক সেদিক নড়ব না। কেননা, আমাদের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের পক্ষে দেরী করাও আর সম্ভব নয়।" কিন্তু জাপানীরা তখনো নিজেদের সঙ্কল্পে অটল। তখনো তাদের চৈতন্য ফিরে আসেনি। পদস্থ সামরিক কর্মচারীরা নতুন ফন্দি এঁটে চলেছেন। তারপর এলো সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল আটটা পনের মিনিট আঠারো সেকেন্ডের সময় হঠাৎ একটি শাদা আলোর ঝলকানি দেখা গেল মুহূর্তের জন্য। এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল চৌষট্টী হাজার নরনারীর মধ্যে অধিকাংশই মৃত। যারা বেঁচে রইলো তাদেরও জীবনের আশা কম। জাপানী ওয়ার কাউন্সিল এরকম একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের কথা ভাবতেই পারেনি। সারা পৃথিবী আণবিক বোমার ভয়াবহতায় আতঙ্কিত। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন : "জাপানের যুদ্ধলিপ্সা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্রমাগত বোমা ফেলে যাবো। কেবল তাদের আত্মসমর্পণই এ যুদ্ধ থামাতে পারে।" এই সংকলনের বিভিন্ন রচনায় সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন এই ঘটনাটির ওপর। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থাকায় পুস্তিকাটি আরো প্রামাণিক ও হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির ওপরে আরেকটি বই লিখেছেন রবার্ট জে লিফটন। বইটির নাম 'ডেথ ইন লাইফ'। আণবিক বোমার আঘাতে যারা মারা গেছেন এবং অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে।

পিয়ার্স সাইক্লোপিডিয়ার ৭৭তম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। সাহিত্য, রাজনীতি, দেশ, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি নানা ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রামাণিকভাবে প্রকাশের জন্য এই বর্ষপঞ্জীটির সুনাম দীর্ঘদিনের। ছোটদের জন্যও এর একটি সহজবোধ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মূল্যবান রেফারেন্স বই হিসেবে সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই বইটি উপযোগী।

সম্প্রতি রুশ সাহিত্যিক মিখাইল জোশচেনকোর নির্বাচিত রচনাবলীর একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দুইখণ্ডে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় প্যাভেল গ্রোমোভোর বিস্তৃত ভূমিকাসহ। এই খণ্ডে আছে—সেন্টিমেন্টাল গল্প, একটি জীবনের ইতিহাস ও আরো পঞ্চাশটি গল্প। দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'ইয়োথ রিগেইনড' এবং 'দি ব্লুপ্র বুক' নামে দুটি উপন্যাস।

এই সংস্করণের মোট মুদ্রণসংখ্যা এক লক্ষ কপি।

জার্মান কবি ও দার্শনিক গ্যেটের জীবন ও সাহিত্যের ওপর একটি দলিল-চিত্র শীঘ্রই সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে। ছবিটি তুলছেন স্টুডিও হামবুর্গ। গ্যেটের 'ফাউস্ট' ও 'ইফিগেনি' অবলম্বনে তোলা কয়েকটি দৃশ্যও দেখা যাবে এই তথ্যচিত্রে। ছবিটি দেখানো হবে বিদেশী টেলিভিসন ও পশ্চিম জার্মানীর কালচারেল ইনস্টিটিউট মারফৎ। ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানিশ ও ব্র্যাজিলীয়ান ভাষায় তার ধারাবিবরণী শোনা যাবে।

বৃটিশ ঔপন্যাসিক ফ্যারিমন্ড-এর সাম্প্রতিক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'নো ফ্লাইডে ইন দি উইক' প্রকাশিত হয়েছে কয়েক মাস আগে। এ-উপন্যাসের নায়ক জিমি ল্যাটিমার একটি কয়লাখনির মালিক। উপযুক্ত অর্থাগম না হওয়ায় ভদ্রলোক খনির কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার স্ত্রী একজন রক্ষণশীলা মহিলা। তিনি এতদিনের গড়ে তোলা বাড়িঘর ছেড়ে যেতে নারাজ। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি চলে। মিঃ ফারিমন্ড নানাপ্রকার নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী শেষ করেছেন। তাতে পাঠকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

নতুন বই

লৌকিক শব্দকোষ: কামিনী-কুমার রায়। ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস। ও [illegible] ইন্ডিয়ান [illegible]। কলকাতা-১। দাম [illegible] পয়সা।

ভাষার দুই রূপ, সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষা। যে-কোন ভাষাকে গভীরভাবে জানতে হলে তার মৌখিক রূপের সংগে পরিচয় অপরিহার্য। তাছাড়া কথ্যভাষায় একই শব্দের বিভিন্ন অর্থরূপও দেখা যায়। কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং কথ্যভাষার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ প্রয়োজন। তার জীবন্ত রূপকে তুলে ধরবার জন্য দরকার গবেষকের সযত্ন প্রয়াস। বাংলা ভাষায় এই ধরনের গবেষকের অভাব ঘটে নি। বিভিন্ন সময়ে নানান পত্র-পত্রিকায় আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহ, প্রকাশ সম্পাদনার চেষ্টা দেখা গেলেও, পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বাংলা পৃথিবীর সমৃদ্ধ একটি প্রাচীন ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এর এই অপূর্ণতা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

বাংলা ভাষার চর্চা সুরু হয় বিদেশীর হাতে। মানুএল দা আসসুম্পসাঁও এবং ন্যাসি হালহেড ছিলেন এ বিষয়ে অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮২৬ খৃঃ রামমোহন ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—এঁরা বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের যে অসামান্য কাজ করে গেছেন বাঙালী মাত্রেই সে বিষয়ে অবহিত। অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিক ভর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার-সনও নতুন আলোকপাত করেছিলেন।

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে কথ্যভাষা সংগ্রহ ও কোষগ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু তা ঐ দেশেরই সীমান্তে গণ্ডীবদ্ধ।

কথ্যভাষার বিভিন্ন রূপ সন্ধান করে গিয়েছেন শ্রীকামিনীকুমার রায়। তাঁর সুদীর্ঘ দিন কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতি 'লৌকিক শব্দকোষ'। বাংলার সাধারণ মানুষের মুখে প্রচলিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ-গুলোর ব্যাখ্যা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে গ্রন্থকার এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়ে-ছেন। চিন্তা এবং জীবনপ্রবাহে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বিচিত্র রূপে মধ্যে একটি মিল খুঁজে পেয়েছেন শ্রীরায়। এক-একটি শব্দকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লোকবৃত্ত—তা যেমন উপাদেয় তেমনি উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয়। বর্তমান গ্রন্থখানির বৈজ্ঞানিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্রটিও উজ্জ্বল।

শ্রীকামিনীকুমার রায় [illegible] বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। [illegible] বলে, তিনি এক অসাধারণ [illegible] লৌকিক শব্দ-কোষ' রচনার মধ্য দিয়ে। যদিও গ্রন্থখানি আকারে খুবই ছোট এবং সম্পূর্ণ নয়—তবুও গ্রন্থকারের নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় অতুলনীয়। তাঁর এই গ্রন্থখানির ভবিষ্যৎ সংস্করণ আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ নিক এটাই কামনা করি।

●

INTRODUCTION OF SANKARA by Dr. Rasvihari Das. Published by: Firma K. L. Mukhopadhyay—Calcutta—India: Price Rupees Fifteen only.

ভারতীয় সাধক ও দার্শনিক শংকরের দর্শনচিন্তা জটিল এবং সহজবোধ্য নয়। দর্শন বিষয়ে তাঁর মতবাদ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। ভারতীয়ের দৃষ্টিতে শংকরা-চার্যের মত দার্শনিক আর এ-দেশে জন্মায়নি। শংকর দক্ষিণভারতের মানুষ কিন্তু তাঁর বিচরণকাল সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ তারিখ পাওয়া যায় না। তবে পণ্ডিতরা অনুমান করেন, ৬০৮ শকাব্দের (৬৮৬ খৃঃ) ১২ই বৈশাখ শুক্লা-তৃতীয়ায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন। সম্ভবত তিনি কুড়িখানি গ্রন্থ রচনা করেন—এর মধ্যে ভাষ্য এবং গদ্য ও পদ্যে অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্ব লিখিত হয়েছে। পর্যটক হিসেবেও তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি চারটি মঠের প্রতিষ্ঠাতা। স্বয়ং একজন গোঁড়া ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন, এছাড়া পঠন ও তপস্যায় তাঁর অনেক সময় ব্যয়িত হয়। অতিঅল্পবয়সে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। শংকরের নাম অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ এই দুই তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত। শংকরের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বিষয়ে কাহিনী আছে যে স্বয়ং বেদব্যাস শংকরের বিচারে প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন, "বৎস, তুমি বেদের মর্মার্থ লিপিবদ্ধ করে শিষ্যদের যে-শিক্ষা দিয়েছ, তা যথার্থ। কিন্তু এই সব নয়, এর প্রচার প্রয়োজন। তুমি ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার ও প্রদানের জন্য আরো কিছুকাল মানবদেহ ধারণ করে থাক, তোমার আয়ু বৃদ্ধি হোক।" এইভাবে শংকর আয়ুলাভ করেন ও ভগবান বেদ-ব্যাসের আদেশ পালন করেন। শংকর-ভাষ্যের ভূমিকা হিসাবে ডঃ রাসবিহারী দাস এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য শংকর-দর্শন সহজবোধ্য নয় এবং স্থানে স্থানে অতিশয় জটিল। সেই দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। শংকরের যুক্তি

● [illegible] এমন [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়কে [illegible] প্রকাশিত হলো। [illegible] প্রয়োজন।

●

আলিম্পন: প্রতিভাময়ী বর্ধন; প্রাপ্তি-স্থান: ব্লক ডি ৩১, সি আই টি বিল্ডিংস, কলকাতা ৯; দাম—৬ টাকা।

বাংলাদেশের লোকশিল্পে আলপনা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পূজা-পার্বণ উৎসব বা যে-কোন মাংগলিক আচরণে এর অপরিহার্যতা আজও ফুরিয়ে যায় নি। আজকাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে আলপনা নিজের স্থান রচনা করে নিয়েছে; কিন্তু এ ধরনের আলপনায় আমাদের পল্লী-জীবনের চিত্রা-চরিত আলপনার রীতি দেখা যায় না। ধর্মীয় বা উৎসব অনুষ্ঠানে যেসব আলপনা ব্যবহার করা হত বা এখনো হয়ে থাকে তার বিভিন্ন অংশের যে তাৎপর্য তা আমরা অনেকেই ভুলে যাই। শ্রীমতী বর্ধনের এই ছোট ইংরাজী বইখানির ভূমিকায় এবং সংলগ্ন কুড়ি পাতার ছবিতে সেই তাৎপর্যের কিছুটা সর্বসাধারণকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টাটি প্রশংসার দাবী রাখে। এই স্বল্প-পরিসর বইয়ে তিনি লক্ষ্মীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা এবং বিবাহাদি অনু-ষ্ঠান উপলক্ষে ব্যবহৃত চিত্রাচরিত আলপনার নকশা উপস্থিত করেছেন। আশা করি তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত আরো বিভিন্ন ব্রত-উৎসবাদিতে ব্যবহৃত বিচিত্র আলপনার উপহার ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

(১০৭)

হৃদয়চৈতন্য

আগে নাম ছিল হৃদয়ানন্দ, পরে হল হৃদয়চৈতন্য।

তেমনি আগে নাম ছিল 'দুঃখী', হৃদয়চৈতন্যের কাছে দীক্ষা পেয়ে নাম হল কৃষ্ণদাস। পরে সেই কৃষ্ণদাসেরই নাম হল শ্যামানন্দ।

মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে পুণ্যকীর্তি মাধব মিশ্রের বাড়ি। মাধবের দুই ছেলে গদাধর আর কাশীনাথ। কাশীনাথের দুই ছেলে নরনানন্দ আর হৃদয়ানন্দ।

এই গদাধরই মহাপ্রভুর পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত। হৃদয়ানন্দ তাঁর হাতেই লালিত-পালিত, শিক্ষিত-দীক্ষিত। শুধু সেবক নয়, ছাত্র।

সূর্যদাস সরখেলের ছোট ভাই গৌরীদাস। এই সূর্যদাসের দু মেয়ে জাহ্নবী আর বসুধাকে বিয়ে করেন নিত্যানন্দ। গৌরীদাস জন্মস্থান শালিগ্রাম ছেড়ে কাটোয়ার অদূরে অম্বিকা কালনায় এসে গঙ্গাতীরে বাসা বাঁধে।

কালনায় গৌরীদাসের গৃহে এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এসেছিলেন নৌকো করে, নিজে বৈঠা চালিয়ে। সে বৈঠা দিয়েছিলেন গৌরীদাসকে। বলেছিলেন, তুমি যে মানুষকে ভবনদী পার করিয়ে দেবে এ বৈঠা তারই প্রতীক।

আরো একবার এসেছিলেন নিত্যানন্দকে নিয়ে। গৌরীদাস তাঁদের ছেড়ে দিতে চায়নি, বলেছিল, এখানে যাবজ্জগৎ বন্দী হয়ে থাকবে। প্রভু বলেছিলেন, তাই যদি তোমার অভিলাষ, তবে আমাদের বিগ্রহ করে রেখে দাও।

গৌরীদাস গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করল।

বিগ্রহসেবার জন্যে একটি যোগ্য ভক্ত চাই। তারই সন্ধানে গৌরীদাস গদাধরের স্মরণাপন্ন হল। বললে, আমি একটি ভিক্ষা নিতে এসেছি।

কী ভিক্ষা? বলো, গদাধর তাকাল মুখের দিকে : তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

তোমার হৃদয়ানন্দকে ভিক্ষে চাই।

গৌরীদাসকে বিমুখ করল না গদাধর। হৃদয়ানন্দকে তার হাতে সঁপে দিল। আর গৌরীদাস হৃদয়ানন্দকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে তুলে দিল বিগ্রহসেবায়।

মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে মহোৎসব হবে, গৌরীদাস ভিক্ষায় বেরুল। হৃদয়ানন্দকে বলে গেল, যথারীতি যুগলবিগ্রহের সেবা-পূজা কোরো, আমি যথাসময়ে ফিরব।

কিন্তু কই, সেই সে গেছে, গৌরীদাসের আর খবর নেই। মোহান্তদের নিমন্ত্রণপত্র এখুনি পাঠিয়ে না দিলে তারা নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হবে কী করে? এখনো আনুষঙ্গিক কত আয়োজন অসমাপ্ত।

গুরু এসে পৌঁছুবার আগেই হৃদয়ানন্দ সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করল।

উৎসবের আগের দিন গৌরীদাস উপস্থিত হল। আপনার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করেছি। তৃপ্ত মুখে বলল হৃদয়ানন্দ।

কোথায় গৌরীদাস তাকে আশীর্বাদ করবে, তা না, উল্টে রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার বিনানুমতিতে তোমার এই স্বতন্ত্রাচারের অর্থ কী?

হৃদয়ানন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তুমি যখন আমাকে অতিক্রম করে আমাকে অমান্য করলে তখন তোমার আর এ আশ্রমে স্থান নেই। তুমি অন্যত্র চলে যাও।

গুরুর আদেশ মেনে নিল হৃদয়ানন্দ। গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষতল আশ্রয় করে রইল।

গৌরীদাস নিজেই উৎসব সুরু করল আশ্রমে।

হৃদয়ানন্দের নিমন্ত্রণের ভিত্তিতে ধীরে-ধীরে লোকসমাগম হচ্ছে। প্রভুর জন্যে প্রভূত উপচারনিয়ে একজন আসছিল, গঙ্গাতীরে হৃদয়ানন্দকে দেখে সেখানেই বাহকদের থামতে বললে। হৃদয়ানন্দ বললে, উৎসব এখানে নয়, উৎসব আশ্রমে। সেখানে নিয়ে যাও।

গৌরীদাস সমস্ত ফিরিয়ে দিল। বললে, এ সমস্ত হৃদয়ানন্দের নিমন্ত্রণে এসেছে, এ আমি গ্রহণ করব না। এ উপচার নিয়ে হৃদয়ানন্দকে আলাদা উৎসব করতে বলো।

বাহকেরা দ্রব্যসম্ভার আবার হৃদয়ানন্দের কাছে ফিরিয়ে আনল।

গুরুদেব আমাকে আলাদা উৎসব করতে বলেছেন? বেশ তাই হবে। হৃদয়ানন্দ গঙ্গাতীরে সেই বৃক্ষতলেই উৎসব আরম্ভ করল।

উৎসবের কোলাহল শুনে আমন্ত্রিতদের অধিকাংশই সেই বৃক্ষতলে আকৃষ্ট হল। গৌরীদাসও নিজের আয়োজনে আশ্রমে উৎসব করছে। মধ্যাহ্নভোগের সময় পূজক গঙ্গাদাসকে বললে, মন্দিরের দরজা খোলো। ভোগ লাগাও।

মন্দিরের দরজা খোলা হল। মন্দির শূন্য। বিগ্রহ নেই।

গৌরীদাস লাঠি হাতে নিয়ে ছুটল গঙ্গাতীরে। নিশ্চয়ই হৃদয়ানন্দ বিগ্রহ সরিয়েছে।

গঙ্গাতীরে পৌঁছে দেখল অদ্ভুত কাণ্ড! কীর্তন হচ্ছে আর কীর্তনমণ্ডলীর মধ্যে বিগ্রহদ্বয় নৃত্য করছেন।

গৌরীদাসের হাতে লাঠি দেখে দুই বিগ্রহ অন্তর্হিত হতে চাইল। কিন্তু গৌরীদাস দেখল, চৈতন্যচন্দ্র হৃদয়ানন্দের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

দু বাহু বাড়িয়ে হৃদয়ানন্দকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল গৌরীদাস। বললে, তুমিই ধন্য। আজ থেকে তোমার নাম হৃদয়চৈতন্য।

মন্দিরে ফিরে এসে দেখল যুগল বিগ্রহ আবার স্বস্থানে উপস্থিত হয়েছে। হাসছে উজ্জ্বল নেত্রে। যেন বলছে, কী, চিনলে তো হৃদয়ের গুরুভক্তি? আর চিনলে তো কে তার হৃদয়স্থ?

এই হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের দীক্ষা-গুরু।

শ্যামানন্দের বাল্য নাম দুঃখী। হৃদয়চৈতন্যের কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নেওয়ার দরুণ তার নাম হল কৃষ্ণদাস।

পরে তার নাম শ্যামানন্দ হল। কেন? কোথায়? কী করে?

(১০৮)

শ্যামানন্দ

মেদিনীপুরের ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামে সদগোপ বংশে জন্ম—পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা দাসী। অনেক দুঃখের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল বলে নাম হল দুঃখী। কেউ কেউ বলে দুখিয়া।

বাপ পূর্ববাস ত্যাগ করে উড়িষ্যায় দণ্ডেশ্বর গ্রামে গিয়ে বাস করে। বাল্যকাল থেকেই দুখিয়ার মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ ফুটতে থাকে। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে হঠাৎ তার গঙ্গাস্নানে স্পৃহা জাগে। বাবাকে বললে, আমি গঙ্গাস্নান করতে যাব।

কোথায়? কার সঙ্গে? শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উচাটন হল।

এক দল স্নান-যাত্রী অম্বিকা-কালনায় যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে।

অনুমতি না দিয়ে লাভ নেই, ছেলেকে আটকানো যাবে না। শুধু এইটুকুই আশা করা যাক, শ্যাম-অন্তে আবার সে ঘরে ফিরে আসবে।

কিন্তু দুখিয়া আর ফিরল না। অম্বিকা-কালনায় তার হৃদয়চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হৃদয়চৈতন্য দেখল বৈরাগ্যের বৃন্তে ভক্তির একটি অম্লান পদ্ম। বললে, এস, তোমাকে মন্ত্র দিয়ে দি।

হৃদয়চৈতন্য তাকে কৃষ্ণমন্ত্র দিল। বললে, আজ থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণদাস।

দুখিয়া হাসল। বললে, দুঃখী কৃষ্ণদাস।

সত্যিই তো, কৃষ্ণকে না পাওয়া পর্যন্ত জীবনমাত্রই দুঃখী।

শুধু গঙ্গায় কৃষ্ণদাসের চিত্ত তৃপ্ত হতে চাইল না, বললে, যমুনা দেখব।

হ্যাঁ, দেখবে বৈকি। ব্রজবনে যাবে।

গুরুসেবায় কিছুকাল অতিবাহিত হলে কৃষ্ণদাসকে হৃদয়চৈতন্য বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি দিল।

নবদ্বীপ হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল কৃষ্ণদাস। সেখানে আরেক কৃষ্ণদাসের দেখা পেল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের। কৃষ্ণদাস জীব-গোস্বামীর চরণে আশ্রয় নিল। আর কথা কী! জীব তাকে শাস্ত্র পড়াতে বসল। জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় অজ্ঞানতিমির কেটে যেতে লাগল।

প্রত্যুষে নির্জন বনবীথি ধরে পথপরি-ক্রমায় বেরিয়েছে কৃষ্ণদাস। ললাটে গোপী-চন্দনের তিলক, হাতে জপমালা, মুখে গৌর-গুণগান। যেতে-যেতে কৃষ্ণদাস থমকে দাঁড়াল, পথের উপর একটি সোনার নূপুর পড়ে আছে! ব্যগ্র হাতে নূপুর কুড়িয়ে নিল কৃষ্ণদাস। মাথায় ঠেকাল। বুকের মাঝখানে আঁকড়ে ধরল দুহাতে।

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেল যে একটি কিশোরী পথের ধুলোয় কী খুঁজতে-খুঁজতে এগিয়ে আসছে।

দেবী, আপনার কি কিছু হারিয়েছে? স্নিগ্ধ বিনয়বচনে জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণদাস।

কিশোরী চমকে উঠল। দেখল এক সৌম্যকান্তি নবীনযুবক। বললে, হ্যাঁ, হারিয়েছে। আমার নয়, আমার সখীর। আপনি পেয়েছেন?

কী?

আমার সখীর বাম পদের নূপুর। কিশোরী আরো একটু জুড়ল: কাল রাত্রির নৃত্যে নূপুর শিথিল হয়ে পড়ে-ছিল, বাড়ি ফেরবার সময় পথে তাই স্খলিত হয়ে পড়েছে।

দেখুন তো এটা কিনা। কৃষ্ণদাস বুকের ভিতর থেকে নূপুর বার করে দেখাল।

কিশোরী হাত বাড়াল। আর, কিছু বলবার বা চাইবার আগেই নূপুর নিজের থেকে কিশোরীর হাতে গিয়ে পড়ল।

এ কি ইন্দ্রজাল নাকি? মন্ত্র-নীর না গন্ধর্বনগর? কিশোরীও যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কৃষ্ণদাস মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান হল দেখল জীবগোস্বামীর কাছে সে শুয়ে আছে। জীব বললেন, তুমি মহাভাগ্যবান, তুমি রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার চরণ নূপুর স্পর্শ করেছ। দেখেছ তার প্রিয় সখী ললিতাকে। এই নূপুর পেয়ে শ্রীমতী তো খুশিই তার প্রিয়তম শ্যাম-সুন্দরও আনন্দিত হয়েছেন। আজ থেকে তোমার নাম হোক শ্যামানন্দ।

শ্যামানন্দ উঠে বসল।

আর দেখ, বললেন জীবগোস্বামী, সেই নূপুর তুমি মাথায় ধরেছিলে বলে তোমার কপালে নূপুরাকৃতি তিলক ফুটে উঠেছে। আজ থেকে তোমার তিলকও নূপুরাকৃতি হোক। এ তিলকেরও নাম হোক শ্যামানন্দী তিলক।

হৃদয়চৈতন্যের কাছে খবর পৌঁছুল কৃষ্ণ-দাস জীবের কাছে নতুন দীক্ষা নিয়েছে ও নতুন তিলক ও নতুন নাম গ্রহণ করেছে। তারপর শ্যামানন্দ যখন কালনায় ফিরে এল তখন তার আগের তিলকের পরিবর্তে নতুন তিলক-অঙ্কন দেখে হৃদয়চৈতন্য দারুণ ক্রুদ্ধ হল ও শ্যামানন্দকে পরিত্যাগ করল।

তোমার তিলকের যে আকার নির্দেশ করে দিয়েছিলাম তা মুছে ফেলে দেখি নতুন তিলক পরেছ। এ অবমাননা অসহ্য। হৃদয়চৈতন্য বললে, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করলাম, তুমি আশ্রম ত্যাগ করে এ মুহূর্তে চলে যাও।

অশ্রুপ্লুত চোখে নীরবে তাকাল শ্যামা-নন্দ।

একটু বুঝি মায়া হল হৃদয়চৈতন্যের। বললে, তবে যদি ঐ তিলক ধুয়ে মুছে আগের তিলক ধারণ করো আদেশ ফিরিয়ে নিতে পারি।

কিন্তু নূপুরতিলক শ্যামানন্দ কী করে মুছে ফেলবে? সে যে তার ললাটে স্পর্শ-মাত্রই আপনা থেকে ফুটে উঠেছে।

আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেল শ্যামানন্দ। গঙ্গাতীরে অনাহারে পড়ে রইল।

আশ্রমের বিগ্রহ স্থির থাকতে পারল না। সে হৃদয়চৈতন্যকে স্বপ্নে দেখা দিল। বললে, এ তুমি করেছ কী, আমার আনন্দকে তুমি নির্বাসিত করলে? তার কপালে যে আমারই নূপুরচিহ্ন। আমার নূপুরই তো রাধিকার পায়ে।

সমস্ত ঘটনা স্বপ্নে উদ্ঘাটিত হল।

হৃদয়চৈতন্য তার ভুল বুঝল। ভুল বুঝে তার সংশোধন করতে এক মুহূর্ত দেরি করল না। গঙ্গাতীরে ছুটে গেল। কোলে তুলে নিল শ্যামানন্দকে।

জিজ্ঞেস করল, তোমার গুরু কে?

আমার শ্রীগুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু।

আর সংশয় রইল না। গুরুশিষ্যে মিলন হয়ে গেল।

বৃন্দাবনেই ঠাকুর নরোত্তম ও আচার্য শ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্যামানন্দের বন্ধুত্ব হয়ে-ছিল। এরা তিন জনই বীরচন্দ্রের আমলেতে বাংলা-উড়িষ্যায় বৈষ্ণবতার জয়পতাকা প্রোথিত করল। বইয়ে দিল প্রেমভক্তির বিপুল বন্যা।

বিষ্ণুপুরে গ্রন্থাপহরণের পর শ্রীনিবাস শ্যামানন্দকে খেতুরিতে পাঠিয়ে দিলেন। খেতুরির মহোৎসবেও সে উপস্থিত ছিল। গ্রন্থপ্রাপ্তির খবর পৌঁছুলে শ্যামানন্দ কালনায় ফিরে এল। সেখান থেকে সে উড়িষ্যায় যাত্রা করল। সুবর্ণরেখার ধারে ধরণী-রাজের অধিপতি অচ্যুত, তার পুত্র রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব নিল। তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীচাঁইই পরাকাষ্ঠা—এই প্রচারমুখ্যে পেয়ে গেল আরো অনেক শিষ্য, উঠল বিরাট শ্যামানন্দী পরিবার।

দামোদর যোগাভ্যাসী বৈদান্তিক। শ্যামানন্দ তাকে তর্কে পরাস্ত করল। পরাস্ত করে তার সমস্ত শূন্যতা ভক্তিরসে ভরে দিল। শ্যামানন্দের শিষ্য হয়ে দামোদর 'নিতাইচৈতন্য' বলে কাঁদতে লাগল।

ধারেন্দাতে সেরখাঁ নামে এক দুরন্ত পাঠানকেও উদ্ধার করল শ্যামানন্দ। তার শিষ্য রসিকানন্দও প্রেমভক্তি প্রচার করে বহু পাষণ্ডকে ভক্ত করে তুলল।।

শ্যামানন্দে মেতে উঠল দিক-দেশ।

সমগ্র উৎকল ও বর্তমান মেদিনীপুরে জেলার ধারেন্দা, নৃসিংহপুর, বলরামপুরে, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি শ্যামানন্দ ও তার প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য রসিকানন্দের প্রেম-ভক্তি প্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠল। খবর এল গুরুদেব হৃদয়চৈতন্য অপ্রকট হয়েছেন। এর অল্প পরেই রসিকানন্দকে শ্রীপাঠের মহান্ত-পদে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার হাতে শ্যামা-নন্দী সম্প্রদায়ের ভারার্পণ করে শ্যামানন্দ নিত্য লীলায় প্রবেশ করল।

'আখর জোটন করিতে লিখন
আর সংশয় রইল না। গুরুশিষ্যে
না লইবে দোষ মনের সন্তোষ
বন্দনা আমার কাম।।'

(সমাপ্ত)

আগের ঘটনা

[অর্ক খুন। তদন্ত করছেন রাজীব সান্যাল। খুনী সন্দেহে পুত্র নিখিলেশ হাজত থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে। শশাঙ্ক ভট্টাচার্য নিখিলেশেরই বন্ধু। মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে রুমমেট সুজাতা দাস, প্রভা মুখার্জি, আর কর্মচারী ভৈরব দত্ত, বিশ্বনাথ বসু সকলকেই জেরা করা হল। নতুন তথ্যের খোঁজে আবার ভৈরব দত্তের বাড়ি গেলেন সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর। পেলেন না। ফিরবার মুখেই ভৈরব দত্তের সঙ্গে রাজীব সান্যালের দেখা। ভৈরব জানাল : 'সুজাতা দাস হঠাৎ রেজিগনেশন দিয়েছে।']

দেবল দেববর্মা

সুরার একটা তীব্র উৎকট গন্ধ রাজীবের নাকে এসে লাগল। ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। ভৈরব দত্ত আজও মত্ত। একটু আগেই মাল টেনেছে। লোকটি ভয়ঙ্কর হুইস্কী। নইলে এমন মাতাল গন্ধে গোটা জায়গাটা রম রম করে ওঠে।

কথা শুনে রাজীবের চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠবার জোগাড়। 'বলেন কি মশায়? মিস দাস রেজিগনেশান দিয়েছেন?'

ভৈরব মিটিমিটি হাসছিল। বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখখানা অল্প অল্প দুলিয়ে সে বলল, 'হুলোবাগী এবার পাখা মেলে উড়তে চাইছে স্যার।'

চিন্তিতমুখে রাজীব প্রশ্ন করল, 'রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করেছেন ম্যানেজার-সাহেব?'

'কি জানি স্যার। ও কথাটা বলেন নি আমাকে। তবে খবরটা কাকপক্ষীতে জানে না এখনও। সারাদিন অফিসে থেকে আমি জানতে পারি নি। হুলোবাগী কি কম শয়তানী স্যার। কখন ফাঁকতালে সাহেবকে কাগজটি গছিয়ে দিয়ে গেছে। পাশের ঘরে বসে প্রভাই হয়ত টের পায় নি।' একটু থেমে ভৈরব আবার যোগ করল, 'আমি হলপ করে বলতে পারি স্যার। ও বাগী চুপি চুপি কেটে পড়তে চায় দিকনগর থেকে।'

রাজীব হেসে বলল, 'তা হতে পারে না ভৈরববাবু। মিস সুজাতা দাস এখন দিকনগর ছেড়ে যেতে পারেন না। ম্যানেজার-সাহেবকে কথাটা বলতে হবে আমাকে। উনি কি এখন বাংলোতে আছেন? কি করছেন?'

ভৈরব বিনীত ভঙ্গিতে জানাল, 'একটু সেবা করছেন দেখে এলাম।'

'সেবা করছেন? কি জিনিস?'

চোখ মটকে ভৈরব জবাব দিল,—'বস্তুটি কি, তা আবার বলে দিতে হবে আমাকে? দেখে এলাম আজিজুল গ্লাসে মিশিয়ে-টিশিয়ে দিচ্ছে। সাহেব তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছেন।'

'উনি কি বাড়ীতেই বসে ড্রিঙ্ক করেন?'

'এই দেখুন। নইলে সাহেব মানুষ যাবেন কোথায়? বীরেনের দোকানে গেলে লোকে যে মদমাতাল বলে নিন্দা করবে। ঘরে বসে খেলে তো মাতাল হয় না। পাঁচজনে বড়জোর বলবে শরীরটা চাঙ্গা করবার জন্য উনি একটু ড্রিঙ্ক করছেন।' কথা শেষ করে ভৈরব টেনে টেনে আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে হাসল।

রাজীব হেসে বলল, 'মথুরাপুরে কেন গিয়েছিলেন ভৈরববাবু?'

'মথুরাপুরে নয় স্যার। গিয়েছিলাম আলোকপুরে।'

'হঠাৎ আলোকপুরে? কি ব্যাপার?'

'ম্যানেজারসাহেবের কাজে।' একটু হেসে ভৈরব বলল, 'স্টীম লন্ড্রীতে কাপড় কাচতে দিতে যেতে হয়েছিল।'

'ফিরে এসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বুঝি? রেজিগনেশন দেবার খবর তো তখনই শুনলেন?'

ঘাড় হেলিয়ে ভৈরব বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

রাজীবকে এবার উৎফুল্ল দেখাল। খানিকটা কৃতজ্ঞ বলেও মনে হল। ভৈরবের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'যাই হোক, সময়ে খবরটা দিয়ে আমাদের খুব উপকার করেছেন কিন্তু।' দাঁত চেপে রাজীব বলল, 'সুজাতা দাস যদি পালিয়ে যাবার মতলব করে থাকে তাহলে সে খুব ভুল করেছে।' একটু থেমে রাজীব ফের শুরু করল, 'ভৈরববাবু, আপনাকে কিন্তু আমার একটু দরকার ছিল।'

'বলুন স্যার। যা হুকুম করবেন, ভৈরব দত্ত যথাসাধ্য তামিল করবে।'

'তা জানি ভৈরববাবু। দু-একটা খবর যা এনেছেন তাতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। তবু ভবিষ্যতে এমনি খবর আরো কিছু পেলে সত্যিকার উপকার হয়।'

ভৈরব বলল, 'সে আপনাকে বলতে হবে না স্যার। খবর পেলেই একটি মুহূর্ত দেরী না করে আপনাকে পৌঁছে দেব। কিন্তু দেখবেন স্যার, আমার নামটা আবার যেন না পাঁচকান হয়। দয়া করে যেন ফাঁসিয়ে দেবেন না।'

রাজীব বলল,—'আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। সুব্রত আজ পাঞ্জাবীদের ডেরায় গিয়ে একটা লোকের খোঁজ পেয়েছে। সে নাকি গত শনিবার রাত এগারোটার সময় ওখানে এসে উঠেছিল। ওর বাড়ী কলকাতায়,—ভবানীপুরে। ব্যবসা সংক্রান্ত কি সব খোঁজ-খবর নিতে লোকটি কোলিয়ারীতে গিয়েছিল।'

কথা শুনে ভৈরবের চোখ দুটো চকচকে উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল, 'বলেছিলাম না স্যার? লোকটাকে দেখেই আমার কেমন খটকা লাগল।'

রাজীব বলল, 'আচ্ছা, ওর পরনে কি ছিল বলুন দিকি?'

'মানে ও কি পরেছিল জানতে চাইছেন?' একটু ভেবে ভৈরব বলল, 'প্যাণ্ট জামা পরেছিল স্যার।'

'প্যান্ট অর্থাৎ ফুলপ্যান্ট আর সার্ট। তাই না?'

ভৈরব উত্তর দিল, 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

রাজীব খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'মুস্কিল হয়েছে কি জানেন? পরদিন সকালে উঠে লোকটা কলকাতায় ফিরে যায়। তার নাম ঠিকানা কেউ জানে না। ভবানীপুরে থাকে, এইটুকু মাত্র বলেছিল অন্যদের। কিন্তু এই সামান্য সূত্র থেকে লোকটাকে খুঁজে বের করা খুব মুস্কিল।'

ভৈরব নিশ্চিত জেনেছে এমনি একটা ভঙ্গি করে বলল, 'আমার তো মনে হয় স্যার, তরঙ্গকে ঐ ষণ্ডা জোয়ানটাই শেষ করে গিয়েছে।'

'আচ্ছা লোকটার প্যান্টের কাপড়ের কি রঙ ছিল বলতে পারেন?'

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ভৈরব বলল, —'সবুজ রঙ বলে মনে পড়ছে স্যার।'

'আর সার্ট?'

'জামাটা শাদা রঙের।'

'পায়ে নিশ্চয়ই সু জুতো?' রাজীব বাঁকা চোখে তাকাল।

'জুতোর কথা জিজ্ঞেস করছেন স্যার?' একটু চিন্তা করে ভৈরব বলল,—'জুতোর কথা মনে নেই আমার। তবে হ্যাঁ, শু জুতো হতে পারে। হওয়াই সম্ভব।'

'সম্ভব কেন বলছেন?' রাজীব জানতে চাইল।

'ফুলপ্যান্টের সঙ্গে শু ছাড়া আর কি মানানসই হবে?'

রাজীব ঈষৎ হেসে কি যেন ভাবল মনে। বলল, 'আচ্ছা ভৈরববাবু, আপনি বিশ্বনাথ বসু বলে কাউকে চেনেন?'

'বিশ্বনাথ বসু? আমাদের পারচেজ সেকশনের ঐ নতুন কেরানীর কথা বলছেন তো?' ভৈরব একটু না থেমেই বলে গেল, —'ওকে বিলক্ষণ চিনি। ছোকরা দিন-কতক তরঙ্গের পিছনে ছিনে জোঁকের মত লেগেছিল। ওর ভাবগতিক দেখে আমি মনে মনে হাসতাম স্যার। আরে ব্যাটা, ও হল মগডালের রসাল। তুই বামন হয়ে উঁচুডালের পাকা ফলে হাত বাড়াচ্ছিস।'

'বিশ্বনাথ বসুর সম্বন্ধে আর কিছু জানেন?'

'ভীষণ দেমাকী ছোকরা স্যার। এম-এ না কি যেন পাশ করেছে। সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। ইদিকে বাবুর জুয়ার আড্ডাতেও যাতায়াত আছে।' ভৈরব গলা নামিয়ে শেষের কথাগুলি বলল।

'তাই নাকি?' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করল, 'ওর সঙ্গীসাথী সব কারা?'

'জুয়ার আড্ডায় কারা যায় সে কি আপনাকে বলে দিতে হবে স্যার? বাজে ছোকরা সব। মদ আর জুয়ো,—চা আর লুডো খেলার সামিল বলে মনে করে।'

রাজীব চিন্তিত মুখে বলল, 'ছোকরা সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নিন দিকি।'

ভৈরব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'নিশ্চয় নেব স্যার। কালই পারচেজ সেকশনের শিবনাথ দাসকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সাণ্ডাল্‌দের বিল পাশ করে শিবনাথ। ঠাণ্ডা মানুষ —চুপচাপ নিজের কাজ করে যায়। কিন্তু তাহলে কি হবে? চাঁদির চশমার আড়ালে সব দিকে ওর নজর আছে।

রাজীব বলল, 'ঠিক আছে ভৈরববাবু, আর একটা মাত্র প্রশ্ন আপনাকে। তাহলে ছুটি আপনার।'

ভৈরব সোৎসাহে বলল, 'বলুন স্যার।'

'আপনার ম্যানেজার সাহেবের শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানাটা একটু লিখে দেবে আমাকে? খুব প্রয়োজন।'

সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেল ভৈরব। কেমন ভিজে ভিজে গলায় বলল, 'কাজটা কি ঠিক হবে স্যার? ছাপোষা মানুষ। সাহেবের শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানাটা দিয়ে শেষে চাকরীটা খুইয়ে বসব না তো?'

'আরে না, না।' রাজীব ওকে সাহস দিয়ে বলল, 'কে জানতে পারছে আপনার নাম? আর সাহেবের শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা কি আপনি শুধু একাই জানেন?'

'ঈশ্বরের দিব্যি স্যার। আমি শুধু ঠিকানাটাই জানি। কোনদিন ও তল্লাটে যাই নি।'

রাজীব বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে থানায়। ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাবেন। আমি কথা দিচ্ছি, এ ব্যাপার তৃতীয়জনের কর্ণগোচর হবে না।'

এক টুকরো কাগজ আর কলম ওকে এগিয়ে দিল রাজীব। বলল, 'ওই চেয়ারটায় বসে লিখে ফেলুন।' মনে মনে হাসছিল সে। একটু আগে বিশ্বনাথ বসুও ওই চেয়ারে এসে বসেছিল। রাজীবের নির্দেশমত সেও কাগজে খানিকটা লিখেছে।

ভৈরবের সাজ-পোশাকে বেশ ছিমছাম শৌখীনতা। অল্প একটু চওড়া পাড়ের দিশী ধুতি, গায়ে সার্ট নয়, বকের পালকের মত ধবধবে পাঞ্জাবি। মাথার চুল থেকে তেলের সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে এসে লাগছে।

রাজীব হেসে বলল, 'ধুতি পাঞ্জাবিতে বেশ মানিয়ে [illegible] আপনাকে। প্যান্ট জামা পরলে নিশ্চয়ই এমন সুন্দর দেখাত না।'

[illegible] হল। কি [illegible] সুন্দর। এই [illegible] আমি [illegible] পাঁচ-[illegible]

[illegible] হয়েছি। [illegible]

[illegible] রাজীব বাঁ দিকে [illegible] বাড়ির [illegible] ঘরে বাতিটা [illegible] একটা [illegible] দিয়েছে। রাজীব [illegible] করেছিল। অপলকদৃষ্টে [illegible] দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রাজীব জীপ গাড়িটায় উঠে বসল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জীপটা [illegible] স্টার্ট নিল। গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাজীব উল্টোদিকে এগিয়ে চলল। দুবার রাস্তা বদল করে ঠিক জায়গাটিতে এসে পৌঁছতে তার মিনিট ছয়-সাতের বেশী লাগল না। এদিকটা এরই মধ্যে নিস্তব্ধ, নির্জন। পথের দু পাশে ঝোপজঙ্গল, বড় বড় গাছ দৈত্য-দানোর মত দীর্ঘ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে।

বাঁ দিকে ওরেন্ট সুদামডি কোলিয়ারী যাবার রাস্তা।

মোড়ের কাছে এসে রাজীব হঠাৎ ব্রেক কষল। এ পথে লোকজন প্রায় নেই। শাখা-প্রশাখা মেলা সেই বিরাট বটগাছটা এক পাশে। কি খেয়াল হতে রাজীব ঘন সন্নিবদ্ধ ডালপালার উপর টর্চের আলো ফেলল। সচকিত বিরক্ত হয়ে একটা পাখী ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল। বটগাছটার [illegible] সুতোর [illegible] অন্ধকারের মধ্যে পাখীটা কোথায় যে উধাও হল, তা নিশ্চয়ই [illegible] করতে পারল না রাজীব।

রাতের প্রথম প্রহরেই [illegible] সুদামডি পৌঁছতে [illegible] লাগল না। মাথার উপর [illegible] আকাশের গায়ে মসলিনী ফুলের মত [illegible] তারা। কোলিয়ারীর মাইনিং সুপারভাইজার তার [illegible] কোয়ার্টার খুঁজে পেতে একটুকু কষ্ট হল না রাজীবের। জিজ্ঞেস করতেই একজন অপরিচিত লোকেই বাড়ীটা দেখিয়ে দিল।

খোঁজখবর নিয়েই এসেছে রাজীব। শশাংক ভট্টাচার্য বেলা দুটোর শিফটে খাদে নেমেছে। তার ছুটি হবে রাত দশটার পর। ঘন্টাখানেক ওভার টাইম কাজও করতে পারে সে, সুতরাং এখন কিছুটা সময় নিশ্চিন্তে। নিখিলেশকে তবে একা পাওয়া যাবে বলেই তার ধারণা।

জীপের শব্দ শুনেই সম্ভবত নিখিলেশ উৎকর্ণ ছিল। দরজার কাছে জুতোর মচমচানি কানে যেতেই সে তাড়াতাড়ি কবাট খুলে মুখ বের করল।

'আপনি ?'

করযোড়ে নমস্কার জানিয়ে রাজীব বলল, 'আমাকে হয়ত আপনি আগে দেখেন নি নিখিলেশবাবু। আমি রাজীব,—রাজীব সান্যাল। মধ্যপ্রদেশের সি আই ডি ইন্সপেক্টর।'

নমস্কার করে নিখিলেশ বলল, 'ভিতরে আসুন, আপনার নাম আমি শুনেছি, কিন্তু আমার কাছে হঠাৎ এলেন যে!'

ঈষৎ হেসে রাজীব বলল, 'ভয় পাচ্ছেন নাকি? কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই নিখিলেশবাবু। আমি আপনার কাছে বন্ধুর মত এসেছি।'

সামান্য একটু ঠোঁট প্রসারিত করে নিখিলেশ কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল, 'খুনী আসামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন ইন্সপেক্টরবাবু?'

'কে বলল আপনি খুনী? বিচারে এখনও তা সাব্যস্ত হয়নি কখনো।'

'সে পরের কথা।' নিখিলেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বিজনগর আর সুদামডির লোকেরা আমাকেই খুনী বলে জেনেছে। অথচ জানেন—' কথাটা বলেই নিখিলেশ হঠাৎ চুপ করে গেল।

'কি বলছিলেন বলুন?' রাজীব ওর মুখে কথা তুলে দিতে চাইল।

'কিন্তু এ-সব কথা আপনাকে বলা কি উচিত হবে? আজ পর্যন্ত কারো কাছে আমি এ ব্যাপারে মুখ খুলিনি ইন্সপেক্টরবাবু।'

নিখিলেশকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল।

মৃদু [illegible] হাসল রাজীব। গলার স্বরে দরদ মিশিয়ে বলল, 'আমাকে আপনি সাহায্য করুন নিখিলেশবাবু। আমার স্থির বিশ্বাস তরঙ্গর খুন হবার কারণ আমরা দুজনে চেষ্টা করলে ঠিক খুঁজে পাব।'

বাঁকা হেসে নিখিলেশ বলল, 'কিন্তু পুলিশের [illegible] আমাকেই দোষী [illegible] ধরে নিয়েছে।'

'[illegible] পাওয়া গেছে, তাতে [illegible] ছিল না নিখিলেশ-বাবু। একটা [illegible] যাতে দোষটা সহজেই [illegible] উপর [illegible]।'

শান্তভাবে নিখিলেশ বলল,—বেশ। তাহলে আমার [illegible]।'

ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে রাজীব বলল, 'আগে আপনি দু একটা প্রশ্নের জবাব দিন। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ, আরো পরিষ্কার হতে পারবে।'

সিগারেটে টান দিয়ে রাজীব বলল, 'তরঙ্গের ভালবাসায় কোন খাদ ছিল বলে মনে হয়েছে আপনার? আপনি নিশ্চয়ই জানতেন, তরঙ্গের অনেক পুরুষ বন্ধু ছিল। অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশত সে। কোনোদিন আপনার মনে সন্দেহের মেঘ জমে নি?'

প্রশ্ন শুনে নিখিলেশ হাসল। বলল, 'তরঙ্গ অবিশ্বাসিনী কিম্বা সে আমাকে প্রতারণা করবে এ চিন্তা কোনোদিন আমার মনে হয় নি। আর অনেকের সঙ্গে মিশলেই কি মেয়েরা খারাপ হয় ইন্সপেক্টরবাবু?'

রাজীব লজ্জিত হয়েছে মনে হল, 'তা ঠিক নয়', সে বলল, 'তবে প্রশ্নটা বোধহয় আপনার খারাপ লেগেছে, তাই না নিখিলেশবাবু? আসলে আপনি নির্দোষ কিম্বা তার সঠিক বিচার হতে পারে আপনার এই উত্তরের উপর।'

নিখিলেশ নিজের মনে চিন্তা করল কিছু। কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল, 'আপনার বক্তব্য আমি বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা শুনলে নিশ্চয়ই এ বিষয় নিয়ে আপনাকে বেশী ভাবতে হবে না।'

'কি কথা?' রাজীব আগ্রহ প্রকাশ করল।

'তরঙ্গের সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ থাকলে আমি কি ওকে বিয়ে করতে পারতাম?'

'বিয়ে করতে পারতেন মানে? তরঙ্গকে আপনি বিয়ে করেছিলেন নাকি?' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করল।

নিখিলেশ বলল, 'গত বুধবার কলকাতায় আমাদের বিয়ে হয়।' একটু থেমে কলকাতার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের ঠিকানাটা উল্লেখ করল নিখিলেশ।

'এ বিয়ের সংবাদ এখানের কেউ জানে না?'

'কেউ না। আমরা কাউকে বলিনি। তরঙ্গ নিষেধ করেছিল জানাতে।'

'তরঙ্গর মা'ও জানেন না?'

'না। আমাদের বিয়েতে তরঙ্গের মার মত ছিল না। তরঙ্গ বলেছিল, বিজনগর ছেড়ে চলে যাবার সময় মাকে গিয়ে আমরা প্রণাম করে আসব।'

আগে থেকে শুভ সংবাদ জানাবার কোনো মানে হয় না।'

রাজীব নিরুত্তর।

নিখিলেশ নিজে থেকে বলল, 'আমার মনে হয়েছিল সংবাদটা বিশেষ দু একজনের কাছে গোপন রাখতে ইচ্ছে তরঙ্গের। এর বেশী কিছু বলতে পারব না আমি।'

রাজীব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ম্যানেজার-সাহেবের সম্বন্ধে তরঙ্গ কিছু বলেছিল আপনায়?'

'মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী?' একটু চিন্তা করে নিখিলেশ বলল, 'হ্যাঁ, অনেকবার ওকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের। ও বলত, ম্যানেজারসাহেব লোক খারাপ নন। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তবু অনেক কিছু পেয়েও সুখী লোক হতে পারেন নি উনি। স্ত্রীর সঙ্গে নাকি বনি-বনা হয় নি চক্রবর্তীসাহেবের। তরঙ্গ বলত যে কোন দিন ওদের ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে।'

হাতের সিগারেটটার শেষ টান দিয়ে রাজীব বলল, 'তরঙ্গের রুমমেট সুজাতা দাসকে চেনেন আপনি? ওর সম্বন্ধে কি বলত তরঙ্গ?'

'চিনি ভদ্রমহিলাকে,' নিখিলেশ সহজেই বলল, 'ভারী গম্ভীর আর শক্ত ভঙ্গি। খুব কড়া মহিলা নিশ্চয়ই। তরঙ্গ বলত, সুজাতাদি একটা পাগল। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ ওর।' একটু থেকে সে আবার বলল, 'তরঙ্গ আমাকে ওর গল্প পরে শোনাবে বলেছিল।'

'প্রভা মুখার্জি' বলে একটি মেয়েকে চেনেন?'

'তরঙ্গের সেন্সের ফর্সা মেয়েটি তো? হ্যাঁ চিনি ওকে, তবে আলাপ-সালাপ নেই। ও বলত, মেয়েটি নাকি খুব হিংসুটে। কারো ভালো সহ্য করতে পারে না।'

'ভৈরব দত্ত বলে মিলের এক ভদ্রলোককে জানেন?'

নিখিলেশ হেসে বলল, 'ভৈরববাবু বিখ্যাত ব্যক্তি। ম্যানেজারসাহেবের ঘরের লোক বলে সবাই জানে। খুব বেশী মদ খান লোক বলে সবাই জানে। খুব বেশী মদ খান উনি। তবে হ্যাঁ, একটা গুণও আছে,—ভালো ফটোগ্রাফার। তরঙ্গ ওর সম্বন্ধে কি বলে-ছিল জানেন? এমনিতে বেশ আছেন উনি, কিন্তু ক্ষেপে উঠলেই আর রক্ষা নেই।'

'তখন কালভৈরব, তাই না?' রাজীব হেসে বলল।

নিখিলেশ বিষণ্ণ হাসল।

'বিশ্বনাথ বসু বলে কারো নাম শুনে-ছেন আপনি তরঙ্গের কাছে?

নিখিলেশ ঘাড় নাড়ল। 'মনে পড়ে না।' —সে বলল।

'আচ্ছা, আপনার বন্ধু শশাংক ভট্টাচার কেমন লোক?'

'খুব ভাল ছেলে। জানেন নিশ্চয়ই, জজসাহেবের কাছে মামলা নিয়ে গিয়ে ওই আমার জামিনে খালাস করে নিয়ে এসেছে।'

রাজীব বলল, 'তা ঠিক। তবে স্ত্রী-জাতির প্রতি আপনার বন্ধুর একটু দুর্বলতা আছে। অবশ্য এ দুর্বলতাটা প্রায় সব পুরুষেরই। তবু ওরই মধ্যে একটু ইতর বিশেষ হয়। সুন্দরী মেয়ে দেখলে আপনার বন্ধু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খোঁজেন।'

নিখিলেশ অল্প হাসল। অর্থাৎ এ-দোষটুকু সে ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছে না।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজীব তাকাল।—'আচ্ছা নিখিলেশবাবু, এই কিছু-দিনের মধ্যে তরঙ্গ তেমন কোনো কথা বলেছিল আপনাকে? হয়ত আপনার কাছে সেটা তুচ্ছ মনে হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছে করলে সেটা সিরিয়াসভাবে নেওয়া যায়।'

নিখিলেশ আগের মতই চিন্তা করল নিজের মনে। প্রায় দু-তিন মিনিট। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলা হয় নি।

'কি কথা?' রাজীব উটের মত ঘাড় বাড়িয়ে রইল।

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা ক'জন একটা রেস্তোরায় খেয়ে নিলাম। বন্ধুদের কাজ ছিল, ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমাদের হাতে তখনও ঘন্টা দেড়েক সময়। স্টেশনে এসে কিছুক্ষণ প্লাটফর্মে, আবার কিছুক্ষণ গাড়ীতে বসে দু'জনে গল্প করলাম। তখন তরঙ্গ একটা কথা বলেছিল আমায়।'

'সেই কথাটাই বলুন।' রাজীব ওকে তাড়া দিল।

'তরঙ্গ বলল, মঙ্গলবার দিন বিকেলে অফিসে সে একটা চিঠি পেয়েছে। ম্যানেজার-সাহেবের দরজার কাছে পড়ে ছিল। কারো পকেট থেকে হয়ত পড়ে গিয়ে থাকবে। মেয়েদের কৌতূহল বোঝেন তো? চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। তরঙ্গ বলছিল চিঠিটা নাকি সাংঘাতিক। ওর মধ্যে একটা ছুরির হদিশ আছে।'

'চিঠিটা আছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ।' নিখিলেশ ধীরে ধীরে বলল, 'তরঙ্গ ওটা রাখতে দিয়েছিল আমাকে। আমি ফেলে রেখেছি বাক্সতে। ভেবেছিলাম ও চিঠিতে কি দরকার আমাদের। আমরা যখন চলেই যাব।'

'চিঠিটা নিয়ে আসুন তো।' রাজীব আদেশ করল।

বাক্স খুলে চিঠিটা বের করে আনল নিখিলেশ।

কয়েক লাইন পড়েই বিস্ময়কর অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল রাজীবের মুখ থেকে। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, 'এ চিঠির খবর তরঙ্গ আর কাউকে বলেছিল জানেন?'

নিখিলেশ মাথা নাড়ল। অর্থ, এটা তার অজ্ঞাত।

চিঠিটা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রাখল রাজীব। বলল, 'এর গল্প আর কারো কাছে করবেন না। চলুন, এবার আমি উঠব। কিন্তু তার আগে আপনার বন্ধুর ঘরটা একবার দেখে যেতে চাই।'

'ওর অনুপস্থিতিতে সেটা কি ঠিক হবে?'

রাজীব হাসল।—'আমাকে সি আই ডি বলে মনে করছেন কেন? একজন বন্ধু বলে ধরে নিন। আমরা তো শুধু ঘরটা দেখব-মাত্র।'

শশাংকের ঘরটা অন্য ঘরেরই মত: আয়তনে বরং সামান্য ছোট হতে পারে। আগোছালো ঘর, বিছানার চাদরটা বেশ ময়লা, দেওয়ালের কোণে ঝুল, এক কোণে কয়েকটা কাগজপত্র জমে রয়েছে। ময়লা দু-তিনটে জামা-কাপড় একপাশে ডাঁই করে রাখা।

রাজীব হেসে বলল, 'আপনার বন্ধুর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। কি অবস্থা দেখেছেন ঘরের!'

নিখিলেশের মুখের দিকে চেয়ে রাজীব নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। বিয়ের কথা নিয়ে এত তাড়াতাড়ি কোনো রসিকতা করা উচিত হয় নি তার। তার সম্বন্ধে কি ভাবছে নিখিলেশ? কে জানে কি মনে করছে তাকে?

বাতিল করা কাগজপত্রের মধ্য থেকে একটা বলের মত পাকানো কাগজ তুলে নিল রাজীব। অনেকখানি কি সব লেখা রয়েছে ওতে। রাজীব বলল, 'আপনার বন্ধুর একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখছি। নিয়ে যাই, এক সময় বরং পড়ে দেখা যাবে।'

জীপে উঠে রাজীব সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল গাড়ীতে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিখিলেশের বাড়ীর সামনে গাড়ীর টায়ারের দাগ ছাড়া আর কোন পরিচয় রইল না পড়ে।

* * * * *

দিকনগর থানায় ফিরে রাজীব শুনল, সুব্রত বাড়ীতে গেছে। ঘড়িতে প্রায় দশটার মত। রাজীব টেলিফোনটা মুখের কাছে নিয়ে দিকনগর পেপার মিলকে চাইল।

নারীকণ্ঠে ঘোষণা হল, 'পেপার মিল।'

'কে, মিস দাস বলছেন?'

'আমি সুজাতা দাস। আপনি কাকে চান?'

নিজের পরিচয় বলল রাজীব।—'সি আই ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল।'

বিস্ময় প্রকাশ করে উত্তর এল, 'আপনি! এত রাত্রে? কি খবর বলুন?'

'খবর তো আপনার কাছেই শুনব আশা করছি। বলুন আপনি।'

'আমার কাছে?' এবার গলার স্বর ভিজে, ঠাণ্ডা মনে হল রাজীবের। থতমত ভঙ্গি। অনেকক্ষণ পরে উত্তর এল ভেসে, 'সরি। আমার কাছে কোন খবর নেই।'

একটু হেসে রাজীব টেলিফোনটা রেখে দিল।

(ক্রমশঃ)

'বিশ্ব সুন্দরী' সম্মানে ভূষিত হওয়ার পরের দিন সকালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিবাসিনী অষ্টাদশবর্ষীয়া লাইব্রেরিয়ান মিস পেনেলোপি প্লামার লন্ডন হোটেলে তাঁর ঘরে বিছানায় বসে প্রাতরাশ সেরে নিচ্ছেন।

জীবিকার মত এর কথা আমরা তেমন করে ভাবিনি এবং ভাববার অবসরও পাইনি।

আমরা রেডিওগ্রাফার। নিয়োগপত্রে অন্তত একথাটাই থাকে। কিন্তু সবাই আমাদের বলে এক্স-রে অ্যাসিস্টান্ট। অথচ প্লেট নেওয়া থেকে শুরু করে অনেক কিছুই আমাদের করতে হয়। সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে ডাক্তারবাবুর সামনে কেস তুলে ধরি। আসল ঝক্কিটা আমাদের উপর দিয়েই যায়। তবুও আমরা এক্স-রে অ্যাসিস্টান্ট।

নতুন চাকরি করতে এসে এই হোঁচট খাওয়াটা তিনি স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি। এতদিন যে ক্ষোভটা মনে মনে পুষে রেখেছিলেন আজ সেটা সুযোগ পেয়ে প্রকাশ হয়ে গেল। কারণ রেডিওগ্রাফার আর এক্স-রে অ্যাসিস্টান্টে তফাৎ যে অনেকখানি। আর নিয়োগপত্রের চুক্তিভঙ্গে কেই বা সুখী হতে পারে? কথাটা বলতে পেরে তিনি যেন স্বস্তি পেলেন।

কাজটা সম্বন্ধে আগে কোন ধারণাই ছিল না। চাকরি পেয়েছি এই আনন্দেই ডগমগ ছিলাম। সত্যি বলতে কি এরকম একটা জীবিকার কথা সেই প্রথম জানলাম। ভেবেছিলাম কি না কি হবে। কিন্তু এখন এক্স-রে যন্ত্রই ধ্যান-জ্ঞান। এই অল্প অবসরেই কাজটা আমার ভাল লেগে গ্যাছে। জোর করে ভাল লাগাতে হয়নি।

এরকম সহজ কথা সচরাচর শোনা যায় না। নিজের জীবিকা সম্বন্ধে সবাই অভিযোগের ঝড় তোলে। শুনে মনে হয় একমাত্র তার কাজ ছাড়া পৃথিবীর আর সব কাজ ভাল। জ্ঞান হওয়া থেকেই আমরা এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আসছি। প্রসঙ্গক্রমে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে পড়লো। কলেজে সিনিয়র কাউকে তাঁর নিজের সাবজেক্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেই সে হাহা করে উঠতো। প্রাণপনে নিজের সাবজেক্টকে খাটো করে অন্য সাবজেক্টের গুণগান করতো। কলেজ পেরিয়ে চাকরি করতে এসেও দেখি সেই একই অবস্থা। কেউ নিজের জীবিকাকে সুনজরে দেখছে না। একান্ত আকস্মিকভাবে নিজের চাকরি ভালো লাগার কথা শুনে কিরকম বিমূঢ় হয়ে গেলাম। সে ভাবটা চট করে কাটিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললাম।

চাকরিকে ভালবাসি। বাঁচার জন্যই চাকরি করতে আসা। সে কথাটাও মনে রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের জীবিকায় বলতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা নিয়েই আমরা কাজ করি। প্লেট নেওয়ার সময় এক্স-রে যন্ত্রের রশ্মিটা সরাসরি আমাদের উপরে এসে পড়ে। এর ফলে রক্তকোষে আঘাত। ক্রমাগত এরকম চলতে থাকলে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। অথচ শুনলে অবাক হবেন, এরকম একটা মারাত্মক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমরা 'হ্যাজার্ড অ্যালাউন্স' পাই না। তাই বলছিলাম বাঁচার জন্য চাকরি করতে এসে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আমাদের কিরকমভাবে ব্যাহত হয়।

ও'র মুখটা কিরকম করুণ মনে হলো। আমাকে কিন্তু ভাববার অবসর না দিয়ে তিনি বলে চলেছেন আরেক কথা। বাঁচার কথা। এবার তাঁর চোখ-মুখ দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসে ভরা।

এ থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও আছে। প্লেট নেবার সময় আমাদের লেড অ্যাপ্রোন ব্যবহার করার কথা। কিন্তু বিরাট ভারী সেই অ্যাপ্রোন গায়ে চাপিয়ে কাজ করার কথা ভাবতেই পারি না। এছাড়া আরও একটা পথ আছে। আর আমার মনে হয়, সেটাই সবসেরা পথ।

অনুসন্ধিৎসু চোখে তাঁর দিকে তাকাই।

এক্স-রে যন্ত্রের একদিকে যদি লেড ওয়াল করে দেওয়া যায় তবে সেটাই হবে আমাদের অহেতুক ঝুঁকি থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। এতে প্লেট নেওয়ার কোন অসুবিধা হয় না। শুধুমাত্র রশ্মিটা আমাদের গায়ের উপর আছড়ে পড়তে পায় না। আমরা রোগীকে দেখতে পাই ঠিকই। এরকম ব্যবস্থা চালু আছে কলকাতার প্রায় সব হাসপাতালেই। কিন্তু কলকাতাকেই তো সারা বাংলাদেশ ভেবে বসলে চলবে না। মফস্বলের কোন হাসপাতালেই এরকম বন্দোবস্ত নেই। ট্রান্সফারেবল সরকারী চাকরির দৌলতে কলকাতার বাইরে গেলেই যে কাউকে এরকম বিপদের সামনাসামনি পড়তে হবে।

আমাদের চোখ তো শুধু কলকাতায়ই আটকা। মফস্বলের কথা এমনিতেই ভাবি কম আর সে ভাবনা বিলাসেরই নামান্তর। চাকরি করতে এসে এ'র ভাবনার পরিধি কিন্তু একটি কেন্দ্রে নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি। কলকাতা এবং মফস্বলের কথা সবই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে ভাববার চেষ্টা করেছেন।

এক

আর একটা মজার কথা কি জানেন, আমরা কাজ করি টেকনিসিয়ানের অথচ এজন্য আমাদের কোন ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা নেই। কাজ করতে করতে সবকিছু আমাদের শিখে নিতে হয়। আমরা জেনেশুনে আসি না প্রায় কিছুই। সামান্য ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা আছে পি জি হাসপাতালে। তাও চাকরি পাওয়ার পর এবং নিতান্তই মর্জিমাফিক ট্রেণিংয়ে পাঠানো হয়। যাঁরা ট্রেণিং নিতে যান তাঁদের বণ্ড সই করতে হয় অথচ কোর্স শেষ হওয়ার পর তাঁরা কোন বেনিফিট পান না। এরচেয়ে মজার কথা আর কি হতে পারে?

নিজের রসিকতায় তিনি নিজেই হেসে ফেলেন। একটু মুচকি হেসে আমিও তাতে যোগ দেই। কিন্তু কাজের কথায় হাসি মিলিয়ে যেতে সময় লাগে না।

আমাদের প্রত্যেকেরই ট্রেণিংয়ের সুযোগ পাওয়া উচিত। সে কিন্তু এরকম ট্রেণিং নয়। এজন্য প্রয়োজন, ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন। কারণ রেডিও-ফিজিক্স থেকে শুরু করে কেমিস্ট্রি পর্যন্ত অনেক কিছুই আমাদের জানতে হয় কাজের প্রয়োজনে। অথচ আমরা তার কোন স্বীকৃতি পাই না। যদি ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন হয় তবে হাস-পাতালে হাসপাতালে সব শিক্ষিত রেডিও-গ্রাফার পাওয়া যাবে। সাধারণ লোকের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে না। পশ্চিম-বঙ্গ অনেক ব্যাপারে এগিয়ে থেকেও এক্ষেত্রে কিরকম পিছিয়ে আছে ভাবলে অবাক লাগে। মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে রেডিওগ্রাফারের ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। সেখানকার রেডিও-গ্রাফাররা তাঁদের শিক্ষার স্বীকৃতি পাচ্ছেন আর আমরা তাই দেখছি। একটা ভাল লাইব্রেরীও নেই যে বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করবো। একে ধরে তাকে বলে আর কাঁহাতক পারা যায় বলুন। ডিপ্লোমা কোর্সের ব্যবস্থা করলেই সব ঝঞ্চাট মিটে যায়।

টেকনিসিয়ানের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার স্বীকৃতি খুবই সঙ্গত। ও'র প্রতিটি কথায় যেন অজস্র আকাঙ্ক্ষা উপচে পড়ছে। স্বীকৃতি পেলে ও'দের পদমর্যাদাও যথাযথ গুরুত্ব পাবে।

আমাদের এই জীবিকায় মজা আরো অনেক আছে। সাধারণ লোক আমাদের সম্পর্কে নাও জানতে পারে কিন্তু রেডিও-গ্রাফার হিসেবে নিয়োগপত্র পাবার পর কাজটা যখন বেশ রপ্ত করে নিয়েছি তখনই হয়তো আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্টান্ট করে। আসলে যাঁরা আমাদের কাজ করাচ্ছেন তাঁদেরও এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই একজন রেডিওগ্রাফার থেকে একজনকে তাঁরা যে কোন পদে বদলি করতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, রেডিও-গ্রাফার যদি কোয়ালিফায়েড পোস্ট হতো তাহলে এরকম পদমর্যাদায় অদল-বদল হতো না।

তিনি একটু হাসলেন। হাসলে ও'কে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এরকম দোটানায় পড়ে বেচারী যে নাস্তানাবুদ সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটা কাজে লেগে থাকলে আর কিছু না হোক সেটা ভাল-ভাবে শেখা যায়। আর বিশেষ করে কাজটা যখন টেকনিসিয়ানের এবং শেখার অনেক কিছু আছে। যদিও এই সরকারী চাকরিতে টেনিসিয়ানের গুরুত্ব মানা হয়নি।

তিনটি গ্রেডে আমাদের চাকরি। সরকারী মতে দশ বছর অন্তর প্রমোশন হওয়ার কথা। এখানেও আবার একটু মজা আছে। প্রমোশনের অন্যতম শর্ত হলো উচ্চতর পদ শূন্য হওয়া এবং শূন্য হলে দু-এক বছর আগেও পদোন্নতি ঘটে। তবে আমার পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতায় এরকম সৌভাগ্য অপ্রত্যাশিত। তাই দশ বছরকেই আমরা ভাগ্যের চৌকাঠ পেরোনোর সময়সীমা বলে মেনে নিয়েছি। প্রমোশনের আশায় থেকে প্রায় হাঁপিয়ে পড়তে হয়। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।
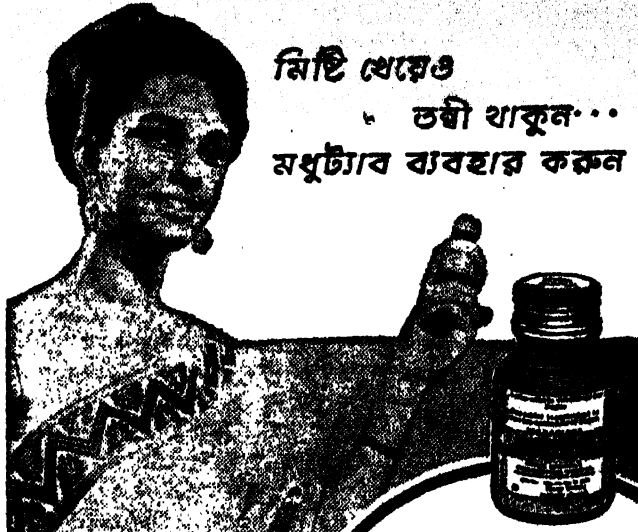
ও'র মুখে এখন আর হাসি নেই। মজার কথা বলতে বলতে সারা মুখমণ্ডল হঠাৎ যেন কিরকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে। চাকরিকে ভালবেসে চাকরির জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞতায় ও যেন কিরকম বুড়িয়ে গ্যাছে। বয়সের ভারটা দেহে নয় কথাবার্তায়। কাজের স্বীকৃতি নেই, আর্থিক স্বাচ্ছল্য নেই, এমন কি ঝুঁকির জন্য হ্যাজার্ড অ্যালাউন্স পর্যন্ত নেই, এসবের ভবিষ্যতের নিষ্করুণ ছবি কল্পনা করে ওর মুখের হাসি হয়তো শুকিয়ে যাচ্ছে।

তবু তো কথার ফাঁকে ও দু-একবার হাসবার চেষ্টা করেছিল। হাসি ফুটেও ছিল কিন্তু স্থায়ী হয়নি। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে বন্ধুর পথ যেন প্রতিমুহূর্তে ও'র হাসি লেপেমুছে নিতে চাইছে। তবু আকাঙ্ক্ষা ও'র চোখের কোন বেয়ে উঁকি মেরে যাচ্ছে। আর একটু ভরসা পেলেই যেন ওরা কথা করে উঠবে। কিন্তু সেই ভরসাটুকুই দেখা নেই। তাই এই মুহূর্তে ও'কে কিরকম করুণ দেখাচ্ছে। সামনে আদিগন্ত ভবিষ্যতের হাতছানি থাকলেও ক্লান্ত ও। চাকরি করতে এসে বাঁচার সম্ভাবনার ও হদিস পাচ্ছে না। এর চেয়ে বেদনা আর নেই। —প্রমীলা

প্রত্যেকেই একা

মানস রায়চৌধুরী

হাতে হাত দিয়ে বসে আছি নিশিদিন, প্রত্যেকেই একা।
কী আশ্চর্য অন্ধের মতই পাই স্পর্শাতুর আঙুলে পৃথিবী
প্রতি বৃক্ষ, নদীর তরঙ্গ, আর বিকেলের পথে পথে প্রতিটি পাথর
একা, একা। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে কি কখনো।
কোনোদিন বলবে যে এমন আপনার আর হবে না কেউ—
যদিও বন্ধুত্বভরা, গ্রন্থ আর ডায়েরীর পাতাভরা
সৌহার্দ্য-উত্তাপ জেগে আছে
তবু দেখি একা, একা, কুয়াশা ছড়ানো বুক,
হাতের মুঠোয় অন্ধ হাত।
যেন এই অপ্রবেশ্য সম্পর্কের ভাঁজে ভাঁজে
অন্ধকার কলোনী গড়েছে
সেখানে কথন নেই, মুখ চেপে জীবনের সারমর্ম বোঝা
এত নির্জনতা, এত লোকজন, একা, একা—
অথচ হাতের মধ্যে সমর্পিত হাত।

মনে হয়

তুলসী মুখোপাধ্যায়

মাঝে মাঝেই মনে হয়
কলকাতায় কয়েকহাজার বটগাছ থাকলে ভালো হত
চলতে চলতে হঠাৎ থেমে পড়ত ক্লান্ত পথচারী
গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আলাপ করত সুখ-দুঃখের
একটা গা-ঘেঁষা ভাবে জড়িয়ে থাকত কলকাতা!
মাঝে মাঝেই মনে হয়
কলকাতায় কয়েকহাজার বটগাছ থাকলে ভালো হত।

বদলে, সারাক্ষণ গনগনে হয়ে থাকে কলকাতা
যখন তখন দপ্ করে জ্বলে ওঠে আগুন
আর ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার হয়ে
দমকলবাহিনী ছুটে আসে যাত্রা-দলের বিবেকের মতো
অতএব ছায়া নেই—দুদণ্ড বসে থাকা নেই
পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা অব্দি নেই
কেবল ছুটে চলা—
বোমারু বিমানের মতো কেবল ছুটে চলা
আর পকেটমারের ভয়
ট্রাম-বাসে হেরে যাবার ভয়
হঠাৎ গরম হয়ে যাবার ভয়!

মাঝে মাঝেই মনে হয়
কলকাতায় কয়েকহাজার বটগাছ থাকলে ভালো হত।

[ভায়ী জেদী, সুন্দরী লীলাকে ভাসিয়ে নিল সুখেন। অহমেদ হল সত্যর সংসার। রূপপুরের মায়া কাটাল সত্যচরণ। ঘরে এল যমুনা। নববধূবতী। নতুন স্বপ্ন। যমুনা এবার অন্তঃসত্ত্বা। তবু বিয়ে করতে পারল না সত্যচরণ। লীলার সঙ্গে তার আগেই ডিভোর্স।

চোয়াড়ে সুখেনকে নিয়ে লীলার মনে তখন আরেক জগৎ। কিন্তু বাদ সাধল বিধাতা। জুয়া, মদ আর মেয়েছেলে নিয়ে সুখেনের রয়েছে দ্বিতীয় ভুবন। এক রাতে সে লীলাকে ফাঁকি দিল। শিবানীকে নিয়ে পালাল কলকাতায়।

সত্য পাগল হল। যমুনাও মারা গেল নার্সিংহোমে।

রমা লীলার প্রেসের প্রধান কর্মী। তার ভাই অহীনের সঙ্গে লীলার হালের দহরম-মহরম ভালো লাগে না। তবু লীলা প্রেস বাড়াতে চায়, নতুন বাড়ির খোঁজ করে। কেল্টুবাবুর বাড়িই সে কিনবে।]

॥ ৪৪ ॥

তারপর কিছুক্ষণ চারপাশের সাদা দেয়াল মসৃণ শিলিও ফুলগাছ সমেত বাড়িটা কাঁপানো জলের মত অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছিল। আর সেই অস্বচ্ছতার ভিতর ভাঙচুর প্রতিবিম্বের মত লোকটাকেও খুব অস্থির মনে হচ্ছিল। সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল লীলার দিকে। মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল। অসাধারণ ভব্যতায় মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে যেন অভিবাদন জানাল গৃহকর্ত্রীকে।

একটা ঘোরতর দুঃস্বপ্ন ছাড়া কী! প্রচণ্ড ভয়ে লীলার শরীর নীল হয়ে গেল। ছেলেবেলায় শোনা জুজু তাহলে আছে? নাকি রূপকথার রাক্কস এল! পৃথিবীতে সত্যিসত্যি কি রাজপুত্র আছে? সোনারুপোর জীয়নমরণকাঠি মাথায় আর পায়ে রাখা হতভাগিনীদের সব স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে বারবার। তাই নিজের জোরেই নিজে তৈরী হওয়া ভালো।

অবশেষে বাসিনী ডেকেছে। কিন্তু সে কী ডাক! বাঘিনীর মত রক্তকাঁপানো গর্জন। বাসিনী উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক কুমুদের মত আঙুল তুলে ডেকেছে, লীলারাণী!

লীলা ছুটে বাড়ির ভিতর ঢোকবার চেষ্টা করছিল। বাসিনী সামনে। ফের সে গর্জেছে, লীলারাণী, ইদিকে আয়।

পলকে সম্বিৎ ফিরে পেল লীলা। যেন রাজ্যের সব অধিকার ওরা জড়ো করে বড় গলায় হাঁকছে। ছোটলোকের মেয়ে বাসিনী—তার হাতে লীলার ইজ্জতও বুঝি খাঁচারপোরা পাখি। আর ওই উদ্ভট আগন্তুক। লীলা মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর হনহন করে ভিতরের বারান্দায় গেল। কর্কশকণ্ঠে ডাকল, ঘন্টা, ঘন্টা!

ঘন্টা নেই। তার প্রেসে থাকবার কথা। তাহলে!

সে হাঁফাতে হাঁফাতে ফের ডাকল, বাসিনী, শুনে যাও।

বাসিনী ততক্ষণে রণচণ্ডী। রাক্ষুসীর মত দাঁত ছরকুটে গেছে। ঠোঁটের দুপাশে পানের চাপচাপ লালা। প্রচণ্ডভাবে মুখ-নেড়ে পান চিবুতে চিবুতে তৈরী হচ্ছে!...লীলা, খবর্দার, যদি ভালো-মানুষের বেটি হোস্, যদি রূপপুরের কুমুর পেটে জন্মে থাকিস্, বাবা তোর এক। লীলারাণী, দেবতা তেত্রিশ কোটি—বিধেতাপুরুষ একজনাই। আর আকাশে সূর্যি—সেও এক বৈ দুই লয়, চন্দদেব—তিনিও একজনা...ওরে পোড়ারমুখী মনে কী ভেবেছিস তুই? কুমু নাই, আমি আছি। হুঁ বাবা, বাসিনী মরে নাই!...

লীলাও গলা চড়িয়ে ডাকল, বাসিনী।

বাসিনী একপা এগিয়ে মহাকালীর ভঙ্গীতে শূন্যে অদৃশ্য খড়্গ আস্ফালন করে পাল্টা চেঁচাল, আয়, ইদিকে আয়। ওনার পায়ে ধর, পায়ে মাথা কুটে ক্ষেমা-ভিক্ষে কর লীলা। নৈলে আজ রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। কেন্দে যে আইন-জজিয়তী, আস্তাকুঁড়ে ফেলে সে সব কাগজপত্তর। ইস্ কী আমার ছারকপালে গবরমেন্টো রে, কাগজে লেকে দিলেই হল? ডাক্ তোর শ্বশুর ভট্টাচার্জিকে—মুখে মারব ঝাঁটারবাড়ি।

লীলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওদিকে লোকটা হলুদ দাঁত বের করে হাসছে নিঃশব্দে। দৃশ্যটা উপভোগ করছে যেন।

বাসিনী তার পেটে গুঁতো মেরে বলল, হাঁ করে দেখছিস্ কী! ধর, ওকে একটুন ধর। হাওয়াগাড়ি ভাড়া করে পাঁপগাঁই নিয়ে পালা নিজের ঘরে। আ মরণ! কেন্ন হাসছে! মজা করে না দাঁড়ার মতন কিসেটা? বলদ, বলদ!...তারপর সে লীলার দিকে অগ্রসর হল। যেন চুলের ঝুঁটি ধরে মেয়েকে বরের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ি পাঠিয়ে দিতে আসছে সেকালের এক পাড়াগেঁয়ে মা।

তৎক্ষণাৎ লীলা সজোরে চড় মেরেছে বাসিনীর গালে। তারপর পিঠে একটা লাথিও।

বাসিনী বুড়ো হয়েছে। চড় খেয়ে মাথা ঘুরে উঠেছিল। তার ওপর লাথি। গাঁক করে ওঠার পর ভিরমি খেয়ে মত পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ওর ভাঙা-গলায় কান্না শোনা গেল। কুমুদিদির নাম ধরে সে কাঁদছিল। কাঁদছিল—যেন দমহারানো ভেঁপু।

ইত্যবসরে সত্য গলা ঝেড়ে শান্ত স্বরে ডেকেছে, লীলা।

বাসিনীর পড়ে যাওয়া এবং হঠাৎ কেঁদেওঠায় অপ্রস্তুত হয়েছিল লীলা। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। তখন সত্যর ডাক শুনে সে অসহায়ের মত উঠোনের ফুলগাছঘেরা বেড়ার খুঁটিটা লক্ষ্য করল। ওপড়ানো যাবে তো? আর, ঘন্টাটা কেন প্রেসে চলে গেল? সে ফিরলে তার সঙ্গে যাবার কথা ছিল যে।

সত্য ফের বলল, লীলা। আমি পাগলামি করার জন্যে তোমার এখানে আসিনি। ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি। আমি ভালো হয়ে গেছি। বিশ্বাস করো, যমুনা মরে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে।

লীলা মুখ নামাল। সে থরথর করে কাঁপছিল। কোথায় হারাল সব সাহস, হারাল চিৎকার করার মত গলার জোর, আশেপাশের বাড়িগুলো সব নিস্তব্ধ, বাইরে দু-একটা রিকশো পাঁই করে মিলিয়ে যাচ্ছে, কোন পথচারীও ই পথে!

সত্য বলল, যমুনার জন্যে এসেছি। যমুনা মারা গেছে। শুনেছ? এ শোনবারই কথা। যমুনার ছেলে আমার

সমস্যা। তাকে আর নার্সিংহোমে রাখতে চাচ্ছে না। তিন মাসের ছেলে—বেঁচে থাকতেই ও এসেছে। তুমি তাকে নেবে?...তোমার তো ছেলেপুলে নেই। নেবে তুমি? অনেক ঘুরেছি—কেউ জায়গা দিতে চায় না। দিদির কাছে গিয়েছিলাম, দিদি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

লীলা কঠোর স্বরে বলল, তুমি যাও। এক্ষুনি চলে যাও বলছি। তা না হলে সেদিনের মত...

সত্য নিঃশব্দে হাসল।...যাচ্ছে। আমি নিজের কথা ভাবিনে লীলা। ওকে তুমি রাখবে?...অবশ্যি শেষঅব্দি কোন অনাথ-আশ্রমেই দিতে হবে তাহলে। আমার পাপের বোঝা, আমিও বইতে পারছি না—আর, একটু হাঁফ ছাড়তে চাই লীলা।

বাসিনী গুনগুনানি থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, এই রইল তোমার পাপের সংসার, রইল তোমার সব—আম চললাম। কই, চল্‌ বাবা সত্যচরণ, কেউ নাই তোর—আমি আছি। চল্‌। ওর আশা আর করিসনে। পালা, এক্ষুনি পালা এ যেলাপুরী থেকে।

পরক্ষণে সত্যর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে রাস্তায় নামল। সত্যকে আর কথা বলবার অবকাশই দিল না সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল আচম্বিতে।

লীলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, সারাজীবনের সঙ্গী এই সংসার, এই সুখ-দুঃখে ভরা জীবনের গণ্ডী অক্লেশে মুহূর্তে ডিঙিয়ে চলে গেল বাসিনী। তার এত ঔদ্ধত্য এত সাহস এমন কণ্ঠস্বর—কোনদিন ভাবতে পারা যায়নি। যাকে ভেবেছিল মন্তের সূত্রে ক্রীতদাসী, তার সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা আশা করেনি।

সারা বাড়িটা নির্জীব হয়ে পড়েছে। রোদের রঙ বিবর্ণ দেখাচ্ছে। চারপাশে একটা ধূসরতা জমিয়েছে কখন। আর কী শীত, কী শীত। মাথাটা দুহাতে ধরে বসে রইল লীলা। বিছানায় উবুড় হয়ে পড়ল। নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। বাইরে হাট করে দরজা খোলা। বাইরের দুরন্ত হাওয়া এসে খোলা দরজা পেরিয়ে উঠোনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ফুলের ঝোপ নাড়া দিচ্ছে। সব স্তব্ধতা কাঁপিয়ে শুধু ওই উত্তুরে-হাওয়ার দাপাদাপি।

কতক্ষণ এভাবে পড়েছিল, তারপর অহীন এসে ডেকেছে। লীলা উঠে বসল। চোখ মুছে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এস।

অহীন একটুখানি চুপ করে থাকার পর বলল, তোর অকস্মাৎ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কী?

লীলার বেশবাস বিশৃঙ্খল, সারা মুখে একটা অপরিচ্ছন্ন আভা, আর বাড়ির দরজা হাট করে খোলা—অহীনের এইসব বৈলক্ষণ্য চোখে পড়বারই কথা। লীলা পা গুটিয়ে বসল বটে—বুকের একটা পাশ ঢাকা উচিত ছিল, সেটা অজান্তিতেই। চুল খোঁপা খুলে এলোমেলো হয়েছে। কপালের আধেকটা ঢেকেছে।

দেখে ফের অহীন ঠাট্টা করে বলল, একেবারে বিষাদের প্রতিমূর্তি যে! এদিকে বাড়ি একদম ফাঁকা......

লীলা খাটের কোনায় মুঠো রেখে চিবুক ঘষতে ঘষতে জানালার বাইরে তাকিয়ে জবাব দিল, বাসিনী চলে গেছে।

চলে গেছে মানে?

আর আসবে না।

কেন? কোথায় গেল সে? দেশে?

কী জানি! লীলা মুখ না ফিরিয়ে শুধু চোখের দৃষ্টিটা এদিকে রাখল।...আচ্ছা অহীন, এই যে সব আইন-টাইন করা হয়েছে, এত কোর্টকাছারি, এসব কি শুধু লোকদেখানো ভড়ং? কোন মূল্য নেই?

তা কেন হবে? অহীন অবাক হল।...কী বলছেন, বুঝতে পারছিনে কিছু!

লীলা শুধু চোখের তারায় হাসবার চেষ্টা করছিল। সে-হাসির চেষ্টাও বেশ করুণ দেখায়। বলল, তা যদি না হবে, তাহলে......

তাহলে কী?

তাহলে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছিনে কেন? কেন দিনরাত্তির বুকে ভয় পুষে বেড়াচ্ছি, কেন সব সময় মনে হয়, হঠাৎ আমাকে কখন ধরে ফেলবে—তারপর...

হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁপছিল লীলা। হাঁফাচ্ছিল। অহীন একটু ঝুঁকে বলল, বুঝিয়ে বলবেন, না প্রলাপ বকবেন?

আমার অনেক কথা তোমাকে বলেছি, কিন্তু আসল কথাটা বলিনি। আমি...আমি খুব ভীতু, ভীষণ ভীতু আসলে। সব জোর আমার লোকদেখানো।...বিড়বিড় করতে থাকল লীলা। শোকার্তার মত অসংলগ্ন তার কথাবার্তা।...আর কেউ নেই আমার। এত একা, এত একা হয়ে গেছি ভাই।

অহীন তার একটা হাত মুঠোয় ধরে পাশে বসল। বলল, দেখুন লীলাদি, যে যাই ভাবুক, আপনি আমার দিদির মত। আপনিও আমায় ছোটভাইয়ের মত স্নেহ করেন। আমাকে সব খুলে বলতে এত দ্বিধা কেন বলুন তো?

লীলা মুখ তুলে বলল, আজ আবার ও এসেছিল।

কে?

সেই লোকটা।

এবার হো-হো করে হেসে উঠল অহীন।...আরে কী মুসকিল, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি—বেশ কিছুদিন আগে আমি আর [illegible] পথে দাঁড়িয়ে আছি, একটা পাগলা লোককে ছুটে এসে [illegible] হাত ধরে বলতে শুরু করেছে—[illegible], ওরা আমাকে [illegible] ধরেছে। [illegible] কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ [illegible] এক বিকট আর্তনাদ করে লোকে পালাল। [illegible] বলল, [illegible]। কী আশ্চর্য কাণ্ড! [illegible] তো আপনি বল-ছিলেন, একদিন নাকি আপনাকেও [illegible] করছিল। [illegible] ভাগিয়ে দেয়। আজ আবার এসে পাগলামি করছিল বুঝি? থানায় জানিয়ে দিন না, পাগলামি ঠাণ্ডা করে দেবে।

লীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, ও আর পাগল নয়। তাই আমার বড় ভয় করছে। হয়ত আবার আসবে।

তাই নাকি?

আজ এসেছিল—ওর ছেলেকে আমার কাছে নাকি রাখতে চায়।

ওর ছেলে—মানে, সেই যে মেয়েটি...

হ্যাঁ। মেয়েটি নাকি মারা গেছে। ছেলে নার্সিংহোমে আছে।

আপনি রাখতে চাইলেন না?

না।

যান, আপনি ভীষণ নিষ্ঠুর মেয়ে।

ও-কথা থাক। লীলা ততক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে ফের বলল, ও কথা থাক অহীন।

বাসিনী তাহলে ওর সঙ্গে গেছে? বাঃ চমৎকার তো! তাহলে আপনার আর ভয় কী, ছেড়ে দিন ও-কথা। এখন একটা কথার জবাব দিন তো?

কী কথা?

আচ্ছা পরে হবে। কিন্তু খাওয়াদাওয়া হয়নি এখনও—সে তো বুঝতেই পারছি। খাবেন, চলুন। অহীন উঠে দাঁড়াল।

তুমি কোথায় যাচ্ছো?

রান্নাঘরে, দেখি, বাসিনী কী সব রান্না-বান্না করে রেখেছে। চলুন, আমিই আজ গৃহকর্ত্রীর মত সামনে বসিয়ে খাওয়াব। হাত-পাখা ঘোরাব...সরি, এখন শীতকাল যে।

হাসতে হাসতে অহীন সত্যি রান্নাঘরের দিকে এগোল। লীলাও উঠল। আসে। সত্যিই অহীন......

নাঃ, আহারে রুচি নেই। সব খিদে উবে গেছে। লীলা উঠোনে নেমে বলল, অহীন, পাগলামি করো না। খিদে পেলে সে দেখব'খন। তুমি শীগগির একবার প্রেসে গিয়ে ষণ্টাকে পাঠিয়ে দাও। এক্ষুনি। বলবে, রিকশো করে চলে আসে যেন।

অহীন রান্নাঘরের ভিতর চিৎকার করছিল, আরে বা বা, তোফা! ইলিশ মৎস্য যে! ও লীলাদি, কী সর্বনাশ, মাছ কি এখন জ্যান্ত আছে? তাহলে লাফাচ্ছে কেন? হায় বাসিনী, তুমি এ কী করলে!

খাওয়াদাওয়া হল না শেষ অব্দি। রান্নাঘরের দরজার দুজনে [illegible] চলেছে, এমন সময় রমা হাজির। থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। তারপর ফিরে চলে যাচ্ছিল কিংবা সেইরকম তার পদক্ষেপ, অহীন চেঁচিয়ে ডাকল, বড়দি, তোর বল কিছুতেই পাতে বসতে চায় না। এদিকে এসে একটু ম্যানেজ করে দে তো। আমি ততক্ষণে চট্‌ করে প্রেস থেকে আসছি।

রমা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, প্রেসে আবার কী? আমি তো আসছি ওখান থেকে।

ষণ্টাকে ডাকতে বলেছেন যে।

ষণ্টা প্রেসে নেই।

লীলা উদ্বিগ্নমুখে দ্রুত এগোল রমার সঙ্গে। রমা জানাল, ষণ্টা বাসিনী আর সত্যবাবুর সঙ্গে চলে গেছে। ষণ্টা বলে গেছে, তার কিছু জিনিসপত্তর এখানে রইল। পরে একদিন এসে নিয়ে যাবে।

নাগিনী তাকে ছাড়ল না—কী আর করা যায়।

অহীন গম্ভীরমুখে মন্তব্য করল, বেশ জমটা গেল তাহলে। অনন্তভ মাটক!

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইল বাইরের ঘরে। লীলার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে রমা দুজনে কোন কথা বলতে উৎসাহ পাচ্ছিল না। লীলার ওপর এই দিনটা যা গেছে—বন্যা নয়, ঝড়ই। এ-বাড়িতে লীলাকে এখন একা থাকতে হবে—এটাই একটা ভয়ঙ্কর সত্য। অমানুষিকও। অহীন বা রমা দুজনেই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল লীলাকে। মাঝে মাঝে বড় রহস্যময়ী মনে হয় ওকে। আবার কখনও এত অসহায় লাগে যে সত্যি সত্যি ওদের দুঃখ হয়, সমবেদনা অনুভব করে। এখন ওরা জানতে চাচ্ছিল, লীলার মনোবল কতখানি টিকে আছে। সেও হঠাৎ সব ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে যাবে না তো? গেলে, রমার ভাগ্যে কী হবে কে জানে। প্রেস তো আর সে কিনে নিতে পারছে না। অন্য কেউ কিনলে তাকে রাখবে কিনা—সেও ভাবনার কথা।

সুতরাং এক সময় রমা একটু কেসে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে উঠল, লীলাদি, কী ভাবছেন! বরং প্রেসে চলুন। রাজ্যের কাজ জমে গেছে। আপনি তো প্রুফ দেখতে শিখেছেন। চলুন তো, দুজনে ওই নিয়ে বসি।

লীলা মুখ তুলল মাত্র। কোন জবাব দিল না।

অহীন বলল, তোদের প্রুফরীডার নেই?

রমা জবাব দিল, নাঃ। সুখেনবাবু যদ্দিন ছিলেন, নিজেই দেখতেন। তারপর আমি।

আমায় রাখবি?

রমা হাসল।...আমি কী জানি? আমার বসকে জিগ্যেস কর।

লীলাদি, রাখবেন? প্রুফ দেখতে আমি অল্প অল্প জানি।

লীলা বলল, আমাকে কিছু জিগ্যেস করো না ভাই। ওসব রমার কাজ। যা ভালো বোঝে, করবে। আমার বড্ড মাথা ধরেছে। কিছু ভালো লাগছে না।

অহীন উঠল।...দিদি, তুই তো এখন প্রেসে যাবি। আমি এঁর কাছে থাকছি। তুই এলে আমার ছুটি।

রমা কটমট করে তাকিয়ে বলল, না। তুই প্রেসে যা। নটা অব্দি থাকবি। তারপর বাড়ি ফিরে যাস। চাবি কানাইয়ের কাছে থাকে। চিঠি লিখে দিচ্ছি, আজ থেকে চাবি তোকেই দেবে। কিন্তু সকাল নটার মধ্যে দরজা খুলে দেওয়া চাই ওদের।...রমা ব্যাগ খুলে একটা স্লিপ বের করে লিখতে থাকল।

অহীন বলল, তুই?

আমি এখানেই থাকব। এই নে চিঠি।

তোরা দুজন মেয়ে—একা-একা থাকবি? ভয় করবে না?

কিসের ভয়?

রাক্ষসের।

রমা চড় তুলতেই হাসতে হাসতে অহীন বেরিয়ে গেল। লীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, ওঘরে যাই রমা। আমার বড্ড শীত করছে।

বাইরে বিকেল। রোদের রঙ ময়দানের ঘাস থেকে একটু করে মুছে যাচ্ছে। দূরে কাশিমবাজার মিলের চিমনিটা আকাশের ধূসরতায় মিশে যাচ্ছে ক্রমশ। বাইরে শুধু একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে যেন। হাত ধরাধরি শিশু-নারী ও পুরুষেরা বেড়াতে বেরিয়েছে। কোথাও খেলার ছুটোছুটি। শীতের বিকেলে শহরের কেউ আর ঘরে নেই। শেষ রোদ গায়ে নিতে সবাই মাঠের দিকে চলে এসেছে। কেবল ওপাশের খৃস্টান কবরখানার দীর্ঘ প্রাচীন অশ্বত্থ আমলকী আবলুস গাছের পাতায় হলুদ রঙ—পাতাঝরা দুরন্ত হাওয়া থামলে গাছগুলোকে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছিল। আর তাদের চারপাশ ঘিরে নীল কিংবা ধূসর কুয়াশা জমে উঠছিল। জানালার সামনে রমা—বিছানায় লীলা শুয়ে আছে, তার কপালে রমার হাত।

অহীন সামনে থাকলে নির্ঘাৎ বলত, মসের মাথায় হাত দিলে সর্বনাশ হয়—হাতটা নীচেই দে।...অবশ্যি রমা আজকাল যত খোসামুদেই হোক, অতটা নীচে নামতে পারবে না। এটা তার সত্যি সত্যি একটা সমবেদনা—মেয়েদের প্রতি মেয়েদের স্বভাবসুলভ দরদ। তাছাড়া আর কী?

একটু পরে আলো জেলে দিল রমা। তারপর বলল, এখন কেমন বোধ করছেন?

সেকথার জবাব না দিয়ে লীলা বালিশের নীচে হাতড়ে একগোছা চাবি বের করল। চাবিটা রমাকে দিয়ে বলল, ওই নীচের বাকশোটা খোল তো।

এক কোণে গুটিকয় সেকেলে বাকশো পরপর সাজানো রয়েছে। সবগুলোই রঙীন ঢাকনাপরা। বেশ ভারি বাকসোগুলো। নামাতে হাঁপানি ওঠে। নীচেরটা খুলে রমা বলল, তারপর?

ভিতরে ঠাসা কাপড়চোপড়। সবই সেকেলে ফ্যাসানের। চওড়া নকসীপাড় রঙীন সিল্কের শাড়ি। কিছু জর্জেটের। কিছু জমজমাট ফুলতোলা লম্বাহাতা ব্লাউস—আরও সব টুকিটাকি। লীলা বলল, একেবারে নীচে একটা টিনের স্যুটকেস আছে। পেয়েছ?

রঙচটা মরচেধরা স্যুটকেসটা তুলে এনে রমা বলল, কী আছে? বেশ ভারি তো।

গয়না। আমার মায়ের।

কী হবে?

নিয়ে এসো। কাজ আছে। আর, জানালাগুলো বন্ধ করে দাও। শীত করছে।

বিছানায় নিয়ে গিয়ে স্যুটকেসটা খুলতেই রমা অবাক হয়ে গেল। ঠাসা একরাশ গয়না—গয়না নয়, অজস্র ভাঙাচোরা টুকরো, কিন্তু আস্ত সোনার খাঁটি। লীলা বলল, এর মধ্যে অনেকখানি গয়নাও অনেক আছে।

শেষঅব্দি সেকালের ফ্যাসানের কথাই মাথায় এল রমার। কী ভারি গয়না পরত মেয়েরা! কোন মানে হয় না।

কিন্তু একটা মানে হয়।

ফেলটুবাবুর ওই বাড়িটা কেনা যায়। চারশো ভরি সোনা নিয়ে যে মেয়ে নির্বিবাদে রাত কাটাচ্ছে এই নিরিবিলি এলাকায়, তার সাহসেরও পরিমাপ করা যায় বৈকি। দুরুদুরু বুকে রমা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল সোনার দিকে। অবশ্যি না বলে দিলে সে চিনে উঠতে পারত না। আজকাল নকল সোনায় বাজার আর শরীর অলঙ্কৃত।

অনেকটা রাত্রে দুজনে মুখোমুখি বসে লুচি তৈরী করল। বেগুন ভাজল। দিনের রান্না ফেলে দিতেই হল। অহীন বলেনি, বেড়াল ইলিশ মাছের নিকেশ করেছে। দরজার খিলকপাট একেবারে বন্ধ। ঘরে সোনা আছে জেনেই রমা এতদিন পরে শহরটাকে ভয়ের চোখে দেখছিল।

তারপর একই বিছানায় শুয়েছে দুটিতে। একই লেপের তলে। জানালায় খুটখুট শব্দ হতেই রমা কাঠ। লীলা একটু হেসে সাড়া দিয়েছে, অহীন নাকি?

অহীনই। টিকে আছে কিনা দেখতে এসেছিল। বলে গেল, কোনসব স্যাঙাতদের

বলা আছে, এদিকে লক্ষ্য রাখবে। তবে পাগল-টাগল দেখলে তারা কিছু বলবে না।

লীলা রসিকতাটা গায়ে মাখেনি।

রমা কিন্তু ঘুমোতে পারেনি সারাটি রাত। সোনার জল—তার ওপর বারবার ঘুমের ঘোরে লীলার ককিয়ে ওঠা—কখনও দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরা—এমনকি গায়ে পা তুলে দেওয়া...কী বিচ্ছিরি শোওয়া এই ভদ্রমহিলার! স্বামী বেচারার ঘুম প্রাণান্ত হত! আর কি তাইতেই পুরুষের মত সুখ। রমার ভাগ্যে ইচ্ছে করে। আঃ, তেইশটি বছর কাটিয়ে এমনি জাগন্ত রাত্রে এত দুঃসহ হয়ে ওঠে। পুরুষের ভালোবাসা কী, রমা জানে না। ভালবাসার দিকে মনই ছিল না। মন ছিল বাঁধা সংসারের চাকায়। কবে স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছে, মনেই পড়ে না। মা বরাবরই অসুস্থ। বাবার চাকরীও তেমন সুবিধের নয়। কত ভাবনা ছিল মাথায়। চাকরীর জন্যে ছুটোছুটি করেছে। মেলেনি। আসলে রমা নাকি দেখতে সুশ্রী নয়। একটা অসংগত-রকমের পুরুষালি তার শরীরে—চেহারায়, চালচলনে ছন্দোবন্ধ। অহীন—অহীনও টাকা চেয়ে না পেলে কুৎসিত ঠাট্টা করেছে—তোর মত খেঁদিপেঁচীর কাছে হাত পেতেছি, এই তোর সৌভাগ্য। রমার নাকটা বড় বিশ্রী-গড়নের। রমা জানে। খারাপ লাগে বলে আয়না না দেখে চুল আঁচড়ায়।

টেবিল-ল্যাম্পটা সারারাত জ্বলেছে। সে-আলোয় লীলার ঘুমন্ত মুখ দেখে সে এতদিন পরে যেন প্রথম ঈর্ষা অনুভব করতে শিখছিল। কত কী হারিয়ে যায় অগোচরে! 'আপনি কী হারাইতেছেন, তাহা জানেন না!' সত্যি!...

সাতসকালে ফেল্টুবাবু হাজির। ভরা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রমাই গেল দরজা খুলতে। কাপটা নিজেরই। কিন্তু ফেল্টু-বাবু উল্টো বুঝে সেটা হাতস্থ করে এক-গাল হাসলেন—স্প্লেন্ডিড ওয়েলকাম। ভেরি ভেরি হ্যাপি রমা। আর ইউ গণকঠাকুরাণী? আমি যে চা না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি—তাও টের পেয়ে বসে আছ দেখছি!

রমা একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল। সে ভেবে-ছিল, অহীন। যাই হোক, বসবার ঘরের দরজা খুলে ফেল্টুবাবুকে বসতে বলে চলে এল সে। দুএকটা চুমুকও দিয়েছে ইতিমধ্যে—সেকথা আর বলা যায় কোনমুখে?

একটু পরেই লীলা এসে দেখা করল। কোণের দিকে বসে সে মৃদুকন্ঠে বলল, বাড়িটা কিনে নেব ভেবেছি। দরদামের কথা জিগ্যেস করতে অবশ্যি সাহস হয়নি। এখন আপনি যদি...

সে হচ্ছে। হাত তুলে থামাল ফেল্টু-বাবু।... আমি এলাম, মানে জাস্ট একটু-খানি আড্ডা দেওয়া আর কী? ওঃ, সুখেনের কাছে আপনার কত কথাই যে শুনেছি। কতবার ভেবেছি—যাই নিজেই যেচে গিয়ে আলাপ করে আসি। পারিনি। কারণ কী জানেন? ওই সুখোটাকে ভীষণ ভয় করতুম। ও একটা ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। ও সব করতে পারে। তবে ওই যে বলেছি, জগার হাতে ওর রেহাই নেই। অপেক্ষা করুন, কীচকবধের দেরী নেই।

হো হো করে হাসতে লাগল ফেল্টু-বাবু। ধুসর কটস্উলের পাঞ্জাবি—খোলা বোতাম, গলার নীচে সোনার চেনটা চকচক করছে। মাঝে মাঝে আঙুলে জড়িয়ে একটু টেনে আনছে। মাথার পুরু ঘন-ঘন লাল মাফলার পাগড়ির মত জড়ানো। সাদা পাজামার তলায় হরিণের চামড়ার চটি। হাতে কালো ছড়ি। কড়ে আঙুলে একটা মোটা পলাবসানো চাঁদির আংটি। বেশ মেজাজী চেহারায় বসে রয়েছে। বিস্কুটরঙা আলোয়ান কোমরে পেঁচানো—লীলা মুর্শিদাবাদ... থাকতে বাসায় বসা একটা ট্যাঁমকোনা পাখি দেখেছিল—তেমনি দেখাচ্ছে ফেল্টু-বাবুকে।

আর স্বীকার করতে হয় ভদ্রলোকের চেহারা সুন্দর। উজ্জ্বল গৌর রঙ কিছুটা নিষ্প্রভ—হয়ত শীতে, হয়ত অত্যাচারের মালিন্যে। চোখের নীচে খয়েরী ছোপ। তাহলেও পুরুষোচিত। বরং রাজোচিত বলাই শোভন। মাতাল না হলে এইসব পুরুষ জীবনে অনেককিছুই করতে পারত।

আপনার খারাপ লাগছে না তো? ফেল্টু-বাবু চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে ফের বলল।...সাতসকালে এসে জ্বালাতন করছি বুঝি?

লীলা আঙুলে আঙুল জড়িয়ে সলজ্জ হেসে বলল, তা কেন? আজ আবার আপনার কাছে যেতাম।

আমার সৌভাগ্য। তবে কী জানেন, ও নরকে আপনার না যাওয়াই ভালো। বরং মাঝে মাঝে আমিই আসব এখানে।

লীলা কথাটা স্পষ্ট করে দিল।... বাড়ির ব্যাপারেই যেতাম। খুব শীগ্গির হলেই ভালো হয়।

বাড়ি উঠে পালাচ্ছে না আপনার সুখেনের মত। সে হবে'খন। ফেল্টুবাবু বলতে লাগল।...জানেন, ওই যে মেয়েটি নিয়ে সুখেন ভেগেছে, সে একটা ইয়ে। ও আপনি ভাববেন না। যেইসানকে তেইসান মিলে গেছে। এবার সুখেনের আর রেহাই নেই। শিবি ওকে ঠিক জায়গায় ঠুকে বসিয়ে দেবে। অবশ্যি যদি ইতিমধ্যে জগা একটা খুনখারাপী না করে বসে।

রমা ওদিকে উনুনে আঁচ দিয়েছিল। এ বাড়ির সব দায় কাঁধে নেবার লক্ষণ তার আচরণে। এক ফাঁকে এসে লীলাকে বাঁচালে সে।...ফেল্টুদা, একটু উপকার করবেন?

চওড়া জানুতে চাপড় মেরে ফেল্টুবাবু বলল, আলবৎ করব। বলো, বাকের দুধ চাই?

না, মুলো।

মুলো? সে কী হবে? ফেল্টুবাবু আকাশ থেকে পড়ল।

মুলোর জাতে দেব!

তাই বলো। ফেল্টুবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

আর চাই পাকাপোক্ত বরবটি টমাটো। [illegible]!

আজকাল বাজারে গঙ্গার টাটকা ইলিশ উঠছে। না পেলে গঙ্গার ধারে বসে জেলেদের কাছেই পাবেন।

ফেল্টুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পকেটে হাত ভরে কাঁচুমাচু মুখে বলল, কিন্তু সঙ্গে টাকাকড়ি নেই যে!

আমি দিচ্ছি।

থলে?

তাও দিচ্ছি।

লীলা অবাক। হাঁ হাঁ করে উঠল সে ...আরে, ও কি রমা! সত্যিসত্যি ওঁকে বাজারে পাঠাচ্ছ যে।

রমা নির্বিকার মুখে বলল, অহীনের পাত্তা নেই এখনও। প্রেসে ছুটতে হবে একটু পরেই।

অহীনকে আসতে দাও।

ফেল্টুবাবু থলেটা হাতে নিয়ে বলল অহীন এখনও ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া ও যে একটা বাউণ্ডুলে। বাজার করার জানে কী? দেখুন না, বাজারশুদ্ধ নিয়ে পৌঁছচ্ছি রমা, অন্তত গোটা দশেক টাকা দিও কিন্তু

কী দিল রমাই জানে। পকেটে গুঁজে দিতেই ফেল্টুবাবু ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল লীলা গম্ভীরমুখে বলল, এটা কী হচ্ছে রমা?

রমা হাসল।...ফেল্টুদা এমনি মানুষ দেখবেন, খেতেও চাইবে।

সে কি!

হ্যাঁ।

তুমি ওঁকে খেতেও বলবে নাকি?

আপত্তি কী।

কী যে কর, বুঝিনে।

রমা শাসনের সুরে বলল, চুপচাপ বসে থাকুন তো। যা করার আমিই করব।

লীলা উঠল।...তাই কর। আমি একবার বেরোব।

কোথায় যাবেন আবার?

তোমাদের বাড়ি হয়ে অহীনকে নিয়ে যাব আঢ্যমশায়ের গদীতে।

গয়না বেচতে?

রমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। লীলা তার ঘরে চলে গেল উঠোনে নামবার সময় রমা মুখ ফিরিয়ে দেখল লীলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পড়েছে। চিরুনিতে তার হাত। রাতের বিরক্তিতে জ্বলে উঠতে গিয়ে সামলে নিল রমা। লীলার উদ্দেশ্যে বলল, শীগগির ফিরবেন। নৈলে আমার প্রেসে যাওয়া হবে না।

পুবের জানালা দিয়ে সকালের নরম রোদ লীলার গায়ে পড়েছে। অনেক দেখ-শুনের পর পরিচ্ছন্ন সতেজ গাছের মত উজ্জ্বল হয়েছে সে। বরং দেখতে ভালোই লাগল রমার। (ক্রমশঃ)

হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি, দিনে দুপুরে হাজার জোড়া অবাক-হওয়া চোখের সামনে আগেপিছে পুলিশ ভ্যানে যখন ছেলেটি উঠল, ততক্ষণে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের ছবি। কালো পিচ-ওঠা রাস্তা বেয়ে গাড়ি যাবে সোজা থানায়। তারপর অনেক টানা-পোড়েনের অন্ধকার রাত শেষে আবার যেদিন জনসূর্যের আলোয় এসে দাঁড়াবে খালি চোখে দেখা যাবে মাংসের দোকানের ছাল ছাড়ানো ছাগলের মত ছেলেটির গায়ে একটি ছাপ—[illegible] অথচ [illegible]ত। এর দেহে কোন রোগ সংক্রমণ হয়নি, অথচ একে জবাই করা হোল। অপরাধ? [illegible]রি, জালিয়াতি।

কিন্তু আড়াইশো টাকা মাইনের কেরানী বাপের [illegible] [illegible] সংসারে [illegible]খানেক টাকা বাড়তি সাহায্য করতে [illegible]ওয়া কি অপরাধ? বাবা একটু [illegible] [illegible]বেন, মায় মুখে হাসি ফুটবে, ভাই-[illegible] আবার স্কুলে পড়তে যাবে—এর [illegible] কিছু ভেবে চায়নি। স্কুলের [illegible] এক লাফেই পার হয়েছিল। ইচ্ছা ছিল [illegible]-বে-বাড়িগুলির দেওয়ালে, দরজায় থামে অসংখ্য লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রং ঝুলছে, তারই কোন একটার আশ্রয় নেবে—কিন্তু অনিবার্য কারণেই তা সম্ভব হয়নি। তাই সেই কারণটাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিল সে, বয়স তখন মাত্র ষোল।

খবরটা পেয়েছিল পাড়ার এক দাদার মুখে। কাজটা খুবই সোজা। বলতে গেলে কিছুই না। খাতা লিখতে হবে, মাঝে-মধ্যে মালিকের দু'-একটা ফাই-ফরমাস খাটতে হবে। টাইপ জানা থাকলে সুবিধে হয়। মাস গেলে কড়কড়ে একটা বড় পাত্তি। খবরটা যেদিন রাতে পেয়েছিল, তার চেয়ে দীর্ঘতর রাত জীবনে আর একবার শুধু এসেছে—গরাদ-দেওয়া দরজার আড়ালে [illegible] রাত।

পরদিন রাস্তায় [illegible] [illegible] অফিস-বাবুদের ভিড় [illegible] [illegible] [illegible] বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে। ঘণ্টাদুয়েক পাগলের [illegible] শুধু রাস্তার বাড়িগুলির নম্বর মেলানোর চেষ্টা করে যখন হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা, ঠিক তখনই হদিস মিলল।

ঠাণ্ডা অন্ধকার লম্বা করিডর পেরিয়ে সামনে এক চিলতে উঠোন। একপাশে ডাঁই করা শুকনো চামড়া, খড়, কাঠের বাক্স। পাশ দিয়ে নবাবী আমলের ইট বার করা সরু একমানুষে একটা সিঁড়ি। তাই বেয়ে দোতলায় ঢুকবার মুখেই কালোর উপর শাদা কালিতে লেখা পুরোনো একটা সাইন-বোর্ড—এ এইচ অ্যাণ্ড কোং, হাইড মার্চেন্ট,......বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট। দশ বাই বারো সাইজের কামরাটার ডানদিকে গদীর উপরে যিনি বসে তাঁর নামই দরজায় বিজ্ঞাপন হয়ে ঝুলছে। উল্টোদিকে একটা ছোট টেবিল। দুপাশে দুটি চেয়ার। খানকতক ফাইল, কাগজপত্র, গোটাকতক হাতল-ভাঙা-চেয়ার-মার্কা [illegible] ইতস্তত ঘরময় ছড়ানো। রেমিংটন সাহেবের কারিগরী বিদ্যার নমুনা [illegible] অবহেলায় [illegible] পড়ে রয়েছে।

[illegible] [illegible] [illegible] নিজে নিজের নাম, [illegible], [illegible] পড়ে গড় করে আটকে গেল। খানিকটা চুপ করে [illegible] হাইড মার্চেন্ট। তারপর [illegible] গলায় বললেন—

: কাজ ত' তেমন কিছু নয়। কিন্তু আপনি বড় [illegible]। বয়সটা কম

হওয়ার জন্য চাকরীটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে উঠল ছেলেটি—

ঃ চান্স দিয়ে দেখুন পারি কিনা?

মিনিট-দশেকের ইন্টারভ্যু। চাকরী সেদিনই হল। মুখের কথায় চাকরী। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের দরকার নেই। কাজ পেলেই মালিক খুশী। সন্ধ্যায় বাবা-মাকে খবরটা দিতেই খুশীর আনন্দে সারাটা বাড়ি মেতে উঠল। সেই রাতে ধার-করা টাকায় বছর-খানেকের মধ্যে প্রথম মাংস এনেছিলেন বাবা।

ছেলে এরপর থেকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন চামড়ার হিসাব রাখতে শুরু করল। ফার্স্ট গ্রেড, সেকেন্ড গ্রেড, থার্ড গ্রেড হাইড—টন টন চালান যাচ্ছে। চামড়ার গ্রেডেশন, প্রাইস, খদ্দেরের মেজাজ মর্জি ভাঙা রোমিওটেন সকাল-সন্ধ্যায় ঘণ্টাদশেক সাদা কাগজের গায়ে জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলেছে। চুক্তিপত্র তৈরী করা, খাতায় হিসাব লেখা, রেল-অফিসে হাজিরা দেওয়া থেকে শুরু করে সারাটা শহর দুবেলা চষে বেড়াতে হয়। যাতায়াত ভাড়া হাইড মার্চেন্টের। কি হপ্তায় মাল চালান যায় কোম্পানীর। কিন্তু কোম্পানীর গোডাউন যে কোথায় তার হদিশ মেলেনি কোনদিন।

ঐ পুরোনো বাড়িটার প্রতিটি দেওয়াল এক-একটা অফিস। হাজার অফিসওয়ালা বাড়িটার এক কোণে চামড়ার লেনদেন হয়। হপ্তায় হপ্তায় মাল চালান যায় কানপুর, বোম্বাই, আগ্রায়। মাঝে মাঝে কর্তাসাহেব খানকয়েক ছাপানো ফর্ম দিয়ে বলেন, সই করে দাও। নিজের নামটা সই করতে গিয়ে বুক কেঁপে ওঠে, ছাপার অক্ষরে লেখা আছে, বুকিং ক্লার্ক। ফরমের উপরে লেখা রেলওয়ে রিসিট। সই হয়ে গেলে আদর করে কখনো কখনো সাহেব গাল টিপে দিয়ে বলেন—বাচ্চু। চারশ' টন সেকেণ্ড গ্রেড হাইড আগ্রায় চালান দেওয়া হল, তারই সরকারী রসিদ। স্বাক্ষরকারী সাহেবের পেয়ারের বাচ্চু। এইভাবেই সকাল গড়িয়ে বিকেল, বিকেল ঘুরে সন্ধ্যা আবার রাত শেষে দিন হয়। একটি একটি দিন জুড়ে মাস। বারো মাসে বছর শেষ হল।

তারপর সেই দিন এল। সকালবেলায় সাহেবের কাছে একটি লোক এল। ফিস ফিস করে দুজনে কথা বলল। হঠাৎ সাহেব গদি ছেড়ে উঠে পড়লেন। খুব জরুরী কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হোচ্ছে, বাচ্চু যেন অফিস সামলায়—মেহমান আসতে পারেন। আজকাল প্রায়ই অতিথিদের আপ্যায়নের দায় বাচ্চুকে বহন করতে হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসে। মাল কেনাবেচা নিয়ে কথা হয়। দরদস্তুর, হিসাবকিতাব শেষে অর্ডার মেলে। মজার ব্যাপার, যাঁরা মাল কেনেন বা যার হয়ে বাচ্চু বিক্রী করে, কাউকেই কখনো সরেজমিনে জিনিসটা দেখতে বা দেখাতে কেউ দেখেনি।

দুপুরেই অতিথি এল। খাস সরকারী অতিথি। ঘণ্টাখানেক ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সাহেবের হালসাকিনের তালাস না পেয়ে বাচ্চুকেই তাঁরা ধরে নিয়ে গেলেন। অভিযোগ জালিয়াতির, চুরির।

কলকাতা, বোম্বাই, আগ্রা, কানপুর জুড়ে সাহেবদের ব্যবসার জাল ছড়ানো। রেলের গোপন সুড়ঙ্গপথ বেয়ে ফরম বেরিয়ে আসে। ভুয়া মালের হিসাব দেখিয়ে রেলের কাছ থেকে ডেমারেজ আদায়ের ব্যবসা। চারশ' টন ফার্স্ট গ্রেড হাইড চালান দেওয়া হল কানপুরে। চালানের নথিপত্র সব মজুত। কিন্তু যে মাল কখনো রেলগাড়ির দরজায় পৌঁছয়নি, তা কি করে রেল কোম্পানী কানপুরে সাহেবের কাউন্টারপার্টকে চালান দেবে। তাই ক্ষতিপূরণ মোটা টাকা বছর বছর গচ্চা যায় রেলের। জাল, জালিয়াতির কারবারে বেশ দুটো পয়সা সাহেবরা কামিয়ে নেন। সরকারী কর্তাদের টনক যখন নড়ে, ততদিনে চিড়িয়া উধাও। ধরা পড়ে বাচ্চুরা।

জ্যান্ত মানুষের চামড়া নিয়ে লেনদেন চলছে এই শহরে। ব্যবসাটা নিখুঁত। কারণ, কোন প্রমাণ নেই। ধরা পড়লেও ক্ষতি নেই —একশ, সোয়াশ' টাকায় সই মিলে যাবে। দরিদ্র এই শহরের দরিদ্র মানুষগুলো শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই জেনে-না-জেনে চোরাগোপ্তা পথের শিকারীদের শিকার হচ্ছে। ফাঁদা পাতা শহর জুড়ে—পালানোর পথ বন্ধ।

—সন্ধিৎসু

প্রফুল্ল রায়

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[ঠিক আঠাশ বছর আগের কথা। রাজদিয়ায় বেড়াতে এল কলকাতার ছেলে বিনু। সংগে মা-বাবা আর দুই দিদি। আশ্চর্য লাগল হেমনাথকে। কাঁধে তাঁর গোটা রাজদিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা। সাদাসিধে প্রাণবন্ত লারমোর সাহেবও কম আশ্চর্য নয় বিনুর চোখে। দাদু হেমনাথের বন্ধু লারমোর সেই যে কবে আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসেন পূব বাঙলায় আজ আর তা মনে পড়ে না।

বিনুকে অবাক করে দিল পূব বাঙলা। মুগ্ধ করল গ্রাম বাঙলার মানুষ। ভারি সহজ, সরল। এক ঝলকেই যুগলের সংগে জমল ভাব। অন্তরঙ্গতা।

প্রথম দিন। রাজদিয়া ঘুরে দেখল ওরা। নৌকোয় চেপেই পরদিন এল সুজনগঞ্জের হাটে। অদ্ভুত অনুভূতি। চারদিকে মুখের মেলা। লারমোর ঘুরে পয়সায় মুগী দেখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল। অথচ হেমনাথের দেখা নেই।]

।। পনের ।।
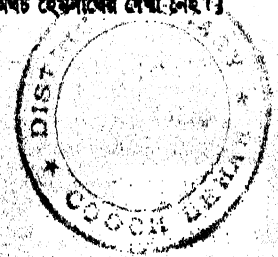
আগে আগে চলেছেন অবনীমোহন, পেছনে যুগল আর বিনু।

একটু পর তারা সেই পুরনো আধভাঙা মন্দিরটার সামনে এসে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের মন্দির যুগল?'

যুগল বলল, 'বিষহরির।'

বিনু বুঝতে পারে নি। সে তাড়াতাড়ি শুধলো, 'বিষহরি কী?'

'মা মনসা।' যুগল বলতে লাগল, 'আইতেন শাবণ (শ্রাবণ) মাসে, দেখতেন এইখানে পুজোর কি ধুম। রাইজ্যের (রাজ্যের) মানুষ ঐ সময়টায় পাথরের খাদাভরা (বাটিভর্তি) দুধ আর সবুরি কলা নিয়া ভাইঙ্গা পড়ে।'

মন্দিরের পর খানিকটা জঙ্গল মতন। ছোট বড় ক'টা তেঁতুল গাছ, কিছু আগাছা, কিছু বুনো কচু ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর থেকেই হাটের চালা শুরু হয়েছে।

আশ্বিন মাসের এই পড়ন্ত বেলায় যখন রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে আসছে, চারদিকের গাছগাছালির মাথায় সোনালী আভা লেগেছে—সেই সময় সুজনগঞ্জের হাট বেশ জমে উঠেছে। দরাদরি আর চেঁচামেচি-চিৎকারে চারদিক সরগরম।

বিনুরা এখন হাটের যে অংশে সেটা তরি-তরকারির বাজার। চারদিকে বড় বড় বেতের ধামা আর বাঁশের চাঙারিতে সজীব পরিপুষ্ট শাক এবং আনাজ সাজানো। ব্যাপারীরা সবাই চাষীশ্রেণীর মানুষ।

যেতে যেতে একটা ব্যাপারীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অবনীমোহন। বললেন, 'তোমার বেগুন কত করে?'

লোকটা বলল, 'দ্যাড় পহা স্যার (দেড় পয়সা সের)।'

অবনীমোহন অবাক, 'দেড় পয়সা!'

'হ। তয় (তবে) আপনে যদি এক পসারি কিনেন তিন পহায় (পয়সায়) দিয়া দিমু।'

'পাসারি কী?'

'আড়াই স্যার (সের)।'

'আড়াই সের বেগুন তিন পয়সা! বল কী!'

'দর নি বেশি কইলাম বাবু। তাইলে (তা হলে) এক পাসারি দুই পহাই (পয়সাই) দিয়েন (দেবেন)।'

'এত সস্তা!'

ব্যাপারী লোকটা মুসলমান। বিস্ময়-ভরা চোখে ভাল করে অবনীমোহনকে দেখে নিয়ে বলল, 'এরেই সস্তা কইলেন বাবু!'

অবনীমোহন হতবাক, 'সস্তা নয়?'

'উঁহু, গেল সন এই আশ্বিন মাসে পহায় (পয়সায়) দুই স্যার (সের) কইরা বাগুন (বেগুন) বেচাছি। আইজ হেই বাগুনের পাইকারি দর উঠছে পহা পহা স্যার (পয়সা পয়সা সের)। দিনকাল যে কী পড়ল! হাটখান ঘুইরা দ্যাখেন, জিনিস-পত্তরে আর হাত দ্যাওন (দেওয়া) যায় না। সগল কিছু আকুরা (আক্রা), একেরে (একেবারে) আগুন।'

অবনীমোহনের বিস্ময় বোধহয় শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁছেছিল। সেই সুরেই বললেন, 'গেল বছর পয়সায় দু সের বেগুন ছিল!'

'তয় আর কই কী?' ভাল করে অবনীমোহনকে আরেকবার দেখে নিয়ে বেগুন-ব্যাপারী বলল, 'বাবু নিশ্চয় এই-খানের মানুষ না?'

'না।'

'আমিও তাই ভাবছি। এইখানের হইলে পহায় দুই স্যার বাগুন শুইনা আটাশ যাইতেন না (অবাক হতেন না)। বাবু থাকেন কই (কোথায়)?'

'কলকাতায়।'

'কইলকাতার মাইনষের (মানুষের) কথাই ভিন।'

'কেন?'

'দশ পয়সা স্যার বাগুন হইলেও তাগো (তাদের) কাছে সস্তা। একেক পূজায় তেনারা কইলকাতার থনে (থেকে) আসে আর এইখানে জিনিসপত্তরের দাম চইড়া (চড়ে) যায়।' বলতে বলতে ব্যাপারী একটু থামল। তারপরেই কি ভেবে বলল, 'আইচ্ছা বাবু—'

'কী?'

'শুনছি কইলকাতায় নি পহা (পয়সা) দিয়া মাটি কিনতে হয়?'

হেসে অবনীমোহন মাথা নাড়লেন।

দু-ধারে হাটের চালা, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ। যেতে যেতে চোখের সামনে যা পড়ছে—মানকচু, মেটে আলু, পটল, শুকনো লঙ্কা, নতুন আউশ চাল, মিঠে কুমড়ো—সব কিছুর দর করছেন অবনীমোহন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে যেন মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উনিশ শ' চল্লিশ সালে চারদিকে যখন দুর্মূল্যের আঁচ লাগতে শুরু করেছে তখন কলকাতা থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে পূববাঙলার সজল শ্যামল ভুবনটিতে সমস্ত কিছুই আশ্চর্য রকমের সুলভ। এত প্রাচুর্য এমন সুলভতা আগে আর কখনও দেখেন নি অবনীমোহন। জীবনে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তাঁর।

এদিকে খিদেটা অনেকক্ষণ আগেই পেয়েছিল বিনুর। অবনীমোহনের পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে পেটের ভেতরটা জ্বালা করছে। আর চলতে পারছিল না সে। তাকে খাওয়ানো এবং হেমনাথকে খুঁজে বার করবার জন্যই লারমোরের কাছ থেকে উঠে এসেছিলেন অবনীমোহন। জিনিসপত্রের দর করতে করতে এমন মজা পেয়ে গেছেন যে সেকথা খুব সম্ভব আর মনে নেই তাঁর।

এক সময় বিন্দু আস্তে করে ডাকল, 'বাবা—'

অবনীমোহন যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পেছন ফিরে বললেন, 'কী রে?'

'খুব খিদে পেয়েছে।'

এবার মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। আমি একদম ভুলে গেছলাম।' বলেই যুগলের দিকে তাকালেন, 'মিষ্টির দোকান কোথায় রে?'

নদীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলল, 'উই দিকে—'

'নিয়ে চল তো।'

নদীর শিয়রে যেখানে মাঝিঘাটা, তার এক ধারে সারি সারি হোগলার ছাউনিতে অস্থায়ী মিষ্টির দোকান বসেছে। গামলা-ভর্তি ধবধবে রসগোল্লা, লম্বা লম্বা বাদামী চমচম, পাতক্ষীর আর মাথা-সন্দেশ সাজানো রয়েছে। প্রথম দিন পূর্ববঙ্গের মাটিতে পা দিয়ে রাজদিয়ার স্টিমারঘাটায় এই রকম মিষ্টির দোকান দেখেছিল বিনু।

কাছাকাছি আসতে চারদিক থেকে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'এইদিকে আসেন বাবু, এইদিকে—'

সামনে যে দোকানটা পাওয়া গেল, বিনুদের নিয়ে অবনীমোহন তাতেই ঢুকে পড়লেন।

দোকানী লোকটা মধ্যবয়সী। পরনে আধ ময়লা খাটো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা। চোখে-মুখে বিনীত ভঙ্গি। সে বলল, 'বসেন বাবুরা, বসেন—'

দোকানের ভেতরে দুখানা বেঞ্চি পাতা ছিল; অবনীমোহনরা বসলেন।

দোকানী এবার শুধলো, 'কী দিমু বাবু?'

অবনীমোহন বিনু-যুগলের দিকে তাকালেন, 'কী খাবি রে তোরা?'

বিনু কিছু বলবার আগেই যুগল তার কানে ফিসফিস করল, 'হমস্ত (সমস্ত) দিন রৈদে (রোদে) ঘুরাঘুরি গেছে ছুটোবাবু, রসগোল্লা-পানিতুয়া খাওনের (খাবার) আগে এট্টু মাঠা খাইয়া লন (নিন)।'

অবনীমোহন শুনে ফেলেছিলেন। বললেন, 'মাঠা কী?'

যুগল লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকল। বিনুকে বলেছে বটে, তার নিজের মনেও কি মাঠার জন্য একটু লোভ ছিল না?

যুগলের হয়ে দোকানীই যেন জবাব দিল, 'মাঠা হইল দইয়ের ঘোল।'

অবনীমোহন উৎসাহিত হলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আগে মাঠাই দাও—'

খুব ভাল করে তিনটে কাচের গেলাসে ধুয়ে ননীভরা সাদা ধবধবে ঘোলে পূর্ণ করল দোকানী। বিনুদের দিতে দিতে বলল, 'খান বাবুরা ; তারপর মাখম (মাখন) দিমু।'

ঘোলের গেলাস শূন্য হয়ে গেলে দোকানদার কলার পাতায় করে সবার হাতে এক দলা করে মাখন দিল।

অবনীমোহন বললেন, 'আবার মাখন কেন? মিষ্টিই তো খাব—'

'মাঠা আর মাখম আমরা একলগেই (একসঙ্গেই) দেই (দিই)। তার লেইগা ভিন্ন পয়সা লাগে না।'

মাঠা-মাখনের পর কিছু রসগোল্লা আর চমচম নিলেন অবনীমোহনরা। দু-একটা খাওয়া হলে দোকানী শুধলো, 'মিঠাই কেমুন খাইতে আছেন বাবু?'

অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার। তোমার দোকান কতদিনের?'

'অনেক বচ্ছরের। জ্ঞান হওয়া ইস্তক (জ্ঞান হওয়া থেকে) এই কাম্ই করতে আছি। এ আমাগো জাত-ব্যবসা।'

'সুজনগঞ্জের হাটেই দোকানদারি কর?'

'আইজ্ঞা না।' দোকানী হাসল, 'হপ্তায় তো এইখানে মোটে একদিন হাট। এক দিনের বিক্রিকিনিতে কি সংসার চলে বাবু'

'তবে?'

'আইজ সুজনগঞ্জ, কাইল গিরিগঞ্জ, এইভাবে হপ্তায় সগল দিনই কোনখানে না কোনখানে (কোথাও না কোথাও) হাট থাকে। রোজ একেকখানে (একেক জায়গায়) ঘুইরা দোকানপাতি করি।'

অবনীমোহন বললেন, 'এই সব মিষ্টি কোথায় তৈরি করেছ?' এখানে তো কোনরকম সরঞ্জাম দেখতে পাচ্ছি না।'

দোকানী বলল, 'মিঠাই বানাই বাড়িতে। হাটের থন (হাট থেকে) রাইতে বাড়ি গিয়া বানাইতে বসি। পরের দিন সকালে হেই সগল (সেই সব) নায়ে (নৌকো) তুইলা হাটে যাই।'

অবনীমোহনের মনে হল, এই সব প্রাচুর্যের দেশেও কারো কারো জীবনযাত্রা রীতিমত কণ্টকর। তিনি বললেন, 'দিন রাত্রি তোমাকে তো বেশ খাটতে হয়!'

'হ বাবু—' দোকানদার হাসল, 'না খাটলে চলব ক্যান?'

একটু চুপ করে থেকে অবনীমোহন বললেন, 'তা তো ঠিকই।'

খাওয়া হলে লারমোর আর হেমনাথের জন্য দুটো ছোট মাটির হাঁড়িতে মিষ্টি নিলেন অবনীমোহন। হাঁড়ি দুটো যুগলের হাতে দিয়ে দাম মিটিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আলাপ-টালাপ হল, তোমার নামটাই জানা হয় নি।'

দোকানী বলল, 'আমার নাম হার ঘোষ। হাটে আইলে (এলে) আমার দোকানে আবার আইসেন বাবু।'

'আসব।'

'নমস্কার বাবু—'

'নমস্কার।'

মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে নদী পাড় ধরে ধরে অবনীমোহনরা হাঁটতে লাগলেন। বিনু দেখতে পেল, হাট তলার সেই মাঝিঘাটায় আরো অসংখ্য নৌকো এসে জমেছে। নৌকোয় নৌকোয় নদী জল দেখা যাচ্ছে না। মাঝিঘাটার মাথার ওপর ঘরের রঙের চিল উড়ছে—ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে।

একটু পর নদীর পাড় থেকে হাটের ভেতর ঢুকে পড়ল সবাই। অবনীমোহন আবার দর শুরু করে দিলেন। যে জিনিস চোখের সামনে পড়ছে, ছেলেমানুষের মতন একবার হাতে তুলে দাম না করে দেওয়া চাই তাঁর।

আনন্দের স্রোতে লক্ষ্যহীনের মত কিছুক্ষণ ঘুরবার পর বিনু ডাকল, 'বাবা'

'কী রে?' অবনীমোহন অন্যমনস্কের মতন উত্তর দিলেন।

'বিকেল হয়ে গেল। দাদুকে খুঁজে বার করবে না?'

'তাই তো, চল-চল—' বলতে বলতে যুগলের দিকে ফিরলেন, 'হ্যাঁ রে যুগল, নিত্য দাসের দোকানটা কোন দিকে?'

'অহনই (এখনই) যাইবেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ এখনই।'

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে বিনুদের নদীর আরেক ধারে এসে পড়ল ল। এখানে সারি সারি ধান-চালের ত। সেগুলোর ছাউনি মজবুত। টিনের, ও টিনের, গায়ে শাল কাঠের শক্ত ান। রীতিমত স্থায়ী বন্দোবস্ত।

আড়তগুলো ঠিক নদীর ওপরে। তার তলাতেই বড় বড় হাজার মণী পাঁচশ' মহাজনী নৌকো অগণিত মাস্তুল শের দিকে খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখা গেল একটা আড়তের সামনে ামেলা খানিকটা জায়গা। সেখানে বড়- একখানা চেয়ারে বসে আছেন হেমনাথ তাঁকে ঘিরে অনেক মানুষ মাথায় ঘন হয়ে বসে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, লোকগুলো সুজনগঞ্জের দোকানী- আড়তদার। তাঁদের ভেতর গভীর কোন পরামর্শ চলছিল।

বিনু ছুটে হেমনাথের কাছে চলে গেল। এতক্ষণ বিনুদের কথা খুব সম্ভব খেয়ালই ছিল না। একটুক্ষণ অবাক থেকে তিনি বললেন, 'দাদাভাই, তুমি এখানে!' তারপরেই বুঝিবা সব মনে পড়ে গেল, 'যুগল কোথায়?'

বিনু দেখিয়ে দিল, 'ঐ তো—'

ঘাড় ফেরাতেই যুগলকে দেখতে পেলেন হেমনাথ। খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'এই হারামজাদা, হাটে আসতে এত দেরি করলি কেন? গিয়েছিলি কোথায়?'

ভয়ে ভয়ে যুগল বলল, 'ছুটোবাবুরে নিয়া আমি তো অনেকক্ষণ আইছি (এসেছি)।'

'অনেকক্ষণ এসেছিস তো, ছিলি কোথায়?'

কোথায় ছিল, যুগল বলল।

এবার অবনীমোহনের দিকে চোখ পড়ল হেমনাথের। বললেন, 'যুগল সত্যি কথা বলছে অবনী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে এলেন।
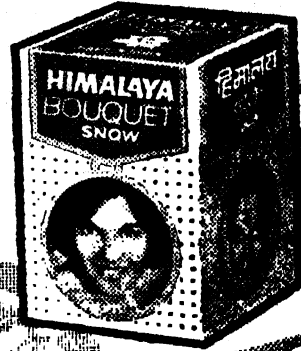
যে লোকগুলো হেমনাথকে ঘিরে বসে ছিল, অবনীমোহনদের দেখে তারা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। মুখে অবশ্য কিছু বলছে না, দৃষ্টি কিন্তু অত্যন্ত উৎসুক। হেমনাথ তাদের মনের কথা যেন পড়তে পারলেন। বললেন, 'এরা আমার জামাই আর নাতি। দিন-দুই হল কলকাতা থেকে এসেছে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে দুখানা চেয়ার এসে গেল। বিনু আর অবনীমোহন বসলেন। রাজদিয়ায় পা দেবার পর থেকে যে যত্ন যে সমাদর আর মর্যাদা পেয়ে আসছেন এখানেও তাই পেলেন অবনীমোহনরা। সেই এক মনোরম অভিজ্ঞতা।

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর হেমনাথ অবনীমোহনকে বললেন, 'তোমরা একটু বসো অবনী। এদের সঙ্গে একটা কথা হচ্ছিল, সেটা সেরে নিই।'

অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা—'

হেমনাথ এবার চারধারের লোকগুলোর দিকে তাকালেন, 'তা হলে ঐ কথাই পাকা তো?'

সবাই সমস্বরে বলল, 'নিশ্চয় পাকা। আপনে যা কইবেন বড়কর্তা, তার উপরে কোন্ শালায় রাও (শব্দ) করব?'

হেমনাথ বললেন, 'না-না, যদি কিছু মনে হয় নিশ্চয়ই বলবে। সে যাক গে, আরেকবার সবাই শুনে নাও। হাটের পুজোর আড়তদারেরা পাঁচ টাকা করে চাঁদা দেবে, আর দোকানীরা দেবে আট আনা করে। চাঁদা তুলবার ভার দেবে হরিপদ, মহেন্দ্র, প্রাণবল্লভ, নিবারণ, বিনোদ—এই পাঁচজন। টাকা জমা থাকবে নিত্য দাসের কাছে। খাটতে হবে কিন্তু সবাইকে। কে কী করবে তা ঠিক করে দেবে নিত্য দাস।'

সকলে মাথা নাড়ল, 'হ-হ, এইর থিকা (এর চাইতে) ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হয় না।'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল করে ভেবে-চিন্তে দ্যাখো, কারো কিছু বলবার আছে কিনা—'

চারদিকের ভিড়টা চেঁচামেচি করে উঠল, 'না, আমাগো কিছু কওয়ার (বলবার) নাই।'

একটুক্ষণ নীরবতা। বোঝা গেল দুর্গা-পুজোর ব্যাপারে পরামর্শ-সভা বসেছে।

হাটে আসার সময় এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হেমনাথ।

যাই হোক এক সময় কে যেন বলে উঠল, 'শুধা (শুধু) দুগ্গা পুজাই হইব বড়কর্তা, অন্য বছরের লাখান (মত) আর কিছু হইব না?'

'আর কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

লোকটা বলল, 'দরিদ্রনারায়ণের সেবা করলে কেমুন হয়?'

হেমনাথ উৎসাহের সুরে বললেন, 'খুব ভাল কথা। পুজো হবে, ধুমধাম হবে, আর গরীবেরা দুটো খেতে পাবে না?'

লোকটা বলল, 'চাউল-ডাইল যা লাগে আমি দিমু।'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ নিত্য দাস।'

এই তাহলে নিত্য দাস। লোকটার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি; ছোটখাটো মজবুত চেহারা। পরনে ধুতি আর মোটা কাপড়ের নিমা (একজাতীয় জামা)। লোকটার চোখেমুখে সর্বাঙ্গে বিনয় এবং স্নিগ্ধতা মাখানো।

হেমনাথের কথায় কী প্রেরণা ছিল কে জানে। আরেকটা লোক বলল, 'মশল্লাপাতি আর আনাজ-টানাজের খরচ আমার।'

ভিড়ের দূর প্রান্ত থেকে অন্য একজন বলে উঠল, 'পূজা হইব আর এক রাইত যাত্রা হইব না? সগল বারই (সব বারই) হয় কিন্তাম (কিন্তু)—'

হেমনাথ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কী মত?'

সবাই বলল, 'অন্য অন্য বার যহন যাত্রা হয় তহন এইবারও হইব।'

'বেশ।'

কে একজন বলে উঠল, 'বরিশালের মট্ট কোম্পানির যাত্রা চাই। আর এক রাইত কবিগান।'

অন্য একজন বলল, 'এক রাইত কাচ-নাচ হউক—'

আরেকজন বলল, 'এক রাইত কিন্তাম (কিন্তু) সারি গানও দিতে হইব বড়কর্তা—'

কাজেই স্থির হল, ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পর পর এই চার রাত যাত্রা-কবিগান-কাচনাচ এবং সারিগানের আসর বসবে।'

শুনতে শুনতে বিনুর চোখ চকচক করতে লাগল। মনে পড়ল যুগলও সেদিন যাত্রাপালা আর কবিগানের কথা বলেছিল। যুগল আশা দিয়েছিল, পুজোর সময় এক-দিন সুজনগঞ্জে নিয়ে আসবে তবু দাদুকে একবার ধরতে হবে। যাত্রা এবং কবিগানের জন্য, কাচনাচ আর সারিগানের জন্য তার প্রাণ উন্মুখ হয়ে আছে।

পুজোর ব্যাপারে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে চঞ্চল হলেন হেম-নাথ। দ্রুত অবনীমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'বিনুদাদা তো সেই সকালবেলা চাট্টি খেয়ে বেরিয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয় ওর। কিছু খেয়ে—'

তাঁর কথা শেষ হল না; আগেই অবনী-মোহন বলে উঠলেন, 'আমরা এইমাত্র খে... এসেছি। আপনার জন্যে আর লালমোহ... আমার জন্যে মিষ্টি এনেছি।'

হেমনাথ বললেন, 'আমি তো বাই... বিশেষ খাই না। বরং লালমোহনকে পাঠি... দাও—'

যুগলকে দিয়ে লারমোরের কা... মিষ্টির হাঁড়ি পাঠিয়ে দিলেন অব... মোহন।

এদিকে কে যেন বলে উঠল, 'আশ্বি... আইজ তিন তারিখ; পূজা পড়ছে আটা... (আটাশ) তারিখে। অহনও তো পর্তি... (প্রতিমা) বানাইতে দেওয়া হইল না—'

হেমনাথ বললেন, 'গেলবার ঠা... বানিয়েছিল কে?'

'নগা পাল।'

'কোন্ নগা? তালতলির?'

'হ।'

'রাজদিয়া ফেরার পথে তো তালত... পড়বে। যাবার সময় নগাকে প্রতিমা বা... যাব?'

'তাইলে তো খুব ভাল হয়—'

আবার পুজোর কথায় মেতে উঠলে... হেমনাথ। ইতিমধ্যে লারমোরকে খাব... দিয়ে ফিরে এসেছে যুগল।

এদিকে সূর্যটাকে কোথাও খুঁ... পাওয়া যাচ্ছে না; পশ্চিমের গাছগাছালি... ওপারে সে অদৃশ্য হয়েছে। সূর্য নেই, কি... তার শেষ আভাটুকু এখনও চারদিক ছ... আছে। হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মু... মতন আকাশটা এখন লাল টুকটুকে... এরই মধ্যে পাখিরা অধীর হয়ে উঠে... ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে।'

বেলাশেষের নিবু-নিবু রক্তিম আলো... দিকে তাকিয়ে অবনীমোহন চঞ্চল হলেন... আস্তে করে ডাকলেন, 'মামাবাবু'— হেমনা... তাকালে বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে... মামীমা কিসব কিনে-টিনে নিয়ে যে... বলেছিলেন—'

হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালে... হেমনাথ, 'ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ... বলেই ভিড়টার উদ্দেশে বললেন, 'আজ অ... নয়। তোমরা কেউ না কেউ রোজ একটা... একটা ব্যাপারে জড়াচ্ছ;' আর বাড়ি... প্রত্যেকদিন গৃহযুদ্ধ বাধছে।'

সবাই একসঙ্গে বলল, 'আপনে ছা... আর কার কাছে যামু বড়কর্তা?'

'খুব হয়েছে। এখন চলি—'

বিদায় নিয়ে অবনীমোহনদের সঙ্গে ক... হাটের মাঝখানে চলে এলেন হেমনাথ... তারপর ঘুরে ঘুরে আনাজ কিনলেন, ল... কিনলেন, পান-তামাক কিনলেন, ধু... টুকি কিনলেন। মাছ কিনলেন দুরকমের... কই আর চিতল। কইমাছ কেনার সময় এক... মজার ব্যাপার ঘটল।

হেমনাথ জেলেকে বললেন, 'তিন বাই... কই দে—'

বিনু শুধালো, 'বাইশা কি দাদু?'

'বাইশা মানে বাইশ।'

কিন্তু দেখা গেল বাইশের বদলে জেলেটা তিনবার হাপ্পিশটা করে মাছ দিল। বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদু, লোকটা বেশি মাছ দিয়েছে—'

হেমনাথ হাসলেন, 'বাইশায় মানে যদিও বাইশ তবু হাপ্পিশটা করে দেওয়া এদেশে নিয়ম।'

কথাটা মনঃপূত হল না বিনুর। বাইশের জায়গায় কেন হাপ্পিশটা মাছ দেবে, সে ভেবে পেল না।

যাই হোক মাছটাছ কেনা হলে সুজনগঞ্জের আরেক প্রান্তে নৌকো হাটায় এলেন হেমনাথরা। বিভিন্ন চেহারা আর মাপের নতুন নতুন অগণিত নৌকোর মেলা বসেছে যেন এখানে।

দেখেশুনে বিনুর পছন্দমত একখানা নৌকো কিনলেন হেমনাথ। নৌকোটা এক-মাল্লাই এবং ছইঅলা। সঙ্গে একটা বৈঠা আর তল্লা বাঁশের লগি পাওয়া গেল।

নৌকোর দাম চুকিয়ে হেমনাথ যুগলকে বললেন, 'তুই নৌকোটা নিয়ে নদী ধরে মাঝিঘাটায় আয়। আমরা লালমোহনকে নিয়ে আসছি।'

হাটের সওদা নিয়ে যুগল নতুন নৌকোয় উঠল। আর অবনীমোহনদের নিয়ে সেই বটগাছটার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন হেমনাথ।

●

আশ্বিনের সন্ধ্যেটা যেন সরু সুতোয় ঝুলছিল, কেনাকাটা সেরে লারমোরের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সুতোটা ছিঁড়ে ঝপ করে নেমে গেল।

হাটের চালায় চালায় বিকিকিনি বন্ধ হয়ে গেছে, সারা সুজনগঞ্জ জুড়ে এখন ভাঙা আসর। দরাদরি-চিৎকারের সেই একটানা ভনভনে আওয়াজটাও নেই, তার বদলে মৃদু অবসন্ন একটা গুঞ্জন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সারাদিন ধরে এখানকার সুর যেন খুব চড়া একটা তারে বাঁধা ছিল, অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দ্রুত স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে।

হাটুরে লোকগুলো বেশির ভাগই মাঝিঘাটায় চলে গেছে। এখানে সেখানে দু-চারজন ব্যাপারী কুপি জ্বালিয়ে পয়সা গুনছে, সারাদিনের বেচাকেনার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে।

বটগাছতলায় এসে দেখা গেল, একটা রুগীও নেই। সেই মাঝিদুটোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লারমোর টিনের বাক্স গুছোচ্ছেন।

হেমনাথ বললেন, 'সমস্ত দিন বনের মোষ তাড়ানো হল?'

লারমোর হাসলেন, 'তা একরকম হল। তোমার ঘোড়ার ঘাস কাটার খবর বল—'

হেমনাথ হো-হো করে মনের সব কটা দরজা-জানলা খুলে হেসে উঠলেন, 'ঘোড়ার ঘাস কাটা! বেড়ে বলেছ!' বলেই হঠাৎ হাসি থামিয়ে গভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু সত্যিই কি আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটি, বনের মোষ তাড়াই লালমোহন?'

হেমনাথের কণ্ঠস্বরের গভীরতা লারমোরকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'না।'

একটু চুপচাপ। হেমনাথ বললেন, 'যাও এখন চল—'

'যাবে তো, বৌঠান যা-যা বলে দিয়েছিল, কিনেছ? নইলে আবার হোম ফ্রন্টে লড়াই বেধে যাবে।'

'কিনেছি কিনেছি—যুগলকে দিয়ে সে সব মাঝিঘাটায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার চিন্তা করতে হবে না। এখন চল।'

মাঝিঘাটায় এসে মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু। নৌকোয় নৌকোয় এখন আলো জ্বলছে। নদীজলে সেই আলো পড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

মাঝিঘাটে এখন ঘরে ফেরার তাড়া। একের পর এক নৌকো ছেড়ে দিচ্ছে। কাছে-দূরে যেদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু আলোর বিন্দু। ওগুলো যে নৌকার আলো, বিনু জানে। তবু মনে হয় ওরা যেন রহস্যময় কোন সংকেত, নদীময় ছোটাছুটি করে কাদের যেন বিভ্রান্ত করে চলেছে।

যে নৌকোগুলো এখনও রয়েছে তাদের কোনটা থেকে মাছের ঝোলের উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে, কোনটা থেকে আসছে শান্ত আজানের সুর, কোনটা থেকে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তনের পদ। ওরা বোধহয় আজ সুজনগঞ্জেই থেকে যাবে।

হেমনাথ খুঁজে খুঁজে যুগলকে বার করলেন। দেখা গেল, বুদ্ধি করে নতুন একমাল্লাই নৌকো নিজের ছোট কোষ নৌকো আর লারমোরের নৌকো—তিনটেকে পাশাপাশি এনে রেখেছে সে। অসংখ্য নৌকোর অরণ্য থেকে কি করে যে লারমোরের নৌকোটাকে যুগল বার করল, কে বলবে।

নৌকো তিনটে; বাইবার লোকও মোটে তিনজন। যুগল আর লারমোরের সেই মাঝি দুটো। তিনজনে তিনটে নৌকো বাইবে। যুগল বাইবে নিজের কোষ নৌকোটা; মাঝি দুজন বাকি নৌকো দুটো।

বিনুর ইচ্ছে ছিল ওবেলার মতন এবারও যুগলের নৌকোতেই যায়। সে কথা বলতেই হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'উঁহু, রাত্তিরবেলা ঐ বাঁদরের সঙ্গে খোলা নৌকোয় যেতে হবে না।'

বিনুর মনে হল, হেমনাথের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যা অমান্য করা যায় না।

হেমনাথ আবার বললেন, 'এই বার—ওঠ—'

লারমোরের সেই নৌকোটায় একে একে সবাই উঠতে যাবে সেই সময় চিৎকারটা শোনা গেল, 'লালমোহন সাহেব—লালমোহন সাহেব—'

সকলে চকিত হয়ে ফিরে দাঁড়াতেই দেখা গেল তিন-চারটি মুসলমান ছুটে আসছে। তাদের সামনে যে, তার বয়স কাঁচা—যুবক। ছুটতে ছুটতে এসে লারমোরের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল, 'বাচান (বাঁচান), আমার বাজানরে (বাবাকে) আপনে বাচান সাহেব—'

বিব্রতভাবে লারমোর বললেন, 'কে তুমি, কে?'

'আমি আপনাগো গয়নাকি—'

(ক্রমশঃ)

অন্য জগৎ

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র জাদুবিদ্যা বা ডাইনী-বিদ্যার উপর বিশ্বাস বুদ্ধিবাদী মানুষের মন শিক্ষা ও সভ্যতার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। অতীতের অনেক কাহিনী অনেক গল্প আজকের মানুষ অলীক বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। বিশ্বাসে ভাটা পড়েছে সত্য তাহলেও সে বিশ্বাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তার প্রমাণও অজস্র রয়েছে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশেই।

বৃষ্টির জন্য বা রোদ্দুরের জন্য তুক-তাক মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকের অভাব এ শতাব্দীতেও খুব একটা আছে বলে কিন্তু মনে হয় না। সূর্য ঠাকুরকে মুড়ো ঝাঁটা ও পোড়া কাঠ দেখানোর রীতি বৃষ্টি বন্ধের মানসে, বা 'বুইড়ারে গোর দিলাম চুলার ধারে রইদ উঠ, রইদ উঠ,' জাতীয় আচার অনুষ্ঠান বা ছড়াপাঁচালীর প্রচলন কিন্তু আজও অবধি একেবারে বিলুপ্ত হয় নি এদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে। লাউ-কুমড়ো বা ফসলের ক্ষেতে কালো হাঁড়ির উপরে অঙ্কিত কল্পিত ভূত-প্রেতের প্রতিচ্ছবি আজকালও হয়ত অনেকেরই চোখে পড়ে থাকে। এসবই ত নজর এড়ানোর জন্য তুকতাকের প্রাথমিক প্রয়াস। অতদূরে গ্রামাঞ্চলেই বা যাই কেন? রাজধানী এই দিল্লী শহরেই আসুন না। সর্দার প্যাটেল রোড ধরে এগিয়ে চলুন। দেখবেন কত নব নতুন বাড়ী উঠেছে। মালিকের নামের আগে অনেকেই ডক্টর, প্রফেসার বা অ্যাড-ভোকেট জাতীয় বিশেষণ বসানো আছে। নামের পেছনেও আছে। অক্সফোর্ড এডিনবরা বা ঐ জাতীয় কিছু। অথচ নির্মীয়মাণ বাড়ীর সামনে দেখবেন লটকানো আছে বিকটদর্শন কৌতুক মুখের প্রতি-কৃতি। উদ্দেশ্য? বাড়ীর উপর যেন কারো নজর না পড়ে। এমন অনেক দৃষ্টান্তই ত আছে। দর্শনশাস্ত্রে এম-এ এবং বিদেশ-প্রত্যাগত মা'কে তো নিত্য নিয়তই দেখছি। তরা শিশুপুত্রটিকে কাজলের ফোঁটা পরিয়ে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটি ঈষৎ দাঁতে কেটে তবেই ছেলেকে পাঠান চাকরের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে।

বিলেত দেশও কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম নয়। এই কিছুদিন আগের একটা ঘটনার কথাই বলি। ডরসেটের ব্রিডপোর্টে এক বাড়ীর চিমনীর ভেতর পাওয়া গেল একটি বাছুরের হৃৎপিণ্ড। বাবলা জাতীয় কাঁটার ক্ষতবিক্ষত ও কণ্টকিত। কী ব্যাপার? না, কোন শত্রুব্যক্তিকে হৃদয় যাতনায় ক্ষত-বিক্ষত করে হত্যা করার মানসেই ঐ তুক-তাকের ব্যবস্থা। তাছাড়া এদেশে যেমন পাথরের মাদুলি আর ছাগলের লোমে তৈরী তাগা ধারণের একাধিক দৃষ্টান্তের অভাব নেই ওদেশেও। কালো বেড়ালের লোম বেশ করে কাগজের পুরিয়ায় পুরে পকেটে নিয়ে মাঠে নামতে দেখেছি কোন বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়কে। কী ব্যাপার? না ওটা সঙ্গে থাকলে নাকি কারো নজর লেগে খেলা খারাপ হবার ভয় ত নেইই উপরন্তু আহত হবার সম্ভাবনাও নাকি নেই। আসল কথা কী প্রাচ্য কী পাশ্চাত্য সব দেশের ব্যাপার দেখে মনে হয় বিশ্বাসে ভাটা পড়লেও তুক-তাকে বিশ্বাস মানুষ আজও ষোল আনা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

নিশির ডাক বা বাণ মারার ভয়াবহ কাহিনীর কথাও হয়ত অনেকের অজ্ঞাত নয়। এসব হল অভিচার তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ঘটনা। এই বাণ মারারই এক ভয়াবহ কাহিনী একবার শুনেছিলাম এক প্রাচীন ব্যক্তির মুখে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও বটে। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

ঘটনার কাল ১৮৯৮ খৃঃ। ঘটনাস্থল পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরের কেওটখালি গ্রামের একটি ভদ্র গৃহস্থ পরিবার। চার ভাইয়ের যৌথ পরিবার। সবাই সরকারী চাকুরে। বাড়ীতে সব মিলিয়ে ছটি শিশু। চারটি মেয়ে ও দুটি ছেলে। অভাব অনটনের বালাই নেই বেশ সুখের সংসার। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সুখের সংসারে বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে এল!

শ্রাবণ মাস সামনে ঝুলন পূর্ণিমা। বাড়ীতে সে উপলক্ষে বরাবরই একটু উৎসব হয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। কর্তারা সব ছুটি নিয়ে এসেছেন বাড়ীতে। অতিথি অভ্যাগতও দুচারজন এসেছেন। উৎসবেরও মহড়া চলছে। ঠিক এমন সময়ই দুর্ঘটনার সূত্রপাত হল। পূর্ণিমার আর তিনদিন মাত্র বাকী। হঠাৎ বাড়ীর সর্বকনিষ্ঠ শিশু পুত্রটির প্রচন্ড জ্বর এল সকালের দিকে আর সন্ধ্যা নাগাদ তার কণ্ঠনালীর পাশে একটি ছোট্ট ফুটো বেরিয়ে তা দিয়ে অঝোরে রক্তক্ষরণ হতে সুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী ভরে গেল কিন্তু রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ করা গেল না। অনবরত রক্তক্ষরণের ফলে শেষরাত্রের দিকে শিশুটি মারা গেল। কী করে যে হঠাৎ অমন ফুটো হল আর কেনই বা রক্তক্ষরণ বন্ধ করা গেল না তা সব ডাক্তার বদ্যিরা ভেবেও কূল কিনারা পেল না।

দুর্ভাগ্যের প্রথম ধাক্কা সামলানোর আগেই এল আবার দ্বিতীয় ধাক্কা। ঠিক একদিন পরে অপর একটি শিশুও ঠিক একইভাবে মারা গেল। শুধু তাই নয় পরের দিন ঘটলো আর এক অঘটন। বাড়ীর উত্ত প্রান্তে ছিল একটি প্রাচীন আম গাছ। হঠা সবার নজরে পড়লো যে আমগাছের ফেটে অঝোর ধারায় রস গড়াচ্ছে। ঠি টাটকা রক্তের মত টুকটুকে লাল। সবা বুঝি দিল বাড়ীতে কোন অপদেবত নজর পড়েছে অতএব বাড়ী ছেড়ে পালি যেতে। ওদিকে বেলা গড়িয়ে অপরা আগতপ্রায়। আতঙ্কে সবাই বাড়ী ছে পালানোই স্থির করে ফেললো। চটপ সে রকম প্রস্তুতিও চললো। শুধু ওবাড় নয় সারা পাড়ায় নেমে এসেছে এ আতঙ্কের ছায়া। এই অবস্থার মধ্যে এ মুস্কিল আসান। এসে সকল মুস্কিলে অবসান ঘটালো।

বেলা তখন তিনটে সাড়ে তিনটে হ বাড়ীর লোক বাড়ী ছেড়ে পালাব প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। হঠাৎ সদর দরজায় হ পড়লো—'মুস্কিল আসান। কই গো বাড় বাবুরা সব কই? বাড়ীতে যেন বাণ পড়ে বলে মনে হয়। বাড়ী ভার হয়ে গে আপনারা শীগ্গির আসেন। শুনি দে কী ব্যাপার। নইলে কিন্তু সব প্রাণে মা যাবেন। আসেন, আসেন, শীগ্গির। আ বলুন দেখি কি ব্যাপার?'

বাড়ীর লোকেরা সব যেন হাতে আক পেল। কর্তারা বাইরে এসে দেখে এ বৃদ্ধ ফকির দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের আহ্ দান করছে। আর ঠিকই ত এত দুর্বিপাকে মাঝেও ত একবারও মনে হয়নি যে এ অভিচারঘটিত কোন অপকীর্তি হতে পা বলে? বাণ মারার কথা শুনেই এব সবার টনক নড়লো। আদ্যোপান্ত সম অঘটনের কাহিনী নিবেদন করলো ব ফকিরের কাছে। আম গাছটার অবস্থ তাকে নিয়ে গিয়ে দেখালো। গাছটা ত মিইয়ে এসেছে। সেই শিশু দুটির ম সে দিকে নজর পড়তেই ফকির গর্জে উঠ —'দেখ মাউলার পো-এর কান্ড। দাঁ তোরে তামাসাটা দেখাই তবে।' এক ম মাটি তুলে নিয়ে প্রায় মিনিট দশেক বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়া তারপর—'থাক্ চুপ করে পড়ে থাক নড়বি ত আর রক্ষা থাকবে না।' ব সেই এক মুঠো মাটি গাছটার গায়ে ছু মারলো। আশ্চর্য! পাঁচ মিনিটের মা সেই রক্তবৎ রসক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। তার ফকির ফিরে বললো—"কত্তা বড় জবর কিন্তু মারছে সুমুন্দির বাপে। ও ওটাকে জীবনের শিক্ষাও দিয়ে আমি ছাড় হায় আল্লা! আর তিনটা দিন আগে এ বাবুদের এমন সর্বনাশটা হোত না। হা হায়! হায়! থাক বাবু বা করবার ত

...হে। এইবার ওটারে বুঝানো যে ওর ...রও বাপ আছে। সেই ব্যবস্থাই আসে ...।' আশ্বাস দিয়ে ফকির উধাও হল। ... ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে ...। সংগে এনেছে গ্রুর শেকড়-বাকড় ... তুকতাকের সব সাজ-সরঞ্জাম। আর ...ছে চারটি ইঞ্চি ছয়েক লম্বা সর্পা-...তে বেকানো লোহার গজাল। এসে ...লো, 'কত্তা ঘরখানা ত একটু ছাড়তে হবে। ... ত ভর হয়ে আছে। বলার সংগে সংগে ... খালি করে দেওয়া হল। এই ঘরেই ...টি শিশু মারা গেছে। ফকির সে ...র চৌকাঠের নীচে ইঞ্চি ন'য়েকের মত ...ড়ে বের করলো লাল শালুতে জড়ানো ...টি ছোট্ট মাটির ভাড়। ভাঁড়টি চোখে ...তেই ফকির কুৎসিত গালাগাল করে ... ভাঁড়টিকে তার থলিতে পুরে নিল। ...রপর ফিরে বললো—'কত্তা ছয়জনের ...স্থা করছিল। আজ একজনের তারিখ ...ল। চারজনেরে বাঁচালাম। কিন্তু হায় ...লা! দুইজনরে আর পারলাম না। ঠিক ...ছে চোখের জলে ওটার চোখে অন্ধকার ...াব। আচ্ছা, আমি তাহলে কাজে বসি।' ...র দরজা বন্ধ করে ফকির তার কাজে ...লো। ঘন্টা খানেক কী মন্ত্র তন্ত্র ...ওড়ালো সেই জানে তারপর দরজা খুলে ...চয় দিয়ে বললো —'আর ভয়ের কারণ ...। তবে এক কাজ করেন। এই ...কড়টা সংগে নিয়ে গিয়ে আপনাদের ...রের পুকুরটা থেকে এক কলস পানি ...য়ে আসুন দেখি।' পানি আনা হলে তা ...পূত করা হল। তারপর মন্ত্র উচ্চারণের ...গ সংগে চললো ক্রমাগত সে পানি ...টানো। সবার গায়ে, আসবাবপত্রে, দরজা ...নালায়, আঙিনায় রান্নাঘরে গোয়ালঘরে ...গাছড়ায় পথে-ঘাটে মায় আস্তকুড়ে ...র্থ। পানি ছিটানো শেষ হতে ফকির ...টি লোহার গজাল বাড়ীর চার কোণে ...তে দিল। গজাল পোঁতা শেষ হতে ...খ বুজে বিড় বিড় করে কিছিং মন্ত্র তন্ত্র ওড়ানোর পর বাড়ীর সবাইকে বললো—...ন এইবার সব গিয়ে নিশ্চিন্তে থাকেন। ...পুরের নাস্তার আর এই দিকে নাক ...রাতে হবে না। ইঃ আল্লা, চারটে দিন ...গে যদি জানতে পারতাম তবে শিশু দুটা ...ন বেঘোরে মারা যেতো না। সবই তার ...ছা!' ফকির আকাশের দিকে তাকিয়ে ...র্ঘশ্বাস ফেলে কথা শেষ করলো। তারপর ...পথে পা বাড়ালো। একটি পয়সা ...সা ত নিলই না উপরন্তু যাবার সময় ...ন গেল—'আল্লা মেহেরবান। তার উপরই ...সা রাখবেন। আর বাবুরা উত্তর দিকের ...কে কোন ডাকর বাকর যেন বাড়ীতে ...ঢুকতেই না দেন। এইবারের কথাটা যেন ...ন রাখেন। অল্লা রসুল।' ফকির চলে ...ল।

আদ্যোপান্ত কাহিনীটিই শোনা ...হিনী। ঠিক যেমন শুনেছিলাম তেমনই ...বেদন করলাম।

অশিক্ষিত বা মুদ্রা জাতিদের মধ্যে ...তুতাক মন্ত্র তন্ত্র বা ডাইনীবিদ্যা প্রভৃতি ...ভিচার প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস কিন্তু আগেও যেমন ছিল আজও প্রায় তেমনই আছে। উদাহরণ স্বরূপ নিউজিল্যান্ডের মাওরি জাতের মধ্যে প্রচলিত একটি উদ্ভট কু-সংস্কারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাওরিদের বিশ্বাস যে গ্রামে যে আধি-ব্যাধির প্রকোপ সুরু হয় তা ডাইনীদেরই কারসাজি এবং তাদেরই দ্বারা দূষিত কোন ব্যক্তিকে দিয়েই ঐ সব রোগ ব্যাধির প্রথম সূত্রপাত হয়। তাকে রোগমুক্ত করে বাঁচানো অসম্ভব। আর শুধু তাই নয়। ঐ প্রথম আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্পর্শ করবে সেই ডাইনীর কোপে পড়বে। নিজে অসুস্থ না হলেও তার দ্বারাই ব্যাধির বীজ চারদিকে ছড়াবে। অতএব তেমন সব দূষিত ব্যক্তিকে হাত পা বাঁধা অবস্থায়ই বাকী জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তাকে কেউ স্পর্শও করে না। কাঠের হাতা দিয়ে পানাহার তার মুখে তুলে দেওয়া হয়। অন্যান্য অবশ্য কর্মগুলিতেও তাকে ঐভাবেই কখন প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হয়। এই অবস্থায় বেঁচে থাকতে থাকতে যদি সে কোন যোগ্য রোজার দ্বারা দোষমুক্ত হয় তবেই সে আবার স্বাধীন বন্ধনহীন জীবন ফিরে পায়।

ডাইনী সন্দেহে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করেছে বা অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলেছে এমন সব করুণ হত্যা-কাহিনীর কথা ত সব সময়ই শোনা যায় বুনো অসভ্য-দের মধ্যে। তবে করুণ কাহিনী যেমন আছে কৌতুকপ্রদ কাহিনীরও অভাব নেই। এবার সে রকম একটি কাহিনী উল্লেখ করছি।

কাহিনীটি দক্ষিণ আমেরিকার ইকু-কোডোর অঞ্চলের অরণ্যবাসী কলরেডো রেড ইন্ডিয়ানদের এক প্রেতসিদ্ধ চিকিৎসকের বৃত্তান্ত নিয়ে বলা। মূল বক্তা জনৈক মার্কিন পরিব্রাজক। নাম হেক্টর এসেবস্। মূল বক্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপেই কেবল প্রতিপাদ্য বিষয়টুকুই তুলে ধরলাম।

"ঐ দুর্গম অরণ্যে গিয়ে শুনলাম কল-রেডোদের পিশাচসিদ্ধ চিকিৎসক জুলিওর রোগ নিরাময়ের অলৌকিক ক্ষমতার কথা। মন্ত্রবলে নাকি প্রেতাত্মাদের অনায়াসে সে বশীভূত করে তাদের দ্বারাই ঐসব অসাধ্য সাধন করে থাকে। এমন কি মৃত ব্যক্তির দেহেও নাকি প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। অাঁ! বলে কী? দেখতে হয় ত তবে।

ঠিক পরেরে দিনই বেলা দশটা নাগাদ গিয়ে হাজির হলাম প্রেতসিদ্ধ ডাক্তার জুলিওর চেম্বারে। গভীর অরণ্যের মাঝে প্রায় চার একর জমি বেশ গুছিয়ে পরিষ্কার করে বুনো ধন্বন্তরী তার ক্লিনিক কাম রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার স্থাপিত করেছে। সামনে ইয়াকা ও কলাগাছের ছোট্ট একটি বাগানও আছে। তাহলে হবে কী? চার-পাশে যে গভীর জঙ্গলের বহর দেখলাম তাতে ছোটখাট জন্তু জানোয়ার ত কোন ছার খোদ হাতী গন্ডার অবধি নির্ভাবনায় লুকিয়ে থাকতে পারে।

শুনেছিলাম ডাক্তার নাকি দিনের বেলা কারো সংগে দেখা সাক্ষাৎ করে না। সেদিক থেকে আমার ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে। দেখা ত করলই এবং কথাবার্তাও হয়ে গেল। তবে আমার চেহারা আর বেশভূষা দেখে কিন্তু গোড়াতে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়েই কথাবার্তা সুরু করেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সন্দেহ নিরসন হতে বেশ সহজভাবেই কথাবার্তা শেষ করল। প্রেত-সিদ্ধ হলেও লোকটার চেহারায় কিন্তু কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়ল না। রোগা লম্বা নিতান্ত আটপৌরে চেহারা। তবে অস্বাভাবিক ছিল তার চোখ দুটো। প্রেতের চোখের মতই তার তীব্র চাহনি। ডাক্তারের দুই স্ত্রী। সামান্য বাক্যালাপেই টের পেলাম হিম্মৎ থাকলে আরও দুচারটি স্ত্রী হয়ত থাকত। আধ ঘন্টা কথাবার্তায়ই বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এই পার্থিব জগতে কেবল দুটি বিষয়েই ঐ ডাক্তারের প্রবল আসক্তি। মাছি ও নারী।

ব্যাধির কথা জিজ্ঞেস করতে চটপট বানিয়ে বলে দিলাম যে বছরখানেক যাবৎ আমার পিঠে একটা ব্যথা হয়ে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে এবং বহু চিকিৎসা করেও সে ব্যথার কোন উপশম হয় নি। ব্যাধির বৃত্তান্ত শুনে ডাক্তার বেশ ভারীক্কি চালে বললো—'হুঁ বুঝেছি। কোন ভয় নেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এখন নয়। আমি দিনের বেলা কোন চিকিৎসা করি না। আমার আজ্ঞাবহ প্রেতেরা সব দিনে বিশ্রাম করে। রাতেই আমি ওদের তলব করে কাজে লাগাই। অতএব রাতের আগে চিকিৎসা হবে না। রাত এগারোটা নাগাদ আসবেন ব্যথা সারিয়ে দেবো। তখনকার মত কথা-বার্তা সেখানেই শেষ হল।

রাত দশটা নাগাদ যথারথ গিয়ে হাজির হলাম ধন্বন্তরী জুলিওর সর্বরোগহর আরোগ্য নিকেতনে। [illegible] ...চালা [illegible] চর্বির প্রদীপ। আর তার [illegible] গোল হয়ে বসে আছে [illegible] চিকিৎসার্থী। [illegible] বা ব্যথা। কেবল একটি বছর দশেকের বিকলাঙ্গ মেয়ে রয়েছে দলে দেখলাম। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, চারপাশে গহন অরণ্য আর ভিতরে ডাক্তারের চেম্বারে একগাদা রুগ্ন আর বিকলাঙ্গ
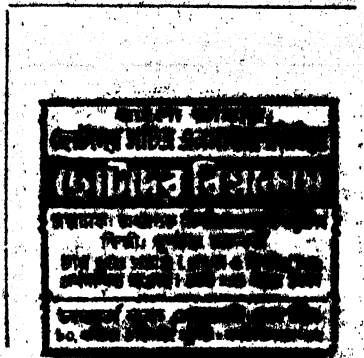
জায়েকের সমাবেশ। সব মিলে মিশে কেমন যেন একটা গা ছম ছম করা ভৌতিক পরিবেশের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কম্পমান প্রদীপের ছায়ায় রুগ্ন লোকগুলির অস্থির ছায়াগুলি একদল মৃতপ্রেতের প্রেতের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল। নিশুম রাতের থমথমে পরিবেশে সবাই অপেক্ষমান। কখন আসবে সর্বরোগহর ধন্বন্তরী ডাক্তার জুলিও

প্রায় ঘন্টা দেড়েক একটানা অপেক্ষা করার পর হঠাৎ এক সময় সবগুলি ছায়া এক সংগে আন্দোলিত হয়ে এক যোগে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চললো বুনো কায়দায় অভিবাদন ক্রম-আগুয়ান এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তির উদ্দেশ্যে। ডাক্তার অবশেষে এল।

খুব গম্ভীর চালে প্রত্যাভিবাদন করে ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে গ্রহণ করল তার যথাযথ আসন। তারপর ধীরে সুস্থে সামনে সাজিয়ে রাখল তার চিকিৎসার সরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতি।

শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি বলতে নজরে পড়লো একটি লৌহশলাকা, চিমটা ও একটি ক্ষুরজাতীয় অস্ত্র। আর সংগে আছে বেশ শক্ত এক গাছা দড়ি। অ্যানাসথেসিয়ার বিকল্প ব্যবস্থা। রোগী যাতে শল্যচিকিৎসায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। অবশ্য দড়ির সংগে তাড়িরও ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে বলে দেখতে পেলাম। আর সে যে কী ওস্তাদ কারিগরের হাতে তৈরী তাড়ি তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম তার এক ডোজ কেবল পেটে পড়তেই। মেডিসিনের পর্যায়ে সাজানো হল এক গাদা লাল নীল হলদে সবুজ তরল পদার্থে ভরা বোতলের সারি। মনে হল সেগুলোও কোন না কোন হুইস্কি ভডকার বাপ ঠাকুর্দা জাতীয় আসল মেডিসিনের চোখ জুড়ানো রঙিন সমাবেশ।

যন্ত্রপাতি ওষুধপত্র বের হবার পর বের হল গুহ্যের মাদুলি। শেকড়বাকড়, পশুপক্ষীর হাড়-পালক চঞ্চু আর এক গাদা বিভিন্ন সাইজের পাথরের টুকরো। এবার সেগুলি সব সামনে সাজিয়ে রেখে সুরু হল চিকিৎসার গৌরচন্দ্রিকা। অর্থাৎ প্রেত সাধনা। মন্ত্র তন্ত্র যা সব উচ্চারিত হল সেগুলি আমার বোধগম্য হল না বটে তবে

নানাবিধ অংগভংগি যা দেখলাম তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম প্রেতাত্মাদের অমন আহবানের জবাবে সাড়া না দিয়ে কোন গত্যন্তর ছিল না। কারণ মৃত্যুর পরও মা বোনেরা ইজ্জতের ভয় করে না এমন কোন প্রেতাত্মা আছে বলেও আমার মনে হয় না। ঠিক সে কারণেই বোধ হয় মাত্র আধঘন্টাটাক ডাকাডাকির পরই প্রেতাত্মারা সব করায়ত্ত হয়ে গেল। আর সংগে সংগে সুরু হয়ে গেল চিকিৎসা।

সুরু হল শল্যচিকিৎসা দিয়ে। প্রথমেই ডাক পড়লো বাতে পংগু এক বৃদ্ধা রমণীর। চলৎশক্তিরহিতপ্রায় বাতে পংগু ঐ বৃদ্ধাকে অবশ্য আগেই এ্যানসথেসিয়ার এক ডোজ বাঘা তাড়ি গেলানো হল। বেশ কিছুক্ষণ পর দেওয়া হল 'রিপিট' ডোজ। প্রথম ডোজের পরই বৃদ্ধার অবস্থা হয়েছিল টলটলায়মান। এবার সেকেন্ড ডোজটি পড়তে একেবারে রীতিমত বেহুঁস। এদিকে একটি অগ্নিকুন্ড জেবলে তাতে তাতানো হচ্ছে গুটিকয়েক মন্ত্রপূত পাথরের নুড়ি। গনগনে আগুনে তেতে তেতে পাথরগুলি যখন লাল টুকটুকে হয়ে উঠল তখন শিবনেত্র হয়ে ডাক্তার প্রেতের উদ্দেশ্যে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চিমটার সাহায্যে একটি রক্তবর্ণ উপলখন্ড তুলে নিয়ে নেশায় অচৈতন্য বৃদ্ধার হাটুতে ঠিক যেখানটায় দুষ্ট প্রেতাত্মা গিয়ে বাসা বেঁধে ফুলা আর ব্যথার সৃষ্টি করেছে সেখানটায় উত্তপ্ত পাথরখন্ডটি ছুঁইয়ে দিল দুষ্ট ভূতকে এক মোক্ষম ছেঁকা।

ওরে ব্বাস্! আর যায় কোথা! কোথায় ভূত আর কোথায় নেশা! কোথায়ই বা সত্তর বছরের বৃদ্ধার বাতজনিত চলৎশক্তিহীনতা। অবিশ্বাস্য সে দৃশ্য। পংগু বৃদ্ধা এক ছেঁকাতেই যেন সতের বছরের হারানো যৌবন ফিরে পেল। তিড়িং করে এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে যে বিদ্যুৎগতিতে সে আরোগ্য নিকেতনের চৌহদ্দি পার হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে গতিবেগের মোকাবিলা করতে বোধ হয় তেমন তেমন সব নামকরা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানকেও রীতিমত ঘোল খেতে হবে।

বৃদ্ধা অদৃশ্য হতেই ডাক্তারের জয় জয়কার পড়ে গেল। তা পড়বে না? অমন ইলেক্‌ট্রোথেরাপী যে ডাক্তার জানে যে একটি মোক্ষম ছেঁকায় চোখের নিমেষে ব্যথা বেদনা সব ভুলিয়ে সত্তরের জড়তাকে সতেরর যৌবনে ফিরিয়ে আনতে পারে তার জয়-জয়কার পড়বে না ত পড়বে কার?

বাতের চিকিৎসায় ভেল্কী দেখানোর পর যথাযথ দ্বিতীয় দফার মন্ত্র তন্ত্র পাঠ শেষ হতে ডাক পড়ল এক অশীতিপর বৃদ্ধ রোগীর। বেচারা চোখের ছানিজনিত দৃষ্টিহীনতায় ভুগছে। রোগীকে ডেকে এনে ডাক্তারের মুখোমুখি বসানো হল। অতঃপর ডাক্তার উপর দিকে মুখ করে বিড়বিড় করে যেন কার সংগে কী শলা-পরামর্শ করতে

করতে একটি কুৎসিৎ অংগভংগি করল ভাবখানা—'তবে দেখাচ্ছি মজা এবার। দাঁড়া বেটাচ্ছেলে।' অংগ ভংগিটি যে কাকে উদ্দেশ্য করে হল ঠিক বোধগম্য হল না। যাক, অংগভংগি শেষে ডাক্তার চিকিৎসায় ম দিল।

নীল আরকে পূর্ণ বেশ বড় একটা বোতল টেনে এনে চোঁ চোঁ করে এক মুখ আরক টেনে নিল। তারপর চোখ বুজে (এক মুখ আরক নিয়ে) শিবনেত্র হয়ে মিনিট খানেক চুপচাপ বসে রইল। কী হবে? কী হবে? ভাব নিয়ে সবাই যখন উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষায় রত তখন হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে ডাক্তার থু থু করে ঐ এক মুখ আরক রোগীর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল রোগীর তখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। তা চোখের দৃষ্টি ত পরের কথা দিক্‌দৃষ্টি পর্যন্ত খুলে গেছে। দ্বিতীয় দফার আরক প্রয়োগের আগেই সে এক গাল কেতাথ কা হাসি হেসে জানিয়ে দিল যে সে বে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আর দরকা হবে না। স্রেফ থু থু ছিটিয়েই ডাক্তা চোখের ভূতকে চোখছাড়া করে তবে ছাড়ল। অবশ্য ওষুধ প্রয়োগের আগে মন্ত্র তন্ত্র প্রয়োগ করা হল মুদ্রা সহযো তাও কম জোরদার ছিল না।

তৃতীয় কেস সেই বিকলাঙ্গ বাচ্চা মেয়েটা। দেখে মনে হল 'পলিও' কেস তবে ডাঃ জুলিওর ডায়গ্‌নোসিস্ স্বতন্ত্র এক হাত গালাখিস্তির পর পুনরায় অগ্নি কুন্ড জেবলে সেই সর্বরোগহারি উপলখন্ড গুলি আগুনে চাপানো হল। আর সংগে সংগে সুরু হল অ্যানস্‌থেসিয়ার উদ্যোগ পর্ব। তাড়ি আর দড়ির ব্যবস্থা। বুঝলা এবার গুটি গুটি কেটে পড়া দরকার। কার পাথর যখন তৃতীয়বার অগ্নিকুন্ডে চড়ে তখন সে চড়বে শুধু আমার পিঠে চ ব্যথার ভূতটাকে তাড়া করার জন্যই। অতএ আর বিলম্ব মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

ডাক্তার যখন পাথর আগুনে চাপিয়ে তাড়ির নেশায় বেহুঁস শিশুটির পংগু দেহে লুকানো ভূতটাকে টিপে টুপে আবিষ্কা করার নেশায় মত্ত তখন আমি পা টিপে টিপে তার অলক্ষ্যে সটকান দিয়ে আমার পিঠে চামড়ার ভূতটাকে বাঁচালাম। তারপর আ ওমুখোও হইনি জীবনে দ্বিতীয়বার।

ওখানে থাকাকালীনই পরে একটি লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। ডাঃ জুলিওর পুরানো রোগী। মাথায় একটিও চুল নেই শুনলাম মাথা ধরার ভূতটাকে ঘরছাড় করতে গিয়েই নাকি মাথাটি চুলছাড়া হয়ে গেছে। তবে মাথার ভূত এখনও নাকি মাঝে মাঝেই ফিরে এসে আস্তানা গাড়ে ফিরে আর এল না কেবল ভূতের বাস চুলগুলি।

ভাবছি রক্ষা পালিয়ে এসেছিলাম! ন হলে যে পিঠের ভূতটা পিঠে থাকলেও পিঠের চামড়াটি আজ আর পিঠে থাকতো না।"
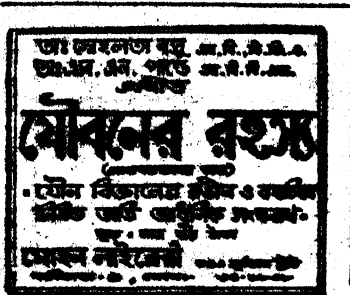
জলাভূমিতে মাথা উঁচু করা ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপের মত আমরা যেন ভেসে আছি। স্বার্থের একটা পঙ্কিল স্রোত বয়ে যাচ্ছে দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে। পৃথক করে রেখেছে সকলকে। তবু তারা অস্তিত্বকে জিইয়ে রেখেছে। যে কোন একটা ভূ-আন্দোলনে দ্বীপগুলোর অস্তিত্ব মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে বিপর্যয় আসবে না। ছোট ছোট দ্বীপগুলো মাথা উঁচু করে নিজেদের স্পর্ধা জানাবে।

এ বাড়িতে আমরা সেই জলাভূমির দ্বীপের মত বাস করছি। আমি, চন্দনা, রমেন, বাবা আর সব।

আমরা জানি, আমরা সবাই আলাদা। তবু আলাদা হতে পারি না। যে আত্মীয়তার বন্ধনে আমরা একসঙ্গে বাস করছি এতদিন সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারি না। নিজেদের আবর্তে দম ঘুরিয়ে যাওয়া লাট্টুর মত ঘুরপাক খাচ্ছি অবিরত; তবু কেউ কারুর ঔদ্ধত্যকে ত্যাগ করতে পারছি না।

মাঝে মাঝে সেই পঙ্কিল স্রোতে ঢেউ খেলে। বাতাস বয়। মনে হয় আমরা বুঝি মন, প্রীতি আর আত্মীয়তার সেতুবন্ধ রচনা করতে পারব। হাওয়া পড়ে যায়। অনড় গাছের মত দাঁড়িয়ে আবার আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখি। ভাবি, আমরাই ত সেরা, অন্যদের সৌন্দর্য কোথায়?

এ ঘরটা তালাবন্ধ থাকে। এটাতে মা থাকত। যে মাটিকে আশ্রয় করে দ্বীপগুলি একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

দরজা খুললে মার সেই চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরা ছবিটা প্রথমে চোখে পড়ে। আলমারীতে এখনও সাজান রয়েছে মা'র ব্যবহার করা জিনিষ। বাক্সে এখনও রয়েছে বিয়ের বেনারসী। মা পান খেত। পান সাজার বাসনগুলো যত্নের অভাবে মরচে পড়ে গেছে। আলমারীর মাথায় ধুলোর কার্পেট। ঘরের কোণায় ঝুল পড়েছে। মাকড়সা বাসা বেঁধেছে।

মা মারা যাবার পর চন্দনা ঘরটায় ধূপ ধুনো দিত। ছবিটাকে প্রণাম করত। ধীরে ধীরে সব বন্ধ হয়ে গেছে। ভক্তি; শ্রদ্ধা

বেঁচে থাকতেই মানুষ যা পায়, মরে গেলে মন থেকে সব মুছে যায়। তখন শ্রদ্ধা জানান একটা বাড়তি কাজ বলে মনে হয়।

চন্দনা একদিন আমাকে বলেছিল, জান, ছবিটার দিকে তাকালে মনে হয় মা যেন কাঁদছে।

—ফটো আবার কাঁদতে পারে নাকি।

—হ্যাগো! আমি যে দেখেছি।

বিশ্বাসটাকে ভাঙতে ইচ্ছে হল না। বেঁচে থাকলেও মাকে কাঁদতে হত, মরে গিয়ে মা কাঁদবে তাতে আশ্চর্য কি।

চন্দনা আর একদিন বলেছিল, ঘরটার দরজার কাছে গেলে গা ছম ছম করে।

আমি বলেছিলাম, যাবার দরকার কি?

ঘরটার তালাবন্ধ করা হয়েছিল। রমেন এসে সেটা ব্যবহার করত। রমেনকে কথাটা বলেছিল চন্দনা।

রমেন গম্ভীরভাবে বলেছিল, তোমাদের যত আজগুবি চিন্তা। কদিন বাপের বাড়ি ঘুরে এসো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রমেন আমার ছোটভাই। দুর্গাপুরে চাকরী করে। বিয়ে করে নি। মাঝে মাঝে আসে। আমার সঙ্গে বেশী কথা বলে না! কেন একটা অদ্ভুত জেদ আমার বিরুদ্ধে, বাবার বিরুদ্ধে। তবু ভাই।

মনে আছে বিজয়া দশমীর দিনে ঠাকুর বিসর্জন হয়ে গেলে আমরা একটা মাদুরে দুভাই বসতাম। মা আমাদের আশীর্বাদ করত।

মা বলত, রমু দাদাকে প্রণাম কর।

তারপর বলত, যা বাবাকে প্রণাম করে আয়।

বাবা দোতলায় থাকতেন। আমরা দু' ভাই পাল্লা করতে করতে উপরে উঠতাম। এখন রমেন আমার পাশে এসে বসে না। ছুটিতে এলে মার ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকে। বই পড়ে। যাবার আগে ঘর বন্ধ করে চাবিটা চন্দনাকে দিয়ে যায়।

চন্দনা এখন রমেনকে সমীহ করে চলে। এক সময়ে দুজনে খুব ভাব ছিল। এখন রমেন সরে গেছে, চন্দনার কথায় সেটা আন্দাজ করতে পারি।

চন্দনা একদিন রমেনকে বিয়ের কথা বলেছিল।

রমেন বলেছিল, দাদা ত বিয়ে করেছে। আমি আর এ বাড়িতে [illegible] বাড়াতে চাই না।

চন্দনা, বেশ ত, তুমি বিয়ে করে তোমার বৌকে দুর্গাপুরেই নিয়ে যেও।

রমেন গম্ভীর দৃষ্টিতে বৌদির দিকে তাকিয়েছিল। কি বলতে চাইছে বৌদি? এ বাড়িতে কি শুধু তার আর দাদারই সব অধিকার। অশিপুরের বড় দ্বীপটাই কি জন্মভূমিতে আধিপত্য চালাবে।

চন্দনা লজ্জিত হল, মানে, তোমার যখন খুসি আসবে, থাকবে এ-ত তোমাদেরই বাড়ি।

রমেন কোন কথা বলল না।

—তুমি বরং ট্রান্সফার হয়ে চলে এসো। সকলে মিলে একসঙ্গে থাকা যাবে। বাড়িটা যেন আজকাল ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে গেছে। বাবা উপরে থাকেন। তোমার দাদা অফিস চলে গেলে একেবারে নিঝুম। চন্দনা যেন সন্দেহের মেঘটাকে কাটাতে চাইল।

রমেন তালাবন্ধ করে চাবিটা চন্দনার হাতে দিয়েছিল।

পরের বার রমেন যখন এল, চন্দনা দেখল রমেন অনেক সংক্ষেপ হয়ে গেছে। বুঝে নিয়েছে সে আলাদা।

রাতে শুয়ে চন্দনা আমাকে কথাটা বলেছিল।

আমি বললাম, কেন, তুমি ওকে এসব বলতে গেলে। ওর যখন খুসি ও বিয়ে করবে।

চন্দনা যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আমি রমেনের পক্ষে চলে যাব, সেটা ও আশা করতে পারে নি।

চন্দনা বলল, তুমি বিশ্বাস করো, আমি ঠাকুরপোকে সেভাবে কথাটা বলিনি।

ওপরের ঘরটায় বাবা থাকেন। বাবাকে আমরা কোনদিন আপন করে পাই নি। চিরকাল দূরের মানুষ হিসেবেই পেয়েছি, ভেবেছি। মা বেঁচে থাকতেই বাবা আরেকটা বিয়ে করেছিলেন। বিয়েটা ছিল অস্পষ্ট। সকলেই জানত সে বাবার রক্ষিতা। তবু আমরা তাকে নোতুনমা বলতাম। নোতুনমা কখনও আমাদের বাড়িতে আসেননি। বাবাই যেতেন তার কাছে। আমাদের সংসারে এই কলংকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

সকলেই জানত আর জেনে না জানার ভান করত। বাবা বাড়িতে নোতুনমার আলোচনা পছন্দ করতেন না।

আমরাও তার বাড়িতে কখনও যেতাম না। আমাদের ইস্কুলে যাবার পথে নোতুনমার বাড়ি পড়ত। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে নোতুনমাই বরং কাছে ডেকে আদর করত। মাঝে মাঝে খাবার কিনে দিত।

রমেন বলত, মাকে এসব বলিস না দাদা। বাবা শুনলে রাগ করবেন।

বাবা যেন তার অনন্ত শক্তি দিয়ে নোতুনমার ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইতেন। অথচ আমরা সবাই জানতাম। সকলে জানত। বাবা কোর্ট থেকে ফিরে নোতুনমার জন্য বাজার করে দিয়ে আসতেন। আমাদের কোন দিন বলতেন না—বাজারটা দিয়ে আয়।

মাকে এজন্য কোনদিন কাঁদতে দেখিনি; আক্ষেপও করতে শুনিনি। বাবাকে এ বিষয়ে ক্ষোভ জানাতেও দেখিনি। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেও দেখিনি। বাবাকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি নি। মার প্রতি অবিচার বাবার প্রতি একটা অশ্রদ্ধা আনলেও সেটা কোন দিন বিদ্রোহের আকার নেয় নি। এখনও না।

বাবার বয়স হয়েছে। কোর্টে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন। ঘরে একটা ইজি-চেয়ারে বসে থাকতেন সব সময়।

চন্দনাই বাবার দেখাশোনা করে। খাবার দিয়ে আসে উপরে। বাবার কাজকর্ম চন্দনাই করে।

আমার সঙ্গে দেখা হত না বললেই চলে। চন্দনার কাছে থেকেই আমার খোঁজ নেয়।

একদিন অফিস থেকে ফিরে কলঘরে যাব চন্দনা বলল, বাবা তোমাকে একবার ডেকেছেন।

অনেকদিন পর উপরে গেলাম। বাবার ঘরটা যে এ বাড়িরই অংশ সেটা প্রায় ভুলে গিছলাম। ঘরটাকে অনেকদিন পর ভাল করে দেখলাম। চারদিকে একটা নিঃস্তব্ধতা, নিঃসঙ্গতা। উপরের ঘর হলেও স্যাঁতসেঁতে লাগছে। ভেজা ভেজা। কবিরাজি ঔষুধের গন্ধে বাতাসটা ভারী মনে হল।

—আমায় ডেকেছ?

—হ্যাঁ।

—কিছু বলবে?

—বলবার জন্যেই ত ডেকেছি। নিচের দুখানা ঘর ভাড়া দেব ভাবছি। ঘর দুটো ত পড়েই আছে।

—অসুবিধে আছে। আলাদা বন্দোবস্ত নেই। তাছাড়া ভাড়াটেই বা কি রকম আসবে কে জানে।

—কোর্টে যেতে পারি না। কিছু টাকা আসত—এই আর কি!

—কেন, চলে ত যাচ্ছে। তাছাড়া রমেনও মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছে।

—তাহলে তোমার মত নেই?

—না।

—বৌমারও কি মত নেই?

—থাকবে না এটাই আশা করব।

—আচ্ছা যাও।

নিচে চলে এলাম। কেন জানি বাবা অনেক নিস্তেজ মনে হল। মনে হল বাবা যেন অসম্ভব একাকী। কয়েকটা বই আর নিস্তব্ধতাকে সংগী করে দিন কাটাচ্ছেন।

ভাড়া দেওয়া হল না। তবু মনে হল বাবা কেন এসব চাইছেন। হয়ত রোজগার পড়ে গেছে বলেই কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে চাইছেন। আবার ভাবলাম, নোতুনমাই হয়ত এবাড়িতে এসে উঠবে। মার পবিত্র স্মৃতি কলুষিত হবে। রমেন হয়ত কোন দিনও এ বাড়িতে ঢুকবে না।

মাঝে মাঝে নোতুনমার খবর কানে আসে। নোতুনমার ফেলে আসা অতীতটা ভাল নয়। নোতুনমা আগে ছিল বিধবা। কি একটা মামলা করতে এসে বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু সেও বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে নরেশকাকা আমাদের বাড়িতে আসেন। নরেশকাকা বাবার মুহুরী। বাবা তাঁকে দিয়ে টাকা পাঠায় নোতুনমাকে। জানি না নোতুনমার এখন চলে কি করে।

আমার সঙ্গতি ছিল না এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার। অনেকদিন চিন্তা করেছি —আলাদা বাড়ি ভাড়া করব। সেখানে আমি আর চন্দনা শান্তিতে থাকব। আবার পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। সব দিক চিন্তা করে এ বাড়িতে থাকাই ঠিক হয়েছে।

এ বাড়ির সংসারটা আমাকেই চালাতে হয়। বাবা কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেছেন অনেকদিন। রমেন মাসে মাসে সামান্য টাকা পাঠায়। রসিদে কোন কথা লেখা থাকে না। যেন সে যে আমাদের টাকা পাঠায় এটা তার উদারতা।

মনে হয় মালগাড়ী চেপে চলেছি

...ও। একঘেয়ে দিনরাত। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের দোলায় চেপে মাস, দিন বছর অতিক্রম করছি।

ঘরের জানালা খুলে শুধু ঋতু বদলের পালা দেখি। তাকে উপলব্ধি করবার সময় নেই, অবসর নেই।

দমহীন লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে খেতে যখন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াই, তখন অনেক কথাই ভীড় করে আসে মনে। আমাদের গাঁয়ের সেই পুরনো শিবমন্দির। মন্দিরের পুরোহিতের মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। নাম ছিল সুধা। কতদূরে গেছি সুধার সঙ্গে খেয়াল নেই। সেই নীল নীল আকাশ, পাখির শিস্ দেওয়া দুপুর এখনও হাতছানি দেয়।

মামাবাড়ির কথা মনে পড়ে। নদীর চরে কাশফুলে যেন হিমবাহ ভীড় করেছে। ওপারে বার্নে'শ জংশনের অস্পষ্ট আলো। সব কিছু যেন কেমন উদাস করে দেয়।

কৈশোরের প্রথম আলোয় এসেছিল সুধা। সেই আমার জীবনে প্রথম ভালোবাসা।

এত বছর চন্দনার সঙ্গে ঘর করার পরও কেন যে সুধার কথা মনে হয়, বুঝতে পারি না। মনে হয় সুধা যেন অনেক বেশী ভালবাসত আমাকে।

পাশের বাড়ির মেয়ে সুধা। ইস্টিশানে একটা বকুল গাছ ছিল। দুজনে যেতাম বকুল ফুল কুড়োতে। কত বকুলগন্ধ ছড়িয়ে আছে আমাদের ভালবাসার পথে পথে। সুধাকে একদিন সেই পাখির শিস্ দেওয়া ভোরে 'বৌ' বলে ডেকেছিলাম। কেমন যেন অবশ হয়ে পড়ল ও। চোখে-মুখে যেন একটা অবসন্ন ভাব। থর থর করে কেঁপে উঠেছিল ওর শরীরটা। মনে হল এখুনি পড়ে যাবে ও। সেই প্রথম ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমিও যেন কেমন ভয় পেয়ে গেছলাম।

সুধা অনেকক্ষণ পরে স্বাভাবিক হল, শুধু বলল, ওসব বলতে নেই। যদি সত্যি না হয়।

—কিন্তু তুমি অমন হয়ে গেলে কেন?

—বুকটা যেন কেমন করে উঠল। মাথাটাও ঘুরে গেল।

—কিন্তু তোমাকে যে ভীষণ ভালবাসি সুধা।

—সেজন্যেই ত বেশী ভয়। জান, আমার যেন কেমন সব সময় ভয় ভয় করে। আমি যেন কেমন হারিয়ে যাই।

সত্যি সুধা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। অনেক ভীড়ে তাকে খুঁজে পেলাম না। আমরা মামাবাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। সুধাকে অনেক চিঠিও লিখেছিলাম। পরে আর কোন খবর পাইনি।

সুধার প্রতি আমার ভালবাসাটা কেন জানি চন্দনার প্রতি একটা সন্দেহ এনে দিয়েছিল। মনে হত চন্দনা যেন আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে। ভালবাসার লুকোচুরি খেলছে। হয়ত কাউকে ভালবাসত (তাকে পারেনি) আমার মত সাদামাটা রোজগেরে ছেলের সঙ্গে তার বাবা কেনই বা মেয়ের বিয়ে ঠিক করল?

বাবার প্রতিষ্ঠা—আমাদের বাড়ি—এটা কি তার মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

চন্দনাকে দেখেছি অনেক। তার চোখে মুখে কোন ইংগিত পাইনি। মনে হয়েছে আমার সন্দেহটাই ভুল। মেয়েটা খুব নিরীহ। বর্ষার আকাশে মেঘ ডাকলে ভয় পাওয়া পাখির মত এতটুকু হয়ে যায়। ভোরের আলোয় দেখেছি মরা বিনুনি কোলের মধ্যে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে চন্দনা। চোখে মুখে প্রশান্তি।

অফিস থেকে ফিরে দেখেছি বাতি জেলে বই পড়ছে চন্দনা। দুপুরবেলা ঘুমিয়েছে। কেমন যেন একটা ফোলা ফোলা মুখ। চোখ দুটো ভারী ভারী। আঁটসাঁট করে চুল বেঁধেছে।

—আমার কাছে কেউ এসেছিল?

—কে আবার আসবে।

—চিঠিপত্র এসেছে।

—বাবা লিখেছে।

—কি লিখেছে, তোমার মায়ের অসুখ?

—না, লতুর জন্যে একটা পাত্র ঠিক করতে বলেছে। আর কতদিন তারা মেয়েকে ঘরে রাখবে!

—কেন, তোমার দাদারা কি করছে?

—দাদাদের দিয়ে হল না বলেই তোমাকে লিখেছে।

—পাত্র যেন গাছের ফল, নাড়া দিলেই পাওয়া যায়!

—তাই লিখে দাও।

আবার হয়ত কোনদিন বলেছি, বেশ বাসর সাজিয়ে বসে আছ দেখছি, কার অপেক্ষায়? কেউ আসবে নাকি?

চন্দনা জ্বলে উঠেছে, কি কথার ছিরি হয়েছে তোমার। সকলকেই বন্ধুবান্ধব মনে কর।

হেসে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছি। —বৌএর সঙ্গে রসিকতা করব না ত কার সঙ্গে করব?

—রসিকতার একটা মাত্রা থাকে।

মাঝে মাঝে ভেবেছি চন্দনা না থাকলে কি করতাম আমি। রমেন নেই। বাবা উপরে চুপচাপ বসে থাকেন। চন্দনা গিয়ে খাবার দিয়ে আসে। বাবার কাজকর্ম সেরে দিয়ে আসে। বাবা নিচে একেবারে নামেনই না আজকাল। কেউ দেখা করতে এলে সোজা উপরে চলে যায়। নরেশকাকা মাঝে মাঝে যা আসেন। তাও বেশীক্ষণ থাকেন না।

বাবা, রমেন, চন্দনাকে নিয়েই আমার জগৎ। তবু এদের আমি আপন করে কাছে পাই না। ভাবি, আমি কি চেষ্টা করেছি ওদের কাছে পাবার। তাদেরও ত কিছু দিই নি। অর্থের দোহাই দিয়ে নিজেকে গোপন করে রেখেছি ওদের কাছে। নিজেকে করেছি স্বার্থপর।

রমেন এ বাড়িতে থাকুক, তাও ত চাইনি ভালভাবে। সে যখন আসে বড়ভাই হিসেবে আমারই ত উচিত তাকে কাছে টেনে নেওয়া। আমারই এগিয়ে যাওয়া উচিত তার কাছে। আমার কথা চন্দনাকে দিয়ে বলিয়েছি।

বাবার খবর মাঝে মাঝে নিই বটে, কিন্তু সেটাই কি যথেষ্ট। মার প্রতি অবিচারে বাবার কষ্টে আনন্দই পেয়েছি। নোতুনমাকেও ত ক্ষমা করতে পারি নি। চিরদিন তাকে বাবার রক্ষিতা বলেই ঘৃণা করে এসেছি। চন্দনাকেই বা কি দিয়েছি। অবিশ্বাসের বেড়াজালে তাকে দিনের পর দিন শাস্তি দিয়েছি। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে এসেছে কপটতা—পরস্পরকে ফাঁকি দেবার সুযোগ।

দিনের পর দিন সে অপেক্ষা করেছে নোতুন সম্ভাবনার। দেহ-মনে এসেছে ক্লেদ আর মাতৃহৃদয়ের হাহাকার।

এ বাড়িটা তাই ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়। চাপা, গুমোট একটা আবহাওয়ায় কতগুলো যান্ত্রিক মানুষ বাস করছে। নিঃশব্দে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে। রমেন এলেও তার পরিবর্তন হয় না। নোতুনমা এ বাড়িতে উঠে এলেও হবে না।

তবু জানি, রমেন এ বাড়ি ছেড়ে কোনদিন চলে যাবে না। এ বাড়িকে ঘিরেই তার অশান্তি, বিক্ষোভ ঘুরপাক খাবে।

প্রত্যেকটি প্রাণী যেন স্বতন্ত্র। তাদের মনপ্রাণ সব আলাদা। একটা জগতে একসঙ্গে বাস করছে শুধু।

কোন আলোড়নেই আমরা এই জলাভূমিটাকে ছেড়ে চলে যেতে পারব না। শক্তি নেই, ঝুঁকি নেবার সাহস নেই। আমরা পরস্পরের কাছে অথচ অনেক দূরে বন্দী হয়ে আছি নিজের গণ্ডিতে। কেউ কারো হাহাকার পর্যন্ত শুনতে পাইনে।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল

হাসির মজলিস

—তুমি আমাকে এত ভালবাস, কিন্তু আমি মরে গেলে তোমার যে কি হবে!

—পাগল হয়ে যাব।

—আবার বিয়ে করবে?

—কি করে এখনই বলি, পাগল হয়ে গিয়ে কি করব!

●

সুনন্দনন্দ রায়; কলকাতা-১৪।

ছেলেটির বুদ্ধির ওপর মাস্টারমশায়দের একেবারেই আস্থা ছিল না। একদিন একজন শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মূর্খলোক চিনতে পার কিভাবে?

ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তার প্রশ্নে।

●

এক সময়ে এক যুবকের ওপর ভার পড়েছিল জনৈক যুবতীকে তার বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার। পথে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের জন্য গল্প বলা শুরু করল। কিন্তু কত গল্প আর তৈরি করা যায়। কিছুক্ষণ পরে যুবকটি দেখল রাস্তায় একটি গাভী। যুবকটি বলে উঠল—গাভীটির চেহারা দেখে মনে হয় মাতৃরূপিণী।

যুবতী উত্তর করল—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! বাছুরের নিকট গাভী নিশ্চয়ই মাতৃরূপিণী।

●

—অনুগ্রহ করে ৬৫নং বেডের পেশেণ্ট মিঃ দত্ত কেমন আছেন জানাবেন? গত সপ্তাহে তাঁর অপারেশন হয়েছিল।

—ধরুন, দেখে এসে বলছি। (কিছুক্ষণ পরে) হ্যাঁ, মিঃ দত্ত বেশ ভালই আছেন। ক্রমশ তাঁর অবস্থার উন্নতি হোচ্ছে। কিন্তু আপনি কে বলছেন!

—আমিই মিঃ দত্ত। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ডাক্তারকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। তাই আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত।

●

নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়, রাঁচী।

এক বিধবা বৃদ্ধা। বয়স হয়েছে। চার ছেলে চার বৌ। নাতি-নাতনী। সুখের সংসার। বৃদ্ধা হঠাৎ অসুখে পড়ে শয্যাশায়ী। পাড়াপ্রতিবেশীরা, এমনকি ছেলে-বৌরা সকলেই বৃদ্ধা এ-যাত্রা আর রক্ষে পাবে না। ছেলে-বৌরা খুব সেবাযত্ন লাগল। প্রায় বছর ঘুরে গেল বৃদ্ধার কিন্তু সেই একই অব ছেলে-বৌরা পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছে। তারা এক কি পরামর্শ করে তার পরদিন খুব সকালে মাকে তুলসী কাছে এনে সবাই কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। বাক্‌বন্ধ তাদের কান্নার কারণ বুঝতে না পেরে মিটি-মিটি চাইতে লা পাড়াপ্রতিবেশীরা কান্না শুনে ভাবল বৃদ্ধা বোধহয় গ করেছে। এই ভেবে সবাই ছুটে এসে বৃদ্ধাকে বেঁচে থাকতে ছেলে-বৌদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। ছেলের বৌরা বলে উঠল—"মা আমাদের যা মরেছে, তার বেশী আর মরবে

●

প্রথম বন্ধু—আমি যা বলি সব মিথ্যা।

দ্বিতীয় বন্ধু—তুই মিথ্যাবাদী নিজে থেকেই স্বীকার কর

তৃতীয় বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে—তুই কি বোকা, ও যে-কথা তাও ত মিথ্যা।

●

শিক্ষক। এক-কে এক দিয়ে ভাগ করলে এক হয় আবা কোটিকে এক কোটি দিয়ে ভাগ করলেও এক হয়।

ছাত্র। তাহলে শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে এক হবে ত

●

অশোক চৌধুরীর আদ্রা

সেদিন একটা মাতালকে রাস্তায় টলতে টলতে দেখলাম এবং বলতে শুনলাম—মদ খেলে মানুষ খারাপ যায়, শরীর খারাপ হয়ে যায়, সংসার ভেসে যায়, তাই মদ মোটেই উচিত নয়। আমি বেশ আছি। কোন নেশাই নেই

●

সমীর মণ্ডল, পুরুলিয়া পলিটেকনিক:

বাবা—আচ্ছা, ছেলেমেয়েদের হাফ-টিকিট হবে?

টিকিট ক্লার্ক—হবে, চোদ্দর কম হলে।

বাবা—তাহলে তো ঠিক আছে, আমার মোটে আটটা।

মন দিয়ে দেখুন
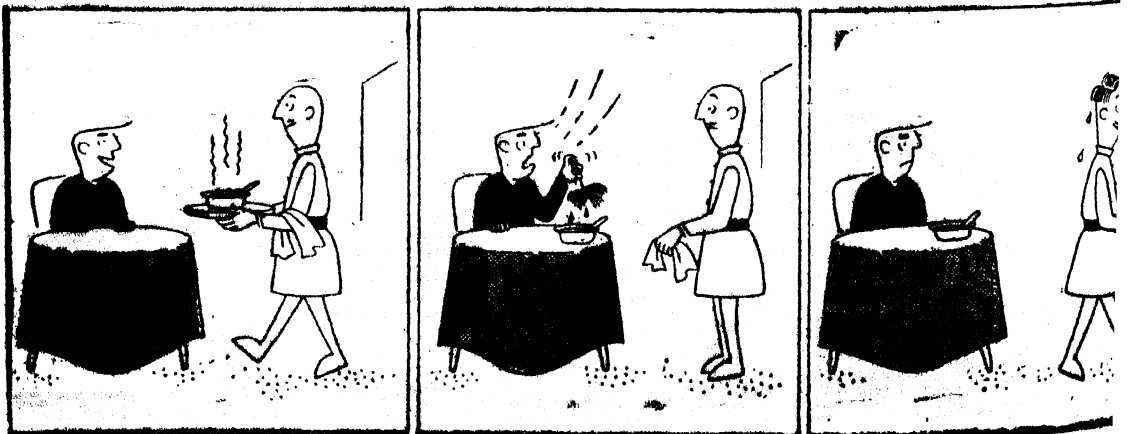
আপনি কি আদর্শ স্বামী?

হাজার হাজার স্বামী-স্ত্রীর আচরণ ই করে দেখা গেছে, মোটামুটি ছ' ধরনের ী এবং স্ত্রী আছেন মানুষের সমাজে। সকলেই এক-একভাবে জীবনসাথীকে বিব্রত করে রাখেন। অবশ্য বিব্রত ার জন্যেই কোনো স্বামী বা স্ত্রী তাঁর র ওপর কর্তৃত্ব করে, শাসন করে ত ঘটান না, একটা কিছু ভালো ভেবেই টা করে থাকেন। কিন্তু এই ভালো র মনোভাবটা নিয়ে ঠিক পরিষ্কার াপড়া থাকে না বলেই ঘটে যতো শান্তি। ছ'ধরনের স্বামী এবং স্ত্রীর রণ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একটু লোচনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

(ক) স্বার্থত্যাগী : এই ধরনের মানুষ ী বা স্ত্রীর জন্যে 'সবকিছু' স্বেচ্ছায় দিতে থাকেন এবং এই স্বার্থত্যাগ ়ে এগিয়ে যায় যে, জীবনসাথী তা করতে অপরাধী বোধ করেন নিজেকে। ধরনের মানুষ আকাশকুসুম কল্পনা ই থাকেন বেশিক্ষণ। সবকিছু দেওয়াটা াকম আত্মপীড়ন এবং নিদারুণ অভি- র পর্যায়ে চলে যায় বলে সেই দেওয়ার একটা বিষণ্ণতার গ্লানি জড়িয়ে পড়ে।

(খ) সমালোচনাপ্রিয় : এই ধরনের রা যখনই দেখেন তাঁর স্বামী বা স্ত্রী কোনো একজনের সম্পর্কে দুটো ভাল বলছেন, তখনই তীক্ষ্ণভাবে তার প্রতি- আর সমালোচনা শুরু করে দিতে চান। সম্ভবত সন্দেহবাতিক, তাই নিজেদের ন ছাড়া আর কারুর প্রশংসা এমনকি লোচনা সইতে পারেন না। এ'দের র্শমনাও বলা চলে।

(গ) বিদ্বেষীপ্রিয় : নারীবিদ্বেষী স্বামী পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রী যখন বিদ্বেষবাণ তে থাকেন, তখন এই ধরনের স্বামী ার স্ত্রীকেই এবং স্ত্রী নিজের স্বামীকেই নণের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে বসেন। জাতটাই তোমাদের এইরকম' কিংবা মজাতটার স্বভাবই অমনি'—এইভাবে ন্ত বেড়ে চলে।

(ঘ) আক্রমণপ্রিয় : এই ধরনের স্বামী স্ত্রী কোনো একটি নির্দোষ কথাকে তার সমর্থনে একে-তাকে দলে ভেড়ান, ারে একদিন এক সুযোগে অতর্কিতে কথাটি দিয়েই নিজের স্ত্রী বা স্বামীর না কাজের সমালোচনায় আক্রমণের য়াররূপে ব্যবহার করে খুব মজা পান। ন্ত স্ত্রী বা স্বামী এতে ক্ষুব্ধ এবং সংসারে বিষণ্ণতা জাগতে থাকে।

(ঙ) বাক্‌প্রিয় : অনেক স্বামী আছেন তাঁদের স্ত্রীকে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে াই বোঝাতে চান যে, তাঁরাই সব স সবচেয়ে ভাল বোঝেন এবং বাড়ীর াদ হয়ে তাঁরাই সব ব্যাপারে কথা বলেন। এ-ধরনের স্ত্রীও স্বামী সম্পর্কে সকলকে ফলাও করে খুব বলে বেড়ান। এর ফলে সবার মনে বিতৃষ্ণা জাগে।

(চ) প্রণয়প্রিয় : এইসব রোমান্টিক মানুষেরা কেবলই চুম্বন, হাতে হাত ধরা আর অবিরাম 'আমরা বিয়ে করে কত সুখী হয়েছি' এই ধরনের প্রণয়ভাষণ আর অনুরাগ আচরণের ধোঁয়াশায় নিজের স্বামী বা স্ত্রীর সত্যিকারের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিজের বিপুল অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে চলেন।

এবার নীচের প্রশ্নগুলি দিয়ে নিজেকে খানিকটা যাচাই করে দেখতে চান কি? শুধুই হ্যাঁ কিংবা না জবাব দিন'

১। একবার যদি ছেলেমেয়েদের সামনে কিংবা বাড়ীর আত্মীয়স্বজনের সামনে আপনার স্ত্রী কোনো একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তাহলে কি আপনি কখনো সেটা ওলটপালট করে দেখার চেষ্টা করেন? হ্যাঁ—না

২। কোনো বিশেষ কারণ না থাকলেও আপনি কি মাঝে-মধ্যে আপনার স্ত্রীকে ছোটখাটো এটা-সেটা উপহার এনে দেন? হ্যাঁ—না

৩) আপনি কি অন্তর থেকে বলতে পারেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীর ওপর বিশ্বাস রাখেন? হ্যাঁ—না

৪। আপনি কি গালগল্পজবকে অবহেলা অপছন্দ করেন? হ্যাঁ—না

৫। আপনার স্ত্রী যিনি ভিন্ন সমস্যাকে কিভাবে দেখেন এবং তা নিয়ে কিভাবে চিন্তা করেন, তা বোঝবার জন্যে আপনার স্ত্রীর জায়গায় মনে মনে নিজেকে বসিয়ে কখনো অবস্থা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন কি? হ্যাঁ—না

৬। যখন আপনার স্ত্রী কোনো বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন 'আমি খুব ক্লান্ত' এ-কথা না-বলার চেষ্টা আপনি করতে পারেন কি? হ্যাঁ—না

৭। আপনার সঙ্গিনীকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন কিংবা অন্ততঃ মাসে দুটো দিনও কোথাও বেড়িয়ে আসার বাঁধা নিয়ম করতে পেরেছেন কি? হ্যাঁ—না

৮। আপনি ঐ নিয়মটা ঠিকমতো মেনে চলতে পারছেন কি? হ্যাঁ—না

৯। আপনার স্ত্রীর আগ্রহের সঙ্গে মিলতে পারে, এমন কোনো নতুন আগ্রহ পছন্দ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন কি? হ্যাঁ—না

১০। আপনার কি মনে হয় প্রথম পরিচয়ের দিনগুলিতে যেমন সৌজন্য দেখাতেন, আজও আপনার স্ত্রীকে ঠিক তেমনই সৌজন্য আপনি দেখান? হ্যাঁ—না

১১। আপনি কি নিশ্চিত করে বলতে পারেন, গত সপ্তাহের মধ্যে আপনি একটি-বারও আপনার সঙ্গিনীকে একটিও কড়া কথা বলেননি, একটুও রূঢ় আচরণ করেননি? হ্যাঁ—না

১২। আপনার সঙ্গিনীর পোশাক-আশাক সম্পর্কে আপনি যে সত্যি সত্যি গভীর আগ্রহবোধ করেন, সে-কথা তাঁকে সার্থকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে অবাক করে দিতে পারেন কি? হ্যাঁ—না

১৩। 'এবার তোমার খুব বকুনি খেতে হবে'—এমন কথা আপনার সঙ্গিনীকে না-বলার চেষ্টা করেন কি? হ্যাঁ—না

১৪। আপনি যখন আপনার স্ত্রীকে বলেন, 'শোনো, আজ আমার অফিস থেকে বেরুতে দেরী হবে', তখন কি সবসময়ে সত্যি কথাই বলেন? হ্যাঁ—না

এবার হিসেব করুন :

যদি আপনি এই প্রশ্নগুলির দশটারও বেশিতে 'হ্যাঁ' জবাব দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পরীক্ষা করে দেখা উচিত আপনার মাথার চারিপাশে সেই পবিত্রতার স্বর্গীয় জ্যোতিটা ফুটে উঠেছে কিনা এবং দেখা দরকার সেই জ্যোতিটাকে আপনি যতটা উজ্জ্বল বলে মনে করেন, ততটা উজ্জ্বল হয়েছে কিনা।

আটটা থেকে দশটাতে 'হ্যাঁ' জবাব হলে : আপনি খুব চমৎকার স্বামী হয়ে গড়ে উঠেছেন। আপনি কি একটা বিষয় মনে রাখতে পারবেন যে, বিবাহ-জীবনে [illegible] [illegible] মন আর নতুন [illegible] [illegible] মন [illegible] রাখা। [illegible] [illegible] [illegible] উপভোগ্য হয়ে ওঠে যখন আপনারা [illegible] দের সুখসুবিধাগুলো [illegible] দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিতে পারেন, [illegible] দুর্ভাবনা না করে এটা-সেটা [illegible] খেতে পারেন এবং আসবাবপত্র [illegible] করে নেবার বৈচিত্র্য মেনে নিতে রাজী হন।

পাঁচটি থেকে আটটিতে 'হ্যাঁ' জবাব হলে : আপনি নিজেকে বুঝিয়ে বলুন, 'সাবধান হয়ে চলতে হবে। নিজের মর্যাদা রাখতে হবে।' [illegible] [illegible] [illegible] না। কথা দিয়ে কথা রাখবেন। আপনার [illegible] খোলা মনই রয়েছে, শুধু [illegible] বলে, আপনার বিবাহিত জীবন সহজভাবে [illegible] পথে চলতে পারছে না।

পাঁচটিরও কম 'হ্যাঁ' জবাব হলে : আপনার বিবাহিত জীবনে আপনার মনপ্রাণ দিয়ে সবটুকু দিচ্ছেন না। [illegible] ভালোবাসা আদর যত্ন সহানুভূতি আর মমতাবোধের প্রাণস্পর্শ [illegible] [illegible] সঙ্গিনীকে দিতে চেষ্টা করুন, তাহলে তাঁর সব অপূর্ণতা দূর হয়ে আপনার জীবনকেও পূর্ণ আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

বাহাদুর খাঁর সম্বর্ধনা

আলাউদ্দিন সংগীত সমাজের অধ্যক্ষ ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সম্মানার্থে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের নাতিদীর্ঘ হলটি লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল। এইটুকু সীমিত পরিসরের মধ্যেও এমন সীমাহীন আনন্দ পরিবেশনা সম্ভব হয়েছিল উদ্যোক্তাদের মুক্ত প্রাণের উদার আহ্বানে।

আলি আহমেদ খাঁর সারল্য এবং বিনয়ের ভাষণ চিত্তস্পর্শী। সভাপতির উজ্জ্বল অভিনন্দন এবং প্রধান অতিথি রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে আলাউদ্দিন ঘরানার বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত হলেও জানার মত বহু তথ্য পরিবেশন করতে পেরেছেন।

এমনই এক আবেগসিক্ত পটভূমিকায় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ বাজিয়ে শোনালেন স্বরচিত রাগ 'মায়াবতী'। সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, বর্ণাহারে এবং মাদকতায় সুরের আয়োজন বিস্তার করে শিল্পী প্রতিটি শ্রোতাকে যেন সম্মোহিত করে রেখেছিলেন।

বাহাদুর খাঁর বাজনা আগেও অনেক শুনেছি। সে বাজনায় কারুকার্যের অভাব ছিল না কিন্তু পান্ডিত্য প্রদর্শনই যেন প্রধান হয়ে উঠত। কিন্তু এবারের শিল্পীর পরিণত মনের পরিমিতিবোধে অলঙ্কার-চাঞ্চল্য সংহত, শুধুমাত্র ভাবপ্রকাশের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী অলংকার-বাহুল্যে রাগরূপকে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। কিরবাণীর আবেগ ও দরবারী কানাড়ার গাম্ভীর্যের মিলনে 'মায়াবতী' অপূর্ব এক মর্যাদামন্ডিত ভাবমূর্তি পেয়েছে। দ্রুতলয়ের বন্দেশ বাজনা শেষ হয়ে গেলেও আপন শক্তিতে মনের মধ্যে যেন গুঞ্জন করে। কোমল গান্ধার ও ধৈবতের পর মাঝে মাঝে কোমল নিখাদের চকিত স্পর্শ ভোলার নয়।

তবে ছন্দবৈচিত্র্যের যে চমকসৃষ্টি হয়েছে তার কৃতিত্ব অনেকখানি পাবেন অনিল ভট্টাচার্য। দক্ষহাতে বাঁয়ার সুরেলা বোল তবলার উঠান পড়ন শিল্পীকে যেন সুরসৃজনায় উন্মুখ করেছে।

মেদিনীপুরের বন্যাত্রাণ তহবিলের সাহায্যে শিল্পীবৃন্দের বিচিত্রানুষ্ঠান

মেদিনীপুরের বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহার্থে শিল্পীসংসদও এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রসদনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সেই জমজমাট আসর অনেকদিন মনে থাকবে। প্রধান অতিথি রাজ্যপালের কাছে গিয়েও শিল্পীরা বেশ মোটা দক্ষিণায় স্মারকগ্রন্থ বিক্রি করেছেন। সে দৃশ্যও রীতিমত উপভোগ্য।

সকল শ্রেণীর দর্শক ও শ্রোতা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলেন যে অনুষ্ঠানটির জন্য সেটি হল উত্তম-সুপ্রিয়ার দ্বৈত-সংগীত। বিশেষ করে এই আসরের জন্যই গানটি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর ও সংগীত-পরিচালনায় ছিলেন নচিকেতা ঘোষ। মঞ্চের মাঝখানে সুপ্রিয়া ও উত্তম সুদক্ষ অর্কেস্ট্রা পরিবেষ্টিত। গানের নির্দেশ দিচ্ছেন নচিকেতা ঘোষ। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে—বিচিত্র ভাষা ও অভিব্যক্তির অভিনন্দনে উত্তমকুমার অভিষিক্ত। নচিকেতা ঘোষ সুরটি সময়োপযোগী দিয়েছেন এবং শিল্পীযুগল তাঁদের কণ্ঠদান ও মুখভাবের ব্যঞ্জনা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে অনুষ্ঠানটি যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। ও'দের উদ্দেশ্য মহৎ, হয়ত সেই কারণেই উদ্যম সার্থক। সারা প্রেক্ষাগৃহের খুশীর বন্যাই তার প্রমাণ।

স্ব-মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর অনুষ্ঠানকে ভাবগ্রাহী করে তুলেছেন সুন্দর এবং রুচিমার্জিত কয়েকটি বাংলা কাব্যসংগীত ও সুরসমৃদ্ধ গান দিয়ে। শান্ত গম্ভীর কন্ঠে যেন রুচির ঐশ্বর্যকেই নিবেদন করলেন।

আরতি মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত, রাগসংগীত ও পূজা রেকর্ডের একটি গান সুখশ্রাব্য হয়েছে। মানব মুখোপাধ্যায়ের রাগভিত্তিতে পরিবেশিত গান সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরভরা কন্ঠের রবীন্দ্রসংগীত একটি মুহূর্তেই যেন শিল্পীর মনের আকাশকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলো। ইলা বসু তাঁর জনপ্রিয় 'গান ফুরানো জলসাঘরে' ছাড়াও একটি ঠুংরী গেয়ে শোনান। পরিশীলিত কন্ঠে ঠুংরীর সূক্ষ্ম কাজ এবং শিল্পীর মেজাজ সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য কন্ঠের গান আস্বাদন করার মতই মধুর. শিল্পী-পত্নী উৎপলা মুখোপাধ্যায় "মনের বর্ষা এল নয়নে"—গাইবামাত্রই জমে উঠেছিল। ভক্তদের চাহিদা অকৃপণ ঔদার্যে পূর্ণ করেছেন মান্না দে। প্রায় ঘন্টাধিক প্রলম্বিত অনুষ্ঠানে ইনি প্রতিটি শ্রোতার অনুরোধে সাড়াই শুধু দেননি। গান গেয়ে আনন্দও পেয়েছেন। শুনলাম যাওয়া-আসার ব্যয়ভার নিজেই বহন করে ইনি সাহায্যরজনীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। এ ধরনের শিল্পীজনোচিত মনোভাব অবশ্যই শ্রদ্ধেয়। শ্রীমতী অমলাশঙ্করের পরিচালনায় উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের শিষ্যারা ভারতনাট্যম, লোকনৃত্য এবং শঙ্করধারার নৃত্যে নিজেদের নৃত্যমান সমুন্নত রেখেছেন। ভঙ্গিসুষমায় দর্শকের দৃষ্টি [illegible] ভাবে আকর্ষণ করেছেন মমতাশঙ্কর কুমারী জিন। ভারতনাট্যমের [illegible] অঙ্গ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন ক[illegible] জয়শ্রী সেন।

শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের [illegible] স্পন্দিত কন্ঠে কবিগুরুর ক[illegible] সুনির্বাচিত কবিতা শিল্পীযুগলের উদ্বেলতার আবেগে প্রতিটি মুহূর্তকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সুধীন্দ্রনাথ[illegible] একটি কবিতা বসন্ত চৌধুরীর উদাত্ত[illegible] সু-পরিবেশিত। বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট [illegible] কৃষ্ণ ভদ্রের হাস্যকৌতুকে জীবন্ত হ[illegible] সারা অডিটোরিয়ামে হাসির [illegible] ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। এছাড়াও পর্দার জনপ্রিয় শিল্পীরা প্রথম থেকে [illegible] অবধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে [illegible] অনুষ্ঠান ঘোষণায় অংশগ্রহণ করে [illegible] এবং উদ্যোক্তা উভয় পক্ষেরই অ[illegible] কারণ হয়েছেন।

এমন আনন্দভরা অনুষ্ঠানে[illegible] মেয়র ও শিল্পীসংসদ অবশ্যই ধন্য[illegible]

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে[illegible] আসন্ন উৎসব

সম্প্রতি এক ঘরোয়া সাংবাদিক স[illegible] তানসেন সঙ্গীত সঙ্ঘের [illegible] শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন [illegible] সঙ্গীত সম্মেলনের এক বিশদ বিবর[illegible] করলেন। ৮ ডিসেম্বর থেকে ১৪ [illegible] অবধি মহাজাতি সদনে ৭ দিনব্যা[illegible] সম্মেলনে দুটি সারা রাত্রির আসর ([illegible] ১৪) ছাড়াই ৮ই ডিসেম্বর বেলা ১[illegible] ৫টা অবধি একটি দিনের আসরের [illegible] থাকবে যাতে শ্রোতারা দিনের বেলায় [illegible] শোনবার সুযোগ পান।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও এক [illegible] আয়োজন করেছেন সঙ্গীতানুরাগী[illegible] দের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের জন্য। [illegible] কিনে সম্মেলন শোনার সঙ্গতি যাঁ[illegible] তাঁরা বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার [illegible] মহাজাতি সদনের তিন তলার প্রা[illegible] আসন তাঁদের জন্যই সংরক্ষিত থাক[illegible] কোন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সুপারি[illegible] এখানে প্রবেশাধিকার পাবেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল [illegible] প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলনে, তারও [illegible] বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আরও [illegible] সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে শ্রীশৈলেন[illegible] পাধ্যায়ের নিজস্ব সঙ্গীতচিন্তা "মা[illegible] সহিত রাগরাগিণীর তুলনা-র" উদ[illegible] আলোচনা গুণীমহলের অভিন[illegible] করেছে। কন্ঠসঙ্গীতে ছিলেন [illegible] পাধ্যায়, সহযোগী শিল্পীরা হলে[illegible] ঘোষ (বেহালা), বনোয়ারীলাল (আ[illegible]

সেতার), লালজী শ্রীবাস্তব (তবলা) এবং কৃষ্ণলাল মুখার্জি (হারমোনিয়াম)। এই থিওরী অবলম্বনে সম্প্রতি শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'সঙ্গীতদীপিকা' নামে এক পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে।

সম্মেলনে যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন—পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, সরাফৎ হোসেন খাঁ, গোলাম মুস্তাফা খাঁ, মুণাব্বর খাঁ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, মানিক বর্মা, সুনন্দা পট্টনায়ক, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মালবিকা কানন, শিশির গুহ, নিতাইলাল সান্যাল, দীপালি গুহ, শ্যামলী বসু, কল্পনা চন্দ (কণ্ঠসঙ্গীত), ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, বিসমিল্লা খাঁ, শ্যাম গাঙ্গুলী, বলরাম পাঠক, ইমারৎ খাঁ, গৌর গোস্বামী, বাহাদুর খাঁ, রবীন ঘোষ, আলি হোসেন, মৃন্ময় ধর, কল্যাণী রায় (যন্ত্রসঙ্গীত)। সঙ্গতে আছেন—ওস্তাদ আহমেদ জান থেরাকোয়া, পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ, পণ্ডিত লালজী শ্রীবাস্তব, ওস্তাদ কেরামৎ খাঁ, অনিল রায়চৌধুরী, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় (তবলা)। সারেঙ্গীঃ—মহম্মদ সগীরুদ্দিন, লছন খাঁ, বাচ্চালাল, রামনাথ মিশ্র, মহেশ-প্রসাদ। নৃত্যে—মন্দাকিনী মালব্য (পুণা), কুমার বচনলাল এবং কুমারী রুচি।

সঙ্গীত কলা মন্দিরে সরোজা দেবী সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি সঙ্গীত কলা-মন্দিরের কারু-কার্যময় শিল্পশ্রীমণ্ডিত প্রেক্ষাগৃহে সরোজা-দেবী ও সম্প্রদায়ের ভারতনাট্যম ও অন্যান্য প্রাচ্য নৃত্যানুষ্ঠান উপহার দিয়েছিলেন সঙ্গীত কলা-মন্দিরের সভাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষ আমন্ত্রণের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কলকাতায় ধর্মঘট এবং অন্যান্য অশান্তিকর পরিস্থিতির কারণে নাগরিকজীবন বিড়ম্বিত, তবু এখানে আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পথ বেয়ে আনন্দ দেবার বিচিত্র আয়োজন। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি এই অনুরাগ আছে বলেই পারিপার্শ্বিকের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রেরণালাভ করি। কিন্তু দর্শক সংখ্যার অনুপাতে বিরাট প্রেক্ষা-গৃহের সংখ্যা নিতান্ত কম। সঙ্গীত কলা-মন্দিরের রুচিমার্জিত বিরাট রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক সংকুলানের বিস্তৃত ক্ষেত্র এ অভাব অনেকটা পূর্ণ করবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী সরোজা, কুমুদা ও রাজেশ্বরী আলারিপু, গোবিন্দগোয়া ইত্যাদি ভারতনাট্যমের বিভিন্ন অঙ্গ ছাড়াও মীরাভজন (কুমুদা) দোহিয়া কেজা (সরোজা) জিপসী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবের নৃত্যরচনা প্রদর্শন করে সর্বশেষে মঞ্চস্থ করলেন 'দুষ্মন্ত শকুন্তলা'।

সুপরিশীলিত সাঙ্গীতিক পটভূমিকায় তিস্র, আদি, রূপকম তালের বিভিন্ন ছন্দে এঁদের নৃত্যে দক্ষিণভারতীয় শিল্পীর সহজাত নৃত্যদক্ষতা মুদ্রিত। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে শ্রীমতী সরোজার নমনীয় দেহভঙ্গী ও শ্রীমণ্ডিত বিভিন্ন নৃত্যের অঙ্গ। এঁদের বেশভূষার আরো একটু রুচির পরিচয় থাকলে খুসী হতাম। নৃত্যের বহিরঙ্গের দক্ষতার সঙ্গে অন্তরে প্রবেশের গভীরতার মিলন ঘটেনি বলেই হয়ত মনে দীর্ঘস্থায়ী কোন ছাপ ছিল না।

ময়ূরভঞ্জে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বিচিত্রানুষ্ঠান

ময়ূরভঞ্জ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসো-সিয়েশনের সভ্যরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের গৃহ-নির্মাণকল্পে ৯ এবং ১০ নভেম্বর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সুরবাব), শিশিরকণা ধরচৌধুরী (বেহালা), ওস্তাদ শওকত আলি খাঁ (সুরশৃঙ্গার) রাধাকান্ত মোহান্তি (কণ্ঠসংগীত), ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ (কণ্ঠসংগীত) এবং ভদ্রকের মনোরম সঙ্গীত পরিষদ কথক, ওড়িশী, লোকনৃত্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু সুন্দর—বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যুলবুল চৌধুরীর তবলাসঙ্গতে শিশিরকণার বেহালা।

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি

এলাহাবাদ প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৯শে নভেম্বর থেকে। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তানসেন সংগীত সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় আহূত হয়েছেন তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ 'মানব জীবনের সহিত সঙ্গীতশিল্পের সম্পর্ক'—উদাহরণসহ আলোচনাচক্রে পেশ করতে। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন এলাহাবাদের বনোয়ারীলাল (সেতার), তবলায় লালজী শ্রীবাস্তব, বেহালায় রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হারমোনিয়মে কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়।

—চিত্রাঙ্গদা
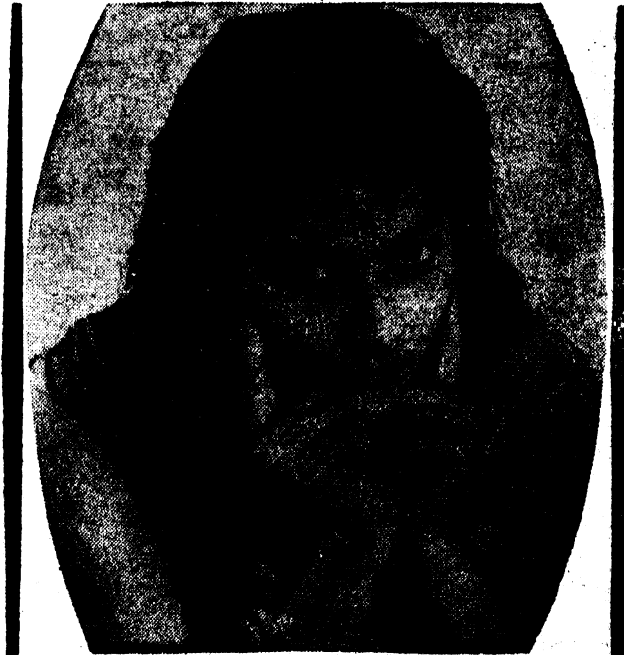
রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের কাছ থেকে
পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রযোজক অসীম দত্ত।

পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়কে পুরস্কার
দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

বৌদি (বাংলা) : পুণ্যে
প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন, ৩,৬৫৭·৬০ মিট
দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ, প্রযোজনা
ভুবনমোহন সাহা, রচনা ও পরিচালনা
দিলীপ বসু, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গী
রচনা : প্রণব রায়, সঙ্গীতপরিচালনা
রবীন চট্টোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ : দেওজীভা
শব্দানুলেখন : সুনীল ঘোষ, সঙ্গীতান
লেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসু
ঘোষ, শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরক
সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়, নেপথ্য ক
সংগীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা ব
ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রূপায়ণ : সন্ধ
রাণী, লিলি চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, প
দেবী, বনানী চৌধুরী রাজলক্ষ্মী দে
সলিল চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্য
বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যা
অনুপকুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, প্র
মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায়, সু
দাস, মাস্টার শঙ্কর, মাস্টার বাপী প্রভৃ
এস বি ফিল্মস এর পরিবেশনায় গেল
নভেম্বর, শুক্রবার থেকে রাধা, পূর্ণ, আ
ছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হ

বর্তমান যুগের বাঙালীর সমাজজী
শিক্ষাদীক্ষা, ধন-সম্পদ, রুচিনীতিতে
বহু স্তরে বিভক্ত। এই কলকাতা শহ
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অত্যধিক আ

হেতু বহু বাঙালী পরিবারের ছেলেমেয়েরা একদিকে যেমন পার্টিতে যায়, টুইস্ট বা বল নাচে যোগ দেয়, ধূমপান ও মদ্যপান অভ্যস্ত হয়, তেমনই আবার অন্যদিকে প্রচুর বিত্তবান পরিবারের পুত্র-কন্যারা কলেজীয় শিক্ষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এক বিরাট একান্নবর্তী সংসারে থেকে ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার বা স্ল্যাকসও জিনস-এর ধারেকাছেও না গিয়ে নিজেদের কাপড় পাঞ্জাবী ও শাড়ী-ব্লাউজে ভূষিত করে এবং বাড়ীর দোল-দুর্গোৎসবে যোগ দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় দিন যাপন করে। আজ একদিকে যেমন বহু পরিবারের মেয়েই আফিসে, স্কুলে চাকরী করে অর্থোপার্জনে নম দিয়েছে, অন্যদিকে এমনও রক্ষণশীল বহু পরিবার রয়েছে, যাদের মেয়েরা প্রচুর উচ্চ-শিক্ষা সত্ত্বেও অর্থোপার্জন করে সংসারের ধন-ভাণ্ডারকে পুষ্ট করার কথা ভাবতেই পারে না। রুচি ও চিন্তাধারার বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কগুলিরও নব মূল্যায়ন হচ্ছে। আজ প্রগতিশীল পরিবারে মাও যেমন সন্তানদের কাছে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' রূপে পূজিত হন না, বাপও তেমনই 'স্বর্গ, ধর্ম, পরমন্তপ' বলে স্বীকৃত হন না। আলোকপ্রাপ্তা বৌদিদিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের স্বামী নামক গৃহপালিত জীবটিকে তাঁদের বাপের বাড়ীর দিকে বেশী করে নজর দেওয়াতে ব্যস্ত থাকেন, যার ফলে ভদ্রলোকের কাছে আসল বাপ-মা-ভাইয়ের চেয়েও আইনত বাপ-মা-ভাই (ফাদার ইন ল', মাদার ইন ল' ও ব্রাদার ইন ল') বেশী প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। কদাচিৎ কোনো বৌদি হয়ত দেওরের সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যা মিষ্ট হাসি-ঠাট্টা মাধ্যমে প্রকট হয়ে অম্লান মাধুর্যকেই উৎসারিত করে। আজ কি শহর, কি মফস্বল—গোটা বাঙলা দেশে এমন একজন বৌদির সাক্ষাৎ পাওয়া ভাগ্যের কথা, যিনি স্নেহময়ী মায়ের চোখ দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দেবরের মঙ্গলের জন্যে যথাসর্বস্ব পণ করে নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দেন। সব প্রকার আধুনিকতা সত্ত্বেও, স্বার্থের কুটিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েও আমরা সকলেই—বাঙালী মাত্রই সেই নিঃস্বার্থপরতার জীবন্তপ্রতিমা, মাতৃরূপা বৌদিকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে লালায়িত। শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'বিন্দুবাসিনী' 'গঙ্গামণি' বা 'নারায়ণী'র সমগোত্রীয় মাতৃসমা বৌদিদিদের আমরা ভালো না বেসে পারি না। তাই পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন 'বৌদি' আমাদের হৃদয়কে করেছে আলোড়িত ও মুগ্ধ এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙালী দর্শকমাত্রই 'বৌদি'কে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা উত্তমকুমার

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নার্গিস

ফুলবাড়ীর গ্রামের যজ্ঞেশ্বর চাটুজ্জের ছেলে হরিচরণের স্ত্রী সরমা তার একমাত্র দেবর অজয়ের উচ্চশিক্ষা লাভকে সম্ভব করবার জন্যে নিজের শিশু সন্তানদের পর্যন্ত বঞ্চিত করে যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা সরমাকে মহিমাময়ী করে তুলেছে। ছোট ভাইয়ের অর্থের প্রয়োজন মেটাতে হরি যখন চুরির অপরাধে জেলে যায়, তখন অজয়ের কাছে প্রকৃত তথ্য গোপন করে সরমা যেভাবে নিজেকে ওই ঘৃণ্য অপরাধের কারণ স্বরূপ বলে অজয় দ্বারা বৃথা লাঞ্ছিত হয়, তা সরমার চারিত্রিক মহিমাকে অধিকতর উজ্জ্বল করে তোলে। তাই বহু দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনা ভোগের পর আবার যখন বৌদি-দেওরে, ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলন হয়, তখন দর্শকের মন খুশীতে ভরে ওঠে। কাহিনী-বিস্তারের মধ্যে হয়ত কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এ সকলকে ছাপিয়ে কাহিনীর সামগ্রিক আবেদন দর্শকের মনকে করে পরিপ্লুত, হৃদয়কে

করে আবিষ্ট, মথিত। এবং এইখানেই 'বৌদি' ছবির সার্থক সাফল্য।

অভিনয়ে নিঃসংশয়ে সন্ধ্যারাণী একাই বৌদি সরমার ভূমিকাভিনেত্রীরূপে ছবির অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছেন। দুঃখ-ব্যঞ্জক দৃশ্যগুলিতে তাঁর বেদনার্ত রূপ দর্শক-অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না। দুঃখের দৃশ্যগুলিকে অন্তরস্রাবী করে তুলতে তাঁর সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় হরির চরিত্র-চিত্রণে। অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকাশপাতাল ভাবনা তাঁর দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দেবর অজয়রূপে অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজয়ের বাকদত্তা কমলারূপে লিলি চক্রবর্তী, ফ্যাক্টরী কর্মী ও সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী শংকরের ভূমিকায় অনুপকুমার, ধনী রমণীমোহন বেশে কমল মিত্র, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে বিকাশ রায়, কমলার পিতা হরগোপালের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল এবং পোস্ট-মাস্টারবেশী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকায় প্রয়োজনীয় নাটনৈপুণ্য প্রদর্শনে ত্রুটি করেননি। অর্থপিশাচ বীরেশ্বরের ভূমিকায় কালীপদ চক্রবর্তীর অভিনয় হয়েছে জীবন্ত। অপরাপর ভূমিকায় মলিনা দেবী (বীরেশ্বর পত্নী), রাজলক্ষ্মী দেবী (বাড়ী-ওয়ালী), কমলা চৌধুরী (ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মালিকের স্ত্রী), পদ্মা দেবী (হরগোপালের স্ত্রী), তরুণকুমার (পরীক্ষায় ক্রমাগত ফেল্ করা মেসের যুবক), জহর রায় (জেলের গান-গাওয়া আসামী), মাস্টার শংকর (চন্দন), মাস্টার বাপী (রতন) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন ও প্রশংসনীয়। ছবিতে চার ধরনের চারখানি গান আছে; চারটিই সুগীত ও সুরসমৃদ্ধ। কিন্তু কোনো গানই কাহিনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে নি। "জুতিপালিশওয়ালাবাবু" গান-খানি অতীতকালের জনপ্রিয় গান "একটি পয়সা দাও গো বাবু" (শাপমুক্তি)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্রুত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর সাধারণ বাঙালী গৃহের জীবনধারার অন্যতম নিদর্শন বৌদির স্নেহ-বেদনাভরা পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্স-এর "বৌদি" বাঙালী দর্শক-মাত্রকেই অভিভূত করবার ক্ষমতা রাখে।

সন্ত তুকারাম (হিন্দী) : অশোক ফিল্মস্-এর নিবেদন; ৩,৯৯২·৮৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : আর এ পুরিয়া; প্রবর্তনা : হীরালাল, আর জৈন; পরিচালনা : রাজেশ নন্দা; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : পণ্ডিত গিরীশ; সঙ্গীতপরিচালক : বেদ পাল; গীত-রচনা : ভারত ব্যাস ও মধুকর রাজস্থানী; চিত্রগ্রহণ : রাজকুমার ভকরী; সঙ্গীতানু-লেখন : বি এন শর্মা ও কৌশিক; শিল্প-নির্দেশনা : হীরাভাই প্যাটেল; সম্পাদনা : বি এস গ্ল্যাড; নৃত্যপরিচালনা : বদরীপ্রসাদ; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফী ও মান্না দে; রূপায়ণ : সাহু মোদক, বি এম ব্যাস, রোহিতকুমার, বদরীপ্রসাদ, অনীতা গুহ, মধু আপ্তে, হেলেন প্রভৃতি। ফিল্ম অ্যান্ড ফিল্মস্ (ইন্ডিয়া)র পরিবেশনায় গেত ২৯ নভেম্বর, শুক্রবার থেকে জনতা, গণেশ, খান্না, কালিকা, ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

মহারাষ্ট্রীয় সন্ত তুকারামের জীবন আমরা ছেলেবেলায় স্কুলের নীচু ক্লাসের বাঙলা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি। মনে আছে নিরীহ তুকারামের হাত থেকে আখ গাছটি কেড়ে নিয়ে তার কোপনস্বভাবা স্ত্রী যখন তাই স্বামীর পিঠে ঘা কতক বসিয়ে দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দু' টুক্রো করে ফেলেছিল, তখন তুকারাম শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন : ভালোই হোলো, এর আধখানা তুমি খাও, আধখানা আমি খাই। সেই নিরীহ, শান্ত ভগবদ্ভক্ত মানুষটির জীবন চরিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাওয়ার প্রতি একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল আমাদের মনের মধ্যে। বিশেষ করে, আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে পুণার প্রভাত ফিল্মস্ মারাঠী ভাষায় সন্ত তুকারামের জীবনীচিত্র নির্মাণ করে যে প্রচুর যশ অর্জন করেছিলেন, সে-কথা আজও আমাদের মনে আছে।

কিন্তু অশোক ফিল্মস্ নির্মিত হিন্দী ছবি "সন্ত তুকারাম" আমাদের সে আগ্রহকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করেছে। তুকারামের জীবনীর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বহু আদর্শকে চিত্রকারেরা দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু চলচ্চিত্রশৈলী যে বিশেষ জ্ঞানটি থাকলে কাহিনী অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকচিত্তকে ধীরে ধীরে অধিকার করা যায়, ছবিটি কয়েকটি অসংলগ্ন এবং ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ঘটনা বলীর দলিল না হয়ে একটি ঘাত প্রতিঘাতময় সুডৌল কাহিনীনাট্যের চিত্ররূপরূপে প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানটির একান্ত অভা

ছায়া দেবী

সম্পাদনা । সুবোধ রায়

ব্যবস্থাপক । রতন চক্রবর্তী

চিত্রগ্রহণ । বিমল মুখার্জী

সিংহ পরিচালিত

মিনার বিজলী ছবিঘরে
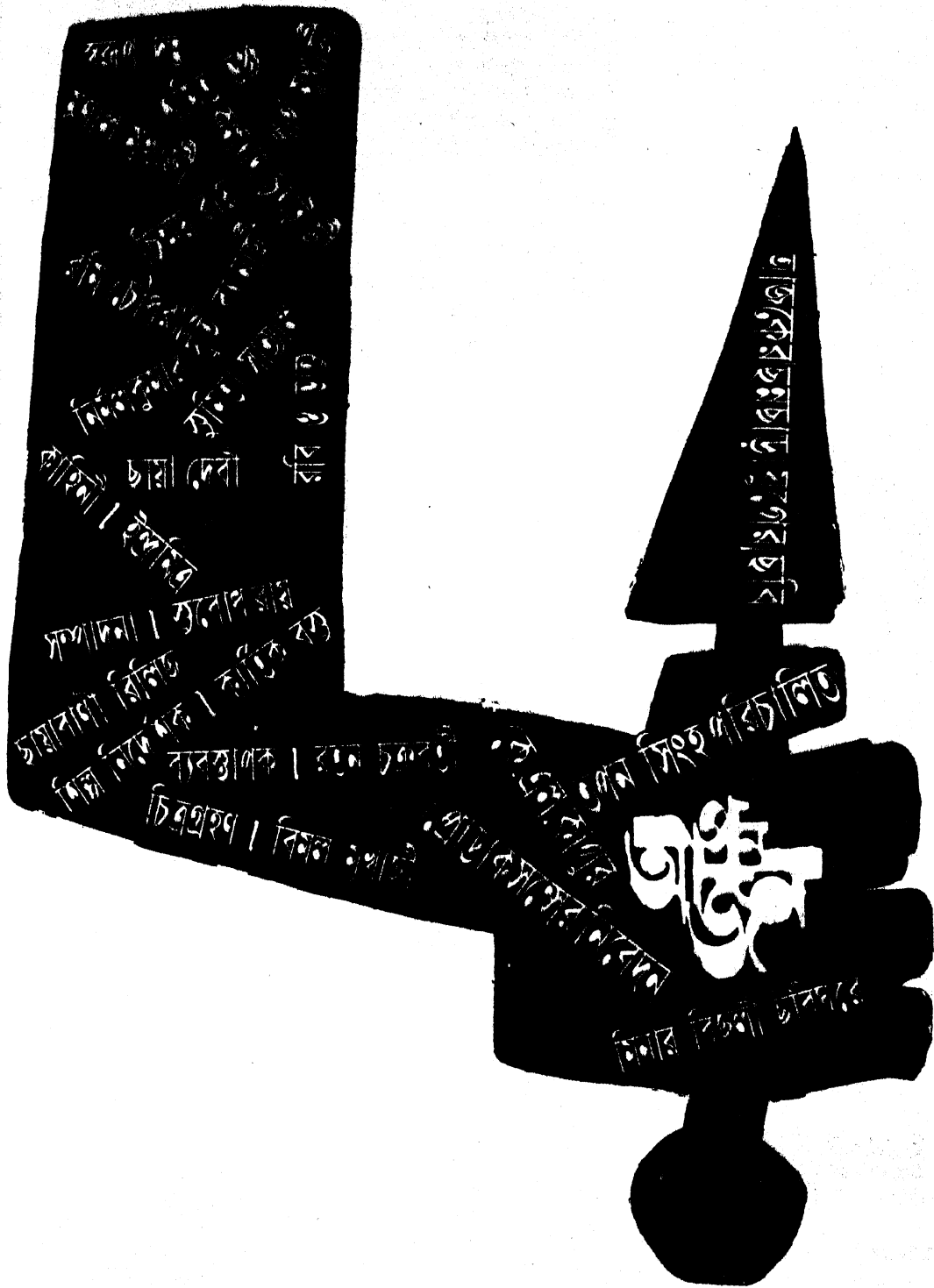
করে আবিষ্ট, মথিত। এবং এইখানেই 'বৌদি' ছবির সার্থক সাফল্য।

অভিনয়ে নিঃসংশয়ে সন্ধ্যারাণী একাই বৌদি সরমার ভূমিকাভিনেত্রীরূপে ছবির অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছেন। দুঃখ-বাজক দৃশ্যগুলিতে তাঁর বেদনার্ত রূপ দর্শক-অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না। দুঃখের দৃশ্যগুলিকে অন্তরস্রাবী করে তুলতে তাঁর সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির চরিত্র-চিত্রণে। অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকাশপাতাল ভাবনা তাঁর দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দেবর অজয়রূপে অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজয়ের বাকদত্তা কমলারূপে লিলি চক্রবর্তী, ফ্যাক্টরী কর্মী ও সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী শংকরের ভূমিকায় অনুপকুমার, ধনী রমণীমোহন বেশে কমল মিত্র, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে বিকাশ রায়, কমলার পিতা হরগোপালের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল এবং পোস্ট-মাস্টারবেশী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকায় প্রয়োজনীয় নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনে ত্রুটি করেননি। অর্থপিশাচ বীরেশ্বরের ভূমিকায় কালীপদ চক্রবর্তীর অভিনয় হয়েছে জীবন্ত। অপরাপর ভূমিকায় মলিনা দেবী (বীরেশ্বর পত্নী), রাজলক্ষ্মী দেবী (বাড়ী-ওয়ালী), নমিতা চৌধুরী (ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মালিকের স্ত্রী), পদ্মা দেবী (হরগোপালের স্ত্রী), তরুণকুমার (পরীক্ষায় ক্রমাগত ফেলকরা মেসের যুবক), জহর রায় (জেলের গান-গাওয়া আসামী), মাস্টার শঙ্কর (চন্দন), মাস্টার বাপী (রতন) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন ও প্রশংসনীয়। ছবিতে চার ধরনের চারখানি গান আছে; চারটিই সুগীত ও সুরসমৃদ্ধ। কিন্তু কোনো গানই কাহিনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে নি। "জুতিপালিশওয়ালাবাবু" গান-খানি অতীতকালের জনপ্রিয় গান "একটি পয়সা দাও গো বাবু" (শাপমুক্তি)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্রুত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর সাধারণ বাঙালী গৃহের জীবনধারার অন্যতম নিদর্শন বৌদির স্নেহ-বেদনাভরা পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্স-এর "বৌদি" বাঙালী দর্শক-মাত্রকেই অভিভূত করবার ক্ষমতা রাখে।

সন্ত তুকারাম (হিন্দী) : অশোক ফিল্মস্-এর নিবেদন; ৩,৯৯২·৮৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : আর এ পুরিয়া; প্রবর্তনা : হীরালাল, আর জৈন; পরিচালনা : রাজেশ নন্দা; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : পণ্ডিত গিরীশ; সঙ্গীতপরিচালক : বেদ পাল; গীত-রচনা : ভারত ব্যাস ও মধুকর রাজস্থানী; চিত্রগ্রহণ : রাজকুমার ভকরী; সঙ্গীতানু-লেখন : বি এন শর্মা ও কৌশিক; শিল্প-নির্দেশনা : হীরাভাই প্যাটেল; সম্পাদনা : বি এস গ্ল্যাড; নৃত্যপরিচালনা : বদরীপ্রসাদ; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফী ও মান্না দে; রূপায়ণ : সাহু মোদক, বি এম ব্যাস, রোহিতকুমার, বদরীপ্রসাদ, অনীতা গুহ, মধু আপ্তে, হেলেন প্রভৃতি। ফিল্ম অ্যাণ্ড ফিল্মস্ (ইণ্ডিয়া)র পরিবেশনায় গেল ২৯ নভেম্বর, শুক্রবার থেকে জনতা, গণেশ, খান্না, কালিকা, ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

মহারাষ্ট্রীয় সন্ত তুকারামের জীবনী আমরা ছেলেবেলায় স্কুলের নীচু ক্লাসের বাঙলা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি। মনে আছে, নিরীহ তুকারামের হাত থেকে আখ গাছটা কেড়ে নিয়ে তার কোপনস্বভাবা স্ত্রী যখন তাই স্বামীর পিঠে ঘা কতক বসিয়ে দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দু' টুকরো করে ফেলেছিল, তখন তুকারাম শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন : ভালোই হোলো, এর আধখানা তুমি খাও, আধখানা আমি খাই। সেই নিরীহ, শান্ত ভগবদ্ভক্ত মানুষটির জীবন-চরিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাওয়ার প্রতি একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল আমাদের মনের মধ্যে। বিশেষ করে, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে পুণার প্রভাত ফিল্মস্ মারাঠী ভাষায় সন্ত তুকারামের জীবনীচিত্র নির্মাণ করে যে প্রচুর যশ অর্জন করেছিলেন, সে-কথা আজও আমাদের মনে আছে।

কিন্তু অশোক ফিল্মস্ নির্মিত হিন্দী ছবি "সন্ত তুকারাম" আমাদের সেই আগ্রহকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করেছে। তুকারামের জীবনীর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বহু আদর্শকে চিত্রকারেরা দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু চলচ্চিত্রশৈলীর যে বিশেষ জ্ঞানটি থাকলে কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকচিত্তকে ধীরে ধীরে অধিকার করা যায়, ছবিটি কয়েকটি অসংলগ্ন এবং ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ঘটনা-বলীর দলিল না হয়ে একটি ঘাত প্রতিঘাত-ময় সুডৌল কাহিনীনাট্যের চিত্রকল্পরূপে প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানটির একান্ত অভা

ছায়া দেবী
সম্পাদনা । সুবোধ রায়
ছায়াবাণী রিলিজ
শিল্প নির্দেশক । কার্তিক বসু
ব্যবস্থাপক । রতন চক্রবর্তী
চিত্রগ্রহণ । বিমল মুখার্জী
তপন সিংহ পরিচালিত
মিনার বিজলী ছবিঘরে
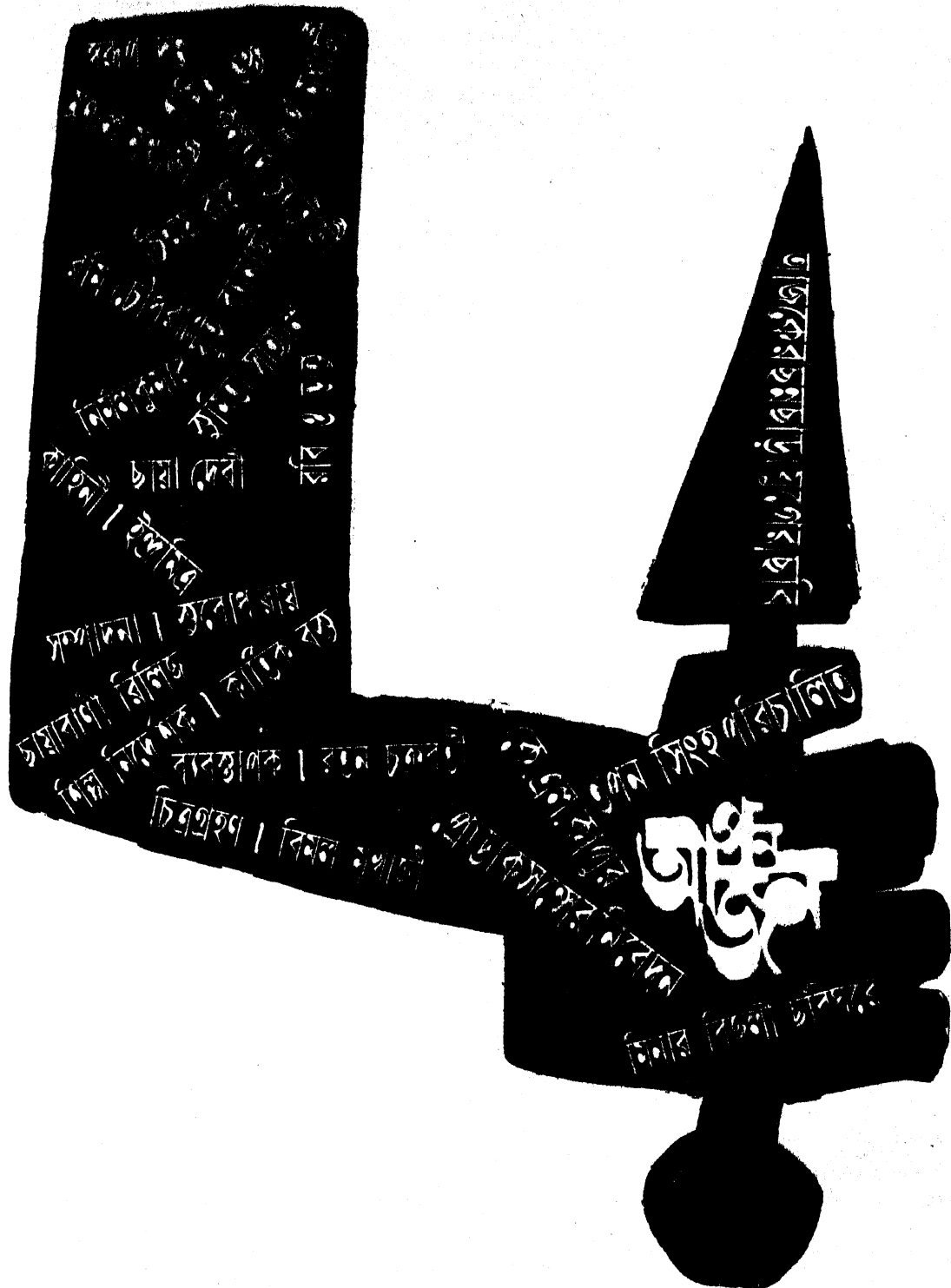
পরিলক্ষিত হল ছবির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। তাই ছবিটির কোনো কোনো দৃশ্যের সংলাপ নৈতিক আদর্শ তুলে ধরার জন্যে কিছুটা হৃদয়গ্রাহী হলেও সমগ্র ছবিটির সঙ্গে আমরা কোনো সময়েই একাত্ম হয়ে উঠতে পারি নি। বিদেশীরা যেখানে পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল, ভারতীয়রা সেখানে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তিতে বিশ্বাসী—এই বক্তব্যকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট করবার জন্যে "সন্ত তুকারাম"-এর মতো ভক্তজনের জীবনী-চিত্রের শুরুতেই ব্যায়ামবীরদের মাংসপেশী-ময় চেহারা, ছুটন্ত অশ্বপৃষ্ঠে সৈনিকদের অগ্রগতি, বিমান থেকে বোমা বর্ষণ প্রভৃতি দৃশ্য দেখানো যে ছবির আবহ সৃষ্টির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর, এ-জ্ঞানও চিত্র-নির্মাতার নেই। কোন্ নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে শান্ত শিষ্ট তুকারাম সর্বজনপূজ্য সন্ত তুকারামের পদে উন্নীত

তরুণ অপেরার হিটলার যাত্রাভিনয়ের একটি দৃশ্য

হয়েছিলেন তারই একটি বিশ্বাস্য হৃদয়-গ্রাহী চিত্র দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করবার পরিবর্তে চিত্রনির্মাতারা বহু অলৌকিক ঘটনার অর্থাৎ সস্তা ভেল্কীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ-ছাড়া সনাতন আচারনিষ্ঠ ধর্মমতের সঙ্গে তুকারামের 'রামকৃষ্ণহরি' কীর্তনরূপী প্রেমাত্মক ভজনপূজনের বিরোধের উপর চিত্রকাহিনীকে বিস্তৃত না করে গ্রামের এক গণেশ-পূজারী, অর্থগৃধ্নু মুম্বাজীর অকারণ ব্যক্তিগত শত্রুতাকে বড়ো করে দেখানোর উদ্দেশ্য সহজবোধ্য নয়। চিত্রটিতে দুঃখ, মৃত্যু, আকাল প্রভৃতির দৃশ্য হঠাৎ এসেছে, হঠাৎ গেছে; কাজেই দর্শকরা দৃশ্যগুলি সম্পর্কে নির্বিকার থেকেছেন। চিত্রায়ণের দিক দিয়ে এতখানি ব্যর্থতার নিদর্শন সাম্প্রতিক কোনো ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় নি। অথচ ছবিটি রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বহু মন্ত্রীর কাছ থেকে প্রশংসাবাণী আদায় করেছে এবং কয়েকটি রাজ্যে প্রমোদকরমুক্তও হয়েছে। কিন্তু কি গুণে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

অতীতে ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক ছবির জনপ্রিয় নায়ক সাহু মোদক বর্তমানে তাঁর শরীরে প্রচুর মেদ সঞ্চয় করার ফলে রীতিমত স্থূলাঙ্গের অধিকারী। তিনিই অবতীর্ণ হয়েছেন তুকারামের ভূমিকায়। অভিনয় অবশ্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছেন এবং তাঁর বাচনও সংবেদনশীল। তুকারাম-পত্নী জিজাবাইয়ের ভূমিকায় অনীতা গুহ চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। শিবাজীর ভূমিকাভিনেতাকে মানিয়েছে চমৎকার। কিন্তু এ-ছাড়া মুম্বাজী, শঙ্কর শেঠ প্রভৃতি সকল ভূমিকাভিনয়ই হয়েছে উচ্চগ্রামে ও মঞ্চ-ঘেঁষা।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে তিরিশ বছর আগেকার পুরাতন রীতি অনুসৃত হয়েছে। আঁকা-পশ্চাদ্‌পটের সামনে খোলা সেট-এ অভিনয় আজ অচল। ছবির অধিকাংশ গানই ভক্তিরসাশ্রয়ী এবং সেই কারণে তাদের মাদকতা আছে।

ব্যাটল্ অব অ্যালজিয়ার্স (অ্যাল্-জিরীয়) : কাস্‌বা ফিল্মস্ (অ্যাল্‌জিয়ার্স) এবং আইগর ফিল্মস্ (রোম)-এর যুগ্ম নিবেদন; পরিচালনা : গিলো পন্টি-কোর্ভো; চিত্রনাট্য : ফ্রাঙ্কো সালিনার; চিত্রগ্রহণ : মার্সেলো গ্যাটি; সঙ্গীত-পরিচালনা : এনিও ম্যারিকোনে, গিলো পন্টিকোর্ভো এবং রিজোলি। সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা, ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট, সিনে সেন্ট্রাল প্রভৃতি প্রতি-ষ্ঠানের উদ্যোগে প্রদর্শিত।

অ্যালজিরিয়ার স্বাধীনতাকামী নাগরিকেরা ফরাসী ঔপনিবেশিকদের শৃংখলবন্ধন থেকে ১৯৫৪'র নভেম্বরে যে বিদ্রোহের শুরু করেছিল এবং ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্বে যে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে ১৯৬২'র জুলাই মাসে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছিল, গিলো পন্টিকোর্ভো সমগ্র অ্যালজিয়ার্সবাসীদের সহযোগিতায় তাকেই বাস্তবরূপে তুলে ধরেছেন এই চিত্রটির মাধ্যমে। বিদ্রোহাত্মক প্রতিটি ঘটনাকে এবং ফরাসী সরকারের দমনাত্মক প্রতিটি কার্যকে এমন পক্ষপাত-শূন্য অথচ গভীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পুনরভিনীত করানো তথ্যচিত্রনির্মাণ-বিষয়ক দক্ষতার পরিচায়ক। "ফল অব বার্লিন"-এর বাস্তবতাও বোধ করি এর ঐতিহাসিক নিষ্ঠার কাছে পরাজিত। আলোকচিত্রশিল্পী মার্সেলো গাটি নিউজ ক্যামেরাম্যানের মনোবৃত্তিকে পুরোভাগে রেখে ছবির প্রতিটি ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছেন বলেই দর্শক মনে এর প্রতিক্রিয়া এমন তীব্রভাবে বাস্তবধর্মী।

ণী

বর

র

র একটা মাস মাত্র বাকি বছর শেষ
বাংলা ছবি তো এ বছর খুব একটা
ই না। তবে আনন্দের ব্যাপার হোল,
ট বেরিয়েছে তার প্রত্যেকটিই মোটা-
বে 'বাজার' পেয়েছে শুধুমাত্র দু-
ব্যতিক্রম ছাড়া, ব্যবসায়িক দিক থেকে
এটা সুলক্ষণ নিশ্চয়ই। এবারে বেশী
বেরোতে না পারার কারণ অবশ্য
অর্ধেকটাই এবার অস্বাভাবিক
মধ্যে কেটেছে। এর মধ্য থেকেও
ছবির আর্থিক সাফল্য নিঃসন্দেহে
ক। তার ওপর আবার রাষ্ট্রীয়
রের বড় ভাগটাই এবারে এসেছে
দখলে। নতুন বছরের আবার নতুন
আসবে। সংকট আছে অনেক সংকট
শ্চমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি তো
।

সপ্তাহে টালিগঞ্জে স্টুডিও পাড়ায়
চাঞ্চল্য ছিল এ সপ্তাহে তা কিছুটা
। সোমবার থেকে একটানা প্রায় পর
াঁচদিন পীযূষ বসুর স্বর্ণশিখর
র সেট পড়েছিল ক্যালকাটা মুভি-
ডিওয়, তারপর আবার শেষ দুদিন
ই ব্যাক প্রোজেকশন হলো নিউ
দু নম্বরে। সব কটা দিনই মাধবী
হাজির ছিলেন। শ্রীমতী মুখার্জীর
। তারিখ, কাজেই শনিবারের মধ্যে
সম্ভব কাজ শেষ করে ফেলতে
, পীযূষবাবুরই তাই চেষ্টা।
ন এ ছবির বিভিন্ন দিনে যে সব
অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে
রূপ দত্ত, তরুণকুমার, দিলীপ
া ভট্টাচার্য, মাধবী মুখার্জী ও
য়কজন।

ুতী দেবী জানালেন তাঁর ছবির
মুটি শেষ, শুধুমাত্র কটা দিনের
র কাজ বাকি। তাও আর এখন
দেরী হবে কিছুদিন। এ সুযোগে
ণের কাজটা করে নিতে চান
শুক্রবার দিন দেখা গেল
দেবীর ঘরে তারই এক মহড়া
ৃদংগ, খোল, করতাল, বাঁশী
য়। কে এল কাপুর প্রোডাকসনের
ও রৌদ্র' ছবির বিভিন্ন চরিত্রে
সু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত,
াটার্জী, অমিত ভঞ্জ, আরতি
ান মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা। এ
ীতপরিচালনা অরুন্ধতী দেবীর

ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজিত
বসু পরিচালিত তারাশংকরের
ারপ্রাপ্ত "আরোগ্য নিকেতন"
ছবিটি পূর্বভারতীয় অঞ্চলে নির্মিত
১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে জাতীয়
চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছে। উক্ত ছবিটি
বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। ২০-এ নভেম্বর
দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে
ছবিটির প্রযোজক অরোরা ফিল্মের পক্ষে
অরুণ বসু, পরিচালক বিজয় বসু, প্রধান
শিল্পী বিকাশ রায় ও প্রচারউপদেষ্টা
শ্রীপঞ্চানন দিল্লী গিয়েছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত
মঞ্চ সফল নাটক "আগন্তুক" চিত্রায়িত হতে
চলেছে। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ও
টৌল ফিল্মস ইণ্ডিয়ার যুগ্ম প্রযোজনায়
"সারথী" গোষ্ঠীর পরিচালনায় ছবির চিত্র-
গ্রহণ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হবে।
সেই উপলক্ষে গেল ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা
৬টায় বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের
সানুগ্রহ অনুমতিতে ঐ মঞ্চেই মহরৎ দৃশ্য
গৃহীত হয়েছে। আড়াইশো রজনীরও বেশী-
দিন এই "আগন্তুক" নাটক জনসমাদর লাভ
করেছে। উক্ত নাটকটি চিত্রায়িত হলে আরও
বহু দর্শক এই দেশাত্মবোধক গুপ্তচর-
বিরোধী কাহিনীটা দেখবার সুযোগ পাবেন।
যে শক্তিমান শিল্পীগোষ্ঠী মঞ্চে অভিনয়
করছেন, তাঁদের অনেককেই ছবির পর্দায়
দেখা যাবে।

পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীর পরবর্তী
ছবিটির নাম হলো "রূপসী"। ছবিটির
কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরি-
চালক শ্রীগাঙ্গুলী নিজে। সংগীতবহুল
এই ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব
নিয়েছেন প্রবীণ সুরকার অনিল বাগচী।
আগামী ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম
ল্যাবরেটরীজে ছবিটির ৫খানি গান রেকর্ড
করা হচ্ছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গান-
গুলিতে কণ্ঠদান করবেন—শ্যামল মিত্র,
মানবেন্দ্র মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, অনিল
বাগচী ও অধীর বাগচী।

ছবিটির চিত্রগ্রহণ ডিসেম্বরের মাঝা-
মাঝি সুরু হবে।
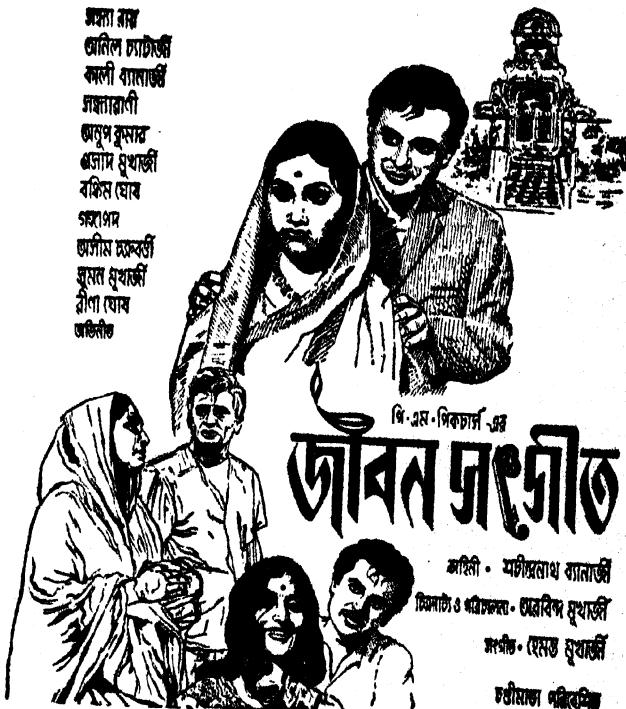
কলকাতার মেয়র কর্তৃক সংগঠিত বিপর্যস্ত নিবেদিত উত্তরবঙ্গ বন্যায় দুর্গতদের জন্য ত্রাণ ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে রণজি স্টেডিয়ামে স্টার নাইটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর এবং মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুনীল দত্ত।

মঞ্চাভিনয়

গত ১০ নভেম্বর সিটি কলেজের (বাণিজ্য বিভাগ) অ্যাম্বুলেন্স কোরের বাৎসরিক উৎসবে যাদবপুরের 'যাযাবর নাট্য-গোষ্ঠী' বনফুলের 'কবয়ঃ' নাটকখানি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। পরিবেশনার গুণে নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী শীতল মুখোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, অমল সরখেল। নাটকটি পরিচালনা করেছেন শ্রীতপন চক্রবর্তী।

সম্প্রতি 'পোস্টমাস্টার' ও 'বশীকরণ' নাটক দুখানির সফল পরিবেশনের পর সুপরিচিত দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী অজিত সেনের 'বসুন্ধরা জাগো' নাটকখানি উপহার দিতে চলেছেন। রূপক-সাংকেতিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বসুন্ধরা জাগো' বিশ্বশান্তির ভিত্তিতে রচিত। বিষয়বস্তু, সংলাপ ও প্রয়োগের দিক থেকে দর্পণ গোষ্ঠী অভিনবত্বের দাবী করছেন। মানুষের সামনের পথ আজ দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে সুন্দর জীবনের অরুণোদয়, অপর দিকে মৃত্যুর চির-অন্ধকার। কিন্তু বেছে নিতে হবে একটি পথ—জীবন অথবা মৃত্যু। অভিনয়ে আছেন অশোক বসাক, শ্যামলী দাশগুপ্ত, শিব ঘোষ, উমা গুহ, তপন চট্টোঃ, শ্যামল মুখোঃ, শ্যামল বসাক, পিন্টু শর্মা ও সুদাম রাহা।

আগামী ৯ ডিসেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সুন্দরম্ নাট্য-সংস্থা "শব্দরূপ ধাতুরূপ" নাটকটির পুনরাভিনয়ের আয়োজন করছে। আলোকসজ্জায় বিমল দাস, মঞ্চ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। নাটক-সংগীত-নির্দেশনায় পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা সংগীত ও নাটকের মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব বিল্ডিং-এ ১২ অকটোবর। সেদিন সদস্যরা দিলীপ বসাক রচিত ও পরিচালিত 'পদ্ম পাতায় জল' নাটকটি অভিনয় করলেন শিল্পীদলে ছিলেন—কমলারঞ্জন দাস, জয়-দেব দত্ত, রবীন ভট্টাচার্য, রামরঞ্জন সেন, অপূর্ব মুখার্জি, যোগেশ দে, দিলীপ বসাক ও মধু মজুমদার। আবহসং[illegible]

ন্ষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বজিৎ, ার, কানন দেবী, আরাধনা, সৌমিত্র াধ্যায়, ওয়াহেদা রহমান, সুস্মিতা া, বাবুই বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, রায়, নন্দিতা বোস, সুনীল দত্ত, দ ও মধুমতী। ফটো : অমৃত।

া—প্রতুল জোয়ারদার, প্রদ্যুৎ চ্যাটার্জী, দ করণহাই। সংগীতাংশে ছিলেন— ঘোষাল, ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, নগেন দেবনারায়ণ দত্ত, রবীন রায়, দীপক ও সত্যেন ঘোষ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কর বসু।

ণনাট্য মহল' পরিচালিত একাংক ও গ নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ারী মাসের শেষের দিকে। অনু- করার ঠিকানা : দাস ব্রাদার্স', ঘোলা ািেড, ঘোলা, ২৪-পরগণা।

শীলব' পরিচালিত একাংক নাট্য াগিতা ১২ই জানুয়ারী থেকে শুরু যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ই বর।

ূপ-মহল' নাট্যসংস্থা 'চন্দ্রনাথ', বাবা', 'চাণক্য', 'রিজিয়া' ও 'বৈকুন্ঠের মঞ্চস্থ করবেন। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় । গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন ার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মাধব াধ্যায়, মণি শ্রীমাণি, গীতশ্রী দেবী, ক্ষ্মী (ছোট) সুচিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌধুরী, রণেন ঘোষ, সুবাস বসু, । বসু, কাজল সেন এবং চিত্র ও গতের বিশিষ্ট শিল্পীরা।

টকখানির সংগঠনে, সঙ্গীতে ও পরি- য় আছেন যথাক্রমে—কাজল সেন, ১ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীলবরণ।

ারত-সোবিয়েত সংস্কৃতি সমিতির । সদস্যরা মিখাইল শলোকের এ্যান্ড য়ট ফ্লোজ দি ডন উপন্যাসের বঙ্গা- ন বহে ধীরে মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ ন। প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের কায় সুবিস্তীর্ণ কাল এবং অগণিত ও চরিত্রের সমন্বয়ে রচিত এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন লাহিড়ী। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ক প্রয়োজনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন

'লক্ষ্ণৌর বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক তি' পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতি- গিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ২রা সেম্বর। প্রতিযোগিতা শুরু হোচ্ছে ১৪ই সেম্বর।

বিবিধ সংবাদ

তপন সিংহ পরিচালিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'আপনজন' এবং অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত নির্মীয়মান ছবি 'মেঘ ও রৌদ্রের প্রযোজক সংস্থা কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের কর্মকর্তারা গেল ২৩ নভেম্বর, শনিবার একটি মনোজ্ঞ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। পরিচালক শ্রীসিংহ সাংবাদিকদের কাছে সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার পরে সংস্থার পক্ষে শ্রীমালহোত্রা সানন্দে জানালেন যে, চিত্রপ্রযোজনায় ব্রতী হবার আগে তাঁরা এই বিশেষ ব্যবসায়টি সম্বন্ধে যে-সব ভীতিজনক কথা শুনেছিলেন, শ্রীসিংহকে পরিচালকরূপে নিয়োগ করে 'আপনজন' ছবিটি সমাপ্ত করার পর তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারছেন যে, যে-কথাগুলি তাঁদের কানে এসেছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই প্রযোজনা-ব্যবসায়ে শ্রীসিংহকে পেয়ে তাঁরা এমনই উৎসাহিত এবং আশান্বিত বোধ করছেন যে, তাঁরা শিগগিরই শ্রীসিংহের পরিচালনাধীনে একখানি রঙীন হিন্দী ছবি নির্মাণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে জলযোগের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল এবং সংস্থার তরফে শ্রীমালহোত্রা ছাড়াও রাজকাপুর, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও মিস্টার শাহ সাংবাদিকদের তত্ত্বাবধানে যত্নবান ছিলেন।

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘের ২৪তম বাৎসরিক উৎসবে অভিনীত শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি নাটকের একটি দৃশ্যে কেতকী দত্ত, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, দীপক মুখোপাধ্যায়।

ব্যবসায়িক চিত্রগৃহ মারফত প্রধানত হলিউডী ছবি ছাড়া বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নত চলচ্চিত্রসৃষ্টির সঙ্গে সাধারণ দর্শকের পরিচয়লাভের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। কলকাতার বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির সভ্য না হলে—যা হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য—ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, হল্যান্ড, সুইডেন, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশের চলচ্চিত্রগুলির সঙ্গে ইচ্ছাসত্ত্বেও সাক্ষাৎলাভ করা যায় না। সরকারী উদ্যোগে আজ পর্যন্ত যে তিনটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছে (১৯৫২, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে), তাদের প্রদর্শনীক্ষেত্র সীমিত ছিল কয়েকটি চিত্রগৃহের মধ্যে। অথচ চলচ্চিত্রচেতনা সাধারণ দর্শকদের মধ্যে যে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। এমন অবস্থায় নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি রাজা সুবোধ মল্লিক (ওয়েলিংটন) স্কোয়ারে অন্তত চার হাজার দর্শকের বসবার স্থান করে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা বসাচ্ছেন ১৪ ডিসেম্বর থেকে, তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। দশ দিন স্থায়ী এই মেলায় বাঙলা একখানি (সুবর্ণরেখা) ও হিন্দী একখানি (১৯৪০-এ নির্মিত আওরাৎ) ছবি ছাড়া আটটি বিভিন্ন দেশের আটখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র দিনে দুবার (৫-৩০ ও ৮-১৫-তে) করে দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রদর্শনীসূচী হচ্ছে : (১) সুবর্ণরেখা, বাঙলা—১৪ই, (২) এ লাইভ ট্রাক, বুলগেরিয়া—১৫ই, (৩) বাইসিকল থীফ, ইতালী — ১৬ই, (৪) ইউকিওয়ারিস, জাপান—১৭ই, (৫) অক্টোবর, ইউ এস এস আর—১৮ই, (৬) ইউ অ্যান্ড ইয়োর প্যাল, জি ডি অর—১৯এ, (৭) টু হাফ টাইমস ইন হেল, হাঙ্গারী—২০এ, (৮) দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার, সুইডেন—২১, (৯) বার্থ সার্টিফিকেট, পোল্যান্ড—২২এ এবং (১০) আওরৎ, হিন্দী—২৩এ ডিসেম্বর।

নাট্যকার মন্মথ রায়কে সভাপতি ও চিত্রসাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্তকে সম্পাদক পদে বৃত করে একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক মধু বসু এই মেলাটির উদ্বোধন করবেন। দশ দিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র মেলায় প্রবেশলাভের জন্য অত্যন্ত সামান্য দক্ষিণা ধার্য করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কর্মকর্তারা।

৩ নভেম্বর ১৯৬৮ ভবানীপুর তানসেন সংগীত মহাবিদ্যালয় ভবনে টাকী সম্মিলনী কর্তৃক বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে এক আনন্দানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ঊর্মিমালা ঘোষের আবৃত্তি, শ্রীমতী এনাক্ষী ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত ও শ্রীমতী মীনাক্ষী বসুর কীর্তন ও শ্যামাসংগীত বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে সুরকার শ্রীমোহনলাল দাশের আধুনিক, ভাটিয়ালী ও বাউল সংগীত, শ্রীনবচন্দ্রের শ্যামাসংগীত ও কবি ফিরোজ চৌধুরীর স্বরচিত কবিতা ও আবৃত্তিও উপভোগ্য হয়। তবলায় সংগত করেন শ্রীবিশ্বনাথ হালদার ও শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ। সম্মিলনীর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীরমণীমোহন রায়চৌধুরী ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত সভ্য ও অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়ন করেন।

বেতার শ্রুতি

ক্লাব, সংঘ আর সমিতির সংগে শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত সকল বাঙালীরই মোটামুটি একটা পরিচয় আছে। এ বিষয়ে বড়োদের চেয়ে ছোটোদেরই উৎসাহ আর উদ্দীপনা বেশি। বাংলাদেশের নিভৃততম পল্লীগ্রামেও শিক্ষার একটু একটু আলো দেখা পাঁচজন ছেলে চেয়েচিন্তে যোগাড় করা রং-চটা দাগ-ওঠা জাল-ছেঁড়া একটা ক্যারম বোর্ড, ঘুঁটি-হারানো দুভাগ-হওয়া একটা সাপ লুডো আর বেলের আঠা দিয়ে খবরের কাগজের মলাট দেওয়া পাঁচটা ডিটেকটিভ বই আর তিনটে ছড়ার বই নিয়ে ক্লাব করে, সংঘ গড়ে, সমিতি খোলে। দু-দশ টাকা চাঁদা উঠল তো শহর থেকে একটা ফুটবলও আনিয়ে নিল—নইলে বাতাবি লেবুই সই।

এই রকম খেলাধুলোর, বই পড়ার, নাটক করার, সাঁতার কাটার অনেক ইয়ুথ ক্লাব, সবুজ সংঘ আর মিলন সমিতির সন্ধান মেলে বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামে। বাংলার বাইরে ভিন্ন রাজ্যেও আর কখনও না হোক, পুজোর সময় অন্তত একটা সমিতি গড়ে ওঠে। পুজোর সংগে থিয়েটার হয়, গান হয়।

শহর কলকাতায় তো পাড়ায় পাড়ায়, কথায় কথায় সংঘ আর সমিতি। বণিক-সংঘ, বাড়িওয়ালা সমিতি, ভাড়াটে সমিতি, ট্রেনযাত্রীদের অ্যাসোসিয়েশন, ছাত্রদের সংগঠন।

কিন্তু যাঁরা খেলা দেখেন কিংবা সিনেমা দেখেন অথবা জলসা শোনেন তাঁদের কোনো ক্লাব, সংঘ, সমিতি, অ্যাসোসিয়েশন, ফেডারেশনের কথা জানা যায় না। সম্প্রতি গৌহাটি থেকে খবর এসেছে যে, সেখানে একটি রেডিও-শ্রোতা ক্লাব আছে। ক্লাবটা আন্তর্জাতিক ক্লাব, এবং ক্লাবের সভাপতি জানিয়েছেন যে, আসলে তাঁদের দুটো ক্লাব—একটা ওয়ার্ল্ড রেডিও লিস্নার্স ক্লাব, অপরটা ভয়েস অফ জর্মেনী লিস্নার্স ক্লাব।

এই আন্তর্জাতিক রেডিও ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারত আর ভারতবাসীদের সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রেডিও কী বলে তা শোনা এবং ভারত-জার্মান মৈত্রী সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানা। পৃথিবীর বড়ো বড়ো তিরিশটি দেশের বেতার-কেন্দ্র নাকি ইতিমধ্যেই এই ক্লাবটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ক্লাবটি ১৯৬৭ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের কথা ও সংস্কৃতিজগতের খবরাখবর জেনে নিয়ে এবং নিজেদের খবর তাঁদের দিয়ে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। এবং আজ এটি দক্ষিণ এশিয়ার রেডিও মনিটরিং ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদানপ্রদানের একটি প্রথম শ্রেণীর রেডিও ক্লাব বলে পরিগণিত হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ ধরনের ক্লাব আরও অনেক দেশে আছে এবং তাঁদের সংগে চিঠিপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকা বিনিময় করে তাঁরা গভীর সংযোগ স্থাপন করেছেন। ক্লাবটির খবর আকাশবাণী ছাড়া অন্য অনেক দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝেই নাকি প্রচারিত হয়—যেমন সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, মিশর, সিংহল, উত্তর ভিয়েৎনাম, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।

ক্লাবটি আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে গৌহাটিতে একটি সর্ব-ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক রেডিও-শ্রোতা ক্লাব সম্মেলনের আয়োজন করেছেন বলে জানিয়েছেন। সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে স্বদেশের ও বিদেশের বহু রেডিও-শ্রোতা ক্লাবের ও বেতার-কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। এই ধরনের সম্মেলন ভারতে এই প্রথম।

ক্লাবটি এই কাজে অন্যান্য দেশের মতো আকাশবাণীরও সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। কিন্তু আকাশবাণীর ডিরেক্টর-জেনারেল নাকি একটি চিঠিতে তাঁদের খুব 'তারিফ' করলেও সহযোগিতা করতে 'নারাজ' হয়েছেন। ক্লাবটি ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে নানাপ্রকার সহযোগিতা পাচ্ছেন, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো সাড়া পাননি বলে আক্ষেপ করেছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি—সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে তাঁরা আলোচনাচক্র, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুস্তক ও পত্রিকা প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র প্রদর্শন ছাড়াও কতকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন—যেমন ডাকটিকিট, মুদ্রা, কিউ-এস-এল কার্ড, রচনা ও সাধারণ জ্ঞান। প্রতিযোগিতায় পুরস্কারেরও ব্যবস্থা আছে। যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর।

এই সময়ে ডিক্স-কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া গঠন করা ছাড়াও একটি অভিনব জিনিসের আয়োজন করা হয়েছে—ভারত আর পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যেসব বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলা ও হিন্দী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেইসব বেতার-কেন্দ্রের মধ্যে শ্রোতাদের বিচারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসাবে তিনটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নির্বাচন। যে কোনো শ্রোতা তাঁর নির্বাচনের সমর্থনে বাংলা ও হিন্দীর জন্য আলাদা আলাদা কাগজে কয়েকটি লাইন লিখে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

ডিক্স-কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার যেসব লক্ষ্য তাদের মধ্যে তিনটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রতি দু' বছর অন্তর ভারতীয় ভাষার সম্প্রচারকদের জনপ্রিয়তা নির্ধারণে ভোটগ্রহণ, কাউন্সিলের বুলেটিন মারফৎ ভারতের বাইরে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান জনপ্রিয় করে তোলা, এবং ভারতের বাইরে আকাশবাণীর প্রচারিত অনুষ্ঠান কেমন শোনা যায়, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে তা জানাবার জন্য বিভিন্ন দেশে শ্রোতা নিয়োগ।

এই ক্লাব আর এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য যে সাধু তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না, এবং প্রত্যেকেরই উচিত এই উদ্দেশ্যসাধনে তাঁদের সংগে সহযোগিতা করা। যাঁদের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করা উচিত ছিল সেই আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কেন যে সহযোগিতায় 'নারাজ' হলেন বোঝা কঠিন।

কিন্তু তারও চেয়ে দুর্বোধ্য আর দুজ্ঞেয়, এইরকম একটি ক্লাব, বৎসরাধিককাল ধরে যাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীর এতগুলো দেশের এতগুলো বেতারকেন্দ্র যাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, স্বদেশে তাঁদের অস্তিত্ব এমন অজ্ঞাত কেন? আকাশবাণী সহযোগিতায় 'নারাজ' বলে তাঁদের অস্তিত্ব প্রচারে কুণ্ঠিত হতে পারেন, কিন্তু কাগজপত্রেও যে এই ক্লাবটির উল্লেখ দেখা গেছে তা তো স্মরণ হয় না।

• • • অনুষ্ঠান পর্যালোচনা • • •

'১৮ই নভেম্বর রাত ৭টা ৪৫য়ে শিশু-চলচ্চিত্র বিষয়ে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের সমীক্ষাটি বেশ চিত্তাকর্ষী হয়েছিল। আলোচনায় যেমন চিন্তনীয় বস্তু ছিল, কণ্ঠস্বর আর বলার ভঙ্গিও তেমনি মনোহর ছিল।

১৯শে নভেম্বর বেলা আড়াইটেয় বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে 'পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাহিনী' শীর্ষক আলোচনায় আবিষ্কারের কাহিনীর চেয়ে প্রয়োগ কাহিনীই শোনা গেল বেশি। যত বড়ো বড়ো সব টেকনিক্যাল টার্ম। বাংলা টার্মগুলির অনেকগুলিই আবার ভুল—যেমন ছত্রক, অণুবীক্ষণিক ইত্যাদি। আলোচনাটি যদিও তথ্যপূর্ণ তবু কিছুতেই মনে করতে পারা গেল না যে, তা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। যাদের জন্য প্রচার তারাই যদি না বুঝল তাহলে সে প্রচারে কী লাভ? বক্তা কতটা জানেন সেটা শোনানোর অনুষ্ঠান তো এটা নয়। শ্রোতার গ্রহণক্ষমতা কতখানি তা বিচার করে বক্তার বক্তব্য স্থির হওয়া উচিত এই অনুষ্ঠানে। এ বিষয়ে বক্তার দায়িত্ব যতখানি, বেতার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু বেতার কর্তৃপক্ষকে যে জাড্যে পেয়ে বসেছে!

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সিগনেচার টিউন বাজিয়ে মজদুরমণ্ডলীর আসর শেষ হবার পর ছোটোদের আসর আরম্ভ হবার কথা ছিল। হয়েওছিল বোধহয় যথাসময়ে, কিন্তু সেই অতি পুরাতন রোগ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আরম্ভটা শোনা যায় নি। আরম্ভের ঘোষণাটাও না। যন্ত্রের বিকট আর্তনাদের মধ্যে যেন দূরাগত কয়েকটি কথা শোনা গিয়েছিল প্রথমে অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট। তারপর নীরবতা। মাঝে মাঝে শুধু যান্ত্রিক আর্তনাদ। এই রকম চলল পুরো ৪ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। তারপর খণ্ডিত কথিকা শোনা গেল। আসরের শেষে ঘোষণা করা হ'ল, 'যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ৬টা ৩১ মিনিট থেকে ৬টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত ৪৪৭·৮ মিটারে কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত।'—৬টা ৩১ মিনিট থেকে ৬টা ৩৩ মিনিট? অর্থাৎ মাত্র দু মিনিট? কিন্তু আমি ঘড়ি ধরে দেখেছি, পুরো ৪ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। আমার এই ঘড়ি দেখার পিছনে একটা কারণ আছে।—'যান্ত্রিক গোলযোগ' অথবা 'অনিবার্য কারণে' অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটা কলকাতা কেন্দ্রে একটা ক্রনিক রোগে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং ঘোষক-ঘোষিকাদের ঘোষণায় এই বিঘ্ন কখনই পুরো এক মিনিট কিংবা পুরো দু' মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না, তা সে যতক্ষণই অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকুক না কেন। যন্ত্রগুলি কেমন করে ঘড়ি ধরে কাঁটায়-কাঁটায় এক মিনিট কিংবা দু' মিনিট বিকল থাকে, ঘোষণায় তা বলা হয় না। বারবার অসত্য ভাষণে এখন আর কৌতুক বোধ হয় না, অসত্য ভাষণ ধরার দিকেই ঝোঁক যায়—এবং অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি ও পুনরায় অনুষ্ঠান প্রচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত দৃষ্টি ফেরাই না। কিন্তু এই অসত্য ভাষণের কী প্রয়োজন?

২০শে নভেম্বর বেলা ৩টেয় শ্রীমতী চন্দনা রায় অতুলপ্রসাদের গান গাইলেন। মনে হয় নবীন শিল্পী। গলা এখনও পুরোপুরি তৈরি না হলেও বেশ আশান্বিত হওয়া গেল। ভালো লাগল।

২১শে নভেম্বর বেলা ১২টা ৫০য়ে দিল্লীর বাংলা খবরে একটা নতুন শব্দ শোনা গেল—'কচ্চিৎ'। বলা হ'ল, 'রাজস্থানের রাজ্যপাল বলেছেন, পুলিশের গুলী বর্ষণের তদন্ত কচ্চিৎ কখনও হওয়া উচিত।' 'কচ্চিৎ' বলে কোনো শব্দ আছে কিনা জানা নেই, 'কুচিৎ' আছে—এবং তার অর্থ 'কোথাও'। উদ্ধৃত বাক্যে 'কচ্চিতে'র পরিবর্তে 'কুচিৎ' বসালেই বা কী অর্থ হয়?

এই দিন রাত ৮টায় উন্নত ধরনের বীজ তৈরির আনুপূর্বিক ইতিহাস আলোচনা করলেন ডঃ শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনাটি বেশ টেকনিক্যাল এবং তথ্যসমৃদ্ধ। আধুনিক কৃষিবিদ্যার খবর রাখেন যেসব শিক্ষিত চাষী, তাঁদের ভালো লেগেছে বলেই বিশ্বাস।

রাত ৮টা ১৫য় তিনটি রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন শ্রীমতী রমা ধর—'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে', 'যা হবার তা হবে' এবং 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে'। প্রথম গানটি তেমন মনোগ্রাহী হতে পারে নি, শেষের গানটিই তিনি গেয়েছেন সবচেয়ে ভালো।

২৩শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় মহিলামহলে গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রী হিমবাহে মহিলা অভিযাত্রী দলের তিনজন তাঁদের চমকপ্রদ অভিযানের কথা শোনালেন—শ্রীমতী সুজেয়া গুহ, শ্রীমতী সুতপা (প্রারম্ভিক ঘোষণায় পদবীটা তাড়াতাড়িতে বোঝা গেল না, সমাপ্তি ঘোষণায় কারও নাম বলা হয় নি) এবং শ্রীমতী সুদীপ্তা সেনগুপ্ত। সকলেই সুন্দরভাবে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন—কিন্তু প্রথম জনের বর্ণনায় মাঝে-মাঝে গীতিকাব্যের ভাষা ছিল, মাঝে-মাঝে প্রবন্ধের ভাব ছিল, মাঝে-মাঝে কথোপকথনের ভঙ্গি ছিল। এই ধরনের বর্ণনায় কথোপকথনের স্বাভাবিক ভঙ্গিই ভালো।

এই দিন রাত ৮টায় বিচিত্রায় 'বর্তমান যুবসমাজের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি আলোচনা শোনা গেল। আলোচনাকারীরা আজকের এই উচ্ছৃঙ্খলতা আর হতাশার জন্য বর্তমান সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, বেকারসমস্যা প্রভৃতিকে দায়ী করলেন। একদিন তাঁদের মনে যে আশা ছিল, এইসব ব্যবস্থা আর সমস্যার জন্য কীভাবে তা বিনষ্ট হয়েছে বা হতে চলেছে তা-ই তাঁরা বর্ণনা করলেন অকপটে। আলোচনাটি পরিচালনা করলেন শ্রীদিলীপ সেন। পরিচালক হিসাবে তাঁর দক্ষতা কিন্তু পরিস্ফুট হয় নি। আলোচনাকারীদের বর্ণনা আর তার ভাষা একই 'গ্রামে' বাঁধা ছিল, ফলে বাছাই করতে কিছুটা অসুবিধা হয়েছে।

—শ্রবণক

বোলিংয়ে কেরামতি

কমল ভট্টাচার্য

লালচে কাল রংয়ের মানুষটির দৈর্ঘ্য বড় জোর পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। সারা অঙ্গে তাঁর সাদা ক্রিকেটের পোষাকটিই আগে চোখে পড়ত। আর সেই পুরো হাতার জামার ভেতর থেকে কাল লম্বা লম্বা আংগুলের মোচড় দেওয়া বল যখন মাঠে আছড়ে পড়ে ঘুরতে থাকত, ঠিক সেই মুহূর্তে দর্শকরা পরম আগ্রহে বড় বড় চোখ করে দেখতেন সেই বাঁক খাওয়া বলে ব্যাটসম্যানের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। চাপা গোঙানি আওয়াজে দর্শকরা নড়েচড়ে বসতেন। ব্যাটসম্যান অফস্পিন বা লেগস্পিন না বুঝতে পেরে উইকেট খুইয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতেন। বোলারটিকে বোঝা প্রায় সাধ্যের অতীত ছিল। এ হেন বিভ্রান্তকর বোলারটি হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বনামধন্য সনি রামাধীন।

ভারতে এই খ্যাতিমান বোলারটি বারদুয়েক এসেছিলেন। বলাবাহুল্য, এখানকার ব্যাটসম্যানদেরও তিনি স্বস্তি দেননি। তবে এটাও ঠিক, ভারতীয় দলের মুস্তাক-মোদী-হাজারের মত ব্যাটসম্যানরা যে রামাধীনের বোলিংয়ের দাপটে ভেঙ্গে মুষড়ে পড়েননি তার নজীর আছে। ১৯৫০ সালের ইংল্যান্ড সফরে রামাধীন যে ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব করেছিলেন, ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের ত্রাহি রব ডাকিয়ে ছেড়েছিলেন তার বছর পাঁচেক পরে রামাধীন ভারতে এসে ঠিক অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেননি। পাঁচবছর কাটতেই যে রামাধীনের বোলিংয়ের ভাটা পড়েছিল এমন কথা অতিনিন্দুকও বিশ্বাস করতেন না। তবে গর্ব করে বলতে পারি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বেশ সমঝেই রামাধীনের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। কোনক্রমে খেলা এবং স্বচ্ছন্দের সঙ্গে খেলা—এই দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত। সেই ভয়ংকর বোলারটি সারা বিশ্বের ক্রিকেট আসরে যে আতংক সৃষ্টি করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি?

১৯৫০ সালের ইংল্যান্ড সফরে রামাধীন তাঁর বোলিংয়ের চাতুরী দেখিয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিলেন। শুধু রামাধীন নয়, ভ্যালেনটাইন তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। এই জোটা স্পিনারটির কৃতিত্ব সেদিন কিছু কম ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতেন রামাধীনের বোলিং এত ভয়ংকর ছিল যে, ব্যাটসম্যানরা তাঁর বলে রান করতে পারতেন না। স্বভাবতঃই ব্যাটসম্যানরা ভ্যালেনটাইনের বলে রান করতে গিয়ে আউট হতেন। ভ্যালেনটাইনের নিখুঁত লেংথের বোলিংয়েও যে রান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, সেটা বুঝতে কারও বাকি ছিল না। কথাটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল যখন রামাধীনের অনুপস্থিতিতে কয়েকটি কাউন্টি ম্যাচে ভ্যালেনটাইন ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করার প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ইংল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন দল গড়তে খুব ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে বারবাডোসের প্রাক্তন ক্রিকেটার ক্লারেন্স স্কিনার এক সাধারণ খেলায় সনি রামাধীনের বোলিং দেখে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বেশ উৎসাহভরেই বলেন রামাধীনের বোলিংয়ের কিছু বিশেষত্ব আছে। সেটা হল তাঁর অফব্রেক এবং লেগব্রেকের সংমিশ্রণ যা ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। জামাইকা দলের বিপক্ষে এক ট্রায়াল ম্যাচে রামাধীনকে আমন্ত্রণ করা হল। এই খেলায় সনি বেশ ভাল বল করলেন। দলে নেওয়া যেতে পারে এই ভেবে সনিকে আবার এক ট্রায়াল ম্যাচে কর্তৃপক্ষরা আহ্বান জানান। সে ম্যাচে আর একজন নবাগত তরুণ বোলারকেও সুযোগ দেওয়া হয়। নাম তাঁর এ্যালেফ ভ্যালেনটাইন। কর্তৃপক্ষরা যোগ-বিয়োগ করে দলগঠন করলেন। এই দলে রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইনকে স্থান দেওয়া হয়। এই দুই তরুণ বোলারকে দলভুক্ত করে কর্তৃপক্ষরা যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখে তাঁদের পড়তে হয়নি। রামাধীন-ভ্যালেনটাইনই ছিলেন টেস্ট ম্যাচ জেতার প্রধান হোতা।

সফরের কয়েকটি খেলার পরই সারা ইংল্যান্ডে রটে গেল যে, রামাধীন একজন বিভ্রান্তিকর বোলার। তিনি অফব্রেক বল বেশী দেন। কিন্তু তাঁর লেগব্রেক বল বুঝতে ব্যাটসম্যানরা নাজেহাল হন। 'রামাধীনের বোলিংয়ে কোন ধাঁধা নেই।' এই কথাটা বলেছিলেন ক্লাইড ওয়ালকট। জাহাজে ওয়ালকট প্রথম দেখেন দলীয় খেলোয়াড় রামাধীনকে। ইংল্যান্ডে অনুশীলন করতে গিয়ে রামাধীনের বলে তিনি প্রথম কিছুটা অসুবিধায় পড়েন। তবে উইকেট-কীপিং করতে গিয়ে ওয়ালকট রামাধীনের অফব্রেক এবং লেগব্রেকের ধাঁধাটি ধরে ফেলেন।

সনির বোলিংয়ে কি কোন যাদু আছে? আর তার রহস্যটাই বা কী? এই নিয়ে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় মহলে গবেষণার অন্ত ছিল না। সনি রামাধীনকে আবিষ্কার করতে তাঁরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। কেউ বললেন—সনির রান আপের মধ্যেই আছে সেই গোপন রহস্য। লেগব্রেক বল দেওয়ার সময় রামাধীন একটু বাঁকা হয়ে দৌড়ান। কেউ আবিষ্কার করলেন তাঁর লেগব্রেক বলটি বেশ ঝুলে উঁচু হয়ে আসে। আবার কোন কোন ব্যাটসম্যান ব্যাকফুট খেলে সনির চাতুরী ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এইসব থিওরীর ওপর নির্ভর করে যাঁরাই খেলতে গেছেন তাঁরা অল্প সময়েই তাঁবুতে ফিরেছেন।

এ্যালফ ভ্যালেনটাইন ছিলেন রামাধীনের উপযুক্ত জুটি বোলার। ১৯৫০ সালে তাঁর বোলিং ছিল নিখুঁত। ন্যাটা বোলার ভ্যালেনটাইন স্পিনের ওপরই বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচকরা ভ্যালেনটাইনকেই সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ ন্যাটা স্পিন বোলার আখ্যা দিয়েছিলেন।

ইংল্যান্ডের নামকরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র গ্ল্যামারগ্যানের গিলবার্ট পার্কহাউস নির্ভয়ে রামাধীনের বল খেলে-

অ্যালফ ভ্যালেনটাইন
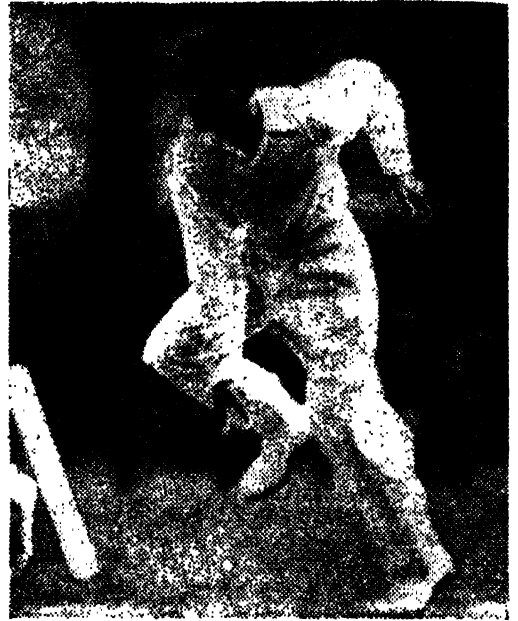
সনি রামাধীন

ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইংল্যান্ড সফরের দ্বিতীয় খেলা ছিল গ্লামারগ্যানের বিপক্ষে। পার্কহাউস সে খেলায় ৮৮ রান করেছিলেন।

বিখ্যাত ব্যাটসম্যান লেন হাটনও রামাধীনকে সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বিচক্ষণ হাটনকে রামাধীন সহজে টলাতে পারেননি। বলা-বাহুল্য হাটন একাই সমস্ত দলটিকে আগলে রেখেছিলেন। রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইনের বোলিংয়ে হাটন যে ব্যতি-ব্যস্ত হয়েছিলেন সেকথা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করেন। হাটন বলেন, 'তাঁর খেলোয়াড়-জীবনে অস্ট্রেলিয়ার লিন্ডওয়াল এবং মিলার যেমন কোনদিন স্বস্তি দেননি, পরবর্তীকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইনের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে তেমনি অস্বস্তি অনুভব করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালের খেলা প্রসঙ্গে লেন হাটন মন্তব্য করেছিলেন "অস্ট্রেলিয়ার দুই দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার লিন্ডওয়াল এবং মিলার একসময়ে যে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই বোলার রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইন তার থেকে বাদ পড়েননি। যখন খেলা থেকে অবসর নেব তখন দুই দেশের চারটি বোলারের ছবি আমার শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখব। এঁরা যে আমার অনেকবার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন।"

১৯৫০ সালের ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট পর্যায়ে রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইন প্রায় অর্ধেকেরও বেশী উইকেট দখল করে-ছিলেন। ৭৭টি উইকেটের মধ্যে ৫৯টি উই-কেট এঁরা ভাগাভাগি করে নেন। বোলিংয়ের দাপট এবং পারদর্শিতায় কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলাররাই ছিলেন দলে ভারী। কিন্তু দুই তরুণ নবাগত বোলার রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইন শেষপর্যন্ত ফাস্ট বোলারদের সেবার নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বোলারদের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাত্তা পান নি। বলা দরকার এই মাঠেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে ইনিংসে জয়ী হয়। ভ্যালেনটাইন উইকেট পান ১৩টি। এই ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠেই টেস্ট খেলায় ভ্যালেনটাইন যদিও ১১টি উইকেট পান তবুও ইংল্যান্ডের স্পিনার এরিক হোলিস, জিম লেকার এবং বব বেরী বোলিংয়ের চাতুর্যে রামাধীন এবং ভ্যালেন-টাইনকে ছাড়িয়ে যান। অভিজ্ঞতার চরম নিদর্শন দেখিয়ে ইংল্যান্ডের স্পিনাররা প্রথম টেস্টে দলকে জয়যুক্ত করেছিলেন।

তরুণ নবাগত দুই বোলার রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইন প্রথম টেস্টে যা পারেন নি লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের নাজেহাল করে ছেড়েছিলেন; তাঁরা বোলিংয়ের এক অবিশ্বাস্য নজির রেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পাল্টা জবাবের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে মিলে ২০টি উইকেটের মধ্যে ১৮টা উইকেট পান। রামাধীন পান ১১টি উইকেট ১৫২ রানে এবং ভ্যালেনটাইন পান ২২৭ রানে ৭টি।

ফলাফল সমান রেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্টে ইংল্যান্ডকে দশ উইকেটে পরাজিত করে। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসমানরা মারের দাপটে ইংল্যান্ডের বোলারদের তছনছ করে দেন। ওরেল এবং উইকস এক চমকপ্রদ ইনিংস খেলেন। ওরেলের ২৬১ এবং উইকসের ১২৯ রান ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠ সেদিন আলো করে দিয়ে-ছিল। এঁদের জুটির সহযোগিতায় রান-সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫৮। এই খেলা সম্পর্কে উইসডেনের মন্তব্য, 'ওরেলের চৌকশ মারের ছটা ইংল্যান্ডের ক্রীড়ারসি-করা কোনদিনই ভুলবেন না।' ইংল্যা-ন্ডের বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার পেলহাম ওয়ারনার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'আমার জীবনে এত ভাল খেলা আমি কোনদিন দেখি নি।" ইংল্যান্ডের এই বিপর্যয়ের মূলে ছিল রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইনের মারাত্মক বোলিং। তাঁরা দুজনে বারটি উইকেট নিয়ে দলের 'রাবার' জয়ের পথ সুগম করে দেন।

শেষ খেলা ওভালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডঙ্কা বাজিয়ে ইনিংস জয়ী হয়ে 'রাবার' নিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক লেন হাটনের অপরাজিত ২০২ রানও দলের পরাজয় রোধ করতে পারে নি।

শুধু ১৯৫০ সালের ইংল্যান্ডে সফরেই নয়, রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইন বহু নাটকের নায়ক সেজেছিলেন। কিন্তু ১৯৫০ সালের সেই নাটকীয় পরিস্থিতির কথা সহজে ভোলার নয়।

এর পর এক যুগ পরে যখন সেই দুর্ধর্ষ বোলার রামাধীনের খেলার পালা সাঙ্গ হল তখন স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল তাঁর 'ক্রিকেট পাঞ্চ' বইতে রামাধীনের বোলিং-এর রহস্যটি ফাঁস করে দেন।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯তম সার্ভিসেস এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ের শেষ দৃশ্য : এয়ার ফোর্সের এন এল টমাস (বাঁদিক থেকে প্রথম) ১০·৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে প্রথম স্থান লাভ করেন।

দর্শক

সার্ভিসেস এ্যাথলেটিকস

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯তম সর্বভারতীয় সামরিক এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ৬টি সামরিক দলের (সাউদার্ন, ইস্টার্ন, সেন্ট্রাল, ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড, নেভী এবং এয়ার ফোর্স) প্রায় ৩০০ শত এ্যাথলীট যোগদান করেছিলেন। প্রতিযোগিতায় উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং তীব্রতা থাকা সত্ত্বেও ক্রীড়ামান উন্নত হয় নি। মাত্র ২টি বিষয়ে (সটপুট এবং হ্যামার থ্রো) নতুন সার্ভিসেস রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান যেমন—সটপুটে যোগীন্দর সিং, ৮০০ মিটার দৌড়ে বি এস বড়ুয়া, হাইজাম্পে ভীম সিং এবং ট্রিপল জাম্পে লাব সিং প্রভৃতি তাঁদের স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় রেকর্ড স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি। আমাদের জাতীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দলই দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের জাতীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যেমন বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেন, আমাদের দেশে তার একটি মাত্রও নজির নেই। আমাদের দেশের যুবশক্তি চরমভাবে উপেক্ষিত বলেই আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে আমরা হালে পানি পাই না। মুষ্টিমেয় ক্লাব এবং রাজ্যকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন খেলাধুলোয় আমাদের জাতীয় দল তৈরী হয়।

দুটি বিষয়ে প্রথম স্থান

১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় : এন এল টমাস (এয়ার ফোর্স)।

৫০০০ মিটার দৌড় ও ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ : মুক্তিয়ার সিং (সাউদার্ন কম্যান্ড)।

লং জাম্প ও ট্রিপল জাম্প : লাব সিং (সেন্ট্রাল কম্যান্ড)।

৪×১০০ মিটার রীলে : সাউদার্ন কম্যান্ড।।

৪×৪০০ মিটার রীলে : সাউদার্ন কম্যান্ড।।

নতুন রেকর্ড

সটপুট : যোগীন্দর সিং (সেন্ট্রাল কম্যান্ড) দূরত্ব—১৬·৩৮ মিটার।

হ্যামার : বলবীর সিং (সাউদার্ন কম্যান্ড), দূরত্ব—৫১·৬৪ মিটার।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম সেন্ট্রাল কম্যান্ড (১৯৯ পয়েন্ট), ২য় সাউদার্ন কম্যান্ড (১৩৯), ৩য় ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড (১১৯)।

আন্তঃ রেলওয়ে এ্যাথলেটিকস

১৯৬৮ সালের আন্তঃ রেলওয়ে এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় সাউদার্ন রেলওয়ে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। পুরুষ বিভাগে
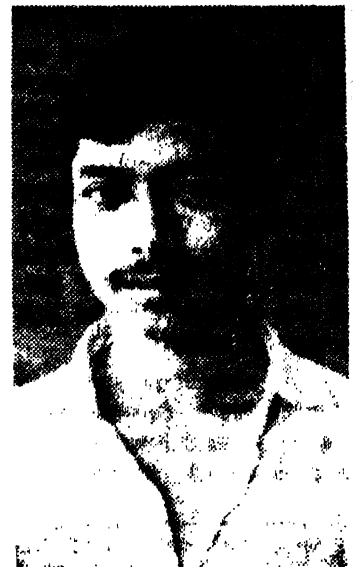
রাজা মুখার্জি

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯তম সার্ভিসেস এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সেণ্ট্রাল কম্যাণ্ডের ভীম সিং ২·০৩ মিটার (৬ ফিট ৮ ইঞ্চি) উচ্চতা অতিক্রম করে হাইজাম্পে প্রথম স্থান লাভ করেন।

সাউদার্ণ রেলওয়ে ৯১—৭৬ পয়েন্টে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান নর্দার্ণ রেলওয়েকে পরাজিত করে সাউদি আরাবিয়া গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে। অপরদিকে মহিলা বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ইস্টার্ণ রেলওয়েকে ৫৬—২২ পয়েন্টে পরাজিত করে তারা রায়সাহেব কৃপা নারায়ণ স্মৃতি কাপ পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিশেষ সাফল্যলাভের সূত্রে সাউদার্ণ রেলওয়েরই এইচ কে রঘুনাথন 'মার্শাল টিটো গোল্ড কাপ' জয়ী হয়েছেন।

১৯৬৮ সালের আন্তঃ রেলওয়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ফাইনালে নর্দার্ণ রেলওয়ে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্টার্ণ রেলওয়েকে ৫ উইকেটে পরাজিত করে তিন বছর পর পুনরায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। শেষ দিনে লাঞ্চের পর খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে : ৩৩৮ ও ২৮৫
নর্দার্ণ রেলওয়ে : ৩৩৬ ও ২৮৮ (৫ উইকেটে)

অস্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় স্কুল দল

অস্ট্রেলিয়া সফরে রাজা মুখার্জি'র নেতৃত্বে ভারতীয় স্কুল দল এ পর্যন্ত ৩টি ম্যাচ খেলেছে। সফরের প্রথম খেলায় ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। সফরের প্রথম খেলায় প্রথম ইনিংসে ভারতীয় স্কুল দলের লক্ষ্মণ সিং ৯৯ রান করে মাত্র এক রানের জন্যে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন দীপঙ্কর সরকার—৫৬ রানে ৩ এবং ২৪ রানে ৪ উইকেট।

ডার্লিং ডাউন্স সেকেণ্ডারী স্কুল দলের বিপক্ষে ভারতীয় স্কুল দল তাদের সফরের দ্বিতীয় খেলায় এক ইনিংস ও ৬৭ রানে জয়ী হয়। ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের ৩০৪ রানের (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) মধ্যে রাজা মুখার্জি'র নট-আউট ১৪৪ রান এবং অস্ট্রেলিয়ান স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় দীপঙ্কর সরকারের 'হ্যাটট্রিক'সহ ৫৩ রানে ৬ উইকেট—বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া রাখেশ ট্যাণ্ডন দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে ভারতীয় স্কুল দলের ইনিংস জয়লাভের পথ সুগম করে দেন।

সফরের তৃতীয় খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ২১ রানে কুইন্সল্যাণ্ডের সম্মিলিত স্কুল দলকে পরাজিত করে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। স্থানীয় স্কুল ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৯৪ রানে শেষ হয়ে যায়। লাঞ্চের পর তাদের ইনিংস মাত্র ২০ মিনিট টিকে ছিল। রাখেশ ট্যাণ্ডেন ১৩ ওভার বল দিয়ে মাত্র ১৯ রানে ৫টা উইকেট পান। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৬২ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন— প্যাটেল (৮৭ রান), ট্যাণ্ডন (৫৮ রান) এবং কুন্দরণ

দীপঙ্কর সরকার

(৪২ রান)। স্থানীয় স্কুল দলের ১৪৭ রানের মাথায় ২য় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ট্যাণ্ডন, বোরদে এবং গাভরী প্রত্যেকেই ৩টি করে উইকেট পান।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এই দেখুন এরা। যাকে বলে আবালবৃদ্ধ বনিতা।
আমার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখেরও বেশী।
রান্নায় আমার যে এত হাতযশ—
এই দেখুন তার চাবিকাঠিটা আমার হাতে।
সানরাইজ
গুঁড়ো মশলা। স্বাদে-গন্ধে এর জুড়ি নেই।
খাঁটি নির্ভেজাল জিনিষ। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী।
প্রকাশ ব্রাদার্স
গুঁড়ো মশলার
আদি প্রতিষ্ঠান।
৭৪/এ, নলিনী শেঠ রোড,
কলিকাতা-৭

৩য় খণ্ড ৮ম বর্ষ

৩১শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 13th December, 1968 শুক্রবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

[illegible]

[illegible] সুরবাহারে [illegible] আলা-[illegible] এবং [illegible] বিস্তারের পর [illegible] তেমন বাহারে আলাপ শোনানো হলো বুঝতে পারলাম না। এর জন্য এই অনুষ্ঠানে মোট তিনবার ঘোষণা করা হলো যে, ইমারৎ হুসেন খান প্রথমে সুরবাহার [illegible] সেতার বাজাবেন এবং অনুষ্ঠানের শেষে বাজালেন ইত্যাদি। দুটো বাজনাই অবশ্য তবলা সঙ্গত ছাড়া। সুরবাহারে অবশ্য আলাপের সময় কোন সঙ্গত হয় না জানি। প্রথমে ভেবেছিলাম সুরবাহারে হয়তো ১৫ থেকে ২০ মিঃ আলাপ করে উনি সেতারে তবলার সঙ্গে কোন রাগের দ্রুত গৎ বাজাবেন। সেটা হলেই অনুষ্ঠানটি সুন্দর হোতো এবং ভালও লাগতো। পুরো ৩০ মিঃ-এর অনুষ্ঠানে কেন যে একজন স্বনাম-খ্যাত গুণী শিল্পী একটি যন্ত্র ২৫ মিঃ এবং সম্পূর্ণ অন্য একটি যন্ত্র মাত্র তিন মিনিট সঙ্গত ছাড়া বাজালেন তা বোধগম্য হোল না। পরে আবার গ্রামোফোন রেকর্ডে বেহালা বাজনা শুনিয়ে অবশিষ্ট ২ মিঃ সময় ভরাট করে দেওয়া হোল। সমস্তই কি পরিকল্পনাহীনতার সাক্ষী দিচ্ছে না?

অজিত চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৫৭

পেট্রোল যদি ফুরোয়

সম্প্রতি পেট্রোল নিয়ে খুব একচোট হৈ-চৈ হয়ে গেল। এই বস্তুটির অভাবে আমাদের চলমান জীবন যে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে সেকথা ভেবে সত্যি বেশ শঙ্কা অনুভব করেছি। পেট্রোল পাম্পে গাড়ির কিউ দেখে অবস্থাটা আন্দাজ হচ্ছিল। গতির যুগে বাস করে আমরা অনেকেই যখন ভুলতে বসেছিলাম যে, আজকের গতির অন্যতম উৎস পেট্রোল তখন সে একবার আমাদের তা মনে করিয়ে দিল। অবশ্য অভাবটা কৃত্রিম এবং সম্পূর্ণরূপেই সাময়িক। তাই চিন্তাটা মাথায় বেশিক্ষণ থাকতো না যদি না ইতিমধ্যে অমৃতের সাতাশ সংখ্যায় মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের 'পেট্রোল যদি ফুরোয়' আলোচনাটি প্রকাশিত না হতো। এই নিবন্ধটি পড়ে জানতে পারলাম, লেখক কিভাবে পেট্রোলের অভাবে রাস্তার মাঝখানে স্ট্র্যান্ডেড হয়ে পড়েছিলেন। এতটা পর্যন্ত বেশ ভালই লাগছিল। লেখকের অভিজ্ঞতার অংশটা পড়তে পড়তে আমরা হঠাৎ উদ্ভূত অবস্থাটা বেশ রসিয়ে উপভোগ করছিলাম। কিন্তু মজাটা বেশিক্ষণ টি'কলো না যখন দেখলাম যে, লেখক সেই করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পর যে মন্তব্যটি করেছেন আমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তোলার পক্ষে তা যথেষ্ট।

তিনি বলেছেন, আগামী ষোল সতেরো বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব পেট্রোল ফুরিয়ে যাবে।

আশঙ্কাকে তিনি খুব বাড়তে দেননি। তার সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, ভূতাত্ত্বিকদের মেতে পৃথিবীর আরো অনেক জায়গা থেকেই পেট্রোল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এখুনি এব্যাপারে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ শ' দেড়েক বছর এতে নির্বিবাদে চলে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সভ্যতা তো এখানেই থেমে থাকবে না বা পৃথিবী নামক উত্তর-দক্ষিণ ঈষৎ চাপা গোলাকার বস্তুটিও অবলুপ্ত হয়ে যাবার কোন বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত নেই। তাই সমস্যা যে একসময়ে মারাত্মক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং সে সম্ভাবনাই যথেষ্ট।

সমস্যা আছে বলেই তা থেকে বাঁচার আগ্রহ আমাদের খুব বেশি। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। তাঁরা নানারকম পথ-নির্দেশও করেছেন। লেখক সে সম্বন্ধে আলোচনা করে আমাদের শঙ্কামুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। আসল কথা হচ্ছে, সভ্যতা কোনসময়েই থেমে থাকতে পারে না। তার সেপথেই সমস্যার সমাধানের সূত্র বেরিয়ে আসবে। অবশ্যই এর পেছনে থাকবে বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনা।

পেট্রোলের সংকটক্ষণে এরকম একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

রামচন্দ্র রাউথ
কটক—২

'ষষ্ঠীব্রত' প্রসঙ্গে

আপনাদের ২২শে কার্তিক শুক্রবারের (৮ম বর্ষ ৩য় খণ্ড ২৬ সংখ্যা) শ্রীঅভয়-ঙ্করের (সাহিত্য ও সংস্কৃতি) "বিধাতার অপমৃত্যু" প্রবন্ধটির জন্য তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

ষষ্ঠীব্রত তাঁর নবতম পুস্তকে 'My God died young' নিজের জীবনকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সামাজিক নিয়মকানুনের উপরে যে কটাক্ষপাত করেছেন তার উপরই ভিত্তি করেই আমার বক্তব্য, শুধু ষষ্ঠী কেন আমাদের দেশের বহু তথাকথিত ষষ্ঠীব্রত রাতারাতি নিজেকে প্রচার করার জন্য এই রকমের ভূমিকা গ্রহণ করছেন। কয়েকজন তথাকথিত লেখক বিদেশে গিয়ে নিজেদের দেশের নর্দমা ঘাটার ব্যাপারে বিশেষ তৎপর। এতে করেই তাঁরা আনন্দ পান এবং বিদেশী পুস্তকব্যবসায়ীরাও আনন্দের সঙ্গে এই রকমের পুস্তকগুলি দেশে বিদেশে প্রচার করে থাকেন। দেশমাতৃকার অঙ্গে কালিমা লেপন করে এইসব তথা-কথিত লেখক খ্যাতি নিয়ে থাকেন। এমনকি সময়ে সময়ে তাঁরা বিদেশী তথা-কথিত সাহিত্যিকদের দ্বারা বিশেষভাবে পুরস্কৃত ও সমাদৃত হন।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোন বিদেশী লেখকই বোধহয় তাঁদের দেশের নামে এই রকম কলঙ্কলেপনে রাজী হবেন না। সময় সময় ভাবি, সেদিন কবে আসবে যেদিন আমাদের এইসব তথাকথিত লেখকেরা তাঁদের দেশকে ভালবাসবেন! নিজের দেশের ভাল ভাল ছবিগুলি বিদেশে পরিবেশন করলে কি এইসব লেখকদের মাথা কাটা যেত?

এইসব লেখকদের কাছে আমার নিবেদন তাঁরা যেন মিস মেয়োর "মাদার ইন্ডিয়া" নীতি অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি-ভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ইত্যাদি লেখকদের পথের ধারা গ্রহণ করেন। নিজের দেশকে ছোট করে কেউ কোনদিনই বড় হতে পারে না। জাতীয় স্বধর্মকে আঁকড়ে ধরাই বাঁচবার একমাত্র পথ।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা : ৩৯

উৎকণ্ঠারোগ

অমৃতের ২১ সংখ্যায় শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্যের 'উৎকণ্ঠারোগ' ছোট নিবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। উৎকণ্ঠারোগ মানুষের জীবনকে কেমন ভয়াবহ করে তুলতে পারে সে সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। উৎকণ্ঠা আর ভয় এক জিনিস নয়। তাছাড়া উৎকণ্ঠারোগ সংক্রামক ব্যাধিও নয়। আবার উৎকণ্ঠাই সমস্ত কাজে আমাদের সজীব করে তোলে। এই উৎকণ্ঠাই অস্বাভা-বিক হয়ে স্নায়বিক ব্যাধিতে দাঁড়ায়। তার থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে। আধুনিক যুগের এই বিশেষ রোগটিকে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে শ্রীভট্টাচার্য বিশ্লেষণ করেছেন। কিভাবে এই রোগ থেকে আত্মরক্ষা করা যায় আর এর চিকিৎসার উপায়ই বা কি সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারও অতি সহজে কুফল সৃষ্টি করে। আজকের ব্যস্তিব্যস্ত যন্ত্রচালিত জীবনে মানুষকে এই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এই সহজবোধ্য ছোট প্রবন্ধটি রচনার জন্য শ্রীভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই।

গৌতম চৌধুরী
কলকাতা-৯।

গৌরাঙ্গ-পরিজন

গৌরাঙ্গ-পরিজনের সমাপ্তির ঠিক আগে যে-পদটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে অভাবনীয় মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটেছে। বিশুদ্ধ পদটি এইরূপ হবে :

আখর জোটন করিতে লিখন
আগে পাছে হয় মান।
না লইবে দোষ মনের সন্তোষ
বন্দনা আমার কাম।।

সম্পাদকীয়

আবার ছাত্র বিক্ষোভ

ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। [illegible] শুরু করে পাঞ্জাব এবং দক্ষিণের দিকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত স্কুলে, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একই কাণ্ড চলছে। কিছুদিন আগে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিরোধের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কোনো রকমে তা মেটাতে না মেটাতেই শুরু হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হাঙ্গামা। উত্তর প্রদেশের স্কুলগুলোও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। সেখানে ছাত্র নয়, শিক্ষকরাই ধর্মঘট করেছেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ছাত্রদের বিক্ষোভে গত সপ্তাহে লণ্ডভণ্ড হয়েছে। আমাদের ঘরের কাছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র বিক্ষোভের ঢেউ লেগেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাঁপ বন্ধ।

এই সমস্ত বিক্ষোভের কারণ নানাবিধ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সর্বত্রই একই ধরনের বিক্ষোভের প্রকাশ। এ থেকে আমাদের শিক্ষা-নিয়ামকদের কিছু শিক্ষা নেবার আছে বলে মনে করি।

গত সপ্তাহে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন মহোদয় ছাত্র বিক্ষোভের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উদ্বেগ সকলের মনেই। সামান্য কারণে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে এবং তার পরিণতিতে পুলিশ, কাঁদানে গ্যাস থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পড়াশোনার যে-ক্ষতি হচ্ছে সে বিষয়ে তো সন্দেহই নেই। তার চেয়েও বড় ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষা জগতের আবহাওয়ার। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন; শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ছাত্র সমাজের অসন্তোষ প্রকট হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। কেন এমন হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার।

এই সমস্যা অবশ্য শুধু আমাদের দেশের নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা দিয়েছে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিক্ষোভের এক অদ্ভুত প্রবণতা। ইয়োরোপ-আমেরিকার সচ্ছল দেশগুলিতে, যেখানে ছাত্ররা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতে অভ্যস্ত এবং রাষ্ট্রও বেশি মনোযোগ দেয় তাদের প্রতি, সেখানেও ছাত্ররা সরকারের বিরুদ্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভারতবর্ষের ছাত্র বিক্ষোভকে সেই আন্তর্জাতিক বিক্ষোভের অংশ মনে করার কোনো হেতু নেই। কিন্তু তার অন্য হেতু আছে নিশ্চয়ই।

শিক্ষামন্ত্রীও বলেছেন যে, ছাত্র বিক্ষোভের তিন রকম কারণ—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। শিক্ষা কমিশনও ছাত্র সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ছাত্রের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। জনসংখ্যার তুলনামূলক হারে নিশ্চয়ই ছাত্রসংখ্যা এখনও আমাদের দেশে কম। কারণ, এখন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র চালু করা যায় নি। কিন্তু কয়েকটি পরিকল্পনাকালে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আজকাল সমাজের এমন স্তরেও শিক্ষা গিয়ে পৌঁছুচ্ছে যেখানে কোনোদিন এর আগে শিক্ষার আলোকবার্তা পৌঁছয় নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উচ্চতর শিক্ষার্থীদের মধ্যেই বিক্ষোভ বেশি দানা বাঁধছে।

রাজনীতির খেলা নিশ্চয়ই এর মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেপরোয়া মতবাদ, উচ্ছৃংখলতা ইত্যাদিও বিক্ষোভে উস্কে দিতে সাহায্য করে। কিন্তু সবটাই তা নয়। ছাত্র সমাজের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা হতাশার ভাব সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে হাল হয়েছে তাতে তরুণেরা ভরসা করার মতো যদি কিছু না দেখতে পায় তো তাদের খুব বেশি দোষ দেওয়া চলে কি? যাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চূড়োয় বসে আছেন অনেক সময় ক্ষমতা নিয়ে তাঁদের মধ্যে যে লজ্জাজনক আচরণ দেখা দেয় তাতেও তরুণদের মনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটা অনাস্থার ভাব জাগা অস্বাভাবিক নয়। শিক্ষকরাও কি সব সময় তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত কর্ম করেন? ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে তাদের পরামর্শ দেওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষকদের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় সেই দায়িত্ব থেকে অধিকাংশ শিক্ষক নিজেদের মুক্ত করে নোট-বই লেখা, বাড়িতে দল বেঁধে ছাত্র পড়ানো এবং অন্যবিধ উপায়ে পয়সা কামাইয়ের ধান্দায় আত্মনিয়োগ করেন। অভিভাবকদের অবস্থাও তথৈবচ। পড়ুয়া ছাত্রদের প্রতি অভিভাবকরা যদি নজর না রাখেন, তাদের যদি সঙ্গ না দেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে চেষ্টা না করেন তাহলে তরুণ মন ধীরে ধীরে পারিবারিক বন্ধন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সুতরাং দায়িত্ব সকলেরই। সরকারের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং অভিভাবকের। ছাত্রদেরও নিছক ধোয়া তুলসী পাতা মনে করার কোনো কারণ নেই। শৃংখলাবোধ তাদের হয় নি। জীবনের সামনে কোনো স্থির লক্ষ্য নেই। বিপথে চলে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা। এই সমস্ত স্বীকার করে নিয়েই ছাত্র বিক্ষোভের সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। তরুণের ওপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ও সমাজের ভবিষ্যৎ। তারা উন্মার্গগামী হলে ক্ষতি যতটা তাদের, ততটাই দেশের। শিক্ষা-নিয়ামকরা এই বিষয়টির দিকে নজর দিলে ভাল করবেন।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্‌টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা : গান্ধীর বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেশ দেশাই-এর নেতৃত্বে শিষ্য-শিষ্যার ছোট দল আমেদাবাদে চলে এলেন। প্রিভারাও তাঁদের সঙ্গ নিলেন। ঠাণ্ডা রাতে সেদিন পুলিশের জন্য অপেক্ষা করার ফলে প্রিভার গলায় প্রচণ্ড ব্যথা ধরে গেছে, জ্বরও হয়েছে—ঘাম দিয়ে জ্বর নামানোর জন্য ডাক্তার তাঁকে গাদা-গাদা এ্যাসপিরিন খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রাত্রে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে করতে এ-নির্দেশ তিনি কেমন করে পালন করেন, তা ভেবে প্রিভা বিব্রত বোধ করতে থাকেন। কিন্তু ডাক্তার তাঁকে ব'লেন, 'তাতে কী হয়েছে? ঘাম হলে আপনি কামরাতেই জামা বদল করে নেবেন—'এখনো ভারতের রীতিনীতি সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান হয় নি?' (লোকে সেখানে সর্বসমক্ষে জামা-কাপড় ছাড়ে, স্নান করে।)—তৃতীয় শ্রেণীতে সে-রাত্রে ভ্রমণটা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। (তবু প্রিভারা ননীর পুতুল নন, ব্রিন্দিসি থেকে তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে বোম্বাই-এ পৌঁছোন জাহাজের ডেক-এ ভ্রমণ করে। ঠেসাঠেসিতে ভারতীয়েরা অভ্যস্ত, গর্ভস্থ ভ্রূণের মত হাঁটুটাকে দুমড়ে চিবুকের তলায় এনে তারা ঘুমোতে পারে। দেশাই শুয়ে পড়েছেন কামরার সঙ্কীর্ণ খালি জায়গাটায়, তলায়—বেশ ঠাণ্ডা রাত। যাত্রাও যেন শেষ হতে চায় না—অবশেষে সকালে আমেদাবাদে পৌঁছানো গেল। স্টেশন থেকে আশ্রমের পথ সম্বন্ধে যা প্রথমেই প্রিভার মনে পড়ে, তা এক বিদিগিচ্ছিরি ধুলো, স্থানে স্থানে দুয়েকটা বাঁদর, দূর থেকে যাদের কুকুর বলে ভুল হয়। অভিযোগের সুরে চেঁচাতে চেঁচাতে বাঁদরগুলো রাস্তার গাছে লাফ দিয়ে চড়ছে। পরে প্রিভা আশ্রমের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেখানে বিশেষ খাতির করে তাঁদের দুজনকে একটা ঘর দেওয়া হয়। অবশ্য সেটা দেওয়ার আগে গান্ধী তাঁকে গোপনে অনেক শপথ করিয়ে নেন, যেমন প্রিভা এটা করবেন না, সেটা করবেন না, এবং যতদিন ঈভের সঙ্গে প্রভুর এই বেষ্টিত কাননে তিনি থাকবেন, ততদিন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলে দাঁত বসাতে যাবেন না। অবশ্য সেই একই কাননে আপেলের চার-চারটি বীজ পুঁততে প্রভু ইতস্তত বোধ করেন নি।...সবিশেষ খাতির-যত্ন পেলেও (এবং সুইজারল্যাণ্ডে তাঁদের জীবন কোনো অর্থেই আরামের নয়) প্রিভার মনে হয়, আশ্রমের অবস্থা আরো অনেক ভালো হতে পারত। বিছানার ঠিক উপরেই বিরাট বিরাট টিকটিকি, যারা গোল গোল চোখ নিয়ে তোমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—আর মাকড়শার কথা না হয় নাই বললাম। কাঠবিড়ালী ইচ্ছামত ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এবং ঘরের দরজা যেহেতু ভালো ক'রে বন্ধ হয় না, এক রাত্রে একটা প্রকাণ্ড বাঁদর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে প'ড়ে বাক্‌সপত্র হাতড়াতে শুরু ক'রে দিল। ভাগ্যে সে-সময়টায় সাপের প্রাদুর্ভাব কম— কারণ সাপও আশ্রমের অভ্যস্ত অতিথি—তবে যে-জিনিসটা সত্যিই চরম (যদি তার উল্লেখ করা চলে), সেটা পায়খানার বন্দোবস্ত। (বর্ণনা শুনে আমি সত্যিই লজ্জায় লাল, কারণ জানি তো, পায়খানা জিনিসটার উপর গান্ধী কতখানি মূল্য আরোপ করেন। কারুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'লেই তিনি প্রথমে সে-জায়গাটা পরিদর্শন করবেন, এবং অকপটে সমালোচনাও করবেন। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর পায়খানার তো তিনি ঘোরতর নিন্দা করেন। কবির সেই পায়খানা তবে কী বস্তু ছিল, কে জানে। কোন সিংহাসনে বসেন কবি?)—যাই হোক, আশ্রমের পায়খানা বাগানের একপ্রান্তে, বলা-বাহুল্য—তার দরজা ভালো ক'রে বন্ধ হয় না, ছিটকিনি নেই। পায়খানা মানে কতকগুলো কীটদষ্ট তক্তা, যার উপর পা পড়লেই কি ক্যাঁচ করে শব্দ হবেই, যেন এই ভাঙল ব'লে, এবং সে-তক্তাগুলো দু ধরনের পাত্রের উপর শূন্যে ঝোলানো। এক পাত্রটি সামনের কাজের জন্য, দ্বিতীয়টি পিছনের কাজের জন্য—এত বন্দোবস্ত এই কারণে যাতে মহামূল্য জিনিসগুলি মিশে একাকার না হ'য়ে যায়। কারুর পক্ষে এই কারসাজিতে সফল হ'তে গেলে বিলক্ষণ আর্টের দরকার পড়ে—এবং সেই সাফল্য প্রিভা একটিবারের জন্যও অর্জন করেন নি। কাজকর্ম হ'য়ে গেলে পেটুক রাবলে যাকে পরিষ্কার হওয়ার উপায় ব'লে বর্ণনা করেন, বলা বাহুল্য, আশ্রমের পায়খানায় তা কোথাও নেই, কোনো জায়গায় কাগজের চিহ্নমাত্র নেই। হয়তো পরিচ্ছন্নতার কারণে, কিম্বা বাছা-বাছা জিনিসগুলির পবিত্রতা রক্ষার্থেই কাগজ ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবে দৈনিক এই অনুষ্ঠানটি সেরে বেরোনোর পর লোকে একবার স্নান করে নেয়, পাশেই। এবং যেহেতু সম্মানিত অতিথির পরিচর্যার জন্য মীরা আশ্রমের এক সম্ভ্রান্ত অধ্যাপককে প্রতিদিন পাঠাতেন জল গরম ক'রে রাখার জন্য, প্রিভাদের পক্ষে পায়খানা অভিমুখে এই যাত্রা দিনে একাধিকবার করার সত্যিই উপায় ছিল না। না, না, কিছুতে না, আশ্রম আমার পশ্চাদ্দেশ দেখবে না...এ-পায়খানা তাদের জন্য যারা ভোগে কোষ্ঠবদ্ধতায়। (গান্ধী ভোগেন এই কোষ্ঠবদ্ধতায়, এবং সেটা তিনি জগৎসমক্ষে চীৎকার ক'রে জানাতেও ছাড়েন না। এটাও আমরা জানি, ঐ পায়খানাতে ব'সে বহু উচ্চ বা গভীর প্রেরণা তাঁর মাথায় এসেছে।) ...কোলা-র ছোট ছেলেটির (এখানে আমার নিজের কথাই বলছি) এই অশ্রদ্ধাজনক ভাবে পাঠক যেন ক্ষুব্ধ না হন। গান্ধী যে নিজেই মনে মনে হাসেন না, সে-বিষয়েও আমি ততটা নিশ্চিত নই (কিন্তু হাসেন না যিনি, তিনি মীরা।)...এবং যখন আশ্রমের নড়বড়ে পায়খানার প্রসঙ্গ একবার তুলেছি, তখন সেই অপমানজনক বিড়ম্বনার কথাটাও পাড়ি (কিন্তু এবার আমি একেবারেই ঠাট্টা করছি না), যার মধ্যে ভারতের নানা স্থানে জেলরক্ষকরা তাদের কয়েদীদের ফেলে। এইসব কয়েদীদের মধ্যে প্রায়ই অতি সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট লোকও থাকেন। প্রতি সকালে নির্ধারিত সময়ে জেলরক্ষকরা কয়েদীদের একটি বিশেষ স্থানে নিয়ে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করায় ও পেট খালি করার আদেশ দেয়। কয়েদীরা তা পারুক আর না পারুক, দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র এই সময়টিই তারা পায় কাজটি করার জন্য।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩২—ভারত থেকে ফেরার পথে এদম' প্রিভা লণ্ডনে থামেন ও তাঁর ভারত-পরিভ্রমণ সম্বন্ধে সেখানে বহু বক্তৃতা দেন। দেখা করেন লয়েড জর্জ-এর

সত্ত্বেও, যাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে তিনি বিস্মিত হন।

লয়েড জর্জ-এর গলাটি ভারী মিষ্ট ও গম্ভীর, কিন্তু সে-গলায় কথা ততটা না ব'লে শুনলেনই তিনি বেশি। গান্ধীর প্রতি তাঁর অতীব আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেন, বললেন, 'গান্ধী সিধে ব্যক্তি, অনুগত ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। তিনি যা করছেন, ঠিকই করছেন। আমি ক্ষমতায় থাকলে তাঁর সঙ্গে আমার বনিবনাটা সহজ হত—এমন চরিত্রের বিপক্ষীকে পেলে তর্ক করেও আরাম। হায়, আয়র্লণ্ডে যদি তাঁর মত লোকের সাক্ষাৎ পেতাম।......তাঁর চরিত্রের নৈতিক গুণের কথা বলছি না...(জর্জ-এর বক্তব্য যেনঃ 'সেটা আমি ধর্তব্য ব'লে মনে করি না')—কিন্তু তিনি সত্যিই একজন গুণী ও সং কূটনীতিজ্ঞ। সরকারের ভার আমার হাতে থাকলে বল্ডউইনকে তাঁর কাছে পাঠাতাম। তাঁরা দুজনে একটা মীমাংসায় আসতে পারতেন।" —বড়লাট উইলিংডন-এর কথা ওঠে, এবং লয়েড জর্জ প্রিভার কাছে জানতে চানঃ "কতক্ষণ আপনারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন?" —"পোনে এক ঘণ্টা।"...(খুব শান্ত স্বরে) "সেই সময়টুকুর মধ্যেই কি বুঝতে পারেন নি যে লোকটার মস্তিষ্ক ব'লে কিছু নেই?"—পরেই গম্ভীরভাবে বলেন জর্জঃ "অবশ্য তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বেরই সম্পর্ক আমার।"—শেষ দিন সন্ধ্যায় যে সব পুলিশ অফিসার ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড থেকে সুরু করে ব্রিনদিসি পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে প্রিভা ডিনার খেলেন লণ্ডনে। সকলেই তাঁরা গান্ধীর সম্বন্ধে স্নেহসূচক উক্তি করলেন, তাঁকে বললেন বুড়ো খোকা ('ওল্ড বয়')। যে খাতির-যত্ন গান্ধী তাঁদের কাছে পান (সকলেই গান্ধীর পরিচারক হয়ে ওঠেন), তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত তাঁদের প্রত্যেককে গান্ধী একটি ক'রে ঘড়ি উপহার দেন—সে উপহার গ্রহণ করার অনুমতি অবশ্য তাঁরা তাঁদের উপরওলাদের কাছে চান। তাঁদের তখন জানানো হয়, ঘড়ি তাঁরা নিতে পারেন, কিন্তু লিখিতভাবে অনুমতি যেন না চান। যে-কারাগারে বন্দী হ'য়ে আছেন গান্ধী, তার পরিচালকের মধ্যবর্তিতায় সে-উপহার ইংরেজ পুলিশের কর্তারা এখানে আনিয়ে নেবেন। কিন্তু এই সব পুলিশ অফিসাররা গান্ধীকে উপহারের জন্য প্রকাশ্যে ধন্যবাদ না জানাতে পেরে বড় বিড়ম্বিত বোধ করছেন; ভাবছেন, গান্ধীর প্রতি এই অবিনয় দেখাতে তাঁদের বাধ্য করা হচ্ছে। তাই প্রিভা যেন সে-কথাটা গান্ধীকে জানান, এই অনুরোধ তাঁরা করলেন। প্রিভার কানে কানে চুপি চুপি এটা পর্যন্ত বললেন, "এবং শীঘ্রই 'ওল্ড বয়'-কে আমরা আবার এখানে দেখতে পাব, তিনি আসবেন নতুন এক গোল বৈঠকের জন্য।"......

আগস্টের শেষ, ১৯৩২—সোফিয়ার বোন মাদাম ক্লোদাভ আরেনি তাঁর বড় ছেলেকে

সঙ্গে করে কয়েকদিনের জন্য লুগানোতে এসেছেন, উঠেছেন পার্ক হোটেলে। সেই অবসরে গান্ধীর রোম সফরের যে খুঁটি-নাটিগুলো আমার এখনো জানা ছিল না, সেগুলো মাদাম মারেনির কাছ থেকে জেনে নিলাম। —আমি মিথ্যা ভয় পাই, আসলে গান্ধীকে তাঁর বাড়ীতে আমার পাঠানোর দরুন জেনারেল মরিস কিন্তু ততটা দুর্ভাবনায় পড়েন নি। তিনি সতর্কতা অবলম্বন ক'রে আগে এবিষয়ে সমর মন্ত্রকের পরামর্শ চেয়ে বসেন, সমর মন্ত্রক আবার মুসোলিনীর পরামর্শ চান। মুসোলিনী আপত্তির কিছু দেখেন না, আমাকে উদ্দেশ করে নাকি বলেনঃ "উনি একজন মস্ত বড় লেখক, ওঁর প্রতি কোনো বিরুদ্ধ ভাবই আমার নেই।" আগাগোড়া ব্যাপারটায় তিনি নাকি সন্তুষ্টই হন। রাষ্ট্রদূত স্কার্পা (যাঁকে গান্ধী যুক্তিসংগত কারণেই এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন) নাকি মাদাম মারেনিকে এমন পর্যন্ত বলেন যে, গান্ধীর থাকার ব্যাপারে আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যমে তাঁরা খুশীই হয়েছেন, কারণ গান্ধী রোমে এলে তাঁর সঙ্গে ঠিক কোন ধরনের ব্যবহার সংগত হবে, সেটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি—অন্যদিকে হেলাবিগেরই পুনরাবৃত্তি করে মাদাম মারেনি আমায় জানালেন, গান্ধীকে রোমের সর্বসাধারণের মধ্যে পেয়ে তাঁর আনন্দ ও অভিভূতির কথা—গান্ধীকে পেয়ে জনতার সেই যে-জাগ্রত উৎসাহ, তা যেমন গভীর তেমনি আন্তরিক। গান্ধীকে তারা বুঝতে চায় ও পারে। গান্ধী যেদিন রোম ছেড়ে চ'লে গেলেন সেদিন স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে মাদাম মারেনিও ছিলেন, গান্ধীর সঙ্গে সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসিম-এর লোকে তুলনা করছে, তাও তিনি নিজের কানে শোনেন। লোকেরা গান্ধী সম্বন্ধে এমন উক্তিও করেঃ "এক দৈব ঘটনা, যীশু খৃস্টই নতুন দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন।"

সেপ্টেম্বর ১৯৩২—গান্ধীর কথা সর্বক্ষণই মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় তিনি মরতে চলেছেন (ভারত থেকে যে-খবর পাচ্ছি, তাতে ইতিমধ্যেই তাঁর অবস্থা শঙ্কাজনক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কয়েকদিন ধরে উপবাস চলছে তাঁর, তবু রাজনৈতিক কাজকর্ম তিনি বন্ধ করতে চান না)। ইউরোপীয় 'আদর্শ-বাদীরা' এ-সম্বন্ধে তাঁদের অবজ্ঞা দেখিয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা বুঝছেন না অহিংসার এই শেষ বীরের পরাজয় ও তিরোভাবের অর্থ কী হবে জগতের ভবিষ্যতের পক্ষে, এমনকি তাঁদেরই আদর্শের ভবিষ্যতেরও পক্ষে। তাঁদের একজনও কোনো উচ্চবাচ্য করবেন না, গান্ধীর সংগ্রামে এতটুকু সাহায্য করতেও এগোবেন না কেউ ইউরোপে। আর বালখিল্য কোয়েকারের দল শুধু ২৪ ঘন্টার অনশনব্রত নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উচিত কর্মপদ্ধতির কথা ভাবতে পারলেন না। লন্ডনে যিনি একমাত্র উঠেপড়ে লেগেছেন, তিনি সি এফ এনড্রুজ। এবং একমাত্র তাঁরই কথা শুনতে রাজী ব্রিটিশ সরকার। মিসেস কাজিনস্ নামে একজন ইংরেজ থিওজফিস্ট বছর কুড়ি ধরে ভারতে বাস করছেন—তিনি ৬ই অক্টোবর (যন্ত দেরী সেটা) জেনিভায় ভারতের কারণে এক আন্তর্জাতিক দিবস পালনে উদ্যোগী হয়েছেন। নাম-করা কোনো ফরাসী ব্যক্তিই তাতে অংশগ্রহণ করছেন না—তাঁদের কেউ অসুস্থতার অজুহাত দিয়েছেন, কেউ বা স্বার্থপরের মত এ-সব নিয়ে মাথা না ঘামানোই শ্রেয় মনে করেছেন। এ্যালবার্ট শ্ভাইটজারের উপর উদ্যোগীরা নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু তিনিও আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন (অবশ্য তাঁর কাজের চাপ প্রচন্ড, এবং আমার মতই তাঁরও স্বাস্থ্য ভঙ্গুর)। উদ্যোগীরা তাই আমার শরণাপন্ন হয়েছেন, যাতে শ্ভাইটজারকে আমি ব্যক্তি-গতভাবে অনুরোধ জানিয়ে লিখি। তাঁকে লিখলাম (২৩শে সেপ্টেম্বর) ঃ

"......গান্ধী নিয়ে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ভারত নিয়েও নয়। কিন্তু যে-উদ্দেশ্য গান্ধী নিজের মধ্যে মূর্ত করেছেন ও যার জয় বা ধ্বংসের উপর ইউরোপের নিয়তি আগামী এক শতাব্দী বা তারও বেশি কাল ধরে নির্ভর করবে, প্রশ্ন সেই অহিংসাকে নিয়ে। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি জগতের (বিশেষত এশিয়া ও রাশিয়ার) সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছি, তাই জানি ভারতীয় সত্যাগ্রহ সর্বত্র কোন ধরনের ক্রোধ বা আশা-ভরসার উদ্রেক করে। জানি ইহুদী এক বিচারকর্তার দ্বারা অনুপ্রেরিত এই যে-বীরত্বপূর্ণ ও ধৈর্যসম্পন্ন পরীক্ষাটি চালিয়েছে গোটা একটা জাত, একমাত্র সেইটেই এতদিনের সঞ্চিত প্রকান্ড হিংসাশক্তিকে ঠেকানোর এমন এক শেষ বাঁধ যার জুড়ি নেই। কারণ একমাত্র সেই কার্যকরী অস্ত্রেরই শক্তি আছে ঘৃণা ব্যতীত সামাজিক রূপান্তর সাধনের, অথবা আরো ভালো, এমন এক হঠাৎ পরিবর্তন আনার যা যেমন জরুরী তেমনি ভয়ঙ্কর। গান্ধী না থাকলে হিংসার বন্যায় সারা জগত প্লাবিত হবে, এবং তখন সে-বন্যার দিকে চেয়ে আমিই প্রথম চেঁচিয়ে উঠবঃ "ছুটে যা, জগৎ প্লাবিত কর।" কারণ আজকের সমাজের যে-অবস্থা, তাকে যেন তেন প্রকারেণ ঝাঁট দিয়ে দূর করতেই হবে, এবং তা দূর হবেও......।"

এ-অনুরোধও আমি তাঁকে জানাই, তিনি যদি একান্তই না আসতে পারেন, অন্তত একটি বাণী যেন পাঠান "সেই মানুষকে উদ্দেশ্য করে, যিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হয়তো তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমাদের ক্ষতবিক্ষত সময়ের শান্তিকামী শেষ আশাটুকু।"

কিন্তু উত্তরে এ্যালবার্ট শ্ভাইটজার গুণ্স্বাক হতে আমাকে লিখলেন (২৪শে সেপ্টেম্বর) ঃ

"প্রিয় বন্ধু, আপনার চিঠি আমায় গভীরভাবে অভিভূত করল এবং আপনার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থাতেও যে কষ্ট করে তা আপনি লিখেছেন, তাতেও কম অভিভূত আমি নই।...জগতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী দুশ্চিন্তার বোঝা আমি বহন করি, তা আপনার অজানা নয়। যে-কষ্ট আমি পাই, তার সবটা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারি না...কিন্তু জেনিভায় যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব... আমি আমার সীমার শেষ পর্যায়ে এখন, এবং যেহেতু শীঘ্রই আমায় আফ্রিকাতে ফিরতে হবে, একমাত্র নিজের কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ক'রে থাকা ছাড়া আমার উপায় নেই। যে-বইটা লিখতে সুরু করেছি তা যদি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শেষ না ক'রে উঠতে পারি তো হয়তো তা আর কখনও শেষ করতে পারব না... কারণ লাবারেনে-তে একবার ফিরে গেলেই সেখানকার কাজের চাপ পড়বে আমার উপর। তাই এই শরতে নড়াচড়া না করার অঙ্গীকার নিয়েছি। যেহেতু অন্যান্য সব সভার নিমন্ত্রণই আমি প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছি, সে নিয়মের ব্যতিক্রম যদি এবার ঘটাই তো লোকের রীতিমত নিন্দাভাজন হব। জীবনকে সম্মান করার যে-আদর্শ—একমাত্র তাকেই রূপ দেওয়া আমার কর্তব্য ব'লে এমন নিশ্চিতভাবে জানি যে সে-কাজকেই অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিই। এবং মরার আগে তা যে শেষ করতে পারব, এমন আশাও রাখি। আমার এই আদর্শটির মধ্যে দেখি এক নূতন অধ্যাত্ম-চেতনার বীজ, তাই সর্বক্ষণ ভয়, পাছে তাকে রূপ দেওয়ার কর্তব্য সম্পন্ন করার আগেই মরে যাই।......বিশ্বাস করুন, সম্ভব হলে আপনার অনুরোধ নিশ্চয় রাখতাম—বাণী আমি পাঠাচ্ছি না, কারণ সম্মেলনের ভাবটা কেমন হবে বুঝতে পারছি না বলেই কী লিখব ঠিক করতে পারলাম না। আমি জগতের এত বাইরে বাস করি—মনে হয়, মৌন থাকি বহু সপ্তাহ ধরে এবং সেটার দরকারও আমার। ইচ্ছা রইল, আফ্রিকায় পাড়ি দেওয়ার আগে আপনাকে আরো একবার দেখতে পাব—আপনার কথা প্রায়ই মনে করি......

আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে
অ্যালবার্ট শ্ভাইটজার।"

(কী দুঃখের কথা, যেমন শ্ভাইটজারের পক্ষে, তেমনি গান্ধীর পক্ষে। শ্ভাইটজারের যে-বিশ্বাস, তা তো মূর্ত গান্ধীতেই, 'জীবনকে সম্মান' করার যে-আদর্শ তাঁর, তাও গান্ধী তাঁর কর্মের মাধ্যমে জীবন্ত করেছেন......)

[ক্রমশঃ]

ঘটনাটি এত অপ্রত্যাশিত আর দ্রুত ঘটে গেল যে কী করা উচিত ভেবে ঠিক করতে পারলাম না আমি। শুধু নিঃসীম বিহ্বলতায় শুকনো ঢোক গিলে কোন রকমে উচ্চারণ করলাম—আমি! আমায় বলছেন?

নিদারুণ আতংকে আর উত্তেজনায় মেয়েটিও কথা বলতে পারছিল না। হঠাৎ ভয় পেয়ে আমার কাছে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। তারপর কী করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে শুকনো বালিয়াড়ির ওপর আমার পাশে বসে পড়েই আরো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে দিল। কেবল আমার প্রশ্নের উত্তরে আমার দিকে না তাকিয়েই প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে চাপা গলায় বলল—হাঁ, আপনাকে! ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। পরে বলব সব। প্লিজ আমায় একটু সাহায্য করুন। না, না, কোন ভয় নেই। না করলে কিন্তু বড্ড বিপদে পড়ে যাব।

পরক্ষণেই আবার জোরে জোরে দম নিয়ে, কাকে যেন শোনাবার জন্যেই হঠাৎ জোরে খিল-খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, তুমি একটি আস্ত ইয়ে—বুঝলে! মাইরি মাইরি, সত্যি বলছি, আগে জানলে কে তোমায় বিয়ে করত! বলেই উদ্দাম হাসির শেষে লম্বা একটা ইস শব্দ তুলে টান দিল। তারপর বলল, আচ্ছা বলতে পার প্রফেসারদের কী শুধু লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহ থাকতে নেই?

এ কথার উত্তরে কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে চুপ করেই রইলাম। সামনেই অস্তগামী সূর্যের আবির লাল আভায় রাঙা সফেন সমুদ্র-তরঙ্গগুলো আছড়ে পড়ছে পায়ের কাছে বালিয়াড়ির বুকে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে উত্তাল তরঙ্গগুলো সরাসরি আছড়ে পড়ছে আমার বুকের মধ্যে। কিছুতেই বিহ্বলতাটা যেন কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না।

মাথা থেকে দামী লাল রেশমী শাড়ির আঁচলটা সমুদ্রের দমকা হাওয়ায় খসে পড়তেই মেয়েটি কথা ভুলে তাড়াতাড়ি আবার তুলে নিল যথাস্থানে। তারপর আবার আমার উদ্দেশ্যে চাপা গলায় ফিস-ফিস করে উঠল, ইস অমন চুপ করে থাকবেন না। প্লিজ, যা হোক কথা বলুন, না হলে ওরা ঠিক ধরে ফেলবে। বলতে বলতেই গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত ওর কণ্ঠস্বর তখুনি চড়ায় উঠে গেল—পীযুষদাকেও দেখেছি, রাতদিন কেবল বই মুখে করে বসে। রানুদিও বলে, জ্বলে-পুড়ে মরলাম তোর জামাইবাবুকে নিয়ে! তুমি তো রানুদিকে—না? সেই যে গো গোলগাল, ফর্সা—আমার মাসতুত বোন? বারে, অমন বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছ কী? মনে নেই তোমার? আমাদের বিয়ের সময় বাসরঘরে তোমার সঙ্গে অত ঠাট্টা ফাজলামি করলে—আর ভুলে [illegible]

এর মধ্যেই। কথা বলতে বলতে দ্রুত হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কালো সান গ্লাসটা আর আরেই পরে নিল চোখে।

ঝড়ের মতো অনেকক্ষণ আইকে থাকা নিঃশ্বাস সজোরে ফেলতে ফেলতে, কেমন করে জানি না, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মনে আমার নেই। কিন্তু পীযূষ-বাবুকে তো...।

হঠাৎ আমাদের ঠিক পেছনেই কয়েক জোড়া ভারী পায়ের শব্দ হতেই কথা থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, চারজন ট্রাউজার-সার্ট পরা লপেটা মার্কা যুবক মেয়েটির ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করতে করতে এসে, দাঁড়িয়ে পড়ল পেছনে। বুঝতে অসুবিধে হল না, এদের ভয়েই মেয়েটা এতটা আতংকিত হয়ে পড়ে আশ্রয় নিয়েছে আমার পাশে।

মেয়েটি কিন্তু নির্বিকার। যেন এতগুলো লোকের উপস্থিতি টের পায় নি মোটেই। ছুটে আসা ঢেউগুলোর দিকে অতি মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছে। আর অনর্গল অতি উৎসাহে কথা বলে যাচ্ছে আমার সঙ্গে—পীযূষদা আসেই নি আমার বিয়েতে তো দেখবে কী। হঠাৎ আবার গ্রামোফোন রেকর্ডের দম ফুরিয়ে আওয়াজ নেমে এল একবারে খাদে—আঃ ওদিকে তাকাবেন না। জোরে জোরে কথা বলুন আমার সঙ্গে।...বিদ্যুৎ তরঙ্গের চেয়ে দ্রুত আবার চড়া পর্দায় উঠে গেল মেয়েটির কণ্ঠস্বর। কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা, নিজের পরীক্ষা...রাণুদির শাশুড়ির অসুখের ঝামেলা। রাণুদি তো বলছিল পীযূষদার নাকি নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত নেই...।

তাড়াতাড়ি আবার ওর দিকে ঘুরে বসে বললাম—ও তাই। আমি তো ভেবে-ছিলাম...। কিন্তু তারপর আর কী বলা সংগত, ভেবে ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ থেমে পড়লাম।

পেছনে লোকগুলো যে একপাও নড়ছে না, না তাকিয়েও বুঝতে পারছি।

কিন্তু আমি থামতে চাইলেও ওর যে থামলে চলবে না মেয়েটির মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। আমার অসম্পূর্ণ কথার খেই ধরে বলে উঠল—ও তাই না মশাই, এবার ফিরে গিয়ে কিন্তু একদিন রাণুদির বাড়ি যাওয়া চাই-ই মনে থাকে যেন...।

হঠাৎ পেছনে অকারণ জোরে জোরে শুকনো কাশির শব্দ হতেই যেন অনামনস্ক-ভাবে নিছক অনুসন্ধিৎসাবশত মুখ ফেরাল মেয়েটি। আর, তারপরই কথা ভুলে বিস্ময়ে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে হেসে বলল—ওমা, আপনারা? কী আশ্চর্য। এই তো সেদিন ঘুরিয়ে গেলেন এখানে। না কী এবার আরো লম্বা সফরে বেরিয়েছেন। পুরীটাও ছেড়ে গেলেন ফ্রাফপথে। বেশ আছেন কিন্তু আপনারা।

আমিও কৌতূহলে ঘাড় ফেরালাম ওদের দিকে। দেখলাম সকলের চোখে মুখেই এক অমূল্য নিধিকে হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ আর চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠেছে।

বেজায় লম্বা, টেরিলিনের বুশ সার্ট পরা লোকটা আমার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে, কাশিয়ে নিয়ে, একটু ইতস্তত করে বলল, তুমিই বা কী খারাপ আছ? তুমিও তো এই সেদিন বেড়িয়ে গেলে এখানে।

লোকটার কথা যেন মুখ থেকে লুফে নিল মেয়েটি। হেসে বলল—এবার আসতে হল—ওই যে দেখছেন সঙ্গে, কী বলব, একেবারে নাছোড়বান্দা। বিয়ের আগে পর্যন্ত স্রেফ বই মুখে করে কাটিয়েছেন, তখন কিন্তু কাউকে প্রয়োজন হয় নি। আর এখন হয়েছেন ঠিক উল্টো। ঘোড়া দেখা খোঁড়া। বউ না হলে এক পা চলে না। অগত্যা...।

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে যাওয়ায়, হেসে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল,—দেখেছেন, ও'র সংগে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিতেই ভুলে গেছি। বলেই এক পা পিছিয়ে এসে আমার হাতটা ধরে হিড়-হিড় করে টেনে আনল সামনে—বারে, এখনো চুপ করে বসে আছ কী। তোমার তো নিজের থেকেই এগিয়ে এসে আলাপ করা উচিত। বিশ্ব-কুড়ে, বুঝলেন নীরেনবাবু। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতেই আগ্রহ নেই মানুষটার।

প্রথম থেকেই লোকগুলো আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী দেখছিল কে জানে। কখনো আমার দিকে, পরক্ষণেই মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল। ও কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন ভঙ্গিতে নিজেই পরিচয় করিয়ে দেবার কাজ শুরু করে দিল, —ইনি তো শুনলেই নীরেনবাবু। নীরেন বোস, ইনি সঞ্জয়...। সঞ্জয় কী যেন আঃ হা...ভুলে যাচ্ছি পদবীটা।

কালো মোটা লোকটা হঠাৎ হেসে উঠল—থাক থাক। অনেক হয়েছে। তুমি এবার থাম তো মিলি! এবার ওনার সংগে পরিচয় করিয়ে দাও। ইনি কে? আগে তো দেখিনি তোমার সংগে।

এই প্রথম মেয়েটির নাম শুনলাম—মিলি।

মিলি সপ্রতিভ উত্তর দিল, আবার নতুন করে কি পরিচয় দেব ও'র। বুঝতেই তো পারছেন। বলেই লজ্জার ভঙ্গিতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল একটু। তারপর বলল, পতিদেবতা। নেহাৎ নাম করতে নেই তাই নামটা নিজে মুখে বলতে পারছি না। কলকাতার একটা কলেজের ইংরিজির প্রফেসার। বোশেখ তো এটা? অঘ্রাণে বিয়ে হয়েছে আমাদের। ছ মাস পাঁচেক হল—না গো?

বেয়াড়া চাল-চলনের লোকগুলোকে প্রথম দেখাতেই সর্বাংগ আমার রি-রি করে জ্বলছিল। তবু মুখে হাসি টেনে বলতে হল,—তা হল বইকী! তারপর নিজের নামটা থামিয়ে বললাম—অনিমেষ...দত্ত।

লোকগুলো যেন কিছুতেই খুসী হতে পারছে না, ওদের চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। বিশ্বাস করে মিলির কথা তো নয়ই! নিজেদের মধ্যে মুখ তাকাতাকি করে চাপা হাসি হাসল। তারপর একজন বলল,—তা বেশ। শুনে খুসী হলাম। এখানে কোথায় উঠেছ—ঠিকানাটা দাও। গল্প করতেও তো যেতে পারি তোমার ওখানে। আছো তো কিছুদিন—না বলবে আজই চলে যাচ্ছ! সেবার তো তাই করলে।

মিলি হঠাৎ কৌতুকে আর উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল, বারে, এখনো আগের মত ন্যাড়া হাত-পা আছি মনে করেছেন নাকি আপনারা। না তাই সম্ভব। ইনি বাইরে থেকে দেখতেই মহাদেব। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে শেখেন নি। কিন্তু নিজের বউয়ের বেলায় সেই রক্ষণশীল পতিদেবতা। এটা করবে না, ওটা নিষেধ, এটা মেয়েদের করা উচিত নয়...আবার খিল খিল করে হেসে উঠল মিলি। তারপর হাসি থামিয়ে বলল,—বাব্বা, হাজার হোক, পতি-দেবতা তো। যত বিক্রম সব বউয়ের বেলায়।

মিলির কথার মধ্যেই সঞ্জয় বিব্রত গলায় বলল, বুঝেছি। বললাম তো শুনে সুখী হলাম। এবার তোমার ঠিকানাটা বলো? কোথায় উঠেছ! নাকি বলবে আজই চলে যাচ্ছ!

মিলি কিন্তু মোটেই দমবার পাত্রী নয়। অথচ কোনরকম ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যেতে চায় না, সেটা ওর কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে। হেসে হেসেই কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে—ওমা, আর কতদিন থাকব এখানে। কদিন আর বেড়ায় লোকে। বাড়িতে শাশুড়ি শয্যাশায়ী। নেহাৎ আগে থেকে টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল, আর ঠিক সময় বড় ননদও এসে পড়ল তাই কোনরকমে দুদিনের নাম করে আসা হল। তাও তো আজ যাই কাল যাই করে পাঁচদিন হয়ে গেল। তারপর আর কী থাকা ভাল দেখায়, আপনি বলুন।

লোকগুলো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। যেন ইতিকর্তব্য কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পাচ্ছে না—এবং সে বাধাটা যে আমিই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। মিলির অসহায় অবস্থাটা সামলে নেয়া উচিত ভেবে এবার আমি কথা বলা শুরু করলাম—সত্যি, পুরীতে যে এত ভীড় হয়, জানতাম না। তাও ভাগ্যিস এসেই সিট রিজার্ভ করে-ছিলাম, তাতেই এই। কাল বিকেলের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি আমরা। তা আপনারা কী করবেন। রিজার্ভেসন পেয়েছেন? অবশ্য সংগে মেয়েছেলে না থাকলে তেমন অসুবিধে আর কী?

লোকগুলো বোধহয় আমাকে বাজিয়ে দেখার সুযোগই খুঁজছিল। এ লাইনে রীতিমত পোক্ত লোক ওরা। আমি কথা বলা শুরু করতেই দেখলাম, দুভাগে ভাগ হয়ে গেল দলটা। মহা উৎসাহে গল্প জুড়ে দিল দুজন। কোলকাতার কোথায় থাকি, আদি নিবাস কোথায়, পুরীর জল-হাওয়া...।

কোলকাতার সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের অফিস-কেরানী আমি, তবু প্রফেসারী ঢংয়ে কথা বলে যাচ্ছি। আশ্চর্য, মিলির সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিটের পরিচয়েই, ওর মত অনর্গল মিথ্যে কথা বলায় অপরিসীম

একটা কমতা এসে গেছে আমার জিভে। ওদের সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু কান আছে ওদের দিকে। নিজে ব্যস্ত থাকায় ঠিক অনুসরণ করতে পারছিলাম না ওদের কথাবার্তা। ছাড়া ছাড়া কানে আসছিল।

কথা বলতে বলতে মিলিকে একটু দূরে নিয়ে গেল ওরা। একজনের কথার উত্তরে চাপা অথচ সহজ ভঙ্গিতে মিলি মাথা নেড়ে হেসে বলল— মাইরি, মাইরি ওরা নয়। কেন মিথ্যে বলব। আর পালাবেই বা কেন বলুন।

মোটা কালো লোকটা এবার চাপা গম্ভীর গলায় বলল—বেশী চালাকি করতে চেষ্টা কর না মিলি। আমরা স্পষ্ট দেখলাম মিনতি আর শ্যামা ওদিকে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। আর তুমি এদিকটায় একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়েই কী যেন বললে ওদের. সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে হাওয়া হয়ে গেল ওরা। আর তুমি ছুটে এসে বসে পড়লে এর পাশে। বল—ঠিক বলছি কী না? তাও ভেবেছিলাম. থাকগে ওরা পালায় পালাক কিন্তু তোমায় তো ধরে ফেলেছি। বুঝতেই তো পারছ... কেন! কিন্তু তুমি যে আমাদের এমন ভানুমতীর খেল দেখাবে—এতটা ভাবতে পারি নি। সত্যি, তুমি সব পার মিলি। পাকা অ্যাকট্রেসদেরও ছাড়িয়ে যাও। থাকগে, মিলি লক্ষ্মীটি...একটু মুখ তুলে চাও আমাদের দিকে।

মিলি বিব্রত বিরক্ত গলায় বলল, ছিঃ ওসব কথা আর বলবেন না কল্যাণদা...।

থামো! গর্জে উঠল কল্যাণ। তবু সেই এক কথা বলবে। তোমার বিয়ে হয়েছে না ছাই। অন্তত তোমার মত মেয়েকে কেউ বিয়ে করে!

—সে আপনার ইচ্ছে। আপনি মানুন আর নাই মানুন। আগে যা করেছি, করেছি। এখন আমি বিবাহিতা। দোহাই আপনার, এখন আর আমায় টানবেন না এসব নোংরামির মধ্যে!

মিলি থামতেই অন্য লোকটা কি যেন বলল, ঠিক শুনতে পেলাম না। মিলির উত্তরটা কানে এল—কে বলেছে—আমি? কক্ষনো না। মাইরি, মাইরি...বিশ্বাস করুন। আমি কেন মিথ্যে মিথ্যে আপনাদের নামে বলব বলুন। ছোট দারোগাকে জিজ্ঞেস করবেন। আমি বলেছি, আমি কিচ্ছু জানি না।

—হাঁ তুমিই। আবার বলছি বেশি চালাকি কর না। বুঝলে! নেহাৎ এটা পুরী, কলকাতা নয়—তাই। নইলে পিঠের চামড়া খুলে নিতাম না তোমার!

মিলিও এবার চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল. আমাকে ওসব ভয় দেখিও না বুঝলে। অনেকক্ষণ তোমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করেছি, আপনি আপনি বলে কথা বলেছি। কিন্তু আর তোমাদের মান রাখতে পারব না। তোমাদের মত আমার হাতেও গণ্ডা গণ্ডা গুণ্ডা আছে, ভুলে যেও না। ওঃ ভাত দেবার মুরোদ নেই কীল মারার গোঁসাই। যাও যাও, পথ দেখ!

আচ্ছা দেখা যাক। বলেই লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আক্রোশে ফুঁসতে লাগল। তারপর শুধু বলল, এখন আমার কথার উত্তরটা দেবে মিলি। সত্যি আজ চলে যাচ্ছ।

এতক্ষণে মিলি যেন সহজ হতে চেষ্টা করল। একটু হেসে বলল,—বাব্বাঃ, এত করে বলছি, তবু বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার। তবে, আজ নয়, কাল। বিশ্বাস না হয় অলোকা হোটেলেই তো উঠেছি আমরা। গিয়ে খোঁজ নেবেন।

লোকটা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল—তোমার কলকাতার নতুন ঠিকানাটা দেবে আমাকে। না, না...সে সব নয়। আমার নিজেরই দরকার। অবশ্য না দিতে চাইলে আমাকেই খুঁজে নিতে হবে।

মিলি কী বলল, শুনতে পেলাম না। প্রত্যুত্তরে লোকটা কিছুক্ষণ অবিশ্বাসে ভরা দৃষ্টিতে মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—সামনের বুধবার? শকুন্তলা থিয়েটার. সন্ধ্যার সময়? ঠিক বলছ—না এটাও পট্টি দিলে? তোমাকে তো আবার বিশ্বাস নেই।

ওরা চলে যেতেই আমি নিঃসীম ক্লান্তি আর বিরক্তিতে আবার বসে পড়লাম বালির ওপর। মিলি কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত সেই মুহূর্তে দুজনেরই কথা বলার মত শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। মিলির ওপর প্রচণ্ড রাগ আর ঘৃণায় মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। বুকের ভেতরটা ভীষণ তোলপাড় হয়ে চলেছে, বেশ বুঝতে পারছি। ভয় হচ্ছে জোর করে কথা বলতে চেষ্টা করলেই হয়ত হাউ-মাউ করে চিৎকার করে ফেলব। তাই নিজেকে প্রাণপণে সংযত করতে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

ততক্ষণে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে চারিদিকে। ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় ফসফরাসের আগুন চিক-চিক করে জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। সমুদ্রবক্ষে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের একটানা গর্জন ভেসে আসছে কানে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন বলে শব্দটা প্রতিধ্বনির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়।

চশমাটা চোখ থেকে খুলে অন্ধকারের মধ্যে যতক্ষণ দেখা যায় লোকগুলোকে, পেছন থেকে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিলি। তারপর আবার ধপাস করে আমার পাশে বসে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—উঃ, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ আপনি। না হলে যে কী করতাম কে জানে।

একটু চুপ করে থেকে আবার নিজের মনেই গজগজ করে বলল—যম! যম! হাড়-মাস না খেয়ে ছাড়বে না কিছুতেই। আশ্চর্য যেখানেই যাই ঠিক যমেরা হাজির হবে পেছন পেছন। পড়বি তো পড় একেবারে মুখোমুখি—বলেই হি-হি হি-হি করে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—শকুনের চোখ তো. ভাগাড়ের মড়া চোখে পড়বেই—পড়বে! চোখে ধুলো দিয়ে পালায় কার বাপের সাধ্যি।

মিলি হঠাৎ কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা আমার সিঁথিতে সিঁদুর আছে কী না বোঝা যাচ্ছিল? বার বার দেখতে চেষ্টা করছিল শয়তানগুলো। কিন্তু ওরা চলে ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। এইসা জোরে মাথার কাপড়টা টেনে ধরে রেখেছিলাম, বিশ্বাস কর...।

এতক্ষণ দায়ে পড়ে সহ্য করেছি কিন্তু এখনো ওর বেয়াদপি দেখে গা রিরি করে জ্বলে উঠল আমার। মনে হল ইতর মেয়েটার গালে সজোরে দুটো চড় কষিয়ে উঠে পড়ি। কিন্তু তখনো নিজেকে সামলে নিতে পারিনি বলেই ওর কথার উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিন্তু মিলি এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসতে শেখে নি। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে আবার তাগাদা দিল, বলো না। পরক্ষণেই জিভ কেটে থেমে গেল। তারপর বলল, দেখছেন, মিথ্যে কথা বলে বলে কী বিশ্রী অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না কিন্তু। আচ্ছা...হাঁ...এখন বলুন তো —আঃ তাকান না বাপু ভাল করে আমার

দিকে—বিয়ে হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে কিছু?

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিতে হল—জানি না। তারপর একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলাম, ঠিক করে বল—কে তুমি? নিজে যা খুশী কর, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমায় এমন করে জড়ালে কেন? তুমি হয়ত জান না, আমি সত্যি সত্যিই অলোকা হোটেলে উঠেছি। তোমাদের না পেয়ে ওরা হয়ত আমার ওপর হামলা শুরু করে দেবে।

আমি কথা শুরু করতেই মিলি ব্যস্ত সমস্তভাবে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমি চুপ করাতেই ও অনুচ্চ গলায় চিৎকার করে ডাকল, শ্যামা, মিনু...!

কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না আসায়, চুপ করে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর আমার দিকে মনঃসংযোগ করল, রেখে দিন দিকি। আপনিও যেমন। ভারী মুরোদের মানুষ সব। ওসব জানা আছে আমার। যত গাজোয়ারী আমাদের সঙ্গে। কেন রে বাপু, এত জুলুম কেন আমাদের ওপর। যেন ভাঁড় যাথ তেল—ব্যস মিটে গেল। কোন ঝামেলা নেই। তা নয়, বিনি পয়সার মস্তানি।

—তা বেশ। কিন্তু সে কথাটা ওদের মুখের ওপর বলে দিতে পারছ না কেন? তা হলেও তো সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। চোরের মত পালিয়ে বেড়াতে হয় না।

এ কথায় উত্তর দেবার আগেই মিলি আমার পেছনে ঘুরে ব্যস্তসমস্ত গলায় ডাকল—এই শ্যামা! সত্যি আছিস না চলে গেছিস। সকলে মিলে আর জ্বালাস নি বাপু আমায়।

তবু ওদিকের অন্ধকারের ভেতর থেকে কোন প্রত্যুত্তর না আসায় গভীর বিরক্তির সঙ্গে মিলি গজগজ করল—মরগে যা সব। আমি কিছু জানি না। তারপর শাড়ির আঁচল তুলে ঘাড়-গলা-মুখ মুছতে মুছতে আমার দিকে ঘুরে বলল—বাপরে বাপ! সত্যিকার পতিদেবতার মত তাইস শুরু করে দিলেন, দেখছি। কেবল কেন আর কেন! সব কেন'র যে উত্তর দিতে নেই মশাই আমাদের। ন্যাকা-হাবা মানুষ তো নন। সব বুঝেও তবু সেই কেন? শুধু এইটুকুই জেনে রাখুন মুখের কথার দামটাই বড় মূলধন। যারা আগে জিনিষ নিয়ে পরে দাম দেবার বেলায় মেরে পিঠের ছাল তুলে দেখায় ভয় দেখায় সে হাটে আর সওদা ফেরি করে বেড়াই না আমরা। তারপর একটু থেমে, দম নিয়ে বলল—তবে ওই লাইনটা তো ভালো নয়—তাই কাউকে চটাতে নেই। দরকার কী বুদ্ধোতিতে যদি ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পারি।

অনেকক্ষণ বক বক করে বোধহয় হাঁপিয়ে উঠল মিলি। তাই চুপ করে গিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর এদিক-ওদিক সন্ত্রস্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে, হাত দিয়ে শাড়িটা ঝেড়েঝুড়ে বলল—অনিমেষবাবু—চলি এবার। মনে হচ্ছে চলে গেছে ওরা। শ্যামারাও তো হাওয়া হয়ে গেল দেখছি। যাকগে, একাই চলে যেতে পারব। অনেক জ্বালিয়ে গেলাম আপনাকে। ক্ষমা চেয়ে আপনাকে আর ছোট করব না।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আমার নাম কিন্তু অনিমেষ নয়। ওটা...!

মিলি তাড়াতাড়ি বাধা দিল—থাক। আমার মত মেয়ের কাছে সত্যি পরিচয় দেবার দরকার নেই। নাম নাই জানলাম, কিন্তু আপনি মানুষটাকে চিনে নিয়েছি। চিরদিন মনে থাকবে আপনার কথা। আচ্ছা, চলি, কেমন!

আর দাঁড়াল না মিলি। লোকগুলো যেদিকে গেছে সেদিকেই হন হন করে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমিও ওর পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। এতক্ষণ যেন একটা পাষাণভার চেপে বসেছিল আমার মনে। কিন্তু মিলির শেষ কথাগুলোয় অনেকটা হাল্কাবোধ করছিলাম নিজেকে। এত অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য আর দুর্জয় সাহস, আর কোন মেয়ের মধ্যে দেখিনি আমি। ভাবতে চেষ্টা করলাম, মেয়ে হয়ে এত বিপদ আর উৎপীড়নকে যদি তুচ্ছ করে এগিয়ে চলতে পারে তো এইটুকুতে আমিই বা কেন ভেঙে পড়ব। তবু অলোকা হোটেল থেকে আজই সরে যাওয়া উচিত মনে হল। একটা রাতের ব্যাপার মাত্র। কাল সকালেই চলে যাবার কথা আমার। তবু বলা যায় না যদি আজ রাতেই ওরা আমার ওপর হামলা করে। ওদের পক্ষে সব সম্ভব। তাই ভাবতে চেষ্টা করলাম জেনে-শুনে অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হয়ে লাভ কী? মিলির কথাই ঠিক, একটু চেষ্টা করলে যদি ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলা যায়—ক্ষতি কী?

সিগারেটের আগুনে অন্ধকারের মধ্যে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলাম—সবে সাতটা। এত তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। এখুনি সবে দলে দলে লোকে সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে আসছে। একা একা হোটেলের বন্ধ ঘরে বসে থাকার চেয়ে আরেকটু বসাই ভাল। তবে, আর এই নির্জন অন্ধকার জায়গায় বসা উচিত নয়। হোটেলের সামনে আবছা আলোয় বসলে তবু দু-চারজন মানুষের মুখ দেখা যাবে।

জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা নিঃস্তুপ ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একাগ্রমনে কী যেন লক্ষ্য করছিল দূরে। আচমকা পেছনেই আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ভীষণ চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণে আশ্বস্ত, সংযত গলায় মিলি বলল—ওঃ আপনি!

আরো এগিয়ে এসে ওর কাছে দাঁড়ালাম। বলাম—আবার কী হল মিলি। ওরা এখনো চলে যায় নি বুঝি।

মিলি ততক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ওদিকে। দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শান্ত গলায় কথা বলল,—অত সহজে ভাব ভোলার নয় অনিমেষবাবু। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—না, আজকের দিনটাই মাটি হয়ে গেল।

বললাম—আমি কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসব তোমাকে? না আপত্তি আছে?

—আপত্তি! মিলির কণ্ঠস্বরে কী সুর যে ফুটে উঠল বোঝান শক্ত। আবার তেমনি আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে, চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল,—সে মেয়ে যে আমি নই, অন্তত আপনার তো অজানা নয় অনিমেষবাবু। তবে, আবার আপনি আমার জন্যে কষ্ট করবেন... তাই ভাবছি...।

—সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না মিলি। যদি তোমার উপকার হয়, আমি যেতে রাজী!

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে দিলাম। তবে হোটেলের দিকে আর না গিয়ে পাশের অন্ধকার রাস্তার দিকে এগিয়ে চললাম। মিলি আগের মত শাড়ির আঁচলটা তুলে ঘোমটা দিয়ে নিল। তারপর রাস্তায় উঠে একটা রিকসা ভাড়া করে চেপে বসলাম দুজনে। মাথার ওপর হুডটাও টেনে দিলাম। মিলি বাড়ির ঠিকানা বলে দিল রিক্সা-ওয়ালাকে।

অনেকক্ষণ পর এক জায়গায় রিকসা থামল। আমাকে সুযোগ না দিয়ে মিলি নিজেই ব্যাগ খুলে ভাড়া দিল। দুজনে নেমে পড়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

দুদিকে দোতলা একতলা ঘিঞ্জি বাড়ির সার চলে গেছে রাস্তা বরাবর। লোক চলাচলও করছে বেশ। আলোঝলমল দোকানে দোকানে কেনা-বেচা চলছে। তার মধ্যে দিয়ে মিলিকে অনুসরণ করে হাঁটতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু একটু পরেই একটা অন্ধকার গলিতে মিলি ঢুকে পড়তে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। তারপর এ গলি দিয়ে সে গলি, তস্য গলি, ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ ভেদ করে হাঁটতে হাঁটতে হাঁফিয়ে উঠলাম আমি। মিলি হাঁটছিল আমার আগে আগে। ডাকলাম—শোন, মিলি—!

এক ডাকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরল ও—কষ্ট হচ্ছে তো? আর কিন্তু বেশি কষ্ট দেব না। এসে গেছি। ঐ যে বাড়িটা, ওর একতলার ঘরটা নিয়েছি আমরা।

বললাম—তা তো বুঝলাম। কিন্তু এই পথে ফিরব কী করে বল তো?

মিলি হেসে বলল, বারে, এই জন্যে ভাবনা। কেন, আমি কী মরে গেছি। আমি বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যাব আপনাকে। এখন চলে আসুন তো!

একটু পর ভেতর থেকে বন্ধ একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতে গিয়েও মিলি চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

কান পেতে কী যেন শুনতে চেষ্টা করল। তারপর রাগত গলায় ডাকল—শ্যামা! মিনু! আছিস তোরা। বলতে বলতে দরজায় ধাক্কা দিল।

একটু পর দরজা খুলে গেল আমাদের সামনে। ভেতরের হ্যারিকেনের আলোয় দেখতে পেলাম একটি ফর্সা ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে এসে দাঁড়াল দরজার গোড়ায়। পরক্ষণেই কণ্ঠস্বরে যেন বিস্ময় ফুটে বেরুল,—ওমা, মিলিদি তুমি? আজ এর মধ্যেই ফিরে এলে যে?

মিলি কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল—কী হচ্ছে কী শ্যামা। এত হাসির কী হল! নাকি ভেতরে লোক ঢুকিয়েছিস। আবার? - বলেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে ডাকল—ভেতরে আসুন অনিমেষবাবু। না-না। এবার কিন্তু আমি আপনার আপত্তি শুনব না। একটু বসে যান। বললাম তো ভয় নেই আপনার। বড় রাস্তা পর্যন্ত পেঁৗছে দেব যাবার সময়।

অগত্যা মিলির পেছনে আমি ঢুকে পড়লাম ঘরে। মিলি আবার পেছন থেকে দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল। সেই মুহূর্তে একটা লোককে সঙ্গে করে ওদিকের খোলা দরজা দিয়ে শ্যামা আর মিনতি বেরিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারের মধ্যে।

দরজাটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে মিলি হেসে বলল, বসতে দেবার মত ঘরে আসবাব কিছু নেই অনিমেষবাবু। এই বিছানাটার ওপরই বসে পড়ুন। আমি আসছি এখুনি। দেখবেন, পালাবেন না কিন্তু......।

চলে গেল মিলি। আমি একা বসে বসে ঘরের ভেতর অলস দৃষ্টি বোলাতে লাগলাম। ঘরের মধ্যে কিছুই নেই একরকম। দুটো ছোট তক্তপোষের ওপর পরিষ্কার চাদরে ঢাকা দুটো বিছানা পাতা। একটা পুরনো কাঠের টেবিল। তার ওপর হ্যারিকেনটা জ্বলছে। কয়েকটা কাপ ডিস, দুটো কাচের গেলাস। দুটো মাঝারি মাপের চামড়ার সুটকেশ তক্তপোষের নিচে ঢোকানো রয়েছে। আর ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে ধনুকের মত বাঁকা ভঙ্গিতে টাঙানো দাঁড়ির আলনায় ঝুলছে কিছু শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ আর কয়েকখানা গামছা।

বাইরে থেকে মিলির চাপা গলায় ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল আমার কানে, আমি ওদিকে তোদের জন্যে ভেবেচিন্তে মরি। কোথায় গেল, কোন বিপদ হল কী না। আর তোমরা ওদিকে......। কিন্তু এই শেষ, মনে রেখ মিনু। হাজারবার বলেছি, ঘরের মধ্যে লোক ঢোকান পছন্দ করি না আমি। ভেবেছ মিলিদির চোখে ধুলো দেবে—না! দূর হ...দূর হ হতভাগী আমার সামনে থেকে।

মিলি চুপ করল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিনতি চাপা আক্রোশে কী যেন বলতেই গালে ঠাস ঠাস চড় মারার শব্দ হল। পর-মুহূর্তেই নিঃসীম একটা স্তব্ধতা নেমে এল ওদের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর মিলির কণ্ঠস্বরটা আবার ভেসে এল আমার কানে, ...মুখ সামলে কথা বল মিনু। না জেনে-শুনে কথা বলিস না—বুঝলি। বেশ এখন যাচ্ছ যাও, তবে বারোটার মধ্যেই ফেরা চাই-ই। মনে রেখ চারিদিকে বিপদ। ভুল করেও যেন ওদিকে যেও না। আর একা এস না। ওদের কাউকে বোল যেন পেঁৗছে দিয়ে যায় তোমাকে। আর শোন্...যাবার সময় পানের দোকান থেকে গিরিকে পাঠিয়ে দিয়ে যাস্। ভুলিস নি কিন্তু। আমার নাম করে বলিস...খুব দরকার।

তারপর আবার সব চুপচাপ। পাঁচ মিনিট পর শ্যামাকে সঙ্গে করে, চায়ের কাপ হাতে হাসি মুখে ঘরে ঢুকলো মিলি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম তো আপনাকে। রাগ তো করেইছেন...তার ওপর আবার ভদ্রতা করে কিছু বলতে গেলে......।

ওর হাত থেকে চা'টা নিয়ে বললাম,... না...না। আমি তো নিজেই এলাম।

শ্যামার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে. নিজেও বসল ওদিকে তক্তপোষের ওপর পাতা বিছানায়। দেখলাম দামী শাড়ি ব্লাউজ বদলে আটপৌরে শাড়ি জামা পরেছে মিলি। গলায় পুরাঁর শ্বেত শামুকের সরু একগাছা হার। হাতে একটা করে চুড়ি মাত্র। কানে সাদা পাথরের ফুল। কিন্তু তাতেই যেন ওকে এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা নিটোল স্বাস্থ্যবতী প্রাণবন্ত মেয়ে মিলি। চল নামা নদীর মত টলটল করছে কানায় কানায়। কেমন একটা আলগা শ্রী আছে দেহে। তবে বয়েস যতটা কম মনে হয়েছিল আগে, এখন মনে হল তা নয়। সম্ভবত সাতাশ আটাশ। আমার সামনে ভদ্র শান্ত ভঙ্গিতে বসে কথা বলতে বলতে বুকের ওপর লুটোন লম্বা বেণীটাকে আলগা করতে লাগল।

একটু পর শ্যামা উঠে গেল রান্নাঘরে। দুজনে বসে বসে গল্প করে চললাম। মিলি বলল—ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে গল্প করবেন তো আমার কথা? বলবেন তো একটা বিশ্রী মেয়ের পাল্লায় পড়ে কী নাকানি-চোবানিই না খেতে হয়েছে।

সে কথার উত্তর না দিয়ে, চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম,—এ ছাড়া কী আর কোন উপায় নেই মিলি তোমার? আমার কিন্তু কী মনে হচ্ছে জান তোমায় দেখে, ইচ্ছে করলে তুমিও আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত সুখের সংসার করতে পারতে।

মিলি হাসল একটু,—ইচ্ছে করলেই কী সব হয় অনিমেষবাবু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যাক ও কথা। নিজেকে একটু ভুলে থাকতে দিন আমায়। তার চেয়ে আপনার কথা বলুন। না—না—থাকগে। তারও দরকার নেই। দু'জনের কাছেই দু'জনের পরিচয় অজ্ঞাত থাকাই ভাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি এই প্রথম পুরীতে এলেন? না আগেও এসেছেন! ভুবনেশ্বর দেখেছেন, কোণারক? উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখা হয়েছে, না...।

মিলির সঙ্গে গল্প করতে ভালই লাগছিল। লেখাপড়া নিশ্চয়ই বেশি শেখেনি। কিন্তু গুছিয়ে কথা বলার মধ্যে আশ্চর্য একটা দখল আছে। মার্জিত রুচি আছে উচ্চারণে—যা শ্রোতাকে মুগ্ধ, আকৃষ্ট করে রাখে। অথচ নিজেকে জাহির করার এতটুকু প্রচেষ্টা নেই। সারনাথ থেকে সাঁচী, দিল্লী, আগ্রা, কন্যাকুমারিকা থেকে নেপাল—ঘোরে নি কোথায় মিলি। দুনিয়ার ঘাটে ঘাটে শুধু সওদা ফেরি করেই বেড়ায় নি ওরা, মনের মণিকোঠায় সযত্নে সংগ্রহ করে এনেছে এক বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার। ভ্রমণই যে শিক্ষার বড় মাধ্যম—মিলিকে দেখে সে কথার যাথার্থ্যই স্বীকার না করে উপায় নেই।

তার মধ্যেই বাইরে থেকে কে যেন ডাকতেই, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল মিলি। একটা লোককে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল—ও, গিরি এসে গেছ। শোন, ভেতরে এস। তারপর লোকটা ভেতরে এসে দাঁড়াল, বলল—অলোকা হোটেলের কাছ থেকে চট্‌পট্‌ একবার ঘুরে এস তো গিরি। কাল যে লোকগুলোকে দেখালাম তোমায়, মনে আছে তো? দেখে এস ওরা এখনো হোটেলের ভেতরে বা বাইরে বসে আছে, না চলে গেছে। পরে বলব সব।

গিরি চলে যাবার পর আবার ফিরে এসে বসল মিলি। তারপর আবার নিজের কথায় ফিরে এল। আমি ওর কথা শুনে যাচ্ছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, একটু আগে সমুদ্রের ধারে ভীতাচকিতা যে ছলনাময়ী দেহপসারিণীকে দেখেছি, সে অন্য কেউ। এ মিলি নয়। কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে অসংকোচে তাকাচ্ছে বার বার, কিন্তু চাউনিতে বা দেহভঙ্গিতে নেই প্রশ্রয়ের এতটুকু ইংগিত।

গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেল। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম—রাত দশটা। এবার ওঠা দরকার। কিন্তু গিরি না ফেরা পর্যন্ত বেরুতেও পাচ্ছি না। কে জানে ইতিমধ্যে লোকগুলো হোটেলে ঢুকে আমাদের খোঁজ না পেয়ে, কোন গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে কিনা।

আরো একটু পর হন্তদন্ত হয়ে গিরি ফিরল। মিলির সঙ্গে কথা বলার ধাঁচ লক্ষ্য করে বুঝতে অসুবিধে হল না, লোকটা আসলে মিলির দালাল। মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলছে, কিন্তু মিলির কাছে প্রশ্রয়ের অভাব, এবং আমার উপস্থিতির কথা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায়, সামলে নিচ্ছে নিজেকে।

গিরি একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে এল। যা আশংকা করেছিলাম ঠিক তাই। লোকগুলো নাকি আমাদের না পেয়ে এক-রকম নিশ্চিত—আমি লোকটাও ঠগ। নামে না মিলুক, চেহারার সাদৃশ্যে কিন্তু ধরা পড়ে গেছি আমি। ম্যানেজার নাকি জানিয়েছেন—আমি এখনো হোটেলেই আছি, এবং রাতে নিশ্চয়ই ফিরব। সেই প্রত্যাশায় ওরা ঘাঁটি আগলে অন্ধকার রাতে বসে পাহারা দিচ্ছে।

গিরি চলে যাবার পর দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। কেউ কথা বলতে পাচ্ছিলাম না। নিজেও ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না—এ অবস্থায় কী করা উচিত আমার। তবে আগের মত অত মুষড়ে পড়ি নি। বরং মিলিকেই বিচলিত বলে মনে হল। অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে রইল।

এবার আমি কথা বললাম, ভারি মুস্কিলে পড়তে হল কিন্তু এবার। এখন কী করা উচিত বলো তো মিলি?

অনেকক্ষণ পর আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল মিলি। বলল, উপায় একটা হবেই, কিছু ভাববেন না। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন তো এখন। তারপর বলল, আরেকটু চা খাবেন? খান খান...বলেই গলা বাড়িয়ে ডাকল, শ্যামা, জেগে আছিস না ঘুমিয়ে পড়লি রে? কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না তো তোর। এক কাপ চা করে আন ভাই তাড়াতাড়ি। আর শোন...বেশি থাকলে আমাকে কিন্তু একটু...বুঝেছিস! কথা শেষ করেই হেসে ফেলল মিলি...না খেয়ে উপায় কী বলুন? মিনুর জন্যে কতক্ষণ জেগে বসে থাকতে হবে, কে জানে। কী করে যে ও এত রাতে একা ফিরবে, ভগবানই জানেন। আর ভাবতে পারি না।

একটু পর চা এল। চা খেতে খেতে নিছক সময় কাটাবার জন্যেই আবার কথা বলার দরকার হল। চায়ের কাপটা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানার ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

মিলিও হাতে একটা এমব্রয়ডারি নিয়ে বসল। গল্প করতে করতে বেশ ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল আমার। ঘন ঘন হাই উঠতে দেখে মিলি হেসে বলল, ঘুম পাচ্ছে তো এবার? তারপর একটু চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, এক কাজ করুন না অনিমেষবাবু। অবশ্য আপনার যদি না আপত্তি থাকে। রাতটা এইখানেই ঘুমিয়ে থাকুন না? মানে...বলছিলাম, যদি হোটেলে না ফিরলেও চলে...তো...মিথ্যে ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী? এখানে তো আপনি একা মানুষ। তবে আর কী...কে আর জানতে যাচ্ছে পুরী বেড়াতে গিয়ে কোথায় একটা রাত কাটিয়ে এলেন আপনি। খুব ভোরে লোক-জন ওঠার আগে ডেকে দোব আপনাকে। ব্যস, এখানেও কেউ জানতে পারবে না!

ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত তাতেই রাজী হলাম। বলা যায় না, সত্যি যদি ওরা কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাকে। একটা রাতের জন্যে সারাজীবনের মত প্রাণই খোয়া যাবে! তাছাড়া মিলির কথাটাও ঠিক—দূর প্রবাসে একটা রাত কোথায় কাটিয়ে যাচ্ছি কে জানতে পারছে!

যা ছিল ঘরে, তাই খেতে দিল মিলি আমায়। আপত্তি সত্ত্বেও খেতে হল। ওরা দু'জন রান্নাঘর থেকে খেয়ে ফিরে এল এ ঘরে। আমি শুলাম একটা বিছানায়। আর ওদিকেরটায় শ্যামা চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর পাশেই রাতে মিনতি ফিরে শোবে, জায়গাটা খালি রইল।

মিলি মেঝের ওপর একটা শতরঞ্চ বিছিয়ে, হাতে সেই সেলাইটা নিয়ে বসল। বলল, সারারাত বাতিটা জ্বলবে কিন্তু অনিমেষবাবু। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে তো। অবশ্য মিনু এসে গেলে কমিয়ে দেব অনেকটা।

বললাম—কিছু না। আমার সব অভ্যেস আছে।

শুয়েই শ্যামা নাক ডাকতে শুরু করল দেখে মিলি হেসে বলল, আশ্চর্য, কী ঘুম যে ঘুমোতে পারে মেয়েটা! তারপর বলল, দোষ কী ওর। শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে বেচারীর। এই তো সেদিন টাইফয়েড থেকে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে বললাম,—তুমিও শুয়ে পড়লে না কেন মিলি। রাত তো অনেক হল।

—বারে, মিনু এখনো বাইরে রয়ে গেল, আমি ঘুমোই কী করে বলুন? তার ওপর আবার ওই খুনে গুণ্ডাগুলো পেছন নিয়েছে। ভালয় ভালয় ফিরে এলে বাঁচি। সত্যি যা দুর্ভাবনা হয়, কী বলব!

মুখ নিচু করে একমনে সেলাই করে যাচ্ছে, আর আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে মিলি। আর আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছি ওর দিকে। হারিকেনের ম্লান আলোয় আরো সুন্দর লাগছিল ওকে। যেন লীলাচঞ্চল এক মোহিনী নারীমূর্তি আমি দেখতে পাচ্ছি মিলির মধ্যে, আর কেমন একটা অদ্ভুত নেশায় দু' চোখ ভারি হয়ে উঠছে আমার। মনে হচ্ছে, মিলির এক কথায় কেন এখানে থেকে যেতে রাজী হয়েছি আমি, এখন বুঝতে পারছি। আশ্চর্য, রাত্রির গভীরে বোধহয় মাদকতা লুকিয়ে আছে। তাকে আকণ্ঠ পান করার দুর্নিবার একটা লোভ আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে, বুঝতে পারছি।

আমার কথা বলতে ভাল লাগছিল না। শোনারও যে আগ্রহ ছিল, তাও না। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ পাচ্ছিলাম তাই শোনার ভান করে যাচ্ছিলাম। অদ্ভুত ভাল লাগছিল ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে। ঘন ঘন হাই উঠছিল, তবু এটা ওটা প্রশ্ন তুলে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে চেষ্টা করছিলাম।

আমাকে ঘন ঘন হাই তুলতে দেখে, হঠাৎ কথা থামিয়ে মিলি বলল, আর নয়, এবার ঘুমোন। অনেক রাত হয়ে গেল। কাল খুব ভোরে আপনাকে ডেকে দেব, নিশ্চিন্ত থাকুন।

কথা শেষ করেই উঠে পড়ল মিলি। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে বাথরুমের ভেতর গিয়ে ঢুকলো ও। ফিরে এসে,

সেলাইটা হাতে করে হারিকেনের দিকে ঘুরে বসল এবার। বুঝলাম আর গল্প করার ইচ্ছে নেই ওর। মিলি চুপচাপ মুখ নিচু করে সেলাই করে চলেছে, আর আমি ঘুম না আসা পর্যন্ত নিঃস্তব্ধ রাত্তির অনুচ্চারিত সংগীত শুনে চলেছি। আর কিছু মনে নেই, এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম।

রাত তখন কত, জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। দেখি তখনো টেবিলের ওপর হারিকেনটা আগের মতই জ্বলছে। পাশ ফিরতেই ওপাশের বিছানা চোখে পড়ল। আশ্চর্য, এখনো শ্যামা একাই শুয়ে, মিনতির জায়গাটা খালি পড়ে রয়েছে। ভীষণ চমকে উঠলাম, মিলি কী তা হলে এখনো জেগে বসে সেলাই করে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে মেঝের দিকে তাকাতেই নিমেষে আমার সর্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরন বয়ে গেল। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা কনকনে কী যেন নেমে এল নিচের দিকে। চোখ দুটো আটকে রইল ঘুমে বেহুঁশ মিলির দিকে। মিনতির জন্যে প্রতীক্ষা করতে করতে একসময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। পাশেই পড়ে রয়েছে এম্ব্রয়ডারিটা। চোখের ওপর শাড়ির আঁচলটা বোধহয় চাপা দিয়েছিল, এখন খসে পড়ে রয়েছে গালের পাশে। ঘুমন্ত অসংবৃত মিলি যেন একমুহূর্তে আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল।

বুকের ভেতর হৃদপিন্ডটা ভীষণ অশান্ত হয়ে পেন্ডুলামের কাঁটার মত এক-টানা শব্দ তুলে বেজে চলেছে।

আশ্চর্য, দেহপসারিণী মিলির এ বিপুল গোপন ঐশ্বর্য যেন আদিম মানবের পাশব জিঘাংসায় উন্মাদ করে তুলছে আমাকে। লুণ্ঠনের সর্বনাশা উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বুকের মধ্যে পলকে পলকে আরো উন্দাম আর মাতাল হয়ে উঠছে। পুরীর সমুদ্র-সৈকতের মত ধীরে ধীরে পায়ের নিচ থেকে বালি খসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিপরীত-মুখী স্রোত। মনে পড়ে গেল মিলির কথাটা ...আজকের দিনটা নষ্ট হয়ে গেল।...... টাকার জন্যে আমরা সব পারি—সব-! আশ্চর্য, মিলির সম্বন্ধে তবে এত দ্বিধা কেন? কেন এত সংকোচ। একটা রাত পুরীর কোন এক দেহপসারিণীর ঘরে কাটিয়ে গেলাম—কে জানতে পারছে!

অপাঙ্গে শ্যামাকে ভাল করে দেখে নিলাম। তেমনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। যাক নিশ্চিন্ত। মিনতিও এত রাতে নিশ্চয় ফিরবে না। তা হলে আগেই চলে আসত।

অতি সন্তর্পণে বিছানার ওপর থেকে নেমে এলাম। একটু শব্দ হল পায়ের কিন্তু শুনতে পেল না মিলি। একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুত ইতিকর্তব্য স্থির করে নিলাম। তারপর চাপা গলায় ডাকলাম। আশ্চর্য...কোন যুবতী মেয়েকে পরপুরুষের এত নিকট সান্নিধ্য সচেতন করে তোলে না, জানা ছিল না আমার।

আরো কয়েকবার ডাকলাম। তবু কোন সাড়া নেই মিলির। নাকি এও আরেক ছলনা ওর। মিলির পক্ষে যে কিছুই অসম্ভব নয় —অন্তত সে কথা আমার অজানা নয়।

বেড়ালের থাবার মত নিঃশব্দ পা ফেলে এবার এগিয়ে এলাম ঘুমন্ত মিলির খুব কাছে। জোরে জোরে শ্বাস টানছে ও। শুধু শব্দ নয়, বাতাসটাও আমার গায়ে লাগছে। একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে, অত্যন্ত দ্রুত চিন্তা করে নিলাম। তারপর ডাক দিলাম মিলি। মিলি।

বুকের মধ্যে হৃদপিন্ডটা বোধহয় স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়েছিল—হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই দ্রুত তালে চলা শুরু করে দিল—ধক্-ধক্ ...ধক্‌ধক্...। অজানিত ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।......এক্ষুনি হয়তো চোখ মেলবে মিলি...তারপর...কী বলব? আমি...যদি হঠাৎ...।

কিন্তু না...আশ্চর্য, এতেও ঘুম ভাঙে না তরুণী মেয়ের। মনে মনে হঠাৎ ভীষণ হাসি পেল। এতক্ষণে যেন রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম হল আমার। কিন্তু লীলারঙ্গিণী দেহপসারিণীর এ আবার কী ছলনা কে জানে!

মিলির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটাও যেন হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আরো দ্রুত হয়ে উঠল। বুকটা আগের চেয়েও দ্রুত ওঠানামা শুরু করে দিল। কিন্তু মিলির হীমকঠোর দেহটা তেমনি নিঃস্পন্দ প্রাণহীন।

হাসি চেপে আবার ফিস্ ফিস্ করলাম...মিলি, উঠে পড় এবার লক্ষ্মীটি। আর ঢঙ করতে হবে না—আমি সব বুঝতে পেরেছি!

কিন্তু জীবনের যেন কোন লক্ষণ নেই মিলির দেহে!

মাথার মধ্যে চিন্তার সুতোগুলো যেন হঠাৎ কেমন জট পাকিয়ে উঠল। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ভাবতে চেষ্টা করলাম—আর এগোব—না পিছিয়ে যাব! সত্যি ঘুমোচ্ছে, না ছলনা করছে আমার সঙ্গে! হয়ত তাই, আমার অসহায় অবস্থাটা দেখে হয়ত এখুনি মিলি কপট ঘুম থেকে উঠেই উন্দাম হাসিতে ভেঙে পড়বে।

একটা আনাস্বাদিত শিহরন আবার তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল আমার দেহের কোষে কোষে। এবার রক্তের উত্তাপও বেশ অনুভব করতে পারছি। কেন জানি না, আমার ঠোঁটের কোণে চাপা উল্লাস ফুটে উঠল। ওর ঠিক পাশে বসে পড়লাম। এতক্ষণ বেশ ভীষণ ওঠানামা করছিল মিলির বুকটা, কিন্তু মনে হল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল বুকের স্পন্দন। মিলির হাতটা একটু নড়তেই, আমি ওর দিকে তাকালাম।

হাত না সরিয়েই আমি আবার তাড়াতাড়ি ডেকে উঠলাম—মিলি। কী হচ্ছে কী মিলি! কিন্তু...এবারও কোন উত্তর এল না ওর দিক থেকে। জেদটা যেন হঠাৎ আরো প্রবল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে আস্তে গজরালাম...ভেবেছ, বুঝতে পারছি না কিছু? তবু যদি তোমাকে চিনতে বাকী থাকত আমার। আচ্ছা...দেখছি কতক্ষণ ঘুমের ভান করে থাকতে পার তুমি......

সওদাগরি অফিসের কেরানী আমি। ছাত্রাবস্থায় কবে কালিদাস পড়েছিলাম, মনে নেই। থাকা সম্ভবও নয়। আঠারো বছর বিল তৈরী কাজের ঠেলায় কবে সব কাইল চাপা পড়ে গেছে, কে জানে। না থাকুক... দরকার নেই...সে জন্যে আফশোষ নেই। তবে আরেক মহাকাব্য সৃষ্টির ব্যর্থতার বেদনায় বুক টনটন করে উঠছে আমার।

আবার ডাকলাম—মিলি......!

না—এবারও কোন সাড়াশব্দ নেই। নিরেট পাথরের মত ঘুমে অকাতর বেহুঁস দেহটা শুধু পড়ে রয়েছে আমার চোখের সামনে। আবার কানে কানে বললাম— বাতিটা নিভিয়ে দিতে বলছ আগে? বুঝেছি মিলি—এবার বুঝেছি—দাঁড়াও...!

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে, ওর দিকে পেছন করে এগিয়ে গেলাম টেবিলের ওপর রাখা
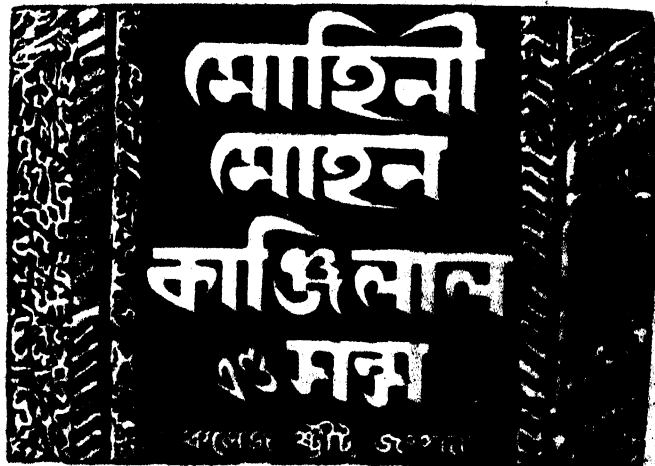
হারিকেনটার দিকে। কল ঘুরিয়ে নামিয়ে দিলাম পলতেটা। তারপর দপ্ করে আলো নিভে যেতেই যেন সমস্ত সংকোচ আর দ্বিধা থমথমে রাত্রির নিকষ অন্ধকারের গভীরে নিমেষে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ রান্নাঘরের খোলা দরজার শিকলটা খলখল্ শব্দ করে বেজে উঠতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা অজানিত ভয়ে হৃদপিন্ডটা লাফিয়ে উঠল—মিনতি কী ফিরে এল এই সময়? হতেও পারে. ফিরে আসারই তো কথা! কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম, কিন্তু না আর কোন সাড়া শব্দ নেই। কেবল দরজার খোলা পাল্লা দুটোকে কে যেন খুব সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিল সেই মুহূর্তে। আশ্চর্য, কিসের শব্দ। মিনতি নয়, তবে ব্যাপারটা কী, জানা দরকার।

অন্ধকারে বিছানা হাতড়ে তাড়াতাড়ি দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে এসে, হারিকেনটা আবার জ্বালিয়ে নিলাম। কিন্তু......ভয়ে আর অজানিত একটা গভীর শংকায় হিম হয়ে উঠল আমার বুক। আলোয় দেখতে পেলাম, মিলির বিছানাটা ফাঁকা। তাড়াতাড়ি চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিটা আটকে গেল—দরজার পাল্লা দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভেতর থেকে।

মাথাটা হঠাৎ ভীষণ বেগে ঘুরে উঠল আমার। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে টলতে টলতে ফিরে এসে বিছানায় চোখ কান বুজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন ভীষণ জ্বরের ঘোরে কেটে গেল আমার। কানের মধ্যে যেন একসংগে হাজার ঝিল্লি সমস্বরে ঐকতান শুরু করে দিল! সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়িয়ে দেখা, দূর থেকে ছুটে আসা উত্তুংগ তরঙ্গমালা যেন আছড়ে পড়ছে আমার হৃদয়ের তটে তটে।

...ঠক্ ঠক্-ঠক্। বাইরে থেকে দরজার ওপর ঘা পড়তেই রান্নাঘরের দরজা ঠেলে মিলি বেরিয়ে এসেই সাড়া দিল—দাঁড়া মিনু —খুলছি।

শব্দ করে দরজা খুলে দিতেই. ভেতরে ঢুকে পড়ল মিনু। দরজাটা আবার বন্ধ

করে দিয়ে শান্ত গলায় মৃদু ভর্ৎসনা করে উঠল মিলি, উঃ কী কান্ড তোর মিনু? কত দেরী করে ফিরলি বল ত? সারারাত দুর্ভাবনায় মরি—!

মিনতি তাড়াতাড়ি কী যেন উত্তর দিতে গিয়ে, বোধহয় আমার দিকে চোখ পড়তেই, উচ্ছল অথচ শংকিত চাপা গলায় কথা বলল—তুমি খুব রাগ করেছ, না মিলিদি? কী করব বল? তুমি একা ফিরতে বারণ করেছিলে, কিন্তু ওরা পৌঁছে না দিলে...। তারপর একটু চুপ করে থেমে বলল—গিরিদা বলছিল মুখপোড়াগুলো নাকি খুব হুজ্জোত পাকিয়ে তুলেছে। হ্যাগো...ঠিক মিলিদি...।

—সে সব পরে শুনিস। এখন শুয়ে পড়। খেয়ে এসেছিস, না খাবি? ভাত রেখেছি কিন্তু তোর জন্যে।

—হাঁ—হাঁ খেয়েছি। তারপর হঠাৎ মেঝের বিছানায় এমব্রয়ডারিটা পড়ে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে মিনতি বলে উঠল, তুমি বুঝি আমার জন্যে সারারাত জেগে বসে আছ মিলিদি? ঠিক ওটাই ভাবছিলাম, কটা বাজে জান, চারটে প্রায়, তুমি কী গো মিলিদি...।

—সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। এখন হাত পা ধুয়ে এসে নিচের বিছানাটায় শুয়ে পড় দেখি। আমি শ্যামার পাশে বসছি। সেলাইটা আর একটু বাকী, ভাবছি অনেকদিন পর আজ যখন বসেছি, তখন একেবারে সেরে ফেলি।

—ওমা, তুমি সারারাত জেগে বসে, আর আমি ফিরেই ঘুমোব? তাই হয়। আর কতক্ষণই বা ঘুমোব, ভোর তো হয়ে এল। তারচেয়ে এস দুজনে মিলে শেষ করে ফেলি। তাড়াতাড়ি হয়েও যাবে...।

দুজনেই নিচের বিছানায় বসে সেলাই করতে করতে গল্প করে চলল। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের ভান করে আছি, আর ওদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছি। কথা বলতে বলতে এমন সুন্দর হাসি হাসে কী করে মিলি, কে জানে। আশ্চর্য, ওর কণ্ঠস্বরে কোথাও জড়িয়ে নেই একটু আগের সংকোচ, এতটুকু চাঞ্চল্য। উদাত্ত কিন্তু শান্ত সংযত মিলির কণ্ঠস্বর। কিন্তু কিছু ভাল লাগছে না আমার। কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিচ্ছে আমার কানে। পুড়ে যাচ্ছে আমার সর্বাংগ। কোনরকমে যেন পালাতে পারলে বাঁচি আমি।

কিছুক্ষণ পর মিলি হাসি থামিয়ে বলে উঠল. মিনু, এবার স্টোভটা জ্বেলে একটু চা করে ফেল ভাই। ভদ্রলোককে ভোরবেলা ডেকে দোব বলে রেখেছি।

সেলাই রেখে মিনতি উঠে যেতেই নিজেও উঠে পড়ল মিলি। তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, অনিমেষবাবু, ভোর হয়ে গেছে, উঠে পড়ুন।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম, কিন্তু গভীর সংকোচে কিছুতেই তাকা করে তাকাতে পারলাম না ওর চোখের দিকে। একটা রাতের ব্যবধানে সব যেন ওলোট পালোট হয়ে গেছে আমার। মিলির মুখে কিন্তু তেমনি সুন্দর হাসি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সহজ, স্বচ্ছন্দ চাউনি। কোন সংকোচ নেই, নেই বিস্ময়, নেই অকারণ লজ্জা দেবার এতটুকু প্রচেষ্টা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বরং সন্দেহ জাগে, ঘটনাটা সত্যি—না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম আমি।

তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা পরে নিলাম। বোধহয় আমার ব্যস্ততা দেখেই, বিছানার কোণে বসে পড়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন! এখনো তো ভাল করে ভোরই হয় নি। চা চড়িয়েছি, তাই ভাবলাম একটু আগেই ডেকে দি...।

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকেই বললাম, এত ভোরে আমার চা খাওয়া অভ্যেস নেই। তোমরা খাও। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে।

মিলির কণ্ঠস্বরে এবার বিস্ময় আর বিব্রতভাব ফুটে উঠল, বারে. আপনার জন্যেই চা চড়ান হল, আর ভাবলাম সেই দৌলতে আমরাও একটু পাব! তারপর একটু থেমে আবার শুরু করল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? মনে করুন যদি আরেকটু দেরী করেই ডাকতাম, ঘুমিয়ে থাকতেন তো এখনো। বলেই ডাক ছাড়ল মিলি,—মিনু, একটু তাড়াতাড়ি কর ভাই!

আমি তখন যাবার জন্যে ব্যস্ত। প্রতিবাদ করে উঠলাম, তা হোক, আমায় যেতেই হবে। বলেই ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম,—চলি এবার। কিছু মনে কর না মিলি।

মিলি তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে, বলল, মনে তো করবই। একটু চা খেয়ে গেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত আপনার। তারপর তেমনি সুন্দর উচ্ছল হাসি হেসে বলল,—লক্ষ্মীটি খেয়ে যান। এত ভোরে পুরীর কোথাও চা পাবেন না। তখন মনে পড়বে আমার কথা।

ওর কথা শুনে আমিও হাসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শুধু মুখটাই বিকৃত হয়ে উঠল, মনে হল আমার। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লাম। আমার পেছন পেছন বিষণ্ণ মুখে মিলিও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। চলে যাবার আগে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। যাবার সময় কী যেন বলে যাব, মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে সব যেন আবার তালগোল পাকিয়ে উঠল। নেহাৎ কিছু বলা উচিত, তাই শুধু বললাম,—এবার চলি মিলি।

বলেই আর দাঁড়ালাম না। হনহন করে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চললাম। কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও আমি টের পাচ্ছি, মিলি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্তত দরজা বন্ধ করার শব্দ এখনো আমার কানে এল না।
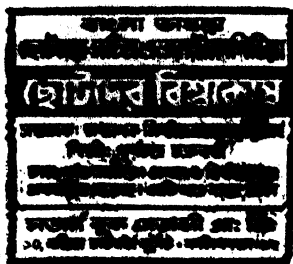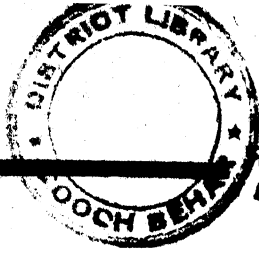
মানব-জীবন ঘুমে-জাগরণে মেশা এক বিচিত্র মায়াপুরী। ঘুম মানে অনন্ত বিস্মৃতি। ঘুমের রাজ্য এক রহস্যময় জগৎ। মানুষের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটে এই ঘুমের রহস্যলোকে। মানুষের ব্যক্তিমানসের অনেক গোপন কথা জড়িয়ে থাকে ঘুমের গহনে, ব্যক্তিত্বের জটিলতা, যৌন প্রবণতার ইংগিত কিন্তু আমরা কজন জানি যে ঘুম আর জাগরণ আমাদের দেহের সংগে সম্পর্কিত এক অখন্ড ছন্দহিল্লোল। ঘুম একটা জৈবিক ঘড়ি, তার ঘূর্ণায়মান গতি-বিভংগের ওপর আমাদের মনোভংগী, শারীরিক সামর্থ্য, ব্যক্তিগত কর্মশক্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। খুব কম মানুষই জানেন যে, তাঁদের দেহ আর মন একটা পারস্পরিক সূত্রে গাঁথা, কেউই স্বতন্ত্র নয়। ঠিক সময়ে না ঘুমিয়ে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমরা যে কি বিপজ্জনক কাজ করি তা কি জানি—বিজ্ঞান কি আমাদের ঘুমকে স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত করতে পারে? সম্প্রতি একটি আশ্চর্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার ভেতর পাওয়া যাবে এই রহস্যময় প্রশ্নের উত্তর। এই প্রশ্ন অনাদি কালের। দিনের বেলায় যে মানুষ রহস্যময় শক্তির অধিকারী রাতের বেলায় উন্মত্ততার প্রান্তসীমায় সে বিচরণ করে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা দুজন, গে গায়ের লুস এবং জুলিয়াস সেগাল। এঁরা দুজনেই যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। গায়ের লুস স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর দুটি গল্প 'অ্যাটলান্টিক মনথলি' নামক বিখ্যাত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তার ফলে উৎসাহিত হয়ে তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। ড্রুমাইন্ড রাসেল তাঁকে বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা লিখতে উৎসাহিত করেন। মিস গায়ের লুস মনে করলেন কিছুকাল কোন ল্যাবরেটরীতে কাজ করা যাক এবং লেখার কাজ ছেড়ে মন দিয়ে তাই করতে লাগলেন। কিন্তু অবসরকালে তিনি না লিখে থাকতে পারেন নি। স্যাটারডে ইভনিং পোস্টে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ আমেরিকান সাইকলজিক্যাল ফাউন্ডেশন থেকে একটি পুরস্কার লাভ করে। এই পুরস্কার বৈজ্ঞানিক বিষয়কে জনপ্রিয় ভংগীতে রচনার জন্য দেওয়া হয়। মিস গায়ের লুস যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেনট্যাল হেলথের একজন রিপোর্টার।

ঘুম প্রসংগে রচিত এই গ্রন্থটি রচনায় তাঁর সহযোগিতা করেছেন ন্যাশনাল মেনট্যাল হেলথের কর্মী জুলিয়াস সেগাল। বাল্যকালে স্কুল ম্যাগাজিনে লিখে তিনি লেখার আনন্দ উপভোগ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে একটি হাসপাতাল জাহাজে সাইকিআর্টিক রোগীদের সেবা করার সময় মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ হয় এবং তিনি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ডিগ্রী নিয়েছেন। ডঃ সেগাল 'হার্পারস' এবং 'লুক' এই দুটি বিখ্যাত সাময়িকপত্রের লেখক। ডঃ সেগাল অ-কাহিনীমূলক (নন-ফিকশান) রচনায় সিদ্ধহস্ত। এই গ্রন্থটির বৈজ্ঞানিক মূল্য অসীম এবং সেই সংগে সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য। এই ভংগীতে যে এমন একটি দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা করা যায় তা 'স্লিপ' পাঠ না করলে বোঝা যায় না। গ্রন্থটির পূর্ণাংগ পরিচয় দেওয়ার জন্য কয়েকটি পরিচ্ছেদের বিশদ আলোচনা দেওয়া প্রয়োজন।

সবাই আমরা ঘুমাই। যে অন্ধকারের গহ্বরে আমাদের জন্ম যার মধ্যে আমাদের মৃত্যু—আমাদের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে যার জোয়ার-ভাঁটা খেলে তার নাম ঘুম। এই ঘুম এমন এক বস্তু যার কাছে আমরা সবাই নতি স্বীকার করি—ঘন্টার পর ঘন্টা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকি। প্রতিদিন মানুষ যে সচেতন অবস্থা থেকে অচেতনের বুকে ঝাঁপ দেয় সেই বিষয়ে কিন্তু তার কোন কৌতূহলই নেই। জীবনের সংক্ষিপ্ত কাল-টুকুতে প্রতিটি মানুষ চেষ্টা করে সে কে তা জানার, যে সব চিন্তা এবং কর্ম তার নিজস্ব সেইগুলি সম্পর্কে তার গর্বের আর সীমা নেই। অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও তার চেষ্টা কম নয়, অথচ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও মানুষ তার নিজের কাছে সেই অপরিচিতই থেকে যায় যে পরিচয়হীনতা নিয়ে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। মানুষ দুটি বিভিন্ন জীবন যাপন করেছে কিন্তু একটি মাত্র জীবন সম্পর্কে সে অবহিত আর সত্তর বছর বয়সে পৌঁছে মানুষ তার জীবনের যে বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সেই বিষয়ে তার কোন ধারণাই জন্মায় না। দিনের বেলা মানুষ কাজ করে, দেখে, লক্ষ্য করে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, চিন্তা করে, কিন্তু রাতের বেলায় তার দেহ বা মনে কি ঘটছে কে তার সংবাদ জানে? যে মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই যবনিকা পতন। নিদ্রিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে অনেক অপরিচিত সত্তা মাথা তুলে দাঁড়ায়—এ সবই জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু আমরা তা জানি না—আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় মানসিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঘুমের রাজ্যে সংগোপনে লুকিয়ে থাকে মনের গোপন কথাটি—এই গোপন কথাটি হল জাগ্রত অবস্থার সকল কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্রবিন্দু — ব্যক্তিজীবনের হেঁয়ালি।

মানুষ যাই করুক না কেন সর্বপ্রথম ভাবতে হবে, সেই পরিকল্পনার সূতিকাগার মনের গহনে আর তার যন্ত্রপুরী হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের যেটুকু ক্ষমতা মন মাত্র সেইটুকুই করতে পারে, তার বেশী নয়। নিজের আচরণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করার আগে মানুষের সর্বাগ্রে নিজের মস্তিষ্কের পরিধি কতটুকু তা জানা প্রয়োজন। বিগত দুই দশকে বিজ্ঞানীরা ঘুম সংক্রান্ত রহস্যময় তত্ত্ব সন্ধানে তাঁরা তাই মস্তিষ্ক আবিষ্কারে সক্রিয় হয়েছেন সর্বাগ্রে।

বৈজ্ঞানিকরা একদা যে সব তথ্য এই গবেষণার সংগে অসম্পর্কিত বা বাহুল্য মনে হয়েছে সেই সব পটভূমিও উপেক্ষা করেন নি। এঁদের অধিকাংশ ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক পন্ডিত। এঁরা কেউ নর-নারীর উর্বরতা, কিম্বা ওষুধ বা বেদনাজনিত প্রয়োজনে প্রযুক্ত অচেতনকর প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এঁদের মধ্যে গণিত-বিদ্যায় পারদর্শী পন্ডিত এবং মহাকাশচারী মানুষের সমস্যা সম্পর্কিত গবেষকও ছিলেন। মনোবিকলনের চিকিৎসা, পাগল সারানোর কাজে যাঁরা ব্রতী প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর বিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় ঘুমের প্রকৃতি এবং মানব জীবনে তার ভূমিকা বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

আমরা জানতাম মানব চেতনার আলো এবং অন্ধকার এই দুটি দিক হল জাগরণ আর ঘুমের ঘোর। কিন্তু এখন জানা গেছে এর ভেতরে অনেক ছায়া-ঘেরা পথ আছে। ঘুম মাত্রেই তার সবটুকু অচেতন অবস্থা নয়, প্রতি রাতের বিস্মৃত অন্ধকারের মধ্যে যে বিরাম তার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা আমাদের জাগ্রত অবস্থায় সংগে তার সাদৃশ্য বর্তমান। ঘুমের মধ্যে আছে স্বপ্ন, অনেক বিচিত্র স্বপ্নের চিন্তা। জন্ম দুটি পরস্পরাক্রমে বিভক্ত এবং এই বিভাগ এতই স্পষ্ট যে, অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন দুটিকে পৃথক

ঘুমে জাগরণে মেশা

[illegible] বিচার করা কর্তব্য। একটি পর্যায় হল [illegible], [illegible] স্বপ্নের আর একটি প্রগাঢ় ঘুম [illegible] গভীর নিদ্রা বলা যায়। দুটি [illegible] বিপরীত পর্যায়। [illegible] আছে এবং তা জীবনের শেষ পর্যন্ত [illegible] থাকে।

মিস গার্জেস লুস এবং ডাঃ জুলিয়ান সেগাল এই দিক থেকে ঘুম তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, বিষয়টি বিজ্ঞানগত হলেও সাধারণ পাঠকের সঙ্গে বোধগম্য করে অতি সুন্দর ভঙ্গীতে পরিবেশিত। মানব প্রকৃতির ক্রমবিকাশে ঘুমের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান সুতরাং সেই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। ঘুমের অবস্থা বিচার করে জাগরণের পাগলামির সংযোগ-সূত্র সন্ধান করা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই গবেষণায় [illegible] বিস্ময়ে হতবাক হন।

বৈজ্ঞানিকরা তাই বিচার করে দেখেছেন ঘুম কি শুধু স্বপ্ন সম্ভবের উপযোগী একটি ক্ষেত্র বিশেষ না আলো-অন্ধকার, ঘুম ও জাগরণ, গভীর ও পাতলা ঘুমের একটি ছন্দায়িত গতি-বিভঙ্গ যা দেহের অভ্যন্তরে ঘড়ির মত কাজ করে। অনেকে কেমন সহজে ঘুমিয়ে পড়েন এবং মানসিক এলার্ম ঘড়ির তাড়নায় ঠিক সময়ে উঠে পড়েন, বিজ্ঞানীদের মতে এই রহস্যের যেদিন সমাধান হবে সেদিন ঘুমের সংগে মানবমনের এবং দেহের যে নিবিড় সম্পর্ক [illegible] কৌতূহলপ্রদ সংবাদ পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থটির মধ্যে সকল শ্রেণীর পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করার উপাদান আছে আই আগামী বারে এই বিচিত্র প্রসংগে আলোচনা করার বাসনা রইল।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে বিদেশীদের মধ্যে যে কিছু কিছু আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে 'অমৃতে' এর আগেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এবার এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি সংবাদ এসেছে যা শুনে ভারতীয় সাহিত্য-রসিকরা খুশি হবেন বলে আশা করা যায়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীমতী প্রভজং কাউরের কথা। পাঞ্জাবী সাহিত্যে শ্রীমতী কাউর একটি খুবই পরিচিত নাম। এ পর্যন্ত তাঁর ৩৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই কবিতা ও গল্পগ্রন্থ। 'আকাদামী পুরস্কার' বিজয়ী শ্রীমতী কাউর গত বছর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ইংরেজী ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি ভাষাতেও তাঁর লেখা অনুদিত হয়েছে। শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'অধিত্যকা' গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। বেঙ্গলি লিটারেচার পত্রিকায় এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী কাউর এই গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের জন্য গ্রান্ড প্রাইজ দি লা রোজ দ্য ফ্রান্স পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। শ্রীমতী কাউরের স্বামী ব্রিগেডিয়ার নরেন্দ্র পাল সিংও অনুরূপ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। শ্রীসিং এখানকার ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক উপদেষ্টা। তিনি মুলত ঔপন্যাসিক। পাঞ্জাবী, হিন্দী ও ইংরেজীতে তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'শিখদের আধ্যাত্মিক সংগীত' গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় খুবই প্রশংসা অর্জন করেছে। ভারতের অন্তত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে তাঁর গ্রন্থ পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

জার্মান ভাষায় ভারতীয় গল্পেরও একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রকাশক হর্স্ট আর্ডম্যান। যে সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার নাম 'গাইসটিগে এরেগনিসে ইন্ডিয়েন'। গ্রন্থটি দেখবার সৌভাগ্য এখনও আমাদের হয়নি। তবে এ সম্পর্কে 'বন' থেকে প্রকাশিত একটি নিউজ বুলেটিন পড়ে জানা যায়, শ্রীবুদ্ধদেব বসু সাম্প্রতিক জার্মান ভ্রমণের সময় এই গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এতে বুদ্ধদেব বসুর 'আমরা তিনজন' গল্পটি সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধও এতে স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে গল্প রচনায় যাঁরা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের কোন গল্প এতে স্থান পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে রিপোর্টে কোন উল্লেখ নেই। যাই হোক, বিদেশীরা ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছেন, এটাই আশার কথা। ভবিষ্যতে বাংলা গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশিত হবে বলে আশা করি।

ট্রান্সলেটার্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া সম্প্রতি অনুবাদ কর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বিধিসম্মত শিক্ষার জন্য এক বছরের একটি কোর্স আরম্ভ করেছে। যাঁরা অনুবাদ করেন বা করতে চান এবং যাঁরা অন্তত দুটি ভাষা জানেন, তাঁরাই এই কোর্সে যোগ দিতে পারেন। সোসাইটির এই প্রচেষ্টাকে সকলেই অভিনন্দন জানাবেন বলে আশা করি। অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই একটা অনীহা আছে। সাহিত্যের যথার্থ অনুবাদ হয় না, একথা খুবই ঠিক। কিন্তু অনুবাদ ছাড়া আর কোন পথ আছে অন্য দেশের সাহিত্যকে জানবার? সেই ভাষা শিখে? কিন্তু কটি ভাষা শিক্ষা লাভ করা সম্ভব? ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আজ অনুবাদ খুবই প্রাধান্য অর্জন করেছে। আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশের মানুষের কথা আমরা কি করে জানবো? এর একমাত্র পথ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যের অনুবাদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুবাদ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ সুবিধা আছে। ভারতে এখন পর্যন্ত তেমন সুসংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক অনুবাদ সংস্থা স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য অনুবাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থির হয়েছিল — ১) জাতীয় অনুবাদ সংস্থা সংগঠন করে অনুবাদ সম্পর্কে কয়েকটি নীতি নির্ধারিত করা এবং অনুবাদকর্মকে পেশাদারী হিসেবে রূপান্তরিত করা। ২) জাতীয় অনুবাদ সংস্থা আন্তর্জাতিক অনুবাদ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ৩) প্রতি দেশেই বিজ্ঞানসম্মত অনুবাদের প্রচার এবং প্রসারের চেষ্টা করতে হবে। ৪) অনুবাদ ও অনুবাদকের শক্তির পরীক্ষা। ৫) অনুবাদের রূপগত ও ধ্বনিগত দিক সম্বন্ধে আলোচনা। ৬) অনুবাদ শিক্ষার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা এবং গবেষণার সুযোগ দান। এই সম্মেলনের পর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনুবাদ সম্পর্কে একটা আগ্রহের ভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬১ সালে রোমে 'পি-ই-এন'র উদ্যোগে অনুবাদের একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত থেকে শ্রীমতী লীলা রায় এতে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে ভারতের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের উদ্যোগে হায়দরাবাদে অনুবাদের অন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে। ভারত সরকারের অনুরোধে শ্রীমতী লীলা রায় একটি সাবকমিটি গঠন করেন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য সিলেবাস প্রণয়ন করেন। অবশ্য সরকারী উদ্যোগে এর বেশী আর কিছু হয় নি। সম্প্রতি রাইটার্স গিল্ড

এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। পিণ্ডের মুখপাত্র … জানিয়েছেন—এর মধ্যেই অনেক হাজারখানি এতে যোগদান করেছে। … অনুবাদ সংস্থার অধ্যাপক … ভারতীয় অনুবাদ সংস্থাকে নানাভাবে সাহায্য করছেন এবং অনুবাদ প্রকাশের … তাঁর বইটি ভারতে প্রকাশের অনুমতি দান করেছেন। অনুবাদ সংস্থার এই কার্যাবলী যে সহৃদয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

গত বুধবার ২৭ নভেম্বর মহাজাতি সদনে আচার্য ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীকে তাঁর জন্মদিনে 'ভারত প্রবক্তা'রূপে অভিনন্দিত করা হয়। শ্রদ্ধার্ঘ লিপিতে বলা হয়—"প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের সংস্কৃতিকে তুমি একসূত্রে বেঁধেছ; তোমার উদার চিন্তার প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞান ও আধুনিক মূল্যবোধ পাশাপাশি অবস্থান করে সমন্বয়ী দৃষ্টির মহিমা প্রচার করেছে।' অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন —"আচার্য ত্রিপুরাশঙ্কর ভারত প্রতিভার এক সার্থক প্রতিমূর্তি, মনুষ্যমহিমার প্রতি-মূর্তিরূপে, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীরূপে ছাত্রছাত্রীদের তিনি শুধু দিয়েছেন, প্রতিদানে তিনি চাননি কিছুই।" আলোচনা এবং কবিতায় যাঁরা জন্মদিনের অর্ঘ্য নিবেদন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, ভবতোষ দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিভূতিভূষণ বসু, …বাগচী, কুমারেশ ঘোষ, … চৌধুরী, আরতি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

আগামী ২৭শে জানুয়ারী মহা… ভবনে কবি ও ইংরেজী সাহিত্যের প্র… অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের জন্ম… বার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হবে বলে জ… গেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা … এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন এবং পৌর… হিত্য করবেন কলকাতার বিশ্ববিদ্যাল… উপাচার্য ডঃ ভি কে গোকাক। অনুষ্ঠ… মনোমোহন ঘোষের কবিতা পাঠ এবং … কাব্যনাট্য 'নলদময়ন্তী'র কয়েকটি … অভিনীত হবে। এই উপলক্ষে কলক… বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সমগ্র ইংরাজি র… মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিদেশী সাহিত্য

আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলা বসেছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে। প্রতিবছরই পৃথিবীর নানা দেশের লোক যায় সেখানে। কেউ যায় মেলা দেখতে, কেউ সওদা করতে। কিন্তু এবার ভালোয় ভালোয় কাটেনি কটা দিন। শুরু-তেই অসন্তোষ, অবশেষে গোলমাল। উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসতে থাকে চতুর্দিক থেকে। গাঁটের কড়ি গুনছেন সকলেই কিন্তু মজা লুটছেন বড় বড় প্রকাশকের দল তার ওপরে সব রকমের বই দেখাবার ভালো ব্যবস্থা ছিল না প্রদর্শনীতে। সোস্যালিস্ট স্টুডেন্ট লীগ নামলেন বিরুদ্ধ প্রচারে। ব্যবসায়ীরা এবার শান্তি পুরস্কার দিতে চান লিওপোল্ড সেদার সেঙ্গরকে। স্টুডেন্ট লীগ তারও বিরোধিতা করেন। এবং আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেন, এবারকার 'অ্যান্টি ফেয়ার' শান্তি পুরস্কার পাবেন জনৈক আফ্রিকান বিপ্লবী। এ নিয়ে তুমুল হৈ চৈ। ভেতরে বাইরে তুলকালাম কাণ্ড। গুজবের পর গুজব শোনা যেতে থাকে। আসছে বার নাকি মেলা বয়কট করবেন অনেকেই। কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকলেন মেলার ভেতরে। কেউ খুশি হতে পারেননি এ ব্যবস্থায়। প্রকাশক সমিতি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাই নিয়ে। সংখ্যা-গরিষ্ঠ হলেও প্রতিবাদীর দল দুর্বল নন। পেঙ্গুইন, ডায়োজেনেস প্রভৃতি প্রকাশকদের সঙ্গে উইলিয়াম স্টাইরণ, গুন্টার গ্রাস প্রমুখ সাহিত্যিকরা তাঁদের সমর্থক। সমালোচকেরা দাবী করেন: 'প্রত্যেক দর্শককে বিনামূল্যে মেলা দেখতে দেওয়া হোক। কারো বক্তব্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অনুচিত। এবং অনিবার্য না হলে পুলিশ ডাকা চলবে না। যদি দেখা যায়, প্রদর্শকেরা অবস্থা আয়ত্তে রাখতে পারছেন না, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে, তাহলেই পুলিশকে মেলা-প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যায়।'—ফলে দর্শকেরা কেউ এবার মেলা দেখতে তেমন উৎসাহ বোধ করেননি। চারদিক ছিল প্রায় জনশূন্য। বইয়ের স্টলগুলি ফাঁকা ফাঁকা। এবং উত্তেজনাহীন। গত বছর যেখানে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দর্শক মেলা দেখতে যান—এবার সেখানে দর্শকসংখ্যা মাত্র পঁচাত্তর হাজার। তবে প্রকাশকেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হননি। ব্যবসা ভালোই হয়েছে।

সম্প্রতি, মার্কিনী সাহিত্যিক কনরাড রিচার মারা গেছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তর বছর। মার্কিনী জীবনযাত্রার ওপর তিনি প্রায় কুড়িটি বই লেখেন। তার মধ্যে 'দি ট্রিজ' 'দি লাইট ইন দি ফরেস্ট' 'দি টাউন' প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার প্রথম দিককার জীবনযাত্রা, রীতিনীতি ও আচার-আচরণের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর বহু রচনায়। রাখাল বালক, আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান সমাজ এবং নিম্নবিত্ত চাষী মানুষেরা তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রায়িত। জনৈক সমালোচক বলেন, 'সীমান্ত জীবনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও সত্যিকারের বাস্তব ছবি তাঁর মতো আর কোনো মার্কিনী সাহিত্যিক তুলে ধরতে পারেননি। 'দি টাউন' উপন্যাস-টির জন্য তিনি কয়েক বছর আগে পুলিৎজার পুরস্কারে সম্মানিত হন।

আলবেয়ার ক্যামু আট বছর আগে মারা যান একটি দুর্ঘটনায়। তখন তাঁর বয়স ছেচল্লিশ বছর। সমালোচকেরা তাঁর জীবন ও সাহিত্যের বহু অ্যাবসার্ডিটির সঙ্গে এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটির গভীর যোগ-সূত্র খুঁজে পান। কেউ কেউ মনে ক… তিনি অস্তিত্ববাদী ধারার সাহিত্যিক। জী… কালে কামু এই মনোভাবের তীব্র প্রতি… করেন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের অস্বী… করে লিখলেন—'দি মিথ অব সিসি…' (১৯৪২)। আসলে তিনি ছিলেন … নিজস্ব পথের পথিক। আলজেরিয়ার … প্লাবিত সমুদ্র-উপকূল তাঁর সাহিত্যে … উঠেছে গভীর তাৎপর্য নিয়ে। সম্প্রতি … বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধের একটি … লন বেরিয়েছে ইংরেজীতে। তাঁর গল্প … ন্যাসে শব্দ স্পর্শ ও অনুভবের … ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শ পাওয়া যায়—এ সংক…

বৃত্তির প্রবন্ধেও পাওয়া যায় তারই তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি। তেইশ বছর বয়সে সাংবাদিকতা প্রায় সময় কাম্যু কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন সাহিত্যবিষয়ে। ১৯৫৮ সালে সে-গুলি 'দি রং সাইড অ্যান্ড দি রাইট সাইড' এই বইয়ের আকারে বেরোয়। তিনি তার ভূমিকায় মন্তব্য করেন, 'শিল্পের মধ্য দিয়ে এই মানুষের জগতের পুনরাবিষ্কার ছাড়া আর কোনো কাজ নেই—যার দুটি বা তিনটি মহান ও সরল ইমেজের উপস্থিতিতেই হৃদয়ের দুয়ার প্রথম খুলে যায়।' এ সংকলনের বাকি প্রবন্ধে জীবন, প্রেম, মৃত্যু ও অন্য সম্পর্কে যে অনুসন্ধানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—তাই তার গল্প-উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত গ্যেটে যেমন আলোর জন্য চিৎকার করে উঠেছিলেন, কাম্যু তেমনি বেপরোয়াভাবে খুঁজে ফিরেছেন—আলো আর আলো। প্রথমে দিককার প্রবন্ধে তার মানবতাবোধ ও আত্মমমতা অত্যন্ত প্রখর। উত্তর আফ্রিকার শৈশবের মানুষ ও পারিবারিক জীবনের স্মৃতি অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে তার এ সময়ের লেখায়। চলমান জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কেও তখন তিনি উদাসীন নন। দ্বিতীয় পর্বের লেখায় পাওয়া যায় য়ুরোপীয় সভ্যতার গভীর অন্ধকার ও অসংগতির কথা। কাম্যুর মতাদর্শ ও বক্তব্য অ্যাবসার্ডিটির সংগে সংগ্রামের স্বাক্ষর রয়েছে 'নাপসিয়েলস' (১৯৩৮) এবং নাময় (১৯৫৪) প্রবন্ধে।

সম্প্রতি পোলিশ লেখক গিয়োর্দানো ব্রুনোর একটি বিস্মৃতপ্রায় বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে উরক্ল লাইব্রেরীতে। ১৫৭২ সালে এটি লেখা। ল্যাটিন ভাষায় এর নামকরণ হয়েছিল 'দেমোগরজেন' বা জীবনবৃক্ষ। পৃথিবীর আর কোনো গ্রন্থাগারে ব্রুনোর গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপি নেই। তার মৃত্যুর পর প্রায় সব বইয়েরই পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলা হয়। বইটি আবিষ্কার করেন দোসেন্ত এ নউইক। ব্রুনোর যে সকল পুরোনো রচনা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে —'দেমোগরজেন' তারও প্রায় দশ বছর আগেকার লেখা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী মার্কিনী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জন বেরো চিন্তায়, বুদ্ধিতে ও মেধায় শুধু উল্লেখযোগ্য নন, রীতিমত জনপ্রিয়। গল্পের রীতিনীতি এবং কাঠামো গঠনে তিনি প্রচলিত পদ্ধতিকে সবসময় মেনে চলেন না। কিন্তু গভীর নৈতিক উপলব্ধিতে তার প্রতিটি লেখা পাঠকের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে। দায়িত্বহীন বাগবিস্তারে তার কোনো লোভ নেই। সম্প্রতি "মসবিজ মেমরেস অ্যান্ড আদার স্টোরিজ" নামে তার একটি গল্প-সংকলন বেরিয়েছে। এ বইয়ের মোট ছটি গল্পের মধ্যে তিনটি গল্প যথাক্রমে স্মার্কিং অব মিঃ স্মীথ' 'দি গনজাগো ম্যানাসক্রিপ্টস' এবং 'এ ফাদার টু বি' প্রথম বই আকারে বেরোয় ১৯৫৬ সালে। তখন তার নাম ছিল 'সিক্স দি ডে'। কিন্তু এই সংকলনের প্রকাশক যুগোকারেও পূর্বে-প্রকাশের কথা স্বীকার করেননি। পাঠক বইটি হাতে নিয়ে সেজন্যে বিরক্ত হন। তাছাড়া, এ সংকলনে যে তিনটি গল্প আছে —তাদের নাম হলো 'লিভিং ইন দি ইয়েলো হাউস' (১৯৫৭), 'দি ওল্ড সিসটেম' (১৯৬৭) এবং 'মসবিজ মেমরেস' (১৯৬৮)।

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের অনিশ্চয়তা, মৃত্যু, অপঘাত, অ্যাবসার্ডিটি ও স্নায়বিক উত্তেজনার বিরুদ্ধে আন্দ্রে ম্যালরক্স অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। ব্যক্তিগত প্যাশন কিংবা ইমোশনের কথা ভাববার সময় পাননি তিনি। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে 'ম্যান্স ফেট' এবং 'ম্যান্স হোপ' নামে তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বেরোয়। সম্প্রতি তিনি 'অ্যান্টি মেমরেস' নামে একটি আত্মজীবনী লিখেছেন। এতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গতার কথা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সমকালীন ঘটনাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

লন্ডনবাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকের লেখায় সম্প্রতি কিছুটা অস্থিরতার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। মার্কিনী জীবনের পুরো অস্থিরতা ইংরেজের ধাতস্থ হয়নি। কিন্তু প্রতি মুহূর্তের চঞ্চলতার সংগে তাঁদের পরিচয় দীর্ঘকালের। সম্প্রতি মরিস রাউডন ইংরেজ অভিজাতদের নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন। তার নাম—'আফটার-ওয়ার্ডস'। এর মধ্যে ভূমিকায় যাঁরা ঘোরাফেরা করেন, তাঁরা সকলেই বিত্তশালী—নানা উপায়ে অর্থোপার্জন করেন, সম্ভব রকমের মদ খান এবং অন্যের সাহায্যে মাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরে যান। একটি আত্মহত্যার ঘটনা উপন্যাসের বক্তব্যকে জটিল করে তুললেও মূল কাহিনীর সংগে যোগাযোগহীন। মিঃ রাউডন মাঝে মাঝে অনেক উজ্জ্বল পংক্তির ব্যবহার করে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। তবে সাধারণত উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে—এখানে তাও নেই। সেজন্যেই সমালোচকের মনে প্রশ্ন জাগে, 'হাউ মাচ ইন্টারেস্ট ক্যান এ ওয়াইন-গ্রোয়ার টার্নড নুড মেল-মডেল ডিমাণ্ড?"

নতুন বই

ISLAM AND ITS IMPACT ON INDIA: Kalika Ranjan Qanungo; General Printers and Publishers Private Ltd; 119. Dhurmatala St., Calcutta-13.

ভারতীয় সংস্কৃতি এমন একটি মহাসমুদ্র, যাতে নানা সংস্কৃতির ধারা এসে মিলিত হয়েছে। আমরা ভারতের সাধনা বলতে যা বুঝি, তা শুধু আর্য সাধনা নয়, —প্রাক্-আর্য, বৌদ্ধ, জৈন, ও ইসলামী সাধনা এখানে অবিরোধে মিলিত হয়েছে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতি-সংঘর্ষ কখনও ঘটেনি, একথা সত্য নয়, কিন্তু ভারত আপনার সমন্বয়ী প্রতিভার বলে যুগ-প্রয়োজনে বহিরাগত সংস্কৃতিকেও আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এইভাবে ভারত যুগে যুগে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে। পুণ্যতীর্থ ভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
> হেথায় দ্রাবিড় চীন,
> শক হূনদল, পাঠান মোগল
> এক দেহে হলো লীন'।

এ-কথার তাৎপর্য এই—শক, হূন প্রভৃতি বহিরাগত জাতি ভারতের বিশাল বক্ষে লীন হয়ে গেছে, আর ইসলামী সভ্যতা যেমন ভারতীয় সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করেছে, তেমনই ভারতবর্ষে ইসলামী সংস্কৃতিও ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

'ভারতের সংস্কৃতির' উপর 'ঐস্লামিক সংস্কৃতির' প্রভাব কতখানি, সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ের আলোচনার তিনটি প্রধান বিঘ্ন—(১) ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অস্পষ্ট ধারণা, (২) মুসলিম সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক পরিচয়ের অভাব ও (৩) উগ্র স্বাজাত্যাভিমান। এই সকল কারণে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাব'-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিও বিচারমূঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তাই তাঁদের আলোচনা অতিকথন বা অল্পকথন-দোষে দুষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন বাংলার অন্যতম প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয়। তিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ-রচনার সম্পূর্ণ অধিকারী, কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর এবং ফারসী, আরবী প্রভৃতি ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপন্ন। তিনি বলেছেন, ঐতিহাসিক সর্বপ্রকার অতিশয়োক্তি বর্জন করতে হবে, তিনি যেমন বিনা প্রমাণে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না, তেমনই স্বাজাত্যাভিমানের বশে কোন প্রমাণকেই উপেক্ষা করবেন না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কানুনগো মহাশয় বলেছেন, মধ্যযুগে ভারতভূমিতে এমন কয়েকজন সাধক-কবি ও মনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা জাতি ও সম্প্রদায়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করে এক উদার, সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম দ্বৈত সাধনার

ধারা যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় মিলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক রামানন্দ-শিষ্য কবীর, শিখধর্মের প্রবর্তক ও আদিগুরু নানক, স্বামী প্রাণনাথ প্রভৃতি ভক্ত সাধকগণের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মহানুভব সম্রাট আকবর শুধু সংগীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কলা-বিদ্যার চর্চায়ই উৎসাহ প্রদান করেননি, তিনি 'দীন-ই-ইলাহী' নামক অভিনব ধর্মের প্রবর্তন করে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে লেখক আকবরের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন এবং হয়তো সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ অতিশয়োক্তি করে ফেলেছেন। তিনি লিখেছেন—

'It was a bold and vigorous enterprise; but time was not then ripe for such an experiment.... Though born and brought up as a Turk, he was every inch a Hindustani and an incarnation of the genius of Indian history of which perhaps our legendary Rajarshi Janaka was a symbol'.

মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের উপর ইসলামের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি সুলতানগণ বাংলা ভাষার চর্চায় উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর এই যুগেই 'পরাগলী মহাভারত' রচিত হয়েছে। আবার বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের অনুসরণে 'অ-লোকপন্থী' মুসলিম সাধক মারফতী গান রচনা করেছেন। হিন্দী-সাহিত্য, হিন্দু ও মুসলমান কবির দানে সমভাবে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। মালিক মুহম্মদ জয়সী 'পদ্মাবৎ' নামে আখ্যান-কাব্য রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এই মুশ্লিম কবির উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব ছিল গভীর। ভারতীয় যৌগিক ও তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল এবং তিনি পদ্মিনী উপাখ্যানের যে রূপক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা ভারতীয় চিন্তাধারার অনুকূল। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী প্রভৃতি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত কবি আলওয়াল পদ্মাবতের অনুসরণে 'পদ্মাবতী' নামক আখ্যান-কাব্য রচনা করে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হিন্দী-সাহিত্যে কবীর, রজ্জব প্রভৃতি ভক্ত কবিদের দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ'রা হিন্দু-মুশ্লিম-নির্বিশেষে সকলকেই সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণতা পরিহার করে ভক্তি-সাধনার পথে অগ্রসর হতে ও শ্রীভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মুশ্লিম যুগে ভারতীয় সংগীত, চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীত-সম্পর্কে হিন্দু ও মুশ্লিমদের দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন—হিন্দুদের নিকট সংগীত ছিল ধর্ম-সাধনার অঙ্গ, কিন্তু মুসলমানদের উপাসনায় সংগীতের স্থান ছিল না (সুফী সাধকদের কথা স্বতন্ত্র), সংগীত তাঁদের নিকট ছিল আস্বাদনের বস্তু। মুশ্লিম যুগের ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

'Under the influence of Islam, Indian painting lost its spirituality and idealism and gained in its approach to life and reality.'

আবার, একথাও সত্য যে ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে ইসলামের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে এমন অনেকে অতিশয়োক্তি করেছেন, যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যাঁরা আচার্য শঙ্করের উপর ইসলামের প্রভাবের কথা বলেছেন, উপনিষদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় গভীর নয়, এবং ইসলামের একেশ্বরবাদের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদে পার্থক্য কত সুদূর-প্রসারী, তাও অনুধাবন তাঁরা করেননি। লেখক বলেছেন—

'As early as the day of the Upanishads, Hindus conceived of God as Light and Sound. Therefore, it is idle to speculate any influence of Islam on Sankaracharya's monotheism which with its Maya is the very antithesis of the Sametic monotheism'.

ভারতবর্ষে সহজিয়া, কর্তাভজা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম-সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের উপরও ইসলামের প্রভাব প্রমাণিত হয়নি। এই সকল সম্প্রদায় জাতিভেদ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এ'দের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের বিরোধী। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত যে অর্বাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম থেকেই এই সকল সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। কানুনগো মহাশয় বলেছেন—

Their fundamental doctrines betray no evidence of the influence of Islam. It is more in accordance with historical facts to hold that these owed their rise to the persistently lingering influence of Tantric Buddhism assuming semi-Bramhanical garb under changed conditions'.

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যাঁকে 'রাধাভাব-দ্যুতি-বিলসিততনু কৃষ্ণস্বরূপ' বলে বন্দনা করেন, সেই প্রেমঘনমূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর উপর ইসলামের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মত আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

There is not the faintest evidence of Sree Chaitanya's intellectual contact with Islam'

অবশ্য, এ-কথা সকলেরই স্বীকার্য যে, মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন সাধক যে সমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন তার অগ্রদূত আল্ বেরুনী এবং শেষ আচার্য দারা শুকো।

পরিশেষে লেখক দেখিয়েছেন যে, ভারতের পরাধীনতার একমাত্র কারণ জাতিভেদ নয়, ভারতীয়দের মধ্যে সংহতি ও রাজনৈতিক চেতনার অভাব। বরং ভারতীয়দের জীবনে জাতিভেদ প্রথা অনেক-অংশে আশীর্বাদ-স্বরূপও হয়েছে। কারণ—

'Without a caste-system India would have as easily and completely lost its ancient culture and religion as did Iran'.

এ-কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, কানুনগো মহাশয়ের গ্রন্থখানি মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার উপর অনেকাংশে নতুন আলোক সম্পাত করেছে। ঐতিহাসিকরা এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক গ্রন্থখানি পাঠ করে উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই।

ত্রিপুরাশঙ্কর সে[illegible]

সরকার্স্ ডায়েরী ১৯৬৯ । এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ৬-০০, ৫-০০, ৪-০০, ২-৭[illegible] ২-২৫ ১-৭৫।

বাঙলাদেশের মানুষের কাছে সরকারের ডায়েরীর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিবৎসর বৎসর আরম্ভের পূর্বেই এদের ডায়েরী প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন দামের সংস্করণ নানান তথ্য ও পরিসংখ্যানে পূর্ণ। জাতীয় পোস্টাফিস সংক্রান্ত সংবাদ, কোর্ট [illegible] স্ট্যাম্প ডিউটি, রাজ্যপাল ও রাজপ্রধানদের তালিকা, ইনকাম ট্যাক্স, ওয়েলথ ট্যাক্স, স্টেট ডিউটি, গিফট্ ট্যাক্স-এর সঙ্গে আছে ইংরেজি, বাংলা, সম্বৎ, শকাব্দ, হিজরী তারিখ। এবার প্রকাশিত ডায়েরীগুলির মধ্যে আছে দু-রকমের ল, এগ্রিকালচার, ডিমাই ক্রাউন, ডিমাই ডায়েরী। তাছাড়া আছে পকেট ও বাংলা ডায়েরী। সুলভ মূল্যে এই ডায়েরীগুলি প্রতি বৎসরের মত সমাদৃত হবে আশা করি।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

রেখালেখা [সোদপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় মুখপত্র : ১৪শ বর্ষ : ১৯৬৮]

বৃহত্তর কলকাতার প্রান্তদেশ থেকে এমন একটি পরিচ্ছন্ন সুমুদ্রিত সুচিত্রিত পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে—এ ধারণা ছিল না। রেখালেখা তার পরিচ্ছন্নতার এবং আন্তরিকতায় বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছাত্র এবং শিক্ষকের যুগ্ম সহযোগিতায় এবং সাধনায় লালিত এই মুখপত্রখানি পত্রিকাপ্রেমীদের সহর্ষ সাধুবাদ পাবে। প্রবন্ধ-বিচিত্রা, নাটিকা, কবিতাগুচ্ছ, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, গল্প, নানা লেখা, ইংলিশ সাপ্লিমেন্ট প্রভৃতি শিরোনামে প্রকাশিত বিবিধ স্বাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র কল্যাণ দাস-এর আঁকা গোর্কির রেখাচিত্রটি তারিফ করার মতো।

দূরদৃষ্টি [১ম বর্ষ সংখ্যা]—সম্পাদক কমলকুমার সান্যাল।। ৩১ হায়নাথ [illegible] রোড, ব্লক ই ১৪, কলকাতা-৯।। চল্লিশ পয়সা।

দূরদৃষ্টি সাহিত্যের কাগজ নয় সংবাদ ও সমালোচনার মাসিকপত্র। এ সংখ্যায় দুটি কবিতা ছাপা হয়েছে। নানা রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা আছে কয়েকটি।

মেজর ম্যাক ডারমট রচিত 'স্পাইডার' আমেরিকায় পুরস্কার পেয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। লোমহর্ষক অলৌকিক কাহিনী রচনায় তাঁর অসামান্য খ্যাতি।

জুরীরা রায় দিলেন—'অপরাধী তবে মস্তিষ্কবিকৃত।'

সত্যি যদি আমার মাথাটা খারাপ হত, তাহলে বলার কিছু ছিল না, আশ্চর্য হওয়ারও কিছু ছিল না। আমি কিন্তু বেশ ভালোভাবেই জানি যে, আমার মাথাটা ঠিকই আছে, কোনো গোল নেই।

আদালতে কেন যে নিজের কথা নিজের মত বলতে দেয় না কে জানে? কি বিচিত্র সব আইন। আমি ফ্রান্সের সেই মেয়েটির কথা তুলতে চেয়েছিলাম, কি যেন তার নাম, থাকগে নামটা এখন কিছুতেই মনে আসছে না। প্রতি শুক্রবার সেই মেয়েটির হাত-পায়ে ক্ষতচিহ্ন দেখা যেত, মনে হত যেন তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে কে সেই গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে, দগদগে লাল হয়ে উঠত রক্তে—কিন্তু পরদিনই এই ক্ষতের আর কোনো চিহ্ন থাকত না, যেন কখনো কিছুই হয়নি। মেয়েটি অতিশয় ভক্তিমতী এবং প্রতিদিন ক্রুশের নীচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করত। তার মনের শক্তি দেহকে অতিক্রম করে চলে যেত, সেই শক্তিই সব কাজ করত। অন্ততঃ আমি ত' বরাবরই তাই মনে করতাম।

আদালতে আমি টেলিপ্যাথির কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হল। আমি ডাঃ রাইনারের বহুবিধ পরীক্ষার কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, তাঁর এক্সপেরিমেন্টের কথা বলে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, বার বার নানাভাবে নানাদিক থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, টেলিপ্যাথি একটি বিশ্বাসযোগ্য সত্য। কিন্তু যতবার এ-কথা বলতে গেছি, ততবার মাননীয় বিচারপতি ধমক দিয়ে বলেছেন—

—আপনি শুধু লার্নেড কাউন্সেলের প্রশ্নের জবাব দিন। পরমপ্রাজ্ঞ উকিল

ছায়া কালো কালো

স্বপ্ন নিয়ে স্মৃতি দিয়ে

এফ ম্যাক ডারমট

সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিতে যে অনেক কথা বলা দরকার, সে-কথা মাননীয় বিচারপতি কিন্তু বুঝতে চাননি।

বিচারপতি মহাশয় অবশ্য অতিশয় ভদ্র, তাঁর কণ্ঠস্বর মোলায়েম। প্রকৃতপক্ষে বিচার চলার কালে এবং যেভাবে তিনি জুরীদের কাছে চার্জ বুঝিয়ে দিলেন, তার ফলে জুরীরা এই রায় যে দেবেন তা অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম।

কিন্তু এখন হাতে আমার কলম, সামনে সাদা কাগজ—এখানকার ওয়ার্ডার, ওয়ার্ডারই ত' বলে এঁদের—ওয়ার্ডার লোক ভালো। বেশ সহানুভূতিশীল। আমাকে কাগজ তিনিই এনে দিয়েছেন, সুতরাং কাগজ এবং কলম দুই বস্তু যখন আমার আয়ত্তে, তখন আর আমার সত্য কথা বলায় বাধা নেই, আমি সত্যি কি যে ঘটেছে, তাই আপনাদের জানাতে চাই।

সমগ্র ঘটনাটির সূচনা অতি সাধারণভাবে ঘটেছিল, তথাপি আমার মনে হয়, যেভাবে জোনের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখনই আমার পক্ষে তা একটা হুঁশিয়ারী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল, এই যোগাযোগের পরিণাম যে অসাধারণ, তা আমার মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তেই।

সারে অঞ্চলের একটি পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে সেই অঞ্চলের মনোরম নিসর্গ দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। আমার হাতে যে মানচিত্রটি ছিল, তা দেখে ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি যে ঠিক কোন্ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি, সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েছি এমন সময় পিছন থেকে কে বলে উঠল—

মাফ করবেন। ডরকিং স্টেশনটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন?

আমি পিছন ফিরে দেখি এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তরুণী, তার অঙ্গে একটা নীল রঙের জামপার এবং স্কার্ট। তার দিকে তাকিয়ে প্রথমে মনে হল যে, মেয়েটি আমার পরিচিত। কিন্তু বেশ ভেবে দেখলাম—না, মেয়েটি আমার চেনাশোনা কেউ নয়। আমি মেয়েটির হাতে ম্যাপটি দিয়ে দেখালাম আমরা ঠিক কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে। সেই পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে যখন অস্তমান সূর্যের দিকে সম্মোহিত হয়ে দুজনে তাকিয়ে আছি, তখন প্রায় অচেতন ভঙ্গীতেই আমার হাত দিয়ে মেয়েটির গলায় জড়িয়ে ধরলাম। এখনকার দিনে কোনো পুরুষ পর্যটকের পক্ষে মেয়ে পর্যটকের কণ্ঠ বেষ্টন করাটা এমন একটা বিশেষ ব্যাপার নয়। তবে, জোনকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, আমার মত একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের পক্ষে তার কাঁধে হাত রাখাটা সোজা ব্যাপার নয়, কিছুতেই এসব ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ার মেয়ে নয় সে।

আর আমি, অন্য যে-কোনো মানুষের ব্যতিক্রম নই, তা জানি। আর একটি জন্য, অপরিচিত মেয়ের গলায় মাত্র এক মিনিটের পরিচয়ে এভাবে হাত রাখার অভ্যাস আমার কোনোকালেই ছিল না।

মনে আছে, আমতা আমতা করে, আমি মার্জনা ভিক্ষা করে কিছু বলেছিলাম আর জোন ভ্যাবাচাকার মত ভঙ্গীতে মৃদু হেসেছিল।

আমরা একত্রে ডরকিং স্টেশনে গিয়েছিলাম আর এর তিনমাস পরে আমাদের বিবাহ হয়ে গেল।

আমরা দুজনেই যে অতিশয় সুখী হয়েছিলাম, এ কথা বলা বাহুল্য। তথাপি গোড়া থেকেই দুজনে স্থির করেছিলাম, সপ্তাহে অন্তত একটি দিন আমরা দুজনে দুজনকে ছেড়ে একটি সন্ধ্যা কাটাব।

জোন যেত সিনেমা দেখতে। কোন একটা পাব-এ গিয়ে মদ্যপান করার মত মনোভঙ্গী আমার নয়, তাই আমি যেতাম 'গ্যামবিট ক্লাবে'—এই গ্যামবিট ক্লাব একটা দাবাখেলার আখড়া হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ ক্লাব হয়ে উঠল—এক পাত্র কফি পান করতে করতে হরেক রকম উদ্ভট আলোচনা হত, ভূত-প্রেত, মহাকাশ যাত্রা, অ্যাটলান্টিস ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব প্রসঙ্গ কিন্তু রোমহর্ষক গাঁজকা নয়, রীতিমত যুক্তিসম্মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা চলত।

ক্লাবগুলিতে যেমনটি ঘটে থাকে, এখানেও তাই, দলাদলি দানা পাকাতে লাগল এবং ছোট ছোট দলে এক-একটা দল ঘোট পাকাত। আমি বসতাম বিখ্যাত মনোবিশ্লেষক ডাঃ এমেসের সঙ্গে এক টেবিলে। আর একজন থাকতেন এই দলে, তিনি আমাদের গলির বিষণ্ণ-দর্শন রসায়নবিদ্ লেসলি ফিসার। এই লম্বা বিষণ্ণ মানুষটি তাঁর বাই-ফোক্যাল চশমার ভেতর দিয়ে এমন ভঙ্গীতে ডাঃ এমেসের দিকে তাকিয়ে থাকতেন যেন কোনো পরম-প্রাজ্ঞ ঈশ্বর

অনুগৃহীত ব্যক্তির মুখ-নিঃসৃত বাণী শুনেছেন।

একদিন রাত্রে লেসলী বললেন, তিনি একটি প্রবন্ধ পড়ছিলেন, সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, আমাদের সচেতন মন অনেক কিছু ভুলে গেলেও আমাদের মস্তিষ্কে একটা অক্ষয় রেকর্ড থেকে যায়, সেই রেকর্ড হল আমরা যা-কিছু শুনি, যা-কিছু দেখি, তারই রেকর্ড।

ডাঃ এমেস কথার মধ্যেই বললেন—এ-কথা যথার্থ এবং প্রমাণ করা খুবই সহজ।

তিনি বললেন—ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তের যে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা, সেই সময় অনেক কাল আগে ঘটে-যাওয়া কোনো ঘটনার কথা স্মরণ করার চেষ্টা করো। ধীরে ধীরে, সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার কথা মনে পড়বে, যা অনেক আগেই আমরা ভুলে গেছি, সেইসব বিস্মৃত ঘটনা মনের গভীরে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

যাই হোক, সেই রাত্রেই আমি এই প্রক্রিয়াটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম। মনে পড়ল, অনেক আগে ছোটবেলায় আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন আমার ঠিক পাশটিতে যে-ছেলেটা বসত, তাকে আমরা স্নো বল বলতাম। আমরা তাকে স্নো বল বলে ডাকতাম, তার কারণ সে ছিল ভীষণ মোটা এবং গোলাকার, তার মাথার চুলগুলি ছিল শাদা। এরপর হিউইটের কথা মনে হল। এই যে সহযোগী চিন্তা তা অনিবার্য। ক্রিকেট সীজনে স্নো বলের প্রিয় টিম ছিল সারে—হিউইট সমর্থন করত মিডলসেক্স। আর আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম এসেকস্ টিমকে। তারপর সহসা আমার মনে সেই অপরিসীম লজ্জার উদয় হল, সারে টিমের হাতে এসেকসের যখন ইনিংস পরাজয় অনিবার্য, তখন আমি পালাতাম।

এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ক্লাস-রুমটাই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল, আমি বুড়ো বোলিসকে দেখতে পেলাম, তাঁর শাদা গাউন খড়ির ধুলোয় ধূসরিত। তাঁর মুখের আঁচিলটা, কি আশ্চর্য আঁচিল, একটি বোঁটায় যেন গালের ওপর ঝুলছে—আর এই আঁচিলটার প্রতি আমার দৃষ্টি থাকার ফলে ব্ল্যাক-বোর্ডে যে তিনি কি লিখছেন, সেদিকে আমার মন থাকত না। মনটা আঁচিলে সরে যেত। ক্লাসের সবগুলি ছেলের নাম আমি আবৃত্তি করতে পারতাম সেই মুহূর্তে—স্বাভাবিক অবস্থায় এইসব নাম কবে ভুলে গেছি।

এই সাফল্যে আমার এমনই উত্তেজনা জাগল মনে যে, পরদিন রাতে জোনকে 'গুডনাইট' জানিয়ে সেই কামরার অন্য বিছানায় শুয়ে আমি আমার চিন্তা শুরু করলাম। এইভাবেই চলল রোজ একই খেলা। ছবি ক্রমশঃই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। প্রতি রাতেই আমার অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন চলে।

তারপর, এক রাতে এক আশ্চর্য অনুভূতি জাগল মনে—এই স্মৃতিচারণের প্রাত্যহিক ব্যায়াম আর আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই। আমি চোখ বন্ধ করলাম। ভাবছি, কি বিষয় নিয়ে আজ চিন্তা করব এমন সময় তাল গাছ এবং পূর্বাঞ্চলের এক সাগর-উপকূল মনে ভেসে উঠল, তরঙ্গ-গুলি সাগরবেলায় এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। আমি তখন খুবই ছোট—আমার বাবা ও মা তখন থাকতেন সিংহলে। হায়! তখনই যদি এই বিষয়ে একটু সতর্ক হতাম!

এখন ভাবি, যদি সচেতন হতাম সেই-দিন, তাহলে সর্বনাশের নেশায় মেতে উঠতাম না হয়ত। এই স্মৃতিচারণ প্রক্রিয়ার ওপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ খাটে না, তা এখন স্বয়ংক্রিয়। কিন্তু একটা আকর্ষণও ছিল, পুরোনো অভিজ্ঞতার কি কম দাম নাকি—কম কৌতূহলজনক? সুতরাং আমিও গা এলিয়ে দিলাম—যা হচ্ছে হোক না। এর পরে কয়েক রাত্রি যা সব কাণ্ড ঘটল তাতে একটু অস্বস্তি বোধ করি। যেই তন্দ্রার ঘোর মনে জাগত, আমি অমনই এমন এক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম যা সাধারণ অবস্থায় অনেক বেশী, সে এক আশ্চর্য উষ্ণ পরিবেশ।

আমার মনে হত আমি যেন মহাসমুদ্রে ভাসমান—আমাকে ঘিরে চারপাশে একটা আকস্মিক আলোড়ন। কেমন একটা তীব্র বেগ সারা অঙ্গে। সেই একই সঙ্গে শরীরে একটা উত্তেজনা ও কামনার স্রোত প্রবাহিত হত—এর পর কেমন একটা অস্বস্তি, অতিশয় শীতভাব, শ্বাসরোধ হওয়ার অবস্থা। পিঠের দিক একটা তীব্র যন্ত্রণায় আকুল হয়ে ওঠে, কি যেন ফুটছে দেহে আর আমি এমনই চীৎকার করে উঠলাম যে, জোনের ঘুম ভেঙে গেল।

সেই মুহূর্তে আমার জন্ম হল।

এই যে স্মৃতিচারণ, এই যে স্মৃতি-রোমন্থন, এ একটা মনস্তাত্ত্বিক খেলা মাত্র আর এই খেলা আমি বেশ উপভোগ করতাম। এখন কিন্তু যদি অতীতের সামান্যতম কিছু ভাবার চেষ্টা করি, তাহলে যেন স্লেটের ওপর ভিজা কাপড় দিয়ে সব লেখা মুছে দিয়ে নতুন লেখার মত নতুন অভিজ্ঞতা মনে জেগে উঠবে। যে-কোনো স্বপ্নের চেয়ে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল, স্বপ্নের মধ্যে যোগসূত্র থাকে না কিন্তু এই স্বপ্ন ধারাবাহিক এবং বিরামহীন একটা নিটোল ঘটনার চলচ্চিত্র। সাধারণত এই অভিজ্ঞতা দর্শনের পরই আসত গাঢ় ঘুম, স্বপ্ন ঘুমের ভিতর মিশিয়ে যেত, কিন্তু প্রথমেই ঘুমোবার চেষ্টা করে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় ছিল না। পরদিন প্রভাতে সবকিছু স্পষ্ট মনে জাগত, তার ভেতর কোনো অস্পষ্টতা বা অনিশ্চিত কিছু থাকত না।

জোন-ই আমাকে বলল আমাদের ডাক্তারের কাছে যেতে—ডাক্তার ফরজেবুরী আমাকে দেখে বললেন, রাতে শোবার সময় গোটাদুই এসপিরিনের বড়ি খেতে—আমার শরীরটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে, তিনি দেখেশুনে একটা টনিক দেবেন এ-কথাও বললেন।

এরপর মনে পড়ল ডাক্তার এমেসের কথা, তিনিই সমস্ত ব্যাপারটির সূত্রপাত করেছেন। আমার কথা শুনে তিনি অতিশয় উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সেই ধূসর শীতল চোখদুটি যেন আমার অঙ্গে বিঁধছে।

ডাক্তার এমেস বললেন যে, কোনোরকম একটা নার্কটিক (গঞ্জিকা জাতীয়) ওষুধ দিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে তারপর নানারকম কথায় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং যেহেতু এই কেসে তার নিজের আগ্রহ রয়েছে, তিনি আমার কাছ থেকে ফি বাবদ কিছু নেবেন না।

এই সম্মোহক অবস্থায় ঠিক কি যে ঘটেছে, সেই কথা আমি অনেক সময় ভেবেছি। আমার দেহে নার্কসিস বিষ ইন-জেকসন দেওয়ার পর যে অবস্থা হত, সেই অবস্থায় একমাত্র ডাক্তারের বিড় বিড় ছাড়া কোনো কিছুই শুনতাম না। আদালতে সাক্ষী দেওয়ার সময় ডাক্তার এমেস বলেছেন যে, তিনি নাকি আমাকে বলতেন, "স্পষ্ট স্বপ্ন বিবরণ" ভুলে যেতে—কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি কিছুতেই আমার চোখের ওপর তাঁর চোখের দৃষ্টি ফেলতেন না। সে-কাজটা বেশ চেষ্টা করেই করতেন তা আমি বুঝি।

যাই হোক, এখন আর কোনো কিছু বোঝার নেই, কোনদিনই সে সুযোগ পাব না। শুধু এই জানি যে, সেই রাত্রি থেকে জাগরণের কালে দেখা স্বপ্ন আমাকে এমন পেয়ে বসল যে, বিছানায় শুতে যাওয়ার কথা মনে হলে আমার মনে আতঙ্ক জাগত—আমি স্লিপিং ট্যাবলেট অনেক বেশী করে খেতাম, শোবার আগে আমার মস্তিষ্কটা অবশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম।

জোন আশ্চর্য মেয়ে। সে সব সইত। কিন্তু যখন সে দেখল যে, আমার এই বিড়ম্বিত অবস্থা ক্রমশ অধিকতর বেদনা-দায়ক ততই তার মন ভেঙে পড়তে থাকে।

তারপর এল সেই ভয়ংকর রাত্রি—আমি বলি রোম্যান নাইট। হা ভগবান! কেন আমাকে কেউ সতর্ক করে দেয়নি। কেন আমি চলে যাইনি—কেন আমি আত্মহত্যা করিনি—আজ মনে সেই অনুশোচনার জ্বালা।

জোন আমাকে এক গ্লাস গরম দুধ দিয়ে বলেছিল, এটা খেয়ে নাও, আর কোনো-রকম কৃত্রিম বড়িটড়ি খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা কোরো না।

আমি শুয়ে পড়তে জোন তার ঠাণ্ডা হাতখানি আমার কপালে রাখল। সেই এক সোনালি মুহূর্তে মনে হয়েছিল সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর আমার গায়ে কে যেন একটা আঙরাখা পরিয়ে দিল, মাথায় একটা লোহার হেলমেট। আমার কোমরের কাছে খাপে-ভরা চওড়া তলোয়ার। আমি একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কুয়াশা-মাখানো ভোরে সূর্যোদয় দেখছি। আমার পায়ে স্যাণ্ডাল আর হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন থাকায় পায়ে শীত অনুভব করছি।

তারপর দেখলাম আর এক মূর্তি। একটি তরুণী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাথার কালো চুল দুপাশে কুণ্ডলী করে ভাগ করা, মধ্যিখানে সিঁথি এবং তারো গায়ে একটি আঙরাখা, তবে সেই

পরিচ্ছদটি আমার চেয়েও আয়তনে অনেক বড়ো।

আমি জানি এই মেয়েটি আমার স্ত্রী,—সে এই জোন তাও জানি। যেই সে এল আমি তার কাঁধে হাত রেখে গলাটি জড়িয়ে ধরলাম। একদিন মারেতে ঠিক এমনই করেছিলাম, যেদিনটিতে জোনকে প্রথম দেখেছিলাম। আমরা দুজনে সূর্যোদয় দেখছি। এমন সময় জোন লক্ষ্য করল আমার ডান হাত দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, ক্ষতটা বেশ লম্বা তবে তেমন গভীর নয়। জোন তার আন্ডারওয়ার থেকে এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে আমার ক্ষতটা বেঁধে দিল। কি শান্ত পরিবেশ, কি অপার শান্তি, কি আনন্দ চারপাশে। আমি ভারী খুসী হলাম। সে রাতে খুব সুন্দর ঘুম হল।

যখন ব্রেকফাস্ট টেবলে গিয়ে হাজির হলাম তখন দেখি জোন আগে থেকেই এসে বসে আছে। সে আমার দিকে তাকাল বটে কিন্তু মুখে তার অন্যদিনের মত হাসি নেই।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বড় বড় চোখের পানে তাকালাম, বললাম—

—জানো জোন, আমার সমস্ত দুঃস্বপ্ন যদি গত রাতের মত হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই একটুও।

জোন শুধু বলল—তার আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমার ডান হাতে ঐ ক্ষতটা কি? কি করে হাতটায় আঘাত লাগল?

আমি ওর দিকে তাকালাম, তারপর আমার দিকে, আমার হাতে কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই।

আমি বললাম—তুমি ত' জানো! তুমিও ত' ছিলে আমার সঙ্গে, আচ্ছা আগে কখনও এমন হয়েছে?

শিউরে উঠে জোন বলে—না। তারপর আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমার বুকের ওপর চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

জোন বলল—জানো লক্ষ্মী সোনা, এসব আমার ভালো লাগে না, এসবের কি অর্থ! একবার দেখছি তোমার কপালে হাত বুলোচ্ছি, প্রার্থনা করছি তুমি যেন শান্তিতে ঘুমোতে পারো আর পর মুহূর্তেই তোমার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াচ্ছি, তোমার দিকে এগিয়ে গেলাম—এসব কিন্তু স্বপ্ন নয়, এ একেবারে খাঁটি সত্য।

আশ্চর্য কাণ্ড! এখন আমি স্বস্তি পেয়েছি, সান্ত্বনা দানের ভূমিকা এখন আমার। সমস্ত ব্যাপারটি বিপরীত দাঁড়িয়েছে।

আমি জোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—কিছু ভেবো না। এসব কাণ্ড অনেক আগে ঘটে গেছে। আমার মনে সমস্ত ঘটনা সুস্পষ্ট হয়ে আছে—এ সব সত্য। তুমিও এসব পেয়েছ টেলিপ্যাথির সাহায্যে, এই আর কি। এতে চিন্তার কি আছে! তবে আর বোধহয় এমনটি হবে না।

বললাম বটে তবে আমার অন্তরে একটা সুনিশ্চিত প্রত্যয় ছিল না।

সেই রাত্রেই সর্বপ্রথম গুহা দর্শন ঘটল। কিংবা বলা যায় আমি তা অনুভব করেছিলাম। আমাদের চারপাশে ভীষণ স্যাঁত-স্যাঁতে ঠাণ্ডা, সামনে যে জ্বলন্ত বিরাট ধুনী জ্বলছে তাতেও ঠাণ্ডা কাবু হচ্ছে না। আমাদের দুজনের পরিধানে পশুচর্ম, আমরা শুয়ে আছি পশুচর্মের ওপর। আমাদের কাছাকাছি নরদেহের বিশ্রী গন্ধ, প্রস্রাবের দুর্গন্ধ। কাছাকাছি কোথাও কোটি কোটি জল ঝরে পড়ছে বিরামবিহীন। মাঝে মাঝে অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুনটা দপ করে জ্বলে। চারদিকে আলো করে তুলছে, সেই আলোর আশে-পাশে অন্য দলের মানুষের ছায়া দেখা যায়। বিশাল গহ্বরের অন্ধকারে সবাই এক-একটি দল গড়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে। গুহার পটভূমিকাটি কিন্তু আমাকে আতংকিত করে তুলেছে। আমার মনে একটা দায়িত্ববোধও রয়েছে। ওরা আমাকে পাহারা দিচ্ছে।

আমি উঠে অগ্নিকুণ্ডে আরো কয়েক খণ্ড কাঠ দিলাম— আগুনের শিখা ওপর দিকে তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে। পিছনের পটভূমি থেকে একটা বিভীষিকাময় শব্দ শোনা যায়। একটা অতিকায় দানব যেন প্রকাণ্ড লোহার পাত নিয়ে ছিঁড়ছে এই কথা মনে ভাবতে পারলে সেই শব্দ কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়। তার আওয়াজে চারদিক প্রকম্পিত।

কাছাকাছি চলছে, পারিবারিক জীবন-রঙ্গ। বিচিত্র জৈব লীলা। এই শব্দের তীব্রতায় যুগল মূর্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে বসছে পারস্পরিক আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে। তাদের চোখে মুখে আতংকের ছাপ। এদের মধ্যে অনেকে ঘুমিয়েছিল। তারা উঠে পড়েছে। জোন আমার পাশটিতে নড়ে-চড়ে বসছে, আমার বুকের কালো চুলগুলি নখ দিয়ে করুণ ভাবে আঁচড়াচ্ছে। আমি ওকে ঠেলে ফেলে দিলাম—আমার নাকটা যেন বেড়ে যাচ্ছে। এমন সময় আরো পাঁচ রকম উৎকট গন্ধের সঙ্গে যেন কস্তুরী সুরভি ভেসে আসতে থাকে।

সহসা আগুনটা জ্বলে উঠল আরো জোরে। সেই আলোতে দেখলাম একটি নগ্ন শিশু হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত পালাচ্ছে। তারপর সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্য থেকে কি একটা বস্তুর অভ্যুদয় ঘটল যা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। শুধু মাথা আর গলা, কোনো দেহ দেখা যাচ্ছে না। মাথাটা যেন কাকের মত কিন্তু তার আকার পূর্ণ দেহ মানুষের মত প্রকাণ্ড। তার সেই হাড় বার করা চোয়াল এবং ঠোঁটে দু সারি পাতলা এবং তীক্ষ্ন দাঁত—সেই নগ্ন শিশুটার ওপর সেই মাথাটি ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে, জন্তুটার চোখ দুটি প্রকাণ্ড দুটি বাটির মত জ্বলছে। একবার একটা গৃহপালিত মুরগীকে এইভাবে খাদ্য খুঁটে নিতে দেখেছিলাম। তারপর দেখি সেই দীর্ঘ গলাটির নীচে কুমীরের মত আঁশযুক্ত প্রকাণ্ড এক সরীসৃপদেহ, মাথাটি ঐভাবে শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছে, আর শিশুটা প্রাণপণে চীৎকার করছে, এই সময়ে তাকে টপ্ করে সেই বিকট জন্তুটা শূন্যে উঠিয়ে নিল। যেন ক্রেন-এ করে একটি সামান্য বস্তু ওঠানো হল।

আমি আগুনের ধুনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে সেখান থেকে একটি জ্বলন্ত কাঠের খণ্ড তুলে নিলাম, এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ জোনের নগ্ন পায়ের ওপর পড়ল, ঠিক হাঁটুর ওপর। আমার কানের কাছে ওর তীব্র চীৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

সেই সুতীব্র আর্তনাদ আবার শুনতে পাই। জোনের বিছানার দিক থেকে আওয়াজটা আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বেডল্যাম্পটা জ্বালাই।

জোন বিছানায় উঠে বসেছে, তার চীৎকার থেমে গেছে এখন সে কাৎরাচ্ছে। দুটি হাত দিয়ে একটি পা প্রাণপণে চেপে আছে। মুহূর্তের মধ্যে আমি ওর পাশে বসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি। যেন প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে তার সারা অঙ্গ কাঁপছে। হাঁটুর ঠিক ওপরটায় একটা গভীর ক্ষত হয়েছে, পুড়ে গেলে যেমন হয়।

আমি তাড়াতাড়ি ফাস্ট-এড বক্সটা নিয়ে আগুনে গা-হাত পুড়ে গেলে যেমন ওষুধ দেয় তেমনই ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলাম। নীচে গিয়ে চা করলাম। কি যে হয়েছে সেই বিষয়ে দুজনের কেউ-ই কথা বলিনি একটিও। কিন্তু, ওর হাতে চায়ের কাপটি ধরে দিতে ও যেন আতংকিত ভঙ্গীতে আমার কোলের ওপর পড়ে গেল। হাতের কাঁপন লেগে পেয়ালা থেকে চা পড়ে গেল।

গুমরে গুমরে কাঁদতে কাঁদতে জোন বলে—আমাদের কি হবে? ওগো আমরা কি করব?

আমি বললাম— একটি কাজ করব। একটু দূরে চলে যাই চলো, কিছুদিন অন্য কোথাও, অনেক দূরে গিয়ে থাকো, আমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকো। তারপর ডাঃ এমেস আমাকে একটু সারিয়ে তুললে চলে আসবে।

ও আমার দিকে তাকালো, ওর মুখে সেই পুরোন হাসিটি ফুটে ওঠে। জোন বলল—জানো, মাকে দেখতে গিয়েছিলাম সেবার—ফিরে এসে দেখি ডাস্টবিনে নোংরা বোঝাই, তোমার সেকথা মনে আছে? না, সোনা! এখনই আমাকে তোমার বেশী দরকার। তোমাকে ছেড়ে এখন থাকতে পারব না। আমি যদি কোথাও যাই, তুমিও যাবে সেইখানে, তোমাকে নিয়ে যাবো।

ডাঃ এমেস আমাকে যে সার্টিফিকেট দিলেন তাতে লেখা আছে আমার অচিরাৎ মানসিক স্থৈর্য হারানোর সম্ভাবনা। আমার পক্ষে একটু বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন।

দক্ষিণ উপকূলের কর্ণওয়াল যাবো স্থির করলাম—আগে কখনও সেইখানে যাইনি। আমরা একটা তিন কামরা বাড়ি পেলাম, সম্পূর্ণ আমাদের অধিকারে। যে চাষীর বাড়ি সে এই গোলাবাড়ির এক প্রান্তে ছায়াঘেরা টিনের ঘরে সপরিবারে থাকে।

আমরা স্বামী-স্ত্রী, দুজনে দুটি আলাদা

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] একটু [illegible] [illegible] পড়ি। [illegible] ক্লান্ত এবং এই অঞ্চলের [illegible] পরিবেশ আমার অস্তিত্বের চারপাশে যেন একটু সুবাস আস্তরণ সৃষ্টি করল। সুবাস কথাটি বললাম তার কারণ, ঘরের জানলা খোলা, সেই [illegible] দিয়ে গোলাপের মধুর গন্ধের সঙ্গে রাতের অন্য ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।

পরদিন সকালের কথা ছাড়া আর কিছুই মনে নেই। আমার যখন ঘুম ভাঙলো তখন আমার মনটা প্রফুল্ল এবং দেহে যে স্বস্তির ভাব জেগেছে আমি অনেক সপ্তাহ সেই স্বস্তি উপভোগ করিনি। জোনের মুখটা যদিও কিঞ্চিৎ ম্লান তবু সে আমাকে দেখে হাসল।

সে বলল—আজ একটু মাছ ধরতে যাব।

আমি একটা ছোট্ট নৌকা ভাড়া করে সেই অপরূপ খাঁড়ির ভেতর অনেক ঘুরলাম। আমরা একটাও মাছ ধরতে পারিনি, তবে সেই খাঁড়ির ভেতর যেখানে গাছের ডাল এসে জলে নুইয়ে পড়েছে সেই সব জায়গায় অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম।

একটা জায়গায় আমরা দুজনে শুয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকি। আমাদের গায়ে সূর্যকিরণ ভেঙে পড়েছে—আকাশ নীল, ঢেউ-এর আওয়াজ শোনা যায়।

একটি সপ্তাহ এইভাবে কেটে গেল।

কোনোরকম দুঃস্বপ্নের খোঁজ নেই। যদিও আমি এবং জোন অনেক আনন্দের দিন একত্রে কাটিয়েছি তবু এই সপ্তাহের আনন্দের যেন তুলনা নেই। জীবনে এত আনন্দ আর পাইনি। মনে হয়, ওর মনেও ঠিক এমনই আনন্দ হয়েছে।

এরপর ১৫ জুন সেই ভয়ংকর দিন—

"আপনি বলতে পারেন পনেরই জুন রাতে কি হয়েছিল?"

"মহামান্য আদালতকে আপনার নিজের ভাষায় ১৫ জুন রাত্রে কি হয়েছিল বলবেন কি?"

সত্যি কথা বলতে কি আমি ত' বলার চেষ্টা করেছিলাম। সেই চেষ্টা কি করিনি? কিন্তু শোনে কে?

জজ সাহেব মাথা নীচু করে বসে আছেন। আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। হাতের পেন্সিলটা টেবিলের ওপর রাখা কাগজের প্যাডে ঠুকছেন। যখন মুখ তুললেন দেখলাম আমার উকিলকে কি ইঙ্গিত করলেন। আর তারপরই আমাকে থামিয়ে দেওয়া হল।

মনে আছে সকালের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই ছোট্ট ঘরটির দেয়ালে আঁটা পারিবারিক ছবি দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুপুরের দিকে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে এল—আমরা দুজনে বেড়াতে গেলাম। কিন্তু গাছ থেকে টপ টপ করে জল ঝরছিল। আর খাঁড়ির জল ভারী [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] আমরা দুজনেই [illegible] [illegible]। জোন বলল—আগামী কালটি আরও সুন্দর হবে, এ আমি [illegible] দিলাম। আমরা পিকনিকের মত খাবার-দাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, আর নতুন নতুন অঞ্চল আবিষ্কার করব।

আমি বলেছিলাম যে আমি বেশ সেরে গেছি এতদিনে। রোজ রাতে ঘুমের ওষুধ খেতে হত, গত দুদিন আর খাইনি। পরদিনের জন্য মাছ ধরার কথা চিন্তা করছিলাম, একটা দুরেসই টোপ ঠিক করতে হবে। আমাকে একজন বুড়ো মেছুড়ে বলেছিল পাহাড়ে একরকম আগাছা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে ভালো টোপ হয়। পিঁপড়েরা এই চাক তৈরী করে। আমি ভিজে এবং ঠাণ্ডা পাহাড়ে সেই পিঁপড়ের চাক ভাঙতে গিয়েছিলাম—কি ভিজে আর ঠাণ্ডা।

না-না—

আমি ওঠার চেষ্টা করেছিলাম। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে—কী ঠাণ্ডা। আমার গায়ে ঠাণ্ডা লাগছে—সামনে আগুন জ্বলছে তার ছোঁয়াচ গায়ে লাগছে। আমার পাশেই ত' জোন আছে, চেঁচানোর কি প্রয়োজন! ওকে চেঁচিয়ে ডাকার প্রয়োজন নেই। আমার ভারী ঘুম পাচ্ছিল। আমার অঙ্গে ওর দেহের উষ্ণ স্পর্শ এসে লাগছে। আমি যখন পাশে আছি ভয় কি! আমি ওর গলাটি দুহাতে জড়িয়ে ধরে মাথাটি নীচু করে আমার মাথার কাছে টেনে আনি। ওর চুলটা আমার গলায় পড়ছে। যেন আমারই চুল, কিন্তু আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে।

জোন বিছানায় উঠে বসেছে, তার সহসা আমি জেগে উঠি। সচকিত হয়ে পড়ি। খুব জোরে বাতাস বইছে। আগুন ধু-ধু করে জ্বলছে, যেন কোনো বিশাল পাখা দিয়ে সেই আগুনকে সতেজ করা হচ্ছে। অনেক দূরে অন্ধকারে গাছের মর্মর শব্দ শোনা যায়। পাতা ঝরার শব্দ শোনা যায়—আমার আশ-পাশে অসংখ্য মানুষের গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পাই। আমি জানি গাছের পাতার আওয়াজে ওরা এমন ভয় পায়নি। ওরা ভয় পেয়েছে অন্য কারণে, আমার মত জন্তুরীর চড়া গন্ধে ওরা আতংকিত হয়ে পড়েছে।

আমার মনে হয় খেলার অনুভূতির মতো, আতংকের অনুভূতি মানবমনে সীমিতভাবে ঢেউ জাগায়। কিন্তু কোনোদিন কল্পনায় ভাবিনি সেই বিকট জন্তুটার মাথা শূন্যে আন্দোলিত হয়ে যেভাবে একটা উৎকট গন্ধে চারদিক আচ্ছন্ন করেছিল সেই দৃশ্য আমাকে এতখানি আতংকিত করে তুলবে। এইবার সেই প্রাণীটার দেহের অনেকখানি অংশ আলোকে উদ্ভাসিত। বিরাট আকৃতি, প্রায় তিন-চারজন [illegible] উঁচু—অন্ধকারে আকাশে তার মাথা গিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] অনুসারে ওর [illegible] [illegible] দুটি [illegible]—আমি সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠি।

আমি [illegible] [illegible] গেলাম—দানবটা আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাকে ধরতে পারেনি, সেই তীক্ষ্ণ দাঁতে জাহাজের ক্রেনের মত ভঙ্গীতে জোনকে শূন্যে তুলে নেয়।

আমি জন্তুটার দেহের নীচের অংশে প্রাণপণে আঘাত করি—এমনই বর্মের মত তার চর্ম যে মনে হল না যে আমার আঘাত সে অনুভব করছে। জন্তুটা একটু ঘুরে দাঁড়াতেই তার দেহের সেই ধারালো আঁশ আমার গালে লেগে গালটায় একটা গভীর ক্ষত হয়ে গেল।

এই জন্য আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার গাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি হাত দিয়ে সেই সিক্ততা অনুভব করি। পরে সবাই বলেছিল জোন নাকি নখ দিয়ে এই ক্ষতটা করেছে।

আমি চীৎকার করি, জোন—জোন! তুমি ভালো আছো ত?

কোনো সাড়া নেই। আমার বুকটা ধক ধক করে ওঠে,—কেমন ভয় জাগে মনে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠি। দেশলাইটা খুঁজে বার করি।

কি যে দেখব তা যেন আমি জানতাম—কিন্তু আমার সেই প্রাক-চেতনায় যা দেখলাম সেই অবস্থা কল্পনা করিনি। আমি যে গোলাবাড়িতে রক্তাক্ত পাজামা পরে গেছি সে কথা আমার স্মরণ নেই। আমার শুধু মনে আছে যে রক্তাক্ত দেহে কম্পিত কলেবরে আমি আর সেই চাষী দাঁড়িয়ে আছি আর সামনে পড়ে আছে সেই বস্তু যা একদা জোন নামে পরিচিত ছিল।

চাষীটা বলেছিল—আমি পোস্ট অফিস থেকে ডাক্তারকে ফোনে ডেকে পাঠাই, তারপর আমার দিকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলে—আর পুলিশকেও খবর দিই!

* * *

আমি এখন আশ্চর্যভাবে শান্ত। এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে একটা আশ্চর্য পরিস্থিতি জেগেছে। জোন আর আমি অভিন্ন—আমরা এক। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটা সম্ভব নয়। আমরা দুজনে এক—চিরদিনের। আমাদের মিলন চিরন্তনের। ওরা বলছে আমাকে এইখানে—"ডিউরিং হার ম্যাজেস্টিস প্লেজার" অনেকদিন থাকতে হবে। আমার মনে হয় তা হবে না। জোনকে নিয়ে যাওয়ার পর সেই গুহায় আর যাইনি—দু-এক রাতের মধ্যেই যেতে হবে। তারপর সেই আগুনের বেড়া পার হয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দেব, জোন আর আমি, আমরা দুজনে অন্ধকারে হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব। আমরা যে অভিন্ন আত্মা। আমাদের এই সংযোগ অনাদি কালের।

—অমিতাভ মজুমদার অনূদিত

১৯৬৯

দেশে বিদেশে

"সূর্যাস্তের মহাসমুদ্র"

আমেরিকার "ফরেন অ্যাফেয়ার্স" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে কিছুদিন আগে লেখা হয়েছিল, "১৯৫৮ সালে লেবাননে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল আজ সে চাইলেও ঐরকম নিরুদ্বিগ্নচিত্তেই ঐ ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

এই এক দশকে সবচেয়ে বড় যে পার্থক্য ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে এই যে, রুশ নৌবহর আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে এবং বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরে আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবহরের পাশাপাশি প্রায় সমান শক্তিশালী একটি রুশ নৌবহর উপস্থিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার একটিও বিমান-বাহী জাহাজ ছিল না। আজ তার অন্ততঃ একটি বিমানবাহী জাহাজ আছে এবং আর একটি প্রায় প্রস্তুত। ১৯৬৭ সালে যেখানে ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েট রাশিয়ার গোটা ছয়েক জাহাজ ছিল সে জায়গায় আজ রুশ নৌবহরের জাহাজের সংখ্যা ৪৬—৫০টি জাহাজ নিয়ে গঠিত আমেরিকান ষষ্ঠ নৌ-বহরের প্রায় সমান।

প্রাচীন কালের মানুষ এক সময় ভূমধ্যসাগরকে "সূর্যাস্তের মহাসমুদ্র" বলে বর্ণনা করেছিলেন। ২৫ কোটি মানুষ এই সমুদ্রের তীরে যে ১৭টি দেশে বাস করে সেগুলির মধ্যে যেমন একদিকে রয়েছে ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীস ও তুরস্কের ন্যায় ন্যাটো জোটের অন্তর্ভূক্ত দেশ তেমনি রয়েছে আলবেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মত

[illegible] জোট-বহির্ভূত সমাজতন্ত্রী দেশ, [illegible] আরব যুক্তরাষ্ট্র, আলজেরিয়া [illegible] ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ [illegible] ভূমধ্যসাগরকে [illegible] এই "মুখোমুখির [illegible] নিয়ে প্রাচীন- [illegible]

[illegible] আগে বলে- [illegible] নৌবাহিনীর পতাকা [illegible] সকল সমুদ্রের বুকে উড়ছে। [illegible] হোক আর কালই হোক, মার্কিণ [illegible] বুঝতে হবে যে, সে আর পৃথিবীর [illegible] সমুদ্রের অধিপতি নয়।"

মার্কিণ [illegible] কাছে অ্যাডমিরাল গর্শকভের এই [illegible] ভূমধ্যসাগরেই সবচেয়ে আগে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে ক্যালিণ্ট শক্তির সংগে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য মার্কিন রণতরী-বাহিনী সর্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করেছিল। প্রায় ২৫ বৎসর কাল ধরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর ভূমধ্যসাগরকে কার্যত 'আমেরিকান লেক' হিসাবেই গণ্য করে এসেছে। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর [illegible] সোভিয়েট যুদ্ধ জাহাজ বাহিনী [illegible] তোলার দিকে মন দেন। তিনি [illegible] কাজ আরম্ভ করে গিয়েছিলেন [illegible] ক্রুশ্চেভের আমলে প্রথম দিকে কিছুটা বাধা পায়। ক্রুশ্চেভের বিশ্বাস ছিল, ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে যুদ্ধ জাহাজ অচল, শত্রুপক্ষের বোমার লক্ষ্যস্থল হওয়া ছাড়া সেগুলির আর কাজ নেই। কিন্তু কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র বসাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে সোভিয়েট রাশিয়া নৌবাহিনীর উপর বিশ্বাস ফিরে পেল। একটি পশ্চিমী হিসাবে, দশ বছর আগের তুলনায় এখন পৃথিবীর সমুদ্রপথগুলি অ্যাডমিরাল গর্শকভের রণতরী বাহিনীর তৎপরতা তিনগুণ বেড়ে গেছে।

সোভিয়েট রণতরী বাহিনীর এই শক্তি বৃদ্ধির ফল সবচেয়ে বেশী করে বোঝা যাচ্ছে ভূমধ্যসাগরে। এই শক্তি বৃদ্ধির ঘটনা লক্ষ্য করেই ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা-সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছিলেন, "ভূমধ্যসাগর [illegible] স্পষ্টতই স্বাধীন পৃথিবী ও [illegible] ভাবিয়ে [illegible]।"

ন্যাটো শক্তিজোটের কর্ণধারদের ভূমধ্য- [illegible] সময় থেকেই বিশেষ [illegible] হয়েছে। ভূমধ্যসাগর [illegible] এই [illegible] সীমা। [illegible] নৌবহরের অধিকর্তা [illegible] হয়েছে। ভূমধ্যসাগরে [illegible] আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অর্থ [illegible] ন্যাটো জোটের দুটি প্রান্তই বিপন্ন হওয়া। গত বছর নভেম্বর মাসে ওয়েষ্টার্ণ ইউ-রোপীয়ান ইউনিয়নে একটি রিপোর্ট পেশ [illegible] প্রতিনিধি [illegible] করেছিলেন, "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর [illegible] প্রান্তকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, এই 'বিপদের' কথা বলা এখন আর অসম্ভব সম্ভব নয়। এই 'বিপদ' এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।"

ভূমধ্যসাগরে রুশ বাহিনীর উপস্থিতির কতকগুলি লক্ষণ ও পরিণাম পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী ইতিমধ্যে আতংকের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। মার্কিন নৌসেনাপতি ভাইস অ্যাডমিরাল পিটার কমণ্টন সেদিন বলেছেন, ভূমধ্যসাগর ও আটলাণ্টিক ন্যাটো জোটের প্রত্যেকটি রণতরীকেই রুশ জাহাজ কোন না কোন প্রকারে নজর রাখে। তার জন্য রুশরা শুধু তাদের যুদ্ধ জাহাজই নয়, তাদের বিশাল বাণিজ্যপোত বাহিনীর জাহাজ ও মাছধরা জাহাজও ব্যবহার করে। আলজেরিয়ার মার্স-এল-কাবিরের নৌঘাটিটি সম্প্রসারণ করার জন্য সোভিয়েট কারিগররা আসছেন। জিব্রাল্টারের মাত্র শ'তিনেক মাইল দূরের এই নৌঘাটিটি গত জানুয়ারী মাসে ফরাসীরা ছেড়ে গেছে। আলজেরিয়া যদি ঐ নৌঘাটি রুশদের ব্যবহার করতে দেয় তাহলে ভূমধ্যসাগরে ন্যাটো গোষ্ঠী নৌ-শক্তির দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে, এমন একটা আশংকা ঐ গোষ্ঠীর দেশগুলি গত করেকমাস ধরেই পোষণ করে আসছে। গত বছর আরব-ইজরায়েল লড়াইয়ের সময় দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে কয়েকটি রুশ যুদ্ধ জাহাজ ভূমধ্যসাগরে বেরিয়ে আসার পরই ইজরায়েল যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। এখনও আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দে সোভিয়েট রাশিয়া তাদের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ রেখে দিয়েছে—যাতে ইজরায়েলী বিমান বোমাবর্ষণ করতে সাহস না পায়।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যের উপস্থিতি ও তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ ভূমধ্যসাগরে শক্তির দ্বন্দ্বকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছে। গত নভেম্বর মাসে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ন্যাটো কাউন্সিলের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের একটি অংশে বলা হয়েছে, "ইউরোপ অথবা ভূমধ্যসাগরের পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন পরিবর্তন আনার জন্য সোভিয়েটরা যদি হস্তক্ষেপ করে [illegible] স্পষ্টতই একটা আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি হবে যার পরিণাম [illegible] চেকোশ্লো-ভাকিয়ার ঘটনার পর সোভিয়েট রাশিয়া "সোস্যালিস্ট কমনওয়েলথ" সম্পর্কে যে তত্ত্ব [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] এই প্রস্তাব গৃহীত [illegible] যে, সমাজ- [illegible] স্বার্থ [illegible] এই [illegible] স্বার্থ বিপন্ন [illegible] ঐ কমনওয়েলথের [illegible] সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারবে। [illegible] এই তত্ত্ব অগ্রাহ্য করেছে তাদের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়াও আছে। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো গত অক্টোবর মাসে একটি বক্তৃতায় বলেছেন, "বুলগারিয়ার প্রধানতম নেতারা সম্প্রতি বলেছেন যে, কোন দেশে সমাজতন্ত্র বিপন্ন হলে সমস্ত সমাজতন্ত্রী দেশের কর্তব্য হল তাকে সাহায্য করা। এই বিবৃতি গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রত্যেক দেশের সার্বভৌমত্বের নীতির সংগে এই বিবৃতির সংগতি নেই। এই বিবৃতি থেকে এটাই বোঝা যায় যে, তারা যুগোশ্লাভিয়ায়ও আসবে সাহায্য করতে—যদি আমরা না ডাকি তাহলেও। যদি কেউ তোমাকে না ডাকে তাহলে তোমাকে তার দরকার নেই।"

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ন্যাটো কাউন্সিলের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া ও অষ্ট্রিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করেই। প্রকৃতপক্ষে, ন্যাটো কাউন্সিলে যখন সম্মেলন চলছিল সেই সময়েই এরকম একটা খবর রটেছিল যে, এইসব দেশে সোভিয়েট হস্তক্ষেপ হলে ন্যাটো গোষ্ঠী পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে অর্থাৎ ন্যাটো প্রতিরক্ষা বলয়ের সীমান্ত যুগো-শ্লাভিয়া ও রুমানিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে বলে ন্যাটো গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু পরে এই সংবাদ অস্বীকার করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে বলেন যে, রাশিয়া যদি ঐসব দেশে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ইউরোপে একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যেদিকে ন্যাটোকে নজর দিতে হবে; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ন্যাটোর আওতার মধ্যে ঐ দেশগুলিকে আনা হবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার বক্তব্য হল, সে কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তি এবং সেই অর্থে ভূমধ্যসাগরীয় শক্তিও বটে। এই অঞ্চল তার দক্ষিণ সীমান্তের সংলগ্ন। এই কারণে এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তায় তার আগ্রহ আছে।

ভূমধ্যসাগরে এই শক্তির দ্বন্দ্ব [illegible] যুদ্ধকে কোন পথে নিয়ে যাবে তা দেখার বিষয় হয়ে থাকবে।

শাদা চোখে

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হওয়ার পরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে [illegible] রাজনীতির [illegible] অভ্যন্তরে [illegible] চলেছে। [illegible] আসন [illegible] মধ্যে এই [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] এই দেশের [illegible] মাধ্যমে [illegible] এই [illegible] রাজনৈতিক দলই [illegible] সবচেয়ে [illegible] বিষয়। [illegible] পরিণামে বিষময় হয়ে উঠবে—একথা রাজনীতিবিদরা বোঝেন না তা নয়—তবে [illegible] চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকলে হিতাহিত বিবেচনার অবকাশ খুব অল্পই থাকে।

পশ্চিম বাঙলার রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত নাটকীয় পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী সকল রাজনৈতিক দলই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অল্পবিস্তর এর জন্য দায়ী। এই মন্তব্যে হয়ত অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করবেন। কিন্তু যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিবিষ্ট মনে অনুধাবন করছেন তাঁরা এই বক্তব্যকে যে সমর্থন করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক নেতা বলেছেন জনসঙ্ঘের এই রাজ্যের রাজনৈতিক আবির্ভাব প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাথাচাড়া দেওয়ার জন্য দায়ী। তাঁদের সঙ্গে এই ব্যাপারে সহমত পোষণ করা যায় না। কেননা জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক আদর্শ প্রগতিশীল পশ্চিম বাঙলার মানুষের মনে এতদিন কোন রেখাপাত করতে সমর্থ হয় নি। হঠাৎ জনসঙ্ঘ এই রাজ্যে পল্লবিত হয়ে ওঠবার কি কারণ ঘটতে পারে? মনে হয়, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুনরভ্যুত্থান ঘটার জন্যই জনসঙ্ঘ শাখা-প্রশাখা বিস্তারে সক্ষম হচ্ছে। জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে একথা বলা হচ্ছে না। কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা মুশ্লিম রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য জনসঙ্ঘকে দায়ী করে যে সমস্ত বক্তব্য রাখছেন তাঁদেরই যুক্তিকে খণ্ডন করবার জন্য এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অবতারণা। কিন্তু কেন এমন ঘটল বা ঘটছে এখন তার রাজনৈতিক সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে এই রাজ্যের জনসাধারণকে এই অশুভ রাজনীতির আওতা থেকে মুক্ত রাখবার জন্য এবং এর বিষময় পরিণতি সম্পর্কে যাতে তাঁরা সজাগ থাকেন সেই জন্য এই অস্বস্তিকর অবস্থার পর্যালোচনা দরকার। রাজনীতির গতি-প্রগতির ধারায় সাড়ে বিবৃতে থাকলে সেই গণদেবতা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ তাঁদের নিস্পৃহতা একনায়কত্ববাদ বা স্বৈরাচারের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। রাজনৈতিক সিতাই গণতন্ত্রের আসল ধ্বনিরাম।

[illegible] যে [illegible] পরে [illegible] তখনই [illegible] বদলে গণতন্ত্রের রথে চড়ে এক রাজনীতির চত্বরে এসে নেমেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যে সপ্তদশ আইনসভা সদস্য দলত্যাগ করে পি ডি এফ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে জানি না, তবে যে তাঁরা বিরাট সুবিধাবাদের জন্ম দিয়ে গেছেন একথা তাঁদের পরম বন্ধুও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

পি ডি এফ মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে এই রাজ্যে একটি ভাবনা ক্রমশই দানা বেঁধে উঠেছে। সেটা হচ্ছে রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাখবার জন্য ১০।১২ জনের একটি গোষ্ঠীচক্র গঠন করতে পারলেই কেউকেটা বনে যাওয়ার পথ খুবই প্রশস্ত হবে। অবশ্য তাঁদের বিধানসভার সদস্য হওয়া চাই।

পি ডি এফ মন্ত্রিসভার পতনের পর এবং রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যখন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রসঙ্গে বাজার সরগরম হয়ে উঠল তখনই এই অশুভ চক্রের ছায়া পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রগ্রেসিভ মুশ্লিম লীগের জন্ম হয়। লীগের নাম শুনলেই ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় তেমনি পশ্চিম বাঙলার মানুষের মনে আতঙ্কের ভাব জাগে। তবে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে কালাতিপাত করবার ফলে সাধারণ মানুষ খানিকটা সহনশীল হয়ে উঠেছে। কাজেই খুব খোঁজ-খবর করে আখেরে কি ঘটবে তার জন্য আজকাল অত চিন্তিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু যাঁরা দেশের মঙ্গল চান তাঁরা এতে নিশ্চয়ই আতঙ্কিত বোধ করবেন।

পশ্চিম বাঙলার বিধানসভার ২৮০টি আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৪০টি আসন আছে যাতে মুশ্লিম জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাঁরা স্বভাবতভাবে সেদিকে ঝুঁকবেন সেই প্রার্থীই নির্বাচনী বৈতরণী অক্লেশে পার হয়ে আসবেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম নেই এমন নয়। কিন্তু তা অতি সামান্য। এই তথ্যকে মূলধন করেই এই রাজ্যের রাজনীতিতে অন্তরালে এক ভীষণ টানাপোড়েন চলেছে। এবং সম্প্রদায়গত ভাবাবেগকে প্রবল মাত্রা দিয়ে এই জনতাকে একত্রিত করবার প্রচেষ্টা খুব জোর কদমে চলেছে। জানি না কে কতটুকু সফল হবেন, তবে এই নীচ রাজনীতির [illegible]

আগেই [illegible] মুশ্লিম জনতার প্রভাব [illegible] তা ছাড়াও আরো প্রায় ১০।১৫টি আসনে তাঁদেরই হাতে নির্বাচনে জয়পরাজয়ের চাবিকাঠি। কাজেই, পশ্চিম বাঙলার এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি ১০।১৫টি বিধানসভার সদস্যকে একত্রিত করে একটি গাঁটছড়া লাগানো যায় তবে লাটসাহেবের লালবাড়ির শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে আসর জমানো মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। বিশেষ করে, পি ডি এফ রাজত্ব একথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে।

অধিকন্তু, অনেকের মনে, বিশেষ করে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের মধ্যে, এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনেও কি কংগ্রেস কি যুক্তফ্রন্ট কেউ এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। আর যদিও বা সম্ভব হয় তবে সেই ব্যবধান ২০।২২ এর বেশী হবে না। অতএব, পুনরায় দলছুট হওয়ার চেয়ে আগে থেকেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তৈরি থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। লোকদলের নেতা অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ইতিমধ্যেই নির্বাচনী ফলাফলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পশ্চিম বাঙলার মানুষকে একথা শুনিয়েছেন। এবং তিনি কংগ্রেসকে রাজ্যের ক্ষমতায় আসার জন্য তাঁর দলের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হতে হবে বলেও দ্বিধাহীন ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। শ্রীকবির ছাড়াও অনেক নেতা এ ধারণা পোষণ করেন যে, আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর অপেক্ষাকৃত ছোট দলের হাতেই রাজ্যক্ষমতার চাবিকাঠি থাকবে। ইনতক শ্রীআশু ঘোষ পর্যন্ত এ ধারণার বশবর্তী।

অবশ্য এই মত পোষণের পক্ষে কার কি রাজনৈতিক যুক্তি আছে এবং তা কতখানি যুক্তিসহ সে বিচার করবার অবকাশ এখনও ঘটে নি। কারণ, রাজ্যের নির্বাচনী আসর এখনও জমে ওঠে নি। কাজেই আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা মোটেই নিরাপদ নয়। কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্ট উভয় সংগঠনই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দাবী জানাচ্ছে। এমন কি আই এন ডি এফও কংগ্রেসের সমানসংখ্যক আসন পাবে বলে আশা পোষণ করছে। একমাত্র লোকদল তার আসন দিয়ে প্রতিযোগীদের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করে।

কিন্তু এর মধ্যেও কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসের দাবীর যৌক্তিকতাকে স্পষ্টতই বোঝা যায়। কংগ্রেস একটি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দল। গ্রামে গ্রামে তার সংগঠন আছে। সেই সংগঠনের মাধ্যমেই নির্বাচনী আবহাওয়াকে অনুকূলে টেনে আনতে হয়ত পারে। আর যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও যে সমস্ত বড় ও ছোট রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়েছে তাদেরও নানা ধরনের সংগঠন আছে। অতএব, এদের বক্তব্য বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। কিন্তু, অধুনা সংগঠিত শ্রীঘোষের লোকদল এখনও সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারে নি। তবে তিনি কিসের জোরে ৫০।৬০টি আসন জিততে পারবেন বলে আশা পোষণ করছেন। নিছক তাঁর জনপ্রিয়তার জোরেই কি এটা সম্ভব? আই এন ডি এফ নেতা শ্রীআবদুস সাত্তার অবশ্য জোরের দাবী জানিয়েছেন অন্য দিক থেকে। তিনি বলেছেন পশ্চিম বাঙলায় গভর্নর শাসন কায়েম করে জনতাকে তিনি বাংলোতে থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেছেন। অতএব, জনসাধারণ আই এন ডি এফ প্রার্থীকে ছাড়া অন্য কাউকে ভোট অন্তত নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেওয়াই অসম্ভব। অতএব, শ্রীঘোষ গণ-আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে দলবলসহ বিধানসভার স্বকল্প আলোকিত কক্ষকে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু আসলে কি তাই?

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই মুসলিম জনতার অধিকাংশের অশিক্ষাকে মূলধন করে নির্বাচনে বাজীমাৎ করবার কাজে ব্যস্ত। প্রত্যেক দলের প্রার্থীতালিকা লক্ষ্য করলেই এ ধারণা সুস্পষ্ট হতে বাধ্য। মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় দেখা যাবে কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থী সকলেই মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম ঘটে নি তা নয়। হয়ত কৌশলের দিক থেকে অনেক কেন্দ্রে এই ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে। কিন্তু সেটা আসল চিত্র নয়।

আবার প্রার্থী মনোনয়নের জন্য অন্তর্দলীকে যে নাটক বিভিন্ন দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। সম্প্রদায়গত রাজনীতিকে চিরতরে বিসর্জিত করবার মুখ্য দায়িত্ব কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের। কিন্তু এই দুই মহান প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রার্থীতালিকাও উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থন জানায়।

কংগ্রেসই ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র রূপে ঘোষণা করেছে। অবশ্য, অন্যান্যরা বিশেষ করে বামপন্থীরা ত এর বিরোধিতা করেন নি বরং স্বাগতই জানিয়েছে. শুধু তফাৎ এই যে বামপন্থীরা বিশ্বাস করেন সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটলেই সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু ঘোষণা সমাজের বুক থেকে এ বিষ নিঃসারিত করতে পারে না। যা হোক, কংগ্রেস বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে তার আচারে ও ব্যবহারে এমন কোন ফাঁক রাখা উচিত নয় যার রন্ধ্রপথে সাম্প্রদায়িক মনোভাব মাথাচাড়া দিতে পারে। ঠিক সেই রকম যুক্তফ্রন্ট শরিকদেরও সজাগ থাকা উচিত। তবে দুঃখের বিষয়, আশুলাভের চেষ্টায় তাঁরাও কখন কখন এ খেলায় মেতে ওঠেন। না হলে শ্রীকাজেম আলি মীর্জার মনোনয়নকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারত না।

নির্বাচন যখন এগিয়ে আসবে তখন আবার দেখা যাবে মুসলিম জনতাকে খুশী করে দলে টানবার জন্য কিছু কিছু বিশেষ মুসলিম জননেতাকে তাঁদের মধ্যে প্রচারের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। অতীতে তাই ঘটেছে, ভবিষ্যতেও তাই ঘটবে। এ ধরনের সুবিধাবাদী নীতি আদর্শের পরিপন্থী।

মুসলিম জনতাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে এক শ্রেণীর নেতারা যে রাজনৈতিক ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ছেন তাতে দেশের ও দশের এবং আখেরে সেই মুসলিম জনগণেরও কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। হয়ত কিছু নেতা সাময়িকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারেন, কিন্তু তাও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া অসম্ভব। বর্তমানে রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী এবং যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্রম-পুনরভ্যুত্থান তাঁদেরই পরাজয় ঘোষণা করছে।

যে কোন কারণেই হোক, সাধারণভাবে মুসলিম জনতার মধ্যে এক ধরনের চিন্তা আছে যে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের উপযুক্ত স্থান করে নিতে পারছেন না। অবশ্য এ চিন্তা সীমিত ক্ষেত্রে বর্তমান। এক বিশেষ শ্রেণী এ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং তাঁরাই সমস্ত জনতাকে স্বমতে টেনে এনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি লাভের চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছেন।

সম্প্রদায়গত রাজনীতি করার মত পারিপার্শ্বিকতা বর্তমানে নেই। বিশেষ করে মুসলিম জনতার পক্ষে এ নীতি মারাত্মক। তাঁদের যাঁরা নেতৃত্ব করছেন সেই নেতাদের উচিত সমস্ত মুসলিম জনতাকে এই দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিলীন করে দেওয়া। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলের অভাব নেই, এবং বহু চিন্তাধারাও বর্তমান। কাজেই একটা না একটা রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মোটেই মুশকিল নয়। এর জন্য সচেষ্ট হলে আখেরে সকলেরই মঙ্গল হবে। অনেকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছেন। এটা শুভ লক্ষণ। কারণ, সমাজের গতির সঙ্গে তাল না থাকলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করা আদৌ সম্ভব নয়।

তবুও কেন তলে তলে এই অশুভ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এটাই বুদ্ধির অগম্য। কেউ কেউ হয়ত বলবেন গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই আছে দলবদ্ধ হওয়ার। অতএব, মুসলিমরা যদি দলবদ্ধ হন তাতে আপত্তি করার কি থাকতে পারে? এই ত অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যেও সংগঠন গড়ে উঠেছে। কই সে সম্পর্কে ত কারও সোচ্চার প্রতিবাদ নেই? আপাতদৃষ্টিতে দেখলে প্রশ্নগুলি খুবই সমীচীন বলে মনে হবে। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে যদি বিচার করা যায়, তবে এ ধরনের প্রশ্নের যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হবে না। স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা কখনও এইরকম আবেদনে সাড়া দেন নি। তাঁদের মধ্যে যে অনেকেই পৃথগন্নের ধুয়ো তোলেন নি তা নয়। কিন্তু তাতে কখনও বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু ভারতবর্ষে এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই যাঁরা আদর্শগতভাবে এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে লড়াই করছেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিম জনতার একটি অংশ যে কোন কারণেই হোক নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বাধিকার অর্জনের জন্য তৎপর হয়েছিলেন। তাঁদের জন্যও যে অন্যান্য রাজনৈতিক দল লড়াই করে নি তা নয়। কারণ যে কোন শ্রেণীসংগ্রাম বা অর্থনৈতিক সংগ্রাম মুসলিম জনতাকে বাদ দিয়ে সংগঠিত হয় নি। কাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসলে তাঁদের বাদ দিয়ে আসবে এমন চিন্তাও করা যায় না। এতদসত্ত্বেও এঁদের একটি বিশেষ অংশ সব সময়ই সাম্প্রদায়িক জিগীরের শিকার হয়ে পড়েছেন। অবশ্য, অশিক্ষাই মূলত এর জন্য দায়ী। কাজেই তাঁদের সুস্থ রাজনীতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ভার রাজনীতিক দলগুলির। এবং সেই কর্তব্যে অবহেলা আত্মহত্যারই নামান্তর হবে মাত্র।

হালফিল শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ সরকারের 'মুসলিম জিলা' গঠনের পরিকল্পনা এই মৃতকল্প ধারায় নতুন প্রাণসঞ্চার করেছে। এবং কেরলের সেই ঢেউ আজ পশ্চিম বাঙলার সৈকতে এসেও মৃদু মৃদু আঘাত করতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত 'মুসলিম জেলা' গঠিত হবে কিনা জানি না, তবে এই একপেশে রাজনীতির অবাঞ্ছিত ফল যে কিছু ফলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণ এর পিছনে আছে জানি না, তবে 'মুসলিম জেলা' এ নামের সঙ্গেই সাম্প্রদায়িকতার একটা দুষ্টভাব প্রকাশ পায়। পশ্চিম বাংলার সুযোগসন্ধানী রাজনীতিজ্ঞরা ইতিমধ্যেই ঐ পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের চিন্তাধারার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন।

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলার সচেতন মানুষের—কি হিন্দু কি মুসলমান—কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করা। এবং তা করতে হলে আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিচারবুদ্ধির পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে, যাতে সুযোগসন্ধানীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। জনতা যতই সচেতন হয়ে উঠবে ততই সমাজ পঙ্কিলতামুক্ত হতে থাকবে, গণতন্ত্রের আদর্শ রূপায়িত হবার পথ সুগম হয়ে উঠবে।

—জনদর্শী

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

আগের ঘটনা

[রাত দশটা। খুন হল তরঙ্গমালা। খুনী সন্দেহে ওর প্রেমিক নিখিলেশ হাজত থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে। শশাঙ্ক নিখিলেশের বন্ধু। মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে সুমেজো সুজাতা, প্রভা, কর্মচারী ভৈরব, বিশ্বনাথ বসু সকলকেই জেরা করা হয়। প্রত্যেকের উপরই গভীর সন্দেহ। হঠাৎ সুজাতার চাকুরিতে ইস্তাফা দেবার খবর এল। সি আই ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল চঞ্চল হলেন। ইতিমধ্যে নিখিলেশের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে নিলেন। তরঙ্গের সঙ্গে ওর রেজিস্ট্রেশন ম্যারেজ হয়ে গেছে। পালিয়ে যাবে অকিল এলাকা থেকে। এমন সময় খুন হল তরঙ্গমালা। রাজীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সুজাতাকে ফোনে ধরল।]

॥ পনর ॥

অত রাতে শচীনন্দলাল তার জন্য বসে।

রাজীব ঘরে পা দিয়ে অবাক হয়ে তাকাল, 'কি ব্যাপার শচী?'

ওকে দেখে শচীনন্দলাল উঠে দাঁড়াল। 'লণ্ড্রী থেকে সেই জামা-প্যান্ট নিয়ে এসেছি স্যার। সন্ধ্যে থেকে আপনার জন্য বসে। কেবলই ভাবছি, এই বুঝি আপনি এলেন।'

রাজীবকে বেশ লজ্জিত মনে হল। 'তুমি তাহলে অনেকখানি সময় আমার জন্য নষ্ট করে বসে আছ শচী। আমি দুঃখিত,—ভেরি সরি। জামা-প্যান্ট নিয়ে তুমি যে সন্ধ্যের সময় আসবে সে কথা একেবারেই মনে ছিল না।'

কাগজের একটা প্যাকেট করে জামা আর ফুল প্যান্টটা শচীনন্দলাল এনেছে, এক-টানে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে রাজীব আধ-ময়লা পরিধেয় দুটির উপর ঝুঁকে পড়ল। প্রথমে সাদা হাফ সার্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপরে ফুল প্যান্টটা,—পায়ের দিক থেকে কোমর পর্যন্ত, আর বোতাম-টোতাম সমস্ত অংশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিল। কিন্তু কোথায়? কিছুই না পেয়ে খুব হতাশ হয়ে রাজীব বলল, 'হল না শচী। জামা-প্যান্ট তুমি লণ্ড্রীওয়ালাকে ফেরৎ দিয়ে এস।'

আদেশমত শচীনন্দলাল উঠল। আগের মতই জামা আর প্যান্টটা মুড়ে দিয়ে কাগজের একটা প্যাকেট করল। বলল, 'আমি তাহলে যাই স্যার।'

চেয়ারে বসে দুই চোখ বন্ধ করে সম্ভবত কিছু ভাবছিল রাজীব। চোখ না খুলেই বলল, 'কাল সকালেই একবার এস শচী। তোমাকে আলোকপুরে একটা কাজে পাঠাব।'

শচীনন্দলাল চলে যেতেই রাজীব সোজা হয়ে বসল। পকেট থেকে নিখিলেশের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল। আশ্চর্য! এ চিঠিটা কে লিখতে গেল? চিঠির মাধ্যমে পত্রলেখক কাকে যেন হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছে। পত্রে কোন

সম্বোধন নেই। কালো কালো ভেয়ো পিঁপড়ের সারির মত কতকগুলি আঁকা-বাঁকা অক্ষর কাগজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়েছে। মনোযোগী ছাত্রের মত চিঠিটা পড়ল রাজীব। সম্বোধনহীন পত্রখানি খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বেশ অর্থবহ। চিঠির শেষে গর্জন বলে একটা ছোট্ট নাম লেখা। অর্থাৎ গর্জন নামের কোন লোক এই চিঠিটা লিখে কাউকে হুঁশিয়ার হতে বলেছে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে রয়েছে বিপদ।

রাজীব অনেকক্ষণ চিন্তা করল মনে। গর্জন? নামটা কেমন বেখাপ্পা আর অদ্ভুত। এমন নাম কখনও শুনেছে বলে তার মনে পড়ল না। পুরো নামটা কি হতে পারে? গর্জনকুমার? উঁহু,—ওটা বিশ্রী শোনায়। আচ্ছা গর্জনপ্রসাদ হলে কেমন লাগবে কানে? রাজীব সজোরে মাথা নাড়ল। নামটা মোটেই সুখশ্রাব্য নয়। হঠাৎ গর্জন সিং নামটা রাজীবের মনে হল, পেন্সিল কাগজ নিয়ে দুবার নামটা লিখল রাজীব। স্বগতোক্তির মত খুব ধীরে ধীরে নামটা উচ্চারণ করল।

চিঠিতে অবশ্য আরো দুটি নামের উল্লেখ রয়েছে। পুরো নাম নয়, সে দুটিও ছোট্ট নামের সংকেত মাত্র। একটি শী বাবু,—লোকটি গর্জনের কাছ থেকে তার প্রাপ্য টাকা খুবে নিয়ে এসেছে। অন্য নামটি উমোবাবু বলে এক ভদ্রলোকের। গর্জনের আশংকা একে নিয়ে। তার ভয় অন্য কেউ উমোবাবুর কান ভারী করেছে। এবং উমো-বাবুর আকস্মিক আগমনের সঙ্গে এই কান ভারী করার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলেই গর্জন মনে করে। চিঠির সবশেষে একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে গর্জন। ফেঁসে গেলে একসঙ্গে সকলে বিপদে পড়বে। বাঁচতে হলে খুব হুঁশিয়ার থাকা ভিন্ন উপায় নেই।

সম্বোধনহীন পত্রখানা আরো কয়েকবার পড়ে এক পাশে সরিয়ে রাখল রাজীব। পরে আবার ওটা কাজে লাগবে। শনিবার রাতে অরূপ খুন হবার পর থেকে সমস্ত ঘটনা-গুলি নিজের মনে সাজাচ্ছিল রাজীব। একের পর অন্যটি, পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে। আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করে রাজীবকে যথেষ্ট গম্ভীর মনে হল। খুনী লোকটা ভীষণ ধূর্ত। এমন সুন্দরভাবে আত্মগোপন করে আছে যে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এবং খুঁজে পেলেও তাদের অপরাধ প্রমাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য।...

অন্যদিনের চেয়েও অনেক ভোরে ঘুম ভাঙল রাজীবের। পূবের আকাশটা তখন সবে লাল হতে শুরু করেছে। বাতাসে ঠাণ্ডা শিরশিরানি ভাব। শিশির পড়ে ঘাস, গাছ-পালা সব ভিজে মনে হচ্ছে। সমস্ত রাত ভালো করে ঘুমোতে পারে নি রাজীব। শুধু শেষরাতে কখন এক চটকা ঘুম এসে থাকবে। খুনের কেস হাতে থাকলে শেষ দিকটায় এমনি অবস্থা হয় রাজীবের। আর মনের অবস্থাটা এমনি হলে অন্তরে রাজীবও খানিকটা আশ্বস্ত হয়। সে জানে এর পর আর দু-একদিন মাত্র অপেক্ষা। রহস্যের কঠিন আবরণ ভেদ করে অনু-সন্ধিৎসু মন হত্যাকারীকে খুঁজে পাবেই।

জামা-প্যান্ট পরে অফিসে এসে বসতেই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

এত সকালে টেলিফোন? রাজীবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সি আই ডি ইন্সপেক্টরের কাছে সাতসকালে টেলিফোন এলে চিন্তার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দুঃসংবাদ বলে জানা গেছে। কপালে অনেকগুলি রেখা পড়ল রাজীবের। কেউ খুন হল নাকি আবার? টেলিফোনে হাত দেবার আগে প্রতিধ্বনির মত কথাটা মানসিক ভূভাগে বহুক্ষণ অনুরণিত হল।

'হ্যালো', টেলিফোনে তখনই নিজের পরিচয় দিতে রাজীব চাইল না।

'মে আই স্পীক উইথ মিস্টার সান্যাল —সি আই ডি ইন্সপেক্টর?'

'ইয়েস, আই অ্যাম অন দি লাইন।' রাজীব এবার স্পষ্ট হল।

'কে, মিস্টার সান্যাল। আরে মশাই, কাল সন্ধ্যের পর থেকে আপনাকে দুবার ফোন করেছি। দুবারই আপনার পাত্তা নেই। আপনাদের পুলিশ লাইনের অপারেটর বলল যে, আপনি মথুরাপুরের বাইরে গিয়েছেন।'

'কিছু প্রয়োজন ছিল ম্যানেজারসাহেব?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল, 'কাল বিকেলের দিকে একবার বেরোতে হয়েছিল কাজে। ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল।'

টেলিফোনে হাল্কা একটুখানি হাসি ভেসে এল। সুদর্শন চক্রবর্তী বলল, 'আপনি দেখছি ভীষণ অ্যাকটিভ, ইন্সপেক্টর। বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খুনী আসামীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'রাত দশটায় আপনি টেলিফোন করে-ছিলেন নাকি?' রাজীব প্রশ্ন করল।

সুদর্শন যেন খোঁচা দিয়ে বলল, 'এর পরে টেলিফোন করলে রাতদুপুরে আপনার ঘুম ভাঙাতে হত। কিন্তু ব্যাপারটা অত জরুরী বলে আমার মনে হয় নি।'

ইচ্ছে করলে উষ্মা প্রকাশ করতে পারত রাজীব। কিন্তু তাতে ক্ষতি বৈ লাভ নেই। অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে। মিল ম্যানেজার কি বলতে চায় তা অবশ্য আঁচ করতে পেরেছে রাজীব। তবু অনেক সময় অজ্ঞতার ভান করতে হয়। ন্যাকা সাজা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

'কি ব্যাপার বলুন দিকি?' রাজীব খুব সহজ গলায় বলল।

'আমাদের টেলিফোন অপারেটর মিস সুজাতা দাস রেজিগনেশান দিয়েছেন। ওটা অ্যাকসেপ্ট করে নিলে মিস দাস সম্ভবত তখনই দিকনগর ছেড়ে চলে যাবেন।'

—টেলিফোনে উত্তর এল 'উনি কেন নোটিশ দেন নি?'

'ইচ্ছে করলে এক মাসের নোটিশ অবশ্য আমরা দাবী করতে পারি। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তা ঠিক চাওয়া হয় না। ইট ইজ নো ইউজ কিপিং অ্যান আনউইলিং ওয়ার্কার। ওতে কোম্পানীর বরং ক্ষতি হয়। অনিচ্ছুক লোকে কাজ করে না।'

'আপনি কি ঠিক করেছেন?'

'অন্য সময় হলে আমি মিস দাসের রেজিগনেশান অ্যাকসেপ্ট করে নিতাম। মানে, উইদাউট এনি হেজিটেশান। কিন্তু এখন সারকামস্টান্সেস ভিন্ন। আমার মনে হচ্ছে পুলিশের একটা গ্রীন সিগন্যাল নেওয়া দরকার।' টেলিফোনে সুদর্শন তার বক্তব্য জানাল।

হঠাৎ রাজীব বলল, 'মিস দাস রেজিগ-নেশান দিয়েছেন একথা আর কেউ জানে?'

'আর কারো জানবার কথা নয়। মিস দাসকে আমি ব্যাপারটা গোপনীয় রাখতে বলেছি,—টিল হার রেজিগনেশান ইজ অ্যাকসেপ্টেড।'

'পদত্যাগপত্রটা নিশ্চয়ই হাতে লেখা?'

'ঠিক ধরেছেন। টাইপ করতে গেলেই জানাজানি হবে। সম্ভবত সেজনাই মিস দাস ওটা হাতে লিখেছেন। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কি জানেন? উনি পদত্যাগপত্রটি মাতৃ-ভাষায় রচনা করেছেন—'

'ওতে কিছু মনে করবার নেই। হয়ত ইংরেজীতে তেমন দখল নেই মিস দাসের। সেজন্যই বাংলাতে চিঠি লিখেছেন। ভুল-চুক হবার সম্ভাবনা কম।'

কয়েক সেকেন্ড পরে রাজীব আবার বলল, 'কিন্তু পদত্যাগপত্রটা আমি কি এক-বার দেখতে পারি? অবশ্য ম্যানেজার-সাহেবের যদি আপত্তি না থাকে।'

টেলিফোনে মিল ম্যানেজার জানাল, 'রেজিগনেশান লেটারটা দেখান অবশ্য উচিত নয় তবে আপনি যখন বলছেন,—দেখে যেতে পারেন। খুব সাদামাটা চিঠি লিখেছেন মিস দাস। দিকনগরে তার শরীর মন ভেঙে পড়ছে। তাই চাকরী ছেড়ে দিতে চান।'

'আজ এগারোটা নাগাদ আপনার ওখানে আসছি তাহলে।'

'আজ?' সুদর্শন যেন নিষেধ করতে চাইল। 'আজ আমি এখনই কলকাতায় যাচ্ছি। ফিরতে রাত নটার বেশী হবে। আপনি বরং কাল আসুন।'

রাজীব বলল, 'আপনি আজই যাচ্ছেন?'

'কেন বলুন তো?' টেলিফোনে মিল ম্যানেজারের গলাটা একটু বিরক্ত শোনাল। 'কোম্পানীর কাজে আমায় যেতে হচ্ছে। খুব দরকার।'

এবার হেসে ফেলল রাজীব। বলল,—'আমারও খুব জরুরী প্রয়োজন ছিল মিস্টার চক্রবর্তী। যাই হোক আপনি ফিরে আসুন।'

টেলিফোনে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তারপর, আপনার তদন্তের কতদূর?'

রাজীব হেসে উত্তর দিল, 'ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। নতুন একটা ক্লু পেয়েছি। ঘটনার দিন রাত দশটার পর, একজন পাঞ্জাবী শিখকে সুবোধজির মোড়ের কাছে দেখা গেছে। লোকটাকে ঠিক ট্রেস করা যাচ্ছে না।'

'পাঞ্জাবী শিখ? ওরে বাবা।' কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আভাস।

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা ম্যানেজারসাহেব, আপনি তাহলে কলকাতা থেকে ফিরে আসুন। মোর হোয়েন উই মিট এগেন।' টেলিফোনটা ছেড়ে দিল রাজীব।

দরজা খুলে শচীদুলাল ঘরে ঢুকল। সাতসকালেই ওর স্নানটান সারা। চুলটুল পরিপাটি করে আঁচড়ান। কামাবার পর গালে একটু ক্রীম বা ঐ জাতীয় কিছু ঘষেছে বলে মুখটা একটু তেলতেলে মনে হচ্ছে।

রাজীব হেসে বলল, 'এসে গিয়েছ শচী। বস ঐ চেয়ারটায়।' একটা স্লিপ কাগজ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কি যেন সে লিখতে লাগল।

চেয়ারে বসে শচীদুলাল বলল, 'কোথায় পাঠাবেন যেন বলেছিলেন স্যার।'

'আলোকপুরে।' রাজীব মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'সন্ধ্যের সময় আমার সঙ্গে দেখা করো শচী। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

স্লিপ কাগজে লেখা শেষ হলে রাজীব বলল, 'তোমাকে আলোকপুরে গিয়ে কি করতে হবে তা এই কাগজে লিখে দিলাম শচী। বি ভেরী কেয়ারফুল, প্রত্যেকটি নির্দেশ ঠিকমত মেনে চলবে। নইলে পরে আমাদের ট্রাবলে পড়তে হতে পারে।'

'আমি তাহলে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ি স্যার?' শচী অনুমতি চাইল।

'বেশ তো,' রাজীব আপত্তি করল না।

শচীদুলাল চলে যেতেই রাজীব টেলিফোনটা নিল। অপারেটরকে বলল দিকনগর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে।

অন্য প্রান্তে টেলিফোন বাজবার শব্দ পাওয়া গেল।

রাজীব বলল, 'কে? সুব্রত?'

কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি সুব্রত রাজীবদা। কাল কখন চলে গেলেন আমি জানতেই পারলাম না।'

রাজীব বলল, 'তুমি বাড়ী গিয়েছ শুনে তোমাকে আর ডিস্টার্ব করলাম না।'

কণ্ঠস্বর আবার কানে এসে লাগল, 'বলুন রাজীবদা, কি করতে হবে?'

'তোমার কুটির মার কথা মনে আছে সুব্রত?'

'কুটির মা?'

'হ্যাঁ। ঐ যে মেয়েটি, প্রভা মুখার্জিদের মেসে রান্না করে। ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলা দরকার।'

'কোথায় বলবেন?'

'থানায় বসে। আমি যতদূর জানি বেলা দশটা নাগাদ রান্নাবান্না সেরে মেয়েটি ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। আর কোথাও কাজ করে কিনা জানি না। কিন্তু বেলা সাড়ে দশটার সময় ওকে আমি দিকনগর থানায় দেখতে চাই। তুমি সেইমত ব্যবস্থা করো।' রাজীব নির্দেশ দিল।

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল রাজীব। পৌনে আটটার মত। টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে এবার দিকনগরের পথে বেরিয়ে পড়া যেতে পারে। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীটা একবার দেখল রাজীব। আশ্বিনের উজ্জ্বল রোদ গাছ-পালায়, মাটির বুকে সতেজ, স্বতঃস্ফূর্ত। কাগজ কলম নিয়ে বসবার আগেই খুট করে শব্দ এল ওর কানে। রাজীব চোখ তুলে তাকিয়ে অবাক হল। শশাংক ভট্চায সামনে দাঁড়িয়ে।

'আসুন, আসুন শশাংকবাবু। বসুন।' রাজীব এক গাল হাসল।

শশাংক নমস্কার করে বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম স্যার। নিখিলেশ বলছিল আপনি নাকি কাল গিয়েছিলেন আমাদের ওখানে?'

'হ্যাঁ।' রাজীব স্বীকার করল, 'শুনলাম নিখিলেশবাবুকে আপনি জামিনে খালাস করে নিয়ে এসেছেন। তাই আলাপ পরিচয় করতে গিয়েছিলাম।'

'বেশ করেছেন স্যার। নিখিলেশের সঙ্গে আলাপ পরিচয় না হলে ওর সম্বন্ধে আপনার একটা ধারণা হবে না। ও বলছিল আপনি নাকি আলাদা মানুষ। খুব প্রশংসা করছিল স্যার।'

রাজীব বলল, 'আজ আপনার ডিউটি নেই শশাংকবাবু?'

'ছিল স্যার। সকালে ছটার সময়েই নামতে হত খাদে। কিন্তু ডিউটিতে যেতে আজ পা উঠল না।'

'কেন?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল।

'সেম খাদে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। দুটো লোক একেবারে শেষ। একটা বিলাসপুরী কুলি আর একজন [illegible]। ইলেকট্রিশিয়ান। লোকটা অল্প-বয়সী, মাস [illegible] হল [illegible] এসেছিল।' শশাংক [illegible]।

রাজীব বলল, 'কিন্তু খাদ তো বন্ধ নেই শশাংকবাবু।'

'তা নেই ঠিক। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট হলে সেদিন আমি আর খাদে নামি না স্যার। আমার খুব খারাপ লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, ডেড বডি পর্যন্ত আমি দেখতে যাইনি।'

রাজীব অনেকক্ষণ একদৃষ্টে শশাংকের দিকে চেয়ে রইল। সম্ভবত শশাংক অস্বস্তি বোধ করছিল। এবং কিছু বলবার জন্য উসখুস করছিল মনে মনে। ওর অবস্থা বুঝে রাজীব বলল, 'আচ্ছা শশাংকবাবু, একটা প্রশ্ন আপনাকে করব?'

'নিশ্চয় স্যার?'

'তরঙ্গের সঙ্গে আপনার কখন শেষ দেখা হয়েছিল?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে শশাংক উত্তর দিল, 'শনিবার দিন সকালে। সাড়ে দশটা নাগাদ।'

'কোথায় দেখা হয়েছিল?'

'দিকনগর বাজারে। সাবান না তেল কি যেন কিনতে এসেছিল তরঙ্গ।'

'আপনিও নিশ্চয় কিছু কিনতে এসেছিলেন দিকনগরে?'

'আজ্ঞে না। আমি এসেছিলাম বাসের লোকের হাতে মধুপুরে একটা চিঠি পাঠাব বলে।'

'কি কথা হয়েছিল তরঙ্গের সঙ্গে? আপনাকে অবাক করে দেবার মত কোন কথা বলেছিল তরঙ্গ?'

শশাংক বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করল। বলল, 'হ্যাঁ। ওর দুটো কথা আমার হেঁয়ালীর মত মনে হয়েছিল স্যার।'

'কি কথা বলুন তো?'

'তরুণ বলেছিল তার কাছে আমার একটা খাওয়া পাওনা আছে। রবিবার বিকেলে মধুরাপুরে ও আমাকে খাওয়াবে।'

'শুনে আপনি কি বললেন?'

'আমি অবাক হয়েছিলাম। ভাবলাম তরুণ কোন নতুন চাকরী-টাকরী পেয়েছে। নইলে খাওয়াবার প্রশ্ন উঠছে কেন? ওকে বলেছিলাম, দিকনগর ছেড়ে চললেন নাকি? তরুণ হেসে জবাব দিল, বলা যায় না কিছু। হয়ত দেখবেন, কাল রবিবারেই রওনা দিয়েছি।'

রাজীব টেবিলে পেন্সিল ঠুকে কি যেন চিন্তা করছিল। মুখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আর একটা কথা কি বলছিলেন না? সেটা আপনার হেঁয়ালীর মত মনে হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তরুণ আমাকে বলে গেল আর একটা কথা বলল। খাওয়াবারই সঙ্গে তার কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কি কথা বলুন তো?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল।

'তরুণ বলল, চাকরী ছেড়ে দিলে সে একটা গোপন খবর ফাঁস করে দেবে। তার কাছে নাকি দারুণ সব কাগজপত্তর আছে।'

'কি কাগজপত্তর আপনি জিজ্ঞেস করেন নি?'

শশাংক এক গাল হাসল। বলল, 'তরুণের এ কথাটায় আমি কোন মূল্য দিইনি। ওর কথা বলার এমনি একটা ভঙ্গি ছিল স্যার। খুব তারমা করে চোখ ঘুরিয়ে কথা বলত তরুণ। সব সময়েই অগাধ রহস্যের খবর রাখে এমনি একটা ভাব ছিল ওর।'

রাজীব নিজেও হাসল। বলল, 'নারী-জাতির বড় অপবাদ শশাংকবাবু। একটু কিছু পেটে গেলেই বড় আকুপাকু করে ওঠে। যতক্ষণ না সেটা বলতে পারছে, ততক্ষণ ওদের সোয়াস্তি নেই। এ সর্বনাশটি অবশ্য যুধিষ্ঠিরবাবু করে দিয়েছেন।'

'যুধিষ্ঠিরবাবু?' শশাংক আশ্চর্য হয়েছে মনে হল।

'মহাভারতের যুধিষ্ঠিরবাবুর কথা বলছি। আপনি জানেন না? ভদ্রলোক অভিশাপ দিয়েছিলেন,—নারীজাতির পেটে কথা থাকবে না। সেই থেকেই ভোগান্তি চলছে ওদের।'—বলে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাজীব বলল, 'আমাকে একবার দিকনগরে যেতে হচ্ছে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেল। আপনি ইচ্ছে করলে যেতে পারেন আমার সঙ্গে। যাবেন নাকি?'

শশাংক ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। 'আমার আর একটু কাজ আছে রাজীববাবু। দিকনগরে আপনি একাই যান।'

রাজীব কৌতূহলদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। 'আজ কি কাজ আছে'

'মানে, আজ তো শনিবার।' শশাংক কেমন মিইয়ে গেল।

'গত শনিবার এই সকাল বেলাতেই তরুণের সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল না?'

প্রায় আমতা আমতা করে শশাংক জবাব দিল, 'হ্যাঁ স্যার। আমি স্বপ্নেও পারিনি ওর সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না।'

রাস্তায় নেমে রাজীব জীপে উঠে বসল। নির্দেশ পাওয়া মাত্র নেপালী ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

মধুরাপুর থেকে দিকনগরের পথটা বেশ সুন্দর। দুপাশে আদিগন্ত মাঠ। কোথাও ধানের ক্ষেত, সবুজ হিল্লোলে ধানের চারা। কোথাও পড়ো অকর্ষিত জমি। বর্ষার জল হাওয়ায় গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাপ, আগাছার জঙ্গল। মাথার উপর রৌদ্রস্নাত শরতের সুনীল আকাশ।

সাড়ে দশটার অনেক আগেই জীপ এসে থানার কাছে থামল।

সুব্রতের ঘরের দরজার কাছেই বছর চব্বিশ বয়সের একটি মেয়ে জড়সড় হয়ে বসে। মেয়েটি কে, এক নজরে তাকিয়েই আন্দাজ করল রাজীব। কথার উত্তর দেবে কি? ভয়ে ও এরই মধ্যে আধমরা হয়ে গেছে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সুব্রত বলল, 'আসুন রাজীবদা। মেয়েটাকে আমি থানায় বসিয়ে রেখেছি।'

'তাতো দেখলাম,' রাজীব চেয়ারে বসে বলল, 'কিন্তু তুমি ওকে ধমকেছ নাকি?'

'ধমকাব কেন?' সুব্রত অবাক হয়ে বলল।

'ওর মুখ চোখ খুব শুকনো দেখলাম। ভয় পেয়েছে বলে মনে হল।' রাজীব সহানুভূতি প্রকাশ করবার চেষ্টা করল।

উত্তর না দিয়ে সুব্রত অল্প একটু হাসল।

ডেকে পাঠাতেই একজন সিপাই এসে ঘরের মধ্যে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল। রাজীবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুব্রত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটির দিকে এক পলক তাকাল রাজীব। আধময়লা শাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ। হাতে দুগাছি চুড়ি ছাড়াও শাঁখা আর নোয়া—এয়োস্ত্রীর পরিচয়। বয়স চব্বিশ কিংবা দু-চার বৎসর বেশীও হতে পারে, অভাব অনটনে দৃষ্টি ভাবলেশহীন, নিরানন্দ।

খুব সহজ সুরবার ভঙ্গিতে রাজীব বলল, 'তুমি বাছা, শুভ্রা দিদিমণিদের ওখানে তো তুমিই রান্নাবান্না কর?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ কাজটা সেই করে।

'তোমার কাছে দু-একটা খবর জানার দরকার ছিল। মনে করে একটু বলবে কি?'

এবার সাহস পেয়ে মেয়েটি মুখ তুলল। 'বলুন, কি জানতে চাইছেন আমার কাছে?'

'তেমন কিছু নয়। ছোট ছোট দু' একটা প্রশ্ন। তুমি নির্ভয়ে উত্তর দাও দিকি।' রাজীব ওকে অভয় দিয়ে ফের বলল, শনিবার দিন বিকেলের কথা তোমার মনে আছে?'

'আছে বাবু। আপনি জিজ্ঞাসা করুন।'

'তুমি সন্ধ্যার দিকে কখন কাজে গিয়েছিলে?'

'বেলা পাঁচটার পর। তখনও সন্ধ্যা হয় নি।'

'তরুণা দিদিমণি তখন ঘরে ছিলেন?'

'উনিই তো ছিলেন। শুভ্রা দিদিমণি মধুরাপুরে গিয়েছিলেন। আর দুজনের তো কি শনিবারে বাড়ী যাওয়া আছে?'

'কি করছিলেন তরুণা দিদিমণি?'

'আর একজন বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন ঘরে বসে।'

'তুমি চেন বাবুকে?'

'ওমা! চিনি না আবার? উনি তো নিত্যেই আসা যাওয়া করেন। বিশ্বনাথবাবু নাম।'

'বাবু কখন গেলেন?'

'আধ ঘণ্টা পরে। আমি চা করে দিলাম, দুজনে খেলেন বসে।'

'এর পর আর কেউ এসেছিলেন?'

'এসেছিলেন বৈকি। আমাদের ভৈরববাবু এলেন আর খানিক পরেই। ভীষণ গম্ভীর মুখ। দিদিমণির খোঁজ করলেন আমার কাছে।'

'তোমার দিদিমণি তখন কোথায়?'

'বাথরুমে গিয়েছিলেন গা ধুতে। আমি ভৈরববাবুকে বসতে বললাম। উনি দিদিমণির ঘরে বসে টেবিলের কাগজপত্তর দেখছিলেন।'

'তারপর?'

'দিদিমণি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ওনার সঙ্গে কথা বলছিলেন।'

'কি কথা বলছিলেন জানো?'

'না বাবু। মনে হল আপিসের কোন কাজকর্মের কথা বলছেন দুজনে। বোধহয় কিছু শলাপরামর্শ করছিলেন।'

'হুঁ।' রাজীব গম্ভীরমুখে বলল, 'তারপর?' উনি কখন গেলেন?'

—'খানিক পরেই। দিদিমণিও ওনার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হতে দেরী নেই বাবু।'

'তরুণা দিদিমণি ফিরলেন কখন?'

'ঘণ্টাখানেক পরে। আমার তখন রান্নাবান্না সারা হয়েছে।'

'দিদিমণি কিছু বললেন তোমাকে?'

'হ্যাঁ বাবু।' মেয়েটি ঢোক গিলে বলল, 'বলেছিলেন সকালে আসিস। তোর মেয়েকে একটা শাড়ী দেবো।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি বললুম, হঠাৎ শাড়ী কেন গো দিদিমণি? কোনো সুখবর আছে নাকি? তা দিদিমণি হেসে বললেন,— কাল সকালে শুনিস।' মেয়েটি হঠাৎ চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'সকালে যা শুনলাম গো বাবু, তার চেয়ে খারাপ খবর কোনোকালে শুনিনি।'

রাজীব ধমক দিয়ে বলল, 'কাঁদছ কেন? আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।'

সওয়া এগারোটা নাগাদ রাজীব এসে পৌঁছল দিল্লী অফিসে। ম্যানেজারসাহেবের কামরা খালি। দরজাটা হাট করে খোলা। উর্দিপরা বেয়ারাটার কোন পাত্তা নেই। পাশের ঘরে বসে প্রভা নিজের মনে কাজ করছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজীব বলল, 'আসতে পারি?'

'আসুন, আসুন!' প্রভা সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

'আপনাকে বলেছিলাম না? আর একদিন আপনার কাছে আসতে হবে।'

'হ্যাঁ,' প্রভা ঠিক করে হাসল, 'আপনার দেখছি সব মনে আছে।'

'তা থাকে একটু।' রাজীব হাসিমুখে বলল।

'ম্যানেজারসাহেব কিন্তু অফিসে নেই। আজ আসবেন না।'

'[illegible] [illegible] [illegible] নেই। আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

'কি সৌভাগ্য আমার।' প্রভা চোখ দুটি বড় বড় করে বলল। 'বলুন, আপনার কি কাজে আসতে পারি?'

'সেটা পরে বলছি। তার আগে একটা কথা বলি আপনাকে। আজ শনিবার, আপনার কিন্তু বাড়ী যাওয়া চলবে না।'

'সে কি? আমার যে সব ঠিকঠাক!'

'প্ল্যান চেঞ্জ করে দিন।' রাজীব হেসে বলল। একটু পরেই মুখখানা গম্ভীর দেখাল তার। খুব চাপাগলায় রাজীব উচ্চারণ করল, 'আজ-কালের মধ্যেই খুনীকে আমি ধরতে পারব আশা করছি। কিন্তু আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন হবে।'

'আমার সাহায্য?' প্রভা চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল।

'কোনো ভয় নেই আপনার।' রাজীব ওকে আশ্বস্ত করল। 'আচ্ছা, মঙ্গলবারদিন দিল্লী কে এসেছিলেন কলকাতা থেকে?'

'কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। কেন বলুন তো?'

'কি প্রয়োজনে বলতে পারবেন?'

'মানে, আমি ঠিক জানি না—।'

'জানেন, কিন্তু বলতে চাইছেন না।' রাজীব মন্তব্য করল।

'কি মুস্কিলে ফেললেন বলুন তো? এসব কোম্পানীর হাঁড়ির খবর। আমিও ঠিক জানিনে। শুধু—।'

'শুধু কি?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল।

'মনে হয় কোনো কারচুপি বা গণ্ডগোলের খবর পেয়ে উনি এসেছিলেন। আবার হয়ত আসতে পারেন।' একটু থেমে প্রভা বলল, 'দেখবেন, কাউকে আবার বলে বসবেন না যেন। ম্যানেজারসাহেব জানলে চাকরীটা যাবে।'

রাজীব হাসল, 'আচ্ছা প্রভাদেবী, তরঙ্গের সঙ্গে আপনার শেষ কখন কথাবার্তা হয়েছিল?'

'শনিবার দিন। অফিস থেকে ফিরে দেখি তরঙ্গ আমার ঘরে বসে রয়েছে।'

'তেমন কোনো কথা বলেছিল তরঙ্গ? আপনাদের অফিস নিয়ে?'

প্রভা মিনিটখানেক চিন্তা করল আপনমনে। বলল, 'হ্যাঁ, একটা কথা তরঙ্গ বলেছিল আমায়।'

'কি কথা?'

'অফিসের কি সব খবর নাকি ও জানতে পেরেছে। যা বেরিয়ে পড়লে অনেক ঘুঘু নাকি জব্দ হয়ে যাবে।'

'শুনে আপনি কি বললেন?'

'কি বলব আবার? ও অমনি মেয়ে—হয়ত ম্যানেজারসাহেবের কাছে কি একটু শুনেছে। তাই নিয়ে দপদপিয়ে মরছে।'

রাজীব বলল, 'আমি এখন উঠছি। কাল সকালে আপনি একবার থানায় আসুন।'

'থানায়?' আতংকগ্রস্ত লোকের মত প্রভা বলল।

'কোনো ভয় নেই। ঠিক [illegible] [illegible]। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। কিন্তু—।'

জিকনগর বাজারের কাছে সুজাতা দাসের সঙ্গে দেখা। নির্দেশমত নেপালী ড্রাইভার ঠিক ওর পাশেই গাড়ী থামাল। গলা বাড়িয়ে রাজীব বলল, 'এই ভরদুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন?'

সুজাতা দাস উত্তর দিল, 'দড়ি কিনতে!'

'দড়ি?'

'মানে, এই বাঁধাছাঁদা করার জন্য।' সুজাতা দাস অদ্ভুত হাসল।

রাজীব বলল, 'কাল রাতে আপনাকে একটা খবর দেব ভেবেছিলাম।'

'খবর দেবেন কি, আপনিই তো খবর চাইলেন।' সুজাতা মন্তব্য করল।

'আগের বুধবার তরঙ্গ একটি কাণ্ড করে গিয়েছে শুনেছেন?'

খুব অবাক হয়ে সুজাতা বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'তরঙ্গের শেষ কীর্তিটি আপনি শোনেন নি?' রাজীব পুনরায় বলল।

'কি কীর্তি আবার?'

'বুধবার দিন তরঙ্গ নিখিলেশকে বিয়ে করেছিল। কলকাতায় ওদের দুজনের রেজেস্ট্রী করে বিয়ে হয়।'

ভীষণ বোকা বোকা আর ভাবলেশহীন মনে হচ্ছিল সুজাতাকে।

রাজীব ওর দিকে চেয়ে হাসল। বেচারী সুজাতা,— এরকম মুখ অনেকদিন আগে ও একবার আয়নায় হয়ত দেখে থাকবে।

* * *

সন্ধ্যের অনেক আগেই শচীদুলাল এসে হাজির। রাজীব সুব্রতর সঙ্গে কেসের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিল। শচীদুলাল এসে সশব্দে ফেটে পড়ল, 'পেয়েছি স্যার।'

'কি পেয়েছ শচী?' রাজীব সহাস্যে তাকাল।

'[illegible] ফুলপ্যান্ট আর [illegible] সার্ট। ব্যাটা [illegible] আমায় খুব ভুগিয়েছে। [illegible] ম্যানেজারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এনেছি।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফুলপ্যান্টটা পর্যবেক্ষণ করল রাজীব। কোমরের কাছে একটা [illegible] [illegible] [illegible] খুলে খুঁজতে পাওয়া [illegible] [illegible] মিলিয়ে দেখল রাজীব। [illegible] [illegible] জিনিস। রাজীব অল্প একটু হাসল।

শচীদুলাল একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'এই দাগটা দেখেছেন স্যার?'

হাল্কা বাদামী রঙের গোলাকার খানিকটা দাগ। রাজীব বলল, 'রক্তের দাগ বলে মনে হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' সাদা জামাটা উল্টে-পাল্টে দেখে কি একটা বস্তু টেনে আনল রাজীব। কলারের কাছ থেকে,—খুব লম্বা একটা চুল। বেশ দীর্ঘ।

সুব্রত বলল, 'নিশ্চয় মেয়েছেলের চুল রাজীবদা। ব্যাটা ম্যানেজারটা দেখছি শয়তান। তরঙ্গকে ওই খুন করেছে। আজ রাতেই ওকে অ্যারেস্ট করব রাজীবদা?'

রাজীব রহস্য করে হাসল। বলল, 'ধীরে সুব্রত। ধীরে অগ্রসর হও। রজনী এখনও বাকী।—'

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

অঙ্গনা

রূপচর্চায় নতুন সহায়

দরজার কাছে এসেও অনেকে সরে যায়। হাজারো সংকোচ এসে তাদের পথরোধ করে। কিন্তু মন মানে না। তাই দুই-চার পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। ততক্ষণে ভেতরে ভেতরে সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। গুটি-গুটি ফিরে আসে। দরজার সামনে স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো বিজ্ঞাপন মনোযোগ দিয়ে পড়ে। 'নিজেকে আকর্ষণীয় করুন, আপনার উপস্থিতিকে মনোরম করুন'—এই আমন্ত্রণের পর কেউ আর নিজেকে সামলাতে পারে না। লোভ লোভ ভাবটা তখন পাকা করে বিজয়ীর হাসি হাসছে। দরজা ঠেলে সটান ঢুকে পড়ে। চেয়ারে বসে মুখের কোণে হাসির রেখা আরেকটু প্রসারিত করে। তারপর বলে, দেখুন তো কিছু করা সম্ভব কিনা।

'সেইজন্যই তো আমার সাগ্রহ প্রতীক্ষা', মিষ্টি হাসেন সুসান ক্যাটল। এক নজর আগমনকারীর মুখের দিকে তাকান। মুখই তো মনের দর্পণ। সেখানে লেখা আছে সব-কিছু। যাঁরা পড়তে জানেন তাঁরা সেখান থেকেই সবকিছু অনুমান করে নেন। সুসানও তেমনি মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন, ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তির তাড়নায় এখানে এসেছেন। কথা-বার্তার সংকোচ তখনও পুরোপুরি কাটে নি। কিন্তু এভাব স্থায়ী হয় না। একটু পরেই দুজনের মধ্যেই গড়ে ওঠে প্রচণ্ড হৃদ্যতা। আগন্তুক তখন নিজের কথা গড়গড় করে বলে যায়। সুসান তাঁর বিউটি পার্লার খুলেছেন মুরেসগেটে। কিন্তু এর আগেও তাঁর জীবনে আর একটি অধ্যায় ঘটে গেছে। [illegible] তিনি [illegible] বিউটি পার্লারের [illegible]। [illegible] অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তিনি বলেছেন, [illegible] আমি তখন [illegible] [illegible]

আমি ধরে নিয়েছিলাম এতে করে লাভ খুব একটা হবে না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি এর সাফল্য দেখে। এই সাফল্যে আমার আনন্দিত হওয়ার এবং গর্ব অনুভব করার যথেষ্ট কারণ আছে। এমন অনেক মহিলাকে আমি সাহায্য করেছি যাঁরা এ-সম্বন্ধে কোনদিন কিছুই ভাবেন নি। বলতে গেলে আমি তাঁদের পরীক্ষায় পাশ মার্ক পাইয়ে দিয়েছি, হয়ত বা কিছু বেশিও।

সুসান সবকিছু বলায় একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করেন। মাঝে মাঝে তিনি কিছুটা বিমর্ষও হন। নানারকম কাজ তাঁকে করতে হয়। সবসময় যে সাধারণ ঘর থেকেই মেয়েরা আসেন তা নয়। তাই তাঁকে পড়ে থাকতে হয় ম্যানিকিনদের নিয়ে। হরেক পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপনের পাতা উজ্জ্বল করে থাকা এইসব ম্যানিকিনদের রূপ পরি-চর্যায় সুসান অনেকখানি সাহায্য করেন। পণ্যের বিজ্ঞাপন সুন্দরীর মুখে তাই অত সুন্দর মানায়। কিন্তু এ-কাজে তিনি খুব একটা খুশি নন। যদিও পেশার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ম্যানিকিনদের রূপচর্চায় তাঁকে মন দিতেই হয় তবুও গেরস্থঘরের বউ-ঝিরা এলেই কাজ করে এবং কথা বলে তিনি আরাম পান বেশি—এ সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যাঁরা সৌন্দর্য চর্চা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন অথবা নিজেদের সাজিয়ে-গুছিয়ে [illegible] শ্রী করে তোলার ব্যাপারে যাঁদের তেমন [illegible] সেই তাঁদের সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিকার আনন্দিত হই। কারণ এঁরা ত সৌন্দর্য বাড়াতে আসেন নি, এঁরা চান নিজের উপস্থিতিকে আর একটু মনোরম করতে। এঁদের এই আকাঙ্ক্ষাটুকু পূরণ করতে পারলেই এঁরা খুশি। তাই এঁদের সঙ্গে কাজ করেও সুখ।

[illegible] এক

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর আশা ছিল যে, অপেক্ষাকৃত তরুণীরাই এ-ব্যাপারে আগ্রহী হবে। কারণ সৌন্দর্যচর্চার প্রায় তাদেরই একচেটে। কিন্তু মানুষের ভাবনার সঙ্গে বাস্তব সবসময় তাল মিলিয়ে চলে না। সেখানে তাই ছন্দপতন হয়। লক্ষ্য করলেন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মহিলারাই তাঁর কাছে আসছেন বেশী। তরুণীদের সংখ্যা সে তুলনায় কমই বলতে হবে। সুসানের চিন্তাধারায় কিছুটা ত্রুটি ছিল। যৌবনকে ধরে রাখার আগ্রহ চির-কালেরই এবং সকলেরই। এই আগ্রহবশেই সেই ভদ্রমহিলারা এসে জড় হতেন সুসানের কাছে। তরুণীরা তখন সতেজ। তাই সুসানের বিউটি পার্লারে যাবার তাগিদ তাঁদের স্বভাবতই কম। গায়ের চামড়া না কোঁচকানো পর্যন্ত তাঁরা এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহী হবেন না।

তবু বৃদ্ধাদের টান-যৌবনে রূপের তুলি বোলাতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন না বরং আর একদিক থেকে তিনি এর সদুত্তর খোঁজেন। বয়সে ভাটার টান সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনেকখানি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই যাঁরা এখানে এসে নিজেদের রূপকে আর একটু ধরে রাখতে চান সুসান মনে মনে তাঁদের সাধুবাদ জানান। এঁদের সত্যি খেলোয়াড়োচিত মনোভাব আছে, সুসান ভাবেন। বয়সের দিক থেকে বিচার করে কি রকম মহিলারা তাঁর কাছে আসে সে সম্বন্ধে সুসান বলেছেন, আশি বছরের সেই ভদ্রমহিলাই হচ্ছে আমার বিউটি পার্লারের সর্বাপেক্ষা প্রবীণ আগন্তুক। বয়স সত্ত্বেও ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল এবং ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত অমায়িক। তিনি এসেছিলেন মাথার চুল নিয়ে বিব্রত হওয়ার দরুন। মাথার চুল পড়ে পড়ে তাঁর সমস্ত [illegible] করে দিয়েছে। [illegible] দিয়ে সত্যি এ একটা [illegible] ব্যাপার।

আমি ধৈর্যসহকারে ভদ্রমহিলার সব কথা শুনলাম। তারপর তাঁকে নিয়মিত মাথায় টুপি ব্যবহারের পরামর্শ দিলাম। শুধু তাই নয় [illegible] টুপিটা [illegible] থেকে [illegible] শুধু মাথার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বললে [illegible] অনেকটা [illegible]

[illegible] নির্দিষ্ট [illegible] নির্ধারিত [illegible] করেছেন। [illegible] নিয়মের [illegible] আছে। কোন কোন সময় আলাপ-আলোচনা [illegible] দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুসানের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কসমেটিক নিয়ে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করায় সুবিধা হচ্ছে আস্তে আস্তে সব কথাই বেরিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে নিয়ে প্রথমেই কথা বললে সব কথা চেপে দিয়ে এটার উপরই জোর দেন বেশী। তাই প্রসঙ্গের প্রথমেই কসমেটিক। তারপর আলোচনা চলে পরিচয়ও বাড়ে। ক্রমে ক্রমে কেশসজ্জা, কাপড়-চোপড় এবং সর্বশেষে কেন্দ্র দুটো সন্তান প্রতিপালনে উভয়ের মনোভাবের আদান-প্রদান চলে। বিশেষ করে এ সম্বন্ধেও সুসানের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিস্তৃতই বলতে হবে। তিনি যে শুধু দুটি সন্তানের জননী তাই নয়, তাঁর কন্যাসন্তান দুটি বেশ ডাগর-ডোগরও। এ সম্বন্ধে কথা বলতে যেন তাঁর কোন ক্লান্তিও নেই। বলতে বলতে এক সময় দেখেন যে, তাঁর সব কথাই বলা হয়ে গেছে, এমন কি তাঁর বয়স পর্যন্ত। বয়স নিয়ে লুকোছাপা তিনি একদম পছন্দ করেন না। কারণ বয়সের বিরুদ্ধেই তো তাঁর সংগ্রাম। যদিও সুসানকে বয়সের তুলনায় রীতিমত তরুণী মনে হয়।

সৌন্দর্য চর্চায় মেয়েদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি কোথায়? এর উত্তরে সুসান জানিয়েছেন, যে কোন মূল্যে যৌবনকে ধরে রাখার চেষ্টাই হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে মেয়েদের সবচেয়ে বড় মূর্খামি। সুসান নিজের অভিজ্ঞতায় এরকম প্রচুর মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু চতুর এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞা মহিলারা এ-পর্বটি সযত্নে পরিহার করে চলেন। সব দায়িত্বটুকু তাঁরা নিজের হাতে তুলে নিতে চান না। অনেকখানি নিয়মের উপর ছেড়ে দেন। এজন্য তাঁদের খুব একটা বেশী [illegible] করতে হয় না। সাদাসিধে [illegible] বা [illegible] সে জন্য একমাত্র দায়ী তা নয়, [illegible] সঙ্গে একটু বুদ্ধি খরচ করাটাই হচ্ছে আসল কথা। [illegible] ক্ষেত্রে যে কথা সত্যি সাজ-পোষাকের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সব সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে, অলংকার [illegible] [illegible] সবচেয়ে বড় [illegible]। তাই [illegible] [illegible]

তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসি সুব্রহ্মণিয়মের কন্যা শ্রীমতী অরুণা এম, এ গত ২৫শে নভেম্বর ডঃ এল, এম রামকৃষ্ণ এম বি বি এস ডি এল ও’র সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

দৈহিক পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে দেহশ্রীকে সেইভাবে প্রকাশ করাই আসল কথা।

সুসান আবার নিজের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে বসলেন: বিশেষ করে প্রদর্শনী এবং মেলাগুলো ঘুরে আমি দেখেছি, অধিকাংশ মেয়েরাই নিজেদের উপস্থিতি নিয়েই বেশী অভিযোগ জানিয়েছেন। এ জন্য কেউ কেউ ক্ষোভে ফেটেও পড়েছেন। তখন আমার মনে হয়েছে যে এদের কাউকে কাউকে এ দুঃসহ অবস্থা ও উপলব্ধি থেকে সহজেই মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। তবে গেরস্থঘরের বৌদের নিয়েই সমস্যা। কারণ এমনি তাঁদের উপর সংসারের চাপ খুব বেশী, তার উপর আছে ছেলেমেয়ে, তাই নজর রাখা সত্ত্বেও এই চাপের ফাঁক দিয়ে দেহ-সৌন্দর্য এক সময় শেকলছেঁড়া পাখির মত হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। সমস্যা তাই এঁদের নিয়ে সবচেয়ে বেশী।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই সমস্ত ভদ্রমহিলারা সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট নারীসুলভ মাধুর্যের অধিকারী হতে পারেন নি। অনেক সময় অন্তরের পরিমার্জনায় অনাক্রান্ত দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।

কিন্তু এঁদের অন্তর-বাহির দুই-ই সমান। তবু এঁদের পরামর্শ দিতে আমি ব্যবসায়িক সূত্রে বাধ্য। এঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য সহৃদয়তা ততটা থাকে না। এঁদের সঙ্গে বসে প্রথমেই গল্প শুরু করি। যাতে করে একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে। হয়ও তাই। অচিরেই এঁদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মনে মনে একটা স্পষ্ট ছবি গড়ে ওঠে। এরকমই একটা ঘটনা ঘটে গেল দিন কয়েক আগে। মোটামুটি বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা প্রবেশ করলেন আমার বিউটি পার্লারে। চেয়ারে বসতেই তাঁর ভুরুর দিকে নজর পড়তেই আমার ভুরু গেল কুঁচকে। ভুরু নয় যেন একটা মোটাসোটা বুনো ঝোপ। হাতটা নিস-পিস করে উঠল। হাতের কাছে সেই কম্বটা খাপিয়ে পরিপাটি ভুরুর কৃতকর্মগুলি [illegible] উপরে [illegible] হল। কোনক্রমে ইচ্ছাটাকে চেপে রেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলাম। দু-এক কথায় পরই জানতে পারলাম যে, এই ভুরু হচ্ছে ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্বের অন্যতম সহায়। তাঁর ভুরুর সঙ্গে ভদ্রমহিলার সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং ভুরুকে অবিকৃত রেখে তাঁর সম্বন্ধে অন্য দিক থেকে ব্যবস্থা নিতে হল।

—প্রমীলা

বাই নিয়ে কথা

বিমল বসু

বাই কাকে বলে? প্রশ্নের (স্বর্গত) রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য় এর অর্থ সুপরিস্ফুট করেছেন। 'বাই' মানে—'বায়ু-রোগ', 'বায়ু', 'ছিট'। ছিট কাপড়ের নানান রঙের মতো এই 'বাই'য়ের আছে নানান শ্রেণীবিভাগ। ইংরেজিতে 'বাই' বলতে বোঝায়—'ম্যানিয়া', 'ম্যাডনেস', 'অবসেসন'। মোহাচ্ছন্নতা। পাগলামি। বিকৃত খণ্ডিত দৃষ্টিপাত। সাধারণভাবে 'বাই' বলতে আমরা বুঝি : বিশেষ একদিকে উৎকট রকমের ঝোঁক—ভারসাম্যহীনতা, অগ্রপশ্চাৎ বিচারহীন বিকৃত মনোভাব—এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংপৃক্ত।

'বাই'য়ের শিকার বড় একটা আমরা কেউ হতে না চাইলেও জীবনে অন্ততঃ সাময়িকভাবে এই 'ছিট'-এর হাতে হাত রাখেন নি—এমন মানুষ 'কোটিতে গোটিক'। 'কবিতা লেখার বাই' প্রথম যৌবনে—মানে 'সাহিত্য-বাই' আর কলেজ-জীবনে 'প্রেম-বাই' একবারও কি আপনাকে স্পর্শ করে নি সাময়িকভাবে? এই ধরনের 'ফল্-বসন্ত' কি জীবনে একবারও আসে নি আপনার?

নিশ্চয়ই এসেছে। আর এগুলোই তো সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের সার্থক লক্ষণ। অলক্ষণ হয়ে ওঠে যখন আমরা এই 'বাই'য়ের মাত্রার ভারসাম্য হারিয়ে কেউ উৎকটভাবে বিশেষ ধরনের মানসিক বিকারে মোহগ্রস্ত হই।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার পবিত্রতা আর স্বর্গের দ্যুতি চলকে ওঠে। কিন্তু 'পরি-স্কার-পরিস্কার'-বাই (শুচিবাই-ছুঁচিবাই)? মুকুলেজ-শিমির ছায়াটা দেখেছেন এই 'শুচিবাই'য়ের উৎকট রকমের অনুরাগে? আগে যাঁর দিকে একবার তাকালে আর নজর ফেরানো যেত না—আজকাল তিনি বীভৎস বিভীষিকা।

আবার দেখুন 'বই-বাই' কিন্তু শুচি-বাইয়ের মতোই ছোঁয়াচে। 'বই-বাই'গ্রস্ত জীবন-উদাসীন এক সাহিত্যপ্রেমী ভয়ানক-ভাবে এই রোগে ভুগছেন। পুরোনো বই কেনা এঁর রোগ। পুরনো বইয়ের একবার সন্ধান পেলে আর তাঁকে ঠেকানো যায় না। ঘড়ি-আংটি-সোনার বোতাম তো তুচ্ছ—অস্থাবর সব গেছে, স্থাবরও কিছু যেতে বসেছে এই পুরাতনীর অপ্রতিরোধ্য প্রেমে। হাজার দশেকের ওপর এই পুরনো বইয়ে ইতিমধ্যে চারটি ঘর ভরতি হয়ে গেছে। এমনকি শোবার ঘরের দুই-তৃতীয়াংশ এই পুরাতনের পাঁজায় কবলিত। এই শীর্ণ-জীর্ণ-বিবর্ণ বইয়ের ওপর ভদ্রলোকের অপরিসীম মমতা আর যত্ন। 'বই-বই-বাই' মারাত্মক রকমের তীব্র বলেই বোধহয় তাঁর আর 'বউ' বাছা হয়নি। বউয়ের চেয়ে বইয়ের আদর আর আকর্ষণ তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি।

দাদার পরিবাদে প্রখর হয়েও কিন্তু এঁর কনিষ্ঠা ভগিনী বাংলাভাষাসাহিত্যের প্রখ্যাতা অধ্যাপিকা এই 'বই-বই-ব্যাধি'তে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছেন সম্প্রতি। হবেন না বা কেন? 'বাই'টা ছোঁয়াচে রোগ যে।

পণ্ডিতমহলে ও সাহিত্যসমাজে এই 'বই-ব্যাধি'গ্রস্তদের তবু একটা সুনাম-সম্মান আছে। বিদগ্ধসমাজে আছে এঁদের রীতিমতো সমাদর। জীবনের অন্যদিকে মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ হলেও 'বই-বই-বাই'গ্রস্তরা কিন্তু বই-সংগ্রহের দিক দিয়ে 'সুনীতি সংরক্ষণ সভা'র একনিষ্ঠ সভ্য নন। প্রেম এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় সেই মহাজন উক্তি : 'দেয়ার ইজ নাথিং আন-ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার'—তাঁরা প্রাত্যহিক জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছেন। এবং প্রয়োজনমতো এ জন্যে তাঁরা 'দেখ, বরো, অর স্টীল' আয়ুধপ্রয়োগে যাকে বলে একেবারে 'সব্যসাচী'। সাহিত্যাকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর এক অবিসংবাদিত প্রখ্যাত সমালোচক—কবি স্বয়ং কবুল করে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীর খতিয়ানে : 'এ কাজের সুবিধার জন্য আমি সদাসর্বদা আলোয়ান ব্যবহার করিতাম।' পরলোকে পা বাড়াবার আগে ইনিই তাঁর বিরাট লাইব্রেরীর অর্ধাংশ পশ্চিম বাংলার কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় আধ লাখ টাকায় বিক্রি করে 'লাভ' কিনিয়ে ছিলেন সে-কথা তো অনেকেরই জানা। এই থেকে একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, 'বউ'য়ের চেয়ে 'বই'-বাই আর্থিক সাফল্য সহজেই আনতে পারে। আর সেজন্যেই কি আট মাসে জাতীয়-পাঠাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরী) থেকে বারো হাজার প্রায় দুষ্প্রাপ্য বই হাওয়ার হাওদায় চড়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে? (১৯৬৭ মধ্য-ডিসেম্বরে সংবাদপত্রে এ খতিয়ান স্মর্তব্য)।

কিন্তু 'বউ-বাই' আছে যার তার ইহ-কাল-পরকাল সব একেবারে ঝরঝরে। বড় কুৎসিত আর মারাত্মক রকমের প্রাণহন্তী ব্যাধি এটি। কেন? আপনার প্রাণের দোসর 'ক'বাবুর ব্যাপারটা মনে মনে একবার অনু-ধাবন করে দেখুন না। এমন দিলখোলা আড্ডাবাজ মানুষটার সুন্দরী তন্বী বউ পেয়েই তো পদস্খলন ঘটলো। একেবারে বদলে গেলেন। আড্ডা ছাড়লেন। বন্ধুরা কেউ বাড়িতে এলে বিরক্ত হতে লাগলেন। সদানন্দ মানুষটি একেবারেই যেন নিপাত্তা। সব সময়েই বিরক্ত, খিটখিটে, ক্ষিপ্রমেজাজ। ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। বেচারা 'ক'বাবু অফিসে স্বস্তিতে কাজ করতে পারেন না। 'ফ্রেঞ্চ লিভ' নিয়ে অসময়েই বাড়িতে এসে হাজির হন। অফিস যাবার সময় সদর এবং অন্দর দুই-ই একেবারে দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে চাবিকাটি নিজের ফতুয়ার 'ফোকা-পকেটে' অতি সন্তর্পণে এবং সাবধানে রাখেন। ঘরের জানালায় বউয়ের দাঁড়াবার হুকুম নেই। তরুণী বউয়ের হাসিমুখ দেখলে 'ক'বাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে অশুভ আশঙ্কায়—বুঝি কারো সঙ্গে গোপনে খুব জমিয়েছে। বউয়ের মুখভার দেখলে কার জন্যে মন খারাপ?—জেরায়-জেরায় বেচারীকে একেবারে জেরবার করে ছাড়েন। জেরা করবার কায়দাটিতে কিন্তু 'ক'বাবু লালবাজারের 'ডি-ডি'র বড়কর্তার চেয়েও কেরামতি দেখাতে পারেন। কখনো করুণা-ঘন দৃষ্টিতে প্রেমে-স্নেহে-করুণার টলমল করেন, কখনো ভয়ালভয়ঙ্কর ভৈরব হয়ে

সুখিতামা ডাক্তারবাবুকে অনেক প্রচেষ্টার ফলে ফ্লুরেন্স ওঠেন। জননী জননী বউ নাকের জলে চোখের জলে ভাসতে থাকেন।

ক'বাবুর এই থড়গপাণি সদাসশঙ্ক অথচ আর্ত চেহারা দেখলে আমার কষ্ট হয়। মনে হয় তাঁর মতো নিঃসঙ্গ মানুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। এই নিঃসঙ্গতা, এই বউ-বউ আর সন্দেহ-বাই খেঁপিয়ে তুলে তাঁকে প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। তিন বছর বাদে আজও তিনি তেমনি নিঃসঙ্গ ও নির্বান্ধব। কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে কিন্তু 'বাই'য়ের হাতে তিনি চিরবন্দী নিঃসঙ্গ আলেক-জাণ্ডার সেলকার্ক। আগে দিনরাত পাহারা দিতেন বউকে। আজকাল অফিস থেকে ফিরেই পড়ার ঘরে মাস্টারের সামনে চেয়ার টেনে বসে সংবাদপত্রের আড়ালে মুখ ঢেকে নিষ্প্রভ চোখ দুটিকে তীক্ষ্ণ করে পাহারা দেন স্কুলগামিনী পঞ্চদশী প্রিয়দর্শিনী কন্যাকে। 'বাই'য়ের হাতে বন্দী মানুষটির চিরনির্বাসন ঘটেছে স্বাভাবিক জীবনাঙ্গন থেকে।

'খাই-বাই' আর 'বউ-বাই' এক পংক্তিভুক্ত হলেও সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে কিন্তু 'রোগ-বাই'। এ বাইটাকে ধুচরোভাবে আমরা অল্পবিস্তর প্রায় সকলেই আমল দিয়ে থাকি। তবে মাত্রায় আর মাপে কেউ কম কেউ বেশি। তবে এ বাইটা সামান্য পরিমাণে থাকাটা নিন্দনীয় নয় কিন্তু মাত্রা ছাড়ালেই 'বউ-বাই'য়ের চেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে আর সেটাই সবচেয়ে ভয়ের।

দেহধারী জীবমাত্রকেই আধিব্যাধির হাতে মাঝে-মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এটা মর্তজগতের একটা অতি স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু অতিরিক্ত রকমের ভয়-ভাবনাই সবচেয়ে বেশি মুশকিল বাধায়। রোগীর এই অস্বাভাবিক আশঙ্কা অনেকসময় রোগনির্ণয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারকে বিভ্রান্ত করে সামান্য ব্যাধিকে ঘোরালো করে চিকিৎসা-বিভ্রাটের সৃষ্টি করে।

অতিশয়োক্তি করা শুধু কবিদের নয়—মানুষমাত্রেরই স্বভাব। অল্প-বিস্তর আমরা সকলেই এই স্বভাবের দাস। তিলকে 'তাল' করতে আমরা অদ্বিতীয়। উচ্ছে ভেজে পটল বলে উচ্চকণ্ঠ হতে আমাদের বিন্দুমাত্র অনীহা নেই। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা অতিশয়োক্তির এই স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত বলেই রোগীর রোগ-বর্ণনার শুধু এবং সমাপ্তির মাঝখানেই চিকিৎসাপাত্র অন্যমনস্কভাবে দিয়ে থাকেন। যে কোন হাসপাতালে, ডাক্তারখানায় এবং আপনার নিজের বাড়িতেও কি এ ব্যাপারটা আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে?

কথাপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার-বন্ধুকে সহাস্যে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি হাসিমুখেই জবাব দিয়েছিলেন: 'রোগীর পাল্লায় তো পড়েন নি—রাক্ষসী পদ্মাও তার বাক্যস্রোতের কাছে একেবারে 'অজন্তী' নদী। আমাদের দুটি 'তোক'-এই কাজ হয়। কিন্তু রোগীর উৎপাত এবং দুষ্ট মনোভাবের আঁচ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে 'এফ-এম' দিতে হয়।' 'এফ এম'? ফাঁকা মাথায় ফকিকার —কোন ঔষধ নয়—সুগার অব মিল্ক।—ডাক্তার-বন্ধুটি জোরে হেসে উঠেছিলেন। রোগীকে আয়ত্তে রাখা এবং তার উৎপাত থেকে রেহাই পেতে গেলে সব ডাক্তারকেই এই ফাঁক আর ফাঁকি ফাকিজের আস্তিনে সদাসর্বদা রাখতে হয়। হেকিম আর কবিরাজির কথা জানি নে তবে চিকিৎসাজগতের নামকরা অ্যালোপ্যাথ এবং হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকরা কেউই এর ব্যতিক্রম নন।

স্বস্তির কথা, সবাইয়ের রোগ-বাই নেই। কিন্তু যাদের একবার এই রোগে ধরেছে 'প্রাণপাখী' খাঁচাছাড়া না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের স্বস্তি নেই। 'কানা পুতের নানা রোগ' আর কি। সব সময়েই একটা না একটা রোগ তাঁদের সংগী হয়ে আছে, নানান ধরনের অন্তহীন ব্যাধির সায়রে তাঁদের নারায়ণী শয়ান। তাঁরা তো ভোগেনই। তাঁদের ছেলেপুলে বউঝিকে এই ভোগান্তির জের আজীবন টানতে হয়। ডাক্তার-বদ্যি এমন রোগী দেখলে পালিয়ে বাঁচেন। যে নবজাতক এই পরিবেশে চোখ মেলে তাকায় উত্তরজীবনে সে-ও এই রোগ-বাইয়ের শিকার হয়। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে যমের অরুচি ও ডাক্তারবদ্যিদের চক্ষুশূল হয়ে এবং দারাপুত্র-পরিবারকে কুম্ভীপাক নরকে নিমজ্জিত করে এই 'রোগ-বাই'-আক্রান্ত মানুষজনেরা কিন্তু বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকেন দীর্ঘকাল। রোগ-সংক্রমণের আলোচনায় এঁরা বাগদেবী বীণাপাণির বরপুত্র; অন্যের সামান্যতম রোগের আশ্চর্যতম রোগহর ভেষজ-নির্দেশে এঁরা দেববৈদ্য 'অশ্বিনীকুমার'। কামিজের হাতায় এঁদের বিবিধ বড়ি, ঔষধের পুঁটলি, বুক-পকেটে প্রেসক্রিপশনের পাঁজা। ললাটে বিরক্ত ভ্রূকুটি আঁকা, 'শেষের সেদিন'-এর ভয়াল স্বপ্নের চোখে আর্ত ও শঙ্কিত দৃষ্টি, বুকের ধুকপুকুনিতে আসন্ন মৃত্যুর মৃদঙ্গ-নিক্বণ।

রোগ-বাইগ্রস্তদের আবার রকমফের আছে। নানান ধরনের ডাকটিকিট ও রক-মারী মুদ্রাসংগ্রহকারী সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো একদল রোগবাইগ্রস্ত নানান রঙের ও রকমারী চেহারার বড়ি সংগ্রহ করতে অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখান। কোন ঔষধে বা কোনও ডাক্তারের ওপর এঁদের কোন আস্থা না থাকার দরুন ডাক্তার-বদলের সঙ্গে চলে তাঁদের ঔষধপত্র বদল, ফলে হরেকরকমের ওষুধ আর নানান ছোটবড় বেঁটেলম্বা রঙিন শিশিতে এঁদের ঘরের সেলফ একেবারে ঠাসা, এসব রকমারী ওষুধ আর শিশি অন্যকে সাগ্রহে দেখাবার উৎসাহে রোগ-বাইগ্রস্তরা খাজুরাহো মন্দিরের শিল্প-সৌন্দর্য-ওয়াকিবহাল রসজ্ঞ অভিজ্ঞ গাইডকেও টেক্কা দিতে পারেন।

একদিক দিয়ে রোগবাইগ্রস্তরা একেবারে 'ফুলবাবুটি'। পোশাক-আশাকের কাটছাঁট, কালার ম্যাচিং, রুচি এবং স্টাইল সম্পর্কে 'ফুলবাবুরা' যেমন নিখুঁতভাবে ওয়াকিব-হাল—রোগবাইগ্রস্তদের জ্ঞানের ব্যাপ্তিটি তেমনি উনারা তাঁদের স্বাস্থ্যযোগ এবং রোগের লক্ষণ সম্পর্কে। এই নিখুঁত নিখুঁত রোগ-লক্ষণের পাঁচালী শুনে, অনেক বিচক্ষণ ডাক্তারও রোগ-নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হয়ে চিকিৎসা-বিভ্রাটের সূচনা করেন। সাগর-পারের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা ৭৮জনের কোন রোগ না থেকেও রোগী সেজে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারকে তাঁরা বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

চেহারা এবং চরিত্রে রোগ-বাইগ্রস্তদের মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক থাকলেও চিন্তা-ঐক্যে তাঁরা 'এক প্রাণ একতার' সমর্পিত—এই দিক দিয়ে তাঁরা এক এবং অনন্য। এঁদের প্রত্যেকের ধারণা বাজারে নতুন এবং হালে আমদানিকরা বড়িই সর্বরোগহর সার্থক দাওয়াই। রোগ-নিরাময়ে কানাকড়ি মূল্য নেই এমনি চোখধাঁধান উজ্জ্বল রঙের ট্যাবলেট এই সমস্ত রোগ বাইগ্রস্তদের সম্পর্কে বিশল্যকরণীর মতো কাজ দিয়েছে। এই ধরনের অতিনিরীহ ট্যাবলেট ১১৯ জনের মধ্যে ১২০ জনকে অস্ত্রোপচার-পরবর্তী দুঃসহ যন্ত্রণা দূরীকরণে, শতকরা ৫০ জনকে এবং সমুদ্রপীড়ার যমযন্ত্রণায় শতকরা ৫৮ জনকে অপার আরাম ও স্বস্তি এনে দিয়েছে।

এই রোগ-বাইগ্রস্তদের একটা দল আবার প্রকৃতিতে পাদরী—একেবারে সাধু-সন্ত। পরের দুঃখমোচনে যেন সমর্পিতপ্রাণ। এঁরা 'একই পালকের পাখি'দের মধ্যে ব্যক্তিগত রোগ এবং রোগ-নিরাময়ে 'আশ্চর্য' বটিকার বিস্তৃত খবর স্বেচ্ছায় সানন্দে পাড়াজনোচিত মানবতায় ভাগিদে বিতরণ করে বেড়ান। ডাক্তার এবং ওষুধ-কিনি করে বেড়ানোই এঁদের পেশা। রোগ-বাইগ্রস্তদের মধ্যে কাজ-কুলীন হচ্ছে বাইগ্রস্ত বৃদ্ধরা। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে যখন অবলম্বনের এবং মনো-সংযোগের কিছু থাকে না, ঘরে-বাইরের জগৎ সম্পর্কে যখন উদাসীন্য আসে তখনই তাঁরা নজর ফেরান নিজ দেহের দিকে। দেহ-সম্পর্কীয় একটুকু বৈপরীত্যে এঁরা 'বিন্দুতে সিন্ধুর' গর্জন শুনতে পেয়ে আকুল হয়ে ওঠেন। জীবনবিমুখরাই এই রোগবাইয়ের বড়ো শিকার হয়ে থাকেন। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' তখন 'করুণাধারা'র নব-আঁকা কঠোর ধারায় স্থায়ীভাবে আসে এই রোগ-বাই। এই বিকার। জীবনকে কিছু দেবার বা জীবন থেকে কিছু নেবার উৎসাহ

যখন বন্ধ হয়ে যায় তখনই মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে পাগলের মতো আঁকড়ে ধরে দেয়ালটাকে।
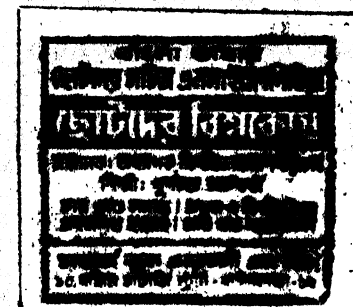
লক্ষ্য করবেন রোগ-বাইগ্রস্তরা 'পথ চেয়ে আর কাল গুনে' ঠিক ফাল্গুনেই বিপত্তি ঘটিয়ে বসেন। আকাশে-বাতাসে যখন আনন্দ-উৎসবের সাড়া জাগে তখনই এ'রা রোগ-বায়ুদের গন্ধ পান বাতাসে। আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে এ'রা 'কুসুমের মাস'-এর কোকিল নন—বীভৎস-দর্শন বায়স, ছন্দপতনে যার জুড়ি মেলা ভার। আনন্দের দিনেই মা-লক্ষ্মীর বাহনের মতো মুখ করে হিসেবুটে রোগবাইগ্রস্তদের আবির্ভাব বসন্তকালের কোকিলের উপস্থিতির মতোই অপরিহার্য ধারায় ঘটে থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে সুস্থ-সবল স্বাভাবিক মানুষ অসুস্থ হবার ভান করে কোন 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'র তীব্র ইচ্ছার দাস হয়ে? লুচি মাংসের বদলে ঘোলের শরবত আর কাঁচকলা সেদ্ধোর নিমগ্ন হতে চায় কোন মহামূর্খ? কেন হয়? মনোবিজ্ঞানীরা এক বাক্যে রায় দিয়েছেন যে পলায়নী মনোবৃত্তি সব অকাজের কাজি। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া ব্যাপারে প্রবল অনীহা, করণীয় কর্ম-সম্পাদনে আত্মবিশ্বাসহীনতার দরুন আশঙ্কা ও ভয়, জেদী বাপ-মা, স্বামী এবং কড়া বিভাগীয় কর্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় অসুখের নিরাপদ আশ্রয়। প্রিয়জনের সম্প্রীতি এবং সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণের হাতিয়ারও এই রোগ-শয্যায় শয়ান। রোগমুক্তি? সে তো স্বর্গের নন্দনকানন থেকে কৃমিকীটভরা মর্ত্যের মৃত্তিকায় অধঃপতন। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য চার্লস ল্যাম্বের 'কনভ্যালাসেন্স' নামধেয় অবিস্মরণীয় নিবন্ধটি।

কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এই 'নিরাপদ আশ্রয়'-অন্বেষণে ব্যাকুল জীবন থেকে পলায়নের এক অতি উজ্জ্বল কাহিনী। ব্রাউনিংয়ের বাবা ছিলেন যেমন বদমেজাজী তেমনি কড়াধাতের মানুষ। ইনি তাঁর মেয়ের জীবনকে প্রায় দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন। বালিকা-বয়সে মেরুদণ্ডে প্রাপ্ত অতিসামান্য 'অণু' মাত্রার আঘাতকে ব্রাউনিং 'আণবিক বোমা'য় পরিণত করে চল্লিশ বছর বয়স অবধি কোচে শুয়ে কাটিয়ে ছিলেন প্রায় উত্থানশক্তিরহিতের মতো। হয়তো সারাজীবনটাই কাটাতেন যদি না দুর্মদ-দুরন্ত রবার্ট ব্রাউনিংয়ের আবির্ভাব তাঁর বিবর্ণ রিক্ত পাণ্ডুর সুখহীন ক্লান্ত জীবনে ঘটত কালবৈশাখীর দুর্বার বেগে। 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে'—এই ছিল এলিজাবেথ ব্রাউনিংয়ের নিভৃত হৃদয়ের গোপন বাসনার গান। সাড়া দিলেন রবার্ট ব্রাউনিং। একটা খেপো ক্ষ্যাপা হাওয়া প্রেমের রূপ নিয়ে এল এলিজাবেথের জীবনে। সেই উত্থানশক্তিরহিতা বিবাহান্তে শুধু স্বাভাবিক জীবনই যাপন করেন নি—'পঞ্চাশে লন্ডনেতে গিরিশ' প্রবাদবাক্যকে সার্থক করে খ্যাতনামা শৈলীশিখরজিজ্ঞাসিনী

হয়েছিলেন এবং স্বামীকে উপহার দিয়েছিলেন সুস্থ সবল এক নবজাতক। আত্মীয়-স্বজনের সহানুভূতি কাড়ার এবং স্বামীর চঞ্চল প্রেমদৃষ্টিকে নিজের ওপর সংহত ও অচঞ্চল রাখার উদ্দেশ্যে 'আধুনিক বিবিরা' পুরাতনদিনের মতো আর 'গোঁসাঘর' খোঁজেন না, প্রায়ই এই 'রোগ-মুখোশের' আশ্রয় নেন—এ খবরের সঙ্গে বিবাহিত পুরুষ হিসেবে আপনি এখনো মুখোমুখি হন নি? স্বর্গত জলধর সেনের 'গৃহিণীর রোগ' গল্পটি রোগ-বাই-এর জীবন্ত নিদর্শন রূপে ব্যঙ্গ-কৌতুক ও সরস কাহিনী হিসেবে গল্পসাহিত্যের কোহিনূর হয়ে আছে আজও।

আমাদের এই ভারতভূমে রোগ-বাইগ্রস্তদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্পর্কে কোনো সমীক্ষা না হলেও ব্রিটেন ও আমেরিকায় এ বিষয়ে রীতিমতো সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানকার ডাক্তাররা এই সুস্থ-সবল অথচ রোগ-বাইগ্রস্তদের নিয়ে মহাভাবনায় পড়েছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা দশজন এই মানসিক বিকৃতিতে ভুগছেন। এবং এ'দের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তির পথে। এজন্যে লন্ডনের 'নিউ সাইটিস্ট'-এ ডাঃ রিচার্ড এ্যাসর এক প্রবন্ধে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করেছেন টেলিভিশনের মেডিকেল প্রোগ্রাম ও ওষুধপত্রের ব্যবসাদারদের বিজ্ঞাপন-আড়ম্বরকে।

এই রোগ-রোগ-বাইগ্রস্তদের অভিজ্ঞ ডাক্তাররা কিন্তু এক নজরেই সত্যিকার রোগী থেকে তফাৎ করে নিতে পারেন। তাই অনেক সময় ডাক্তাররা বাইগ্রস্তদের কাতরানিতে কান দিতে চান না। এতে অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটে যায়। রোগ-বাইগ্রস্তরা 'হাতুড়েদের' অতিসহজ শিকার হয়ে পড়েন। ফলে অর্থনাশের সঙ্গে আয়ুক্ষয়েও বিশেষ বিলম্ব হয় না।

হাল-আমলে এই রোগবাইগ্রস্তদের নিয়ে ডাক্তাররা ভারি বিপদে পড়েছেন, নিজেরাও বিপন্ন বোধ করছেন। কেননা নিদারুণ উপেক্ষা আর অন্তহীন আন্তরিক সহানুভূতি—দুয়ের 'অতি'টাই রোগবাইগ্রস্তদের পক্ষে প্রাণঘাতী মুষল তাই আমেরিকার ডাঃ হিউজ ম্যাথুস 'পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিসিন'-এ একটি নিবন্ধে ডাক্তারদের পরামর্শ দিয়েছেন মধ্যপথ অবলম্বনের। অতি তাচ্ছিল্য বা অতি দয়ার্দ্রভাব নয়—সহানুভূতি এবং সৎ উপদেশ মাত্রাহীনভাবে দেখার দরকার নেই আবার একেবারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নিরাশ করবেন না। কঠোরতার সঙ্গে কোমলতা ও সহৃদয়তা মিশিয়ে হতাশ জীবনে আশা সঞ্চার করুন। ভারি রকমের কোন ওষুধ নয় হালকা ব্যায়াম আর মিতাহারের নির্দেশ দিন হাসিমুখে। 'হট বাথ' আর অ্যাসপিরিনের বড়ি—ব্যস—এইই যথেষ্ট। এতেই কাজ হবে। নিতান্ত ওষুধ খাবার জেদ দেখলে ভিটামিন বড়ি দিন।

ডাক্তাররাই কখনো দেবদূত কখনো যমদূত হয়ে দেখা দেন রোগীর কাছে। সহাস্যমূর্তি ডাক্তারকে দেখলে রোগীর অর্ধেক রোগ সেরে যায়— এতো হামেশাই চোখে পড়ে। সব ডাক্তারই এই 'ফেথকিয়োরে'-এ অল্পবিস্তর আস্থাশীল। রোগ-নিরাময়ের ইচ্ছামন্ত্রটি ঘুমিয়ে থাকে লুকিয়ে থাকে রোগীর মনের অতলে। ডাক্তার এসে তাঁর আশ্বাসের রুপোর কাঠিটি ছোঁয়ান—ইচ্ছামন্ত্রের ঘুম তখন ভাঙে। প্রয়োজন মতো অতিসাধারণ ওষুধ তখন যেন বিশল্যকরণীর কাজ করে। আসল রোগী আর নকল রোগী (রোগবাইগ্রস্ত) যেই হোক—রোগমুক্ত বা বাইমুক্ত করতে গেলে ডাক্তারের এই আশ্বাসের রুপোর কাঠিটি অবসাদগ্রস্ত ক্লিষ্ট মনে স্পর্শ করাতেই হবে। এদেশের এবং ওদেশের ডাকসাইটে ডাক্তারদের রোগনিরাময়ের বীজমন্ত্র হচ্ছে এটি।

ভয় তাড়াতে পারলেই জয় অনিবার্য— তা ব্যক্তির জীবন থেকে বা জাতির জীবন থেকেই হোক। বিভীষিকার জন্ম অপ্রত্যয়, সংশয় আর ভয় থেকে। আর এই ভয় আর সংশয় থেকেই জন্ম হয় 'রক্তবীজে'র মতো যতকিছু অকল্যাণের আর অপ্রীতির। 'বাই'ও এই রক্তবীজ-এর অনুজাতক রক্তদন্তী রাক্ষসী যা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দেয় প্রতি মুহূর্তে। ভাষার রূপ ধরে এক নতুন ধরনের 'বাই' আজ জাতীয় জীবনকে কিভাবে ভ্রষ্টচরিত্র এবং জাতীয় সংহতিকে শতধাবিচ্ছিন্ন করছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশই তার জীবন্ত প্রমাণ।

ডাক্তাররা মাথা ঘামাচ্ছেন রোগবাই থেকে জনজীবনকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু জাতির জীবন থেকে 'আংরেজি হঠাও'-বাই ও 'হিন্দী একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'-বাই তাড়াতে আজ ডাক দেবো কোন ওঝাদের?

নতুন ঠগী

ফুলে আর ফোটোয়

সরকারী আর্থিক বৎসরে তিন-তিনটে পরীক্ষায় ফেল করে চতুর্থ পরীক্ষার প্রস্তুতি-পর্বে নিতান্তই হতাশ বোধ করছিল বিপিন ব্যাপারী। কেমন একটা অসহায় অসহায় ভাব—কাউকে বলাও যায় না অথচ বেশীক্ষণ চেপে রাখলে দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসছে। ব্যাপারটা ত' সহজ নয়। ল'য়ের ইণ্টারমিডিয়েটে সম্ভবত সেবার শুধু বিপিনই ফেল করেছিল। আই-এ-এস পরীক্ষাটা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সদ্য কানুনগো থেকে বি-ডি-ও পদে উত্তীর্ণ বড়দা গলায় গলকম্বল দুলিয়ে বললেন—

ঃ আজকাল যেসব ছেলে আই-এ-এস দিচ্ছে সব থার্ড ক্লাশ। সেদিন এস-ডি-ও সাহেব বলছিলেন ট্রেনি অফিসরগুলো ইংরেজীর এ, বি, সি, ডি পর্যন্ত জানে না। বিপনে তুই অ্যাপীয়র হ'। বি-এ'তে ইংরেজীতে কত ছিল?

ঃ ফরটি-থ্রী পয়েণ্ট ফোর পার্সেণ্ট।

অঙ্কটা কষাই ছিল। কিন্তু চট করে নম্বরটা মুখ ছেড়ে বেরুতে চায় না। তবু বিপিন বড়দাকে বলেছিল—

ঃ ল'য়ের পরীক্ষা সামনে। এখন অন্য পরীক্ষা থাক না।

ঃ না তুই দে। ভালই হল। গোটাদুয়েক ল'য়ের পেপার নিয়ে নে। তাতে দুদিকেরই হয়ে যাবে। তুই আর কিছু চিন্তা করিস না। শুধু পড়ে যা। কাল থেকে তোর জন্য বাজার থেকে ব্রাহ্মী শাক আনবো।

বড়দার মুখের উপর কোনদিনই প্রতিবাদ করতে পারেনি বিপিন। তাই জোরে উঠে ব্রাহ্মী শাকের রস আর ষষ্ঠ জর্জের ঊর্ধ্বতন ত্রয়োবিংশ পুরুষের ঠিকুজী-কুলজী গিলতে লাগল। গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া। বড়দার ঐ এক বাই। পত্রিকায় কম্পিটিটিভ একজামিনেশনের বিজ্ঞাপন দেখলেই গলায় খড়ম-পায়ে-হাঁটার আওয়াজ তুলে ডাকেন—

ঃ বিপিন।

বিপিন এই ডাকের বিশেষ অর্থটি জানে। অর্থাৎ আরও কোন পরীক্ষা দিতে হবে। বি-এ পাশ করে—পাস কোর্সে—তিন-তিনটি বছর বেকার। বছর-ভোর পরীক্ষা দিতে ও ফেল করতে হয়। কেমন একটা নেশা ধরে গেছে। কিন্তু এক বছরে তিন-তিনটে—জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।

এমন সময় সদর দরজায় প্রচণ্ড জোরে কে কড়া নাড়ল। দরজা খুলতেই চোখে পড়ল পিওন দাঁড়িয়ে সামনে। কৈ আর কোন পরীক্ষা ত সে দেয়নি যে, তার রেজাল্ট আসবে। তাহলে কি বড়দা তার হয়েই অন্য কোন পরীক্ষার ফর্মের জন্য মনি অর্ডার পাঠিয়েছিলেন? আজকাল বড়দা নিজেই বিপিনের হয়ে অ্যাপ্লাই করেন। আগড়ম-বাগড়ম কিছুই যখন বুঝে উঠতে পারছে না. পিওন একটা পার্শেল বাড়িয়ে বলল—

ঃ পার্শেল—ভি, পি। বিপিন ব্যাপারীর নামে।

ঃ আমার নাম।

ঃ সাড়ে সাত টাকা। এই নিন, এই জায়গায় সই করুন।

পার্শেল আছে শুনে যতটা আনন্দ হয়েছিল, টাকার অঙ্কে মনটা ঠিক ততটাই দমে গেল। ঐ টাকায় স্টেট ব্যাঙ্কের বা এল আই সি'র ছোট অফিসারের পরীক্ষাটা হেসে খেলে দেওয়া যায়। ঐ দুটোই এখনো বাকি আছে। আগামী শীতে পঁচিশ পেরুবে। তার আগে নিশ্চয়ই বড়দা ঐ দুটো দিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে দেবেন। পরীক্ষা দেওয়া হবে অথচ টাকার অভাবে পার্শেলটা পাওয়া যাবে না। তাই বাড়ানো রসিদটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল বিপিন। হঠাৎ কানের খুব কাছে একটা পরিচিত স্বর শুনতে পেল—

ঃ কি রে বিপিন? পার্শেল নাকি? কোথা থেকে এল? বড়দা একমাস মেডিক্যাল লীভ নিয়ে বাড়িতে বসে রোজ দুপুরে একশ'টা ঐকিক নিয়ম, একশ'টা সুদ-কষা, একশ'টা ঘড়ি ও চৌবাচ্চার অঙ্ক কষাচ্ছেন। সামনের জানুয়ারীতে ডব্লিউ বি সি এস দিতে হবে।

ঃ দেখিনি এখনো।

ঃ দেখ না পড়ে।

পড়ে দেখল বিপিন। ৩।১ বিপ্রদাস পতি-তুণ্ডি লেন, কলকাতা—৩৩ থেকে জনৈক মহাদেব শাস্ত্রী পাঠিয়েছেন পার্শেলটি। কিন্ত ভেতরের বস্তুর হদিস ত' বাইরে নেই। কি জানি কি ভেবে শেষ পর্যন্ত বড়দা টাকাটা দিলেন। টাকা নিয়ে পার্শেল গছিয়ে পিওন বিদায় নিল।

উপরের পিচবোর্ড ছিঁড়তে ভেতর থেকে একটা ছোট প্যাকিং বেরুল। তার ভেতরে আরো ছোট একটা মোড়ক। গোটা পাঁচেক মোড়ক হাতড়ে শেষ পর্যন্ত আংটির বাক্সের মত ছোট একটা প্যাকিং-য়ের ভেতর থেকে যে বস্তুটি বেরুল সেটির জন্য সাড়ে সাতটা টাকা গচ্চা যাওয়ায় বড়দা বিপিনকে দুশটা করে সব টাইপের অঙ্ক ফাইন করে দিলেন। অথচ বস্তুটি একটি ছোট্ট কবচ। তামার কোটিং—এক টুকরো কালো কারও সঙ্গে আছে। টাকার চেয়েও অঙ্কের শোকে বিপিন কবচটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল, বড়দা বললেন—

ঃ থাক না। এটা পরতে ক্ষতি কি। দেখনা পরে যদি ভাল কিছু হয়।

।। ষোল ।।

লারমোর বললেন, 'কোন্ গহরালি 'র? ওঠ্—ওঠ্—'

সঙ্গের মুসলমান মাঝি দুটো এক-সঙ্গে বলে উঠল, 'চরবেউলার গহইরা—'

'তোরাবালি মণ্ডলের ছেলে?'

'হা।'

গহরালি পা জড়িয়ে পড়েই ছিল। লারমোর ব্যস্তভাবে বললেন, 'পা ছাড় গহর। ওঠ্—' বলে তার কাঁধ ধরে তুলবার জন্য ঝুঁকলেন।

গহরালি উঠল না। পায়ের কাছে জোর করে পড়েই থাকল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আগে কথা দ্যান, বাজানেরে বাচাইবেন। নাইলে উঠুম না, পায়ে মাথা কুটুম।' বলে সত্যি সত্যি লার-মোরের পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

লারমোর অত্যন্ত বিব্রতভাবে বললেন, 'কী হয়েছে তোর বাজানের (বাবার)?'

'দুইদিন ধইরা গলা দিয়া খালি লো (রক্ত) উঠতে আছে। হুঁশ-জ্ঞান কিছু নাই।'

এক মুহূর্ত কি ভেবে লারমোর বললেন, 'আমার পা ধরে পড়ে থাকলে তো বাপের রোগ সারবে না। উঠে দাঁড়া।' হেমনাথের দিকে ফিরে বললেন 'তোমাদের সঙ্গে এখন আর যাওয়া হল না হেম। ওদের সঙ্গে চরবেউলায় ছুটতে হবে।'

হেমনাথ মৃদু হাসলেন, 'সে আমি বুঝেছি।'

লারমোর বললেন, 'বৌঠানকে বুঝিয়ে বোলো, আজ আর তাঁর হাতের রান্না খাওয়া হল না। ফিরে এসে খাব।'

হাত জোড় করে হেমনাথ বললেন, 'মাপ করো ভাই। তোমায় আর তোমার বৌঠানের ব্যাপারে আমি নেই। শুধু শুধু গলা বাড়িয়ে কোপ খেতে যাবে কোন্ মুর্খে? ফিরে এসে তুমিই বুঝিয়ে বোলো।'

সবাই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খুব বন্ধু হয়েছিলে! বিপদে পড়লে উদ্ধার করতে পার না!'

হেমনাথ হাসছিলেন। বললেন, 'ফিরছ কবে?'

'চার পাঁচ দিনের আগে নিশ্চয়ই না; দেরিও হতে পারে। চরবেউলায় যেতেই তো লাগবে একদিন, ফিরতে আরেক দিন। দুটো দিন পথেই কাটবে। তারপর তোরা-বালির অবস্থা বুঝে বেশিদিন থাকা না-থাকা নির্ভর করছে।'

'তা বটে। যেতে যখন হবে আর দেরি কোরো না।'

এদিকে গহরালি পা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। লারমোর তাকে বললেন, 'তোদের সঙ্গে নৌকো আছে?'

'আছে।'

'ভালই হয়েছে। ঐ বাক্স দুটো নিয়ে চল্—' যে বাক্স দুটোয় ওষুধপত্তর যন্ত্রপাতি আছে, তা দেখিয়ে দিলেন লারমোর।

গহরালিরা বাক্স মাথায় তুলে দাঁড়াল।

লারমোর হেমনাথদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলি হেম, চললাম অবনী, চলি রে দাদাভাই—'

অবনীমোহন বললেন, 'আসুন।'

হেমনাথ বললেন, 'এসো। সাবধানে থেকো। বেশি অনিয়ম টনিয়ম কোরো না। তোমার তো আবার নিজের সম্বন্ধে খেয়াল কম।'

বিনু কিছু বলল না।

নীরব হেসে গহরালিদের সঙ্গে মাঝি-ঘাটার দূর প্রান্তে চলে গেলেন লারমোর।

কোথায় চরবেউলা কে জানে, চর শব্দটা বিনুর অজানা নয়; চারদিকে অসীম অথৈ জলের মাঝখানে উজ্জ্বল ভুঁইচাঁপাটির মতন চরবেউলা কোথায় ফুটে আছে বিনু জানে না।

লারমোর বলছিলেন, পুরো একটি দিন লাগে সেখানে যেতে। তার মানে আগামী কাল সন্ধ্যেবেলা তিনি চরবেউলা পৌঁছুবেন। বিনু কোনদিন চর দেখে নি। নদীর মাঝামাঝিখানে উজ্জ্বল একটুকরো ভূমির জন্য সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। লারমোর অবশ্য নিতেন না, অবনীমোহন আর হেম-নাথও যেতে দিতেন না, তবু চরবেউলা যাবার জন্য একবার বায়না ধরলে হত।

আগেই ঠিক করা ছিল, যুগল আর সেই মাঝি দুটো—তিনজনে তিনখানা নৌকো বাইবে।

যুগল একটা নৌকোয় বসে ছিল। লার-মোরের নৌকোর সেই মাঝি দুটো খাড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? নৌকোয় উঠে আলো জ্বাল।'

মাঝি দুটো দুই নৌকোয় উঠে নিজেদের হারিকেন জ্বালল। হেমনাথেরা উঠতে যাবেন, সেই সময় একটা ডাক দূর থেকে ভেসে এল, 'হেই—হেই মাঝি—ই—ই—ই—'

হেমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখাদেখি অবনীমোহন আর বিনুও দাঁড়াল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছুটতে ছুটতে যারা সামনে এসে পড়ল, তাদের সঙ্গে যে আরেকবার দেখা হয়ে যাবে, বিনু কল্পনাই করতে পারে নি। সেই রোগাকাটি, দুপুরবেলা বকুলতলার কাছে দাঁড়িয়ে যে দেখা দিয়েছিল, আর তাদের জোয়ান মতন আর দুই বাবরিওলা চাকরী এসেছে। চাকরী দুটো এখন খালি গায়ে নেই, জামা জোড়া ঘোড়ামুখীন হাফ-শার্ট পরেছে। অবাক বিস্ময়ে বিনু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তাকিয়ে হরিন্দ কাগা-বগার উদ্দেশে বলল, ‘হুশ রাখিস পুতেরা। বাকি (বোজারা) দেখলে খোঁজ লইস ইসলামপুরের নাও কিনা।’

কাগা-বগা সমস্বরে বলল, ‘আইচ্ছা।’

চোখ দুটো আবার ছইয়ের ভেতর নিয়ে এল হরিন্দ। বলল, ‘বে বুঝা কইতে আছিলাম; মা-ঠাইরণ ভাইলো ভাল আছে।’

‘হ্যাঁ।’ হেমনাথ বললেন।

‘সেইবার বড় তুফানের সময় আপনাগো বাড়িও গেছিলাম। মা-ঠাইরণের হাতের ভাত-বাঞ্জন খাইয়া আইছিলাম। খালি অমত্ত (অমৃত)। অহনও মুখে লাইগা আছে। কতবার ভাবছি আরেক দিন গিয়া মা-ঠাইরণের হাতের পাক খাইয়া আসুম।’

‘আজই চল না।’

‘না হ্যাম কত্তা, আইজ না। অন্য দিন যামু।’

হরিন্দ বলবার পর কাগা-বগা নৌকো বাইতে বাইতে মাঝে মাঝে চিৎকার করছিল, ‘মাঝি হে-এ-এ-এ—’

দূর দিগন্ত থেকে সাড়া ভেসে আসছিল, ‘কিবা কও-ও-ও-ও—’

‘নাও যায় কই?’

‘সুবইড্যার চরে।’

কখনও উত্তর আসছিল, ‘রসুলপুর।’ কেউ বা বলছিল, সাভার। কেউ বলছিল, নারায়ণগঞ্জ।

এদিকে ছইয়ের ভেতর হেমনাথ তখন হরিন্দকে বলছেন, ‘অন্য দিন আর গেছ! দেড় বছর পর সুজনগঞ্জে এলে। আবার ক’বছর পর এদিকে আসবে তার কি কিছু ঠিক আছে?’ সেই সময় কাগা-বগার চিৎকার শোনা গেল, ‘মাঝি হে-এ-এ-এ-এ—’

হাওয়ার স্রোতে ভাসতে ভাসতে সেই উত্তরটা এল, ‘কিবা কও-ও-ও-ও—’

‘কাগো নাও?’

‘বেবাইজাগো (বেবাজিয়াদের)।’

‘যায় কই?’

‘ইসলামপুর।’

ছইয়ের ভেতর হরিন্দ বোধ হয় কান খাড়া করেই ছিল। ইসলামপুরের নামটা শুনতেই হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে চলে গেল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ‘নাও থামাও বেবাইজারা।’ আলোর একটা বিন্দু দেখিয়ে কাগা-বগাকে বলল, ‘উইদিকে বা (বেয়ে যা)।’ ভেতরে এসে বলল, ‘ইসলামপুরের নাও পাইয়া গেছি হ্যাম কত্তা।’

হেমনাথ বললেন, ‘আজ ইসলামপুরে না গেলে চলত না?’

হরিন্দ বলল, ‘আইজ না গেলে কাইলের হাট ধরতে পারুম না। ইসলামপুরের হাট আবার মাসে দুইবার। কাইলের হাট ফসকাইলে আবার পনের দিনের ধাক্কা।’

‘তা হলে যাও।’

আলোর বিন্দুটা কাছাকাছি মনে হয়েছিল, আসলে কিন্তু তত কাছে না। একটু পরেই কাগা-বগা একটা বিরাট নৌকোর গায়ে এসে নৌকো ভেড়াল। কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল বিরাট নৌকো একটাই না, পর পর অনেকগুলো। সব মিলিয়ে বিরাট বহর।

বড় নৌকোটা থেকে কেউ বলল, ‘নাও থামাইতে কইছেন ক্যান?’

হরিন্দ বলল, ‘তোমরা ইসলামপুর যাইবা তো। আমরাও যামু; আমারে যদি এটু লইয়া যাও।’

‘নিচ্চয় নিমু; আসেন।’

হরিন্দ এবার হেমনাথের দিকে ফিরে বলল, ‘যাই হ্যাম কত্তা—’

‘এসো।’ হেমনাথ বলতে লাগলেন, ‘সুযোগ টুযোগ করে একবার আমাদের বাড়ি যেও।’

‘যামু।’ হেমনাথকে প্রণাম করে ছোড়া যাত্রিগুলাকে নিয়ে ‘বেবাইজা’দের নৌকোয় গিয়ে উঠল হরিন্দ।

কাগা-বগা চলে গেছে, কাজেই সেই মাঝিটা বৈঠা নিয়ে হালে বসল। এতক্ষণ আয়েশ করে তামাক টানছিল সে।

দেখতে দেখতে ‘বেবাইজা’দের নৌকোগুলো গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক সময় অবনীমোহন বললেন, ‘অদ্ভুত মানুষ তো।’

হেমনাথ হাসলেন, ‘হ্যাঁ—’

এই সময় বিনু বলে উঠল, ‘দাদু, ‘বেবাইজা’ কাকে বলে?’

অবনীমোহনও তাড়াতাড়ি বললেন, ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ ‘বেবাইজা’ কী?’

হেমনাথ বললেন, ‘শব্দটা ‘বেবাইজা’ না, বেবাজিয়া। মানে বেদে।’

বিনু বই-পড়া বিদ্যে থেকে বলল, ‘বেদেরা তো হেঁটে হেঁটে বেড়ায়, তাঁবুতে থাকে। নৌকোয় করে ঘোরে নাকি?’

‘দাদাভাই, এ দেশটা তো জলের দেশ। এখানে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবে কোথায়? তাই নৌকোয় করে ঘুরতে হয়।’

বিনু আর কিছু বলল না। বার বার তার মনে হতে লাগল, হরিন্দ আর কাগা-বগার মতন সে-ও যদি বেদেদের নৌকোয় পাড়ি দিতে পারত।

অন্ধকারে আশ্বিনের পরিপূর্ণ নদী অথবা প্রান্তরের ওপর দিয়ে নৌকো চলেছে। এখন কত রাত, কে জানে। একটানা জলের আঘাতে নৌকোর তলায় ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে।

এখন বেশ হাওয়া দিয়েছে। জলের মাঝখানে হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা; গায়ে লেগে সির সির করছে।

সেই সকাল থেকে ঘোরের ভেতর যেন ডুবে আছে বিনু। জন্ম থেকে যাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বেঁচে আছে সে... একটা দিন এভাবে আর কখনও ছোটাছুটি করে বেড়ায় নি সে।

অনেক আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বিনু। কিন্তু পাখি, মাছের সেই ঝাঁক, সাঁকোর বাঁশে বসে বসে মাছরাঙাদের বড়শি খাওয়া, সুজনগঞ্জের হাট, ঢোল-দেওয়া, লাফানেওয়ালার দুপুরী দেখা, বকেয়া গান, হরিন্দ, লাঠিখেলা, আর দুই ঢাকী, মিষ্টির দোকানে বসে বসে মোটা খাওয়া, বেবাজিয়াদের বহর—অসংখ্য মানুষ আর অগণিত ঘটনা ভাবিবার অবকাশ তাকে দেয় নি। এক উত্তেজনা থেকে আরেক উত্তেজনা, এক কৌতূহল থেকে আরেক কৌতূহল তাকে অবিরাম ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। চোখ টান করে অপার বিস্ময়ে সে শুধু দেখে গেছে, কান পেতে শুনে গেছে।

হরিন্দরা বেদে-নৌকোয় উঠবার পর আর বসে থাকতে পারল না বিনু। হাজারো বিস্ময় যে ক্লান্তিকে দূরে ঠেলে রেখেছিল, এবার তারা বড় বড় পা ফেলে ঘিরে ফেলতে শুরু করল। হাত-পা যেন আলগা হয়ে যেতে লাগল বিনুর। জলের একটানা ছপ-ছপানি শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুমের ভেতরেই বিনু টের পেল, বাড়ি ফিরেছে। ঘুমোতে ঘুমোতেই মায়ের সঙ্গে বসে গেল সে। খেতে খেতে দু-একবার ঝিনুকের নাম কানে এল। তখনি তার মনে পড়ে গেল, সকালবেলা যখন সুজনগঞ্জের হাটে যায়, ঘোড়ার গাড়ি করে ঝিনুককে আসতে দেখেছে। ঘুম-চোখেই আলোর ছোটাছুটি দেখল সে, স্নেহলতা-শিবানী-সুরমা আর সুধা-সুনীতির গলা শুনতে পেল। ওরা কী বলছে তা অবশ্য বুঝতে পারল না।

তারপর রাত্রিবেলা হেমনাথের কাছে শুয়ে তাঁর বুকে হাত রাখতেই বিনু টের পেল একটা চুড়ি-পরা ছোট কচি হাত তার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

গভীর ঘুমে ডুবে যেতে যেতে বিনুর মনে হল, কচি হাতখানা ঝিনুকের। হেমনাথের ভাগ নিয়ে ঘুমের ভেতরেই কি মেয়েটা হিংসে শুরু করে দিল? (ক্রমশঃ)

মাথার ওপরে সেতু॥

[illegible]

মাথার ওপরে সেতু
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
আমাদের মুখ তাই নীলিমার দিকে পেতে আছি।

সেই বীজে বৃক্ষ ফলবান হয় জন্ম যার নার্সারিতে নয়, বনে
পাখির আদরে টুক, সেই বীজে মুকুলিত হয় আলো
রঙিন উপলে বসে নীলিমার মুখ পাতি তাই।

সাধ বল স্বপ্ন বল কামনার আলোড়ন বল
কিছুই সম্পন্ন নয়, কিছুই সম্পূর্ণ নয় আর
হৃদপিন্ডের ঠিক নিচে যন্ত্রণার চাড় লাগে
মনে হয় অশ্রু উঠে আসে
কেউ বলে, ওর নাম নিষাদ সময়
কেউ বলে, প্রেম
আমরা বসে থাকি সেতুর তলায়।

রাত্রি হলে
আকাশের প্রান্ত থেকে ঝাঁপ দেয় তারা
উদ্ভাসিত শাদা আলো ডুবে যায় বালির তলায়
অকস্মাৎ মুখে হাত দিয়ে বল, বীজ বুঝি! বীজ।
অশ্রু, অন্ধকার উত্তর আমার।

মৃতবৎসা বসে আছে দিগন্তের গায়ে পিঠ দিয়ে।

রক্তের ভিতরে॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

রক্তের ভিতরে গাঢ় অবসাদ
বিকেলের দিঘির স্তব্ধতা
রক্তের ভিতরে কাঁপে
আঠেরো দিনের যুদ্ধ-শেষ কুরুক্ষেত্রের গোধূলি
রক্তের ভিতরে আছে মহাপ্রস্থানের পথ
অসংখ্য পায়ের ছাপ ছড়ানো ছিটনো
ভারি করে তোলে শেষ প্রয়াণের বেলা
পেন্ডুলাম

য

রক্তের ভিতরে কোনো রৌদ্র নেই
শুয়ে আছে বিশাল পুরুষ
নিদ্রিত আছেন তাই
পৃথিবী আপন কক্ষপথে
চোখের তারায় সূর্য-চমকায়
মেরুদণ্ড ধনুকের ছিলা
দাঁতের ঘর্ষণে ডাকে শরতের মেঘ
নিদ্রিত আছেন তাই
পাতালপুরীতে পঞ্চপ্রদীপের আলোর বৈভব
রৌদ্রের আলোয় স্থির অশ্রুর সমুদ্র মনে হ

রক্তের ভিতরে দুঃখ
দুঃখের ভিতরে শোক
শোকের ভিতরে ম্লান বিষাদ মৈনাক
কার্তবীর্যার্জুন নই
গোমতীর স্রোত বাঁধবো সহস্র বাহুতে
মন্ত্রবলে করবো রুদ্র সমুদ্র বন্ধন
রক্তের ভিতরে গাঢ় অবসাদ
পেন্ডুলাম ভারি করে দোলে
হৃদপিন্ডের উপাধানে
মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন বিশাল পুরুষ
সূর্যের শরীরে তার
পদচিহ্ন
লেখা যায় প্রয়াণের বেলা।

আগের ঘটনা

[পদ্মাবতী লীলাকে ভাসিয়ে নিল [illegible]। [illegible]। [illegible] কারবার সত্যচরণ। ডিভোর্স। তবে এবার বন্দনা। নবযুবতী। [illegible] অন্তরঙ্গ, কিন্তু বিয়ে করতে পারল না সত্যচরণ।

তোয়াজে মুকুন্দকে নিয়ে লীলার মনে দ্বিতীয় তুফান। [illegible] তার নিত্যসঙ্গী। এক রাতে সে ফাঁকি দিল লীলাকে। নিরুদ্দেশ [illegible]।

পাগল হল সত্যচরণ। বন্দনাও মারা গেল [illegible]।

রমা লীলার প্রেসেরই প্রধান কর্মী। তার ভাই অহীনের [illegible] দহরম-মহরম। নতুন বাড়ি কিনল লীলা, প্রেস বাড়াল।

সত্য এল লীলার কাছে, ছেলের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করল। কিন্তু প্রত্যাখ্যান। লীলার ভয় করল এবার। রাতে তার সঙ্গে রমাই রইল এখন।]

॥ ৩৫ ॥

রমার শোওয়ার ভঙ্গী লীলার পছন্দ নয়। এখন শীত—লেপের আড়াল রয়েছে, তা নাহলে সে এক অনাছিষ্টি দৃশ্য দেখা যেত। গ্রামের মেয়ে হিসেবে লীলার অবশ্য নানারকম শোওয়ার ভঙ্গী বিস্তর দেখা আছে। রূপপুরের বাড়িতে হরদ্ ঘন্টায় মা মাসিমারা তো বটেই, বাবা মারেফ ছিলেন—সে সুবাদে অনেক লোককে তাদের বাইরের ঘরে শুয়ে থাকতে দেখেছে। এখন ভাবলে লজ্জা করে। অবশ্য ওরা গ্রামের মানুষ। গরীবের মাংস নিয়ে মাথাব্যথা কম, ডাল-ভাতের মত সহজ সব। বাবাও কি কম বলতেন? মারেফতশাহি নাঙ্গেই—বাবের ভাষায় দশ হাত কাপড়েও ন্যাংটো!' সব সময় হাঁটুর ওপর গোটানো থেকেছে। মায়ের ধমক খেলে অপ্রস্তুত হেসেছে বাবা। নিবারণদার নতুন বৌ—রানীগঞ্জের মেয়ে, পাড়াতুত জ্যাঠশ্বশুরকে প্রণাম করতে এসেছে। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন যেন ব্যাঘ্রচর্ম-ধারী মহাদেব—পা বাড়ালেই দিগম্বর হবার দাখিল। ওই অবস্থায় আশীর্বাদ করছেন। পরে মা ক্ষেপে পড়েছিলেন—এবার তোমাকে দারোগা পাতলুন পরিয়ে ছাড়ব! নয়ত মোছলমানদের মত—ওই যে কী বলে...... বাবাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—পায়জামা! পাতলুন-পায়জামা পরে কী হবে শুন, মানুষ ন্যাংটো হয়েই আসে—ন্যাংটো হয়েই চলে যায়। বেশ আছি। কথাটা এত ভাল লেগেছিল বালিকা লীলার। আজও কানে বাজে।

তবে এসব সাজে পুরুষমানুষকে। কিন্তু রমা! দুষ্টুমি করে লীলা কোন কোন রাতে লেপ তুলে দিয়েছে। রমার এত ঘুম! আজও ঢেকেছে শরীরকে, শুধু হাতের [illegible] অন্যমনস্কতার হাসি, বেপরোয়া। এই সব মেয়ের বিয়ে হলে কী করবে?

বাইরের ঘরে একটা খাট আছে। সেটা এঘরে আনা যায়। কিন্তু রমা কী ভাববে? তাছাড়া লীলার কী একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে—একলা শুলে গা ছমছম করে, ঘুম আসে না। কদিন আগে ভুল করে পাশের জানালাটা বন্ধ করা হয় নি। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। রমাকে ডেকেছিল, সাড়া পায় নি। মাথার কাছের টেবিলে জল থাকে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। জল খাবার পর জানালার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল সে। বাইরে শীতের রাতের জ্যোৎস্না। কবর-খানায় কোন আলো নেই। ঘন নীলরঙা কুয়াশা আর জ্যোৎস্না মিলে একটা দূরের জগৎ—কোন শব্দ নেই, কোন স্পন্দন নেই, নিঃসাড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনে হয়েছিল, হয়ত চোখের ভুল, একটা ছায়া নড়াচড়া করছে কবরখানার পাঁচিলের এপাশে। তারপর সেই ছায়াটা এসে তার অযত্ন-লালিত সব্জীক্ষেতের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েছে স্থিরভাবে। চোর-ডাকাত নয়ত? বুক কেঁপে উঠেছিল লীলার। নগদ টাকা-কড়ি আগের দিন অনেকগুলো ছিল। আজ আর নেই। বড়জোর পেতে পারে সামান্য কিছু হাতের বা কানের সোনা, একটা রিস্ট-ওয়াচ, আর কী! ভয় সত্ত্বেও একটু হেসে জানালাটা প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ করেছিল সে। তারপর শুয়ে পড়েছিল। অনেকটা রাত অব্দি ফেল্টুবাবু জ্বালাতন করে গেছে। ওকে নিয়ে সে এক সমস্যা। অহীন এসে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেছে তা না হলে শুত কিনা কে জানে! আজ-কাল তো ভদ্রলোকের হাতে প্রচুর টাকা। প্রচণ্ড মদ খাচ্ছে আর এখানে-ওখানে অনাছিষ্টি কাণ্ড করছে। অহীন বলে, ফেল্টুদার আশা, শহরটা চুষে চুপসে দেবে একেবারে।......

ফেল্টুবাবু নয়ত? মাতালের পক্ষে এমন ঘোরাঘুরি খুবই সম্ভব। তারপর একটু তন্দ্রামত এসেছে লীলার—হঠাৎ মনে হল খুব কাছেই কে তার নাম ধরে ডাকছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোরটা কেটে গিয়েছিল লীলার। কান পেতেছিল। আর কোন শব্দ শোনে নি। কিন্তু ভয় পেয়ে রমাকে ডেকে-ছিল। রমার ঘুম ভাঙাতে তাকে চিমটি কাটতে কাতুকাতু দিতে, শেষ অব্দি রাগে খামচা-খামচি করে সে এক মারাত্মক লড়াই। তারপর যদি-বা মেয়ের ঘুম ভাঙল, চোখ বুজেই বলল, দরজা-জানালা বন্ধ আছে তো? তাহলে চুপচাপ ঘুমোন। বরং কাল থেকে অহীনকে বলব, বাইরের ঘরে শোবে।

কে ডাকছিল তাকে? কার ছায়া দেখে-ছিল কুয়াশাভরা জ্যোৎস্নায়? অত ঠাণ্ডায় দুপুর রাতে কে কী মতলব নিয়ে ফিরছিল কে জানে। কণ্ঠস্বরটা বুঝতে পারে নি। পরদিন অহীনকে সব বলাতে সে ফেল্টু-বাবুর কাছে নাকি জিগ্যেস-পত্তর করেছিল। ফেল্টুবাবু মা-কালীর দিব্যি কেটেছে। না, ফেল্টুবাবু নয় একথা ঠিকই। কারণ সে রাতে ফেল্টুবাবুকে রিকশো করে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে অহীন। টানতে-টানতে নিয়ে গিয়ে তার ঘরে শুইয়ে রেখে তারপর বেরিয়েছে। শীত এখন পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেছে। মাতালকেও তার শীত বিলক্ষণ কাবু করে। শীতের রাতের শহরে মাতালদের সচরাচর ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় না। সবায় তখন ঘরের স্ফূর্তি চায়। ওই ফেল্টুবাবুই তো বলে—শীত এলে মনটা মুষড়ে যায় রে। ওই যে ছড়ায় বলে না—মাঘ মাসে যার ইয়ে নেই সে যাক না শ্মশানঘাটে।

রমার আকস্মিক অহীন কিন্তু খুবতে রাজী হয় নি। বলেছিল, বড়দিকে কম মনে করবেন না। ও একলা ডাকাত রুখতে পটু। আমি অজে-বাজে প্রকৃতির ছেলে, কোথায় কখন কী অবস্থায় থাকি বলা যায় না।

রমা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, তোকে প্রেসের দায়িত্ব দিতে চান দিদি, আর তুই, এমন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াবি?

বা বাব্বা। কী কথায় কী বলে। প্রেসে দারোয়ানী করব আবার এখানে এসেও দারোয়ানী করব। কী পেয়েছিস আমাকে তোরা?

কথাটা বলেছিল লীলার সামনেই। তাই লীলা দুঃখিত হয়েছিল বৈকি। কিন্তু বিকেলে ওই অহীনই লীলাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরোলে লীলার মন হাল্কা হয়ে উঠেছিল। পথে অহীন বলেছিল, বড়দি মেয়েটার সব আমার ভালো লাগে, বুঝলেন? ভালো লাগে না ওর বলবার ভঙ্গীটা। যেন সব তাতেই একটা আপিস-আপিস ভাব। পৃথিবীটা এই সব লোকেরাই নীরস করে ফেলছে। তবে বুঝতে পারছি, আমার লীলাদি ভীষণ ভয় পান আজকাল—তিনি সরলা-অবলা স্ত্রীলোক......

লীলা হেসে ফেলল, এই, কী সব বলছ?

অন্যায় বলছি নাকি? নৈলে দিন-দুপুরে যখন-তখন ভূত দেখছেন কেন?

তারপর লীলা অনেকক্ষণ আর কথা বলে নি। ইদানীং সে প্রায়ই ভূত দেখছে এখানে-ওখানে। ভীড়ের মাঝে একটা লোক ময়লা পাঞ্জাবী, রুক্ষ চুল, গাছতলায় শুয়ে-থাকা কোন পাগলা, হয়ত আচমকা পিছন থেকে কে তার নাম ধরে ডেকে উঠবে...... একটু 'কান পাতলা' যাকে বলে, সেইরকম। গঙ্গায় ব্রীজ হবে বলে এপার-ওপার মাটি জড়ো করেছে—সেই উঁচু পথের মাথায় কে সেদিন সামনে ঝুঁকে গঙ্গার জল দেখছিল। অহীন বলেছিল, চলুন ওদিকে। উঁচু থেকে আমাদের শহর দেখে আসি। বাপ্‌স, কী এলাহি কাণ্ড না চলেছে। বড় বড় ড্রেজার আর কপিকল, হাজার টন লোহা সিমেন্ট... যাই বলুন, টাকার কিন্তু অভাব নেই। কেবল চাকরী চাইলেই...লীলা আনমনে জবাব দিয়েছিল, চাকরী পেলেই কি তুমি করবে? অহীন হাসছিল। আপনি দিচ্ছেন বুঝি? লীলা বলেছিল, প্রেসটা তোমার দিদির সঙ্গে মিলে চালাও। যা হবে, সবই তো তোমাদের। আমার আর কী চাই' অহীন আরও হাসল। বাপ্‌স, এক্ষুনি বৈরাগ্য ধরে গেল? চলুন, উঁচুতে ওঠা যাক। উঁচুতে উঠলে নাকি বিষয়-বৈভব সবই তুচ্ছ লাগে। কই, পারবেন না বুঝি! এ কি লীলাদি, আপনি না শতমুখে গল্প ঝাড়েন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে!

পশ্চিমের কড়া রোদের সবটুকু গায়ে নিয়ে কে অবহেলায় ঝুঁকে পায়ের নীচে জল দেখছে।

...জানেন, বাঙালী মেয়েরা আজকাল পাহাড়ে চড়ে। তুষারশৃঙ্গ না কী বলে তা সব ছুঁচের ডগার মত। "সেখানে পতাকা পুঁতেছে। কই, হাত দিন! লীলা থেমে উঠে বলেছিল, থাক। ব্রীজ শেষ হলে ওঠা যাবে। আমাকে আবার একবার প্রেসে যেতে হবে। বাইণ্ডারদের টাকা দিতে হবে নাকি, রমা বলছিল।

লীলার মুখটা বুঝি অসম্ভব লাল দেখেছিল অহীন। ফেরার পথে দুম করে বলে উঠেছিল, আজকাল বুঝি আর ক্রীম মাখেন না লীলাদি? আপনার গাল ফেটেছে দেখেছেন?

লীলা আলগোছে গালে হাত বুলিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে সেই লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করছিল। জবাব দেয় নি কথাটার। লোকটার গায়ে কি পাঞ্জাবী, না শার্ট?

প্রেসে ফিরে গিয়ে সে এক কাণ্ড। ফেল্টুবাবু রমার সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে গল্প জুড়েছে। অহীনকে দেখেই সোজা জানিয়ে দিল, ডোণ্ট ডিসটার্ব। আমি রমাকে একটা প্ল্যান দিচ্ছি। বসুন মিস ঘোষ। বরং আপনাকেই আগাগোড়া সবটা বলি। ফাইন্যান্সার তো আপনিই।

শুধু ওখানেই ক্ষান্ত হয় নি ফেল্টু-বাবু। লীলার বাসায় এসে যথারীতি দশটা অব্দি কাটিয়ে অহীনের টানাটানিতে শেষে উঠেছিল। ভদ্রলোক অতগুলো টাকা পেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। সাহু-মশাইরা একটা আধা-বিলিতী ধাঁচে বার খুলেছেন ওদিকে। বারে লোক মন্দ জোটে না। নতুন নতুন মুখ সব। তাদের সবাইকে নাকি একদিন খাইয়ে ফেলেছে ফেল্টুবাবু। অহীন সঙ্গে ছিল। হাত ধরে টানাটানি করেও রুখতে পারে নি। দু-চার পাত্র পেটে পড়ার পর তখন ফেল্টুবাবু স্বয়ং বাংলা-বেহার উড়িষ্যার মহান নবাব। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল—এভরি বডি অন মাই একাউণ্ট। পকেট থেকে মুঠো-মুঠো দশ টাকার নোট বের করে সাহু-মশায়ের হাতে গুঁজে দিচ্ছিল।

ও টাকা তো লীলার। লীলার কেন, লীলার মায়ের। তার বাবার। ওই টাকার সঙ্গে কয়েক পুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রূপপুর মাঠের সোনাফলানো সব জমি। কত অভাগা চাষাভুষোর অশ্রুতে ভেজা মাটির টুকরো। কত গৃহস্থ বধূর অলঙ্কার—কে জানে, অনেক ভালবাসা, দুঃখ, দাবী আর কান্নার স্পর্শে করুণ; ঘোষ-বাড়ির লোহার সিন্দুকে বন্ধকী কবালায় কত সব বিচিত্র ইতিহাস লেখা ছিল? হতভাগিনী মেয়ে এল কুলনাশিনী। সব ভাঙল। উন্মূল হল কতদিনের পুরনো গাছ!

সজল নিঃশব্দে গভীর দুঃখ আর হয়ত ঘৃণা নিয়ে ফিরে গেছে রূপপুর। এই শীতে সব জমি থেকে ফসল উঠছে। গ্রামের মানুষের চোখে শীতের সোনালী রোদে-ভরা পৃথিবী স্বর্গের প্রত্যাশায় পূর্ণ। সব-টুকুই বেচে দিলে লীলা? পা রাখবার এক বিন্দু মাটিও রাখলে না!

লীলা যখন ভাঙে, এমনি করেই নির্বিকার মুখে মুচড়ে দুমড়ে ভাঙে। পৃথিবী এক দিকে, সে আর দিকে। সে যেন সবকিছু ভাঙতেই এসেছে, গড়ার দায়িত্ব তার নয়। নিষ্ঠুর রাক্ষসীর মত তাকায় চার পাশে...কিন্তু এর পর? এর পর আর কী রইল তোমার লীলা? কী ভাঙবে আর দুটো বাড়ি, একটা প্রেস, ব্যস! যদি তা এমনি করে ভেঙে ফেল, কী হবে তোম ভেবেছ?

ও রঘুপণ্ডিতের ছেলে। ওর চালচল মুখের কথায় এই সব পাণ্ডিত্য আ বিস্তর। কথা বললে থামতে চায় ন উপদেশ দিতে নামলে ওকে সামল কঠিন। প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী ক সজল। তার অবশ্য কোনরকমে চলে যাবে সম্প্রতি একটা ফালতো বোঝা কাঁধে চেপে —বাসিনী। একা বাসিনী হলেও কথা ছিল তার কোলে রানীচকের জামাইবাবুর রোগ পটকা বাচ্চাটা। সজলের বড় ঝামেলা। কি উপায় কী? বাসিনীর মুখের দিকে তাকি দায় কাঁধে নিয়েছে।

লীলা বাসিনীর দরুন মাসে মাসে টা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সজল হাঁ-ন কিছুই জবাব দেয় নি। হয়ত এসব ক বলার পিছনে তার এই মতলবটাই ছিল বুদ্ধিমতী লীলা সেটা আঁচ করে নি মুখেই তুলেছিল কথাটা। কাছে দেবার ম টাকা থাকলে তখনই দিয়ে ফেলত, ছিল না ব্যাঙ্কেও আমানতের অঙ্ক চড়ায় ঠেকেছে এখন শুধু প্রেস ভরসা।

কিন্তু বুড়িটা যার জারজ ছেলেকে নিয়ে মেতে উঠল—এ রাগ পড়তে চায় না ভাবলে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলে ভেবেছ তোমায় টাকা পাঠাব? কক্ষনো না। যেদিন শুনব, ও আপদ বিদেয় করেছ, সেদিন। এখন নয়।

আজ অব্দি টাকা পাঠায় নি লীলা। বাসিনী লোক পাঠাক, তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু লোক পাঠাল কই বাসিনী? রাগের ঝোঁকে কাপড়-চোপড় যা ফেলে গিয়ে-ছিল, সজলের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘণ্টার গুলোও দিয়েছে। ঘণ্টা তার মায়ের কাছে থাকে। শীগগীর নাকি বিয়ে করে ফেলছে সে। রূপপুরে থাকলে সব খরচ দান-ধ্যান যা দরকার, লীলাকেই দিতে হত। খুব বাঁচা গেছে বাবা! এখন নিজের দিকেই আঁটোসাঁটো হয়ে আসছে সব—আসুক। কত দূর ডুববে? তল অব্দি দেখা যাবে না হয়। জীবনে মাঝামাঝি নামে কোন জায়গায় থেকে গায়ের জ্বালা মেটে না। হয় এপার, নয় ওপার।......

এমনি করে একটা অন্ধ প্রচণ্ড মারাত্মক শক্তি লীলাকে টেনে নিয়ে চলেছে কোথায়—আবছা বোঝবার মত বয়স আর মানসিক পরিণতি লীলার হয়েছে। আর সে সে-ভয়ে সে-হতাশায় ভীত থাকে না। এখন লীলার ভয়, অন্য ভয়। ভূতের ভয়। কে নাম ধরে ডাকে। কে বলে, খুব হয়েছে, ফেরো লক্ষ্মীটি। পাগলামি ভালো হয়েছে জানতে পারা সবচেয়ে মারাত্মক। পাগলরা তখনই নাকি সবচেয়ে ভয়ানক হয়ে ওঠে। রানীচকে মোহিনীবাবুর কাচ মেয়ের ওপর হামলা করে ওদিকে আর পা বাড়ানোর সাহস নেই লোকটার। হয়ত এত দিনে সে একতলা ছোট্ট বাড়ির উঠোনে আগাছা গজিয়েছে। সাপ চলে। শেয়াল এসে দাঁড়িয়ে থাকে। শিউলি-তলার পাশে টিউবকলটা ডুবে গেছে ঝোপে-

...ড়। চামচিকের বাসা, চড়ুইয়ের বাসা। ...রবেলা ইঁদুরে ছোটাছুটি করে। ঘুমুদেব ...ওয়া খাটের নীচে ঘুণপোকার শব্দ ওঠে ...র রাত। দেয়ালের কোণে গোখরোর ...লস। মাঝরাতে ফণার ছায়া স্যাঁ করে ...হলে পড়ে ইঁদুরের দিকে।......

রমা, রমা, শুনছ? এই?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লীলার ঘুম ভেঙেছে। প্রচণ্ড জোরে চুল খামচে ধরেছে রমার। রমা চোখ খুলেই দেখেছে, ঘরভরা উজ্জ্বল আলো। কী হয়েছে?

আমার বড্ড গা কাঁপছে।

রমা জড়িয়ে ধরেছে নিবিড়ভাবে।... ...স। এবার চুপচাপ ঘুমোন তো।

তারপর সকাল হলে ফের সেই সপ্রতিভ ...জিত আচরণ. প্রতিদিনের লীলা ফিরে এসে সংসারের খবরদারী করে। রাত এলেই মুখ শুকিয়ে যায়। ঘুম হারায়। আর ভাবনা ভাবনা ভাবনা, ছাই-পাঁশ হাতী-ঘোড়া অনাছিষ্টি মাথামুণ্ডহীন!

লীলা জেগে থেকে ইদানীং একটা ...ছিরি ব্যাপার করছে. জানতে পারলে, রমা ...ত শুতেই চাইত না। ভাগ্যিস ও বড্ড ঘুমকাতুরে। ওর অপরাধ নেই। সারাটি দিন—তারপর রাত নটা-দশটা অব্দি যা খাটছে, ঘুম খুবই স্বাভাবিক। ও ঘুমোলেই কাপড়-চোপড় অসম্বৃত হয়ে যায়। তখন লীলা যেন তার ভাবনার চাপ থেকে বাঁচতে পলেয়েস্টারের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে, ...টু লেপ তুলে, রমার দেহ খুঁটিয়ে দেখে। ...র কথা, বাসিনী এমনি করে ঘুমন্ত কিশোরী লীলাকে দেখত। লীলার বরাবরই ঘুম পাতলা। জেগে উঠেই দেখত ওই বিশ্রী কাণ্ড। বাসিনীর কৌতূহলী ...ন্ত চোখ থেকে যেন ভাপ বেরোচ্ছে। লীলা চেঁচামেচি করত। বাসিনী একটু হেসে বলত কিছু না। তোমার বয়স দেখছি বাছা। সবার দেখে মা-মাসিরা। দেখতে হয়।

রমার মধ্যে পুরুষালি একটা ভাব রয়েছে, তা তার দেহের মধ্যেও যেন ছায়া ফেলেছে। পরক্ষণে লীলা নিজের প্রতি ঘৃণায় কটু হয়ে ওঠে। সে কি বাসিনীদের মত বুড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ? কেন এ অশালীন কৌতূহল?

অভ্যাসটা কতদূর এগোতে কে জানে, ঘুচল অবশেষে। ফেন্টুবাবুর সতীর এক বোনঝি দুলি- অহীন তাকে সঙ্গে করে এনে সঁপে দিল লীলার হাতে। দুলির বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে—সে লোকটা কাকে নিয়ে সুখেনবাবুর মত কলকাতা পালিয়েছে। কোন পাত্তা নেই। তবে দুলি বাবুবাড়ি কাজকর্ম করেই মানুষ হয়েছে। রান্না-বান্নাতেও পটু—অবশ্যি যদি এনাদের রুচিতে না বাধে।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী—হাতের কাজ-কর্মও ছিমছাম পরিষ্কার। ভালোই লাগল লীলার। বিশ্বাসী না হয়ে উপায় নেই। সতীমাসির ঘুপটি ঘরে তার ঠাঁই হয় না। তার ওপর আছে হাজারজনা ইতর গুণ্ডার চোখ। বরং বড়লোকের বাড়ি নিরাপদে থাকবে।

অহীনের দ্বিতীয় বক্তব্য হল, রমার জন্যে মা বকাবকি করেন। দিন-রাত্তির কোথায় থাকে, কী করে—কোন খবর নেই। তার ওপর কে দেখেছে নাকি এখানে ফেন্টু-বাবু আসেন। মায়ের কানে তুলেছে। সুতরাং মা বলছেন, ওর চাকরীতে দরকার নেই। অহীনের মত যোগ্য ছেলে থাকতে তাঁর মেয়ে একটা নচ্ছার জায়গায় পড়ে কী বিপদ বাধাবে—সেটা কি ঠিক হবে?

রমা ছিল না তখন। এসময় তার এখানে থাকবার কথা নয়। কিন্তু অহীনের নিঃসংকোচ কথাগুলো শুনতে শুনতে লীলা রাগে জ্বলে উঠেছিল। আশ্চর্য ভদ্রমহিলা তো! মুখে এক ভিতরে অন্য! তবে রাগ করা সম্ভব হল না শেষ অব্দি। কারণ কথাগুলো পাচার করে এনেছে তাঁর ছেলে।

লীলা বলল, এসব কথা আবার রমার কানে তুলো না। ও রেগে-মেগে কী সব করে বসবে। আর আমি একা-একা চোখে সর্ষের ফুল দেখব।

অহীন বলল, কেন? আমিও তো রয়েছি। রামের ছোট ভাইয়ের নাম কী ছিল যেন......

লীলা সকৌতুকে বলল, রাম মরেছে। এখন শুধু সীতা আর লক্ষ্মণ বাকি রইল।

নিজেকে সীতা ভাবতে খুব ভালো লাগছে বুঝি? রোমাঞ্চ হচ্ছে?

লাগছে বৈকি।

ঠিক আছে। গণ্ডী টেনে দিন। পাহারায় রইলাম। কিন্তু সাবধান—রাবণ আছে। সে বড় মায়াবী স্কাউণ্ড্রেল।

লীলা একটু ঝুঁকে ওর হাতের চেটো নিল। নখের আঁচড় কেটে বলল, তাহলে আজ থেকে তুমি শুচ্ছ এখানে।

অহীন হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, সুড়-সুড়ি লাগছে। কিন্তু খাওয়াটা কি মায়ের হোটেলে সেরে আসতে হবে নাকি? একে তো মা কেন জানি না চটে আগুন হয়ে থাকেন আজকাল—তার ওপর যদি শোনেন, এখানে শুচ্ছি...

কেন? চরিত্র নষ্ট হবে?

লীলা এমন ভঙ্গীতে কথাটা বলল যে, অহীন কয়েক মুহূর্ত থ বনে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। এতদিন লীলাদির সঙ্গে মিশছে। ঠাট্টা-ইয়ারকিও কিছু না হয়েছে, এমন নয়। অথচ আজ এই প্রশ্নটায় কী যেন আছে—তা অশালীন হয়ত নয়, কিন্তু লীলাদির পক্ষে এটা এক অস্বাভাবিক স্পষ্টতা। ভিতরে খুব মারাত্মক জোর না থাকলে এমন সোজাসুজি কথা কাকেও বলা যায় না সম্ভবত।

অহীন হাড়ে-হাড়ে জানে, লীলা সতী-সাধ্বী মেয়ে নয়। বুঝতে পারে এক মারাত্মক সর্বনাশা আগুনের পাশে তার বাস। অন্তত এই তার ধারণা। আর অহীনও খুব একটা সাধুসন্ত প্রকৃতির নয়—মুখে যাই বলুক।

অথচ লীলার মধ্যে কী যেন আছে—হয়ত তা অসহায়তা, করুণার প্রত্যাশা, কিম্বা কোন একটা দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ ক্ষমতা। তা না হলে কেন সে তার সঙ্গ ছাড়তে পারে না। বরং ভালোই লাগে মেলামেশাটা। নিজের মনে কোন গোপন অভিসন্ধি আছে বলে কোনদিন তো টের পায় না। তা যদি টের পেত, হয়ত বলে......

নাঃ। এ একটা অভ্যাস। শুধু অভ্যাস। সেই যেরাতে লীলার সঙ্গে তার বাড়ি এসেছিল একই রিকসোয়, পরদিন ভোরে জগদীশের দোকানের সামনে বস্তা চোরাই মাল ফেলে গেল, সেটা অহীনেরই পরামর্শ—আর সেই রাত থেকে লীলাকে তার ভীষণ ভালো লেগে গেল—সবকিছু খুঁটিয়ে বিচার করলে অবশ্য সন্দেহে মন স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। লীলা অসাধারণ সুন্দরী—জেদী আর একটু বন্য প্রকৃতির—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা রোমান্সেরই কাছ ঘেঁষে যায়। তাহলেও অহীনের কাছে লীলা যেন এক ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের জিনিস। বয়স, মানসিক দূরত্ব—হিসেব করলে কত কী মাথামুণ্ডু কৈফিয়ৎ পিলপিল করে পথ আগলে দাঁড়াবে। দেহটা হয়ত সব—কিন্তু সবসময় সব নয়। দেহের ভিতর যেন বা একটা মায়া-দেহের অস্তিত্ব টের পেয়েই সরল প্রেম ঘোরালো হয়ে ওঠে। জটছাড়ানো কঠিন হয়।

লীলা দুষ্ট-দুষ্টু হেসে ফের প্রশ্ন ছুঁড়ল, কী খোকাবাবু, খাবি খাচ্ছ জবাব দিতে? আমার কিন্তু লজ্জাটজ্জা নেই। জানোই তো আমি কী......

অহীন গম্ভীর মুখে বলল, দেখুন, চরিত্র-টরিত্র ওসব থাকে বাবা-মায়েদের। আমরা যারা এখনও ছেলেপুলে হয়ে আছি, তাদের আবার ওসব কী!

নির্লজ্জ ভঙ্গীতে লীলা মন্তব্য করল, তা বৈকি। তুমি তো খুকুসোনা। গাল টিপলে দুধ বেরোয়...যাও, ফাজিল কোথাকার।

অহীন হাসল না। বেরিয়ে গেল। যাবার পথে বলে গেল, দুলি, চললাম রে। তোর মাসিকে আসতে বলব'খন।

বিকেলে প্রেসে যেতে রমা জানাল, একটা কথা বলছিলাম লীলাদি। মা বলছেন......

সে তো আগেই শুনেছে লীলা। কথা কেড়ে বলল, তাতে কী। তুমি আজ থেকে বাড়িতেই শোবে। দুলি নামে মেয়েটা আমার কাছে থাকছে। আর অহীন রয়েছে। বাইরের ঘরটা খালি পড়ে থাকে।

রমা মুখ নামিয়ে বলল, মা জানতে পারলে হয়ত আপত্তি করবেন। বরং......

বরং কী? লোক দেবে? লীলা হেসে উঠল। আজ মন যেন কোন কটুতকেই স্পর্শ করছে না।

কেন, তাতে অসুবিধে কী? আমাদের নতুন দারোয়ান রয়েছে। সে এখানে না শুয়ে ঘরটার মত আপনার ওখানেই থাক। সকালে এসে প্রেস খুলবে।

কে, ওই বাহাদুর? তাহলেই হয়েছে। ওর ভেজালি দেখে আমিই ভিরমি খাই। কোত্থেকে কী সব জোটাচ্ছ তুমি। থাক বাবা, ওতে আমার দরকার নেই। এখানে এত সব মেসিনপত্তর রয়েছে—ওকে যে কাজে রাখা হয়েছে, সেকাজেই থাক।

লীলা উঠল। রমা একদৃষ্টে [illegible] শুনে বলল, এগুলো সই করুন

বিজ্ঞানের কথা

অধ্যাপক [illegible]

রসায়ণ শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৮ সালে বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়েই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এমন নজির ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটে নি। যে পাঁচজন মার্কিন বিজ্ঞানী এবার বিজ্ঞানের তিনটি শাখায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে দুজন অবশ্য জন্মসূত্রে অন্য দেশের সন্তান। একজন হলেন ভারতের ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা এবং অপরজন নরওয়ের অধ্যাপক লারস অনসেজার। ডঃ খোরানাকে শারীরতত্ত্ব ও ভেষজ বিজ্ঞানে এবং ডঃ অনসেজারকে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৬৪ বছর আগে নরওয়ের রাজধানী অসলো শহরে অনসেজারের জন্ম। ১৯২৮ সালে তিনি জন্মভূমি ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন এবং ১৯৪৫ সালে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার পর থেকে তিনি বরাবর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং বর্তমানে এই বিভাগের উইলার্ড গিবস অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত। রসায়নশাস্ত্রে যে বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক অনসেজারকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে তাপ-গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি মৌলিক সূত্র যা 'অনসেজার বিপরীত সম্পর্ক' নামে অভিহিত। সুইডিশ অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাপত্রে অধ্যাপক অনসেজার সম্বন্ধে বলেছেন, তত্ত্বীয় তাপ-গতিবিদ্যার বিকাশে তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে অপরিবর্তনীয় পদ্ধতির অনুসন্ধানে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন।

অধ্যাপক অনসেজার ৪০ বছরের অধিককাল ভৌত রসায়নের তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য দ্রবণ সম্পর্কিত গবেষণায় নিবিড়ভাবে ব্যাপৃত আছেন। তাঁর তাপ-গতিবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণা যদিও মৌলিকত্বের দিক থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যার দিক থেকে পূর্বোক্ত বিষয়ের তুলনায় তা নগণ্যই বলা চলে। বস্তুত, তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য দ্রবণের গবেষণা থেকেই তিনি তাপ-গতিবিদ্যা গবেষণার প্রেরণা লাভ করেন।

১৯২৬ সালে জার্মানীতে গবেষণাকালে অনসেজার তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য দ্রবণের তড়িৎ-পরিবাহিতা সম্পর্কে তাঁর প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে অস্টওয়াল্ড, আরেনিয়াস, নার্ন্‌স্ট, কোলরাশ প্রমুখ দিকপাল বিজ্ঞানীরা তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য দ্রবণ সম্পর্কে [illegible] পরবর্তীকালে [illegible], ডিবাই, [illegible] প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য দ্রবণের ধর্মাবলী সম্পর্কে নানা তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করেন। তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য দ্রবণের পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় পদ্ধতির উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সাধারণ সূত্র সর্বপ্রথম প্রদান করেন ডিবাই ১৯২৩ সালে। অনসেজার ১৯২৬ সালে তাঁর গবেষণা নিবন্ধে দেখান, ডিবাই-হুকেলের এই তত্ত্বে কিছু ত্রুটি আছে এবং কিভাবে এই তত্ত্বের সংশোধিত রূপ দেওয়া যায়। অনসেজারের এই গবেষণা সকল ভৌত-রসায়নবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ডিবাই স্বয়ং এই সংশোধনের প্রশংসা করেন।

তাপ-গতিবিদ্যার দিক থেকে অপরিবর্তনীয় পদ্ধতির তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনসেজারের নিবন্ধ ১৯২৯ সালে নরওয়ের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩১-৩২ সালে 'ফিজিক্যাল রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি নিবন্ধে তিনি এর বিশদ ব্যাখ্যা দেন। অনসেজারের এই গবেষণার গুরুত্ব ও উপযোগিতা পরবর্তীকালে বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং একাধিক বিজ্ঞানীর অনসেজার তত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় তা প্রকাশ পায়। তাই এ বছর অধ্যাপক অনসেজারকে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রদান করায় যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক

ভূগোল কংগ্রেস

আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশন এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে দিল্লীতে। গত ১ ডিসেম্বর নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান-ভবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এশিয়ার ভূখণ্ডে আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসের অধিবেশন এই সর্বপ্রথম। ৭৫টি দেশ থেকে ১৭০০ জন ভূগোলবিদ এতে যোগদান করেন এবং মূল সভাপতির পদে অভ্যাগতদের বরণ করা হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস.

সুমনা যাবে না ওখানে, আর কোনদিন
না। এটাই ঠিক ছিল। তাই তিল তিল করে
নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল সেই রকম
ভাবেই। আর নিজের প্রতিদিনের সময়কে
সেইভাবেই ভাগ করতে পেরেছিল। তারপর
সেই সময়কে ভেঙে টুকরো টুকরো করে
খরচ করত সেতারের আলাপের মত করে।
তার যেন আর ছিঁড়তে না পারে অথবা
সুরেলা সুরে গান যেন আর না থামে।
কলেজের অধ্যাপনা, কিছুক্ষণ বন্ধুদের
সঙ্গে হৈহুল্লা হয় কফি হাউসে না হয়
বন্ধুদের কারো বাড়ীতে এবং সব শেষে
সুরেশ্বরের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ।

এইভাবেই সুমনার দিনরাত্রির পাখীর
মত উড়াল দিত। কোন ক্লান্তি নেই, কোন
দুঃখ নেই আর। সবই কেমন সয়ে এসেছিল।
সুমনার দিন যদি শেষ হত, আনন্দের দিন
আসতে আর বাকি কোথায়? কলেজের
অধ্যাপনায় তাই কোন কামাই ছিল না। আর
বন্ধুদের সঙ্গে হৈহুল্লায় সুমনাই ত আসর
মাতিয়ে রাখত। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে,
নির্দিষ্ট করা কোন জায়গায় সুরেশ্বরের
সাক্ষাৎ মিলত। এমনও হয়েছে, কোন কোন
দিন সুমনাই আগে এসে গেছে অথচ
সুরেশ্বরের দেখা নেই। কিন্তু সুরেশ্বরের
সেদিনই আগে আসার কথা। এবং চিহ্নিত
সেই স্থানে অপেক্ষা করার কথা। কারণ
সুমনার কাজের যে সব ফিরিস্তি দেওয়া
ছিল তাতে করে সুমনাই দেরী করবে
এটাই ঠিক ছিল সেদিনের মত। কিন্তু হয়ে
গেল উল্টোটা। আগে এল সুমনা কিন্তু
সুরেশ্বর কোথায়? ধৈর্য নামক শব্দটা
যখন অধৈর্যে রূপান্তর নিচ্ছে, তখন ঠিক
তখন সুরেশ্বরের হাসি হাসি মুখটা
কতগুলো জোনাকির মত সুমনার চোখের
সামনে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে
লাগল।

'কি, কতক্ষণ?' স্রোতের মুখে যেমন
নুড়ি পাথর ভেসে যায় তেমনি একমুখ
হাসির মধ্যেও এই কথাগুলো ভেসে বেড়াল!
হাত বাড়াল সুরেশ্বর।

রূপান্তরিত অধৈর্য যা এতক্ষণ সুমনার
চারদিকে বর্মের মত অভেদ্য ছিল তাও
সামান্য এই কথা দুটোর আঘাতে কেমন
ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর ঢেউ যেমন
পাড়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তেমনি
ভেঙে যেতে চাইল সুমনা।... 'হ্যাঁ,
অনেকক্ষণ।'

'অনেক দেরী হয়ে গেল, তাই নয়?'

বিকেলের শেষ আলোর সবটুকু পশ্চিম
দিকের আকাশে তখনও। সেই আলোর
মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সুরেশ্বরকে কেন যেন
অনেক বড় বলে মনে হচ্ছিল সুমনার। তাই
সুমনা আরও তাকিয়ে থাকতে চেয়েছিল
সুরেশ্বরের মুখের দিকে।

'কি দেখছ? খুবই দেরী করে ফেলেছি,
না?' একটা কৈফিয়তের মিনতি যেন হতে
চাইল সুরেশ্বর। বাস্তবও মানুষকে সুন্দর
করে। বাস্তব মানুষ সুরেশ্বর এখন তাই
অনেক বেশী সুন্দর।

'হ্যাঁ, অনেক।' ছোট্ট উত্তর [illegible]
নিয়েছে সুমনা। কারণ সুরেশ্বরের [illegible]

দিকে তাকিয়ে থাকলে কোন অর্থই খ'ুজে পায় না আর নতুন করে। একটা সুন্দর পুরুষকেই শুধু খ'ুজে পায়।

'এত দেরী করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তবু দেরী হয়ে গেল—' কৈফিয়ৎটা তখনও ঠিক কেবলিভাবেই সুরেশ্বরের মুখের ভেতর নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল। এই মুহূর্তে সেটা হয়ত মুখোমুখী হতে চাইছে সুমনার। কথাগুলো কথার সহযোগে একটা রূপ পেতে চাইছে। তাই বলতে পেরেছে সুরেশ্বর আবার, 'হ্যাঁ, দেরী হয়ে গেল—'

'হোক। চল।' সুরেশ্বরের প্রসারিত হাতের মাঝে যে পরম নির্ভরতা লুকিয়ে আছে তাকেই পেতে চাইল সুমনা। অনেক ঘনিষ্ঠ করে। তাই হাতে হাত সুরেশ্বরের। স্পর্শ দিয়ে আর এক স্পর্শকে পেতে চাইল সুমনা। নিবিড় করে সেই স্পর্শ শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইল। এ স্পর্শে যে সুখ অনেক।

'কোথায় যাবে?'

'তোমার যেখানে ইচ্ছে।'

'আর তোমার কোন ইচ্ছে নেই?'

'আছেই।'

'কি?'

'আমি শুধু তোমার ইচ্ছে এখন আমার [illegible]' [illegible] নেন সুমনা। এই [illegible] তাকে [illegible] দিয়ে [illegible] সুরেশ্বরকে একটা [illegible]- [illegible] আর কিছুই ভাবতে পারেনি সুমনা।

[illegible] সরবী কুন্তলার [illegible] না পিসতুত দাদা এই সুরেশ্বর। [illegible] বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য— পুরুষের সব কটা লক্ষণ সুরেশ্বরকে দেখার [illegible] দিনেই সুমনার নজরে পড়েছিল।

কুন্তলাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, '[illegible] দাদা সুরেশ্বর রায়, একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার। নেশা শিকার করা। এবং এ [illegible] বন্ধু সুমনা, আমরা একই কলেজে অধ্যাপনার কাজ করি।'

'নমস্কার।' সুমনা বলেছিল।

সুরেশ্বরও হাত জোড় করেছিল এবং বলেছিল, 'নমস্কার।' [illegible] বন্দুক [illegible] মত করে হাত দুটো [illegible] করেছিল সুরেশ্বর। তারপর আরও বলেছিল, 'ওর কথা যেন বিশ্বাস করবেন না, আমি মোটেই শিকারী নই। বন্দুক একটা আছে বটে, বন্দুকে [illegible] ঘুরে বেড়াই অবশ্য কিন্তু কি শিকার করি?' থেমেছিল সুরেশ্বর।

সুমনা তখনও তাকিয়ে আছে সুরেশ্বরের দিকে। কেমন যেন নতুন একজন মানুষকে দেখছে। সব পুরুষ থেকেও ভিন্ন এই পুরুষ। যে অনেক কিছু শিকার করে— তাই সুরেশ্বরের শরীরের পেশীর দৃঢ়তা [illegible] সুমনাকে মুগ্ধ করছিল। আনন্দ দিচ্ছিল।

কুন্তলাই এক সময় বলেছিল, 'বোস তোরা আমি চা করে নিয়ে আসি।'

আপত্তি করেছিল সুমনা, 'কি দরকার [illegible] এ [illegible]—এই ত' খেয়ে [illegible]।'

সুরেশ্বরও বলেছিল, 'থাক না কুন্তি, আমিও খেয়ে এসেছিরে—'

কুন্তলা বলল, 'তা হোক, তুই এসেছিস, সুরেশ্বরদা এসেছেন।'

কুন্তলার কথাকে বাধা দিয়ে সুমনা আবার বলেছিল, 'বোস না, তার চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করা যাক।' সুমনা সুরেশ্বরের উপস্থিতিকে আরও বেশী করে চাইছিল।

এটা বুঝেই কুন্তলা বলেছিল, 'তোরা দুজনে গল্প কর না ততক্ষণ, আলাপ, এখন হয়ে গেল।' একরকম জোর করে ঘর ছেড়ে চলে গেল কুন্তলা।

কি আলাপ করবে সুমনা? এক ঘরে, সুরেশ্বরের প্রতি মুগ্ধ থাকলেও কথা বলার স্বতঃস্ফূর্তটাকে কোথায় খ'ুজে পাবে এখন? তাই বারে বারে তাকিয়েছে সুরেশ্বরের মুখের দিকে আর চোখে চোখ পড়বার আগেই নামিয়ে নিয়েছে।

সুমনার এই অসহায়তাকে লক্ষ্য করেছে সুরেশ্বর। আর ঘরের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে থাকা নিস্তব্ধতাকে ভাঙতে চেয়ে চুরুটের আগুন জ্বালতে চেয়েছে। আগুন জ্বালার সময়ে দেশলাইয়ের কাঠি ঘসার সমস্কার খস্-স্-স্ শব্দটা কতক্ষণ এই নিস্তব্ধতার মধ্যে জেগে থেকেছে। তারপর হয়ত সত্যি সত্যি ঘরের নিস্তব্ধতাকে ভাঙতে পেরেছে, তখন বলতে চেয়েছে, 'আপনাকে এর আগে এখানে কোনদিন ত' দেখিনি?' আলাপের ঘরের জানালায় মুখ বাড়িয়েছে সুরেশ্বর।

আবার তাকিয়েছে সুমনা [illegible]রেশ্বরের দিকে। এতক্ষণের দম আটকানো সময়কে নিয়ে আর কি করবে, ভেবে না পেয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ এসেছি কিন্তু দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে।'

'তা হবে।' চুরুট টানা বন্ধ রেখে আরও বলেছে সুরেশ্বর, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালই হল।'

'কেন?' হঠাৎ নিজের প্রশ্নে নিজেই অবাক সুমনা।

সুরেশ্বরও শুনেছে সুমনার কথা। জবাবটা দিতে পারল না যেন। শুধু চুরুটের মুখের আগুনটাকে নিয়ে সময় কাটালো।

আবার সেই নিস্তব্ধ মুহূর্তটা ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারল। সুরেশ্বর আর সুমনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলল।

সেই সময় ঘরে ঢুকল কুন্তলা। চায়ের কাপ দুটো দুজনের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে সুমনাকে বলল, 'কিরে তোদের আলাপ হল?'

মাথা নেড়েছে সুমনা। চায়ের কাপটা তুলে নিয়েছে হাতে।

'কি আলাপ হল বল না?' সুমনার মুখোমুখি বসতে চেয়েছে কুন্তলা।

'তুই ত আজকাল বেশ ফাজিল হয়েছিস কুন্তি।' ওদিক থেকে তখন সুরেশ্বর বলেছিল।

কেমন যেন বেঁচে গেল সুমনা। যা বলতে ফেলেছিল কুন্তলা—কেন যেন ভাল লাগল সুরেশ্বরকে আবার। তাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে সুমনা আবার তাকাল সুরেশ্বরের দিকে। চা খাওয়া শেষ করে সুরেশ্বর চুরুটের ধোঁয়া নিয়ে খেলা করছিল।

এর পরেও সুমনা আরও করে[illegible] সুরেশ্বরের মুখোমুখি হয়েছে। কুন্তলাদের বাড়ী না হয় কোন রাস্[illegible] রাস্তাতেই দেখা হয়েছিল। দুজনেই এ[illegible] এসেছিল তখন।

'কেমন আছেন?' সুমনাই হয়ত খুলেছে প্রথমে।

চুরুটে আগুন জ্বালিয়েছে সুরে[illegible] তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে চে[illegible] 'বড় কঠিন প্রশ্ন। কি জবাব দেই বলুন' সুমনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে [illegible] ধোঁয়া ছাড়ছিল সুরেশ্বর।

লজ্জা পেয়েছিল সুমনা। মুখের[illegible] পাল্টাচ্ছিল। এমন একটা কথা শুরু [illegible] জন্য যে এত অসুবিধায় পড়তে হবে [illegible] জানতে পারলে কথাই শুরু কর[illegible] সুমনা। সুরেশ্বরের মুখ থেকেই প্রথম [illegible] শুনত। কিন্তু এখন কি জবাব [illegible] সুমনা? এই ভাবনাটাই সুমনাকে [illegible] বেশী লজ্জা দিল। সুমনার মুখকে [illegible] বেশী রঙচঙে করে তুলল।

'খুব যেন অসুবিধায় পড়েছেন দেখ[illegible] মুখের সামনে ধোঁয়ার বিস্তার থাক[illegible] সুমনার আরক্তিম মুখটা অনেক [illegible] স্পষ্ট।

'না, তা কেন?' সহজ হবার [illegible] করেছে সুমনা।

'কোথায় চলেছেন?' সুরেশ্বর [illegible] প্রসঙ্গ এনে পরিস্থিতিটাকে আবার [illegible] করে শুরু করতে চাইল।

'এখনও ঠিক নেই। ক্লাস শেষ করে বেরিয়েছি, কফি হাউসে যেতে পারি [illegible] কুন্তলাদের ওখানে।' অনেক সহজ [illegible] সুমনা।

'একটা কথা বলব, যদি অভয় দে[illegible] বলি।'

'বলুন না।' অভয় দিয়েছিল সুমনা

'কফি হাউসেই চলুন।'

'কিন্তু কুন্তলা—ওর ত এখনও [illegible] ক্লাস বাকী।'

'তা হোক, যদি আপত্তি থাকে [illegible] করব না।' সুরেশ্বর এখন বিনয়ীর ভূমি[illegible] নিতে চেয়েছে।

সুরেশ্বরের সঙ্গে আলাপের প্রথম [illegible] থেকে, সুরেশ্বর কেমন করে যেন সুম[illegible] মনে ছবি আঁকতে পেরেছিল। এই [illegible] প্রথমে কয়েকটি রেখা পরে ক্রমশ সেই [illegible] গুলোই একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের [illegible] নিয়েছিল। সুরেশ্বরের পুরো রূপটাই [illegible] পর্যন্ত ধরা পড়েছিল সুমনার [illegible] আয়নায়। অথচ গত তিন বছর কিম্বা তা[illegible] বেশী সুমনা প্রথমে একটি পুরুষ তারপ[illegible] আস্তে আস্তে সমগ্র পুরুষজাতটাকে [illegible] করতে শিখেছিল। এই ঘৃণাটাই পরবর্ত[illegible] কালে সুমনাকে পুরুষবিদ্বেষী [illegible] তুলেছিল। প্রথমে যে কলেজে পড়াত সুম[illegible] সেখানে [illegible] কয়েকটা [illegible] অধ্যাপক ছাড়া পুরুষ অধ্যাপকও ছি[illegible] কিন্তু কোন পুরুষের সংস্পর্শে থাকবে [illegible] বলে ওই কলেজ ছেড়ে পুরোপুরি মেয়েদে[illegible]

ছায়া পরিচালিত কলেজে শেষ পর্যন্ত চাকরী নিয়েছিল সুমনা। আর পুরুষ-বিদ্বেষী মনটা একেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তাই যেখানে যত পুরুষের সঙ্গে পরিচয় ছিল সব জায়গা থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনেছিল সুমনা। এই রকম যখন মনের অবস্থা, পুরুষবিদ্বেষী মনটা যখন এতই হয়ে ঠিক সেই সময়ে সুমনার মনের আঙিনায় সুরেশ্বরের অনুপ্রবেশ শুধু তিন বছর কেন হয়ত তারও বেশী কয়েকটা বছরের একটু একটু করে সঞ্চিত ঘৃণা মন্থনে মন্থনে বিষের বদলে অমৃতের আস্বাদন লাভ। তা না হলে এতদিনের বিদ্বেষী মনটা সেই পুরুষদের প্রতিভূ আর এক পুরুষ সুরেশ্বরের ছবি কেমন করে আঁকতে পেরেছিল? অথচ আগে ত সেখানে একমাত্র সুনন্দ ছিল. তারপর, তিন বছর কেন, তিন বছরের আগে থেকেই ঘৃণার ভ্রূণ জন্ম নিল। ধীরে ধীরে সেটা বড় হচ্ছিল, একটা আকৃতি পাবার চেষ্টা করছিল। আর সুমনা তখন বলত, 'এভাবে একসঙ্গে আর থাকা যায় না।'

'তুমি কি করতে চাও?' সুনন্দ খুব সহজ ভঙ্গীতে জানতে চেয়েছিল।

সুমনা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। সময়ের বুকে হুমড়ি খেয়ে থাকতে চেয়েছিল। এবং মনের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করছিল। বলেছিল, 'এটা ত খুব সহজ ব্যাপার. আদালতে একটা দরখাস্ত পেশ করে—' থেমেছিল সুমনা। সময়কে আবার খুঁজছিল সুমনা। সময়ের বুকে আবার মুখ লুকোতে চেয়েছে। যতটা সহজে এই উপায়কে খুঁজে পেয়েছিল সুমনা কার্যক্ষেত্রে হয়ত ততটা সহজ হচ্ছিল না। ওদের দুজনের মনের মিল না থাকলেও পাঁচ ছ' বছরের ব্যবহারিক জীবনের সমস্তাকে এত তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল সুমনার।

সুনন্দ খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'বেশ তাই হবে।' এমনিতেই কম কথা বলে সুনন্দ। ইদানীং আরও কম কথা বলছিল।

তারপর কোনদিক থেকে আপোষের কোন সূত্র কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না। ভেঙে যাওয়া মন দুটোকে আরও টুকরো টুকরো করার জন্যে চিরকালীন বিচ্ছেদের বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল, প্রথমে মনের কাছে পরে আদালতের কাছে।

সেই ঘৃণার জন্ম হয়েছিল।

তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হয়ে গেল।

কুন্তলা বলল, 'এখন কি করবিরে?'

সুমনা বলেছিল, 'তাই ত আমিও ভাবছি, কি করব এখন, কোথায় বা যাব এত তাড়াতাড়ি?'

বাইরে তখন অনেক রোদ্দুর। কয়েকটা দিনের বৃষ্টির অসহযোগিতা গরমের দাপটকে বাড়তে দিয়েছিল। রোদের তেজটা তাই আরও অসহ্য। এই রোদ্দুরে সুমনা আর কুন্তলা যেন দুটি রোদের পাখী। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে ছিল জানে না। কোথায় যাবে, কোথায় যাওয়া যায় এই ভাবনাই তখন মুখর কোন সংগীতের মত। এই সংগীতও এক সময় থেমে গেল। বাস স্টপের সামনে লম্বালম্বি ছায়া বিস্তার করে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল।

'তোরা দুটিতে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? কোথায় যাবি, আয় উঠে আয়।' গাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছিল সুরেশ্বর।

'তুমি আবার কোত্থেকে, এই সময়ে?' কুন্তলা এগিয়ে গেল গাড়ীটার দিকে। তারপর সুমনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়রে সুমনা।'

সুমনা এতক্ষণ ধরে কি ভাবছিল? কিসের প্রার্থনা করছিল? কিছু ছায়া হয়ত চেয়েছিল কিন্তু আরও কিছু? সুমনাও এগিয়ে গেল। তারপর রোদের পালক খসিয়ে বিস্তারিত ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন করল।

নিঃশব্দগতিতে আবার গাড়ীটা ছুটে চলল। আর খুচরো কিছু গরম বাতাস গাড়ীর মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক করে বেড়াল।

'তোরা দুটিতে ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলি?' গাড়ী চালাতে চালাতে সুরেশ্বর একটু আগের ঢুকে পড়া বাতাসের উপর ভাসিয়ে দিল কথাগুলো।

তখন কুন্তলা জবাব দিয়েছিল, 'তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হয়ে গেল. কি করব এখন তাই ভাবছিলাম।'

মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়েছে সুরেশ্বর, পেছনের দিকে। আর গাড়ীটা তখন এ রাস্তা ও রাস্তা করে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল, নীল ও হলুদ বাতিগুলোর মানে বুঝতে বুঝতে চৌরঙ্গীর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কোথায় যাচ্ছ দাদা?' কুন্তলা সুরেশ্বরের পিঠে হাত রেখেছে।

মুখ ফিরিয়েছে সুরেশ্বর, আবার। মিটিমিটি হেসেছে। আর চুরুটের আগুনের মুখে ছাইটাকে আরও বাড়িয়েছে।

গাড়ীটা তখন সুরেশ্বরের ইচ্ছে মত, কুন্তলার একটু আগের প্রশ্নের জবাব হয়ে চৌরঙ্গীর একটা বড় হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'নেমে পড়।' গাড়ী পার্ক করেছে সুরেশ্বর। আর চুরুটটা সেইভাবে তখনও সুরেশ্বরের মুখেই আটকে রয়েছে।

'কোথায় যাব?' কুন্তলা অবাক।

'চল কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। এই পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি আমার। এখানেই আসতাম, তবে তোদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হল।'

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলে তখন তিনজনে মুখোমুখী বসেছে। কি খাবে ওরা এখন? কি খাওয়াবে সুরেশ্বর? তিনজনেই তখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া তিনটি ফুল যেন। ভেসে ভেসে চলেছে, তবু কাছাকাছি রয়েছে।

'কি খাবিরে তোরা?' মেনু কার্ডটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সুরেশ্বর। সুমনার মুখে দৃষ্টিটা দাঁড়িয়ে রেখেছে। কুন্তলার মুখের জবাব চেয়েছে।

'আমার তেমন কিছু খাবার ইচ্ছে নেই। তোমার যা ইচ্ছে তাই তুমি খেতে পার, সারাদিন খাওনি যখন তুমি।' কুন্তলা সুমনার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলেছে।

সুমনা কি কিছু খাবে? কি খাবে? তার ত খাওয়ার কোন প্রার্থনা ছিল না। ছায়া, ছায়া চেয়েছিল সে। সেই ছায়া পেয়েছে সুমনা। তার সঙ্গে আরও পেয়েছে শরীর জুড়োবার মত কিছু ঠাণ্ডার শান্তি। তাই শরীরটাকে চেয়ারের বুকে এলিয়ে আরাম করে চোখ বুজিয়েছে শুধু।

বয় এসেছে। 'কেয়া লাঞ্চ' লায়েগা সাহাব?'

'আপনি কিছু খাবেন?' এবার কৌতুক-সুরে জানতে চেয়েছে সুরেশ্বর সুমনার কাছে।

সুমনা তখনও নীরব থেকেছে। ছায়া উপভোগ করেছে। আর তাজা শরীরে ঠাণ্ডার শান্তির প্রলেপ বুলিয়েছে।

সুরেশ্বর আবার বলেছে, 'আপনার কথাটা জানতে পারলাম না।'

'কেবল এক কাপ কফি।' অনেক পরে মুখ খুলেছে সুমনা।

'আমারও তাই।' কুন্তলাও সুমনার কথাই বলতে চেয়েছে।

সুরেশ্বর আর জোর করেনি। দু' কাপ কফি আর নিজের জন্য ডিনারের অর্ডার দিয়েছে।

সেলাম জানিয়ে বয়টা চলে গেল।

আবার কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঠাণ্ডা সময়ের বুকে তিনটে মানুষের মুখোমুখী প্রতীক্ষা কি বিলম্বিত লয়ের কোন রাগ-রাগিণী?

খাবার এসেছে। কফি এসেছে।

কফির পেয়ালা দুটো সুমনা কুন্তলার সামনে দিয়ে খাবারের প্লেট টেনে নিয়েছে সুরেশ্বর। 'আমি শুরু করলাম—' সুরেশ্বর বলতে চেয়েছে। যে কথা সেই কাজ। সুরেশ্বর এতই ক্ষুধার্ত ছিল, কারো দিকে

আর না তাকিয়ে একমনে খাচ্ছিল। তারপর চিকেনের হাড় চিবুতে চিবুতে নজরে পড়ল কফির কাপ দুটো তখনও সুমনা আর কুন্তলার ছায়া বুকে নিয়ে তেমনি পড়ে আছে। খুব লজ্জা পেল সুরেশ্বর। খিদেটা তাকে এতই একমনা করেছিল—সামনে যে কেউ বসে আছে তাও পর্যন্ত ভুলে গেছে। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সুমনাকে বলল 'কি আপনি খেলেন না?'

সুমনা একটু নড়েচড়ে উঠল। সিধে হয়ে বসল চেয়ারে। কেবিনের চারদিকে চোখ বোলাল। পর্দার কারুকাজ দেখল। চেয়ার-টেবিলের নতুন পালিশের গন্ধ নিল নাক ভরে। তারপর সত্যি সত্যি কফির কাপটা তুলে নিল তখুনি। 'হ্যা, হ্যাঁ, এই ত খাচ্ছি।'

'সত্যি আমি একদম ভুলে গেছিলাম সব কিছু। কি লজ্জা বলুন ত? সত্যি, সত্যি—' নিজের লজ্জাকে ঢাকবার জন্য কত কি যেন করতে চাইল সুরেশ্বর। মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, চিকেনের হাড় হাতেই রয়ে গেছে।

'না না আপনি খান, আপনার সারাদিন খাওয়া হয়নি বললেন।' সুরেশ্বরের এই লজ্জাকে লজ্জা বলে মানতে চায়নি সুমনা।

লজ্জাটা তখনও সুরেশ্বরকে বুঝি পীড়া দিচ্ছিল। 'কুন্তলা তুই খাচ্ছিস না কেন?'

'না দাদা, আমি আবার গরম কফি খেতে পারি না।'

'ও।' সহজ হয়ে আসছে সুরেশ্বর।

সুমনা আগেই কফির কাপ শেষ করেছিল। কুন্তলাও তখন সবে কফির স্পর্শ ঠোঁটে তুলে নিয়েছে। আর সুরেশ্বরও মাংসল চিকেনের হাড়টায় একবার দাঁত লাগিয়েছে।

সুরেশ্বর এক সময় বলল, 'জানিস কুন্তি এই রোববারে শিকারে যাব, অনেকদিন ধরে ইচ্ছে একটা রয়েছে কিন্তু ছুটি পাচ্ছি না বলে যেতে পারছি না। তুই যাবি ত? আপনিও চলুন না—'

'বেশ মজা হবে, কি মারবে দাদা? তুইও চল না সুমনা।' অনেক প্রগলভা কুন্তলা।

'আমি?' সুমনা তাকিয়েছিল সুরেশ্বরের দিকে। অন্য এক সুরেশ্বরকে দেখতে পেল সুমনা। যেখানে কোন লজ্জা নেই, কঠিন, কর্কশ, রক্তলোলুপ এই সুরেশ্বর। লজ্জাও যেমন রাঙাতে পারে সুরেশ্বরকে মৃত পশুর রক্তও কি ঠিক তেমনি করে রাঙায় সুরেশ্বরকে। কেমন একটা উত্তেজনা, অস্থির করছিল সুমনাকে। সুমনা বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমিও যেতে পারি।' কেন বলেছিল সুমনা? রক্তলোলুপ অর এক সুরেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল? যাকে এখন পর্যন্ত দেখার সৌভাগ্য হয়নি সুমনার। হয়ত তাই—হয়ত—

'তা হলে ওই কথা রইল, তোদের বাড়ী থেকে রওনা হব আমরা কি বলিস?'

'বেশ তাই হবে।' কুন্তলা মাথা নেড়েছিল।

রাতটা কেমন উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। কেমন এক অসহায় অবস্থা। কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। ঘুমও এসেছে আবার ভেঙে ভেঙে গেছে। সারা শরীরে কেমন একটা জ্বালা। চোখ দুটো ভারী ভারী। ইচ্ছে করছিল যাবে না সুমনা। কেন যাবে? বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে, আহত কিম্বা নিহত পশুর আর্ত চীৎকার দেখবে? পৈশাচিক উল্লাসে মাতবে? সুমনা আর ভাবতে পারছিল না। সুরেশ্বর তার কে? কি তার সঙ্গে সম্পর্ক? সুনন্দকেও ত দেখেছে, তারপর—শিক্ষা আর সৌন্দর্যের নীচে এক নীচ সুনন্দকে খুঁজে পেয়েছে শুধু।

'তোমাকে ত বলেছি চাকরী তোমার ছাড়তে হবে সুমনা।'

'কেন?'

'আমাদের বাড়ীর মেয়েরা কখনো চাকরী করে না, কোনদিন চাকরী করবে না।'

'আমি বুঝতে পারলাম না তোমার কথা।'

'আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে?'

'যদি বলি হ্যাঁ।'

'তা হলে শোন, মেয়েদের চাকরী মানে স্বেচ্ছাচারিতা, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নানান পুরুষের কাছে আত্মবিক্রয় করতে হয়। কিন্তু তোমার ত এমন কোন টাকার প্রয়োজন নেই যার জন্য এমন খেলায় মেতেছ। আর বাড়ীর যখন অমত, মা দাদা বৌদিদের এবং আমারও যখন তখন তুমি আসবে, বাইরের সব পুরুষদের সম্বন্ধে একটা না একটা গল্প বলবে, এটা কিন্তু কেউ মেনে নিতে পারছে না—'

'না তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না। আমার এই অর্জিত শিক্ষাকে তোমার কথায়, তোমাদের পরিবারের প্রত্যেকের কথায় বাক্সবন্দি করে রাখতে পারব না। আর তুমিও শিক্ষিত একজন পুরুষ হয়ে কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করবে?'

'শিক্ষা আমার যতই থাক বাড়ীর কথা আমার কথা।'

'বেশ, ভেবে দেখব।'

'ভেবে দেখাদেখি নেই। আজ এই মুহূর্তে প্রিন্সিপালের নামে তোমার রেজিগনেসান লেটার সাবমিট করতে হবে।'

কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল সুমনা। বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'না আমি তা পারব না।'

'তোমাকে পারতে হবে।'

'না-না-না।'

সুনন্দও কম যায় না। 'হ্যাঁ, তোমাকে পারতেই হবে।' কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে গিয়ে কখন সুমনার গলা টিপে ধরেছিল সুনন্দ। আজই যেন এর একটা ফয়সালা চাইছে সুনন্দ।

ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে আনল সুমনা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুমি আমাকে মারতে পারলে? হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে গলা টিপে শেষ করতে চাইলে?'

সামাজিক সম্পর্ক সেদিনই শেষ হয়ে গেল। মানসিক প্রশান্তির জন্য সুমনা এখন বিচ্ছেদের মামলায় মুখোমুখি। জেয় হয়ে গেছে। দু-চারদিনের মধ্যে এর বেরুবে। এইভাবে ফেলে আসা অতীত দংশনে রাতের ঘুমকে কেড়ে নিয়ে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল সুমনাকে।

ভোরে উঠেই সুমনা হাত-মুখ ধু কাপড় পালটেছে। তারপর প্রথম ট্রাম। কুন্তলাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়ে বলছে কুন্তলাকে, 'এক কাপ চা খাওয় আগে।'

'বোস, এই নিয়ে আসছি।'

সুরেশ্বর এসেছে জিপ নিয়ে। 'তে রেডি?' সদ্য জ্বালানো চুরুটটা দু আঙ্ ফাঁকে ধরে রেখেছে।

দু কাপ চা এনে হাজির ক কুন্তলা।

'কিরে এখনও তৈরী হোসনি?'

'আমি যাব না দাদা, শরীরটা খারাপ হয়েছে। অত দৌড়ঝাঁপ করতে না।'

সুরেশ্বর তাকিয়েছে কুন্তলার দি কি বুঝেছে, হেসেছে, 'তা হলে কি হ

'কেন সুমনা ত আছে, ও যাবে।'

সুমনাও তাকাতে চেয়েছে কুন্ দিকে। তা হলে কুন্তলা যাবে না, এক যাবে? সুরেশ্বরের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরবে, রক্তের নেশায় উন্মাদ হ

'তা হলে চলুন, আর দেরী করা রোদ উঠে গেলে কষ্ট হবে তখন।' সু দিকে তাকিয়েই কথা বলছিল সুরেশ্বর।

কি একটা শক্তি তখন টেনে নিয়ে চ সুমনাকে। জিপ এসে থেমেছে একটা জ সামনে।

শিকারে আসা এই প্রথম সুমনার। অজানা অচেনা একটা শিহরণ, হিংস্র দের হঠাৎ আক্রমণের ভীতি সুমনাকে দুর্বল করছিল। সন্তর্পণে পা ফেল সুমনা বিছিয়ে থাকা বড় বড় ঘাসের ম

কয়েকটা খরগোস ছুটে গেল মানু সাড়া পেয়ে। মানুষের গন্ধ পেয়েছে জ ধারে বসে থাকা নাম না জানা পাখীগু ঝাঁক বেঁধে উঠে পড়ল আকাশে।

সুরেশ্বর ইতিমধ্যে বন্দুক তাক গুলি ছুঁড়ল। দুটো-একটা পড়ল জ আশেপাশে। রক্তে লাল করে দিল জ একাংশ।

এবার খানিকটা সাহস ও মেয়ে স্বভাবজাত নিষ্ঠায় ছুটে যেতে চাইল আ পাখী দুটোকে কুড়িয়ে আনতে।

সুমনার হাত ধরে টানল সুরেশ 'যাবেন না জলে অনেক জোঁক আছে।'

'তাই নাকি?' পেছিয়ে এল সুম কিন্তু তবুও তাকিয়ে থাকতে চাইল রক্তাক্ত পাখী দুটোর দিকে। আহত প দুটো তখনও ভাসছে, ডুবছে। তাই সুম চোখ দুটো তবুও জলায় দিকেই চাইছে।

সুরেশ্বরও পেছন পেছন চলে হাতের বন্দুক উদ্যত। শত্রু আক্রম মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

প্রকৃতির কাছে মেয়েরা বুঝি অন্যরকম হয়ে যায়। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় সুমনা। গাছ থেকে ফুল ছেঁড়ে। খোঁপায় গোঁজে। মুচকি হেসে ফিরে তাকায় সুরেশ্বরের দিকে। সেই প্রাচীন আদম-ইভের টিক বুঝি শুরু হয় এখানেও।

শুধু খরগোস নয়, একটা খেঁকশিয়ালও ছুটে পালাল।

ভয় পেয়েছিল এবার সুমনা। কতদূরে গেছে সুরেশ্বর তাই ফিরে ফিরে দেখা।

'ওটা কিছু নয় একটা খেঁকশিয়াল।' সুরেশ্বর আশ্বাস দিয়েছে সুমনাকে।

জলার ধারে ঝোঁপের মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা শব্দ। খস-খস খস-খস।

শব্দটা আগেই শুনেছিল সুমনা। পা দুটো আপনা থেকে থেমে গেল। কে যেন মাটির বুকে গাছ-গাছালির মত পুঁতে রেখেছে সুমনাকে। ইচ্ছে থাকলেও আর দৌড়বার চড়বার শক্তি নেই। মন বলছে, পালাও বিপদ আসছে। কোথায় পালাবে, কার কাছে পালাবে? সেই অজানা অচেনা শিহরণ পা থেকে মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে। এরকমভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে জ্ঞান হারাবে সুমনা।

সেই শব্দটা আরও এগুচ্ছে। সুরেশ্বরও প্রস্তুত। বন্দুক তুলে শব্দ লক্ষ্য করছে।

সুমনা কেমন হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে তখন, 'এদিকে তাড়াতাড়ি আসুন না, আমার কেমন ভয় করছে।

সুরেশ্বর এগিয়ে গেল, তখন ঠিক তখন একটা বুনো মোষকে সুমনার দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল।

কি করবে সুমনা? এখন? ডুবে যাওয়া মানুষ যেমন হাতের কাছে পাওয়া কুটো কুটোও আঁকড়ে ধরতে চায় তেমনি হাতের কাছে সুরেশ্বরকে পেয়ে জড়িয়ে ধরল। মোষটা এক ছুটে ওদের পাশ দিয়েই দৌড়ে গেল।

সুরেশ্বর তখন বলিষ্ঠ দু হাতে সুমনাকে তুলে সরিয়ে নিল। অনেকক্ষণ ধরে সুমনাকে সেইভাবে ধরে রাখল। মনে হল সুমনার ছবিকে দুহাতের ফ্রেমে আর সুমনার মুখ সুরেশ্বরের মুখের অনেক কাছে। সুমনার শরীরের গন্ধ কেমন মাতাল করে তুলল সুরেশ্বরকে। সংযমের বাঁধ বুঝি ভেঙে গেল। তারপর আবেগে বিহ্বল সুরেশ্বর এলোপাথাড়ি চুমু খেতে লাগল।

সুমনাও কেমন যেন হয়ে গেছে। তখনও সুরেশ্বরের গলা জড়িয়ে থাকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে যখন দেখল মোষটা দৃষ্টি সীমার বাইরে কোথাও চলে গেছে তখন বলল, 'আমাকে নামিয়ে দিন—আমাকে প্লিজ নামিয়ে দাও, ওটা ত চলে গেছে তখন।'

'হ্যাঁ, জানি'—সুমনা এখনও সুরেশ্বরের হাতে, সুমনাকে নিয়ে এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, তাই কৌতুক করে বলল, 'ফিরিয়ে দিতে পারি কি বকসিস দেবে বল?' সুমনার মুখে মুখ ঘসছে তখনও সুরেশ্বর।

এদিকে এত উত্তেজনার মধ্যে সুমনার শাড়ী হাঁটু অব্দি উঠে গেছিল। খুবই লজ্জা তখন সুমনার। ওই অবস্থার থেকে যতই শাড়ীকে ঠিক করতে গেছে সুমনা—উচ্ছৃংখল বাতাস ততই বে-আব্রু করেছে সুমনাকে।

কে যেন তখন সুরেশ্বরকে দিয়ে কথা বলাল, 'তাতে কি হয়েছে সুমনা আমরা এখন আদিম মানব-মানবী।'

সুমনাকে এবার ঘাসের মধ্যে শুইয়ে দিয়েছিল সুরেশ্বর। তারপর সেই আদিমতাকে কি খুঁজতে চেয়েছিল সুরেশ্বর?

সবই বুঝতে পারছিল সুমনা। তাই বলেছিল, 'লক্ষ্মীটি আজ নয় আর, কদিন পরেই ত আমি মুক্তি পেয়ে যাচ্ছি, তখন তোমার যা ইচ্ছে আমাকে নিয়ে তাই করো।' সুমনা সেদিন তার জীবনের সব কথাই বলেছিল সুরেশ্বরকে।

এক একটা দিন কারো কারো জীবনে এতই উল্লেখযোগ্য যেমন সুমনার পক্ষে আজকের দিন। আর এই দিনটিকে কয়েক বছর ধরে যেন খুঁজে বেরিয়েছে সুমনা। কবে আসবে সেই দিন। দু'হাতের অঞ্জলি ভরে যাকে ফেলবে, ছড়াবে, খেলবে। নিজের যা ইচ্ছে তাই করবে। করো শাসন মানবে না, কোন বাঁধন আর থাকবে না। তাহলেই কি সুমনা খুশী? হ্যাঁ, খুশী। যন্ত্রণার বুঝি শেষ হল। আনন্দের সুরু ওই।

অনেক ভোরেই আপনা থেকে ঘুমটা ভেঙেছে সুমনার। রাতের খোলস ছিঁড়ে-খুঁড়ে যেমন ভোর হবে, দিন হবে তেমনি এতদিনের যন্ত্রণার শৃংখল আজ ভাঙবে। তারপর আপনা থেকে সদিচ্ছার বাসনা পাখী হয়েছে। সুমনার মনের দাঁড়ে বসেছে। সুমনার মুখ ঘসটেছে। কি বলেছে সে পাখী? আদর, ভালবাসা, প্রেম? তবু শুয়ে থেকেছে সুমনা। খাটে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখেছে। যে আকাশে এখন আলো, শুধু আলো। সারাটা দিনের মধ্যে এ আলো কতবার রঙ পাল্টাবে। রঙ পালটাচ্ছে। সুমনার মনের ক্যানভাসের ছবিও যেমন পালটেছে। সুনন্দ নেই সুরেশ্বর আছে।

হ্যাঁ, সুরেশ্বর আছে। তার জন্য অপেক্ষা করছে। হয়ত সুমনার অপেক্ষায় আকাশ দেখছে। চুরুটের ধোঁয়া উড়ছে ওই আকাশে। সেই ধোঁয়ার বুকেও ছবি ভাসছে। সে ছবি সুমনার। যাকে আদর করেছে, চুমু খেয়েছে, ভালবেসেছে। তাই ত গতকাল বলতে পেরেছিল সুরেশ্বর, 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব সুমনা, ঠিক দশটায় আসবে। তারপর দুজনে একসঙ্গে গিয়ে তোমার মুক্তির সার্টিফিকেট জজ-সাহেবের এজলাস থেকে নিয়ে আসব।'

'তুমি দেখে নিও আমি ঠিক দশটায় তোমার এখানে আসব।'

আর ত দেরী করা চলে না, সুমনা ছুটে চলেছে। বাস ধরেছে। কনডাক্টার জিগ্যেস করলে জায়গার নাম বলেছে। পয়সা দিয়েছে, টিকিট নিয়েছে। ওটপে নেমেছে। কিছুটা হেঁটেও গেছে গলির ভেতরে। এত তাড়াতাড়ি যে পৌঁছতে পারবে ভাবেনি সুমনা। অনেক আনন্দ নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসেছে। এত পরিশ্রমে হাঁপিয়েও উঠেছে ততক্ষণে।

সিঁড়ির মুখোমুখী দেখা হল মল্লিকার সঙ্গে। 'কি রে কেমন আছিস ছোট? আয় বোস।' চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিল। পাখা ঘুরিয়ে দিল।

চেনা বাড়ী, চেনা সিঁড়ি, চেনা ঘর। কোন কষ্ট হচ্ছিল না সুমনার। তাকাল চারদিকে ভাল করে। যেখানকার যে জিনিস ঠিক তেমনি রয়েছে এখনও। খুব অবাক লাগল সুমনার এত দিনেও কোন পরিবর্তন হয়নি তার ঘরের। সব ঠিক তেমনি রয়েছে। নিজ থেকেই বলতে গেল সুমনা, 'মা কোথায় বড়দি?' সম্বোধন এখনও ভোলেনি সুমনা।

'বোধহয় ঠাকুরঘরে। তুই বোস, জিরিয়ে নে আমি চা নিয়ে আসছি। চায়ের সঙ্গে কিছু খাবি ত?'

'না।'

'তাহলে এখনও সেই অভ্যেসটাই রেখেছিস।'

মাথা নেড়েছিল সুমনা।

'এই নে তোর বাক্স আলমারির চাবি। যা দরকার নিয়ে যেতে পারিস। বাইরে বদলি হবার আগে এইরকম হুকুম দিয়ে গেছে ছোটঠাকুরপো।' চলে গেল বড়জা মল্লিকা।

চাবি নিয়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে বসে থাকল সুমনা। এ চাবি এখন আর কি করবে? কি অধিকার আছে এখানে আমার, এই ঘরে বসার, চাবি দিয়ে খোলাখুলি করার?

অনেক দেরীই করছে মল্লিকা। কি এত আনছে সুমনার জন্য? সুমনা সারা ঘর পায়চারি করল। এটা ছুঁলো। ওটা দেখল। নাড়াচাড়া করল। কাপড়ের আঁচল দিয়ে ধুলো ঝাড়ল। তারপর এক সময় চাবি দিয়ে স্যুটকেস খুলে বসল। কি খুঁজছে সুমনা? কাপড় হাতড়ালো, জামা হাতড়ালো। সবার তলা থেকে কি যেন খুঁজে নিল। রূপোর ফ্রেমে বাঁধা একটা ছবি। বিয়ের পরে যে ছবি তুলিয়েছিল। তারপর তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

ইতিমধ্যে সাড়া পড়ে গেল বাড়ীতে। কে এসেছে দেখে এসো! এখনি হয়ত সবাই ছুটে আসবে। মেজদি, মা, বাচ্চারা। সবাই। একসঙ্গে। চিড়িয়াখানায় নতুন আনা কোন জন্তু দেখার মত করে সবাই দেখবে।

ক্রমেই একসঙ্গে পায়ের আওয়াজগুলো ছুটে ছুটে আসছে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুমনা। ছবিটা তখনও দু'হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা। এদিকে ঘড়ির কাঁটা ছুটেই চলেছে। দশটা বুঝি কখন বেজে গেল।

হাসির মজলিস

—একটা ছোট পিস্তল চাই আমার স্বামীর জন্যে।

—হ্যাঁ পাবেন। কিন্তু তিনি কোন কোম্পানীর পিস্তল পছন্দ করেন?

—সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। কারণ তিনি এখনও পর্যন্ত জানেন না, আমি তাকে গুলি করতে যাচ্ছি।

●

রামরতন সেন, ধানবাদ :

শিক্ষক—প্রবীর তুমি গতকাল স্কুলে আসনি কেন?

প্রবীর—পরশু আপনাকে ডাক্তারখানায় দেখে ভেবেছিলাম, গতকাল আপনি স্কুলে আসবেন না।

●

ছুটন্ত ভদ্রলোককে চমকে দিয়েছিল ছেলেটি। তিনি ছুটছেন ট্রেন ধরতে। শেষ ট্রেন। না গেলেই কেলেঙ্কারি। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো ছেলেটি। বলল :

—আচ্ছা দাদা, এদিক দিয়ে কোন পুলিশ যেতে দেখেছেন?

—না ভাই, কোন পুলিশ তো আমার চোখে পড়েনি।

—বেশ, ভাল খবরই শোনালেন। তাড়াতাড়ি আপনার ঘড়ি আর মানিব্যাগটা দিন তো!

●

দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ভদ্রলোকের সংসারের ওপরই শুধু নয়, পৃথিবীর ওপরেই আর কোন মায়া ছিল না। সব সময়ই ভাবনা, কিভাবে মরা যায়। একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললেন—আর তো পারি না মশায়, নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে।

ডাক্তার—খবরদার, সে কাজটি করবেন না। ওটা আমার কাজ।

●

জনৈক কলেজের ছাত্র একটি প্রশ্নে জানিয়েছেন, আধুনিক এবং প্রাচীন সাহিত্যে পার্থক্য প্রচুর দেখতে পাই। কিন্তু মিল কোথাও পাই না। আপনি কি পেয়েছেন?

উত্তর—হ্যাঁ, খুবই পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। সে মিল হোল যৌনজ্ঞানে।

●

অবিবাহিত লোকের বৈশিষ্ট্য?

—নিজের মতে যিনি অচল।

স্কুলে প্রথম দিনের ক্লাশ করে ফিরল ছেলেটি। বাবা জানতে চাইলেন, কেমন লাগল, আজকের ক্লাশ?

—বেশ ভাল। কিন্তু আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে বাবা।

—কেন?

—একজন দিদিমণি জানতে চাইলেন, কোথায় তোমার জন্ম। তখন ভাবলাম হাসপাতালে আমার জন্ম হয়েছে বললে সবাই ভাববে আমরা কি গরীব। তাই বলেছি আমাব জন্ম ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে।

●

আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না, পাশ করার পর একটা সেলুনে কাজ নেব না লেখক হবো।

—বলল পরীক্ষার্থী জনৈক ছাত্র।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু জানাল—টস করে দেখনা। হেড বা টেল যা হবে, সেইটে করলেই হল!

●

আর্মি মেডিকেল অফিসার জল পরীক্ষা করছিলেন। চার্জে যে সার্জেন্ট ছিলেন তাঁকে বললেন—জল যাতে দূষিত না হয়, তার জন্য আপনারা কি করছেন?

—প্রথমে আমরা জল গরম করি।

—সুন্দর!

—তারপর আমরা ফিলটার করি।

—চমৎকার!

—এবং তারপর নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বীয়ার পান করি।

●

নির্মল : বিয়ের আগে স্ত্রীর সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা করতে এখনও কি সেইভাবেই চলছ?

সুশান্ত : হ্যাঁ ভাই, সেই একই ব্যাপার। অনীতার সঙ্গে প্রেমে পড়ার দিনগুলোর কথা আমার আজও মনে পড়ে। ওদের বাড়ির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতাম। জানালায় পর্দায় শুধু দেখতাম ওর ছায়া। ভয়ে বাড়ীর ভেতর ঢোকার সাহস হোত না। আজও সেই একই ব্যাপার চলছে। ভয়ানক বদরাগী কিনা।

●

হানিমুন কাকে বলে?

—নতুন কর্তার অধীনে কাজ করবার আগেকার ছুটি।

জন মন্রো লেখন

আপনি কি স্নব?
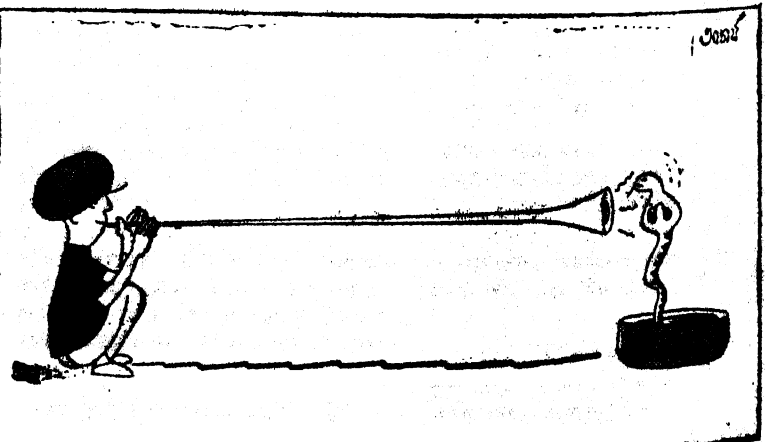
...কে মুখের ওপর 'স্নব' বললে গালি দেওয়ার মতোই হয়। অবশ্য ইংরেজী কথা, ঠিক বাংলা এখনো ... বলতে পারেন 'চালবাজ'। পাঁচজনের ...খেলো হয়ে যাবার নিদারুণ আতঙ্ক ...ই নাকি লোকে স্নব হয়ে যায়, অর্থাৎ ...র উপায়ে এমন সব সামাজিক মাপ-অনুসরণ করার চেষ্টা করে যেগুলি ...র বাইরে কিংবা যেগুলির ...সত্যি সত্যিই সমাজে এমন কিছু ...রের নয়। দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরার ...স্নবদের আচরণ সমাজে ঘৃণিত থাকে। তা বলে কেউ একটু সেজে-...ভাবে আসরে এলে তাকে 'সং-সাজা', 'পুতুল পুতুল লাগছে' বলে ঠাট্টা ঠিক নয়, স্নব বলে আড়ালে নিন্দে অনুচিত। কি কি আচরণ দেখলে ...স্নব বলে মনে করে, সেগুলি ...রে একটা টেস্ট তৈরী করা হয়েছে। ...যদি সতর্ক হতে চান আপনাকে কেউ স্নব মনে করতে না পারে, ...আপনার পক্ষে টেস্টটি খুব ...।

...উ নিজেকে স্নব মনে করে না, কেউই ...র করতে চায় না যে, সে জাঁকিয়ে ...ব্যর্থ অনুকরণ করছে। কিন্তু আমা-...মধ্যে অনেকেই কোনো-না-কোনো ...বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে ...প্রেসটিজ বাড়িয়ে তোলার আশায় ...সব আচরণ করতে থাকি, শুধু ...উঁচু মহলে কাঁধ মিলিয়ে চলবার ...বাসনায় সেই ধরণের অভিজাত ...দের দিকই নিজেদের মনপ্রাণ ঢেলে ...আপন রুচিবৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলি, ...এতসব করেও ক্লান্ত অবসন্ন বিষন্ন ...করি। নিজের সত্তাকে এবং নিজের ...বাঁধাকে সহজভাবে বিকশিত হতে ...য়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করি বলেই এমনটা।

...জের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ ...মানসম্ভ্রমের মাপকাঠি বলে যেমন ...আর নিজের পরিবেশের নিজস্ব ...বর্জন করে যদি কেউ লোকচক্ষে ...জ বাড়াতে চায়, তবে নিঃসন্দেহে ...সামাজিক এবং মানসিক টানাপোড়েন ...বেড়ে যাবে। তাতেই ফলে ...উৎকণ্ঠা অশান্তির অবসান।

...-সমাজে আপনার জন্ম, যেখানে ...প্রতিপালিত, সেখানে অবহেলা ...সমমাভাব দেখিয়ে অন্য ...কোনো ...সমাজ-পরিবেশের প্রতি দরদ ...দেখাতে গেলেই আপনি যদি ...স্নব হতে ...সুরু ... করে ...নিজেকে ভালবাসুন নিজের ...পরিবেশের সকলকে যথাসম্ভব প্রীতি আর সহানুভূতির চোখে দেখুন, যত্ন ভালবাসা তাদের জন্যেও খানিকটা রাখুন। তারপরে যদি দূরের সমাজ-পরিবেশকে ভালবাসতে চান, সেখানে ছুটে যেতে চান তাহলে আপনার আনন্দ অভিজ্ঞতার জগৎ সত্যিই প্রসারিত হয়ে পড়বে।

নীচের প্রশ্নগুলিতে আপনি যদি আন্তরিকভাবে জবাব দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন এ বিষয়ে আপনার নিজের সত্যিকারের আচরণের একটা কেমন সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠবে আপনারই মনে।

আপনার পছন্দমত (ক) কিংবা (খ)-তে টিক চিহ্ন দিন। তারপর সবশেষে দেখুন আপনি কতো পয়েন্ট পেলেন।

১। (ক) যেসব বই খুব নাম করেছে, খুব বেশি বিক্রী হয়, আপনি কি কেবল সেসব বই-ই পড়েন?

(খ) আপনি কি খুব বেছে বেছে কেবলমাত্র ভাল ভাল বইগুলিই পড়েন?

২। (ক) আপনার বন্ধুদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিপত্তি যাচাই করে তবে তাদের সঙ্গে ভাব জমান?

(খ) যার সঙ্গে মনের মিল হয়, বনিবনা হয়, তাকেই বন্ধু বলে মনে করেন?

৩। (ক) যদি কোনো বিশিষ্ট বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটে থাকে, তখনি যাকে সামনে পাবেন তাকেই সেই পরিচয়ের কথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছেটাকে সত্যি সত্যি সংযত রাখতে পারবেন কি?

(খ) এই ধরণের বিশিষ্ট পরিচিতির মর্যাদার কথা আপনি যাকে তাকে সবাইকে আনন্দ-গর্বের সঙ্গে শুনিয়ে থাকেন কি?

৪। (ক) মনে করুন, আপনি খুব হৈ-হুল্লোড়ের জন্যে একটা জমকালো পার্টি দেবার কিংবা আসর বসাবার ইচ্ছে করলেন, সেখানে আপনার বাড়ীর এবং আত্মীয়-স্বজনদের সকলকেও ডাকবেন কি?

(খ) এ ধরণের অনুষ্ঠানে এলে তারা অস্বস্তিবোধ করতে পারে মনে করে আপনি কি তাদের বাদ দেবেন?

৫। (ক) যখন পুরনো দিনের কথা বলেন, তখন কি বিশেষ ঘটনাগুলিকে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জাহির করেন?

(খ) পুরনো দিনের কাহিনী বর্ণনা করবার সময়ে যা সত্যি, তা ভাল হোক মন্দ হোক, সহজভাবে বলে যান কি?

৬। (ক) মনে করুন, একটি একঘেয়ে সন্ধ্যেবেলা পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে গল্পগুজব করে কাটাবেন কথা দিয়েছেন, ইতিমধ্যে এক অতি বিশিষ্ট পরিচিত মহল থেকে আমন্ত্রণ এসে গেল সান্ধ্যভোজের, আপনি কি সে আমন্ত্রণে যাওয়া বাদ দেবেন?

(খ) এরকম আমন্ত্রণ পেলে আপনি প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাওয়ার কথা বাতিল করে দেবেন?

৭। (ক) আপনি কি আপনার ছেলে-মেয়েদের পরামর্শ দেন কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে?

(খ) সমাজের যে কোনো স্তর থেকে বন্ধু বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা কি আপনার ছেলেমেয়েদের দিয়ে থাকেন?

৮। (ক) যদি আপনার সমাজে কিংবা কর্মক্ষেত্রে আপনি হঠাৎ একটা বেশ উঁচু-দরের সম্মান মর্যাদা লাভ করেন, তাহলে আপনি কি প্রতীক্ষা করে থাকবেন পাঁচজন যাতে এগিয়ে এসে আপনাকে অভিনন্দন জানায়?

(খ) এরকম সম্মান মর্যাদা পেলে আপনি নিজে আগুয়ান হয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়াটাই আপনার কাজ বলে মনে করবেন কি?

৯। (ক) আপনি কি মনে করেন দোকানদার, হোটেলের বয় এরা যে স্তরের লোক এদের সঙ্গে ঠিক সেই ধরণের ব্যবহার করাই দরকার?

(খ) এদের আপনি কি আপনারই মতো মানুষ মনে করে সমানভাবে ব্যবহার করেন?

১০। (ক) আপনি কি আপনার সামর্থ্য বুঝে চলেন?

(খ) আপনি কি কেবল আজকের দিন-টাই চালিয়ে নেবার কথা ভাবেন?

প্রত্যেকটি সঠিক জবাবে ৫ পয়েন্ট করে পাবেন। সঠিক জবাবগুলি এইরকম :—

প্রশ্ন ১ (খ), ২ (খ), ৩ (ক), ৪ (ক), ৫ (খ), ৬ (ক), ৭ (খ), ৮ (ক), ৯ (খ), ১০ (ক)।

সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাবেন ৫০।

যদি আপনি আন্তরিকভাবে জবাব দিয়ে ৪০ থেকে ৫০ পয়েন্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে সবাই তৃপ্তি পাবে, এবং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আপনি স্নব নন, ব্যর্থ অন্ধ অনুকরণ করেন না, গড্ডলিকায় ভাসেন না।

যদি ২৫ থেকে ৩৫ পয়েন্টের মধ্যে পেয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, আপনি নিজেকে যতখানি খাঁটি লোক বলে মনে করেন ততখানি খাঁটি নন।

যদি ২০ পয়েন্ট কিংবা তারও কম পয়েন্ট পান, তাহলে এই কথাই বোঝাবে যে, অনেকখানি এগিয়ে গেছেন স্নব হবার দিকে, সামাজিক গড্ডলিকার স্রোতে— একথা আপনি মানতে পারুন বা নাই পারুন।

কালো মন্ত্রো

পিটার ওডোনেল

প্রকৃতির মরণ ফাঁদ

চোরাবালি

বনবিহারী মোদক

আজ থেকে একাত্তর বছর আগেকার কথা। ১৮৯৭ সালের একটি শীতের সকালে, আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে ওট্রান্টো প্রণালীতে, বর্তমান আলবেনিয়ার ভেলোনা বন্দরের অনতিদূরে ভগ্নপ্রায় একটা মাছ-ধরা জাহাজ এসে ভিড়ল। মোচার মতো ছোট্ট জাহাজটিতে মাত্র ছ'টি প্রাণী। সকলেই জেলে।

পুরো দুটো দিন ক্ষ্যাপা সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে লড়াই কোরে, সবাই ওরা খুঁকছে; না জুটেছে খাবার, না হয়েছে একটু বিশ্রাম। মাটি দেখে তবু ওদের ধড়ে প্রাণ এল। তাড়াতাড়ি পাড়ে নেমে, ওরা লোকালয়ের সন্ধানে ছুটল। অন্ততঃ একখানা রুটি আর এক ঢোক মদ না পেলে আর ওরা বাঁচবেই না। তাছাড়া, কোন্ দেশে, কতদূরে এসে পড়ল—সকলের আগে সেটাও তো জানা দরকার। একজন শুধু রয়ে গেল জাহাজটির পাহারায়।

যে থাকল, তার আর উঠবারই ক্ষমতা নেই। রাত্রে ভিজে পাটাতনের ওপর আছাড় খেয়ে, বেচারার একটা পা অত্যন্ত জখম হয়েছে। হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে বোধহয় জ্বরও হয়েছে একটু। পাটাতনের ওপর বসে, সে চেয়ে রইল বন্ধুদের চলমান মূর্তিগুলোর দিকে। ওরা যদি খাবার নিয়ে ফিরতে পারে, তবেই ওর খাওয়া জুটবে; নতুবা এই অসুস্থ শরীরেও নির্ঘাৎ হরিমটর।

ঐ তো ওরা এগিয়ে চলেছে। এখন কোনো লোকবসতি বা দোকান পেলে, তবেই রক্ষে। কিন্তু ওকি! হঠাৎ সে অবাক হয়ে দেখল—একজন বালির চরেই যেন বসে পড়েছে মনে হচ্ছে; আর দুজন তার হাত ধরে টানাটানি করছে। আরে! আরেকজনও কি হাটু গেড়ে পড়ল? ওকি, ওরা সবাই এমন ছটফট করছে কেন? ঐতো, পেছনের দু-জনকেও ওরা আঁকড়ে ধরল! আরে, প্রায় কোমর পর্যন্ত যে বালির নীচে ডুবে গেছে ওদের!...খোঁড়া পা আর অশক্ত শরীরের কথা ভুলে, সে-ও পড়ি-কি-মরি হয়ে ছুটল ওদের দিকে।

খানিকটা এগিয়ে, বন্ধুদের অবস্থাটা ভাল করে দেখতে পাওয়া মাত্র ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। তাদের সকলেরই বুক পর্যন্ত তখন বালির নীচে চলে গিয়েছে! ওদের আর্ত চীৎকারে সাড়া দিয়ে সে আরও জোরে ছুটতে লাগল। পাশের বালিয়াড়ির উঁচু টিলা থেকে হঠাৎ একটা বিরাট পাথরের চাঁই ওর শরীর ঘেঁষে গড়িয়ে নামল। মুহূর্তের জন্যে থেমে, ফিরে তাকাতেই সে দেখল—দাড়িওয়ালা একটা বুড়ো টিলা থেকে ছুটে নামছে আর দু-হাত তুলে চীৎকার কোরে তাকে কি যেন বলছে। এক মুহূর্ত কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় থেকে, আবার সে নিমজ্জমান বন্ধুদের দিকে এগুতে যাবে, ঠিক সেই সময় একটা দড়ির ফাঁস এসে ওর গলায় আটকে গেল। গতির মুখে হঠাৎ উল্টো টান খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ও'। অশক্ত শরীরে এই উত্তেজনা, ভয় ও পরিশ্রমের ফলে ও' জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান হওয়ার পর ও দেখল—অতি জরাজীর্ণ একটি কুটিরে শতচ্ছিন্ন ও মলিন একখানা কম্বলের উপর সে শুয়ে আছে। দ্বিতীয় আর কোনো জনপ্রাণীর কোনো চিহ্নও কোনো দিকে নেই! অদূরে সৈকতের ঝাউবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হাওয়ার গম্ভীর শন্ শন্ শব্দ কেমন একটা অবর্ণনীয় আতঙ্কে ওর দেহ-মনকে পাথরের মতো ভারী করে তুলল। ক্রমে সমস্ত ঘটনা মনে পড়ায়, মনে জোর করে একটু সাহস এনে, অতিকষ্টে ও উঠে বসল। ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকল দাড়িওয়ালা সেই বৃদ্ধটি। হাতে তার একটা মগ। দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা বলে, মগ শুদ্ধ দুধটা বৃদ্ধ ওর মুখে তুলে ধরল। দ্বিরুক্তি না করে দুধটুকু খেয়ে নিল ও।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইটালীয়ান ভাষায় বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ওকে সব কথাই বলল। পাথর ফেলে না দিলে সে-ও ছুটতে ছুটতে ঐ মরণ-ফাঁদেই গিয়ে পড়ত। তাই ও জখম হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, পাথর ফেলা ছাড়া বৃদ্ধের আর কোনো উপায় ছিল না। যদি কোনো হতভাগ্যকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে—এই আশায় দড়ির ফাঁসটা সব সময় ওর কোমরেই গোঁজা থাকে। ওর পাঁচজন সঙ্গী বালিতে ডুবে গেছে শুনে বৃদ্ধের সেকি আফসোষ! ত্রিসংসারে আপনজন কেউ না থাকায়, মানুষের জীবন রক্ষার যে কাজটিকে বৃদ্ধ নিজের ইচ্ছেতেই তার শেষ জীবনের এক-মাত্র ব্রত করে নিয়েছে, মোমবাতি জ্বালতে জ্বালতে হয়েছিল বলে সেই ব্রতেও ওর ফাঁকি থেকে গেল। পাঁচটি জীবন সে বাঁচাতে পারল না।

বৃদ্ধ আরও বলল—আজ পর্যন্ত মানুষ যে ঐ চোরাবালির অতল তলিয়ে গিয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা এলাকাটা ছোট নয়; তবু চোরাব চারিদিকে একবার খুঁটি পুঁতে হয়েছিল। কিন্তু আলগা বালির খুঁটিগুলোকে বেশী দিন খাড়া যায় নি। এখন ও' প্রায় সব এখানেই থাকে। গাঁয়ের ছোকরারা এসে সর্বদিন খাবার পেঁছে দিতে চায় অগত্যা ওকেই তখন গ্রামে যেতে তবে, ভরসা এইটুকুই যে, এ-এ মানুষজন তো দূরের কথা, এমন গরু-ভেড়াও ভয়ে এদিকটা মাড়া একমাত্র ভিন্‌দেশী নাবিক আর জে মাঝে মাঝে এসে অজান্তে বিপদে প

• • •

ভেলোনা বন্দর থেকে মাত্র কিলোমিটার দূরে, শান্ত সাগর নির্জন ঝাউয়ের ছায়ায়, আশ্চর্য এই মানুষটির সমাধিতে আজও অতি জনা ও ছোট্ট একটি পাথরের বেদী দেখ অমোঘ মৃত্যুর ভয়াবহ এই মুখ থেকে, বহু মানুষের জীবনই এ-মা রক্ষা করেছিলেন। মানুষ আজ তাঁকে ভুলেই গিয়েছে। শুধু ঝাউবনের ধ্বনিই বোধহয় আজও সেই ম বৃদ্ধের বিদেহী আত্মার স্মৃতিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায়।

• • •

বিখ্যাত স্প্যানিয়ার্ড নৌ-অভিযা আবিষ্কারক বালবো:আ-র বৈচিত্র্যময় কাহিনীতেও, একবার তাঁর ভয়ংকর বালিতে পড়ার লোমহর্ষক বিবরণ যায়। দুঃসাহসী এই আবিষ্কার রোমাঞ্চকর জীবনে তখন দুর্ভাগ্যের ছায়া নেমে এসেছে। শত্রুর মুখে এক নিন্দাবাদ শুনেই, স্পেন সম্রাট ফার্ডিন দ্য ক্যাথলিক তখন তাঁকে দন্ড দিয়েছেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত বালবো প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী বলতে তখন কেউ-ই নেই। প্রশান্ত মহাসাগর অক্লান্ত আবিষ্কারের পর ১৫১৩ সালের প্রথমে বালবোআ পার্ল দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছুলেন। নতুন দেশ আবিষ্কারে তখন তাঁর বেশী ঝোঁক সোনার পেয়ে গল্প-কাহিনী তখন তাঁকে করে তুলেছে। কোন মতে একবার গিয়ে পৌঁছুতে পারলে, সম্রাটকে

জল আর সোনা উপঢৌকন পাঠাতে পারবেন। তখন নিশ্চয়ই সম্রাট আর তাঁকে শাস্তি দিতে পারবেন না। অতএব সোনা তাঁর চাই-ই চাই।

দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য উন্মাদের মতো, বালবোআ তখন পার্ল দ্বীপ থেকে পেরুর সোনা-পথের সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কষ্টসহিষ্ণু নেটিভ ইন্ডিয়ান পথ-প্রদর্শকটিও তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। বালবোআ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন, গাইডটা পেছন পেছন আসছে; প্রায় দৌড়চ্ছে সে। সামনেই ঝোপের আড়াল থেকে অদূরে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। গাইড ছুটে এসে, দেখেই বুঝল—সর্বনাশ হয়েছে। নিমজ্জমান বালি থেকে উঠে আসবার জন্যে বালবোআ যতই চেষ্টা করছেন, ততই আরও নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি!

কর্তব্যনিষ্ঠ ও সরলপ্রাণ এই আদি-বাসীটি তখন কল্পনাও করতে পারে নি যে, মৃত্যু-ফাঁদে পতিত এই সাহেবটির জাতভাইরাই একদিন আদিবাসীদের যথা-সর্বস্ব লুটে নিয়ে, ওদের কুটিরগুলোতেও আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সেকথা জানলেও, হয়ত সে সাহেবটির জীবন না বাঁচিয়ে পারত না। কারণ, শ্বেতাঙ্গদের চোখে ওরা সবাই তো অসভ্য বর্বরমাত্র! যাইহোক, নিজের জীবন বিপন্ন করেও, সেদিন সে তাঁকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে তুলে না আনলে লাতিন আমেরিকার ইতিহাসই হয়ত অন্য রূপ পরিগ্রহ করত।

* * *

এ যুগের পর্যটক ও অভিযাত্রীরাও যে চোরাবালির খপ্পরে না পড়েছেন, এমন নয়। মাত্র কয়েক বছর আগে হ্যাঞ্জ্‌লেংকা ও জিগ্‌মুন্ড্‌ নামক দুজন চেক অভিযাত্রী মোটর যোগে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ পরিভ্রমণ করেছেন। Africa : The Dream and the Reality নামক গ্রন্থে তাঁদের এই দুঃসাহসিক অভিযানের যে রুদ্ধশ্বাস বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাতেও দেখা যায়—জনমানবহীন মরুপ্রকৃতির একটি এলাকায় পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরাও একবার চোরাবালির গহ্বরে তলিয়ে যেতে বসেছিলেন।

* * *

কিংবদন্তী, রূপকথা এবং কথা-সাহিত্যের রাজ্যেও চোরাবালির কাল্পনিক বিবরণ অজস্র পাওয়া যায়। ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও পরিবেশ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমাদের বাংলা সাহিত্য অনেকটা ঘর-কুণো হওয়া সত্ত্বেও চোরাবালির ভয়াল কাহিনী এতেও কিছু কিছু আছে বৈকি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, সত্যান্বেষী গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সিও অজ্ঞাতপ্রায় একটি ভয়ংকর চোরাবালির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে, অতি জটিল একটি হত্যা-রহস্যের জট খুলেছিলেন, সেই রোমাঞ্চকর গল্পটিও সুধী পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি?

।।২।।

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!" এ-আক্ষেপ শুধু কবির নয়; রূপৈশ্বর্যময়ী এই ধরণীর অনেক রহস্য সম্পর্কেই আমাদের সকলেরই জ্ঞান আজও একান্তই সীমাবদ্ধ। 'চোরাবালি' কথাটা শোনামাত্রই আমাদের মনে ভয়ঙ্কর একটা বিভীষিকার ভাব সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এই চোরাবালি জিনিসটা কি রকম, কেন এটা বিপজ্জনক—এ-সব সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা আমাদের আছে কি?

কারুর কোনো আকস্মিক বিপদ বোঝাতে আমরা অনেক সময় বলি—হঠাৎ বেচারার পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। কিন্তু পায়ের নীচের এই অবলম্বনটা হঠাৎ সরে যাওয়া বা বসে যাওয়াটা যে আমাদের দেহ-মনে কি রকম মৃত্যু-শীতল আতংক-শিহরণ জাগায়, শুধু কল্পনায় সেটা অনুভব করা সম্ভব নয়। এই ভয়াল অনুভূতির খানিকটা আভাস আমরা পাই বিমান যাত্রাকালে, বিশেষতঃ ডাকোটা বিমানের শূন্যে বাম্পিং-এর সময়। নাগর-দোলায় নীচে নামার সময়ও এ-অনুভূতির কথঞ্চিৎ আভাস মেলে; যদিও সে-ভীতি থাকে আনন্দ-মিশ্রিত। অভাবিতভাবে হঠাৎ এই নীচে নামার আকস্মিকতার সঙ্গে যদি তলিয়ে যাবার উপলব্ধিটাও যুক্ত হয়—তাহলে আতংকের ভাবটা হয় আরও অকল্পনীয়, আরও ভয়াবহ। এই জন্যেই দেখা যায় যে, চোরাবালির নীচে তলিয়ে গিয়ে যত লোক প্রাণ হারায়, নিমজ্জন-কালীন আতংকে হৃৎস্পন্দন থেমে মৃত্যুর সংখ্যাটা তার চেয়ে কম নয় মোটেই।

চোরাবালি জিনিসটা যে ভয়ংকর, সে-সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ভয়ানক এই মৃত্যু-ফাঁদটা সৃষ্টি হয় কি করে?

সে-প্রসঙ্গে আসবার আগে, বালির স্বভাবধর্ম ও বৈশিষ্ট্যগুলো একটু সহজ-ভাবে বুঝে নিই আসুন। ধরুন আপনি—কাঁচা মেঠো-পথ দিয়ে আপনি বাইসাইকেলে চলেছেন। গুণ্ গুণ্ করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে দিব্যি শাঁ শাঁ করে এগুচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন—সেই সহজ সাবলীলতার মধ্যেও আপনার স্টিয়ারিংটি কেমন যেন টাল-মাটাল হয়ে গেল। আপনি দক্ষ সাইক্লিস্ট, সেটা সবাই জানে। কিন্তু ওরকম হল কেন? নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন—রাস্তার সে-জায়গাটা স্রেফ বালি। একজন খ্যাতিমান দৌড়বাজ যে গতিবেগে ছুটতে পারেন, বালুকাময় প্রান্তরে তার অর্ধেক গতিও তিনি দেখাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্যে, বালির ওপর ধীরে পদচারণও সহজ নয়।

আগেকার যুগে জল-ঘড়ি এবং বালুকা-ঘড়ির চল ছিল। কিন্তু এত জিনিস থাকতে, শুধু জল এবং বালিই এ-কাজে ব্যবহৃত হত কেন? এর কারণ, বালির গড়িয়ে নামার গুণটা প্রায় তরল পদার্থেরই অনুরূপ।

বালির আরেকটি উল্লেখ্য গুণ হল—জলশোষণ ক্ষমতা। বালি যতটা জল শুষতে পারে, অন্য অনেক কঠিন পদার্থের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

তাজা একটা জলজ্যান্ত মানুষ অথবা বলবান একটি জন্তু কত অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—এই ভয়াবহ দৃশ্য চোখের ওপর দেখে দেখে বিগত যুগের মানুষ চোরাবালি সম্পর্কে অনেক অন্ধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। তারা ভাবত—ক্ষুধার্ত ধরিত্রী বুঝি তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে নিজের হাতে এদের গ্রাস করছে। চোরাবালির

বালিকেও এরা সাধারণ বালি বলে ভাবতে পারত না। তারা বলত — এটা বুঝি আলাদা এক ধরনের অভিশপ্ত বালুকা। এমন কি, চোরাবালির আশেপাশের বালিকে বাড়ীঘর ইমারত তৈরীর কাজেও ব্যবহার করতে সাহস করত না। এটা যে অন্য জাতের বালি—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বর্তমান শতকের প্রারম্ভেও, স্থপতি ও রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। সুখের বিষয়, আজ এ-ভুল ভেঙেছে। অনুন্নত আদিবাসী জনগোষ্ঠী ছাড়া, আর সবাই এখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, অন্য যে-কোনো বালির মতো, চোরাবালির বালিও বালি-ই। অলৌকিক কোনো অসাধারণত্বই এতে নেই।

নীচে ছিদ্র-হীন মৃত্তিকাস্তর এবং উপরে বালি থাকলে চোরাবালির সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, জল নীচে চলে যেতে পারে না বলে, বালুকণাগুলো সবই কিছু-না-কিছু ভিজে থেকে যায়। এই ভিজে বালি অনেক সময়েই তার ভারবহন ক্ষমতা হারিয়ে, তরল পদার্থের ধর্ম (উপরে পতিত ভারী বস্তুকে ডুবিয়ে নেবার ক্ষমতা) লাভ করে। ভিজে ও ঝুরঝুরে বালি এই অবস্থায় আলগাভাবে বিছানো থাকলেই, ভয়ঙ্কর এই মরণ-ফাঁদ তৈরী হয়।

সমুদ্র-সৈকত বা নদীতীর যদি ঢালু না হয় অথবা খুব সামান্য ঢালু হয়, মৃত্তিকা-অভ্যন্তরের জল তাহলে গড়িয়ে নেমে যেতে পারে না। উপরের বালুকে ভিজে ও নরম রেখে, এটাও চোরাবালির সৃষ্টি করতে পারে। আবার নীচের মাটি যদি চারপাশ থেকে খাড়াভাবে নেমে খাদ তৈরী করে, তাহলেও মাটির ভিতরের খাঁজের সঞ্চিত জল, উপরের আচ্ছাদনী বালুকণাগুলোকে ভিজে ও আলগা করে রাখে। এর ফলেও চোরাবালির সৃষ্টি হতে পারে।

শুধু যে ভারী বস্তুর চাপ পড়লেই চোরাবালি বসে যেতে সুরু করে, তা নয়। উপরটা কোনো কিছুর দ্বারা নাড়া খেলেও আলগা বালিকণাগুলো একে অন্যের ওপর গড়িয়ে নামতে থাকে। নীচের কণাগুলোও এইভাবেই ক্রমে আরও নীচে নেমে তলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ এইভাবে নামার পর বালির নিম্নগতি আপনিই থেমে যায়। এই অবস্থায় বালিগুলো কিছুটা ভারবহনক্ষম ও শক্ত হয়ে পড়ে। তখন আর মানুষ বা জন্তু-জানোয়ার এতে ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে না। নীচের বালি থিতিয়ে বসার পরে, ওপরের বালুস্তর আলগা হয়ে, খানিকক্ষণ পরে আবার কিন্তু জায়গাটি চোরাবালিতেই পরিণত হয়।

ডোভার প্রণালীর প্রবেশ পথে, কেন্ট উপকূলের অদূরে গুড্-উইন্ স্যান্ডস্ নামক বিখ্যাত বালিয়াড়িটি এক সময় দ্বীপ ছিল। এর কোনো কোনো অংশের বালি হয়ত ঘন্টা কয়েকের জন্যে বেশ শক্ত ও ভারবহনক্ষম দেখা গেল। কিন্তু জোয়ারের জলে ডুবে যাবার পরই বালুচরটি হয়ে দাঁড়াল বিভীষিকাময় মৃত্যু-ফাঁদ। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বালিগুলো দ্রুত সঞ্চরণশীল হয়ে উঠল। তখন এই চলমান বালুকণারই ওজন হয়ে উঠল দুর্বহ; সঙ্গে সঙ্গে ভারী যে কোনো জিনিসকে প্রবল বেগে এর নীচের দিকে টেনে নেবার ক্ষমতাটিও হয়ে দাঁড়াল অবিশ্বাস্য। এমন কি, বিশাল এক একটি ওশান লাইনারও মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে এর অতল গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গিয়েছে—এমন ভয়াবহ নজিরও নৌবিদ্যার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে!

বিপদ আর মৃত্যুর দ্বার যেখানে অবারিত, সেখানে রক্ষা-কবচের প্রচ্ছন্ন ব্যবস্থাও বোধহয় প্রকৃতিরই বিধান। চোরাবালির কাছে মানুষ এত অসহায় বলেই, প্রকৃতি বোধহয় যেখানে সেখানে এই মৃত্যু-গহ্বর সৃষ্টি হতে দেন না। জলধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার দরুণ, বালি সাধারণত ভিজে ও আলগা থাকতে পারে না। বালুকার স্বভাবধর্মের মধ্যে প্রকৃতির এই আশীর্বাদ নিহিত বলেই ভয়ংকর এই মরণ-ফাঁদ কদাচিৎ দেখা যায়। তা না হলে, মানুষ ও জীব-জন্তুর অসহায় মৃত্যুর সংখ্যা অগণিত হত।

আর্দ্র বায়ু ও কম সূর্যোত্তাপযুক্ত অঞ্চলেই চোরাবালির অবস্থিতি বেশী লক্ষ্য করা যায়। যে-সব অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, প্রখর সূর্যালোক অথবা বেগবান বায়ুপ্রবাহ সতত বর্তমান, চোরাবালি সে-সব জায়গায় খুব কমই দেখা যায়। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে—আগ্নেয়গিরির বিশ্বব্যাপী বলয়ের মতো, নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বেলাভূমিগুলোতে চোরাবালির অবস্থিতির মধ্যেও মালার ন্যায় একটি বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

॥৩॥

এ-পর্যন্ত আলোচনায় আমরা শুধু 'চোরাবালি' শব্দটিই ব্যবহার করেছি। কিন্তু চোরাবালির সবই তো আর এক রকম নয়। এরও অনেক প্রকার-ভেদ ও রূপান্তর আছে। সমস্ত জাতের নিমজ্জনশীল মৃত্তিকাকে বর্গীকৃত করলে, শ্রেণী-বিন্যাসটি দাঁড়াবে এই রকম :

নিমজ্জনশীল মৃত্তিকা
- ভূ-পৃষ্ঠের
  - চোরাবালি
    - সৈকতস্থিত চোরাবালি
    - জলনিমগ্ন অদৃশ্য চোরাবালি
  - চোরাগর্ত
  - চোরাকাদা
    - শ্যাওলা-ঢাকা চোরাকাদা
    - গুল্মাচ্ছাদিত চোরাকাদা
  - চোরাজুয়ার
- ভূ-গর্ভের
  - ফাটল বা খাঁজ
  - উৎস

চোরাবালির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। এইবার এর অন্যান্য রূপান্তরগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা সেরে নেওয়া যাক।

চোরাগর্ত—শিকারীদের তৈরী মুখ-ঢাকা গর্ত বা বুনো হাতী ধরার 'খেদা'র মতো, এগুলোও আসলে উপরে পাতলা আচ্ছাদনযুক্ত গর্তমাত্র। উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে, জঙ্গলাকীর্ণ তরাই অঞ্চলেই সাধারণতঃ এইরকম চোরাগর্ত দেখা যায়। বুনো লতাপাতা, ঝোপঝাড় বা পাতলা মৃত্তিকাস্তরের দ্বারা উপরটা বেমালুম ঢাকা থাকে বলে, মানুষ বা জীব-জন্তু এর উপর এসে পড়ামাত্রই তলিয়ে যায়।

চোরাকাদা—পচা শ্যাওলা ও উদ্ভিদে পূর্ণ, সছিদ্র, নরম ও ভিজে মাটি থেকেই চোরাকাদার উদ্ভব। মিথেন গ্যাস, গন্ধক প্রভৃতি মিশ্রিত থাকার ফলে, এর ভিতরটা পচা পংককুন্ডের মতো ভট্‌ভটে হয়ে থাকে। জলাভূমিতেই সাধারণতঃ চোরাকাদা দেখা যায়। নদীর, বিশেষতঃ পাহাড়ী নদীর ঢল বা বন্যা নেমে যাবার পর তীরে যে পুরু পলি পড়ে, তাতেও চোরাকাদার সাক্ষাৎ মেলে। আপাতদৃষ্টিতে একে শক্ত মাটি বলেই ভুল হয় এবং মানুষও অসন্দিগ্ধমনে এর মধ্যে এসে বিপদে পড়ে। এই ভীষণ কাদা থেকে উঠে আসবার জন্যে মানুষ যতই ছট্‌ফট্‌ করে, ততই সে আরও নীচে চলে যেতে থাকে। সাহায্যকারী কেউ লম্বা বাঁশ বা দড়ি ফেলে না দিলে, এ-অবস্থায় তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

পাশ্চাত্যের কর্দমভূমিগুলোতে বৈঁচি বা বেতফলের মতো ছোট ছোট একরকম বেরীফলের ঝাঁকড়া গাছ দেখা যায়। ঐসব ফলের নাম অনুসারেই ওখানকার চোরাকাদাকে বলে ক্র্যানবেরি বগ।

চোরাতুষার—তুন্দ্রা অঞ্চলের দিগন্তব্যাপী তুষারক্ষেত্রের মাঝে মাঝে সুগভীর একধরণের তুষারকর্দম দেখা যায়। আর্দ্র, পিচ্ছিল ও বন্ধুর এই তুষার-কর্দমগুলো হল আরেক জাতের মৃত্যু-গহ্বর। চোরাতুষার নামে পরিচিত এই তুষার-কর্দমের মধ্যে বল্গা-হরিণ ও আরোহীসহ কত স্লেজগাড়ীও যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। গ্রীণল্যান্ড, আলাস্কা ও সাইবেরীয়ার অধিবাসী; মেরু-অভিযাত্রী; এস্কিমো—যুগ যুগ ধরে এইরকম কত মানুষ যে অসহায়ের মতো এইসব চোরাতুষারে ডুবে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে, মানুষের তৈরী কোনো ইতিবৃত্তই আজও তার সঠিক সংখ্যা বলতে পারবে না।

ওৎলা—ভূগর্ভের নিমজ্জনশীল মৃত্তিকার মধ্যে, ওৎলাটি বাস্তবিকই প্রকৃতির একটা আশ্চর্য সৃষ্টি। এই জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে মানুষ বা জন্তু-জানোয়ার দিব্যি নির্বিঘ্নে হেঁটে যেতে পারে; মানুষশুদ্ধ তলিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি পায়ের পাতাটিও মাটিতে বসে যায় না। মনে হয়—স্বাভাবিক শক্ত মাটি। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—মাটির বালি-মেশানো দোঁয়াশ ধরণের এবং ভিজে ভিজে। সামান্য একটু গর্ত খুঁড়ে, শক্ত একখানা লম্বা বাঁশ পুঁতে, বাঁশটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নীচের দিকে চাপতে থাকুন। বাঁশটা প্রথমে অল্প অল্প বসে যেতে থাকবে; একটু পরেই আর কিন্তু চাপ দিতে বা ঝাঁকাতে হবে না, ভৌতিক ব্যাপারের মতো বাঁশটা আপনিই সর্ সর্ করে নীচে নেমে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে যাবে! এখানেই বিস্ময়ের শেষ নয়। এইবার সেই গর্তটা দিয়ে জ্বলন্ত একটা দিশলাইয়ের কাঠি নামিয়ে দিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে—দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল!

ওৎলার ওপর ভারী কোনো জিনিস রেখে ঝাঁকানি দিতে থাকলে, চারিপাশের বিশ-ত্রিশ হাত জায়গার মাটি আস্তে আস্তে নড়ছে বলে টের পাওয়া যায়। অনেক সময় পায়ের চাপেও সামান্য একটু তল্‌তলে বলে মনে হয়। এর ওপর মানুষ বা জীব-জন্তুর কোনো বিপদ হয় না বটে তবে হাতি চলতে গেলে কী হয়, বলা যায় না। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মানুষ কোনো কিছু বুঝতে না পারলেও, জন্তু-জানোয়ারেরা কিন্তু তাদের সহজাত সতর্কতাবুদ্ধি থেকেই ওৎলা, চোরাকাদা প্রভৃতির অস্তিত্ব টের পায় এবং সভয়ে সে-সব জায়গা এড়িয়ে চলে। ত্রিপুরারাজ্যের তৈদু নামক স্থানের অনতিদূরে বিরাট একটা লুঙ্গা-র (টিলার নীচের অথবা দুই টিলার মধ্যবর্তী নিম্নভূমিকে ওদেশে 'লুঙ্গা' বলে) একাংশে একটা ওৎলা আছে। অনেক বছর আগে, একবার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সরকারের পোষা একটা হাতীকে ঐজায়গা দিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। অঙ্কুশাঘাতে জর্জরিত ও রক্তাক্ত হয়েও, হাতীটা কিছুতেই ওখানে যায়নি।

এই ওৎলাগুলো আসলে কিন্তু শক্ত মাটির বহিরাবরণযুক্ত, কর্দমমিশ্রিত ভূগর্ভস্থ চোরাবালি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আপাতদৃষ্টিতে অতি নগণ্য মনে হলেও বালি জিনিসটা কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রায় অনেকরকম প্রতিবন্ধকতারই কারক। বায়ুতাড়িত বালুকণা, মরু অঞ্চল বা সৈকত-ভূমির নিকটস্থ শ্যামল শস্যক্ষেত্রেও ঊষর ও নিষ্ফলা করে তোলে। নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দরগুলোও, স্রোতোবাহিত বালুকার ক্রম-সঞ্চিত স্তূপের জন্যে প্রতিনিয়তই সমস্যার সম্মুখীন হয়। ভাগীরথীর মোহনার কাছে স্যান্ড-হেড্ বা নদীগর্ভস্থ বালুচরগুলো খননের জন্যে, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষকে কিরকম সদাবিব্রত থাকতে হয়, বাংলাদেশের সংবাদপত্র পাঠকের তা অজানা থাকার কথা নয়। এর উপর চোরাবালির সমস্যা তো আছেই। সভ্যসমাজের সমস্ত রাষ্ট্র-সরকারকেই এর জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বিপজ্জনক এলাকাটা ঘিরে দিয়ে মানুষ ও জীবজন্তুর প্রবেশপথ বন্ধ করা, বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন ও বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে রাখা, এমনকি উদ্ধারকারী রক্ষীদলকে মোতায়েন রাখা— এসবও সরকারকেই করতে হয়।

কিন্তু এগুলো তো হল দুর্ঘটনা এড়াবার সতর্কতা-ব্যবস্থা। এসব সত্ত্বেও কোনো মানুষ যদি এই ভয়াবহ মৃত্যু-ফাঁদে পড়ে, তখন তার নিজের পক্ষে করণীয় কি? এই শোচনীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি কিছুই নেই?

এ-প্রশ্নের জবাব পেতে হলে, আগে দেখতে হবে—চোরাবালিতে মানুষ তলিয়ে যায় কি ভাবে? দু' রকমভাবে এটা ঘটা সম্ভব:

১) ধীরে ধীরে ক্রমনিমজ্জন

২) ধ্বস নামার মতো, হঠাৎ ডুবে যাওয়া

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, দ্বিতীয়োক্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার কোনো উপায় বা কৌশলই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এ-মৃত্যু একেবারে অনিবার্য অমোঘ। এক নম্বরের অবস্থাটি অবশ্য অতটা ভয়াবহ নয়। চোরাবালিতে পতিত ব্যক্তিটি যদি সেই সময়ও মাথা ঠান্ডা রেখে, শুধু নিম্নোক্ত কৌশলদুটি অবলম্বন করতে পারেন, তাহলেই তাঁর জীবন রক্ষা পায়:

ক) 'চোরাবালিতে পড়েছি'—বুঝতে পারামাত্রই, এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বা আদৌ ছটফট্ না করে, আলগোছে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

খ) বালিতে বেশী চাপ বা নাড়া না দিয়ে, অতি ধীরে ধীরে ও আলগোছে বুকে হেঁচড়ে (হামাগুড়ি নয় কিন্তু; হামাগুড়ি দিতে গেলেই হাঁটু দুটো এবং হাতখানা বালিতে ডুবে যেতে থাকবে) যে কোনো দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, অতিবড় স্থির-বুদ্ধি ও বিচক্ষণ লোকও ও-অবস্থায় পড়লে আতঙ্কে ছট্‌ফট্ না করে পারেন না। নিমজ্জমান পা-দুখানা টেনে তুলবার জন্যে মানুষ যতই হাঁচড়-পাঁচড় করতে থাকে, উঠে আসার শেষ সম্ভাবনাটুকুও ততই সুদূরপরাহত হতে থাকে। কোনো জন্তু-জানোয়ার চোরাবালিতে পড়লে, তার মৃত্যুটাও ঐ একই কারণেই ত্বরান্বিত হয়।

মজা এই যে, বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা কিন্তু চোরাবালির এই ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক রহস্যকে হাল আমলে প্রায় সম্পূর্ণই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, চোরাবালিকে এত ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নাকি নেই। বিশ্রুতকীর্তি স্থাপত্যবিজ্ঞানী, অধ্যাপক র‍্যালফ্ ব্রেজেল্টন পেক্-এর মতে—

> ". . . since the density of the sand-water suspension exceeds that of the human body, the body cannot sink. Struggling may lead to loss of balance and drowning. This possibility has no doubt led to the superstition, prevalent in literature, that quicksand has the ability to draw a person to his death".

নিম্নরেখ অংশদুটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমে সুস্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে—মানবদেহ ডুবতে পারে না। কিন্তু ঠিক পরের বাক্যটিতেই বলা হল—জোর-জবরদস্তি নিমজ্জন কারণ হতে পারে! তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? প্রাণহানির শঙ্কাটা কি তাহলে থেকেই যাচ্ছে না?

* * *

তত্ত্বগত বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে চোরাবালিকে যতই নিরাপদ বলে রায় দেওয়া হোক না কেন, সাধারণ মানুষের কাছে চোরাবালি চিরদিনই বোধ হয় আশঙ্কার কারণ হয়েই থাকবে। অপরিচিত বালুভূমির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে ভয় সে পাবেই—একথা যেমন সত্যি; তেমনি অজানার রহস্য আর নিসর্গশোভার হাতছানিতে সে-ভয়কে সে জয় করেই এগুবে—এ-সত্য কি তার চেয়েও বড় নয়? তাছাড়া, ভয়ের কারণ কোথায় নেই? কাব্যিক রূপ-কল্পনার মায়া-কাজল ঘুচিয়ে, যে চাঁদের বুকে আমরা আজ মানব-মনীষার প্রথম পদচিহ্ন আঁকতে চলেছি, বিজ্ঞানীদের মতে সেখানেও তো রয়েছে আলগা উল্কাচূর্ণ আর প্রস্তরচূর্ণের পুরু আবরণ। প্রথম মানব-অভিযাত্রীরা সেখানে পৌঁছে, ধূলি-গহ্বরে ডুবে যেতে পারেন—এই শঙ্কাকে মেনে নিয়েই তো আমরা এগুচ্ছি এগুবো। এই এগিয়ে চলার কি শেষ আছে?

শিল্পী : রঘুনাথ সিংহ

প্রদর্শনী পরিক্রমা

অনেকদিন পর আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের দুটি দর্শনীয় প্রদর্শনী দেখা গেল রঘুনাথ সিংহের ভাস্কর্য (১৯ থেকে ২৮ নভেম্বর) এবং ফরাসী ট্যাপেস্ট্রি ও স্টেইণ্ড গ্লাস প্রদর্শনী (২৬ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর)। দুটিই বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময়।

রঘুনাথ সিংহ কলকাতার সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপন করে য়ুরোপে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি ভাস্কর্যের উপাদান হিসেবে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা চালান। মুক্তাঙ্গনে প্রদর্শনের উপযোগী ভাস্কর্য সৃষ্টির দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। ইতিপূর্বেই তাঁর এই জাতের ভাস্কর্য সৃষ্টি দেখা গেছে এবং বর্তমান প্রদর্শনীতে তার অল্পমূল্যের কাঠ এবং তার সংগে রঙীন সেরামিকস্ এনে যে [illegible] দেখালেন হল ঘরের মধ্যেও মুক্তাঙ্গনে প্রদর্শনীর উপযুক্ত [illegible] বেশী দেখতে পাওয়া যেত।

[illegible] মধ্যে ১২/১৩ [illegible] অল্পমূল্যের কাঠের কাজ। প্রথানুগ সাদৃশ্য এড়িয়ে চললেও বাস্তবের আভাস তিনি পরিত্যাগ করেননি। আধুনিক রীতির সুদক্ষ প্রয়োগে ১ ২ ৩ নম্বরে ফিগারগুলির গঠন ও স্থাপন ভঙ্গী ৬ নম্বরের পাখির গঠন এবং ১০ নম্বরের বৃহদাকৃতি মুখে (কতকটা আফ্রিকান ভাস্কর্যের আমেজ তৈরী) একটা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। কাঠের ওপর সাধারণত কালো রং ব্যবহার করে তার ওপর মাঝে মাঝে উজ্জ্বলবর্ণের সেরামিকস্ টুকরো বসিয়ে মূর্তিগুলির মধ্যে, গঠন ফুটিয়ে তোলা ছাড়াও একটা চিত্রধর্মিতার সৃষ্টি করেছেন। গঠনবৈচিত্র্যে মূর্তিগুলি যেন নিজেদের চারপাশে একটা বিশেষ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

●

সেরামিকসের কাজগুলি অনেক ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক এবং ভাস্কর্যের চেয়ে চিত্ররূপটাই সেখানে যেন বেশী পরিস্ফুট। তিনটি মাছের রূপের মধ্যে বহুবর্ণে চিত্রিত মাছের গঠন থেকে যেন নতুন ফর্ম তৈরীর প্রেরণা নিয়ে কাজ করেছেন। বিশিষ্ট স্টেইনড গ্লাসের বর্ণাঢ্য রূপটাই এখানে যেন প্রধান। শ্লেট রঙের জমির ওপর বহুবর্ণের একটি মাছের রূপ (১৪) যেন প্রাগৈতিহাসিক ফসিলের আকস্মিক আবিস্কারের মুহূর্তের মত উত্তেজনাময়। থ্রি ফেসেস (২৭) অনেকটা তার মাতৃমূর্তির মুখেরই সেরামিকসে রূপান্তর। ডাইং ওয়ারিয়রে (২৮) সেরামিকস প্লেটের ওপর বিচিত্র সমারোহ। আরেকটি ফর্মের মধ্যে প্লেটের দুপাশেই বিচিত্র বর্ণ্যপাতির অংশের সজ্জা দৃষ্টির ওপর অদ্ভুত এক মোহ বিস্তার করে। চিত্র এবং ভাস্কর্যের একটা সুন্দর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন শ্রীসিংহ।

●

ট্যাপেস্ট্রি এবং স্টেইনড গ্লাস এই দুটি শিল্পই মধ্যযুগের ফ্রান্সে সৃষ্টি এবং পরিণতি লাভ করে। একটি সামন্ত রাজাদের জন্যে অপরটি ধর্মমন্দিরের প্রয়োজনে তৈরী হত।

পনের শতক থেকে আঠার শতক ছিল ট্যাপেস্ট্রি শিল্পের স্বর্ণ-যুগ। রাজা মহারাজাদের যুদ্ধ প্রকৃতির কোলে প্রেমিক-প্রেমিকা আবার কখনো বা ধর্মীয় কোন কাহিনীকে ভিত্তি করে এই দেওয়ালজোড়া বহুবর্ণের সুতোয় বোনা চিত্রগুলি সুদক্ষ কারিগরের দীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী হত। এক একটি ট্যাপেস্ট্রি বুনতে এক একজন কারিগর অন্ততঃ তিন চার বছর ধরে। ডিজাইন করতেন য়ুরেনস, ওয়াতু এবং আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পী।

গবেলাঁ, বুভে প্রভৃতি জায়গার ট্যাপেস্ট্রির চাহিদা ছিল সারা ইউরোপের অভিজাতদের কাছে।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা চলে যাবার পর আধুনিক যুগে এই ট্যাপেস্ট্রি শিল্পের পুনরভ্যুত্থান হয় জাঁ লুরসার উদ্যোগে। আরাস, ভাল-দ্য-লোয়ার, প্যারিস, ওবুসোঁ, বুভে, গবেলাঁ প্রভৃতি প্রাচীন জায়গাগুলিতেই এখনো নতুন করে ট্যাপেস্ট্রি শিল্পের পত্তন হয়েছে। বয়নশিল্পীরা নিছক ডিজাইনের অনুকরণ করেন না, ডিজাইনকে তাঁরা তাঁদের শিল্পরীতির অনুযায়ী ইন্টারপ্রেট করেন। আধুনিক খ্যাতনামা শিল্পীরাও পেছিয়ে নেই। মিরো, আর্প, অ্যাডাম, কালডার, লে কারবুজিয়ে, সোনিয়া ডেলনি, নিকোলাস দ্য স্তায়েল প্রমুখ শিল্পীরা আধুনিক ডিজাইন নিয়ে বয়নশিল্পীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন। বাইশখানি দেওয়ালজোড়া বৃহদাকার ট্যাপেস্ট্রির প্রদর্শনীতে এঁদের ডিজাইনের বাহার ও বয়নশিল্পীদের দক্ষতার নমুনা সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেল। যে কোন একটি ট্যাপেস্ট্রি সমস্ত ঘরের চেহারা বদলে দিতে পারে তার রং রেখা ও ডিজাইনের সমারোহে। বয়নশিল্পীদের বহুবর্ণের সুতোয় মূল চিত্রের টোন মেলাবার ক্ষমতা মনোমুগ্ধকর। মিরোর আদিম শিল্পের প্রভাবে করা ডিজাইনের ঘোর কৃষ্ণ, নীল, লাল ও সাদার সুচিন্তিত ব্যবহার এবং নিকোলাস দ্য স্তায়েলের বিমূর্ত কম্পোজিশনের সূক্ষ্ম টোন ও রেখার গতিময় রূপ, সোনিয়া ডেলনির ফ্ল্যাট কিউবিজম ঘেঁষা জ্যামিতিক অ্যাবস্ট্রাকশনের কমলা, হলুদ, বাদামী, কালো-সাদার সমারোহ জাঁ আঁতলার মোটা রেখার ক্যালিগ্রাফি এবং এমিল গিয়োলির অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরেখার ক্যালিগ্রাফি প্রতিটি শিল্পীর চিত্রের বিশেষ মেজাজের দিকে দৃষ্টি রেখে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ইন্টারপ্রেট করেছেন বয়নশিল্পীরা। অ্যাডাম ও আর্পের কাজে ভাস্কর্যসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্ণবিলেপনে গাম্ভীর্যের আমেজ এবং লেকর বুজিয়ের পিকাসো অনুপ্রাণিত ডিজাইন. ভিয়েরা ডা সিলভার কৃষ্ণ ও নীলাভ ধূসর বর্ণের রেখাময় তুলিচালনার স্বচ্ছন্দ মেজাজের কাজ হঠাৎ দেখলে ট্যাপেস্ট্রির বদলে মূল ছবি বলেই মনে হয়।

স্টেইনড গ্লাসের নমুনাগুলি মাপে ছোট সংখ্যায়ও কম কিন্তু বাহারে কম নয়। আধুনিক শিল্পীরা এই মাধ্যমে আধুনিক ডিজাইনের প্রয়োগে কয়েকটি মাধুর্যময় কাজ সৃষ্টি করেছেন। জাঁ পিয়েরোবারের 'মধ্যাদিন' কাজটির হরিদ্রা ও বাদামী রঙের ডিজাইন ও গাব্রিয়েল লোয়ারের ঢেউয়ের রূপ (শুধু মাত্র নীল কাচের সাহায্যে তৈরী) দুটি অনবদ্য সৃষ্টি। ইসবেল রুয়োর (জর্জ রুয়োর কন্যা) ধর্মীয় বিষয়ের ওপর করা কাজটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর আগে ফরাসী সরকারের উদ্যোগে এ ধরনের একটি বৃহৎ প্রদর্শনী হয়েছিল। বর্তমান প্রদর্শনীটিতে তত বৈচিত্র্য না থাকলেও বর্ণাঢ্যতা অনেক বেশী। প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ফরাসী সরকার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংগীত ও শিল্প আকাদমী অব ফাইন আর্টস।

দীর্ঘকাল পরে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে করুণা সাহা তাঁর একটি বৃহৎ প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন (২১শে নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর)।

তেলরং, জলরং ও ড্রয়িং নিয়ে ষাটখানির ওপর কাজের এই প্রদর্শনীতে শ্রীমতী সাহার কাজের অনেক বৈচিত্র্য উপস্থিত করা হয়। নিসর্গদৃশ্য, প্রতিকৃতি প্রভৃতি নিয়ে অনেক বিভিন্ন ধরনের কাজ উপস্থিত করেছেন তিনি। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিধুভূষণ ঘোষ ও আরো কয়েকজনের প্রতিকৃতি দেখা গেল। এর মধ্যে রেণু আহুজা, মজুলিকা দাস, পাম্মা প্রমুখ কয়েকজনের প্রতিকৃতিতে একটা ডেকরেটিভ রঙের প্রয়োগ পরিস্ফুট হয়েছে। আসলে মনে হয় ডেকরেটিভ ধর্মীতাই শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। মাতিস পিকাসো অনুপ্রেরণায় যে কয়েকটি স্টিল লাইফ বা ওই জাতের কাজ রয়েছে তার মধ্যেও ডেকো-রেশনাই প্রধান। তাঁর আধুনিকতম কাজে রঙের মিষ্টতাই বেশী এবং ডিজাইন ও বর্ণপ্রয়োগের দিকে নীরদ মজুমদারের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'বিয়ন্ড দি ভেল' (১৪) ছবির রক্ত ও হলুদ অবগুণ্ঠনের আড়ালে ক্ষণিকদৃষ্ট মুখ 'সুইরল অ্যারাউন্ড এ স্টার্স' (১৮), 'থ্রি ইন ওয়ান', 'ইলিউশন ওপেক' (২৭), 'অ্যাট দি স্টীল পয়েন্ট' (২৮) প্রভৃতি ছবির দেহাকৃতির ভাঙ্গা রেখা ও ফ্ল্যাট রঙের মধ্যে সূক্ষ্ম টোনের পরিবেশে শ্রীমজুমদারের চিত্রনির্মাণরীতির স্বাক্ষর পরিস্কার দেখা যায়।

জলরঙের কাজগুলি সাধারণ। দুটি ঘাটের ছবিতে মধ্যাদিনের স্তব্ধতার আমেজ দেখা যায়। দেহাকৃতি অঙ্কনে অনুশীলনের ছাপ আছে থাকলেও ছাপ সামান্য।

সুনীল সরকার কলকাতার শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাশ করার পর কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষকের কাজ করছেন। ১৮ থেকে ২০ অক্টোবর অ্যাকাডেমিতে তিনি তাঁর ২৭খানি ড্রয়িং-এর একটি প্রদর্শনী করলেন।

শ্রীসরকারের সবগুলি ড্রয়িংয়ে তাঁর প্রতিকৃতি ও দেহাকৃতি আঁকবার দক্ষতা দেখা গেল। রমণীর দেহবল্লরীর বিচিত্র লীলা নানাভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা তিনি করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি রমণীর শুধু মাত্র মুখমণ্ডলের ছবি অনেক সুন্দর এবং মাধুর্যমণ্ডিত যেমন ১, ৪, প্রভৃতি ছবিগুলি। কাঠির সাহায্যে কখনো তিনি সূক্ষ্ম রেখায়, কখনো বা মোটা টোনে কাজ করেছেন। কেশভঙ্গিমার কয়েকটি স্টাডি ইণ্টারেস্টিং হয়েছে। পূর্ণ দেহাকৃতির চাইতে অর্ধেক দেহের স্টাডিগুলিই বেশী সফল হয়েছে। "কোল্ড" (২২) ছবির হাল্কা দু' চারটি রেখায় একটা মূর্ত সৃষ্টি হিসেবে প্রশংসনীয়। অ্যাকাডেমিক ধাঁচের কাজের মধ্যে উঁচুদরের কাজ আজকাল বিশেষ দেখা যায় না। সেদিক দিয়ে শ্রীসরকারের স্কেচের প্রদর্শনীটি উল্লেখযোগ্য।

—[illegible]

শিল্পী : করুণা সাহা

প্রেক্ষাগৃহ

- চিত্রসমালোচনা
- বিদেশী ছবি
- মঞ্চাভিনয়
- বোম্বাই থেকে

আপনজন / রবি ঘোষ

আপনজন

ওরা যে আপনজন আমাদের।

সত্যিই ওরা নিজের লোক, কাছের মানুষ। অথচ এই শহুরে জীবনের গোলকধাঁধায় ওদের আসল সত্তাকে আমরা অস্বীকার করি, হারিয়ে ফেলি। সহজভাবে জীবনযাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক অব্যবস্থা, আর্থনীতিক সংকট। কিছুতেই ভালো হবার সুযোগ দিই না, সামান্য [illegible] মাশুল গুণতে হয় দীর্ঘকাল। বরং [illegible] দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করি [illegible], নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার সেতু [illegible] তুলি। কিন্তু সময় বদল হয়, ভুলে যাই [illegible], নিষ্পেষিত হই শত-শত যৌবনের [illegible]। ওরা শিকার হয় সময়ের, সমাজের। [illegible] হয় আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালোবাসা থেকে। ওরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে চায় নিজের মূল্যবোধ। মনের ভিতরে তবু থেকে যায় ওরা আসল জন।

সত্যিই ওরা আপনজন। তাই, যাদের চালচুলো নেই ওরা তাদের দলে। মা-হারা বাপ-[illegible] [illegible] দলে। বিধবা [illegible] [illegible], অথচ এ [illegible] তাদের জায়গা [illegible]। কিন্তু কেন? [illegible] যৌবন [illegible] সত্যি কথা [illegible] এ-প্রশ্নের সম্মুখীন হতে কেউ-ই চাই না সহজে। আসলে যে সাহস আমাদের নেই। অন্তরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর বড়ো ভয়।

কিন্তু কেউ কেউ দাঁড়ান বই কি! সহানুভূতি আর সহমর্মিতা নিয়ে প্রবেশ করতে চান এর অন্তর্মূলে। তপন সিংহ আমাদের সেখানেই দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি শোনাতে চেয়েছেন অভিশপ্ত সমাজ-ব্যবস্থার মর্মন্তুদ কাহিনী। স্নেহবঞ্চিত, অসহায় ছন্নছাড়াদের গল্প। বুকে টেনে নিয়েছেন আমাদের চোখেদেখা কাছের সেই যুবকদের। কে এল প্রোডাকশনের 'আপনজন' বর্তমান যৌবনবিক্ষুব্ধ সমাজের নিপুণ আলেখ্য। অপূর্ব চিত্রভাষ্য। অবশ্য সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত খুবই ক্ষীণ। তা নাই হলো। আর্টের তো তা উদ্দেশ্যও নয়। সচেতন করা তার কাজ।

প্রৌঢ়া মহিলা (ছায়া দেবী), যাঁর চোখে ঐসব 'বকবাজ' ছেলেরাও 'সোনার চাঁদ', তিনি গ্রামবাংলার সহজ-জীবনের প্রতিনিধি। এঁর চোখে কলকাতা এক বিরাট জিজ্ঞাসা। অবিচার, অনাচার আর কৃত্রিমতার এমন গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া সত্যিই বড়ো অভিজ্ঞতা। এমন জীবন্ত অভিনয় ইদানীং খুবই দুর্লভ। স্বরূপ দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামানন্দ বসু এরা প্রত্যেকেই চরিত্রের গভীরে ঢুকেছেন, ফলে অভিনয় বলেই মনে হয় না। রবি ঘোষ আর অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন নির্বাচনপ্রার্থী। এদের অভিনয় সহজ ও সুন্দর। নির্মলকুমার শহুরে চাকুরিজীবীর অভিনয়ে চমৎকার। তাঁর শিক্ষিতা চাকুরিজীবী স্ত্রীর ভূমিকায় সুমিতা সান্যালের অভিনয়ও একরকম।

ছবিটি সর্বাংশে ত্রুটিমুক্তও নয়। রূপকথায় যেখানে দুই রাক্ষসের উল্লেখেই নির্বাচনপ্রার্থীদের কথা মনে করিয়ে দেয়, সেখানে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে তাদের আবার ততক্ষণ ধরে না দেখালেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ঐ দৃশ্যেই মাইকের লাউড-স্পীকারের গাঁক-গাঁক শব্দের শট্‌টি লক্ষ্য ভেদ করেছে। গানের দৃশ্যগুলি সুপরিকল্পিত। কিন্তু লোফালুফি খেলার দৃশ্যে 'মস্তান'দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া একটু যেন কৃত্রিম মনে হয়। বৃদ্ধা ছায়া দেবী যৌবনের গান শোনাতে গিয়ে অতীতের প্রেমদৃশ্য যেভাবে ফ্লাশ ব্যাকে দেখানো হয়েছে তা অনায়াসেই ছাঁটাই করা যেত। ঐ চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্যও একটু যেন সাজানো।

কিন্তু সবশেষে বলব, কাহিনী নির্বাচনে, চিত্রনাট্যের মরমী বিন্যাসে এবং দলগত সু-অভিনয়ে 'আপনজন' দর্শকসমাজে আলোড়ন আনবে।

বিমল মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ উঁচুদরের। সম্পাদনাও উন্নত। আর প্রচার-পরিকল্পনায় পূর্ণেন্দু পত্রীর কৃতিত্বও কম নয়।

চিত্র-সমালোচনা

● স্ত্রী

স্ত্রী। চন্দনা ও গৌরপ্রসাদ

জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ঐক্য, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির বুলি শুনি প্রায়ই—কিন্তু ওগুলো যে শুধু মুখের কথায় ফল নয়, এর জন্য বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে সবচাইতে প্রথমে ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন, প্রয়োজন সাংস্কৃতিক চেতনা বিনিময়ের যে কথা এক আধবার উচ্চারণ করলেও হাতেকলমে কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য পথে পড়ে না। বিশেষ করে আমাদের মত বহুভাষী বহু সংস্কৃতির বাহকদের মধ্যে এটা সব চাইতে প্রথমে প্রয়োজন।

ডাবিং-এর সাহায্যে দুটি একটি পৌরাণিক ছবি ছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় কোন ছবি চোখে পড়েনি। পাশের প্রতিবেশী উড়িষ্যা—যাদের সঙ্গে রুচি, রীতিনীতি, ব্যবহার এমনকি ভাষার দিক থেকেও বহুলাংশে সংস্কৃতি বিনিময়ের কোন বিশেষ বাধা নেই সেই ওড়িয়া ছবিই বা কটা দেখতে পাই আমরা। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রিলিজ তো দূরে অস্ত। ওড়িয়া ছবির বাজার খুব ছোট, তায় আবার খরচ মোটামুটি হাজারি ধরনের সুতরাং ব্যবসায়িক দিক থেকে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা খুব বেশী। এহেন দায়িত্ব নিতে কেবা চায়! সম্প্রতি শ্রীমতী পার্বতী ঘোষের প্রযোজনায় নতুন ওড়িয়া ছবি 'স্ত্রী'র এক বিশেষ প্রদর্শনী দেখে মনে হল শ্রীমতী ঘোষ সে গুরুভার মাথা পেতে নিয়েছেন।

কাহিনীতে নতুনত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু উপস্থাপনার গুণে তা অনেকাংশে (বিশেষ ভাবে প্রথমার্ধ) হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। দেবব্রত স্ত্রীর মৃত্যুতে অকস্মাৎ আঘাত পেয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত, কিন্তু অনুরাধা আর তার দাদা প্রসন্নর আবির্ভাবে মরা আর হয়ে ওঠে না। সেবাশুশ্রূষা করাকালীন অনুরাধার সঙ্গে দেবব্রতর মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিয়ে করে বাড়ী আসে দেবব্রত। প্রথম পক্ষের ছেলে নয়ন অনুরাধাকে 'মা' বলে ডেকে ওঠে—এখান থেকেই নাটকের শুরু। প্রথম বিয়ের কথা অনুরাধাকে না জানানোয় ভুল বোঝাবুঝি হয় দুজনের মধ্যে। তারপর অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে মেলে দুজনে: নয়ন অন্ধ তখন। দূর-সম্পর্কের ভাই শঙ্কর আর দেবব্রতর বিধবা বোন ভানু মারা গেছে, শোকে দুঃখে দেহত্যাগ করেছেন মা স্নেহময়ী। এর মধ্যে টুইস্ট, শেকিং, ডুয়েট সং সবই আছে। শেষ দৃশ্যে সংঘর্ষের ব্যাপার আছে কিছু।

পরিচালক "সিদ্ধার্থ" বক্স অফিসের দিকে নজর রেখেই হাল্কা রসের বেশ কিছু দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, ফলে দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতির সঙ্গে গল্পের গম্ভীরতাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই পুনঃ সম্পাদনার প্রয়োজন। কয়েকটি দৃশ্যে সঙ্গীতের ব্যবহার সুন্দর পরিবেশ রচনায় সহায়তা করেছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমেই নাম করব অনুরাধা চরিত্রের চন্দনাকে। হাঁটা, চলা, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ প্রতিটি দৃশ্যে তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তি যতখানি সংযত সুন্দর ঠিক ততখানি প্রাণবন্ত, অন্য কোন ছবি না দেখেও বলতে বাধা নেই চন্দনা দেবী ওড়িয়া চলচ্চিত্রের প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী। দেবব্রতর ভূমিকায় গৌরপ্রসাদ চিত্রনাট্যের প্রতি কর্তব্যই করেছেন, বিশেষ কিছু নয়। চন্দনার পাশে তাঁকে বড় নিষ্প্রভ লাগে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখের দাবী রাখে শঙ্করের ভূমিকায় যদুনাথ ও বিজুরীর ভূমিকায় স্বরূপ।

বয়স, অভিজ্ঞতা সব দিক থেকে অনুজ হলেও ওড়িয়া এ ছবিটি যে 'অনেক' বাংলা ছবির চাইতে 'অনেক' বেশী ভাল তারই প্রমাণ পাবে দর্শকরা।

● বুঁদ যো বন গাই মতি

একদিকে মহৎ প্রেরণা, অন্যদিকে দর্শক-মনোরঞ্জনের তাগিদ ভি শান্তারামের বুঁদ যো বন গই মোতি-কে যেমন খাঁটি আর্ট ফিল্মের মর্যাদা দেয় না, তেমনি নিছক বাজারী ছবি বলে দূরে সরিয়ে রাখাও যায় না। আর এখানেই রয়েছে এই ছবির সাফল্য ও ব্যর্থতা। সর্বশ্রেণীর দর্শকেরই কিছু কিছু খোরাক আছে এতে। এক কথায় বুঁদ যো বন মোতি চিত্তাকর্ষক।

পরিচালক ভি শান্তারাম এ ছবিতে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। মিথ্যা কি চিরকাল গোপন রাখা যায়? আদর্শবাদ কি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে? শিক্ষকদের হৃদয়ে কি ভালোবাসা বলতে কিছু থাকতে নেই? বলা বাহুল্য, কোন প্রশ্নই নতুন নয়, কিন্তু ট্রিটমেন্টের গুণে এর সমাধান সুসঙ্গত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলব, এরকম সামাজিক ভূমিকাবিশিষ্ট ছবিতে এত নাচ-গানের বহর সত্যিই বেসুরো।

সত্যপ্রকাশ হলেন মানুষগড়ার কারিগর। ছাত্রপ্রিয় আদর্শ শিক্ষক। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি তাঁর অনীহা। এ জন্য বিপদের ঝুঁকিও নেন, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না তাঁর। দোকানদার ও টাঙ্গা-ওয়ালী শেফালী মাস্টারজীর প্রতি অনুরক্ত। চরম বিপদের সময় তন্বী শেফালী রক্ষা করে সত্যকে। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার খাতিরে শিক্ষকদের কি ভালোবাসতে আছে?

স্টোর প্রেক্ষাগৃহে উত্তরবঙ্গ বন্যার্তদের ত্রাণ-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে তপন সিংহ পরিচালিত আপনজন চিত্রের চ্যারিটি শোয়ে মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে, রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর এবং শ্রী আর এন মালহোত্রা। ফটো : অমৃত

মহেশ সত্যপ্রকাশের একমাত্র প্রাণের অনুজ। পড়াশুনার খাতিরেই তাকে বাইরে বোর্ডিংয়ে থাকতে হয়। এক সময় বেড়াতে এল সে দাদার কাছে। পাশের বাড়ির রেণুকাকে চোখে ধরল। রেণুকা নবযুবতী। সময় এগোচ্ছে। হঠাৎ রেণুকা অস্বাভাবিকভাবে মারা গেল। সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল। খুনী সন্দেহে সত্যপ্রকাশ গ্রেপ্তার। শেষ পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত আসামী আত্মপ্রকাশ। এরপরও ঘটনা এগিয়ে যেতে লাগল।

জীতেন্দ্র এবং মিনু মমতাজের অভিনয় সাবলীল। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, গভীর ভালোবাসা সব কিছুই মমতাজ গভীর অভিব্যক্তিতে জীবন্ত করে তুলেছেন। জীতেন্দ্রের অভিনয়েও একই কথা প্রযোজ্য। ললিতা পাওয়ার, বৈশালী, নানা পালশিকর, সুরেন্দ্র প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। ক্যামেরার কাজ খুবই উন্নত। গানগুলি আকর্ষণীয়। একটি নাচের দৃশ্য সুস্থরুচির পরিচায়ক না হলেও ভালো লাগবে অনেকেরই।

ছবিটি প্রযোজনা, পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন ভি শান্তারাম।

বিদেশী ছবির খবর

●

জন্ম ১৯৩৩-এর জুনে, ছোটবেলাতেই মারা গেলেন মা-বাবা। নিঃসহায় ছেলেটা মানুষ হল এক আত্মীয়ের কাছে, স্কুলের পড়া শেষ না হতেই ঢুকতে হল কারখানায়। ভাগ্যের পরিহাসে সে-চাকরীর মেয়াদও বেশীদিন হল না। ক্রাগুয়েভাজের সেই আধা শহুর আধা গেঁয়ো পরিবেশ তার মধ্যে এক নতুন অনুভবের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

আর তার ফলেই আজ সেই মা-বাবা-হারা ছেলেটি যুগোস্লাভিয়ার বোজানিক যুগোস্লাভিয়ার সবচাইতে জনপ্রিয় অভিনেতা। সতের বছর বয়সে নিজের গ্রামের থিয়েটার দলে ঢোকে। ওখানে ভালো কাজ করায় বেওগ্রাদ-এর থিয়েটার ও ফিল্ম অ্যাকাডেমীতে অডিশন দেবার সুযোগ পায়। বোজানিক জাতশিল্পী, সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করতে জানে। জিকা মিত্রোভিচের 'এক্রন অফ ডাঃ এম' ছবিতে প্রথম ক্যামেরার সামনে আসে সে। আর এদিকে বেওগ্রাডের জাতীয় নাট্যশালায়ও অভিনয় শুরু করে। সুন্দর কাজ করার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ওখানে স্থায়ী আসন পায় বোজানিক। থিয়েটারে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ শুরু করে। দিনে দিনে এক-একটা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বোজানিকের প্রতিভার নতুন নতুন দিক প্রকাশ পেতে থাকে। রোমান্টিক, সিরিও-কমিক, স্যাটায়ারিস্টিক সব ধরনের চরিত্রেই সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ফিল্মে পুরোপুরি আসার আগে অব্দি প্রায় চল্লিশখানা নাটকে সে অভিনয় করেছে। যুগোস্লাভ ড্রামা থিয়েটার দলে থাকাকালীন সে যেসব ছবি করেছে, তার মধ্যে শেকসপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজর', 'ওথেলো', শ'য়ের 'সেণ্ট জুয়ান', শেখভ-এর 'আইভানভ', শার্দুর 'মাদাম সান্ সে জেনী', ক্র্যাডুন শার্কার 'লাইফ ইজ এ ড্রিম', ডস্টয়েভস্কির 'ইডিয়ট', ব্রেখট-এর 'ককেশিয়ান চক সার্কল', গোগোলের 'ডেড সাউল', উইলিয়ামসের 'দি রোজ টাটু', আর্বুজভের 'দি স্টোরি অফ ইরখুটস্ক' ও আরও অনেক নাটকের নাম করা যেতে পারে।

ফিল্মে এসেছে সে মাত্র বছর-ছয়েক আগে। এখন আর মঞ্চে যাবার সময় হয়ে ওঠে না ঠিকমত। ফিল্মের কাজেই সারা বছর ব্যস্ত। নিজের দেশের ছবি ছাড়াও, বিদেশের ছবিতেও সে কাজ করে। এই তো গত বছরে যে-আটখানা ছবি করেছিল, তার মধ্যে ছ'খানাই ইতালীর।

প্রথম ছবির কথা তো বলেছি। তারপর থেকে বোজানিক একে একে 'দি লাস্ট ট্র্যাক', 'স্কাই অ্যাবভ দি ব্রাঞ্চেস', 'দি ফার্স্ট সিটিজেন অফ এ স্মল টাউন', 'লা ট্রুর', 'টেক কেয়ার', 'ব্ল্যাক ম্যান্সারস', 'জেনিকা', 'দি টেস্টেমেণ্ট', 'দি ব্রিগেণ্ডস', 'শোলাইরা', 'এ ক্যাট উইথ এ হেমলেট',

কথক (টালিগঞ্জ)-এর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা সভায় লোকসংগীত গায়ক প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী পরিচালক তপন সিংহ, কানন দেবী এবং উত্তমকুমার।

'দি লাফিং ওয়ানস্ ডাইজ টোয়াইস্' ছবি-গুলো করে। যাত্রাপথের শুরু সবে।

যুগোস্লাভিয়ার ভোলা ওর নতুন ছবি 'আউট অফ সেপ' এবার বার্লিনে ওদেশের প্রতিযোগী ছবি হিসাবে যোগ দিয়েছিল। পুরস্কারও পেয়েছে একটা। পেত্রোভিকের নতুন ছবি 'গড হেল্পস দোজ হু হেল্প ওয়ান এনাদার' ছবিতে বোজানিক কাজ করবে ইতালীর বিখ্যাত অভিনেত্রী অ্যানি জিরারদোর (ভিসকান্তির 'রোকো এন্ড হিজ ব্রাদার্স' খ্যাত) সঙ্গে।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর 'লা ম্যারি এতেৎ এন ন্যর' সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছে লন্ডনে। ইতি-মধ্যে তিনি অবশ্য 'বেয়জমি ভলস্' নামে নতুন ছবির কাজও শেষ করে ফেলেছেন। আবার শিগগির নাকি আরেকটা নতুন ছবিতে হাত দেবেন। বন্দোবস্ত পাকাপাকি সব। ছবির নাম 'দি সাইরেন অফ মিসি-সিপি'। ত্রুফো ছবিকে প্রেমের উপাখ্যান বলে বর্ণনা করেছেন। কর্সিকা, নিস ও কানের লোকেশনে ছবির বেশীর ভাগ কাজ হবে। প্রধান ভূমিকাদুটোতে থাকবেন জাঁ পল বেলমদো ও ক্যাথরিন ডানিয়ুভে।

পিয়ের এ'তে বেশ কিছুদিন বাদে আবার ফিরে এলেন সিনেমাজগতে। গত পাঁচ-ছ' মাস যাবৎ উনি এক সার্কাস দলের সঙ্গে ঘুরছিলেন। এ কদিন সার্কাসের সঙ্গে থাকার ফলে একটু দুর্বলতা এসে গেছে ওঁর। উনি এক জায়গায় বলেছেন, ক্লাউনের পোশাক পরলে আমি সবকিছুই ভুলে যাই। একটা নতুন প্রাণ, নতুন উত্তেজনা পাই যেন।" সিনেমা লাইনে এসেই বন্ধু কারিয়েরের সহযোগিতায় নতুন ছবি 'দি গ্রান্ড লভ'-এর চিত্রনাট্য শেষ করে ফেলেছেন। চল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ় উনিশ বছরের এক যুবতীর প্রেমে পড়ে এঁদের [illegible] তার পনের বছর সংসার করা পুরোন স্ত্রী বর্তমান। এই কাহিনী নিয়ে এক সুন্দর হাসির ছবি। ছবির পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা পিয়ের এ'তে নিজেই। স্ত্রী চরিত্র এখন স্থির হয়নি।

মঞ্চাভিনয়

●

নাট্যচক্র দল-এর শিল্পী সম্প্রতি বিশ্বরূপা থিয়েটারে অনুপ সরকার রচিত হাসির নাটক 'ম্যাজাম্যাকবার' অভিনয় করলেন। হাসির হিল্লোলে নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখর, কিন্তু বলতে বাধা নেই যে এর মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু অতিনাটকীয় ব্যাপারের সুর ধরে ভাঁড়ামি এসে গেছে যা নাট্যগতিকে স্থানে স্থানে মন্থর করেছে। তবে কাহিনীর বিন্যাস ও কিছু কিছু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ প্রশংসার মতো। নাট্যকার স্বয়ং সার্থকভাবে নাটকটি পরিচালনা করতে পেরেছেন।

শিল্পীদের অভিনয়ে চরিত্রোপলব্ধির আন্তরিকতা ছিল বলে সামগ্রিক নাট্য-প্রযোজনাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে বাধা পায়নি। বিভিন্ন ভূমিকায় প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে কিছুটাও স্বাতন্ত্র্যও কখনো কখনো লক্ষ্য করা গেছে। 'নির্মল' ও 'রাম' চরিত্রে অরুণ সরকার ও রবি ঘোষ স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। গৌর ঘোষের 'বিশ্বম্ভর', কণা মুখোপাধ্যায়ের 'মালতী' এবং বাদল মুখোপাধ্যায়ের 'কালীকিঙ্কর'ও উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণ।

নির্মলকুমার-মাধবী শুভ পরিণয়

উপস্থিত ছিলেন :
সত্যজিৎ রায়
উত্তমকুমার
তরুণকুমার
সুপ্রিয়া দেবী

কানন দেবী, তপন সিংহ
সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের সাউথ ক্যালকাটা কালচারাল ক্লাব-এর সদস্যারা সম্প্রতি 'রবীন্দ্রসদন' মঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ পরিবেশন করেছেন। নাট্যাভিনয়ে মহিলা শিল্পীরা যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে। পুরুষ চরিত্র রূপায়ণে শিল্পীরা প্রতিটি মুহূর্তে বুদ্ধিদীপ্ত স্বকীয়তার পরিচয় রাখতে পেরেছেন এবং এই প্রসঙ্গে ঐন্দিলা চৌধুরী 'ওসমান', ইন্দুনিভা রায়চৌধুরীর 'জগৎ সিংহ', মাধুরী সেনের 'বীরেন্দ্র সিংহ' মীনা সেনের 'কতলু খাঁ', সুনীতি দাসের 'গজপতি বিদ্যাদিগগজ' উল্লেখযোগ্য। কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায় (তিলোত্তমা), মঞ্জু সেনগুপ্ত (আসমানী), প্রণতা ভট্টাচার্য (বিমলা), মঞ্জা গঙ্গোপাধ্যায়ের (আয়েষা) অভিনয়ে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেনঃ গীতা সেন, কল্যাণী গুহ, কনক মানি, নারায়ণী সেনগুপ্ত, কল্যাণী রায়। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন শ্রীসুহৃদ চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি এলাহাবাদে সাতদিনব্যাপী এক বিরাট নাট্য-প্রতিযোগিতা স্থানীয় 'প্রয়াগ সংগীত সম্মেলন' প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হোল। প্রায় আটাশটি অপেশাদার নাট্যসংস্থা পাঁচটি ভাষায় (বাংলা, হিন্দী, উড়িষ্যা, গুজরাটি, মারাঠি) নাটক পরিবেশন করেন। এই প্রতিযোগিতার বিচারকের গুরুদায়িত্ব যাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তারা হোলেনঃ বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমার্কণ্ড ভটট, পুণা নাট্যবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রভাকর গুপ্তে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগীয় অধ্যাপক আর এন দেব, হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীওঁকার সরণ এবং বিহারের প্রখ্যাত নাট্যকার-প্রযোজক ও বিহার আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রতিযোগিতায় যে সব সংস্থা যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল নতুন দিল্লীর 'বৈশালী কলা সংগম', চেনা-মহল, অপরাজিত সংঘ, 'খেয়ালী', 'কালী-বাড়ী বেঙ্গলী ক্লাব ও শনিচক্র', কলকাতার 'এ্যামেচার ইউনিট', হুগলীর 'গীতিছন্দম', পাটনার 'ছদ্মবেশী', ধানবাদের 'সপ্তর্ষি' জব্বলপুরের 'মহারাষ্ট্র নাট্যসংঘ', গোরক্ষ-পুরের 'সংকেত', লক্ষ্ণৌয়ের 'অভিযাত্রিক', বরোদার 'রচনা' ও ত্রিবেণী, রাউরকেল্লার 'নাট্যসংঘ', এলাহাবাদের 'শিল্পী সংঘ', ভোজপুরী নাট্যমঞ্চ, বর্নিহিরোস ক্লাব।

প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন হুগলীর 'গীতিছন্দম', এরা অভিনয় করেন 'কাবুলিওয়ালা' দ্বিতীয় স্থান অধিকারের সম্মান অর্জন করেন ধানবাদের 'সপ্তর্ষি', এদের নাটক ছিল 'শর্বরী'। এই নাটকের নাট্যকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মানে ভূষিত হন। মারাঠী অভিনেত্রী শ্রীমতী ফাটে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। দ্বিতীয় পুরস্কার পান কলকাতার 'অ্যামেচার ইউনিটে'র শ্রীমতী রাণু রায়। এ ছাড়া অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী সার্টিফিকেট ও মেরিট পান।

বরাহনগরের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'রূপশ্রী' এই মাসেই শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় যে নাটকটি পরিবেশন করবেন বলে স্থির করেছেন, তার নাম হোল 'যুগসূর্য'। স্বামী বিবেকানন্দের সংসার ও সন্ন্যাস জীবনকে কেন্দ্র করে এ নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীহরিপদ বসু। নাটকটিতে সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্র ও মঞ্চ-জগতের অপরাজেয় সুরকার অনিল বাগচী। নাট্য-নির্দেশনায় রয়েছেন শ্রীমণি দে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের (পোদ্দার বিল্ডিং) শিল্পীরা নিজস্ব দপ্তর ভবনের দিলীপ বসাকের 'পদ্মপাতায় জল' নাটকটি সুন্দরভাবে অভিনয় করলেন। বন্দী-জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর আশা-আকাঙ্ক্ষার পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এ নাটক। নিরন্তর জীবন-দ্বন্দ্বের মধ্যেই নাট্যকার আশাদীপ্ত এক পূর্ণতার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং শিল্পীদের অভিনয় ব্যঞ্জনায় তা আভাসিত হোতে পেরেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা রূপ দেন তাঁরা হোলেন মঞ্জু সমাদ্দার, কমলারঞ্জন দাস, জয়দেব দত্ত, দিলীপ বসাক, রবীন ভট্টাচার্য, যোগেশ দে, রামরঞ্জন সেন প্রভৃতি।

কখনো মেঘ। **কখনো মেঘ**। উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক

বোম্বাই থেকে

●

ফিল্ম ডিভিশনের বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একই বছরে ভারত সরকার নির্মিত পাঁচখানি দলিলচিত্র ভারত সরকারের সুবর্ণ পদক পেল। আজকের দিনে দলিল-চিত্র গোটা পৃথিবীর কাহিনী-চিত্র পরিচালকদের কতখানি প্রভাবিত করেছে, বিদগ্ধ দর্শকেরা সেকথা নিশ্চয়ই জানেন। (বিশেষ করে যাঁরা ফিল্ম-সোসাইটির সভ্য)। আমাদের সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলোর কথাই ধরুন না পথের পাঁচালী থেকে শুরু করে ও'র অধিকাংশ চিত্রই ডকুমেন্টেশ্যান অব লাইফ। অতএব দলিল-চিত্র যতই পূর্ণতার দিকে এগোবে, কাহিনী-চিত্র ততই লাভবান হতে বাধ্য।

যে পাঁচখানি দলিল-চিত্র এ বছরে সরকারী সম্মান লাভ করেছে—এর প্রতিটার সঙ্গে জে এস ভাওনগরীর নাম জড়িত। একটি ছবির তিনি প্রযোজক-পরিচালক, বাকী চারখানির তিনি প্রযোজক কিম্বা সহ-প্রযোজক।

দলিল-চিত্র নির্মাতা হিসাবে, ভাওনগরী এক পৃথিবী-বিখ্যাত নাম। রাষ্ট্রসংঘের ফিল্ম-বিভাগের ইনি একজন কর্তাব্যক্তি। থাকেন প্যারি-নগরীতে। বছর তিনেক আগে তিনি ভারত সরকারের ফিল্ম বিভাগের

প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে আসেন এখানে। দু বছর ভারতে কাটিয়ে সম্প্রতি আবার প্যারি ফিরে গেছেন ভাওনগরী।

এই দু'বছরে তিনি অনেকগুলো দলিল-চিত্র প্রযোজনা করেছেন ভারত সরকার ও ফিল্ম-ডিভিশনের জন্য। মূলত এ'রই চেষ্টায় আজ ফিল্ম ডিভিশন ছকে বাঁধা দলিল-চিত্র তৈরী করা বন্ধ করে, নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে চিত্রনির্মাণে। কিন্তু যে কারণে সবাই ওকে মনে রাখবে সেটা হল, বহু প্রতিভাধর পরিচালক ইনি আবিষ্কার করেছেন ও তাঁদের সুযোগ দিয়েছেন দলিল-চিত্র তৈরীর। শুধু বোম্বেতেই নয়, মাদ্রাজ ও কলকাতার কিছু নতুন দলিল-চিত্র পরিচালক এ'র কাছে সহায়তা পেয়েছেন সর্বতোভাবে।

এখন দেখা যাক যে সব দলিল-চিত্র সোনার মেডেল পেয়েছে, সেগুলো কেমন।

প্রথম ছবি—'আই অ্যাম টুয়েন্টি' (আমার বয়স বিশ) শ্রেষ্ঠ সামাজিক চিত্র হিসাবে পদক পেয়েছে। বিশ বছর যাদের বয়স এমনি একদল ছেলেমেয়ের বক্তব্য সংগ্রহ করে ও সেই বক্তব্যগুলো সুচারুভাবে সম্পাদনা করে, পরিচালক এই ছবি নির্মাণ করেছেন। ওদের বক্তব্য নানা বিষয়ঃ স্বাধীনতা শিল্পকলা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সিনেমা, সাহিত্য। আসলে যার যা প্রাণ চায় বলেছে মাইকের সামনে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন একটা বাঙালী ছেলে এক জায়গায় বাংলায় বলছে, পাটাউডী সেঞ্চুরী করেছে, তাতে আমার লাভটা কি হল? আমি যদি একটা সেঞ্চুরী করতে পারি তবে না আমি খুশি হব! ইত্যাদি। ছবিটা দেখতে ভালই লাগে। দেখবার পর মনে হয় যেন খানিকটা অবাস্তব। যেন খানিকটা সাজানো। সরকারী বক্তব্যটা প্রচার করাই আসল উদ্দেশ্য। বিশ মিনিটের এই ছবিটা পুরোপুরি ইংরেজিতে যাকে বলে 'গিক্‌সিম'। প্রাইজ কমিটিকে চমক লাগাবে। তাতে আর আশ্চর্য কি।

দ্বিতীয় ছবি—'থ্রু দি আইজ অব এ পেইন্টার' (শিল্পীর চোখ দিয়ে)। এ ছবি শ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক চিত্র হিসাবে সুবর্ণ-পদক পেয়েছে। বিখ্যাত চিত্রকার হুসেন সাহেবের বহুদিনের শখ একখানি দলিল-চিত্র করবেন। পরীক্ষামূলক দলিল-চিত্র, রাজস্থান ভ্রমণ নিয়ে। কথাটা ভাওনগরীকে বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন আনন্দে। এখুনি শুরু করুন। ফিল্ম-ডিভিশন হুসেনকে সব কিছু দিয়ে সাহায্য করল। ছবি ত হল। কিন্তু কেউ এ ছবির মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝল না। শোনা যায় স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও নাকি এই ছবি দেখে বলেছেন, হুসেনের ছবি তিনি বুঝতে পারেন নি। সেই ছবি যখন বার্লিন ফ্যাস্টিভ্যালে গোল্ডেন বেয়ার' পেল—হুসেনকে নিয়ে কি হৈ-চৈ তখন সবার। হুসেন তখন কাগজে লিখলেন, নিজে চিত্রকার না হলে কেউ কখনো উত্তম চলচ্চিত্র তৈরী করতে পারে না। ব্যস তাঁরাদের চাকে খোঁচা লাগল। বোম্বের সব বিখ্যাত

প্রযোজক, পরিচালক তেড়ে মারতে এলেন হুসেনকে। একচোট গালাগাল করলেন তাঁরা হুসেনকে শহরের বিখ্যাত কাগজ ভারত-জ্যোতিতে।

বার্লিনের গোল্ডেন বেয়ারের পর ভারত সরকার স্বর্ণপদক দেবেন এ ত জানা কথাই।

তৃতীয় ছবি—'আকবর'। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-মূলক ছবি হিসাবে আকবর স্বর্ণপদক পেয়েছে। আকবরের জীবন ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এই ছবি রচনা ও প্রযোজনা করেছেন স্বয়ং ভাওনগরী। আকবর চিত্রটা কতকগুলো পেইন্টিং-এর সংগ্রহ। সঙ্গীতাংশই এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। সঙ্গীতাংশ বাদ দিলে 'আকবরে' প্রায় কিছুই থাকে না—কোন কোন বিদগ্ধ দর্শকেরা বলেন, এই ছবিতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত ধ্রুপদ গাইয়েরা ডজনখানেক গান প্লে-ব্যাক গেয়েছেন। সংগীতের জন্য নাকি লাখ টাকার বেশী খরচ হয়েছে এই দলিল-চিত্র নির্মাণে।

এদেশে সর্বপ্রথম শাহানশা আকবরই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সংগঠন করতে প্রয়াসী হন। এবং আংশিক সাফল্য লাভও করেন এ ব্যাপারে। সেকুলারিজম ছিল আকবরের শাসনব্যবস্থার মূলমন্ত্র। ভাওনগরীর আকবর ছবিতে কোথাও সে ইঙ্গিত নেই। এটাই ছবির দুর্বলতা। বাকীটা মোটামুটি ভাল।

তাছাড়া আকবর আসলে হল রেকর্ড ফিল্ম। কিন্তু একে পুরস্কার দেওয়া হল শিক্ষামূলক ছবি হিসাবে। অবশ্য মোটা কথায় সব দলিল-চিত্রই ত শিক্ষামূলক। তবে শিক্ষামূলক ছবি ও সাধারণ দলিল-চিত্রে তফাত এই যে প্রথমোক্ত চিত্রে কোন বিশেষ ব্যাপারে দর্শকদের শিক্ষা (ইনস্টাক-শান) দেওয়া হয়। কি হিসাবে আকবর ইনস্ট্রাকশনাল ফিল্ম হল, একমাত্র কমিটিই তা বলতে পারেন। নাকি নাম-মাহাত্ম্য?

চতুর্থ চিত্র—ইণ্ডিয়া ৬৭—শ্রেষ্ঠ তথ্য-চিত্র হিসাবে স্বর্ণপদক পেয়েছে। পরিচালক শুকদেবের চোখে ভারতদর্শন। আসলে এটা একটা ব্যক্তিগত ছবি। শুকদেবের জীবন-দর্শনে যাঁরা সায় দেন তাঁরাই শুধু এ ছবি উপভোগ করবেন। এতে আছে গোটা-কয়েক হিন্দী ও কর্ণাটক সঙ্গীত। হোটেলে নাইট ক্লাবে নাচের দৃশ্য। বিহারের পালামৌ জেলার দুর্ভিক্ষের দৃশ্য। পরম-পবিত্র বেনারসের ঘাটে অথবা পীঠে এ ছবিতে রাস্তার কুকুর মলত্যাগ করে। (শুকদেবের জীবনদর্শন?)। আবার অন্যত্র ল্যাংটো ছেলে যখন প্রস্রাব করে ক্যামেরা তখন সামনে 'জুম' করে এগিয়ে যায় ক্লোজ-আপ নিতে। আরো বহু রং-লাগানো রঙীন পোস্টকার্ড আছে এ ছবিতে। কোন তথ্য পরিবেশন করেছেন শুকদেব এ ছবিতে? উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কেননা বক্তব্যটা যে কি শুকদেব নিজেই জানেন না। এখানেই হল আধুনিক ছবির চাবিকাঠি।

পাঁচ নম্বর চিত্র—সন্দেশ। শ্রেষ্ঠ অব্যবসায়িক প্রমোশন চিত্র হিসাবে পদক পেয়েছে। প্লট,—দ্রৌপদী এককণা খুদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করছেন। প্রয়োগকার্য—মান্ধাতা আমলের। ১৯৩৭ সালের ভক্তি-মূলক পৌরাণিক হিন্দি ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়, সন্দেশ। এখানেও ভাওনগরী প্রযোজক। উপরোক্ত পাঁচখানি ছবিতেই ভাওনগরী বিরাজমান। অবশ্য ভাওনগরী এখন আর এ দেশে নেই। কিন্তু তাঁর নাম-মাহাত্ম্যের জন্যই বুঝি কমিটি ভাওনগরী প্রযোজিত সবকটা ছবিকে স্বর্ণপদক দিলেন, এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক।

সম্প্রতি ফিল্ম ডিভিশন অনেকগুলো দলিল-চিত্র তৈরী করেছেন। তারই একটার নাম হল 'লাইফ বিগিনস অ্যানিউ'। মুক্তি পাবে সত্তেরই জানুয়ারী ৬৯ ইং। এই ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করা হয়েছে। ফিল্ম ডিভিশনের ইতিহাসে রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যবহার এই প্রথম। ছবিটা বিধবা ও পতিতা মেয়েদের নিয়ে।

—শ্রীমতী মিত্র

বেতার শ্রুতি

মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এক ধরনের আখ্যানমূলক লোকগীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইংরেজীতে সেই লোকগীতিকে বলা হয় ব্যালাড। ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম আছে — যেমন ডেনমার্কের ভাষায় ভিসে, স্পেনীয় ভাষায় রোমান্স, রুশ ভাষায় বিলিনা, ইউক্রেনীয় ভাষায় দুমি, সাইবেরীয় ভাষায় জুমোকা পেসমে ইত্যাদি।

সমগ্র ইয়োরোপে সকল দিক দিয়েই যে এদের মধ্যে ভাবগত ও অঙ্গগত ঐক্য দেখা যায়, তা নয়। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে এদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে—যেমন এরা আখ্যানমূলক হয়, আবৃত্তি করার পরিবর্তে গীত হয়, প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়ে এদের লৌকিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং এদের ভিত্তি জনশ্রুতি-মূলক বিষয়। এদের মধ্যে রচয়িতার একটি আত্মনির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পায়। এবং একটি মাত্র ঘটনাই এদের লক্ষ্য—গীতি-সংলাপ ও ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়ে কাহিনী দ্রুতগতিতে একেবারে শেষ পর্যন্ত ধেয়ে যায়। কোথাও থামার অবসর পায় না।

এই যে ব্যালাড, এর বাংলা করা হয়েছে গীতিকা।

গীতিকা শিক্ষিত ও প্রায়শ সচেতন কবিমনের সৃষ্টি। যে সমাজে এর সৃষ্টি তার একটা প্রাচীন ঐতিহ্য থাকে। সেই ঐতিহ্য অংশত একটি সচেতন শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তার অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টি নিরক্ষর হলেও মূর্খ নয়। তাদের মধ্যে একটা সামগ্রিক ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও জীবনের নাট্যরূপ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম কৌতূহল বিদ্যমান থাকে।

দেশে এবং কালে মানুষ যতই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়ুক না কেন, তার কতকগুলি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন বৃত্তি থাকে। লোকসাহিত্য সেই অন্তর্নিহিত সর্বজনীন বৃত্তির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকসাহিত্যের বহিরঙ্গে যত পার্থক্যই থাকুক, অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কারণেই ভারতের লোককথা একদিন ইয়োরোপের পশ্চিম প্রান্তে সুদূর আয়ারল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। ইয়োরোপের কোন গীতিকা ভারতে প্রচলিত হয়েছে কিম্বা ভারতের কোন গীতিকা ইয়োরোপে নীত হয়েছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, শাশ্বত মানবিকতার যে চিরন্তন বৃত্তি তার উপর নির্ভর করেই প্রত্যেক দেশে গীতিকাগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে রচিত হয়েছে।

এই রকম মৈমনসিংহ জেলার পূর্ব ভাগ, বিশেষ করে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমায় রচিত হয়েছিল বাংলা লোক-সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ — মৈমনসিংহ-গীতিকা। যে ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহ জেলাকে দু ভাগে ভাগ করেছে তার পূর্ব ভাগেই মৈমনসিংহ-গীতিকার সৃষ্টি ও প্রচার।

ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা, বিশেষ করে মুসলমানেরা, একদিন এই সব গান গাইত, আর শত শত চাষী লাঙলের উপর বাহুভর করে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে তা শুনত, কাজ ভুলে যেত। এই সব গান তখন লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যেত, তাদের তানে সরল কৃষকপ্রাণ তন্ময় হয়ে যেত।

এই তন্ময়-যাওয়া গানগুলি সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ভূমিকায় লিখেছেন, 'পৌরাণিক উপাখ্যান-বিষয়ক কাব্য-কথা তো প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাইতেছে। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বংশীদাস ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে'র পরে রামকান্তের একখানি 'পদ্মপুরাণ' না পাওয়া গেলেও বঙ্গসাহিত্য বিশেষ শ্রীহীন হইবে না; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পরে কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' না পাওয়া গেলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে। কিন্তু 'মহুয়া' 'মলুয়া' বঙ্গের অন্যত্র কোথায় পাইব? 'দেওয়ান মদিনা' 'ফিরোজ খাঁ' প্রভৃতির ন্যা যে বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলো পাত করিতেছে—এই অপূর্ব জিনিষ বঙ্গ-সাহিত্যে সুদুর্লভ।'

এই সুদুর্লভ অপূর্ব জিনিসের একটি সম্প্রতি আকাশ-বাণীর নাট্যবিভাগ শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন। ২২শে নভেম্বর রাত ৮টায় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্তর্গত 'মহুয়া' পালাটি 'মহুয়া সুন্দরী' নামে নাট্যাকারে প্রচার করেছেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী গীতিকা-গায়ক আছে। তারা পুরুষানুক্রমিকভাবে গীতিকার ভাণ্ডার নিজেদের মধ্যে রক্ষা করে আসছে। তারা নিরক্ষর, তাই স্মৃতিই তাদের একমাত্র অবলম্বন। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীরের গীতিকা-ব্যবসায়ী, রাজপুতানার চারণ মধ্যপ্রদেশের পরধান, বাংলার ভাট—এরা সকলে এই গীতিকার দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। ... তাদের ব্যবসা লুপ্ত হতে বসেছে, অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হ... গেছে।

মৈমনসিংহ-গীতিকা যখন লুপ্ত হতে বসেছিল তখন তার কিছু কিছু ধরে রাখা হয়েছে। তবু শ্রুতির অভাবে তা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হতে চলেছিল। এমন সময় আকাশ-বাণী বিস্মৃতির গর্ত থেকে 'মহুয়া সুন্দরী'কে উদ্ধার করে শ্রোতাদের সামনে হাজির করে একটা প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। প্রাচীন লোকসাহিত্যের উপর আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের যে দৃষ্টি পড়েছে, এটা সুখের কথা। আরও সুখের কথা হবে, যদি এই দৃষ্টিটা আরও প্রখর হয়, আরও গভীর হয়।

মৈমনসিংহ-গীতিকার অন্য যে সব পালায় প্রচুর নাটকীয় উপাদান আছে, সেগুলিও যদি এইরকম নাট্যাকারে প্রচারিত হয় তাহলে শ্রোতাদের খুশির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে, এবং একটা ভালো কাজ করা হবে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২২শে নভেম্বর রাত ৮টায় প্রচারিত মহুয়া সুন্দরীর বেতার-নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। মহুয়াকে তিনি সুন্দরীরূপেই সাজাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ সফল হয়েছেন বলা যায় না। তবে তাঁর চেষ্টাটা ধরা পড়েছে কিছু। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে বিশেষ আন্তরিকতা ছিল বলে মনে হয় না। নাট্যরূপে গানের অনেক পদ পরিবর্তিত হয়েছে, নূতন সংযোজিতও হয়েছে অনেক। আপনিছিতিও রক্ষিত হয় নি সর্বত্র।

প্রথমেই স্মরণ করা দরকার, মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলিকে আমরা খাঁটি রূপে পাই নি। তারা তাদের নিজস্ব রূপ নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হতে পারে নি। সংগ্রাহক আর সম্পাদকরা তাদের নিজস্ব রূপের উপর কারিকুরি করে, নিজস্ব পোশাকের উপর যাত্রার সাজ পরিয়ে আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন। আমরা তাদের যে-রূপে দেখেছি সে তাদের আসল রূপ নয়। এ-রূপে মাটির সেই খাঁটি সোঁদা গন্ধ নেই, মাঠের সেই খাঁটি অমসৃণ সুর নেই।

সংগ্রাহক আর সম্পাদকরা গীতিকাগুলির রূপ বদলে সুন্দর করতে গিয়ে তাদের ক্ষতি করেছেন অনেক। সে ক্ষতি কোনোদিন কোনো মতেই আর পূরণ হবার নয়। গীতিকাগুলির আসল রূপটি আর কোনোদিনও দেখতে পাওয়া যাবে না। এখন আবার নাট্যকাররা যদি তার উপর আরও রূপ বদলান তাহলে তাদের হত্যা করতে বাকি থাকে কী? বাংলা সাহিত্যের উত্তরসূরীরা কি কোনোদিন তাঁদের ক্ষমা করতে পারবেন?

মহুয়া সুন্দরীর সঙ্গীতাংশ একটি সম্পদ। সঙ্গীতাংশে ছিলেন শ্রীঅমর পাল, শ্রীপরেশ দেব ও শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্রীঅমর পাল, এবং এই পরিচালনায় তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অভিনয়াংশে প্রথমেই নাম করতে হয় হুমরা বাইদ্যার ভূমিকায় শ্রীকালীপদ চক্রবর্তীর ও মহুয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী জয়শ্রী সেনের। শ্রীমতী সেন বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে মহুয়ার অন্তর্বেদনাটি ফুটিয়েছেন। হুমরার প্রতিহিংসাও বেশ সুন্দর ফুটেছে শ্রীচক্রবর্তীর অভিনয়ে। সন্ন্যাসীর ভূমিকায় শ্রীআনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভালো। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই।

সবশেষে, নাটকটির সুপ্রযোজনার জন্য প্রযোজক শ্রীশ্রীধর ভট্টাচার্যের নাম করতে হয়।

২৪শে নভেম্বর বেলা ১টায় রূপ ও রঙ্গের আসরে একটি কৌতুক নাটিকা ছিল—'বিয়ের লগ্ন'। রচনা—শ্রীগঙ্গাপদ বসু। নাটিকাটি হৈ-হুল্লোড়ে জমেছিল ভালো। রচনায়ও পাকা হাতের ছাপ ছিল। কিন্তু কৌতুক নাটিকায় বড় জিনিস যেটি সেই অভিনবত্বের অভাব ছিল এতে। এমন গল্প আর নাটক ইতিপূর্বে অনেকই শোনা গেছে। রেডিও থেকেও অনেক প্রচারিত হয়েছে। তাই যতটা কৌতুক এই নাটিকাটি সৃষ্টি করতে পারত, তা পারে নি। এক জিনিসে একবারের বেশি হিউমার হয় না। বার বার তো নয়ই।

নাটিকাটিতে সাসপেন্স ছিল না মোটে, পরিণামটা অনেক আগেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, সব অনুমান করা গিয়েছিল। তবু নাটিকাটি জমেছিল।

নাটিকাটির অভিনয়ে শিল্পীরা সকলেই সহযোগিতা করেছেন, বেশ একটা টিম-ওয়ার্ক দেখিয়েছেন।

এই দিন রাত সাড়ে ১০টায় 'ধ্রুবপদী' নামে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান শোনা গেল—নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করলেন শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা ও তাঁর সম্প্রদায়। প্রারম্ভিক ঘোষণায় শ্রীগুহ-ঠাকুরতা ও তাঁর সম্প্রদায়ের নাম শুনে আশা করা গিয়েছিল, অনুষ্ঠানটি হৃদয়গ্রাহী হবে। কিন্তু অনুষ্ঠান শুনে আশাহত হতে হয়েছে। অনুষ্ঠানটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ রূপটি, বিশেষ ভাবটি ধরা পড়ে নি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব যে রূপ, যে ভাব, যে আবেশ, যে মাধুর্য, তার কিছুই এতে অনুভূত হয় নি। অনুষ্ঠানটি বড় কৃত্রিম বড় আড়ষ্ট—রসকষহীন। যেন মাস্টারের কাছে জোর করে তালিম নেওয়া, জোর করে পরিবেশন করা।

২৫শে নভেম্বর সকাল ৮টায় শ্রীবিষ্ণুপদ দাসের কণ্ঠে লোকগীতি সুন্দর লাগল। রেডিওর লোকগীতির তালিকায় এমন শিল্পী বড় বেশি নেই। এঁর কণ্ঠে লোক-গীতির খাঁটি রূপটি অনায়াসেই ধরা পড়ে, তার স্ব-ভাব ও স্ব-মাধুর্যে সহজেই মূর্ত হয়ে ওঠে।—রাত ৮টা ৪৫এ শ্রীমতী গৌরী সেন যে দুখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন তাতে মাধুর্যের কিঞ্চিৎ অভাব থাকলেও উচ্চারণের স্পষ্টতা আর কণ্ঠের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল প্রচুর। তাঁর কণ্ঠে, সচরাচর লক্ষণীয় ন্যাকামি ছিল না মোটে। সেজন্য তিনি প্রশংসার্হ।

নাট্যকার বাদল সরকারের অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তির প্রায় অব্যবহিত পরে ২৬শে নভেম্বর রাত সওয়া ১০টায় তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটির প্রচারে শ্রোতারা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। প্রচারটি কতকটা তলীয় হলেও বেতারের কর্তৃপক্ষ এর জন্য প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' বর্তমান কালের একটি বলিষ্ঠ নাটক। বর্তমান কালের সামাজিক জীবনের যত সমস্যা তার অনেকগুলিই এতে অতি দক্ষতার সঙ্গে অতি অল্প কথায় তুলে ধরা হয়েছে। একটি কিম্বা দুটি বাক্যে বড় বড় সমস্যায় একেবারে সোজা করে টান দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। নাট্যকার এ ব্যাপারে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের সংলাপ যেমন বাস্তবোচিত তেমনি ক্ষুরধার, অথচ শ্রুতিমধুর।

অভিনয়াংশে প্রতিটি শিল্পী যথাযথ অভিনয় করেছেন। আতিশয্য নেই, বাহুল্য নেই। শ্রীশম্ভু মিত্র চমৎকার অভিনয় করেছেন। কবির চরিত্রটি তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে ফুটিয়েছেন। তাঁর অভিনয় আর আবৃত্তি শুনে মনে হয়েছে, তিনি যেন তাঁর মনের মতো ভূমিকা পেয়েছেন।

নাটকটির সম্পাদনা, শব্দ সংযোজন ও প্রযোজনা সবই প্রশংসনীয়। নাটকটির সাফল্যের জন্যে প্রযোজক শ্রীপ্রদ্যোত গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব কম নয়। এবং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এমন আলোচিত, পরিচ্ছন্ন, অভিনয়-সফল নাটক রেডিওয় খুব বেশি শোনা যায় না।

২৭শে নভেম্বর রাত সওয়া ১০টায় পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সঙ্গে আকাশবাণীর প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারটি একেবারে নিষ্প্রাণ। উত্তরবঙ্গে যে দারুণ একটা প্রলয় ঘটে গেছে, বহু প্রাণহানি হয়েছে, ঘর-বাড়ী ভেসে গেছে, গবাদি পশু বিনষ্ট হয়েছে এবং একটা ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে তার তেমন পরিচয়ই পাওয়া গেল না এই সাক্ষাৎকারে। সেই ভয়াবহ, সেই আর্ত, সেই করুণ চিত্রটাই ফুটে উঠল না। একেবারে সাদামাটা, দায়-সারা সাক্ষাৎকার।

এই অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের ভাষণটি কয়েক দিন পূর্বে অন্য একটি অনুষ্ঠানে শোনা গেছে। একই জিনিস বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শোনাবার অর্থ কী?

২৮শে নভেম্বর সকাল ৭টা ৪০এ শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিলেন। ভালোই গাইছিলেন। কিন্তু শেষ গানের শেষাংশ শুনতে দেওয়া হল না। ঘোষক হয়তো কৈফিয়ৎ দেবেন, ৮টায় খবর আরম্ভ, তাই কেটে দিতে হয়েছিল। কিন্তু খবর তো বরাবরই থাকবে, কাটাটা বন্ধ হবে কবে?

ক্রিকেট মেলা বসবে না

অজয় বসু

কুড়ি হাজার পাউণ্ড সামান্য কটি টাকা মাত্র। বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কারণে তার [illegible] বাড়ছে। টাকার পরিমাণ এবং তার মূল্যের কথা ভেবে ভারত সরকার এই টাকা এম সি সি দলের ভারত সফরের অনুমোদন মঞ্জুর করতে পারেন নি। কাজেই এম সি সির ভারত পরিক্রমণের প্রস্তাব আপাততঃ শিকেয় তোলা রইলো।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, যাক্ অনেকগুলো টাকা বাঁচলো। আবার কেউ শীতের দুপুরে ক্রিকেট মেলা দেখার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপে গুঞ্জনও সুরু করে দিয়েছেন। ভিন্ন জনে ভিন্ন মনোভাব। কাজেই কেউ সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন, কেউ বা দেখবেন বিষ নজরে। মত বা অন্য মত শুনে তাই অবাক হওয়ার তাগিদ নেই।

এম সি সির আকাশছোঁয়া গ্যারাণ্টির দাবীর কথা জেনে ভারত সরকার সে দাবী নাকচ ছাড়া আর কিই বা করতে পারতেন? বিদেশী ক্রিকেট দলকে এদেশে আনাবার চেষ্টায় বছর বছর মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা সত্যিই ভারত সরকারের পক্ষে সমীচিন নয়। সরকার হয়তো আরও ক্ষুদ্র প্রয়োজনে, মাথাভারী আমলাদের অন্য দেশ সফরের বিলাসের চাহিদা মেটাতে আরও মোটা অঙ্কের মূল্য ধরে দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই কাজ যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমনি যখন তখন বিদেশী ক্রিকেট দলের গ্যারাণ্টির দাবী মেটাতে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারটিকে হালকা করে দেওয়াও কি উচিত?

সরকারের কাছে এই গ্যারাণ্টির দাবীটিই সব চেয়ে বড় অস্বস্তিকর। ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন বিদেশে যায় তখন তাদের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় না। তারা পূর্বচুক্তি অনুযায়ী মাঠে সংগৃহীত মুনাফার হিস্যা পায়। কিন্তু অন্য দেশের ক্রিকেট দলের যখন এদেশে আসার কথা হয় তখন তারা ভারতীয় দল যে পদ্ধতিতে টাকা দেয় সেই পদ্ধতি অনুসারে মুনাফা ভাগ বাঁটোয়ারায় চুক্তি করে না। তারা গ্যারাণ্টি হাতে নিয়ে ভারতীয় বোর্ডকে শাসায়। আর সেই শাসানির চাপে অস্থির হয়ে ভারতীয় বোর্ড শিক্ষামন্ত্রক ও অর্থমন্ত্রকের দোরে দোরে ধর্ণা দেয়। এতোদিন দোরে দোরে হত্যা দিয়ে কাজ হাঁসিল করা সম্ভবপর হচ্ছিল। এখন সরকার শক্ত হতে চাওয়ায় অবস্থাটা বদলে যাচ্ছে।

ভারত সরকার অতি সঙ্গত কারণেই বলতে পারেন যে, ক্রিকেট সফর বিনিময়ের চুক্তি একই ধরণের হওয়া চাই। অর্থাৎ ভারতীয় দল যে সর্তে বিদেশ সফর করবে, বিদেশী দলের সফরের ভিত্তিতেও সেই সর্ত রাখতে হবে। সফর বিনিময়ের চুক্তিতে বৈষম্য থাকবে কেন? কম পেয়ে বেশি দেবার প্রতিশ্রুতি রাখার সর্ত কি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষে অসম্মানজনক নয়? এম সি সি যদি গুটি কয়েক ম্যাচ খেলার জন্যে কুড়ি হাজার পাউণ্ড গ্যারাণ্টি দাবী করতে পারে তাহলে ভারতীয় দল যখন ইংলণ্ড যাবে তখন সেই অঙ্কেই ভারতীয় বোর্ড গ্যারাণ্টি চায় না কেন?

কেন চায় না তা আমরা জানি। চাইবার মুখ নেই বলেই ভারতীয় বোর্ড এ বিষয়ে নিরুচ্চার। ভারতীয় বোর্ড দেশের টেষ্ট খেলার বা বড়সড় ক্রিকেট মাঠে এখনও টার্ণস্টাইল বসায় নি। কতো টিকিট বিক্রী হয় টার্ণস্টাইলে তার হিসাব ধরা থাকে। টার্ণস্টাইল না থাকার দরুণই বিদেশী ক্রিকেট দলগুলি বোর্ডের দেওয়া অর্থ সংগ্রহের হিসাব বিশ্বাস করতে চায় না। বলেই তারা গ্যারাণ্টি সম্পর্কে আগেভাগেই নিশ্চিন্ত হতে চায়। কাজেই টার্ণস্টাইল-বিহীন ব্যবস্থাপনার হিসাব এড়িয়ে বিদেশী ক্রিকেট দল যদি গ্যারাণ্টির টাকা চেয়ে বসে তাহলেও তাদের দোষ দেওয়া যায় না। দোষ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরই। বোর্ড মাঠে মাঠে টার্ণস্টাইল না বসিয়ে দর্শক সংখ্যা ও সংগৃহীত অর্থের হিসেব সম্পর্কে সকলেরই সন্দেহের এক অবকাশকে জিইয়ে রেখেছে। এই সন্দেহ নিরসন না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী দলগুলিও গ্যারাণ্টির দাবী ছাড়তে রাজী হবে না। কিন্তু তাদের দাবী যতোই সঙ্গত হোক না কেন, ভারত সরকার অসম্মানজনক সর্ত মানতে যাবেন কেন? সরকারের আপত্তিও তাই অযৌক্তিক নয়।

অতএব প্রস্তাব, বিদেশী গ্যারাণ্টির প্রস্তাবকে প্রতিরোধ করতে এবং ভারত সরকারকে সন্তুষ্ট রাখতে দেশের টেষ্ট খেলার মাঠে এখুনিই টার্ণস্টাইল বসানো হোক। এবং টার্ণস্টাইলের নির্ভুল হিসেব হাতে নিয়ে সফর বিনিময়ের আলোচনার সময় একই ধরণের চুক্তি মানামানির ওপর জোর দেওয়া হোক। চুক্তি সমানে সমানে না হলে ভারত সরকারের পক্ষে বিদেশী দলের গ্যারাণ্টির দাবী মেনে নেওয়া কঠিন।

আসছে বছর অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিল্যাণ্ড ক্রিকেট দলের ভারত সফরের কথা আছে। মনে হয় আগামী বছরের এই দুটি সফর সম্পর্কেও ভারত সরকার বৈষম্য-বিহীন চুক্তির কথা তুলবেন এবং সেক্ষেত্রেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকেও আবার কাদায় পড়তে হবে। ভারত সরকার এতোদিন এ সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান নি। এখন ঘামাচ্ছেন বলেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মাথা ব্যথার ভারী হয়ে ওঠারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অবশ্য টার্ণস্টাইল বসিয়ে একদিকের সমস্যার আশু সমাধান করা গেলেও, ভবিষ্যতে আরও একটি দুর্ভাবনা দেখ[া] দিতে পারে। টার্ণস্টাইলের নির্দেশ মে[নে] হিসেবের কড়ি যখন মেলানো হবে তখন দেখা যাবে যে, সফরকারী বিদেশী ক্রিকে[ট] দলগুলি ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জন করে ঘরে ফিরছে। কারণ, ভারতে ক্রিকেট মাঠে বিদেশীদের দেখতে কাতারে কাতারে লোক জমে। সেক্ষেত্রে কুড়ি হাজার পাউণ্ড তো ছার, তার অনেক গু[ণ] বেশি পাউণ্ড বিদেশীদের গুনে দিতে হবে। সেই মোটা অঙ্কের বিদেশী মুদ্রার হস্তা[ন্]তরের নজীরে সেদিন ভারত সরকা[র] নিশ্চয়ই বিচলিত বোধ করবেন এবং অনুমান করা যায় যে, তখন ভারত সরকার আবা[র] সফর বন্ধে নতুন করে সক্রিয়তা দেখাতে এগোবেন।

অর্থাৎ যেদিক থেকেই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হোক না কেন, সহজে বোঝা যাচ্ছে যে, বিদেশী ক্রিকেট দলে[র] ভারত সফরের সহজ পথ ক্রমশঃই দুর্গ[ম] হয়ে উঠছে। মোটা অঙ্কের বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ে বাইরে থেকে ক্রিকেট দল আনানো[র] বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বিদেশী মু[দ্রা] সংকটের ভারে টালমাটাল ভারতের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

তাহলে কি বিদেশী ক্রিকেট দল এদেশে আসবে না? সহজে আসতে পারবে ব[লে] মনে হয় না। আর এলেও নিতান্ত বিচ্ছি[ন্ন] লগ্নেই আসবে। কালে ভদ্রে, ক[দা]চিৎ কদাচিৎ। তাতে হয়তো ভারতীয় ক্রিকেট[কে] কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। কিন্তু উপা[য়] কি? ক্রিকেটের লাভ লোকশানের প্রশ্ন দেশের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত বলে অর্থনীতি সংক্রান্ত নির্দেশকে মান্য ক[রা] ছাড়া পথও নেই।

যে ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে তা ক্রী[ড়াগত] ও মানগত। তবে ঘরোয়া আসর[কে] সুসংগঠিত রাখতে পারলে সে আশঙ্কাকে অনেকটা দূরে হটিয়ে দেওয়া যাবে। তাছা[ড়া] গত ক' বছরে বারবার বিদেশী ক্রিকে[ট] দলের এদেশে সফরের কল্যাণে জাতী[য়] ক্রিকেটের মান যে বর্তমানে তুঙ্গে উ[ঠে] দাঁড়িয়েছে তাও বলা যায় না। বিদেশীদে[র] সফর ঘিরে সোরগোল বেড়েছে, উৎসবমু[খর] আসরে স্ফূর্তি স্ফূর্তিভাব জেগেছে এ[বং] বোর্ড ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলি[র] তহবিলও ফুলে উঠেছে। কিন্তু সেই অনু[]পাতে জাতীয় দলের ক্রীড়াগত পর্[যায়] বাড়েনি। ফাস্ট বোলার বলতে আজও কে[উ] ভারতে নেই এবং নিরপেক্ষ উইকেটে মা[থা] উঁচু করে দাঁড়াবার মতো শক্তিমান ব্যাট[স]ম্যানদেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ত[াই] বিদেশে গিয়ে জাতীয় দলকে কেবল নাকাল হতে হচ্ছে।

এই সমস্যা সমাধানে পিচের স্পোর্টি[ং] চরিত্র ফিরিয়ে আনা এবং ফাস্ট বোলারকে গড়ে-পিটে মানুষ করা দরকার। বিদেশীদে[র] দিকে চেয়ে আত্মহারা হয়ে থাকার ফ[লে] আমরা দরকারী কাজে মন বসাতে ভু[লে] গিয়েছিলাম। সফর আপাততঃ বন্ধ। ফুরসৎও যথেষ্ট। এই অবকাশে কি কাজে[র] কাজে মন বসানো যায় না?

খেলাধুলা

দর্শক

পূর্বাঞ্চল এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

কাঁচড়াপাড়ার ইস্টার্ণ রেলওয়ের এক-মালি মাঠে ৫ম বার্ষিক পূর্বাঞ্চল এ্যাথলে-টিকস্ প্রতিযোগিতার দুদিনব্যাপী (নভেম্বর ৩০ ও ডিসেম্বর ১) আসর বসেছিল। পশ্চিমবাংলার মাটিতে পূর্বাঞ্চল এ্যাথলে-টিকস্ প্রতিযোগিতার আসর এই প্রথম। সার্ভিসেস, পশ্চিমবাংলা, বিহার এবং উত্তর-প্রদেশের মোট ১২৫ জন এ্যাথলীট এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহিলা বিভাগে মাত্র দুটি রাজ্য—পশ্চিম-বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশ যোগদান করেছিল।

পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দল ১৪২ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে উপর্যুপরি ৫ বার দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের গৌরব অর্জন করেছে। পুরুষ বিভাগের অনুষ্ঠান-সংখ্যা ছিল মোট ১৯টি। সার্ভিসেস দল ১৮টি অনুষ্ঠানে যোগদান করে ১৬টিতে প্রথম স্থান পায়। বাকি তিনটি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায় দুটি রাজ্য—বাংলা (১০০ মিটার দৌড় ও ম্যারাথন) এবং বিহার (ডিসকাস)। সার্ভিসেস দল ১৮টি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান পেয়েছে ১৬টি, দ্বিতীয় স্থান ১৩টি এবং তৃতীয় স্থান ২টি। প্রথম স্থান অধিকারী সার্ভিসেস দলের যেখানে ১৪২ পয়েন্ট দাঁড়ায়, সেখানে পশ্চিমবাংলার ৩৩, বিহারের ২৮ এবং উত্তরপ্রদেশের ২ পয়েন্ট। কি বিরাট ব্যবধান!

মহিলা বিভাগে মাত্র পশ্চিমবাংলা এবং উত্তরপ্রদেশ যোগদান করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন মাত্র একজন—কুমারী কল্পনা বাগচী। মহিলা বিভাগে উত্তরপ্রদেশের ১৬ জন এ্যাথলীটের অংশগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত মাত্র ২ জন এসেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। দলের এই অবস্থায় কুমারী কল্পনা বাগচী যে দৃঢ়তার পরিচয় দেন, তা সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি ৬টি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে উত্তরপ্রদেশের পক্ষে ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন (জ্যাভেলিনে ১ম স্থান, ৮০ মিটার হার্ডলস ও লং জাম্পে ২য় স্থান, ১০০ মিটার দৌড়, হাইজাম্প ও ডিসকাস নিক্ষেপে ৩য় স্থান পান)।

বিশেষ সাফল্য

(দুটি বিষয়ে প্রথম স্থান)

মহিলা বিভাগ

১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় :
১ম — রীণা ঘোষ (বাংলা)

হাইজাম্প ও লং-জাম্প :
১ম—সীমা মৈত্র (বাংলা)

পুরুষ বিভাগ

লং-জাম্প ও ট্রিপল জাম্প :
১ম — লাব সিং (সার্ভিসেস)

দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১৪২ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিমবাংলা (৩), ৩য় বিহার (২৮) এবং ৪র্থ উত্তরপ্রদেশ (২)

মহিলা বিভাগ : ১ম পশ্চিমবাংলা (৬৩ পয়েন্ট) এবং ২য় উত্তরপ্রদেশ (১৪)

বিশ্ব পেশাদার সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতায় ট্র্যাক প্যারসিউট চ্যাম্পিয়ান হিউগ পোর্টার (ইংল্যান্ড)

সুব্রত মুখার্জি কাপ

১৯৬৮ সালের সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কল-কাতার কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (পাইকপাড়া) ১—০ গোলে নাগাল্যান্ডের মককচুং গভর্ণমেন্ট স্কুলকে পরাজিত করে সুব্রত মুখার্জি কাপ জয়ী হয়েছে। ইতি-পূর্বে পশ্চিমবাংলা থেকে সুব্রত মুখার্জি কাপ পেয়েছে রাণী রাসমণি স্কুল এবং বাটানগর স্কুল।

রবীন্দ্র-সরোবরে আয়োজিত এ্যামেচার রোয়িং এসোসিয়েশন অব ইস্টের বার্ষিক বাইচ প্রতিযোগিতায় উইলিংডন ট্রফি বিজয়ী লেক-ক্লাব (বি বিভাগ) ঃ বাঁদিক থেকে—বি সেন, এস দুমড়া, এম ই খান, এ মেহতা এবং আর বাপ্পা।

আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলাটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোলশূন্য ছিল। অতিরিক্ত সময়ে কুমার আশুতোষ স্কুল দলের অধিনায়ক কল্যাণ মুখার্জি জয়সূচক গোলটি দেন। এখানে উল্লেখ্য, সেমি-ফাইনালে কুমার আশুতোষ স্কুল ৪—১ গোলে গত দু'বছরের সুব্রত কাপ বিজয়ী কার নিকোবর গভর্ণমেন্ট স্কুল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মককচুং গভর্ণমেন্ট স্কুল (নাগাল্যান্ড) ১—০ গোলে ইম্ফলের নাগাসী স্কুলকে পরাজিত করেছিল।

ফাইনালের পথে

কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন প্রথম রাউন্ডের খেলায় ওয়াক-ওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে দিল্লী এম বি স্কুলকে ২—০ গোলে, কোয়ার্টার ফাইনালে জলন্ধর স্পোর্টস স্কুলকে ০—০ ও ২—০ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে গত দু'বছরের সুব্রত কাপ বিজয়ী কার নিকোবর গভর্ণমেন্ট স্কুলকে ৪—১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

কুমার আশুতোষ স্কুলের পক্ষে ফাইনালের টীম ঃ খোকন বসু; অজিত-কুমার দাস, দিলীপ পালিত এবং উজ্জ্বল-কান্তি ঘোষ; রতনকুমার বসু এবং পুটে ঘোষ; কাশীনাথ নন্দী, সুবিমল দে, কল্যাণ মুখার্জি (অধিনায়ক), বিনয় মুখার্জি এবং তপন সিংহ।

এ্যামেচার রোয়িং এসোসিয়েশন অব্ ইস্টের ম্যাকলীন স্কালস ট্রফি বিজয়ী (১৯৬৭ ও ১৯৬৮) নেভিল শিরিমানে (কলম্বো)

বাইচ প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্র-সরোবরে এ্যামেচার রো[illegible] এসোসিয়েশন অব ইস্ট-এর ১৭তম [illegible] প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। কলকা[illegible] আমরা এই প্রতিযোগিতা শেষ দেখেছি [illegible] ১৯৬৪ সালে। এখানে উল্লেখ্য, এই প্র[illegible]যোগিতাই ভারতের শ্রেষ্ঠ বাইচ প্র[illegible]যোগিতা।

১৯৬৮ সালের ফাইনাল

উইলিংডন ট্রফি (৪ দাঁড়ের অনুষ্ঠান)

লেক-ক্লাব 'বি' দল ½ লেংথে [illegible] 'এ' দলকে পরাজিত করে প্রতিযোগি[illegible] শ্রেষ্ঠ পুরস্কার উইলিংডন ট্রফি জয়ী [illegible] ইতিপূর্বে লেক-ক্লাব একবার এই [illegible] পেয়েছে। সময় ঃ ৩ মিঃ ৩৪ সেঃ

ভেনেবলস বাওল (২ দাঁড়ের অনুষ্ঠা[illegible])

গত বছরের বিজয়ী ক্যালকাটা রো[illegible] ক্লাবের দুই দাঁড়ি সি জি ব্র্যাডলি এবং বি কুক লেক-ক্লাবের এ চ্যাটার্জি এবং [illegible] সেনকে বহু দূরত্বে ফেলে বিজয়ী [illegible] সময় ঃ ৩ মিঃ ৫২-৫ সেঃ।

ম্যাকলীন স্কালস ট্রফি (এক দাঁড়ের অনুষ্ঠান) ঃ

গত বছরের বিজয়ী নেভিল শিরি[illegible] (কলম্বো) ১½ লেংথে এস ডি দুমড়া (লেক-ক্লাব) পরাজিত করেন। সময় ঃ [illegible] মিঃ ৫০ সেকেন্ড। এখানে উল্লেখ্য, নে[illegible] শিরিমানে এই নিয়ে তিনবার (১৯[illegible] ১৯৬৭-৬৮) এই ট্রফি জয়ী হলেন।

হুগলী কাপ ঃ

প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পয়েন্ট [illegible]হের সূত্রে লেক-ক্লাব এই ট্রফি জয়ী হয়ে[illegible]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৩য় খণ্ড
৮ম বর্ষ

৩২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 20th December, 1968 শুক্রবার, ৫ই পৌষ, ১৩৭৫ 40 Paise.

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপরিমল চৌধুরী

চিঠিপত্র

‘নতুন ঠগী’

নতুন ঠগী পর্যায়ের চিত্তাকর্ষক ও রোমহর্ষক রচনাগুলি যেমন ভাল লেগেছে তেমনি পড়তে ভাল লাগে চিঠিপত্রে উক্ত শিরোনামে প্রকাশিত প্রতারিত ব্যক্তিগণের অভিজ্ঞতাগুলি। আর একটি বাস্তব প্রতারণার অভিজ্ঞতা যুক্ত করলাম পাঠকদের জন্য।

কিছুদিন আগে ‘শতরঙ’ নামে হঠাৎ এক যৌথ পুস্তক বিক্রয় প্রতিষ্ঠান চৌরঙ্গী রোডে গড়ে ওঠে। বলা হয়, এই কোম্পানী অমৃত, যুগান্তর, প্রভৃতি যাবতীয় প্রচলিত ও বিখ্যাত পত্র-পত্রিকাগুলির বিক্রয় এজেন্ট।
এদের বিশেষত্বঃ—

(১) উক্ত পত্রিকাগুলির কার্যালয়-নির্ধারিত বার্ষিক মূল্য অপেক্ষা ৫৲ বা ১০৲ কম বার্ষিক মূল্যে গ্রাহকগণকে সরবরাহ করা।

(২) প্রকৃত বার্ষিক মূল্য ৪৮৲ হলে ‘শতরঙ’ ৪০৲ টাকায় পিওন মারফৎ পত্রিকা আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

(৩) সমস্ত বিশেষ সংখ্যাগুলি (পূজা সংখ্যা, বড়দিন সংখ্যা) আপনি বিনামূল্যে পাবেন।

(৪) ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার প্রত্যেক গ্রাহকদের পুরস্কার।

(৫) ‘শতরঙ’এ বার্ষিক গ্রাহক ছাড়া অন্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

সাধারণত হোস্টেল বা কলেজ রিডিং-রুমগুলি এর শিকার হয়েছিল। কোনও ছাত্রাবাস রিডিংরুম ইনচার্জ উক্ত ‘শতরঙ’-এর দালালের কথায় সহজে বিশ্বাস করতে ইতস্তত করলে দালাল খাতা খুলে কলকাতার নামকরা বিভিন্ন ছাত্রাবাসের তালিকা শুনিয়ে দিয়ে কে কতগুলো পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক হয়েছে জানাল। উক্ত ‘শিকার’ বিশ্বাস করে একটি পত্রিকার গ্রাহক হল। তারপর—। প্রথম সপ্তাহে কোনও পত্রিকা এল না। অফিসে গিয়ে [অফিস বলতে একটা ভাড়া করা চেয়ার-টেবিল বিশিষ্ট ছোট্ট ঘরের দরজায় নেম প্লেট লাগানো। এখানে কোনও পত্রিকা নেই। কারণ তাঁরা পত্রিকা কার্যালয় থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহককে পৌঁছে দেন। অফিসে ম্যানেজার সদাই অনুপস্থিত। যাঁরা উপস্থিত তাঁরা কিছুই জানেন না, সব কিছুই ম্যানেজার জানেন] কারণ জানা গেল—গ্রাহক তালিকাভুক্ত হবার পরের সপ্তাহ থেকে পত্রিকা পাঠান হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে প্রথম সপ্তাহের পত্রিকা এল। বারংবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাপ্তাহিক পত্রিকা দুসপ্তাহ বাদে বাদে আসতে লাগল। এদিকে ‘শতরঙ’-কে বাতিল করে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও এক বৎসরের টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং এবছরটা কোনওরকমে যাক—সিদ্ধান্ত নিলেও হঠাৎ মাস দুয়েকের মধ্যেই একদিন পিওন ও পত্রিকা আসা বন্ধ হল। অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল পত্রিকার অফিস তালা বন্ধ। স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা গেল প্রায় দুমাস হল ‘শতরঙ’ উঠে গেছে। অগত্যা—।

‘শতরঙ’ এখন কলকাতার বার্ষিক গ্রাহকদের চোখে সর্ষেফুলের রঙ দেখিয়ে হয়ত অন্য কোথাও নবরূপে উদিত হচ্ছেন। সাধু ও সুধী ব্যক্তিরা সাবধান হবেন।

স্বপনকুমার গোস্বামী
একটি কলেজ হোস্টেল, কলকাতা

কলকাতা উন্নয়ন

আজ এ-কথা কারও অজানা নেই যে, বিশ্বের এবং ভারতের অন্যতম নগরী কলকাতা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শহরের উন্নয়নের জন্য কাকেও মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশন তো মোটেই মাথা ঘামান না। গত জুলাইতে কলকাতা সফরকালে শ্রীমতী গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন—“এই শহরের জন্য ‘কিছু’ একটা করতে হবে।” এই ধরনের মন্তব্য শ্রীনেহরুও কয়েকবার করেছেন। কিন্তু কলকাতা যে তিমিরে সেই তিমিরে। কলকাতায় চক্রবেড় রেল স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব হয় ১৯১৪ সনে। কিন্তু আজও পর্যন্ত এক ইঞ্চি রেলপথও স্থাপিত হল না।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতার উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পাঁচশালা যোজনায় ৮০ কোটি টাকার খসড়া প্রকল্প রচনা করেছেন। রাজ্য সরকার এবারও দাবী করেছেন যে, এই শহরের উন্নয়নের সকল দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রকেই বহন করতে হবে। কিন্তু এবারও কেন্দ্র কলকাতা উন্নয়ন প্রকল্পে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আরও জানতে পারলাম শ্রীগ্যাডগিল এ-বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন (যুগান্তর, ১লা ডিসেম্বর)। এখানে উল্লেখযোগ্য বোম্বাই ও দিল্লীর ব্যাপারে কেন্দ্র কোন টাল-বাহানা করে না। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়।

[illegible] সরকার [illegible] কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন নিম্নলিখিত জরুরী প্রকল্পগুলি চতুর্থ যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য দাবী জানান।—

১। চক্রবেড় রেল, ২। দ্বিতীয় হাওড়া সেতু, ৩। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে সাবওয়ে নির্মাণ, ৪। বস্তি অপসারণ, ৫। পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশন, ৬। জল সরবরাহ, ৭। গৃহনির্মাণ কর্মসূচী, ৮। স্টেডিয়াম এবং ৯। সি এম পি ও-কে আরও বেশী সাহায্য করা।

প্রণবেশ দাশগুপ্ত
কেপার রোড,
লখনউ (ইউ. পি)

‘কুইজ’ প্রসঙ্গে

(লেখকের উত্তর)

৬ই ডিসেম্বরের ‘অমৃতে’ শ্যামনগর থেকে শ্রীসনৎ সেন ও সমর সেন লিখেছেন, ‘আপনার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেন’ কুইজে ৭ পয়েন্টের নীচে কারও পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সম্ভাবনা আছে। যেমন ধরা যাক, ৭নং প্রশ্নের ক, খ, গ কোন উত্তরটিই একজনের পছন্দ হলো না, তখন তিনি ঐ প্রশ্নে কোনো পয়েন্ট পাবেন না। ফলে, ৭ পয়েন্টের কম পাবেন।

‘পরিস্থিতি যাচাই করতে পারেন?’ টেস্টে মন ঠিক করতে না পারলেও ভুল-এ দাগ দিতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার পেছনে মনোমিতি অর্থাৎ সাইকোমেট্রির একটি সূত্র আছে, সেটিকে বলে ফোর্সড্ চয়েজ বা বাধ্যতামূলক উত্তর বেছে নেওয়ার পদ্ধতি। উত্তরদাতা যাতে বিশেষ ট্রেনিং পরিস্থিতিতে দ্বিধাকে জয় করার মনোবল পেতে পারেন, তার জন্যেই এইভাবে উত্তর দেবার প্রবণতা বাড়িয়ে তোলা হয়। এসত্ত্বেও যদি কেউ উত্তর বাদ দিয়ে চলে যান, তাহলে তাকে কম পয়েন্ট দেওয়া হয়।

‘একটু বাড়তি কিছু করতে চান’ মনোপ্রশ্নচর্চার সর্বোচ্চ বিভাগে পয়েন্ট হবে ১৪—২৭। ছাপা হয়েছে ১৪—২২, সেটি ঠিক নয়।

৬ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত ‘আপনি কি আদর্শ স্বামী?’ মনোপ্রশ্নচর্চার ৩নং কলামের ২৯—৩০ লাইনে হবে ‘বিবাহ-জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলো সব কথাবার্তা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলা’। ছাপা হয়েছে ‘প্রয়োজনীয় বলা’, সেটি ঠিক নয়।

পাকিস্তানে নতুন বিদ্রোহ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ-র দশ বছরের "মৌলিক গণতন্ত্রী" শাসন এবার মৌলিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৫৮ সালে তিনি যখন কায়দা করে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা দখল করেছিলেন তখন পাকিস্তানীরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের কোনো সুযোগ পাননি। এই দশ বছরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর ক্ষমতাই শুধু বাড়াননি, যাতে তাঁর বিরোধীপক্ষের লোকেরা কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে না পারেন তার জন্য সুচতুর কৌশলে পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রেই তিনি ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। আজ দশ বছর পর সেই বিক্ষোভ মুখর হয়েছে। পাকিস্তানের শক্ত মানুষ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ-র বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানেই বিক্ষোভ আজ প্রবল।

আয়ুব বলছেন এ হল বিরোধীদের নষ্টামি। দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে সব কিছু ধ্বংস করাই হল এর উদ্দেশ্য। পাকিস্তানী জনগণ এ ধরনের কথা বহুবার শুনেছেন। শাসকের কণ্ঠে এই আওয়াজে তাঁরা আর বিশ্বাস করতে পারেন না। অতীতে দেখা গেছে আয়ুব কত কৌশলে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করেছেন। যাঁরা বিরোধী ছিলেন সেই জনপ্রিয় নেতাদের অর্ডিন্যান্স বলে সমস্ত নির্বাচিত সংস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন যতদিন না তাঁর আসন বেশ শক্ত হয়। এই ক' বছরে তাঁর সেই বিরোধীদের অনেকেই মৃত, অনেকেই অবসর নিয়েছেন বার্ধক্যহেতু। এবং তা সত্ত্বেও যাঁরা এখনও বিরোধিতা করছেন তাঁদের অনেকেরই স্থান হয়েছে কারাগারে। এদিকে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তৃতীয়বারের নির্বাচন হবে এক বছরের মধ্যেই। প্রেসিডেন্ট আয়ুব এবারও যাতে মৌলিক গণতন্ত্রী বা বেসিক ডেমোক্র্যাটদের পকেট ভোটে প্রেসিডেন্টের গদী দখল করতে পারেন তার জন্য পাকা-বন্দোবস্ত করতে চাইছেন।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এবার তিনি বাধা পেলেন তাঁর এককালের সহকর্মী ও অনুগতদের কাছ থেকেই। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব। আয়ুবের চীন-ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা ছিলেন তিনি। আজ তিনি আয়ুবের প্রধান বিরোধীই শুধু নন, তাঁর স্থান হয়েছে আয়ুবের কারাগারে। পশ্চিম পাকিস্তানকে এতদিন আয়ুব নানারকম কৌশলে ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। সেই পশ্চিম পাকিস্তানেই এবার শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড আয়ুব-বিরোধী অভিযান। পাকিস্তানের তরুণ ছাত্ররা আয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশকে লোপ করে দিয়ে এক ইউনিট গঠন করেছিলেন আয়ুব। আজ পাঞ্জাবীরা চাইছেন পাঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধীরা চাইছেন সিন্ধু প্রদেশ এবং খান ওয়ালি খানের নেতৃত্বে পাঠানরা চাইছেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই পাখতুনিস্থান। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাতেন তখন আয়ুবের একটি সহজ উপায় ছিল সেই আন্দোলনকে নস্যাৎ করা—তাকে তিনি পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন করার চক্রান্তরূপে অভিহিত করতেন। আজ পশ্চিম পাকিস্তানের এই আন্দোলনকে তিনি কী বলবেন?

তাঁর সাম্প্রতিক পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময়ে সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পুলিশ-সেপাই, বেয়নেট দিয়ে মঞ্চ ঘিরে পাকিস্তানের 'জনপ্রিয়' প্রেসিডেন্ট ঢাকার রমনা গ্রীনে বক্তৃতা দিয়েছেন। পাকিস্তানী যুবকের রক্তে ঢাকার মাটি এবারেও লাল হয়েছে। আর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলছেন, এই সব বিরোধীদের আন্দোলন দমন করার মতো ক্ষমতা সরকারের আছে। তারা নাকি দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। আয়ুব তাঁর গদীরক্ষার জন্য সব সময়েই বিরোধীদের এভাবে অরাজকতাসৃষ্টিকারী, দেশের স্বার্থ-বিরোধী ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাতে আন্দোলন থামেনি। জেলখানা ভরে উঠেছে তবুও আন্দোলন চলেছে।

বিরোধীরা দাবি করছেন, আয়ুব আগামীবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। তাঁদের বক্তব্য হল, সরকারী ক্ষমতার আসীন হয়ে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা নির্বাচনকে প্রভাবিত করেন এবং এভাবে সব আটঘাট তাঁদের বাঁধা যে মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনতন্ত্রানুযায়ী ক্ষমতাসীন এই প্রেসিডেন্টকে সরানোই মুশকিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলী জিন্নার ভগিনী কুমারী ফতিমা জিন্নার মতো মহিলাও আয়ুবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পারেননি। তাই এয়ার-মার্শাল আসগর খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসেও একই কথা বলেছেন, আয়ুব খাঁ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

পূর্ব পাকিস্তানের দাবি তো শুধু আয়ুবের অপসারণই নয়। তাঁরা চাইছেন পশ্চিম পাকিস্তানের সমান অর্থনৈতিক বরাদ্দ, স্বায়ত্তশাসনাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। গত দশ বছর ধরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পূর্ব পাকিস্তানীদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। পূর্ব পাকিস্তানের নেতা মুজীবর রহমানকে আয়ুব বছরের পর বছর জেলে পুরে রেখেও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে চাপা দিতে পারেননি। এইবারেই প্রথম সুযোগ আসবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করা। আয়ুবের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের যে-নেতারা দাঁড়িয়েছেন তাঁরা এবার যদি সুস্পষ্ট ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবির পক্ষে দাঁড়ান তাহলে পাকিস্তানে নতুন বন্দর শুরু হতে পারে আয়ুবকে উচ্ছেদের জন্য। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা কি তা করবেন?

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্‌টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ ঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সৌভাগ্যক্রমে ২৬শে সন্ধ্যায় লন্ডন থেকে এন্ড্রুজের এই তার আমাদের হাতে এল ঃ "জয় ঈশ্বর, মহাত্মার জীবন রক্ষা হয়েছে—এন্ড্রুজ।" অহিংসা জয়ী হল তবে। আমরাও গান্ধীকে টেলিগ্রাম পাঠালাম (২৭শে সকাল) ঃ "আপনার আত্মার মহান জয়ে আমরা আনন্দিত।"

(তবু এত দেরী লাগল ঃ ভারত থেকে যে-খবর পাচ্ছিলাম, তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। এবং ইংরেজ মন্ত্রীদের খামখেয়ালিপনা এমনই যে তাঁদের উত্তরটা তাঁরা আরো এক ঘন্টা আগেও জানাতে পারেন নি। এ-ব্যপারে মন দেওয়ার আগে উইক-এন্ডের বিশ্রামটি তাঁরা ধীরে সুস্থে গ্রহণ না ক'রে ছাড়েন নি। যদি কোনোদিন ইংলন্ডকে আমার আক্রমণ করতে সাধ যায় তো তা করব শনিবার দুপুরে। সরকারী সব কর্তা তখন মাঠে হাওয়া খেতে গেছেন, ফিরবেন সেই সোমবার।)

১লা অক্‌টোবর আগাগোড়া গান্ধীর স্বহস্তে লেখা এই চিঠিটি পেলাম (তারিখ খামের উপরে ঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২—সন্ধ্যা ৬টা) ঃ

"প্রিয় বন্ধু ও ভাই, জীবনে এত প্রচন্ড একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে জানাতে চাই, যে-ক'টি দিন আপনার এবং আপনার উচ্চমনা অনুগতা ভগিনীর সান্নিধ্যে কাটাই, সেগুলি আমার কাছে বড় মূল্যবান। মহাদেব দেশাই রয়েছেন সংগে, আপনাদের কথা আমরা প্রায়ই স্মরণ করি।

অনেক চিন্তার পর যে-সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, জানি না তা সম্বন্ধে আপনি কী ভাববেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, বিবেকের আদিষ্ট স্বর শুনেই এ-সিদ্ধান্ত নিলাম।..."

(১৩ই সেপ্টেম্বরই গান্ধী জানান র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে যে ২০শে সেপ্টে-ম্বর থেকে তিনি আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করছেন—যদি তাঁর উদ্দেশ্য জয়ী হয়, তবেই অনশন ভঙ্গ করবেন। এই মধ্যবর্তী সপ্তাহটি তাই তিনি তাঁর বন্ধুদের সংগেই নিরিবিলি কাটাতে চান—তাঁদের কাছ হতে বিদায় নেওয়ার জন্য)।

ভারতের কারণে জেনিভায় মিসেস কাজিন্স ও সি এফ এন্ড্রুজের উদ্যোগে যে আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হচ্ছে ৬ই অক্‌টোবর, তাতে নিচের এই বাণীটি পাঠালাম—পড়বেন আমার বোন ঃ

"ভারতের যীশুখৃস্ট। ভারতের সংগ্রাম শুধু এক প্রকান্ড দেশেরই নয়, যে-দেশ মানবিকতার মহাভূমি, যা আমাদের ইউরোপীয় ভাষা ও চিন্তা সমষ্টির এক সাধারণ উৎস, যেখানে আমাদেরও যুগ-যুগান্তের সেই শিকড় যার প্রসাদে আজকের ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তিমান বৃক্ষ আকাশে মাথা তুলেছে। তার নিয়তিতে, তার জাগরণে, তার স্বাধীনতার বাসনায় আমাদের যে-আগ্রহ, তা শুধু আত্মীয়-জনোচিত নয়। কত জাতিই তো আজ ন্যায্য বিদ্রোহের আবেগে কম্পিত হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে, নিজেদের নিয়তির হাল তারা নিজেদের হাতে ধরতে চায়, চায় তাদের অধিকার অর্জন করতে। সারা বিশ্বে যেখানে যত প্রাচীন জাতি ছিল কবরের বদ্ধ সুপ্তিতে, আজ তাদের উপর দিয়ে যেন কী এক হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, ডাক পড়েছে ঃ 'লাজারুস, জাগ্রত হও।'

"কিন্তু যদি অন্যান্য জাতি থেকে ভারতের এই জাগরণ অদ্বিতীয় হ'য়ে জাগে আমাদের চোখে, যার জন্য সকল রাজনৈতিক আবেগ বা যুক্তির বাইরে তার লক্ষ্যকে আমরা নিজেদেরই ও এমন কি সমগ্র মানবজাতির লক্ষ্য বলে মনে করি, তবে তার কারণ ততটা তার সেই অভীষ্ট নয় (যা হ'ল এক মহান দেশের স্বাধিকার অর্জন, বহু জাতির ভারতীয়দের এক যুক্ত রাষ্ট্র স্থাপন)। তার কারণ হ'ল সেই পথ যা সে নিয়েছে তার অভীষ্ট সাধনে ও কর্মক্ষেত্রে তার সেই চেতনা ও ব্রতের ভাব এবং সে-ব্রতে যে-পবিত্র ব্যক্তির অবতার সে ঘটিয়েছে ঃ অহিংসার মহাত্মা, সত্যাগ্রহের ঋষি ও বীর গান্ধী।

'জগতের এক নিকৃষ্ট যুগে তাঁর আবির্ভাব। এলেন এমন এক সময় যখন যা-কিছু নীতি এতদিন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তা নষ্ট হয়েছে। ইউরোপের পা আজ টলমল করছে, পাশবিক হিংসার চিরাচরিত বৃত্তিতে আজ তা আত্মসমর্পণ করেছে, উন্মত্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রে সে ধ্বংসমুখী হয়েছে। আজ যখন চার বছরের এক ভয়ংকর যুদ্ধ সবে সমাপ্ত এবং আগামীকালে সম্ভাবনা একটা নয়, দশটা সম্মিলিত যুদ্ধের—যার ফলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর একটিও টি'কে থাকবে না—এই দুই ভয়াবহ সত্যের মধ্যিখানে ভারতের দুর্বল-শরীর ঋষি এসে হাজির, বসেছেন তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধের মত। সর্বব্যাপী মানবতাগ্রাসী কোন লোহিত সমুদ্রের দুটি ধারার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানে যেন তিনি রয়েছেন। তিনি একাকী, তাঁর গ্রহণ না করার নীতিতে আমরণ দৃঢ় ও প্রশান্ত—পাশবিক শক্তিকে তিনি বাধ্য করেছেন তাঁকে সমীহ করতে। এই বৃদ্ধের আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞার সামনে দৃপ্ততম সাম্রাজ্যও ভয়ে নতজানু—বহু বছরের যুদ্ধ যে-জয়ে সফল হয়নি, এই একটিমাত্র অনশনে তা অর্জিত। কারণ সশস্ত্র হাত যে-জয় চেনে, তা যেমন মৃত্যু ডেকে আনে, তেমনি এমন পাপের বীজ বপন করে যা ক্ষালন হওয়ার নয়। এই প্রথম বার ইউরোপের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন সেই নতুন সেন্ট টমাস যাঁর একমাত্র বিশ্বাস শুধু অর্জনেই এবং যে-গৌরবময় দৃষ্টান্তটির নামকরণ গান্ধী নিজেই করলেন 'আত্মত্যাগের তরবারি।' এই প্রথম বার গান্ধী সর্বসমক্ষে দেখালেন তাঁর জয়যুক্ত অভিজ্ঞতার ফল, যে-অভিজ্ঞতার পরি-কল্পনার ঘোষণা তিনি করে আসছিলেন ১৯২০ থেকে। প্রাচীন ঋষিদের পরীক্ষাই তিনি অনেকখানি নিজের জীবনে করলেন। অহিংসার নীতি যখন তিনি আবিষ্কার করেন, বলেন যে সহস্র অবারিত হিংসা শক্তির মধ্যেও ঋষিরা নিউটনের চেয়েও বড় প্রতিভার পরিচয় দেন, ওয়েলিংটনের চেয়েও তাঁরা বড় যোদ্ধা ছিলেন। অস্ত্রের সংগে তাঁদের এককালীন পরিচয়ের ফলেই বুঝেছিলেন তার ব্যর্থতা—তাই ক্লান্ত পৃথিবীকে তাঁরা শোনালেন গতিমুখর অহিংসার বজ্রগম্ভীর বাণী। সে-বাণীর বক্তব্য ঃ চিত্তের সম্পূর্ণতায় বিবেকদীপ্ত যে-দুঃখ পাওয়া যায়, তা স্বয়ং শয়তানের

শান্তি পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে পারে। বলেন গান্ধী, এই অস্ত্র বিশ্বাসের প্রীতিতে সম্পন্ন হয়ে যে-লোক এগোয়, সে যত তুচ্ছই হোক, তার কাছে গোটা সাম্রাজ্যের অন্যায়ের শক্তিও হার মানবে। সে রক্ষা করতে পারবে তার সম্মান, তার ধর্ম, তার নিজের ও তার জাতির আত্মা, তার স্বাধীনতা—এবং তার পরে সে ঘটাবে হয় সাম্রাজ্যের পতন, নয় তার পুনরুজ্জীবন।

"প্রমাণ তিনি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন—সে-প্রমাণ কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে নয়। ভুল ও অন্যায়ের সম্মান বোঝা আজ ইউরোপের সব রাষ্ট্রের উপর। মনুষ্য জাতির মুক্তির জন্য এমন প্রমাণ খৃষ্ট আগে দেন—কিন্তু মুক্তি পেতে গেলে মুক্তি পাওয়ার বাসনা থাকা চাই। জগত কি চায় মুক্তি পেতে? সর্বনাশের বন্যাকে এতদিন কোনো রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল যে—শেষ ক'টি বাঁধ, তাও ধ্বসে পড়ছে—এমন সংকটের মুহূর্তে মুক্তি পাওয়ার বাসনা কি জাগতে পারবে জগতের? যেমন চলছে, তেমনি চলুক না—এ-ধোঁকা যেন সে নিজের মনকে না দেয়। জাগতেই হবে এখন। অন্যায় বজায় রাখাতেই যার অস্তিত্ব, সেই পাপদুষ্ট সমাজকে বদলাতেই হবে। সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা, উভয়েই চায় নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করতে—একটি পথ হিংসার, অন্যটি অহিংসার। দুটিই বিপ্লবাত্মক—এখন বেছে নেওয়ার ভার আপনাদের।"

অক্টোবর ১৯৩২—গান্ধীর চিঠি, লেখা ৩০শে সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ অনশন ভঙ্গের চারদিন বাদে :

"প্রিয় বন্ধু, আপনার প্রীতিপূর্ণ বার্তা পেয়েছি। পরীক্ষার সময় আপনি আমার মনে সর্বদা জাগ্রত ছিলেন। এই মহান নাটকের প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের প্রভূত করুণার পরিচয় পাই। আমার প্রীতি নেবেন।

বাপু

আপনাকে লেখা যখন শেষ করেছি, মীরার চিঠি পাচ্ছি। তাঁর সময় কাটে আনন্দের সীমাহীন উদ্বেগে। কিন্তু তিনি কাঁটার শয্যা বেছে নেন এবং তাইতে শুয়ে আছেন বীরের মত।

এম, কে, জি।"

গান্ধীকে আমি লিখলাম (২২শে অক্টোবর) :

"আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় বন্ধু, ১৬ ও ৩০ সেপ্টেম্বরের আপনার দুটি মধুর চিঠিই আমরা পেয়েছি। পরীক্ষার সেই মুহূর্তে আমাদের কথা স্মরণ করেছেন জেনে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। মনে মনে সে-ক'দিন আমরাও আপনার পাশে ছিলাম এবং আমাদের চিন্তায় উদ্বেগ যে ছিল, সেটা বলা বাহুল্য। কিন্তু আমি জানতাম যে আপনি যা করেছেন, তা ঠিক। জানতাম, আপনার ত্যাগ শুধু মহানই নয়, উচিত ও ন্যায্যও, তার দরকারও ছিল। আপনার দেশবাসীর এমন মুহূর্তে এই ছিল আপনার কর্তব্য। অস্পৃশ্যদের যে-কারণ,

তা সকলের ঊর্ধ্বে—সেটি ব্যতীত অন্য কোনো কারণেই এমন প্রচন্ড শক্তির দরকার পড়ত না। ভারতের মর্যাদা, তার নৈতিক একতা (যা সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ঐক্যের সার-বস্তু), এমন কি জীবন ধারণে তার অধিকার পর্যন্ত আজ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত সেই সংস্কারের সংগ্রামের সংগে, যার মাধ্যমে মৃত অতীতের সামাজিক প্রথার বলিরা আবার ফিরতে পারে সমাজে—এবং একদিন যারা বহিষ্কৃত হয়েছিল, তাদের সেই ফেরা আজ তাদেরই লক্ষ লক্ষ ভাই-এর বুকের মধ্যে। এমন একটি উদ্দেশ্য যাতে জয়ী হয়, সেই প্রতীক্ষায় সমগ্র মনুষ্য সমাজ আগ্রহান্বিত। 'যে মহান পরীক্ষা' আপনি চালিয়েছেন, তার ফলাফল দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ আজ উদগ্রীব। এবং সে-ফলাফল কী হবে, তা আগে থেকে জানা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, আপনার পক্ষেও নয়। ঠিক বিজ্ঞানের মত যতক্ষণ এ-পরীক্ষা চলে তার স্বকীয় সত্যের সুদৃঢ় নীতিতে, ততক্ষণ আমরা শুধু বিশ্বাসের সংগে অপেক্ষাই করতে পারি। তবে ফলাফল নির্ভর করবে পৃথিবীর নিয়তির উপর এবং কোন পথে সে-পৃথিবীর কর্মধারা পরিচালিত হয়, তার উপর: এবং একমাত্র এই পরীক্ষা বা সত্যাগ্রহের সাফল্যই পারবে হিংসার করাল স্রোত থেকে মনুষ্য সমাজকে রক্ষা করতে। প্রার্থনা করা যাক। সত্যকারের প্রার্থনা তাই যা আপনি করেন—কাজ করতে করতে।'

ডিসেম্বর ১৯৩২—যাতে কোনো মন্দিরের দরজা অস্পৃশ্যদের জন্যও খোলে, সেকারণে গান্ধী আবার অনশন গ্রহণের কথা বলছেন। তাই তাঁকে তার করে জানালাম যে এমন একটা গৌণ কারণে যদি তিনি তাঁর গত অক্টোবরের বীরত্বব্যঞ্জক কাজের পুনরাবৃত্তি করেন তো ইউরোপীয় মতামত এবার তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারে।

ডিসেম্বর ১৯৩২—অধ্যাপক পি, কিরুচিন (শ্বেত রাশিয়ার এ্যাকাডেমির) গান্ধীর বিষয়ে আমাকে লেখেন (গান্ধী নিয়ে তিনি পড়াশুনো করছেন, আমার বইপত্রের সংগেও তাঁর পরিচয় আছে—জানেন, আমি একজন 'গান্ধী-ভক্ত, যে-গান্ধী নতুন এক ধর্মের প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, যিনি ভারতীয় জনগণের চোখে ধুলো দিচ্ছেন', তাই আমার সংগে গান্ধীর বর্তমান সম্পর্কটা কী, সেটা তিনি জানতে চেয়েছেন)। আমি তাঁকে এই উত্তর পাঠালাম (২৭শে ডিসেম্বর):

'...গান্ধীর সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা কী, তা আপনি জানেন। যখন থেকে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানার সুযোগ পাই, সেই ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে সুইজরল্যান্ড পরিদর্শনকালে আমার কাছে যখন তিনি পাঁচ দিনের জন্য ওঠেন, তখন থেকে তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামত সংশোধন করার প্রয়োজন বোধ করি নি। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদীরা যাই বলুন না কেন, মানুষ হিসেবে তাঁর চরিত্র সকলের মনে শ্রদ্ধা জাগাবে। বিশ্বাসের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও তাঁর আন্তরিকতা সকল সন্দেহের অতীত। নিজের প্রতি ভুল তিনি হয়তো করতে পারেন , কিন্তু জেনে শুনে অন্যকে প্রবঞ্চনা কখনো করেন না। এবং তাঁর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার সময় এই চরম সত্যটা সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার: বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে চলেছেন। তাঁর মধ্যে এমন কিছুই নেই যা জমাট বেঁধে গেছে বা চিরকালের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর জ্ঞানে ঘাটতি থাকতে পারে এবং তা মেনে নিতে তিনি খুবই সম্মত, নিজেকে সংশোধন করতে বা তাঁর জ্ঞান পূর্ণ করতেও তিনি সর্বদাই প্রস্তুত—তবে সেটা তিনি করেন ততটা বই পড়ে নয় যতটা নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের দ্বারা। নিজেকে শিক্ষা দেওয়ার বা

নিজের কাজের জন্য এই রীতিই তিনি চিরকাল অনুসরণ করেন: সমাজ নিয়ে সোজাসুজি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটানো, প্রতি পদে বিচার করা এবং প্রতি পদে নিজের বৃত্তটাকে আরো একটু বড় করা। সন্দেহ নেই, এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তাঁর চিত্ত পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হবেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করব: 'ঈশ্বর সত্য', তাঁর অতি প্রিয় আদর্শগত এই মন্ত্রটি গত চার-পাঁচ বছরে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সত্যই ঈশ্বর'-এ—এবং এটিকে আজ তিনি তাঁর নীতি বাক্য বলে মানেন। একই মন্ত্রের এই অদল বদল খুব বেশি গুহ্য ও আপাত দৃষ্টিতে পরম নিগূঢ় ঠেকলেও এটা বলতেই হবে যে এই রূপান্তরটি অতি গভীর অর্থপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সকল সত্যের উপলব্ধিকে যাচাই করা সম্ভব হয়।

তা-ছাড়া, তাঁর 'আত্মজীবনী'তে আমার মুখবন্ধটি যদি পড়ে থাকেন তো দেখবেন গান্ধী নিজেই তাঁর অভিজ্ঞতাগুলির আপেক্ষিক ও ক্ষণস্থায়ী চারিত্রিক গুণের কথা বার বার বলেছেন: 'আমার অভিজ্ঞতা যে সামান্যতম অর্থেও সম্পূর্ণ, এমন দাবী আমি কিছুতে করতে পারি না। জ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের উপর যে-দাবী করেন, একমাত্র সেই দাবীই আমি আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে করতে পারি—তার এতটুকু বেশী নয়।' তাঁর অত্যন্ত চুলচেরা ও যথাযথ বিশ্লেষণ সত্ত্বেও নিজের সিদ্ধান্তকে তিনি কখনো চরম বলবেন না, বরং সর্বদা তিনি তাঁর মনের দরজা খোলা রাখেন নতুন নতুন সম্ভাবনার জন্য......

—"তাঁর সংগে আলোচনা করতে গিয়ে এই রকমই আমার মনে হয়েছে। তিনি বিনয়ী অথচ দৃঢ়, সামাজিক কর্ম সম্বন্ধে কোনো অনুমানকে সর্বদাই মনোযোগের সংগে যাচাই করে দেখছেন, এবং উপলব্ধ সত্যের উপর ভিত্তি করে এগোচ্ছেন এক পরীক্ষা থেকে অন্য পরীক্ষায়—কিন্তু সর্বদাই প্রস্তুত তিনি অন্য ধরনের পরীক্ষাতেও বা অন্য অভিজ্ঞতা আহরণ করতেও এবং তাদের যাচাই করে দেখার পর দরকার পড়লে তাঁর কর্মপদ্ধতি সেই আলোকে বদলাতেও তিনি রাজী। তাঁর জীবনটাকে তেমন গুছিয়ে তুলতে পারেন নি কখনো। কিন্তু আরো দশ বছর যদি বাঁচেন তিনি তো সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক বড় বড় উন্নতি সাধন করতে দেখা যাবে—আমার তো তাই ধারণা। ততদিনে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ শেষ হবে এবং ভারতীয় ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর দেশের জনগণকে দাঁড় করাবেন এক নতুন যুদ্ধে। এমন একটি বিবর্তন যাঁদের কাছে অপ্রত্যাশিত ঠেকবে তখন, তাঁরা গান্ধীকে বোঝার চেষ্টা করেন নি। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট যাতে অটুট থাকতে পারে, তাঁর বর্তমান রণকৌশল সে-চেষ্টায় ব্রতী—তবু এটা সত্য হলেও ভারতীয় ধনিক গোষ্ঠীর প্রতি ভবিষ্যতে তিনি কী চোখে তাকাবেন, সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আভাস ইতিমধ্যেই দিয়েছেন, ভয় দেখাতেও ছাড়েন নি (এমন কি লন্ডনেও, গোল টেবিল বৈঠকে)।

'১৯২২-এ গান্ধীর উপর যে-বইটা লিখি, সময় পেলে সেটাকে পূর্ণ করে তুলব। আজ তা অসম্পূর্ণ। এই দশ বছরে গান্ধীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেক বেড়েছে, এবং আজও আমি তাঁকে (যেটা তিনি নিজেও মনে করেন) তাঁর গন্তব্যের মাঝামাঝি রাস্তায় বলে মনে করি। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে, তিনি হচ্ছেন 'সত্যের এক বিনম্র (ও জেদী) অনুসন্ধানকারী, পথভ্রষ্ট তিনি কখনো হন না। আমার আন্তরিক সম্ভাষণ জানাই আপনাকে।'

(ক্রমশঃ)
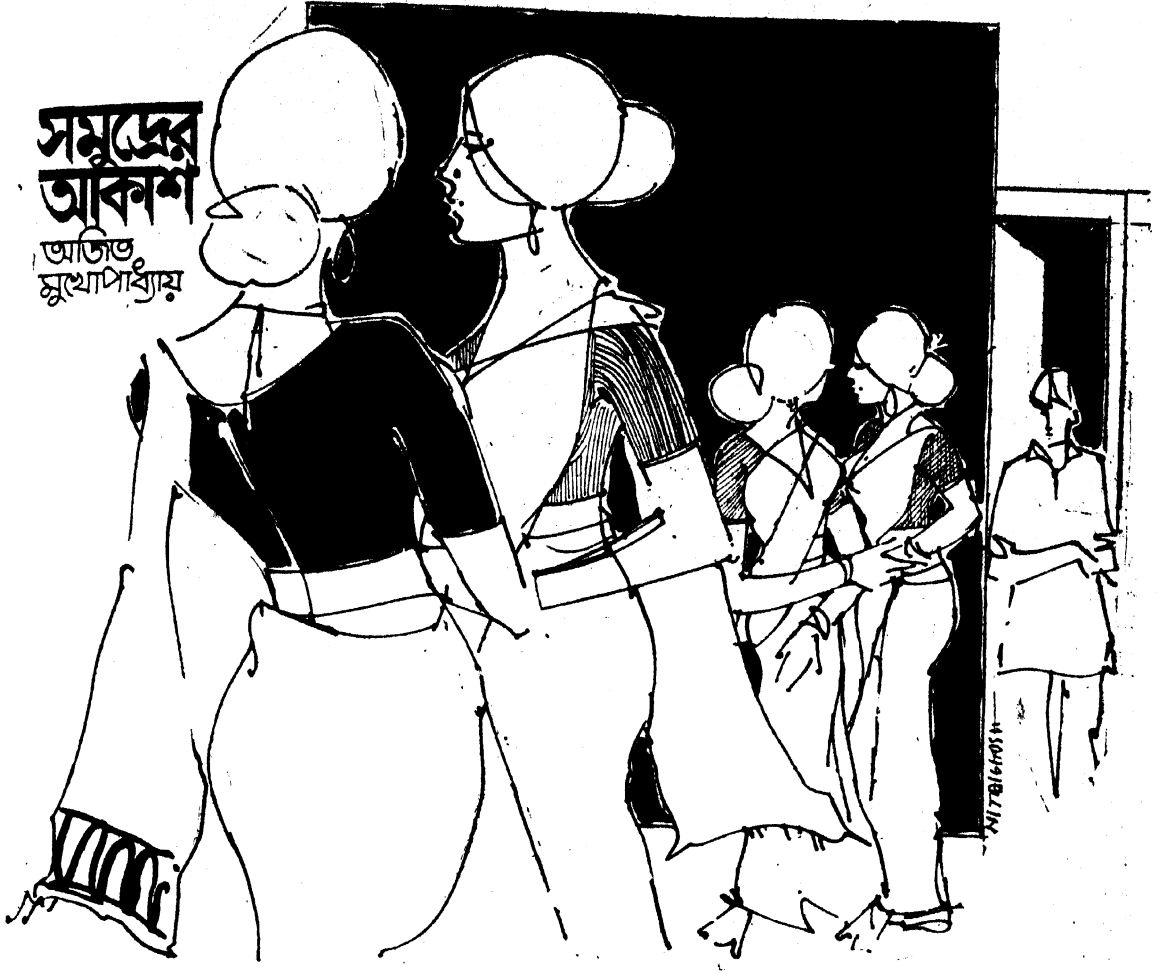
ছড়ের একেকটা টানের মত দেবীর রূপের একেকটা স্তর খুলছে। স্নো পাউডার রুজ...

না না...এই রুজ লাগাস না। দেবী বলল।

আজ কিছু বাদ দিতে নেই...

দেবীর ঘাড় চেপে ধরল তিনজন একসংগে, বলল সবাই এক স্বরে।

বৈরাগিনী সাজে বিয়ে চলে না, প্রেম চলে...

আবার সম্মিলিত মেয়েলী হাসি। সেই সন্ধ্যে থেকে চলেছে হাসির বহর। কখনো টুকরো কখনো সম্মিলিত। এত হাসতে পারে মেয়েরা। হাসি হাসি। কেবল হাসি। পাঁচটা মেয়ে জুটলেই পঞ্চাশবার হাসি।

রুজ লিপস্টিক সুর্মা...আর কী...ও হরি নখপালিশ...

যাঃ। তোরা কী আমাকে পাগল পেয়েছিস।

পাগল নয় ছাগল। বলি দেব। বাবার থানে বলি।

আবার হাসি।

আজ কোনো প্রতিবাদ করবি না। আমরা যা বলব সুবোধ বালকের মত পালন করবি।

মানে! ঝলসে উঠল দেবী। আমার বিয়ে আমি যা খুশি তাই করব!

......আজ্ঞে না ম্যাডাম...উৎসবটা আমাদের বিয়েটা আপনার। বিয়ে করে কাল বাদে পরশু থেকে যা খুশি করুন না, আমরা কি আর আসছি না থাকছি?

বিরাট ধ্বসনামা হাসি। ঘর দোর সব প্রবল ঢলে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কনে সাজার ঘরে নানান জিনিসপত্রের স্তূপ। দাম-সামগ্রী থেকে ভোজ্যদ্রব্য পর্যন্ত। একপাশে নতুন সতরঞ্চি পেতে দেবীকে সাজানো চলছে। বারান্দা সংলগ্ন জানলাটাতে ছিটকিনি এঁটে দিয়েছে, যেটার সামনেই দেবী। দরজা ভেজানো। দেবীর মুখভাব কেমন কেমন। অবোধ্য। সে খুশি কি অখুশি বোঝা যাচ্ছে না। বান্ধবীরা আত্মীয়ারা কথার খোঁচা মেরে যাচ্ছে। দেবী আয়ত চোখে কেবল তাকাচ্ছে তাদের দিকে।

কে বলল, এই, দরজাটায় খিল দে...

এখুনি? কে তির্যক কণ্ঠস্বরে প্রশ্নের সংগে ব্যঞ্জনা জুড়ে দিল।

সশব্দ হাসিতে আবার ঢলে পড়ল সবাই।

দরজাটা ভেজানোই থাক। বলল দেবী।

কিন্তু একজনা দেবীর কথা অমান্য করে সত্যি সত্যি খিল তুলে দিল। কোণের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেবী লেসআঁটা শায়া এলাস্টিকের জামা, ব্লাউজ ও বেনারসী পরছে। শাড়ি পরা শেষ হতে না হতেই একজনে দেবীকে ধরে আচমকা মুখ ফিরিয়ে দিল।

আহা কী দেখাচ্ছে মাইরি...সবাই বলে উঠল।

একটি মেয়ে বলল, আমারই তোকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বলেই দেবীকে জড়িয়ে ধরে কয়েকটা চুমু খেল সজোরে।

এই...এই কী করছিস কাহিনী...ধ্বজ-ভুজংগুলো সব [illegible] ...তোর প্রেমের বানে...

আবার কলোচ্ছ্বাস...

তল্লাকার জায়গায় [illegible] শব্দ।

কে-রে কে...পাঁচজনে [illegible] জানলার কাছে। এককজন [illegible] দুটো [illegible] মুখ চাপা দিল কাকে। [illegible] দিদিকে [illegible] ...গৌরব [illegible] দরজাটা [illegible]।

[illegible] নয় শাসনের ভঙ্গিতে গৌরব [illegible] বলল। মেয়েরা কেউ কিছু [illegible] না। গৌরবের [illegible] পরিচিত। [illegible] ঠেলা দিয়ে আচমকা বেগে [illegible] প্রবেশ। এর কাঁধ তার পিঠে খোঁচা মেরে সোজা দেবীর সামনে, দেবী তখনো বুকের আঁচল গুছোতে পারেনি।

[illegible] শাবাস...কী করেছিস দিদি... ইম্পি ইম্পি...দীর্ঘ টানে ইম্পির 'ই'কে [illegible] রূপান্তরিত করে সন্তমে তুলে দিল গৌরব।

নবা যুবক গৌরবকে নতুন চাকরিতে ঢুকিয়েছে স্বপনদা। সেজন্য গৌরবকে দিদির বন্ধুরা হনুমান বলে ডাকে। [illegible] ইঙ্গিতে [illegible]।

কাহিনী বলল, এই হনুমান...তোর মনিব আসছে?

আসবে না মানে? কাঁধে তুলে নিয়ে আসব...

দেবী হাসল একটুখানি। গৌরবের গালে চড় বুলোল। গৌরবের চোখে কৌতুকের দৃষ্টিটা বদলে সিরিয়স হল। বলল, সত্যি বলছি দিদি, স্বপনদা ফেল মেরে যাবে...

এ-কথাটা সবাই ভেবেছে, কাহিনী শিখা কল্যাণী সবাই...ফ্যায়ারম্যানের মেয়ে হলেও দেবীর যা রূপ এতে অনেক ভালো বর জুটত। আজ এই বিয়ের আগে পর্যন্ত অনেক মেয়ে দেবীকে ঈর্ষা করেছে...এমন কি দেবীর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেখা এতবড় আনন্দের দিনে দেবীকে বর্জন করেছে...সুরেখার ধারণা...এখন অন্ধ ধারণা দেবীকে স্বপন বিয়ে করছে ওর রূপের জৌলুসে...রূপ, কেবল স্থূলে দেহগৌরব ছাড়া কী আছে দেবীর। সুরেখা স্কুলের গণ্ডী ডিঙিয়ে আধা-সাহেবী কলেজে যাচ্ছে, সুরেখা সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভঙ্গিতে কথা বলতে জানে, সাজতে জানে, কত নতুন নতুন ফ্যাশন সর্বপ্রথম আয়ত্ত করতে পারে, কী ধারালো রুচি, সুরেখা ভাবতেই পারে না দেবীর মত বর্বর সৌন্দর্যকে স্বপন বরণ করবে। স্বপনের সাধারণ চেহারা, মার্জিত রুচি, আধুনিক ধ্যান-ধারণা তার। বাইরে থেকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার চলা-বলা-ব্যবহার সব কিছু। কিন্তু বড় চঞ্চল। সুরেখার ধারণা, এই চঞ্চলতার জন্যই স্বপনের নামে অপবাদ দিয়েছে সবাই, ওর চরিত্র ভালো না। আজকাল ছেলেদের নামে দুশ্চরিত্রের অপবাদ দেওয়া মেয়েদের [illegible] বাড়িয়েছে। [illegible] [illegible] বোধহয় অনেক [illegible] দেখেছে তাই তার ধারণা দেবী স্বপনের সুখের কারণ হবে [illegible] সুরেখা বাদে কলোনীর [illegible] ধারণা বোধহয় এক...[illegible] আছে কাহিনী। কাহিনীর [illegible] ব্যাপার [illegible] চাপা মেয়েটা...[illegible] চাপা নয়, [illegible] স্বপন কাহিনীর [illegible] তার ভাবী বউয়ের গালে [illegible] ছোঁয়াতে পারে এমন স্থৈর্য একমাত্র কাহিনী ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে আশা করা যায় না। কাহিনী সুরেখার মত পাগল নয়, মূঢ়ও নয়। কাহিনী মনে মনে স্বপনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে, আর সে দুঃখটা সুরেখার চাইতে কোনো অংশে কম নয়, কিন্তু তার জন্য বেচাল ব্যবহার অন্ততঃ কাহিনী করবে না। কাহিনীরও স্পষ্ট মত স্বপন রূপে দেবীর কাছে কেঁচো, কিন্তু স্বপনের বিয়েই করা উচিত নয়। অন্তত দেবীকে নয়। দেবীর গণ্ডী বড় ছোট, বড় শক্ত। দেবী যাকে চায় তাকে একেবারে গ্রাস করতেই চায়, দেবীর রূপে অনেকেই মারা পড়তে পারে কিন্তু কারুর প্রতিই দেবী সামান্য ঠোঁট বেঁকিয়েও করুণা জানাবে না। অত ছোট মনে কি প্রেম চলে। একদিন না একদিন নিশ্চয় দেবীর রূঢ়তা নির্মমতা নীচতা ও অহংকার স্বপনকে বড় দুঃখ দেবে।

কাহিনী বলল, তাই তো চায় দেবী, সবাই ওর কাছে ফেল মারুক...

দেবীর মস্ত খোঁপায় ফুলযুক্ত রুপোর কাঁটা গুঁজে দিয়ে শিখা বলল, অন্তত স্বপনদা তো মারুক......

মানে...আমি কি একটার পর একটা বিয়ে করে যাব...! দেবী বলল।

সবাই হেসে আকুল আবার।

দেবী বলে চলল, একটাই বিয়ে করতে চাই এবং সেটা প্রেম করেই...

জানে। সবাই জানে। হাজার বার দেবীর মুখ থেকে শুনেছে। প্রেম করেই বিয়ে করবে দেবী। বিনা প্রেমে বিয়ে করা তার ধারণার বাইরে। আর সপ্রেম বিবাহই তার দেহকোষের একমাত্র স্পন্দন। মা-বাবা সবাই জানে। প্রকাশ্যেই বলে দেবী, কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। বাবা তো সর্বদাই শিবঠাকুরটি সেজে। ধোঁয়া নয় জলে। কে জানে রেল এঞ্জিনের গরম চাপা দেবার চেষ্টায় কেউ গলার ভিতরে লাল-জল ঢালে! লাল জল তো বিদেশে গরম করার জন্যই। হয়তো শারীরিক মানসিক সর্ব-প্রকার গরমকেই ঠাণ্ডা করার এবং ঠাণ্ডাকে গরম করার বিপরীতধর্মী কাজে এর ব্যবহার ফলপ্রদ। অদ্ভুত। বাবাও তদ্রূপ অদ্ভুত। বাবাকে দেবী কতবার বলেছে, বাবা তুমি স্বপনদাকে বল না...ছেলেরা তো কখনো বলবে না...মেয়েদের পক্ষ থেকেই এগুলো দরকার...

বাবা হেসেছে...ধুর বোকা...স্বপনটা একটা পাত্তর?

তোমার সবতাতেই ঠাট্টা...

ওর শতগুণ ভালো পাত্তর আছে, ড্রাইভারের শালার ছেলে...

সে তো শুনলাই আজ [illegible] দশ আগে থেকে...রেগে-মেগে দেবী বলে ফেলেছিল... বিয়ে করার জন্য সে অধীর হয়ে পড়েছে। [illegible] সব ব্যাপারেই এই [illegible] দলের [illegible] দেখে। এই কলোনীর কম্পাউণ্ডেই স্বপনের কোয়ার্টার। স্বপনের সঙ্গে মাসে [illegible] পাঁচবার দেখা হচ্ছে বাবার সঙ্গে। বাবাকে [illegible] খাবার পয়সাও ধার দিচ্ছে। বাবা স্বপনের হাত ধরে টানাটানিও করেছ। স্বপন [illegible]। যাই হোক তা সত্ত্বেও স্বপনকে মুখ ফুটে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করতে পারছে না বাবা।

শেষ পর্যন্ত দেবী নিজেই মা-বাবার সামনে স্বপনকে বলেছে...

মা একটু গম্ভীর গম্ভীর...কারণ অন্য মেয়েদের মুখে স্বপনের চরিত্র সম্বন্ধে শুনেছে মা। মা আবার পুরো সেকেলে.. চরিত্র যদি নিষ্কলংক না রইল তাহলে সে আবার মানুষ! দেবী অতটা ভাবে না। ও প্রসঙ্গ তার কাছে স্পষ্ট নয়। দুশ্চরিত্র স্বামীকে সে সহ্য করতে পারবে কিনা এখনো পরিষ্কার বলতে পারে না। কারণ, ছেলেরা ওইটুকু স্বাধীনতা না পেলে দাম্পত্য ভেঙে যায়...দেখে দেবী নিজেকে কিছুটা উদার করে তৈরী করার চেষ্টা করছে...

তার ধারণা তার নিজের প্রেম খাঁটি জমাট হয়, শুদ্ধ হয়, তাহলে সে সুখী করতে পারবে তার স্বামীকে।

স্বামীর প্রেম সে কেন্দ্রীভূত করতে পারবে।

কাঠের পাত দেওয়া বারান্দায় বসে কলোনীর রাস্তায় রিকশ চেপে স্বপনকে সুরেখার সঙ্গে হাসাহাসি করে যেতে দেখেও দেবী সহ্য করেছে, ফেটে পড়েনি।

মা রেগে গেছে। বলেছে...ছি ছি ওই বখাটেকে বিয়ে করতে চাস...

অবশ্য স্বপনকে প্রকাশ্যে আদরই করে...আর সে আদর তখন বড় আন্তরিক। সংসারে অসময় আছেই তখন আছে স্বপন। বড় বড় সাহেবসুবোর সঙ্গে স্বপনের অন্তরঙ্গতা...যার ফলে গৌরবের চাকরি। স্বপন থাকুক না। একজন আদর্শ বন্ধু হয়ে, কে বারণ করছে। কিন্তু জামাই? না-না জামাই করতে মাও চায় না।

কৃষ্ণামানিদের কোয়ার্টার থেকে একদিন ছুটে এসে মা ফেটে পড়ল।

কৃষ্ণামানিদের বাবা গার্ড। যখনই রাতে ডিউটি থাকে তখনই স্বপন নাকি কৃষ্ণা-মানিদের কোয়ার্টারে রাত কাটায়। ফেস্ফাঁস বলে ফেলল কৃষ্ণামানির ভাই রামাল।

বাবা এসব খবরের ধার ধারে না। বাবা নাকি লোক চেনে। তাতে বাবার অভিমত স্বপনটা মিচকে শয়তান। এঞ্জিনের

ড্রাইভারের কাছে বলেছে, মদ খাবার পয়সা স্বপনটা দেয় কেন জানো, মেয়েটার সঙ্গে জমানোর জন্যে আমাকে সরিয়ে রাখা।

এরকম যাদের ধারণা তারা দেবীর জন্যে কখনোই স্বপনকে পাত্র ভাবতে পারে না।

অবশ্য বাবা ঘরে, বা কলোনীতে কোথাও কারুর নিন্দেবান্দা করে না। কারুর প্রসঙ্গ এলেই এড়িয়ে যায়। কোনো প্রসঙ্গেই বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে পারে না।

দেবী যখন নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিজেই করে বসল, বাবা হাসল হো-হো করে...নীল প্যান্ট শার্ট পরল, জুতোটা পায়ে গলাল...ডিউটিতে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, ভালোই তো, ভালোই তো...

দেবী বলল, দেখলে তো আমার মতের উপর কেউ না বলবে না...

স্বপন বলল, ওঃ কী ভীষণ মেয়েরে বাবা...

মা একটু একটু হাসছিল। যেন মজা উপভোগ করছে।

বিয়ের রাত্রেও সবাই দেবীর প্রকট প্রেমাভিলাষ শুনে হেসে শতখান।

গৌরব বলল নেচে-নেচে, তুহি মেরা মঞ্জিল...ইত্যাদি...

সবাই গালাগাল দিল গৌরবকে, অ্যাই অ্যাই ফাজিল...যা ভাগ...মেয়েদের মধ্যে কেন রে...

মেরা দিল দিওয়ানা হো-গিয়া...গান ধরল সুর করে।

কাকে দেখে রে? কাকে দেখে?

হঠাৎ গৌরব গম্ভীর হয়ে গেল, তোমরা তো কেবল ওই জান...কাউকে না দেখে কি দিল দিওয়ানা হয় না?

কী ফচকে...মারব চাঁটি...আমরা কেবল এই জানি...

কপট কিল চড় ও কাতুকুতুর তোড়ে গৌরব ঘর ছেড়ে পালাল।

কিছুক্ষণ পর থিতিয়ে পড়ল ঘরের কলধ্বনি। হাই তুলল কেউ কেউ। রেল-ইয়ার্ডের শান্টিং, এঞ্জিনের হুইশল আর শোনা যাচ্ছে না। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে।

বাইরে সামিয়ানা টাঙানো মাঠে লুচি ভাজার শব্দ, হালুইকরদের হাঁক। সবই দৌরিতে জোগাড় হয়েছে, রান্না শেষ হতেই রাত বারোটা বেজে যাবে। হঠাৎ দিনস্থির হয়েছে দেবীর অধীর চাপে।

বাবা ও মা কেমন মুখভার করে ঘোরা-ফেরা করছে।

বাবাকে দেবী আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে, তোমার মন খারাপ কেন বাবা? যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা কোরো বাবা...

বাবা দেবীকে কাছে টেনে কেবল চোখের জল ফেলেছেন।

দেবীও কেঁদে ফেলেছে। বাপ-মায়ের চোখের জল কোন্ মেয়ে সইতে পারে।

মা অদ্ভুত। চোখে জলটল নেই। কেমন পাথর-পাথর ভাব। বিমর্ষ।

মাকেও দেবী একই প্রশ্ন করেছে। মা বলেছে, নিজের মা হ, তখন বুঝবি।

দেবী যথেষ্ট বুঝেছে, কোনো মাই মেয়েদের জন্য নির্ভর থাকতে পারে না। কেমন অকারণ দুশ্চিন্তা করা মায়েদের স্বভাব। সে যখন মা হবে, তখনও অকারণ দুশ্চিন্তা করবে।

আরে! এখনই তো তার অকারণ দুশ্চিন্তা।

এখন তো সে মা হয়নি।

হ্যাঁ, কেমন যেন দুশ্চিন্তা। অথচ এখন অকারণ দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। এখন তার মত সুখী কে, তার মত আনন্দিত কে। এত আনন্দের জন্যই সে বন্ধুদের সঙ্গে হাসতে পারছে না। হ্যাব-লামিতে মন ভরছে না। সকলের উৎসব একত্র করলেও যে তার মনের উৎসবের তুলনায় ম্লান হয়ে যাবে।

তার এই মনের উৎসব যে সহজে অনুষ্ঠিত হয়নি। এ তাকে অর্জন করতে হয়েছে। আজ তার জন্যে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হবে, অনেকেই তার আনন্দ তুচ্ছ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাতে দেবী টলবার পাত্রী নয়।

কী সে করেনি। কী না সে সহ্য করেছে।

মা কৃষ্ণামাসির বাড়ি থেকে এসে স্বপনের সঙ্গ পরিহার করার দাবী জানায়। স্বপনকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতে বারণ করে। তখন যেন স্বপনও ধ্যান করে এদের মনের ভাব বুঝতে পারে অথবা গৌরবের মারফৎ কিছু জানতে পারে। স্বপনেরও পাত্তা পাওয়া গেল না পুরো একমাস। যে-ছেলে দিনের মাথায় চল্লিশবার আসে, তার দেখা নেই চল্লিশ দিন।

স্বপন এমন করেছে কখনো কখনো মাঝে মাঝে। কিন্তু সে মাত্র ক' দিনের জন্য বড়জোর।

স্বপন একদিন এ-বাড়িতে পা না দিলেই, পরদিন যে-কেউ দেবীকে দেখেই বলে দিতে পারবে, গতকাল স্বপন আসেনি। দেবীর মুখচোখ চুল চাউনি চলাফেরা সবই যেন স্বপনের গরহাজির প্রচার করবে। এমনকি কত দিনের গরহাজির তাও নাকি ধরা পড়ে দেবীকে দেখে। সুতরাং চল্লিশ দিনের গরহাজির দেবীর রূপ যে কেমন বিপর্যস্ত করেছিল, সে-দৃশ্য ভাবলে আজও অনেকে শিউরে ওঠে।

যে-রূপ দেখলে দুর্দান্ত পাগলেও স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে যায়, সে-রূপ দেখলে জহ্লাদেরও চোখ ফেটে জল ঝরবে।

খবর রোজই পাচ্ছিল স্বপন। তার নিজের পরীক্ষাও চালাচ্ছিল। সে ক'দিন দেবীর অদর্শনে স্বাভাবিক থাকতে পারে তার পরীক্ষা।

পরন্তু স্বপন নিজেই প্রেমরোগে কোনো-দিন করবে মনে তার প্রেমে কোনো মেয়ে কাঁদবে, এটাই তার চিন্তার বাইরে।

স্বপন ছুটে এল সন্ধ্যার পর, তখন সব ঘরে বাতি জ্বলেনি, ঘরগুলো যেমন অস্বাভাবিকতার ডুবে আছে। বাইরের বারান্দায় আইবোলগুলো পড়ছে, মা আছে বসে। দেবী কী করছিল নিজেই বলতে পারবে না। মনে হয় উনুনে আঁচ দিচ্ছিল। চল্লিশ দিন একটা মানুষ কোনো কাজ না করে বাঁচতে পারে না। কেবল বাঁচার জন্য দেবী সবকিছুই করে যাচ্ছিল। স্বপনের সঙ্গে একবার তো দেখা হবেই।

পিঁড়ি টেনে স্বপন বসে পড়েই হাঁপাতে লাগল...উঃ, কী ছুটেছি...

যেন চল্লিশ দিন একটানা কাজ সেরে এইমাত্র ছাড়া পেয়েছে স্বপন।

দেবী তাকাল না, নড়ল না...উনুনের আঁচে হাওয়া করতে লাগল। ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, আর আগুনের শিখাগুলো চলকে চলকে উঠছে।

কয়েক মিনিট স্বপন হাসল মুচকি মুচকি, কাশল, পিঠে হাত বুলিয়ে দিল দেবীর। বলল, উঠি...

খুবই শান্তকণ্ঠে দেবী বলল, উনুনটা মাথায় ঢেলে দেব...

কপট ভয়ের লাফ দিয়ে স্বপন বলল, আমার, না তোর?

আমার মাথার দাম আছে...

বেশ বেশ...তাহলে আমার মাথাতেই ঢাল...

খুব বাড় বেড়েছে, না?

মোটেই না...

এর উল্টো ফল পেতে হবে...বলে দিচ্ছি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিগত শতাব্দীর মাঝের দিকে চার্লস ডিকেনস যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বেরিয়ে হোটেল-ওলাদের বড় বিপদে ফেলেছিলেন। ডিকেনস এক উদ্ভট অতিথি, যখন তিনি হোটেল ছেড়ে যেতেন তখন দেখা যেত যে তাঁর ঘরের আসবাবপত্র সব ওলট-পালট, ঢেলে সাজানো। একটা নতুন ঘরে ঢুকলেই ডিকেনস সোজা বিছানার কাছে চলে যেতেন, একটা পকেট কমপাস বের করে বিছানাটিকে এমনভাবে সাজাতেন যে তার মাথার দিকটা উত্তর মুখো থাকত। সেকালের একটা ধারণা ছিল যে চুম্বক তরঙ্গ উত্তর-দক্ষিণাবর্তে প্রবাহিত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তি যদি এইভাবে শুয়ে ঘুমাতে পারেন তাহলে তাঁর অশেষ উপকার হবে শরীরের দিক থেকে। দেহের ওপর দিয়ে সরল রেখায় সেই তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়া চাই।

ডিকেনস তাঁর কমপাসের কাঁটাটি ধরে প্রতি রাত্রে শয়নকালে এইভাবে দেখতেন, এটা তাঁর একটা বাতিক ছিল। "স্লিপ" গ্রন্থটির লেখকরা বলছেন ঘুমানোর আগে আমরা অনেকেই অনেকরকম প্রক্রিয়া করি, ডিকেনস যা করতেন তার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকলেও সেটি একটি প্রাত্যহিক আচারমাত্র। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে এইসব আচার এমনই স্বাভাবিক আকার নেয় যে তখন আর সেটাকে বাতিক বলে কেউ মানতে চায় না। দেখা যায়, যে শিশুদের বেলায় প্রতীকী ক্রিয়া যতই বাস্তব সংহ-ভূত হোক না কেন, তার মধ্যে কুহকের সর্বাস্তির আমেজ থাকে।

অনেক আদিম মানুষ এবং প্রায় সকল শিশুদের ঘুমের ব্যাপারে আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়, কম্বল বা তাবিজ ধারণ করে অনেকে, তার গুপ্ত অর্থ থাকে এবং সেই সব পদ্ধতিতে ঘুমের সুবিধা হয়। সাধারণতঃ বাপ-মা বিশেষ কিছু জানতে পারেন না কারণ এদিকে তাঁদের নজর থাকে না।

ঘুমের যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিশেষ করে শোবার ঘর, বিছানা প্রভৃতি জীবনের অনেক ব্যক্তিগত নাটকের রঙ্গমঞ্চ। বিছানায় শুয়ে মানুষ রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, বিছানা আবার আনন্দের ভূমি। বিছানায় যাওয়া মানে ভালোবাসা। ছোট ছেলে-মেয়েরা বিছানায় উঠে খেলা করে—অন্ধকারের মধ্যে ফিস্ ফিস করে অনেক প্রাণের কথা পরস্পর বলাবলি করে। বালিশ আমাদের অনেক চাপা কান্নার সাক্ষী, যারা প্রেম-জর্জরিত বা যাদের মনের অবস্থা অসহনীয়, বালিশ তাদের অনেক দুঃখের মুহূর্তের সঙ্গী। এই বিছানায় অনেক দম্পতির মুখোস খুলে যায়, দাম্পত্য জীবনের কলহ, তিক্ততা এবং মিলন সবই ঘটে এই বিছানায়। যাঁরা অনিদ্রার রোগে শোবার ঘর তাঁদের কাছে একটা ভয়ংকর বিভীষিকার কারাগার। আবার অনেকের কাছে সুখের স্বপ্ন-সঞ্চারী মোহঅঞ্জন মাখানো আশ্রয়।

ঘুম সংক্রান্ত মনোভংগীর সূচনা শৈশবে ঘটে, প্রতিটি বয়স্ক মানুষ তা আত্ম-সচেতন ভংগীতে লক্ষ্য করেন যখন নবজাতক বাড়িতে আসে। এত ক্ষুদ্র একটি প্রাণী কেমন সহজে বাপ-মার চোখের ঘুম কেড়ে নেয়—প্রথম প্রথম শিশু রাতে ঘুমায় না, মাঝে মাঝে ঘুমায় আবার জেগে ওঠে, কাঁদে, হাসে, খেলা করে। তরুণী জননীর একদা গভীর ঘুমের স্বভাব ছিল, এখন তিনি সামান্য শব্দ, একটু কান্না, সামান্য কাশির আওয়াজে চমকে উঠে পড়েন—কয়েকটি ক্লান্তিকর সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুর চোখে নিয়মিত ঘুম আসে। ঘুমের শিক্ষা সুরু হয়। শিশুকে যেন কোন সময় ঘুমাতে হয় তার শিক্ষা দেওয়া হয়।

সন্তান তিন বছরের হওয়ার আগে শিশুর প্রাত্যহিক জীবনে ঘুম একটা প্রধান সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। ঘুম নিয়ে পাগলামি করতে পারে শিশু। দামাল শিশুকে ঘুম পাড়াতে অনেক তরুণী জননী হিমসিম খেয়ে পড়েন। যে কোনো জায়গায় সেই শিশু ঘুমিয়ে পড়তে পারে, ছেলেরা যে ঘুমাতে ভয় পায় তা নয় তবে ঘুমে তার প্রচণ্ড অনীহা।

অনেক সময় এর পিছনে ভয়-ভয় ভাব থাকে, শিশুর কাছে স্বপ্নগত অবস্থা বাস্তবের ভিত্তিতে গড়া, সেটা কল্পলোক। ছোট শিশু তার ঘুমের ভেতর পাওয়া স্বপ্নের কথা বা যে আতংকে সহসা সে জেগে ওঠে, ফকিয়ে কাঁদে তার কারণ সে প্রকাশ করতে পারে না কি তার হয়েছে। একই গল্প কেন যে শিশু বার বার শুনতে চায় তার হেতু সে বলতে পারে না। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন শিশু যে শয়নঘরের দরজা বন্ধ করতে আপত্তি জানায় তার হেতু তার মনে একটা 'সেপারেশন অ্যাংজাইটি'—বা বিচ্ছেদের উদ্বেগ জাগে।

সারা পৃথিবীতে যেখানে দারিদ্র্য প্রবল, সেই অঞ্চলে শোবার জায়গার অভাব থাকায়, বাড়ির সবাইকে একটি ঘরেই শুতে হয়, বাপ-মার কাছে রাখা হয় শিশুদের। গুহাবাসীদের শয়নব্যবস্থা এই রকম ছিল। একালের সচ্ছল অবস্থার মানুষের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিন্তু একথা সত্য যে এই ধরণের শয়ন ব্যবস্থার মধ্যে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

একক শয়নকক্ষ পঞ্চদশ শতাব্দীর আবিষ্কার। যেসব শিশু একা শুতে চায় না, দরজা বন্ধ করায় যাদের আপত্তি তারা সেই জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বস্তির দাবী জানায় যা কয়েক শতাব্দী আগে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানকালে অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ পরিবারে এখনও যার প্রচলন আছে।

কেউ জানে না যে শিশুর প্রাক-নিদ্রা-কালীন মনোভংগী কিভাবে তার উত্তর-কালের জীবনকে প্রভাবিত করে। অনুমান করা গেছে এই অবস্থা মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে কিন্তু শিশু-মনোবিজ্ঞানী তাঁদের রোগীদের ঘুমের ইতিহাস জানার যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা ঠিক বিবেচনা করেন না—অথচ ঘুমের ইতিহাস ও ভংগী সংক্রান্ত তথ্য সন্ধান করে দেখা গেছে যে অনেক রহস্য সন্ধান পাওয়া গেছে। রাত্রি-কালীন আচরণ মানব-মনের এক অনাবিষ্কৃত জগৎ।

সারা পৃথিবীতে যে ধরণের নিদ্রা-রীতি প্রচলিত তার যেটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে তা সীমিত, যা জানা গেছে তা শুধু কথাভংগী থেকে গৃহীত। আদিম সংস্কৃতিতে ভয় ছিল সর্বপ্রধান—মৃত্যুর আতংক এবং নিদ্রাভীতি। লোকে ঘুমকে ভয় করত কারণ ঘুম বা আচ্ছন্নভাব (কোমা) মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। সেকালের কালের নিদ্রাকালীন প্রার্থনার মধ্যে বলা হত—

"In your hands I entrust my spirit—"

ঘুমে জাগরণে নেশা (২)

গোঁড়া ইহুদীদের এই ছিল শয়নকালীন প্রার্থনা। সকালবেলা ঘুম ভাঙার সময় মনে হত এ এক নতুন জীবনে উত্তরণ, তখন আবার দিনের আলোর জাগার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হত। নতুন দিনটির জন্য ধন্যবাদ।

হাজার হাজার শিশু বিছানার প্রান্তে হাঁটু মুড়ে আজো প্রার্থনা জনায়—

"Now I lay me down to sleep
I pray the Lord my soul to keep
If I should die before I wake,
I pray thee Lord my soul to take."

দিনের কাজটুকু যে যার সাধ্যমত সম্পন্ন করে রাতের দেহভার অর্পণ করে ঈশ্বরের হাতে। রাজা, মহারাজা, ধনী, রাষ্ট্রনেতা সকলেই আত্মাকে এই সময়টুকুর জন্য মহাবিস্মৃতির গহ্বরে ফেলে দেন।

ফ্রয়েড মনে করেন যে নিদ্রা সম্পর্কে উদ্বেগ এবং নিদ্রাকালীন আবশ্যিক আচরণ সর্বজনীন। যতই সামান্য হোক না কেন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সবাই এই আচরণ বা আচার পালন করে থাকেন। এই অনুভূতি ঠিক যে পরিচিত তা নয় তবে স্বভাবসিদ্ধ। এই আচরণে স্নান, দাঁতমাজা, মাথার চুল আঁচড়ান, মুখ ধোয়া প্রভৃতি অনেক কিছুই হতে পারে। অনেকে কুকুরকে বেড়িয়ে নিয়ে আসেন, কেউ দরজা, গেট, সিন্দুকপত্র তালা লাগিয়ে টেনে টেনে দেখেন, কেউ বাড়ির সমস্ত আলোর সুইচ নিজের হাতে নিভিয়ে দেন। পলিনেশিয়ার এক অংশের মানুষ সব সময়ে মাথাটা পুব দিকে রেখে ঘুমায়। পুবদিকে থাকে ফাঁকা জমি, এটা কবর দেওয়ার জন্য সংরক্ষিত। অনেক সময় স্বাস্থ্যতত্ত্বের সঙ্গে কুসংস্কার বিজড়িত। মুসলমানরা মক্কার দিকে মাথা রেখে ঘুমান, বাঁদিকে কাত হয়ে ঘুমান তাঁরা, কারণ সেই ভঙ্গীতে নাকি গর্ভসঞ্চার নিরোধ করা যায়। পরিচ্ছন্ন বিছানার চাদর, শয়নকালীন পোষাক প্রভৃতি একালের আধুনিক উপকরণ। প্রথমতম শয্যা ছিল মাটি, খড়, চামড়া। অশৌচ পালনে মাটি ও খড়ের শয্যা আজো ব্যবহার করা হয়। বাইবেলে রাণী ইসথারের বিলাসবহুল যে শয্যার উল্লেখ আছে আসলে তা ভূমিশয্যা, কয়েকটি বালিশ দ্বারা গঠিত, বিরাট শয়নব্যবস্থা। বিছানার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় চতুর্দশ লুই-এর কালে। সম্রাট তাঁর বিরাট বিছানাটিকেই সিংহাসন হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং সেইখানে বসে বিচার, বিবেচনা, দরবার ইত্যাদি করতেন। রাজসভার অধিবেশন পর্যন্ত বিছানায় বসে দেখতেন। এর ফলে সম্ভ্রান্ত মহলের সকলেই বিছানা বিছিয়ে আসর জমাতেন। যাবতীয় কাজকর্ম, সামাজিক আলাপচার হত বিছানায় বসে।

শতাব্দীকাল ধরে শয্যা এবং শয্যাদ্রব্য তার নিজস্ব আচার বিস্তার করেছে। বর্তমানের শিল্পসমৃদ্ধ সমাজে জীবন এবং প্রেমলীলা একসূত্রে জড়িত তাই বিছানাই একমাত্র প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্র, এবং তার উপযুক্ত কাল প্রাক্-নিদ্রার লগ্ন। স্বাভাবিক অবস্থায় এইসব আচার আচরণ, অস্বাভাবিক অবস্থায় যত্রতত্র শয়ন করা চলে। একজন চৌকিদার রাজার পিছনে পিছনে ঘুরে দেখেছিল গভীর রাতে তিনি এক রজকিনীর সঙ্গে প্রেমলীলা করেন। রজকিনীর সঙ্গে এই প্রেমলীলার কথা কেউ জানে কিনা জানার জন্য তিনি প্রতিদিন রাতের চৌকিদারকে প্রশ্ন করতেন কহো সিপাহী রাত কি বাৎ! শেষ পর্যন্ত সিপাহী বা চৌকিদার স্থির করল রাতের সংবাদ রাজার নিজের খবর, লোকটিকে একালের সাংবাদিকদের চেয়েও চতুর বলা যায়। সুতরাং সে রাতের বেলায় রাজাকে অনুসরণ করে দেখল রাজা শ্মশানে রজকিনীর কাছে গেলেন, মড়ার খাটিয়ায় বসলেন, তার বাসি ভাত পরমানন্দে আহার করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই খাটেই শয়ন করলেন। পরদিন যেই প্রশ্ন করলেন—কহো সিপাহী রাত কি বাৎ! সিপাহী জবাব দিল—

"প্রেম না জানে জাত কু জাত,
ভুখ না মানে বাসি ভাত
নিদ্ না মানে মুরদা খাট,
এহি হ্যায় রাজা রাত কি বাত"।।

রাজা হার মানলেন। সিপাহীর সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি নিখুঁত।

রাতের ঘুম কোনো কিছু বাধা মানে না। তাই নেপোলিয়ান, চার্চিল, গান্ধী, রুজভেল্ট সবাইকে ঘুমাতে হয়, দিনের আহার শেষ হলে আর রাতের কর্ম অন্তে গভীর অন্ধকারে।

গায়ের লুস এবং জুলিয়াস সেগালের 'স্লিপ' একটি আশ্চর্য গ্রন্থ, আমরা তার আংশিক পরিচয় দিতে পারলাম—স্বপ্নতত্ত্ব যেমনই বিস্ময়কর, নিদ্রাতত্ত্বও তেমনই চমকপ্রদ।

—অভয়ঙ্কর

Sleep: By GAY GAER LUCE & JULIUS SEGAL
Published by William Heinemaun Ltd., London — Price 30 Shillings.

সাহিত্য আকাদমী ও জাতীয় গ্রন্থাগারের যুগ্ম উদ্যোগে গত ৭ ডিসেম্বর সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীটি ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগারে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—"সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সাহিত্য আকাদমীই হচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র বাস্তব ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের শতকরা ২০ জন মাত্র এর থেকে উপকৃত হয়। দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। আমাদের সংবিধানকেও এই দিক থেকে সংশোধন করা দরকার।" উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং সাহিত্য আকাদমীর সহ-সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আকাদমীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—"পরস্পর অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে সংহতি বিধানই হল আকাদমীর অন্যতম উদ্দেশ্য।" সাহিত্য-আকাদমীর অন্যতম আঞ্চলিক সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ রায় জানান, এপর্যন্ত আকাদমী ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৫০০ শত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ৩৩৩টি সাহিত্য আকাদমী সরাসরিভাবে এবং বাকিগুলো বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিষ্ণু দে, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্য আকাদমীর এই উদ্যোগের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আর একটি কথা মনে পড়ল। আমরা ইংরেজি, আমেরিকান বা ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে যত জানি তত আমাদের দেশের প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে জানি না। এ অবস্থার সমাধান প্রয়োজন। সাহিত্য আকাদমীর উদ্যোগে এ-কাজ চলছে। কিন্তু এর বাইরেও যে প্রচেষ্টা চলছে, তার গুরুত্ব কম নয়। সম্প্রতি শ্রীজে. এম সোমাসুন্দরম প্রাচীন তামিল সাহিত্যের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আন্নামালাই নগর থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে একেবারে প্রারম্ভিক সময় থেকে আরম্ভ করে ৬০০ খৃঃ পর্যন্ত তামিল সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখক থিরু কুরালকে সঙ্গম গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। এছাড়াও তামিল-সাহিত্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধেও তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থটি তামিল সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশংসা অর্জন করবে।

একালের অসমীয়া তরুণ কবিদের মধ্যে সুশীল শর্মা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৩৫ সালের ১৩ নভেম্বর কামরূপ জেলার সোরাকুচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমীয়া সাহিত্যে এম-এ পাস করেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'রামধেনু' পত্রিকায়। 'নীলাচল', 'অসমবাণী', 'দৈনিক অসম' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'কেরানীর চিঠি'। হেম বড়ুয়া সম্পাদিত 'মডার্ণ আসামিস পোয়েট্রি' এবং মহেন্দ্র বরা সম্পাদিত 'নতুন কবিতা' সংকলনেও তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে। সুশীল শর্মা সাম্প্রতিক অসমীয়া কাব্যধারা সম্বন্ধে খুব সন্তুষ্ট নন। তাঁর ধারণা, সাম্প্রতিক অসমীয়া কবিদের অধিকাংশই সিরিয়াস নন। অবশ্য সিরিয়াসনেসের অভাব একালের অধিকাংশ ভারতীয় সাহিত্যকেই নির্ধারিত করছে। সমাজ-জীবনে আমরা অসম্ভব মাত্রায় চঞ্চল হয়ে পড়েছি। হালকা কথা এবং অগভীর অনুভূতিই আমাদের এখন আকর্ষণ করে।

তৎসত্ত্বেও যখন তরুণ সাহিত্য-সমাজ বা কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে সিরিয়াস ভাবে সাহিত্য ও শিল্পচর্চা করতে দেখা যায়, তখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করি। সম্প্রতি এরকম একটি সংবাদ এসেছে কুচবিহার থেকে। গত ১ ডিসেম্বর কুচবিহারে এন এন পার্কে একটি সাহিত্য সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ফণিভূষণ বিশ্বাস। এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল—"সাম্প্রতিক কবিতা, কথা-সাহিত্য, এবং উপন্যাসের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব।" এতে অংশগ্রহণ করেন নগেন্দ্রনাথ পাল, রণজিৎ দেব, শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল ঘোষাল ও গুরুসদয় দে। 'আধুনিক সাহিত্য' পত্রিকায় সম্পাদক রণজিৎ দেব সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ এই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। যাঁরা ছোট সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন, তাঁরাই জানেন কিভাবে এইসব পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এইদিক থেকে 'আধুনিক সাহিত্য' গোষ্ঠী সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন মনে হয়। যাই হোক—এই অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের ব্যবস্থাও ছিল। কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন কৃষ্ণগোপাল ঘোষাল, ফণিভূষণ বিশ্বাস, নগেন্দ্রনাথ পাল, শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, পীযূষ মিত্র, শ্যামলী ভট্টাচার্য ও রণজিৎ দেব।

গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের উদ্যোগে এই কারণে ১৯৫৭ সালে 'ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে আছে—

(ক) সৎ-সাহিত্যের প্রকাশ এবং স্বল্প মূল্যে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা।

(খ) গ্রন্থ প্রদর্শনী এবং গ্রন্থ-মেলার ব্যবস্থা করা।

(গ) অনুবাদ, গ্রন্থ রচনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা সভা, ওয়ার্কসপ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যকরী করবার জন্যও উদ্যোক্তারা এগিয়ে এসেছেন। এরই মধ্যে একাধিক পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এঁরা করেছেন। ১৯৬৭ সালে উর্দু, হিন্দি এবং পাঞ্জাবী অনুবাদক এবং লেখকদের একটি 'ওয়ার্ক-সপ' দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। বোম্বাইয়ে ১৯৬৭র আগস্টে মারাঠি ও গুজরাটি অনুবাদকদেরও অনুরূপ একটি 'ওয়ার্ক-সপ' অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির উপরেও এ-ধরনের অনুষ্ঠান হবে বলে জানা গেছে। এঁরা ৩০০ গ্রন্থ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আশা করা যায়, পুস্তক প্রকাশন ব্যাপারে এইভাবে একটি সর্ব-ভারতীয় ভিত্তি গড়ে উঠবে।

বড়দিনের আর দেরী নেই। য়ুরোপ-আমেরিকার প্রকাশকেরা এবারও অন্যান্য বছরের মতো বহু বই প্রকাশ করেছেন এ উপলক্ষে। সালভাডোর দালির একটি বই বেরিয়েছে ম্যাক্স জেরার্ড-এর সঙ্গে। বইটির নামও 'দালি'। বহু ছবি ছাপা হয়েছে বইটির ভেতর। যারা শিল্পী ও মানুষ দালিকে জানতে চান—তাদের পক্ষে বইটি একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকটি পাতা শিল্পী দালির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সমকালীন যুগজীবন সম্পর্কে তার অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। বইটি প্রকাশ করেছেন আব্রামস। দাম ঃ পঁয়ত্রিশ শিলিং।

রোজেলিন বাকু এবং মরিস সেরুলাজের "গ্রেট ড্রয়িংস অব দি ল্যুভ্রে মিউজিয়ম" নামে একটি বই বের করেছেন জর্জ ব্রেজিলার। তিন খণ্ডে সমাপ্ত। দাম ঃ ষাট শিলিং। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা কালি-কলমের বহু ছবি, জলরঙের চিত্র, খড়িমাটির স্কেচ, ছাপা হয়েছে। শিল্পী ও শিল্পে আগ্রহী প্রতিটি মানুষের পক্ষে বইটি মূল্যবান।

শেক্সপীয়রের নাটকের একটি 'ফার্স্ট ফলিও এডিশন' সম্পাদনা করেছেন চার্লটন হিলম্যান। ১৬২৩ সালের প্রামাণ্য সংস্করণ থেকে বইটি মুদ্রিত। বিচ্ছিন্ন ভাবে এই সংস্করণের মুদ্রিত কপি পাওয়া গেলেও এর আগে এত সুন্দর কোনো সংস্করণ এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়নি। সমালোচকেরা বইটির প্রামাণিকতা বিষয়ে নিঃসংশয়। দাম ঃ পঁচাত্তর শিলিং। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯২৮।

সিয়েরা ক্লাব প্রকাশ করেছেন 'গালাপাগোস ঃ দি ফ্লো অব ওয়াইল্ডনেস' নামে দুই খণ্ডে সমাপ্ত একটি বই। উনিশ এবং বিশ শতকের শিল্পভাবনার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। বইটির দাম ঃ পঞ্চাশ শিলিং।

রিচার্ড মেরীম্যান লিখেছেন 'এনড্রু ওয়েইথ' নামে একটি বই। মার্কিন দেশের জনপ্রিয় শিল্পীর বহু মূল্যবান ছবি স্থান পেয়েছে বইটিতে। শিল্পীর জীবন ও শিল্পনিপুণতা সম্পর্কে এত মূল্যবান আলোচনা আর বিশেষ বেরোয়নি। দাম ঃ পঁচাত্তর শিলিং।

পাশ্চাত্য শিল্পে বিশ শতকের ভয়াবহতা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় রবার্ট হিউজেস-এর 'হেভেন অ্যান্ড হেল ইন ওয়েস্টার্ণ আর্ট' গ্রন্থে। বিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় শিল্পীসত্তা যে কিভাবে উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে তার তাত্ত্বিক দিকটি সম্পর্কেও নতুনভাবে চিন্তিত করে পাঠক-পাঠিকাকে। নরকের ভয় এবং স্বর্গের সম্ভাবনা—এই উভয় দিকেরই চিত্র-নির্দশনে বইটি উল্লেখযোগ্য। প্রধানত ইতালীয়, ফরাসী, স্প্যানিস ও ওলন্দাজ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি নিয়েই তৈরী হয়েছে বইটি। দাম ঃ সাড়ে সত্তর শিলিং।

গান উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। কিন্তু যারা সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপকথা

ছায়া কালো কালো

মিরিয়াম এলেন দ্য ফোর্ড

[এই কাহিনীর রচয়িতা এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনীর লেখিকা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁর কয়েকটি গল্প য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। লেখিকা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কাহিনীটি রচনা করেছেন।]

উত্তর কালিফোর্নিয়ার মাদার লোড পল্লীর একটি ছোট্ট শহরে আমি প্রথম প্র্যাকটিস শুরু করি। এইখানেই আমার ডাক্তারিতে হাতেখড়ি। জায়গাটাকে ঠিক ভুতুড়ে শহর বলা যায় না, মানে পড়ো অঞ্চল নয়—একদা এই জায়গায় প্রচুর জনসমাগম ছিল, প্রকৃতপক্ষে যখন সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তখন অনেকে ভাগ্যান্বেষণে এইখানে এসে বাস করতে শুরু করেন, এখন সোনার উৎস নিঃশেষিত, মধুহীন এই শূন্যপুরী তাই খাঁ-খাঁ করছে। গোলড রাসের হিড়িক এখন শেষ। সোনারখনিগুলি অনেককাল আগেই শূন্য হয়ে গেছে, তবে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে সমুদ্রের জল চলে যাওয়ার কালে তার চিহ্ন রেখে যায় এখানে ওখানে ডোবার মধ্যে জল আটক থেকে থেকে যায়, তেমনই দুচারঘর স্বর্ণপিয়াসী মানুষ এখনও এখানে আছে। তারা সোনার সন্ধানে প্রতিটি ধূলিকণাকেও রেহাই দেয় নি। এখন কিছু কিছু এলাকা পরিষ্কার করে সেইখানে চাষবাস করে, হাঁসমুর্গী প্রতিপালন করে কোনোরকমে দিন কাটায়।

আপনারা হয়ত ভাবছেন এমন একটি ঈশ্বরবর্জিত অঞ্চলে আমার মত শহুরে যুবক কেন ছুটে এলো ডাক্তারির ব্যবসা শুরু করতে। এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। মেডিক্যাল স্টুডেন্টের সুদীর্ঘ আট বছরের কঠোর পরিশ্রম আর সংগ্রামই এর একমাত্র কারণ। সকল প্রশ্নের এই একটাই জবাব। যে মাসে ডিপ্লোমা পেলাম, সেই মাসেই রিপোর্ট পেলাম আমার ফুসফুসে টি-বি আক্রমণ করেছে। আমার শরীরের পক্ষে পাহাড়ী হাওয়া উপকারী, বছর পাঁচেক এইভাবে কাটিয়ে আবার শহরে যখন ফিরে এলাম, তখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

এই অঞ্চলের একমাত্র ডাক্তারটি কিছুকাল আগে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেছেন, সুতরাং শুধু তাঁর প্র্যাকটিস নয় তাঁর দোতলা বাড়িটাও আমি পেয়ে গেলাম। শহরের প্রান্তে চমৎকার বাসা, নীচে অফিস ঘর, ওয়েটিং রুম, আর আমার থাকার জায়গা ওপরতলায়—আগের ডাক্তারের যে রান্নাবান্না করত ঘরদোর পরিষ্কার করত, সেই এসে প্রতিদিন আমার রান্না করে দিত।

মোটামুটি কর্মব্যস্তজীবন, একেবারে বৈচিত্র্যহীন, অপ্রীতিকর জীবন নয়।

অবশ্য চিত্তবিনোদনের তেমন সুযোগ ছিল না, তবে আমার অবসরও অনেক কম ছিল। কিছু ভালো লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দাবা খেলতাম—আর যদি তেমন কোনো জরুরী 'কল্' না থাকত আমার দৈনন্দিন অফিসের কর্মের পর ঘুমোবার সময় পর্যন্ত বই পড়ে কাটাতাম।

এই কাজই করছিলাম সেই রাতে, মে মাসের সেই পরিচ্ছন্ন রাতে বসে বসে একটা বই পড়ছিলাম, এই মাসেই আমার এখানে আগমনের ন'মাস পরে দোরগোড়ায় নামের ফলক লাগিয়েছি। আমি একটি মেডিক্যাল জার্নাল অতিশয় মনোযোগ সহকারে পড়ছিলাম, একটা নতুন ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন, তাই প্রথমবার দরজায় আঘাত পড়তে আমি মোটেই শুনতে পাইনি। আবার সেই প্রচন্ড আঘাত, এইবার আমি সচেতন ছিলাম, তাড়াতাড়ি ম্যাগাজিনটি নামিয়ে রেখে উঠে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

চমৎকার জ্যোৎস্নায় চারপাশ ভরে গেছে, আর আকাশের পূর্ণ চাঁদ সেই রাতটিতে এমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল যা আমি আগে আর কখনও দেখিনি। আমার ছোট্ট বাগানের প্রতিটি ঝোপ-ঝাড়ে আলোছায়ার তীক্ষ্ন খেলা চলেছে। আমার দোরগোড়ায় একটি গোলাপকুঞ্জে ঘেরা চত্বর—তার ছায়া পড়ে আশ-পাশ গভীর আঁধারে ভরা।

প্রথমটায় তেমন কিছুই দেখতে পাইনি। তারপর এদিকওদিক তাকিয়ে দেখি একটি এগারো কি বারো বছরের ছোট্ট মেয়ে—তার সারা অঙ্গে একটি কালো রঙের শালজাতীয় কিছু জড়ানো, তার ভিতর থেকে পদ্মফুলের মত একটি সুন্দর মুখ গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি তাকে চিনতে পারিনি। তবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুমান করি ওর চোখে কি বার্তা লুকানো আছে। এই পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষগুলি নেহাৎ ইমারজেন্সী কেস না হলে আমাকে ডাকে না, তখন সেই জরুরী ডাকে দৌড়াতে হয়, দিনের রাতের যে কোনো সময়; বেশ শক্ত সমর্থ ওদের দেহ, এমনই দৃঢ় ওদের গড়ন যে কোনো অসুখ হলেও ওরা যেমন করে হোক প্রায় হামাগুড়ি দিয়েও শহরে চলে আসবে। এইসব রোগীদের বাসা এমনই নিরালা এবং দুর্গম অঞ্চলে যে সেইসব জায়গায় পায়ে হেঁটে ভিন্ন যাওয়া যায় না। ঘোড়া বা বাইসিকল সেইসব উঁচুনীচু পাহাড়ে জায়গায় অচল। অতি দুর্গম পথঘাট।

মেয়েটি আমার মুখের দিকে করুণ কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে এক আশ্চর্য দৃষ্টি, কেমন একটা উদাস-বিষন্ন ভঙ্গী সেই চোখে। সে ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করে—ডাক্তারসাহেব কোথায়?

স্পষ্টই বোঝা যায় যে বছর খানেকের মধ্যে ওদের পরিবারস্থ কেউ শহরে আসেনি, আমার আগের ডাক্তার এক বছর আগে দেহ রেখেছেন। আমি ধীর গলায় বললাম—ডাক্তার ওয়ারেনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁর জায়গায় আমি এসেছি, আমিই এখানকার ডাক্তার।

মেয়েটি এইবার চেঁচিয়ে বাঁশীর মত কণ্ঠে বলে—আমার মার বড় অসুখ, আপনি একটু দয়া করে এখনই আসবেন?

—তোমার নাম কি? আমি প্রশ্ন করি।

মেয়েটি ধীর গলায় বলে—ক্যাথারিন ইভান্স, আমাদের বাড়িটা সাঁকোর ধারে।

এই কথা আমার কাছে অর্থহীন, কারণ এই অঞ্চল আমার পরিচিত নয়, অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল নদীর ওপর কোনো একটা জায়গায় সাঁকো আছে।

মেয়েটি অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে—আমরা আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছাব, আমি ত' তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে এসে গেছি।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কোনো আশা নেই নিষ্কৃতির। এখন রাত দশটা বেজেছে, এখন রোগী দেখতে যাওয়ার অর্থ সারা রাতের মত বাইরে থাকতে হবে, কি অসুখ তাই বা কে জানে।

প্রশ্ন করি—তোমার মার কি হয়েছে বল দেখি?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ও'র বড় কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। কাঁদছেন জোরগলায়—মাকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। সারাদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছেন—মুখচোখ লাল হয়ে আছে।

আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হল যে, যদি সারাদিন ধরেই এই অবস্থা চলছে তাহলে এতক্ষণ অপেক্ষা করে এত রাতেই বা আমাকে ডাকতে আসা কেন? তবে এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল, এসব দেশের মানুষ একেবারে চরম অবস্থায় না পৌঁছালে ডাক্তারকে ডাকে না। মেয়েটি যেন আমার মনের কথা বুঝল, সে বলে উঠল—

—এখন কিন্তু আপনাকে দেওয়ার মত টাকা আমাদের নেই তবে পরে—'

আমি ও কথা চাপা দিয়ে বললাম—তার জন্য কিছু এসে যায় না, তুমি এখানেই দাঁড়াও একটু, আমি আসছি—

কি কি জিনিষ যে সঙ্গে নিতে হবে তা বুঝিনি, অন্ততঃ আমার মাথায় এলো না। এই ছোট্ট মেয়েটি কোনোরকম রোগ বিবরণ দিতে পারেনি, কোনোরকম অ্যাকসিডেন্ট কেস নয়, সুতরাং ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেওয়ার ব্যাপার নেই। জ্বর এবং বেদনার অর্থ অনেকরকম হওয়া সম্ভব। যে কোনো-রকম জরুরী অবস্থায় যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সম্ভব তা প্যাক করে নিলাম তারপর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ি।

ক্যাথারিন ইভানস ততক্ষণে একেবারে গেটের সামনে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই জ্যোৎস্নাবিধৌত পরিবেশেও মেয়েটির ছোট্ট শরীরটা কেমন রূপালি ও স্বচ্ছ মনে হচ্ছিল।

বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েটি আমার পাশে পাশে চলছিল, শেষ রাস্তার কাঠবিছানো অংশটুকু পার হয়ে আমরা যখন চড়াই-এ উঠছি তখন মেয়েটি আমার আগে আগে চলতে থাকে, এইখানে পথ ক্রমশঃই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, সেইদিকে নির্দেশ করে নিয়ে চলেছে।

এইরকম একটি রাত আমি আগেও দেখিনি, পরেও নয়। বন্য লাইলাক ফুলের কুঞ্জগুলি যেন রূপালী কুয়াশায় ঢাকা। বড় বড় ওক গাছগুলি যেন রূপালী পাতে খোদাই করা। মেয়েটি সুনিশ্চিত পদক্ষেপে চলেছে পরিচিত পথ বেয়ে। তার পদক্ষেপ দৃঢ়। সেই বন্ধুর পথে এত সহজে চলা সমতটের মানুষের পক্ষে সহজ নয়। মাঝে মাঝে ঝুলন্ত গাছপালার ডালপালা বা জঙ্গল সে পরিষ্কার করছে আমার চলার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে। আম ওর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু মেয়েটি কম কথা বলে, আমার কথার উত্তরে সে সামান্যই জবাব দেয়। মেয়েটি কেমন যেন, বোধহয় একটু বোকা ধরনের, আর এই ধরনের চড়াই-এর পথ ভেঙে চলাটাও আমার পক্ষে

ভয়ঙ্কর। ওর কয়েক পা পিছনে পেছনে আমি হাঁটতে থাকি।

আমি প্রশ্ন করি—আচ্ছা! তোমার বাবা কি বাড়ি কাছে আছেন?

—আমার বাবা নেই। তিনি মারা গেছেন।
—তোমার ভাই-বোনেরা আছে ত'?
—না, আমি একমাত্র সন্তান।

বুঝলাম রোগিণী একাই রয়েছে, নদীর ধারে কোনো নিরালা কুটিরে পড়ে গোঙাচ্ছে। আমরা গিয়ে পেঁছাতে পেঁছাতে মারাও যেতে পারে—আমি একটু জোর কদমে হাঁটতে থাকি।

আবার প্রশ্ন করি—আচ্ছা, ডাঃ ওয়াকেন কি তোমার মাকে আগে কখনও দেখেছেন?

—হ্যাঁ, সেই আমি যখন হয়েছিলাম তখন!

—আচ্ছা! তোমার মা যে অসুস্থ হয়েছেন এ ছাড়া আর কোনো কিছু কি তোমাকে বলেছেন?

কোনো উত্তর নেই। নদীর কলতান ভেসে আসছে। আমরা নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি বুঝতে পারি।

ক্যাথারিন অবশেষে বলে—এই যে, এইবার সাঁকোর কাছে এসে গেছি।

সামেই সাঁকো। নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না। সাঁকো বলে বটে, আসলে কয়েক খণ্ড কাঠ ফেলা আছে। সেগুলি শক্ত করে বাঁধা—নীচে বেগবতী নদী বয়ে চলেছে। বেশ গভীর এবং অতি দ্রুত তার গতি।

মেয়েটি বেশ সহজেই তার ওপর উঠে পড়ল—কিন্তু লক্ষ্য করলাম এই নড়বড়ে সাঁকোতে উঠতে তারও ভয় করছে। অন্ততঃ তার চোখে যেন একটা শংকিত দৃষ্টি। কোনোকালে ধারে একটা মোটা দড়ি লাগান ছিল, সেটি ধরে [illegible] হয়, [illegible] জীর্ণ প্রান্তদেশ সাঁকোর দুই পাড়ে [illegible]। মধ্যে অনেকখানি ফাঁক। একটু [illegible] বরাবরই আমার [illegible] করে, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েটির হাত ধরার চেষ্টা করি, [illegible]। কিন্তু মেয়েটি আমার [illegible] [illegible] আমার সামনেই [illegible]। [illegible] আমি ওর পিছনে পিছনে [illegible]। [illegible] আমি [illegible] সেই [illegible] সাঁকো পার হবার চেষ্টা করি।

সাঁকোর [illegible] ক্যাথারিনদের কেবিন বা কুটির দেখা যায়, একটা জানালা থেকে ক্ষীণ [illegible] আসছে। কেবিনের [illegible] [illegible] জন্য, অন্ততঃ সেইটুকু [illegible] নেই। বোধহয় বা আর মেয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible]।

কেবিনের পাশে একটা প্রকান্ড ঘর। বোধহয় গোলাঘর কিংবা খামার।

মেয়েটি দোরগোড়ায় পেঁছে বলে ওঠে—এই ত' দরজা—আপনি একেবারে ভেতরে চলে যান।

মেয়েটি বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আমাকে এই নির্দেশ দিয়ে কোথায় সরে পড়ল, বোধহয় গোলাঘরের আড়ালে অদৃশ্য হল। আচ্ছা মজার মেয়ে ত'!

তবে সহসা মনে হল, আহা ছোট্ট মেয়ে। কতই বা বয়স! ও বোধহয় ভীষণ ভয় পেয়েছে। ওর মার অবস্থা যে কেমন তা ভেবে শংকিত হয়ে আছে, তাই আগে আমি দেখে কি বলি তা শোনার অপেক্ষায় আছে। আহা, বেচারীর ভয় হওয়াটাই ত' স্বাভাবিক। মা আর মেয়ে, সংসারে ত' আর কেউ নেই।

আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম।

একটি সেলফে একটা কেরোসিনের কুপী জ্বলছিল, সেই মৃদু আলোকে সমস্ত ঘরখানি দেখা গেল—এই কেবিনে এই একটি মাত্র ঘর, আর কোনো ঘর নেই। একচালা, বেশী আসবাব নেই, একপাশে রান্না করার সরঞ্জাম।

দেয়ালের একপ্রান্তে একটি চারপায়ে শুয়ে আছেন, রোগিণী—যন্ত্রণায় ভীষণ কাৎরাচ্ছেন, আমি ব্যাগটি রেখে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি চোখ মেলে দেখলেন—সেই চোখ অর্ধ-সচেতন এবং যন্ত্রণায় কাতর।

মহিলাটির যে প্রচন্ড জ্বর তা বোঝার জন্য কোনোরকম থার্মোমিটার প্রয়োজন ছিল না। অনুমানে সেটা বোঝা যায়। তিনি দুটি হাত দিয়ে পেটটা চেপে আছেন। আমি বুঝলাম ব্যাপারটি কি। তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করলাম, 'এবডোমেন'টা অতিশয় কঠিন আর যন্ত্রণার তীব্রতায় রোগের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার চোখে। মেয়েটি যে আমার কাছে শেষপর্যন্ত গিয়েছিল ভালোই করেছে বলতে হবে। আর দু-চার ঘন্টা সময় পেলে এই এপেনডিক্স ফেটে যেত আর ফলে পেরিটোনাইটিস এবং নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে যেত।

এমনিতেই অবস্থা বেশ খারাপ। এপেনডিকটমী করতে হবে—কিন্তু এই পরিবেশে একটা মেজর অপারেশন করি কি করে? [illegible] তেমন উপযুক্ত [illegible], কোনোরকম [illegible] পাওয়ার উপায় নেই, মেয়েটিকেই অ্যাসিসট্যান্ট হিসাবে ডেকে আমি, এছাড়া আর কি করা যায়?

ক্যাথারিনকে খুঁজি, কিন্তু সে কোথাও নেই। এখনও সেই [illegible] লুকিয়ে [illegible], আশ্চর্য মেয়ে বটে, [illegible] নিয়ে এই জঙ্গলে থাকে কি করে? আমার এমন [illegible] নেই যে ওকে খুঁজি আমি, এখানে সব [illegible] নেই।

আমি একাই কোমল গলায় রোগিণীকে সাহস [illegible] বলি—মিসেস ইভান্স কোনো ভয় নেই, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভদ্রমহিলার চোখ আমার কার্যকলাপ অনুসরণ করে। তবে আমার কথাগুলি যে বিন্দুবিসর্গ তিনি বুঝলেন এ আমার মনে হয় না।

দেওয়ালের গায়ে সেলফ থেকে একটা কেরোসিন স্টোভ জ্বালিয়ে সেই জলে আমার যন্ত্রপাতি ফোটানোর জন্য ছেড়ে দিলাম।

এরপর প্রয়োজন একটা অপারেশন টেবলের। এই কেবিনে একটা আদ্যি টেবল পড়েছিল, মাটিতে কিছু পুরাতন খবরের কাগজ জড়ো করা আছে, আমি সেই খবরের কাগজ তুলে নিয়ে টেবলটাতে বিছিয়ে নরম করলাম। দেয়ালের পাশে রাখা সিন্দুকটার ভেতর থেকে একটি লেপ পাওয়া গেল, আর দুখানি কাচা চাদর। খবরের কাগজের ওপর সেই লেপ আর পরিচ্ছন্ন চাদর বিছালাম। বিধাতার করুণায় জায়গাটি পরিচ্ছন্ন এই য, ঘরে আসবাবপত্রের বালাই নেই, তেমন ধুলোও নেই।

যেখানটিতে আলো রাখা ছিল সেই কুলুঙ্গিটার কাছে টেবলটা টেনে নিয়ে গেলাম, অন্ততঃ জায়গাটায় একটু আলো হল, আমার সঙ্গে শুধু কিছু ক্লোরোফর্ম ছিল, সেইটুকু এনাস্থেটিক দিয়ে কাজ সারতে হবে। আমি নিজেই আমার এনাস্থেটিস্ট, সার্জেন এবং নার্স।

ক্যাথারিন এখনও অদৃশ্য হয়ে আছে। জানালার কাছে গিয়ে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করলাম, শুধুমাত্র ওর পোষাকের একটা অংশ দেখা গেল। খুবই খারাপ, আমি বিরক্ত হলাম মেয়েটির ব্যবহারে। ওর মার এই অবস্থা, এই সময় ওকে যে প্রয়োজন হতে পারে এটুকু বোঝার বয়স ওর হয়েছে, তবে!

এমন সময় মনে হল, হাজার হোক, ছোট্ট মেয়ে, এতখানি পথ গেছে এবং আমার সঙ্গে এসেছে, এই রাত্রে ওর পক্ষে এভাবে যাওয়া আসাটাই কম কঠিন কর্ম নয়, ওর কাছে আর কি প্রত্যাশা করা যায়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাক, ওর আশা রাখা বৃথা।

সেই ভয়ংকর রাত্রির পর অনেক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন আমি বুঝি যে প্রয়োজনের মুখে গুরুতর বিপদ যখন আসে তখন একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আমাদের সহায়তা করে, সেই [illegible] শক্তির অধিকারী হয়ে আমরা [illegible] অলৌকিক কাজও সহজে করে ফেলি। যা [illegible] তাও সম্ভব হয়, পঙ্গু যে [illegible] গিরিলঙ্ঘন করতে পারে।

এই আমার [illegible] অভিজ্ঞতা। একলা অসুরের বিক্রমে সেই মহিলাটিকে তুলে টেবলে শোয়ালাম, এই আমার হাতে-গড়া অপারেশন টেবল। আলোটাও ঠিকমত তৈরী করে নিয়েছিলাম—যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে মহিলাটিকে অচেতন করে তাঁর

এবডোমেনের খানিকটা খুলে দেখলাম, এপেনডিকসে পচন ধরে গেছে, সেটি বার করলাম। সবই সেই জ্বাল কেরোসিনের আলোয় করা হল। এই আলোর তেজ বাইরের চাঁদের আলোর বেশী নয়—আর অপারেশনের যন্ত্রপাতির কথা নাই উল্লেখ করলাম। আমার অস্ত্রশস্ত্র অতি অকিঞ্চিৎকর।

চাঁদ ডুবে যেতে যেতে এবং কেরোসিনের আলো নিভের যাওয়ার আগেই আমি ক্ষত-স্থানটা সেলাই করে আমার রোগিণীকে আবার তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

মেয়েটি এখনও অনুপস্থিত। যাক, একরকম ভালোই হয়েছে, এই দৃশ্য অন্তত ছোট মেয়ের স্মরণ রাখার মত নয়। মিসেস ইভানসকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি যখন লক্ষ্য করছি এনাস্থেটিকের ঘোর কতক্ষণে কাটে তখন দেখি জানলা দিয়ে মেয়েটি তাকিয়ে আছে, আমি যেই জানলার কাছে গেলাম মেয়েটি দৌড়ে পালাল। আচ্ছা মেয়ে ত'!

আমার মনে হল এই পরিবেশে বসবাস করতে হলে শরীরটা বেশ দৃঢ় এবং সুস্থ রাখা প্রয়োজন। মহিলাটির স্বাস্থ্য বেশ উজ্জ্বল। অন্তত অত্যন্ত উঁচু দরের হাস-পাতালে ভালো ডাক্তারদের হাতে যে সব অপারেশন হতে দেখেছি সেইখানকার রোগিণীদের চেয়ে আমার রোগিণীর অবস্থা অনেক ভালো।

কেবিনে আসার পর থেকে আর এই কাল পর্যন্ত যে সময় আমার কেটেছে ঘড়িতে তা লক্ষ্য করে আমি অবাক হলাম, ভাবলাম ঘড়ি বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। কানের কাছে নিয়ে দেখি ঠিক চলছে। মাত্র দেড়ঘণ্টার ভেতর সব হয়ে গেল। আশ্চর্য!

মিসেস ইভানস্ তাঁর রক্তহীন ঠোঁট নেড়ে মৃদু গলায় জানতে চাইলেন—আপনার কাজ সব হয়ে গেছে কি?

আমি বললাম—এখন আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দেব, তারপর এক বা দুই সপ্তাহ বিশ্রাম নিলে আপনার শরীর আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আপনি আগের মত ঘোরাফেরা করতে পারবেন।

আমি তাঁকে একটা ঘুমের ওষুধ দিলাম, তারপর যখন আমার ইনজেকসনে কাজ হল তখন যে লেপটা দিয়ে অপারেশন টেবল বানিয়েছিলাম, সেটি গায়ে জড়িয়ে রোগিণীর কাছে মাটিতে শুয়ে রইলাম। সকাল হলে মেয়েটি আসবে—নিশ্চয়ই উদ্বেগ এবং ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমিও শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম। পরিশ্রম ত' কম হয়নি।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন পরিষ্কার দিন। রোদ ফুটে উঠেছে। সর্বাগ্রে মনে হল মিসেস ইভানসের কথা। এই কেবিনে তখনও পর্যন্ত মাত্র আমরা দুজন।

মহিলাটির শরীরে সামর্থ্য অসীম। ও'র মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে এসেছে, নাড়ি এবং টেম্পারেচার স্বাভাবিক। স্পষ্ট বোঝা গেল যে বেদনা এবং জ্বরজনিত সেই বিকারের ঘোর এখন অতিক্রান্ত। ও'র চোখ বেশ পরিষ্কার—তাঁর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ হলেও উনি যে কথাগুলি বললেন তা বেশ স্পষ্ট। মিসেস ইভানস বললেন—আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কি যে হয়েছিল মনে পড়ছে না, —কিন্তু আপনাকে ত' ঠিক চিনতে পারছি না।

এখন ও'র জন্য যা কিছু করণীয়, সেইগুলি ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ও'র জন্য সেলফে কোনোরকম তরল খাদ্য পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধান করি। তার ভেতরেই এক ফাঁকে নাম বললাম—, আর একথাও বললাম ডাক্তার ওয়ারেনের জায়গায় আমি এসেছি।

মহিলাটি আমাকে বললেন—ঐ পাত্রে কফি আছে, আর কিছু ময়দা এবং বেকন আছে। আপনি ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিতে পারেন। আপনাকে এইভাবে নিজের খাবার করে নিতে হবে কি লজ্জার কথা। কিন্তু আমি উঠতেই পারছি না।

উনি কনুই-এ ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ও'কে বিরত করি।

দৃঢ় গলায় বলি—ওকি। উঠবেন না মোটে। জানেন, কাল রাত্রে আমি একটা মেজর অপারেশন করেছি। আপনি কিছু জানেন কি? আপনার এপেনডিকস্ প্রায় ফেটে যেতে বসেছিল। যেভাবে আছেন ঠিক এইভাবেই আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে, আমি না বললে উঠতে পারবেন না। আর এখন কদিন কোনোরকম শক্ত জিনিস খেতে পারবেন না, আপনাকে লিকুইড ডায়েটে থাকতে হবে, তরল খাদ্য ভিন্ন আর কিছু খাওয়া চলবে না। আমি আপনার জন্য কিছু স্যুপ ও অন্য খাবার নিয়ে এসে দেব। আপনার কফি খাওয়া চলবে না, তবে যতক্ষণ না কিছু পাওয়া যায়, এ ছাড়া আর কিছুই যখন নেই, তখন একটু কফি খেতে পারেন। আমি কিছু এনে দেব একটু পরে।

মহিলাটি নম্র গলায় বললেন—কয়েকটা মুরগীর ডিম আছে, খুঁজে দেখুন। একটু পোচ করে দিন, এই খাদ্যটুকু তরল হবে ত'! আমার খিদে পেয়েছে বেশ।

একটু থেমে মহিলাটি বললেন—হা ভগবান! ডাক্তার সাহেব আপনি না বললেও আমার কিছু [illegible] চলার উপায় নেই। আমার ত' আর কেউ নেই।

আমি বললাম—কিন্তু আপনার—

কথাটি আর শেষ করতে পারিনি। ও'র মুখ চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত [illegible] দৃষ্টি দেখে আমি [illegible] থেমে যাই।

উনি বললেন—ডাক্তার, আপনি কি করে আমার অসুখের খবর [illegible]? কি করে আপনি [illegible] এখানে আসতে পারলেন?

তাহলে [illegible] তা [illegible], ভাগ্যক্রমে [illegible]। আমি [illegible], একটু একটু [illegible] হন তাহলে [illegible] ক্যাথরিন [illegible] নিয়ে [illegible]।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র-মহিলার মুখ মোমবাতির মত শাদা হয়ে গেল। এর পর উনি যে কথা বললেন তা প্রায় শোনাই যায় না—

মিসেস ইভানস বললেন—ডাক্তার, আপনি কি জানেন না আমি কে? আমি মিসেস ইভানস্—কিন্তু আপনি আমাদের কথা জানেন না কিছুই। জানেন না গত বছর ডিসেম্বর মাসে কি হয়েছিল? সব খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল এই সংবাদ। শহরের সবাই জানে।

এখন আমার মুখ শাদা হওয়ার পালা। সব কথা মনে পড়ল। মনে পড়েছে সেই বীভৎস ঘটনার কথা।

ক্রিসমাসের ঠিক আগের দিন টমাস ইভানস নামে জনৈক শান্ত ভদ্রমানুষ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। অনেকদিনের পরিশ্রম এবং অজস্র ক্ষতির পর সাফল্য যখন তার জীবনে এলো না তখন সে উত্তেজনার বেগে মানসিক স্থৈর্য হারাল, সে একেবারে উন্মাদ হয়ে গেল।

যে পাত্রে সোনা পাবে আশা করে এতদিন ধুলো জড়ো করে দিয়েছে সেই পাত্র ভেঙে চুরমার করল। তারপর কেবিনে ফিরে এসে একটা ধারালো ছুরি নিয়ে স্ত্রীর দিকে তেড়ে গেল।

ইভানসের স্ত্রী আকুল হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত চীৎকার করে কাছাকাছি অরণ্যে লুকিয়ে পড়ল। ইভানস ছুটল তার পিছু পিছু কিছুদূর—কিন্তু কি ভেবে বাড়ি ফিরে এল।

বারো বছরের মেয়ে ক্যাথরিন বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। এইসব গোলমালে সে ভয় পেয়ে উঠে পড়েছে। তীব্র আতংকে তার শরীর কাঁপছে। চীৎকার করে কাঁদছে ক্যাথরিন।

টমাস ইভানস সেই ক্রন্দনাতুর মেয়েটিকে চেপে ধরল তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে সাঁকোর ওপর উঠে হাতলের দড়ি ছিঁড়ে নদীর শীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শীতকাল, নদীর বেগ তখন প্রচণ্ড। ওদের দেহ আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

আমার মনে পড়ল একেবারে সেই বারো বছরের মেয়েটির নাম ক্যাথরিন।

কাল রাত্রে আমাকে যে ডাকতে এসেছিল, সে সেই [illegible] ক্যাথরিন। সেই আমাকে পথ চিনিয়ে এনেছে, তার ঘোর-ঘোড়ায় পৌঁছে দিয়ে [illegible] হয়েছে।

কিন্তু তার [illegible] সে [illegible] কাজকর্ম [illegible] একটু সুস্থ [illegible] দাঁড়িয়েছে—

এই সেই [illegible] ইভানস, গত [illegible] ঘটে গেছে। [illegible] আমি অচৈতন্য হয়ে [illegible]।

[illegible] অনূদিত।

দেশে বিদেশে

হরিয়ানায় সংকট

বয়সের দিক থেকে ভারতের কনিষ্ঠ রাজ্য হরিয়ানা, আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষুদ্রতম।

প্রথমে তালিকায় হরিয়ানার আরও কয়েকটি অবদান : চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই রাজ্যেই দলভাঙাভাঙির ব্যাপারটা একটা কেলেংকারির পর্যায়ে ওঠে এবং "আয়ারাম-গয়ারাম" খেলার সূত্রপাত এখান থেকেই। তাছাড়া, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই রাজ্যেই প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়।

এই রেকর্ডের সঙ্গে আর একটি যোগ হল : মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর গঠিত সরকার এই হরিয়ানাতেই সর্বপ্রথম একটি সঙ্কটের সম্মুখীন হল।

দৃশ্যত এই সঙ্কট হরিয়ানার, তবে, পরোক্ষভাবে ভারতের রাজনীতির এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভিতর দিয়ে স্থায়ী সরকার গঠন করা যেতে পারে এবং যুক্তফ্রন্টের পাঁচমিশালি জোটের চেয়ে কংগ্রেসই অধিকতর স্থায়ী সরকার তৈরী করতে সক্ষম, এই দুটি অনুমানই হরিয়ানায় বড় রকমের ধাক্কা খেল। ঐ দুই শ্লোগানের ভিত্তিতে কংগ্রেস হরিয়ানায় মধ্যবর্তী নির্বাচনে যে লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছিল, তা তাকে সাহস ও আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল। বিশেষ করে, এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস দলভাঙাভাঙির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় নীতিতে দাঁড়িয়ে জিতেছিল বলে কংগ্রেস চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের বিপর্যয়ের পর এই হরিয়ানা থেকেই তার আত্মবিশ্বাস অনেকখানি ফিরে পেয়েছিল।

কিন্তু কংগ্রেস তখন টের পায়নি যে, দলের মুষল দলের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে। এই মুষলের নাম শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা। এককালে অবিভক্ত পাঞ্জাবে সর্দার প্রতাপসিং কায়রোঁর গোঁড়া সমর্থক শর্মাজী নাকি তাঁর মুরুব্বীকে বলেছিলেন, "আমাকে একটা পদ দিন, সেই পদে আমি আঠার মত লেগে থাকব।" তাঁর সম্পর্কে রাও বীরেন্দ্র সিং বলেছিলেন, "উনি হচ্ছেন হরিয়ানার চাণক্য।" শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলেছিলেন, হরিয়ানার রাজনীতিতে কংগ্রেস শর্মার বিরুদ্ধে প্রচার করলে নিজের ক্ষতি করবে। কারণ, শর্মা চতুরও বটে, সরলও বটে।

হরিয়ানার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শর্মা মুখ্যমন্ত্রিত্ব রাখতে পারেননি; কিন্তু তাঁকে যে উপেক্ষা করা চলবে না সেটা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল তাঁকে উপেক্ষা করারই চেষ্টা করছিলেন আর তার পিছনে কংগ্রেস সভাপতিরও প্রশ্রয় ছিল। শর্মার বক্তব্য হচ্ছে : বংশীলাল তাঁরই লোক ছিলেন, তাঁরই সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন; অথচ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বংশীলাল স্বতন্ত্র পথে চলতে শুরু করেন। কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েও বংশীলাল মুখ্যমন্ত্রিত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন; কেননা, কংগ্রেস হাইকম্যান্ড বিধানসভার কংগ্রেস দলের সভা ডেকে বংশীলালের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সুযোগ দিতে চাইছেন না। তাছাড়া, শর্মা হরিয়ানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হতে চান; কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সাংবিধানিক

নির্বাচনের তারিখ স্থির করতেও টালবাহানা করেছেন।

[illegible] হরিয়ানার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুলেছেন। [illegible] প্রাক্তন [illegible] বংশীলাল মন্ত্রিসভা থেকে শর্মার সমর্থক [illegible] মন্ত্রীকে কোশলে পদত্যাগ করতে হয়েছে, তাঁদের মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে আনতে হবে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী [illegible] আহমেদকে মন্ত্রিসভা থেকে হটিয়ে দিতে হবে (তিনিই নাকি কৌশল করে শর্মার সমর্থক তিনজন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন), বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দলের ভিতর অনাস্থা প্রস্তাব আনার তারিখ ঠিক করতে হবে, শর্মা যাতে হরিয়ানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শর্মা বললেন, সোমবারের (৯ ডিসেম্বর) মধ্যে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড যদি তাঁর এই দাবীগুলি মেনে না নেন তাহলে তিনি তাঁর অনুগামী-দের নিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবেন। এই চরমপত্রের প্রকাশ্য হুমকির সামনে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড একমাত্র সম্ভব-পর যে-সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, তাই নিলেন ঃ তাঁরা শর্মাকে দল থেকে সাসপেন্ড করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীগড় থেকে খবর পেল, হরিয়ানা বিধানসভার ১৫ জন কংগ্রেসী এম-এল-এ বংশীলাল মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, প্রাক্তন রাও বীরেন্দ্র সিংহের বিশাল হরিয়ানা দল, জনসংঘ, ক্রান্তি দল, স্বতন্ত্র পার্টি ও নির্দলীয় সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দল-ত্যাগী কংগ্রেসীরা একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেছেন এবং ৪১ জন সদস্য রাজ্যপাল শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে বলে এসেছেন, বিরোধী পক্ষই এখন সংখ্যা-গরিষ্ঠ। [হরিয়ানা বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা ৮০ এবং দলত্যাগের আগে সেখানে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা ছিল ৪৮]।

বংশীলাল মন্ত্রিসভার উপর এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাল্টা চাল শুরু হয়েছে। শর্মা গোষ্ঠীর দলত্যাগের দুদিন পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলতে আরম্ভ করেছেন, হরিয়ানায় কোন সঙ্কট নেই। রাজ্যপাল শ্রীচক্রবর্তীও বুধবার (১১ ডিসেম্বর) বলেছেন, "গতকালের পর হরি-য়ানার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাস্তব পরিবর্তন ঘটেছে।" এই 'বাস্তব পরিবর্তন' কি তা রাজ্যপাল বলেননি; কিন্তু সংবাদে

আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফিরে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে আসছেন। তাছাড়া নির্দলীয়দের কয়েকজনের সমর্থন আদায় করতেও কংগ্রেস সমর্থ হয়েছে বলে প্রকাশ।

এখন প্রশ্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বংশীলাল মন্ত্রিসভা কি এ-যাত্রা টিকে গেল। দিল্লীতে সর্বশেষ যে অনুমান তাতে মনে হচ্ছে, হরিয়ানার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার ফাঁড়া আপাততঃ বোধহয় কেটেই গেল।

যদি যায়, তাহলে একরকম মন্দের ভাল, কিন্তু বংশীলাল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফিরে পেতে ব্যর্থ হন তাহলে হরিয়ানার রাজ-নীতি নিয়ে অবধারিত জটিলতা দেখা দেবে ও বিতর্ক উঠবে। পার্লামেণ্টে বিরোধী দল থেকে কেউ কেউ বলছেন, হরিয়ানার বিরোধী পক্ষকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেওয়া হোক। কিন্তু নয়াদিল্লীর মতিগতি যতদূর বোঝা যাচ্ছে, সেখানকার কর্তারা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে হরিয়ানায় আর একবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করার পক্ষে যাবেন, তবু দল-ছুটদের মন্ত্রিত্ব করার সুযোগ দেবেন না। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র বলে-ছেন যে, দলত্যাগের ফলে যখন তাঁর নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপন্ন তখনও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙে দেবার পরামর্শ দিতে পারেন এবং যতক্ষণ তিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন ততক্ষণ রাজ্যপাল তাঁর পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য।

এই অভিমত অবশ্য বিধানসভার অধ্যক্ষদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী। অধ্যক্ষরা সুপারিশ করেছিলেন যে, বিধানসভার সদস্যদের অধিকাংশ যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করতে চান তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত হবে রাজ্যপালকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে পরামর্শ দেওয়া। অধ্যক্ষদের এই সুপারিশের উল্লেখ করে লোকসভায় স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী বলেছেন যে, হরিয়ানার অধিকাংশ সদস্য যদি মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে চান তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যপালকে বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে পরামর্শ দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর উচিত হবে।

হরিয়ানার ঘটনাপ্রবাহ অতঃপর যেদিকেই যাক, এটা ঠিক যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের মারফৎ রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক স্থিরতা আনার সম্ভাবনা সম্পর্কে অতঃপর দ্বিতীয় চিন্তা দেখা দেবে।

সমুদ্রের অধিকার

পৃথিবীর সমুদ্রের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্প্রতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সমুদ্র থেকে ও সমুদ্র গর্ভ থেকে নিত্যব্যবহার্য সম্পদ আহরণ করার কৌশল মানুষ ক্রমেই বেশী করে আয়ত্ত করছে, মহাকাশের মত সমুদ্রগর্ভকেও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার সম্ভাবনা বাড়ছে। [illegible] [illegible] পরিপ্রেক্ষিতেই সমুদ্রের অধিকারের [illegible] [illegible] বা কোন ধরনের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রশ্নটি নতুন গুরুত্ব লাভ করেছে।

মানুষ অবশ্য অনেকদিন আগে থেকে জেনে এসেছে যে, সমুদ্রগর্ভে অপরিমিত সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে। মাছ ও তেলের জন্য মানুষ সমুদ্র মন্থন করছে বেশ কিছুদিন থেকেই। দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রগর্ভ থেকে হীরা তুলতে আরম্ভ করেছে। ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যাণ্ডে উপকূলবর্তী সমুদ্র থেকে তেল আহরণ করছে। নিউ থাইল্যান্ডের সমুদ্র থেকে আকরিক লোহা, মেক্সিকো উপসাগর থেকে গন্ধক, অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র থেকে জিরকোনিয়াম প্রভৃতি তোলা হচ্ছে। কিন্তু নিছক তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে সমুদ্র থেকে যা পাওয়া সম্ভব তার তুলনায় মানুষ সামান্যই পাচ্ছে।

কিন্তু প্রয়োগকৌশল যেভাবে মানুষের আয়ত্তে আসছে তাতে সেই দিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন পৃথিবীর সমুদ্রের জলরাশি কাঁচা মালের যোগানের বৃহত্তম উৎসে পরিণত হবে। মার্কিণ গবেষক চ্যাপম্যান ১৯৬৩ সালে বলেছিলেন যে, সমুদ্রগর্ভ থেকে খনিজ পদার্থ আহরণের কাজ আগামী দশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পুরোদস্তুর চালু হয়ে যাবে। ক্যালি-ফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুটের জন সেরু বলেছেন "পরবর্তী প্রজন্মের জীবনকালের মধ্যেই মানুষ সমুদ্র থেকে শুধু কোবাল্ট বা নিকেল নয়, সীসা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়ম ইত্যাদিও আহরণ করবে।

কিন্তু সমুদ্রের এই সম্পদ সন্ধানের এক্তিয়ার কিভাবে নির্দিষ্ট হবে? এই এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ বাধলে তার সমাধান কিভাবে হবে? সমুদ্রের অধিকার নিয়ে যাতে নতুন এক ধরনের উপনিবেশবাদ মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে তার জন্য কি করা যায়?

পৃথিবীর বিজ্ঞানী, আইনবিদ ও চিন্তাশীল রাষ্ট্রনীতিবিদরা এইসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করছেন।

সমুদ্রকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার সম্ভাবনা তাঁদের আরও বেশী আশঙ্কার হেতু হয়ে দেখা দিয়েছে। একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ গত বছর বলেছেন, "সামরিক ঘাঁটিগুলি এখন জমির সংলগ্ন। কিন্তু দশ বছর পরে আর তা হবে না। আমরা জাতীয় প্রতিরক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রের বৃহৎ অংশকে ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন-করণের এবং ঐ সকল বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে অন্য জাতিকে প্রবেশ করতে দেব না।"

এইসব সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে মাল্টার প্রতিনিধি সমুদ্রগর্ভে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু এই প্রস্তাব যে বিশ্বব্যাপী আগ্রহের সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির চারদিনব্যাপী রাজ্য সম্মেলন একান্ত গোপনীয়তার মধ্যে দমদমে ক্লাইভ হাউসস্থ ময়দানে সুসজ্জিত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনকে দলের একাদশ কংগ্রেস বলে ঘোষণা করে মার্কসবাদীরা ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ধারার সঙ্গে নিজেদের অবিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, কম্যুনিস্ট পার্টি খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার পরও মার্কসবাদীরাই হচ্ছে তার একমাত্র উত্তরসূরী, দক্ষিণ কিম্বা অতি-বাম নয়।

প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মার্কস-বাদী কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের কর্মপন্থা, কলাকৌশল ও তাত্ত্বিক বিচারধারার উপর যে আলোকপাত করেছেন, তা ভিন্ন সম্মেলন-মণ্ডপে প্রায় ৪৫০ জন প্রতিনিধি কি আলোচনা করেছেন, তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র জনসাধারণের সামনে আসেনি, আসবার কথাও নয়। কারণ, প্রায় সমস্ত বামপন্থী দলই সম্মেলনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করেন যাতে আভ্যন্তরীণ কলহ কিম্বা আদর্শগত মতভেদ অথবা পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসার কোন ছবি জনসমক্ষে ফলাও হয়ে প্রচার হবার সুযোগ না পায়। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও সমস্ত কিছু আলোকপ্রাপ্ত হয়, কারণ কলহ চরমে উঠলে এক পক্ষ না এক পক্ষ তা প্রকাশ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। বর্ধমান প্লেনামের সময় এমন গোপনীয়তা অবলম্বিত হয়েছিল যে, সাংবাদিকদের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গেও কথা-বার্তা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু তত্ত্বগত দলিল নিয়ে অভ্যন্তরে যে-কেলেঙ্কারী হয়েছিল, তা চেষ্টা সত্ত্বেও গোপন রাখা যায়নি।

অবশ্য রাজ্য সম্মেলনে আলোচনার ধারা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দলের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন, তত্ত্বগত দলিল সম্পর্কে কোন সদস্য মতামত দেননি। যাঁরাও বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা শুধু দলীয় সংগঠনের দুর্বলতার উপর আলোকপাত করে কিভাবে পার্টিকে সুসংবদ্ধ ও মজবুত বানিয়ে ভবিষ্যতের লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত করা যায় তার উপর জোর দিয়েছেন। অধিকন্তু দলের সামনে যে-কর্তব্য রয়েছে, তাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে মার্কসবাদীরা কি কৌশল অবলম্বন করবেন, সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শ্রীদাশগুপ্ত অবশ্য বলেছেন, মত-পার্থক্য বলুন আর যাই বলুন প্রতিনিধিরা 'রাজনৈতিক শত্রুশিবিরের' মূল্যায়নের প্রশ্নে বহুমত হয়েছেন। তবে সেটাকে পার্থক্য বলা যায় না। কারণ, তাঁদের বক্তব্যের মূল সুর ছিল শত্রু-শিবিরের সর্ব-বিধ মূল্যায়ন করা, যাতে ভবিষ্যতে চলার পথে বাধাবিপত্তিকে পূর্বাহ্নেই চুরমার করে দেওয়া যায়।

পার্টির আদর্শগত দলিল নিয়ে আলোচনা না হওয়ার ফলে এ-কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শোধনবাদী ও সংকীর্ণতা-বাদীদের কোন প্রভাব দলের অভ্যন্তরে আর নেই। কাজেই বর্ধমান প্লেনামে গৃহীত তত্ত্বগত দলিলের বক্তব্যের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করবার জন্য যে আর কেউ অবশিষ্ট নেই—এ-কথা পরিষ্কার।

এতদসত্ত্বেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটা হচ্ছে যদি মার্কসবাদীরা মনে করেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বগত দলিল গৃহীত হয়ে থাকে, তবে শোধনবাদী বা সংকীর্ণতাবাদী-দের বিরুদ্ধে এত রণহুঙ্কার কেন? মার্কস-বাদীদের মূল্যায়ন যদি সঠিক হয়, তবে শোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ স্বখাত সলিলে আপনা থেকেই নিমজ্জিত হয়ে যাবে। অবশ্য, মার্কসবাদীরা বলতে পারেন, প্রচেষ্টা ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে যে-পরিমাণ জোর শোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে, ততটুকু জোর ত পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের উপর দেওয়া হয়নি। তবে কি তাঁরা মনে করছেন তাঁদের আদর্শগত দলিলের মধ্যে কোথাও কিছু ফাঁক রয়ে গেছে, যার রন্ধ্রপথে শোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ মাথাচাড়া দিতে পারে? এই সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা মার্কসবাদীদেরই কর্তব্য, অন্য কারও নয়।

অতিবাম বা যাঁরা সংকীর্ণতাবাদী বলে আখ্যাত হচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মূল্যায়ন সম্পর্কে তিনটি প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। প্রথমত, নকশালপন্থীরা চান যে, সোভিয়েট রাশিয়াকে পুরোপুরিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শক্তি বলে চিহ্নিত করে আদর্শগত পন্থা ঠিক করা হোক। অতিবামদের তরফ থেকে সোভিয়েটের এই মূল্যায়নের মূলে রয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনু-সরণকারী রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দালনের উপর তার প্রতিক্রিয়া।

ভারতবর্ষের বাম কম্যুনিস্টরা অতিবাম-দের এই বক্তব্য সম্পর্কে প্রায় সহমত হয়েও বলতে চান যে, রাশিয়াকে এখনও পুরোপুরি-ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। সোভিয়েট অর্থনীতির ক্ষমাহীন সমালোচক হয়েও বাম কম্যুনিস্টরা রাশিয়াকে সমাজবাদী শিবিরের একটি শক্তি-স্তম্ভ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে মহম্মদ ইসমাইল, এম-পি মহোদয়কে দিয়ে এ-কথা বলান হয়েছে যে, সোভিয়েটের বর্তমান শোধনবাদী নেতৃত্বকে তাঁরা স্বীকার করতে নারাজ। তবে মহান সোভিয়েটের সমাজবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং সেই ব্যবস্থা এখনও পুরোদমে চালু আছে। এদিক-ওদিক যে বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে, সেটা শোধনবাদীরা বলেন, পারি-পার্শ্বিকতা বিচার করে কৌশলের দিক থেকে ঘটছে। আদর্শগত দিক থেকে নয়।

যাহোক, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শগত দলিলের মধ্যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যে-সমালোচনার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু চীন এখন আমেরিকার নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিক্সন সাহেবের কাছে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। এবং চীনের এই প্রস্তাব সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যের সরকারী মহলে বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। চীন থেকেও এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করা হয়নি। অতএব, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে পট পরি-বর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে, তার পরি-প্রেক্ষিতেও মার্কসবাদীদের সম্মেলনে আদর্শ-গত দলিল সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি শুনে আশ্চর্য লাগে। সাধারণ প্রতিনিধিরা কি তবে চিন্তাশক্তি একেবারে বিসর্জন দিয়ে নেতৃত্বের প্রতি সৈন্যসুলভ আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন? এ-কথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রথমে এই প্রশ্নের উপর তাঁদের বক্তব্য রাখবেন এবং পরে দলের মধ্যে ঐ প্রশ্ন নিয়ে আলো-চনা চলবে। এর্ণাকুলাম কংগ্রেসে হয়ত এই প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্মেলনে এই সম্বন্ধে কোন আলোচনা হলই না—এটা কি ধরনের কথা। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের কোন জবাব দেননি। তবে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন, "প্রতিনিধিরা যদি আলোচনা না করেন, আমরা কি করতে পারি।" এই উক্তি আরও আশ্চর্যকর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, যা নিয়ে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দুই শিবির চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে মার্কসবাদীরা পার্থক্য টানছেন, সেটা হচ্ছে unity in action অর্থাৎ ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া ও চীন একান্ত হয়ে হো-সরকারের সঙ্গে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। মার্কসবাদীরা এ-কথা অবশ্য অস্বীকার করেন না যে, রাশিয়া হো-সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করছে না। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে বড় ভাই হিসাবে রাশিয়ার উচিত চীনের সঙ্গে সমঝোতা করে এই কর্তব্য সম্পাদন করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চীন যেখানে রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়, সেই ক্ষেত্রে এ-ধরনের কর্মে একাত্মতা কি সম্ভব?

আর আদর্শগত দলিলে তৃতীয় মতা-নৈক্যের প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষের মার্কস-বাদীদের ওপর চীনের মত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। বাম কম্যুনিস্টরা বলছেন যে, ভারত-বর্ষের পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যা-লোচনা করে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ বাম কম্যুনিস্টরাই করবেন। সম্যক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত না

হয়ে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি তার কর্মপন্থা জোর করে মার্কসবাদীদের ওপর চাপাবার চেষ্টা করার ফলেই মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এট্যাসি কেসে করে বিপ্লব আমদানি করা যায় না—এ-কথা মহামতি স্টালিনই বলে গেছেন। অতএব, স্বাভাবিক কারণেই ভারতের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষোভ জন্মেছে। প্রকাশ্য সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরায়া এই ক্ষোভের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি করেছেন। শ্রীসুন্দরায়া বলেছেন যে, যাঁদের দৃষ্টান্ত ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি পথগম হয়েছিল, তাঁরাই আজ মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। শ্রীসুন্দরায়ার বক্তব্যের মধ্যে উষ্মা ছিল না—ছিল ক্ষোভ। ভারতবর্ষের রোগ নির্ধারণ করে ওষুধ দেবেন এখানকার ডাক্তাররা। চীনে ডাক্তার ডায়াগোনেসিস না করে যে-ওষুধের কথা বলছেন, তা প্রয়োগ করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে যে বাধ্য, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই দল আর কম্যুনিস্ট পার্টি থাকে কিনা? যে-সমস্ত ছোট ছোট দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিকতা বিশ্লেষণ করে স্বাধীনভাবে কর্মপন্থা ঠিক করেছেন কম্যুনিস্টরা তাঁদের কম্যুনিস্ট পার্টি বলেই স্বীকার করেননি। তাঁরা সব সময়েই এ-কথা বলেছেন, আন্তর্জাতিকতা ছাড়া কোন সঠিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনই হতে পারে না। এবং কম্যুনিস্ট পার্টিও থাকতে পারে না। এখন সেই নিরিখে বিচার করলে মার্কসবাদীদের কম্যুনিস্ট পার্টি বলা যায় কি না সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভার তাঁদেরই ওপর বর্তিয়েছে। এবং সেই কষ্টিপাথরে বিচার করলে যতই গুণগত পার্থক্য থাকুক না কেন, শোধনবাদীরা একটি শিবিরের এবং অতি-বিপ্লবীরা আর একটি শিবিরের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরাই সাচ্চা কম্যুনিস্ট হিসাবে দাবী করতে পারেন। বাম কম্যুনিস্টরা নন।

অবশ্য এ-কথা বাম কম্যুনিস্ট তরুণ নেতা শ্রীতরুণ সেনগুপ্ত প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর শুভেচ্ছা ভাষণে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। শ্রীসেনগুপ্ত ওজস্বিনী ভাষায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকে জাতীয়তাবাদী দল বলে ঘোষণা করে বলেছেন যে, তাঁর দলকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে দেশকে ভালবাসা। যাঁরা তাঁর দলকে ভালবাসে না, তাঁরা দেশকে ভালবাসে না। এই ঘোষণা সেদিন যেন ফুয়েরারের কথার মত শোনাচ্ছিল।

আদর্শগত মত বা পথ যাই হোক না কেন, প্রকাশ্য অধিবেশনে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির চিন্তাধারার খানিকটা চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁরা প্রায় সকলেই যথাক্রমে সর্বশ্রী সুন্দরায়া, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু উপস্থিত জনতাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে পারলে শ্রেণীসংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং কেন্দ্রের হাতে যে-ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, তার খানিকটা আদায় করে রাজ্যগুলোকে আর্থিক ও ক্ষমতার দিক থেকে আরও শক্তিশালী করার আন্দোলনকে অধিকতর জোরদার করা যাবে। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য শ্রীসুন্দরায়া পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের গদিচ্যুতির ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে-চক্রান্ত করছে, তা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন।

বামপন্থী রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে হয়ত এই বক্তব্য সঠিক। কিন্তু এ-ছাড়াও আর একটি বিষয় পর্যালোচনা করার অবকাশ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচন সমাসন্ন। সাধারণ মানুষ জানতে চায়, যুক্তফ্রন্ট সরকার আবার যদি সরকারী গদিতে আসীন হয়, তবে তাঁরা জনতার আশু দুঃখমুক্তির জন্য কি কর্মপন্থা অনুসরণ করবেন। কোন নেতারই ভাষণে এ-সম্বন্ধে কোনরকম ইঙ্গিত ছিল না। অবশ্য মার্কসবাদীরা বলতে পারেন যে, এটা ছিল তাঁদের দলীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন। কাজেই তাঁরা দলীয় কলাকৌশল, তত্ত্বকথা ও কর্মপন্থার বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য যুক্তিটা ঠিক মনে হবে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক দলীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হওয়ার ফলে জনসাধারণ ভবিষ্যৎ নেতাদের মুখে কিছু শোনার জন্য সেখানে ভিড় করেছিলেন। শুধু তত্ত্বকথার ওপর জোর দিয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মনে তা রেখাপাত করতে পেরেছে কি না মার্কসবাদীরা সেটা বিশ্লেষণ করে দেখবেন। বিশেষ করে নির্বাচন আসন্ন হওয়ার ফলে এই প্রশ্ন আরও জরুরী বলে মনে হয়।

বাম কম্যুনিস্টরা না বললেও যুক্তফ্রন্টের একটি কর্মসূচী আছে। কিন্তু সব দলই যদি দলীয় তত্ত্বকথা ও নীতি ব্যাখ্যা করে চলে যান, তবে সেই কর্মপন্থা খেতাবেই থেকে যাবে। জনতা জানতে পারবে না। আর যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীর সঙ্গে পুরোপুরি না হলেও সীমিত ক্ষেত্রে প্রত্যেক পার্টির আদর্শের সঙ্গে কিছু না-কিছু সঙ্গতি রয়েছে। না থাকলে কর্মসূচীতে ঐক্যমত হওয়া যেত না। কিন্তু শুধু জেহাদের কথা ঘোষণা করার ফলে মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যই কি যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেওয়া হবে? রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা মনে করেন, এই জেহাদ ঘোষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিবামদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, মার্কসবাদীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন বলে তার অর্থ এই নয় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে মধুযামিনী যাপনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। এটা বিপ্লবের একটি কৌশল মাত্র। অতিবামরা এতে হয়ত আস্থা স্থাপন করতে পারেন, কিন্তু গণদেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় না।

আর একটি নৈতিক প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এই সম্মেলনের অধিবেশন থেকে। মার্কসবাদীরা নির্বাচন লড়ার জন্য বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ঐকমত্য কাজেই ব্যবহারিক দিক থেকে তাঁদের আচার ব্যবহার একটি চিহ্নিত সড়ক ধরে প্রকা পাওয়া উচিত। কেন না, তাঁরা যদি ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শরিকদের বিরুদ্ধে রাজ নৈতিক আদর্শের কথা তুলে পার্থ বোঝাবার চেষ্টায় তীব্র বিরূপ সমালোচনা মুখরিত হয়ে ওঠেন, নৈতিক দিক থেকে অসঙ্গত মনে হতে পারে। সেদিনকার প্রকাশ্য অধিবেশনে সকল বক্তাই তাঁদের ভাষণের বিশিষ্ট অংশ শুধু সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন এবং বক্তব্যের ভাব ব্যঞ্জনা এবং গভীরতা থেকে এটাই মনে হয়েছে যে, শোধনবাদের আশু বিনাশসাধন না করতে পারলে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। অবশ্য একবার মাত্র ডাঙ্গে চক্রের কথা উল্লেখ করলেও, আজকে এ-কথা কারও অবিদিত নয় যে, শোধনবাদ বলতে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদেরই বোঝায়। কাজেই যাদের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে গণমনে ঐক্যের বীজ বপনের চেষ্টা চলছে, সেই অংশীদারদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শোভনীয় কি? এছাড়া আরও কিছু কিছু শরিকদের স্বমতে দীক্ষা দেওয়ার কথাও নেতৃবৃন্দ বলেছেন। ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনে যুক্তফ্রন্টের বেশীর ভাগ দল সামিল হয়েছিল মনুমেণ্ট ময়দানে। একমাত্র এস এস পি তাতে যোগ দেয়নি। হয়ত এস এস পি-কে মন্ত্রশুদ্ধি করবার অভিলাষ প্রকাশ করেই বাম কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ ঐ কথা ঘোষণা করেছিলেন।

বাম কম্যুনিস্ট নেতাদের আরও একটি বক্তব্য ভীষণ বেমানান বোধ হচ্ছিল। শ্রীসুন্দরায়া বারবার উল্লেখ করছিলেন যে, তাঁদেরই দলের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়াতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ভীত হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবাংলায় তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে সংসদীয় আসনের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাঁদেরই নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছিল বলে শ্রীসুন্দরায়া যে অহমিকার ভাব প্রকাশ করছিলেন, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। কারণ অন্যান্য শরিকরা যে একেবারে অশক্ত ছিল এমন নয়। তা যদি হত, ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সদস্য দলত্যাগ করার পরই যুক্তফ্রন্টের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটত না। তদুপরি এহেন বক্তব্য অন্যান্য শরিকদের মর্যাদা হানিকরও বটে।

উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার কোথাও মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে যুক্তফ্রন্ট সরকারে বিশেষ কোন ভূমিকায় স্থান ছিল না। তবে কেন সেখানকার সরকারগুলি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেল? শ্রীসুন্দরায়া নিজের দলের বিপ্লবী ভূমিকার যে ঢক্কানিনাদ করলেন, সেটা অধিবেশন-মণ্ডপে করলে ভাল করতেন। প্রকাশ্যভাবে অন্যান্য শরিকদের রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে কটাক্ষের মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করে তিনি যুক্তফ্রন্টেরই ক্ষতি করেছেন বলে মনে হয়।

রাত তখন দশটা

দেবল দেববর্মা

আগের ঘটনা

[রাত দশটা। খুন হল তরঙ্গমালা। খুনী সন্দেহে ওর প্রেমিক নিখিলেশ হাজত থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে। শশাঙ্ক নিখিলেশের বন্ধু। মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে রুমমেট সুজাতা, প্রভা, কর্মচারী ভৈরব, বিশ্বনাথ বসু সকলকেই জেরা করা হয়। প্রত্যেকের উপরই গভীর গভীর সন্দেহ। হঠাৎ সুজাতার চাকুরিতে ইস্তাফা দেবার খবর এল। সি আই ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল চঞ্চল হলেন। ইতিমধ্যে নিখিলেশের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে নিলেন। তরঙ্গের সঙ্গে ওর রেজিস্ট্রেশন ম্যারেজ হয়ে গেছে। পালিয়ে যাবে অফিস এলাকা থেকে। এমন সময় খুন হল তরঙ্গমালা। রাজীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। শুধু তাই নয়, এর পরও অনেক খবর মিলল। খুনের যেন কিনারা হয়ে এসেছে। কিন্তু খুনী কে?]

।। ষোল ।।

অনেকক্ষণ পরে শচীদুলাল বলল, 'কিন্তু স্যার, রক্তের রঙ কি এমনি হয়? দাগটা কেমন ফিকে বাদামী বলে মনে হচ্ছে না?'

গোলাকার কয়েকটি দাগ, যেন একই কেন্দ্র হতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্যাণ্টের কাপড়ের সেই দাগটা আলোর কাছে তুলে পরীক্ষা করল রাজীব। নিরীক্ষণ শেষ হলে সে বলল, 'গরম জলে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করলে এমনি দেখাতে পারে। যাই হোক একবার পরীক্ষা করতে দিলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।' একটু থেমে ফের বলল রাজীব, 'অন্য উপায় কিছু দেখছি না। সুদর্শন চক্রবর্তীকে চেপে ধরলে ভদ্রলোক

হয়ত ওটা মাছের রক্ত বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন।'

—'কিন্তু মেয়েদের মাথার লম্বা চুলটা রাজীবদা?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'ওটা?' রাজীব বাঁকা চোখে তাকাল। 'চুলটার সম্বন্ধে সোজা উত্তর তো পড়ে আছে সুব্রত। পুরুষমানুষের জামার কলারে লম্বা চুল পাওয়া গেলে ওটা অর্ধাংগিনীর বলে চালিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আদর অভিমানের কোনো একটি নিবিড় ঘন মুহূর্তে জামার কলারের কাছে ওটা আটকে গিয়ে থাকবে।'

সুব্রত মনে করে বলল, 'তরুণের মাথার কয়েকটা চুল হরেন ডাক্তার বোধহয় রেখে দিয়েছে রাজীবদা।'

রাজীব হাসল। 'আমার মনে আছে সুব্রত। চুলগুলো কালই পরীক্ষার জন্য পাঠাব। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে এক একটি চুল ঠিক পেনসিলের মত দেখায়, —অর্থাৎ বাইরেটা রঙিন, ভিতরটা কাঠ, এবং আরও ভিতরে একটা কালো শীস। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলি মেডুলা, কোরটেক্স এবং কিউটিকল। দেখা যাক জামার কলারে পাওয়া চুলের সঙ্গে, তরুণের চুলের কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় কিনা।'

সুব্রত সহর্ষে বলল, 'আমার আর তর সইছে না রাজীবদা। সুদর্শন চক্রবর্তীকে হাজতে না ঢোকানো পর্যন্ত আমার মনে সোয়াস্তি নেই।'

কথা শুনে রাজীব প্রায় ধমক দিল। —'বড্ড ব্যস্ত তুমি সুব্রত। খুনের কেসে ছটফট করলেই কিন্তু সব মাটি। পূর্ব-পরিকল্পিত একটা খুনের পিছনে কোনো একজন বা অনেকজন দীর্ঘসময় মাথা ঘামিয়েছে। সুতরাং জট ছাড়াতে ধৈর্যের প্রয়োজন।' অল্পক্ষণ চিন্তা করে রাজীব বলল, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে খুনীকে হাতে নাতে ধরতে পারা যাবে।'

সুব্রত সোৎসাহে বলল, 'কেমন করে রাজীবদা?'

রাজীব ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'ওকে আর একটা খুনঃ করবার সুযোগ দিয়ে।'

'আর একটা খুন? বলেন কি স্যর?' শচীদুলাল চোখ দুটোকে প্রায় কপালে তুলল।

'ইয়েস। আর একটা খুন। মনে রেখো শচী। এ মার্ডারার ইজ সেলডম্ কনটেণ্ট উইথ ওয়ান ক্রাইম। গিভ হিম টাইম অ্যাণ্ড এ ল্যাক অফ সাসপিশন অ্যাণ্ড হি উইল কমিট অ্যানাদার।' রাজীব কথা শেষ করেই অল্প হাসল। বলল, 'আচ্ছা, আজকের মত তাহলে সভা ভঙ্গ সুব্রত।'

খুব সকালে দিকনগরের পথে জীপ-গাড়ীটা দ্রুত ছুটছিল। দুপাশে সেই পরিচিত দৃশ্য। গাছপালা, ধানক্ষেত, ঝোপ-ঝাপ আর আগাছার জঙ্গল, কোথাও বন্ধ্যা নারীর মত অনাবাদী মাটি। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রাজীব সময় দেখল। সাড়ে সাতটার কাছাকাছি। শচীদুলালকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে খানিকটা সময় গেছে। নইলে আরো খানিকটা সময় পেত রাজীব। সকালের এক্সপ্রেসটায় রওনা হয়ে বেলা দশটার মধ্যেই শচীদুলাল কলকাতায় পৌঁছে যাবে। রক্তের সেই দাগটা আর শার্টের কলারের কাছে পাওয়া চুলটার পরীক্ষা করানোর জন্যই শচীকে কলকাতায় পাঠান। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে ফলাফল সংগ্রহ করে ফিরতে হবে। রাজীব বারবার বলে দিয়েছে, সম্ভব হলে শচী যেন রাত নটা নাগাদ নিশ্চয়ই মথুরাপুরে এসে পৌঁছয়।

দিনটা রবিবার। কথাটা খেয়াল হতেই রাজীবের ভ্রু কুঞ্চিত হল। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীর খোদ কর্তার সঙ্গে তার একটু জানাশুনো আছে। শচীর হাতে রাজীব একটা চিঠি দিয়েছে। পত্র নিয়ে খোদ কর্তার সঙ্গে দেখা করবে শচীদুলাল, যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়। কলকাতায় বিকেলের ট্রেনটা ধরবার একটা সম্ভাবনা থাকে।

জীপগাড়ীটা অফিসগামী কোনো বাসের মতই দিকনগরের নিকটবর্তী হল। দূরে দূরে কোলিয়ারীর চানখ, গাছপালার আড়ালে ঘরবাড়ী, আর পেপার মিলের বয়লার ঘরের চিমনীর মুখ থেকে উদ্গত কালো ধোঁয়া চোখে পড়তেই রাজীব নড়ে-চড়ে বসল। আর কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী দিকনগরে ঢুকবে। সুতরাং আলস্যের আর অবসর নেই।

নেপালী ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে রাজীব বলল, 'বাহাদুর, বীরেন শ'র দোকান চেন?'

সাতসকালে মদের দোকানের খোঁজ দেখে বাহাদুর মুচকি হাসল। মাথা হেলিয়ে সে বলল, 'জী, হাঁ।' অর্থাৎ দোকানটা তার চেনা।

রাজীব গম্ভীর মুখে হুকুম করল, 'লে চলো।'

চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জীপগাড়ীটা এসে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল। মাটিতে পা দিয়ে মাথা তুলে দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকাল রাজীব। বড় বড় হরফে লেখা, শ'জ ওয়াইন শপ। নীচে বাংলা অক্ষরে শুধু মদের দোকান কথাটি লেখা হয়েছে। এত সকালে সুরারসিকদের আগমনের কথা নয়। ওদের অনেকেরই চোখে এখনও নিশীথের অন্ধকার। বেলা ন'টার আগে শয্যাত্যাগ প্রায় অকল্পনীয়। অবশ্য খোয়ারি ভাঙতে কেউ কেউ সকাল-বেলাতেও এসে জোটে। এক পাত্র পেটে ঢেলে দিয়ে দেহের অবসাদ তাড়ায়।

রাজীবকে দেখে দোকানী লোকটি জড়-সড় হয়ে দাঁড়াল। পরনে খাকী প্যাণ্ট আর শাদা সার্ট। হাতে একটা মোটা রুল। নতুন আবগারী দারোগা নয় তো বাবু? দোকানী মনে মনে কথাটা ভাবছিল।

'তোমার নাম বীরেন শ?'

'আজ্ঞে না। আমি তেনার কর্মচারী—'

'বীরেনবাবু কোথায়?'

'বাড়ীতে আছেন। ডেকে নিয়ে আসব হুজুর?'

'দোকানে সন্ধ্যের পর কে থাকেন?'

'আমি হুজুর—।'

'বীরেনবাবু?'

'তিনিও থাকেন। তবে মাঝে মাঝে তেনাকে ইখানে সিখানে যেতে হয়।'

'ম্যানেজার সাহেবকে চেন তুমি? পেপার মিলের ম্যানেজার সাহেব—?'

'চিনি হুজুর।'

'দোকান থেকে মদের বোতল যায় ওর বাংলোতে?'

জিভ কেটে লোকটা উত্তর দিল 'কি যে বলেন হুজুর। ম্যানেজার সাহেবের জন্যে মাল কিনতে ভৈরববাবুকে কলকেতা ছুটতে হয়। সময় কম থাকলে আলোকপুরে তো নির্ঘাত। আমাদের দোকানের মালে কি ও'র রুচি হয় আজ্ঞে?—না ওনার সম্মান থাকে? দামী শ্যাম্পেন আমরা কোথায় পাব বলুন?'

'এর আগের শনিবারের কথা মনে আছে তোমার?'

'কি কথা হুজুর?'

'দোকানে তুমি সন্ধ্যের পর সর্বক্ষণ ছিলে?'

'আজ্ঞে হুজুর।' লোকটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল।

'বীরেনবাবু?'

'আজ্ঞে তিনি রাত আটটার পর গণপত মাড়োয়ারীর গদীতে একটা কাজে গিয়ে-ছিলেন।'

'কখন ফিরলেন?'

'আজ্ঞে রাত দশটা নাগাদ।'

'দোকানে তখন কেউ ছিল?

কেউ না হুজুর। তার একটু আগেই ভৈরববাবু দু পেগ হুইস্কী খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।'

'ভৈরববাবু কখন এসেছিলেন দোকানে?'

'রাত ন'টার পর।'

রাজীব ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় কি সব বলল।

ঠিক তখনই লোকটার চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাল। বলল, 'কথাটা তো আমি ভুলেই গেছিলাম হুজুর। ভেনার ভাবগতিক দেখে আমি তো হেসে বাঁচিনে। মালিক আসতেই বললাম ভেনাকেও। তা মালিকও আমার তেমনি। হি হি করে হেসে বলল, 'নেশাটা বোধহয় বেশী হয়ে গেছে। তাই ঝোঁকের মাথায় কাণ্ডটি করেছে।'

দিকনগর থানায় এসে রাজীব দেখল, সুব্রত তার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজীবের চোখের তারায় উপচানো খুশী, ঠোঁটের চাপা হাসি, আর মুখের উজ্জ্বল ভাব দেখে সুব্রত বলে ফেলল, 'ব্যাপার কি রাজীবদা? আজ যে ভীষণ ব্রাইট দেখাচ্ছে আপনাকে!'

মুচকি হেসে রাজীব বলল, 'এখুনি এক ভদ্রমহিলা আসবেন, সী ইজ এ প্রেটি ইয়ং গার্ল। তুমি বাড়ী গিয়ে দু' কাপ চা পাঠিয়ে দাও। আর দোহাই সুব্রত, উনি যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ আমাকে রাজীবদা বলে ডেকে কাছে এস না।'

কথাটার অর্থ সুব্রতর ঠিক বোধগম্য হল না। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে বেরিয়ে গেল।

প্রভা ঠিক সময়ে এল। আশমানী রঙের একটা শাড়ী, গায়ে অমনি রঙেরই ম্যাচ-করা একটা জামা। এই সকালবেলাতেই কেমন নিপুণ হাতে কাজল টেনেছে চোখে। স্নো-পাউডার ঘষে গোল মুখখানা যতদূর সুন্দর করা যায়, দীর্ঘসময় তারই প্রস্তুতি চলেছে।

'বলুন কি জন্য ডেকেছেন?' প্রভা এসেই চড়াও হল।

খুব গম্ভীরভাবে রাজীব বলল, 'আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম মনে আছে?'

'আছে—।' প্রভা স্বীকার করল।

'বাঘ শিকারের গল্প পড়েছেন মিস মুখার্জি?' রাজীব ঈষৎ যেন হেঁয়ালী শুরু করল।

'বাঘ শিকারের?' প্রভা খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'বাঘ শিকারে অনেক সময় টোপ ব্যবহার করতে হয়। ছাগল-টাগল, গরু-বাছুর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে টোপ হিসেবে মানুষ ব্যবহার করারও চেষ্টা হয়েছে।'

'তাতে কি?' অত ভনিতা করে বলছেন কেন?'

রাজীব দাঁত টিপে বলল, 'ভয় পাবেন না মিস মুখার্জি। আপনাকে আমি টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই।'

'আমাকে?' আতংকে প্রভার চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। পকেট থেকে রাজীব একটা কাগজ বের করে প্রভাকে পড়তে দিল। মিনিটখানেকের মধ্যেই পড়া শেষ করে প্রভা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'এ-চিঠি আপনি কোথায় পেলেন?'

'পেয়েছি,—যেখানেই হোক,' রাজীব হাসল।

'জানেন, কি সাংঘাতিক খবর আছে এ-চিঠিতে?'

রাজীব আবার হাসল। বলল, 'এই খবরটা আপনাকে জানাতে হবে একজনকে।'

'কি খবর?'

'বলবেন, শনিবার বাড়ী যাবার সময় তরঙ্গের কাছ থেকে একটা গল্পের বই নিয়েছিলেন আপনি। বইটার মধ্যে একটা অদ্ভুত চিঠি ছিল।'

'তারপর?' প্রভা খুব ভয়ে ভয়ে বলল।

'বলছি,' রাজীব ওর ফ্যাকাশে মুখটার দিকে চেয়ে হাসল। 'বলবেন চিঠিটা ডিরেক্টরদের হাতে পড়লে বহু ঘুঘু ব্যক্তি ফাঁদে পড়ে যাবেন।'

'কিন্তু আমার কথা কি সে বিশ্বাস করবে? যদি বলে, এতদিন কেন আমি চিঠির কথা চেপে গিয়েছিলাম?'

ইতিমধ্যে দু' কাপ চা এসে হাজির টেবিলে। এক চুমুক চা পান করে রাজীব বলল, 'সেই কথাটা জানেন মিস মুখার্জি? পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। এখানেও ব্যাপারটা তাই। চিঠির কথা যার মনে ছ্যাঁকা দিচ্ছে, আপনার কথা সেই বিশ্বাস করবে। বলবেন, তরঙ্গ খুন হবার পর ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন আপনি। পুলিশের ভয়ে চিঠির কথা কাউকে ফাঁস করেননি।'

'তারপর?' প্রভা মনোযোগী শ্রোতার মত প্রশ্ন করল।

ভবিষ্যৎ বক্তার মত রাজীব উচ্চারণ করল, 'তারপর আর কি? আজ রাতেই খুব সম্ভবত তিনি আসবেন আপনার কাছে—।'

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ। চিঠিটা সংগ্রহ করতে হবে না? তার জন্যেই তো এই খুনোখুনী!'

প্রভা বিস্ময়ে হাঁ করে রইল।

রাজীব বলল, 'ভয় পাবেন না। আমি সদাসর্বদা আপনার সঙ্গে আছি। নির্ভয়ে এগিয়ে যান।'

প্রভা চলে যেতেই সুব্রত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল। বলল, 'চাকামুখী মেয়েটার কি সাজগোজ দেখলেন রাজীবদা। সাত-সকালে কেমন পটের বিবি সেজে এসেছিল।'

রাজীব তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। 'তুমি দেখছি মেয়েদের মত ঈর্ষায় জ্বলছ বড়বাবু।'

'দূর! ঈর্ষা করতে যাব কেন?'—সুব্রত হাসল।

'বেরোতে হলে মেয়েদের সাজসজ্জার একটু প্রয়োজন হয় বড়বাবু,' রাজীব একটু থেমে যোগ করল—'রমণীতনু মানে একটি ফুলের বাগান। ঠিকমত পরিচর্যা না করলে খোলতাই হয় না।'

বেলা এগারোটার সময় রাজীব এসে দাঁড়াল মিল ম্যানেজারের কামরার সামনে। দিনটা রবিবার। মিলের অফিস-টফিস কিছু কিছু বন্ধ। কোনো কোনো ঘরে এবং কারখানায় যথারীতি কাজ চলছে। রাজীবকে দেখে উর্দী-পরা বেয়ারা মস্ত এক সেলাম জানাল।

'ম্যানেজার সাহেব আছেন?'

'হাঁ সাব।' লোকটি সামান্য নত হয়ে বিনয় প্রকাশ করল।

স্লিপ দিতেই সুদর্শন চক্রবর্তী ডেকে পাঠাল তাকে।

'কি খবর ইন্সপেক্টর সাহেব? আপনার সেই পাঞ্জাবী শিখের পাত্তা পেলেন নাকি?' মিল ম্যানেজার শুরুতেই তদন্তের গল্প শুরু করল।

খুব হতাশ ভঙ্গি করে রাজীব বলল, 'কোনো হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না লোকটার। তবে পুলিশ বসে নেই,—অনুসন্ধান চলছে।'

'মিস দাসের পদত্যাগপত্রটা দেখবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, এসেছি যখন, চোখ বুলিয়ে যাই একবার।'

পদত্যাগপত্রটা পড়ে রাজীব মুচকি একটু হাসল। ব্যাপারটা সুদর্শন চক্রবর্তীর দৃষ্টি এড়ায়নি। সে বলল, 'ওতে হাসির কি পেলেন?'

'কিছু না। লেখাটা বেশ সুন্দর, গোটা গোটা দেখলাম, নিজের হাতের লেখা খুব খারাপ। তাই মনের দুঃখে একটু হাসলাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে রাজীব বলল, 'একটা কথা বলব ম্যানেজার সাহেব?'

'কি কথা? বলুন না—।'

'আপনার মিলের একটা গাড়ী দেবেন? মানে আমাকে একটু মথুরাপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে?'

'নিশ্চয় দেবো। কিন্তু আপনার জীপ-গাড়ীর কি হল?'

'আর বলবেন না। সাহেব কোথায় যেন যাবেন দশটার পর। তাই জীপটা ছেড়ে দিতে হল।'

টেলিফোন তুলে সুদর্শন চক্রবর্তী বলল, 'ভৈরববাবু? হ্যাঁ, একবার আসুন তো এখানে।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভৈরব এসে ঢুকল ঘরে। রাজীবকে দেখে খানিকটা আশ্চর্য এবং খানিকটা বিনয়ের ভাব প্রকাশ করে সে বলল, 'স্যর আপনি?'

'হ্যাঁ, ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে একটু দরকার ছিল।' রাজীব বাকীটুকু উহ্য রাখল।

সুদর্শন বলল, 'ভৈরববাবু, একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করে-দিন ইন্সপেক্টর সাহেবকে। মথুরাপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে ও'কে।'

ভৈরব একগাল হাসল।—'নিশ্চয়ই স্যর, আসুন আমার সঙ্গে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে রাজীব বলল, 'একটা ভালো গাড়ী দেবেন কিন্তু ভৈরব-বাবু। দেখবেন পথের মধ্যে আবার না খারাপ-টারাপ হয়ে যায়। গিন্নীকে কথা দিয়ে এসেছি, বারোটার মধ্যে ফিরব বলে। বিশেষ দরকার আছে, সময়ে পৌঁছতে না পারলে হোমফ্রণ্টে কালবোশেখী শুরু হয়ে যাবে।'

ভৈরব দত্ত মিষ্টি হেসে বলল, 'কিছু চিন্তা করবেন না স্যর। কোম্পানীর নতুন কেনা শাদা গাড়ীটা আপনাকে দিচ্ছি। পাখীর মত হুস করে গিয়ে মথুরাপুরে হাজির হবে।'

'ড্রাইভার? বেশ ভালো চালায় তো?'

'শাদা গাড়ীটা ইয়াসিনই চালায় স্যর। মিলের সেরা ড্রাইভার। একবার দেখুন না বসে। গাড়ী তো নয় স্যর, যেন পুষ্পক রথ।' ভৈরব আকর্ণবিস্তৃত হাসি উপহার দিল।

* * *

রাত ন'টার পরই এদিকটা নির্জন হয়ে গেল। সন্ধ্যের পরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসটা ভিজে, গাছপালা জলে নেয়ে কাঁপছে। মাঝে মাঝে হু-হু পুবে-হাওয়া সম্ভবত গভীর রাতে আরো দু'-এক পশলা বৃষ্টি হবে। আকাশে পাতলা একটা মেঘের চাদর। জ্যোৎস্না তার আড়ালে লুকিয়েছে। তারাভরা সুন্দর আকাশী চিত্রটার উপর কে যেন মস্ত একটা রাগে এক পোঁচ মেঘ রঙ মাখিয়ে হিজিবিজি টেনে দিয়েছে।

দোকানপাট অনেকক্ষণ বন্ধ। পথে লোকজন নেই। নির্জন, স্তব্ধ পৃথিবী। একা একা পথ হাঁটতে কেমন যেন গা ছম-ছম করে। রাত আটটার পরই খাওয়া-দাওয়া সেরে সুজাতা বেরিয়ে গেছে। ওর আজ নাইট ডিউটি।

ফিস ফিস করে সুব্রত বলল, 'রিপোর্টে কি বলেছে রাজীবদা? ওটা রক্তের দাগ তো?'

'হ্যাঁ। মানুষের রক্ত।'

'আর চুলটা?'

'তরুণের চুলের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তার।' রাজীব চাপা গলায় উত্তর দিল।

বাড়ীর চারপাশে খানিকটা মাঠ। খোলা জানালা দিয়ে বহুদূরে কি একটা আলো দেখা দিল। আলেয়ার আলোর মত ভৌতিক সংকেত। কাছেই একটা গাছের চারপাশে জোনাকির আলো যেন অশরীরী আত্মার নানা অংগপ্রত্যংগের অস্তিত্বের হদিশ দিয়ে জ্বলছে, আবার নিভছে। হঠাৎ কাছেপিঠে কোথায় শৃগালের দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

বিছানায় শুয়ে প্রভা বলল, 'আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে। লোকটা যদি আমার গলা টিপে ধরে।'

খুব বিরক্তি প্রকাশ করে রাজীব বলল, 'আপনি চুপ করবেন দয়া করে? বেশী কথা বললে দেখছি আমাকেই আপনার গলা টিপে ধরতে হবে।'

প্রভা ভয়ে ভয়ে চুপ করল।

দিকনগর থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজল। মশার একটা মোক্ষম কামড় খেয়ে সুব্রত কাতরে উঠল। সে অস্ফুটে বলল, 'কতক্ষণ এমন ঘাপটি মেরে বসে থাকা যায় রাজীবদা?'

রাজীব প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ।'

হঠাৎ খুব মৃদু একটা শব্দ রাজীবের কানে এল। সন্তর্পণে পা ফেলে কে যেন এগিয়ে আসছে। শব্দটা গড়াচ্ছে এদিকেই। লোকটার পায়ে নিশ্চয় রবার সোলের জুতো। নইলে শব্দটা আরো জোরে শোনাত।

টুক টুক করে কে যেন টোকা দিল দরজায়।

বিছানাতে উঠে বসে প্রভা বলল, 'কে?'

'আমি।' চাপা গলায় জবাব এল।

দরজা খুলে খুব অবাক হল প্রভা। 'আপনি? এই বেশে?' সে অস্ফুটে বলল।

দীর্ঘকায় লোকটি। ফুলপ্যাণ্ট আর জামার উপর বর্ষাতি। মাথায় বৃষ্টি বাঁচাবার জন্য টুপি।

'চিঠিটা দেখতে এলাম।' আগন্তুক তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিল।

প্রভা পিছন ফিরল। 'সুইচটা খারাপ হয়ে গেছে। ঘরে অন্ধকার।' সে নিজের মনে বলল। কোথা থেকে দেশলাই বের করে প্রভা একটা কাঠি ধরাল। টেবিলের ড্রয়ার টেনে চিঠিটা হাতে নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অব্যক্ত একটা ধ্বনি বেরুল প্রভার মুখ দিয়ে। তারপরই মনে হল ঘরের মধ্যে সবল কোন এক প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছটফট করছে প্রভা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিল রাজীব। মেঝেতে খুব ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ। প্রভাকে ফেলে দিয়ে লোকটা ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রাজীব ওকে ধরে ফেলল। প্রচণ্ড শক্তিতে লোকটাকে ধরাশায়ী করে উঠে দাঁড়াল।

সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'রাজীবদা, এ তো সুদর্শন চক্রবর্তী নয়। এ যে ভৈরব দত্ত।'

'হ্যাঁ,' রাজীব দ্রুত বলে গেল 'ভৈরব দত্তই তরুণকে খুন করেছে। আজ আমরা না থাকলে প্রভাকেও সে গলা টিপে শেষ করত। এবং তারপর নিশ্চয় অন্য কোনো লোকের ব্যবহার করা একটা জিনিস ইচ্ছে করে ফেলে রেখে যেত এখানে। পুলিশ সেই লোকটাকে খুনী বলে সন্দেহ করত। এবং তাকে অ্যারেস্ট করত। যেমন নিখিলেশকে করেছে।...'

মুখে সামান্য একটু জলের ঝাপটা দিতেই প্রভা সুস্থ বোধ করল। উঠে বসল। রাজীব বলল, 'মিস মুখার্জি খুব ভয় পেয়েছেন। লোক পাঠিয়ে কুটির মাকে নিয়ে এস সুব্রত। আজ রাতটা সে এখানে থাকুক।'

ইতিমধ্যে চার-পাঁচজন সেপাই নিয়ে শচীদুলাল এসে হাজির। একটু দূরে সকলের সঙ্গে সে আত্মগোপন করেছিল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলতেই দলবল নিয়ে ছুটে এসেছে।

মেঝের উপর ভৈরব দত্তকে পড়ে থাকতে দেখে শচী বড় বড় চোখ করে বলল, 'কি সাংঘাতিক কাণ্ড স্যর। এই লোকটাই তাহলে খুনী! কেমন ভালো মানুষ সেজে ঘোরা-ঘুরি করত।'

* * * * *

...কথা হচ্ছিল দিকনগর থানায় বসে। বেলা প্রায় সাড়ে ন'টার মত। ফটফটে নীল আকাশ এখন। মেঘ-টেঘ সব কোথায় নিরুদ্দেশ। ইলিশ রঙের উজ্জ্বল রোদে মাটি, গাছপালা ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে।

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, ভৈরবকে কি আপনি খুনী বলে সন্দেহ করেছিলেন?'

সন্দেহ নিশ্চয় করেছিলাম। তবে ভৈরবকে একা নয়। শশাংক থেকে শুরু

শ্রীমতী সুজাতা পর্যন্ত প্রত্যেককেই সন্দেহ হয়েছে আমার।'

সুব্রত বলল, 'তাহলে অন্য সকলকে বাদ দিয়ে ভৈরবের সম্বন্ধেই আপনার সন্দেহ গাঢ় হল কেন?'

বিশ্লেষণ করবার ভঙ্গিতে ব্যাপারটা বলছিল রাজীব।—'খুনের কেসটা হাতে নিয়ে প্রথমেই একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হল। তরঙ্গের মৃত্যুতে কারো লাভবান হবার কথা নয়। অর্থাৎ তরঙ্গ মারা গেলে কেউ সম্পত্তির বেশী ভাগ পাবে না কিংবা ইন্সিওরেন্সের টাকাও কারো কপালে জুটবে না। এমনকি যে ওকে খুন করেছে, তরঙ্গের গা থেকে সে একটি গয়না-গাঁটি পর্যন্ত খুলে নেয়নি। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। খুনের মোটিভ অন্য কোনোখানে। কিন্তু সেটা কি, তা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।'

'কিন্তু তরঙ্গের জামার মধ্যে নিখিলেশের ঐ চিঠিটা—!'

রাজীব হেসে ফেলল, 'খুনের ব্যাপারটা বেশ সুন্দর সাজিয়েছিল ভৈরব। তরঙ্গের ঘর থেকে ঐ চিঠিটা সে সংগ্রহ করে। এমনকি নিখিলেশের একটা রুমাল পর্যন্ত। একটা জিনিস তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সুব্রত। অবশ্য সেই রাতের প্রচণ্ড বর্ষণে চিঠিটা জলে ভিজে বেশ নষ্ট হয়ে যায়। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে চিঠিটার এক জায়গায় ছোট্ট একটা লেখা যেন তুলে ফেলা হয়েছে। আসলে ওটাই হল তারিখ। চিঠিটা বাড়ীতে এনে আতসকাচ দিয়ে ভালো করে দেখলাম। আমার সন্দেহ ঠিক। এবং তখনই আমি মনস্থির করলাম। খুনী নিখিলেশ নয়, অন্য কেউ।'

সুব্রত এবং অন্য সকলেই খুব মন দিয়ে শুনছিল।

রাজীব বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে তরঙ্গকে যে খুন করেছে সে নিখিলেশকেও ফাঁসাতে চায়। তবে কি তার আক্রোশ ওদের দুজনের ওপরেই? লোকটা তরঙ্গের আর এক প্রণয়ী নাকি? খোঁজ করতে শুরু করলাম। ত্রিভুজ প্রেমের তৃতীয় কৌণিক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তিনি কোনজন? দেখা গেল, তরঙ্গ রীতিমত সুন্দরী। এবং তার স্তাবক আর পূজারীর সংখ্যা এক নয়, একাধিক। শশাংক, বিশ্বনাথ, ম্যানেজার, ভৈরব এমন কি একজন মহিলাও তার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী। প্রায় সকলেই তরঙ্গের অন্তরঙ্গ। এবং তার অঙ্গুলি হেলনে ওঠা-বসা করতে চায় এমন অভাজন এরা সবাই। দেখলাম, এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী আর শাঁসালো লোকটি হল মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী।'

ইতিমধ্যে চা এসেছে। একটু চা দিলে রাজীব ফের শুরু করল।-'ঘটনাস্থলে আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। একটা প্যান্টের বোতাম সুব্রত। খুব দামী কাপড়ের প্যান্টে এ ধরনের বোতাম লাগানো হয়। আমার মনে হল খুনী নিশ্চয়ই একটা দামী ফুলপ্যান্ট পরে এখানে এসে থাকবে। কিন্তু সে কোনজন?'

বিশ্বনাথের অবস্থা ভালো নয়। তার মাইনের বহর আঁচ করা যায়। ফলে সন্দেহটা তার উপর থেকে সরে এল। শশাংক খুব সাধারণ। এমন দামী ফুলপ্যান্ট কি সে ব্যবহার করে? বাকী রইল সুজাতা দাস। পুরুষের ছদ্মবেশে সে নিখুঁত। কিন্তু দামী ফুলপ্যান্ট কি তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব? আমার সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল সুদর্শন চক্রবর্তীর উপর। এবং মুখের উপর তাকে সাসপেক্ট বলে প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাইলাম।

কিন্তু এইটুকু বলবার পরই কাজ হল। ভৈরব দত্ত তার কোটর থেকে বেরিয়ে এল। সুদর্শন চক্রবর্তীর অনুগৃহীত সে। পুলিশ ম্যানেজারকে সন্দেহ করুক, এটা সে চায় নি। গায়ে পড়ে ইনফর্মেশন দিতে এল ভৈরব রাত দশটার পর। সুদামডির মোড়ে সে একজন পাঞ্জাবী শিখকে দেখেছে। অন্তরের অভিলাষ, সুদর্শনের উপর থেকে সন্দেহের দৃষ্টি সরিয়ে নিক পুলিশ।

কিন্তু তখনও আমি ভাবছি, অপরাধী কে? সুদর্শন? বিশ্বনাথ? সুজাতা দাস? শশাংক? না ভৈরব দত্ত? কিন্তু ভৈরব তো ফুলপ্যান্টই পরে না। চকচকে, উজ্জ্বল, দামী, সবুজ বোতামটার সঙ্গে ওর যোগসূত্র কোথায়?' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রাজীব বলতে শুরু করল, 'কি খেয়াল হতে একদিন ভৈরবের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। ভাগ্য প্রসন্ন। ভৈরব বাড়ীতে ছিল না। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি জুতো। দত্ত-পরিবারের সকলের। হঠাৎ একজোড়া সু-জুতোর উপর নজর পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। জুতোর নীচে ইটের গুঁড়োর দাগ। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে সুব্রত, যেখানে তরঙ্গের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে আগে একটা ইটের পাঁজা ছিল বলে আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম।'

অনেক আগেই রাজীবের নির্দেশ মত ভৈরবের বাড়ী থেকে জুতোজোড়া আনা হয়েছিল। শচীদুলাল তাড়াতাড়ি সেটি পরীক্ষা করে দেখল। জুতোর সোলে এবং অন্যান্য দু-এক জায়গায় ইট-গুঁড়ো লেগে আছে।

'কিন্তু খুনের মোটিভটা কি তাতো বললেন না রাজীবদা?'

সহাস্যে পকেট থেকে একটি কাগজ বের করল রাজীব। বলল, 'মোটিভ এখানেই পাবে।'

সম্বোধনহীন একখানি চিঠি। গর্জন নামে কোনো এক ব্যক্তি ভয় পেয়ে এই চিঠিখানি লিখেছে। সুব্রত ধীরে ধীরে পড়ল—......খবর পেয়েছি উমোবাবু খুব জরুরী কাজে বিকলগরে আসছেন। শুক্রুরবার শী বাবু এসে তার হাজার টাকা নিয়ে গেছেন। আপনার বাকী দু-হাজার টাকা ঠিক করে রেখেছি, যেদিন মনে হবে নিয়ে যাবেন। বলেন তো বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

উমোবাবু কেন আসছেন জানতে পেরেছেন কি? শুনছি, শাদা গুঁড়োর সেই মালটায় এখনও হাত পড়ে নি। এদিকে পুরো তিন কুইন্টল মাল কম দিয়েছি। উমোবাবু জানতে পারলে কোমরে দড়ি পড়বে। আপনি, আমি, শীবাবু কেউ বাদ যাবে না।

মনে হচ্ছে উমোবাবুর কানে কোন শালা চুকলি কাটছে। জুবিলীর সময় আপনার কথামত দু'শ বোতল মালের সঙ্গে একশ'টা জলের বোতল মিশিয়ে দিয়েছিলাম। শুনছি সাপ্লাইয়ের খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে। শেষ-মেষ কি হবে ভগবান জানেন।

একটু হুঁশিয়ার থাকুন। উমোবাবু সাংঘাতিক লোক। একবার যখন সন্দেহ
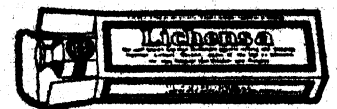
হয়েছে তখন আঁত-পাঁতি করে দেখবে। জানাজানি হলেই খেল খতম। আপনার চাকরী আর আমার বিজনেস দুই লাটে উঠবে। জল আরো কতদূরে গড়াবে কে জানে।

দশদিন বাদে দেখা করব—

গজেন্দ্র

সুব্রত বলল, 'এর মানে কী রাজীবদা? উমোবাবু আর শশীবাবু কে এরা?'

গম্ভীর মুখে রাজীব বলল, 'এই চিঠিখানা তরঙ্গ পেয়েছিল। সম্ভবত ওর মেয়েলী কৌতূহলের জন্য কোনো গোপন স্থানে ও সেটা আবিষ্কার করে। চিঠিটা ভৈরবকেই লেখা। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটা হল ওরই মৃত্যুবাণ।'

টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের নতুন প্যাকেটটা ছিঁড়ে রাজীব ধূমপান শুরু করল। খানিকটা ধোঁয়া নাক-মুখ দিয়ে বার করে রাজীব বলল, 'শশীবাবু লোকটা কে জানো সুব্রত? পারচেজ সেকশনের শশীনাথ—ভৈরবের আশ্রিত লোক। ওর কাজ হল সাপ্লায়ারদের বিল পাশ করা।' একটু থামল রাজীব। বলল, 'আমি জানতে পেরেছি মিলের সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে মোটা টাকা খেত ভৈরব। ক'মাস আগেই পেপার মিলের জুবিলী উৎসব হল। তখন মদের বোতলের সঙ্গে জলের বোতলের সাপ্লাই যোগসাজসে চালিয়ে দিয়েছে ও। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আর খবরটা পৌঁছেছে উমোবাবুর কানে।'

'কিন্তু উমোবাবুটি কে রাজীবদা?'

'দিকনগর পেপার মিলের অন্যতম ডিরেক্টর উমেশপ্রসাদজী। তরঙ্গকে উনি স্নেহ করতেন। গত মঙ্গলবারে এই ব্যাপারে তদন্ত করতেই এসেছিলেন ভদ্রলোক।—' রাজীব সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে শুরু করল, 'খুব বোকামি করেছিল তরঙ্গ এমন একটা সাংঘাতিক চিঠি পেয়ে ভীষণ কলরব শুরু করে। এর তার কাছে নানা গল্প জুড়ে করে দেয়। পেপারমিলের ভিতরের ঘটনা সে জানে। ইচ্ছে করলে সব ফাঁস করে দিতে পারে। কথাটা কানে গেল ভৈরবের। তরঙ্গ উমেশপ্রসাদজীর লোক। একে আগেই সন্দেহ করেছিল ভৈরব। চিঠিটা খোয়া যাবার পর সে মরীয়া হয়ে উঠল। তার মনে হল চিঠিটা তরঙ্গই গোপনে সংগ্রহ করেছে। এবং সুযোগ পেলেই উমেশপ্রসাদজীর হাতে সে ওটা তুলে দিতে পারে। সুতরাং তরঙ্গমালাকে শেষ করতে ভৈরব-দত্ত কৃতসংকল্প হল।' সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে রাজীব বলল, 'ভৈরব লোকটা কিন্তু একেবারে পশু। মেয়েটার প্রাণ নিয়েও তো ক্ষান্ত হয় নি। এমন কি ওর মৃতদেহ উপভোগ করতে চেয়েছিল ভৈরব। সম্ভবত বোতামটা তখনই—।'

'কিন্তু ম্যানেজারসাহেবের প্যান্টটা ও কখন পরল স্যার?'

'ধীরেন শ'র দোকানে। কর্মচারী লোকটা দেখেছিল ভৈরবকে,—ফুলপ্যান্ট সার্ট ইত্যাদি পরে সাহেব সাজছে। ও ভেবেছিল নেশার ঝোঁকে ভৈরববাবু খোদ ম্যানেজার সাজতে চাইছেন।'

শশাংক এসেছিল রাজীবের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের মধ্যে অতগুলি লোক দেখে সে কেমন বোকার মত হাসল।

রাজীব প্রশ্ন করল, 'নিখিলেশবাবু আসেন নি?'

'এল না স্যার। কালই বাড়ি চলে যাবে। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।'

রাজীব মুখ নীচু করে বলল, 'হুঁ। আপনাকে কিন্তু আমি প্রথমে খুনী বলে সন্দেহ করেছিলাম শশাংকবাবু। ডেড্‌বডি দেখতে আপনি যান নি, এটা কিন্তু ভাল কথা নয়।' একটু হেসে রাজীব ফের যোগ করল, 'শশাংকবাবু খুব দুর্বলপ্রকৃতির লোক সুব্রত। অ্যাকসিডেন্ট শুনলেই ভড়কে যান। ওদের কোলিয়ারীর পিটে ক'দিন আগে অ্যাকসিডেন্ট হল। তা উনি ডেড্‌বডি দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, সারা দিন ডুব দিয়ে মথুরাপুরে এসে বসে রইলেন।'

মথুরাপুরে ফেরার জন্য জীপে উঠতে যাচ্ছিল রাজীব। সুব্রত বলল, 'ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা করবেন না রাজীবদা?'

'না।' রাজীব শক্ত হয়ে দাঁড়াল। একটু পরে বলল, 'ম্যানেজার আমার কাছে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল সুব্রত। ঘটনার দিন রাত্রে সে এগারোটার সময় দিকনগরে ফেরে নি। ফিরেছিল রাত দুটোর পর।'

'কি করে জানলেন?'

'ওর ড্রাইভার ইয়াসিন মিঞা আমাকে সব বলেছে। কর্তাকে ঘরে না পেয়ে গিন্নি খুব অপমানিত বোধ করেন। এবং তখনই তিনি ফিরে যান স্টেশনে। রাত এগারোটার ডাউন ট্রেন ধরে সোজা কলকাতা। দশ টাকা বকশীষ পেয়েছিল ইয়াসিন। মেমসাহেবকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সে গিয়েছিল আলোকপুরে,—সুদর্শনকে খবরটা দিতে। প্রণয়িনীর ঘরে বসে ম্যানেজার তখন মদ গিলছিল। ইয়াসিন খবর দিতে এসেছিল বলে তাকে মারতে বাকী রাখে।' ম্লান হেসে রাজীব বলল, 'ইয়াসিন আমাকে কি বলল জানো সুব্রত? কি তাজ্জব বাত দেখুন ইন্সপেক্টর-সাব, বিবি গোসা করে চলে গেল—তো সাহেবের এতটুকু দুখ নাই।'......

গাড়ী ফিরছিল মথুরাপুরের দিকে। ড্রাইভারের পাশে রাজীব। পিছনের সীটে শচীন্দ্রলাল আর সুব্রত। সেও মথুরাপুর যাচ্ছে। এস-ডি-পি-ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে বলে।

দু'পাশে ঘরবাড়ী। দিকনগরের মানুষজন। বাজারে কর্মব্যস্ত লোকের গুঞ্জন। আর একটু পরেই বাসস্ট্যাণ্ডটা পড়বে।

হঠাৎ সুব্রত বলল, 'কিন্তু রাজীবদা, আপনি আর দুটো চিঠির রহস্য কিন্তু ফাঁস করেন নি।'

'আবার কোন্ চিঠি?'

'কেন তরঙ্গের মা যে চিঠিটা পেয়েছিলেন। নিখিলেশের সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা ছিল ওতে?'

রাজীব হেসে বলল, 'ওটা বোধহয় প্রভার কীর্তি। তুমি ওকে পরে জিজ্ঞেস করো। নিশ্চয় স্বীকার করবে।'

'আর হাজব্যাণ্ডের লেখা চিঠিখানা? হাজব্যাণ্ডটি কে রাজীবদা?'

রাজীব মুচকি হাসল। মথুরাপুরগামী একটা বাসে পরিচিত একটি রমণীমূর্তি চোখে পড়ল। আর একটু পরেই বাসটা ছাড়বে।

মেয়েটির দিকে অঙ্গুল বাড়িয়ে রাজীব বলল, 'ওকে চেন সুব্রত?'

'চিনি বৈকি রাজীবদা। ওই তো টেলিফোন অপারেটর সুজাতা দাস।'

হ্যাঁ, চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে ও। হাজব্যাণ্ড বলে সইকরা চিঠিটা ওরই লেখা। আংটিটাও ওরই প্রেজেন্টেশন।'

'বলেন কি রাজীবদা? সুজাতাই হাজব্যাণ্ড?' সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করল।

'হ্যাঁ, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে সই পাতায়, বকুলফুল পাতায়, আরো কত কি। সুজাতা বর-বউ সম্পর্ক পাতিয়েছিল তরঙ্গের সঙ্গে। মেয়েটা আসলে একটা ট্রাইবেড্।' একটু হেসে বাসের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল রাজীব, 'পুওর লেসবিয়ান।'

সুজাতা ওদের দেখেনি। সে তাকিয়েছিল শূন্যে আকাশের দিকে। আশ্বিনের রৌদ্রস্নাত নীল আকাশ। রাজীব জানে সুজাতার দৃষ্টিটাই এমনি। আকাশের অনেক নীচে মাটির পৃথিবী। ঘর-বাড়ী, সবুজ ধানক্ষেত, মেয়ে-পুরুষের হাসিখুশী, পরিহাস উত্তাপ,—সব এখানেই।

আকাশের দিকে চাইলে শুধু শূন্যতা,—পূর্ণতা নেই।

(সমাপ্ত)

এক লিপি অনেক ভাষা

আশিস সান্যাল

ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার সমাধানের সূত্র হিসেবে সম্প্রতি আবার এক লিপি প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন মহলে একটা দাবী উঠেছে। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের অন্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশের সিং দিল্লিতে এক সভায় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই লিপি প্রবর্তিত হলে ভারতীয় ভাষা সমস্যা সমাধানের পথ অনেকটা সুগম হবে। লিপির ক্ষেত্রে তিনি 'দেবনাগরির' পক্ষপাতী। 'দিনমান' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রখ্যাত হিন্দি কবি 'অজ্ঞের'ও এই মতের সমর্থক। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, 'দেবনাগরির' ভাওয়েল সিস্টেমের সঙ্গে অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার ভাওয়েল সিস্টেমের একটা সঙ্গতি আছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে একলিপি প্রবর্তনের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করে আসছেন। অবশ্য লিপির ক্ষেত্রে তিনি রোমান লিপি প্রবর্তনের পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। শ্রীমুলকরাজ আনন্দও সম্প্রতি এক প্রবন্ধে ভারতীয় ভাষায় এক লিপি এবং রোমান লিপি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন।

এক লিপি প্রবর্তনের দাবী শুধু ভারতেই নয়, পাকিস্থানেও শোনা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে ঢাকায় জনসভায় এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান পাকিস্থানে এক লিপি প্রবর্তনের দ্বারা পাকিস্থানী সংহতি দৃঢ়তর হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, লিপিটি হবে উর্দু। করাচীর একটি উর্দু লেখক সংস্থা প্রেসিডেন্টের এই অভিমতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রতিবাদ করেছেন পূর্ব বাংলার মানুষেরা।

দেখা যাচ্ছে, এক লিপি প্রবর্তনের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের অনেক লেখক, রাজনীতিবিদ ও চিন্তাশীল মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছেন। অবশ্য লিপির ক্ষেত্রে কোন লিপিটি সুবিধাজনক সে নিয়ে মত-ভেদের অন্ত নেই। ভারতে দেবনাগরি এবং রোমান আর পাকিস্থানে উর্দু এবং রোমান—আপাততঃ একলিপির ক্ষেত্রে এ' কটি লিপির কথাই বিশেষভাবে শোনা যাচ্ছে। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে যথেষ্ট অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। এক লিপি গ্রহণের দ্বারা যদি ভাষা সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হয় এবং সংহতির ভিত্তি দৃঢ়তর হয়, তাহলে বোধহয়, কোন বিবেকবান নাগরিকই তাতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু এক লিপির ক্ষেত্রে অন্ধ প্রাদেশিক বোধ দ্বারা পরিচালিত হলেও, সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জটিলতাই বৃদ্ধি করবে। যথেষ্ট সহনশীলতা এবং সংবেদনশীল মন নিয়েই তাই বিষয়টি অনুধাবনায় অগ্রসর হতে হবে।

।। এক ।।

ভারতীয় ভাষা সমস্যার সমাধানের সূত্র হিসেবে এক লিপি প্রবর্তনের দাবীটি যে শুধু সম্প্রতি কালেই শোনা যাচ্ছে, এমন নয়। প্রায় দুইশত বৎসরকাল এ নিয়ে আলোচনা চলে আসছে। অবশ্য সে সময়ের আলোচনা ছিল প্রধানতঃ রোমান লিপিকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েই ভারতে দেবনাগরি এবং পাকিস্থানে উর্দু লিপির দাবী উঠেছে। যাই হোক, এক লিপি এবং রোমান লিপি প্রবর্তনের জন্য সুদীর্ঘদিন ধরে যে আলোচনা চলে আসছে, তা প্রসঙ্গত এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৭৮৮ খৃঃ স্যর উইলিয়ম জোনস ভারতীয় ভাষাসমূহকে রোমান লিপিতে অগ্রসর হন। এরপর চার্লস ট্রিবিলন, ডকটর ডফ, মিস্টার টমাস প্রমুখ তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরেজ এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। তৎকালীন সুধীজনের অনেকেই রোমান লিপি ব্যবহারের দ্বারা ভাষা সমস্যার কতদূর সমাধান হবে, সে নিয়েও যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করেছেন। *১ ভারতীয় ভাষায় রোমান লিপি সর্বাধিক উদ্যোগী হয়েছিলেন ইটন কলেজের সহকারী শিক্ষক ট্রু সাহেব। লাহোরে এই সময়ে একটি 'রোমান-উর্দু' সমিতিও স্থাপিত হয় এবং ঐ নামের একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ট্রু সাহেবের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রস্তাবের মর্ম ছিল যে, ভারতীয় ভাষা-সমূহের ঐক্য সম্পাদনের জন্য রোমান লিপি ব্যবহার করা উচিত। এই মতের সমর্থনে তিনি যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তা বর্তমান আলোচনার সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(ক) রোমান বর্ণমালার মত অল্পাক্ষর অথচ সব কথা লিখবার উপযোগী বর্ণমালা আর দৃষ্ট হয় না। এতে বাংলা বা হিন্দির মত সংযুক্ত অক্ষর নেই এবং উর্দুর মত নোক্তা (বিন্দু) বিশিষ্ট বেশি বর্ণ নেই। এতে প্রতিটি অক্ষর পৃথক পৃথক থাকে।

(খ) রোমান বর্ণমালা প্রাচ্য বর্ণমালার সগোত্র অর্থাৎ একই বংশসম্ভূত। প্রাচ্য ভাষাসমূহের বর্ণ বিন্যাসের সঙ্গে রোমান বর্ণমালা সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলেছে।

(গ) মুদ্রাঙ্কন ব্যয় যত কম হয়, ততই জ্ঞান-সভ্যতা এবং ভাষার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। রোমান লিপিতে মুদ্রাঙ্কন ব্যয় লাঘব হবে এবং এই অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকগুলি যত সুন্দর হয়, ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকে তা অল্পই হয়ে থাকে।

(ঘ) ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত এমন বহু বিদেশী শব্দ আছে, যেগুলি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং মূল পরিভাষা সম্বন্ধে অনেক ভ্রম জাগে। রোমান লিপি ব্যবহার করলে তার অনেকগুলিই রক্ষিত হবে।

ট্রু সাহেবের এই অভিমতগুলি যে খুবই যুক্তিপূর্ণ, তাতে সন্দেহ নেই। শুধু সেকালের পণ্ডিতরাই এর অসারতা প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের মতামতও প্রসঙ্গত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাষায় প্রকাশিত ক্ষুদ্রতম ধ্বনি প্রকাশক চিহ্নের নাম হচ্ছে বর্ণ। উচ্চারণের ভিত্তিতেই ভাষায় বর্ণমালার সৃষ্টি। ভারতীয় ভাষায় এমন অনেক উচ্চারণ আছে, যা রোমান লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর জন্য রোমান লিপিতে কিছু নতুন বর্ণমালা সৃষ্টি করতে হবে অথবা বর্তমানের লিপিতে বিশেষ সঙ্কেত সংযোগ করতে হবে। যদি তাই হয়, তাহলে অঞ্চল বিশেষে উচ্চারণের বিভিন্নতা অনিবার্য। ইংরেজি ভাষায় রোমান হরফের যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ আছে, তার কারণ সুদীর্ঘদিনের অভ্যাস। এই প্রসঙ্গে ডঃ লাইটনর লিখেছেন—'ইংরেজেরা যে রোমান অক্ষরে লিখিত স্বভাষা বিশুদ্ধরূপে পাঠ করেন, তাহা কেবল বহুকালকৃত অভ্যাসের ফল। অভ্যাসের বশেই তাঁহারা light কে 'লাইঘট' না পড়িয়া 'লাইট'রূপে পাঠ করেন।' শুধু তাই নয়, রোমান লিপি আরও কয়েকটি জটিলতা বৃদ্ধি করবে। যেমন 'জি'এর উচ্চারণ ভারতীয় ভাষায় হবে 'জ' কিন্তু ইংরেজিতে হবে 'গ'। 'এবং একই সঙ্গে বাংলা-ইংরেজি লিখতে গেলে ছেলেদের তালগোল পাকিয়ে যাবে। তাছাড়া একই লিপির জন্য যদি স্বতন্ত্র উচ্চারণই লিখতে হয়, তাহলে স্বতন্ত্র লিপিতেই বা ক্ষতি কি?'

রোমান লিপিতে ফরাসী প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষা লিখিত হয়। তা সত্ত্বেও একজন ইংরেজের পক্ষে রীতিমত অধ্যয়ন না করে ফরাসীভাষা শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না। রোমান লিপি গ্রহণের বিপক্ষে সেকালে আরও একটি মত বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ডঃ রাজেন্দ্রলাল

---

*...ভারতীয় ভাষাসমূহে এমন অনেক উচ্চারণ আছে, যাহা বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহাদের প্রকাশের নিমিত্ত কতকগুলি নূতন রোমান বর্ণের আবিষ্কার করিতে হইবে অথবা বর্তমান অক্ষর নিচয়ে বিশেষ সংকেত সংযোগ করিতে হইবে।' —ডঃ লাইটনর।

*...বাবেলস্তম্ভ নির্মাণ করিবার সময় মানবজাতির উপর যে শাপ নিপতিত হয়, তাহা অদ্যাপি আমাদের প্রভুতা করিতেছে, অতএব একণে একরূপ ভাষা বা একরূপ বর্ণমালা প্রচার করিবার প্রয়াস বিফল মাত্র।' —ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র [জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৬৪]

* যদি আমাদের বর্ণমালা সংস্কার করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন কি? অতএব প্রথমে বর্ণমালায় সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত।' —বঙ্গদর্শন [পৌষ, ১২৫৮]

মিত্রের ভাষায় তা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

> The benefits which European scholars, officials and missionaries are to derive by substituting the Roman characters in their writing and printing the Indian dialects, are what have been most elaborately, but little consideration has been shown as to the advantage which the native are to derive by accepting the Roman as a substitute for their national alphabet".

পরাধীনতার নাগপাশ এখন আমরা মুক্ত হয়েছি। এখন আমাদের জাতীয়তাবোধের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটেছে। একালের দৃষ্টিতে হয়ত তাই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মনোভাবের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত হব না। উপরে বর্ণিত রোমান লিপি ব্যবহারের পক্ষে ও বিপক্ষের অভিমতগুলি সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ কথাই বলা যায়। ভারত-বিভাগ, ভারতীয় ভাষাগুলির অগ্রগতি, নতুন জাতীয়তাবোধ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেই তাই বর্তমানে রোমান লিপি ব্যবহারের এবং তার বাস্তব সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

॥ দুই ॥

ইংরেজি ছাড়া ভারতে বর্তমানে সংবিধান-স্বীকৃত পনেরটি ভাষা আছে। এই ভাষাগুলির অধিকাংশেরই বর্ণমালা খুব জটিল। এতে নানাবিধ বর্ণ এবং যুক্তাক্ষর থাকায় তা লিখতে বা মুদ্রণে সময়ের প্রয়োজন হয় বেশি। রোমান লিপি গ্রহণ করলে ভারতীয় ভাষা এইসব জটিলতা থেকে মুক্ত হবে। অবশ্য এর জন্য বর্তমানে রোমান বর্ণমালায় কয়েকটি নতুন চিহ্ন যোগ করতে হবে। রোমান লিপি প্রবর্তনের প্রস্তাবকরা এ সম্বন্ধে বলে থাকেন—"আপাততঃ ভারতীয় ভাষা লিখবার জন্য কতকগুলি চিহ্নের যোগ করতে হবে বটে, তবে পরে ভারতীয়রা যখন এর সম্যক পরিচয় লাভ করবে, তখন আর সে সকল চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। এইসব চিহ্ন ত্যাগ করলে বর্ণমালার সর্বাধিক সৌকর্য প্রকাশিত হবে।" রোমান লিপির এইসব সুবিধা থাকলেও কয়েকটি ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়। এই প্রশ্নগুলি বিশেষভাবে দেবনাগরি লিপির সমর্থকরা তুলে থাকেন। প্রশ্নগুলি পর্যায়ক্রমে সাজালে দাঁড়ায়—

ক) বর্ণের নতুন উচ্চারণ সৃষ্টি করতে হবে।

খ) নতুন বর্ণ বা চিহ্ন প্রবর্তন করতে হবে।

গ) ভারতীয় ভাষার সমস্ত উচ্চারণ প্রকাশের পক্ষে এই লিপি বিজ্ঞানসম্মত নয়।

এই অভিমতগুলির যৌক্তিকতা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। দেবনাগরি ও রোমান লিপির সুবিধা ও অসুবিধার কথা পরে আলোচনা করা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। এক লিপি প্রবর্তিত হলেই যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা বিনা অধ্যাবসায়ে জানা বা বলা সম্ভব হবে, এমন নয়। ভাষাগুলি অন্তত বিশেষে উচ্চারণের মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব হবে না। ফরাসী ভাষা রোমান লিপিতে হওয়া সত্ত্বেও, একজন ফরাসীভাষী বা ইংরেজিভাষী ব্যক্তি বিনা অধ্যাবসায়ে ফরাসী বা ইংরেজি বলতে পারেন না। বহু ভারতীয় ইংরেজি জানেন, কিন্তু ফরাসী ভাষা পড়তে বা বলতে পারেন না। লিপি শিখবার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করা যার পক্ষে সম্ভব নয়, তার পক্ষে অন্য ভাষা শিক্ষাও সম্ভব নয়। 'বঙ্গদর্শনে' এ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, "যিনি অল্প সময় ব্যয়ে বর্ণমালা শিক্ষা করিতে অক্ষম, তিনি যে ভাষা শিক্ষা করিবেন, তাহা কখনই হইতে পারে না।"

বর্ণমালা শিখলেই যে কোন ভাষা জানা যায়, একথা বোধ করি কোন সহৃদয় ব্যক্তিই বলবেন না। কিন্তু ভারতের বর্তমান ভাষা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে অন্য কয়েকটি দিকও ভাবনার প্রয়োজন আছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন লিপি প্রবর্তিত থাকার ফলে, যখন এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে যায়, তখন কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। ভাষা না জানলেও রাস্তার নাম, জায়গার নাম বা তার পরিচিত ব্যক্তির নাম তার পরিচিত লিপির মাধ্যমে হলে সহজেই সে অনুসরণ করতে পারে। রোমান লিপি প্রবর্তিত হলে অন্ততঃ সেই সব অসুবিধা দূরীভূত হবে। আবার ভারতের কয়েকটি ভাষার মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড়। রোমান লিপি প্রবর্তিত হলে এই সব ভাষার মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। যেমন—বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া। রোমান লিপি প্রবর্তিত হলে এইসব ভাষার কিছু কিছু অংশ সেইসব ভাষাভাষীদের পক্ষে অনুসরণ করা দুরূহ হবে না। অনুরূপে হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি বা তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ভাষাগুলির সম্পর্ক নিবিড়তর হবে।

এখন যে প্রশ্নটি উপরে উত্থাপন করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গটি বিস্তারিত করা যাচ্ছে। অর্থাৎ এক লিপি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও কেন রোমান লিপির কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে? এ ব্যাপারে প্রথমেই এই দুই বর্ণমালার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলার মত দেবনাগরি বর্ণমালাও খুব জটিল। যুক্তাক্ষর এই বর্ণমালায় জটিলতা আরো বৃদ্ধি করেছে। ভাষার প্রধান দাবী সরলতা এবং এই সরলতা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার। ভাষাকে যদি সময়ের উপযোগী করতে হয়, তাহলে অকারণ জটিলতা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। বর্ণ-সংখ্যা বেশি থাকলে টাইপরাইটিং বা টেলিগ্রামের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। যুক্তাক্ষরও এই জটিলতাকে বৃদ্ধি করে। কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অবশ্য এরই মধ্যে যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লেখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলায় এই প্রচেষ্টা বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা লিপি সমস্ত প্রকার জটিলতা মুক্ত নয়। দেবনাগরি লিপি সংস্কার করে যদি গ্রহণ করা যায়, তাহলেও রোমান লিপির মত সুবিধাজনক হবে না।

এ ছাড়াও ভারতীয় ভাষায় দেবনাগরি লিপি প্রবর্তনের পক্ষে আর একটি আপত্তি আছে। এই লিপি ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত হলে পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষার একটা বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠবে। দেবনাগরি লিপি কখনই পাকিস্থানে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এ ক্ষেত্রে দেখা যাবে, বাংলা ভাষাই পশ্চিম বাংলার বাঙালীর কাছে অপরিচিত বলে ঠেকছে।

॥ তিন ॥

ভারতের ভাষা সমস্যা সমাধানের সূত্র হিসেবে এক লিপি এবং রোমান লিপির সুবিধার কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও এই লিপি প্রবর্তনের পূর্বে বিশেষভাবে ভাবতে হবে বলে মনে হয়। কেননা, ভারত ও পাকিস্থান—এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোন রাষ্ট্রে এক লিপি প্রবর্তিত হয়, তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুই বাংলা। দেশ বিভাগের যুপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত দুই বাংলার ভাষার সংযোগসূত্র হবে ছিন্ন। আর পরিণামে সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভারতে যদি একলিপি প্রবর্তিত হয়, আর পাকিস্থানে না হয়—তাহলে পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষায় যে লিপি ব্যবহৃত হবে, পূর্ব বাংলায় তা হবে না। অনুরূপে পাকিস্থানে এক লিপি প্রবর্তিত হলে পশ্চিম বাংলার ভাষার সঙ্গে পূর্ব বাংলার ভাষা হয়ে পড়বে বিচ্ছিন্ন। তাই লিপি প্রবর্তনের উদ্যোগ দুই রাষ্ট্রের যুগ্ম পরিচালনায় হওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণীয় লিপি নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ দেবনাগরি বা উর্দু এ দুটির কোনটিই উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতে এক লিপি হিসেবে যেমন উর্দু লিপি কখনই স্বীকৃতি লাভ করবে না, তেমনি পাকিস্থানেও দেবনাগরি লিপি স্বীকৃত হবে না। ভারতে দেবনাগরি বা পাকিস্থানে উর্দু লিপি প্রবর্তনের জন্য যাঁরা দাবী করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। তাঁদের দাবী মূলতঃ রাজনৈতিক অভিলাষের দ্বারা পরিচালিত। অথচ আমরা পাকিস্থানে উর্দু লিপি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিবাদী কন্ঠের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে যে পরিমাণ সোচ্চার প্রতিধ্বনি তুলছি, সেই পরিমাণ নীরবতা পালন করছি ভারতে দেবনাগরি লিপি প্রবর্তনের প্রস্তাব সম্পর্কে। এই অদ্ভুত মানসিকতা পরিবর্তনের সময় এখন আগত। ভাষা সম্পর্কে যে কোন বিবেকবান নাগরিককেই এখন সচেতন হতে হবে। তবে এই সচেতনতা যেন অন্ধ প্রাদেশিকতায় রূপান্তরিত না হয়, সেদিকেও সর্বদা দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি উভয় রাষ্ট্র যুগ্মভাবে এ ব্যাপারে অগ্রসর না হয়, তাহলে কি হবে? অতি সহজেই বলা যায়, ততদিন এ ব্যাপারে আমাদের অত্যধিক উৎসাহের প্রয়োজন নেই। ততদিন বিভিন্ন প্রাদেশিক বর্ণমালার সংস্কার সাধনের দ্বারা লিপিমালাকে সময়োপযোগী করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেই চলবে। ...

অঙ্গনা

সকল কাজে

অফিসপাড়া এক বিরাট যজ্ঞশালা। এখানে শুধু অফিসে অফিসেই কাজ হচ্ছে না। বাইরে, আশে-পাশেও কাজ হচ্ছে। আর তার সবটাই হচ্ছে বেঁচে থাকার লড়াই। বাঁচতে হলে কাজ করতে হবে। তাই যাঁরা অফিসে জায়গা করে নিতে পারে নি বাইরেই তাঁরা নিজেদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। কাজে-অকাজে অনেকদিন এ পাড়ায় এসেছি-গেছি। বড় বড় অফিসগুলির দিকে একনজর তাকিয়েছি। হয়তো বুক চিরে এক-আধটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এসেছে। এই বিরাট কর্মশালায় কোথাও নিজের জন্য একটা পাকা সীটের বন্দোবস্ত করতে পারলাম না। এ জন্মে অফিসপাড়ার স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলাম। এ যে কি আপশোষ বলে বোঝানো যায় না। তাই এ পাড়ায় যখন আসি ঘুরে-ফিরে বেড়াই। বাইরে থেকে অফিসগুলি দেখি আর আশে-পাশের দোকানী ও বাইরের 'উটকো' পশারীদের দেখি। এরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। অফিসের বাবুদের মত আমার দৃষ্টিতে এরাও অভিন্ন।

এদের ধারে-কাছে ভিড় সব সময়ই লেগে আছে। কিন্তু মজার জমায়েত শুরু হয় টিফিন আওয়ার্সে। দোকানে দোকানে খদ্দের তখন উপচে পড়ে। এত লোকের ঠাঁই দেওয়া ওদের কম্ম নয়। তা যতই সে দোতলা কি আরো বহুতলা হোক না কেন। উপচে-পড়া এই ভিড়কে সামাল দেবার জন্য রয়েছে বাইরের পশারীরা। তাঁদের ভাণ্ডারেও মজুত রয়েছে কত না বিচিত্র খাদ্য-সম্ভার। দোকান ঘুরে যে জিনিস পাওয়া যাবে না অনেক সময় তারও সন্ধান মেলে এদের কাছে। অফিসের বাবুদের মেজাজ এরা বুঝে গ্যাছে। তাই খাবারও আনে সেরকম। পাটিশাপটা থেকে শুরু করে ঘরে তৈরি আরো কত মনোহর এবং রসনাতৃপ্তিকর জিনিসই না পাওয়া যায় এদের কাছে। আবার দামেও দু পয়সা কম। ইদানীং বাবুরা তাই ভিড় জমান এদেরই চারপাশে।

এখানেও আবার একটা লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। সবসময় এ'রাও বাবুদের দাবী পুরিয়ে উঠতে পারে না। অফিস আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই টুকটাক বিক্রি হয়। টপ বিক্রি টিফিন আওয়ার্সে। মাল নষ্ট হবার ভয়ে এরা কখনো বেশি জিনিস আনে না। তাই প্রায়ই পীক আওয়ার্স শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এদের ঝাঁকা নিঃশেষ হয়ে আসে। একটু লেট হলেই তাই পছন্দসই খাবারটা আর পাওয়া যায় না। অনেককেই হতাশ হতে হয়। ওরা বাবুদের মন জোগায়, কাল থেকে আরো বেশি মাল আনবো।

রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য প্রথম মহিলা

'বড়রা ভাল হলে ছোটরা কিছুতেই খারাপ হতে পারে না। আমরা ঠিক থাকলে সবাই ভালভাবে পড়াশুনো করবে।' এ উক্তি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীর। কথা হচ্ছিল লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষার ঘরে বসে। কলকাতার নামকরা মহিলা কলেজ, শুধু পার্ক সার্কাসের নয়, বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর মহিলা কলেজ লেডি ব্রেবোর্ণ—একদা বাংলা দেশের গভর্নরপত্নীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারের জন্য কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; শিক্ষিকারা ছিলেন হিন্দু, অধ্যক্ষা ছিলেন মিস গ্রোস। ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। ১৯৩৯ সালের জুলাইয়ে ৩৫ জন ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৬৮ সালের আগস্টে ৯৫০ জনে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসেই শিক্ষা শেষ করে অক্সফোর্ড থেকে দেশে ফিরেছিলেন শ্রীমতী রমা চৌধুরী—প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর স্ত্রী। লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই তিনি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত। মিস গ্রোসের পর শ্রীযুক্তা সুনীতি গুপ্তা এই কলেজের অধ্যক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকে অধ্যক্ষা পদে রয়েছেন ডঃ শ্রীমতী চৌধুরী।

কথা প্রসঙ্গে তাই বলছিলেন তিনি—দীর্ঘ তিরিশ বছর এই কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি আমি। যেন একটি পরিবারের মত হয়ে গেছি সবাই। সন্তানের স্নেহ রয়েছে আমার এই প্রতিষ্ঠানটির উপর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নিম্নতম কর্মচারী থেকে প্রবীণা অধ্যাপিকা পর্যন্ত। আর সেই সঙ্গে ছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং আপনজনের মত মমতার কথা বলতে বলতে গর্বে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডঃ চৌধুরীর।

বললেন—তুমি এই কলেজের মধ্যে কোথাও কোন নোংরা দেখতে পাবে না, দেখতে পাবে না এত বড় বাড়ীর দেওয়ালে একটু দাগ। ঢুকলেই তুমি বুঝতে পারবে কোথায় এসেছ। কথা বলতে বলতে বললেন আবারও—রবীন্দ্রভারতীর বর্তমান উপাচার্য অসুস্থ হওয়ায় হঠাৎই আমাকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল। এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে আমার সেবার স্বীকৃতি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আমায় কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন। এ তাঁদের অশেষ স্নেহ। তবু বলব—আজ এদের ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কথাটা মিথ্যা যে নয় সে প্রমাণ তাঁর আবেগমথিত কণ্ঠস্বরেই শুধু পাই নি, কথার ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম—নতুন পুরনো ছাত্রী এবং অধ্যাপিকার দল আসছেন ছলছল চোখে—রমাদি আপনি চলে যাবেন!

যদি আমার কথা কিছু সত্যিই লিখতে চাও, আমার কলেজের কথা বাদ দিয়ে লিখো না। কলেজকে বাদ দিয়ে আমার কিছু নেই—বললেন ডঃ চৌধুরী।

কথাটা সত্যিই. রমা চৌধুরী আর ব্রেবোর্ণ কলেজ দুটি ভিন্ন নয়। একটি নাম উচ্চারণ করলেই আর একটি অনাড়ম্বর মানুষের মুখ ভেসে উঠবে মানসপটে। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী ও স্বর্গীয় সুধাংশুমোহন বসুর কন্যা ডঃ রমা চৌধুরী ভারতীয় শিক্ষিত মহিলাসমাজে একটি উজ্জ্বল নাম। বৈদিক সাহিত্যে নারী—এই গবেষণা করে বিদগ্ধসমাজে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা। শিক্ষাজীবনে দর্শনশাস্ত্রে রেকর্ড নম্বর পেয়ে ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা—যিনি অক্সফোর্ডের ডি-ফিল উপাধি পান। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রাচ্যবাণীর যুগ্ম প্রতিষ্ঠাত্রী, সম্পাদিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যাও তিনি।

—বিশেষ প্রতিনিধি

তারপরই গলাটা খাটো করে বলে, তাহলেও একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। অনেক বাবুর এদিকে নজর কিনা।

টিফিন আওয়ার্সে অফিসপাড়া তাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। এমনিতেই এ জায়গাটা সম্বন্ধে একটা বিরাট কৌতূহল আছে। কিন্তু এ সময়টাতে এখানে এলে আমি সকলের সঙ্গে কি রকম একাত্মতা অনুভব করি। ওদের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে খাবার কিনে খাই, নানা কথার ঝাঁপিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করি।

এবার কিন্তু আমার কৌতূহল চরিতার্থতার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সেদিনও এমনি করে ভিড়ে মিশে গিয়ে খাবার কিনে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ নাম ধরে ডাকতেই পিছন ফিরে দেখি আমার এক কলেজের বন্ধু। ওকে দেখেই মনে পড়ে গেল আমরা দুজনে কি রকম ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে ধরতাম। পায়ে-পায়ে ও আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। একথা-সেকথার পর জানতে চাইলো, কোন অফিসে কাজ করি। শুধু অফিসপাড়ার মোহে এবং খাবার লোভে আমি এখানে আসি ও তো অবাক। আমাকে টানতে-টানতে ওর অফিসে নিয়ে গেল। একটা চেয়ারে বসতে দিল। চাকরি না হোক অফিসপাড়ার একটা অফিসে এসে বসতে পেরেছি এতেই তখন মনে আমার আনন্দের জোয়ার। ও আমাকে বলে দিল, অফিসপাড়ায় এলে আমি যেন ওর সঙ্গে দেখা করি। এরকম একটা সুযোগ যখন পাওয়া গ্যাছে তখন দেখা তো করবোই। মনে মনে ভাবি, এবার ভিনপাড়ায় আসছি, এরকম ভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাছাড়া এখানে এলে নানারকম খাবার দেখে দেখে খাওয়াটা এমনিতেই একটু বেশি হয়ে যায়। তারপর বিশ্রামও দরকার হয়ে পড়ে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে এখানে খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে অন্যকিছু ভাবা যাবে। এত সব কথা ভেবে মনে মনে তখন স্বস্তি পাচ্ছি। হঠাৎ বন্ধুটি বলে বসলো, তোর সেই পেটুক স্বভাবটা এখনো আছে দেখছি। আমি লজ্জায় লাল হয়ে যাই। অন্য প্রসঙ্গ আনি। ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, তা একদিন আর না অফিসপাড়ায় তোকে ভোজ খাওয়াব। এই-টুকুই যথেষ্ট। আসব তো নিশ্চয়ই।

এর পর দু-একদিন সবে অতীত হয়েছে। এক দুপুরে আমি সটান বন্ধুর অফিসে এসে হাজির। হাসিমুখে ও আমাকে স্বাগত জানালো। আমার জন্যে সেদিন একটু তাড়াতাড়িই টিফিনে বেরিয়ে পড়লো। ব্যাপারটা নিমন্ত্রণ। তাই ঘোরাঘুরি একটু বেশি। তাছাড়া বিলম্বে হতাশ হওয়ার সম্ভাবনা আমার চেয়েও ওর ভাল জানা।

দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। একটু ঘুরে আমরা এসে হাজির হলাম এক ভদ্রমহিলার কাছে। অফিসপাড়ায় তিনি নিয়মিত খাবার নিয়ে আসেন। তাঁর সামনে গোটা-চারেক হাঁড়িতে ঢাকা

রয়েছে নানা খাদ্যসম্ভার। আমার আর তর সয় না। হাঁড়ির ঢাকনা সরিয়ে দুটো করে ক্ষীরের পাটিশাপটা তখন পাতে পড়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাচ্ছি। নলেন গুড়ের মিষ্টি স্বাদ পাচ্ছি। এর পর দুটো পুলিপিঠে। এরকম খাবার পেয়ে তখন প্রায় আমার উল্লাসে ফেটে-পড়ার কথা। পাটিশাপটা এর আগেও পাড়ায় আমি খেয়েছি। কিন্তু শীতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষীরের এ বস্তুর কথা ভাবতেও পারি নি। এর পর পাতায় পড়লো দুটো সর-পুরিয়া। সরপুরিয়া খাওয়ার আগেই আমি আবার পাটিশাপটার অর্ডার দিয়েছি। আমার বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

গাপগুপ খেয়ে যাচ্ছি তাই নয়। সেই মহিলার সঙ্গে নানা-রকম কথাও হচ্ছিল। তিনি রোজ খাবার নিয়ে আসেন কৃষ্ণনগর থেকে। টিফিন শেষ হয়ে গেলেই তিনি বাড়ি যান। রাত জেগে খাবার তৈরি করেন। আবার সকালে কলকাতা পৌঁছে যান। এরকম চলছে বেশ কিছুদিন। এর আগে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। তারপর অফিসপাড়াকেই নির্বাচন করে নিয়েছেন। কথায় কথায় জানতে পারি, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই খাবার বিক্রি করেন। স্বামী বসেন আরেক অফিসপাড়ায়। তবে স্ত্রীর আয়টাই বেশি। আর এখানে জিনিস বিক্রি হতে সময় বেশি লাগে না।

আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই।

চলতে চলতে বন্ধু জানতে চাইলো, খাওয়া কিরকম হয়েছে। আমি ঘাড়টা একটু বেশ লম্বা করে নাড়লুম। ও নিঃশব্দে হাসলো। তারপর নিজেই বলে যেতে লাগলো, এবার কিছু স্বাস্থ্যকর জিনিস খাওয়া দরকার। শুধু জিভের লোভটা সামলালেই তো চলবে না। আমি ভাবলাম হয়তো ফলটল খাওয়ার কথা বলছে। কিন্তু আমরা হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে পৌঁছে গেছি কাঁচা ছোলা ও বাদাম ভাজার সমারোহমণ্ডিত এক মহিলার কাছে। দামদস্তুরের বালাই নেই। দশ পনের বিশ পয়সার প্যাকেট সাজিয়ে রেখেছেন। যার যেমন খুশি। আমাদের মত নবাগতদের নিয়েই যা বিপদ। নিজের খদ্দেরদের উনি চেনেন। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই দুটো পনের পয়সার ভিজে ছোলার ঠোঙা হাতে ধরিয়ে দিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই চিবুচ্ছি আর গল্প করছি। বেশ ভাল দাঁতের স্বাস্থ্যচর্চাও হয়ে যাচ্ছে। ছোলা শেষ হবার পর বাদামভাজার পালা। আমি কিন্তু ততক্ষণে বুঝে গেছি এই হচ্ছে বন্ধুর নিত্য খাদ্যতালিকা। খাওয়ার ওর সুনামও আমারই মত।

দু'জনে প্রায় চুপচাপ বাদামভাজা চিবুচ্ছি। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো মহিলাটির কথায়। তিনি অভিযোগ করলেন, আজকাল ও'দের বিক্রি অনেক কমে গ্যাছে। নানারকম খাবারের জৌলুষে নগণ্য ছোলা আর বাদামভাজার দিকে নজর দেবার সুযোগ কারো হয় না। অথচ বছরখানেক আগেও কি বিক্রিটাই না হতো। বাইরে থেকে আসা মেয়েদের খাবারের দৌলতেই এটি হচ্ছে। ওরা তো আসতে শুরু করেছে সম্প্রতি। আমি আছি ও'দের অনেক আগে থেকে।

কথার জের টেনে সেই মহিলা বলে চলেন, আর দিনকাল যা পড়েছে ঘরে-বাইরে আয় না হলে বাঁচার উপায় নেই। আমার স্বামী কাজ করেন কারখানায়। আর আমি এখানে বাদাম-ছোলা বিক্রি করে যা পাই তাতে সংসার অবশ্য মন্দ চলে না। তবে ছেলেটা স্কুল থেকে ফিরে আমাকে দেখতে পায় না। এটাই যা দুঃখ। কারণ ছুটি পর্যন্ত আমার বিক্রি চলে। তাই আমার ডিউটি ঠিক অফিসের মতই।

খাওয়াটা বেশ চাপ হয়ে গ্যাছে। কিন্তু কথাটা তক্ষুনি মুখ খুলে বলতে পারছিলাম না। বন্ধুর প্রস্তাবে তাই বেশ আশান্বিত হলাম। এরকম খাওয়ার পর পান না খেলে ঠিক মানায় না। পা চালিয়ে দিলাম। এক অফিসের ফুটপাত-লাগোয়া এক চিলতে জায়গায় ভদ্রমহিলা পানের ডালা সাজিয়ে বসেছেন। বাবুদের জন্য সিগারেট-বিড়ির বন্দোবস্তও আছে। আমরা দুটো মিষ্টি পান নিয়ে মুখে পুরে বেশ আরাম করে চিবুচ্ছি। দেখলাম, ভদ্রমহিলার বিক্রি মন্দ নয়। তাছাড়া পান-বিড়ি-সিগারেটের চাহিদা তো সারাদিনের।

কিন্তু ভদ্রমহিলার বেশ বয়স হয়েছে। এই বয়সেও পেট চালানোর তাগিদে তাঁকে অফিসপাড়ায় নিয়মিত হাজিরা দিতে হচ্ছে। যদিও তাঁর কোন হাজিরা খাতা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি খুব পাংচুয়াল। কারণ তাঁর কামাই হলে সেদিনের রুজিটাই মার যাবে। এসব তিনি বলে যাচ্ছিলেন আপন মনে। কথায় কথা বাড়ে। তিনি আরো জানালেন, এই বুড়ীকে দেখবার কেউ নেই। ভাগ্যের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস। তাই নিজেকেই নিজের ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে। লোকের বাড়ি খাটার চেয়ে এ অনেক ভাল। হাজার হোক এটা ব্যবসা। আর আমরা ব্যবসায় নেমেই সকলের পথ খুলে দেব।

ঐ যে মেয়েটি পুতুল সাজিয়ে বসে আছে তার ইতিহাসও আমার মত। পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করার চেয়ে এ পথ কি খারাপ? তুমিই বল না।

বলবার মত আমার কিছু ছিল না। অফিসপাড়ায় আজকের অভিজ্ঞতা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। কতবার এখানে এসেছি কিন্তু এতকথা জানতে পারিনি। আজ যেন অফিসপাড়া আমার কাছে নতুন হয়ে ধরা দিল। পরমুখাপেক্ষিতাকে অগ্রাহ্য করে এ'রা স্বাধীন জীবিকার পথ ধরেছেন, ভবিষ্যৎ সমাজ নিশ্চয়ই এতে উপকৃত হবে। আর এমনিভাবেই ব্যবসাক্ষেত্র মেয়েদের আগমনে ভরে উঠবে। চাকরি নিয়ে মারামারি করার চাইতে এ'দের তাঁদের কর্মক্ষমতা হয়তো আরো ভালো খুলবে।

—প্রমীলা

ফটো : সুনীল দত্ত

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[অক্টোবর, উনিশ শো চল্লিশ। কলকাতা থেকে বিনু এল দাদু হেমনাথের বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। আশ্চর্য লাগল হেমনাথকে। কাঁধে তার গোটা রাজদিয়ার ঝামেলা। আরো আশ্চর্য তাঁরই বন্ধু লারমোর। সাদাসিধে, প্রাণবন্ত। আয়ারল্যান্ড ছেড়ে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে এসে পূবে বাঙলার মাটি আর মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছেন।

লারমোর বিনুর বিস্ময় আর যুগলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালোবাসা।

প্রথম দিন ঘুরল রাজদিয়া। পরদিন। নৌকোয় চেপে এল সুজনগঞ্জের হাটে। অদ্ভুত অনুভূতি। লারমোর নিয়মমাফিক বিনে পয়সায় রুগী দেখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যে। রাত। হাটও ভেঙেছে। নৌকোয় চাপল ফিরবার জন্যে। এমন সময় গহরালি ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়ল লারমোরের পায়ের কাছে, 'বাচান আমার বাজানরে আপনে বাঁচান সাহেব—' লারমোরকে যেতে হল চরবেহুলায় আর হেমনাথ বিনু প্রমুখ ফিরে এল বাড়ি।]

।। সতের ।।

কানের কাছে মুখ এনে কোমল গলায় কেউ যেন অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলছে। স্বরটা বিনুর খুব চেনা, কিন্তু কথাগুলো সে বুঝতে পারছে না। চোখ মেলে তাকিয়ে যে দেখবে, তেমন শক্তিটুকুও তার নেই। গভীর ঘন ঘুম আঠার মতন চোখে জড়িয়ে আছে।

গলার স্বরটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল, সেই সঙ্গে হাতে মৃদু ধাক্কা অনুভব করল বিনু। এবার তার মনে হল, কান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে দু-একটা শব্দ ভেতরে ঢুকছে।

অনেক কষ্টে চোখের পাতা দুটো টেনে তুলল বিনু, আর তখনই দেখতে পেল হেমনাথ ঈষৎ ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

এখনও ভাল করে ভোর হয় নি। ঘরের ভেতরটা আবছা। শিয়রের দিকে একটা জানলা খোলা রয়েছে। তার বাইরে যতদূর চোখ যায়, উঠোন-পদ্মবাগান-পুকুর-ওপারের ধানবন—সব কিছু ঝাপসা, নিরাকার। ঝুপসি আমবাগানে আর ঢ্যাঙা সুপুরি গাছের পাতার ভেতর এখনও থোকা থোকা অন্ধকার।

চোখ মেলতেই হেমনাথ আরো একটু নীচু হলেন, 'দাদাভাই, উঠবি না?'

আধবোজা ঘুমন্ত গলায় বিনু বলল, কেন?'

'বা রে, ভোর হয়ে গেছে। এক্ষুনি রোদ উঠে যাবে। তার আগে সূর্যস্তব সেরে নিতে হবে না?'

রাজদিয়ার আসার পর হেমনাথের সঙ্গে ভোরবেলায় উঠছে বিনু, নিয়মিত সূর্যবন্দনা করছে।

কাল সমস্ত দিন যা ছোটাছুটি করেছে তাতে হাত-পাগুলো যেন আলগা হয়ে গেছে। বিনুর সারা গায়ে পুরো একটি দিনের ক্লান্তি মাখানো। রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে সুজনগঞ্জের হাট থেকে রাজদিয়া ফিরেছিল সে, সেই ঘুম এখনও কাটে নি। এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছা করছে না।

হেমনাথ আবার তাড়া দিলেন, 'ওঠ্ দাদা, তাড়াতাড়ি ওঠ্—'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার উঠে বসল বিনু। দু হাতে চোখ রগড়ে রগড়ে যতখানি পারল ঘুম তাড়াল, তারপর করুণভাবে একবার বিছানাটার দিকে তাকাতে গিয়েই দেখতে পেল—সেই মেয়েটা পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। সেই মেয়েটা যার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, জাপানী পুতুলের মতন মুখ, টলটলে কালো দুটো মণি আর যার নাম ঝিনুক।

বিনুর মনে পড়ে গেল, কাল ঘুমের ঘোরে দাদুর বুকের ওপর থেকে এই হিংসুটি মেয়েটাই তার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল।

বিনু বলল, 'ঝিনুক বুঝি কাল এখানে শুয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'তুই শুয়েছিলি আমার বাঁ ধারে, ঝিনুক ডান ধারে।'

অপ্রসন্ন চোখে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে কী বলবে ভাবতে লাগল বিনু। সেই ফাঁকে হেমনাথ বললেন, 'আর দেরি করিস না দাদা, মুখটুখ ধুতে ধুতে কিন্তু রোদ উঠে যাবে।'

নিঃশব্দে এবার বিছানা থেকে নেমে হেমনাথের পিছু পিছু ঘরের বাইরে চলে এল বিনু।

এই ভোরবেলায় ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে। এত ঠাণ্ডা, মনে হয়, আশ্বিনের এই সকালেই সে সারা গায়ে পৌষের মেজাজ জড়িয়ে এসেছে। বাতাসটা গায়ে লাগতে চামড়া যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে।

বারান্দার এক কোণে মাটির হাঁড়িতে জল আর নিমের দাঁতন ছিল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে হেমনাথের সঙ্গে উঠোনের শেষ প্রান্তে এসে পুবদিকে মুখ করে দাঁড়াল বিনু।

এর মধ্যেই স্নেহলতা উঠে পড়েছেন; পুকুর থেকে স্নান সেরে এইমাত্র বাড়ি এসে ঢুকলেন তিনি এবং উঠোনে ভিজে পায়ের ছাপ আঁকতে আঁকতে দক্ষিণদুয়ারী ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এ বাড়িতে স্নেহলতাই বোধহয় সবার আগে ওঠেন। ঘুম থেকে উঠবার পর কোনদিন তাঁকে শুয়ে থাকতে দ্যাখে নি বিনু। তার ভেতর হয় তাঁর স্নান সারা হয়ে যায়, নতুবা স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে পুকুর থেকে ফেরেন। সূর্যোদয়ের আগেই এই কাজটি স্নেহলতার চুকিয়ে ফেলা চাই। বিনু শুনেছে, শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস এ নিয়মের নড়চড় নেই।

আজ একা স্নেহলতাই বিনুদের আগে ওঠেন নি, শিবানীও উঠেছেন। হেমনাথের আশ্রিত দুটি বিধবাও উঠে পড়েছে।

এই মুহূর্তে শিবানী বাসি উঠোনে জলছড়া দিচ্ছেন। আর সেই বিধবা প্রৌঢ়া দুটি তকতকে করে ঘরের পিড়া (ভিত) লেপছে।

যাই হোক পুব দিকটা একেবারে ফাঁকা। যতদূর চোখ যায়, সেই দিগন্ত পর্যন্ত বাধা দেবার মতন কিছুই নেই; অবশ্য দু-চারটে তাল-সুপুরি ঢ্যাঙা পায়ে ডিঙি মেরে অনেক উঁচুতে কী দেখবার চেষ্টা করছে। ঐটুকু বাদ দিলে সব বাধাবন্ধহীন, অবারিত।

এই বিশাল ব্যাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হেমনাথের সঙ্গে গলা

ঘুমিয়ে এক সময় সূর্যবন্দনা শুরু করল বিনু, 'ওঁ জবাকুসুমং—'

দু-চারটে অক্ষর সবে উচ্চারণ করেছে সেই সময় পেছন থেকে কচি গলায় ডাক শোনা গেল, 'দাদু, ও দাদু—'

হেমনাথ ফিরেও তাকালেন না; তন্ময় হয়ে সূর্যস্তব আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন।

ডাকটা আবার শোনা গেল, 'দাদু, ও দাদু, ও দাদু—' এবার সেটা খুবই অস্থির, অসহিষ্ণু।

কে ডাকছে, বিনু বুঝতে পারল। চোখের পাতা অল্প ফাঁক করে একবার হেমনাথকে দেখে নিল সে; হেমনাথের চোখ আগের মতনই বোজা; আগের মতনই ধ্যানস্থ হয়ে আছেন তিনি। পেছনের ডাকটা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হয় না।

সূর্যস্তব আওড়াতে আওড়াতে টুক করে একবার মাথাটা ঘুরিয়ে পেছন দিকে দেখে নিল বিনু। যা ভেবেছিল, ঝিনুক—ঝিনুকই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ কোঁচকানো, মুখ থমথমে।

এক পলক ঝিনুককে দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজে সামনের দিকে তাকাল বিনু এবং হেমনাথের সঙ্গে সূর্যস্তব আবৃত্তি করতে লাগল। আর পেছনে ঝিনুকের গলায় সেই ডাকটা একটানা বেজে চলল।

সূর্যবন্দনা শেষ হতে হতে আলোর আভা ফুটে গেল। সারারাত সূর্যটা কোথায় ছিল, কে জানে। দিগন্তের তলা থেকে সোনার ঘটের মতন হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে এল। তার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে হেমনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি রে, অত ডাকাডাকি কেন?'

ভারী গলায় ঝিনুক বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। কক্ষনো না, কিছুতেই না।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'না-না, কথা বলব না।' বলেই দুপ-দাপ পা ফেলে ঘরের দিকে চলল ঝিনুক। বোঝা গেল, খুব রাগ করেছে সে।

হেমনাথের দেখাদেখি সূর্যপ্রণাম করে বিনুও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এই সকালবেলার ঝিনুকের এত রাগের কারণ সে বুঝতে পারল না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

লম্বা পায়ে ছুটে গিয়ে ঝিনুককে ধরে ফেললেন হেমনাথ, তারপর টপ করে একেবারে কোলে তুলে নিলেন।

ঝিনুক সমানে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, 'ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও বলছি। তোমার কোলে আমি উঠব না, তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

হেমনাথ ছাড়লেন না। বরং কোলের ভেতর ঝিনুককে চেপেচুপে রেখে হেসে হেসে ছড়া বলতে লাগলেন,—

'রাগ করেছেন রাগুনি,
রাঙা মাথায় চিরুনি,
বর আসবে এক্ষুনি,
নিয়ে যাবেন তক্ষুনি।'

ঝিনুকের দাপাদাপি আর হাত-পা ছোঁড়া আরো বেড়ে গেল। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন হেমনাথ। বললেন, 'সকালবেলায় ঝিনুক দিদির এত রাগ কেন, এবার বল্ দিকি।'

ঝিনুক বলল, 'তুমি আমায় ডেকে তোলনি কেন?'

'কখন রে?'

'একটু আগে।'

'তখন তুই ঘুমুচ্ছিলি যে।'

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে ঝিনুক বলল, 'উঁহু—উঁহু—'

হেমনাথ সবিস্ময়ে বললেন, 'ঘুমোচ্ছিলি না!'

'না।' ঝিনুক বিনুকে দেখিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি ওকে ডাকলে, আমাকে ডাকলে না।'

'ওকে ডেকেছি, তুই জানিস?'

'হ্যাঁ জানি। একশ' বার জানি।'

'জানিস যদি উঠে পড়লি না কেন?'

'উঠব না, কিছুতেই না।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'ওকে ডেকে তুলবে আর আমাকে ডাকবে না। না ডাকলে উঠব কেন?'

এবার ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করতে পারলেন হেমনাথ। চোখ বড় বড় করে সকৌতুকে বললেন, 'বিনু দাদাকে ডাকলে তোকেও ডাকতে হবে, এই তো?'

'হ্যাঁ।' ঝিনুক মাথা নাড়ল, 'ওকে নিয়ে তুমি 'জবাকুসুম' করলে—

'জবাকুসুম' অর্থে সূর্যস্তব। হেমনাথ আগের সুরেই বলেন, 'তোকে নিয়েও বুঝি 'জবাকুসুম' করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, কাল থেকে ভোরবেলা উঠবি। ডাকামাত্র উঠে পড়তে হবে।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা। তারপর ঝিনুকের চিবুক আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলে হেমনাথ বললেন, 'পেট বোঝাই তোমার হিংসে।'

●

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। খানিক আগেও আমবাগান, পুকুর, ধানবন, সুদূর আকাশ—সবকিছু ঝাপসা হয়ে ছিল। এখন চারদিক স্পষ্ট, গাছের চকচকে সজীব পাতাগুলো পর্যন্ত আলাদা করে গুণে নেওয়া যায়। সারাটা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে এই আশ্বিনে আকাশখানি বড় উজ্জ্বল, বড় মনোরম। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত সে নীল চাঁদোয়া টাঙিয়ে রেখেছে।

এ-বাড়িতে এখন আর কেউ ঘুমিয়ে নেই। অবনীমোহন, সুরমা, সুধা, সুনীতি সবাই উঠে পড়েছে।

পুবের ঘরের বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসে এই মুহূর্তে সকালবেলার খাওয়ার পর্ব চলছে। আগে এ বাড়িতে চা ঢুকত না; উনিশ শ' চল্লিশ পর্যন্ত তাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ। অবনীমোহনরা আসবার পর চা এখানে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছে।

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'কাল রাত্তিরে ঝিনুকের কথা কী যেন বলছিলে; ঠিক খেয়াল করিনি।'

স্নেহলতা বললেন, 'ও এখন কিছুদিন এখানে থাকবে।'

'বেশ তো।'

'ঝিনুক বাড়ি থাকলে ভবতোষ কোথাও বেরুতে টেরুতে পারে না। বেরুলেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয়। মেয়েটা তার মুশকিলে পড়ে গেছে।'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'কাল কখন ঝিনুককে দিয়ে গেছে?'

স্নেহলতা বললেন, 'তোমরাও বেরিয়েছ, ওরাও এসেছে।'

'ভবতোষ আর কী বললে?'

'কী ব্যাপারে?'

'বৌমার কোন খবর আছে?'

'না। ও মেয়ে সংসার করবার মেয়ে নয়। চলে যে গেছে, সে একরকম ভালই হয়েছে।'

খানিক গাঢ় বিষাদ আশ্বিনের এই উজ্জ্বল মনোরম সকালটাকে যেন নিমেষে মলিন করে দিল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হেমনাথ একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন। সুরমার দিকে ফিরে বললেন, 'কদিন তোরা এখানে এসেছিস?'

সুরমা বললেন, 'আজ নিয়ে পাঁচদিন।'

'বলতে নেই, এই ক'দিনে তোকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে। সেই ফ্যাকাশে রুগ্ন ভাবটা নেই। স্টিমার থেকে যখন নামলি তখন মুখখানা এই এতটুকু; গায়ে রক্ত নেই; হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছিলি।'

স্নেহলতা এই সময় ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'বলতে নেই বলতে নেই করে তো সবই বলে ফেললে। ভাল-ভাল বলে রোগা মেয়েটার দিকে নজর দিতে হবে না।'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'বেশ, আর বলব না। নজরও দেব না।'

সুরমা বললেন, 'কেন বলবে না, নিশ্চয়ই বলবে। ভাল হলে ভাল বলবে না? সত্যি, আগের চাইতে অনেক সুস্থ লাগছে।'

হেমনাথ বাড়িয়ে কিছু বলেননি। সামান্য কয়েকটা দিনে সুরমার চেহারায় সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে গেছে যেন। তাঁকে রীতিমত উজ্জ্বল আর সজীব দেখাচ্ছে। পরিবর্তনটা বেশ চোখে পড়ে।

অবনীমোহন এতক্ষণ চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'রাজদিয়া সত্যি সত্যি টনিকের কাজ করতে শুরু করেছে।'

আসবার সময় স্টিমারে টনিকের কথা আরেকবার বলেছিলেন অবনীমোহন। সুরমা হাসলেন, কিছু বললেন না।

হঠাৎ হেমনাথের কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ভালো কথা—'

স্নেহলতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী?'

'দু-দিন ধরে সেই বাঁদরটাকে তো দেখছি না। কোথায় গা ঢাকা দিলে সে?'

'কার কথা বলছ?'

'কার আবার, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হিরণ ছোঁড়ার।' বলে আস্তে আস্তে সুধার দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন।

সুধা সুনীতি আর বিনু একধারে বসে খাচ্ছিল। বিনু শুনতে পেল, চাপা গলায় সুনীতি সুধাকে বলছে, 'দাদু তোর দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে!'

মুখ নীচু করে সুধা বলল, 'তাকাগ গে।'

'সেই বাঁদরটা কোথায় গেছে জানিস?'

ঠোঁট উল্টে সুধা বলল, 'জানতে বয়ে গেছে।'

মুখ টিপে সুর টেনে টেনে সুনীতি বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই।'

এই সময় স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'সত্যিই তো ছেলেটা গেল কোথায়?' রোজ দুবেলা হাজিরা দিচ্ছিল। হঠাৎ হল কী?' বলতে বলতে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'যুগল, যুগল—'

আশে-পাশে কোথাও ছিল যুগল। ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী কন (বলেন) ঠাকুরমা?'

'হিরণদের বাড়ি একবার যা, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।'

যুগল ছুটল।

এরপর সুজনগঞ্জের হাটের কথা উঠল, লারমোরের কথা হল, কালকের সেই মজার ঢেঁড়াটার কথা নিয়ে অনেকটা হাসাহাসি চলল। এসবের ফাঁকে হেমনাথ টুক করে একবার বললেন, 'ভাবছি, আমিও একটা ঢেঁড়া দেব কিনা।'

হাসতে হাসতে থমকে গেলেন স্নেহলতা। কিছু একটা আন্দাজ করেছেন তিনি। তীক্ষ্ণ ভ্রুকুটিতে স্বামীকে বিদ্ধ করতে করতে বললেন, 'তুমি আবার কিসের ঢেঁড়া দেবে?'

'এখনই শুনবে।'

'এখনই শুনব।'

'নির্ভয়ে বলি?'

'থাক প্যাকনা (ন্যাকামো)!'

হেমনাথ বললেন, 'ঢ্যাঁড়াটা হবে এই-রকম। জেলা ঢাকা, থানা মুন্সিগঞ্জ, শহর রাজদিয়ার শ্রীহেমনাথ মিত্রের বড় বিপদ। কী বিপদ? না চল্লিশ বছর ঘর করার পরও সে তার বউর মন পায়নি। আপনারা জেনে রাখুন—মিঞাভাইরা, হিন্দু ভাইরা—হেমকর্তার ধর্মপত্নীর মন অন্য পুরুষে মজেছে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই হাসির ধুম পড়ে গেল। অবনীমোহন আর সুরমা অবশ্য মুখ টিপে হাসছেন; ভেতরের উচ্ছ্বসিত কৌতুকটাকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না। সুধা-সুনীতি কিন্তু হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ছে। বিনু প্রায় কিছুই না বুঝে আর সবার দেখাদেখি বিজ্ঞের মতন হাসছে।

আস্তে আস্তে সুধা-সুনীতির দিকে একবার তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, 'ঢেঁড়ার কথা কিন্তু শেষ হয়নি; আরো একটু আছে।'

হাসতে হাসতেই সুধা-সুনীতি বলল, 'আরো কী?'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'মিঞাভাইরা, হিন্দুভাইরা—সাকিন রাজদিয়ার হেমকর্তা এই বিপদে তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই সে ঠিক করেছে পুরনো বউকে তালাক দিয়ে আগামী অঘ্রান মাসে একজোড়া তরুণী ভার্যা ঘরে তুলবে। তাদের একজনের নাম সুধামুখি, আরেক-জনের সুনীতিলতা।'

স্নেহলতা মধুর কৌতুকময় হেসে বললেন, 'ঢেঁড়াতে আমার আপত্তি নেই।'

হেমনাথ বললেন, 'প্রস্তাবটা তাহলে অনুমোদন করছ?'

'করছি।'

এদিকে সুধা-সুনীতির হাসি থেমে গিয়েছিল। তারা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বুড়োর ভার্যা হতে আমাদের বয়ে গেছে।'

করুণ মুখে হেমনাথ বললেন, 'বুড়ো বলে দাগা দিলে দিদিরা! সত্যিই বুড়ো আমি হইনি। এই দেখ, একটাও দাঁত পড়েনি, মাড়ি কি মজবুত!'

সুধা বলল, 'বুড়ো তো হননি, তবে চুল সাদা হল কী করে?'

'বয়েসের জন্যে না রে দিদি, কুপিত বায়ুর দোষে।'

'আর চামড়া কোঁচকানো কেন?'

'হজমের গোলমালে।'

গল্পে গল্পে, হাসাহাসি আর লঘু কৌতুকে সকালটা কাটতে লাগল। খাওয়ার পালা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় বাইরে বাগানের দিক থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'জেঠামশায়—জেঠামশায়—'

হেমনাথ ঘরে বসে সাড়া দিলেন, 'কে রে?'

'আমি শিশির।'

'আয় আয়—' হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠোনে নামলেন।

একটু পর শিশিররা উঠোনে চলে এলেন। দেখা গেল, শিশির একাই নয়, তার সঙ্গে স্মৃতিরেখা, ঝুমা-ঝুমো এবং তাদের মামা আনন্দও এসেছে।

শিশির বললেন, 'আপনার বৌমাদেরও নিয়ে এলাম।'

'আনবেই তো, আনতেই তো বলে-ছিলাম। এসো এসো, ঘরে এসো সবাই—'

এদিকে বারান্দার আরেক কোণে একটা মজার ব্যাপার চলছিল। বিনু দেখতে পেল, আনন্দকে দেখিয়ে সুধা সুনীতিকে বলছে, 'দিদি, সেই ভদ্রলোক এসেছে। যার দিকে—'

ভুরু কুঁচকে সুনীতি বলল, 'যার দিকে কী?'

ঠোঁটের ফাঁকে প্রগলভ একটি হাসি টিপে রেখে সুধা বলল, 'যার দিকে তাকিয়ে সেদিন তুই একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ, মুগ্ধ—মুগ্ধ—'

কথা শেষ হবার আগেই সুধার পিঠে দুম করে কিল পড়ল।

(ক্রমশঃ)

এসো না দক্ষিণ হাওয়া ॥

গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি আসবে বলে
বাগানে গোলাপ চারা লাগিয়েছিলাম।
আর জিনিয়া পিটুনিয়া জিরেনিয়ামের শয্যা
তৈরি করেছিলাম সযত্নে।

কলাবতীর তাজা সবুজ সারি
লাল প্যানজিফুলগুলো সারে দাঁড়িয়েছিল
যেন কোন মহারানীর অভ্যর্থনার জন্য
সারবন্দী প্রহরীর দল।

তোমাকে দেখবে বলে
উৎসুক সূর্যমুখীরা ঠেলাঠেলি করছিল।
ভিড় জমিয়েছিল
ডালিয়া, কসমস, মরসুমফুল...

তুমি এসে কবে চলে গেছ।

মরা বাগান
আগাছা আর শুকনো পাতার ছয়লাপ।
যাক না প্রজাপতিরা ফিরে ফিরে বিষণ্ণ পাখায়,
যাক না মৌমাছিরা গুনগুনিয়ে অন্য কোন বাগানে।
এসো না, দক্ষিণ হাওয়া, এসো না তুমি আর এখানে
পাটকিলে পাতা আর ধুলোর কোয়াশা ওড়াতে।

প্রকৃতি ॥

দীপেন রায়

আকাশের পরিমাপ নিতে গিয়ে তোমারই বুকের পাশে
যেন শুয়ে আছি। বিধাতার এ সমুদ্রে
খেলে বেড়ানোর সমস্ত ইচ্ছার জন্যে
তুমি যাদুকরী অলৌকিক নগ্নতা শেখালে।
বালকের দেহ থেকে সমস্ত পোশাক খুলে পোশাকবিহীন
ছেড়ে দিলে জলের ওপর। জলে জল ঘোরানোর মন্ত্র

তুমি পড়ে গেলে। অক্ষরবিহীন সাজনের ঠোঁটে
জলের কল্লোল ঘুরে ঘুরে সে যেন নিজের মনে
নিজেরই প্রতিমা। বালকেরে জল ছুঁড়ে এ জলক্রীড়ায়
মাতালো স্বভাব বুঝি তার।

ইন্টারভ্যুর সময় স্থির করা হয়েছিল
লাপিছু পাঁচ মিনিট। সময় পেরিয়ে গেল
চ ছেলেটি আর ওঠে না। সেই তখন
ক ঘ্যান-ঘ্যান করছে। অনেক বোঝান
যে করার আর কিছু নেই। এটা
নসরড পলিটেকনিক, সরকারী আইন
নে মেনে চলতে হয়। এখানে ভর্তির
য়স ষোল থেকে কুড়ি। তুমি বাপু দু'
ছর আগেই কুড়ি ছুঁয়ে ফেলেছ।

: স্যার আপনাদের ত' অনেক সীট
লি আছে। দয়া করে একটা চান্স দিন।

প্রায় ধমকে উঠলেন মেকানিক্যালের হেড
ব দি ডিপার্টমেন্ট বারীনবাবু। হাফ হাতা
াটা একটা বুশ সার্ট আর আদ্যিকালের
রোনো একটা খাকির ফুলপ্যান্ট পরনে,
ত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছাত্রবৎসল অধ্যাপক।
লেকশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে রায়
নেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তবু
লেটি ছাড়ছে না। সাধারণত বারীনবাবু
টেন না, বিশেষত ছাত্রদের ওপর ত নয়ই।
বার বোঝা গেল যে মানুষটি ভেতরে
তরে রেগে গেছেন। বেল টিপে বেয়ারা
লীলকে ডেকে বললেন—

: রেজিসট্রেশন নম্বর ৩৫৯। অজিত-
মার রায়। ডাকো।

ছেলেটি আস্তে আস্তে টেবিলে ছড়ানো
তিন পরীক্ষার মার্কসীট, অন্যান্য সার্টি-
কেট গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত
ড় করে প্রশ্নকারী মাস্টারমশাইদের
স্কার জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অধ্যক্ষের ঘরেই ইন্টারভ্যু নেওয়া
চ্ছল। তিন বছরের সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল
মেকানিক্যালের ডিপ্লোমা ক্লাসের প্রথম
র্ষে ছাত্রদের মৌখিক পরীক্ষা করে নেওয়া
হয়। জুন, জুলাই দু'মাস ধরে চলে এই
পরীক্ষা। অন্যান্য বছর আড়াই শো সীটের
জন্য তিন, সাড়ে তিন হাজার দরখাস্ত
পড়ে। কিন্তু এবছর চাকরীর বাজার ভীষণ
খারাপ। হাজার হাজার ডিগ্রী পাওয়া ছেলে
বেকার বসে আছে, ডিপ্লোমাদের সংখ্যা
লাখের ওপর। তাই পলিটেকনিকগুলিতে
ছাত্র-ভর্তির চাপ অন্যান্য বছরের তুলনায়
কিছুই নেই। ব্যাপারটা অধ্যক্ষ ও অন্যান্য
মাস্টারমশাইদের রীতিমত চিন্তিত করে
তুলেছে। সেপ্টেম্বর এসে গেল অথচ একশ
সীট এখন পর্যন্ত খালি পড়ে আছে। এবার
তাই নির্বিচারে ছেলে ভর্তি করা হচ্ছে।
মৌখিক পরীক্ষাটা নিয়ম-রক্ষা মাত্র। শুধু
দেখে নেওয়া হচ্ছে সত্যি সত্যি ছেলেটি
স্কুল-ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেন্ডারী পাস
করেছে কি-না আর বয়স আছে কি-না।

সকাল থেকেই ইন্টারভ্যু চলছে।
প্রিন্সিপ্যাল নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।
সম্ভবত ঘটনাটি তাঁর চোখে পড়েছে।
ছেলেটি বেরিয়ে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—

: কী ব্যাপার বারীনবাবু?

: আর বলেন কেন। তখন থেকে বলছি
যে তোমার বয়স পেরিয়ে গেছে, এখানে
কুড়ির পর আর ভর্তি হওয়া যায় না। কে
কার কথা শোনে? ঐ এক কথা—দয়া করে
একটা চান্স দিন স্যার। দুঃখের কথা বিশ্বাস
করে না। ছাত্রের মেরিট আমরা বিচার
করব ঠিকই, কিন্তু বয়সের লিমিট বেঁধে
দিয়েছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। বললাম,
তুমি বরং রাইটার্স বিল্ডিংসে বা নিউ
সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে সরকারী কর্তাদের
সঙ্গে দেখা কর। তাঁরা যদি পারমিশন দেন,
তাহলে আমরা নিয়ে নেব।

: ছেলেটি কি কুইনস টেকনিক্যাল
কলেজের কথা বলছিল? অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা
করলেন।

: আজ্ঞে হ্যাঁ। শিয়ালদার কাছে ঐ
নামে বেসরকারী একটা টেকনিক্যাল
ইন্সটিটিউটে থার্ড ইয়ারে ছেলেটি পড়ত।
গত এপ্রিলে কলেজটা উঠে গেছে। নতুন
পরীক্ষার্থী এসে পড়ায় আলোচনায় ছেদ
পড়ল। শুরু হয়ে গেল ইন্টারভ্যু।

দেড়টা নাগাদ প্রথম ব্যাচের মৌখিক
পরীক্ষা শেষ হল। বারীনবাবু প্রিন্সি-
প্যালের ঘর ছেড়ে, করিডর পেরিয়ে নিজের
ঘরে যাচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে
দাঁড়ালেন। ছেলেটি দাঁড়িয়ে দরজার গোড়ায়।

: কী ব্যাপার? তোমায় ত' বললাম
আমাদের করবার কিছু নেই। যদি তুমি
এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে স্পেশ্যাল
পারমিশন নিয়ে আসতে পার তো তাহলে
আমরা নিয়ে নেব।

: আমায় স্যার পাঁচমিনিট সময় দিন।
দয়া করে সব শুনুন—তারপর যদি চলে
যেতে বলেন, চলে যাব।

প্রায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত নিপুণভাবে
কামানো মাথাটি বার কয়েক দুলিয়ে প্রবীণ
অধ্যাপক বললেন—

: বেশ। ভেতরে এস। কিন্তু পাঁচ
মিনিট। এর বেশী সময় দিতে পারব না।
যা বলবার এর মধ্যেই বলবে।

সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে
সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে অধ্যাপক
বললেন—

: কী বলবে বল।

: আমি শিয়ালদার কুইনস টেকনিক্যাল
কলেজের ছাত্র।

: শুনেছি।

: আজ থেকে তিন বছর আগে ঐ কলেজে ভর্তি হই। গড় গড় করে বলে চলে ছেলেটি। তখন থার্ড ডিভিশনে স্কুলের গণ্ডি পেরুনো ছেলেদের পলিটেকনিকে ভর্তি হওয়ার কোন আশা ছিল না। সবাই ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চায়। যাদের রেজাল্ট ভাল তারা পরীক্ষা দিয়ে যাদবপুর, শিবপুর, খড়গপুর বা রিজিওন্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি হচ্ছে। মাঝারি মেরিটের ছেলেদের কোন গতি হচ্ছে না অথচ এরাই সংখ্যায় ভারি—রাতারাতি গণ্ডায় গণ্ডায় বেসরকারী টেকনিক্যাল স্কুল বা কলেজে কলকাতা ছেয়ে গেল। মাস্ স্কেলে প্রডাকশন শুরু হয়ে গেল। হাজার হাজার টার্ণার, ফিটার, প্লাম্বার, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারম্যান, বছর বছর চাকরীর বাজারে ভিড় বাড়াতে লাগল।

: স্যার আমি থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছি। ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল ইঞ্জিনীয়ার হব। কলকাতার সবকটা স্পনসরড পলিটেকনিকে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। কিন্তু কোথাও জায়গা হল না। সে সময় একদিন পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। কুইনস টেকনিক্যাল কলেজ। শিয়ালদা, হাওড়া, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজারে ব্রাঞ্চ। সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা দুই পড়ানো হয়। ডিপ্লোমা তিন বছরের। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এদের ডিপ্লোমা স্বীকার করে।

সেদিনই শিয়ালদায় কলেজে গিয়ে খোঁজ নিলাম। ভর্তি চলছে। সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল প্রতিটি বিভাগে দু'শ করে ছাত্র নেওয়া হবে। শিয়ালদার গোলকধাঁধার অন্ধকারে গলির ভেতরে দোতলা বাড়ির ঢোকবার মুখে সাইনবোর্ড ঝুলছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একতলার করিডোরে বাঁ-হাতে ঘুপচি একটা ঘর—অফিস। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেরা ভর্তি হচ্ছে। উল্টোদিকে ঘরের সামনে নেমপ্লেট ঝুলছে—বি চক্রবর্তী, প্রিন্সিপ্যাল।

মেকানিকালে ভর্তি হলাম।

ভর্তি ফী দু'শ ছ' টাকা যেখানে স্পনসরড পলিটেকনিকে লাগে চুরাশী টাকা। মাস গেলে মাইনে দিতে হবে ষোল টাকা, স্পনসরড পলিটেকনিকে লাগে বারো টাকা। স্পনসরড পলিটেকনিকে সেশন্যাল ফী মাত্র পনেরো টাকা, কুইনস কলেজে ফী বছর আশী টাকা গুনতে হবে।

ক্লাস শুরু হল। ছাপানো প্রসপেকটাস, ফি-বুক, সাইক্লোস্টাইলড্ রুটিন ছাত্ররা হাতে হাতে পেল। প্রথম দিন কলেজের একটা বড় ঘরে ছ'শ ছেলে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালের উদ্বোধনী ভাষণ শুনল। সেদিনই জানা গেল ঐ কলেজে দুজন প্রিন্সিপ্যাল। বি চক্রবর্তী হলেন এডমিনিসট্রেটিভ প্রিন্সিপ্যাল। ওর ছোট ভাই জে চক্রবর্তী অ্যাকাডেমিক সাইডটা ম্যানেজ করেন। ব্যাপারটা বুঝতেই দু মাস কেটে গেল। বড় ভাই কি পাস, কেউ জানে না। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ছোটজন সম্ভবত আর্টসের গ্র্যাজুয়েট।

প্রথম ছ' মাস কোন ক্লাস হয়নি। রোজই ছোটভাইয়ের সইকরা নোটিশ দেয়াল বোর্ডে ঝোলে—অমুক অধ্যাপক অনুপস্থিত তাই ক্লাস আজ হবে না। ছাত্ররা তোমরা কলেজের মধ্যে চেঁচামেচি কর না। লাইব্রেরী খোলা আছে।

গত তিন বছরে লাইব্রেরীতে যত ডিম্যান্ড স্লিপ দিয়েছিলাম জড় করলে কমপক্ষে তার ওজন হবে সেরখানেক।

এভাবেই বছর ঘুরে গেল। পরীক্ষা এগিয়ে এল। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে ঘন্টাখানেক চুপ করে বসে থাকতাম। কি উত্তর দেব—ক্লাসই কোনদিন ঠিকমত হয়নি। কিন্তু পাশের তালিকা যখন বেরুল দেখলাম তাতে আমার নামও আছে।

এভাবেই দুটো বছর কেটে গেল। মেকানিক্যালের ছাত্র অথচ কোনদিনও ল্যাবরেটরী বা ওয়ার্কশপে যাইনি। মাস্টারমশাইদের জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—

: চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা কর।

কাকে জিজ্ঞাসা করব? বড় না ছোট তাই বুঝতে পারতাম না। দেখতে দেখতে তিনটি বছর শেষ হল। টেস্ট দিলাম। অ্যালাউ হলাম। ফাইন্যালের জন্য ছ'শ ছেলে মোট ষাট হাজার টাকা জমা দিল। নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা আরম্ভ হল। প্রশ্নপত্রের উপরে বড় বড় করে বিলিতি এক পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থার নাম ছাপানো। এদের সুনাম জগৎজোড়া। এই পরীক্ষায় পাশ করলে চাকুরীর অভাব হয় না।

দুমাস পরে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর কথা। রোজ যেতাম। কিন্তু অফিস থেকে বলা হত দেরী আছে।

দেরী আছে শুনতে শুনতে চার মাস কেটে গেল। নিরুপায় হয়ে একদিন আমরা সব ছেলে মিলে মিটিং করে স্থির করলাম প্রিন্সিপ্যালকে জিজ্ঞাসা করব। গেলাম ছোট প্রিন্সিপ্যালের কাছে। তিনি বললেন—

: ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এডমিনিসট্রেটিভ। আমার করার কিছু নেই। তোমরা এডমিনিস্ট্রেশনে গিয়ে খোঁজ নাও।

আবার বড় প্রিন্সিপ্যাল বললেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক। এইভাবে মাসখানেক ধরে সাটলককের মত ছ'শ ছেলের গুচ্ছ প্রশাসন আর শিক্ষণের কোর্টে কোর্টে থাপ্পড় খেয়ে ফিরতে লাগল। ইতিমধ্যে পরের ব্যাচ পাশ করে সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ারে উঠে এল।

হঠাৎ নতুন একটা নোটিশ পড়ল। নোটিশে বলা হচ্ছে ১৯৬৭র মে মাসে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজনও পাশ করতে পারেনি। তাঁদের জানানো হচ্ছে যে তারা যদি ১৯৬৮র মে মাসে পুনরায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হয় তাহলে নতুন থার্ড ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে পরীক্ষার ফী জমা দিক। নোটিশ দেওয়ার দিন থেকে দশ দিনের মধ্যে ফী জমা দিতে হবে।

আমরা স্যার খেপে গেলাম। ছুটে গেলাম বড় প্রিন্সিপ্যালের কাছে। ব আমরা কে কোন বিষয়ে ফেল করে দেখতে চাই—রুপ লিস্ট কোথায়? আ কোন কথাই শুনলেন না। বললেন—

: বেশী চেঁচামেচি করলে

ডাকব।

ঘাড় নীচু করে ছ'শ ছেলে বেরিয়ে অফিস কাউন্টারে নতুন ছশ'র ব্যাচ প ফী তখন জমা দিচ্ছে।

আমাদের এক বন্ধু লন্ডনে চিঠি ছিল। তার উত্তর এল। পৃথিবী পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা জানাচ্ছে কুইনস কলেজের অধ্যক্ষ প্রশ্নপত্রের টাকা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু পরে কোন বা ছাত্রদের উত্তরপত্র পাঠান নি। আ পরীক্ষার ফলাফল তাই তাঁদের জানানো সম্ভব নয়।

সেই সময় একদিন রাস্তায় এক ম মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনি ব যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কলেজকে দিনও অ্যাফিলিয়েশন দেয় নি। শ বিলিতি কোর্সটাকে স্বীকার করত। স্বীকৃতিটুকুও এখন ফিরিয়ে নি কারণ বারবার বারণ করা সত্ত্বেও ক বিজ্ঞাপনে ফলাও করে বলা হত " টেকনিক্যাল কলেজ, রেকগনাইজড বা ইউনিভার্সিটি।" এতবড় মিথ্যাকে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত নন। ই ভার্সিটির নাম ভাঙিয়ে ছাত্র নিয়ে বন্ধ করবার জন্যই এই ব্যবস্থা নাকি হয়েছে। তাছাড়া মাস্টারমশাইরা কোনদিন নিয়মিত মাইনে পান নি। একজনের আট ন' মাসের উপর বাকি। অধিকাংশই চাকরী ছেড়ে দিয়ে প্রফেসর পি কে এম এত সহজে ছা না বলেছেন—তিনি বড় ও ছোট চক্র নামে মামলা ঠুকে দিয়েছেন। সব মাস্টারমশাই বললেন—

: পরীক্ষা দিয়েই বা তোমরা করবে। তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল বা সে কাজ কোনদিন কিছু হয় নি। ে জীবনেও পাশ করতে পারবে না।

স্যার আমরা সবাই দল বেঁধে প্রিন্সিপ্যালের কাছে। তিনি বে নিরুপায় হয়ে আমরা প্রিন্সিপ্যালের পুলিশে ডায়েরী করেছি। সব শুনে অফিসার বললেন, তিনিও নাকি এ শুনেছেন।

: বলুন স্যার সবাই সব শু অথচ কেউ আমাদের কিছু বলেন আমাদের তিন তিনটে বছর নষ্ট গেল। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

থার্ড ডিভিশনে পাশ করে হ হাজার ছেলে দিশেহারা হয়ে ঘুরে কলেজে কলেজে একটা সীটের আ কিন্তু সবাই ব্যস্ত ভাল ছেলেদের এদের কেউ দেখে না। হতাশের নিম্ন দলের জন্য শুধুমাত্র খোলা থাকে কু টেকনিক্যাল কলেজের দরজা।

—শ্রী

আগের ঘটনা

[সুন্দরী লীলাকে ভাসিয়ে নিল সুখেন। তছনছ হল সত্যর সংসার। দুলপদুরের মারা কাটাল সত্যচরণ। ডিভোর্স। ঘরে এবার যমুনা। নবযুবতী। স্বপ্নের আমেজ। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু বিয়ে করতে পারল না সত্যচরণ।

চোরাড়ে সুখেনকে নিয়ে লীলার মনে দ্বিতীয় ভুবন। জুয়া মদ আর মেয়েছেলে তার নিত্যসঙ্গী। এক রাতে সে ফাঁকি দিল লীলাকে। শিবানীকে নিয়ে পালাল।

পাগল হল সত্যচরণ। যমুনাও মারা গেল নার্সিংহোমে।

রমা লীলার প্রেসেরই প্রধান কর্মী। তার ভাই অহীনের সঙ্গে লীলার হালে দহরম-মহরম। নতুন বাড়ি কিনল লীলা, প্রেস বাড়াল।

সত্য এল লীলার কাছে, ছেলের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করল। কিন্তু প্রত্যাখ্যান। লীলার ভয় করল এবার। রাতে তার সঙ্গে রমাই থাকে এখন। ফেন্টুবাবুর সঙ্গে রমার 'ইয়ে' ধরা পড়ে লীলার চোখে।]

॥৪৬॥

রকশো করে গেলে মন্দ হত না। মাত্র
ল চারেক পথ। বিশেষ করে খোলামেলা
াশের নীচে অপর্যাপ্ত রোদ—যা গায়ে
মনটা ছুটির বেহালায় সুর হয়ে বাজে।
ছুটির দরকার ছিল। হাঁফ ছাড়তে চাই-
মন সবরকম কাজ-অকাজের দায়িত্ব
ক। ব্যবসা-বাণিজ্য ওসব আর যারই
থাক, আমার নেই। লীলা বলছিল।
া. কিছুক্ষণ বাঁচতে যাই। কিন্তু
শোর সামনে প্রকাণ্ড উত্তরের বাতাস।
কটা সময় নেবে। ঠাণ্ডা লাগবেও বেশ।
তাহলে বাস। বাসেই যাওয়া যাক।
ওরে বাবা, দমবন্ধ হয়ে যাবে। যা ভীড়
বাসে।

তাহলে ট্যাক্সি ভাড়া করতে হয়।
দিন ঘোরাঘুরি আর যাতায়াতে পঞ্চাশ-
টাকার বেশি চাইবে না।

লীলা চোখ কপালে তুলেছিল। অত
?

অহীন বলেছিল, বারে! স্ফূর্তি করতে
ছেন, টাকা ছাড়া স্ফূর্তি হয় নাকি?

লীলা একটু হেসেছিল। টাকা দিয়ে
ক স্ফূর্তি কিনে দেখলাম। এবার বিনি
য় কিছু চাই।

শেষ অব্দি ট্রেনে যাওয়াই ঠিক হয়ে-
। মাত্র কয়েক মিনিটের পথ—পরের
ন মুর্শিদাবাদ। অতীতকালের বাংলা-
র-উড়িষ্যার রাজধানী। কবর আর ধ্বংস-
প দেখতেই দেশ-দেশান্তরের মানুষ
ল। নেমকহারামী দেউড়ীর কবরখানায়
এক নেমকহারাম দুর্জোন কবরের পাশে
য়ে সিগ্রেট টানে। জাফরাগঞ্জের কোন
াবাকী রাক্ষুসী নবাবনন্দিনীর অন্ধকার
র লুকানো কবরের কাছে, নরম সে

ঘরের ভিতর শেষ তরুণ নবাবকে তলোয়ারে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল, তার শেষ দেয়ালটি গঙ্গায় ধ্বসে গেছে জেনে, কে বলে উঠেছে—না, না। এ অসম্ভব।

শীতকালে টুরিস্টদের বড় ভীড়। রিকশো মেলা কঠিন। ওরা হাঁটছিল।

অনেকদিন পরে লীলা সেজেছে। একেবারে লালে লাল সর্বাঙ্গ। কাঁধে উপচেপড়া একটা থুপিখোঁপায় ফুল গুঁজেছে একরাশ। বুনো ফুল পথের পাশেই ফুটেছিল ঝোপে। কপালে লাল মোটা টিপ। বুকের ওপর লকেটহার। কানে সেকেলে ধাঁচের মোটা ইয়ারিং। ইচ্ছাকৃতভাবে কোমরে ভাঁজ তুলে হাঁটছে—গরবিনীদের মত লাগে। হাঁটতে হাঁটতে পীচের পথে পাথর-কাঠ বা টুকরোটাকরা কিছু দেখলে স্লিপারের ডগায় কিক করছে। রক্তলাল পুলওভারটা কাঁধে ঝোলানো। রোদের তাপ বেড়ে গেছে কিছুটা। কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। চোখে গগলস।

অহীনকে ঈষৎ ভব্য দেখাচ্ছিল। বেশ পরিচ্ছন্ন। তারও চোখে গগলস কাঁধে ব্যাগ। একটা ক্যামেরাও। মোতিঝিলের পথে দু-পাশে বড় বড় অশথ শিরীষ দেবদারুর গাছ। কোথাও ফাঁকা, কোথাও ঘন ছায়া। ইতিমধ্যে ঝোপঝাড়ের পাশে লীলাকে দাঁড় করিয়ে কয়েকটা ছবিও তোলা হয়ে গেছে।

আরো কিছুটা হেঁটে লীলা হঠাৎ দাঁড়াল। আর কতদূর?

বেশি দূরে নয়। এসে গেছি। ওই যে জঙ্গল মত দেখছেন...অহীন দেখাল।

কী আছে ওখানে?

কবর।

কবর দেখবার জন্যে এমনি করে হাঁটাচ্ছ? অদ্ভুত ছেলে তুমি।

মুর্শিদাবাদে আর কী আছে কবর ছাড়া!

ধুর, ও দেখে কী হবে?

ঘসেটি বেগমের নাম শোনেন নি? নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মাসি?

আমি কারুর মাসির নাম জানি না।

এই মরেছে!

অহীন ইতিহাস নিয়ে পড়ল। লীলা কিছুটা শুনছে, কিছুটা শুনছে না। ঝোপ-ঝাড় ফুল পাখি কাঠবেড়ালির দিকেই তার মনোযোগ বেশি। মোতিঝিলে পৌঁছনোর আগেই অহীন দেখল, এবার সে শ্রোতা। লীলা গাছপালার গল্প বলছে। এত জঙ্গল চারপাশে, বাঘও আছে বৈকি। একবার একটা বাঘ দেখেছিল লীলা।

সেই ভুল বাঘটা তো? অনেকবার বলেছেন। অহীন সুযোগমত বাধা দিল।... জানেন লীলাদি, একসময় এই জায়গাটা কী ছিল? বিরাট প্রাসাদ লোকজন সৈন্য-সামন্ত... নবাব সিরাজদ্দৌলা মাসির ধনসম্পদ দখল করার জন্যে একদিন হঠাৎ চারদিক থেকে প্রাসাদটা ঘিরে ফেললেন। আর ওই যে দেখছেন ঝিলটা—ওটা ছিল অশ্বখুরাকৃতি। ...কল্পনা করছেন কিছু?

আমি কল্পনা করতে পারিনে।

চোখ বুজে দেখুন—যা সব বললাম, স্পষ্ট দেখবেন।

আমি কিছু দেখিনি।

হতাশ হয়ে অহীন বলল, ফিরে গিয়ে আপনাকে ইতিহাস পড়াব।

লীলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।... অহীন, কই আমাকে বই দিলে না! পড়াবে বলছিলে—তার কী হল?

পড়বেন? সত্যি সত্যি তো?

চারপাশে লোকজন আছে। তা না হলে লীলা অহীনের হাতটা হাতে নিত। তাকে

একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ওখানে দরজা-জানালাবিহীন ঘরের মত একটা নিরেট কূপের গায়ে নাকি গোলার আঘাতের চিহ্ন—ভিড় করে সবাই দেখছে। লীলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আদিখ্যেতা সব। চল।

অহীন পা বাড়িয়ে বলল, এবার কিন্তু রিকশো করতে হবে।

এবার কোন্ কবর?

অহীন হাসল। মুর্শিদকুলিখাঁর। কাটরায়।

লীলা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কবরটবর আমি দেখব না। অন্য কোথাও চল।

তাহলে হাজারদুয়ারী চলুন।

একটু পরেই ওরা হাজারদুয়ারীর প্রাঙ্গণে পৌঁছল। লীলা এতখানি পথ আর কোন কথা বলেনি। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে কেন গুম হয়ে রইল। রিকশো থেকে নেমে অহীন উঁচু সিঁড়িতে পা রেখে পিছন ফিরল। লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন স্থানীয় গাইডগোছের ওকে বোঝাচ্ছে—জানেন ম্যাডাম, এই বাড়িটা ১৮৮৫ সালে নবাব হুমায়ুন জাঁহা তৈরী করিয়েছিলেন। একেবারে ইটালিয়ান স্থাপত্য। এর ভিতর অনেক আজব জিনিস দেখতে পাবেন। একটা আশ্চর্য আয়না—সামনে দাঁড়ালে আপনি পাশের লোকের চেহারা দেখবেন, নিজেরটা নেই। আর একটা থালা রয়েছে। খাবারে বিষ থাকলে তা ফেটে যায়। একটা কামান আছে—তা মানুষখেকো।...

লীলা ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল—সে কিছু দেখবে না।

গাইড নাছোড়বান্দা। তাহলে ইমামবাড়া চলুন। ওই যে—ওই বাড়িটা। মুসলমানদের ধর্মগুরু হজরত মোহাম্মদের নাতি ইমাম হোসেনের পায়ের চিহ্ন রয়েছে।

অহীন এসে বাঁচাল।

গঙ্গার ধারে সুন্দর গম্বুজের নীচে গোলাকার চত্বর। নীচে সিঁড়ি গঙ্গার জল অব্দি নেমে গেছে। লীলা ধুপ করে বসে বলল, জায়গাটা মন্দ লাগছে না। তবে বড্ড ভিড়।

অহীন একটু ঝুঁকে বলল, হঠাৎ কী হল আপনার বলুন তো?

কী হবে? কিছু না।

তবে এমন নিস্পৃহ হয়ে পড়লেন কেন? কেমন যেন উদাস-উদাস...!

নাঃ। আমার খুব ভালো লাগছে তো।

লাগছে না।

তুমি গণক।

হাতটা নিল অহীন। কিছুক্ষণ নিবিষ্ট-মনে দেখার পর বলল, আপনার মনে একটা ঝড় উঠেছে। তা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, বাইরের কোন চমক দাগ কাটছে না। ঠিক বলছি না?

হাত ছাড়িয়ে নিল না লীলা। বলল, ঝড় নয়। খিদে।

চলুন, কোন হোটেলে যাই।

হোটেলে নোংরা লাগে।

তাহলে রেস্তোরাঁয় চলুন। সামান্য কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।

না।

উঠে দাঁড়িয়ে লীলা বলল, ওপারে কী আছে?

ওপারেই ছিল সুবিখ্যাত হিরাঝিল। নবাব সিরাজের সুরম্য প্রাসাদ।

এখন আছে সেটা?

অহীন হেসে ফেলল। কোন চিহ্নই নেই আর। তবে রোশনীবাগে নবাব সুজাউ-দ্দৌল্লার কবর আছে।

ফের কবর?

কবরে এত আপত্তি কেন? সব কবরই ইতিহাস। ইতিহাসের শেষ কবরে। আপনি-আমি সবারই শেষ।

ওরা হাঁটছিল গঙ্গার ধারে-ধারে। লীলা বলল, ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতী থামাও তো। নতুন কিছু থাকলে দেখাও।

তবে খোশবাগে চলুন। সিরাজদ্দৌল্লার কবর...অহীন জিভ কেটে ফের বলল, থুড়ি কবর তো দেখবেন না।

এপারে ভীষণ ভিড়। ওপারেই চল। লীলা গম্ভীরমুখে যেন আদেশ করছিল।

সাহানগরের ঘাটে খেয়া পেরিয়ে সামনে গ্রাম। এলাহিগঞ্জ-ডাহাপাড়া। বন গাছপালা আমবাগান বাঁশবন আর ক্ষেতভরা সরিষার হলুদ ফুল। মেঠো পথ। ধুলোওড়ানো এলোমেলো বাতাস। অহীন বাঁদিকে ঘুরল। খোশবাগেই যাবে। পথেও টুরিস্টদের ভিড়। পথের পাশে একটা ছাতিম গাছের নীচে লীলা দাঁড়াল।

অহীন বলল, কী হল?

বুঝেছি। ফের তুমি কবর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ।

তাহলে কোথায় যাবেন?

বরং চল না ওই জঙ্গলটার দিকে যাই।

যাঃ! লোকে কী ভাববে?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা। অহীন অপ্রস্তুত হাসল। লীলা বলল, ওদের ভাবতে দাও না। সেও বেশ মজা হবে। চল।

একরকম জোর করে অহীনের হাত ধরে টানতে টানতে লীলা এগোল। চষা ক্ষেতের ওপর আগাছার জঙ্গল ভেঙে ঝোপঝাড় পেরিয়ে বাঁশবনের ভিতর এসে দাঁড়াল।

নির্জন। অতি নির্জন চারিধার। সামনে শুকনো মিয়ানো ঘাসে-ঢাকা একটুকরো ফাঁকা জমি। অল্প রোদ পড়ে আছে সেখানে। লীলা ধুপ করে বসে ডাকল, এস।

অহীন পা ছড়িয়ে একটু [...]
বসেছে। একটা ঘাসের কুটো দাঁতে [...]
কাটতে সে লীলাকে লক্ষ্য করছিল।

বেশ জায়গাটা কিন্তু। লীলা [...]
অনেকদিন এমন জায়গা দেখিনি। এত [...]
লাগছে বলার নয়। তোমার বুঝি [...]
লাগছে?

অহীন জবাব দিল না।

কথা বলছ না যে।

আপনাকে দেখছি।

কেন?

আমার ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।

লীলা খিলখিল করে হেসে উঠ[...]
যে সব সময় নিজেই ভূতের ভয়ে অস্থির [...]
অপরকে ভয় দেখাবে কী!

ভূতের ভয় আপনি কি সত্যি ক[...]
করি।

আসল ভূত দেখেননি। ওটা ভুল [...]
আপনার সেই ভুল বাঘটার মত।...আরে [...]
আপনার বুকে শুঁয়াপোকা!

লীলা সেটা দেখে নিয়ে বলল, [...]
পোকাটা এল কোত্থেকে? এই, লক্ষ্মী[...]
ফেলে দাও তো।

আমার সাহস নেই বাবা। আ[...]
ঝেড়ে ফেলুন।

এস না। গা শিরশির করছে এ[...]
লক্ষ্মীটি!

যান। মেয়েদের গায়ে হাত [...]
অভ্যেস নেই।

হ্যাঁ, তুমি কচি খোকা।

অহীনকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল।
হাসবার চেষ্টা করে বলল, এইজ[...]
আপনাকে ভয় করে। আরে, ফেলে [...]
ওটা। গলার দিকে যাচ্ছে যে।

তুমি ফেলে দাও এসে।

বাধ্য করাচ্ছেন?

করাচ্ছি।

কেন?

কৈফিয়ৎ দিতে বসলে তোমার [...]
ইতিহাস হয়ে যাবে। কই, এস।

সন্তর্পণে একটা শুকনো [...]
সাহায্যে অহীন পোকাটা তুলে ফেলে [...]
জুতোয় পিষে মারল। তারপর বলল,
লীলাদি, আপনি আননেসেসারী [...]
খাটাতে পারেন। চলুন, এবার ওঠা [...]
খিদে পেয়েছে।

লীলা হাসতে হাসতে বলল, [...]
একটা জমিতে মুলো আছে দেখলাম। [...]
নিয়ে এসো কয়েকটা।

মুলো খাবেন? বাঃ!

খেতে দোষ কী। খিদে পেলে [...]
জঙ্গলে ওই তো খেতে হয়।

আপনি খান। কই, উঠুন।

তোমাকে নিয়ে পারা যায় না[...]
কোথায় যাবে। লীলা উঠল। হাসল[...]
চোখে গগলস, কী বুঝি আড়ালে [...]
দিচ্ছিল। অহীনের নিভাজ অনুমান
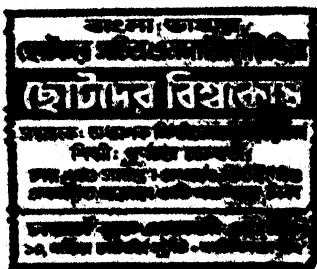
সেই আগাছার ক্ষেত ভেঙে পথে এসে তেই একটা দলের মুখোমুখি হয়েছে া। সামনের লম্বা ফর্সামত ভদ্রলোক হীনকে প্রশ্ন করলেন, ওদিকে দেখবার ছু আছে নিশ্চয়!

অহীন আমতা-আমতা করছিল। জবাব লা দিল, আছে। এক নবাবনন্দিনীর র। যান না, ওই তো বাঁশবনের ভিতরে। ন কিছুদূর হাঁটলে একটা মাটির ঢিবি খবেন।...

পুরো দলটা প্রায় দৌড়ে বনবাদাড় ঙতে শুরু করেছে। লীলা হাসিতে ঙে পড়ছিল। অহীন বলল, এই, মাইরি, পনি যেন কী! ওরা কী ভাববে বলুন া! ছিঃ।

লীলা বলল, ওদের সঙ্গে মেয়ে তো ই। ওদের ভয় পাবার কী আছে। এখন ড়াতাড়ি চল তো। ট্রেন ধরতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন?

খুব ঘোরা হল। হাত-পা ব্যথা করছে। পস্, কম হাঁটালে!

খেয়া পেরিয়ে রিকশো চেপে স্টেশনে ৗছনর মুহূর্তে ডাউন ট্রেনটা প্লাটফরম ড়েছে। হতাশ হয়ে দুজনে খোলা কাশের নীচে একটা বেঞ্চে বসল। পুরো নটি ঘণ্টা পরে ফের একটা ট্রেন রয়েছে। সে বা রিকশোয় যাওয়া যায়। তাহলে র পিছু হটে শহরের ভিতর দিকে যেতে । বাসস্ট্যান্ড কিছুটা দূরে। অহীন কশো খুঁজে এল। এখনই আপ ট্রেন এসে ছে। রিকশোওয়ালাদের গরজ নেই। রিস্ট বাগানোর তালে ওঁৎ পেতে রয়েছে া। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরল সে। ং বাসস্ট্যান্ড অব্দি রিকশো করে যাওয়া তে পারে। লীলা মাথা নাড়ল। থাক। । ওখানে কিছু খেয়ে নেবে। তিনটে ঘণ্টা প করে কাটিয়ে দেব।

দুজনে উঠে এসে প্লাটফরমের ওপর ষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়াল। লীলা ল, আমি কিন্তু কিচ্ছু খাবো না। মাথা রছে। তুমি যা খাবে খেয়ে নাও।

সে কি! তাহলে আমিও খাবো না।

ছেলেমানুষী করো না। যা বলছি ন।

আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি খাব? লজ্জা করছে?

যান। আপনি না খেলে আমি খাবো

ইতিমধ্যে একটা ঠোঙাভরতি মিষ্টি ছে গেছে হাতে। লীলা বলল, থাক। ই হবে। তারপর একটা মিষ্টি তুলে নের মুখে গুঁজে দিল। চারপাশে ভিড়। নের লজ্জা করছিল। খারাপ লাগছিল। বাড়াবাড়ি করছে লীলা। লোকেরা কী ছে কে জানে। অহীনকে ঠিক দেবরের দেখাচ্ছে—নাকি দূরসম্পর্কের ভাইয়ের । ততক্ষণে লীলা পা বাড়িয়েছে। টিং-রুমে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিই। তে পারছি না। মাথা ধরেছে খুব। খাওয়া শেষ করে পানের রকমারি য় থেকে একটা মাথাব্যথা দূর করার ট্যাবলেট কিনে অহীন ওয়েটিং-রুমের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় আপ লালগোলা লোকাল এসে গেছে।

প্ল্যাটফরমটা মুহূর্তে সমুদ্র হয়ে উঠেছে। ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে ডান-দিকে ট্রেনের জানালায় চোখ চলে গেল অহীনের।

থার্ড ক্লাশ কামরা। ব্যাপারীগোছের যাত্রীতে ঠাসা। টাকওয়ালা একটা লোক জানালার ধারে বসে রয়েছে। তার গোঁফটা এত বিসদৃশ লম্বা আর ঘন না হলে অহীনের দৃষ্টি যেত না ওদিকে। সে পর-ক্ষণেই চমকে উঠল। লোকটার ওপাশে মাথায় কম্ফোর্টার জড়িয়ে—গায়ে খয়েরী শার্ট, উস্কোখুস্কো চুল, হতশ্রী চেহারা সুখেন বসে আছে না?

ধাক্কা মেরে ভিড় ফাঁক করে অহীন কাছে গেল। সুখেনদা!

সুখেনও চমকে উঠেছিল। সোজা হয়ে বসল। তারপর তাড়াতাড়ি হাতে ধরে-রাখা গগলসটা পরে নিয়ে অপ্রতিভ হাসল। অহীন, তুমি এখানে?

আপনি...অহীনের গলা কাঁপছিল।... এখানে! কী আশ্চর্য!

ব্যবসাবাণিজ্য করছি ভাই। কলকাতা থেকে ফিরছি।

সর্বনাশ! থাকেন কোথায়! শিবানীর খবর কী?

শ্বশুরমশাইকে বলে দেবে না তো?

যান, কোন মানে হয় না। কী ভাবেন আমাকে!

সুখেন একটু কেসে বলল, এবার পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে গেছি ভাই। লাল-গোলায় আছি। সামান্য কারবার আছে। শিবানী—শিবানী ভালই আছে।

অহীন অন্যমনস্কভাবে বলল, কিসের কারবার? ফের প্রেম নয়ত?

নাঃ। ভ্যারাইটি স্টোর্স গোছের।

কেমন চলছে?

মোটামুটি ভালই। তোমাদের খবর কী?

বেশ ভালই। লীলাদি...

সুখেন লোকটাকে আড়াল করে জানালায় ঝুঁকল। চাপাস্বরে বলল, তোমাকে হঠাৎ পেয়ে ভালই হল। ভাব-ছিলাম লালুর সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেলব। শিবির ইচ্ছে তাই। ও নিজেই যেতে চেয়েছিল—বারণ করেছি। তুমি লালুকে বলবে লালগোলা আসতে?

অহীন ঘাড় নাড়ল।

তুমিও এসো সুযোগমত। স্টেশনে নেমে 'জলযোগ' নামে একটা খাবারের দোকান দেখবে। ওখানে কিন্তু আমার নাম বললে কেউ চিনবে না। বলবে, সন্তুবাবুর দোকান কোথায়। যাবে তো?

যাবো।

চাকরী পেয়েছ?

না।

আমার ওখানে চলে এসো। বড় কারবারের স্কোপ আছে হাতে। এপার-ওপার পদ্মার জল কেনাবেচা হয়। বুঝেছ?

ট্রেনের হুইসিল শোনা গেল। ট্রেনটা চলতে থাকল। অহীন হাঁটল পাশে-পাশে।

অবশ্য রিস্কও লাভ। শুধু একটু রিস্ক মাত্র। বিনিপুঁজির ব্যবসা। কী, আসছ তো?

যাবো।

লালুকে বলো।

বলব।

জনশূন্য প্লাটফরমে একা অহীন দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটা নেই। দূরের বাঁকে গাছপালার ওপর ঘন কালো ধোঁওয়া দেখা যাচ্ছে। অহীন সেদিকে তাকিয়েছিল। এক-সময় চমক ভাঙল। লীলা এসে ডেকেছে।

অহীন অদ্ভুত হাসছিল। নিঃশব্দে।

কী ব্যাপার তোমার? এখানে কী করছ?

দাঁড়িয়ে আছি।

কার সঙ্গে কথা বলছিলে দেখলাম। চেনা কেউ?

হ্যাঁ।

বন্ধুবান্ধব?

বলতে পারেন। তবে লোকটা আজকাল বর্ডার এলাকায় চোরাকারবার করে। অদ্ভুত কারবার সব। পদ্মার এপার-ওপার জল বেচাকেনার কারবার। আমাকেও দলে টানতে চায়।

যাবে নাকি?

তা মন্দ হয় না। পদ্মার চরে গুলি খেয়ে মরার মত আনন্দ আর কিসে আছে? আজকাল আমরা ভীষণভাবে মরতেই তো চাই।...ওহো, এই যে একটা ট্যাবলেট এনেছি। চলুন, জল এনে দিই।

সেদিন বাড়ি ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেছে। লীলাকে পেঁৗছে দিয়ে অহীন চলে গিয়েছিল। ফিরল অনেক পরে রাত্রের দিকে। এসেই বলল, আজ একটা মজার গল্প শোনাব লীলাদি।

লীলা ওর অপেক্ষা করছিল। ভাগ্যিস আজ ফেল্টুবাবু এদিকে আসেন নি। সে বলল, গল্প পরে হবে। আগে খেয়ে নাও।

বাড়িতে খেয়ে এলাম। মায়ের মুখ যা হয়েছে দেখলাম না! উঃ! আপনি আমাকে কাল থেকে রেহাই দিন লীলাদি। বাড়িতে না শুলে আর ম্যানেজ করা কঠিন। দিদিও কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছে।

দুলি রান্নাঘরের বারান্দায় চুপচাপ বসে রয়েছে। বড় শান্ত মেয়ে। কথা বলে কম। দৃষ্টিশক্তিও ততটা নেই। তা না হলে দেখত ঘরের ভিতর পর্দার আড়ালে একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটেছে।

বিসদৃশ। কেননা অহীনও একটু অবাক হয়েছিল। লীলা ওর হাত ধরে টেনেছে। তারপর বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অগ্রজারা যেভাবে কনিষ্ঠদের আদর করে, সেইভাবে মুখ একটু তুলে......

জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে খাটের ওপর ফেলে অহীন ছুটে বেরিয়ে গেল। যেন ভয় পেয়ে পালাল।

(ক্রমশঃ)

আবহাওয়া নিয়ে

দুর্লভ চক্রবর্তী

ইংরেজরা নাকি খুব মিশুকে নয়। ওদেশে দুজন অচেনা লোক পাশাপাশি বসে থাকলেও নাকি কথা বলতে চায় না। এবং কথা যখন বলে তখনও নাকি শুধু আবহাওয়া নিয়েই দু'একটি মন্তব্য করে। —যেমন আজকের দিনটা কী বিশ্রী, কিম্বা, আজকের দিনটা কী চমৎকার। আমাদের দেশে এ নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি। আমরা ভাবতেই পারিনে, আলাপ করার বিষয় হিসেবে আবহাওয়া বস্তুটা ধর্তব্যের মধ্যে আসে কী করে। কিন্তু আমার মনে হয়, আবহাওয়ার বিষয়ে আমাদের এই অবহেলা খুব আন্তরিক নয়। হতে পারে যে, এদেশে দুজন অচেনা মানুষ আলাপ জমাবার সময় আবহাওয়ার কথা তোলে না, এবং এমন কথাই তোলে এবং তুলতে থাকে যাতে আলাপ শেষে প্রলাপ হয়ে ওঠে। হতে পারে—মশায়ের নাম কি, নিবাস কোথায়, কী করা হয়, জিজ্ঞেস করার পর অনিবার্যভাবেই আমরা 'বেতন কতো' জানতে চেয়ে নাজেহাল করে তুলি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমরা একেবারে উদাসীন। বরং আমি একথাই বলব যে তুলনামূলকভাবে আমরাই যেন বেশি আবহাওয়া সচেতন।

এবং সে চেতনা আমরা ব্যক্তও করি। এই কলকাতা শহরেই আমি বহু লোককে বলতে শুনেছি, কী শীত পড়েছে রে বাবা। অথচ সকলেই জানেন, বিলেতে যা শীত পড়ে তার তুলনায় কলকাতার শীত ছেলে-খেলা। আসলে, বিলেত বা ইউরোপ আমেরিকার শীত ছাড়া আর কোনো ঋতুরই অস্তিত্ব নেই। সেখানে শুধু শীত, এবং আরো শীত। আবার শীত ছেড়ে যদি গরমের কথা তুলি তো সেখানেও দেখব একই পরিস্থিতি। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকেই আমাদের এই কলকাতা শহরে গরম নিয়ে হাহুতাশ করি আমরা অনেকেই। কিন্তু গরমের দিনে তাপ ওঠে এখানে কতো ডিগ্রি? বেশির ভাগই ফারেনহাইট মাপের ১০৩ থেকে ১০৫.৬ ডিগ্রি। দু'চার বছর পর পর হঠাৎ দু' একদিন হয়তো ১১০ ডিগ্রির দেখা মেলে। সেদিন, না সেদিন নয়, পরের দিন খবরের কাগজে এই খবরটি দেখে আমরা একেবারে হাঁ হয়ে যাই। এত গরমে আমরা বেঁচে আছি কী করে। কিন্তু, বেশি দূরে যেতে হবে না, কলকাতা থেকে আসানসোলে পাড়ি দিলেই মালুম হতে শুরু করবে, গরম বলে কাকে। এবং তারপর যতো পশ্চিমে এগোতে থাকা যাবে ততো বেশি। আর রাজস্থানের কথা না তোলাই ভালো, সেখানে তো আস্ত একটি মরুভূমিই হু হু করে জ্বলছে। এবং সেখানেও মানুষ বাস করছে। তারা সম্ভবত গ্রীষ্ম নিয়ে আমাদের মতো এত দাপাদাপি করে না—করলে সেখানে টিঁকতে পারত না।

অপিচ বৃষ্টি। বৃষ্টি নিয়েও আমাদের খেদোক্তি কি কম কিছু? অথচ আমাদেরই দেশের চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি পড়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এবং সেখানেও মানুষজন রয়েছে। বৃষ্টির জন্যে মুখভার করে নিশ্চয়ই তারা ঘরে বসে থাকে না।

আসলে আবহাওয়ার সংগে একটা মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগ আছে, সেইজন্যে সামান্যও আমাদের কাছে অসামান্য হয়ে ওঠে অনেক সময়। আর কারণটাও খুব অস্পষ্ট নয়। পৃথিবীর ওপর সকলেই বাস করছি আমরা বাতাসের সমুদ্রের মধ্যে। ঠিক যেমন মাছ বাস করে জলের সমুদ্রে। এর মধ্যেই আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবকিছু। কাজেই এই বাতাবরণ যে আমাদের শরীর-মনকে প্রভাবিত করবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

মনস্তত্ত্বের ব্যাপারটা সবথেকে বেশি বোঝা যায় বর্ষাকালে। বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরোতে খারাপ লাগে নিশ্চয়ই, কিন্তু বর্ষাকালে সারাদিন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে যে মনটা একটু উদাসও হয়ে ওঠে তাও অস্বীকার করা যাবে না। বস্তুত, আমাদের এই বাংলাদেশে অন্তত, ভালো কবিতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বর্ষাকে নিয়ে। আমার এ দাবি যদি নিতান্তই অতিশয়োক্তি মনে হয় তো বৈষ্ণব কবিতা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ভেবে দেখুন। মনে যদি কারো বেদনা থাকে, কিম্বা থাকে কোনো গভীরতর বিরহবোধ, তাহলে বর্ষা-মেদুর দিনের আর্দ্র হাওয়ার প্রভাবে মনটাও ঈষৎ ভিজে উঠবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে!

আর বর্ষার ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বোধকরি শরৎকালে। রৌদ্র-করোজ্জ্বল দিন, অভ্রের মতো গভীর নীল আকাশ, বৃষ্টিরিক্ত শাদা মেঘের রাশি—সবকিছু মিলিয়ে মনে বেশ একটা খুশির আমেজ আনে। বলতে গেলে, এই সানন্দ উৎসাহেরই প্রতিফলন ঘটে শারদীয় উৎসবে। আর তারপরই ঘনিয়ে আসতে থাকে পাণ্ডুর শীতাক্রান্ত হেমন্তের দিনগুলি। তাতে

বিষাদই হয়ে ওঠে স্থায়ী ভা অবিস্মরণীয় প্রকাশ ঘটেছে জী নানের কবিতায়।

অবিশ্যি কবিতার কথাই যখ তখন বলে নেওয়া ভালো, কবিতা স ওপরই লেখা হয়েছে। এবং শুধু মাসের ওপরও—অর্থাৎ ছয় দফার বারো দফায়। 'ফুল্লরার বারমাস্যা' তা নিখুঁত উদাহরণ। বারো মাসের প্র মাসে কালকেতুগৃহিণী ফুল্লরা কীভা কাটায় তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কবিতায়।

সে যাক, কথা হচ্ছিল আব সংগে মনস্তত্ত্বের যোগ নিয়ে। এর মোক্ষম প্রমাণ পড়েছিলাম বহুদিন একটি শিশুপাঠ্য গল্পে। সেটা এই-

শীতকালের সন্ধ্যায় এক ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় উঠে আরেকজন সাহেব যাত্রী বসে আছেন আগে থেকেই। তিনি তাঁর পাশের জানলাটি খুলে রেখেছেন। কাজেই শুরু করতেই প্রথম ভদ্রলোকের বে করতে লাগল। একটু পরে তা কাচের জানলাটি তুলে দিলেন। এব শীত কম লাগাতে তিনি বেশ স্ব করতে লাগলেন। কিন্তু এতে দ্ ভদ্রলোক অর্থাৎ সাহেব যাত্রীটির র অস্বস্তি লাগতে শুরু করল—সত্যি কি, তাঁর রীতিমত গরমই লাগছে ফলে ঝপাস করে তিনি জানলাটা দিলেন। আর তৎক্ষণাৎ শীতে হু কেঁপে উঠতে লাগলেন ১নং ভ কাজেই আবার তিনি সবেগে গিয়ে ব দিলেন জানলাটা। —আঃ কি শীতকালে চলন্ত ট্রেনে জানলা করলে কখনো তিষ্ঠানো যায়! কিন্তু তা শুনবেন কেন? অতএব—ট্রেন স্টেশনে আসা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে জানলাটা খোলা এবং বন্ধ করাই লাগল। তারপর ট্রেন থামা মাত্রই একসঙ্গে গিয়ে কমপ্লেন করলেন গার্ড তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে এসে হাতজোড় করে বললেন, 'মাপ করবে জানলার কাচটা যে ভাঙা তা আমি রিপোর্ট করব ওপরে। এইবারের আপনারা দয়া করে ম্যানেজ করে নি

তখন দুই যাত্রীই সবিস্ময়ে করলেন, সত্যিই কাচ নেই জানলা এই কাচহীন জানলার ফ্রেমই বন্ধ খোলার সঙ্গে সঙ্গে একজনের গর অন্যজনের শীত লাগছিল এতক্ষণ।

...কাজেই আবহাওয়ার ব্যাপারে স্তত্ত্বের যে একটা বড় প্রভাব রয়ে অস্বীকার করা যাবে কী করে!

ইতালির সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

শিশির ভট্টাচার্য

অল্পদিনের ব্যবধানে বর্তমান ইতালির ন লেখক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার য়াঁর গৌরব অর্জন করেছেন; বর্তমান লিয় সাহিত্য ও তার এই বিশ্ববন্দিত তিাকদের সম্বন্ধে বাংলা দেশের পাঠক- খুব বেশী পরিচিত নন। একমাত্র না ও মোটামুটি ব্যতিক্রম হিসেবে লুইজি নদেল্লোর নাম করা যেতে পারে। নদেল্লো বাঙালী পাঠকের কাছে রণভাবে তো পরিচিতই এমন কি কের দিনে বাংলা রঙ্গমঞ্চেও আর রিচিত নন।

ইতালিয় সাহিত্যের অতীত ইতিহাস বময় একথা সকলেই জানেন। আর এই থ সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ ন পিরানদেল্লোর আবির্ভাব। যদি বলা যে, তাঁর আবির্ভাব ইতালিয় সাহিত্যের ন যুগের শেষ ও বর্তমান যুগের ন্ড সূচনা করে তবে ভুল বলা হয় ইতালিয় সাহিত্যের দরবারে পিরান- া প্রবেশ করেছিলেন একজন কবি বে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম তিনখানি ই কাব্য সংকলন। তারপর তিরিশ বছর উপন্যাস ও ছোটগল্প মিলিয়ে তিনি চারশ' গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১০ র পর তিনি মঞ্চের জন্যে কলম ধরেন তাঁর অনেক ছোটগল্প ও উপন্যাস ক রূপান্তরিত করেন। মৃত্যুর মাত্র দিন পূর্বে ১৯৩৪ খৃঃ নোবেল স্কার কমিটি সাহিত্যের জন্যে তাঁকে স্কার দান করেন।

পিরানদেল্লোর মৃত্যুর পর তিরিশ রও বেশী কেটে গেছে। পশ্চিমী জ আজ এক আমূল পরিবর্তন ছে। তা সত্ত্বেও আধুনিক রঙ্গমঞ্চে াট্যজগতে পিরানদেল্লো একজন সর্ব- স্বীকৃত প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব বলে পৃথিবীময় হয়ে থাকেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় া এই আন্তর্জাতিক খ্যাতির অতি ই তিনি পেয়েছেন। সমন্বয়মূলক নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে অস্তিত্ববাদের প্রয়োগে তিনি একজন অগ্রদূত। এমন কি আরও সাম্প্রতিক কালে রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে যে অসংলগ্নতার প্রয়োগবাদ দেখা যাচ্ছে সেখানেও তাঁকে নবভাষ্যকারদের পূর্বসূরী বলেই গণ্য করা হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকায় আজ বর্তমান যুগের রঙ্গমঞ্চ কিম্বা আধুনিক নাটকের ওপর পিরানদেল্লোকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনাই করা সম্ভব নয়। কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যখন চিন্তা করা যায় যে কেবলমাত্র গুটিকয় নাটকের ওপরই তাঁর এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিটা ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই নাটকগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' (সেই পার- সোনাজ্জি ইন চেরকা দাউ তোরে) ও 'চতুর্থ হেনরি' (এনরিকো কোয়ার্তো) এই দুখানাই অনেকটা নিয়মিত অভিনীত হয়ে থাকে। পিরানদেল্লোর সাহিত্যকর্মের ভেতর এই নাটকগুলোই তাঁকে বুঝতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। আর তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির মূলেও হচ্ছে এই নাটকগুলোই।

'ছটি চরিত্র'—নাটকটার সঙ্গে বোধহয় পিরানদেল্লোর নাম একেবারে অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবেই জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন সত্যি সত্যি পিরানদেল্লোকে এই নাটকটার ভেতর কতটা খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে এক কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ পিরানদেল্লো সহজ মানুষ হলেও এই নাটকটা মোটেই সহজ নয়। একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলে বোধহয় এই কথাটা বলাই যুক্তিসংগত হবে যে, 'ছটি চরিত্র' নাটকটা মোটেই সাধারণ স্তরের দর্শকের জন্যে লেখা নয়। পিরানদেল্লো এটা লিখেছেন, মূলত রসবেত্তা ও খুঁতখুঁতে বিচারক শ্রেণীর দর্শকের উপযোগী করে। নাটকের গল্পের ভেতরে যে আরও একটা গল্প আছে সেটাই দর্শককে ভাবিয়ে তোলে আরও অনেক বেশী।

আনুষের বাইরের রূপ আর আসল রূপের যে ফারাক, অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির যে বিসমতা, শিল্প ও বাস্তব জীবন-এর যে অসংগতি চেতনশীল ও সংবেদনশীল মানুষের মনকে অহরহই নিপীড়িত করে চলেছে তারই ওপর এই নাটকটাতে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে। তাহলে তথাকথিত আধুনিক বিদগ্ধ দর্শকসমাজ এই নাটকে কি খুঁজে পাবেন? পিরানদেল্লোর নাটকের অনিবার্য দার্শনিক বাগাড়ম্বর তাঁরা কেমন করে সহ্য করেন! নাটকটার অসাধারণ বাস্তব মঞ্চরূপায়ণ ও আশাতীত রকমের মঞ্চসফলতা এই সব দর্শককেও যথেষ্ট আনন্দ দেয়।

পিরানদেল্লোর সব নাটকই যে রঙ্গ- মঞ্চে সফল হয়েছে তা নয়। যেমন 'যার মুখে ফুল' নাটকটা। কুশল মঞ্চপ্রয়োগ বা চমৎকার অভিনয় কিছুতেই এই নাটকটার জড়তা ঢাকা পড়ে না। অথচ এটাকে নাটক হিসেবে না দেখে যদি গল্প হিসেবেই ধরা যায় তাহলে যে কেউ এটাকে পিরানদেল্লো মেজাজের একটা অতি উৎকৃষ্ট গল্প বলেই মেনে নিতে রাজী হবেন। গল্পটার আরম্ভে নায়কের জীবনের প্রতি আসক্তি প্রায় হাস্য- কর বলেই মনে হয়। কিন্তু পরিণতির দিকে তার বিয়োগান্ত দিকটা আস্তে আস্তে ফুটে উঠে পাঠকের মনে বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করে। যে গল্পের ওপর ভিত্তি করে নাটকটা দাঁড় করানো হয়েছে সেই মূল কাহিনী ও নাট্যকথা যদিও এক, তবু মঞ্চের দর্শক থেকে গল্পের পাঠকের তৃপ্তি হয় অনেক বেশী। ছোটগল্পের ফর্ম, তার অতিপ্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ততা, তার দ্রুত- চরিত্রায়ণ, আকস্মিক ক্লাইম্যাক্স সবটুকুই পিরানদেল্লোর মেজাজের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে। অথচ রঙ্গমঞ্চের মুখ চেয়ে এটাকে তিনি গল্পসাহিত্য হিসেবে প্রায় বাতিলের কোঠাতেই ফেলে দিয়েছিলেন।

ইউরোপে বিশের যুগে পরীক্ষা- নিরীক্ষার দুই প্রধান কেন্দ্র ছিল রোম আর প্যারিস। পিরানদেল্লো যদিও জার্মানীতে

লেখাপড়া শিখেছেন, শুধু জীবিকা হিসেবে যেতে [illegible] শিক্ষকতা। পিরানদেল্লোর আজকের আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিকে যদি সেই সময়কার প্যারিস আর রোমের মানদণ্ডের নিরিখে বিচার করা যায় তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁর [illegible], নন কনফরমিস্ট অর্থাৎ প্রচলিত প্রথা থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী জীবনদর্শনের জন্ম হয়েছিল ইতালির রাজনৈতিক সংযুক্তির পরবর্তী কালের সিসিলিয়ান [illegible] একটা দারুণ আঘাত থেকে। এই আঘাতের কারণ রাজনৈতিক। অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিয়েমন্তে ও সার্দিনিয়ার সর্দারি মেনে নেওয়ার ফলে। এই কারণে সেই সময়ে সিসিলির যুব-সমাজে জীবন সম্বন্ধে একটা আনীহার ভাব দেখা গিয়েছিল। আর এই ভাব নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সিসিলিয়ান সমাজ অর্থাৎ বর্তমান ইতালির দক্ষিণাঞ্চল বাকী দেশের তুলনায় যথেষ্ট দরিদ্র। তাই দেশের নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অর্থ-নৈতিক নিম্নমান আর সামাজিক অসাড়তা সম্বন্ধে সচেতনতা তাদের দারুণ ক্লিষ্ট করে তুলেছিল। এই অচলায়তন অবস্থা থেকে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচার ইচ্ছাটাই যেন অহেতুকভাবে যুবসমাজকে পেয়ে বসল। আসলে দেশের সর্বাঙ্গীন নবজাগরণের দিনে এই মনোভাবের কোন বাস্তব যুক্তি ছিল না। এটা এসেছিল কেবলমাত্র একটা মানসিক হীনমন্যতা বোধ থেকে। এই অবস্থায় মানসিক মুক্তির একমাত্র পথ হল ফ্যান্টাসি বা কল্পনাবিলাসকে আশ্রয় করে।

সমসাময়িক লেখকদের তীব্র বাস্তববাদে অভিভূত হয়ে লাম্পেদুসা, *১ তাঁর উপন্যাসের নেকড়ে দলের বাস্তব ও সাংস্কৃতিক কর্ম হিসেবে আকাশে নতুন নতুন তারা খুঁজে বেড়ানোর পথ দেখালেন। পিরানদেল্লোর নাটক 'প্রাচীন ও নবীন' (ই ভেক্কি এ ই জিওভানি) এ দন ইপ্পোলিতো আর্কিও-লজিক্যাল রিসার্চের কাজের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন দেখতে পাই।

পিরানদেল্লোর জগৎ হচ্ছে এমন সমস্ত চরিত্র নিয়ে যাদের জীবন এই পৃথিবীর মাটির সীমানাতেই সীমাবদ্ধ। যেমন কেরানী, স্কুলমাস্টার, শ্রমিক, নিম্নতম পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী এই সব। কিন্তু তাহলেও তাঁর সৃষ্ট এই সব চরিত্রের [illegible] দৈনন্দিন ক্ষুদ্র জীবনের গ্লানি থেকে পালিয়ে গিয়ে কল্পনাজগতের স্বাধীন ও ব্যক্তিগত রাজত্বে ঘুরে বেড়ায়। এদের অনেকের কাছেই জীবন দেখার দূরবীক্ষণ আছে। তাদের অনেকের অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেয়ালও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চরিত্র-গুলোর কোনটাই নিউরটিক বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নয়। নিজের নিজের অনুভূতি বা অনুবিধা এরা নিজের [illegible] রাখে আর আপ্রাণ চেষ্টাও করে যাতে অন্য কারো তা ক্ষতির কারণ না হয়।

'এই রকমই, যদি তোমার মনে হয়' (কোজি এ সে ভি পারে) নাটকটার কথা যদি ধরা যায় তো দেখতে পাই তিনটি চরিত্রের প্রত্যেকেই অপর দুজনের জন্যে আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। যে কোন ঘটনার কার্যকারণের মূলে 'যুক্তি'কেই তারা একমাত্র সত্য বলে মেনে নেয়। আর 'যুক্তিবাদ'ই যে সত্যের একমাত্র পথনির্দেশক এ তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এমন কি সেই সত্যের সন্ধান যদি তাদের জীবনের পরি-পন্থী হয় তাহলেও তারা পশ্চাৎপদ নয়। কিন্তু পিরানদেল্লোর বাকী চরিত্র, যারা তাঁর ভাষায় স্বাভাবিক বা সাধারণ মানুষ তারা তাদের নিজস্ব কল্পনাশক্তিকে তো হত্যা করেই, এমন কি আর সবার মন থেকেও মুছে ফেলতে চায়। পিরানদেল্লোর সৃষ্ট 'শত্রু' হচ্ছে এরাই।

পিরানদেল্লোর আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিশ্চয়ই তাঁর নাট্যকার হিসেবে, কিন্তু এটাই সব নয়। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা যা দিয়ে তিনি শুধু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গতি ও সরঞ্জামের মাধ্যমেই জীবনের বাস্তব রূপায়ণ দেখিয়েছেন তা যেন কোন শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-প্রযোজকেরও ঈর্ষার বস্তু। পিরানদেল্লোর সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যের একটা সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের মানসিক অসঙ্গতি। পিরানদেল্লো তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে এই কল্পিত মানসিক বিপর্যয়, অসঙ্গতি, হিংসা ও অপরাধের সাধারণ পথ নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি মানুষের ব্যক্তিসত্তাকেই আরও বিশ্বস্তভাবে এঁকেছেন। মানুষের আত্মিক শক্তি সেখানে বাইরের চাঞ্চল্যকে পরাস্ত করে আত্ম-সমাহিত ভাব নিয়ে এসেছে। মানুষ প্রেমের মধ্যে আলোর পথ খুঁজে পেয়েছে। এমন কি সেই প্রেম একতরফা হলেও। পিরান-দেল্লো বীরচরিত্র আঁকেন নি। কিন্তু তাঁর চরিত্রেরা কেউ কাপুরুষ নয়। তারা মনুষ্যত্ব হারায় না। এদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি তাঁর 'একটি চরিত্রের বিয়োগান্ত নাটকে' বলেছেন, 'এই সব চরিত্র জোর করে লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। লেখক যাতে তাঁর সহানুভূতি দিয়ে তাদের বুঝতে চেষ্টা করেন সেই জন্যে।' আর এই সব কম-দামী মানুষ, যারা নিজেকে বলি দিয়ে অপরের জীবন ফুটিয়ে তোলে, তাদের জন্যে পিরানদেল্লোর সহানুভূতি ও বুঝতে চাওয়ার কোন শেষ নেই। সাধারণ মানুষের জন্যে এই বেদনাবোধ, দরদ, প্রচলিত পথের খাতির দিকে পা না বাড়ানোর এই আ[illegible] [illegible] পিরানদেল্লোকে পশ্চিমী [illegible] নৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অ[illegible] আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অপ[illegible] জন ইতালির সাহিত্যিকের কথা[illegible] আসা যাক। তাঁদের তিনজনের [illegible] কিন্তু একেবারে ভিন্ন পর্যায়ের। মধ্যে কেউই পিরানদেল্লোর মত সু[illegible] উঁচু আসন দখল করতে পারেন [illegible] তিনজনেরই, বিশ্বসাহিত্যে না [illegible] ইতালির সাহিত্যে অন্তত বি[illegible] আছে।

প্রথমেই পিরানদেল্লোরই সমসাময়ি[illegible] ন্যাসিক 'গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার' *২ [illegible] যাক। দেলেদ্দা নারী হওয়ার জন্যে তাঁর সুনাম কিছুটা চাপা পড়েছে। সমালোচকেরা নারীর প্রতি বিশেষ [illegible] করুণার ও নীতিবাগীশের দৃষ্টি [illegible] লেখা পড়েছেন। কেউ কেউ তাঁর [illegible] 'লোকগাথা'র পর্যায়েও নামিয়ে [illegible] অন্যান্য অনেক পুরস্কারবিজয়ীর [illegible] যেমন হয়ে থাকে, দেলেদ্দার ক্ষেত্রেও বিরূপ সমালোচনা যথেষ্ট হয়েছে [illegible] রচনা পাঠ করে সেলমা লে[illegible] ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অভিনন্দন [illegible] ছিলেন আর প্রথম মহাযুদ্ধে বি[illegible] দেখানোর জন্যে দেলেদ্দার জন্মভূমি[illegible] নিয়ার একটা বিশেষ গৌরবময় স্থান[illegible] এই দুটোই হল অযোগ্য পাত্রী[illegible] পুরস্কার পড়ার আসল কারণ—[illegible] কম কুৎসা রটানো হয় নি। কিন্[illegible] পণ্ডিতের মতামতে তেমনভাবে [illegible] দিয়েও তাঁকে বুঝতে খুব অসুবিধা [illegible] প্রশ্ন জাগতে পারে দেলেদ্দার রচনা [illegible] ভাল লাগে কেন! তাঁর রচনায় [illegible] বস্তু আছে যা পাঠককে ঐতিহ[illegible] সাংস্কৃতিক কচকচির ভেতর [illegible] অনায়াসেই তাঁর সৃষ্ট এ[illegible] জগতে নিয়ে চলে যায়।

দেলেদ্দার জন্মভূমি সার্দিনিয়া[illegible] পিরানদেল্লোর সিসিলির ঠিক উল্[illegible] সার্দিনিয়া গো-মেষ চারণভূমির দে[illegible] দেশের আদিমকালের ইতিহাস [illegible] মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ নে[illegible] স্পন্দনতা নেই। আছে সহযোগিত[illegible] ভিত্ত অবারিত উদার মাঠঘাটের [illegible]

---

*১। লাম্পেদুসা — উনিশ শতকের শেষার্ধের একজন সিসিলিয়ান অভিজাত-বংশীয় লেখক। তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'নেকড়ে'-তে উনিশ শতকের সিসিলিয়ান অভিজাত সমাজের এক দরদী ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন। প্রিন্স ফাব্রিৎসিও সালিনাকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসটি রচিত। 'প্রিন্স সালিনার বংশের প্রতীক হচ্ছে একটা নেকড়ে বাঘ। তাই থেকে এই উপন্যাসের নামকরণ এবং এর একটি কর্মিদলের নামও তাই। উপন্যাসটিতে তিনি দেখিয়েছেন পুরাতন আভিজাত্যকে আঁকড়ে থাকা প্রাচীন দল ও পরিবর্তনের মুখোমুখি রাজনীতি ও সমাজনীতিতে সচেতন যুবসমাজের এক আদর্শগত সংঘাত।

*২। দেলেদ্দা গ্রাৎসিয়া — [illegible] ১৯৩৬), ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প[illegible] সার্দিনিয়াতে জন্ম। তাঁর ছোট[illegible] উপন্যাসগুলিতে দেলেদ্দা সা[illegible] সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে চা[illegible] মেষপালকের জীবনযাত্রা অতি নি[illegible] ফুটে উঠেছে। হাল্কা হাসির ঝি[illegible] সুখদুঃখের বর্ণনার ভেতর দিয়ে যে [illegible] ছবি তিনি এঁকেছেন তা বাস্তবিক [illegible] উপন্যাসগুলির মধ্যে নাম করার [illegible] দোপো ইল্ দিভর্ৎসিও (বিবাহ[illegible] পরে), লা মাদ্রে (মা)। ১৯২৬ সা[illegible] নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

যের একমাত্র নির্ভর। [illegible] সব-চেয়ে সফল রচনাগুলোর [illegible] যার মনখারাপকরা [illegible] বা অদ্ভুত গন্ধ [illegible] পাখীভালতা [illegible] [illegible] এবং [illegible] একটা অদ্ভুত [illegible] [illegible] ও [illegible] একটা [illegible] পাঠককে কল্পনায় [illegible] নিয়ে চলে যায়।

দেলেদ্দার [illegible] আর্য— যেমন দেখা যায় তাঁর 'দুর্ঘ পুরোহিত ভূত্য এফিস' ও তার হাতে অবশ্য পড়ে যাওয়া তিনজন কর্মীর চরিত্রে। এরা সকলেই যেন ঠিক ঝড়ের হাওয়ায় দলখাগড়া পাতার মতই চঞ্চল। ভূত্য 'পিয়েত্রো' আর তার ধনী মনিবকন্যা যে আবেগের তাড়নায় এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটাকে প্রথম দিকে বড়লোকের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু পরে দেখা যায় কোন্ এক অজানা মুহূর্তে খেয়ালের স্তর পার হয়ে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে দাঁড়িয়ে গেছে। এই বন্ধনই তো যুগ যুগ ধরে অখণ্ড যাত্রাপথের চলায় দুই সঙ্গীকে চিরদিনের জন্য একসঙ্গে বেঁধে দিয়ে আসছে। তাঁর 'লেদেরা'—জড়িয়ে ধরা আইভিলতাই যেন ঠিক। নিরাশ্রয় বালিকা—জমিদার পরিবারের অনুগ্রহে আশ্রয়ের সন্ধান পেল। তারপর দেখি অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে জমিদারিতে ফাটল ধরেছে, কিন্তু আশ্রয়স্থল গাছের মোটা কাণ্ডের চাইতে জড়িয়ে থাকা দুর্বল আইভিলতাটা অনেক বেশী শক্ত ও জীবনীশক্তিতে ভরপুর। আকাশের আলোর পথের সন্ধান সেই ভালো জানে।

দেলেদ্দার প্রত্যেকটি গল্পই এইরকম কোন না কোন রূপককে আশ্রয় করেই সুরু হয়েছে। আরম্ভ হয়েছে বেশ খানিকটা বেগ নিয়েই। আর তারপর এই রূপক বা উপমাটাই হয়তো কোন এক মুহূর্তে পাঠককে ঠেলে পেছনদিকে এক পৌরাণিক উপাখ্যানের পটভূমিতে নিয়ে হাজির করে, যার ওপর ভিত্তি করে হোমারের যুগ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই মানবিক অভিজ্ঞতার নিরিখে সাহিত্যের নানা উপাখ্যান সৃষ্টি করেছেন। দেলেদ্দা একজন নিখুঁত শিল্পী। প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় তাঁর কলমের দক্ষতা অসাধারণ। দূরের আকাশ মেঘ রঙে কালো হয়ে এলো, গহনবনের ভেতর দুরন্ত বাতাসের দাপাদাপি, নিশ্ছিদ্র তমসাচ্ছন্ন রাত্রির শেষে উদিত সূর্যের আশ্বাস, এক ঋতুর শেষে আর এক ঋতুর বর্ণাঢ্য অভিসার—এ সবই তাঁর বর্ণনায় বাস্তবের রূপ ধরে পাঠকের চোখের সমনে হাজির হয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাও কম সুন্দর নয়। মানুষের যৌবনোদ্দীপ্ত ঋজু পিঠ বার্ধক্যের ভারে ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ছে, মেষ ও মেষপালকেরা [illegible] উপ-ত্যকার গরু-ভেড়া নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, শ্রান্ত মানুষ [illegible] দীর্ঘ [illegible] দীর্ঘতর পথ হেঁটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] ইতিহাস [illegible] [illegible]। দেলেদ্দার সাহিত্যের [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] সাহিত্যের পাঠশালায় পাঠ নিয়ে আসতে হয় না। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পুঁথিও তাকে বগলে করে বয়ে আনতে হয় না। তাঁর সাহিত্য পড়ার জন্যে যেটুকু দরকার তা হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি কিছুটা ভালোবাসা এবং এই দুনিয়ার রহস্যময়তার কার্যকারণ সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান—এই যথেষ্ট।

এর পর আমাদের আলোচনার আসরে বাকী রইলেন যে দুজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক তাঁরা দুজনেই কবি। কারদুচ্চি*৩ এবং কোয়াসিমোদো। এঁরা দুজনেই দিকপাল বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। তবু এঁদের দুজনেই সম-সাময়িক দুটি কবি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের অন্যান্য সবাইকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে এঁদের দুজনের কবিসত্তার বিচার বা আলোচনা সম্ভব নয়।

কারদুচ্চির নাম করতে হলেই আগে নাম করতে হয় পাসকোলি*৪ এবং দান্নুংসিওর*৫। ঠিক একই কারণে সালভাতোরে কোয়াসিমোদোর আলোচনা করতে বললে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible]।

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। দান্নুংসিও [illegible] এই রকম একটা বড়ো [illegible] না করা যায় তা নয়। [illegible] না তাকিয়েও বলা যায় যে অন্তত [illegible] ধরে তাঁর প্রভাব ছিল একেবারে অপ্রতিহত। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভেতর আর কোন ইতালির কবির কবিতাই তাঁর রচনার মতো এতো পঠিত হয়নি এবং আর কোন কবিকেই তাঁর মতো এতো অনুকরণ করাও হয়নি। দান্নুংসিওর কৃতিত্ব যারা খাটো করে দেখাতে চান, তাঁদের মধ্যেও এমন লোক বোধহয় কেউই নেই যিনি তাঁর বিস্ময়কর মনোহারী ভাষার ঐশ্বর্য এবং তাঁর আকাশ-ছোঁয়া কল্পনাশক্তির প্রভাব থেকে [illegible] পারেন। তাঁকে বাদ দিতে গেলে বর্তমান ইতালির সাহিত্য যে দরিদ্র হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই। দান্নুংসিওর নাম নোবেল পুরস্কার কমিটির মনোনয়ন না লাভ করার

---

*৩। ভিওসুরে কারদুচ্চির তুস্কানিতে জন্ম। বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৬০ খৃঃ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত। তাঁর সেরা কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের নাম "দেচেম্যালিয়া"। কারদুচ্চি ১৯০৬ খৃঃ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

*৪। জিওভান্নি পাসকোলি বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত। সান মাউরো দি রোমানিয়াতে জন্ম। কারদুচ্চির পর তিনি বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ পান। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খৃঃ। সহজ গ্রাম্য জীবনের ওপর লেখা। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৪ এর মধ্যে আরও চারখানি কাব্য প্রকাশিত হয় প্রিমি পোয়েমেত্তি, কান্তি দি কাসতেল্লো ভেক্কিও, পোয়েমি কনভিভিয়ালে ক্লাসিকাল ঢং-এ বিশ্বজনীন সুরে লেখা। এই সময় থেকে তাঁর রচনার সুর বদলাতে থাকে, এবং পরবর্তী কালের সমস্ত রচনা ইতালির কবিতা (পোয়েমি ইতালিচি—১৯১১) ও তারপরের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে যেমন জাতীয় গৌরবগাথার ছবি পাওয়া যায়, তেমনি দেখা যায় তিনি ক্রমশঃ গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে অজস্র রূপকল্পের আশ্রয় ও সাংকেতিকতার মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছন্দ ও শব্দ সম্পদের ওপর দখল অসাধারণ। তিনি লাতিন ভাষাতেও উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন এবং শেলি, টেনিসন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইতালির ভাষায় অনুবাদ করেন।

*৫। গাব্রিয়েলে দান্নুংসিও—ছেলেবেলা থেকেই লিরিক কবিতা লিখতেন। ১৯ বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কান্তো নুয়োভো' (নতুন গান) যথেষ্ট সমাদৃত হয়। এরপর তিনি অজস্র কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। এর কতগুলো যেমন তাঁকে ইতালির তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ লেখক বলে খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তেমনি আর কতগুলোতে প্রাচীন দল তাঁর ওপর বিষম চটেছিলেন, তিনি সামাজিক দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে। তাঁর রচনার মধ্যে নাম করার মতো—ইল ত্রিয়ন্‌ফো দেল্লা মর্তে (মৃত্যুর বিজয়, ১৮৯৪), লে ভের্জিনি দেল্লে রোক্কে (পাহাড়ের কুমারীরা) (১৮৯৬), ইল ফুওকো (আগুন ১৯০০)। এই উপন্যাসখানি নিয়ে দেশজুড়ে একটা বিরাট হৈ-চৈ ও কেলেঙ্কারী ঘটে যায়। পরে পোপ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। দান্নুংসিওর নাম নোবেল পুরস্কার কমিটির মনোনয়ন লাভ না করার পেছনে এটা একটা বড়ো কারণ। দান্নুংসিও জাতীয় মহাকবি বলে সম্মানিত হয়েছিলেন।

ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পেছনে অনেকেই ব্যক্তিগত কারণ বলে মনে করেন।

তাহলে কারদুচ্চির স্থান কোথায়? নিজের জীবিতাবস্থাতেই কারদুচ্চি যে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন তা অসাধারণ। তাঁর এই খ্যাতি যে কেবল কবি এবং পণ্ডিত হিসেবে তা নয়। নতুন ইতালির নাগরিক বিবেকের প্রতীক এবং প্রতিভূ হিসেবেও লোকে কারদুচ্চির গলাতেই মালা দিত। কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগকে দূরে সরিয়ে রেখে যদি নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর ক্লাসিক আবেগময় কবিতা আর সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক গঠনবাদের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ রাজনৈতিক টীকাটিপ্পনী আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে প্রথাগত পাণ্ডিত্যের প্রাণহীন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। যাইহোক, সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার ও পাঠকের মনের ভালো লাগা-না লাগাও অবশ্য ঠিক এক জিনিস নয়। তা ছাড়া এসব তর্কের গণ্ডীর বাইরে থেকে দেখলে ইতালির কাব্য-সাহিত্যের নব্যধারার পথে কারদুচ্চি যে একটি মাইলস্টোন বিশেষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরবর্তী কবি ত্রয়ী অর্থাৎ কোয়াসিমোদো, উন্‌গারেত্তি ৬* ও মোন্‌তালে *৭ সম্পর্কে এবার যদি আলোচনার মোড় ঘোরান যায় তাহলে আমরা এক বিস্তৃত বিতর্কের ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ব। বিশ্ব-সাহিত্যের কাব্যধারায় আজকের দিনে একের পর এক যে নতুন ঢেউ এসে পুরানো দিনের চিন্তাধারা একেবারে ওলট-পালট করে দিয়ে কাব্যরসিক মানুষের সামনে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে সেদিক দিয়ে এই ইতালির কবি ত্রয়ীর মধ্যে অবদান কার বেশী আর কার কম এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। নোবেল পুরস্কার কমিটির মনোনয়ন কোয়াসিমোদোর ভাগ্যে জুটেছে বলে উন্‌গারেত্তি ও মোন্‌তালে তাঁর তুলনায় দ্বিতীয় সারির কবি একথা প্রমাণ করা শক্ত। প্রথমেই কোয়াসিমোদোর কথা ধরা যাক।

কবি সালভাতোরে কোয়াসিমোদো প্রথম জীবনে উন্‌গারেত্তি ও মোন্‌তালেরই ভাবশিষ্য ছিলেন। তিরিশের যুগে কোয়াসিমোদো "এর্‌মেতিস্‌মো" কবি-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ছিলেন। এই 'কবিগোষ্ঠী' তাঁদের কাব্যচিন্তায় যে ভাবধারার অনুসরণ করতে এসেছিল মোটামুটি ফরাসী [illegible] সামরিক কবিদের সাংকেতিকতাবাদ [illegible] আবেগধর্মকে অনুসরণ করে। এই ন[illegible] গোষ্ঠীর কবিরা কোয়াসিমোদোর নে[illegible] ফরাসী সাংকেতিকতা বা সিমবলিজ[illegible] সামনে রেখে যে আবেগপ্রবণতা ইতা[illegible] কবিতায় নিয়ে এলেন তার ফলে নতুন ন[illegible] ছন্দ ও শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার [illegible] প্রবল উৎসাহে তরুণ দল মেতে উঠলেন।

মনে রাখা দরকার যে এর কিছু [illegible] আগেই সমস্ত ইউরোপের বুকের ও[illegible] দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের ঝড়ের তাণ্ডব [illegible] গেছে এবং তার ফলে ইউরোপের রাষ্ট্[illegible] সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে এ[illegible] মস্তবড়ো ওলটপালট ঘটে গেছে। এর [illegible] লাগল যুগমানসেও। পুরানো পথ, পু[illegible] মত ছেড়ে তারা নতুন দিনের পরিপ্রেক্ষি[illegible] নতুন পথের সন্ধানে মেতে উঠেছে। পরিবর্তনের হাওয়া এসে সাহিত্য [illegible] কাব্যের ধারাতেও প্রচণ্ডবেগে আঘাত ক[illegible] এরই একটা ছবি আমরা পাই কোয়া[illegible] মোদোর "এর্‌মেতিস্‌মো" গোষ্ঠীর সমন্বয়কার প্রচেষ্টার ভেতর। এই [illegible] কবির দল মানুষের অশান্ত মনের রূ[illegible] প্রকাশের চেষ্টায় ভাষার মাধ্যম হিসেবে নতুন টেকনিক বা আঙ্গিক ব্যবহার ক[illegible] আরম্ভ করলেন।

তাঁরা বলতে চাইলেন, মানুষের [illegible] মনের আড়ালে যে অচেতন ও অবচেতন [illegible] থাকে আসল মানুষটার মননশীল[illegible] পেছনে তার কৃতিত্ব কম তো নয়ই অনেক বেশী। সুতরাং মানুষ সচেতন [illegible] যে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে কেব[illegible] তারই সাহায্যে মনের সম্পূর্ণ চেত[illegible] কাব্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই প্র[illegible] অর্থে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দসমষ্টির [illegible]

---

*৬। জিউসেপ্পে উন্‌গারেত্তি জনপ্রিয় কবি। জন্ম আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। পড়াশোনা করেন প্যারিসে। সেখানেই মালার্মে ও ভালেরির লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। উন্‌গারেত্তি বিখ্যাত 'পোয়েজিয়া পুরা' আন্দোলনের জনক।

*৭। ইউজেনিও মোন্‌তালে জনপ্রিয় আধুনিক ইতালির কবি। জন্ম উত্তর ইতালির জেনোয়া শহরে। কবি জিউসেপ্পে উনগারেত্তি প্রবর্তিত 'খাঁটি কবিতা' বা 'পোয়েজিয়া পুরা' কবিগোষ্ঠীর একজন প্রধান ও প্রথম সারির কবি।

যে সমস্ত শব্দ ও ধ্বনি মানুষের কানে অসে কাব্যকে সম্পূর্ণ করছে হলে সে-গুলোর ব্যবহারও অপরিহার্য।

সত্যি কথা বলতে গেলে, এই নতুন পথের প্রবর্তক কোয়াসিমোদো নন। এই পথের প্রথম পথিক কবি হিউসেপ্পে উনগারেত্তি। উনগারেত্তি তাঁর 'পোয়েজিয়া পুরা' বা খাঁটি কবিতা অর্থাৎ কবিগোষ্ঠীর ভাষার মাধ্যমে এই কথাই প্রচার করে-ছিলেন। বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি বলেছেন, কবির মনের তাৎক্ষণিক ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করাই হচ্ছে কবির ধর্ম। আর এই ভাব ও রূপকল্পকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবি যে সকলসময় প্রচলিত অর্থবহ, ভাষা ও শব্দই ব্যবহার করবেন তা নাও হতে পারে। তিনি এমন অনেক নতুন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করতে পারেন যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও অসংলগ্নও মনে হতে পারে। কারণ "খাঁটি কবিতা' মুষ্টিমেয় কয়েকজন মননশীল লোকের বোঝবার জন্যেই লেখা হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, কোয়াসিমোদো প্রাথমিক জীবনে উনগারেত্তিরই শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে কোয়াসিমোদো তাঁর নিজস্ব যে বিশিষ্ট রচনার রীতি নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছেন তা যেমন ব্যক্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনি বর্ণাঢ্য কল্পনাবিলাসী, সংগীতময় ও মানবিক আবেদনে সম্পৃক্ত। তাঁর "আকোয়ে এ তেররে" এবং "লা তেররা ইমপারেজিয়াবিলে" কাব্যগ্রন্থ দুটিতে তাঁর কবিতা ছন্দ যতি মিলের শুকনো বিলাস থেকে পাঠকের মনকে আধুনিক মানুষের এক যন্ত্রণাময় বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে হাজির করে। তাঁর নিজের কথায়, "কবিতার একান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত বাস্তবতা।" কাব্যসংকলন "তুত্তে লে পোয়েজিয়ে" গ্রন্থে পাঠক কবির কথারই প্রতিধ্বনি খুঁজে পাবেন। কোয়াসিমোদো অনেকগুলি অপূর্ব কবিতা লিখেছেন। আর এইসব কবিতা পড়লে অনায়াসেই বোঝা যায় যে সমসাময়িক ইউরোপীয় অন্যান্য কবির আসরে তাঁর জন্য একটা স্বতন্ত্র আসন পাতা হয়ে আছে। আর সকলের তুলনায় তাঁর গলাটাই সবার চেয়ে জোরালো আর স্পষ্ট। ছন্দ-যতির জটিলতা এড়িয়ে তাঁর কবিতাই আজকের মানুষের মনের সবচেয়ে কাছাকাছি সাড়া জাগায়। তিনি সরব ও পৌরুষদৃপ্ত। মালার্মে রিলকে ও ভালেরি কাব্যধারার যে উৎসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন তার খাঁটি রূপ এ যুগের কবিদের মধ্যে কোয়াসিমোদোর ভেতরই খুঁজে পাওয়া যায়। কোয়াসিমোদো সংহত, কিন্তু যেটুকু বলেন তার ভেতরই তাঁর বাঙ্ময়তা। রহস্য-ময়তার আলোতে উজ্জ্বল, জীবনজিজ্ঞাসার প্রশ্নে মুখর ও মানবিক আবেদনে স্পষ্ট। কোয়াসিমোদো নিঃসন্দেহেই তাঁর সমকালীন যুগের মানুষের মুখপাত্র। ১৯৫৯ খৃঃ নোবেল পুরস্কারের সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়।

•

আগেই বলেছি কোয়াসিমোদোর কাব্য-জীবনে গুরুস্থানীয় ছিলেন উনগারেত্তি এবং মোনতালে দুজনেই। এঁদের দুজনেরই কাব্যচর্চায় হাতেখড়ি হয় কোয়াসিমোদোর অনেক আগেই। উনগারেত্তি ছাত্রাবস্থাতেই প্যারিসে মালার্মে ও ভালেরির রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তাঁর 'পোয়েজিয়া পুরা" বা খাঁটি কবিতা আন্দোলনের পশ্চাৎ-পটে মালার্মে ও ভালেরির প্রভাব যে অনেকখানি একথা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। তিনি নিজেই বলেছেন, কবির ধর্মই হচ্ছে তার মনের কোন বিশেষ মুহূর্তের বিচিত্র অনুভূতিকে এক একটা রূপকল্পের মাধ্যমে, সাংকেতিকতার আশ্রয়ে প্রকাশ করা। আর এই প্রকাশের জন্য কবি যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে যে কোন বাক্য বা শব্দের ব্যবহার করতে পারেন। তবেই হবে খাঁটি কবিতা। রেখে ঢেকে বলা কবির ধর্ম হতে পারে না।

উনগারেত্তির "পোয়েজিয়া পুরা" আন্দোলন তিরিশের যুগ ও তার পরবর্তী-কালে ইউরোপের তরুণ কবিদের মধ্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর কাব্য-সংগ্রহ "ইল পোর্তো সেপোলতো", "সেন্তিমেন্তো দেল তেম্পো", "ইল দোলোরে" "লা তেররা প্রোমেসসা" ইত্যাদির সমস্ত কবিতাগুলোই পাঠককে এক রহস্যময় ভাবাবেগের জগতে নিয়ে যায়, যেখানে নানা বিচিত্র শব্দ ও ধ্বনির সংকেতময় ব্যঞ্জনা তার মনকে এক দুর্জয় আকর্ষণে টানে। তাই উনগারেত্তির কবিতা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তবে কবি আর্টকেই জীবন অথবা জীবনকেই আর্ট বলে মেনে নিয়ে আর সব কিছুকেই যে অস্বীকার করেছেন একথা তাঁর সব কাব্যেই স্পষ্ট।

ইউজেনিও মোনতালে কবি হিসেবে উনগারেত্তিরই শিষ্য। "পোয়েজিয়া পুরা" আন্দোলনেরও তিনি অংশীদার। এই কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে মোনতালে একজন প্রধান ও প্রথম শ্রেণীর কবি। যুদ্ধোত্তর যুগের বিধ্বস্ত সমাজের উপর আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি যেন সর্বাকছুকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এটা তাঁর আগের লেখার মধ্যে খুবই স্পষ্ট। যেমন, "ওস্সি দি সেপিয়া", "লা কাসা দেই দোগানিয়েরি" এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে লেখা "লে ওকাসিওনি"-তে আধুনিকতা অনেক বেশী হলেও তাঁর মূল সুর অক্ষুণ্ণই আছে। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে মোনতালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন। এই দিক দিয়ে তাঁকেও তাঁর সমসাময়িক যুগের মানুষের মুখপাত্রই বলা যায়।

উনগারেত্তি ও মোনতালে দুজনেই এখনও জীবিত। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে আজকের দিনের মানুষের পাওয়ার আশা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

হাসির মজলিস

—তুমি আর আগের মত আমাকে ভালবাস না। কাঁদতে দেখেও কেমন এড়িয়ে যাও, কারণ জানতে জানতে চাও না, পাশে আস না! অভিমান ঝরে পড়ে স্ত্রীর কণ্ঠে।

—কি করে করি বল। প্রতিবারে এত টাকা খরচের ক্ষমতা আমার নেই। জানান নিরুৎসুক স্বামী।

●

বাবা (রাগতভাবে)—কাল তুমি কোথায় ছিলে স্বপন?

স্বপন—কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম শহরের বাইরে।

বাবা—ওদের বলো, চুলের কাটাগুলো যেন গাড়িতে না ফেলে যায়।

●

—শুনেছি তার বেতন পাঁচ অঙ্ক?
—হ্যাঁ, স্ত্রী আর চার ছেলেমেয়ে।

●

—একটা ছাতার নীচে ছ'জন লোক দেখলাম—অথচ কেউ ভেজেনি!
—কি করে সম্ভব!
—তখন যে বৃষ্টি পড়ছিল না।

●

রমলা আর মিনতির দেখা অনেক কাল পরে। কলেজ-জীবনের পরই ছাড়াছাড়ি। স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক কথা হোল।

রমলা—দেখ ভাই, দু'খানা বই আমার শান্তি। সব সুখ পেয়েছি ওর মধ্যেই।

মিনতি—বইদুটোর নাম বল না। পারলে কিনে নেব।

রমলা—একখানার নাম 'মাদার্স কুক্ বুক', আর একখানা 'ফাদার্স চেক বুক'।

১ম বন্ধু—তোর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কিরে?

২য় বন্ধু—দিনটা আমার আজও মনে আছে। ১ ডিসেম্বর সোমবার। এইদিন আমি শ্বেতশুভ্র বরতনুর উপর প্র হাত বুলিয়েছিলাম, গভীর আবেগে চুম্বন করেছিলাম

১ম বন্ধু—সে কিরে! এখনও তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ আছে?

২য় বন্ধু—হ্যাঁ।

১ম বন্ধু—কই! কোনদিন বলিসনি তো?

২য় বন্ধু—বলতে হয় নাকি, বুঝতে হয়। [সিগারেটে সুখটান মারতে লাগল।]

●

নারী এবং পুরুষে প্রভেদ কোথায়?

— জিওগ্রাফিতে

●

বাই-প্রোডাক্টের নিদর্শন কি?

সন্তান

●

নিরাপদ চট্টোপাধ্যায় : রাঁচী

ঈশপের গল্প। একজন আরেকজনকে তার গাধা বিক্রী কর রোদ্দুর এড়াবার জন্য দুজনে সেই গাধার ছায়ায় যখন ব তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, "তোমাকে আমি গাধা বিক্রী কর গাধার ছায়া বিক্রী করিনি। তাই তুমি গাধার ছায়ায় বসতে না।" এই নিয়ে যখন তাদের মধ্যে বচসা হতে লাগল, তখন এক ছুটে পগার পার। এই গল্পেরই প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা আমাদের দেশে এককালে আগে ঘটে গেছে। এক ব্যক্তি ব্যক্তিকে তার কুয়ো বিক্রী করে। ক্রেতা যখন কুয়ো থেকে তুলতে যায়, বিক্রেতা এই বলে বাধা দেয় যে, সে কুয়ো করেছে, কুয়োর জল বিক্রী করেনি। এই নিয়ে শেষপর্যন্ত ম রুজু হয়। শেষে রায় বেরয়—"ক্রেতার কুয়োর মধ্যে বি জল রাখবার কোন অধিকার নাই, অতএব সে যেন আব কুয়ো থেকে সব জল তুলে নেয়।"

মন বুঝে দেখুন
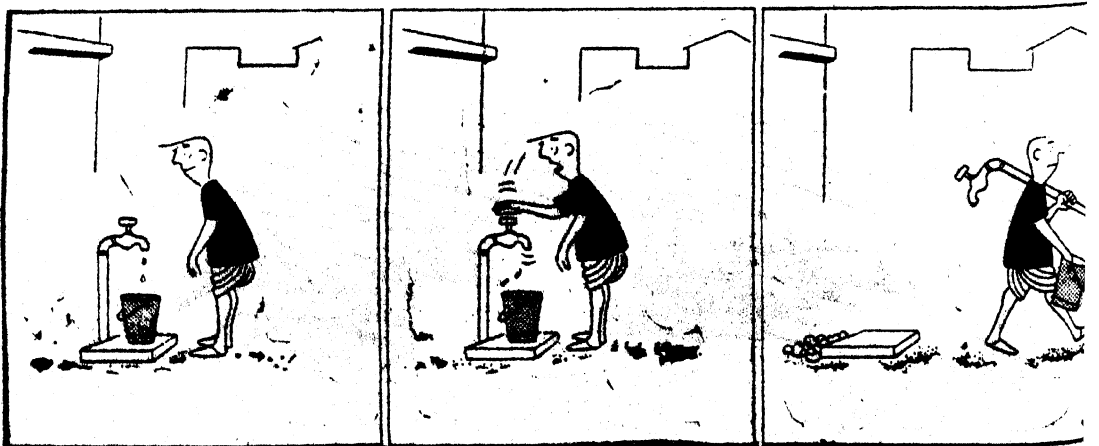
আপনার মনের স্বাস্থ্য আজ কেমন?

...েহের স্বাস্থ্য কেমন আছে তা জানবার ...থার্মোমিটার আছে, আরো রকমারী টেস্ট আছে। মনের স্বাস্থ্যও তো মাঝে ...রে খারাপ হয়ে পড়ে, সেটা জানবারই বা ...কোনো টেস্ট থাকবে না কেন? মানসিক স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে ...বহু লোকের অভিজ্ঞতার সার সঞ্চয় করে ...এমন একটি টেস্ট তৈরী করেছেন, যার ...প্রশ্নগুলিতে আপনি কেবল হ্যাঁ—না জবাব ...দিলেই নিজের মনের স্বাস্থ্য বুঝতে ...পারবেন পরিষ্কারভাবে। তবে, জবাব দিতে ...হবে আন্তরিকভাবে।

১। নতুন আগ্রহ পছন্দ খেলার খেয়াল ...লা খুঁজে বেছে নিয়ে তাতে মেতে ...ওয়া আপনার পক্ষে সহজ মনে হয় কি?

হ্যাঁ—না

২। বিফল হতে পারেন, হেরে যেতে ...রেন, আহত হতে পারেন এমন সব ...ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আপনি কোনো নতুন ...লোকজন, নতুন জায়গা বা নতুন জিনিস ...য়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে, দেখতে জানতে ...আনন্দ বোধ করেন কি?

হ্যাঁ—না

৩। সব সময়ে কোন-না কোন অসাধ্য-...সাধন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে ... আপনি অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন ...ল মনে হয়?

হ্যাঁ—না

৫। অনেকগুলি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ...গিয়ে চললে কোনোদিনই আপনার কোমর ...ভেঙে পড়বে না, আপনি কি এমন কথা ...ন করেন?

হ্যাঁ—না

৫। আপনি কি সব সময়ে প্রাণপণ ...চেষ্টার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সব কাজ ...তে চান?

হ্যাঁ—না

৬। যে সমস্ত দিনে আপনি অসুস্থ, ...ন্ত, কিংবা শুধু 'কিছু ভাল লাগছে না' ...ন করেন, তখন কি নিজেকে অপরাধী ...ধ হয়?

হ্যাঁ—না

৭। আপনি কি মনে করেন, কোনো ...ক যতক্ষণ নিজেকে প্রত্যেকটি কাজে ...র্ণভাবে জড়িয়ে রাখবে, ততক্ষণই সে ...র্থক সফলতা নিয়ে কাজ সেরে বেরিয়ে ...সবার সুযোগ পাবে?

হ্যাঁ—না

৮। কোনো প্রশ্ন না করে, কোনো ...অভিযোগ অনুযোগ না করে আপনি যে ...কোনো কাজে, যে কোনো জায়গায় গিয়ে ...নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন কি?

হ্যাঁ—না

৯। আপনি কি সবসময়ে নিজেকে ...র্মক্ষম এবং যে কোনো সময়ে কাজে ...রিয়ে পড়বার উদ্যম উপভোগ করেন?

১০। ক্লাবে, পাড়ায়, সমাজে আপনি কোনো বিশেষ সম্মান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলে খুব উল্লাস বোধ করেন কি?

হ্যাঁ—না

১১। আপনি কি কখনো সময়াভাবের ফলে দারুণ চাপ অনুভব করেন?

হ্যাঁ—না

১২। যে-সব লোক কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক পরা এসব ব্যাপার খুব আস্তে আস্তে করে, তারা কি আপনার বিরক্তি সৃষ্টি করে?

হ্যাঁ—না

এইবারে আপনার জবাবের সঙ্গে মনোস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য মিলিয়ে দেখতে পারেন।

১নং এবং ২নং প্রশ্নের জবাব হওয়া উচিত 'হ্যাঁ': বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যে-সব লোকের আগ্রহ পছন্দ খেয়াল খেলার সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ এবং যে সমস্ত আগ্রহ আছে সেগুলিকেই দিনরাত আঁকড়ে পড়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে মানসিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশংকা থাকে। এ রকম বিপর্যয় ঘটে গেলে তা থেকে অবসাদ, অশান্তি, অসন্তোষ সৃষ্টি হয়ে দেহ এবং মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। সজীব প্রাণোচ্ছল মন সব-সময়ে নতুন চিন্তা, নতুন কাজ-কর্মের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবার জন্যে আকুল হয়ে থাকে। অল্পস্বল্প আগ্রহ-আনন্দের সংকীর্ণ গর্তে পা পড়ে গেলে, জীবনটাকে দেখে বেড়াবার সব আশা-ভরসাই নির্মূল হয়ে যায়। সে তো বেঁচে থেকেও মৃত্যুর সামিল।

৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের জবাব হওয়া উচিত 'না': যা করছেন, যা পাচ্ছেন, তা নিয়ে যদি এক-নাগাড়ে মনের মধ্যে অসন্তোষের অতৃপ্তি জেগে থাকে, তাহলে তার ফলে হজমের ক্ষতি হয়ে পেটের মধ্যে আলসার জাতীয় ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। আপনার নিজের শক্তি-সামর্থ্য ঠিকভাবে বুঝে নিয়ে তারই চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করতে থাকুন যাতে নিজের সুখতৃপ্তির ওপর নিজের আয়ত্ত থাকে। আকাশের যে-তারা ছোঁয়া যায় না, তার দিকে চোখ রেখে পথ চলবেন না, তাতে পা মচকাতে পারে।

৫নং এবং ৬নং প্রশ্নের জবাব হওয়া উচিত 'না': মনোবিজ্ঞানীরা আজ বুঝতে পেরেছেন যে, কাজ এবং অবসর বিনোদনের মধ্যে একটা ছন্দ এবং সামঞ্জস্য থাকা খুবই দরকার। কারুরই উচিত নয় সব-সময়ে দম না ফেলে এক-নাগাড়ে হাঁসফাঁস করে কাজ চালিয়ে যাওয়া। কিংবা একথাও কারুর মনে করা ঠিক নয় যে, যখন অবসর সময়ে অলসভাবে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছেন, তখন বুঝি কাজকর্মের খানিকটা সময় হারিয়ে ফেলছেন। একটুও আনন্দ হাসি খেলা নেই, কেবল কাজ আর কাজ, এই নিয়ে যার জীবন, তার মন খুব শীগ্গির ভোঁতা হয়ে যায়।

৭নং এবং ৮নং প্রশ্নের জবাব হওয়া উচিত 'না': এক অবস্থায় একজন যেমন কাজ করবে, ঠিক সেই অবস্থায় সেই পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই অন্য একজন অনেক ভালো কাজ করতে পারে, একথাটা সকলেই জানেন। নিজেকে প্রবঞ্চনা করবেন না; যখনই দেখবেন আপনার পরিবেশ, আপনার সঙ্গীসাথী, কিংবা আপনার কাজের ধরন আপনার দেহ অথবা মনের সামর্থ্যের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, তখনই ব্যাপারটা অবহেলা না করে খানিকটা ভাবতে চেষ্টা করবেন। যদি পারেন তো পরিবেশ-পরিস্থিতিটাকে বদলে নিতে চেষ্টা করুন, কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, সেগুলিকে মেনে নিন—সেগুলির দোহাই দিয়ে কাজের ক্ষতি করবেন না।

৯নং এবং ১০নং প্রশ্নের উত্তর হওয়া উচিত 'না': যদি এই দুটি প্রশ্নের উত্তরে আপনি 'হ্যাঁ' বলে থাকেন, আপনি কতকগুলি অজানা সমস্যাকে জানবার চেষ্টা না করে সেগুলি এড়িয়ে গিয়ে ছোট-বার চেষ্টা করছেন, শেষে বিপাকে পড়বেন। সব সময়ে উল্লসিত হয়ে থাকার মারাত্মক ফাঁদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। একটু অবসর নিয়ে অলস নিশ্চিন্ত মনে খানিকটা ভাবুন, নয়তো—যদি পারেন, কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছুর হাল ছেড়ে দিন।

১১নং ও ১২নং প্রশ্নের জবাব হওয়া উচিত 'না': বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন ছন্দে প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজস্ব ধারায় কাজ করে, জীবন চালায়। এটা আপনি যদি অন্য সবার মধ্যে লক্ষ্য করে না থাকেন, তাহলে সম্ভবত নিজেকে অত্যন্ত কঠোর কর্মব্যস্ততার মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতা আপনার সঙ্গে [illegible] যখন সবার সঙ্গে খিটখিটে ভাব জেগে উঠতে থাকবে, তখন দেখবেন, আপনার জীবন থেকে যেন ক্রমেই অনেকটা মাস, কয়েকটা বছর বার্ধক্যের মধ্যে [illegible] পড়ছে. চাইছে, বুড়িয়ে যাচ্ছেন।

কালো মন্তো

পিটার ও'ডোনেল

ভোরবেলা···

কালো মুখোশ
...তা দেখুক,
আমরা যা খুঁজে
পাইনি ওরা
তা দেখিয়ে দেবে

একটু বাদেই
অন্ধকার হলে
আমরা সরে
পড়ব

গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে
খবরদার !

হুজুর গরীব
বাড়ি ফিরছি
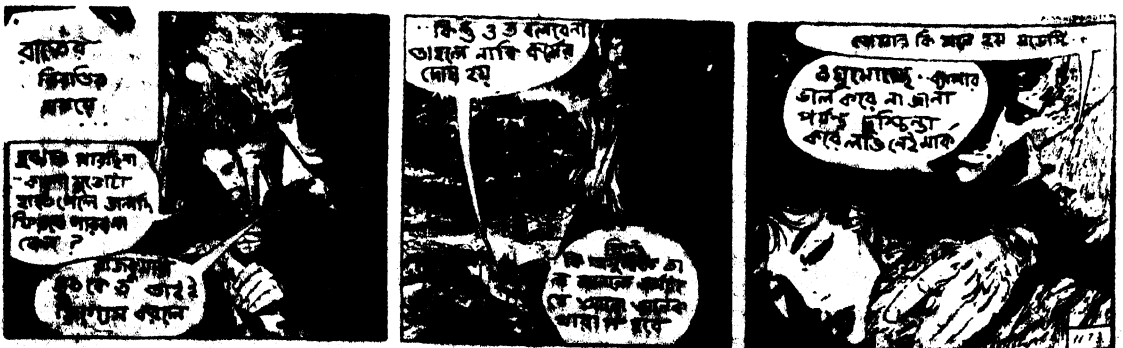
প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা মানুষটি। নাম সুকুমার। কাল পাথরে খোদাই করা নিখুঁত চেহারা। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোখ-মুখ প্রতিভাদীপ্ত। কথা খুবই কম বলেন। যেটুকু বলেন তাও সহজবোধ্য নয়। এমন কি ও'র নিতান্ত কাছের মানুষ-রাও সব সময় তাঁকে বুঝে উঠতে পারেন না। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। অন্যায় আদেশ করলেও অবহেলা করা কঠিন। অথচ হঠাৎ দেখে বুঝবার উপায় নেই। না চালচলনে, না ব্যবহারে। সমীহ করে চলেন সুকুমারের আত্মীয়বন্ধুরা। এমন কি তাঁর বড় ভাই কিংবা বাবাও ব্যতিক্রম নন।

যৌবনের প্রারম্ভে একসময় নাকি ও'র দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ ঘটেছিল। যার ফলে সুকুমার তাঁর পরিচিত সমাজ-জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ বাধা না থাকলেও বহুদিনের অভ্যাসটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

খেয়াল-খুশীর অন্ত নেই। সুযোগ পেলেই সুকুমার ছবি আঁকেন। ভিতরের তাগিদ মত গল্প লেখেন। ক্লান্তি বোধ করলে বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। শিকার করতে গিয়ে নিজেই শিকার হয়ে বসেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে হারিয়ে যান। উত্তেজনা আর উদ্দীপনার বিলুপ্তি ঘটে। সুকুমারের রস-পিপাসু মন তাঁর উপলব্ধিকে আর এক নতুন পথের সন্ধান দেয়।

প্রকৃতির শ্যাম শোভা, তার [illegible]-সৌম শান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে [illegible] আত্মবিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু [illegible]দিন এ মনোভাব স্থায়ী হয় না। দেহ স্থায়ী হতে দেয় না। অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। আবার সেই পুরাতন গণ্ডিটানা জীবন। ছবি আঁকা আর গল্প লেখা।

ভালই লেখেন সুকুমার, কিন্তু মূল্য পান না। ও'র লেখা চলতি লেখা না। পড়তে বসে ভাবতে হয়। অত সময় নেই বর্তমান যুগের পাঠকদের।

নিকটতম শুভানুধ্যায়ীরা আর একটু সহজ করে পরিবেশন করতে বলেন। সুকুমার অক্ষমতা জানিয়ে বলেন, ফরমাস মত পুতুল গড়া যায়। সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

অনেক বেশী পড়াশুনা করে অনেক বেশী পিছিয়ে পড়েছেন সুকুমার। কথাটা তিনি বুঝতে চান না। তাঁর চিন্তার নাগাল যদি সাধারণ মানুষ না পায় তাহলে ক্ষোভ করে লাভ কি?

ক্ষোভ তিনি করেন না। করতে হয়তো সংকোচ বোধ করেন। এমন কি নিজের কাছেও। আত্মতৃপ্তিই নাকি তাঁর কাছে সবার বড়। এ কথা বহু যুক্তি দ্বারা সকলকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর অবচেতন মনে যে একটি বিপরীত চিন্তা একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল এ-কথা নিজের কাছেও একদিন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। আত্মতৃপ্তি বলতে এতকাল যা বুঝে এসেছেন আজ মনে হচ্ছে ওটা ভুল। অপরকে আনন্দ দেওয়াই আত্মতৃপ্তির যথার্থ সংজ্ঞা এইটেই এতদিন সুকুমারের অহঙ্কারের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

শুধুই কি অহঙ্কার? আর কিছু নয়? আর কেউ না বুঝলেও সুকুমার জানেন, তাঁর ভীতির কথা। সহজ করে কোন কিছুই গ্রহণ করতে তিনি ভয় পান। তাঁর ব্যাধিটাই তাঁকে সবকিছু থেকে আড়াল করে রেখেছে। তাই পদে পদে সুকুমারের এত সাবধান[illegible] নিজেকে লুকিয়ে রাখার এমন সযত্ন প্রয়া[illegible]

সুকুমারের সান্নিধ্যে বহুজন এসে[illegible] আবার চলে গেছে। চলে গেছে মনে [illegible] ক্ষুব্ধ হয়ে আর অপমানিত হয়ে। ও[illegible] আসা-যাওয়ার কারণটা স্পষ্ট। না বুঝব[illegible] কথা নয় কিন্তু এ নিয়ে কোন দিন তি[illegible] বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। [illegible] যা ঘটেছে তাকেই স্বাভাবিক পরিণ[illegible] মনে করে কতকটা আত্মপ্রসাদ লাভ ক[illegible]ছেন। অথচ মঞ্জুশ্রীর ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যবহা[illegible] খানিকটা পরিবর্তন দেখা গেল। ও[illegible] কিছুটা প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন সুকুমা[illegible] মনের অত্যন্ত গোপন আর দুর্বল স্থা[illegible] নাড়া দিয়েছে মঞ্জুশ্রী।

একটি ঘরোয়া আলোচনাচক্রে প্র[illegible] দর্শন। সুকুমারের সাহিত্য-সৃষ্টি নি[illegible] বারে বারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল মেয়ে[illegible] জটিলকে সহজ করে গ্রহণ করে সুন্দর আলো[illegible]চনা করে চলেছে মঞ্জুশ্রী

আলোচনা শেষে আত্মগোপন ক[illegible] থাকা সম্ভব হবে না জেনেই সকলে[illegible] অলক্ষ্যে সরে পড়েছিলেন সুকুমা[illegible] অতীতের পুনরাবৃত্তিকে তিনি এড়ি[illegible] যেতে চান।

সুকুমারের চলে যাওয়া নিয়ে খানিক[illegible] সোরগোল হওয়ায় মঞ্জুশ্রী তাঁর উপস্থিতি[illegible] কথা জানতে পেরে সহজেই বাসস্থানে[illegible] সন্ধান পেল। এবং পরদিনই এসে হাজি[illegible] হল।

সাদরে আহ্বান জানালেন সুকুমা[illegible] আসুন—

আপনিই সুকুমারবাবু ত? প্রশ্ন ক[illegible] মঞ্জুশ্রী।

হাসিমুখে জবাব দিলেন সুকুমার, ...নার অনুমান সত্য! ...আশ্চর্য! [illegible] ...র সুযোগ পাইনি। মঞ্জুশ্রী বলল।

সুকুমার জবাব দিলেন, না জানলেও ...ছিল না।

...বার ধরনে একটু অবাক হলেও ...করে হেসে প্রত্যুত্তর করল মঞ্জুশ্রী, ...আপনার কথা। একমত হতে পারলাম ...কিন্তু আপনি আলোচনাচক্র থেকে ...রে এলেন কেন?

...সুকুমার সহাস্যে বললেন, বিব্রত বোধ ...লাম।

...অদ্ভুত কথা শোনালেন। বলল মঞ্জুশ্রী। ...অদ্ভুত কেন?

...র কেন? নিজের সৃষ্টির প্রশংসা ...ে কার না ভাল লাগে। আপনার কি ...না?

...র আগে কেউ করে নি। কিন্তু এখন ...হচ্ছে লাগে। হাসতে হাসতে সুকুমার ...আলোচনা পরে হবে তার চেয়ে বলুন ...কফি খাবেন?

...প্রয়োজন নেই।

...আপনাকে উপলক্ষ্য করে আমি একটু ...চাই।

...শের ঘরে বসে ওদের কথোপকথন ...ল অংশু। আর, ভাবছিল সুকুমারদা ...রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে গেলেন? ...কাল ধরে এই মানুষটি সম্বন্ধে সে ...জেনেছে তা অসম্পূর্ণ? নইলে এমন ...দিন সে দেখেনি।

সুকুমারের নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার ...ই একমাত্র মানুষ, যার কাছে তিনি ...খানি সহজ আর উন্মুক্ত। প্রাণ খুলে ...বলে প্রায়ই তিনি ভারমুক্ত হন।

...অংশুর চিন্তায় বাধা পড়ল, পাশের ...মঞ্জুশ্রীর কন্ঠস্বরে, তাহলে কফি খাব ...চাকর-বাকরের হাতে নয়।

সুকুমার হেসে জবাব দিলেন, তাহলে ...পদে ফেললেন দেখছি। আমার সংসার ...কর-বাকর আর জন্তু-জানোয়ার নিয়ে।

মঞ্জুশ্রীর হাসির শব্দ শোনা গেল। ...কিছু কিছু শুনেছি, কিন্তু কথাটা ...য়। আপনার অনুমতি পেলে আমি ...করে দিতে পারি। ভয় নেই কফি ...খারাপ করি না।

...মেয়েটা ত কম নয়! ভাবছিল অংশু। ...একটু করে সুকুদাকে বেশ ত কায়দা ...এনেছে।

...আবার বাধা পড়ল অংশুর চিন্তায়। সুকুমার বললেন, হঠাৎ অভ্যেস পালটে ...ডেকে আনতে চাই না। নইলে কফি ...করে দিক তাতে আপত্তি করবার কি ...পারে।

মঞ্জুশ্রী কল-কল করে হেসে উঠল, ...বেশ যা হোক, এর মধ্যে আবার ...র ভয় কোথায়?

সুকুমারের জবাবটাও সঙ্গে সঙ্গেই ...গেল, সব সময় কি মানুষ জেনে-...তে পায়। এটাকে আমার একটা ব্যাধি ...আপনি ধরে নিতে পারেন।

...অমনি হেসেই মঞ্জুশ্রী জবাব দেয়, [illegible] চিকিৎসার ভারটা না হয় আমিই [illegible]। ভয় নেই আমি তেতো ওষুধ গেলাব না।

কথা-বার্তার ধার এবং ভার দুই আছে। শুনতে ভালই লাগছে। কাছে গিয়ে চেহারাটা দর্শন করে চোখ সার্থক করবার বাসনা জাগল অংশুর।

অংশু উপস্থিত হতে খুশী হয়ে আহ্বান জানালেন সুকুমার, কতক্ষণ এসেছো অংশু?

উপস্থিতির সঠিক সময় জানাতে চায় না সে। বলে, এইমাত্র। তারপর মঞ্জুশ্রীকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে, এঁকে ত চিনলাম না সুকুদা।

সুকুমার একটু লজ্জিত হয়ে বলেন, এতক্ষণে আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল—

মঞ্জুশ্রী মুখ টিপে একটু হেসে জবাব দিল, স্বাস্থ্যের সন্ধানে এসেছি। নাম মঞ্জুশ্রী রায়। থাকি কলকাতায়।

অংশু গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি পাকা জহুরী মঞ্জুদেবী। নইলে এই জংগল-রাজ্যে এসে সুকুমারদাকে আবিষ্কার করতে পারতেন না।

মঞ্জুশ্রী উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলল, এটা নেহাৎ যোগাযোগ। তারপরে সুকুমারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পুনরায় বলে, তা বলে কফির কথা আমি ভুলিনি সুকুমারবাবু।

অংশু একটা জবাব দিতে গিয়েও চেপে গিয়ে বোকা বোকা মুখ করে চেয়ে রইল। এইমাত্র এসেছি বলার পর চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

*

বর্তমান কাহিনীর এখান থেকেই শুরু। কিন্তু শুরুতেই সুকুমারের জীবনপথের চিরাচরিত ধারা খানিকটা যেন বিপরীত দিকে পাক খেতে আরম্ভ করেছে। মঞ্জুশ্রী ওঁর জীবন-বোধকে নতুন আলো দেখিয়েছে। যে আলোয় নিজের মনের বর্তমান চেহারা দেখতে পেয়ে তিনি চমকে উঠেছেন। কিন্তু পিছিয়ে যেতে পারেন নি। বরং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

[illegible]সছে। এ-বেলা ও-বেলায় সুকুমার [illegible] এই আসা যাওয়ার মেয়াদ সামান্য গোনাগুনতি কয়েক দিন। তারপর আবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে তার পুরোন জীবনে। মধ্যের কটা দিনের উপলব্ধি তাঁর সত্তার ভাণ্ডারে যত্ন করে তুলে রাখবেন সুকুমার।

অংশু বলে, আপনি হারিয়ে যাচ্ছেন সুকুদা।

সুকুমার জবাব দিলেন, পতন হয়েছে বললি না যে?

অংশু বলল, তেমন দেহের এবং মনের জোর আপনার নেই। তবু কেন মঞ্জুকে এতটা এগুতে দিলেন বুঝি না। আপনি আমি নন বলেই একথা বলছি।

সুকুমার মৃদুকণ্ঠে বলেন, বেশী এগোতে দিয়েছি বুঝি?

অংশু বলে, ওটা আমার প্রশ্ন।

সুকুমার সহসা সোজা হয়ে বসে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, তোমার প্রশ্নের জবাব ভবিষ্যতে দেব অংশু। তবে একটা কথা ভুলে যেও না যে, তোমার সুকুদা সাহিত্যিক আর চিত্রশিল্পী। তার কাজই হল নতুনের সন্ধান করা।

তাহলে এ-পথে এতদিন সন্ধান করেন নি কেন সুকুদা? অংশু বলল।

সুকুমার জবাব দিলেন, তখন পুঁজি ছিল বলেই প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু তোমার মঞ্জুর উপর এত রাগ কেন অংশু-বাবু?

আমার সাংগীতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এক বিষয়ে আমি নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করি যে, তানসেনের পুত্র-বংশীয় কিন্দে গৌড়হার বাণীর আলাপে এই যন্ত্রে বাসৎ খাঁ সাহেবের কোন তুলনা ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়কু মিয়া পৈতৃক বিদ্যার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ ক'রে-ছিলেন। কনিষ্ঠ মহম্মদ আলী খাঁ'র শিক্ষা সেই তুলনায় কম হ'লেও, তিনিও যা লাভ ক'রেছিলেন—তার তুলনা কোথাও পাই না। অন্ততঃ আওচার-আলাপ ও জোড়ে এই ঘরের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত; রামপুরের বাহাদুর হোসেন খাঁ সুরশৃঙ্গারের অদ্বিতীয় বাদক ছিলেন। রাগ ও রূপ উভয় বিষয়েই তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। রামপুরে তাঁর অবস্থানের ফলে সেখানকার সকল ওস্তাদই রাগের রসালুতার এক বিশেষ নিদর্শন রেখে গেছেন। বাহাদুর হোসেন তানসেনের পুত্র ও কন্যা উভয় বংশের পদ্ধতির সমন্বয় সাধন ক'রে-ছিলেন; উজির খাঁ সাহেবও মাতামহ বাহাদুর হোসেন খাঁ'র দীক্ষা-শিক্ষায় লালিত পালিত ও বর্ধিত হ'য়েছিলেন। এইজন্যই এ-যুগে সুরের রসালুতায় উজির খাঁ সাহেব এক অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব উজির খাঁর উৎকৃষ্ট তালিম খাঁ সাহেবের শেষবয়সে লাভ করেছিলেন। কয়েকশত ঘরাণা ধ্রুপদ রাগ আলাপ-পদ্ধতি ও তারপড়ন এই তালিমের অন্তর্গত। আলাউদ্দিন সরোদ যন্ত্রে বীণার বহু অলংকারের প্রয়োগ আমাকে গিরিডিতে শেখালেন; তবে পর্দায় পর্দায় খণ্ডমেরুর কাজ তিনি দেখাতেন না। প্রথমতঃ আলাপের প্রারম্ভে তিনি উদারা-সপ্তকের খানিকটা অংশে ও মুদারার পূর্বাঙ্গে একটি তানে রাগের আওচার বা মুখ্য তান বাজাতেন। ক্রমে উদারার সুরগুলির দ্বারা রাগের বিস্তারের পর ক্রমে ক্রমে তারার অভিমুখে মুদারার উত্তরাঙ্গের সুরগুলি বাজিয়ে দেখাতেন। তারপর অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগের তিন-চারটি তানে বিলম্বিত আলাপ ক'রতেন। জোড়ের সময় চিকারীযুক্ত বিলম্বিত বাজাবার পর গমকজোড় যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করতেন। লড়ীজোড়ের সময় নানা ছন্দ ও ছন্দবৈচিত্র্য দ্রুত শুদ্ধ 'ডা' বোলের দ্বারা বাজিয়ে ঝালা আরম্ভ ক'রতেন। এই রীতি উজির খাঁ সাহেবও সুরশৃঙ্গারে ক'রেছিলেন। বিলম্বিত আলাপের উজির খাঁ সাহেবও সুরশৃঙ্গারে নানাপ্রকার অলংকার ব্যবহার ক'রতেন। আলাউদ্দিনের বাজনাতেও অনেক অলংকার প্রকাশ পেত। তবে উজির সাহেব ও আলাউদ্দিন সুরশৃঙ্গার সরোদ যন্ত্রে আওচার বিস্তারেরই প্র দিতেন; যদিও মাঝে মাঝে ইচ্ছ কয়েকটি সুরের গণ্ডির মধ্যে খণ্ডমে প্রকরণ অনুযায়ী কয়েদ বিস্তারও বাজাতেন। এখানে মহম্মদ আলী সাহেবের রবাবী পদ্ধতির কথা উ যোগ্য। রবাবী পদ্ধতিতে খণ্ডমেরুর খুবই কম; আওচার বিস্তারের এখানে পূর্ণরূপে বিদ্যমান এবং পদ্ধতিতে জোড়ের সময় লড়ী-জো বিস্তার যথেষ্ট পরিমাণে দেখানো প্রাচীন ওস্তাদগণ কয়েকটি বড় বড় বিস্তৃতভাবে আলাপ শিক্ষা দিতেন; বলতেন: "এক সাধে তো সব ভারতের শ্রেষ্ঠ কলাকারগণ কয়েকটি র সাধনায় জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাই সব রাগে তাঁদের বিস্তারের কোন থাকতো না। অন্যান্য রাগে তাঁরা য ভাবে কলা-কৌশল দেখাতে পারতেন সব রাগের ধ্রুপদ জানা থাকলে যথা রাগ বিস্তারের কোনও অসুবিধাই পারে না। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব আমাকে শুদ্ধ-কল্যাণ ও বেহাগ পূর্ণাঙ্গ আলাপ দুই মাসে ভাল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য প্রদত্ত তানগুলি স্বরলিপিতে আমি রেখেছি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তানের অভ্যাস আজও বজায় রে এই দুই রাগ শিক্ষা দেওয়ার পর কেদারা, ইমনকল্যাণ, দেশ ও মা রাগের আলাপের বিলম্বিত আওচারে কয়েকটি ক'রে শিখিয়েছিলেন। বেহ শুদ্ধ-কল্যাণ শিক্ষার পর তাঁর অনুযায়ী এই সকল রাগের বাজাতে আমার কোনও অসুবিধা হ তাছাড়া একশত ধ্রুপদের মাধ্যমে পঞ্চাশটি রাগের আদর্শ আমি তাঁর থেকে পাই। এই সকল রাগ বা আমার কিছুই অসুবিধা বোধ হয় আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছেও গি প্রায় দু মাসে আমি পুরিয়া ও টোড় দুটি রাগের বিস্তৃত আলাপ শিখে তাছাড়া অনেক ধ্রুপদ ও ধামার কাছ থেকে লাভ করায় মহম্মদ আ আলাউদ্দিন এই দুই শীর্ষস্থানীয় কারের দুই পদ্ধতির আলাপ আয়ত্ত সুযোগ আমার হয়েছে।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

আমার সাধনাকে সফল করতে, সকলের সকল স্বীকৃতি মাথায় তুলে নিয়ে যাত্রা-জগতকে এমন করে মর্যাদার আসন দিতে পারবো, এ আমার কল্পনায় ছিল না। থিয়েটার বায়োস্কোপের অভিনেতৃবর্গের স্বীকৃতি ও সহানুভূতি আমি পেয়েছি, সাদরে তা মাথায় তুলে নিয়েছি। আমার মনে হয়, যাত্রাজগতকে সরকার বহুপূর্বে মনেপ্রাণে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথম।

কিছুদিন আগেই একথা বলেছিলেন ছিয়াত্তর বছরের যশস্বী যাত্রাভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। সংগীত নাটক আকাদমির পুরস্কার লাভ জীবনসায়াহ্নে তাঁকে যে কতখানি তৃপ্তি দিয়েছিল, তা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। জীবনে খ্যাতি অর্থ সব-কিছুর ওপরে ছিল তাঁর অপরিসীম জনপ্রিয়তা। কোন পুরস্কার থেকেও জন-সমাদরকে তিনি সব থেকে বেশী মূল্য দিতেন। যাত্রার সম্পর্কে আজীবন চিন্তা করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি যাত্রা সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। যাত্রার উন্নতি অবনতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "গানের দিক থেকে যাত্রা-গানের বহুলাংশে অবনতি ঘটেছে। কিন্তু অভিনেতাদের অভিনয়চাতুর্য ও রুচি আগের চেয়ে অনেক উন্নতভাবপূর্ণ সঠিক অভিনয়ের প্রচেষ্টাও বেড়েছে।"

যাত্রা মঞ্চঘেঁষা হয়ে পড়ছে বা যাত্রার ভবিষ্যৎ ভাল না খারাপ সে প্রসঙ্গে তিনি জানান, "এখন দেখা যাচ্ছে, সুবিধাবাদী হিসেবে দল গঠন করা হচ্ছে। এ যুগে থিয়েটার যেমন বায়োস্কোপকে অনুকরণ করতে চাইছে, যাত্রাও তেমন পদোন্নতির আশায় থিয়েটারপন্থী হয়ে পড়ছে। এইভাবে চললে, যাত্রার মান নষ্ট হবে, এতে সন্দেহ নেই। প্রচেষ্টা থাকলে যাত্রার মর্যাদা আবার ফিরে আসবে। আমার মনে হয়, গীতাভি-নয়ের দিন আবার আসবে।"

যাত্রার জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে ফণিভূষণ জানান : যাত্রার চাহিদা আগেও ছিল, এখনও আছে। আগে যাত্রাগান হতো বারোয়ারীর টাকায় গ্রামে-গ্রামে, ফ্রি-শো হিসেবে। এখন টিকিট বিক্রি করে যাত্রাগানই বেশী হয়, অর্থাৎ এইভাবে যাত্রাগানের প্রচলন হয়ে গেছে। জনপ্রিয়তা সমানই আছে। তখন ছিল গীতবহুল নাটকের গীতাভিনয়। এখন চলছে অভিনয়। গান কমিয়ে কথায় অভিনয়। তখন গানের সংখ্যা যেমন ছিল বেশী, গায়কও পাওয়া যেত প্রয়োজনমতো। এখন গায়ক বেশী মেলে না। তিন ভাগ গান যাত্রা-নাটক থেকে উঠে গেছে। যাত্রা নাটকের মূল গীতাভিনয়ের দিকটা একেবারেই হাল্কা হয়ে গেছে।

নিজে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কিছুদিন চাকরিও করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল যাত্রার সাধনা। অবশেষে জয় হোল যাত্রার।

প্রায় পঞ্চাশ বছর অভিনয় করে গেছেন ফণিভূষণ। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে আজও তাঁর অনন্য জনপ্রিয়তা। ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত চলেছে তার জীবনন্ত অভিনয়। অবশেষে সেই কালরাত্রি নেমে আসে গত ১৪ ডিসেম্বর। 'বাঁশের কেল্লা' পালায় অভিনয় করছিলেন নারকেলডাঙা রেল কলোনীর মোগলবাগান পার্কে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপরে হাসপাতালে মৃত্যুর হাতে ধরা দেন ফণিভূষণ।

হুগলী জেলার সরলগাছা গ্রামে তার জন্ম ১৩০০ সালে। ১৯১৬ খৃঃ প্রথম যাত্রা অভিনয় শুরু। যাত্রার প্রায় দুশ চরিত্রে অভিনয়ের কৃতিত্ব ফণিভূষণের। নিজের রচিত পালা 'মধ্যাহ্নে সূর্যাস্ত' পালায় প্রথম অভিনয় করেন। দলের নাম ছিল মুখার্জি অপেরা।" "আমি যাত্রায় প্রথম অভিনয় করি ১৯১৬ সনে অক্টোবর মাসে। প্রথম অবৈতনিক সম্প্রদায়ের শিল্পী ছিলাম। আমি প্রতি মাসে মাসে গড়ে ২৫ রজনী অভিনয় করেছি। কখনও অ্যামেচার কখনও পেশাদার শিল্পী হিসেবে।"

বহু অভিনয় নাটক রচনা, নাটক পরি-চালনা করেছিলেন ফণিভূষণ। মাত্র ষোল বছর বয়সে 'ক্ষাত্রিয় গৌরব' পালা রচনা করেন। পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে ফণিভূষণ 'ভাণ্ডারী অপেরা'য় প্রথম যোগ দেন। মঞ্চে মনোমোহন থিয়েটার এবং মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গেও এক সময় ফণিভূষণ যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষরও রেখে গেছেন। মোট বাইশটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

আশিস রায়। ফটো : অমৃত

চিত্রসমালোচনা ●
দেশী ছবির খবর ●
মঞ্চাভিনয় ●
বিবিধ সংবাদ ●

চিত্র-সমালোচনা

● **জীবনসংগীত** (বাঙলা) : পি, এম পিকচার্স-এর নিবেদন; ৩,৯৪০.৪৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়; কাহিনী : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এই তীর্থ); সংগীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; গীত রচনা : অতুলপ্রসাদ, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, সমীরবরণ, চণ্ডী বসু এবং অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বাণী দাশগুপ্তা; রূপায়ণ : অনিল চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অসীম চক্রবর্তী, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যা রায়, রীণা ঘোষ, সন্ধ্যারাণী, শোভা সেন, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্-এর পরিবেশনায় গেল ৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বর্তমান যুগের নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যুবকের জীবন সংগ্রামের প্রায়-বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে আলোচ্য চিত্র "জীবনসংগীত"। আজকাল দিনে শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, সততা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হয়েও একটি বাঙালী যুবক কর্মের সন্ধানে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়ে শুধু ক্লান্তি ও হতাশাকেই বরণ করে, যদি না দৈবাৎ কোনো সদাশয় ব্যক্তি তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, কিংবা কোনো সদস্য মহাজন তার মুখ [illegible] হয়ে ওঠেন। মনে সংশয় জাগে, বর্তমানের এই সংগ্রাম জীবনে সবাই কি সৎ পথ ধরে মানুষ হবার আর সংগ্রাম করে [illegible] [illegible] বাঁচার জন্য জীবনের অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথে চলে অসদুপায় অবলম্বন করতেই হবে? প্রশ্ন জাগে, ভাগ্যের হাতে এমন অসহায়ভাবে ক্রীড়নক হয়ে মানুষ আর কতকাল বাঁচবে? উপযুক্ত অবাঙালী যুবক সোমেশ্বর ঝার সঙ্গে দৈবাৎ দেখা না হ'লে স্ত্রী ও শিশুসন্তান-সমেত পরমেশ মুখোপাধ্যায়ের কি অবস্থা হ'ত, তা' কল্পনাতেও আনা যায় না।

কাহিনীর মধ্যে ঘটনার প্রাচুর্য আছে, চরিত্রচিত্রণও আছে; কিন্তু যা নেই, তা' হচ্ছে নাটকীয় অনিবার্যতা। কাহিনীর গতি যখনই মোড় ফিরেছে, তখনই তা 'দৈবাৎ'-এর সহায়তায়; এমন কি একেবারে সমাপ্তি পথে চোরা কারবারীর চাকরী নেওয়া থেকে কাহিনীর নায়ক অব্যাহতি পেল সোমেশ্বর ঝার দৈবাৎ দর্শনলাভের ফলে। স্বভাবতই চিত্রটি দ্রুতগতিবিশিষ্ট নয়। অবশ্য ঘটনার বহুলতা সত্ত্বেও কাহিনীর অগ্রগতি দর্শক আগ্রহকে শেষ পর্যন্ত সজাগ রাখে।

অভিনয়ে প্রত্যেকটি শিল্পী গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নায়ক পরমেশ ও নায়িকা সাবিত্রীরূপে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এবং দুই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া—অতুলেশ্বর ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণীর আন্তরিক অভিনয়। এছাড়া অসীম চক্রবর্তী (সোমেশ্বর ঝা), অনুপকুমার (নন্দ), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (শরৎ), বঙ্কিম ঘোষ (বৃন্দাবন), গঙ্গাপদ বসু (ঈশ্বরবাবু), অজয় লাহিড়ী (লালী), শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় (টাইপিস্ট ভারতী) প্রভৃতিও উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি সাধারণ মান বজায় রাখার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অতুলপ্রসাদ থেকে শুরু ক'রে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচিত গান পর্যন্ত ছবিটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এক চণ্ডী বসু রচিত ও মান্না দে গীত "সাকরে তোমারে সাধ যে মেটে না", এই গানখানির কয়েক পংক্তি ছবির ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছুটা সার্থকতা লাভ করেছে; বাকী গানগুলি শুধুই গানের জন্যে গান।

বর্তমান নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত যুবকের জীবন সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "জীবন সংগীত" দর্শকদের মনে আশার আলোক প্রজ্বলিত করে এবং এইখানেই এর সার্থকতা।

● **কখনো মেঘ** (বাঙলা) : চলচ্চিত্র-ভারতীর নিবেদন : ৩,৬০৯.৭৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ : প্রযোজনা : বিভূতি লাহা ও শিবনারায়ণ দত্ত; পরিচালনা : অগ্রদূত; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : প্রশান্ত দেব; সংগীত-পরিচালনা : সুধীন দাশগুপ্ত; গীতরচনা : সুধীন দাশগুপ্ত ও প্রশান্ত দেব; চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা, শব্দানুলেখন : যতীন দত্ত, সুশীল সরকার, দেবেশ ঘোষ ও সোমেশ চট্টোপাধ্যায়; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : মান্না দে এবং আরতি মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণ মিত্র, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন প্রভৃতি। ডি লাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

হত্যা, রহস্য, রোমান্সের সঙ্গে প্রেম ও কৌতুককে বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিমাণ মতো মিশিয়ে গড়ে উঠেছে 'কখনো মেঘ'-এর চিত্রকাহিনী। দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে শিক্ষয়িত্রী সীমা রায় নারায়ণ চৌধুরী নামে এক সুদর্শন তরুণের সঙ্গে প্রথম পরিচয় স্থাপনের পরে ক্রমে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

...ন একটা নতুন অনুভূতির স্বাদ নিয়ে ...কাতায় ফিরে আসতে না আসতেই তার ...ত বিঘ্নিত হয় এক দল দুর্বৃত্তের ...া। তারা সীমাকে জানায়, তার সদ্য-...ত খুল্লতাত তার কাছে যে-হীরেগুলি ...পনে পাচার করেছেন, সেগুলি ফেরৎ ...েই তারা খুশী। সীমা যতই বলে, তার ...র সঙ্গে তার কোনোদিনই কোনো ...র্ক ছিল না এবং হীরে সম্পর্কে সে ...ই জানে না, তবু তারা তার কথায় ...ো বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং তাকে ...ভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। এই ...ময় তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে ...র প্রতি অনুরক্ত নারায়ণ চৌধুরী এবং ...লিশী গোয়েন্দারূপে পরিচয়প্রদানকারী ...ধীশ নিয়োগী। সীমা ঠিক বুঝতে পারে ..., ঐ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে পরি-...ের উপায় কি? কে তাকে ঐ বিপদ থেকে ...ার করবে? শেষ পর্যন্ত কিভাবে সকল ...মস্যার সমাধান হওয়ায় সীমা আবার ...স্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল তাই ...য়েই ছবির শেষ দিককার উত্তেজক দৃশ্য-...লি গড়ে উঠেছে। সাসপেন্স ও রোমান্সের ...ঙ্গে কৌতুকের মিলন ঘটাতে সমগ্র ছবিটি ...য়েছে পরম উপভোগ্য এবং এ-ব্যাপারে ...ংসা দাবী করতে পারেন যুগ্মভাবে চিত্র-...াকার ও পরিচালক।

নায়ক নারায়ণ চৌধুরী ওরফে গোয়েন্দা ...লোক মুখোপাধ্যায়রূপে উত্তমকুমার তাঁর ...চনে ও ভঙ্গীতে ছবিটির বেশীর ভাগ ...ংশকে জীবন্ত করে রেখেছেন। পৃথ্বীশ ...নিয়োগী ওরফে চিরঞ্জীব লাহিড়ী বেশে ...লী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রূপসজ্জা ও ...লিষ্ঠ অভিনয় ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। ...ন্তু বসাক, প্রসাদ ভট্টাচার্য ও বৈদ্যনাথ পাল —এই তিন দুর্বৃত্তের ভূমিকায় যথাক্রমে ...ামু মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র ও বঙ্কিম ঘোষ স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চমৎকার চরিত্র-চিত্রণ করেছেন। চাকর রঘুরূপে ...পতি চট্টোপাধ্যায় ছোট্টর মধ্যে একটি ছাপ রাখতে পেরেছেন। নায়িকা সীমা রায় বেশে অঞ্জনা ভৌমিকের অভিনয় সংযত ও স্বাভাবিক। সীমার বন্ধু ও সহকর্মী কণার ভূমিকায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় সুষ্ঠুভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাস্টার অরিন্দম, শোভা সেন প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ, বিশেষ করে চলচ্চিত্রায়ণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিছু কিছু বাচন দ্রুত লয়ে হওয়ায় শ্রুতিগ্রাহ্য হয় নি। ছবির চারটি গানই সুরের অভিনবত্ব দাবী করে। কমলেশ শ্রীবাস্তবের 'ইলেকট্রনিকস' আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টি করে সাসপেন্সকে ঘনীভূত করেছে।

কৌতুকরসবিমিশ্র সাসপেন্স ও রোমান্সের ছবি 'কখনো মেঘ' দর্শকদের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠবে, প্রতিবাস আমাদের আছে।

নাগিনা মাহাতো চিত্রের প্রথম শুটিং এবং চা চক্রে পরিচালক তপন সিংহ, দিলীপকুমার, সত্যজিৎ রায়, সায়রা বানু, সন্ধ্যা রায়, রঘু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায়।

ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

দানীবাবু জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

'দানীবাবু' বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এক স্মরণীয় নাম। রূপাভিনয়ের অসামান্য খ্যাতির দীপ্তি আজও ভাস্বর। মহাকবি গিরিশচন্দ্র-এর পুত্র 'দানীবাবু' (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতাদের সর্বাগ্রগণ্য। গিরিশযুগে এ'র নাট্য-প্রতিভার উন্মেষ এবং গিরিশ-পরবর্তী যুগে তা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান হয়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অন্ধকার শুধু দূর করেনি বঙ্গনাট্যমঞ্চকে নবগৌরব দান করেছিল। শনিবার ১৪ ডিসেম্বর (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫) তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। এই অলোকসামান্য নাট্যপ্রতিভার বরপুত্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর আবির্ভাব-লগ্ন মর্যাদা ও শ্রদ্ধা-সহকারে স্মরণ করবার জন্যে এদেশের ছায়াচিত্র ও মঞ্চজগতের নবীন প্রবীণ রূপকারদের নিয়ে 'দানীবাবু জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতি' গঠিত হয়েছে। সভাপতি : অহীন্দ্র চৌধুরী, যুগ্ম- সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, সহ-সম্পাদক : সুনীল দাশগুপ্ত এবং পৃষ্ঠপোষক ও কমিটিতে আছেন সর্বশ্রী সরযূবালা দেবী, মলিনা দেবী, কানন দেবী, শম্ভু মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রাসবিহারী সরকার, নরেন্দ্র দেব, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মধু বসু, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, জহর রায়, সবিতাব্রত দত্ত, তরুণ রায়, শোভা সেন, তাপস সেন প্রমুখেরা।

১৪ ডিসেম্বর, শনিবার, সকাল ৮টায় বাগবাজারস্থ 'গিরিশ ভবনে' গিরিশ-পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ নট সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)-এর জন্ম শতবর্ষপূর্তি উৎসবের প্রথম দিবস অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমৃত-সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। কলকাতার পৌরপ্রধান গোবিন্দ দে দানীবাবুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য আয়োজনের সঙ্গে তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে স্বর্গত নটের তৈলচিত্রে মাল্যদান করেন। উৎসব সমিতির পক্ষে অধ্যক্ষ শুদ্ধসত্ত্ব বসুর বিবৃতির পরে সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর পিতা শিশিরকুমার ও তাঁর নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দানীবাবুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এ ছাড়া উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, দেবনারায়ণ গুপ্ত, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি সময়োচিত বক্তৃতার মাধ্যমে দানীবাবুর নট-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। মঞ্চ ও চিত্র-শিল্পী সবিতাব্রত দত্ত এই অনুষ্ঠানে নবীন শিল্পীদের অনুপস্থিতিতে আক্ষেপ প্র করেন এবং আবৃত্তি ও গান করেন। স বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দানীব প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

•

সব পেয়েছির আসরের বার্ষিক উ উপলক্ষে মহাজাতি সদনে আগামী জানুয়ারী সন্ধ্যায় বাঙলা দেশের প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ স্বপনবুড়ো রচিত কৌ নাট্য 'স্বর্গীয়া সাহিত্য সমাবেশ' ম করবেন। এই নাটকে মঞ্চে আবির্ভূত হবে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর, মাইকে কালীপ্রসন্ন, আশুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, রবী নাথ, স্বর্ণকুমারী, শরৎচন্দ্র আরো বহু বি চরিত্র।

বিভিন্ন ভূমিকাকে রূপদান করবে নরেন্দ্র দেব, বনফুল, শৈলজানন্দ, ম রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ জরাসন্ধ, স্বপনবুড়ো, শৈলেন চট্টো, কৃষ্ণ ঘোষ, ধীরেন বল, দিলীপ দাশগুপ্ত, ম মল্লিক, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যো, অতীন মজুম নগেন্দ্র মিত্র মজুমদার, সঞ্জীব সর রেবতীভূষণ, গৌর আদক, রবিরঞ্জন চ শৈলেন সরকার, বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, ব আতাহার আরো বহু উদীয়মান কবি সাহিত্যিক।

শৈলজানন্দ নাটকটি পরিচালনা করবে

শ্রীমা নাট্য কোম্পানী ১৯৬০ স পেশাদারী দল হিসাবে লোকপরিচিতি করলেও মাত্র কয়েক বৎসরের ম কলকাতার প্রথম শ্রেণীর যাত্রা সংস্থাসমূ মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। বিশেষ উল্লে যোগ্য যে শ্রীমা নাট্য কোম্পানী এক যাত্রা সংস্থা যারা সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্র চ পাধ্যায়ের 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর নাট্যর যাত্রা আসরে মঞ্চস্থ করে প্রভূত সমাদর করেছেন।

দলের স্বত্ত্বাধিকারী নন্দদুলাল চ পাধ্যায় অভিনেতা ও সংগঠকরূপে বি পারদর্শী। যাত্রাজগতের অন্যতম প্র ম্যানেজার কালীপদ বিশ্বাসের সু পরিচালনাধীনে দল প্রথম সারিতে বি স্থান ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়ে এ বৎসর শারদীয়া থেকে আপার আসা উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন আসরে প্রভূত প্রশং সহিত পালা পরিবেশনের পর বর্ত উত্তরবঙ্গে সফররত। ভাবনাকাক্ষী দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পরিচালন দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে ও প্রতিটি নাট্য শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ ভূমিকায় আকর্ষ অভিনয়গুণে এদের অভিনীত পালাগু 'রাক্ষসী পদ্মা', 'তৃষ্ণা', 'সোনাই দী 'ওমর খৈয়াম' ও 'টাকা-আনা-পাই', প্রতি আসরই দর্শকসমাবেশে আকীর্ণ ও অ প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া মোশান পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত উত্তরবঙ্গ ত্রাণ ভাণ্ডারে দক্ষিণ কলিকাতার সন্ত চিত্রগৃহ "পূর্ণ থিয়েটার"-এর কর্তৃ ১০০১ টাকা দান করেছেন।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সোস্যাল এণ্টারপ্রাইজ প্রযোজিত ক্ষুধিত পাষাণের একটি দৃশ্য। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন গণেশ সিংহ, বেবী গুপ্তা, মায়া চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী কাজী, প্রভাত ঘোষ, চিন্ময়জীবন ঘোষ। গ্রন্থনায় ছিলেন কাজী সব্যসাচী।

বেতার প্রভৃতি

অল্প কিছুদিন আগে খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছিল যে, ...দের অভিজাত বংশের লোক এবং বিশিষ্ট জীবনচরিত লেখক ...ন ল্যাংলি হল অস্ত্রোপচারের সাহায্যে পুরুষ থেকে স্ত্রীতে ...ত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর-নাম জন পেপিতা ল্যাংলি হল। তিনি ... নিগ্রো ড্রাইভারকে বিয়ে করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ...র সঙ্গে তাঁর অস্ত্রোপচারের পূর্বের ও পরের অর্থাৎ তাঁর ...ষ-রূপের ও স্ত্রী-রূপের ছবিও ছাপা হয়েছিল। খবরটা ... বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল।

গর্ডন ল্যাংলি হল এতদিন পুরুষ বলেই গণ্য ছিলেন, ...মার্গারেট রাদারফোর্ড নামে এক বিশিষ্ট মহিলার পোষ্যপুত্র-... পরিচিত ছিলেন। এখন তিনি নারী, তবে সম্পূর্ণ নারী ...কারণ, নারীত্বের যে মুখ্য কৃতিত্ব সন্তান-সম্ভাবনা, চিকিৎ-...রা মন্তব্য করেছেন, সেটি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

বেশ কিছুদিন থেকেই গর্ডন ল্যাংলি হলের একটা অনু-...হচ্ছিল যে, তিনি পুরুষ নন, তিনি নারী। তিনি চিকিৎ-... পরামর্শ নিলেন, পরে বাল্টিমোরে জন হপকিন্স হাসপাতালে ...দেহে অস্ত্রোপচার করা হ'ল—এবং হরমোন চিকিৎসায় তিনি ...ষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হলেন।

সম্প্রতি কলকাতায় আকাশবাণীর বেতারজগৎ দপ্তরে ...পচারে নয়, কলমোপচারে একজন নাট্যকার পুরুষ থেকে ...ে রূপান্তরিত হয়েছেন। এবং খবরটা সম্ভবত এই প্রথম ...গুলিতে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর কলমোপচারের পূর্বের পরের কোনো ছবি ছাপা সম্ভব নয়। তাঁর পুরুষ-নাম ...কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ত্রী-নাম স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপান্তরের পর তাঁকে আমি দেখেছি, কিন্তু রূপান্তরিত বলে ...য়নি—পূর্ববৎ পুরুষই আছেন। কিন্তু বেতারজগৎ সম্পাদক স্ত্রী-রূপেই ঘোষণা করেছেন—ডিসেম্বর মাসের প্রথম বেতারজগতের মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'বেতারে এই পক্ষে' ...ড়ো করে এবং ভিতরে ১লা ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানসূচীতে ছোটো করে তাঁর স্ত্রী-নাম ছেপেছেন।

সম্ভবত ভুল করেই করেছেন, এবং শোনা যায় ভুলটা ...নের জন্য স্নিগ্ধকুমার তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ... মশায়ের কাছে ভুলটা ভুল বলে মনে হয়নি। তিনি নাকি বলেছেন, 'ও এমন কিছু নয়।' ফলে বেতারজগতে তিনি ...রয়ে গেছেন। অবশ্য বেতার তাঁকে পুরুষ বলে ঘোষণা ... ১লা ডিসেম্বর বেলা ৩টায় ঘোষণা শোনা গেছে, "আজকের অতন্দ্র'—রচনা শ্রীস্নিগ্ধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

এবার দেখা যাক ভুলটা কার এবং কোথায় তার উদ্ভব। ...দপ্তর থেকে বেতারজগৎ দপ্তরে অনুষ্ঠানসূচী পাঠানো ...রেজীতে এবং বেতারজগৎ দপ্তরে তা বাংলা করে নেওয়া ...র্তমান ক্ষেত্রে বেতার দপ্তর 'অতন্দ্র' নাটকের রচয়িতার নাম ...দপ্তরই **Snigdhakumar Banerjee** পাঠান নি, পাঠিয়েছেন ...**nigdha Banerjee** — কারণ, ইংরেজী **AKASHVANI** ...পত্রিকাতে **Snigdha Banerjee** ছাপা হয়েছে। সুতরাং ...কুমারটা বেতার দপ্তরই বাদ দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বেতারজগৎ দপ্তরে **Snigdha**-র বাংলা করা হয়েছে স্নিগ্ধা, ওটা যে স্নিগ্ধও হতে পারে, বাংলাকারীর তা বোধহয় মনেই হয়নি। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল, কারণ বেতারজগতে এই রকম ঘটনা এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার ঘটেছে—এই স্নিগ্ধ-কুমারের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কিছুদিন আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্জন শিখর' ছাপা হয়েছিল 'নির্জন শিকার'।

বারংবার এইরকম বিপত্তি যাতে না ঘটে সে জন্য বেতার দপ্তরের উচিত বেতারজগৎ দপ্তরে বাংলায় অনুষ্ঠানসূচী পাঠানো। অথবা বেতারজগৎ দপ্তরের উচিত আরও সতর্ক হওয়া এবং সন্দেহজনক স্থলে বেতার দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক নামটা জেনে নেওয়া।

মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি: মানুষকে তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে গড়েছেন—এবং তার কণ্ঠে স্বর দিয়েছেন। কারও কারও কণ্ঠে স্বর ছাড়া অতিরিক্ত সুরও দিয়েছেন, এবং পরোক্ষে একটা বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। মানুষে-মানুষে এই বিভেদ এখনও খুনোখুনির পর্যায়ে না পৌঁছুলেও রেষারেষির পর্যায়ে পৌঁছেছে। যাদের কণ্ঠে স্বর আছে কিন্তু সুর নেই, তারা যাদের কণ্ঠে স্বরও আছে, সুরও আছে, তাদের ঈর্ষা করে। এই ঈর্ষার ফল অনেক সময় ভালো হয় না।

সম্প্রতি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে এইরকম একটি ঈর্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে এবং তার ফল ভালো হয়নি।

কলকাতা কেন্দ্রের ঘোষক-ঘোষিকাদের মধ্যে কে কে গান জানেন ঠিক করে বলতে পারব না। তবে ৫ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১২টার গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে যিনি ঘোষক ছিলেন তিনি যে গান জানেন না তা হলফ করে বলতে পারি। তাঁর মনে যে গান গাইবার একটা সুপ্ত বাসনা আছে তা-ও অনু-মান করতে পারি। কিন্তু অনুমানের কথা থাক, ঘটনার কথা বলি।

৫ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১২টায় গ্র্যামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে রাজেশ্বরী দত্তর গান ছিল। প্রতিটি গানই সুনির্বাচিত, এবং প্রতিটি গানেই সুরের আগুন জ্বালানো। সেই আগুনের উত্তাপে সারা মন আবেগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল, আবার মাঝে মাঝে ঘোষকের ঘোষণায় শীতল হয়েও যাচ্ছিল।

ঘোষক পুরুষ। তাঁর কণ্ঠে সুর নেই, কিন্তু স্বর আছে। তিনি হয়তো ভাবলেন, সুরের চেয়ে স্বর ছোটো কিসে। রাজেশ্বরী দত্ত তাঁর সুর দিয়ে মন জয় করবেন আর তিনি সেই জয়বার্তা ঘোষণা করবেন, এ হতে পারে না। তাঁরও কিছু করা চাই, এবং সুরের বদলে স্বর দিয়েই। তাই প্রতিটি রেকর্ড বাজাবার আগে গানের প্রথম লাইন স্বরাঘাত দিয়ে কায়দা করে ঘোষণা করতে লাগলেন। ফলে সময়ে টান পড়ল, শেষের রেকর্ডখানি পুরো বাজানো গেল না। শেষের রেকর্ডখানি পুরো না বাজিয়ে তিনি গানটিকে হত্যা করলেন, শ্রোতাদের মেজাজ নষ্ট করলেন—এবং পরিশেষে নিজের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করলেন।

কিন্তু তবু কি শিক্ষা হবে? না, সে সম্ভাবনা নেই—ঘোষক-ঘোষিকারা কায়দা করে গানের লাইন ঘোষণা করবেনই, সময়ে টান ফেলবেনই এবং গান কাটবেনই। কিছুতেই বোঝা যায় না, ঘোষণার পরমুহূর্তেই যখন পুরো গানটি শোনা যাবে তখন আগে গানের প্রথম লাইনটি বলার দরকার কী।

• • • অনুষ্ঠান পর্যালোচনা • • •

৩০শে নভেম্বর বেলা ৩টের নাটক 'সুরের বাঁধনে'। নাটকটি শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীক্ষিতি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত।

শীর্ষেন্দু ডাক্তার, গানের সে কিছুই বোঝে না। তবু অর্চনার গান শুনে সে মুগ্ধ হল, তাকে বিয়ে করল। এই বিয়ের জন্য অর্চনাকে প্রচুর দাম দিতে হল। বাবার অমতে বিয়ে করায় বাবা তাকে পরিত্যাগ করলেন। শীর্ষেন্দু অর্চনাকে গ্রহণ করে সুখী হল, কিন্তু সে সুখ বেশিদিন সইল না। অর্চনার গানের ফাংশন থাকে, সিনেমায় কনট্রাক্ট থাকে, স্তাবকের দল থাকে—তাই রাত্রে বাড়ি ফিরতে তার দেরি হয়, মেয়ের অযত্ন হয়। এই নিয়ে বিরোধ। বিরোধ একদিন চরমে উঠল, বিচ্ছেদ হল। অর্চনা মেয়েকে নিয়ে যেতে চাইল, শীর্ষেন্দু দিল না। কারণ, অর্চনার কাছে থাকলে সে-ও তার মতো 'নটী' হয়ে উঠবে। অর্চনা একাই চলে গেল।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। মেয়ে বড়ো হয়েছে। অর্চনার নাম হয়েছে। শীর্ষেন্দু এক নবনির্মিত হাসপাতালের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে অর্চনার গান শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এই গানটি অর্চনা তাদের বিয়ের দিনটিতে ছাড়া আর কখনও গাইত না।

শীর্ষেন্দুর পরিচর্যার মধ্য দিয়ে অর্চনা তাকে নতুন করে আবিষ্কার করল। আবার তাদের মিলন হল।

সমস্যাটা ছোটো নয়, অবাস্তব নয়। এমন অশান্তি, খোঁজ নিলে বিস্তর পাওয়া যাবে। নাটকে সমস্যাটা উপস্থাপিতও হয়েছে ভালো, কিন্তু কোথাও কোথাও সংলাপ যেন জোর করে চাপানো—বিশেষ করে প্রথম ভাগে। প্রথম ভাগে শীর্ষেন্দুর ভূমিকায় শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও বড়ো শুকনো, কাঠ কাঠ। প্রণয়ীরূপে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, পরে বৃদ্ধ স্বামীরূপে কিন্তু তাঁকে মানিয়েছিল ভালো। আসলে এই ভূমিকায় আরও কম ভয়েস-এজের শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। অর্চনার ভূমিকায় শ্রীমতী বাসবী নন্দী বরাবরই ভালো অভিনয় করেছেন—বেশ ধীর, সংযত।

১লা ডিসেম্বর বেলা ১০টার নাটক 'অতন্দ্র'। শ্রীস্নিগ্ধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত।

মোটর দুর্ঘটনার স্বামী মারা যাবার পর মিতার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। তাকে সারাবার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে তার স্বামী প্রসূনকে বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের অভিনয় করতে হচ্ছে। মিতাকে বোঝাতে হচ্ছে প্রসূনেরই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। মিতা বুঝেছেও তাই। তাই সর্বক্ষণ প্রসূনকে 'সারিয়ে' তোলবার জন্য তার চেষ্টা। প্রসূনের জন্য তার উৎকণ্ঠা। কিন্তু মিতা ওষুধ না খেলে প্রসূন ওষুধ খায় না, মিতা ইনজেকশন না নিলে প্রসূন ইনজেকশন নেয় না। এমনি করে মিতার চিকিৎসা হয়। এরই মধ্যে প্রসূনের ভাগ্নে কাঞ্চু এল। কাঞ্চুকে মিতা বোঝাল প্রসূনের মাথা খারাপ, প্রসূন বোঝাল মিতার মাথা খারাপ। বেশ জটপাকাল। শেষে ডাক্তার সব পরিষ্কার করে দিল। দুর্ঘটনায় নিহত হবার সময় ছেলেটির পরনে যে রঙের স্যুট ছিল, কাঞ্চুকে সেই রঙের স্যুট পরিয়ে তাকে একটা নকল মোটর দুর্ঘটনায় ফেলে মিতার পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে দিল। মিতা ভালো হয়ে গেল।

নাটকের বিষয়বস্তুটা ভালো ছিল। জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছিল মন্দ নয়। কিন্তু ঐ যে নকল মোটর-দুর্ঘটনা, তার পরিকল্পনায় প্রযোজক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। নকল যদি আসলের মতো না হয়, তাহলে সে কেমন নকল? আর, শেষটা অকারণে একটুখানি টানা, রসহানি করে।

অভিনয়ে একমাত্র শ্রীমতী বিনতা রায়ের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিকৃত-মস্তিষ্ক মিতার রূপটি তিনি ফুটিয়েছেন সুন্দর। খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছে। প্রসূনের চরিত্রে শ্রীমিহির ভট্টাচার্য কাজ চালিয়ে গেছেন। ডাক্তার চরিত্রে শ্রীমনোমোহন ঘোষ আর প্রবীণের চরিত্রে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রোচিত। কাঞ্চুর চরিত্রে সব্যসাচী ভালো।

শব্দ-সংযোজনার কাজ মোটেই প্রশংসনীয় নয়, যন্ত্র-সংগীতের বাহুল্য পীড়া দিয়েছে।

২রা ডিসেম্বর মহিলামহলে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রাজ্যপাল ধর্মবীরের একটি ভাষণ শোনা গেল। রাজ্যপাল কি মহিলামহলের জন্য ভাষণটি দিয়েছিলেন? যতদূর জানি, তা তিনি দেননি। পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ উপলক্ষে ১লা ডিসেম্বর রাত্রে তিনি একটি বিশেষ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই টেপই পরদিন আবার মহিলামহলে বাজানো চলে কি? বিশেষ:ক অভিনিবেশ করা? তাহলে অন্যান্য মহল আর আসরে বাজানো হবে না কেন?

২রা ডিসেম্বর রাত সাড়ে [illegible] দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে শ্রী[illegible] ইভা নাগ প্রথমে বললেন, সুপ্রীম [illegible] শ্রীমধু লিমায়ে ও অন্য ৪৫ জনের মু[illegible] আদেশ দিয়েছেন। পরে সুপ্রীম কো[illegible] স্থলে হাইকোর্ট বললেন। শ্রোতারা কৈফিয়ৎ চাইলে তাঁরা কী জবাব দেব[illegible] কতভাবে আর তাঁরা শ্রোতাদের বিভ্র[illegible] করবেন? রাত ৯টা ৪৫য়ে শ্রীমতী [illegible] গুপ্তর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে [illegible] ভরল না। মনে হল, অতুলপ্রসাদের গা[illegible] তাঁর স্বক্ষেত্র।

৩রা ডিসেম্বর বেলা আড়াই[illegible] বিদ্যার্থীদের অনুষ্ঠানে 'মধ্যযুগের ই[illegible] রোপের জ্ঞানতপস্বী'—এই পর্যায়ে রো[illegible] বেকন, দান্তে ও চসারে সম্বন্ধে বল[illegible] শ্রীবিভাসচন্দ্র মিত্র। এত অল্প সময়ে, [illegible] সংক্ষেপে সুন্দর বললেন তিনি। স্পষ্ট [illegible] কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট বাচনভঙ্গি।

৪ঠা ডিসেম্বর বেলা ১২টা ৫[illegible] দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে [illegible] চারেক নন-ফেরাস মেটাল অর্থে লো[illegible] বর্জিত ধাতু বলা হল। বরাবরই তাঁরা [illegible] বর্জিত ধাতু বলেন। কিন্তু লোহবর্জি[illegible] বলতে কী বোঝায়? বিবেকবর্জিত মা[illegible] বললে তার অর্থ বোঝা যায়। বিবেক ছাড়[illegible] মানুষ হয়। কিন্তু লোহ থেকে যদি [illegible] ছেড়ে যায়, তাহলে থাকে কী? আসলে [illegible] লৌহেতর ধাতু—লৌহ বাদে অন্য ধাতু[illegible]

৫ই ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১০[illegible] শ্রীমণীন্দ্র দাসের কণ্ঠে লোকগীতি ভা[illegible] লাগল। সকাল ৭টা ১৫য় শ্রীমতী নিম[illegible] মিশ্রের কণ্ঠে ভজনও। কিন্তু শেষটা শুন[illegible] দেওয়া হয়নি, ৮ই ডিসেম্বর সকাল সা[illegible] ৯টার নজরুলগীতিও না। শেষ কাটা [illegible] হয় আর বন্ধ হবে না।

৮ই ডিসেম্বর সকাল ৭টা ১৫য় শ্রীম[illegible] মায়া রায় চৌধুরীও ভজন গাইলেন সু[illegible] বেশ প্রাণবন্ত গলা।—সকাল ৮টা ৪[illegible] জনৈক ঘোষিকার কণ্ঠে প্রথমে শোনা গে[illegible] 'এখন রাগপ্রধান গান শোনাচ্ছেন'...তার[illegible] দীর্ঘ বিরতি......তারপর 'শ্রীবাসুদেব চ[illegible] পাধ্যায়'...তারপর আবার বিরতি...তার[illegible] আবার ঘোষণা, 'আকাশবাণী কলকাত[illegible] এখন শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় রাগপ্রধ[illegible] গান শোনাচ্ছেন।' এই রকম অপদার্থতা অ[illegible] আর কতদিন সহ্য করতে হবে?

—শ্রবণ

জলসা

মিউজিক সার্কেলের দুটি সংগীতমুখর সন্ধ্যা

উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণ তহবিলে ও
...ন্টস হেলথ হোমের সাহায্যার্থে ক্যাল-
মিউজিক সার্কেল দুটি সংগীত-
...র আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রসদনের
... উৎসব উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল
...বীর। উদ্যোক্তারা তাঁর হাতে বন্যাত্রাণ
...লের অর্থ প্রদান করেন। গানের আসর
...হয় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্র-
...ত দিয়ে। শ্রীমতী মিত্রের সুনির্বাচিত
...গুচ্ছ 'আজি আনন্দ সন্ধ্যা', 'তুমি
...ই যাবেই চলে', 'যেতে যেতে চায় না
... নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে', 'জীর্ণ-
... 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি',
... আমার চির অচেনা", "অধরা মাধুরী
... বৃন্দাবনে'—কখনও ইমন, কখনও
কখনও বা কাফির ছোঁয়ায় কথা ও
...র মিলন—শিল্পীর সুর-সমৃদ্ধ মার্জিত
এবং ভাবগ্রাহী চিত্তের সংবেদন-
...তায় রসাসিক্ত মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে।
... অনুষ্ঠান ব্রিজলাল কাবরার গীটার
... রাগ-সংগীতের সবিস্তার পরিবেশন-
...র অভিনবত্বে গীটারের ভাষ্য পরিবর্তন
...লঘু-সংগীতবাহী যন্ত্রকে মার্গসংগীতের
...ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার পুরো কৃতিত্ব
... তরুণ শিল্পীর অবশ্যপ্রাপ্য। ইনি
... রাগে আলাপ এবং দেশমল্লারে গত্
...য়ে শোনান। শ্রীরাগের ভক্তিভাব এবং
...রের বিদেশব্যাকুল হৃদয়ের কাতরতা
প্রাণকাড়া মীড়ের টানে যেন
...ই চিত্তকে আকৃষ্ট করে। যন্ত্রের
...ত পরিসরের জন্য ছন্দ-বৈচিত্র্যের
... ছিল কম কিন্তু সুরের মাদকতা
...ভাব অনায়াসে ভুলিয়ে দিতে পারে।
...কাওয়ালী সংগীতের অবতারণা এই
...র বিচিত্রময় অবদান। শিল্পী গোলাম
... হোসেন খাঁ ও সম্প্রদায়। মুক্তকণ্ঠে,
... উচ্ছলতায় কখনও পিলু কখনও
... এবং অন্যান্য মধুর রসাত্মক রাগস্পর্শে
...লী সংগীত যেন উপভোগের উৎসব
...উঠেছিল। এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ
...দের দাবী রাখেন মিউজিক সার্কেলের
...বৃন্দ।

...রিশীলিত বাজের আধারে এবং পরণ
... তানের বিদ্যুৎবেলিক ও আত্ম-
...লী বিস্তারে "মধুমন্তী" রাগের
...ন-উদ্বেল মাধুর্যকে অনুভবগ্রাহ্য
... পেরেছেন তরুণ শিল্পী আমজেদ
খাঁ। তবে শিল্পীচিত্তের যথাযথ
... ঘটেছে ধুনের একটি 'সেতারখানি
... সুন্দর বন্দেজে। বেহাগ, কেদারা,
...কামোদের চকিত স্পর্শে আমজাদ
...পার মালা রচনা করেছেন। এঁর
... মেজাজী সংগত করেন কানাই দত্ত।
...নুষ্ঠানসূচী 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয়
পদ্মশ্রী বেগম আখতারের ঠুংরী ও গজল
দিয়ে। সঙ্গে ছিল ওস্তাদ কেরামত খাঁর
বৈচিত্র্যময় তবলা-সংগত।

'ঠুংরী' আঙ্গিক বন্ধনে দৃঢ়-নিবদ্ধ সংগীত নয়—রাগের মধুর বন্ধন মেনেও, ভাবের আকাশে বিহার করবার অবাধ স্বাধীনতা এখানে শিল্পীর আছে এবং এই স্বাধীনতার এক রসঘন রূপ মেলে ধরেন ঠুংরী ও গজলের সাম্রাজ্ঞী বেগম আখতার। বোল-বিস্তারের সহজাত অধিকারে আবেগের চাঞ্চল্য ও সংযমের শাসনে কিছু বলা না বলার ইশারায় দুটি মিলনোন্মুখ চিত্তের আনন্দ-বেদনা ব্যাকুলতার যেন ছবি এঁকে গেলেন— সুরে রেখায় রেখায়। মাঝে মাঝে খট্‌কা, জমজমা, মুড়কীর অকস্মাৎ-স্পর্শ হৃদয়ের ওঠাভার অভিমান স্পন্দের চিরন্তন আকুলতা শ্রোতৃচিত্তেও সঞ্চারিত। মহৎ উদ্দেশ্যে এমন এক সৌন্দর্যময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ।

সংগীতচক্রের "বিজয়িনী"

শ্রীধীরেন বসু প্রযোজিত এবং পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যগ্রন্থের 'বিজয়িনী'-অবলম্বনে রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ নৃত্যনাট্য এক উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। "বিজয়িনী"র ভাববস্তুকে নৃত্য ও গীতি-কাব্যের ভাষায় বিশ্লেষণ সহজ নয়। কিন্তু বিষয়-বর্ণনের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে কল্পনাশক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর অভিনন্দনের দাবী রাখে। সংগীতাংশ বেশীর ভাগ "শাপমোচন" কিছু "মায়ার খেলা" এবং 'তপতী'র গানের সমন্বয়ে 'বিজয়িনী'র মর্মভাবের ভূমিকা, ক্রমপর্যায় এবং উপসংহার শিল্পীজনোচিত রসরূপ পরিগ্রহ করেছে। গানগুলি এই নৃত্যনাট্যের সম্পদ-বিশেষ এবং 'বসন্ত'র গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পরাণসখীর ভূমিকায় সুচিত্রা মিত্রের গানের মুন্সীয়ানা, ভাব-গাম্ভীর্য ও শোনা মাত্রই চিত্ত আকৃষ্ট করে। বিজয়িনীর গানে তরুণ শিল্পী সুমিত্রা সেনের ক্রম-পরিণত গায়নশৈলী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীমহলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। অনঙ্গদেবের গানগুলি আন্তরিকাতর সঙ্গে পরিবেশিত। তাঁর সংগীত পরিচালনাও সুষ্ঠু, সুন্দর।

কিন্তু এত উচ্চমানের সংগীতের তুলনায় নৃত্যাংশ দুর্বল। নৃত্য-রচনায় বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য অথবা কৃতিত্বের পরিচয় নরেশকুমার রাখতে পারেননি। শিল্পী হিসেবে প্রথমেই যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন গোবিন্দম কুট্টি। শ্রীকুট্টির অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি, আঙ্গিকতা এবং নৃত্যশৈলীর আধারে অনঙ্গদেবের ভাবমূর্তি আকর্ষণীয়। তবে বয়স অথবা যে কারণেই হোক— অনঙ্গদেবের যৌবন-সৌন্দর্যের দিকটি যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। বসন্তের নৃত্য-ভূমিকায় লীলাচাপল্যের দিকটি নরেশ-

সংগীতচক্রের বিজয়িনী নৃত্যনাট্য অলকনন্দা চাকলাদার। ফটো: অমৃত

কুমারের নৃত্যে কিছুটা পরিস্ফুট হলেও, অভিব্যক্তির দৈন্য দৃষ্টিকে পীড়িত করেছে।

বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে পরাণসখীর ভূমিকায় জয়শ্রী লাহিড়ীর নৃত্য বিষয়বস্তু পরিস্ফুটনের জন্য মণিপুরী কথাকলি ও কথক যখন যে আঙ্গিকের প্রয়োজন তারই ছোঁয়ায় পরাণসখীর বাসনা-রঙীন বিহ্বলতা, মিলনের উল্লাস এবং বিদায়বেদনা। নৃত্যের ছন্দে এবং নাটকীয়তায় পরিব্যাপ্ত।

"বিজয়িনী" চরিত্রে শ্রীমতী অলকানন্দা চাকলাদারের শান্ত-মাধুর্য লাবণ্য সংযত রূপ—স্ব-মর্যাদায় ব্যক্ত। বিশেষ, শেষ দৃশ্যে আয়ত নয়নের প্রসন্ন-উজ্জ্বল

তরুণ বাঙালী বৈজ্ঞানিক

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিজের ল্যাবরেটারী ডঃ রায়চৌধুরী

হরগোবিন্দ খেরানাকে এবার পুরস্কার দেওয়া হলে সারাভারতে বিষাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শিক্ষাসূত্রে তিনি ভারতীয় হলেও হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সেজন্যেই তার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে র্ষের মানুষ আনন্দিত হলেও রাই এ গৌরবের প্রকৃত দাবীদার। নিয়ে চতুর্দিকে জল্পনাকল্পনার। দিল্লীর উর্ধ্বতন সরকারী মহল কলকাতার মুদি দোকানদাররা পর্যন্ত যে. বিদেশ থেকে ভারতীয় কদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা

ই সাময়িক বিলাপে এখন ভাটা

ন্তু আরেকটি সুখবর আছে ভারত-র জন্যে। একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক মার্কিন দেশে গিয়ে দুটি যন্ত্র র করেন। যার ফলে চিকিৎসা বহু নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে

তরুণ বৈজ্ঞানিকের নাম ডঃ তুষার-চৌধুরী। বয়স মাত্র একত্রিশ বছর। আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ-সুবিধা নেই বলে যে অভিযোগ আছে তিনি তা স্বীকার করেন না। আসলে যা নেই, তা হলো নতুন কিছু করার মনোভাব। যে উদ্দীপনা থাকলে মানুষ জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিকে অভিযান চালায়—সেই পরিবেশের অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সেই মানসিকতার জাগরণ দরকার। এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন সার্বিক সমর্থন, উৎসাহ ও অভিনন্দন জানাবার উপযুক্ত পরিমণ্ডল।

যুগান্তকারী আবিষ্কার

ডঃ চৌধুরী গবেষণা করে যে মাইক্রো-ইলেকট্রোড যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন, তার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে জীবকোষ থেকে লবণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থানান্তরী-করণ সম্ভব। এর ফলে জীবনের নিজস্ব মৌল এককের অন্তর্নিহিত কাঠামো সম্পর্কে একটি নতুন তত্ত্বের সূত্রপাত হলো। তিনি বিশ্বাস করেন, একটি এপিথেলিয়াল কোষের সিটোপ্লাজম অনেকটা জেল-পদ্ধতির মতো। যার বিশেষভাবে সংগঠিত কাঠামো লবণের স্থানান্তরীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ডঃ চৌধুরী সিদ্ধান্ত করেন, কেবল কোষ-পর্দা নয় বরং বিশেষ ধরনের এই কোষগুলির সেল-সিটোপ্লাজমও স্থানা-ন্তরিত ম্যাকানিজমের লাস হিসেবে বিবেচিত হওয়া সম্ভব। এর ফলে এতদিনের আনুমানিক থিয়োরীর ভিত্তিমূলে ভেঙে গেল। এতদিন সকলের ধারণা ছিল, এই কোষগুলি তরল ভর্তি গুটি বস্তার মতো—যার চতুর্দিকের আবদ্ধ পর্দা কেবল সার-বস্তুর স্থানান্তরীকরণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ডঃ চৌধুরী ব্যাখ্যা করে বলেন, সজীব কোষের মধ্য দিয়ে লবণ স্থানান্তরিত হয়। ইলেকট্রিক ভোল্টেজের সঞ্চয়নের সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত। "আমার চেষ্টা হলো, কিভাবে এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হয়—সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। আমি উপলব্ধি করি তার সবচাইতে ভালো প্রয়াস হলো বিভিন্ন স্থানে একেকটি কোষের মধ্যস্থিত বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের পরিধি বা শক্তি নির্ণয়।"

অনেকে এপর্যন্ত মাইক্রো-ইলেকট্রোড নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কারোর পক্ষেই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। ডঃ চৌধুরী বুঝেছিলেন এর জন্যে একটা অতি

সূক্ষ্ম মাইক্রো-ইলেকট্রোড বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। অনেক বছর গবেষণা করে তিনি তাঁর সাফল্য স্বরূপ তোলেন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে। এখন এই যন্ত্রটি 'চৌধুরী পিপেট পুলার' নামে পরিচিত। এর সাহায্যে একই সময়ে দুটি শীর্ষভাগসহ একটি মাইক্রো-ইলেকট্রোড গ্লাস তৈরী করা সম্ভব। এটি একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে একটা চুলের চেয়েও কয়েক সহস্র গুণ ছোট দেখায়।

ডঃ চৌধুরী বলেন, ধারালো এবং মেকানিক্যাল শক্তিতে সূচের মতো মাইক্রো-ইলেকট্রোড সবচেয়ে তীক্ষ্ম শীর্ষবিন্দু সৃষ্টি করতে পারে। কোষের মধ্যে ইলেকট্রিক ভোল্টেজের পরিধি নির্ণয়ের এটিই সবচাইতে সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম। একটি কোষের মধ্যে যতটুকু বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারণ সম্ভব—তা এর দ্বারা বোঝা যায়। তিনি এভাবে তার নতুন তত্ত্বকে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

বহু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে কোষের স্থানান্তরীকরণে পদ্ধতির অসঙ্গতির ফলেই রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ডঃ চৌধুরী তার নতুন পদ্ধতিতে রোগাক্রান্ত ও স্বাভাবিক কোষের মধ্যে যে বিদ্যুৎশক্তির তারতম্য ঘটে তার দ্বারা নতুন রোগ নির্ণয় করতে শুরু করেছেন।

ডঃ চৌধুরীর আবিষ্কৃত পিপেট পুলার যন্ত্রটির প্রস্তুতকারক কলকাতারই একটি ফার্ম—'ইণ্ডিয়ান সায়েণ্টিফিক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস'। একটি মার্কিনী ফার্ম এখন এটিকে আমেরিকায় বিক্রি করছেন।

স্বীকৃতি ও আমন্ত্রণ

এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে গত জুলাই মাসে (১৯৬৮) বিশুদ্ধ ও অ্যাপ্লায়েড বায়োফিজিকসের আন্তর্জাতিক সংঘ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান এই তত্ত্বের ওপর ভাষণ দেবার জন্য ইজরায়েলে। পরে তিনি ভারতবর্ষ, লেবানন, পশ্চিম জার্মানীতে একই বিষয়ের ওপর কয়েকটি সেমিনার পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় আবিষ্কার

ডঃ চৌধুরীর আরেকটি আবিষ্কারও অনুরূপভাবে যুগান্তকারী। বহুদিন গবেষণা করে তিনি তৈরী করেন একটি মাইক্রো-ইন্‌জেকটার। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে কোন তরল পদার্থকে (যেমন ঔষধ) এর সাহায্যে একটিমাত্র কোষের নির্দিষ্ট স্থানে ইন্‌জেকট করা সম্ভব। অবশ্য এটিকে স্বতন্ত্র আবিষ্কার না বলে পূর্ববর্তী আবিষ্কারের পরিপূরক বলা যায়। তিনি তার স্পেশাল মাইক্রো-ইলেকট্রোডকে এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করেন। ১৯৬৭ সালের মে মাসে মন্ট্রিলের আন্তর্জাতিক গ্লাস-মাইক্রো-ইলেকট্রোড সম্মেলনে ডঃ চৌধুরীকে তাঁর মাইক্রো-ইন্‌জেকশনের কৌশল সম্পর্কে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখন থেকে বহু লোক তাঁকে এ সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করছেন। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের গবেষণাগারে তিনি এখন গবেষণা করে যাচ্ছেন ক্যান্সার রোগের বিভিন্ন রকম স্থানীয় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। অনেকের ধারণা, মাইক্রো-ইন্‌জেকশনের আবিষ্কারের ফলে তাঁর গবেষণা অনেকটা সাফল্যের কাছাকাছি।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

ডঃ চৌধুরী বলেন, শিক্ষকতাই আমার বড় কৌতূহল। আমি গবেষণার সঙ্গে শিক্ষাদানকে যুক্ত করতে চাই। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাই করে থাকেন। সেখানকার মেডিকেল স্কুলের ফিজিওলজি কোর্সে তাঁর একশজনেরও বেশী ছাত্রছাত্রী আছে। তা ছাড়া তিনি গত বছর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রেণীতেও অধ্যাপনা করেছেন কিছুকাল। স্নাতক শ্রেণীতে বায়োফিজিকস্ গবেষণার ডিরেক্টার এবং ফ্যাকাল্টি উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে। অবসর সময়ে তিনি তাঁর গবেষণা সম্পর্কে পনেরটি প্রবন্ধ এবং দশটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার লিখেছেন প্রকাশের জন্য।

অবশ্য স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত তিনি কলকাতাতেই পড়াশোনা করেন। গণিত আর পদার্থবিদ্যা নিয়ে বি-এস-সি পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তখন থেকেই তাঁর মনে গবেষণামূলক শিক্ষাদানের প্রবণতা জাগে। কিছুকাল তিনি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষকতা, কলকাতার একটি ফার্মে ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং-এর তদারকী এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করেন। ১৯৫৯ সালে আমেরিকা যান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক সহকারীর কাজে যোগ দেন একই বছরে। সেখান থেকে তিনি নিওক্লিয়ার ফিজিকসে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। বাফেলোর নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট পান ১৯৬৪ সালে। তখন তিনি পশ্চিম নিউইয়র্কের ইউনাইটেড হেলথ ফাউণ্ডেশান থেকে 'ক্যারিয়ার ডেভেলাপমেণ্ট ফেলোশিপ্' ভোগ করেন। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন ১৯৬৬ সালে।

আশা আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা

তাঁর শিক্ষা, পেশা ও গবেষণার অতীত পর্যালোচনা করে কেউ কেউ বলেন, স্বাভাবিকভাবেই ডঃ চৌধুরী নিজের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি বলেন, "আমি ব্যবহারিক গবেষণায় যেতে চাই। দেখতে চাই আমার টেকনিকগুলো রোগ-নির্ণয়ে কিভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।" এবং ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমি আশা করি, ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল সায়েণ্টিস্টদের সঙ্গে একযোগে একটি প্রোগ্রামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।"

তিনি মনে করেন, "এই কাজে[...]
জন্য ভারতবর্ষে যথেষ্ট সুযো[...]
রয়েছে।" যাঁরা বলেন, এ প্রকার কা[...]
ভারতে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম [...]
তাঁদের সঙ্গে একমত নন। ব[...]
সঙ্গেই বলেন, "আমি আমার উ[...]
নিজের হাতে তৈরী করেছিলাম।"

আসলে এর জন্যে যা দরকার,
অফুরন্তের কৌতূহল, উৎসাহ[...]
এবং ধৈর্যগুণ। এ সবই তিনি[...]
পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে। [...]
"আমার বাবা হলেন আমার [...]
তিনি আমাদের সকলকে কৌ[...]
দিয়েছেন।"

সুখী পরিবার

তাঁর বাবার নাম তাপস [...]
দশটি সন্তানের জনক। সকল[...]
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিয়েছেন। [...]
তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে অ[...]
চৌধুরী হলেন বাবা-মায়ের [...]
ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদের না[...]
ইংরেজী কায়দায় উচ্চারণ ক[...]
করেছে। তবু সকলেরই রয়েছে [...]
করার জন্যে এক অদম্য কৌতূহ[...]
ভাই ডাঃ তুহিনকুমার চৌধুরী [...]
হয়েছেন। বয়স ছাব্বিশ বছর[...]
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিও নিওক্লিয়ার [...]
নিয়ে গবেষণা করছেন। এবং মান[...]
লোহিত কণিকার জীবন-ইতিহা[...]
পড়াশোনা করছেন ক্যালিফোর্নিয়া[...]
ল্যাবরেটরীতে গেস্ট-সায়েণ্টিস্ট [...]
ছোটভাই তপনকুমার চৌধুরীর [...]
বাইশ বছর। তিনিও একজন [...]
পিটার্সবার্গের সাউথসাইড [...]
কাজ করছেন। সর্বকনিষ্ঠ ভাই [...]
'কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের [...]
চৌধুরী বলেন, "আশা করি [...]
আমরা সব ভাই মিলে একসঙ্গে [...]
করবো।"

ডঃ চৌধুরীর দুটি বোন এ[...]
ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্‌টা[...]
জন্যে গবেষণা করছেন। এক[...]
হলো বিজ্ঞানের ইতিহাস, [...]
আমেরিকান ইতিহাস। দুজনেই [...]
তাঁদের স্বামীরাও একই বি[...]
ইলেকট্রিক্যাল ইনঞ্জিনিয়ারিং-এ [...]
পাবার জন্যে চেষ্টা করছেন। ড[...]
স্ত্রী মীরারাণী ও দুই ছেলে প্র[...]
বছর) এবং সুশান্ত (৪ বছর) [...]
চৌধুরী এখন ইংরেজী ও [...]
ছাত্রী। ছেলে দুটির প্রথমটি ক্ল[...]
দ্বিতীয়টি নার্সারী স্কুলে প[...]
চৌধুরীর বাসা হলো [...]
আর্লিংটনে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় [...]
থেকে নদী পেরিয়ে তাঁর বো[...]
রাত্রির খাবারের জন্যে সেখানে [...]
তাঁদের আলাপ-আলোচনায় স[...]
অনেক রাত পর্যন্ত মুখরিত হ[...]

ব্রাডম্যান—একটি অবিস্মরণীয় নাম

শঙ্করবিজয় মিত্র

ব্র্যাডম্যান।

সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিকেটের একটি ণীয় নাম। যে গৌরব, যে মহিমায় এই টি ক্রিকেট জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত তার র জুড়ি কোথাও নেই। ইংলন্ড ও ষ্ট্রেলিয়ায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ ফ্রিকায় কিংবা ভারতে ক্রিকেটের তিহাসে কত ব্যাটসম্যান জন্মেছেন যাদের লার জৌলুস বা নৈপুণ্য ক্রীড়ানুরাগী- র সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ই একটি নামের কাছে তাদের সকল তিই ম্লান হয়েছে। ইংলন্ডের হব্‌স, মন্ড, কম্পটন, উলি, দলীপ সিংহজী, নি, কাউড্রে, সেক্লটার, পিটার মে--অস্ট্রে- লিয়ার পন্সফোর্ড, ম্যাকেব, কিপ্যাক্স, মরিস, লার, হার্ভে, সিম্পসন—ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেল, উইক্‌স, সোবার্স, মার্স—ভারতের কে নাইডু, হাজারে, বিজয় মার্চেন্ট, লা অমরনাথ, মুস্তাক আলি বা পাতৌদি এমনি আরও কিছু খেলোয়াড় ক্রিকেটে কেটেছেন। কিন্তু ঐ নামের কাছে যা শে সকলেই যেন নিষ্প্রভ। এমন কি কেটের গভর্ণর সি জে ম্যাকার্টনি, র ট্রাম্পার, ব্রাড্‌সাল, বা রণজীও এই টি নামকে পথ ছেড়ে দিতে দ্বিধাবোধ ন নি।

অনন্যসাধারণ প্রতিভা, ক্রিকেটের প্রতি নামন অনুরাগ, খেলার সময় অসাধারণ গ্রতা ও বিপক্ষদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন তা তাঁকে ক্রিকেট জগতে এই অসাধারণ নটি এনে দিয়েছে। অতি দীর্ঘদিন কেটে তিনি ছিলেন না—১৯২৮ থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত কুড়িটি বছর প্রথম ণীর ক্রিকেটে তাঁর অবস্থিতি। এই ময় মধ্যে তাঁর দুর্দান্ত প্রতাপ সকলকে দেখ ও সন্ত্রস্ত করে তুলতো।

ডন ব্র্যাডম্যান এ বছরের আগস্ট মাসে বছর বয়স উত্তীর্ণ হয়েছেন। খেলা ক অবসর নিয়েও তিনি অস্ট্রেলিয়ায় টি দীপ্যমান পুরুষ। এডিলেড সহরে বিরাট ব্যবসা। কত বাবসা প্রতিষ্ঠানের তিনি পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য তার কোন ইয়ত্তা নেই। কথায়-বার্তায় সুরসিক, বক্তা হিসাবেও কম যান না। ক্রিকেট জগত থেকে যে সম্মান নিয়ে তিনি বেরিয়ে এসে- ছিলেন সেই সম্মান এখনও তাঁর জীবনকে ঘিরে রেখেছে।

ক্রিকেটে তাঁর আবির্ভাবও ঘটেছে সহজ স্বাচ্ছন্দগতিতে। ১৯২৮ সালে ইংলন্ড দল অস্ট্রেলিয়া পর্যটনে যায়। অস্ট্রেলিয়া দলে সেই প্রথম ব্র্যাডম্যান টেস্টম্যাচ খেলার সুযোগ পান। তার আগের বছর সবেমাত্র তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এসেছেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। ব্র্যাডম্যান প্রথম অবতরণে সুবিধে করতে পারেন নি। প্রথম টেস্টে তিনি ১৮ ও ৩১ রাণ করেন। ঐ টেস্টে ইংলন্ড রেকর্ড রাণে (৬০৭) জয়লাভ করে। ফলে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি দল থেকে বাদ পড়েন। দ্বিতীয় টেস্টেও ইংলন্ড ৮ উইকেটে জয়ী হয়। তৃতীয় টেস্টে ব্র্যাডম্যানকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং এই টেস্টে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ক্রিকেট দুনিয়ার হৃদয় জয় করেন। প্রথম ইনিংসে ৭৯ রাণে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরী করেন। ব্যাটিং'এর তালিকার ষষ্ঠ স্থানে এসে চারঘন্টা সাত মিনিটে তিনি ১১২ রাণ করেন। এরপর থেকে ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়া দলে বরাবর তৃতীয় স্থানে ব্যাট করতে নেমেছেন এবং ব্যাটিং'এ যে কীর্তি রেখে গেছেন তা সত্যই অতুলনীয়।

এর দুবছর পরে অস্ট্রেলিয়া দল ইংলন্ড সফরে যায়। এই সফরে ব্র্যাডম্যান ইংলন্ডের মাঠে প্রথম খেলতে নেমেই সমগ্র ব্রিটিশ জগতের হৃদয় জয় করেন। এই টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিং'এর গড়পড়তা ছিল ১৩৯·১৪। লীডস মাঠে তিনি টেস্ট ক্রিকেটের পূর্বেকার সমস্ত ব্যাটিং রেকর্ড ধূলিসাৎ করে ৩৩৪ রাণ করেন। তিনি যখন ব্যাট করতে নামেন তখন মাত্র দু'রাণে প্রথম উইকেট পড়ে গেছে, বোলারা খেলায় বেশ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মাঠে ব্যাট করতে নেমেই ব্র্যাডম্যান সেই প্রাধান্যে ফাটল ধরালেন এবং অমিতবিক্রমে ব্যাট চালিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই ১০৫ রাণ, চা-পানের পূর্বে ২০০ রাণ ও দিনের শেষে ৩০৯ রাণ করেন। ৩৩৪ রাণ করতে তিনি সময় নিয়েছিলেন ছ'ঘন্টা তেইশ মিনিট। ইংলন্ডের ক্রিকেট অনুরাগী ও সমালোচকরা সেদিন এই নবীন যুবকের অভ্যুদয়ে বন্দনাগান গেয়েছিলেন।

এর পরেই তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে মনোনীত হন। ১৯৩০-৩১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। এই টেস্ট সিরিজেও তিনি ও প্রবীণ ব্যাটসম্যান পন্সফোর্ড ব্যাটিং'এ অস্ট্রেলিয়া দলে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তৃতীয় টেস্টে তিনি ২২৩ রাণ করলেও চতুর্থ টেস্টে তাঁর ১৫২ রাণ অপূর্ব ব্যাটিং নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে যায়। এই টেস্টে মাত্র ৯৯ রাণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আউট হয়ে গেলেও সেই ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ উইকেটে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই দ্রুত হারে তিনি যেভাবে রাণ তোলেন তাতে সকলেই চমকৃত হন। ঐ ইনিংসে মাত্র ৪৫ মিনিটে তিনি অর্ধশত রাণ করেন।

পরের বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের নজীর গড়ে তোলেন। ঐ বছর তাঁর ব্যাটিং'এর গড়-পড়তা দাঁড়ায় ২০১-৫০ রাণ। চতুর্থ টেস্টে ছ'ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট ব্যাট করে তিনি ২৯৯ রাণে নট আউট থেকে যান— জুটি না থাকায় মাত্র এক রাণের জন্যে তাঁর তিনশত রাণ পূর্ণ হয়নি।

এমনিভাবে চব্বিশ বছর বয়সে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৩৪ সালে ইংলন্ড সফরে পন্সফোর্ডের সহযোগিতায় ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং'এ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে এই জুটি যে দুটি রেকর্ড করেন আজও তা অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলন্ডের টেস্টে নজীর হয়ে আছে—চতুর্থ উইকেট জুটিতে ৩৮৮ ও দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৪৫১ রাণ। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে মেলবোর্ণে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে তিনি

দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ অধিনায়ক অ্যালেনকে যেভাবে পরাজিত করেন তার নজীর অল্পই মেলে। বৃষ্টিভেজা মাঠে ইংলন্ড দলের ৯টি উইকেট মাত্র ৭৬ রাণে পড়ে গেলে অ্যালেন এই রাণেই প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া দলকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। ব্র্যাডম্যান তখন অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক। ব্রিটিশ সিংহের দিকে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্গারুর লেজ বাড়িয়ে দিলেন শেষের ব্যাটসম্যানকে সামনে এনে। দেখতে দেখতে ৯৭ রাণে পাঁচটা উইকেট পড়ে গেল। ষষ্ঠ উইকেটে জুটি বাঁধলেন ব্র্যাডম্যান ও ফিঙ্গলটন। এই জুটি ৩৪৬ রাণ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয়। ব্র্যাডম্যান এই উইকেটে ৭ ঘন্টা ৩৮ মিনিট খেলেছিলেন। ১৯৩৮ সালে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য. এই সিরিজের চতুর্থ টেস্টে লীডস মাঠে ব্র্যাডম্যান তাঁর জীবনের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলে দু'ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটে ১০৩ রাণ করেন। গোড়ালি মচকে যাওয়ায় ব্র্যাডম্যান পঞ্চম টেস্টে একেবারেই খেলতে পারেন নি। এই সুযোগে ইংলন্ড ৭ উইকেটে ৯০৩ রাণ করেন এবং হাটন ব্যক্তিগত ৩৬৪ রাণ করে ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়া সফররত ইংলন্ড দলের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যান প্রথম টেস্টে তৃতীয় উইকেটে হ্যাসেটের সঙ্গে জুটি বেধে রেকর্ড (২৭৬ রাণ) করেন। দ্বিতীয় টেস্টে বার্ণেসের সঙ্গে জুটি বেধে তিনি পঞ্চম উইকেটে ৪০৫ রাণের রেকর্ড করেন। ক্রিকেট জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি ১৯৪৭ সালে লালা অমরনাথের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলেন এবং এই সিরিজে তাঁর ব্যাটিং'এর গড়পড়তা দাঁড়ায় ১৭৮·৭৫ রাণ। এই সিরিজেই তিনি টেস্ট খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে তাঁর ২০১ রাণ জীবনের শেষ দ্বি-শতাধিক রাণ এবং তাঁর ৩৭তম ডবল সেঞ্চুরী।

দৃপ্ত ভঙ্গিমাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সাল। তখনও তিনি অমিতবিক্রমে ব্যাট চালনা করছেন। এই সময় তিনি অস্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়কতার ভার নিয়ে ইংলণ্ডে গেলেন। ঘোষণা হল এই সিরিজের পর ব্র্যাডম্যান ক্রিকেট জীবন থেকে সরে দাঁড়াবেন। লর্ডসে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম ও শেষ টেস্টের খেলা। ক্রীড়ারসিক ব্রিটিশ সমাজ ক্রিকেটের অনন্য-সাধারণ খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যানকে শেষবার দেখার জন্যে এবং তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে লর্ডস মাঠে ভিড় করেছে। তিনি মাঠে নামলে দর্শক ও খেলোয়াড়েরা তাঁকে বীরের অভ্যর্থনা জানালেন। ইস্পাতের মত দৃঢ়চেতা অধিনায়ক ব্র্যাড-ম্যান এই রাজকীয় অভিনন্দনে অভিভূত হয়েছিলেন সেদিন, একটু অভিভূত ও আত্মবিস্মৃতও। তাই অতি প্রয়োজনীয় ৪টি মাত্র রাণ সংগ্রহও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরিক হোলির দ্বিতীয় বলেই বোল্ড আউট হয়েছিলেন। ফলে সকলে টেস্টে শতরাণ বা সেঞ্চুরীর গড় আর উঠল না। কুড়ি বছরের ক্রিকেট জীবনের ৮০টি টেস্ট ইনিংসের প্রতিটি রাণের গড় দাঁড়াল ৯৯·৯৪ মাত্র।

ইংলণ্ডের সমালোচকরা সেদিন এক-বাক্যে তাঁর স্তুতি গান গেয়েছে—বলেছে ব্র্যাডম্যান অতুলনীয়। ক্রিকেটের যে-কোন যুগেই তিনি আসুন না কেন, ব্র্যাডম্যান আসতেন ব্র্যাডম্যান হয়েই। তাঁর প্রতিভা সর্বযুগেই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। কুড়ি বছরের টেস্ট ক্রিকেটে মাত্র একবারই তাঁর ব্যাটিং'এর গড়পড়তা ৭০এর নীচে ছিল। এমনি ছিল তাঁর রাণ তোলার দুর্বার শক্তি। এই শক্তির জন্য "রাণ তোলার মেসিন" নামে তিনি আখ্যাত হয়েছিলেন।

তাঁর সময়ের টেস্ট খেলাগুলিতে তিনি একাই সমগ্র অস্ট্রেলিয়া দলের মোট রাণের ২৬'০৩ শতাংশ রাণ সংগ্রহ করেছেন। এবং সমস্ত খেলায় সমগ্র দলের মোট রাণের ২৫·৪৭ শতাংশ তাঁর একলার অবদান। সমস্ত টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রাণের সংখ্যা ৬৯৯৬ এবং প্রতি খেলায় তাঁর গড়-পড়তা ৯৯·৯৪। সমস্ত খেলাতে তার মোট রাণ হচ্ছে ৫০,৭৩১ সর্বমোট ৬৬৯ ইনিংসে এবং প্রতি খেলায় তাঁর গড় দাঁড়ায় ৯০২৭ রাণ। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ব্র্যাডম্যান করেছেন ২৮০৬৭ রাণ ৩৩৮ ইনিংসের খেলায় এবং তাঁর প্রতি খেলার গড় হচ্ছে ৯৫·১৪ রাণ।

রাণের এই বিরাট সংখ্যা সত্যই বিস্ময়কর। আর তাঁর টেস্ট খেলায় ৮০টি ইনিংসের ৬৩টি ইনিংসই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। আর লক্ষ্যণীয় যে তিনি ইংলন্ড ব্যতিরেকে বাইরের অপর কোন দেশের মাটিতে টেস্ট ম্যাচ খেলতে যান নি। ভারতবর্ষ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ডেও তিনি খেলতে যান নি।

ব্র্যাডম্যান জীবনে মোট ২১১টি সেঞ্চুরী করেছেন। তার মধ্যে ৪১ ডবল সেঞ্চুরী, আটটি ট্রিপল সেঞ্চুরী এবং একটি চার শতাধিক রাণ। তিনিই একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান যিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী করেছেন।

শুধু রাণ বা রেকর্ড দিয়ে ব্র্যাড-ম্যানের প্রতিভার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। মাঠে নামলে ব্র্যাডম্যানের সমস্ত সত্তা ক্রিকেটময় হয়ে থাকতো. ধ্যান-জ্ঞান, কার্য-করণ ঐ একেতেই নিবদ্ধ। তখন তাঁর স্বতন্ত্রমূর্তি। বিপক্ষের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা প্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন। ব্যাটিং করতে গিয়ে একটা সেঞ্চুরীতে তার ক্ষুধা মিটত না, দুটো সেঞ্চুরী বা তিনটিতেও তিনি যেন অপরিতৃপ্ত। তাঁর ব্যাটে লেগে বলগুলো বাউন্ডারীর সীমানা না ছুলে তাঁর ভাল লাগতো না। মাঝে মাঝেও স্কোর বোর্ডটায় তাঁর নজর যেত এবং সেটা যত দ্রুত এগোয় তত্ই আনন্দ পান। বোলারদের প্রতিটি মারবার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে থাক[তেন]। ক্রিকেট খেলায় কোন মারই তাঁর অজ[ানা] অনায়ত্ত ছিল না এবং বোলারের বল [...] সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ন ও তাঁর দৃ[ষ্টি] সহজাত উপস্থিতবুদ্ধি তাঁকে নতুন [...] মারের পথ বাতলে দিত। উইকেটের [...] দিকে বল ছুটত গোলার মত, চারের [পর] চার, প্রয়োজন মত ছয়, আর বুদ্ধি[...] সুকৌশলী খুচরো রাণ নিতেও [...] সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি হয়তো [...] স্ট্রোক প্লেয়ার ছিলেন না। হ্যাম[...] বা ম্যাকর্টনির ঝিলিক দেখা যেত না [...] ব্যাটিং'এ, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে [...] রাণ নিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ [...] জন্মায় নি। যে দলে ব্র্যাডম্যান [...] সে দলের রাণ উঠবেই—এমনি [...] মানসিকতা বিপক্ষ দলে গড়ে উঠতো [...] উপস্থিতিতে এবং তিনি অবলীলাক্রমে [...] দুর্বলতার সুযোগ নিতেন।

দর্শকদের তিনি ছিলেন আ[...] উৎস। ব্র্যাডম্যান মাঠে নামলে দর্শ[...] স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ঝড়ে পড়ত [...] তিনিও দর্শকদের বঞ্চিত করতেন না। [...] নেমেই প্রথম বলে তিনি একটি [...] নিতেন। এটা যেন তাঁর কাছে [...] রীতিতে পরিণত হয়েছিল। একটি [...] নিয়ে সুরুতে যে পাড়ি জমাতেন [...] কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেউ জানত [...] দেখতে দেখতে রাণ উঠছে দশ, কুড়ি, [...] চল্লিশ, দর্শকরা উত্তেজিত হয়েছে, [...] চাই এবং সেঞ্চুরীও হল। দর্শকরা [...] হর্ষধ্বনি করল। খেলা দেখতে [...] উইকেটে টিকে থাকবার প্রাণান্তকর [...] দেখতে কার ভাল লাগে, আজকের [...] তাই এই অনাবিল আনন্দের খোরাক [...] বঞ্চিত। ব্র্যাডম্যান কখনও তাঁর দ[র্শকদের] বঞ্চিত করেন নি।

অধিনায়ক হিসেবে ব্র্যাডম্যান [...] অতি কঠোর শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। [...] যেমন খেলার সময় একাগ্রমনা [...] তিনি দলের সকলকেও সেইভাবে [...] প্রাণিত দেখতে চাইতেন। খেলার [...] খুটিনাটি তাঁর নখদর্পণে ছিল এবং [...] সাজানোর দিক থেকে তিনি ছিলে[ন] জরীপদার। যেভাবে যেখানে ফিল্ড স[াজালে] বিপক্ষ ব্যাটসম্যান সুবিধা করতে না [...] তিনি ঠিক সেইভাবেই ফিল্ড সাজ[াতেন] ফিল্ডসম্যান হিসাবেও তাঁর তুলনা [...] না। ক্ষিপ্রগতিতে বল ধরতে এবং [...] ভাবে উইকেট লক্ষ্য করে বল ছুড়তে [...] জুড়ি দেখা যেত না। বীরের মত [...] তিনি খেলা জিততে ভাল বাসতেন. [...] ঠাসা অবস্থাতেও তাঁর যুদ্ধং দেহি [...] ভাবের পরিবর্তন দেখা যায় নি।

আজকের দিনের ক্রিকেটে যে [...] বাচক মনোভাব দেখা গিয়েছে ব্র্যাড[ম্যানের] আদর্শ গ্রহণ করলে তার থেকে [...] মুক্তি পাওয়া যায়।

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ

ট ইন্ডিজ : ২৯৬ রান (জো গোমেজ ৮৩ এবং রোহন কানহাই ৯৪ রান। এ্যালান ডেভিডসন ৬০ রানে ৪ উইকেট)
৫৫ রান (ক্লাইভ লয়েড ১২৯ এবং জো কেমু নট আউট ৭১ রান। গিলমোর ১২২ রানে ৫ উইকেট)

লিয়া : ২৮৪ রান (ইয়ান চ্যাপেল ১৯৭ এবং বিল লরী ১০৫ রান। ল্যান্স গিবস ৮৮ রানে ৫ উইকেট)
৪০ রান (ইয়ান চ্যাপেল ৫০ এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী নট আউট ৩৮ রান। সোবার্স ৭৩ রানে ৬ এবং গিবস ৮২ রানে ৩ উইকেট)

ব্রিসবেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রে- য় প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করার র লাভ করেছে। নির্ধারিত ৫ দিনের টেস্ট খেলাটি ৪র্থ দিনের খেলা ভাঙ্গার রিত সময়ের ৬ মিনিট আগেই শেষ সুতরাং ৫ম দিনটা মাঠে মারা যায়। ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ২৯৬ উত্তরে অস্ট্রেলিয়া খেলার ২য় দিনে বে ব্যাট করেছিল (২৫৫ রান ৫ কেট), তাতে খেলার গতি অস্ট্রেলিয়ারই লে ছিল। এমনকি ৩য় দিনে অস্ট্রে- র প্রথম ইনিংসের বাকি ৫টা উইকেট ২৯ রানে পড়ে গেলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় ইনিংসের খেলার এক সময় তারা রয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল (৯৩ ৪ উইকেট)। তখন অস্ট্রেলিয়ার দলেই খেলাটা ঘুরেছিল। খেলার ৪র্থ সোবার্স এবং গিবসের মারাত্মক ংই অস্ট্রেলিয়ার মরণকাল হয়ে দাঁড়ায়। লিয়ার খেলোয়াড়দের থেকে ওয়েস্ট দলের খেলোয়াড়রা সহজ এবং সচ্ছল ত ব্যাট করে উন্নত ক্রীড়াচাতুর্যের দেন। তাছাড়া বোলিংয়ে ওয়েস্ট দলের খেলোয়াড়রাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তবে ওয়েস্ট জের পক্ষে সবই অতি সহজভাবে । অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিপক্ষে বেশ লড়তে হয়েছিল। ওয়েস্ট জের গিবসের মত বুদ্ধিমান স্পিন র বর্তমান পৃথিবীতে দ্বিতীয়জন গিবস ১ম ইনিংসে ৮৮ রানে ৫টা এবং য় ইনিংসে ৮২ রানে ৩টে উইকেট গিবস তাঁর বলের যাদুতে অস্ট্রেলিয়ার য়াড়দের এককথায় সম্মোহিত করে ছিলেন। তাঁর বলের ফ্লাইট ব্যাটসম্যান- বার বার বিভ্রান্ত করে—ব্যাট-বলে এক আগে ব্যাটসম্যানদের দুবার করে খেতে হয়েছে। আলোচ্য প্রথম টেস্টে করার গৌরব লাভ করেছেন তিনজন াড়—অস্ট্রেলিয়ার চ্যাপেল (১৯৭ রান) লরী (১০৫ রান) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ব্রিসবেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বোলার গ্লিসন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যান ডেভিড হলফোর্ডের বিপক্ষে এল-বি ডবলউ-এর আবেদন করে অকৃতকার্য হয়েছেন।

দলের লয়েড (১২৯ রান)। শেষে তারিফ করবো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক সোবার্সের বোলিং কেরামতির। অসুস্থ অবস্থায় বল করে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে সোবার্স ৭৩ রান দিয়ে ৬টা উইকেট পান, যা নিজ দলের জয়লাভের পথ অনেক প্রশস্ত করে দেয়।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্লাইভ লয়েড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

তাদের প্রথম ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রচুর রান করার পক্ষে আদর্শ উইকেট এবং তীরগতিতে বল ছুটে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে বন্দী করে রাখে। ২য় উইকেটের জুটিতে কেম্‌মু এবং কানহাই দলের ১৬৫ রান তুলে এই জুটির নতুন রেকর্ড করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ২য় উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ছিল ১৬৩ রানের (হান্ট এবং কানহাই, এডিলেড, ১৯৬০-৬১)। কেম্‌মুর ৮৩ রানে ১২টা এবং কানহাইয়ের ৯৪ রানে ১৫টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী ছিল। চা-পানের পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলায় দারুণ ভাঙ্গন ধরে—২ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৮০ রানের বিনিময়ে তাদের ৮টা উইকেট পড়ে যায়। কনোলীর বোলিংয়ে তাদের ৪টে উইকেট পড়ে ৪১ রানে।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৯৬ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের দান হাতে পায়। দলের কোন রান হওয়ার আগেই প্রথম উইকেট পড়ে যায়। অধিনায়ক বিল লরী (১০৫ রান) এবং ইয়ান চ্যাপেল (১৯৭) ২য় উইকেটের জুটিতে ২১৭ রান তুলে খেলার ভিত বেশ শক্ত করেন। কিন্তু চা-পানের পর ২য় উইকেট জুটির বিদায়ের পরই ভাঙ্গন শুরু হয়। যেখানে খেলার এক সময় ১ উইকেট পড়ে দলের ২১৭ রান ছিল সেখানে ২৫৫ রান দাঁড়াল ৫ উইকেট পড়ে। এই ২৫৫ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। এই অবস্থায়

জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় (১৯৬৮) ডাঃ বি সি রায় ট্রফি বিজয়ী পশ্চিম বাংলা দল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ২৯৬ রানের থেকে অস্ট্রেলিয়া ৪১ রানের পিছনে ছিল। হাতে অবশ্যি ৫টা উইকেট জমা ছিল। দ্বিতীয় দিনে চ্যাপেলের আক্রমণাত্মক খেলা দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। তিনি ৪ ঘণ্টার খেলায় তাঁর ১১৭ রানে ১৭টা বাউণ্ডারী করেন।

তৃতীয় দিনে ২৮৪ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। অর্থাৎ এইদিন তারা তাদের বাকি ৫টা উইকেটে মাত্র ২৯ রান সংগ্রহ করেছিল। অফস্পিনার গিবস (৮৮ রানে ৫) এবং লেগ স্পিনার হলফোর্ড (৮৮ রানে ২) অস্ট্রেলিয়ার এই পতনের প্রধান কারণ হয়েছিলেন। এ'রা দুজনে অস্ট্রেলিয়ার বাকি পাঁচটা উইকেট ৫৪ মিনিটে ফেলে দেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং খেলার বাকি সময়ে ৭টা উইকেট খুইয়ে ২৯৮ রান সংগ্রহ করে। ক্লাইভ লয়েড উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১২৯ রান করেন। লয়েডের ব্যক্তিগত ১২৯ রানে ছিল ১৮টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভারবাউণ্ডারী। ৭ম উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং কেরু ১২০ রান তোলেন।

চতুর্থ দিনে ৩৫৩ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ২য় ইনিংস শেষ হয়। এইদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের বাকি ৩ উইকেটে ৫৫ রান যোগ করে।

অস্ট্রেলিয়া ৩৬৫ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। জয়লাভের জন্যে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তাদের ৩৬৬ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের জয়লাভের সমস্ত আশা নির্মূল করে দেন অধিনায়ক সোবার্স এবং গিবস। চতুর্থদিনেই খেলা ভাঙার নির্ধারিত সময়ের ৬ মিনিট আগে ২৪০ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৫ রানে জয়ী হয়। সাবাস সোবার্স! ডানকাঁধের কঠিন ব্যথা অগ্রাহ্য করে তিনি এমন বল করেন যে, তারই ভেল্কিতে অস্ট্রেলিয়ার ৬ জন আউট হয়ে যান। গিবস পান ৩টে উইকেট।

ব্রিসবেনের আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলাটি ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া দলের ২৬তম টেস্ট ম্যাচ। এই ২৬টি টেস্ট খেলার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৪, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৬, খেলা ড্র ৫ এবং 'টাই' ১ (ব্রিসবেন, ১৯৬০-৬১)। বর্তমান ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ৫টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৪টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ১টি (১৯৬৫ সালে)।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

কালজেরাতে আয়োজিত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল বনাম অস্ট্রেলিয়ান স্কুল ক্রিকেট দলের প্রথম জুনিয়র টেস্ট খেলা ড্র গেছে।

প্রথমদিনের খেলায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংস ১৭৪ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়ান স্কুল ক্রিকেট দল ৩ উইকেট খুইয়ে ১৩৮ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে প্রথম ইনিংসের রানের মাথায় (৩ উইকেটে) অ স্কুল দল তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় স্কু দলও ২১৭ রানের (৬ উইকেটে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি করে। রাজা মুখার্জি ১৫৬ মিনিটে তাঁর ৫৩ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ান ৯০ মিনিটের খেলা হাতে নিয়ে ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ১ তুলেছিল। জয়লাভের জন্যে তাদে রানের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় মহীন্দর অমরনাথ ৩৫ রানে ৫টি পেয়েছিলেন।

ডাঃ বি সি রায় ট্রফি

জব্বলপুরের কর্পোরেশন সপ্তম জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল যোগিতার ফাইনালে পশ্চিম বাংলা গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত উপর্যুপরি দুবার ডাঃ বিধানচন্দ্র জয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলায় বাংলা ২—১ গোলে এগিয়ে ছিল সাইড রাইট সেনগুপ্ত প্রথমার্ধে প্রথম মিনিটেই দলের প্রথম গোল অন্ধ্রপ্রদেশের রসিদ ২২ মিনিটের গোলটি শোধ দেন। ইনসাইড-লেফ ভৌমিক দলের দ্বিতীয় গোলটি দি ২—১ গোলে এগিয়ে দেন। দ্বি খেলায় পশ্চিমবাংলার পক্ষে গো আউট-সাইড-লেফট পি ঘোস এব ফরওয়ার্ড সুকল্যাণ ঘোষ দক্ষিণদার

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এই দেখুন এরা। যাকে বলে আবালবৃদ্ধ বনিতা।
আমার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখেরাও বেশী।
রান্নায় আমার যে এত হাতযশ—
এই দেখুন তার চাবিকাঠিটা আমার হাতে।
সানরাইজ
গুঁড়ো মশলা। স্বাদে-গন্ধে এর জুড়ি নেই।
খাঁটি নির্ভেজাল জিনিষ। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী।
প্রকাশ ব্রাদার্স
গুঁড়ো মশলার
আদি প্রতিষ্ঠান।
৭৪/এ, নলিনী শেঠ রোড,
কলিকাতা-৭
PURE POWDER SPICES

৩য় খণ্ড

৮ম বর্ষ

৩৩শ সংখ্যা

মূল্য

৮০ পয়সা

Friday, 27th December, 1968 শুক্রবার, ১২ই পৌষ, ১৩৭৫ 80 Paise

সূচীপত্র

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা : ১৩৭৫

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

মা-লক্ষ্মীরা শুনুন!
সংসার-খরচায় কি
কুলিয়ে উঠতে
পারছেন না? তাহলে
এক কাজ করুন...
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কে
একটা সেভিংস্ অ্যাকাউণ্ট খুলুন
তাতেই বাঁচোয়া।
BILL
কথায় বলে,
হিসেবের কড়ি
বাঘে খায় না।
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ মারফৎ আপনি
আপনার খরচ খরচার হদিশ পাবেন।
কবে কত জমা হল, কবে কত তোলা হল
—আপনার পাশ বই'এ নিয়মিত
সব হিসেব পাবেন।
বাড়ি ভাড়া, ইন্সিওরেন্সের কিস্তি ইত্যাদি পাওনা
স্বচ্ছন্দে চুকিয়ে দিতে পারবেন।
দিব্যি হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায় ব'লে মেয়েরা
আজকাল দলে দলে ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে
এসে সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলছে।
এ সপ্তাহে আপনিও আসুন। এসে দেখা করুন।
মাত্র ৫ টাকা দিয়েই অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারেন।
ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(যুক্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ। সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ!)
দূরে থেকে ঠাঁই, সকলেরই ঠাঁই
'দুশ্চিন্তা কম ক'রে সঞ্চয় চালু করার উপায়'—
এই বিনামূল্যের পুস্তিকাটি যাঁরা চান,
তাঁরা স্থানীয় ন্যাশনাল অ্যাণ্ড
গ্রিণ্ডলেজে চিঠি লিখুন।
BILL
BILL
BILL
BILL
BILL
NGB-19A/68 BEN

সূচীপত্র

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা : ১৩৭৫

বড়দিন ও বিনোদন

খৃস্টের আবির্ভাব-দিবসকে কেন্দ্র করে যে-উৎসব এক সময়ে ছিল শুধুমাত্র খৃস্টানুরাগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আজ দেশে দেশে সেই উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রায় ঘরে ঘরে। ভারতবর্ষে তো বিজয়ীর দম্ভ নিয়ে এক সময়ে ইংরেজ শাসকরা খৃস্টধর্মের উৎসব পালনের আয়োজন করতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে খৃস্টের প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর আবির্ভাব-দিবসের উৎসব পালন বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁদের জন্য নয়, মানব-প্রেম ও মানব-ত্রাণের যে-মহৎ বাণী এই মহাপুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তার আকর্ষণে।

মানুষের মুক্তির জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। ক্ষমা ও প্রেমই ছিল তাঁর জীবনের শিক্ষা। দু'হাজার বছর প্রায় পূর্ণ হতে চলল—যীশুর সেই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু মানুষ তাঁকে আকাশের ধ্রুবতারাই করে রেখেছে। এখনও মাটির পৃথিবীতে তাঁর প্রেম, ক্ষমা ও শান্তির বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। বড়দিনের উৎসবে তাঁর সেই বাণী আমাদের মনে নিত্য উচ্চারিত হক।

বৎসরের এই সময়টা আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীতের আমেজ লাগে। কলকাতায় এবং বাংলাদেশে শীতের সময়ে মানুষের আনন্দ উপভোগ ও চিত্তবিনোদনের হয়ে থাকে নানা আয়োজন। এই কারণেই আমরা বর্তমান সংখ্যাটিকে ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ইংরেজরা যখন বড়দিনের উৎসব করতেন এই দেশে তখনও তাঁদের একটা লক্ষ্য থাকত ছুটির দিনে আনন্দ করা। এবং যেহেতু তাঁদের হাতে ছিল ক্ষমতা তখন বেশ জাঁকিয়েই আনন্দ করা হত। এখনকার উৎসব তার চেয়ে স্বতন্ত্র। এখন শুধুমাত্র খৃস্টানপল্লীতে বা চৌরঙ্গীপাড়াতেই উৎসবের আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে না। বাঙালী-অবাঙালী সব পাড়াতেই বড়দিনের ছুটির আনন্দের ঢেউ এসে লাগে। কলকাতার চিড়িয়াখানা তো এখন জমজমাট। উপভোগ্য ঠান্ডায়, মিঠে রোদে চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ার দেখতে শিশুরা যাবে এবং অবধারিতভাবে তাদের সঙ্গে যাবেন বড়রা। সার্কাসের তাঁবুও পড়ে এ-সময় কলকাতায় অথবা গঙ্গার ওপারে হাওড়ায়। হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে বসে সার্কাস দেখবে, তারিফ করবে ক্রীড়াকুশলীদের দুঃসাহসিক নৈপুণ্য। চিত্তবিনোদনের এমন সুন্দর ব্যবস্থা সত্যিই অতুলনীয়।

বড়দিনের অন্য আকর্ষণ খেলাধুলো। শীতে ফুটবল খেলা জমে না। যদিও ফুটবল এদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু খেলার রাজা ক্রিকেট তো আছে। এবারে কোনও বিদেশী টিম আসছে না কলকাতায়, টেস্ট খেলা দেখার সৌভাগ্য হবে না ক্রিকেট-রসিকদের। কিন্তু তাতে কি! পাড়ায় পাড়ায়, পার্কে, মাঠে, ময়দানে ক্রিকেটের ছড়াছড়ি। আমাদের ছোটরা গলিতে টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলা প্রথম শেখে। কিন্তু দুনিয়ার ক্রিকেট-রেকর্ড তাদের মুখস্থ। তাদের জন্য আমরা ভালো মাঠ বা ভালোভাবে খেলার সুযোগ করে দিতে পারি না। তাই সুযোগের অভাবে অনেক 'ব্রাডম্যান' হয়তো অঙ্কুরেই ঝরে পড়ে কলকাতার গলিতে। তাহলেও শীতের দিনে ক্রিকেট খেলা আনন্দের ও উৎসবের সঙ্গী হিসেবে যেন অপরিহার্য। এই সময়ে আরও অনেক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন হয়। সঙ্গীত-সম্মেলন ও চিত্র-প্রদর্শনী হল তাদের মধ্যে অন্যতম। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসগ্রাহী শ্রোতা হিসেবে বাঙালীর নাম আছে। এই সময়ে দেখা যাবে কলকাতায় এবং অন্যত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে রাতের পর রাত জেগে শ্রোতারা নিবিষ্ট মনে সঙ্গীত-সুধারস-সাগরে ডুব দিয়েছেন। এক অলৌকিক আনন্দের সন্ধান পান তাঁরা। যাঁরা শিল্পরসিক, তাঁদের জন্য চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজনও এই সময়েই হয় বেশি। শিল্পীরা চান স্বীকৃতি, চান তাঁদের শিল্পকর্ম দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিতে। সেই আনন্দের অংশগ্রহণের মতো রসিকজনের অভাব হয় না।

উৎসবের মূলকথাই হচ্ছে সকলকে নিয়ে আনন্দ করা। আধুনিক জীবনযাত্রায় মানুষ একদিকে যেমন সামগ্রিকতার টানে বিব্রত, অন্যদিকে তেমনি সে নিঃসঙ্গ। উৎসবই তাকে নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা এবং আত্মমুখীনতা থেকে দেয় মুক্তি। তাকে ঘরের কোণ থেকে নিয়ে আসে বাইরের প্রাঙ্গণে যেখানে আলোক, যেখানে উজ্জ্বলতা, যেখানে সকলের অবাধ নিমন্ত্রণ।

আজকের দিনে এই ধরনের সর্বজনীন মিলন ও আনন্দ উৎসবের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবনের যে সুন্দর দিক আছে, যা লাবণ্য ও মাধুর্যে স্নিগ্ধশ্রী, তারই সাক্ষাৎ মেলে উৎসবে, সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, ক্রীড়াঙ্গনে কিংবা অনুরূপ কোনো অনুষ্ঠানে। সেই সুন্দরই সত্য হক আমাদের জীবনে। আনন্দের পদসঞ্চারে আমাদের প্রাত্যহিক সমস্যার বিবর্ণ ও ধূসর জীবনাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠুক, এই আশা নিয়ে আমরা পাঠকদের কাছে উপহার দিচ্ছি এই ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যাটি যার মধ্যে আনন্দের বার্তা প্রতিফলনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি।
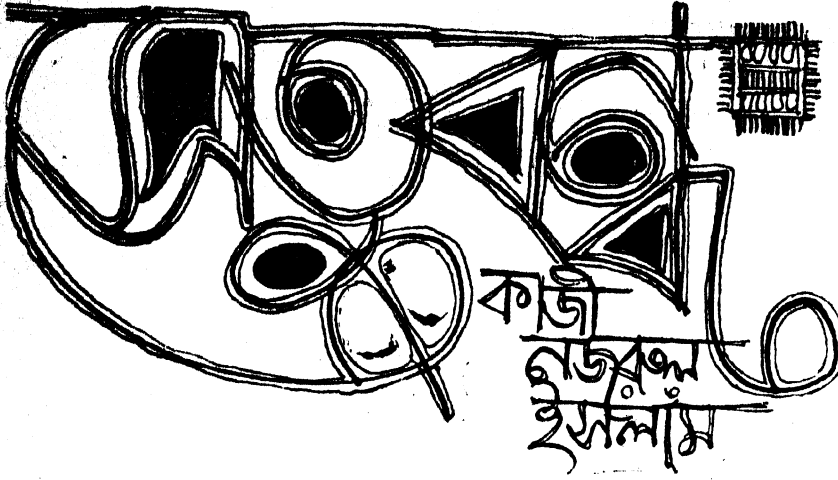
— কুশীলবগণ —

ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা, যন্ত্র, যন্ত্রী, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা, সেতু, মেঘ, বৃষ্টিধারা, তরঙ্গ, পদ্মা, জলদেবী, মীনকুমারী, ঝড়, বজ্রশিখা, বন্যা......

প্রথম অঙ্ক । প্রথম দৃশ্য

— মেঘলোক —

[মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে 'মেঘ'-এর প্রবেশ। 'মেঘ'-এর নীলাঞ্জন অনুলিপ্ত অঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খল ঝামর চুল স্কন্ধদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। চূড়ায় রক্তিম শিখীপাখা ফিকে-নীল ফিতা দিয়া বাঁধা। ললাটে বহ্নিশিখা রং-এর প্রদীপ রক্তচন্দন—যেন বজ্রাগ্নি। স্নিগ্ধ নয়নে ঘন কাজল ঝলমল করিতেছে—যেন এখনি জল ঝরিয়া পড়িবে। গলায় হলুদ-রাঙা রাখী দিয়া বাঁধা গম্ভীর নিনাদী মৃদঙ্গ। পরনে পেনসিল দিয়া ঘষা-শ্লেট রং-এর ধড়া ও ঢিলা নিমাস্তিন। দুই হাতের মণি-বন্ধে কাঁচা সোনার বলয়-কঙ্কণ। মৃদঙ্গে আঘাত হানার বিরতিতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সুবর্ণ কঙ্কণ-বলয় বিজুড়ির ঝিলিক হানিতেছে। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া সাত-রঙা বিরাট জলধনু।

অন্তরীক্ষ হইতে স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠের একতান-সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে—সেই গানের তালে তালে 'মেঘ'-এর মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য।]

—গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।।
সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব-বাণী
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু।।
ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে শশী-চমকে গো বিজলি ওঠে ঝলি।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা
মুরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু।।

[গান করিতে করিতে একদল নৃত্যপরা কিশোরীর বেশে 'বৃষ্টিধারা'র প্রবেশ। তাদের পরনে মেঘ-রং'এর কাঁচুলি, ধানী রং ঘাগরী—পাড় জরীর। নীল জমিনে সাদা ডোরা-কাটা কাপড়ের হাল্কা উত্তরীয়। পায়ে ছড়া নূপুর, কারুর পায়ে পাঁয়জোর গুজ্‌রি। সবুজ আলতা-ছোপানো পদতল। হাত-ভরা সোনালী রঙ রেশমী চুড়ি, কঙ্কণ, কেয়ূর। শ্রোণীতে ফোটা কদমের ঢিলে চন্দ্রহার। বুকে যূঁই চামেলীর গোড়ে মালা। আঁখিপাতার কূলে কূলে চিকন কাজল-লেখা। কপোল কেতকীপরান-পান্ডুর। জোড়া ভুরু লুলিত অলকে হারাইয়া গিয়াছে। ভুরু-সন্ধিতে কাঁচপোকার টিপ। কর্ণমূলে শিরীষ-কুসুম। কারুর কটিতটে ছোট গাগরী, কারুর হাতে ফুল-ঝারি। কেহ বিলম্বিত বেণী, কেহ আলুলায়িত কুন্তলা। বিলম্বিত বেণী কিশোরীরা আনমনে স্খলিত মন্থর গতিতে পদচারণা করিয়া ফিরিতেছে, মুক্ত-কুন্তলা-বালিকারা নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে, জড়াজড়ি করিয়া—ঘুরিয়া ফিরিয়া। এক কোণে একটি বালিকা একরাশ কেয়াফুল বুকে জড়াইয়া পা ছড়াইয়া উদাস চোখে চাহিয়া আছে। 'বৃষ্টিধারা'র নৃত্য-গানের ছন্দে ছন্দে অন্তরীক্ষ হইতে রাশি রাশি যূঁই, চামেলী, বেলি, বকুল, দোপাটি, টগর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঐ গানের তালে তালে 'মেঘ'এর মৃদঙ্গবাদন ও নৃত্য।]

— বৃষ্টিধারার গান —

অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্ বাজে।
রুমু রুমু ঝুমু মঞ্জুরীর-মালা চরণে আজ উতলা যে।
এলোচুলে দুলে দুলে বন-পথে চল আলি
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন্-মরালী,
উগারি গাগরি ঝারি
দে লো দে করুণা ভারি,
ঘুঙট উতারি বারি
ছিটা লো গুমোট সাঁঝে।।

তালীবন হানে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।
মুকুলে ঝরিয়া পড়ি' আকূতি জানায় যূথী
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তূতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি
চল লো চল সেহেলী
নিয়ে মেঘ-নটরাজে।।

[বৃষ্টিধারার বালিকাদের নাম — রেবা, চিত্রা কঙ্কা, চূর্ণা, মঞ্জু, নীরা, বিন্দু, নীনা, কৃষ্ণা, চম্পা, অশ্রু, মন্দা]

মেঘ। ওগো নৃত্যপরা নূপুরিকার দল! তৃষ্ণাতুরা ধরার আবেদন কি এতদিনে পৌঁছল তোমাদের দরবারে? চাতকীর চঞ্চু যে বিশুষ্ক হয়ে উঠল তোমাদের করুণা যেচে যেচে!

মন্দা। (সেই আনমনা বালিকাটি, যে একরাশ কেয়া বুকে করে বসে ছিল)
সত্যি বলেছ রাজা, দিদিদের আর নূপুর পরাই হয় না। কাজল ঘষে ঘষে চোখে জল ভরে এল, তবু কাজল পরাই আর শেষ হয় না। আমি তো কোন্ সকালে উঠে কেতকী-বিতানে এসে পথ চেয়ে বসে আছি। (বেণী জড়াইতে জড়াইতে) বেণীটাও জড়াবার ফুরসৎ পাই নি।

রেবা। তোর বাপু সব-তাতেই অতিরিক্ত তাড়া-হুড়ো। আমরা বলি, নটরাজের মাদলই আগে বেজে উঠুক, ঝলুকই আগে বিজলীর ইঙ্গিত। —তা না—মেঘ না চাইতেই জল! ভোর না হতেই বেরিয়েছেন পাড়া বেড়াতে! একবার তমালতলায়, একবার কদমশাখায়, একবার পাহাড়তলীর শাল-বীথিকায়, একবার কেয়াবনের নাগ-পল্লীতে—

মন্দা। আর তোমরাই বা কিসে কম রেবাদি? ঘুমুর বাঁধছ ত বাঁধছই। ঝিল্লি বেচারী সন্ধ্যে থেকে সুর দিয়ে হয়রাণ। কেশ এলো করছ ত করছই! কত যে বিজুলি-ফিতে ছিঁড়ল—কত যে লোধ্র ফুলের প্রাণ গেল গাল রাঙাবার রেণু জোগাতে!

বিন্দু। তুই থাম মন্দা। —আচ্ছা রাজা, আজ যে অসময়ে তোমার মৃদঙ্গে তালি পড়ল! আমরা সব কেউ সাগর-দোলায়, কেউ শৈলশিরে ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ জেগে দেখি কিরণমালা পূবে হাওয়ায় পাল্কি নিয়ে হাজির, হাতে তার নীপ-শাখা।

মেঘ। তোমাদের অভিযানে বেরুতে হবে, বিন্দু!

বৃষ্টিধারা সকলে—অভিযানে বেরুতে হবে? আবার কার বিরুদ্ধে অভিযান রাজা? এবার কোন দৈত্যপুরী ভাঙবে?

মেঘ। গন্ধর্বলোকের পদ্মাদেবী আমাদের স্মরণ করেছেন। তাঁর বুকের ওপরে বাঁধ বাঁধবার জন্য নাকি দুর্দান্ত যন্ত্রপাতির ষড়যন্ত্র চলেছে। পদ্মা এ অপমান সইবেন না। তিনি আমাদের সাহায্য চান।

চিত্রা। ওমা, কি হবে? যন্ত্রপাতির স্পর্ধা ত কম নয়! তার রাজ্য পশ্চিম হতে ক্রমেই পূর্বে প্রসারিত হয়ে চলেছে উন্মত্ত বুভুক্ষায়—তা দেখছি; তাই বলে সে ঔদ্ধত্য যে পদ্মাকেও লাঞ্ছনা হানতে এগুবে—এ বার্তা শুধু নতুন নয় রাজা—অদ্ভুত!

কঙ্কা। এই অতিদর্পীকে একটা অতি বড় শাস্তি না দিলে আর চলে না, রাজা!

চূর্ণা। —তোমার ব্রহ্মাস্ত্র নিশিত বজ্র, তোমার সেনাপতি পবন, তার মারণ-সেনা বন্যা, তুফান ঝঞ্চা—সব প্রস্তুত রাজা?

মঞ্জু। হ্যাঁ, সব প্রস্তুত বই কি! ওলো চূর্ণী, রাজার কঠিন বজ্র যে এখন শ্রীমতী বিদ্যুল্লতার গলায় কোমল হার হয়ে ঝলমল করছে! বলি রাজা, তোমার হাতের বজ্র ভেঙে কি শেষে প্রিয়ার গলার হার গড়ালে? হা কপাল! যেমন রাজা তেমনি সেনাপতি! সেনাপতি পবনদেব ওদিকে ফুল-কুমারীর মহলে মহলে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছেন! —মালতীর কানে ফুঁ, মল্লিকার গালে সুড়সুড়ি, কামিনীর চোখের পাতায় চুমকুড়ি, কমলের খোঁপা ধরে টান—এইত বীরবরের কীর্তি। উপযুক্ত রাজার উপযুক্ত সেনাপতি!

মেঘ। (হাসিয়া) সত্যিই আমার সেনাপতির ধনুর্বাণ কামদেব চুরি করেছেন। মঞ্জু! আর আমার বজ্রাগ্নি লুকিয়েছে (মঞ্জুর কপোলে মৃদু করাঘাত হানিয়া) তোমাদের ঐ কালো আঁখিকোণে!

নীরা। বেশ ত রাজা, তাহলে এই অভিযানে আর তোমার হিমালয় ছেড়ে যাবার দরকার কি? শুধু আমরাই যাই না কেন, দেখি এ আঁখির আগুনে যন্ত্ররাজ দগ্ধ হয় কি না!

মেঘ। অমন কাজ কোরো না নীরা, কোরো না! ও হতভাগা যত পুড়বে তত খাঁটি হবে, তত ওর শক্তি বাড়বে। তোমাদের আঁখির আগুনে—ওর কঠিন হিয়া গলবে না, নীরা। কত অশ্রুই না ঝরছে নিরন্তর আকাশ গ'লে ওর প্রতপ্ত ললাটে। তবু ঐ অশান্ত দৈত্য-শিশু শান্ত হল না। পুড়িয়ে ওর কিছু করতে পারবে না, আগুনই ওর প্রাণ। ওকে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নীপা। তোমায় যদি পথে পথে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি রাজা, ঐ দৈত্যটাকে আর পারব না?

কৃষ্ণা। ওরে নীপা, আমাদের রাজা হল দেবতা—ওপরের মানুষ। তাই ওকে পলকা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ানো দুরূহ নয়, কিন্তু ওটা যে হল দৈত্য, তাই ত ও এত ভার! ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়েই ত ও অমন করে চোখ কান বুঁজে মাটি কামড়ে পড়ে আছে! তাইত ও স্থাণু। ওকে ভাসানো অত সহজ হবে না।

অশ্রু। ঠিক বলেছিস কৃষ্ণা! ফুল সুন্দর বলেই একটু ছোঁওয়ায় ঝরে পড়ে যায়, একটু ফুঁয়ে উড়ে যায়। আর, ঐ দৈত্যটা কুৎসিত, তাই ও হয়ে উঠল বোঝা, ওর আসন হল অটল। ওর পায়ে মাথা খুঁড়লে শুধু ললাটই হবে ক্ষত, আসন একবিন্দু টলবে না!

মেঘ। দেব-দানবের এ যুদ্ধ চিরন্তন অশ্রু! ঐ মায়াবী দৈত্যটা হাজার রূপ ধরে হাজার বার আমাদের স্বর্গ আক্রমণ করেছে, প্রতিবারেই ওদের আক্রমণ আমরা প্রতিহত করেছি। আমাদের একমাত্র ভয়, ওরা ঘোর মায়াবী। কোন ছিদ্র দিয়ে সে স্বর্গপুরী প্রবেশ করবে—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের রূপোর কাঠির ছোঁওয়ায় কত রূপের পুরী পাষাণপুরী হয়ে উঠল। ও কাঠি যাকেই ছোঁবে, সে-ই হয়ে যাবে জড়। ও রূপোর কাঠি যাদু জানে। ওরা যদি তাই দিয়ে একবার

এ স্বর্গ ছুঁতে পারে, তাহলে এর সমস্ত আনন্দ একমুহূর্তে পাষাণ হয়ে যাবে, এর পারিজাতমালা শুকিয়ে যাবে।

অপ্সু। তাহলে কি উপায় হবে রাজা! ও যদি আমাদের আনন্দপুরী ছুঁয়ে দেয়? তুমি খুব বিপুল করে প্রাচীর গাঁথ না কেন আমাদের স্বর্গ ঘিরে!

মেঘ। ওরে বাস্ রে! তা হলে কি আর রক্ষা আছে? ওরা ত তাই চায়। তারই জন্যে ত ওরা আমাদের নিরন্তর রাগিয়ে তুলছে। প্রাচীর তুললেই ত ওদের তাণ্ডবার পশুত্বটাকে প্রচণ্ড করে তোলা হবে। আমরা একটা কিছু আড়াল তুললেই ওরা সেইটে অবলম্বন করে উঠে আসবে স্বর্গে। অবলম্বন পাচ্ছে না বলেই ত ওরা মাঝপথ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে, এ স্বর্গলোকের সীমা খুঁজে পাচ্ছে না।

চম্পা। কিন্তু রাজা, গন্ধর্বলোক ত প্রাচীর তুলেই ওদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাচ্ছে।

মেঘ। মূর্খ ওরা, তাই ওদের আজ কি দুর্দশা হয়েছে দেখ। যন্ত্ররাজের যে পথ কিছুতেই মাটি ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল না, দেয়াল তুলে গন্ধর্বলোক সেই পথকে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। ঐ দেয়াল ধরেই ওরা ওদের ওপর এসে পড়েছে দলে দলে।

মন্দা। রাজা, এইবার যদি ওরা স্বর্গে এসে পড়ে?

মেঘ। ভয় নেই মন্দা। আমাদের এই অলখ-পুরীর দশ দিক মুক্ত। তাই ত ওরা দিশাহারা হয়ে পড়েছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বন্ধদ্বার-দুর্গেই পড়ে শত্রুর পরিপূর্ণ আক্রোশ। আড়ালের ইঙ্গিতে শত্রুকে আহ্বান করার মত দুর্বুদ্ধি আর নেই। নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখ, কি বীভৎস ঐ যন্ত্রীসেনা—ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা, চুন, সুরকী ধুলো-বালি! ওদের সংখ্যা করা যায় না—কেবল স্তূপ আর স্তূপ! প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে! সব প্রাণহীন! আর প্রাণহীন বলেই অন্যেরে প্রাণে মারতে ওদের বাজে না। ঐ দেখ, গন্ধর্বলোকের প্রাচীর ধরে ওরা কি রকম ছেয়ে ফেলছে ওদের দেশ—মারীভয়ের মত! এ সুবিধা যদি না করে দিত গন্ধর্বলোক, তাহলে ও পাপ অন্ধকারের নীচেই পড়ে থাকত মুখ থুবড়ে।

চিত্রা। কিন্তু রাজা, যন্ত্ররাজের ঐ সেতুবন্ধকে এত ভয়েরই বা হেতু কি? অমনি সেতুবন্ধ দিয়েই ত সীতার উদ্ধার হয়েছিল।

মেঘ। উদ্ধারই বটে, চিত্রা! ঐ সেতুবন্ধে পদার্পণের পাপে, আগুনে পুড়েও সীতার কলঙ্ক পুড়ল না—শেষে পাতাল প্রবেশ করে উদ্ধার খুঁজতে হল।

মেধা। বুঝেছি রাজা, সকল বন্ধন ও বন্ধনী হতে মুক্ত রাখাই হয়তো আমাদের স্বর্গপুরীর শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা।

মন্দা। আচ্ছা রাজা, যন্ত্ররাজের এই সেতুবন্ধের উদ্দেশ্য কি?

মেঘ। এই সেতুবন্ধ যে পাতালপুরীর সীতার উদ্ধার করবে মা মন্দা, ও করতে চায় স্বর্গলক্ষ্মীকে বন্দিনী। ঐ সেতুবন্ধ স্বর্গ-প্রবেশের লঙ্ঘন-সোপান। ঐ সেতুবন্ধের লৌহ-বর্ম্ম দিয়ে সে স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যাবে—তাই বলে তার সমুদ্ধত কৃষ্ণ-পতাকা।

কৃষ্ণা। তা হলে ওকে দুঃশাসনের মত মারও খেতে হবে রাজা!

মেঘ। ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, অনাগত সে দিন এলো বলে। এখন চল, পদ্মাদেবীর নিরাশা-শুষ্ক কূলপানে। যন্ত্রপতির আয়োজন দেখে তারপর সেনাপতি পবন-দেবকে খবর দেওয়া যাবে। সে ততক্ষণ ফুল-মহলায় বিশ্রাম করে নিক্। [নৃত্য গান করিতে করিতে মেঘ ও বৃষ্টিধারার প্রস্থান]

হাজার তারার হার হয়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম্ব-তলে।
'বৌ কথা কও' বলে পাখী
করে যখন ডাকাডাকি
ব্যথার বুকে চরণ রাখি'
নামি বধূর নয়ন-জলে।
ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে বরণ করি
নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।
লুটাই নদীর বালুতটে
সাধ করে যাই বধূর ঘটে
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যন্ত্রপতির রাজসভা। বিশাল লৌহমঞ্চে বিশালকায় যন্ত্রপতি উপবিষ্ট। পশ্চাতে আঁধার-কৃষ্ণ যবনিকা জুড়িয়া ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত অট্টালিকার পর অট্টালিকা—জীবজন্তু-তরুলতা-পরিপূর্ণ। বিরাট অমঙ্গলের প্রতীকসম ঊর্ধ্বে প্রসারিত-পক্ষ বিপুল শকুনি-ভীষণদৃষ্টিতে নিম্নে চাহিয়া আছে। যন্ত্রপতির কঠিন মুখে রক্ত-আলো পতিত হইয়া তাঁহাকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। মস্তকে লৌহমুকুট। মুকুট-মণি—ইলেকট্রিক টর্চ। সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া লৌহ-জালীর সাঁজোয়া। দক্ষিণ করে স্থূল লৌহদণ্ড, বামকরধৃত দীর্ঘ শৃঙ্খলে বন্ধ ক্ষুধিতদৃষ্টি সিংহ, হিংস্রমতি শার্দুল, শাণিত-নখর ভল্লুক ও কুটিল-ফণা ভুজঙ্গী পদতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রাসাদ-চূড়ায় কৃষ্ণপতাকায় 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' কাটিয়া তাহারি নীচে লেখা হইয়াছে—'বিশ্বের শোষণ পেষণ'।]

'যন্ত্র'—বিপুল স্থূলকায়, কদাকার, অন্ধদৃষ্টি। বড় বড় নখ-দন্ত। দক্ষিণ হস্তে জাঁতা-কল, বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগার—বেয়াদবের মত তাহারই পুঞ্জীভূত ধূম মুখ দিয়া অবিরত বাহির করিতেছে। মস্তকে চিমনি-আকৃতির লম্বা টুপী। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া বিরাট চক্র। রক্ত-বস্ত্র, রক্ত-দেহ। তাহার পৃষ্ঠের চক্রের সাথে সাথে সেও অনবরত ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

ইঁট, কাঠ, পাথর যেন নেশা খাইয়া ঝিমাইতেছে। কেবল লোহের উজ্জ্বল কঠিন-দৃষ্টি।

ইঁটের পরনে পিরান ও সুর্কিরং চাহারখানার ঢিলে আরবী পায়জামা। মাথায় লালরঙা চোকো টুপী, খর্বকায়, অলস-দৃষ্টি, সিমেন্ট-রং-রঞ্জিত মুখ। পায়ে চোকো বুট।

কাঠ—স্থূল কর্কশ বস্ত্র শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিশুষ্ক মুখ। শির নাঙ্গা। ম্লান দৃষ্টি, নখ চুল বড় বড়।

পাথর—মুখ চোখ বন্দ্র ধূমল বর্ণ। স্থূল, কদাকার, কতকটা কচ্ছপের মত। যেন শুধু পেট আর মাথা। শিরে জবরজং কৃষ্ণ-উষ্ণীষ। হাত-পা ভারী ভারী। মুখ চ্যাপটা, চোখ ছোট।

লোহা—আলকাতরা রং—দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ দেহ, কঠোর-দৃষ্টি, বদ্ধমুষ্টি, তিক্ত কণ্ঠ। আঁটসাঁট জামা।

যন্ত্র, ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বন্দনা-গীত গাহিতেছে]

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত।
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত।
বিশ্ব হল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে
নন্দন-আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত।।
শঙ্কর হে, সে কোন সতী-শোকে হয়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে, হয়েছ জড়, সাধিতেছ ধ্বংস।
রুক্ষ তব দৃষ্টি-দাহে
শুষ্ক সব হে
ভীষণ তব চক্রাঘাতে
নির্জিত যুগান্ত।।

যন্ত্র। আর ত পথ এগোয় না রাজা, সামনেই খরস্রোতা পদ্মা—স্বর্গের নিষেধ-বাণীর মত।

যন্ত্রপতি। ওকে ওর গতি লঘু করতে বল!

যন্ত্র। জানি রাজা, বহু স্রোতস্বতী তোমার আদেশ পালন করেছে, কিন্তু পদ্মা তাদের সম্রাজ্ঞী!

যন্ত্রপতি। তুমি ভুলে যাচ্ছ সেনাপতি যে, আমিও সম্রাট। ওকে বল—এ আমার আদেশ!

যন্ত্র। যে-মন্দাকিনী ইন্দ্ররাজের ঐরাবতকে তৃণকণার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এ তারই জ্যেষ্ঠা কন্যা। তার তরঙ্গ-সেনার হুহুঙ্কারে প্রলয়-নর্তনে ধরণী প্রকম্পিত!

যন্ত্রপতি। ধরণী প্রকম্পিত হতে পারে—আমি নয়। ওকে খবরটা পৌঁছে দাও। ওর বুকের ওপর দিয়ে প্রস্তুত হবে আমার পথ।

যন্ত্র। সে খবর সে শুনেছে রাজা। তার তরঙ্গ-সেনা পর্যন্ত এ খবর শুনে ফেনা ছুঁড়ে বিদ্রূপ করে।

ইঁট। মনে হয় যেন গায়ে থুথু দিয়ে অপমান করলে!

যন্ত্র। আরে বাপু, তুমি থাম! —রাজা, এ অভিযানে তোমায় অধিনায়কত্ব করতে হবে।

যন্ত্রপতি। তুমি কি ওর হাঙ্গর কুমীর দেখে ভয় পেয়ে গেলে সেনাপতি?

যন্ত্র। না রাজা, আমার ভয় শক্ত কিছু নিয়ে নয়। ভয় আমার ঐ তরল তরঙ্গ-সেনাকে। ও যদি কামড়াত, তা হলে আমার ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু ও ত কামড়ায় না—শুধু সমস্তক্ষণ ঠেলে! ধরতে গেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে যায় গলে!

পাথর। আজ্ঞে, বেটা একে মনসা, তাতে আবার ধুনোর গন্ধ ঐ পবন ব্যাটা! ও যখন এসে যোগ দেয়, তখন আমার এই কাবুলী বপুখানিকেও তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছাড়ে!

ইঁট। আজ্ঞে, আর আমাকে ত সুর্কি-গুঁড়ো করে দেয়!

কাঠ। আমার খাতির তদোধিক! কান ধরে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে খাওয়াতে যখন দেয় রাম-ছুট, তখন দু'-পাশের লোক বলে—মড়া ভেসে যাচ্ছে!

লোহা (সগর্বে)—আমি বরং গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরি, তবু ওদের মত ভেসেও যাই না, ভেঙেও পড়ি না।

পাথর। হ্যাঁ, তাই থাপ্পড় কষিয়ে তোমার মুখটা দেয় নয়ের মত করে বেঁকিয়ে—তারপর বেশ করে বালি-চাপা দিয়ে দেয় জ্যান্ত কবর!

যন্ত্র। চুপ কর সব! —তোমাদের সমবেত শক্তি দিয়ে ওকে প্রতিরোধ করতে হবে—একলা যে যাবে তাকেই অকূলে ভাসতে হবে।

কাঠ। ভাসতে হয় ত সকলকেই হবে সেনাপতি, তবে এবার সকলে একসাথে ভাসব—এই যা সান্ত্বনা। বাবা, পদ্মার যা চেহারা দেখে এসেছি তা মনে করলে এখনো কাঠ হয়ে যেতে হয়! স্রোত ত নয়—যেন লাখে লাখে অজগর ফোঁসাচ্ছে—মোচড় খাচ্ছে। তারপর কুমীরগুলো যেন খেজুরগুঁড়ির ঢেঁকি। (অন্যদিকে চেয়ে) হাঙর-গুলোর মুখ কিন্তু আমাদের সেনাপতিরই মত!

যন্ত্র। দেখ তুমি বড় হালকা। তোমার দুর্বলতায় রাজা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন।

যন্ত্রপতি। সেনাপতি, আমি এখন চললাম। তোমরা প্রস্তুত হও—পদ্মাকে শাসন করতেই হবে। [প্রস্থান]

পাথর। আচ্ছা সেনাপতি, রাজার অত আক্রোশ কেন ঐ জল-ধারার ওপর? ওকে কি না বাঁধলেই নয়? আমরা ওকে কি ডিঙিয়ে যেতে পারিনে? তা হলে খাসা হত কিন্তু! ধরি মাছ না ছুঁই পানি। তখন একবার দেখে নিতাম—ওর তরঙ্গ-সেনা কত লাফাতে পারে। আমরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালে বোধহয় ওকে আলগোছে ডিঙিয়ে যেতে পারি!

যন্ত্র। সে চিন্তার ভারটা আমারই ওপর ছেড়ে দাও। তোমাদের যা বলি তাই কর এখন। আমাদের যন্ত্রপতি স্বর্গ জয় করতে চান। তাঁর যন্ত্ররথের পথের বাধা ঐ বিপুল স্রোতধারা—ও যেন স্বর্গের গড়খাই—ওর তরঙ্গ যেন স্বর্গের সীমান্তরক্ষী সৈন্য। ওকে জয় করতে পারলেই স্বর্গ জয় সহজ হয়ে উঠবে।

ইঁট। স্বর্গের সরস্বতীকে ত আগেই বন্দী করেছি সেনাপতি, তাঁর বীণার তারকে বেতার-যন্ত্রের কাজে লাগিয়েছি—তাঁর পদ্মবনকে করেছি কাঠ গুদাম! স্বর্গে আর আছে কি?

যন্ত্র। (পাথরের প্রতি) দেখ, তোমায় ভারিক্কি বলেই জানতাম। তোমাকেও দেখছি হালকা কাঠের ছোঁয়াচ লাগল! (কাঠের প্রতি) দেখ, তোমার হালকা হওয়ার কিন্তু একটা সুবিধাও আছে। তোমায় তরঙ্গ সহজে ডুবাতে পারে না। ভেসে এক জায়গায় কূলে ঠেকবেই।

পাথর। আজ্ঞে, ডুবলে কিন্তু ভরাডুবি!

যন্ত্র। আঃ থাম তুমি! (কাঠের প্রতি) দেখ, তোমার নৌকো হয়ে দেখে আসতে হবে—কোথায় পদ্মার তরঙ্গ-সেনা উদাসীন, কোথায় ওর গতিবেগ লঘু।

লোহা। আচ্ছা সেনাপতি, পদ্মাকে কি বন্দিনী করবে?

যন্ত্র। —না। তা করতেও পারব না, আর পারলেও করতাম না। আমরা পদ্মাকে চাই না—চাই স্বর্গ-লক্ষ্মীকে। এই স্রোতের জল সেই স্বর্গের প্রাণ-ধারা। এই প্রাণ-ধারার গতিবেগ সংযত করা ছাড়া একেবারে

বন্ধ করলে যার জন্যে এই অভিযান, হয়-ত সেই স্বর্গ-লক্ষ্মীকেই হারাব এবং পাব দক্ষযজ্ঞের সতীকে! আমাদের রাজমন্ত্রী কৌটিল্য তা হতে দেবেন না।

কাঠ। কই সেনাপতি, মন্ত্রী কৌটিল্যকে ত দেখতে পেলুম না কখনো।

যন্ত্র। সবচেয়ে মূল্যবান যে, তাকে রাখতে হয় সবচেয়ে গোপনে। মন্ত্রী কৌটিল্যই হল আমাদের রাজ্যরক্ষার রক্ষাকবচ। আমরা সকলে, যার রাজা পর্যন্ত, ঐ কৌটিল্যেরই অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

পাথর। ঠিক বলেছ সেনাপতি, দুর্বুদ্ধি যিনি, তিনি থাকতেন দেখার অতীত হয়ে। ষড়যন্ত্রকে দেখতে চাওয়া দুরাশা।

ইঁট। আমারও তাই মনে হয় সেনাপতি। জগৎটাকে সৃষ্টি যেই করুক—ওর মালিক যেই হোক—ওকে চালায় কিন্তু শয়তান।

যন্ত্র। ওহে, তোমাদের কথাবার্তায় রাজদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি। রাজার এবং ভগবানের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করলে তার শাস্তি কি জান?

কাঠ। জেল কিম্বা নরক। —এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ্।

যন্ত্র। এই চুপ! চুপ! ঐ রাজা আসছেন, শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

যন্ত্রপতি। সেনাপতি! আজই যাত্রা কর পদ্মাতীরে তোমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে। সৈন্যপরিচালনার ভার আমিই গ্রহণ করব (ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহার প্রতি)—প্রিয় সৈনিকগণ! তোমাদেরি আত্মদানে আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য। এর যা কিছু গৌরব, যা কিছু প্রতিষ্ঠা—সব তোমাদেরই। আমাদের এ যুদ্ধ স্বর্গমর্তের চিরন্তন যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জড় ও জীবের, বস্তু ও প্রাণের, মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ের। অমৃতে আমাদের অধিকার নেই, তাই আমরা অমৃতকে তিক্ত করে তুলতে চাই। যে-বেদনায় আজ মহাজড়, সেই বেদনার বিক্ষোভে দেবতার আনন্দকে পঙ্কিল করে তুলতে চাই। প্রকৃতিকে আমরা বশীভূত করেছি—এইবার স্বর্গরাজ্য জয়ের পালা। আমাদের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ঐ মুক্ত স্রোতস্বতী — আনন্দলোকের গোপন প্রাণ-ধারা। ওকে বাঁধব না—ওর বুকের ওপর দিয়ে যাব আমাদের চলার চিহ্ন এঁকে। —স্বর্গের আনন্দ-লক্ষ্মী করবে এই জড়জগতের পরিচর্যা—এই দম্ভের দীপ্ত তিলক তোমরা পরাও এই মর্ত-লোকের লাঞ্ছিত ললাটে।

অহঙ্কারের এই উদ্ধত পতাকা স্বর্গের বুকে প্রতিষ্ঠা কর, বীর!

সকলে। জয় যন্ত্রপতির জয়! জয় যন্ত্রপতির জয়!

যন্ত্র। সৈন্যগণ, গাও আমাদের সেই যাত্রাপথের কুচকাওয়াজের গান।

— গান —

চরণ ফেলি গো মরণ ছন্দে
বাঁধিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্তের মাটি মহীয়ান করি
[illegible] দীপ জ্বালান।।
চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো, অমরায়,
ধাঁধিয়াছি বিদ্যুতেতায়,
দেবরাজ হতমান।।
পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান।।

তৃতীয় দৃশ্য

[সিংহাসনারূঢ় মকরবাহিনী পদ্মা। পরনে জল-তরঙ্গ শাড়ি হাওয়ায় কেবলি ঝিকিমিকি করিতেছে। গায়ে কাঁচা রৌদ্র-কিরণের উড়নী। কাশ-বন চামর দুলাইতেছে। বেলা-ভূমে হাঙ্গর কুম্ভীর প্রহরীর কার্য করিতেছে। দুই তীরে বালুচরের শ্বেত পর্দা ঝুলানো। অগণিত মীন-সেনা সিংহাসনের চারি পাশে পায়চারী করিয়া ফিরিতেছে। জল-দেবীগণ বন্দনা-গান গাহিতেছে।]

নমো নমো নমো হিম-গিরি-সুতা
দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায়
মর্তে করিলে ধন্যা।।
আছাড়ি পড়িছ ভীষণ রঙ্গে
চূর্ণি পাষাণ ভীম তরঙ্গে,
কাঁপিছে ধরণী ভ্রূকুটি ভঙ্গে
ভুজঙ্গ-কুটিল বন্যা।।
কূলে কূলে তব কন্যা কমলা
শস্যে-কুসুমে হাসিছে অচলা
বন্দিছে পদ শ্যাম-অঞ্চলা
ধরণী ঘোরা অরণ্যা।।

[জলদেবীদের নাম—তরঙ্গিনী, সলিলা, অনিলা, তটিনী, নির্ঝরিণী, বালুকা।]

পদ্মা। তোদের এ গান থামা তরঙ্গিনী। এ বন্দনা-গান আজ আমার গায়ে বিদ্রূপের মত বিঁধছে!

তরঙ্গিনী। জানি মা, তোমার বেদনা কত বিপুল। কিন্তু যন্ত্রপতির এ স্পর্ধার দন্ড কি আমরা দিতে অসমর্থ, মা?

পদ্মা। আপাততঃ তাই মনে হচ্ছে তরঙ্গিনী। কত বাধাই না দিলাম। যন্ত্রপতির অগণিত সেনা-সামন্ত আজো আমার বালুচরের তলে তাদের সমাধি রচনা করে পড়ে রয়েছে, তবু ত তাকে আটকে রাখতে পারলাম না। সে আমার বুকের ওপর দিয়ে তার উদ্ধত যাত্রা-পথ রচনা করে গেল। (অদূরে সেতু-বন্ধ দেখা যাইতেছিল, সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ দেখেছিস্ তার সেতুবন্ধ? ও যেন কেবলি আমার মাথার ওপর চরে বিদ্রূপ করছে। অসহ্য তরঙ্গিনী, অসহ্য এ অপমান!

সলিলা। কি চতুর ঐ যন্ত্রপতিটা, মা! কাপুরুষ—আমাদের ভয়ে আমাদের নাগালের বাইরে ওর পথ রচনা করেছে! পেতাম ওকে তরঙ্গের মুখে, তা হলে ওর ঐ আকাশস্পর্শী স্পর্ধার মুখের মত শাস্তি দিয়ে ছাড়তাম!

বালুকা। তাহলে এতদিন ঐ বালুচর হত ওর সমাধি।

পদ্মা। যুদ্ধজয় শুধু শক্তি দিয়ে হয় না, সলিলা শক্তির [illegible]

নিলা। আহা মা, ওর পথ না হয় আমাদের নাগালের ঊর্ধ্বেই রইল, কিন্তু ও পথের মূল ত রয়েছে আমাদেরি বুকের ওপর প্রোথিত। সে-মূলকে কি আমরা উপড়ে ফেলতে পারিনে?

ম্মা। আমার শক্তিহীন তরঙ্গ-সেনাকে সে কথা জিজ্ঞাসা কর অনিলা। সে চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমবার—প্রথমবার কেন, বহুবারই আমরা তাদের ও পথমূলকে উচ্ছেদ করেছি, কিন্তু আর পারা গেল না। ওর বিপুল ভারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি আর আমার তরঙ্গ-সেনার রইল না!

ঝর্ণরিণী। আচ্ছা মা, আমরা ত পারলাম না। কিন্তু আমাদের এ অপমান—এই পরাজয় দেখে স্বর্গের দেবতারা কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন, তাই ভাবছি। তুমি আকাশের দেবতাদের আহ্বান কর না একবার!

ম্মা। আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যও চেয়েছি, নির্ঝরিণী। দেবরাজ তাঁর মেঘ-রথে চড়ে দেখেও গেছেন সব! তিনিও যেন যন্ত্রপতির এই অতি বিপুল স্থূলকায় দেখে বিস্মিত—হয়ত বা ভীতও হয়েছেন। আমার মরাল-দূতী এই সেদিন ফিরে এসেছে। তিনি বলেছেন, এর জন্য তাঁকে বড় রকমের প্রস্তুত হতে হবে। পরাজয়ের লজ্জাকে তাঁর অতিমাত্রায় ভয়!

টনী। কিন্তু মা, অসুরের হাতে দেবরাজের পরাজয় ত বহুবারই হয়ে গেছে।

ম্মা। বারে বারে পরাজিত হয়েই ত তাঁর এত ভয়, তটিনী। তাঁর পরাজয়ের পথ অনুসরণ করে যদি অসুরের দল আবার স্বর্গ আক্রমণ করে!

[হঠাৎ ঊর্ধ্বে মেঘের দামামা-ধ্বনি শোনা গেল। ম্মাদেবী উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন]

বন। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া) দেবী! স্বর্গে দামামা বেজে উঠেছে। আমার অগ্রজ দেবরাজ সেনাপতি ঝঞ্ঝা তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে পড়লেন বলে। আদেশ দিন দেবী, আমি আমাদের সৈন্য-সামন্তদের প্রস্তুত হতে বলি।

ম্মা। (উত্তেজনায় দণ্ডায়মান হইয়া) — তুমি প্রস্তুত হও সেনাপতি। এখনি তরঙ্গ-সেনাদলকে কূলে কূলে দামামা-ধ্বনি করতে বল। সকলে যেন তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে। আমি দেবরাজ সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করে আনি। জয় মা ভবানী! (পদ্মা শ্বেত মরালীর ডানায় চড়িয়া ঊর্ধ্বে উড়িয়া গেলেন। তরঙ্গ-সেনা, হাঙ্গর, কুমীর, মীনদল, জলদেবীগণ অতি ব্যস্ততা-সহকারে বাহির হইয়া গেল। পশ্চিম গগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঊর্ধ্বে ভীষণ শনশন শব্দে ঝঞ্ঝা আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মার জল সম্ভ্রমে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যেন দেবরাজ সেনাপতিকে অভিবন্দনা জ্ঞাপন করিল।)

[ঝঞ্ঝার উচ্ছৃঙ্খল ঝামর-কেশ। ন্যস্ত কৃষ্ণবাস স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া ধরায় লুটাইয়া পড়িতেছে। হস্তে লি-গৈরিক পতাকা। কর-খর্পরে ধূমায়িত অগ্নি। বক্ষ-শে বিদ্যুতের যজ্ঞোপবীত। চরণে খর-ধ্বনি নূপুর। নে বজ্রাগ্নি-জ্বালা। বাহুতে ছিন্ন শৃঙ্খল। দিগন্ত-ছাওয়া কুটিল ভ্রূ-ভঙ্গ। নিবৃত্ত বাসুকী কোটি ফণা বিস্তার করিয়া ছত্র ধরিয়াছে। তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দে স্বর্গ-মর্ত্য শিহরিয়া উঠিতেছে। — যেন দ্বিতীয় প্রলয়েশ শঙ্কর।]

— অন্তরীক্ষে গান —

হর হর শঙ্কর! জয় শিব শঙ্কর!
দানব-সন্ত্রাস জয় প্রলয়ঙ্কর!
জয় শিব শঙ্কর।।
নিপীড়িত জন-মন-মন্থন দেবতা
আন অভয়ঙ্কর স্বর্গের বারতা!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় সংঘাত-সংহর!
জয় শিব শঙ্কর।।
এস উৎপীড়িতের রোদনের বোধনে
বজ্রাগ্নির দাহ লয়ে রোষ-নয়নে।।
ভীমকৃপাণে লয়ে মৃত্যুর দণ্ড
দৈত্যারি-বেশে এস উন্মাদ চণ্ড
ধ্বংস-প্রতীক মরু-শ্মশান-সঞ্চর!
জয় শিব শঙ্কর।।

ঊর্ধ্বে ঝঞ্ঝা, পদ্মা, বজ্রশিখা, মেঘ, পবন। নিম্নে তরঙ্গ-সেনা, সেতু, জলদেবীগণ, মীনকুমারীগণ, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা।]

ভারবাহী মানুষ। (অন্তরীক্ষ লক্ষ্য করিয়া) জাগো দেবতা! আর এ ভার বইতে পারিনে। যন্ত্ররাজা আমাদের ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে আমাদের সর্বস্ব হরণ করেছে। আমাদের আত্মাকে হত্যা করে আমাদের পশু করে তুলেছে। আমাদের পিঠ হয়েছে কুব্জ, আমাদের দেহ হয়েছে রোগ-জীর্ণ, খর্ব। আমাদের কর্তব্য হয়েছে ওদের ভারবহন। জাগো দেবতা, জাগো!

ভারবাহী পশু। জাগো রুদ্র জাগো। নিপীড়িত কুলিরও অধম হয়েছি আমরা। যন্ত্ররাজের পশুত্ব আমাদেরও নীচে গিয়ে পৌঁচেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ আমরা। দিবসে হই তার ভারবাহী, নিশীথে হই ক্ষুধার আহার্য। জাগো রুদ্র, এই অপমৃত্যুর হাত হতে আমাদের রক্ষা কর।

পদ্মা। ঐ শোনো, শোনো দেবরাজ-সেনাপতি! নিম্নে পীড়িত মানবাত্মা, ভারবাহী পশুর ক্রন্দন-ধ্বনি। আমারই কূলে ওরা ওদের শান্ত নীড় রচনা করেছিল। যন্ত্রপতি ওদের ধরে আমারই সর্বনাশ করিয়েছে। হানো তোমার বজ্রাঘাত, আর আমি সইতে পারিনে!

ঝঞ্ঝা। মাভৈঃ! ভয় নাই দেবী। যন্ত্ররাজের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। ওকে আরও অগ্রসর হতে দিলে আমাদের স্বর্গের সদর-দ্বারে গিয়ে সে হানা দেবে। আমি বিধাতার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছি। (বজ্রকে দেখাইয়া) ঐ দেখ তার মৃত্যুদণ্ড—জ্বলন্ত অগ্নি-শিখায় লেখা! —পবন! মেঘরাজ! তরঙ্গ-সেনা! —বন্যাধারা! সকলে প্রস্তুত?

[ঊর্ধ্বে ও নিম্নে সমবেত কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সেতু-বন্ধ কাঁপিয়া উঠিল।]

এইবার আমাদের প্রলয়-নাচের পালা শুরু হোক!... দেবী! তুমি নিম্নে গিয়ে তোমার তরঙ্গ-সেনা বন্যাধারাকে পরিচালিত কর।...পবন! তুমি তোমার পরিপূর্ণ গতিবেগে
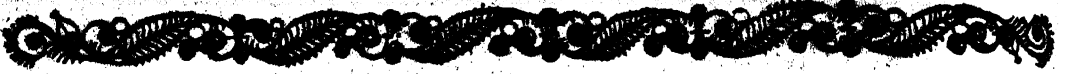
নিয়ে সেতু-বন্ধের ঊর্ধ্বদেশ আক্রমণ কর। বন্যাধারাকে, তরঙ্গ-সেনাদলকে পশ্চাতে থেকে শক্তি দাও, সাহস দাও, পরিচালিত কর, ওদের মাঝে আরো আরো গতিবেগ সঞ্চারিত কর। মেঘ! তুমি সাগর শূন্য করে, সকল গিরি-শির রিক্ত করে জলধারা বর্ষণ কর। তরঙ্গ-সেনা তোমার শক্তিতে, অধীর উন্মাদনায় উন্মত্ত ফেনায়মান হয়ে উঠুক!...বজ্রশিখা! তুমি তোমার অগ্নিদন্ড নিয়ে সেতু-বন্ধের শিরোদেশে, পাদমূলে আঘাতের পর আঘাত কর। ধরণীধব বাসুকীকে খবর দাও, সে তার ফণা আস্ফালন করে ধরণীকে কাঁপিয়ে তুলুক। ভেঙে ফেলুক ঐ অসুরের দম্ভ সেতু-বন্ধ!

[ঊর্ধ্বে নিম্নে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল—'জয় গন্ধর্বলোকের জয়! জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়! জয় মা ভবানী! জয় শঙ্কর!'...পৃথিবী টলমল করিয়া উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত ও অবিরল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পদ্মার ঢেউ ভীম নর্তনে দুই কূল প্লাবিয়া তুলিল। তরঙ্গ-সেনাদলের গিরি-মাটি-রাঙা উত্তরীয় পবন-বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জলদেবীগণ, মীনকুমারীগণ, হাঙ্গর কুমীর সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সকলে সেতুবন্ধে আঘাত করিতে লাগিল। ক্রমে শত শত ভারবাহী মানুষ ও পশুর দল হাতুড়ী শাবল গাঁইতি এবং শৃঙ্গা লইয়া সেতু-বন্ধকে আক্রমণ করিল। সেতুবন্ধ কাঁপিয়া উঠিল।]

সেতু। জয়, যন্ত্ররাজের জয়! সাবধান স্বর্গ-বিলাসীর দল! ও আঘাত আমার অচেনা নয়। বহুবার ওর শক্তি পরীক্ষা করেছি। (হঠাৎ বজ্রাঘাতে টলটলায়মান হইয়া) উঃ যন্ত্ররাজ! আর পারি নে। দেবতাই বুঝি জয়ী হল!

(বাষ্পরথে সসৈন্যে যন্ত্ররাজের আগমন)

যন্ত্ররাজ। জাগো যন্ত্ররাজ-সেনা, জাগো! আজ স্বর্গের চক্রান্তকে চিরদিনের মত ব্যর্থ করতে চাই। আজকের জয় দিয়ে স্বর্গরাজ্য জয়ের কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে হবে। জাগো যন্ত্রী, জাগো সেনাদল!

[ইঁট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি যন্ত্ররাজ-সেনার ও সেনাপতি যন্ত্রের ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ...দেবাসুরের ভীষণ রণ-কোলাহল ক্রেদে ধরণী আকাশ পঙ্কিল ধূম্রাক্ত হইয়া উঠিল।]

ঝঞ্ঝা। কোথায় নিশিত পাশুপতাস্ত্র! জাগো! দেবতার উদ্যত দন্ড হয়ে যন্ত্ররাজের বক্ষ ভেদ কর। সাবাস! (পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ ও যন্ত্ররাজের পতন। সঙ্গে সঙ্গে সেতুবন্ধও ভীষণ শব্দে পদ্মা-গর্ভে নিপতিত হইল।)

পদ্মা। জয় মা ভবানী! জয় দেব-শক্তির! গন্ধর্ব-লোকের জয়! (যন্ত্ররাজের বুকে ত্রিশূল হানিয়া) আজ হতে মর্তে পশুর রাজত্বের অবসান হল! [যন্ত্ররাজের বিকট আর্তনাদে আকাশ যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল]

ঝঞ্ঝা। জয় দেবরাজ ইন্দ্রের! জয় মন্দাকিনী-সুতা পদ্মা দেবীর! আজ গন্ধর্বলোকের সাথে স্বর্গও অসুর-গ্রাস থেকে মুক্ত হল। জয় শিব শঙ্কর!

[তরঙ্গ-সেনাদল দলে দলে আসিয়া পতিত সেতুবন্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিপুল সেতু-বন্ধ পদ্মা-গর্ভে লীন হইল। উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ-দল গগন-চুম্বনপ্রয়াসী হইয়া উঠিল। ...দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গিয়া পূর্ব গগন সাত-রঙা রামধনু-শোভিত হইয়া উঠিল। অস্তপাট সোনার গোধূলি-রঙে রাঙিয়া উঠিল। সূর্যদেব সহস্র কর বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে আশীর্বাদ করিলেন।

[পদ্মা তরঙ্গ-শিরে একরাশ ছিন্ন শতদল লইয়া স্বর্গের পানে তুলিয়া ধরিলেন, ঝঞ্ঝার ধূর্জটি কেশে পরাইয়া দিলেন। দূর মেঘ-লোকে বিজয়-দামামা-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।]

যন্ত্র। (মৃত্যু-কাতর কন্ঠে) আমার মৃত্যু নাই। দেবী! আজ তোমারই জয় হল। দেবতার মত দানবও বলে—'সম্ভবামি যুগে যুগে'। আমি আবার নতুন দেহ নিয়ে আসব। আবার তোমার বুকের ওপর দিয়ে আমার স্বর্গজয়ের সেতু নির্মিত হবে।

পদ্মা। জানি যন্ত্ররাজ! তুমি বারে বারে আসবে, কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনায় মৃত্যু-দন্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে!

যবনিকা

[সেতু-বন্ধ নাটিকার ১ম ও ২য় দৃশ্য ১৩৩৪ সনের 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল]

মহারাজা নন্দকুমার

বিমল মিত্র

আমার মনে হলো আমি যেন সামনে মহারাজ নন্দকুমারকেই দেখছি। কিন্তু সেই সজ্জ-পোশাক কোথায়? সেই জাঁক-জমকই বা কোথায় গেল? সেদিনকার সেই হুগলীর ফৌজদারের চেহারা হঠাৎ এমনই বা হয়ে গেল কেন?

একটা ময়লা কালো রং-এর ট্রাউজার আর গায়ে একটা বুশ্‌-সার্ট। পায়ে কাবলি জুতো।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি এতদিন পরে কোত্থেকে আসছেন?

লোকটা বললে—সেটেলমেণ্ট অফিস থেকে।

—কালিগঞ্জে সেটেলমেণ্ট অফিস?

লোকটা হাসলো। বললে—হ্যাঁ স্যার—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এতদিন ধরে আমিই তো কালিগঞ্জ সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে গিয়ে জুতোর শুকতলা ক্ষইয়ে ফেলেছি। আজ সাত বছর এই-ই করেছি কেবল। সামান্য ন' হাজার টাকার ব্যাপার। ন' হাজার পাওনা টাকার জন্যে সাত বছর ঘুরে ঘুরে এখন যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, ঠিক এই সময়ে এ এল। এই সাত বছরে আমাকে অন্তত ছিয়াত্তরবার কালীগঞ্জে যেতে হয়েছে সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে ধরনা দিতে

ফেরতে তীর্থগিরির মত। আর তা ছাড়া কি টাকাটা কিছু কম খরচ হয়েছে? প্রত্যেকবার কলকাতা-কালীগঞ্জটা করে টাকা খরচ হয়েছে যাতায়াত খরচা। এক পিঠের ট্রেন ভাড়া সাড়ে তিন টাকা। তারপর আছে খাওয়া-খরচ। তারপর ট্যাক্সি-ভাড়া, রিক্সা ভাড়া। তারপর পান সিগারেট!

কিন্তু এত করেও কিছু হয়নি। প্রত্যেকবার গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি—কী হলো স্যার? কদ্দূর? কবে টাকাটা পাচ্ছি?

অফিসার ভদ্রলোক খুব মিষ্টভাষী।

গেলেই বসতে বলেন। বলেন—বসুন, বসুন—আপনাকে খুবই ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে—

আমি বলি—একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন স্যার। দেখছেন তো ক' বছর ধরে ঘোরাঘুরি করছি—

অফিসার ভদ্রলোক বলেন—গভর্মেণ্টের অফিস, বুঝতেই তো পারছেন। একটা ফাইল এ টেবিল থেকে ও-টেবিলে যেতেই দেড়মাস লাগে—

আমি বলি—তা এ-রকম হয়ই বা কেন?

অফিসার বলেন—কেউ যে কাজ করে না আমাদের অফিসে।

—তা কাজ করে না কেন? আপনারা কিছু বলতে পারেন না?

অফিসার হাসেন। বলেন—বলা কি আর আজকাল সহজ মশাই। আজকাল ইউনিয়নের যুগ, কে কাকে কী বলবে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? বলতে গেলেই তো ঘেরাও করবে!

আমি একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে নিচু গলায় বলি—যদি কাউকে কিছু দিলে কাজ হয় তো বলুন, তা আমি দিতে প্রস্তুত—

—কী? ঘুষ?

অফিসার ভদ্রলোক যেন সাপ দেখে দশ হাত পেছিয়ে গেলেন।

আমি বললাম না না, ঘুষ নয়। এই পান-সিগারেটের নাম করে যদি কিছু দিই—?

ভদ্রলোক অফিসার যামলেন। বললেন—না না, ওদের অত প্রশ্রয় দেবেন না। প্রশ্রয় পেলে একদিন আমার আপনাদেরই গলা কাটবে। এখন হয়ত পান-সিগারেট খেতে দিলেন, তারপর একদিন টাকা-কড়ি চেয়ে বসবে। তখন আর আমি অফিসের ডিসিপ্লিন রাখতে পারবো না—

ভাবলাম খুব ভালো কথা। প্রত্যেক অফিসের বড়-সাহেব যদি এই রকম হয় তো ইণ্ডিয়ার তো সুদিন ফিরে আসবে!

—তাহলে কবে আসবো বলুন?

ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। তার চেয়ে বরং ফাইলটা তৈরি হলেই আমি নিজেই আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব—

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম।

বললাম—তা যদি করেন তো খুব উপকার হয়! বার-বার আসা-যাওয়া করছি, সাত বছর ধরে এই হয়রানি, দেখতেই পাচ্ছেন!

ভদ্রলোক সহানুভূতি জানালেন—সত্যিই, আজকাল যে কী হয়েছে—

কিন্তু সহানুভূতিতে তো মানুষের পেট ভরে না। ন' হাজার টাকার ব্যাপার। পিতৃ-পুরুষের জমি-জমা ছিল একদিন। সেকালে তাতেই তাঁদের চলে যেত। তারপর সরকার থেকে সব জমি নিয়ে তার খেসারত দেবার বন্দোবস্ত হয়েছে। দর দাঁড়িয়েছে ন' হাজার টাকা! আমারও যেমন উড়ে আসা টাকা, গভর্মেণ্টেরও তেমনি উড়ো খৈ। কার টাকা কে দিচ্ছে!

আসবার সময় বললাম—তাহলে কবে নাগাদ আপনার চিঠি আশা করবো?

ভদ্রলোক বললেন—বড় জোর একমাস। একমাসের মধ্যেই চিঠি পেয়ে যাবেন—

আমি চলে এলাম।

এক মাস তো দূরের কথা, তার পর দু' মাস কেটে গেল, কোনও চিঠি-পত্র নেই। একদিন আবার গেলাম কালীগঞ্জ। অফিসারের ঘরে গিয়ে দেখি ঘর ফাঁকা। কেউ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—তিনি কোথায়?

একজন বাবু বললেন—তিনি ছুটি গেছেন, তাঁর ভাগ্নির বিয়ে—

এত পরিশ্রম করে গিয়েছি, এতগুলো টাকাও খরচ হয়ে গেল। অথচ কোনও কাজ হলো না। অফিসের যাকে জিজ্ঞেস করি সে-ই বলে—আমি কিছু জানি না, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন—

তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেন—আমি তো কিছু জানি না, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন—

এই রকম এর কাছ থেকে ওর কাছে ঘুরে-ঘুরে শুধু হয়রানিই হলো, কাজের কাজ কিছু হলো না। এই নিয়ে অন্ততঃ ছিয়াত্তরবার এসেছি কালীগঞ্জে। ফাইল যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে আছে। আমার তদ্‌বির-তাগাদায় এক চুল নড়েনি সে।

শেষে বিরক্ত হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। আর কালীগঞ্জে গেলাম না। ভাবলাম এ পৃথিবীতে সাতবার জন্ম হলেও ও-টাকা পাবার আর কোনও আশা নেই।

এমন সময় হঠাৎ আমার বাড়িতে সেই কালিগঞ্জ সেটেলমেণ্ট-অফিসের লোক সশরীরে হাজির হওয়াতে চমকে উঠলাম। লোকটাকে দেখে প্রথমে কিছু সন্দেহ করিনি। কিন্তু তার প্রস্তাব শুনে মনে হলো যেন স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমার এসে হাজির হয়েছে!

লোকটা বললে—আপনি ন' হাজার টাকা পাচ্ছেন স্যার, কিন্তু একটু অনুগ্রহ করলেই আঠারো হাজার টাকা পেতে পারেন—

—কী রকম?

আমি কথাটা শুনে তার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। না, কোনও সন্দেহ নেই। এ পুরোপুরি তো সেই নন্দকুমার!

ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বলি।

আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত 'বাঙলার ইতিহাস' বইখানা পড়ছিলাম। সে কতকাল আগেকার কথা। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে! ইংরেজরা এসে কলকাতায় গেড়ে বসেছে। চারদিকে অরাজকতা। নবাবকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। সবাই একজোট হয়ে নবাবকে তাড়িয়ে ইংরেজদের এনে বসাতে চায়।

সেই সময় একদিন রাত্রে উমিচাঁদের আবির্ভাব! শয়তান উমিচাঁদ।

নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার। উমি-চাঁদকে যথারীতি খাতির করে বসালে। জিজ্ঞেস করলে—কী খবর? আপনি এত রাত্তিরে?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—একটা কাজ করতে হবে দাদা, আপনিই করতে পারেন। আপনি ছাড়া আর কারো করবার ক্ষমতা নেই। টাকা যা চান তা দেওয়া যাবে—

টাকা! নন্দকুমারের মুখ দিয়ে কথাটা ফস্ করে বেরিয়ে গেল। কে টাকা দেবে?

—কেন, ফিরিঙ্গি কোম্পানী দেবে।
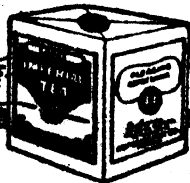
—কত টাকা দেবে?

—যা চান আপনি।

নন্দকুমার বললে— কী করতে হবে আমাকে?

—আপনাকে এমন কিছু কঠিন কাজ করতে হবে না। ইংরেজরা সেপাই নিয়ে চন্দননগর দখল করতে যাবে, আপনি মোট-কথা বাধা দিতে যাবেন না—

নন্দকুমার কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আরে মশাই, এতে ভাবার কিছু নেই। এমন হাতী-ঘোড়া কিছু নয় এটা। আসলে আপনার নবাবও যা, ও ক্লাইভ সাহেবও তাই!

—সে কী রকম?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—আরে মশাই, চারদিকের হাল-চাল দেখছেন না? ওদিক থেকে পাঠান আহমদ-শা-আবদালী তো এসে পড়লো বলে। এই তো এবার কলকাতা থেকে ফিরে নবাবকে যেতে হবে আজিমাবাদের দিকে, শুনেছেন তো?

—হ্যাঁ, তা শুনেছি।

উমিচাঁদ সাহেব বললে—তা নবাব কি তাকে আটকাতে পারবে ভেবেছেন?

—কেন পারবে না?

—কেন পারবে শুনি? সেপাইরা কি নিয়ম করে মাইনা পায়? আর যা পায় তাতে কি তাদের পেট ভরে? আপনার দফতরের কথাই ধরুন না। আপনার দফতরের লোকেরা, আপনার ফৌজের সেপাইরা কি নিয়ম করে পেট-ভরানোর সব মাইনে পায়? খেতে পরতে পায়?

নন্দকুমার বললে—অনেক লিখে লিখে তবে মাইনে আদায় হয়।

—আদায় হয় শেষ পর্যন্ত?

—ওই ন' মাসে ছ' মাসে আসে কোনও রকমে। তাও মাইনে বাড়াবার জন্যে কত তাগিদ দিচ্ছি মশাই, তারও কোনও জবাব নেই। জিনিস-পত্তোরের দামও বাড়ছে দিন দিন—

—আপনার মাইনে?

নন্দকুমার বললে—নিয়ম করে মাইনে পেলে কি আর ভাবনা?

উমিচাঁদ সাহেব বললে—তা আমি জানি। ও দেখবেন এ নবাবি টিঁকবে না। এই চাকরিতে যে-কটা দিন আছেন কাজ গুছিয়ে নিন, আখেরের কাজ গুছিয়ে নিন—নইলে পরে পস্তাতে হবে। তাই তো বলছিলুম বড় গাছে নৌকো বাঁধুন। এরা সব বনেদী মানুষ, এই ইংরেজ বেটারা। এদের কারবারের কায়দা-কানুনই আলাদা। আমিও তো কারবার করি, আর ও-বেটাদের দেখছি। কথার খেলাপ করে না মশাই, যার যা পাওনা-গণ্ডা তাকে তা আগে মিটিয়ে দিলে তবে ওদের ভাত হজম হয়। আমার কারবারের একটা পয়সাও ওরা বাকি ফেলেনি, তা জানেন?

—তা কী করতে হবে আমাকে, বলুন?

—ওই যে আপনাকে বললুম। ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আপনি যত টাকা চাইবেন ও-বেটারা দেবে। দু হাজার চান দু'হাজার, চার হাজার চান

চার হাজার। ও-ষেটাদের মশাই হক্‌কের টাকা। কিছু দূরে নিন না!

নন্দকুমার একটু ভেবে বললে—তা কত নিই বলুন তো ঠিক-ঠিক?

—যা আপনার খুশী!

—পাঁচ হাজার চাইলে দেবে?

—তা দেবে না কেন, পাঁচ হাজারই দেবে ক্লাইভ সাহেব।

নন্দকুমার বললে—তা যদি হয় তাহলে ছ' হাজারই চাই, কী বলেন?

—তা তাই-ই চান।

নন্দকুমারের সাহস বেড়ে গেল। লোভও বেড়ে গেল। বললে—দাঁড়ান, ছ হাজারই বা কেন? যখন মাগ্‌না পাওয়া যাচ্ছে তখন আট হাজারই চাই। আট হাজার হলেই আমার ভালো হতো। আমার তো অনেক ঝুঁকি, নবাব যদি জানতে পারে তাহলে তো বুঝতেই পারছেন......

উমিচাঁদ বললে—ঝুঁকির কথা যদি বলেন তাহলে আট কেন, দশ হাজারই চান না পুরোপুরি—

নন্দকুমার আর পারলে না। বললে—তাহলে দাঁড়ান, আমি একবার ঠাকুরঘর থেকে আসি—

উমিচাঁদ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুরঘর? ঠাকুরঘর কেন?

নন্দকুমার বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস না করে আমি কিছু করিনে কিনা, বড় জাগ্রত ঠাকুর আমার, কালী-মূর্তি—

বলেই চলে ভেতরে। আর তার একটু পরেই হাসতে হাসতে আবার এল।

বললে—কিন্তু উমিচাঁদ সাহেব, ঠাকুর বলছেন—তুই বারো হাজার নে—

উমিচাঁদ জিজ্ঞেস করলে — আপনার ঠাকুর নিজের মুখে বলেছে? তাহলে বারো হাজারের এক দামড়ি কম নেবেন না, বারো হাজারই নিয়ে নিন্‌

—দেবে তো?

উমিচাঁদ বললে—দেবে না কেন? ইংরেজ-ব্যেটাদের বাপ দেবে। টাকা না দিলে আপনি কাজে হাত দেবেন না। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমরা ঘর করি, টাকা না পেলে আমরা কাজ করবো কেন? আপনি এক কাজ করুন। আপনি আমার কথার ওপর বিশ্বাস করবেন না। আমি সোজা-সুজি লোক পাঠাচ্ছি ক্লাইভ সাহেবের কাছে। ক্লাইভ সাহেব যদি লিখে পাঠায় 'গোলাপ ফুল' তাহলে বুঝে নেবেন সাহেব আপনার কথায় রাজি, আর যদি কিছু উত্তর না আসে তো বুঝবেন গররাজি—

—আমাকে তাহলে কী করতে হবে?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। ফরাসীদের কাছে নবাবের দেওয়া টাকাটা পাঠাতে হবে না। ইংরেজরা যখন চন্দন-নগরে হামলা করতে যাবে তখন শুধু আপনি আপনার ফৌজ নিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবেন। বুঝলেন? আমি তাহলে চলি—

উমিচাঁদ সাহেব চলে গেল।

বারো হাজার টাকা! বারো হাজার টাকা মবলক পাওয়া গেল। ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল নন্দকুমার। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে এমন চাকরি হবে, এত টাকা হবে, তা তার বাপ-মা-ই কি ভাবতে পেরে-ছিল? হঠাৎ বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হলো—

—হুজুর!

—কৌন্‌?

—ফিরিঙ্গি-কুঠি থেকে হরকরা এসেছে—

দিশি হরকরা। এসেই ফৌজদার সাহেবকে মাটি পর্যন্ত নিচু হয়ে সেলাম করলে। তারপর একটা লেফাফা এগিয়ে দিলে। দিয়ে আবার চলে গেল কুর্নিশ করে। হুকুম-বর্দারও চলে গেল।

ফাঁকা ঘরখানার মধ্যে নন্দকুমার লেফাফাখানার মুখ ছিঁড়ে ফেললে। ভেতরে একটা সাদা কাগজ শুধু। তার ওপর বড় বড় হরফে ফার্সিতে লেখা—'গুলাব কে ফুল'।

কে লিখেছে, কেন লিখেছে, কোথা থেকে লিখেছে, কিছুই লেখা নেই! না থাক, ফৌজদার সাহেব লেফাফাখানা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। জয় মা কালী, জয় মা জগদম্বা, ভাগ্যিস তুমি বুদ্ধি দিয়েছিলে। নইলে তো চার হাজার টাকা লোকসান হয়ে যেত! জয় মা বগলামুখী, আজ তোমায় সোনার রেকাবিতে সিন্নী চড়াবো। হীরের চামর দিয়ে তোমার বাতাস করবো; গঙ্গাজলের বদলে আজ খাঁটি গরুর দুধ দিয়ে তোমার চরণামৃত বানিয়ে দেব। জয়, জয় করাল-বদনী, জয় হোক তোমার—

পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেও মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাস করছি। মানুষের টাকার লোভের কথাটা তখনও মাথা থেকে যায় নি।

তাই লোকটার কথা শুনছিলাম আর অবাক হয়ে সেই ফৌজদার নন্দকুমারের কথাগুলো মনে পড়ছিল।

লোকটার বোধহয় একবার কেমন সন্দেহ হলো।

বললে — আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন তো?

বললাম—না—

লোকটা বললে—কেন, এ তো সোজা কথা। আপনি তো কম্‌পেনসেশন পাচ্ছেন ন' হাজার টাকা, আপনি যদি আমাদের ওপর একটু অনুগ্রহ করেন তো আঠারো হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। অথচ তার জন্যে আপনাকে কিছু পরিশ্রম করতে হবে না—

—কী—রকম?

লোকটা খুব চতুর। বললে—বুঝতেই তো পারছেন, সবই আমাদের হাতে। আমরা ইচ্ছে করলে হ্যাঁ-কে 'না' করতে পারি, আপনার তিনশো বিঘে জমিকে দুশো বিঘে করে দেখাতে পারি। কারো সাধ্যি নেই যে ধরে। খতিয়ান-নম্বর দাগ-নম্বর সব একেবারে কাটায়-কাটায় মিলিয়ে দেব—

—তাতে আপনার স্বার্থ?

লোকটা হাসতে লাগলো নির্বোধের মত। বললে — বুঝতেই তো পারছেন, আপনার মত আমরাও কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি, যা মাইনে পাই তাতে মশাই চলে না। জিনিস-পত্তোরের দাম তো দিন-দিন বেড়েই চলেছে। সংসার কেমন করে চলছে তা কেবল ভগবানই জানে। আর আপনিও তো এই সাত বচ্ছর ঘুরে-ঘুরে দেখলেন ফাইল কি নড়লো? আপনার যাতায়াতে এই সাত বচ্ছরে মবলক কত টাকা গচ্চা গেল হিসেব করে বলুন তো! আরো সাত বচ্ছর ঘুরুন, তাতেও ওই ন' হাজার টাকা আপনি পাবেন না।

আমি চুপ করে আছি দেখে লোকটা যেন আরো উৎসাহ পেয়ে গেল।

বলতে লাগলো—তাই কালিগঞ্জ থেকে রেল-ভাড়া খরচ করে আপনার কাছে এলাম। ভাবলাম আপনার কাছে নিজে এসে নিরিবিলিতে বুঝিয়ে দিলে আপনি হয়ত সব জিনিসটা বুঝবেন। অফিসের মধ্যে জিনিসটা ঠিক খুলে বলা যায় না—কার মনে কী আছে কে বলতে পারে? আর সকলের সামনে তো সব কথা বলাও যায় না। আপনিই বলুন না, বলা যায়?

আমি চুপ করে আছি দেখে লোকটা আরো উৎসাহী হয়ে উঠলো।

বললে—অবশ্য আপনি বলতে পারেন আরো অনেক পার্টি তো আছে? তা আছে বৈকি! অনেকেরই জমি-জমা আছে! তাঁরাও দেন। দেখুন, আপনার লোকসান করে তো আমরা নিচ্ছি না। আপনাকেও তেমনি পাইয়ে দিচ্ছি আমরা। আপনাকে যা পাইয়ে দিচ্ছি তার ওয়ান পার্সেন্টও যদি আমাদের দেন তো আপনার কোনও লোকসান নেই, কিন্তু আমরা একটু ভদ্রস্থ হয়ে......

লোকটা অনেক কিছু বলে যেতে লাগলো, আমি কোনও কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে শুধু শুনতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম। আমার মনে হলো যেন হুগলীর সেই ফৌজদার দুশো বছর পরে আবার সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়েছে। নন্দকুমারদের যেন ফাঁসি হলেও মৃত্যু নেই। নন্দকুমাররা সেবারে এমনি করে ফিরিঙ্গিদের এখানে ডেকে এনেছিল, এবারে এরা আবার কাকে ডেকে আনবে?

ফস্ করে যেন একগোছা কাঠি একসঙ্গে জ্বলে উঠলো ভিতরে। পা থেকে কম্বলখানা ছুঁড়ে ফেললো সমীর।

গৃহ। গৃহ-সুখ। পারিবারিক জীবন। ধেৎতারি নিকুচি।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সমীর। আলনা থেকে প্যান্টটা পেড়ে নেয়। একমেবাদ্বিতীয়ং টেরিলিন প্যান্টটা। সকাল থেকে শীতে শরীর কালিয়ে গেল, এক পেয়ালা চায়ের দেখা নেই। বেলা আটটায় আগে মেলেও না দেখা।

অথচ মা এবং তাঁর কর্মিষ্ঠ কন্যার কর্মলীলার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে সেই ভোর রাত থেকে। বাসনের শব্দ, সাবান কাচার শব্দ, বালতি টেনে টেনে দালান মোছার শব্দ। শুধু চায়ের পেয়ালার ঠুং-ঠাং শব্দটি নয়।

সব কাজ সেরে স্নানশুদ্ধ হয়ে তবে ও'রা চায়ের জল চাপাচ্ছেন।

ওই নিয়ে ধিক্কার দিলে দিদি উল্টে ধিক্কার দেয়, 'এতো যদি অতিষ্ঠ তো দোকানে গিয়ে চা খেয়ে এলেই পারিস। বিছানা ছেড়ে ওঠবার মুরোদ তো নেই। এদিকে—কাকে 'কা-কা' করবার আগেই বাবুর 'চা-চা'।'

দিদির কথাগুলো এতো কদর্য!

আশাপূর্ণা দেবী

কে বলবে দিদির তিরিশের বেশী বয়েস [illegible]।

বিধবা হওয়ার অহংকারে এই বয়সেই দিদি একটা ঢলঢলে সেমিজ আর কালো-পাড় ধুতি পরে বেড়ায়, আর মার থেকেও পাকা-পাকা কথা কয়, এবং শুচিবাই করে।

অথচ হেনার দিদি?

দেখলে বিশ্বাসই হয় না বিধবা। কী মার্জিত সাজসজ্জা, কী সুকুমার মুখ! মাঝে মাঝে হেনাকে ছেড়ে হেনার দিদিরই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে সমীরের। হেনা বলে হেনার দিদির বত্রিশ বছর বয়েস। কে জানে, সত্যি বলে না মিথ্যে বলে। মেয়েদের বিশ্বাস নেই, হয়তো সমীরের চিত্তে দিদি সম্পর্কে অনেকটা দূরত্ব বজায় রাখবার জন্যেই—

কিন্তু সমীর তো সমীরের দিদির বয়েস জানে। তিরিশের বেশী নয়। আর দিদির মুখটা খুব কুৎসিতও নয়। ইচ্ছে করে মুখটা কুৎসিত করে দিদি। বলে, 'এটা হোটেল-রেস্টুরেন্ট নয় যে, বাসিমুখে বাসি-কাপড়ে চায়ের জল চাপাবে লোকে। এটা হচ্ছে গেরস্তর বাড়ি!'

কবে যেন মা একটু ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল, 'ওর জন্যে রাত্তিরে একটু চা বানিয়ে ফ্লাস্কে করে রেখে দিলে বালাই চোকে।'

হ্যাঁ, ছেলের কথায় এইভাবেই কথা বলেছিল মা, 'বালাই চোকে'। তার মানে মেয়ের কাছে ছেলের জন্যে স্নেহ প্রকাশ করতে সাহস হয় না মার। মা জানে দিদি তার ওই ছোট ভাইটাকে দারুণ হিংসে করে। কারণ দিদির ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আর ওর ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ একেবারে সোনা দিয়ে বাঁধানো।

তাছাড়া মার নিত্যি রোগ, ওই কর্মিষ্ঠ মেয়েকে তোয়াজ করে না চললে চলবেই বা কেন?

চায়ের দোকানে গিয়ে চা খাওয়ার বাধা কি সমীরের শুধু আলস্য? অন্য বাধা নেই?

মুখটা বেজার করে প্যান্টের পকেটে হাত দিলে সমীর, খুচরো আনাকয়েক পয়সা আছে। কাল কি যেন একটা কিনতে দিয়েছিল মা, তার তলানি পয়সা ক'টা আর ফেরৎ দেয় নি সমীর। আজ এটা দিয়েই চলে যাবে। কিন্তু এ ক'টাই বা থাকে কই? উঃ বোঝা হয়ে গেছে এই জীবনে।

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পয়সা ক'টা যেন অনুভব করতে করতে চটিটা পায়ে গলাচ্ছিল সমীর, দিদি এসে সামনে দাঁড়ালো, দিদির গায়ে এখন আর সেই ঢলঢলে সেমিজটাও নেই, ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন ছোট ভাই বলে মানুষ নয় সে।

সমীর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চটি-টাকে ঠুকে নিল, পায়ে গলালো, আর ঠিক সেই সময় দিদি বোমা ফাটালো, 'সাত-সকালে চোঙা প্যান্ট পরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

এই একটা যে প্যান্ট নেই সমীরের, যার সামনে [illegible] দিয়ে দিয়ে বছরের পর বছর কাটাচ্ছে। তবু দিদি সুযোগ পেলেই ওই 'চোঙা' শব্দটা ব্যবহার করবে।

সমীর ওই বিদ্রূপ-বিকৃত প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না, দরজার দিকে এগোলো, কিন্তু দিদি কি এতো সহজে হার মানবে? দিদি বলে উঠলো, 'দয়া করে আজ যেন গেরস্তর বাজারটা করে দেওয়া হয়, বাবার শরীর ভাল নেই।'

বাজার করা কাজটা খারাপ হলেও খুব খারাপ লাগে না সমীরের। করতে পেলে মনে-মনে খুশিই হয়। কারণ সত্যি বলতে, বাজারের সূত্রেই দু'পয়সা পকেটে আসে। কিন্তু বাড়ির কর্তা ভদ্রলোক তো সহজে ওই অধিকারটি হস্তচ্যুত করেন না, নিত্য-নিয়মে সকালবেলা থলিটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, এবং সস্তা আক্রা বুঝে সওদাটি করে আনেন। নেহাৎ শরীর খারাপ হলেই—

কী হলো আজ!

ভাবলো সমীর।

কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না। আজ তার মেজাজটা বেশী খাপ্পা ছিল। তাই আজ সমীর জিগ্যেসটুকুও করলো না। সমীর হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললো। কড়াগলায় বলে উঠলো, 'আমার দ্বারা হবে না।'

'তোমার দ্বারা হবে না? চমৎকার!' দিদি মুখটা যতদূর সম্ভব অচমৎকার করে বলে, 'তবে তোমার দ্বারা কি হবে শুনি? শুধু চোঙা প্যান্ট আর ছুঁচলো জুতো পরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো?'

জীবনে একবার একটা সৌখিন জুতো কিনেছে সমীর, দিদি অহরহ সেই খোঁটাটি দেবে।

সমীর আরো চড়াগলায় বলে, 'হ্যাঁ, তাই হবে। আমার দ্বারা হবে না কিছু, হলো তো?'

আশ্চর্য! পকেটে ক'টা পয়সার জোর রয়েছে বলে চুপি চুপি একটু চা খেতে যাচ্ছিল, দিল মেজাজটা বিগড়ে। আর কী এমন চাহিদা আছে সমীরের, শুধু ওই একটু ভোরে ভোরে চায়ের চাহিদা ছাড়া? দাও না—সকাল ছটায় এক পেয়ালা চা দাও না তাকে, তারপর বাজারের থলিটা ধরিয়ে দাও হাতে, রোজই করে দেবে বাজার হাস্য-বদনে। তা তো নয়, ওই তুচ্ছ জিনিসটাই পরম দুর্লভ।

দিদি ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'বাবার শরীর খারাপ শুনেও এই কথা বললি তুই? বলতে মুখে বাধলো না?'

সমীর ওই কুৎসিত ভঙ্গীটার দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অনাদিপ্রসাদ। সদাগরি অফিসের চিরকেরানী অনাদিপ্রসাদ ঘোষ। সরকারি অফিস হলে এতো দিন কবেই সসম্মানে অবসরের রাস্তা দেখিয়ে দিতো, এখানে বয়সের অতো কড়াকড়ি নেই, কাজ করতে পারলেই দাম আছে। সেই দামেই তো এখনো এই সংসার টানছেন অনাদিপ্রসাদ।

স্ত্রী আছে, বিধবা মেয়ে আছে, সদা-রুগ্ন বেকার বয়স্ক ছেলে আছে, আরো দুটো নাবালক আছে। তা অনাদিপ্রসাদের সংসারে একা বেকার যুবক ছেলেটাই বা কেন, কে সদাক্ষুব্ধ নয়? ছেলে তো অগ্নিগর্ভ, মেয়ে সর্বদাই 'ক্ষণং দোহি', স্ত্রীর অহরহ ঘ্যান-ঘ্যানানি, এমন কি বারো চোদ্দ বছরের দুটো ধাড়ি ছেলে রাতদিন ঝগড়া করছে। ছেলে-বেলায় ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া অনাদিপ্রসাদরাই কি করেন নি? কিন্তু সে কি এই রকম? এরা যেন সর্বদাই আক্রোশে ফুলছে, কেউ কাউকে সইতে রাজী নয়। হয়তো এটা আশ্চর্য নয়, হয়তো এটাই যুগধর্ম।

তবে অনাদিপ্রসাদ এই যুগের মানুষ হয়েও অভিযোগহীন নির্বিকার। অনাদি-প্রসাদ যেন নিজের চারিদিকে একটি দুর্গ নির্মাণ করে তার মধ্যে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে দিয়েছেন। বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেলেও অনাদিপ্রসাদ প্রশ্ন করেন না 'কী হলো?' এমন কি তাকিয়েও দেখেন না। তখন হয়তো তিনি নিজের মনে গেঞ্জিতে সাবান লাগাচ্ছেন, অথবা জুতোয় কালি। হয়তো থলে থেকে বাজার বার করে গুছিয়ে গুছিয়ে সাজিয়ে রাখছেন সব জিনিস আলাদা করে, হয়তো বা থলে হাতে বেরিয়ে পড়ছেন।

সমীর বলে, মানে—অবশ্য আড়ালে বলে, 'ক্যালাস্। ক্যালাস্। আজন্ম কেরানীগিরি করে শরীরের সব রক্ত বরফ-জল হয়ে গেছে।'

তা আড়ালে না বলে সামনে বললেও কিছু এসে যেত না। শুনলেও অনাদিপ্রসাদ নির্বিকার ভঙ্গতে হয়তো দড়ি থেকে আসনটা পেড়ে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে পেতে নিয়ে বসে বলতেন, 'হয়েছে নাকি?'

এই ধরনেরই কথা অনাদিপ্রসাদের টুকরো টুকরো ছোট ছোট।

আজও সেই অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাজারের থলিটা পেরেক থেকে পেড়ে নিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কাঁচা লঙ্কা আছে? লেবু লাগবে?'

মেয়ে, যার নাম নাকি দীপালী, সে এই শীতের সকালেও সেই ভিজে কাপড়েই নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে ঝাঁজালো গলায় বলে ওঠে, 'কাল না তোমার বুকে ব্যথা হয়েছিল বাবা? তবু আজ বাজার বইবে?'

অনাদিপ্রসাদ বলেন, 'কাল হয়েছিল আজ নেই।'

'চা না খেয়েই বেরিয়ে যাচ্ছো?'

'আসছি এখুনি, হোক তোদের।'

বেরিয়ে যান ছেঁড়া চটিটা পায়ে দিয়ে এখানে জলজ্যান্ত একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন দেখতেই পান না।

অসহ্য এই উপেক্ষা।

এর চাইতে যদি অনাদিপ্রসাদ ছেলেকে বকতেন, 'কেন পারবে না তুমি সংসারের একটা কাজ করতে?'...অনেক ভালো ছিল সেটা। কিন্তু না, ছেলেকে তিনি কোনো সময়ই বকেন না, যেন কোনো প্রত্যাশার প্রশ্ন নেই তাঁর ছেলের কাছে।

তবু বেরিয়ে গেলেন, কেন সমীরের গালে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে।

সেই চড়খাওয়া জবালা নিয়ে সমীর গলায় বলে, 'আমি না হয় খুব খারাপ , শিশিরবাবু পারেন না একটা দিন র করে দিতে —খাড়ি ছেলে?'

সমীরের মা উনুনে আগুন দিয়ে ধোঁয়া তে রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে এসে বলেন, 'ওদের যে পরীক্ষা বড় ভাই হয়ে সে খবরটাও তো না। সারা দিন আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে, পড়াটা একটু দেখলেও কাজ হতো।' মার কণ্ঠস্বর নীরস-বিরস।

ইদানীং মা কদাচ সমীরকে 'তুই' করে বলেন। যেন ওই 'তুমি'র ধাক্কায় করে দূরত্বের সৃষ্টি করেন।

মরুকগে—তাতে কোনো ক্ষতি নেই র, সমীর নিজেই জানে সে তোমাদের র মানুষ নয়, সে বহু দূরবর্তী অন্য গ্রহের জীব। শুধু কোনো এক কুগ্রহের ত তাকে তোমাদের সঙ্গে এক ছাদের থাকতে হচ্ছে, এক হাঁড়ির ভাত খেতে।

অতএব মা দূরত্ব সৃষ্টি করলে সমীরের এসে যাবে না। বরং মার সেই গায়ে পড়ে—'সমীর, তুই কী হয়ে যাচ্ছিস রে না!...সমীর, তোর জন্যে আমার খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।...সমীর, অগ্রাহ্য করিস কেন বল তো?...... উঠে পড়ে লেগে একটা চাকরী বাকরি —' এসব কথা বলা বন্ধ হয়েছে বলে বেঁচেছে।

অতএব সমীর ভাইদের পরীক্ষার খবর র জন্যে কিছুমাত্র লজ্জিত হল না। ক্ষণপূর্বে বাবা ঘটিত কারণে যে ভাবটুকুর সঞ্চার হয়েছিল সেটা গেল তার।

অতএব সমীর 'ওসব পড়ানো-ফড়ানো আমার হবে না' —বলে দরজাটা দমাস বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দরজার ওপার থেকে দিদির খর-গলার মিষ্টবাণী শোনা গেল, 'চায়ের এসে না পড়লে আর একবার কেউ তে বসতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।' দিদির গলা মোড় পর্যন্ত যায়।

সম্পর্কে যে সমীরের একটু দুর্বলতা সেটা বুঝে ফেলেই বোধকরি দীপালী নিয়েই এতো কূটনীতি খেলে।

অথচ—পুরনো কথা সমীর মনে রাখতে সে না তাই, নইলে বলতে পারতো, আগে সমীর যখন পড়ুয়া ছেলে ছিল, র চায়ের আবদার করতে কুণ্ঠা ছিল, দিদিই সেধে-সেধে বলতো, 'সমীর-ভাই, বি? চুপি-চুপি একটা কাজ করতে? চা খাওয়াবো।...সমীর, এই চা তার বদলে একটা কাজ—'

কাজ আর কি, জামাইবাবুর কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া।

সমীরের কলেজের কাছে জামাইবাবুদের বৃহৎ পরিবার তারা। এপাড়া থেকে রোজ-রোজ নতুন বৌয়ের চিঠি নাকি হাসির হুল্লোড় পড়ে যেতো সে। তাই দূতের হাতে পত্র।

আশ্চর্য! জামাইবাবুটার অমন দুম করে মরে যাবার কী দরকার ছিল?

দরকার আর কিছুই নয়, সমীরের জীবন বিষময় করে তোলা। ওই দিদিটার অমন বিশ্রী সাজ করে দাপিয়ে বেড়ানো দেখে দেখেই বাড়িটা যেন আরো নিমপাতা হয়ে গেছে সমীরের কাছে। মা-ও যেন মেয়েকে পৃষ্ঠবল পেয়ে বদলে গেছে।

কিম্বা মেয়ের ভয়ে।

সিতাংশু বসে বসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কাঁচের গ্লাশে চা খাচ্ছিল।

সমীর বেঞ্চের একপাশে বসে পড়ে বললো, 'ক' গ্লাশ হলো?'

'কোথায়?' সিতাংশু তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'ট্যাঁক তো মা-ভবানী! এই এক গ্লাশই চাখছি বসে বসে। বাড়িতেও তো দু-চারবার হবার জো নেই। বৌদি রেশনের চিনির ওজন শোনায়।'

সমীর চায়ের আর টোস্টের অর্ডার দিয়ে পাটা টান-টান করে বসে বলে, 'এই দিদি-বৌদিগুলোই হচ্ছে যত নষ্টের মূল।'

'ফাদাররাও কম নয়।' সিতাংশু বেজার মুখে বলে, 'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাজারের থলিটি আঁকড়ে থাকতে চায়। এই যে এক্ষুনি দেখলাম তোর ফাদারকে, চলেছেন থলিটি নিয়ে। কর্মক্ষেত্রেও ওই একই অবস্থা, হ্যাংলা বুড়োরা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত চেয়ার আগলে বসে থাকতে চায়, একসটেনশানের পর একসটেনশান।' অতএব আমরা হতভাগারা ইয়ং জেনারেশনরা বুড়ো আঙুল চুষছি। 'পকেট মানি' বলে মা পাঁচটা টাকা দেয় মাসে, তাতে ক'দিন চলে বল? মিছিমিছি করে বলি চাকরি খুঁজতে যাচ্ছি বাসভাড়া লাগবে—'

সমীর তিক্ত হয়। বলে, 'দূর এসব উঞ্ছবৃত্তি আর ভাল লাগে না। ইচ্ছে হয় কোথাও চলে যাই।'

'চলে? হুঃ! কোথায় যাবে যাদু? কে কোথায় তোমার জন্যে বাড়াভাত আর পাতা বিছানা নিয়ে বসে আছে? বাড়িতে তবু ওদুটো এখনও জুটছে।'

'তার সঙ্গে হুলও জুটছে।'

'আরে বাবা সে তো জুটবেই। বেকারকে কে আর করে জামাই-আদর করে? তবে হ্যাঁ সেকালে জন্মালে মন্দ হতো না। 'কুলিন' হয়ে গ্রামে গ্রামে তিনশো পঁয়ষট্টিটা শ্বশুর-বাড়ি করে রেখে দিতাম, রোজ এক এক জায়গায় জামাই-আদর। তার সঙ্গে আবার ফাউ একটি—' কথাটা শেষ না করেই সিতাংশু একটা অসভ্য ভঙ্গী করে।

সমীরের চা-টোস্ট এসে গিয়েছিল।

সমীর সেটা টেনে নিয়ে বাঁ-হাতে টোস্টটায় কামড় দিয়ে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গরম গ্লাশটা ধরে এক চুমুক দিয়ে বলে, 'তুই কুলিন বামুনের ছেলে, তোর ওসব সেকালের স্বপ্ন দেখা পোষায়। আমার সেকাল-একাল সবকালই স্বপ্নহীন মরু-ভূমি! সমস্ত পৃথিবীটাই পচে-গলে ঘেয়ো কুকুর হয়ে গেছে।'

'তা মাঝে মাঝে তাই মনে হয় বটে—' সিতাংশু প্যান্টের পকেটে একবার হাতটা ঢুকিয়ে খুচ্-খুচ্ শব্দ তুলে বলে, 'ওহে আর এক কাপ হোক—' তারপর বন্ধুর দিকে তাকায়, 'কিছু মনে করিস না ভাই, দু'কাপের মতন নেই।'

'মনে করা-টরা অনেক দিন ভুলে গেছি।'

সমীর উঠে পড়ে।

'চললি?'

'হুঁ।'

'কোথায় যাবি?'

'জাহান্নমে।'

সিতাংশু জিভে একটা চুক-চুক শব্দ করে বলে, 'সত্যি? ঠিকানা জানিস? আমায় দিয়ে যা না ভাই—ঠিকানাটা। রাস্তা চিনিনে বলে যেতে পারছি না।'

'আরে দূর! আমিই কি চিনি! মুখটা থাকায়, 'ভদ্দরলোক' হয়ে ওকুল দুকুল গেছে আমাদের।'

গুনে গুনে পয়সা দিয়ে দেখে তিন নয়া পয়সা পড়ে থাকছে, সে আঙুলে টোকা দিয়ে আকাশে ছুঁড়ে মেরে ফাঁকা দু'পকেটে ঢুকিয়ে লটপট করতে করতে এগি রাস্তায়।

অনাদিপ্রসাদের একটা কাটা আছে, বাজার ফেরৎ খুচরো পয় কৌটোয় ফেলেন। কিন্তু সে হিসেব থাকে অনাদির। কৌটোর ছোট্ট এক টুকরো খাতা আছে, তা মেরে বাজারের হিসেব লেখেন আ লেখেন ফেরৎ সাত নঃ, ফেরৎ দশ ন ফেরৎ নাই।

এইভাবেই সারাজীবন হিসেব চললেন অনাদিপ্রসাদ। আক্ষেপ অসন্তোষ নেই, অভিযোগ নেই, নেই, অদ্ভুত এক ভাবশূন্য মানুষ

কিন্তু সত্যি কি ভাবলেশ-শূ

তবে মনে মনে অত কথা ব করে সদাগরি অফিসের চিরকেরানী প্রসাদ ঘোষ।

আমি কি করবো? আমি কি পারি? আমি তো দেখে-শুনেই ভ দিয়েছিলাম তোমার। তোমার সইলো না সে দোষ কি আমার? তোমার ভাসুর-দ্যাওর বিরাট এ পরিবার, পড়ে থাকলে নিশ্চিত ত তুমি থাকলে না পড়ে, আমার ঘ বসাতে এলে। এসো, আমি কিছু করিনি, তবু তুমি রাত-দিন নাগিন ফুঁসে বেড়াচ্ছো। তোমার ও জন্যে আর আমি কোথায় পাবো? তুমি একবার 'জীবন' জোগাড় করতে করো। আমি আপত্তি করতে য কিন্তু আরও একবার পাত্র খুঁজে বিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তে বিয়ের দরুনই দেনা শুধছি এখনো বড় ছেলেটি যখন তখনই ও-কথা কিনা! 'দিদির আর একবার বিয়ে উচিত ছিল আপনার।'

আমার কি কি উচিত ছিল, সে তো শুনেই চলেছি জীবনভোর।

ইস্কুলে পড়তে পড়তে বাবা ম কোনো মতে ম্যাট্রিকটা পাশ করে খুঁজে বেড়িয়েছি, হিতৈষীরা 'অন্ততঃ বি.এ'টা পর্যন্ত পড়া উ তোমার, গ্র্যাজুয়েট না হলে এ বা

আমি অকালে মরিনি। আমি থেকে ছেলেকে গ্র্যাজুয়েট করেছি বলে, 'বসে বসে বি এ পাশ না ছেলের জন্যে আর একটু ভাবা উ আপনার। কোনো একটা 'লাইন' চিন্তা করেন নি আপনি আমার জন পাশ করিয়ে ছেড়ে দিয়ে ভাবলে কর্তব্য সারা হলো। ছেলেকে দাঁ

রা অনেক কিছু করা উচিত।'
চুপ করেই থাকি।
তোমাদের 'উচিত' শিক্ষা দিতে
আমি একথাও বলতে যাই না,
। দাঁড় করিয়েছে?'
যখন মাত্র পঁচাশী টাকা আয়,
লেলো, 'তোমার মার এতো শরীর
মার এখন বিয়ে করা উচিত।'
ই উচিত কর্ম। তার প্রতিফল-
চত কথা শুনে চলেছি।
ছোট ছেলে দুটোও বলে, 'তাদের
ার রাখা উচিত।' আমি শুনতে
ুনে কি করবো? যাকে 'মানুষ
ম' ভেবে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম,
না সিগারেটের খরচা জোগাতে
ষ্ট মারছে। ও যে আমার জ্যেষ্ঠ
ঝি সেটাই তোমার জ্বালা! সেই
আগুনেই খাক্ হচ্ছো তুমি
কিন্তু—তার জন্যে আমি ।ক
ামি তো তোমায় হাজার দু'হাজার
রাতে বারণ করিনি। নিঃসম্বল
মন হতে পারে সে দৃষ্টান্তরও
ই। তুমিও হতে পারতে সে
কেটে পয়সা এলেই তোমার সব
৷ হয়ে যেতো। কিন্তু সে ক্ষমতা
মার। 'সামান্য' চাকরী করার
স্টিজ হানি, 'অসামান্য'টি কে
য় তা জানি না। তোমাদের এই
তো খারাপ হয়ে গেছে, তার
ী কি আমি? তোমাদের যে
র শূন্য, অথচ আশা এতো উচ্চ,
বা কি করতে পারি আমরা?
তা উচ্চ আশা ছিল না, কোনো-
থবীর মাটিটা আঁকড়ে ধরতে
ই চরম পাওয়া মনে হতো, তাই
কোনো দিন আমাদের পচাগলা
ারের মতো লাগতো না। (যো
াগে।) আজও লাগে না।...আমি
আমার ক্ষমতাই আমার ভাগ্যফল।
ান এমন অসংখ্য কথা বলে
াদিপ্রসাদ। বলতে গেলে সারাক্ষণই
। কিন্তু অনাদিপ্রসাদের মুখ
বোঝা যায় না। মুখ দেখে তার
বলে, 'ক্যালাস্! ক্যালাস! চির-
াগিরি করে করে সব রক্ত বরফ

লে যখন বাড়ি ঢুকলো তখন
আসন পেতে খেতে বসবার
রছেন। বসে পড়েননি ছেলে
কা দিতে যাচ্ছে বলে। বাপকে
বেরোবে। যেমন সমীরও

ী খিঁচড়ে গিয়েছিল বলে
দিষ্টকাল পথে পথে না ঘুরে
। এসেছিল। ভাবতে ভাবতে
হা তো বুকে ব্যথা নিয়ে তেজ
বইতে গেলেন, কে জানে কি
ছ বাড়িতে।
দেখলো যথারীতি অফিস যাবার
রূপ আসন পাতা, আবার

ছেলেরা ভক্তি ভরে প্রণত। দেখে আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল। বাপের জন্যে যে একটু চিন্তিত হয়েছিল, তার জন্যে মনে মনে নিজেকে 'বুদ্ধু উজবুক উল্লুক' বলে গাল দিল সমীর। তারপর বিদ্রূপের গলায় বলে উঠলো, 'রঙ্গমঞ্চে এটা কি নতুন নাটক হচ্ছে?'

দীপালী বাপের ভাতের থালাটা নামিয়ে দিচ্ছিল। সেটা হাতে করেই ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠলো, 'কেন জানিস না, ওদের পরীক্ষা চলছে?'

'ও আই সি! পরীক্ষা! গ্র্যাজুয়েট হবার জন্যে সোপান গাঁথা হচ্ছে। অর্থাৎ আর দু'খানি ভবিষ্যৎ 'বেকার' তৈরি হচ্ছে।'

ছেলে দুটো বেরিয়ে গেল।

দীপালী ভাতের হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে কড়া গলায় বলে উঠলো, 'অলক্ষুণে ডাক ডাকছিস কেন শুনি? সবাই যে তোর মতন আড্ডাবাজ বেকার হবে, তার মানে আছে?'

সমীর দেখলো বাবা কোনোকথা বললেন না। যথারীতি আসনে বসে গেলা-সের জলে হাত ধুলেন, ধোয়া হাত দুটো জোড় করে কপালের কাছে এনে কাকে যেন প্রণাম করলেন, তারপর ভাতে হাত দিলেন। জ্ঞানাবধি এই দৃশ্য দেখে আসছে সমীর, কোনোদিন এর ব্যতিক্রম হতে দেখেনি। পৃথিবী রসাতলে গেলেও ওই মহাপুরুষ ব্যক্তিটি ভাত খাবার আগে কপালে হাত জোড় করে তবে ভাতে দেবেন! অসহ্য! অসহ্য এই স্তিমিত শান্তির চেহারা!

সমীর সেই অসহ্যর দাহটা প্রকাশ করলো। চিরকাল দেখা দৃশ্যটারই নতুন করে সমালোচনা করলো, 'ওটা কী হলো বাবা?'

অনাদিপ্রসাদ বোধহয় 'বাবা' সম্বোধনটার একটু চমকে গেলেন। যেন মনে হলো একটা ভুলে যাওয়া শব্দ হঠাৎ কানে এসে বাজলো তাঁর। চোখ তুলে বললেন, 'কোনটা?'

'ওই যে করযোড়ে প্রণাম।'

'ওঃ ওইটা! কিছু না—একটা পুরনো বদভ্যাস।'

অনাদিপ্রসাদ ভাত ভেঙে ডালের বাটিটা উপুড় করলেন।

সমীর দেখলো, ওই ডালটা ছাড়া পাতে আর একটা মাত্র চচ্চড়ি জাতীয় তরকারি বিরাজিত। মাছ উনি আনেন বটে, কিন্তু সেটা একবেলার মতো। তিনি সকালে খান না। রাত্রে তরিয়ে তারিয়ে খাবার জন্যে তুলে রাখতে বলেন।

অতএব সকালে শুধু ডাল চচ্চড়ি আর আলু ভাতে।

সমীর দেখলো সেই খাওয়াতেই বাবার মুখে পরম পরিতৃপ্তির ভাব। সমীরের ওই পরিতৃপ্ত মুখছবির দিকে তাকিয়ে ঘৃণা এলো। সমীর বিদ্রূপের গলায় বলে উঠলো, 'ওই পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন অন্নের থালা'র জন্যে পরম কারুণিক শ্রীভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন বুঝি?'

অনাদিপ্রসাদ থালাটা সাফ করতে করতে শান্ত গলায় বলেন, 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের অভাবটা আমার অক্ষমতা। কৃতজ্ঞতাটা জানাতে হবে বৈকি।'

সমীরের ওই শান্ত কণ্ঠ শুনে ঘাড়ে খুন চাপে। সমীর ব্যঙ্গ-তিক্ত গলায় বলে ওঠে, 'অক্ষমতা! ওঃ! 'অক্ষমতা' সম্পর্কে তাহলে চেতনা আছে আপনার। শুধু 'সংসার' বাসনার সময় সে চেতনাটা আসেনি। আসেনি 'সংসার' বাড়াবার সময়।'

সমীরের মা এই শীতের দিনেও যথারীতি স্বামীর খাওয়ার কাছে পাখা নিয়ে বসে ছিলেন, এবং এতোক্ষণ নীরবই ছিলেন। এখন হঠাৎ চমকে উঠে বলেন, 'কাকে কি বলছিস তুই?'

চমকে গিয়েই 'তুই' করলেন তিনি ছেলেকে।

কিন্তু সমীরের আথায় আগুন জ্বলছে। সমীরের ঘাড়ে খুন চেপেছে। সমীরকে এই 'পারিবারিক সুখছবি' জল-বিছুটি দিচ্ছে। সমীর জানে বাবা ওই থালাটা চেটে পুটে সাফ করে উঠে, ধুতির ওপর কোট পরে, আর তার উপর জরাজীর্ণ মটকার চাদরটি চাপিয়ে তালিমারা জুতোয় পা গলিয়ে অফিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হবেন, এবং মা এখনো নবোঢ়া বধূর মতো পান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাবা যখন পানটা নেবেন হাত বাড়িয়ে, কুঁচকে যাওয়া মুখ আর ঝুলে পড়া দাঁত নিয়েও মা একটু মুচকি হাসবে। তারপর অকা-রণেই বলবে 'ফিরতে দেরী হবে না তো?'

জীবনে কখনো বাবার অকারণে ফিরতে দেরী হয় না, চন্দ্র সূর্যের মতই অমোঘ নিয়ম বাবার, তবু ওই ফালতু কথাটা বলা চাই মার।

বাবাও বলবে একটা ফালতু কথা, 'না দেরী হবে কেন!'

তারপর বেরিয়ে যাবে।

মা খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। এ সবই মুখস্থ সমীরের।

তাই সমীরের এদের প্রতি করুণা।

এদের প্রতি ঘৃণা।

এখন সমীর সেই ঘৃণা আর খুন চাপা গলায় বলে উঠলো, 'ঠিকই বলছি। বলছি—ক্ষমতার পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান এতো টনটনে তখন গোটা ছেলে-মেয়েকে পৃথিবীতে আনবার কার ছিল না ও'র। ভালভাবে মানু[illegible] বার ক্ষমতা না থাকলে—'

অনাদিপ্রসাদ জলের গ্লাসটার পর্যন্ত নিঃশেষ করে রোয়াক উঠোনে নেমে আঁচাতে গেলেন।

সমীরের মা ক্রুদ্ধ গলায় 'খারাপইবা কি করেছেন শুনি। পাশ করিয়েছেন তোমাকে।'

'ওঃ তাই বটে! তাহলে তো [illegible] করেছেন। কিন্তু ও দুটোকে [illegible] পেরে উঠবেন না, যারা ঘটা করে ওঠার পরীক্ষা দিতে গেল। ওদে[illegible] পাশ করাবার আগেই পৃথিবীর [illegible] চুকিয়ে বসবেন খুব সম্ভব। তারপর কি হবে ওদের? আমি [illegible] হচ্ছে পাপ, অসংযম, চরি[illegible] নামান্তর।'

বলে ফেলে অবশ্য চুপ করে[illegible] সমীর।

হয়তো এতোটা বলবার ইচ্ছে[illegible] তার। কিন্তু মাথায় খুন চাপলে[illegible] থাকে আঘাতটা কতো জোর হ[illegible]

জোর একটু বেশীই হয়ে [illegible]

সমীরের মার চীৎকারেই [illegible] হলো। আচমকা মাথায় থান ই[illegible] মতই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, [illegible] কী বললি? এতো বড় কথাটা [illegible] ও'কে?......বলি ওগো—ছেলের [illegible] কথা শুনেও চুপ করে থাকবে [illegible] বলবে না ওকে?'

অনাদিপ্রসাদ আঁচিয়ে এসে [illegible] টাঙানো গামছাখানা টেনে নিয়ে[illegible] ছিলেন, অভ্যস্ত নিয়মে প্রত্যে[illegible] শুকনো করে মুছতে মুছতে [illegible] আর বলবো বল? নিজের লজ্জা[illegible] আছি ওর কাছে।'

'লজ্জা। ওর কাছে তোমার [illegible]

সমীরের মা বিস্ময়ের আ[illegible] ভাসেন।

অনাদিপ্রসাদ গামছাটি প[illegible] করে ফের দাঁড়তে ঝুলিয়ে রে[illegible] 'তা লজ্জা বৈকি। ও জে[illegible] গ্র্যাজুয়েট ছেলে, এই ভাবে ঘ[illegible] বেড়াচ্ছে। আর আমি একটা ম[illegible] এই একষট্টি বছর বয়সেও [illegible] অফিসের ভাতটি খেয়ে দশটা [illegible] করছি, এতে ওর কাছে আমার [illegible] যায় না? বুঝি তো ওর জ্বাল[illegible]

অনাদিপ্রসাদ ধুতির উপ[illegible] চাপিয়ে তার উপর জরাজীর্ণ [illegible] ঝুলিয়ে তালিমারা জুতোর [illegible] বেরিয়ে যান, যেন সমীর নামে[illegible] নস্যাৎ করে দিয়ে।

একটা কাঠি ফুরনো ধ[illegible] বাকসের মতো দাঁড়িয়ে থাকে [illegible]

ুনিয়াখানা যৌবনের বশ।

াক বুড়ো প্রায়ই আক্ষেপ করত, আর
কেন ভায়া, দুনিয়া তার যৌবন যার।
ছলেবেলায় এই যৌবনটির জন্য
র ভেতরে একটা লোভনীয় প্রতীক্ষা
বোধহয় সকলেরই থাকে। কিন্তু
র বেড়া বাঁধা এই রম্য বাগিচায় পা
র পর তার অনেক চটক চোখে পড়ে
াই হোক, ওই দুর্লভ গন্ডীর মধ্যে
কালে তার মহিমা সম্পর্কে আমি
অন্তত খুব সচেতন ছিলাম না।
...ক্রমে প্রৌঢ় ব্যবধানে সরে আসার পর
আবার সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখছি,
ন চটকদার বস্তু বটে। শুধু তাই নয়,
য়ার্লড ইজ্ ফর দি ইয়ং—সেই বুড়োর
র, দুনিয়া তার যৌবন যার।
এক নামজাদা দার্শনিক বলে গেছেন,
ন অনেক সময় কান্ডজ্ঞানশূন্য, কিন্তু
কদাপি ধী-শূন্য নয়। সর্ব কৃত্রিমতার ওপর তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—সে ধোঁকা
বা ফাঁকি ধরতে জানে। কিন্তু আজকের বাস্তব দুনিয়ার দার্শনিক এই বাসি প্রসঙ্গ
নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবেন কিনা সন্দেহ। তিনি বরং উত্তর-যৌবন সম্পর্কে কিছু
দর্শন বচন শোনাতে পারেন। কারণ এ যুগের এটাই বড় সমস্যা।

কেন?

কারণ, দি ওয়ার্লড ইজ ফর দি ইয়ং। যৌবন যার দুনিয়া তার। এতে দ্বিমত
কেউ নয়।

অতএব আজকের দার্শনিক বলেন যদি কিছু, যৌবনের বদলে সম্প্রসারিত
যৌবনের কথা বললেন। অর্থাৎ কাল ফুরালেও যে যৌবনের বহিরঙ্গ অনেক কাল
পর্যন্ত অটুট রাখা যায়—তার কথা। আর বলবেন বোধ হয় একেবারে উল্টো কথাই।
বলবেন, টেনে বাড়ানো এ যৌবন ধী-শূন্য যদি বা, কান্ডজ্ঞানশূন্য কদাপি নয়।
সর্ব কৃত্রিমতা আড়াল করার প্রতি তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—ধোঁকা আর ফাঁকি
তার একমাত্র পুঁজি।

খবরের কাগজে সেদিন একটা কার্টুন দেখে আপনারা অনেকে হাসাহাসি
করেছেন জানি।...এক ভিড়ের ট্রাম থেকে একজন মহিলা নেমে যাচ্ছেন, তার চুলের
(পরচুলের) বোঝা এক ভদ্রলোকের ছাতায় আটকে আছে, আর ভদ্রলোক তাঁকে
চেঁচিয়ে ডাকছেন, ও ম্যাডাম, আপনার সব চুল যে আমার ছাতায় আটকে থাকল, নিয়ে
যান, নিয়ে যান!

যাঁরা হেসেছেন তাঁরা হেসেছেন, কিন্তু আমার ধারণা, যদি কোনো ম্যাডামের
বরাতে অমন দুর্দৈব ঘটেই, তাঁর পুঁজি খোয়ানোর দুঃখে আজকের দিনে কাঁদবার
লোকেরও অভাব হবে না।

যাক, আমি কোনো গুরু-গম্ভীর তত্ত্ব বিস্তারে বসিনি। যৌবন আগলে
রাখার প্রেরণা বা তাড়নার বহু বিচিত্র নজির সকলেই হামেশা দেখছেন। অবকাশ সময়ে
আমিও দেখি। আমার দেখার রঙ্গপট একটি হাল-ফ্যাশানের চুলছাঁটার সেলুন। নাম
প্রসাধনী। প্রসাধনীর হেড কারিগর যে, মালিকও সেই। নাম অমল, বয়েস এখন
তিরিশ-বত্রিশ হবে। চৌকস চটপটে ছেলে। আমি তাকে গত বারো বছর ধরে দেখছি।
তখন বাড়িতে এসে চুল ছেঁটে দিয়ে যেত। নিজের উদ্যমে দোকান করেছে, তারপর

ক'বছরের মধ্যে সেটাকে এমন ঝকঝকে করে তুলেছে। আশপাশের দুটো সেলুন কমপিটিশনে টিকতে না পেরে উঠে গেছে। তাদের বাছাই করা তিনটি কারিগর প্রসাধনীতে কাজ পেয়েছে। অমলের আশা অদূর ভবিষ্যতে সেলুনটাকে সে এয়ার কণ্ডিশন করে ফেলতে পারবে। আর, তার একটা বড় খেদ, এ লাইনে একটিও দিশি মেয়ে কারিগর মেলে না। তাহলে আলাদা একটু পার্টিশন করে মেয়েদের ব্যবস্থাও রাখত। দোকান জমজমাট হত তাহলে। এ তো আর সাহেব-পাড়ার দোকান নয় যে মেয়েরা এসে পুরুষ কারিগরের হাতে চুলের বোঝা ছেড়ে দেবে। —মেয়েরা না থাকলে কোনো ব্যাপারই ঠিক কমপ্লিট হয় না, কি বলেন সার?

ওর হাত যেমন চলে, রসালো জিভখানাও তেমনি অবিরাম নড়ে। আমাকে দেখলে আরো বেশি নড়ে। গল্প উপন্যাস লিখি ও জানে। একটু-আধটু পড়েও। তাই দেখামাত্র অন্য খদ্দেরদের শুনিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তারপর সোৎসাহে বলে, আপনার অমুক লেখাটা পড়ছি সার। ওমুক বইটা খুঁজছি, বা, আপনার ওমুক ছবিটা দেখলাম, হাই ক্লাস!

গোড়ায় গোড়ায় বিড়ম্বনা বোধ করতাম, বিরক্তও হতাম। কিন্তু ও সেটাও খুব সহজেই বুঝত। তাই ফাঁক পেলেই গলা খাটো করে বলত, কিছু মনে করবেন না সার, এরকম বললে আপনার তো কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমার বড় উপকার হয়—কতজন এসে আপনার কথা জিজ্ঞেস করে আপনি জানেন না সার।

প্রসাধন-কলা ছেড়ে তোষামোদ-কলাতেও লোকটা যে কম পটু নয়, এ বোধহয় ওর শত্রুও স্বীকার করবে।

ওর বচনের জ্বালায় হোক বা ভিড় এড়ানোর জন্যে হোক, ইদানীং প্রতি মাসে আমি রাত্রের নিরিবিলিতে আসি। তখনো যে খদ্দের একেবারে থাকে না এমন নয়, তবু অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। যাই হোক, এখান থেকেই মানুষের যৌবনপ্রীতির অনেক সকৌতুক নজির আমি দেখেছি। আর, এই দেখাটুকু লক্ষ্য করেই অমল খদ্দেরদের অনেক মজাদার কাণ্ডকারখানা আমাকে শোনায়। এই নিয়ে আমি একবার একটা হাসির গল্প লিখেছিলাম। এরপর থেকে ওকে আর পায় কে। রসদ যোগাবার তরল আনন্দে ও আপনা থেকেই মুখর হয়ে ওঠে।

সেদিন রাত ন'টা নাগাত গিয়ে দেখি অমলের দোরে ঝকঝকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভিতরে অমল অপরিমিত মনোযোগ সহকারে এক শৌখিন ভদ্রলোকের চুলে কলপ লাগাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, শাদা চুল পরিপাটি ভাবে তকতকে কালো করাটাও প্রসাধনীর এক বড় আকর্ষণ। অমল বলে, এ কাজে ও স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিয়েছে। চুল কালো করার মাশুল দু-টাকার থেকে পাঁচ টাকা—অর্থাৎ খদ্দের বুঝে যেমন আদায় করা যায়। ব্যাপার লক্ষ্য করেছি প্রায় একই, শুধু একটু যত্ন-আত্তি আর তোষামোদের যা তফাত।

ভদ্রলোককে দেখে আর অমলের সুতৎপর তন্ময় মনোযোগ দেখে বুঝলাম, পাঁচ টাকার খদ্দের তো বটেই, বেশিও হতে পারে। ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। মোটামুটি সুপুরুষ। হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে মুক্তো ব[illegible] আংটি, জামায় হীরের বোতাম।

ভদ্রলোকের চুল কতটা শাদা [illegible] বোঝা গেল না। কারণ, কলপ-[illegible] প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন [illegible] করছে, সেটা বাড়তি। স্ফীত অ[illegible] প্রাপ্তির আশা তার। আমা[illegible] চোখের ইশারায় একটু অপে[illegible] বলল, এবং অন্য কারিগর অ[illegible] এগিয়ে আসতে ইশারায় তা[illegible] করল। অর্থাৎ, হাত খালি হলে[illegible] কাজ ধরবে। বুঝলাম, আমাকে [illegible] মতই কিছু রসদ তার কাছে জম[illegible]

আরো মিনিট দশেকের মধ্যে কেশ-বিন্যাস শেষ। অমল তাড়া[illegible] গিয়ে পুশ-ডোর ঠেলে দাঁড়া[illegible] একটু বাড়তি সম্ভ্রম দেখালো[illegible] পকেট থেকে বড়সড় মানি-ব্যা[illegible] করতে পুশ-ডোরের ওধারে চ[illegible]

দরজা ঠেলে অমল [illegible] আসতে দেখি চাপা খুশিতে [illegible] ডগমগ করছে। হাতের দশটাকা[illegible] ভাঁজ করে কাঠের বাকসে রাখ[illegible] সামনের দেয়াল-ঘড়িটার দিকে [illegible] একবার। তারপর দ্বিতীয় [illegible] বলল, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, [illegible] আর কেউ আসবে না, তুমি যাও[illegible]

আমার গলায় বুকে কাপড় জড়িয়ে চিরুনি কাঁচি হাতে পি[illegible] দাঁড়াল।—সার, এই যে ভদ্রলোক গেলেন ...চিনলেন?

কাঁচি চলছে, মাথা নাড়ার উ[illegible] বললাম, না।
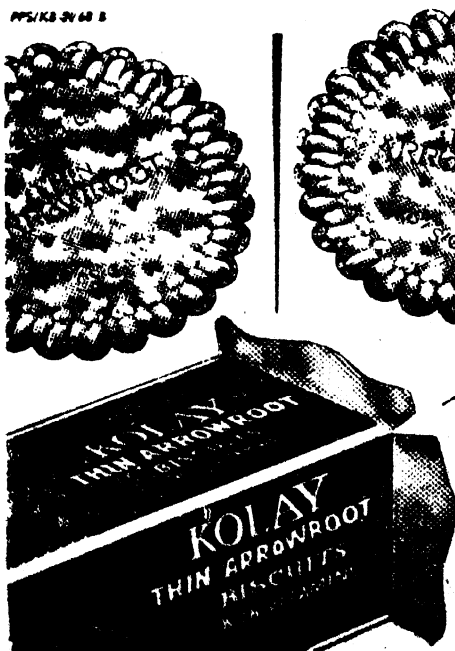
...ছে লোক, আপনার তো চেনার ...জগদ্ দত্ত...থিয়েটার কোম্পানীর

...টা চেনা। ওই রাজ্যের মস্ত লোকই ...আমার খদ্দের হয়েছেন?

...া. দুমাস ধরে। পাকা হাতের ...সে একবার লাগালেই চলে, কিন্তু ...নর দিন অন্তর অন্তর আসছেন— ...সে চারবার এলেন।

...ম নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম, কেন, ...বেশি শাদা?

...দাই বটে, তবে ভয়ে আর ...ত ভেতরটা আরো বেশি শাদা, ...

...র বিশ মিনিটের মধ্যে বুঝতে আর ...কি থাকল না। অমল বেশ রসিয়ে ...চুলের ভয় আর অশান্তির ...র বিস্তার শুরু করল। তার সার ...গদ্ দত্তের বয়েস এখন ষাট ছুঁয়েছে। ...টে বাড়ি তিনটে গাড়ি আর অঢেল ...অবস্থাজনিত আনুষঙ্গিক গুণো- ...আছে। তার মধ্যে একটি সাত্ত্বিকারের ...অস্বীকার করা যায় না। নিজের ...ছোট ভাই আছে, নাম সুবল দত্ত— ...কুড়ি বছরের ছোট তাঁর থেকে। ...টিকে বাপের মত মানুষ করেছেন ...ভাই ভালবাসেন তাঁকে। বিষম ...ধন প্রিয়বালা আসার পর থেকে। ...প্রিয়বালাকে দেখেছেন নিশ্চয় সার? ...স্টেজে ঢোকে যখন তামাম হলখানার ...বদলে যায়।

...স হল প্রিয়বালা জগদ্বাবুর ...র যোগ দিয়েছে। পশ্চিমের ডাঁটালো ...গে কেউ তাকে কলকাতার কোনো ...দেখেনি। সেই থেকে জগদ্বাবু ...খদ্দের।

প্রিয়বালা জগদ্বাবুর চোখের মণি। ...ছেড়ে দিন-রাত তার কাছেই ...থাকতেন। কিন্তু ফ্যাসাদ বাঁধল ...ছোট ভাই সুবল দত্তকে নিয়ে। ...প্রিয়বালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠতে ...ফলে রাগে দুঃখে নিজের মাথার ...ছেন জগদ্ দত্ত। ষাট বছরের সঙ্গে ...বছরে রেষারেষি। ওদিকে উদার ...ইটিকে বেশ একটা মোটা অঙ্কের ...অনেক আগেই দিয়ে বসেছিলেন। ...ব-গাছ গজাচ্ছে এখন। শোনা যাচ্ছে, ...কা দিয়ে সুবল দত্ত প্রিয়বালাকে ...আলাদা থিয়েটার খুলবে।

...জগদ্ দত্তর বন্দুক আছে সার, ...আর তাঁর মাথায়ও রক্ত চড়েই ...একবার ভাবেন, ভাইকে গুলী করে ...আর একবার ভাবেন প্রিয়বালাকে। ...র মনে হয়, ওই বন্দুক দিয়ে শেষ ...ভদ্রলোক নিজের মাথারই খুলি ...কি বলেন সার?

...মি কিছু বলিনি। কিছুদিন বাদে ...ন্তে আর ঝাপা-ঢাকা করে একটা ...গল্প লিখেছিলাম। সেই প্রেমের ...ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের ...ছে স্থূল দৃষ্টিতে চল্লিশ বছরকেই

যদি কোনদিন জানতে পারে এই গল্পের খোরাক আমি জুগিয়েছি, আমাকে একেবারে জ্যান্ত পুঁততে চাইবে।

ভাবলাম, ষাট বছর জিতলে ও চুলগুলোর মোটা বখশিসই পেত তার কাছ থেকে।

মাস দুই পরের কথা। প্রসাধনীতে ঢুকে সেই রাতে বিপরীত গোছের দৃশ্য দেখলাম। অর্থাৎ যেমনটি সচরাচর দেখা যায় না। রাতের নিরিবিলিতে মাথার একরাশ শনের মত শাদা চুল কালো করতে বসেছে নিতান্ত ক্লিষ্ট চেহারার একটি লোক। গায়ের রং রোদে-পোড়া কালচে—কপালের দুদিকে ফুটে ওঠা নীল শিরা দুটো দূর থেকে দেখা যায়। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য, আর মেহেনতের ছাপ। পরনে তেলচিটে খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে বিবর্ণ একটা ফতুয়া। তবু, বয়েস যাই হোক, দেহের কাঠামো তেমন শীর্ণ নয়।

এ-হেন মূর্তির মাথার শাদা চুল কালো করার তাগিদটা ভারী অদ্ভুত লাগল। অমল তার ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা নিজের দু-হাতের দখলে টেনে এনে গজগজ করে উঠেছে—স্থির হয়ে বসুন, অত ছটফট করলে কালোর ভেতর দিয়ে অনেক শাদা চুল দাঁত বার করে হাসবে। এই সরব-দৃশ্যে আমার পদার্পণ।

অমল বিব্রত মুখ করে বলল, একটু বসুন সার, ভোলা চা খেতে গেছে, এলো বলে—

ওর হাত জোড়া থাকলে ভোলাই আমার চুল কেটে থাকে। আমি মাথা নেড়ে অদূরে বসে সকৌতুকে অমলের ওই খদ্দেরটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। অমল সেটা লক্ষ্য করল এবং বার দুই-তিন আমার দিকে ফিরে তাকালো। বিরক্তি গিয়ে তার চোখেও বেশ সরস কৌতুক নেচে উঠেছে। শাদা চুলের গোছায় হাত চালাতে চালাতে সামনের আয়না দিয়ে লোকটার মুখখানা ভালো করে দেখছে আর চাপা খুশিতে দাঁতে করে নিজের ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছে। এবারেও গল্প আছে কিছু হাবভাবে অমল যেন সেটাই আমাকে বোঝাতে চাইছে।

ভোলা আসতেই গম্ভীর মুখে অমল তাকে ডাকলো, এই এদিকে আয়, এঁর কাজটা ধর—খুব ভালো করে বানিয়ে দিবি, চুল দিয়ে কালো জেল্লা বেরোয় যেন—

সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বলল, কি-চ্ছু ভাবনা নেই মশায়, ও আমার থেকে অনেক জিতিয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে হৃদয়ের দিক থেকে ষাট বছরই অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।

গল্পটা অমলের আদৌ পছন্দ হয়নি। সে বলেছে, এটা কি করলেন সার, ষাট বছর ওই অভিনেত্রীর জন্য তার চারটে বাড়ি আর তিনটে গাড়ির একটা করে খসালেই তো অনায়াসে তাকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারত। আর জগু দত্ত ভালো কাজ করবে—জাপান থেকে চুল কালো করার ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

সংশয় ভরা চোখে লোকটা একবার ভোলার দিকে তাকালো শুধু। কোনরকম প্রতিবাদ করল না।

অমল সোজা এগিয়ে গিয়ে লম্বা ঘরের ওধারের কোণের একেবারে শেষ চেয়ার আর আয়নার সামনে গিয়ে আমাকে ডাকল, ইদিকে আসুন সার—

উঠে গেলাম। এই ব্যবধান রচনার উদ্দেশ্য বুঝেও বললাম, ওকে ছেড়ে এলে কেন, ভোলাই তো কাটতে পারত—

আমার গলায় চাদর জড়াতে জড়াতে অস্ফুট একটা শব্দ বার করল গলা দিয়ে। তারপর চাপা ব্যঙ্গস্বরে বলল, দুটাকা রেট, দুদিন রাতদুপুরে এসে দর কষা-কষি করে আজ দেড় টাকায় কাজ সেরে যাচ্ছে।

আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম, এমন অবস্থায়ও চুল কালো করার সখ!

—প্রাণের দায় যে! চুলে ক্লিপ চালিয়ে খাটো গলায় অমল লঘু উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করল, যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই গোল, বুঝলেন সার। খুব মজার ব্যাপার... আপনাকে বলব বলেই এদিকে নিয়ে এলাম ...কিন্তু লিখতে গেলে এবারে আপনার পক্ষেও খুব মুশকিল হবে—

আড় চোখে যতটুকু সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে একবার ওধারের লোকটার দিকে তাকালাম। কোনো দিকে হুঁশ নেই, তন্ময় আগ্রহে আয়নায় নিজের শাদা চুলের ওপর ভোলার হাতের কসরৎ দেখছে।

চুলে কাঁচি চালাতে চালাতে অমল তেমনি চাপা গলায় আর চাপা আনন্দে মজার ব্যাপারটা বলে গেল।—লোকটা কলে কাজ করে, আর বয়েস তো দেখতেই পাচ্ছেন। ঘরে এক গাদা ছেলেপুলে, নিজের প্রথম পরিবার অনেক আগেই খতম হয়েছিল। ওর বড় জোয়ান ছেলেটাকেও মিলে ঢুকিয়ে তার বিয়ে দেবার চেষ্টায় এগিয়েছিল। কিন্তু ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেরই মুণ্ডু ঘুরে গেল—চালাকি করে ও-ব্যাটা নিজেই তাকে বিয়ে করে বসল। তারপর থেকেই বিষম ফ্যাসাদ। বাপে ছেলেয় সাপ-বেজির সম্পর্ক, আর ওই ছেলের দিকেই বউটার গোপন টান। ...হবে না তো কি, বউটাকে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি—প্রথম দিন ওকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার সঙ্গে চুল কালো করার দর-দস্তুর করতে এয়েছিল। বড় ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও বউকে বিশ্বাস করে না বলেই সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয়। তখন দেখেছি। কালো পাথরে কোঁদা চেহারা—স্বাস্থ্য আর ইয়ে যেন চুইয়ে পড়ছে। এই বুড়ো অমন মেয়েমানুষ বশে রাখবে কি করে!

আমি নীরব শ্রোতা। একটু চুপ করে থেকে তেমনি খাটো গলায় অমল যেন প্রায় জেনেই একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারল।—কিন্তু এবারে লিখলে বুড়োর বদলে আপনি ওই ছোঁড়াটাকে জেতাবেন কি করে—মা-সম্পর্ক যে!

জবাব দিইনি। লেখারও বাসনা ছি[illegible] কিন্তু তা হবার নয় বলেই বোধহয় [illegible] মাস বাদে এই রঙ্গমঞ্চে আবার এক[illegible] এই বুড়োর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা [illegible] আরো ক্লিষ্ট আরো ঝড়ো মূর্তি। [illegible] হাতে তার চুল কালো করার কা[illegible] ভাগের তিন ভাগ শেষ।

অতএব ভোলা এসে আমার মাথা [illegible] করল। আর সেই দখল ছাড়ার মিনিট[illegible] আগে ট্যাঁক থেকে সন্তর্পণে খুচরো [illegible] গুনে অমলের হাতে দিয়ে বুড়ো [illegible] করল।

আমি বাইরে এসে দেখি অদূরের [illegible] পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে ফতুয়ার পকেট [illegible] একটা ক্ষুদে আয়না বার করে বু[illegible] নিবিষ্ট মনে তার কালো পালি[illegible] চকচকে চুল পর্যবেক্ষণ করছে। ঘরের [illegible] আলোতে দেখেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত [illegible] পারেনি।

পাশ কাটাতে গিয়েও আমি দ[illegible] গেলাম। গম্ভীর অথচ লঘু বিদ্রূপের [illegible] বলে ফেললাম, চমৎকার হয়েছে, [illegible] বুঝতে পারবে না।

অবাক চোখে লোকটা ঘুরে দ[illegible] তারপরেই মুখে বোকা-বোকা হাসি। [illegible] হুজুর...তবে বড় খরচ।

হুজুর শুনে হোক বা খরচের [illegible] বিমর্ষ শুকনো মুখ দেখে হোক, [illegible] জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে কার্ত্তিক দোলুই। এত [illegible] থেকে মুখখানা যেন আরো ক্লিষ্ট [illegible] লাগছে। আমার মনের অগোচরে [illegible] খটকা লেগেছিল কিনা জানি না।—[illegible] থাকো কোথায়?

—ফুটপাথে।

—আমি অবাক। আর কে থাকে?

—এখানে কেউ থাকে না হুজুর, আর ব্যাল-বাচ্চারা দেশে থাকে।

সত্যিই খটকা লাগছে।—দেশ কো[illegible] আমাকে সদয় ভেবেই লোকটার [illegible] মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস।—মেদিনীপুর [illegible]

—তা অত খরচ করে পাকা চুল [illegible] করবার দরকার কি?

দুটো গর্তের করুণ দৃষ্টিটা [illegible] মুখের ওপর থমকালো।—কি করব, [illegible] দায়—ভিক্ষে করতে মন সরে না।

—কেন? কি করো তুমি?

—আজ্ঞে হুজুর রিকশ টানি।...[illegible] শাদা চুল দেখে কেউ আমার রি[illegible] উঠতে চায় না, সব জোয়ানদের রি[illegible] ওঠে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম [illegible] লম্বা শ্রান্ত দেহটা টেনে টেনে [illegible] চলে যাচ্ছে।

লাইটপোস্টের নীচে আমি হতভম্ব দাঁড়িয়ে।

হাতীর পা

মহাশ্বেতা দেবী

দুর্দান্ত দাঁতালটাকে সত্যবাবু গুলী করে মেরেছিলেন। ধান খেতে আসত হাতীটা, চাষীদের ঘর ভাঙত। শেষ অব্দি জোনাবালির বউটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছিল।

জোনাবালির বউ আঁতুড়ে ছিল। তাই সবাই পালালেও ও পালাতে পারে নি।

সত্যবাবু হাতীটার পা দিয়ে একটা পা-রাখবার টুল বানিয়েছিলেন। সেটায় পা রেখে বসে হাতী মারবার গল্পটা বলতে উনি ভালবাসতেন।

ওঁর চোখমুখ ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠত, কথাগুলো কাটা কাটা। বোঝা যেত অন্যায় আর অত্যাচারকে উনি বরদাস্ত

বলেন না। ও'র মতে হাতাটা অন্যায় করেছিল।

যাঁরা মিথ্যে কথা বলেন না, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন না। সেই জন্যেই কোনদিন রাজনীতি করলেন না। বাঁকুড়া শহরে বসে দাপটের সঙ্গে চাকরী করে গেলেন, স্কুলের হেড ক্লার্কের চাকরী। ও'র বড় ছেলে ব্যাঙ্কের আমানত টাকা নিয়ে গণ্ডগোল করেছিল। সত্যবাবু একবার গিয়ে দাঁড়ালে কেস অন্যরকম হত। সত্য-বাবুর স্ত্রী ও'কে যেতে বলেছিলেন।

'না।' বলে সত্যবাবু ও'কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ও'র বড় ছেলে জেলেই মারা গিয়েছিল। বিচারাধীন অবস্থায়। জ্বর আর রক্তআমাশায় ভুগে।

'বুঝেছ হে, সবাই আমায় ঔরঙ্গজেব বলে।' সত্যবাবু ঘোড়ার মত শব্দ করে হাসতেন। অশোকরা শুনত। ও'র স্কুলের ছাত্র অশোক, পরে ফিশারীতে ঢুকেছিল।

'ঔরংজেব!'

'বুঝলে না? ছেলেমেয়েদের পর করে দিচ্ছি, নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে সব নষ্ট করে ফেললাম। চারদিকে আগুন জেলে দিয়ে ওরংজেব কোরান লিখত, আর আমি বসে বসে ক্রসওয়ার্ড করি।'

অশোকের মনে হত কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। হেমন্তর বউ ওর ছেলে, অর্থাৎ সত্যবাবুর একমাত্র পৌত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকে। শরৎ ওর দাদার মৃত্যুর পর সেই যে চাকরী নিয়ে দিল্লী যায় আর ফেরেনি। বাঁকুড়ার বাড়ীর সাতখানা ঘরে সত্যবাবু আর ও'র স্ত্রী থাকেন। ছোট ছেলে বরুণ কলকাতায় দিদির কাছে থাকে। জামাইয়ের চাকরীর দরকারে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেবার কথা ছিল, সত্যবাবু জমা দেন নি। বলেছিলেন 'ওর কোন চরিত্র নেই। ওকে আমি বিশ্বাস করি না।'

মেয়েও বাপের সঙ্গে কোন যোগ রাখে না। সত্যবাবুর কথা শুনতে শুনতে অনেক সময়েই অশোকের মনে হয়েছে সত্যিই সত্যবাবু লোকটা পাথর দিয়ে তৈরী। চিরে ফেললে দেখা যাবে হৃৎপিণ্ডটা ফসিল হয়ে আছে। পাঁজরের হাড়গুলো গ্রানাইটে তৈরী।

'আপোষ আমি করি না বুঝলে অশোক? মাথা উঁচু রেখে চলে যাব যাতে পরকালে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি। বলতে পারি তোমার দেওয়া শরীরের অমর্যাদা করি নি। মাথা নিচু করি নি কোথাও।'

ও'র বিরাট হলঘরে, হাতীর পায়ের ওপর পা রেখে বসে উনি যখন কথা বলেছেন, মনে হয়েছে কথাগুলো ও'র মুখেই মানায়। অন্যায় যে করে, যে অত্যাচারী, তাকে ঐভাবে জব্দ করে তাকে পায়ের নিচে রেখে দিতে পারেন উনি।

ও'র স্ত্রী অবশ্য অশোককে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন 'বস বাবা। বউমা কেমন আছে?'

'ভালই তো। বাপের বাড়ী গেছে।'

'তাই বুঝি বিজয়ার পর এল না?'

কুমুদিনী কিছুক্ষণ ঘসঘস করে নারকেল কুরেছেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলেছেন 'লোকের বাড়ীতে লোক আসে। আমার বাড়ীতে কে আসবে বল? ছেলে আসে না, মেজবউমা আসে না। মেয়েটা আসত যেত, তা অব্দি উনি বন্ধ করে দিলেন। আর বড়বউমা!'

কুমুদিনীর বয়স হয়ে গিয়েছে কিন্তু একসময়ে ও'র মত সুন্দরী এ শহরে কেউ ছিল না। এখনো বোঝা যায় চোখ দুটি ও'র ঠিক কালো নয়, একটু নীলচে। ফর্সা রঙ, কপালে ছোট উল্কির টিপ, দোষের মধ্যে চোখ দুটি একটু বসা।

সবাই না কি বলত 'নয়নবসা সুন্দরী'। কুমুদিনী লেখাপড়াও জানতেন। একসময়ে অনেক বাংলা বই পড়েছেন।

'বরুণের বাবা রাক্ষস, বুঝলে অশোক? রামায়ণে অব্দি লেখা আছে জলের জানোয়াররা সন্তান খেয়ে ফেলে। উনিও সকলের সুখশান্তি গিলে খেয়েছেন। এখন আমাকে খাবেন বলে বসে আছেন।'

অশোকের অস্বস্তি হয়েছে। কথাটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে ও। বলেছে 'বরুণ আসে না মাসীমা?'

'আমি তো ওকে আসতে দিই না বাবা। আমি তো বলেছি চাকরী পাবে যেদিন, সেদিনই আমি তোমার কাছে চলে যাব। মেয়ের বাড়ীতে তো গিয়ে উঠতে পারি না। জামাইকে তবু ভালো বলতে হবে, শ্বশুর তো মুখে নুড়ো ঘষে দিলে, তবু শালাকে টানছে। ওদের অবস্থাও তো জানো!'

অশোক জানে। সত্যবাবুর [illegible] জমিজমা যা ছিল সবই নবদ্বীপ-মেহের-পুরে। ঐ জায়গাটুকুই পাকিস্তানে গেল। জামাইটি সত্যিই লোক সুবিধের নয়। কলকাতার বাড়ীখানা ফাটকা করেই উড়িয়ে দিল। অশোক শুনেছে ও জমির দালালী করে এখন অবস্থা খুব ফিরিয়েছে। নাক-তলায় বাড়ীও তুলেছে একখানা। অশোকের শ্বশুরবাড়ী ওর বাড়ীর কাছেই। ইচ্ছে করলে মাকে নিয়ে যেতে পারে না তা নয়, তবে ও'র মেয়ে বাবাকে ভয় পায়। বোধ-করি বলতে সাহস পায় না।

'তোমাদের সার একটি রাক্ষস, বুঝলে অশোক? রামায়ণে লেখা আছে.....'

অশোক দেখলে ব্যাপার বেগতিক। কুমুদিনীর হিস্টিরিয়ার ধাত আছে। একেকটা কথা বারবার বলতে বলতে উনি ক্ষেপে যান। কি করবে, কিছু বলবে কি না ভাবতে সুরু করল অশোক, কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে দিলেন সত্যবাবু।

'উঁহু হু...কথাটা ভুল হল গিন্নী। রামায়ণে ও কথাটা তো লেখা নেই?' সত্যবাবু বারান্দায় উঠে এসেছেন।

'বটে! তবে ঠিকটা কি তুমিই বলে দাও?' কুমুদিনী নারকেল কোরা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ও'র নাকের পাটা ফুলে গেল, চোখের নীলচে মণি দুটি জ্বলে উঠল।

'কথাটা কৌশল্যা দশরথকে বলে-ছিলেন। তুমি হিমুদের 'রামায়ণী কথা' বইখানায় পড়েছ। কথাটা হচ্ছে 'কোন কোন জলজন্তু যেমন স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে তুমিও তাহাই করিয়াছ!'

'বললে, কথাটা তুমি দাঁড়িয়ে স্বীকার করলে? তুমি হিমুর নাম করলে? জিভ আটকে গেল না তোমার, লজ্জা করল না? চার চারটে সন্তানের মা আমি, তোমার জন্যে বচ্ছরান্তে একবার 'মা' ডাক শুনতে পাই না। অমন অপচ্ছরার মত বউ, অমন সোনার চাঁদ নাতিরা, তারা দিল্লীতে পড়ে থাকে, একবার এ মুখো হয় না। কোন মুখে তুমি হিমুর নাম করলে বল! এত এত মানুষ মরে তুমি মরতে পার না? আবার কেতাবের কথার ভুল ধরে কেতাব করে দিতে এয়েছ!'

চেঁচাতে চেঁচাতে হঠাৎ থামলেন কুমুদিনী। বললেন 'ও'কে আমার সুমুখ থেকে যেত বল অশোক, নইলে আমি মাথা খুঁড়ব।'

সত্যিই ঢিপঢিপ করে মাথা খোঁড়েন কুমুদিনী, খুঁড়ে খুঁড়ে রক্ত বের করে ফেলেন।

'কিন্তু আপনি...'

'আমি এখন ঘরে যাব অশোক। কাপড় ছাড়ব, সংকটাকালীর খাঁড়াধোয়া জল খাব, তোমরা যাও!'

খাঁড়াধোওয়া জল এ বাড়ীতে কলসী-খানেক রাখা থাকে। অনেকদিন ধরেই কুমুদিনী হিস্টিরিয়ার উপক্রম হলেই দু'আঁজলা জল খেয়ে শুয়ে পড়েন।

বেরিয়ে আসতে আসতে অশোকের দুটো কথা মনে হল। বলল, 'বাড়ীতে একজন মেয়েমানুষ নেই! মেয়েছেলে ঝি রাখলে হয় না একজন?'

সত্যবাবু কি ভাবছিলেন আর হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নাড়ছিলেন। বললেন 'নেই।'

'কি নেই?'

'এই যে বায়োকেমিক ওষুধটা...আহা ও'র সিম্পটমে এই ওষুধ একফোঁটা পড়লে ...কিন্তু উনি খাবেন না তো?'

মাথা নাড়তে লাগলেন সত্যবাবু। বললেন 'কিছুতে না। অথচ একটা ময়লা কাপড় পরা লোক পেতলের কলসীতে খানিকটা সরপড়া ঘোলা জল রেখে যাবে, ও ঢকঢক করে খাবে। এ আমার একটা ফাইট, বুঝলে অশোক? ও'র পথ আর আমার পথ...ও'র মত আর আমার মত...!'

'কিন্তু সার!'

'কি বলছ অশোক?'

'আমি বলছিলাম মাসীমা অসুস্থ হয়ে পড়েন, বাড়ীতে একজন মেয়েছেলে ঝি রাখলে হত না?'

'মেয়েছেলে ঝি!' সত্যবাবু একটু হাসলেন। বললেন 'উনি রাখতে দেবেন না। ও'র জন্যে আমার খরচ যত কম হয় ততই না কি উনি খুশী হন। রাঁধুনী ছাড়িয়ে দিয়েছেন, গোয়ালের চাকরটাকেও! তাই গোরু বেচে দিলাম আমি। গোয়ালের খাটুনীটা তবু বাঁচুক, একটু আরাম পান! স্ত্রী মনে, বিয়ের মন্ত্র তো জান অশোক,

অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার...অলঙ্কার তো উনি সেই কবেই ত্যাগ করেছেন। আমার দেওয়া বস্ত্র পরেন না। ও'র ছেলেমেয়েরা বছরের কাপড়টা ও'কে পাঠায়। অন্ন আমি এক-বেলা খান, একবেলা জলবাতাসা...এদিকে আমার জন্যে দেখ রুটি, লুচি, মাছ, মাংস... এ বড় চ্যালেঞ্জ ও'র, জানলে ? তোমার মাসীমা আমায় ভাঙতে চেষ্টা করছেন... মানে আমার মনোবল ভাঙতে...বুঝলে তো ?'

অশোকের অস্বস্তি এখনো যায় নি। ও বলল, 'মাসীমার সামনে স্যার...মানে হিমুদার নামটা উঠে পড়লে...' অশোক হেমন্তকে ভালবাসত। ফুর্তিবাজ, দায়িত্ব-হীন, দুর্বলচিত্ত মানুষটি হেমন্ত। টাকার গোলমাল করে ভয়ে যেন লুকিয়ে গিয়েছিল।

'কেন', হিমুর নাম করব না কেন ? হিমু কি আমার ছেলে ছিল না ? আমার কি ওর কথা মনে হয় না ? কিন্তু ও'র জন্য আমি এতবড় অন্যায়টা করতাম কি করে তাই বল ? জান অশোক, সেবার কলকাতার রাস্তায় দেবযানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মানে আমার বড়বউমা ! সঙ্গে আমার নাতিটিও ছিল। আমাকে দেখে বউমা যেন আঁতকে উঠলেন। যেন ভয় পেলেন বউমা, জানলে অশোক, ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে রিকশায় উঠে বসলেন।'

'তাই না কি ?'

'হ্যাঁ অশোক ! ফি-বছর আমার বাড়ীতে তিনটে মণিঅর্ডার ফেরৎ আসে তা জানো ? আজ তোমায় বলছি। দিল্লী থেকে একটা, কলকাতা থেকে দুটো। প্রতি বছর আমি পুজোর জামাকাপড়ের জন্যে টাকা পাঠাই, ছেলে-মেয়ে-বড়বউমা সবাই ফেরৎ দেয়। তোমার মাসীমা তাই নিয়ে গর্ব করেন। জান অশোক, বলেন ওরা ঠিক করেছে।'

অশোক কি বলবে ভেবে পেল না। সত্যবাবু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেন জেনে ও একটু অবাক হয়েছে।

'বরুণ চিঠি লেখে না ?'

'মা-কে লেখে। আমাকে বিজয়াতে চারটি শব্দ লেখে, আমার—বিজয়ার—প্রণাম —লইবেন। মা-কে বড় বড় চিঠি লেখে, মাও লেখেন। আমি তো বুঝতে পারি সব। উনি টাকাও দেন ওকে। মনে হয় ও'র অলঙ্কার না পরার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। হয়তো বরুণই মেরে দিচ্ছে সব। আমি কিছু জিজ্ঞেস করি না অশোক। বরুণও, আমার ধারণা, উইল টার্ণ আউট টু বী ভেরি ভেরি ব্যাড। বুঝতে পারছ না, জমির ফাটকা, কাঁচা টাকা...আমি যেখানে আছি অশোক, সেখানে আর কেউ নেই, জানলে ? নীতি নিয়ে চলতে গেলে এই হয়...।'

ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন সত্য-বাবু। ঝুলন্ত আলোর আড়ালে ও'র লম্বাটে মুখখানা যেন জলজন্তুর মতই বিশ্রী দেখাতে লাগল। মাঝে মাঝে দাড়ি নাচাবেন, বলতে ইচ্ছে হল অশোকের। 'আপনাকে শ্রান্তিঘরেতে দেখলে আমারই ভয় করে। আর হাতীর পা-টার ওপর পা রাখবেন না।

অশোকের মনে হল অতবড় একটা জন্তু, মরে গেছে বলেই তাকে অমন অপদস্থ করতে নেই। দেখতে ভালো লাগে না। এ যেন সত্যবাবুর অহংকার আর ঔদ্ধত্যের স্পর্ধায় একটা বিরাট অপমান করা। হাতীটাকে।

সত্যবাবু ওর চোখ দেখে বুঝলেন অশোক হাতীর পা-টার দিকে চেয়ে আছে। খুশীতে জ্বলজ্বল করে উঠল ও'র চোখ। বললেন 'খুব রিভেঞ্জফুল হয়ে গিছলে হে। যারা ওকে মারতে চেষ্টা করত, বুঝলে... কিন্তু আমার ওপর শোধ নিতে পারে নি।'

মাথা নাড়তে লাগলেন সত্যবাবু। বললেন 'তুমি তো জান, আমার অবস্থার লোকের পক্ষে শিকার করাটা কি ধরণের বিলাসিতা একটা। গুলীর দাম যা হয়েছে দিনে দিনে...তখনো আমার সাধ্যে কুলোত না কি ? আরে, এ হাতী তো রাঘববাবুর মারবার কথা। উনিই ঠিক করে দিলেন সব, তুমি তো জানো...'

'বন্দুকটা এখনো আছে না কি ?'

'না হে। বেচে দিয়েছি। টাকার দরকারে বন্দুক বেচে দিলাম অশোক...'

'ওদিকে ভারা বাঁধা রয়েছে মনে হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। বাড়ীটায় কলি ফেরাব ভাবছি। আজকাল তো বাড়ীভাড়া দিলেটিলে...'

ও'দের কথাবার্তার পেছনে নেপথ্য-সঙ্গীতের মত একটা গুনগুনে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, অনেকটা গানের মত শোনাচ্ছিল। হিন্দুস্থানী মেয়েরা 'ছট' বা বিয়েতে যে-রকম গান গায়, তেমনি এক-ঘেয়ে গান।

সত্যবাবু বললেন 'তোমার মাসীমা কাঁদছেন। আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন।'

অশোক বেরিয়ে এল।

সত্যবাবু দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সামনে-পেছনে দুলতে লাগলেন, তারপর বাতাসকে উদ্দেশ করে বললেন, 'অন্যায় আমি সহ্য করি না। কেন না আমি অন্যায় করি না।'

ও'র কথাগুলো শুনতে পেল অশোক। কুমুদিনীর বিচিত্র বিলাপের সুরের সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলোও শোনা যাচ্ছিল। বোধ হয় খোলা জানলায় বসে বিলাপ করছেন উনি।

'তোমার জন্য আমার এই শাস্তি। তুমি কেন মর না, এত এত লোক মরে...'

এই ফিশারীর কাজে লেগে থাকবার খুব একটা ইচ্ছে অশোকের ছিল না। কাজ করতে করতেই ও খোঁজ নিচ্ছিল কি করে সোজাসুজি মাছের ব্যবসা করা যায়। সত্যবাবু শুনে বলেছিলেন, 'খুব ভালো। বউমাটি ভালো পেয়েছ, উনি বুঝবেন। ব্যবসা করা তো সত্যিই ভালো। জানো, আমার বয়স থাকলে আর টাকা থাকলে আমিও ব্যবসা করতাম।'

আসলে অশোক সঙ্গে সঙ্গে কোল্ড স্টোরেজ একটা করবার চেষ্টাতেও ছিল। তাই কলকাতা চলে আসবার পর আর সত্য-বাবুদের খবর রাখতে পারেনি। থাকুড়াতেও যে ও যাওয়া-আসা করত সে শুধু শরতের অনুরোধে। অশোক শরতেরই সমবয়সী আর একসময়ের সহপাঠি।

কলকাতায় এসে অশোক শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকে। বনানী এ-বাড়ীর বড় মেয়ে। ওর ভাইবোনরা এখনো কেউ ছাত্র, স্কুল অথবা কলেজের, একজন শুধু কাজে ঢুকেছে। এ বাড়ীতে অশোক এখনো অতি প্রিয় অতিথি।

এই পাড়াতেই সত্যবাবুর জামাইও বাড়ী করেছেন। এখানেই অশোক মাঝে

তাকে ... দেখেছে। বরুণ সিনেমা যাচ্ছে, বরুণ পাড়ার পুজো নিয়ে মাতামাতি করছে, বরুণ হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ ছেলেদের বলখেলায় নেমে পড়ছে।

সত্যবাবুর ছেলে বরুণ। মাঝে মাঝে দেখা গেছে কিছু না করেই বরুণ সমস্ত মাঠটায় হেঁটে বেড়াচ্ছে, কখনো বা দুপুর রোদেও। আধাতৈরী বাড়ী, ইঁটের পাঁজা, খুঁড়খোঁড়া মাটির ভেতর ভেতর দিয়ে, বিশাল, এবড়োখেবড়ো একটা অনিচ্ছুক ছায়াকে টানতে টানতে বরুণ ঘুরছে।

বরুণ জনপ্রিয় নয়, বরুণকে সকলে ভয় পায়, অপছন্দ করে। সম্ভবত ওর বিশাল শরীর, আর স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে। নইলে বরুণ অল্প কথা বলে, ভদ্র ব্যবহার রাখতে চেষ্টা করে, অশোকের ধারণা ও নির্বোধ। মাঝে মাঝে ওকে রোদে ঘুরতে দেখলে অশোকের মনে হয় অস্বাভাবিক বেশী বেশী পেশী, স্বাস্থ্য, উদ্যম, প্রাণশক্তি থাকবার ফলে ওর এই দুর্দশা।

যেমন করে হোক, নিজেকে খরচ না করতে পারলে ও মরে যাবে।

ওর জামাইবাবুর অনুগত, ডানহাত বরুণ। দুজনের একজনকেও পাড়ার ভদ্রলোকরা বিশ্বাস করেন না। অথচ বরুণের জামাইবাবুর কাছ থেকেই সব জমিজমা কিনেছেন ওঁরা, এখানে বাস করে ওঁকে চটানোও মুস্কিল। ভদ্রলোক প্রতিপত্তিশালী। ওঁর নারকেল বাগানে অনেক সময়েই সন্ধ্যের পর দুমদাম শব্দ শোনা যায়। অশোক শুনে চমকে উঠেছিল। বলেছিল, 'কিসের শব্দ বল তো?'

ওর শ্বশুর বলেছিলেন, 'কিছু প্রফুল্ল দত্তের চেলারা বোধহয় ... পেরিমেন্ট করছে।'

পরে অশোকও বুঝেছে কথাটা মি... নয়। জমি বাপের নয় দাপের প্রবাদ এখ... অচল। এখানকার জমি বাপের নয়, দাপে... নয়, জমি কৌশলের আর ফাটকার। ... প্রতিপত্তির প্রয়োজন আছে। অনেকটা ন... চরের দখলের মত ব্যাপার। প্রত্যে... কেনাবেচা আইনসঙ্গত চললেও ভে... ভেতর রেষারেষি, দ্বেষ-বিদ্বেষ, প্রত্যে... স্থানীয় নেতা হতে চায়। সন্ধ্যের ... প্রফুল্ল দত্তের গলা শোনা যায় 'জা... আমি এখানকার বাঘ? জানো? স্বীক... করো?'
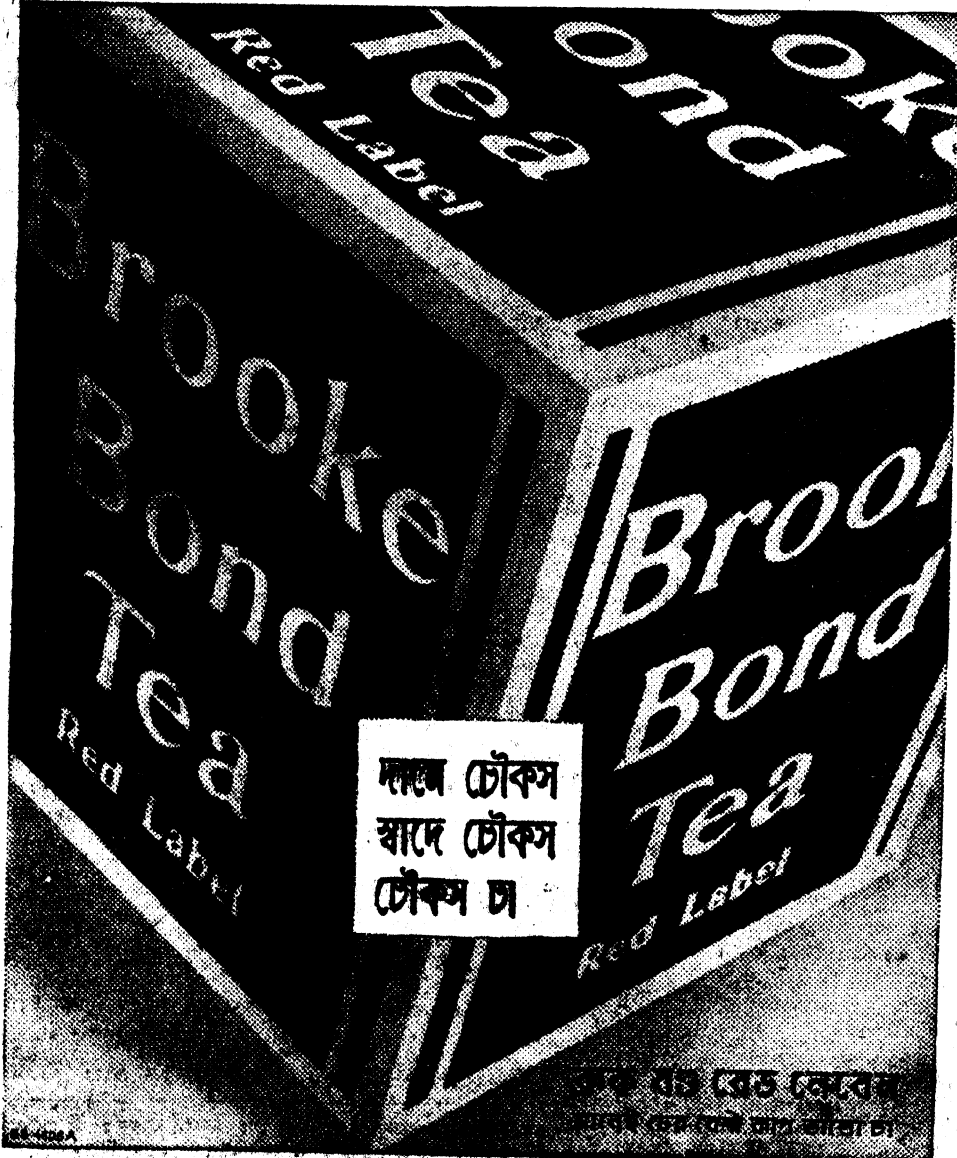
সবাই জানে জঙ্গলের সবচে...

...ন্গত প্রাণীটি, ওর স্ত্রী। তার ওপরেই ...ই প্রাত্যহিক আস্ফালন চালায় প্রফুল্ল ...র। হয়তো, নিরাপত্তার জন্যেই সত্যবাবুর ...য়ে ওর ভাইকে এনেছিল গোড়ার দিকে, ...মে বরুণ প্রফুল্ল দত্তের ডানহাত হয়ে ...ঠেছে।

সত্যবাবুর মেয়ে ওর স্বামীকে খুবই ...লবাসে, ভয়ও পায়। এখন ও আর বরুণ ...জনেই বিশ্বাস করে সত্যবাবুর সাহায্য ...লে প্রফুল্ল দত্ত আরো ওপরে যেতে ...রত।

প্রফুল্ল দত্তের বাড়ীতে অনেকগুলো ...। প্রত্যেকটা ছোট। আসবাব, ছবি, ...লেণ্ডারে ঠাসা, প্রতিটি দরজার মাথায় ...কণাকালীর পট। দেওয়াল নোংরা, ...ঠানে অনেকগুলো গোরু, গোবর— ...না আর খোলপচা দুর্গন্ধে বাতাস ...রী।

দোতলায় প্রফুল্ল দত্তের নিজের ঘরের ...ঝেতে একরকম মোজাইক, দেওয়ালে ...েক রঙের। ট্রানজিস্টর—রেডিওগ্রাম— ...রেক্সের আলমারী—নিয়নবাতি—বইয়ের ...রের ফাঁকে ফাঁকে পুতুল। এই ঘরটিতে ...টের মত বসে থাকে প্রফুল্ল দত্ত। যে ...ন্ত্র লককে সকালের দিকে হাজারটা ...জিগ্যেস করলেও কয়েকটা চাপা ...কার আর ফ্যালফেলে লালচে চাউনী ... আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না ...৬ মধ্যে থেকেই যে বাঘ।

অশোক শুনেছে প্রফুল্ল দত্ত গোপনে ...বাস করে ওর বউ ওকে বিষ দিতে ...র। ওর বউ না কি বরুণের সাহায্যে ...থায় টাকা পয়সা সরায়। বরুণ জামাই- ...র আড়ালে আড়ালে অন্য কোথাও ...কটরী করে টাকা বাগিয়ে আনছে ...কথাও শোনা যায়।

এই ভেদাভেদের মধ্যে শুধু সত্যবাবুর ...েধ ওরা সবাই মিলে একটি যুক্তফ্রন্ট ...করেছে। ওদের কথা যখনি ভেবেছে ...াক তখনি মনে হয়েছে, আসলে ঐ ...ীর পা-টা ছাড়া সত্যবাবুর নিজের ...ে কিছু নেই। ঔরংজেবের চেয়েও ...গা উনি, জীবিত অবস্থাতেই বউ- ...মেয়ের স্নেহ হারিয়েছেন। কিন্তু ...ীর পা-য়ের ওপর পা রেখে বলাটা কি ...া? এক সময় হাতীটা যখন জ্যান্ত ... ও তো মানুষকে কাছে ঘেঁষতেই দিত ...শেষের দিকে ক্ষ্যাপা হয়ে গিয়েছিল বলে ...ওপর যে গুলী অথবা তীর চালাত, ...ওপরেই শোধ তুলত।

সত্যবাবুর ওপরেও ও হয়তো শোধ ...ে। অশোক ইস্কুলে একটা গল্প ...। একটা লোক একটা বেড়াল আর ...বাচ্চাদের ঢিল মারে। বাচ্চাটা মরে যায়। ...টা ঐ-টুকুন প্রাণী, লোকটার ওপর ...তুলল। লোকটা যখন মিউজিয়মে ...পুরোন দিনের অস্ত্রশস্ত্র নিজে ...র চকে পরখ করে দেখছে, বেড়ালটা ...য়ে পড়ল মাথার ওপর। আর স্প্রিং ...গজাল-গাঁথা মূর্তির কপাট লোকটার ওপর পড়ে গিয়ে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে গেঁথে ফেলল লোকটাকে।

সত্যবাবুর ওপর যে শোধ তুলবে কেউ না কেউ, এ ধারণাটা ক্রমেই ভারী হচ্ছিল ওর মনে।

সম্ভবত বরুণকে এত কাছাকাছি দেখে। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী স্বাস্থ্য, রক্ত, মাংস, পেশী আর উদ্যমের জ্বালায় পীড়িত হতে হতে যে ইটের পাঁজা আর আধখোঁড়া ভিতের পাশ দিয়ে দিয়ে কেবলি হেঁটে বেড়ায় অনিচ্ছুক, কাতর একটা বিশাল ছায়াকে টানতে টানতে।

মাঝে মাঝে পাঁচিলে বুক রেখে বরুণ কলেজের ছেলেমেয়েদের দেখত আর হাঁপাত। ওর কি মনে হত ওদের কাছাকাছি বয়স হলেও ওর জগৎ আর ওদের জগৎ বড্ড বেশী আলাদা?

'দেখেছিস? জানোয়ারটাকে দেখেছিস?' ফিসফিস করে মেয়েরা বলত।

'শ্রাবণী, মনে হচ্ছে, ও তোমাকেই দেখে।' অশোকও বলত। বনানীর ছোট-বোন শ্রাবণীকে। শ্রাবণী ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকত। এ-পাড়ার সবচেয়ে অহংকারী আর প্রসাধনগর্বিতা একটি উনিশ বছরের মেয়ে। শাদা ফুরফুরে উলের সেটাল কাঁধে জড়িয়ে, শাদা শাড়ী আর শাদা চামড়ার জুতো পরে, সুঁচ দিয়ে খোঁপাটা উঁচু করে শ্রাবণী ব্যাডমিন্টন খেলতে যেত। বরুণ ওর দিকে চেয়ে থাকত। শ্রাবণীর কথায় অথবা ভঙ্গীতে কোন দিন বোঝা যায় নি ও লক্ষ্য করেছে বরুণকে। শ্রাবণীর এখন সেই বয়স, যখন নিজেকে সবসময়ে অসাধারণ মনে হয়। যে বয়সে মেয়েরা এত বেশী নিজের প্রেমে পড়ে থাকে (অথবা নিজের ছায়ার প্রেমে, নইলে আয়নার সামনে এককেটা দুপুর কাটিয়ে দেয় কি করে) যে আরেকজন পুরুষকে নিজের চেয়েও বেশী ভালো-বাসতে পারে না। দু-চার বছর বাদে হয়তো তবু তা সম্ভব হয়, কিন্তু মজাটা হচ্ছে, সব ছেলেরাই চায় উনিশ বছরের মেয়েরা নিজেদের চেয়েও ওদের বেশী ভালবাসুক। দু'চার বছর বেশী বয়সের মেয়েরা যখন নিজেদের চেয়েও বেশী ভালবাসে ছেলেদের, নিজেকে ধুলো-গুঁড়ো করে দিতে চায় ছেলেদের কাছে, তখন আবার সেই প্রবল ভালবাসা দেখে, বা ভালবাসার প্রবণতা দেখে ছেলেরা খুঁত-খুঁত করে।

বলে মেয়েরা এত ফরোয়ার্ড হলে কি ভালো লাগে?

শ্রাবণী ফরোয়ার্ড নয়, ব্যাকওয়ার্ডও নয়। নিজের মধ্যে বর্তমানে ন যযৌ ন তস্থৌ, নিজের মায়াজালে কিছুদিনের মত বন্দী, যেন কাচের প্রাসাদের রাজকন্যা, ডাইনীরা যাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

এই শ্রাবণীকে নিয়েই সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল।

অশোক আর বনানী দুজনে ফরাক্কা গিয়েছিল। অশোক ওর কোল্ড্‌স্টোরেজের ব্যবসা ওখানেই করতে চায় আর বনানীও ওখানে সংসার করতে চায়।

হঠাৎ টেলিগ্রাম। শ্রাবণীকে নিয়ে ওর বাবা আসছেন। ভীষণ জরুরী ব্যাপার।

খবরের কাগজে ও অঞ্চলে হাঙ্গামা, দুটো দলে রেষারেষি, লক্ষ্য করেছিল বনানী।

'দেখেছ, ওখানেই হচ্ছে, আমাদের পাড়ায়।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

এর চেয়ে বেশী আর কেউই ভাবেনি ওরা বিষয়টা নিয়ে। হ্যাঁ, আজকাল এগুলো যদি বিপদ হয়, তাহলে কলকাতায় কোন অঞ্চলই আর বিপদমুক্ত এলাকা নেই। কিন্তু উদ্বিগ্ন হবে কেন? যত যা-ই হোক না কেন, বনানীদের পরিবারের মত পরিবার কখনো এ সব নোংরামিতে জড়ায় না।

ওরা ভদ্র হয়, সভ্য, চেঁচিয়ে ঝগড়া করে না। ছেলেরা-মেয়েরা মন দিয়ে লেখা-পড়া করে, ভদ্র ইস্কুলে-কলেজে যায়। নেহাৎ শান্তিপ্রিয় মানুষ, শান্তিতেই থাকা পছন্দ করে। আন্দোলনে বা হাঙ্গামায় বা আনন্দ উৎসবে এরা গায়ে-গতরে মাতে না, থিওরী-গতভাবে সমর্থন করে অথবা করে না। কিন্তু

হই-হাঙ্গামা দেখলেই ক্যাজুয়েল লীভ নিয়ে বাড়ীতে থেকে যায়।

এই বাড়ীর মেয়ে শ্রাবণী, যে শাদা সেটাল আর শাদা শাড়ী পরে ব্যাডমিণ্টন খেলতে যায় আর বাড়ী ফিরে আসে। সাধারণত যে নিজের লম্বা আঙ্গুল, আঙুরের মত টসটসে ঠোঁট, কালো ধ্যাবড়া ভুরু আর লম্বাটে গলার ছায়া দেখে দেখে ছুটির দুপুরগুলো বিভোর হয়ে থাকে। রাজনীতি-পাড়ানীতি-সংসারের জটিলতা অথবা অর্থনীতি, কোন সমস্যাই যার কাছে নিজের চেহারার মোহিনীমায়ার চেয়ে বড়ো নয়, সেই শ্রাবণীর কাছে পাঁচিল টপকে লাফিয়ে চলে এসেছিল বরুণ। বলেছিল, 'কেন তুমি আমায় ইগনোর করে চলে যাও বল তো? আমায় ঘেন্না কর?'

সেদিনে বরুণের জামাইবাবু একটা কন্ট্রাকটরীর ফাইনাল অর্ডার পেয়েছে। সেদিন বরুণ প্রফুল্ল দত্তের সঙ্গে একটু সেলিব্রেট করেছে। স্বাস্থ্য আর উদ্যম অত্যন্ত বেশী হলে মানুষ খায় বেশী, ঘুমোয় বেশী, সবকিছুই গো-গ্রাসে না হলে যেন ভালো লাগে না। বরুণ সেলিব্রেটও একটু বেশীই করেছিল।

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

ওরা চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে আসছিল। আদিত্য বে-পাড়ার ছেলে, ভদ্র, শান্ত, থিওরীগতভাবে ছাত্র-আন্দোলনকে সমর্থন করে কিন্তু জীবনেও মন্দকথা শোনে নি বা বলেনি। বরুণকে ও মোটেই চিনত না।

'কেন, কেন ইগনোর কর আমাকে? তুমি তো গ্যানা বোসের মেয়ে! এত সুপিরিয়র মনে কর কেন নিজেকে? আমার দিদির ননদকে দেখেছ? তিন-তিনটে ছেলের মা হয়ে গিয়েছে কিন্তু হাসিদি'র বিউটি দেখলে ভিরমি খাবে। তোমার চেয়ে......'

এখন, পাড়ার যুবকদের আর কিশোর-দের কাছে পাড়ার বয়স্ক লোকদের একেকটা ডাকনাম থাকে। কোনটা জ্ঞানের অপভ্রংশে গ্যানা, কোনোটা চেহারা বা অন্য কিছু দেখে নামকরণ। গোলালোমুখে ছুঁচলো গোঁফ তাই সুবাসবাবুর নাম ট্যাকঘড়ি। বিশ্রী একটুকরো লোমওয়ালা আঁচিলের জন্যে ডাক্তার সান্যালের নাম টুথব্রাশ, কিন্তু আদিত্য এসব কিছুই জানত না। তার ওপরে বরুণ যখন বলল, 'আমি তো তোমায় বিয়ে করতে যাচ্ছি না। আমার মত ব্যাক-গ্রাউন্ডলেস ছেলেকে তুমি বিয়েই বা করবে কেন। আমি তো শুধু বলছি তুমি আমায় ইগনোর কর কেন?' আর এগিয়ে এল শ্রাবণীর দিকে আর চেপে ধরল শ্রাবণীর হাতটা আর শ্রাবণী চেঁচিয়ে উঠল ভয় পেয়ে তখনি আদিত্য বরুণের মুখে এক ঘুষি মেরে বসে।

বরুণ ওকে মশা বা মাছির মত উৎপাত মনে করেছিল। খুব একটা গায়ে মাখেনি। ওর মজাই লাগছিল বোধহয় আর সেলিব্রেটের ফলে চামড়ায় ওর সেতার বাজছিল, রক্তটা পর্যন্ত যেন আরেক রকম বাজনার সুরে বাঁধা, শ্রাবণীর হাতটা ধরতে ওর হাতের চামড়া গরম হয়ে উঠেছিল, অবাক হয়ে গিয়েছিল বরুণ।

তখনো আদিত্য ওকে আবার মারে, বেশ জোরেই। কানের লতি ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ে গেল।

'রক্ত পড়ে গেল গো!' কঁকিয়ে উঠেছিল বরুণ। চিরকাল ও নিজের রক্তকে ভয় পায়। তাই ভয় পেয়েই শ্রাবণীর হাত ছেড়ে আদিত্যকে চেপে ধরেছিল দু'হাতে।

অশোক তো বরুণকে হাঁটতে দেখেছে। ছায়াটা ওর কত বড়ো। যার ছায়া অত বড়ো হয়, তার হাত দু'খানাও তো তেমনি বড় হবে। আর শরীরে জোর অত বেশী থাকলে যা হয়, ঠিকমত মাপ করা যায় না, মশা মারতে কামানদাগা হয়ে যায়। আদিত্য তো ভালো ছেলে, ছোটবেলা হরলিকস খেয়েছে, কডলিভার মেখে রোদে শুয়ে থাকত আয়ার কাছে। বড় হয়ে বড়জোর চীজ অথবা মাখন কিংবা লুকিয়ে কচিৎ ব্র্যাণ্ডি খেয়েছে। ওর আই-এ-এস'এর রেজাল্ট এখনো বেরোয়নি। সিনেমায় কেউ মরে গেলে ওর নাকের ভেতর এখনো কান্নায় সুড়সুড় করে। বন্ধুদের কাছে হাতের গুলী দেখায়, কিন্তু আকাশে মেঘ দেখলেই জামার নিচে লুকিয়ে সোয়েটার পরে।

ও কি করে বরুণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাত? বরুণের হাত থেকে বলা হয়তো অনুচিত, বরুণের হাতের হাত থেকে বলাই ভালো। কেন না বরুণ আদিত্যকে চিনতও না, ওর ওপর রাগ-অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই ছিল না ওর।

বরুণের হাত তো সে-রকম নয়। ওর হাত দু'খানায় জোর যে বড্ড বেশী। ছোটবেলা না কি ছেলে মনে করে বিকেলের ঝোঁকে মাঠ থেকে আলকেউটে ধরে ফেলে-ছিল আর কুমুদিনী চেঁচিয়ে ওঠবার পর ভীষণ ভয়ে বরুণ সাপটার গলা আর ঘাড়ের মাঝামাঝি টিপ ধরে ল্যাজের দিক থেকে টেনে টেনে সাপটাকে মেরে ফেলেছিল।

তারপর যা হয়, গণ্ডগোল, ভীষণ গণ্ডগোল। শ্রাবণীর বাবা শুধু শ্রাবণীকেই রেখে যেতে আসেন নি। অনুরোধও জানাতে এসেছেন।

কেউ চায় না কেস হোক। শ্রাবণীর বাবা চান না, প্রফুল্ল দত্তও নয়, এমন কি আদিত্যর বাবাও নয়। তার কারণ হল, উনি [illegible] প্রাপ্ত, বৃদ্ধ না হলেও প্রৌঢ়ত্ব শেষ হয়। যে অবস্থায় মারা গেছে আদিত্য, আদালতে সমাজ-বিরোধী যুবকের গু[illegible] হিসাবেও বেরোতে পারে। অথবা, জড়িত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী-জলঘোলা নষ্ট-এদিকেও যেতে পারে। ও'র পক্ষে আর শোকটাই এত মর্মান্তিক যে [illegible] দত্তকে একবার দেখেই উনি বুঝে নি[illegible] প্রফুল্ল দত্তের পেছনে অদৃশ্য সব [illegible] শক্তি আছে। সকলের সঙ্গে লড়তে [illegible] তাঁর মতো সাতপুরুষের ভদ্রসন্তানের [illegible] সম্ভব নয়।

যাদের সামনে ঘটেছে, যা হয়েছে [illegible] যেতে প্রস্তুত আছে সবাই। কিন্তু বরু[illegible] কি অনবরত বলে চলেছে 'কেন, [illegible] কেশ্চান ছিল বলব কেন? ও তো [illegible] করেনি? আমি তো ওকে বললুম [illegible] যান, ও বোধহয় বললে স্কাউ[illegible] আমরা বাঁকুড়ায় একটা রেসপেক[illegible] ফ্যামিলি, আমাকে ও বললে স্কাউ[illegible] আমিই তো ওর গলাটা তখন ঝাঁকানি থামিয়ে দিতে গিয়ে...'

হঠাৎ না কি বরুণের মনে পড়[illegible] সত্যবাবুর ছেলে। ও নাকি এখন এ অ[illegible] আর মিথ্যে বলতে পারে না। কেস [illegible] যে সবাই মিলে জড়িয়ে পড়া, আদ[illegible] অপ্রিয় সব ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনীর [illegible] তারণা তা কে না জানে। শ্রাবণীই ব[illegible] বার অপ্রিয় একটা ঘটনার নায়িকা হ[illegible] করে? সত্যবাবু যদি এসে দাঁড়ান, স[illegible] যদি বরুণকে বলেন, দেখা যাচ্ছে ও'র [illegible] তো বলছে বরুণ। সত্যবাবুর মেজ[illegible] চলে এসেছে, মেয়ে-জামাই-মেজছেলে [illegible] বলে বলে হয়রান হয়ে গিয়েছে। অ[illegible] কথা নাকি কুমুদিনী বলেছেন ওদের। [illegible] শ্রাবণী তো অশোকেরও প্রিয় [illegible] স্নেহের সম্পর্ক। অশোকেরো উ[illegible] বিষয়ে দায়িত্ব নেওয়া।

'উনি শুনবেন না।'

অশোক মাথা নাড়ল। তবু ও [illegible] গেল সত্যবাবুকে। ফরক্কা থেকে কল[illegible] কলকাতা থেকে দুর্গাপুর আর দু[illegible] থেকে বাসে বাঁকুড়া। যেতে যেতে ওর [illegible] হতে লাগল সত্যবাবু রাজী হবে[illegible] বিরাট একটা অবাঞ্ছিত কেচ্ছা-কেলে[illegible] ফেটে পড়বে চতুর্দিকে। শ্রাবণীর [illegible] উঠবে বারবার আর বিপক্ষের উকীল [illegible] পায় করতে চেষ্টা করবেন শ্রাবণী [illegible] মেয়ে যে, সে-ই গণ্ডগোল বাধিয়ে[illegible] বরুণের সঙ্গে ওর সম্পর্ক একটা [illegible] করতেই হবে ও'কে। বরুণ মানে [illegible] দত্ত।

সবকিছুই হবে, কিন্তু সত্যবাবু [illegible] হবেন না। সত্যবাবু জেদে অটুট [illegible] সব দিকেই অসুবিধে, অশোকেরো। [illegible] জানেন কি হবে। যদিও, উনি এ[illegible] অনমিত্ত থাকলে অশোক ও'কে শ্রদ্ধা [illegible] পারবে। বোধহয় ও'কে শ্রদ্ধা করে[illegible] আরো সোজা হবে। কিংবা হবে না।

নুষের জেদের জন্যে এতগুলো জীবন পর্যন্ত হবে তাই কি ভালো? হয়তো লকে ফিরিয়ে দেবার পর সত্যবাবু তো সত্যিই একলা হয়ে যাবেন একেবারে। ন হাতীর পা-টা ছাড়া কিছু থাকবে ও'র।

কিন্তু অশোকের প্রতিটি ধারণা আর শ্বাস উল্টে দেবেন বলেই বসেছিলেন ত্যবাবু।

ভাবখানা দেখালেন অশোকের কথাতেই জী হলেন উনি কিন্তু ভেতর ভেতর ভেতর আরেকবার সাধলেই খাই ছের নিমরাজী হয়ে ছিলেন ন। উনি যদি অশোককে ফিরিয়েই দিতেন াহলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত তিনটে রিবারে। বেড়াজালে অনেক মাছ উঠত, উই বাদ যেত না। এখন তো খুশী ওয়াই উচিত অশোকের, কিন্তু ভেতর থেকে ন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল সব। না চোখে, বিষণ্ণ অশোক দেখল, কেমন করে ত্যবাবু নতুন ভূমিকায় টুপ করে ঢুকে লেন। বিনা রিহার্সালেই সাকসেস। যেমন কবারের চেষ্টায় রাইফেল ছুঁড়েছিলেন, কবার দেখে নিয়েই ব্রিজখেলা শিখেছিলেন, মনি।

ছুটে গেলেন কলকাতা, বরুণকে কি বাবালেন কে জানে। ওকে দিয়ে উনি ওর নবন্দী প্রত্যাহার করালেন, ডাক্তারকে য়ে বলালেন ও তখন সাময়িকভাবে প্রকৃতিস্থ ছিল। প্রফুল্ল দত্ত অন্য দিকটা খতে লাগল, সত্যবাবু বরুণকে। শুধু ই নয়, চেনাশোনা ধরে ধরে, প্রতিপত্তি াটিয়ে উনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। কবে বাঁকুড়ায় কোন সরকারী পোস্টে ছল, এখন কোথায় এসেছে, খবর নিতে আর াকি রাখলেন না কিছু।

এজন্যে পয়সা-কড়িও ঢালতে লাগলেন নজের যা ছিল সব। বাঁকুড়ার বাড়ী বিক্রী রে দেওয়াই সাব্যস্ত হোল। এখন তো ছেলেমেয়েরা বাবাকে ছাড়তেই চায় না কেউ। বাই বলতে লাগল ও'কে বড্ড ভুল বোঝা য়েছে, অবিচার করা হয়েছে ও'র ওপর।

সব চুকেবুকে গেল, তখনই উনি এক-বারটি বাঁকুড়া গেলেন। অশোক ও'র সংগে গল। এখন ও'র সংগে ও নিজেও জড়িয়ে ড়েছে, ও'র কাছে অশোকও নানা কারণে ণী, ও'র বাড়ী আর ফার্নিচার বিলি-বেস্থা করতে ও যদি খানিকটা সাহায্য না রে তাহলে কে করবে?

বাঁকুড়া থেকে চলে আসবার আগে শোক ও'র সংগে দেখা করতে গেল।

পেট্রোম্যাকস্ জেবলে বসেছিলেন ত্যবাবু, ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছিলেন। শোক আসবার পরও অনেকক্ষণ বসে ছিলেন।

'সবাই আমাকে নিয়ে হাসছে।' একবার লেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ গেল। অনেক, অনেকক্ষণ বাদে, অশোক বলল 'আমি যাচ্ছি।'

কেন না ও-ও তো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না একটাও। কি বলবে ও'কে, কিই বা বলবার আছে। বরুণের শরীরটা বড়ো, বরুণের বাবার ব্যক্তিত্বের আয়তনটা অনেক বেশী বড় ছিল, এখন সেটা ছোট্ট হয়ে গেছে। সস্তা শীতের জামা জল পড়তে যেমন কুঁচকে যায়। এখন আর, 'আমি যাচ্ছি, ছাড়া আর কি বলতে পারে অশোক।

'এরা সবাই বুঝলে অশোক, যদ্দিন আমি অন্যরকম ছিলাম তদ্দিন আমার মুখদর্শন করত না। এখন আমার পাদোদক দিলে পরে খায় এমনই অবস্থা। রিয়ালি!'

'আমি যাচ্ছি।'

'তুমিই বলো অশোক, এখন আমি তো সাধারণের চেয়েও সাধারণ, একটা সুবিধা-বাদী, খোসামুদে, বজ্জাতলোক। এর আগে কি আমি ভালো ছিলাম না? তখন, তখন কি কুমুদ আর ছেলেমেয়েরা আমাকে একবার......' কান্না অথবা কফে ও'র গলা আটকে গেল।

এখন অশোক দেখতে পেল হাতীর পা-টা তাকের ওপর রেখেছেন উনি, মাথার উপরে সম্ভবত এতদিনে হাতীটা শোধ নিয়েছে সত্যবাবুর ওপর। এখন আর ওর পা-টার ওপর ঠ্যাং চাপিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। ব্লটিং কাগজের অথবা পিজ-বোর্ডের মত চামড়ার স্তর, তোবড়ানো একটা হাতীর পা। প্রথম দিকে লবণ-টবণ ঠিকমত দেওয়া হয় নি বলে বেঁকে গেছে দিনে দিনে।

সময় একটা শব্দহীন বলের মতন গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে।

শয্যার পাশে হাতের নাগালে চৌকির ওপর এক কাপ চা, যার উষ্ণ বাষ্প আপাতত অন্তর্হিত। পাশে আধ কাপ চা অনাদরে অবহেলায় পরিত্যক্ত। ছাইদানে উপচানো সিগারেটের খণ্ডাংশ কুণ্ডলী-পাকানো। একটা সিগারেট বহুক্ষণ জ্বলে জ্বলে গন্ধে আর ধোঁয়ায় নিঃশেষ হচ্ছে।

পরস্পর মুখোমুখি দুটি প্রাণী এখন কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। যেন উভয়ের অস্তিত্ব ভুলে গেছে তারা।

মণীশের দৃষ্টি সামনের দেয়ালে। যেখানে জল পড়ে পড়ে ব্লটিং পেপারের মতন দাগ হয়ে গেছে। দাগটাকে একবার হাঁটুগেড়ে বসা ভালুকের মতন দেখাল, নাকি আড়মোড়া-ভাঙা একটা মার্জার!

একটা অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পেরেছে ভেবে মণীশ খুব নিশ্চিত হল। এখন এই দাগটাকে নিয়েই ভারি গবেষণা করতে পারবে সে। যেমন : এই দেয়ালের অংশটুকু একদা দুধ-শাদা ছিল। কেমন ছিল অন্যদিকের দেয়াল দেখলে স্পষ্ট ধারণা করতে পারা যায়। তারপর ছাদে জল জমে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ওখানকার দেয়ালটুকু ঘোলাটে করে দিয়েছে।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই : ভাবল মণীশ : জলেরও দাগ আছে, জল রঙহীন নয়, তার দাগ এমনি করেই শাদা দেয়ালকে কলংকিত করে।

দীপ্তি দুএকবার ওর মুখ তুলে ধরেছে। সে দেয়ালকে দেখতে পায়নি, পেয়েছিল মণীশের বড় বড় চোখদুটো, সে-চোখের দর্পণে ঘোলাটে দেয়ালের প্রতি-বিম্ব ছিল-কি-ছিল-না দীপ্তি লক্ষ্য করেনি। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেনি, নিজের আবেগের বাষ্পে বন্দী হয়ে পড়েছিল।

চোখের পরদায় বিচিত্র এক আলোর অন্ধকার অনুভব করছিল দীপ্তি। সে-আলোতে সে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কেবল আপন সত্তাকেই সে উপলব্ধি করতে পারছিল। বর্তমানের ব্যথা-বেদনার মধ্যেও তার নিজের দিকটাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

সে যদি নিরপেক্ষ চিন্তা করতে তাহলে দেখত তার সমূহ ভাবনা স্বার্থপরতার বৃত্তে আটকানো। আত্মবোধ থেকে উৎসারিত।

মণীশ এখানে অবান্তর। দীপ্তির দিক থেকে তেমন কোনো দেখা যায়নি। আগেকার দিনগুলির মণীশকে ঘিরে তার নিজস্ব সুখ-অসু গুলিই বড় হয়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রিকতা থেকে সমস্যাগুলি রচনা করেছে আজকে তার বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতেও তার কায়দাগুলি কিছুমাত্র পালটায়নি।

চোখের সামনে মলাটবন্ধ কেতাবের মতন এই যে শয্যায় পড়ে ক্লান্ত হয়ে আছে মণীশ তাতেও রাগ হচ্ছে দীপ্তির। যেন ওর চুপ করে থাকবার অধিকার নেই। বিশেষত এই পরিস্থিতিতে। দীপ্তির প্রতি মণীশের অমনোযোগিতারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয় কি? অন্তঃশায়ী ধৈর্যহীন হিংসার ক্ষুর দেখাচ্ছে দীপ্তিকে। মণীশের নীরব থাকা মানে স্পষ্টত তাকে উপেক্ষা করা। যেটা দীপ্তির পক্ষে অসহনীয়।

'কথা বলছ না কেন?' দীপ্তি বলল, বলতে পারল, কিন্তু গলার স্বর তেমন রূঢ় মনে হল না।

মণীশ নড়ল না। তেমনি করে শুয়ে রয়েছে।

ছাইদানে সিগারেটটা ছাই হয়ে গেছে। তার তীব্র গন্ধটা ঘরময় ছুটোছুটি করছে।

দেয়ালের থেকে মণীশের চোখ এবার ওর পায়ের নখের ওপর। পাজামার ফাঁকে পায়ের নখগুলি দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল মণীশ।

'কী হল? কথা বলছ না কেন?' দীপ্তির আর্তনাদ : 'বলো এখন আমি কী করব? একটা কিছু বলো, আমি আর পারছি না।'

এখনো দীপ্তির চিন্তায় আত্মগত ভাব। আমি কী করব, আমি আর পারছিনে, আমি .. আমি...

মণীশ দেশলাই খুঁজল। আর সেই চেষ্টায় ওর শরীরটা নড়ে উঠে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করল।

দীপ্তি সাহস সংগ্রহ করে, আবার বলল : 'চুপ করে থাকলে চলবে না। একটা কিছু বলো...'

মণীশ বলল, 'আমি কী বলব...' ওর কথাগুলো শুকনো বাসী শোনাল। যেন অন্য কারুর গলা।

দীপ্তি বলল, 'মানে? তোমার চুপ করে থাকার কী অর্থ?'

'না। আমার কিছু বলবার নেই।'

'আমি জানতাম...' কী জানত দীপ্তিই জানে. বলে' দম নিল খানিক, তারপর : 'আমার কোন কথাই তুমি কোনদিন ভাবতে পেরেছে? এই দশ বছর ধরে,—'

মণীশ বলল, 'সে-কথা থাক।'

'কেন? কেন থাকবে? এই দশ বছর ধরে মন্ত্রের মতন কতবার শুনিয়েছ, ভালোবাসি-ভালোবাসি। আমি না হলে...'

'ভালবাসার কথা থাক।'

'তার মানে আজ আর তুমি আমাকে ভালোবাসো না?'

'সে-কথা তোমার চেয়ে ভালো কে জানে?'

'তবে?'

মণীশ অন্যমনস্ক খুঁজতে খুঁজতে এবার দেশলাই পেয়েছে। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে অগ্নি-সংযোগ করবে, দীপ্তি প্রশ্ন করল : 'দশ বছরের স্মৃতি আর তোমাকে তাড়া করে না। আশ্চর্য, সেই আগের মতোই। এই দীর্ঘ দশ বছরে কখনো তোমাকে উত্তেজিত হতে দেখলাম না, একটু অস্থির হতে। তুমি...'

মণীশ সিগারেট ধরাল। ওর অস্বাভাবিক বড় বড় চোখদুটো আবার কেমন ঘুম-কাতর দেখাল। আবার কী দেয়াল দেখছে, দেয়ালের কলংক?

দীপ্তি ঠোঁট চেপে ওকে জরিপ করল। তারপর বিরক্ত গলায় বলল, 'তোমাকে কোনোদিন বুঝতে পারলাম না।'

বোঝবার চেষ্টা কী ছিল দীপ্তির? ভালোবাসায় সে উত্তেজনা খুঁজছিল, চাঞ্চল্য। দশ বছর ধরে প্রেমিকের কাছে সে কোনোদিন উত্তেজনা পেল না, চাঞ্চল্য। অথচ ভালোবাসে! শব্দহীন শিশিরের মতন ভালোবাসে। এর নাম গভীরতা, যা ইন্দ্রিয়ের দরোজায় আগুন ধরায় না।

'এই দশ বছর ধরে তোমার কাছে পেয়েছি বিশ্বাসের পাঠ। আর, ঠানদিদির রুদ্রাক্ষের মালার মতো জপিয়েছ : অপেক্ষা করো।'

মণীশ সংক্ষিপ্ত কাশল। বলল, 'অপেক্ষা আমরা দুজনেই করেছি। তার প্রয়োজন ছিল। সে-কথা তুমি জানো।'

দীপ্তি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলল, 'জানি। কিন্তু কতদিন এই অপেক্ষা-অপেক্ষা খেলা চলতে পারে?'

'খেলা!' মণীশ বিস্মিত না হয়ে পারল না।

'নয়তো কী। জানো না একটা মেয়ে, কতদিন অপেক্ষা করতে পারে, পারা যায়?'

মণীশ বলল, 'পারে না। হয়তো পারা উচিতও নয়। তার জন্যে তো তোমার কৈফিয়ত চাইনি।'

'চমৎকার নাটক। কৈফিয়ত চাইনি!' দীপ্তি শক্ত হয়ে বলল, 'তার অর্থ কোনোদিন আমার দায়িত্বকে তুমি স্বীকার করোনি।'

'দায়িত্ব স্বীকার করেছি বলেই চোখ-কান খোলা রাখতে হয়েছে। বাইরের সংসারকে উপেক্ষা করতে পারিনি।'

দীপ্তি বলল, 'এ উত্তর আমি জানতাম। আমার চেয়ে বাইরের সংসার তোমার কাছে বড়। আমি, আমি তোমার কাছে কেউ ছিলাম না, তোমার সংসারের ধারণার বাইরে...'

মণীশ পরিপূর্ণ চেতনায় তাকাল দীপ্তির দিকে। কম্পিত ওর শরীরটা দেখল, কুঁজো হয়ে বসে-থাকা। হাতে শাদা পাথরের বিয়ের আংটি। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুরের রেখা। গোধূলির আলোতে ওকে কোমল ও নরম দেখাচ্ছিল। অনন্তর মণীশ হাসল। এতক্ষণকার বিশ্রী গুমটের পর হাসতে পেরে হালকা বোধ করল। বলল, 'কঠিন সংসারটা যে তোমার-আমার চেয়ে অনেক বড়, এ-কথা তো মিথ্যে নয়। মনে পড়ে : বাইরের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে যেদিন তোমার কাছে ফিরে এলাম, তুমি আমাকে তিরস্কার করেছিলে দায়িত্বহীন কাপুরুষ বলে'?'

দীপ্তি নিঃশব্দ।

'তখন প্রথম যৌবন। মস্ত আঘাত পেয়েছিলাম। তোমার মতনই সেদিন আমার চেয়ে বাস্তবের পৃথিবীটাই তোমার কাছে বড়। তারপর—' ছড়ানো পা-দুটো গুটিয়ে এনে মণীশ বলল : 'এই শহরেই যে কোনো একটা কাজের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। পাইনি। চাকরি নিয়ে আরো দূরে চলে যেতে হল, বাংলার বাইরে। সেদিন তুমি আমাকে বাধা দাওনি।'

দীপ্তি আস্তে বলল, 'সে তো তোমার ভালোর জন্যেই।'

মণীশ বলল, 'হ্যাঁ আমার ভালোর জন্যেই বইকি। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। এবং সম্ভবত আমার ভালোর জন্যেই যখন তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলাম, তুমি নানান অজুহাতে প্রস্তাবকে নাকোচ করে দিলে?'

'যারে ওই নতুন জায়গায়, তোমার ওই মাইনের...?' দীপ্তি দম নিয়ে বলল, 'আর তাছাড়া সেদিন যদি তোমার হাত ধরে চলে যেতাম, তাহলে কী আর পারতে চেষ্টা করে বাঙলা দেশে ফিরে আসতে? আমার সংগে জড়িয়ে পড়লে, আজকের উন্নতি হত তোমার?'

মণীশ আবার দেয়াল দেখল, দেয়ালের দাগ। এখন মনে হল এই দাগটা ডানামেলা সারসের মতো হয়ে গেছে।

বাইরে রোদের রঙ নিবে গেছে। বিকেলের আকাশ নির্মেঘ নীল। হাওয়া কাঁপিয়ে যাচ্ছে জানালার শার্সি।

দীপ্তি মণীশকে লক্ষ্য করল। বাইরের আলো ওর মুখে। সন্ধ্যাতারার মতন চকচক করছে ওর চোখের মণি। ওই চোখ-দুটোর স্মৃতি অনেক রঙ, অনেক আলো নিয়ে গেঁথে রয়েছে দীপ্তির হৃদয়ে। কখনো কোনোদিন বিষন্নতার ছোপ পড়তে দেখেছে সেই চোখের তারায়। কখনো সন্ধ্যার ঝিলে আলোর প্রতিভাস হয়ে দুলেছে

সেখানে। কিন্তু কোনোদিন বৈশাখের লোলিহান ক্ষুধায় জ্বলে উঠতে দেখেনি:

দীপ্তির হঠাৎ কেমন শীত-শীত করতে লাগল। সর্বাংগে কাঁটা দিয়ে উঠল। মৃদু স্বরে ডাকল: 'মণি—'

মণীশ মুখ ফেরাল। দুজোড়া চোখ কতক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

দীপ্তি চাপা গলায় বলল, 'আজ এই অবস্থায় তোমার কাছে ছুটে এসেছি বলে কী ঝগড়া করবে?'

'ঝগড়া।' মণীশ অসহায় হাসল

'তবে আমার সংগে ভালো করে কথা বলছ না কেন?'

'কী বলব?'

'আজ আর আমাকে কোনো কিছু বলার নেই?' দীপ্তি ফোঁপাল: 'তুমি এমন ছিলে না। এমন নিষ্ঠুর, উদাসীন। বুঝেছি আমার ব্যবহারের শাস্তি দিচ্ছ তুমি।'

'দীপ্তি, চা খাবে?'

'না।'

মণীশ চুপ করে রইল।

দীপ্তি বলল, 'তোমার মনে পড়ে?'

'কী?'

'আমাদের সেই হারিয়ে-যাওয়া অশ্চর্য দিনগুলো? সেই বাড়ি-পালিয়ে, কলেজ-পালিয়ে...?'

'পড়ে। কিন্তু...'

'তোমার কী মনে হয় না সেই দিনগুলোর অনুভব আজো কোথাও স্থায়ী

হয়ে রয়েছে? ইচ্ছে করলে আমরা সেই অনুভবে ফিরে যেতে পারব?'

মণীশ বলল, 'স্মৃতিকে ধরে রাখতে নেই।'

'নেই? না।' দীপ্তি চুপ করে ভাবতে লাগল। বোধহয় আঁতিপাতি করে খুঁজছিল ফেলে-আসা স্মৃতির কোনো টুকরো।

একরাশ খেলনা জমাকরা ছোট্ট শিশুর মতন দেখাচ্ছিল দীপ্তিকে। স্মৃতির ঐশ্বর্যে তার সারা মুখে অনির্বচনীয় মুগ্ধতা।

দীপ্তির স্মৃতি আছে ভবিষ্যতও আছে। কিন্তু যার ভবিষ্যতকে সে নিজের হাতে নষ্ট করেছে তার কাঁধে অকারণ স্মৃতির বোঝা চাপিয়ে দেবার নিষ্ঠুরতা কেন!

'সেই যে—এক বর্ষার বিকেলে চন্দননগরের স্ট্র্যান্ডে?' দীপ্তির কণ্ঠস্বরে বর্ষার গন্ধ: 'সারা বিকেল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম গঙ্গার ধারে। হঠাৎ মেঘ কালো করে ঝম-ঝম বৃষ্টি নামল; আমরা পিছন ফিরে ছুটলাম চার্চের দিকে। তোমার মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। তুমি আছড়ে পড়েছিলে। আমি তোমাকে তুলে নিয়ে ছুটেছিলাম...'

'সেদিন কী বলেছিলাম, মনে আছে তো?'

'বলেছিলে: এইভাবে আমার ভার চিরদিন নেবে তো? বলেছিলে—বিশেষভাবে বহন করার নাম 'বিবাহ—'

দীপ্তি বলল, 'তোমার তো সব মনে আছে দেখছি। কিছুই ভোলনি।'

সে-সব কথা এখন থাক, দীপ্তি। মণীশ কঠিন গলায় বলল।

'তবু, কেন এমন হল বলো তো?'

মণীশ সিগারেট ধরাল।

'কাল-হরণই আমাদের কাল হল।' দীপ্তি বলল: 'তুমি ভাগ্য বিশ্বাস করো?'

'না।'

'তবু এটা ভাগ্য ছাড়া আর কী।' দীপ্তি বলল: 'এমন পরিষ্কার দীর্ঘ বছরের স্মৃতিগুলো মনে আছে। অথচ চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় সেই স্মৃতি আমাকে বাধা দিল না কেন?'

মণীশ আবার দেয়াল দেখল, দেয়ালের দাগ।

'নিজেকে এমন খেলো, বাজে ভাবতে...' দীপ্তি নিশ্বাস ফেলল। তারপর—'এমন কেন হল বলো তো?'

মণীশ উত্তর করল না। কারণ ওর কথার উত্তর হয় না।

'তোমার কী মনে হয় আমার ভালোবাসায় কোনো ফাঁক ছিল...?' দীপ্তি চিন্তা করে বলল।

'কী করে বলব।' মণীশ হাসতে চেষ্টা করল।

'কতদিন কত ঝগড়া হয়েছে তোমার সঙ্গে, দেখা-না করার কত প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। সেই ঝগড়া অভিমান যে আমার নিজের মধ্যেই জমে জমে মেঘ সৃষ্টি করছিল, আমি বুঝতে পারিনি।' একটু থেমে দীপ্তি বলল: 'তুমি কোনোদিন আমার মান-অভিমানের দাম দাওনি।

আমি যত রাগ করেছি তুমি উলটো ব্যবহার করে আমাকে রাগিয়েছ। আমাকে অন্ধ করে দিয়েছ...'

'এসব এখন থাক।'

'না। আমাকে বলতে দাও।' দীপ্তি নড়ে বসল: 'লীলাবউদির কথা তোমার মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। ও'র সঙ্গে মেলামেশা তুমি পছন্দ করতে না।'

'লীলাবউদিকে আমি সন্দেহ করতাম। পাড়ায় ও'র যথেষ্ট বদনাম ছিল।'

'সেই নিয়ে আমার সঙ্গে একমাস দেখা বন্ধ করেছিলে। তোমার ওই মিথ্যে সন্দেহকে মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্যেই আমি লীলাবউদির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিনি।'

'তারপর তুমি রাগ করে চলে গেলে আসাম। কাঠের ব্যবসা করতে...'

'ভেবেছিলাম আমার অবর্তমান তোমাকে স্থির হতে দেবে। ভেবেছিলাম...' মণীশ সিগারেট ধরাল।

দীপ্তি অনেকক্ষণ মণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল: 'কেন গেলে? আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে একবারও ভাবলে না আমার কী করে কাটবে? না-দিলে তোমার ঠিকানা, না-কোনো চিঠি। পুরো একটি বছর।'

মণীশ বলল, 'আমার দুর্বলতা তোমাকে জানতে দিইনি।'

'কিন্তু একথা একবারও ভাবলে না কেন, যা তুমি নও তা তোমার শোভা পায় না। কেন বুঝলে না একটি মেয়ের হৃদয়কে?'

মণীশ চুপ করে রইল।

'নির্মল এল এই সময়ে। ও যেন আমার মনের দৈন্যকে বুঝতে পেরেছিল। হঠাৎ কয়েকদিনের পরিচয়ে—'

মণীশ বলল, 'তার পরের ঘটনা আমি জানি।'

'না। জানো না। শোনো—' দীপ্তির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন: 'নির্মল প্রথম দিনই দুঃসাহসী হয়ে আমার স্তব করেছিল, আমার স্বাস্থ্য ও যৌবনের প্রশংসা করেছিল। ওর স্তবে হঠাৎ এক প্রখর আলোয় আমার ভেতরের রক্তমাংসের মানুষটিকে আমি চিনতে পারি। আমি শংকিত হয়েছিলাম। একটা উল্লাস-জাগানো ভয়। তোমার সঙ্গে এই দীর্ঘদিনের সম্পর্কে তুমি কোনোদিন আমার এই ভেতরের রূপটিকে জাগিয়ে তোলোনি। আমরা যেন পুরাতন বন্ধুর মতন হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেতরে-ভেতরে শীতের নদীর মতন শুকিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নির্মলের স্তব আমার শুকনো খালে বন্যার ঢল এনে দিল। আর, কিছু বোঝার আগেই আমি কুটোর মতন ভেসে গেলাম...'

মণীশ বলল, 'একথা বলে এখন লাভ কী?'

'জানিনে। হয়তো তোমার ভালো-মানুষির নিরীহ-স্বভাবের কী দাম আমাকে জীবন দিয়ে দিতে হয়েছে সেই কাহিনীই তোমাকে শোনাতে চাই।'

'কিন্তু সত্যি-সত্যি এ সকল আলোচনার তো এখন কোনো মানে হয় না।'

দীপ্তি বলল, 'আমাকে বলতে দাও। আমি জানি তুমি আমাকে অসংযমী চপলমতি আখ্যা দেবে। কিন্তু তুমি কী জানো কত মেয়ে মনকে তিলে-তিলে হত্যা করে শরীরধর্মের দাসত্ব করছে। এর মতো সত্য কথা কী আছে মেয়েদের মনের সঙ্গে শরীরের সন্ধি সব সময় হয় না। তুমিই বলো: আমি কী করে জানব পাকা আঙুরের মতন আমাদের চামড়ায় টোকা দিলে সব রস বেরিয়ে পড়বে।' একটু থেমে: 'তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি নির্মলকে ঘৃণা করি। সেদিনও করেছি, আজো করি। কিন্তু এমন করে ও-যে আমার শরীরকে
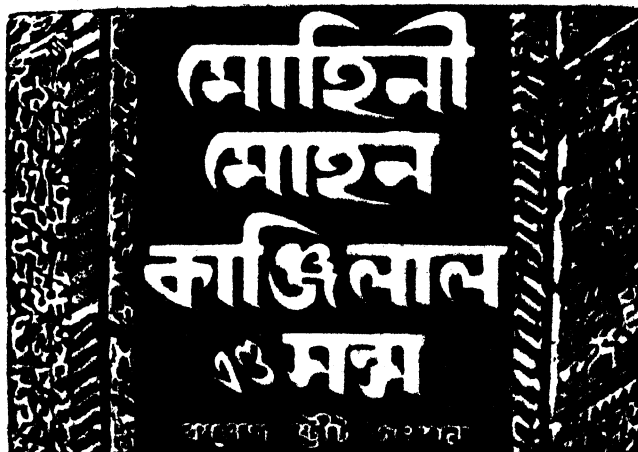
নির্লজ্জ করে দেবে তার আমি কী জানি।'

মণীশ বিহ্বল হয়ে দীপ্তির মুখের ওপর স্তব্ধ হয়ে রইল। যেন এ মেয়ে দীপ্তি নয়, যাকে দশ বছর ধরে দেখেছে।

'আমাকে এবার ঘৃণা করছ তো?' দীপ্তি বলল।

মণীশ নিঃশব্দ।

'আমিও নিজেকে ঘৃণা করি। কিন্তু প্রহেলিকাকে আমি কিছুতেই সমাধান করতে পারলাম না: ভালোবাসার মতন ঘৃণারও যেন আকর্ষণ আছে।'

বাইরে সন্ধ্যার জটিলতা। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। আলো-জ্বালার দরকার। কিন্তু কেউ সাহস সংগ্রহ করতে পারছে না। এই ধূসর অন্ধকার যেন পরদার মতন তাদের বাঁচিয়েছে।

'মণি—'

'কেন?'

'আমার কী হবে বলতে পারো?'

'বাঁচতে হবে, দীপ্তি।'

'এর নাম তুমি বাঁচা বলো?'

'বলি। মানুষ এর চেয়েও কঠিন ক'রে বাঁচে।'

দীপ্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তাহলে বাঁচতেই হবে। হ্যাঁ তারপর শোনো। নির্মল বুঝতে পেরেছিল আমার একটা অতীত রয়েছে। কিন্তু কোনোদিন তা নিয়ে সে প্রশ্ন করেনি। ঝড়ের মতন আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তারপর ঝড়ের মতনই সে কান্ড করে বসল। আমাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করে ফেলল। বিশ্বাস করো, আমার নিজের কাছেই বাধাগুলি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এটা কেউ বিশ্বাস করবে না: আমার মতন বয়স্ক মেয়েকে জোর করে কেউ বিয়ের মতন ব্যাপারটা করে ফেলতে পারে, শুনলে ন্যাকামি বলবে। বাড়ি ফিরে সারারাত কেঁদেছি, মনে হয়েছে ছাদ থেকে লাফিয়ে জীবন-জ্বালা জুড়োই: কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি।'

মণীশ কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই দীপ্তি বলল, 'এটাকে কী বলবে তুমি? খেয়াল, না বিকারগ্রস্ত মনের প্রতিক্রিয়া...'

মণীশ বলল, 'কী জানি, কখনো বিচার করে দেখিনি।'

দীপ্তি বলল, 'কতদিন নিজেকে বুঝতে চেয়েছি। কী করে বিয়ের চুক্তিতে সই করলাম, আর কেনই-বা বাড়ি ফিরে কাঁদতে বসলাম। আমি কী পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচি আমাকে বাধা দিল না!'

মণীশ বলল, 'অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।'

দীপ্তি বলল, 'তুমি বিরক্ত হচ্ছ আমার প্রলাপ শুনে। যে-কাজ আমি বুদ্ধি দিয়ে করিনি, বিচার দিয়ে করিনি, সেই ভুলকে মিথ্যা জেনেও সংশোধন করবার কোনো উপায় নেই, মণি? একটা বাজে চুক্তি আমার জীবনকে বেঁধে রাখবে!'

মণীশ বলল, 'ভুল যদি হয়েই থাকে তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, দীপ্তি। তাকে মেনে নিতে হবে। মানুষকে অনেক সহ্য করতে হয়।'

'আমি জানতাম তুমি একথা বলবে। আমি যখন পর হয়ে গেছি, তুমি তোমার অধিকারের হাত তুলে নিয়েছ। কিন্তু, তোমার মনকে কী বলে প্রবোধ দেবে?'

'মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। কত মানুষ এ-সংসারে সারাজীবন মনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বেঁচে গেল।'

'আমাকে না-পাওয়ার জন্যে কোনো কষ্ট তোমার হবে না?'

'না।'

'না!'

'না।'

দীপ্তি বলল, 'তার মানে আমার অস্তিত্বটাই তোমার জীবনে সত্য হয়ে ওঠেনি। আমি তোমাকে কিছুই দিইনি, তাই কিছু হারাবার দুঃখ তোমার নেই।'

মণীশ বলল, 'দীপ্তি, কেঁদো না।'

দীপ্তি বলল, 'আমি আঘাত সইতে পারি, কিন্তু অবহেলা নয়। কেন তুমি ফেলে গেলে আমাকে? আমার ভালোবাসাকে সরিয়ে ঠেলে ফেলে কে তোমাকে যেতে বলেছিল? যদি গেলে, কেন আমাকে সম্পূর্ণ করে জয় করে গেলে না, কেন তোমার কামনা-বাসনার রঙে আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে রাঙিয়ে গেলে না?'

'দীপ্তি—'

'না। তোমার ওই ভালোমানুষির হৃদয়হীন অভিনয় আমার ভালো লাগে না। দীপ্তি বলে মেয়েটি তোমাকে প্রতারণা করেছে, এই আত্মপ্রসাদে তুমি যে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবে, এ আমি সইতে পারিনে।'

'দীপ্তি, কী বলছ?'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। তোমার বন্ধুরা জানবে একটি মেয়ে তোমাকে ঠকিয়েছে, দশ বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পর... ...

'দীপ্তি।' মণীশ কঠিন চিৎকার করে উঠল।

দীপ্তি মণীশের উত্তপ্ত মুখাবয়ব দেখল, চোখের আগুন, আঙুলগুলির বিক্ষোভ। 'তুমি আমাকে মারবে?'

মণীশ চোখে আঙুল চাপা দিল। 'দীপ্তি তুমি এবার যাও।'

দীপ্তি ভয় পেল না, বসে রইল। হঠাৎ সে যেন একটা জোর পেয়েছে। মণীশ এতক্ষণপর তার বিকারহীন নিস্পৃহতা কাটিয়ে উঠেছে। তাকে এখন জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ মনে হচ্ছে। একটু থেমে দীপ্তি বলল, 'ধরা পড়ে গেছ তুমি। আমি আর তোমাকে ভয় পাইনে।'

আর, সেই সময় চোখে হাত রেখে মণীশের মনে হল: এই মেয়েটি ভীষণ নিষ্ঠুর, সমস্ত মুহূর্ত তীব্র অত্যাচার দিয়ে রক্তাক্ত করে রেখেছে। একটা নিঃশব্দ যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে মণীশের সত্তা।

'মণি—'

মণীশ নিরুত্তর।

'মণি, তুমি আমাকে ভুলতে পারবে না পারোনি। কোনোদিনও নয়।' দীপ্তির চোখের তারায় আলোর সাপ: 'আজো তুমি আমাকে পেতে পারো।'

মণীশ তড়িতাহত মুখ তুলে তাকাল।

'চলো, এখন এই রাত্রেই কোথাও পালিয়ে যাই—'

মণীশ স্তব্ধ।

'যাবে?'

'কোথায়?'

'যেখানে তোমার খুশি।'

'না।' মণীশের হৃৎপিন্ড যেন ফেটে পড়বে।

'আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো, যা তুমি পাওনি এই দশ বছর ধরে, আমাদের একটা বোকামি......'

'তা হয় না দীপ্তি। দশটা বছর অনেকটা সময়......'

'কিন্তু তোমার চলবে কী করে?' দীপ্তি বলল।

মণীশ সিগারেট ধরাল। সন্ধ্যার মেঘ স্তরে স্তরে আকাশে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়া।

মণীশ বলল, 'আমি আবার নতুন করে ব্যবসা স্টার্ট করেছি।'

দীপ্তি বলল, 'ব্যবসা দিয়ে নিজেকে ভোলাবে? যখন শ্রান্ত হবে, ক্লান্ত আসবে?'

মণীশ বলল, 'তোমার কথা ভাবব।'

'একটা কথা শোনো। আমার অনুরোধ বিয়ে করো।'

'এটা কী তোমার মনের কথা, দীপ্তি?'

'কেন নয়? তোমাকে এমন লক্ষ্মীছাড়া দেখতে আমার ভালো লাগবে না?'

মণীশ হঠাৎ উন্মাদের মতন হেসে উঠল। 'দীপ্তি, এটা যদি তুমি বিশ্বাস করতে তাহলে আজ আর আমাকে পরীক্ষা করতে আসতে না।'

'পরীক্ষা।' দীপ্তি হাত ঘড়ি দেখল। তাকে যেন ব্যস্ত দেখাল। আয়নায় চুলগুলি দেখে নিল, মুখ, চোখের কাজল। ওকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বোধ হচ্ছিল। ভ্যানিটি ব্যাগ কাঁধে তুলে নিয়ে ও তাড়া-খাওয়ার মতন বলল, 'পৌনে আটটা। তোমার দরজার সামনে গাড়িটা দাঁড়াল না? ওকে পৌনে আটটায় আসতে বলেছিলাম। একটুও লেট করেনি।' তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দীপ্তি।

দরজা খোলার শব্দ। রাস্তায় ওর হিল-তোলা জুতোর আওয়াজ। গাড়িটা ওর অস্তিত্বকে মুছে নিয়ে চলে গেল।

মণীশ আবার দেয়াল দেখল, দেয়ালের দাগ।

...তুই যা করতে বলেছিস, তা আমি ইচ্ছে করেই করলাম না। আমার ইচ্ছে, তুই আরো দিন কতক ওখানে দেখে তারপর যা হয় একটা করিস। এত তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ফেলা বোধহয় ঠিক হবে না। ছাড়তে তো বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু জোগাড় করা যে কী দুরূহ ব্যাপার, সে আর তোকে বেশী কী বোঝাবো।

আমার কথাগুলো তুই অন্যভাবে নিস না। আমি তোর মানসিক অবস্থাটা ঠিকই বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করা যায়! মনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে পারবো—এ পৃথিবীতে এরকম জায়গা আমরা কোথায় পাবো বলতে পারিস? কোথাও নয়, কোথাও নয়। সর্বত্রই এই আনঅ্যাডজাস্টমেণ্ট। অবিশ্যি এই অসঙ্গতিটা প্রথম-প্রথম যতোখানি পীড়াদায়ক মনে হয়, পরে ততোটা আর মনে হয় না। কিছুটা গা-সওয়া হয়ে যায়। তখন এই অসঙ্গতির ভেতরে থেকেই আমরা আমাদের সত্তাটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি। এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সফলও হই।

তাই বলছি। এ সম্পর্কে আরেকটু চিন্তা

করে দ্যাখ। আরো কিছুদিন ধৈর্য ধর। তারপর না হয় আমায় লিখিস। আমি তোকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবো।

(২)

...বাড়ির কি বেবস্থা করিবা না করিবা আমি কেমন করে বলি। ভাড়াটিয়া বসানো অসম্ভব। আর বিশ্বাসী লোক এমন কে আছে? কেউ নাই। এক রাখা যায় সেই ছেলেটিকে যার নাম মিহির। সে থাকিতে পারে। তোমার কি মত? সে থাকবে ভাড়াটারা নয়। আর তুমি আসিলে ভালো হয় খুব। তা না হলে বিলিকে নিয়া আসিতে পারি। ও আমাকে বলেছে কাকা না আসিলে আমাকে নিয়া যাবেন কাকিমা। আমার হাতে এক পয়সা নাই। মেয়ের শরীর ভীষণ খারাপ। কি যে করি। আর তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও। আমার দুঃখ নাই। কিন্তু ৯০।১০০ টাকার জন্য তোমার সব পণ্ড করিবা না।

(৩)

...অফিসে রোজ ওভারটাইম করতে হচ্ছে। গত শনিবার ও রবিবার সুবিধা মতো খোঁজ করতে গিয়ে রওনা হয়ে গেছো জানালাম। রবিবার হিমাংশু ছিল সংগে।

নারায়ণ খাঁ কল্যানের কাছে ফর্ম আনতে গিয়ে তোমার জন্যে ফর্ম এনে আজ আমায় দিয়ে গেছে। নিজের ফর্ম সে জমা দিয়েছে। সিক্‌সথ জুলাই লাস্ট ডেট হলেও তোমার আগের দরখাস্তে কাজ দেবে। তাছাড়া কল্যানের অভিমত, ফর্মটা ব্যাক ডেট দিয়ে পাঠাতে বলেছে। সে ফাইল আপ করে নেবে রেকর্ডে।

আমি লেখার সময় বর্তমানে খুব কম পাচ্ছি। উপায় নেই এ ছাড়া। লিখছি নিয়ম করে। তোমার অভিজ্ঞ জীবন অনেক কিছু আমায় এ লাইন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে। ভূষণবাবুকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে একটা ভালো লেখা পাঠাবার ইচ্ছা ছিল। পরে পাঠাবো। 'নেপথ্যে', 'বিশ্বরঙ্গ' ও 'ধন' ইত্যাদিতে আমার প্রভাব গম্ভীরভাবে গিয়ে পড়েছে। তাছাড়া 'মহুয়া' নাম দিয়ে যেটা পাঠিয়েছিলাম তার ছাপ পড়েছে সাম্প্রতিক তিন ছোটগল্পে। লেখকদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কারণ, সবাই আমার চোখ-কান খুলে দিয়েছে। আমার বিষয়বস্তু কেমন করে সাজাতে হবে এবার বুঝতে পারছি। ছোটগল্পের আঙ্গিক কি ধরণের হবে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হল তোমার কঠিন সমালোচনা পেয়ে। আমার অন্তর তোমাকে শুভেচ্ছা জানাবেই। অনেক সংশয় নিয়ে কলম ধরেছিলাম। দৃঢ়বিশ্বাস তোমার কথায় ও উপমা সাজাবার ভঙ্গীতে নতুন করে খুঁজে পেয়েছি। তোমাকে কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ-এর মতো জীবনে পাবো। হয়তো বাংলা সাহিত্যে তোমার সেই আসন প্রতিষ্ঠা পাবে। আমি বেশী লিখবো না ভেবেও অনেক লিখে ফেলেছি। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে কবি কমলনয়ন মিশ্রের 'ব্যথার পেয়ালা'। কোনো লেখা কোথাও পাঠাবো না ভেবেই ঠিক ছিলাম। কিন্তু তুমিই বাধ্য করেছিলে পাঠিয়ে দিতে। ব্যাণ্ডেল ইনসিডেণ্ট নিয়ে তোমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যেটা লিখেছিলাম সেটা কমলনয়নবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। কবিতাটা পড়লে বুঝতে পারবে আমার প্রভাব তাঁর মধ্যে কম গভীরভাবে গিয়ে পৌঁছয়নি। 'মানসিক' ইত্যাদিতে তুমি আমার উপাখ্যান খাড়া করেছো। তাতে বেদনাবোধ জাগেনি মনে। কেন জাগবে? বরং খুশিতে মন ভরে আছে। মানিকবাবুর মতই চিরে দেখবে সবাইকে আর আমাকেও। আমার মনে হয় হাতে-কলমে তোমার কাছ থেকে যা পেলাম তার দাম দিতে পারবো না।

(৪)

...নরেণবাবু তো ছোটলোকের মত বলেই বসলেন, 'আদিনাথবাবু আপনেরে কী ল্যাখছে ইট্টু দ্যাখাইতে পারেন? আমি ছেকরেটারিবাবুরে চিঠিটা লইয়া গিয়া দ্যাখাইতাম। উনি আমাগো মুখের কথা বিশ্বাস করে না।'

এইসব শুনে মনে হয় ন্যাপলা বোকাটাকে চাকরির জন্যে কেউ ধরেছে। তাই সে এ ব্যাপারে ডেফিনিট হতে চাইছে।

সে জন্যেই তোর উচিত ছিল মেডিক্যাল সার্টিফিকেটসহ একটা দরখাস্ত করা। আইনতঃ তোর এই বিনা নোটিশে অনুপস্থিত হওয়াটায় ত্রুটি থেকে গেছে। যাই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওইভাবে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিস। নইলে কর্তৃপক্ষ হয়তো কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে।

নরেণবাবুকে আমি জানিয়েছি, তুই হাসপাতালে আছিস এবং তোর অপারেশান হয়েছে। সুতরাং ওদের যদি পার্সোনালী জানাস, তাহলে আমি যা বলছি তাই জানাবি। অফিশিয়ালী জানাতে হলে তা অবশ্য জানানো সম্ভব নয়। কেন না কোনো বাইরের ডাক্তার তো আর অপারেশান করেছে বলে সার্টিফিকেট দিতে পারে না।

তোর অন্যান্য খবর জানাবি। আমার উপন্যাস ১০০ পৃষ্ঠা হয়েছে। মনে হয় আরো ৪০।৫০ পৃষ্ঠা হবে। শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

(৫)

...তোর ব্যথা বুঝতে পারছি। আমি তোর সমব্যথী। কিন্তু কী করবো তোর জন্যে? কী করা যেতে পারে? এইটে ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিনে।

চাকরির অসহনীয় পরিস্থিতিতে তুই যে টিকতে পারবি নে এ আমি জানতাম। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়ে কি আরো বিব্রত হবিনে? তুই একা হলে কথা ছিল না। তোর যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার রয়েছে। তাদের প্রতিপালনের কথাটা ভুলে যাসনে।

আমার অভিমত : আগে অন্য কোনো মোটামুটি ভালো চাকরি জোগাড় করে তারপর ওটা ছাড়। লেখা ছাড়া বাঁচবিনে জানি। লিখবি নিশ্চয়ই। অনেক লিখতে হবে। এই লেখাই তোকে দাঁড় করাবে। একদিন মস্ত বড় হবি। কিন্তু অর্থচিন্তা চমৎকার। আর্থিক সমস্যার আপাতত একটা সমাধান না হলে মানসিক শান্তি না পেলে লিখবি কেমন করে? ভেবে দেখ। এগুলো আমার উপদেশ নয়। তোর সংগে তোর সমস্যা নিয়েই আলোচনা করছি।

কোনো দৈনিকে একটা রেগুলার ফিচারের ব্যবস্থা করতে পারলিনে? তাহলেও তো অনেক হত। আমি তোর বন্ধু হয়ে কিছুই করতে পারছিনে। বিরাট বড়লোক নই যে তোর জন্যে কোনো ব্যবস্থা করবো। খুব খারাপ লাগছে, নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে তোর ব্যাপারটায় বন্ধুত্ব কিছু করতে পারছিনে জেনে।

(৬)

...নেপাল দত্তকে লেখা চিঠিটা সরকারের মনে খুব ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছে। চন্দ্র বোধহয় ওকে জেরা করেছে। তাইতো ও এখন আমাকে বলছে, 'ন্যাপালবাবুরে দ্যাখাইমু এই কথা আমি আপনেরে কই নাই। আমি নিজেই দ্যাখতে চাইছিলাম।'

কিন্তু আমার বেশ ভালোভাবে মনে আছে, ও বলেছিল, 'আপনের যদি আপত্তি না থাকে, চিঠিটা আমারে দ্যান। আমি ন্যাপালবাবুরে ইট্টু দ্যাখাইতাম।'

যাই হোক, এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে সরকারের সংগে আমার একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আসলে লোকটা খুব মিটমিটে শয়তান। আমার মনে হয়, তোর এই ছুটির ব্যাপার নিয়ে কমিটিতে খুব হুজ্জোত বাধাতে পারে। সুতরাং সম্মুখীন হওয়ার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকিস। এবং ওকূল যদি ছাড়তে চাস তাহলে ১৬ তারিখেই অবশ্য পাড়ি দিস। নইলে হয়তো আমারও মুখ রক্ষা হয় না ওদের সংগে অত গলাবাজি করার পর।

মাঝে-মাঝে ভাবি, গিয়ে মিনতির খোঁজ-খবর নেবো। কিন্তু তোর বিরুদ্ধে অনুযোগ-অভিযোগ শোনার আশংকায় যেতে পারি না।

(৭)

...সেক্রেটারির ব্যাপারখানা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। আমি নিজে দরখাস্তটা ওর হাতে দিয়েছি। সেকথা ও এখন অস্বীকার করছে কী করে! আরো আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এইসব লোকই নিজেদের প্রগতিশীল ভাবধারার ধারক এবং বাহক বলে গণ্য করে। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা বলে কথা আছে না? আমাদের ন্যাপলা ব্যাটারও অবস্থা হয়েছে তাই। শিক্ষা, কালচার না থাকলে এবং সেই সংগে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা পেলে মানুষের বুঝি এইরকমই মনোভাব হয়। ধরাকে সরা ভেবে বসে। আমাদের বাড়িতেই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আছে। যাই হোক, আমি আর এ নিয়ে ওদের সংগে গায়ে পড়ে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাই না। তবে ওদের কেউ যদি এ সম্পর্কে আমাকে কোনো কথা বলতে আসে তক্ষুনি শালাদের আচ্ছা করে ঝাড়বো।

আমার উপন্যাস ১৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এগিয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

আর মোটেই লিখতে পারছি না। এরপর কী যে লিখবো মগজে আসছে না। সবকিছু যেন কোলাপস্ মেরে গেছে। এজন্যে খুব একটা মানসিক অশান্তিতে আছি। তুই তো বুঝিস, লিখতে-লিখতে লেখা যদি বন্ধ হয়ে যায়, চিন্তা-ভাবনাও যদি এগোতে না পারে তাহলে কীরকম মানসিক অবস্থা হয়। যাই হোক, তবু আশা করছি, এই ক্লান্তি, এই হতাশা হয়তো দূর হয়ে যাবে একদিন।

একটা কথা, তোর ফিঁয়াসের নামটা সংকেতে উল্লেখ করিস। যাতে না অনিমার মনে কোনোরকম সন্দেহ উঁকি মারে।

(৮)

...তারপর মিনতির পায়ে য়্যাঁড়া বিষ লেগে পা ফুলে ঢোল হয়েছে। তুমি অনিমেষকে লেখায় তার পরামর্শ মত আগে ঔষধপত্র করেছে। তাতে কিছুই হল না। শেষে হারিয়ে-মাড়িয়ে কাশ্যপ গোত্র। সে আজকাল আমাদের বাড়ি আগের মত আসে না। আমি তোমার কথা মত ডাক্তার দেখিয়ে ইনজেকশন করাচ্ছি। পাঁচটা করতে হবে এখন একটু কমের পথে এসেছে। তুমি একবার সুযোগ করে এসে ওকে নিয়ে গেলেই ভালো হয়। তিতু ভালো আছে। তবে খুব রোগা হয়ে যাচ্ছে। বোধহয় তোমার জন্য। কেবল তোমার কথা বলে। মাসিমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ওকে নিয়ে গেলে একটু হয়তো সুবিধা হবে। তুমি চাকুরি পেয়েছো জেনে সুখী হলাম। মাইনা কত পাও জানলে আরও সুখী হব। যাক, আমার হাত এখনো সারেনি। ওদের রান্না করে খেতে হয়।

(৯)

...কদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলুম।

সকলকে আপনার কথা বলেছি। রবিবার প্রশান্তর কাছে গিয়েছিলুম। আমার লেখাটা ওদের সকলেরই ভালো লেগেছে বললে। প্রশান্তর কাছে জানলুম, আপনার নাকি ওখানে একদম ভালো লাগছে না। চাকরি ছেড়ে-ও দিতে পারেন এই রকম মনোভাবের চিঠি নাকি সে পেয়েছে। বাঙলাদেশ—চাকরি—সংসার ইত্যাদির কথা চিন্তা করে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতেই অবশ্য আমার মত আছে। তবে আমার অনুরোধ, চিন্তা করবেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত।

আমার লেখাটা বিরাজদার ভালো লেগেছে। তবে তিনি বাড়াতে উপদেশ দিয়েছেন।

লিখছি এবং লিখবো। কার ভালো লাগল বা কার খারাপ লাগল এটা আমার কাছে বড় কথা নয়।

(১০)

...ফলে স্বভাবতই খুব রেগে আছিস বোধহয়। যাইহোক, বুঝলাম তুই কলকাতা আসছিস। কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি আসিসনি। না আসার কারণ বুঝলাম না। তীক্ষ্ণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আছিস বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরাই কি খুব সুস্থ আছি? মনে হচ্ছে, 'নদীর এপাড় কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ও পাড়েতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস'। এসব সান্ত্বনা নয়। সান্ত্বনা দেবার মত মহাজ্ঞানী হইনি। আমার মনে হচ্ছে, লেখাটাই আদতে বড় কথা। কলকাতায় বসে সুস্থভাবে লেখা অসম্ভব। কারণ, এখানে প্রতি মুহূর্তে অজস্র কাদা এসে গায়ে লাগছে। একটু দূরে থাকলে বোধহয় স্থিরভাবে লেখার সুযোগ থাকে। সেইজন্যেই তোকে বলা। তবে তোর চাকরির যা বিবরণ শুনছি তাতে খানিকটা আতংকিত হবার কারণ নিশ্চয়ই থাকে। এ ব্যাপারে সাক্ষাতমতো কথা হতে পারে।

'সন্দর্ভে' লেখার ব্যাপারে আমার মনে হয় অনুচিত নয়। 'সন্দর্ভে' না লিখলেও 'সুসমাচার' এমন কিছু পাত্তা দেয় না, দেবে না, লিখলেও তাই। ফলে লেখাই উচিত। আমার কাছে চাইলে আমি লিখতাম: 'গণসাহিত্যে'-ও লেখার চেষ্টা কর। ছোট-খাটো কাগজে যতদূর সম্ভব না লেখাই ভালো। টাকা পেলে অবশ্য অন্য কথা। দৈনিক 'প্রত্যহে' গল্প পাঠান।

সখিদাকে চিঠি দিয়েছিলি কিন্তু উত্তর পাসনি জেনে দুঃখ পেলাম। গতকাল সুধাময়, মলিদার ছোটভাই মারা গেছেন। উনি খুব বিচলিত। ভূষণদার চিঠি না লেখাই অভ্যাস। তবে তোর চিঠির কথা আমাকে বলেছেন।

(১১)

...এমন কতগুলো কাজে আটকে পড়েছিলাম যে তোর কথা মনেই ছিল না। তোদের ওখানে যে কটা দিন ছিলাম বেশ আনন্দেই কেটেছিল। অপরের বাড়িতে আছি একথা কোনো সময়েই মনে হয়নি। তোর সমস্ত ব্যাপার নিয়েই শিবুর সঙ্গে আলোচনা হল। তোকে এখানে পুনর্বসতি দেয়ার ব্যাপারে ওরা কিছু করতে পারবে বলে মনে হল না। মাধবের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। কয়েকটি সাধারণ কথা ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। ছুটিতে বেড়াতে বেরুচ্ছি। নতুন কোনো খবর থাকলে জানাস। ওই সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারলি? না, অবস্থা একই রকম চলছে?

(১২)

...বিশ্রী একটা মানসিক অবস্থায় থাকার দরুণ তোর খবর নিতে পারিনি। তার জন্যে মনে কোনোরকম অভিমান রাখিস না। 'গ্রন্থসভা' থেকে আমার যে বইটা ছাপার কথা ছিল, সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকখানি এগুবার পর এখন তারা রিফিউজ করছে। বলছে, বইয়ের বাজার এখন খুব খারাপ যাচ্ছে এবং তারা অনেক লস দিয়েছে। এ হেন কারণে এখন নতুন কোনো বই ছাপা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কভারের ডিজাইন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, নানান জায়গায় আবার নতুন করে টোপ ফেলছি। এখনো কোনো জায়গা থেকে উত্তর আসেনি। জানি না, আসবে কিনা। এদিকে নতুন উপন্যাসটা নিয়েও খুব ব্যস্ত আছি। প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা মতো লেখা হয়েছে। মনে হয় ২০০ পৃষ্ঠার ওপরে গিয়ে ঠেকবে। নিরঞ্জনবাবুর কাছে ১০৮ পৃষ্ঠার মত দেয়া আছে। সেটুকু পড়ে ওদের ভালো লেগেছে। বাকীটা পুজোর ছুটির আগেই জমা দিতে বলেছে। এত বড় একটা লেখা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ওরা গতি করতে পারবে কিনা বুঝতে পারছি না।

এখানে নানান মহলে তোর সম্পর্কে
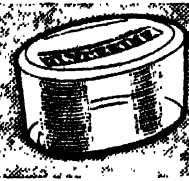
সামান্যকম গন্ডগোল ঘটেছে বটে, তবে আমাদের বাড়ির কারুর তোর সম্পর্কে কোনো রকম ভ্রান্ত ধারণা হয়নি। যারা এই সমস্ত বিশ্রী ব্যাপার ঘটাচ্ছে, বরং তাদের ওপরেই বাড়ির সবাই খুব অসন্তুষ্ট।

তুই আসবি জেনে খুশি হলাম।

(১৩)

...তোমার পাত্তা পেয়ে খুশি হলাম। জালপ ছেড়ে শুনেছি তুমি কোথায় গেছো কেউ জানে না। কাজেই তোমার চিঠির প্রত্যাশা করছিলাম।

তুমি ওখানে চাকরি করছো জেনে খুশি হলাম। সাহিত্যচর্চায় কিছু মূলধন আবশ্যক। এই ফাঁকে সেই মূলধন আহরণ কর। এতদিন মূলধন ভেঙে সাহিত্য করলে। কিন্তু তাতে সুফল পাওনি। এবারে একান্তমনে কাজ কর, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিষয়বস্তু জমা কর।

'গণসাহিত্যে'র আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো নয়। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে তাদের দৈন্য ধরা পড়ে গেছে। 'আত্মকথা' ধারাবাহিক তিন মাস বেরিয়েছে, টাকা পাইনি বলে শ্রাবণ থেকে লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। কাজেই সেখানে তুমি চাকরি কর—এটা আমার ইচ্ছে নয়। তাছাড়া সেখানে চাকরি আদৌ পাওয়া যাবে না। 'গণসাহিত্য' সম্পর্কে গিরিজাকান্তর মোহও ভঙ্গ হয়ে গেছে। পরিচালনার দোষেই এই অবস্থা।

আগামী ২১শে অক্টোবর আসানসোল যাচ্ছি, সেখানে দু' চারদিন থেকে আর কোথাও যেতে চাই। কোথায় যাবো ঠিক করিনি। আসানসোলে গিয়ে ঠিক করবো।
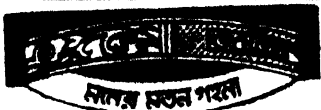
(১৪)

...আমি শুনেছিলাম আপনি চাকরি করতে গেছেন। চাকরির বৃত্তান্ত শুনে দুঃখিত হলাম। চিঠি পেয়ে কিন্তু খুবই খুশি হয়েছি। আপনি কি সপরিবারে ওখানে গেছেন? এখানে আপনার জন্যে চাকরির চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আমার আর সাধ্য কতটুকু? আমরা আবার একটা কাগজ করবো বলে চেষ্টা করছি। তাতে যদি কোনোরকমে কিছু করতে পারি জানাবো। এবং আপনার উপন্যাসও ছাপাবো। রথীনবাবুকে নিশ্চয়ই আপনার জন্যে তাগাদা দেবো। 'অন্ধকারের সংলাপ' নামে আমার উপন্যাস বেরুচ্ছে। আর একটা ছড়ার বইও। একটা নাটকও লিখেছি। কয়েক মাসের ভিতর ওটাও ছাপবো। এর বিষয়বস্তু পারমানবিক অস্ত্র। নতুন প্রকাশনার ব্যবসায়ে নেমেছি। আপনার বই আমরা নেবো মনস্থ করেছি। এখন পর্যন্ত টাকা খরচ করেই যাচ্ছি। ভবিষ্যৎ এখনো বিশেষ নিশ্চিত নয়।

(১৫)

...তুমি বলাইদাকে একটি চাকরির কথা লিখেছিলে। বলাইদা বললেন যে, যদি তুমি ম্যাট্রিকুলেট হও তবে তিনি তাঁর বিজ্ঞাপন দপ্তরে একটি কেরানীর কাজ দেবার চেষ্টা করতে পারেন। মাইনে আপাতত ১০০.০০। গ্রেড ২৪০.০০ টাকার মতন। যদি তুমি এরকম চাকরি করতে চাও তবে একটি দরখাস্ত করবে। দরখাস্তটা আমার ঠিকানায় পাঠালে আমি বলাইদার হাতে দিয়ে দেবো।

(১৬)

...আমরা নানা অশান্তির মধ্যে আছি। তোমার দাদার কানে ফোঁড়া হয়েছে। তার উপর আমার হাত আবার বেড়েছে। শ্যামলের জ্বর। এবার বুঝে দেখ কত সুখে আছি। তারপর তোমার বিষয় সত্যিই চিন্তা হয়। জান তো অদৃষ্টি কেন বাধ্যতে। যাক সর্বদা সাবধান মত থাকবে। তোমার বাড়িতে সে ভদ্রলোক আছে কিন্তু দিনরাত খুব লোক যাওয়া-আসা করে। মিনতির শরীর কেমন?

(১৭)

...জীবনে এত সুন্দর করে আমার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি। আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি আপনি সত্যিই আমাকে ... রাখবেন। আমার ভাবনা আজ ... পরিণত হয়েছে। আমার কথা আপনার ... মনে না পড়লে কি হবে আমার ... আপনার কথা মনে পড়ে। বিশেষ ... সপ্তাহে ৪ দিন। যে অমূল্য সম্পদ আপ... আমায় দিয়েছেন অর্থাৎ......

(১৮)

...অভিমানের কারণ আছে। আপ... এখানে এসেছিলেন কিন্তু আমাকে না দে... ফিরে গেছেন। এখানে এখনো কোনোর... ডেভালাপমেণ্ট হয়নি। আপনার বো... কোয়ালিফিকেশানে বার-বার যা থাকি... যা হোক খুব আশা রাখবেন না। আমা... ক্ষমা করবেন। এখনো বলছি আমি লে... আছি। হঠাৎ স্থান পরিবর্তন ক... পরিস্থিতি অনুকূল হলেও বেশ কিছু... লেখা আসে না। সেইজন্যেই বোধ... আপনার কিছুদিন ধরে মন্দা চল... ভবানীপ্রসাদ চিঠি-পত্র দেয় মাঝে-মা... একেবারে পাশাপাশি থাকলেও দেখা হ... বেশ কিছুদিন। আমি লিখবার চে... করছি। আমি কিই বা আর ভাবতে প... যে লিখবো। তবে ঐ যে আপনার। ... চেষ্টা করলেই পারা যায় সেই মন্ত্র নি... চলেছি। আশা করি আপনার হৃদয় আ... জন্য সুধায় পূর্ণ থাকবে যেমন রয়েছে।

(১৯)

...ঘটনাটা এতই অভাবনীয় যে বিশ্ব... করতে কষ্ট হচ্ছিল—সহ্য করতেও। নিজে... সৌভাগ্যের জন্য গর্ব অনুভব করছিল... কিন্তু বিধি আমার বাম ছিল। তাই পুরো... পুরি অনুভব করার আগেই একদিন ... হঠাৎ প্রেমে পড়ে গেলুম। প্রেম—বিশ্ব... করুন, সত্যিই প্রেম। আপনি বলেন, আ... হাতে নাকি প্রেম নেই। তবে একে কি ব... প্রথম কদিন পূর্বরাগের পালা চলল। তার... একদিন......। অক্টোপাশের কথা নিশ্চ... শুনেছেন। যে একবার জড়িয়ে ধরলে ... পাওয়া যায় না আর। এও অনেকটা ... রকম। মনে হয় অক্টোপাশের থেকেও ... যাহোক, কদিন প্রেমালাপের পর আ... প্রেমিকা শ্রীমতি ... দেবী নিরুদ্দেশ হয়েছে... কিন্তু আমি এখনো শয্যাশায়ী।

...শারদীয় 'ছায়াছবি' পড়েছি। শ্রী... মিত্রই দিয়েছেন অকল্য। যিশু নামক ... মহাপুরুষকে জানি, যিনি ক্ষমাকেই ... ধর্ম বলে গেছেন। বিশেষ-বিশেষ মুহূ... আমি তাঁকে স্মরণ করি। ভাবছি, ঘরে ... ক্রুশবিদ্ধ ছবিটাই রাখবো। কারণ ... মধ্যে বড় দুর্বল হয়ে পড়ি। আমার বিশ্ব... ওই মূর্তিই আমাকে ক্ষমার স্বর্গে ... যাবে।

(২০)

...কখনো আনিয়ে চলার প্রয়োজন ... দায়িত্বের কথা চিন্তা করেই। সেটি... নির্ভর হওয়া আমাদের পক্ষে কখনো ... কিনা ভেবে দেখবেন। বন্ধুদের ... আমাকে খুব বেশী আর ওয়াকেবহাল...

…লে ভুল হবে। কেউ-ই যোগাযোগ রাখছে …হী নয়। ফলে অনাগ্রহ উভয়তঃ না হয়ে …ার কি বলুন? লেখা মোটামুটি চলছে। …টি গল্প অনেক কষ্টে শেষ করবার চেষ্টা …ছি। যদি ডিসেম্বরে শেষ করতে পারি …হলে জানুয়ারীর প্রথমে 'সুসমাচারে' …রে বিহার যাবো ইচ্ছে আছে। মাস দেড়েক …কে বোকে নিয়ে ফেরার ইচ্ছে। 'সুসমাচারে' …কাশিত আপনার গল্প আমার ভালো …গেনি।

(২১)

আপনার লেখা সম্পর্কে আমার …মত আপনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন …নে বিব্রত হচ্ছি। শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা যার …েই গ্রহণ করে থাকুন, আপনার নিজের …নার দিকে সামান্যতম মনোযোগ আকর্ষণ …রা আমার বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য ছিল। …নিনা শ্রদ্ধাটা শুধুই সৌজন্য প্রকাশ কিনা …ংবা প্রকৃতই কোন হতাশার সৃষ্টি করতে …পেরেছি আপনার মনে।

ব্যাপারটা আরেকটু খুলে বলি। ইদানিং …াপনার গল্পগুলি আমাকে হতাশ করছিল। …ামার আশংকা হচ্ছিল আরো এই জন্যে যে …পনি হয়তো আপনার রচনার ত্রুটি সম্পর্কে …ব সময় সচেতন নন। অথবা অতি-…চেতনতার ধার এবং ভার বহন করার …উপযুক্ত মানসিকতা আহরণের পরিবর্তে এক …রনের আপোষের চেষ্টায় শক্তির অপচয় …রছেন। যার ফলে গল্পের চরিত্রগুলি এবং …পরিবেশ আমাদের অত্যন্ত পরিচিত হওয়া …স্ত্বেও তাদের মানসিকতার ধারাবাহিক …উত্থান-পতনের ফাঁকে-ফাঁকে এমন কোন …উজ্জ্বলতা ধরা পড়ছে না যা কাহিনীর …পড়ার শেষ হয়ে যাবার পরে-ও মনে থাকে। …প্রকৃত বর্ণনা ডকুমেন্টারি হলে তা দিয়ে …আমার কী লাভ? হরিণের দ্রুত চলা …আমরা জানি। কিন্তু পঙ্গু লোকটি যখন …বিছানায় শুয়ে-শুয়ে হরিণের চলার কথা …ভাবে তখন হরিণের চলা এবং পঙ্গু …লোকটির না চলতে পারার ট্র্যাজেডির …সূত্রপাত করে। পঙ্গু লোকটির মানসিক …অবস্থার ধারাবাহিক বর্ণনায় প্রক্ষিপ্ত কিছু …নেই এবং সে ততটুকুই চিন্তা করে যা তার …বর্তমান অবস্থায় করা সম্ভব বা করতে সে …অভ্যস্ত হয়েছে।

আমার মনে হয় আপনার অধিকাংশ …রচনায় বাইরে থেকে চমৎকারিত্ব আরোপের …চেষ্টা আছে। সে তুলনায় একটি লোককে …সত্য-দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস প্রায় …অনুপস্থিত।

(২২)

…মনে হচ্ছে কোথাও কিছু গোলযোগ …ঘটে গেছে। আমার দিক থেকে বোধহয়। …তুমি কি কিছু মনে করে চটে রয়েছো। …জানো তো আমি গোলমেলে মানুষ।

তোমার পথ চেয়ে থাকি। এই বুঝি …হাজির হলে।

…কল্যানকে আবার চিঠি দিয়েছি তোমার …আমার বাড়ি আসবে।

লেখা ছেড়ে এখন পড়ছি। তুমি লেখা থামাবে না। তোমার মন আর আমার ভাবনা এক হয়ে......বাঙালীর প্রবাসী চরিত্রকে নগ্ন করে......তোমার চিঠিগুলি সব জমা হয়ে আছে। রত্নের মত যত্নের সংগে আমার ভান্ডারে তোলা থাক।

(২৩)

...আপনার পদত্যাগপত্র পেয়েছি। কিন্তু ......আপনি লিখেছেন, আপনার পদত্যাগপত্র কিংবা টাকা সম্বন্ধে কোনো কথা প্রশান্ত-বাবুর কাছে জানাই নাই। তিনি কি স্কুলে কিংবা আমার সংগে আসিয়া দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাস্টারমহাশয়েরা তো তাহার বাড়ির কাছেই থাকেন, প্রশান্তবাবু কোনোদিন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান নাই, ইহা অযথা অন্যের উপরে দোষ চাপাইবার প্রয়াসমাত্র।
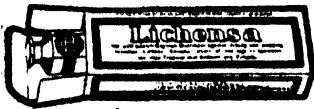
আপনি এখানে আসিয়া টাকা নিয়া যাইলেই ভাল হয় নতুবা দেরী হবে।

(২৪)

...জানি না ইতিমধ্যে মারাত্মক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে বসেছেন কিনা। মানে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত। কলকাতায় বা এখানকার কাছাকাছি কোথাও কোনো ব্যবস্থা না করে চাকরিটি খোয়াবেন না। হঠাৎ উত্তেজনার বশে ওরকম কিছু করে বসলে অপকারই হবে। এতাদৃশ অবস্থার সংগে আমারও-কিছু পরিচয় আছে। বরং মাঝে মধ্যে উপায় থাকলে কলকাতায় এসে কোনো ব্যাবস্থা করার চেষ্টা চালাবেন। অত উতলা বা হতাশ হলে চলবে কেন?

আর কে বলেছে যে, আপনার জন্যে আমরা একটি ব্যবস্থা করে বসেই আছি? আশ্চর্য হয়ে গেলাম এমন খবরে। কেন এমন খবর দিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস, কারণ ভবিষ্যতে আমরা যদি কিছু করতে না পারি, তাহলে আগ বাড়িয়ে উস্কানিটা কাজে লেগে যাবে।

(২৫)

...কখনো মনে হয়, দিই এই দাসত্বের বাঁধনটা পা থেকে আলগা করে। তারপর যেদিকে খুশি ভেগে পড়ি। শুধু গ্রাসাচ্ছা-দনের ভাবনাতেই তো এমন করে আটকা পড়ে থাকা। নইলে আর কিসের পরোয়া ছিল। আমি তো বলি, হে আদিম রিপু! হে দুষ্ট দেবতা এবার মুক্তি দাও! কতকাল আর এমনি করে আপন পক্ষপুটে রক্ষা করে রাখবে? তোমার পক্ষছায়ার বাইরে যা কিছু অন্বেষণ করার আছে এইবেলা তা করে নিতে দাও। এই যে দুর্লভ জনম, চতুর্দিকে এত আলোর প্রস্রবণ, অন্ধকারের গভীর প্রহেলিকা, এত ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের সমারোহ—এর মধ্যে একবার প্রাণভরে নির্বিকারে অবগাহন করতে দাও। কিন্তু সে মহাবাধির রিপু কোনো কথাই কানে তোলে না। কবে যে আমায় মুক্ত করে দেবে তা জানি না। হয়তো যখন তার শাসন থেকে মুক্তি পাবো, চেয়ে দেখবো গেছে গড়িয়ে। জীবন সারাবেলা সমস্ত ঐশ্বর্যের পসরা সাজিয়ে রেখে শেষে অবহেলায় সব ধুলোয় ছড়িয়ে চলে গেছে কখন। শেষ বেলায় ধুলোয় লোটানো অবহেলার ঐ কুড়োনোর মতন দুর্ভাগ্য আর কি আ

(২৬)

...তোমার অস্তিত্ব সম্পর্কে কাল নিবাসী বান্ধবজনের মনে যখন সন্দেহ উপস্থিত ঠিক সেই সময়ে মধুর পত্রালাপ প্রাপ্ত হওয়ায় দগ্ধ কিঞ্চিৎ আশাবারি সিঞ্চিত হয়েছে। মাঝে জানিয়ে দিও—'আমি আছি'। বর্তমান অবস্থা জেনে আন্তরিক দু হলাম। কিন্তু মনে রেখো জীবনের উ পথে বিবিধ বাধা উত্তীর্ণ হতে হয় এবং প্রাপ্ত মানুষই খাঁটি মানুষ। কলিক নিকটবর্তী কোনো স্থানে তোমার হলে সেটা আমাদের পক্ষেও সুখকর সন্দেহ নেই কিন্তু এই যে দূরে আদিনাথ, এটারই বা মূল্য কম কি? যাকগে, এখানে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই স্তিমিত ও সকলের দ্বারে বার্ধক্য উপস্থিত। সাহিত্যের সংগে সকলেরই সম্পর্ক ভাশুর-ভাদ্দর বৌ দাঁড়াচ্ছে। তোমার খোঁজ কেউ করে জেনে অবাক হই। এদের অমনোযোগ হয়েছো বলে নিজেকে সৌজন্যের অ কিংবা তুচ্ছ ভেবো না। তুমি বরাবরই ভাবপ্রবণ।আমি লক্ষ করেছি। যে লিখেছো সেটা কোথায় দেবে ঠিক জানিও। আমার কথা কি আর লেখা আছি—এই পর্যন্ত। গতকাল ভূপতির গেল। চোখের ওপর এই ধরনের ঘটতে থাকলে কে আর ভালো থাকে।

(২৭)

...কি খবর? কেমন আছিস? খবর পাইনি বলে রাগ করেছিস? ভূষণদার সংগে দেখা। তোর সংগে ক দেখা হয়নি বল তো?

ধীরেন সিমলায় গেল অধ্যাপক যতীন ভান্ডারায়। আমি অথৈ জলে।

(২৮)

...আমি একাই এসেছি। ছুটির পরে ছবিকে নিয়ে আসবো করেছি। পুজোয় যাবো। তখন আ সংগে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এখানকার নতুন কাজের মধ্যে কিছু আছে। হয়তো মন্দ লাগবে না। এখানে আসবার আগে রতনবাবুকে শ্রী স্কুলে আমার জায়গায় ঢোকানোর মুটি একটা ব্যবস্থা করে এসেছি হয়তো এতদিনে ওরা ওকে নি আপনি লিখছেন জেনে আনন্দ পেলাম এখনো মনটাকে গুছিয়ে নিতে পা

নি কখনো সিমলায় এলে নিশ্চয়ই দি হবে।

॥ উপসংহার ॥

দিন যায়। ঋতুর পরে ঋতু। সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলি ক্রমে অস্পষ্ট, মলিন। সময়ের মুঠির ফাঁকে জলের মত ঝরে পড়ে কথা। এরই মধ্যে কিছু গল্প, গান আমাদের চলার পাথেয়। কোনো কথা বলা হয় না। সব কথা রাখা যায় না আর। যেন ভুল করে যাত্রা শুরু হয়েছিল কবে! হৃদয়ের দুকূল-ভাসানো বেগে বন্যার মত ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল সকল আবর্জনা, সমস্ত জঞ্জাল। তলে-তলে ভাটার টান শুরু হল! জমে-জমে অজান্তে পাহাড় হল। এখন আগাছার-অন্ধকারে ঢেকে গেছে চতুর্দিক। অথচ ফুল ফোটাবার বাসনা ছিল মনে। ছিল ক্ষমা, সৃষ্টির অহমিকা।

ছুটির পরে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়। হেড আপিসের জরুরি খবর থাকে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে ডাকে, 'আসুন।'

'না।' মাথা নাড়ে আদিনাথ। আলো জ্বেলে গাড়িটা বেরিয়ে যায়। 'আমি এখন কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াবো।'

যেতে-যেতে কত কথাই যে মনে পড়ে! শীত এলো। বয়সের ঘরে পড়ল একটা চাড়া। সময় তো সেই সোনার ধরা দেয় না, ছোঁয়া দেয় না। কেমন থেকে দেখা দিয়ে পালিয়ে যায়।

এখনো কেউ-কেউ মনে পড়িয়ে দেয়, তখন কত নাম!'

এসব কথায় কান দেয়া বৃথা। শুনে বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে। মৃদু সংকোচে মাথা নুয়ে আসে।

'এখন আর কেন লেখেন না?'

জবাব নেই। হাসি ছাড়া আত্মরক্ষার নেই। আজ তাই অর্থহীন, শব্দহীন, হাসিই তার একমাত্র সম্বল যা দিয়ে লজ্জা দেখানো চলে; নিজের কাছ থেকে সাময়িকভাবে হলেও পালিয়ে যেতে পারে আদিনাথ।

অন্ধকার, হিম আর কুয়াশায় ঢাকা পথ-ঘাট। একা-একা অনেক দূর অবাধ গিয়ে এসে বুঝি ঘরের কথা মনেই পড়ে। অথবা পথ ভুলে ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে বনের ভেতরে ঢুকে পড়ল। দীর্ঘ মাস-মুহূর্ত পার হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে শ্রান্তি ও শিশিরের গন্ধ নিতে-নতুন করে জোনাকির জ্বলা-নেভা দেখে আদিনাথ। নিজের জন্যে এক গোপন ও মর্মান্তিক শোকে নতুন অভিভূত হল আজ। যেন কত দীর্ঘকাল ধরে ঘর-বাড়ি-আত্মীয়পরিজনহীন এক নির্জন ভয়া-বহতার ভেতরে এমনি হেঁটে চলেছে, চলেছে আদিনাথ। কাছে আসার নেই, দূরে যাবারও না। যেন কোনো-দিন ছিল না কোথাও। একবার মনে হল, এই বনের পাশেই বয়ে চলেছে সেই আশ্চর্যের নদী। যা তার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের সুন্দরতম মুহূর্তের মত রমণীয়। কান পাতলে জলের শব্দ শোনা যাবে।

বনের বুকের গভীর থেকে হু-হু করে বাতাস এলো। চমকে ওঠে আদিনাথ। তার কান্না পায়। চুপ-চাপ রতন চলে গেল একদিন। আর সবাই? কে কোথায় আছো তোমরা? ধীরেন, যতীন, ভূপতি, প্রশান্ত, কল্যাণ, গীতা? আর আমি, আমিই-বা কোথায়? হরিণঘাটার হরিণী? সন্তোষ-পুরের পথ-ঘাট? বড়জাগুলির বনের পাশে পড়ে থাকা হেমন্তের দিন, ঘুঘু-ডাকা গ্রামের দুপুর? যেন মুছে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, স্মৃতি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে একে-একে। ধরে রাখা বৃথা। আপন ভেবে কাছে টানতে চাইলে হেসে উঠবে সবাই। পাগল, পাগল, আদিনাথটা পাগল হয়ে গেছে! আহা আদিনাথ, মানে আদি, মানে আমাদের আদু! সেই যে কবিতা লিখতো! গল্প লিখে নাম করেছিল বেশ! বেচারা! ছেড়ে দিলে কেন ওসব? কী হবে লিখে? অভ্যাসটা কি খারাপ? তা ঠিক। চাকরি করছিল না? ওইখানেই তো যত গোলমাল। কোনো দিনই মন লাগিয়ে চাকরি কিংবা ঘর-সংসার করতে না পারার দুঃখে মরমে মরে যাচ্ছিল। আর সেই মেয়েটা? কী যেন নাম? সেই যে গো মাস্টারনী? গীতা, গীতা। হ্যাঁ, গীতাই। কী ভালোই যে বেসেছিল আদিনাথ! মেয়েটাই কি কম ভালো-বেসেছিল? তা কী হল ওদের? কী আর হবে! একদিন বিয়ে করল গীতা। কাকে? মাধবকে। কোন মাধব? মাধব পাটিকার? না, ভটচায। যাক, বাঁচালে। ভালো আছে তো ওরা? জানিনে। মিনতি? মিনতি কোথায়? আদিনাথের বউ? কী একটা গোলমাল ছিল না? ওরা কেউ ই কারো স্বামী কিংবা স্ত্রী নয়। অথচ দিব্যি ঘর-সংসার পেতে কাটিয়ে দিলে দুজন। এই তো জীবন। সুখী তো? ভগবান জানেন। ছেলে দুটো? ওদের কাছে থাকে না। কোথায়? বাইরে। তার মানে? পড়ে। শুনেছি লেখা-পড়ায় ভালো। আহা বেঁচে থাক!

আদিনাথ হাই তুলল। ঘরের কথা মনে পড়ছিল না আর। অজান্তে শরীর থেকে সমস্ত ক্লেদ-ক্লান্তি, আশা ও হতাশার চিহ্নগুলি ধীরে-ধীরে শীতের বনে আমলকির পাতার মত নিঃশব্দে ঝরে যাচ্ছিল। খুব ছেলেবেলায় সন্ধ্যার নদীর বুক থেকে বাতাস উঠে এলে এমনি করেই ঘরে ফিরে গেছে আদিনাথ। খড়ির পাড় ধরে যেতে-যেতে নামতা পড়ার মত আকাশের শ্লেটে তারা গুণে একদিন কেমন করে, কোথায় যে হারিয়ে গেল জন্ম-পর! অথচ আশা ছিল। চিরদিনের মত বেঁচে থাকার সাধ!

'এত দেরি যে?'

'হয়ে গেল।'

'এদিকে হাট-বাজার কিছুই যে হল না।'

'হবে, কাল হবে সব।'

মিনতি বুড়িয়ে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোয় ওর ছায়াটাকে দেখে নিজের জন্যে মায়া হতে থাকে আদিনাথের।

রাত্রে সহজে ঘুম আসে না এখন। পুরোনো কথা ভাবে আদিনাথ। একদিন রাগ করে গোটা পাণ্ডুলিপিটাই জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দিয়েছিল মিনতি। এখন আর কিছুই বলে না। আদিনাথ নতুন করে লেখার কথাই ভাবে। ঘুম আসে না, তাই কাগজ-কলম নিয়ে বসে থাকে চুপ-চাপ। অভ্যাস-অভ্যাস। অভ্যাসকেই স্বভাবে দাঁড় করাতে হবে। না জানি শেষ অধ্যায় কেমন হবে! কিন্তু শুরু? শুরু হবে কোথা থেকে? আবার নতুন করে শুরু করতে হবে যে!

দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরাধের পর অপরাধে নির্বাধ সাফল্য দুর্বৃত্তদের সাহস এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে তারা আর এক রকমের দুর্বৃত্তপনায় তুষ্ট থাকতে পারছে না। বৃত্তভেদ ঘুচিয়ে নানারকমের অপরাধে হাত পাকাচ্ছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী সম্পাদকীয় পড়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিগূঢ় হাসল।

বারো লাখ টাকা দামের হীরের নেকলেসের খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার কপাল মন্দ। নইলে যে কণ্ঠহার গলায় ঝোলানোর দরুন ফ্রান্সের রাণী মেরি আঁতোনিয়েতকে স্বামী-পুত্রসহ ফরাসী বিপ্লবে প্রাণ হারাতে হল, অভিশপ্ত সেই মণিহার রাজা কামেশ্বর সিং কিনতে যাবেন কেন? ফলে, অভিশাপ তাঁর বংশেও লেগেছে। অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গার রাজবংশেও বাতি দেওয়ার আর কেউ নেই।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ। পড়ে মুচকি হাসল ইন্দ্রনাথ। বিষয়টি প্যারা-সাইকোলজির গবেষণা-বস্তু; সুতরাং মাথা না ঘামানোই শ্রেয়।

পরবর্তী সংবাদটি বিলক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক। শিরোনাম—'দু'কোটি বছর আগেকার তিমির খুলি'।

ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। খবরটির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। মালাবার উপকূলে একদল বৈজ্ঞানিক মাটি খুঁড়ে একটা তিমিমাছের মাথার খুলি পেয়েছেন. অনুমান, খুলিটা দু'কোটি বছর আগেকার। পৃথিবীর তুষারযুগেরও

আগে এখানকার সমুদ্রে তিমির দল ঘুরে বেড়াত এবং এটি তাদেরই একটি কঙ্কালের অবশেষ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

শিরদাঁড়া সিধে করল ইন্দ্রনাথ। কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে যাচ্ছে, এমন সময়ে টেলিফোনের ঝংকার শোনা গেল।

আর, তারপরেই শুরু হল তিমিমাছের রহস্যময় করোটি-পর্ব।

●

টেলিফোন তুলতেই তারের মধ্য দিয়ে ভেসে এল আর এক ঝংকার।—এবার বামা-কণ্ঠের—"শুয়ে শুয়ে নিশ্চয় বিড়ি টানা হচ্ছে?"

"বিড়ি নয়, সিগারেট। এক-একটার দাম—"

"নিকোটিন হার্টের বিদ্যুৎ কমিয়ে দেয় জানো?"

"এই জানলাম।"

"হ্যাঁ, জেনে রাখো। আমেরিকায় এই নিয়ে গবেষণা চলছে। এদেশে গবেষণার দরকার নেই। তুমিই হলে সাক্ষাৎ প্রমাণ।"

"আমার হার্ট—"

"চুপ করো। শার্লক হোমস্, ব্যোমকেশ বক্সী, কিরীটি রায়, প্রতুল লাহিড়ীর মত ডিটেকটিভদেরও খেটে খেতে হয়েছে। তোমার ভাবসাব দেখে মনে হয়,—"

"হাতে একটা কেস এসেছে মনে হচ্ছে? ধানাই-পানাই রেখে কি করতে হবে বললেই তো হয়।"

নৈঃশব্দ। জলতরংগ হাসি। তারপর—"ঠিক। আমি কর্তাকে নিয়ে আসছি।"

●

যথাসময়ে মেসের সিঁড়িতে যুগপৎ স্লিপার এবং পাম্পশুর ঐকতান শোনা গেল। তারপর সশব্দে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল কবিতা এবং মৃগাঙ্ক।

সংগে সঙ্গে সোল্লাসে ইন্দ্রনাথ বলল—"আসা হোক, আসা হোক। বৌদি, তোমাদের দেখেই বোধকরি কবি লিখেছিলেন, 'পুরুষ তমালতরু, প্রেম-অধিকারী, নারী সে মাধবীলতা আশ্রিতা তাহারই।' আহা রে, ঠিক যেন কুরুশ আর কাঁটা।"

মুখ লাল করে কবিতা বলল—"বাতচলার বয়স তোমার অনেক দিন গেছে ঠাকুরপো।"

মৃগাঙ্ক বলল—"ইন্দ্র, তোকে মালাবার যেতে হবে।"

"উদ্দেশ্য?"

"বায়ু পরিবর্তন, সেই সঙ্গে আমার এক বন্ধুকে সাহায্য করা।"

"কি জাতীয় সাহায্য?"

"আজকের কাগজ তোর সামনেই রয়েছে। দুকোটি বছর আগেকার তিমিমাছের খুলি পাওয়া গেছে—দেখেছিস নিশ্চয়?"

"দেখেছি।"

"ভোরবেলা ট্রাঙ্ককল পেলাম তিরুমালাইয়ের কাছ থেকে। তিরুমালাই আমার দাক্ষিণী বন্ধু। আলাপটা অবশ্য, ইয়ে, তোর বৌদির দিক থেকে। তিরুর বাবা বিরাট কারবারি মানুষ ছিলেন। ম্যাংগানিজ-এর খনি ছাড়াও আরও অনেক ব্যবসা ফেঁদে ভদ্রলোক প্রায় কুবের হয়ে ওঠেন। শ্বশুরমশায়ের সংগে দহরমমহরম তখন থেকেই। বড়লোকের একমাত্র ছেলে হলে যা হয়, তিরুও হয়েছিল তাই। কাপ্তেনিতে জুড়ি ছিল না। তিরুকে দেখে 'কানাড়া ছাঁদে কবরী বান্দে নবমল্লিকার মালে।' দিব্বি ডাগরডোগরটি চেহারা। এই চোখ, এই নাক—"

"অঃ, কি হচ্ছে?" কবিতা রক্তিম।

"সরি। কিন্তু যা সত্যি, তা বলতেই হবে।"

"তোমাকে বলতে হবে না, আমিই বলছি," বলল কবিতা। "আসল কথাটা শোনো ঠাকুরপো। তিরু আমাকে ইয়ে করত।"

"ভালবাসত," মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মৃগাঙ্ক। "অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু আমি গিয়ে পড়লাম ধূমকেতুর মত। তিরুর বাড়াভাতে ছাই দিয়ে কবিতাকে নিয়ে উড়লাম। তখন অবশ্য তোর বৌদির জানা ছিল না যে, 'দরজা দিয়ে বাড়িতে যখন দারিদ্র্য ঢোকে, প্রেম তখন জানলা দিয়া পালাইয়া যায়।' এখন বুঝছে হাড়ে হাড়ে।"

ইন্দ্রনাথ বলল—"অর্থাৎ তিরুমালাই না রাকড়ীমালাই কি যেন বললি—সে তোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্রাক-বিবাহ মঞ্চে।"

"এগজ্যাকটলি। এখন অবশ্য আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রেমের ত্রিকোণটা এখনও আছে কিনা আমার জানা নেই। যাই হোক, আজ ভোরে তিরু টেলিফোন করল। বলল—"

"তার আগে তিরুর বর্তমান ছবি তোমার বলা দরকার," বলল কবিতা।

"ঠিক, ঠিক। বাপ স্বর্গারোহণ করার পর তিরু কারবারের ঝামেলা একেবারে মিটিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ সব বেচে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকে মাইশোরের প্যালেসে। মহারাজার জগমোহন প্যালেসকে টেক্কা দেওয়ার জন্যে একটা প্রাইভেট মিউজিয়াম স্থাপন করেছে। দেশবিদেশ থেকে কত জিনিস যে আনি-

য়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। হায়দ্রাবাদের স্যালারজঙ্গ মিউজিয়ামও নাকি দানিল যাবে টিমটিম করবে ওর কালেকশনের কাছে। তিরু বিয়ে করেনি। কবিতার লেগ-পুলিংয়ের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে মিউ-জিয়াম নিয়ে পড়েছে।"

"ভাঁষার ছিরি দ্যাখো না," নাসিকা স্ফীত হল কবিতার।

"তিরুমালাই পরম ... রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর। ... ফিল্ম দেখার প্রচণ্ড নেশা। সেই জন্যেই আজ ট্রাংককলে ও আমাকে বলল তোকে নিয়ে যেতে।"

"কেন?"

"বলছি। তিরুর কিউরিও কেনার বাতিক ইদানীং খুব বেড়েছে। বাতিকের মগডালে উঠলে মানুষের অবস্থা যা হয়, তিরুরও তাই হয়েছে। দেশে ও বিদেশে কিউরিও বিক্রেতারা তার নেশার খবর পেয়েছে। এজেন্টরা ক্রমাগত যোগা-যোগ রাখছে। খবর আনছে, মাল বেচছে, কমিশন পকেটে পুরছে। সম্প্রতি একদল ডাচ বৈজ্ঞানিক আলাবার উপকূলের ওয়ে-নাদ অঞ্চলে মাটি আর পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে দেখছিল পুরাকালের কিছু জন্তুজানো-য়ারের নমুনো পাওয়া যায় কিনা। গোটা হিমালয় পর্বতটা যদি একদা জলের তলায় ডুবে থাকে, তাহলে জলচর প্রাণীদের কিছু হাড়গোড় পাহাড় কি মাটির মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। আশ্চর্য ওদের অনুমান। পাহাড় ফাটানো সার্থক হয়েছে। ওয়েনাদের দুর্গম অঞ্চলে তিমিমাছের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। বয়স কমকরে দুকোটি বছর।"

ইন্দ্রনাথ বলল—"ও খবর কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু প্রাইভেট ডিটেকটিভের তলব কেন পড়ল, সে খবর বেরোয়নি।"

"সেটা আমিই বলছি," বলল মৃগাঙ্ক। "তিমি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী—সে তুমিও জানো আমিও জানি। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতই তিমির এখনও ফুসফুস আছে—পুরাকালেও ছিল। নীল তিমি, পাখনা তিমি আর কুঁজো তিমির মাথার গড়ন মোটামুটি একরকম—তফাৎ শুধু মাপে। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক খুলি বলে একালের খুলি চালিয়ে দিলে ধরা মুস্কিল। বিশেষজ্ঞদের কাছে অবশ্য চালিয়াতি চলবে না, কিন্তু তিরু তো তা নয়। তাই তোমার শরণ নিচ্ছে।"

"আমি তিমি-বিশেষজ্ঞ নই," ইন্দ্রনাথ বিরক্ত।

"সে আমিও জানি, কিন্তু তুমি অপ-রাধ বিশেষজ্ঞ—মানে, হবার চেষ্টা করছ।"

খোঁচাটা হজম করে নিয়ে শুধু ভুরু কুঁচকোলো ইন্দ্রনাথ।

কবিতা বলল—"কথার জাহাজদের নিয়ে তো আর পারা গেল না। শোনো ঠাকুরপো, আমি আসল কথাটা বলি। তিরু একটা চিঠি পেয়েছে গতকাল। অদ্ভুত চিঠি। অক্ষর দিয়ে লেখা নয়। একটা সাদা কাগজে বড় বড় করে আঁকা শুধু পাঁচটা মূর্তি। নাচিয়ে মূর্তি।"

"নাচিয়ে মূর্তি!" সিধে হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। "আশ্চর্য! শার্লক হোমসকে নাচিয়ে মূর্তিদের ধাঁধা নিয়ে একবার মাথা-ঘামাতে হয়েছিল। কিন্তু সে তো অলীক কাহিনী।"

"রহস্য সেইটাই", বলে মোনালিসা হাসি হাসল কবিতা।

●

মহীশূরে নগরী।...

ছবির মত সুন্দর শহর। একদিকে মেঘছোঁয়া চামুণ্ডা পর্বত। পাহাড়ের কোলে সাজানো মহীশূর।

তিরুমালাইয়ের প্রাসাদোপম পৈতৃক ভিটে আড়ালি সড়কের দিকে। স্ট্যাচুসার্কেল থেকে যে রাস্তাটি চামুণ্ডা হিলের সমান্ত-রাল হয়ে চলে গেছে ললিতা-মহলের অভি-মুখে, তারই অনতিদূরে।

বাবা ছিলেন শিল্পপতি; কিন্তু বাড়ি করেছিলেন রাজপ্রাসাদের মত। তিরুমালাই সেই মাঠের মত দরদালানের একতলায় সাজিয়েছে সংগ্রহশালা।

বিশাল হলঘর। কারুকাজকরা থাম। সিলিংয়ে অজন্তা প্যাটার্ন। ঝলমলে ঝাড়-লন্ঠন। ঝকমকে বাতায়ন। ঠিক যেন একটা সভাগৃহ। রাজদরবার।

কিন্তু দরবারে এখন রাজাসন নেই, সভাসদ নেই, মন্ত্রী, কোটাল, বিদূষক নেই —আছে শুধু কিম্ভূতকিমাকার কিউরিও। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিবিধ দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কখনো তা উদ্ভট, কখনো কৌতূহলোদ্দীপক। কখনো বিস্ম-য়কর, কখনো লোমহর্ষক।

ডাইনোসরের বিশাল কঙ্কাল সব মিউজিয়ামে দেখা যায় না, কিন্তু তিরুর মিউজিয়ামে আছে। পাশেই রয়েছে ভগবান-য়ারের বিষ্ণুপতীক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি। তার সামনে সিন্ধুঘোটকের খড়কুটো ছাঁট মামী-মূর্তি। হঠাৎ দেখলে জীবন্ত মনে হয়। দেওয়ালে ঝুলছে সারি সারি হস্তী-দন্ত। তার মধ্যে একজোড়া হাতীর দাঁত রূপো দিয়ে বাঁধানো। ওপরে খোদাইকরা লিপি থেকে জানা যায়, দুশো মানুষ হত্যা-করার পর খুনে হাতীটিকে পাঁকে ফেলে গুলী করে মারা হয়। হাতীর চারটে থামের মত পা দিয়ে চারটি টুল বানিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের চারকোণে।

এক জায়গায় একটা রাক্ষুসে মাকড়-শার গনগনে চোখ দেখে আঁৎকে ওঠে দর্শক, লেবেল দেখেও বুকের ধুকপুকুনি কমে না। কাঁচের আলমারীতে সাজানো গরিলার করোটি দেখে অনেকেই যখন কল্পনা করতে থাকে খুলির মালিককে, তখন ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় জঙ্গলাভিধিকা গরিলাকে—দুই হাত তার উদ্যত, নাসিকা স্ফীত, দংষ্ট্রা বিকশিত। কিন্তু নিষ্প্রাণ। ট্যাক্সিডার্মির কেরামতিতে মনে হয় যেন জীবন্ত।

কোথায় দানবীয় কাঁকড়া, কোথাও প্রবালস্তূপ, কোথাও নরকঙ্কাল, কোথাও শিল্পসামগ্রী। হরেকরকম বস্তুর জগাখিচুড়ি। কিন্তু এই এলোমেলো বিন্যাসটাই এমন একটা আশ্চর্য রূপ দিয়েছে, যে ...

দেখলে মনে হয় যেন কিম্পুরুষের কীর্তি!

অন্তত ইন্দ্রনাথের তাই মনে হয়েছিল।

ঘুরে ঘুরে কবিতার হাঁটু যখন টন-টনিয়ে গেছে, মৃগাঙ্কর চোখ ঠিকরে পড়ার উপক্রম হয়েছে, আর বকতে বকতে তিরুমালাইয়ের মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, তখন ইন্দ্রনাথ রুদ্র ফস করে ঐ জাতীয় একটা মন্তব্য করে বসেছে।

শুনে দালান কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করেছে তিরুমালাই। দরাজগলার সেই বিকট হাসিতে নরকংকালের অস্থিসন্ধিও বুঝি খটাখট করে কেঁপে উঠেছে।

হাসি শুনে ত্রস্তে যে প্রাণীটি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে কিন্তু এহেন পরিবেশে মোটেই আশা করেনি অতিথি-বৃন্দ।

ফলে, তিন অতিথিই ফ্যালফ্যাল করে (আক্ষরিক অর্থে) তাকিয়ে থেকেছে নবাগতার দিকে।

উচ্চহাসি থামিয়ে তিরুমালাই বলেছে—"এসো, টিয়া। আলাপ করিয়ে দিই। যাঁদের কথা বলছিলাম তোমায়। প্রাইভেট ডিটেক-টিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র, নভেলিস্ট মৃগাঙ্ক রায়, তস্য গৃহিণী কবিতা রায়। আর এই আমার সেক্রেটারী টিয়া আতা।"

অবিকল মুক্তার মত সুন্দর একসারি দাঁতে মিষ্টি হেসে, স্নিগ্ধ কালো চোখে স্বাগতম জানিয়ে যুক্তকরে নমস্কার করেছে টিয়া-নাম্নী ললনা। বলেছে—"আপনাদের জন্য দোতলায় ঘর তৈরি! আগে জিরিয়ে নিন, তারপর মিউজিয়াম দেখবেন।"

"তাই ভাল, তাই ভাল," কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলল তিরু। "আতিথেয়তা জিনিসটা আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। আসতে না আসতেই মিউজিয়ামে ঢুকিয়ে ফেলেছি।"

এরপর আর বিশেষ কথা জমল না। টিয়া-নাম্নী মাধবীলতার মত আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটি একটু এগিয়ে যেতেই তিরুমালাইয়ের কানে কানে ফিস ফিস করে বলল কবিতা, "বলি, ডুবে ডুবে জল খাওয়া হয় নাকি? এ রত্নটিকে কোত্থেকে জোটানো হল?"

প্রাণপণে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে বলল তিরু—"শান্তিনিকেতন থেকে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তারই জবাবে এসেছে।"

"হুঁ", দ্ব্যর্থক মন্তব্য প্রকাশ করল কবিতা। "তোমার বাঙালী-প্রীতি এখনো কমেনি দেখছি।"

●

স্নানাহারের পর ইন্দ্রনাথের ঘরে জটলা হল।

টিয়া আর কবিতা ভিজেচুল এলিয়ে দিয়ে বসল রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে। কবিতা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল—"তিরু, কোথায় তোমার নাচুনে মূর্তিগুলো?"

"এই তো", এক তা কাগজ টেবিলে রাখল তিরুমালাই।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সবার আগে সিধে হল কবিতা। বলল—"কেউ ঠাট্টা করেছে।"

মুখ তুলল না শুধু মৃগাঙ্ক আর ইন্দ্রনাথ। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল দুজনে। তারপর মৃগাঙ্ক উঠে গিয়ে সুটকেশ থেকে একটা বই এনে রাখল টেবিলের ওপর। মলাটে লেখা 'শার্লক হোমস্ ফিরে এলেন।'

ইন্দ্রনাথ বলল—"ঠাট্টা নয়, হেঁয়ালি দিয়ে কেউ চিঠি লিখেছে। হেঁয়ালিটা কোনান ডয়ালের দৌলতে পৃথিবীর অনেকেই জেনে গেছে। এই চিঠিতে পাঁচটি মূর্তি আঁকা হয়েছে।"

মৃগাঙ্ক বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল—"শার্লক হোমসকে বাউল মূর্তিদের জট একবার ছাড়াতে হয়েছিল। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, মূর্তিগুলো আসলে ছদ্মবেশী অক্ষর। সুতরাং আমাদের বেশি মাথা খাটাতে হবে না। এই যে," বলে বইখানা বাড়িয়ে দিল সামনে।

ইন্দ্রনাথ বলল—"দেখুন পাতায় পাতায় মূর্তি আঁকা। প্রতিটি নেচে-কুঁদে এগিয়ে-যাওয়া মূর্তি এক-একটি ইংরেজী হরফের প্রতীক। আপনি দেখুন, আপনার পাঁচটি মূর্তি বইয়ের মূর্তির সঙ্গে মিলে যায় কিনা।"

কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে বলল তিরু—"যায়।"

"বইতেই দেওয়া আছে মূর্তিগুলোর মানে কি," বলল ইন্দ্রনাথ। "আপনি লিখুন আমি বলছি।"

বলে, চিঠির মূর্তির সঙ্গে বইয়ের মূর্তি মিলিয়ে দেখে একটি একটি করে অক্ষর বলতে লাগল ইন্দ্রনাথ। পাঁচটি হরফ পর পর লেখা হল। শব্দটা দাঁড়াল এইরকম:
CHEAT

●

"অর্থাৎ কেউ আপনাকে ঠকাতে চাইছে, তারই হুঁশিয়ারি এই চিঠি", থমথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল ইন্দ্রনাথ।

তিরুমালাইকে একটু উত্তেজিত মনে হল। বলল—"কিন্তু এত লুকোচুরি কেন? সোজাসুজি বললেই তো হত। আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুটির এই কাণ্ডকারখানা দেখেই মনে হচ্ছে, আমাকে কেউ ঠকাচ্ছে না। বরং কেউ 'হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে ব্যাগড়া দেবার চেষ্টা করছে।"

"অসম্ভব নয়," বলল ইন্দ্রনাথ। "হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করেন কি?"

"আমার মঙ্গল যারা সত্যিই চায়, তারা এত বোকা নয়, সোজা পথে চলে। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই চিঠির লেখক নিজেই একটা চীট। প্রতারক!"

"চটেছেন দেখছি," মৃদু হেসে বলল ইন্দ্রনাথ, "আপনাকে এখন ঠকানোর সম্ভাবনা তো একটাই। তিমির খুলি, কেমন?"

"হ্যাঁ। দুকোটি বছর আগেকার এই তিমির খুলি যদি আমি মিউজিয়ামে রাখতে পারি, মিউজিয়ামের প্রেসটিজ কত বেড়ে যাবে জানেন? খুলিটা আদৎ কিনা তাও যা সন্দেহ ছিল, এখন আর তা রইল না। সাংকেতিক লিপিলেখককে ধন্যবাদ। খুলি আমি কিনবই।"

"খুলি এখন কোথায়?"

"মালাবারে। ওয়েনাদের জঙ্গলে। খুলি ওখান থেকেই পাওয়া গেছে। ওখানেই রয়েছে।"

একদৃষ্টে একটা চকচকে তামার পাত্রের দিকে তাকিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। চোখ দেখে মনে হল, কি যেন সে নিরীক্ষণ করছে। ধীরে ধীরে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। বলল—"ঠিক আছে। চলুন, তাহলে ওয়েনাদের জঙ্গলেই এবার যাওয়া যাক।"

●

ঠিকহল, পরের দিন সকালে জীপ আর স্টেশন-ওয়াগনে যাত্রা শুরু হবে।

বিকেলের দিকে থাড়া ন সড়কের দিকে বেড়াতে গেল তিন অতিথি। সঙ্গে এল টিয়া। তিরুমালাই আসতে পারল না। তাকে অভিযানের আয়োজন করতে হবে।

টিয়া মেয়েটিকে প্রথম প্রথম লাজুক মনে হলেও দেখা গেল আলাপ জমে গেলে সে রীতিমত স্মার্ট। তখন মুখে কথার খই ফুটতে থাকে। কবিতা মৃগাঙ্ককে নিয়ে

এগোলো ডালিয়া কোণের দিকে। টিয়া ইন্দ্রনাথকে শোনাতে লাগল মহীশূর নগরীর ইতিহাস। হাত-মুখ ঘুরিয়ে কথা বলার ভঙ্গিটি তার সত্যিই মিষ্টি।

ইন্দ্রনাথ বললে—"আপনি তো বেশ পড়াশুনা করেন দেখছি। খবরও রাখেন অনেক।"

সলজ্জ মুখে বলল টিয়া—"কোথায় আর রাখি। চেষ্টা করি।"

"আজকের কাগজ পড়েছেন?"

"পড়েছি বইকি। কেন বলুন তো?"

"জন চাডউইকের ডিটেকটিভ কাহিনী দেখেছেন?"

"ওহো, আপনি মাইসেনিয়ান স্ক্রিপ্ট-এর রহস্যকথা বলছেন? চাডউইক সাহেবের বাহাদুরী আছে বলতে হবে। ওঁর গবেষণা সফল হলে তো ব্রোঞ্জযুগের সাইপ্রাস স্ক্রিপ্টের গোপনকথাও জানা যাবে।"

"বইটা কিনেই ফেলুন না।"

"অর্ডার পাঠিয়ে দিয়েছি—সকালেই।"

গোধূলির রক্তাভা মিলিয়ে যাবার আগেই মৃগাঙ্ক আর কবিতা ফিরল বা দিকে। বিশাল নীল তিমির মত ধূসর বেঁকিয়ে পড়ে রইল চামুণ্ডাপর্বত। কি ইন্দ্রনাথ আর টিয়াকে কোথাও দেখা না।

মৃগাঙ্ক বললে—"গেল কোথায় দুটো। ছেলেবুড়োদের ব্যাপারই আলাদা।"

চোখে বিদ্যুৎ হেনে কবিতা বলল—"তুমিও তো ঐ রকম ছিলে।"

"আমি তখন গাধা ছিলাম।"

"আর আমি অন্ধ ছিলাম।"

সর সর করে পাশের ঝুলঝোপ নড়ে উঠল। ভেতর থেকে আবির্ভাব ঘটল ইন্দ্রনাথের।

বলল—"সরি, দাম্পত্য কলহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্যে।"

ভুরু বেঁকিয়ে কবিতা বলল—"ওখানে কি করছিলে? টিয়া কোথায়?"

বলতে বলতে পেছনে এসে দাঁড়াল টিয়া। পশ্চিমের শেষ আলোয় দেখা গেল মুখ—মুখ তার থমথমে, হিমানী-স্নিগ্ধ চোখ চকচকে।

ফিস ফিস করে কবিতা বলল ইন্দ্রনাথকে —"কি করা হচ্ছিল?"

ততোধিক নিম্নকণ্ঠে ইন্দ্রনাথ জবাব দিল—"রহস্যালাপ!"

●

ওরেনাদের জঙ্গল।

পাহাড় আর বন। টিলা আর মহীরুহ। জনমানবশূন্য। কারণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এ অঞ্চলে আর কেউ টিঁকতে পারেনি। কিছু কিছু আদিবাসী মাটি কামড়ে এখনও পড়ে আছে।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় পর-পর তিনটে তাঁবু। খাকী সার্ট-প্যান্ট-পরিহিত কয়েকজন ইউরোপীয় তাঁবুর সামনে বেতের চেয়ার টেবিল পেতে কফি পান করছিল। গালে কটা দাড়ি গোঁফের জঙ্গল।

সুদূর হল্যান্ড থেকে এরাই এসেছে ভারতের মাটিতে গবেষণার আশা নিয়ে। তাদের পরিশ্রমের প্রথম পুরস্কার এই তিমির খুলি। অর্থাভাবে অভিযান বানচাল হবার উপক্রম হয়েছে। তাই তারা চায় করোটির বিনিময়ে কিছু অর্থ।

আলাপ জমে ওঠার পর এই সব কথা বলছিল হাচিনসন সাহেবের দলবল। ইন্দ্রনাথ তার কবি-কবি চেহারার মধ্যে অকস্মাৎ কবিতাকে যেন প্রকট হয়ে তুলেছিল। পাখীর গান শুনেছিল, অরণ্যের শোভা দেখছিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক চোখে শুনেছিল হাচিনসন সাহেবের বক্তৃমে। তিমির খুলির রহস্যকথা।

খুলিটা ওখান থেকেই দেখা যাচ্ছিল। শেষ তাঁবুর জানলার পাশেই উঁচু বাক্সের ওপর বসানো ছিল বিশাল করোটি। প্রাগৈতিহাসিক স্তন্যপায়ী জলচরের অস্থিময় মগজ-আধার। পাথরের মধ্যে বন্দী কংকালকে পাথর কাটিয়ে উদ্ধার করতে হয়েছে। জলমেশানো পাতলা অ্যাসিড ঢালতে হয়েছে বিস্তর। তাই খুলির কোথাও ক্ষয়ে গেছে; ভেঙে গেছে। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বিস্ময় জাগে। দুকোটি বছর আগে এই খুলিই বিচরণ করেছিল সমুদ্রজলে, অনুভূমিক লেজ নেড়ে থেতর প্রাণীর মত সাঁতার কেটেছিল, ফুসফুসে বাতাস বোঝাই করার জন্যে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ভেসে উঠেছিল সমুদ্র-পৃষ্ঠে।

সাহেবদের সঙ্গে বকবকানিতে দেখা গেল তিরুমালাইয়ের জুড়ি নেই। ইন্দ্রনাথ আগাগোড়া শ্রোতাই হয়ে রইল।

এক সময়ে কথার তুফান একটু ঝিমিয়ে আসতে তিরু উঠে পড়ল। বেশ কিছুদূরে পাতা নিজেদের তাঁবুর দিকে যেতে যেতে বলল—'ব্যাপার কি মিঃ রুদ্র? আপনি তো একেবারে বোবা হয়ে গেলেন দেখছি?"

আচমকা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ।

বলল—"আমাকে একজন তীরন্দাজ জুটিয়ে দিতে পারেন?"

যেন হোঁচট খেল তিরুমালাই।

বলল—"কি দেব?"

"তীরন্দাজ। কলির অর্জুন না হলেও মোটামুটি টিপ থাকলেই হল।"

হতভম্ব হয়ে তিরু বললে—"তা পারবো না কেন। এখানকার বাসিন্দাদের সর্দার রামমূর্তি পাকা তীরন্দাজ। ৯৫ বছর বয়সেও তীর ছুঁড়ে ওর লক্ষ্যভেদ দেখলে অপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যর দিকে এখনও মিনিটে ১৬০টা তীর ছুঁড়ে মারতে পারে।"

"ওতেই হবে। মিনিটে একটা তীর ছুঁড়তে পারলেই হল। কিন্তু লাগা চাই।"

"কিন্তু কেন বলুন তো?"

"কিছু কিছু রহস্য আমাকে তৈরি করতে দিন? হাজার হোক রহস্যভেদী তো। যথাসময়ে সব জানবেন," বলে চোখ নাচিয়ে হাসল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

●

রামমূর্তি যথাসময়ে এসেছিল। থুড়থুড়ে বুড়োর তীরের খেলা দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল কবিতা। ইন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল একা।

পরের দিন সকাল বেলা ইন্দ্রনাথ বলল—"আজকেই আমাকে বোম্বাই যেতে হবে।"

"সে কী!" তিরু বিস্মিত।

"আপনারা মাইশোরে ফিরে যেতে পারেন। আমি ফিরে এসে দেখা করব।"

কবিতার কোনো ওজোর টিঁকল না। সেই দিনই তাঁবু উঠিয়ে জীপ আর স্টেশন-ওয়াগন রওনা হল মহীশূরের দিকে।

হাচিনসন সাহেবদের বলা হল, এক হপ্তার মধ্যে তাঁদের জানানো হবে, তিমি-মাছের খুলি কেনা হবে কি না।

●

ইন্দ্রনাথ রুদ্র বোম্বাই থেকে ফিরল কয়েকদিন পরেই।

এসেই হাতমুখ ধুয়ে বলল—"বৌদি, তোমার ওল্ড ফ্রেন্ড তিরুমালাই, না, মার্কণ্ড-মালাই কি যে ছাই নাম মনেও থাকে না—ও'কে বলো টিয়া আর্চিকে নিয়ে কিম্পুরুষের মিউজিয়ামে চলে আসতে।"

তিমির খুলির রহস্যকথা জানবার জন্যে কবিতা তখন বিলক্ষণ উৎকণ্ঠিতা, সুতরাং কথায় 'ছিরি' নিয়ে আর ঝংকার দিল না। দৌড়োলো হুকুম তামিল করতে।

অতঃপর কিম্পুরুষের সৃষ্টিছাড়া মিউজিয়ামে জমায়েত হল সকলে। টর্পেডোর মত একটা বৃহৎ চুরুট থেকে ঘন ঘন ধুম্র উদ্গীরণ করতে করতে তিরুমালাই বলল—"তারপর?"

ইন্দ্রনাথ পঁচকে একটা সিগারেটে মৃদুমন্দ টান দিয়ে বলল, "তিমির খুলি দুকোটি বছরের পুরানো কিনা—এইটাই জানতে চান তো?

"তা তো বটেই," অসহিষ্ণু কণ্ঠ তিরুর।

"না," সংক্ষিপ্ততম উত্তর ইন্দ্রনাথের।

"খবরটা কি তিমির আত্মা এসে দিয়ে গেল?"

"আজ্ঞে না," ইন্দ্রনাথ বিনয়ের অবতার। "তিমির খুলিই দিল।"

"তিমির ভাষায় ?"

"আজ্ঞে না, বিজ্ঞানের ভাষায়।"

"যথা ?"

"অ্যাবস্ট্রাক্ট অভ ওয়ার্ল্ড মেডিসিন' এর পাতা ওলটানো আমার বরাবরের অভ্যেস। মাসকয়েক আগে ফরেনসিক সেকশনে দেখলাম একটা চাঞ্চল্যকর খবর বেরিয়েছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাড়ের বয়স নির্ধারণ করা দুর্ঘট। কিন্তু নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির কয়েকজন গবেষক একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা এগারো রকমের হাড়ের নমুনা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এগারোটার মধ্যে একটা হাড় একদম টাটকা। তিনটে দুই, চব্বিশ আর ছেচল্লিশ বছরের পুরোনো, বাকি ছ'টার বয়স একশ বছরেরও বেশি। মানে, দুশ থেকে সাতশ বছরের মধ্যে। খটমট লাগলে বলবেন।"

কেউ কোনো জবাব দিল না দেখে ইন্দ্রনাথ আবার শুরু করল—"করাত দিয়ে কাটা হাড় নিয়ে তাঁরা ফ্লোরেসেন্স টেস্ট করলেন, অ্যাসিড দিয়ে দেখলেন এফারভেসেন্স; দেখা হল নাইট্রোজেনের পরিমাণ কতখানি। হাড় গুঁড়ো করে বেনজিডিন টেস্ট করা হল। খরগোশের সিরাম দিয়ে ইমিউনো ইলেকট্রো-ফোরেসিস পরীক্ষা হল। দেখা হল অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা। এরপর ক্রোমাটোগ্রাফি ছাড়াও আরও কিছু পরীক্ষা করলেন গবেষকরা।

"তারা দেখলেন, এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে হাড়ের নমুনাগুলোকে অনায়াসেই 'প্রাচীন' আর 'আধুনিক' এই দুই গ্রুপে ভাগ করা যায়। দেখলেন, হাড়ের বয়স যত বেড়েছে, নাইট্রোজেনের পরিমাণও তত কমেছে। অ্যামিনো অ্যাসিড হ্রাস পেয়েছে। নতুন হাড়ে থাকে কম করে দশটা অ্যামিনো অ্যাসিড; কিন্তু ৪০।৫০ বছর পুরোনো হলে সংখ্যা কমে গিয়ে এসে দাঁড়ায় মাত্র চারে। আশা করি, কারো মাথা ভোঁ ভোঁ করছে না।"

এবারও সকলে নীরব। তিরুমালাইয়ের কন্ঠার ওঠানামা থেকে বোঝা গেল ভদ্রলোক কতখানি উৎকন্ঠিত।

"দুকোটি বছর আগেকার তিমির খুলি এই সব টেস্টের মধ্যে ফেলা গেলে, বয়সটা একশো বছরের এদিকে কি ওদিকে— —তা জানা যাবে এই আশা নিয়েই আমি বোম্বাই গেছিলাম। ফরেনসিক ল্যাবোরেটরীর কর্তাদের সঙ্গে খাতির ছিল। তাই অসুবিধে হয়নি। করোটি চূর্ণ পরীক্ষা করে জানা গেল, এ খুলির বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। কারণ অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গেছে চারটে। দুকোটি বছর হলে কিছুই পাওয়া যেত না।"

ঘর নিস্তব্ধ।

গাঢ় ধূম্রজালের আড়াল থেকে তিরুমালাইয়ের কন্ঠ ভেসে এল—"হাড়ের টুকরো আপনি পেলেন কোত্থেকে ?"

"তীরন্দাজ রামমূর্তির দৌলতে।"

"খুলে বলুন। বুঝতে পারছি না।"

"তিমির খুলিটা তাঁবুর মধ্যে কিন্তু জানলার পাশে রেখে দিয়েছিল হাচিনসন সাহেবের দলবল। আমার দরকার ছিল একটা টুকরোর। কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। তাই রামমূর্তিকে বললাম, নগদ পাঁচটা টাকা দেব, তোমার তীরের খেল দেখাও। সে তো মহা খুশী হয়ে ধনুকে তক্ষুনি তীর লাগালো। আমি বললাম এখন নয়, সন্ধ্যের দিকে জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়বে ঐ খুলি লক্ষ্য করে। একটা চিলতে আমার দরকার। মাঠের ওপর চিলতে পড়ুক, আমি কুড়িয়ে নেব। কিন্তু তীর যেন না পড়ে। একগাল হেসে রামমূর্তি বলল, তাই হবেগো বাবু। লোকটাকে সত্যিই কলির অর্জুন বলা উচিত। ওকে আমি যা বলেছিলাম, ও তার চাইতে এক কাঠি বেশি এগিয়ে গেল। অর্থাৎ অবিকল রবিন হুডের কায়দায় তীরে এমন মোচড় দিয়ে ধনুক থেকে ছাড়ল যে খুলির খানিকটা হাড় খুবলে নিয়ে তীর সনসন করে উড়ে গেল তাঁবু ফুটো করে। কিন্তু আশ্চর্য ওর টিপ। খুবলোনো হাড়ের টুকরোটা মাটিতে পড়ার আগেই আর একটা তীর মেরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল তাঁবু থেকে বেশ খানিকটা দূরে। থ্রিলিং! এরকম তীরের জাদু কেবল রবিনহুডের পক্ষেই সম্ভব জানতাম। দিন মশাই, আপনার একখানা সিগার দিন, আমার স্টক ফুরিয়েছে।"

নীরবে চামড়ার সুবৃহৎ সিগার কেসটা এগিয়ে দিল তিরুমালাই। বলল—"তারপর আপনি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে আনলেন, কেমন ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি আমার বিলক্ষণ উপকার করলেন। আর একটা উপকার করুন।"

"হুকুম করুন।"

"ঠাট্টা নয়। সাংকেতিক ছবি দিয়ে আমাকে কে হুঁশিয়ার করেছিল ?"

"তার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি", চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ। "আপনি বিয়ে করছেন না কেন ?"

থতমত খেয়ে গেল তিরুমালাই। প্রাণপণে কবিতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে বলল, "এমনি।"

"তাহলে এবার বিয়ে করে ফেলুন। ভাল পাত্রী পাওয়া গেছে।"

তিরুমালাই নিরুত্তর। কবিতা উৎসুক।

ইন্দ্রনাথ বলল—"মেয়েটির চেহারা যেমনি মিষ্টি, মনটিও তেমনি মিষ্টি। কিউরিও সংবাদ নিয়ে অনেক এক[illegible] কাছে আসে। একজন দালালের ক[illegible] খবর পেল, একটা আন্তর্জাতিক জা[illegible] দল ভারতের মাটিতে এসেছে। [illegible] বস্তু জালিয়াতি তাদের ব্যবসা। [illegible] এঞ্জেলোর তৈলচিত্র জাল থেকে শু[illegible] তিমির খুলি পর্যন্ত—সব কাজে[illegible] পোক্ত। কাজেই তিরুমালাই যেন হ[illegible] হন। তারা লোক বুঝেই টোপ [illegible] মিষ্টি মেয়েটি সব শুনল, বুঝল[illegible] মুস্কিলে পড়ল। কেননা, বা[illegible] মানুষের শুভবুদ্ধি সব সময়ে [illegible] থাকে। বুদ্ধিমতী মেয়েটি তাই[illegible] সোজাসুজি বললে কাজ হবে না[illegible] চিঠি দিলে কাজ হতে পারে, [illegible] চিঠি যদি কিম্ভূতকিমাকার সা[illegible] লিপিতে লেখা হয়, তাহলে কিম[illegible] মিউজিয়াম-অধিকর্তার কৌতূহল [illegible] হবে, এক্সপার্টকে কনসাল্ট করবে[illegible] সব জোচ্চুরি ফাঁস হয়ে যাবে। [illegible] চিঠি লিখল কোনান ডয়ালের পদ্ধ[illegible] করে। প্ল্যান সফল হল। আমরা [illegible] এবং জানলাম, মিষ্টি মেয়েটি কিম[illegible] মিউজিয়ামের ব্যোমভোলা মানুষটি[illegible] প্রাণ সঁপে বসে আছে।"

ভোলামহেশ্বরের মতই এবার [illegible] ছোট কলকেতে টান মারল তির[illegible] কিছু বলল না।

কবিতা ভুরু বেঁকিয়ে বলল[illegible] অত হাঁড়ির খবর জানলে কোত্থেকে[illegible]

"মিষ্টি মেয়েটির কাছ থেকে। [illegible] খাওয়া দাওয়ার পর যখন আমরা গ[illegible] করছিলাম, তোমার মনে আছে [illegible] মিঃ তিরুমালাই সাংকেতিক লিপি[illegible] ওপর মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন এ[illegible] মুন্ডপাত করছিলেন। ঠিক সেই [illegible] একটা চকচকে তামার পাত্রর দিকে [illegible] রহস্যের প্রথম সূত্র দেখলাম।"

"তামার পাত্রের মধ্যে ?"

"এক রকম তাই। মিষ্টি মেয়ের[illegible] তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল। [illegible] সে মুখ কালো হয়ে গেছে। [illegible] বেড়াতে বেরিয়ে সাংকেতিক অক্ষ[illegible] কথা পাড়লাম। টোকা মারতেই [illegible] মিষ্টি মেয়েটি অনেক খবর রাখে। [illegible] কথার প্যাঁচে ফেলে কোণঠাসা কর[illegible] কবুল করল।"

গাঁজায় দম দেওয়ার মত চুর[illegible] মারা বন্ধ করে ভোলামহেশ্বরটি [illegible] 'সাংকেতিক লিপি-লেখিকা তাহলে[illegible]

লিপি-লেখিকার রাজহংসীগ্রীবা [illegible] রেখে সস্নেহে বলল [illegible] 'টিয়া আঢ্য।"

মিষ্টি চোখে মিষ্টি হেসে [illegible] মিষ্টি মেয়ে—"দুষ্টু!" *

[* বিশদ বিবরণীর জন্য অনুসন্ধিৎসু [illegible] ১৯৬৮ এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'অ[illegible] অভ ওয়ার্ল্ড মেডিসিন' দেখতে [illegible] অপরাধ-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতির [illegible] এ যাবৎ হয়েছে বলে শোনা য[illegible] লেখক।]

...ন্ত রাত ধরে মাছ ধরার স্বপ্ন ...লো মলয়।

...কটা আশ্চর্য নিথর সবুজ পুকুর! ...শে সুপুরি আর নারকেল গাছের ছায়া ...য়ে খেয়ে পড়েছে। মাঝখানে ছোট্ট এক ...া নীল আকাশ। আর সেইখানেই ...ধু শাদা ফাংনাটা—একটুও নড়ছে না। ...র তাকিয়ে থাকতে-থাকতে যেন নেশা-...য়। যেন ঘুম পায়। কত কথা মনে ...কত কথা মনে না পড়তে-পড়তে যেন ...তুলে চায়। এই পুকুরে মাছ কখনো ...গেলে না। এই পুকুর থেকে টোপ- ...কোনো মাছকে খেলিয়ে-খেলিয়ে ...করে ডাঙায় তুলে আছড়ে মারতে ...। শুধু শাদা ফাংনার দিকে তাকিয়ে ...। চোখে পড়ে শুধু সুপুরি আর ...ল গাছের ছায়া—যাদের শেকড় ...শ যারা পুকুরের অগাধ স্নিগ্ধতায় ডুবিয়ে রয়েছে। তাদের সেই স্নিগ্ধতার ...নে হলেই কেমন যেন একটা হিংসে কেবলই মলয়ের মনে হয়; তারা যা ...সে পায়নি।

...দা ফাংনাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-...স্বপ্নের মধ্যে কখন তার ঘুমের আমেজ ...আসছে, সবে যখন শরীরের মাংস-পেশী শিথিল হয়ে একটা ভারি চমৎকার নীল আকাশ আর সবুজ পুকুরের সংগে মিশতে চলেছে—তার কাঁধে দারুণ একটা ঝাঁকুনি। উপড়ে-পড়া সুপুরি-নারকেল গাছ, নীল আকাশ, সবুজ পুকুর, শাদা ফাংনা—একাকার হয়ে গেলো। চোখ বুজে স্পষ্ট যা কিছু দেখছিলো, চোখ মেলে স্পষ্ট কোনো-কিছুই প্রথমটায় ঠাহর করতে পারলো না।

মালতী হেসে বললো, 'কী লোকরে বাবা! একেবারে অঘোর-অচৈতন্য! দু' দু'বার গরম দু'পেয়ালা চা ঠান্ডা হিম। উঠবে কখন? উঠবে না? মনে নেই?'

প্রশ্ন তিনটি যেন তিন তিনটি বাণ—সমস্ত সত্তাকে এ-ফোঁড় ওফোঁড় করে যায়। কিন্তু পুরাণের বাণ নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে কোনো এক জায়গায় ফিরে আসে বলে সবাই জানে। এই বাণগুলি কার্যসিদ্ধির পরেও কিন্তু উঁচিয়ে থাকে। ফেরে না।

তারপর মলয়ের সর্বাংগ দিয়ে যেন একটা আঠালো ঘিনঘিনে সরীসৃপ কিল-বিলিয়ে গেলো। কারণ মালতীর ঠোঁট। তার এঁঠো ঠোঁটটা এঁঠো ঠোঁট ঠেকলে মলয়ের মনে হয় শেকসপীয়র কোনোদিন সনেট লিখতেন না, কীটস্ লিখতেন না নাইটিংগেল নিয়ে অমর কবিতা।

মালতী আবার হেসে বললো, 'কী

লোকরে বাবা! সবকিছু ভুলে যায়। যেন একটা বাচ্ছা!—মণি, এই মণি—!'

আর এই দু'টো শব্দ—ম-ণি।

এর মধ্যে সবকিছু আছে—শুধু একটা ছাড়া। যেটা মণি-মানিকের প্রাণ। তার জৌলুস। তার চকমকি। মালতী তাকে যখন ভালোবেসে মণি-মণি বলে ডাকে মলয়ের মনে হয় যেন চোখা-চোখা পাথর তাকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারছে।

ধড়মড় করে সে উঠে বসলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে হোলো সরলদের বাগান-বাড়িতে আজকে যে মাছ-ধরা আর আড্ডার কথা সেটা মাঠে মারা গেলো।

'কী লোকরে বাবা, মালতী হেসে আবার বললো। মনে নেই—?'

'খুব আছে। আর এক পেয়ালা চা বানাও। তোমার দিদির বাড়ি যেতে হবে তো—?'

'হু'!' শাড়ির খুঁট দাঁতে কেটে ফিক-ফিক করে হাসলো মালতী। 'হু'—সেটা কিন্তু সবটা নয়। দিদির মেয়ের জন্যে হকার্স কর্নার থেকে একটা ফ্রক কিনতে হবে। দিদির ছেলের জন্যে অ-আ-ক-খ'র একটা বই কিনতে হবে। জামাইবাবুর জন্যে জগুবাজার থেকে এক ডিবে ভালো নস্যি কিনতে হবে। আর তোমার জন্যে—"

শেষ কথাটা শুনলো না মলয়। বাথ-রুমে যেতে-যেতে মনে মনে কথাটা শেষ করলো—"—পোটেসিয়াম সাইনাইড।"

শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাটার মোড় চাট্টিখানি কথা নয়। ট্যাকসির সঙ্গতি মলয়ের নেই। দু নম্বর বাসে মালতিকে নিয়ে ওঠবার অভিজ্ঞতা তার প্রচুর। বাসে উঠে সে এমন একটা হাবভাব দেখায় যেন সেটা তার পিতার সম্পত্তি।

এবারও হোলো তাই। বাসে উঠেই বললো, "কেমন লোক মশাই আপনারা? ভদ্রমহিলাকে ঠেলছেন! লজ্জা করে না—?"

মলয়ের লজ্জা করলো। মুখের ভাব এমন করতে চাইলো যাতে বোঝায় মালতি আর সে একেবারে আলাদা। তাদের মধ্যে কোনোরকম সম্পর্ক নেই।

লেডিজ সিটে আলোয়ান জড়িয়ে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাকে কোনোরকম সমারোহ না করে মালতি বললো, "উঠুন। —লেডিজ সিট—খেয়াল নেই?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পক্ষে যতটা সম্ভব ক্ষিপ্রতায় ওঠা সম্ভব উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, "বসুন মা—বসুন।"

তারপর, পাশের খালি আসনটা দেখিয়ে মালতি ডাকলো, "মণি—মণি—এইখানে—"

উপরকার রড ধরে মলয় এমন একটা মুখের ভাব করতে চেষ্টা করলো যে কথা-গুলো এমন ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যাঁর নাম মণি হলেও হতে পারে—সে নয়।

মালতির পাশের খালি সিট কিন্তু খালি পড়ে রইলো না। পরের স্টপেই ভিড় করে উঠলো একদল মেয়ে। সে-যেখানে পারলো বসলো। একটি মেয়ের বসবার জায়গা হোলো না। মালতির সিটের পাশে উপরের রড ধরে সে দাঁড়িয়ে রইলো। নিজেকে যথাসম্ভব সংকুচিত করে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো মলয়। মালতি কটমট করে তাকালো মেয়েটির দিকে। তরপর মলয়ের দিকে।—মলয় সেই ভোরবেলাকার নিথর সবুজ পুকুরের স্বপ্ন ভাববার চেষ্টা করলো যার হৃৎপিণ্ডে এক টুকরো নীল আকাশ দুলছে।

মলয়ের সামনে সে-মেয়েটি দাঁড়িয়ে তার গলায় একটি কালো তিল। তার মুখের চেয়ে সেই তিলটাই সবার আগে লোকের চোখ কেড়ে নেয়। বালক বয়সে মলয় কোনো একটি ফর্সা মেয়ের গালের উপরকার কালো তিল নিয়ে কবিতা লেখবার চেষ্টা করেছিলো। সেই তিলের কথা, সেই মেয়েটির কথা ভাবতে চেষ্টা করলো মলয়। কিছুই মনে পড়ে না। জীবনটা যেন এই বাসের ভিড়ের মতোই ঠাসাঠাসি। দাঁড়াবার, ভাববার, মনে করবার এতোটুকু ফাঁক কোথাও নেই।

সেই তিল থেকেই সুরু। যার গলায় অমন সুন্দর তিল তার মুখটা দেখবার লোভ সব মানুষেরই হয়। মলয়েরও হোলো। ছেলেবেলার হারিয়ে-যাওয়া মুখটা খ[ুঁজে দেখবার] চেষ্টা করলো। মেয়েটির মুখ যাকে [সুন্দর] বলে তা নয়—তবে সেই মুখের মধ্যে যেন একটা আছে যেটা ধরা দিতে [গিয়েও] ধরা দেয় না।

মেয়েটি উসখুস করে উঠলো। আরো সংকুচিত হয়ে দাঁড়াবার [চেষ্টা] করলো মলয়।

মালতি কটমট করে তাকালো ম[লয়ের] দিকে। আর মলয়ের মনে হোলো যদি তার প্রতি মালতির ভালোবাসা [একটু] কমাতেন তা'হলে তাঁর যে সৃষ্টি-খানিকটা সম্পূর্ণ হোতো।

এইরকম দার্শনিক চিন্তা খুব বেশ[িক্ষণ] মলয় করতে পারলো না। স্বপ্নেও সে ভাবতে পারেনি সেটা হঠাৎ বাজ[ের] মতোই ঘটে গেলো। মেয়েটি আর এ[কবার] উসখুস করে মলয়ের দিকে কটমট তাকিয়ে সজোরে এক চড় কষালো। বললো, "ভদ্রমহিলাকে চিমটি কাটবার পুরস্কার।"

ট্রাফিক বাতির লাল আলো জ্ব[লছে।] সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে ঠেলা, [ট্যাক্সি,] টেম্পো, ইত্যাদি নানা ধরণের গাড়ি-ঘ[োড়া।] একপাল ছাগল পথ পার হচ্ছে। [তার] পিছনে দৌড়চ্ছে ছড়ি হাতে ক[টি] ছেলে। মলয়কে পুরস্কার দিয়ে [মেয়েটি] নেমে গেলো। নানা মন্তব্য শুনতে-শ[ুনতে] মলয়ও নামলো।

তার হুঁশ হোলো মালতির [কথা] শুনে—"মণি-মণি—কী লোকরে বাবা! [সব]কিছু ভুলে যায়! যেন একটা বাচ্ছা—"

মলয় বললো, "বিশ্বাস করো, মহিলাকে আমি চিমটি কাটিনি—"

একমুখ হেসে মালতি বললো, "[সে] আমি কি জানি না? তুমি চিমটি [কাটতে] যাবে কেন! ফ্যালফ্যাল করে মেয়েটার [দিকে] তাকাচ্ছিলে। যেন বিশ্ব-সংসার [ভুলে] ফেলেছো।—এমন একটা ভাব। তাই আমিই তাকে চিমটোচ্ছিলুম।—ছে[লেটা] তো হুঁশ-পবন বলতে কিছু নেই। আমাদের বিয়ের তারিখ খেয়াল আছে[?]

তারপর ফুটপাথের পাশের দোকানের দিকে তার হাত ধরে নিয়ে যেতে মালতি বললো, "অন্তত একটা ফুলের মালা তো আজকের দিনে দিতে পারো—"

একটা চড় মারার জন্যে আঙুলগুলো নিশপিস করছিলো। সে নিজেকে সামলে পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে একটা এক টাকার ফুলওলাকে দিয়ে বেলফুলের একটা কিনলো। লোকটি খুচরো যখন মলয় বললো, "চেঞ্জটা রাখো—"

ফুটপাথেই বেলফুলের মালাটা জড়াতে-জড়াতে মালতি বললো, "[স]এইজন্যেই তো তোমাকে এতো ভা[লোবাসি।] কখনো তুমি ফুলওলাদের সঙ্গে দ[র] কর না!"

আমার ছেলেবেলা

তুষারকান্তি ঘোষ

আমার ছেলেবেলার কথা বলতে গেলে সেই মনে পড়ে সেকালের কলকাতার এবং আমাদের অমৃতবাজার গ্রামের অবশ্য যশোরের এই অমৃতবাজার আজ পাকিস্তানে পড়েছে। কলকাতায় আমাদের ছেলেবেলা কেটেছে এক বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে। আমি অবশ্য আমার ঠাকুরদাদের দেখিনি। আমার বাবার কথা মনে পড়ে; আর মনে পড়ে আমার দুই কাকার কথা—মতিলাল ও গোলাপলাল ঘোষ। এই যে একান্নবর্তী পরিবারের কথা বলছি এ ছিল আমার বাবার কর্তৃত্বাধীন। ... লোক ছিলেন এবং সকলকে ... বাড়ীর সকলেই আমার বাবা যা বলতেন, তাই মেনে নিতেন; এবং তাঁর জীবৎকালে আমাদের বাড়ীতে কোন ... হয়নি।

তখন পাড়ায় পাড়ায় খুব একতা ছিল। বাগবাজার পল্লীর মানুষ তাঁরা সকলেই ... মতই ছিলেন। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানের কোন তফাৎ ছিল না। একজন বাগবাজারের হিন্দুর ... মুসলমানের ওপর যত দরদ ... বোধহয় অন্য পল্লীর কোন ... উপর ছিল না। এই কথা মুসলমান ... সম্বন্ধেও বলা যায়। এই আত্মীয়-... একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

তখন বাগবাজারের খালধারে যে ...পাড়া ছিল, সেখানে বহু মুসলমান ... পরিবার বাস করতো। আমার পরি-... মনে আছে একজন মুসলমান জেলে ... আমাদের বাড়ীতে নোনা ইলিশ ... করতে আসতো। এই স্ত্রীলোকটি ... মকে দিদি বলতো; এবং সেই জন্য ... লোকে তাকে জেলেনী মাসী ...। এই সঙ্গে একটা কথা না বলে ...—এই জেলেনী মাসীর তৈরী করা ... মাছে যে আস্বাদ ছিল সে ... মাথা খুঁড়লেও পাওয়া ...। এই যে হিন্দু-মুসলমানের ...কথা বলছি, তার আরও একটা প্রমাণ আমি দিতে পারি। তখন প্রায়ই পল্লীতে পল্লীতে মারামারি হতো—যেমন দরজীপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বাগবাজারের ছেলেদের, পটলডাঙ্গার ছেলেদের সঙ্গে ঝামাপুকুরের ছেলেদের। এই সব বিবাদে একপাড়ার হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান এক হয়ে অন্য পাড়ার হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টানের সঙ্গে ঝগড়া করতো। তখন কলকাতার প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে একটা করে পুকুর এবং বাগান ছিল। সেই বাগান পুকুরে ছেলেবেলায় যে আনন্দ করেছিলুম, তার স্মৃতি ভোলবার নয়। সেই জন্যে আজ আমি বারাসতে থাকতে ভালোবাসি—কলকাতায় থাকতে ভালো লাগে না।

ঠিক এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের পল্লীগ্রামেও দেখতুম। যশোর জেলায় আমাদের অমৃতবাজার গ্রামে মুসলমানের সংখ্যাই খুব বেশী ছিল। কিন্তু গ্রামবাসী-দের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ভালোবাসার। আজ একটা মজার কথা মনে পড়ছে। তখন আমাদের গ্রামে দু'চার জন এমন লোক ছিল যাদের অন্য লোকের পুকুর থেকে মাছ চুরি না করলে ঘুম হতো না। এই সব মাছধরিয়েদের পাড়াপ্রতিবেশীরা ধরিয়ে দিত। এতে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ ছিল না। কোন হিন্দু যদি কোন মুসলমানের পুকুরের মাছ ধরতো তখন হিন্দুরাই তাকে ধরে দিত, হিন্দু বলে ছেড়ে দিত না। মুসলমানরাও ঠিক তাই করত। একবার আমাদের ঘোষেদের দীঘিতে যখন তিন-চার জন মুসলমান ছেলে রাত্রে মাছ চুরি করছিল তখন পাড়ার অপর ক'জন মুসলমান তাদের ঘিরে ফেলে দেয়। তখনকার দিনের হিন্দু-মুসলমানের ভাই ভাই ভাব বড়ই মধুর ছিল। আজকের সঙ্গে তখনকার দিনের তুলনা করলে মনে বড়ই ব্যথা লাগে। মনে পড়ে আমরা চিরকাল মহরমের চাঁদা দিয়েছি এবং তাঁরাও কালীপুজো, শীতলা পুজোর চাঁদা দিতেন।

তখনকার দিনে আমাদের যশোর জেলায় কতকগুলো জিনিস পাওয়া যেতো, যা কলকাতায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হতো। আমাদের কপোতাক্ষী নদীর গলদা চিংড়ি মাছ, কই মাছ, খেজুরে গুড়, মানকচু ইত্যাদি যার আস্বাদ স্বপ্নের মত বলে মনে হয়। এইসব জিনিস কলকাতায় এনে বিক্রী করা হতো। আবার কলকাতা থেকে সরষের তেল, নুন, কাপড় ইত্যাদি যশোর জেলায় চালান হতো। এই যে সব জিনিসের কথা বলছি, এর অনেক জিনিস বেশী দিন থাকে না; যেমন বিলের মাছ। বিল শুকিয়ে গেলেই এই সব মাছ নষ্ট হয়ে যায়। আজও তাই হয়। তবু এসব জিনিস কলকাতায় চালান আসে না। যদি এইসব জিনিস আগেকার মত কলকাতায় আসতে পারতো, আর আমাদের জিনিস ওখানে পাঠানো যেতো, তাহলে উভয় দেশেরই মঙ্গল হতো—আমাদের অনেক অভাব দূরে করা যেতো। আর উভয় পক্ষই জিনিস বিক্রী করে লাভবান হতেন।

যাই হোক, আমার ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে আমি রাজনীতি করতে চাই না, কেবল যে-সব কথা মনে পড়ছে, তাই সরলভাবে বলছি।

আর একটা কথা বোধহয় কেউ জানেন না যে যখন আমাদের বিরাট পরিবার যশোহর উচ্চপদস্থ গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে কলকাতায় চলে আসেন, তখন ঐ দেশবাসী একটি মহানুভব মুসলমান পরিবারের সাহায্য ব্যতিরেকে একাজ সম্ভব হতো না। আমাদের অমৃত-বাজার গ্রামের সন্নিকটবর্তী চাঁদা গ্রামে বিশ্বাস-পদবীযুক্ত একটি মুসলমান পরি-বার বাস করতেন। অমৃতবাজার বেরোবার কিছুদিন পরেই গভর্নমেন্ট যে লাইবেল মকদ্দমা আনেন, সে মকদ্দমায় আমাদের পক্ষে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই মকদ্দমার ফলে যদিও আমার বাবাকে জেলে যেতে হয়নি, তবুও আমাদের পরিবার ভীষণ আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলো। মকদ্দমার পরে মনো-

মোহন ঘোষ আমার বাবাকে বলেন যে গভর্নমেন্টের মধ্যম এই মনোভাব তখন আর তাঁদের যশোরে বাস করা নিরাপদ নয়। কিন্তু এই বিরাট পরিবার নিয়ে প্রায় অজ্ঞাত কলকাতায় আসার প্রধান সংকট ছিল অর্থাভাব। তখন চাঁদার বিশ্বাসিরা আমার বাবাকে দু-তিন শত টাকা ধার দিয়েছিলেন, এবং এই সাহায্যের দ্বারাই তাঁরা তখন কলকাতায় [illegible] আমরা এই সাহা[illegible]

ছেলেবেলার কথা বলতে গেলে আরও মনে পড়ে কলকাতায় পত্রিকাভবনে যে সব দেশের জ্ঞানী-গুণী ও জননায়কেরা আসতেন তাঁদের কথা, যেমন মহাত্মা 'গান্ধী, 'কেশরী' সম্পাদক লোকমান্য তিলক, মৌলানা মহম্মদ আলী ইত্যাদি। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের ছেলে বলে তাঁদের কাছ থেকে কতই না আদর পেতুম। সেই সব বাল্যস্মৃতি স্মরণ করে আজও কত গৌরব বোধ করি।

পরিশেষে একটা কথা বলি—আ ছেলেবেলাকার কাল ছিল—সুখের জিনিসপত্র সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে যেত। আজকে র‍্যাশনে লাইন দিয়ে এবং জিনিসপত্রের দাম বিবেচনা তখনকার কালের সুখের কথাই শুধু পড়ে। আবার কি বাঙালী তেমনি দিন ফিরে পাবে?

(আকাশবাণীতে সম্প্রচা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সিনেমার স্বাতন্ত্র্য

বিলেতে আমেরিকায় অনেক সিনেমা হল একটু মজার। সেখানে ছবি ঠিক রম্ভ হবার আগে না ঢুকলে পুরোটা যে খা যাবে না এমন কোন কথা নেই। সারা ন ধরেই একটি ছবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খানো হয়, আর দর্শক টিকিট কিনে যখন শি হল-এ গিয়ে ঢুকে যতক্ষণ খুশি খানে থাকতে পারে। তার মানে একবার বির মাঝখানে গিয়ে ঢুকে শেষটা পর্যন্ত খে আবার পরের বার গোড়া থেকে মাঝখান র্যন্ত দেখে নেওয়া যায়।

তাতে ছবিটা পুরো দেখা হয়ে যায় বটে স্তু দেখা সার্থক কি হয়? দেখে তৃপ্তি-ই মেলে?

মেলে বোধহয় অনেকের। তা না হলে কম ব্যবস্থা চালুই বা আছে কেন?

এভাবে ছবি দেখে তৃপ্তি যাদের হয়, ছবি র সার্থকতা সম্বন্ধেও তাদের ধারণা ধ হয় আলাদা। ল্যাজা বা মুড়ো যে দিক যে হোক পুরো ছবিটা চোখ দিয়ে গিলতে রলেই হল। কোনটা আগে কোনটা পরে র ওলট পালটে কিছু আসে যায় না।

এ ধরণের মনোভাব এখনকার কালের নেক শিল্পকলা সাহিত্যের পেছনেই কাজ হে কি না কে জানে! আমার এক বন্ধু ত' ক উদাহরণ দিয়ে এ শিল্পরহস্য আমায় ঝবার চেষ্টা করেছিলেন। সোনার জন্যে মন কষ্টি পাথর, তাঁর মতে কবিতা যাচাই- তেমনি একটি অভ্রান্ত পরীক্ষা আছে। র নিচে বা মাঝখানের লাইন যেমন খুশি লবদল করলেও যার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি না, তা-ই হল তাঁর বিচারে এখনকার যথার্থ বিতা। দুচারটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে এ তিনি প্রমাণও করেছিলেন।

পরিহাস থাক। ইদানীং শিল্পচিন্তায় নেক উদ্ভট বিভ্রান্তি দেখা গেলেও ছায়াছবি য় ভিত্তিক শিল্পকলা হিসেবেই এখনো কৃত। সঙ্গীতের মত সময়বাহী এ ল্পে আনুপূর্ব অবজ্ঞা করবার বিষয় নয়। গে অন্তরা গেয়ে পরে আস্থায়ী যদি কেউ ন তাহলে সঙ্গীতের যথার্থ রূপ নিশ্চয় টে না। তার প্রকাশের একটি ধারা আছে, ই বিকাশ-পরম্পরা-রক্ষা করেই শিল্প বে তা সার্থক হয়।

ছায়াছবি প্রথম যখন সুরু হয় তখন সব ভাবনার কোনো অবকাশই ছিল না। র সচল ও সবাক হবার মত ব্যাপারের দের চমকই ছিল তখন যথেষ্ট। সে বিস্ময়-চমক কেটে যাবার পরও ছায়াছবি গল্পকারের ভূমিকা নিয়েই দর্শককে মুগ্ধ করে রেখেছে।

গল্প বলাটা শিল্প হিসাবে সঙ্গীতের মতই সময় ভিত্তিক। তার আদ্য মধ্য অন্ত আছে আর রচনার কৌশলে শেষটা কখনো কখনো গোড়ায় চলে এলেও পরিণতির একটি ধারাবাহিকতা অনুসারেই তা সার্থকতায় পেঁছোয়।

গল্পকার হিসেবে ছায়াছবি গোড়ায় রঙ্গ-মঞ্চকেই বেশীরভাগ অনুকরণ করেছে তা থেকে নাটকীয়তার উপাদান ধার করবার জন্যে। যে হেতু বহুজন তোষণ সাধারণ-ভাবে তার অস্তিত্বের একটি শর্ত, সে কারণে একটি স্তরে এ অনুকরণ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রসিক গুণীজনের অবজ্ঞা উপহাস প্রতিবাদ সব কিছু অগ্রাহ্য করে তথাকথিত হলিউড ও বোম্বাই মার্কা ছবি তাই শুধু বেঁচে-বর্তেই থাকবে না কলাবস্তীর আশীর্বাদ নিয়ে ক্রমশঃ বেড়েও যাবে।

ছায়াছবি শুধু ওই স্তরেই অবশ্য আবদ্ধ হয়ে নেই। অন্য অভিজাত শিল্পের তুলনায় প্রজননটা তার যান্ত্রিক ও কৃত্রিম হলেও ছায়াছবি কিছুকাল বাদেই প্রাণ-স্পন্দিত হয়ে নিজের আত্মার সন্ধান করছে। তার সে শিল্পআত্মা যে রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে কি মুদ্রিত উপন্যাসের পাতার মধ্যে নেই এ সত্য আবিষ্কার করতে তার দেরী হয় নি। নিচের তলায় প্রাণের দায়ে বহু-জনের মন ভোলাতে যত সস্তা রসের ভিয়েনেই সে চড়াক, ওপর মহলে তার আত্মানু-সন্ধানের মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। তাই কোনো সুলভ সাফল্যের প্রলোভনে সে বাঁধা পড়ে নি।

কিন্তু অন্তরের তাগিদে ফাঁকি না থাকলেও লক্ষ্য সম্বন্ধে দৃষ্টি তার ঝাপসা। ইউরোপ আমেরিকার সাম্প্রতিক দুঃসাহসিক সব প্রচেষ্টার নমুনা যা পাই তাতে মনে হয় নিজের অসীম সম্ভাবনা সম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠলেও সে সম্ভাবনা সার্থক করে তোলার ধারণা তার নিতান্ত ঘোলাটে। যন্ত্রযুগের তপোবল নিয়ে শ্রেষ্ঠ কটি শিল্প-সমবায়ে গড়ে ওঠার দরুন শক্তিতে দশভুজা হয়েও সে যেন বাহুবাহুল্যে বিব্রত হয়েই নিজেকে ব্যর্থ করছে বাতুল আস্ফালনে।

ইউরোপ আমেরিকার এক শ্রেণীর শিল্পীসমাজ সেদিন পর্যন্ত যার নামে মূর্ছা যেত সেই ইঙ্গমার বেরিয়-মান (Ingman Bergman) এর দৃষ্টান্তই রয়েছে চোখের সামনে। 'ওয়াইল্ড স্ট্র-বেরিজ' ছবিটি ১৯৫৭ সালে ছায়াছবির জগতে নতুন এক প্রতিভার অরুণোদয়ের যে আশা জাগিয়ে তুলেছিল তা পূর্ণ হল কই? পর পর অনেক ছবিই তারপর বেরিয়মান তুলেছেন। সেগুলিতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি কোথাও কোথাও যে নেই তা নয়। কিন্তু রুগ্ন যৌন-বিকারের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথই যা সার করেছে সে শিল্পী-সত্তার বিদ্যুৎচমক ফোটবার অবকাশই কোথায়?

বেরিয়মান আধুনিক অগ্রসর সিনেমা-শিল্প-স্রষ্টাদের একমাত্র যথার্থ প্রতিনিধি না হলেও তাঁর মধ্যে যা অত্যন্ত প্রকট দেহসর্বস্ব সেই বিকৃত মানসিকতায় বেশীর ভাগ তথা-কথিত নবযুগদিশারীই আচ্ছন্ন।

যত পীড়াদায়কই হোক এ ভ্রষ্ট সাধনা তবুও সাময়িক বলেই আশা হয়। আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে নিজের শক্তির দুরন্ত বেগে সিনেমা শিল্পের সৃষ্টিপ্রেরণা এ যুগের একটি ব্যাধিলক্ষণ স্বরূপ অসুস্থ যৌনভাবনার কানাগলিতে কিছুকালের জন্যে পথ হারিয়েছে, এ নিষ্ফলতার অভিশাপ থেকে নিজের সুস্থ চেষ্টাতেই সে মুক্ত হবে এ বিশ্বাসে জোর পাবার কারণও কিছু আছে।

প্রথম সাবালকত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমাশিল্প সুলভ জনতোষণের পথ যেমন নিয়েছে তেমনি কাহিনী ব্যাখ্যাতা হিসেবে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতেও ছাড়ে নি। জনপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেও সে যুগের অনেক ছায়াছবি তার স্বধর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিণতির পথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে।

শোনা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় কাঁচা ফিল্মের স্বল্পতাই মন্টাজ চিত্রগ্রহণের প্রেরণা দিয়ে সিনেমা শিল্পের বিকাশ-স্বাতন্ত্র্যের পথ করে দেয়। রাশিয়ার এই চিত্রগ্রথন কৌশলের অভিনবত্বের সঙ্গে আমেরিকায় ডি ডবলিউ গ্রিফিথ-এর 'ব্রোক-

অপ' চিত্র গ্রহণের দুঃসাহসিক উদ্ভাবন মিলে ছায়াচিত্রকে যে পথে এগিয়ে দিয়েছে তা অভিনীত নাটক কি মুদ্রিত গল্প উপন্যাস থেকে ভিন্ন হলেও কাহিনী-বিমুখ নয়। গল্প উপন্যাস ও নাট্যসাহিত্যের মত সিনেমাও মানুষের বিচিত্র জীবন-রহস্য অন্য মাধ্যমে কাহিনীর ধারার ভেতর দিয়ে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছে।

বড় বড় গালভরা তত্ত্বকথার ধুকনি সিনেমা-শিল্প নিয়ে সেদিন বড় একটা শোনা যায় নি। কিন্তু ছবি কিছু কিছু তৈরী হয়েছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার মত।

নির্বাক যুগের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। ছবির মৌনতা ঘোচবার পর থেকে 'পাইকারী স্বপ্নের কারখানা' যাকে বলা হয় সেই হলি-উডই চার্লি চ্যাপলিন-এর মডার্ণ টাইমস্, দি গ্রেট ডিক্‌টেটর, লেখক ডুডলে নিকল্‌স ও পরিচালক জন ফোর্ড-এর সহযোগিতায় ইন্‌-ফর্মার, স্টেজ কোচ, লেখক রবার্ট রিস্‌কিন ও পরিচালক ফ্র্যাংক কাপরার যোগাযোগে মিস্টার ডিড্‌স ও জন ডোর-র জীবন-বিচিত্রা, ও তারপরে লস্ট উইক এন্ড, ওপ্‌ন্‌ সিটি দা ট্রেজার অব সিয়েরা মাদ্রের মত ছবি আমাদের দিয়েছে। আমেরিকা ছাড়া অন্য দেশ থেকে যা পেয়েছি তার মধ্যেও যুদ্ধোত্তর ইটালীর দি বাইসাইক্‌ল থীপ্‌ ও মিরাক্‌ল ইন মিলান আর জাপানের রশোমন বিশেষভাবে মনের ওপর দাগ কেটে গেছে।

এই সমস্ত ছবিতেই সিনেমা গল্প বলার ভূমিকাই নিয়েছে। সিনেমা নাটক নভেল নয়, কিন্তু জীবনের বিস্ময়-বৈচিত্র্য রূপায়িত করার সঙ্গে তার রহস্যগভীরতার সন্ধান নেওয়াই তার কাজ। সিনেমার সার্থকতাও তাইতে। যান্ত্রিক কলা-কৌশলের বিস্ময়কর উন্নয়ন সিনেমা-শিল্পকে যত জমকালো জৌলসই দিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক কি অক্ষর-বন্দী গল্প উপন্যাসের মত মানুষের জীবন-কথার বাইরে তার ধ্যান-ধারণা কিছু নেই। তার স্বাতন্ত্র্য শুধু তার পদ্ধতিতে। জীবনকে শিল্পদর্পণে ফোটাবার ও ব্যাখ্যা করবার এমন কটি উপাদেয় সমাবেশ সিনেমার মধ্যে ঘটেছে যা তাকে অনন্য করে তুলেছে। রঙ্গমঞ্চের নাটক কি মুদ্রিত কাহিনীর তাঁবে-দারী করবার দিন আর তার নেই। নিজের শক্তি ও অধিকারেই সিনেমা এখন জীবন-ভিত্তিক শিল্পের প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত।

এ প্রতিষ্ঠা অর্জন করা অবশ্য সহজ হয় নি। সিনেমা-শিল্পকে একটু অবজ্ঞার কি বড় জোর অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখা প্রথম যুগে ত বটেই এখনকার কালেও যথার্থ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজের উন্নাসিক রেওয়াজ।

সিনেমার প্রতি এই তাচ্ছিল্য একেবারে অযৌক্তিক অকারণ নয়। আমেরিকার হলি-উড ও তারই অনুকরণে আমাদের বোম্বাই এ তাচ্ছিল্যের প্ররোচনা নিজেরাই দিয়েছে।

বিস্ময় ব্যবসা হিসাবে সিনেমাকে আমেরিকায় ফাঁপিয়ে তুলেছে, আবার সেই আমেরিকাতেই সিনেমা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা দেখা গেছে সবচেয়ে বেশী। সিনেমার প্রথম রবরবার যুগে আমেরিকার পশ্চিম সাগরকূলে হলিউড অবিরাম সস্তা স্বপ্নের মোড়কে প্রমোদের পুরিয়া বাজারে ছেড়েছে আর পূর্ব সাগরকূলে ব্রডওয়ের রংগমঞ্চ হলিউডের ফিল্ম প্রধানদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসায় মুখর হয়ে উঠেছে। সে যুগের বড় বড় সাহিত্যিকরাও সুবিধা পেলে হলি-উডকে খোঁচা দিয়ে মজা করতে ছাড়েন নি।

হলিউড এ সব কিছু গ্রাহ্যই করে নি। এ সব ঠাট্টা-বিদ্রূপ সেখানকার মুভিমোগলদের কানেই পৌঁছেছে কি না সন্দেহ। ডেট্রয়েটের মোটর কারখানার সঙ্গে হলিউডের তখন বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। সেখানকার বড় বড় ফিল্ম কোম্পানী প্রত্যেকে বছরে পঞ্চাশ ষাট করে পুরো দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী করে যাচ্ছে। সমস্ত হলিউডে প্রতিদিন একটির বেশী ছবি তৈরী হয়ে বেরিয়ে বছরে মোট ছবির অংক দাঁড়াচ্ছে প্রায় চার'শ।

আমেরিকার মানুষের তখন ছবি দেখায় অরুচি নেই। সাধারণ প্রতি গৃহস্থ পরিবার সরেশ নিরেশ যে কোনো ধরনের ছবি হপ্তায় বার দুই তিন দেখে।

দেশের এই সব অঢেল খদ্দের ত আছেই, তার ওপর সারা পৃথিবীতে তখন হলিউডের ছবি নিয়ে কাড়াকাড়ি। দুনিয়ায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। সুতরাং চলতি কাফিলা হয়ে কটা কুকুরের ডাকে তারা কান দেবে কেন? হলিউডের ছবি তৈরীর একটি অভ্রান্ত ফর্মুলা ছিল তখন। সেই ছকের একটু অদলবদল করে ছবির পর ছবিতে অনায়াসে তারা কিস্তিমাৎ করেছে। সে ফর্মুলা সাজাবার জন্যে যদু মধুর বেশী কারুর তাদের দরকারই হয় নি।

লেখকের অবস্থা ও মান-মর্যাদা সিনেমা-রাজ্যে তখন কি রকম ছিল পরবর্তী কালে বিখ্যাত একজন পরিচালকের কাছে তার বড় মজার বর্ণনা পাই।

এ পরিচালক হলেন এলিয়া কাজান। নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে নাট্যপরিচালনায় কৃতিত্ব দেখাবার দরুন হলিউডে সিনেমার রাজ্যে তাঁর তখন ডাক পড়েছে। সেখানে প্রথম কাজের দিন দুপুরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে হলিউডের অত্যন্ত মূল্যবান একটা শিক্ষা তিনি পান। না, এ শিক্ষা কারুর কোন উপদেশ কি বক্তৃতা থেকে তিনি পান নি, পেয়েছিলেন, হলিউডের বড় কোম্পানীর কর্মীরা দুপুরে যে বিরাট হলে লাঞ্চ খেতে বসে স্রেফ্ তার আসন সাজাবার ব্য[...] থেকে।

বিরাট ভোজনাগারের ঠিক মাঝখা[...] আসনগুলি সিনেমাস্বর্গের দেবদেবী অ[...] প্রধান নায়ক নায়িকা আর তাঁদের অন[...] স্তাবকবৃন্দের জন্যে সংরক্ষিত। তারপর [...] বড় পরিচালক আলোকচিত্রকর [...] ইত্যাদির সদলবদলে বসবার নানা বি[...] স্থান। ছায়াচিত্রের নির্মাণকর্মের যে স[...] আশি জন প্রধানতঃ লাগে বড় মেজ [...] হিসেবে তাদের সকলের আসন ব[...] ব্যবস্থার মধ্যে লেখকের জায়গা কোথায় [...] করেছিলেন কাজান। খোঁজও পেয়েছি[...] হলের এক সুদূর কোণে প্রায় অপাং[...] অচ্ছুৎদের মত আর সকলের অবজ্ঞাত [...] টেবিলে। হলঘরে জায়গা পেয়েছে এ[...] যেন তাদের সৌভাগ্য।

হলিউডে লেখকদের মর্যাদা তখন [...] বেশী নয়। এলিয়া কাজান নিজে তখন একটি বিখ্যাত বই 'এ ট্রি গ্রোজ্ ইন ব্রুক[...] পরিচালনা করেছিলেন। ন মাস হলি[...] এ ছবি নিয়ে কাজ করবার মধ্যে লেখিকা স্মেলিসংগারের সঙ্গে তাঁর একবারও দেখা[...] নি।

নির্বাকের জায়গায় সবাক চিত্রের য[...] সুরু হবার পর লেখকদের এ দুরবস্থার [...] হঠাৎ সমাদর সুরু হয়ে যায়। হঠাৎ হলি[...] থেকে তারবার্তা ছোটে আমেরিকা[...] নয় ইংলণ্ডেরও লেখকদের আবাহন জানা[...] সিনেমার পুরোন ফর্মুলা আর চলছে [...] নতুন গল্পের জন্যে সত্যিকার লেখক [...] তার জন্যে হলিউড মুক্তহস্ত।

হলিউডের সে ডাকে যাঁরা সাড়া [...] ছিলেন তাঁরা নেহাৎ হেঁজিপেঁজি [...] নন। উইলিয়ম ফকনার, স্কট ফিটজের[...] জন ও হারা, উইলিয়াম স রোয়ানের লেখকও তার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু হলিউ[...] ছায়াছবির ইতিহাসে এঁদের কোনো স্মর[...] দানের কথা পাই না। না পাওয়াটা [...] বিস্ময়করও নয়। প্রথমতঃ সাহিত্য [...] সিনেমার মাধ্যম এক নয়। কলম চা[...] যিনি অদ্বিতীয় তিনি সিনেমার মা[...] সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ হবেন এমন কোনো [...] নেই। দ্বিতীয়তঃ লেখকদের চড়া দাম [...] ডাকলেও হলিউড তাঁদের কাজে লা[...] পারে নি।

সাহিত্যের জাত-লেখক নয় সি[...] শিল্পে নব যুগান্তর যাঁরা এনেছেন [...] বেশীর ভাগ সাধারণ জনতা থেকে [...] আসা চার্লি চ্যাপলিন কি ফ্র্যাঙ্ক কা[...] মত অচিহ্নিত মানুষ।

সিনেমা-শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিণতির এঁরাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, সে পথ জী[...] রহস্য বিস্ময় মাধুর্য মহিমাকে অব[...] করেই প্রসারিত। অংগবিন্যাসের বিচ্যুতি স[...] সমন্বভিত্তিক সংগীতের সমধর্মী [...] সিনেমা সেই পথেই নিজের স্বাতন্ত্র্য [...] করে একটি মহৎ জীবন-শিল্প হয়ে [...] চলেছে বলে আমরা আশা করতে পারি।

তপন সিংহ

কোন শুদ্ধ শিল্পের ঠাস বুনোট কোন ভবিষ্যৎ খসড়া করা যায় না। 'আপন বেগেই পাগল পারার' মত শিল্প অতীত চিন্তায় জারিত হয়ে প্রাত্যাহিকতার পথ বেয়ে সে এগিয়ে চলে। সিনেমা শুদ্ধ শিল্প, সুতরাং এর অবস্থাও তাই। তবে কিনা অন্যান্য সুকুমার শিল্প যেমন খুব বেশী আর্থিক কাঠামোয় গড়া নয়—এটা তার উল্টো। সবচেয়ে ব্যয়বহুল শিল্প এটাই। কাজেই কাহিনী-চিত্রের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে তিন দিক থেকে ভাবতে হয়। এক—ব্যবসায়িক দিক, দুই—নন্দনতত্ত্বের দিক, তিন হল সাধারণ দর্শকের দিক।

প্রথমে ব্যবসায়িক দিকটার কথাই ধরি। বাংলা দেশে দিনের পর দিন ছবির সংখ্যা যেভাবে কমছে, তাতে ভয় হয় যে, আর ক'বছর বাদে না, বাংলা ছবি বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিদিন Production cost বেড়েই চলেছে। স্টুডিও ভাড়া, শিল্পীদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ খরচা আগের দিনের তুলনায় এখন তো আকাশ ছোঁয়া। কাজেই নতুন লোক সাহস করে এ লাইনে আসছেন না, আর যার একটা ছবি 'মার' খেয়েছে, সে তো নয়ই। অবশ্য এখানে একটা কথা উঠবে, বাংলাদেশে বাংলা ছবি 'মার' খাচ্ছে কেন? তাহলে দর্শকদের কথা বলতে হয়।

আজকের সমাজের চারদিকেই কেমন বিশৃঙ্খল ভাব, কোন কিছু সুস্থ চিন্তার হাওয়া নেই। পেটের সমস্যা দিন দিন যেভাবে হাঁ করে এগিয়ে আসছে, মনের সমস্যা কোন ঠাঁই পাচ্ছে না সেখানে। উপরন্তু illiteracy তো আমাদের জন্মসঙ্গী। স্বাধীনতার একুশ বছর পরেও অশিক্ষিতের হার কতটুকু কমেছে? তাও তো 'শিক্ষিত' অর্থে সই করতে পারে এই ধরা হয়। প্রকৃত শিক্ষিত কোথায়? হিসেব করে দেখ দেখা যাবে হয়ত শতকরা -০০১ ভাগও ন সুতরাং শিল্পকে বোঝা, তাকে এ্যাপ্রিসি করা সম্ভব কি এদের পক্ষে। দর্শ এখন চায় 'সস্তা আমোদ'। তার জন্য রয়ে হিন্দী ছবি!

সিরিয়স কিছু করাও এখানে 'রিস্ক'- ব্যাপার। আমি বছরে একটা-দুটো যা ছবি করি—এবং চেষ্টাও করি সাধ্যমত বি বলতে সাধারণভাবে। পারি কিনা জানি আসল ব্যাপার হোল দর্শকরাই তো ছ ব্যবসায়িক সাফল্যের পুরো ভারটা ফলে ভালো ছবি 'মার' খায়। অবশ্য বক্তব্যকে পরিচ্ছন্ন রুচিতে, সরলভ সোজাসুজি বলা যায়, তা নিশ্চয়ই দ নেবে। আমি নিজে তার প্রমাণ। আ অনেক ছবিই দর্শক বেশ সুন্দরভ নিয়েছে। আরও অনেকের ছবি চলছে—

মধ্যে ভালো ছবিও আছে। বাঙালী-দর্শক বাঙালী মেজাজের ছবি হলেই নেবে।

বিদেশেও অবশ্য ছবির বাজার ভালো নয়, টেলিভিশনের পর থেকে সিনেমার বাজার বড় মন্দা। হলিউডের Production তো কমেই চলেছে বছরে বছরে। পূর্ব ইউরোপেও সিনেমা ব্যবসা যে খুব একটা [illegible] হয়েছে, তা [illegible]। [illegible] কথা [illegible] আগে [illegible] চারদিকে। বিদেশে তো আরও [illegible]। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভীতি ওদের মধ্যে বড় বেশী কাজ করছে। চারদিক থেকে মানুষ যেভাবে suppressed বা oppressed হচ্ছে তাতে নিজেকে বিশ্লেষণ করে নতুন কোন সুস্থ, স্বাভাবিক চিন্তার জন্ম দিতে পারছে না। জীবনের সব দিকেই তো অনিশ্চয়তা! যা যাই হোক, বিদেশের কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশের সমস্যাও প্রায় একই, কারণ হয়ত আলাদা। এখানকার দর্শকরাও মানসিক দিক থেকে শিল্পরস গ্রহণের যোগ্যতাহীন। গত বছরে যা ছবি হয়েছিল, এবারে তো তার অর্ধেক রিলিজ হলো না। অবশ্য প্রায় পাঁচ-ছ' মাস ধর্মঘট ও অন্যান্য কারণে ব্যবসায় স্থিতাবস্থা ছিল না। বাংলা চিত্র-ব্যবসায়ের হাড়ে হাড়ে যেসব অপকীর্তি ও দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে, তাকে প্রথমে সরাতে হবে। আর আসল দায়িত্ব হল সরকারের। বছরে সরকার 'প্রমোদকর' ও অন্যান্য খাতে আমাদের কাছ থেকে যা মোটা পরিমাণ টাকা নিচ্ছেন, তাকে পুনরায় এই ব্যবসায়েরই উন্নতির কাজে লাগানো দরকার। 'খালি নিয়েই যাব হাত পেতে দেবো না কিছুই' এ নীতি চলবে না। সরকার তো বিনা পরিশ্রমেই এই ব্যবসা থেকে কয়েক লক্ষ টাকা পাচ্ছেন, ব্যবসার উন্নতির কাজে তার থেকে কিছু লাগান দরকার। নতুন সিনেমা ঘর তৈরী, Production এ আরও অনেক কাজে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকার নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয় থাকলে তো শুধুমাত্র প্রযোজক বা পরিচালকরা কিছু করতে পারবেন না। আর তাছাড়া পরিচালকরা আজকের এ দুরাবস্থার জন্য দায়ীও ত নন।

যাই হোক, আসল ব্যাপার হোল আজকের বাংলা চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে যে দু'পক্ষের সাহায্য সব চাইতে প্রথমে প্রয়োজন, তারা হল সরকার ও দর্শক। দর্শককে ঠিকভাবে তৈরী হতে হবে, আর সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। নইলে আমার মনে হয় বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের আয়ু আর মাত্র কয়েক বছর।

• • •

এবারে সিনেমার নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে ভবিষ্যৎ কি দেখা যাক। আমাদের বাংলা দেশে ছবির আর্ট-এর দিকে খুব একটা উন্নতি হয়েছে, তা বলতে পারি না। এখনও সেই emotion, sentiment, melodrama ধাঁচে গড়া ছবির সংখ্যাই বেশী। অবশ্য সব ছবি বাজারও পাচ্ছে না। আজকের বাংলা সাহিত্যে যে স্বাধীনতা ও নতুন রীতি এসেছে—ছবিতে তা এখনও আসেনি। কবে আসবে তাও ঠিক বলা সম্ভব নয়। আসল ব্যাপার হোল মানুষের জনজীবনে স্থিরতা নেই, অর্থনৈতিক অসাম্য রয়েছে, চারদিকে frustration. আজকের যুব-সমাজের সামনে কোন নির্দিষ্ট আদর্শ বলতে কিছু নেই। তারা কোন্ পথে যাবে, কোন্ পথে চালিত করে তাদের কাজে লাগান যাবে, এটা কেউই ভাবছেন না। আমাদের ছবির রাজ্যেও খুব একটা কেউই এ নিয়ে চিন্তিত নন। আমি নিজেও প্রথম দিকে ছবি করার সময় এসব কথা চিন্তা করিনি। একবারে প্রথম দিকে তো টেকনিকের বাহাদুরি দেখাবার আগ্রহ ছিল বড় বেশী। মনে পড়ছে 'অংকুশ' ছবি করতে গিয়ে গরুর গাড়ীর চাকার ভেতর দিয়ে একটা শট নেবার জন্য ছ' ঘন্টা সময় খরচ করেছিলাম। এখন আর সে অভ্যাস নেই। কিভাবে দেখাবার চাইতে কি দেখাব, কি বলব সেই দিকেই বেশী নজর। এ ব্যাপারে আমার বেশ পরিবর্তন হচ্ছে ভেতর থেকে। কখনও কবিতা ভাল লাগতো (কাবুলিওয়ালা), কখনও বা ভাবাবেগ (অতিথি)। এখন মনে হচ্ছে জীবনের কাছাকাছি যাওয়া দরকার। এই যুগযন্ত্রণা আমাকেও পীড়িত করছে—আমিও তাই নতুন পথে, নতুন কথা বলতে চাইছি। নতুন ছবি 'আপনজন'এ তার একদিকের কথা বলতে চেষ্টা করেছি। পরের ছবিতেও চেষ্টা করব।

জীবনের যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, ছবির বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন দরকার সেইভাবে। কিন্তু হচ্ছে না। গড্ডালিকাস্রোতে গা ভাসাচ্ছেন অনেকেই। চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে বাইরে পা দিতে নারাজ অনেকেই। কিন্তু দিতে হবে একদিন। আজকের এই নীতিহীন, আদর্শহীন জীবনের প্রতিচ্ছবি সিনেমায় যতটা ফোটানো সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে ততখানি কি সম্ভব? তবে আমাদের এ যুগযন্ত্রণা ও মানসিক অস্থিরতার যে ছবি আধুনিক চিত্রকলায় ফুটে উঠছে, তারই পথ বেয়ে চলচ্চিত্রও হয়ত একদিন abstract art -এর পথ নেবে। একজন শিল্পী বলেছেন শুনলাম "More horrible will be the world, more abstract will be our art" কথাটা ঠিক, তবে কিনা ও ধরনের ছবির আবেদন সর্বজনীন হবে না। আমাদের দেশে তো নয়ই। বিদেশে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হয়তো শুরু হয়ে থাকবে, কিন্তু আমাদের দেশে সিনেমায় abstractness সম্পর্কে চিন্তা করার মত অবস্থা এখনও হয়নি।

মোট কথা ছবি দিয়ে জীবনের কথা বলতে হবে, জীবনকে পর্দায় আনতে হবে। 'জতুগৃহ' ছবিতে তার কিছুটা চেষ্টা করেছিলাম, তবে সেখানে ইমোশন অনেকটা [illegible]। এখন আবার শুরু [illegible] যদি সুযোগ পাই,

পারিবারিক জীবনের অনেক না-বলা সত্যকে দেখাবো, যা অনেকের জীবনের সত্য। যাই-হোক, বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ এদিক থেকে এখনও খুব একটা আশাপ্রদ নয়। তবে ভালো পরিচালক তো আমাদের আছে। কাজেই আশা করতে দোষ কি?

আর পরিচালক বা ব্যবসায়িক দৃষ্টির না দেখে যদি ব্যাপারটাকে সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতেও দেখি তাহলে ভারতীয় ছবির কথা বলতে গেলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার ধারণা খুব ভাল। হয়ত আগামী দশ বছরের মধ্যে এক বিরাট ওলট-পালট হয়ে যাবে। সেন্সর বোর্ডের খোসলা কমিটির ব্যাপারে জড়িত থাকায় সম্প্রতি বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী ঘুরে এলাম। ও-সব জায়গায় এমন কিছু নজরে পড়েছে, যা দেখে খুবই আশ্বস্ত হয়েছি। হিন্দী ছবির একাধিপত্য ভাঙবে বুঝি এবার। পুণা ফিল্ম ইন্সিটিট্যুট থেকে যে-সব ছাত্র গ্রাজুয়েট হয়ে বেরোচ্ছে তাদের অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি প্রত্যেকেরই মধ্যেই বেশ seriousness আছে দেখলাম। সিনেমাকে সেই চিরাচরিত entertainment media হিসাবে দেখতে অনেকেই রাজী নয়—নতুন কিছু যেন তারা করতে চাইছে। সে তুলনায় কলকাতায় তো সে ধরনের কোন Urge দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয়, এবারে হাওয়া বদলটা ভারতের পশ্চিম দিক থেকেই হবে।

তা হোক, ওদের কাছে আমাদের ঋণ অনেক, পূরণ কতটুকু করতে পারবে কে জানে, তবে নতুনের ঢেউ তো আসুক আগে। সেটা কম আনন্দের নয়, বিশেষ করে যদি পশ্চিম দিক থেকেই আসে। আমার ইউনিটেও তো ফিল্ম ইন্সিটিট্যুটের গ্রাজুয়েট রয়েছে একজন—কল্যাণ চ্যাটার্জি। ওর মধ্যেও সিনেমার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ, কৌতূহল আছে, তার সঙ্গে seriousness তো আছে। ওখানে ওরা সিনারিও লেখা, ডিরেকশন, ফটোগ্রাফী, অভিনয়, এডিটিং ও অন্যান্য ব্যাপারে বেশ সুন্দর শিখছে। এরাই তো ভবিষ্যৎ। সমগ্রভাবে ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎও তাই ভাল নিশ্চয়ই।

সব মিলিয়ে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে কাহিনী-চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে দর্শকের ওপর নির্ভরশীল। দর্শকরা সজাগ হোক, ছবির গতি ছবির পরিণতি, ছবি তোলবার রীতিনীতি—সবই পাল্টাবে। ভালো ছবি, পরীক্ষামূলক ছবি এখান থেকেই হয়েছে। আরও হবে, অনেক হবে, শুধু দর্শক চাই। আশার কথা দর্শক তৈরী হচ্ছে, আরও তৈরী হওয়া দরকার। আর তার ওপর সরকারী কর্তব্য তো আছেই। সে কথা বেশী বলেই বা কি লাভ?

ঋত্বিক ঘটক

সব রকম শিল্প প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জাতের স সঞ্চারিত হয়ে থাকে। সিনেমাতেই ধরা ক না কেন ঃ প্রাথমিক স্তরে শুধু হাসি ন্না সুখ-দুঃখ দিয়ে জীবনের বিচিত্র নকসা ক থাকে। তার একটু ভেতরে ঢুকলে খ যায় রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা- লা খেলা করছে—আরও তলিয়ে দেখার ষ্টা করে যাঁর মন, তিনি দেখেন দর্শনগত শিল্পচেতনার পরিস্ফুট প্রভাব। এই সব রে ভিন্ন রস আস্বাদন করা সকলের পক্ষে মনভাবে সম্ভব নয় এবং সেটা আশাও র যায় না। তবে যার যে স্তরে বিচরণ, নি সে স্তরেই আনন্দ পাবেন, এইটাই ম কিন্তু সত্যিই মহৎ যে-শিল্প, সেটা ব স্তরই ছুঁয়ে যায়। এইখানেই পুজো- র সঙ্গে তার দারুণ মিল। এর ভীরতম দিকটি বুঝতে গেলে কম্পারেটিভ থোলজির সাহায্য দরকার। এ প্রসঙ্গে সেফ ক্যাম্পবেলের 'দি মাস্ক অব গড' রণীয়। এবং এই মিথোলজি দেখায় যে তার ইতিহাস দুরকম মানবচেতনার দ্বের। এক হচ্ছে কর্মযোগীদের চেতনা র এক হচ্ছে ভাবুকের চেতনা। কঠোর হয় কঠিন ও প্রতিক্রিয়াশীল ; কোমল হচ্ছে প্রগতিবাদী, অশান্ত ও চঞ্চল। প্রথম নুষের যে শিল্পকলার নির্দশন আমরা ই, তা হচ্ছে প্যালিওলিথিক যুগের স্পেন ফ্রান্সের মধ্যেকার পিরানীজ পর্বতমালার গুলির ভেতরকার নগ্ন মাতৃকামূর্তি ং এই গ্রেট মাদার সারা পৃথিবীর বিভিন্ন তির চেতনায় আজো হন্ট করছে। এর ই রূপ—এক হচ্ছে বরাভয় আর এক নদাত্রী কালী চণ্ডীর রূপ। আমাদের রাণে এই দেবীকে একত্রে দুইরূপে কল্পনা া হয়েছে 'দেবীসূক্তে'। এবং আমাদের াজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে এই ভাবরূপী **Arche type** টি। বাঙলা শের আগমনী বিজয়ার গান, লোককথার ন্ত গভীর দিকগুলিই এই সাক্ষ্যই বহন ছে।

এই ভূমিকাটি দরকার ছিল এ কারণে যে, ছবি করার পদ্ধতিতে এ ব্যাপারটা ভীষণভাবে এসে পড়ে। এবং এটাই হচ্ছে ছবির সর্বভারতীয় স্তর, যার মানবিক নিক্তিতে কোন ছবির চূড়ান্ত বিচার করতে হবে। **La D'olche Vita** -র সাফল্য কোথায়? রোম্যান ক্যাথলিক সংস্কৃতির খুঁটি ধরে নাড়া দিতে গিয়ে ফেলিনি বারবার **Primordial Arche type** এর সম্মুখীন হয়েছেন। এবং ভারত যেমন স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিতে এসেছে তেমনি মনকে নাড়া দিয়েছে। 'পথের পাঁচালী'র ইন্দিরঠাকুরুণ, ছবিটির কয়েকটি জায়গায় গ্রাম-বাংলার আত্মারূপে প্রতিভাত হতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর ইমেজ-এর ভেতর এই ফোর্স জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই 'পথের পাঁচালী'র ইন্দিরঠাকুরুণকে ভোলা কোন দিনই সম্ভব নয়।

চ্যাপলিন মূর্তিমান মিথলজি। তিনি কোন বিশেষ দেশের বাসিন্দা নন, কিন্তু তাঁর দুর্বল নিষ্পেষিত, অসহায় চেহারায় সমস্ত জীবনের নির্যাস ভরে আছে। মানব-সভ্যতার প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত শ্রেণী-সমাজের সমস্ত বাধার সমস্ত বঞ্চনার প্রতীক হচ্ছেন চ্যাপলিন।

আমার দেশের একটি বিশেষ, মুখর অংশ সহজেই এই যুগে শেকড় হারিয়েছে। এটা একটা তিক্ত বাস্তব ঘটনা এবং এই শেকড়হীন শ্রেণী এখনও কোনো অবলম্বন ধরে উঠতে পারে নি।

আমার কথা হচ্ছে যে, আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা যদি অনুপ্রবেশ না করি, তাহলে কোন জাতীয় শিল্পই গড়ে উঠবে না। এ-দেশে ছবির একটা বিরাট সৃষ্টিশীল ভূমিকা তাড়াতাড়ি আসতে পারে।

'অযান্ত্রিকে'র বিমল **arche type** বলাকী পাগলা তার অ্যাবসার্ড একসটেন-শন এবং নৃত্যপরায়ণ আদিবাসী ওঁরাওরা তার সাবলাইম একস্ট্রিম। পিয়ারা সিং হচ্ছে কঠোর মন—বিমল কোমল মন।

'মেঘে ঢাকা তারা'। উমার সিমবলজি এখানে খুবই পরিষ্কার। নীতা আমার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র। তাকে আমি কল্পনা করেছি শত শত বছরের বাঙালীঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ের প্রতীকরূপে। তার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোতে। তার পাহাড় অর্থাৎ মহাকালের সঙ্গে মিলন হয় মৃত্যুতে। যখন বিদায়ের প্রথম ইংগিত আসে যক্ষার প্রথম আভাসে, তখন কারা যেন বিনিয়ে বিনিয়ে মেনকার বিজয়ার প্রলাপ গাইতে থাকে। অবলুপ্তির আগের মুহূর্তের যে আলোকময় পারিপার্শ্বিক—তার স্বপ্ন দেখে নীতা—ছোটকালের পাহাড়ে উঠে সূর্যোদয় দেখার স্মৃতির মধ্যে দিয়ে।

এবং বিবেকরূপী বংশী দুদী তাই বলে, 'শান্ত মেয়ে, ওর কি অতো চাপ সাজে?'

'কোমল গান্ধার'। শকুন্তলা বাংলাদেশে পরিণত হয় আমার কাছে। রবি ঠাকুরের সেই আশ্চর্য প্রবন্ধটি—শকুন্তলা ও মিরন্দার অপূর্ব তুলনা যেখানে রয়েছে, সেটি আমায় প্রভাবিত করে। চারপাশের যে দ্বিধা, যে ভাঙন, আমি জানি তার মূলে ভাঙা বাংলা।

নিজে পূর্ব বাংলার লোক বলে একথা বলি না। গোটা বাংলার ঐতিহ্যটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করি বলেই একথা জানি, দুই বাংলার মিলন অবশ্যম্ভাবী। তার রাজ-নৈতিক তাৎপর্য আমার হিসেব করার কথা নয়; কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্য আমার কাছে অবধারিত। তাই কোমল গান্ধারের সুর হচ্ছে মিলনের। স্তরের ওপর স্তর দিয়ে, রূপকের ওপর রূপক চালিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যদি কোথাও সেই জীবন

সত্যটিকে ছুঁতে পারি, সে চেষ্টাই ছিলাম।

'সুবর্ণ রেখা'। আমার নায়িকা ছোট্টটি, তখন সে একদিন সুবর্ণরেখা পারে ঘন শালবনের মধ্যে এক বিরাট বিমানবন্দর আবিষ্কার করে। ওর মজা লাগে। ভাঙা এরোপ্লেনগুলো ওর শোনা কথা মনে পড়ে যে, প্লেনে চেপে মার্কিন সাহেবরা রাত্তিরবেলায় কোথায় এক বর্মাদেশ, তার নাম না শহরগুলোর ওপর বোমা ফেলে আস আর এই নীরব ক্লাবঘর, এখানে কত না হত, যখন সাহেবগুলো বোমা ফেলে এইখানে হৈ-হুল্লোড় করত। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল এক বীভৎস মূর্তি। আঁতকে উঠে মেয়েটি আশ্রয় আর এক পথচারী চরিত্রের কোলে। জানলো কালী মূর্তিওয়ালাটি আসলে বহুরূপী—সে ভয় দেখাতে নি, সামনে পড়ে গিয়ে আমার কেমন মনে হয়, মানবসভ্যতা ঐ Terrible Mother Arche-type-image- এর সামনে গেছে। আজ সব সভ্যতার জটিল সমস্যা ঐ Confrontation এর উপ

আমাকে এই ছবি করতে দেওয়া ছিল এই জিনিসের ভিত্তিতে যে ভাই-বোনের ঘরে গিয়ে পৌঁছবে এ মর্মান্তিক দুরবস্থার মধ্যে। ঘটনাটি সত্যি কথা বলতে কি এতই পচা যে এটাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় ছিল। মোপাসাঁ একটি বিখ্যাত গল্পে এটি ব্যবহার করেছেন লেভ টলস্টয় একই জিনিস তাঁর একটি প্রচন্ড বিখ্যাত গল্পে ব্যবহার করেছেন কাজেই সেটিকে আবার আমার নিজের কাজের মধ্যে ব্যবহার করার সময় যথেষ্ট চিন্তা ছিল। তবুও ব্যবহার করা গেল এবং বোধহয় খুব খারাপ একটা ব্যবস্থা হয়নি। ঈশ্বর কলকাতায় এসে প্রথমবারের মত যে কোন বেশ্যাবাড়িতে যেতে পারত কিন্তু আমার ইঙ্গিত হচ্ছে, যে মেয়ের কাছেই যেত, সে তারই নিজের বোন হত সীতা হঠাৎ ঈশ্বরের সামনে পড়ে গিয়েছিল, যার ফলে জিনিসটা একটু মেলোড্রামার দিকে এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঘটনাটা এ সত্ত্বেও একই জায়গায় পৌঁছে যেত। আমাদের দেশে প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে যে সমস্ত মলাটের কথা আমরা পাই তার থেকে বোঝা যায় যে আমাদের জীবনটা ভাঙতে ভাঙতে এই জায়গায় এসে পৌঁছিয়েছে। সেইটাই ইঙ্গিত করার খানিকটা অক্ষম চেষ্টা আমি আমার ছবিতে করেছিলাম।

তার বেশী ব্যাখ্যা করা আমার সাধ্যের বাইরে।

মা বলছিলেন,
আমায় নাকি
দিন-দিনই
কচি দেখাচ্ছে ...
মা তো ছেলের দিক
টেনে কথা কইবেনই!
আসলে কিন্তু নির্মল
আর আমার তারিফ করা
উচিত। তিনি তো জানেন না
ওঁর আদরের ছেলেটিকে
আমিই নির্মল বার সাবানে
কাচা ধবধবে পোশাক
পরিয়ে অমন খোকাটি
ক'রে রেখেছি।
Nirmal
BAR
SOAP
পূর্ব ভারতে বার সাবান
হিসেবে কাটতিতে
সবার উপরে
—সবার সেরা
বলেই।
কুসুম
প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
KPN 4623

নির্মলকুমার ঘোষ (এন্-কে-জি)

তথ্য ও খন্ডচিত্রের কথা

প্রমোদ ও জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর সিনেমা যে নতুন নতুন ক্ষেত্রে সক্রিয় হবার চেষ্টা করবে এটা যে কোন শিল্পবস্তুর অগ্রগতির পক্ষে স্বাভাবিক। পূর্ণাংগ ছবি এদেশে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে হয়ে আসছে, সুতরাং জনজীবনে সিনেমা আজ একটি আবশ্যিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। শুধু স্বীকৃত বললে কম বলা হবে—এর বহুধাবিস্তৃত আবেদন মানুষের কৃষ্টি ও চিন্তাকে প্রত্যক্ষভাবে কতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারে তা আজ আর অস্পষ্ট নেই।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিত্রের দৈর্ঘ্যে যাদের প্রয়োজন বা আগ্রহ নেই তারা নিজের নিজের বিশিষ্ট প্রয়োজনে স্বল্পদীর্ঘ বা সর্ট ফিল্মের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করতে লাগলেন কেমন করে সিনেমার সর্বাত্মক আবেদনকে কত কার্যকরীভাবে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। এমনি করেই সর্ট ফিল্ম বা সামান্য দৈর্ঘ্যের ছবি যার ছড়াছড়ি আজ প্রেক্ষাগৃহে বসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি।

"ছোট" ছবিকে শ্রেণীবদ্ধ করে দেখা যেতে পারে। তিন-চারশো ফুট থেকে আরম্ভ করে দুই বা তিন হাজার ফুট পর্যন্ত ছবিকে স্বল্পদীর্ঘ বা সর্ট ফিল্ম আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। এই সর্ট ফিল্ম বর্তমানে ডকুমেন্টারী ও পাবলিসিটি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কিছু সংখ্যক ফিল্ম অবশ্য তৈরী হয় ছোট গল্পকে বাহন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি সমধর্মী ছবিকে পর পর দেখিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখাতে যে সময় লাগে, সেই সময় কাটিয়ে দেয়া যায় ও হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অবশ্য এ রকম চেষ্টা বেশী হয় নি। সত্যজিৎ রায়ের তিনখানা ছোট ছবি নিয়ে ('পোষ্ট-মাষ্টার', 'মণিহার', 'সমাপ্তি') 'তিন কন্যা'-র পরিবেশন এই শ্রেণীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কয়েক বছর আগে আর একটি চেষ্টা হয়েছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু তার নামধাম মনে নেই।

বর্তমানে যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তোলা ও দেখানো হচ্ছে তা প্রধানতঃ ডকুমেন্টারী ও বিজ্ঞাপনমূলক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। বিজ্ঞাপন-ছবি যা পাবলিসিটি সর্টস্ আজকাল এত বেশী দেখা যাচ্ছে এবং একটি পূর্ণাংগ ছবির প্রদর্শনের আগে বিজ্ঞাপন-ছবির যে বন্যা বয়ে যায় তাতে আর যাই হোক এই শ্রেণীর ছবির সংগে দর্শকের অতি-পরিচিত হতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং এই প্রবন্ধের আওতা থেকে বিজ্ঞাপনমূলক ছবিকে বাদ দিয়ে শিক্ষা ও কৃষ্টির দিক থেকে মূল্যবান যে সব ছবি হয় তাদের সম্বন্ধে আলোচনাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে।

আমেরিকা, সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, ইংলন্ড, জার্মাণী ও ইটালীতে ডকুমেন্টারী বলে পরিগণিত হতে পারে এ রকম ছবি দীর্ঘকাল ধরে হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসন সৃষ্টির পর থেকে তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টারী তোলাটা বেশ জোরদার হয়েছে। তথ্যচিত্রের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা। তাই সিনেমার দিক থেকে অগ্রগণ্য দেশগুলি তথ্যচিত্রকে জনশিক্ষার কাজে বেশ নিপুণভাবে লাগাচ্ছে। ডকুমেন্ট বা দলিল হিসেবে এইসব ছবির দীর্ঘ স্থায়িত্বের প্রশ্নটা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। তবে অনুসন্ধিৎসু দর্শকের জ্ঞান-বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে এই জাতীয় ছবিগুলি যত্নে সুরক্ষিত থাকে এবং বার বার দেখানো যায় তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবেই ডকুমেন্টারী কথাটার তাৎপর্য ও প্রয়োজন দুটোই সার্থক হবে।

কোন্ কোন্ ছবিকে ডকুমেন্টারী বলা যেতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া একটু কন্টকর, কারণ শিক্ষা কথাটার অর্থ বর্তমানে এত ব্যাপক ও গভীর যে এক কথায় শিক্ষামূলক ছবির বর্ণনা দেয়া কঠিন। তাছাড়া পূর্ণাঙ্গ প্রমোদ-চিত্র বা ফিচার ফিল্মও শিক্ষার সংগে সম্পর্কশূন্য নয়। অবশ্য স্বল্প-দীর্ঘ ছবির আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ ছবির কথা ওঠে না। জনশিক্ষার আকার ও প্রকার এত রকম বলেই তথ্যচিত্রকে সঠিকভাবে বর্ণনা যায় না। তবে ইস্পাত কারখানার অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালী, আণবিক গবেষণার অগ্রগতি অথবা পুরাতত্ত্বের দিক থেকে মূল্যবান কোন দেউল বা মন্দিরের চিত্রবর্ণন অথবা দেশের কোন মহাপুরুষের জন্মস্থান বা কর্মক্ষেত্রের বহুমুখী গৌরবকে জনচিন্তার সঙ্গে পরিচিত করবার চেষ্টা যে-সব ছবিতে হচ্ছে এগুলিই যথার্থ তথ্যচিত্র এবং এদের প্রয়োজন আমাদের মত একটি দেশের পক্ষে অত্যন্ত বেশী। ফিল্মস্ ডিভিসন এদিক থেকে বিশ্বস্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ভারত সরকারের জাতীয় উন্নয়নের বহুমুখী প্রচেষ্টার মুকুর হিসেবে ভারতের সংস্কৃতি চিত্রগুলির কথা বলতেই হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থাও এই রকম প্রচেষ্টা করছেন, যে কোন সংস্থার সংগে অবশ্য ভারত সরকার শিল্প বা তথ্য বা অর্থ বিভাগের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

আগেই বলা হয়েছে একটি উন্নয়নশীল দেশের জনসাধারণের পক্ষে তথ্যচিত্র প্রয়োজন কত বেশী। দেশের সংস্কৃতি কৃষ্টি ও জাতীয় সত্ত্বাকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে এত সহজ ও এত কার্যকর মাধ্যম আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। চীন ও পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ করার সময় যে সব প্রামাণ্য-চিত্র তোলা হয়েছিল সেগুলি জাতিকে সংহত করাবার কাজের পক্ষে খুব সহায়ক হয়েছিল। আমাদের তরুণ যোদ্ধারা মাটিতে, জলে, আকাশে শত্রুর মোকাবিলা কেমন করে করছে ও কেমন করে সেই দুরূহ কাজের জন্য তৈরী হচ্ছে তা বিশদ ও অন্তরঙ্গভাবে দেখানো হয়েছিল এই ছবিগুলিতে।

সুতরাং প্রামাণ্য বা তথ্যচিত্রের প্রয়োজন জাতীয় জীবনে বাড়তে থাকবেই এবং সেগুলো তৈরী করতে হবে সেই প্রয়োজনের তাগিদ মেটাবার জন্য। ভারতের আজ অত্যন্ত প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষ করে ডলার, স্টার্লিং ও রুবল। ভারত সরকারের টুরিজম্ বিভাগ বিদেশী পর্যটকদের এদেশে আনবার জন্য আধু

নানারকম মাধ্যমের ব্যবহার করছেন। ভারতবর্ষে যে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করা যায় এবং ভাল আধুনিক রুচিসম্মত হোটেলে থাকার অসুবিধে নেই, এটা ফলাও করে জানাতে হবে বিদেশে। বিশেষ করে ভারত-বর্ষের নৈসর্গিক মহিমা, অতীতৈতিহাসের গরিমা যে কোন দেশের তুলনায় নগণ্য নয়, এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে ওসব দেশে উপযুক্ত তথ্যচিত্রের মধ্য দিয়ে। ভারতের দূতাবাসগুলি এদিক দিয়ে সংযোগের কাজটি নিশ্চয় করতে পারে এবং আশা করি ঐদিক থেকে কাজ হচ্ছেও।

তথ্যচিত্র জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার পরিচায়ক। শুধু সংখ্যায় বেশী হলেই অবশ্য হবে না। তথ্যচিত্রকে অপ্রয়োজনীয় প্রণালীর পথে চালিত করলে কাজ হবে না, শুধু অর্থের অপব্যয় হবে। তাই তথ্যচিত্রের সাবজেক্ট বা বিষয় খুব চিন্তা করে নির্বাচন করতে হবে। যে ছোট-ছবি আমাদের জাতীয় অনুভূতিকে আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন করবে, মনকে নব নব জ্ঞানানুসন্ধানের পথে টেনে নেবে, দেশের অগণিত নরনারীকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে দেবে যে তাদের দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মান ঊর্ধ্বগামী এবং সুখ-সমৃদ্ধির পথ নির্বাধ সেই ছবিই সত্যিকারের ডকুমেন্টারী বা তথ্যচিত্র। আগামী দিনের ভারত নির্ভুলভাবে যথেষ্ট সংখ্যক তথ্যচিত্র তৈরী করে নিশ্চয় প্রমাণ করবে যে জগৎসভায় তার আসন সুনির্দিষ্ট।
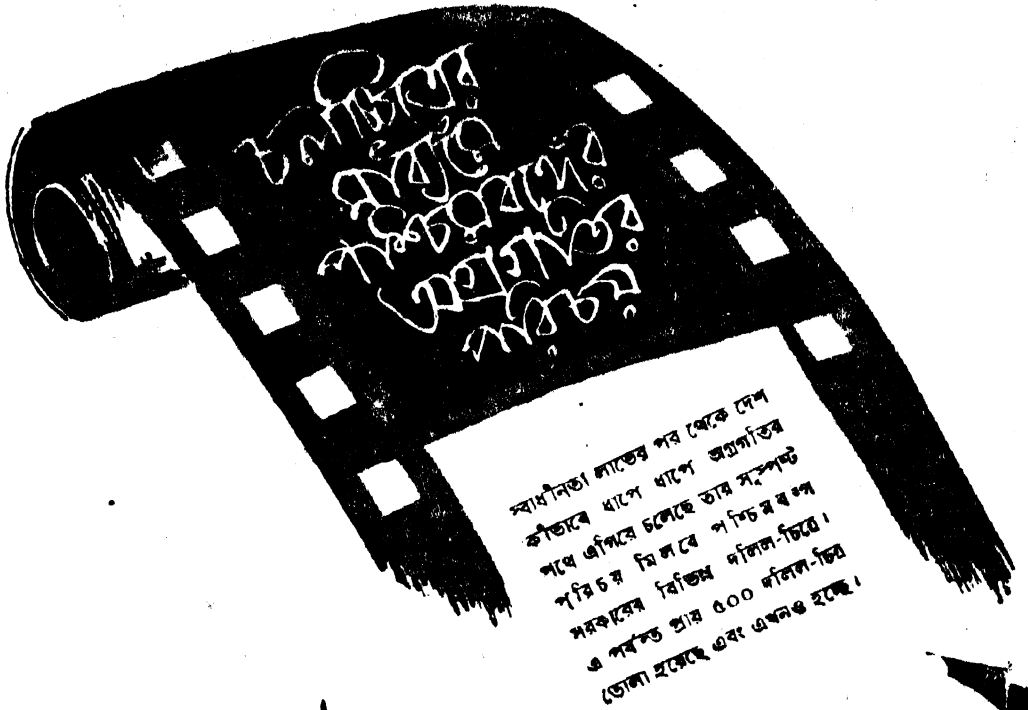
উত্তমকুমার

কোনটা ভালো লাগে—নায়ক চরিত্র না চরিত্রাভিনয়? এ ধরনের কোন প্রশ্ন সত্যি কথা বলতে কি মনেই আসে নি। একের পর এক রোল পেয়েছি। নায়ক, পার্শ্বচরিত্র, সহনায়ক, খলনায়ক সব কিছুই। মনের আনন্দে ছবি করেছি, এখনও করছি। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন এত ছবিতে নায়ক হবার পর আমার ক্লান্তি আসছে কিনা! আমি বলব 'না', কারণ আছে; বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন চরিত্র। আগেকার ছবির সঙ্গে তো আবার এখনকার ছবির ফারাকও অনেক। কোথাও রোমান্টিক, কোথাও সরল সাধাসিধে, কোথাও বা ভারিক্কি চালের। নানা রকম চরিত্রে জাম্প করার ফলেই একঘেয়েমি আসে নি। অবশ্য এটা অনেকটাই সত্যি যে, সাধারণের কাছে আমার ইমেজ রোমান্টিক নায়কের। কিন্তু সত্যিই কি আমি একমাত্র তাই? খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, জতুগৃহ বা মরুতীর্থ হিংলাজ ছবির চরিত্র কি রোমান্টিক?

নায়ক হিসাবে যা ছবি করেছি তার তুলনায় চরিত্রাভিনয় কম। কিন্তু সংখ্যায় তা একেবারে খুব কম নয়। সেই বসু পরিবার থেকে শুরু করে মায়ামৃগ আর গড় নাসিমপুর পর্যন্ত খানকুড়ি ছবি আছে। প্রত্যেকটি ভিন্ন চরিত্র। চরিত্রাভিনয় বা নায়ক চরিত্র কোনোটাতেই বিশেষ কোন দুর্বলতা আমার নেই। থাকলে বিচিত্র ধরনের এত চরিত্র করতাম কি করে? চরিত্র ভালো লাগলেই ছবি করি তা সে যে চরিত্রই হোকনা কেন। তবে যদি দেখি প্রধান ভূমিকা ও পার্শ্ব-চরিত্র দুয়ের মধ্যে যার ছবিতে আবেদন বেশী সে চরিত্রই নেই। গড় নাসিমপুরে মীরজুমলা চরিত্রে যে আকর্ষণীয় ক্লো ছিল বা মায়ামৃগ ছবিতে যে রোমান্টিক প্রকাশ ছিল তা আমাকে আকর্ষণ করেছে—তাই ও চরিত্রগুলো বেছে নিয়েছিলাম। আবার খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে প্রধান চরিত্র হলেও রাইচরণকে ক্যারেকটর অ্যাকটরের মধ্যেই ফেলা যায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ও চরিত্র করে আমি আনন্দ পাই নি, আমি সন্তুষ্টও নই ও চরিত্র করে। দর্শক অভিনয় দেখে যাই বলুন না কেন, আমার সন্তুষ্টি ও ছবিতে আসে নি।

শেষ অঙ্ক ছবিতে ভিলেন-এর রোল করে কিন্তু আনন্দ পেয়েছি; অবশ্য চরিত্রটা আসলে নায়কের। খল নায়কের চরিত্রে এখন আর আগেকার মত কৃত্রিমতা নেই। ধীরাজ-বাবু বা আরও কেউ কেউ যে ধরনের অভিনয় করতেন, আজকের দিনে তা একেবারেই অচল। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা বড় বেশী যেন ড্রামাটিক হয়ে যায়! ও ধরনের অভিনয় একবারে ভালো লাগে না। সময় বদলাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে অনেক কিছুই—এখন আর ও ধরনের অভিনয় চলে কি? শিল্পী যে, তার কাছে চরিত্রাভিনয় নায়ক চরিত্র দুটোর আকর্ষণই সমান। তবে কিনা নির্বাচনের আগে চরিত্রের ডেপথটা দেখা দরকার। রোমান্টিক নায়ক হিসাবে

আমায় অনেকে ধরে থাকেন—এ বিশেষণটাকে অস্বীকার করছি না, তবে অন্য ধরনের চরিত্রও তো আমার ক্রেডিটে আছে। এখন যেসব ছবি করছি তাতেও তো নানা চরিত্র। কোনটা রোমান্টিক, কোনটা আবার তার উল্টো, নানা ধরনের চরিত্র করলেও জীবনী-মূলক কোন ছবি করি নি। একমাত্র 'অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী' ছাড়া। তাও ওটা ঠিক জীবনীমূলক ছবি নয় নিশ্চয়ই। অনেকেই আমাকে এ ব্যাপারে এ ধরনের ছবি করার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বলতে পারি বায়োগ্রাফিক্যাল কোন চরিত্র করার ইচ্ছে আদৌ আমার নেই। কারণ ও ধরনের চরিত্র করতে গেলে অনেক হ্যান্ডি-কাপের মধ্যে যেতে হয়। যেমন ধরুন নেতাজীর জীবনী যদি তোলা হয় — তখন নেতাজীর আচার-আচরণ, ব্যবহারবিধি, রীতিনীতি, তখনকার সমাজের আপস্ অ্যান্ড ডাউনস গুলো বিশেষ করে রপ্ত করতে হবে, নইলে তো চরিত্রকে ঠিকভাবে ফোটানো যাবে না! আমার ও ধরনের কোন বাঁধাধরার মধ্যে যাবার ইচ্ছে নেই।

একটা কথা ঠিক, অভিনেতা যে তাকে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে আইডেন্টিফায়েড হয়ে যেতে হবে; অন্ততপক্ষে অভিনয় করা-কালীন। আমার অভিনয় সবার ভাল লাগে। কিন্তু এই ভালো লাগানোর পেছনে যে কত পরিশ্রম, কত চিন্তা তা অনেকেই ভাবতে পারবেন না। অনেকেরই হয়ত ধারণা সেঞ্চুরী করার পর এখন আর আমাকে নিশ্চয়ই কোন চরিত্র নিয়ে বিশেষ ভাবতে হয় না বা পরিচালকেরাও খুব বেশী নির্দেশও দেন না আমায়। তা কিন্তু মোটেই নয়। আমি খুব মনযোগসহকারে ভাবি প্রত্যেকটা চরিত্রকে, পরিচালকরাও ভাবেন তারপর যা হয় ছবিতে সবাই দেখেন। পার্শ্ব-চরিত্র বা নায়কচরিত্র যাই হোক—দুটোর

অনিল চট্টোপাধ্যায়

ওপরই আমার বিশেষ নজর—নির্দেশকেরও। একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার এই জনপ্রিয়তার অনেকটাই পাওনা পরিচালকদের।

নায়কচরিত্র—পার্শ্বচরিত্র দুই-ই করেছি অনেক, আরও হয়ত করতে হবে। চেষ্টা করেছি, করছি করবও সবায়ের কাছে যে আসন পেয়েছি তার যোগ্য প্রতিদান দিতে।

*

চিত্রজগতে অভিনয়ের যাত্রাপথ আমার চরিত্রাভিনয় দিয়েই শুরু। অনেক পরে শুরু করেছি নায়ক চরিত্রে অভিনয়। সে কারণেই কিনা জানি না চরিত্রাভিনয়ের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা। যেসব ছবি করেছি তার মধ্যে নায়ক চরিত্রর চাইতে বোধহয় ক্যারেক্টার অ্যাকটিংই আমার ক্রেডিটে বেশী। ঐ ছোট ছোট চরিত্রগুলো আমাকে বড় টানে। লৌহকপাট, কালামাটি, কোমল-গান্ধার এখনও কেন জানি না বড় সুন্দর লাগে, মনের কোথায় যেন এখনও রিন-রিন ঠিন-ঠিন করে ওদের সুর বেজে যায়।

প্রথম দিকে একনাগাড়ে চরিত্রাভিনয় যদিও করেছি কিন্তু একঘেয়েমি আসে নি, কারণ চরিত্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ফ্লেবার ছিল, ওই ফ্লেবারই আমার মধ্যেকার শিল্পী-সত্তাকে এগিয়ে নিয়েছে। আবার যখন নায়ক চরিত্র শুরু করলাম, একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন ওরই ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরনের চরিত্রাভিনয় করেছি। ফলে এখনও এক-ঘেয়েমি আসে নি। রোমান্টিক নায়ক হিসাবে নির্জন সৈকতে বা. আহ্বান করলেও সত্যি কথা বলতে কি দর্শকের কাছে বিশেষ ধরনের কোন একটা ইমেজ তৈরী করে রাখতে রাজী নই, যার জন্য এই এক চরিত্র থেকে অপর চরিত্রে জাম্প করা। আমার ধারণা দর্শকের কাছে একটা বিশেষ টাইপ ইমেজ তৈরী করে রাখলে সেখানে পদে পদে শিল্পীকে হোঁচট খেতে হয়। কোন শিল্পী নিশ্চয়ই তা করতে চান না।

এ পর্যন্ত যত ছবিতে নায়ক চরিত্র করেছি সেগুলো একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে একটা জিনিসের ওপর আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। তা হল আমার অভিনীত সব চরিত্রগুলোই বড় কাছের, কল্পনাপ্রসূত বা অবাস্তব কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আড্ডা দিই, লোকের সঙ্গে মিশি খুব, গালগল্প করি। এগুলো আমার চরিত্রকে বাস্তব করে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

তুলতে চেষ্টা করে। ফলে হয় কি চরিত্রগুলো মোটামুটি আমার পরিচিত জগৎ ও অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই গড়া হয়, আর তার ওপর অভিনয় করতে গেলে একটু-আধটু কল্পনার আশ্রয় নিতে তো হয়ই। জতুগৃহের ঐ কেরাণী চরিত্র আমাদের চারপাশে বহু রয়েছে, কোমল গান্ধারের আধ-পাগলা চরিত্রটার দেখা খুব-একটা পাই না বটে কিন্তু ও চরিত্রের ডেপথ ও অনুভূতি আমাদের অপরিচিত নয়। সন্ধ্যাদীপের শিখা, ঘুম ভাঙার গান বা জতুগৃহ একটা ছবি থেকে আরেকটা ছবিতে যান, দেখবেন কি ধরনের ডাইভারসন। আমি এটাই চাই।

কোন্ চরিত্র করে আমি স্যাটিসফাইড, যদি জিজ্ঞেস করেন তখন বিশেষ কোন একটা ছবির নাম করার অসুবিধে আছে। চরিত্রাভিনয়ের কথা ধরলে বলব জতুগৃহ, কালামাটি, অগ্নি সংস্কার, কাঁচের স্বর্গ, কোমল গান্ধার—এ সব চরিত্রগুলোই করে আনন্দ পেয়েছি, ভালো লেগেছে। ঐ ছোট ছোট চরিত্রগুলোর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এমন একটা টেনসন আছে যা ঐ ছবির প্রধান চরিত্রগুলোর চাইতেও বেশী চোখে পড়ে। অবশ্য এ সব ব্যাপারটাই চিত্রনাট্যকারের ওপর নির্ভর করে। চিত্রনাট্য তো ছবির মূল।

তাই কোন চরিত্র নেবার আগে চিত্রনাট্য পড়ে দেখি, যদি মনে হয় চরিত্র আমার উপযোগী, ভালো লাগে তাহলে নিই, আবার যদি চিত্রনাট্যের পরিবর্তনের দরকার হয়, তাও সবাই মিলে বসে আলাপ-আলোচনা করে স্থির করি। নায়ক চরিত্র বা চরিত্রাভিনয় কোন্‌টা নেব সেটা যদিও অনেকাংশে নির্ভর করে আমারই ওপর, তবুও মাঝে মাঝে এমন অবস্থার মধ্যে পড়ি যখন আমার সে স্বাধীনতা কাজে লাগাতে পারি না। বেশীর ভাগই পরিচিত বন্ধু-বান্ধব—তাদের কথাও রাখতে হয় মাঝে মাঝে।

যাই হোক, মোট কথা চরিত্রাভিনয়ের প্রতি আমার যথেষ্ট দুর্বলতা নিয়েও বলব সব সময় সব ধরনের চরিত্র নেওয়াও ঠিক হয়ে ওঠে না, যদিও ইচ্ছে থাকে। কারণ বক্স অফিস বলে একটা কথা আছে, সেখানে আমার যে স্ট্যান্ডার্ড সেখান থেকে পতনের ভয়েই এমনটি করতে হয়। তপনবাবুর নতুন ছবি 'সাগিনা মাহাতো' করছি—এটাও চরিত্রাভিনয়। আরও করব। সত্যজিৎবাবুর 'মহানগর'-এ কাজ করেছি প্রধান চরিত্রে, আবার কাঞ্চনজঙ্ঘায় করেছি চরিত্রাভিনয়। দুটোই আমার কাছে সমান আকর্ষণীয় ছিল। তপনবাবুর কালামাটি, জতুগৃহ, লোহ কপাট সবকটাই ভালো লেগেছে, 'সাগিনা মাহাতো'ও লাগছে। এর পর বাকিটুকু দর্শকের কাছে।

*

চরিত্রাভিনেতা অথবা নায়ক আমি কি হতে চাই এ নিয়ে সত্যি বলতে কি আমার ভেতরে খুব একটা দোটানা বোধ করি না। কারণ আমি নায়কের ভূমিকাতেই অভিনয় করতে ভালোবাসি। তবে বলা ভালো যে, নায়ক বলতে সচরাচর বায়স্কোপে অনেকে যা ভাবেন সে ভাবনাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। নায়ক অথবা চরিত্র এই বাছ-বিচারটা যখনই আসছে তখনই ধরে নিতে হয় এ দুটো জিনিস একসঙ্গে নেই—অর্থাৎ যে ভূমিকায় নায়কত্ব আছে সে ভূমিকা চরিত্রহীন, চরিত্র তাতে নেই। এরকম অনেক বস্তাপচা ধারণা বাংলা দেশে চলে আসছে। সধবার একাদশীর নায়ক নিমচাঁদ, কিন্তু তার কি চরিত্র নেই—নাকি চরিত্রাভিনয় যে অভিনেতা জানে না তাকে দিয়ে নিমচাঁদ হয়? আমি নায়ক হলে নায়কের চরিত্রাভিনয় করতে পারবো না—তাহলে তো অভিনেতা হওয়ারই কোন দরকার নেই। আমি নায়ক চরিত্রের চরিত্রাভিনেতা হতে চাই। তবে দুঃখের বিষয় বেশির ভাগ ছবিতে চরিত্রই প্রায় দেখা যায় না—নায়কের চরিত্র আছে এমন ছবি আরও দুর্লভ। শুধু ন্যাকা-ন্যাকা কথা, বোকা-বোকা হাসি, অবিশ্বাস্য রকমের গুণ-বিভূষিত নায়ক নয়—সত্যিই জীবননাট্যের নায়ক, এমন নায়কের সন্ধান পাওয়া তো বাংলা ছবিতে দুষ্কর হয়ে এসেছে। আর একটা বোকা-বোকা কথা শুনে আসছি রোমান্টিক নায়ক। রোমান্টিক কি — নায়ক কে—এ সম্বন্ধে ধারণা দশ বছর বাংলা ছবিতে কাজ করে প্রায় ঘোলাটে হয়ে এসেছে—আর দশ বছর পরে হয়ত আমিও ভাবতে আরম্ভ করব রোমান্টিক মানে যে, যে খায় না, চাকরি করে না, যার কাশি হলে কষ্ট হয় না, নায়িকার ছাড়া, ঘেন্না হয় এমন কোন অসুখ তার হতেই পারে না (বাংলা ছবির নায়কের কলেরা কেউ শুনেছে!), সে অনেক প্রেম করে, অনেক মেক-আপ করে এবং তার চুল কখনই নষ্ট হয় না।

যাই হোক আমার কি পছন্দ এই প্রশ্নটার জবাব সংক্ষেপে দিতে হলে বলতে পারি আমি সব সময়েই চরিত্র খুঁজি—খারাপ হোক, ভালো হোক, চরিত্র আছে এমন প্রেমিক, এমন শ্রমিক, এমন কেরাণী, এমন রাঁধুনীই আমার ভালো লাগে। কিন্তু আলুনি চরিত্রবর্জিত ভগবানের ভগ্নাংশ ভালোমানুষ আমার ভালো লাগে না। তবু তো মাঝে-মধ্যে এরকম ভূমিকায় অভিনয় করতেই হয়। কবুল করছি সেটা পয়সার

জন্যে। নইলে উপরোধে ঢেঁকি গিলে কিম্বা বলা ভালো এই পেশায় পেশাদার হলে যে দুটো-একটা অপ্রীতিকর (অনেকের কাছে অপরিশুদ্ধও বটে) অবস্থা হজম করতে হয়, তেমনি অবস্থাতেই ছবিগুলো করি। না হলে করতাম না। আমার মনে হয় বেশীর ভাগ অভিনেতাই এই কথা বলবেন। সাধ করে কোন অভিনেতা আর ওই জঘন্য নায়কের পার্টগুলো করতে চান? সবাই চায় যোগেশ কিম্বা নিমচাঁদ, হ্যামলেট কিম্বা ইডিপাস করতে। কিন্তু দিচ্ছে কে? আসল কথা তেমন চরিত্র আজকাল লিখছে কে? লেখক নেই একথাটা যেমন সত্যি তেমনি যাঁরা লিখেছেন কাহিনীগুলো তাঁরা নালিশ করেন যে, আজকের সমাজ আজকের সমস্যা নিয়ে সত্যি সত্যি সিরিয়াস ছবি করলে নাকি চলবে না। কত ভালো গল্প, কত কাহিনী নাকি মফস্বলে চলবে না বলেই ছবি করা যায় না। অতএব এক ফরমুলা—দুই আর দুই-এ চার—এক গল্পই পাঁচ রকম সাজে ছবি হচ্ছে। যেখানে ছবিরই কোন জাত নেই, সেখানে নায়কের চরিত্র থাকবে এটা দাবী করাই অন্যায়। জানি, তাই দাবী করি না। জানি যে, দেশের বেশির ভাগ লোক খেতে পায় না, লেখাপড়া শেখে না, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পায় না সে দেশে ভালো ছবি করা শক্ত। ছবি কেন—আর কোথায় কোনখানে ভালোটা কি হচ্ছে আমাদের দেশে? সাহিত্য গান কোনটা কি হচ্ছে ভাবলেই বুঝতে পারি দেশের সামগ্রিক অবক্ষয়ের বাইরে আমরা কেউই নেই। দেশ যেদিন নড়তে-চড়তে আরম্ভ করবে সেদিন তার সংস্কৃতিও নাড়া খাবে। তাই দাবী করি না। কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেয়াদপ অসন্তুষ্ট বিবেক দাঁত ফোটাতে থাকে। শিল্পীর কি কোন দায়িত্ব নেই, কোন অগ্রণী ভূমিকা নেই। তাই অভিনয়ের জন্য ভালো চরিত্র দাবী করি না—কিন্তু আশা করি, পাব একদিন না একদিন পাবো। সেদিন হয়ত এতদিনের চর্চার, অভ্যাসের পুরস্কার হিসেবে ভালো অভিনয়ের সুযোগ পাবো।

মাধবী মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, চরিত্রাভিনয় বলতে যা বোঝায় তা আমি এখনও করে উঠতে পারিনি। নায়িকা চরিত্রই করে আসছি প্রায় প্রথম থেকে। বাংলা দেশের ছবিতে মোটামুটিভাবে নায়িকা চরিত্রে বিশেষ পরিবর্তন নেই, শুধুমাত্র স্থান-কাল-পাত্র ছাড়া। অবশ্য একঘেয়েমি এসে গেছে একথা বলি না। চরিত্রগুলোর মধ্যে মোটামুটি ডাইভারশান তো আছে। তাই বোরিং ফিল করছি এটা বলতে পারি না: আর তাছাড়া যদি তাই হত তাহলে এত ছবিতে অভিনয়ই তো করতে পারতাম না।

মধ্যবিত্তঘরের বৌ (মহানগর) থেকে শুরু করে রোমাণ্টিক নায়িকা (শঙ্খবেলা) আবার গরীবের মেয়ে (গোধূলি বেলায়) সব ধরনের চরিত্রই প্রায় করেছি। তবে কিনা যে চরিত্র সম্পর্কে আমি একবারে অজ্ঞ তা আমি করতেও চাইছি না, করিও নি—চরিত্রাভিনয় তো নয়ই, নায়িকা চরিত্রও নয়। আমার মনে হয় যদি তা কেউ করতে যান তাতে নিজের শিল্পীসত্তার অবমাননাই হবে বুঝি! নায়িকা চরিত্রই করে আসছি, চরিত্রাভিনয়ের কথা খুব একটা ভাবিও নি। তাছাড়া আমাদের ফিল্মল্যাণ্ডে নায়িকাদের সুযোগই তো বেশী নিজেকে দেখাবার। চরিত্রাভিনেত্রীর সে সুযোগ আছে কি? একনাগাড়ে নায়িকার অফার এসেছে, ছবিও করেছি—চরিত্রাভিনয়ের কথা খুব একটা ভাবিও নি।

তাই বলে চরিত্রাভিনয় যে আমার ভাল লাগে না বা চরিত্রাভিনয় আমি করব না, একথা বলছি না। ভালো চরিত্র এলে নিশ্চয়ই করব। অবশ্য ভালো বলতে আমি বিশেষ কোন চরিত্রের কথা বলছি না—বিশেষ ধরনের কোন দুর্বলতা আমার নেই। আমার তো মনে হয় যদি কারো তা থাকে তাহলে তিনি অন্য ধরনের চরিত্রে বিশেষ মন দিতে পারেন না। এটা অবশ্যই ব্যক্তিগত মত।

চরিত্রের ভালো হওয়া বা মন্দ হওয়া অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট-এর ওপর নির্ভর করে। 'মহানগর'এর স্ক্রিপ্ট যদি অন্য কারো হাতে পড়ত তাহলে আরতি কি ঠিক ওরকম থাকত? কাজেই ভালো চরিত্র বলতে স্ক্রিপ্ট রাইটারের দক্ষতার ওপর বেশী জোর দিই। এমন কাহিনীও হয়তো আছে যেখানে নায়িকা হয়ত শুধুমাত্র নায়িকাই —করার কিছুই নেই, অথচ চরিত্রাভিনেত্রীর প্রাধান্য বেশী, গুরুত্বও। সেখানে যদি আমাকে চরিত্র বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয় স্বাভাবিকভাবেই আমি দ্বিতীয় রোলটাই বেছে নেব।

শিল্পী যখন, তখন নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ যেখানে যে চরিত্রে থাকবে তাই করব। করাই-ই তাই করে বাইশে শ্রাবণ' থেকে শুরু করে 'চারুলতা', 'কাপুরুষ', 'মহানগর', 'সুবর্ণরেখা'—এ সব কটা ছবিতেই কাজ করে নিজেকে ফোটাতে চেয়েছি চরিত্রের মত করে। পেরেছি কিনা জানি না। তবে চেষ্টায় ত্রুটি রাখিনি এটা বলতে পারি। চরিত্রাভিনয় করার সুযোগ এখনও আসে নি। 'থানা থেকে আসছি'তে আমার চরিত্রটা ছোট হলেও নায়িকা চরিত্রই, ওকে ঠিক চরিত্রাভিনেত্রী বলা যায় কি? আমার তো মনে হয় না। সুতরাং চরিত্রাভিনয়ে আমার পছন্দ, অপছন্দ ব্যাপারে বেশী কিছু বলা সম্ভবও নয়।

বিশেষ ধরনের কোন চরিত্রের ওপর আমার আকর্ষণ নেই ঠিক কথা . তবে যা চরিত্র করছি প্রায়ই এর থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য নতুন কোন চরিত্র পেলে ভালো লাগত। এখন যে ছবি হাতে রয়েছে তার মধ্যে 'দিবা রাত্রির কাব্য' ছবির রোলটায় তবুও কিছুটা নতুনত্ব আছে। বেশ আনন্দ পেয়েছি কাজ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বড় সুন্দর চরিত্র 'সুপ্রিয়া'। বিদেশে কি হয় জানি না, আমাদের দেশে এখনও অব্দি নায়ক-নায়িকা-নির্ভর ছবি—পার্শ্ব-চরিত্র পার্শ্বচরিত্রই। গল্পের খাতিরে নেহাৎ যেটুকু দরকার তার চাইতে এক কণাও বেশী নয়। যাই হোক এটা আমার ধারণা যে, কোন শিল্পীর পক্ষে সব ধরনের অভিনয় করার প্রয়োজন আছে। নিজের যোগ্যতা ও শিল্পসত্তাকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করা দরকার। নইলে অবিচার করা হয়।

শিল্পী হতে হলে সবচাইতে প্রথমে যে যোগ্যতার প্রয়োজন সেটি হল নিজেকে কল্পনা ও বাস্তবের মোড়কে মুড়ে যতটা সম্ভব জীবন্ত করে তোলা—এখানেই তো শিল্পীর কৃতিত্ব। একমুখী হলে তা কখনই সম্ভব নয়, বহুমুখী না হোক অন্ততঃ পক্ষে বিভিন্নমুখী হওয়াতো চাই। নিজে চেষ্টা করি সেভাবে কিছু করার। একটানা নায়িকা চরিত্র করছি, যতখানি সম্ভব তার মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের চরিত্র বেছে বিভিন্নমুখী হতে চেষ্টা করছি। চরিত্রাভিনয় করার জন্য যদি কেউ ডাকেন, যদি দেখি তাতে বিশেষত্বও কিছু আছে, করব। ক্যারেক্টার অ্যাক্টিং-এ একটা জিনিস আমি দেখেছি কোনো কোনো ছবিতে চরিত্রের এত গ্র্যাভিটি যা নায়িকারও নেই। ওরকম চরিত্র পেলে করার ইচ্ছে আছে।

মোট কথা নায়িকাই হোক বা চরিত্রাভিনয়ই হোক ভালো চরিত্র পেলে তা করতে সর্বদা প্রস্তুত। এক ধরনের ছবি করতে যদি কিছুমাত্রায় একঘেয়েমি এসেও থাকে তাতে করার কিইবা আছে? শিল্পী আমি সব পরিবেশ, সব চরিত্রকেই মোটামুটি নিজের করে নিতে হচ্ছে।

সন্ধ্যা রায়

প্রথম যখন ফিল্ম লাইনে আসি তখন আমি নেহাতই ছোট, অভিনয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তো দূরে থাক কোন আইডিয়াই ছিল না। অথচ ঐ সময়ের জলজঙ্গল, নাগিনী-কন্যার কাহিনী বা গঙ্গায় যে চরিত্র করেছি তাতে অনেকেই বলেছেন 'খুব ভাল' কাজই নাকি করেছি। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমি ওগুলো অভিনয় করিনি। আপনাআপনিই হয়ে গেছে। একটু খুলেই বলি— যশোরে যে গ্রামে আমার ছোটবেলা ও কৈশোর কেটেছে তার পরিবেশ ঐ গঙ্গা, নাগিনীকন্যার কাহিনীর পটভূমিকার মতই। কঘর মাত্র কায়স্থ থাকতাম। আর বাকি সব তথাকথিত নীচু সম্প্রদায়ের লোক। কাজেই আমার ওঠা-বসা হাঁটা চলা ছেলেদের জেলেদের নৌকো, নদীর খালে বা গাছের ডালেই হত। জন্ম থেকেই মাটির গন্ধ আমার নাকে, মাটির ছোঁয়া আমার গায়ে, মনে। তাই ঐ চরিত্র-গুলো করতে গিয়ে আউটডোরে যখন কাজ করেছি তখন গঙ্গা এবং নৌকো আমাকে যশোরের অতীতে নিয়ে গেছে। আমি ছোট্টটি হয়ে যেতাম। অভিনয় বুঝতাম না। রাজেনবাবু (গঙ্গার পরিচালক) আমাকে যা বলতেন তাই করতাম। আসল কথা তখনকার সবকিছু মধ্যে একটা প্রাণের সাড়া ছিল। ইচ্ছাকৃত নয়, আপনা থেকেই।

'বাঘিনী' পর্যন্ত ঐ ধরনের যতগুলো চরিত্র করেছি, একমাত্র বাঘিনী ছাড়া সব-গুলোই চরিত্রাভিনয় বলা যেতে পারে। 'আগুন'-এর ঐ ছোট্ট যাযাবরী চরিত্র ভয়া-নক ভালো লেগেছে। তবে বাঘিনীর দুর্গা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমার ব্যক্তি-গত জীবনের সঙ্গে ও চরিত্রের টেম্পারা-মেন্টের দিক থেকে মিল আছে অনেক। রামপুরহাটে যেখানে স্যুটিং করছিলাম জায়গাটা বড় ভালো লেগেছিল।

যাই হোক, প্রথমে চরিত্রাভিনয়ের কথা ধরি। গাঁয়ের মেয়ের চরিত্রের ওপর যে আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে তা নয়—তিন অধ্যায় এবং ভ্রান্তি বিলাসের চরিত্র আমার ভালো লেগেছে। নানা ধরনের চরিত্র করার অফার আমার কাছে এলেও সব চরিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয় না আমার পক্ষে। কারণ, নিজেকে ফাঁকি দিতে রাজী নই। তবে হ্যাঁ, আলোর পিপাসায় আমার যা চরিত্র তা কিন্তু মোটেই আমার পরিচিত নয়। কিন্তু বাইজীগান সম্বন্ধে আমার মোটামুটি দখল আছে। আশ-পাশের দেখা, নিজের অভি-জ্ঞতার ছোঁয়া-লাগা চরিত্র করতেই ভালো লাগে। প্রাণের সাড়া পাই তাতে। বাঘিনীতে যেমন পেয়েছিলাম। কিন্তু অন্য ধরনের চরিত্র হলেই অসুবিধে। হিন্দীতে দুটো ছবি মাত্র করেছি। পুজাকে ফুল করার কথা ছিল না—আকস্মিকভাবে হয়ে যায়, আর আসলি-নকলির চরিত্র আমার খুব ভালো লেগেছে। কাজ করে আনন্দও পেয়েছি। পলাতক-এর হিন্দী রাহগীর করছি। তবে কিনা বাংলায় যে একসপ্রেশন সহজ সরল, হিন্দীতে ভাষার কারণেই বোধ হয় তা অনেকাংশে হার্ড।

চরিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে আমি আরেকটা দিকে বিশেষ জোর দিই। আমার তো ধারণা সরলতা বাদ দিয়ে কোন চরিত্র করলে তার অ্যাপীল ঠিকভাবে দর্শকের কাছে পাঠানো যায় না। এখন এই সরলতা বাদ দেওয়ার প্রশ্নে চরিত্র নির্বাচনের কথা ওঠে। আগেই বলেছি কোন বিশেষ ধরনের চরিত্রের ওপর দুর্বলতা আমার নেই। আমার পরি-চিত জগৎ, আমার চিন্তার পরিধির মধ্য থেকেই চরিত্র বেছে নেই। কাজেই চরিত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন আসে না। যেমন—আমাকে যদি কোন হোটেল-নাচিয়ের চরিত্র করতে বলা হয় তা আমি কোন দিনই এ্যাকসেপ্ট করব না। কারণ আমি ও চরিত্রের সঙ্গে এখনও বিশেষ পরিচিত নই। মোট কথা ক্যারেকটার অ্যাকটিং হোক বা হিরোইনের রোল করি, নিজের ওপর এ কতৃত্বটা করি।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি, যদিও কথাটা খুবই স্থূল। বাংলাদেশের দর্শক, পরিচালক, প্রযোজক সবাই-ই চান নায়িকার গ্ল্যামারকে। যার জন্য এখানেই অনেক প্রতিভাবান অভিনেত্রী শুধুমাত্র ঐ গ্ল্যামার-টুকুর অভাবে সরে যাচ্ছেন বা যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা প্রতিভার অপচয়ই বলব। হয়ত আমাকেও একদিন, তাঁদের মত সরে যেতে হবে। দুঃখ তার জন্য নয়, দুঃখ হয় মনের মত কাজ করতে পারা যায় না বলেই।

চরিত্রাভিনয় না নায়িকাচরিত্র—কোনটা করতে বেশী [illegible] লাগে যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে [illegible] দুটোই ভালো লাগে। আর সবচাইতে ভালো লাগে ক্যারেকটার-হিরোইন করতে।

আহ্বান, স্বীপের নাম টিয়ারং, বাঘিনী তিনটের চরিত্রের মধ্যে মূল সুরে কোথায় যেন একটু মিল আছে। এবং শুধু এই তিনটেই নয়, কুমারী মন, গঙ্গা, আগুন—এগুলিও একদিক থেকে কাছাকাছিই মনে হয়। মোটকথা ঐ ধরনের জেলে, বাগ্দী বা সাপুড়ের চরিত্র করতে গিয়ে নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলি। ফেলে আসা অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে। আমি সন্ধ্যা রায় হারিয়ে যাই, তখন দুর্গা গামলী পাঁচি হয়ে যাই। আর, তখন অভিনয় করতে গিয়ে ক্যামেরা কনসাসনেস আমার একটুও ছিল না এটা আগেই বলেছি, সেই জন্যই প্রাণবন্ত লাগত সবাইয়ের। অবশ্য এখন অভিনয় জিনিসটা কি তা বুঝতে শিখেছি। ভাবি মাঝে মাঝে, আগের দোষ-ত্রুটিগুলো শুধরে নিতে চেষ্টা করি। অজিত গাঙ্গুলীর নতুন ছবি 'রূপসী' শুরু করছি। এ ছবির চরিত্র বাঘিনীর চাইতেও ডেয়ারিং, ডেপ্থও আছে।

যাই হোক অভিনয় করছি, করব। পার্শ্বচরিত্র বা নায়িকা যাই হোক।

অঞ্জনা ভৌমিক

নায়িকা চরিত্র চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে শিল্পীর কাছে অভিনয়ের মাপ-কাঠিতে পার্থক্য খুব একটা আছে কি? আমার তো মনে হয় না। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে শিল্পীকে যতখানি একাগ্রতা ও মনযোগ দিতে হয় কোন পার্শ্বচরিত্র করতে গেলেও সেই একই মনযোগ একাগ্রতার প্রয়োজন। তাই নয় কি? তবে পার্থক্য শুধু কাজের সময়ের মধ্যে। চরিত্রের সঙ্গে একভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিতে না পারলে তা যেমন দর্শকের প্রাণে ঠিক লাগে না, তেমনি নিজে করেও সন্তুষ্ট হওয়া যায় না—অন্ততপক্ষে আমার তো তাই ধারণা। অভিনয় পেশা হলেও তার মধ্যে প্রাণের পরশ না থাকলে তাতে আনন্দ কোথায়? নিজেকে ফাঁকি দেওয়া মানে তো নিজের কাছেই ছোট হওয়া।

এ পর্যন্ত করেছি মাত্র খান-সাতেক ছবি—তার ভেতরে আবার দুটোতেই নায়িকা চরিত্র একটায় মাত্র চরিত্রাভিনয়। সুতরাং অভিজ্ঞতাও কম। তবুও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণা থেকেই বলছি একথা-গুলো।

অনুষ্টুপ ছন্দ ছবিতে আমার চরিত্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক সরলতা বা গ্রাম্য ভাব ছিল তা আমার চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতাই বোধ হয়। নায়িকা সংবাদ, রাজদ্রোহীতে আমি যে রকম হাল্কা ধরনের রোমান্টিক চরিত্র করেছি ওগুলো করতে গিয়েও কোথায় যেন মনের মধ্যে বেশ একটু হাল্কা আনন্দও পেয়েছি। স্বাভাবিক ব্যবহারিক জীবনেও আমি যে সিরিয়াসনেস বা গভীরতার অপছন্দ তা না হলেও লঘু আনন্দ আমার একটু বেশী ভালো লাগে। জীবনে সিরিয়াস-নেসের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু রোমান্টিসিজম বাদ দিয়েও তো জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না!

সেইজন্যই বোধহয় ও চরিত্রগুলো আমার ভালো লেগেছিল। এখন শুকসারীতে যে চরিত্র করছি তাও প্রায় একই রকম। 'কখনো মেঘ'এ সীমা ঠিক রোম্যান্টিক চরিত্র না হলেও ঐ হাল্‌কা ভাবটা আছে। গম্ভীর বা ভারিক্কি ধরনের চরিত্র আমি করিনি এখনও। করব না, তা বলতে পারি না, তবে এ-ধরনের চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ কম। তার চাইতে বরং হাল্কা সুরের মধ্যেও যে বেদনার স্বরলিপি আঁকা যায় সে ধরনের চরিত্রই ভালো লাগে। এখনও অব্দি অবশ্য সে ধরনের চরিত্র আমি করতে পারিনি। ইচ্ছে আছে করার। জানি না হয়ে উঠবে কি-না। মাথায় আছে অনেক কিছু। সময় সুযোগমত কাজে লাগাবার ইচ্ছে আছে।

চরিত্রাভিনয় যে ছবিতে করেছি তা হল থানা থেকে আসছি। ছবিটার চরিত্র আমাকে খুব একটা আকর্ষণ করেনি, আর তাছাড়া চরিত্রটার মধ্যেও ডেপ্থও ছিল না বিশেষ, হাল্কা সুরও ছিল না। এদিক থেকে বরং চৌরঙ্গীর ছোট্ট সুজাতা অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লেগেছে। পেশায় এয়ার হোস্টেস সে, চলনে-বলনে সে তাই প্রগল্‌ভ বড়, কিন্তু তার সেই খোলামেলা মনের তারেও যে সুর বেজেছিল তাতে কোনো মিউজিকের স্বরলিপি ছিল না, ছিল বেহাগের ঝঙ্কার। এ-চরিত্রই বেশী ভালো লাগে আমার। মনে আছে কিছুদিন আগে একটা ইংরেজী ছবি দেখেছিলাম কোল-কাতায়। আমার মনটাকে বড় নাড়া দিয়েছিল ছবিটা। প্রধান চরিত্রাভিনেত্রীর অভিনয় যার পর নাই ভালো লেগেছিল আমার। বিশ্বাস করুন, কটা দিন বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম—জানি না কেন! সেই থেকে মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে বাসা বেঁধে আছে—যদি কোনদিন সুযোগ আসে ও ছবির বাংলা চিত্ররূপ করে ঐ চরিত্রে অভিনয় করব।

দিবা রাত্রির কাব্যতে আমার যে চরিত্র তা-ও রোম্যান্টিক, তবুও তারই মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে।

কোন ছবিতে প্রধান চরিত্র নেব কি চরিত্রাভিনয় করব তা পুরোপুরি চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। যদি দেখা যায় দুটো চরিত্রের মধ্যেই সমান কাজের সুযোগ আছে তখন তারই মধ্যে যেটা আমার মনে লাগবে তাই নেব। তবে কিনা নায়িকারা সাধারণত নায়িকা-চরিত্র করার সুযোগ পেলে চরিত্রা-ভিনয় করেন না বলেই আমার ধারণা, যদি না সে চরিত্রের ওপর দুর্বলতা থাকে। আমি তো নায়িকা-চরিত্র পেলে চরিত্রাভিনয় সহজে করব না—তবে ঐ যে বললাম যদি মনোমত কোনো চরিত্র পাই তাহলে অন্য কথা। শিল্পী-জীবন যখন বেছেই নিয়েছি তখন হয়ত অনেক এমন চরিত্র করতে হবে যা আমার ইচ্ছার সঙ্গে হয়ত মিলবে না। তবে সেখানেও মনের সঙ্গে কখন যেন আপোষ হয়ে যায়।

সুতরাং এ মহাশ্বেতা অঞ্জনা কখনো মেঘ দেখে ভয় না করে বরং জীবনে অনুষ্টুপ ছন্দের ঢেউ তুলে শুক-সারীর মত চিরদিনই গান গেয়ে যাবে দিবারাত্রির মহাকাব্যের।

সুকুমার দাশগুপ্ত

প্রযোজকদের, বিশেষ করে বাংলা ত্রের প্রযোজকদের সম্বন্ধে কিছু গেলে মনে আসে যাত্রাদলের রাজার গায়ে চুমকি বসানো ভেলভেটের আছে, ঠোঁটের উপর সুস্পষ্ট ওপর দিকে পাকানো। ভোঁতা তলো- আস্ফালনে মাঝে মাঝে তিনি ঝাড় ডাচ্ছেন, বীর দর্পে আসর প্রকম্পিতও তোলেন। কিন্তু সে ওই অভিনয়ের টা।

রি আসল রূপ দেখতে পাই সাজ- যখন বাবরী চুল খুলে ফেলে তিনি তে মাথা চুলকোতে থাকেন। ছেঁড়া । ছিদ্রপথে হাতপাখার বাঁট চালান পিটুনী মেটাতে, আধপোড়া বিঁড়িটুকু দেশলাই ভিক্ষা করেন।

াসরের রাজা সাজঘরে এসে হাত- করে দাঁড়ান অধিকারীর সামনে। রী আবার একজন নয়, বড়, মেজ, ছোট……অনেক। তাঁদের সবাইয়েরই মেটাতে হয়, ভেলভেটের পোশাকটুকু রাখতে রক্তদান করতে হয় ক্ষেপে- । দর্শকদের কজনেই বা জানে এক গাওনার জন্যে যে টাকাটা যাত্রাপার্টি তার শতকরা চল্লিশ ভাগ পেলেন অধিকারী অর্থাৎ সরকার বাহাদুর। অধিকারী প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা । তিরিশ-ভাগ। পনেরো বিশ ভাগের সেজ অধিকারী পরিবেশকদের। রে ক' টাকা বাকী রইল হিসাব করতে গিয়ে নকল রাজা প্রযোজক আর একবার কানে গোঁজা আধপোড়া বিঁড়ি ধরান।

এ তো গেল সাজঘরের কথা। তার আগে রাজা সাজতে গিয়ে প্রযোজককে অনেক কিছুই ভাবতে হয়। পাড়ি দিতে হয় অসাধ্য-সাধনের দুস্তর সাগরে।

প্রথমেই মনে জাগে কি পালা খোলা হবে? দর্শকদের মন ভেজানোর বীজমন্ত্র কিসে লুকানো আছে? নতুন কিছু সবাই চায়। প্রযোজকরাও চাইবেন বৈ কি। কিন্তু চাইতে গিয়ে যার পেছনে ছোটেন, সেটা অনেক সময় সোনার হরিণ হয়ে দেখা দেয়।

কিন্তু সেটা তো পরে। তার আগে পালার জন্য চাই অভিনেতা-অভিনেত্রী। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখে রঙ চাপিয়ে যারা সাজবেন। তাঁদের 'মান' যত, 'দামও' তত, তবু তাঁদের কাছে ছুটোছুটি করতে হয়। নইলে দর্শকরা বাহবা দেবে না। মেজ অধি- কারী সেজ অধিকারীর মুখ ভার হবে।

থমকে দাঁড়াতে হয় নকল রাজাকে। এক- রাত্রি গাওনা করে যে টাকা মিলবে, তার বেশীর ভাগটাই তো চ'লে যাবে। তবু নকল রাজা আসরে নামলেন; পালা ধরবে বলে মনে হয়। নকল রাজা আসর মাতাবার জন্য সবেমাত্র বীর আস্ফালন শুরু করেছেন; অকস্মাৎ সেজ অধিকারী অর্থাৎ পরিবেশক উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন, 'পরি রণসাজ, ওহে মহারাজ, যাও চলি এবে সমর অংগনে।' রসভঙ্গ হল কি না হল, সেটা ভাববার সাহস বা স্পর্ধাটুকুও প্রযোজকের নেই।

কোনো কোনো পালার এরপর ষাঁড়ের নাকে নস্যি' দিয়ে আসরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবলা ফাটে, বেহালার তার ছেঁড়ে, দস্তুরমত দক্ষযজ্ঞ। যাঁদের ভাগ্য অতখানি মন্দ নয়, তাদের পালা অবশ্য এক সময় শেষ হয়; কিন্তু পাম্প-লাইটের তেল তখন ফুরিয়ে এসেছে। ভোরের আলোয় মুখের মাথা রঙ বড় মলিন, বড় কুৎসিত দেখায়।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। তাহলে যাত্রা- দলের এ রাজা সাজার বাসনা কেন?

এর জবাব এক কথায় হয়তো দেওয়া যাবে না। কেউ বলবেন, ফাটকা খেলার নেশা প্রযোজকের রক্তের মধ্যে। কারণ, চলচ্চিত্র আমাদের দেশে আজও ব্যবসার মর্যাদা পায়নি। আবার কেউ বলবেন অতি লোভ, যে লোভ মানুষকে যুগ যুগ ধরে স্বর্ণখনির সন্ধানে আফ্রিকার গহন অরণ্যে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু সবাইয়েরই কি শুধু লোভ আর নেশা? সৃষ্টির তাগিদে কেউ কেউ কি ছুটে আসেন নি? শিল্পী যে ছবি আঁকেন, ভাস্কর যে মূর্তি গড়েন, কবি যে কাব্য রচনা করেন, সে কি শুধু ব্যবসাদারী বুদ্ধি নিয়ে?

তবে এইসব সৃষ্টিধর্মী প্রযোজকের অপরাধটা কোথায়? কেন তারা নির্বোধ বলে শুধু ব্যঙ্গের পাত্রই হয়ে থাকবেন? এমন এক দিন ছিল, যখন শিল্পী, গায়ক প্রভৃতি স্রষ্টা রাজা মহারাজাদের আশ্রয়েই যত্নে লালিত হ'ত। আজ সে দিন নেই তা জানি; কিন্তু সরকারও কি চোখ বুজেই থাকবেন? এইসব সৃষ্টিধর্মী প্রযোজকের হাতে রক্ষাকবচ আঁটবার জন্যে এগিয়ে আসবেন না? অধিকারীর দল মিলে যে চক্রব্যূহ রচনা করেছেন, তারই মাঝে অভিমন্যুর মতই কি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে? বেরিয়ে আসবার মন্ত্র- গুপ্তিটুকু শেখাবেন না?

আমি শুধু সেই প্রযোজকদের কথাই বললুম—যারা শুধু যাত্রাদলের রাজা সাজতে চায়, পরিবেশকদের হাতে নাচানো পুতুল, নাচের পুতুল নয়।

সমকালীন ছবিতে চিরকালীনতা

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীক কলামতে 'টেনথ মিউস' এই চলচ্চিত্র শিল্পটি সর্বকনিষ্ঠ হয়েও যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তা সে-যুগে যেমন আভাসিত হয়েছে সৃষ্টিধর্মী পরিচালকের মনীষায় তেমনি এ যুগে তা আরও স্পষ্ট অবয়বে হাজির হতে পেরেছে কাল-ধর্মের গুণে। প্রগতিশীল মনন আর সৃজনধর্মী আকৃতি চলচ্চিত্র-আংগিককে এনেছে নবতর সমৃদ্ধি। চলমান দৃশ্য প্রবাহে স্থান ও কালের ব্যবধান অবলোপের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রকে এনে দিয়েছে এমন এক স্বাতন্ত্র্য যা অন্য-কোন শিল্পমাধ্যমে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে কাল তো ঘটনার কাল, ছবির কাল নয়। ছবির কাল ঠিক ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। চলচ্চিত্রকারের মনন ও প্রকাশভংগী সেকালের ঘটনার চিত্ররূপে যেমন এ-কালীন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, আবার একালের ঘটনার উপস্থাপনেও চিরকালীন আবেদন সঞ্চার করতে সক্ষম। অবশ্য প্রতিভাবান সৃষ্টিধর্মী পরিচালকের পক্ষেই এটা সম্ভব, নচেৎ সাধারণ দুর্বল পরিচালকের হাতে ছবির কাল ঘটনার কালকে শুধু অতিক্রমই করতে পারে না তা নয়, ঘটনার কাল সেখানে স্থূল শারীরিক উপস্থিতিতে গন্ডীবদ্ধ হয়ে শুধু আবিলতা সৃষ্টি করে—যা কখনই বাঞ্ছনীয় নয় চলচ্চিত্রের মত শক্তিশালী শিল্পমাধ্যমের পক্ষে।

আধুনিককালের বহিরঙ্গাশ্রয়ী কতকগুলি চিহ্নে চিহ্নিত হলেই ছবি আধুনিক হয়ে ওঠে না। চলচ্চিত্রকারের বাস্তব-বোধ, আধুনিক মনন ও দৃষ্টিভংগী ছবিকে আধুনিক করে তোলে। ফেলে-আসা-দিনের ঘটনার উপস্থাপনেও যদি একালের জীবন-যন্ত্রণা ও যুগ-চেতনার বিশ্লেষণ স্বাক্ষরিত থাকে তবে তাকে সমকালীন ছবি বলতে বাধা থাকে না। আধুনিক জীবনধারার কয়েকটি দিক ছবিতে মুদ্রিত থাকলেই তাকে আধুনিক ছবি বলার সাধারণ রেওয়াজ একটা চালু আছে বটে কিন্তু শুধুমাত্র সেই লক্ষণেই ছবিকে এ-কালীন বলা সঙ্গত নয়, এই কারণে যে, সেখানে বর্তমান যুগ জীবনদর্শনে প্রতিষ্ঠিত নয়। মাথার ওপর হেলিকপ্টার ওড়ালে বা সুসজ্জিত ড্রইংরুমে টেলিভিশন সেট দেখালেই ছবিকে একালের ছবি বলব না, যদি না সেখানে এ যুগের অর্থনীতি সমাজনীতি বা জীবনের মূল্যবোধ পরিচালকের যুগধর্মী চিন্তাধারায় বিশ্লেষিত হয়। পুরোন দিনের ঐতিহাসিক কাহিনীর চিত্রীকরণেও যদি একালের জীবন ভাবনা যুগের মেজাজে প্রতিবিম্বিত হয় নবতর ব্যঞ্জনায় তবে তাকে এ যুগের ছবি বলা চলে নির্দ্বিধায়।

সমকালীন ছবিতে চিরকালীন আবেদন সঞ্চারের নীতি আরও ব্যাপক ও সার্বজনীন। যে ছবির আবেদন সমকালের গন্ডীকে অতিক্রম করে কালাতীত মাহাত্ম্য অর্জন করে বিষয়-বস্তুর নির্বাচন ও প্রকাশ শৈলীর মধ্য দিয়ে, তাকে চিরায়ত সৃষ্টি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু সে-ধরণের ধ্রুপদী সৃষ্টি কোনকালেই সুলভ নয়। চিরন্তন রসে ধন্য ছবির সংখ্যা মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য কারণ যুগোত্তীর্ণ ছবির স্রষ্টা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং সে-ধরণের প্রতিভার পরিচালক সব দেশেই অতি বিরল দৃষ্ট। আর শুধু চলচ্চিত্র বলেই কথা নয়, কলাশিল্পের অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই চিরন্তন সৃষ্টির সংখ্যা অঙ্গুলীমেয়।

এক একটি ছবি আছে যা কোনকালেই 'সেকেলে' বা পুরোন হয়ে যায় না। নতুনের আকর্ষণ সমানভাবে অনুভূত হয়। আবার বিগতদিনের ঘটনা সম্বলিত চিত্র ও নতুন নতুন 'ইনটারপ্রেটেসন' বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগে নতুন রং-এ আকর্ষনীয় হয়ে উঠতে পারে। তবে সেই নব-অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টির অবকাশ থাকা চাই ছবির 'ট্রিট্‌মেন্টে'।

এক একটি ছবির কাহিনীর আবেদন অনাগতকালেও মূল্য হারাবার নয়। চিরন্তন মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ কাহিনীর চিত্ররূপেও যদি প্রকাশসুষমা সমান 'টোনে' যুক্তবেনী রচনা করতে না পারে তবে সেখানে ঘটে বিরাট ছন্দ পতন এবং তখন তা কখনই রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না—যুগোত্তীর্ণ সৃষ্টি তো দূরের কথা। সৃষ্টিকে আগে তো রসোত্তীর্ণ হতে হবে, তবে তো যুগোত্তীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন উঠবে। মোটকথা 'কনটেন্ট' আর 'ফর্ম'-এ 'ক্লাসিক্যাল অ্যাপীল' ফুটে উঠলেই ছবি কালোত্তর সৃষ্টিমহিমায় অন্বিত হতে পারে, নতুবা নয়।

১৯০৫ খৃঃ রুশ নৌ-বিদ্রোহের কাহিনীর চিত্ররূপ দেখা গেল ১৯২৫ খৃঃ 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'-এ। আইজেনস্টাইন এই নির্বাক ছবিটির মাধ্যমে মন্তাজ টেকনিকের নতুন দিগন্ত রচনা করেছেন বলে এর অ্যাকাডেমিক মূল্যই শুধু আছে তাই নয়, এই ছবির মধ্যে বিদ্রোহের যে 'স্পিরিট' শাশ্বত মহিমায় চিরন্তন করে রেখেছেন অসামান্য প্রয়োগ-সাধনায়, তার জন্যেই ছবিটির পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই সমান সমাদর। একটি কালের বিদ্রোহকে আইজেনস্টাইন সর্বকালের বিক্ষোভের প্রতীক হিসেবে যেন নির্দিষ্ট করেছেন নির্বিশেষ ব্যাপ্তিতে। তাইতো এই দশকে এদেশের মাটিতে যখন ১৯০৫ খৃঃ রুশ দেশের বিদ্রোহ দেখি ১৯২৫ খৃঃ-এর 'পোটেমকিন' ছবিতে তখন বিদ্রোহের সার্বজনীন রূপ সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ মনের কোণে জন্ম হয় না। পরন্তু মনে হয় বিদ্রোহের রঙ সর্বত্রই লাল—যেমন রক্তের রঙ। এই যে সার্বিক চেতনার বিস্তার একটি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে—এখানেই চিরকালীনত্বের অধিষ্ঠান!......যতদিন থাকবে বঞ্চনা ও শোষণ ততদিনই থাকবে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ। আর এর অবসান দূরাগত কালেও ঘটবে কিনা একটা প্রশ্ন। তাই শোষিত-পীড়িতের বিক্ষোভের মূল্য আজও শেষ হয়ে যায় নি। আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক' 'অক্টোবর' প্রভৃতি নির্বাক ছবিও তাই আজ সমান আবেদনধর্মী। দেশকালের সীমা অতিক্রম করে ছবিগুলি আজও সমান অনুপ্রেরণা সঞ্চারে সক্ষম শুধুমাত্র চলচ্চিত্রকারের বৈপ্লবিক এষণা আর রসোত্তীর্ণ প্রয়োগ-লালিত্যের কারণে।

চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ' ছবিটিও ১৯২৫ সালের। আমেরিকায় সে সময় যে স্বর্ণলোলুপতা দেখা গিয়েছিল দ্বেষ, হিংসা, ষড়যন্ত্র আর ঘৃণ্য লালসায় তারই চিত্ররূপ 'গোল্ডরাশ'। কিন্তু ছবিতে সেই বিষয়বস্তু যে শিল্পসম্মত যুগোত্তর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে তা একদিকে ছবিকে যেমন করে তুলেছে সমকালীন আবার সংগে সংগে চিরকালীন। মনে রাখতে হবে সমকালীন ছবি হলেই তা চিরকালীন হয়ে ওঠে না। কিন্তু চিরকালীন ছবি মাত্রেই তা সমকালীন। বিগতকালের কোন সমস্যা হয়তো একালেও রঙ বদলে বিরাজ করছে। সেই সমস্যার রূপায়ণ যদি কালোপযোগী করে পরিবেশন করা হয় তবে তাকে সমকালীন আখ্যা দিতে বাধা নেই। কিন্তু বিগত যুগের সেই সমস্যা যদি পরবর্তী-কালের কোন সমস্যাই না হয় এবং সেই বিশেষ সমস্যার মধ্যে সার্বিক আবেদন সঞ্চার সম্ভব না হয়, তবে তাকে চিরকালীন বলা যাবে না কোন যুক্তিতেই। প্রসঙ্গ

...জ্ঞতা, মনন এবং রসাবেদন সৃষ্টির ... বিশেষকালের কোন সমস্যাকে অবশ্য চিরন্তন মাহাত্ম্যে উত্তীর্ণ করতে পারে ... ব্যঞ্জনায়।...'গোল্ডরাশ' ছবিটিতে যে ...লালসা দেখি তা আজও যুগ-মানসে ...সেই উন্দামতা—না থাকলেও তার ...র দাপট আজও শেষ হয়ে যায় নি। ... লোভ কোনদিন শেষ হবে কিনা সন্দেহ। ... ছবির আবেদনও নিঃশেষ হবার নয়। ...তে যে পরশ্রীকাতরতা আর সংঘাত রূপ ... তা যেন মানুষের চিরন্তন ...কেই লঘু পরিহাসে ব্যঙ্গ করেছে। ...টিতে মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম ... চিরকালীন বেদনাবোধে ... এক ... মাত্রা যোজনা করেছে।...... ...লিনের 'মসিয়ে ভার্দু' শুধুমাত্র এক ...হাসিক চরিত্রের জীবনী বর্ণন নয়। ...র দৃষ্টিভঙ্গীই এখানে সৃষ্টিকে নবতর ...নায় মহত্ব দান করেছে। একদিকে যেমন ... একটি ব্যক্তির জীবনে অদম্য লোভ ... যার কারণে পর পর হত্যা করতেও ... নয় আবার শেষে আসামীর ... তার মুখ দিয়েই বলান হয়েছে— ... যাঁরা বিচারকের আসনে তার বিচার ... একক জীবনে গুটি কয়েক হত্যার ... তাঁরা কি বিচার করবেন তাদের যারা ... ঘোষণা করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন- ... আর সম্পত্তি নাশ করছে, শহর, বন্দর ... শ্মশান করে দিচ্ছে? নাকি তাদের ... সমরনায়ক বলে অভিনন্দন জানাবেন ...সিত হয়ে?......একজন ক্রিমিনালের ... এই ধরনের ডায়লগে যে নিদারুণ ... সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে ছবির পর্দায় ... কি চিরকালীন আবেদনে ধন্য হবার ... তাঁর 'লাইম লাইট' ছবিটি তো ...শিল্পীর চিরন্তন বেদনাবোধের এক ...সামান্য দলিল। বিগতকালের খ্যাতিমান ...শিল্পী একালে যেন অপাঙক্তেয়—অচল। ...বীণ বয়সে অবহেলা আর উপেক্ষায় ...শিল্পীর যে মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে ...তীত চারণার মধ্য দিয়ে তার আবেদন ... কোন কালেই ম্লান হবার নয়। ...রাতনকে বিদায় নিতে হবে নতুনকে ...জায়গা ছেড়ে দিতে—এই নির্মম নিয়মের ...কাছে মাথা পেতে নিয়ে শিল্পীর সেই ...টির প্রস্থান—'লাইম লাইট' ছবিটিতে যে ...রসাবেদন সৃষ্টি করেছে তা নিঃসন্দেহে ...চিরন্তন।

১৯৩০ সালের নির্বাক 'আর্থ' ছবিটিতে ...যুদ্ধ বিপ্লবোত্তর যুগের কৃষিসমাজ ও ...র রূপান্তরের সংঘাত রূপ পেয়েছে। ... পরিচালক ডভজেনকোর অসামান্য ...কল্পনায় অতীত বিষয়বস্তুও চিত্রে এক অভিনব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। পুরাতনের সংগে নতুনের যে চিরকালের দ্বন্দ্ব তাই যেন মূর্ত হয়েছে সেকালের কৃষি-বিপ্লবের পটভূমিকায় যুগসন্ধানী দৃষ্টিতে। উন্মত্ত শোকের নগ্ন প্রকাশ যেমন গ্রীক ভাস্কর্যের চিরায়ত শৈলীর সন্ধান এনে দেয় আবার নতুনের জয় ঘোষণায় চিরন্তন সত্যই অভ্রান্ত নির্দেশে প্রকাশ পায়। সংলাপহীন নিঃশব্দ সেই চিত্রে শুধু চলমান দৃশ্য প্রবাহ আর মূক অভিব্যক্তি বোধহয় কিছুটা 'অ্যাবসোলিউট ফিল্ম'-এর আস্বাদও এনে দিতে পেরেছে। সিনেমা যে একদা সাহিত্য নিরপেক্ষ শিল্পমাধ্যম হতে পারে তার আভাস অন্তত সেযুগের ছবিটি দিতে পেরেছে।

পুডভকিনের মহান চিত্রসৃষ্টি 'মাদার' যেমন সর্বকালের অভিনন্দনীয় কীর্তি তেমনি কার্ল ড্রেয়ারের 'প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক' অন্যায়, অবিচার আর কুসংস্কারের জ্বলন্ত প্রতিবাদরূপে সব যুগেই অনির্বাণ শিখায় দীপ্যমান হয়ে থাকবে। সবাকযুগের আর একটি সংলাপহীন ছবি কানেতোশিন্দো পরিচালিত 'দি আইল্যান্ড'। নিরলস পার্বত্যজীবনের সংগ্রাম, হাসি-কান্না, অবহেলা, মূর্ছনা, মূক অভিব্যক্তি ছবিটিতে এক অনাস্বাদিত রসের সঞ্চার করেছে যার আবেদন মূল্য শুধু একালেই নয় সর্বকালেই অপরিসীম।

এ দেশের যুগান্তকারী চলচ্চিত্র প্রতিভা প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ১৯৩৫ সালের 'দেবদাস' ছবিটিতে শুধু সেকালের সমাজ আর সংস্কারের প্রতিফলনই দেখি না, একটি ব্যর্থ প্রেমের হাহাকারই সেখানে বড় কথা যার আবেদনধর্মিতা শুধু সেকালের গণ্ডীতেই আবদ্ধ নয় বরং সর্বকালীন রসাবেদনে সমুত্তীর্ণ। আবার হাহাকারই সেখানে শেষ কথা নয়। একটি পতিতার জীবনে সুস্থ জীবনবোধের সঞ্চার যে ইংগিতধর্মিতায় দেখিয়েছেন চলচ্চিত্রকার রূপালী পর্দায় তার মহতী ব্যঞ্জনা কোনকালেই তুচ্ছ করার নয়। ১৯৩৭ সালের প্রমথেশকৃত 'মুক্তি' চিত্রে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের যে সংঘাত ফুটে উঠেছে পারিবারিক দর্পণে তার অমোঘতা কোনকালের দর্শকই অস্বীকার করতে পারবে না। তাঁর ১৯৩৯ সালের 'অধিকার' চিত্রেও যে বস্তীজীবন আর অভিজাত জীবনের দ্বন্দ্ব রূপায়িত, তার আবেদন তো একালেও অগ্রাহ্য করার নয়। প্রমথেশের 'রজত-জয়ন্তী' ছবিটিও সেই একই বছরে মুক্তিলাভ করে এবং সে ছবিতেও অভিজাতের ঠুনকো অহমিকা যে কতখানি অসার তার নগ্নরূপের পরিচয়, মুখোশের আড়ালে যে মুখ তার সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে যে

রস সৃষ্টি করেছে তার আবেদন তো কোন কালের সীমায় বন্দী হয়ে থাকার নয়।

বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়-কৃত ১৯৫৫ সালের 'পথের পাঁচালী' ছবিটি দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত গ্রাম-বাংলার ঘনিষ্ঠ চিত্ররূপ বলেই সর্বদেশে সমাদর লাভের যোগ্য বলে যেমন বিবেচিত হয়েছে তেমনি হাসি-কান্নায় ভরা গ্রামীণ জীবনের অপরূপ কাব্যগন্ধী চিত্রায়ণ সর্বকালীন রসাবেদনে সমুন্নত হয়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছে সনিষ্ঠ মননশীলতার গুণে। তাঁর 'অপরাজিত' ছবিতেও কিশোর জীবনের সেই অপরাজিত মন, যা শত বিঘ্ন সত্ত্বেও নির্ভীক, দুর্বার—মানুষেরই অপরাজয়ের সেই শাশ্বতরূপ প্রতিবিম্বিত করেছে। সত্যজিতের 'দেবী' সেকালের এক অন্ধ বিশ্বাসের করুণতম শোচনীয় পরিণতির কাহিনীর ছবি। সেই অন্ধ বিশ্বাস বা সংস্কার আজ আর হয়তো নেই। কিন্তু চিত্ররূপে একটি সুস্থ সুন্দর জীবন কেমন করে এক অন্ধ সংস্কারের বলি হয়ে ধীরে ধীরে পাষাণে পরিণত হল এবং রক্ত-মাংসের শরীর তা বরদাস্ত করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে পড়ল তারই মর্মস্পর্শী দৃশ্যপ্রবাহ একালের দর্শককেও স্তম্ভিত না করে পারে না। সেখানে কি-সংস্কার সেটা বড় কথা তেমন নয়—যে কোন সংস্কারই হোক—যার পরিণতি এমন ভয়াবহ তার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহ করে বসবে। অন্ধ সংস্কার আজও তো সমাজের বুক থেকে মুছে যায় নি। 'দেবী'র সেই অমানবিক অন্ধ বিশ্বাস যেন সমাজের যে কোন নিষ্ঠুর কুসংস্কারের প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর 'চারুলতা' ছবি তো চিরন্তন মানবিক আবেদনে ধন্য। আঠার শতকের কাহিনী হলেও দাম্পত্যজীবনের বেদনা, পাওয়া না পাওয়ার সেই চিরকালীন আকুতি, প্রেমের সেই বিচিত্র চিরন্তন গতি ছবিটিকে যে কোন শতাব্দীর মানসে চিহ্নিত করে অসাধারণ প্রয়োগকুশলতার কারণে।

এ যুগের বলিষ্ঠ চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবি আশ্চর্য প্রয়োগ-পারিপাট্যে যেমন রসোত্তীর্ণ, তেমনি যন্ত্রের যন্ত্রণার সংগে মানুষের জীবন যন্ত্রণার এক অদ্ভুত সমীকরণে ছবিটি সর্ব-কালীন আবেদনেও ধন্য। তাঁর 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে একালের জীবন-যন্ত্রণার রক্তাক্ত রূপ ভেসে উঠেছে বিস্ময়কর জীবন-দর্শনের মধ্য দিয়ে। ছবির যে-সমস্যা ট্র্যাজেডির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার গুরুত্ব যেমন আগামী-কালেও হ্রাস পাবার কথা নয়, তেমনি রসাবেদন সৃষ্টির বিচারে ছবিটি সমকালীন হয়েও চিরকালীনতার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত শুধুমাত্র পরিচালকের শিল্পসম্মত, তীক্ষ্ণ, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগীর জন্য।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বস্তুত সূক্ষ্ম বিচারবোধ মানবিকতা ও উন্নত মননের মধ্যে সিনেমাকে প্রতিষ্ঠিত করা ফিল্ম সোসাইটির ব্রত। নানা চলচ্চিত্র উৎসব উদযাপন, নির্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন, আলোচনাচক্র ও ঔপপত্তিক রচনা প্রকাশ করাও এঁদের কর্তব্য।

ফিল্ম সোসাইটির কাজ শুধু ছবি দেখানো নয়। তাদের কাজ যথার্থ ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশান এবং তদনুসারে সাংস্কৃতিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সিনেমা যে সময় যাপনের নামে 'অহিফেন সেবন' নয় একথা আজ ফিল্ম সোসইটির আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণিত।

ভারতে প্রথম ফিল্ম সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালে। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা ছিল মুষ্টিমেয় চিত্রামোদীদের মধ্যে। তাঁদের অনেকেই আজ চলচ্চিত্রজগতে সম্ভাবনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। সে যাই হোক, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলন নামমাত্র প্রচলিত ছিল। ১৯৫৯ সালে আরো ৬টি ফিল্ম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে সেই সংখ্যা ৯২-তে দাঁড়িয়েছে। এটা যে সুলক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। চলচ্চিত্র সম্পর্কে মননশীল পত্র-পত্রিকাও বেরিয়েছে প্রায় পনেরোটি। ১৯৬৬ সালে 'ফিল্ম স্টাডি গ্রুপ' সংগঠনও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাবের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই গবেষণাসংস্থা ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্রামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। বছরে কমপক্ষে ছয়টি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে আলোচ্য ছবির অংশপ্রদর্শন ও তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, প্রস্তাবনা এবং মত-বিনিময় উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রবিদ, শিল্প-রুচিসম্পন্ন পরিচালক, আলোকচিত্রী ও অন্যান্য কলাকুশলীদের সঙ্গে উৎসাহী চলচ্চিত্রামোদীরাও এতে যোগদান করেন। এযাবৎ অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রের মধ্যে 'সিনেমা অ্যাজ অ্যান আর্ট ফর্ম', 'ফিল্ম ল্যাংগুয়েজ', 'সিনারিও' প্রভৃতি শিরোনামায় আলোচনাচক্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, গুরুদাস ভট্টাচার্য, আশিস বর্মণ, হরিসাধন দাশগুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ পরিচালক ও সমালোচক। বর্তমানে ফিল্ম সোসাইটির সদস্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এই ফিল্ম সোসাইটিগুলির কেন্দ্রীয় সংস্থা হল ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া। এর প্রধান কার্যালয় কলকাতায়। তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত (পূর্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) এই সংস্থার কাজ প্রত্যেকটি ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে সংযোগস্থাপন এবং প্রদর্শন। বিভিন্ন ছবি আনবার ব্যবস্থা। বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি উক্ত সংস্থার মাধ্যমেই স্ব-স্ব সংগঠনের সদস্যদের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করে।

ফেডারেশন ছবি আনে প্রধানত বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের মাধ্যমে। দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ফেডারেশনকে কোন ছবি এলে ছবি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জ্ঞাপন করেন (যেমন দৈর্ঘ্য, ফিল্মের মাপ ছবি কতদিন থাকবে, ছবির আখ্যানভাগ, পরিচালক প্রভৃতির নাম এবং অন্যান্য নানা তথ্য)। ফেডারেশন তখন ছবি আনার ব্যবস্থা করে এবং ছবির অবস্থান অনুসারে

ভারতবর্ষের ফিল্ম সোসাইটি ও ফিল্ম ক্লাব সমূহের অবস্থান

নানা ফিল্ম ক্লাবে দেখানোর ব্যবস্থা করে। ফেডারেশনের সভাপতি অবশ্য প্রথমে ছাড়পত্র অনুমোদন করেন। অনেক সময় অনেক ছবি বাতিল হয়েও যায়। এর পরে ভারত সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ছবির আন-সেন্সারর্ড কপি দেখানোর অনুমতি দেন বিভিন্ন ক্লাবে প্রদর্শনের জন্যে।

ফেডারেশনের সভাপতি অবশ্য প্রাথমিক অনুমোদন দান করেন এবং সেটাই মুখ্য। অবশ্য এই অনুমতি কিছুদিনের জন্য। এর পর কনসাুলেট ইচ্ছে করলে ছবি ফিল্ম সেন্সার বোর্ডকে দিয়ে সেন্সার করিয়ে নিয়ে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শন করাতে পারেন বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রেক্ষাগৃহের মাধ্যমে।

ফেডারেশনকে প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটি বার্ষিক চাঁদা দেয়। সেই চাঁদার পরিমাণ সেই সেই সংস্থার সদস্যসংখ্যার উপরে নির্ভর করে। কোন ফিল্ম সোসাইটি প্রত্যেক সদস্যদের কাছ থেকে বছরে চব্বিশ টাকার বেশী চাঁদা নিতে পারে না। ফেডারেশন চলে বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির দেয় চাঁদার উপরে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ১৯৫৯ থেকে শুরু, তাহলেও কি ধরে নিতে হবে যে, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন যথেষ্ট আস্থার সঞ্চার করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া রীতিমত দুরূহ। চলচ্চিত্রকে আজ দু দিক থেকে শিল্পগতভাবে সংরক্ষিত হতে হবে, প্রথমত ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রে উন্নত সিনেমাটোগ্রাফিক টেকনিক প্রবিষ্ট করানো; দ্বিতীয়ত চলচ্চিত্রকে যুগপৎ যুক্তিগ্রাহ্য ও দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলা। ঠিক তা না হলে যথার্থ শিল্পবোধ সঞ্জাত হয় না। ১৯৫৯ সালে ফেডারেশন সংগঠিত হলে তার উদ্দেশ্যকে সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি সূত্রে গ্রহণ করা হয়।

আজকে ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলন শুধুমাত্র ফিল্ম সোসাইটির সদস্যসংখ্যা বাড়াতে সীমাবদ্ধ নয়। এর দায়িত্ব ফিল্ম সোসাইটিগুলির উপরেই বর্তায়। কয়েকটি উৎসব উদ্‌যাপন বা বিদেশী পুস্তক ও পত্রপত্রিকা থেকে না বুঝে চৌর্যবৃত্তির দ্বারা কিছু উদ্দেশ্য-বর্জিত রচনা সাজিয়ে পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে সদর্থে কোন প্রগতিকেন্দ্রিক আন্দোলন কার্যকরী হতে পারে না। আজ বাংলা দেশে ৩৭টি ফিল্ম সোসাইটি রয়েছে। কিন্তু বাংলা দেশের দর্শকদের এক উল্লেখযোগ্য (সংখ্যা কম হলেও) অংশের রুচির উন্নতি ঘটেছে। তারা সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের সংগে বেয়ারগম্যান-ফেলিনি-আন্তোনিয়নি-দার-ত্রুফো প্রভৃতি প্রতিভান্বিত চলচ্চিত্রকারদের সৃষ্টির সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করতে চান। কিন্তু আসল মোহ, 'আনসেন্সরড' কথাটির জন্য যৌনতার দিকে তাদের আকর্ষণ বেশী। ঠিক ছবি দেখে অথবা দ্য বেয়ারফুটেড' দেখার যতটা ব্যগ্র, ততটা নয় 'স্কোয়ার অফ দ সেন্ট এলিজাবেথ' অথবা 'সান ইন দ নেট' দেখতে। এতেই বোঝা যায় যে, রুচিবোধ উন্নতি হয়েছে, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

ফিল্ম সোসাইটির মধ্যে কিছু হাফ-জান্তার আবির্ভাবই সবথেকে মারাত্মক। এরা বিদেশী ছবির আলোচনা গলধঃকরণ না করতে পেরে তার থেকেই না বুঝে এমন সব কথা লেখেন বা বলেন, তার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এক পন্ডিতম্মন্য ব্যক্তি য়োরোপের এক পরিচালক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন একটি পত্রিকায় কিন্তু তার উল্লিখিত একটি ছবিও অদ্যাবধি ভারতে আসে নি এবং সেই অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি কোনদিন ভারতের বাইরে যান নি একথা সত্য। অথচ লিখেছেন এমন যেন ছবিগুলি দেখেই লিখছেন। অবশ্য কিছুটা বিচার করে পড়লে বহু অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। কিন্তু এই যদি আন্দোলনের চরিত্র হয়, তবে তার চেয়ে পরিতাপের আর কিছু হতে পারে না। অবশ্য আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকার চলচ্চিত্র-সমালোচনাও এক বিচিত্র বিষয়। রেস্তোরাঁয়, ক্যাবারে বা বারে দু-একবার আমন্ত্রণ করে বহু নীচুশ্রেণীর ছবি আমাদের দেশের সংবাদপত্রে বা পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন অদ্যাবধি একাজ করে নি। তারা কিছু ভালো কাজ করে নি একথা ঠিক নয়। কিছু পত্র-পত্রিকায় অর্থাৎ কিছু কিছু আলোচনা রীতিমত আশার সঞ্চার করেছে। তার সংখ্যা নগণ্য হোক।

'ফিল্ম স্টাডি গ্রুপ'-এ একাধিক মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি অতি উচ্চাংগের চলচ্চিত্র-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে ফিল্ম সোসাইটিগুলির মুখপত্রে। এ সবই সুলক্ষণ। হয়ত এই কয়টি লক্ষণ আজও বিদ্যমান বলেই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে আজও আশার আলোক থেকে গেছে। এখন কর্তব্য সেই চারাগুলোকেই বাঁচিয়ে রাখা। নিরীক্ষা-মূলক শর্ট যাতে কিছু তোলা হয়, তার মদৎ দেবে এই ফিল্ম সোসাইটিগুলি। আলোচনার মাধ্যমে যে জনসাধারণের রুচি সজাগ করে তোলা যায়, তার সবথেকে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার'। একদা অনাদৃত ও সাংবাদিকদের চক্রান্তে নিন্দিত এই ছবিটি ফিল্ম সোসাইটি-দর্শকদের কাছে অনিবার্য আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে।

পরেশ বসু

চলচ্চিত্রে আলজিরিয়া

বছর কয়েক আগের কথা।

চারদিকে বারুদের গন্ধ। বাতাস ভারী। থমথমে ভাব। তাবৎ বাঘা বাঘা রাজনীতিকের নজর তখন আলজিরিয়ার উপর। নখ-দন্তহীন সিংহের থাবা থেকে মুক্তির লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে। গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে। প্রকাশ্যে আর চোরাগোপ্তা চলল ফরাসী সৈন্যের উপর আক্রমণ। মিলিটারি দেখলেই মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত চনমন করে উঠত, কারা আগুন ছড়িয়ে দিত, দেখা গেল গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা। শত্রুবাহিনীও এর বদলা নিল। চলল অমানুষিক নির্যাতন। পাশবিক অত্যাচারের শিকার হল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই। আলজিরিয়ানের স্বাধীনতার স্বাদ ঘুচিয়ে দিতে চাইল বেয়নেটের মুখে। বয়ে গেল রক্তের স্রোত। অবশেষ স্বাধীন হল। কিন্তু লড়াইয়ের রেশ কাটল না। তাঁদের জীবনের সঙ্গে মিশে রইল সেই সব বিভীষিকার রাত, দুঃস্বপ্নের দিনগুলি।

আজো আলজিরিয়ার কথা ভাবতে গেলে রাজনৈতিক অস্থিরতার দৃশ্যই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে দেশের সাহিত্য শিল্প অর্থাৎ জীবনের সৃষ্টিশীল দিকটার দিকে নজর পড়ে না সহজে। অথচ একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে তাঁরাও নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, আর তার প্রকাশ সর্বত্রই। শুধু সাহিত্য, সঙ্গীতেই নয়, চলচ্চিত্রেও। বরং ছায়াছবির জগতে আলজিরিয়া এনেছে আলোড়ন, দেখিয়েছে তাঁদের লড়াকু জীবনের মহাকাব্য দি ব্যাটল অব আলজিয়ার্স'। অবাক হয়ে গেলেন সিনেমারসিকরা। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ছিনিয়ে নিল সেরা ছবির মর্যাদা। সেটা ১৯৬৬ সালের কথা। প্রসঙ্গত, আগেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, আল-জিরিয়ার ছবির উপর ফরাসী ও ইতালির সিনেমার ছায়া একটু বেশিই লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী ছবির মতো এঁরাও লঙ শটের বদলে মিড আর ক্লোজ শটের অনুরাগী।

সে যাই হোক গত দশকে আলজিরিয়া ফিল্ম ফেডারেশন বেশ কয়েকটি অসাধারণ ছবি তুলে সিনেমা জগতে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। যা অনেকের ভাবনায় আসে নি, তাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন ফরাসী প্রভাবিত এই দেশটির চিন্তাশীল প্রযোজক পরিচালক আর অভিনেতা-অভিনেত্রী। বহু আশঙ্কাই অমূলক বলে প্রমাণ করে দিয়েছে লা বাটাগলিয়া ডি আলজেরি, দি উইন্ড ফ্রম দি অরেস প্রভৃতি নিও-রিয়ালিস্টিক ছবিগুলি। সামাজিক-রাজনীতিক নানান ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হাল-ফিলের আল-জিরিয় ছবিতে এমন এক ধরনের বাস্তব-সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে যা বিশ্বচলচ্চিত্রে তাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ছবিতে যা সহজলভ্য সেই ঠুনকো প্রেমের রম্যকথা, অবিশ্বাস্য খুন-খারাবির গল্প, পলায়নী দৃষ্টি-ভঙ্গী কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না আলজিরিয় চলচ্চিত্রে। বরং ওদেশের পরিচালকরা দাঁড়িয়েছেন নানান সমস্যার মুখোমুখি, আঁকড়া জীবনকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে। দর্শক সন্ধান পেলেন নতুন রিয়্যালিটির। বিশ্ব-বন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে যে ন্যাচারালিস্টিক ইন্ডিভিজুয়ালিটি দেখা যায় তার চেয়ে রেমিনিস্যান্ট 'বাইসাইকেল থিভস' মার্কা নিও-রিয়ালিজম ঢের বেশি সক্রিয় আলজিরিয় সিনেমায়।

স্বাধীন আলজিরিয়ার গোড়ার দিকে অসংখ্য তথ্যমূলক ছবি তোলা হয়। এগুলির ছন্দে ছিল গীতিময়তা, অঙ্গে ছিল সহানুভূতির ছোঁয়া। সবে জন্ম নেওয়া শিশুর মতো এক সমস্যাবহুল দেশের নানা অসুবিধা আর অসঙ্গতির দেখা মিলল গোড়ার দিককার ডকুমেন্টারি ফিল্মগুলিতে। ইতালির পরিচালক ইনো লরেনৎসনির ছবি ল মেনস লিবারে এবং ফরাসী পরিচালক মার্সেলিন লরদান ও জঁ পিয়ের সার্জেন্ট-এর ভোলা আলজারিক আসে জারেই হল সবচেয়ে আলোড়নকারী পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রথম ডকু-মেন্টারি। আলজিরিয়ার সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণে এই ছবি দুটির ভূমিকা সত্যি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশের সীমানা ডিঙিয়ে উপরোক্ত ডকুমেন্টারি ছবি দুটি যথেষ্ট খ্যাতি পেল, বিভিন্ন চলচ্চিত্র-উৎসবে দেখানো হল, আলজিরিয়দের জীবন-জিজ্ঞাসার অনেক কাছাকাছি এলেন অনু-রাগীর দল। ছবি দুটির মান খুবই উঁচু দরের। পিপল অন মার্চ-এও উন্নত মান পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। এটি প্রযোজনা করেন রেনে ভতিয়ের। এই ছবিটিতেই আল-জিরিয়দের শেকল-ভাঙার গান শোনা গেল, স্বাধীন আলজিরিয়ার জন্মযন্ত্রণাও পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের নানা দিকের উপর আলোকপাত করা হল এবং বিবিধ সংকটের মোকাবিলা করবার দুর্বার সংকল্পও প্রকাশ পেল।

ব্যাটল অব আলজিয়ার্স ছবির একটি দৃশ্য

তবে স্বাধীনতা-উত্তর আলজিরিয়ার প্রথম 'বিশিষ্ট' ছবি হল দি উইন্ড ফ্রম দি অরেস। ছবিটির কলা-কুশলী থেকে শুরু করে সব বিভাগেই আলজিরিয়ানরা কাজ করেন। লাখদর হামিনা এর কাহিনীকার ও পরিচালক। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন কেলটুম্ টনিয়া এবং মহম্মদ চার্ত্তাথ। রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আলজিরিয়ানদের কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা-ই মূর্ত হয়ে উঠেছে একটি পরিবারের কাহিনীর ভিতর দিয়ে। শোনা যায়, প্রত্যেক সমালোচকই ছবিটির সরলতা ও আন্তরিকতায় অভিভূত হন এক সময়ে। ঘৃণা কিম্বা খোঁচা লাগানো দুঃখ, আশা, ভালবাসার কোনটাই এখানে বড়ো হয়ে ওঠে নি। মানুষের প্রতি গভীর মমতা আর বিশ্বাসই এর অন্তর্নিহিত সুর। ১৯৬৭ সালে কান চলচ্চিত্র-উৎসবে এটি শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা পেয়েছে, আর ঐ বছরেই মস্কো-উৎসবে লাভ করে সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের পুরস্কার। লাখদার হামিনার আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হল হাসান তেরো। এই বইটি এত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, গোটা ছবি তোলার খরচ আলজিরিয়ায় প্রদর্শিত প্রথম তিন সপ্তাহের প্রদর্শনী থেকেই উঠে আসে। এটি কান-উৎসবে দেখান হয় নি। কারণ কি? কেউ কেউ মনে করেন কান-উৎসব শুরু হবার মধ্যে ছবির কাজ বোধ হয় শেষ হয় নি। আবার অনেকে বলেন, নির্বাচকমণ্ডলীর ফরাসী সদস্যরা এক খোঁচায় ছবিটি অমনোনীত করে দেবেন আশঙ্কায় এটি পাঠানো হয় নি। কেননা, ফরাসী সৈন্যদের নিয়ে বেশ কিছু ঠাট্টা তামাসা করা হয়েছে এ ছবিতে। হামিনার সাম্প্রতিক ছবি দি ব্যাটেল অব এল দজেরি গত তিন বছর ধরে তোলা হচ্ছে। খবরটি দিয়েছেন জনৈক বিশিষ্ট আলজিরিয়ান চিত্র-সমালোচক।

আরো একটি আলজিরিয় ছবি দারুণ সাফল্য লাভ করে। আন্তর্জাতিক সম্মানও পায়। বইটির নাম আগেই উল্লেখ করেছি! দি ব্যাটল অব আলজিয়ার্স। এটি আলজেরো-ইতালিয় কো-প্রোডাকশনের ছবি। পরিচালনা করেন পনটিকরভো। ছবিটির স্টাইলে বেশ কিছুটা ডকুমেন্টারি ফিল্মের ছোঁয়া আছে। মাত্র কয়েক দিন আগে কলকাতায় ছবিটি দেখানো হয়। ব্যাটল অব আলজিয়ার্স হচ্ছে আলজিরিয়ানদের স্বাধীনতাসংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের চিত্রভাষ্য। একজন ফরাসী অভিনেতা ছাড়া আর কোন অভিনেতাই ঠিক পেশাদার নন। ছবিটিতে কোনরকম পলিটিক্যাল ক্যারিকেচার করা হয় নি। ফরাসী সৈন্যদের প্রতিও অযথা বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের হুল ফোটানো হয় নি। বলতে ভুলে গেছি যে, ফরাসী অভিনেতাটি আলজিরিয়ায় অবস্থিত ফরাসী বাহিনীর কমাণ্ডারের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

আলজেরো-ইতালিয় সহপ্রযোজনায় আর একটি অবিস্মরণীয় ছবি হল ল' এটরেঞ্জার। আলবেয়র কামুর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই ছবির পরিচালনা করেন ভিসকনতি এবং নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন খ্যাতনামা অভিনেতা মার্সেল্লো মাস্ত্রয়ানি। গোটা চিত্রটাই আলজিরিয় পরিবেশে তোলা হয়। ফরাসী অভিনেতা জ্যাকুইস চার্ব প্রযোজনা করেন উনে সি জেনে পেইন ছবিটি। এটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র। ১৯৬৬ সালের মস্কো-ফেস্টিভ্যালে আলজিরিয়ার সমস্যাবলী ও তার জীবনযাত্রা এ ছবির ভেতর দিয়ে নিপুণভাবে ফুটে ওঠে। একথা আজ আর কারো অজানা নয় যে, কয়েক বছর আগেও আলজিরিয়া ছিল বিশ্ব-রাজনীতির ঝটিকাকেন্দ্র। আত্মদানের বিনিময়েই তাঁরা স্বাধীনতা লাভ করেছেন। কিন্তু সেই সব ভয়ঙ্কর দিনের স্মৃতি আজো তাঁদের শিরায় শিরায় যন্ত্রণা ছড়িয়ে দেয়, জিভটা বিস্বাদ ঠেকে। সেই সব দুঃস্বপ্নের রাত আলজিরিয় ছবির পটভূমিতে সক্রিয়। যুদ্ধের সময় বহু আলজিরিয়ান ও ফরাসী ছেলেমেয়েরা মা-বাবা হারায়। পঙ্গু বিকলাঙ্গের সংখ্যাও নেহাত কম হল না। ভয়াবহ সঙ্ঘর্ষের শিকার হল সকলেই। এই সব অনাথ, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ, ক্ষতবিক্ষত কিশোর-কিশোরী শিশুর দল আশ্রয় পায় অনাথ আশ্রমে। সেখানে ফরাসী ও আলজিরিয়ান উভয়েই বাঁচবার স্বপ্ন দেখছে, আর মাঝে মাঝে ধিক্কার জানাচ্ছে সময়, সমাজ আর সভ্যতার মুখোশধারী রাষ্ট্রনায়কদের। এই দুরূহ অথচ অশ্রু-সজল সত্য ঘটনা নিয়েই গড়ে উঠেছে উনে সি জেনে পেইন। প্রখ্যাত সিনেমা-সমালোচক এ্যালা ক্যানার ভাষায়, 'সেন্টিমেন্টাল ও মেলোড্রামাটিক হবার সবরকম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ছবিটি আশ্চর্যভাবে এর সংক্রমণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে হয়ে উঠেছে অনন্যসাধারণ। মানবিকতার অনিন্দ্য প্রকাশ।'

সম্প্রতি কালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হল লা আবে দস দামনেস। পরিচালনা করেন আমেদ রাচেডি। নানান দেশে বিভিন্ন যুগে যে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী লড়াই হয়েছে তা-ই মুখ্য এই ছবিটিতে। সামাজিক কাঠামো বদলের সম্ভাবনা ও বিশ্বাসকেই চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে। বিপ্লবের ঝাঁঝ রয়েছে সর্বত্র। এ ছবিটি সম্পর্কেও জনৈক সমালোচকের মন্তব্য 'আফ্রিকার ইতিহাসের পঞ্চাশ বছরের নানা ঘটনাই যেন অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিরাট লম্বা মিছিলের মতো এগিয়ে চলেছে।' মুস্তাফা বেইদির লা ন্যুট অ পেরদ্যু সলসিল মুক্তি পায় গত বছরের মার্চ মাসে। বিশিষ্ট জাতি হিসেবে আলজিরিয়দের স্বাতন্ত্র্য লাভের ইতিহাসই বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরা হয়। এটিও নাকি পুরোপুরি আজিরিয়ানদের তৈরি। বলাবাহুল্য, এদিক থেকে এটি দ্বিতীয় আলজিরিয় ছবি। লা ন্যুট অ পেরদ্যু সলসিল অন্য কারণেও উল্লেখের দাবি রাখে। সিনেমাস্কোপে নির্মিত প্রথম আলজিরিয় ছবি হিসেবে এটি পথিকৃতের সম্মান পাবে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সালের অস্থির পটভূমি বিভিন্ন ছবিতে কিছু কিছু ছায়া ফেলে। প্রোলগ, দি ল্যান্ড ওয়াজ পোর্চড, দি চেক অব প্রিজন, দি স্টোরি অব সলসা, দি স্টোরি অব ফতমা এবং এপিলগ তার মধ্যে উল্লেখ্য। মুস্তাফা বেইদির ছবিতে জীবনের নানামুখী দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উৎপীড়ন ধরা পড়ে। সমাজ-বাস্তবতার তিনি অনুরাগী।

আর সম্প্রতি আলজিরিয়ায় মুক্তি পায় এল ভেন। একটি ইন্টারনমেন্ট ক্যাম্পের ভেতরকার কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে এতে। অসংখ্য ছোটখাটো রাষ্ট্রের মতো বহু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে অবস্থান করছে। অনেকটা উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনীর অবস্থান। বন্দীজীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা, আশা-নিরাশা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এই ছবির কেন্দ্রভাব। ছবির পরিচালক স্লিম রিয়াদ নিজেই ছিলেন ২০০০০০ জন বন্দীর একজন। 'এই চিত্রে খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তিনি তাঁর সহযোদ্ধা ও বন্দীদের বিশ্বাস, অনুভূতিকে রূপায়িত করেছেন। পরিচালক তাঁর নিজস্ব রাজনীতি চেতনাকে সর্বত্র বজায় রেখেছেন। ছবির শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মহম্মদ ইসিআখেম এবং সংলাপ রচনা করেন তরুণ লেখক মখনাচি ভজামেল।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র লা অকসটেভেলের প্রথম পর্ব ১৯৬৭ সালেই শেষ করেন মহম্মদ বওরাম। ছবিটিকে অনেকেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিত্র বলে অভিহিত করেছেন। সমাজে মেয়েদের ভূমিকা কি, পুরুষদের প্রতি তাদের মাথায় যে এক ধরনের গজিয়ে-ওঠা আনুগত্য বোধ রয়েছে তার শিকড় কোথায় এবং কতদূর ছড়ানো, পুরুষদের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কি হওয়া দরকার—এরকম জটিল মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠেছে ছবিটি। এটিতে ডকুমেন্টারি, সাংবাদিকতা ও কাহিনী চিত্রের ককটেল-স্বাদ পাওয়া যাবে। মহম্মদ বওরাম এক সময় সহকারী পরিচালক হিসেবে আহমেদ রাচেডির স আবু ডেস ডামেনস এবং ল্যাখদার হামিনার লা ভেন্ত দস অরেস-এ কাজ করেন। মহম্মদ বওরাম বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, ছবির আঙ্গিক তার বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ফর্ম কোন স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়। ইতালির নিও-রিয়ালিজম আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। সমসাময়িক ব্রাজিলের প্রযোজকরাও এই পাঠ দেন। আলজিরিয়ায় আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তববোধ নিয়েই কাজ শুরু করি ও তারপর নিজস্ব ভঙ্গিতেই তা প্রকাশের চেষ্টা করব। সিনেমাটোগ্রাফি সম্পর্কে আমাদের ধারণাই ধীরে ধীরে আলজিরিয়-রীতি প্রতিষ্ঠা করবে, কালে কালে তা সার্থকও হয়ে উঠবে। মনে হয়, আমেরিকা বা অন্য বহু ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, সেরকম এক জাতের অস্বাভাবিক ভাবনা ঘোরে ছবি তৈরির মূলে। আমরা নিজেদের কথা নিজেদের মতোই বলবার চেষ্টা করছি।

যাই হোক, ইতালিয়দের সহযোগিতায় আলজিরিয়রা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পেয়ে গেছেন দাঁড়ানোর মতো শক্ত মাটি। আর এর জন্যে তাঁদের চিন্তা-ভাবনারও অন্ত নেই। তবে মনে রাখা দরকার, তাঁরা নিজস্ব রীতি গড়ে তুলতে ঢের বেশি আগ্রহী হলেও বিদেশী সাহায্যের দরজা বন্ধ করে দেন নি, এবং সে ঝোঁকও মাথাচাড়া দেয় নি। ফলে শুধু ইতালিয়দের কাছ থেকেই নয়, যুগোশ্লাভিয়া থেকেও নানান রসদ সংগ্রহ করছেন। সেখানে ইতিমধ্যে সিনেমাটোগ্রাফিক সেন্টার, একটি নতুন স্থাপিত হয়েছে। আর এমনি করেই বিশ্বের দরবারে আলজিরিয় সিনেমা শিল্প নিজস্ব আসন তৈরি করে নিয়েছে।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কম্বোডিয়ার মহামান্য সামদেশ প্রিয়াহ্ নরোদম সিহানুক!

অনেক খ্যাতির অধিকারী তিনি। তার অনেক গুণ। বাইজী রাখেন নি তিনি রাজসভায়। জলসাঘরে নেই ঢালাও মদ্যপানের আয়োজন। গুণী পোষণের নামে রাখেন নি সভাকবি। আধুনিককালে এসব অচল।

কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন উৎসাহের সঙ্গে। রাজ্য চালাতে হয় বলে রাজনীতি করেন। তার বাইরে তিনি রসিক মানুষ। দেশের লোককে খুশি করতে চান। আনন্দ পেতে চান তিনি নিজেও। কম্বোডিয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রযোজকদের মধ্যে তিনিও অন্যতম পুরুষ।

মাত্র কয়েক দিন আগের কথা।

কম্বোডিয়ায় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের একটি উৎসব হয়ে গেলো। সিহানুক ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তেইশটি উল্লেখযোগ্য ছবি দেখানো হয় প্রদর্শনীতে। এ উপলক্ষে তার দুটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবিও দেখানো হয়। ছবি দুটির নাম—যথাক্রমে 'শ্যাডো ওভার দি অ্যাংকোর' এবং 'দি লিটল প্রিন্স'।

'শ্যাডো'র উদ্বোধন হয় নমপেন-এ। তার মধ্য দিয়েই উৎসবের সূত্রপাত। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি চিত্রগৃহে উপস্থিত। সকলেই অপেক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে। পর্দা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। রূপোলী পর্দার বুকে ভেসে উঠলো কয়েকটি নাম :

প্রযোজক : নরোদম সিহানুক
পরিচালক : নরোদম সিহানুক
চিত্র নাট্যকার : নরোদম সিহানুক
সংলাপ : নরোদম সিহানুক
সঙ্গীত : নরোদম সিহানুক

সকলেই বিস্মিত! বিশেষ করে তার দেশের মানুষ।

কম্বোডিয়া-বিরোধী গুপ্তচরের কার্যকলাপ নিয়ে ছবিটির কাহিনী গড়ে উঠেছে। সিহানুক নিজে তার নায়ক। প্রথম দৃশ্যটি মনোরম।

অভিনেতা সিহানুক দাঁড়িয়ে আছেন বিমানবন্দরে। একজন লাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আসবেন। তারই জন্য তার দীর্ঘপ্রতীক্ষা। তিনি আবার পুরুষ নন। নারী। সুন্দরী। এবং ভুবনমোহিনী তার রূপ।

সিহানুকের অর্ধ-কম্বোডিয়ান এবং অর্ধ-ইতালীয় স্ত্রী প্রিন্সেস মনিক অভিনয় করেন সুন্দরী রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায়।

দিন যায়।

উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

আর সেই সময়েই বজ্রপাত। নায়ক জানতে পারেন তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে ভেতরে ভেতরে। তার রাজ্যের কিছুটা অংশ হাতছাড়া হবার উপক্রম। মনে মনে তিনি আঘাত পান। বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছেন তিনি। ভালোবাসা লাঞ্ছিত হয়েছে গোপন ষড়যন্ত্রে।

ছবিটির মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ। অনেকেই গুপ্তচর সংস্থার লোক। তাদের মধ্যে আছে একজন দুর্নীতিপরায়ণ জেনারেল এবং রাষ্ট্রদূতের ল্যাটিন সহকারী।

নায়ক বোঝাতে চান, তিনি নিরপেক্ষ। নায়িকার মনে প্রেমের ছোঁয়া লাগে। ভালো লাগে নায়ককে। তার আন্তরিকতায় কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

এমন সময় গুপ্তচরের দল ধরা পড়ে একটি বেতারযন্ত্রসহ। এই দলের সঙ্গে নায়িকার গভীর যোগাযোগ। তাদের তোরঙ্গ-ভর্তি সোনাদানা। হয়তো প্রথম দিকে সে নায়কের সর্বনাশ করতেই চেয়েছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার মন ঝুঁকেছিল নায়কের দিকেই। তখন তার উপায় নেই। নিজের দোষকে অস্বীকার করতে পারছে না কোনক্রমে। ফলে সমস্ত কিছুই বানচাল হয়ে যায়।

সুন্দরী রাষ্ট্রদূতকেও চলে যেতে হল দেশ ছেড়ে।

উপসংহারে ঘটনাটি হৃদয়স্পর্শী।

বিমানবন্দরে নায়ক এসেছে নায়িকাকে বিদায় দিতে। তার মন দুঃখভারাক্রান্ত। তাকে ছেড়ে দিতে মন চায় না। ধরে রাখবারও উপায় নেই।

উপরে নক্ষত্রখচিত মহাকাশ। তারই বুকে পাড়ি জমায় নায়িকা। রুপোলি পাখির মতো একটি বিমান তাকে নিয়ে উড়ে যায়। দুঃখ ও বেদনার ছায়া পড়ে নায়কের মুখে। বিমানবন্দরের সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তার সমস্ত শরীরে বিষাদ।

এই প্রথম সে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। অনেকের মধ্যে থেকেও সে যেন একা। তার কথা সে বোঝাতে পারছে না কাউকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব [illegible] পশ্চিম য়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই [illegible] গুপ্তচর কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত হয়ে[illegible] ইদানীংকালে এরূপ আর কোন দ্বিতীয় [illegible] চোখে পড়েনি।

চলচ্চিত্র উৎসবে যেসব ছবি দেখানো হয়—তাদের প্রত্যেকটিই প্রেম কিংবা অন্য কোনো সামাজিক ঘটনা নিয়ে লেখা।

সিহানুকের অপর ছবি—'দি লিটল প্রিন্স'-এর কাহিনীভাগ বেশ সুন্দর। রাজপরিবারে নানা ঘটনা নিয়ে ছবিটি তোলা।

পিতার মৃত্যুর পর আশা করা যায় রাজকুমার দেশের সিংহাসনে আরোহণ করবেন। কিন্তু সহজে তা হবার নয়। নানা রকমের বাধা-বিপত্তি আসতে থাকে। তার প্রতিবন্ধক কাকীমা এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গের দল।

সকলেই চেষ্টা করতে থাকে তার সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে।

সাধারণ গল্প-কাহিনীর মতোই এ[illegible] বাস্তব ঘটনাগুলিও উপভোগ্য। অবশেষে রাজকুমার তার ন্যায্য উত্তরাধিকার পান।

ছোট্ট রাজকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করেন সিহানুকের ছেলে নরোদম সিহামনি[illegible]

এবং আগের ছবির মতো এরও টাই[illegible] টেল অংশে দেখা যায় সিহানুকের নাম[illegible] প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার...... সিহানুক! ধ্রুপদী কিংবা জনপ্রিয় শিল্পী[illegible] দল এতে অংশগ্রহণ করেন নি। দক্ষিণ-পূ[illegible] এশিয়ার একটি বিশেষ রাজপরিবারে[illegible] কাহিনী হলেও অদ্ভুত তাজা স্বাদ পাও[illegible] যায় এর পরিবেশনে।

সিহানুক এ পর্যন্ত মোট আটটি পূ[illegible] দৈর্ঘ্য ছবি করেছেন। ছটি ছবি পু[illegible] পেয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসবে 'রয়েল কর্টে[illegible]' নামে একটি দলিলচিত্রও দেখানো হ[illegible] এটিও সিহানুকের একটি সুন্দর অবদান[illegible]

উৎসব-শেষে বিচারকদের রায় ঘোষ[illegible] করা হয়।

পুরস্কার পেয়েছেন জাপান, উ[illegible] ভিয়েতনাম, ক্যানাডা আর ন্যাশনেল লি[illegible]রেশন ফ্রন্ট।

এবং গ্রান্ড-প্রাইজ দেওয়া হলো 'লিটল প্রিন্স'কে—যার পরিচালক, প্র[illegible]জক ও কাহিনীকার......মহামান্য সামদেশ প্রিয়াহ্ নরোদম সিহানুক...।

— শম্ভু মিত্র

…শনাল থিয়েটার' কথাটা আমি …শুনি শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর …তার পূর্বে হয়তো এক আধ জায়গায় …কতে পারি ইংরেজিতে, কিন্তু সে …র্থ কোনো সম্যক বোধ হয়নি। মনে …হ ওটা একটা বিলিতি ব্যাপার। শ্রীশিশিরকুমারের মুখে যখন শুনলাম …কথাটা একটা রূপ পেল প্রথম।

…র মুখেই শুনেছি যে দেশবন্ধু …ন দাশ তাঁকে একটা 'ন্যাশনাল …রি করে দেবেন বলেছিলেন দার্জিলিং …র আগে। কিন্তু দার্জিলিংএ দেশবন্ধু …ন এবং আজও পর্যন্ত বাংলাদেশ …জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী করতে পারেনি। চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো ছোট্ট …দেশ পরাধীন অবস্থাতেই একটা …ই নাট্যমন্দির তৈরি করেছিল সাধারণের …।

…মাদেরই দেশে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী …ক্ষ্য করে অনেকগুলো নাট্যগৃহ তৈরী …সরকারি অর্থে। তার বেশীর ভাগই …। যে-সমস্ত সরকারী দপ্তর থেকে …নাট্যগৃহগুলো নির্মিত হয়েছে তাঁরা …র মঞ্চপ্রচেষ্টার কোনো সংবাদ রাখেন …মনে হয়নি। যাই হোক, তবু কলকাতায় …শুনেছিলাম এবং এখনও শুনি যে রবীন্দ্রসদনটি জাতীয় নাট্যশালারূপে …ত হবে।

…ভাবেই বোঝা দরকার যে 'ন্যাশনাল …টার' মাত্র একটি নাট্যমঞ্চ কিনা। আশা …বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করেন …ন্যাশনাল থিয়েটার' কেবলমাত্র থিয়েটার- …নয়, বরঞ্চ এমন একটা নাট্যশালা …উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আছে। …একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। …ও অনেক লোকের ইচ্ছে যে একটা ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরী হোক, এবং তার জন্যে একসময়ে সরকারি দপ্তর থেকে কিছুটা উদ্যোগও হয়েছিল। যদিও এখনো সেটা হয়নি, তবু যে কোনোদিন সেটা কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে তৈরী হয়ে যেতে পারে। এবং তৈরী হতে আরম্ভ করলেই কিন্তু তারই নাম হবে ভারতবর্ষের 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। তখন কলকাতার রবীন্দ্রসদন কি বাংলা ন্যাশনাল থিয়েটার হবে? অর্থাৎ বাঙালী কি তখন আলাদা জাতি হবে? যেমন রাজ-নৈতিক শ্লোগানে মুসলমান পৃথক জাতি বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল?

দিল্লীতে বহু লোক ভাবেন যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' তো দেশে মাত্র একটাই হতে পারে, যেমন ইংলণ্ডে আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের চেয়ে আয়তনে বড়ো এবং ইউরোপ যদি একটা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হোত তাহলে যেমন তার একটি মাত্র ন্যাশনাল থিয়েটার হ'তে পারতো না, তেমনি ভারতেও কেবলমাত্র দিল্লীতে একটা নাট্যশালা নির্মাণ করে তাকে ন্যাশনাল নাম দিলেই বোধহয় সেটা সত্যিই ন্যাশনাল হয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু আমরা যতোদিন কলকাতায় তুচ্ছ কোঁদলে ব্যাপৃত থাকবো তার মধ্যে যেকোনো সময়ে দিল্লীতে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র কাজ সুরু হয়ে যেতে পারে। তখন আমরা ঠেকাবো কী ক'রে? যেমন অস্বাভাবিক ব্যয়ে অকর্মণ্য রবীন্দ্রনাট্যগৃহগুলোর নির্মাণও আমরা ঠেকাতে পারিনি। একবার একটা ঘটনা হয়ে গেলে তখন আর তো সেটাকে ওড়ানো যায় না, বরঞ্চ চেষ্টা করতে হয়, মানিয়ে নেবার। এবং সে মানিয়ে নেওয়ায় তো সৌজন্য থাকে না, ফলে সহা-বস্থানের সঙ্গে চিরকালীন একটা খেয়ো-খেয়িও চলে। সাধুনিককালের আদর্শ দাম্পত্যজীবনের মতো আর কি।

উদাহরণ স্বরূপ আরো বলা যায় যে, দিল্লীতে একটা জাতীয় নাট্যশিক্ষণালয় আছে। তার নাম 'ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা'। বছরে কয়েক লাখ টাকা খরচ হয়। অথচ সেখানে অভিনয় শেখানো হয় হিন্দীতে, যদিও আমাদের সংবিধানে অনেকগুলি ভাষাকেই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ অভিনয়শিক্ষার বিদ্যালয় প্রত্যেক ভাষায় আলাদা আলাদা হওয়া উচিত, কারণ নিজের মাতৃভাষায় ছাড়া অভিনয়ের সূক্ষ্মতা বোঝা বা প্রকাশ করার অভ্যাস শুরুই হ'তে পারে না। এবং নাট্য-সৃষ্টির দিক থেকেও দিল্লী, মারাঠী বা বাংলার তুলনায় কিছু একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবী করতে পারে না। তবু সেখানে ন্যাশনাল ইস্কুল স্থাপিত হয়ে গেছে, এবং প্রচুর ব্যয়ে সেটা চালানোও হচ্ছে। যদিও তার দ্বারা, অন্ততঃ বাংলা নাট্যপ্রচেষ্টা, এতোটুকুও সহায়তা পেয়েছে ব'লে আমরা জানি না। অথচ প্রয়োজন ছিল কলকাতায় একটা ঐ ধরনের অভিনয়শিক্ষণা-লয় প্রতিষ্ঠা করার যাতে আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় সম্পর্কে এখানকার শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কিছু শিখতে পারে। তাতে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বাংলা নাট্য-প্রযোজনার মান উন্নত হোত। কিন্তু এখানে যখন আমরা কলহ করি, তখন অন্য জায়গার লোক ব'সে থাকে না, তারা কিছু একটা সুরু ক'রে দেয়। কিন্তু আমরা কোঁদলে এতো ব্যাপৃত থাকি যে এসব আমাদের চোখেও পড়ে না। তারপর 'কেউ আমাদের দেখতে পারে না' বলে নাকি-কান্নার অবকাশ তো রইলই।

যাই হোক উপরের উল্লেখগুলোতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে 'ন্যাশনাল' একটা নাম মাত্র, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে এর অর্থ বিভিন্ন। তেমনি, আমরা যখন

'ন্যাশনাল থিয়েটার' বলি তখন অনেক-ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার ধোঁয়াটে এবং বিচার-হীন। কী হলে একটা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল হয় এবং সেই ন্যাশনাল থিয়েটারটা কী ধরণের থিয়েটার, এটা আমাদের বিচার করা উচিত।

সরকারী উদ্যোগে যা করা হয় সেটাই কি ন্যাশনাল? তাহলে সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করায় শিশিরকুমারকে অতো প্রশংসা করা হয়েছিল কেন? সে-খেতাবও তো তা হলে জাতীয় খেতাবই ছিল? এবং শিশিরকুমারের পরে অন্য অনেকেও সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থাৎ বোঝা যায় যে পদ্মশ্রী বা পদ্মভূষণ ইত্যাদি খেতাব যদিও সরকারী উদ্যোগে দেওয়া হয় তবু অনেকে সেটাকে জাতিপ্রদত্ত সম্মান বলে মনে করেন না।

১৯০৮ সালে বিলেতে লাইসিয়ম নাট্যশালার সামনে এক জনসমাবেশ হয়েছিল এই দাবীতে যে শেক্‌স্‌পীয়রের স্মৃতিতে একটা ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হোক। সেই দাবীর সমাবেশে বর্ণার্ড শ'ও যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি লক্ষপতিদের কাছে টাকা চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির কিছু অংশ আজও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি লিখেছিলেন......

"... the newspaper reports of civil and criminal trials, especially those dealing with divorce, murder and suicide, prove that the morality of the town is becoming more and more a sensational and romantic morality inculcated in the commercial theatres; and that our profusely endowed free libraries, however well-stocked with high-class literature, act mainly as circulating libraries of romantic and essentially theatrical fiction. To continue in the face of these facts . . . leaving the theatre to prostitute itself further and further on the plea that 'they who live to please must please to live' is really to abandon the most potent factor in the formation of our national conscience and character to the survivors in a competition in which the most scrupulous go to the ... No European nation neglects ... grave fact as England does"

পরে বিলেতের লোকেরা চাঁদা ... শেক্‌সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার প্র... করেন। (অনেক পরে অবশ্য।) আজ ... নাম রয়্যাল শেকস্‌পীয়র কোম্পানী। ... আধুনিক ইংরেজি নাট্যসৃষ্টির ক্ষে... সম্প্রদায়ের নাম প্রথম সারিতে।

এইরকমভাবেই শ্রেষ্ঠীর অর্থসাহ... নিউ ইয়র্কে সুরু হয়েছে লিংকন সে... যাদের প্রথম প্রযোজনা হয়েছিল, ... মনে পড়ে, আর্থার মিলারের লেখা ... দ্য ফল, নির্দেশ দিয়েছিলেন ইলিয়া কাজা... জার্মানিতে এই ধরনের সাহায্যপুষ্ট না... কর্মের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ... মিউনিসিপ্যালিটি বা বড়ো কাউন্সি... বা বিভিন্ন রাজ্য নাট্যসৃষ্টিকে সাহা... করে এসেছে। জাপানে এই শতকে... গোড়ায় কাবুকি নাট্যভঙ্গীর অপ... রোধ করবার জন্যে শ্রেষ্ঠীরা চাঁদা ... কাবুকি নাট্যসম্প্রদায়গুলোকে ...

...বেন। তার ফলেই আজ আমরা কাবুকি ...র মতো নাট্যরূপ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে মিউনিসিপ্যালিটি বা ...রা কেউই নাট্যসম্পর্কে সেই দায় ...করেননি।

...বিলেতের ন্যাশনাল থিয়েটার এবং তাঁরা ও রয়্যাল শেকস্‌পীয়র ...ইংরেজ নাট্যজগতের পথপ্রদর্শক। ...কেবল সরকারের পয়সায় যেমন তেমন ...টা নাট্যগৃহ চালালেই সেটা জাতীয় ...না। জাতির মনে হওয়া চাই যে এই ...আমাদের গৌরবের বস্তু, এখানকার ...আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ...নইলে 'লোকরঞ্জনী শাখা' তো এখনই ...হয়ে বসে আছে।

...কথাটিই আমরা গোড়াতে ঠিক ...যে এমন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ...যেখানে উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়ের ...আছে।

...কেউ মনে করেন রবীন্দ্রসদন যদি অনেক নাট্যসংস্থাকে ভাড়া দেওয়া ...হলেই ন্যাশন্যাল থিয়েটার হিসেবে ...দ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু কলকাতা ও কাছাকাছির মধ্যে তিনশো পঁয়-...স্থ পাওয়া শক্ত হবে না। তার ...প্রত্যেক সংস্থা বছরে একদিন করে ...র সুযোগ পাবে। বছরে একদিন ...ভিনয় করে নাট্যকলার মানকে কিভাবে উন্নত করানো যায় এটা সাধারণ-...বোধ্য। তার 'ওপর কলকাতা ও কাছাকাছি ছাড়াও আরো অনেক আছে বাংলাদেশে, সেখানেও অনেক ...আছে, তাঁদেরও দাবী থাকবে ...দনের ওপর, ফলে, নীলদর্পণের ...আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুলে ...পরিলে কাষেই ফাটে'।

...এর ফলে যারা নাট্যকর্মকেই পেশা ...গ্রহণ করে আত্মনিয়োগ করতে চায় ...কোনো সাহায্যই হবে না, উপরন্তু ...থিয়েটারের ক্লাব বানিয়ে বছরে একদিন ...করেই খুশী তাদের দলকেই পুষ্ট ...। আর যারা নিজের জোরে অন্যত্র ...দর্শকদের মুখোমুখি হতে পারেন ...হরিহরছত্রের মেলায় আদপেই বা ...কেন?

...শ 'কোর্ট থিয়েটার' নামক এক ...নাট্যপ্রচেষ্টার উদাহরণ দিয়ে ...যে, যে-কাজ এই নাট্যশালা করেছে ...সাফল্য এ অর্জন করেছে, ...কাজকে অর্থসাহায্য ব্যতীত আর ...নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ...অব্যবসায়িক নাট্যপ্রচেষ্টা পঁচিশ-...বছর ধরে যে-মান সৃষ্টি করেছে তাকে ...নিয়ে যেতে পারাটাই জাতীয় দায়িত্ব। ...এমন একটা থিয়েটার, যেখানে যারা ...প্রথম শ্রেণীর নাট্যসৃষ্টির কাজ ...এসেছে তাদের কিছু বলবার থাকবে, ...যারা কাজ করবার কিছু সুযোগ ...। নইলে এটা তো সরকারী পয়সায়

দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করানোর মতো, তাতে দরিদ্রেরও দারিদ্র্য যায় না, আর নারায়ণও তুষ্ট হন না।

কিন্তু কে সেই লোকেরা যাঁদের কর্মের সুযোগের জন্য এই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে? এইখান থেকেই যতো বিবাদের সুরু—হতো 'লাভক্ষতি টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ'। যখন দেশবন্ধু বলেছিলেন শিশির-কুমারকে, তখন পরিকল্পনা ছিল থিয়েটারই হবে, এবং শিশিরকুমারই সেটা পরিচালনা করবেন। এবং তাঁদের কারোরই মনে হয়নি যে তাতে জাতীয় নাট্যশালা জাতীয় হতে আটকায়।

কিন্তু এখন ব্যাপারটা নাকি অন্যরকম। অর্থাৎ নাচ আছে, গান আছে, পুতুলনাচ আছে, নৃত্যনাট্য আছে, ও সোজাসুজি নাট্যাভিনয়ও আছে। এবং সকলেরই দাবী আছে রবীন্দ্রসদনের ওপর। সুতরাং কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়কে নাকি এর মধ্যে প্রাগাধিকার দিতে পারেন না।

কর, কারণ সাধারণ থেকে নিজেকে
র রাখাই তার পন্থতি।

কিন্তু যারা গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর
উন্নতমানের নাট্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত
লোকসাধারণের সাহায্যেই এতোদূর
ত পেরেছেন, লোকসাধারণের বিশ্বাস
অর্জন করতে পেরেছেন। নইলে লোকে
র অভিনয়ই দেখতে আসতো না অতো
করে, বা এটাকে জাতীয় সংস্কৃতির
বলে মনে করতো না। তাই আরো
প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত নাট্য-
দের সংগে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা
। যাকে ইংরেজিতে বলে কনফিডেন্সে
। তাহলে একটা না একটা পথ
রই যেত, অন্ধগলির মধ্যে ঘুরে
তে হোত না।

বর্ণার্ড শ যখন ন্যাশনাল থিয়েটারের
বলেছিলেন তখন তিনি কোর্ট থিয়ে-
র প্রচেষ্টাকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ
ছিলেন। তারপর যখন সেখানে ন্যাশনাল
টার হোল তখন সেটা নাট্যাভিনয়ের
নাই হোল, কভেন্ট গার্ডেনও সেখানে
উচিত বলে কোনো 'ডিমোক্র্যাটিক'
য়রী আবিষ্কৃত হয়নি। জাপানে যখন
নাল থিয়েটার হোল সেটাও নাট্যা-
য়ের জন্যে হোল, নাচ বা গানের জন্যে
অথচ আমাদের এখানে হঠাৎ এক
ণ 'ডিমোক্র্যাটিক' থিয়োরী আবিষ্কৃত
যে, এই আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে নাকি
আঙ্গুল বারুদ পুরিতেই হইবে, নহিলে
পাতিত্ব হইয়া যাইবে। ফলে, দেখা যায়,
'থিয়োরী' কাজের সহায়ক না হয়ে
টাস কুয়োর সাহায্য করছে। অর্থাৎ
থা যেন না বদলায়, যেমন আছে তেমনিই
ক। এবং স্ট্যাটাস কুয়ো বজায় রাখতে
ই চান যাঁদের বর্তমান অবস্থায় সুবিধা
ছ।

লকাতা শহরে মঞ্চাভিনয় যে
হ অন্ততঃ চারবার করে
পারে ও তদুপরি ছুটির
লোতেও যে হতে পারে, এটা একটা
ও ঘটমান ব্যাপার। কিন্তু এইরকম
তভাবে নাচ বা গানের আসর যে
পারে তার প্রমাণ এখনো পাওয়া
না। সুতরাং যে-জিনিসটা জন্মেছে ও
তাকে সাহায্য করাটাই বোধ হয়
ক কর্তব্য। তারপর ভাবতে হয় যে,
লো জিনিসগুলো ঘটে নি সেগুলো
রে ঘটানো যায়। কিন্তু যে-ছেলে
জন্মায় নি তার ভালো করতে হবে
ব-হেসেটা জন্মেছে তাকে অবহেলা
একমাত্র সৎমায়ের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের
নয়।

ছাড়া মস্কো শহরে বা লণ্ডন শহরে
র্লিন শহরে সাহায্যপুষ্ট থিয়েটারের
ব্যালে বা কনসার্ট হলের চেয়ে বোধ-
বশীই। যে-কেউ ঐ সমস্ত শহরের
র-বই দেখলেই দেখতে পাবেন।
ও মঞ্চাভিনয়ের যে ইতিহাস আছে,

এবং আধুনিককালেও যে গভীর নাট্যপ্রয়াস চলেছে তাতে ন্যাশনাল থিয়েটার হলে সেটাকে মঞ্চাভিনয়েরই ক্ষেত্র হতে হবে প্রথমতঃ, যেমন কল্পনা করেছিলেন দেশবন্ধু এবং শিশিরকুমার। এবং আজও বেশীর ভাগ লোক সেই রকমই কল্পনা করে।

এরপর প্রশ্ন আসে যে, যদি এই কথা মেনেই নেওয়া হয়, অর্থাৎ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ যদি নাট্যাভিনয়েরই ক্ষেত্র বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া যায়, তাহলে সেটা চালাবে কারা? কাকে কাকে এর মধ্যে নেওয়া হবে?

এই হোল আর একটা বিবাদের ক্ষেত্র। কেউ কেউ বলেন যে, যতো রেজেস্টারী করা দল আছে তাদের প্রত্যেককে এক একটা ভোটের ক্ষমতা দিয়ে ডাকা হোক। তাদের ভোটের মারফতেই ঠিক হবে যে কী হবে, এবং কে কে করবে। এবং সেটাও আবার বৎসরান্তে বদলাতে হবে। যাতে কেউ মৌরুসীপাট্টা না গাড়তে পারে।

শুনতে এটাও খুব 'ডিমোক্র্যাটিক' লাগে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে রেজেস্টারী করার সঙ্গে নাট্যমানের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কি এমন সমস্ত দলও নাকি আছে যারা আমোদকর থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে যে ন্যূনতম শর্তাবলী তাও পালন করতে পারে না ব'লে রেজিস্টার্ড হওয়া সত্ত্বেও কর থেকে রেহাই পায় না। এই রেজিস্টার্ড দলগুলোর মধ্যে বছরে কয়েকটামাত্র অভিনয় করে এমন ক্লাব-সদৃশ সংগঠনও আছে, আবার নাট্যনিষ্ঠ ও সৃষ্টিকুশল সংস্থাও আছে। অর্থাৎ যারা সখের দল, এবং যারা নাট্যকেই জীবনের ব্রত করেছে, উভয়েই আছে। এই অবস্থায় রেজিস্টারী খাতার নিরিখের কোনো মানে হয় না।

তার উপর, এইভাবে ভোটের অধিকার দেওয়া হ'লে ফলটা কি ভালো হবে? কারণ, এতে তো নাট্যনিষ্ঠার বা কলাকুশলতার

কোনো প্রশ্ন থাকছে না, প্রশ্ন কেবল, রক্ত-করবীর ভাষায়, বড়ো খাতায় নাম ওঠার। রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ কলহে যেমন অনেক নতুন সভ্য ভর্তি ক'রে নেওয়া হয়, এও তেমনি নিজের বাছা বাছা লোকদের দিয়ে আলাদা আলাদা নাম রেজিস্ট্রী করাবার প্রবণতাকে সাহায্য করবে. নাটক তাতে ভালো করুক আর নাই করুক!

আমরা তো দেখেছি, এই কলকাতা শহরে কয়েক বছর আগে ৬৫ কিম্বা ৮৫টা দলের নাম দিয়ে এক পরিষদ তৈরী ক'রে ঝাঁঝালো বুলি আর কুৎসিত গালি ছুঁড়ে আকাশ যেন অন্ধকার ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই ৬৫ না ৮৫টা দল! ক'জন তাদের মধ্যে নাটোর প্রয়োজনায় দর্শকের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে!

যে-রাজনৈতিক খেলা খেলবার জন্যে এইসব ঘটনা ঘটানো হয় তারই কি পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছে এই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের নামে? যাতে, নাট্যোন্নতি হোক বা না হোক, দলাদলিটা বেশ ফলফলাও হয়ে উঠতে পারে? তখন কি ভোটে পাত্তা পাবার জন্যে সকলেই ঐরকম নতুন নতুন নামে দল রেজিস্টারী করবার ফিকিরে ঘুরবে? যেমন এক একটা বণিকসম্প্রদায় নানান্ নামে কোম্পানী রেজিস্টারী করায়, তেমনি নাট্যসংস্থাগুলোও কি দশটা নামে দশটা দল রেজিস্টার ক'রে মহলাঘরের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে, এবং ভোটের দিন ভাই বেরাদর বৌ ছেলে এমনকি চাকরকে পর্যন্ত সাজিয়ে নিয়ে ভোট দিতে যাবে?

কথাটা কিন্তু মোটেই হাসির নয়। যদি এমন একটা প্রক্রিয়া তৈরী করা হয় যাতে কাজের মূল্য থাকে না, কিন্তু ফিকিরবাজের মূল্য থাকে, তাহ'লে সেই প্রক্রিয়ায় সাধারণ ভালো মানুষও ফিকিরবাজ হ'তে বাধ্য হয়।

একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল। বহুদিন আগে, সেকালে, এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে আমন্ত্রণ ক'রে জমিদার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যাত্রা দেখাবার জন্যে। যাত্রায় রাম এলো, সীতা এলো, দশরথ বিলাপ করলে, রাম পিতৃসত্য পালন করতে বনে গেল,—কিন্তু সাহেব বাংলা ভাষা বোঝে না, তার নাক মাঝে মাঝেই ডেকে উঠতে লাগলো। এমন সময়ে আসরে হনুমানের প্রবেশ। তার লম্ফঝম্প দেখে ছেলে-পুলেরা যখন কলরব ক'রে উঠেছে তখন সাহেবের চট্কা ভেঙে গেল। এতোক্ষণ পরে তিনি ল্যাজনাড়া ও হুপ্ হাপ্ শব্দ শুনে একটা রসগ্রহণের বস্তু পেলেন। প্রচণ্ড খুসি হয়ে একেবারে দশ টাকা বখশিস্ ক'রে দিলেন হনুমানকে। হনুমান তো নমস্কার ক'রে টাকা নিয়ে চলে গেল, আবার রাম এলো সীতার বিলাপ করতে করতে, সীতা এলো অশোক কাননে বিলাপ করতে করতে, কিন্তু সাহেবের আবার চোখ জেরে আসছে,. থেকে থেকে নাক ডেকে উঠছে। খানিক পরে আর সহ্য না হওয়াতে বল্লেন,—বাবু কল্ দ্যাট্ হানুমান এগেন, ফির্ হানুমানকো বোলাও।

ফের হনুমান এলো, এবং আগের বারের চেয়ে আরো খানিকটা বেশী তারার পশ্চাদ্দেশ আন্দোলিত ক'রে ল্যাজ নাড়ালো, আরো খানিকটা বেশী লম্ফঝম্প করলো। সাহেবের আবার ঘুম ছুটে গেল, আবার উৎফুল্ল হয়ে তিনি মোটা মোটা হাতে করতালি দিলেন, এবং আবার আর একটা দশ টাকার নোট হনুমানকে বখশিস দিলেন।

এইরকম আরো একবার হতেই দেখা গেল যে রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন, এমনকি সীতা কৈকেয়ী কৌশল্যা পর্যন্ত এক একটা ল্যাজ লাগিয়ে আসরে নেমে ল্যাজ নাড়াতে থাকলো ও হুপ হাপ শব্দ করতে থাকলো।

আশা করি, গল্পটা সর্বৈব মিথ্যে, কিন্তু আমাদের চারপাশে তাকিয়ে এটাকে এতো সত্যি মনে হয় যে, ভয় করে। মনে হয় যে, এতো অধঃপতনের পরেও তো বাঙালী হিসেবে আমাদের খানিকটা জ্ঞানোদয় হওয়া উচিত। একটু তো মনে হওয়া উচিত যে, যা সৎ, যা সুস্থ, যা সুন্দর, তাকে আমরা কি ক'রে খানিকটা বাঁচবার সাহায্য করতে পারি। কারণ, এরপর তো আর সময় থাকবে না। ইতিহাস আর সময় দেবে না।

তারপর বৎসরান্তে সমস্ত ঢেলে সাজাবার কথা। এককালে জমিদারী নীলাম হোত প্রত্যেক বছরে। তাতে যে লোক নীলামে ডেকে জমিদারী পেত সে ঐ বছরের মধ্যে যতোটা পারে মুনাফা লুঠবার ফিকির করতো, প্রজাদের সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব বোধ করতো না। সরকারের প্রশাসন বিভাগেও উচ্চপদস্থ লোক নিয়োগ করা হয় না এক আধ বছরের চুক্তিতে। তাহলে তো এক বছরের চুক্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা যেত।

রয়্যাল শেক্সপীয়র কোম্পানীও গোড়াতে ঐরকম অল্প সময়ের জন্যে লোক নিয়োগ করতো। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের থিয়েটারকে যদি সত্যিই উপযুক্ত ও সম্মানার্হ ক'রে তুলতে হয় তাহলে বেশী দিন ধ'রে একজনকে গ'ড়ে তোলবার সুযোগ দিতে হবে। আর তাই ১৯৬০ সালে পীটার হলকে আনা হয়। এবং আজ পর্যন্ত তাঁরই নেতৃত্বে নানান্ নির্দেশকের সাহায্যে রয়্যাল শেকস্পীয়র কোম্পানী একটা বিশ্ববিখ্যাত নাম। ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরী হ'লে লরেন্স ওলিভিয়ের তার নেতৃত্ব পান, এবং সেটা এক আধ বছরের চুক্তিতে নয়। ব্রেখ্‌ট্‌ যে-নাট্যশালা পান সেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করেছেন, এবং সেটা প্রতি বছর ভোট দিয়ে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন করা হবে, এই শর্তে নয়।

প্রতি বছর ভোট দিয়ে যদি কোনো শিশুর নতুন নতুন মা-বাবা নির্বাচন করা হয়, তাহলে কি সেই শিশুর পক্ষে মঙ্গল হয়? প্রত্যেক বছর যদি নতুন নতুন মা-বাবা নতুন নতুন থিয়োরীতে শিশু পালন সুরু করে তাহলে কি শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়?

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কেউ কারো নয়। একটা নাটকের চুক্তি, কিংবা বড়োজোর এক বছরের চুক্তি। পরের নাটকে কে থাকবে কিনা ঠিক নেই, তাই পরস্পরের মধ্যে কোনো সৌহার্দ্য জন্মায় না, মঞ্চটাকে আপনার ব'লে মনে হয় না। তাই বরং মালিকের মন রেখে চলবার চেষ্টা হয়, যাতে আর একবার নিযুক্ত হ'তে পারে। এই পাপচক্রকে ভাঙবার জন্যেই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের আন্দোলন সুরু হয়েছে দেশে দেশে, যাতে শিল্পীদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধে একটা বোধ জন্মায়, এবং সেই বোধ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর নাট্যাভিনয় সম্ভব নয়। তাই নির্দেশক ও অভিনেতা অভিনেত্রী সকলকেই বেশীদিনের জন্যে নিয়োগ করা হয়। অথচ এই সমস্ত ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও বাংলা দেশে কথা উঠছে বৎসরান্তে সবাইকে ভোট দিয়ে নতুন সাজতে হবে। এতো আবার সেই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের নিয়মটাই অন্যনামে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে চালাবার চেষ্টা। তাছাড়া ভোটের জোরে কবে কোথায় শিল্পসৃষ্টি হয়েছে এটা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর।

এসব কথা তাঁরাই ব'লে থাকেন যাঁরা কখনো সংগঠন গড়েন নি, বা গড়তে গিয়েও পারেন নি। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলা মানে একটা সম্মানার্হ সংগঠন গড়ে তোলা, সেটা যাঁরা করেছেন তাঁর কেউই এইসব দায়িত্ববোধহীন কথায় সায় দেবেন না। অথচ দরকার সেই সমস্ত প্রতিভাময় শিল্পীদের, নির্দায়িত্বিক থিয়োরীপ্রবক্তাদের নয়।

বাংলা নাট্যকর্মীদের এখনো অনেক কিছু করতে বাকি আছে। তুচ্ছ দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে তাকে বাংলা নাট্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এমন একটা নাট্যভঙ্গী আয়ত্ত করতে যা একেবারে ভারতের একেবারে বাঙালীর। যেটা দেখে বাঙালী মন, ভারতীয়ের মন গভীরতার অনুভব পাবে, আর যেটা দেখে পৃথিবীর লোক বলবে, এ একটা অদ্ভুত গভীর নাট্যপ্রকাশ যেটা ভারতের নিজস্ব।

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে ভাবা উচিত। এবং সেটা রবীন্দ্রসদনের চেয়ে বড় চেয়ে নয়। জাতি তার নিজের সৌভাগ্যের জোরে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে যে রবীন্দ্রসদনের দুলাদলির ঊর্ধ্বে গিয়ে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের নাটক

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরম্ভেই একটি আভাস দেবার প্রয়োজন বোধ করি। প্রবন্ধের আকার বড় হবে না; সুতরাং তার অপ্রশস্ত পক্ষে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা দেবার মাত্র এখানে চেষ্টা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র বা প্রধানত নাট্যকার হতেন, তাহলে এই আলোচনা সহজ হয়ে যেত। শেকস্‌পিয়ারের নাটকগুলির শ্রেণী-বিভাগে জটিলতা নেই। ট্র্যাজিডি ও কমিডি এই দুই মূল শ্রেণীতে তাদের ফেলে আলোচনা করা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ব পৌরাণিক শ্রেণীতে বিভাগ করে একটি আলোচনা করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকগুলির ওপর এই ধরনের সহজ শ্রেণী-বিভাগ আরোপ করা সম্ভব নয়। নাটকের পরিণতির দিক থেকে, বা যেখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। আবার নাটকে প্রযুক্ত রীতির ভিত্তিতে যেমন গদ্য কি পদ্যনাট্য বা গীতিনাট্য এইভাবে এসকগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। মোট কথা কোনো একটি বিশেষ নীতির প্রয়োগ এখানে সম্ভব নয়, করতে গেলে দেখা যাবে তাতে একাধিক বাধা এসে পড়ে। প্রথমত, একই নীতি সকল নাটকের ওপর প্রয়োগ করা যায় না; দ্বিতীয়, নাটকগুলির রূপ এমন মিশ্র আকারের যে বিশেষ বিশেষ রীতির প্রয়োগে ও সন্তোষজনকভাবে শ্রেণীবিভাগ হয় না।

তাঁর নাট্যে এই জটিলতার মূল কারণ তিনি শুধু শিল্পী ছিলেন না, একাধারে শিল্পী ও দার্শনিক ছিলেন। শুধু কি তাই? শিল্পী হিসাবেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ বহু ও বিচিত্র ক্ষেত্রে। কথাশিল্প, কবিতা, সংগীত, নাট্য, নৃত্যশিল্প—সবগুলিতেই তিনি অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অপরপক্ষে তাঁর গভীর মনীষা তাঁকে দর্শনে ও আধ্যাত্মিক সাধনায়ও আকৃষ্ট করেছে। বিশ্ব-রহস্য ভেদ করতে তিনি নানা দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। সাধনজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বিশ্বসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে মনন এবং দিব্যদৃষ্টিতে লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী মন বিশ্বের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেখানে যে দোষের সন্ধান পেয়েছে তার সমালোচনা করে তিনি নানা ভাষণে, চিঠিতে এবং প্রবন্ধে নানা মন্তব্য করেছেন। কাজেই তাঁর মন সাধারণ পথে কাজ করেনি, তাঁর মতি-গতি বহু ও বিচিত্র পথে প্রবাহিত। ফলে দেখা যায় নাটককে তিনি কেবল শিল্প হিসাবে গতানুগতিক পথে ব্যবহার করেন নি। তার রীতি সম্বন্ধে যেমন একদিকে তাকে নিয়ে নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করেছেন, তেমন অপর দিকে তাঁর সাধনালব্ধ এবং চিন্তালব্ধ তত্ত্বগুলির বাহন হিসাবেও তাকে ব্যবহার করেছেন। ফলে একই নাটকে এমন বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে যে কোনো একটি নীতির ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। একই কারণে একটি বিশেষ নাটককে কেবল একটি বিশেষ নীতির প্রয়োগে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করলে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সহজবোধ্য হবে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটককে আমরা কাব্যনাট্য বলতে পারি, কমিডিও বলতে পারি আবার গীতিনাট্যও বলতে পারি। অনুরূপভাবে 'শ্যামা' নাটকখানিকে আমরা কাব্যনাট্যও বলতে পারি, গীতিনাট্য বলতে পারি আবার নৃত্যনাট্য বলতে পারি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, আমরা কি নীতি প্রয়োগ করে তাদের শ্রেণীর নির্দেশ করব। মনে হয় এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করতে পারি। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'কে তিনি গীতিনাট্য বলেছেন; আবার 'শ্যামা'কে নৃত্যনাট্য বলেছেন। বোঝা যায় যে, এসব ক্ষেত্রে একাধিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হলেও যেটি মূল বৈশিষ্ট্য তার ভিত্তিতেই তাদের শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। প্রথমটির মূল বৈশিষ্ট্য তার গীতিরূপ, দ্বিতীয়টির মূল বৈশিষ্ট্য তার নৃত্যরূপ।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাট্যের সামগ্রিক আলোচনায় আমরাও এই পথ অবলম্বন করতে পারি। এই নীতি প্রয়োগের ফলে তাঁর নাটকগুলিকে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

(১) গীতিনাট্য (২) কমিডি (৩) ট্র্যাজিডি (৪) ঋতুনাট্য (৫) প্রতীক নাটক (৬) নৃত্যনাট্য।

এই বিভাগের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির একটি সাধারণ আলোচনা এখন করা হবে।
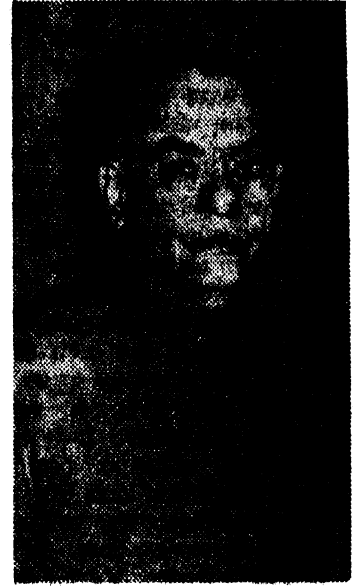
(১) গীতিনাট্য—এই শ্রেণীতে তাঁর জীবনে প্রথম রচিত নাটকগুলি পড়ে যায় বলে এদের দিয়ে আলোচনা শুরু করা অযৌক্তিক হবে না। এই শ্রেণীতে পড়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড' ও 'কাল-মৃগয়া'। এগুলি ১৮৮১ ও ৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য বিলাতে প্রবাসের পর দেশে প্রত্যাগমন করেছেন। ভারতীয় সংগীতে তাঁর অধিকার পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে পরিচয় লাভ নতুন হয়েছে। সম্ভবত পশ্চিমের অপেরা জাতীয় নাটকের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে দেশে ফিরে এসে তাঁর এক অদম্য ইচ্ছা হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে তিনি সংগীতে নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করবেন। সেই চেষ্টার প্রথম ফল 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। নাটকখানি রচিত হবার পর তাঁর পৈতৃক গৃহে মঞ্চস্থও হয়েছিল। অনেক বিশিষ্ট মানুষ তা দেখে খুশী হয়েছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, কবিতায় এক প্রশস্তি রচনা করে রবীন্দ্রনাথকে নববাল্মীকি বলে নাম দিয়েছিলেন।

তাঁর এই পরীক্ষার সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ কতখানি তৃপ্তি পেয়েছিলেন তা তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' উল্লেখ আছে। প্রায় একই সময়ে 'কড়ি ও কোমলে' নতুন কাব্যরীতির প্রয়োগ যে প্রতিকূল সমালোচনা আকর্ষণ করেছিল অথচ নাটকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল তার তিনি উল্লেখ করেছেন। বাংলা নাটকে গীতিরূপের আরোপ এই ভাবে প্রথম ঘটেছিল। এই শ্রেণীর নাটককে তিনি পাশ্চাত্য অপেরা থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন; কারণ অপেরায় তাঁর মতে সংগীতের ওপর গুরুত্ব বেশী আরোপ করা হয়, কিন্তু সংগীতকে তিনি নিজের রচিত নাটকে অভিনয়ের অনুগামী রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

(২) কমিডি—কমিডি ও যাকে ব্যঙ্গনাট্য বলি তাদের একটা গুণগত সাদৃশ্য

আছে আবার পার্থক্যও আছে। যেখানে সাদৃশ্য আছে সেখানে তা ট্র্যাজিডির বিপরীতধর্মী, অর্থাৎ সে কাহিনীর শেষে দুঃখ, হত্যা বা মৃত্যুর সংস্পর্শ নেই। অন্যপক্ষে তাদের মধ্যে যেখানে পার্থক্য সেখানে হাল্কা পরিবেশের অস্তিত্ব বা তার অভাবের দ্বারা তা চিহ্নিত। যেখানে হাল্কা পরিবেশ প্রকট সেখানে তা ব্যঙ্গ শ্রেণীতে পড়ে। আর যেখানে গম্ভীর পরিবেশে মিলনান্তক কাহিনী পরিস্ফুট করা হয় সেখানে তা কমিডির রূপ গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলির মধ্যে যেমন ব্যঙ্গধর্মী নাটক পাই তেমন কমিডি-ধর্মী নাটকও পাই। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ পাই 'বশীকরণে' বা 'গোড়ায় গলদে'। উভয় ক্ষেত্রেই ভ্রান্তিকে ভিত্তি করে প্রহসনের অবতারণা করা হয়েছে। সেকশপিয়ারের 'কমিডি অফ এরারস' বা 'মিড সামার নাইটস ড্রিমের' সঙ্গে তাদের তুলনা চলে। অপর পক্ষে 'চিরকুমার সভা' ততখানি প্রহসনধর্মী নয়। এখানে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক বাক্যালাপের সাহায্যেই কৌতুক সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকের মধ্যে ঠিক কমিডি শ্রেণীর নাটক দুর্ভাগ্যক্রমে খুঁজে পাওয়া যায় না। 'বাঁশরী' বা 'নলিনী'কে কমিডি বলা যায় কিনা সন্দেহ। 'বাঁশরী'তে দেখি সোমশংকর সুষমাকে বিবাহ করলেও তার মন পড়ে রইল বাঁশরীর কাছে। অনুরূপভাবে দেখি 'নলিনী'তে নীরদের নলিনীর সঙ্গে মিলিত হবার পরিণতি নীরজার মৃত্যু। উভয় ক্ষেত্রেই বিয়োগ এবং মিলন যেন মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

(৩) ট্র্যাজিডি—এই শ্রেণীতে পড়ে 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' 'মালিনী', 'তপতী' ও 'প্রায়শ্চিত্ত'। প্রথম তিনখানি নাটক পদ্যে রচিত এবং শেষের দুখানি গদ্যে রচিত। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাট্য তাঁর প্রথম জীবনে রচিত 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ। অনুরূপভাবে 'বিসর্জন' তাঁর রচিত উপন্যাস 'রাজর্ষির' নাট্যরূপ। 'রাজা ও রাণী' সোজাসুজি নাট্য হিসাবেই রচিত। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' দুখানি গ্রন্থই উচ্চশ্রেণীর নাটক। তবে তুলনায় 'রাজা ও রাণীর' বিন্যাসে যে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'লিরিকের প্রাবল্যে নাটক হয়েছে কাব্যের জলাভূমি—তার টানে প্রবেশ করেছে ইলা ও কুমারের উপসর্গ।' তপতীতে সেই দোষ খণ্ডনের চেষ্টা হয়েছে। তুলনায় 'বিসর্জন' আরও সুসন্নিবিষ্ট এবং তাই তা আমাদের আরও বেশী মুগ্ধ করে। 'বিসর্জন'কে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে অনায়াসে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

(৪) ঋতুনাট্য—ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাব বিদ্যমান, বর্তমান। ঠিক বলতে কি বিশ্বসত্তার সম্বন্ধে তাঁর যে চিন্তা তা এখানে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। সে চিন্তা প্রধানত গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতার মধ্যে। এই দার্শনিক তত্ত্বটির সঙ্গে আমা-দের সর্বপ্রথম পরিচিত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিশ্বসত্তার একটি রূপ রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। সেটি হল তাঁর নিত্য 'চঞ্চল রূপ। তাঁর এই গতি-শীলতার সঙ্গে ঠিক নদীর প্রবাহের তুলনা হয় না, কারণ সে প্রবাহে ছন্দ নেই। রবীন্দ্র-নাথের পরিকল্পনায় সৃষ্টিপ্রবাহ শুধু নিত্য গতিশীল নয়, তার মধ্যে ছন্দ আছে। সেই ছন্দকে সূচিত করে জন্ম-মৃত্যু, ভাঙ্গা-গড়া, যৌবন-জরা। তাই দেখি 'বলাকার' 'চঞ্চলা' কবিতায় সৃষ্টিপ্রবাহকে তিনি নদীর প্রবাহের তুলনা দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষে সৃষ্টিপ্রবাহের গতিশীলতার মধ্যে ছন্দকে সূচিত করতে তিনি তাকে নৃত্যপরা অপ-সরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

> ওগো নটী চঞ্চলা অপসরী, অলক্ষ্য সুন্দরী
> তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি-ঝরি
> তুলিতেছে শুচি করি, মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

এই নৃত্যপরা অপসরী 'মহুয়ার' 'বোধন' কবিতায় নিত্যকালের মায়াবীরূপে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরও কাজ 'ভরা পাত্রকে শূন্য করা,' 'মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছিয়ে চির পুরাতনকে উজ্জ্বল করে' তোলা। এই পরিকল্পনার পরিণত রূপটি পাই নট-রাজের চিত্রে। তাঁর নৃত্যের তালে বিশ্ব ভাঙ্গে, বিশ্ব গড়ে, তাঁর আনন্দনৃত্যের স্পর্শ লেগে 'ছয় ঋতু নৃত্যে মাতে' এবং 'ধরাতে বর্ণ গীত ও গন্ধের প্লাবন বহে যায়।'

রবীন্দ্রনাথের ঋতু সম্পর্কিত নাটকগুলি তাঁর মানসপটে চিত্রিত বিশ্বসত্তার এই মূর্তিটি পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ তাঁর ধারণায় যে বিশ্বরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে নাটকে তার প্রচার করে-ছেন। এই অর্থে তারা তত্ত্ববাহী নাটকও বটে। তবে একটি বিশেষ মনোরম তত্ত্বকে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ দিয়েছে বলে এই নাটকগুলিকে বিষয়ের ভিত্তিতে একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এই শ্রেণীতে পড়ে 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'শ্রাবণগাথা', 'বসন্ত', 'ঋতুরঙ্গ' ও 'শেষবর্ষণ'। এই নাটকগুলিতে যে সুরটি বারম্বার ধ্বনিত হয়েছে তা হল যিনি 'নিত্যকালের মায়াবী' তিনি 'ভরা পাত্রটি শূন্য করেন। ভরিতে নূতন করি।' 'বসন্তে' দেখি ঋতুরাজ পূর্ণ হতে রিক্ত এবং রিক্ত হতে পূর্ণের মধ্যে যাতায়াত করেন। 'শ্রাবণগাথায়' দেখি শ্রাবণের ভিতর দিয়ে গ্রীষ্মের রিক্ততার তপস্যা শরতে পূর্ণতা পেল। ছয়টি ঋতু যেন ভাঙ্গাগড়ার ছন্দে একই সূত্রে গ্রথিত, তারা যেন একই নটরাজের নৃত্যের ছন্দের তাল রক্ষা করে। 'ঋতুরঙ্গে' এই রূপ বিশেষভাবে প্রকট।

এই প্রসঙ্গে শেলীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর 'ওয়েস্ট উইন্ড' কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সেখানে শীতের প্রতীক পশ্চিমের ঝড় এবং বসন্ত পূবের হাওয়া। একজন তাই অপহারক, অন্যজন ভগিনী। শীত ঝড় তুলে গাছের পাতা খসিয়ে প্রকৃতিকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তাই তাকে তিনি বলেছেন ধ্বংসকারী এবং সংরক্ষক। পরে বসন্ত শিঙা বাজিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। সুতরাং শেলীর পরি-কল্পনায় ঋতুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় তারা পরস্পর সংযুক্ত।

(৫) প্রতীকধর্মী নাটক—এই শ্রেণীতে পড়ে 'প্রকৃতির পরিশোধ', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'অরূপরতন', 'ডাকঘর' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাট্যের বিভিন্ন সমালোচকগণ এদের নানাভাবে নামকরণ করেছেন। কেউ রূপক নাটক নাম দিয়েছেন, কেউ সাংকেতিক নাটক বলেছেন, কেহ বা এই দুটি শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ধরে কোনো-টিকে রূপক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কোনোটিকে বা সাংকেতিক শ্রেণীতে ফেলেছেন।

এই সকল নাটকেরই মূল লক্ষণ হল এখানে প্রতীককে অবলম্বন করে নাটকের পরিস্ফুট করা হয়েছে। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় কোথাও প্রচলিত সমাজবিন্যাসের সমালোচনা করে তার ত্রুটি কোথায় তা দেখানো হয়েছে। কোথাও কবির নিজ সাধনজীবনে লব্ধ উপলব্ধিকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে আমরা 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র উল্লেখ করতে পারি। 'অচলায়তনে' ভারতের রক্ষণশীল সমাজের অন্ধ সংস্কারের মূঢ় আনুগত্য যে সমাজকে নির্জীব করে তোলে তাই হল প্রতিপাদ্য। 'মুক্তধারা' ও 'রক্ত-করবী'তে পাই পশ্চিমের প্রযুক্তিবিদ্যাকে ভিত্তি করে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ও লোভ প্রণোদিত আনন্দের লেশ রহিত জীবনের তীব্র সমালোচনা। এই সমালোচনা তিনি পশ্চিমে ভ্রমণকালে নানা ভাষণে, ভ্রমণ-কাহিনীতে এমন কি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতা-মালায়ও নানা প্রসঙ্গে করেছেন। পাশ্চাত্য সমাজে যন্ত্র যে মানুষকে নানাভাবে প্রভা-বান্বিত করে তার জীবনের মুক্ত ছন্দকে ব্যাহত করছে এবং বস্তুপিণ্ডের লোভ যে মানুষকে সহজ স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে টেনে নিয়ে তার জীবনকে কারাগারে আবদ্ধ করছে এটি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি শুধু বেদনা পাননি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যন্ত্রের যে প্রয়োজন নেই তিনি তা বলেন না, তবে যন্ত্র যখন জীবনকে সংকুচিত করে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে প্রাণের ধারাকে ক্ষুণ্ণ করে তিনি তখন তাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত নন।

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি উপমার প্রয়োগ করেছেন। পাখীর মুক্ত গগনে বিহরণের জন্মগত অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধি-কারের সার্থক ব্যবহারের জন্য তার একটি নীড়ের প্রয়োজন। সেই নীড়ের পরিবর্তে যদি তাকে সোনার খাঁচা দেওয়া হয়, তাহলে তার বাস্তব সম্পদ বাড়ে কিন্তু তাকে মুক্ত জীবনের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। 'মুক্তধারায়' যন্ত্রের জীবনধারা ব্যাহত

করবার শক্তির বীভৎসতা মূল বর্ণনীয় বিষয়। 'রক্তকরবীতে' পাই প্রযুক্তি-বিদ্যা প্রয়োগে সঞ্জাত অন্ধ রুদ্রলোলুপতা পৃথিবীর মুক্ত জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে যে কারাগারে আবদ্ধ করে তার বর্ণনা আছে। উভয়েই প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দুর্বলতার ভিন্ন রূপে প্রতিবাদ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনে লব্ধ উপ-লব্ধির ব্যাখ্যা হিসাবে আমরা 'রাজা' ও 'অরূপ রতনের' কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর ধারণায় বিশ্বসত্তার প্রকাশ দুটি ভিন্ন পর্যায়ে ঘটে থাকে। প্রথমটিকে তিনি কাজের প্রকাশ বলেছেন। সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক শক্তির মত কাজ করেন। দ্বিতীয়টিকে তিনি আনন্দের প্রকাশ বলেছেন। সেখানে বিশ্ব-সত্ত ব্যক্তিরূপী সত্তা হিসাবে কবির সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদান করতে উৎসুক। সেখানে তিনি বলপ্রয়োগ করেন না, সেখানে তিনি বলেন আমার আনন্দ তোমায় দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমায় দও (শান্তিনিকেতন গ্রন্থে 'সৌন্দর্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভক্ত যদি তাঁকে নিজের অন্তরে স্থান দেন তাহলে পরস্পরের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে; তিনি তখন কবির জীবন-শিল্পী হয়ে তাঁর জীবনকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করেন। 'আত্মপরিচয়ে' তিনি প্রথম রূপ-টিকে বিশ্বদেবতা বলেছেন এবং দ্বিতীয় রূপটিকে জীবনদেবতা বলেছেন। অন্তরে তিনি অরূপ থেকেও অধিষ্ঠান নেন বলে তাঁকে অন্তরতমও বলেছেন। এই দুই নাটকে সেই তত্ত্বকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা হয়েছে। ভক্তের অন্তরে নিভৃতে মিলন হয় বলে তিনি অন্ধকার ঘরের রাজা এবং অরূপরতন। এইভাবেই যিনি অসীম তিনি সীমার মাঝে প্রকট হন।

উভয় শ্রেণীর নাটকেই সমালোচনা-মূলক মন্তব্য বা সাধনজীবনে লব্ধ সূক্ষ্ম তত্ত্ব নানা প্রতীকের সাহায্যে পরিস্ফুট করার চেষ্টা হয়েছে। 'মুক্তধারায়' যন্ত্র প্রতীক, নদী প্রতীক, কারণ তা প্রাণের প্রবাহকে সূচিত করে। 'রক্তকরবী'তে নন্দিনী প্রতীক, কারণ তার প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। রক্তকরবী প্রতীক, তা প্রাণ-শক্তির আত্মবিকাশের অদম্য ক্ষমতাকে সূচিত করে। 'অচলায়তনে' অচলায়তনও প্রতীক, কারণ তা রক্ষণশীলতার চাঞ্চল্যহীন স্থির-তাকে সূচিত করে। অনুরূপভাবে 'রাজা' ও 'অরূপরতনে' রাজা প্রতীক, তিনি জীবনদেবতাকে সূচিত করেন। সুদর্শনাও প্রতীক, তিনি ভক্তকে সূচিত করেন। প্রতীকের ব্যবহারই এইসব নাটকের সাধারণ লক্ষণ। সুতরাং এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে প্রতীকধর্মী নাটক বলাই সঙ্গত মনে হয়।

এই শ্রেণীর নাটকের বিভিন্ন আলো-চনায় তাদের সূচিত করতে দুটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কোনো সমালোচক তাকে রূপক শ্রেণীর নাটক বলেছেন, কোনো সমা-লোচক রূপকের সঙ্গে সাংকেতিক নাটকের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে কোনোটিকে রূপক শ্রেণীতে ফেলেছেন, কোনোটিকে সাংকেতিক শ্রেণীতে ফেলেছেন, কোনোটিকে মিশ্র শ্রেণীর বলে মন্তব্য করেছেন। মনে হয় এই বিতর্কের প্রেরণা কবি-সাহিত্যসমালোচক ইয়েটস-এর সিম্বল ও অ্যালিগরির সূক্ষ্ম পার্থক্যসূচক বিশ্লেষণ হতে এসেছে। প্রথমটি সূচিত করতে সাংকেতিক শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সূচিত করতে রূপক কথাটির প্রয়োগ হয়েছে। ইয়েটস্-এর মতে যা সাংকেতিক তা ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রকাশনে সাহায্য করে। আর যা রূপক তা ইন্দ্রিয়া-তীত নয় এমন বস্তু বা কোনো পরিচিত তত্ত্বের প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করে এবং তার অন্য ভাব প্রকাশও সম্ভব।

সুতরাং কোনটি রূপ আর কোনটি সাংকেতিক তা নির্ভর করে আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতির ওপর। উপরের নীতি অনুসারে 'অচলায়তন' বা 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারাকে' রূপক বলতে হয়; কারণ তারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের ব্যাখ্যা করে না এবং তাদের অন্যভাবেও প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করা যেত। অপর পক্ষে 'রাজা' ও 'অরূপ-রতন'কে সাংকেতিক পর্যায়ে ফেলা যায়, কারণ এখানে এক ইন্দ্রিয়াতীত সাধনলব্ধ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই নাটক-গুলিকে বিষয়-বস্তুর প্রকৃতির ভিত্তিতে হয়ত তত্ত্ববাহী বলা যেত; কিন্তু মনে হয় তাও ঠিক হবে না। কারণ এদের সবগুলি তত্ত্ববাহী নয়। এই প্রসঙ্গে 'ডাকঘর' নাটিকাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি অনন্যসাধারণ, নাটকের রূপ গ্রহণ করলেও এটি ঠিক নাটক নয়, কারণ এতে কাহিনী নেই, এর মধ্যে গতি নেই। কবির মনের একটা আকুতি, সুদূরকে পাবার ব্যাকুলতা এখানে সুন্দর রূপ পেয়েছে। কবিতার মধ্যে এর প্রকাশ প্রশস্ত, নাটক এর স্বাভা-বিক রূপ নয়। এটিকেও তত্ত্ববাহী বলা যায় না। সুতরাং এই নাটকগুলির যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ প্রতীকের সাহায্যে প্রতি-পাদ্যের বা তত্ত্বের পরিস্ফুরণ তার দ্বারাই তাদের চিহ্নিত করা যুক্তিসম্মত। তাদের প্রতীকধর্মী বলাই সংগত।

(৬) নৃত্যনাট্য—রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য-গুলি অনন্যসাধারণ। এদের সমস্থানীয় নাটক বিশ্বের অন্য সাহিত্যে আছে বলে আমার জানা নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর পক্ষেই তাদের রচনা করা সম্ভব। যিনি একাধারে নাট্যকার, কবি, সুরকার এবং নৃত্যশিল্পী তাঁর পক্ষেই এই শ্রেণীর নাট্য-রচনা সম্ভব। এই পর্যায়ে পড়ে 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চন্ডালিকা'।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল নৃত্যকে অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে অভিনয়ের মধুরতম রূপটি গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে অভিনয়ের চারটি অঙ্গের মধ্যে দুটি প্রধান অঙ্গকে, অর্থাৎ আঙ্গিক ও বাচনিক অভিনয়কে এখানে তিনি সমান প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আঙ্গিক অভিনয়ের পূর্ণতম রূপটি প্রকট হয় নৃত্যে আর বাচনিক অভিনয়ে সব থেকে আকর্ষণীয়

রূপটি পাই সংগীতে। তিনি এই দুটি অংগকে যুগ্মাশ্বের মত তাঁর অভিনয়ের রথটিকে পরিচালিত করবার জন্য ব্যবহার করে-ছিলেন। সুতরাং তাঁর এই শ্রেণীর নাটক শুধু গীতিনাট্য নয় বা শুধু নৃত্যনাট্য নয়, তা একাধারে সংগীত ও দেহ ভঙ্গির নাটক। বলা যায় এইভাবে তিনি পাশ্চাত্য-দেশের ব্যালে ও অপেরার সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

ব্যালে নৃত্য অভিনয়ের বাহন হবার ক্ষমতা রাখে সত্য, কিন্তু তার ক্ষমতার একটি সীমা আছে। তা গড়ে উঠেছে যন্ত্রসংগীত, সজ্জা, দৃশ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে। তা কাহিনী বলবার এবং আবেগের অভিব্যক্তি দেবার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু যেহেতু তার বাচনিক অংগ নেই, সেই হেতু খানিকটা তা পঙ্গু। এই কারণে তা কাহিনী বলতে পারে, কিন্তু জটিল কাহিনী বলবার ক্ষমতা রাখে না। অনুরূপভাবে তা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা রাখে, কিন্তু গভীর বা সূক্ষ্ম ভাব তার নাগালের বাইরে, এইখানেই তার দুর্বলতা। অপর পক্ষে সংগীতের ক্ষমতার সীমা আছে। তা যে বাচনিক অভিনয়ের চরম রূপ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন জিনিসও আছে যা দেহভঙ্গির ভাষায় আরও সহজে এবং সুন্দর রূপে প্রকাশ করা যায়। যেখানে ভাষা দুর্বল সেখানে তা আরও ভালো কাজ করে। সুতরাং নৃত্য এবং সংগীত খানিকটা উভয়ের পরিপূরক। ভাষা ও সুর যেখানে হার মানে সেখানে দেহভঙ্গি পরিপূরক হিসাবে কাজ করে আবার দেহভঙ্গি যেখানে হার মানে সেখানে সংগীত সে অভাব পূরণ করে। এইভাবে সংগীত ও দেহভঙ্গির সমন্বয়ে আমরা অভিনয়ের পূর্ণতম রূপটি পেতে পারি। এই ধরনের চিন্তাধারাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে নৃত্যনাট্য প্রবর্তনে উৎসাহিত করেছিল।

যেখানে অভিনয়ের নৃত্য এবং সংগীত মূল বাহন সেখানে ভাষার অকারণ বাহুল্য বর্জনীয়। সেই জন্য দেখি কাহিনী এখানে যতখানি সম্ভব ছোট করা হয়েছে, কারণ নৃত্য বচনের পরিপূরক হওয়াও সংগীতের অকারণ স্ফীতির প্রয়োজন থাকবে না। ফলে নাটক এখানে সুসম্বিবন্ধ ও সুসংহত হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় এই শ্রেণীর নাটকগুলির বুনানি বেশ ঠাসা এবং বাঁধন আঁট-সাঁট। ফলে সাহিত্য হিসাবেও নাটকগুলির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্য বোঝা সহজ হবে আমরা যদি 'চিত্রাঙ্গদা'র কাব্যনাট্য রূপের সঙ্গে তার নৃত্যনাট্য রূপের তুলনা করি। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই সহজ হবে। কাব্যনাট্যে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মিলনের দৃশ্যটি বেশ বড় এবং উচ্ছ্বাসপূর্ণ। নৃত্য-নাট্যে তা প্রায় বর্জিত হয়েছে এবং মিলনের আনন্দসূচক একটি সংগীতসহ নৃত্যের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছে।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

সেদিন ও এদিনের রঙ্গালয়

১৮৭২-১৯৬৮ অর্থাৎ বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের বয়স হোল ৯৬ বছর। আর চার বছর পরেই শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই দীর্ঘকালের ইতিহাস যেমন গৌরবময়, অপরদিকে তেমনি বেদনাদায়ক। দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণের জন্য এই পেশাদার মঞ্চ থেকে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে যেমন বহু কিছু করার চেষ্টা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি একশ্রেণীর শিক্ষিত উন্নাসিক ব্যক্তি একে আঘাতের পর আঘাত হেনেছেন। ফলে, নাট্যশালার অগ্রগতির পথ কতকটা বাধা-প্রাপ্ত হয়েছে।

গোড়ার যুগে নটেদের 'নোটো' বলে অবজ্ঞা করা হোত। সেদিন অতি দুঃখেই গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন—

"লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।"

দীর্ঘ এক যুগ ধরে গ্লানির বোঝা বয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের নট-নায়কেরা একটু আশার আলো দেখতে পেলেন ১৮৮৪ সালে। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' হোল বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দিকচিহ্ন বা Landmark! নাট্যশালা এবং সেই সঙ্গে নটেরাও একটু মর্যাদালাভ করলেন। নাট্যশালার প্রতি বিমুখ ব্যক্তিদেরও নাট্যশালার টিকিটঘরে টিকিট কিনতে দেখা গেল।

স্বর্গত নট-নাট্যকার অমৃতলাল বসু আনন্দে লিখলেন—

"লিখিয়া চৈতন্যলীলা, হীরক হইল শীলা
নাট্যশালা হোল তীর্থ, ভক্ত মেলা থিয়েটার
হাতে শিঙ্গা, বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নর্তশির আঁখি জলে ভেসে যায়।"

১৮৮৪ সালে 'চৈতন্যলীলা' মঞ্চস্থ হওয়ার পর বাংলার নিন্দনীয় সাধারণ রঙ্গালয় কিঞ্চিত মর্যাদালাভ করলো! এ মর্যাদা দিলেন—ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখে, শুধু মুগ্ধই হলেন না, সেই সঙ্গে তিনি জানালেন, অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি আসল ও নকলকে প্রত্যক্ষ করলেন।

নকলের মধ্যে দিয়ে আসলকে প্রত্যক্ষ করানোর দায়িত্ব নাটকের। গিরিশচন্দ্র এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে উপেক্ষা করেছিলেন। লিখেছিলেন—

"রঙ্গমঞ্চ ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার আশায় করি জীবন যাপন।"

গিরিশচন্দ্রের সাধ ও আশা তাঁর জীবদ্দশায় আংশিকভাবে পূরণ হলেও, বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় তখনও ফুলে-ফলে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেনি।

সেদিন একটি নাটকের আয়ুষ্কাল ছিল পনের দিন থেকে তিন মাস। দর্শক সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। অথচ একটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে পোষাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট, আসবাবপত্র, পোস্টার, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি প্রচারপত্র বাবদ যে টাকা খরচ হোত, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে টাকাও উঠতো না। এর ওপর শিল্পীদের মাইনে, মহলার খরচ, মহিলা শিল্পীদের নিয়ে আসা ও পৌঁছে দেওয়ার গাড়ী খরচ এসব তো ছিলই। মোটকথা, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কেউ সেদিন সাধারণ রঙ্গালয়কে চালানোর কথা ভাবেন নি, রঙ্গমঞ্চের প্রতি একান্ত অনুরাগবশত এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখা ও দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি করাই ছিল সেদিনকার মঞ্চ পরিচালকদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অন্তত পঞ্চাশ বৎসরকাল বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে তার অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার চেষ্টা করে এসেছে। স্টার থিয়েটারের যে 'চৈতন্যলীলা' সেদিন বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার আয়ুষ্কাল পুরো চার মাসও হয় নি। ১৮৮৪ সালের ২রা আগষ্ট 'চৈতন্যলীলা' মঞ্চস্থ হয় এবং ঐ ১৮৮৪ সালের ২২শে নভেম্বর পুনরায় নতুন নাটক 'প্রহ্লাদ চরিত্র' মঞ্চস্থ করতে হয়। এমনিতর সেদিনের নামকরা বহু নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা দর্শকের অভাবে অল্পদিন অভিনয় করার পরই বন্ধ করতে হয়েছে।

১৯২৩ সালে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আবির্ভাবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নবযুগের সূচনা হয়। একদিকে যেমন শিশিরকুমারের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মঞ্চ-প্রীতি দেখা দেয়, অপর দিকে তেমনি আর্ট থিয়েটারে একদল শক্তিশালী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। ফলে, ঐ সময় বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে নতুন উদ্দীপনার সূচনা হয়। এই সময় অভিনয়ের ধারার পরিবর্তন হয় এবং সেইসঙ্গে কলাকৌশল, সাজ-পোষাক, দৃশ্যপট, এমন কি প্রচার-পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয় করতে হোত, সেই অনুপাতে অর্থাগম হোত না। মঞ্চে নতুনত্ব কিছু করার জন্য প্রযোজকেরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। নাটক ও তার অভিনয়ের সুনাম হলে, অবশ্য তিন মাসের জায়গায় ছমাস কি এক বছর হয়ত চলতো কিন্তু জমা-খরচের খাতা খতিয়ে দেখলে, হয়তো দেখা যেত—ডাইনে-বাঁয়ে সমান অথবা জমার চেয়ে খরচের ঘরটাই বেশী ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিনে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রযোজকেরা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই বছরে অন্তত চার বা ততোধিক নাটক মঞ্চস্থ করে এসেছেন। সেদিনের এই নিষ্ঠাবান নাট্য-কর্মীদের কল্যাণে শুধু নাট্যশালারই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি, সেই সঙ্গে বাংলার নাট্য-সাহিত্যও পুষ্টিলাভ করেছে।

আজকের দিনে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি ইতস্তত কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত বিরূপ সমালোচনা কাউকে কাউকে করতে দেখা যায়। তাঁদের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, এইরূপ সমালোচনা করার পূর্বে, তাঁরা যদি ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন—কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সে সময়ে কত উল্লেখযোগ্য নাটকের সৃষ্টি হয়েছে, কত প্রতিভাবান নট ও প্রতিভাময়ী নটীর আবির্ভাব ঘটেছে। আর সেই সঙ্গে দৃশ্যপট ও আলোকসজ্জার কত উন্নতি হয়েছে।

১৯৫২ সালের আগে একটিমাত্র পেশাদার রঙ্গালয় ছাড়া অন্যান্য রঙ্গমঞ্চ-

গুলির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। এখানে সন্ধ্যায় পাদ-প্রদীপের আলোয় অভিনয় হোত আর মধ্যাহ্নে নেপথ্য অভিনয় হোত হাইকোর্ট পাড়ায়। সে সময় ঋণের দায়ে পেশাদার মঞ্চগুলি এমনিই জড়িয়ে পড়েছিল যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে অকটোবর মাসে স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর, সাধারণ রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্বন্ধে অনেকেই আবার আশান্বিত হয়ে উঠলেন। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহটিকে সুসংস্কৃত করে 'শ্যামলী' মঞ্চস্থ হোল। এবং 'শ্যামলী'র পর মধ্যসাপ্তাহিক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য চেষ্টা চলতে লাগলো। তখন সাধারণ রঙ্গালয়গুলির অভিনয় আসর ছিল সপ্তাহে চারদিন। বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার। রবিবারে দুবার অভিনয় হোত। অন্যান্য দিন একবার। কিন্তু 'শ্যামলী'র অভাবনীয় সাফল্যে সে সময় মধ্যসাপ্তাহিক নাটক মঞ্চস্থ করতে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় রাজী হলেন না। বললেন—'দীর্ঘদিন থিয়েটার পরিচালনা করছি কিন্তু এরকম দর্শক সমাগমও ইতি-পূর্বে দেখিনি, আর প্রতিটি অভিনয় এইভাবে হাউসফুল হতেও দেখিনি। কাজেই, এখন কোন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতে গেলে, সাধারণ লোকের ধারণা হয়ে পারে 'শ্যামলী'র বিক্রি কমে এসেছে। কাজেই এরকম অবস্থায় 'শ্যামলী'কে disturb করা উচিত হবে না। বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারে 'শ্যামলী' যেমন চলছে চলুক। মধ্যসাপ্তাহিক নাটকের কথা শ্যামলীর বিক্রি কমে এলে চিন্তা করা যাবে।' 'শ্যামলী' অপ্রতিহত গতিতে চার বৎসরের অধিককাল চলে। ইতিমধ্যে অন্যান্য থিয়েটারেও স্টার থিয়েটারের দেখাদেখি বুধবারের অভিনয় বন্ধ করে দেন। এবং 'শ্যামলী'র মত একই নাটক সপ্তাহে তিন দিন করে অভিনয় করতে সুরু করে। ফলে, সেই ১৯৫২ সাল থেকে বুধবারের অভিনয় আসরটির যেমন বিলুপ্তি ঘটে তেমনি প্রতিদিন একই নাটকের অভিনয় করাটাও রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকের ধারণা, এর ফলে থিয়েটারের Production cost অনেক কমেছে। বিপুল পরিমাণে দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে একই নাটকের একটানা অভিনয় সম্ভব হচ্ছে বটে, কিন্তু ১৯৫২ সালের পর থেকে থিয়েটারের ব্যয়ভার চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। শিল্পী, কলা-কুশলীদের মাইনে, ইলেকট্রিকের খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার খরচ যে হারে বেড়েছে তাতে বছরে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করতে হলে, আজকের দিনে এই অগণিত দর্শকসমাগম সত্ত্বেও থিয়েটার চালানো সম্ভব হোত কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

অবশ্য একটানা একই নাটকের অভিনয় করার ভাল ও মন্দ দুটো দিকই আছে। অভিনয়ের মান বজায় রেখে, দিনের পর দিন একই নাটকের অভিনয় করা যেমন শক্ত, তেমনি নানা রসের ও নানা স্বাদের নাটকের অভিনয় করতে না পারার দরুন শিল্পীদের অভিনয়-প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। সে যুগের শিল্পীদের মত বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করার দক্ষতা এ যুগে খুব অল্পসংখ্যক শিল্পীর মধ্যেই আছে। এর কারণ, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, গীতি-বহুল (অপেরা) নাটকের অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ে দীর্ঘকাল না হওয়ার ফলে, নবীন শিল্পীদের অভিনয়-প্রতিভার পরখ করার সুযোগ হচ্ছে না। শিল্পের সংগে শিল্পীর সম্পর্ক অংগাংগিভাবে জড়িত। কাজেই আজকে নতুন করে ধ্রুপদী নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার কথা সাধারণ রঙ্গালয়ের চিন্তা করার প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের যাতে পুনরাবির্ভাব ঘটে, সেজন্যও চেষ্টা করা দরকার। কারণ, ১৯৫২-১৯৬৮ এই ১৬ বছর তো সামাজিক নাটক নিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের কাটলো। এখন রুচির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে, সামাজিক নাটকের প্রতি অরুচি আসতেও বোধহয় দেরী হবে না।

সেকাল ও একালের যাত্রা সংস্কার

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

উনিশ শতকে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র, মতিলাল শীল প্রমুখ বিদ্বজ্জন ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, প্রভৃতি নানাদিক থেকে বাংলার সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারের তরঙ্গ যাত্রা-জগৎকেও আঘাত করে। কুরুসিকতা ও ভণ্ডরসিকতা লঘুচেতা শ্রোতার আপাত ভাল লাগে ব'লে যাত্রাপালায় এসবের উপস্থাপনা করা হ'ত। যাত্রাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার জন্য মাঝে মাঝে কুরুচিপূর্ণ নৃত্যগীতও প্রয়োগ করা হ'ত। বিকৃতরুচির জন্য উনিশ শতকে স্ত্রীলোকের পক্ষে এবং রুচিশীল শ্রোতার পক্ষে যাত্রা শোনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কুরুচিপূর্ণ যাত্রা থেকে শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বদাই দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। এ হেন অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনোমোহন বসু যাত্রা-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। অবশ্য এর পূর্বে উনিশ শতকের প্রথমে কেঁদুলির শিশুরাম অধিকারী তার দলে যাত্রা-সংস্কারের সূচনা করেন। শ্রীদাম দাস ও সুবলদাস অধিকারীও সংগীতের দিক থেকে যাত্রার কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন করেছিলেন। কিন্তু মনোমোহন বসুকেই প্রকৃত প্রথম সংস্কারকরূপে ধরা যেতে পারে। দীর্ঘ সময় ধ'রে গায়নপদ্ধতির পরিবর্তন ক'রে, গানের সংখ্যা কমিয়ে, পাত্র-পাত্রীর কথা অধিকতর স্বাভাবিক ক'রে এবং ভক্তি-করুণ রসের যোগান দিয়ে জনগণের নাট্য-পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য তিনি যাত্রাধর্মী এক শ্রেণীর নাটক রচনা করেন। 'রামাভিষেক', 'হরিশ্চন্দ্র', 'রাসলীলা' প্রভৃতি এর সাক্ষ্য বহন করে। নাটকগুলি 'বৌবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ে' যেমন অভিনীত হ'ত, তেমনি 'রামমাস্টারের যাত্রাদল' কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হ'ত। মনোমোহনবাবু নাটক রচনা ক'রে এবং এবিষয়ে কিছু কিছু বক্তৃতা দিয়ে যাত্রা-সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিলেন মাত্র। কিন্তু যাত্রার প্রধান সংস্কারকরূপে দেখা দিলেন হুগলী কলেজের শিক্ষক মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। চন্দননগরের অধিবাসী মদনমোহন-প্রবর্তিত রীতি দ্বারা উনিশ শতকের যাত্রা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

আগে যাত্রায় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। রাণী ও মেথরাণীর পোশাকে পার্থক্য ছিল না। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালাগুলির প্রধান প্রধান চরিত্র উকিলের পোশাকে আসরে অভিনয় করা হ'ত। মদনমোহনবাবু প্রথম যাত্রায় রাজপোশাক প্রবর্তন করেন এবং উচ্চস্তরের চরিত্র ও নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র পোশাকের পার্থক্য বজায় রাখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। সেকালে যাত্রার সকল চরিত্রকেই নাচতে হ'ত। রাবণ-মন্দোদরী, রাম-সীতা, দশরথ-কৈকেয়ী, ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী, কংস, কৃষ্ণ, মালিনী, ভিস্তিওয়ালা সকলেই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করত। এই সব নাচে আবার খেমটার ঢং প্রচলিত ছিল। অভিনেতারা নাচ শিখে পটুত্ব অর্জন করে যে আসরে নাচতেন, এ-কথা মনে করা ভুল। সুনিয়ন্ত্রিত নৃত্য যাত্রার আসরে কদাচিৎ দেখা যেত। কাজেই অরুচিকর ও অসম্ভাবজনক নৃত্য বন্ধ করে দিয়ে মদনমাস্টার নৃত্যের উপস্থাপনারীতির পরিবর্তন করেন। পালায় নৃত্যের সংখ্যা কমে গেল; প্রত্যেক চরিত্রকেই আর নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে হ'ল না। পটু নৃত্যশিল্পী দিয়ে তিনি মাঝে মাঝে আসরে নাচের ব্যবস্থা করতেন।

দু একটি ছোট ছোট কথা, তারপরেই লম্বা লম্বা গান—এই রীতিতে যাত্রা চলত। কিন্তু মনোমোহন বসু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মদনমাস্টার যাত্রায় সংলাপের অংশ বাড়িয়ে দিলেন, গানের সংখ্যা দিলেন কমিয়ে এবং গায়ন পদ্ধতিরও সংস্কার করলেন। প্রচলিত চটুল সুরের পরিবর্তে রাগ-রাগিণী বজায় রেখে ভাব অনুযায়ী নানা ধরনের সুর তিনি গানে প্রয়োগ করেন। তাঁর গান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভৈরবী-একতালায় পরিবেশিত ও বহুপ্রচলিত মদনবাবুর একটি গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

"তাই ভাবিগো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে
কেমন ক'রে যজ্ঞে যাই বল না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাতো কবে না।।"
(দক্ষ-যজ্ঞ)

থিয়েটারে নারী স্ত্রী-ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করায় যাত্রার পুরুষ-কণ্ঠে স্ত্রী-চরিত্রের গান অধিকাংশ স্থলেই শ্রুতি-কঠোর মনে হতে থাকে। এক সংগে নারী-চরিত্রে অভিনয় ও চমৎকার গীতি পরিবেশন করার মত উপযুক্ত লোকও সচরাচর পাওয়া যেত না। পুরুষ-চরিত্রেও একই অবস্থা ছিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য মদনবাবু একই লোক দিয়ে অভিনয় ও গীতি-পরিবেশন করানো তুলে দিলেন। তিনি যাত্রায় জুড়ির গানের প্রবর্তন করলেন। পুরুষ-চরিত্রের গান বয়স্ক জুড়ির কণ্ঠে এবং স্ত্রী-চরিত্রের গান বালকদের কণ্ঠে পরিবেশিত হ'তে শুরু হ'ল। এর ফলে সংগীত সুশ্রাব্য হয়ে ওঠে। মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ পালাকার এই রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যাত্রানাটক রচনা করতে থাকেন এবং সাঁতরা কোম্পানী, ত্রৈলোক্য পাইন, বৌকুণ্ড ও অন্যান্য যাত্রা সংস্থায় মদনমাস্টার প্রবর্তিত পথে গীত পরিবেশিত হ'তে আরম্ভ করে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও যাত্রায় ঐকতান বাজানো হ'ত। পেশাদার দল অপেক্ষা শৌখিন দলের ঐকতান অধিক সুশ্রাব্য হ'ত। কারণ অধিক অর্থ ব্যয় ক'রে ঐকতানের জন্য বিভিন্ন নিপুণ বন্ত্রী নিয়োগ করা পেশাদার সংস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তথাপি যাত্রায় ঐকতান বাদিত হত। কারণ ঐকতান বাদনে যেমন একটি সুরের পরিবেশ রচিত হয়, তেমনি শ্রোতাদেরও পালা আরম্ভের সময় জাগন জমানো সম্ভব হয়। বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় কয়েকটি ঐকতানের দল গঠিত হয়। বদুনাথ পাল, পার্বতীচরণ দাস ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর ঐকতানের দল খুব খ্যাতি অর্জন করে। এই সব দলে পরিবেশিত ঐকতানের ফলে এর প্রতি শ্রোতৃবর্গের আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে যায়। যাত্রায়ও এই ঐকতানের প্রভাব পড়ে। এই শতকের শেষের দিকের যাত্রার প্রতি অংকের পরে একটি ক'রে ঐকতান বাদিত হত। এরূপ জনপ্রিয় ঐকতানের কিছু কিছু উন্নতিও সাধিত হয়।

পূর্বে পেশাদার যাত্রার মাঝে মাঝে প্রলাপবাক্যের মত অসংলগ্ন ব্যঙ্গোক্তি ব্যবহৃত হ'ত। দলের বন্ত্রীরা এই ব্যঙ্গোক্তি করতেন অভিনীত চরিত্রকে লক্ষ্য ক'রে। এই অসংলগ্ন কদর্য-রীতিকে মদনমাস্টার যাত্রার আসর থেকে বিদায় করেন। পরে অন্যান্য দলেও এর প্রয়োগ বন্ধ হ'তে থাকে। মদনবাবু 'আসরে প্যালা আদায়ের রীতি সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দেন। যাত্রার আসরে প্যালা একটি উপদ্রব স্বরূপ ছিল; এটা অধিকাংশ শ্রোতার মনঃ-

পুত ছিল না। কাজেই মদনমাস্টারের যাত্রায় দর্শক সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। মদনবাবুর প্রভাবে অন্যান্য যাত্রাসংস্থায়ও প্যালারীতি বন্ধ হ'তে অরম্ভ করে।

এইভাবে নানাদিক থেকে মদনমোহন যাত্রার সংস্কার করায় ঊনিশ শতকের তৃতীয় পাদে যাত্রার আসরে রুচিশীল শ্রোতার উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। মতি-রায়, ব্রজ রায় প্রমুখ পেশাদার অধিকারীরা মার্জিত যাত্রা পরিবেশন করতেন। তাই কেশবচন্দ্র সেনের বাটীতে মতি রায়ের যাত্রায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন।

ঊনিশ শতকে প্রবর্তিত রীতি অনুযায়ী বিংশ শতকে যাত্রা রচিত ও পরিবেশিত হ'তে আরম্ভ করে। এই শতকের যাত্রায়ও রীতি অনুযায়ী সময় সময় নানা পরিবর্তন-সংস্কার সাধিত হয়েছে। যে জুড়িগান এক সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, এই শতকের শ্রোতারা তাকে আর বেশীদিন বরদাস্ত করতে চাননি। কাজেই যাত্রা-লেখক ও পালাপ্রযোজককে এবিষয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। অহিভূষণের নাটকে বিবেকের গানের সূচনা হয়—এই শতকের প্রথমদশকে। বিবেকের গান যাত্রায় জন-প্রিয় হয়ে ওঠে। এবং সঙ্গে সঙ্গে জুড়ির গান জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রায় জুড়ির গান প্রয়োগ করেননি। সুতরাং জুড়ির গান ছাড়াও যে যাত্রা জনপ্রিয় হ'তে পারে, একথা বুঝতে কারো বাকি রইল না। দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জুড়িগান বজায় থাকে। তৃতীয় দশকে এর প্রয়োগে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ের উক্তিগীতিগুলি জুড়ি দিয়ে না গাইয়ে একটি গায়কের দ্বারা পরি-বেশিত হতে আরম্ভ করে। দলের প্রধান গায়ককেই এই গানের অংশ গ্রহণ করতে হত। মতিলাল ঘোষ, হারাধন রায়, অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রমুখের পালায় এই শ্রেণীর গীত সন্নিবেশিত হয়। যাত্রা-পালায় এই প্রধান চরিত্রটি ক্রমে বিবেক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয় দশকের শেষ ভাগ থেকে বিবেক চরিত্র যাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বলে বিবেচিত হ'তে আরম্ভ করে। এই চরিত্র ধর্ম, মন, জ্ঞান, দৈব, সুদর্শন, বিবেক প্রভৃতি নামে বিভিন্ন পালায় চিহ্নিত হ'ত। এই ধরনের রূপক নামের আড়ালে থাকায় চরিত্রটি যে কোন সময় যে কোন স্থানে উপস্থিত হয়ে সংগীতে বক্তব্য পরিবেশন করতে পারত।

ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে থিয়েটারে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। থিয়েটারী নাটকে সখীনৃত্য জন-প্রিয় হয়ে ওঠে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এই শ্রেণীর নৃত্যগীত তাঁর পালায় সংযোজন করেন। মথুরানাথ সাহার দলে হরিপদ-বাবুর নাটক পরিবেশিত হয়ে এই নৃত্য-গীত খুব জনপ্রিয় হয় এবং এই সময়ের নৃত্য-গীত যাত্রা-ব্যালে নামে পরিচিতি লাভ করে। এরপর থেকে বিভিন্ন পালাকার যাত্রায় ব্যালে-গীতি সন্নিবেশিত করেন. বাঈজীগণ, নর্তকীগণ, সখীগণ, বনদেবী-গণ, অপসরাগণ যাত্রা-ব্যালে পরিবেশন করে। 'ব্যালে' যাত্রার একটি বিশিষ্ট অঙ্গে পরিণত হয়।

ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে অত্যন্ত দীর্ঘ সংলাপ যাত্রায় প্রচলিত হয়। এই শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল। তৃতীয় দশক থেকে সংলাপ অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে আসে। এর মূলে রয়েছে অভিনয়ের বাস্তবতার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। অঘোরচন্দ্র, ভোলানাথ রায়, রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁদের পালায় অত্যন্ত দীর্ঘ সংলাপের পরিবর্তে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তাইচরণ সরকার এই সময় পালায় ছোট ছোট সংলাপ সংযোজন করে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেন। গৈরিশছন্দ খুব জনপ্রিয় হওয়ায় যাত্রাপালায় বিংশ শতকে এর বহুল প্রচলন হয়। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের সংলাপ অমিত্রাক্ষর অপেক্ষা গৈরিশছন্দেই অধিক রচিত হয়েছে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও যাত্রার কিছু কিছু সংস্কার যে না হয়েছে তা নয়। নৃত্য-গীতের ব্যাপক চর্চার ফলে এ সম্পর্কে লোকের দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। তাই পূর্বপ্রচলিত আদিরসাত্মক খেউড়-গীতি, গণের গান ও ব্যালে নাচ জনগণের তৃপ্তি বিধানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। নাটকেও আর উক্তিগীতি, গণের গান এক

গান-গীতি সন্নিবেশিত হচ্ছে না। যাত্রার দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহারের সাধারণ রীতিও পরিত্যক্ত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্র নাথ, জিতেন বসাক, সত্যপ্রকাশ দত্ত, কানাই নাথ প্রমুখের নাটকে এর পরিচয় রয়েছে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালের যাত্রাপালায় ছোট ছোট সংলাপ যোজনার বিশেষ প্রচলন করেন ব্রজেন্দ্রকুমার। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমারের 'মায়ের ডাক', 'বর্গী এল দেশে' প্রভৃতি পালার উল্লেখ করা যায়। যাত্রার আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে নারী-চরিত্র অভিনয়ের দিক থেকে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব থেকে যাত্রায় স্ত্রী-ভূমিকায় নারী অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। বর্তমানে পেশাদার যাত্রার এটি একটি বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে। পূর্বে যে যাত্রায় এ চেষ্টা হয়নি, তা নয়। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ভবতারিণী, ত্রৈলোক্যতারিণী তাঁদের দলে নারী দ্বারা স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তখন যাত্রায় সে রীতি অন্যান্য দলে গৃহীত হয়নি।

বিভিন্ন সময়ে যুগরুচি অনুযায়ী যাত্রার সংস্কার হয়েছে। যাত্রা চিরকাল একই-ভাবে রচিত ও পরিবেশিত হয়নি। বর্তমানের যাত্রাপালারও সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এখনো যাত্রায় 'একালে বালক চরিত্র' সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু এই বালক চরিত্রের বয়স ও শিক্ষার কথা বিবেচনা করে অনেক যাত্রা-নাট্যকারের পালায় সংলাপ সন্নিবেশিত হয় না। বিবেক চরিত্র যাত্রার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই চরিত্রটি আর রূপকচরিত্র নয়। বিবেক এখন বাস্তব চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে; অথচ এই চরিত্র সংযোজনার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়নি। বাদশাহের কক্ষে, কুচক্রীর মন্ত্রণালয়ে, প্রেমিকের নির্জন গৃহে, রাজার দরবারে এ চরিত্র অবাধে ঘুরে বেড়ায়। এই চরিত্র-চিত্রণে পালাকারদের অনেকেই স্থান-কালের বাস্তবতার কথা একেবারেই চিন্তা করেন না। পরিচিত যাত্রা-নাট্যকারদের পালায়ও বহু স্থলে ঘটনা-সংস্থাপনে বাস্তবতাবোধ ও সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় রাখা হচ্ছে না। স্থান কাল বিবেচনা না ক'রে পাত্র-পাত্রীর উপস্থাপনা, আজগুবি পরিকল্পনা দ্বারা নাটককে ভারাক্রান্ত করা, যেযুগে পিস্তলের ব্যবহার কল্পনাতীত সেযুগের কাহিনীতেও পিস্তল বাগিয়ে কার্যোদ্ধার করায় দ্বিধাহীনতা, একের পর এক অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমস্যার সস্তা সমাধান করা, অশিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প শ্রোতৃমণ্ডলীর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পালায় নানা রকম চমৎকারিত্ব সৃষ্টি ক'রে তাক লাগাবার প্রচেষ্টা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যাত্রা-নাট্যকারদের অনেকেই কল্পনা-দৈন্যের পরিচয় দিচ্ছেন। কিছুকাল ধরে যাত্রাপালা একটি বাঁধাছকে রচিত হচ্ছে। এ জাতীয় পালা কখনো কাল্পনিক নামে চিহ্নিত হচ্ছে, কখনো বা ঐতিহাসিক বলে প্রকাশিত হচ্ছে। পালা কাল্পনিক নামে চিহ্নিত হ'লে তাতে আর ঘটনার সম্ভাব্যতা বজায় রাখা হয় না; এই শ্রেণীর পালায় রাজা-বাদশার আবির্ভাব ঘটলেও তাতে ইতিহাসের কোন পরিচিত নাম থাকে না। পালা ঐতিহাসিক হলে দু একটি চরিত্র ইতিহাস থেকে নেওয়া হয় বটে। কিন্তু বেশির ভাগ লেখকের নাটকে যুগপরিবেশ, ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের বিশেষ কোন যোগ থাকে না। ফলত পরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্রও অস্বাভাবিক অদ্ভুত রূপ ধারণ করে। বর্তমানের সচেতন লেখকের রচনায় এটা একেবারেই কাম্য নয়। কাজেই যাত্রানাট্যকারদের অনেকেরই পালারচনায় নাট্যকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ সংস্কার বাঞ্ছনীয়। লোকচিত্তের নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করার দায়িত্ব কেবল লোকনাট্যকারদের নয়, লোক-নাট্য পরিবেশক সংস্থারও বটে। কাজেই যাত্রাপরিবেশক অধিকারীদের এই সব দোষ-ত্রুটি, অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য কোন কোন সংস্থা যে এবিষয়ে কিছু কিছু দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে শুরু না করেছেন, এমন নয়। প্রসঙ্গত সত্যম্বর অপেরা, তরুণ অপেরা, নাট্য-ভারতী প্রভৃতি সংস্থার নাম করা যেতে পারে। নৃত্য, ঐকতান, ঐতিহাসিক পালার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা, পালারচনায় বাস্তবতাবোধকে অবলম্বন করা, যুগ-সমস্যাকে তুলে ধরা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সংস্থা কয়টি সংস্কারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু পরিচয় দিচ্ছে—একথা বলা যায়।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

যাত্রাজগৎ

ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাদশাহী আমলে রঙ্গমঞ্চকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু শাসনদণ্ডের নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় জনগণের মন থেকে নাট্যস্পৃহাকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই মঞ্চাভিনয়ের পরিবর্তে দেখা দিয়েছিল যুক্তপ্রদেশে (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) 'নৌটঙ্কী', বিহারে 'রামলীলা' এবং আমাদের বাঙলাদেশে 'যাত্রা'। আজও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি প্রথম যাত্রাভিনয়টি আমাদের এই বাঙলাদেশের—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান, উভয়ের সম্মিলিত নাম যে-বাঙলা দেশ, সেই দেশের ঠিক কোন্ জায়গাটিতে কবে কার নেতৃত্বে কোন্ দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে আজও রীতিমত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদগ্ধজন। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, স্নানযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে 'যাত্রা' কথাটি যুক্ত থাকার জন্যেই, বোধ করি, আমাদের যাত্রাভিনয় পূর্বে ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হ'ত ব'লে অনুমিত হয়েছে। যাত্রার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এইখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বৈষ্ণব সাহিত্যপাঠে জানা যায়, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদ যাত্রাভিনয় করেছিলেন। বর্ধমান শহরের পূর্বদক্ষিণে 'কানাই নাটশাল' নামক জায়গাটি তাঁর এই যাত্রাভিনয়ের অন্যতম স্থান হিসেবে সুপরিচিত।

অতীতকে ত্যাগ ক'রে বর্তমান যুগে চ'লে আসবার আগে আমাদের কৈশোর ও প্রথম যৌবনে শহর-কলকাতায় যে-সব পেশাদারী যাত্রাদলকে আমরা ধনীর গৃহপ্রাঙ্গণে ও সাধারণের বাজারে অভিনয় করতে দেখেছি, তাদের মধ্যে মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি, ভাণ্ডারী অপেরা, সত্যম্বর অপেরা এবং মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রাপার্টির নাম আজও স্মৃতির পাতায় জ্বল্ জ্বল্ করছে। প্রথমে থিয়েটার ও পরে সিনেমার দাপটে কল্‌কাতার যাত্রাসম্প্রদায়গুলিকে শহরের বুকে আসর পাতবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে মফস্বলের দূরদূরান্তরে—আসামের চা-বাগান, রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া-ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের কয়লাখনি বা আসানসোলের শিল্পাঞ্চলকে নিজেদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করতে হয়েছিল। কিন্তু যাত্রাজগতের পক্ষে আশার কথা, বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ প্রমুখ নাট্যোৎসাহী সংস্থাগুলির চেষ্টায় গেল পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে কলিকাতাবাসী নাগরিকবৃন্দের মধ্যে আবার নতুন ক'রে যাত্রাভিনয় দেখবার জন্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। শোভাবাজার রাজা রাধাকৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে এবং রবীন্দ্রকাননে (পূর্বতন বিডন উদ্যান) অনুষ্ঠিত যাত্রা-উৎসবে উপস্থিত অভূতপূর্ব জনসমাগম বিভিন্ন যাত্রাদলকে এই শহরের বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ, মহাজাতি সদন, ত্যাগরাজ হল, পার্কসার্কাস ময়দান প্রভৃতি স্থানে যাত্রাভিনয়ের আসর বসাতে সাহসী করেছে। এবং তাঁদের এই সাহস বহুলাংশে ফলপ্রসূও যে হয়েছে, এ-কথা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে কল্‌কাতা শহরে—প্রধানত রবীন্দ্রকাননন-এর নিকটবর্তী দাক্ষণে নতুন বাজার থেকে শুরু ক'রে উত্তরে বেনেটোলা পর্যন্ত বিস্তৃত রবীন্দ্র সরণির উভয় পার্শ্বে —অন্তত সতেরোটি পেশাদারী যাত্রাদলের নাম দেখতে পাওয়া যায়। এ'দের নাম হচ্ছে: (১) সত্যম্বর অপেরা, (২) তরুণ অপেরা, (৩) নিউ প্রভাস অপেরা, (৪) ভারতী অপেরা, (৫) অম্বিকা নাট্য কোম্পানী, (৬) শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী, (৭) নবরঞ্জন অপেরা, (৮) নিউ আর্য অপেরা, (৯) নিউ রয়াল বীণাপাণি, (১০) নাট্যভারতী, (১১) জনতা অপেরা, (১২) কালিকা নাট্য কোম্পানী, (১৩) শ্রীমা নাট্য কোম্পানী, (১৪) মধুবা নাট্য কোম্পানী, (১৫) কুণ্ডু নাট্য কোম্পানী, (১৬) মীনা ভ্যারাইটিজ এবং (১৭) নট্ট কোম্পানী। এ'দের মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকদের অবগতির জন্যে নীচে দেওয়া হ'ল।

১। সত্যম্বর অপেরা: (৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

এইটি হচ্ছে বর্তমান বাঙলার প্রাচীনতম যাত্রাসংস্থা। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি বাঙলা ১৩০০ সাল থেকে প'চাত্তর বছর ধ'রে বাঙলা, বিহার এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে যাত্রাপালা পরিবেশন ক'রে আসছে। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলমণি বিশ্বাস, প্রভাতরঞ্জন বসু, গুরুপদ ঘোষ, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যাত্রাজগতের বিশিষ্ট শিল্পী এই সংস্থায় অভিনয় ক'রে গেছেন। যাত্রাজগতের শীর্ষস্থানীয়, আকাদামী পুরস্কারের জন্যে মনোনীত যাত্রাসূর্য ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ বর্তমানে এই সংস্থার নাট্য-শিক্ষক এবং প্রধান অভিনেতারূপে বিরাজ করছিলেন। "পদধ্বনি" নাটকে অভিনয় করতে করতে তাঁর সহসা অসুস্থ হয়ে পড়া এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরলোকগমন করা সংস্থার পক্ষে একটি মর্মান্তিক ঘটনা।

যশের সঙ্গে পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক পালা অভিনয়ের পরে বর্তমানে এই সংস্থা বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে রচিত যুগোপযোগী সামাজিক পালা 'একটি পয়সা' ও 'পদধ্বনি' অভিনয় ক'রে দর্শকগণের প্রশংসাভাজন হয়েছে।

যাত্রার সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সংস্থার অধিকারী শৈলেন মোহান্ত, বি-কম, রবীন্দ্র-

ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে তাঁদের নাট্য-উপদেষ্টার পদে বৃত করেছেন। এছাড়া নৃত্য পরিচালনায় আছেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ লাহিড়ী এম-এ এবং ঐকতানরচনায় আছেন তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় (উভয়েই রবীন্দ্র-ভারতীর)। সংস্থার ম্যানেজার, সহ-ম্যানেজার ও জন-সংযোগকারী হচ্ছেন যথাক্রমে সুবলচন্দ্র অধিকারী, নিরঞ্জন সাহা ও মধু বড়াল। বাংলা ১৩৭৫ সাল সংস্থার হীরকজয়ন্তী বর্ষ। এই বর্ষে সংস্থার ভূতপূর্ব অধিকারী, লোক সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারী 'গৌরচন্দ্র দাসের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাত্রাজগতে অভিনব ও প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে একটি 'যাত্রা লাইব্রেরী' স্থাপন করা হবে।

২। **তরুণ অপেরা** : (১১৩, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

গেল তিন দশক ধ'রে এই সংস্থাটি প্রখ্যাত যাত্রাপালাকারদের রচনা বাঙলা এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সুখ্যাতির সঙ্গে পরিবেশন ক'রে আসছে। বর্তমানে তরুণ অপেরা নতুন আদর্শ নিয়ে নতুন নতুন পালা পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছে। এই সংস্থার বর্তমান নাট্য নিবেদন, শম্ভুনাথ বাগ রচিত "হিটলার" দর্শক সমাজে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। এ'দের অন্যান্য জনপ্রিয় পালা হচ্ছে: (১) সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রামমোহন', (২) সত্য মুখোপাধ্যায়ের 'ফকীর সুলতান' ও (৩) ঘুমভাঙার গান। 'হিটলার'-এর নির্দেশনায় আছেন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক অমর ঘোষ। দলের শিল্পী হচ্ছেন শান্তিগোপাল, শিব ভট্টাচার্য, সুদেশকুমার, সুশান্তকুমার, অজিত দত্ত, বর্ণালী, সুপর্ণা, আরতি দত্ত প্রভৃতি। সংস্থার সত্ত্বাধিকারী হচ্ছেন সুধীরকুমার মণ্ডল, প্রয়োজক বীরেন্দ্রনারায়ণ পাল এবং ম্যানেজার তারাপদ ঘোষ ও পরিতোষ ধাড়া।

৩। **নিউ প্রভাস অপেরা** : (৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

প্রভাস অপেরার জন্ম হয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা ১৩২৫ সালে। কিন্তু ১৩৭৩-এর শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সংস্থার বর্তমান মালিক দীনবন্ধু গুছাইত তাঁর অনুজপ্রতিম রমেন বসু মল্লিকের ওপর সংস্থা পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ ক'রে শুরু করেন নিউ প্রভাস অপেরার নতুন অভিযান। সেই বছরই নূতনত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাঁরা উপহার দিয়েছিলেন "বাঁচতে দাও" পালা-নাটক। এ বছর অভিনব যাত্রাস্কোপে অভিনীত "পাগলঠাকুর" তাঁদের জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। এ'দের সামাজিক পালা "নাগরদোলা" এবং হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাকে অবলম্বন ক'রে রচিত "কাল পুরুষের ডাক" দর্শকরা সাদরে গ্রহণ করেছে। এই সংস্থার শিল্পী হিসেবে রয়েছেন : নটশেখর পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় হালদার, অনাদি চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নট-নাট্যকার দেবেন নাথ, নিমাই দত্ত, অতুল ভট্টাচার্য, জয়ন্তকুমার, সুবর্ণ সামন্ত, কৃষ্ণকুমার, হাস্যসম্রাট রাধারমণ পাল, বীণা ঘোষ, রীতা দত্ত, অনিলা ভট্টাচার্য এবং অরুণ গোস্বামী। সংগীতে আছেন বসন্ত বৈদ্য ও সীতাংশু ধাড়া। নৃত্যে আছেন মিস্ চুমকী। সংস্থার নাট্য পরিচালক, কার্যাধ্যক্ষ, ম্যানেজার ও সহ-ম্যানেজার হচ্ছেন যথাক্রমে পূর্ণেন্দু-

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভৈরব ওঝা, চন্দন মিত্র ও সনৎ ঘোষ।

৫। ভারতী অপেরা : (১১৩, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

মাত্র কয়েক বছর আগে রামপদ পাত্রের উৎসাহে, কালীপদ ঘোষের অধিনায়কত্বে, জানকী মেন্দার কর্মকুশলতায় ও ননী ভট্টের নির্দেশে এই যাত্রা সংস্থাটির জন্ম হয় নাথ কোম্পানীর পোশাকের দোকানে। এর পরে সত্যম্বর অপেরার গদি থেকে হরিপদ বায়েনের সাহচর্যে বিজয় মিত্রের পরিচালনায় সংস্থার গদি স্থাপিত হয় শোভাবাজারের মোড়ে। কিন্তু শীঘ্রই গদিটিকে পুরোপুরি যাত্রা-পাড়ায় স্থানান্তরের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং নিরাপদ দাসের অকৃত্রিম সাহায্য বলে শম্ভু ঘোষের যুক্তি অনুসারে বর্তমান ঠিকানায় সংস্থার অফিসটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। যাত্রাজগতের খ্যাতিমান নাট্যকারদের পালা শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে অভিনয় ক'রে সংস্থাটি যথেষ্ট সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমান বছরে ব্রজেন দের ঐতিহাসিক নাটক "পাপের ফসল" এবং আনন্দময় রচিত সামাজিক চিত্র "মণিকাঞ্চন"—এই দুটি পালা তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়, পান্না চক্রবর্তী, চিত্রা মল্লিক প্রভৃতি।

সংস্থাটির মালিক, সর্বাধিনায়ক ও ম্যানেজার হচ্ছেন যথাক্রমে উমাশংকর ঘোষ, কালীপদ ঘোষ ও জানকী মেন্দা।

(৫) অম্বিকা নাট্য কোম্পানী : (১১৭।১, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

এই সম্ভ্রান্ত যাত্রাসংস্থাটি বহু বছর ধ'রে আসাম ও বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পালা পরিবেশন ক'রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। অতীতে যাত্রাজগতের প্রখ্যাত নট পরলোকগত কালীয়দমন গুহঠাকুরতা এই সংস্থার প্রধান অভিনেতা ছিলেন। বর্তমানে এর শিল্পিসংস্থায় আছেন প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা চন্দ্রশেখর দাশ, নাট্যপরিচালক অমিয় বসু, দেবকুমার, ছবি রায়, রীণা দেবী, মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংস্থা এ বছরে অভিনয় করেছেন মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের "আকাশ অনেক বড়", কানাই নাথের 'গড় নাশিমপুর' এবং ব্রজেন দের 'কালাপাহাড়'। দেবেন নাথের 'মৃত্যুর চোখে জল' অভিনয় ক'রে এ'রা প্রচুর সুনাম পেয়েছেন। দলটি ম্যানেজার অনিল দাসের কর্মনৈপুণ্যে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

৬) শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী : (১১৭।১, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

অল্পকালের মধ্যেই এই যাত্রাসংস্থাটি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। সংস্থা পরিচালক অশ্বিনীকুমার দাস এবং নাট্য পরিচালক ও দলের শ্রেষ্ঠ নট সুজিত পাঠকের অধিনায়কত্বে ব্রজেন দের 'সম্রাট কায়কোবাদ', জীতেনবাবুর 'ফরিয়াদ', কানাইবাবুর 'লক্ষ্মী এলো ঘরে' এবং নির্মলবাবুর 'পথের ছেলে' নামক পালাগুলি এ'রা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করছেন। সংস্থাটির শিল্পীদের মধ্যে শ্রীপাঠক ছাড়াও আছেন বিমল লাহিড়ী, অজিত সাহা, ছবি কর, ছবি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নৃত্য প্রদর্শনের জন্যে আছেন অনিল ঘড়ুই, অর্জুন ঘড়ুই, জয়দেব প্রভৃতি।

৭। নবরঞ্জন অপেরা : (১১৭, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

এই যাত্রাসংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের পালা পরিবেশন ক'রে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সত্ত্বাধিকারী জীবনকৃষ্ণ দাস ও সংস্থাপরিচালক শম্ভুনাথ ঘোষের নেতৃত্বে স্বপনকুমার, অনিল রায়, মধু মল্লিক, মোহন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চপলরাণী, রূপালী, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, তিলোত্তমা প্রভৃতি শিল্পী দ্বারা অভিনীত এ'দের যে-সব পালা দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করে, তার মধ্যে আছে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'মাইকেল মধুসূদন' ও রাষ্ট্রবিপ্লব, ব্রজেন দে রচিত 'নেকড়ের থাবা', সত্যপ্রকাশ রচিত 'নূতন প্রভাত' এবং আনন্দময় রচিত 'দেবাগিরি'। এ'দের দলে আছেন উদীয়মান সংগীতসুধাকর সুধীর ধাড়া ও নৃত্যগীতপটিয়সী মীরা গুপ্তা।

৮। জনতা অপেরা : (১১৭, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

নবরঞ্জন অপেরার সগোত্র প্রতিষ্ঠানটি লালমোহন দাসের সত্ত্বাধিকারিত্বে এবং শম্ভুনাথ ঘোষের কর্মপরিচালনাধীনে মাটির কান্না (ব্রজেন দে), অঙ্গার (সত্যপ্রকাশ), অশান্ত-ঘূর্ণী (প্রসাদ ভট্টাচার্য), শুভলগ্ন (কানাইনাথ) প্রভৃতি পালা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করছেন। এ'দের দলে আছেন নট-জ্যোতি দিলীপকুমার, তপনকুমার, অজিত মুখোপাধ্যায়, অমূল্য ভট্টাচার্য, বেলা সরকার প্রভৃতি শিল্পী। সংগীত পরিবেশন করেন শৈলেন ঘোষ ও ছটু কাওয়াল এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন ওমপ্রকাশ, শশীকলা, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় ও মালা চক্রবর্তী। দলের ম্যানেজার হচ্ছেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধুপ্রসাদ রায়।

৯। নিউ আর্য অপেরা : (১১৯, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

যাত্রা ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজনা করেছেন গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই যাত্রাপ্রতিষ্ঠানটি মঞ্চখ্যাত নট-নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্তের রচনা "রাইফেল" যাত্রানাটকটিকে তাঁরই পরিচালনাধীনে মঞ্চস্থ করে। এই পালাতে শ্রেষ্ঠাংশ রহমৎ সেখ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যাত্রাযাদুকর পঞ্চু সেন। এবং তাঁর সঙ্গে থাকেন নট-নায়ক নিতাই দাস, নট-নাট্যকার আনন্দময়, দুর্গাদাস, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধা বারিক, শেফালী, লতা, স্বপ্না ও শংকর দল। এ'দের পরিবেশিত আরও দুটি পালা হচ্ছে শান্তিরঞ্জন দে'র 'নূরজাহান' ও সত্যপ্রকাশ দত্তর 'বিষ পাথর'।

১০। নিউ রয়্যাল বীণাপাণি অপেরা : (১১৭, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬)

'মূর্খের পাঁচালী', 'স্বামী বিবেকানন্দ', 'লাল রাজপথ' প্রভৃতি পালা অভিনয় করে সুনাম কেনবার পরে এই সংস্থাটি কালীপদ সরকারের নির্দেশনায় ব্রজেন দে রচিত 'ঝড়ের দোলা' পালাটি সগৌরবে অভিনয় করে চলেছেন। চিত্রাভিনেতা দীপক মুখোপাধ্যায়, বিজন মুখোপাধ্যায়, পালান নস্কর, দিলীপ চৌধুরী, বিভূতি পাণ্ডে, গোকুল দে, ছবিরাণী, তনুশ্রী রায়চৌধুরী, ফিরোজাবালা প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে গানে আছেন তিনকড়ি ভট্টাচার্য এবং নৃত্যে আছেন নমিতা দাস। এই পালাতে সুর সৃষ্টি করেছেন যাত্রাজগতে বিখ্যাত সুরকার অমিয় ভট্টাচার্য। আরও যে-দুটি পালা এ'রা নতুন তৈরী করেছেন, সেগুলি হচ্ছে : 'দেবতার মৃত্যু' এবং 'এক টুকরো রুটি'।

১১। শ্রীমা নাট্য কোম্পানী : (৩৫০এ, রবীন্দ্র সরণি কলিকাতা-৬)

এই যাত্রাসংস্থাটি অল্পকালের মধ্যেই যে সুনাম অর্জন করতে পেরেছে, তার মূলে আছে দলের পরিচালক দীনেশ নন্দী ও ম্যানেজার কালিপদ বিশ্বাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। প্রতিভাধর শিল্পী দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এবং শ্রীচট্টোপাধ্যায়, কনকলতা, প্রফুল্ল গোস্বামী, অমিতাভ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত গৌতম, শ্যামশ্রী মজুমদার, সোনালী গোস্বামী প্রভৃতি শিল্পীর অভিনয়গুণে এ'রা ব্রজেন দে রচিত সোনাই দীঘি, শান্তিরঞ্জন দে রচিত রাক্ষসী পদ্মা এবং ওমর খৈয়াম, সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত তৃষ্ণা ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত

বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি পালা অত্যন্ত সগৌরবে অভিনয় ক'রে চলেছেন। এই দলে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বুলবুল ও হংসোরি হালদার।

হাওড়া সমাজ

হাওড়ার বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নাটুকে ব্যক্তি। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ছিল অসামান্য। ১৯২০-র দশকে কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি শৌখিন গীতাভিনয় বা যাত্রাভিনয় সম্প্রদায় গজিয়ে উঠেছিল। ১৯২২-এ কুমারটুলিয়াটোলা বাণীবৈঠক অমৃতলাল বসু রচিত 'বিজয়বসন্ত' নাটকটি যাত্রাপালা রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। ১৯২৩-এ রাজবল্লভপাড়া গীতাভিনয় সমিতি গিরিশ দৌহিত্র দুর্গাপ্রসন্ন বসুর অধিনায়কত্বে করেছিলেন 'ভীমার্জুন' পালাগান। এর কিছু পরে দীনবন্ধু লেনের বারবেলা বৈঠক অাচার্য মন্মথমোহন বসুর পুত্র অমিতাভ বসুকে নাম-ভূমিকায় রেখে 'ভীষ্ম' গীতাভিনয়ের আসর বসিয়েছিলেন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ। বৌবাজারের জেলেপাড়ায় প্রখ্যাত পাঁচালী-বিশারদ জ্যোতিশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে তাঁরই রচিত 'জগন্নাথ' নাটকের যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতাতেও এই ধরনের একাধিক যাত্রাপালা গাওয়া হয়েছিল ঐ সময়ে।

নাটুকে বিশ্বরঞ্জন শহুরে শিক্ষিত সমাজের যাত্রাভিনয়ের প্রতি এই আগ্রহাতিশয্য নিশ্চয়ই সকৌতুকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর বাড়ীর বাইরের রোয়াকে বসে তাঁর নাট্যোৎসাহী বন্ধুদের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনাও করেছিলেন এবং নিজেরা যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে কিছু করতে পারেন কিনা, সে চিন্তাও করেছিলেন। বিশ্বরঞ্জনের মাথায় এসেছিল, যাত্রাভিনয়ের জন্যে এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে, যার প্রস্তুতিতে পোশাক-আশাকের দিক দিয়ে খরচ পড়বে কম, অথচ যার দর্শক-মাতানোর ক্ষমতা হবে খুব বেশী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, গৌরাঙ্গ-জীবনী অবলম্বনে একখানি পালাগান তৈরী করলে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। লোক লাগবে বেশী! তা তাঁদের দলে ত নাট্যোৎসাহীর অভাব নেই এবং বেশ ভালো গাইয়েও আছে দু'পাঁচ জন। অতএব যেমন ভাবনা, তেমনই কাজ। সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকণ্ঠ বন্ধু হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরাপর সমভাবনার ভাবুক বন্ধুদের সাহচর্যে বিশ্বরঞ্জন বাবু ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে গড়ে তুললেন 'হাওড়া সমাজ'। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য-লীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস'কে অবলম্বন করে তিনি নিজে গাঁথলেন 'নদের নিমাই' যাত্রাপালা। বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনা থেকে সংগ্রহ করলেন অন্তত তিরিশখানি গান ঐ পালায় অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে এবং পালায় গাঁথবার উপযোগী করে তাদের কিছুটা পরিবর্তনও করে নিলেন। যন্ত্রীসংঘ তৈরী হয়ে গেল। ব্রজেনবাবু হলেন সঙ্গীত-পরিচালক। বন্ধু হৃষিকেশকে দেওয়া হল নিতাইয়ের ভূমিকা, ঐ ভূমিকারই নাচগান বেশী। নিমাইয়ের লোকোত্তর চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে নির্বাচিত হলেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়। হরিদাসের ভূমিকা দেওয়া হল দলের অন্যতম গায়ক কানাইলাল মুখোপাধ্যায়কে। বিশ্বরঞ্জনবাবু নিজে নিলেন 'মাধাই'এর ভূমিকা এবং 'জগাই' সাজলেন শচীন ভদ্র। নাটক মহলায় পড়ল; ব্রজেনবাবুর নেতৃত্বে গানের মহলা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে বিশ্বরঞ্জনবাবু এই গান-সংবলিত পালাটিকে যথার্থ বৈষ্ণব ভাবধারার সার্থক বাহক করবার জন্যে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীপাদ বিশ্বরূপ গোস্বামীর শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর আশীর্বাদপূত উপদেশ অনুসারে 'নদের নিমাই'কে ভক্তি-ভাগীরথীতে পরিণত করলেন। শ্রীখোল-বাদনে ও কীর্তন পরিচালনায় গোস্বামীজীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। দলটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে একটি কার্যনির্বাহক সমিতিও গঠিত হল। সমিতির সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ভক্তিভূষণ। দলের উপদেষ্টা, নাট্যাচার্য, সঙ্গীতাচার্য ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীপাদ বিশ্বরূপ গোস্বামী, বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যথারীতি মহলা সম্পূর্ণ হবার পর ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে 'নদের নিমাই' কীর্তনাভিনয়ের প্রথম আসর বসে বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিজ বাসগৃহের নাতিবৃহৎ উঠানটিতে। এই 'নদের নিমাই' কীর্তনাভিনয় প্রথম অভিনয়েই এমন সাফল্য লাভ করে যে, হাওড়া ও শিবপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সানুনয় আহ্বান আসতে শুরু করে আসর বসাবার জন্যে। ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এমনই এক আসরে 'নদের নিমাই' বাংলা তথা ভারতের পরম শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজীর আশীর্বাদপূত হয়। সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে গঙ্গা

গায় হয়ে পূর্ব কুলস্থ খাস কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় 'হাওড়া সমাজে'র নদের নিমাই'-এর আসর বসতে লাগল। এবং এরও পরে বাংলা দেশের মফস্বলে— শহরে ও গ্রামে, দূর-দূরান্তরে। এই 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয়ের জনপ্রিয়তা এমন প্রচণ্ড রকম বেড়ে গিয়েছিল যে, যেখানেই এর আসর বসত, সেখানেই চতুর্দিক থেকে লোক যেন একেবারে ভেঙে পড়ত। অভিনয় আরম্ভের বহু আগে থেকেই, অনেক ক্ষেত্রে দু আড়াই ঘণ্টা আগেই সেখানে আর তিল ধারণের জায়গা থাকত না। মনে পড়ে, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুজোর দালানের চত্বরে এমনি একটি আসরের কথা—যাকে বলে লোকারণ্য, ঠিক তাই। লোকে ঘামে গলদঘর্ম হয়ে পড়ছে, কিন্তু তাতে দ্রূক্ষেপ নেই। পালা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তন্ময়। গোড়া থেকেই যেন ভক্তির প্লাবন বইতে থাকে। গানে, নাচে, অভিনয়ে পালা জমজমাট। ওরই মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসা কুড়োতেন 'নিতাই'-এর ভূমিকায় হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে-নাচে-অভিনয়ে তিনি মাৎ করে দিতেন। তাঁর মুখের 'বলে দে রে নদেবাসী কে দেখেছিস তারে', 'আমি প্রেমের ভিখারী', 'বুক ভরে সে আছে বুকে', 'তোরা আয়রে, প্রেম নিবি আয়', 'মাধাইরে, তোর ভাবনা কি আর আছে' প্রভৃতি গান আজও আমার কানে বাজছে। জগাই-মাধাই উদ্ধারের দৃশ্য আজও ভোলা যায় না। ভক্ত হরিদাস-এর ভূমিকায় কানাইলাল মুখোপাধ্যায় যে-ভাবসমৃদ্ধ মধুর চরিত্রাংকন করতেন, তা দর্শকবৃন্দকে সম্পূর্ণ আপ্লুত করত।

হাওড়া সমাজের সভ্যগণ সকলেই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের সন্তান; ব্যক্তিগত জীবনে এ'রা কেউবা ব্যবসায়ী, আবার কেউ-বা চাকুরিয়া। এ'দের কাছে অভিনয় করা, গান গাওয়া বা যন্ত্রসংগীত বাজানো ছিল নেশা, কোনো দিনই তা পেশা হয়ে ওঠে নি। 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয় সংশ্লিষ্ট সভ্যদের মধ্যে কেউ কোনও দিন তাঁদের কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কথা কল্পনাও করতে পারেন নি। এ'রা কোনো জায়গায় অভিনয় করতে গিয়ে মাত্র খরচ-খরচা বাবদ সামান্য অর্থ গ্রহণ করতেন; এর বেশী কিছু নয়। বরং 'হাওড়া সমাজ' এই 'নদের নিমাই' কীর্তনাভিনয় করে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সেবাশ্রম, দরিদ্র ভাণ্ডার প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অর্থভাণ্ডার পুষ্টিতে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া যখনই জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত আর্তদের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করবার আহ্বান এসেছে, তখনই 'হাওড়া সমাজে'র সভ্যরা সানন্দে সে-ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

অবশ্য ধনী-মানী-গুণিজন দ্বারা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানপুষ্ট হয়ে হাওড়া সমাজের একটি অর্থভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। বিশ্বরঞ্জনবাবুর আগ্রহে ও শ্রীমদ রামদাস বাবাজীর অনুপ্রেরণা এবং আশীর্বাদে সেই অর্থ নিয়োজিত করে গেল ১৯৩৬ সালে নদের নিমাই মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দিরটি নির্মিত হয় এবং সেখানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি অভিনব প্রাণকাঁদানো শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু বৈষ্ণব ভক্ত, মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ এই নদের নিমাই মন্দিরে শুভাগমন করেছেন। দীর্ঘ বত্রিশ বছরে মন্দিরটি বর্তমানে জীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং এর আশু সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

হাওড়া সমাজ আজ পর্যন্ত 'নদের নিমাই' (নদীয়ালীলা) কীর্তনাভিনয় অন্তত ৬২৯ বার অনুষ্ঠিত করেছেন। এ ছাড়া 'নদের নিমাই' (নীলাচললীলা) ১৮৩ বার, প্রভাসলীলা ২৯ বার এবং বৃন্দাবনলীলা ৬২ বার এ'দের দ্বারা অভিনীত হয়েছে। এ'রা গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম'কে 'হরিবোলা' নামে যাত্রাপালায় রূপান্তরিত করে ২৯ বার অভিনয় করেছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে 'হাওড়া সমাজে'র কর্মকর্তাদের মধ্যে সভাপতি, নাট্যাচার্য, সঙ্গীতাচার্য ও সম্পাদকরূপে রয়েছেন যথাক্রমে শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

একটি শৌখিন যাত্রা সম্প্রদায়ের পক্ষে ১৯৩১ থেকে শুরু করে ১৯৬৮ পর্যন্ত আটত্রিশ বছর কাল ধরে টি'কে থাকা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। অবশ্য এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করায় সংস্থার যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই'-এর অভূতপূর্ব সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সিকদারবাগান নাট্যসমাজ খোলেন 'নদীয়াবিনোদ' (নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস) এবং শ্যামবাজার সুহৃদ সম্মিলনী অভিনয় করেন 'নদীয়াবিনোদ'। এ-দুটি পালাও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

বিরাট বড় আসর রঞ্জি স্টেডিয়ামে। হঠাৎ হৈ-হৈ উঠল। আকস্মিক আক্রমণে উদ্যোক্তারা বিব্রত ভীত। মাইকের সামনে গেলেই "থামুন দাদা" বলেই বিশৃঙ্খল চীৎকার। দক্ষযজ্ঞের মত সভা লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম। শিল্পীদের চোখে চিন্তার ছায়া—ইট-পাটকেল দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ে উদ্যোক্তারা মঞ্চে উঠতে সাহস করছেন না। পুলিশ চিন্তা করছেন "ড্র্যাসটিক স্টেপ" নেবেন কিনা। "কি ব্যাপার? দাঁড়াও দেখি" মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। "হেমন্তদা দেখুন না কি কান্ড—আমরা কি পয়সা খরচা করে এই সব আলতু-ফালতু প্রোগ্রাম শুনতে এসেছি?"—"আপনারা কি চান বোম্বের শিল্পীদের কাছে আমার মাথা হেঁট হোক? আপনাদের জন্য আমিই ওঁদের এনেছি।" বিরাট অডিটোরিয়ম-প্রান্তর মন্ত্রমুগ্ধ স্তব্ধতা। অমন কোন নামী শিল্পীকে আসরে উপস্থিত করলেন স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অর্কেস্ট্রা সেট করা থেকে কার কফির দরকার, কার জলের, সবেতেই তাঁর সজাগ তদারক। "হোলো? এবার বালসারা যাও—এখন সন্ধ্যা, এবার কিশোর।" তারপর হয়ত দেখা গেল কোন চান্স পাওয়া শিল্পী নাচ শেষ করতেই চায় না। "মরেছে। আবার ঝোলালো। এবার আর গোলমাল থামানো যাবে না।" ড্রপম্যানদের কাছে যেয়ে বললেন "ওহে এই তেহাই এর সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে ড্রপ ফেলে দাও নৈলে ব্যাচারাদের হাততালি খেয়ে ফিরতে হবে।...এবার উত্তম—ফের'র গাড়ী রেডি করে রাখ।" এমনি করে দেখা গেল অর্গানাইজাররা অডিয়েন্স হয়ে বসে শো দেখছেন আর প্রোগ্রাম কনডাক্ট করছেন—"হেমন্তদা" যেখানেই যান হেমন্তদার রোল একাধারে পারফরমার কাম কনডাকটরের—বলেছিলাম সেদিন রবীন্দ্রসদনের আসরে। "তোমরা ত আজ দেখছ যখন নাম-যশের তুঙ্গশিখরে। কিন্তু হেমন্ত যখন জুনিয়র আর্টিস্ট ছিল তখনই সব জায়গায় ওকেই কনডাক্ট করতে হোতো।" বললেন বিমান ঘোষ।

দায়িত্ব দেবার মত প্রশস্ত হৃদয় এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আছে বলেই সকল সময় সকল দায়িত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই হেমন্তদার ওপর এসে পড়ে। বোম্বের শানমার-বাজ মহল থেকে সুরু করে বাংলার দীনাতিদীন শ্রোতার কাছেও তিনি 'হেমন্তদা'—শুধু কি তাই? একবার গ্রীনরুমে দেখি সাজ-সজ্জার চটক অথবা রূপের বাহার নেই এমন কোন অভ্যাগতা যাঁর দিকে (উদ্যোক্তাদের নজর নেই) ভি আই পিদের পিছনে উইংস-এর এক কোণে সসংকোচে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান শুনছেন। হেমন্তবাবুর দৃষ্টি-প্রসাদ থেকে তিনিও বঞ্চিত হননি "অজিত আমায় একটা চেয়ার এনে দাও না ভাই"—তারপর স্বহস্তে সেই চেয়ারে অত্যন্ত সাদর আহ্বানে বসালেন যাঁকে তিনি সেই ভি আই পির পরিধির বাইরের অবজ্ঞাতা। "সে কি আপনি দাঁড়িয়ে" সলজ্জে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করতেই "আমরা যখন বসবার দরকার হবে আপনার কাছে চেয়ে নেব তখন আপনি দাঁড়াবেন"—ব্যস আর সেখানে দাঁড়ালেন না। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু এই সামান্য ঘটনার মধ্যে যে অসমান্য মনের দীপ্ত আভাষ ঝলকে উঠেছিল তার চকিত আলো আজও স্মৃতির আকাশকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। আর সেই মহিলা? তিনি কি কোনোদিন ভুলতে পারবেন এমন নামী মানুষের এমন সহৃদয় সৌজন্য? আর প্রতি মুহূর্তের এই সহজ বিনম্রতা স্বাবারীহীন সহজতার উৎস হোল সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। পপুলারিটির উন্নত শিখরে উঠে জনতার মতকে হেয় করবার মত শ্রেষ্ঠত্ব বোধ অথবা অহমিকা তাঁর নেই বলে সবারই শ্রদ্ধেয় হতে পেরেছেন। যখন জানতে চাইলাম—"কোন গান আপনার প্রিয় অথবা গেয়ে আনন্দ পান?" সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে" যে গান শুনে সবাই খুশী হন, আরো শুনতে চান সেই গানই আমার অন্তরের গান। এক মুহূর্তের জন্যও আমি ভুলি না শ্রোতাদের ভাল লাগাই আমার সাকসেসের কারণ। আমি যেখানে পৌঁছেচি সেখানে এঁরাই আমায় পৌঁছে দিয়েছেন। এঁদের রুচির ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। হয়ত সেই কারণেই আজ চার জেনারেশন ধরে আমার পপুলারিটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই ভালোবাসাটা পারস্পরিক। আমি জানি আমি ধর্মযাজকও নই অথবা সমাজ সংস্কারকও নই। শ্রোতাদের মান উন্নত করবার জন্য ধরাতলে আমি অবতীর্ণ একথা যদি কখনও মনে আসে তবে আমার শিল্পীজীবনের আয়ু যদি আর ৫ বছরও থাকে তা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে। ধর আগে আমার ফ্যান ছিল ১০ লক্ষ, তারপর হোল ১০ হাজার এখন যদি ৫শো থাকে সে পাঁচশোও শূন্যে পরিণত হবে যদি আমি মনে করি আমি এদের চেয়ে হাইয়ার লেভেলের মানুষ। আমি সবসময় মনে রাখি আমি এদেরই একজন এবং এদের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া না চাওয়ার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমায় চলতে হবে। সমকালীন ভাব ও ভাবনার ছায়া যদি আমার গানে না পড়ে তবে, আজকের মানুষ আমায় গ্রহণ করবেই বা কেন?—তবে একটা জিনিষ মেনে চলতে হবে। যা গাইব তা যেন আমার স্বধর্মের অনুকূল হয়। আমার প্রকৃতি-বিরোধী কোন কিছু জোর করে যদি করতে যাই তবে তা কারো মনকে স্পর্শ করতে পারবে না। ধর, আমি যদি আজ টুইস্ট নাচের গান গাইতে যাই অথবা কমিক গান গেয়ে হাসাতে চাই তাহলে নিশ্চয় আমার গানের আসর থেকে বিদায় নিতে হবে। আবার একই টাইপের গানে নিজেকে আবদ্ধ রেখে তাই যদি বাঁচিয়ে বলে চালাতে যাই তবে একঘেয়েমী আসতে বাধ্য। একটা বিষয়ে আমি নিঃসংশয় যে কোনো মানুষের রুচি মূলত

আলাপ নয়, ভাল জিনিসের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকেই। যদি সেই ভাললাগাকে রুচিমার্জিত এবং সরল ও শিল্পসম্মত করে তোলা যায় তবে দেশ-কালের সীমা ছাপিয়ে তাই হয়ে ওঠে ইউনিভার্সাল এবং যে কোন দেশের যে কোন মানুষের চিত্তে দোলা দেয়। মূল ভাবনার ধারাটি সবদেশের মানুষেরই এক—পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য হতে পারে। দেখ এই "রাণার"-এর গান এ দেশে গাইলে যেমন শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে ওঠে ওদেশেও ঠিক তেমনই করতালির ঘটা।"

"একটা কথা 'হেমন্তদা'—আপনি শিল্পী, আপনার নিজস্ব একটা ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা ত আছে। কখনও চিত্তগ্লানি আসেনি অপরের রুচিমাফিক করে গাইতে?"

"আগেই ত বলেছি আমরা বনে বসে তপস্যা করি না, মানুষের সমাজে মানুষকে গান শোনাই। তাদের স্বীকৃতি পাওয়াই আমাদের সার্থকতা না পাওয়াটা ব্যর্থতা। অতএব চিত্তগ্লানির প্রশ্ন এখানে আসে না।"

সঙ্গীতজীবনের সুরু ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী জানতে চাইলে বললেন, সে ব্যাপারও ভারী মজার। প্রথমে গান ছিল আমার নেশা, অবসরের কাব্য। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম গান ছাড়া জীবনে অন্য পেশা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বাবা চাকরী করতেন ৩২ টাকা মাইনের। ঐ উপার্জনেই চার ভাই এক বোনকে মানুষ করেছেন—ধার করে বাড়ীও করেছেন। ভাবতে পার? গান গাওয়াটা তখনকার দিনে শুধু অনাবশ্যক বিলাসই নয়—বখে যাওয়ার সামিল বলেই গণ্য হোত। গানকে উচ্চাংগের শিল্প বলে কেউ মাথায় তুলে নাচতেন না। অতএব ছেলে বড় হয়ে পাশ করে চাকরী করবে এইটেই ছিল সবার মস্ত বড় আশা—ছেলে 'গাইয়ে' হবে এটা কেউ ভাবতেই পারতেন না। কাজেই বুঝতেই পারছ। এখান থেকে ওখান থেকে একটু-আধটু গান তুলে লুকিয়ে-চুরিয়ে গাইতাম। আমায় প্রেরণা দিত কবি সুভাষ। সে আমার সত্যিকারের বন্ধু—তা না হলে আমার জীবন কোন পথ বেয়ে সার্থকতার দিকে মোড় নেবে সেই বা জানল কি করে? সেই একদিন আমার সব আপত্তিকে এক ঝটকায় উড়িয়ে দিয়ে জোর করে রেডিওতে নিয়ে গেল। রেডিও প্রোগ্রাম করলাম। সবার তারিফও পেলাম। তারপর থেকেই রেডিও প্রোগ্রাম সুরু। সব সময় সুভাষ আমায়—উৎসাহ দিত "You have brain and have strength". আমি পিছনে আছি। এরপর সুভাষই আমায় গ্রামোফোন কোম্পানীতে নিয়ে গেল। প্রথমের দিকে ওখানে তেমন কিছু সুবিধে হয় নি।

"এরই মধ্যে কোন ফাঁকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সিট পেলাম। বাবার এক বন্ধু শান্তি বসু চেলো বাজাতেন। আমার প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর অবদানও কম নয়। তাঁরই উদ্যোগে কলম্বিয়ার ট্রেনার শৈলেশ দত্তগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। শৈলেশ-বাবু ও মিঃ সরকার "জানিতে যদি গো তুমি পাষাণে কি ব্যথা আছে" ও "বল গো বল মোরে" রেকর্ড দুটি করিয়ে-ছেন। এরপর নরেশ্বর ভট্টাচার্য ও শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে পর পর ছটি রেকর্ড। ধীরে ধীরে সেলও হতে লাগল। ইঞ্জি-নীয়ারিং সেকেন্ড ইয়ার অবধি পড়ে পড়া-শোনায় ইস্তফা দিলাম। কিছুদিন শর্ট-হ্যান্ড টাইপ রাইটিংও শিখেছি।"

"প্রথম যুগের হিট সং?"

"কথা কোয়োনাক শুধু শোনো" খুব হিট করেছিলো। তারপরের লিফট হোল 'ফেলে আসা দিনগুলি মোর' (৭ নম্বর বাড়ী) ও 'পথের শেষ কোথায়' (প্রিয় বান্ধবী)। "এই সময়ই হোল জীবনের সংগ্রামের যুগ। ভবানীপুর থেকে পায়ে হেঁটে কোথায় টালিগঞ্জ, কোথায় শ্যাম-বাজার যাওয়া-আসায় বড় কষ্ট হচ্ছিল বলে ত্রিশ টাকায় একটা সাইকেল কিনেছিলাম। এক টাকা জোড়ার একজোড়া ধুতি ও একজোড়া চটি দিয়ে চালাচ্ছিলাম। তবু এ সবকে কষ্ট বলে মনেই হয়নি—তখন গানের নেশা এমন করে আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

"সিনেমায় এলেন কেমন করে?" "অজয় ভট্টাচার্যের জন্য। তিনিই প্রথম ডিরেক্টার হরিপ্রসন্ন দাসের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রথম প্লে-ব্যাক করি "নিমাই সন্ন্যাস"-এ। টালিগঞ্জ থেকে বাণীকুটীর রোজ দু-তিনবার করে হাঁটাহাঁটি করতে হোত গ্যাসট্রিক আলসার নিয়ে। হতাশায় মন ভেঙে পড়লেও ইষ্টমন্ত্রের মত একটি চিন্তা মনের মধ্যে সব সময় জপ করতাম—"থামলে হবে না। চলতে হবে। থামা মানেই ত মৃত্যু।" মিউজিক ডিরেক্টর হবার প্রথম সুযোগ এল অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই সময়েই হেমেন গুপ্তের "অভিযাত্রী" ও "প্রিয়তমায়" সঙ্গীতপরিচালক হিসেবে একটু সুনাম হয়। কলকাতায় একরকম এসট্যাবলিশড হলাম।

এরপর বোম্বের অধ্যায়। সে বড় যন্ত্রণা-দায়ক অভিজ্ঞতা। কলকাতায় অত নাম যশ এখানে যেন কর্পূরের মত উবে গেল—। মিঃ এস মুখার্জী (ফিল্মিস্থান) এমনভাবে ট্রিট করতেন—এত বকাঝকা করতেন যেন আমি একটা স্টার্ক ইডিয়ট। নিজেকে বড় ছোটো মনে হোত। দূর! এত হীনমন্যতা সহ্য করা কোন ভদ্রসন্তানের উচিত নয়। সব ছেড়ে চলে যাব স্থির করে একদিন মুখার্জিকে জানালাম। সেইদিনই আসল মানুষটির পরিচয় পেলাম। উনি বললেন, "যেতে আমি তোমায় দেব না কোনো মতে। কারণ "ইওর ডিফিট ইজ মাই ডিফিট"—এমন কঠিন মানুষের মধ্যে এমন স্নেহের নির্ঝর। চোখে জল এসে গেল—ধু ধু মরুসাহারার বুকে যেন জলভরা মেঘের স্বপ্ন জাগে। এরপরই 'নাগিন' ছবিটা খুব লেগে গেল। সে যে কি দুর্দান্ত হিট—ভাবা যায় না। 'নাগিনের' রেকর্ড সেল আজও কেউ ভাঙ্গতে পারেনি। একটা রেকর্ড দু লক্ষ সেল। বাঙালীর ছেলে বোম্বের ফিল্ডে দখল করবে এটা কারুরই অভিপ্রেত ছিল না। তাই বাধা-বিপত্তিরও অন্ত ছিল না। অথচ মিঃ মুখার্জির প্রতিজ্ঞা 'হিট করাতেই হবে'—তাই উনি এত কঠোর—এতটুকু ত্রুটিতেই এমন ক্ষেপে যেতেন। এই সাফল্যের কারণ বুঝতে আরো অনেক সময় লেগেছিল।'

"কি কারণ?" "নাগিনের বাঁশীর সুরের সঙ্গে গানের সুরের মিলটা এমন সুন্দর হয়েছিল যে শুনলেই কানে লেগে যেত। তারপর অনেক ছবি ফ্লপ করে। ফ্লপ-ফ্লপ-ফ্লপ। নো হোপ, নো লাইট। নেক্সট "বিশ সাল বাদ।"

"সঙ্গীতপরিচালক হিসাবে আপনার হিট সং কি কি? বাংলা গানের কথা বলছি।"

"শাপমোচনে'র 'সুরের আকাশে তুমি', 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস', 'শোনো বন্ধু শোনো', 'বসে আছি পথ চেয়ে'; হারানো সুর'র 'আজ দুজনার দুটি পথ' ও গীতা দত্তর গাওয়া 'তুমি যে আমার'; 'চন্দ্রনাথ'-এর 'ও রাজার দুলাল' এবং 'আকাশ পৃথিবী শোনে'। ইদানীংকালে 'মণিহার'-এর 'আমি ছাড়তে পারিনি আকাশ' ও 'কে যেন গো ডেকেছে আমায়', আমার সুরে লতার গাওয়া 'আষাঢ়-শ্রাবণ মানে না ত মন', 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা'; 'গাঁয়ের বধূ'র নীচের 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই' এবং
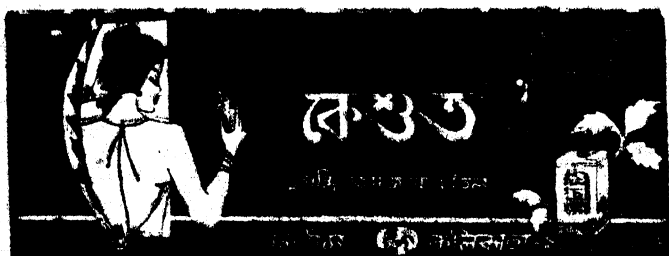
নীল আকাশের নীচে'; স্বরলিপিতে আমার গাওয়া 'যে বাঁশী ভেঙ্গে গেছে' এবং ঝড় দত্তর 'এই রাত তোমার', গান ও সলবেসেছিলো', 'গানের স্বরলিপি'। রাগিনী'র গানও চলছে খুব। "সবগুলি নেই কলাম্বিয়ায় রেকর্ড করা হয়েছে।"

"সবই কি আপনার সুর?"

"সবই আমার সুর। শুধু 'চন্দ্রনাথ'-এর রাজার দুলালী' রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর।'

"একটা কথা হেমন্তদা। শিল্পী ও পরিচালকরূপে আপনি ও সম্প্রতি-তবু প্রডিউসার হবার ঝুঁকি নেবার কারণটা কি?"

"কারণ খুবই প্রাঞ্জল। গানের পথ বেয়ে জীবনে স্বীকৃতি পেলেও নিজের গানের পর কোনো দিনই খুব বেশী আস্থা রাখতে পারিনি—তখনও নয়, এখনও না—"

"কেন?"

"কারণ জীবনের চরম সার্থকতার মধ্যেও নিজের সম্বন্ধে সবসময় একটা সংশয়ত দৃষ্টিভঙ্গী রাখবার চেষ্টা করছি। যে শিল্পী তিনি যত বড়ই হন না—চিরদিন রাজত্ব করতে পারেন না। তাঁর মধ্যেও শক্তির সীমা আছে। নিজেকে তার উত্তমই ভাবাটা মূর্খতা। যা চেয়েছি ভগবান আমায় তার চেয়ে অনেক বেশীই দিয়েছেন। চার জেনারেশন ধরে 'পপুলারিটি' মেনটেন করছি নিজের কোন অসাধারণ গুণের জন্য নয়। বিভিন্ন টাইপের সুর—ছন্দের বৈচিত্র্য, ভাবের গভীরতা, অনুভবের নিবিড়তা যা গানকে ছাপিয়েও মনে চিরস্থায়ী দাগ রাখতে পারে। পেরেছি কিনা জানি না। তবে চেষ্টা করেছি।— কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছেছে এই বছরই আমার শেষ—এবার আমি ফুরিয়ে যাব। তাই চিত্র-প্রযোজনায় আত্ম-নিয়োগ করলাম নিছক নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদেই। 'নীল আকাশের নীচে' আমায় সম্মান দিয়েছে। কিন্তু অল রাউন্ড সাকসেস হল 'বিশ সাল বাদ'।...... এ মধ্যে কত ছবি ফ্লপ্ করল। কত আশা-নিরাশা, মনস্তাপ—কিন্তু এক মুহূর্তও থামিনি। আক্ষেপে, বিলাপে সময় নষ্ট করিনি। সবসময় ভাবতাম বড় প্রোডিউসার না হতে পারি, ছোট্টো প্রডিউসার তাই বা ক্ষতি কি? সত্যিকারের ভাল ছবি সময় যদি নাও হয়, স্টান্ট পিকচারও হতে পারে। 'বিশ সাল বাদ' আমার সেই সংকল্পের ফলশ্রুতি। অনেক ছবি ফ্লপ করবার পর যখন বুদ্ধে উঠল কলকাতা থেকে ডিফিট নিয়ে যাব? তা ও হতে পারে না।—এই হোল এই ছবি শুরু করার কারণ। বীরেন নাগ এতে প্রথম পরি-চালক, বিশ্বজিৎ প্রথম হিরো, ভারাক্রান্ত দেখেছে দর্শকগণ। অনেক কথা শিখলাম, যা প্রমাণ করেছে, অন্যান্য ভাইরা হতে পার বিচার আমার ... | ...

বেশী। কিন্তু আমার জীবনদর্শন আলাদা; পরিচালনার দায়িত্ব যার ওপর দিয়েছি—তাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা না দিলে তার কাছে ভাল কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। উত্তমকে দিয়ে একটা বইয়ের স্টার্ট করে-ছিলাম, কিন্তু কয়েক রিলের পরই কাজ বন্ধ করে দিতে হয়।

"তারপর 'কোহ্‌রা' —বিশ্বজিৎ হিরো" —একটু থেমে আপনমনেই যেন বলে চললেন পরিণত শিল্পী—"যে কোন ডিপার্ট-মেন্টেই একবার যার নাম হয়ে গেল তার ভালমন্দ সব কাজই 'বাহবা' পায়। কিন্তু নাম করতে পারেনি এমন লোক খুব ভাল কাজ করলেও কারো এতটুকু 'অ্যাপ্রিসিয়ে-শন' পায় না—এই লাইনে এই এক ভারী মজা—ব্যাস! আমার কথাটি ফুরালো। আর কিছু জানার আছে?"

"ওদেশে ত অনেকবার গেছেন, ওরা আজ ভারতীয় সংগীত নিয়ে এমন করে মেতে উঠেছে কেন?"

রবিশঙ্কর বলেন, 'ওদের গানে ফ্লেক্সি-বিলিটি আছে। কিন্তু নানা দেশের সংগীত মেশাতে-মেশাতে ওরা আজ ফুরিয়ে গেছে। তাই আমাদের গানের অবিমিশ্র শুদ্ধতা ওদের এমন অভিভূত করে। এ-ত গেল ক্ল্যাসিক্যাল গানের দিক। কিন্তু আপ-নার কাছে শুনেছে ওরা মডার্ণ গান বা ফোক সং। ওদের এসব গানে ত উল্লাসের উপকরণ প্রচুর আছে। তবু আমাদের গান ওদের এমন টানে কেন?"

"স্রেফ নতুনত্ব, আর কিছুই না। এক সময় রোমান সংগীত নিয়ে মেতেছিল। আজ ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে মাতামাতির পালা। তবে তুমি যেটা বললে আমাদের গানের 'মেলডিক ডেফ্‌থ'-এ বস্তু ওদের আকৃষ্ট করে বৈকি।

তবে আমি গান শিল্প এসবের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েও বলছি সব সময় মানুষের প্রাণের স্পর্শ আমায় আনন্দ দিয়েছে। একটা কথা ভুলব না। একবার ফিজিতে গাইতে গেছি। সেখানের অডিটোরিয়ামে মাত্র ৫ হাজার লোকের বসবার মত ব্যবস্থা।

দেখলাম শীতের রাত হু-হু হাড়-কাঁপানো কনকনে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে হাজার হাজার লোক স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে যে আমার মমতা কি হয়ে উঠল বোঝাতে পারব না। খাম মাথায় উঠল। আমি ছুটে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'গেট খুলে দাও। মুষ্টিমেয় কয়েকজন এলিটকে আমি গান শোনাতে আসিনি। আমার গান সাধারণের গান। গেট খুললে যদি আমার নামে কেস হয় হোক। গেট খুলতেই হুড়মুড় করে জল-স্রোতের মত জনস্রোত যেন ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখে চোখে জল এসে গেল। পৃথিবীর নিভৃত কোণের একটি দ্বীপ-বাসীর সাধারণ লোকের মনেও আমার গান তবে পৌঁছেছে? পরদিন ওখানের কাগজে বেরিয়েছিল, 'Hemantakumar is a great artiste, but a greater mass'—এর চেয়ে বড় পুরস্কার শিল্পীর জীবনে আর কি হতে পারে? শিল্পী ত মানুষের থেকে আলাদা নয়—জীবন ও শিল্প এক হয়ে না উঠলে কোন সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। সত্যিকারের ভাল গান গাইতে পেরেছি কিনা জানি না—তবে একটা কথা আমি কখনও ভুলি না। আমা-দের চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট করেন শ্রোতারা। কত রাতি স্বীকার করে হয়ত প্রবেশপত্র কিনতে হয়, শীতে, গরমে তেমন সুবিধা করে বসতে পারেন না। অনেককে কতদূর থেকে অনেকটা পথ হেঁটে বাসস্টপে এসে তারপর হয়ত বসবার জায়গাও পান না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসেন। আমরা হাজার ব্যস্ত থাকলেও দরজা-গোড়ায় গাড়ী দাঁড়ানো থাকে, আমাদের চারপাশের সবার প্রাণপণ চেষ্টা থাকে আমাদের 'ম্যাক্সিমাম কমফোর্ট' দেবার। গাইতে বসলে শ্রোতাদের উদ্গ্রীব মুখগুলি মনে ভাসে। তাই চট করে দুটো গান গেয়েই উঠে পড়তে পারি না। মনে হয় এদের মধ্যে অনেকে আছেন, হয়ত এই-আধবারই জলসা শোনবার সুযোগ পান—তাঁদের গাওয়া-আসার মজুরীটা যেন পুষিয়ে যায়।"

সন্ধ্যা সেন

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের পোশাক ভাবনা

কানু ছাড়া যেমন গীত নেই তেমনি পোশাক ছাড়া প্রসঙ্গ নেই। ছাল-বাকলের সেই আরণ্যক জীবন থেকে শুরু করে আজকের শান-বাঁধানো সভ্যতা পর্যন্ত একথা টের পাওয়া যাচ্ছে হাড়ে-হাড়ে। পোশাক-আশাক নিয়ে তুলকালাম লড়াই লেগেই আছে। কোন সময়েই তা পুরোনো হতে পারে না। মাঝে মাঝে উত্তাপ একটু কমে এলেও উত্তেজনার আগুন সব সময়ই গনগনে থাকে। সামান্য ফুঁ দিয়ে তা উস্কে দেওয়ার যা অপেক্ষা। সে কাজের কাজী অনেক। এক-একটা ঢেউ থিতিয়ে আসতে না আসতেই এ রাজ্যে আরেকটা নিয়ে হুটোপুটি পড়ে যায়। ফ্যাশানের রাজ্য বড় অশান্ত।

বিশেষ পোশাকের জগতে বিচিত্র পরিবর্তন প্রায় রূপকথার সামিল। জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজকুমারী তার শিয়রের পাশে অচিন দেশের রাজকুমারকে দেখে কত না অবাক হয়েছিল, আমাদের আজকের বিস্ময় তার চেয়ে অনেক বেশি। হরদম পোশাকের রূপ বদলাচ্ছে। সেই সঙ্গে রঙ-রস-বৈচিত্র্যও আসছে। পৃথিবীর এক-প্রান্ত নিছক পোশাকের দৌলতে অপর প্রান্তের গঙ্গাজলে পরিণত হচ্ছে। দূরকে নিকট আর পরকে ভাই করার ব্যাপারে আজকের দুনিয়ায় পোশাক এক বিরাট ভূমিকার অধিকারী।

নারী সাজতে-গুজতে ভালবাসে আর পুরুষও পছন্দ করে নারীর সাজগোজ। কিন্তু সেই পোশাক নিয়ে দেশে দেশে কি হুল্লোড়, কত না অনাসৃষ্টি। হৈ-হৈ-রৈ-রৈ-

এর আর শেষ থাকে না। সমাজসেবীরা সজাগ, পুলিশ সতর্ক। পুলিশের ধমক অথবা গ্রেপ্তারের ভয়ে নওজওয়ানরা একটু সমঝে চলে (অবশ্য যথেষ্ট ক্রোধভরে) আর সেচারা মা-বাবার দল ছেলে-মেয়েদের পোশাক যাতস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। খবরের কাগজের পাতা খুললেই এ সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদের স্তম্ভটা আমাদের নজর কাড়ে। সোল্লাসে এবং যথাসম্ভব সরব হয়ে সেগুলো পড়ে ফেলি। ট্রামেবাসে, চায়ের দোকানে আর পথে-ঘাটে আলোচনা জমে ওঠে। প্রসংগ তো মুখের কাছে জায়গায়েই আছে। নতুন নতুন তথ্য সহযোগে তাকে আমরা যথারীতি সেব্য করে তুলতে চেষ্টার কসুর করি না। এর জের চলে দীর্ঘদিন। তারপর পরং গতি। কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্তে সবকিছু উত্তেজনা কি রকম মিইয়ে আসে। ততটা হাতে গরম আর থাকে না। বাধ্য হয়ে প্রসংগের মোড় ফেরাতে হয়।

টপলেশ আর লো-কাটের ধাককা আমরা অনেকটা সামলে উঠেছি। অবশ্য তার জের যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। তবে সেদিনের অস্থিরতা এখন নেই। অনেকেই এদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাছাড়া আর একটা কথা মেনে নেওয়া ভাল যে, পোশাকে দেহ-সৌন্দর্য যদি পুরোপুরি ফুটে না ওঠে তবে সে প্রায় জোব্বা-জাব্বার সামিল। ঘোরখা পরে চলাফেরা করাও যেকথা এসব পোশাক পরেও একই কথা। দিন অনেক বদলেছে এবং রুচিও পালটেছে। তাই এ-সহজ স্বীকৃতির পথে বাধা কোথায়। বিশেষ, মেয়েদের আজকাল পুরুষের সমান দক্ষ হয়ে উঠতে হচ্ছে। সারা দেহে জামা-কাপড়ের পাহাড় বয়ে বেড়ান আর দক্ষতার পরিচয় দেওয়া একই সংগে অসম্ভব। একদিন অবশ্য মেয়েরা সামনে দিয়ে চলে গেলে মনে হতো, জামা-কাপড়ের একটা বাণ্ডিল চলে যাচ্ছে। আজকে আর সেটি হবার উপায় নেই।

এখন আজকের পরিচিত এই দৃশ্যটি একবার কল্পনা করা যাক। উজ্জ্বল-যৌবন এক তরুণী পথ দিয়ে চলেছে। পথচারী-মাত্রেই একবার অপাঙ্গে তার দিকে দৃষ্টি হানছে। মনে মনে তারিফ করছে মেয়েটির রুচির। তার দেহের খাঁজে খাঁজে শাড়িটি সুন্দরভাবে বসেছে। ব্লাউজের মধ্যে আধুনিকীকরণের মিঠে আমেজ। আলতো করে শাড়িটা বুকের ওপর ফেলা। প্রসাধনে সৌন্দর্যবোধ সুস্পষ্ট। সবকিছু মিলে তার ভরাট-যৌবন লাবণ্যে ঝলমল করছে। ছোট-ছোট পায়ে মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে। এক নজর দেখে তারিফ না করে উপায় নেই। শাড়ি থেকে ব্লাউজের ব্যবধানও বেশ মানানসই। সবদিক থেকেই সে আজকের রূপসজ্জার একটি জলজ্যান্ত নিদর্শন। অথচ খুব একটা উদগ্রতা নেই।

সাজ-পোশাকে আজকের প্রার্থনাই বদলে গ্যাছে। সবাই চান, মেয়েরা সাজপোশাক

করুক, দেহ-সৌন্দর্য প্রকাশ পাক এবং হাল্কা চালে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত হোক —এটাই আজকের প্রার্থনা।

পোশাকে, ওলট-পালট যুগের ধর্ম। না হলে আদম-ঈভের আদিম অবস্থা থেকে স্তর পরম্পরায় এতটা এগুনো সম্ভব হতো না। তাই চলতি রুচির সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করে সবকিছুতে সম্মতি জানিয়ে যাওয়াই ভাল।

সবকিছুতে আজকাল ছিমছাম থাকতে হবে। পোশাকের ব্যাপারে একথা তো সর্বাগ্রে প্রযোজ্য। পরিবর্তিত রুচিতে

চিত্ররূপ অভিনেত্রী
নন্দিতা বসু

—ফটো : অমৃত

হাওয়া সেদিকেই বইছে। এ জন্য হৈ-চৈ বা সোরগোল তুলে লাভ নেই। প্রয়োজন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষার। যা কিছু অশ্লীল সব কালস্রোতে ভেসে যাবে। আর পোশাকের পরিবর্তনে কোনরকম রোষকষায়িত দৃষ্টিপাত উপহাস্য হতে বাধ্য।

কথাগুলো বলতে হলো সেদিনের সেই চোখে দেখা ঘটনাটা স্মরণে রেখে। সেদিন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। বাসের দেখা নেই। অথচ পিক-আওয়ার্সও নয়। ধৈর্যের খেলা চলছে। বিরক্ত হয়ে যখন ট্যাক্সি ধরবো কিনা ভাবছি ঠিক তখনই একটি মেয়েকে বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বাস-ট্যাক্সি, যাবার তাড়া এবং অসীম বিরক্তি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। মেয়েটি এসে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছে। আমি একবার আড়-চোখে ওর সম্পূর্ণ ভিউটা নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু মেয়েটির জামা-কাপড়ে চোখ আটকে গেল। ফুলহাতা কাল রঙের নেট-ব্লাউজ। ট্রান্সপারেন্ট। বেশ আঁটসাটো। দেহ-সৌন্দর্য প্রকাশে অনন্য। শাড়িটাও সুন্দর কায়দায় অনেকখানি নামিয়ে পরা। বেশ একটা মিঠে আমেজ অনুভব করলাম। ইতিমধ্যে বাস এসে ওকে নিয়ে যেতে আমার ধ্যান ভাঙলো। মেয়েটির মিষ্টি পোশাক আর শহরের ফ্যাশানে পরিবর্তনের কথা ভাবতে ভাবতে বাসে উঠে বাড়ির পথ ধরলাম।

ব্যাকলেশ-টপলেশ-শ্লীভলেস আজ অনেকখানি পুরনো-মহিমা। ফুল শ্লীভ অথবা থ্রী কোয়ার্টার ব্লাউজের দিকে অনেকেই ঝুঁকেছেন। অর্থাৎ ফ্যাশানের রাজত্বে কারো কায়েমী স্বত্ব নেই। এক রাজা যাচ্ছে অন্য রাজা আসছে। কিন্তু রুচির মৌল পরিবর্তনটুকু অক্ষুণ্ণই আছে অর্থাৎ দেহ-সৌন্দর্যের প্রকাশ। সেদিকে কোন ত্রুটি নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই দেহকে প্রকাশ করে ফ্যাশানের নতুন চল হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সে ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। বরং হাল ফ্যাশানে তা আরও বাড়ছে।

দেহ-সৌন্দর্যের প্রকাশ অথবা দেহের প্রকাশে রুচিশীল মেয়েদের আগ্রহ এত বেশি যে, প্রচণ্ড শীতেও তারা গা-ঢাকা জামা পড়তে রাজী নয়। তাই এই শীতেও দেখা যাবে অধিকাংশ মেয়েই গ্রীষ্মের সাজ-পোশাকে যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সারা শীত শাড়ি এবং শ্লীভলেস ব্লাউজে কাটিয়ে দেওয়ার মতো মেয়ের সংখ্যাও এই শহরে নেহাত কম নয়। তাই বলছি, পোশাকের মর্জি বুঝে ওঠা ভার।

এটাকে এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বলা চলে। নানা পোশাকে মেয়েরা নিজেদের সাজাচ্ছে, কোনটায় তাদের ভাল মানায়। তিব্বতী উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর এ পোশাকও পালে-পার্বণে মন্দ লাগে না। ব্যবহারও শৌখিন। রাত্রির পোশাকও পরিবর্তনে উন্মুখ। চিরচরিত রাত্রিবাস পরিত্যাগ করে অনেকেই আজকাল রুচির পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন নতুন ক্যাটহ্যাটের গাউন ব্যবহার করে। এতে শরীর বেশ হালকা থাকে আর গাউনটা কোন সময়ই শরীরের উপর চেপে বসে না। এভাবে বাড়িতে হালকা পোশাকে যথার্থ হালকা থাকা যায়।

বিদেশী পোশাকও আমরা সযত্নে অঙ্গে ধারণ করেছি। তাদের কেউ-কেউ মোটামুটি আসনও করে নিচ্ছে। ইদানীং এই প্রবণতা যে বেড়েছে, তা শহরের রাস্তা-ঘাটে অসংখ্য নজীর থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। 'টিন-এজার'দের জন্য যে কনশেসন এত দিন চালু ছিল, এবার তা অনেকেই নিতে শুরু করেছেন। শ্ল্যাকস্-শোভিত মেয়ের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এছাড়া আরো দু-এক প্রস্থ পোশাক অবশ্য আছে। তাদের মন মাতানোর ক্ষমতাও কম নয়। মেয়েরা তাদের বেশ পছন্দও করছে। এর বদলে আমাদের লাভও হচ্ছে কম নয়। এদেশের ফ্যাশানের ক্ষেত্রে যা অপারেজয় সেই শাড়ি ওদেশের মেয়েদের মধ্যে ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। শুধুই শাড়ি নয়, নানারকম জামাকাপড়ও। পূর্ব ইউরোপের ঐতিহ্য-বাহী লেস যেমন সহজেই এ-দেশের পোশাক-রসিকের মন জয় করে, তেমনি ভারতীয় পোশাকও বিদেশীদের জয় করে নিচ্ছে। পোশাকে শুধু দেহকে প্রকাশ করলেই চলবে না সেই সঙ্গে রসাবেশও চাই। শাড়ি এই রসাবেশে সাহায্য করে।

ফ্যাশানে রসাবেশই হলো মুখ্যকথা। তাই মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই মেয়ে-টির কথা। নিউ মার্কেটে দর্জির দোকানে জামার মাপ দিতে এসে স্পষ্ট বলেছিল, বডি-লাইন যেন শার্প হয়। এই একটি মাত্র কথায় আজকের ফ্যাশানের সকল কথা বলা হয়ে গেল। সত্যি, এমন সুন্দর করে আর ফ্যাশানের কথা ভাবা যায় না। পোশাকে দেহের সৌন্দর্য বাড়াতে হবে এবং তাকে প্রকাশ করতে হবে, না হলে ফ্যাশানের সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। তাই ফ্যাশানকারকদের নজরও এদিকে। এ জন্যই দেশী পোশাকের পাশাপাশি বিদেশী পোশাকের চর্চাও সমানে চলছে। এটা লক্ষ্য করার বিষয় বটে। তাছাড়া আজকের পোশাকে সমন্বয়েরও প্রয়োজন কম নয়। পারস্পরিক আদান-প্রদানেই গড়ে উঠবে সর্বশ্রেষ্ঠ ফ্যাশান। আজকের পোশাক তাই আগামী দিনের মৈত্রীসেতু।

সেকালের খেলাদোলা

সুকুমার সেন

সেকালের সংজ্ঞা নিষ্প্রয়োজন। যা একাল নয় এবং যে কাল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সঞ্চয় ও অনুমান সাপেক্ষ তাই সেকাল অর্থে এখানে ব্যবহার করছি। প্রবন্ধের নামে যে কথাটি ব্যবহার করেছি তা কোন অভিধানে মিলবে না জানি। তার বদলে যা মিলবে, যা আমরা সর্বদা ব্যবহার করে থাকি সেই 'খেলা-ধুলা' কথাটি এখানে ইচ্ছা করেই গ্রহণ করলুম না। প্রথমত, সে কথাটি বিকৃত— এসেছে 'খেলাদুলা' থেকে। দ্বিতীয়ত, কথাটির দ্বিতীয় অংশ ছেলেখেলা (ধুলা-খেলায় ইঙ্গিত-বিজড়িত) বোঝায়। তাই অষ্টাদশী বাংলায় পাওয়া খেলাদুলার আগে-কার রূপ 'খেলাদোলা' ব্যবহার করছি। কথাটির আসল মানে হল পরিশ্রমসাপেক্ষ ক্রীড়া ('খেলা') ও পরিশ্রমবিহীন আনন্দ-ক্রীড়া ('দোলা')। শিশুক্রীড়া দুইয়ের অর্থেই আসে। এ প্রবন্ধে শিশুক্রীড়ার কথা বলব না।

সেকালের অ-শিশু অর্থাৎ বয়স্কদের খেলা দু-ধরনের ছিল। এক ধরনের খেলায় ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখ্য, অপর ধরনের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, থাকলেও খুব গৌণভাবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলায় হত বীর্য, ধৈর্য ও বুদ্ধির পরীক্ষা।

বীর্য পরীক্ষার খেলায় প্রথমে উল্লেখ করতে হয় শিকার। তবে শিকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় থাকত না। রাজা-রাজড়া ও বড়লোকে আমোদের জন্য শিকারে বেরত। সঙ্গে থাকত পেশাদার শিকারী— "আহিড়ি", "আখটি"। বড়লোকের শিকার-খেলায় কষ্ট করে বনে যেতে হত না। তাঁরা শিকারের জন্যে বিস্তৃত খোঁয়াড় করতেন গ্রামের বাইরে। সেই খোঁয়াড়ে বন্য জন্তু ছেড়ে দেওয়া হত। ক্রীড়া-শিকারী সেই জন্তু নিপাত করতেন। বনে-জঙ্গলে শিকার করতে হলে চারদিক ঘেরে হাকডাক পাড়া হত ঢাক বাজানো হত। তাতে শিকারের জন্তু ভয় পেয়ে তার গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে আসত। চর্যাগানে এমনি শিকারের উল্লেখ আছে—"বেঢ়িল ডাক পড়অ চৌদীস"। চীৎকার করে পশু তাড়ানো হত বলেই শিকারের নাম হয়েছিল কথ্য সংস্কৃতে 'আক্ষেবাট'। এর থেকে এসেছে পুরানো বাংলায় 'অহের, অহেরি'; মধ্য বাংলায় 'আহিড়ি, আহেরি'। মধ্য বাংলায় এরই অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায় 'আখাট' (অখাট, আখেট)। এ শব্দের [illegible] অর্থ হল, যে ফাঁদ ("ফোকার টাটি") দিয়ে পশু ও পাখি মারে। সংস্কৃত 'খেটক' (ঢাল) শব্দের সঙ্গে 'আখটি' [illegible] আছে।

বাঙ্গালী সমাজ থেকে পশু শিকার যখন উঠে গেল তখন কিন্তু গ্রামের বাইরে শিকারের জন্যে ঘেরা স্থান রাখবার রীতি লুপ্ত হল না। সেই ঘেরাও স্থানে যে 'হাওয়া' ঘর ("আখড়াশালা") থাকত সেখানে পাশাখেলা হত, ঘরে বাইরে মল্লক্রীড়া হত। (আধুনিক কাল পর্যন্ত গাঁয়ের বাইরে এমন স্থানের অস্তিত্ব লোপ পায় নি। তবে তা শিকারের জন্যে নয়, মল্লক্রীড়ার জন্যেও নয়; অক্ষক্রীড়ার জন্যে নয়—পরিব্রাজক বাউল বৈষ্ণবদের আশ্রয়স্থানরূপে। এখন তার নাম 'বৈষ্ণবের আখড়া')।

প্রতিযোগিতামূলক জয়পরাজয়নির্ভর মল্লক্রীড়া (বা মল্লযুদ্ধ) সব দেশে মানুষের ইতিহাসের গোড়া থেকেই আছে এবং আজ পর্যন্ত তার স্বরূপে ও প্রকৃতিতে অতিশয় কোন পরিবর্তন ঘটে নি,—পরাজিতের পরিণাম ছাড়া। আদিম মানুষ মল্লযুদ্ধে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবিত রাখত না। পরবর্তী কালে তাকে জীবিত রাখলেও অঙ্গহানি করে শক্তিহীন করে দিত। তারও পরবর্তী কালে অল্পস্বল্প অঙ্গহানি (যেমন কান কেটে দেওয়া) অথবা রূপ বিকৃত করা (মাথা মুড়িয়ে মুখে চুনকালি দেওয়া) হত। তারপরে আধুনিক কাল পর্যন্ত —"দুয়ো" (অর্থাৎ দুর্ভাগ্য) বলে হাততালি দেওয়া, "ছি-ছি" বলে নিন্দা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এখনকার কালের মতো আগেকার কালে কখনও মল্লক্রীড়ার ফলাফল নিয়ে দ্যূত-ব্যসন হত না। অবশ্য মল্লক্রীড়া-বিজয়ী পুরস্কার লাভ করত। সাধারণ পুরস্কার ছিল পতাকা উড়ানোর অধিকার ("বীর ধাজা"; তুলনা করুন, চর্যাগানে "আজো কুন্দুরে বীরা, সরস নায়ী মঝে উভিল চীরা") কিম্বা অঙ্গ-ভূষণ প্রাপ্তি। যেমন কুণ্ডল ("বীরবৌলি"), বালা ("বীরবালা")।

সেকালের মল্লবীরদের সজ্জাশোভন পোষাকের বর্ণনা পুরানো সাহিত্যে পাই। তাঁরা কেউ কেউ (মুসলমান হলে?) জাঙ্গিয়া কেউ কেউ (হিন্দু হলে) ছোট কাপড় আঁট করে পরতেন। মাথায় টুপি—"মলটোপ" বা "বীরটোপর", গলায় কুঁচের মালা, হাতে বীরবালা, কানে 'বীরবৌলি, পায়ে ঘুঙ্গুর ("ঘাটা"), কোমরে লোহার শিকল জড়ানো, সর্বাঙ্গে রাঙামাটি ("বীরমাটি") লাগানো। মাথা নেড়া।

যারা মল্লক্রীড়া শিক্ষা করত তাদেরও গায়ে রাঙামাটি মাখতে হত। (রক্তারক্তি হলে না বোঝা যায়—এই উদ্দেশ্য?) [illegible] [illegible], মারামারি,

ধস্তাধস্তি, বিপক্ষকে ধরে আছাড়ে দেওয়া ("মেলাপাড়া")। তাছাড়া নানারকম ডিগবাজি, মাথায় মাথায় ঢুসঢুসি, পায়ে পায়ে প্যাঁচ কসা, লোহার শিকল ছেঁড়া, বুকে বেল রেখে ভাঙা। আখড়া প্রাঙ্গনে "মালকোট" পোতা থাকত। সেই কাঠ ধরে নানা রকম কসরৎ শেখা ও দেখানো হত।

সেকালের মল্লবীরদের দক্ষতা মুষ্টিযুদ্ধে ও কুস্তি-কসরতেই পর্যবসিত ছিল না। তাঁদের তলোয়ার চালনায় ও লাঠি খেলায়ও ওস্তাদ হতে হত। তাঁরা বড়লোকের ছেলেদের মল্লবিদ্যা ও অসিচালনা শেখাতেন, লাঠি খেলা নয়। লাঠি-খেলা শেখা বড়লোকের ছেলের মর্যাদাহানিকর ছিল। সেকালে লাঠিখেলায় বাঙালীর যেমন দক্ষতা ও যশ ছিল এমন আর কোন জাতির ছিল বলে জানি না। পুরানো বাংলা সাহিত্যে লাঠিখেলার দীর্ঘ বর্ণনা নেই বটে কিন্তু এ বিষয়ে দু একটি এমন শব্দ পাওয়া যায় যাতে বাঙালীর দক্ষতার ইঙ্গিত পাই। এমন ভাবে বন্‌বন্‌ করে লাঠি ঘোরাতো যে ঢিল ছুড়লে অথবা বন্দুক ছুড়লে লাগবে না। এমন লাঠি ঘোরানোর নাম ছিল 'চাক ভাঙারি' ('চক্রভ্রমিক') আর এক রকম লাঠি-খেলার নাম ছিল "বাঙ্গালী"। কী রকম সে খেলা তা জানি না। লাঠি-খেলায়ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত, দুজনের মধ্যে অথবা দুদলের মধ্যে। এ খেলা বোধ করি এখনো বিলুপ্ত হয় নি।

পাঁচ [illegible] শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা হত তীর [illegible] ([illegible]) খেলায়। এ ছিল

লাক্ষ্যভেদের শিক্ষায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। লক্ষ্যভেদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভালো গল্প আছে মহাভারতে। বাঙালীর ইতিহাসে এক সবচেয়ে বড় লক্ষ্যভেদীর বীরের সন্ধান মিলেছে। তিনি লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণ সেন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। পিতা ও পিতামহের আমলে তিনি সেনাপতি হয়ে বহু যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। নিজেও কাশী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। লক্ষ্মণসেন ওস্তাদ তীরন্দাজ ছিলেন। এ বিষয়ে সেকশুভোদয়ার একটি গল্প আছে রাজা লক্ষ্মণ সেন নাকি কানবালার মধ্যে দিয়ে সরু তীর ছোটাতে পারতেন, যে কানবালা পরে আছে তার গায়ে আঁচটুকুও লাগত না। লোকে তাই তাঁর নামে ছড়া বেঁধেছিল

লক্ষ্মণসেন রাজা বড় বীর।
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর।।

একজন পদাতিক রাজার উপর খুশি ছিল না। সে এই ছড়া শুনে উপহাস করে বলে ছিল,

লক্ষ্মণসেন রাজা কী বড় বীর।
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর।।

সে রাজার চেয়ে বেশি বাহাদুরি দেখিয়েছিল তীর ছোঁড়ায়। কিন্তু ব্যাপারটি কী তা ভালো করে বলা নেই।

সেকালে জনসাধারণের অভ্যর্থিত ক্রীড়াকৌতুক যথাসম্ভব সামাজিক—ধর্মসম্পর্কিত ও গার্হস্থ্য—উৎসবের অঙ্গরূপে পরিগৃহীত হত। সেকালের একটি বাহুবলের খেলা—(—এ কালের মাগ্‌বি বল খেলার মতো কতকটা—) কোন গোলাকার বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়ি—তা ছাগমুণ্ডই হোক আর ঝুনো নারকেলই হোক—দল বেঁধে কাড়াকাড়ি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য হয়েছিল। বৈষ্ণবভাবের ক্রমবর্ধমান প্রবলতায় ছাগমুণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি এখন দেখা যায় না। তবে তার প্রতিনিধি নারিকেল নিয়ে কাড়াকাড়ি, এবং বিজয়ী হলে সেই ফলটি পুরস্কাররূপে পাওয়া এখনো কোথাও কোথাও দেখা যায়। গাঁয় গাঁয়ে বলিষ্ঠ ছেলে ও পুরুষদের যুদ্ধ-খেলাও ছিল। এ খেলার কিছু সন্ধান মেলে সেকালের বিবাহের প্রসঙ্গে। গাঁয়ে কোন বাড়ির মেয়ের বিয়েতে ভিন্ন গ্রাম থেকে বরযাত্রী দল এসে গাঁয়ে ঢুকলে সে গাঁয়ের বাহুবলীরা যুদ্ধং দেহি করে এসে দাঁড়াত। ভাবটা এই আমাদের না হারিয়ে অর্থাৎ আমাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করলে গাঁয়ের মেয়ে নিয়ে যেতে দেব না। এটা কিন্তু সবসময়ে যুদ্ধের ভাগে পর্যবসিত থাকত না। কথা কাটাকাটি হতে হতে বরযাত্রী কন্যাযাত্রী দলে মারামারি লেগে যেত। তবে সে মারামারির নিগূঢ় গভীর কোন কারণে নয় দু-পক্ষের বাহাদুরির সংঘর্ষ। এরকম অনুষ্ঠানিক প্রায় সংঘর্ষ কিছু দিন আগেও অজ্ঞাত ছিল না। কন্যাযাত্রী বরযাত্রীর কান কেটে দিয়েছে এমন ঘটনা ভুক্তভোগীর কাছে শুনেছি।

বরযাত্রীর কন্যাযাত্রীর বিরুদ্ধে যে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল তা পুরাণো আখ্যান কাব্য থেকে জানা যায়। চাঁদ সদাগর পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়ে উজানি গাঁয়ে ঢুকে সেখানকার বাহুবলীদের সম্মুখীন হন এবং তাদের দলপতিকে "বাকড়া-গদুয়া" (=যুদ্ধে প্রতিরোধকারীর স্বীকৃতি ও সম্মানসূচক সুপারি) দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন। বৈষ্ণবজীবনীতে নিত্যানন্দের বিবাহ প্রসঙ্গেও বাকড়া-গদুয়া দানের উল্লেখ পেয়েছি।

সেকালে সর্বজনের চিত্তবিনোদন সবচেয়ে বড় খেলা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সাপুড়ে ও ওঝার 'ঝাঁপান'। এ ব্যাপার আর কোন দেশে কখনো ছিল বলে জানি না। সাপুড়ে ও ওঝা গুণীরা সাধারণ 'ঝাঁদিয়া' (এখন বেদে') নামে পরিচিত ছিলেন। (নামটি আগে কিন্তু শুধু সাপুড়েই বোঝাত। দ্বাদশ শতাব্দীর এক গ্রন্থকার ঝাঁদিয়া বলতে সাপধরা বৃত্তির ব্যক্তিই বুঝেছিলেন।) সাপুড়ে-গুণীদের আর এক নাম ছিল 'ডঙ্ক' বা 'ডাক'—যার থেকে "ডাকপুরুষের বচন"। সাপুড়ে-গুণী গুণ-পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হলে নানাভাবে পুরস্কৃত হতেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত হস্তাভরণকে বলত 'দ্বাদখাড়ু' বিজয়ী গুণীরা দোলা চড়ে যেতেন, তাঁদের আগে পাছে শিষ্য সেবক দল বেঁধে চলত। ঝাঁপানে অর্থাৎ দোলায় চড়ে তাঁরা বিজয়-যাত্রা করতেন বলে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাম দাঁড়িয়ে গিয়ে ছিল 'ঝাঁপান'। ঝাঁপান খেলা মনসাপুজোর উৎসবে দাঁড়িয়েছিল। ঝাঁপান খেলায় গুণীরা পরস্পর "বাণ" (হিপনোটিক স্ট্রোক) মারতেন। সে বাণের শক্তি অনুসারে নাম ছিল, "ভার", "সম্ভার", "নিসম্ভার" ইত্যাদি। 'ভার' বাণের শক্তিতে উদ্দিষ্ট অঙ্গ অবশ হয়ে যেত, 'সম্ভার' বাণে সমগ্র দেহ অবশ, মূর্ছাকম্প হত। 'সম্ভার' বাণ কাটা যেত 'নিসম্ভার' বাণে। আরও নানারকম বাণ ছিল। সে সব গল্পকথার মধ্যে পড়ে। তবে বিষধর সাপ নিয়ে ঝাঁপান খেলায় বীরত্ব, কৌশল ও নিপুণতার প্রকাশ খুবই ছিল। বর্ধমান জেলার অনেক স্থান ঝাঁপান সমারোহের জন্যে বহুকাল ধরে বিখ্যাত ছিল। এমনি একটি স্থানের নামে সম্প্রতি রেলওয়ে স্টেশন হওয়াতে সেখানকার ঝাঁপানের স্মৃতিকে নয় নামটুকুকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। এ হল জোগাঁয়ের আগের স্টেশন ঝাঁপানডাঙা। এখানকার ঝাঁপানের আড়ম্বরের বেশ জাঁকালো বর্ণনা আছে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" উপন্যাসে।

ধর্মের গাজনে ও শিবের চড়কে যে অঙ্গ ফুঁড়ে লম্ফ ঝম্প ও চরকি খেলা হত তা আসলে ছিল কৃচ্ছ্রসাধনা। কিন্তু পরিণামে তা জনসাধারণের কাছে বীভৎস সার্কাস ক্রীড়াকৌতুকে পরিগণিত হয়েছিল। তা না হলে পাঁজিতে অমন চড়কপুজোর ছবি ছাপা হত না।

ধর্মের গাজনের অন্তত একটি অনুষ্ঠান ছিল বিশুদ্ধ ক্রীড়াকৌতুক—জলক্রীড়া। ধর্মপুজাবিধানে এ খেলার বর্ণনা নেই; অন্যত্র আছে। ধর্মপুজার অনুষ্ঠানে এর নাম 'দাদুড়ঘাটা'। শব্দটি এখন রাঢ় অঞ্চলে সাধারণ বিশেষ্য শব্দে পরিণত)। অর্থ জাতে "দাদুরি" (সংস্কৃত দদুরিক, অর্থ ব্যাঙের মতো) খেলা। চৈতন্যজীবনীতে এবং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এ খেলা 'কয়া' বা 'কয়াকয়া' নামে উল্লিখিত। এ খেলায় দল বেঁধে জলের উপর হাত চাপড়ানো এবং লাফ ঝাঁপ ও চীৎকার করা হত। এই ছিল ব্যাপার, স্নানক্রিয়ার আনুষঙ্গিক।

আধুনিক কালের বিশিষ্ট জলক্রীড়া সাঁতার ও নৌকাচালনার মতো প্রতিযোগিতা খেলার কোন উল্লেখ কোথাও পাই নি। তবে সে খেলা যে ছিল না তা জোর করে বলা উচিত হবে না। যেমন উচিত হবে না দৌড় প্রতিযোগিতা খেলার অস্তিত্ব অস্বীকার। পায়ে চলে দৌড় ও রথে চেপে দৌড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প বৈদিক সাহিত্যে আছে, সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রাচীন কাহিনীর প্রসঙ্গে এখানে ওখানে উল্লিখিত থাকতে পারে। ভারতবর্ষে ঘোড়দৌড় ইংরেজের আমদানি। তবে মানুষের বিশেষ করে শিশু মানুষের দৌড় খেলা সব দেশেই বরাবরই আছে। মোগলেরা এদেশে 'চৌগাম' অর্থাৎ পোলো খেলা এনেছিল, কিন্তু সে খেলা ছিল আমীর-ওমরাওদের। বাংলা দেশে কখনো যে সে খেলা হয়েছিল তার প্রমাণ নেই। তবে আরাকানে সপ্তদশ শতাব্দীতে হয়ে থাকতে পারে। আধুনিক হকি খেলা কতকটা চৌগানেরই অশ্বহীন রূপান্তর।

বেশি বয়সের ও অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের খেলাধোলা সেকালে অনেকরকম ছিল এবং তার অধিকাংশই একাল পর্যন্তও চলে এসেছে। কিন্তু এ কালকে আমরা কতটুকু জানি? সে সব খেলার কথাও সেকালের মধ্যে পড়ে। অন্য সময়ে তা বলব।

[illegible]কথা যেমন আগাগোড়া মধুর, ক্রিকেটও তেমনি। ক্রিকেটে শূন্য মধুর, সেঞ্চুরি মধুর, চার মধুর, ছক্কা মধুর, তেরো মধুর, নিরানব্বইও মধুর। 'কাষ্ঠময় ওষ্ঠে তোর কত মধুভরা!'

'নিরানব্বইও মধুর? অসম্ভব।' নীলাঞ্জনা আপত্তি করে উঠল।

'ব্যাটসম্যান এক রান করতে চাইছে, প্রতিপক্ষ ঘিরে ধরেছে, করতে দেবে না—কঠিনে-কোশলে সে লড়াই এককথায় ভীষণ মধুর। সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে মিনিটে, মিনিটের পর মিনিটে, তবু একবিন্দু রস বেরুচ্ছে না—ক্রিকেটে রানই হচ্ছে রস—সেটা দারুণ সুন্দর নয়? 'পলকের মাঝে যেন অনন্ত বিরাজে।''

'রস বেরুচ্ছে না সে শুষ্কতাও মধুর?'

'ক্রিকেটে সমস্ত মধুর। তুমি শুধু ব্যাটসম্যান দেখছ কেন, বোলারকে দেখ, হাতের থাবা-পাতা বাঘা ফিল্ডসম্যানদের দেখ। শুধু পঙ্কজ রায়কে দেখছ কেন, বেনোকে দেখ। নাই রস নাই দারুণ দাহন-বেলা। খেল খেল তব নীরব ভৈরব খেলা।'

'নীরব ভৈরব খেলাই বটে। কিন্তু নিরানব্বইয়ে আউট হয়ে যাবার ব্যর্থতাকেও তুমি মধুর বলবে?'

'ক্রিকেটে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। মোকদ্দমায় তোমার হার মানেই তোমার বিপক্ষের জিত। ব্যাটসম্যানের সর্বনাশ মানেই বোলারের পৌষ মাস। সমস্ত সুখই আর কারু দুঃখ দিয়ে কেনা।'

'কিন্তু নিরানব্বই শুনলে ব্যাটসম্যানের জন্যেই প্রাণটা হায়-হায় করে। নিরানব্বইয়ের এক ছাড়া গতি নেই।'

'সুন্দর বলেছ। এক ছাড়া নেই গতি, সেই মোর প্রাণপতি। তাই যেমন করে পারো একটা রান কুড়িয়ে নাও, হাতিয়ে নাও, নয়তো ছিনিয়ে নাও। যেমন নিরানব্বই করে জয়সীমা ছুটেছিল কানপুরে। রান-আউট হয়ে গেল। সকল পথে তাড়াতাড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।'

'রান-আউট আরেকটা কেলেঙ্কারি।'

'কী বলো, যে ছুঁড়ছে তার ক্ষিপ্রতাকে দেখ, দেখ তার আজুর্নিক লক্ষ্যভেদকে। উইকেট ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। একেই বলে, 'ভয়ংকরের বেশ এবার ঐ আসে সুন্দর।' 'দস্যুর মত ভেঙে-চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।' কিন্তু মঞ্জরেকার কী করল? ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ছিয়ানব্বই করেছে।

স্তব্ধানন্দ মঞ্জরেকার। পাহাড়ের মত দৃঢ়-নিশ্চল, ছাক্কা ছিয়ানব্বই গড়ে তুলেছে শুধু একখানা চারের মারের অপেক্ষায়। কত তাকে বললুম ধৈর্য ধরতে—

'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক
শিরোপরে শত বজ্র গর্জিবে গর্জুক।
রহ হিমাদ্রির মতো
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ।
স্থাপ তুমি জয়স্তম্ভ
করো আত্ম অবলম্ব
দাও অস্থি মেদমজ্জা লাগে যতটুক।
শত সূর্য করি গুঁড়া
গড়ো সে উজ্জ্বল চূড়া
দেবতা দেখুক।।'

কিন্তু ধৈর্য ধরল না, এলেন-এর বলে লাইলের হাতে আউট হয়ে গেল। আহা, সে দৃশ্য দেবতারাও দেখল বৈকি।'

নীলাঞ্জনা মৃদু হেসে বললে, 'আমার বলে প্রণয় যেমন প্রগাঢ় তেমনি সবার বিচ্ছেদও দুর্বার।'

'প্রগাঢ় বলতে প্রগাঢ়। 'প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতির।''

'সে তো হাত জমে যাবার পর। কিন্তু প্রথম দিকে কী?' নীলাঞ্জনা চোখ নাচাল।

'প্রথমদিকে ইংরিজি মার্মার murmur পরে খাঁটি মার-মার। শুধু প্রগাঢ় ভালোবাসা নয়, একেবারে আগ্রাসী ভালোবাসা।'

'আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংসসহ
ধরার মানুষ আমি
আমি ভাই মহাকামী
আমার আকাঙ্ক্ষা সে যে মহাভয়াবহ।'

নীলাঞ্জনা লাফিয়ে উঠল: 'আরে এটা তো ক্রিকেটকে মনে করেই লেখা।'

'নিশ্চয়ই।' সুদর্শন সায় দিল: 'আমার আকাঙ্ক্ষা ব্র্যাডম্যানের ৩৩৪, হ্যামণ্ডের ৩৩৬, হানিফ মহম্মদের ৩৩৭, হাটনের ৩৬৪, সোবার্সের ৩৬৫ নট-আউট। আমার আকাঙ্ক্ষা এক ওভারে ছ বলে ছ-টা ছ মেরে ছারখার করা।'

'সেটা স্বপ্নের কথা।'

'আজ্ঞে না, সেটাও একজন করেছে, যার নাম হঠকারী বা অবিবেকীর বিপরীত—বলতে পারো ধীরোদাত্ত স্থিরসোমা, হাতের বানানে রেফ বাদ দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় শোভা-রস। যার মারে একসঙ্গে কান্না ও আনন্দ। তাই বলছিলাম মর্মরধ্বনির চেয়ে মার-মার ধ্বনি অনেক গভীর।

'আলিঙ্গনে ভাঙেচুরে
শ্বাসে হিমালয় উড়ে
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ-উপগ্রহ।
মর্দনে মন্থনে বুকে
অগ্নি উঠে গিরিমুখে
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।''

'ওদেশে নিরানব্বইয়ের ধাক্কা নেই?' নীলাঞ্জনা কথাটাকে লাইনে নিয়ে এল।

...দুটোই আছে। ১৯৬২-৬৩র প্রথম টেস্টের সেকেণ্ড ইনিংসে ডেক্সটার নিরানব্বুইয়ে আউট হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ক্যাপটেন, এই তার প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরি হতে যাচ্ছিল, হতে পারল না। ভাবো হতাশার বহরটা, যেন রাশিয়ায় থেকে নেপোলিয়নের বিধ্বস্ত হয়ে আসা! কিন্তু এ তো গেল হতাশার নিরানব্বুইয়ে আনন্দও আছে।'

'এক রানের জন্যে একশো থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে?'

'না, বঞ্চনা করি বাঁচালে মোরে।' জানো ...ক ইচ্ছে করে নিরানব্বুইয়ে আউট হল।'

'কোন সাটক্লিফ—বার্ট না হার্বার্ট?'

'হার্বার্ট। ইংলণ্ডের সাটক্লিফ। হবস সাটক্লিফ ক্রিকেটের রামলক্ষ্মণ, কিংবা ...—এত বড় ওপনিং পার্টনার আর ...পৃথিবী।'

'সেই সাটক্লিফ ইচ্ছে করে নিরানব্বুইয়ে ...হল? ইচ্ছে করে কেউ আউট হয়? ...নিরানব্বুইয়ে?' নীলাঞ্জনা বিশ্বাস ...চাইল না।

'সেই তো মজা। নইলে যে তার রেকর্ড ...হয় না।' সুদর্শন বললে, 'এই মহান ...১ থেকে ৯৮ প্রত্যেক সংখ্যায় এসে ...হয়েছে। তারপর ১০০ থেকে ১২৭ ...একটানা। শুধু নিরানব্বুইয়েই ...উঠেছিল না, মন সরছিল ...নিরানব্বুইয়ে আউট হলে ১ থেকে ১২৭ ...রেকর্ড হয়। একটা একশো ...সিঁড়ির রেকর্ড। 'সাতাশ ...একশো সাতাশ?' তাই একবার ...করার লোভ সম্বরণ করে ...নিরানব্বুইয়ে আউট হল সাটক্লিফ। একেই বলে রেকর্ডের নেশা। অনেক রকম রেকর্ড আছে—এটা একেবারে অভিনব।'

'তুমি বললে এক থেকে একশো সাতাশ। তাহলে বলতে চাও সাটক্লিফ শূন্য করেনি?'

'শূন্য করেনি এমন ক্রিকেটার জন্মেনি এখনো। যেমন আলিঙ্গন ছাড়া চুম্বন নেই তেমনি শূন্য ছাড়া ক্রিকেটার নেই। সব দেশে সমস্ত বীরই এই শূন্যের মেডেল বুকে দুলিয়েছে। কিন্তু জানো, নিরানব্বুইয়ে আরো একটা আউট আছে। শুধু নিরানব্বুইয়ে নয়, চারশো নিরানব্বুইয়ে।'

'বলো কী?'

'ক্রিকেটে কিছুই অসম্ভব নয়। যে বলে আকাশই শেষ সীমা তার কল্পনাই সীমাবদ্ধ।'

'বলো না এ কৃতিত্বটা কার?'

'হানিফ মহম্মদের। অবশ্যি এটা টেস্ট স্কোর নয়, করাচির একটা বেসরকারি ম্যাচ। অমনিধারা ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল ব্র্যাডম্যানের ৪৫২ নট-আউট। হানিফ ৪৯৯ করে শেষ ওভারের শেষ বলে এক রান তুলতে গিয়ে রান-আউট হয়ে গেল—পাঁচশো করতে পারল না। চারশো নিরানব্বুই আর পাঁচশোর মধ্যে ব্যবধান শুধু এক রান নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি।'

'খবর শুনে ব্র্যাডম্যান কী বললে?'

'অভিনন্দন জানিয়ে কেবল পাঠাল, তারপর এডিলেডে দেখা হলে ব্র্যাডম্যান হানিফকে ব্যক্তিগতভাবে সম্বর্ধনা জানালে। বললে, যে আমার রেকর্ড ভেঙেছে, ভেবেছিলাম সে লম্বায় ৬ ফুট তিন ইঞ্চি হবে আর ওজনে অন্তত পনেরো স্টোন। কিন্তু এ যে দেখছি একটি ছোট্ট মানুষ। লম্বায় মোটে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি আর ওজনে সাড়ে নয় স্টোন। কিন্তু, জানো, আমার পক্ষে

নিরানব্বুইয়ে আউট হল সাটক্লিফ
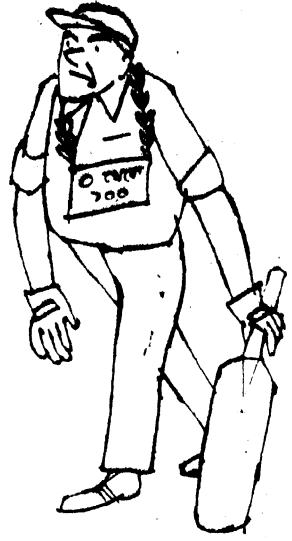
একটা কথা বলবার আছে, হানিফকে বোঝাল ব্র্যাডম্যান, চারশো বাহান্ন করে সবে গা-টা গরম করেছি, আমার ক্যাপটেন ইনিংস ক্লোজ করে দিল। যদি তা না করত, হাতে যা সময় ছিল তাতেই আমি—আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্র্যাডম্যান হাসল।'

'তার মানে রানের ডানায় চড়ে চাঁদে গিয়ে উঠত।'

'তা ব্র্যাডম্যানের পক্ষে অসাধ্য ছিল না। বাহান্নটা টেস্ট ম্যাচে আশি ইনিংস খেলে যার এভারেজ ৯৯·৯৪, তাকে তুমি কী

বলবে? লাঞ্চের আগে একটা সেঞ্চুরি, টি-এর আগে আরেকটা, আর দিনের শেষে তৃতীয়টা —প্রথম দিনেই ৩০৯ রান—এ তুমি কোথায় পাবে? ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, দিনের ধরা-বাঁধা না থাকলে এ বুঝি লক্ষ রান করে বসবে। ব্র্যাডম্যানের থেকে কোনো ওভার মেডেন পাওয়া বোলারের কাছে এক মহামূল্য সম্পদ। সবাই বলত এ মানুষ নয়, এ এক যন্ত্রদানব, বৃহত্তম কম্পিউটর, শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে যত রকম মারের কথা লেখা আছে সব এর জানা, আর আরো কিছু সে জানে যা এককথায়, দুনিয়ার বার। এমনকি মাটিতে পড়ে গিয়েও মেরে দাঁড় ধরায়।'

'তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল নাকি?'

'ঘটেছিল, লিডসে। টিলডের্সলির স্লো বল পিটিয়ে ছাতু করছে ব্র্যাডম্যান। একবার এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে পা পিছলে ক্রিজের বাইরে পড়ে গেল, সবাই ভাবলে নির্ঘাৎ স্টাম্প-আউট। কিন্তু না, কী তীক্ষ্ণ চোখ কী দুর্জয় অভিনিবেশ, সবচেয়ে শরীরের কী দুর্ধর্ষ শক্তি, পড়ে গিয়েও সে বল ছেড়ে দিল না, প্রায় শুয়ে পড়া অবস্থাতেই লেট-কাট করে স্লিপ-ফিল্ডসম্যানদের নাগালের বাইরে বল পাঠিয়ে দিল। অন্য লোক হলে ঐ অবস্থায় তার হাত থেকে ব্যাট খসে পড়ত মাটিতে হাত রেখে সে শরীরের ভার সামলাত, চোখ থাকত অন্ধকারের দিকে আর উইকেটকিপার মোলায়েম ঘুমের মধ্যেই স্টাম্প-আউট করে দিত। কিন্তু ব্র্যাডম্যান ব্র্যাডম্যান।'

'তোমার এই ব্র্যাডম্যান শূন্য করেনি?'

'আহা, শূন্যেও সে রাজরাজেশ্বর। মেলবোর্নে, টেস্ট, বোয়েসের প্রথম বলেই সে আউট। শোনো, প্রথম বলেই। আবার তার টেস্ট জীবনে সেইই প্রথম প্রথম বলে আউট হওয়া।'

'কেমন করে এটা হল?'

'এও দুনিয়ার বার। চার নম্বরে নামল ব্র্যাডম্যান—সে কী হাততালি, তার প্রতি পদক্ষেপে হাততালি। গার্ড নিচ্ছে তখনো হাততালি। হাততালি না থামলে বলের সম্মুখীন হবে না এমনি ভাব দেখিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ব্র্যাডম্যান। তখন হাততালিটা থামল। ব্র্যাডম্যান যেই এবার মারের আসন করে দাঁড়িয়েছে, ফের শুরু হল উল্লাস। বোলার শুধু দু-চার পা ছুটেছে, দেখল ব্র্যাডম্যান ফের হাতে ব্যাট ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কোলাহল চলতে থাকলে সে খেলবে না। এই কোলাহল বা আনন্দকলরোলটা কেন? না, জনতা চায় ব্র্যাডম্যান শুরু থেকেই উদ্দাম মার মারে—চাই কি প্রথম বলেই একখানা ছয়ের আতসবাজি ছোটায়। কিন্তু ব্র্যাডম্যান জানে ব্র্যাডম্যান কী করবে, জনতার কাজ পাগল হয়ে দেখা নয়, দেখে পাগল হওয়া। এমনি করে বারবার তিনবার খেলা বন্ধ হল। আর যতবার খেলা বন্ধ হয় ততবারই বোয়েস নতুন করে ফিল্ড সাজায়। ভাবখানা দেখায় সে ধরেই নিয়েছে প্রথম বলেই ব্র্যাডম্যান দারুণ হাঁকড়াবে, কী করে সে বাউন্ডারিটা বাঁচানো যায়। অবশেষে জনতা শান্ত হল, বোয়েস তার স্ট্রাইড নিলে। হায়, উজ্জ্বল দিনেরও মেঘ আছে, নির্মলতম নির্ঝরেও নিষ্পঙ্ক নয়, ব্র্যাডম্যানেরও ভুল হল। ভেবেছিল বাউন্সার আসছে, হঠাৎ দেখল শর্ট-লেংথ, জনতাকে খুশি করবার আকাঙ্ক্ষায় মারতে গেল আর মারতে গিয়েই প্লেড-অন হয়ে গেল। তখন দেখতে হয় কাকে বলে স্তব্ধতা! বিশাল মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে কোথাও একটি নিশ্বাস পড়ছে না, নড়ছে না চোখের পাতা। ব্র্যাডম্যান শূন্য মানে সমস্ত মাঠ শূন্য। শর্টলেগ-এ দুহাত তুলে জার্ডিন নাচছে বটে কিন্তু সেটা

আর ওজনে অন্ততঃত পনেরো স্টোন

মনে হচ্ছিল শত্রুর পক্ষেও অশালীন। স্তব্ধতার মরুভূমি পেরিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে একা চলে গেল ব্র্যাডম্যান।

পেভিলিয়নের গেটের কাছে পৌঁচেছে তখন কে একটি মহিলা মৃদুছন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। সেই শব্দ কেউ শুনল না, দেখল দুখানি হাত পরস্পরকে আঘাত করবার জন্যে নড়ছে। আর যায় কোথা! সেই ছোট্ট ইশারায় সমস্ত মাঠ ফেটে পড়ল হাততালিতে। এখন শোনো একবার সেই শূন্যের শব্দ!'

'এই যে সুদর্শন! এই যে নীলাঞ্জনা!' খবরের কাগজের পরিতোষ এসে হাজির 'কী কথা হচ্ছে?'

'ব্র্যাডম্যানের শূন্য করার কথা।'

'ওসব পুরোনো কথা ছাড়ো।'

'কালিদাস পুরোনো হবে না, শেকসপিয়র পুরোনো হবে না, রবীন্দ্রনাথ পুরোনো হবে না—তেমনি ব্র্যাডম্যানও পুরোনো হবে না।'

'ক্রিকেটের কবি যদি কেউ থাকে সে ব্র্যাডম্যান নয় সে ভিক্টর ট্রাম্পার।' পরিতোষ অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'তাই ওসব ছেড়ে আধুনিকদের কথা বলো। বলো ডিয়লিভিয়েরার কথা যাকে নিয়ে। MCC মানে দাঁড়াল Mighty Colour Conscience প্রথম যখন টিম থেকে ডিয়লিভিয়েরাকে বাদ দেওয়া হল, সেটা ঐ সাউথ আফ্রিকার কালাতঙ্ক বিবেচনা করে, তখন MCC ছিল Mighty Colour Consciousness—আর যখন দেশমত জাগ্রত হয়ে ডিয়লিভিয়েরাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করল তখন সাউথ আফ্রিকার প্রতিবাদে সমস্ত ট্যুর বাতিল করে দিয়ে MCC সাধু সজ্জন—তার মানে হয়ে গেল Mighty Colour Conscience যেন ইংলণ্ড কত বিবেকের ধার ধারে! আর যে দেশ ... বর্ণবৈষম্য মানে তাকে মুখের উপর বলে দিতে হয়—'it is not cricket'।

'কিন্তু তাই বলে ব্র্যাডম্যানের জীবনের শেষ টেস্টে ওভেলে হলিস-এর দ্বিতীয় বলে শূন্য করে আউট হয়ে যাওয়া করুণের চেয়েও করুণ। খুনী আসামীর শেষ খাওয়া মানে ফাঁসির খাওয়ার মত কত রান না জানি আজ আত্মসাৎ করে দেখবার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে আছে। কিন্তু এ 'কী হেরিলাম নয়ন মেলে!' দ্বিতীয় গুগলি বলটাতেই ব্র্যাডম্যান বোল্ড! কত লোকের আশা ছিল যাবার শিখরেও সূর্য সমান বঙ্কিম হবে কিন্তু কী একটা কালো মেঘের আড়ালে উঠে শেষবিদায়ের সূর্য অন্তর্ধান করল!'

'শুধু ব্যাটসম্যান আর রানের স্তূপ দিয়ে কী হবে,' নীলাঞ্জনা বিরক্ত হয়ে বললে, 'যদি প্রতিপক্ষকে আউট করতে না পারো? সুতরাং ব্যাটসম্যান ছেড়ে বোলারের কথা বলো। ব্যাটে-বলে সমান ধুরন্ধর সেই দ্বিতীয়রহিত সোবার্স বা শোভা-রসের কথা বলো।'

'ঠিক বলেছ, হাতে হাত দাও' নীলাঞ্জনার দিকে হাত বাড়াল পরিতোষ 'নয়নে শুধু কাজল দিয়ে কী হবে যদি কটাক্ষ না থাকে? শুধু স্তূপ দিয়ে কী হবে যদি রূপ না থাকে? ঠিক বলেছ—কই হাতে হাত দাও।'

নীলাঞ্জনা মুচকে হেসে বললে, 'তোমাদের প্রেসের লোককে বিশ্বাস নেই।'

'কেন?'

'তোমাদের দুই কাজ, ছাপা আর চাপা। প্রেস-এর যা অর্থ তাই। তারপর মারামারি রব তুলবে freedom of press। হ্যাণ্ডসেকের দরকার কী! নমস্কার!'

'বিমার' এলে আনাড়ি ব্যাটসম্যান যেমন ভাব করে তেমনিভাবে পরিতোষ নিজেকে গুটিয়ে নিল না, উচ্চহাসির স্ট্রোক মেরে একেবারে ওভারবাউন্ডারি করে দিল। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়!'

কার্তিক বসু ক্রিকেটার গড়েন। হাল-[illegible] কলকাতার মাঠে যতগুলি ক্রিকেট [illegible]লোয়াড় খেলছেন, তার অর্ধেকেরও বেশি [কার্তি]ক বসুর হাতে-গড়া। তবু বাংলার [illegible] ক্রিকেট আজ বড় দুর্দিন। জাত-[খে]লোয়াড়ের বড় অভাব। জাত-খেলোয়াড় [illegible] নির্মল চ্যাটার্জির মত ব্যাটস-[ম্যা]ন এবং পণ্টু চৌধুরীর মত বোলার [illegible] কোথায়? ভারতীয় দলে মণ্টু [বা]নার্জি, খোকন সেন, পণ্টু চৌধুরীর [টে]স্ট ম্যাচ খেলার পর বাংলার শেষ টেস্ট [খে]লোয়াড় পংকজ রায়। রণজি ট্রফির খেলায় [illegible] আশানুরূপ নয়। [illegible] এই শোচনীয় অবস্থা থেকে [illegible] উপায়? তিন মাস ক্রিকেট [illegible] কোথাও হালে পানি পায় [illegible] জানেন। অসময়ে খেলার [illegible] কিনা সে-চেষ্টা আজও [illegible] ইনডোর স্টেডিয়ামে চৈত্র [মা]সের ভরদুপুরে এবং ঘন বরষায় পংকজ [রা]য় টেস্ট খেলোয়াড় বলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় [illegible] প্র্যাকটিশ করতেন দিনের পর দিন। [কার্তি]ক বসু মাঝে মাঝে ইনডোরে স্কুলের [ছে]লেদের প্র্যাকটিশ করান। তবে ইনডোর [স্টে]ডিয়ামটি ক্রিকেটের জন্যে রিজার্ভ নয়। [illegible] কি না হয়! ইনডোরে ক্রিকেটের [ব্যব]স্থা থাকলে খেলা যে সেখানে চালিয়ে [যা]ওয়া যায়, তার প্রমাণ রয়েছে। তাহলে [illegible] মেটাবার জন্যে তথা ক্রিকেটের [illegible] জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হয়নি [illegible] বাংলার ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অনেক [illegible] কিন্তু খেলার মান সেই অনুপাতে [illegible] এখানে খেলার মান সম্পর্কে [illegible] মতামতের যথেষ্ট মূল্য [illegible] ধরে তিনি বাংলা ক্রিকেটের [illegible] কোচ। লোকে জোর দিয়ে [illegible] ক্রিকেটের টেকনিক জানতে [illegible] ক্রিকেট খেলা শিখতে [illegible] কার্তিক বসুর কাছে যাও। [illegible] কার্তিক বসুর সঙ্গে [illegible] আমার আর্জি শুনে [illegible] ঃ "ভাল কথা। তোমার [illegible] নয়। কি করলে ভাল [illegible] ক্রিকেটের মান বাড়বে, তা আশা করি [illegible] দিতে পারব। আমায় একটু [illegible] দাও। বরং কাল, ঠিক এই সময়ে।"

কথা বলতে বলতে তিনি এগিয়ে গেলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "দেখলে ত' এটা কি ছাড়ার বল। তুমি বলো!" কার্তিক বসু ব্যাটসম্যানের ভুল শুধরে দিলেন। অফ্ স্টাম্পের একটু বাইরের বল কি করে ডিফেন্স করতে হয় পা বাড়িয়ে, তা তিনি দেখিয়ে দিলেন। একেবারে কারেক্ট এ্যাপ্রোচ। যার নাম কপি-বুক ক্রিকেট।

পরের দিন কার্তিক বসু বেশ গুছিয়ে আমার একটির পর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল:—

"আপনাদের সময়ে বাংলাদেশে টেস্ট ক্রিকেট খেলবার মত কোন খেলোয়াড় ছিলেন না!"

"ছিলেন বৈকি। তবে সে-খবর কর্তাদের কানে পৌঁছে দেওয়ার মত কোন লোক ছিলেন না। তখন বাংলার ক্রিকেট সাহেবদের হাতে। সাহেবদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে বারবার তাদের হারালেও, তাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতেন না। তাই বাঙালী ক্রিকেটারদের জন্যে সাহেবদের কখনও মাথা ঘামেনি। মুখ ফুটে তাঁরা কিছু বলেননি। এ-দুর্ভোগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যুগ শেষ হল। রণজি ট্রফির খেলায় বাংলার হয়ে তখন মাত্র তিনজন বাঙালী খেলতে পেতেন। যে-বছর বাংলা রণজি ট্রফি পায়, সে-বছর বাংলা দলে পাঁচজন বাঙালী খেলোয়াড় ছিলেন।"

"এত কষ্ট সয়ে ক্রিকেটে যে অধিকার পেলেন তা রাখা গেল কি? আজকের বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কিন্তু ভাল নয়। ভরা-ডুবি হতে দেরী নেই। এ-বিষয়ে আপনার কি ধারণা?"—কার্তিকদাকে আমি এই প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম :

"কোন খেলার ভবিষ্যৎ কখনও খারাপ হতে পারে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি আমরা সুযোগ-সুবিধাগুলি ঠিকভাবে কাজে লাগাই, তাহলে নিশ্চয়ই উন্নতি হবে। বাংলাদেশের ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। শুধু দেখবার অভাবে ছেলেরা ঠিক পাকা-পোক্ত হতে পারছে না। বাংলার প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা খেলা শেখাতে যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে উঠবে।"

"তখনকার দিনে কোয়ালিটি প্লেয়ার বেশি থাকার কারণ আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

"দুর্ধর্ষ সাহেব খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দেব বলে আমরা মরণপণ করে-ছিলাম।" কার্তিকদার চোখমুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো। বলে চললেন—"ইংল্যাণ্ডের প্রথম শ্রেণীর কাউণ্টি প্লেয়ারদের কাছে কিছুতেই হার মানব না, তাঁদের প্রতিপত্তি কেড়ে নেব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পাগলের মত খেটেছিলাম। সাহেবদের বারবার হারিয়ে প্রমাণ করেছিলাম, বাঙালীরাও ক্রিকেট খেলতে পারে।" কার্তিকদা একটু ভেবে আরও একটা কারণ দিলেন, বললেন, "আমাদের সময়ে বাংলাদেশে আজকালকার মত এত ক্রিকেট টিম ছিল না। তাই সাধারণ খেলা খেলে কোন দলে চান্স পাওয়া খুবই শক্ত ছিল। একটা উদাহরণ দিই। তখনকার দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়ান, মোহন-বাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলে স্থান পেতে খেলোয়াড়দের যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাতে হত। আর দলের এগারটি খেলোয়াড় বাছাই করতে কম মুস্কিলে পড়তে হত না। এক-একটা ক্লাবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা করে খেলোয়াড় থাকতেন। সবাই লড়ছেন খেলবেন বলে। আর আজকাল একটা দল ছেড়ে অন্য দল খুঁজে নিচ্ছে খেলোয়াড়দের

বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হয় না। আজ-কাল দলের সংখ্যা অনেক।"

প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা কার্তিকদা, বিছানায় ঘুমোবার সময়ও আপনার হাতে ব্যাট থাকত। কথাটা কি ঠিক?"

কথাটায় সায় দিলেন কার্তিক বসু। একটু লজ্জা পেলেন। তবে তাঁর বলার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা ছিল না। তিনি দীপ্তকণ্ঠে বললেন : "তখনকার দিনে খেলোয়াড়রা বড় হব বলে খেলার অনুশীলন করতেন; সমস্তক্ষণ একটা খেলার আবহাওয়া নিজেদের আশেপাশে গড়ে তুলতেন। খেলা থেকে কি পাব—এ-কথা তাঁদের মনে কখনই আসত না। বরং খেলার জন্যে তাঁরা অনেক ত্যাগস্বীকার করেছেন। খেলাকে জীবনের ধর্ম মনে করতেন। সাহেব খেলোয়াড়রা এ-দেশ ত্যাগ করার পরও আমাদের খেলা উন্নত ছিল। দেশের হালচাল পরিবর্তনের সঙ্গে খেলারও আমূল পরিবর্তন হল। নদীতে যেন চর পড়ে গেল।" হাত উলটে কার্তিক বসু আফশোষ করলেন। হাতের মুঠি শক্ত করলেন তিনি, যেন এই ক্ষয়িষ্ণু বাংলাকে উদ্ধার করতে চাইছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আমি দেখলাম আশার আলো। তিনি বাংলার দুর্দশায় এতটুকু ভেঙে পড়েননি। তিনি বললেন : দেশের স্কুলগুলির নিজস্ব খেলার মাঠ নেই। এ-অভাব দূর করতেই হবে। তখন কলকাতা শহরে ন' লক্ষ লোক বাস করত। আর আজ নব্বুই লক্ষ লোক শহর জুড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। চাহিদা মেটানর জন্যে সারাদেশে শত শত স্কুল গড়ে উঠেছে, কিন্তু ছেলেদের খেলবার মাঠ কোথায়? স্কুলে পাঠ্যপুস্তকের মত খেলাটাকেও শিক্ষার মূল বিষয় বলে ধরে নিতে হবে। তার জন্যে চাই প্রত্যেক স্কুলের নিজস্ব খেলার মাঠ, প্রয়োজনমত খেলার শিক্ষক। এ-ব্যবস্থা শুধু শহরে নয়, প্রতিটি গ্রামে গ্রামে। শিক্ষকরা সময়মত তৈরি খেলোয়াড়দের নাম পাঠাবেন আরও উন্নত শিক্ষার জন্যে। ক্রীড়াবিদরাও গ্রামে গ্রামে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন। গ্রাম এবং [illegible] মধ্যে খেলার যোগসূত্র থাকলে সুফল পাওয়া যাবে।"

আমার প্রশ্ন : "মাত্র তিন মাস খেলে বাংলার ছেলেরা কি অস[illegible] করতে পারবেন?"

"কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেন[illegible] ক্রিকেটের মরসুম সাজগোছ করতেই যায়। অন্তত পাঁচ মাস ক্রিকেট [illegible] হবে। আর একই মাঠে ক্রিকেট, ফুট[illegible] বল খেলা হবে এই বা কেমন [illegible] ক্রিকেটের জন্যে আলাদা মাঠ চাই। [illegible] বলের ডামাডোল কাটিয়ে উঠতেই [illegible] পুজো কেটে যায়। ক্রিকেটের প্রস্তু[illegible] শেষ করার মত হাতে সময় পাওয়া [illegible] ক্রিকেট খেলার জন্যে ভাল মাঠ [illegible] বোম্বাইতে স্কুল, কলেজ, ক্লাব এবং [illegible] খেলা নিয়ে মোট পঞ্চাশটি টিম [illegible] তুলনায় বাংলায় অনেক কম।" ক[illegible] তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

পঙ্কজ রায়

কার্তিক বসু যেখানে শেষ করলেন, তারপর বাকীটুকু জুড়ে দিলেন টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়। ভারতীয় ক্রিকেটের দুর্দশার কথায় তিনি কোন আমল দিলেন না। বললেন : "এই বিশাল ভারতে ক্রিকেটের গুণাগুণ বিচারে বাংলার ক্রিকেটের স্থান কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে জান?" উত্তর দেওয়ার মত কথা খুঁজে পেলাম না। লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। পঙ্কজ রায় কোন দ্বিধা না করেই বললেন : "কর্তৃপক্ষদের সব সময়ে দায়ী করলে চলবে কেন? ছেলেরাও সাধ্যমত চেষ্টা করে ভাল খেলবার, কিন্তু তাদের সাধনায় তেমন জোর নেই। কোনরকমে খেলাটাকে আয়ত্ত করতে পারলেই রুজি-রোজগারের একটা পথ মিলবে, আজকাল সকলেরই স্থির ধারণা হয়েছে। তারপর খেলাটা তাদের সেকেন্ডারী হয়ে পড়ে। খেলা তখন একটা মাত্রায় এসে ঠেকে যায়। উন্নতির পথ বন্ধ। এমনকি অর্জিত বিদ্যেটাও ধরে রাখা সম্ভব হয় না। তুমি ত' জান ভাল খেলবার জন্যে কি চেষ্টাই না আমি করেছিলাম।" অকপটে স্বীকার করলাম তাঁর কথা। বলতে আমার দ্বিধা নেই। কোথায় দর্জিপাড়ার মাঠ, মার্কাস স্কোয়ার, ইনডোর স্টেডিয়াম—সারা বছর খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা একটা-না-একটা ঘাঁটি খুঁজে বার করতাম। অলি-গলিতে, কর্পোরেশনের মাঠে খেলতে গিয়ে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিনি।

"এছাড়া কোন উপায় ছিল কি?" পঙ্কজ রায় কথাটার গুরুত্ব দিয়ে বললেন : "একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় তিনমাস ক্রিকেট খেলে বাকী ন' মাস বসে থাকে। অর্থাৎ পুনরায় ব্যাট ধরে ন' মাস আগে যে-খেলা সে খেলে এসেছে, তা আয়ত্ত করতে তার কম সময় লাগে না।" একটু চিন্তা করে পঙ্কজ রায় বললেন : "সে-খেলা ফিরে পেতে অন্তত তিন সপ্তাহ লাগবেই। তাহলে বোঝ, কোন ভরসায় আমরা বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজের সঙ্গে খেলব। তাদের সঙ্গে খেলে ত' দেখেছে কত তফাৎ। পাল্লা দেওয়া দূরের কথা কাছে ঘেঁষতে পারা যায় না।"

"এ-অভাব ত' চিরকালের। সময় সময় তবুও বাংলার খেলোয়াড়রা বেশ তাক-লাগান খেলা দেখিয়ে যে-বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন, তার কারণ কি?" পঙ্কজ রায়ের উত্তর : "বাংলাদেশে ক্রিকেটের উন্নতি এবং জনপ্রিয়তার জন্যে রাজা-মহারাজাদের অবদান ছিল সবথেকে বেশি। তাঁরা বাইরে থেকে নামকরা খেলোয়াড় আমন্ত্রণ করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতেন। খেলোয়াড়দের খেলা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকত না। এবং খেলার জন্যে মোটা মাইনের ব্যবস্থা থাকত। কাজেই তখন খেলার উন্নতিও খুব হয়েছিল।"

"তখনকার দিনে রাজা-মহা[illegible] ক্রিকেট খেলার জন্যে যে [illegible] করতেন, তা আজ [illegible] পক্ষদের পক্ষে অসাধ্য [illegible] পঙ্কজ রায় একটা [illegible] করলেন। বললেন : "[illegible] মহারাজারা সখ মেটাতে [illegible] নেই। ইংল্যান্ডে দেখে [illegible] খেলোয়াড়রা দিনদুপুরে [illegible] ক্রিকেট খেলার মহড়া দিচ্ছেন। ইংল[illegible] নামকরা টেস্ট খেলোয়াড়রা কেউ [illegible] পুত্তুর নন। রুজি রোজগারের [illegible] তাঁদের সারাদিন কেটে যায়। কিন্তু [illegible] আলো জ্বালিয়ে তাঁরা বেশ নি[illegible] ক্রিকেট খেলেন। কাউন্টিকে খেলতে [illegible] তিনি দিনে খেলবার সময় পান না[illegible]

—প্রশান্ত [illegible]

জোড়ামিল নয় ওলোটপালট চাই

অজয় বসু

...লিম্পিক হকির ব্রোঞ্জ পদকটির দিকে ...য়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর ...প্রান্ত পর্যন্ত সবাই যেন আজ তারস্বরে ...শোষ করছেন। স্বর্ণ সঞ্চয়ে অভ্যস্ত ...যে দেশ, সে দেশকে যদি সোনা ছেড়ে ...ঞ্জর পদকটি আঁকড়ে ধরতে হয়, তাহলে ...বাসীর মনোবেদনা বাড়ে বৈকি! সোনার ...র ব্রোঞ্জের কোনো তুলনাই হয় না। ...না কিসে আর কিসে! তাই সোচ্চার ...না আশাহতের হা-হুতাশ এবং মনো-...দের যন্ত্রণার যথার্থ কারণ উপলব্ধি করা ...। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে এই ... কি একেবারে অপ্রত্যাশিত?

...বোধহয় নয়।

...শুধু ঝলমলে ঐতিহ্যের দিকে না ...কয়ে যদি আরও চারপাশে নজর দেওয়া ...তাহলে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, ...ক'বছরে নানান আয়োজনের সঙ্গে ...র্জাতিক হকির ওপরতলায় বড় রকমের ...বদলের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৬ সালে ব্যাংককে এশীয় ক্রীড়ার ... প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকি-...নকে হারিয়ে ভারত বিশ্ববিজয়ী সম্মান ...ন করে নিলেও, ওই প্রতিযোগিতাতেও ...ঃ সর্বক্ষণ শ্রেষ্ঠের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ...তে পারে নি। ব্যাংককের ফাইনালে ...কিস্থানই ছিল প্রবলতর পক্ষ, বেশির ...গ সময়েই পাকিস্থান ছিল অক্রমণাত্মক ...কায় অবিচল। ভারতের রাইট উইং ...বীর সিং নিছকই নিজের চেষ্টায় একটি ...ল করে নিজের দলকে জয়যুক্ত করে-...লেন। তাছাড়া ফাইনালে ওঠার পথে ...তিখবশ্য ভারতকে অন্য একাধিক প্রতি-...গীকে নামমাত্র গোলের ব্যবধানে হারাতেই ...তিমতো হিমসিম খেতে হয়েছিল। সুতরাং ...স্থা যে বদলাচ্ছে তার লক্ষণ সেই ...৬৬ সালেই পাওয়া গিয়েছিল।

তবু তো পাকিস্থানকে ...রিয়ে এশীয় হকিতে সোনার ...ডেল পাওয়ার সান্ত্বনায় সেদিন অনেকেই ...ষ্কুট থেকে বাস্তবকে অস্বীকার করতে ...য়েছিলেন। এশীয় হকির স্বর্ণ-স্বীকৃতি ...দের কাছে হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো। ...স্তু চক্ষুষ্মান দর্শকদের চোখ শুধু স্বর্ণ-...জ্জর চাকচিক্যেই ধাঁধিয়ে যায় নি। তাঁরা ...ংককের হকিমাঠে আরও সন্ধানী দৃষ্টি ...লে বুঝেছিলেন এবং বলেওছিলেন যে ...রতীয় হকি দলের পুঁজিতে টান পড়ছে।

পরের বছর লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক হকি উৎসব হয় সেখানে ব্যাংকক প্রত্যাগত দলটিকে প্রায় অটুট রেখেই পাঠানো হয়। কিন্তু লণ্ডনে গিয়ে বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় হকি দল প্রতিযোগী মহলের প্রথম দুটি আসনের একটিও দখল করতে পারে নি। দেওয়ালের লিখন ব্যাংককে যদিও বা কিছুটা অস্পষ্ট থেকে থাকে, লণ্ডনে তা পুরোপুরি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তারপর এ বছরের কেনিয়া সফরের বৃত্তান্তেও ভারতীয় হকির নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের সমর্থন নেই। কাজেই মেকসিকোর বিপর্যয় আমাদের কাছে বেদনাদায়ক হলেও, তেমন অপ্রত্যাশিত নয়। চোখ, কান ও মনের দুয়ার যাঁরা খুলে রেখেছিলেন তাঁরা বোধহয় এমনি এক দুর্যোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

কেন এই হার হলো? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হলো প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। তিনি বলেছেন, দলে শৃংখলাবোধের অভাবই পরাজয়ের হেতু।

এ অভিযোগ চাঞ্চল্যকর বিশেষতঃ তা যখন উচ্চারিত হয়েছে দায়িত্বশীল প্রধান-মন্ত্রীর মুখে। শৃংখলা কি ভাবে ভাংগা হয়েছে এবং কারাই বা ভেংগেছেন? সাধারণ হিসাবে শৃংখলা ভংগ বলতে বুঝি যে, অধিনায়ক অন্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন না ফলে দলগত সংহতিও গড়ে উঠছে না অথবা আচরণ-বিধির মর্যাদা রাখায় নিষ্ঠা দেখানো হচ্ছে না। অর্থাৎ বিদেশ গিয়ে খেলোয়াড়েরা অনুশীলন করছেন না, যখন তখন শিবিরে ফিরছেন অথবা মদ্যপান করছেন, নাইট-ক্লাবে সময় কাটাচ্ছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সোচ্চার অভিমতে কোন দুষ্কর্মের প্রতি ইংগিত করেছেন জানি না। তবে তিনি যে খোলাখুলি অভিযোগে হকি দলটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু তারপর তিনি কি করেছেন? তাঁর বিচারে যাঁরা শৃংখলা ভেংগেছেন তাঁদের শাস্তি দিতে তিনি কেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি? জাতীয় দল হারতেই রাষ্ট্রের কর্ণধার বিচলিত চিত্তে খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে শৃংখলা ভংগের অভিযোগ আনবেন, আর তারপরই নিষ্ক্রিয়তার আড়ালে বিষয়টিকে গাঢাকা দিতে সাহায্য করবেন, এ কোনো কাজের কথা নয়। কাজ হতে পারে যদি দোষীদের খুঁজে বার করে তাদের যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তাহলেই উত্তরকালের খেলোয়াড়দের অপরাধপ্রবণতা কমবে।

ওলিম্পিকে হকি দলের হারে প্রধান-মন্ত্রীর বিচলিত অবস্থা এবং পরক্ষণেই তাঁর নিষ্ক্রিয়তা দেখেই ভারতীয় ক্রীড়া সম্পর্কে ভারত সরকারের মনের অবস্থা টের পাওয়া যায়। সেই মন একেবারেই অগোছালো এবং নেপথ্য চাপের কাছে নতি স্বীকারে সর্বদাই প্রস্তুত। মেকসিকো ওলিম্পিকের আগে ক্রীড়া দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সজোরে ঘোষণা করেছিলেন যে অকারণে ক্রীড়া কর্মকর্তাদের মেকসিকো যেতে দেওয়া হবে না। তবুও শেষ পর্যন্ত প্রায় ডজন দেড়েক কর্মকর্তা মেকসিকোতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা কি করে-ছিলেন তা দেশের জনসাধারণ জানতে পারেন নি। সরকারও তাঁদের ভূমিকার মূল্যায়নে এখনও সক্রিয়তা দেখান নি।

দেশের ক্রীড়াবিদেরা সাফল্য লাভ করা মাত্রই প্রশাসন আত্মতুষ্ট বোধ করেন। টেস্ট-ম্যাচে সেঞ্চুরী করলেই নবাব পাতৌদি প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা পান। আর ওলিম্পিক হকিতে হার হলেই নেহরুতনয়া গোটা দলকেই বেআদপ বলে ধিক্কার দেন। কিন্তু এই সাফল্য ও ব্যর্থতার ফাঁকে যেসব গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ থেকে যায় সেই সুযোগ সদ্ব্যবহারে নেহরু বা তাঁর কন্যার নেতৃত্বাধীন সরকার এগিয়ে আসেন না। দায়িত্বশীল মন্ত্রীর কাজে ও কথায় এইখানেই অসঙ্গতি। আর সেই অসঙ্গতির অবক্ষয়েই জাতীয় ক্রীড়া ভুগছে। এই পরিস্থিতিতে হকিতে হার কোনো আশ্চর্য অঘটন নয়।

সরকার কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ নামে একটি উপদেষ্টা বোর্ড নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলি যখন উপদেষ্টা বোর্ডের উপদেশাবলীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় তখন সরকারী ব্যবস্থার ফাঁস ক্রীড়া-সংস্থাগুলির গলায় এঁটে দেওয়া হয় না। তখন বলা হয় যে ক্রীড়াসংস্থাগুলি হলো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। তাদের কাজে হাত দেওয়া অগণতান্ত্রিক। তাই যদি হয় তাহলে ঠাঁটু বজায় রাখতে একটি ক্রীড়া পরিষদ খাড়া করার প্রয়োজন কি?

জাতীয় ক্রীড়াদলের বিদেশ সফর বা বিদেশী দলের ভারত সফরের অনুকূলে সরকার নিয়মিত অর্থসাহায্য দিয়ে থাকেন, প্রয়োজনে দামুল্য বৈদেশিক মুদ্রাও মঞ্জুর করেন। কিন্তু মঞ্জুরীকৃত অর্থ গিয়ে জলে পড়লো কিনা তার হদিশ জানার চেষ্টা করা হয় না। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যাঁর হাতে সেই জাতীয় সরকারের মনের ও কর্মপদ্ধতির অবস্থা যখন এমন এলোমেলো তখন দেশীয় ক্রীড়া বা জাতীয় হকির যে মান উন্নয়ন ঘটবে এমন আশা কোথায়?

মেক্সিকো ওলিম্পিকে হারের পর সরকারী মুখপাত্র বা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা এবার কিছু করা হবে বলে সংসদে ও তার বাইরে ঘোষণা করেছেন। আশা করি, এবারের আশ্বাস অন্ততঃ আগেকার অনেক শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতির মতো। শুধু শব্দতেই বিলীন হবে না। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে মেক্সিকোর বিপর্যয় সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে একটি কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছে। এই কমিটিতে কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের ঠাঁই হয়েছে। খেলোয়াড়দের ডেকে এনে কমিটিতে জায়গা দেওয়ার লক্ষণটি দূরাস্তঃ আশাপ্রদ। কমিটি হয়তো যথাকালে তদন্ত সেরে কিছু সুপারিশ রাখবেও। কিন্তু সুপারিশগুলিকে বাস্তবে কার্যকর করে তোলা হবে কিনা কে বলতে পারে!

খেলাধুলোর উন্নয়ন চিন্তায় দেশে এর আগেও সরকারী ও আধা-সরকারী উদ্যোগে ঘটা করে আলোচনা সভা, ক্রীড়া কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে। সেইসব বৈঠকে শুধু সংকল্প নয় করে অনেক লোভনীয় প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। মায় টেস্টম্যাচ উপলক্ষে ইডেনের কলংক মোছাতে একটি তদন্ত কমিশন বসানো হয়েছিল এক প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে। কমিশন তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠাভরে পালনও করেছিল, কিন্তু কমিশনের সুপারিশগুলির হাল যে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে তা আমরা সবাই জানি। কাজেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ নিযুক্ত নতুন তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভাগ্যে যে কি লেখা রয়েছে সে সম্পর্কে এখন নিশ্চিত হবার কারণ দেখি না। তবে ঘানষে ঠেকে শেখে বলেই নতুন উদ্যমকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চাই না। তাই বলি, দেখা যাক, খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া নতুন কমিটির সুপারিশগুলিকে কার্যকর করায় জাতীয় সরকার এবারে আন্তরিকতা ও তৎপরতা দেখাতে এগিয়ে আসেন কিনা।

আগেই বলেছি, খেলোয়াড়দের নিয়ে কমিটি গঠন করার নজীরটি আশাপ্রদ। তবে ওঁদের শুধু বিক্ষিপ্তভাবে এক-আধটি কমিটিতে বসার অধিকার দিলেই (তাও নিতান্ত দায়ে পড়ে!) চলবে না, তাঁদের হাতে জাতীয় হকির তথা জাতীয় ক্রীড়ার সমস্ত বিভাগের প্রশাসনের অধিকার তুলে দেওয়াও দরকার।

আমাদের দেশের চতুর ক্রীড়া-কর্মকর্তারা এতোদিন ছলে, কৌশলে, চক্রান্তে ক্রীড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিকে খেলোয়াড়দের নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছেন। ক্ষমতা ও অর্থ, লোভ ও মোহের টানে তাঁরা প্রশাসনিক কাঠামোয় নিজেদের যুগ-যুগ ধরে জিইয়ে রাখতে গিয়ে খেলোয়াড়দের সেই কাঠামোর ছায়া মাড়াতে দেন নি। ফলে অ-খেলোয়াড় এইসব কর্মকর্তার আমলে ক্রীড়া প্রশাসনে আসল জিনিস খেলাধুলার মূল্য ও মর্যাদা কমে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, প্রশাসনে যদি যথার্থে খেলোয়াড়দের ফিরিয়ে আনা যায় কেবলমাত্র তাহলেই খেলাধুলোর সত্যিকারের মূল্য ধরে দেবার চেষ্টা করা হবে এবং তাতেই জাতীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়নের রাস্তা হবে সুগম।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন সম্প্রতি নবগঠিত কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্বোধন করতে গিয়ে জাতীয় ক্রীড়ানীতির কথা বলেছেন। সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আমার প্রস্তাব, খেলাধুলোর প্রশাসনের দায়িত্ব খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দিতে হবে—এই মূল কথার ভিত্তিতেই যেন জাতীয় ক্রীড়ানীতির বনেদ তৈরী করা হয়। নইলে কোনো নীতিতেই জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন ঘটাতে পারবে না।

প্রশাসনে খেলোয়াড়দের ভূমিকা প্রয়োজন ঐতিহাসিক কারণে। যেহেতু শুধু প্রশিক্ষকদের হাতে শুধু শিক্ষাভার তুলে দিলেই ক্রীড়া উন্নয়নে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। ক্রীড়া শিক্ষাকে সার্থক ও সফল করে তুলতে প্রশাসনিক সহযোগিতা চাই। দুটি বিষয় আপেক্ষিক। তাই দু কাজের দায়িত্ব একই ধরনের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করতে হবে। খেলোয়াড় আর খেলোয়াড় কর্মকর্তাদের চিন্তায় ও কাজে যদি গরমিলই থেকে যায়, তাহলে কি কাজ যে হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই কাজই আমাদের দেশে এতোকাল হয়ে আসছে। জনকয়েক আসাধারণ প্রতিভাধর খেলোয়াড়ের কল্যাণে যতোদিন আমরা আন্তর্জাতিক হকির পুরোভাগে থাকতে পেরেছি ততোদিন খেলোয়াড়বর্জিত ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার দিকে অনেকেই নজর দেন নি। কিন্তু অন্যান্য দেশের সগর্ব অগ্রগতির পর আর ওদিক পানেই চোখ ফেরানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তদন্ত কমিটিতে জনকয়েক খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ জানানোর দৃষ্টান্ত দেখে অনুমান করা যায় যে, কর্তাদের টনক নড়েছে। কিন্তু তবু জিজ্ঞাস্য, এখনও দ্বিধা কিসের? কেন স্বার্থপর কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিয়ে যথার্থ খেলোয়াড়দের ক্রীড়া প্রশাসনে সর্বময় ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে না? করলে একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আভাষ মিলতো। মেক্সিকোর বিপর্যয়ের পরও কি ক্রীড়া প্রশাসনে সরকারী বিপ্লব বাধাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে না? আর দুঃশাসনে অবসান ঘটাতে মন্ত্রো এক ওলট-পালট ঘটানো ছাড়া উজ্জীবনের অন্য রাস্তা আছে বা কি? অন্য পথে শুধু গোঁজামিল দেওয়া হবে এবং এই গোঁজামিল অন্ততঃ চোখের জল মোছাতে কোনো স্থায়ী কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে না। আমার আস্থা তাই গোঁজামিলে নেই, আছে এই প্রশাসনিক বিপ্লবে।

একটি অসাধারণ ইনিংস

কমল ভট্টাচার্য

১৯৪৩ সালের ঘটনা। বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা রেস্ট দলের সঙ্গে হিন্দু দলের। তখনকার দিনে মাঠে ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের মত লোকের ভীড় রেকর্ড ভীড় বলেই ধরা হত। কিন্তু এই খেলাটা ছিল একপক্ষেরই। কেননা হিন্দু দল ছিল তখন খুবই ভারী দলের তাবড় তাবড় খেলোয়াড়রাও ছিল ক্রীড়ানুরাগীদের নয়নের মণি। মার্চেন্ট, মানকড়, অধিকারী, সি. এস. নাইডু, কিষণ-চাঁদ, সারভাতে এবং সুটে ব্যানার্জির নামে তখন সকলের লাল পড়ত। অপরদিকে রেস্ট দলে নাম করার মত ছিলেন একমাত্র বিজয় হাজারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও দর্শকরা এই খেলাটা 'নো-ম্যাচ' বলে নাক সিঁটকে ওঠেন নি। তাঁরা জানতেন, যে দলে বিজয় হাজারে আছেন তার সমাপ্তি সহজে ঘটবে না। ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে হাজারে দলের সবাইকে টেক্কা দিতেন। হাজারের ভাল খেলার জন্যেই রেস্ট দল শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠেছিল।

এই খেলার ঘটনাটি খুব বেশী দিনের নয়, ২৫ বছর আগের। তবুও সেদিনের পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার এই ফাইনাল খেলাটি আজকে হয়ে রয়েছে রূপকথার মত। ক্রিকেটের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই পেন্টাঙ্গুলার টুর্নামেন্ট খেলার সময়কেই ভারতীয় ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ বলতেন। মার্চেন্ট, মুস্তাক, হাজারে, অমর সিং, লালা অমরনাথ, ওয়াজীর আলী, সি এস নাইডু, মহম্মদ নিসার, আমীর ইলাহী প্রভৃতির মত বাঘা বাঘা খেলোয়াড় এই যুগেরই।

ভারতীয় ক্রিকেটের আসরে পাঁচটি দল নিয়ে পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা সরগরম হয়ে থাকত। এই প্রতিযোগিতার গোড়ার দিকে ইউরোপীয়ন দলের বিরুদ্ধে একমাত্র ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে খেলতো পার্শী দল। হিন্দু দলের যোগদানের ফলে টুর্নামেন্টের নামকরণ হয় ট্রাঙ্গুলার। তারপর মুস্লিম দল যোগদান করলে প্রতিযোগিতার নাম বদলে দাঁড়ায় কোয়াড্রাঙ্গুলার। শেষবেশ প্রায় চব্বিশ বছর পর 'পেন্টাঙ্গুলার' নাম হল, রেস্ট দলের যোগদানের ফলে। বিজয় হাজারে এই রেস্ট দলের একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন। একা খেলে যে ম্যাচ জেতা যায় তার প্রমাণ বিজয় হাজারে এক সময় প্রতিটি খেলায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য, একা খেলে তিনি যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দুর্লভ।

এই বছরের পেন্টাঙ্গুলার টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনালে মুসলীম দলের বিপক্ষে রেস্ট দল প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার উপর জয়লাভ করেছিল। আর এই জয়লাভের মূলে ছিল হাজারের অনবদ্য ব্যাটিংনৈপুণ্য। ব্যাটিংয়ে রেকর্ড রান তুলতে হাজারেকে কখনও বিচলিত হতে হয়নি। দিনের পর দিন খেলে হাজারে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে ভালবাসতেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাঁর রানের সংখ্যাও তিলে তিলে বেড়ে যেত। কোথায় যে তাঁর খেলার শেষ হবে, কেউ জোর করে বলতে পারতেন না। রঞ্জি ট্রফির প্রতিযোগিতার এক ইনিংসের খেলায় হাজারের ৩১৬ রান তখনকার দিনে খুব হৈচৈ করার মত ছিল। এই বিরাট ইনিংসটি তিনি খেলেছিলেন বরোদার পক্ষে (মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে, ১৯৩৯-৪০ সালে)। আবার পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে মুসলীম দলের বিপক্ষে হাজারের ২৪৮ রানই রেকর্ড রান হয়েছিল।

বিজয় হাজারের এই রেকর্ড গড়া ২৪৮ রানের খেলায় কোন ভুলচুক ছিল না। মুসলীম দলের বিখ্যাত টেস্ট বোলার আমির ইলাহীর বোলিংয়ে (১০০ রানে ৮ উঃ) রেস্ট দলের ব্যাটসম্যানরা নাজেহাল হলেও হাজারে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খেলায় দেড়শ রান করেছিলেন ২৭৮ মিঃ (১৪টা চার), ২০০ রান করেন ৬ ঘণ্টায়। মুসলীম দলের ৩৫৩ রানের প্রত্যুত্তরে রেস্ট দল তুলেছিল ৩৯৫ রান। খেলার শেষদিনে লাঞ্চের পঁয়ত্রিশ মিনিট পর রেস্ট দলের ইনিংস শেষ হয়। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে তারা জয়লাভ করে।

যাঁরা পরবর্তীকালে ইডেন উদ্যানে হাজারের ব্যাটিং দেখেছেন তাঁরা আজও ভুলেননি হাজারেকে মাঠ থেকে নড়ান কত শক্ত ছিল। বিশ্বের অতি ধুরন্ধর বোলাররাও হাজারেকে সহজে টলাতে পারেননি। তবু বলতে হয়, হাজারের খেলা দেখে অনেক ক্রিকেটরসিকরা মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হতেন। বলতেন, একদিক থেকে হাজারের ব্যাটিং-নৈপুণ্য অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। তাঁর খেলার এক দোষ ছিল, তিনি কেবল আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিতে রান সংগ্রহে পারদর্শী ছিলেন।

তিনি শুধু আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিতে পারদর্শী ছিলেন। আক্রমণাত্মক খেলায় তিনি ছিলেন নিঃস্পৃহ। অনেকের মতে, তাঁর শম্বুক গতির খেলা দলকে যেমন একাধিক-

বিজয় হাজারে

বার শোচনীয় পরাজয় থেকে রক্ষা করেছে তেমনি জয়লাভের সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাতও করেছে। আক্রমণাত্মক ভূমিকা উপেক্ষা করার ফলেই হাজারে শ্রেষ্ঠ ব্যাটস-ম্যান হয়েও বাংলার ক্রীড়ানুরাগীদের মন পাননি। সময়বিশেষে তাঁর প্রাণমাতান চৌকস মারের ছটা দেখেও অনেকেই উল্লসিত হননি। এত ধীর-স্থির মনোভাব কি একজন জাত্ ক্রিকেটারের শোভা পায়? কিন্তু এর পরও বলার আছে। হাজারে যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় খেলতে পারতেন তার অনেক নজীর আছে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসাবে দলের চরম বিপর্যয়ের মুখে ব্যাট করতে নেমে উগ্রমূর্তি ধারণ করতে দ্বিধা করেছেন। দলের ব্যর্থতা তাঁর অজানা ছিল না। তাই দলের হার যাতে না
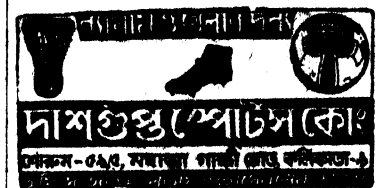
... দৌড়কে দৃষ্টি রাখতে তিনি কখনও ... করেননি। তিনি জানতেন তাঁর একার ... শুধু সর্বদা দলের স্বার্থ রক্ষা ...। এর মধ্যে তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। সেঞ্চুরী করার লোভ তাঁর ছিল কি? জীবনে তিনি অনেক সেঞ্চুরী করেছেন। সেঞ্চুরী, ডবল সেঞ্চুরী, ট্রিপল সেঞ্চুরী করে প্রমাণ করেছেন তিনিই দলের একাই একশ'। সেই ১৯৪৩ সালে পেন্টা-ঙ্গুলার ফাইনাল ম্যাচে হিন্দুর বিপক্ষে হাজারেকে পাল্লা দিয়ে উঠতে কেউ পারেন নি।

সেই খেলার কথাই বলছি। ফাইনাল খেলার শেষ দিনে হাজারে লাঞ্চের আগেই ... রান করলেন। এটাও একটা নতুন রেকর্ড হল। রেকর্ড গড়ার পালা তখনও শেষ হয়নি। হাজারে পঞ্চম উইকেটে সহোদর বিক্রমের জুটিতে ৩০০ রান করলেন (৩২৯ মিনিটে)। পুরোন রেকর্ডটি ছিল অমরনাথ এবং এল, পি, জয়ের জুটিতে (১৯৭ রান, ১৯৩৮)। বিক্রমের ২৮০ মিনিটে ২১ রানটাও কি রেকর্ডের হিসেবে পড়েনি? এমন অস্বাভাবিক ঘটনার নজীর কখনও ঘটেছে বলে মনে হয় না।

প্রথম দিনের খেলায় হেমু অধিকারী এবং বিজয় মার্চেন্ট যথাক্রমে ১২৩ ও ১২২ রাণ করে নট আউট রইলেন। গ্যালারীতে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের মত দর্শক সেই ঢিমে তালে খেলা দেখে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। ৬০ মিনিটে মাত্র ২৮ রাণ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় বৈকি! তার ওপর রেস্ট দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ে হিন্দু দলের ব্যাটসম্যানরা খুবই লাভবান হয়েছিলেন। হেমু অধিকারীর মাত্র ১৭ রাণে হ্যারিস ক্যাচ ফেলেন। বিজয় মার্চেন্ট দুদুবার ক্যাচ তুলেও বেঁচে গেলেন (৩০ এবং ৮৭ রাণে)। বলা বাহুল্য এরপর অধিকারী এবং মার্চেন্ট সেঞ্চুরী করেন।

দ্বিতীয় দিনে অবশ্য মার্চেন্ট এবং অধিকারী যথেষ্ট উন্নত খেলার পরিচয় দেন। তাঁদের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ৩৪৫ রাণ ওঠে। মার্চেন্ট ২৫০ রাণ করে হাজারের ২৪৮ রাণের রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। রাণ ওঠার গতিও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে (৫৫০ রান ৫৪৫ মিনটে)। অধিকারী আউট হলেন ১৮৬ রানে। মার্চেন্ট ২৫০ রান করে নট আউট রইলেন। ৫ উইকেটে ৫৮১ রান করে হিন্দুদল প্রথম ইনিংস ছাড়লেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে রেস্ট দলের দু'টি উইকেট পড়ে যায় ৮১ রানে। হাজারে ৩২ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে রেস্ট দল বিপাকে পড়লেন। তাদের প্রথম ইনিংশ শেষ হল মাত্র ১৩৩ রানের মাথায়। হাজারের ৫৯ এবং ডি ডায়াসের ৪১ রানই ছিল দলের উল্লেখযোগ্য খেলা। সেই বিপর্যয়ের মুখেও দর্শকরা শেষ হাল ছাড়েন নি। কারণ জয়-পরাজয়ের কথা চিন্তা করে দর্শকরা মাঠে বসে থাকেন নি। তাঁরা বরং খুশীই হয়েছিলেন রেস্ট দলকে ফলো অন্ করতে দেখে; হাজারের খেলা দেখতে পাবেন। দর্শকদের সে আশা ব্যর্থ হয় নি। সুরুতেই কিন্তু হাজারের একটি শক্ত ক্যাচ সোহনী ফেলে দেন; বোলার ছিলেন সুঁটে ব্যানার্জি। দর্শকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তারপর আর হাজারেকে ধরে রাখা যায় নি। প্রচণ্ড মার মেরে তিনি বোলারদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। বল করতে আর কেউ বাকি থাকেন নি। হাজারেকে রোধ করবার জন্যে অধি-নায়ক বিজয় মার্চেন্ট একে একে ডেকেছিলেন সুঁটে ব্যানার্জি, এস উবলিউ সোহনী, সি এস নাইডু, সি টি সারভাতে, ভিনু মানকড়, হেমু অধিকারী, বিজয় মার্চেন্ট স্বয়ং, এমন কি ডি কিষেণচাঁদ পর্যন্ত। দলের মধ্যে বল করতে বাকি ছিলেন রঙ্গনেকার, রামপ্রকাশ এবং উইকেট-রক্ষক মন্ত্রী। পাঁচ উইকেটে ১৮১ রান উঠলে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। হাজারে ১২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনি তিন ঘন্টায় ১০০ রান করেন (৮টি চার) হাজারের ভাই বিক্রম দু' ঘণ্টায় করলেন ১০ রান।

চতুর্থ দিনেও দর্শকদের কামাই ছিল না। বিশ হাজার দর্শকের সামনে বিজয় হাজারে অসাধারণ ব্যাটিংয়ের নজীর রেখে সকলকে খুশীতে ভরিয়ে তোলেন। হাজারের ২০০ রান উঠে ৩১৭ মিনিটে এবং ২৬০ রান ৩৯৬ মিনিটে। হাজারে বিদায় নিলেন ৩০৯ রানের মাথায়। তিনি মোট ৪০১ মিনিট খেলেন; বাউন্ডারী মারেন ৩১টি এবং ওভার-বাউন্ডারী ১টি। দুই সহোদর বিজয় এবং বিক্রমের সেদিনের খেলা কেউ ভুলবেন না। হিন্দু দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্টের ২৫০ রানের রেকর্ডটিও যে বিজয় হাজারে সেই খেলাতেই ভেঙ্গে দেবেন তা কেউ কল্পনাও করেন নি। সেদিন বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শক হাজারেকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রেস্ট দল হেরে গেলেও হাজারে হাজারো দর্শকের অভিনন্দন মাথায় নিয়ে মাঠ ত্যাগ করেছিলেন।

অলিম্পিকে নিগ্রোদের ভূমিকা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান অলিম্পিক গেমস্। এই অলিম্পিক গেমসে স্বর্ণপদক জয়ের সম্মান বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য। আর একদিক থেকে আমরা অলিম্পিক গেমসের মূল্যায়ন করি—অলিম্পিক গেমসের আসর এক মহামিলন ক্ষেত্র। জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের অগণিত নর-নারী অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানে মিলিত হন। এই মিলন বিশ্বশান্তি এবং সৌহার্দ্যের প্রতীক। অলিম্পিক গেমসের পদক জয়ের তালিকা থেকে খেলাধুলোয় বিভিন্ন মহাদেশ এবং দেশগুলির অগ্রগতি আমরা একনজরে তুলনামূলক বিচার করতে পারি। এই তালিকায় আমরা দেখতে পাই, উন্নত দেশগুলির স্থান তালিকার উপর দিকে এবং অনুন্নত দেশগুলির অবস্থান তালিকার নীচের দিকে। আবার দেখবেন কোন কোন দেশের ভাগ্যে এখনও স্বর্ণপদকই জোটেনি।

অলিম্পিক গেমসে নিগ্রো জাতির সার্থক ভূমিকা অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে এক পৃথক অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁদের সাফল্যকে পৃথকভাবে দেখানোর এক মহৎ উদ্দেশ্য আছে। বহু রকম প্রতিবন্ধক অবস্থায় জীবন-যাপন করেও নিগ্রো এ্যাথলীটরা খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যে বিরাট আন্তর্জাতিক সাফল্য লাভ করেছেন তা একদিকে যেমন অশ্বেতকায় জাতিগুলির পক্ষে গৌরবের বিষয় তেমনি অনুকরণীয়।

তুলনামূলক বিচারের দিক থেকে অলিম্পিক পদক বিজয়ী নিগ্রো এ্যাথলীটদের তালিকা দু'ভাগ করা হয়েছে—(১) আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট এবং (২) জামাইকা, কেনিয়া, ঘানা, ত্রিনিদাদ, ব্রেজিল, ইথিয়োপিয়া, পানামা প্রভৃতি দেশের নিগ্রো এ্যাথলীট।

আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট

১৯২৪ সালের ৮ই জুলাই আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটদের কাছে এক মহা স্মরণীয় দিন। এইদিনে মিচিগ্যান ইউনিভারসিটির ২১ বছরের নিগ্রো ছাত্র উইলিয়াম ডেহার্ট হাবার্ড ২৪ ফিট ৫ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে অলিম্পিকের লং জাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী হন। আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটদের পক্ষে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব হাবার্ডই প্রথম লাভ করেন। অলিম্পিকের লংজাম্পে সেই সময় থেকেই নিগ্রো এ্যাথলীটদের বিরাট প্রাধান্য অক্ষুন্ন রয়েছে। বিগত ১০টি অলিম্পিকে (১৯২৪-১৯৬৮) আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা পেয়েছেন ৮টি স্বর্ণপদক—এর মধ্যে উপর্যুপরি ৬ বার (১৯৩২—১৯৬০)। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের লং জাম্পে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট বব্ বিমোন অবিশ্বাস্য ২৯ ফিট ২½ ইঞ্চি অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন। অলিম্পিকের লংজাম্প আসর নিগ্রো এ্যাথলীটদের কাছে এক স্বর্গরাজ্য।

অলিম্পিক এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়। এই দুই অনুষ্ঠানে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটদের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ৮টি অলিম্পিক গেমসে (১৯৩২-৬৮) আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা এই-

কুমারী উইমা টিয়াস (আমেরিকা) : ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের ১০০ মিটার সালের টোকিও এবং ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হন—অলিম্পিক গেমসের ১০০ মিটার দৌড়ে তিনি ছাড়া অপর কোন মহিলা বা পুরুষ উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণপদক জয় করেননি।

মেডলিন ম্যানিং (আমেরিকা) : ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড (২ মিঃ ১ সেঃ) করেন

ভাবে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন : ১০০ মিটার দৌড়ে ৫টি, ২০০ মিটার দৌড়ে ৩টি, ৪০০ মিটার দৌড়ে ৪টি এবং ৮০০ মিটার দৌড়ে ৩টি। দূরপাল্লার দৌড়ে কিন্তু তাঁরা কোন সুবিধাই করতে পারেন নি; গত ৮টি অলিম্পিক গেমসের দূরপাল্লার দৌড়ে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা কোন স্বর্ণ-পদকই পাননি। তবে দূরপাল্লার দৌড়ে (১,৫০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথনে) কেনিয়া এবং ইথিয়োপিয়ার নিগ্রো এ্যাথলীটরা স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে স্বজাতীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। স্বল্পপাল্লার দৌড়ে অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট এডি টোলান, জেসী ওয়েন্স, এ্যান্ডী স্ট্যানফিল্ড, বব্ হেজ, হেনরী কার, জিম হাইন্স প্রভৃতি বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীটদের নামের তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য পাত্র। ১১০ মিটার হার্ডলসে আমেরিকান নিগ্রো এ্যাথলীটদের কৃতিত্ব শ্বেতকায়দের থেকে অনেক বেশী। গত ৮টি অলিম্পিক গেমসে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা যেখানে পেয়েছেন ৫টি স্বর্ণপদক, সেখানে বাকি ৩টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন আমেরিকারই শ্বেতকায় এ্যাথলীটরা। অলিম্পিকের পোলভল্ট, ট্রিপল জাম্প, শট পুট ডিসকাস, এবং হ্যামার থ্রোতে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা যে কোন পদকই পাননি তার একমাত্র কারণ এই সব অনুষ্ঠানে তাঁদের বিতৃষ্ণা। জ্যাভেলিন থ্রোতে পেয়েছেন মাত্র একটা পদক, তাও স্বর্ণপদক জয়। হাইজাম্পে তাঁদের ভাগে পড়েছে ২টি স্বর্ণপদক। তবে হাইজাম্পের অন্যান্য পদক আমেরিকার শ্বেতকায় এ্যাথলীটদের থেকে তাঁরা বেশী পেয়েছেন। হাইজাম্প সম্পর্কে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটদের গর্ব করার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক হাইজাম্পে নিগ্রো এ্যাথলীট চার্লি ডুমাস

স্বর্ণপদক বিজয়ী হন এবং ঐ বছরেই তুমান ৭ ফিট উচ্চতা অতিক্রম করে নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন—হাইজাম্পের ইতিহাসে ৭ ফিট উচ্চতা অতিক্রম করায় প্রথম নজির সৃষ্টি তাঁরই।

আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট জেসী ওয়েন্স সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট হিসাবে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে জেসী ওয়েন্স ৪টি স্বর্ণপদক জয়ী হন—১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, লং-জাম্প এবং ৪×১০০ মিটার রীলেতে। তাঁর

> ধারাবাহিক উপন্যাস এবং অন্যান্য বিভাগীয় রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

এই অসামান্য কৃতিত্বে ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক গেমস্ তাঁর নামেই উৎসর্গীত হয়েছে।

ডাবল—একটি দুর্লভ সম্মান

অলিম্পিক গেমসের একই বছরের আসরে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় অনুষ্ঠানে কোন একজন এ্যাথলীটের পক্ষে স্বর্ণপদক-জয় এক অসামান্য সাফল্যের পরিচয়। এ পর্যন্ত ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন ১০জন এ্যাথলীট—৬জন পুরুষ এবং ৪জন মহিলা। এই তালিকায় আছেন এই তিনজন আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট : এডি টোলান (১৯৩২), জেসী ওয়েন্স (১৯৩৬) এবং কুমারী উইলমা রুডলফ (১৯৬০)।

একমাত্র নজীর

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট কুমারী উইমা টিয়াস নতুন বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণপদক জয়ী হলে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে একমাত্র নজীর সৃষ্টি হয়। কারণ, ইতিপূর্বে ১০০ মিটার দৌড়ে কোন পুরুষ বা মহিলা উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণপদক জয়ী হননি।

এবার আমেরিকার বাইরে — আফ্রিকা মহাদেশ এবং অন্যান্য দেশের নিগ্রো এ্যাথলীটদের অলিম্পিক পদক জয়ের খতিয়ান আলোচনা করা যাক। বৃটিশ গায়নার নিগ্রো এ্যাথলীট হ্যারী এডওয়ার্ড অলিম্পিক পদক জয়ের ক্ষেত্রে নিগ্রো জাতির পথিকৃৎ। ১৯২০ সালের অলিম্পিকে হ্যারী এডওয়ার্ড গ্রেট বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জপদক জয়ী হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বৃটিশ গায়নার অপর এক নিগ্রো এ্যাথলীট ফিল এডওয়ার্ডসের নাম উল্লেখযোগ্য; ইনি কানাডার পক্ষ নিয়ে ৩টি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছিলেন—১৯৩২ সালে ৮০০ ও ১,৫০০ মিটার দৌড়ে এবং ১৯৩৬ সালে ৮০০মিটার দৌড়ে। তাছাড়া ১৯২৮ ও

এ এফ ডাসিলভা (ব্রেজিল) : ট্রিপল জাম্পে ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালের স্বর্ণপদক বিজয়ী

১৯৩২ সালে ফিল এডওয়ার্ডসের সহযোগিতায় কানাডা ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে ব্রোঞ্জপদক জয়ী হয়েছিল।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক পর্যন্ত হিসাবের তালিকায় পাওয়া যায়—আমেরিকার বাইরের ১২টি দেশের ২০ জন নিগ্রো এ্যাথলীট মোট ৩০টি পদক সংগ্রহ করেছেন : স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৬ এবং ব্রোঞ্জ ১৮। দেশ ভিত্তিতে এই ৩০টি পদক ভাগ করলে দাঁড়ায় : জামাইকা ৮, বৃটিশ গায়না ৬, ত্রিনিদাদ ৩, ব্রেজিল ৩, ইথিওপিয়া ২, পানামা ২, কানাডা ১, হাইতি ১, সেনাগল ১, কেনিয়া ১, কিউবা ১ এবং ভেনিজুলা ১। ৬টি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন : ১৯৪৮ সালে আর্থার উইন্ট (জামাইকা) ৪০০ মিটারে, ১৯৫২ সালে জর্জ রোডেন (জামাইকা) ৪০০ মিটারে, ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালে এ এফ ডাসিলভা (ব্রেজিল) ট্রিপল জাম্পে এবং ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে আবেবে বিকিলা (ইথিওপিয়া) ম্যারাথন দৌড়ে।

অলিম্পিক গেমসে জামাইকা এক সময় নিগ্রোদের পক্ষে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। অলিম্পিকের দুটি আসরে (১৯৪৮ ও ১৯৫২) জামাইকার তিনজন এ্যাথলীট হার্ব ম্যাককীনলে, আর্থার উইন্ট এবং জর্জ রোডেন ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে এইভাবে ৭টি পদক পেয়েছিলেন : আর্থার উইন্ট ৩টি পদক (১৯৪৮ সালে ৪০০ মিটারে স্বর্ণ এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ৮০০ মিটারে রৌপ্য), হার্ব ম্যাককীনলে ৩টি পদক (১৯৫২ সালে ১০০ মিটারে রৌপ্য এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জ) এবং জর্জ রোডেন ১টি (১৯৫২ সালে ৪০০ মিটারে স্বর্ণ)।

ম্যারাথনে একমাত্র নজির

ইথিওপিয়ার নিগ্রো এ্যাথলীট আবেবে বিকিলা উপর্যুপরি দুবার (১৯৬০ ও ১৯৬৪) ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হন। অলিম্পিক গেমসের ম্যারাথন দৌড়ের ইতিহাসে দুবার স্বর্ণপদক জয়ের নজির একমাত্র তাঁরই। তাছাড়া দুবারই তিনি অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছেন। তাঁর ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ড (২ ঘঃ ১২ মিঃ ১১-২ সেঃ) আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

চ্যালেঞ্জের জবাব

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকা এবং আফ্রিকার নিগ্রো পুরুষ এ্যাথলীটরা স্বল্প, মাঝারী এবং দূরপাল্লার দৌড়ে বিরাট সাফল্যের সূত্রে পৃথিবীর শ্বেতকায় এ্যাথলীটদের যেভাবে চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছেন তা অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে আজ এক নতুন অধ্যায়। এই সাফল্যের সূত্রেই তাঁরা আবার বিশ্বের রাজনৈতিক দরবারে নিগ্রো জাতির যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের বিভিন্ন দৌড় অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ী নিগ্রো এ্যাথলীট ছিলেন : ১০০ মিটারে জিম হাইন্স (আমেরিকা), ২০০ মিটারে টমি স্মিথ (আমেরিকা), ৪০০ মিটারে লী ইভান্স (আমেরিকা), ১৫০০০ মিটারে কিপচো কিনো (কেনিয়া), ১০,০০০ মিটারে নাফতালি তেমু (কেনিয়া) এবং ম্যারাথনে মামো ওলডে (ইথিওপিয়া)। পুরুষদের ৪০০ মিটার দৌড়ের তিনটি পদকই জয়ী হয়েছিলেন আমেরিকার তিন নিগ্রো এ্যাথলীট—লী ইভান্স (স্বর্ণপদক), লরী জেমস (রৌপ্যপদক) এবং রোনাল্ড ফ্রিম্যান (ব্রোঞ্জপদক)। মহিলা বিভাগেও নিগ্রো এ্যাথলীটরা স্বর্ণপদক জয় করেছেন : ১০০ মিটারে কুমারী উইমা টিয়াস (আমেরিকা) এবং ৮০০ মিটারে মেডেলিন ম্যানিং (আমেরিকা)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৪ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 3rd January 1969. শুক্রবার ১৯শে পৌষ, ১৩৭৫ 80 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

চিঠিপত্র

'আপনজন' প্রসঙ্গে

'আপনজন' ছবির আলোচনা আপনারা প্রকাশ করেছেন। ধন্যবাদ। ছবিটি বাংলা চলচ্চিত্রে আলোড়ন এনেছে—কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, তপনবাবুর ছবিটি একেবারে একালের সমাজ নিয়ে এবং তার সঙ্গে সেকালের ভাবধারা, আদর্শের বেণীবন্ধন রচনার প্রয়াস নিয়ে গড়ে উঠেছে। ছন্নছাড়া, অশান্ত, অ্যাংরি ইয়ংম্যানদের যুগের কোথায় হতাশা, কোথায় হীনতা, কোথায় সমস্যা—তার উপর তিনি আলোকপাতের প্রয়াস পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই হতাশা-বেদনা-সমস্যা-পঙ্কিলতার মধ্যেও 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' গান গেয়েছেন, এবং ঐ উচ্ছৃংখল তরুণ সমাজের মনের গহনে যে এখনও কিঞ্চিৎ মহত্ত্ব 'মরুভূমিতে মরুদ্যান'-এর মতো সঞ্চিত রয়েছে, উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে যে তা ঝর্ণার উচ্ছলধারায় বেরিয়ে আসতে পারে ও নতুন ক্লেদহীন সমাজগঠন করতে পারে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছবিতে দিয়েছেন। তপনবাবুকে ধন্যবাদ। তিনি নতুন ডিসে করে নতুন খাবার আমাদের পরিবেশন করলেন। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, 'আপনজন' ছবির নামকরণের সার্থকতা সমগ্র ছবির কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয়েছে কি? উত্তরে বলবো, হয়েছে। যে বৃদ্ধার 'আপনজন' (তথাকথিত) স্বার্থের সম্মার্জনীতে তাকে গৃহতাড়িত করেছে তাদের ব্যবহার যে কতো 'ঠুনকো' এ ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। এখানে 'আপনজন' কথাটি 'আয়রনি'-র কাজ করেছে। কিন্তু বৃদ্ধার সত্যিকারের 'আপনজন' হয়ে উঠেছে তারাই—সেই ছন্নছাড়া, চাঁদমুখ ছেলেরাই—যারা হয় মাতৃহারা, নয় বাপে তাড়ানো, যারা দিনে দু'বার 'ফর্মালিটি' রক্ষার জন্য বাড়ী যায়, যাদের একমাত্র বাড়ী ঐ পড়ো বাড়ী, যেখানে আছে অনাথ দু'টো সদ্য-ফুটে-ওঠা শিশুর শুকনো পাপড়ির মতো মুখ। নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে এরা হয়েছে 'অমানুষ', কিন্তু 'মনুষ্যত্ববোধ' কি এদের একেবারে উবে গেছে? যদি তা-ই হতো, তবে ওরা বলতো না—আমরা চুরি-ডাকাতি করি না। অন্য পাড়ার ছেলেরা 'মাস্তানি' করতে এলে আমরা ধরে ঠেঙাই। আমরা দেখেছি আজকের পৃথিবীতে যে যতো চোখ রাঙিয়ে, মাসল দেখিয়ে চলতে পারে, তারই জিত। আমরা কী পেয়েছি দেশের কাছে, সমাজের কাছে? স্বাধীনতার জন্মলগ্ন আমাদেরও জন্মমুহূর্ত। সেই জন্মলগ্নের পবিত্র মুহূর্তে আমাদের মুখে পড়েছে 'মধু' নয়, 'বিষ'—স্বার্থপরতার বিষ, ভেজালের বিষ, সঙ্কীর্ণতার বিষ, হিংসার বিষ। এই বিষের 'ধোঁয়াশায়' আমরা দিগ্ভ্রান্ত হয়ে গেছি। স্বাধীনতা হয়ে এসেছে 'দানবী'রূপে, বিভীষিকার করাল-মূর্তি নিয়ে আমাদের কাছে—তাই প্রসন্না কলহাস্যময়ী 'ভারতলক্ষ্মীর' রূপকল্পনা আমরা কী করে করবো? কিন্তু আমরা কি সত্যই একেবারে 'অকেজো'? আমরা যে এখনও 'ঠাকুমা'র মুখে 'স্বদেশী ডাকাত'দের বীর্যবত্তার কাহিনী শুনি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতো মাতৃমন্ত্রী বীরদের ত্যাগের কাহিনীতে আমাদের চোখ ছল-ছল করে ওঠে, আর তাই বলে উঠি—আমাদের 'ঠাকুমা' যা 'বেড়ে গল্প' বলতে পারেন না! আবার আমরাই রুখতে পারি, এই সেই 'ভারতলক্ষ্মী' কল্যাণময়ী পবিত্রমূর্তি—যিনি সেকাল-একালকে একসূত্রে বাঁধতে গিয়ে, আমাদেরই রুখতে গিয়ে রক্তমাখা দেহ নিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়লেন। **অরুণকান্তি লাহিড়ী, পর্ণশ্রী, বেহালা।**

নতুন ঠগী

সম্প্রতি "অমৃতে" প্রকাশিত 'রাতের কোলকাতা" ও "নতুন ঠগী" পর্যায়ে যে সমস্ত বিচিত্র ঘটনার আলোচনা আপনারা করেছেন এজন্য আপনাদের সাধুবাদ জানাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ঘটনা সংবাদ পর্যায়ে আসে তার কতটুকুই বা খবরের কাগজে স্থান পায়? কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় জীবনের জন্য জীবিকার প্রয়োজন হলেও এক ধরনের লোকের প্রবঞ্চনার কৌশল আমাদের সমাজ-জীবনের আদর্শ ও ভাবধারাকে কলুষিত করে বিচিত্র এক পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলে। এর প্রতিকারের পথ থাকলেও সেই পথ এত পিচ্ছিল যে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে রেহাই পায় না ও পায়নি। ভাবতে আরো অবাক লাগে যে অনেকেই এবিষয়ে আজো সজাগ নন। তাই বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যের মাধ্যমে সে সাবধান বাণী আপনারা উচ্চারণ করছেন তার জন্য আর কিছু না হোক সেই সমস্ত প্রপীড়িত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যকে প্রণিত জানাই

বর্তমান সমাজব্যবস্থা বড়ই জটিল। আর জটিল সেই সমস্ত বিচিত্র ব্যবস্থার যারা নিয়ত কালোয়াতীর মুখোস পড়ে শিরোমণির ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ফলে কোথাও থেকে সাহায্য না পেলেও এ ধরনের ব্ল্যাক মেইলিং থেকে আমরা সাবধান হতে পারবো এই আশ্বাস যে বিচিত্র ঘটনার পরিবেশন থেকে পাচ্ছি সেটাই সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। তাই অনুরোধ "শ্রীসন্ধিৎসু" তাঁর অনুসন্ধানের পথ আরো বিস্তৃত করুন। কেননা "অমৃত" শুধু নামে না হয়ে কাজে অমৃত হবে, সাধারণশ্রেণী দীর্ঘজীবী হয়ে তার স্বাদ ভোগ করবে এটাই তো কাম্য। **শ্রীরণেন্দ্রনাথ দত্ত, বেলঘরিয়া, ২৪-পরগণা।**

'কুইজ' প্রসঙ্গে

অমৃতের ৩১ সংখ্যায় 'আপনি কি স্নব?' নিবন্ধের উপসংহারে ৯নং প্রশ্নের সঠিক জবাব হিসাবে ৯ (ক) উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে সঠিক উত্তর 'ক' এর পরিবর্তে 'খ' হওয়াই বিধেয়। এ সম্বন্ধে আপনাদের সমর্থন পেলে ৫ পয়েন্ট বেশী পাই।

আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনে আপনাদের 'কুইজ'এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এই ধরনের নিবন্ধ প্রকাশের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। **জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, কানপুর।**

(দুই)

আমরা আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃতে'-র নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। কয়েকটি 'ফিচার' সত্যই পাঠকদের আগ্রহ উদ্রেক করে। বিশেষ করে 'কুইজ' ফিচারটি প্রকৃতই সময়োপযোগী। কিন্তু এই ফিচারটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ একই পৃষ্ঠায় প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই থাকাতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ 'কুইজে'-র শিরোনামা থাকাতে পাঠকমাত্রই কিছুটা biased হয়ে উত্তর তৈরীর চেষ্টা করেন। এই ধরনের উত্তরদাতার সতর্কতার আড়াল ভেদ ক'রে মনের খাঁটি কথার সন্ধান পাওয়া কোন মনস্তাত্ত্বিকের পক্ষেই খুব কঠিন হ'য়ে পড়ে।

আমাদের মনে হয়, শিরোনামা এবং উত্তর দুটোই যদি পরবর্তী সংখ্যার 'কুইজ'-র সঙ্গে থাকে তাহ'লে ফিচারটি হয়তো আরও আকর্ষণীয় হবে। বিষয়টি বিবেচনা ক'রে দেখলে আনন্দিত হবো। **ইতি—এস্ চক্রবর্তী, এম্ দত্ত। কলিকাতা—৩৭।**

সম্পাদকীয় বক্তব্য

আপনাদের পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। এই সংখ্যা থেকে কুইজের উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হল। শিরোনামা পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্য পাঠকের আপত্তি থাকায় আপাতত সেটা মুলতুবি রইল।

সম্পাদকীয়

নববর্ষের অভিনন্দন

বর্ষচক্রের আবর্তে আরেকটি নূতন বৎসর আমাদের দুয়ারে উপস্থিত। খৃস্টীয় বৎসরই আন্তর্জাতিক বৎসররূপে স্বীকৃত। আমরাও তাই এই শুভদিনে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিগত বৎসরের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ তার বাঁচবার সংগ্রামকে যেমন তীব্রতর করেছে তেমনি মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টাকেও করা হয়েছে প্রবলতর। মানুষের মনীষা আজ এই গ্রহের সীমানা অতিক্রম করে মহাকাশে গ্রহান্তরের বলয় স্পর্শ করতে চলেছে। গত বড়দিনের উৎসবের সময়ে মার্কিন মহাকাশচারীরা চন্দ্র-প্রদক্ষিণের পর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে এক উজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করেছেন। এত বড় একটা সাফল্য গোটা মানবজাতিরই গৌরব বৃদ্ধি করেছে। কোনো একটা বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতির কৃতিত্বের স্বীকৃতিতেই এই অসামান্য কীর্তির মর্যাদা সূচিত হবে না; মানবজাতির সুমহান অগ্রগতির স্মারকরূপেই তার স্থায়ী সম্মান।

নতুন বৎসর আরও কী মহৎ সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা আমরা জানি না। কিন্তু অনুমান করতে পারি যে, এ বৎসরেও চলবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা। গত বৎসর ভিয়েতনামে যুদ্ধের উত্তেজনা খানিকটা হ্রাস পেলেও সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা এখনও সুদূরপরাহত। চাঁদে যাবার জন্য মানুষের প্রস্তুতির শেষ নেই। হয়তো দেখা যাবে আর অল্প দিন পরেই মানুষের পায়ের স্পর্শ লাগবে চিরকালের চেনা চাঁদের বুকে। অথচ এই পৃথিবীতে মানুষ এখনও পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীতে বসবাস করার চাবিকাঠি আবিষ্কার করতে পারে নি। এরচেয়ে দুঃখের ও বেদনার আর কী হতে পারে?

দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে চলছে নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক বৈঠক। আজ পর্যন্ত কোনো একটি প্রশ্নেই আলোচনাকারী বৃহৎ শক্তিসমূহ একমত হতে পারে নি। তাই নিরস্ত্রীকরণও রয়ে গেল মানুষের কাছে আলেয়ার আলোর মতোই অধরা এবং চিরপলাতক। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের জন্য বছর চার আগে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে একটা আংশিক চুক্তি হয়েছিল বটে। তার ফল খুব আশাপ্রদ হয় নি। কারণ, এতে কোনো রাষ্ট্রকেই তার মহাস্ত্র পরীক্ষা থেকে বিরত রাখা যায় নি। নলচে আড়াল দিয়ে মাটির তলায় তারা ঠিকই পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন বৎসরের প্রথম শুভদিনে মানবজাতির উন্নতি ও নিরাপত্তার কথাই আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে। পৃথিবীতে সম্পদের কোনো অপ্রাচুর্য ঘটে নি। তার ভাণ্ডারে এখনও অনেক রত্ন সঞ্চিত। অথচ আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ নিরন্ন, বঞ্চিত এবং অপুষ্টির আক্রমণে অর্ধমৃত। একদিকে চলেছে ভাগ্যবান ও স্বচ্ছল সমাজে ভোগবিলাসের বন্যা, চলেছে নানাবিধ অপচয় অব্যাহতভাবে। অন্যদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বুভুক্ষু, দরিদ্র ও ব্যাধিক্লিষ্ট মানুষের কী সকরুণ দুরবস্থা! রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে এই অসাম্য দূর করার জন্য বিগত দুই দশক ধরে কত সদিচ্ছা ও প্রয়াস চলছে। এখনও দুই জগতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ক্ষুধা থেকে মানুষের এখনও মুক্তি ঘটে নি। কবে ঘটবে তাও বলা মুস্কিল।

আমরা ভারতবর্ষের মানুষ পৃথিবীর সৌভাগ্যবানদের দলের নই। এখানে দারিদ্র্য আছে, অশিক্ষা আছে, ব্যাধিও আছে। ভারতে একদিকে চলেছে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে পুরাতন সমাজকে ভেঙে নতুন যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ। একটি প্রাচীন দেশে, সমস্ত রকম ধর্মীয় ও আনুষঙ্গিক সংস্কার পরিবর্তন করে সমাজে এই রূপান্তর আনয়ন সহজ কথা নয়। তা সত্ত্বেও পরিবর্তনের স্পন্দন লক্ষণীয়। এক-একটি নতুন বৎসর আমাদের দেশের মানুষের কাছে এই পরিবর্তনের বার্তাই বহন করে আনে। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিগত বৎসরে আশাপ্রদ কিছু ঘটে নি। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে উন্নয়নকর্ম বিশেষত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেক ছাটকাট করতে হয়েছে। যেখানে আমাদের উন্নয়নের গতি ও ব্যাপকতা আরও বহুগুণ বেশি হওয়া প্রয়োজন সেখানে তার সীমা সঙ্কোচন ও গতিবেগ হ্রাস করার অর্থই হল ভবিষ্যৎ বিপদ টেনে আনা। সুতরাং আমাদের কাছে নববর্ষ নতুন সংকল্প, নতুন দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়েই উপস্থিত।

আমরা আকাশের চাঁদ প্রত্যাশা করি না। কিন্তু পৃথিবীতে চাঁদের কোমল উজ্জ্বলতা বিরাজ করুক প্রতি মানুষের ঘরে, পৃথিবী শ্রীময়ী ও সমৃদ্ধিময়ী হয়ে উঠুক এ প্রার্থনা করি নববর্ষের প্রারম্ভে। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।

কাছের ও দূরের গান্ধী স্বপ্নের সৌধ

রঁম্যা রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডিসেম্বর ১৯৩২—মনে হচ্ছে, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শয়তানি এমনই যে তা গান্ধীকে আবার এক নতুন অনশন ব্রতে বাধ্য করবে—অস্পৃশ্যদের ভয়ংকর বড় কারণে গান্ধী নেবেন এই ব্রত। কিন্তু এবার তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। স্বাস্থ্য খুব ভেঙে পড়েছে, এই নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁর থাকবে না।

১৯৩৩

জানুয়ারী ১৯৩৩—তাঁর ভিলনভ্‌-পরিদর্শনের বার্ষিকী উপলক্ষে গান্ধীর চিঠি আমার বোনকে :

"য়েরবড়া কেন্দ্রীয় কারগার

৬ জানুয়ারী ১৯৩৩

প্রিয় মাদলেন, আপনার ছোট্ট চিঠিটি পেয়ে বড় খুশী হলাম — তা আমাদের বিশেষ করে মনে করিয়ে দিল আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলনের উজ্জ্বল দিনগুলি। যেন একেবারে আপনজনের সঙ্গে মিলিত হই আপনাদের বাড়ীতে। অনশনের সময় যা ঘটল, তা যদি যাদুর মত ঠেকে থাকে—এবং যাদুই তা—তো জানবেন একমাত্র ঈশ্বরেরই সে-কীর্তি। তাঁর হাতে আমি এক তুচ্ছ নিমিত্তমাত্র ছিলাম। কোনো বিশেষ কাজ যে আমি নিজে করছি, এ-রকম এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় নি। সোজা কথায়, সেটা করা আমার অসাধ্য ছিল—কিন্তু বলছি যখন আমার মাধ্যমে ঈশ্বরই কাজ করেছেন, সেটা যতদূর জানি একেবারে আক্ষরিক অর্থে সত্য। কিন্তু আপনার বড় ভাই দেবদাসকে যে-টেলিগ্রাম পাঠান, তার থেকে ধারণা হল যে, ইউরোপে আমার এই দ্বিতীয় অনশনের সংকল্পটা লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। তাতে আমি বিস্মিত নই। এভাবে ভাবতে চাওয়ার আগাগোড়া ব্যাপারটা সত্যিই এত নতুন —তবু আমার তো মনে হয়, সত্যের অনুসন্ধানে যাঁরা দৃঢ় মনে বেরিয়েছেন, তাঁদের গবেষণার এইটেই হবে একমাত্র যুক্তিসম্মত ও অনিবার্য ফল। অনশন ব্যতীত প্রার্থনা সম্ভব নয়, এবং যে-অনশন প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, তা কারুরই ভালো করে না, তা দেহের উপর অত্যাচার। সত্যিকারের অনশন তাই এক তীব্র আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা, এক আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। তা একাধারে প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যক্তিগত শুদ্ধির উপায়। এ-ধরনের অনশন জন্ম দেয় এক নীরব ও অদৃশ্য শক্তির, যা একেবারে মর্মে গিয়ে স্পর্শ করতে পারে সমগ্র মানব সমাজকে—অবশ্য তার প্রাখর্য ও পবিত্রতা যদি সেই রকম যথেষ্ট হয়। অত্যন্ত অল্প পরিধির মধ্যে হলেও আমি তার অন্তর্ভেদী ও অদৃশ্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি, তাইতেই বুঝেছি তার মাহাত্ম্য কতখানি, জেনেছি তাকে প্রবল শক্তি বলে। এই পরিস্থিতিতে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনে যে-সিদ্ধান্তই নিই, তা এড়ানো যেত না। যদি সন্দেহে দুলতাম তো বিশ্বাসঘাতকতা করতাম যেমন নিজের প্রতি তেমনি আমার সঙ্গী কেলাপ্পান ও হরিজনদের কারণের প্রতি। আপাতত অবশ্য অনশনের প্রস্তাবটি অনির্দিষ্টভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। হয়তো এখনো আমার মনোভাব অস্পষ্ট রয়ে গেছে—স্পষ্ট হওয়া সোজা নয়। তবু বলতে দ্বিধা করব না, সময় হলে একদিন লোকে বুঝবেই যে আমার এ-সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল—অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে সেটা হয় ঈশ্বরের ডাক, যা না শুনে আমার উপায় ছিল না। আরো কোনো ব্যাখ্যায় যদি দরকার বোধ করেন তো অনুগ্রহ করে নিঃসংকোচে আমাকে লিখবেন—আপনার ভাইকে কী বলে ডাকা যায়, তা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। তাঁর প্রসঙ্গ আপনার কাছে তোলার সময় যদি বলতে হয় 'মিস্টার রলাঁ' বা 'আপনার ভাই', সেটা যেমন কাটখোট্টা তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ ঠেকে। তাঁকে শুধু 'ভাই' বলাটাও আবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, আমাদের দুজনের সম্বন্ধটাও তাতে ঠিক ধরা পড়বে না, যে-দুটো কথা আমার মনে আসে, তা হল 'ঋষি' ও 'মুনি'। কথা দুটোর অর্থ প্রায় এক, যদিও হুবহু এক নয়। সুতরাং তাঁর ও আপনার সম্মতি যদি পাই তো এখন থেকে তাঁকে ডাকব 'ঋষি' ব[ঙ্গে]। আশা করি এ-চিঠি যখন পোঁছোবে, তিনি সর্বাঙ্গীন শারীরিক কুশলে থাকবেন। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠুক, তা আশা করা হয়তো সম্ভব নয়—কেউ যেন ইচ্ছা প্রকাশ করুক, সেটাও তিনি চান না। কারণ তার অর্থ তখন এই হবে যে শারীরিক স্বাস্থ্যের খাতিরে তাঁকে তাঁর ইতিহাসের গবেষণায় মনোযোগ কমাতে হবে—এবং ঋষির পক্ষে যেটা ইতিহাস সেটাও অধ্যাত্মের অন্তর্ভুক্ত, নইলে তিনি ঋষি ঋষি নন। 'ঋষি'কে অনুগ্রহ করে বলবেন যে কয়েক মাস আগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের উপর তাঁর রচনাগুলি পড়লাম — এই প্রথমবার। পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলাম, ও ভারতের প্রতি তাঁর প্রেম কত গভীর, তা আরো ভালো করে বুঝলাম।'

এপ্রিল ১৯৩৩ — ২৯ এপ্রিল গান্ধী ঘোষণা করছেন, অস্পৃশ্যদের কারণে তিনি দিন আল্টেকের মধ্যে তিন সপ্তাহের এক অনশন ব্রত নেবেন। (মনে হচ্ছে, অনশনের লক্ষ্য ততটা ব্রিটিশ সরকার নয় যতটা ব্রাহ্মণ শ্রেণী, যারা অস্পৃশ্যদের হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি তুলছে)। — নতুন করে এই অনশন ব্রত নেওয়ার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমি কয়েক মাস আগে লিখি, যার উত্তরে গান্ধী যেমন অন্যের মুখ দিয়ে তেমনি স্বয়ং তাঁর স্বাভাবিক একগুঁয়েমি ও মিষ্টত্বের সঙ্গে আমাকে জানান তাঁর যুক্তির কথা। তা সত্ত্বেও অক্টোবরের আগে কাণ্ডটা ঘটবে, এমন প্রত্যাশা কেউ করে নি। আশা করা গিয়েছিল, ততদিনে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রাহ্মণদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে। সে-আশায় জলাঞ্জলি—এখন এই বিভ্রজনক কাণ্ডটা ঘটতে দেখা ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না। কিন্তু ভয় হচ্ছে এর ফলাফল থেকে যেতে পারে অতি-ভীষণ—যত ভীষণ আমরা ভাবছি, হয়তো তার থেকেও বেশি।

মে ১৯৩৩—অস্পৃশ্যদের কারণে ৮ই মে গান্ধী তাঁর ২১ দিনের অনশন আরম্ভ

(অর্থাৎ আর একবার) করেন। ৯ই মে বিনা শর্তে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়—পাছে তাঁর মৃত্যুর জন্য তারা দায়ী না হয়, সেই কারণেই আগে থেকে এই সতর্কতা অবলম্বন করা। তার উত্তরে গান্ধীও সোজনোর সংগে কংগ্রেসের সভাপতিকে নির্দেশ দেন আইন অমান্য আন্দোলন ছ' সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখার।

জন ১৯৩৩—মাদাম মার্শা আমাকে একটি চিঠি দেখান, চিঠিটি রোম থেকে তাকে লিখেছেন কাউন্টেস হেট্টি আন্তোনিনি। কাউন্টেস দুজন ভারতীয় সংগীতজ্ঞকে (বোম্বাই-এর মিউজিক আকাডেমির পরিচালক ওংকারনাথ ঠাকুর যাঁদের একজন) আমার সংগে পরিচয় করাতে চান। সংগীতজ্ঞেরা যখন ভারত ছাড়ছেন, গান্ধী নাকি তাঁদের বলেন: 'ইউরোপে দুটি লোকের সংগে তোমরা দেখা করবে, একজন মুসোলিনী, অন্যজন রম্যাঁ রলাঁ। মুসোলিনীকে সবাই চেনে, রাস্তার পাঁচকে ছেলে পর্যন্ত তাঁর কথা শুনেছে। আর সংস্কৃতিদীপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই চিনবেন রম্যাঁ রলাঁকে।' মুসোলিনীকে কথাটা সংগীতজ্ঞরা বলেন, তাঁর সামনে গানও করেন নাকি একাধিকবার — গান শুনে মুসোলিনীও নাকি তৃপ্ত। কিন্তু মুসোলিনীর সংগে আমার এই তুলনামূলক উল্লেখের সম্মানে আমার বুকটা ফুলে উঠল না, তাঁদের সংগে দেখা করতে আমি রাজী হলাম না। অজস্র কাজ আমার, ছুটিতে বেরোবার আগে 'আনু আঁশাতে' বইটাও শেষ করতে হবে......

জন ১৯৩৩ — গান্ধীর অনশনের দ্বাদশ দিনে (২১ দিনের দিন নিরাপদে অনশন সমাপ্ত করেছেন তিনি) মহাদেব দেশাই আমায় লিখছেন যে, গান্ধী আমার চিঠি পেয়েছেন—চিঠিটি তাঁকে নাকি খুব উৎফুল্ল করে। তিনি বিশেষত খুশী হন এই কারণে যে, এবার তাঁর অনশনটিকে ভারতে প্রায় সকল শুভাকাঙ্ক্ষী অসমর্থন করেন (রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত)। আমিও যে আসলে খুব সমর্থন করেছি, তা নয়, কিন্তু জানি, গান্ধীর সংগে তর্ক করা অনর্থক। তাঁর পক্ষে এটা ততটা রাজনৈতিক কর্মের (বা প্রতিবাদের) অংগ নয়, যতটা আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরের সংগে মিলনের পথ। এখানকার খবরাখবরে যা বুঝছি, পরীক্ষাটা কঠোরই হয়। গান্ধী তাঁর হতাশার ভাব প্রকাশ্যে কখনো জানান না—কিন্তু যখন দেখেন তাঁর নিজের ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের (যাঁরা দেড় বছর ধরে বন্দী রয়েছেন) আত্মত্যাগ খুব বেশি ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তখন মনে মনে দুঃখিত তিনি নিশ্চয় বোধ করেন। আমার ধারণা, তাঁর ঈশ্বরকে তিনি একথা না বলে পারেন নি: 'যদি আমি ভুল ক'রে থাকি বা আমাকে তোমার প্রয়োজন আর না থাকে তো ফিরিয়ে নাও আমায়।' কারণ ২১ দিনের দিন অনশন ভংগ করার পর প্রথম যেকটি কথা তিনি উচ্চারণ করেন, তার মধ্যে ছিল: 'ঈশ্বর যদি আমাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে না নিয়ে থাকেন তো তার কারণ হল এই যে, সংগ্রাম চালানোর জন্য আমার প্রয়োজন তিনি এখনো অনুভব করেন। এবং সে-সংগ্রামে আমি আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছি আরো জোরের সংগে।'

১৯৩৪

এপ্রিল ১৯৩৪—ভারত থেকে ফিরছেন এক আমেরিকান, গান্ধীকে সম্প্রতি দেখেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমার বোনকে গান্ধী জানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমার মনোভাবের কথা তিনি প্রায়ই ভাবেন, সে-মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে কি না ভেবে তিনি নাকি শংকিতও।......ফাদার সেরেজোল শীঘ্রই ভারতে যাচ্ছেন, তাঁর হাত দিয়ে আমি তাই গান্ধীর জন্য এই চিঠিটি পাঠালাম (৪ঠা এপ্রিল):

'পরম প্রিয় বন্ধু, ভারত হতে সম্প্রতি প্রত্যাগত এক আমেরিকান বন্ধুর মুখে শুনে দুঃখ পেলাম যে, আপনার প্রতি আমার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে ভেবে আপনি নাকি শংকিত। তা একেবারেই সত্যি নয়— আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, আমার বন্ধুত্বে আমি সমানই আন্তরিক......

'অবশ্য সেটা বলার পর এটুকুও আমার যোগ করা উচিত (এবং তা ভিলনভেই আপনাকে জানাই), ইউরোপে আজ কোন ধরনের কর্মের দরকার, সে-বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার সংগে আমার মতের অমিল আছে।

'সত্যাগ্রহের যে-মহান পরীক্ষা আপনি করছেন, ও যার ফলাফল আজো অনিশ্চিত, আশা করি ভারতের পক্ষে তার জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে তার সফল হওয়ার এতটুকু আশাও নেই।

'আজকের ইউরোপ যে-মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন, তার তুলনা গত কয়েক শতাব্দীতে নেই। পয়সা এবং বুর্জোয়া ও সামরিক প্রতিক্রিয়ার এক আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ (ফ্যাশিজম যার অন্যতম অস্ত্র) তার শক্তির সমস্ত সংঘবদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে ইউরোপের গলা টিপে ধরার যোগাড় করেছে, আগামী বহু শতাব্দীর জন্য এই মহাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চিহ্ন মৃত্যু ঘটাতে চাচ্ছে—যে-স্বাধীনতা ইউরোপ অর্জন করে কত শতাব্দীর অক্লান্ত বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায়। শুধু জার্মানী ও ইতালীই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে আত্মসমর্পণ করে নি, বশীভূত হয়েছে হাংগেরী, পোল্যান্ড এবং সমস্ত বলকান দেশগুলিও। কামানের গোলায় অস্ট্রিয়ার সব শ্রমিক-মজদুরদের মাটির সংগে মিশিয়ে দেওয়া হল। এমন কি ফ্রান্স ও ইংলন্ডও ফ্যাশিস্ট প্লেগে আক্রান্ত—আর প্যারীতে জবরদস্তি করে শাসন ক্ষমতা হাতে নেওয়ার ভয়াবহ সামরিক প্রস্তুতি চলেছে।

'এর বিরুদ্ধে বিরাট বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়ে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া — সে নিয়েছে ভার প্রতিরক্ষার, নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার, যে-সমাজ হবে আরো ন্যায়সংগত আরো বিবেচনাপূর্ণ, যার হাল ধরবে মুক্ত ও শিক্ষিত শ্রমিকরা।

'কিন্তু এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই যে যদি ইউরোপ কোনো রকমে একবার ফ্যাশিস্ট হয়ে উঠতে পারে তো তা সংগে সংগে জাপান এবং সম্ভব হলে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সংগে দলবদ্ধ হবে—তাদের লক্ষ্য হবে সোভিয়েট রাশিয়ার ধ্বংস সাধন করা, যে-সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বটাই একটা শাশ্বত ভয়ের কারণ সেই শক্তিগুলির কাছে, যাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় শ্রমের অন্যায্য শোষণে।

ইউরোপে আমরা যারা এখনো স্বাধীনচেতা, সকল ফ্যাশিজম ও সাম্রাজ্যবাদের চিরশত্রু, তাদের প্রধানতম কর্তব্য তাই আজ সেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসা, একমাত্র যাকে ঘিরে সামাজিক সংগঠনের সকল আশার অনিবার্য ভিত্তি সূচিত হয়েছে।

'সে-প্রতিরক্ষা সম্ভব হবে কেমন করে? সত্যাগ্রহের দ্বারা? কর্মকে গ্রহণ না করে, বা হিংসা বর্জন করে? এ-ধরনের ধ্যান-ধারণা বা কৌশলের জন্য ইউরোপের জনগণের মন একেবারেই প্রস্তুত হয় নি: দুয়েকটি দেশে এখানে ওখানে 'বিবেকী বিরোধী'দের ছোট ছোট কেন্দ্র আছে সত্য, কিন্তু সেখানেও বিবেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে-কোনো সমবেত কর্মে প্রায়ই সায় দিতে চায় না। অনেক চেষ্টা করে কোনো 'সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল' ধরনের আন্দোলনে তাদের একত্র করতে (যা করছেন পিয়ের সেরেজোল) কেউ কেউ পেরেছেন, কিন্তু এখনো সে-ধরনের প্রচেষ্টা খুব কমই, প্রায় নেই বললেই চলে। 'বিরোধীরা' ব্যক্তিগতভাবে আত্মত্যাগের দ্বারা নিজের নিজের আত্মার মুক্তি সাধন করতে পারেন, কিন্তু অন্যের আত্মা বা জীবন নিয়ে মাথা ব্যথা করার সময় তাঁদের নেই। হয়তো এমন হতে পারে যে বহু শতাব্দীর পরে তাঁদের এই আত্মত্যাগ ফলপ্রসূ হবে, জ্যোতির্ময় হয়ে তারা জাগবেন ভবিষ্যতের চোখে—যেমনটি হয়েছিল খৃষ্টধর্মের প্রথম পর্যায়ের শহীদদের বেলা। কিন্তু তাঁদের সেই ত্যাগ আজকের বিপন্ন মুহূর্তের অনিবার্য নিয়তিটার এতটুকু অদলবদল করতে পারছে না, যে-নিয়তির ফলে পরস্পর-বিরোধী দুটি জগত মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছে : একদিকে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সেবায় ফ্যাশিস্ট একনায়কত্ব, অন্যদিকে প্রোলেটেরিয়ান বিপ্লব। এ-দুটির কোনো একটির পক্ষ না নিয়ে উপায় নেই।

"আমিও পক্ষ বেছে নিয়েছি। শোষকের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত যে-শ্রমশক্তি, যা তার জগত গড়ার ভার নিয়েছে নিজের হাতে, আমি তার পক্ষে। এ-সম্বন্ধে আমার কণামাত্র সন্দেহ নেই যে আপনিও সেই একই পক্ষে। নিজের সম্বন্ধে এটুকু বলি, হিংসার আশ্রয় আমি কখনো নেব না, না কাউকে আক্রমণ করতে, না নিজেকে রক্ষা করতে (অন্তত সেই রকমই তো আমার অন্তরের বাসনা—এ-কথা যদি না রাখতে পারি তো সেটা হবে আমার দৌর্বল্যের পরিচয়, এবং তার জন্য পরে সেই দৌর্বল্যকে অভিশাপ দেব)। কিন্তু আত্মরক্ষার্থে যদি কেউ হিংসাবলম্বী হয়, যদি তার অহিংসায় বিশ্বাস না থাকে, বা অহিংসার সমগ্র আদর্শ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য 'দৈব' জিনিসে যদি সে আস্থা না খুঁজে পায়, তো তাকে আমি অভিশাপ দেব না। ঈশ্বরে বা অনন্তে যে বিশ্বাসী, তার পক্ষে আত্মত্যাগ করা সোজা, অতি সোজা। কিন্তু ইউরোপের দুই-তৃতীয়াংশ লোক সকল ঈশ্বর বা সকল অনন্তে তাদের সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছে (এবং তাদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিও অজস্র আছেন)। একমাত্র যে-ভাব তাদের আজো উদ্দীপ্ত করতে পারে, তা মানুষের একতা —আকুল আবেগে তারা আশা করে আছে যে, আজকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম তারা চালিয়েছে, তা একদিন মুক্ত করতে পারবে তাদের ভাইদের ও সন্তানদের; অন্তত তাদের, তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারা এমন এক পৃথিবীর গোড়াপত্তন করে যাবে যা আজকের পৃথিবী হতে শ্রেয়। এমন বিশ্বাস করতে পারাটা কিছু কম কথা নয়। তাদের এই বিশ্বাস তারা কাজে লাগাক, সেটা চাওয়া চলে। কিন্তু যে-বিশ্বাস তাদের একেবারেই নেই, সে-বিশ্বাস তো তারা কাজেও লাগাতে পারে না, এবং সেটা তাদের কাছে চাওয়াও চলে না। যা সত্য, যা কর্তব্য, তা নিজের প্রতি সৎ থাকা, তা নিজের চিন্তা ও কর্মের মিলন ঘটানো, সাহসের সঙ্গে, নির্লিপ্ততার সঙ্গে। গভীর কর্তব্যবোধে প্ররোচিত হয়েই ভিয়েনার শ্রমিকরা তথাকথিত খৃস্টানধর্মী ফ্যাশিস্টদের বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েও তাদের বিশ্বাসকে বাঁচাতে রুখে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার যে কর্তব্য আজ, যে-কর্তব্য সেই একই সমাজ-আদর্শে বিশ্বাসী ইউরোপের অন্যান্য সকলেরও, তা-ই তাদের বাধ্য করছে প্রাণ দিয়েও আদর্শটি রক্ষা করতে—যে-কোনো অস্ত্রই থাক না তাদের, সেটাই কাজে লাগাতে হবে। অহিংস যারা, নিক তারা অহিংসার অস্ত্র—অন্যেরা নিক সশস্ত্র যুদ্ধের পথ। কিছুতেই নিষ্ক্রিয় থাকা চলবে না। পাপকে গ্রহণ করা বা অসহায়ের মত তাতে অভ্যস্ত হওয়া, তা সম্ভব নয় না আপনার পক্ষে, না আমার পক্ষে। আপনি যুদ্ধ চালান সত্যাগ্রহের মাধ্যমে, প্রোলেটেরিয়ান বিপ্লবের রয়েছে অন্য অস্ত্র। কিন্তু যুদ্ধটা একই, যদিও তার কর্মক্ষেত্র দুটি আলাদা। আপনার ক্ষেত্রে (তা যদি আপনার ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ হয়ও, হোক না।) আপনি সুখী। পিয়ের সেরেজোল আপনাকে সে-কথা জানাবেন।

"আমার যা কাজ (তা-ই আমার একমাত্র ব্রত), তা একটি শ্রদ্ধার বন্ধন গড়ে তোলা এই বিভিন্ন পন্থীদের মধ্যে, যাঁরা একই লক্ষ্য সামনে রেখে অনলস যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

"ভ্রাতৃত্বপূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রেমের সম্ভাষণ আপনাকে জানাই। দূরে থেকেও আমি আপনার নিকটে।

রম্যাঁ রলাঁ

(ক্রমশঃ)

বজ্রমণির কণ্ঠহার

হীরামনের হাহাকার

অদ্রীশ বর্ধন
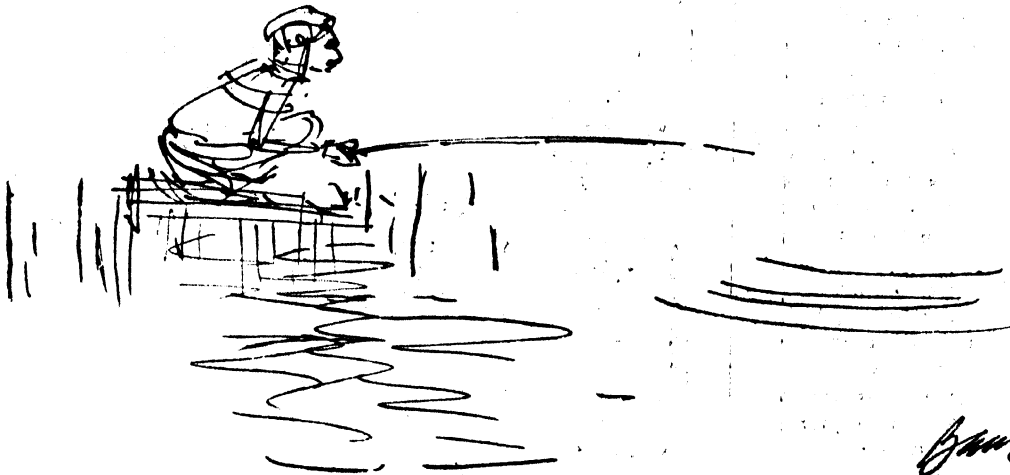
জহুরীর দোকান।...

বড়-রাস্তার ওপরেই। চার-রাস্তার মোড়ে। নাম, জহুর-মহল।

বড় বড় কাচের শো-কেস সাজানো ভিতর মণি-মাণিক্য, সোনারুপো। দিনের আলোয় জড়োয়া সেটের এক রূপ, সন্ধ্যার পর বৈদ্যুতিক আলোয় আর-এক। জৌলুস চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অনভ্যস্ত চোখকে বিহ্বল করে তোলে।

পথচারীরা থমকে দাঁড়ায় জহুরীর জহর দেখে। বন্দুকধারী সান্ত্রীদের নজর সবার ওপরেই। সন্ধ্যার পর পাহারা দ্বিগুণ হয়।

আর, চব্বিশ ঘণ্টা একটা খয়েরী রঙের জীপ দাঁড়িয়ে থাকে দোকানের পাশের গলিতে।

পর-পর কয়েকটি রাহাজানি হয়ে যাবার পর জহুরীর টনক নড়েছে। তাই জীপের ব্যবস্থা। সশস্ত্র পাহারাদার অষ্টপ্রহর মোতায়েন থাকে সেখানে।

ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি ছিল না। সদর স্ট্রীট বা পার্ক স্ট্রীটের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, যাতে দিনের আলোয় সবার চোখের ওপরেই দোকান লুঠ না হয়ে যায়—তাই হুঁশিয়ার জহুরী সবরকম পাহারার ব্যবস্থাই করেছিলেন।

কিন্তু লোহার ঘরেও নাকি ছিদ্র থাকে। তা নাহলে অত কড়াকড়ি ব্যবস্থার মধ্যেও অমন বিপর্যয় ঘটবে কেন।

বিপর্যয় বলে বিপর্যয়!

বুদ্ধির খেলায় অতি-ধুরন্ধর জহুরীও যখন হার মানলেন, যখন সর্বনাশের আর দেরী নেই, তখন এক যুবকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ম্যাজিকের মত কাজ করল। চরম মুহূর্তে মুখোস খুলে গেল। রক্ষা পেল বজ্রমণির কণ্ঠহার।

যুবকের নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ছিপছিপে একহারা চেহারা। টানা-টানা চোখ। স্বপ্নালু দৃষ্টি। ধারালো নাক, চিবুক, কপাল। দেখে মনে হয় যেন কবি। কবিতাই আর দিবা-নিশির ধ্যান।

কিন্তু আসলে তা নয়। ইন্দ্রনাথ রুদ্র পেশায় গোয়েন্দা। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

ভাবালু দৃষ্টি তার অষ্টপ্রহরের ছদ্মবেশ।

'হীরামনের হাহাকার'-এর রহস্যভেদ ইন্দ্রনাথ রুদ্রর গোয়েন্দা-জীবনের এক স্মরণীয় কীর্তি।

●

কাহিনীর প্রারম্ভেই একটা কথা বলা দরকার। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এ কেসের সঙ্গে জড়িত। কাহিনী প্রকাশ করবার অনুমতি তাঁরা দিয়েছেন—তবে একটি সর্তে। তাঁদের নামধাম গোপন রাখতে হবে।

তাই, রোমাঞ্চকর এবং রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক এই রহস্য-কথার স্থান-কালপাত্র সবই কাল্পনিক মুখোসে ঢেকে দেওয়া হল। মনে হবে, সবই অচেনা—মায় অকুস্থল পর্যন্ত—বুঝি তাদের অস্তিত্বই নেই।

●

কাহিনীর বিস্তার রাজস্থানের মরু-অঞ্চলে। শুরু কিন্তু এই কলকাতায়! মহানগরীর এক চৌমাথায়। হীরে-মোতি-পান্নায় সাজানো জহুরীর দোকানেই জহর-মহলে।

জহুরীর নাম খেমচাঁদ রাজকুমার। বয়েসে প্রৌঢ়। মাথার চুল কিন্তু সে অনুপাতে একেবারেই সাদা।

গৌরবর্ণ ঋজু দেহ। কিন্তু অধিকাংশ ধনীর মত মেদবহুল নন। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসিটুকু যেন বাঁধানো। সদা অম্লান। এ হাসি পাকা সেলসম্যানের হাসি। এই হাসিটুকুই সম্বল করে খেমচাঁদ রাজকুমার আজ ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন কুবেরের কাছাকাছি।

মাঘের সকাল। ভোরের কুয়াশা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। দশটা নাগাদ একটা ঝকঝকে 'ফ্যালকন' গাড়ী এসে দাঁড়াল জুয়েলার্স খেমচাঁদ রাজকুমার'-এর দোকানের সামনে। গাড়ী থেকে নামলেন স্বয়ং খেমচাঁদ রাজকুমার।

মার্বেল পাথরের বড় বড় থামওলা বিশাল হলঘরে দ্রুত পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন প্রৌঢ় জহুরী। জনা পঞ্চাশ সেলস-ম্যান সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল তটস্থ হয়ে। সারি সারি শোকেসে ফ্লোরেসেন্ট টিউবের নীলাভ আলোয় ঝকমক করতে লাগল রূপো, প্ল্যাটিনাম আর সোনা দিয়ে বাঁধানো মণিমাণিক্য। খেমচাঁদ কিন্তু সেদিকে তাকালেন না। পঞ্চাশজন সেলসম্যানের ধোপদুরস্ত পোশাকের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। প্রত্যেকের বুকে সোনালী সুতোয় তোলা একটা হীরে। খেমচাঁদ রাজকুমার-এর প্রতীকচিহ্ন।

যুক্ত-করে সবার নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন খেমচাঁদ। তারপর ছড়ি দুলিয়ে এগোলেন জব্বলপুরী মার্বেল-বাঁধানো নির্মল মেঝের ওপর দিয়ে। ভদ্রলোকের অমায়িক হাসি অহমিকা-শূন্য; কিন্তু চলার ভঙ্গিমায় আভিজাত্য যেন ঠিকরে পড়তে লাগল।

পড়াটাই বুঝি স্বাভাবিক। খেমচাঁদ রাজকুমার তো সাধারণ জহুরী নন। শুধু ভারতে কেন, তাঁর দোকানের খ্যাতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে। জহরৎ-ব্যবসায়ে 'খেমচাঁদ রাজকুমার' আজ একটা নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয় দেশে এবং বিদেশে।

বিশাল হলঘরের পেছনে পৌঁছোলেন খেমচাঁদ। রক্তবর্ণ ইটালিয়ান মার্বেলের হাল-ফ্যাশানি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন মেজানিন ফ্লোরে।

দেড়তলার সিলিং-নীচু এই ঘরেই তাঁর অফিস। ছোট ছোট চেম্বারে ভাগ করা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। মৃদুসুরভিত। যেন ল্যাভেন্ডারের কুঞ্জ ধারেকাছে রয়েছে কোথাও।

সুইংডোর ঠেলে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল খেমচাঁদের সেক্রেটারী।

'গুডমর্ণিং স্যর', বলল মিষ্টি হেসে।

খেমচাঁদও মৃদু হাসলেন। শুভেচ্ছা ফিরিয়ে দিলেন।

সেক্রেটারী আইভি লাহাও জহর-মহলের একটি দর্শনীয় রত্ন। রত্ন-চেনা চোখ দিয়ে আইভি লাহাকে খুঁজে বার করেছিলেন জহুরী খেমচাঁদ। তাই পদ্মরাগমণির মতই সুন্দরী আইভি লাহা। দুধে-আলতা-গোলা রঙ। কারণ-অকারণে সে-মুখ পদ্মরাগের মতই লাল হয়ে ওঠে। এ কান্ডটি আরও বেশী করে ঘটে অখন্ডনারায়ণ আবির্ভূত হলেই।

অখন্ডনারায়ণ কোনো দেবতার নাম নয়। এরকম সৃষ্টিছাড়া নামের জন্য খেম-চাঁদও দায়ী নন। কিন্তু তবুও তাঁর একমাত্র সন্তান এবং একমাত্র ওয়ারিশকে এই নামেই ডাকতে হয়। অখন্ডনারায়ণ বাবার ধনরত্ন সম্পত্তি বা কারবার নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। মাঝে মাঝে মেজানিন ফ্লোরের অফিসে সে আসে। এলেই ভোরের পূব-আকাশের মত রক্তিম হয়ে ওঠে আইভি।

দুই চোখ নাচিয়ে অখন্ডনারায়ণ তখন বলে—'অফিস তো নয়, যেন ড্রইংরুমে চা খেতে ঢুকলাম।'

শুনে, মুক্তোর মত দাঁত দিয়ে গোলাপ-পাপড়ির মত ঠোঁট কামড়ে চোখ নামায় আইভি।

খেমচাঁদকে দেখে কিন্তু আইভি শুধু গালে টোল-ফেলা হাসি হাসে। খেমচাঁদও হাসেন। হেসে সরাসরি কাজের কথায় চলে আসেন।

সেদিনও তাই হল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেমচাঁদ বললেন—'মিনিট পনেরোর মধ্যেই এক ভদ্রমহিলা আসবেন। আসাম থেকে আসছেন। আমার পুরোনো বান্ধবী। এলেই আমার কাছে নিয়ে যেও, কেমন?'

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল মিস আইভি লাহা।

চেম্বারে ঢুকলেন খেমচাঁদ। মালাক্কা-বেতের সুদৃশ্য ছড়িটা ঝুলিয়ে রাখলেন পাশের আলনায়। গলাবন্ধ পশমের কোট খুলে ঝোলালেন হ্যাঙ্গারে। এসে বসলেন টেবিলে।

আগাগোড়া কাঁচে-ঢাকা বিশাল টেবিলে স্তূপীকৃত চিঠিপত্রের দিকে বারেক তাকালেন খেমচাঁদ। চোখ দেখেই বোঝা গেল মন চিঠির দিকে নেই, রয়েছে অন্য কোথাও।

ধীর পদক্ষেপে বন্ধ স্যার্সির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানলার ওপাশে রাস্তা। তার পর অট্টালিকার পর অট্টালিকা। গত রাতের কুয়াশা এখনও জমে রয়েছে রাস্তার এখানে-সেখানে। আনমনা চোখে সেই দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন খেমচাঁদ রাজ-কুমার। আবছা কুয়াশা। ম্যাড়মেড়ে ধূসর রঙ। কিন্তু এই বিরঙ পটভূমিকায় যেন সহসা অজস্র রঙ লাফিয়ে উঠল। প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হল। হু-হু করে মনটা পৌঁছে গেল অনেক...অনেক বছর আগেকার এক দৃশ্যে। প্রৌঢ় খেমচাঁদ রাজকুমার যেন সত্যের বছরের তরুণ হয়ে নেমে গেলেন ধোঁয়াটে কুয়াশার মায়াজগতে।

চল্লিশ বছর আগের কথা।...

দার্জিলিং শহর। বসন্তের রাত। শৈল-নগরীর পথেঘাটে তাই কপোত-কপোতীর মেলা, রিমঝিম কুহরণ।

জলাপাহাড়ের কাঁচমহলে উৎসবের আলো। গাছে গাছে রোশনাই হরেক রঙ, হরেক প্যাটার্ন। ঝাউগাছে আলোর মালা। কাঁচমহল যেন হাসছে।

কাঁচমহলের অধিপতি মহারাজকুমার কমলাক্ষ আচার্যের একমাত্র কন্যা শর্মিষ্ঠার সেদিন জন্মদিন। তাই বাগানের আলো-অন্ধকারের ছায়া-মায়ায় হাত ধরাধরি করে ঘুরছিল ওরা দুজন। খেমচাঁদ আর শর্মিষ্ঠা। কারণ না থাকলেও হাসছিল। মানে না থাকলেও কথা বলছিল।

বৈদ্যুতিক রোশনাইতে ঝিকমিক করছিল শর্মিষ্ঠার কণ্ঠহার। দামী পাথরের কণ্ঠহার। শর্মিষ্ঠা রহস্য করে বলত বজ্রমণি। অত ভাল বাংলা বুঝতে পারেনি খেমচাঁদ। হেসে কুটিপাটি হয়ে শর্মিষ্ঠা বুঝিয়ে দিয়েছিল, বজ্রমণি কাকে বলে।

বজ্রমণি হীরের আর এক নাম।

আজকের জহুরী খেমচাঁদকে শিখিয়ে দিতে হয় না হীরে ক'রকম। কিন্তু সেই রাতে শর্মিষ্ঠার বুকের টিলার ওপর এলিয়ে থাকা লালাভ হীরের নেকলেস দেখে বুঝতে পারে নি, হীরের রঙ কেন লাল হয়।

মহারাজকুমারের অর্থের অভাব ছিল না। আসামে অনেক চা-বাগান, আখক্ষেত, কমলা বাগান আর শালবনের মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু কত টাকা থাকলে এক লাখ টাকা দিয়ে হীরের নেকলেস কেনা যায়? তাও কিনা কন্যার জন্মদিনে? হিসেবটা তখন মাথায় আসেনি খেমচাঁদের।

শুধু খেমচাঁদ কেন, গোটা দার্জিলিং শহর নাকি থ মেরে গেছিল বজ্রমণির কণ্ঠহারের দাম শুনে। মুখ বেঁকিয়ে বিজ্ঞরা বলেছিল—রাজরাজড়ার খেয়াল!

জহুরী খেমচাঁদ রাজকুমার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রাস্তার কুয়াশার দিকে।

চল্লিশ বছর আগের কথা। কিন্তু আজও কত মিষ্টি লাগছে বাসন্তী রাতের সেই স্মৃতি। মিষ্টি লাগছে টুকরো হাসি আর গান, জলতরংগের সুর। চল্লিশ বছরের সাঁকো পেরিয়ে আজও যেন কানে ভেসে আসছে ঝাউয়ের অশান্ত মর্মর, আর কুয়াশার আলো।...

সেই সংগে বজ্রমণির রক্তদ্যুতি। যেন একটা অপার্থিব রক্তচ্ছটা মালার মতই ঘিরে ...রেছিল সুন্দরীর মরাল-গ্রীবা। খেমচাঁদের কিন্তু মনে হয়েছিল, লাল-হীরের নেকলেসও ...কে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে ওর কালো ...খের হীরের কাছে।

কিন্তু এ চিন্তা আজ কেন? এতো ...বছর আগের কথা। আজ খেমচাঁদের ...নে ঘাটের তোরণ-দ্বার। তাছাড়া... ...ছাড়া...শর্মিষ্ঠার সংগে অর্জুন বর্মার ...য়ের সেই রাত...তারপর ওদের একমাত্র ...লের অন্নপ্রাশনে আমন্ত্রণ... সে আঘাতের ...লা কি আজ মিলিয়েছে? না... বোধহয় ... টনটনে ক্ষতটার মুখ খুঁচিয়ে শান্ত ... কি যেন ওদের ছেলের নাম? অদ্ভুত ...তাই আজও মনে আছে... মরিচি... ...রিচি বর্মা।

মরিচি! দশ প্রজাপতির অন্যতম! ...ব্রহ্মার মানসপুত্র! হাস্যকর নাম। ...মনেই হেসে উঠলেন খেমচাঁদ রাজ-...।

...কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! বিশ্ব-...টের নাম মরিচি!

...টেবিলে এসে বসলেন খেমচাঁদ। এত-...দিন পরে শর্মিষ্ঠার আগমনের হেতুটা ...নেক অনুমান করা যায়। মরিচির নব-...কীর্তি নিশ্চয়ই। বজ্রমণির কণ্ঠহার নিয়ে যে ...রুক্ত শুরু হয়েছে চল্লিশ বছর আগে, খুব ...ম্ভব মরিচি এসেছে তার যবনিকা ফেলতে।

...মন্দ কী! দেখা যাক, নাটকের শেষ ...শের ক্লাইমাক্স!

চিঠিপত্রে মন দিলেন জহুরী। দেখতে ...দেখতে হারিয়ে ফেললেন নিজেকে। মিনিট ...কয়েক পরেই দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে ...দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনী ঢঙে ঘোষণা করল ...স আইভি লাহা—'মিসেস শর্মিষ্ঠা বর্মা ...এসেছেন।'

সংগে সংগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ...খেমচাঁদ। পরক্ষণেই হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ ...করল এক নারীমূর্তি।

পলক পড়ল না খেমচাঁদের। চল্লিশ বছর ...আগের শর্মিষ্ঠাকে বৃথাই অন্বেষণ করলেন ...সামনের প্রৌঢ়ার মধ্যে।

সব আছে; অথচ কি যেন নেই। সেই ...চোখ, সেই নাক, সেই চিবুক, হাসলে পরে ...গালে সেই টোল। কিন্তু চোখের চকমকিতে ...চপলতা আর নেই; আছে প্রশান্তি। চিবুকের ...ভাঁজে হিসেব, আর গালের টোলে বহুদর্শিতা।

বুদ্ধিমতী আইভি আগেই অপসৃতা ...হয়েছিল। চৌকাঠের ফ্রেমে দাঁড়িয়ে থাকা ...অবগুণ্ঠন-আবৃতা প্রৌঢ়া শর্মিষ্ঠা তাই এবার ...হেসে উঠল।

বলল—'কি দেখছো?'

'দেখছি না, খুঁজছি।'

'কাকে?'

'কিশোরী শর্মিষ্ঠাকে।'

'বাব্বা! আগে তো বাংলা উচ্চারণই ...করতে পারতে না। আজকাল বেশ বচন ...শিখেছ দেখছি।'

'তোমার জন্যেই শিখেছিলাম।'

'...খুঁজছিলে, তাকে পেলে?'

'সত্যি বলবো, না মিথ্যে বলবো?'

'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। বলি, এতযুগ বাদে দেখা হল, বসতে বলতেও কি নেই।'

'দুষ্টু মেয়ে! শিরীষ গাছের তলায় বসার আগে আমার বলার অপেক্ষা রাখতে?' বলে একটা গদীমোড়া চেয়ার এগিয়ে দিলেন খেমচাঁদ। 'কলকাতায় কদ্দিন এসেছো?'

'তা, প্রায় হপ্তা-দুয়েক তো বটেই।'

'দু-হপ্তা! শর্মিষ্ঠা, তোমার কথা কিন্তু তুমি রাখলে না। কথা দিয়েছিলে, যেখানেই থাকি না কেন—কাছাকাছি এলেই খবর দেবে।'

'কিন্তু আমি কি করি বলো। এত কাজ নিয়ে এসেছি। তাছাড়া মরিচি সব-সময়ে সংগে রয়েছে—'

'ওহো মরিচি...তাতো বটেই', বলেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন খেমচাঁদ। 'কুয়াশা কাটছে—রোদ উঠছে তো।'

মুখ টিপে হাসল শর্মিষ্ঠা।

বলল—'খেম, তোমার চেয়ে আমি তিন বছরের ছোট। মনে আছে?'

'আছে।'

'কাজেই ছেলেমানুষী করো না। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে এসো কাজের কথায় আসা যাক। টেলিফোনে কি বলে-ছিলাম মনে আছে?'

'আছে। বজ্রমণির কণ্ঠহার তুমি বেচে দিতে চাও।'

আবার মুখ টিপে হাসল শর্মিষ্ঠা। খেমচাঁদ দেখলেন, হাসির ভঙ্গিমাটুকু আগের মত মিষ্টি। শুধু যা মুক্তার মত ঝিকমিকে দাঁতের সে শ্রী আর নেই।

'যাক, বজ্রমণি নামটা এখনো ভোলোনি দেখছি,' বলল শর্মিষ্ঠা।

'ভোলা কি যায়? কিন্তু হঠাৎ এ দুর্মতি কেন?'

'জানি তুমি একথা বলবে। তবে একটা কথা তোমাকেও মানতে হবে। হীরের নেকলেস যৌবনেই মানায়। বুড়ি হয়ে মরতে চলেছি এখন—'

'তাতো বটেই', বললেন খেমচাঁদ। মনের চোখে দেখলেন দার্জিলিংয়ের বাসন্তী রাত। উৎসবমুখর কাচমহল। আর, গরবিনী রাজ-হংসীর মত মনোরম গ্রীবা ঘিরে লালাভ হীরের দ্যুতি:

শর্মিষ্ঠা বলল—'শুধু তাই নয়। বেচবার আরো কারণ আছে। খেম, আমি শুধু দেউলে হতে বাকী আছি।'

আবার জানলা দিয়ে শীতের নীল আকাশ দেখতে লাগলেন খেমচাঁদ।

'বিশ্বাস হলো না?' বলল শর্মিষ্ঠা। 'না হওয়াই স্বাভাবিক। কি না ছিল অর্জুনের। মার্চেন্ট-শিপ, কোল-মাইন, মোটা শেয়ার; কিন্তু সব গেছে। বিশ্বাস করো, সব গেছে। আছে শুধু মরিচি। ওর জন্যেই তো—'

'রেস খেলে নাকি?'

'না, না, ব্যবসা করতে গিয়ে ফতুর হয়েছে। হিসেবে একটু ভুল করে ফেলেছিল; তাই—'

'ও।'

'জানি। কি ভাবছ, আমি জানি। খেম, মরিচি ছেলে খারাপ নয়। মাথামোটা বলতে পারো, বোহিমেরী বলতে পারো—কিন্তু মন্দ বলতে পারো না। অর্জুন যাবার পর ওকে নিয়েই আমি বেঁচে আছি।' শেষের দিকে গলা ধরে এল শর্মিষ্ঠার।

মৃদু হাসলেন খেমচাঁদ। বললেন—'জানি, ছেলে যে কি জিনিস, তা আমি জানি। আমিও তো বাবা।'

মস্ত জিভ কাটলো শর্মিষ্ঠা—'এই দ্যাখো। নিজের ধ্যান ভানতে গিয়ে তোমার কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। অখণ্ড আছে কেমন?'

'মন্দ নয় বলেই তো জানি। জানি না এখনও বেড-টি খাওয়া হয়েছে কিনা, হলে এখুনি এলেও আসতে পারে।'

'অখণ্ড কারবার দ্যাখে না?'

'রাম বলো। কারবার দেখবার সময় পেলো কই? কলেজ থেকেই তো বেরুলো বছর তিনেক। তারপর লণ্ডনে গিয়ে টো-টো করে এল বছরখানেক। আরেকটা বছর গেল প্যারিসে আর্টের চর্চায়। থার্ড ইয়ারটা খুব সম্ভব ক্লাবে তাসের আড্ডায় কেটেছে।'

'তুমি কিছু বলো না?'

'বলে লাভ কি? ওর মাথায় এখন কত চিন্তা, কত প্ল্যান। লেটেস্ট প্ল্যান শুনলাম, সাংবাদিক হবে। ইন্ডিয়ায় নাকি নির্ভীক জার্নালিজম-এর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বন্ধু-বান্ধবও জুটিয়েছে এই লাইনে।'

'তার মানে রিপোর্টার হবে?'

'অগত্যা। পাথরের বিজনেস বড্ড শুকনো—অন্তত ওর কাছে। আর আমি জীবনটাই কাটিয়ে দিলাম এই নিয়ে।'

চুপ করে রইল শর্মিষ্ঠা। তারপর বলল—'কি আর করবে বলো। যুগের হাওয়াই এমনি। আজকালকার ছেলে-ছোকরা তো—গোঁয়ার। খেম, আমার ছেলেও তো আমাকে ডুবিয়েছে। সম্বল শুধু হীরের নেকলেসটা।'

'বজ্রমণি যার হাতে, দুনিয়া তার হাতে।'

'বুড়ো বয়েসেও জেলাসি গেল না তোমার। খেম, নেকলেসটা বেচে দাও।'

'দেবো।'

'তোমার মনে আছে নিশ্চয়, বাবা এক লাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।'

'বেশ মনে আছে।'

তখনকার এক লাখ এখন কত হওয়া উচিত?'

'ওভাবে তো দাম হয় না।'

'তবে কিভাবে হয় জহুরীমশাই?'

'সে তুমি বুঝবে না। অনেক দিন যদিও দেখিনি, তবুও তোমার বজ্রমণির কণ্ঠহারের মোটামুটি বাজার-দর বলতে পারি।'

'কত?'

'লাখ আষ্টেক তো বটেই।'

থ হয়ে গেল শর্মিষ্ঠা। কিছুক্ষণ পরে আমতা আমতা করে বলল—'বলো কী! নেকলেসের এত দাম হয়?'

(আগামী সপ্তাহেঃ প্রণয়-প্রহেলিকা!)

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য

ও

সংস্কৃতি

কুম্ভীলক প্রসঙ্গে

কুম্ভীলক কথাটির অর্থ 'চলন্তিকায়' আছে 'চোর'। যে অপরের লেখা হইতে চুরি করে, plagiarist — যে ইংরাজী কথাটি উল্লেখ করে অর্থকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে সেই plagiarize কথাটির অর্থ ওয়েস্টার ডিকসনারীতে বলা হয়েছে—

"To steal or purloin and pass off as one's (the ideas, words, writings etc of another).

অর্থ সুস্পষ্ট, অর্থাৎ অপরের চিন্তা বা রচনাকে নিজের বলে চালানোর নাম কুম্ভীলকবৃত্তি। ইংলণ্ডের জনৈক স্কুলের ছাত্র plagiarist কথাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছিল প্লেজিয়ারিস্ট বলে যাঁরা নাটক লেখেন তাদের। এনড্রু ল্যাঙ এই আশ্চর্য সংজ্ঞাটির সংবাদ পেয়ে মন্তব্য করেছিলেন "অর্থাৎ যে কোনো সফল লেখক মাত্রেই প্লেজিয়ারিস্ট—" এই সব উক্তির সমর্থনে এমন তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা যায় যার ফলে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করা যায়।

মৌলিক লেখক হওয়া ভারী কঠিন। যে কোনো চিন্তায় মৌলিকত্ব দাবী করাও বড় কঠিন। কাজী নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' ও মোহিতলালের প্রবন্ধ 'আমি' নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তার মধ্যে কিছু সত্য নেই একথা বলা যায় না। একেবারে পুরো-পুরি মৌলিক লেখক একথা বুকে হাত দিয়ে বলা যে কোনো লেখকের পক্ষে অতি কঠিন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নানা বিদেশী কবির ভাব, ছায়া ইত্যাদি আছে এমন অনুযোগ যায় যায় শুনে একবার 'ভারতীর' আড্ডায় একজন বলেছেন কবি 'খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরি আঙিনায়' গানটি একেবারে চুরি। এই উক্তি করার পর তাঁকে সবাই চেপে ধরল—কোথা থেকে চুরি বলুন—। তখন তিনি গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা থেকে। শ্রাবণ এবং আশ্বিন দুটি কথাই উক্ত পঞ্জিকায় লেখা আছে। বলা বাহুল্য এই কথায় প্রচুর হাস্যরোল উঠেছিল। মৌলিকত্বের একটি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে যা বিশেষ চমকপ্রদ—

"Originality — unconscious or undetected imitation"

ইমার্সন একবার বলেছিলেন, প্লেটোর রচনা থেকে চুরির পরিমাণ পরিমাপ করে লেখকের গুণাগুণ বিচার করতে হবে, যিনি যত বেশী নিতে পারবেন, তিনি তত বড় লেখক। রাডিয়ার্ড কিপলিঙও একটি কবিতায় বেশ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন—

"When 'Omer smote 'is
bloomin' lyre,
He'd 'eard men sing by
land and sea;
An' what he thought'e
might require,
'E went an' took—the
same as me."

স্পষ্টত এই কথাটির অর্থ সংক্ষেপে করা সম্ভব নয়। প্লেজিয়ারিজম বা কুম্ভীলকবৃত্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করে কোনো আইনও রচিত হয় নি, অর্থাৎ এই চৌর্য-বৃত্তির কোনো আইনগত সংজ্ঞা নেই। বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম। সমগ্র বিষয়টির দর্শন একটিমাত্র দৃষ্টিকোণে বিচার্য, চৌর্যবৃত্তির উদ্দেশ্য কি! কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে লেখককে চুরি করতে হয়েছে, অভিধানের কথা আগে বলা হয়েছে।

অপরের রচনার আক্ষরিক চুরিও, কিন্তু করে না বলে, কোনো রকম স্বীকৃতি না দিয়ে যে চুরি, তাকে সাধু প্রচেষ্টা বলা যায় না। তবু রচনা চুরির দায়ে কাউকে জেলে যেতে হয় না, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না তিনি পান ফুলের মালা আর ভক্তের করতালি। একজন বিখ্যাত লেখক ভিনসেন্ট স্টারেট বলেছেন—

"In point of fact, until fairly recent times, the history of plagiarism was the history of literature"

অতীতের অনেক লেখক স্বীকার না করে ঋণ গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁদের সেই কর্ম সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন অবশ্য ধরা পড়লে। তাঁরা বলতেন—আমরা অপরের চিন্তা যে ধার করেছি তার উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্য। মিলটন বলেছিলেন—

"Borrowing without beautifying is a plagiary"

পোপের অভিমতও ছিল অনুরূপ। কেন এই যথেষ্ট, আর কিছু বলার নেই।

ডাঃ জনসন এই জাতীয় কুম্ভীলক-বৃত্তিকে মৃদু নিন্দা করেও নিজে নানা অজুহাতে এই কার্য করেছেন। পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-চোর আখ্যা দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'হ্যামলেট' রচনাকারের কথা উল্লেখ করা যায়।

'হ্যামলেট' কে লিখেছেন? যে কোনো স্কুলের ছাত্রও এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। সবাই বলবে—কেন শেক্সপীয়র। হয়ত তাই—তবে শেক্সপীয়রের আগেও 'হ্যামলেট' ছিল, আবার তারও আগে আর একখানি. হয়ত তারও আগে অন্য একটি। তবে, বর্তমানে যে 'হ্যামলেট' প্রচলিত তার লেখক উইলিয়ম শেক্সপীয়র, আর যতদিন পর্যন্ত এই 'হ্যামলেটে'র কোনো নকল না হয় ততদিন শেক্সপীয়রের হ্যামলেটই আমাদের কাছে যথেষ্ট। সম্ভবত টমাস কিড রচিত 'হ্যামলেটে'র পরিমার্জিত রূপ শেক্সপীয়রের হ্যামলেট। কিড এই কাহিনী পেয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী লেখক বেলে ফরেস্টের রচনা থেকে, বেলে ফরেস্ট আবার লাতিন ভাষায় লিখিত দিনেমারদের ইতিহাস থেকে আখ্যানভাগ পেয়েছিলেন, এই গ্রন্থটির লেখক স্যাকসো গ্র্যামাটিকাস। গ্র্যামাটিকস ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ লিখেছিলেন। তিনি আবার কোথা থেকে পেয়েছিলেন? তা বড় বড় পণ্ডিতজন বলতে পারেন।

শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে খর্ব করার জন্য এই সব বৃত্তান্ত লিখিত হচ্ছে না। টেমপেস্টের ছায়ায় কপালকুণ্ডলা বা স্কটের অনুকরণে দুর্গেশনন্দিনী এই কথা বললে বঙ্কিমচন্দ্রের কি এসে যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। এ কথাও এই সূত্রে বলা যায় যে সাহিত্যিক ঋণ্গ্রহণ সর্বক্ষেত্রেই তেমন হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় ব্যাপার নয়। শেকস্‌পীয়রের কালে এই কর্ম ভালো বা মন্দ বিচার করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। লেখক, নাট্যকার প্রভৃতি পরস্পরের রচনা না বলে গ্রহণ করতেন, কোনো স্বীকৃতি থাকত না। চরিত্র, ঘটনা, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটি ছত্র নিজের রচনায় বেমালুম চালিয়ে দেওয়া হত।

বর্তমানকাল বাদে প্রাচীন যুগে এই অবস্থাই প্রচলিত ছিল। গ্রীকদের মধ্যে কুম্ভীলকবৃত্তির প্রচলন ছিল। ডেমস্থেনিস, প্লুটার্ক, সফোক্লেস, মেনানডার প্রভৃতি মহৎ লেখকদের রচনায় এমন প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তবে এই কুম্ভীলকবৃত্তিকে কেউ সুনজরে দেখত না। এরিস্টোফানেস "দি ফ্রগস" নামক নাটকে এই নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। রোমানরা এই বিষয়ে সংজ্ঞা নির্দেশ করলেন, তবে তার মূলে ছিল গ্রীক। গ্রীক কথাটি plagium এই কথাটির অর্থ চুরি করে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীকে নিয়ে পালানো। মার্শিয়াল এই কথাটির সাহিত্যিক অর্থ দিলেন এবং সেইভাবে প্রয়োগ করলেন। তাঁর স্বদেশবাসী হোরেস এবং ভার্জিল দুজনেই এই কুম্ভীলকবৃত্তির নিন্দা করেছেন, অথচ দুজনেই সম্পূর্ণভাবে এই অপরাধ-মুক্ত ছিলেন। ভার্জিলকে যখন তিরস্কার করা হল, তখন তিনি উত্তরে বললেন—আমি গোবরের পাহাড় থেকে কিছু মণি-মুক্তা আহরণ করেছি—এ আর অপরাধ কি?

অতীতকালের যে সব মহৎ লেখক অপরের রচনা না বলে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন চসার, মলিয়ের, স্টার্ন, ডিজরেলি, এবং দুমা। চসার দান্তের রচনা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছিলেন এবং "ক্যাণ্টারবেরী টেলসে"র কিছু মালমশলা নিয়েছিলেন বোকাচিও-র রচনা থেকে। মলিয়ের 'সাইরানো দ্য বার্জিরাক' থেকে একটি দৃশ্য হুবহু নকল করে তাঁর—

"Les fourberies de Scapin" নামক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডাঃ ফেরিয়ার কয়েক বছর আগে প্রমাণ করেছেন যে স্টার্নের মত কুম্ভীলক বেশী জন্মায়নি। ডিজরেলির সমালোচনা করতে বসে একজন লিখেছেন—

> "Disreli was a perpetual plagiarist. There is hardly a clever mot, a quotable saying, in all his books, which can be called original".

সমালোচক কিন্তু তার পর আত্মগত-ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেছেন—

> "Who bears him any grudge for that?"

বড় ডুমা বুক ফুলিয়ে চুরি করে—বুক ফুলিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন। এই বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম।

এইভাবেই চলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুইন অ্যান লেখকদের স্বত্বস্বামীত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে বললেন আর সতর্ক করলেন যে, না বলে অপরের রচনা নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া অনুচিত কর্ম।

পোপ প্রশ্ন তুললেন কিন্তু কতদূর যাওয়া যাবে—?

> "How far the liberty of borrowing may extend? I have defined it sometimes by saying that it seems not so much the perfection of sense to say things that had never been said before, as to express those best which have been said oftenest".

পোপ বলেছেন যে ব্যবসায়ীরা যেমন যেটুকু গ্রহণ করে তার মূল্য দেয় লেখকরাও তেমনই যা নেবেন তার মূল্য দেবেন। একেবারে জলদস্যুগিরি করা লেখকদের উচিত নয়।

মেরী ওর্‌টলি মনটেগু বলেছেন যে আমি পোপের সমালোচনা গ্রন্থ "এসেস অব ক্রিটিসিজম" পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তবে, তখন আমি প্রবীণ সমালোচকদের লেখা পড়িনি, তাই জানতাম না যে পোপ যা লিখেছেন তার সবটাই চুরি করা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যিক সমাজ আরো একটু সচেতন হলেন। কুম্ভীলকবৃত্তি অবশ্য বন্ধ হল না, বা কমে গেল না, তবে তার বিরুদ্ধে প্রবল বিরূপতা সৃষ্টি হল। এইকালে লেখকদের স্বপক্ষে কিছু আইন প্রণীত হওয়ায় লেখকদের অধিকার সংরক্ষিত হল, লেখকদের রচিত বাক্যকে কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা দান করা হল। আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন সোজাসুজি না বলে অপরের রচনা চুরির ব্যাপারে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করল।

ক্রিসটোফার মর্‌লি লিখিত একটি সমালোচনা সম্প্রতিকালে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ও ও ম্যাকইনটায়ার রচিত 'ম্যানহাটান গসিপ' গ্রন্থটির রিভিয়ু করতে বসে ক্রিসটোফার মর্‌লি পাশাপাশি উধৃতি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে পনের বছর ধরে ম্যাকইনটায়ার যে ভদ্রলোকের রচনা থেকে চুরি করে আসছেন তাঁর নাম ক্রিস্টোফার মর্‌লি। ম্যাক ইনটায়ার তাঁর ম্যানহাটান গসিপে মাঝে মাঝে মর্‌লি সম্পর্কে চাটুকারিতামূলক মন্তব্য করতেন। মর্‌লির এই চাঞ্চল্যকর উদ্‌ঘাটনে ন্যুইয়র্কের সাংবাদিক ও লেখক সমাজ বিহ্বল হয়ে পড়ল। রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সাহিত্যিক সমাজে এই জাতীয় লোমহর্ষক কাণ্ড বেশী ঘটে না।

'নিউ ইয়রকার' পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশিত হল—

> "Mr. McIntyre has been caught with his lorgnette down! It is not a pretty sight".

আর ম্যাকইন্‌টায়ার বললেন—

> "If it did happen, it happened unintentionally"

সকলে তা গ্রহণ করল আর কালক্রমে সবাই এই ঘটনা বিস্মৃত হল।

বিখ্যাত লেখক জ্যাক লনডন আজীবন সাহিত্যিক চৌর্যবৃত্তির অপরাধে মামলা লড়েছেন। তাঁর জীবনীকার আরভিং স্টোন লিখেছেন যে এই জাতীয় মামলা প্রায় সারাজীবন লেগেই ছিল। একবার তিনি ধরা পড়লেন ফ্রাঙ্ক নরিস লিখিত একটি ছোটগল্প চুরির অপরাধে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি তৃতীয় গল্প আবিষ্কৃত হল যার আখ্যানভাগ অনুরূপ। অবস্থা পরিবর্তিত হল।

জ্যাক লনডন তাঁর উপন্যাস 'বিফোর এ ডাম' লিখেছিলেন স্ট্যানলী ওয়াটারলুর "স্টোরী অফ অ্যাবে"র অনুকরণে এবং অনুসরণে। ওয়াটারলু এই নিয়ে মহা হৈ হৈ করলেন। জ্যাক লনডন ঋণ স্বীকার করলেন তবে বললেন আদিম মানুষ সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

এই প্রসঙ্গে অনেক লেখার আছে—কিন্তু একটি সাধারণ প্রশ্ন মনে জাগে—কতটুকু নেওয়া চলে। মানে, কতটুকু নেওয়া আইনসঙ্গত হবে। এই সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নীতি সংক্ষেপে বেঁধে দেওয়া যায় না। তবে একটা কোনোরকম লাইসেনস না দিলে ঐতিহাসিক বা জীবনীকাররা কোনো কিছু লিখতেই পারবেন না। সাধারণ উপন্যাস বা গল্পলেখক এবং রম্য রচনাকারদের সম্পর্কেই কুম্ভীলকবৃত্তির অপবাদ ওঠে। কবিতা চুরির দৃষ্টান্তও আছে। তবে গল্পের প্লটও সীমাবদ্ধ। এই বিষয়ে আদম-সুমারী করে জানা গেছে সমগ্র বিশ্বে মাত্র ছয়টি প্লট আছে। সিনড্রেলার উপাখ্যান সারা পৃথিবীতে বিশেষ জনপ্রিয়। যত উপন্যাস প্রকাশিত হয় তার অর্ধেকের বিষয়বস্তু ছিন্নকন্থা থেকে রাজার ঐশ্বর্য। তাই যদি সত্য হয় তাহলে মনে হয় বিষয়বস্তুর রূপান্তরকরণ অনুমোদন করা চলে।

একথাও বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই যে সব লেখকই সিনক্লেয়ার কাছে তাদের ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

সৌসাদৃশ্য থাকা সম্ভব এবং অনুমোদন করা যায়। টেনিসনকে যখন অনুযোগ করা হয় যে হোরাসের কথা তিনি চুরি করেছেন। তিনি বললেন—

"Fools! as if no one had heard the sea moan except Horace—"
হোরাস লিখেছিলেন—
"The moanings of the homeless sea".

একটি মজার কাহিনী উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের অবসান ঘটানো যাক—কয়েক বছর আগে জনৈক বিখ্যাত গল্পলেখক একটি ইংরাজী মাসিকপত্রের জন্য গল্প লিখছেন। গ্রীষ্মকাল, ঘরের সবকটি জানলা খোলা। তাঁর টেবলে একটি বাতি জ্বলছে, তিনি গল্পের কথা ভাবছেন। আগামীকাল প্রাতে গল্পটা দিতে হবে অথচ মাথায় প্লট নেই।

ঠিক সেই সময় সেই ঘরে একটি প্রকাণ্ড প্রজাপতি উড়ে এল। কিছুক্ষণ বাতিটার চারপাশে প্রদক্ষিণ করল, তারপর সেই মৃদু আলোকের মধ্যে আত্মবিসর্জন করল। বাতিটা নিভে গেল।

তৎক্ষণাৎ লেখক উঠে পড়লেন। বিছানায় শোবার সময় স্ত্রীকে বললেন—'যাক গল্পটা পেলাম। লোকটা একটা নির্জন কুটিরে চেয়ারে বাঁধা, আর একটি বারুদের পিপার ওপর বাতি জ্বলছে—এই বাতির আগুন যখন বারুদে পৌঁছাবে তখন আর কিছু থাকবে না। এই ব্যাপারটি ঠিক ঘটার মুহূর্তে একটি প্রজাপতি উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাতিটার ওপর, বাতি নিভে গেল। লোকটাও বাঁচল।'

স্ত্রী বললেন—বাঃ বেশ আইডিয়া। কিন্তু প্রজাপতি কি তা করবে?

লেখক স্বামী বললেন—এখনই ত' করল!

এই বলে লেখক মুখে পরম পরিতৃপ্তির আভাস নিয়ে পরমানন্দে শয্যাগ্রহণ করলেন।

পরদিন প্রভাতে ব্রেকফাস্ট টেবলে বসে চিঠিপত্র দেখছিলেন, তারপর সদ্যপ্রাপ্ত মাসিকপত্রের পাতা ওলটাতে থাকেন, এই পত্রিকার জন্যই গল্প লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। কিন্তু পত্রিকাটি পড়তে পড়তে তিনি উত্তেজিত ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠে পত্রিকাটি স্ত্রীর হাতে দিলেন।

আরেকজন লেখক ঠিক এই একই কাহিনী লিখে ফেলেছেন। সেখানেও সেই নির্জন কুটির, সেই বারুদের পিপা আর মোমবাতি। প্রজাপতির আঘাতে মোমবাতি নিভে গেল। মানুষটি বাঁচল।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি লিখেছেন মিঃ এইচ, গ্রীনহাউ স্মিথ। তিনি দীর্ঘকাল স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম "হোয়াট আই থিংক"।

যদি দ্বিতীয় লেখকের গল্পটি লেখা হত এবং প্রকাশিত হত তাহলে সকলে তাঁকে চোর বলত। অথচ এই কাহিনীটিতে এতটুকু চুরি নেই। চিন্তার ফল মাত্র। দুজন লেখকই একরকম চিন্তা করেছেন।

যে লেখক চোর, শুধু তিনিই মনে মনে জানেন কতটুকু তাঁর চুরি করা, কতটা নিজস্ব। আর মনে মনে এই অপরাধী লেখক নিশ্চয়ই লজ্জাবোধ করেন। কুম্ভীলকের এইটুকু শাস্তি।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

"আসামের সাহিত্য বাংলা সাহিত্য থেকে প্রাচীন। কিন্তু বাংলার চেয়ে আসামে ইংরেজি প্রভাব পরে পড়ায়, অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশ পরে ঘটে।' গত ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে সর্ব ভারতীয় 'কবি সম্মেলন' কর্তৃক আয়োজিত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় উপরের মন্তব্যটি করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী দেশ ও সাহিত্যকে জানবার এ রকম সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। সেতারে যেমন অনেকরকম তার আলাদাভাবে বাজলেও সব মিলিয়ে একটা স্বতন্ত্র সুর সৃষ্টি করে, তেমনি এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও এক ভারতের সুর ধ্বনিত হয়।' তিনি আশা করেন যে, এভাবেই ভারতের প্রতিবেশী সাহিত্য এবং শিল্প সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল এই ধরনের উৎসব আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, '১৮৭০ সাল পর্যন্ত আসাম ছিল স্বাধীন। এর পরেও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আসামে বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল। এই কারণে অসমীয়া ভাষার বিবর্তন কিছুটা পিছিয়ে যায়। লক্ষ্মীনাথ এবং তাঁর বন্ধুদের প্রচেষ্টাতেই নতুন করে অসমীয়া সাহিত্যের দুয়ার উন্মুক্ত হয়।' শ্রীরায় বেজবরুয়ার সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন। শ্রীহেম শর্মা বেজবরুয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'ভারতীয় সংহতির প্রতি বেজবরুয়ার দৃষ্টি ছিল সতর্ক। তিনি ছিলেন মানবদরদী। সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন।' শ্রীমণীন্দ্র রায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'আমরা ইংরেজি বা আমেরিকান সাহিত্য সম্বন্ধে যে পরিমাণ উৎসাহ প্রকাশ করি, সেই পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে করি না।" এই দৃষ্টিভঙ্গির এখন পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। উর্দু কবি শ্রীশামসুজ্জমান এবং হিন্দি কবি স্বদেশ ভারতীও বেজবরুয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। তিনি বলেন, 'বেজবরুয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। এই ধরনের অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই ক্রমশ জানবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।' বেজবরুয়ার সাহিত্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তিনি দেখান যে, সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই বেজবরুয়ার কৃতিত্ব ছিল সমান।' অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বেজবরুয়ার কবিতার অনুবাদ পাঠ। ওড়িশার কবি শ্রীবৈষ্ণবচরণ গারিদা, উর্দুর রাজ আমিন, সাজ্জাদ নাজার হাসার উর্ফি, শামসুজ্জমান, বাংলার জগন্নাথ চক্রবর্তী, আলোক সরকার, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমল ভৌমিক, শিশির ভট্টাচার্য, মণীষা ভট্টাচার্য, প্রদীপ নাগ প্রমুখ অনূদিত কবিতা পাঠ করে শোনান। হিন্দি কবি কিরণ জৈন কবিতার অনুবাদ পাঠিয়ে দেন। গোপাল ভৌমিক ও কৃষ্ণ ধর মূলে অসমীয়া ভাষায় কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের আর একটি উল্লেখ্য দিক ছিল বেজবরুয়ার সঙ্গীত পরিবেশন। শ্রীমতী দেববালা চালিহার পরিচালনায় সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বুলু বরদলৈ, জয়ন্ত বরুয়া, ইন্দ্রজিৎ চালিহা, রেখা বসু, রাণু গোঁহাই সন্তোষ কর প্রমুখ। কয়েকজন বিদেশী শ্রোতাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অনুষ্ঠানের কথাও মনে পড়ে। গত ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। নতুন দিল্লির জামিয়া মালিয়া ইসলামিয়া বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীএম মুজিব এই অনুষ্ঠানে উর্দু কবি গালিবের একটি প্রতিকৃতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেন। আসছে বছর মির্জা গালিবের শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে সারা ভারতে। এই উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

গত ১ জানুয়ারী 'বঙ্কিম-স্মারক' ডাক-টিকিট প্রকাশিত হয়। বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এবং ভারতীয় সাহিত্যে নির্ণয় করা দুরূহ। তাঁর এই সম্মান প্রত্যেক সাহিত্য-রসিককেই আনন্দ দান করবে বলে আশা করা যায়।

ডঃ উমাশঙ্কর যোশি এবং ডঃ কে পি পুট্টাপ্পার 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভের সংবাদ এর আগেই 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান-ভবনে এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ বি গোপাল রেড্ডি এই পুরস্কার প্রদান করেন। উমাশঙ্কর যোশি বাংলা দেশে একটি খুবই পরিচিত নাম। তিনি 'নিশীথ' কবিতাগ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন। শ্রীপুট্টাপ্পা পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁর 'শ্রীরামায়ণ দর্শনম' নামক গ্রন্থের জন্য।

গত ১৫ ডিসেম্বর বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে সন্ধ্যায় এক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। কবিতা পাঠ ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, কবিতা সিংহ, কৃষ্ণ ধর, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, আলোক সরকার প্রভৃতি।

বোম্বাইয়ের শ্রীগুরুচরণ দাস ইংরেজি ভাষায় মৌলিক নাটক রচনার জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটি পুরস্কার লাভ করেছেন। গত ২৩ নভেম্বর এই পুরস্কার বিতরণ উৎসবে বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীশান্তা রামা রাও। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার' সম্পাদক শ্রীশ্যামলাল, প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক শ্রীনির্সিম ইজিকিয়েল, শ্রীগারসন দা চুনহা প্রভৃতি এই প্রথম ইংরেজি ভাষায় নাটক রচনার জন্য এই ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল।

বিভিন্ন ধরনের সম্মেলনের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। লেখকদের সম্মেলনও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু মহিলা লেখকদের জন্য আলাদা সম্মেলনের কথা কদাচিৎ শোনা যায়। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এই ধরনের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সম্মেলন বোম্বাইয়ের 'গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী সমিতির' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যে কটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। (ক) হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় মহিলা লেখকদের কাছ থেকে প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি আহবান করা; (খ) শিশু সাহিত্য রচনার জন্য উৎসাহ দান করা; (গ) পাক্ষিক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা; (ঘ) সংবাদ-পত্রে মহিলা লেখকদের রচনা প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করা।

আশা করা যায়, দেশের অন্যান্য প্রান্তেও এই সম্মেলন উৎসাহ সঞ্চার করবে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে আগামী ১১-১২ জানুয়ারী ১৯৬৯ শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় একাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ দুইদিন-ব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। এই সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করবেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। উক্ত সম্মেলনের প্রথম দিন অর্থাৎ ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ-এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ ভবতোষ দত্ত, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এবং দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫টায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীঅমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য, ডঃ উমা রায় প্রমুখ বিশিষ্ট প্রবন্ধ-লেখকগণ।

মনীষীদের নামকে স্মরণীয় করে তোলবার জন্য নানা রকম স্মৃতিস্তম্ভ, তোরণ কিংবা পাঠভবন স্থাপিত হয়ে থাকে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। ইদানীং স্মারক-ডাকটিকিট প্রবর্তিত হচ্ছে বিশেষ উপলক্ষে। উনিশ শতকের প্রখ্যাত হিব্রু উপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক অ্যাব্রাহাম ম্যাপুর প্রতিকৃতিসহ একটি বিশেষ ডাকটিকিট ছেপেছেন সম্প্রতি ইজরায়েল সরকার। হিব্রু সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক হিসেবে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'দি গিল্ট অব শমরোন'। গল্পকার হিসেবেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। এ ছাড়া লিখেছেন 'দি এডুকেশন অব ইয়ুথ' এবং 'দি বিলিফস অব এ প্যাডাগগ' নামে তরুণ-তরুণীদের উপযোগী দুটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

কিউবান সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্যামুয়েল ফেইজুর জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত। ১৯১৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন লস ভিলাস প্রদেশে। এ পর্যন্ত তার চল্লিশটিরও বেশী গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটকের বই বেরিয়েছে। সম্প্রতি তিনি একটি কবিতার বই লিখেছেন। তার নাম 'কার্তা দ্য অটোনো'। কিছুকাল তিনি সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী ও অধ্যাপকের কাজ করেন। দশ বছর ধরে কাজ করছেন লস ভিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের ডিরেক্টর হিসেবে। তাঁর বহু কবিতা এবং প্রবন্ধ, উপন্যাসের বই বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কোন একটি লেখা লিখে সাহিত্যিকরা সন্তুষ্ট হন না—তার সংশোধন, পরিবর্তন ও পুনর্লিখনে প্রায়ই অনেক রচনা নতুন রূপ লাভ করে। এমন উদাহরণ আছে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে। কখনো কখনো দেখা যায়, সংশোধিত লেখাটি মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। সম্প্রতি জেমস জয়েসের সাহিত্যে পাঠান্তর বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই বেরিয়েছে। বইটির নাম 'এ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ ইয়ং ম্যান'। সম্পাদনা করেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ চেস্টার জি অ্যান্ডারসন। এটি আসলে কোনো নতুন বই নয়। এ পর্যন্ত জয়েসের যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় বাজারে প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপির বিস্তর পার্থক্য। ডঃ অ্যান্ডারসন গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে তার একটি তথ্যনির্ভর তালিকা তৈরী করেছেন। এই গ্রন্থটি তারই ভিত্তিতে সংকলিত ও নির্বাচিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। জয়েসের সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের জন্য বইটি অত্যন্ত মূল্যবান।

সম্প্রতি প্রকাশিত আরেকটি 'মিয়াজোবোন' বইয়ের নাম—'দি ডগ বিন্দস দি ফুকস'। দুজন পৃথিবীখ্যাত সাহিত্যিক অভেন ও

আইশারউডের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটক সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

উইলিয়ম স্টাইরনের 'দি **কনফেসনস অব ন্যাট টার্নার'** নামে একটি বই বেরিয়েছিল কিছুকাল আগে। নিগ্রো সমস্যার ওপরে বইটি লেখা। পাশ্চাত্য সাহিত্যিক মহলে তাই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। নিগ্রো সাহিত্যিকরা ভয়ানক ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, স্টাইরন ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক আর অজ্ঞতাবশতই হোক, ঘটনাকে বিকৃত করে দেখিয়েছেন। প্রকৃত সমস্যার রূপ আলাদা, প্রকৃতি ভিন্ন। স্টাইরন বলেন, 'নিগ্রো দাসত্বের দ্বিধা-সংশয়ের আকর' হলো এই গ্রন্থটি। সম্প্রতি জন হের্নার্ক ক্লার্ক তার ওপরে একটি আলোচনার বই সম্পাদনা করেছেন। বইটির নাম **'উইলিয়াম স্টাইরনস ন্যাট টার্নার'।** দশজন নিগ্রো সাহিত্যিক দশটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বইটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সমালোচকের ভাষায় বইটি উদ্দেশ্যমূলক।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অপ্রধান ভাষা মোলদাভিয়ান। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাষাটির অবদান একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। সম্প্রতি মোলদাভিয়ান সাহিত্যিক বরিস ভ্লেসত্তানুর একটি ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে **কাগজের নৌকা** নামে। ছোটদের জন্য লেখা হলেও নাম-গল্পটিতে প্রতীকী ব্যবহার লক্ষণীয়। বসন্তে ছোট ছেলেমেয়েরা নদীতে নৌকা ভাসায়। লেখক লক্ষ্য করেন, প্রত্যেক সকালে সেইসব নৌকা তার সামনে ভেসে আসে। তারা যেন পাঠকের উপকূলে ভেসে যেতে চায়। কত কাগজ বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। তাদের সাধ্য নেই নৌকা হয়ে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু কয়েকটি কাগজের শীট নৌকার রূপ ধরে চলে যায় অজানা দেশে, অচেনা মানুষের মধ্যে। এই গ্রন্থের দুটি গল্পের নাম 'দি ওভার গ্রোন রোড', 'এ মিনিট অব সাইলেন্স'। প্রতিটি গল্পই আশাবাদী, রোম্যান্টিক এবং প্রতীকী ব্যবহারে অলৌকিক আস্বাদবাহী।

এস এইচ কোর্টিয়ারের গোয়েন্দা উপন্যাস **সি হু ইজ ডাইয়িং** সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সস্তায় কিভাবে আণবিক বোমা পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে নানা কলাকৌশলের কথা বলা হয়েছে উপন্যাসটিতে। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই ভয়ংকর মানসিকতার মানুষ। প্রেম ও যৌনতার যোগাযোগে সুখপাঠ্য।

ভেনেসিয়ান ব্লন্ড নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন এ এস ফিনসম্যান। তার নায়ক একজন জুয়াড়ী। জুয়া খেলতে গিয়ে সে তার সর্বস্ব হারিয়েছে। অবশেষে ধর্মের দিকেই তার মন যায়। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারে তার বৈরাগ্য সাময়িক। একজন তরুণীর ভালোবাসায় তার মন আবার পূর্ণ হয়ে ওঠে। সূর্যাস্তের সময় দেখা যায়, নায়ক তার স্বপ্নকারিণীর সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ।

স্টীফেন মারলো লিখেছেন **দি সেকেণ্ড লংগেস্ট ডে** নামে একটি উপন্যাস। সম্ভবত চ্যাণ্ডলারের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বইটি লেখা। ছদ্মনামের আড়ালে একজন যুবক আর্লিংটনের অভিজাতবংশীয়া মহিলাকে বিয়ে করে। অবশেষে সবই প্রকাশ হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে বিষয়টি নতুন কিছু মনে না হতে পারে। তবু বইটি একটানা পড়ে যাওয়া যায়।

বৃটেনের প্রখ্যাত মহিলা শিশু-সাহিত্যিক **এনিড ব্লাইটনের** মৃত্যুসংবাদও অনুরূপভাবে আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা। সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন সত্তর বছর বয়সে লণ্ডনের একটি হাসপাতালে। শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী ফ্যানটাস্টিক কাহিনী রচনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অনেকের মতে, তাঁর লেখার কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। কাহিনী কোন নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যায় না। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। পুতুলের দেশ আর খেলার রাজ্যের অদ্ভুত ধরনের খবরা-খবরে তাঁর অধিকাংশ বই-ই বেশ মজাদার। জীবনে তিনি প্রায় চারশ বই লিখে গেছেন। পৃথিবীর তেত্রিশটি ভাষায় তাঁর বহু বই অনূদিত হয়েছে। অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও কেবল নিজের দেশ বৃটেনেই তাঁর বই বিক্রী হয়েছে প্রায় সাড়ে আট কোটি।

নতুন বই

অ-কৃ-ব-র বিচিত্র গল্প সংকলন : অজিতকৃষ্ণ বসু। বিহার সাহিত্য ভবন (প্রা) লিমিটেড। ৩৭-এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম — সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের যে-বিভাগটি অধুনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সেই বিভাগে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইদানীং বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামী এবং অজিতকৃষ্ণ বসু ব্যতীত আর কেউ হাস্য ও কৌতুক-প্রধান কাহিনী রচনা করেন মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের এই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের দিকটি একদা অতিশয় পরিপুষ্ট ছিল। বাঙালীর চরিত্রে সহজাত হাস্যরস-প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে সুদীর্ঘকাল রস-রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। ইদানীং হয়ত আমরা জীবনযন্ত্রণায় কাতর হয়ে হাসতে ভুলে যাচ্ছি, তাই এই ধারা ক্ষীণ হয়ে আসছে। অজিতকৃষ্ণ ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনা লিখছেন দীর্ঘকাল। তাঁর সমগ্র গল্পের সংগ্রহ প্রকাশিত হলে এক বিশাল গ্রন্থ হয়ে উঠবে —তাই এই সংকলনে মাত্র কয়েকটি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে, যার মধ্যে 'বাণী, তত্ত্ব, সমস্যা বা যুগ-যন্ত্রণার ভার নেই'। কিন্তু শুধু মাত্র কৌতুকরসই নয়, নিদারুণ শ্লেষ ও জীবনদর্শনের অন্যদিকও তাঁর রচনায় বিরল নয়, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে আছে। 'প্রেম-ত্রিকোণ' গল্পটির পটভূমি বিচিত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের কালের। 'তিলক কামোদ' গল্পটিতে গগন যাত্রাওয়ার গুরু-গম্ভীর ছদ্মবেশ বিশেষভাবে মনে লাগে। আমাদের সংসারে ছদ্মবেশেরই মূল্য আসলের চেয়ে বেশী। ভৌতিক গল্পের উপেনবাবুর সম্ভাব্য দুঃখের জ্বালা, যখন সে কোয়ার্টার বদল করে অন্যত্র যাবে, তখন আর পাবে না চামেলীর ভালোবাসা। 'প্রতারক' গল্পটির শ্লেষ অতিশয় সূক্ষ্ম। গুলন্দাজ গোকুল গাঙ্গুলীর গল্পের বিরহী-বৃক্ষের বুকে কোনো চিহ্ন নেই। 'ইউক্লিডের মৃত্যু' জাতীয় কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অতি অল্পই রচিত হয়েছে। 'রেবেকাসুন্দরী ও ফার্ণাণ্ডেজ' গল্পটির সূক্ষ্ম কৌতুক উপভোগ্য। এই গ্রন্থে ছাব্বিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে আছে বৈচিত্র্য এবং অজিতকৃষ্ণের সুনিপুণ শ্লেষের পরিচয়। নিজস্ব ভঙ্গীতে রস পরিবেশনের কুশলতা অজিতকৃষ্ণের রচনার বৈশিষ্ট্য। এই সংকলন গ্রন্থটি সুরসিক পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হবে। সরস গল্প পরিবেশনে অজিতকৃষ্ণের সহজ ভঙ্গীটি পাঠকচিত্তে একটা সুতীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করে, **এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব।**

পলাতকা : (গল্প) পার্ল এস বাক। অনুবাদ—রেখা চট্টোপাধ্যায়। আদিত্য্যা-য়ন—৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পার্ল বাক বাংলাদেশে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর গুড আর্থ আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে বাংলায় অনুদিত হয়েছে। পার্ল বাক কিছুকাল পূর্বে কলিকাতায় এসেছিলেন, তবে দীর্ঘদিন এইখানে থাকলে হয়তো আর একখানি 'গুড আর্থ' পাওয়া যেত। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর 'এসকেপ এ্যাট মিডনাইট' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এছাড়া তাঁর 'দি সিলভার বাটারফ্লাই'-এর অন্তর্গত গল্পও এই খণ্ডে সংকলিত। মোট দশটি গল্প এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। প্রতিটি গল্প আকারে দীর্ঘ। যতদূর জানা আছে তাঁর গল্পগ্রন্থ ইতিপূর্বে বাংলায় অনুদিত হয়নি। পার্ল বাকের গল্প বলার ভঙ্গী অনাড়ম্বর। তিনি মাত্র কয়েকটি সামান্য ঘটনা পরিবেশন করে মূল গল্পটিকে দাঁড় করান, কিন্তু সেই গল্পের অন্তর্নিহিত গভীরতা পাঠক-চিত্তকে আলোড়িত করে। নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী পার্ল বাকের নতুন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পার্ল বাকের ছোটগল্প নিঃসন্দেহে একটা নতুনত্বের বাণী বহন করে এনেছে। তার সুর স্নিগ্ধ এবং মাধুর্যে ভরা। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বাংলা অনুবাদে অক্ষুন্ন রেখেছেন অনুবাদিকা, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। পার্ল বাকের গল্প বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে একটা মূল্যবান উপহার।

●

দেবীস্তুতি —শ্রীনিতাই ঘটক সংকলিত। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

কবি নজরুলের জনপ্রিয়তার অবধি নেই। কারণ তিনি সাধারণের অতি কাছের মানুষ—তাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, প্রণয়-বিরহ, হাসি-অশ্রুর রামধনু হয়ে ফুটে উঠেছে স্পর্শকাতর কবির কাব্য-দিগন্ত।

নজরুল মায়ের দামাল ছেলে—এ খবর সবারই জানা। কিন্তু এই দুরন্তপনার অন্তর উৎস হোল জগজ্জননীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসার আবেগ শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় লিখেছেন—" তাঁর ব্যক্তিসত্তার মর্মকেন্দ্রটি সমাজের কাছে আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। যিনি আজ স্তব্ধ, মৌন, মূক হয়ে আমাদের মধ্যে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন তাঁর মহাধ্যানের অতলে ডুব দিলে শুনতে পাওয়া যাবে শুধু মাতৃনামের ঝঙ্কার। কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক ও পরম শাক্ত।" কবির এই সাধনার দিক প্রথম জীবনের 'দেশমাতৃকারূপী' আরাধ্যা জননী উত্তরকালের "বিশ্বমাতৃকা জগজ্জননী'তে রূপান্তরের ইতিহাস বা আমাদের অগোচরেই থেকে গেছে, সেই আন্তরসত্তারই জীবন্ত আলেখ্য হোল "দেবীস্তুতি" নামে প্রকাশিত অমূল্য সঙ্কলন। "এখানে তিনি শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃস্বরূপের নব ভাষ্যকার"—হিন্দুশাস্ত্রের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাঁর ডুবুরী মন শুধু রত্নই আহরণ করেনি—আপন উপলব্ধির রসসিক্ত করে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে যে "অপরূপ অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন তাতে তাঁকে প্রাচীন ঋষিদের সগোত্র বলে চিনে নিতে ভুল হয় না।" পরমা-উপলব্ধির আবেগে আত্মবিস্মৃত কবি-প্রদত্ত মাতৃরূপের বিশ্লেষণ তত্ত্ব সর্বজনগ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু ভাবুক কবির অনুভবের পরশমণিতে তত্ত্ব এখানে 'রস' হয়ে উঠেছে। এই রসোত্তীর্ণ মহাভাবই "দেবীস্তুতি'র প্রাণবস্তু।

গীতিগুচ্ছের সঙ্গে প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় কবির "প্রস্তাবনা"র মূল্যও অপরিসীম। একবার পড়তে সুরু করলে শেষ না করে থাকা যায় না। শুধু তাই নয়, কবির ভাবলোকের রহস্যে, মাধুর্যে এবং সরসতা—সর্বোপরি স্বকীয়তায় বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যেতে হয়। বিশ্বজননীর করুণার বরদান ছাড়া এমন ভক্তিগীতি রচনা সম্ভব নয়। প্রাণের একান্ত অনুভাব জাতি-ধর্মের অতীত এ সত্য অনুভূত হয় "দেবীস্তুতি" পাঠে।

কবির দুঃখলগ্নে তাঁর আন্তরসত্তার এমন এক উজ্জ্বল ছবি উপহার দেওয়ার জন্য শ্রীনিতাই ঘটক ধন্যবাদার্হ।

●

একদিন চিরদিন (কাব্যগ্রন্থ)—মনীষী মোহন রায়।। সুজনী ৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭।। দাম : দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা এখন অনুভবের গভীরতায় মগ্ন নয়—বুদ্ধি ও মেধার চমকপ্রদ ব্যবহারে উচ্চকণ্ঠ। মনীষীমোহন রায় এ-দিক থেকে ভিন্নপন্থী কবি। লেখার অজস্রতায় সুপরিচিত না হলেও তিনি রোম্যান্টিক আবেদনে উজ্জ্বল। বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতি—বিশেষ করে পাখি, পল্লব, জ্যোৎস্না, ঝুমকো লতা, স্বপ্ন, প্রেম প্রভৃতি বিষয় তাঁর কবিতায় কখনো সরাসরি, কখনো অনুষঙ্গরূপে উপস্থিত। মনে হয়, কবিতার ব্যাপারে কোনো তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দের নির্বাচন তিনি পছন্দ করেন না। সমকালীন জীবনপ্রবাহের অন্তর্নিহিত আবেদনকেই তিনি কবিতার ভেতরে কখনো কখনো সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

কবিতার গঠন এবং নির্মাণে ইদানীং যে বৈচিত্র্যময় কারুকার্যের সন্ধান মেলে মনীষীবাবু সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নি। কোনো কোনো কবিতায় তিনি লোকায়ত ভাব এবং ভঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন অথচ নিকতার আধারে। 'খুশির নোলক' 'বৌয়ের প্রতি পুরুষপ্রেমিক' প্রভৃতি কবিতাকে এই ধারার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। অন্যান্য কবিতায় তাঁর আস্তিক্যবোধ প্রকৃতি ও প্রেমের আলোকে পাঠককে আচ্ছন্ন করে। এ কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব ক'টি কবিতাই বাংলাদেশের সঙ্গীতময় রোম্যান্টিকতার আত্মবাহী।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শালবনী [প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা]—সম্পাদক নিখিল বসু ও পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত।। হাট কোয়ার্টার্স, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।।

সম্পাদকীয় পাঁচালীতে লেখা হয়েছে : "উত্তর বাংলার শালমহুয়া সবুজ সবুজ চায়ের পাতা আর তরাই বনভূমির প্লাবিত জ্যোৎস্নায় ঘাত-প্রতিঘাতের অনেক সিঁড়ি টপকে শালবনী প্রকাশিত হল।...খেতাব পাওয়া সুন্দরীর গলায় ঝুটো মতির মালায় আমাদের ভয়ানক অরুচি। নবাগতদের উত্তীর্ণ রচনার প্রতি আমাদের লোভ সর্বাগ্রে। তিনি মঙ্গলগ্রহের প্রাণী হলেও আমাদের আপত্তি নেই।" এমনি সব দুর্ধর্ষ ঘোষণা নিয়ে বেরিয়েছে শালবনী। এ সংখ্যায় লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দীপক সরকার, নির্মলেন্দু গৌতম, রাণা চট্টোপাধ্যায়, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, নিখিল বসু, জীবন সরকার এবং আরো কয়েকজন। সবশেষে সম্পাদকীয় শ্লোগান শুনুন : "বাঁয়ে হটো, ডাইনে হটো, লাইন ক্লিয়ার—ক্লিয়ার—আমরা ছুটেছি উড়ন্ত চাকির মতো লেখকের গ্রহ থেকে পাঠকের গ্রহান্তরে...।"

জন স্টাইনবেক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

১৯৬২-তে জন স্টাইনবেককে নোবেল পুরস্কারে যখন সম্মানিত করা হয় তখন তিনি খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন। মার্কিন লেখকদের মধ্যে স্টাইনবেকের রচনা ছিল বহুমুখী। অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন এবং আঙ্গিকের দিক থেকে যে-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন সে তাঁর নিজস্ব। স্টকহোমে যখন নোবেল পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন—

> "The writer is delegated to declare and to celebrate man's proven capacity for greatness of heart and spirit, for gallantry in defeat for courage, compassion and love ,......
>
> I hold that a writer who does not passionately believe in the perfectibility of man has no dedication nor any membership in literature.

স্টাইনবেকের মৃত্যুর মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত কথাগুলি চিন্তা করছি। লেখকের সত্তা যে সাধারণ সত্তা থেকে ভিন্ন, তার মহত্ত্ব যে নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে হয়, এই বিশ্বাস ছিল তাঁর।

স্টাইনবেক ছিলেন একাধারে বাস্তববাদী আবার কল্পনাবিলাসী। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অতিশয় সংবেদনশীল। দুই মহাযুদ্ধের ভেতর যেসব লেখকদের কেটেছে তাঁদের সাহিত্যে স্বাভাবিক হেতুতেই যারা অবহেলিত, অপমানিত ও অবদমিত, সেই লাঞ্ছিত মানুষের কথা এসেছে। মানবিক প্রকৃতিকে তার আটপৌরে আকৃতিতে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই স্টাইনবেকের আঁকা চরিত্র মানবিক হয়েছে। অত্যাচারী মানুষ এবং অত্যাচারিত মানুষ দুই-ই তিনি দেখেছেন, তাঁর ব্যক্তিমানসে যে স্পন্দন জেগেছে তাই ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। প্রতিটি চরিত্র স্বকীয়তায় অনন্য, সুস্পষ্ট এবং সম্মুখ। স্টাইনবেকের কাহিনী পরিবেশনের আঙ্গিক বিশেষভাবে পাঠকমনকে স্পর্শ করে। লম্বা বর্ণনার বালাই নেই, এতটুকু বাহুল্য নেই, অতিশয় সংক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে যেটুকু বলা প্রয়োজন তাই তিনি বলেছেন। অথচ স্টাইল নিয়ে মাতামাতি করে স্টাইনবেক কাহিনীর চরিত্রহানি ঘটাননি, তাঁর গল্প বা উপন্যাস তাই পাঠককে গ্রাস করে। গভীর অভিনিবেশসহকারে স্টাইনবেকের রচনা পড়তে হয়, কিছুই এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

স্টাইনবেক মার্কসবাদী লেখক নন, তবে তিনি প্রগতিশীল লেখক। স্টাইনবেকের রচনাগুলি প্রথম প্রকাশের কাল ছিল আমেরিকার দুঃসময়, তখন মন্দার বাজার। 'মাইস অ্যান্ড মেন' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭-এ এবং ১৯৩৯-এ 'দি গ্রেপস অব রাথ'। এই দুটি উপন্যাসেই আমেরিকার মন্দার বাজারের তথ্যনিষ্ঠ চিত্র এঁকেছেন স্টাইনবেক।

স্টাইনবেক কালিফোর্ণিয়ার মানুষ, তিনি কালিফোর্ণিয়া প্রসঙ্গে অনেক লিখেছেন। আঞ্চলিকতার মোহ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তাই মন্দার বাজারের যন্ত্রণা তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে। এর জন্য স্টাইনবেকের রচনাকে আমেরিকার এক শ্রেণীর সমালোচক সুনজরে দেখেন না। কিন্তু যে অঞ্চল লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন, যার অভিজ্ঞতা তাঁর সরেজমিনে পাওয়া তার কথাই ত' তিনি লিখবেন। কালিফোর্ণিয়ার সালিনাস নগরে ১৯০২ খৃঃ জন্ম স্টাইনবেকের, মা আইরিশ, পিতার শরীরে জার্মান রক্ত। এই দুই ভিন্ন ঐতিহ্যের প্রতিনিধি স্টাইনবেক। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন কিছুদিন, ডিগ্রী লাভ করা বরাতে জোটেনি। অভাব, অনটনের সংসার, ফলে খেত খামারে কাজ করতে হয়। এখানে-সেখানে দিনমজুরি। এইভাবে একদিন এসে উপস্থিত হলেন নিউইয়র্কে। সেদিন নিউইয়র্ক তাঁর মনে ধরেনি, ঘরে ফিরে এসে লিখতে লাগলেন। প্রথম রচনা 'দি কাপ অফ গোল্ড' প্রকাশিত হল ১৯২৯-এ। এই উপন্যাসটি তিনি ছ'বার পরিবর্তিত করেছেন। কিন্তু শেষনিঃশ্বাস ফেলেছেন নিউইয়র্কে। শেষজীবন কেটেছে নিউইয়র্কে, বলতেন—
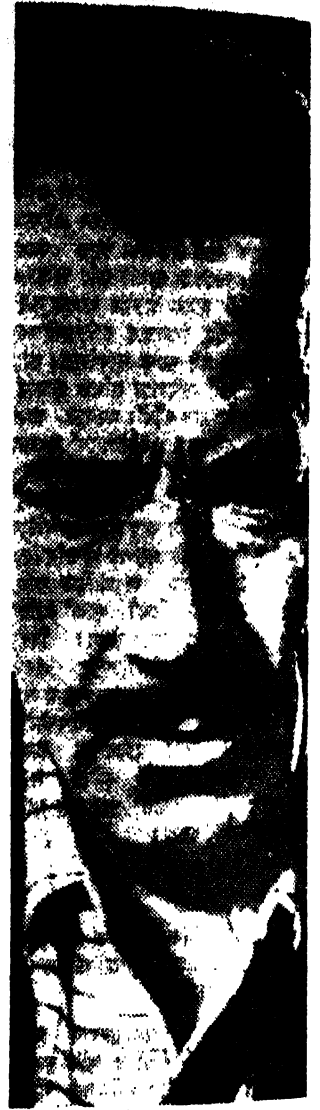
> "If you have lived in New York no place else is good enough".

সুতরাং আঞ্চলিকতার অপরাধে তাঁকে অপরাধী করা যায় না। কিন্তু কালিফোর্ণিয়ার মাটি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে প্রথম জীবনের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠায়। 'দি পাসচার্স অব হেভেন' এবং 'টু এ গড আনোন' ক্যালিফোর্ণিয়ার

গল্প। মন্দার বাজারের গল্প, গ্রন্থদুটিও তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি, অর্থাৎ বেশী বিক্রী হয়নি। কিন্তু স্টাইনবেকের 'টোরটিলা ফ্লাট' বিশেষ সমাদর লাভ করল, এমনকি ছায়াছবিতেও রূপায়িত হল। সরল মানুষের কাহিনী এই টোরটিলা ফ্লাট। টোরটিলা ফ্লাট এবং দি গ্রেপস অব রাথ-ই স্টাইনবেককে বাঙালী পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করেছে। আমেরিকার মার্কাস কানলিফ প্রভৃতি সমালোচকরা স্টাইনবেকের প্রতি সুবিচার করেননি। আঞ্চলিকতার অপরাধ দিয়ে দু' কথায় তাঁর সাহিত্য বিচার করে তাঁর দায়িত্ব সেরেছেন। কিন্তু উত্তরকালে স্টাইনবেকের প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করেছে। কালিফোর্ণিয়ার কৃষিপ্রধান পরিবেশ তাঁর অন্তরকে আকুল করেছিল, তাই মধ্য-ত্রিশের দশকে তিনি এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও কিষান সম্প্রদায়কে সহানুভূতি-সহকারে বিচার করেছেন। টোরটিলা ফ্লাটে আছে স্টাইনবেকের স্বচ্ছ সরসতা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ছাপও এই রচনায় আছে, কিন্তু ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'ইনডিউবিয়াস ব্যাটল'-এ জন স্টাইনবেকের ক্রোধ ফুটে উঠেছে, এখানে তিনি প্রতিবাদের হাত উঠিয়েছেন। যদিও স্টাইনবেক আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত হননি, তথাপি এই উপন্যাসে মার্কসীয় দর্শনের প্রতি লেখকের অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। কালিফোর্ণিয়ার উপত্যকা অঞ্চলে বহিরাগত ফল-আহরকদের ধর্মঘট এই উপন্যাসের উপজীব্য। এই কালে স্টাইনবেক 'সানফ্রান্সিসকো নিউজে'র তরফ থেকে ভূমিহীন চাষীদের সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। এরা এসেছিল মধ্য-আমেরিকার ওকলাহামা প্রদেশ থেকে অন্নের প্রয়োজনে। ঐসব অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ শুরু হওয়ায় এরা বেকার হয়ে পড়ে। তাই দলে দলে এইসব বহিরাগত এলো কালিফোর্ণিয়ায়, গাছ থেকে ফল তোলার কাজ দেওয়া হল এদের। কিন্তু তাদের প্রতি ঘোর অবিচার চলে, শোষিত এইসব মানুষ স্টাইনবেককে আকুল করে তোলে, তাই লিখিত হল—'ইনডিউবিয়াস ব্যাটল' আর এর তিন বছর পরে 'দি গ্রেপস অব রাথ'। এই উপন্যাসটি পুলিটজার পুরস্কার লাভ করল এবং প্রকৃতপক্ষে লেখক হিসাবে স্টাইনবেককে সুপ্রতিষ্ঠ করল। সমগ্র আমেরিকা এই নতুন প্রতিভার প্রতি যথেষ্ট সচেতন হল। এই উপন্যাসে দেখান হল যেসব মার্কিন নাগরিক একদা জমির মালিক ছিলেন তাঁরা ভূমিহীন হলে কি দুর্দশায় পড়তে পারেন, একদা এইসব জমির মালিক যথেষ্ট প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন জাতিগঠনের প্রথম পর্যায়ে অজ তাঁরা ভূমিহীন, গৃহহীন। আশ্রয়হারা এই পথচারী মানুষের কথা গভীর সহানুভূতি-সহকারে এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। আমেরিকার জনগণ এই উপন্যাসে নতুন বক্তব্য এবং বলিষ্ঠ ইঙ্গিতের পরিচয় পেয়ে সচকিত হল।

মার্কিন ধনতন্ত্রবাদ যখনই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তখনই বহুলোক মার্কসীয় বিপ্লবের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে মার্কসীয় রীতিতে বিপ্লবের দ্বারা অর্থ-নৈতিক মুক্তি সম্ভব এই কথা বলেছেন, তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁরা পথনির্দেশ করেছেন মার্কসীয় ভঙ্গীতে সমস্যা সমাধানের। এই প্রগতিশীল লেখক-দের মধ্যে স্টাইনবেক অন্যতম।

স্টাইনবেকের 'মাইস অ্যান্ড মেন' এই গ্রন্থের দু' বছর আগে লেখা। 'মাইস অ্যান্ড মেন' সম্ভবতঃ বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এই উপন্যাসের জড়বুদ্ধি নায়ক লেনি-র মন ছিল অতিশয় সরল, তার অন্তরে ছিল সুগভীর প্রেম ও প্রীতির উৎস, সে আতংকিত হয়ে উঠত তার দূরসম্পর্কের আত্মীয় জর্জকে দেখলে বা তার কথা কানে এলে, কিন্তু জর্জকে সে ভীষণ ভালোবাসে। কিন্তু লেনির ভালোবাসার উৎপাতে সবাই প্রাণ দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে, শেষে একদিন ওদের মালিক কার্লির স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল লেনির প্রীতির আতিশয্যে। জর্জ আর লেনিকে সেদিন রক্ষা করতে পারে না, লেনি যখন ভাবছে তার সোনার ভবিষ্যৎ তখন জর্জই তাকে স্বহস্তে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করল। অন্য শিকারীরা সেই আওয়াজে দৌড়ে এসে দেখে লেনির সেই অবস্থা, তার পাশে বসে আছে জর্জ। তার চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। 'মাইস অ্যান্ড মেনের' আবেদন সর্বকালীন। এর মধ্যে প্রচুর নাটকীয় সংঘাত আছে আর আছে ট্রাজেডি। 'অফ মাইস অ্যান্ড মেন' রচনা-কালে স্টাইনবেক নাকি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর কাহিনীকে যথাসম্ভব নাটকীয় ভঙ্গীতে পরিবেশনের, সব কাহিনীই যে বলার ভঙ্গীতে নাটকীয় করা যায় এই ছিল মনোভংগী, তাই নাটকীয় আঙ্গিকে লিখিত এই উপন্যাসের প্রকাশ হওয়ার সঙ্গেই মঞ্চে তার চাহিদা দেখা দিল এবং 'অফ মাইস অ্যান্ড মেন' নাটক হিসাবেই অধিকতর পরিচিতি এবং সাফল্য লাভ করে। এই কাহিনীও ভূমিহীন বহিরাগতদের কাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে স্টাইনবেক ছিলেন যুদ্ধকালীন সংবাদদাতা। নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন এবং দি ডেলী একসপ্রেস' পত্রিকার তরফে সংবাদদাতার কাজ করেন। নাৎসী অত্যাচার তাঁকে অনু-প্রাণিত করে 'দি মুন ইজ ডাউন' নামক উপন্যাস রচনায়, এই উপন্যাসটির সেইকালে বঙ্গানুবাদ হয়।

যুদ্ধের পর স্টাইনবেক ফিল্ম চিত্রপট রচনা করেন। 'বার্নিং ব্রাইট' ফিলম হিসাবে সাফল্য লাভ করে। কিন্তু ১৯৫২ খৃঃ লিখিত 'ইস্ট অব ইডেন' তাঁর একটি মহৎ উপন্যাস। জ্ঞান এবং অজ্ঞতা, ভাল এবং মন্দের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যেই জীবন—এই উপন্যাসের অন্তঃশীলা তথ্য।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের অংশভাগী হওয়াটাই ছিল স্টাইনবেকের জীবনদর্শন। 'দি গ্রেপস অব রাথে' স্টাইনবেক বলে-ছিলেন—

This is the beginning from I'to'we —

এই উক্তি আমাদের পরিচিত। এদেশে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথাই বলে-ছিলেন, এক রকম একই উক্তি দুজনের। তাই তিনি আপনাকে দেখতে পারেন নি, দেখেছেন বহুকে। সেই বহুকে পেয়েছেন ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, খেত-মজুরদের মধ্যে। স্টাইনবেক সমাজসংস্কারের দৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিলেন তবে যে কালে জন্মে-ছিলেন সেই কালটি—এই জাতীয় সমাজ-সচেতন মানুষের কথায় কর্ণপাত করতে নারাজ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী স্টাইন-বেক যে ধর্ম, যে শিক্ষা, যে বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তি-মানসকে ক্ষুণ্ণ করে তার বিরোধী ছিলেন। তার বিরুদ্ধেই তাঁর সংগ্রাম।

স্টাইনবেক ছিলেন নানা কাজের মানুষ। পাঁচ-মিশেলী কাজ তাঁর ভালো লাগত। পরবর্তী জীবনেও তিনি এই বৈচিত্র্যের সন্ধানে ঘুরেছেন তাই কেউ কেউ বলতেন, স্টাইনবেকের মাথায় পোকা আছে, এ রোগ সারানো শিবের অসাধ্য।

স্টাইনবেক এ যুগের একজন স্মরণীয় লেখক। নিজস্ব বিশ্বাস ও ধারণা নিয়ে সাহিত্যরচনার দিকে এ যুগের অধিকাংশ লেখক সচেতন নন, সেই কালে স্টাইনবেক এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

১৩০৫ সালে শহর কলকাতায় সিঁদচুরি

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে কলকাতা পুলিশের স্বনামখ্যাত দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় গোয়েন্দাগিরির কাজে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণগুলি 'দারোগার দপ্তর' নামক বিখ্যাত সিরিজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে তিনি বাঙলা রহস্য কাহিনীর আদি লেখক-রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। সে-বইগুলি আজ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। আমরা বহু সন্ধানে কয়েকখানি বই সংগ্রহ করে কয়েকটি কাহিনী আধুনিককালের উপযোগী ভাষায় ও বিন্যাসে সম্পাদনা করেছি। তার মধ্যে একটি কাহিনী এই সংখ্যায় পরিবেশিত হল। তদন্তকার্যে নিযুক্ত হয়ে গোয়েন্দাদের যে কী বিপুল পরিশ্রম করতে হয়, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়, কায়িক ক্লেশ উপেক্ষা করে কিভাবে নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজে লেগে থাকতে হয়, তার কিছু নজীর এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাবে।

একদিন খবর পেলাম, উত্তর কলকাতার এক ভদ্র ও বর্ধিষ্ণু পল্লীর মধ্যে গগনচন্দ্র ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে সিঁদ কেটে চোর অনেক টাকা দামের গয়নাগাঁটি নিয়ে গেছে।

সংবাদ পেয়ে গগন ঘোষের বাড়ি গেলাম। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মার্জিত কথাবার্তা। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জানা গেল, কলকাতায় তাঁর স্থায়ী বাস নয়। তিনি মফস্বলের জমিদার, সেখানে কিছুদিন যাবৎ তাঁর শরীর ভাল থাকছিল না বলে সম্প্রতি কলকাতায় হাওয়া বদল করতে এসেছেন এবং এই পল্লীতে একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া করে বাস করছেন।

বাড়ির আশপাশ ঘুরে দেখলাম। বাড়ির পিছনে একটুখানি খালি জমি। সেদিকে অন্দরমহলের একটি জানলা। সেই জানলার নীচে সিঁদ কাটা হয়েছে এবং সেই জমিতে তিনটে কাঠের বাক্স ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

গগনবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, তিনি সেদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নীচে নেমে দেখেন, বাড়ির সদর দরজা খোলা। দেখে তাঁর মনে সন্দেহ হয়। ঘরদোর তল্লাস করে অবশেষে তিনি আবিষ্কার করেন, নীচেকার একটি ঘরে সিঁদ দেওয়া হয়েছে আর সেই ঘরে যে ক'টি বাক্স ছিল তা নেই। তখন তিনি চারদিকে খোঁজ করে দেখতে পান, বাড়ির পিছনদিককার খালি জমিতে বাক্সগুলি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তার ভিতরে যেসব সোনারুপোর অলঙ্কারাদি ছিল সেসব কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানায় খবর দেন।

সিঁদ-চুরির ব্যাপারে যে-ভাবে তদন্ত করা দরকার তার কিছুই বাকি থাকল না। বাড়িতে যে-দুজন ঠিকা চাকর আর রাঁধুনি কাজ করত তাদের চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অনুসন্ধান করা হল, কোন চোরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া হল: পাড়ার লোকজনের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তির সেই বাড়িতে যাতায়াত আছে, তাদের স্বভাবচরিত্র কেমন, কোন চোর-বদমায়েসের সঙ্গে তাদের কোন সংস্রব আছে কিনা প্রভৃতি বিষয় যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু কিছুই জানতে পারলাম না।

বাইরে থেকে সন্দেহযুক্ত কোন নতুন লোক এসে সেই পাড়ার মধ্যে বাস করছে কিনা, এই চুরি সম্বন্ধে সেই পাড়ার কোন লোকের ওপর কোনরকম সন্দেহ হতে পারে কিনা তারও খোঁজখবর নেওয়া হল। কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

স্থানীয় যেসব মার্কামারা চোর আছে তাদের খানাতল্লাস করা হল। কিন্তু কোন ফল হল না। যেসব নামকরা চোরাই মালের কারবারি এই শহরে আছে তাদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে এবং গোপনে অনুসন্ধান করা হল, দু'তিনজন পুরনো চোরের সাহায্য নিয়ে নানাভাবে তদন্ত করা হল, সোনারুপোর জিনিসের কারবার যারা করে সেইসব স্যাকরাদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু কোনদিক থেকে কোন সূত্রই পাওয়া গেল না।

আমি এবং আরও দু'তিনজন দারোগা মিলে এক মাস যাবৎ যতদূর সম্ভব জোর তদন্ত চালালাম, কিন্তু কোন ফল হল না। ক্রমে সকলেই নিরাশ হয়ে এই মোকর্দমার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করলাম।

এই তদন্তের ব্যাপারে গগনবাবু আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। দরকার হলেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, আমাদের সঙ্গে নানা স্থানে যেতেন, এমন কি প্রয়োজন হলে টাকা খরচ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এত করেও তাঁর বাড়ির সিঁদচুরির কোন কিনারাই করতে পারলাম না।

●

অতঃপর অন্য একটি কাজে আমাকে মফস্বল যেতে হল এবং পনেরো দিন কলকাতার বাইরে কাটাতে হল। কলকাতায় ফিরে শুনলাম, দশবারো দিন আগে গগনবাবুদের পাড়ায় আর একটি সিঁদচুরি হয়েছে এবং বিস্তর অলংকার ও অর্থ চুরি গেছে।

যে-দারোগা এই ব্যাপারে তদন্তে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গগনবাবুর বাড়ির একটা বাড়ির পরেই যে লাল-রঙের দোতলা বারান্দাওলা বাড়িতে প্রাণনাথ রায় নামে উকিল বাস করেন, সিঁদ হয়েছে সেই বাড়িতে এবং প্রথমবারে যে-ভাবে বাইরে থেকে একতলার ঘরের জানলার নীচে সিঁদ কাটা হয়েছিল, এবারও ঠিক সেইভাবে সিঁদ দেওয়া হয়েছে। আরও জানা গেল, যেসব বাক্স থেকে জিনিস চুরি করা হয়েছে সেসব বাক্স ছিল দোতলার একটা ঘরে। চোর নীচেকার যে ঘরে ঢুকেছিল সে ঘরের বাড়ির দিককার দরজা খোলা ছিল। সেই খোলা দরজা দিয়ে চোর ওপরে উঠে একটা ঘরে ঢুকে বাক্সগুলো বার করে আনে, কিন্তু নীচে আনেনি, সেগুলো নিয়ে সে ছাদে যায় এবং সেইখানে বসে খুলে জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সাব-ইন্সপেকটারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সেখান থেকে চলে এলাম। মনের মধ্যে নানা অনুমান এবং সন্দেহ। দেড়মাসের মধ্যে দু'দুটো বড় রকমের চুরি, দুটোই এক জায়গায়, এমনকি এক বাড়িতেও বললে চলে, অথচ ইতিমধ্যে শহরের অন্য কোন তল্লাটে এ ধরনের চুরির কোন খবর পাওয়া যায়নি। এইসব দেখে শুনে অনুমান হয়, যে-জায়গায় পর পর দুটো চুরি হয়ে গেল সেই জায়গায় বা তার কাছাকাছি কোন মহল্লায় কোন পাকা সিঁদেল-চোর এসে আস্তানা গেড়েছে, অথবা, সে দূরে থাকলেও, এই জায়গায় এমন কোন লোককে সে ঠিক করে রেখেছে যে তাকে পাড়ার সমস্ত খবর এবং অন্ধি-সন্ধি জানাচ্ছে।

যাই হোক, এ বিষয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে হাতে যে কাজগুলো ছিল সেগুলো সমাধান করতে ব্যাপৃত হলাম।

●

প্রাণনাথবাবুর বাড়িতে চুরি হবার মাস দেড়েক পর আবার সেই পাড়াতেই আর একটি সিঁদ-চুরির খবর পাওয়া গেল। গগনবাবু আর প্রাণনাথবাবুর বাড়ির কাছা-কাছি আর একটি বাড়িতে সিঁদ কেটে নগদ টাকা আর গয়না চুরি হয়েছে।

সাধারণত এই রকম খবর আমার কাছে পৌঁছলে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করে আমার বিভাগের ডি সিকে জানাই। এবার কিন্তু ইচ্ছে করেই ঘটনা-স্থলে গেলাম না। যেকাজে নিযুক্ত ছিলাম সেই কাজের রিপোর্ট ইত্যাদি তৈরী করতে লাগলাম। তিন দিনের দিন ডি সির কাছ থেকে এক বিশেষ বার্তাবহ মারফৎ এক লম্বাচওড়া হুকুমনামা এলো। তার সারমর্ম: "ইতিপূর্বে অতি অল্পদিনের মধ্যে যে পাড়ায় দু-দুটো সিঁদ হয়ে অনেক দামী জিনিস ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে তার একটি তদন্তে তুমি কিছু-

দিন লিপ্ত ছিলে। সেই জায়গাতেই আবার একটি সিঁদ চুরি হয়েছে। এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তুমি এই পত্র পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করবে এবং যতদিন পর্যন্ত এইসব চুরির কিনারা না হয় ততদিন পর্যন্ত তুমি অন্য কোন কাজ করবে না। এই তদন্তে তোমার যা প্রয়োজন হবে, আমাকে জানালে তা তুমি পাবে।

এই আদেশনামা পেয়ে আমি তো বিমূঢ়। প্রাণপণ চেষ্টা করেও প্রথম চুরির কোন হদিস পাই নি। দ্বিতীয় চুরির বেলাতেও তাই। অবশ্য দ্বিতীয়বারে আমি কলকাতায় ছিলাম না। যাই হোক সে চুরিরও কোন কিনারা হয় নি। আবার একটা চুরি হয়েছে এবং আমার ওপর গুরুদায়িত্ব চাপানো হয়েছে। যদি কৃতকার্য না হই, তাহলে এতদিনের সুনামের গায়ে দাগ লাগবে। কিন্তু যা ঘোরালো ব্যাপার, ভরসা তো কিছু পাচ্ছি না। যাইহোক, হুকুম যখন হয়েছে তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। অতএব অনতিবিলম্বেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম আমার পূর্বপরিচিত সেই এস-আই'টি এবারও তদন্তে নিযুক্ত হয়েছেন। আগের মত এবারও তাঁকে নানাভাবে প্রশ্ন করলাম এবং উত্তরও পেলাম।

এবার যাঁর বাড়ি চুরি হয়েছে তাঁর নাম নগেন দত্ত। নগেনবাবুর বাড়ি প্রাণনাথবাবুর উল্টোদিকে। নগেনবাবু একজন ছোটখাট জমিদার। বহুদিন এই অঞ্চলে বাস করছেন।

এবার সিঁদ কাটা হয়েছে, নগেনবাবুর বাড়ির পূর্বদিকে যে সরু গলি আছে সেই গলির মধ্যে বসে। সেই অতিশয় সরু এবং নোংরা গলি দিয়ে লোকজন বড়-একটা যাতায়াত করে না। এবারেও জানলার নীচে একইভাবে সিঁদ দেওয়া হয়েছে এবং চোর ওপরে উঠে একটা ঘরের তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে সেই ঘরের বাক্স-প্যাটরা খুলে টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়ে নীচে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই সিঁদও আগেকার দুটো সিঁদের মতই, কোন তফাৎ নেই। মনে হয় তিনটে সিঁদই কাটা হয়েছে একটা অস্ত্র দিয়ে। তদন্ত ইতিমধ্যে যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া যায়নি।

তারপর প্রায় পনেরো দিন ধরে দিনে রাতে আরও ব্যাপক তদন্ত করা হল, কিন্তু যথা পূর্বং, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আমার মনে একটা আবছা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। একাজ উটকো লোকের নয়। সন্ধানী লোকের কাজ তাতে আর সন্দেহ নেই। চোর বোধ করি এই মহল্লাতেই থাকে।

পনেরো দিন পরে এস আই হাল ছেড়ে দিয়ে সদরে আমায় একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে ছিলেন। আমিও আর স্থানীয় ফাঁড়ির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখলাম না। কিন্তু তাই বলে যে তদন্ত থেকে বিরত হলাম তা নয়। সেই পাড়ার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ইতিমধ্যে ভাব জমিয়েছিলাম। নাম পরেশ গাঙ্গুলী। বছর চল্লিশ বয়স। অমায়িক মানুষ। একদিন তাঁর বৈঠকখানায় বসে কথায় কথায় বললাম—"আপনাদের পাড়ায় যেরকম চুরি হতে আরম্ভ হয়েছে তা বড় ভাবনার কথা। পুলিশের পক্ষেও বটে, আপনাদের পক্ষেও বটে।"

পরেশবাবু বলেন—"পুলিশের কথা জানি না। আমরা কিন্তু খুবই চিন্তিত। পুলিশ যে এত অপদার্থ তা জানতাম না। পরপর চুরি হচ্ছে অথচ তার কোন কিনারা হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত দেখছি, ভিটে বিক্রি করে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

বললাম—"আমার মনে হচ্ছে যদি আপনার সাহায্য পাই তাহলে হয়ত এ ব্যাপারটার সমাধান করতে পারি।"

পরেশবাবু আমার কথা শুনে বিস্মিতভাবে বললেন—"কি রকম? আমায় কি করতে বলেন? বলুন কি চান?"

"বিশেষ কিছু নয়। কয়েকদিন রাত্রে আপনার বাড়ি থাকবো। রাত এগারটা থেকে সকাল পর্যন্ত। অন্য সময়ে নয়।"

পরেশবাবু বললেন—"এ আর বেশি কথা কি? কিন্তু রাতের বেলায় আমার বাড়িতে থেকে করবেন কি?"

—আমি আপনার বাড়ির ছাদের ওপর থাকবো। আপনার বাড়িটা তিনতলা বলে বেশ উঁচু। তার ছাদে বসে পাড়াটা বেশ ভালই ওয়াচ করা যেতে পারবে।"

পরেশবাবু বললেন—"এতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি চাকরকে দিয়ে ছাদে আপনার বিছানা করিয়ে দেব।"

—"বিছানার দরকার হবে না। একটা চেয়ার পেলেই যথেষ্ট। আর, চাকরকে একথা বলবেন না। আমি সবাইকার অজানতে ছাদে থাকতে চাই।"

পরেশবাবু বললেন— "বেশ তাই হবে। আমি রাত দশটা পর্যন্ত বৈঠকখানায় থাকি। আপনি সেই সময় এলে ঘর বন্ধ করে বারমহলের দরজা দিয়ে ভিতরে যাব। চাকররা থাকে অন্য মহলে, তারা জানতে পারবে না। তারপর বারমহল দিয়ে দোতলায় উঠে ছাদে যাবার যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়ি দিয়ে আপনি ছাদে চলে যাবেন। আমি অন্দরমহলে যাব। তারপর, অন্দরের অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব বা কিছুক্ষণ সময় কাটাবো। কিন্তু এভাবে সারা রাত আপনি ছাদের ওপর জেগে বসে থাকবেন? খুব কষ্ট হবে তো!"

হেসে বললাম—"আমাদের কাজে কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করলে চলে না পরেশবাবু। এ আর কি কষ্ট! পৌষের শীতে পুকুরের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাতের পর রাত পাহারা দিয়েছি চোর ধরবার জন্যে। দিন পাঁচেক পর আমি ধরলাম চোরকে, আর নীলমণি ধরলে আমাকে। নীলমণি, মানে নিউমোনিয়া।"

আমার কথা শুনে পরেশবাবু হাসতে লাগলেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পরে স্থির হলো, আমি সেইদিন রাত থেকে ওয়াচ শুরু করব।

নির্ধারিত সময়ে পরেশবাবুর বাড়ি উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি আমায় নিয়ে ছাদে উঠলেন। দেখলাম দুটি গদি আঁটা চেয়ার ইতিমধ্যে সেখানে রাখা হয়েছে। পরেশবাবুকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে একটি চেয়ারে বসলাম। অন্যটিতে পরেশবাবু বসলেন এবং কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে নানা বিষয়ের গল্পগুজব করে শুতে চলে গেলেন। আমি তখন আমার চেয়ারখানিকে আলসের ধারে এনে এমনভাবে বসলাম যাতে সেখান থেকে পাড়ার রাস্তাগুলো দেখা যায়।

সারা রাত কেটে গেল। সন্দেহজনক কোন কিছুই নজরে পড়ল না। দেখলাম, মাঝে মাঝে বীটের চৌকিদার পাড়া টহল দিয়ে গেল।

এমনিভাবে রাতের পর রাত কেটে গেল। প্রায় প্রতি রাত্রেই পরেশবাবু ছাদে আসতেন এবং কিছুক্ষণ গল্প করে যেতেন।

পনেরোটা রাত কাটাবার পর যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি তখন একদিন গভীর রাতে পরেশবাবু ছাদে এলেন। বললেন—"ঘুম হচ্ছিল না, তাই ভাবলাম, আপনার অবস্থাটা একবার দেখে যাই। আর কত দিন এভাবে না ঘুমিয়ে বসে বসে কাটাবেন?"

বললাম—"দেখি আর দু'চার দিন।"

পরেশবাবু আমার পাশে বসলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—"দেখছেন? ওই যে! রাস্তায় একটা লোক।" এই বলে হাত বাড়িয়ে পথের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বললাম—"দেখেছি। মাথাটা একটু নীচু করে বসুন।"

পরেশবাবু বললেন—"ওই লোকটাই বোধহয় চোর।"

বললাম—"সম্ভবত নয়। কারণ লোকটা যে বাড়ি থেকে বেরুলো, সেটা তো গগনবাবুর বাড়ি। গগনবাবুর বাড়িতে কি চোর লুকিয়ে থাকবে?"

পরেশবাবু বললেন—"তাহলে বোধহয় গগনবাবুই কোন কাজে বেরিয়েছেন। হয়ত কোন শব্দটব্দ পেয়েছেন, তাই বাইরেটা দেখে নিচ্ছেন। ও'র বাড়িতেই তো প্রথম সিঁদ হয়।"

কোন কথা বললাম না। দেখতে লাগলাম। লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে যে সরু গলিটার মধ্যে এর আগে সিঁদ হয়েছে, সেই গলির মধ্যে ঢুকল। দু'চার মিনিট। তারপরেই বেরিয়ে এলো। দূরে জুতোর মসমস আওয়াজ। টহলদার সেপাই আসছে। তার সাড়া পেয়েই লোকটা যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সেই বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

লোকটার গতিবিধি কিছুই বুঝতে পারলাম না। লোকটা কে? কেনই বা সে এত রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে গেল? ভেবেচিন্তে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে

পরেশবাবু হাই তুলতে তুলতে নীচে নেমে গেলেন।

ব্যাপারটা নানাভাবে চিন্তা করতে করতে রাত কেটে গেল। সকাল বেলা মনে হ'ল, বাড়ি ফেরার আগে একবার গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করে রাতের ঘটনাটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা ভেবে সেদিকে অগ্রসর হলাম না।

পরদিন রাত্রে যথাসময়ে পরেশবাবুর বাড়ির ছাদে গিয়ে বসলাম। পরেশবাবুর শরীর ভাল ছিল না বলে তিনি আর সে রাত্রে ছাদে এলেন না।

পথের ওপর চোখ স্থির রেখে বসে রইলাম। টহলদার সেপাই পাড়া ঘুরে চলে গেল। ক্রমে রাত দুটো বাজল। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। তারপরে হঠাৎ যেন চমক লাগল।

দেখলাম, সেই লোকটা। আজো সেই-ভাবে সন্তর্পণে উঁকিঝুঁকি মেরে গগন-বাবুর বাড়ি থেকে বেরুলো। একটু এগিয়ে এসে এদিক ওদিক দেখল, তারপর সেই সরু গলিটার মধ্যে ঢুকে গেল। খুব মনে হচ্ছে, কাল রাত্রে যাকে দেখেছি, এ সেই লোক। সেই একই রকম চলার ভঙ্গী। গতরাত্রে লোকটা গলির মধ্যে ঢোকবার দুচার মিনিট পরেই সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আজ কিন্তু তাকে বেরুতে দেখছি না। বহুক্ষণ কেটে গেল। আধঘণ্টারও বেশি সময় পার হল। তবু লোকটার দেখা নেই। কোথায় গেল? ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় হঠাৎ তাকে সদর রাস্তার ওপর দেখতে পেলাম। এতক্ষণ ধরে সে ছিল কোথায়? সদর রাস্তায় এলই বা কেমন করে? সে তো সরু গলির মধ্যে দিয়ে বেরোয়নি। কারণ গলিটার ওপর আমার বরাবর নজর ছিল। বিমূঢ় হলাম। দেখলাম, লোকটা এবার হনহন করে এগিয়ে এসে গগন-বাবুর বাড়িতে ঢুকে গেল।

বাকি রাতটুকু বসে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল। সকাল হবার পর নেমে এসে পরেশবাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই তিনি নীচে এলেন, তাঁকে গত রাত্রের ব্যাপারটা বললাম।

দুজনে বৈঠকখানায় বসে কথা বলছি এমন সময় পাড়ার মধ্যে সোরগোল উঠল। কিসের গোলমাল জানবার জন্যে আমি আর পরেশবাবু বাইরে এলাম। একটু পরেই শোনা গেল, সরু গলির মধ্যে বানোয়ারী-বাবুর বাড়ীতে সিঁদ কেটে চোর টাকা-গয়না নিয়ে পালিয়েছে।

শুনে চমক লাগল। তৎক্ষণাৎ পরেশ-বাবুকে নিয়ে বানোয়ারীবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। বানোয়ারীবাবু বাড়ী নেই, থানায় খবর দিতে গেছেন। তাঁর ভাই কিশোরীবাবু ছিলেন। তিনি আমার চিন-তেন। বললেন—"আসুন। দেখুন ব্যাপার।" এই বলে আমায় বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। আগের বার যে সরু গলিটার মধ্যে বসে চোর সিঁদ দিয়েছিল, কিশোরীবাবুদের বাড়ির পিছনেই সেই গলি। এবারও সেই গলির মধ্যে বসেই সিঁদ কাটা হয়েছে। এবং সেই একই ভাবে ঘর থেকে টাকাকড়ি আর গয়নাগাঁটি নিয়ে চোর সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে।

একটু পরেই স্থানীয় থানার ও-সি'কে নিয়ে বানোয়ারীবাবু ফিরে এলেন। ও-সি'র সঙ্গে দুজন জমাদার। আমায় দেখে ও-সি বললেন—"এই যে, আপনিও এসে গেছেন।"

বললাম—"আমি ঠিক আসিনি। আমি কিছু তদন্ত করব না। যা করবার আপনি করুন। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তবে পাড়া ছেড়ে যাচ্ছি না। কাছেই থাকবো এবং দরকার হলেই আপনাকে জানাবো।"

এই বলে সেখান থেকে চলে এসে গগনবাবুর বাড়ির বিপরীত দিকে যে রোয়াকওয়ালা বাড়িটা ছিল সেই বাড়ির রোয়াকে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমাদের ডি সি এসে উপস্থিত। তাঁকে ফোনে খবর দেওয়া হয়েছিল। আমায় দেখে বললেন—"তোমাকে সব কাজ থেকে সরিয়ে এই কাজের ভার দিয়েছিলাম, তা তুমি কিছুই করতে পারলে না।" এই বলে তিনি বানোয়ারীবাবুর বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে গেলাম না। সেই-খানেই বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে একজন জমাদার এসে বললে— "বড়সাহেব আপনাকে ডাকছেন।"

বললাম—"তুমি তাঁকে গিয়ে বল, আমার এখান থেকে যাবার উপায় নেই। সাহেব যখন ফিরবেন তখন এইখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

জমাদার চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ডি সি দলবল সমেত আমার কাছে এসে রাগতভাবে বললেন— 'আমি তোমায় ডেকে পাঠালাম, গেলে না কেন?'

বললাম—"অপরাধ মার্জনা করবেন। বিশেষ কারণে এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারিনি।'

—কি বিশেষ কারণ?'

বললাম—"এখানে যাঁরা রয়েছেন, দয়া করে দুপাঁচ মিনিটের জন্যে তাঁদের একটু তফাতে যেতে বলুন। সকলকার সামনে আমি কিছু বলতে চাই না।"

সাহেব বললেন—"আমরাই একটু তফাতে যাই না কেন?"

ঘাড় নেড়ে বললাম—"না, এখান থেকে আমার নড়বার উপায় নেই।'

সাহেব এখন আশপাশের সবাইকে দূরে সরে যেতে বললেন। ইতিমধ্যে গগনবাবু বাড়ি থেকে একটা চেয়ার এনে সাহেবকে সমাদর করে বসতে বললেন। সাহেব চেয়ারে বসলেন। গগনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বললাম—"আপনিও দয়া করে এখান থেকে চলে যান।'

গগনবাবু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি তখন নীচু গলায় সাহেবকে গত দুরাত্রির অভিজ্ঞতার কথা জানালুম। শুনে তাঁর দুচোখ যেন বড় হয়ে উঠল। বললেন—"তারপর! আর কি দেখলে? শেষটা বল।"

বললাম—যে সময় লোকটা সদর রাস্তা দিয়ে চলে এসে গগনের বাড়ি ঢুকে গেল সে সময় দূর থেকে ভালমত দেখতে না পেলেও আমার মনে হচ্ছে তার হাতে একটা বান্ডিল ছিল। আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, গগনের বাড়িতে দ্বিতীয় কোন পুরুষ মানুষ রাত্রে থাকে না। তাহলে লোকটা কে? আমি তখন থেকে গগনের বাড়ির দরজায় চোখ রেখে বসে আছি এই-জন্যে যে যদি কেউ এই বাড়ি থেকে কোন বান্ডিল নিয়ে বেরোয় তাহলে তাকে দেখতে পাবো। আমার বোধ হচ্ছে গগনই চোর। তার বাড়িতে সব প্রথম যে চুরি হয়েছিল তা মিথ্যে, সাজানো ব্যাপার। অপর অপর বাড়িতে চুরি হলে যাতে তার উপর সন্দেহ না পড়ে সেইজন্যেই চালাকি করে সে নিজের বাড়িতে প্রথমে সিঁদ কেটে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে রেখেছে।

আমার কথা শুনে ডি সি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর ও সি'কে ডেকে পরা-মর্শ করে গগনের বাড়ি খানাতল্লাশ করবার হুকুম দিলেন। এবং আমাকে নিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে নিজেও গগনের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ব্যাপার দেখে গগন ঘোষ প্রথমটা খুব খাপ্পা হয়ে উঠে তড়পাতে লাগল— "একী অন্যায়। একী জবরদস্তি। আমার বাড়ি খানাতল্লাস? এত বাড়ি থাকতে আমার বাড়িতে হামলা" ইত্যাদি।

কিন্তু ডি সি তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। বাড়ির মধ্যে জোর তল্লাসী চলতে লাগল। নীচের তলায় অন্যরা রইল। সাহেব আর আমি উপরে উঠলাম। উপর-তলায় ছোট একটা ঘর। তালাবন্ধ। আমি গগনকে ডেকে প্রশ্ন করলাম—"এ ঘরে কি আছে?"

উত্তরে গগন শশব্যস্তে বললে—"ওটা ঠাকুরঘর। ভিতরে নারায়ণ আছেন।"

ডি সি বললেন—"দেখতে চাই কীরকম নারায়ণ আছেন। দরজা খুলে দিন।"

গগন কিছুতেই দরজা খুলতে রাজী হল না। তখন অগত্যা দরজা ভেঙে ফেলা হল। দেখা গেল, ভিতরে ঠাকুর নেই, কেবল প্রকাণ্ড একটা কাঠের সিন্দুক রয়েছে এক পাশে। তালা ভেঙে সেটা খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে পাড়ায় যে-কটা চুরি হয়েছিল তার প্রায় সব জিনিসই রয়েছে, কেবল গগন নিজের বাড়িতে যেসব জিনিস চুরি হয়েছে বলে জানিয়েছিল সেসব জিনিস একটাও নেই।

গগনকে গ্রেপ্তার করা হল। আরও খানাতল্লাসীর পর তার শোবার ঘরের বিছানার তলা থেকে ডাকাতে সিঁদ কাটবার যন্ত্র, তালাভাঙার যন্ত্র এবং এক গোছা চাবি পাওয়া গেল।

গগনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানা গেল, সে একজন নামকরা দাগী সিঁদেল চোর, যশোর জেলায় তার বাস। ইতিপূর্বে সে দুতিনবার জেল খেটেছে, তার আসল নাম গোপালচন্দ্র দাস, জাতে কৈবর্ত।

যথাসময়ে বিচার হল এবং গগন ওরফে গোপালের প্রতি পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের হুকুম বেরুলো।

ছায়া কালো কালো

জ্বলন্ত দুটি চোখ

[এই কাহিনীর লেখক বলেছেন যে ঘটনাটি ঠিক যেমন ঘটেছিল সেইভাবে তিনি লিখেছেন। সত্য ঘটনার এমন বিচিত্র বিবরণ বিস্ময়কর। যে পত্রিকায় এই কাহিনীটি প্রকাশিত হয় তার সম্পাদক মন্তব্য করেন—

"We believe him, but only just, for it makes fear too clever a horror story."

একটা কৈফিয়ৎ নিশ্চয়ই আছে। একেবারে অকাট্য, যুক্তিগ্রাহ্য, এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য কৈফিয়ৎ আছে। কোথাও কিছু আছেই।

কিন্তু কোথায়?

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাস্তব জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে। লনডনের এই পিকাডিলি সার্কাস থেকে বাসে মাত্র দশ মিনিটের পথও নয়।

জোন আর আমি সিনেমায় গিছলাম। দশটা নাগাৎ সিনেমা থেকে বেরিয়ে সামনেই একটা কফির দোকানে ঢুকেছিলাম গলাটা ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য।

সামনের বসন্তকালে আমাদের দুজনের বিয়ের সব ঠিকঠাক, সেই কথাই হচ্ছিল। আমাদের প্রায় তিন বছরের ওপর এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে। সুদীর্ঘকাল আগে এইভাবে বিয়ের কথা ঠিক করা থাকলে মনের ওপর একটা চাপ পড়ে।

জোন ইতিমধ্যেই একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। তবে সম্প্রতি একটা টনিক খাচ্ছে, তার

ফলে সপ্তাহখানেক একটু ভালো আছে। অনেকটা সামলে নিয়েছে।

আমরা কফি পান করতে করতে ফিল্মের কাহিনী নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি করছিলাম। বিদায়ের মুহূর্তে মানুষ কিভাবে সময়টা গড়িয়ে দেয় সে আপনাদের অজানা নয়। গড়িমসি করতে ভালোই লাগে। তাই যখন জোনদের দোরগোড়ায় পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

জোন থাকত একটা দোকানের ওপরকার স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট-এ। দুটি দোকানের জানলার পাশ দিয়ে যাওয়ার রাস্তা।

দরজা খুললেই সিঁড়ি, আর সেই সিঁড়ি একেবারে দোতলায় পৌঁছেচে। সেই জায়গাটায় চাতালটা সংকীর্ণ। সামনেই শোবার-বসবার যুক্ত কক্ষ আর পিছনে রান্নাঘর ও স্নানঘর। বেশ ছোট অথচ আরামদায়ক ব্যবস্থা। জোন এই বাড়িতে অনেককাল ধরে আছে, আর বাড়িটায় যে সন্ধ্যা ছটা থেকে পরদিন সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত জন-প্রাণী থাকে না, এতে তার কিছু এসে যায় না, কখনও কোনো কথা তার মনে জাগেনি।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি ওকে বিদায়-চুম্বনে অভিষিক্ত করলাম। আমি বরাবরই আশা করতাম ও আমাকে ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে একটু গল্প-স্বল্প করতে চাইবে, কিন্তু তা হওয়ার নয়, কখনও কিছু বলে না, বেশ চালাক মেয়ে আর কি।

জোন দরজাটা বন্ধ করে দেয়। আমি ধীরে ধীরে রাস্তার ধারে চলে গেলাম। ল্যাম্পপোস্টের কাছে গিয়ে পিছন ফিরলাম, জোন আমার দিকে তাকায়। ওপরের জানলায় ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। জোন হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানায়।

আমার বাসা এখান থেকে হাঁটা-পথে প্রায় কুড়ি মিনিটের রাস্তা। আমার এই সময়টুকুর প্রতিটি মুহূর্ত অতি বিশ্রী লাগত। যাইহোক, প্রতিটি দোকান এক একটি বিচ্ছেদের প্রতীক। এই বিচ্ছেদ, জোনকে এভাবে ছেড়ে আসা আমার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক। ভালোবাসার মানুষ যদি কাছে না থাকে তা হলে মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায়, মরুভূমির মত হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য জোন এবং আমার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা, এত ভালোবাসা, অথচ কেউ কারো বাড়িতে কখনও যাইনি। জোন ভারী কড়া মেয়ে। বে-আইনী কাজ এতটুকু সে ঘটতে দিতে চায় না।

আমার বাসাটা অতি ছোট, —খুবই ছোট্ট বলা যায়। তবে এর দোতলা আছে, একতলাও আছে, নব-দম্পতির যেটুকু প্রয়োজন তার সবটুকুই আছে। জোনও তা জানে। গত ক' মাস ধরে আমি ঘরটা সাজাচ্ছি, রঙচঙ করছি। একেবারে মিলন-কুঞ্জে পরিণত করেছি—এখন শুধু জোন এলেই হয়। জোন হল আমার বিবাহের উপহার। তবে কি জানেন—সবটাই ভারী চুপি চুপি ঘটছে। অতি সংগোপনে। কেউ কিছু জানবে না, কেউ শুনবে না, দেখবে না।

আমি ব্রেকফাস্টের সব কিছু রেডী করে রাখি। ঘড়িতে সাড়ে-সাতটায় এলার্ম দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ার উদ্যোগ করছি, অর্থাৎ বিছানায় শুতে যাচ্ছি। ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

জোনের কণ্ঠস্বর—

ডার্লিং, ডার্লিং, তাড়াতাড়ি আমাকে কিছু বলো—আমি আতঙ্কিত—

—জোন, সোনার মেয়ে—কিন্তু ব্যাপার কি?......

রাত্রের এই সময়টিতে ফোন করা জোনের পক্ষে কেমন যেন আশ্চর্য মনে হল। অবশ্য আমি কিছু বলে ফেলিনি, কারণ......

জোন, সুইটহার্ট—শোনো, লক্ষ্মীটি, আমাকে বোকা মনে করবে না ত'? সত্যি করে বলো—বলো—

—বলব ত'। কিন্তু হয়েছে কি......? কেন এমন কথা?

—সব ব্যাপারটি একটু বোকা-বোকা বটে, তবে কেমন যেন মনে হল তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি, একটু গলার স্বর শোনা যাক—

—বাঃ বেশ বলেছ। সুন্দর। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।

এক কথা বললেও আমি বেশ বুঝেছিলাম এর পিছনে কিছু আছে। শুধু এইটুকু নয়, আরো কিছু। কিছু একটা হচ্ছে নিশ্চয়ই। ওর গলার স্বর শুনেই ঠিক বুঝেছি। ও বলল—তুমি কথা বলে যাও। থামলে কেন।

ওদিক থেকে সব চুপ-চাপ, কিছু একটা যুৎসই কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কি যে বলবে আর কিভাবে বলবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

আমি একটু প্রম্পট করার চেষ্টা করি। ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বলি—

—ডার্লিং, কি ব্যাপার বলো ত'। ওখানে কিছু হয়েছে না?

—না তেমন কিছু নয়।

তখনও চাপার চেষ্টা। তারপর সহসা আর চাপতে না পেরে বলে উঠল—

—ডার্লিং, কে একজন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি গাধার মত বললাম—তা বেচারীকে দোষ দিই না। দেখবার জিনিস তাই দেখছে। তা তুমি পর্দাটা টেনে দাও না কেন?

এই কথাটির জন্য আমার নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছা করছে—কিন্তু কি আর করা যায়। মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গেল।

ওর কণ্ঠস্বর কম্পিত, জোন বলল—না, না, তা নয়। কে যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখ তুলছে না একেবারে।

আমি ব্যাপারটি ঠিক না বুঝতে পেরে বললাম, সোনা মেয়ে, আমি তোমার কথায় পরিহাস করছি না, তোমাকে খেপানোর বাসনা আমার নেই। ঠিক কি হয়েছে খুলে বলো দেখি। একেবারে গোড়া থেকে সবটা বলো।

কণ্ঠস্বর ধীর এবং কম্পিত, সে শান্ত গলায় বলল—তোমাকে বিদায় জানিয়ে আমি জানলাটি বন্ধ করে পর্দা টেনে দিই। তারপর বাথরুমে যাই—তারপর, কথাটি হয়ত কেমন বোকার মত শোনাবে, তবু বলি শোনো—আমার কিন্তু মনে হল কে আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। আমি পিছন ফিরলাম, অবশ্য কেউ কোথাও নেই।

আমি রান্নাঘরে গেলাম। উনানে একটা কেটলি চাপালাম, মনে হল সেই অদৃশ্য দৃষ্টি বাথরুমের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে এল। আমাকে অনুসরণ করছে। তখনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে তাকাই, কোনো কিছু দেখার নেই, শুধু বেশ বুঝি এক-জোড়া চোখ আমার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে। আমার অবস্থাটা বুঝতেই পারো।

যতটা সম্ভব সাহস দিয়ে বললাম—তা আর বুঝি না। সে ত' বটেই। কিন্তু তুমি বলে যাও, থামলে কেন?

—জল গরম হতে আবার বাথরুমে গেলাম, তারপর আবার রান্নাঘরে ফিরে হট ওয়াটার বটলটা ভর্তি করি। তবু সেই একজোড়া চোখ, সেইভাবে আমার দিকে চোখ মেলে রয়েছে। কি বিপদ। ডার্লিং, তুমি আমার কথা শুনে হাসবে নিশ্চয়ই, কিন্তু হেসো না। আমার প্রাণ যায়। আমার দিকে সমানে তাকিয়ে আছে সেই চোখ।

—তুমি এখন কোনখানে, শোবার ঘরে?

—হ্যাঁ, আমার শোবার ঘরে দাঁড়িয়েই ফোন করছি।

—সামনের ঘরটা?

—হ্যাঁ, এখানেই। ভয় পেয়ে আমি আতকে উঠে পালিয়ে এসেছি এই ঘরে। ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছি।

—বেশ, যেমনটি আছো তেমন থাকো, আমি এখনই আসছি। একটু সাবধানে থাক লক্ষ্মীটি।

জোন আতংকিত হয়ে বলে—না, না, তা করার দরকার নেই। মনে হয় এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে, এ নিশ্চয়ই নার্ভের ব্যাপার। সত্যি, আমার মনে হয়, কোনো ভয় নেই। এ স্নায়ুবিকার হয়ত।

আমি একটু ভেবে দেখলাম, যাই হোক হয়ত নার্ভেরই ব্যাপার। ওকে এখনই গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বটে, তবে ও নিজেই যদি সামলে নিতে পারে ত' ভালো হয়। নার্ভের ব্যাপারে এমনই করা উচিত।

আমি বেশ শান্ত গলায় এবং দৃঢ়ভাবে বললাম—আচ্ছা লক্ষ্মীটি আমার একটা কথা শুনবে? আমার কথা শোনো ভালো করে।

—বেশ ত'। বলো।

—আমার কথাটা ভালো করে ভেবে দেখো। আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে।

—বেশ ত'। শুরু করো।

—আচ্ছা, তোমাদের ওপরে ওঠার আর কোনো পথ আছে, না ঐ সামনের দরজা আর সিঁড়ি?

—না। আর কিছুই নেই।

—পিছন দিকে কোনো রাস্তা আছে? আগুন লাগলে পালাবার পথ? বারান্দা দিয়ে পাশের দরজায় যাওয়ার কোনো পথ?

—না, কিছুই নেই। মই-টইও নেই।

জোন কথাগুলি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করে।

আমি প্রশ্ন করি—ওপরে ওঠার ব্যবস্থা কি?

—এর ওপর আরো দুটি তলা আছে। সেগুলির নিশ্চয়ই পাশের দরজার সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থা আছে। তবে সিঁড়িটা ছিল কাঠের। সেই সিঁড়ি আমার বাথরুম তৈরী করার সময় খুলে নেওয়া হয়। যেটুকু ফাঁক ছিল ইঁট দিয়ে গেঁথে দিয়েছে।

—তুমি ঠিক জানো।

—হ্যাঁ, ঠিকই জানি। ওপর থেকে নামারও কোনো পথ নেই। বাথরুম আর কিচেনের জানালায় বার্গলার-প্রুফ চোর-নিবারক খিল আঁটা।

—তোমার শোবার ঘরের সামনের জানলাটার কথা মনে করো।

—আমি বেরোবার সময় নিজের হাতে বন্ধ করে যাই। না, সামনে দিয়ে কেউ আসতে পারে না, এই বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। এরকম কোনো চেষ্টা করার মধ্যেও যথেষ্ট রিস্ক আছে, চোরও এমন বিপদের ঝুঁকি নেবে না। চট্ করে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

—বেশ। তাহলে তোমার ধারণা, কেউ কোথাও নেই। সত্যি কেউ ভেতরে নেই?

জোনের কণ্ঠস্বর এখন অনেকটা শান্ত ও সুস্থ। সে বলল—ডার্লিং, তুমি ভারী চালাক, ভারী মজার মানুষ। তুমি আমাকে যুক্তির পথে নিয়ে আমার চেষ্টা করছ: নিশ্চয়ই কেউ কোথায় নেই।

—বেশ, তাহলে একটা ভারী রুলদান হাতে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে চারপাশটা বেশ করে দেখে নাও। আমি ধরে আছি—

[illegible] ছাড়ছি না, [illegible]

[illegible]

—কেন! [illegible] টেলিফোন-টান দিয়ে যাচ্ছে না।

আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে ও [illegible] ফুলে বেরোল, কি সব বলতে চেষ্টা করছে গলায়। অনেকটা ধারাবিবরণীর মতো। আমি শুনতে পাই—

—না দরজায় শিকল, আলমারির পাশে কেউ নেই......দরজার তালাতেও শক্ত—। আলমারিটা খালি। ...সিঁড়ির নীচে খাটের তলায় কেউ নেই। —না—জানালাটা খারাপ।

আবার শোনা গেল—

—রান্নাঘর ফাঁকা—আর আমার কাজের লোকটা চায়ের বাসন-পত্রও ধুয়ে রাখেনি।

তারপর ফিরে এসে টেলিফোন ধরে বলল—

বাথটবের জল এমন ঠাণ্ডা যে সেখানে ডুবলে ঠাণ্ডায় জমে মরে থাকতে হবে।

—তুমি স্নান করোনি?

—না, নিশ্চয় নয়। অর্ধেক লণ্ঠন আমার দিকে তাকিয়ে—স্নান করি কি করে? কি ভেবেছ তুমি?

জোন আবার সেই চিরপরিচিত জোন। অনেক রাত হয়ে গেছে, তাই টেলিফোনের মাধ্যমে চুম্বন ছুঁড়ে দিয়ে—ফোন রেখে দিলাম।

আবার রাত দেড়টায় ফোন বেজে উঠল। আমি তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। আবার জোনের কণ্ঠস্বর। জোন বলল—ডার্লিং, আমি অতিশয় দুঃখিত, কিন্তু কি করব ভীষণ ভয় পেয়েছি।

আমার ঘুম এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি বললাম—ব্যাপার কি জোন? তোমার কি হল বলো তো?

এখন জোন কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সে বলল—আবার সেটা ফিরে এসেছে। তুমি ফোনটা নামাবার সঙ্গেই ফিরে এসেছে, এখনও রয়ে গেছে। একেবারে এই ঘরের ভেতর।

—কোনখানে আছে? ঠিক কোন জায়গায়?

—জানি না। তবে—সর্বদাই ঠিক আমার পিছনটিতে। ডার্লিং—আমি শক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছি, সামলানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু সত্যি বলছি আমি একেবারে ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছি।

প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হওয়ার জোগাড় দেখছি। স্থির করলাম আমাকে একটু শক্ত হতে হবে এইবার।

আমি কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব চড়িয়ে বললাম—জোন! জোন শোনো, ভগবানের দোহাই, একটু শান্ত হও। শুনছ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

ওর জবাবে শুধু একটা ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দ শোনা যায়।

সে অনেক কষ্টে বলল—চেষ্টা তো করছি।

—আমি যা [illegible]। কোনো তর্ক করো না।

—[illegible]!

—পোশাক পরে নাও। [illegible] টেলিফোনের রিসিভারটা [illegible] পাশে রাখ।

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। তাই করছি। তাই করছি।

—তারপর নীচে চলে এসো। সোজা দরজাটা সজোরে বন্ধ করবে, এমন জোরে যে আমি যেন শুনতে পাই। আমি বুঝব যে তুমি নীচে এসে দাঁড়িয়েছ। আমি তারপর যাবো। তুমি এইখানে এসে বাকী রাতটুকু এখানেই থাকবে।

—কিন্তু—।

—কিন্তু টিন্তু নেই। যা বলছি তাই করো।

—বেশ ডার্লিং, এক মিনিটে তৈরী হচ্ছি। আমার পোশাক প্রায় অর্ধেক পরাই আছে। আমি একটা কোট গায়ে দেব, তারপর মাথায় হ্যাটটা তুলে নেব।

আমি শুনলাম টেবলের উপর রিসিভারটা রাখল। তারপর ওর পায়ের শব্দ শুনলাম, জামা পরার খস্‌খস্‌।

আমার ভাবনা-চিন্তার আর শেষ নেই। বুঝলাম, ওর নার্ভ দেখছি একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন। সকালেই ওর ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। সম্ভবতঃ তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। তবে হেলা-ফেলা করার মত অবস্থাও নয়।

ও টেলিফোনে বলে—ডার্লিং, আমি এখন রেডি।

আমি বললাম—বেশ, আলো নেভানোর চেষ্টা কোরো না। তুমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। যেমন আছ ঠিক সেইভাবে।

জোন বলে—আচ্ছা—। আবার টেবলে রিসিভার রাখার শব্দ।

[illegible] দেখা হল।

[illegible] আওয়াজ শোনা গেল। ও বেরিয়ে পড়েছে।

ও নিশ্চয়ই এইবার আমাদের বাসার দিকে আসছে। আমি কিছুক্ষণ শুনলাম, চারদিক শূন্য।

তারপর......

তারপর আমি স্পষ্ট শুনলাম

একটা হাত ওর রিসিভারটা তুলে ধরল। টেবিল থেকে তোলার আওয়াজ স্পষ্ট।

আমি চীৎকার করি—কে? কে?

চুপচাপ। আমি আবার শোনার চেষ্টা করি। কোনো সাড়া নেই।

কোনো কথা না বলে কে রিসিভারটি তুলে রাখল। আমি আর কিছু শুনতে পাই না।

আমি চীৎকার করি—হ্যালো। হ্যালো! কে—কে? কিন্তু শুধু ডায়াল টোন শোনা যায়।

যেই হোক, সে চলে গেছে। কাউকে জখম করে নি, কোনো কিছু নেয় নি। জোন দোরগোড়ায় অচেতনা হয়ে পড়ে আছে। টেলিফোন তুলে রাখা হয়েছে।

কিন্তু যে এসেছিল সে কি চায়?

—কি সে? কাকে চায়? কোথায় গেল?

জোন আতংকে দিশেহারা হয়ে গেছে। সে স্পষ্ট দেখেছে সেই দুটি জ্বলন্ত চোখ।

অনেক পরে জোন সুস্থ হয়ে যা বলেছিল তা শুনে আমারও মনে আতংক জেগেছে। এই অশরীরী আত্মা কি চায়?

—অমিতাভ মজুমদার অনূদিত।

১৯৬৮ বিদায় ১৯৬৮ বিদায় ১৯৬৮ বিদায় ১৯৬৮ বিদায়

বিদায়ী ১৯৬৮ সাল সম্পর্কে লন্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখেছেন, এই বছর হচ্ছে "উত্তর পাওয়ার বছর" অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক যখন তার শেষ বছরটিতে পা দিতে চলে সেই সময়েই, পত্রিকাটির মতে, পৃথিবীর বহুবিধ প্রশ্নগুলির উত্তর আসতে আরম্ভ করেছে।

ডি গ্যলের ফ্রান্স আমেরিকার সঙ্গে তার ইউরোপীয়ান মিত্রদের বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে কিনা, পাশ্চাত্যের সঙ্গে রাশিয়ার একটা অধিকতর নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক স্থাপিত হবে কিনা, এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপযুক্ত ভূমিকা কি হবে—এগুলিই যদি পৃথিবীর মানুষের সামনে বৃহত্তম প্রশ্ন হত তাহলে "ইকনমিস্টের" অভিমত মেনে নেওয়া সহজ হত। কিন্তু ১৯৬৮ সালের পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের পক্ষে, দুর্ভাগ্যবশত এগুলিই বৃহত্তম প্রশ্ন ছিল না।

বছর যখন শেষ হতে চলেছে তখন তিনজন আমেরিকান ইতিহাসের দুঃসাহসিকতম, দুঃসাহসিকতম, দুঃসাহসিকতম যাত্রায় বেরিয়ে চাঁদের দুয়ারে উঁকি দিয়ে ফিরে এলেন। এই সাফল্য যেমন ১৯৬৮ সালকে মানুষের জয়যাত্রায় একটি ঐতিহাসিক তারিখ হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়ে গেল তেমনি তার ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখে গেল বায়াফ্রার অনাহারশীর্ণ শিশুগুলির দেহে। যে মানুষ লক্ষ যোজন দূরের জ্যোতিষ্ককে নিজের হাতের মুঠোয় ধরতে পারে সে মানুষ নিজের উদরের ক্ষুধা দূর করতে পারে না, যে মানুষ মহাকাশের অপরপ্রান্তে বসে যীশু খৃষ্টের নামকীর্তন করতে পারে সে মানুষ খৃষ্টের শান্তির বাণীকে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে শেখে নি—১৯৬৮ সাল ইতিহাসের পাতায় এই কথা লিখে দিয়ে গেল।

বছর শেষ হওয়ার মুখে পোপ পল শান্তির আবেদন জানালেন, বললেন ১৯৬৯ সাল "শান্তির বছর" হিসাবে পালন করা হোক। কিন্তু ১৯৬৮ সালের পৃথিবীতে কোথায় শান্তি? রাষ্ট্রপুঞ্জ শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পোপ যখন রোমের একটি কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে বড়দিনের উপাসনা করছিলেন ঠিক তখনই যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান বেথেলহেমের অদূরে ইজরায়েলী বিমান প্রতিবেশী রাজ্যের উপর বোমাবর্ষণ করছিল। এবং বড়দিনে যুদ্ধ বন্ধ রাখার আবেদন অগ্রাহ্য করে নাইজিরিয়া বিদ্রোহী বায়াফ্রানদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে খাতায় কলমে যুদ্ধবিরতি হওয়া সত্ত্বেও দুপক্ষের লোকই প্রাণ দিচ্ছিলেন। এই ১৯৬৮ সালে রাশিয়া ও অন্যান্য ওয়ারশ শক্তি তাদের সামরিক বাহিনী নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর্থিক চাপে পড়ে ফ্রান্স তার হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের কর্মসূচী স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেও চীন আর একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই মারাত্মক অস্ত্রের প্রসার নিরোধের চেষ্টাকে মিথ্যা করে দিয়েছে।

সুতরাং, একথা মেনে নেওয়া কঠিন যে, ১৯৬৮ সালে বিশ্বের বড় বড় প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বরং একথাই বলা যায় যে, অনেক সাধু সঙ্কল্প (ও সম্ভবত সদিচ্ছা) সত্ত্বেও বিশ্বশান্তি ও ক্ষুধা দূরীকরণের সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। কিম্বা হয়ত সমস্যা জটিলতর হয়েছে।

ভিয়েতনাম প্রসঙ্গ অবশ্য ১৯৬৮ সালে আলোচনার টেবিলে গেছে এবং বছরের শেষে আশা করা যাচ্ছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে এই সমস্যার একটা মীমাংসা করা সম্ভব হবে। কিন্তু বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক আরও অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলির মীমাংসার কোন পথই বিদায়ী বছরে মানুষ বার করতে পারে নি। রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু ইয়ান স্মিথ সরকার তাঁদের বেআইনী শাসন ও পীড়ন চালিয়ে রাষ্ট্রসংঘ—রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুরোধকে উপেক্ষা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ঔদ্ধত্য সহ্য করে রাষ্ট্রসংঘ "নামিবিয়া" ওরফে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রভুত্ব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে অর্থসাহায্য দেওয়া বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক সে নির্দেশ মানতে রাজী নন। পর্তুগালকে তার আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ও ইজরায়েলকে জর্ডানের অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিতে আজও বাধ্য করা যায় নি। নাইজিরিয়া থেকে বায়াফ্রার বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সে দেশে যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত তাকে এখন একপক্ষে বৃটেন; অন্যপক্ষে ফ্রান্স প্রশ্রয় দেওয়ায় সেই যুদ্ধ আরও উৎকট হয়ে পাচ্ছে।

এই সব ঘটনা ১৯৬৮ সালে ঘটেছে এমন একটা বিশ্বরাজনীতির পটভূমি প্রেক্ষিতে যেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ ও অন্যান্য ওয়ারশ শক্তির সেনাবাহিনীর প্রবেশ ও তৎপরবর্তী ঘটনা নূতন উত্তেজনা এনেছে। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের সম্ভাবনা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তা চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার পর স্থগিত হয়ে গেছে এবং "সমাজতান্ত্রিক কমনওয়েলথ" সম্পর্কে রাশিয়া তার নিজস্ব প্রভাব-পরিমন্ডলের তত্ত্ব উপস্থিত করেছে তাতে পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক একটা নূতন ভিত্তির উপর দাঁড়াবার উপক্রম হয়েছে। রাশিয়ার এই তত্ত্ব রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়ার পক্ষেও স্পষ্টতই আতঙ্কের কারণ হয়েছে। এই আতঙ্ক এতখানি ছড়িয়েছিল যে, এক সময়ে কথা উঠেছিল, ইউরোপে ন্যাটোর ছত্রচ্ছায়াতলে ঐ দেশগুলিকেও আনা হবে কিনা। পরে অবশ্য ঐ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—যদিও ন্যাটো পরিষদের অধিবেশনে বলা হয়েছে যে, যুগোশ্লাভিয়া বা রুমানিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে সেটা ইউরোপের ন্যাটো বহির্ভূত দেশগুলি লক্ষ্য না করে পারবে না।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার পরই ভূমধ্যসাগরে রুশ নৌবাহিনীর উপস্থিতি "ভূমধ্যসাগর মহাসমুদ্র" নামে পরিচিত ঐ সমুদ্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আবহাওয়া

দেশে বিদেশে

নিয়ে এসেছে। ভূমধ্যসাগরে খান তিনেক মার্কিন যুদ্ধজাহাজের প্রবেশ এই আবহাওয়াকে রাজনৈতিকভাবে আরও ঘোরালো করে তুলেছিল—যদিও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায় নি। ভূমধ্যসাগরের একটি প্রবেশমুখে জিব্রাল্টারের ঘাঁটি আগলে বসে আছে বৃটেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ব্রিটেনকে আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে জিব্রাল্টার ছেড়ে যেতে বলেছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন সাফ বলে দিয়েছেন, জিব্রাল্টার ছাড়ার কথাই ওঠে না। আলজেরিয়া তার পুরোনো নৌঘাঁটি মার্স-এল-কবির সোভিয়েট নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, এই খবর পাওয়ার পর বৃটেনের জিব্রাল্টার থেকে সরে আসার সম্ভাবনা আরও কমে গেল।

আগামী বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত সভাপতি রিচার্ড নিকসন যখন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করবেন তখন তাঁর জন্য ভিয়েতনামে লড়াই চালাবার দায়িত্ব রেখে যাবেন না বলে প্রেসিডেন্ট জনসন আশা প্রকাশ করেছেন। এই আশা সার্থক হতে পারে, নাও পারে। কিন্তু বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর স্থলাভিষিক্তের জন্য একটি দুশ্চিন্তা রেখে যাচ্ছেন। সেটি হচ্ছে ন্যাটোর সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা ফ্রান্সকে ইউরোপ থেকে অ্যাটলান্টিকের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছে। ফ্রান্সের ছাত্র বিদ্রোহ ও ফ্রান্সের দুর্বলতা ডি গলের অহমিকাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে এবং পশ্চিম ইউরোপের মুখপাত্র হিসাবে পশ্চিম জর্মানীকে এগিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনাগুলি ন্যাটো জোটকে ডি গলের চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠে নূতন শক্তি অর্জন করতে সাহায্য করেছে—যা, বলা বাহুল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্বস্তিকর।

ফ্রান্সকে নিয়ে যেমন আমেরিকার স্বস্তি, ইটালীকে নিয়ে তেমনি অস্বস্তি। ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েট নৌবাহিনীর উপস্থিতি পশ্চিমী সামরিক পরিকল্পনায় ইটালীর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। ইটালীর অধিবাসীরা বলেন, ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যেমন [illegible] করে ইটালীর মাটিতে তেমনি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি [illegible] করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হল এই যে, এই সময়েই ইটালীতে কম্যুনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছে এবং কম্যুনিস্ট চ্যালেঞ্জের মুখে যদিও সেখানে কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে একটি মধ্যবাম কোয়ালিশন সরকার খাড়া করা হয়েছে তথাপি ঐ সরকার কতখানি স্থায়ী হবে সেবিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা একদিকে যেমন পশ্চিমী দেশগুলিকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছে অন্যদিকে তেমনি কম্যুনিস্ট দুনিয়ার বিভেদ [illegible] করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের বিরোধ মিটবার লক্ষণ নেই, উপরন্তু রুশ-চীন সীমান্তে উভয় পক্ষই সৈন্য সমাবেশ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। চীনের সেনাধ্যক্ষের আলবেনিয়া সফরের পর দুই দেশের মধ্যে কোনরকম একটা সামরিক চুক্তি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তাহলে খাস ইউরোপে এই সর্বপ্রথম এশিয়ার একটি দেশ তার সামরিক বল নিয়ে উপস্থিত থাকবে—যেটা রাশিয়াসহ ইউরোপের অন্য কোন দেশের পক্ষেই সুখকর হওয়ার কথা নয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা বৃহৎ শক্তির ক্ষমতার সামনে ক্ষুদ্র দেশগুলির অসহায়তার প্রশ্নটিও নূতন করে তুলে ধরেছে—যদিও এই প্রশ্নের মীমাংসা কিভাবে তা কেউই বলতে পারেন নি। "বৃহৎ শক্তিগুলির মোকাবেলা করার জন্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নিজেরা একজোট হও"—এই জিগির ১৯৬৮ সালের পৃথিবীতে সবচেয়ে জোরালোভাবে তুলেছেন যুগোশ্লাভিয়ার টিটো। এই বিষয়টি আলোচনা করার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির আর একটি সম্মেলন করার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন—যদিও সেই চেষ্টায় তিনি বিশেষ সাড়া পান নি।

১৯৬৮ সালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির এইসব চাপে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছকও কিছুটা কিছুটা বদলেছে। তার কতকগুলি লক্ষণ হল:—(১) জাপানের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। জাপানের শিল্পপণ্যের বিনিময়ে সাইবেরিয়ার বনসম্পদ আহরণের অধিকার জাপানকে দিয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। (২) চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্পর্কে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। (৩) রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্থানের সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে—যার ফলে মস্কো পাকিস্থানকে সমরাস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছে।

পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতবর্ষকে নূতন বন্ধুর, নূতন বাণিজ্যিক সম্পর্কের সন্ধান করতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ানের কয়েকটি দেশে সফরের মধ্যে তারই ইঙ্গিত। নূতন পাক-সোভিয়েট বোঝাপড়ার পরিপ্রেক্ষিতে ও মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের আন্ডার-সেক্রেটারি কাটজেনবাখ ভারতে এসে আমেরিকার চীনা নীতি পুনর্বিবেচনার আভাস দিয়ে যাওয়ার পর ভারতে এমনকি চীনের সঙ্গে সম্পর্কও নূতন করে গোড়া তোলার কথাও উঠেছে।

কিন্তু অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও মাও সে তুং-এর চীন যেভাবে ভারতের নকশালপন্থীদের উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে তাতে ভারতের সঙ্গে চীনের বোঝাপড়া সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই নকশালপন্থীরা শুধু যে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভেদ আনছে তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা নূতন অনিশ্চয়তা আনছেন। যেমন, একথা মনে করার কারণ আছে যে, কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ সরকার যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে কলহ করছেন তার অন্তত আংশিক কারণ হল, নকশালপন্থীদের উৎপাতে তাঁরা যে বিড়ম্বিত হয়েছেন সেটা তাঁরা লুকোবার চেষ্টা করছেন।

বলতে গেলে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই বিভেদ দেখা যাচ্ছে এবং সে কারণেই ১৯৬৮ সালের ভারতবর্ষ চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী অনিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ পায় নি। হরিয়ানায় বংশীলাল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দলত্যাগী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মার চ্যালেঞ্জ ও পাঞ্জাবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীজ্ঞানসিং রাড়েওয়ালার পদত্যাগ দেখিয়ে দিয়েছে যে, অকংগ্রেসী দলগুলির ভিতর অনৈক্যই আজকের ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার একমাত্র কারণ নয়, এমনকি অন্তর্বর্তী নির্বাচনের রায়ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে না পারে। এই সিদ্ধান্তগুলি বিহার ও উত্তরপ্রদেশের আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ কংগ্রেসের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু কংগ্রেস দলকে নয়, অন্যান্য প্রায় সব দলকে বিড়ম্বিত করছে। আয়ারাম-গয়ারামের দল এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করছেন। অবশ্য এটা আশার কথা যে, এখন পর্যন্ত কেন্দ্রে এই আয়ারাম-গয়ারাম রোগের ছোঁয়াচ লাগে নি।

১৯৬৮ সালের শেষে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে আশার কথা হচ্ছে, খাদ্যশস্যের ফলন খুব ভাল হয়েছে। এর উপর ভরসা করে দেশের নেতারা আশা করছেন, গত কয়েক বছরের দুর্দিন কাটিয়ে উঠে আমাদের দেশ হয়ত আবার অধিকতর সুদিনের মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে ভারতবর্ষের যে দুশ্চিন্তা তার কোন সুরাহা হয় নি। বিদেশী সাহায্যদাতারা সেই যে তাঁদের হাত গুটিয়ে নিয়েছেন তারপর তাঁদের বন্ধ মুঠি আর খুলতে চাইছেন না—তার ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার চেহারাটা এখনও অনিশ্চয়তার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

১৯৬৮ সালের পৃথিবীতে ভারতবর্ষকে এই দুর্ভাগ্য ভাগ করে নিতে হয়েছে অন্যান্য দরিদ্র, উন্নতিকামী দেশের সঙ্গে। "উন্নয়নের দশক" শেষ হতে চলল। ইতিমধ্যে এই দশকের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হতে চলেছে—যার প্রমাণ ১৯৬৮ সালে [illegible] রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের সেক্রেটারি জেনারেল ডাঃ রাউল প্রেবিশের পদত্যাগের মধ্যে এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা কর্তৃক ব্যাঙ্কের তহবিলে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ঘটনার মধ্যে।

[illegible] চোখে

[illegible] প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সফর [illegible] ... [illegible] না। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর এবারের সফর [illegible] রাজনীতির আওতায় এক নূতন দিগন্তের [illegible] করেছে।

গণতন্ত্রে দলের ও সরকারের ভূমিকা এক নয়। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এক অভিনবরূপে প্রতিভাত করেছেন। সর্বোপরি, শ্রীমতী গান্ধীর 'দল একেলা কংগ্রেস' ঘোষণা দল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসসঞ্জাত মনোভাবকে অনেকখানি প্রাধান্য দিয়েছে, উত্তেজনার মুহূর্তে কোন নেতা বা নেত্রী এরকম ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস দেখাতে পারেন। শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এটা মোটেই শোভনীয় নয়—কারণ তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্ণধার, আর একই সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী।

অগণিত জনতার অকুণ্ঠ অভিনন্দনের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী দু'দিনব্যাপী সফরে চারটি বিরাট জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তিনটি মূল সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

প্রথমত, তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যে গত নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে দেশে অনৈক্যের বীজ প্রোথিত হয়েছিল। আর অস্থায়ী সরকার বিভিন্ন প্রদেশে সংগঠিত হওয়ার জন্য উন্নতি ব্যাহত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে স্থায়ী সরকার দরকার। তবেই শুধু দেশের মধ্যে একতা আসে এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এই স্থায়ী সরকার কংগ্রেস নেতৃত্বে গঠিত হতে হবে।

তৃতীয়ত, শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলতে দিতে হবে। হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে কেউ যদি উন্নয়ন-যজ্ঞের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তাকে সমূহ সাজা পেতে হবে। হিংসাত্মক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।

এই বক্তব্য পেশ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে তাঁর পূর্বসূরীরা এই উপমহাদেশের [illegible] সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে [illegible] ও [illegible] প্রবর্তন করেছেন, [illegible] [illegible] করার জন্য তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোকে আসতে না দেওয়ার জন্য ও স্বাধীনতার ফলভোগে বঞ্চিত রাখার জন্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মাত্র। অন্য কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, হিংসা ভারতের কৃষ্টির পরিপন্থী। কাজেই হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করে প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করলে মারাত্মক ফল ফলবে। তিনি আরও বলেছেন, গণতন্ত্র ভারতের মাটিতে তার শিকড় শক্তভাবে প্রোথিত করেছে। এমন কোন শক্তি নেই যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে এই দেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলে নূতন কোন ধারার প্রবর্তন করতে পারে। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে।

কেন তিনি এই সমস্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন সেই সম্পর্কেও শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ভাষণে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি কথায় ও কাজে সঙ্গতি রক্ষা করেননি। বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলির সুবিধাবাদী কোয়ালিশন সরকার জনতার কথা চিন্তা না করে আত্মপুষ্টির চেষ্টায় সর্বদা ব্যাপৃত ছিল। আর সুযোগ পেলেই তাঁদের সমস্ত কুকর্মের বোঝা কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রের কাছে এক কথা বলছেন, আর স্বরাজ্যে ফিরে এই সমস্ত সরকারের প্রতিনিধিরা স্বীয় রাজনৈতিক রূপ ধারণ করেছেন। সখেদে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে ঐ সমস্ত সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রের তরফ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বন্ধুত্বের উদারহস্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুত্বের মনোভাবকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু হেলায় অবজ্ঞা করে কুৎসা প্রচার করা হয়েছে। তিনি কেবল সরকারের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি ভাবতেও অক্ষম কেন এই জেহাদ। তিনি মনে করেন নিজেদের অক্ষমতাকে চাপা দেওয়ার জন্য এই সুকৌশল অপপ্রয়াস।

এই সমস্ত তথ্য পেশ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচন এক জরুরী প্রশ্ন নিয়ে জনগণকে উপস্থিত হয়েছে। [illegible] হবে তাঁরা [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করতে চান, কি চান না? যদি তাঁরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উন্নতির পথে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কংগ্রেস দলকে এক [illegible] [illegible] জন্য ভোট দেওয়া এবং সমস্ত প্রদেশে [illegible] কায়েম করেন সরকার শক্তিশালী হবে এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ [illegible] হবে না।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্যকে এক নিছক রাজনৈতিক প্রচার বলে মনে হবে। কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেইহেতু তাঁর বক্তব্যকে রাজনৈতিক কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণের সমূহ প্রয়োজন আছে। কারণ, সার্থক গণতন্ত্র রূপায়ণে সরকারের কর্ণধারদের ভূমিকা বিরোধী-পক্ষের ব্যবহারিক দিক থেকেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশে হিংসাত্মক বিপ্লব সংগঠিত হওয়া বা না হওয়ার মূলে সরকারী ভূমিকার মূল্য ও গুরুত্ব সমধিক। বিপ্লব আমদানী করা সম্ভব নয়। দেশের অভ্যন্তরে হিংসাত্মক বিপ্লবের পটভূমি তৈরী হয়। সেই আবহাওয়া প্রতিরোধের দায়িত্ব সরকারের। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে সেই পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি হয় নি বলেই নকশালবাড়ীর আন্দোলন 'শিশুসুলভ' চপলতায় পর্যবসিত হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয়।

প্রধানমন্ত্রী হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। দলীয় নির্বাচনী প্রচারকল্পে মন্ত্রীর আসনে সমাসীন থেকে এ ধরনের বক্তব্য রাখা উচিত কিনা কংগ্রেস নেতারা এ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবেন। কংগ্রেস দলের কোন নেতা বা নেত্রী—অন্ততপক্ষে যিনি মন্ত্রী নন—তিনি যদি এহেন উক্তি করেন তবে তার যে তাৎপর্য হবে মন্ত্রী হিসাবে করলে তার ভিন্ন প্রভাব পড়তে বাধ্য। সুস্থ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষে এটা অনুকূল নয় বলে মনে হয়। অবশ্য এই দেশে সমস্ত রাজনৈতিক দলই এহেন চিন্তাধারাকে অল্প-বিস্তর প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। কিন্তু এই প্রশ্ন গণতন্ত্রের একটি মৌলিক অধ্যায়, কাজেই, জনতার আসীন থাকাকালে যে কোন দলেরই নেতা বা নেত্রী হোন না কেন এই অভ্যাস বদলাবার সমধিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নতুবা, জনতার মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করবার যথেষ্ট অবকাশ থেকে যাবে।

যে কেউ অনুধাবন করলে দেখতে পাবেন, ভারতবর্ষে বর্তমানে নকশালপন্থীরা ব্যতীত অন্য কোন দলই নির্বাচনবিরোধী নয় এবং সেই সমস্ত দল প্রত্যেকেই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বলছেন। আর এদের প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] আছে তার দিকে

সম্পাদনাকারক হতে এবং যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক লাভের অংশীদার একা কম্যুনিস্টরা হতে পারতেন না।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, স্বয়ং কম্যুনিস্টরাই এখন হিংসার পথ বর্জনের জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছেন। এবং এই বক্তব্য আজও স্বচ্ছ মনে হবে নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে কম্যুনিস্টদের ভূমিকার সঙ্গে বর্তমানে তাঁদের বিবৃতি ও ঘোষণার তুলনামূলক সমীক্ষার মধ্যে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে চীনও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আমেরিকার কাছে বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করেছে।

অবশ্য শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, হিংসা ভারতীয় ইতিহাসে বাইরের জিনিস এবং এর কৃষ্টির সঙ্গে হিংসার কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী এখন এক বিস্মৃত কাহিনী। বর্তমানে জীবনযুদ্ধে যে সমস্ত নূতন নূতন সৈনিক আবির্ভূত হচ্ছেন তাঁরা এ ইতিহাসের খবর কেউ রাখেন না। এবং তাঁদের এই সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়াসও কারো মধ্যে নেই। কাজেই যে মনোভাব সৃষ্টি হয় নি তাকে মূলধন করে কারবার করলে লোকসানের আশংকাই প্রবল হতে বাধ্য।

বিভিন্ন রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মনোভাব বিশ্লেষণ করে শ্রীমতী গান্ধী যে বক্তব্য রেখেছেন সেই সম্পর্কেও গভীর মননশীলতার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে সর্বসময়ে কংগ্রেসই ক্ষমতায় থাকবে এ ধরনের সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দিয়ে কার্যক্রম ঠিক করা উচিত নয়। এই বিরাট উপমহাদেশে চিন্তার বৈষম্য হতে বাধ্য এবং তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ভিন্নচরিত্রের সরকারও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। আর এই চিন্তার বিচিত্রতার উপরই গণতন্ত্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কাজেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্কের কি আর্থিক কি রাজনীতিক—একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা টানা উচিত। অনড়, অচল কোন নীতি নির্ধারিত করে তাকে শক্তির জোরে কার্যকর করতে গেলেই ঝগড়ার সূত্রপাত হবে। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে এই দূরদর্শিতা যাঁদের থাকে এবং যাঁরা পূর্বাহ্নেই ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান ভেবে রাখেন তাঁরাই 'স্টেটসম্যান'—নতুবা ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিকের পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারেন না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আজকে সেই স্টেটসম্যানশিপের অভাব পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই সম্পর্কে কংগ্রেসকে নূতনভাবে চিন্তা করা উচিত।

শ্রীমতী গান্ধী বিশেষ করে বাম কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত কেরালা সরকারকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর একথা স্মরণে রাখা উচিত ছিল যে শ্রীযুক্ত নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর দল যদিও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রন্টের সমস্ত শরিককে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সে আশা ফলবতী হয় নি। অন্যান্য শরিকরা তাতে মোটেই সায় দেয় নি। কাজেই বাম কম্যুনিস্টদের সেই আন্দোলন কথায় পর্যবসিত হয়ে আছে মাত্র। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্ন একান্তভাবে একটি মৌলিক ও নীতিগত বক্তব্য। যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই কয়টি রাজ্যে কংগ্রেস সরকারও গঠিত হয় তবু এই প্রশ্ন থেকে যাবে। কারণ, কেরালা, তামিলনাদু ও উড়িষ্যায় অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় থাকবে। এমন কি মধ্যপ্রদেশেও এখনও অকংগ্রেসী সরকার সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে সগৌরবে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য থেকে এই কথা মনে হয়েছে যে, কেবলমাত্র যেন কম্যুনিস্টরাই রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, অন্য কেউ নয়। আর সকলেই সংবিধানের সুবর্ণ পথে যাতায়াত করছেন। তামিলনাদুর ডি-এম-কে সরকারের কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য একপেশে এবং তথ্যগত দিক থেকে ভুল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভূগোলের দিকে দৃকপাত না করেই প্রধানমন্ত্রী অহেতুক কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে অত্যধিক ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে কম্যুনিস্টরা রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে বিশেষ কোন ভূমিকার অধিকারী নয়। এককথায় তাঁদের প্রভাব প্রায় নাই বললেই চলে। কিন্তু তাঁর ৯৫ মিনিটব্যাপী ময়দান ভাষণে তিনি শুধু কম্যুনিস্টদের সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। অথচ সমস্ত রাজ্যে যেখানে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সব জায়গাতেই তিনি কংগ্রেসকে গদীতে আসীন করবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী শক্তিচক্রের আবির্ভাব সম্পর্কে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। কাজেই তাঁর বক্তব্যে এখানে একটি বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে যার ফলে বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে তাঁকে ভুল বোঝার সুযোগ থেকে গেছে। যা হোক, প্রধানমন্ত্রীর একথাও স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে পশ্চিমবঙ্গেও কম্যুনিস্টরা এতটা শক্তিশালী নন যে তাঁরা এককভাবেই এই রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। তাঁদের সঙ্গে ফ্রন্টে যাঁরা আছেন তাঁদের সকলকেই যদি প্রধানমন্ত্রী দেশপ্রেমিক নয় বলে ধরে নেন তবে তিনি মহা অবিচার করবেন। আর যদি এও মনে করে থাকেন যে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিশলেই জাতীয়তাবোধ তিরোহিত হয়ে যাবে এবং দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলেও সকলেই মহানন্দে কালাতিপাত করবেন তবে বলব তিনি আর একবার ভুল করেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে কোন দলই দেশের শত্রুতা করবার সাহস রাখে না। চীনা আক্রমণের সময় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

অধিকন্তু, চার-চারটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ফলে সকলেরই নির্বাচন করাটা প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই সমস্ত দল যখন নির্বাচনকে গ্রহণ করেছেন তখন অহেতুক ভিন্ন প্রশ্ন তুলে অবস্থাকে ঘোরালো করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রধানমন্ত্রীর তাই উচিত ছিল বিরোধী দলগুলির নির্বাচনী ইস্তাহারের ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করে জনতাকে তাঁদের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা। নতুবা প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে শুধু শাসনের সুর ধ্বনিত হতে বাধ্য। তাতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তোলার অবকাশ খুব কমই থাকবে।

—সমদর্শী

শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর রাত্রি ৯টা ২১মিঃ অ্যাপোলো—৮ মহাকাশযান সাফল্যমণ্ডিত চন্দ্র অভিযানের শেষ পর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নেমে আসে। মহাকাশযানের সন্ধানে প্রশান্ত মহাসাগরে অপেক্ষারত বিমানবাহী মার্কিন জাহাজ ইয়র্কটাউন থেকে মাত্র পাঁচ হাজার গজ (৪৫০০ মিটার) দূরে মহাকাশযানটি নেমে এসেছিল।

শতাব্দীর বিস্ময় এই অভাবনীয় গৌরব অর্জন করেছেন যে বীরত্রয়, আমরা জানাই তাঁদের অন্তরের অভিনন্দন।

শতাব্দীর বিস্ময় চাঁদে অভিযান
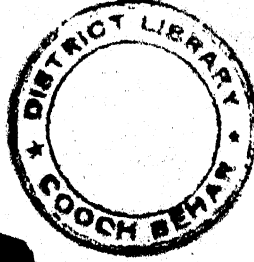
দিলীপ বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক সায়েন্স-ফিকশনের জন্মদাতা, ফরাসী লেখক জুলে ভার্ন পৃথিবী থেকে চাঁদে যাত্রার এক কাল্পনিক কাহিনী লিখেছিলেন। তাঁর যাত্রীরা (তারাও ছিল সংখ্যায় তিনজন) পৃথিবী থেকে চাঁদে যাত্রা করে চন্দ্র-পরিক্রমা করে আবার পৃথিবীর সমুদ্রজলে নেমে আসে। কল্পনায় জোর ছিল খুব বেশী, কিন্তু ঐ গল্পতে তখনকার বিজ্ঞানের যতোখানি সাহায্য নেওয়া সম্ভব ছিল, ভার্ন সাহেব তাই শুধু করেছিলেন।

আর আজ সেই কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত। ত্রয়ী বীর আমেরিকান,—বোরম্যান, লোভেল ও এনডারস এপোলো—৮ ব্যোমযানে চেপে ২১শে ডিসেম্বর সকালে যাত্রা করে আবার ২৭শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯-৩০টায়তে প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের নিকটে অবতরণ করবেন।

পূর্ব-পরিকল্পনা মতো তাঁরা সবশুদ্ধ ১৪৭ ঘণ্টা মহাকাশে ব্যোমযানে কাটাবেন এবং তার মধ্যে চাঁদের নিকটে পৌঁছে চাঁদের জমি থেকে ৬০ মাইল আন্দাজ উচুতে তাঁরা দশবার চাঁদকে পরিক্রমা করে চাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি তুলবেন, পৃথিবীতে টেলিভিশন ছবি পাঠাবেন এবং ভবিষ্যতে চাঁদে অবতরণের স্থান ঠিক করবেন। প্রত্যেকটি কাজেই দারুণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া হয়েছে এবং অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের নিদর্শন দিয়েছেন তাঁরা।

লেখার সময়ে (২৬শে ডিসেম্বর, সকাল) আমাদের এই অতিপ্রিয় ত্রয়ী বীর তাঁদের চন্দ্র-অভিযানের পুরো দায়িত্ব পালন করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। সর্বাপেক্ষা বিপদের ঝুঁকি অবশ্য এই প্রত্যাবর্তনের পথেই। আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁদের শুভ ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকবো এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখি যে, তাঁদের চন্দ্র-অভিযানের প্রধান দায়িত্ব তাঁরা সফলভাবেই পালন করেছেন। আমরা তাঁদের আমাদের মধ্যে পেতে চাই এবং ইতিমধ্যে আমাদের সশ্রদ্ধ সপ্রেম অভিনন্দন জানাই এই ত্রয়ী বীরদের, আমাদের প্রিয় বোরম্যান, লোভেল ও এনডারসকে।

আমরা এখন এই অভিযানের বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করবো, এবং প্রসঙ্গত বলে রাখি, এ বছর পুজো সংখ্যাতে আপনাদের পত্রিকাতে চাঁদে অভিযানের মূল প্রসঙ্গ ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি, যার পটভূমিকা থেকে সামান্য কিছু পুনরাবৃত্তি হয়তো এখানে হতে পারে।

চড়াই-উৎরাই

পৃথিবী-চাঁদের দূরত্ব গড়পড়তা ২,৪০,০০০ মাইল। পৃথিবীর ভর চাঁদের অপেক্ষা ৮১ গুণ বেশী। তাহলে বিপরীত বর্গফলের (Inverse square law) নিয়মানুসারে এই ২,৪০,০০০ মাইল পথের শেষ দশ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ মাত্র ২৪,০০০ মাইল চাঁদের মহাকর্ষের বা মাধ্যাকর্ষণের আধিপত্যে থাকবে, বাকী প্রথম ২,১৬,০০০ মাইলে (পৃথিবীর দিকে) পৃথিবীর মহাকর্ষই কাজ করবে।
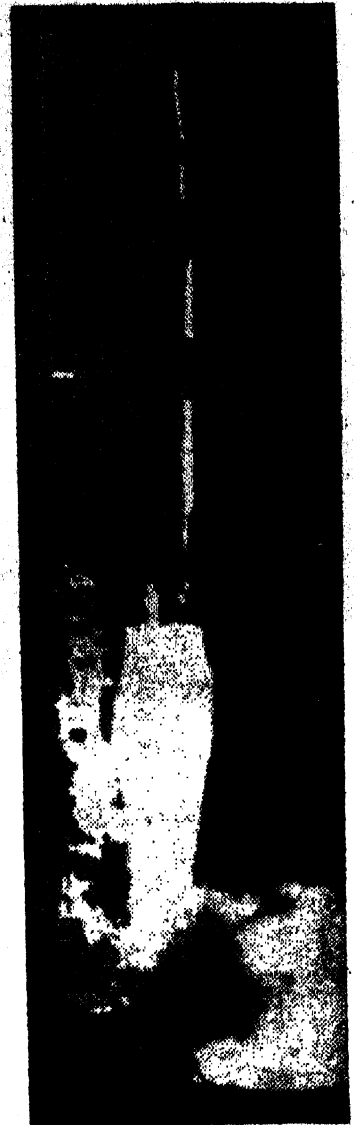
পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথম ২,১৬,০০০ মাইল যাওয়া যেন খাড়া উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে শীর্ষদেশে আরোহণ, কারণ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে উঠতে হলেও পৃথিবীর মহাকর্ষকে কাটিয়েই উঠতে হয়। তবে কল্পনা করে নিতে হবে যে, পাহাড়ের গাত্রটি একেবারে খাড়া বা Vertical.

তারপর ২,১৬,০০০ মাইল পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে অপরদিকে মাত্র

এপোলো-৮ গতিপথের রেখাচিত্র
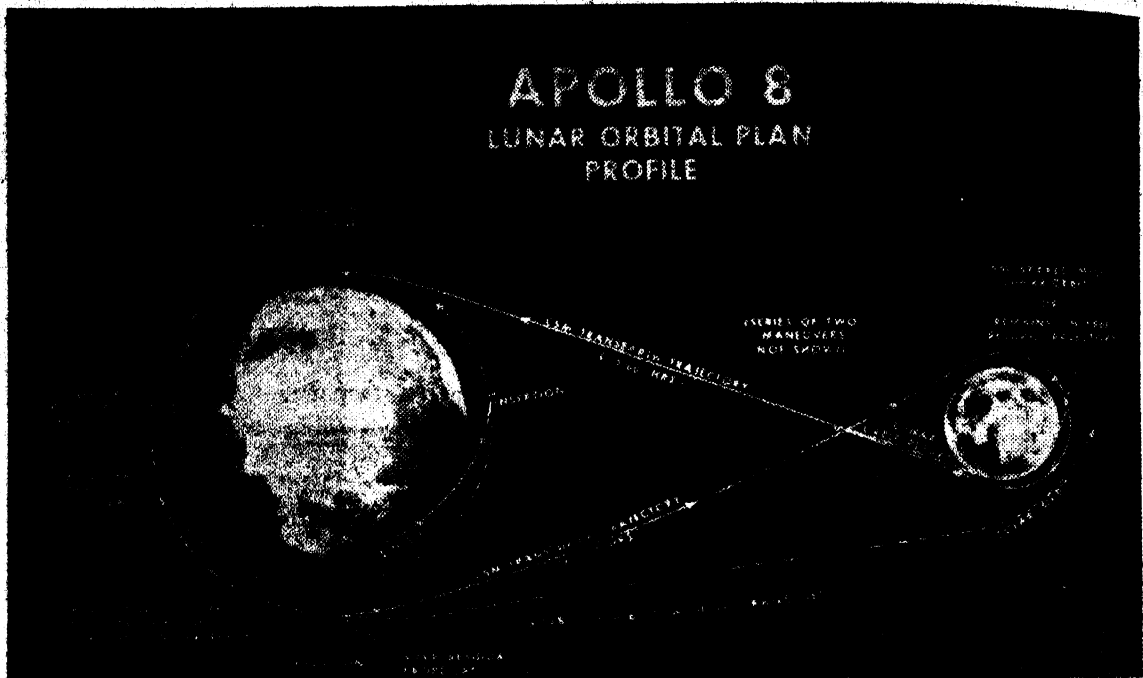
২৪,০০০ মাইল অবতরণ করলেই চাঁদের জমির সাক্ষাৎ মিলবে।

আচ্ছা, এবারে দেখা যাক, আমাদের ত্রয়ী বীর তাঁদের এপোলো—৮ ব্যোমযান নিয়ে কি করলেন।

এপোলো-৮ ব্যোমযান

ব্যোমযানটি একটি তিন-থাকের বিরাট স্যাটার্ন—৫ রকেটের উপরে অবস্থিত। সব জড়িয়ে ৩৬৩ ফুট, অর্থাৎ ২৬ তলা বাড়ির সমান উঁচু এবং ওজন ৬২,১৮,৫৫৮ পাউন্ড বা প্রায় ৭৭,৭৩২ মণের কিছু বেশী।

২১শে ডিসেম্বর পৃথিবী থেকে যাত্রা করে প্রথমে স্যাটার্ন রকেটসহ এপোলো—৮ ব্যোমযান দুবার পৃথিবীকে পরিক্রমা করলো প্রায় ১২০ মাইল উচ্চে। অর্থাৎ, প্রথমে এ যেন পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে গেল। তখন তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইলের কিছু কম—মোটামুটি পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী যে কোনো স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহের যা গতিবেগ, তাই-ই।

বহু কাপকেনেডির হিসাবে (যার বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়) পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি অনুযায়ী ডিসেম্বর ২১শে যাত্রা শুরু করে চাঁদের চার ধারে দশবার পরিক্রমা করে আবার ২৭শে ডিসেম্বর ফেরবার কথা। এই সময়ে অভিযান কোনো কারণে করা সম্ভব না হলে আবার জানুয়ারী ১৮ থেকে ২৪শে করতে হোতো।

চাঁদের পথে পাড়ি

ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল গতিবেগে পৃথিবীকে দুবার চক্কোর দিয়ে আবার রকেট ইন্‌জিন চালিয়ে, তার গতিবেগকে বাড়িয়ে ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল করা হোলো। ইন্‌জিনের প্রতিধাক্কা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২,৩০,০০০ পাউন্ড—এটা একটা নতুন ধরনের জি—২ ইন্‌জিনের সাহায্যে করা হয়েছিল।

এই বাড়তি গতিবেগ সংগ্রহ করে ত্রয়ী আরোহী নিয়ে এপোলো—৮ ব্যোমযান ৬৯ ঘণ্টা পরে শীর্ষদেশ আরোহণ করে চাঁদের জমির দিকে অবতরণ করতে লাগলো। শীর্ষদেশে তার গতিবেগ ছিল মাত্র ঘণ্টায় ৩,০০০ মাইল। চাঁদের দিকে অবাধে ২৪,০০০ মাইল নেমে গেলে চাঁদের জমিতে প্রায় ঘণ্টায় ৮,০০০ মাইল বেগে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হোতো। অবশ্যই সেটা করতে দেওয়া যেতে পারে না।

চাঁদের জমি থেকে যখন কয়েক শ' মাইল উচ্চে এপোলো—৮ ব্যোমযান এসে হাজির হোলো, তখন আবার অন্য একটি রকেট ইন্‌জিনকে চালু করা হোলো। দুটো কাজ এখন করতে হবে—প্রথম, তার পতনের গতিবেগকে কমিয়ে চাঁদের উপগ্রহ করার জন্য, অর্থাৎ চাঁদ পরিক্রমার জন্য যে গতিবেগ সেটা দিতে হবে, দ্বিতীয়—এপোলো—৮-এর পতনের গতিমুখকে খানিকটা ঘুরিয়ে চাঁদের জমির সমান্তরাল করতে হবে। তবেই এপোলো—৮ চাঁদের উপগ্রহ হয়ে দাঁড়াবে। সামান্য একটু আলোচনা করা যাক।

উপগ্রহ

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহরা, আর ঠিক একই নিয়মে চাঁদের উপগ্রহ হলো এপোলো—৮। কি রকম? দড়ি দিয়ে একখণ্ড পাথর বেঁধে ঘোরাবার উপমাটি ব্যবহার করা যাক।

দড়ি দিয়ে বাঁধা পাথরটা যখন হাতের চার ধারে ঘোরে, তখন আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, পাথরের উপরে যুগপৎ দুটো বল (ফোর্স) কাজ করছে। যতোক্ষণ ঘুরবে, দড়িটা টান টান থাকবে, অর্থাৎ হাতের টান দিয়ে দড়ির সাহায্যে পাথরটাকে হাতের দিকে টেনে রেখেছি। তা বলে কি পাথরটা দড়ির টানে হাতের ওপর এসে পড়ছে? না, কারণ উল্টো দিকে তার ছিটকে বেরিয়ে যাবার ঝোঁক রয়েছে।

প্রমাণ : দড়িটা ছেড়ে দিলেই পাথরটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে। এই যে একদিকে দড়ির টান, যাকে কেন্দ্রানুগ বল বলা হয়, আর অন্যদিকে পাথরটার ছিটকে বেরিয়ে যাবার ঝোঁক, (যার নাম দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রাতিগ বল)—এই দুটো সমান বা তাদের ভারসাম্য থাকলেই পাথরটা হাতের চারধারে ঘুরেই চলবে।

ঠিক একই নিয়মে, চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর মহাকর্ষের আওতায় দাঁড়িয়ে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করে। তেমনি এবারে চাঁদের মহাকর্ষের আওতায় দাঁড়িয়ে এপোলো—৮-কে চাঁদের চতুর্দিকে পরিক্রমা করানো হতে থাকলো।

চাঁদের দৃশ্য

প্রথমে এপোলো—৮-কে একটি উপবৃত্তাকারে (নিকটবর্তী পয়েন্ট ৭০ মাইল, দূরবর্তী ১১৬ মাইল) পরে আরো একটু সংশোধন করে প্রায়-বৃত্তাকারে চাঁদের জমি থেকে ৬০ মাইল উচুতে ঘোরানো হতে থাকলো। প্রতি দু' ঘণ্টায় এপোলো—৮ একবার চন্দ্র-পরিক্রমা শেষ করতে থাকলো, যার মধ্যে ৪৫ মিনিটের জন্য সে চাঁদের চির-অদৃশ্য উল্টো পিঠের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। বলা বাহুল্য, এই ৪৫ মিনিটের জন্য এপোলো—৮ আরোহীদের সঙ্গে পৃথিবীর বেতারবার্তার বিনিময় বন্ধ হয়ে যেতে থাকলো।

চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, কাজেই সরাসরি উল্কাপিণ্ডের আঘাতে চাঁদের বুকে বহু বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি আবার নিশ্চয়ই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। আরোহীদের মতে, চাঁদের উল্টো পিঠের গর্তের সংখ্যা এতো বেশী এবং এতো বেশী সেখানে বড়ো বড়ো খানাখন্দ রয়েছে যে, সেদিকে ভবিষ্যতে আমাদের নামা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। অবশ্যই রেডিওবার্তার বিনিময়ের অসম্ভব অসুবিধা হবে বলে আমরা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে চাঁদের দৃশ্য পিঠের দিকেই অবতরণ করবো।

এপোলো—৮ দশবার চন্দ্র-পরিক্রমা করেছে ২০ ঘণ্টা সময় নিয়ে। ২৪শে ডিসেম্বর থেকে গতকাল খৃষ্টমাসের বড়োদিন ২৫শে ডিসেম্বর অবধি চাঁদকে ২০ বার চক্কোর দিয়ে ত্রয়ী বীর এবারে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। বহু মূল্যবান তথ্য, চাঁদের বহু ছবি ও কিছু টেলিভিশন ছবি ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে, যা ভবিষ্যতে আমাদের চাঁদে সশরীরে অবতরণ করতে দারুণ কাজে আসবে। তাছাড়া চাঁদের জমির বিশদ বর্ণনা ইতিমধ্যেই দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বেরিয়েছে বলে আমরা এখানে তাদের সরাসরি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রত্যাবর্তন

ফেরাটাই মজার, কিন্তু সর্বাধিক কষ্টের। [ক্রমশঃ চলবে]

আরোহীরা দশবার চাঁদ পরিক্রমা করে আবার রকেট ইনজিন চালিয়ে তার প্রতিঘাতের গতি সঞ্চার করে, চন্দ্র-পরিক্রমার কক্ষপথ থেকে মুক্ত হয়ে আবার পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করলেন। সেটা হলো ২৫শে ডিসেম্বরের ভারতীয় সময় বেলা ১১-৯ মিনিটে। আরোহীরা বলেছেন যে, তাঁরা যে পাহাড়ে উঠছেন, তার অনুভূতি তাদের মধ্যে এসেছিল। তার কারণ আর কিছুই নয়—রকেট ইনজিন চালু হলেই মহাকর্ষকে (এখানে চাঁদের, পৃথিবী ছাড়বার সময়ে পৃথিবীর) প্রতিরোধ করা হচ্ছে বলে শরীরের ওজনের দিকে আসছে।

চাঁদের দিকে ২৪,০০০ মাইল (আমরা সবসময়ই গড়পড়তা হিসাব ধরে নিয়েছি, আলোচনাকে জটিলতা না বাড়াবার জন্য) পাহাড়ী পথ বেয়ে শীর্ষদেশে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন যেখানে সেখানে চাঁদের

মার্কিন নভশ্চরত্রয় (বাম থেকে দক্ষিণে) কর্নেল ফ্রাঙ্ক বরম্যান, মেজর উইলিয়াম এ অ্যান্ডার্স ও ক্যাপ্টেন জেমস লোভেল

আর পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ যা মহাশূন্যে [illegible] হয়ে যাবে। ঘণ্টায় ৩,৩০০ মাইল গতিবেগ এখন তাঁদের।

এবার ২,১৬,০০০ মাইল ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন। বিপদ এখানেই সবচেয়ে বেশী। কারণ [illegible] পৃথিবীর চতুর্দিকে যে বায়ুমণ্ডলের আবরণ আছে, সেটা ছোঁবার সময়ে তাঁদের গতিবেগ হয়ে দাঁড়াবে ৩৯, ৪২৮ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় (ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল)। এতো বেগ নিয়ে এর পূর্বে আর কোনো মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে নি।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পথটি অপেক্ষাকৃত ছোট—একটি সড়ক বা সুড়ঙ্গের মতো, যাতে ঠিক নির্দিষ্ট কোণে (এঙ্গেলে) প্রবেশ করতে না পারলে পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডলে ঘর্ষণ-সংঘাতে আরোহীসহ এপোলো—৮ মহাকাশযান ছাই হয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার কোণটি (এঙ্গেল) ভুল হয়ে গেলে হয় তাঁরা বায়ুমণ্ডলকে ছুঁয়েই আবার ছিটকে বেরিয়ে যাবেন এবং পৃথিবীতে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না, আর নয়তো একেবারে গভীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবেন।

ত্রয়ী আমেরিকান—বোরম্যান, লোভেল ও এন্ডারস মহাকাশের কলম্বাস এবং মানুষের ইতিহাসের সর্বাধিক দুঃসাহসী অভিযানের বীরদের আমরা বারবার [illegible]দের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আগের ঘটনা

[লীলাকে ভাসিয়ে নিল সুখেন। বাল্যবন্ধু এসে তছনছ করে দিল সাজানো সংসার। রূপপুরের মায়া কাটাল সত্যচরণ। ঘরে এল বমুনা। নবযুবতী। নতুন স্বপ্ন। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু মারা গেল নার্সিংহোমে। সত্য পাগল হল।

চোরাড়ে সুখেনকে নিয়ে লীলার মনে ছিল আরেক জগৎ। কিন্তু বিধাতা বিমুখ। জুয়া, মদ আর মেয়েছেলে নিয়ে সুখেনের রয়েছে দ্বিতীয় ভুবন। এক রাতে সে ফাঁকি দিল লীলাকে। শিবানীকে নিয়ে পালাল।

লীলা উদ্‌ভ্রান্ত। প্রেস নিয়ে পড়ে থাকতেও মন সায় দেয় না তেমন। প্রেসের কর্মী বয়সে ছোট ভাই অহীন। মনে ধরল তাকে। সঙ্গে নিয়ে চলে এল মুর্শিদাবাদ।]

॥ ৪৭ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিন রাত্রে অহীন অমনি করে পালিয়ে গেলে বেশ কিছুক্ষণ দুলে দুলে হেসেছিল লীলা। হাসির উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ছিল। খাটের একটা কোণ আঁকড়ে হাসি সামলানোর চেষ্টা করছিল সে। যেন অহীনকে জোর জব্দ করা হয়েছে। ছেলেবেলায় কালী-পুজোর সময় সেই মজার কাণ্ডটা মনে পড়ছিল। কালীপুজোয় খুব ধুমধাম হত রূপপুরে। জমিদারের কাছারিবাড়ির লাগোয়া ছিল কালীমন্দির। বিরাট দেউড়ীর পরে উঠোন—চারপাশে বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা—সামনে মধ্যখানে মন্দির। চারপাশেই সিঁড়ির ধাপ। হাঁড়ি-কাঠটা ছিল উঠোনের মধ্যে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জমিদার—রক্ষণাবেক্ষণ করতেন লীলার বাবা প্রাণকান্ত নায়েবমশাই। অবশ্য সে-বাবদে যথারীতি একটা দেবোত্তর সম্পত্তি তো ছিলই—সেটা নামে সেবাইত জমিদার থাকা সত্ত্বেও আসলে ভোগ করতেন প্রাণকান্ত। রঘু পণ্ডিতের মাসতুতো দাদা আদিনাথ পুজোআচ্চা করত মাত্র—পেটে বিদ্যে ভোলা মত। নায়েবমশাই যা দয়া করে দিতেন ওই যথেষ্ট। আসলে লোকটা ছিল আত্মভোলা সদাশিব গোছের। সব সময় নেশায় বুঁদ থাকলে মেজাজ অমনি দিল-দরিয়া হয় হয়ত। কালীপুজোর রাত্রে রূপপুরে প্রায় সবাই মাতাল—তা কুমুদিনীর চোখই যেমন থাক না কেন মাতালের ওপর। প্রকাশ্যে স্বয়ং প্রাণকান্তও দু-এক চুমুক খেয়ে ফেলতেন। সে-রাত্রে তো সব বলই জানা; নেশা নয়। তিনি অবশ্য বাড়ি ফিরতেন সেই ভোরবেলা। ভিড়ের মধ্যে কাউকে লক্ষ্য করার সুযোগ কুমুদিনীর কোথায় তো।

সেবার কালীপুজোর রাত্রে সবাই যখন বদ্ধ মাতাল, চত্বর থেকে জমিদারের পাঁঠাটা কোন্ ফাঁকে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। প্রায় শতখানেক বলি হয়। প্রথমে ওই পাঁঠাটা বলি না হলে তাদের সময় আসে না। দিব্যি সব স্নান করিয়ে সিঁদুর ইত্যাদি যথাবিহিত ব্যবস্থা সেরে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এখন বলির লগ্ন সমাগত। জমিদারের পাঁঠা নেই। পাগলের মত সব খুঁজছে। প্রাণকান্ত চেঁচাচ্ছেন—সব মাথা নোব। শিগগির ফার্স্ট বয়কে খুঁজে বের কর। আদিনাথের খুব পড়েছিল পেটে। সবাই যখন খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত, সে হতাশ হয়ে থামের পাশে বসে পড়েছে। তারপর প্রায় মূর্ছিত কিংবা দশায় ঘোরে নিস্পন্দ হয়ে আছে। মাতালের কাণ্ড। সেই সময় কে চেঁচিয়ে উঠেছে—পেয়েছি, পেয়েছি, এই তো ব্যাটাচ্ছেলে ফার্স্ট বয়।

ধূলিধূসরিত অর্ধোলঙ্গ আদিনাথকে হাঁড়িকাঠে টেনে তার মুণ্ডুটা গলিয়ে দিতে সবাই ব্যস্ত। কে শোনে কার কথা। রামু কামার খাঁড়া তুলে তৈরি। রামু খায়েন দল-বল নিয়ে কেশরফোলানো সিংহের মত ঢাকগুলো তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। অবিশ্রান্ত জয় মা জয় মা চিৎকারে পুজোমণ্ডপ ফেটে পড়ছে। এদিকে আদিনাথের নেশা গেছে ছুটে। সে প্রচণ্ড কেঁদে বলছে, ওরে আমি রে, আমি...আমি।

লীলা বারান্দার থামের পাশে দাঁড়িয়ে যা-যা দেখছিল, অবিকল মনে পড়ে। হয়ত ওটা স্রেফ রসিকতা, হয়ত মাতালদের তুখোড় ঠাট্টাবাজি। তার কিন্তু ভীষণ ভয় লেগেছিল। সত্যি সত্যি বলি দিয়ে ফেলে না তো।

কিন্তু কই? ছাড়া পেয়েই আর আদি-নাথের পাত্তা নেই। অমাবস্যার রাত্রে তখন তাকে খুঁজে বের করা সমস্যা। শেষ অবধি পাঁঠাটা পাওয়া গিয়েছিল কিনা মনে নেই, কিন্তু আদিনাথের পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখে ভাসে।......

ঠিক সেইরকম একটা হাস্যকর কাণ্ড ঘটে গেছে। তাছাড়া আর কী বলা যায়। লীলার হাসি শুনে দুলি এসে উঁকি দিচ্ছিল পরদার ফাঁকে। তখন লীলা তাকে এই গল্পটা শুনিয়েছিল। তবে অহীনের কথা কিছু বলেনি।...হঠাৎ ঘটনাটা মনে পড়ল, বুঝলি দুলি?...লীলা বলেছিল।...পুরুষ-মানুষগুলো ভীষণ বোকা হয়। ওদের জব্দ করা কী সোজা রে।

দুলি মন্তব্য করেছিল, শুধু বোকা নয়, বদমাসও।...তা, খাবেন না? সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ জানালার বাইরে কিছু দেখবার চেষ্টা করার পর লীলা বলেছিল, নারে, খিদে নেই। তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

সেকি! তিনজনের রান্না আছে।

যা পারবি খা, সকালে ভিখিরী ডেকে দিয়ে দিস্।

দুলি অবাক হয়ে চলে গেলে লীলা তখন চমকে উঠে ভেবেছিল, অহীনকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হয়ে গেল না তো? আসলে অহীনকে সত্যি সত্যি ছুঁতে যেত না, কোন অসভ্যতা করার ইচ্ছেও ছিল না—এটা একরকম ভঙ্গী। একটা কৌতুক-প্রদ ভান। নিতান্ত তামাসা। অহীন কি এটা অন্যভাবে বলে ধরে নিল? ওর যা বয়স, তাতে এই ধরনের ছেলেমানুষী ভাব-প্রবণতা হয়ত খুব স্বাভাবিক। এমন একটু, সখী-সখীভাব ছেলেদের থাকে—লীলা দেখেছে। কিন্তু অহীন...

চকিতে লীলার মনে পড়ছিল, অহীন তত অবোধ সরল ছেলেমানুষ নয়। সুখেন-দের মত আড্ডায় মিশেছে। শিবানীকে নিয়েও

ওখানে একটা কী দোকান আছে...হ্যাঁ, চায়ের দোকান। বলল, চায়ের দোকানের সেই ইয়ে......দুলাল ভুরু কুঁচকে অপ্রস্তুত হাসল।...নামটা পেটে আসছে। মুখে আসছে না।

লীলা চমকে উঠে বলল, জগদীশ নয়তো?

দুলাল হাততালি দিল।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই নাম।

জগদীশ! জগদীশ কেন তার কাছে এসেছিল? লীলার মন তোলপাড় হচ্ছিল। জগদীশের কথা উঠলেই অনিবার্যভাবে সুখেনের কথা এসে পড়ে। তাহলে কি সুখেন...দাঁতে ঠোঁট কামড়াল লীলা। রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ খাটে শুয়ে রইল। সুখেনের প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ এলে সোজা বাহাদুরকে লেলিয়ে দেবে। নয়ত নিজেই ওর ভোজালিটা তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

কিন্তু আকাশপাতাল ভেবে আর সারা-রাত্তির নানারকম স্বপ্ন দেখে সকালে শয্যা-ত্যাগ করেই লীলা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়েছে।

রিকশো না করে হেঁটে কালেক্টারীর কাছে চলে এসেছিল সে। অনেকগুলো চায়ের দোকান রয়েছে। কোনটা জগদীশের কে জানে! কাকেও জিগ্যেস করতে লজ্জা করে।

তার আগে জগদীশ তাকে দেখতে পেয়েছে। এই যে ম্যাডাম, আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য! দয়া করে নিজেই পায়ের ধুলো দিলেন। জগদীশ সবিনয়ে দাঁত বের করল।

লীলা বলল, কাল আমার খোঁজ কর-ছিলেন শুনলাম। কেন?

বলব বৈকি। তবে এখানে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলা যায় না দিদি দয়া করে আমার ওখানে চলুন।

দোকানে আমি যাব না। যা বলবার এখানেই বলুন।

জগদীশ পা বাড়িয়ে বলল, তাহলে চলুন বলতে বলতে যাই। প্রেসের দিকে যাবেন তো?

না। বাড়ি ফিরব।

তবে ওদিকেই চলুন।

জগদীশের আচরণ বা ভঙ্গীতে কী [illegible]—লীলার সেদিনের মত অসভ্য লাগল [illegible]লোকটাকে। বরং হিসেবী আর [illegible] [illegible]নী লোকের মত মনে হচ্ছিল। একটু [illegible] হাঁটছিল সে। পরণে হাঁটু অব্দি [illegible] ধুতি গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে [illegible] রঙের চপ্পল।

[illegible] এলাকা পেরিয়ে ইরিগেশন [illegible] কাছে এসে জগদীশ দাঁড়াল। পিছনে [illegible]। এক টুকরো ঘাসের মাঠ। বড় একটা [illegible] গাছের নীচে প্যাটিকয় জরী [illegible] দৌড় করানো। কালিঝুলিমাখা [illegible] বালতি করে জল এনে [illegible]-

গুলো ধুচ্ছে। ওপাশে একটা নতুন বাড়ি—তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে লীলাকেই যেন লক্ষ্য করছে। লীলা বলল, বলুন।

একটা ঘূর্ণিহাওয়া একরাশ শুকনো-পাতা ঘাসের কুটো নিয়ে ওদের পেরিয়ে গেল। লীলা আঁচলের ওপরই দু হাতে মুখ ঢেকে একবার ধরল। ঘূর্ণিটা সরে গেলে বলল, কী, বলুন!

জগদীশ গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, বলি। কথাটা খুব প্রাইভেট। আপনার-আমার মধ্যেই থাকবে। বুঝলেন।

লীলা বলল, কথাটা আগে বলুন।

আচ্ছা দিদি......বলেই খ্যাচ করে জিভ কেটে জগদীশ একটু হেসে নিল।...আপনি আমার মেয়ের বয়সী। দিদি বলা ঠিক হচ্ছে না। বড গুণ্ডাবদমায়েস হইনে কেন, ঘরসংসার ছেলেমেয়ে তো একদিন ছিল আমার। আজ না হয় এমন ইয়ে হয়ে গেছি...আপনি যাই ভাবুন আমাকে। একটা মেয়ে ছিল। আমার দোষেই তার হয়ত অনেক সর্বনাশ ঘটেছে। তবে সম্প্রতি... জগদীশ একটু থামল।

লীলা স্থিরদৃষ্টে তাকাল।

আচ্ছা মামণি, একটা খবর জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে। সুখেনের সব হাল-হদিস তো আপনি জানেন। তার......

লীলা বাধা দিয়ে বলল, জানি না। কেন?

দেখুন, যে যেমন লোক, তার তেমন আত্মীয়কুটুম্ব হয় সংসারে। যে গাছের বাকল, সে গাছেই মানায় ভালো। সুখেনের সঙ্গে আপনার মিলবে কেন? ও আমি বেশ বুঝি। ও হারামজাদাকে জব্দ করতে হলে আমাদের মত মানুষ চাই।

লীলা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বলল, কাকেও জব্দ করার কথা আমি ভাবিনি।

জগদীশ জিভ কাটল ফের...... না, না, তা বলছিনে। আপনার কাছে শুধু একটা কথা জানতে চাচ্ছি। সত্যি বলবেন? আমিও তো আপনার মত একটা মেয়ের বাবা। বলবেন তো?

বলুন।

আচ্ছা, সুখেনের কি এখনও বৌ রয়েছে একটা—কলকাতায় থাকে নাকি?

এবার লীলা হেসে ফেলল।......তাই বলুন। কেন জানতে চাচ্ছেন?

জগদীশ হঠাৎ ফোঁস করে নাক ঝাড়ল। মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্য পাশে। সম্ভবত সে অশ্রু সম্বরণ করছিল। লীলা ভাবল, আদিখ্যেতা নয় না!

জগদীশ ধরা গলায় বলল, আমি শালা একটা পাপীতাপী মাতাল লোক। একদিন আপনাকে যা তা বলেছিলাম মনে দুঃখ—মাপ করে দেবেন। বুঝতেই তো পারছেন,

খামোকা এতসব চোরামাল আমার ঘাড়ে চাপিয়ে ইনফর্ম করা। মেজাজ ঠিক ছিল না।

লীলা হাল্কা মেজাজে বলল, না, না। আমি কিছু মনে করিনি তাতে। আপনার আড্ডার লোকেরাই তো এসব করেছিল।

সে কি আর বুঝিনি! ওই সুখেটা যদি অত বুদ্ধু না হবে তো...

লীলা কথা কাড়ল।...থাক্ সে। সুখেনবাবুর খোঁজ পাননি?

পেয়েছি। লালগোলায় আছে। লালু গিয়েছিল। জগদীশ নির্দ্বিধায় জানাল।... অহীনই খবর দিয়েছিল লালুকে। অহীন ছেলেটা আর যাই হোক, শিক্ষিত তো বটে। শিবি আর তার বরকে আজ সে নিজেই আনতে গেছে। তাই কাল আপনার খোঁজ করছিলাম ওই কথাটা জানবার জন্যে। আজ-কাল সব আইন বড্ড গোলমেলে তো। একটা ছাড়া দুটো থাকবার উপায় নেই।

চৈত্রের সকালটা আস্তে আস্তে ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। লীলার চারপাশে শুধু ছায়াছায়া সব দৃশ্য। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে শুধু বলল, অহীন? ও।

জগদীশ ঘড় ঘড় করে কাসল অথবা হাসল। হ্যাঁ, ভাগ্যিস ওর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে দেখা হয়েছিল সুখেনের। ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল ওখানে। ফেরার পথে দেখা হয়ে যায়। ঈশ্বরের কৃপা। আমি তো কম খুঁজিনি মামণি, একমাত্র মেয়ে। কী কষ্টে এতটুকুটি কোলে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম বর্ডার পেরিয়ে। সে কি আজকের কথা? মাথেকো মেয়ে বলেই অতটা প্রশ্রয় দিতাম। তবে এবার সব ঠিক করে ফেলেছি। আমিও জামাইয়ের ওখানে গিয়ে থাকব। শহরটা আর ভাল লাগছে না। এদিকে বয়সও হয়েছে। একটু বিশ্রাম দরকার।

লীলা দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়েছিল। আশা-প্রত্যাশার জ্বলন্ত একটা শরীর তার সামনে যেন ছটা বিকীরণ করছে। পা বাড়াবার মুহূর্তে সে বলল, সুখেনের একটা বৌ আছে বলে শুনেছি। সে কলকাতায় থাকে। আর......

জগদীশ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, আর কী মা?

সে রাত্রে চোরাজাগুলোর বস্তা আপনার দোকানের সামনে ফেলেছিল। সেটা কার পরামর্শে [illegible] আপনার অহীনবাবুর।

[illegible] লীলা হনহন করে [illegible]। [illegible] হাসি [illegible] জগদীশ তার [illegible] দাঁড়িয়ে রইল। কেন সে বলতে চাইছিল—তা হোক অহীনের মত উপকারী ছেলে হয় না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

অঙ্গনা

সেই রেওয়াজ

সেই প্রবাসী ভদ্রলোকের কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। প্রবাসেই তিনি একরকম পাকাপোক্ত। দেশটার নাম ইংল্যান্ড। দু-এক বছর ফাঁক দিয়ে কলকাতা ঘুরে যান। হাসি-মুখে বলেন, স্বাদ বদলাতে এসেছি। রহস্যটুকু নিজে থেকেই ফাঁস করে দেন, অবশ্যই দুঃখের। তেল-মশলা ছাড়া সব বিলিতী সেদ্ধ খাবার খেয়ে খেয়ে বাঙালী রসনাটা একদম বিদ্রোহ করে বসেছে। তাই দেশ ফিরে এলাম। টক-ঝাল-চচ্চড়ি খেয়ে আবার জিভটাকে শানিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু মুশকিল তবু আসান হলো না। দেশে ফিরেও বিদেশী খানার হাত থেকে রেহাই নেই। সবাই আদর করে খেতে বলে। আমিও খুশিমনে নেমন্তন্নে যাই। খেতে বসে এই খুশি খুশি ভাবটা উবে যায়। মাংস-কালিয়া-কোপ্তার সমারোহ দেখে মনটা বিগড়ে যায়, তবু খেয়ে যাই। কারণ এতে তেল-ঝালের সোয়াদটুকু যে আছে। মনটা অতৃপ্ত থেকে যায়। আসল দেশী খাবার কোথাও বড়-একটা পাই না। অবশ্য এতে দোষ কারোর নেই। আমাদের দেশে অতিথি আপ্যায়নের জন্য কে আর কবে মোচা ঘন্ট আর মুলো শাকের আয়োজন করেছে? সবাই নিজের সাধ্যমত ভাল-মন্দ আয়োজন করে। কেউ কেউ অবশ্য আমার মন বুঝে শাকটাকের ব্যবস্থাও করেন? কিন্তু মন আরো কিছু চায়। মাছ-মাংস তো ওদেশে নিত্য আহার্যের তালিকাভুক্ত।

কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলি, আপনার রসনা আরো কি দেশী খাবার সন্ধান করে ফেরে?

তিনি একটু হাসেন, বাঙলা দেশের মানুষ আমরা কিন্তু কেউ বাড়িতে খেতে ডেকে বড়ির ঝোল বা বড়ির শুক্তো পাতে দেয় না। অথচ এজন্য আমার কত আগ্রহ। সবাই মনে করে এতে বুঝি তাঁর মান খাটো হবে। দেশে ফিরে আমরা এসব খাবারই চাই। শুধু আমিই নই, প্রবাসী অনেককেই এরকম দেখবেন। সেদিন তাই একজন খাবার কথা বলতেই আমি বড়ির প্রসঙ্গ এনে সেভাবে রান্না করে খাওয়াতে বললাম। তিনিও বেশ খুশি-মনেই রাজি হয়ে গেলেন। কেউ কেউ হয়তো একে হ্যাংলামো বলবে কিন্তু এতে আমার রসনায় তৃপ্তি হবে সবচেয়ে বেশি। খাওয়াটাও হবে সুখের।

তারপরের গল্পটা অবশ্য আর শোনা হয় নি। সেদিন খাওয়াটা কতটা জমেছিল অথবা কতখানি সুখপ্রদ হয়েছিল সে তথ্যও অজ্ঞাত থাকলেও তাঁর বাসনা যে পূর্ণ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত বড়ি খাওয়ার কথায় সেরকমই মনে হয়েছিল।

শীতের চনচনে রোদ্দুরে প্রবাসী ভদ্রলোকের ব[illegible] খাওয়ার শখের কথা বারবার মনে পড়ছে। কারণ এই তো ব[illegible] সময়। বাড়ির বুড়ীর দল এ সময়টা বড়ি দেবার জন্য তৈরি করে রেখেছে। রোদ ভাল না হলে বড়ি ভাল হয় না। শ[illegible] মত আবহাওয়ায় রোদও পাওয়া যায় না। কলকাতা থেকে দূ[illegible]

সুমহান নট দানীবাবু

চিত্তরঞ্জন দাস

সুমহান নট দানীবাবু ওরফে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়ে গেল ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ বা ইংরেজী ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮-তে। বাঙলা দেশে এই প্রথম এমন একজন ব্যক্তির জন্মশতবার্ষিকী পালিত হ'ল, যিনি জীবিতকালে প্রভূত যশ আহরণে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্যাপারটা অভিনব।

দানীবাবু জন্মগ্রহণ করেন শ্যামপুকুরে (ফড়েপুকুরে?) তাঁর মাতুলালয়ে ১২৭৫ সালের ২৮ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর, ১৮৬৮) শনিবার। তাঁর জন্মের চার দিন কম চার বছর পরে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২-এ বাঙলার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। কিন্তু তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই দানীবাবুর পিতা নটগুরু গিরিশচন্দ্র শ্যামবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ গড়ে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ-এর ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে যশস্বী হয়ে উঠেন। বলা যেতে পারে, গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাধনায় প্রথম যুগেই দানীবাবুর জন্ম। এবং এরই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ দানীবাবু অতি শৈশব থেকেই নাটকের নেশায় [illegible]। না, লেখাপড়া তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। তিন তিনটে বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল দু' পাতা লেখাপড়া শেখবার জন্যে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক তাঁর যেন বিষ, বিদ্যালয় তাঁর কাছে কারাগারের তুল্য। অতএব ও-পাঠ তুলে দিতে হল।

পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেশে, সুযোগ পেলেই যাত্রা-থিয়েটার দেখে আর শোনা-পার্ট মনের মতো হ'লে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই আবৃত্তি করে বন্ধুদের মধ্যে বাহাদুরী দেখায়। বড়াই ক'রে বলে দেখিস, আমি বাপীর (গিরিশচন্দ্রকে দানীবাবু ঐ নামেই সম্বোধন করতেন) মতো অ্যাক্‌টো করব। হ্যাঁ, এই ছিল তাঁর আশা, এই ছিল তাঁর সাধনা।

তাই মাত্র দশ বছর বয়সেই বালক দানী তার সঙ্গীদের নিয়ে গ'ড়ে তুলল এক থিয়েটারের দল, নাম দিল তার—'পেনালোট গঙ্গা-নাটের থিয়েটার'। কাগজের ওপর আঁকা হল সিন-সিনারি; ছবি আঁকায় দানীর হাত ছিল ভালো। অভিনয় হল—'চিতোর রাজ' ও 'পদ্মিনী'। দানীবাবু এতে বাজালেন ঢোল। এর পরে অভিনীত হল 'লক্ষ্মণ-বর্জন'; দানীবাবু সাজলেন লক্ষ্মণ এবং তাঁর মামাতো ভাই চুনীলাল দেব সাজলেন রাম। ছেলেখেলার অভিনয়; কিন্তু এতেও বাহবা পেল দানী। বিভিন্ন শখের দলে সুযোগ পেলেই দানী অভিনয় করে। 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ সিরাজ-এর ভূমিকায় তার অভিনয় দেখে প্রেমানন্দ ভারতী সানন্দে বলেছিলেন Young G. C." (ছোট গিরিশ)।

দিন দিনই নেশা বেড়ে অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসুক হয়ে উঠল দানী। কিন্তু উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। গিরিশচন্দ্রের এতে ঘোরতর আপত্তি। ইতিমধ্যে দানীবাবু একটি দুষ্কার্য ক'রে বসেছেন; বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি পল্লীরই এক বাল-বিধবাকে নিজের জীবনসঙ্গিনী করে তুলেছেন। প্রয়োজনীয় [illegible] জন্যে অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে বাপের পকেট হাতড়াতে হ'ত। টের পেয়ে গিরিশচন্দ্র সখেদে বললেন। 'ছেলেটা শেষ পর্যন্ত চোর হল।' দানীবাবুর পিসিমা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন; অল্পবয়সে মাকে হারাবার পর থেকে তাঁর কাছেই লালিতপালিত হয়েছেন দানীবাবু। গিরিশ-শিষ্য অমৃতলাল মিত্রকে গোপনে ডাকিয়ে পিসি [illegible] বললেন: ওর একটা ব্যবস্থা করে দে; না কি শেষটা চোর-ডাকাত হয়ে জেলে যাবে?' পিসির কথায় কাজ হল। [illegible] থিয়েটারে তখন গিরিশচন্দ্রের [illegible] নাটকটি মহলায় পড়েছে। গিরিশচন্দ্রকে না জানিয়েই অমৃত মিত্র দানীবাবুকে [illegible] ভূমিকাটি শেখাতে লাগলেন। একেবারে ড্রেস-রিহার্সালে গিরিশচন্দ্র [illegible] দানীবাবুকে [illegible] মনে কি ভাব উদয় [illegible] [illegible] দানীবাবু সকলকে মুগ্ধ করলেন; সকলের [illegible]

প্রতিষ্ঠ হয়ে সে থাকতে চায় নি। কয়েকদিন পরে সুকুমার একটা ছোট চিঠি পেল। খুলে অবাক।

সুপ্রিয়...

তুমি সুখী হলে আমি সবচেয়ে বেশী সুখী হবো। আগেও বলেছি আমার কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করো, সাহায্যের জন্য আমি রইলাম।

ইতি—
সোনালী

আর কিছু লেখা ছিল না চিঠিতে।

সুকুমার সুখী হতে পেরেছিল কিনা জানা যায় নি। কিন্তু এটা ঠিক সুকুমারের আগের মত চপলতা নেই। যেন কেমন হয়ে গেছে। সবার অলক্ষ্যেও যেন কেমন পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করে। গ্রামের উন্মুখ পরিবেশের সঙ্গে তার মনও যেন উদাস হয়ে গেছে।

ও তো সবসময় ভাবে সোনালীর কথা। কিন্তু সে কথা তো সোনালী বিশ্বাস করবে না। আর সত্যিই তো সোনালী যদি তাকে বিশ্বাস না করে কিছুই বলার নেই সুকুমারের।

দিন, মাস ঘুরেছে, যেমন করে থেমে আছে সুকুমারের মন।

বর্ষাই বৈশাখ ফিরে এলো। মন-যন্ত্রণা সুকুমারকে টেনে নিয়ে গেল সেই সৈকতে।

সোনালীদের বাড়ী আজ সাজানো, আলোর ঝলমলানি দেখে সুকুমারের মুখে হাসি ফুটেছে। তা হলে কি সোনালীর বিয়ে? আর একটু আগিয়ে গেলে সৈকত। সুকুমার খুব খুসী। সোনালী সুখী হোক, মনে মনে এই কামনাই করল সুকুমার।

কিন্তু ও কি! পরনে সুন্দর শাড়ী পরে ওখানে কে?

বোধ হয় অন্য কেউ অভিসারে এসেছে।

কিন্তু না সুকুমারের মুখ রক্তহীন রোগীর মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সুকুমার বলতে পারল না, 'বিশ্বাস কর সোনা, এমন একটি মুহূর্তও যায় নি যে তোমার কথা ভাবি নি। শুধু তাই নয় শুভদৃষ্টির শুভক্ষণে তোমার মুখ ভেসে উঠেছিল। আমার সামনে।'

কিন্তু না, কোন কথাও সোনালী বলেনি। বলেনি পুরুষ মানুষ বিশ্বাসঘাতক; তোমার জন্য আমার জীবন মরুভূমি হলো, এ কথাও শোনেনি সোনার মুখ থেকে।

বললে বোধহয় সুকুমারের পক্ষে ভাল হতো। খানিকটা হাল্কা হতে পারত।

'একটা অনুরোধ, প্রতিবৎসর আজকের দিনের মত তুমি এখানে আসবে তো?'

সোনালীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত ক্ষমতা সুকুমারের ছিল না।

ভাষাহীন হয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। মনে হচ্ছিল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন আসামীর কথা। আসামীর ধরে নেওয়া সিদ্ধান্তকে যেন বিচারক নাকচ করে দিয়ে বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের মত সোনা বলে উঠলো, 'কথা দাও আসবে তো?'

'আসব', বহু কষ্টে সুকুমার উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু সুকুমার যেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই সোনা বলে উঠলো, 'যাই, ছোট বোনের বিয়ে। আবার হয়তো খোঁজ খবর পড়ে যাবে এখুনি।'

সুকুমার বসে পড়ল। আপন মনে কি যেন ভাবছিল। ও-পারে ছোট ছোট কুটীরগুলিতে এক এক করে জ্বলে ওঠা আলোগুলো যেন তারার মেলা।

রাত্রির গভীরতা বুঝতে পারেনি সুকুমার।

সোনালী আবার আসবে এ কল্পনাও করতে পারেনি সুকুমার।

'রাত অনেক হয়েছে বাড়ী যাবে কি করে?' সোনার সেই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর।

স্ট্রীট লাইট থেকে ছিটকে পড়া আলোয় ঘড়িটা দেখল সুকুমার। শেষ লঞ্চ অনেক আগেই চলে গেছে। আজ আর তার বাড়ী যাওয়া হবে না।

সোনা তার পাশেই বসে পড়ল। অস্ফুটস্বরে সুকুমার বলে উঠলো, 'এ রাত যেন না পোহায়, যেন ভোর না হয়।'

ওপরের সীমাহীন নীল আকাশ যেন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তির জন্য নির্বাক হয়ে প্রশান্তির কোলে বিশ্রাম নিচ্ছে।

নতুন ঠগী

কোন এক ইংরাজী দৈনিকে বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল, যার সারমর্ম ঃ

"চালাক চতুর ছোকরা আবশ্যক। গ্র্যাজুয়েট, বা অটোমোবিলে ডিপ্লোমা অথবা যে কোন প্রকার কারিগরী জ্ঞান দিলে পক্ষে কিছুটা মাল বিক্রির অভিজ্ঞতা। আমেরিকার জগৎ-বিখ্যাত মোটর-ব্যাটারীর এ্যাসিডের ভারতীয় ডিস্ট্রিবিউটর ও প্রস্তুতকারক। কোম্পানীর সেলস অফিসর পদে লোক নেওয়া হবে। শিক্ষানবিশ কালে বেতন মাসিক চারশ টাকা। চাকুরীতে পাকাপাকিভাবে বহাল হলে বেতন হবে মাসিক সাতশ টাকা।" তার কোম্পানীর নাম ও পোস্ট বক্স নম্বর।

রবিবারের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের একটা কোণে পড়েছিল। চোখে পড়তেই পরম আদরে দাঁড়ি কামানোর ব্লেড দিয়ে নিপুণ ভাবে চেঁছে তুলে নিল সুশীল। বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সুশীলের জুড়ি নেই। গত দেড় বছর প্রায় হাজার খানেক চাকরীর বিজ্ঞাপন যোগাড় হয়েছে। গোড়ার দিকে কিছু ফেলে দিয়েছিল। আজকাল ফোটোর অ্যালবামের মত একটা ঢাউস পেট মোটা খাতায় আঠা দিয়ে সব সেঁটে রাখে। কখন কোনটার উত্তর এসে যাবে, যদি ভুল হয়ে যায়। কাটিং মিলিয়ে নিলে কোন গন্ডগোল নেই।

সিভিল ইনজিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস করে প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনসটিটিউটের ইনসট্রাকটর, পিম্প্রির পেনিসিলিন ফ্যাক্টরীর কেমিস্টের পদ, অ্যাপ্লাই করতে কিছু আর বাকি রাখে নি। গড়ে মাসে স্ট্যাম্প, রেজিসট্রেশন ফি, পোস্টাল অর্ডার, টাইপিং খরচ ধরে প্রায় টাকা চল্লিশেক বেরিয়ে যায়। হায়ার সেকেন্ডারীর একটা ছেলেকে সপ্তাহে দুদিন পড়িয়ে যা পায় তাতেও কুলোয় না। মার কাছে শেষের দিকে হাত পাততে হয়।

ট্রেনি অবস্থায় চারশ আর পাকাপাকি-ভাবে বহাল হলে সাতশ টাকার মাস মাইনের চাকরী। সেদিনই ম্যাটিং টাইপিং শেষ করে চিঠিটা লাল বাক্সের মুখটা গলিয়ে ভেতরে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুশীল। সাধারণত এসব বেশী মাইনের চাকরী তাদের জন্য নয়। যাদের ব্যাকিং থাকে তাদেরই হয়। প্রথম প্রথম নিজের ওজন বুঝে অ্যাপ্লাই করত। আজকাল কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না। জানে এমনিতেও হবে না ওমনিতেও হবে না। তবে আর চান্স নিতে ক্ষতি কি।

কফি হাউসে বিকালে বন্ধু বান্ধবরা আসে। আসে সবাই। ১৯৬৪তে সিভিলের ব্যাচে ওরা নব্বইজন ভর্তি হয়েছিল। জনা দশেক চাকরী পেয়েছে। বাদ বাকি সবাই ভোরে উঠে ইংরেজী দৈনিকগুলির বিজ্ঞাপনের পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। দুপুরে খেয়ে দেয়ে কলেজ স্কোয়ার বা শ্যামবাজার বা ভবানীপুরের টাইপের দোকানে থার অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করছে। দুটোর মধ্যে পোস্ট অফিসের কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর এক অফুরন্ত অখণ্ড অবসর।

তাই অনেকদিন আরপর্লি লেনের মর্নিং ওয়াক ছাড়িতে ছাটতে চলে আসে ভবানীপুরের যে দোকানে সুশীল টাইপ করায়। তারপর দুজনে ঘণ্টা দেড়েক রাস্তায় কাটিয়ে পড়ন্ত বিকেলের মায়ায় কফি হাউসে আড্ডা দেয়। এই ভাবেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে এসে খুঁজতে পারে কোন বিজ্ঞাপনটি কে দিল করেছে। খবর পায় কার অ্যাপ্লিকেশনের কি রেজাল্ট হল। খবরটা সুশীল চেপে গেল। দেখল কারুরই চোখে বিজ্ঞাপনটা পড়ে নি। কেউ আলোচনা করল না। শুধু হাসি ঠাট্টা হল দলের একজনের বেশ্যার খাতার গল্প নিয়ে।

দিন চারেক পরেই ভোরের ডাকে বেশ বড় একটা খাম এল। খামের উপরে কোম্পানীর নাম, ঠিকানা ছাপানো। নীচে ডান দিকে টাইপ করা—সুশীলকুমার মিত্র, ‘—’ রাহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা—২৬। বাঁ দিকে একটা ব্যাটারীর ছবি, উপর থেকে অ্যাসিড ঢালা হচ্ছে আর দুনম্বর একসারসাইজ বুকের ছাপানো সূর্যোদয়ের ছবির মত ব্যাটারীর চার দিক থেকে জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে। ছবির তলায় অ্যাসিডের বিস্তারিত গুণাগুণ—তাতে বলা হয়েছে, এর সারা পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশ লাখ মোটর চালক এই বিশেষ অ্যাসিডটি ব্যবহার করে খুশী হয়েছেন।

খামটা হাতে নিয়ে রীতিমত উত্তেজিত বোধ করছিল সুশীল। এত টাকা মাইনের চাকরী তার হওয়ার নয়। রিগ্রেট লেটার বড় কোম্পানীগুলি বাহুল্য বিবেচনায় আজকাল আর পাঠায় না। আস্তে আস্তে খামটার মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে চিঠিটা বার করল।

ভাঁজ করা দামী কাগজ। ভাঁজ খুলতেই নিখুঁত টাইপ করা চিঠিটা চোখে পড়ল। বাঁ দিকে উপরে ফ্যাকটরীর ঠিকানা ও কোম্পানীর মনোগ্রাম। ডান দিকে উপর থেকে নীচে পর পর সাজানো অফিসের ঠিকানা, টেলিগ্রাম কোড এবং তারিখ। বাঁ হাতে রেফারেন্স নাম্বার। ঠিক তার তলায় নিজের নামটা জ্বলজ্বল করছে। আর উদ্দেশ্য করেই চিঠিটি লেখা হয়েছে বিষয়ের জায়গায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা রয়েছে—আপনার আবেদনক্রমে জুনিয়র সেলস অফিসার হিসাবে নিয়োগ।

নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। চারশ টাকার মাস মাইনে চাকরী তার হবে—এ কল্পনার অতীত উত্তেজনায় সারাটা শরীর থর থর কাঁপছে। একটু একটু করে চিঠিটা পড়তে লাগল—

"আমরা অত্যন্ত আনন্দের স... আপনাকে জানাচ্ছি যে, মাসিক চারশ টা... বেতন ও ভাতার জুনিয়র সেলস অফিসার পদে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন। আপন... অবগতির জন্য এই সঙ্গে খসড়া নিয়ো... পত্র পাঠালাম। যদি আপনি এই সুযো... গ্রহণ করতে রাজি থাকেন তাহলে স... সঙ্গে আমাদের টেলিগ্রাম করে জা... যাতে নিয়োগপত্র এবং তৎসহ আপ... শিক্ষানবীশ কালীন প্রয়োজনীয় 'সাহি... প্রেরণ করতে আমরা সক্ষম হই। দয়া ক... মনে রাখবেন এই খসড়াই চূড়ান্ত। এ... কোনরূপ অদলবদল কোম্পানী গ্রহ... করবে না।"

কে চাইছে অদলবদল করতে। কে... কাকে দয়া করছে? বড় কোম্পানীর ভদ্রতা... বিমূঢ় হয়ে পড়ে সুশীল। এই সুযোগ... গ্রহণ করতে রাজি থাকেন মানে?—... এক্ষুণি রাজি। আর এক মুহূর্তও দের... নয়। পত্রপাঠ টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। ম... মনে স্থির করে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ পড়... শুরু করে—

"এই সঙ্গে আমরা আমাদের উ... পাদনের এক সেট পূর্ণ 'সাহিত্য' পাঠা... যার সাহায্যে এর গুণাগুণ ও বাজা... চাহিদা সম্পর্কে আপনার সম্যক ধার... হবে। আমাদের অন্যান্য উৎপাদনগু... প্রায় প্রস্তুত ও কয়েকদিনের মধ্যেই বাজা... ছাড়া হবে। সে সব দ্রব্যও আপনার ... কোটার অন্তর্ভুক্ত হবে।"

কে এখন ঐ সব সাত আট পা... কুদে কুদে টাইপে ছাপানো ব... অ্যাসিডের গুণাগুণ পড়ে। ... হয়েছে এই যথেষ্ট। কাজে নামলে ... সবই আস্তে আস্তে জানা হবে। গাটা ... অবশ লাগছে সুশীলের। ট্রেনিং পিরি... চারশো, ট্রেনিং শেষে মাসে সাত শো। ... দেড় বছরের চাকরীর অ্যাপ্লিকেশনের ... একমাসের মাইনেতেই উঠে আসবে। ... প্যারাগ্রাফটা পড়তে শুরু করে—

"চাকরী গ্রহণের টেলিগ্রামে ৫৫... (পেতাল্লিশ টাকা মাত্র) ...

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[উনিশশো চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতা থেকে বিনু এল দাদু হেমনাথের বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা ও সুনীতি। আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। কাঁধে তাঁর গোটা রাজদিয়ার ঝামেলা। আরো আশ্চর্য তাঁরই বন্ধু ল্যারমোর। সাদা-সিধে, প্রাণবন্ত। আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে খৃষ্টধর্মের প্রচার করতে এসে শুধু বাঙলার মাটি আর মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছেন।

ল্যারমোর বিনুর বিস্ময়, আর যুগলের সঙ্গে বিনুর মধুর মতো ভালোবাসা। বিনু ঘুরে বেড়ায় রাজদিয়া। শুধু তাই নয়, নৌকোয় চেপে সুজনগঞ্জের হাটও দেখা হয়ে গেছে তার। অদ্ভুত অনুভূতি।

একদিন সকাল বেলা। ঠাট্টা মস্করা চলছে। ছোট্ট দেওর 'দুরখী' [illegible] রয়েছে। এমন সময়ে শিশির এল।]

(আটার)

হেমনাথ বললেন, 'এখানে না। চল ঘরে গিয়ে বসি—'

শিশিরদের সঙ্গে নিয়ে সামনের বড় ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলেন হেমনাথ। স্নেহলতা-সুরমা-অবনীমোহনরাও পিছু পিছু এলেন। সুধা-সুনীতি, ঝিনুকে কিংবা বিনু বাইরে বসে থাকবে না ; তারাও এল।

স্নেহলতা-শিবানী শিশিরকে চেনেন, স্মৃতিরেখাকে চেনেন, রুমা-ঝুমাকে চেনেন। না চিনে যাবেন কোথায়? এই রাজদিয়া-রই তো ছেলে শিশির ; ছেলেবেলা থেকে তাঁকে দেখে আসছেন। চাকরির খাতিরেই না হয় কলকাতার দেশছাড়া শিশির।

স্নেহলতা আনন্দকে চিনতেন না ; হেমনাথ তাঁদের সঙ্গে আনন্দর পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুরমা কাউকেই চেনেন না ; তার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। আর অবনীমোহনের সঙ্গে শিশিরদের তো আগেই আলাপ হয়ে গেছে।

এ ঘরে চারধারে তক্তপোষ পাতা, হেমনাথ বললেন, বোসো সব, বোসো—'

সবাই বসলে শিশির স্নেহলতা-শিবানীর উদ্দেশে বললেন, 'কেমন আছেন পিসিমা? কেমন আছেন জেঠাইমা?'

শিবানী বললেন, 'ভাল আছি বাবা। তোরা সবাই ভাল তো?'

শিশির বললেন, 'হ্যাঁ।'

স্নেহলতা বললেন, 'আমি কিন্তু ভাল নেই শিশির।'

ঈষৎ উদ্বেগের সুরে শিশির শুধালেন 'কেন?'

'ছেলেরা যদি দেশের বাড়ি ছেড়ে দূরে গিয়ে থাকে, মা-মাসিরা ভাল থাকতে পারে না?'

মুখখানা কাচুমাচু করে শিশির বললেন, 'কী করব ; চাকরি চাকরির জন্যেই দূরে গিয়ে থাকতে হয়। নইলে আপনাদের ছেড়ে কলকাতায় থাকতে কি আমার ভাল লাগে?'

স্নেহলতা হাসলেন, 'বুঝলাম।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোর ওপর আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি।'

শিশির উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলেন, 'কেন?'

'খবর পেয়েছি চার পাঁচ দিন আগে রাজদিয়া এসেছিস। আজ আমার সঙ্গে দেখা করার সময় হল বুঝি?'

বিব্রতভাবে শিশির বললেন, 'রোজই ভাবি আসব। বেরুবার মুখে কেউ না কেউ এসে পড়ছে; আসাই আর হচ্ছে না। আজ তাই ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে পড়েছি।'

শিবানী বললেন, 'কেউ এসে পড়বার আগেই ; না রে?'

শিশির হাসলেন, 'হ্যাঁ।'

স্নেহলতা কিন্তু এই কৈফিয়তে খুশী হলেন না। অভিমানের সুরে বললেন, 'দায় সারতে যখন এসেছিস তখন বোস, আমি আসছি।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দুপুরবেলা দয়া করে এখানে দুটি খেয়ে যাবার সময় হবে তো?'

তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে শিশির বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি না বললেও খাব। না খেয়ে এখান থেকে যাচ্ছি না?'

খুব ব্যস্তভাবে এইসময় স্মৃতিরেখা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিলেন শিশির।

আর কিছু না বলে স্নেহলতা চলে গেলেন। তখন আস্তে আস্তে স্মৃতিরেখা বললেন, 'তুমি কী বল তো! আজ এখান থেকে বেরিয়ে গুহদের বাড়ি যাবার কথা নয় না? সেদিন ওরা বার বার করে বলে গেল?'

শিশির বললেন, 'এখান থেকে না খেয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই। গুহদের বাড়ি আরেকদিন যাওয়া যাবে।'

'বেশ বললে! ও'রা আমাদের জন্যে বসে থাকবেন না?'

'আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলে শিশির হেমনাথের দিকে তাকালেন, 'জেঠা-মশায়, আপনাদের সেই ছেলেটা কোথায়? কী যেন নাম—'

হেমনাথ বললেন, 'যুগলের কথা বল-ছিস?'

'হ্যাঁ, যুগল—'

'ওকে হিরণদের বাড়ি পাঠিয়েছি। অনেকক্ষণ গেছে ; এখুনি ফিরে আসবে।'

হেমনাথের কথা শেষ হতে না হতেই যুগল এসে পড়ল। ছুটতে ছুটতে এসেছে ; খুব হাঁপাচ্ছিল। বলল, 'হিরণ-দাদায় বাড়িতে নাই।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'গেছেন কোথায় যাবু?'

'বিষ্যুদবার ঢাকায় গেছে ; আইজ তরি ফিরে নাই।'

'কবে ফিরবে, বলে গেছে?'

'না।'

হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা, এখন শিশির কী বলছে শোন—'

শিশির যুগলকে গুহদের বাড়ি পাঠালেন। বলে দিলেন, দু-তিন দিন পর তাঁদের এখানে যাবেন। আজ যাওয়া হচ্ছে না।

একটু পর বড় বড় কাঁসার থালায় চিড়ের মোয়া, মুড়ির মোয়া, কলা, নারকেল কোরা, সন্দেশ আর [illegible] নিয়ে [illegible] এলেন স্নেহলতা। [illegible] [illegible]

...মনে হচ্ছে অদূরে দরজায় কাছটায় ... তাকাল বিনু। দেখল, সুধা-সুনীতির ... হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার দিকেই তাকিয়ে আছে ঝিনুক; চোখের পাতা পড়ছে না ... রয়েছে।

ঝুমা গম্ভীর গলায় বলল, 'একদিন ... চিনে রাখা যায়। এই যে আজ ... বাড়ি এলাম, আর আমাকে চিনিয়ে ... হবে না। দেখবে, ঠিক চলে এসেছি।'

ঝিনুকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ... বলল, 'দাদুকে বলব, তোমাদের বাড়ি ... যেতে—'

চোখ বড় বড় করে টেনে টেনে ঝুমা ..., 'এ মা—'

বিনু অবাক। বলল, 'কী হল?'

বুড়ো ধাড়ি ছেলে হয়েছ! একা একা ...তে পারবে না! আবার দাদুকে সঙ্গে ...!' নাক কুঁচকে ধিক্কার দিয়ে দিয়ে হেসে ... ঝুমা।

মুখ লাল হয়ে উঠল বিনুর। কী বলতে ... করল সে, পারল না।

এদিকে আনন্দের খাওয়া হয়েছে গিয়ে... অবনীমোহন যেন উন্মুখ হয়েই ...লেন। বললেন, 'শিকার-কাহিনী শুরু ... ভাই—'

ঝুমা বিনুর দিকে আরেকটু এগিয়ে ...সে নীচু গলায় ডাকল, 'এই—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বিনু।

আগের স্বরেই ঝুমা বলল, 'চল, ...রা পালাই—'

আধফোটা গলায়, বিনু শুধলো ...থায়?'

'ঐ বাগান-টাগানে—' সামনের দিকে ...ঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

'শিকারের গল্প শুনবে না?'

'আমরা ঢের শুনেছি।'

বিনুর যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে ..., 'আমি তো শুনিনি।'

'তোমাকে পরে বলে দেব। এখন ওঠো ...—' ঝুমা তাড়া লাগাল, 'ওঠো না—'

বিনু উঠতে যাবে, তার কানে ঝুমা ...ফিস করল, 'মামার গল্প একদম ...বাস করবে না।'

অপার বিস্ময়ে বিনু বলল, 'কেন?'

'দিদি বলে, মামা কোনদিন ... নি।'

আড়চোখে একবার ঝুমাকে দেখে নিয়ে ... বলল, 'তা হলে এই সব গল্প—'

'একেবারে গাঁজা। বানিয়ে বানিয়ে বলে। ... এখন চল—'

ঝুমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বিনু। ... যেতে দরজার কাছটায় এসে লক্ষ করল, ...ক সেইরকম পলকহীন তাকিয়ে ...। তার পাশ দিয়ে বিনুরা উঠোনে ... গেল।

উঠোনের শেষ মাথায় এসে ... ..., আড়চোখে তার পিঠটা ... ... যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতেই ...তে পেল, কেউ না। ... ...

ঝিনুক; সেই একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে, এখনও মেয়েটার চোখে পলক পড়ে নি।

বাগানে এসে ঝুমার সঙ্গে ছোটাছুটি করে ফড়িং ধরল বিনু। কোথায় কোন অলক্ষ্যে বসে ঝিঁঝিরা একটানা করুণ সানাই বাজিয়ে যাচ্ছিল; তাদের খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল; পারল না অবশ্য। করমচা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ল রাশি রাশি; জামরুল পাতা কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে লাগল। ডুমুর গাছের মগডালে জোড়া জোড়া মোহনচূড়া পাখি বসে ছিল, তাদের ঢিল ছুঁড়ল। অনেক উঁচুতে সুপারি গাছের মাথায় বসে ছিল কয়েকটা হলদিমনা। সবটুকু জোর দিয়ে ঢিল ছুঁড়েও যখন নাগাল পাওয়া গেল না তখন হুস্ হুস্ শব্দ করে চেঁচিয়ে তাদের উড়িয়ে দিল।

গাছপালা তছনছ করে পতঙ্গ আর পাখিদের রাজ্যে আতঙ্ক ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ ঝুমার নজর গেল পুকুরঘাটের দিকে। খুশী গলায় সে চেঁচাল, 'এই—'

'কী?' বিনু তাকাল ঝুমার দিকে।

'ঐ দ্যাখো কি মজা!' বলে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

বিনু দেখল, পুকুরঘাটে একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে—নতুন নৌকো। কাল হাট থেকে হেমনাথ এটা কিনে এনেছেন।

হাততালি দিতে দিতে ঝুমা বলল, 'চল, নৌকো চড়ব—'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'নৌকো তো চড়বে, চালাবে কে?'

'কেন, তুমি আর আমি।'

'আমি নৌকো চালাতে পারি না।'

'আমিও পারি নাকি?'

'তাহলে?'

'চালাতে চালাতে শিখে যাব।'

ঝুমার তর সইছিল না। বিনুর একটা হাত ধরে টানতে টানতে অস্থির গলায় বলল, 'চল না—'

ঝুমার সঙ্গে যেতে যেতে বিনু বলল, 'যদি আমরা নৌকো থেকে জলে পড়ে যাই?'

'পড়ে গেলে সাঁতরে উঠে পড়বে। তুমি সাঁতার জানো না?'

এইটুকুন পুঁচকে মেয়েটা সাঁতার জানে, আর সে জানে না—এই কথাটা কিছুতেই বলতে পারল না বিনু। মনে ভাবল, সুগলাকে আর ছাড়াছাড়ি নেই, সাঁতারটা তাকে শিখে নিতেই হবে।

বিনু সাঁতার জানে কি জানে ...-শুনবার সময় নেই ঝুমার। জোর করে মেয়েটা তাকে নৌকোয় তুলল। তারপর দড়ির বাঁধন খুলে বৈঠা দিয়ে অপটু হাতে চালাতে শুরু করল।

জল ঠেলে ঠেলে ... ... নিয়ে এল ঝুমা।

এর আগে যদিও একবার নৌকোয় উঠেছে তবু ভয় করতে লাগল বিনুর। সে পাটাতনের মাঝখানে কাঠ হয়ে বসে আছে। আশ্বিনের শান্ত জলেও নৌকোটা টলমল করছে।

ঝুমা বলল, 'ভারি মজা, না!'

বিনু চুপ।

ঝুমা বলল, 'জানো, আমি প্রথম নৌকোয় চড়লাম। তুমি এর আগে চড়েছ?'

বিনু আস্তে করে বলল, 'চড়েছি।'

হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে ঝুমা বলল, 'বা রে, আমি একা একাই বাইব নাকি? তুমি একটা বৈঠা নাও।'

কথামতন আরেকটা বৈঠা তুলে নিল বিনু। ঝুমা নামের এই মেয়েটা সাংঘাতিক; কিছুতেই তার অবাধ্য হওয়া যায় না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সে যা বলে তা না করে যেন উপায় নেই।

দুই অপটু মেয়ে সমানে বৈঠা চালাচ্ছে। বাইতে বাইতে বিনুর মনে হল, ঝুমা তাকে গভীর জলের কোন অজানা রহস্যের দিকে নিয়ে চলেছে।

(ক্রমশঃ)

হাসির মজলিস

কণ্ডাকটার ভদ্রলোক বলছিলেন, জানেন আজ রাসবিহারীর মোড়ে এক মহিলা আমার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

সহযাত্রী গণেশচন্দ্র শর্মা বললেন, কিছুই অন্যায় নয়। কারণ মহিলা ভেবেছিলেন ওটা ও'র স্বামীর পকেট।

●

রিপোর্টার—আমি খুব দুঃখিত, আপনার বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারিনি।

অভিনেত্রী—দুঃখ করবার কি আছে। পরের বার নিশ্চয় আপনি আসবেন।

●

অভিনেতা—তাহলে আমাদের কনট্রাক্ট ফর্মে একটা সই করা দরকার।

প্রযোজক—কি দরকার। মৌখিক কনট্রাক্টই যথেষ্ট।

অভিনেতা—আগের বারও মৌখিক কনট্রাক্ট হয়েছিল। কিন্তু টাকাটাও মৌখিক পেয়েছিলাম কিনা।

●

রাস্তায় দেখা দুই ভদ্রলোকের। দুজনই স্কুল শিক্ষক।

১ম জন—কি খবর, কেমন চলছে?

২য় জন—আর চলছে। চাকরি এখন থাকলে হয়!

১ম জন—কেন কি হয়েছে?

২য় জন—ছেলেমেয়েরাই আর আসছে না ভর্তি হতে। সরকারী ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কৃপায় স্কুল তো এখন ওঠবার মুখে।

●

মিঃ দত্ত—আমাদের পাওনা টাকাটা এবার দিচ্ছেন তো?

মিঃ ঘোষ—না স্যার, কয়েকদিন অপেক্ষা করুন।

মিঃ দত্ত—সে কি! আপনাকে জানিয়েছিলাম আমাদের টাকার খুব দরকার। কালকের মধ্যে না দিলে, আপনার কাছে যারা টাকা পাবে সবাইকে জানিয়ে দেব, আমাদের টাকা আপনি দিয়ে দিয়েছেন।

লন্ড্রীর মালিক সকালে দোকান খুলে দেখে দোকানের সামনে এক গাধা মরে পড়ে আছে। দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ল সে।

সঙ্গে সঙ্গে গেল পুলিসের কাছে। উপস্থিত পুলিস সার্জেন্টকে ব্যাপারটা জানালো। শেষে জানতে চাইল, স্যার এখন আমি কি করতে পারি?

পুলিস ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—আপনার কর্তব্য ওটার সৎকার করা। তাছাড়া আপনি একজন লন্ড্রীর মালিক তো বটে।

—তা তো নিশ্চয়।

—তবে আপনার কর্তব্য আপনি করুন।

লন্ড্রীর মালিক পুলিসের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকে বলল—দেখুন স্যার আমার কর্তব্য, আগে ওর আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া।

●

পরিচালক—দারুণ হয়েছে আপনার অভিনয়। ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে।

অভিনেত্রী—আরে মশাই আমি তখন মরে যাচ্ছিলাম, আমার দু'পায়ের নিচে জুতোর কাঁটা বিঁধে গিয়েছিল।

পরিচালক—দয়া করে কাঁটা দুটোকে ওই জায়গাতেই রেখে দিন। পরের দৃশ্যের শুটিংটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

●

—কি দাদা, এর মধ্যেই বুড়ো হয়ে গেলেন?

—প্রায়।

—বয়স কত হোল?

—ঠিক জানি না।

—কেন? নিজের বয়সটা জানেন না?

—কি করে জানব, জন্মাবার সময় তো আমার জ্ঞান ছিল না।
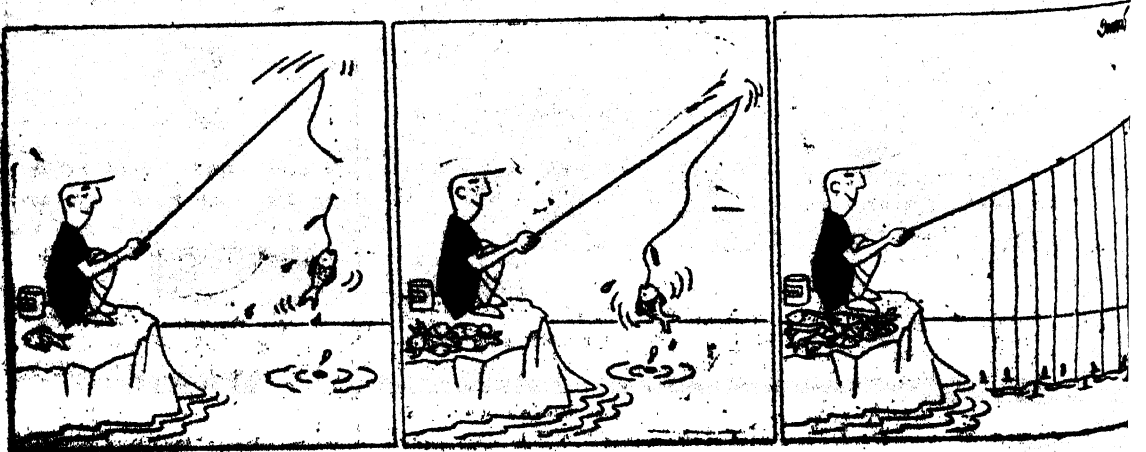
আপনার ঘুম ভালো হয় না?

ঘুম নিয়ে গবেষণার বড় ধুম পড়েছে। নিউইয়র্কে তো একটা 'স্লিপ রিসার্চ ফাউণ্ডেশন'-ই গড়ে উঠেছে। কেন আমরা ঘুমোই? না ঘুমিয়ে পারি না কেন? অনেকে আবার ঘুমোতে চাইলেও ঘুমোতে পারে না কেন? না ঘুমোলে সত্যিই কি কোনো ক্ষতি হয় আমাদের?...এমনি নানা ধরনের প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা চলেছে মনোবিজ্ঞানীদের দপ্তরে।

মনোবিদরা বলছেন, আমাদের সর্বাঙ্গে অনেক সংবেদন-গ্রাহক স্নায়ু আছে, সেগুলির মাধ্যমে কতরকম খবর গিয়ে অনবরত আঘাত করে চলেছে মস্তিষ্কটিকে। মস্তিষ্কে দুটি প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আছে যার কাজ হলো যে-সব খবর আসছে সেগুলিকে সুস্পষ্ট করে তোলা এবং ক্ষীণ বার্তাকে জোরালো করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। এই কেন্দ্র দুটির একটি হলো হাইপোথ্যালামাস, অন্যটিকে বলা হয় রেটিকিউলার ফরমেশ্যান।

এই দুটি স্নায়ু কেন্দ্রের কনট্রোল গ্রাহক-স্নায়ুর বার্তা এমনিভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে, বার্তার কম্পনক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তার ফলে বার্তাটি সুস্পষ্ট জোরালো হয়ে মস্তিষ্কে সাড়া জাগাতে পারে। মস্তিষ্কের ঠিক জায়গায় বার্তাটি সুস্পষ্ট সাড়া জাগাতে পারলে তবেই মস্তিষ্ক তার জবাব দিতে পারে এবং সেই জবাবের ফলেই আমাদের সচেতন আচরণ সৃষ্টি হতে থাকে।

মস্তিষ্কে এইভাবে বার্তা দেওয়া-নেওয়া চলে, একথা আজকাল প্রায় সকলেই জানেন। মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, মানুষের জেগে-থাকা অবস্থায় ঐ দুটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র— হাইপোথ্যালামাস এবং রেটিকিউলার ফরমেশান—খানিকক্ষণ বার্তা পাঠানোর কাজ করতে করতে বন্ধ করে দেয়। তখনও দেহের গ্রাহক-স্নায়ুগুলির থেকে কোনো বার্তা সৃষ্টি হয়ে সোজাপথে মস্তিষ্কে পৌঁছতে থাকে ঠিকই, কিন্তু ক্ষীণ বার্তাকে জোরালো করে তোলার কাজটা একেবারে বন্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের অস্পষ্ট ক্ষীণ বার্তা মস্তিষ্কের সাড়া জাগাতে পারে না বলে জবাবও পায় না। এই ব্যাপারটা যখন ঘটে, তখন আমরা ঘুমোই।

কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি জগতের সব ব্যাপারে একেবারে সংবেদনহীন হয়ে থাকেন না। খুব জরুরী কোনো বার্তা এলে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলি জেগে উঠে চটপট কাজ সুরু করে দেয় এবং বার্তাকে জোরালো করে দিয়ে ব্রেনে পাঠিয়ে দেয়। তার, সেই জরুরী বার্তা যদি সত্যি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ হয়, মস্তিষ্কে চাপ সৃষ্টি করে, তাহলে মস্তিষ্ক উচিতমতো জবাব দিয়ে দেয় এবং দেহকে যথাযথ কাজ করবার নির্দেশও দেয়।

আপনি এতো কথা শুনে হয়তো বলবেন, 'বাঃ, বেশ বেশ, শুনতে খুব ভালো লাগলো, কিন্তু রাত্তিরে আমি কি করে শান্তিতে ভালোভাবে ঘুমোতে পারি, বলতে পারেন?'

তাহলে জানতে হবে, আপনি কেন ভালভাবে ঘুমোতে পারছেন না। সেটা জানতে হলে ওপরের কথাগুলি মনে রাখুন এবং নীচের প্রশ্ন কটিতে কেবল 'হ্যাঁ' 'না' জবাব দিয়ে যান।

১। শীত-শীত করছে বলে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসেন কি?

২। রাত দুটো-তিনটের সময়ে দারুণ ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় কি?

৩। যখন শুতে যান, তখন মাথার মধ্যে নানা জিনিস বোঁ বোঁ করে কি?

৪। বিছানায় শুতে যাবার সময় খুব ক্লান্তি বোধ করেন কি এবং ঘুমোবেন বলে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে আরাম করা সত্ত্বেও ঘুমোতে পারেন না, হঠাৎ কি সব যেন করতে হবে মনে হয় কি?

৫। গরমকালে গভীরভাবে ঘুমোতে কোনো অস্বস্তি বোধ করেন কি?

৬। বিছানায় কি-সব নড়েচড়ে চলে বেড়াচ্ছে বলে মাঝে মাঝে মনে হয় কি? অর্থাৎ অস্বস্তিতে মাঝে মাঝে গা-হাত-পা-মাথা চুলকোতে ইচ্ছে হয় কি?

৭। বিছানায় শুয়ে আপনি কি কখনো দরকারী বিষয় এবং মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন?

৮। আপনি কি রাত দশটার পরেও জটিল সমস্যা আঁকড়ে ধরে সমাধানের চেষ্টা চালাতে থাকেন?

৯। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুয়ে শুয়ে আপনি মজার গল্প পড়েন?

১০ আপনি কি বদহজমে ভোগেন?

উত্তর

এবার বিশ্লেষণ করা যাক

যদি আপনি সাতটি কিংবা তারও বেশি প্রশ্নে হ্যাঁ জবাব দিয়ে থাকেন, তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, আপনার ঘুম খুবই খারাপ, এবং তার জন্য দোষ দিতে হবে শুধু আপনাকেই।

শুতে যাবার আগে খুব বেশি খাবার-দাবার খেলে হজমের ওপর বড় চাপ পড়ে; গভীর রাত্রে ক্ষুধার জ্বালা থেকে ঘুমের ব্যাঘাত বন্ধ করতে হলে কিছু হাল্কা জলখাবারের মতো জিনিস রেখে দিলে চলে। এক গ্লাস মিষ্টি গরম দুধ খেলেও ঘুমের সুবিধে হয় খুব।

টাকার দুশ্চিন্তা হলো সবচেয়ে খারাপ শত্রু ঘুমের। আর-একটা হলো বয়স। বয়স বাড়তে থাকলে আপনি বিচলিত হয়ে পড়তে থাকেন। ডাক্তাররা বলেন, উদ্বেগ দুশ্চিন্তা এসব শুধু ব্রেনেই থাকে না, দেহের মধ্যেও ওগুলোর সৃষ্টি হয়—দেহের মাংসপেশী কোনো কারণে টান হয়ে থাকলে উৎকণ্ঠা বোধ হয় অকারণে। পেশী আলগা করে দিন, দেখবেন উদ্বেগ কোথায় চলে গেছে।

গরমের রাতে যদি ঘুমোতে না পারেন, তাহলে ঘরে ঠিকমতো বাতাস খেলানোর ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাস আপনাকে নাকে ঢুকলে দেহ স্নিগ্ধ, হয়ে ঘুমের সাহায্য করে। বন্ধ বাতাস আপনাকে অস্থির করে তোলে, ঘুম হয় না তাতে। আর একটা কথা, বিছানার চাদর যদি টাটকা কাচা ধোয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, সেটাও ভালো ঘুম এনে দিতে সাহায্য করে থাকে। নোংরা দুর্গন্ধ চিটচিটে বালিশ বিছানায় শুলে আপনার যতো অবসাদই থাক, ঘুম ভালো হবে না।

রাত্রে খুব মজার গল্প পড়তে থাকলে ঘুম পালাবে চোখ থেকে। তার চেয়ে, খবরের কাগজ কিংবা কোনো বক্তৃতার বিবরণ পড়ুন। ঘুমিয়ে পড়া সহজ হবে।

ঘুমোবার আগে বেশ খানিকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়িয়ে নিলে বেশ আরাম পাবেন, ঘুম আসবে তাড়াতাড়ি। শোবার পরে কোনো ভারী ব্যাপার নিয়ে মোটেই আলোচনা করবেন না। শুয়েই তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বার জন্যেও ব্যস্ত হবেন না। শরীরটাকে তার নিজের তাল মতোই ঘুমোতে এবং জাগতে দিন।

আর একটা খুব দরকারী কথা—সকালবেলা উঠেই কোনো কিছু নিয়ে খিটখিট সুরু করবেন না। তাতে সারাটা দিন বিরক্তিতে কাটবে আপনার, আর তারই ফলে সেদিনই রাত্রে দেখবেন ঘুম ভালো হবে না।

প্রতিজ্ঞা করে ফেলুন : সকালবেলা চা-খাওয়া, বাজার করা কিংবা কয়লাওলাকে নিয়ে একদম রাগারাগি করবেন না।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল

আমার কটাক্ষ নিয়ে ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমার কটাক্ষ নিয়ে যদি
খুশি হও,
খুশি হই—।
অন্য কোনো অসাধ্য প্রার্থনা
ছুঁড়োনা আমার দিকে
কোরো না জিজ্ঞাসা
যে-প্রশ্নে আকাশ কাঁপে
মেরুদণ্ডে ঘূর্ণীঝড় ওঠে,
তার চেয়ে
আমার চোখের মধ্যে হৃদয় ডুবিয়ে বস,
যেন
মর্মর পাষাণঘেরা নর্মদার জলে
পূর্ণিমায় এসেছো বেড়াতে,
ক্যামেরায় মুগ্ধ গুটি কর
প্রহর যা পোজ তুলে নিয়ে
বুকের বালুকাতটে সারাদিন
খুশিকণ্ঠ চড়ুইভাতির কলরব
রেখেছো ধ্বনিত;
শুধু আলোছায়া দিন—
আর বেশি কিছু নয়।
আমার কটাক্ষ নিয়ে যদি
(কেবল কটাক্ষ নিয়ে)
সুখী হও,
সুখী হই—।

তোমার হাতেই সোনার কাঠি

ফিরোজ চৌধু

তোমার হাতেই সোনার কাঠি
তোমার দেহেই অরণ্যের হিম ছায়া
তোমার কাছেই শিক্ষার্থী আমি ভালোবাসার।

অপরাপর যা কিছু সেতো অর্থবিহীন
পদ্মপাতায় জলের মতন গড়িয়ে যাওয়া
বাকী থাকে শুধু তোমার ভালবাসা
চোখের গভীরে স্পর্শের গভীরে ভালবাসা ভালবাসা

আমি ভ্রমর হয়ে সব ফুল ছুঁয়ে দেখেছি
আমি সাঁতারু হয়ে সব নদী পাড়ি দিয়েছি
তোমার কাছেই শিক্ষার্থী আমি ভালবাসার।

তোমার হাতেই সোনার কাঠি
তোমার দেহেই অরণ্যের হিম ছায়া।।

শিল্পী : অনিতা রায়চৌধুরী

প্রদর্শনী পরিক্রমা

●

চিত্ররসিক

…সেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আকাদমি …ফাইন আর্টসে শিল্পায়ন গোষ্ঠির …নে কতকগুলি সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার, …কার্ড ও বিভিন্ন ধরনের কার্ডের …ী হয়। হাতে তৈরী বিভিন্ন …কাগজের ওপর এই ধরনের … প্রায় ষোল-সতেরো রকমের …দেখা গেল। এর ওপর নানা ভারতীয় ডিজাইন দিয়ে …স্ক্রীনে ছাপিয়ে অতি সুদৃশ্য কার্ড …র সেট তৈরী হয়েছে। এই প্রথায় … আঁকা কতকগুলি ক্যালেন্ডারের … চমৎকার হয়েছে।

…ষ্টিয়েন ও আশিস জানার তৈরী …পর বড় প্রদর্শনীটিও ডিসেম্বরের … আয়োজিত একটি উল্লেখযোগ্য …। ষাটখানির অধিক নমুনা- … এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধরনের …প্লেট, কাপ, চায়ের পাত্র ও অন্যান্য …সুসজ্জিতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। … ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রের ওপর …পোড়ামাটির নকশার অনুকৃতিতে …, পরীক্ষা হিসেবে নতুন। পারসীক …র শিল্পের অনুসরণে টারকুইজ ব্লু …ক সেট জার, প্লেট, কলসীগুলির … বর্ণবৈভব উল্লেখ করবার মত। …পাত্রের গঠন বৈচিত্র্য এবং বহু- …রূপে প্রদর্শনীটি উজ্জ্বল হয়েছিল।

●

…থেকে ১৫ই ডিসেম্বর সরকারী …লায়ে ফরাসী স্থাপত্যের ২৬ … ফটোগ্রাফের একটি শিক্ষাপ্রদ …হয়ে গেল। এই ফটোগ্রাফগুলির …ফরাসী স্থাপত্যের গথিক যুগ থেকে … যুগ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের একটি …জানার চেষ্টা করা হয়েছে। শার্ত্র, …রকাসোন, আলবি, সাঁ মিশেল, … বিখ্যাত প্রাচীন স্থাপত্যকলার নিদর্শন এবং কিভাবে তার অংশ বিশেষ আধুনিক স্থাপত্যকলার মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা সযত্নে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। মধ্যযুগের নগর পরিকল্পনা এবং আধুনিক নগর-পরিকল্পনার নকশা ও ফটোগ্রাফগুলিও কৌতূহলের খোরাক যোগায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যেও স্থপতিদের কর্ম-পদ্ধতি কি কি নতুন গঠনের বাড়ি তৈরি করেছে তার নিদর্শনও রাখা হয়েছে। অতি-আধুনিক প্ল্যাস্টিকের বাড়ির ছবিগুলি যেন আধুনিক ভাস্কর্যের প্রভাব বহন করে রয়েছে। লেকরবুজিয়ের করা চণ্ডীগড়ের নকশাটি ভারতীয় স্থাপত্য-বিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ কৌতূহলের খোরাক হবে।

●

৩০শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অতুল তালুকদারের ২১খানি জল রঙের ছবির প্রদর্শনী হয়। শ্রীতালুকদার বর্তমানে শিল্প শিক্ষকতা করেন। দীর্ঘকাল রিয়্যালিস্টিক কাজে হাত পাকিয়ে তিনি এখন আধুনিক রীতির দিকে ঝুঁকেছেন। কাজের ধরনে জোর আছে। ক্যালিগ্রাফির ছাপটাই বেশী। অনেক ক্ষেত্রে শুধু শাদা-কালোয় কাজ করেছেন। পরিপূর্ণ বিমূর্ত কাজের দিকে তিনি অবশ্য এখনো ঝোঁকেননি। তাঁর ছবি-গুলির মধ্যে একটা গতিময়তার ছাপ লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'ঝড়ের পূর্বাভাষ' ছবির লাল রঙের তির্যক রেখাভঙ্গীর জোরালো গতিতে। এই ক্ষিপ্র তুলি চালনার ভঙ্গিমা তাঁর 'শীতের বাতাস' এবং 'সন্ধ্যার ছায়া'-র মধ্যেও পরিস্ফুট। ঊর্ধ্বাধ কৃষ্ণ রেখায় একটা শক্তির পরিচয় মেলে। 'অমিনাস অ্যাপ্রিহেনশন' ছবির হরিতাভ জমিতে কৃষ্ণ রেখার ঊর্ধ্বগতি বেশ একটা মুড সৃষ্টি করেছে। 'কাউ বয়' ছবির স্বপ্নালু ভাবটিও সুন্দর।

এই অ্যাকাডেমিতেই ৩০শে নভেম্বর থেকে ৬ই ডিসেম্বর অনিতা রায়চৌধুরী প্রায় পনেরোখানির মত ক্যানভাস প্রদর্শিত করলেন। শ্রীমতী রায়চৌধুরীর কাজগুলি প্রধানত নিসর্গ চিত্র থেকে বিমূর্ততার দিকে এগোবার স্তরে। ক্যানভাসগুলি মোটামুটি হাল্কা বাদামী রঙের জমিতে রেখা ও টোনের খেলা। কোন কোন ক্যানভাসে পাখী বা মানুষের নৃত্যপর মূর্তির আভাস পাওয়া যায়। যেমন ১৫ নম্বরের ছবি। ৬ নম্বরের ছবিটির রেখাভঙ্গি যেন কতকটা বাঁশঝাড়ের এক অনতিপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি। ৭ নম্বরের কাজে ক্যালিগ্রাফির ঢংটাই প্রবল। ৫ নম্বরের কাজে ধূসরবর্ণের প্রয়োগে একটা বিশিষ্টতার আভাস পাওয়া গেল। আবার কয়েকটি কাজের সংগঠনে অনেকটা দুর্বলতার আভাসও পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের ওপর একটা বিশিষ্টতার ছাপ সারা প্রদর্শনীতে দেখা গেল।

●

ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে ৬ থেকে ১৮ ডিসেম্বর বিড়লা অ্যাকাডেমিতে সুনীল দাসের একটি বৃহৎ একক প্রদর্শনী হয়। ইতিপূর্বে সুনীল দাসের যে-কটি প্রদর্শনী দেখা গিয়েছে, তার মধ্যে বোধহয় এই প্রদর্শনীতেই শিল্পীর সবচেয়ে পরিণত কাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ছোট-বড় ৪১টি ক্যানভাসের মধ্যে তাঁর আধুনিকতম বিমূর্ত নকশার মধ্যে ভারতীয় শক্তিসাধনার রং-রেখায় প্রভাবটাই বেশী করে চোখে পড়ে। সাপ, তীর, লিঙ্গ-মূর্তির আভাসধর্মী ডিজাইন, শক্তিসাধনায় ব্যবহৃত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের বিশিষ্ট প্রয়োগ ইত্যাদি নিয়ে ক্যানভাসগুলির মধ্যে একটা অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি ছবিতে শাদার ওপর শাদা রঙ ও বিভিন্ন আঁচড়ের সাহায্যে বিশিষ্ট ধরনের নকশার সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার তাতেও শুধু

হাল্কা সবুজ রঙকেই প্রধান করে তারই সূক্ষ্ম টোনের প্রভেদে বিমূর্ত ডিজাইন করা হয়েছে। মোটামুটি ছবিগুলির ভেতর বৃত্তাকার ও অর্ধবৃত্তাকার ডিজাইনের প্রয়োগটাই প্রধান। এরই মধ্যে কোথাও কোথাও পেরেক, চুড়ি, আয়নার টুকরো ইত্যাদির প্রয়োগে স্বর্ণোজ্জ্বল রূপ তৈরী করা হয়েছে, যার মধ্যে হয়ত কালীমূর্তি কি শিবমূর্তির রক্ত-কৃষ্ণবর্ণের সাযুজ্যে তন্ত্রসাধনার প্রভাবে আঁকা ছবি বলে মনে হয়। কোন কোন ক্যানভ্যাসে কেবল ধূসর মৃত্তিকার বর্ণাভাস ছবিকে মাটির কাছাকাছি বলে মনে করতে সাহায্য করে। কোথাও লাল-কালোর নকশা প্রায় দাবার ছকের রূপ নিয়ে বসে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি হল ২, ৪, ৫, ১০, ২৮ প্রভৃতি কাজগুলি। সুমুদ্রিত ক্যাটালগ ও সুসজ্জিত প্রদর্শনী বেশ মনোরম হয়েছে।

●

১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত কলকাতায় শীতের মরশুমের সর্ববৃহৎ শিল্প-প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের গৃহে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হয়। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন প্রবীণ শিল্পী অতুল বসু।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীবসু এই মর্মে বলেন যে, বাংলা দেশের শিল্প আন্দোলনের মধ্যে একটা বিদ্রোহের আমেজ আছে। প্রাচীন সস্তা বিলিতি ছবির রেওয়াজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তথাকথিত ভারতীয় রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন রণদা গুপ্ত এবং সেই বিদ্রোহের জের টেনে ১৮৯৭ সালে জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘকাল চালিয়ে আসেন। আরেক বিদ্রোহী হলেন যামিনী রায় যিনি নব্য ভারতীয় এবং অ্যাকাডেমিক রীতি পরিত্যাগ করে পটচিত্রের মাধ্যমে বাংলার বাউল সংস্কৃতির আমেজ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করলেন। আবার এইসব আন্দোলনের বাইরে থেকে তাঁরই সহযোগী কয়েকজন তখনকার দিনের তরুণ শিল্পী তৎকালীন সব রকমের শিল্প-রীতির নিদর্শন নিয়ে প্রথম সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে প্রথম প্রদর্শনী করেন। আবার এসবের বাইরে আরেক প্রবীণ বিপ্লবী হলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং—যিনি ছবির ভেতর সম্পূর্ণ এক নতুন জগতকে রূপায়িত করলেন। শ্রীবসু আশা করেন এই বিদ্রোহের ধ্বনি যেন তরুণ শিল্পীদের কাছ থেকেও শুনতে পাওয়া যায়।

প্রদর্শনীর সাড়ে তিনশোর ওপর শিল্পনিদর্শনের নমুনা থেকে সেরকম কোন বিপ্লবাত্মক শিল্পনিদর্শনের নমুনা না পাওয়া গেলেও একটা প্রশংসনীয় জিনিস লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটিভাবে তরুণ শিল্পীদের কাজের মান গতবারের চাইতে উন্নত এবং নির্বাচন আরেকটু সাবধানে করে কিছু কাজ বাদ দিতে পারলে এবং একটু কম ভিড় করে ছবি সাজাতে পারলে এটিকে একটি অতিসুন্দর প্রদর্শনী বলতে বাধত না। আরেকটা সাধারণ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়—তা হল বেশীর ভাগ শিল্পীরাই বর্ণ সম্পর্কে অনেক যেন বেশী সচেতন হয়েছেন। তবে বাস্তবধর্মী কাজের নমুনো কয়েকটি যথেষ্ট উন্নত নয় এবং নব্য-ভারতীয় বিভাগও খুব একটা উঁচু স্তরের পর্যায়ে ওঠেনি। লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বরোদা প্রভৃতি অঞ্চলের কাজগুলি এবারেও গতবারের মত মান বজায় রেখেছে এবং প্রশংসার কথা হল এই যে, বাঙলাদেশের তরুণ এবং প্রবীণ শিল্পীদের অনেকেরই কাজ এবারে গতবারের চাইতে অনেক উন্নত বলে মনে হল। বিমূর্ত রীতির কাজ এবারে গত-বারের মত বেশী নয়—লোকশিল্পের ঐতিহ্যধর্মী সৃজনীমূলক কাজই যেন একটু বেশী বলে মনে হয়। পূর্ণ বিমূর্ত কাজের মধ্যে জেরাম প্যাটেলের মনোক্রোম-ধর্মী ছোট রিলিফ কাজ, অম্বিন মেদীর অক্ষর ও ডিজাইনের অত্যন্ত সুগঠিত বর্ণাঢ্য দুটি শীলমোহর-ধর্মী কাজ, সুলেখা কাউরের মিষ্টি রঙের দুখানি অ্যাবস্ট্র্যাকশন, যশোবন্ত দেওলালীকরের লোকশিল্পের আমেজে গড়া 'ময়ন' এবং ম্যাজিশিয়ান, সমর ভৌমিকের ভারতীয় মোটিফ নিয়ে প্যানেল, মহিম রুদ্রের দুটি বর্ণাঢ্য অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, সুবীর সেনের রঙ-বর্ণের পাগলা ঘোড়া প্রভৃতি কাজগুলি সহজেই নজরে পড়ে। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর প্রতীক্ষা ছবিটি নতুন না হলেও
একটা বাঙলাদেশের আমেজ এর
দেখতে ভাল লাগে। অরুণ দত্তের রঙ
ছবির রক্তবর্ণের খেলা এবং
এগেনস্ট হোপের' বিষন্ন রূপ উল্লেখ
মত। স্মৃতি দে রায় 'রাবণ' মূর্তির
শাদার ব্যবহারে বাহাদুরী দেখিয়েছেন।
মধুসূদন রাও-এর শায়িত নগ্নিকা
ভাস্কর্যসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়
একটা গাম্ভীর্য সুন্দর লাগে। প্রশান্ত
দারের 'ফাস্ট বর্ণ'—ছোট একটি
সূক্ষ্ম ড্রয়িং এবার অতুল বসুর পুর
লাভ করেছে। প্রবীণদের মধ্যে সুনী
সেনের দুখানি কাজ 'সিয়েস্তা' এবং
ছবিতে একই আঙ্গিকে দু ধরনের
ভঙ্গী দেখা যায়। রথীন মৈত্রের 'ড্রিম
ফ্রিডম'-এ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের চিত্রে
রঙ এবং ডিজাইনের পরিবর্তন দে
জলরঙের কাজে রামচন্দ্র
রিফ্লেকশন, রমেন কুণ্ডুর উল্ক
নিসর্গদৃশ্যের আধা-বিমূর্ত উজ্জ্বল
কিষণলাল ঘোষের দুখানি সুন্দর
প্রতিকৃতি, অনিল পালের মুসৌরীর
দৃশ্য প্রভৃতি কয়েকটি ভাল কাজ
গেল। এছাড়া ইন্দ্র দুগড়, গোপাল
প্রমুখ শিল্পীদের কাজ ও
ভাস্কর্যের বিভাগে ফণিভূষণের
কলোনী' কাজটি গাছের গুঁড়িকে
ভাবে ট্রীট করে একটি বিচিত্র সুন্দর
তৈরি করেছেন। বিকাশ দেবনাথের
রাস্তার শোভাযাত্রা নিয়ে একটি
বলিষ্ঠ ফর্ম তৈরী করেছেন, অতুল
তিনটুকরো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ফর্ম এব
ভাটনগরের এঞ্জেল অব পীসের
গঠনভঙ্গী প্রশংসনীয়।

গ্রাফিক বিভাগে কাজ যথেষ্ট
নয়, তবে হরেন দাসের মন্দির মূর্তি
ফর্ম নিয়ে প্ল্যাস্টারের ওপর ছাপ
সোমনাথ হোড় ও আরো কয়েকজন
মন্দ হয়নি।

●

১৪,১৫ এবং ১৬ই ডিসেম্বর
ডেমি অব ফাইন আর্টসের
গ্যালারিতে সিল্লা ও সবোস গান্ধী
বিচিত্র রূপের মোমবাতির একটি
প্রদর্শনী হয়। বিভিন্ন কোমল
বিচিত্র গঠনের বড় বড় অনেকগু
সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। এ
গুলির গঠনবৈচিত্র্য ও বর্ণসুষমা
যোগ্য। অনেকগুলি এতবড় যে এ
১০।১৫ দিন পর্যন্ত জ্বালিয়ে রা
পারে। প্রদর্শনীর আভিনবত্ব উল্লেখ
মত।

ফেয়ারওয়েল টু ইয়েস্টারডের দৃশ্য

জর্মেনীর ন্যুভেল ভাগ

সৈকত ভট্টাচার্য

● জর্মানীর ন্যুভেল ভাগের সূচিত '৬৬
...। এই বছরেই আবির্ভাব ঘটে আলেক-
...র ক্লুগে, পিটার শামনি, উলরিশ
...নি ও ফোলকার শ্লোয়েনডর্ফের মত
...পরিচালকদের। জর্মান ছবি বিয়াল্লিশ বছর
... আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে এই
...রেই। জর্মান চলচ্চিত্রের ইতিহাসে
...ণীয় বছর। এই জয়যাত্রা শুরু হয় '৬৬-র
... দিকে শামনি ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্বকনিষ্ঠ
...রিশ শামনির 'ইট' মুক্তি পাবার সঙ্গে
...ই উলরিশ শামনির প্রথম উপন্যাস
... স্প্লিট ইওর সন' '৫৮ সালে প্রকাশিত
... পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত
...।

'৫৯ সালে উলরিশ উইলিয়াম জিটয়েলের
...করী হিসাবে যোগ দেন ও পরে কিছুদিন
...ভিশনে কাজ করেন। তাঁর টেলিভিশনের
... তৈরী 'স্পিরিট অ্যান্ড এ বিট অফ
... বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ওডার
...কেনে "Hollywood in Deblatschka
...aVa '৬৫-য়ে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে
...স্কৃত হয়।

উলরিশের প্রথম কাহিনী চিত্র 'ইট' ছবির
...ম সমাজের জীবন জিজ্ঞাসাই শুধু
... হয়ে ওঠেনি জীবনধারণের সার্থকতা
...ম্বন্ধেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যান্ত্রিক
...বনের কঠোরতা আজ জর্মান জীবন-
...কে কতখানি ভাবাবেগ শূন্য ও অর্থহীন
... তুলেছে, তারই নিখুঁত ছবি এঁকেছেন
...রিশ শামনি।

ছবিটির কাহিনীর অভিনবত্বে আকৃষ্ট
... অভিনেত্রী সাবিনে সিনেন, প্রখ্যাত
...মেরাম্যান গেরাড ভান ভেনবার্গ বিনা
...রিশ্রমিকে কাজ করেন। ছবিটি কানু
...বে বিশেষ প্রশংসিত হয়, প্রখ্যাত চিত্র
...লোচক পিটার কেন্টল এর মতে 'ইট'
...আবার জর্মান চলচ্চিত্র শিল্পকে আন্ত-
...র্জাতিকতার মর্যাদা দিয়েছে। ন্যুভেল ভাগ
...বেলের দ্বিতীয় ছবিটি হল ফোলকার
...শ্লোয়েনডর্ফ পরিচালিত 'ইয়ংটোয়েলেস' রবার্ট
...সেলের প্রখ্যাত কাহিনী পরিচালক আন্ত-
...তার সঙ্গে রূপায়িত করেন। ছবিটি
... উৎসবে ফিফরেসসি পুরস্কার পায়।
...শ্লোয়েনডর্ফ ফ্রান্সের আইডেক-এ চলচ্চিত্র
... শিক্ষালাভ করেন, পরে প্রখ্যাত পরি-
... আলে রেনে ও লুই মালের সহকারী

L'Annee derniere a' Marianbad,
'Le Feu Follet', 'Viva Maria'
...দি ছবিতে কাজ করেন। 'ইয়ং টোয়েলেস
...স্বপরিচালিত প্রথম কাহিনী চিত্র।
...বারে লেখক প্রযোজক ও পরিচালক
...র শামনির "ফকসেস আর রানিং"
...র বার্লিন উৎসবে সিলভার বেয়ার পায়।
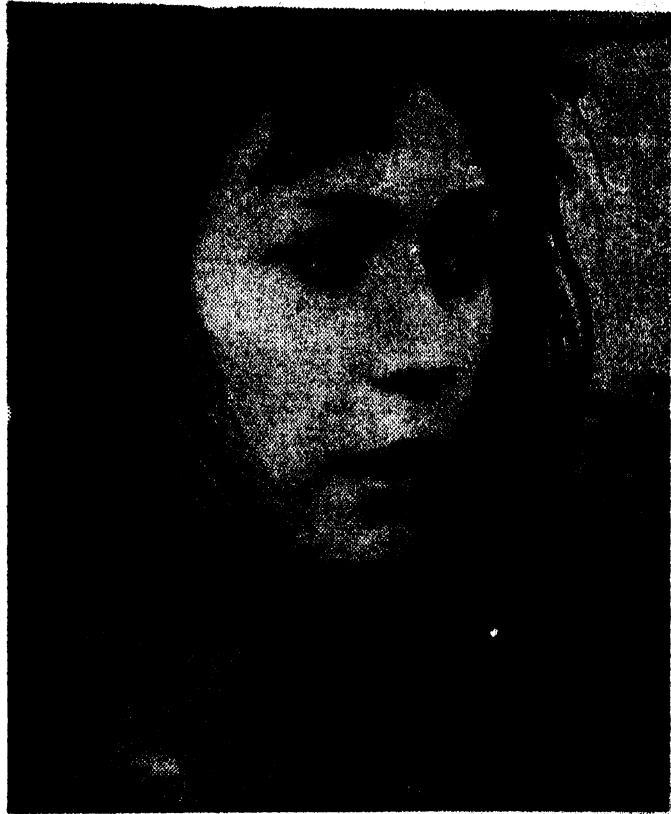
স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রনির্মাণে পিটার শামনি ইতিপূর্বেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'ওয়ান আফটারনুন ফর আস' '৬১তে ওডার হাওজেন উৎসবে পুরস্কার পায়। পরের বছর মানহাইম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয় 'ডি টয় টোনেন কোমেন'।

'ফকসেস আর রানিং' পিটার শামনির প্রথম কাহিনী চিত্র। এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক আধুনিক জীবনের অসারতা উপস্থিত করতে চেয়েছেন। ছবিতে মনোমুগ্ধকর শিকার দৃশ্যগুলোর প্রতীক উপস্থাপনা পরিচালকের গভীর চিন্তাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় বহন করে।

তারপর এলেন আজকের জর্মেনীর শ্রেষ্ঠ পরিচালক আলেকজান্ডার ক্লুগে। তাঁর স্বলিখিত ডায়েরী 'অ্যানিটা গে' অনেকদিন আগেই বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে গিয়ে নায়িকা অ্যানিটার চরিত্রে নির্বাচিত করলেন তাঁর ডক্টার বোন আলেকজান্দ্রাকে। শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা ক্লুগে ইতিপূর্বে কোন চিত্রে অভিনয় করেননি বা কোন ফিল্মস্কুলেও শিক্ষাগ্রহণ করেননি। কিন্তু প্রথম ছবিতেই তিনি ভেনিসের ঝানু ঝানু বিচারক ও সমালোচক মহলে সাড়া তুললেন। 'ফেয়ারওয়েল টু ইয়েসটারডে' সিলভার লায়নে ভূষিত হল। শ্রীমতী ক্লুগে পান শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান হিসাবে "গোল্ডেন রো"। তাছাড়াও ছবিটিকে ছ'টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় অসাধারণ শিল্পগুণের জন্য। চিন্তাশক্তির প্রখরতায় উদ্দীপ্ত 'ফেয়ারওয়েল টু ইয়েসটারডে' দর্শকদের কল্পনা ও

মালসাইটেনের একটি দৃশ্য

চিন্তার মূল ধরে নাড়া দিয়েছে। ছবি তখনই মহৎ হয় যখন তার ফর্ম ও কনটেনটের সন্ধি ঘটে। শুধুমাত্র কাহিনীর বৈচিত্র্যে 'ফেয়ারওয়েল টু ইয়েসটারডে' কখনই মহৎ ছবি হতে পারত না যদি ক্লুগের চলচ্চিত্রায়নে অসাধারণ শৈল্পিক সৌন্দর্য বোধ না থাকত। ৬৬'র 'ইট' ছবির পরিচালক উরিশ শামান '৬৬-তে 'এগেন এভরি ইয়ার' নামে একটি মনোরম চিত্র উপহার দেন। বিদ্রূপাত্মক সংলাপ ছবিটির একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এখানেও শামান জর্মেনীর আধুনিক জীবনযাত্রার কৃত্রিমতায় কশাঘাত করেছেন।

ওয়েস্টফালিয়ার মুনস্টার শহরের একটি পানশালায় তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়েল সপ্তাহে ফ্রাংকফুর্টের অ্যাডভারটাইজিং ম্যানেজার হের লুইকের নিউইয়ার্স ইভের আনন্দোল্লাস শামানির বিদ্রূপাত্মক সংলাপের মাধ্যমে মুখরিত হয়ে উঠেছে, ছবিটি বার্লিন উৎসবে সিলভার বেয়ার পায়।

'৬৭ থেকে এ বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত হান্স যোসেফ স্পাইকার, মেম্পিল, মারেন গোসভ, য়োগার ফিৎস পরিচালকরা 'নুভেল ভাগের লেবেল এ'টে আবির্ভূত হন। সাধারণ দর্শকদের আটোমুটি জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম লেও শিল্পের বিচারে এদের কোন ছবিই উত্তীর্ণ হবার যোগ্য নয়। মেম্পিলের ভুর সাথে সেৎসেন-এর অভাবনীয় বক্স অফিস সাফল্য নিঃসন্দেহে তরুণ প্রযোজকদের উৎসাহ জুগিয়েছে। কিন্তু ছবিটির মান অতি সাধারণ। কান কর্তৃপক্ষ ছবিটিকে উৎসবে প্রদর্শনের অনুমতি না দিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ছবিটিকে কি গুণের জন্য জর্মেনীর জাতীয় পুরস্কার বা ফেডারেল সিলভার প্রাইজ দেওয়া হয়?

রব হুডারের পতাকাতলে তরুণ পরিচালক মারেন গোসভ কোন এক তরুণীর সতীত্ব খোয়াবার কাহিনী নিয়ে 'এংগেলসেন' নামে একটি বিশেষত্ব বর্জিত ছবি তুললেন, তবে একেবারে নিরাশ করলেন স্পাইকার, ফিৎস, সাফ পরিচালকগণ। এ'দের অধিকাংশ ছবিরই উপজীব্য হল সেক্স অথবা ক্রাইম। কোনটায় আবার দুয়ের সংমিশ্রণের মাত্রাধিক্য দেখা দিয়েছে। ছবি হিট করাবার সোজা উপায় হিসাবে তরুণ পরিচালকরা এই পথ বেছে নিলেন। গত ষোল সতের মাসের মুক্তিপ্রাপ্ত সব ছবিই কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় সর্বদিক থেকেই চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে। নুভেল ভাগ আন্দোলনের উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা সব কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল। চিত্রসমালোচকরা ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখলেন। কাজেই এমন অবস্থায় এবার বার্লিন উৎসবে একটা ভাল জর্মান ছবি দেখব সে আশা ছিল না। কিন্তু সত্যি সত্যিই সবাইকে চমকে দিলেন জর্মেনীর সর্বকনিষ্ঠ পরিচালক ওয়ারনার হেরৎসগ। ছবিটির নাম 'সাইন অফ লাইফ'। ছবির নায়ক স্ট্রোৎসাক গত যুদ্ধে আহত হন এবং তাতে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। যুদ্ধশেষে কর্তৃপক্ষ স্ট্রোৎসাককে আরোগ্যলাভের জন্য গ্রীসের কস দ্বীপে বদলি করে দেন। সঙ্গে যায় তার গ্রীক স্ত্রী ও দুই বন্ধু মানিহার্ড ও বেকার। এদের কাজ হলো একটা পুরনো অস্ত্রের ডিপো পাহারা দেওয়া। কাজ বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না।

সময় কাটাবার জন্য স্ট্রোৎসাক দরজা-জানালায় রং করতো, মানিহার্ড তৈরী করত অদ্ভুত ধরনের একটা ফাঁদ আরসোলা ধরার জন্য। আর বেকার নিবিষ্ট মনে দেয়ালগাত্রে লিপি উদ্ধারে ব্যাপৃত থাকত। তিনটি মানুষ যেন তিনটি আলাদা পৃথিবী। দ্বীপের নির্জনতা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্যের অভাব স্ট্রোৎসাকের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। একদিন মানিহার্ডের সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে স্ট্রোৎসাক দেখল দূরবর্তী উপত্যকায় সহস্রাধিক ঘূর্ণায়মান উইন্ডমিল। সহস্রাধিক উইন্ডমিলের এই ঘূর্ণায়মান রূপ স্ট্রোৎসাকের স্থাবর জীবন যাত্রায় আগুন ধরিয়ে দিল। আবার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। উন্মাদ হয়ে উঠল স্ট্রোৎসাক। উদ্দেশ্যহীনভাবে গুলী ছুঁড়তে লাগল, কেউ সাহস পেল না স্ট্রোৎসাকের বন্দুক কেড়ে নিতে। সারা দ্বীপে ত্রাসের সঞ্চার হল। সম্পূর্ণ দুদিন স্ট্রোৎসাক অস্ত্রের ডিপো নিজের অধিকারে রাখল। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব জাহির করল। এখানে পরিচালক স্ট্রোৎসাকের সংগ্রাম গ্রীক উপকথার টাইটেনের বিফল সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্ট্রোৎসাক চরিত্র বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই ক্যামুর মিথ অব সিসিফাস স্মরণ হয়। এই দুরূহ কাহিনীকে পরীক্ষামূলকভাবে রুপালী পর্দায় উপস্থাপনে পরিচালক ওয়ারনার হেরৎসগ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। পরিচালকের নিষ্ঠা ও শ্রম, অপরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীর আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনয়, অনিন্দ্যসুন্দর আলোকচিত্র গ্রহণ সব কিছু মিলিয়ে 'সাইন অফ লাইফ'কে দিয়েছে ক্লাসিক ছবির মর্যাদা। 'সাইন অফ লাইফ' সাম্প্রতিক জর্মান সিনেমায় সেক্স ক্রাইম ঢেউ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ দেখা দিয়েছে। এবার বার্লিন উৎসবে ছবিটি সিলভার বেয়ারে পুরস্কৃত করা হয়।

শামানি ভ্রাতৃদ্বয়, আলেকজান্ডার ক্লুগে ও ওয়ারনার হেরৎসগের শ্রম ও নিষ্ঠা জর্মেনীর 'নুভেল ভাগ' আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখবে বলেই বিশ্বাস।

চিত্র-সমালোচনা

রাত আউর দিন/নার্গিস
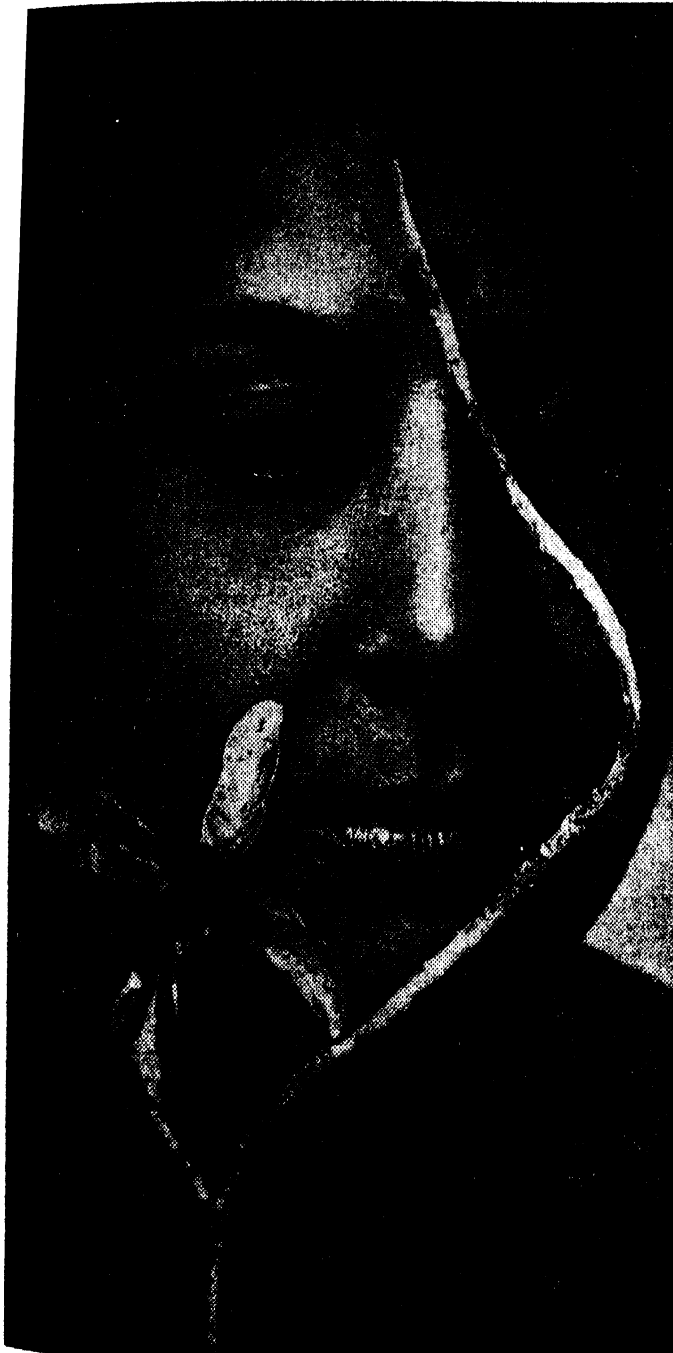
রাজা ঔর রংক্ ঃ (হিন্দী) প্রসাদ প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৪,১৭১·৯৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা এল ভি প্রসাদ; পরিচালনা ঃ কে পি আত্মা; চিত্রনাট্য ঃ আর বিশ্বনাথ শাস্ত্রী ও বান্দাদি, কে; সংলাপ ঃ পণ্ডিত মুখরাম শর্মা; সংগীত-পরিচালনা ঃ লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল; গীতরচনা ঃ আনন্দ বক্সী; চিত্রগ্রহণ ঃ রবিকান্ত নাগাইচ; শব্দানুলেখন ঃ রামস্বামী ও রামচন্দ্র রাও; সংগীতানু-লেখন ঃ মীনু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশনা ঃ কানু দেশাই; সম্পাদনা ঃ শিবাজী অবধূত; নৃত্য-পরিচালনা ঃ হীরালাল, থঙ্গাপ্পন ও সুরেশ; নেপথ্যকণ্ঠসংগীতঃ লতা মঙ্গেশ-কর, মোহাম্মদ রফি, আশা ভোঁসলে, উষা মঙ্গেশকর ও মান্না দে; রূপায়ণ ঃ সঞ্জীব-কুমার, অজিত, মুকরী, কমল কাপুর, মোহন চোটী, বিপিন গুপ্ত, বদরীপ্রসাদ, মহেশকুমার, নাজিমা, কুমকুম, নিরূপা রায় প্রভৃতি। রাজশ্রী পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২০ ডিসেম্বর থেকে রক্সী, বসুশ্রী; বীণা, প্রভাত, পূর্ণশ্রী, ইন্টালী টকীজ, প্যারামাউণ্ট, ভবানী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

মার্ক টোয়েন-এর অমর উপন্যাস 'দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার" অবলম্বনে প্রসাদ প্রোডাকসন্স-এর আলোচ্য ইস্টম্যান কলার চিত্র 'রাজা ঔর রংক' গড়ে উঠেছে। একই সময়ে একই রকম দেখতে দুটি ছেলে জন্মেছিল; একজন ধনীর দুলাল হয়ে, অপরজন গরীবের আস্তাকুড়ে। কৈশোরে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে দৈবক্রমে দুজনের মধ্যে হয় সাক্ষাৎ এবং তখনই গড়ে ওঠে সখ্য। রাজপ্রাসাদে বন্দী রাজার দুলালের হয় বাইরের জগৎ দেখাবার ইচ্ছা; সে তার গরীব বন্ধুর সঙ্গে করে বেশ পরিবর্তন। গরীব ছেলেটিকে রাজবাড়ীর লোকেরা মনে করে যুবরাজ, আর ধনী-সন্তানকে সবাই ভুল করে বসে গরীব 'রাজু' বা 'রাজা' বলে। উভয় পক্ষের ভুল ছেলেদুটিকে অতিষ্ঠ করে তোলে; তারা তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে আরও বিপদে পড়ে। উভয় পক্ষই সাব্যস্ত করে—ওরা দুজনেই পাগল। এরই মধ্যে মাতৃহারা যুবরাজ পায় গরীব মায়ের অফুরন্ত স্নেহ। অপরদিকে গড়ে ওঠে সেনাপতির চক্রান্ত। শেষপর্যন্ত কেমন করে

সকল সমস্যার সমাধান হয়ে দুজনেই স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই নিয়েই ছবির শেষ উত্তেজক দৃশ্যগুলি গঠিত।

গরীব রাজা ও যুবরাজ নরেন্দ্র দেব-এর যুগ্মভূমিকায় বালক-অভিনেতা মহেশ-কুমারের সাবলীল ও স্বাতন্ত্র্য অভিনয় 'রাজা ঔর রংক'-এর একটি বিশেষ সম্পদ। ধনী সন্তানের প্রাপ্য আনুগত্য আদায়ের ব্যাপারে এবং বঞ্চিত দরিদ্র সন্তানের স্বাভাবিক সারল্যের প্রকাশে শ্রীমান্ আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রকাশে সমর্থ হয়েছে। গরীব রাজার বাপ হরিয়ার ভূমিকায় অজিত জীবন্ত অভিনয় করেছেন। এবং মা শান্তার চরিত্রে নিরূপা রায় অত্যন্ত দরদের সঙ্গে মাতৃস্নেহকে প্রকাশিত করেছেন। ছবির রোমাণ্টিক নায়করূপে সঞ্জীবকুমার এবং তাঁর প্রণয়িনী, রাজার দিদিবেশে কুমকুম দর্শক মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত, বদরীপ্রসাদ, মুকরী, কমল কাপুর, মোহন চোটী, নাজিমা প্রভৃতি চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। মূল কাহিনীর হিন্দী চিত্ররূপকে সাধারণ দর্শকের রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে কিছুটা হাসি, গান, উত্তেজনার বস্তুর যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেটা অনস্বীকার্য। তবু মূল কাহিনীর বক্তব্যটুকু যে হারিয়ে যায়নি, এর জন্যে পরিচালক কে পি আত্মাকে ধন্যবাদ জানাই। দৃশ্যসজ্জা ও পরিবেশ সৃষ্টির কাজ সুন্দর। রঙীন চিত্রগ্রহণ ও দুই ভূমিকায় একই কিশোর অভিনেতাকে দিয়ে কাজ করানোর কৌশল দক্ষতার পরিচায়ক। ছবির দুখানি গানই সুগীত; বিশেষ করে লতার কণ্ঠের 'তু কিতনী অচ্ছি হো' গানখানি বারংবার শোনবার মতো।

'রাজা ঔর রংক'-এর আবেদন দর্শক-সমাজকে প্রীত করবে।

সাবরমতী/সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার

মেরে হুজুর (উর্দু) মুভী মোগলস্-এর নিবেদন; ৪,৬৯৩.৩১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : মালিকচাঁদ কোচার ও বিনোদ-কুমার; রচনা ও পরিচালনা : বিনোদকুমার; সংগীত-পরিচালনা : শংকর জয়কিষণ; গীতরচনা : হসরৎ জয়পুরী; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : প্রকাশ আতরা; চিত্রগ্রহণ : সুরীণ নায়ক; শব্দানুলেখন : পুশলকার ও নাসির; সংগীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক ও কৌশিক; শব্দপুনর্যোজনা : রবীন চট্টো-পাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : সন্ত সিং; সম্পাদনা : প্রভাকর সুপারে; নৃত্য-পরি-চালনা : হীরালাল ও বদরীপ্রসাদ; নেপথ্য-কণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর, মোহাম্মদ রফি, আশা ভোঁসলে ও মান্না দে; রূপায়ণ : রাজকুমার, জিতেন্দ্র, জনি ওয়াকার, ডেভিড, কে এন সিং, মালা সিংহ, ইন্দিরা, জেব রেহমান, সুরেখা, মনোরমা, লক্ষ্মীছায়া, মধুমতী প্রভৃতি। রাজশ্রী পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২০ ডিসেম্বর থেকে অপেরা, নাজ, খান্না, মেনকা, ক্রাউন, কালিকা, লিবার্টি, পার্ক শো এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

লক্ষ্ণৌ-এর কাহিনী অবলম্বনে 'মেরে হুজুর' রঙীন ছবিটি নির্মিত হয়েছে। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছেন একটি পুরুষ, যিনি ভোগবিলাসে, নৃত্যগীতে নিজের অখণ্ড অবসরকে ভরিয়ে রেখেছেন এবং কোনোদিন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার কথা চিন্তাতেও আনেননি। সহসা একটি পরমক্ষণে নবাব সেলিম—এই নামেই যুবকটির পরিচয়—তাঁর ভগ্নী শামর বান্ধবী সালতানাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ভাবলেন জীবনের দোসর যদি করতে হয়, তাহলে সে একেই। কিন্তু ইচ্ছাপূরণে বাধা ঘটল। মেয়েটির বাপের কাছে ভগ্নীর দৌত্য হল ব্যর্থ; তার ওপর জানা গেল, মেয়েটি ভালোবাসে নব্য কবি আখতার হোসেন আখতারকে। অবস্থাকে হাসিমুখে মেনে নিলেন যুবক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আখ-তারের সঙ্গে সালতানার বিয়ে দিলেন অর্থে, সম্পদে ওদের জীবনকে সুখী করতে চাইলেন। কিন্তু দুর্বলচিত্ত আখতার কিছু কাল পরে এক বারবনিতার মোহে পড়ে স্ত্রীকে দিল তালাক। শিশুসন্তান নিয়ে সালতানা হয়ে পড়ল অসহায়। সেলিম তার দেখাশুনা করেন; তাতে লোকের মনে জাগে সন্দেহ। সেলিমকে সকলেই জানে উচ্ছৃঙ্খল বলে। কাজেই চিত্তলোকের দেবী সালতানার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার অভিপ্রায়ে সেলিম তাকে নিকা করবার প্রস্তাব করেন। সালতানা প্রথমটা তাকে ভুল বুঝলেও যখন তাঁর আসল অভিপ্রায়ের কথা শুনল, তখন দেব-চিত্ত সেলিমের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠল। এরপরে যখন আখতারের সঙ্গে সালতানার পুনর্মিলন ঘটাবার চেষ্টায় সেলিম নিজের প্রাণ হারালেন, তখন শোক-বিহ্বল, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সালতানাকে বিধবা বেশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল নবাব সেলিমের কবরের পাশে।

বলা বাহুল্য, নবাব সেলিমের মনোহর চরিত্রটিই কাহিনী এবং সেই কারণে ছবিটিরও প্রধান আকর্ষণ। চিত্রনাট্য আগাগোড়াই মেলোড্রামার উপর নির্ভরশীল

এবং কোনো কোনো জায়গায় বাস্তবধর্মী, আবার কোথাও কোথাও অত্যন্ত সাজানো, প্রায় অবিশ্বাস্য। তবু মোটের উপর ছবিটি একটি নিরুচ্চার প্রেমের বেদনাবিধুর আলেখ্য হিসেবে সার্থকতা লাভ করেছে। বিশেষ করে ছবির উর্দু সংলাপ এই আলেখ্য রচনায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

নবাব সেলিম-এর ভূমিকায় রাজকুমার এবং সালতানাবেশে মালা সিংহ তাঁদের নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে। আখতার-এর ভূমিকায় জিতেন্দ্র আরও বেশী স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পারতেন। পেয়ারেলাল বেদীরূপে জন ওয়াকার ছবিতে হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় ডেভিড, কে এন সিং, মনোরমা প্রভৃতি যথাযথ অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর সুন্দর। লক্ষ্ণৌ-এর পরিবেশ সৃষ্টি এবং কাহিনীর মেজাজ অনুযায়ী দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা রচনা সার্থকতা লাভ করেছে। ছবির সাতখানি গানই সুগীত। নবাব সেলিম-এর মুখে মান্না দে গীত উচ্চাঙ্গের গান 'ঝনক ঝনক তোরী বাজে পায়লিয়া' মনে রাখবার মতো। মুভী মোগলস্-এর 'মেরে হুজুর' নিরুচ্চার প্রেমের আলেখ্য হিসেবে দর্শক-প্রশস্তি পাবার যোগ্য।

ইজ্জত (হিন্দী) পুষ্প পিকচার্স-এর নিবেদন; ৩,৭২৬.৫৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ কে নাদিয়াদওয়ালা এবং আর সি কুমার; পরিচালনা : টি প্রকাশ রাও; কাহিনী : দুলাল গুহ; চিত্রনাট্য ও সংলাপ : রাজেন্দ্রসিং বেদী; সংগীত-পরিচালনা : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল; গীতরচনা : সহীর লুধিয়ানভী; চিত্রগ্রহণ : ডি সি মেহতা; সংগীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা : এ এ মজিদ; সম্পাদনা : শিবজী অবধূত; নৃত্য-পরিচালনা : হীরালাল ও হারমান; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মোহাম্মদ রফি ও মান্না দে; রূপায়ণ : ধর্মেন্দ্র, বলরাজ সাহনী, মেহমুদ, ডেভিড, মনোমোহন কৃষ্ণ, তেওয়ারী, মুকরী, তনুজা, জয়ললিতা, ললিতা পাওয়ার, লক্ষ্মীছায়া, দেবিকা প্রভৃতি। দোসানী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ২০ ডিসেম্বর, শুক্রবার থেকে ওরিয়েণ্ট, প্রিয়া, ম্যাজেস্টিক, কৃষ্ণা, মিত্রা, রূপালী, ছায়া, দীপ্তি এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

মান-সম্মানে শুধুই ধনী ভদ্রলোকের জন্মগত অধিকার, না, নিরীহ দরিদ্র অশিক্ষিতদেরও ইজ্জত সম্পর্কে সমান দাবী আছে? পুষ্প পিকচার্স নিবেদিত 'ইজ্জত' ছবিটি এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেছে : ব্যক্তিগত শুচিতা ও সম্ভ্রমের প্রতি মানুষমাত্রেরই জন্মগত অধিকার আছে; এ-ব্যাপারে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, সভ্যতাভিমানী ও তথাকথিত আদিবাসীদের মধ্যে অনুমাত্র পার্থক্য নেই, থাকতে পারে না। অথচ আজও যে নিরক্ষর দরিদ্র মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অন্ত নেই, এ-কথা স্নাতক শেখর শুনল ফাদার এব্রাহামের মুখ থেকে। এবং আরও শুনল সে তার নিজের অবাঞ্ছিত জন্মেতিহাস। প্রতিজ্ঞা করল, তার মার ইজ্জতকে যে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে, সেই ঠাকুর প্রতাপ সিং-কে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। গেল সে ঠাকুরের হাবেলী রামগড়ে। সেখানে পরিচিত হল প্রতাপ সিংয়ের পুত্র দিলীপের সঙ্গে, যে-দিলীপকে একেবারে হুবহু তারই মতো দেখতে; তফাৎ এই যে, দিলীপ একটু ফর্সা, আর সে নিজে একটু কালো। দিলীপও তার বাপের মতোই এক আদিবাসী মেয়ের প্রেমে পড়েছে; কিন্তু সে তাকে বিবাহ করতে চায়, তাকে গৃহবধূ করতে চায়। বাপের তাতে অমত—ঠাকুর পরিবারের ইজ্জত ধুলোয় লুটোবে! শেখর কি প্রতিশোধ নিল? হ্যাঁ, সে তার জন্মদাতাকে আদিবাসীদের রোষানল থেকে বাঁচাতে গুলীর মুখে বুক পেতে দিল। অবশ্য হিন্দী ছবির রীতি রক্ষা করবার জন্যে শেখর গুলীবিদ্ধ হয়েও সুস্থ হয়ে উঠল এবং দিলীপের জন্যে তার বাপের মনোনীত পাত্রী দীপাকে বিবাহ করে দিলীপকে তার প্রেমিকা আদিবাসী কন্যাকে বিবাহ করবার সুযোগ করে দিল।

শেখর ও দিলীপের দ্বৈত ভূমিকায় ধর্মেন্দ্র চিত্রনাট্যের চাহিদা পূর্ণ করে নিজের

ন্যাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। শেখরবেশে ধনী-কন্যা তনুজার সংগে প্রেমের সংযত দৃশ্যগুলিতে তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য বেশী করে প্রকাশিত হয়েছে। অভিশপ্ত জন্মের বেদনা তিনি স্বচ্ছন্দে মূর্ত করে তুলেছেন। বলরাজ সাহানীর ছোট্ট ভূমিকাটি সু-অভিনীত। ভোলা মহেশের চরিত্রে মেহমুদ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফাদার এব্রাহাম বেশে মনোমোহন কৃষ্ণ চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। ধনী-কন্যা দীপার ভূমিকায় তনুজা সংবেদনশীল অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। দিলীপের প্রেমিকা আদি-বাসী কন্যারূপে জয়ললিতা 'মিনি শাড়ী' পরে নেচেছেন, গেয়েছেন এবং দিলীপ ও শেখরের সংগে দর্শকদেরও আকৃষ্ট করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় তেওয়ারী, ললিতা পাওয়ার, দেবিকা, ডেভিড, মুকরী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য। —নান্দীকর

কলকাতার রাজপথে খৃষ্টমাস

নানা রঙের ফিতা, ছোট ছোট পতাকা, ছোট ছোট ঘণ্টা ও চকচকে রাঙতা দিয়ে উৎসব সাজে সুসজ্জিত একটি গাড়িতে বসে 'খৃষ্টমাস দাদু।' তাঁর হাতে ফিল্টার সমন্বিত নতুন 'জেনারেল' সিগারেটের প্রকাণ্ড একটা প্যাকেট। ঘোড়ার গাড়িটি কলকাতার রাজপথ ঘুরছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও বয়স্করা হাসিমুখে হাত নেড়ে 'খৃষ্টমাস দাদু'কে স্বাগত জানায়। মোটর চালকরাও তাঁদের হর্ণ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করেন আর 'খৃষ্টমাস দাদু' সবাইকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান আর উপহার বিলোন। বড়দিনের সুযোগে নতুন ও চমকপ্রদভাবে প্রচারের এই পদ্ধতি সবাইকে শুধু খুশী করে না, পণ্য বিক্রয়েরও সহায়ক হয়। ফিল্টারসমন্বিত 'জেনারেল' সিগারেটের প্রস্তুতকারকরা তাঁদের নতুন ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের প্রচারের কাজে 'বড়দিনের এই রূপকথা' প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্য প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

মঞ্চাভিনয়

সম্প্রতি দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক-এর চৌরংগী স্কোয়ার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা তারাশংকরের মঞ্চসফল নাটক 'দুই পুরুষ' পরিবেশন করেছেন 'স্টার' রংগমঞ্চে। সাধারণত অফিস ক্লাবের নাট্য-প্রযোজনায় যে সব শৈথিল্য চোখে পড়ে, সেদিনকার অভিনয় তা থেকে তো মুক্ত ছিলই, বরঞ্চ কয়েকটি মুহূর্তে অভিনয় রীতি কিছু স্বাতন্ত্র্যের নজীর রাখতে পেরেছে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রশংসার দাবী রা নির্দেশক সলিল দত্ত। প্রতিটি শিল্প প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছেন বলে টি ওয়ার্কে কোথাও ছন্দোপতন হয়নি। 'ন বিহারী' চরিত্রের দৃঢ়তা ও কোমল আশ্চর্য দক্ষতার সংগে মূর্ত করে তুলে সত্যেন মজুমদার। 'মহাভারত' 'সুশোভন'এর ভূমিকায় প্রাণবন্ত অভি করেছেন কবি বসু ও পূর্ণেন্দু রা হিমানী গাংগুলীর 'কল্যাণী' ও সা মুখোপাধ্যায়ের 'বিমলা' দুটি নিখ চরিত্র-চিত্রণ। অন্যান্য ভূমিকায় সাফ সংগে রূপ দিয়েছেন নির্মল ভট্টাচ গোপাল ঘোষ, মদনমোহন মিত্র, যামি ভূষণ নাথ, লক্ষ্মী কাপুর, গৌরাংগ প্র প্রফুল্ল সরকার, শক্তিপদ দাস, শ্যাম বিশ্বাস, পরিতোষ ভৌমিক, মহেশ টাণ্ডন, সুরথ মজুমদার, দোঘন কৃপহেম বেহারা, গৌরীশংকর ভট্ট বারীন দাস, রামবেত্ত সিং, মীরা মালতী চৌধুরী, প্রতিমা পাল, নমিতা

বক্তব্যের গভীরতায় 'রক্তকরবী' এ দুরূহ নাটক সন্দেহ নেই। কিন্তু স শিল্পবোধ ও আন্তরিক নিষ্ঠা থা মঞ্চরূপায়ণের মধ্য দিয়েএর প্রাণময় রূ দর্শকের সামনে তুলে ধরা যায়।

মাত্র কিছুদিন আগে বারাসত রবীন্দ্র-ভবন' মঞ্চে প্রতিভাত হোল। নাট্যানুষ্ঠান-টির আয়োজন করেছিলেন 'রবীন্দ্রভবন কমিটির উদ্যোক্তারা আর অংশ নিয়েছিলেন প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'রজনীগন্ধা'র শিল্পি-বৃন্দ। এই নাট্যপ্রযোজনাটি স্থানীয় নাট্যানু-রাগীদের বিমুগ্ধ করেছে এই কারণে যে, নাটকটি গতানুগতিক রীতি থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে পরি-বেশিত হয়েছে। এর জন্য সাধুবাদ পাবেন নাটকের নির্দেশক শ্রীদিলীপ মৌলিক। অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই স্বকীয় চিন্তার দীপ্তি রাখতে পেরেছেন; প্রতিষ্ঠিত সংস্থার বহু রজনী অতিক্রান্ত অভিনয়-রীতির অনুকরণ তাঁরা করেন নি। অধ্যাপকে'র বাহ্যিক গাম্ভীর্য ও অন্তরের প্রবল আন্দোলনকে নিখুঁতভাবে মঞ্চে পরিস্ফুট করে তুলেছেন শ্যামল গাঙ্গুলী। অপূর্ব একটি বাস্তব চরিত্র উপহার দিয়েছেন তরুণতম শিল্পী বিবেক চট্টোপাধ্যায়; তার অভিনয়ের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতম সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। 'ফাগুলাল' ও সর্দারের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করে-ছেন সৌমেন চ্যাটার্জি ও শ্যামল বিশ্বাস। নেপথ্যচারী 'রাজা'র দৃঢ়তা ও মানসিক দ্বন্দ্ব অপূর্ব কণ্ঠস্বরে মূর্ত করে তুলে-ছেন দিলীপ মৌলিক। 'নন্দিনী'র প্রাণ-চঞ্চলা ও 'চন্দ্রা'র বাস্তব চেতনা রাণু রায় ও মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরীর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে। মৃণাল দাশগুপ্তের 'বিশু পাগল' একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন: মলয় চ্যাটার্জি, কাজল চ্যাটার্জি, শান্তি পাল, জ্ঞান গাঙ্গুলী।

যক্ষপুরীর জটিলতা মঞ্চসজ্জায় পরি-স্ফুট করে তুলেছেন সব্যসাচী দাশগুপ্ত ও জ্ঞান গাঙ্গুলী। আবহ-সংগীত ও সংগীত-নির্দেশনায় সুগভীর শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন চপল বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবব্রত সেনগুপ্ত।

'শৌভনিকে'র নতুন নাট্য-প্রযোজনা হবে 'অন্তিগোন'। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় অনু-দিত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন: অশোক মিত্র, সুকুমার ঘোষ, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, প্রদীপ ভট্টাচার্য, ভূপাল মুখোপাধ্যায়, মমতা চট্টো-পাধ্যায়, চিত্রা নাগ, গীতা প্রধান, মায়া বসু, মঞ্চ-সজ্জা, আলোক-সম্পাতে ও সঙ্গীতে আছেন: অমিয় বসু, স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও ভাস্কর মিত্র। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন: বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিনু দাস।

গত শনিবার সন্ধ্যায় পান্তুর ন্যাশ-নালীজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রথম সম্মেলন ও নাট্যানুষ্ঠান বিধান সরণিতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমুরারীচরণ লাহা ও ডাঃ গোপাল-চন্দ্র দে মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশৈলেন্দ গুহনিয়োগী-বিরচিত 'বৌদির বিয়ে' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। পরিচালকের দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করে শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় ও যথোপযোগী আবহসংগীত সৃষ্টি করে কিশোর ভড় সকলের প্রশংসাভাজন হন। অভিনয়াংশে ছিলেন ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র, গৌরী-শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, শ্যামল-কৃষ্ণ বক্সী, অমরেশ দাস, দেবেশচন্দ্র পাল, অজিত দেমণ্ডল, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অভয়চরণ শীল, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, মানসী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃপ্তি দাস। রাজ্য ভেষজ অধিকারক ও স্বাস্থ্য-দপ্তরের পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ মাননীয় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

'যাযাবর' নাট্যসংস্থা সম্প্রতি 'তটিনীর বিচার' নাটকটি সাফল্যের সংগে পরিবেশন করেছেন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। সুনীতকুমার দাসের সূক্ষ্ম শিল্পবোধসমৃদ্ধ নির্দেশনায় নাট্য-প্রযোজনাটি সবাইকেই প্রায় মুগ্ধ করেছে। অভিনয়ে তিনটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণের স্বাক্ষর রেখেছেন সুনীত দাস (ডঃ ভোস), শিপ্রা সাহা (তটিনী), অরুণ সেনগুপ্ত (বসন্ত)। অন্যান্য ভূমি-কায় ছিলেন বাসুদেব দাস, পুষ্পেন্দু চ্যাটার্জী, উষবতী, বেলা রায়, চিত্রিতা মণ্ডল, পূর্ণ শীল, মিহির সরকার, নীরু দাশগুপ্ত।

আরাধনা/শর্মিলা ঠাকুর ও রাজেশ খান্না।

বোম্বাই শহরের চার্নি রোড স্টেশনের কাছে আজ প্রায় দু'বছর ধরে বিরাট এক পোস্টার ঝুলছে। উপর থেকে, নীচে থেকে, ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে এমন কি আকাশ থেকেও চোখে পড়ে। দু'বছর ধরে কত লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই পোস্টারটা দেখছে :
DREAMGIRL HEMAMALINI IS COMING
দেখছে আর ভাবছে, কে এই হেমা-মালিনী আর কারই বা সে স্বপ্নকন্যা। ছোটবেলা পূর্ববঙ্গের গ্রামে দু'একবার ঘাটুগান দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঘাটুগানের একটা লাইন মনে পড়ল, এই পোস্টারের দিকে তাকিয়ে।

তোমার নাম যে হেমা-মালিনী,
আমার মাথা খেয়েছ।
প্রাণ-যাদুরে, আহা মরি
কি মালা গে'থেছ।

বোম্বাই থেকে

খবর নিয়ে জানা গেল, এই হেমা-মালিনীও লক্ষ লক্ষ হিন্দী-ফিল্মের দর্শকদের জন্য মালা গাঁথা সুরু করেছে। স্বপ্নকন্যাই বটে এমনি তার রূপ আর গুণ। দক্ষিণ ভারতীয় কোটীপতি প্রযোজক প্রথম দর্শনেই স্থির করলেন, হেমাকে প্রথম শ্রেণীর তারকা তৈরী করবেন। দেবানন্দর সংগে নায়িকা করে কিছুদিন নাকি স্যুটিংও করলেন। শেষ পর্যন্ত নায়কের সংগে বুঝি বনল না। এলেন রাজ কাপুর (সদলবলে) হেমার নায়ক হয়ে। তৈরী হল 'স্বপন-কা-সোদাগর' কোটি টাকা খরচ করে। সে ছবিতে হেমা-মালিনী নাকি যা পার্ট করেছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। (দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দী ছবি।)

রাজকাপুর হেমাকে নিয়ে এলেন বোম্বাই—'মেরা নাম জোকার' ছবির অন্যতম নায়িকা হল হেমা। কিন্তু 'স্বপন-কা সোদাগরে'র প্রযোজকের কি হল? আজ তিনবছর ছবি তৈরী হয়ে পড়ে আছে। হেমা-মালিনীর ওপর অভিমান করেই কি এতদিন ছবি মুক্তি করতে চান নি। সুখবর, স্বপ্ন-কা-সোদাগর এবারে নাকি মুক্তি পাবে। ইতিমধ্যে হেমামালিনীর খ্যাতি হাসনাহেনার গন্ধের মতই শহরের প্রযোজক মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকগুলো ছবির সে নায়িকা এখন। তার একটার নাম জানা গেল, টাইমস্ ফিল্মসের 'রক্ষা'।

বোধহয় সব কজন চিত্র-তারকারই ইতিহাস এক। প্রযোজকরা সর্বস্ব পণ করে একটা সাধারণ মেয়েকে তারকার পর্যায়ে তোলেন, শেষ পর্যন্ত তার মুনাফা ভোগ করে অন্যান্যরা। অবশ্য বেশীর ভাগ তারকাই স্বল্পায়ু। আজ যে খ্যাতির মধ্যাহ্ন-গগনে, দু'বছর বাদে হয়ত তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। যারা চালাক-চতুর এই দু'বছরেই সারাজীবনের রসদ সঞ্চয় করে। কেউ কেউ মোটা মক্কেল বাগিয়ে বিয়ে-থা ইত্যাদি করে জেঁকে বসে। তারপর বাকীজীবন সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর কাটিয়ে দেয়। আশা করি হেমা-মালিনীর জ্যোতি দীর্ঘকাল অম্লান থাকবে।

তারকাদের কথা বলতে গিয়ে অশোক-কুমারের কথা সবার আগে মনে পড়ে। অশোককুমার আজ প্রায় তেত্রিশ বছর ধরে চিত্র-জগতে এক উজ্জ্বল তারকা। এঁর জ্যোতি দিন দিন যেন উজ্জ্বলতর হচ্ছে। জরা বার্ধক্য তাঁর ত্রিসীমানায় নেই। চির-যুবা নায়কের মুখে বন্ধন-কম্পনের হাসি আজ-ও অটুট। আমার পাঁচতলার ফ্ল্যাটের মুখোমুখি ছ'তলা বাড়ীর ওপরের দোতলায় থাকেন তিনি।

সপ্তাহে অন্তত দু'দিন সকাল কিম্বা সন্ধ্যায় ছাদের আলিসায় কিম্বা পাঁচতলার বারান্দায় তাঁকে শোবার ঘরের জানালা দিয়ে আমরা দেখতে পাই। অশোককুমার সাধারণত পা-জামা ও পাঞ্জাবি পরে থাকেন বাড়ীতে। কোন বন্ধু-বান্ধব এলে আমরা তাঁদের শোবার-ঘরে নিয়ে এসে অশোককুমারকে দেখাই। ততক্ষণে হয়ত তিনি ঘরের ভেতর চলে গেছেন। কিন্তু আমাদের উৎসাহ তাতে বাড়ে বই কমে না। সবাই তাঁর বাড়ীর দিকে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ

যান তিনি আর একবার বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। অবাঙালী বন্ধু-বান্ধবীরা বলেন, সৌভাগ্য তোমাদের যে, শুধু অশোককুমারের বাড়ীর সামনেই থাক না, মাঝে মাঝে তাঁর দর্শন-ও পাও।

আমি বলি, শুধু দূর থেকেই নয়, মাঝে মাঝে কাছে থেকেও তাঁর দর্শন পাই।

আপনি অশোককুমারকে জানেন! বিস্মিত স্বরে বলে আগন্তুকেরা; ওর বাড়ীতে যান বুঝি!

অশোককুমারের বাড়ীতে প্রতিমাসে গড়পড়তা দুটো করে পার্টি হয়। সাধারণত রাত দশটা থেকে ভোর তিনটে অবধি চলে হৈ-হুল্লোড় নাচ-গান। হোমরা-চোমরা প্রযোজক পরিবেশক চিত্রতারকারা আসেন এই সব পার্টিতে। কোন কোন পার্টিতে চিত্রসাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ করেন অশোককুমার। দু'একবার তাঁর পার্টিতে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমন্ত্রণ পাই আর না-পাই, তাঁর পার্টিতে যোগ আমাকে দিতেই হয়।

সামনের ফ্ল্যাটে আলো আর হাসি আর হুল্লোড়। ঘুমানো কি যায় তখন? নিশুতি রাতের রামপার্ট-রো মুখরিত। ইংরেজী ও হিন্দী সংলাপের ভেতর মাঝে মাঝে বাংলা কথাগুলো সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় আমার কাছে। অশোককুমারের পরিবার—কিশোরকুমার, অনুপকুমার আজো নিজেদের ভেতর বাংলা বলেন। এই সব পার্টিতে প্রায়ই দাদামণির গাওয়া পুরানো জমানার 'জীবন নইয়া', 'অচ্ছুত কন্যা', 'বন্ধন', প্রভৃতি ফিল্মের ডিস্কগুলো বাজানো হয়। আর নিমন্ত্রিতেরা বেজায় হাততালি দেন। এক পার্টিতে অশোককুমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অচ্ছুত কন্যা' 'জীবন-নাইয়া' প্রভৃতি আগেকার দিনের ছবিতে আপনার অভিনয় আজো আমরা ভুলতে পারি না।

তাহলে কি বলতে চান, তিনি স্মিত হেসে বললেন, আজকাল আমি আর অভিনয় করতে পারি না? Not at all আসল ব্যাপারটা কি জানেন, সে-যুগে প্রযোজক পরিচালক ও সিনেমার সাধারণ দর্শকদের কাছে সত্যিকার গল্পের মান ছিল। কাহিনীর গভীরে ওরা পৌঁছাতে পারতেন। সেজন্যই ত প্রভাত, নিউ থিয়েটার্স ও বোম্বে টকিজ কিছু কিছু অসাধারণ ছবি তৈরী করতে পেরেছিলেন। আর সব চিত্র-তারকাদের মত অশোককুমারও আশাবাদী। বলেন, এবারে একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চরিত্রে রূপ দিচ্ছি যেখানি ছবিতে—সিচুয়েশন-ধর্মী টাইপ-চরিত্র নয় এবার।

—শ্রীজতী মিত্র

পতৌদি ও শর্মিলা ওরফে আয়েষা সুলতানার বিয়ের সময়ে অঙ্গীকার পত্র পড়ে শোনানোর দৃশ্য।

বিবিধ সংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সংস্থা 'প্রচেষ্টা'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ এবং পৌরোহিত্য করেন সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রধান অতিথি তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে 'প্রচেষ্টার' উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করেন এবং এই শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কার্যসূচীতে ক্রীড়া, সেবা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মের একত্র সন্নিবেশে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি তাঁর সময়োপযোগী ভাষণে কর্মিবৃন্দকে উৎসাহিত করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তিতে কাজী সব্যসাচী ও সঙ্গীতে সর্বশ্রী অমল নাগ, বাণী ঠাকুর, অনুপ ঘোষাল প্রমুখ শিল্পি-বৃন্দ উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দদান করেন। নাটকানুষ্ঠানে 'প্রচেষ্টা'র সভ্যেরা মজরায়ের কাহিনী অবলম্বনে ভবানী ভট্টাচার্য রচিত 'এক বায়সঃ কথা' মঞ্চস্থ করেন। নাটিকাটি পরিচালনায় এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ে শ্রীবিলাস মুখোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। অন্যান্য ভূমিকায় সর্বশ্রী ধরণীধর ঘোষ, হীরকরঞ্জন দাস, বাবুল মিত্র, তাপস চক্রবর্তী, অঙ্কুর ব্যানার্জি, শুভেন সরকার, গর্জন সেনগুপ্ত, অরুণ সরকার, চপল সেনগুপ্ত, অতীন চক্রবর্তী, হিরন্ময় চট্টরাজ, অশোক মুখার্জি, দিলীপ বোস, স্বপ্না ঘোষ ও কৃষ্ণা সরকারের অভিনয় প্রশংসনীয় হয়। সর্বশ্রী সমর সরকার, জয়ন্ত চৌধুরী, দিলীপ ভোঁস, প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা মিত্রের উৎসাহে ও উপদেশে প্রখ্যাত আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীভোলানাথ দে ও নৃত্য-পরিচালক শ্রীপ্রভাত ঘোষের সহযোগিতায় এবং সভ্য-সভ্যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

গত ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ২১১, বিধান সরণিতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ পুরাতনী ব্রহ্ম সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিল্পীদের কণ্ঠে ব্রহ্ম-সংগীতগুলি পরি-বেশন অত্যন্ত উচ্চমানের হয়। এজন্য উপস্থিত সকলে শিল্পীদের প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন, বদুভট্ট, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতির গানগুলি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়। সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করেন—সর্বশ্রী ইন্দিরা রায়, অনীতা চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বন্দ্যোঃ, ইন্দ্র-জিৎ ও সুরজিৎ রায়, কণিকা শীল, সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল রায় ও আরো অনেকে।

আগামী ১৯ জানুয়ারী বালিগ[...] ইয়ং মেন্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা[...] আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠি[...] হবে। এবারকার বিশেষত্ব কেবলম[...] অবাঙ্গালীদের জন্য আবৃত্তির একটি নতু[...] বিভাগ। আবৃত্তির বিষয়—(ক) সর্বসাধার[...] —হঠাৎ দে মা (রবীন্দ্রনাথ), (খ) স্কু[...] ছাত্রছাত্রী—সিঁড়ি (সুকান্ত ভট্টাচার্য), ([...] শিশু—গল্প বলা (সুকুমার রায়), ([...] অবাঙ্গালীদের জন্য — প্রশ্ন (রবীন্দ্রনাথ[...] নাম দেবার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ার[...]

আগামী ১৪ই জানুয়ারী থেকে ১[...] জানুয়ারী পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী [...] সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মহাজা[...] সদনে। উদ্যোক্তা : আলাউদ্দিন সঙ্গ[...] সমাজ সম্মেলনের শেষ অধিবেশনটি স[...] রাতব্যাপী। প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে থাকে[...] মনব্বর খাঁ, জামিল হায়দার, মীরা ব্যানা[...] প্রসূন ব্যানার্জি, এ কানন, মালবিকা কা[...] আরতি বাগচী, মমতা বেগম, অজয় [...] চৌধুরী, শ্রীলা চক্রবর্তী, সলিল চ্যাটা[...] তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ব্যানা[...] বাহাদুর খাঁ, আলী আহম্মদ খাঁ, ডি[...] যোগ, কঙ্কন লাহিড়ী, শিশিরকণা [...] চৌধুরী, কেরামৎ খাঁ, শ্যামল বোস, ন[...] মহারাজ, কানাই দত্ত, আমীরুল আহ[...] খাঁ, অভিজিৎ চক্রবর্তী অরুণকিশোর [...] চৌধুরী, মায়া চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা [...] ও আরও অনেকে।

বেতার শ্রুতি

বাঙালীর কাছে শিব চির-দরিদ্র। প্রাকৃত পৈঙ্গলে বাঙালীর সাংসারিক দুঃখের যে চিত্র পাওয়া যায় তা কোনো বাঙালী কবির রচনা বলেই মনে হয়। একটি কবিতায় সেকালের দরিদ্র বাঙালীর প্রিয় খাদ্যের বর্ণনা আছে—

ওগ্গর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা।

অর্থাৎ কান্তা রম্ভার পাতে ওগরা ভাত, গাওয়া ঘি, জুতসই দুধ, ময়না মাছ, নালিতা গাছ মানে পাটশাক বেড়ে দেয়, আর পুণ্যবানে তা খায়।

কাল বদলেছে। সেকাল একাল হয়েছে। একালে সাধারণ মানুষ তো ভাল সঙ্গতিপন্ন লোকেরাও খাঁটি গাইক ঘিত্তা আর দুগ্ধ সজুত্ত পায় না। তবে একালে নালিচ গচ্ছার অপ্রতুল হয় নি এখনও। এই গচ্ছাই এখন দরিদ্র বাঙালীর 'প্রিয়' খাদ্য। নানা রকম গচ্ছা—পুঁই পালং নটে ডাঁটা মুলো।

কথাটা মনে পড়ল গত ১৮ই ডিসেম্বরের মহিলামহল শুনে। মহিলামহলের পরিচালিকা তাঁর শ্রোতাদের শীতের সময় শরীর সুস্থ রাখার প্রসঙ্গে খাবারের দিকে নজর দিতে বললেন। সেই প্রসঙ্গে বাঙালীর প্রিয় শীতের শাক-সবজির কথাও বললেন। শ্রোতাদের কাছে তিনি আবেদন জানালেন, কী করে শীতের শাক-সবজি দিয়ে নানা রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায় তা জানাতে। শেষে একটি লাইন যোগ করে খরচের দিকটাতেও জোর দিলেন। বললেন, পাকপ্রণালী পাঠাবার সময় শ্রোতারা যেন খরচের দিক লক্ষ্য রাখেন, এমন সব প্রণালী পাঠান যাতে খরচ কম হয়। অর্থাৎ তিনি দরিদ্র বাঙালীদের দিকে তাকালেন। দরিদ্র বাঙালীরা যাতে অল্প খরচে তাদের 'প্রিয়' শাক-সবজি দিয়ে তৈরি 'প্রিয়' খাবার খেতে পারে তার জন্য আগ্রহ দেখালেন।

এই আগ্রহটা ভালো লাগল। এখন মহিলামহলের শ্রোতারাও যদি উদ্যোগ করে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা করে পাঠান, নিজের রান্নাঘরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা জানান তাহলে আজকের এই দুর্দিনে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মস্ত উপকার হয়। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে খাবার নিয়ে নানা রকম গবেষণা হয়, নতুন নতুন উদ্ভাবন হয়—হয় না শুধু আমাদের দেশে। অথচ এই বাংলাদেশে কী করে অল্প খরচে অল্প সময়ে সহজপ্রাপ্য জিনিস দিয়ে পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায় সেইটেই আজকের দিনের বড় দরকার।

আর দরকার, খাদ্যের অপচয় নিবারণে রেডিও থেকে বার বার করে বলা। ইঁদুরে-বাঁদরে আর পোকা-মাকড়ে খাদ্য যে খেয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই, তার উপর যদি রান্নাঘরে অপচয় হয় তাহলে আর দুঃখের শেষ থাকে না।

তাই অপচয় নিবারণের উপর বেশি করে জোর দিতে হবে, রেডিও থেকে অবিরাম প্রচার চালাতে হবে—এবং তা বেশি করে হবে মহিলামহল থেকে। তবে সেই প্রচার যেন বাস্তবসম্মত হয়, যুক্তিগ্রাহ্য হয়।

এই প্রসঙ্গে অনেক কাল আগে মহিলামহলের অপচয়-নিবারণ সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটি বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। শান্তিনিকেতনে তাঁর কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। এক সময় রেডিওর প্রসঙ্গ উঠল। তিনি কিছুকাল কলকাতা রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, ব্রহ্মার বাপের সাধ্যি নেই এই রেডিওকে ভালো করে। নানা দৃষ্টান্ত দিলেন। তারপর গল্পটা বললেন।

একদিন মীটিংয়ে আগের দিনের প্রোগ্রাম মেটেরিয়াল ফাইল ওলটাতে ওলটাতে মহিলামহলে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির কিউ-শীটের ওপর তাঁর চোখ পড়ল। এক জায়গায় দেখলেন লেখা আছে—খিচুড়ির পরোটা।

তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, 'খিচুড়ির পরোটা? সে আবার কী বস্তু? পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক খাবারই আমি খেয়েছি। আমার না-খাওয়া খাবার বোধহয় কমই আছে। কিন্তু খিচুড়ির পরোটা তো কখনও খাই নি। বাপের জন্মে নামটাও কোনোদিন শুনি নি। তোমাদের মধ্যে কোনো বঙ্গ-সন্তান খেয়েছ কি?'

মীটিংয়ের অন্য সকল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। কারও মুখে কথাটি নেই। খানিক পরে মহিলামহলের পরিচালিকা নম্র কণ্ঠে অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, 'আজ্ঞে সার, ওটা বাসী খিচুড়ির পরোটা। আগের দিন রাত্রের রান্না খিচুড়ি যদি বেঁচে যায় তাহলে সেটা ফেলে না দিয়ে তা-ই দিয়ে পুর করে পরোটা।'

মুজতবা আলী বলে উঠলেন, 'এ যে ছাগলের জন্যে মোষ মানত করা! খানিকটা বাসী খিচুড়ি ফেলে দিতে হবে বলে একগাদা টাটকা ঘি-ময়দা নষ্ট করতে হবে? আমরা মোষ হারালে ছাগল মানত করি, কিন্তু ছাগল হারালে মোষ মানত করি কি?'

• • • অনুষ্ঠান পর্যালোচনা • • •

১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় মহিলামহলে গায়িকা শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীমতী বিনতা রায়ের সাক্ষাৎকারটি বড়ো মিষ্টি লাগল। দুজনের কথাবার্তার মধ্যে একটুখানি কৃত্রিমতা ছিল, একটুখানি অস্বাভাবিকতা। তাতেই সাক্ষাৎকারটি শিল্পরসের ছোঁয়া পেয়েছিল—কারণ আর্ট তো পুরোপুরি বাস্তব নয়, পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। তার মধ্যে একটুখানি অবাস্তবতা থাকবে, একটুখানি কৃত্রিমতা থাকবে। তবে পরিমিত মাত্রায় থাকবে, যাতে অবাস্তবতাটুকু চট করে ধরা না পড়ে, কৃত্রিমতাটুকু চট করে চোখে না লাগে।

ঐ যে শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়ের ধীর বিনম্র স্বরে, যতিপাত করে, একটুখানি টেনে টেনে, শেষটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে দিয়ে, চেষ্টাহীন সহজ সুরে কথা বলা, এবং তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় শ্রীমতী বিনতা রায়ের এগিয়ে যাওয়া, তাতেই মিষ্টি হয়েছে আলোচনা।

১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে দুখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী আরতি সেন। প্রথম গানখানির চেয়ে দ্বিতীয় গানখানিই তাঁর সুন্দর। কণ্ঠে তাঁর মিষ্টতা আছে, কিন্তু উচ্চারণে কৃত্রিমতা আছে বেশি, এবং সে কৃত্রিমতা যেন চেষ্টাকৃত। তাঁর র-য়ে আর ড-য়ে পার্থক্য নেই বিশেষ—'সুরে' 'সুড়ে' হুয়ে যায় 'দূরে' চলে যায় 'দূড়ে'। শ-য়ের পরে জোরটা যেন বেশি—তাই 'বিশ্ব' তাঁর কণ্ঠে 'বিশ্-শো' হয়ে দেখা দেয়। অধুনা-দৃষ্ট এক শ্রেণীর অস্বাভাবিক গায়িকার সঙ্গে তাঁর যেন কিছু মিল পাওয়া যায়। এমন গলায় এমন অস্বাভাবিকতা, এ বড়ো পরিতাপের। তিনি যদি আর একটু স্বাভাবিকতার ধার ঘেঁষে যান, উচ্চারণে কৃত্রিমতার ভাগ কমান তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতামোদীদের কাছে সেটা খুশিরই বিষয় হবে।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে ভজন শোনাচ্ছিলেন শ্রীমতী কৃষ্ণা বাগচি। খুব একটা আরাম লাগছিল না, সুর মিলছিল না। তাই সাড়ে ৭টার পূর্বমুহূর্তে ঘোষক যখন শেষ গানটি অসমাপ্ত রেখে দিল্লীর বাংলা খবরের জন্য স্বার উন্মুক্ত করে দিলেন তখন তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া গেল না।

এইদিন বেলা ১টা ৫০ মিনিটে মহিলামহলে শ্রীসুবোধ রায় রচিত একটি নাটক শোনা গেল—'তীর ও তরঙ্গ'। এটি কেমন করে যে নাটকপদবাচ্য হতে পারে, ভেবে বিস্মিত হতে হয়। নাটকের কোনো ধর্মই এতে পালিত হয় নি—রূপকেরও না, নকশারও না। এটি যে কী, ঠিক করে বলা মুশকিল।

একটি মেয়ে, কলেজে পড়ে। ক্লাস করে আর নোট টোকে আর লাইব্রেরি যায়। মেয়েটি ভালো গান গায়। কিন্তু ফাংশান-টাংশান আর সঙ্গী-সাথী সব এড়িয়ে চলে, কারণ তার সাধারণ শাড়ি আর ছেঁড়া চটি।

তবু তাকে কয়েকজন সহপাঠিনী ভালোবাসে। একজনের তো অন্তরঙ্গ সে। তারই অনুরোধে এক ফাংশনে সে গান গাইতে রাজী হল।

পর পর তিনখানা আধুনিক গান গেয়ে শ্রোতাদের সে মুগ্ধ করল। তার ঐ সহপাঠিনীর বাবা তো তাকে বাড়ি না নিয়ে গিয়ে ছাড়লেন না। বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুব করে খাওয়ালেন, প্রতিশ্রুতি চাইলেন রোজ কলেজ ফেরৎ তাকে গান শুনিয়ে যেতে হবে। তখন জানা গেল অর্থাভাবে তার আর পড়াই হবে না। সহপাঠিনীর বাবা বিস্মিত হলেন, এমন মেয়ের পড়া হবে না, এ কি একটা কথা! মেয়েটির সঙ্গে তিনি গেলেন তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

দেখা করে জানলেন যে, মেয়েটির বাবার অনেকগুলি সন্তান, সংসারের ভারে তিনি ন্যুব্জ।

ভদ্রলোক তখন তাঁকে অনেক উপদেশ দিলেন। আজকের দিনে অধিক সন্তানের অসুবিধার কথা বোঝালেন। শেষে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন এবং এজন্য কী ব্যবস্থা আছে ও কোথায় কার কাছে যেতে হবে সব বলে দিলেন। মেয়েটির বাবা খুশি হলেন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণে আগ্রহ দেখালেন।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে নাটকটির কাহিনী। নাটকটির প্রথম কুড়ি মিনিট শুনে মনে হল মেয়েটির সংগীতজীবনের পরিণতিই বুঝি এর উপজীব্য, কিন্তু ভুল ভাঙল পরবর্তী চার মিনিটের কথোপকথনে। তখন দেখা গেল এটি নাটক নয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের প্রোপ্যাগান্ডা। অথচ ঘোষণা করা হয়েছে নাটক বলে, সাধারণত এই ধরনের প্রোপ্যাগান্ডার বিষয়কে রূপক বা নকশা বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের প্রোপ্যাগান্ডার পর পর তিনখানি আধুনিক গান শোনাবার এবং তার জন্য পৃথক একজন সংগীত-পরিচালক নিযুক্ত করতে হয়েছিল) কী প্রয়োজন ছিল বোঝা গেল না। তাছাড়া আধ ঘণ্টার নাটকে—অবশ্য যদি নাটক বলা যায়—নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তিনখানি গান যাঁরা পরপর শোনাতে পারেন, তাঁদের নাট্যজ্ঞান সম্বন্ধে যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। নাটকটি শুনে এমনও মনে হতে পারে যে, নাটকের সময় বাড়ানোর জন্যই সম্পূর্ণ অকারণে এই তিনখানি গানের সন্নিবেশ অথবা গানগুলির অনুপ্রবেশ ভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

নাটকটি ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের প্রোপ্যাগান্ডা, কিন্তু নাটকে এমন একজনের কাছে প্রোপ্যাগান্ডা করা হল, যাঁর এখন আর [illegible] প্ল্যানিংয়ের বোধ হয় তেমন দরকারই নে[illegible] মেয়েটি কলেজে পড়ে, বিবাহযোগ্[illegible] সুতরাং সাধারণভাবে ধরে নেওয়া [illegible] পারে তার বাবার ফ্যামিলি প্ল্যানিং[illegible] সময় বেশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নাটক[illegible] এখানে তাক করেছেন প্যাঁচা, ম[illegible] চেয়েছেন বাদুড় এবং রেডিও কর্তৃপক্ষ অম্লান বদনে মেনে নিয়েছেন।

নাটকের সংলাপেও কোনো ম[illegible] নেই। বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধা নেই। নাট্[illegible] মেয়েটিকে তার সহপাঠিনীর ব[illegible] খাইয়ে তারপর তাকে দিয়ে খা[illegible] অবশিষ্টাংশ রুমালে বেঁধে বাড়ি [illegible] তাকে অপমান করেছেন, হীন প্র[illegible] করেছেন। তার দারিদ্র্যের জন্য তার [illegible] শ্রোতাদের সহানুভূতি আকর্ষণ ক[illegible] পারেননি, আস্বস্তি উদ্রেক কর[illegible] মেয়েটির প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমত্ব [illegible] পায়নি। সে যে বিনা অপরাধে কষ্টে[illegible] হয়েছে, তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র [illegible] দেখাননি। অথচ তাকে তিনি ভালো [illegible] গুণী মেয়ে বলে ঘোষণা করেছেন। নির্মম সৃষ্টি কোনো সাহিত্যস্রষ্টার সম্ভব কিনা জানি না।

এই নাটকের অভিনয় চলনসইও যায় না। গোড়ার দিকের অভিনয় [illegible] মতো অসহ্য, জায়গায় জায়গায় ক[illegible] অভিনয়। নাটকের গানগুলি অবশ্[illegible]

১৭ই ডিসেম্বর বেলা [illegible] বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে ডঃ [illegible] সাহা সম্পর্কে শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible] কথিকাটি বেশ সুন্দর লাগল। বেশ[illegible] ধীরে সহজ সরল ভঙ্গিতে ডঃ মেঘনাদ [illegible] যে-পরিচয় তিনি দিলেন, তাতে তথ্যে[illegible] বেশি ছিল না, পাণ্ডিত্য প্রকাশের [illegible] না—আর তাতেই কথিকাটি চিত্তাকর্ষ[illegible] উঠেছিল।

১৯শে ডিসেম্বর বেলা ১২[illegible] মিনিটে দিল্লী থেকে প্রচারিত খব[illegible] জায়গায় বলা হল, 'যোগাযোগ উপগ্র[illegible] করী কিনা...' ইত্যাদি। এখানে [illegible] বলতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন [illegible] নিজেই কি কিছু বুঝেছেন? স[illegible] যতদূর মনে হয়, এখানে ইকনমিকে[illegible] করা হয়েছে অর্থকরী। দিল্লীর [illegible] বিভাগের হাতে বাংলাভাষা আর [illegible] খাবে?

এই খবরেই অন্য প্রসঙ্গে [illegible] জায়গার নাম বলা হল—রিও ডি জে[illegible] বক্তা কি অনুগ্রহ করে ইংরেজী [illegible] একবার পরীক্ষা করে দেখবেন? [illegible] দেশের নাম-করা সব জায়গার [illegible] অভিধানও পাওয়া যায়, নিশ্চয় [illegible] কপি সংবাদ বিভাগে নেই! থাক[illegible] উলটে দেখতে বলা যেতে পারত।

আন্তর্জাতিক সাঁতার ও ভারত

শঙ্করবিজয় মিত্র

ভারতবর্ষ সেই দেশ যে 'দেশমে গঙ্গা বহতী হ্যায়'। শুধু গঙ্গা কেন, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র ও আরও কত কি। নদীর তীরে তীরে জনপদ, মানুষের বসতি। নদীতীরের মানুষকে সাঁতার জানতে হয়, সাঁতার কাটেও তারা। কিন্তু এ সাঁতার সে সাঁতার নয়, যে সাঁতার আজ বিশ্বের ক্রীড়াভূমিতে একটা প্রধান আসন নিয়ে বসেছে। নদীর জলে, এঁদো পুকুরে আপন তাগিদের সাঁতার তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই নদী-নালার মালা পরেও ভারত তার কোন সাঁতারুর মাধ্যমে বিশ্ব-ক্রীড়া প্রতিযোগিতার গৌরবের মালা বক্ষে ধারণ করতে পারেনি। আজকের অন্যান্য ক্রীড়ার মত সাঁতারেও অবলম্বিত হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা, দেশে দেশে নির্মিত হয়েছে সুইমিং পুল উন্নত পদ্ধতিতে, আর বিভিন্ন ধরনের সাঁতারে বিভিন্ন প্রয়োগ-কৌশল খাটিয়ে তাতে গতি, বেগ ও অভিনবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ্যাথলেটিকসের দৌড়ের মত সাঁতারও আজ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র এবং দিন দিন এর মান দ্রুত উন্নত হয়ে চলেছে।

বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন খেলাধুলোর সর্ববিষয়ে ক্রীড়াকৃতি যাচাইয়ের প্রধান রণভূমি। সম্প্রতি মেকসিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ওলিম্পিকে দেখা গেছে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বরাবরের মত এবারও সাঁতারে শ্রেষ্ঠস্থান নিয়েছে। তেত্রিশটি প্রতিযোগিতার মধ্যে তেইশটিতেই আমেরিকা প্রথম স্থান দখল করেছে এবং সাঁতারে মোট ৯৯টি পদকের মধ্যে ৫৮টিই তারা দখল করেছে। এতেও আমেরিকা সন্তুষ্ট নয়, তারা এর চেয়েও অনেক বেশি আশা নিয়ে এসেছিল এবং যে বিপুল উদ্যম, পরিকল্পনা, শিক্ষণ ও অর্থ দিয়ে তারা আমেরিকান তরুণ-তরুণীদের শিক্ষিত করে তুলেছিল তাতে অন্য কোন দেশ স্বর্ণ-পদক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এমন ফাঁক রাখা হয়নি। ওলিম্পিক আসরে মার্কিন সাঁতারুদের ঘিরে যে প্রচার চলেছিল এবং এক-একজন সাঁতারু যেভাবে অবলীলাক্রমে রেকর্ডের পর রেকর্ড করে চলেছিলেন তাতে তাঁদের এ আশা পোষণ করা শুধু মাত্র কল্পনাবিলাস ছিল না—কঠোর বাস্তবের সঙ্গে তার গভীর সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু খেলাধুলোর সর্বদাই অঘটন ঘটে, তাই ১৯শে অক্টোবর মেকসিকোর সুইমিং পুলে স্বল্পপাল্লার ফ্রি-স্টাইল আর মহিলাদের চিৎ-সাঁতারের সোনার পদক দুটি যখন অস্ট্রেলিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার করায়ত্ত হল তখন মার্কিন শিবিরে বিস্ময়মিশ্রিত হতাশা উঁকি দিয়েছিল। এমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই মেকসিকোর এক স্বল্পবয়সী তরুণ সাঁতারু ২০০ মিটার বুক সাঁতারের সোনার পদকটাও ছিনিয়ে নিয়েছিল। এমনি দু-একটি সোনার-পদক বেরিয়ে গেলেও সাঁতারের প্রায় সকল বিভাগে আমেরিকার তরুণ-তরুণীদের সাফল্য এ্যাথলেটিকসে তাদের সহ-জুটিদের মতই গৌরবদীপ্ত।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ আসন বজায় রাখতে সে দেশের সাঁতারুরা যে মস্ত বড় ভূমিকা নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। এর আগে অন্যান্য ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের চেয়েও এবার মেকসিকো ওলিম্পিকে মার্কিন সাঁতারুদের সফল ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকেও সাঁতারে আমেরিকাই পুরোভাগে আসন নিয়েছিল। টোকিওতে ১৬টি স্বর্ণ-পদক সঞ্চয়ের গৌরবকে অনেকখানি ঊর্ধ্বে তুলে এবার সেখানে ২৩টি স্বর্ণ-পদক জিনে এনেছেন মার্কিন সাঁতারুরা। মেকসিকোর বিজয়মঞ্চ মার্কিন সাঁতারুদের সাফল্যে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

এককালে অস্ট্রেলিয়া ও জাপান সাঁতারে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল এবং ওলিম্পিকে আমেরিকার সঙ্গে জোর পাল্লা চালিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্য অনেককে আশান্বিত করে তুলেছিল যে আমেরিকার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে অস্ট্রেলিয়া। জাপানও মাঝখানে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল: কিন্তু এ-দুটি দেশই আবার পিছিয়ে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়া মাঝখানে মাথাচাড়া দিলেও জাপানকে সাঁতারে আর কোন ভূমিকা নিতে দেখা যায় না।

টোকিও ওলিম্পিকেই জলক্রীড়ায় আমেরিকা এমন প্রাধান্য স্থাপন করেছিল যে অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোন দেশের সাঁতারু সোনার পদক নিয়ে যেতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রাশিয়ার গ্যালিনা প্রোজুমেনশ্চিকোভা। গ্যালিনা দুশো মিটার বুক সাঁতারে স্বর্ণ-পদক জয় করেছিল। মেক্সিকোতে আমেরিকার প্রাধান্য ছিল ষোড়শী তরুণী ডেবি মেয়ার। মেয়ার এবার দুশো, চারশো ও আটশো মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম হয়েছেন এবং তিনটি বিভাগেই ওলিম্পিক রেকর্ড গড়েছেন। দূর পাল্লার সাঁতারেও ডেবি মেয়ারের কৃতিত্ব অসাধারণ। গত বছর তিনি আঠার মিনিটের কম সময়ে পনেরশো মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে ক্রীড়াবিদদের চমক লাগিয়েছিলেন। ওলিম্পিকে যদি এরকম দূর পাল্লা সাঁতারের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সে-ক্ষেত্রেও সোনার পদকটা তাঁরই করায়ত্ত হত সন্দেহ নেই।

ডেবি মেয়ারের এই সাফল্য অসাধারণ ত বটেই, তাছাড়া অভূতপূর্বও বলা চলে। কারণ এর আগে একটি ওলিম্পিক ব্যক্তি-প্রয়াসে সাঁতারের তিনটি স্বর্ণপদক আর কেউ পায়নি। তবে মেয়ারের এই সাফল্য সম্পর্কে আমেরিকার ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া-কর্তার সকলেরই প্রত্যাশা ছিল। গত বছরই ডেবি চারশো মিটার ও আটশো মিটার সাঁতারে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করেন। সে-রেকর্ড তাঁর মেক্সিকো ওলিম্পিকের রেকর্ডের চেয়ে উন্নততর ছিল।

মেক্সিকো নগরীর উচ্চতা নিয়ে যে-কলরব উঠেছিল, তার প্রশমনের উদ্দেশ্যে মেক্সিকোতে ক্ষুদে ওলিম্পিকের অনুষ্ঠান হয়। ডেবি মেয়ার সেই ওলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দুশো, চারশো ও আটশো মিটারের তিনটি বিভাগেই প্রথম স্থান নিয়েছিলেন অনায়াসেই।

ষোড়শী ডেবি মেয়ার মার্কিন ক্রীড়া-কর্তাদের প্রত্যাশা পূরণ করলেও যাঁকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি আশা করা হয়েছিল সেই মার্ক স্পিটজ সবচেয়ে বেশি আশা ভঙ্গ করেছেন। ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের পূর্বে আমেরিকার সাঁতার বিশেষজ্ঞগণ বলেছিলেন, স্পিটজ কম-সে-কম পাঁচখানা স্বর্ণপদক মেক্সিকো থেকে নিয়ে আসবেন। সাঁতারের বিভিন্ন বিভাগে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেই এই তরুণ সাঁতারু সকলকে এতখানি আশান্বিত করেছিলেন। সপ্তদশবর্ষীয় স্পিট্জ বাটারফ্লাই-এ আট-আটটি বিষয়ে এবং ফ্রি স্টাইলের একটি বিষয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করে এই আশা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু কারণ যাই হোক মেক্সিকোতে তিনি মার্কিন কর্তাদের সমস্ত আশাই ধূলিসাৎ করেছেন। একক কৃতিত্বে তিনি একটিও স্বর্ণপদক জয় করতে পারেননি। রিলে সাঁতারের দলভুক্ত থাকায় যৌথ প্রয়াসের সফল দাবীদার হিসেবে তিনি একটি স্বর্ণ-পদক পেয়ে অফুরন্ত আশার অংশমাত্র পূরণ করতে পেরেছেন।

আমেরিকার নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের দুর্গে হানা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মার্ক ওয়েন্ডেন ও পূর্ব জার্মানীর রোল্যান্ড ম্যাথেজ প্রত্যেকে দুটো করে স্বর্ণ-পদক ছিনিয়ে নিয়েছেন মেক্সিকোর জলক্রীড়ায়। ওয়েন্ডেন জিতেছেন একশো ও দুশো মিটার ফ্রি স্টাইলে এবং ম্যাথেজ জিতেছেন একশো ও দুশো মিটার চিৎ সাঁতারে। মার্কিন সাঁতারু ডন স্কোলান্ডার চার বছর আগে টোকিওতে একাই চারটি স্বর্ণপদক জিতেছিলেন এবারও তাঁর তেমনি আশাই ছিল। কিন্তু অস্ট্রেলীয় ওয়েন্ডেন তাঁকে হারিয়ে দিয়ে দুশো মিটার

ফ্রি স্টাইলে জিতেছেন ও স্কোল্যাণ্ডারের রেকর্ডও ডিঙিয়ে গেছেন। শত মিটার ফ্রি স্টাইলেও ওয়েন্ডেন নূতন বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী হন। মার্কিন সাঁতারু কেন ওয়ালসের ৫২·৬ সেকেন্ডকে অতিক্রম করে ওয়েন্ডেন ৫২·২ সেকেন্ডের বিশ্ব-রেকর্ডের নজীর স্থাপন করেন। শত মিটার ফ্রি স্টাইলে কেন ওয়ালসকে রূপোর পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ওয়েন্ডেন যেমন ফ্রি স্টাইলে পূর্ব জার্মানীর রোনাল্ড ম্যাথেজ তেমনি চিৎ সাঁতারের একশো ও দুশো মিটারে অসাধারণ কৃতিত্বের নজীর রেখে মার্কিন প্রাধান্যকে ক্ষুন্ন করেছেন। এ-দুটো বিভাগেই তিনি স্বর্ণ-পদক জয় করেছেন।

চিৎ সাঁতারে ম্যাথেজের অভ্যুদয় যেমন আকস্মিক, তেমনি অসাধারণ দ্রুতগতিতেই তার বিকাশ। ১৯৬৬ সালে সাঁতারের দুনিয়ায় ম্যাথেজের কোন অস্তিত্ব ছিল না। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে সাতটি সপ্তাহে তাঁর অভ্যুদয় ঘটে ও ইউরোপের সাঁতারুদের মধ্যে তিনি নিজের স্থান করে নেন এবং পর পর চিৎ সাঁতারের তিনটি বিষয়ে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী হন।

অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতির সিঁড়ি বেয়ে ম্যাথেজ যেভাবে তার শীর্ষে নিজেকে নিয়ে যান তা সত্যিই বিস্ময়কর। বিশ্বের সাঁতারু তালিকার প্রথম কুড়িজনের মধ্যেও তাঁর নাম ১৯৬৬ সালে খুঁজে পাওয়া যেত না, এমনকি ইউরোপীয় সাঁতারু তালিকায় কুড়িজনের মধ্যেও তাঁর নাম ছিল না। পূর্ব জার্মানীর সাঁতারুদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল তৃতীয়; একশো মিটার ও দুশো মিটার চিৎ সাঁতারে তাঁর সময় ছিল যথাক্রমে ৬৩·৬ ও ২ মিনিট ১৮·৬ সেকেন্ড।

অক্লান্ত সাধনা ও অফুরন্ত মনের জোরে ম্যাথেজ গত বছর ২০শে সেপ্টেম্বর ১১০ গজ চিৎ সাঁতার ৬০·১ সেকেন্ড সময়ে শেষ করেন। এতে ম্যাথেজ ১৯৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার জন মঙ্কটনের রেকর্ড ভঙ্গ করেন ১·৪ সেকেন্ড কম সময় নিয়ে। ২১শে সেপ্টেম্বর ম্যাথেজ একশো মিটার চিৎ সাঁতারে ৫৮·৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে আমেরিকার চার্লস হিককসের রেকর্ড ভেঙে দেন। হিককস মাত্র চারদিন আগে টোকিওতে বিশ্ব ছাত্র গেমসে এই রেকর্ড করেছিলেন ৫৯·১ সেকেন্ড সময় নিয়ে। এইখানেই শেষ নয়। ম্যাথেজ আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ২৯শে অক্টোবর তারিখে। তিনি দুশো মিটার চিৎ সাঁতারে ইউরোপীয় রেকর্ড করলেন ২ মিনিট ১১·১ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। নভেম্বরের ৮ তারিখে তিনি ২ মিঃ ৭·৯ সেকেন্ডে দুশো মিটার চিৎ সাঁতার সমাপ্ত করে হিককসের আর একটি রেকর্ড ভঙ্গ করলেন প্রায় দেড় সেকেন্ড কম সময় নিয়ে। এইভাবে তিনি সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে তিন-তিনটি বিভাগে বিশ্ব-রেকর্ড করে অকস্মাৎ খ্যাতির শীর্ষে আসন নিলেন। মেক্সিকো ওলিম্পিকে তাই তিনি একশো ও দুশো মিটার চিৎ সাঁতারে যে সফল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর আভাস দিয়েছিলেন।

ম্যাথেজের এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রয়াসের দ্বারাই সম্ভবপর হয়নি, এই প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করবার জন্য পূর্ব জার্মান রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ক্রীড়া-কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিলেন।

মেক্সিকো ওলিম্পিকে এমনি একটি অপ্রত্যাশিত সাফল্যের নজীর তুলে ধরেছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার অখ্যাত তরুণী জুরাডিক জেদভ। একশো মিটার বুক সাঁতারে তিনি সমগ্র ক্রীড়াঙ্গণের চমক লাগিয়ে স্বর্ণ-পদকখানা করায়ত্ত করেছিলেন। একুশ বছর বয়স্কা এই তরুণী ছাত্রী ও রাশিয়ার গ্যালিনা প্রোজুমনশ্চিকোভার মধ্যে শেষপর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। শেষ ২৫ মিটারের সময় জেদভ অসামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১ মিঃ ১৫·৮ সেকেন্ডে এ সাঁতার সম্পন্ন করে ওলিম্পিক রেকর্ড-সহ স্বর্ণ-পদকের অধিকারী হন। রাশিয়ার গ্যালিনা টোকিও ওলিম্পিকের দুশো মিটার বুক সাঁতারে স্বর্ণ-পদক পেয়েছিলেন। কিন্তু যুগোশ্লাভ তরুণীর তীব্র গতিবেগের কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তাঁকে রৌপ্য-পদক নিয়েই তুষ্ট হতে হয়। আমেরিকার কৃতী সাঁতারু মহিলা বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারিণী কেটিবল প্রথম অর্ধপথ পর্যন্ত এগিয়ে থাকলেও শেষপর্যন্ত তাঁকেও ব্রোঞ্জ-পদক নিয়েই ক্ষান্ত হতে হয়। যুগোশ্লাভ তরুণীটি একেবারেই অখ্যাত এই জন্য যে মেক্সিকো ওলিম্পিকের পূর্ববর্তীকালে কোন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তিনি কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি। তাছাড়া এর আগে সাঁতারে যুগোশ্লাভিয়ার কোন সন্তরণ-বীর বিশ্ব ওলিম্পিকের কোন বিভাগে দাগ কাটতে পারেননি।

মেক্সিকো ওলিম্পিকের জলক্রীড়ায় আর একটি অনন্যসাধারণ ভূমিকা নিয়েছেন মেক্সিকোর সপ্তদশবর্ষীয় ছাত্র ফেলিপে মুনোজ। পেপে নামেই ছাত্রটি সমধিক পরিচিত। দুশো মিটার বুক সাঁতারে পেপে ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনের সহস্র সহস্র দর্শককে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে স্বর্ণ-পদক নিয়েছেন। মেক্সিকো ওলিম্পিকে ওই একটি মাত্র স্বর্ণ সঞ্চয় তাঁর দেশের ভাগ্যে ঘটেছে তাঁরই অপূর্ব কৃতিত্বে। আধুনিক ওলিম্পিকের ইতিহাসে মেক্সিকোর ভাগ্যে এটি তৃতীয় স্বর্ণ-পদক। ১৯৪৮ সালে লন্ডন ওলিম্পিকে অশ্বারোহণে স্বর্ণ-পদক জয় করেছিলেন হাম্বার্টো মার্টিজ এবং ১৯৫৬ সালে মেলবোর্নে হাই-ডাইভিং-এ সোনার পদক এনেছিলেন জোয়াকিন ক্যাপিলা।

মুনোজ সাঁতারে স্বর্ণ-পদক জয় করবে মেক্সিকোর অতি আশাবাদীও এ কল্পনা করেননি। বরং তাঁদের আশা ছিল গুইলার্মো একেভারিয়া পারলে ১৫০০ মিটার সাঁতারে কিছু একটা করলেও করতে পারেন। কারণ গত বছর ক্যালিফোর্ণিয়ার সাণ্টাক্লারাতে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-রেকর্ড সৃ[illegible] কারী মার্কিন সাঁতারু মাইক বার্টনের [illegible] মাত্র ছ' সেকেন্ড বেশি সময় নিয়েছি[illegible] তিনি। তাছাড়া ৪০০ মিটার সাঁতারেও [illegible] মিশটজের সঙ্গে পাল্লায় তীব্র প্র[illegible] দ্বন্দ্বিতার পর দ্বিতীয় স্থান অধি[illegible] করেছিলেন। তাই মেক্সিকোবাসী [illegible] তিরেই কিছুটা আশা পোষণ করেছি[illegible] সেই কারণে মুনোজ যখন দুশো মি[illegible] সাঁতারের ফাইনালে উঠলেন, তখন [illegible] বেশ বিস্মিতই হলেন। তারপর ফাইনা[illegible] সাঁতারের সময় প্রথম একশো মিটার সাঁত[illegible] শেষে দেখা গেল মুনোজ চতুর্থ [illegible] রয়েছেন। তাঁর সামনে রয়েছেন [illegible] জার্মানীর হেনিজার, রাশিয়ার কোসিন[illegible] ও আমেরিকার জব। শেষ ৫০ মিট[illegible] আগে ঘোরবার মুখে মুনোজ আর দু[illegible] কাটিয়ে দ্বিতীয় স্থান নিয়েছেন। [illegible] সামনে তখন একমাত্র রাশিয়ার কোসিনা[illegible] ঘুরে পড়েই মুনোজ কোসিনাস্কিকে [illegible] ধরে ফেলেন আর কি। দুজনের মধ্যে [illegible] ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক ইঞ্চির। ২৫ [illegible] থাকতে মুনোজ সমান সমান পাল্লা [illegible] লাগলেন কোসিনাস্কির সঙ্গে। সমস্ত [illegible] প্রয়োগ করে শেষ ২৫ মিটার সাঁতার[illegible] মুনোজ স্বর্ণ-পদক জয় করলেন।

মেক্সিকো ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের [illegible] বিশ্ব সাঁতারের অবস্থা পর্যালোচনা [illegible] দেখা গেছে আমেরিকা ব্যাপকভাবে প্র[illegible] বিস্তার করলেও ইউরোপের বিভিন্ন [illegible] অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার মধ্যে [illegible] সাঁতারের মান উন্নয়নে বিশেষ [illegible] করে চলেছে। সাঁতারের প্রতিযো[illegible] গুলিতেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible] জয়ী হতে হয়। তবে প্রতিযো[illegible] সহজেই যে-কোন প্রতিযোগিতায় যোগ [illegible] পারে।' তাই এবার স্থির হয়েছে, [illegible] ওলিম্পিক সাঁতারে যোগ দেওয়ার [illegible] দেশ-বিদেশের সাঁতারুদের প্রাক-ওলি[illegible] অনুষ্ঠানে যোগ্যতার ন্যূনতম [illegible] পৌঁছাতে হবে। এ-বিষয়ে অ্যাথলেটি[illegible] যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সাঁতারেও [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এই [illegible] অনুযায়ী সাঁতারের একই বিভাগে যদি [illegible] দেশের একাধিক প্রতিযোগী থাকে, [illegible] তাদের যোগ্যতার ন্যূনতম মানের [illegible] রাখতেই হবে। ১৯৭২ সালে মি[illegible] ওলিম্পিকেই এই ব্যবস্থা চালু হবে [illegible] শোনা গেছে।

সাঁতারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ [illegible] প্রভূত উন্নতিসাধন করছে, তখন [illegible] আমরা কতখানি কি করেছি আলোচনা [illegible] দেখতে পাই খেলাধুলার অন্যান্য বি[illegible] মত এ-বিভাগেও আমাদের দৈন্য [illegible] সাঁতারের ভারতীয় প্রতিযোগিতায় [illegible] বোম্বাই ও বাংলার সাঁতারুদের কৃ[illegible] পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও, মানের তুলনায় তাদের মান অনেক [illegible] এই মানকে তুলে ধরতে না পারলে প্রতিযোগিতায় আঁচড় কাটার স্বপ্ন দিনই সফল হবে না। আমাদের সর[illegible] ক্রীড়া-কর্তৃপক্ষের ঘুম কবে ভাঙবে?

খেলাধূলায় নিগ্রোদের অগ্রগতি

ক্ষেত্রনাথ রায়

অন্তর্জাতিক খেলাধূলোর আসরে ...াব জয়ের সিংহভাগ নিয়ে বসে আছে ...রোপ. আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার ...হকায় খেলোয়াড়রা। বাকি ভাগটা ...বতকায়দের। অশ্বেতকায়দের মধ্যে ...খযোগ্য সাফল্য জাপানী এবং নিগ্রো ...লায়াড়দের। আমেরিকা, আফ্রিকা, ...স্ট ইণ্ডিজ. ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের ...গ্রো খেলোয়াড়রা বিভিন্ন খেলাধূলোয় ...র্জাতিক খ্যাতি লাভের সূত্রে অশ্বেত- ...জাতিগুলির মুখোজ্জ্বল করেছেন। ...গ্রোদের কাছে জনপ্রিয় খেলা এ্যাথ- ...টিকস. ক্রিকেট. বাস্কেটবল, ফুটবল এবং ...সিং। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ... ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জাতীয় ক্রিকেট দল ... ব্যাপারে সেখানের শ্বেতকায়দের ...দিনের অন্যায় প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ... পায়। ফ্রাংক ওরেলের নেতৃত্বে ...স্ট ইণ্ডিজের শক্তিশালী নিগ্রো ক্রিকেট ...আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার নিস্তেজ ... যে শক্তি সঞ্চার করে—ক্রিকেট খেলার ...হাসে তা এক নতুন অধ্যায়। এ ব্যাপারে ...স্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো ক্রিকেট খেলোয়াড়- ... অবদান সর্বজনস্বীকৃত। ওয়েস্ট ...ডিজের নিগ্রো ক্রিকেট দল দীর্ঘকাল ...র্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ...রাজিত থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান খ্যাতি ...রে রেখেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো ...কেট খেলোয়াড়—লিয়ারী কনস্টানটাইন, ... হেডলি, ফ্রাংক ওরেল, ক্লাইড ওয়াল- ...এভার্টন উইকস, গারফিল্ড সোবার্স ...ইত বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড়। ...ধারণ ক্রিকেট খেলার সূত্রে এ পর্যন্ত যে ...ড়িয়ে ক্রিকেট খেলোয়াড় দুর্লভ রাজ- ... স্যার উপাধিলাভ করেছেন তাঁদের ... ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই আছেন দুজন ...গ্রো খেলোয়াড়—লিয়ারি কনস্টানটাইন ... ফ্রাংক ওরেল। সর্বকালের অন্যতম ...ষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার স্যার ...নাল্ড ব্র্যাডম্যানের খেলার সঙ্গে তুলনা ... ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো ক্রিকেট ...লোয়াড় হেডলিকে বলা হয় 'ব্ল্যাক ব্র্যাড- ...' আবার 'ব্র্যাডম্যান অফ দি ক্যারা- ...বিয়ান'। আবার ওয়ালকট, ওরেল এবং ...কস এই তিনজন খেলোয়াড় আন্ত- ...র্জাতিক ক্রিকেট মহলে 'থ্রি ডবলিউ' নামে ...পরিচিত। এই তিনজনেরই প্রথম অক্ষর ...ডবলিউ এবং তা থেকেই এই বিচিত্র নাম- ... 'থ্রি ডবলিউ'। এই তিনজন খেলোয়াড় ...জন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুর্ভেদ্য ...। এই তিনজনের মধ্যে একজনেরও ... বাকি থাকলে বিপক্ষের মাথায় ...চিন্তার বোঝা ভারী হয়েই থাকতো।

সরকারী টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় গারফিল্ড সোবার্স যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড (নট আউট ৩৬৫ রাণ) করেন তা আজও কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি। তাছাড়া সোবার্স সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 'অল রাউণ্ডার' হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন।

অনেকেরই চোখের সামনে ত্রয়ী 'ডবলিউ'-এর (ওয়ালকট - ওরেল - উইকস) ক্রীড়াবৃত্তি জ্বলজ্বল করছে। ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের বিপক্ষে কিংস্টনের ৫ম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের স্কোর বোর্ড : মোট রান ৫৭৬ এবং স্কোর বোর্ডে পর পর তিন-জনের স্কোর—ওরেল ২৩৭ রান, উইকস ১০৯ রান এবং ওয়ালকট ১১৮ রান। টেস্ট ক্রিকেটে তিনজনেরই এই রকমের উল্লেখযোগ্য রান করার নজির আরও আছে। এভার্টন উইকস টেস্ট ক্রিকেটে উপর্যুপরি পাঁচটি ইনিংসে সেঞ্চুরী রান করার সূত্রে যে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন তা আজও কারও পক্ষে স্পর্শ করাও সম্ভব হয়নি।

স্যার ফ্র্যাংক ওরেল

১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ফ্র্যাংক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ওরেলের ধ্যান-ধারণা ছিল—বলিষ্ঠ খেলা। পরাজয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আত্মরক্ষামূলক নিস্তেজ খেলা নয়। ওরেলের এই বলিষ্ঠ নীতির উপরই টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র নজির গড়ে উঠলো—১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট

স্যার লিয়ারি কনস্টানটাইন

সিরিজের প্রথম টেস্টে (ব্রিসবেন) অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান সংখ্যা সমান দাঁড়ায়—অভূতপূর্ব ঘটনা। টেস্ট খেলার ইতিহাসে আজও একমাত্র 'টাই ম্যাচ'। অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রতিটি খেলাই দারুণ উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলকে রাজকীয় নাগরিক সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত করা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের আতি-থেয়তায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বলিষ্ঠ খেলোয়াড়রা চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ওরেলের ধ্যান-ধারণাকে স্বীকৃতি দিলেন 'ওরেল কাপ'-এর প্রবর্তন করে। অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের পুরস্কারই এই 'ওরেল কাপ'। আন্ত-র্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে নিগ্রো খেলোয়াড়ের কি বিরাট স্বীকৃতি! কোন খেলোয়াড়ের নামে টেস্ট সিরিজে পুরস্কারের প্রবর্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম নজির।

বক্সিং খেলাতেও নিগ্রোদের যথেষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। এখানে একটা নামই যথেষ্ট হবে—বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ন জো লুই। দীর্ঘ ১১ বছর ৮ মাস ৭ দিন ধরে জো লুই তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখে ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ অবসর নেন। বিশ্ব হেভী ওয়েট বিভাগে জো লুইয়ের সমান সময় কেউ তাঁর বিশ্ব খেতাব ধরে রাখতে পারেন নি। বিশ্ব-খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখতে জো লুইকে ২৫ বার লড়তে হয়েছিল।

ফুটবল খেলাতেও নিগ্রো খেলোয়াড়রা পেছনে পড়ে নেই। বিশ্ব ফুটবল প্রতি-যোগিতায় ব্রেজিলের জুল রিমে কাপ জয় —ফুটবল খেলায় নিগ্রোদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। ব্রেজিলের ফুটবল খেলোয়াড় পিলে—আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায়

জগতে একটি অতি জনপ্রিয় নাম। আর একটি নাম—আফ্রিকার নিগ্রো ফুটবল খেলোয়াড় ইউসেবিও ডা সিলভা ফেরিয়া। পর্তুগালের বিখ্যাত বেনফিকা ফুটবল দলে ইউসেবিও একজন শ্রেষ্ঠ পেশাদার খেলোয়াড়। তাঁর সহযোগিতায় বেনফিকা দু'বার ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান্স কাপ জয়ী হয়। ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইউসেবিও পর্তুগালের পক্ষে শেষ পর্যায়ের খেলায় ৮টা গোল দিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের ফুটবল খেলায় বিচারে ইউসেবিও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিসে দু'জন নিগ্রো খেলোয়াড় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন—মহিলা খেলোয়াড় এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) এবং পুরুষ খেলোয়াড় আর্থার এ্যাস (আমেরিকা)। নিগ্রো পুরুষ এবং মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র এ্যালথিয়া গিবসনই এ-পর্যন্ত উইম্বলেডন খেতাব পেয়েছেন—উপর্যুপরি ২ বার সিঙ্গলস খেতাব (১৯৫৭-৫৮) এবং উপর্যুপরি ৩ বার ডাবলস (১৯৫৬-৫৮)। আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় নিগ্রো খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন একমাত্র আর্থার এ্যাস—১৯৬৮ সালে।

আমেরিকার বাইরে অন্যান্য দেশের নিগ্রো এ্যাথলীটরা অলিম্পিক পদক জয়ের সূত্রে কিভাবে এগিয়ে চলেছেন তারই একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার দৌড়

রৌপ্য পদক—৪টি

জ্যাক লন্ডন (গ্রেট বৃটেন, বৃটিশ গায়না) ১৯২৮
হার্ব ম্যাক্‌কীনলে (জামাইকা), ১৯৫২
এনরিক ফিগারোলা (কিউবা), ১৯৬৪
লেনোক্স মিলার (জামাইকা), ১৯৬৮

ব্রোঞ্জ পদক ৪টি

হ্যারী এডওয়ার্ড (গ্রেট বৃটেন, বৃঃ গায়না), ১৯২০

এভার্টন উইকস

লয়েড লাবীচ (পানামা), ১৯৪৮
এমানুয়েল ম্যাক্‌ডোনাল্ড বেলী (গ্রেট বৃটেন, ত্রিনিদাদ), ১৯৫২
হ্যারী জেরোম (কানাডা), ১৯৬৪

২০০ মিটার দৌড়

ব্রোঞ্জ পদক—৪টি

হ্যারী এডওয়ার্ড (গ্রেট বৃটেন, বৃঃ গায়না), ১৯২০
লয়েড লাবীচ (পানামা), ১৯৪৮
এ্যাব্‌ডাওলায়ে সিয়ে (ফ্রান্স, সেনেগাল), ১৯৬০
এডউইন রবার্টস (ত্রিনিদাদ), ১৯৬৪

৪০০ মিটার দৌড়

স্বর্ণ পদক—২টি

আর্থার উইন্ট (জামাইকা), ১৯৪৮
জর্জ রোডেন (জামাইকা), ১৯৫২

ব্রোঞ্জ পদক—৩টি

হার্ব ম্যাকীনলে (জামাইকা), ১৯৪৮ ও ১৯৫২
ওয়েন্ডেল মটলে (ত্রিনিদাদ), ১৯৬৪

৮০০ মিটার দৌড়

রৌপ্য পদক—৩টি

আর্থার উইন্ট (জামাইকা), ১৯৪৮, ১৯৫২
উইলসন কেপ্রুগাট (কেনিয়া), ১৯...

ব্রোঞ্জ পদক—৪টি

ফিল এডওয়ার্ডস (কানাডা, বৃঃ গায়না) ১৯৩২ ও ১৯৩৬
জর্জ কার (জামাইকা), ১৯৬০
উইলসন কেপ্রুগাট (কেনিয়া), ১৯...

১,৫০০ মিটার দৌড়

স্বর্ণ পদক—১টি

কিপচোগে কিনো (কেনিয়া), ১৯৬৮

ব্রোঞ্জ পদক—১টি

ফিল এডওয়ার্ডস (কানাডা, বৃঃ গায়না) ১৯৩২

৫,০০০ মিটার দৌড়

রৌপ্য পদক—১টি

কিপচোগে কিনো (কেনিয়া), ১৯৬৮

ব্রোঞ্জ পদক—১টি

নাফতালি তেমু (কেনিয়া), ১৯৬৮

১০,০০০ মিটার দৌড়

স্বর্ণ পদক ১টি

নাফতালি তেমু (কেনিয়া), ১৯৬৮

রৌপ্য পদক—১টি

মামো ওয়াল্ড (ইথিওপিয়া), ১৯...

ম্যারাথন

স্বর্ণ পদক—৩টি

আবেবে বিকিলা (ইথিওপিয়া), ১... ও ১৯৬৪
মামো ওয়াল্ড (ইথিওপিয়া), ১...

হাইজাম্প

ব্রোঞ্জ পদক—১টি

জোস টেলেস (ব্রেজিল), ১৯৫২

লংজাম্প

রৌপ্য পদক—১টি

সিলভিও কাটোর (হাইতি), ১৯...

ট্রিপল জাম্প

স্বর্ণ পদক—২টি

এ এফ ডা সিলভা (ব্রেজিল), ... ও ১৯৫৬

রৌপ্য পদক—১টি

নেলসন প্রুডেনসিও (ব্রেজিল), ...

ব্রোঞ্জ পদক—১টি

আরনোল্ডো ডেভোনিস (ভেনিজু... ১৯৫২

৩০০০ মিটার স্টিপ্‌লচেজ

স্বর্ণপদক—১টি

এমোস বিয়োউ (কেনিয়া), ১৯৬...

রৌপ্য পদক—১টি

বেঞ্জামিন কোগো (কেনিয়া), ১৯...

১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে নিগ্রোদের বিশ্ব রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ—ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান

দৌড়	রেকর্ড মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বছর
১০০ মিটার	৯.৯	জিম হাইন্স	আমেরিকা	১৯৬৮
২০০ মিটার	১৯.৮	টমি স্মিথ	আমেরিকা	১৯৬৮
৪০০ মিটার	৪৩.৮	লী ইভান্স	আমেরিকা	১৯৬৮
লং-জাম্প	২৯ ফিঃ ২½ ইঃ	বব্ বিমোন	আমেরিকা	১৯৬৮

মহিলা বিভাগ—ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান

দৌড়	রেকর্ড মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারিনী	দেশ	বছর
১০০ মিটার	১১	উইমা টিয়াস	আমেরিকা	১৯৬৮
৮০০ মিটার	২ ০০১	মেডেলিন ম্যানিং	আমেরিকা	১৯৬৮

দর্শক

ডেভিস কাপ

এডিলেডের মেমোরিয়াল ড্রাইভ কোর্টে অনুষ্ঠিত ১৯৬৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলায় আমেরিকা ৪—১ খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করার সূত্রে ২০-বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। আমেরিকার পক্ষে এই জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, অস্ট্রেলিয়া গত চার বছরের (১৯৬৪-৬৭) ডেভিস কাপ বিজয়ী এবং সর্বাধিক ২২-বারের ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ডও অস্ট্রেলিয়ার। আমেরিকা শেষ ডেভিস কাপ পেয়েছিল ১৯৬৩ সালে এবং ১৯৬৪ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২—৩ খেলায় পরাজয় বরণের পর আমেরিকার শোচনীয় হাঁড়ির হাল হয়েছিল —তিন বছর প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় পশ্চিম ব্রেজিল এবং ইকুয়েডোরের কাছে হেরে যায়।

প্রথম দিনের খেলায় আমেরিকা ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়।

ক্লার্ক গ্রেবনার (আমেরিকা) ৮—১০, ৮—৬, ৮—৬, ৩—৬ ও ৬—১ গেমে বিল বাউরীকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার এ্যাশ (আমেরিকা) ৬—৮, ৭—৫, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে রে রাফেলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় স্ট্যান স্মিথ এবং বব লুৎজ ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে অস্ট্রেলিয়ার রে রাফেলস এবং জন আলেকজান্ডারকে পরাজিত করলে আমেরিকা ৩-০ খেলায় অগ্রগামী হওয়ার সূত্রে ডেভিস কাপ জয়ী হয়। মাত্র ৬৫ মিনিটে ডাবলস খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

তৃতীয় দিনে ক্লার্ক গ্রেবনার (আমেরিকা) ৩-৬, ৮-৬, ২-৬, ৬-৩ ও ৬-১ গেমে রে রাফেলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করলে আমেরিকা ৪-০ খেলায় এগিয়ে যায়। শেষ সিংগলস খেলায় বিল বাউরী (অস্ট্রেলিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে এবছরের আমেরিকান সিংগলস চ্যাম্পিয়ান আর্থার এ্যাশকে (আমেরিকা) ২-৬, ৬-৩, ১১-৯, ৮-৬ গেমে পরাজিত করলে অস্ট্রেলিয়া শূন্যের ০-৫ খেলায় পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পায়।

আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬৯ বছরের ইতিহাসে (১৯০০—৬৮) অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার সাফল্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেভিস কাপের ৬৯ বছরের জীবনে ১২ বছর খেলা হয়নি—১৯০১ ও ১৯১০ সালে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ দশ বছর (১৯১৫-১৮ ও ১৯৪০-৪৫)। ডেভিস কাপের ৫৭ বছরের খেলায় মাত্র ৪টি দেশ ডেভিস কাপ পেয়েছে—অস্ট্রেলিয়া ২২ বার (নিউজিল্যান্ডের সংগে অস্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার), আমেরিকা ২০ বার, গ্রেটবৃটেন ৯বার এবং ফ্রান্স ৬বার। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মোট ২৫ বারের প্রতিযোগিতায় (যেহেতু যুদ্ধের দরুণ ৬ বছর খেলা বন্ধ ছিল) অস্ট্রেলিয়া ২৫বারই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলে ১৬বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে এবং বাকি ৯বার জয়ী হয়েছে আমেরিকা। ১৯৩৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ১৯বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ১৬ বার—১৯৩৮—১৯৫৯)। বাকি ৬বারের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেছে চারটি দেশ—ইতালী ২বার (১৯৬০-৬১), স্পেন ২বার (১৯৬৫ ও ১৯৬৭), মেকসিকো ১বার (১৯৬২) এবং ভারতবর্ষ ১বার (১৯৬৬)। সুতরাং ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা হল পরস্পরের পুরাতন এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯০০—৬৮

	মোটখেলা	জয়	পরাজয়
অস্ট্রেলিয়া	৩৭	২২	১৫
আমেরিকা	৪৪	২০	২৪
গ্রেটবৃটেন	১৬	৯	৭
ফ্রান্স	৯	৬	৩
ইতালী	২	০	২
স্পেন	২	০	২
বেলজিয়াম	১	০	১
জাপান	১	০	১
মেকসিকো	১	০	১
ভারতবর্ষ	১	০	১

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুন ৬ বছর (১৯৪০—১৯৪৫) ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। ১৯৪৬ সাল থেকে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নীচে দেওয়া হল :

বৎসর	বিজয়ী			বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৪৮	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৯	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৪	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৮	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ইতালী	১
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	ইতালী	০
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	মেকসিকো	০
১৯৬৩	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬৫	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	১
১৯৬৬	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ভারতবর্ষ	১
১৯৬৭	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	১
১৯৬৮	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১

উপর্যুপরি ডেভিস কাপ জয়

উপর্যুপরি সর্বাধিকবার ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড :

৭বার—আমেরিকা (১৯২০—২৬)
৬বার—ফ্রান্স (১৯২৭—৩২)

একটি সিংগলস খেলায় সর্বাধিক গেমস

৭৮টি : জে ড্রবনি (চেকোশ্লোভাকিয়া) বনাম এ কে কুইস্ট (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৪৯ সালে বোস্টনে ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলা। ড্রবনি ৬-৮, ৩-৬, ১৮-১৬, ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে জয়ী হন।

একটি ডাবলস্ খেলায় সর্বাধিক গেমস

৮১টি (২বার) : (১) ১৯২৩ সালে ফরেস্ট হিলসে (আমেরিকা) অনুষ্ঠিত চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় যখন উইলিয়মস টিলডেন এবং আর এন উইলিয়মস (আমেরিকা). ১৭-১৫, ১১-১৩, ২-৬, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে জে ও অ্যান্ডারসন এবং জে বি হকসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন; (২) ১৯৫০ সালে ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়ান জোনের ৩য় রাউন্ডে প্রথম রেকর্ডকে স্পর্শ করেন জে বি হ্যাকেট এবং এম মার্ফি (আয়ারল্যান্ড) যখন তাঁরা ১০-৮, ৮-১০, ১২-১৪, ৭-৫ ও ৬-১ গেমে ভি স্কোনেংক এবং জে চাইএভস্কিকে (পোল্যান্ড) পরাজিত করেন।

একটি সেটে সর্বাধিক গেমস

৪৩টি : ১৯৫৭ সালে মন্ট্রিলে ব্রেজিল বনাম ইসরাইলের ডাবলস খেলার ১ম সেটে এই রেকর্ড স্থাপিত হয়।

অপরাজিত সম্মান

ইংল্যান্ডের এইচ এল ডোহার্টি ৫ বছরে (১৯০২—১৯০৬) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের ১৩টি খেলায় (সিঙ্গলস ৮ এবং ডাবলস ৫) যোগদান করে অপরাজিত ছিলেন। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় এ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় ডোহার্টির রেকর্ডকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি।

চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে শেষ খেলা

আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৮ সালে, স্পেন ১৯৬৭ সালে, ভারতবর্ষ ১৯৬৬ সালে, মেকসিকো ১৯৬২ সালে, ইতালী ১৯৬১ সালে, ইংল্যান্ড ১৯৩৭ সালে, ফ্রান্স ১৯৩৩ সালে, জাপান ১৯২৯ সালে এবং বেলজিয়াম ১৯০৪ সালে।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

সুইজারল্যান্ডের লুগানোতে আয়োজিত ১৯৬৮ সালের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় রাশিয়া চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের সূত্রে উপর্যুপরি ৯বার (১৯৫২ সাল থেকে এক বছর অন্তর) বিশ্ব খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছে।

প্রতিটি টেস্ট সিরিজে ট্রুম্যানের উইকেট

ইংল্যান্ডের বিশ্ববিশ্রুত ফাস্ট বোলার ফ্রেডী ট্রুম্যান বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় কিভাবে তাঁর ৩০৭টি উইকেট নিয়ে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব-রেকর্ড করেন তারই এক পরিসংখ্যান গত ২৮তম সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৩১১) দেওয়া হয়েছিল। পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহে ট্রুম্যানের প্রতিটি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের বোলিং পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল।

ট্রুম্যানের টেস্ট উইকেট

বছর	বিপক্ষ	খেলা	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
১৯৫২	ভারতবর্ষ	৪	১১৯·৪	২৫	৩৮৬	২৯
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	১	২৬·৩	৪	৯০	৪
১৯৫৩-৫৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩	১৩৩·২	২৭	৪২০	৯
১৯৫৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	১	৩৫	৪	১১২	২
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	২	৭৫	১৩	১৮৪	৯
১৯৫৭	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	১৭৩·৩	৩৪	৪৫৫	২২
১৯৫৮	নিউজিল্যান্ড	৫	১৩১·৫	৪৪	২৫৬	১৫
১৯৫৮-৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	৮৭	১১	২৭৬	৯
১৯৫৮-৫৯	নিউজিল্যান্ড	২	৪৪·৫	১৭	১০৫	৫
১৯৫৯	ভারতবর্ষ	৫	১৭৭·৪	৫৩	৪০১	২৪
১৯৫৯-৬০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	২২০·৩	৬২	৫৪৯	২১
১৯৬০	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫	১৮০·৩	৩১	৫০৮	২৫
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৪	১৬৩·৪	২১	৫২৯	২০
১৯৬২	পাকিস্তান	৪	১৬৪·৫	৩৭	৪০৯	২২
১৯৬২-৬৩	অস্ট্রেলিয়া	৫	১৫৮·৩	৯	৫২১	২০
১৯৬২-৬৩	নিউজিল্যান্ড	২	৮৮	২৯	১৬৪	১৪
১৯৬৩	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	২৩৬·৪	৫৩	৫৯৪	৩৪
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৪	১৩৩·৩	২৫	৩৯৯	১৭
১৯৬৫	নিউজিল্যান্ড	২	৯৬·৩	২০	২০৭	৬
মোট :		৬৭	২৪৪৮	৫২২	৬৬২৫	৩০৭

দ্রষ্টব্য : ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৬২-৬৩ সালের মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ বলে ওভার খেলা হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৫ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 10th January, 1969. শুক্রবার, ২৬শে পৌষ, ১৩৭৫ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅতুল তালুকদার

চিঠিপত্র

আপনজন প্রসঙ্গে

শ্রীতপন সিংহ পরিচালিত "আপনজন" দেখলাম। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা-সিঞ্চিত এমন একটি বিষয়বস্তু এ ছবিতে নেওয়া হয়েছিল যার সার্থকতার চিত্ররূপ শ্রীসিংহ-এর মত পরিচালকের কাছ থেকে পাব আশা করেছিলাম—কিন্তু বেদনার হলেও একথা সত্য যে আশা পূর্ণ হয়নি। ছবিটি দেখতে দেখতে বার বার মনে হয়েছে এ যেন বিদেশী অতিথিকে তোরন সাজানো রাস্তা দিয়ে রাজভবনে নিয়ে আসা।

ছবিতে পরিচালক "ফর্মকে" প্রাধান্য দিতে গিয়ে "কন্টেন্টকে" হারিয়ে ফেলেছেন অনেক জায়গায়। টাইটেলের সঙ্গে যে জাম্প্ কাট্ দেখানো হয়েছে তার আঙ্গিক-গত গুণটুকু নষ্ট হয়েছে প্রয়োগের আতিশয্যে। টাইটেল্ মিউজিক্-এ যে শট্‌গুলো দেখা গেল—"ওঠ মা ভারতলক্ষ্মী" গানের কয়েক কলির পরে হুবহু সেই মিউজিকের সঙ্গে সেই শট্‌গুলোকেই দেখানোতে প্রথমবারের সৌন্দর্যটুকু দ্বিতীয়বার ছিল কি? বারো রীলের ছবিতে ঐ শট্‌গুলির পুনঃপ্রয়োগের ফলে কি দৈন্য প্রকাশ পায়নি? জীবনবিক্ষুব্ধ ছন্নছাড়া যুবগোষ্ঠী দিন দিন মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে কেন,—তার কারণ অনুসন্ধান ক'রতে পরিচালককে সচেষ্ট দেখা গেল না—দেখা গেল, কি করে সস্তা সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়ে সমাজকে দেখানো যায় যে, এরা আমাদের "আপনজন"। তাই ছেনোর হাতের রিভলবারে আনন্দময়ীকে মরতে হয়। এ বিষয়বস্তুর উপর কিছু করতে হ'লে যতখানি সাহস বা সত্যি বলবার তেজ থাকা দরকার পরিচালকের বোধহয় তা ছিল না! নির্বাচনে নেতারা যে গুন্ডাদের সরাসরি কাজে লাগান—এ কথাটা কঠিনভাবে বলতে পারবেন না বলেই বোধ হয় দরকার হ'ল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষকে। একজন নেতার মুখ দিয়ে বলান হল "—এবার আমাদের সরাবে তোমরা অর্থাৎ গুন্ডারা, বুঝেছ?" কথাটা যথেষ্ট আপত্তিকর। কোনদিন কোন গুন্ডা কাউকে গদিতে বসাতে বা সরাতে পারেনি—পারবে না। মুখোশের জন্য সরস্বতী পুজোর দৃশ্য? অথবা সরস্বতী পুজোতে মুখোশ নাচ? এখানেও পরিচালক আঙ্গিকের প্রাধান্য দিতে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ হ'তে পারেন নি। বর্তমান বিকৃত যুবসমাজের প্রতীকী ব্যবহার মুখোশ,—সন্দেহ নেই। কিন্তু মস্তানদের কোন পুজো প্যান্ডেলে তাসা বা মাইকের কর্কশ হিন্দিগানের সঙ্গে টুইস্ট নাচের (যা আমাদের অন্তত হাজার-বার দেখা) পরিবর্তে মুখোশ নৃত্য হয়? রবির মস্তান হবার পেছনে যে কারণ দেখানো হয়েছে তা এত নগণ্য যা বর্তমান বিক্ষুব্ধ যুবগোষ্ঠীর একটি 'প্রতিনিধি চরিত্রে'র হতে পারে না। যে কারণে ছাত্রদের চেয়ার-টেবিল ভাঙতে দেখা গেল পরিচালক তথ্যনিষ্ঠ হ'লে দেখতে পেতেন ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতার পেছনের কারণগুলো তত হাল্কা নয়। দৃশ্যটিতে গাম্ভীর্য তো ছিলই না বরং একটি ছেলের গীটার সহযোগে নৃত্য—অত্যন্ত বিসদৃশ লেগেছে। পরিচালক বোধ হয় রোমের 'নিরো'কে স্মরণ করাতে চেয়েছেন। চানাভাজা আর ঘুঘনী দুটো আলাদা বস্তু বলেই জানতাম। একটা হয় ছোলাতে অন্যটা মটরএ। তাছাড়া ফিস্ট করতে একটিন কেরোসিন লাগে বোধ হয় ছেনোর সঙ্গে রবির সংঘর্ষের একটা ভূমিকা তৈরী করতে। ছবির শেষ দৃশ্যটিতে মনে হ'ল পুলিশ ও স্বাস্থ্য বিভাগের বিজ্ঞাপন। এ দুটি বিভাগেরই কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জনসাধারণ বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। তাছাড়া অংশটিতে একটি বিদেশী ছবি (ইস্ট সাইড ওয়েস্ট সাইড স্টোরির) আশ্চর্য মিল দেখা গেল।

"আপনজন"-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্পদ এর সম্পাদনা, আলোকচিত্র ও অভিনয়। টুক্‌রো টুক্‌রো ফ্ল্যাশ ব্যাক্ ও আনন্দময়ীর গুলী লাগার দৃশ্যে সম্পাদক যে মন্তব্য সৃষ্টি করেছেন বাঙলা ছবিতে তা বিরল।

তবুও সব মিলিয়ে "আপনজন" ছবিতে শ্রীতপন সিংহকে যতটা আপন ক'রে পাব আশা করেছিলাম—এককথায় তা পাইনি। বাবলু দাশগুপ্ত, ঝাঁশদ্রোনী, ২৪-পরগণা।

নতুন ঠগী

শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিখানি (২৯ নভেম্বর) পড়লুম। ইনি এঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বঙ্গ ও বহির্বঙ্গের দু'টি প্রতারকের কথা জানিয়েছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রতারকদের উদ্দেশ্য পুর্বাহ্নে জানতে পেরেই ভেতরের রহস্য উদ্ধার করতে ব্রতী হন। আমিও কলকাতায় অনুরূপ একজন প্রতারকের ফাঁদে পা দিতে এগোই নি। বোম্বের এক চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিকে বৌবাজারের 'ফিয়াস' লেনের ঠিকানা দিয়ে এক প্রতারক লেখনী-বন্ধুত্বের একটি বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনে নিয়মাবলী বিনামূল্যে পাওয়া যায় এ-কথার উল্লেখ ছিলো। আমি শুধু নিয়মাবলী পাঠাবার জন্যেই অনুরোধ-পত্র পাঠাই। কিছুদিন পর দেখি, বিনামূল্যের নিয়মাবলী ও তিনটি ক্যালেন্ডারের সঙ্গে একটি রেজিস্টার্ড পার্সেল এসেছে। দশ টাকার বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। লেখনী নাম-ঠিকানা না চাওয়া সত্ত্বেও পাঠানো হয়েছে দেখে আমি তা প্রত্যাখ্যান। রহস্য জানবার জন্যে আমি একা বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জানাই। আরো জানাই, সাক্ষাৎকারের টাকা জমা দিয়ে রসিদ ও লেখনী নাম-ঠিকানা নেবো। এই ভদ্রলোক মাত্র আমায় জানালেন যে, এই প্রতি কাজ চিঠি-পত্রের মাধ্যমে করা হয়, কারের মাধ্যমে নয়। দেখা করতে এ হবে না। পত্র পাওয়ার দিনেই আ ছুটির পর বৌবাজারের ফিয়াস দ্বিতলে উঠে অফিসের হদিস চেষ্টা করে দেখি, সব দরজা বন্ধ। বারান্দা। অফিসের দেয়ালে কোনো বা সাইনবোর্ড নেই। জায়গাটা অপরিষ্কার যে, তা অফিস খোলার অনুপযুক্ত।

মিহিরকুমার
স্ট্র্যান্ড রোড, কলকা

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যায় প্র স-মানাচিত্র নিবন্ধটি মনোগ্রাহী অসম্পূর্ণ বলে মনে করি। কারণ, স প্রায় প্রতিষ্ঠিত সায়ান্স-ফিকশান ক্লাবের নাম নিবন্ধে নেই, মানচিত্রে অথচ এই সংস্থাটির উদ্বোধনী সত্যজিৎবাবু বলেছিলেন, এ জাতীয় ভারতে প্রথম—সম্ভবত বিশ্বেও। অতিথি এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রী কান্তি ঘোষের মনোজ্ঞ আলোচনার সংবাদ 'অমৃত' সহ সব পত্রি বেরিয়েছিল। ওয়াল্ট ডিজনীর আ এসে পৌঁছেছিল। ফিল্ম সো আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও সংস্থাটি নিবন্ধকারের চোখ গেছে। খুব সম্ভব এই সংস্থা ফেডারে সদস্য নয় বলেই এটি সম্ভব হ কিন্তু সংস্থাটি ফেডারেশনের সদস্য স্বেচ্ছায়। প্রথম কারণ, ফেডারেশন বেশিত ফিল্মগুলি সায়-ফি ফিল্ম দ্বিতীয় কারণ, অর্থের অভাব। এ ক্লাবের সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা মাত্র ছয় থেকে আট টাকা। কিন্তু রেশনের সদস্য হতে গেলে ক্লাবকে প্রায় ৫০০ টাকা দিতে হয়। আপনার সমীপে আনলাম পাঠকসাধ অবগতির জন্য।

অদ্রীশ ব
সেক্রেটার
সায়ান্স-ফিকশান সিনে

সম্পাদকীয়

আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি

নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু নতুন কথা শোনা গেছে। আমাদের তো সমস্যার অন্ত নেই। দেশের ভিতরে ও বাইরে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভবিষ্যতের মোকাবিলা করতে যে প্রয়োজন সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। শ্রীমতী গান্ধীর সাংবাদিক সম্মেলনে, বছরের প্রথম দিনে, সর্বপ্রথম বৈঠকে, তিনি যেভাবে আমাদের সমস্যা ও তার সমাধানের পথনির্দেশ করেছেন তা হতাশাব্যঞ্জক নয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে যে-সংকটে পড়েছি শ্রীমতী গান্ধী সে-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আশার বাণী শুনিয়েছেন। মন্দার ফলে বিগত বৎসর যে-সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল তার জের নাকি আমরা কাটিয়ে উঠছি। এখন পুনরুদ্ধার অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ফিরে আসার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু করতে না পারলে অর্থনৈতিক অনড় অবস্থা পরিবর্তনের আশা কম। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে যথাসময়ে পরিকল্পনার কাজ শুরু হবে। এটা ভরসার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু কাজ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের উদ্বেগ থাকবেই। কারণ মানুষের প্রত্যাশা বাড়ছে, বহু মানুষ চাইছে কাজ, চাইছে ন্যূনতম নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। সমাজের অর্থনৈতিক প্রগতিশীলতাই একটি সজীব সমাজের ক্রমবর্ধমান দাবি এবং প্রত্যাশা মেটাতে পারে। ১৯৬৯ সাল সেই প্রত্যাশা পূরণের সময়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী চীন-ভারত বিরোধ মেটানো সম্পর্কে সাহসিক প্রস্তাব দিয়েছেন। নতুন বছরের গোড়াতে প্রধানমন্ত্রীর এ-প্রস্তাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ছ' বছর হয়ে গেল চীনের সঙ্গে আমাদের বিরোধ অমীমাংসিত রয়ে আছে। ভারতের এলাকা রয়েছে চীনের দখলে। এবং এই ছ' বছরে চীনের কাছ থেকে শান্তি বা আপসের কোনো প্রস্তাব তো আসেনি, বরং তার জঙ্গী মনোভাব আরও বেড়েই গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই তার বিরোধ চিরকাল জিইয়ে রাখতে চায় না। তাই ভারতের দিক থেকে বার বার এ-কথাই বলা হয়েছে যে সম্মানজনক শর্তে, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে ভারত সব সময়েই চীনের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসা করতে রাজী। প্রস্তাবটি অবশ্যই একতরফা। কারণ চীনের কাছ থেকে এই প্রস্তাবের কোনো সাড়া আসেনি। প্রধানমন্ত্রী তা সত্ত্বেও বলেছেন যে, চীনের মতিগতি যাই হক না কেন, ভারত তার আত্মসম্মান এবং জাতীয় স্বার্থ বজায় রেখে সব সময়েই চীনের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে প্রস্তুত। নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। চীনের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত তথা নেতৃত্বের বিরোধের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত বহির্বিশ্বে তার জঙ্গী মনোভাবের পরিবর্তন হবে কিনা বলা শক্ত। যাই হক প্রধানমন্ত্রীর দিক থেকে এই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও প্রধানমন্ত্রী উদ্‌গ্রীব। যুদ্ধবর্জন চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত অনেক আগেই পাকিস্তানের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল। কাশ্মীর বিরোধের কথা তুলে পাকিস্তান সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তা সত্ত্বেও ভারত হাল ছাড়েনি। যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বিরোধের মীমাংসা হয় এবং শান্তিতে আমরা বসবাস করতে পারি তার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রী সে-আশ্বাসই দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও অনেক সমস্যা রয়েছে। সামনের মাসে চারটি রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন দলের সরকার গঠনের ফলে ভারতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের এক নতুন পরীক্ষা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারসমূহের কী সম্পর্ক হবে বা হওয়া উচিত, তা নিয়ে চলছে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক। এতদিন কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে একদলের সরকার থাকার ফলে এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়নি। এখন তার সুষ্ঠু মীমাংসার সময় এসেছে। এছাড়া অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের বিরাট সমস্যা রয়েছে। আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে চাই সমাজের গতিশীলতা বজায় রেখে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ও নিশ্চিতি আনয়ন। প্রধানমন্ত্রী সেই বিরাট ও দুরূহ কর্তব্যের মোকাবিলা করার জন্য পটভূমি প্রস্তুত করেছেন তাঁর নববর্ষের প্রথম দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে। আগামী দিনগুলো তাঁকে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিক।

কাছের ও দূরের গান্ধী স্বপ্নের সৌধ

রঁম্যা রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী বছর ২রা অকটোবর উদযাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থে

অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জুলাই, ১৯০৪—মীরাকে দেখলাম আমার বোনের বাড়ীতে, ভারত থেকে তিনি সহসা এসে হাজির হয়েছেন। (ভারত ছাড়ার সময় টেলিগ্রাম করে জানান তাঁর আসার কথা।) বললেন, এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত তাঁর মাথায় আসে 'আলোকদীপ্ত প্রেরণার' মত, যেন অন্তরের স্বরের নির্দেশ শোনেন। গান্ধী তাঁকে বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টা করেন নি, তাঁকে যেতে দিয়েছেন। মীরা চান, ইংলন্ডবাসীদের সামনে ভারতীয়দের যথার্থ অবস্থার ছবিটি তুলে ধরেন। এ-বিষয়ে তিনি লন্ডনে এবং ল্যাংকাশায়ারে এক শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাদের কাছে গান্ধী মীরাকে পাঠাচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নয়, তাঁর মুখপাত্র হিসেবে। এমন কি তাঁর নিজের কন্যার মত, যে-কন্যা তাঁকে সবচেয়ে ভালো বুঝেছেন ও তাঁর চিন্তাধারা যিনি ব্যাখ্যা করতে জানেন। গান্ধীর সঙ্গে যে-শেষ আলোচনা মীরার হয় এক রাতে, সেটি মীরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ও আমায় পড়ে শোনালেন। তা শুনে বুঝলাম, ইংলন্ডের সঙ্গে একটা মিটমাটে গান্ধী এখনো রাজী, তবে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই। তিনি বলেন : "আমি ভারতের সেবক নই, সত্যের সেবক।" তাঁকে যে লোকে বুঝবে, সে সম্ভাবনা কম। আজ বৃটেনের হাবভাব হচ্ছে তাঁকে পাত্তা না দেওয়া, এবং সেটা অত্যন্ত অপমানজনক এক ভঙ্গীতেই। বড়লাট তাঁর সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত এক মহিলা বন্ধুকে নাকি বলেন (মহিলার অনুমতিক্রমে এখানে তা উদ্ধৃত করছি), তিনি খোঁজ নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গান্ধীর চরিত্রে ও রাজনৈতিক কর্মে আন্তরিকতার অভাব আছে। সেটা জানতে পেরে গান্ধী তাঁকে সসম্ভ্রমে একটা চিঠি লেখেন—জানান, তাঁর এই বিচারের কথা শুনে গান্ধী ক্ষুব্ধ, কেন তিনি এমন কথা বলেছেন, সেটাও তাঁকে জানাবার জন্য গান্ধী অনুরোধ করেন। বড়লাট গান্ধীর সে-চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেন নি, শুধু তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে চিঠিটার প্রাপ্তিস্বীকার করেন—কিন্তু কৈফিয়তের একটি কথাও তাতে থাকে না। বৃটেন তালে আছে, কী করে কংগ্রেস থেকে গান্ধীকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, এবং তা অন্তর্বর্তী করতে পারলে শুধু কংগ্রেসের সঙ্গেই সে তার সমস্ত আলাপ-আলোচনা চালাবে। যে-কৌশল গান্ধীর এখন করা উচিত, তা কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর আরো ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকা—যা তিনি বলবেন, তা একমাত্র কংগ্রেসের নামেই এবং কংগ্রেসের অনুমোদন সহকারেই বলবেন। সেটা তিনি করতে চাইবেন বলে মনে হয় না। তাঁর অন্তরের 'নীরব স্বরটির' নির্দেশে একলা একলা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বড্ড অভ্যাস তাঁর। —সাময়িক কর্মবিরতির যে-প্রতিশ্রুতি তিনি দেন, তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। স্বাস্থ্যের কারণে পূর্বনির্ধারিত সময়ের আগেই তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাই সৌজন্যের ভাবে গান্ধী আপনা থেকেই জানান যে সেই সময়টুকু পর্যন্ত তিনি সকল রকম রাজনৈতিক কর্ম হতে বিরত থাকবেন। কিন্তু সময়টা পেরোলেই তিনি আবার স্বাধীন—এবং ভয় হয়, হয়তো তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নতুন করে জেলে পোরা হবে। আবার বন্দী হতে যে তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই, সেটা তিনি এবার আর একেবারেই ঢাকছেন না। কিন্তু বিক্ষোভ না দেখিয়েও তিনি থাকতে পারবেন না—এবং একবার মুখ খুললেই যা তিনি সর্বপ্রথমে চেয়ে বসবেন, তা তাঁর সহকর্মী নেহরু, প্যাটেল ইত্যাদির মুক্তি। এঁদের ব্যতীত কংগ্রেস নেতাহীন হয়ে পড়ে থাকবে। কথা বলার অধিকার তাঁর থাকবে, এ-প্রতিশ্রুতি গান্ধী ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিতে চান। সরকার চুপ মেরে আছে—প্রাদেশিক রাজ্যপালদের সঙ্গে যে গান্ধী দেখা করবেন গিয়ে, সে উপায় পর্যন্ত নেই। তাঁকে অবজ্ঞা করা হোক, মনে করা হোক যেন তিনি নেই-ই, এই রকমই আদেশ উপরিওলাদের। এমন অদ্ভুত কান্ড ব্রিটিশদের পক্ষেই সম্ভব। ইংরেজ ভদ্রলোক ('ওল্ড জেন্টলম্যান') এই খালি পায়ে হাঁটা লোকটিকে চেনেন না—তা ছাড়া, এ-লোকটির সঙ্গে তো তাঁর পরিচয়ও করিয়ে কেউ দেয়নি। আজ বিবেকানন্দের মত কেউ থাকলে এর উত্তর দিতে পারতেন—তাঁর প্রতিশোধলিপ্সু শ্লেষের সঙ্গে!

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৪—এলেন মনাস্তিএ-কে সঙ্গে করে পিয়ের সেরেজোল এসে হাজির, ২২ তারিখে তিনি আবার ভারতে ফিরে যাচ্ছেন—সেখানে দুঃস্থদের সাহায্যার্থে এবার এক সেবক দল গঠনের অভিপ্রায় তাঁর। দু' মাস ধরে তাঁর প্রথম ভারত পরিভ্রমণের সময় সমস্যাটা সাক্ষাতে যে-ভাবে দেখেছেন ও বোঝ চেষ্টা করেছেন, সে-সম্বন্ধে আলো করতে লাগলেন।......

গান্ধীর ধৈর্যের আশ্চর্য স্থির কথা সেরেজোল বললেন। অবিরল হাজ প্রশ্নের উত্তর দিতেও গান্ধী কখনো আপ তোলেন না, এমন কি তাঁর নিন্দা কর যে-অজস্র প্রশ্ন অনেকে তোলে, তা গান্ধীর এতটুকু ক্লান্তি কখনো কখনো তিনি বলবেন না, "আর নয়।" চারিপাশে যে-এক আশ্চর্য স্বাধীন ভা আবহাওয়া বিরাজ করে, সে-কথ সেরেজোল বললেন। তাঁর নিন্দুকদের কী অবিশ্বাস্যভাবে ছেড়ে দেন তাঁর বিরু যা-খুশী বলতে, মাঝখানে একটি কথ তুলে তাদের কখনো থামাবার চেষ্টা ক না, তাদের বক্তব্য শোনেন এমন একটি গম্ভ মনোযোগের সঙ্গে যা সেই বিরোধীদের শেষ পর্যন্ত জয় করে ছাড়ে। নিন্দুকদের প্রতি এ ছাড়া অন্য কো মনোভাব নিলে এমন ফল কিছুতে ফল না। সেই নিন্দুকদের একজন সেরেজোলক জানান : "যত চেষ্টাই করি না কেন উঁ নিজেকে ঠিক রক্ষা করবেন। উনি এ প্রকাণ্ড অজগরের মত, মুখটা হাঁ ক খুলে রেখেছেন, সেই হাঁ-র মধ্যে সকলকে গিয়ে পড়তে হয়।"

তাঁর অটুট প্রাণশক্তিরও প্রশং সেরেজোল করলেন। দেখতে দুর্বল হলে এই বৃদ্ধ তাঁর খালি পায় এত জো হাঁটেন যে সেরেজোল ও তাঁর সঙ্গীদে মত সুইজার্ল্যান্ডের দুর্গম পার্বত্য পা অভ্যস্ত হাঁটিয়ের দলও তাঁর সঙ্গে পা দিয়ে উঠতে পারেন না, পিছনে পড়ে যান চাষীদের সঙ্গে আলাপেও কত তাড়াতাড়ি তাদের সঙ্গে গান্ধী নিজেকে খাপ খাই নেন, সেটাও সেরেজোলকে বিস্মিত করে— ছোট টেবিলের উপর পা দুটি মুড়ে বসে তিনি চাষীদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেন। তাঁর স্বল্প ভাষণগুলির আগে সব সময় একটি করে ছোট প্রার্থনা সংগীত গাওয়া হবে—বেদের কোনো মন্ত্র-টন্ত্র, হ সভায় তাঁর ও অন্যান্যদের ঘিরে এক ধর্ম ভাবাপন্ন অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। একলা একলা প্রার্থনা করতে গান্ধী কখনো বসেন না—ঈশ্বরের সঙ্গে একলা যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা তাঁর কখনো নয়। তাঁর প্রার্থনা সব সময়ই ধর্মগ্রন্থ থেকে পঠিত

...র গীত অংশ, একটা শতবর্ষমালা—অনেকটা ক্যাথলিকদের মতনই। এবং তার সামনে এই বিশ্বাসী সুইস প্রোটেস্ট্যান্টের দল (সেরেজোল, এদম' প্রিভা) স্বভাবতই একটু বিব্রত বোধ করেন। সেরেজোল যা বলেন গান্ধীকে: "এ-ধরনের প্রার্থনায় ... একটা যান্ত্রিকতায় পরিণত হতে পারে, সেটা ভেবে আপনি কখনো শঙ্কিত হন না?" এবং গান্ধী উত্তর দেন: "হোক না।" আমার মনে হয় তিনি এটাও বলতে চান: "এমন পাত্র যদি চিত্তের কাছে উপস্থাপিত করা যায় যাতে চিত্ত রাখতে পারে তার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ধন, তো দেখা যাবে সেই শ্রেষ্ঠ ধন চিত্ত হতে উঠে আসবেই এবং তা পাত্র ছাপিয়ে তুলবেও।"

নভেম্বর ১৯৩৪—ভারতে ফেরার পথে ... ভিলনভ হ'য়ে গেলেন......তাঁর হাতে গান্ধীর জন্য এই চিঠিটি দিলাম (৬ই নভেম্বর ১৯৩৪):

'......যাঁরা আপনাকে বলবেন, পাশ্চাত্যের কী করুণ মুহূর্তে আজ তিনি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। সারা ইউরোপের চিত্ত উদ্বেগ আকুল, আরেকটা বড় যুদ্ধ লাগল বলে, যে যুদ্ধে বহু বছরের সঞ্চিত উন্মাদনার প্লাবন ব'য়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। মানবিকতার কথা বা যুক্তির কথা শোনানো তখন ভার হ'য়ে উঠবে। এই জ্বরাক্রান্ত ইউরোপের চরম মুহূর্তে আপনার কাছে আমার একটি আবেদন জানাতে দিন।—আজ হিংসা যত অজস্র আকার নিচ্ছে, তার মধ্যে সব থেকে ... হ'ল সেই সমাজ-ব্যবস্থার রূপ যে চিনেছে পয়সা-দৈত্যকেই তার সব ব'লে। পয়সার ক্ষমতা চিরকালই বড় ছিল, কিন্তু গত অর্ধশতাব্দী ধ'রে, বিশেষত আরো অনেক বেশি ক'রে গত যুদ্ধের পর থেকে তার এক ভয়ংকর ব্যাপ্তি ঘটেছে—আজ তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বড় বড় শিল্পের (ভারী শিল্প, অস্ত্রশস্ত্র, রাসায়নিক পদার্থ) সঙ্গে ও সেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যা আজ পৃথিবী সমস্ত জাতিকে গ্রাস করতে উদ্যত। রাজনীতির পরিচালনাও আজ তার আয়ত্তে (রাষ্ট্রগুলি তার হাতে অস্ত্র বই নয়) এবং তার ক্ষমতা এমনই সাংঘাতিক যে তার ব্যবহার যারা করে, তারা আর মানসিক শান্তি বজায় রাখতে পারে না—ফলে সেই পয়সা আজ সারা পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রের বিরাট বিরাট ক্যাপিটালিজম প্রশ্রয় দিয়ে যুদ্ধকে প্ররোচিত করে, ভাবতে বসে কত উপায়ে মানুষ মারতে পারা যায়: অস্ত্রের দ্বারা, নানা বিষ জাতীয় পদার্থের দ্বারা (বিষাক্ত গ্যাস, আফিম ও তার মিশ্রণে তৈরি এমন নানা দ্রব্য যা একে অন্যের থেকে আরো বেশি মারাত্মক, হিরোইন, ইত্যাদি)। এবং দুর্ভাগ্য এমনই যে কিছু না বুঝে মধ্যবিত্তেরা অন্ধের মত এই সমস্ত ধুনে জল্পনা-কল্পনায় তাদেরও মাথা গলাচ্ছে। এক কৃষক-মজদুরেরাই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছে, চাইছে নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে, যাতে শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সুস্থতার ন্যায্যতর নূতন সমাজ-ব্যবস্থা জন্ম নিতে পারে। অহিংসবাদীরা এদের এই হিংসার ভাবটাকে বুঝতে পারছেন না। তার নিন্দা করছেন, কিন্তু এটাকে বোঝার চেষ্টা তাঁদের করা উচিত। যে-অন্যায় ও খুনে সমাজ-ব্যবস্থা এই হিংসার জন্ম দেয়, হিংসার সেই উৎসটি আবিষ্কার ক'রেই তার সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ করতে হবে। সেই সমাজ-ব্যবস্থাই কৃষক-মজুরদের আজ এই অবস্থায় নামিয়ে এনেছে যখন হয় বিপ্লব নয়তো মৃত্যু ছাড়া তাদের গতি নেই। এ হেন সংঘাতে যখন পক্ষ না নিয়ে কারুরই উপায় নেই, তখন আপনাকেও শোনাতেই হবে আপনার স্বরটাকে—সেটার প্রচণ্ড দরকার। এবং সেটা জরুরী, কারণ আপনার চিন্তাধারা ভুলভাবে উপস্থাপিত হওয়ার ফলে তার ও জগতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। স্বার্থের কারণে বহু লোক সেই ভুল বোঝাবুঝিটাকে আজ আরো জাঁকিয়ে তুলতে চায়।—আপনার মতই আমিও সারা জীবন সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে বেড়িয়েছি। একটা সময় আসে যখন এই সামঞ্জস্য অবাধে পুষ্পিত হতে পারত বিভিন্ন উদারপন্থী উচ্চ-নীচ অথবা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে—আজ তা হওয়ার নয়। সাংবিধানিক অর্থে যাঁরা উদারপন্থী, আজ তাঁরা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন

—বহুকাল ধরে নিজেদের জীইয়ে রাখার জন্য তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলেছেন। আজ যা দেখা যাচ্ছে, তা হিংসা ও ধন-সম্পদের লাগাম-ছেঁড়া নৈরাজ্যবাদ (বহু বিভিন্নভাবে ক্যাপিটালিজম ও ফ্যাশিজম হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে)। যদি কোনোদিন নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, যা প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমের সম্মানে এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকল সেবকের ঐক্যে, তো তাইতেই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। এবং সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। জানি, আপনিও তাই ভাবেন সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা জোর গলায় বলুন। প্রশ্ন যা, তা শুধু ভারতের মুক্তি নয়, সারা জগতের মুক্তি। আজ যখন আপনি স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছেন, সারা বিশ্বের মানুষদের আলিঙ্গন করতে আসুন না এগিয়ে!........"

ডিসেম্বর ১৯৩৪—গান্ধীকে লেখা আমার চিঠিটি মীরা তাঁকে পড়ে শোনান। মন দিয়ে সবটা শোনেন গান্ধী আমাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মনে করেন, ভালো হয় যদি এর উত্তর তিনি দেন খোলা চিঠির আকারে, যেটি আমার চিঠির সঙ্গে একত্র প্রকাশিত হবে।

এর পর ভারতের খবরে জানছি, আমেদাবাদের কাপড়ের কলের বড় বড় মালিকরা (লোকে বলে, তাঁরা নাকি গান্ধীর বন্ধু) জোর করে তাঁদের শ্রমিকদের মাইনে কমাতে চান, ফলে শ্রমিকরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং গান্ধী সেই শ্রমিকদের পক্ষ নেন।

১৯৩৫

এপ্রিল ১৯৩৫—সুভাষচন্দ্র বসু দেখা করতে এলেন। ইনি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র এবং কংগ্রেসের সমাজবাদী বামপন্থীদের অন্যতম নেতা। বছর ছয়েক-আটেক জেল খেটেছেন, আপাতত স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপে রয়েছেন। এ মুহূর্তে ভারতে ফেরা কার্যকরভাবে সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। এঁর বয়স কম এঁর মুখে রীতিমত গাম্ভীর্য ও চিন্তার ছাপ, প্রায় সব সময়ই ভুরু কুঁচকে আছেন। প্রখর বুদ্ধির অধিকারী—এবং তার পরিচয় তাঁর সদ্য প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থটিতেও, যেটি তিনি লিখেছেন গত দশকের ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর। ব্যক্তি ও ঘটনার বিবরণে বইটিতে যে-বিশ্লেষণী দৃষ্টি তাঁর, তা যথার্থ কূটনীতিজ্ঞসুলভ এবং সেখানে নিরপেক্ষ থাকারও এক আশ্চর্য প্রয়াস তাঁর—যদিও কোথায় অন্যদের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল, সেটা তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন। আমার কাছে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন, কী করে তাঁর মতে গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব আজ একটা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এবং যার ফলে সে-নেতৃত্ব থেকে ভারতকে আজ সরে আসতেই হবে অবশ্য যদি ভারত এগোতে চায় চায় তার স্বাধীনতা অর্জন করতে। তাঁর মতে অহিংস প্রতিরোধের কৌশল নিঃশেষে ব্যর্থ হয়েছে।

তা সফল হতে পারত যদি তার ফলে ভারতের জনশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি অচল হয়ে যেত। ইংরেজী পণ্যদ্রব্য সে সম্পূর্ণ পরিহার করবে বলেছিল, তা সে পারে নি। যে আন্দোলন পরিচালনার ভার গান্ধী নেন, তার শেষ পর্যন্ত যেতে তিনি কখনো স্বীকৃত হন নি। কোনো রকম জোরের আশ্রয় তাঁর শিষ্যরা নেবে, সে-অধিকার তিনি তাদের একবারের জন্যও দেননি। সর্বজনীন প্রতিরোধের নীতি সফল করতে গেলে কোনো না কোনো ধরণের একনায়কত্ব অনিবার্য হয় পড়ে, কিন্তু সেটা দিতে দিতে গান্ধী একেবারেই চান নি, যার ফলে এ বিষয়ে যারা সত্যিই আগ্রহী ছিল বা যাদের প্রথম থেকেই ছিল এক ইতস্ততের ভাব, সেই উভয় দলই ভয় পেয়ে পেছিয়ে আসে, বিশেষত যখন তাদের ভীত করবার মত ঘটনা একাধিক ঘটেছিল। ভারতীয় দোকানদাররা তো ইংরেজী পণ্যদ্রব্য পরিহারের প্রস্তাবে সম্মতই হল না। পক্ষান্তরে, ইংরেজরা বহুকাল ধরে ভেবে আকুল হচ্ছিল ঠিক কোন উপায়ে এই প্রতিরোধ আন্দোলনটা ঠেকানো যায় শেষে তারা সেটাকে বানচাল করার উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলল। কয়েক বছর আগেও তারা সহস্র সহস্র ভারতীয়দের জেলে পুরত (জেলগুলোয় আর জায়গা ছিল না, মনে হত অভিযুক্তদের যেন অন্ত নেই), আর তা করে না। এখন তারা বেশ কিছুকাল ধরে শুধু সেই নেতাদেরই বন্দী করছে, যাঁরা ভারতীয় বিদ্রোহের আত্মাস্বরূপ—এই যেমন জহরলাল নেহরু বা সুভাষ বসুর মত লোকদের। এবং ন্যূনতম আন্দোলনও তারা দমন করছে হিংসার দ্বারা। গান্ধীবাদীদের অপ্রতিরোধে তাদের শান্ত করে—জানে, সেদিক থেকে তাদের ভয়ের কিছু নেই। এমন কি ইংরেজ পার্লামেন্টের সোস্যালিস্ট নেতা যে ওয়েজউড বেন, যিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে রীতিমত সহানুভূতিশীল, সেই তিনিও নাকি রাধাকৃষ্ণনকে সম্প্রতি বলেন : হাজার হলেও বলুন তো, ভারত ছেড়ে আমরা খামখা চলে আসতে যাব কেন, যখন ভারতীয়েরা স্পষ্টতই অসমর্থ আমাদের তাড়াতে? সন্ত্রাসবাদী বা টেররিস্টদের ক্রিয়াকলাপের সমর্থন করতে অবশ্য সুভাষ বসু গেলেন না, তবু বললেন যে, একমাত্র ঐ সন্ত্রাসবাদীরাই পেরেছে ভারতে ইংরেজদের বিপন্ন করে তুলতে। বাংলাদেশে যদিও তাদের সংখ্যা তত বেশি নয়, এবং অন্যান্য কারণেও তাদের শক্তি সীমিত, তবু তাদের ক্রিয়াকলাপের ফল কিছু কম গভীর হয়নি। এমন কি জেলে থাকাকালীন সুভাষ বসুর কাছে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার পর্যন্ত এ-কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। এবং তাঁর মনে হয়, যদি সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ত তো তা শীঘ্রই ব্রিটিশদের ঠান্ডা করে ছাড়ত। তবে রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে তিনি খুব ভালো মনে করেন না, সেটা আবার জানালেন—তিনি সুপরিকল্পিত প্রতিরোধেরই পক্ষে, এবং দরকার হিংসাকেও মেনে নিতে রাজী যুদ্ধে তার ব্যবহারেও তিনি প্রস্তুত। পার্টির কাছে গান্ধীর জনপ্রিয়তা কিন্তু সেটাকে তিনি উপযুক্তভাবে লাগান না। জাতীয় চেতনার সৃষ্টিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্বন্ধ গড়ে তোলার পিছনে গান্ধীর পনের বছরের অবদান সত্যিই অসামান্য তবু সৎ পরিবেশে মানুষ হয়েছেন তাঁর স্বভাবটাই এমন যে তা শুধু রকমে কেবলি আপোষ খুঁজে বেড়ায় পরস্পরবিরোধী দুই চরমের মধ্যে বা বিভিন্ন পার্টির মধ্যে। সেই কারণে তাঁকে দেখা যায় আন্তরিকতার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে লাগতে, এবং সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার পক্ষ নিতে। দের কথা তিনি ভাবেন, কিন্তু চান না মালিকদের বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মুখ ফুটে যদিও কিছু বলছেন না, সমাজ প্রচেষ্টাকে তাঁর নিজের অনুমোদিত শিল্পের (চরকা) উন্নয়নে করছেন। এ করে লাভ যা হবে, তা তুচ্ছ কিন্তু এর দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নয়নের মহান আন্দোলনটির পথ করছেন। সব রকম অগ্রগতির পক্ষে এক বড় বাধা, কেবলি রাশ টেনে ধরছেন দেশের জন্য তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনি বিশেষ নজর রেখেছেন যাতে নৈতিক প্রশ্নের উপর একেবারেই জোর দেওয়া হয়, যদিও একমাত্র সেই কারণেই এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য মতবিভেদ। এবং সুভাষ বসুর সেইটের উপরই সোস্যালিস্ট পার্টির দেওয়া উচিত, যদি সে পার্টি জনগণের উপর সত্যিই কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চায়। জনগণকে শেখানো-বোঝানোর নিতে হবে, তাদের শ্রেণীগত সব সমর্থন করতে হবে—কৃষকদের দিতে জমির প্রতিশ্রুতি। গ্রামে গ্রামে সোস্যালিস্ট প্রচার কার্য গড়ে তুলতে হবে, এবং গ্রামের মাধ্যমেই সেনাবাহিনীর কাছেও পৌঁছে দেওয়া যাবে—আর যেহেতু সেনাবাহিনীতে লোক নেওয়া হয় গ্রাম থেকে যে পারিপার্শ্বিকে সেসব লোক বড় সেখানে কাজ সুরু না করলে তাদেরও মনোবৃত্তি বদলানো সম্ভব নয়। তবে ভারত যে আগামী বহুকালের জন্য গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে পেরে উঠবে না, তাঁর দেশের সেই বর্তমান প্রচণ্ড অসামর্থ্যের কথা সুভাষ বসু মেনে নেন। অতি সরল ভাবে এ আশাও তিনি পোষণ করেন যে, যদি ইউরোপে কোনো যুদ্ধ লাগে ও ইংলণ্ড বিদেশী শক্তি দ্বারা অধিকৃত হয় তো সে শক্তি তখন ভারতকে স্বাধীন হতে সাহায্য করতে পারে। যখন তাঁকে জানাই যে অন্যান্য বহু কারণে সেধরণের কোনো ইচ্ছা আমরা এখানে পোষণ করি না, তিনি একটু হতাশ হন। (হায় রে সরল ছেলে!)

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কৌতুকতরলিত চোখে খেমচাঁদ বললেন—
—"ঐজন্যেই তো বললাম, জহুরের দাম জহুরীই হতে পারে।"

চোখ নামিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল—"কথাটার দুরকম মানে হয়।"

"আমি দুরকম অর্থেই বলেছি।"

জ্যাকেটের জড়ির পাড় নখ দিয়ে টেনে সিধে করতে করতে শর্মিষ্ঠা বলল—"স্মৃতি সবসময়ে সুখের হয় না, দুঃখের।"

"সে কথা আমার চাইতে বেশী আর কেউ বোঝে কি?"

"ঝগড়া থাক। নেকলেসটা তুমি অনেকদিন দেখোনি। না দেখে ঠিক দাম কি বলা যায়?"

"কে বললে দেখিনি? তুমি নিজেই কিন্তু আমার খোঁচা মারছ।"

"আমি?"

"একটু আগেই ঐ জানলায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সেই কথা। চল্লিশ বছর আগেকার কথা। যেদিন বজ্রমণির প্রথম কেনা হল—মনে আছে তোমার?"

"নেই আবার! আমার জন্মদিনেই তো বাবা কিনলেন। কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে পেঁৗছালেন দার্জিলিংয়ে।"

"হ্যাঁ। সেই রাতেই পার্টি হল তোমাদের বাড়ী। কাঁচমহল যেন হীরেমহল হয়ে উঠেছিল আলোয় আলোয়।"

"সেই রাতেই প্রথম নেকলেসটা পরেছিলাম।" অন্যমনস্ক সুর শর্মিষ্ঠার কণ্ঠে।

"হ্যাঁ। চল্লিশ বছর আগে সেই প্রথম। আমি আর তুমি বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। তোমার গলায় হীরের মালা। আমার হাতে গোলাপ। তুমিই দিয়েছিলে। গোলাপের রঙ লাল। তোমার হীরের রঙও লাল।"

"তোমার বেশ মনে আছে তো।"

"স্মৃতির পর্দায় এইমাত্র দেখলাম তো! চল্লিশ বছরের ঝামা ঘসেও ছবিটা তুলতে পারি নি। তাই নেকলেস না দেখেও এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা পাথরের গড়ন বলে দিতে পারি।"

"তোমার পক্ষেই তা সম্ভব," মাথা নীচু করেই বলল শর্মিষ্ঠা। "পুরোনো কাসুন্দি এখন থাকুক। নেকলেসের দাম তাহলে এখন আট লাখ।"

"আমার অনুমান তাই। অবশ্য এ সব দামী জিনিস তো আর বললেই বেচা যায় না। খদ্দের পাওয়া মুস্কিল। একজনের কথা ভেবেই দামটা ঠিক করেছিলাম—"

"তাই বলো। খদ্দের তাহলে পেয়েছো?"

"একরকম তাই বলতে পারো। কিন্তু বড় দুঁদে লোক।"

"কেন?"

"আমি আট লাখই হেঁকেছিলাম। ভদ্রলোক সওয়া সাত লাখের কানাকড়িও বেশী দেবেন না। তোমার বিক্রির তাড়া থাকলে অবশ্য—"

"তাড়া তো আছে। একপিঙ্গল যক্ষরাজটি কে শুনি?"

"কি পিঙ্গল যক্ষরাজ?"

"একপিঙ্গল। মানে, কুবের। হেরে গেলে তো। এখনো বাংলা ভালো শেখোনি।"

"তোমার ও মহাভারতী বাংলা কোনো বাঙালীও বুঝতে পারবে না। একপিঙ্গল যক্ষরাজ। মানে, কুবের। মন্দ বলোনি। আমাদের এ কুবেরটিও পিঙ্গলচক্ষু। তবে, কুবেরের শুনেছি তিনটে পা আর আটটা দাঁত আছে। আমাদের একপিঙ্গলের ইয়ে, দুই পিঙ্গলের তা অবশ্য নেই।"

"জনিতা ছাড়ো। কি নাম ভদ্রলোকের?"

"ভীম দত্ত।"

"ভীম দত্ত। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের হর্তা-কর্তাবিধাতা!"

"চেনো নাকি?"

"খবরের কাগজ খুললেই ভীম দত্তকে চেনা যায়। আমিও সেইভাবে চিনেছি। ইণ্ডিয়ার ভাগ্য যে কজন ধনকুবের [illegible] করছে, কে না জানে ভীম দত্ত তাদেরই একজন।"

ভুরু কুঁচকে খেমচাঁদ বললেন—"ভীম দত্তকে স্বচক্ষে কোনোদিন দ্যাখো নি?"

"অত ভাগ্য কি আমার আছে।"

"আশ্চর্য!" কাগজকাটা ছুরি দিয়ে কপালে খোঁচা মারতে মারতে বললেন খেমচাঁদ—"কিন্তু ভীম দত্ত তোমাকে চেনেন। অন্তত মনে তো হল তাই।"

"ভারী আশ্চর্য তো!"

"ভীম দত্ত কলকাতায় রয়েছেন খবর পেয়েছিলাম। দিনকয়েক আগে হঠাৎ ফোন করলেন। তৎক্ষণাৎ গেলাম ওঁর হোটেলে। আমি তো জানি, অকারণে কাউকে উনি ডাকেন না। নিশ্চয় কিছু হীরেমোতি কেনার মতলব আছে। তাই কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, হীরের নেকলেস কিনবেন কিনা। উনি বললেন, মেয়ের জন্যে যা হয় কিছু কিনলেই হল। খুব একটা তাতানো গেল না দেখে মহারাজকুমার কমলাক্ষ আচার্যর নাম করেছিলাম।"

"তারপর?"

"ভদ্রলোকের চেহারাই পালটে গেল। একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, 'আচ্ছা! শর্মিষ্ঠার হীরের নেকলেস তাহলে বিক্রি হচ্ছে! দাম কত?' আমি বললাম 'আট লাখ।' উনি বললেন 'সাত লাখ পঁচিশ হাজার। এক পয়সাও বেশী নয়।' বলে ঠিক ঐরকমভাবে তাকিয়ে রইলেন, টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট ব্রোঞ্জ বুদ্ধ-মূর্তি দেখিয়ে বললেন খেমচাঁদ। "বুঝলাম এরপর দরকষাকষি করা মানেই দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলা।"

হতভম্ব হয়ে গেল শর্মিষ্ঠা। আমতা-আমতা করে বললে—"এ কী করে সম্ভব! ওঁর সঙ্গে আমার কোনোকালেই আলাপ হয়নি। অথচ—। যাক গে, আমার নেকলেস বেচা নিয়ে কথা। উনি সওয়া সাত লাখে রাজী যখন হয়েছেন, তখন আর দেরি নয়। টাকার খুবই দরকার। উনি কলকাতা ছাড়ার আগেই তুমি পাকা কথা বলে নাও।"

দরজা খুলে গেল। আনন্দা রূপসী আইভি লাহা মুখ বাড়িয়ে বলল—"ভীম দত্ত এসেছেন বোম্বাই থেকে।"

"নিয়ে এস", বললেন খেমচাঁদ। পরক্ষণেই শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরে বললেন দ্রুতকণ্ঠে—"আমিই ওঁকে এখন আসতে বলেছিলাম। কিন্তু দোহাই তোমার, খুব একটা গরজ দেখিও না। দেখি যদি কষা-কষি করে দর আর একটু তুলতে পারি। পারবো কিনা জানি না। বড় দুঁদে লোক। খবরের কাগজওলারা মিথ্যে লেখে না—"

আচমকা থেমে গেলেন খেমচাঁদ। টেবিলের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন দুঁদে লোকটি। দি গ্রেট ভীম দত্ত স্বয়ং। বোম্বাই-দিল্লী-কলকাতা-মাদ্রাজের তাবৎ শেঠজীরা যাঁর নামোচ্চারণে চোখ ছানাবড়ার মত করে, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে ভারতের রাজনৈতিক জগতে বহু মহারথী উঠছেন এবং নামছেন—সেই পরম প্রতাপশালী ধনকুবের ভীম দত্ত নিজেই এসে দাঁড়িয়েছেন টেবিলের সামনে।

কমসে কম ছ ফুট লম্বা। ভীমের মত বিশাল বপু। মাথায় কাঁচাপাকা চুল ব্যাক ব্রাশ করা। ঝোপের মত ভুরু। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো। ডান চোখের নিচে একটা মস্ত আঁচিল।

পরনে মূল্যবান স্যুট। নীলাভ টাইপিনে সবুজাভ মণির দ্যুতি।

ভীম দত্তর দুই চোখেও যেন দুটুকরো মরকত মণি বসানো। খয়েরী চোখ। কিন্তু তাতে লালের ছিটে। অসম্ভব উজ্জ্বল চাহনি।

একে-একে ঘরের দুজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন ভীম দত্ত। পিঙ্গল-চক্ষু দিয়ে এক্স-রে করা হয়ে গেল শর্মিষ্ঠা এবং খেমচাঁদকে।

খেমচাঁদ তাঁর অষ্টপ্রহরের সেলস-ম্যানের হাসির ফাঁক দিয়ে বললেন—"আসুন, স্যার।"

ভীম দত্তর পেছনে দেখা গেল আরও দুটি মূর্তি। একজন তন্বী। আর একজন প্রৌঢ়।

তন্বী শুধু তন্বী নয়—দীর্ঘাঙ্গী। যেন অজন্তার দেওয়াল থেকে নেমে আসা একটা শিল্পশ্রী! যেন একটা চলন্ত মাধবী-লতা। আঁটসাঁট রক্ত-রঙের কার্ডিগ্যান আর স্ল্যাক সুস্পষ্ট করে তুলেছে দেহরেখাকে। সমুদ্রের ঢেউ যেন ফুঁসে উঠেছে পীবর বুকে—পরক্ষণেই থমকে গেছে—নামতে পারেনি ক্ষীণ কটি-তটে। খাপখোলা দামাস্কাস তলোয়ারের মত তেজী চেহারা। শান দেওয়া চোখে, উদ্ধত চিবুকে আর দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় প্রচণ্ড অহমিকা।

পেছনেই নেউলের মত খরখরে এক প্রৌঢ়। সাপের মত চোখ। একটা চোখ যে দৃষ্টিহীন এবং পাথরের—তা কিছুক্ষণ তাকালেই বোঝা যায়। পাকানো গোঁফ। শীর্ণ। কণ্ঠাওঠা গলায় দড়ির মত শিরা। খাঁড়ার মত নাক। সব মিলিয়ে রীতিমত ধূর্ত চেহারা। দেখলেই দুর্যোধনের মাতুলের কথা স্মরণ হয়। শকুনি-মামার মতই সেয়ানা-চাহনি, কপট-হাসি।

খেমচাঁদ বললেন—"মিস্টার দত্ত, ইনি শর্মিষ্ঠা বর্মা। শর্মিষ্ঠা, যাঁর কথা তোমায় বলছিলাম—মিস্টার ভীম দত্ত।"

"মিসেস বর্মা", দুই হাত তুলে নমস্কার করলেন ভীম দত্ত। কথা শুনে মনে হল, ইস্পাত নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করার ফলে গলার মধ্যেও খানিকটা ইস্পাত ঢুকে গেছে। "আমার মেয়েকে আর সেক্রেটারিকেও এনেছি। এই আমার মেয়ে সাহানা। আমার সেক্রেটারী—উপেন নন্দী।"

"আজ আমার পরম সৌভাগ্য", বললেন খেমচাঁদ। "বসুন, আপনারা বসুন।" বলে নিজেই চেয়ার সাজিয়ে দিলেন।

আসন গ্রহণ করল সবাই। সাহানা এমনভাবে বসল যেন চেয়ারটা মাপ দিয়ে তৈরী। মেয়ে-অন্ত প্রাণ ভীম দত্তর আদরে-আদরে মেয়ে আই গ্যাস বেলুনের

...উঠেছে ফুলে। সাহানার দেমাকের অনেক গল্প শুনেছিলেন খেমচাঁদ। ...লেন, কাহিনীগুলো একেবারে অলীক নয়।

রাজসিংহাসনে যাঁর বসা অভ্যাস, তাঁকে ...ং কাষ্ঠাসনে বসতে দিলে অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভীম দত্তর চোখে-মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না। নিরেট হিমাচলের মতই বরফ-ঠান্ডা চোখ নিয়ে বসলেন। ঠোঁটের কোণে, চোয়ালের রেখায়, ললাটের কুঞ্চনে ব্যক্তিত্ব আর ক্ষমতা যেন ঠিকরে পড়তে লাগল।

সবার পেছনে বসল উপেন নন্দী। কচ্ছপ থরথরে চাহনি পারার মতই পিছলে যেতে লাগল সব কিছুর ওপরে দিয়ে। লোকটার থরশান চোখেমুখে আর যাই হোক খয়ের খাঁ ভাব নেই।

ভরাট গলায় বললেন ভীম দত্ত। ঘর গমগম করে উঠল তাঁর মেঘডাকা স্বরে— "গৌরচন্দ্রিকার দরকার নেই। আমরা এসেছি হীরের নেকলেসটা দেখতে।"

খেমচাঁদ বললেন—"মিস্টার দত্ত, আপনি ভুল করছেন, ইয়ে আমিই আপনাকে ভুল বলেছি। হীরে তো এখন কলকাতায় নেই।"

পলকহীন চোখে তাকালেন ভীম দত্ত —"আপনি তো বললেন, নেকলেস যাঁর, তাঁর সঙ্গে এখানে এলেই দেখা হবে—"

"বলেছিলাম। কিন্তু নেকলেসটা আজকেই দেখা যাবে, তা কিন্তু বলিনি", স্মিতমুখে বললেন খেমচাঁদ।

বেগতিক দেখে শর্মিষ্ঠা কথা বলল— "মিস্টার দত্ত, আসাম থেকে যখন আসি, তখন নেকলেস বেচার প্ল্যান নিয়ে আসিনি। এখানে এসে ঠিক করেছিলাম বেচব। আনবার জন্যে লোক অবশ্য পাঠিয়েছি।"

শান দেওয়া চোখে বিদ্যুৎ হেনে রাজ-হংসী ঘাড় বেঁকিয়ে ভ্রূভঙ্গী করল সাহানা। শর্মিষ্ঠার কথার মাঝেই ঝংকার দিল উগ্রকণ্ঠে—"নেকলেসটা দেখতে পাবো, এই আশা নিয়েই এসেছিলাম। নেই জানলে আসতাম না।" বাপের মত মেয়ের গলাও ইস্পাতে বাঁধাই মনে হল।

সস্নেহকণ্ঠে ভীম দত্ত বললেন—"এত অল্পে চটিস কেন বল তো? আজ না হয় দুদিন পরেই তো দেখা যাবে। মিসেস বর্মা।"

"বলুন।"

"নেকলেসটা আনতে লোক পাঠিয়েছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। আশা করছি দু'তিন দিনের মধ্যেই পাবো।"

"তাহলেও কোনো লাভ হচ্ছে না। সাহানা আজকেই যাচ্ছে ইন্দোরে। আমি যাচ্ছি সাউথে—কাল সকালে। সেখান থেকে ইন্দোরে গিয়ে সাহানাকে নিয়ে এক-সঙ্গেই বেরোবো।"

"যেখানে বলবেন, সেখানেই ডেলি-ভারীর ব্যবস্থা করতে পারি," বললেন খেমচাঁদ।

"মন্দ বলেন নি," বললেন ভীম দত্ত। গম্ভীরমুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন টেবিলের কাঁচের দিকে। প্রথমে খেয়াল হয়নি খেমচাঁদের। তারপরেই হঠাৎ দেখ-লেন, ভীম দত্ত কাঁচের দিকে কেন তাকিয়ে আছেন।

কাঁচের ওপর শর্মিষ্ঠার প্রতিবিম্ব জ্বলজ্বল করছে মায়ামুকুরের ছবির মত। একদৃষ্টে সেই দিকেই তাকিয়ে আছেন ধনকুবের ভীম দত্ত।

আশ্চর্য! একী অন্যমনস্ক-চাহনি, না, চোরা-চাহনি? হকচকিয়ে গেলেন জহুরী খেমচাঁদ।

সহসা চোখ তুললেন ভীম দত্ত। শর্মিষ্ঠার দিকে সোজা তাকালেন। বন্দুকের গুলীর মত একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন।

"কিছু মনে করবেন না, মিসেস বর্মা। একটা জিজ্ঞাস্য আছে।"

"বলুন।"

"১৯২৯ সালে কিংস হোটেলে আপনি যে নেকলেসটা পরতেন, এইটাই কি সেই নেকলেস?"

বিস্ময়ের একটা বোমা যেন অতর্কিতে ফেটে পড়ল শর্মিষ্ঠার চোখেমুখে। কণ্ঠে কিছুক্ষণ কোনো কথা সরল না।

তারপর ঢোক গিলে বললে—"হ্যাঁ, সেই একই হীরের নেকলেস!"

"বরং আরো সুন্দর," হেসে বললেন খেমচাঁদ। "কেননা, আমরা জহুরীরা একটা প্রবাদে বিশ্বাস করি। হীরে যত খাঁটি হবে, তার জেল্লা ততই বাড়বে সৌন্দর্যের গা ঘেঁসে থাকলে। এ-যেন সৌন্দর্য শুষে নেওয়া।"

"রাবিশ," কড়া গলায় যেন ধমকে উঠলেন ভীম দত্ত। পরক্ষণেই বললেন— "আই মীন, মিসেস বর্মার রূপ নিয়ে আমি কোনো কটাক্ষ করছি না। আপনাদের ঐসব কুসংস্কার আমি মানি না।"

"না মানলে আমি নাচার। কিন্তু আমরা মানি। চল্লিশ বছর আগে ব্রেজিল থেকে আনা রক্তহীরে যত ঝকঝকে ছিল, মিসেস শর্মিষ্ঠা বর্মার গলায় থেকে তার জৌলুষ যে শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।"

"আঃ, কি হচ্ছে, খেম," অস্ফুটকণ্ঠে বলল শর্মিষ্ঠা।

নির্বিকার কণ্ঠে ভীম দত্ত বললেন— "ব্রেজিলের হীরে নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পাথর একটাই এসেছিল। ওজনে কত ক্যারাট ছিল, তা অবশ্য বলতে পারব না। বোম্বাইতে কেটেকুটে ২৩টা ছোট হীরে বানানো হয়।"

'কাটা হল কেন?'

'বেয়াড়া সাইজ ছিল বলে। তবে কাটার পর রক্তহীরের দ্যুতি আরো বেড়েছে। এ হীরের আর একটা আশ্চর্য গুণ আছে।"

"কি?"

'কিছুক্ষণ রোদ্দুরে রেখে তারপর অন্ধকারে নিয়ে এলেই দেখবেন যেন ঝলকে ঝলকে রক্তচ্ছটা বেরুচ্ছে হীরের মধ্য থেকে। এছাড়া ঘোরালে-ফেরালে রামধনু রং তো দেখাতেই পাবেন।"

ভাবলেশহীনমুখে খেমচাঁদের বচন-মালা শুনলেন ভীম দত্ত। তারপর বললেন নিরস গলায়—"ইন্টারেস্টিং। আজ আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাই কাজের কথাটা সেরে নিই। যে দাম বলেছি, ঐ দামেই নেকলেসটা আমি নিচ্ছি।"

"এ জিনিসের দাম কি আট লাখের কম হয়?"

"আমার কাছে হয়। সাত লাখ পঁচিশ হাজারের এক পয়সাও বেশী নয়। পঁচিশ হাজার এখুনি দিচ্ছি। বাকী সাত লাখ দেবো নেকলেস হাতে পেলে। দিতে হয় দিন, নইলে তুলে রাখুন।"

বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভীম দত্ত। চলমান হিমালয়ের মত ঝুঁকে দাঁড়ালেন জহুরী খেমচাঁদের ওপর। পিঙ্গল চোখের রক্তাভা যেন আরো একটু বৃদ্ধি পেল।

অমন যে ঝানু জহুরী খেমচাঁদ রাজ-কুমার তিনিও এ-হেন পর্বতের কাছে মূষিকের মত গুটিয়ে গেলেন। দোকানদারি

প্যাঁচ ভুলে গিয়ে অসহায় চোখে তাকালেন বান্ধবীর দিকে।

শর্মিষ্ঠা বুদ্ধিমতী মহিলা। এ পাহাড়ের সঙ্গে লড়ে লাভ নেই বুঝে সাফ বলে দিল—"থেম, রাজী হয়ে যাও। আমি রাজী।"

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খেমচাঁদ—"বেশ, তুমি রাজী হলে আমিও রাজী। মিস্টার দত্ত, সত্যি কথা বলতে কি, এ জিনিস যে এমন জলের দরে যাবে, তা ভাবিনি।"

"জলের দরেই আমি কিনি, নইলে কিনি না", বলে চেক বই বার করলেন ভীম দত্ত। "পঁচিশ হাজারের চেক দিচ্ছি।"

হঠাৎ যেন ফাটা বাঁশের বাঁশি বেজে উঠল। অদ্ভুত রকমের মিনমিনে গলায় সেক্রেটারী উপেন নন্দী বললে—"নেকলেসটা দু-তিনদিনের মধ্যে আসছে তো?"

বৈষ্ণব-বিনয় যেন মিছরীর রসের মত টস-টস করে ঝরে পড়ল কথার সুরে।

শর্মিষ্ঠা বলল—"এক-আধদিন দেরি হতে পারে।"

গা-গুলোনো মিছরী-কণ্ঠ আবার মিনমিন করে উঠল—"বেশ, বেশ। কিভাবে আসছে?"

"লোকের হাতে", আচমকা কথার মাঝে কথা বলে উঠলেন খেমচাঁদ। অনেকক্ষণ থেকেই উপেন নন্দীর হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন উনি। হাড়বারকরা চোয়ালের খোঁচা, কন্ঠাবারকরা গলায় দড়ির মত শিরা, এক চোখের ধূর্ত চাহনি অনেকক্ষণ থেকেই খারাপ লাগছিল খেমচাঁদের। এক-একটা লোককে কেন জানি না গোড়া থেকেই এমনি খারাপ লাগে। বরদাস্ত করা যায় না। তাই আবার তীব্র কন্ঠে পুনরাবৃত্তি করলেন খেমচাঁদ। "লোকের হাতে আসছে।"

"তাতো বটেই", যেন একটা ধাক্কা খেল উপেন নন্দী। ভীম দত্ত ইতিমধ্যে চেক লেখা সেরে কলম পকেটে রাখছেন। "স্যার, একটা প্রস্তাব ছিল।"

"কি?"

"মিস দত্ত যদি শীতকালটা রাজস্থানেই কাটান, তাহলে নেকলেসটা নিশ্চয় উনি ওখানেই পরবেন। সাউথ থেকে ফেরবার পথে যদি নেকলেসটা আমরা নিয়ে যাই এখান থেকে—"

"নেকলেস এখন কিনছে কে?" ধমকে উঠলেন ভীম দত্ত। দামি জিনিস নিয়ে সারা ভারতে টহল দেব ভেবেছ? দিনকাল ভাল নয়। নতুন করে ঠগীর আমল শুরু হয়েছে তো। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?

"বাপি, মিস্টার নন্দী কথাটা ঠিকই বলেছেন। রাজস্থানে অনেকদিন থাকছি যখন, তখন নেকলেসটা ওখানেই—"

সাহানা মাঝপথেই থেমে গেল।

কারণ, ফার্নেসের মত গনগনে হয়ে উঠল ভীম দত্তর মুখ। সেই সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে লাগল ডান চোখের নিচের আঁচিলটা। লক্ষণটি অতি-পরিচিত। খবরের কাগজের কল্যাণে দেশের অনেকেই জানে, দি গ্রেট ভীম দত্ত কোনো ব্যাপারে বাধা পেলেই এমনি ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে কাঁপতে থাকে মস্ত আঁচিলটা। ঐটাই নাকি তাঁর মেজাজের ব্যারোমিটার। বুদ্ধিমান যারা, তারা আঁচিলের কম্পন দেখেই রণে ভঙ্গ দেয়।

মেয়েকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে গেলেন ভীম দত্ত। খেমচাঁদের দিকে ফিরে বললেন—"হীরের নেকলেস বোম্বাইতে ডোলভারী দেবেন—আমার হাতে।" উপেন নন্দীর কথা যেন ভুলেই গেলেন—"সাউথে কিছু কাজ আছে। তারপর ইন্দোর হয়ে যাবো রাজস্থানে। বিকানীর থেকে মাইল কয়েক দূরে মরুভূমির মধ্যে আমার একটা বাংলো আছে। কেয়ার-টেকারের কাজকর্ম মাঝে মাঝে দেখা দরকার তো। তাই বাংলোয় থাকবো কিছুদিন। সেখান থেকে বোম্বাই ফিরে আপনাকে চিঠি দেবো। আমার চিঠি পেলেই নেকলেস পাঠাবেন। তিরিশ দিনের মধ্যে সাত লাখের চেক পাঠিয়ে দেব।"

"সেই ভাল", উঠে দাঁড়ালেন খেমচাঁদ। "আপনি আর একটু বসুন, রসিদটা করে আনি। বিজনেস ইজ বিজনেস। কথাবার্তা পাকা করে নেওয়াই ভাল।"

"তা তো বটেই", ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন ভীম দত্ত। নিষ্ক্রান্ত হলেন খেমচাঁদ।

সাহানা উঠে দাঁড়াল—"আমি বরং নিচে যাই। জেড স্টকটা দেখি," শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরে—"জানেন তো জেড পাথরের কালেকসন কলকাতায় যেমন, তেমনটি আর কোথাও নেই।"

শর্মিষ্ঠা হাসল। বলল—"তা সত্যি।" তারপর সাহানার হাত মুঠোয় নিয়ে—"এমন সুন্দর গলায় বজ্রমণির কন্ঠহার ছাড়া আর কিছু মানায় না। আমার আশীর্বাদ রইল মা, এ নেকলেস তোমায় সুখী করবে। সুন্দরী-সভায় তুমি শ্রেষ্ঠা হবে।"

গাল লাল হল সাহানার। অধর-রেখার কাঠিন্য কোমল হল। সামান্য হেসে, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা সোনালী চুল দুলিয়ে দ্রুত-পদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

"উপেন," মেঘডাকা গলায় ডাক দিলেন ভীম দত্ত।

"বলুন", বলল ফাটা বাঁশি।

"তুমি নিচে ওয়েট করো। আমি আসছি।"

হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল হল। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল উপেন নন্দী।

ভীম দত্ত এবার সোজা তাকালেন শর্মিষ্ঠার দিকে। বললেন—"আপনি আমাকে এর আগে কখনো দেখেননি, তাই না?"

"সত্যিই দেখিনি।"

"কিন্তু আমি দেখেছিলাম।"

"কোথায়?"

চুপ করে রইলেন ভীম দত্ত। তারপর মৃদুকন্ঠে বললেন—"অনেক বছর আগের কথা। সুতরাং এখন বলতে বাধা নেই। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার নেকলেসের মালিক হয়ে আজ আমি যে আনন্দ পেলাম জীবনে এত আনন্দ আমি কখনো পা... অনেক পুরোনো, অনেক গভীর ... দগদগে ঘায়ে শান্তির মলম পড়ল ... আগেই—আপনার নেকলেস আমার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

"বুঝলাম না", ফ্যাল-ফ্যাল তাকায় শর্মিষ্ঠা।

"বুঝলেন না। বোঝাটা সম্ভবও ... ১৯২৮-২৯ সালে আপনারা সপার... আসাম থেকে এলেই কিংস হো... উঠতেন। আমি...আমি তখন ... হোটেলে কাজ করতাম। চাকরের ... আপনাদের ফাই-ফরমাস খাটতাম। অপ... হামেসাই দেখতাম। একদিন ... নেকলেস পরে এলেন হোটেলে। ... আপনাকে দেখে আমি অবাক ... গেছিলাম। মনে হয়েছিল আপনার ... সুন্দরী মেয়ে বুঝি দুনিয়ায় আর ... ইয়ে...এখন অবশ্য...আমরা দুজনেই ...

"বুড়িয়ে গেছি," ঠান্ডা গলায় ... শর্মিষ্ঠা।

"হ্যাঁ, এখন বুড়িয়ে গেছি। ... তখন আমি আপনাকে মনে মনে ... করতাম। আমি...আমি ছোকরা-চাকর ... আপনি আমাকে চোখ দিয়ে দেখে... দিয়ে দেখেননি...তাই মনে করতে পা... না। কিংস হোটেলের অনেক ফা... মত আমাকেও দেখতেন—মনে ... দরকার পড়েনি। আমি নগণ্য চাকর ছি... কিন্তু আমার দম্ভ ছিল। এখনও ... আপনি সেই দম্ভে চোট দিয়েছিলেন। ... পণ করেছিলাম, আপনার আমার মধ্যে ... ব্যবধান একদিন তা সরিয়ে দেব ... তারপর...তারপর...আমি আপনাকে ... করব। জানি আপনি হাসছেন মনে ম... হাসি আমারও পাচ্ছে। আমার সে ... কোনোদিনই সফল হয়নি। অনেক ... অনেক প্ল্যান এমনি ভাবে ভেস্তে গে... কিন্তু তাতে ভেঙে পড়িনি। আজ ... আপনার নেকলেস আমার মুঠোয় ... নেকলেস পরাবো আমার মেয়ের গলা... শপথের খানিকটা তো থাকবে। আপনা... না পেলেও আপনার নেকলেস ত... পেলাম। একদিক দিয়ে আপনাকে ... কিনে নিলাম। আমার দম্ভের পুরোনো ... অ্যাদ্দিন বাদে আরাম হল।"

পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল শর্মি... এইমাত্র যা শুনল, তা অন্য অবস্থায় শু... জবাবটা অন্যরকমই হত। কিন্তু রাশভা... ভীম দত্ত যেন মিনিট কয়েকের জন্য ... মানুষ হয়ে গেছিলেন। লোহার মুখো... আড়ালে আর এক ভীম দত্তকে দে... শর্মিষ্ঠা। লোহার নয়—মাটির।

তাই মেঘডাকা স্বর স্তব্ধ হ... ঘরের থমথমে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে বলল স... গলায়—"আপনার জীবনটাই তো এ... রহস্য!"

চকিতে চোখ তুললেন ভীম দত্ত।

(ক্রমশ

আগামী সপ্তাহে : টেলিফোন রহ...

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণন। *

কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত' এই বিস্মৃত সমালোচনাটি ৭৫ বছর আগের সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র "পূর্ণিমা" (জ্যৈষ্ঠ/আষাঢ়, ১৩০০) থেকে গৃহীত। দীপককুমার সেন সংগৃহীত।

ভারতবর্ষে একজন মাত্র শ্রীশিশিরকুমার আছেন। তিনিই শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। ভাবিতে গেলে মনে একটা গভীর ...র উদয় হয়, কিন্তু সে সঙ্গে একটা ...ীতল সান্ত্বনা আসিয়াও সে দুঃখের ...নয়ন করে। দুঃখ,—দ্বিতীয় শ্রীশিশির-...র ঘোষ কেহ নাই। আর দুই একজন ...শরকুমার ঘোষ থাকিলে বুঝি ভারত-...ের অশ্রুবেগ আরও কিঞ্চিৎ প্রশমিত ...। সপ্তশত বৎসরের বিষাদ-মণ্ডিত ... আশার বাল-সূর্যের হাসি আরও ...ঞ্চিৎ উজ্জ্বলতর হইয়া ভাসিয়া উঠিত, ...ীতে নবজীবনের স্রোত আরও কিঞ্চিৎ ...বেগে প্রবাহিত হইত। সান্ত্বনা,—...শিশিরকুমারের মত প্রতিভাশালী মহা-...ুষেরা পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ ...রিয়া থাকেন। অতএব আমাদের শতাব্দীতে, আমাদের এই দীনা জীবনহীনা জন্মভূমিতে ...র একজনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বঙ্গমাতার পক্ষে, বঙ্গবাসীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। আমাদের এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বহু মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদাস, ব্যবহারনীতি ক্ষেত্রে শ্রীদ্বারকানাথ ও শ্রীউমেশচন্দ্র, দানক্ষেত্রে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, এবং কাব্যক্ষেত্রে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীমধুসূদন। ইঁহারা সকলেই ক্ষণজন্মা, দেবপ্রতিভাসম্পন্ন ও প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু শ্রীশিশিরকুমারের মত কাহারও প্রতিভা হিমালয়-সানু হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত, গঙ্গা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই আসিন্ধু হিমাচল ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর এরূপ কার্য করে নাই। "অমৃতবাজার পত্রিকা" এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা"র শ্রীশিশির-কুমার ঘোষ নব্যভারতের সঞ্জীবন মন্ত্র। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ নব্যভারতের নবজীবনের প্রণব। মহারাষ্ট্র দেশের বরদা রেলওয়ে স্টেশনে একজন বাঙালী পর্যটক [কবি স্বয়ং : আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য] 'টিকিট' কিনিতেছেন। "টিকিট কালেক্টর" একজন মহারাষ্ট্র দেশীয় ভদ্রলোক। পরিধানে ধুতি, গায়ে চাপকান, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। পর্যটককে স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বাঙালী?" পর্যটক আত্মপরিচয় দিলে তাঁহাকে পরম সমাদরে তাঁহার কক্ষে আহ্বান করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শ্রীশিশির-কুমার ঘোষকে চিনেন?" তিনি শিশিরকুমার সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কন্‌গ্রেস ও শিশিরকুমার ঘোষ মাত্র আমাদের ভবিষ্যত আশা।" এরূপে ভারতবর্ষের স্বাধীন বা অধীন রাজ্যে যেখানে যাও সেখানেই শিশিরকুমারের নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনিবে। দরিদ্রের কুটীর হইতে সম্রাজ্ঞী-প্রতিনিধির প্রাসাদ পর্যন্ত শিশিরকুমারের নাম সর্বত্র উৎপীড়িতের আশ্রয়, উৎপীড়নকারীর আতঙ্ক। ভারতের ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে ইংলণ্ডের "মহাসভা" পর্যন্ত শিশির-কুমারের প্রতিভা বিদ্যুল্লতার ন্যায় বিচিত্র ক্রীড়া করিতেছে।

যশোহর জেলার একটি সামান্য পল্লীতে, অতি সামান্য অবস্থায়, জন্মগ্রহণ করিয়া,

---

* শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত। কলিকাতা বাগবাজার, অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস হইতে প্রকাশিত।

পদগৌরবহীন, অর্থহীন শিশিরকুমার কিসে এতাদৃশ প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন? তাহার একমাত্র উত্তর—প্রেমে। তাঁহার কৃতিত্বের মূলমন্ত্র কি? —প্রেম। তাঁহার অপূর্ব আত্মচরিতের 'শিশিরকুমার চরিতের'—ভিত্তিভূমি কি? —প্রেম। প্রেমে মানুষকে দেবতা করিতে পারে, দেবতাকে নরলোকে অবতীর্ণ করিতে পারে। প্রেমে পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে পারে, স্বর্গকে পৃথিবীতে আনিতে পারে।' Heaven itself descends in love— প্রেমে স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, ইহা কবি-কল্পনা নহে। আমরা শিশিরকুমারের জীবনে এই মহা সত্যের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনে প্রেমের কি অপূর্ব আবর্তন। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে পবিত্র বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেম-গঙ্গা ক্রমশঃ বর্ধিত কলেবরা হইয়া এবং ভারত-ভূমি উর্বরা ও পবিত্র করিয়া আজ কি অনন্ত সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সেই বিষ্ণুপদ তাঁহার পিতৃমাতৃ প্রেম; সেই অনন্ত সমুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম। তাঁহার মন্থনের দেবদুর্লভ ফল—এই অমিয় নিমাই-চরিত।*

শিশিরকুমার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে দীক্ষিত হইলেন। জ্ঞানের ঐরাবতকে উড়াইয়া শিশির-কুমারের প্রেমগঙ্গা শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে অবারিত, অজস্র বেগে ছুটিল। "এই অনন্তের পাছে যে অনন্ত আছে" শিশির-কুমারের "প্রেমসিন্ধু" বহু সাধনার পর সেই অনন্তের দিকে ছুটিল। তখন শিশিরকুমারের হৃদয়ের অবস্থা কি হইল, তাঁহার নয়নে কি স্বর্গ খুলিয়া গেল—তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি তাঁহার "অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস"এর যে দুটি পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভে 'প্রার্থনায়' শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

"তপ্ত বালুকায় আছিনু শুইয়া
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
গৌর আমার নিয়া গেল।

কি গুণে আইল, কেন দয়া হলে
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে, শ্রীগৌর আম
অসাধন চিন্তামণি।
কুঞ্জে নিয়া গেল, অঙ্গ জুড়াই
আমি ইতি উতি চাই,
সুন্দর এমন শীতল কান
কভু আমি দেখি নাই।"

কি প্রেমাস্পদ, শান্তিরসাস্পদ, আ প্রদ স্থান! ইহাই বুঝি শ্রীমদ্ভাগবতক বৃন্দাবন। ইহাই সেই 'শ্যামকুঞ্জ, রাধাকু বৃন্দাবনের বালকবালিকাদের গা শুনিয়াছিলাম—

"শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ, গিরি গোবর্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন।

গীত কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়া হৃদয় উদ্বেলিত করিয়াছিল। কিন্তু ব সে বৃন্দাবন ত চক্ষে দেখি নাই। শিশিরকুমার সেই বৃন্দাবন দেখাইলেন। বৃন্দাবন তাঁহার হৃদয়ে দেখিলাম। পাশ্চা শিক্ষায় জর্জরিত, পাশ্চাত্য দ উৎপীড়িত, পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রণো আমরা হতভাগ্যগণ কি এই "সুন্দর এ শীতল কানন" দেখিতে পাইব না? ভগব তুমি দয়াময়। আমাদের এ দুর্গতি দে বুঝি এতদিনে তোমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া যেই জীবের উদ্ধারের জন্য তুমি কি বয়সে কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি তাহাদের উদ্ধারের জনাই বুঝি প্রতিভাশালী শিশিরকুমারকে এরূপে তো শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিয়াছিলে এবং তাঁ হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া তোমার এ 'অমি চরিত প্রণয়ন করাইয়াছ।

* * *

পাঠক বোধ করি এখন বুঝিয়াছে "অমিয় নিমাইচরিত" কি অমূল্য গ্রন্থ বুঝিয়াছেন কি সমুদ্র, কি সাধনার ম মন্থন করিয়া শিশিরকুমার এই অ তুলিয়াছেন। তাঁহার ভাগবতপ্রেম ক্ষীরসমুদ্র, তাঁহার অধ্যবসায় সেই মন্থনদ এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা মন্থনরজ্জু। এক মাত্র তাঁহার স্বজাতি মানব জাতিকে—এই অমিয় পান করাই জন্য তিনি ক্ষীণ, রুগ্ন শরীরে এ মহা মন্থনশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বলর দাসের কবিতার দ্বারা তিনি এই মহ উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"যেন উপকার আপনি করিলে
আমি শোধ দিব ধার।
এই জগ মাঝে গৌরাঙ্গ পাওয়াই,
যতদিন বাঁচি আর।

---

* এই প্রবন্ধে নিমাইচরিত রচয়িতার অতি উৎকৃষ্ট জীবনবৃত্তান্ত অংশটুকু স্থানাভাববশতঃ অপ্রকাশিত রহিল। কিন্তু সে অংশ এতই উৎকৃষ্ট যে পাঠকবর্গকে তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত করিতে হইল বলিয়া আমরা একান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম এবং কল্পনা রহিল যে সুবিধা পাইলে কোন সময়ে তাহা প্রকাশিত করিয়া আমরা নিজেও পরম আনন্দিত হইব এবং পাঠকবর্গেরও আনন্দবর্ধন করিব।—সঃ। [কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, পরবর্তীকালে প্রস্তাবিত অংশটি আর প্রকাশিত হয়নি।]

...গৌরাঙ্গ-লীলা লিখিয়া লিখিয়া
...অগে জানাইব জীবে।
...গৌরাঙ্গ-লীলা কর্ণেতে পশিলে,
...অবশ্য তোমার হবে।
...পাষাণ ত্রিজগতে নাই
...যে গৌরাঙ্গ-লীলা পড়ি,
...ধরি বলে মোটে না কান্দিবে,
...না দিবে সে গড়াগড়ি।"

...র বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত' ...শিশিরকুমারের "অমিয় নিমাইচরিত" ...র সাহিত্যে ও ধর্মে দুইটি যুগ ...গ্রন্থ। 'কৃষ্ণ-চরিত' অনেকে পড়িয়া- ...সেই 'আদর্শ মনুষ্য' বা ঈশ্বরাবতার ...বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। ...একবার "অমিয় নিমাইচরিত" পড়িয়া ...র দেখিয়া প্রাণ শীতল করুন। ...সত্যই "এমন পাষাণ ত্রিজগতে নাই" যে ...রকুমারের এই প্রেমভাণ্ডার গ্রন্থ পাঠ ...শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে আর্দ্র হইবে না। ...হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবেই, তদ্ভিন্ন ...পড়িবার আর একটি গুরুতর ...জন আছে। তাহা কি? বলিতেছি।

...নেক দিনের কথা নহে—এমন কি সে ...কথা বলিলেও চলে—ভগবান ...নাম শুনিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ণে ...অর্পণ করিতেন। খৃষ্টান মিশনারির ...ব্রাহ্মদের কল্যাণে, ততোধিক ...দের কল্যাণে, শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ...ঘৃণাস্পদ এ জগতে আর ...ল না। কিন্তু আজ "থিওসফিক ...কৃপায় ও বঙ্গ সাহিত্যের ...একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্বয়ং তাঁদের অন্যতম | কৃপায়, শিক্ষিত ...নয়নাবরণ বোধ হয় 'কিঞ্চিৎ ...হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁহাদের ...দাঁড়াইবার কিঞ্চিৎ স্থান ...। এখন চারিদিকে গীতা ও ...শ্রীকৃষ্ণ লইয়া দেশব্যাপী একটা ...আন্দোলন উঠিয়াছে। অনেকেরই ...এখন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর 'অবতার' না হউন, ...'আদর্শ-পুরুষ'। পৌরাণিক যুগের ...হইতে যে কর্দম রাশিতে শ্রীকৃষ্ণ ...ডুবিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ...যেন তাহা সরিয়া যাইতেছে এবং ...ক্রমে তাঁহার পূর্ণ ...আবির্ভূত হইতেছেন। ...বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বলে দেশে ...'কৃষ্ণভক্তির' বাতাস বহিতে ...হইয়াছে। তথাপি তাঁহার ব্রজলীলা ...সন্দেহ এখনও বোধহয় সকলের ...হইতে সমানভাবে অন্তর্হিত হয় নাই। ...চন্দ্র প্রথমতঃ 'ব্রজলীলা' অপ্রমাণ্য ও ...বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিয়া- ...এখন যদিও মহৎ ব্যক্তির ন্যায় ভ্রম ...করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ সমালোচনা ...রতের' নূতন সংস্করণে করিয়াছেন, ...তাঁহার মহাগ্রন্থে 'কৃষ্ণপ্রেম' কথাটি ...পাইলাম না। তিনি অতি সাবধানে ...গোপীদিগের 'কৃষ্ণভক্তি'

বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণপ্রেম' বলেন নাই। তাহাদের সেই কৃষ্ণভক্তি পতিভক্তির সদৃশ বলিয়াছেন, কিন্তু পতিপ্রেম সদৃশ বলিতে যেন সাহস করেন নাই। এই পর্যন্ত উঠিয়া উপসংহার-কালে আবার আরও নামিয়া পড়িয়াছেন। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন—"ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই—** তিনি শৈশবে রূপ-লাবণ্যে এবং শিশু-সুলভ গুণ সকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন—** গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্ত্বও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।"

এখন জিজ্ঞাসা যে যখন শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর মাত্র বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ "সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন" না বলিয়া "সর্বজনের প্রেমাস্পদ হইয়া-ছিলেন" বলিতে ক্ষতি কি? "গোপবালিকা-গণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন" না বলিয়া "গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি প্রেমশালী ছিলেন" বলিতে ক্ষতি কি? "কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব" প্রচার করিতেছেন, এমন একটি দেবপ্রতিভা-সম্পন্ন দেবরূপ-সম্পন্ন, বালক দেখিলে আজও ঊনবিংশতি শতাব্দীর শিক্ষিত মহোদয়গণও কি প্রেমে অধীর হইয়া তাঁহার পূজা করিতে যাই না? কোমলপ্রাণা রমণীগণ কি পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহার পূজার্থ ছুটিয়া যান না? প্রেমে অধীর হইয়া তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া, বুকে লইয়া, মুখে চুম্বন করেন না? তাঁহাকে কি আপন পতি-পুত্রের অধিক প্রেম করেন না? যাহারা তাঁহার প্রতি এরূপ প্রেমবান হইবে, তিনি কি তাহাদের প্রতি প্রেমবান হইবেন না?

পল্লীগ্রামে সামান্য একটি সুন্দর সন্ন্যাসী বালক আসিলে কি কাণ্ডটা হইয়া থাকে তাহা কি কেহ দেখেন নাই? লেখক স্বচক্ষে এরূপ একটি কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইয়া-ছিলেন। তবে 'কিশোর' শ্রীকৃষ্ণের এবং সরলা অশিক্ষিত 'কিশোরী' গোপীগণের প্রেমে কলঙ্ক স্পর্শিবে কেন? কিশোর বয়স্ক একটি বালক ঘোরতর পাপিষ্ঠ হইলে ত সেরূপ প্রেম তাহার পক্ষে অসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব গ্রন্থে মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিতেরই প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু সে কৃষ্ণচরিতের পূজা কুত্রাপি নাই। আসিন্ধু হিমাচল ব্রজলীলার কৃষ্ণেরই পূজা প্রচলিত। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজলীলার কৃষ্ণপ্রেমে ও গোপীপ্রেমেই দশাপ্রাপ্ত হইতেন—কেন? তাহা হইলেই বুঝিতে হইতেছে যে ব্রজলীলার মধ্যে আধ্যাত্মিক, রূপক ও উপন্যাস থাকিলেও এই 'কৃষ্ণপ্রেম' ও 'গোপীপ্রেম' রূপক কি উপন্যাস নহে। শ্রীচৈতন্যদেব একটি রূপক কি উপন্যাস লইয়া এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? তাই বলিতেছিলাম শিশিরকুমারের এই 'অমিয় নিমাইচরিত' পড়িবার একটা অতি গুরুতর প্রয়োজন আছে। এই অসামান্য গ্রন্থ পাঠ করিলে 'কৃষ্ণপ্রেম' ও 'গোপীপ্রেম' যে কি পবিত্র পাষাণদ্রবকারী 'অমিয়' তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। শিশিরকুমারের এই অদ্ভুত গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকের কাছে দিবার সময় আমরা এই কথাটা আরও খুলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত ব্রজের প্রেমলীলার পবিত্রতা, উচ্চতা, গভীরতা এবং জীবের পরিত্রাণকারিতা অচিন্তনীয় উদাহরণের ছলে বুঝাইয়া দিবার জন্যই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীগৌর হইয়া এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হায়! আমরা পতিত বঙ্গবাসী তাঁহাকে এখনও চিনিলাম না।

সিজের পাভিজ

ইতালীর সাহিত্যে ইউরোপীর প্রভাব পড়েছে বহু দেরীতে। এদিক থেকে সিজের পাভিজের প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। ইতালীর সাহিত্যজগতে সিজের পাভিজ একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী।

১৯০৮ সালে টিউরিন শহরে তাঁর জন্ম। এখানেই তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত। টিউরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন সাহিত্য নিয়ে বিশেষ ভাবে পড়াশোনা করেন এবং কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের ওপর গবেষণা করে বি-এ পাশ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে পাভিজ বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা 'লা কালচারা'তে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। চার বছর পরেই এই পত্রিকাটির সম্পাদক হন। এই সময়ে তিনি ইংরাজি ও মার্কিন লেখকদের লেখা অনুবাদ করতে থাকেন। সিনক্লেয়ার লুইস, ড্যানিয়েল ডি-ফো, ডিকেন্স, জয়েস, মেলভিল, স্টেইনবেক, উইলিয়ম ফকনার লেখকদের প্রচুর অনুবাদ করেন। ফলে এদের প্রভাব যেমন পাভিজের ওপর প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়েছিল তেমনি ইতালীর অন্যান্য লেখকদের ওপরও না পড়ে পারেনি। ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের প্রভাব অবশ্য তখনও পুরোপুরি এসে পড়েনি ইতালীয় সাহিত্যের মধ্যে। পাভিজই ইতালীয় সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা নিয়ে আসেন প্রথম। রচনারীতি, বিষয়বস্তু ও চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে পাভিজের অগ্রজেরা পড়েছিলেন মধ্যযুগে। পাভিজ তাঁর রচনার মধ্যে নিয়ে এলেন সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর মননশীলতা। রচনারীতি আরও আধুনিক হোল। বিষয়বস্তু নির্বাচন আর চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে আরও নিপুণতা দেখালেন। পাভিজের সময়ে ইতালীর সাহিত্যাকাশে কবি মারিনেত্তির সুনাম মধ্যগগনে। তিনি ছিলেন ফিউচারিস্ট আন্দোলনের নেতা। ইতালীর সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টাও কম নয়। অবশ্য আলবারতো মোরাভিয়ার অনন্যপ্রতিভা বিতর্কের বাইরে।

১৯৩৫ সালে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের জন্যে ধরা পড়েন পাভিজ এবং নির্জন সমুদ্রধারে ব্রাঙ্কালিওন কালাব্রিতে বন্দীজীবন যাপন করতে হয় তাকে। তার রচনার মধ্যে এ্যামঙ উইমেন ওনলি, দি পলিটিক্যাল প্রিজনার, দি ডেভিল ইন দি হিলস, দি হাউস অন দি হিল, দি কমরেড, দি হারভেস্টারস, দি বীচ, ফেস্টিভ্যাল নাইট অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, দিস বিজনেস অফ লিভিং, ডায়ালগস উইথ লিউকো এবং দি মুন অ্যান্ড দি বনফায়ার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দি পলিটিক্যাল প্রিজনার উপন্যাসখানি লেখা হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। অ্যামঙ উইমেন ওনলি উপন্যাসখানি ইতালীর বিখ্যাত স্ট্রেগা পুরস্কার লাভ করে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যেই তাঁর ন-খানি বই প্রকাশিত হয় ইতালীয় ভাষায় —এগুলোর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা এবং অজস্র প্রবন্ধ।

১৯৫০ সালে তিনি প্রচন্ড মানসিক অশান্তিতে আত্মহত্যা করে বসেন। অবশ্য এই আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল তাঁর অতি ছোটবেলা থেকেই এবং এই রোগেই তিনি বরাবর ভুগে এসেছেন।

পাভিজের লেখা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁর প্রভাব ক্রমশঃই বেড়েই চলেছে। তাঁর রচনারীতি ও লেখার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে হেমিংওয়ে, কামু ও ফস্টারের সঙ্গে তুলনা হয়েছে বহুবার। আসলে তিনি ছিলেন একজন কবি। স্বভাবেও কবি। মন ছিল তাঁর অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল। সব থেকে দুঃখের বিষয় তিনি বহু আঘাত পেয়েছেন তাঁর এই অল্পদিনের জীবনে। ছোটবেলা থেকে যে আত্মহত্যা-প্রবণতা ছিল তা তাঁকে দগ্ধ করেছে বারবার। রাজনৈতিক কারণে বন্দীজীবনের দুঃখকষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কেন যেন তিনি সহজভাবে মিশতে পারেননি কোনদিন। তাদের ভালোবাসার ওপর তাঁর কোন আস্থা ছিল না। কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না তাদের তিনি। বরং, ঘৃণার ভাবই পোষণ করতেন তাদের সম্বন্ধে। এর জন্যও তাঁকে কম কষ্ট পেতে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম হয়। মেয়েটির প্রকৃত নাম আজও জানা যায়নি। তার কবিতায় তাকে —দি গার্ল উইথ দি হার্সক ভয়েস বলে চিহ্নিত করেছেন। মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশা করবার আগে পর্যন্ত ভীষণভাবে ঘৃণা করতেন তিনি মেয়েদের। এই ভালবাসা টিকেছিল মাত্র পাঁচবছর। ব্রাঙ্কালিওনের জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরই অতি আকস্মিকভাবে পাভিজকে ছেড়ে চলে যায় মেয়েটি। তারপর থেকেই পাভিজ পাগলের মত হয়ে যান। মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নারীদের প্রতি ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

পাভিজের অধিকাংশ ছোটগল্প অত্যন্ত বিক্ষুব্ধতার মধ্যে লিখিত। অথচ কোথাও শিথিলতা নেই চিন্তা ও প্রকাশে। প্রতিটি লেখাই ঘনাপিনদ্ধ ভাষায় রচিত। রচনার মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার এক সুন্দর সাযুজ্য রক্ষা সম্ভব হয়েছে। পাভিজের ব্যক্তিমানস ছিল বাস্তবানুগামী। বাস্তবেই চলাফেরা করতেন তিনি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিশক্তি সজাগ রেখে। কিন্তু তাঁর মানস ছিল এন্ডিমিয়নের মত ধরাছোঁয়ার বাইরে—সেখানে কেউই পেতো না তাঁর নাগাল। গরীবের দেশ ইতালী ঐশ্বর্য মন্ডিত। ইতালীর প্রাচীন গথিক স্থাপত্য সৌন্দর্য একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল পাভিজের মনকে। ইতালীর অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন তিনি। ফ্যাসিস্টদের বর্বরোচিত অত্যাচার এবং ইতালীর নিপীড়িত দুঃস্থ মানুষের কষ্টকর জীবনযাপন তাঁর সংবেদনশীল মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলতো। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে পাভিজ কতকটা ছিলেন স্বনির্ভর। কারো কোন বন্ধনকে তিনি কখনও মেনে নেন নি। তাই ফ্যাসিস্টদের বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজীবন তাঁকে লড়াই করে যেতে হয়েছে। মানবমনের নিগূঢ় অনুভূতি ও প্রবৃত্তির স্পন্দনকে উদ্ঘাটন করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং জটিল চরিত্র অংকনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমসাময়িক ইতালীয় সাহিত্যিকদের তুলনায় যথেষ্ট বেশি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। স্বাভাবিক সুস্থ জীবন থেকে দূরে মানুষ যে কত অসহায় তা যেমন করে বুঝেছিলেন কামু, কাফকা, সার্ত্র, অর্থাৎ চারিদিক শোচনীয় আর্তি আর শূন্যতাবোধের দ্বারা মানুষ সর্বদাই কষ্ট পায়, পীড়িত উদ্বিগ্ন, তেমনি পাভিজও বুঝে ছিলেন—মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে অমানুষিকভাবে। এ সংগ্রাম ভেতরের এবং বাইরের। এই প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত।

বর্তমানকালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকেও যেমন তিনি মুক্ত ছিলেন না, তেমনি সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সব্যসাচীর মতই সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন তিনি। তাই পাভিজকে আমরা ইতালীর কতকটা যুগসন্ধিক্ষণের লেখক বলে অভিহিত করতে পারি। পুরোনো যুগ আর প্রাচীন ভাবধারার খোলস ছেড়ে আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের বনেদ তৈরী হয়েছে পাভিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতই টিঁকে থাকবেন তিনি ইতালীর সাহিত্যাকাশে।

—প্রদোষ দত্ত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

- ভারতীয় সাহিত্য
- বিদেশী সাহিত্য
- নতুন বই
- পত্র পত্রিকা
- বই পাড়ায়

ভারতীয় সাহিত্য

এমন কিছু গ্রন্থ আছে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অথচ যার মূল্য খুব বেশি হওয়ায় অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ক্রয় করা সম্ভব হয় না। অথচ একবার ক্রয় করতে পারলে কয়েক পুরুষ ধরে গ্রন্থটি থেকে যায়। এমন একটি অসাধারণ মূল্যবান গ্রন্থ হল **'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা'**। দুইশত বৎসর আগে স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় ত্রিখণ্ডে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে বহুবার এই গ্রন্থটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী পর্যন্ত একটি বিশিষ্ট পুস্তক-সংস্থার উদ্যোগে এই গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ফলে এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জানবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে সহজ কিস্তিতে যাতে গ্রন্থটি কিনতে লোকে আগ্রহী হয়, তাই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। উদ্যোক্তারা যে কিছুটা সফল হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে ভাবতে হয়, আমাদের মাতৃভাষায় কবে এই ধরনের গ্রন্থ রচিত হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, ডি-ফিল, পি-এইচ-ডি সংখ্যাও কম হচ্ছে না, অথচ একাজে এগিয়ে আসার জন্য কারও যেন তেমন আগ্রহ নেই। ভারতবর্ষের অনেক আঞ্চলিক ভাষাতেও কিন্তু এ ধরনের কাজ এখন হচ্ছে।

এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে আর একটি সংবাদের কথা মনে পড়ল। কয়েকদিন আগে **'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডিটরস'**এর উদ্যোগে একটি সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এই প্রদর্শনীতে 'ডানলপ গেজেট' বছরের শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রের সম্মান লাভ করেছে।

এই সপ্তাহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল ১৯৬৮ সালের পূর্বাঞ্চলীয় **'সোভিয়েট ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার'** বিজয়ীদের গত শনিবার ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—"রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার প্রভেদ থাকলেও মানবিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে রুশ সরকার ভারতীয় লেখকদের এই পুরস্কার দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছেন, তার নজীর নেই বললেই চলে। নেহরুর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে রুশ-ভারত বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হচ্ছে।" প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, সোভিয়েট দেশ নেহরু পুরস্কার উভয় দেশের মানুষের মধ্যে আরও অন্তরঙ্গতার সুযোগ এনে দিয়েছে। স্বাগত ভাষণ দেন পুরস্কার কমিটির পূর্বাঞ্চলের উপদেষ্টা সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী ভি গুর্গেনেভ। এই অনুষ্ঠানে বাংলার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উড়িষ্যার শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র, আসামের শ্রীশশী শর্মা, উড়িষ্যার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মহান্তি ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহকে পুরস্কৃত করা হয়।

এই বৎসরটি হল বীরবলের জন্মশতবার্ষিকী বৎসর। বাংলা দেশে এবং বাংলার বাইরে এর আগে কয়েকস্থানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কয়েকটি পত্রিকা এই উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি **'বীরবল জন্মশতবার্ষিকী'** উৎসবের আর একটি সংবাদ এসেছে নবদ্বীপ থেকে। গত ২৫ ডিসেম্বর নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার ভবনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক অরুণপ্রসাদ সেন। প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে বীরবল প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। বক্তৃতা, কবিতাপাঠ ও সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ জয়গুরু গোস্বামী, স্মৃতি চক্রবর্তী, ইলা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রখ্যাত গুজরাটি লেখক **শ্রীরজনীকান্ত মোদি** সম্প্রতি বোম্বাইতে পরলোকগমন করেন। তিনি গুজরাটি পাক্ষিক পত্রিকা 'সমর্পণ'-এর একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইংরেজিতেও তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অরবিন্দের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ভারতীয় বিদ্যাভবনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল খুব নিবিড়। তাঁর মৃত্যুতে গুজরাটি সাহিত্যের যে বিশেষ ক্ষতি হল, তাতে সন্দেহ নেই।

কানাড়ি ভাষায় সম্প্রতি **'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এটি কোনও মৌলিক গ্রন্থ নয়। 'সাহিত্য আকাদমির উদ্যোগে প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যেরই কানাড়া অনুবাদ। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উপর সুলিখিত প্রবন্ধের কানাড়া অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত কানাড়া-ভাষী লেখকরা।

এই ধরনের গ্রন্থের যে সব অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়, এই গ্রন্থেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। অর্থাৎ অধিকাংশ লেখাতেই সম্প্রতিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি অনুপস্থিত। যাই হোক, তবু এই ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্রমশঃ আমরা পরস্পরকে জানতে পারবো।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তামিল ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের কথা মনে পড়ছে। গ্রন্থটির নাম 'কৃষ্ণকর্ণামৃতম্'। মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীএন সুব্রাহ্মনিয় আয়ার। শ্রীআয়ার খুবই জনপ্রিয় লেখক। তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও গুণমুগ্ধরা তাঁকে 'আন্না' বলে ডাকেন। মূল গ্রন্থটির লেখক লীলা শুক। ত্রয়োদশ শতকে কেরলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাপথ পরিভ্রমণে যান, তখন এই গ্রন্থটি তিনি পাঠ করেন এবং গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রন্থে ৩২৮টি স্তোত্র আছে। "কেনোপনিষদ"এর উপর লীলা শুকের লেখা এবং তাঁর অন্যান্য লেখা এর আগে কেরালা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশ করেছে। বর্তমান গ্রন্থটির অনুবাদও বিভিন্ন কারণে উল্লেখ্য।

বন্যাত্রাণে বাংলার সাহিত্যসমাজ যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার বিভিন্ন সংবাদ এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। "সাহিত্যতীর্থ" সংগঠিত সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে গত ২৩ ডিসেম্বর ২৮৯৫৲ টাকার একটি চেক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের হাতে অর্পণ করা হয়। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে অর্পণ করেন শ্রীবনফুল। 'সাহিত্যতীর্থ'র সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক জাতির কল্যাণে সাহিত্যসমাজের এই দানের কথা ঘোষণা করেন। এই তহবিল গঠনে অর্থদান করেছেন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদা-শংকর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, উমা দেবী, গোপাল ভৌমিক, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, জরাসন্ধ, জগদীশ ভট্টাচার্য, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী, পুলিনবিহারী সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মনোজিৎ বসু, মন্মথ রায়, লীলা মজুমদার, শচীন্দ্র বসু, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আরো অনেকে।

প্রখ্যাত বৃটিশ প্রকাশনসংস্থা উইলিয়ম কলিনস সন্স অ্যান্ড কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ উইলিয়ম আলেকজান্ডার রয় কলিনস ব্যবসায়িক সফরে যাত্রা করছেন জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে। এই উদ্দেশ্যে তিনি এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করবেন বলে জানা গেছে। ভারত সফর করবেন ২৯ জানুয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারী। ২৯ জানুয়ারী তাঁর বোম্বাই পৌঁছবার কথা। সেখানে তিনি দুদিন থাকবেন। তারপর দিল্লীতে থাকবেন ২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এই সময়ে মিঃ কলিনস বিভিন্ন সাহিত্যিক ও পুস্তক-বিক্রেতাদের সংগে আলোচনা করবেন। ১৯৬৯ সালে কলিনস-সংস্থার ১৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব পালিত হবে।

পৃথিবীটা দিনের পর দিন জনসংখ্যার ভারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। দুর্ভিক্ষ হতে আর দেরী নেই। ম্যালথুসিয়ান থিয়োরী অনুসারে সেই অমোঘ সময়টি হলো ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ। মাত্র ছ বছর বাকি। উইলিয়ম এবং পল প্যাডক একটি বিরাট বই লিখেছেন এই থিয়োরীর ওপর। বইটির নাম—ফেমিন— ১৯৭৫। লেখকদের ধারণা, এ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের আর কোনো উপায় নেই। কোনো দেশ যদি এই সংকট, অনাহার ও অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাহলে মার্কিনী খাদ্যের সাহায্য তার পক্ষে অত্যাবশ্যক। অথচ সারা পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার মতো যথেষ্ট খাদ্য আমেরিকার নেই। ভারতবর্ষে এই দুর্ভিক্ষের রূপ হবে ভয়াবহ। তখন এদেশে দেখা দেবে ভয়াবহ সামাজিক উত্তেজনা, নানারকম অনাচার, অবিচার আর দাঙ্গা। পাকিস্তান ছোট দেশ। সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হলে আমেরিকার খাদ্য তাকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। ভারতবর্ষকে বাঁচাবার সাধ্য কারো নেই। অতএব সাবধান।

ফরাসী নাটকের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। বইটির নাম থিয়েটার অব ওয়ার্স। তিনজন ফরাসী নাট্যকারের তিনটি বিখ্যাত নাটক এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। তিনটি নাটকই যুদ্ধ-সম্পর্কিত। ঔপন্যাসিক হেনরি দ্য মন্তার-ল্যাঁত-এর নাটক 'দি সিভিল ওয়ার'কে এ সংকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যায়। গৃহযুদ্ধ কিভাবে মানবীয় বিরোধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ নেয়, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশীরা কিভাবে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে তারই চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকে। দ্বিতীয় নাটক 'দি জেনারেলস টি পার্টি'র লেখক বরিস ভিয়ান। জেনারেল ওমর ব্রাডলের 'এ সোলজার্স মেময়েস' অবলম্বনে নাটকটি লেখা। তৃতীয় নাটকটি লিখেছেন জর্জেস শেহারড। এর ভাষা কাব্যময়, আধুনিক এবং বিদ্রূপাত্মক। সুররিয়্যালিজমের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে নাটকটির ওপর।

নিউ ইংলিশ ড্রামাটিস্টস নামে একটি সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছেন পেংগুইন। ইংরেজী নাটকের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হলে বইটি অপরিহার্য। পুরোনো ধারাকে ক্রমশ অস্বীকার করে কিভাবে ইংরেজী নাটক জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধে পরিবর্তিত হচ্ছে—তারই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে এ সংকলনটি মূল্যবান। পিটার টারসনের 'এ নাইট টু মেক দি এঞ্জেলস উইপ' নামে একটি নাটক সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ইংলণ্ডের গ্রাম্য পট-ভূমিতে নাটকটি লেখা। অপর একটি নাটক লিখেছেন চার্লস উড। তার নাম 'ফিল দি স্টেজ উইথ হ্যাপি আওয়ার্স'। এর মূল চরিত্র অ্যালবার্ট হ্যারিস একজন নিঃস্ব মানুষ, পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট এবং আত্ম-অপমানিত। অন্যান্য চরিত্র তারই সহচর—আধুনিক যুগ ও নগর-যন্ত্রণার এক-একটি প্রতীক। এই সংকলনেও অবশ্য তিনটি নাটক গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় নাটকটির নাম 'হ্যাপি ফ্যামিলি'। লিখেছেন গাইলস কুপার। পরিণত বয়সেও মানুষ কিভাবে বুকের মধ্যে শৈশব স্বপ্নকে লালন করেন তার সুন্দর ফ্যানটাস্টিক পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকে।

স্যামুয়েল বেকেট নাট্যকার হিসেবে পৃথিবীখ্যাত। সম্প্রতি তাঁর প্লে নামে একটি নাটকের বই বেরিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে তাঁর যেসব নাটক বা নাটিকা বেতারে অভিনীত হয়েছে—এটিকে তার সংকলনগ্রন্থ বলা যায়। কোন নাটকে চরিত্রের সংখ্যা তিনের বেশী নয়। সংলাপ সংগীতময় হওয়ায় প্রতিটি নাটকই সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করার অনুপযোগী।

রাশিয়ান ঔপন্যাসিক যুশিফ গেরাসিমভের একটি উপন্যাস বেরিয়েছে সম্প্রতি কাইন্ড ডেজ অব রেস্ট নামে। সৈনিকদের জীবনযাত্রা নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। এক বিশেষ অবস্থায় কয়েকজন সৈনিক অস্বাস্থ্যকর রুটি ও ঝোল খেয়ে ... যায়। তারই মর্মান্তিক বর্ণনা বইটিতে।

সুইস সাংবাদিক পিটার সেজারের ... রিপোর্ট ফ্রম ভিয়েতনাম নামে একটি মূল্যবান বই প্রকাশ করেছেন সুইস ...ন্যাল ইনস্টিটিউট। বিশুদ্ধ সংবাদের ভিত্তিতে বইটি লেখা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ...র থেকে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত বহু খবরাখবর দেওয়া হয়েছে এতে। প্রেসিডেন্ট জনসন, চার্লস দ্য গল প্রমুখ ...নেকের কথাই বলা হয়েছে প্রসংগক্রমে।

কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে ম্যাথু রিজওয়ে একটি বই লিখেছেন দি ওয়ার ইন কোরিয়া নামে। রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যদলে রিজওয়ে ছিলেন একজন জেনারেল। স্বভাবতই ...গ্রন্থের তথ্য ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ কম। সাধারণ পাঠক-পাঠিকারাও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন বলে বহু সমালোচকের বিশ্বাস। জেনারেল রিজওয়ের মতে কোরিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে মার্কিনী জনসাধারণ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সেজন্যে তাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। এশিয়া সম্পর্কে সেই প্রথম হোয়াইট হাউসের টনক নড়ে। এ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে জেনারেল ম্যাক-আর্থারের পদচ্যুতির বিশদ বর্ণনা আছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সংগে তাঁর পার্থক্যের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা আকস্মিক।

ভিয়েতনাম সম্পর্কে এ পর্যন্ত বহু রকমের বই বেরিয়েছে — প্রবন্ধ নিবন্ধ আলোচনা সমালোচনা গল্প-উপন্যাস রম্য-রচনা—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কার্টুনের বই বেরোয়নি। সম্প্রতি প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট আবু সম্পাদিত একটি বই বেরিয়েছে ভারডিক্টস অন ভিয়েতনাম নামে। পৃথিবীর নানা দেশে ভিয়েতনাম সম্পর্কে যে সকল কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে তারই উল্লেখযোগ্য সংকলন হলো এই গ্রন্থটি। সমালোচকেরা এর কয়েকটি কার্টুনকে অসাধারণ আখ্যা দিয়েছেন। স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ শিল্পী ও কার্টুনিস্টদের যেমনভাবে উত্তেজিত করেছিল—ভিয়েতনাম যুদ্ধ তেমনভাবে কাউকে জাগ্রত করেনি।

...ী —(উপন্যাস) সিয়ারামশরণ গুপ্ত প্রণীত। অনুবাদ—সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী। ভূমিকা : তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়। প্রকাশক—সাহিত্য আকাদেমি —নিউদিল্লী। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

পণ্ডিত সিয়ারামশরণ গুপ্ত হিন্দি ...র খ্যাতনামা কবি, মৈথিলীশরণ ...প্তের অনুজ এবং স্বয়ং একজন প্রতিষ্ঠিত কবি ও উপন্যাস লেখক। ...রামশরণ গুপ্ত অতি সরল এবং ...ভংগীতে ঘরের কথা লিখতে পারেন ...ং সেই অনাড়ম্বর ভংগীই তাঁর ...হিত্যের এক উল্লেখযোগ্য গুণ। তাঁর ...নায় অনাবশ্যক জটিলতা নেই। 'নারী' ...ন্যাসটি যমুনার জীবনের এক করুণ ...তিহাস। তার স্বামী বৃন্দাবন গিয়েছিল ...শ থেকে চলে হয়ত রুটির সন্ধানে, ...রপর তার কোনো সংবাদ নেই। সে আর ...রে না। সকলে মনে করল বৃন্দাবন আর ...ই, তার হয়ত মৃত্যু হয়েছে। বৃন্দাবনের ...ই নিরুদ্দেশ হওয়ার কালে যমুনাকে ...হায্য করত অজিত, ফলে ঘনিষ্ঠতা হল। ...রণে অজিতের সংগে আপনাকে মিলিয়ে ...তে চায়, সবদিক থেকেই অন্তর ও মন ...খন প্রস্তুত তখন শোনা গেল বৃন্দাবন ...শে ফিরেছে। যমুনা স্বামীর আশা পথ ...চেয়ে বসে আছে, অজিত গেছে বৃন্দাবনকে ...আনতে, বৃন্দাবন আছে শহরে। কিন্তু ...হৃদয় প্রতিবেশীর অভাব ছিল না। ...হাজনী করত মতিলাল, সে বৃন্দাবনকে ...সংবাদ দিয়েছিল অজিতের সংগে যমুনার ঘনিষ্ঠতার। ফলে বৃন্দাবন গেল ক্ষেপে, ...হাজন গ্রাস করল যমুনার সম্পত্তি ...পুরানো পাওনার দাবীতে, আর যমুনাকে অবশেষে অজিতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হল। এই হল কাহিনী। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সুপরিচিত, তাঁর অনুবাদ স্বচ্ছন্দ এবং প্রাঞ্জল। এ ছাড়া তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাংশটি মূল্যবান। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

পত্রাবলী (১ম খণ্ড)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। পশ্যন্তী প্রকাশনী। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, কলকাতা—৩। দাম ছয় টাকা।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ দার্শনিক এবং সাধক। তাঁর চিঠিপত্রের মূল্য অপরিসীম। সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রাবলীতে এই জ্ঞান-তপস্বীর এক বিস্ময়কর পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের মধ্যে লিখিত এই সমস্ত চিঠিতে অধ্যাত্মজগতের নানা নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে। যুবক, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী বিভিন্ন জনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সাংখ্য বেদান্ত, তন্ত্রের নানা তত্ত্ব, শ্লোক ও মন্ত্রাদির রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। বইখানি সাধক সমাজ এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রত্যেকেরই প্রয়োজন মেটাবে।

ইতিহাসের গল্পসল্প—সলিল সরকার। শরৎ বুক হাউস কলিকাতা—১২, দাম দু' টাকা সত্তর পয়সা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের নায়ক-নায়িকা যাঁরা তাঁদের জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনী ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের মহানুভবতা বা খামখেয়ালের ভেতর দিয়ে শুকনো ইতিহাসের তথ্য থেকে আসল মানুষের চেহারা অনেক সময় সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং তার ফলে মানুষগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হবার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিদেশী ইতিহাসের এসব টুকরো কাহিনী অনেকেই মুখস্থ করে থাকে। শিল্পী টিসিয়ানের তুলি কুড়িয়ে রাজা পঞ্চম চার্লস ধন্য হয়েছেন একথা সবিস্তারে জানাবার ব্যবস্থাও হয়, কিন্তু তাজমহলের কর্মরত সামান্য মিস্ত্রির অজ্ঞাতে তার জন্যে সম্রাট শাজাহান পানের খিলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সে কাহিনী এখনো অনেকের অজানা থেকে যায়। বাবরের আত্মজীবনীতে কি চোখে ভারতবর্ষকে তিনি দেখেছিলেন তাও সকলে জানি না। রাষ্ট্রভাষায় সমস্যা সমা-

ধানের জন্যে সম্রাট আকবর কেমনভাবে সর্বজাতির মানুষকে ফতেপুর সিক্রি নির্মাণের কাজে লাগিয়ে সব ভাষার থেকে শব্দ চয়ন করে সর্বভারতীয় ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাও যেন আজকের দিনে জানার দরকার হয়ে পড়েছে। এই ধরনের বহু বিচিত্র কাহিনী দিয়ে বইটি সুসজ্জিত করা হয়েছে। লেখার ভঙ্গীও মোটামুটি ভালই। বহুকাল আগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজা-বাদশা' ও 'রণডঙ্ক' নামে এ ধরনের দুখানি বই লিখেছিলেন। বর্তমান লেখকের প্রচেষ্টাও কতকটা সেই ধরনের।

দৃষ্টিদর্পণ (ইচ্ছা অন্ধদের জন্য) শ্রীতারক মিত্র প্রণীত। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। প্রকাশক—নরেশচন্দ্র দে। ২৪, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা—১২।

শ্রীতারক মিত্র 'অবতার স্মৃতি সংখ্যা' হিসাবে এই ছড়ার বইটি প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছড়ার মধ্যে লোকশিক্ষাকর সুনিপুণ শ্লেষ আছে যা বিশেষ উপভোগ্য। 'অবতারে'র ভূমিকা আজ প্রায় বিস্মৃত। লেখক সেই পত্রিকাটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। লেখকের সমাজ-সচেতন মন সমাজের যেসব ব্যাধি ও জঞ্জালের দিকে পাঠককে সজাগ করার চেষ্টা করেছে তা প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থের মধ্যে অজস্র প্রশংসাপত্র সংযোজন না করলে গ্রন্থটির মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেত, কারণ গ্রন্থটির নিজস্ব মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়, তার জন্য হাততালির প্রয়োজন নেই।

পুরোনো সিঁড়ি।কবিতা পুস্তিকা।—শক্তি চট্টোপাধ্যায়।। অনুভব প্রকাশনী, ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা-২৯।। প্রাপ্তিস্থান : সিগনেট বুকশপ, কলকাতা ১২ এবং কর্ণওয়ালিস বুকস্টল, কলকাতা ৪।। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।।

অনুভব কবিতা প্রচার পুস্তিকা সিরিজের চতুর্দশ পুস্তিকা হিসেবে পুরোনো সিঁড়ি প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে লিখিত কবির অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য কবিতা পুস্তিকাটির চাহিদা বৃদ্ধি করবে। বিচিত্র রকম ছন্দের কারুকাজ দেখিয়েছেন তিনি তাঁর বহু কবিতায়। যাঁরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভালোবাসেন—তাঁদের কাছে পুস্তিকাটি খুবই ভালো লাগবে। ছাপা, প্রচ্ছদ সুন্দর। দাম সুলভ। সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

প্রাপ্তি-স্বীকার

শ্রীহরিদাস পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড)—পথিক। প্রাণগোপাল সাহা। ৬৮।৪ যোগীপাড়া রোড। কলকাতা—২৮। দাম ২·৫০।

নীলানুভিকা—নির্মল আচার্য। ৬৬।১, বেলগাছিয়া রোড। কলকাতা—৩৭। দাম দেড়টাকা।

সূর্যগ্রহণ—সত্যদর্শী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলঃ—৭। দাম তিন টাকা।

তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলি—নীহার গুহ। অধুনা। ১৭।১ডি সূর্য সেন স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম দু' টাকা।

অধিকার—দীপক দে। ৭১ পর্বতভাঙ্গা। কলকাতা—৪৯। দাম এক টাকা।

ভিয়েতনাম ও আমাদের কবিতা—গোপাললাল মল্লিক সম্পাদিত। নিউ ওয়েভ পাবলিশিং কোম্পানী। ২বি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন। কলকাতা—১২। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নদী হ খর ধারে—অমল মিত্র। ৮৩।২ সি আই টি রোড। কলকাতা—১৪। দাম পাঁচ টাকা।

গীতারহস্য দীপিকা—স্বামী শ্রীগুরু শরণানন্দ গিরি। ১৩১বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা—১২।

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী—শ্রীগুরু শরণানন্দ গিরি মহারাজের বাণী—প্রথম খণ্ড। মহালক্ষ্মী প্রেস। ৪এ রাখালদাস আঢ্য রোড। কলকাতা—২৭।

পত্রিকা

অভিনয়-দর্পণ (চতুর্থ সংখ্যা) : প্রধান **সম্পাদক—ঋত্বিক ঘটক, ১৩১, হরিশ** মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬। দাম : দেড় টাকা।

নাট্য-আন্দোলনের উপর পত্র-পত্রিকার সংখ্যা নেহাতই কম। সেদিক থেকে 'অভিনয়-দর্পণে'র আবির্ভাবকে আমরা আগেই অভিনন্দন জানিয়েছি। বলা বাহুল্য, বর্তমান সংখ্যাতেও বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনার খোরাক যুগিয়েছেন সম্পাদক। 'বাঙলা নাটকের মঞ্চসজ্জার বিবর্তন' বিষয়ে খালেদ চৌধুরীর ছোট্ট নিবন্ধ এবং পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'অনুপস্থিত ব্যঞ্জনা এবং আধুনিক প্রযোজক' আলোচনাটি নিঃসন্দেহেই মূল্যবান। তবে এ সংখ্যার সবচেয়ে আকর্ষণ হল অমিয় মিত্র কর্তৃক নোরা ব্র্যাটক্লিফের 'উই গট রিদম্' নাটিকার রূপান্তরটি। এছাড়াও রয়েছে নাট্যচিন্তা বিভাগে ২৬জন নাট্যকারের বক্তব্য, নাট্যসমালোচনা, যাত্রাভিনয়ের সমালোচনা এবং তারাশংকরের 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাসের নাট্যরূপের কয়েকটি দৃশ্য। এটি করেছেন রতন ঘোষ।

স্বাস্থ্যদীপিকা (ভাদ্র-আশ্বিন ৭৫)—**সম্পাদক:** নিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। ২, ফরডাইস লেন। কলকাতা-১৪। দাম ৬০ পয়সা।

'স্বাস্থ্য-দীপিকা' পত্রিকাটির নিয়মিত আত্মপ্রকাশকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোকপাত করে থাকেন। বর্তমান সংখ্যায় খাদ্যে বিষাক্ত ভেজাল, দুধ, দই, ছানা, কোলয়েড জমাট, আপনি ও আপনার শিশু, অজানা মনের সন্ধানে, বসন্ত প্রভৃতি বিষয়ে লিখেছেন রামনারায়ণ চক্রবর্তী, অশোককুমার রায়চৌধুরী, নির্মলাপদ চট্টোপাধ্যায়, বি ব্যানার্জী, বি এন পাইন, রমেশচন্দ্র আচার্য, শ্যামল রায়চৌধুরী।

সোনার কাঠি (২য় বর্ষ : ৩য় সংখ্যা) সম্পাদক—সুকুমার রায়, ৩৩।৪, রাসদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৬, দাম ষাট পয়সা।

ছোটদের জন্যে আলোচ্য পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন মনোজিৎ বসু, স্বপনবুড়ো, সরল দে, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, অহিভূষণ মালিক, রমেন দাস বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, রাজ্যেশ্বর মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অপূর্ব কুণ্ডু এবং আরো অনেকে।

সাহিত্য (কার্তিক)—সম্পাদক : [illegible]কুমার ভট্টাচার্য। এস এস কলেজ, হাইলাকান্দি। কাছাড়। দাম এক টাকা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন শিশিরকুমার ভট্টাচার্য, শান্তনু ঘোষ, দিগম্বর [illegible], বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, তরুণ সান্যাল, [illegible] রায়, রত্নেশ্বর হাজরা, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কার্তিক-পৌষ)—সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু। ১৯, হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা ১। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির বর্তমান সংখ্যায় ন্যাভো রমাঁ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রামমোহন, গগনেন্দ্রনাথ, কালিদাস [illegible] সাম্প্রতিক উপন্যাস : যদুবংশ, আমাদের জীবন-সমস্যা, হিন্দী লৌকিক ছন্দ, বাংলা সাহিত্যের একটি বিস্মৃত পুস্তিকা, গ্রাম-লীলাপট প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন নন্দদুলাল দে, পশুপতি শাসমল, মনোজিৎ বসু, তারকনাথ ঘোষ, পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য, রামবহাল তেওয়ারী, বেলা সেনগুপ্ত, গীতিকা গুহ। বিমল কর-এর উপন্যাস 'যদুবংশ' নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

প্রতিশ্রুতি সম্পাদক: ব্রজেশকুমার সিংহ। হাইলাকান্দি।

মণিপুরীর সঙ্গে বাংলা অক্ষরের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ভাষার পার্থক্যও খুব বেশী চোখে না পড়লেও—একটি স্বাতন্ত্র্যের সুর স্পষ্ট। মণিপুরী ভাষার সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রতিশ্রুতির তিনটি সংখ্যা আমাদের হাতে এসেছে। এই সংখ্যা তিনটিতে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক এবং অন্যান্য কয়েকটি রচনা লিখেছেন স্নেহারূপ সিংহ, কালীপ্রসাদ সিংহ, মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয়

রাজকুমার, আনন্দ বাগচী, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, গোপীনাথ সিংহ, বরুণকুমার সিংহ, ইন্দুকুমার সিংহ, অমরেন্দ্রকুমার সিংহ, চন্দ্রকান্ত সিংহ এবং আরো অনেকে।

পরিক্রমা (সপ্তম বর্ষ)—**সম্পাদক : নুরুল হক চৌধুরী। শ্রীকিষণ সারদা মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র। হাইলাকান্দি,** আসাম।

কলকাতা থেকে দূরবর্তী ভারতের সীমান্তপ্রদেশ আসামের হাইলাকান্দি এস-এস কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত এই সাময়িকীটি রচনা নির্বাচনে ও সম্পাদকীয় রুচিতে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লিখেছেন শংকর গুপ্ত, আবদুল হোসেন ছাবিরী, অসিতরঞ্জন ঘোষ, স্বপনকুমার নন্দী, সুধাংশুশেখর সিংহ, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, প্রদ্যোৎকুমার দেব, অরবিন্দ চৌধুরী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শিশির ভট্টাচার্য, চন্দন চৌধুরী, আবুলকালাম মজুমদার, অপরাজিতা ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, বিষ্ণুপদ রাজবংশী, চাউবা সিংহ, সাসমচা সিনহা এবং আরো কয়েকজন। ইংরেজী ও প্রতিবেশী-সাহিত্যের বিভাগ দুটি উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞান (পৌষ)—**সম্পাদক: যতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। ১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা।**

জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক পত্রিকা। প্রয়োজনীয় তথ্য ও মৌলিক প্রবন্ধের সমাবেশে পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হতে পারে।

বই পাড়ায়

বইপাড়ায় এখন স্কুলবই বেচাকেনার মরশুম। গল্প-উপন্যাসের ক্রেতা তেমন একটা নেই। গল্প-উপন্যাসের বাজার দিন দিন মন্দা হয়ে পড়ায় দু-চারজন ছাড়া প্রায় সব প্রকাশকই এখন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় হাত দিয়েছেন। এ মন্দার বাজারেও গল্প-উপন্যাস প্রকাশনার কাজ চলছে, পুরোদমে না হলেও বলতে পারি বেশ আশা, সামনেই গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি বইয়ের বাজার উঠবে যা-কিছু বেচাকেনা ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিলেই হবে।

হালে খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের বেশ কয়েকটি বই বেরুল। এসব বইয়ের পটভূমি এবং কাহিনীতে বৈচিত্র্যও আছে। এ-সংখ্যার আলোচ্য উপন্যাসগুলোর মূলে উপজীব্য প্রেম। তবে তথাকথিত নিছক প্রেমের উপন্যাস নয়। যেমন **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'দ্বীপায়ন'**। এই বইয়ের নায়ক নিবারণ। চরিত্রটি অনন্য। যে নিবারণ একদিন ছিল গাঁয়ের সবচেয়ে সৎ, পরোপকারী এবং চরিত্রবান ছেলে, সেই ছেলেই একদিন হয়ে উঠল আন্দামানের সবচেয়ে কুখ্যাত মাদকজোগানদার। এর মূলেও ছিল প্রেম। নিবারণ তার স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু একটি ঘটনায় স্ত্রীকে ভুল বুঝল। তার ভালোবাসায় সন্দেহ হল। মনে আঘাত পেল প্রচণ্ড। সেই আঘাতই তাকে তৈরী করল মাদক-জোগানদার। আবার একটি বার্মিজ মেয়ের সহানুভূতি স্নেহ এবং প্রেমই তাকে পুনরায় করল গার্হস্থ্যাভিমুখী। নিবারণ ছেড়ে দিল মাদক-ব্যবসা। আবার এই প্রেমই **সমরেশ বসু** তাঁর **'পাদক্ষেপ'** উপন্যাসে অন্য দৃষ্টিকোণে তুলে ধরেছেন।

শ্রমিক-নেতা সমবয়সী সংমাকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা মায়ের মতো নয় বরং বলা যায় দিদির মতো। তবে তা সঙ্কোচপূর্ণ। আর তার অল্পবয়সী মা তাকে ভালোবাসে অন্য দৃষ্টিতে—পেতে চায়। কিন্তু মোহিতের সংযত আচরণ এবং নির্লিপ্ততা তার মনের ভাব পাল্টে দিল। সাময়িক সুখ-লালসার ঊর্ধ্বে এক পবিত্র প্রেমের জগতে নিয়ে গেল তাকে। সে প্রেম মায়ের, বোনের বান্ধবীর—এবং এই ত্রয়ীর সংমিশ্রণে জাত এক আশ্চর্য উপলব্ধি। **সমরেশ বসু (কালকূট)** প্রেমকে আরও সুন্দর করে ব্যবহার করেছেন তার **'কোথায় পাব তারে'** বইয়ে। 'কোথায় পাবো তাকে সেই অচিন অধরারে, যাকে পেলে আমার সব পাওয়া হবে, যাকে পেলে আমার সব অতৃপ্তির অবসান হবে, ভরে উঠবে আমার শূন্যতা।'—এ আকুলতা মানুষের চিরন্তন। মুসলমান দরবেশ মামুদ গাজী, মাহাতো গিন্নী আঙুরি, আধুনিকা নাগরিকা ঝিনি, প্রৌঢ় অচিনদা, বন্ধ বাউল গোপীদাস বাবাজী, বিন্দু, গোকুল প্রভৃতি প্রেমিক, সকলেই মনের মানুষ খুঁজে ফিরছে। এ-প্রেমের রূপ আলাদা, এ-প্রেম ভগবৎ প্রেম।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রেম নিয়েই লিখেছেন তার **'বনবাংলো'** উপন্যাসে। গ্রাম্য মেয়ে নন্দরাণী। বয়স অল্প। সুন্দরী। সমবয়সী দুলালকে সে ভালোবাসত। টাকার লোভে বাপ বিয়ে দিল তার তিনগুণ বয়সের বিশাল চেহারা লাঠিয়াল রাজু মণ্ডলের সঙ্গে। নন্দ কি রাজুকে ভালোবাসতে পেরেছে? সে নিজেও জানে না। নন্দ বিভ্রান্ত, বিভ্রান্ত দুলালের প্রেমে, সুরপতির লোভে। আর তার পরিসমাপ্তি ঘটল আত্মহত্যায়। কিন্তু রাজু? সে সত্যিই ভালোবাসত—গভীরভাবে ভালোবাসত নন্দকে—অসতী নন্দরাণীকে। তাইতো সারাজীবন ধরে দৃষ্টিহীন হয়ে খুঁজে চলেছে তার প্রাণের নন্দকে নির্জন বনে, পথে-ঘাটে। সত্যি প্রেমের রূপ বিচিত্র!

এবারে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা বলে এবারকার মতো হালখাতা লেখা শেষ করছি। এরও প্রধান উপজীব্য প্রেম। তার সঙ্গে রয়েছে একটি খণ্ডিত দেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষা, বেদনা পরাজয়, স্বাদেশিকতার মর্মবাণী। আর তা প্রকাশ পেয়েছে গদ্যে নয়, কবিতায়। বইটির নাম **'পূর্ববাংলার কবিতা'**। সম্পাদনা করেছেন **মিহির আচার্য।**

আগে পূর্ববাংলার সঙ্গে যাও-বা ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর সে যোগসূত্রটুকুও ছিন্ন হয়েছে। ফলে পূর্ববাংলার লোক পশ্চিমবাংলার সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হচ্ছে, পশ্চিমবাঙলার লোক হচ্ছে পূর্ববাঙলার সাহিত্যসৃষ্টি থেকে। এই সময়ে পূর্ববাঙলার কবিদের সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার সাহিত্যরসিকদের পরিচয় ঘটাবার উদ্দেশ্যে যে কবিতাসংকলন করেছেন শ্রীআচার্য তা সত্যই প্রশংসনীয়। কবিতাগুলো সবই হালের নয়, পুরনো কবিতাও অনেক আছে, তবু এ-গ্রন্থ পাঠ করে পূর্ববাঙলার কবি ও কবিতা সম্পর্কে এ-বাঙলার সাহিত্যরসিকদের একটা ধারণা পাবেন, ওই বাঙলার মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ পাবেন সন্দেহ নেই। শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, সিকান্দর আবু জাফর, হাবিবুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আহম্মদ ছফা, হায়াৎ মামুদ, দিলওয়ার, লতিফা হিলালী, আবদুল গণি হাজারী, ওমর আলী প্রমুখ পূর্ববাঙলার খ্যাতনামা কবিদেরই লেখা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। আশা রাখি, বইটির সমাদার হবে।

ঘসাকাচের পার্টিশান ঘেরা ঘরখানার মধ্যে ম্যাসনেটের ঝকঝকে পালিশকরা দরজা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকেছে সুমিতা। পায়ের নীচে নরম গালচে পাতা, ঘরের আলোটা ম্লান, কাচের টেবিলে ছোট শেড দেওয়া বাতি থেকে এক ঝলক আলো সীমিত রেখায় ওর সামনের কাগজপত্র-গুলোর উপর পড়েছে। মুখখানা ঠিক দেখা যায় না।

পায়ের শব্দ ওঠে না, সুমিতা তবু অফিসার প্রবীর দত্তের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। নতুন বদলী হয়ে এসেছে, শুনেছে ও নাকি খুব কড়া লোক। কেতাদুরস্ত। কেরানীদের যম। হুট করে তার ঘরেও যাওয়া যায় না—গেলেও তাঁর হুকুম ছাড়া বসবার উপায় নেই।

কাজে ডুবে আছেন দত্তসাহেব। করস্-পনডেন্স সেকশনের সামান্য একজন কেরানী কে এল গেল তার হিসাব রাখার সময় প্রবীর দত্তের নেই।

সুমিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে, এক-কালে সতেজ বলিষ্ঠ ছিল বোধ হয়। মাথার ব্যাকব্রাশ করা চুলে কিছুটা পাক ধরেছে।

সুমিতার নিঃশ্বাসের শব্দেই যেন ধ্যান ভেঙেছে। চাইবার অবকাশ দত্তসাহেবের। বাঁ হাত তুলে ইশারায় বসতে বলে।

বসল সুমিতা। কষ্ট হচ্ছিল দাঁড়িয়ে থাকতে। ক'দিন ধরে শরীরটা ভালো নেই বেশ ভুগছে। ছুটি চেয়েছিল কিন্তু অফিসার আসছেন তাই বড়বাবু ছুটি দিতে চান নি। ওরা যেন জোয়ালে গরু, গাড়ি তাদের টানতেই হবে। জোর করেও চালাবে। এই দুর্বিসহ থেকে মুক্তির পথ পায়নি সুমিতা।

অতীতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, কর্মব্যস্ত পরিবেশ থেকে বহু দূরে অতীতের কোন সবুজ স্মৃতিময় দিনের আলোয় তার মন যেন ফিরে যেতে চায়।... টাইপ মেশিনের শব্দ কানে আসে না, টেলিফোন এবং রিং বাজে না সেখানে। ফাইল-চিঠিপত্রের নানা প্রশ্নজড়ানো জটিলতাও নেই সেই জগতে।

—আপনি!...মানে—

দত্তসাহেব ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হন। সুমিতা কোন স্বপ্নভরা জগত থেকে চকিতের মধ্যে এই কাচঘেরা অফিসঘরের পরিবেশে ফিরে আসে।

অভ্যাস বশেই দাঁড়াল সুমিতা। অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। চোখাচোখি হতে সেও অবাক হয়। এই প্রবীর দত্তকে সে চেনে—অতীতে চিনতো।

বিচিত্র এক জগতের সন্ধান করেছিল বহু বৎসর অতীতে সুমিতা সেন—আর ওই প্রবীর দত্ত। ও তখন তরুণ, মনে-প্রাণে তার যৌবনের উন্দামতা, সবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীমা ছাড়িয়ে অফিসে ঢুকেছে। সুমিতাকে ভালো লেগেছিল তার।

সেদিন সুমিতার মনে অসীম আকাশের মুক্তির সুর।

সেই দিনের কথাগুলোই মনে পড়ে সুমিতার। সুমিতা দেখছে প্রবীরকে। তার অনেকদিনের চেনা, হারিয়ে গিয়েছিল প্রবীর। সুমিতা কি বলতে যাচ্ছিল, হয়তো কুশল প্রশ্নই করতো। মামুলি দু-একটা কথা। সে দীর্ঘদিনের ব্যবধান আজ তাদের মধ্যে কি দুস্তর বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে।

আজ সে সামান্য কেরানীই রয়ে গেছে, ফাইল আর চিঠির স্তূপে চাপা পড়ে গেছে সেই সোনালি স্বপ্নমাখা দিন, মনের সুর; প্রবীর আজ পদস্থ অফিসার। মাঝখানে ওই কাচের দরজার ব্যবধান, ওটা অনেক কঠিন—।

দত্তসাহেব পরক্ষণেই বদলে গেছে। তার কালো লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমার আড়ালে সেই উজ্জ্বল চোখের চাহনি চকিতের মধ্যে বদলে যায়। কন্ঠস্বরে ক্ষণিকের জন্য একটু কোমলতাও এসেছিল, সেটা তার সাময়িক দুর্বলতা মাত্র।

কন্ঠস্বরও বদলে যায় দত্তসাহেবের।

—এ মাসের স্টেটমেন্ট পাঠানো হয়নি, হেড অপিস থেকে ট্রাঙ্ককল করেছিল। এটা তিনদিনের মধ্যেই কমপ্লিট করে দেবেন।

সুমিতার ক'দিন ধরে শরীর ভালো নেই। কাজও করতে পারছে না ঠিকমত। অফিস আসা যাওয়ার ধকলটাই বড় হয়ে উঠেছে সব থেকে। বেশ বুঝেছে সুমিতা মনের সেই জোর আর নেই। একদিন যার জন্য জীবনের অনেক সম্পদকে মুঠো মুঠো করে অপচয় করেছিল, অনেককিছুই মূল্য-হীন ভেবে পথের ধুলোতেই মাড়িয়ে এসেছিল, আজ সেই যৌবনের উন্দামতা সব ফুরিয়ে গেছে, ভাটার টানে শূন্য নদীর বুকে শুধু জেগে ওঠে থিকথিকে পলিকাদা আর ভেসে যাওয়া বিবর্ণ আবর্জনাগুলোই।

ওর জীবনেও এসেছে সেই রিক্ততার বেদনা। সেই দৈন্যটা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে হঠাৎ আজকের প্রবীর দত্তের সামনে এসে।

খস্ খস্ করে ফাইলে কি লিখে দত্তসাহেব ফাইলটা ওর সামনে ফেলে দিয়ে অন্য একটা ফাইল টেনে নিয়ে দেখতে থাকেন।

সুমিতার সামনে দুনিয়াটা কেমন কঠিন প্রাণহীন বলে বোধ হয়। ...এতদিন তবু কোথাও তার মনের অতলে একটা মধুর স্মৃতির আবেশ লেগেছিল, তার মত মেয়েদের কাছে ওইটাই বোধহয় একমাত্র সম্পদ—একদিন একজন তাকে ভালো বেসেছিল, তার দিক থেকেও হয়তো কোন দুর্বলতা ছিল।...

দুর্বলতা! আজ দীর্ঘদিনের ব্যবধানের কঠিন আবরণে সেটা পরিণত হয়েছিল উজ্জ্বল মুক্তাবিন্দুর প্রদীপ্ত আভা নিয়ে; তাকে ভালোবাসাই বলতো সে।

...ওসব কথা ভাববার সময় আজ নেই।...সব তার হারিয়ে গেছে কঠিন বাস্তবের আঘাতে। ফাইলটা তুলে নিয়ে একটা ছোট নমস্কার করে বের হয়ে এল, অবশ্য সেই নমস্কারকে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না দত্তসাহেব। এমন অনেক নমস্কার তার চারপাশে পড়ে থাকে।

এতক্ষণ পর সুমিতার মনে হয় সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। কয়েকটি মিনিট, তবু এই সামান্য সময়টুকু তার মনের অতলে একটা ঝড় তুলেছিল। চেয়ারে বসতেই ওপাশের রমাদি এগিয়ে আসে, টাইপ-টাইপমেশিন ছেড়ে নটবর দা টাকের ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে আসে, হরিপদবাবু বুড়ো ঝানু লোক—কৌটো খুলে সাবধানে একটি সাজা পান আলতো করে তুলে নীচের দিকে সামান্য একটু জরদার ছিটে মিশিয়ে মুখে পুরে এখানে এসে জমে।

—কি বললো সাহেব?

নটবর ফাইলটা দেখতে দেখতে বলে,

—বলেনি লিখে দিয়েছে। মেজাজ দ্যাখ না? প্লিজ কথাটাও লিখতে জানে না। হোয়াই ডিলে? এক্সপ্লেন! সাবমিট ইন থ্রি ডেজ। লে বাবা! এ গন্ধমাদন তিনদিনে হয়?

রমাদি বলে—তুই জানালি না কেন?

সুমিতা বলতে পারে না—ওর কথা সে শোনেনি। একটা কঠিন গাম্ভীর্যের মুখোশে নিজেকে সবকিছু থেকে ঢেকে রেখেছে সে। সরিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূরে ওই গজদন্ত মিনারের মধ্যে।

হরিপদবাবু বলেন—আবার কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছে। ঢের দেখা আছে।

দে না ঘড়ে বড়ে জড়িয়ে, তারপর কে কৈফিয়ৎ দেয় দেখা যাবে।

সুমিতার মাথা যেন ছিঁড়ে আসছে অসহ্য যন্ত্রণায়। তবু কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে আছে সে। কোন কথাই বলতে যাবে না—ওই কঠিন মানুষটির কাছে। বৈকালের আলো নামছে, জানলায় সামনে দেখা যায় ময়দানের গাছ-গাছালির মাথায় সেই আলোর আভা, ঘাসের বুকে মানুষগুলো আনাগোনা করছে। ক্রমশ ভিড় বাড়বে এইবার।

এমনি করে তারাও একদিন ওই ময়দানের সবুজে হারিয়ে যেতো, সেদিনের সুমিতাকে আজ ভুলে গেছে সে। তবু ময়দানের গোলমোহর গাছগুলোয় হলুদ ফুল ফোটে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে আসে আরক্তিম আবেশ।

গাছগুলো তখন এতবড় বোধহয় ছিল না, ওরাও ছিল তরুণ।...

...কঠিন দু'একটা ফাইল নিয়ে আলোচনা হতো ওই প্রবীরের সঙ্গে। প্রবীর সবে চাকরীতে ঢুকেছে। লেখাপড়া জানে। ফাইলের কয়েকটা পাতা উল্টে চট্ করে বুঝে নিতে পারতো ব্যাপারটা।

...লিখুন...

সুমিতা ঘাড় কাত করে লিখতো, জানলার ফাঁক দিয়ে তার একরাশ কোঁকড়ানো চুলে,—সুন্দর পুরন্ত গালে এসে পড়তো রোদের ঝকমকে আলো, মাঝে মাঝে পেন রেখে সে ডাগর কালো চোখ তুলে চাইতো তরুণ প্রবীরের দিকে।...কি পয়েন্ট ভাবছে প্রবীর; তার সামনে আইনের সব ফাঁক-গুলো অতি স্পষ্টভাবে চোখে পড়তো।

...হাসতো সুমিতা।

—তোমার নজর খুব তীক্ষ্ম?

চমকে উঠতো প্রবীর—মানে!...

ওর মনের কোণে কোথায় একটা সুর উঠতো। এখানে এসে ওই মেয়েটিকে তার ভালো লেগে যায়, এ ভালো লাগাটা আকস্মিক নয়, তিলে তিলে প্রতিদিনের মেলামেশার মধ্যে সুমিতার মাধুর্যকে অনুভব করেছে প্রবীর।

মেস আর অপিস। তার জীবন এই একঘেয়েমির মধ্যেই সীমিত। এতদিন পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বাড়ি কোন দূরে মফস্বলে। সে বাড়ির জন্যও তার কোন আকর্ষণ নেই। ছেলেবেলাতেই মাকে হারিয়েছিল, বাবাও তারপর বিয়ে থা করেছেন। তিনি সেই নতুন সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তার জন্য ছেলের দিকে চাইবার সময়ও তার ছিল না। মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাতেন, সেও সামান্য। প্রবীর নিজেই টুশানি করে খেটে পড়াশোনা করেছিল, কৃতী ছাত্রও ছিল তাই এখানে পরীক্ষা দিয়ে চাকরীটা পায়।

এতদিন জীবনের কাঠিন্য তার মানুষের মনে স্বার্থপর দিকটাকেই দেখেছিল সে শূন্য জীবনে। বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। মেসেই থাকে, আর মাঝে মাঝে বাবার অভাবের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ চিঠিগুলো আসে—শেষের লাইনটায় কি লেখা থাকে তা জানে প্রবীর। কিছু টাকা পাঠাও। ওইটাই তার কাছে মূলকথা হয়ে উঠেছে। ওইটুকু ছাড়া মানুষের মাঝে আর

কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা জানতো না।

হঠাৎ এমনি দিনে সে দেখেছিল ওই সুমিতাকে। তার জীবনের সেই ধারণা আর চিন্তাগুলো কেমন ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগলো।

...অপিসের পর দুজনে কোন কোনদিন বেড়া হতো ওই ময়দানের দিকে। সুমিতা আর সে। সুমিতার কলকণ্ঠে সুর ওঠে—ও যেন মুক্ত বিহঙ্গের মতই প্রাণময়।

দেওদার গাছে এসেছে নতুন পাতার সমারোহ, মেঘমুক্ত আকাশের বুকে ছেঁড়া মেঘের ভেলায় রঙীন পাল উঠেছে। প্রবীর জানতো না জীবনের কোন কোণে এত মাধুর্য লুকানো আছে।

প্রবীর বলতো,

—এবার পার্ট ওয়ান পরীক্ষাটা দেব, তুমিও পড়াশোনা করো।

হাসতো সুমিতা, হাসলে ওর নিটোল গালে দুটো টোল ফুটে ওঠে, চোখের কালো তারায় ঝিলিক তোলে সেই হাসির আভা, শোনায় সে,

—দিনরাত তোমার ওই পড়া, পরীক্ষা আর আইনের বই নিয়েই কাটে বুঝি?

প্রবীর একটু থেমে যায়। সুমিতারা এমনিই, জীবনের আসল প্রয়োজনের দিকে ওদের নজর নেই, প্রজাপতির মত রঙীন পাখনা মেলে হাওয়ায় ভর করে ওরা উড়ে উড়েই খুশী থাকে। কঠিন নগ্ন অভাবকে হয়তো দেখেনি। প্রবীরের কাছে মেয়েদের এই দিকটার খবরও ঠিক জানা ছিল না। তবু বলে সে,

—এটারও তো দরকার আছে সুমিতা, বাঁচতে গেলে এও চাই।

—ছাই! ওই শুকনো বই আর আইন নিয়ে ডুবে থাকো তুমি।

দিনের সেই স্বল্প রঙীন মুহূর্তগুলো ধীরে ধীরে আঁধারে হারিয়ে যায়। সন্ধ্যা নামে। ইডেনের দেওদার গাছে ফিরে এসেছে ঘরছাড়া পাখিগুলো। আকাশে ফুটে ওঠে দু'একটা ভীরু সন্ধ্যা তারার চাহনি।

সুমিতাও তেমনি বিস্মৃতির আঁধারে হারিয়ে যেতে চায়। ভুলে যেতে চায় তার বাড়ির কথা। সেই অন্ধকার একতলা বাড়ির এঁদো দুখানা ঘরে তার বিধবা মা ভাই-বোনদের কথা। প্রবীরকে কেন্দ্র করে তার মনের অতলে একটি মিষ্টি সুর ওঠে, রঙীন কল্পনার ছবি আঁকে তার এতদিনের নিঃসঙ্গ মন।

খবরটা হাওয়ায় ভেসে আসে অফিসে। ওরা যেন তাদের দিকে ওৎ পেতে বসেছিল। দু-একজনের মুখে চোখে কৌতুকের হাসি।

রমাদিও শুনেছে ওদের দুজনের নামে দু-একটা চাপা ফিসফাস কথা। বুলো সেনকে ওরা সবাই এড়িয়ে থাকতো। বুলডগের মত চেহারা, গোলগাল মুখ। রিটায়ারিং রুমে সেদিন ঢুকেছে সুমিতা। বুলোদি ভারি গলায় বলে।

—এসব কি শুনছি সুমিতা। একজন মেয়ের সম্বন্ধে এইসব কথা উঠলে ওরা ভাববে আমরা সবাই তেমনিই।

বুলোদির বিয়ে হয়নি। বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। সারাদেহের বিশাল আয়তন, তবু সাজ-পোষাকের বাহার তার কমেনি।

অবসর পেলেই ব্যাগ থেকে উল বের করে বুনতে থাকে। মেয়েরা বলে বুলোদির একটা সোয়েটারে তিনগুণ উল বেশী লাগে কিনা, তাই একটা বানাতেই কেটে যায় সারা বছর।

এমনি কর্কশ কথাবার্তা।

সুমিতা চুপ করে থাকে। বুলোদি বলে,

—ওই প্রবীর যদি তোমাকে বিরক্ত করে বলো—ওকে ঠাণ্ডা করে দোব। বুলোদিকে সেও ভয় করে। এর আগে ছেলেদের সঙ্গে একাধিকবার সে ঝগড়া করেছে। প্রবীরকেও হয়ত কড়া কথাই শোনাতে পারে, অপমানও করতে পারে।

কি লজ্জার কথা হবে তাহলে ভাবতেও পারে না সুমিতা। তাই বলে—না, না। ও আমায় বিরক্ত করবে কেন?

বুলোদি বলে—ঠিক আছে। বুঝলে, মেয়েদের নৈতিক চরিত্রই আসল কথা।

বুলোদি উঠে বের হয়ে যায়। সুমিতা চুপ করে কি ভাবছে। এ নিয়ে এমনি অপমান সইতে হবে তা ভাবে নি সে। প্রবীরকেও সে এইসব জঘন্য নীচতার মধ্যে নামিয়েছে।

কথাটা ভাবতেও ভালো লাগে। ওদের দুজনের মধ্যে কোথায় একটা নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠছে তাই বোধহয় তার চরম পাওয়াকে হিংসা করে ওরা।

—সুমি!

...রমাদির ডাকে ফিরে চাইল সে। রমাদি বিবাহিতা, ছেলেপুলে আছে, স্বামীকেও দেখেছে সুমিতা। রমাদি জীবনে সুখী হয়েছে। তাই বোধহয় ওর ব্যবহারে সেই মাধুর্য ফুটে ওঠে। রমাদির দিকে চাইল সুমিতা। রমাদি বলে,

—যদি আপত্তি না থাকে ঘরই বাঁধ তোরা।

সুমিতা চমকে ওঠে। তার মনের অতলে কোথায় যেন অন্য স্বপ্ন রয়ে গেছে। ...সে তো ভালবাসতে চায়নি ওই প্রবীরকে, ভালোবেসেছিল অন্যজনকে, আজও তার পথ চেয়েই আছে। প্রবীরের মধ্যে সেই দূরের মানুষটির ছবিই যেন দেখেছিল সে। তাই মিশেছিল তার একক-নিঃসঙ্গ জীবনের দৈন্যকে ক্ষণিকের জন্য ভুলতে।

কিন্তু জড়িয়ে পড়তে সে চায় নি। আজও চায় না। সেই কথাটাই যেন মনে পড়ে রমাদির কথায়। চন্দনকে সে ভোলেনি, তাকেই একান্তে চেয়েছিল সে, আজও তার পথ চেয়েই আছে সুমিতা।

চন্দন ফিরবে বোম্বে থেকে।

নিজের অজানতেই মস্ত ভুল করে চলেছে সুমিতা। সেই কথাটাই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ওই রমাদি। শিউরে ওঠে সুমিতা,

—না, না। তা হয় না রমাদি। এসব তেমন কিছুই নয়, বিশ্বাস করো তুমি!

রমাদিও অবাক হয়েছিল। বোধ হয় বিরক্তও হয়েছিল। তবু স্থির কণ্ঠে বলে সে, তাই বুঝি।

সুমিতা নিজেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল ওই প্রবীরের কাছ থেকে। প্রথম আবিষ্কার করে সুমিতা—তার অজানতেই বেশ কিছুদূর সে এগিয়ে গেছে। তাই বিকেলের সেই দেখা করার অভ্যাসটাকে ছাড়তে তার কষ্ট হয় রীতিমত। ছুটির পর দেখেছে প্রবীর দাঁড়িয়ে আছে ওপাশের গেটে, জোর করে নিজেকে ওই মেয়েদের ভিড়ে মিশিয়ে সে বাইরে নিয়ে যায়, নিজেরও কষ্ট বোধহয় সুমিতার।

এই লুকোচুরি খেলাটা প্রবীরেরও অসহ্য মনে হয়। তাই সেদিন কার্জন পার্কে ওকে একলা দেখে এগিয়ে যায়।

—সুমিতা!

ও যেন পাখির কাছে মুক্ত আকাশের আহ্বান। চকিতের জন্য চমকে ওঠে সুমিতা। এ খেলায় সে মাতবে না। সাড়া দেবে না ওর ডাকে। এর মধ্যে কয়েকদিনই প্রবীর কাজে অকাজে তার সেকশনে এসেছে, কথা বলার চেষ্টা করেছে, এড়িয়ে গেছে সুমিতা।

—সুমি!

প্রবীরকে এড়াতে তবু পারে নি সে। চুপ করে এগিয়ে এসেছে তার সঙ্গে।

প্রবীরের কাছ থেকে এই কথা শুনবে আশা করে নি সে। রমাদি কিন্তু এমনি একটা আভাস তাকে দিয়েছিল। সে কথায় সায় দিতে পারে নি সে। তার মন অন্য কাউকে তখনও অনুসন্ধান করছে, চন্দনের পথ চেয়ে আছে।

বোম্বেতে পড়ছে এম এস-সি (টেক)। যাবার আগে কথা দিয়েছিল সুমিতা সে তার পথ চেয়ে থাকবে। নামকরা কৃতী ছাত্র চন্দন, তার তুলনায় প্রবীর তেমন কিছুই নয়। অতি সাধারণ একজন কেরানী মাত্র।

সন্ধ্যা নামছে গাছ-গাছালির মাথায়, ময়দানের বুকে ধোঁয়ার জমাট আস্তরণ, সব ভাবনাগুলো অমনি অস্পষ্টতার অতলে তলিয়ে যায়। প্রবীর বলে—ঘর বাঁধতে দোষ কি সুমিতা। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

সুমিতা জবাব দেয় নি। কয়েকমাসের পরিচয় নিয়ে এমনি একটা পরিণতির কল্পনা সে করেনি। সুমিতা ওর দিকে চাইল। প্রবীরের মুখে-চোখে কি ব্যাকুলতা। জীবনে কিছুই পাই নি। আজ সব পেতে চাই সুমিতা। তোমার কাছে তাই এই কথা বলেছি আজ।

...কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে সুমিতা। এতক্ষণ কাগজপত্রের মধ্যে ডুবেছিল। সুমিতা, জরুরী সেই স্টেটমেন্ট নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল, কোন কথাই মনে রাখেনি। অপিসের আবহাওয়াও গরম। কিছুদিন আগে স্ট্রাইক হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষও সুযোগ খুঁজছেন কি করে বেয়াড়া কর্মচারীদের শায়েস্তা করা যায়। সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্যও মার্জনা নেই। সুমিতাও বিপদে পড়েছে। এই ছন্নছাড়া

জীবনের অন্ধকারের মাঝে অতীতের সেই ক্ষণিক দেখা আলোটুকুর কথাই ভাবে সেই কারণেই। আজ সব তার হারিয়ে গেছে, যে কাজ, যে জীবন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল, সেই জীবনই প্যাকে প্যাকে তাকে জড়িয়েছে। আজ সে একাই।

জুতোর শব্দে মুখ তুলে চাইল, দেখে অফিসার প্রবীর দত্ত চেম্বার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে। সারা অপিস প্রায় ফাঁকা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যা। এখনও তার কাজ অনেক বাকী।

আজ প্রবীর দত্ত তার দিকে ফিরেও চাইল না। বোধহয় ওকে সে চেনে না।

শীতের সন্ধ্যা নেমেছে। এমনি এক সন্ধ্যায় ময়দানের সেই তারাজ্বলা আকাশের নীচে যে প্রবীর দত্তকে দেখেছিল ও আজ সে নয়।

বদলে গেছে সুমিতাও।

—এখনও বাড়ি যাস্ নি?

রমাদি ওকে দেখে এগিয়ে আসে। দুজনে বাস রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

আজ অপিসে ওই দত্তসাহেবের গর্জন সেও শুনেছে। রমাদির মাথার চুলে পাক ধরেছে। দীর্ঘ কুড়িটা বছর পার হয়ে গেছে তারও এই অপিসেই। বসন্ত শেষ হয়ে গেছে এবার এসেছে গ্রীষ্মের নিঃস্বতা। সুমিতা জবাব দেয়,

—এই যাচ্ছি। ক'দিন খুব কাজ পড়েছে।

রমাদি বলে—প্রবীর দত্তকে তো আগে চিনতিস, বল না অন্য কোন হাল্কা কাজের জায়গায় বদলি করে দিক্!

সুমিতা জবাব দিল না। একটু হাসল মাত্র।

ওর বাসা এসে গেছে। সুমিতা উঠে পড়ল। রমাদির এই কথাগুলো যেন এড়াতে চেয়েছিল সে।

অতীতের সেই কথাগুলো ওদের কাউকে জানায় নি সুমিতা। জানাতে পারেনি। চায়ও নি। ও তার একান্ত নিজের জীবনের ব্যর্থতাই হয়ে থাক।

অনেক ভুলের মাঝেও সে আর একটা ভুল, অনেক শূন্যতার বেদনার মাঝে সেটা আর একটু করুণ অনুভূতি মাত্র। চন্দন ছিল তার কাছে বড়। তাই বোধহয় সেদিন প্রবীর দত্তের ডাকে সে সাড়া দিতে পারেনি।

চন্দন পুণায় ভালো চাকরী পেয়েছে। চিঠিও দিয়েছিল তাকে। সুমিতার মনের স্বপ্নে পাহাড়ঘেরা একটি দূর শহরের বন্দর। বহু পথ পেরিয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতের একটি শৈল-শহর, ছোট্ট নদীটা বয়ে গেছে শহর নীচে দিয়ে। ছায়ানীল পাহাড়ের শীর্ষে ভবানীমন্দির, তারই নীচে সবুজ ঘাসঘেরা একটি বাংলো। এই কাজ, এই গ্লানি কলকাতার দশটা পাঁচটার দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে সে। চলে যাবে দূরে—তারই প্রতীক্ষা করেছিল যেন।

প্রবীরের ডাক শোনার অবকাশ, মানসিক প্রস্তুতি তার ছিল না।

প্রবীরকে তাই জানিয়েছিল সেদিন—ওটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চমকে উঠেছিল প্রবীর। রাতের অন্ধকারে কোথায় একটা পাখি আর্তনাদ করে উঠেছিল বাগানের দেওদার গাছের মাথায়, তারাগুলোর দীপ্তি ম্লান হয়ে এসেছিল। সুমিতা কি যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রবীর তা শোনেনি। ওর মুখেচোখে কি বেদনা আর অপমানের কালো ছায়া! উঠে চলে গিয়েছিল সে।

ওকথা আর কাউকে জানায় নি সুমিতা। নিজের মনেই সেদিন হেসেছিল—চন্দনের তুলনায় ওই প্রবীর দত্ত অনেক শস্তা। ও শুধু আইনের বই, ফান্ডামেন্টাল রুল নিয়েই দুনিয়াকে ভরিয়ে রেখেছে। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার ছবি কল্পনা করে মনে মনে হেসেছিল সুমিতা। ছেলেরাই অমনি, দুদিন মিশলেই অনেক কিছু ভেবে নেয়।

বাসটা ময়দানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। রাতের ঠান্ডা হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। গাছের মাথায় জমাট কুয়াশায় সাদা ধোঁয়াটে আস্তরণ। দূরে দূরে নিঃসঙ্গ দু' একটা আলো জ্বলছে। সেগুলো ম্লান জ্যোতিহীন—বিবর্ণ—নিষ্প্রভ।

কতগুলো বছর কেটে গেছে, জীবনের চারিপাশের সব শ্যাম সবুজ মুছে গেছে, ব্যর্থ হয়ে গেছে স্বপ্ন দেখা। সুমিতা হেরে গেছে; হারিয়ে গেছে তার সবকিছু।

চন্দনকে মিথ্যাই বিশ্বাস করেছিল সে। পুণায় চাকরী পেয়ে সেখানেই কোন এক অধ্যাপিকাকে বিয়ে করে বসবাস করছে। বাংলাদেশে আর ফেরেনি।

প্রবীর দত্ত সেদিন জুনিয়ার অফিসার হয়ে বদলি হয়ে গেছে। জব্বলপুরে।

কালো আঁধার করা গাছগুলো ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন রেড রোডের ধারে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক জীবনের অনেক হাসি-কান্নার সুর শুনেছে।

অপিস, স্টেটমেন্ট ফাইলের স্তূপ, দশটায় হাজিরা দিতে না পারলে লাল-কালির ঢ্যাঁড়া—এই নিয়েই সুমিতার জীবন।

নিজের বলতে কিছুই নেই। একদিন অনেক কিছু চেয়েছিল—স্বপ্নও দেখেছিল। তাই বোধহয় ভুল করেছে, ভুলের পর ভুল। আর ঠকেছে।

হঠাৎ চোখ পড়ে ওপাশের সিটে দুজন ছেলে-মেয়ের দিকে। হাসছে মেয়েটি, দু-চোখে তার কি স্বপ্ন আর কামনা, একটা নিটোল হাত রেখেছে ছেলেটির হাতে।

সুমিতা চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঠান্ডা কনকনে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে, বাইরে আঁধার-জমাট শূন্যতা, তার জীবন এমনি শূন্য, এমনি বেদনাময়, নিঃসহায় বিবর্ণ। দিনগুলো হারিয়ে গেল, সব যৌবনের দিন; স্বপ্ন দেখার বেলা।

মিষ্টি হাসির শব্দ উঠছে—ছেলেটি হাসছে। মেয়েটির দুচোখে তারই আভা।

ওই যৌবনের দিন—সেই তরুণ একটি কামনা-ব্যাকুল মন আজ হারিয়ে গেছে, তবু বেঁচে আছে সে সেই বিবর্ণ স্মৃতিমুখর ঝরাপাতার ব্যর্থ সঞ্চয় কুড়িয়ে।

যৌবন মরেনি, সুমিতাই সেই সব-পাওয়ার জীবন থেকে নিদারুণ বেদনা নিয়ে নির্বাসিত হয়েছে।

বাসটা নিষ্করুণ আঁধারের বুকে ছুটে চলেছে। তার অভ্যস্ত পথে যান্ত্রিক শক্তিতে। মানুষও তবু অমনি অর্থহীন ভাবে চলে, শুধু ধুঁকে ধুঁকে চলে অন্ত-হীন সেই বন্ধুর পথ বেয়ে।

সুমিতাও তাই চলেছে—লক্ষ্যপথ তার সামনে নেই। জানাও নেই। প্রবীর দত্ত অনেকদিন আগে বিয়ে-থা করেছে, ঘর-সংসার পেতেছে। হয়তো সুখীও হয়েছে তার বিবাহিত জীবনে।

দেশে বিদেশে

চীন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা ?

ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেসব কথা বলেছেন সেগুলিতে একটা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালে ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্যের কতকগুলি স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে এখন অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। তিনি এতখানি আশাবাদী যে, আগামী ১লা এপ্রিল থেকে চতুর্থ পরিকল্পনা চালু হবে বলে তিনি ভরসা দিয়েছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে, পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের প্রশ্নটির 'মোটামুটি' মীমাংসা হয়ে গেছে।

শ্রীমতী গান্ধী এই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন এমন এক সময়ে যখন তাঁর মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে অনেককিছু কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনের সঙ্গে তাঁর বনিবনার অভাবের কথাটা মধ্যে মধ্যেই চালু ছিল। এ রকমও একটা জল্পনা রয়েছে যে, দলাদলির দরুন প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শূন্য পদগুলি (শ্রী এম সি চাগলা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে ও শ্রীঅশোক মেহতা পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এবং ইস্পাতমন্ত্রী শ্রীচেন্না রেড্ডির নির্বাচন আদালতের রায়ে বাতিল হয়ে গেছে) পূরণ করতে পারছেন না।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে গভীর আস্থা ও সামনের কর্তব্য সম্পর্কে যে স্পষ্ট চিন্তা প্রকাশ করেছেন সেটা লক্ষণীয়।

চীন-ভারত সম্পর্কের প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি যে বিতর্কমূলক অভিমত দিয়েছেন তার মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাস ও চিন্তার স্বচ্ছতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, এখন যতই অসুবিধা থাক, চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ মীমাংসার একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয় মর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চীনের সঙ্গে একটা সংলাপ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের উপর চীনা হামলার কথা মনে করিয়ে দিলে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, অতীতকে আমরা নিশ্চয়ই ভুলতে পারি না, কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করার একটা পথ খুঁজে পেতেই হবে।

শ্রীমতী গান্ধীর কথা থেকে জানা যায়, চীনের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষ চীনকে কোন প্রস্তাব দেয়নি এবং এ বিষয়ে চীনের সাড়া দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি মানেন যে, ভারত-চীন মোকাবেলার সঙ্গে যে বিষয়টির সম্পর্ক রয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবী সম্পর্কে এই দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গী। চীন একটা প্রচণ্ড ভারত-বিরোধী প্রচার অভিযান চালাচ্ছে এবং পৃথিবীটাকে চীন যেভাবে দেখছে ভারত মোটেই সেভাবে দেখছে না। আজকের দিনে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই হয়ত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা মীমাংসা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

সাংবাদিকদের জেরার উত্তরে তিনি এমনও ইঙ্গিত দেন যে, চীনের সঙ্গে সংলাপ আরম্ভ করার জন্য ভারত-কলম্বো প্রস্তাবের উপর জোর না দিতে পারে।

ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আর একটি প্রতিবেশী দেশ পাকিস্থান, তার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিষয়েও প্রধানমন্ত্রী প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন। ভারতের যুদ্ধবর্জন প্রস্তাবের উত্তরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব যে সর্ত দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে মন্তব্য করতে বলা হল তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ নিজে পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধবর্জন চুক্তি করতে আগ্রহী; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা আগে করে নিতে হবে একথা বললে যুদ্ধ-বর্জন চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, যা করা যেতে পারে সেটা হল, যুদ্ধবর্জন চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য যে-কোন স্তরে একটা দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

যদিও দুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অধিকতর স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সুস্পষ্ট কোন প্রস্তাব দেন নি তাহলেও তাঁর এই আগ্রহ সারা দেশের মানুষ লক্ষ্য করেছেন—এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে যতটুকু বোঝা যায়, এই আগ্রহ জনমতের অনেকখানি সমর্থন লাভ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর অভিমতের উপর মন্তব্য করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছেন :—

"নয়াদিল্লী যদি চীন সম্পর্কে তার মনোভাব নুতন করে বিবেচনা করতে চায়—সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে তাই মনে হচ্ছে—তাহলে সেটা বর্তমান দুনিয়ার হালচালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণই হবে। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হলে সেটা ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলও হবে। পৃথিবীর কোন দেশই চিরকাল প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক রাখতে চায় না—ভারতবর্ষ ত নয়ই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, উভয় পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া না গেলে তাতে কাজ সামান্যই হবে।"

"হিন্দুস্থান টাইমস"-এ লেখা হয়েছে: "শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছেন যে, পরলোকগত নেহরুর যুদ্ধবর্জন প্রস্তাবের জবাবে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব এবার যেমন যুক্তিযুক্ত ও মাপা সাড়া দিয়েছেন ইতিপূর্বে আর কখনও তেমন দেন নি এবং শ্রীমতী গান্ধীর উচিত হবে, আয়ুবের এই সাড়ার ভিত্তিতে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। এতে ভারতের হারাবার কিছু নেই, লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ...প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে যে সম্ভাব্য নুতন পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটা অনুসরণ করা উচিত।...... চীন সম্পর্কে নুতন পথের কথা শ্রীমতী গান্ধী যেভাবে পুনরায় বিবৃত করেছেন সেটা যেমন স্পষ্ট তেমনি সঠিক।...চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি হবে সেটা একটা বৃহত্তর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সঙ্গে মীমাংসার ব্যাপারটি চিরকালের জন্যও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকলে, আমাদের কূটনীতির উপর দুর্ভাগ্যজনক চাপ পড়বে। দুটি সম্পর্কিত হলেও পৃথক এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নমনীয়তার মিশ্রণ ঘটান সম্ভব হওয়া উচিত।"

"প্যাট্রিয়ট" পত্রিকায় ভিন্ন সুর গেয়ে বলা হয়েছে, "ভারত-চীন আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করার সপক্ষে যে প্রচার চালান হচ্ছে তার একটি সুবিধাজনক বক্তব্য হল, সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্থানকে সাহায্য দিচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে বলেই ভারত-চীন আলোচনা আরম্ভ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যুক্তিটা যেন এই ধরণের : রাশিয়া যখন পাকিস্থানের সঙ্গে ক্রমেই বেশী বন্ধুভাবাপন্ন হচ্ছে তখন এই বিপদের প্রতিবিধান আমরা করতে পারি চীনের সঙ্গে আমাদের দুয়ার খুলে দিয়ে। আমাদের এ রকম একটা নীতি অবলম্বন করা চূড়ান্ত মূর্খতা হবে এবং এতে করে আমরা এ যাবৎ যেসব নীতির উপর আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে দাঁড় করিয়েছি সেগুলি নস্যাৎ হয়ে যাবে।...চীন বা পাকিস্থানের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক কি হবে সেটা তাদের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্কের উপর নির্ভর করবে না। এই সম্পর্ক নির্ভর করবে চীন বা পাকিস্থান এই দেশের প্রতি কি আচরণ করে তার উপর। উভয় দেশই ভারতের অংশ দখল করে আছে এবং আমাদের দেশের বৃহত্তর অংশের উপর ক্রমাগত দাবী জানিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ তারা তা করতে থাকবে ততক্ষণ স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার অনিবার্য পরিণতি হবে লজ্জাকর ও বিপজ্জনক তোষণ। অন্য পক্ষে যে অবধি নিজেদের গায়ের জোর ফলাতে থাকবে সে অবধি আমরা নমনীয় হতে পারি না।"

"ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" পত্রিকা লিখেছেন, "পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে বিশেষ করে চীন ও পাকিস্থানের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুপ্রতিবেশীর নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।...(কেননা, চীন ও

পাকিস্থান) প্রত্যেকেই সামরিক প্রতিরক্ষায় খবে ভয়ঙ্কর রকমের বেশী অর্থ ব্য করছে। তাদের নিজেদের মধ্যে প্রকৃষ্টতর বোঝাপড়া থাকলে এই টাকাটা অধিকতর কার্যকরভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগান যেত। আর কোন কারণে না হলেও এই কারণে ঐ তিন দেশের মধ্যে একটা বোঝাপড়া বাঞ্ছনীয় ও অনেক আগেই এই বোঝাপড়া হওয়া উচিত ছিল।"

পশ্চিম এশিয়া

গত ২৮ ডিসেম্বর রাত্রে কয়েকজন ইস্রায়েলী গেরিলা হানাদার একটি হেলিকপ্টারে করে এসে বেইরুটের আন্ত-র্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে লেবাননের ১৩টি অসামরিক বিমান ধংস করে দিয়েছে। এই একটি হানাদারির ফলে লেবাননের বলতে গেলে সমগ্র অসামরিক বিমানবহর নষ্ট হয়ে গেছে। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ঘটনা পশ্চিম এশিয়ায় নূতন উত্তেজনা এনেছে।

ঘটনাটি শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অভূত-পূর্ব। যুদ্ধের মধ্যে নয়, নিছক গেরিলা আক্রমণের দ্বারা এতবড় একটা ক্ষতি করে দেওয়ার নজীর আর নেই। আরও বিস্ময়কর ঘটনা হল এই যে, সরকারীভাবে ইস্রায়েল এই হানাদারির দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। তার কৈফিয়ৎ হচ্ছে, কয়েকদিন আগে এথেন্সের বিমানবন্দরে আরব গেরিলারা ইস্রায়েলের "এল অল" এয়ারওয়েজের এক-খানি বিমানে চড়াও হয়েছিল এবং গত জুলাই মাসে আরব গেরিলারা একটি যাত্রীবাহী ইস্রায়েলী বিমানকে পিস্তলের মুখে আলজেরিয়াতে নামতে বাধ্য করেছিল, বেইরুতের হানা ঐ সব ঘটনারই প্রতিশোধ।

লেবানন এই ঘটনা সম্পর্কে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে স্বস্তি পরিষদে যে নালিশ করেছিল সেটা বিবেচনা করে স্বস্তি পরিষদ ইস্রায়েলের কাজের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই প্রথম রাষ্ট্র হিসাবে ইস্রায়েলের আচরণের নিন্দা করে রাষ্ট্রসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েল এই ধরনের আচরণ করতে থাকলে স্বস্তি পরিষদ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবে-চনা করবেন। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে, বেইরুতের ঘটনার জন্য লেবানন ইস্রায়েলের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে।

কিন্তু স্বস্তি পরিষদের এই ধরণের কাগুজে প্রস্তাবে ইস্রায়েল সিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংগে সংগেই ইস্রায়েলের প্রতিনিধি বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই প্রস্তাব মানবেন না। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব উপেক্ষা করে ইস্রায়েল তার অধিকৃত আরবভূমির উপর অনড় হয়ে বসে আছে। জর্ডন ও মিশরের ভিতরে সে হানাদারি চালিয়ে যাচ্ছে। বেইরুতের ঘটনায় হয়ত তার মুরুব্বীরা কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে থাকবে; কিন্তু মুরুব্বী-দের সমর্থন সে সম্পূর্ণ হারিয়েছে এমন মনে করার কারণ নেই। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, বেইরুতের ঘটনার ঠিক অব্যবহিত আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইস্রায়েলকে পঞ্চাশটি ফ্যান্টম জেটবিমান দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেই ঘটনার পরও এই সিদ্ধান্তের কোন বদল হয় নি।

অন্যদিকে, আরব তরফের মুরুব্বী সোভিয়েট রাশিয়ার মুশকিল এই যে, তার পক্ষে আরব দেশগুলিকে সংযত রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। আবার একটা পুরোদস্তুর আরব-ইস্রায়েল লড়াইয়ে নিজেকে জড়িত করা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে যেমন অসুবিধাজনক তেমনি অসুবিধাজনক তার পক্ষে আরব দেশগুলিকে একথা বোঝান যে, সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানই শ্রেয়।

সম্ভবত এই উভয়সংকটের দরুনই সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট মোচনের একটা রাস্তা বার করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে ইতিমধ্যে কিছু কিছু গোপন সলাপরামর্শ চলছে।

দক্ষের ফুর্মা

শাদা চোখে
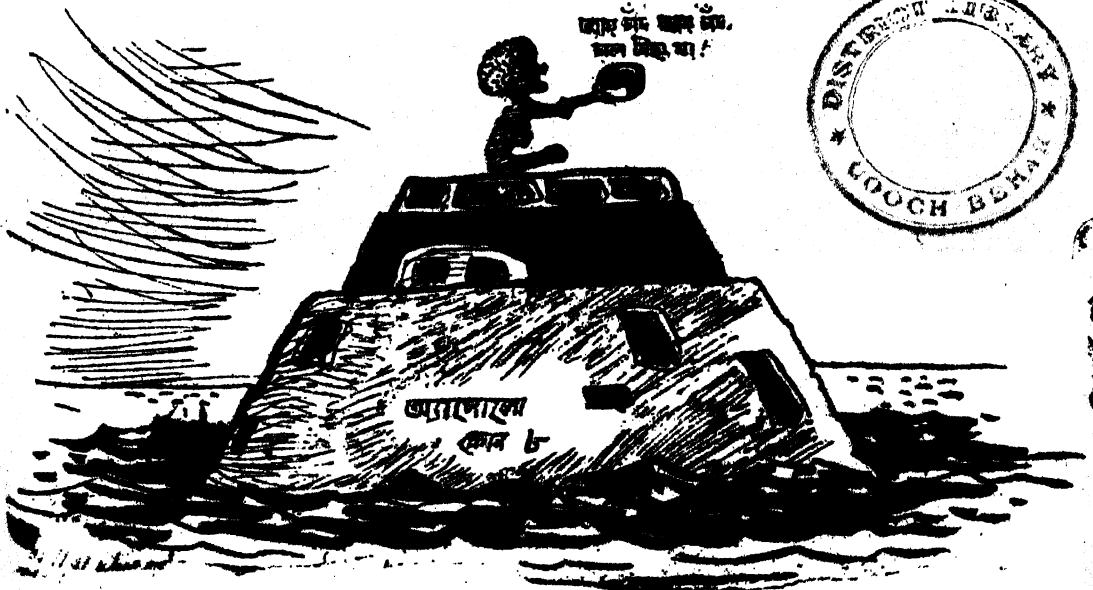
ট্রামে বাসে, অফিসে আদালতে বিশেষ করে সধূমে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটি আলোচনায় আম-জনতাকে খুব মাতামাতি করতে দেখা যায়। বিষয়বস্তু : মধ্যবর্তী নির্বাচনের টেম্পো এখন যা ওঠা উচিত ছিল তা মোটেই দেখা যাচ্ছে না, উদ্দেশ্য : নির্বাচনে জনসাধারণের নিস্পৃহ ভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আর একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে আলোচনাকারীরা এককথায় প্রমাণ করতে চাইছেন যে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি মানুষের আস্থা নেই। কাজেই নির্বাচনের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। আর আস্থা থেকেই বা লাভ কি? যতই নির্বাচন হোক না কেন, কিম্বা যে কোন দলই বাংলার মসনদে আসীন হন না কেন, তাঁদের দুঃখদুর্দশা ঠিক পূর্বাপর একই থাকবে। পরিবর্তন আসবে না।

এ সমস্ত মন্তব্য যত্রতত্র শুনতে পাবেন। তবে এ থেকে কোন সিরিয়াস সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অবসর বিনোদনের জন্য সকলেই একটা কিছু নিয়ে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে চান। কাজেই নির্বাচনের কথাটাই এখন প্রাধান্য পেয়েছে। আর টেম্পো ওঠেনি বলে যাঁরা প্রায়শই মন্তব্য করে যাচ্ছেন তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারছেন না যে টেম্পো উঠেছে বলেই এরকম সরব, সরস আলোচনায় তাঁরা মত্ত হয়ে উঠেছেন। শাকসব্জীর কিম্বা চালের দাম কমেছে বলে কেউ কি জোর আলোচনা করছেন, যদিও বা শুরু করেন তবে শেষ পর্যন্ত সেই হিসেব-নিকেশ মোড় ঘুরে রাজনীতির চত্বরে এসে নামে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম পড়ার মূলেও রয়েছে নির্বাচনের রাজনীতি, এই যে অর্থনীতির গোড়ার কথা পর্যালোচনা করে রাজনীতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার মানসিক প্রবণতা, এটাও নিঃসন্দেহে নির্বাচনের টেম্পো উঠেছে বলেই প্রায়শ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

তবে এই আলোচনা থেকে একটা বক্তব্য পরিস্কার অনুধাবন করা যায়। সেটা হচ্ছে টেম্পো বলতে আমাদের মনে কোন সঠিক ধারণা নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে টেম্পো বলতে সাধারণত অহর্নিশ দুস্ত মিছিলে "ভোট দিন, ভোট চাই" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সদর্প পদচারণা, অলিতে গলিতে রং বেরঙের পোস্টার, দেওয়ালে দেওয়ালে অনুলেখন, পোস্টারের চাঁদমালা আর সর্বোপরি সর্বত্র এই মারি কি সেই মারি ভাব। অর্থাৎ টেম্পো বলতে তুরীয় বা তুষ্ণীম্ভাব নয়। কোলকাতার মানুষ হয়ত আরও বোঝে যে মিছিলে মিছিলে যতক্ষণ না রাজপথ অচল হয়ে যাবে ততক্ষণ টেম্পো শব্দর আভিধানিক অর্থ নিরর্থই থাকবে।

টেম্পো বলতে এইরকম একটি জঙ্গী মনোভাবের উল্লেখ হওয়ার মূলে অবশ্য আরও কারণ আছে। পশ্চিমবাংলায় যখনি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার আগে এই রাজ্যে আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেছে। পুলিশের গুলিতে লোক প্রাণ হারিয়েছে, আর বাংলা বন্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ধরনের নির্বাচনপূর্ব পরিস্থিতি যখন সাধারণের স্মরণে আসে তখনই দ্রুত মূল্যায়ন করে জনতা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতি দাঁড়ায়, নির্বাচনে টেম্পো এবার ওঠেনি। অবশ্য এঁরা কেউ ভগবানের ভগ্নাংশ নন। কাজেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কথাও নয়। আবার অন্য যুক্তিও শোনা যায়। যেমন মধ্যবর্তী নির্বাচন বলেই নাকি আম-জনতা অত উৎসাহভরে নির্বাচনী স্রোতে গা ভাসাচ্ছেন না। বক্তব্য : কোন রাজনৈতিক দলই নাকি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। ফল : রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আবার পশ্চিমবাংলার বুকে তার অশুভ ছায়া নিয়ে নেমে আসবে। অনিবার্য পরিণতি : পুনরায় গভর্নর শাসন এবং ১৯৭২ সালে সাধারণ নির্বাচন। অতএব, মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? শুধু পণ্ডশ্রম ও অর্থবিনাশ।

অবশ্য এ ধারণাও অনেকের মনে আছে যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যদি কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে তবে গোটা ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গেই আবার পশ্চিমবাংলাতেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই চিন্তা ভিত্তিহীন। সাংবিধানিক অজ্ঞতার প্রতিফলন মাত্র। যে দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করুন না কেন সে দলই পূর্ণ পাঁচ বৎসরকাল এই রাজ্যের শাসনভার চালাবেন। সংবিধানে এই কথা পরিস্কার-ভাবে লেখা আছে। কারণ, মধ্যবর্তী নির্বাচন হলেও এটাও সাধারণ নির্বাচন। অবশ্য, আবার যদি দলছুট খেলা শুরু হয় সে আলাদা কথা। নতুবা নবনির্বাচিত বিধানসভা পাঁচ বছর সগৌরবে বহাল থাকবে। ব্যতিক্রম ঘটবার কোন সাংবিধানিক বিধান নেই।

পশ্চিমবাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনের আবহাওয়া জমজমাট হয়ে উঠেছে। বস্তুত-পক্ষে যেদিন থেকে এই রাজ্যে গভর্নর শাসন চালু হয়েছে তখন থেকেই টেম্পো উঠতে শুরু করেছে। একমাত্র নকশালবাড়ী-ওয়ালারা ছাড়া আর সমস্ত রাজনৈতিক দলই সেদিন নির্বাচনের উপযোগী পট-ভূমিকা তৈরীর কাজে নেমে পড়েছে। দল-বদলের পালা, নতুন দল গঠন এবং নির্বাচনের পরিস্থিতির আঁচ করে সরকারের রূপরেখা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা, সমস্ত কিছুই টেম্পো তুলতে সাহায্য করেছে। তবে যাঁরা একটি যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবের কথা চিন্তা করে টেম্পো ওঠেনি বলে মন্তব্য করেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতকের নিরিখে এখনও রাজনৈতিক ভাবধারা বিচারে অভ্যস্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ভারতবর্ষে চার-চারটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় নির্বাচনেও যে-ধরনের প্রচার-কৌশল কিম্বা ভোটারদের মনজয়ের টেকনিক অবলম্বন করা হত বর্তমানে তা বদলে গেছে। কারণ, বেশীর ভাগ ভোটারই এখন তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। হাজার আলোচনা করুন, দেখতে পাবেন মনের গোপন কোণে যে-কথা লুকিয়ে আছে তাকে কখনও প্রকাশ্যে বিবৃত করবে না। একান্ত আপনজন হলে হয়ত মনের আঁচ পাওয়া যেতে পারে। এই যে সযত্ন গোপনীয়তা এটা তুষ্ণীম্ভাব নয়। বহিঃ-প্রকাশ না ঘটলেও এ-উত্তাপের প্রমাণ আছে স্থিতধী, চিন্তাশীল ভোটার এখন আর অহেতুক নিজেকে সোজাসুজিভাবে কোন পক্ষে জড়িয়ে ফেলতে চান না। কিন্তু তাই বলে যে তাঁরা একেবারে সক্রিয় নন, এ বক্তব্য যুক্তিসহ নয়। তাঁদের সার্কেলে তাঁর আলোচনা করেন। সিদ্ধান্তেও আসেন আর সকল দলের প্রার্থীকেই বিনম্র হেসে সমর্থনের আশ্বাসবাণী শুনিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতের উপর দৃঢ় ও অটল থাকেন। কিন্তু তাই বলে এটাকে টেম্পো নয় বলা যেতে পারে না। কারণ, বৃটেন ব ফ্রান্সের দিকে লক্ষ্য করুন। এক মাসে নোটিশেই প্রায় সেখানে সাধারণ নির্বাচ অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। হাইড পার্কের একা সভামঞ্চ থেকেই রক্ষণশীল ও লেবা পার্টির নেতৃবৃন্দ তাদের দলীয় প্রার্থীদে

কেন সমর্থন করা উচিত—এই মর্মে ভাষণ দিয়ে আম-জনতাকে ওয়াকিবহাল করেন। বেশী কর্ণভেদী চিৎকারের প্রয়োজন হয় না টেম্পো তোলার জন্য। অবশ্য অনেকে বলবেন, বৃটেনের পরিষদীয় গণতন্ত্র দুই শতাব্দীর প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আগে যেটা পণ্ডিতের বোধগম্য ছিল না এখন পাঁচ বছরের শিশুও তা অবলীলাক্রমে বলে দিতে পারে। পৃথিবী পাল্টাচ্ছে। তার চলন, বলন, রূপ-রস বদলাচ্ছে। কাজেই আগে যা ১০০ বছরের সাধনার বস্তু ছিল আজ তা এক লহমায় করে দেওয়া যায়। এমনি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে মানুষের জ্ঞানের পরিধি স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাচ্ছে। আর সেইজন্যই আজকের নির্বাচনে আগেকার মত উত্তাপ দেখা যাবে না, কিন্তু তাই বলে টেম্পো ওঠেনি এ-কথা বলাও ভুল হবে।

এই সেদিন একটি অজানা পাড়াগাঁয়ে একটি চাষীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। লোকটি নিরক্ষর, কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতি মনে হল পুরোপুরি করায়ত্ত। জিজ্ঞাসা করলাম, "কর্তা, চালের দাম পড়ছে কেন?" উত্তর এল, গড়িমসি করে নয় একেবারে তড়িৎ-গতিতে, 'হুজুর, ভোট ভেঙে গেছে তাই চালের দাম পড়ছে।" এর রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করেও এ-কথা বলা যেতে পারে, ঐ চাষী ভদ্রলোক সমস্ত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্যক পরিচিত। এই সেদিন কিছু নকশালবাড়ী সমর্থক মিছিল করে নির্বাচন বয়কট করবার আবেদন জানিয়ে যাচ্ছিলেন। আধপোড়া বিড়িটাতে পুনরায় অগ্নিসংযোগ করতে করতে এক চায়ের দোকানী মন্তব্য করছিলেন, 'এই ত সেদিন ধরমবীর ফিরে যাও, গভর্নর শাসন চলবে না বলে কর্ণপটবিদারী শ্লোগানে মাতিয়ে তুলছিলে, আজকে আবার নির্বাচন বয়কট করার শ্লোগান দেওয়ার অর্থই হচ্ছে ধরমবীরের রাজত্ব কায়েম রাখা। তোমরা কি চাও, বুঝতে পারছি না ত?' এই বলেই আধপোড়া বিড়িটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে দোকানী আবার চা তৈরির কাজে মনো-সংযোগ করলেন। বুঝতে হবে রাজনীতির জটিল প্রশ্নের উত্তর সরল সহজভাবেই এই লোকগুলি দিতে পারেন। কোন দর্শনিক-তত্ত্বের গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু করার এঁদের দরকারই নেই, এবং নির্বাচনের টেম্পো যে এহেন দোকানীকেও প্রভাবিত করেছে—উক্তিটাই তার যথার্থ প্রমাণ।

একমাত্র বন্যার ধ্বংসলীলার জন্য উত্তরবঙ্গের কিয়দংশে এবং মেদিনীপুরের কিছু অঞ্চলে নির্বাচনের কাজ ব্যাহত ছিল। কিন্তু তাই বলে নির্বাচনী হাওয়া সৃষ্টি হয়নি এমন নয়। বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের মাধ্যমেও রাজনীতি হয়েছে এবং সেটাও পুরোপুরি নির্বাচনে বাজীমাৎ করার চেষ্টায়। ভোট চাওয়ার শ্লোগান সব সময় সোজাসুজি তোলা যায় না। কোন কোন সময়ে একটা না একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই হাওয়া বইতে থাকে। উত্তরবঙ্গে বন্যাকে কেন্দ্র করে এই আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই বন্যা সাময়িকভাবে মানুষকে বিপর্যস্ত করে রাখলেও আখেরে তা পারেনি। সব দুঃখ-দুর্দশাকে জয় করে হাসিমুখে আবার রাজনীতির আসরে নেমেছে। তাই আজ উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী জনসভায় হাজার হাজার মানুষ ভিড় করছে। দলীয় নেতাদের বক্তব্য শুনছে, সমালোচনাও হচ্ছে। কাজেই সেখানেও টেম্পো ওঠেনি এ-কথা বলা যাবে না।

সব সময়ে সব দেশেই কিছু না কিছু লোক থাকেন যাঁরা প্রত্যেক ব্যাপারেই নিশ্চেষ্ট থাকার চেষ্টা করেন, আবার কিছু লোক থাকে যাঁরা সব বিষয়ের সমালোচনা না করে জলগ্রহণ করে না। এঁদের ইতস্তত আলোচনার যোগফলকে টেম্পো পরিমাপের ব্যারোমিটার হিসাবে গ্রহণ করলে একটি বুনিয়াদী ভুল করা হবে। এঁরা এঁদের অজান্তেই নির্বাচনী আবহাওয়ায় জড়িয়ে পড়েন।

পশ্চিমবাংলায় ইতিমধ্যেই হাজার হাজার জনসমাবেশ সংগঠিত হয়েছে। কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট এবং অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে চষে ফেলেছেন নিজেদের প্রার্থীর অনুকূলে প্রচারের উদ্দেশ্যে। এমনকি এক-এক জায়গায় দুই-তিন রাউন্ড করে বক্তৃতা হয়ে গেছে। আর হাজারে হাজারে মানুষ এই সমস্ত ভাষণ শুনেছেন। যেসব লোকদের কথা শুনবার জন্য গণদেবতা জমায়েৎ হয়েছেন এমন নয় যে সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দকে তাঁরা আগে কখনও দেখেননি। তাই শুধু দর্শনলাভের জন্যই তাঁরা উপস্থিত হন না। নতুন কিছু শুনতে পাবেন এ-ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁরা কাতারে কাতারে ভিড় করেন।

একটু নজর করলেই দেখা যাবে, বিভিন্ন দলের সহস্র সহস্র কর্মী ভোটার-লিস্ট নিয়ে এপাড়া-সেপাড়া, এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রচার করছেন, আর কোন্ ভোটার আছে আর কোন্ ভোটার নেই তার তথ্য সংগ্রহ করছেন। মিছিল হচ্ছে না এমন নয়। পোস্টার পড়ছে না এমন জায়গা ত কম চোখে পড়ে। কিন্তু তবুও টেম্পো ওঠেনি বলতেই হবে। তা নাহলে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রখরতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে পারে ত।

কেরালার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় এই টেম্পো না ওঠার কথা ঐ সমুদ্র-বিধৌত অঞ্চলের নারিকেলকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। আর সব পণ্ডিতই কি রাজনীতিক বা কি সাংবাদিক, সকলেই সমস্বরে বলেছিলেন, খুব কম সংখ্যক লোক ভোট দিতে আসবে। কারণ, নির্বাচনের টেম্পো নেই। কিন্তু তাঁদের কথার আওয়াজ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কেরালার আমজনতা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ঐ পণ্ডিতদের ধারণা কত ভুল। এমন অনেক কেন্দ্রের নজির ছিল যেখানে বেলা দশটা বাজবার আগেই শত-করা ৬০টি ভোট বাক্সবন্দী হয়ে গেছে। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে দল বেঁধে, মিছিল করে এমনকি গান গেয়ে ভোটকেন্দ্রে এসেছিলেন।

পশ্চিমবাংলাতেও এবার সেই চিত্র দেখা যাবে, যাঁরা মনে করছেন টেম্পো ওঠেনি তাঁদের কথা ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। মানুষ আসবে, ভোট দেবে। এবং কাকে দেবে সেটা পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে। এদিক-ওদিক নানা কথার যে ফুলঝুরি রচিত হচ্ছে, ভোটের দিনে দেখতে পাবেন তার কোন অস্তিত্বই নেই। আর যাঁরা বলবার চেষ্টা করছেন, লোক এবার নির্বাচনে নিস্পৃহ, পশ্চিমবাংলায় আবার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেবে, তাঁরা ভুল করছেন। এই রাজ্যে রাজনৈতিক সংহতিকরণ প্রায় সম্পূর্ণ। তাই ঘটা করে কোন সাধারণ ভোটদাতা বক্তব্য রাখেন না। কোন না কোন সংগঠনের সঙ্গেই বেশির ভাগ লোক সংযুক্ত হয়ে গেছেন। তদুপরি এবারের ভোটের রঙ্গমঞ্চে অনেক নব-নায়ক অংশ-গ্রহণ করছেন। তাঁরা হচ্ছেন স্বাধীনোত্তর বঙ্গদেশের পরাধীনতার বিষবাষ্পমুক্ত সচেতন, চঞ্চল নাগরিক। কাজেই এবার অনিশ্চয়তার প্রশ্ন থাকবে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ এবার তাঁদের রাজনৈতিক চেতনার প্রমাণ দেবেন। অভি-ব্যক্তির বাহ্য প্রকাশ না থাকলে কি হবে, নির্বাচনের টেম্পো উঠেছে। মাসখানেক পরে সেই টেম্পো এমন স্তরে উন্নীত হবে যে সমস্ত পণ্ডিতদের ধ্যানধারণা বদলে দেবে।

—সমদর্শী

নতুন ঠগী

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতেই শুক্লা-বৌদি দাদার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—

ঃ নববর্ষ, জন্মদিন, দুটোতেই ফাঁকি দিয়েছ। এবার আর ছাড়ব না।

মর্ণিং, ডে দুবেলা ক্লাস নিয়ে বায় আন্টেক ট্রাম বাস ঠেঙিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত নীলাদ্রিকা বাড়ি ফিরে এই আকস্মিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রমহলে সুনাম আছে। নামটুকু তিনি ফাঁকি দিয়ে অর্জন করেন নি। নোট-সার অধ্যাপক তিনি নন। রীতিমত পরিশ্রম করেন। ক্লাস নেওয়া, বাড়িতে ছাত্র ঠেঙানোর ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত পড়াশুনা করেন। পড়া ও পড়ানোর মাঝের সময় বৌয়ের গঞ্জনা শুনেই কেটে যায়। বাজার, দোকান, রেশন, ধোপা, মুদি—সব দায়িত্ব বৌদির। তাই দাম্পত্য-জীবনের বাজনা পাওনা বলেই মেনে নিয়েছেন। মনে মনে হিসাব মেলাচ্ছিলেন ঠিক কোন ব্যাপারটায় ফাঁকি দিয়েছেন। না পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে গায়ের চাদরটা বিছানায় রেখে হতাশ হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঃ তা বুঝবে কেন? তোমার কি কোন হুঁশ আছে। সংসারের কুটোটি পর্যন্ত তোমায় নাড়তে হয় না। নিজের বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা, কলেজ নিয়েই আছ। আমার দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছ। আমি কি পরি সে বিষয়ে তোমার কি কোন খেয়াল আছে।

ঃ খেয়াল না করে কোন উপায় আছে। আমার শয়নে স্বপনে জাগরণে তুমি মিশে আছ।

ঃ রাখো তোমার রসিকতা। সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত।

ব্যাপারটা ততক্ষণে কিঞ্চিৎ ক্লিয়ার হয়েছে। 'কি পরি'—অর্থাৎ পরনের বসন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ। অ্যাটকটা সামলাবার জন্য মনে মনে কাউন্টার অ্যাটাকের প্যাঁচ আটতে আটতে দাদা বললেন—

ঃ দয়া করে এক কাপ চা দাও। গলাটা ভিজিয়ে নি। তারপর সব শুনব। বড় টায়ার্ড।

ঃ তুমি জামা-কাপড় ছাড়। আমি গুপীকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এবার আমি কোন কথা শুনব না।

কথা শুনবেন না প্রতিজ্ঞা রাখার জন্যই সম্ভবত অনেক অনেক কথা শোনাতে শোনাতে বৌদি রান্নাঘরে চলে গেলেন।

শীতের সন্ধ্যায় গায়ে আলোয়ান চড়িয়ে সোফায় হেলান দিয়ে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে দাদা চেঁচিয়ে বললেন—

ঃ গুপী বৌদিকে ডেকে দে ত'।

ঃ গুপীকে ডাকতে হবে না, আমি নিজেই আসছি। বলতে বলতে সেদিনের খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বৌদি ঘরে ঢুকলেন।

ঃ সন্ধ্যেবেলায় কাগজ পড়ছ। কী ব্যাপার?

ঃ ব্যাপার মশাই গুরুতর। এবার এটা একটু পড়।

ঃ কাগজ ত' সকালেই পড়েছি। বিকেলে কি নতুন কোন এডিশন বেরুলো।

ঃ আহা ছাই পড়ই না। এই—এইটা।

আঙুল দিয়ে জায়গাটা ভাল করে দেখিয়ে দিলেন বৌদি। চাকুরী চাই, পাত্র-পাত্রী, সরঞ্জাম, লটারী, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, টেণ্ডার নোটিশের এক কোণে জনৈকা মহিলা [illegible] [illegible]

আছেন। ছবি দেখে বলা মুস্কিল ভদ্রমহিলা সাত-পাকে ধরা দিয়েছেন কি না, তবে তনুদেহটি সাতাত্তর পাকে পাক খেয়ে একটি নিখুঁত প্রস্ফুটিত পুষ্প। চশমাটা নাকের উপর এঁটে নিয়ে অধ্যাপক নির্দিষ্ট ভাবে চোখ বুলিয়ে গেলেন—

"উপহার বিনামূল্যে

অভিনেত্রী ও সুন্দরীদের পছন্দসই শাড়ির অপূর্ব সম্ভার। রুচিসম্মত আকর্ষণীয় ডিজাইন। আমেদাবাদ ও কোয়েম্বাটুরের যাবতীয় ফ্যাশান-দুরস্ত সুন্দর রঙের সিল্কের শাড়ি সবচেয়ে কম-দামে পাওয়া যাবে। ডিলুক্স স্পেশ্যাল একটির দাম ১১্ টাকা। দুটি একত্রে ২০্ টাকা। তিনটি ৩০্ টাকা। চারটি ৪০্ টাকা। দুটি বা বেশি শাড়ি নিলে বিনা-মূল্যে ব্লাউজ-পীস। বাড়িতে বসে সওদা করুন। ভি পি পার্শেলে পাঠানো হয়। চাহিদা প্রচুর, সাপ্লাই কম। আজই আপনার অর্ডার পাঠান।"

নীচে কোম্পানীর নাম ও পোস্টবক্স নম্বর ইংরেজীতে লেখা।

: কী গো পড়তে পড়তে একেবারে ঝাঁড়িয়ে গেলে যে।

: না মানে, ভাল করে পড়ছি। ব্যাপারটা কী রকম কী রকম লাগছে কিনা। চল্লিশ টাকায় চারটে ডিলুক্স স্পেশ্যাল তার সঙ্গে টুকরো স্পেশ্যালের লেজুড়—খটকা লাগছে। আজকাল চার টাকায় ভাল একটা লুঙ্গি পাওয়া যায় না। আর দশ টাকায় এগার হাতি সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ-পিস সমেত। তাই ভাবছিলাম।

: ভাবাভাবিতে কাজ নেই। আমি অর্ডার পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমায় বললে ত' আর পাঠাতে না।

: সত্যিই পাঠিয়ে দিয়েছ?

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় অধ্যাপকের।

: সত্যি না ত' কি মিথ্যে। ঝাঁঝিয়ে ওঠেন বৌদি।

: না ব্যাপারটা কি রকম 'ফিশি'। সারাটা বিজ্ঞাপনে যেন জলন্ধর সিটির গন্ধ মাখানো।

: তোমার ত' সবতাতেই সন্দেহ। বাস্তিক ছাড় ত'। কোনদিনও ত' বৌয়ের জন্য নিজের হাতে করে একটা জিনিষ নিয়ে বাড়ি ঢুকলে না।

: বল কি! এই পুজোয় তোমায় পাঁচটা শাড়ি দিয়েছি। নিজেকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেন দাদা।

: তুমি দিয়েছ? বাবা দিয়েছেন একটা শ্বশুরমশাই একটা। বড়দা আর মণিদা দিয়েছেন দুটো। তুমি ত' দিয়েছ পঁচিশ টাকা দামের একটা অর্ডিনারী শাড়ি।

: ঐ হল। পাঁচটা শাড়ি ত' পেয়েছ।

: না গো না। নন্দিনীর বর পুজোয় নয় বোম্বাই থেকে আসল জর্জেট এনে দিয়েছে তা দেখছ না।

তুলনামূলক আলোচনাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেন অধ্যাপক—

: কার সংগে কার তুলনা। নন্দিনীর স্বামী একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আর আমি হলাম গিয়ে একজন পেটি লেকচারার।

: থাম ত'। তুমি কারো চেয়ে কম কিসে? দু-দুটো কলেজে পড়িয়ে, টুইশানি করে, তুমি কি কম রোজগার কর।

পতিচর্চা যে স্ত্রীদেরই একান্ত মনোপলি, এমনকি স্বামীদেরও স্ব-বিষয়ে মতামত প্রকাশের অধিকার নেই বৌদি তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পতিব্রতা সতীকে নিরস্ত করা দরকার। নইলে হয়ত সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ হতে হবে। এদিকে কটা শাড়ির অর্ডার গেছে জানা নেই। ইলেকট্রিকের বিলটা মাসের শেষে আসে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসার হলেও খরচটা নেহাৎ মন্দ নয়। বাবা বড়দার কাছে থাকেন। টুইশনির টাকা থেকে তাঁকে দিতে হয়। এবার টুইশনির মার্কেটটা খারাপ। সবেধন নীলমণি ঐ একটিই আছে। পেমেন্ট মাসের শেষ সপ্তাহে, ছাত্রের বাবা মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। নামেই অধ্যাপক। দুটো কলেজের আয় যোগ করলে কেন্দ্রীয় সরকারের ইউ ডি সি'র মাইনের চেয়ে গোটা-পঞ্চাশেক কমই হবে। পিসীমা চিঠি লিখেছেন পিসতুত দাদার খুব টানাটানি চলছে। কিছু পাঠাতে হবে। আলোয়ানের ভেতরে ঘামতে শুরু করলেন অধ্যাপক। কাগজটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—

: কটা শাড়ির অর্ডার দিয়েছ?

: চারটেই দিলাম। সস্তায় হয়ে যাবে। এবছর আর কিনতে হবে না। বৌকে দুটো জিনিষ দিতে হলে ত' তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে।

কড়-কড়ে চল্লিশ টাকার শোক ভুলতে হাতে মুখে জল দেওয়ার জন্য বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে দাদা বললেন—

: খেয়াল আছে মাসের আরো দশটা দিন বাকি?

: সে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। টুইশনির টাকাটা ত' এই সপ্তাহেই পাবে। ওর অর্ধেকটা আমায় দিও।

: কিন্তু ও-টাকা থেকে বাবাকে দিতে হবে, ইলেকট্রিকের বিল দিতে হবে।

: বাবাকে দেওয়ার দায়িত্ব কি তোমার একার? তুমি ত' সব মাসেই দিচ্ছ। এ-মাসটা অন্য ভাইরা দিক না। আর আমি ত' সব চাইছি না।

নিরুপায় অধ্যাপক আলোয়ানটা সোফার উপর ফেলে দিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন।

সেদিন রবিবার কলেজ বন্ধ থাকায় ঘরে বসে বই পড়ছিলেন দাদা। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে মুখটা তুলতে দেখলেন আধ-ভেজানো দরজার ওধারে পিওন দাঁড়িয়ে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। এ-মাসের লাইটের বিল। অন্যমনস্কভাবে বিলটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন।

: একটা পার্শেল আছে। চল্লিশ টাকার। শুভ্রা বসুর নামে।

ঝোলা থেকে চটকদার একটা বড় প্যাকেট বার করে পিওন বলল।

: শুভ্রা তোমার পার্শেল এসেছে। বলে দাদা ঘরে চলে গেলেন।

গুলতি-মুক্ত পাথর-কুচির মত বৌদি রান্নাঘর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এলেন। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে শোওয়ার ঘরের আলমারী খুলে টাকা নিয়ে এসে বললেন—

: সই করতে হবে?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। এই নিন এখানে সই করুন। পেনটা পিওন বাড়িয়ে দিল।

সই করে টাকা দিয়ে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে বৌদি বললেন—

: দেখলে ত' শাড়ি আসে কি না। তোমার ত' সবতাতেই সন্দেহ।

বই থেকে একবার মুখ তুললেন দাদা, তারপর আবার পাতা ওলটাতে শুরু করলেন।

: সারাদিনই ত' পড়ছ। রাখো না না তোমার বই। টান দিয়ে বইটা কেড়ে নিলেন বৌদি। মেঝের উপর বসে ব্লেড দিয়ে চটের সেলাই কাটতে কাটতে কোন দোকানে ব্লাউজ বানাতে দেবেন তার ফিরিস্তি দিয়ে চললেন। মিনিট-খানেকেই সব সারা। দড়ি, চট সব খোলা হয়ে গেছে। ভেতরের বস্তু সামনে পড়ে আছে। আনন্দে উজ্জ্বল বৌদি সবচেয়ে উপরের শাড়িটি তুলে নিলেন। হাতে পরখ করে খুসীতে ডগমগ হয়ে বলে উঠলেন—

: সত্যি আর্ট সিল্কের—

বাক্য অসমাপ্ত থেকে গেল। গায়ের উপর শাড়ি মেলে দিতেই যেন সুন্দর মুখটা থেকে অদৃশ্য ব্লটার সমস্ত রঙ শুষে নিল। বড়জোর একটুকরো স্কার্ফ। আস্তে আস্তে কাপড়গুলি একে একে তুলে দেখলেন। চল্লিশ টাকায় চারটি শাড়ি ও ব্লাউজ-পিসের বদলে চারটি স্কার্ফ ও দুটি রুমাল। চুপ করে টুকরোগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফোঁটা ফোঁটা জল চোখ বেয়ে নেমে এসে বৌদির সারাটা গাল ভাসিয়ে দিল। চেয়ার ছেড়ে পাশের ঘরে যেতে গিয়ে দাদা একবার থমকে দাঁড়ালেন। ভাবলেন বলবেন—

: লাইটের বিল এসেছে। তেরো টাকা বাহান্ন পয়সা। মাস শেষ হতে এখনো তিনদিন বাকি।

টুকরো কাপড়, চট, দড়ির পাশে বসা সুন্দরীটির দিকে তাকিয়ে আর বলা হল না। পাশের ঘরে চলে গেলেন।

—[illegible]

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[উনিশ শো চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু এল দাদু হেমনাথের বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা ও সুনীতি। আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। কাঁধে তাঁর গোটা রাজদিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা। আরো আশ্চর্য তাঁরই বন্ধু লারমোর। সাদাসিধে, প্রাণবন্ত। আয়ারল্যান্ড ছেড়ে খৃস্টধর্মের প্রচারে এসে পূব-বাঙলার মাটি আর মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছেন।

লারমোর বিনুর বিস্ময়, আর যুগলের সঙ্গে তার বন্ধুর ভালোবাসা।

কয়েকদিন পরের সকাল: ঠাট্টা-মস্করা চলছে। ছোট্ট মেয়ে 'দুঃখী' ঝিনুকও রয়েছে। শিশির এল সপরিবার। আনন্দর সঙ্গে সুনীতির কেমন বাঁকা চাহনি বিনিময় চলছে। ওদিকে ঝুমা মেতে উঠল বিনুকে নিয়ে।]

।। উনিশ ।।

অপটু হাতে নৌকো বাইতে বাইতে দুজনে পুকুর পেরিয়ে ধানখেতে এসে পড়ল। ধানখেত ঠেলে ঠেলে একটু পর তারা যেখানে এল সেখানে আশ্বিনের শান্ত জলে শুধু পদ্ম আর শাপলা। আর আছে চাপ চাপ কচুরিপানা; তাদের মাথায় থোকা থোকা নীল ফুল। মাঝে মাঝে মুত্রা আর নলখাগড়ার ঝোপ। এক-আধটা মান্দার গাছও চোখে পড়ে; লাল ফুলে ফুলে তাদের ডালপালা ছেয়ে আছে। কিছু কিছু বউন্যা গাছও ইতস্তত ছড়ানো। বউন্যার নীচু ডালগুলো থেকে শত শত অসংখ্য গোলাকার ফল জলের কাছাকাছি ঝুলছে। আর মুত্রাঝোপ তো সাদা ফুলের মুকুট পরে গরবিনী হয়েই আছে।

শুধু ফুলই না, কত যে পাখি গাছের মাথায় মাথায় আর আকাশময় রঙীন পাপড়ির মতন উড়ছে তার হিসেব নেই।

ঝুমা খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'ইস, কত ফুল! কত পাখি!'

এ দৃশ্য বিনুর অচেনা নয়। কালই চারদিকের এই ঝোপঝাড়, ফুলফল এবং পাখিদের রাজ্য পাড়ি দিয়ে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল সে। যেতে যেতে প্রতিটি গাছ, প্রতিটি লতা আর পাখির নাম শিখিয়েছিল যুগল। সেসব ঠিক ঠিক মনে আছে বিনুর। ঐ যে ঐ পাখিটা, মাছরাঙা, ঐটা হলদিবনা, ঐটা পাতিবক—

পরিচিত দৃশ্য; তবু মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু।

ঝুমা আবার বলল, 'কি সুন্দর জায়গাটা, না?'

'হ্যাঁ—' বিনু মাথা নাড়ল।

'আমি জোর করে ধরে আনলাম বলে তো; নইলে কি কক্ষনো এখানে আসতে?'

বিনু বলল, 'কালই এসেছিলাম।'

'সত্যি!' ঘাড় বাঁকিয়ে ঝুমা তাকাল। তার গলার স্বরে এবং চোখের তারায় অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ সত্যি। মা কালীর দিব্যি।'

মা কালীর নামে যখন দিব্যি কেটেছে তখন আর সন্দেহ করা চলে না। ঝুমা শুধলো, 'কার সঙ্গে এসেছিলে?'

কার সঙ্গে এসেছিল, বিনু বলল।

'কী জন্যে এসেছিলে?'

বিনু তা-ও জানাল।

যুগলের নৌকোয় সুজনগঞ্জে পাড়ি দেবার কথা শুনে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ঝুমা। তারপর ঈর্ষা এবং ক্ষোভ-মেশানো গলায় বলল, 'সুজনগঞ্জের হাট কোথায়?'

'অনেক দূর।' বিনু বলতে লাগল, 'সকালবেলা বেরুলে যেতে যেতে দুপুর হয়ে যায়।'

সুর টেনে টেনে ঝুমা বলল, 'এ-ত-দূ-র!'

'হুঁ—'

'সেখানে কী দেখলে?'

কাল হাটে গিয়ে যেসব বিচিত্র এবং মনোরম অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে গেল বিনু। মন দিয়ে শুনে ঝুমা বলল, 'যুগলকে একটা কথা বলবে?'

'কী!'

'আমাকে একদিন সুজনগঞ্জে নিয়ে যেতে।'

'বলব।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

একটুক্ষণ নীরবতা।

তারপর চারদিকের [illegible] [illegible]

পাখি দেখতে দেখতে ঝুমা বলল, 'ইস আমার এয়ার-গানটা যদি আনতাম?'

বিনু শুধলো, 'তা হলে কী হত?'

'দেখতে, এতক্ষণে কতগুলো পাখি মেরে ফেলতাম—'

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পার!'

চোখ বড় করে মাথা নাড়তে নাড়তে ঝুমা বলল, 'তোমার বুঝি কিচ্ছু মনে থাকে না! একেবারে হাঁদারাম সিকদার—'

বিনুর মুখ লাল হয়ে উঠল। থতমত খেয়ে সে বলল, 'কী মনে থাকে না আমার?'

'সেদিন তোমাকে এয়ার-গান ছোঁড়ার কথা বললাম না?'

এবার মনে পড়ে গেল। বন্দুক ছোঁড়ার কথা বলেছিল বটে ঝুমা। তা ছাড়া যার মামা বাঘ-ভাল্লুক মারতে পারে, সে কি আর দু-একটা পাখি শিকার করতে পারবে না!

ঝুমা আবার বলল, 'কি মশাই, মনে পড়েছে?'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করল বিনু।

ঝুমা পাখি শিকার নিয়ে আর কিছু শুধলো না। চারদিকে ফুটন্ত ফুলের মেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এয়ার-গান যখন আনি-নি তখন ফুল তুলি এসো—'

বিনু উৎসাহিত হয়ে নৌকোর ধারে এসে ঝুঁকে বসল। ঝুমাও বসল তার পাশে। তারপর ক্ষিপ্র হাতে দুজনে ফুল ছিঁড়তে লাগল। চোখের পলকে শাপলা আর পদ্মে, মুত্রা এবং কচুরিফুলে নৌকো বোঝাই হয়ে গেল।

ফুলটুল তুলতে তুলতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বিনু, 'ওটা কী গাছ জানো?' বলেই সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

অথৈ জলের মাঝখানে গাছটা একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে; ডিঙি মেরে আকাশের ওপারের কোন্ [illegible] [illegible] দেখতে চেষ্টা

করছে। কালই গাছটা চিনিয়ে দিয়েছিল ব্গল। বিন্ বলল, 'ওটা কাউ গাছ।'

গাছটার সারা দেহ ফলে বোঝাই। হল্দ আভা-মাখানো সব্জ রঙের ফল-গ্লো সর্ বোঁটায় ঝুলেছে। সেগ্লো দেখিয়ে ঝ্মা বলল, 'ওগ্লো খায়?'

'হ্যাঁ—'
'তুমি খেয়েছ?'
'না।'
'তবে কি করে ব্ঝলে খায়?'
'ব্গল বলেছে।'
'খেতে কি রকম লাগে জানো?'
'খ্ব টক।'

লোভে চোখ চকচক করতে লাগল ঝ্মার। দ্রুত চাপা স্বরে সে বলল, 'চল, ক'টা কাউ পাড়ি। বাড়ি নিয়ে ন্ন দিয়ে খাব।'

ব্যাপারটা খ্বই লোভনীয়। বিন্ তক্ষ্নি রাজী হয়ে গেল, 'আচ্ছা—'

বৈঠা টেনে টেনে নৌকোটাকে কাউ-গাছের কাছে নিয়ে এল দ্জনে। আনামাত্র হাত বাড়াল ঝ্মা; কিন্তু ফলগ্লো ধরতে পারল না। কাজেই পায়ের আঙ্লে ভর দিয়ে আরো খানিক লম্বা হয়ে নিল; এবারও ফলগ্লো ছোঁয়া গেল না।

অগত্যা বিন্র দিকে তাকাল ঝ্মা। কর্ণ হেসে বলল, 'পারলাম না।'
বিন্ বলল, 'তুমি বেঁটে যে—'
'তুমি তো লম্বা—'

গম্ভীর চালে বিন্ বলল, 'তোমার চাইতে অনেক—'
চোখ কুঁচকে বিন্র পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল ঝ্মা। তারপর বলল, 'কেমন লম্বা এবার দেখব। পাড় তো ঐ কাউটা—'

নৌকোর একেবারে ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল বিন্। খানিক ঝ্কে গাছের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। টাল সামলাতে না পেরে হ্ড়ম্ড় করে সোজা জলে গিয়ে পড়ল সে।

এখানে অগাধ জল; পায়ের তলায় মাটি খ্ঁজে পেল না বিন্। একবার ডুবে যাচ্ছে সে পরক্ষণেই ভেসে উঠছে। আর সমানে হাত-পা ছ্ঁড়ছে। হাত বাড়িয়ে কিছ্ একটা যে ধরবে তেমন কিছ্ই নেই কাছা-কাছি। এরই ভেতর অনেকখানি জল খেয়ে ফেলল সে।

খানিক পর বিন্র মনে হল, জলের ওপর আর মাথা তুলতে পারছে না। এবার সে নির্ঘাত ডুবে যাবে। নৌকোটা কিম্বা কাউফলের গাছটা কোথায় কোনদিকে, সে ব্ঝতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে সেদিকে যেতে চেষ্টা করত। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল বিন্র, আঙ্লের ডগাগ্লো ঝিমঝিম করতে লাগল, কানের কাছে একসঙ্গে হাজার ঝিঁঝি একটানা ডেকে চলল। আধে জলে ডুবে যেতে যেতে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল বিন্, 'মরে গেলাম, মরে গেলাম। আমাকে বাঁচাও—'

আর তখনই সে শ্নতে পেল, কেউ যেন ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়েছে। পরম্হ্তেই টের পেল, তার চুলগ্লো কার হাতের ম্ঠোয়। জলের ওপর তাকে ভাসিয়ে রেখে চুল ধরে কেউ টেনে নিয়ে চলেছে।

যে চুল ধরেছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল বিন্; কিন্তু সে এমনভাবে রয়েছে যে ধরা যাচ্ছে না।

ধরাই যখন যাচ্ছে না তখন আর সে চেষ্টা করল না বিন্। এখন সে ভেসে থাকতে পারছে। ব্ক ভরে হাওয়া টানতে-টানতে হঠাৎ তার মনে হল, ঝ্মা আর সে ছাড়া এখানে তো কেউ ছিল না। তবে কি ঝ্মাই তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছে?

যতখানি পারল মাথাটা উঁচু করে একবার নৌকোর দিকে তাকাল বিন্। সেখানে কেউ নেই। ঝ্মা—নিশ্চয়ই ঝ্মা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।
বিন্ ডাকল 'ঝ্মো—'

পাশ থেকে ঝ্মাই সাড়া দিল, 'কী বলছ?'
'তুমি আমাকে বাঁচালে। নইলে—'

বিন্র কথা শেষ হবার আগেই ঝ্মা বলে উঠল, 'এখন কথা বলতে হবে না; আগে নৌকোয় উঠে নাও—'

এক সময় তারা নৌকোর কাছে এসে পড়ল। গল্ইই দেখিয়ে ঝ্মা বলল, 'এটা ধরো।'
বিন্ গল্ইই ধরল।
ঝ্মা আবার বলল, 'আমি তোমার কোমর ধরে ওপর দিকে ঠেলে দিচ্ছি; তুমি নৌকোয় ওঠ।'

দ্-তিনবার চেষ্টা করেও বিন্ উঠতে পারল না। ঝ্মা তখন বলল, 'গল্ইটা খ্ব

শক্ত করে ধরে থাকো। আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে নৌকোয় উঠি।'

ভীত স্বরে বিন্দু বলল, 'আমাকে ছেড়ে দেবে?'

'না রে, ছেড়ে না দিলে নৌকোয় উঠব কি করে? আমি উঠে তোমায় টেনে তুলব। কোনো ভয় নেই—'

ভরসা দিয়ে বিন্দুকে ছেড়ে দিল ঝুমো। তারপর ডুব-সাঁতারে নৌকোর ওধারে গিয়ে তাকেরই পাশকে বেয়ে বেয়ে ওপরের পাটাতনে উঠে পড়ল।

প্রাণপণে দু হাত দিয়ে গলুইটা ধরেই ছিল বিন্দু। জলে পড়ে যাবার পর থেকেই সীমাহীন এক ভয় তাকে ঘিরে আছে। ঘোরের ভেতর সে ঝুমোর সাঁতার-কাটা, নৌকোয়-ওঠা দেখতে লাগল।

এদিকে পাটাতনে উঠেই বিন্দুর দিকে অনেকখানি ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঝুমো। সে বলল, 'আমাকে ধরে ওঠো।'

ঝুমোর হাত ধরে আস্তে আস্তে নৌকোয় উঠল বিন্দু। উঠেই টের পেল, পেটটা খুব ভারী লাগছে। মনে পড়ল, খানিক আগে প্রচুর জল খেয়েছে। বুকের ভেতরটা তার থরথর করছিলই; নিরাপদ জায়গায় উঠবার পর কাঁপুনিটা হাজার গুণ বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ নির্জীবের মতন বসে থেকে ক্লান্ত গলায় বিন্দু বলল, 'তুমি না থাকলে আমি আজ মরে যেতাম।'

গলা বাঁকিয়ে ঝুমো বলল, 'যেতেই তো। ধাড়ী ছেলে, এখনও সাঁতার শেখ নি!'

মুখ নীচু করে বিন্দু বলল, 'তুমি কিন্তু খুব ভাল সাঁতার কাটতে পার।'

'পারিই তো।'

'কোথায় শিখলে?'

'কলকাতায়। একটা সাঁতারের ক্লাবে। কী করে জল থেকে মানুষ তুলতে হয় তাও শিখেছি। ভাগ্যিস শিখেছিলাম।'

বিন্দু চুপ করে থাকল। এতক্ষণ কিছুই দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না সে। বুঝতেও না। তার সামনে থেকে পাখি-ফুল-ধানখেত, পেঁজা তুলোর মতন সাদা মেঘ এবং ঝকঝকে নীলাকাশ দিয়ে ঘেরা জল-বাংলার এই মনোরম রূপের জগৎটি মুছে গিয়েছিল। জলের ভেতর থাকার সময় একটুখানি শক্ত নিরাপদ মাটি আর বুকভরা হাওয়ার জন্য সে ছটফট করছিল।

এখন ভয়টা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। স্পষ্ট করে সব কথা ভাবতে পারছে বিন্দু। কিভাবে অথৈ জল থেকে চুলের মুঠি ধরে ঝুমো তাকে তুলে এনেছে, এই কথাটা যতই সে ভাবল ততই অপার বিস্ময় যেন চার-দিক থেকে ঘিরে ধরতে লাগল। কৃতজ্ঞ চোখে দুঃসাহসী মেয়েটাকে একবার দেখে নিল বিন্দু।

গম্ভীর চালে ঝুমো বলল, 'সাঁতারটা তাড়াতাড়ি শিখে নেবে, বুঝলে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল বিন্দু।

ঝুমো আবার বলল, 'কাউফল খেয়ে আর কাজ নেই, কি বলো?' বলে ফিক করে হেসে ফেলল।

বিন্দু চুপ, ঘাড় নীচু করেই ছিল সে। এবার আরো একটু নুয়ে পড়ল।

ঝুমো ঠোঁট কুঁচকে হেসে হেসে বলল, 'তখন তো পাড়তে গিয়ে উল্টে-মুল্টে জলে পড়লে। আবার পাড়তে গেলে কী করে যে বসবে। তার চাইতে চল, বাড়ি যাই।' হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, 'উঁহু—উঁহু—'

বিন্দু এবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল।

ঝুমো বলল, 'এক্ষুনি তো যাওয়া হবে না।'

এতক্ষণে গলার স্বর ফুটল বিন্দুর। অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

আঙুল দিয়ে নিজের এবং বিন্দুর ভিজে জামাটামা দেখিয়ে বলল, 'এগুলো আগে শুকিয়ে নিক। নইলে—' বলে চোখের একটা ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝল বিন্দু। একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

ঝুমো ডাকল, 'এ্যাই—'

খানিক দূরে নলখাগড়া ঝোপের মাথায় এক ঝাঁক ফড়িং পাতলা ফিনফিনে ডানায় উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের ওড়াউড়ি দেখতে-দেখতে বিন্দু সাড়া দিল, 'কী?'

ঝুমো বলল, 'তুমি যে জলে পড়ে গিয়েছিলে, একথা কিন্তু কাউকে বোলো না। আমার মা যদি জানতে পারে, তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, কাউফল পাড়তে বলেছি, আর সেই জন্যেই তুমি জলে পড়ে গেছ তা হলে কী হবে জানো?'

ফড়িংদের দিক থেকে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বিন্দু বলল, 'কী?'

'মা আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে।'

বিন্দু বলল, 'জানতে পারলে আমার মা-বাবাও খুব বকবে। আর কক্ষনো নৌকোয় উঠতে দেবে না।'

কী একটু ভেবে ঝুমো বলল, 'জলে পড়ে যাবার কথাটা খালি তুমি আর আমি জানবো; আর কেউ না। তাই না?'

'হ্যাঁ—' বিন্দু ঘাড় কাত করল। পর-ক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল, বারো বছরের জীবনে কোনদিন কোন কথা মা-বাবার কাছে লুকোয় নি সে। কিন্তু এই কথাটা গোপন করতেই হবে। নইলে বাইরে বেরুবার পথ আজ থেকে তার বন্ধ; সব সময় কেউ না কেউ তাকে পাহারা দিয়ে রাখবে।

সব চাইতে মজার ব্যাপার, ঝুমোকে সে চেনে না, জানে না। রাজদিয়াতে এসেই তাকে প্রথম দেখেছে। অথচ এই প্রায়-অচেনা মেয়েটাই তার লুকোনো কথাটা জানবে, আর কেউ না।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে জামা-প্যান্ট যখন শুকিয়ে গেল, জলে ডোবার কোন চিহ্নই যখন আর নেই সেই সময় ঝুমো বলল, 'চলো, এবার যাই।'

বিন্দু বৈঠা নিয়ে তক্তাকার মতন গলুইর কাছে যাচ্ছিল, ঝুমো চেঁচিয়ে

উঠল, 'মা—মা—' চমকে বিন্দু তাকাল, 'কী হল?'

'তোমাকে আর ওস্তাদি করে নৌকো বাইতে হবে না। মাঝখানে বসে থাকো। ধারে গিয়ে বৈঠা চালাতে গেলে আবার যদি পড়ে যাও—'

ঝুমো যেভাবে যে কণ্ঠস্বরে কথা বলছে তাতে মনে হয় সে ঝিনুর চাইতে অনেক বড়। বিন্দু তার কাছে যেন অবোধ শিশু। ঝুমোর চালচলন ভাবভঙ্গি সব কিছুই অভিজ্ঞা সুচতুরা বয়স্কা মহিলার মতন।

সাঁতার না জেনে অথৈ জলে পড়ে যাওয়া খুব লোভনীয় ব্যাপার নয়। একটু আগে ঝিনুর সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। কাজেই বৈঠা ফেলে ঝুমোর কথামতন তাড়াতাড়ি নৌকোর মাঝখানে এসে বসল সে।

কাজেই একা একা জল ঠেলে নৌকোটাকে পুকুরঘাটে নিয়ে এল ঝুমো। আর আসতেই দেখা গেল বাগানের ভেতর সুধা-সুনীতি-আনন্দ—ঝুমো এবং ঝিনুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিকার-কাহিনীর আসর তা হলে ভেঙেছে!

সুধারাও ঝিনুদের দেখতে পেয়েছিল; দেখামাত্র ছুটে এল। উদ্বেগের গলায় সুধা বলল, 'এই তোরা কোথায় গিয়েছিলি রে?' সুনীতি-আনন্দ-ঝুমোও সেই একই প্রশ্ন করল। ঝিনুক অবশ্য কিছু বলল না: তীক্ষ্ম কুটিল চোখে ঝুমো আর বিন্দুকে দেখতে লাগল।

ঝিনু নীরব। ঝুমো লাফ দিয়ে নৌকো থেকে মাটিতে নামল। তারপর বলল 'আমরা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। ঐ দ্যাখো কত নিয়ে এসেছি—' পদ্ম-শাপলা আর কচুরিফুলে নৌকো বোঝাই হয়ে আছে, সেগুলো দেখাল ঝুমো।

ঝুমো বলল, 'কি দস্যি মেয়ে তুই!'

এদিকে নিঃশব্দে বিনুও নেমে এসেছিল। সুধা তাকে ধরল, 'এইটুকুন বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিলি; যদি জলে পড়ে যেতি? তুই তো সাঁতার-টাঁতার জানিস না।' বলতে বলতে তার চোখ প্রখর হয়ে উঠল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিনুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'এদিকে আয় তো—'

ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে গেল বিনু। ছোটদির যা চোখ, ওকে বিশ্বাস নেই। হয়তো তার জলে ডোবার ব্যাপারটা ধরেই ফেলেছে। দূরে থেকেই সে বলল, 'না যাব না?'

'তোর চুল কিরকম ভেজা-ভেজা, জামা-প্যান্ট কেমন কোঁচকানো কোঁচকানো। জলে ভিজেছিলি নাকি?'

আরেকটু হলে সত্যি আবছা গলায় বিনু কী বলল, বোঝা গেল না।

সন্দিগ্ধ চোখে ঝিনুর হাবভাব দেখতে দেখতে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সুধা, এই সময় ঝুমো বলে উঠল, 'এই বুঝি তোর চুলগুলোও তো ভেজা-ভেজা, ইজের-ফ্রক কোঁচকানো কোঁচকানো। কী করছিলি বল তো তোরা?'

বিন্দু লক্ষ করল, ঝুমো একটুও ভয় পেল না। যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে নিরীহ ভালমানুষের মতন মুখ করে তাহা মিথ্যে বলে গেল, 'বিনুদাদা না আমার গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল, আমিও ওর গায়ে দিয়েছি। তাই ভিজে গিয়েছিলাম।'

'বদমাইস মেয়ে—'

ব্যাপারটা আরো কিছুক্ষণ হয়ত চলত, তার আগেই আনন্দ বলে উঠল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সবাই উৎসুক চোখে তার দিকে ফিরল। সুধা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের প্রস্তাব?'

কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে আনন্দ বলল, 'সবে এগারোটা বাজে। খাওয়া-দাওয়ার এখনও তো দেরি আছে। ততক্ষণ নৌকোয় করে আমরা একটু ঘুরে ঘুরে আসি না কেন?'

সুধা বলল. 'খুব ভাল, খুব ভাল—'

সুনীতি কিছু বলল না। তবে ঘাড় কাত করে জানাল, এ ব্যাপারে তার বিন্দু-মাত্র আপত্তি নেই।

ঝুমো তো প্রায় হাততালিই দিয়ে উঠল, 'আমরা নৌকোয় চড়ব। কি ভাল যে লাগছে।'

আনন্দ বলল, 'সবাই যখন রাজী তখন আরে দেরি করে দরকার নেই। আসুন—আসুন—'

সুনীতি আগে আগে ছিল। সে প্রথমে নৌকোয় উঠল। তারপর উঠল আনন্দ। আনন্দর ঠিক পরেই ছিল সুধা। নৌকোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল সে।

আনন্দ বলল, 'কী হল!'

সুধার মাথায় ততক্ষণে অনেকখানি দুষ্টুমি ভর করে বসেছে। কৌতুকের আভায় তার নীলচে চোখ ঝিকমিক করছে। ঠোঁট টিপে সে বলল. 'কিছু হয় নি।'

'তা হলে উঠে পড়ুন!'

ভুরু কুঁচকে কেমন করে যেন আনন্দর দিকে তাকাল সুধা। বলল, 'উঠব!'

আনন্দ বলল, 'বাঃ, বেশ। নৌকোয় করে ঘোরা হবে বলে কথা হল। না উঠলে ঘুরবেন কি করে?'

সুধা উত্তর দিল না। কেউ কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল সে। গলুই ধরে জোর ধাক্কায় নৌকোটাকে গভীর জলের দিকে ঠেলে দিল।
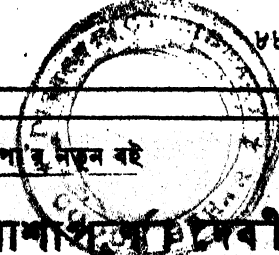
আনন্দ প্রথমটা বিমূঢ়; তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কী হল, এটা কী হল!'

সুধার ষড়যন্ত্রটা ধরতে পেরে সুনীতিও চিৎকার করছে, 'বাঁদর মেয়ে, পাজি মেয়ে—'

সুধা পুকুরঘাট থেকে গলা তুলে বলতে লাগল, 'আনন্দদা, দিদি আপনার শিকারের গল্প খুব ভালবাসে। শুনতে শুনতে একেবারে মুগ্ধ-মুগ্ধ-মুগ্ধ হয়ে যায়। সুযোগ করে দিলাম, যত পারেন শুনিয়ে দেবেন।' বলে হেসে হেসে গলে পড়তে লাগল।

(ক্রমশঃ)

আশীষ নন্দ

হাতের বাজুতে পরার জড়োয়া গহনা

অলংকার শিল্প

অলংকার শিল্প কারুশিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন শিল্পকাজ। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে তৈরী মনুসংহিতায় স্বর্ণকারদের সম্পর্কে ও বিশেষ করে অলংকার শিল্পের নানা কাজের উল্লেখ রয়েছে। অলংকার তৈরীতে নৈপুণ্য না দেখাতে পারলে বা সোনা নষ্ট করলে তার জন্য শাস্তির কথা এই পুস্তকে লেখা আছে। রামায়ণে সীতার রূপ বর্ণনাকালে নানারূপ অলংকারের কথা বলা হয়েছে। সাঁচীতে ও অমরাবতীতে যে বাস্-রিলিফের কাজ রয়েছে, ভারহুত এবং কোনারকের মূর্তিগুলিতে এবং অজন্তার গুহাচিত্রে যেসব চিত্র দেখানো হয়েছে সব জায়গাতেই প্রচুর পরিমাণে অলংকারের ব্যবহার দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অলংকার শিল্পের প্রভূত প্রচলন ছিল।

ভারতীয় অলংকার শিল্পের জন্ম কবে, কোথায় হয়েছিল তা জানা যায় নি। ভারতীয় অলংকারের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন পাওয়া গেছে কাবুল উপত্যকায় জালালাবাদের কাছে একটি বৌদ্ধগুম্ফায় রক্ষিত একটি কাস্কেটে। 'Bollas' মুক্তো খচিত সোনার এই অলংকারটির ভাস্কর্য অপরূপ।

অলংকার শিল্পের সম্পর্কে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যান্য অনেক কারু-শিল্পে যেমন বিদেশাগত ডিজাইন, মোটিফ্ প্রভৃতির ছাপ পড়েছে অলংকার শিল্প কিন্তু সে হিসাবে অতি রক্ষণশীল। আজও এই শিল্পে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপই বিশেষভাবে প্রকট। এককথায় বলা যায় যে অলংকারশিল্প ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সরে যায় নি। অবশ্য এমন কারুশিল্প আরো আছে।

এই শিল্পটি আয়তনেও বৃহৎ এবং সারা ভারতের বোধ হয় এমন অঞ্চল খুব কমই আছে যেখানে একজনও স্বর্ণশিল্পী নেই। লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যবসার সংগে নানাভাবে যুক্ত রয়েছেন যুগ যুগ ধরে। বংশানুক্রমিক তাদের এই পেশা। পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত হচ্ছে তাদের কলাকৌশল। প্রতিভাবানেরা চিরকালই নতুন নতুন নক্সার প্রবর্তন করেছেন, ভেঙেছেন, গড়েছেন এবং নতুন শিল্পশৈলীর জন্ম দিয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বর্ণকাররা কারীগর সম্প্রদায়ের জন্য যে নয়টি শ্রেণীর পত্তন হয়েছিল সেই গোষ্ঠিভুক্ত। মালাকর, চিত্রকর, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কর্মকারদের সংগে স্বর্ণকারদেরও এই সমাজবন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।

অলংকার শিল্পের মধ্যে বিশেষ করে হীরা-মুক্তো, চুনী-পান্না বা এককথায় জড়োয়া
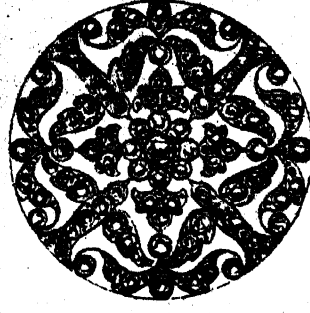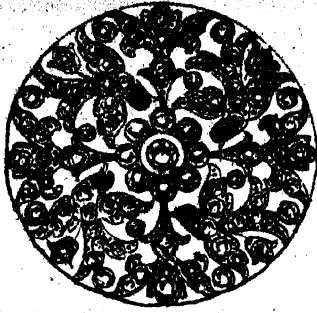
বোর—কপালের ওপরে ঝোলা গহনা, টিকলীর মতো (মণিমুক্তাখচিত)

গহনার কাজে এক সময় বাংলাদেশের খুব নাম ছিল। আজও কম নাম নেই। কলকাতায় জড়োয়া গহনার ব্যবসা বহু পুরোন। ইংরেজ কোম্পানী হ্যামিলটন, জোসেফসন, প্যারী কি শেঠ বদ্রীদাস, লীলারাম, বসেকের দোকানই কলকাতার পুরোন দোকান নয়। এই ব্যবসায়ে অনেক বাঙালীও ছিলেন, আজও আছেন। বি সরকার, হরিচরণ আঢ্য, বিনোদবিহারী দত্ত প্রভৃতির নাম তো শুনেছেনই কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁদের কথা আজ আমরা অনেকেই ভুলেছি। চাষাধোপা-পাড়ার দোলগোবিন্দ রায়েদের কি কম বড় কারবার ছিল! এখন কে মনে করে রেখেছে তা!

জড়োয়া গহনার প্রস্তুতকারক পুরোনো বাঙালী কারীগরদের নামও আজ বিস্মৃতির গহ্বরে। একবার অনেক চেষ্টায় কয়েকটি নাম পেয়েছিলাম। শ্যামচন্দ্র কর্মকার, নারায়ণচন্দ্র কর্মকার, জহরচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম জেনেছিলাম। এ'রা ছিলেন হ্যামিল-টনের বাড়ীর কারীগর। চন্ডীচরণ ও হাওড়ার মণিলাল দাস ছিলেন জোসেফ-সনের বাড়ীর শিল্পী। রায় বদ্রীদাসের একজন বিখ্যাত কারুশিল্পীর নাম ছিল ব্রজনাথ দত্ত। এছাড়াও গোষ্টবিহারী প্রভৃতি আরও অনেক শিল্পী ছিলেন পুরোনো কলকাতার জড়োয়া গহনার কাজের সুদক্ষ কারীগর।

স্বর্ণশিল্পে বাংলার খ্যাতি ছিল সুদূরবিস্তৃত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাকাব্যে এখানকার স্বর্ণশিল্পের নামের উল্লেখ রয়েছে। এতে জানা যায় যে, বাংলা-দেশের স্বর্ণশিল্পীরা তখন তারবালা, কান-পাশা, আংটি ইত্যাদি তৈরী করতেন। ডঃ টেইলর ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং দিনাজপুরের অলঙ্কার শিল্পের বিশেষ করে ঢাকার রূপোর জালিকাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঢাকার শিল্পীরা রূপোর জালি-কাজের অতি উৎকৃষ্ট আতরদান বানাতেন। এছাড়া অন্যান্য অলঙ্কার হার, কানের গহনা ইত্যাদিও তারা বানাতেন।

বাঙালীর অলঙ্কারের প্রতি আসক্তির কথা কে না জানে! বাংলাদেশে 'সোনা'র নামে অগুনতি গ্রাম আছে। সোনারপুর, সোনামুখী, কাঞ্চননগর, সোনাখালী, সোনারগাঁ প্রভৃতি। মধ্যযুগে তো বাংলার রাজধানীই ছিল কর্ণ-সুবর্ণ।

বাংলাদেশে নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রভূত অলঙ্কার পরতেন। বাংলাদেশের অলঙ্কার শিল্পে যে গহনাগুলি সর্বাধিক প্রচলিত তাদের মধ্যে রয়েছে মল এবং চরণচূড়, বিছে, আংটি, বালা, মানতাসা, রুলি, কঙ্কণ, চুড়ী, চূড়, অনন্ত, তাগা, আর্মলেট, বাক, তাবিজ, হার, চিক, নথ, কানপাশা, কানবালা বা মাকড়ি এবং কুন্ডল, চুলের কাঁটা, চিরুনি, টিকলী, টায়রা প্রভৃতি।

বাংলার অলঙ্কার শিল্পের মধ্যে যে নক্সাগুলি সবচেয়ে প্রচলিত তার মধ্যে রয়েছে সাপের মুখ এবং সাপ, ধানের শিষ, মকর মুখ, প্রজাপতি, ময়ূর, জংলা লতা, পাতা এবং পাতার শিষ, মাছ, শাঁখ, চাঁদ ও চাঁদমালা এবং তারা প্রভৃতি। মেট্রো ডিজাইন, জলতরঙ্গ ডিজাইন প্রভৃতিও কিছু দিন আগে খুব চালু ছিল।

এখানে তিন রকমের গহনার প্রচলন দেখা যায়, তারের গহনা, এমবস্ করা গহনা এবং ঢালা ও পেটাই করা গহনা। এক সময় মীনা কাজের খুব চল হয়েছিল। এখন মীনা কাজ আর সে-রকম চোখে পড়ে না।

জড়োয়া গহনা বা মূল্যবান পাথর বসানোর কাজে বাঙালী কারুশিল্পীর কৃতিত্ব অসাধারণ একথা আগেই বলেছি। অধিকাংশ কারীগরই, বিশেষ করে কলকাতার বাইরের স্বর্ণশিল্পীরা এখনও সাবেকী যন্ত্রপাতি দিয়েই কাজ করে থাকেন। জড়োয়া গহনার ক্ষেত্রে অবশ্য কলকাতার অনেক প্রতিষ্ঠান এখন আরও মজবুতভাবে পাথরের কাজ করার জন্য নানা রকম বিদেশাগত টেকনিক Mellegtuff Coronet এবং Claw Cutting পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন।

একটি সোনার আংটি ছাড়া বাঙালীর বিয়ে হয় না। 'নোয়া' সাবিত্রী শাঁখা আর যৎসামান্য সোনার গহনা অতি দরিদ্র কন্যা-কর্তাও তার মেয়ের বিয়েতে এটুকু সংস্থান করতে চেষ্টা করে থাকেন। আজও বাঙালী মেয়ে সোনার গহনাকে তার ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে সযত্নে রক্ষা করে থাকেন। লক্ষ্মীপুজোর দিন গৃহিণী সযত্নে নিজের গলার সোনার হারটি খুলে পরিয়ে দেন লক্ষ্মীর গলায় আর কামনা করেন যেন তার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি আরও সমান্বিত হয়। (নক্সাগুলি টি সি আঢ্যির সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

রুধির রঙ্গিণী

ক্যাথলিন ফিলিপ

[ক্যাথলিন ফিলিপ একটি সত্য ঘটনার ভিত্তিতে এই কাহিনীটি লিখেছেন এবং লণ্ডনে কাহিনীটি প্রকাশের পর বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।]

একটা বেশ চকচকে লাল রঙের ভ্যানে করে সকাল থেকে মালপত্র আসছিল কয়েক খেপে। আমি সেই প্রথম লক্ষ্য করলাম যে, পাশের লিনডেন কটেজের সামনে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল। আমি বেশ ভালো করে দেখি কে, কি বৃত্তান্ত! আমার কাছে এর মূল্য অনেক। আমি নিজেই নবাগত, এখানে একরকম একা-একা আছি, যাঁরা আসছেন, তাঁরা না জানি কেমন মানুষ এই চিন্তা আমার মনে জেগেছিল। সত্যি কথা বলতে কি আমার এই নতুন প্রতিবেশীদের কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা।

প্রতিবেশী হিসাবে বেশ ভব্যযুক্ত মনে হল। স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রীটির দেহ কৃশ, পাতলা হালকা গড়ন। গায়ে একটা সবুজ পোষাক, সেটা ভারী সুন্দর ম্যাচ করেছে ধূসর পিঙ্গল চোখের সঙ্গে—মাথার চুলগুলি তামাটে এবং সোনালি রঙের।

স্বামীটি কিন্তু অন্য ধরনের, একটু মোটা-সোটা, ভারী-ভুরি চেহারা। আমার মনে হল ভদ্রলোকের শরীরটা বেশ মজবুত, দেহে প্রচুর রক্ত আছে, তেজ আর শক্তিও যথেষ্ট।

এইসব ভাবছি এমন সময় পোস্টম্যান শাম সর্ট আমার সামনে এসে দাঁড়াল। শামের কাঁধে তার ভারী পোস্ট-ব্যাগটা ঝুলছে।

আমি বললাম তাকে অভিনন্দন জানিয়ে—গুডমর্নিং পোস্টম্যান! দেখছি লিনডেন কটেজে নতুন মানুষের আগমন

হচ্ছে। ভালোই হল। আমরা ফাঁকা-ফাঁকা ছিলাম।

পোস্টম্যান জবাবে বলে—ঠিক বলেছেন স্যর: এঁদের নাম ব্লাংকার, ওঁদেরও কিছু চিঠিপত্র এসেছে—

এই বলে পোস্টম্যান ওদের গেটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করল। কিন্তু সহসা পিছলে পা হড়কে পড়ে গেল—রাস্তার ওপর আস্ত কলাগাছের মত আড় হয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাই।

বললাম—আহা! ব্যাপার কি ভাই? লেগেছে খুব? কি হল কি?

বিভ্রান্ত কণ্ঠে পোস্টম্যান বলল—কিসের ওপর পড়ে গেলাম কে জানে! এতদিন এই পথে যাওয়া আসা করছি কিন্তু এমন কখনও হয়নি। রাস্তার ঠিক ওপরটায় এমন গর্ত আগে ত' দেখিনি।

অতি সাবধানে পায়ের গোড়ালিটি মুক্ত করল শাম সর্ট।

আমি বললাম—শোনো শাম, তুমি নড়া চড়া কোরো না, এইভাবেই বরং থাকো একটু, আমি তোমার চিঠিগুলি বরং ওদের বাড়ি দিয়ে আসি, তারপর তোমাকে তুলবো। মনে হচ্ছে গোড়ালিটা ফুলে উঠেছে।

এই ভাবেই ব্লাংকারদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটল। আমি ওঁদের কাছে গিয়ে সাময়িকভাবে পোস্টম্যানের দায়িত্ব কেন কাঁধে চেপেছে তা সবিস্তারে জানালাম। মিঃ ব্লাংকার এগিয়ে এলেন শামকে সাহায্য করার জন্য—এইভাবেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ পরিচয় হয়ে গেল।

মিসেস ব্লাংকার বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সবাইকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পাত্র মদ্যপানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

মিসেস বললেন স্বামীকে, গ্লাসগুলি দাও, আমরা নিজেরাই নিজেদেরটুকু ঢেলে নিতে পারি।

স্বামী মিঃ ব্লাংকার বললেন—বাবা, এইভাবে জিনিসপত্র নিয়ে নড়া-চড়া কি সোজা কাজ? আর এ-কর্ম নয়—আর কোথাও এখন নড়ছি না।

আমি পানপাত্র তুলে ধরে বললাম—আপনাদের দীর্ঘ অবস্থিতির কামনায় এ-পানপাত্র উৎসর্গ করছি—এই পল্লীটি বেশ

শান্ত, নির্জন, আপনিও নিশ্চয়ই তা জানেন।

ব্লাংকার ভারী গলায় বললেন—সে-কথা ঠিক! ব্রেনডার শরীরটা খারাপ, মাঝে বেশ কিছুদিন অসুখে ভুগেছে। বায়ু-পরিবর্তনে এইরকম আবহাওয়া ও পল্লী-পরিবেশ ওর পক্ষে উপযুক্ত হবে ডাক্তাররা বললেন। আমার কাজকর্মও এখান থেকে চালানো সম্ভব, শহর থেকে তেমন দূর নয়, তবে আমাকে অফিসের কাজে মাঝে মাঝে একটু দূরে পাল্লায় ছুটতেও হয়। শীগগীরই যেতে হবে এইরকম একটা ট্রিপে।

শাম এতক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে. অবশ্য গোড়ালিটা ফুলে উঠেছে। সে বলে ওঠে—এখানকার ইলেকট্রিক ট্রেন-সার্ভিস সত্যি ভালো। তারপর শাম সবিনয়ে বলে ওঠে—এইবার আমাকে যেতে হবে, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কখনও এইভাবে পড়িনি এর আগে। ভাগ্যিস মিঃ মারচাম আপনি ছিলেন—ঠিক সময়ে উঠিয়ে নিয়েছেন. ও ব্যথাটুকু সেরে যাবে। মানে সেরে গেলে আর থাকবে না—

নিজের রসিকতায় বুঁধ নিজেই হেসে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—আমি বরং তোমার হাত ধরে একটু এগিয়ে দিই শাম।

তারপর নতুন প্রতিবেশীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—পরে এসে গোছগাছের ব্যাপারে সাহায্য করা যাবে, অবশ্য যদি প্রয়োজন থাকে—

ব্রেনডা উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে বলল—নিশ্চয়ই আসবেন, আমাদের খুব উপকার হবে। আমি তেমন পারি না এতসব।

আমরা পথে নেমে পড়লাম, ব্রেনডা হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

।। দুই ।।

সুতরাং জন এবং ব্রেনডা ব্লাংকারদের সঙ্গে যে আমার অতি দ্রুত ঘনিষ্ঠতা হল, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। জন এবং আমি দুজনেই দাবা খেলতে ভালোবাসি, তাই সহজে জমে গেল। ব্রেনডাকে যতটা দুর্বল মনে করেছিলাম প্রথমটায়, ও তার চেয়ে অনেক বেশী কাহিল। অনেক রাতে আমি এবং জন যখন খেলে উঠেছি, তার অনেক আগেই উনি বিছানা নিয়েছেন।

মাঝে মাঝে আমরা এ-অঞ্চলের মদ্য-বিপণি 'ওয়াগন অ্যান্ড হর্সেস'-এ গিয়ে বসতাম। বিয়ারের পাত্র হাতে নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত দাবা খেলতাম।

এত বেশী রাত্তির হয়ে যেত এক-একদিন যে, আমি একটা চাল নিয়ে হয়ত ভাবছি, হঠাৎ দেখি জন চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এইরকম অবস্থায় আমি নিঃশব্দে চলে আসতাম। জনের ঘুম না ভাঙিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

এইরকম একটি রাত্রির পরদিন প্রাতে আমার ঘুম ভাঙতেই আমার দাসীটি হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—স্যর, শুনে দুঃখিত হবেন আপনার বন্ধু মিঃ ব্লাংকার কাল রাতে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ও'র স্ত্রীর ঘরে কোনো রকমে টলতে টলতে যখন ঢুকেছেন, তখন রাত দুটো, আর আতংকে সমস্ত দেহটা কাগজের মত শাদা হয়ে গেছে। মিসেস ব্লাংকার পোস্টম্যানকে দিয়ে খবর দিয়েছেন যে, ব্রেকফাস্ট শেষ করেই ও'দের বাড়ি যেতে, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে।

আমি সবিস্ময়ে বলি—আশ্চর্য! যতক্ষণ আমরা খেলেছি, ততক্ষণ ত' ভালোই ছিল। কি হতে পারে, এত হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল!

তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম, তারপর ছুটলাম লিনডেন কটেজের দিকে। গেটের কাছে পৌঁছাতেই দেখি ডাক্তার ফ্রাঙ্কলীন বেরিয়ে আসছেন।

আমি বললাম—গুডমর্নিং ডাক্তার-সাহেব। ব্রেনডা আমাকে সকালে খবর পাঠিয়েছেন। শুনলাম কাল রাতে জনের হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়েছে।

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, তাঁকে বেশ চিন্তিত মনে হল। একটু বিভ্রান্তকণ্ঠে তিনি বললেন—ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা শ্যক লেগেছে, ভীষণ কোনো আতংকে শরীরটা হঠাৎ এমন হয়ে গেছে, এদিকে পালসও কেমন এলোমেলো। এছাড়া আর কিছুই ত' বুঝতে পারছি না।

এরপর আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা, বলুন ত', কখনো কোনোরকম প্রাচ্যদেশীয় অসুখ-বিসুখের কথা আপনাকে কি বলেছেন? যেমন, ম্যালেরিয়া বা ঐ জাতীয় কিছু? কাঁধের ঠিক ওপরটায় কি একটা কামড়েছে। খুব বড় মশা বা ডাঁশ-জাতীয় কোনো পতঙ্গের কামড় হতে পারে। অনেকে এই জাতীয় ইনসেক্ট-বাইটে এমন কাতর হয়ে পড়ে। উনিও হয়ত তাই—

আমি মাথা নেড়ে বললাম—আমার ত' কিছু জানা নেই। আচ্ছা, ব্রেনডাকে জিজ্ঞেস করেছেন কী?

—না, ও'কে আর ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, এমনিতেই ত' ও'র শরীর যা দুর্বল দেখলাম।

ততক্ষণে স্বয়ং ব্রেনডা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে দেখে বলে উঠল—হ্যালো ইভলিন! তোমাকে দেখে খুসী হলাম। এসো জনকে দেখে যাও। সকাল থেকে তোমাকে খুঁজছে।

ডাক্তারসাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে আমি ভেতরে গেলাম। জন একটি চেয়ারে বসেছিল। অনেকটা আমি যে-ভঙ্গীতে ওকে কাল রাতে দেখে এসেছিলাম সেইভাবে।

আমি সবিস্ময়ে বলি—বারে, আমি ত' ভেবেছিলাম তোমাকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখব। কি হল তোমার বলো ত'?

জনকে অতিশয় শীর্ণ এবং ম্লান দেখাচ্ছে। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। ওর গাল-দুটি সাধারণতঃ লাল হয়ে থাকে. আজ সেই গালদুটি কেমন ধূসর রঙের মনে হচ্ছে। চোখের কোল বসে গেছে।

—কি যে হয়েছে ভাই, সেইটাই ত' তোমার কাছে জানতে চাইছি! তোমাকে প্রশ্ন করব বলে বসে আছি। তুমি আমার মন্ত্রটাকে মারতেই আমি তোমার রাজত্বটা নিলাম। তারপর যেটুকু মনে আছে তা হল যেন অনেক দূরে থেকে, অনেক পথ অতিক্রম করে ঘুম ভেঙে উঠলাম। মনে হল, মরে আছি। শরীরে কোনো বল নেই। অতিকষ্টে পা টেনে টেনে টলতে টলতে ওপরে উঠে এসেছি।

আমি যা সত্য কথা তাই বললাম—আমি যখন দেখলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, তখন উঠে পড়লাম। নিশ্চয়ই কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ।

কফির ট্রে হাতে নিয়ে ব্লেনডা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—সেইটাই ত' মজার ব্যাপার। স্বপ্ন একটা দেখেছেন ঠিক-ই, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেন না।

জন বলল—একটা অদ্ভুত কিছু ঘটেছে, একটা বিশ্রী ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেছে—

কথাগুলি উচ্চারণ করে ও ভয়ে কেঁপে উঠল। ব্লেনডার চোখে একটা বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করে যতদূর সম্ভব সরস করে বললাম—এরপর তুমি যখন দাবা খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়বে, আমি নিজে কোলে করে এনে বিছানায় শুইয়ে দেব, তারপর বাড়ি যাবো।

আমার এই ধরনের উক্তিতে ফল হল। ওরা একটু উৎফুল্ল হল। ধীরে ধীরে ব্লেনডার মুখের সেই উদ্বিগ্ন ভাবটা কেটে গেল।

। তিন ।

এই ঘটনার পর আমার চোখের সামনেই একটা অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটতে লাগল। ওদের দুজনের অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। পল্লী-পরিবেশে ব্লেনডার শরীরের ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে, আর বেচারী জন দিন দিন কৃশ হয়ে পড়ছে। জন শুধু শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছে তা নয়, তার মুখ-চোখের ভাব পরিবর্তিত। সে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

একদিন ব্লেনডা শুতে যাওয়ার পর আমি এই নিয়ে ওকে সোজাসুজি বললাম। ম্লান গলায় জন বলল—আমি সবই বুঝেছি ভাই। কিন্তু কি যে হয়েছে ঠিকমত ঘুম হয় না, আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি ঠিক, কিন্তু যখন বিছানা ছেড়ে উঠি, তখন যেন আমার শরীর আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমি অনেকক্ষণ অবধি পড়ার চেষ্টা করি। তুমি চলে যাওয়ার পরও বই পড়ি, মনে আশা থাকে যে উত্তম নিদ্রা হবে। কিন্তু সব বৃথা। আমাদের একই বিছানা, ব্লেনডার ঘুমে ঘুব গাঢ়, নইলে হয়ত ওকে জাগিয়ে তুলতাম।

আমি প্রতিবাদের সুরে বলি—কিন্তু এত' চলতে পারে না। এরকম ত' ঠিক নয়। তুমি না-হয় ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে আর একবার দেখা করো। তাঁর কাছ থেকে যা-হয় একটা ঘুমের ওষুধ-টষুধ নিতে পারো। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা বাতলে দেবেন।

—তা ঠিক বলেছ। আমি যাবোই। কিন্তু মুসকিল কি জানো বার বার ঘুম ভেঙে যায়, মনে হয় ভীষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কেমন একটা ভৌতিক, উদ্ভট দুঃস্বপ্নের ঘোরে মন ভরে থাকে।

আমিও ভয় পেয়েছি এতদিনে। প্রশ্ন করি—কি জাতীয় দুঃস্বপ্ন বলোত?

প্রশ্ন করে ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।

জন গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। একটা কিছু মনে করার জন্য ভীষণ চেষ্টা করে। তারপর অতি ধীরে ধীরে আত্মগত ভঙ্গীতে বলে—ঠিক মনে করতে পারছি না—কেমন একটা অস্পষ্ট, অদ্ভুত ছবি মনে জাগছে, সম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার। কে যেন আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে, কি যেন করছে, সে যে কে তা আমি চিনি, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই তা বলতে পারব না। আবার ব্যাপারটি যে কেন এত ভীষণ তাও বলতে পারছি না।

নিজের দুটি হাত নিয়ে সজোরে নিংড়ে ধরে, যেন তার ভেতর থেকে কিছু একটা সে টেনে বার করতে চায়। কোন একটা বিস্মৃত পর্ব।

সত্যি, এ বড় বিশ্রী অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি যেমনটি ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক খারাপ। কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই নীরবে বসে থাকি। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠায় মনটা ভরে উঠেছে। এইরকম কষ্ট করে মনে আনার হাত থেকে নিষ্কৃতি-দানের জন্যই প্রশ্ন করি—আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়েছে। তোমার গলার সেই কাটার অবস্থা কি? ওর ওপর ত' এখনও প্লাসটার লাগানো দেখছি। কেমন আছে ঘা-টা?

সেই গোলাকার গোলাপী প্ল্যাসটারে একবার হাত বুলায় জন, তারপর বলে—এটা যে ঠিক ঘা তা নয়, তবে কি জানো, কিছুতেই সারছে না।

এরপর ও উঠে দাঁড়ায়। বলে—আমাদের মন থেকে এসব চিন্তা মুছে ফেলা যাক। আমি দাবার ছকটা নিয়ে আসি, ভালো বাঁধার আছে, দু পাত্র বীয়ার টানা যাক।

এই আমরা শেষবারের মত দাবা খেলেছিলাম, এই আমাদের শেষ খেলা। পরদিন একটু কাজের তাগিদে শহরে যেতে হল, বেশ দু-চারদিন সেখানে আটকে রইলাম। এখানে ফিরেই বাড়ি ঢোকার আগে লিনডেন কটেজে গিয়ে কে কেমন আছে জানতে গেলাম। ব্লেনডা দোর খুলে দিল। কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল—তার মুখ একেবারে কাগজের মত শাদা—।

আমাকে দেখে বলল—ইভলিন, তুমি এসেছ, কী যে আনন্দ হচ্ছে। আমি তোমার ঠিকানা জানি না, নইলে লন্ডনে খবর দিতাম। জনের একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। এখন হাসপাতালে আছে।

ধীরে ধীরে ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজাটি বন্ধ করে আমি বলি—বলো, ঠিক কি হয়েছে বলত? অবস্থাটা কতটুকু খারাপ?

—তুমি যে ফিরে এসেছ কি যে ভালো লাগছে। একটা কথা বলার মানুষ নেই। মারটনে যাচ্ছিলেন সাইকেল চালিয়ে খবরের কাগজ আমার জন্য। তখন সন্ধ্যা হয়েছে,

বেশ অন্ধকারে এমন সময় একটা মোটর পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। আমাকে চিনতে পারছেন না, কিছু বলতে পারছেন না, সর্বদা একটি নার্স আছে দেখাশোনার জন্য।

সত্যি দুঃসংবাদ। আমি প্রশ্ন করি—আচ্ছা কাউকে কি দেখা করতে দেওয়া হয় না?

—আমি গিয়ে পাশে বসতে পারি, কিন্তু তাতে কোনো ফল নেই। আজ রাতে আমাকে হাসপাতালে থাকতে দেবে। আমি দু-একটা জিনিস নেওয়ার জন্য এলাম।

একটা স্যুটকেশ গোছানো রয়েছে দেখলাম। ব্রেনডা বলল—আমি কিন্তু এখন যাই, যদি জ্ঞান হওয়ার পর আমাকে খোঁজেন।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আমিও বরং তোমার সঙ্গে যাই না, কি বলো?

ব্রেনডা বলল—না, না, ধন্যবাদ। আপনি কত ভালো! না, আমি ঠিক যাবো'খন। আমি গিয়ে হয়ত ভালোই দেখব। আজকে হয়ত ও'র শরীরে রক্ত দেওয়া হবে।

মারটন এখান থেকে দু তিন মাইল। ব্রেনডা মোটরে ওঠার সময় বলল—এমনই ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন কি বলব! দেখলে কষ্ট হয়। কী সুন্দর চেহারাই না ছিল, আপনি ত' দেখেছেন!

চিন্তাকুল মনে বাড়ির দিকে চলি। জনের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ। রক্ত দেওয়া হবে। জনকে রক্ত দিতে হবে। প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিলাম সেই দিনটির কথা মনে পড়ে, কী শরীর! সারা দেহে রক্ত যেন উপচে পড়ছে। সেই মানুষের এই অবস্থা।

সেদিন সন্ধ্যাটা একা-একা অতিভয়ং অশান্তিতে কাটল। প্রতিদিনকার মত আজও জনের সামনের চেয়ারটিতে বসবার বাসনা হচ্ছিল। সামনে দাবার ছক, টেবিলের ওপর বীয়ারের মগ, কি আনন্দের দিন। জনকে যে এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম তা কোনোদিন মনে ভাবিনি। আমি হাসপাতালে ফোন করলাম। একজন নার্স জানালো—উনি এখন ভালোই আছেন, ও'র স্ত্রী সামনে বসে আছেন। মাঝে মাঝে একটু জ্ঞান হচ্ছে, আবার অচেতন।

রাতটা নিদ্রাহীন কাটল। সকালে উঠে কাজকর্মে মন দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের দাসীর মেয়েটাকে কাগজের মন্ড থেকে কয়েকটা পুতুল বানিয়ে দিলাম। ওদের স্কুলে দিতে হবে। কাগজ আর আঠা নিয়ে এই কর্মে বেশ মনঃসংযোগ করেছিলাম। আমার হাত বেশ খুলে যাচ্ছিল এমন সময় ব্রেনডার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমাকেই খুঁজছে—

ওর মুখের ভাব এক ঝলক দেখে নিয়ে বুঝলাম ওর মনে একটু স্ফূর্তির ভাব জেগেছে। আমি বললাম—এসো, ভেতরে চলে এসো। জন কেমন? একটু বসো, আমার হাতটা পরিষ্কার করে নিই।

আমার সঙ্গে প্রায় বাথরুমের দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসে ব্রেনডা বলল—হ্যাঁ, অনেকটা ভালো। আজ আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন। ওরা বলল রাতে থাকার দরকার নেই। এখন আর সবসময় নার্সও নেই, তাই মনে হয় ভালো হয়ে উঠছেন।

ব্রেনডার কণ্ঠস্বরে আনন্দের আভাস পাওয়া গেল।

আমি হাত মুছে বললাম—তাহলে জনের নিরাময়ের খাতিরে একপাত্র পান করা যাক।

ওর এই সংবাদে আমার বুকের ওপর থেকে একখন্ড পাথর নেমে গেল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ব্রেনডা বলল—সিসটার বলছিল তুমি একসময় গিয়ে দেখে আসতে পারো। তোমার কথা বলছিলেন বার বার।

এইভাবে গা ছড়িয়ে বসে আনন্দ করছিলাম যখন তখন কি জানি যে আমাদের এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী নয়। অনেক, অনেকদিন পরে আবার হয়ত হাসতে পারব।

আমার মনটার বেশ আনন্দভরা। পরদিন প্রাতে ব্রেকফাস্ট শেষ করে পাইপটা ধরাব এমন সময় পোস্টম্যান শ্যামের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

—মিঃ মারচান আজ চিঠি নিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল। আমার নাতিটা বয়স্কাউটে ঢুকেছে, এখন বলো ভাবতে পারো। যেন ওর বিছানাটা কিছু নয়। কাল রাত চারটের সময় দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসেছে। মুখখানা প্রেতের মত করে কাঁপতে কাঁপতে বলছে—একটা সাদা মুখ ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়েছে, ওর ঘুম ভেঙে গেছে, আতঙ্কে পালিয়ে এসেছে।

পোস্টম্যান কথা বলতে বলতে আমার বসার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর কাছ থেকে চিঠি নিতে গিয়ে আমার হাতটা কেঁপে যায়। বয়স্কাউটদের রাতের বেলায় ভূতে ভয় দেখাচ্ছে এই চিন্তায় আমার শরীরেও যেন কাঁপুনি ধরে গেল। রক্ত জল হয়ে গেল—আমি প্রশ্ন করি—কেমন আছে এখন?

—আছে ভালো। তবে হতভাগার গলায় মশা বা ডাঁশের মত কি একটা কামড়েছে।

শ্যাম যাওয়ার উদ্যোগ করল, আমার বুকটা কেঁপে ওঠে—জনেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল।

আমি বললাম—শ্যাম তুমি একটু দাঁড়াও। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। দেখে আসি ছেলেটা কেমন আছে! নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে।

শ্যাম বলল—না, না, তা করবেন না। আজ সকাল থেকে সবাই ওর দিকে নজর রেখেছে। ধন্যবাদ স্যার, আপনি এত ভেবেছেন। আচ্ছা, স্যার এখন যাই। এইসব আজেবাজে কাজে একেবারে ভীষণ দেরী হয়ে গেছে।

শ্যাম এই ঘটনাকে 'আজে-বাজে-কাজে' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করায় আমার হাসি এল। সে উড়িয়ে দিতে চায় এদিকে এই সংবাদে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। কি করা যায় চিন্তা করছি এমনসময় টেলিফোন বেজে উঠল—আমার উকীল ফোন করে জানালেন যত শীঘ্র সম্ভব শহরে গিয়ে যেন কিছু কাগজপত্র সই করে আসি তাড়াতাড়ি দরকার। আমার মনে মনে ইচ্ছা জনের সঙ্গে একটু দেখা করি—

।। চার ।।

লন্ডনে সকালটা কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম, ঠিক বৈকালিক চায়ের সময়। আমার দাসী মিসেস হোয়াইটহেডকে আমার খাবার আমার সময় বিশেষ সর্তোস এবং আতঙ্কিত মনে হল। অথচ মিসেস হোয়াইটহেড বেশ ঠান্ডা মাথার মানুষ।

আমিই কথা শুরু করি—বয়স্কাউট কেমন আছে?

—ঐ ম্যাথুস? সে ভালোই আছে। এর চেয়ে ভালো আর হয় না, মরলে আর কথা বলত না।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গ্রামের মত মিসেস হোয়াইটহেডও ম্যাথ্যুসের এই ক্যাম্পে রাত্রিবাস পছন্দ করে না। এমনসময় মিসেস হোয়াইটহেড বলে উঠল—তা নয় স্যার, আসলে চিন্তা হচ্ছে আমার বোনঝিকে নিয়ে। আপনি ত' জানেন ও য়ারটন হসপিটালের নার্সগিরি করে। সেও এইরকম দেখেছে।

মিসেস হোয়াইটহেডের কাহিনী যা তার আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর, কি ঠিক জানি না, আমি যেন সহসা পীড়িত হয়ে পড়লাম। আমার হাত থেকে ছুরিটা শব্দ করে প্লেটে পড়ে গেল।

—না, স্যার, আপনাকে বলা ঠিক হয়নি আমার। আমি স্যার ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কথাটা বলিনি। আপনি চা-টা শেষ করুন। আমাকে মাফ করুন। আপনি একেবারে সাদা হয়ে গেছেন।

এই বলে মিসেস হোয়াইটহেড অনুনয়-বিনয় শুরু করল।

আমি যথাসম্ভব ঠান্ডা গলায় বললাম—মিসেস হোয়াইটহেড তা নয়। দুপুরে রোদে ঘুরেছি অনেক তাই বোধহয় শরীরটা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়। তুমি বলে যাও, তোমার বোনঝি কোথায় এই মুখ দেখেছে? নিশ্চয়ই য়ারটনে নয়?

মিসেস হোয়াইটহেড কাহিনীটা বলতে চায়, তার প্রতিক্রিয়াটা যে কেমন হবে তা না ভেবে বলে যায়—

—জানেন, ওর নাইট ডিউটি ছিল। ওর ওপর ছিল বিশেষ করে মিঃ ব্লাংকারের দেখাশোনার ভার। ঠিক দুটোর সময় ও'কে দেখতে গিয়েছিল। উনি তখন জেগে ছিলেন। আমার বোনঝি বলল—এক কাপ গরম কফি এনে দেবে। ঠিক যেই মুখ ফিরিয়েছে তখন দরজার পাশে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই মূর্তি। ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাদা প্রজাপতির মত মুখখানি। জানালায় উঁকি দিয়ে ও দেখার চেষ্টা করে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে, গ্লাসের ভেতর দিয়ে হাতটা চলে গেছে, ওর হাতটা কেটে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। দুদিনের জন্য ওকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছে।

আমি শান্ত গলায় বলি—কিন্তু নিশ্চয়ই একই মুখ নয়, হয়ত কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে।

গলার স্বর মৃদু করে মিসেস হোয়াইটহেড বলে—লণ্ডন থেকে ডিটেকটিভ আসছে স্যর এই বিষয়ে খোঁজ-খবর করার জন্য।

তারপর গলার স্বর আরো খাটো করে বলে—বেটী, আমার বোনঝি, বলছিল ম্যাথ্যুসের গলায় ক্ষত আর মিঃ ব্লাংকারের ক্ষত ঠিক একই ধরনের।

এক মুহূর্তের জন্য আমার ভীত শঙ্কিত দৃষ্টি ওর চোখের ওপর পড়ল। আমার বুকটা কেমন করছে, গলা শুকিয়ে এল। আমি ভীতকণ্ঠে বললাম—কিন্তু ব্যাপারটি কি মনে হয় তোমার?

—আমি জানি না স্যার, তবে আমার স্বামী ম্যার্ট বলছিলো যে একবার সিনেমায় এমন একটা জিনিস দেখেছিল, তার নাম ড্রাকুলা, মানুষের রক্ত চুষে খায়, রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত।

এ একেবারে অসহ্য। আর সহ্য হয় না। আমি ছড়ি আর হ্যাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মিসেস হোয়াইটহেড আমার হাতটা ধরল, বলল—

—কোথায় যাচ্ছেন? আমি যদি আপনি হতুম তাহলে কিছুতেই এসব কথা মিসেস ব্লাংকারকে বলতাম না।

আমি সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকাই।

দারুণ বিস্ময়ে প্রশ্ন করি—কেন? কেন বলতে না?

—স্যর। উনি হয়ত এসব জানেন না,—

তারপর আরো কাছে সরে এসে বলল—হয়ত জানতেও পারেন। সব কিছুই হয়ত জানেন।

আমার ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠল। সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। আমি মিসেস হোয়াইটহেডের বাধা দূর করে চীৎকার করে বললাম—ননসেন্স!

তারপর কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ভাবি তাহলে গাঁয়ের লোক ভ্যাম্পায়ারের কথা ভাবছে, ড্রাকুলার কথা চিন্তা করছে। এইসব অশুভ ব্যাপারের সঙ্গে প্রাচীন প্রাসাদ বা ভগ্নস্তূপ জড়িয়ে থাকে, কিন্তু বিশ শতকের এমন শান্ত পল্লী অঞ্চলে এ ঘটনা অসম্ভব। ব্রেনডাকে গ্রামের লোক সন্দেহ করছে। এমন রূপবতী মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে কত ভাব-ভালোবাসা। এই স্ত্রীর জন্য জনের চিন্তার শেষ নেই।

জন বলত—ওর জন্য পল্লীগ্রামের বাতাস প্রয়োজন। শান্ত পরিবেশ ওর পছন্দ। আমার কানে ভেসে এল জন বলছে—ওর শরীরটা খারাপ। অনেকদিন ভুগেছে।

কি হবে, পুলিশ কি ওকে ধরে নিয়ে যাবে ডাইনী বলে? কে জানে। কিছু একটা করা যাক। কিন্তু কি করা যায়?

অনেকক্ষণ এলোমেলোভাবে বেড়িয়ে যখন ফিরছি তখন দেখি আমাদের গেট থেকে কে বেরিয়ে গেল—সে ব্রেনডা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে বাড়িটা প্রদক্ষিণ করল। তার বুকের কাছে একটা কোট জড়ো করা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি চীৎকার করে উঠি—ব্রেনডা দাঁড়াও, কথা আছে। ব্রেনডা! কিন্তু ব্রেনডা চলে গেল। মিসেস হোয়াইটহেড বলল—আপনি এসেছেন স্যার, মিসেস ব্লাংকার এসেছিলেন। বলছিলেন মিঃ ব্লাংকার ভালো আছেন। উনি বোধহয় চলে গেলেন। আসুন স্যর। আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কিছু খেয়েছেন স্যর?

আমি কথা বলতে পারছি না, বড় ক্লান্ত। আমি মাথা নাড়লাম। ব্রেনডা এরকম পালাল কেন? এমন ভয়-ভয় ভাব কেন? জনের সম্বন্ধে কিছু কি! কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই।

এমন সময় দেখি আমার ড্রয়ারটা খোলা। আমার ড্রয়ারটা কে হাঁটকেছে। ওমা, যা ভেবেছি তাই, আমার তৈরী সেই প্রজাপতি মুখোসটা নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। জানলার ওপর কার মুখ। জানলার পরদা সরিয়ে দেখি—সেই মুখ, সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এ দৃষ্টি মানুষের নয়, এ প্রেতিনীর ভয়ঙ্করী মূর্তি। ব্রেনডা আমার মুখোসটা পরেছে, কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না, আমার কি হল, আমি কি শেষপর্যন্ত ব্রেনডার শিকার হলাম—পিশাচী ব্রেনডা আমার সমস্ত রক্ত চুষে নিচ্ছে—

কারা যেন বাইরে কথা বলছে, কিন্তু আমি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত নেই—সব ফুরিয়ে গেছে।

—অমিতাভ মজুমদার অনূদিত

সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি
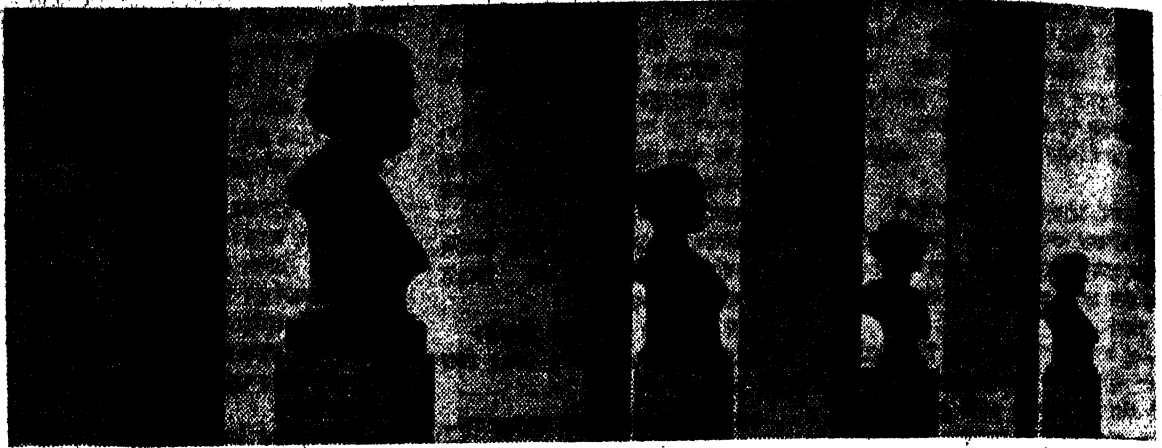
মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন শ্রীমতী জেন আডামস। তারপর জীবনের সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর কেটে গেল এ কাজে। নানা স্বীকৃতিতে তাঁর এই কর্মজীবন ভরে উঠেছিল। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের বিখ্যাত উক্তি : জেন হচ্ছেন ইউনাইটেড স্টেটসের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নাগরিক।

এসব অনেকদিন আগের কথা। আবার মনে পড়লো। ১৯৬৮ সালের মে মাসে শ্রীমতী জেনের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন হল নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেট আমেরিকানদের জন্য সংরক্ষিত হলঘরে। তাঁকে নিয়ে এই হলঘরে স্থাপিত মহিলা আবক্ষ মূর্তির সংখ্যা দাঁড়ালো নয়। এরকম মূর্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল ১৯০০ সালে। ন'জন নারীসহ এরকম ভাগ্যবানের মোট সংখ্যা ভিরানব্বুই।

এজন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন হয়। যে কোন নাগরিক অথবা সংস্থা মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে পারেন। এর একমাত্র সর্ত হচ্ছে প্রার্থীকে আমেরিকান নাগরিকের পূর্ণ যোগ্যতাসহ পঁচিশ বছর আগে দেহান্তরিত হতে হবে। ইতিহাসে দাগ রাখার কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এবার নির্বাচনের পালা আবক্ষ মূর্তি বসানোর শিকে কার ভাগ্যে ছিঁড়বে। নির্বাচন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগবিহীন বিখ্যাত ব্যক্তিরা, যাতে কোনরকম পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ না ওঠে। এবারের নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী ছিলেন শ্রীমতী জেন। সঙ্গত-কারণেই তাঁর প্রার্থীপদ গৃহীত হয়।

শ্রীমতী জেন উনিশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত সমাজ-সেবিকা। 'সোস্যাল সেটেলমেণ্ট হাউস' আন্দোলনের তিনি ছিলেন পাইওনীয়র বিশেষ। দেশের সামাজিক সংস্কার এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁকে 'গড মাদার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। শান্তিরও তিনি ছিলেন অক্লান্ত যোদ্ধা। সেজন্য ১৯৩১ সালে তিনি প্রথম আমেরিকান মহিলা হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

শ্রীমতী জেনের সমাজসেবাই কীর্তিমণ্ডিত। সমাজসেবার অসংখ্য আধুনিক আন্দোলনের তিনি ভিত প্রস্তুত করে গেছেন। কিন্তু তাঁর [illegible] কীর্তি [illegible] শিকাগোর 'হাল হাউস' যা কিনা দেশ ও জাতির পক্ষে প্রথম তো বটেই বিশেষ প্রভাবশালী সেটেলমেণ্ট হাউস। ইউনাইটেড স্টেটসের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বিশ্বের নানা জায়গা থেকে কৌতূহলী দর্শকরা আসেন 'হাল হাউস'-এর প্রোগ্রাম সম্বন্ধে গভীর উৎসাহ নিয়ে এবং তাঁরা সকলেই নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে ফিরে যান। শ্রীমতী জেনের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

বেশ স্বচ্ছল পরিবারেই শ্রীমতী জেনের জন্ম হয়েছিল। তিনি অতি সহজেই সুখ ও শান্তির নীড় গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি। অন্য ধরনের জীবন তিনি চেয়েছিলেন। গ্রাজুয়েশনের পর ডাক্তারী পড়ে গরীবদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ১৮৮১ সালে তিনি স্নাতক হন। কিন্তু শারীরিক কারণে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মেডিকাল কেরিয়র স্বপ্নই রয়ে গেল। কিন্তু লণ্ডনে টয়েনবী হল দেখার পর তিনি অন্যভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। এটাই হলো পৃথিবীর প্রথম সেটেলমেণ্ট হাউস। লণ্ডন থেকে তিনি দেশে ফিরে এলেন। সেই সঙ্গে তাঁর মনে গাঁথা রইলো একটি প্রতিজ্ঞা। শিকাগোতে তিনি এরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। খুঁজতে খুঁজতে মনের মত জায়গাও পাওয়া গেল। জায়গাটায় অধিকাংশই কারখানার শ্রমিকদের বাস। নিগ্রো এবং বহিরাগতের ভিড়ও এখানে মন্দ নয়। বাড়িঘর স্বাভাবিকভাবেই জীর্ণদশাপ্রাপ্ত। রোগব্যালাই বেশ জাঁকিয়েই আছে।

শ্রীমতী জেন আর দেরি করলেন না। এরকমই একটা বাড়ি পছন্দ করে 'লীজ' নিলেন। বাড়িটি পরিষ্কার করে কলেজ-বন্ধু ইলেন গেটসের সাহায্যে নতুন করে সাজালেন। এজন্য তাঁদের

ঘটতে হলো প্রচণ্ড। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে আনন্দও পেলেন খুব।

তারপর এলো সেই সময়। ১৮৮৯ সালে শ্রীমতী জেন হাল হাউসের সূচনা করলেন এবং তারপর থেকে আমৃত্যু তিনি এখানকার প্রধান বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৩৫ সালে শ্রীমতী জেন পরলোকে যান।

প্রথম বছরেই হাল হাউস পঞ্চাশ হাজার দুর্গত মানুষের সেবা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ধারা আজো অক্ষুণ্ণ আছে। সেই দিনে শ্রীমতী জেন একাধারে ছিলেন ইউনাইটেড স্টেটসের রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা এবং একই সঙ্গে দীনতম প্রতিবেশীর সর্বাপেক্ষা নিকটতম বন্ধু ও সহায়ক।

হাল হাউসে কর্মী মায়ের সন্তানদের জন্য কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া যা আছে তার সংখ্যা এবং প্রয়োজনীয়তা খুব একটা কম নয়। এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো, আর্ট গ্যালারী, লাইব্রেরী, মিউজিক স্কুল এবং ক্লাসেস ইন ইংলিশ অ্যান্ড ক্রাফটস। এসব হয়েছিল শ্রীমতী জেনের আমলেই। তারপর হাউসের পরিধি বিস্তৃত হয়। নতুন ভবনে স্ত্রী-পুরুষের ক্লাব রুম, কর্মী মেয়েদের হোম, শিল্পশিক্ষার্থীদের ওয়র্কশপ, শ্রমিক ইউনিয়নের মিটিং হল এবং সর্বোপরি 'লিটল থিয়েটার।'

শ্রীমতী জেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে হাল হাউসকে সমাজসেবা ও আইনী শাসনের একটি কেন্দ্র করে তোলেন। এ'দের পরিকল্পনার মধ্যে পাবলিক বাথস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপার শহরের প্রথম সার্বজনীন খেলার মাঠ, যুবক-যুবতীর জন্য সংসঙ্গ, এবং জাতির প্রথম জুভেনাইল কোর্টও ছিল। এসবকে বাস্তবায়িত করতে শ্রীমতী জেনসহ সবাইকে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে।

সমাজ প্রশাসন এবং উন্নয়নের ব্যাপারে হাল হাউস যথেষ্ট কীর্তিমণ্ডিত অবদান রেখেছে। শিশু শ্রমিক ব্যবস্থার বিলোপ তাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব। তাছাড়া নারী শ্রমিকদের আটঘণ্টা ডিউটি এবং কারখানা নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তনেও হাল হাউস সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আজকাল অবশ্য এসব সারা ইউনাইটেড স্টেটসে প্রায় ডালভাতের সামিল হয়ে গেছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলবে না যে, এজন্য সব কৃতিত্বই পাওনা হচ্ছে শ্রীমতী জেন ও হাল হাউসের। আমেরিকার সবাই একথা স্বীকারও করেন।

শ্রীমতী জেন জীবনে একটি মাইনে করা চাকরি করেছেন। সেই চাকরি হলো জঞ্জাল অপসারণের খবরদারি করা। উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সকলকে এর গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করা। চাকরি করা ছাড়াও তিনি এজন্য অর্থসাহায্য করেছেন, বক্তৃতা করেছেন এবং লিখেছেন। হাল হাউস সম্পর্কে সবাই অবহিত হলে নানা সাহায্য আসতে থাকে। তখন নতুন গৃহ পরিকল্পনা হয় এবং কর্মসূচীও বিস্তৃত হয়।

সমাজসেবার হাল হাউসের কোন ছেদ পড়েনি। এবং আজো এখানকার বিরাট কর্মসূচী ঠিক পালন করা হচ্ছে। আজকের আরো বৈশিষ্ট্য হলো, হাল হাউস মূল কেন্দ্র ছাড়াও শিকাগো শহরের নানা জায়গায় অনেক শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেসব জায়গায়ও একই ধরনের কর্মসূচী উদ্‌যাপিত হয়। পুরানের মহিমা নিয়ে শ্রীমতী জেনের হাল হাউস দাঁড়িয়ে

আছে। জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়েছে। হাল হাউস আজ জাতীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে সম্মানিত হচ্ছে। সকলের কাছেই এর দরজা উন্মুক্ত।

সমসাময়িক সময়ে এমন একটি সামাজিক আন্দোলন বা সংগঠনের নাম করা যায় না যার সঙ্গে শ্রীমতী জেনের সম্পর্ক ছিল না। মেয়েদের ভোটাধিকারের জন্য তিনি রীতিমত লড়িয়ে ছিলেন, নিগ্রোদের দাবীদাওয়ার ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাছাড়া ন্যাশনাল কনজিউমার্স লীগ এবং আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন ও অন্যান্য সামাজিক কাজে তিনি ছিলেন একান্ত অপরিহার্য।

শ্রীমতী জেনের জীবনের আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল বিশ্বশান্তি। এজন্য জীবনের শেষভাগের প্রায় সবটাই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। বিশ্বে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন উওমেন্স ইন্টার-ন্যাশনাল লীগ ফর পীস অ্যান্ড ফ্রীডম। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা তিনি সফর করেন এবং বক্তৃতা করে বেড়ান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নেবারহুড-বেটারমেণ্ট কনসেপ্টের প্রয়োগে তিনি চেয়েছিলেন চিরস্থায়ী শান্তি।

শ্রীমতী জেন এবার স্থান পেলেন ইতিহাসখ্যাত আমে-রিকানদের সঙ্গে সেই বিখ্যাত হলে যেখানে জায়গা করে নিতে অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে হয়। বলাবাহুল্য, সে যোগ্যতা তাঁর ছিল।

—প্রমীলা

শাদা বাড়ি ॥

আলোক সরকার

অনবহিত হাওয়া বনের পাতা ঝরায়।
আমার হেমন্তকাল কোনখানে অন্ধকার। অনন্ত নীল
বনের চন্দ্রলতা—শাদা বাড়ির অন্যমন নিঃসঙ্গতায়
শ্যাওলাজমা নিস্তব্ধ, অলস মালতীকুঞ্জ।

কোথায় অভিমান? কোন প্রতীক্ষার শব্দহীন বিসর্জন?
কোথায় বাগান ছিলো, পায়ে-চলার পথ, পথ-শেষের কুটির?
ধুলোয় লুণ্ঠিত একা অশ্রুবিহীন নির্জন।
আমার হেমন্তকাল অনবহিত রিক্ততায় প্রশ্নহীন বধির—
কেবল শাদা বাড়ি অন্যমন শাদা বাড়ি নিঃসঙ্গ শাদা বাড়ি
আর নিস্তব্ধতা শ্যাওলাজমা অন্ধকার তমসাময় চুল।

দুটি কবিতা

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

গৈরিক পথের বাঁকে

গৈরিক পথের বাঁকে কে ডাকে
অমল কণ্ঠে

অথচ
পুড়েছে বন
ঝরে পড়েছে
এখনো আমার।

তোমরা কি অনন্তকাল ভারবাহী কাফ্রী ক্রীতদাস?

ভগবান তবুও স্থির
বিদ্রোহের দাঁতে দাঁতে তীব্র বিষ
কুটিল লালসা।

কোথা নীলকণ্ঠ পাখী
দেবতার
স্বর্গের প্রাকারে,

গৈরিক পথের বাঁকে কে ডাকে
এমন উজ্জ্বল কণ্ঠে
এখনো কে ডাকে।

অবচেতন দুঃস্বপ্নের প্রেতছায়া আশ্চর্য নিথর।

এ কোন আর্তিতে

অসহায় আর্তস্বরে কেঁপে উঠছে স্বর্গের সোপান
দিগ্বিদিকে প্রতিধ্বনি
কোন প্রার্থনার মন্ত্র
শোনাবো এখন।

উদ্‌ভ্রান্ত ঝড়ের বেগে
ভেঙে পড়ছে জনপদ—প্রিয়ঘর—রমণীর স্মৃতি
গিরিশীর্ষ আন্দোলিত
জলস্রোতে নিরালম্ব বস্তুময় আশ্চর্য প্রহর

এ কোন দুঃসহ কাল
জ্যোৎস্নার রক্ত ঝরে পড়ে
শূন্যে ভাসমান পাখী
নক্ষত্র সংসার জ্বালাময়
নিঃসঙ্গ নায়ক দ্যাখ শূন্যে আছে রক্তের বেদীতে
অসহায় আর্তস্বরে কেঁপে উঠছে ইন্দ্রপুরী
স্বর্গের সোপান।

মার এক স্কুলফ্রেণ্ড অজিত, এক াড়ি থেকে পালিয়ে বিলেতী এক উঠে পড়েছিল লুকিয়ে তারপর মারধর খেয়ে—অনেক কাকুতি- করে জাহাজের সামান্য খালাসী হয়, ছোটখাটো একজন অফিসার হয়ে বছর পরে। সে এখন একজন াকি স্মাগলার। যখনই তার জাহাজ তার জাহাজঘাটে ভেড়ে তখনই তার থেকে কিছু না কিছু সমগ্রী াশ হয়। তার মধ্যে প্রধানতঃ ঘড়ি, নিপেন প্রধান। গায়ে গরমকালেও ূল্যবান কিছু জামাকাপড় শীতকাল া কথাই নেই টিপটু-বাঁধা ক্যাপড়- জোড়া মানুষটা পোর্টের বাইরে একেবারে নাশ্প হয়ে যায়। বললাম— দেখা হচ্ছে, এসব বিক্রি করিস অজিত। বললে আমাদের আবার র অভাব। সারা কলকাতা শহরটাই মালার সিটি হয়ে গেছে—কোন া চাই বল সব পেয়ে যাবি। আমার কত জাহাজী তোদের জন্যে শহরে মাল যোগাচ্ছে।

বললাম, তবু ধর সব দোকানেই তো সব জিনিষ কেনা বা বেচা যায় না, তোদেরও তো ভয় আছে—বল ভয় নেই পুলিসের?

ধাঃ, পুলিস আমাদের কি করবে, আচ্ছা মানুষগুলোকে আমরা হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে রেখে দিয়েছি—তারওপর রুপিয়া ওড়াচ্ছি—রুপিয়ার ধুলো এমনি চিজ বাবা, একবার উড়লে চোখে ধাঁধা লেগে যায় হাত ওঠে না—সে যাই হোক তবু একটু আধটু ভয় করতে হয় বৈকি, তবু খালি ডকের ধারে খিদিরপুরে মেটিয়াবুরুজ এসব অঞ্চলে অনেক নিরীহ দোকান বা মানুষ আছে যারা মোটেই নিরীহ নয়, আমাদের জাহাজীদের বড় বন্ধু ওরা, ওদের সাহায্য ছাড়া আমাদের জিনিষ পার করা সহজ কথা নয়। আমরা তাদের কাছে জিনিষ নিয়ে পৌঁছে যাই। কখনো ক্যাস টাকা নিই কখনো জমা রাখি। এরা আমাদের টাকা কখোনো মারে না। এদের কিছু লোক আছে যাদের দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই—তারা কলকাতার বাবু—বলতে পারিস তারা দালাল। তারা খবর আনে পার্টির। বিশ্বস্ত পার্টি না হলে জিনিষ হস্তান্তরিত করা হয় না।

আমি বলি, কেমন করে বুঝিস বিশ্বস্ত তারা?

দালাল যারা তাদের কথার ওপরই বিশ্বাস করতে হয়। তাদেরও তো প্রাণের ভয় আছে। তাছাড়া আরও কি জান, কলকাতার লোকে আজকাল স্মাগলিং জিনিষের বড় ভক্ত। সকলেই স্মাগলিং করা জিনিষ কিনতে চায়। ভালো রেডিও ক্যামেরা ঘড়ি কলম মূল্যবান জামাকাপড়—ভালো কোন জিনিষ দেখলেই লোকে মনে করে বা সন্দেহ করে স্মাগলিং চিজ এবং আচ্ছা চিজ। এর সুযোগে আরও কিছু ব্যবসায়ী আছে তারা করে কি এদেশেই তৈরী জিনিষের ওপর বিদেশী ছাপ লাগিয়ে স্মাগলিং জিনিষ বলে চড়া দরে বাজারে ছাড়ে। দেখে কিনো ভাই যদি কোন জিনিষ কিনতে চাও তা না হলে বেমালুম ঠকে যাবে।

আমি বললাম, অজিত, আমাকে একটা ভালো ঘড়ি এনে দাও।

অজিত বললে—নিশ্চয়। তুমি ত আমার ঘনিষ্ঠ, বাল্যকালের ফ্রেণ্ড। তোমাকে আমি এক্ষুনি একটা ঘড়ি উপহার দিচ্ছি। অজিত

নিজের হাতঘড়িটা খুলে আমার হাতে এগিয়ে দিল।

আমি বললাম, করছ কি! আমি তোমার পুরোনো ঘড়ি নেবো কেন? আমি একটা নতুন ঘড়ি কিনতে চাই। কত দাম...

অজিত হেসে বললে, পুরোনো কোথায়? একেবারে নতুন। জাহাজ থেকে ফ্রেস জিনিষ নিয়ে এসেছি। বড্ডবার জাহাজে বাখ একটা করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা তুমি যখন দাম দিতে চাচ্ছ কেনা দামটাই দিয়ে দাও। সিঙ্গাপুরের ফ্রি পোর্ট থেকে আনা সুইজারল্যাণ্ডের সেরা মাল। দেখছ এর ডায়ালটা। অটোমেটিক, সমুদ্রের গভীরে নামলেও জল ঢুকবে না। আগুনে পোড়ালেও কাঁটা চলবে। বল এমন জিনিষ দেখছ দোকানদের ইণ্ডিয়াতে। অজিত আকাশের দিকে তাকালো একবার, বললে, ইন্দুর মুখে শুনলাম তুই নাকি আজকাল লেখালিখি করছিস—আমার কথা লিখবি, আমার স্মাগলার জীবনের কথা?...তোকে বরং আমাদের মক্ষিরাণীকে দেখাতে পারি—যাবি আলাপ করবি?

মক্ষিরাণী? তিনি কে!

মক্ষির মত তিনি এলাইনে উড়ে বেড়ান। পুলিসের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাঁর নিজের কথা বড় বিচিত্র।

অজিতের ট্যাক্সি আমাকে নিয়ে এল পার্ক স্ট্রীট সারকুলার রোডের মোড়ে বিরাট একখানা ফ্লাটবাড়িতে। কত বিচিত্র সেখানকার অধিবাসী। এগলি ওগলি পার হয়ে একখানা দরজার সামনে এসে বেল বাজাল অজিত। দরজা খুললেন একজন মহিলা। আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন।

অজিত বললে, মিনতি কেমন আছ?

মিনতি বললে, ভালো। তোমার কথা আমি ভাবছিলাম। কাজ আছে। ভেতরে এসো। বসো।...আমরা ...বসলাম। একটু ভয় ভয় করছিল। অজিত বললে, মিনতি আমার কিছু টাকার দরকার আগে। মিনতি বললে, আমার কাজ শোন আগে কি করতে হবে। বলে আমার দিকে তাকালো। অজিত বললে, বলতে পার ও কোড বুঝবে না, ভালো ছেলে।

সত্যি বুঝলাম না কিছু। কি ভাষায় কথা বলল। এটাই বোধহয় স্মাগলারী ভাষা। আমি কেবল মক্ষিরাণীকে দেখছিলাম—চেহারা বেশ সুশ্রী এবং সুন্দরীও বটে। হাসিটা বেশ।

অজিতের কথায় ধ্যান ভাঙলো, চল আমার কাজ শেষ হয়েছে। বাইরে এসে বললে, মক্ষিরাণীতে মজেছিলি মনে হচ্ছে। রূপটাই ত ওর সম্বল। রূপ দেখিয়ে ভদ্রলোকের মাথা ঘুরিয়ে ও কাজ হাসিল করে নিয়েছে জানিস। তবে দিলটা ভালো। যখনই আমার টাকার খুব দরকার হয়েছে মক্ষিরাণীর কাছে দাঁড়িয়েছি, পেয়েছিও। আমাদের জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার জেমসব্যাটা একেবারে অর্থপিশাচ, নিজের পয়সা বার করবে না অন্যের পয়সায় পিনবে।

জেমসের সূত্রেই আমার মিনতির সঙ্গে আলাপ পরিচয়।

টাকা হাতে পেয়ে জাহাজী অজিত খুস-মেজাজ—কি খাবি বল? অজিত আমাকে টেনে নিয়ে গেল একটা বারে। বললাম তুই খা সকালবেলায় আমি কিছু খাই না।

তুই একটা মেয়েছেলে। যাক যে পেলেন কিছু একটা নে। মক্ষিরাণীকে দেখলি তো ওর বয়স কত বলতো? নিজেই আবার বলল, বাইশও হতে পারে বেয়াল্লিশও হতে পারে। ওর যে কোন রূপ সত্যি আমরা অনেকদিন মিশেও বুঝতে পারিনি। কত রূপ কত বেশ কত ড্রেস আমরা জানি না। পুলিস ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অথচ পুলিসেরই বড় কর্তাদের কারো সঙ্গে হয়তো হোটেলে ডিনার সাপার খাচ্ছে, দিললাগি করছে সেই-সঙ্গে কাজ হাসিল। ওকে ধরবে কে? ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় সেকেণ্ড অফিসারের দৌলতে। সেকেণ্ড অফিসার জেমস পাক্কা জাহাজী। আমরা ত যাকে বলে ছিঁচকে স্মাগলিং করি—ছিঁচকে স্মাগলার—এ পোর্টের জিনিষ ও পোর্টে এনে ঝেড়ে দিই। রাঘব স্মাগলারদের চুলের গোড়া পর্যন্ত ধরা যায় না। হঠাৎ হয়তো একদিন দেখলাম কোন এক পোর্টে আমাদের জাহাজ নজরবন্দী করে পোর্ট থেকে দূরে রাখল—আমাদের পোর্টে নামতে দেবে না। তখনই শুনলাম জাহাজ করে সোনাদানা আসছে অথচ আমরা কেউ জানি না। কেপ্তেন পর্যন্ত জানেন না। খুব কাস্টম অফিসাররাও খুব স্মাগলারদের মত। তাদের ঠিক নজর আছে টেনে বার করল সোনার বার। এমন অনেক জিনিষ লুকানো অবস্থায় এক পোর্ট থেকে আর এক পোর্টে ভেসে চলে যায় কে যে রাখে কখন যে রাখে কেমন করেই বা রাখে বা বাইরে পাচার করে দেয় ধরা মুস্কিল। এমনি চলেছে সারা পৃথিবী-ময়—অথচ আমরা কেউ জানতে পারি না। অবশ্য সব সময়ে যে জানি না তাও ঠিক নয়। জেনেশুনেও অনেক জিনিষ পাচারের সাহায্যকারী হই।

বার থেকে বেরিয়ে আমরা একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। অজিত ফিরে যাবে জাহাজে। গঙ্গারঘাটে আলোআঁধারীতে আমরা দুজনে বসলাম—অদূরে আলোর মালা। সামনে অজিতের জাহাজের পতাকা উড়ছে। পতাকা দেখে বিদেশী জাহাজ মনে হয়। অজিত একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে বলল, তোর সান্যাল স্যারকে মনে পড়ে? বললাম পড়ে। এক সময়ে অজিত ছিল গুণ্ডা—আমরা সকলে তাকে ভয় করতাম। তার হাতের গুলি পায়ের গুলি আর ঘুসির জোর আমরা বেশ অনুভব করেছি—আমরা ওর মুখের সামনে দাঁড়াতে পারতাম না। কেমন যেন লজ্জা করতো। মনে হল অজিত ঠিক পথেই আছে—সান্যাল স্যারের ভবিষ্যতবাণী মিলে গেছে। কমালীও মুদি হয়েছে—অজিত তার কথা রেখেছে স্মাগলার হয়ে। অজিত হেসে বললে, তোর মনে আছে সান্যাল স্যারের কথা? আমাকে বলতেন—তুই চোর বদমায়েস স্মাগলার হবি।

বাক্সকে শোন আমার কথা: সেদিন আমা[illegible] পোর্টের কাছাকাছি এসেছি আমি ও সেকে[illegible] অফিসার জেমস ইঞ্জিনঘরে ডিউটি কর[illegible] হঠাৎ আমাদের দুজনেরই চোখ ইঞ্জিন[illegible] অন্ধকার এককোণে একটা পেটিকা আবিষ্কা[illegible] করে ফেলল। জেমস কিছুক্ষণ দেখে[illegible] বাক্সটা তারপর বললে এ নিশ্চয়ই স্মাগ[illegible] ডিয়ার অজিত। চলো বাক্সটা সরিয়ে ফে[illegible] দিই। তুমি আর আমি চোরের ওপর বাটপা[illegible] করি। কি আছে ওর মধ্যে ভাঙো। খুলে[illegible] দেখি মারাত্মক জিনিষ—এক বাক্স [illegible] রিভলবার, জার্মানীর ছাপ। আমরা [illegible] জিনিষটা সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দিলা[illegible] কোন পোর্টে উঠেছে কোথায় যাবে জানি না[illegible] আপাততঃ আমাদের চোখে যখন পড়েছে [illegible] আমাদের সম্পত্তি। এখন কথা হল জিনিষ[illegible] গুলো জাহাজঘাটে বাইরে নিয়ে যা[illegible] কোথায়? বিক্রি বা করবো কোথায়, সাহে[illegible] বললে, ডরো মৎ, আমাদের মিনু আছে। মিন[illegible] কে? সে একজন—তোমাদের জাতের মে[illegible] আর তুমি চেন না! না চিনি না!...সাহে[illegible] এনে সোজা আমাকে তুলল মিনতির কাছে—সেই প্রথম আমি দেখলাম মক্ষি[illegible] রাণীকে। তখন সামান্য খালাসি আমি। প্রথম দেখেই মাথা ঘু[illegible] গেল। কিছু পরে সাহেবের হাত ধ[illegible] মিনতি এসে ট্যাক্সিতে বসল। আমাকে বসতে হল ড্রাইভারের পাশে। পোর্টে ফিরে এসে সাহেব খানাপিনার পর সেই যে মিনতিকে নিয়ে ঘরের মধ্যে সেঁধালো বের হল সেই ভোরবেলায়। বললে, রয় শোন, একটা উপা[illegible] মিনতি বলেছে। তুমি তো কার চালাতে পা[illegible] পোর্টকমিশনারের কাছ থেকে আমি একটা গাড়ি ধার করে সহর দেখতে বেরব, তুমি চালাবে গাড়ি। মাল পারাপারের ব্যবস্থা মিনতি করে দেবে। ও সব পারে। তা পারে বৈকি। সাহেব ও আমি অনেক কষ্টে পেটিকা সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গাড়িতে তুলে ফেললাম মিনতির হাসিঠাট্টা ফষ্টিনষ্টির মাঝখানে। তারপর ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে ফটক অতিক্রম করে এগিয়ে কলকাতার রাস্তা ধরে ছুটে চললাম। মিনতির নির্দেশমত রাজভবনের সামনাসামনি একটা আলোবাতি[illegible] নিচে থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে কলাকার স্ট্রীটের একখানা পুরোনো বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। ঘর ঘর ভাড়াটে—নানা জাতের। বিভিন্ন জাতের পেশা বিভিন্ন নেশা—কসমোপলিটন কলকাতা!...

মিনতি আমাদের ওপরে নিয়ে এল। সামনের ঘরটার অনেকটা বড় কার্পেট পাতা[illegible] সাজানো গোছানো ঘর কাউচ সোফা[illegible] অগোছালোভাবে কয়েকটি মেয়ে[illegible] ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের আগমনে। মিনতি একটি মেয়েকে ডাকল। সে সামনে এসে দাঁড়ালো। বসাও এঁদের খাতির যত্ন [illegible] নির্দেশ দিল। মেয়েটিও ব্যস্ত হল। মিনতি আমাদের অপেক্ষা করে বললে আপনারা বিশ্রাম করুন আমি পার্টি নিয়ে আসছি। ততক্ষণ আপনাদের জিনিষগুলো এর কাছে [illegible] রাখতে পারেন বলে মিনতি বিদায় নিল। জেমস আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখে[illegible]

...চিকগুলো এখনই ওদের হাতে তুলে দেব? ...আসুক তারপর দেখা যাবে।...মিনতির ...দুজন ভদ্রলোক এলেন।...আমরা এক-...নিভৃত ঘরে এলাম। মিনতি বললে, ...আমাদের জিনিষ দেখান, দাম বলুন।

আমি আমার পকেট থেকে নতুন চকচকে ...বাইরে এনে ভদ্রলোকদের মুখের ...ধরলাম। ভদ্রলোক দুজন আঁতকে ...দেখে মজা পেলাম। আমি তাঁদের হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন। তাঁরা দেখে বললেন, কত দাম চাচ্ছেন।

জেমস বললে, পার পিস ফোর ফিফটি। আমি বললাম, একি বলছ সাহেব, পুরোপুরি 'ফাইভের' কমে আমি ছাড়বো না এ মাল। কোথায় এর আরও দাম। দরাদরির পর মোটামুটি একটা দামে রফা হয়ে ভদ্রলোকরা ক্যাস টাকা দিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে আমাদের উদ্ধার করলেন।

জেমস বললে, চল যাই। মিনতি বললে, এত তাড়াতাড়ি? আমার আগের টাকাটা দিয়ে যান।

তা বটে। জেমস টাকা দিতে গিয়ে মেয়েদের কাছে আটকে গেল। মিনতি বললে, আমার জন্যে আপনাদের অনেক লাভ হল, কিছু ছাড়ুন—খাওয়ান, আমি বড় ক্ষুধার্ত।

কি খাবে বল, কি তোমার ইচ্ছে। এল মদ আর মাংস—পানপাত্র ভরে নিয়ে এল তরুণী রূপসী। সাহেব বেহুঁস। আমি ভাবলুম মুস্কিল। পকেটে ভর্তি টাকা।

আটপাড়ির ওপরে আটপাড়ি হবে না তো। মিনতি আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখেছে, আমি চলেছি। আমার পা কাঁপছে, আমার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে, কিন্তু মস্তিষ্ক এখন অসাড় নয় কাজ করছে। আমি হাত দিয়ে টাকা ভর্তি পকেটটা চেপে ধরেছি। মিনতি তা দেখে হাসছে। মিনতি আমার পকেটে টাকা চেপে রাখা হাতটা তুলে নিল হাতে—হাতের আঙ্গুলগুলো আমার গালে ছোঁয়ালো তারপর তার নরম ঠোঁট দুটো আমার গালে ঘসল। যেহেতু আমি সুন্দর অর্থাৎ বলিষ্ঠ দেহী উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী তাই কি নারীদের কামনার ধন আমি তার কোমল হাত দুটো আমার কোমর বেষ্টন করল কেন?

আমি হেসে বললাম, কি বলতে চাইছ?

কিছু না, তোমার লোভ হয় বুঝি?

মেয়েতে আমার লোভ নেই, লোভ টাকায়।

চল আমরা পাশের ঘরে যাই একটু কথা বলব।

বললাম চল, এ বাড়িটা কার?

আমার।

ওই সব মেয়েগুলো

ওরা আমার মাইনে করা তোমার এদের কাউকে পছন্দ হয়?

না।

আমাকে?

আমি তাকিয়ে রইলাম বললাম আমি সামান্য জাহাজী, তুমি অসামান্য রূপসী সুন্দরী বিরাট ধনী—আমাকে কেন লোভী করে তুলছো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। তাতে মিনতি হঠাৎ কেঁদে ফেললে... তোমার মত আমার একটা ভাই ছিল, প্রথম যখন তোমাকে দেখি তখনই মনে হয়েছে আমার—তার মুখখানা অবিকল তোমার মুখে বসানো।

আমি বললাম, তারা কোথায়।

জানি না।

আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম—তুমি কেন এপথে এলে মিনতি, তোমার কি কেউ ছিল না? আমি তোমাকে চিনি না জানি না তবু তোমাকে বলি এত সুন্দর তোমার মুখ তোমার কি বিয়ে হতে পারত না। এভাবে কেন জীবন কাটাচ্ছ যে হঠাৎ তোমাকে আমার বড় ভালো লেগেছে তাই তোমাকে প্রশ্ন করছি কিংবা তুমি আমার পুরোনো ভগ্ন রক্তটাকে ভাই বলে মুক্তি দিয়ে পুঞ্জাভিলাষির হাত থেকে বাঁচিয়েছ। তোমার দেশ কোথায় মিনতি?

পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলায়—

তোমাকে আজকে দেখে তা মনে হয় না।

মিনতির চোখে জলের দাগ। তখনও ক্ষত পুরোনো হয়নি এ লাইনে তাই কেঁদেছিল। অজিত বলেছিল, আমিও এ প্রশ্ন করেছিলাম এবং তার পূর্বজীবনের কথা আমায় বলেছিল। কিন্তু এখন বোধহয় মিনতি কাঁদে না এবং অজস্র প্রশ্নের উত্তরে হাসিমুখে সবকিছু অস্বীকার করবে। সেদিন মিনতি বলেছিল: আমি কেন স্মাগ-

লিং-এর এই চোরাকারবারীদের পথে নামলুম জান? আমার সেদিন উপায় ছিল না। পাকিস্থান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম আমি একা অনেক কষ্টে সেসময়ে। আমার ভাই মা বাবা সকলেই মারা পড়লেন আততায়ীর হাতে। আমি এসে পৌঁছেছিলাম শেয়ালদা স্টেশানে—দিনের পর দিন শেয়ালদা স্টেশানের প্লাটফরমে দিন কাটিয়েছি। দিন যে কি করে পার হয়েছে আমি জানি—দিনের পর দিন কোন কিছু না খেয়ে শুধু জল খেয়ে দিনরাত গ্যাছে তবু আমার রূপ ঢাকতে পারি নি। আমার চারপাশে অনেক লোক ঘোরাফেরা করেছে। অনেকে ভালো জামাকাপড় ভালো খাওয়া দেবে বলে প্রলুব্ধ করে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে। ঝনঝন করে আমার পাশে টাকা ফেলে দিয়েছে। আর আমি তত ভয় পেয়েছি...লুকিয়েছি মুখ ঢেকে খরগোসের মত আমার স্বজনদের মাঝে—দিনের পর দিন গেছে আমার ভরা যৌবনটাকে ঢাকার মত কাপড়খানা নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্ল্যাটফরমে সেদিন একটা লোক আমাকে ধীরে ধীরে ডাকলো অন্য চোখের দৃষ্টি নিয়ে। আমায় বললে, পয়সা রোজগার করবে। আমি তার কথা শুনে পালাচ্ছি—সে আমায় ডেকে বললে ভয় নেই—আমি তোমার শরীর ছোঁব না, অন্যায় কিছু করবো না। আমাদের ব্যবসায় তোমার সাহায্য চাই।

আমি জানতে চাইলাম কিভাবে পয়সা রোজগার হবে।

লোকটা আমাকে কোন কথা না বলে আর একটা লোকের কাছে নিয়ে এল। লোকটা বললে ৩০ টাকা পাবে, তবে তোমাকে যা বলবো সেইভাবে কাজ করতে হবে।

কাজ এমন কিছু নয়। আমার মাথায় সিঁদুর দেয়া হল, মাথায় ঘোমটা দিতে হল তারপর একটা লোকের পাশে পাশে বসে যেন তার বৌ সেজে ইস্টবেঙ্গল মেলে উঠলাম। লোকটা বললে তোমাকে আমি ছোঁব না তবে তুমি আমার পাশে বসে একটু আন্তরিকভাব দেখাও। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বল।

আমি বললাম, কি কথা বলবো?

যা মন চায়।

আমার মন কিছু চায় না, পেট জ্বালা করে খিদের জ্বালায়।

একটা স্টেশানে ট্রেন থামলে লোকটা কিছু পুরী তরকারী মিঠাই নিয়ে এল। নিজে খেল আমাকেও দিল। তারপর বলল পেট ভরেছে তো। আমি বললাম হ্যাঁ, টাকা দেবে কখন। সীমান্ত পার হয়ে খাইয়ে দাইয়ে হাতে টাকা দিয়ে তোমাকে একজনের হাতে গচ্ছিত করে আমি বিদায় নেবো। তুমি আবার তার সঙ্গে যোকথা পরে ভারতবর্ষে আসবে।

আমি সেদিন বলেছিলাম তাকে তোমাদের এ কিসের ব্যবসা আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না, আমার বড় ভয় করছে। তোমাদের দলে হিন্দু মুসলমান দুই আছে নাকি।

লোকটা বলেছিল, হিন্দু মুসলমান কেন সারা পৃথিবীর সব জাতের মানুষ আমাদের

ব্যবসায়ে আছে। লোকটা কথা শেষ হেসেছিল সেদিন। আমি তার কাছ তিরিশটা টাকা হাতে নিয়ে স্মাগলিং চোরাপথে নিজের অজ্ঞাতেই নেমে পড় এ দেশ থেকে ও দেশ থেকে যে জিনিষের আদানপ্রদান হয় গুপ্তপথে গুপ্তপথের পথিকদের যাত্রা যাতে নির্বি হয় তার জন্যে তাদের পথিকবধূ আমার এপথে যাত্রা শুরু হল। পাকিস্থান যাতায়াত করি—হিন্দু মুসল মানুষের সাময়িক যাত্রাপথের বধূ হই ব্যবসায় এসে দেখেছি এরা ব্যবসাকে বড় দেখে। জাত ধর্ম মানে না সাম্প্রদায়িক নামগন্ধ নেই। যখন হিন্দু মুসলমা প্রচণ্ড রায়েট চলছে তখনও অবাধে এ ব্যবসা চলেছে। কোন অবস্থাতেই ব্যবসা নেই। আমারও কমিশন হিসেবে কাজ বেশ চলতে লাগল। পয়সা ঝনঝন কর আমার শরীরের থেকে দারি যত আবর্জনা ত্যাগ হল, শরী মাংস লাগল। সকলে আমার দি চোখ তুলে তাকালো। আর তখ মনে হল এক তৃতীয়াংশ টাকা আ চাই তা না হলে আমার মন অখুসী হচ্ছে। চায় আরও টাকা—আমারও কদর বেড়ে আর একটা পার্টি এসে একদিন আ দরজায় দাঁড়ালো আরও বড় কমিশনের লো দেখিয়ে। আমি যা চাচ্ছিলাম সে টাকা জ পাব। তবে কাজটা—ওরা আমাকে জাহা ঘাটে নিয়ে এল। বিদেশ থেকে পো জাহাজ ভিড়লে ক্ষুধার্ত নাবিকদের খাদ্য প্রয়োজন—সে খাদ্য হওয়া চাই ন মাংস জীবন্ত তাজা একটা শরীর। আমাদের সেখানে যেতে হবে তাদের করার জন্যে এবং সেই সঙ্গে চোরাইপ ব্যবসায়ী যারা তাদের চোরাই জিনি আদানপ্রদান আমাদের মাধ্যমে হয়ে সকলের চোখের আড়ালে। ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়লাম তখন কেবল কমিশনে আমার মন ভরে না নিজে ব্যবসায় না কেমন হয়। এরপর আমার আর কিছু রইল না। কলকাতায় এসেছিলাম নিজে বাঁচাতে—মানুষের মত বাঁচতে। বেঁচেছি আমার এখন বাড়ি হয়েছে গাড়ি হয় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। খুঁজি ফিরি—সৌখি মানুষ বিরাট অফিসর ব্যবসায়ী সক সঙ্গে আমার গুপ্ত কারবার—চারদিকে জাল পাতা আছে—কিন্তু ঢাকার পথ গ্রামের ছোট মেয়েটাকে আর খুঁজে পাবে ভাই। মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু দিয়ে ফিরে চলে যাই—আবার শেয়ালদার স্টেশানের রোগা মেয়েটা যদি খেতে পেয়ে সেদিন মরে যেত তাহলে ক্ষতি হত। তাহলে তো এ জন্মটা যেত।

'এখন কি এপথ ছেড়ে চলে আস না' প্রশ্নটা করেছিল অজিত মিনতিকে প্রশ্নটা আমিও করেছিলাম অজিত মিনতি উত্তর দিতে পারে নি আমি উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু উত্তরটা ওদের জানা নেই। বোধহয় পারে না।

বিজ্ঞানের কথা

অ্যাপোলো-৮'এর পরবর্তী মহাকাশ অভিযান

অ্যাপোলো-৮ মহাকাশ অভিযানের ...রকর সাফল্যের পর আজ সকল ...ষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, ...দ্র পৃষ্ঠে মানুষের পদার্পণের দিন ...সন্নপ্রায়। কিন্তু অচিরে এটি ঘটবে না। ...প চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ সম্পর্কে ...নও কিছু সমস্যা আছে, পরবর্তী মহা-...শ অভিযানে তার সমাধানের চেষ্টা করা ...। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ ...জ্ঞান এবং মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছেন, ...পর আরও দুটি অ্যাপোলো মহাকাশ ...ভিযান করা হবে। অ্যাপোলো-৯ অভি-...নের দিন স্থির হয়েছে আগামী ২৮ ...ব্রুয়ারী। অ্যাপোলো-৯ কিন্তু চন্দ্রের ...ক্ষপথ পরিক্রমা করবে না, পরিক্রমা করবে ...থিবীর কক্ষপথে তিনজন মহাকাশচারীকে ...য়ে। অ্যাপোলো-৯ অভিযানের প্রধান ...দ্দেশ্য হবে চন্দ্রে অবতরণের জন্য নির্মিত ...নার মোডিউল' নামে অভিহিত মাকড়শা-...শ যানকে পৃথিবীর কক্ষপথে মহাকাশের ...রিবেশে পরীক্ষা করা। এর আগে মানুষ-...হীন অভিযানে লুনার মোডিউল নিয়ে ...রীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু অ্যাপোলো-৯ ...ভিযানে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করা হবে ...ম।

...এই পরীক্ষার মধ্যে থাকবে মূল মহা-...শযান থেকে এল-এম (লুনার মোডিউল) ...কে বিচ্ছিন্ন করা। এল-এম যানের মধ্যেই ...হাকাশচারীরা অবস্থান করবেন। বিচ্ছিন্ন ...র পর মহাকাশচারীরা আবার সেটিকে ...ল মহাকাশযানের সঙ্গে যুক্ত করবেন। ...বং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ও সেখান থেকে ...ত্যাবর্তনের জন্যে ভবিষ্যৎ মহাকাশচারীদের ... করতে হবে তারই পরীক্ষা করবেন ...রা।

অ্যাপোলো-১০ অভিযানের কার্যক্রম ...অনেকটা অ্যাপোলো-৮'এর মতোই। ... এটি চন্দ্রকে আরও কাছ থেকে (মাত্র ... কিলোমিটার দূরত্বে) প্রদক্ষিণ করবে ... এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে এল-এম যান। ...পোলো-৮ অভিযানে কোনো এল-এম ... ছিল না।

যদি এর কোনো একটি অভিযানে ...ই সমস্যা দেখা দেয়, তবে সেই সমস্যা ...ধানের জন্যে অতিরিক্ত আরও কয়েকটি ...ভিযান পরিচালিত হবে। যদি তেমন ...ন্য সমস্যা দেখা না যায়, তাহলে ...পোলো-৯ এবং অ্যাপোলো-১০ অভি-...নের পরই অ্যাপোলো-১১ অভিযানে ...মুষকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করানো হবে। ...র স্পুটনিকের জনক বিশিষ্ট রুশ ...জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক সেডভ সম্প্রতি ...নিয়েছেন, চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ অবতরণের ...ন পরিকল্পনা সোভিয়েত রাশিয়ার নেই।
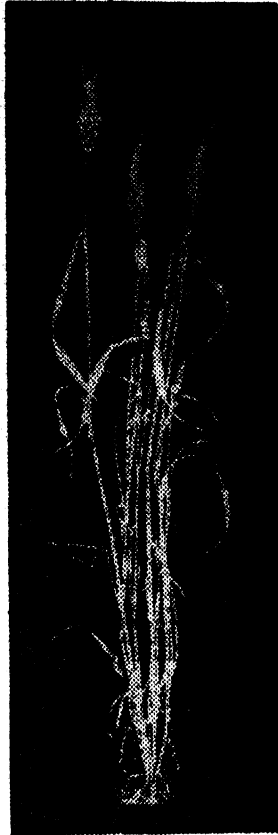
ভারতে কৃষি-গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য অবদান

গত পাঁচ বছরে ভারতে শস্যাদির ফলন উন্নয়নের জন্যে বংশগত পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা একটি নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। উপযুক্ত বর্ণ-সংকর নির্বাচিত করে এবং সেই প্রকারের শস্যে উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে ধান, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, বজরা ইত্যাদি শস্যের ফলন এত বাড়ানো গেছে, যা দু-এক বছরের আগেও কল্পনা করা যেত না। বিজ্ঞানসম্মত নতুন নতুন পদ্ধতির প্রতি কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। নয়াদিল্লীর কাছে পুসা ইনস্টিট্যুটে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের উদ্ভাবিত পারস্পরিক পর্যায়ের ভিত্তিতে রচিত বিবিধপ্রকার শস্য-ফলন পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা অভাবনীয় ফলন লাভ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬৭-৬৮ সালের শস্যোৎপাদন বছরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পর পর দু-বছর খরা ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন-হার কমে যাবার পর আলোচ্য বছরে ৯৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। বিশেষ করে গমের ক্ষেত্রে উৎপাদন-হার ষোল বছর আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে।

এই ইতিবৃত্তের সূচনা ৫ বছর আগে ১৯৬২ সালে। দীর্ঘকাল গবেষণার পর ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জলসেচের জমিতে গমের উৎপাদন হারে ব্যাঘাতের বাধা দূর করতে হলে সোনোরা [illegible] সংকর বীজ প্রয়োজন। এই সংকর বীজ ব্যবহারের ফলে ক্ষুদ্রাকার গমের দানা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু পরিমাণে হয় অনেক বেশি। মেক্সিকোতে রকফেলার ফাউণ্ডেশন এই সংকর জাতীয় গম উদ্ভাবন করেন। ১৯৬৩ সালের তাঁদের একজন বিশেষজ্ঞকে ভারতে এনে দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে এই গমের বীজ উৎপন্ন করা হয়। লারমা রোজো নামে এই বীজ অভিহিত। ভারত সরকার এই জাতীয় বীজ আমদানি করে জমিতে গমের উৎপাদন-হার বৃদ্ধিতে সুফল লাভ করেন।

[illegible] বছর আগে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ গমের উৎপাদন-হার বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন, দীর্ঘকায় জাতীয় গমের অঙ্গ-সংস্থান এবং বিকাশ-পর্যায় উর্বর জমিতেও উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়। এ-ছাড়া, গমের ক্ষতিকারক জমির পোকামাকড়ের দ্বারা এই জাতীয় গম সহজেই আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে দেখা গেছে, লারমা রোজো জাতীয় ক্ষুদ্রকায় গম এই পোকামাকড়-গুলিকে ভালোভাবেই প্রতিরোধ করে। তাই ফলনের উৎপাদন-হারে অন্তরায় সৃষ্টি হয় না।

উপযুক্ত সময়ে এই জাতীয় বীজ বপন করলে যেসব এলাকায় পোকামাকড়ের রীতিমত প্রাদুর্ভাব আছে সেখানেও ফলন বেশ ভালো হয়। ভারতের কৃষিবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, বিভিন্ন জাতীয় বীজ ব্যবহার করে এবং বার বার এক জাতীয় বীজ ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে ফলনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যায়।

ভারতের আবহাওয়ায় মেক্সিকো জাতীয় বীজ সহজেই খাপ খাইয়ে নেওয়ায় ভারতে গমের উৎপাদন-বৃদ্ধিতে একটি যুগান্তর ঘটেছে। তা ছাড়া মেক্সিকোর উৎপন্ন বীজ ও ভারতের উৎপন্ন বীজের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে বেশ সুফল পাওয়া গেছে এবং ইতিমধ্যেই ৫ হাজার বিভিন্ন রকমের সংকর উৎপাদন করা গেছে। ব্যাকটিরিয়া, অ্যালগীর ক্ষেত্রে এই বংশগত উন্নয়ন-পদ্ধতি সম্প্রসারিত করে জমিতে উদ্ভিদের জন্যে প্রয়োজনীয় ফসফেট বৃদ্ধি করা গেছে। ভারতের ফসফেট সারের অভাব থাকায় এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, তাঁদের গবেষণার ফল কৃষকদের হাতের নাগালে এনে দেওয়া। তাই পরি-ষদের উদ্যোগে নয়াদিল্লীর কাছে একটি 'বীজ-গ্রাম' গড়ে তোলা হয়েছে, যে গ্রামে কৃষকদের বিভিন্ন জাতীয় বীজ উৎপাদনে পারদর্শী করে তোলা হচ্ছে এবং [illegible]-দের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কৃষি সংক্রান্ত নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

—[illegible]

আগের ঘটনা

[আরো বন্যা আছে। জীবন ও প্রকৃতির ভিতরের দিকে সে আসে। প্রেম কিংবা কা... আসলে তার প্যাশন। তাই লীলাকে ভাসিয়ে নেয় সুখেন। সত্যর সংসার এসে তছনছ করে দিল তারই বাল্যবন্ধু। রূপপুরের মায়া ছাড়ল সত্যচরণ। ঘরে এল যমুনা। সত্যর চোখে রঙীন স্বপ্ন। যমুনা অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু মারা গেল নার্সিংহোমে। সত্য পাগল হল। দামাল সুখেনকে নিয়ে লীলার মনে ছিল আরেক জগৎ। কিন্তু বিধাতা বিমুখ। জুয়া, মদ আর মেয়েছেলে নিয়ে সুখেনের রয়েছে দ্বিতীয় ভুবন। এক রাতে সে-ও ফাঁকি দিল লীলাকে। শিবানীকে নিয়ে পালাল। লীলা উদ্‌ভ্রান্ত। প্রেস নিয়ে পড়ে থাকতেও মন সায় দেয় না আর। প্রেসের কর্মী রমার ছোট ভাই অহীনকে কেমন মনে ধরল। সঙ্গে নিয়ে ঘুরে এল মুর্শিদাবাদ। প্যাশন জাগল। কিন্তু অহীন পালিয়ে গেল। চারদিকে কেমন ষড়যন্ত্রের ভারী বাতাস। চোখের সামনে যেন লীলা দেখল পৃথিবীটা দুলছে। সবকিছুই টালমাটাল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৪৮ ।।

এমন একটা কিছু হতে চলেছে লীলা অনুমান করেছিল। আমল দেয়নি সংশয়টাকে। যে নিজে আছে কী নেই, তাই নিয়ে নিরন্তর ভেবে আকুল, তার পায়ের নীচে সাপ দেখবার সময় কোথায়?

এখন নাকি বসন্তকাল।

অথচ দিনগুলো কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়, কেমন তার স্বাদ টের পাওয়া যায় না। অর্থহীন শূন্য ভয়ঙ্কর হয়ে-ওঠা এই আকাশের মধ্যে ভেসে বেড়ানো। রাত আসে তার জ্যোৎস্না কিংবা অন্ধকার নিয়ে। কখন ভোরের দিকে পাখি ডাকে। ফের গনগনে অনন্ত নীল সর্বগ্রাস ফোটে। কেউ এসে ডাকলে জানতে পারে, সে আছে। বেঁচেবর্তে আছে বৈকি।

শুধু ওইটুকুই। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ লীলা ভেবে বসে, আঃ, ছাই কেউ পাগল-ছাগল এসে চেঁচামেচি করলেও বড় স্বস্তি পাই। সব একঘেয়ে হয়ে এল যে! নতুবা এখন বসন্তকাল...

এখন স্মৃতিই সার। স্মৃতিতে সুখ নেই, শুধু বিষাদ। শুধু বিষন্নতা, ধূসরতা। এমন দিনে রূপপুরের আমবাগানে ডাকা কোকিল খুঁজে কিংবা বাঁশবন চুঁড়ে বৌ-কথাকও আর গোকুলকৃষ্ণ পাখির সন্ধানে তন্ময় ছেলেবেলা সব রঙ হারিয়ে ছাই-মাখানো আকাশের একটা কোণ চোখে গুঁজে দিতেই চোখ ঝাপসা হয়। জল উপচে পড়ে। খন্টার সঙ্গে মাঠের বাজপড়া তালগাছের কোটরে একটা নীল-হলুদ ট্যাসকোনা পাখি দেখেছিল। খন্টা বলেছিল, আজ দিনটা ভালো যাবে দিদিরাণি। ও-পাখি দেখলে অভাগার ভাগ্য ফেরে।

লীলা দেখেছে ট্যাসকোনা পাখির ডানা কানে গুঁজে রাখালেরা দুর্গম বিলে-জঙ্গলে রাজপুত্রদের মত বুক ফুলিয়ে হাঁটছে। আজ তার ইচ্ছে করে পাখিটা দেখতে। বিশ্বাসের বুকে মুখ লুকাতে তীব্র ইচ্ছে আজ। একটা সহজ বিশ্বাস। কিন্তু রুচি নেই, মনের সে জোর নেই। স্মৃতি আর বিশ্বাস দেয় না। স্মৃতির দিকে ভয়ের চোখে তাকায় সে। স্মৃতি তার যা কুমুদের মত দন্দাল।

ইতিমধ্যে রমা একদিন লীলাকে জানিয়ে গেছে সম্ভবত খুব শিগগির তার বিয়ে হচ্ছে।

বরটি কে?

এখানেরই। সময় হলে সব জানতে পারবেন।

হেসেছে লীলা। প্রাণখুলে হেসেছে। রমা...রমার মত মেয়েরও বর জোটে! কে সেই মহাপুরুষ, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে বৈ কি।

আপত্তি শুধু রমার মায়েরই ছিল। অহীনের কথার মূল্য কে দেয়? তবে মাও সম্প্রতি রাজী হয়েছেন। শোভার চাকরী হয়েছে। শোভা খোলাখুলি জানিয়েছে অনু পাশ করে না বেরোলে সে ও-পথে পা বাড়াচ্ছে না। তার মানে রমার এদিক-ওদিক দেখলে শোভা সংসারের দায় নেবে।

রমার বর কে তা লীলা অনুমান করতে পারেনি। একদিন খগেনই চুপিচুপি জানাল। ও হরি, তাই বলো! তাই অত ঢলাঢলি ফেল্টুবাবুর সঙ্গে?

পরদিন ফেল্টুবাবু প্রেসে লীলার চেয়ারে বসে হুকুমজারী করছিল। লীলাকে দেখেও আসন ছাড়ল না দেখে লীলা খুব বিরক্ত হয়েছিল। লোকটা বড্ড পেয়ে বসেছে যেন। এ-অভদ্রতার মুখোমুখি উত্তর না দিলে নয়। লীলা গম্ভীরমুখে বলেছিল, এবার উঠুন। কাজ আছে আমার।

ফেল্টুবাবু সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলেছিল, বসুন, বসুন। জরুরী কথা আছে। সেদিন যে প্ল্যানটার কথা বলছিলাম...

লীলা দাঁড়িয়ে ঘামছিল। এর কোন মানে হয়? নিজের প্রেসে এসে এমনি করে বাইরের লোকের দৌরাত্ম্য সইতে হবে? রমা আসুক, বরং তাকেই সোজা বলে দেবে। কেন এসব মাতালকে সে প্রশ্রয় দেয়? এদিকে ফেল্টুবাবু লীলার মনোভাবকে আদৌ আমল না দিয়ে বলতে শুরু করেছিল, আরো একটা ফ্ল্যাট না কিনলেই নয়। ব্লকের জন্যে পরের দোরে হন্যে হচ্ছি। ব্লক তৈরির ব্যবস্থাটাও এখানে রাখতে হবে। তারপর টেলিফোন—টেলিফোন না হলে আর একদম চলছে না। কাজ বাড়তে দিয়ে যাচ্ছে...

সে ভেবে দেখবে'খন। বলে লীলা মেসিন-রুমের দিকে যাচ্ছিল।

ফেল্টুবাবু উঠে সঙ্গ নিল।...ভাববার সময় কোথা অত? আমি সব ভেবেছি। আপনি শুধু টাকার ব্যবস্থা করুন। দেখুন না, কয়েকদিনের মধ্যে সারা শহরকে আস্টে-পিস্টে ছেপে একাকার করে দিচ্ছি।

লীলা মুখ ফিরিয়ে জবাব দিয়েছিল, অত টাকা আমার নেই।

নেই তো লোন করুন। কত টাকা চাই, বলুন?

লীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত অথচ দ্রুত উচ্চারণে বলেছিল, আপনি দেবেন?

ফেল্টুবাবু হাতের তালুতে হাতের তালু ঠুকে বলে উঠেছিল, আলবৎ দেব। অনেক দিয়েছি, আরো দেব।

দিয়েছি মানে?

সেটা রমাকেই জিগ্যেস করবেন। হাজারটা দেনায় প্রেস তো ঝাঁঝরা। কাজ হলে কী হবে? মেয়ে দিয়ে এই দক্ষযজ্ঞ চালালে যা হবার হয়েছে। এখন আমি না দেখলে কে দেখবে?

লীলা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর তীব্রকণ্ঠে বলে-ছিল, আপনাকে এসব কথা বলার অধিকার আমি দিইনি। যা বোঝবার রমার কাছে বুঝব। আপনি চলে যান।

ফেল্টু ঘর তোলপাড় করে হাসছিল।... কী যে বলেন ম্যাডাম! ফেল্টুবাবুকে চলে যেতে বলার সাহস এ-শহরে কারুর নেই। আপনি মহিলা—যা বলবেন, বলুন। মহিলা-দের আমি শ্রদ্ধা করি।

লীলা গর্জে উঠেছিল, বাহাদুর, বাহাদুর!

পাল্টা গর্জাল ফেল্টুবাবু, বাহাদুর, চুপসে বৈঠা রও।

প্রেসের লোকজন উচ্চকিত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। কানাই হন্তদন্ত ছুটে বেরিয়েছে। আঃ ছি, ছি, কী মুশকিল! খগেন কিন্তু চশমার ওপর দিয়ে সব লক্ষ্য করছিল। এবার ছুটে এসে ফেল্টুবাবুর সামনে দাঁড়াল। তিড়িংবিড়িং করে নেচেকুঁদে সে চেঁচাল, বেরোও, বেরিয়ে যাও। ইয়ারকি পেয়েছ? পুলিশ ডাকব—পু-পুলিশ।

লীলা ফের গর্জাল, বাহাদুর, একে বের করে দাও।

বাহাদুর উঠে এসে ফেল্টুবাবুর হাত-ধরতেই ফেল্টুবাবু গটগট করে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরল সে। বলল, ঠিক আছে। কিন্তু মাইন্ড দ্যাট, এ-প্রেসের আমি অর্ধেক মালিক। সাইনবোর্ডটা একবার দেখো ম্যাডাম।

সাইনবোর্ড!

কবে সাইনবোর্ডে লেখা হয়েছে—লীলা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড। এর মানে কী?

মানে খগেনই বোঝাল। রমার জন্যে বসে থেকে-থেকে লীলা একসময় উঠল। প্রথমে শঙ্করজেঠার কাছে যাবে, তারপর রমার মায়ের কাছে। রাগে ক্ষোভে থরথর করে কাঁপছিল সে। মানুষ এমন হতে পারে?

রমার সঙ্গে ফেল্টুবাবু এতদিন এই কীর্তি করছিল তাহলে। আর রমা... সর্বনাশী রমা তার বিশ্বাসের মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় এমনি করে শোধ করেছে! পৃথিবীটা এত ভয়ঙ্কর, লীলা তো জানত না।

যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এখন প্রথম কাজ প্রেসটা বিক্রী করা। বাড়িশুদ্ধ—হ্যাঁ, একেবারে বাড়িশুদ্ধ। ও বিষকুম্ভ যত তাড়াতাড়ি বিদীর্ণ হয় তত মঙ্গল।

শঙ্করবাবুর কাছে যাবার পথে হঠাৎ লীলার মনে পড়েছিল, উনি তো ফেল্টু-বাবুরও উকিল।...তা হোক। কোথায় রূপ-পুরের প্রাণকান্ত ঘোষের মেয়ে, কোথায় ফেল্টুবাবু! ছেলেবেলা থেকে বাবার মত শ্রদ্ধা করেছে ওঁকে। রূপপুরে জমি বিক্রীর ব্যাপারে অবশ্য তঞ্চকতা করেছেন কিছুটা—কতখানি তা লীলার ধারণা নেই অবশ্য, কিন্তু এ যে সমূহ সর্বনাশের ঘনঘটা!

কোর্টেই দেখা পাওয়া গেল। সব শুনে বললেন, আপাতত প্রেসে সবসময় তুমি গিয়ে থাকো। ওদের দুজনকে ঢুকতে দিও না। আমি বরং বিকেলে যাচ্ছি। সব কাগজ-পত্র দেখছি। তারপর দরকার হলে দরজায় তালা বন্ধ করে দিতে হবে। তবে যা বুঝছি মা, মামলা লাগবে জোর। ফেল্টু মাতাল, কিন্তু দারুণ মামলাবাজ। ও-বাড়িটা যে কী কায়দা করে দাদাকে ফাঁকি দিয়ে হাতাল, জানলে অবাক হয়ে যাবে।

এইসব উৎকণ্ঠা আর ঝামেলায় আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। রমার আর পাত্তা নেই। ভেবেছিল ওদের বাড়ি যাবে। যায়নি লীলা। রমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছিল না।

কাগজপত্র যা প্রেসে ছিল, শঙ্করবাবু সবই দেখে এসেছিলেন। বলেছিলেন, অবস্থা ঘোরালো হয়ে আছে। তোমার সই নিয়ে ওরা নতুন রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে, ডিক্লারেশন দিয়েছে। ফেল্টুবাবু প্রেসের অংশীদার। তাছাড়া ডেমি আর রেভেন্যু স্ট্যাম্পে কম সই করাননি তুমি। ফেল্টু আমাকে সব দেখিয়েছে। ওর কাছে তোমার অনেক টাকা দেনা। মেসিন কিনবে বলে একগাদা টাকা নিয়ে বসে আছো।

তাহলে প্রেসটা ভেসে গেল।

শুধু প্রেস কেন? বাড়িও। ফেল্টুবাবুর বাড়ি ফেল্টুবাবুই নেবে। দেনা তো কম করেনি লীলা। কাগজে-কাগজে সেই কীর্তির স্বীকৃতি। অত টাকা কিসে লাগল লীলার?

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে শুধু জ্বলুনি বাড়ে। চিৎকার করে কাঁদবার ইচ্ছে হয়। পারে না। এখন বসন্তকাল। দিন-গুলো কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়। রাত আসে জ্যোৎস্না কিংবা অন্ধকার নিয়ে। কখন পাখি ডাকে। ভোর হয়। শুধু নীল ছাইরঙা বিস্তৃত আকাশ। আর কিছু নেই।

একদিন শঙ্করবাবুর কাছে গিয়ে জবাব দিয়ে এল সে। দরজায় তালা দিয়েছিল। ফেল্টুবাবু দলবল নিয়ে গিয়ে সে তালা ভেঙে প্রেস খুলেছে। যথারীতি চালাচ্ছে। থানা-পুলিশ করতে আর যায়নি লীলা। সে প্রস্তুত হচ্ছিল। অন্য একটা প্রস্তুতি চলছিল তার মনে।

কিন্তু সর্বনাশের আর একটুখানি বাকি ছিল তখনও। লীলা কি টের পেয়েছিল—অনেক, অনেক আগে যেদিন সেই মুসল-মান ভদ্রলোককে শঙ্করবাবু বলছিলেন, এ আমার মেয়ে। এর জন্যই বাড়িটা কেনা হল। 'এর জন্যই' কেন?

(৪৯)

কত রাত হয়েছে লীলার স্মরণ নেই, দুলি তার ঘরের মেঝেয় শুয়ে রয়েছে। মাদুর পেতে। অল্পসল্প গরম পড়েছে। প্রথমদিকে ফ্যানের বাতাস ভালো লাগছিল। এখন শীতবোধ হওয়াতে উঠে সে ফ্যানটা বন্ধ করে দিল। তারপর বাকসো খুলে এই বাড়ির দলিলটা বের করে দেখবার ইচ্ছে হল তার। খুবই হঠাৎ এ ইচ্ছে। কিছুক্ষণ আলস্য দিয়ে ইচ্ছেটা টিপে মারতে চাইছিল। মরল না। কেন কে জানে, আজ নিশুতি

বুঝি বিশ্বশুদ্ধ লোককে এত অবিশ্বাসী করেছে। সবাই বিশ্বাসঘাতক।

এমনকি সে নিজেও।

হ্যাঁ, নিজেও।

কোন অপরাধ নেই, তবু মার খেতে হয়। কেবল সবাই সবাইকে আঘাত করে [illegible] নিজে বাঁচতে চায়। এই তো জীবন, এইরকম বেঁচে থাকা।

গতকাল দলিলটা শঙ্করবাবু হাতে তুলে দিলে একবারটিও খুলে দেখেনি লীলা। বাঞ্ছিত দলিল এতদিন পরে হাতে পেয়েই তার লজ্জা হয়েছিল। তবু মন কী জানি এত অবুঝ হয়ে উঠেছে। কাল সন্ধ্যা থেকে একবারও খুলে দেখবার সাহস হয় নি। বুঝি কী দেখবে, হঠাৎ কী সাপের মত ফণা তুলে ছোবল মারবে বুকে! বেশী কৌতূহল ভালো না।

দুরু দুরু বুকে দলিলটা বের করল লীলা। খুলল। রূপপুর-রাণীচকের গ্রাম্য পৃথিবীতে অনেক অন্ধকার—এই দূরের শহর ছিল আলোঝলোমল, লোকগুলো ছিল উজ্জ্বল সুন্দর বিচিত্র। তাই কি? সবটাই পৃথিবীর মধ্যে। পৃথিবী ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং বুক পেতে ছোবল নিল লীলা।

তবে যেন আরেক আলাদা পৃথিবী আছে। আলাদা মানুষ আছে। সে কোথায়—তারা কারা? চোখের জলে দলিলের লেখা ভাসছিল। লীলা আজ বাসিনীর মত পথের ভিখারি।

ভোর হবার অনেক আগে সে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘুমন্ত দুলি টের পেল না কিছু। শূন্য হাতে নিরাভরণ দেহে অসম্বৃত বেশে লীলা বেরিয়েছিল ঘর ছেড়ে।

সরকারী বনের কাছে আসতেই সে সানাই শুনল যেন। রমার বিয়ে আজ? পিছনে আকাশ ভরা সিঁদুর। জন্মএয়োতী পৃথিবী রমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা পাপ করুক আর পুণ্যই করুক, ওরা ছেলেপুলের বাবামা হবে। সংসার নিয়ে বেঁচে থাকবে। লীলা যাবে। এ যে মহা-বন্যার শেষ টান!

না, সত্যি পিছনে সানাই বাজছে।

নির্মীয়মান ব্রীজের উঁচু পথে পা ফেলল লীলা। সামনে অতল খাদ। খাদে গঙ্গার কালো জল। কোথায় জল? জলের আভাস মাত্র। ধূ ধূ বালির চড়া চারদিকে। ধূসর অতিধূসর নদীর রুক্ষ বুক বড় নিষ্ঠুর দয়াহীন করুণাহীন ক্ষমাহীন মনে হয়।

জননী জাহ্নবী। হাসি পেল। তাহলে কোথায় যাবে?

পিছন ফেরা বারণ। রূপকথার গল্পে আছে, পিছন ফিরলেই তুমি পাথর হয়ে যাবে। পিছনে রাক্ষসরাক্ষসীরা মায়ার বাঁশি বাজায়—ওই বুঝি জীবন। জীবনের কত মায়া। ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ, অট্টহাসি, বুকফাটা কান্না হাহাকার, আর দরদী সানাইকার ভেঁপো বাজায়। ওই জীবন! কিন্তু আর পিছন ফিরলেই যে পাথর হয়ে যাবে তুমি। হাতে তোমার সাতশো রাক্ষসরাক্ষসীর প্রাণভোমরা সোনার কৌটোয় রাখা। ওই মায়াবীদের বিনাশ করতেই তোমার প্রত্যাবর্তন।

হতাশ হয়ে লীলা এবড়োখেবড়ো মাটির চাঙর আঁকড়ে নামল। গঙ্গার গর্ভে গিয়ে জল দেখল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য, এই হাঁটুর নীচের জল বুকের ওপর উঠে এলে বন্যা হয়। বন্যা এসেছিল একদিন। আজ সব শুকনো নীরস খসখসে। শুধু বালির চড়া। টুকরো ভাঙাচোরা ঘনকন্নার স্মৃতি আটকে আছে। দু' একটা হাঁড়ি, কাঠের টুকরো, বিসর্জিত প্রতিমার টাট। দুটি কি একটি মিয়ানো রক্তজবা। দেখে ভাবতে পারা যায় না এরা দেবতার জন্য বৃন্তচ্যুত হয়েছিল অবিকল লীলার মত। একেবারে লীলার মত।

সামনে চলে গঙ্গা পেরিয়ে গেল সে।

শূন্য সর্বেক্ষেত গমক্ষেত চষা জমি কাঁটা ঝোপ বাঁশবন পেরিয়ে রেললাইন। কে যেন পিছন থেকে ডাকল, লীলা!

লীলা ফিরে তাকাল না। পিছন ফেরা বারণ। যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। রাণীচকে একদিন তাকে কে নিশিরাতে ডেকেছিল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে। তার পিছনে আজ অব্দি হাঁটছে।

বাসিনী বলত, কেউ ডাকলেই অমনি হুট করে বেরোতে নাই। আগে জিগ্যেস কর, কে তুমি কী বিত্তেন্ত কোথা হতে আসা হচ্ছে। তাপরে যদি বুঝলে মনিষ্যি, তো খুললে। নয়ত মুখের ওপর সোজা বলে দিলে, অন্য জায়গা দেখ বাপু, হবে না। ...ক্যানে গো, শোননি সামন্তমশায়ের কথা? ভর দুক্কুরবেলা—চান করবে বলে গায়ে তেল মাখতে বসেছে। কে বাইরে থেকে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে হুট করে দরজা খুলে মিনসে বেরিয়েছে। আ মরণ! কোথা কে, কাকপক্ষিটি নাই। ইদিকে মাথায় লেগেছে দরজার কাঠে ঠোক্কর। কপাল ফুলেছে। সনধে হতে হতে সেই ফোলা যেন পেকে তাল হল। ব্যস, রাতদুপুরে সামন্তকে কাঁধে করে হরিবোল বলে আর কুতুবপুরের নিবারণ? অমনি দুক্কুর বেলা। কার ডাকে বেরিয়ে পড়েছে তো আর ফেরার নাম নাই। বাড়াভাত নিয়ে বৌ বসে আছে তো আছেই। অই মা গো, বাছারে আমার দেখা গেল—আমকোণ দূরে জলায় দড়ে গাছে ঝুলেছে... তাই বলছি মা, হুট করে ডাকলেই দরজা খুলো না। কে কী বেশ ধরে এসে কত রকম ডাক দেয়।

দিয়েছিল। তখন দুপুরবেলা [illegible]

বাড়ির দরজায় প্রথমে সাইকেলের ঘণ্টি, তারপর ডাক। ওই সেই ডাক।

লীলা!

কিন্তু এ ডাক কি সেই মায়াবীর ডাক? আবার কোন সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে তাকে? আমি আর পিছন ফিরব না। তোমার উদ্দেশ্যে মাথা কুটে বলছি, আমার আর ফেরার পথ নেই। আমি ভিখারি। কোথাও পা রাখবার মাটি নেই।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে লীলা হাঁটছিল।

লীলা!

দুকানে হাত চেপে ধরে সে মাথা ঝাঁকি দিল। মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। কেউ নেই ডাকবার। যেদিকে চলেছে, সেদিকে শুধু অন্ধকার—সব রোদ সেখানে কালো হয়ে আছে। সব দৃশ্য কণ্ঠস্বর ইচ্ছাবাসনা একাকার হয়ে মিশে রয়েছে সে ব্যাপক অন্ধকারে।

শিয়ালমারার বাঁশবনের প্রান্তে নীচু জমি—হাওড়াবারহারোয়া রেলপথের নয়ান-জুলি। সকালে খেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে এক বুড়ো চাষাভুষো মানুষ। সামনে হাতের তালুর মত পরিষ্কার একটুকরো খামার। খামারে স্তূপীকৃত পাকা গম সরিষার পাঁজা। চৈতালী মাড়াই শুরু হবে রোদ উঠলেই। অদূরে হাড্ডিসার দুটো বলদ খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে। ঝিমোচ্ছে। সারারাত বুঝি ঘুমিয়ে পোষায়নি। জাবনার পাত্র মুখের নীচে রাখা—মুখ দেবার মন নেই। বুড়োর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে খেয়োপরা উদোম গা নাতনী বুঝি। সে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে লীলাকে দেখছে। দু' একবার বলেছেও—দেখ দেখ, কী সোন্দর মেয়ামানুষ নানা! নানা ফাঁকাসে ঘোলাটে থলথলে হলুদ চোখ দুটি তুলে একবার দেখে নিয়ে জবাব দিয়েছে—কী জানি হরিশবাবুর বাড়ির কেউ, টিশনে যায়।

না নানা, টিশনে যায় না। দেখ, দেখ।

তু দ্যাখ্ বাছা, আমার এখন অনেক কাম। এই বলে বুড়ো হেঁড়ে গলায় হেঁকেছে—হেই আনিস আলি, আনিস্যা কোন সাড়া না পেয়ে গজগজ করেছে—বাবু সকল রাত উপারে টকীবাজী দেখে এসেছে বুজিন। হেই মোতির মা, মোতি মা রে! ব্যাটাকে খাম্‌চে বিছনা ছাড় করাছিনি! ওই শউরে ভূতই আমার ঘর গেরস্থালীর সব্বোনাশ করবে যে।

বুড়ো পরিতাপের ভঙ্গীতে মাথা দোলাচ্ছিল। আর ডোবার ধারে কাঠের ওপর বসে মুখ ধুতে ধুতে পা ছড়িয়ে দিয়েছিল কালো জলে এক বধূ—তার পায়ে আলতা, বাহুতে অনন্ত, কব্জিতে রুলি কানে 'কামরূপকামিখ্যের' দেশ আসামের ঝুমঝুমি (আতিমশায় এই [illegible] দিয়েছেন), পরনে সায়ার ওপর বোম্বেবালা টৌরিকটন শাড়ি; নাকে নাকছাপি আর পরবে কি [illegible] ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে উদাস চোখ তুলে দেখছিল, উঁচু 'এল-লাইনের' ধারে কো[illegible]

ঝাড় ঠেলে কোন জন্মান্তরের 'মেয়ালোক' ওঠে আসমানে।

তারপর চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে এসেছে আনিস আলি, হাতে টর্চলাইট। খামারের গমের আঁটির ওপর ধপ্ করে রাখতেই বুড়ো চেঁচিয়ে উঠেছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুকে করে আখ্। কলজের মধ্যেখানে আখ্। বাস্ রে বাস্, বিছ্নায় শুই তোর ঘরের মাগ, দিনরাত কোলে নিয়ে নেগা বা!

আনিস আলির বৌ তা শুনে মুখ-ঝামটা দিয়ে জলকে শোনাচ্ছিল, বুড়োটা গোরে যায় না গো!

সেই সময় জীবন্তী হল্ট থেকে লোকাল ট্রেন ছাড়বার শব্দ। নাতনী চেঁচিয়ে উঠেছে, হেই নানা, দেখ দেখ, মেয়াটা কী করে...হেই নান্না,...

রেললাইনের পাশে বাস, ওরা টের পায়। ট্রেনের শব্দ শুনেই তাকাতে গিয়ে টের পেয়েছে। তারপর নড়বড়ে পায়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটেছে। অই আনিস আলি, আনিস্যা! আয় বাপ, বুজিন কী একটা ভালমন্দ হয় উথানে!

শনদাড়িওলা হাড্ডিসার বুড়ো—যে ওবেলায় হয়ত গোরের তলে গিয়ে শোবে, সে দুহাত পিছন থেকে জাপটে ধরেছে 'হরিশবাবুর বাড়ির মেয়াটাকে'। মেয়াটা নিঃসাড়। বুড়ো হাঁফাতে হাঁফাতে বলছিল—অঃ, হায় মা, ইস্, কী দুঃখু...ও হো হো হো, এমন সোন্দর পেরানটা র‍্যালের চাকায় নষ্ট হয়ে যেত হে! বুড়ো ডুকরে কেঁদে উঠছিল, এমনি করে আমার বেটিটা র‍্যালে ঝাঁপ দিয়েছিল, আমি চোখছরতের মাথা খেয়ে তাকিয়ে দেখি নি হে। এমনি ঠেভেলীর খামারে বসে ছিল্যাম, এমনি সকালবেলা। আ হা হা হা! কার ঘরের মেয়া তু মা, কী তোর দুঃখু! বোল্, আমাকে বোল। আমি শিয়ালমারির ইমাস আলি, আমাকে ঢাকিস না মা জননীরে!

বাড়িশুদ্ধ ছুটে এসেছে ততক্ষণে। বুড়োর বুড়ি ধমকাল, থামো তো আনিসের বাপ। ঘরে নিয়ে চল আগে। ...হরিশ-ডাক্তারকে খবর দে আনিস্, জলদি।

দরমাবেড়ার ঘর। ঝকঝকে সাদা মাটির উঠোন। নোনাআতা সজিনা পেয়ারা কলা-গাছের ওপর রোদ, রোদ মানুষের মুখে মুখে। ইমাস আলির বাড়ি শিয়ালমারার মানুষের বড় ভীড়। রেললাইনের ধারে ওদের বাস। ওরা এমন অনেক দেখেছে। শিস দিতে দিতে থেমে গেছে রেলগাড়ি। রক্তে ভেজা কত দলাপাকানো শরীর ওরা দেখেছে। আবার বাঁচতেও দেখেছে অনেক।

কিন্তু এ যে রাজকন্যা! কী কেশের বাহার, কী রূপের জৌলা, কার বুক-আলোকরা মানিক গো?...ওরা বলছিল।

লীলা চোখ মেলে তাকাল। ওরা কারা? কোথায় আছে সে?

হরিশডাক্তার ঝুঁকে পড়ে ডাকল, কেমন লাগছে মা? কোন কষ্ট হচ্ছে?

লীলা দাঁতে মাথা নাড়ল শুধু।

একটা কথা শুধোই মা, আপনার বাড়ি? কোন ভাবনা করবেন না, নির্ভয়ে বলুন। আমি শিয়ালমারার হরিশডাক্তার। আশেপাশে দশবিশখানা গাঁয়ের লোক আমাকে মানে। আমি আছি, বলুন মা।

রূপপুর।

রূপপুর? কার বাড়ির মা? পণ্ডিতদের কেউ? নাকি...

ঘোষবাড়ির।

হরিশডাক্তার লাফিয়ে উঠল। ...এই আনিস্, এক্ষুনি ছোটো রূপপুরে। খবর দিয়ে এসো।

লীলা আস্তে আস্তে বলল, খবর দিতে হবে না। একটা গাড়ি করে দিন, আমি নিজেই যাব।

* * *

আবার কোথায় শুয়ে আছে লীলা বুঝতে পারছিল না। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। মাথা ভার। জলতেষ্টা পেয়েছে কতক্ষণ থেকে। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হচ্ছে প্রচণ্ড নাড়া দিতে দিতে কে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। গড়গড় শনশন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনেছে একটানা কতক্ষণ ধরে। কে বুঝি চেঁচিয়ে কাকে বলছিল, কোথাকার গাড়ি গো, যাওয়া হবে কোথা? ...রূপপুরে। ...কাদের বাড়ি বটে? ...ঘোষবাড়ি গো। আহ্, কতকাল পরে ওই মিঠে শব্দ কানে ভাসছিল। ...তারপর সব দুলে উঠছিল। কে কেঁদে কী বলছিল। ...এলি লীলারাণী, আসতে পারলি? এ আমি জানতাম রে বাছা, তুই আসবি। আমার মোন বলত, তা কি হয়? হয় না। কে যেন হাসছিল হা হা করে। ...দিদিমণির মুখ দেখে কী আনন্দ হল গো! বুকখানা পাঁচ হাত হল... এই বলদা, থামবি? ...মরেছে রে, পান-খাকীর আর সময়-অসময় নাই, এই দেখ পান সাজতে বসল। অনেক চেনা কণ্ঠ চারপাশে শুনছিল লীলা। কোন বুড়ো ডেকে বলল,...আমি চোখে দেখি না সজু, লীলারাণীর চেহারা দেখতে পাব না, এ বড় পরিতাপ! প্রাণকান্তর মেয়ে। প্রাণকান্ত আমার ওপর ভার দিয়েছিল তার ভবিষ্যতের। বিধি বাম। ...এইসব ইতিহাস শোনাচ্ছিল কে অনর্গল। কিন্তু ওরা কি জানে, আজ আর পায়ের নীচে মাটি নেই লীলারাণীর? কোন ভবিষ্যত নেই! ...কেন আমাকে ওরা মরতে দিল না? ...ফের তন্দ্রার ঘোর। গড়গড় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ—গাড়ির চাকা সমানে গড়িয়ে চলেছে। দিন না রাত্রি, রাত্রি না দিন, এত অন্ধকার!...

জল! অনেক কষ্টে লীলা উচ্চারণ করল। তাহলে কে তার মুখে জল গড়িয়ে দিচ্ছে। আঃ, বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল এতদিনে। রূপপুরের জল—আলো ছিল আবার?

কেউ গা মুছে দিচ্ছে। আদ্যর-কার ঠাণ্ডা হাত। চোখ খুলল লীলা। মাথার পিছনে কোথায় একটা শান্ত ম্লান প্রদীপ জ্বলছে। মুখ একটু ফেরাল। দেখল, একটা মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভয় পেয়ে চোখ বুজল লীলা। অশরীরী কণ্ঠস্বরে আজ সারা প্রত্যুষকাল যে তাকে ডাকছিল, এতদিন জানালার বাইরে ডেকেছে ফিসফিস, ভীড়ের মধ্যে এসে ডেকেছে, সেই কি? হারামজাদী ছোটলোকের মেয়েটার পেটে এত সব ষড়যন্ত্র ভরা থাকে!

লীলা দেখবে না, দেখতে চাইবে না। চোখ বুজে থাকবে।

আমি ভালো হয়ে গেছি, তুমিও ভালো হয়ে যাবে। জীবনে এমন অনেক হয়। তা না হলে...

তা না হলে কী? ...লীলা ফিসফিস করে উঠল, কী?

কিছু না, চুপ করে থাকো।

সমাপ্ত

হাসির মজলিস

ছেলে—বাবা, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দৃষ্টিশক্তি সব থেকে বড় জিনিস। কিন্তু এই দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে তাদের কি করা হয়?

বাবা—কি জানি। বোধহয় আম্পায়ার করে দেওয়া হয়।

●

এক ভদ্রলোক হকি খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। খেলা বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ তিনি দেখেন, তাঁর খুবই কাছে বসে একজন তাঁর ছবি আঁকছে। ভদ্রলোক পুলকিত হলেন। নিজের মুখটা দেখবার ইচ্ছে হোল। কিন্তু সঙ্গে আয়না না থাকায় ভীষণ বিরক্ত হলেন। অবশেষে উদ্গ্রীব ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি কোন কাগজের লোক?

—না, আমি কোন কাগজের লোক নই। আমি কার্টুন পোস্টকার্ডের ডিজাইন এঁকে থাকি।

●

ম্যানেজার—ক্যাশিয়ার কোথায়?

কেরানী—রেসের মাঠে।

ম্যানেজার—অফিসের সময় রেসের মাঠে?

কেরানী—ক্যাসের ঘাটতি পুরনোর এই শেষ সুযোগ কিনা।

●

অভিনেত্রী—এতঘণ্টা একটানা শুটিং—আর পারছি না। মাথায় কুলোচ্ছে না। কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ডিরেক্টর—দেখুন আমরা ছবিতে মুখই দেখাব—পেটের তো আর ছবি তুলছি না।

●

দাগী আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হবে। জেলসুপার তাকে বললেন—দেখ তোমাকে ভুল করে এক মাস বেশী হাজতে আটকে রাখা হয়েছিল। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

—না না, দুঃখিত হওয়ার কি আছে। এই বেশী এক মাস আমার অ্যাকাউন্টে জমা করে নিন, পরের বার জেলে এলে কাটান যাবে। —জানাল আসামী।

শিক্ষক—দুধ নষ্ট না হওয়ার নিশ্চিত উপায় কি?

ছাত্রী—গরুর কাছে জল রাখা।

●

—আজ ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড ককটেল খাব।

—সে আবার কি?

—একবার খেলেই অন্য মানুষ।

●

প্রযোজক—এই বেঁটে লোকটি আপনার আগের ছবিতে কি পার্ট করেছিল?

পরিচালক—নেপোলিয়ন, স্যর।

প্রযোজক—এ আপনি বাজে কথা বলছেন, এই রকম ছোটখাট লোককে দিয়ে অত বড় ভূমিকা করালেন কি করে।

●

দুই বন্ধু। পাড়াগাঁয়ের হলেও বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান, তার মধ্যে শয়তানী বুদ্ধিই বেশী। শহর বেড়াতে এসেছে, বেড়াতে বেড়াতে বেলা হয়ে গেল। দুজনেরই খুব খিদেও লাগল। সুসজ্জিত খাবারের দোকান যত নজরে আসে, খিদেও তত বাড়তে থাকে। কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে দুজনে পরামর্শ করে প্রথমে একজন এক খাবারের দোকানে ঢুকে ইচ্ছামত খাবার নিয়ে খেতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় জন সেই খাবারের দোকানে ঢুকে প্রথমজনের অপরিচিতের মত অন্য টেবিলে গিয়ে ইচ্ছামত খাবার নিয়ে খেতে লাগল। প্রথমজনের উদরপূর্তি খাবার শেষ হলে হাতমুখ ধুয়ে যখন দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন দোকানদার দাম দিয়ে যেতে মনে করিয়ে দিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, সে ত দাম দিয়েই দোকান থেকে যাচ্ছে। এই কথায় যে দ্বিতীয়জন (দোকানদার জানত না যে সে প্রথমজনের বন্ধু) তখনও খাচ্ছিল দোকানদার তাকে সাক্ষী মানল, সে অমনই বলে উঠল, "ও ত দাম দিয়েই দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমি যে আগেই দাম দিয়ে খেতে বসেছি তার কি হবে?"

লোকে সত্যি আপনাকে পছন্দ করে কি?

আমরা সকলেই চাই লোকে আমাদের কাজকর্ম কথাবার্তা আচার ব্যবহার সবই পছন্দ করুক, ভালো বলুক। সকলের মনেই এই আকাঙ্ক্ষা আছে, একথা আমরা সকলেই জানি। ভদ্রসমাজে এইজন্যেই কাউকে খুশি করে মন পাবার দরকার হলে আমরা তাকে বলি, 'তোমার এই কথাটা আমার ভারী ভালো লাগে,' 'তোমার অমুক ব্যবস্থাটা বেশ সুন্দর হয়েছে!' এমন কথা শুনতে কার না আর ভালো লাগে?

এই ধরনের সুখ্যাতি শোনবার জন্যেই তো আমরা নিজেদের সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী রাখতে চেষ্টা করি। তবে কেবল জামাকাপড়ে ফিটফাট ছিমছাম হয়ে সেজে থাকলেই লোকের মনে সত্যিকারের পছন্দ জাগানো যায় না। আপনার সমস্ত ব্যক্তিত্বে ফুটিয়ে তোলা চাই পছন্দ করার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি। 'ব্যক্তিত্ব' বলতে বোঝায় আপনার দেহ এবং মনের সবরকম বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। ঠিকভাবে বলতে গেলে 'আপনার ব্যক্তিত্ব' নয়, আপনি নিজেই একটি ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বকেই আমরা সামগ্রিকভাবে পছন্দ করি।

কোন্ কোন্ ব্যক্তিত্বকে মানুষ বেশির ভাগ পছন্দ করে, তার ব্যাপক হিসাব করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন কতকগুলি আচরণ-বৈশিষ্ট্য যাচাই করে সত্যিকারের মাপকাঠি তৈরী করা যায়। এই মাপকাঠি কাছে থাকলে লোকে আপনাকে সত্যি সত্যি পছন্দ করছে কিনা তা যেমন বুঝতে পারবেন, আবার কেউ আপনাকে তোষামোদ করে মিথ্যে পছন্দ শোনাচ্ছে কিনা তাও আঁচ করে নিতে অসুবিধে হবে না।

কেউ সত্যি সত্যি পছন্দ করছে কি না রছে একথা কখনো মনে জাগেনি এমন লোক নেই বললেই চলে। যারা জোর করে নিজেকে সবার মধ্যে পছন্দ করাবার চেষ্টা করে না, আমরাই তাদের নম্র বলে খুব পছন্দ করি, তাই না? হয়তো ঐ ধরনের শান্ত নম্রতার পেছনে একটা স্নিগ্ধ স্বভাব আমাদের আকর্ষণ করে বলেই পছন্দ করি। কেউ প্রবল ইচ্ছায় নিজেকে পছন্দ করাতে চায়, কেউ-বা সহজভাবেই সবার মন জয় করে ফেলে। এই দু'ধরনের মানুষের মনেই কিন্তু সকলের স্বীকৃতি পাবার আকুলতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

আপনার মনে যদি দুঃখ দ্বিধা জেগে থাকে, আপনাকে বুঝি সবাই সত্যি সত্যি পছন্দ করছে না, তাহলেও নিচের টেস্ট আপনার কাজে লাগবে। কিছু না হোক, এই প্রশ্নচর্চায় যোগ দিয়ে খানিকটা মজা নিশ্চয়ই উপভোগ করতে পারবেন। ধীরে সুস্থে নিচের প্রশ্নগুলিতে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিতে থাকুন।

১। যত লোকজনের সঙ্গে আপনার দেখাসাক্ষাৎ হয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোককেই কি আপনি পছন্দ করেন?

২। দেখা হলেই কি আপনি কুশল প্রশ্ন করেন, কোনো কিছুর প্রশংসা করেন— আন্তরিকভাবে না বললেও?

৩। অন্যজনের কথা মন দিয়ে শুনতে পারলে আপনি কি তৃপ্তিবোধ করেন?

৪। হয়তো আপনার সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না, তবুও কি আপনি পাঁচজনকে আনন্দ দিয়ে নিজে খুশি হতে চান?

৫। আপনি কোনো ভুল করলে সেটা সহজে মেনে নিতে এবং অকুণ্ঠভাবে মাফ চেয়ে নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন কি?

৬। যে সব ক্লাবে সংঘ সংগঠনে যোগ দিলে আপনার মর্যাদা বাড়ে বলে মনে করেন, সেখানে যান কি?

৭। উপহার ইত্যাদি দেবার সময়ে যতটা সম্ভব শান্ত সহজভাবে এবং লোক না দেখিয়ে দিতে পারেন কি?

৮। আপনার কাজকর্ম, সামাজিক মেলামেশার চাপ কি এতোই বেশি যে, মাঝে মাঝে দারুণ ব্যস্ততার জন্যে লোকজনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন?

৯। কোনো কিছুর বাসনা জাগলে সেটি চেয়ে নিয়ে আসা কিংবা সেটি জোগাড় করার জন্যে টাকা ধার করার চেষ্টা করার চেয়ে বাসনাটি বর্জন করে চলতে পারেন কি?

১০। সবাইকে যতটা সমঝে চলেন, তার চেয়ে বেশি করে কর্তৃস্থানীয় লোকদের সমীহ করে চলার চেষ্টা করেন কি?

১১। যখন আপনি কাজে দেরী করেন, কিংবা দিনক্ষণ সম্পর্কে কথার খেলাপ করেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করেন, ঢিমেতেতালা কাজ করেন, তখন কি 'সত্যিকারের' জরুরী ব্যস্ততাই তার একমাত্র কারণ বলে মনে হয়?

১২। আপনার অধিকাংশ বন্ধুই কি আপনার সমলিপ্সা?

১৩। আপনি যখন একলা থাকেন, তখন কি সাধারণত সুখী এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?

উত্তর

৭টি সঠিক জবাব হলে:

বিজোড় সংখ্যার প্রশ্নগুলিতে যদি আপনি 'হ্যাঁ' জবাব দিয়ে থাকেন; তাহলে এক পয়েন্ট করে পাবেন। জোড় সংখ্যার প্রশ্নগুলিতে 'না' জবাবই হওয়া স্বাভাবিক, তবে পয়েন্ট হিসাব করবার সময়ে আমরা কেবলমাত্র ১, ৩, ৫, ৭ এইসব বিজোড় সংখ্যার প্রশ্নগুলিকেই ধরবো।

কত পেলেন?

৭টি সঠিক জবাব হলে:

বন্ধু পেতে আপনার কোনো ঝঞ্ঝাট হয় না। আপনি চিন্তাশীল, বিবেচনা করে কথা বলেন, কাজ করেন, এবং মানুষের মনে বড় একটা আঘাত দেন না।

৪ থেকে ৬টা সঠিক জবাব হলে:

লোকে সত্যি আপনাকে পছন্দ করে কি? আমরা বলবো, হ্যাঁ, করে বৈকি যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তারা সকলেই হয়তো করে না—কিন্তু বাস্তবিকই বেশ কিছু লোক পছন্দ করে আপনাকে?

১ থেকে ৩টি সঠিক জবাব হলে:

নিজের আচার-আচরণগুলি একটু শোধরাবে নিন, চোখের সামনে সকলকে দেখতে চেষ্টা করুন। তা না হলে, দেখবেন জীবনটা শূন্য মনে হচ্ছে, আপনি যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন।

শূন্য পয়েন্ট পেলে:

শূন্য পাওয়া মানে একটা জবাবও সঠিক হয়নি। তা যদি হয়, আমরা তাহলে মনে খুবই কষ্ট পাবো। বন্ধু সবসময়ে অর্জন করে নিতে হয়, আর তাকে যত্ন করে রাখতে হয়। বন্ধুরা চলতিপথের খেয়ালখুশির মানুষ নয়। অনেক চেষ্টা করে পেতে হয়, অনেক চিন্তাও করতে হয় বৈকি তার জন্যে......কিন্তু সে চেষ্টা সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করে, যখন লোকে বাস্তবিক আপনাকে পছন্দ করে।

আচ্ছা, বেশ, এখন আপনি তো সব প্রশ্নকটির জবাব দিয়েছেন, মজাও লেগেছে নিশ্চয়ই। আর, হয়তো নিজেকে একটু-আধটু ঠকাবারও চেষ্টা হয়ে গেছে ওর মধ্যে, না কি? আপনি যদি এই টেস্টে সবসেরা পয়েন্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে নিজেকে খানিকটা আত্মতৃপ্ত মনে করছেন, সন্দেহ নেই। এই মনে-করাটার মধ্যেই কিন্তু বিপদ রয়েছে। সদাই স্মার্ট, ছবিটির মতো মানুষকে কেউ ঠিক পছন্দ করতে পারে না বেশিদিন—এবং আপনার ঐ আত্মতৃপ্তির মনোভাব বাড়তে বাড়তে একদিন এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারে, যখন আপনি সচকিত হয়ে দেখতে পাবেন, বেশ কিছু বন্ধু খসে পড়ছে।

সব সময়ে মনে রাখবেন, বন্ধু পেতে হলে নিজেকে বন্ধু হতে হয়—আর, তার মানে হলো, বন্ধুত্বের আঙিনায় সৌজন্য-বোধ, চিন্তাশীলতা, সর্বদা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, এবং সবার ওপরে যে-জিনিসটাকে জাগিয়ে রাখতে হয়, সেটি হলো বিনম্রতা।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল

লতা মুঙ্গেশকর আত্মগোপনের সন্ধিক্ষণে

লতা মুঙ্গেশকার অদ্বিতীয়া 'প্লে-ব্যাক সিংগার' 'হিন্দী ফিল্মের চটকদার গান ও'র উজ্জ্বল কণ্ঠে ঝর্ণার মত স্বচ্ছপ্রবাহী। এই পরিচয়ই অধিকাংশ শ্রোতার জানা। লতা জনপ্রিয় বোম্বের শিল্পী কথাটার মধ্যে যেন একটা উন্নাসিকতা প্রচ্ছন্ন। তার মানে তরলমনা তরুণ-সম্প্রদায়ই তার ভক্ত, ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতরসিক মহলে তিনি যেন খানিকটা অপাংক্তেয়। এইরকম ভাব আর কি!

লতা সম্পর্কে আমারও এ ধারণা যে বর্তমান ছিল—অস্বীকার করছি না। অল্প সময়ের পরিচয়ে তা একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে। শিল্পীকে নতুন করে আবিষ্কার করার রোমাঞ্চ আলাদা।

লতাজীর 'না যেও না' ও 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—শুনেই আমি ও'র রীতিমত ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর কয়েকটা গান শুনে মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল, লতাজী ফিল্মস্-এ স্বনামখ্যাতা হলেও ও'র মনের প্রবণতা 'ক্ল্যাসিক্যালের দিকে। গানের ভিত্তিও তাই। "ক্ল্যাসিক্যাল ভিত্তি' না থাকলে এমন শুধু সুন্দর স্বর-শ্রুতিতে দীপ্ত হয়ে উঠত না ও'র গান। যতই সুরেলা কণ্ঠের অধিকারিণী হোননা কেন। আমার অনুমান ভুল হয়নি।

'লতাজী আপনার গানের প্রেরণা এল কোথা থেকে?' প্রশ্ন করতেই উত্তর এল 'বাবা দীননাথ মুঙ্গেশকার আমার গানের প্রেরণা, উৎস শিক্ষক সবই। বাবা স্টেট-সিংগার ছিলেন। তাঁর নিজস্ব মঞ্চ নাট্য-সম্প্রদায় সবই ছিল। জ্ঞান হয়ে অবধি বাবাকে দেখতাম আপনমনে গুনগুন করে সুর ভাজছেন, গান লিখছেন, শেখাচ্ছেন। প্রতিদিন বাবার সংগে স্টেজে গিয়ে দেখতাম সেই গানই কেমন প্রাণবন্ত হয়ে কত দর্শক-শ্রোতাকে পাগল করে দিচ্ছে।—শুনতে, শুনতে দেখতে, দেখতে গান গাওয়াটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। তারপর একটু বড় হতেই বাবা গান শেখাতে সুরু করলেন। তাঁর মনের মত হলেই 'সাবাস বেটা' বলে যখন পিঠ চাপড়ে দিতেন, সে আনন্দ যেন সাত রাজার ধন পাওয়ার আনন্দের সমান। পরের জীবনে কত নামী লোকের কত তারিফ পেয়েছি কিন্তু সে আনন্দের সংগে তার তুলনা হয় না। এ যেন গৌরবের। কিন্তু সে আনন্দ যেন একটি মনের সংগে সমধর্মী আর একটি মনের সুর মিলে যাবার আনন্দ—এক পরিণত শিল্পী-সত্তার সঙ্গে অপরিণত শিল্পীমনের স্ব-ধর্মগত মিলন। একজনের আশ্রয় দেওয়ার আনন্দ, অন্যজনের আশ্রয় পাওয়ার নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।'—বলেই মৃদু হেসে একটু থামলেন স্বল্পভাষিণী শিল্পী। ও'র কথাগুলিও গানের মতনই সুন্দর। গভীর মনের গহন ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠা এক ভাবঘন রূপ। অজান্তেই যেন এক সরস মাধুর্যে মনের অতলে তলিয়ে নিয়ে বিরুদ্ধ ভাবের বিরসতাকে মুছিয়ে দেয়।

'তারপর আস্তে আস্তে স্টেজেও ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় ও গান দুই-ই সুরু। এই ভাবেই আমার অজান্তেই গান কখন হয়ে উঠল জীবনের অপরিহার্য অংগ বুঝতেই পারিনি।'—লতাজী যেন একটু আনমনা হয়ে গেলেন।

'ক্ল্যাসিক্যাল গান আপনি নিশ্চয়ই শিখেছেন—আমার অনুমান যদি ভুল না হয়?'

'নয় বছর বয়স থেকেই বাইরে গাওয়া সুরু স্টেজের মাধ্যমে। আমানালি খাঁ নামে এক ওস্তাদের কাছে ক্ল্যাসিক্যাল গানের তালিম নিতাম। ১৯৪৫-এ সোলাপুরে এক গানের আসরে গাইলাম। রাগ খাম্বাবতী। খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছিলাম। সায়গল আমার প্রিয় গায়ক ছিলেন—ছোটোবেলার হিরোও বলা যায়।... তারপর হঠাৎ একদিন বাবাকে হারালাম। মনে হোল যেন পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। বাবা আমার শুধু অভিভাবক এবং শিক্ষকই ছিলেন না। বন্ধু সংগী, সাথী বলতে যা কিছু সবই তিনি। তাই নিজেকে এত অসহায় মনে হয়েছিল সেদিন। ......বাড়ীতে আর্ণিং মেম্বার বলতেও ঐ বাবা—অতএব বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা। পুরো ফ্যামিলির দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর। এই দায়িত্ববোধের তাগিদেই হয়ত সেদিন ভেংগে পড়িনি। কতই বা বয়স তখন, বড়জোর তের বছর—কিন্তু মনটা যেন রাতারাতি বয়সকে ছাড়িয়ে অনেক আগে চলে গেল। বাবার জীবিতকালে এ লাইনে অনেকের সংগে যোগযোগ হয়েছিল।—তাঁরা এগিয়ে এলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। মারাঠি ফিল্মে অভিনয় ও গান দুই চলল। সংসার চালাতাম একরকম তাতেই। প্রথম প্লে-ব্যাক সিংগার হিসাবে গেয়েছি ৪২ সালে।—গানটা আজও মনে আছে 'কিতি হাসালো'। ১৯৪৭ এ কোলকাতায় এসেছি প্রফুল্ল পিকচার্স-এ একটা ছবির কাজে খালিফ মাঃ বিনায়কের সুপারভিসনে। মাঃ বিনায়ক কে জানেন? বহুত বড়া মারাঠি অ্যাক্টর—। এই ছবিতে যে গান গেয়েছিলাম হিজ মাস্টার ভয়েসে রেকর্ড হয় গানটি হচ্ছে 'তু য স্বপ্নী পাহিলে'—। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাকগ্রাউন্ড সিংগার হিসেবে নাম হতে লাগল—। অনেক মারাঠি গান রেকর্ড হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয় সংগীত-রসিক মহলে প্রতিষ্ঠা পাই।'

'কিন্তু সে ত একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে খ্যাতি। এমন ভারত-জোড়া খ্যাতির অধিকারিনী হলেন—কেমন করে এবং কবে থেকে?'—প্রশ্ন করি।

'কোন বিশেষ দিনে এবং ক্ষণে নয়'—মৃদু হেসে বললেন লতাজী। বোম্বেতে বিভিন্ন ফিল্মে প্লে-ব্যাক করবার আমন্ত্রণ এল। এইসব ফিল্মের গান শক্তিমান সুরকারের সুর অথবা গীতিকারের কথার জন্য জনপ্রিয় হতে হতে ক্রমশঃ গায়িকার নামটাও একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল আর কি।'

'সুরকার এবং গীতিকারের আড়ালে প্রতিভাময়ী শিল্পীর আত্মগোপনটি সত্যিই মধুর। কিন্তু এতখানি বিনয় কি বিনয়ের ব্যাভিচার নয়? আমিও পাল্টা হেসে বলি।

'একহাত নিয়েছেন মানলাম। কিন্তু এ নিছক বিনয়ই নয় বিশ্বাস করুন।—তারপর আনমনেই যেন বলে চললেন—'শিল্পীর সার্থকতার অন্তরালে—কতজনের অবদান যে থাকে সে খবর কজন রাখে?—'একবার

বিদায় দেওয়ার প্রাণস্পর্শীতার জন্য তার সুর কথা এবং সিচুয়েশন অনেকখানি দায়ী এ কথাটাও ভাববার মত নয় কি?'

'আর শিল্পীর অতুলনীয় কণ্ঠ। গাইবার আবেগ অনুভব এগুলো বুঝি একেবারেই তুচ্ছ?'—

হেসে ফেললেন লতাজী, কিন্তু হার মানবার পাত্রী নন। বললেন 'গাইবার মত গান হলে গাইবার প্রেরণা ত আপনা থেকেই জাগবে?'—

'কিন্তু গাহিবার প্রেরণাতেই গাওয়া ঐ গানটিই পাড়ার ছেলেদেরও গাইতে শোনা যায়। বিজয়ার দিন মাইক ফেরৎ দেওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে প্যাণ্ডেলের গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণাই'—কিন্তু কই তা শুনে হৃদয় ত এমন উদ্বেল হয়ে ওঠে না?—

গাম্ভীর্যের বাঁধ যেন খানখান হয়ে গেল।—হাসতে হাসতে যাকে বলে একেবারে গড়িয়ে পড়লেন লতা। কথায় ত পারব না দেখছি। আর কি জানার আছে?

বাংলা দেশকে এমন করে ভালবাসলেন কেমন করে যার জন্য বাংলা গান আপনার কণ্ঠে এমন করে কথা বলে ওঠে?—

বাংলা ও মহারাষ্ট্রীয়রা—বাইরে থেকে দুটো আলাদা দেশের বাসিন্দা। কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের দারুণ মিল। সাংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে শত দুর্বিপাকের মধ্যেও বাঙালী যেমন নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও বেঁচে আছে আমারাও তাই। এটা ছাড়াও আর একটা বড় কারণ স্বামীজী।'

'আমি জানি আপনি স্বামী বিবেকানন্দর ভক্ত। আপনার লকেটে ও'রই ছবি। কি করে ও'র প্রতি আপনার এই ভক্তি জন্মাল?

ও'রই করুণায়। আমার ভক্তি করবার ক্ষমতা কতটুকু? আমাদের বাড়ী সবাই বিশেষ করে বাবা ও'র খুব ভক্ত—ও'র বিরাট তসবীর—বাড়ীতে টাঙ্গানো। সেই ছবির সামনে কতসময় বাবাকে চোখ বুজে হাত জোড় করে বসে থাকতে দেখেছি। কাজেই স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা সংস্কারের মত মজ্জায় জড়ানো। তারপর ১০।১২ বছর বয়সে বাংলা থেকে অনুবাদ বোধহয় প্রেমানন্দের লেখা পড়ে একেবারে আমি যাকে বলে বিস্ময় বাণে বিদ্ধ—একটা মানুষের মধ্যে কি প্রচন্ড শক্তি—ঐ শক্তি যেন দুনিয়ার সকল ক্ষুদ্রতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। ও'র একটি বাণী যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সেদিন থেকে ও'কে জেনেছি ব্রহ্ম রূপে। —এই স্বামীজী জন্মেছেন বাংলার মাটিতে। অতএব বাংলা দেশ আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র না হয়ে পারে?' একটু থেকে বললেন—'কি অদ্ভুত যোগাযোগ—আমি একটু ঘরকুণো প্রকৃতির।—খুব চট করে সবার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি না। কিন্তু যাকে ভাল লেগে গেল মন থেকে আর মোছে না। আমার কর্ম ও পারিবারিক জীবনে আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন যে মানুষটি তিনিও বাঙ্গালী।—

'ও আপনি হেমন্তবাবুর কথা বলছেন ত? ও'কে আপনি 'দাদা' বলেন জানি।'

'শুধু বলি নয় মানি—আর এ মানা যে কতবড় মানা—তা আমাকে যাঁরা জানেন—তাঁরাই বোঝেন।

'কি করে উনি আপনার মত লাজুক মেয়ের এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয় হয়ে উঠলেন?

প্রথম নানা রেকর্ডে ও'র গান শুনে খুব ভাল লাগত। তারপর উন্‌কী সাথ মিলনে মে এইসা ইম্প্রেশন হুয়া যে উন্‌কী দিল্ বহুৎ সাফ্। ও'র এই সাফ্ দিলই আমায় ও'র এত কাছে টেনেছে।—এখন ত ওর' সঙ্গে আমাদের একটা ফামিলী রিলেশন' গড়ে উঠেছে। দাদার জন্যই আমার অনেক বাংলা গান গাওয়া সম্ভব হয়েছে। আনন্দমঠে দাদা ও আমি বন্দেমাতরম গাই। দাদার সঙ্গে সেই আমার প্রথম বাংলা গান গাওয়া এবং রেকর্ড করা। তারপর গ্রামোফোন কোম্পানী আমাদের দুজনের 'তোমার হোলো সুরু' এবং 'মধুগন্ধে ভরা'—রেকর্ড করেন। গান দুইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বউঠাকুরাণীর হাট-এ দাদা আমায় ডাকলেন —দুটি রবীন্দ্রসংগীত 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' ও শ্রাবণ গগনে ঘোর ঘনঘটা' গাইতে। এ দুটি রেকর্ডও খুব সেল হয়েছে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' এবং 'কত নিশি গেছে'-ও হিট্ গান হয়েছিল। 'মণিহার —চিত্রের গান ত প্রবাদ বাক্যের মত। ইদানীং 'বাঘিনী'-তে গাওয়া 'যদিও রজনী পোহালো তবুও' রেকর্ডের খুব ডিমান্ড হচ্ছে শুনেছি। সলিল চৌধুরীর সুরে গাওয়া 'আরো কিছু দিতে বাকী'-র খবর ত জানেনই। সলিলদার হিট্-সং-এর যে লংপ্লেয়িং বেরিয়েছে ঐ গানটি তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। এসব দেখে আনন্দ হয় বৈকি। বাঙ্গালীও তাহলে আমায় আপনার করে নিতে পেরেছে। ভালবাসাটা শুধু একতরফা হয়নি। সায়গলের বাংলা গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম বলেছি। আমার বাংলা গান গাইবার প্রেরণার অনেকটা অংশ উনিও জুড়ে আছেন।'

'বাংলা দেশের কোন শিল্পী আপনার প্রিয়?'

কানন দেবী-কা আওয়াজ মেরা বহুৎ পসন্দ্। ইদানীং প্রতিমা, সন্ধ্যা এ'রা খুবই ভাল গাইছেন। ছেলেদের মধ্যে দাদা (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। সুকণ্ঠ বাঙ্গালী গায়কের জন্মগত সম্পদ।'

আপনার প্রিয় রাগ কি কি?

—শুদ্ধ কল্যাণ মালকোষ। আভোগী, দরবারী-কানাড়া, বাগেশ্রী, পাহাড়ী, সকালের রাগের মধ্যে ভৈরবী, জৈনপুরী, মধুমাধবী সারং।'

আর একটি প্রশ্ন করব—'আপনি স্বভাবে ভক্তিমতী, প্রকৃতিতে শান্ত, সু-কণ্ঠের অধিকারিণী, ভাবুক—আপনি কেন শুধু ফিল্ম-সঙ্গের গন্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। আপনার শিল্পীমন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না?'

একটু চুপ করে থেকে লতাজী বললেন, 'হাতে সময় আছে?'

'ঘণ্টাখানেক'—

'তাহলে রিসেন্টলী বার হওয়া আমার একটি লং-প্লেয়িং রেকর্ড শোনাই।'

রেকর্ডটি হাতে নিয়ে দেখি Excerpts from Srimod Bhagwad Geeta and the Dhyoneswori' ভগবদ্ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় যেখানে অর্জুনের দিব্যদৃষ্টির সামনে স্বয়ং কৃষ্ণ মেলে ধরলেন পরম-সত্যর প্রকৃতি ও রূপ, তারই নানা শ্লোক, সেখানে বিভিন্ন অপরূপ উপমার আয়নায়—ভগবান স্বয়ং ফুটিয়ে তুলেছেন আপনাকে—ভক্তিভাবের বিভোরতায় আত্মানবেদনের তাগিদে যেন আকৃতি হয়ে উঠেছে লতাজীর মধুর কন্ঠের অনুরণনে। সুরু হোল শুদ্ধ কল্যাণ দিয়ে তারপর ভৈ'রো, জৈনপুরী, টোড়ি, জয়জয়ন্তী, দরবারী কানাড়ার পথ বেয়ে ভৈরবীতে পৌঁছতে সম্বিৎ ফিরে এল। চমকে দেখি লতাজীর চোখের দৃষ্টি অশ্রুসজল, মন যেন চলে গেছে সে কোন্ অধরা-দেশে।

অন্যধারে ধ্যানদেব স্তুতি। 'ধ্যানদেব আমাদের মারাঠী সন্ত। মাত্র আঠার বছর বয়সেই উনি মহারাষ্ট্র ভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন'—বললেন লতা। এর ভাববস্তুও শ্রীমদ্ভাগবতের গীতার ছন্দে।

'কেমন লাগল?'

—'ভাষায় বলা সম্ভব নয়।' রাগসংগীতের পটভূমিকায় আপনার অন্তর যেন হঠাৎ কথা বলে উঠেছে। কার সুর?'

'আমার ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকার। ও আমীর খাঁর শিষ্য।'

এরপর আর কোনো কথা এল না—আত্মবিস্মৃত শিল্পীর আকস্মিক আত্ম-উন্মোচনের এক দুর্লভ মুহূর্তের গভীর স্পর্শটুকু নিয়ে চলে এলাম।

—সন্ধ্যা সেন

বেতার শ্রুতি

কলকাতা কেন্দ্র থেকে যখন ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন প্রচারের কথা উঠেছিল তখন শ্রোতারা, বিশেষ করে বাংলা অনুষ্ঠানের শ্রোতারা অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং সংগত কারণেই এই শংকা দেখা দিয়েছিল। অনেকের মনে তখন রেডিও সিলোনের স্মৃতি জাগরূক ছিল।

রেডিও সিলোনে একটি গানের পর একটু বিজ্ঞাপন প্রচার করে সমস্ত অনুষ্ঠানটাকে হালকা রাখা হ'ত। তবে রেডিও সিলোনের শ্রোতাদের সুবিধে ছিল, চটুল চপল বিজ্ঞাপনের সংগে চটুল চপল হিন্দী গানই বাজানো হ'ত। তাতে বিজ্ঞাপন আর গানের মেজাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকত। বিজ্ঞাপনের জন্য গান, কিংবা গানের জন্য বিজ্ঞাপন আহত হ'ত না।

কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রের বেলায় অবস্থাটা অন্য রকম। কলকাতা কেন্দ্র থেকে কেবল হালকা-পলকা বাংলা আধুনিক গানই শোনানো হয় না, ভাবগম্ভীর রসমধুর রবীন্দ্রসংগীত, শ্যামাসংগীত, অতুলপ্রসাদের গান, রজনীকান্তের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুল-গীতি প্রভৃতিও শোনানো হয়ে থাকে। এবং এদের উপর যদি চটুল চপল বিজ্ঞাপনের ঝাপটা এসে পড়ে, তাহলে এরা শুধু আহতই হয় না, কখনও কখনও নিহতও হয়।

তাছাড়া কলকাতা কেন্দ্রে তো শুধু গান নয়, গানের সংগে নাটক, নকশা, রূপক, আলেখ্য, কথিকা, বিচিত্রা আলোচনা ইত্যাদি নানা জিনিস আছে। এবং এদের সকলের সংগে বিজ্ঞাপন ঠিক খাপ খায় বলে মনে হয় না। এদের শেষে যে রেশ থাকে, বিজ্ঞাপন তা ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

তাই অনুষ্ঠানের মান খর্ব হবে অনুষ্ঠানের মেজাজ নষ্ট হবে—এই আশংকায় বাংলা অনুষ্ঠানের শ্রোতারা শংকিত হয়েছিলেন, এবং এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল।

কিন্তু পরে জানা গেল, বিজ্ঞাপন প্রচার হবে শুধু বিবিধ ভারতীর গানের সংগে, সাধারণ সংগীত-নাটক-রূপক-নকশা-কথিকা ইত্যাদির সংগে নয়। শ্রোতারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অনুষ্ঠানগুলো রক্ষা পেল।

গত ১৫ই অক্টোবর থেকে কলকাতা কেন্দ্রের বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠানে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হয়েছে এবং শ্রোতাদের পরম সৌভাগ্য বাংলা বিজ্ঞাপনও আছে। বাংলা বিজ্ঞাপন নামে মাত্র, হিন্দী বিজ্ঞাপনই বেশি। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। জলের অপর নাম যেমন জীবন, তেমনি বিবিধ ভারতীর অপর নাম হিন্দী ভারতী। বিবিধ ভারতী নাম শুনে মনে হয় ভারতের বিবিধ ভাষার গানের অনুষ্ঠান, কিন্তু বিবিধ ভারতীর শ্রোতারা সম্যক জানেন, এখানে বিবিধ মানে হিন্দী—বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠানে হিন্দী গানের সংখ্যা অধিক।

বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপন কার্যক্রমেও তাই হিন্দী বিজ্ঞাপন অধিক। এমনকি, এই কার্যক্রমে বাংলা গানের জন্য যে কমুর পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় বরাদ্দ, তাতেও নির্ভেজাল বাংলা বিজ্ঞাপন প্রচার হয় না—বাংলা বিজ্ঞাপনের সংগে হিন্দী বিজ্ঞাপন মিশেল থাকে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কর্তারা শ্রোতাদের কিছুতেই ভুলতে দেবেন না যে, বিবিধ ভারতী মানে হিন্দী ভারতী, বাংলাকে শুধু অনুগ্রহ করে একটুখানি স্থান দেওয়া হয়েছে।

অথবা বলা যেতে পারে, ব্যবসায়ীরা সকলে বাঙালী নয় এবং অবাঙালী ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা বোঝে বলে কেবল হিন্দীকে পুজো না করে বাংলাতেও বিজ্ঞাপন দেয় এবং সেই বিজ্ঞাপন প্রচার না করলে রেডিওর অর্থাগম কমে যায়, তাই বাংলা বিজ্ঞাপন প্রচার এবং হিন্দী গানের আসরে বাংলা বিজ্ঞাপন ঠিক সচল নয় বলে বাংলা বিজ্ঞাপনকে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাংলা গান।

মোট বারো ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের বিবিধ ভারতীর ভিতর বাংলার জন্য সময় বরাদ্দ মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তা-ও এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট নিরবচ্ছিন্ন নয়, হিন্দীর বিভক্তি আছে। রাত ৮টা থেকে ৯টা বিবিধ ভারতীর বাংলা গানের আসরে মাঝে পনের মিনিটের হিন্দী খবরের অনুপ্রবেশ আছে। অর্থাৎ হিন্দী ভোলা চলবে না। ভোলার উপক্রম হলেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। হিন্দী হচ্ছে বীজমন্ত্র। বাংলাদেশে বাংলাভাষার কি নিদারুণ অপমান! এই অপমান বাঙালীরা দিনের পর দিন নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। এতটুকু প্রতিবাদ নেই, এতটুকু চিৎকার নেই। সাধেই বলেছে বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি!

ঐ যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের অনুষ্ঠানে পনের মিনিট ছায়া-ছবির গান শোনানো হয় তাতেই অনেক শ্রোতা খুশি। পনের মিনিট কেন পঁচাত্তর মিনিট হবে না—সে-দাবী সোচ্চার হয় না।

দক্ষিণ ভারতে হয়। তাই বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠানে অধিকতর পরিমাণে দক্ষিণ ভারতীয় গান শোনা যায়। বিজ্ঞাপন ছাড়াও যায়। কারণ, তারা দাবী আদায় করে নিতে জানে।

অনুষ্ঠান

পর্যালোচনা

১৭ই ডিসেম্বর বেলা আড়াইটেয় বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে হরিশচন্দ্র সম্পর্কে বললেন শ্রীসুভাষ সমাজদার। 'বন্ধু ঘোষিকার উচ্চারণের গুণে শোনাল শ্রীসুহাস সমাজদার। দুবারই—গোড়ায় এবং শেষের। যেসব নামের ভিন্ন উচ্চারণও শোনাতে পারে, সেসব নাম একটু সতর্ক হয়ে উচ্চারণ করা দরকার, নইলে বক্তা যেমন ক্ষুণ্ণ হন, শ্রোতারাও তেমনি বিভ্রান্ত হন। শ্রীসমাজদারের বলাটা কিন্তু ভালো লাগল—বেশ গল্প বলার মতো বলা, ক্লাস সেভ্‌নের ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করার মতো।

২২শে ডিসেম্বর বেলা ১টার নাটক—'মিথ্যে নাম'। রচনা—শ্রীরমেন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রযোজনা—শ্রীপ্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলাপটা টেলিফোনে, প্রেমও তা-ই।

মলয় একটি অফিসে চাকরি করে, বীণা চাকরি করে অন্য একটি অফিসে—টেলিফোন অপারেটরের চাকরি। সারাক্ষণ টেলিফোন দিতে হয় আর নিতে হয়। একদিন মলয়ের অফিসে সে টেলিফোন করল। মলয় ধরল। যার টেলিফোন, তার আসার অবসরে একটুখানি দুষ্টুমির ইচ্ছে হল। যেচে বীণার সঙ্গে আলাপ করল, কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করল, শেষে নাম জানতে চাইল। বীণা মিথ্যে নাম বলল—শেফালি হাজরা। মলয়ও মিথ্যে নাম বলল—শঙ্কর চ্যাটার্জি। মলয় বুঝল শেফালি মিথ্যে নাম, বীণা বুঝল না শঙ্কর মিথ্যে নাম। সেদিনে আর বেশি না।

পরদিন ৬টা বাজতেই একটা অদম্য তাড়নায় বীণাকে টেলিফোন করল মলয়। তারপর রোজ...রোজ। রোজ ৬টার সময় মলয় যেমন টেলিফোন করার জন্য অধীর হয়ে ওঠে, বীণাও তেমনি টেলিফোন পাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

এমনি করে দুই মিথ্যে নামের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হ'ল। তারপর যা হবার তা-ই হ'ল। টেলিফোনে আলাপ, টেলিফোনে প্রেম, বিয়ের প্রস্তাবও টেলিফোনে।

কিন্তু বিয়ের আগে বীণা একদিন মলয়কে দেখতে চাইল। মলয় ঠাট্টা করল, 'কানা-খোঁড়া কিনা যাচাই করে নিতে চাও বুঝি।' বীণা লজ্জা পেল। তবু অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হ'ল।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মলয় ফিরে গেল। বীণা এল না। শঙ্কর ভুল বুঝল, আহত হ'ল। পরের দিন টেলিফোনে জানল, বীণার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বীণা আটকা পড়ে গিয়েছিল।

শঙ্করের ভুল ভাঙল। আবার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হ'ল। এবার বীণা আসবে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বীণা ফিরে গেল। মলয় এল না। বীণা বুঝলে মলয় আগের দিনের প্রতিশোধ নিয়েছে। পরে মলয়ের অফিসে টেলিফোন করে জানল, শঙ্কর চ্যাটার্জি বলে কেউ নেই ঐ অফিসে। ক্ষোভে দুঃখে ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠল। প্রথমে ক'দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সেই অস্থিরতা কাটাতে চাইল। কিন্তু তাতেও যখন অস্থিরতা কাটল না, তখন সে অফিস ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

মলয় অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের দিন হঠাৎ মা-র অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে দেশে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে বারকয়েক বীণাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পায়নি। মা-র শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে ফিরে আসতে তার মাসখানেক হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে টেলিফোন করে জানল, ঐ অফিসে শেফালি হাজরা বলে কেউ নেই, গত পঁচিশ বছরে ছিলও না কোনোদিন। মলয়ের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। সে-ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

তারপর দীর্ঘকাল পরে যখন তারা ফুরিয়ে গেছে, তখন এক বিয়েবাড়িতে তাদের দেখা হ'ল, কথাপ্রসঙ্গে সব প্রকাশ পেল। প্রকাশ পেল, দুটো মিথ্যে নামের জন্য অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তারা শুধু শুধু ফুরিয়ে গেল।

এই ফুরিয়ে যাবার 'আর্তি'টা বড়ো সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল শ্রীমতী নীলিমা দাসের অভিনয়ে। সে কী বেদনা! কী যন্ত্রণা!

এই ফুরিয়ে যাবার গল্পটা বলার সময়ে অন্তরের যে রুদ্ধ ক্ষোভ, না পাওয়ার যে রুদ্ধ ব্যথা তা অদ্ভুত প্রগল্‌ভতায় ভরে দিয়েছিলেন শ্রীনির্মল-কুমার।

বাস্তবিকপক্ষে নাটকের এই শেষের অংশটা ব্যথায় যন্ত্রণায় ক্ষোভে অভিমানে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। গল্পটা সাজানো হলেও নাট্যকার তাকে শিল্পরসে পরিষিক্ত করতে পেরেছিলেন। সেইখানেই তাঁর কৃতিত্বটা আরও প্রকাশ পেত যদি তিনি কয়েকটি ত্রুটি এড়াতে পারতেন।

মলয় তো জানত শেফালি মিথ্যে নাম। তাহলে সে ঐ নামে বীণার অফিসে খোঁজ করেছিল কেন? কেন বলেনি যে, 'মেয়েটি আপনাদের অফিসে টেলিফোন অপারেটর ছিল?' তারপর বীণারও তো ভাবা উচিত ছিল, সে নিজে যখন মিথ্যে নাম বলেছে, মলয়ও তেমনি মিথ্যে নাম বলতে পারে; সে নিজে যখন একবার অনিবার্য কারণে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে পারেনি, মলয়েরও তা হতে পারে।

এইদিন বেলা ২টোয় মালঞ্চে 'সেকালের বড়োদিন ও বড়োদিনের নানা দিক' বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ল। বড়োদিনের তিনদিন আগে এইরকম অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্য বোঝা গেল না। বড়োদিন মালঞ্চের দিন নয় বলে? কিন্তু মালঞ্চেই যে এই অনুষ্ঠান শোনাতে হবে এমন কোনো নিয়ম আছে কি? অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং এটি বড়োদিনের দিন প্রচারিত হলেই সঙ্গত হ'ত বেশি। এটি বড়োদিনের দিন প্রচারেরই অনুষ্ঠান, কারণ বড়োদিনের পরিবেশটাই এতে ফুটে উঠেছিল বেশি!

এতে ইংরেজী ক্যারল ছিল, বাংলা (যীশু) ভজন ছিল, আর ছিল বড়োদিনের উৎসব বর্ণনা। ক্যারলে বড়োদিনের ভাবটা বেশ প্রকাশ পেয়েছিল—বড়োদিন বড়োদিন মনে হচ্ছিল, সুরটা মনটাকে ধরে রেখেছিল। ভজনে যীশুর কথাটা প্রকাশ পেয়েছিল—কিন্তু বড়োদিন বলতে মনে যেরকম ভাব আসে, সে-রকম কিছু আসেনি, তবে গানগুলি শ্রাব্য হয়েছিল। আর ঐ যে উৎসব বর্ণনা, তাতে মাঝে মাঝে ক্লান্তির সুর ফুটে উঠেছিল। বর্ণনার ভাষা সর্বত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কোথাও ছিল গীতি-কবিতার সুর, আবার কোথাও বা নিরেট গদ্যের প্রকাশ। অস্থানে টান আর অকারণে ভাব পড়াটাকে হৃদয়গ্রাহী হতে দেয়নি।

তবে সব মিলিয়ে বড়োদিনের যে-চিত্রটি, যে-রূপটি যে-পরিবেশটি ফুটে উঠেছিল, তার প্রশংসা করা যায়। প্রশংসা আরও করা যেত যদি এটি ঘনপিনদ্ধ হত, একটু সংক্ষিপ্ত হত। অনুষ্ঠানটির ভিতরে যে-উপকরণ ছিল, তাতে পনের মিনিটের হলেই বোধহয় ঠিক হত, যেটুকু ক্লান্তিকর লেগেছে, তা হয়তো লাগত না। কিন্তু অনুষ্ঠানটি হয়েছিল মিনিট কুড়ি-বাইশের এবং বরাদ্দ সময়ের বাকী সময়টা রেকর্ড বাজিয়ে পূরণ করতে হয়েছিল। তাতে রেশ কেটে গিয়েছিল।

২৩শে ডিসেম্বর বেলা ১টা ৫-এ যখন মহিলামহল আরম্ভ হল, তখন তার সিগনেচার টিউন ও ঘোষণা পুরো শোনা গেল না, দুই-ই খণ্ডিত আকারে ভেসে এল। তারপর পরিচালিকা যে ভক্তিমূলক গান শোনালেন, তা-ও শেষে ধীরে ধীরে 'ফেড-আউট' হতে হতে এক সময় খণ্ডিত হল। এত খণ্ড দেখে শঙ্কা হয়েছিল, আসরটাই হয়তো খণ্ডিত হয়ে যাবে। কিন্তু না, শেষে অখণ্ডই ছিল। ভালো একটি গৃহিণীসভাও।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে এই গৃহিণীসভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ-সেবিকা, স্বাস্থ্যসেবিকা, লেখিকা ও সাংবাদিকা। সভার আরম্ভে এবং শেষে পরিচালিকা একসঙ্গে চারজনেরই নাম বলে দিলেন—শ্রীমতী রিণা বসু, শ্রীমতী বেলা দেবী, শ্রীমতী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী দীপ্তি রায়। কিন্তু তাঁদের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের নাম মিলল না, পরিচালিকা যে অর্ডারে নাম বললেন, তাঁরা সেই অর্ডারে বললেন না। অথবা তাঁরা যে অর্ডারে রেকর্ড করেছিলেন, পরিচালিকা সেই অর্ডারের নাম বলেননি। নামের সঙ্গে বলা মিলল না, নাম আর ব্যক্তি আলাদা হয়ে গেল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে যাঁর নাম বলা হয়েছে, তিনি প্রথমে বলেননি, প্রথমে বলেছেন বেলা দেবী।

গৃহিণীসভায় যাঁরা বলেছেন তাঁরা ঠিক বলেননি, পড়েছেন। হাতে স্ক্রিপ্ট ছিল তা-ই দেখে পড়েছেন, এবং পড়াটা বড়ো স্পষ্ট হয়েছে। বলার মতো মনে হয়নি। সাধারণ সভায় যদিও লেখা বক্তৃতা পাঠ করে শোনানো হয়ে থাকে, গৃহিণীসভায় কিন্তু আলোচনাই বেশি হয়। এই সভাতেও তা-ই হওয়া উচিত ছিল। তাহলে সভাকে সভা বলে মনে হত, তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেত।

গৃহিণীরা সকলেই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং সেসব অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারও কারও অভিমত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলে বিশেষ মূল্যও বহন করে।

২৪শে ডিসেম্বর সকাল ৮টায় ক্যালকাটা ইয়ুথ কোয়্যার পরিবেশিত লোকগীতির অনুষ্ঠানটি ভালো লাগল।

—[illegible]

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

এবারের তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেছিলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে সঙ্গীতরসের মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যার একটি বিশেষ মূল্য আছে। কারণ এ বিশ্লেষণ সকল শ্রেণীর শ্রোতার উপভোগের বস্তু—বিশেষ কোন সঙ্গীতবোদ্ধা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত নয়। সংঘসচিব শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রীমিত্র অভিনন্দন জানালেন। বিনা প্রবেশমূল্যে সঙ্গীতানুরাগী শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান শোনবার সুযোগ দেবার জন্য। এবারের নতুনত্ব হোল—সারাদিনব্যাপী সঙ্গীতাসরের আয়োজন যার জন্য শ্রোতাদের সকাল ও দিনের রাগ (যা আসর থেকে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে) শোনবার দীর্ঘ অবকাশ ঘটেছিল।

প্রধান ধ্রুপদী শ্রীশিশির গুহ এবং শ্রীমতী দীপালী গুহর বিভাষ ও যোগিয়ার ধ্রুপদ ও ধামার দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। শিশিরবাবুর শিক্ষা আছে, রেওয়াজ আছে, অভিজ্ঞতার পরিধিও সুবিস্তৃত। সব মিলিয়ে তাঁর অনুষ্ঠান চিত্তগ্রাহী হয়েছে এবং এর শিক্ষামূল্যও যথেষ্ট। শ্রীবিমল রায়ের তবলা-লহরা প্রতিশ্রুতির আভাষদীপ্ত। শ্যাম গাঙ্গুলী 'শুদ্ধ সারং' রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনান। শ্রীগাঙ্গুলী বাজের দাপট ও লয়কিরীর কাজে উপভোগ্য উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সরাফৎ হোসেন খাঁর ধ্রুপদে আলাপ-অঙ্গ থেকে খেয়ালের বিস্তার শৃংখলা সুপরিলক্ষিত কিন্তু বাড়তের বৈচিত্র্যহীনতা অনিবার্য একঘেঁয়েমির সৃষ্টি করেছে। ফৈয়াজ খাঁর গায়কীর ঢং সম্বন্ধে এখনকার শ্রোতাদের অবহিত করার পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুষ্ঠানের মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু মৌলিকত্বাবিহীন অনুকরণের কোন রসমূল্য থাকা সম্ভব কি? তুলনামূলক বিচারে তাঁর সারারাত্রিব্যাপী আসরান্তের 'রামকেলী' অনেক ভাল। তবে সে ভাল লাগার মধ্যে সুর ও পরিবেশের অবদানও কিছু কম নয়। শিশুশিল্পী পিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের কত্থক নৃত্য যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। এলাহাবাদের লালজী শ্রীবাস্তবের তবলালহরার সঙ্গীতধর্মী বোলবিস্তার আপন সৌকর্যে প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। শ্রীমতী মালবিকা কাননের ইমন এবং হেমকল্যাণে সুরেলা কন্ঠের লালিত্যে মনোহারিত্ব ছিল। তবে তানের বৈচিত্র্য ও ছন্দের কাজ বিশেষ না থাকায়, এ অনুষ্ঠান তেমন জমে উঠতে পারেনি।

'বাগেশ্রী' রাগে গৌর গোস্বামীর বাঁশী বিলম্বিতের অংশ সত্যিই উচ্চাঙ্গের তবে বিলম্বিতের মানের সঙ্গে উপসংহারীর ঝালার মানের পরস্পর নৈকট্যের তারতম্য ঘটেছে। এলাহাবাদের রবীন চট্টোপাধ্যায়ের ইমন কল্যাণ ও কলাবতীতে শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখা গেল, অবশ্য স্ব-নিষ্ঠায় তাঁকে অবিচল থাকতে হবে। আমীর খাঁর শিষ্য নিতাই দাস সান্যালের 'ইমন কল্যাণ' গুরুতর ধীরতা বজায় ছিল। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সরোদবাদন একটি বাজিই যেন আসর জমিয়ে দিয়েছে। ইনি বাজালেন পুরিয়া কল্যাণ। রাগের শুদ্ধতা এবং গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ন রেখেও চমকপ্রদ ছন্দে ইনি আসরকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। অনিল ভট্টাচার্যের তবলাসংগতও অনেকটা কৃতিত্বের দাবীদার।

'বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের পুত্র মুনাব্বর আলি খাঁর গান আমাদের ভাল লেগেছে কিন্তু যে মর্মস্পর্শী দৃশ্যের জন্য তাঁর অনুষ্ঠান একটি সুন্দর করুণ ছবির মত চিত্তপটে আঁকা হয়ে আছে—সে হোল পিতার বহুগীত একটি জনপ্রিয় ঠুংরী গানে যখন স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন এমন সময় অডিটোরিয়ামের সামনের সারিতে উপবিষ্ট তাঁর পত্নীর অবিরল অশ্রু মোছা। অনেক কনফারেন্স আসবে আবার শেষও হবে কিন্তু এ দৃশ্য ভোলবার নয়।

শ্রীমতী কল্যাণী রায় গোকর্ণী বাজালেন তাঁর শান্ত ধীর গতিচ্ছন্দে। বিলায়েতী ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেও নিজের বৈশিষ্ট্যে ইনি রসিকমহলকে আনন্দ দিয়েছেন। টি এল রাণার শিষ্যা কল্পনা চন্দর খেয়াল গান শিক্ষা ও রেওয়াজের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া গেল। বহু দিন বাদে ওস্তাদ আহমেদ জান থেরাকোওয়ার অবতারণা তানসেনের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অবদান। ওস্তাদ বৃদ্ধ কিন্তু বাজনায় বার্ধক্যের ছায়াপাত ঘটেনি। বলিষ্ঠ হাতে কখনও দীপ্ত কখনও মৃদু ঠেকায় বাঁয়া ও তবলার বোলকে যেন জীবন্ত করে তুলেছিলেন। সুরসমৃদ্ধ শাণির কাজ বুঝি তুলনাবিহীন। সুদৃঢ় স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে যেন এঁর মত কয়েকজন শিল্পী ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা ঘোষণা করছে।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর গান এবার তাঁর ভক্তদের আশানুরূপ আনন্দ দিতে পারে নি।

পুণার শিল্পী শ্রীমতী মন্দাকিনী মালব্যের কত্থক নৃত্য একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ঠাটের সঙ্গে নৃত্যের ভূমিকা, কসক মসক তথা বোলবিস্তার দ্বারা লয় প্রতিষ্ঠা আমদ, তোড়ায় গুরুর তালিম ছাড়াও শিল্পীমনের সুষমালালিত্য আপন সৌন্দর্যে নিজেদের মুগ্ধ করেছে। তবে ঠুংরী গানের অংগর অতিরঞ্জন কিছু একঘেঁয়েমি সৃষ্টি করেছে।

শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক গাইলেন 'রয়সী কানাড়া'—অসাধারণ কণ্ঠসম্পদ বিস্তারের গাম্ভীর্য রকমারী তানের বাহার ও বৈচিত্র্য তারাণার চমকে তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে আবার যবনিকা উত্তোলিত হয়। শ্রীমতী পট্টনায়ক স্বরচিত ভজনের পর 'জগন্নাথ স্তোত্র' গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের পুত্রদ্বয় কুমারলাল ও কৈলাসলাল তবলালহরার যুগল বাদ্যে প্রমাণ করেন পিতার দাপট রেওয়াজ ও বাজানোর আনন্দের তাঁরাও অধিকারী। শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া বেহাগ সঙ্গীতশিষ্যদের অনুধাবন ও অনুসরণের বস্তু। তানের কৌশল ও তারাণার বিস্তারেই ইনি অধিকতর মনোযোগ ন্যস্ত করেছেন। সংগতে ছিলেন মহম্মদ সাগিরুদ্দিন ও ওস্তাদ কেরামত খান। আলি আহমেদ হোসেন ও নবী আহমেদ হোসেনের সানাই সুরের আবেশে মুগ্ধ করেছে। তরুণ বেহালাবাদক রবীন ঘোষের 'মালগুঞ্জ'—তার গভীরতর মানসপরিণতির ইঙ্গিতবাহী। শ্রীমতী মাণিক বর্মার 'কেদারা'র চেয়ে যোগশেষই সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তবে প্রথমটির আশানুরূপ সাফল্যের অভাবের কারণ রেডিও টাইমের সংগে সংগতি রাখবার সচেতনতা। দ্বিতীয়টির সাফল্যের অনেকখানি দাবীদার শ্রুতিমধুর রাগটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য। শিল্পীর গায়নশৈলী বিস্তার স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, সমমানের শিল্পী কলকাতায়ও বিরল নয়। উদীয়মান বেহালাবাদক মৃন্ময় ধরকে আসরে উপস্থিত করে উদ্যোক্তারা যন্ত্রসংগীতের জগতে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। গয়া ঘরাণার ধ্রুপদী পণ্ডিত সিয়ারাম তেওয়ারী সম্মেলনসচিব শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে ধ্রুপদের পরিবর্তে খেয়াল গান। সুপণ্ডিত তেওয়ারীজীর সংগীতব্যক্তিত্বে একটি নূতন দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ইমারৎ খাঁ বাজালেন 'কাম্বোজী'। তৈরীর দিক দিয়ে তাঁর হাত প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রীর। ধারণাও পরিণততর। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'বাগেশ্রী' প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ। যন্ত্রসংগীতে দুটি মনোরম অনুষ্ঠান ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর সেতার এবং পদ্মভূষণ বিসমিল্লা খাঁর সানাই। একজনের আছে সুরের মাদকতা অন্যের ধ্যানের প্রশান্তি। একজনের রঙের ইন্দ্রধনু অপরের

পূণ্য কারুণ্য। দুই শিল্পী যেন জীবনের দুটি দিকের ছবি এ'কে গেছেন।

মধ্য এন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

কোন আড়ম্বর ছিল না, ব্যবসায়িক প্রচারের উদ্দেশ্যে জয়ঢাকও বাজানো হয় নি, কিংবা আসরে বসে নি কোন বাইরের খ্যাতনামা শিল্পী। তবু 'মধ্য এন্টালী সংস্কৃতিক সম্মেলন'এর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান শ্রোতারা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন, তৃপ্ত হয়েছেন।

ছোট অথচ মনোরম এই ৬ দিনব্যাপী (৫ই থেকে ১০ই ডিসেম্বর) সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল ইন্টালীর 'দেবনারায়ণ দেবের বাড়ীতে।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনটি ছিল রবীন্দ্র-সংগীত, নাটক ও মূকাভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট। সেদিন বাণী ঠাকুর, সৌরেন পাল, স্বপন রায়, দীপক মজুমদার ও রুনু ভট্টাচার্য কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত উপহার দেন। অমিতাভ মজুমদার ও অধীর ঘোষের মূকাভিনয় দর্শকরা প্রশংসা করেন। নাটক অভিনয় করলেন নটতীর্থের সদস্যরা 'আমি থামব না'। সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের নাটকটি বস্তুর মানুষের জীবনযন্ত্রণা আর হতাশা-ব্যঞ্জক। কয়েকটি চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন—সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, মিহির চট্টোঃ, আশুতোষ মণ্ডল, মাণিক বন্দ্যো-পাধ্যায়, অধীর ঘোষ, রবিন মুখোপাধ্যায়, মহেশ দাস, প্রদীপ সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় দিন থেকে পাঁচ দিন নির্দিষ্ট ছিল উচ্চাঙ্গ-সংগীতের জন্য। কিন্তু মূকাভিনয় প্রতিদিন হত অনুষ্ঠানের সূচনায়। মূকাভিনয়ের বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'সংবাদিকের আত্মকাহিনী' চিত্রটি। সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে ফিচারটি উপস্থিত করেছেন। ফলে দর্শকদের সূক্ষ্মরস গ্রহণ করতে কষ্ট হয় না। প্রতিটি দর্শক উৎফুল্লতায় করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। শ্রীকাশিনাথের 'পাউডওয়ালা' মনোগ্রাহী। বিশ্বনাথের 'চোখে লোচনা' অনবদ্য।

উচ্চাঙ্গের আসরে কণ্ঠসংগীতে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মুনাব্বর আলি খান পরিবেশিত 'মালকোষ' রাগে খেয়াল। সুন্দর আলাপ ও বিস্তারের মাধ্যমে রাগরূপ নির্মাণে শিল্পসম্মত স্বর-সংযোজনে অনু-ষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। গৌতম রায়ের 'যোগ ও 'কৌশিক ধ্বনি' রাগে খেয়াল আর এক অনবদ্য অনুষ্ঠান। শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্যের 'যোগ' রাগে খেয়াল উপভোগ্য। রাগ বিশ্লেষণে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। মানস চক্রবর্তী ছিলেন ছয় দিনের অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী। এছাড়া প্রশংসার দাবী রাখেন নীলিমা মজুমদার (চন্দ্রকোষ), জামিল হায়দার (কামোদ), আশিষ গোস্বামী (বাগেশ্রী), আভা চক্রবর্তী (পূরিয়া কল্যাণ) ও রমনরেশ মিশ্র (দরবারী কানাড়া)।

যন্ত্রসংগীতের আসরে জি এন গোস্বামী বেহালায় 'নটমুখারী' ও ঠুংরী পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পরিবেশন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সরোদে রাগ 'কামোদ' পরিবেশন করেন। বিচিত্র ছন্দ রচনায় শিল্পী শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় সেতারে বাজালেন 'ঝিঁঝিট'। আলাপের অংশে সমগ্র আসরটিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে-ছিলেন। ছন্দের কাজ অবহেলিত। আলি আহমেদ হোসেন সানাইয়ে 'ইমন' ও ঠুংরী পরিবেশনে স্বকীয় মর্যাদা রাখতে পেরে-ছেন। ভি বালসারা ত্রিশজন যন্ত্রীকে নিয়ে পরিবেশন করেন রাগ অর্কেস্ট্রা। এই অর্কেস্ট্রায় ভারতীয় রাগ-সংগীতের বিভিন্ন দশটি ঠাটের ওপর সুর-মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য যন্ত্র সমন্বয় অর্কেস্ট্রা এই প্রথম। শ্রীবালসারা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অকল্পনীয়। আর একটি অভিনব অনুষ্ঠান হরবোলা শৈলেন সাহা কণ্ঠের সাহায্যে বাঁশীর সুরে 'ইমন' রাগটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর কণ্ঠে সানাই, বীণ ও সেতার পরিবেশন শ্রোতাদের চমৎকৃত করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার্থীরা এ দেশের রাগসংগীত কি রকম শিক্ষালাভ করেছে তার এক নিদর্শন পাওয়া যায়, এই সম্মেলনের আমেরিকান শিক্ষার্থী মেরী লু বেনেডিকটের সেতার অনুষ্ঠানে। ইনি 'বিলম্বিত পিলু' ও 'দ্রুত জংলাপিলু' বাজিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেন।

কত্থক নৃত্যের আসরে মায়া চট্টোপাধ্যায় প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেন। নৃত্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানকু মহা-রাজের তবলাসংগত এক অনবদ্য সম্পদ। শিল্পীর কণ্ঠে গানটিও মনোগ্রাহী। বন্দনা সেনের নৃত্যে শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। কৃষ্ণের ভাবলীলায় দেহভঙ্গীর চিত্র-সৌন্দর্য ছন্দের মুখর আনন্দে উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রকাশভঙ্গী প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে তবলা ও সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন রমেশ মিশ্র।

এছাড়া প্রতিদিন সংগতের কৃতিত্বের অধিকারী সন্দীপ দেব, সুরেশ তেওয়ারী, দ্বিজেন ঘোষ। কণ্ঠসংগীতের সমস্ত অনু-ষ্ঠানগুলিতে সারেঙ্গীতে সার্থক সহ-যোগিতা করেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভবতঃ ইনিই প্রথম বাঙালী সারেঙ্গী। অপূর্ব এর হাতের কাজ।

সুরসভার সংগীত সম্মেলন

হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের সহ-যোগিতায় গত ২২, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরসভার উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ-সংগীত, রবীন্দ্র-সংগীত, নজরুল-গীতি, হিমাংশু-গীতি, পল্লীগীতি অতুলপ্রসাদের গান সেতার ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। উচ্চাঙ্গ-সংগীতের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কান্তি মৈত্র, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরচন্দ্র বসাক, মঞ্জুশ্রী রায়, রঘুনাথ বসাক, মণিদীপা সাহা, ধীরেন দাস, মায়া মিত্র (সেতার) ও সুজাতা

সুরসভার সঙ্গীত সম্মেলনে নৃত্য পরিবেশন করেন শান্তা বসু।

বসু (বেহালা)। রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশ-নায় ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টো-পাধ্যায়, সাগর সেন, পূর্বা সিংহ, বাণী ঠাকুর, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, তুষার গুপ্ত, গৌতম বসু, তপন রায়চৌধুরী, শ্যামশ্রী মিত্র, গোপা বাগচী, শাশ্বতী গুপ্ত ও লক্ষ্মী গুপ্ত। নজরুল-গীতি, হিমাংশু গীতি, পল্লীগীতি, অতুলপ্রসাদের গান ও ভজন পরিবেশন করেন তপতী মৈত্র, ইরা মুখোপাধ্যায় (গজল), রঞ্জিতা চক্রবর্তী, সুস্মিতা রায়চৌধুরী, ইলিনা গুপ্ত, মমতা ঘোষ, দীপ্তি রায়, জয়া সুন্দরেশন, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা ঘোষ, সবিতা মুখোপাধ্যায়, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুল্বা ধর, স্বপ্না দাস, মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন জয়শ্রী লাহিড়ী, শান্তা বসুরায় ও শেফালি মুখোপাধ্যায়। সংগতে ছিলেন কিশোর নন্দী, দুলাল ভট্টাচার্য ও বেণু মুখোপাধ্যায়। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায় শম্ভু পাল, পরিতোষ রায়, রথীন চৌধুরী, গোপাল বিশ্বাস ও সলিল নিয়োগী। সমগ্র সম্মে-লনটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হরিদাস দত্ত, শম্ভু ঘোষ ও কান্তিব মুখোপাধ্যায়। সুরসভার পক্ষ থেকে ৫০১ টাকা উত্তরবঙ্গ বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের হাতে দেওয়া হয়।

—চিত্রাঙ্গদা

জেলসাহেবের মহরতে ক্ল্যাপ দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীচ্যবন। চিত্রে রয়েছেন উত্তমকুমার, কাহিনীকার নিমাই ভট্টাচার্য, পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়, ক্যামেরাম্যান দীনেন গুপ্ত, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য ও প্রধান সহকারী পরিচালক অমল সরকার। ফটো : অমৃত

১৯৬৮ : বাংলা ছবি

১৯৬৮ খৃস্টাব্দে বাঙলা ছবি মুক্তি পেয়েছে মাত্র আঠারোখানি। তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় তিনটি বাঙলায় 'ডাব' করা (মূল ভাষার বদলে শিল্পীদের মুখে বাঙলা সংলাপ ও গান বসিয়ে দেওয়া) ছবি যোগ দিলে হয় একুশখানি। মুক্তিপ্রাপ্ত আঠারোখানি বাঙলা ছবি হচ্ছে : পথভোলা, পথে হল দেখা, পরিশোধ, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, চারণকবি মুকুন্দদাস, হংসমিথুন, বধূবেশে, আদ্যাশক্তি মহামায়া, বাঘিনী, চৌরঙ্গী, তিন অধ্যায়, বালুচরী, গড় নাসিমপুর, বৌদি, আপনজন, জীবনসংগীত এবং কখনো মেঘ। 'ডাব'-করা ছবি [illegible] নাম : ভীষ্ম, পদ্মাবতী-জয়দেব ও [illegible] বধ।

আঠারোখানি ছবির মধ্যে একটি ধর্ম-মূলক (আদ্যাশক্তি মহামায়া), একটি জীবনীচিত্র (চারণকবি মুকুন্দদাস) এবং দুটি গোয়েন্দা চিত্র। বাকী চোদ্দটিই হচ্ছে প্রেমধর্মী-গার্হস্থ্য বা সামাজিক চিত্র। আঠারোখানি ছবির মধ্যে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে মাত্র খান-পাঁচেক ছবি। এগুলির মধ্যে 'বাঘিনী' চলেছে একযোগে ৪২ সপ্তাহ, বালুচরী ৩৮ সপ্তাহ, ছোট্ট জিজ্ঞাসা ৩৭ সপ্তাহ, চৌরঙ্গী ৩৫ সপ্তাহ এবং তিন অধ্যায় ২৯ সপ্তাহ। চলতি চারখানি ছবির (বৌদি, আপনজন, জীবন-সংগীত ও কখনো মেঘ) কথা ছেড়ে দিলে মুক্তিপ্রাপ্ত আঠারোখানির মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগই অসাফল্য বরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এ বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে তপন সিংহ পরিচালিত 'আপনজন'। ইন্দ্র মিত্র রচিত 'আপনজনের' কাহিনী গড়ে উঠেছে সেই সব শহুরে যুবক বা কিশোরকে ঘিরে, যাদের জীবনে কোন ভবিষ্যৎ নেই : চরম ব্যর্থতা ও হতাশা যাদের করে তুলেছে বেপরোয়া। [illegible] যারা আজ তাদের গুরুজন ও রাষ্ট্র-কর্ণধারদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা। এমন একটি সমকালীন সমস্যামূলক কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়ে [illegible] সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য

শ্রীসিংহ সকলেরই ধন্যবাদার্হ। অবক্ষয়-গতিকে ছন্নছাড়া জীবন যাপনে বাধ্য যুব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর একান্ত সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীটিও বিশেষ প্রশংসনীয়। 'বাঘিনী' ছবিটিতেও উন্মার্গগামী যুবক জীবনের কথা প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া গেলেও তার আচরণের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে দর্শকমনে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকে যায়। 'চৌরঙ্গী' নিশ্চয়ই একটি নতুন স্বাদের ছবি। কলকাতা শহরের অভিজাত পল্লীতে অবস্থিত বিরাট হোটেলের কর্মী ও বাসিন্দাদের জীবন নিয়ে শংকর যে-অনবদ্য কাহিনী রচনা করেছেন, চলচ্চিত্রে তার প্রতিফলন প্রয়াস আংশিকভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হলেও অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সবচেয়ে বাজী জিতেছে 'বালুচরী'। শরৎ সাহিত্যের অনুসরণে রচিত আবেগধর্মী সাংসারিক কাহিনীর দিন যে আজও নিঃশেষিত হয় নি, তারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে 'বালুচরী'র মতো একটি স্বল্প খরচের সাধারণ মানের ছবির অভাবনীয় আর্থিক সাফল্য।

উত্তমকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন শিল্পী চারখানি ছবিতে অভিনয় করেছেন। শুধু জনপ্রিয়তাই নয়, নাটনৈপুণ্যেও উত্তমকুমার যে আজও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন তার প্রমাণ 'গড় নাসিমপুর'-এ পার্শ্বচরিত্র মীরজুমলার ভূমিকায় তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ সুঅভিনয়। 'চৌরঙ্গী'তে লেখক শংকরের চরিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় দর্শকমনে একটা ছাপ রাখতে পেরেছেন। সন্ধ্যা রায় ছিলেন তিনখানি ছবিতে নায়িকা; তাঁর 'বাঘিনী'-দুর্গা চরিত্রচিত্রণ মনে রাখবার মতো। স্মরণীয় অভিনয় করেছেন ছায়া দেবী 'আপনজনে'। 'চৌরঙ্গী' ও 'তিন অধ্যায়ে' সুপ্রিয়া দেবীর এবং 'বালুচরী'তে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও অসামান্য নাটনৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'তে শিশুশিল্পী প্রসেনজিৎ দর্শক-দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

সঙ্গীত-পরিচালনার ক্ষেত্রে একা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ই ছ'খানি ছবির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে তাঁর সার্থকতম কাজ হয়েছে 'পঞ্চশরে'। এ ছাড়া বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে 'চারণকবি মুকুন্দদাসে' পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-পরিচালনাতে। বাঙলায় 'ডাব'-করা ছবি হলেও 'পদ্মাবতী-জয়দেব'-এর সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে বিজন পালের কাজ সন্তোষজনক।

এ-বছর আমরা হারিয়েছি প্রখ্যাত নট পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (প্রধানত যাত্রাভিনেতা হলেও কয়েকটি সবাক চিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন), চরিত্রাভিনেতা কালী সরকার এবং জনপ্রিয়া অভিনেত্রী রেণুকা রায়কে। চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে গত হয়েছেন গুণময়

বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বসু পরিবার'-খ্যাত নির্মল দে ও বিশু দাশগুপ্ত।

বাঙলা ছবির রাজ্যে ১৯৬৮ ছিল একটি দুর্বৎসর। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস কলকাতা শহর ও শহরতলীতে বাঙলা ছবির প্রদর্শনী বন্ধ থাকে। প্রথমে সিনেমা গৃহের কর্মীরা ১২ মার্চ থেকে ৩ জুন পর্যন্ত বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে অসফল ধর্মঘট চালান। তাঁদের আন্দোলন শেষ হতে না হতে বাঙলা ছবির বিক্রয়লব্ধ অর্থের ন্যায্য বন্টন নিয়ে শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পী সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলন। প্রায় আগস্টের শেষে হল বিরোধের সাময়িক অবসান; এ বিরোধের এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি।

বাঙলা চলচ্চিত্র জগতে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ২৭ ডিসেম্বর পতৌদির নবাবের সঙ্গে শর্মিলা ঠাকুরের বিবাহ।

চিত্র-সমালোচনা :

বাহারোঁ কী মঞ্জিল (হিন্দী) : রিজভী ব্রাদার্স-এর নিবেদন; ৩,৭৯৭-৯৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : সিবতে হাসান রিজভী; পরিচালনা : ইয়াকুব হাসান রিজভী; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : মাহমুদ সরোশ; সংলাপ : আহসান রিজভী; সঙ্গীত-পরিচালনা : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল; গীত-রচনা : মজরুহ্ সুলতানপুরী; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : আনওয়ার সিরাজ; শব্দানুলেখন : মাসির; সঙ্গীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : মুসা মনসুর; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : লতা মঙ্গেশকর; নৃত্য-পরিচালনা : সূর্যকুমার; রূপায়ণে : ধর্মেন্দ্র, রেহমান, আনওয়ার হাশমী, ওয়াহিদ [illegible] মুশারফ, মহেশ দেশাই, [illegible] ফরিদা জালাল, টুনটুন ও (নেতো) কুমারী মালকা এবং উইলিয়ম প্রভৃতি। ইস্টার্ন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর [illegible] পরিবেশনায়

সাথী / বৈজয়ন্তীমালা, রাজেন্দ্রকুমার ও সিমি

গেল ও জ্যানন্দ্ররাজী, শুক্রবার থেকে লোটাস, দর্পণা, গ্রেস, ছায়া, গণেশ, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

রিজভী ব্রাদার্স-এর ইস্টম্যান কালার রঞ্জিত 'বাহারোঁ কী মঞ্জিল' একটি কৌতূহলোদ্দীপক সাসপেন্সধর্মী ছবি। রাধা নামে একটি মেয়ে তার বিবাহের পূর্ব দিন রাত্রে দুর্ঘিপ্রালিত বোম্বাই শহরে তার পিতৃগৃহে। ঘুম থেকে জেগে সে দেখল সে রয়েছে দার্জিলিংয়ের একটি প্রাসাদোপম বাড়ীতে, সেখানে তার জামাইবাবু সুবোধ রায় তাকে ডাকছেন তাঁর স্ত্রী নন্দার নাম ধরে এবং সকলের কাছে তার পরিচয় দিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী নন্দা বলেই। তার নিজের কপালে রয়েছে একটি ক্ষতচিহ্ন, যে-ক্ষত নাকি হয়েছে কোনো বিস্ফোরণজনিত আঘাতের ফলে। রাধা বুঝতে পারে না কোথেকে কি হল। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠে। তার মানসিক চিকিৎসার জন্যে আহূত হন ডাক্তার সিংহ। ক্রমে তাঁর সন্দেহ জাগে কোথাও একটা ষড়যন্ত্র আছে বলে এবং ক্রমে তিনি রোগিণী রাধাকে ভালোও বেসে ফেলেন। ষড়যন্ত্র যখন উদ্ঘাটিত হয়, তখন রাধাকে নিয়ে সুবোধ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বিফল হন; তবে দৈবক্রমে তিনি আইনের হাত এড়িয়ে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবরণ করেন এবং রাধা রাজেশের মিলন ঘটে।

সাসপেন্সকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে যেভাবে ষড়যন্ত্রের উদ্ঘাটন করা হয়েছে, তা অনেক আগেও করা যেত। আসলে কাহিনীকার যখন চেয়েছেন, তখন অতি সহজেই জট ছাড়িয়েছেন। এবং এইখানেই হচ্ছে কাহিনীর দুর্বলতা।

সাসপেন্স-প্রধান কাহিনীর অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে এমন নাটকীয় পরিস্থিতি খুব কমই থাকে, যার মাধ্যমে শিল্পীরা তাঁদের নাটনৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় দিতে পারেন। তবু 'বাহারোঁ কি মঞ্জিল'-এ মীনাকুমারী, রেহমান এবং ধর্মেন্দ্র প্রভৃতি সুখ্যাত শিল্পী যে-অল্প সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করেন নি।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে এর অসাধারণ চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনার তুলনা হিন্দী ছবির রাজ্যেও অতি অল্পই দেখা যায়। ইস্টম্যান কালারের এমন ফোটোগ্রাফী আমরা বিদেশী ছবিতেও কদাচিৎ দেখেছি। আমরা বলব, মাত্র সেট-সেটিং ও ফোটোগ্রাফীর জন্যে ছবিটি চিত্রামোদীদের এবং ক্যামেরাম্যান সমেত চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। ছবিতে মাত্র চারখানি গান আছে এবং চারখানিই লতা মঙ্গেশকারের গাওয়া ও সেই কারণে সুগীত।

—নান্দীকর

হিন্দী নাটকের শতবর্ষ জয়ন্তী

এই শহর কলকাতায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প চর্চার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে ব্যাপৃত আছেন তাদের মধ্যে 'অনামিকা কলা সঙ্গমে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত কয়েক বছর ধরে এই গোষ্ঠীর উৎসাহী সভ্যবৃন্দ হিন্দী নাটকের প্রাণময় রূপকে জনসাধারণের সামনে মূর্ত করে তোলবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা ইতিমধ্যেই নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সম্প্রতি 'কলামন্দিরে' এঁদের পরিচালনায় পাঁচ দিনব্যাপী হিন্দী নাটকের শতবর্ষ জয়ন্তীর মধ্য দিয়ে সেই নিষ্ঠা আর সংস্কৃতি সচেতনতা নতুন করে আবার সূচিত হোল। এমন সুষ্ঠু সুন্দর নাট্যোৎসবের আয়োজন খুব কম চোখে পড়েছে। সুনির্বাচিত পাঁচটি নাটকের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে হিন্দী নাট্য আন্দোলনের বর্তমান রূপটিও বোধ করি পরিস্ফুট হোতে পেরেছে। বিভিন্ন দিনে পরিবেশিত নাটকগুলো হোল ঃ জয়শঙ্কর প্রসাদের 'স্কন্দগুপ্ত', ব্রেখটের 'ককেশিয়ান চক সার্কল', বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (হিন্দী-নাট্যরূপ ডাঃ প্রতিভা আগরওয়াল) 'কুঙ্কারন' ও রমেশ মেহতার 'চোং'।

ইব্রাহাম আলকাজীর পরিচালনায় দিল্লীর 'ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা' এই নাট্যোৎসবে 'স্কন্দগুপ্ত' ও 'ককেশিয়ান চক সার্কল' পরিবেশন করে আধুনিক নাট্যশিল্পের এক উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরতে পেরেছেন। 'স্কন্দগুপ্ত' ঐতিহাসিক নাটক হোলেও সংঘাত রচনায় সাধারণ মানুষের মানসিকতাই তাতে স্থান পেয়েছে এবং পরিচালনায় শ্রীমতী শান্তা গান্ধী সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টির পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

আশ্চর্য প্রযোজনা হোল ব্রেখটের 'ককেশিয়ান চক সার্কল'। যুদ্ধোত্তরকালে আলোচিত নাট্যকার ব্রেখটের এই নাটকটি পৃথিবীর নাট্য-ইতিহাসে একটি অমূ

মহিলা শিল্পী মহলের অনুষ্ঠানে সুনন্দা পট্টনায়ক, কেরামৎ খাঁ, অনুভা গুপ্তা, নমিতা সিংহ, কানন দেবী এবং মলিনা দেবী।

স্মরণীয় সংযোজন। এর হিন্দীরূপ মঞ্চে এনে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা' নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিকের সন্ধান যে দিয়েছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে প্রাচীন ককেশীয় রাজ্যের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায়। অত্যাচারী শাসক নিহত। শাসক-পত্নী 'নতেলা' তাই পালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু পালিয়ে যাবার সময় তার শিশু সন্তানকে রাজমহলে ফেলে চলে গেলেন। অন্যান্য চিন্তার ভারে শিশু তার মা'র মন থেকে প্রায় মুছে গেল। সেই নির্জন রাজপুরীতে 'গ্রোসা' নামে এক দাসী 'মাইকেল'কে (শিশুর নাম) মানুষ করতে লাগল, সে তার সবকিছু বিসর্জন দিলো এই শিশুর কল্যাণে। তারপর রাজ্যে যখন শৃঙ্খলা ফিরে এলো, সৈনিকেরা তখন গ্রোসার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলো মাইকেলকে। আদালতে শুরু হোল বিচার। নতেলা দাবী করলো মাইকেল তার সন্তান, গ্রোসা দাবী জানালো সে জীবনপণ করে মাইকেলকে মানুষ করেছে। বিচারের অপূর্ব নিষ্পত্তিতেই নাটকের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। ব্রেখটের সহযোগী কার্ল ওয়েবরের পরামর্শে এই নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনা করা হয়েছে। 'কলামন্দিরে'র সুপরিসর মঞ্চে এই নাটকের যে দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল তাতে লোকনাট্য পরিবেশনের আঙ্গিক লক্ষ্য করা গেছে। শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়ে কোথাও একটুও কৃত্রিমতা প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি। 'বিচারক' ও 'গ্রোসা'র ভূমিকায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন শশিকান্ত নিকতে ও উত্তরা বাওকর। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উষা মাটে (নতেলা), সুরেশ চৌধুরী (সাইমন), পি পি দীক্ষিত, র বি সাহানি, মুকুন্দ নায়ক, সচিত্তো বজ্রাক্ষ।

নাট্যোৎসবে 'অনামিকা'র 'এবং ইন্দ্রজিৎ'ও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রযোজনার দাবী রাখে। বহু আলোচিত বাদল সরকারের এই নাটকটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন প্রতিভা আগরওয়াল। অনুবাদে মূল নাটকের বক্তব্য কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি, স্বচ্ছ সুন্দর গতিতে এগিয়েছে নাটক। শ্যামানন্দ জালানের নির্দেশনায় একটি সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ভাষা পেয়েছে এবং লেখকের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়েছে হৃদয়গ্রাহী। সুপরিকল্পিত দৃশ্যে (দৃশ্য-সজ্জা খালেদ চৌধুরী) অভিনীত এই নাটকের আর একটি স্মরণীয় চরিত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী চেতনা তেওয়ারী। 'মানসী'র মধ্যে যে চিরন্তন নারীর রূপ লুকিয়ে আছে শ্রীমতী তেওয়ারীর চরিত্র-রূপায়ণে তা স্পষ্ট হোতে পেরেছে। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় 'ইন্দ্রজিৎ' চরিত্রে প্রাণ আরোপ করতে পেরেছেন এবং অমল বিমল কমলের ভূমিকায় বিমল লাট, অমর গুপ্ত, অরিন্দমের অভিনয়ও স্বাভাবিক হয়েছে। রবি কিচলুর আবহসঙ্গীত নাটকটির গতিকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

এছাড়া দিল্লীর 'কথম কলাকেন্দ্র' ও 'থ্রি আর্টস ক্লাবে'র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'কৃষ্ণায়ণ' (নৃত্যনাট্য), চোং (একটি হাসির নাটক)। এই দুটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন শ্রীবীরজু মহারাজ ও শ্রীরমেশ মেহতা।

এই নাট্যোৎসব উপলক্ষে ভারতীয় নাট্য আন্দোলনের ধারার ওপরে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন অনামিকা কলাসঙ্গম। বিশ্বের নাট্যচর্চার কিছু-কিছু ইতিহাসও এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই সুন্দর শিল্পসম্মত প্রদর্শনীটির পরিকল্পনা করেন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা'র ডাইরেকটর ইব্রাহাম আলকাজী।

এই সঙ্গে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং এতে অংশ নেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস, অন্নদাশঙ্কর রায়, রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, ম্যাক্সমুলার ভবনের ডাইরেক্টর ডাঃ লেচনার, দিল্লীর আমেরিকা দূতাবাসের সাংস্কৃতিক অধিকর্তা মিঃ টম নুন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'অনামিকা কলা সঙ্গম' তাদের কার্যাবলী এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেন নাট্যোৎসবের পূর্বে গ্রাণ্ড হোটেলে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানে ইব্রাহাম আলকাজী ভারতের বর্তমান নাট্য-ধারার ওপরে অপূর্ব সুন্দরভাবে আলোকসম্পাত করেন। তাঁর সুগভীর নাট্যচর্চা ও ভারতীয় নাটককে স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত করে তুলতে তাঁর নিষ্ঠাজড়িত প্রয়াস আমাদের বিমুগ্ধ এবং বিস্মিত করেছে।

বিবিধ সংবাদ

নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-সদনের বর্তমান পরিচালকবৃন্দ বাঙলা দেশে নাট্যোন্নয়নের যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তার জন্যে নাট্যোৎসাহীরা নিশ্চয়ই তাঁদের ধন্যবাদ দেবেন। তাঁরা দল ও মতনির্বিশেষে প্রতিটি খ্যাতনামা নাট্য সংস্থাকে আহ্বান জানিয়েছেন, রবীন্দ্র-সদনে তাঁদের একটি করে নাটক প্রযোজনা করবার জন্যে। মাত্র গুটিতিনেক সম্প্রদায় এখনও তাঁদের চূড়ান্ত সম্মতি দিতে পারেন নি। বাকী তেইশটি সম্প্রদায় তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৬ থেকে ১৪, ২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারী এবং ১৭ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রসদন মঞ্চে তাঁদের নাট্যসম্ভার উপস্থাপিত করছেন এবং দর্শকসাধারণ এই অভিনয়গুলি দৈনিক ২, ৩ ও ৫ টাকা প্রদর্শনীমূল্য কিম্বা ৩০ ও ২০ টাকা সিজন টিকিটের বিনিময়ে দেখতে পাবেন। রবীন্দ্র-সদনের কর্তৃপক্ষকে এই পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন কাহিনী অবলম্বন করে মাস্ক মুভী মেকার্স একটি চিত্রগ্রহণ-এর কাজে হাত দিয়েছেন। কাহিনী লিখেছেন শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত এবং চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন শ্রীদীপক মজুমদার।

গত ৭ ডিসেম্বর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ভবানীপুর শাখার রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল আকাদমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিঃ ভি আর দেশাই। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিঃ এস জে উত্তম সিং।

নাচ-গান-আবৃত্তি এবং নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেদিনের অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহেই চিত্তাকর্ষক হয়। কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি আর অর্ঘ্য সেনের রবীন্দ্রসংগীত অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সবশেষে হয়েছিল নাট্যাভিনয়। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'চার-প্রহর' নাটকটি অভিনয় করেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ। অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

গত ১৭ ডিসেম্বর স্টার রঙ্গমঞ্চে এগ্রিকালচার ডাইরেকটরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত টিপু সুলতান নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অপেশাদারী সংস্থা হিসেবে এদের অভিনয় বেশ উন্নত মানের। বিভিন্ন ভূমিকায় শ্রীধীরমোহন মুখোপাধ্যায়, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির সমাদ্দার, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, রণজিত পাল, লোকনাথ ঘোষ, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ও গীতা নাগের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণ সেনগুপ্ত।

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নান্দীকার' শ্রীবিকাশ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বোম্বাই শহরের রবীন্দ্রনাট্যমন্দিরে আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারী তাঁদের জনপ্রিয় নাটকগুলি, নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র, শের আফগান, যখন একা ও নানা রঙের দিন (একাংক) মঞ্চস্থ করবেন। সর্বশ্রী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্র সেনগুপ্ত, বরুণ সেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি বসু, পবিত্র সরকার, রাধারমণ তপাদার, শেলী পাল, দীপালি চক্রবর্তী, কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখ নান্দীকারের বিশিষ্ট শিল্পীরা এই নাটকগুলিতে অংশ নেবেন। সব ক'টি নাটকেরই নির্দেশনায় আছেন শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে নিম্নলিখিত ফরাসী ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। (১) পিক পকেট, (২) লা বী সারজ, (৩) ক্রশিং দা রাইন।

অন্যান্যবারের মত এবছরও মহিলা-শিল্পী মহল দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে তবে এবারের নতুন সংযোজন শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের [illegible] ও ভজন।

প্রথম দিনে "কবি" নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে ছিল উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আসর। তার আগে প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপা কানন দেবী তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে মহিলা শিল্পী-মহলের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন কোনোরকম সরকারী সাহায্য ছাড়াই তাঁরা দক্ষিণ কলকাতায় একটি নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করছেন। তা ছাড়া অক্ষম শিল্পীদের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান এবং চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন সমিতির পরিকল্পনারূপে গৃহীত হয়েছে। শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক, মহম্মদ সগীরুদ্দিন এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁকে বিনা পারিশ্রমিকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক দক্ষিণ ভারতীয় রাগ "সরস্বতী" পরিবেশন করেছিলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মহম্মদ সগীরুদ্দিন খাঁ ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর সারেঙ্গী ও তবলাসঙ্গতে অতুলনীয় কণ্ঠসম্পদের শুদ্ধ শ্রুতি ও তানবৈচিত্র্য ভাব-বিস্তার জমে উঠতে দেরী হয়নি। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে ইনি একটি স্ব-রচিত ভজন গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

এর পর "কবি" নাটকের প্রাণস্পর্শী মর্মভাবকে সুপরিশীলিত অভিনয়-সৌকর্যে মূর্ত করে তোলেন—মলিনা দেবী, [illegible] দেবী, সরযূ দেবী, অনুভা গুপ্ত [illegible], নীলিমা দাস, কেতকী দত্ত, আশা দেবী, মঞ্জু দে, বনানী ঘোষ, মিতা চট্টোপাধ্যায় এবং অনান্যারা।

দ্বিতীয় দিন "মিশরকুমারী" নাটকের পূর্বে সঙ্গীত-ভারতীর শ্রীমতী নীলিমা দাসের পরিচালনায় "অভিসার" নৃত্যনাট্য পরিচালনার দক্ষতা প্রশংসাযোগ্য উল্লেখের দাবী রাখে। তবে শিল্পীদের নৃত্য ও প্রকাশ ভঙ্গিমা আরও পরিমার্জিত ও অনুশীলিত হওয়া প্রয়োজন। দুদিনই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ এই প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্যের উজ্জ্বল সাফল্য ঘোষণা করছে।

সম্প্রতি গান্ধর্বী শিক্ষায়তনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উভয় দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায়।

উভয়দিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংগীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী সন্তোষ ঠাকুর, সুজিত চক্রবর্তী, মনোজ সেনগুপ্ত, সমীর মজুমদার, জয়ন্তী চক্রবর্তী, [illegible] চ্যাটার্জি, বীণা সাধু, শ্যামল দত্ত, মিহির সেনগুপ্ত, গৌরী সেনগুপ্ত, গৌরী ঠাকুর [illegible] ও [illegible]কা সেন।

কলিন কাউড্রের (ইংল্যান্ড) লেট কাট

দিলীপ দত্ত

ব্যাটসম্যানরা ক্রিকেটের নায়ক। ক্লাবের খেলা বা টেস্ট ম্যাচ যেখানেই হোক না কেন, দর্শকরা প্রধানতঃ নামকরা ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং দেখতেই মাঠে ভীড় করে থাকেন। একসময় ইংলন্ডের বিশ্ববিশ্রুত লর্ডস মাঠে ভীড় হোত ডাবলিউ জি গ্রেসের ব্যাটিং দেখবার জন্যে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে লোকজন ছুটে যেতেন ট্রাম্পারের খেলা দেখতে, ব্র্যাডম্যান যেখানেই ব্যাট করেছেন, দর্শকরা অকূল আগ্রহে ছুটে গেছেন সেখানে। মুস্তাক আলি এবং অমরনাথের জন্যে ভারতীয় দর্শকদের কত আকুল উৎসাহই না ছিল. লিণ্ডওয়াল, মিলার, মহম্মদ নিসার, জ্যাক অ ইভারসন, সুভাষ গুপ্তে, চন্দ্রশেখরের মত বোলারদের খেলা দেখার জন্যে ঔৎসুক্য থাকে বটে কিন্তু ক্রিকেট খেলায় বেশী আনন্দ দেন ব্যাটসম্যানরাই। ব্যাটিংয়ের আকর্ষণ সার্বজনীন।

কিন্তু ব্যাটিংয়ের আনন্দ-রস সম্পূর্ণ উপভোগ করতে হলে সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। শাস্ত্রীয় সংগীতে গায়কদের তান সাধারণ শ্রোতারও ভাল লাগে, আবার ঐ তান কোন কোন পর্দায় খেলছে সেটা যাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের কাছে সেই তান হয় আরও মাধুর্যময়। নামী ব্যাটসম্যানের বড় হিটে উত্তেজনা আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি কিভাবে হিট করলেন, সেটা বোঝবার মত ধারণা থাকলে আরও বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। সেজন্যেই ব্যাটিং সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গ্রিপ : হাত দিয়ে ব্যাট ধরাকে বলে গ্রিপ। যেভাবে আমরা কুড়ুল ধরি সেইভাবে দু'হাত দিয়ে ব্যাট ধরতে হয়। ডান হাত থাকে বাঁ-হাতের নীচে (ন্যাটা ব্যাটসম্যানের বেলায় ঠিক উল্টো), আর কাছাকাছি। অর্থাৎ ডান হাতটা ব্যাটের গোড়ার আর বাঁ হাতটা ওপরে। তবে সকলের বেলায় এরকম নয়। হাত দুটো ব্যাটের নীচে থাকবে না ওপরে থাকবে তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত সুবিধের ওপর। তবে হাতলের মাঝামাঝি ধরাটাই সর্বদিক দিয়ে সুবিধার। আর এই ব্যাট ধরার সময় বাঁ-হাতের কব্জিটা থাকে বোলারের দিকে ফেরান।

স্টান্স : ক্রিজে ব্যাট নিয়ে বলের অপেক্ষায় দাঁড়ানকে 'স্টান্স' বলে। এই সময় দুটি পা জোড়া করে দাঁড়ালে সহজভাবে নড়াচড়া করা যায় না। এই জন্যে ব্যাটসম্যানরা দুটি পা একটু ফাঁক করে দাঁড়ান তাতে দেহের ভার দুটি পায়ের ওপর সমানভাবে পড়ে। দাঁড়াবার সময় বাঁ পাটি থাকে ক্রিজের একটু বাইরে আর ডান পাটি ভেতরে। ডান পাটি ভেতরে রাখার প্রয়োজন এই জন্যে যে, তাতে 'স্টাম্প আউট' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই দাঁড়ানর সময় ব্যাটখানা থাকে ডান পায়ের পাশে। দু'পায়ের মাঝখানে রাখলে ব্যাট তোলার সময় প্যাডে আটকে যেতে পারে।

গার্ড : ব্যাট করতে এসে ব্যাটসম্যান গার্ড নেন। অর্থাৎ ব্যাটসম্যান যে স্টাম্পটা গার্ড দিয়ে খেলতে চান, আম্পায়ারের ইংগিত মত তার ঠিক সামনে ব্যাটখানা মাটির সঙ্গে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ক্রিজে একটা দাগ দিয়ে নেন। এই গার্ড নেওয়ার উদ্দেশ্য বলটি উইকেটের কোন জায়গায় আসছে তা বোঝার সুবিধে করে নেওয়া। যেমন লেগ-স্ট্যাম্প গার্ড নিলে এবং সেই দাগের ওপর ব্যাট রাখলে পা দুটি লেগস্টাম্পের বাইরে থাকে, তাই পায়ের বাঁদিকে বল এলে তা লেগ-স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যাবে তা নিশ্চিত-ভাবে ধরা যায়।

উইকেটে আসা : ব্যাট করতে আসার সময় প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে বাইরের উজ্জ্বল আলোয় এসে পড়তে হয়। এই আলোর পরিবর্তনটা চোখে সইয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়ন থেকে উইকেট পর্যন্ত পথটা আস্তে আস্তে হেঁটে যান। ব্র্যাডম্যান যে শুধু আস্তে হাঁটতেন তাই নয়, তিনি সোজা উইকেটের দিকে না গিয়ে একটু ঘুরপথে গোল হয়ে ঘুরে উইকেটে পৌঁছতেন।

ফিল্ডসম্যানদের দেখে নেওয়া :

উইকেটে এসে গার্ড নেওয়ার পর ব্যাটসম্যান চারিদিক চেয়ে দেখেন ফিল্ডসম্যানরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফিল্ডসম্যানরা কোথায় কোথায় আছেন তা দেখে নিলে বলটি মারার সময় সে-কথা আর চিন্তা করতে হয় না, আর স্ট্রোকের গতিপথ এমন-ভাবে ঠিক করে নেওয়া যায় যাতে বল তাঁদের হাতে যাবে না, পাশ দিয়ে চলে যাবে।

ফরওয়ার্ড ডিফেন্স : পা বাড়িয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলাকে ফরওয়ার্ড ডিফেন্স বলে। এই সময় বাঁ পা যথাসম্ভব বলের লাইনে (অর্থাৎ বোলারের হাত থেকে যে লাইন বরাবর বল আসছে) এগিয়ে যায়, আর ব্যাটটি চলে যায় বাঁ পা ঘেঁসে, সেই-খানেই বলের সঙ্গে হবে তার সংযোগ। প্যাড ও ব্যাটের মধ্যে কোন ফাঁক থাকবে না। ফাঁক থাকলে প্যাডের বা ব্যাটের ধারে লেগে ঐ ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এসে বল উইকেটে লাগতে পারে।

ফরওয়ার্ড ডিফেন্স খেলার সময় ব্যাটটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। অর্থাৎ ব্যাটের মাথাটা পিছন দিকে আর হাতলটা সামনে। ব্যাটের ডগাটা এগিয়ে থাকলে ক্যাচ ওঠে।

ব্যাক্ লিফ্ট্ : বল মারার সময় ব্যাট আগে পেছন দিকে ওঠে তারপর এগিয়ে যায়। এই পেছন দিকে ব্যাট তোলাকে ব্যাক-লিফ্ট বলে। এই ব্যাক-লিফ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক ব্যাক-লিফ্টে আসে কাঁধ ঘেঁসে স্লিপের দিক থেকে নয়। অর্থাৎ ব্যাট পেছনদিকে ওঠে কাঁধের কাছে। ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে নেমেই ব্যাটটি খুব বেশী পেছনদিকে তোলেন না, বিশেষতঃ ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ত নয়ই, কারণ উইকেটের গতি সম্বন্ধে তখন সঠিক আন্দাজ না থাকায় ব্যাট নামাতে না নামাতেই বল পৌঁছে যেতে পারে।

ব্যাক ডিফেন্স : পিছিয়ে এসে খেলার সময় ডান পাটি আড়াআড়ি ভাবে চলে যায়, বলের লাইনে, সেই সঙ্গে বাঁ পাটিও।
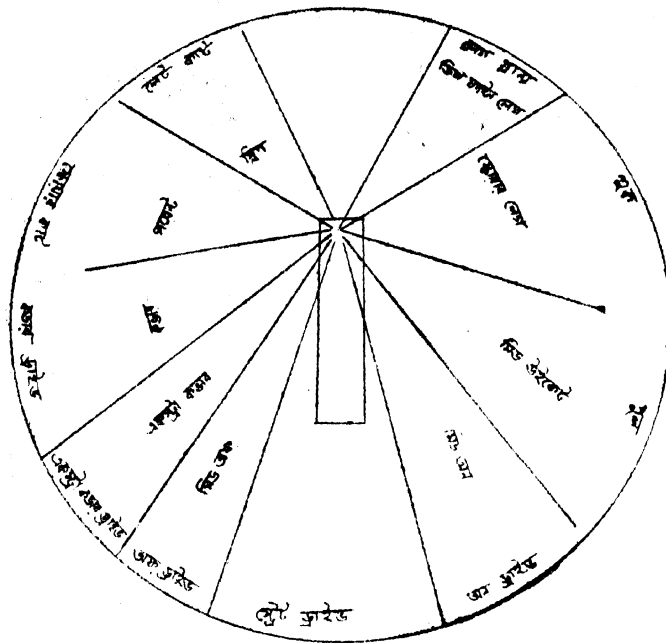
বিভিন্ন ধরের গতি

এই বলের লাইনে যেতে না পারলে আউট সুইং বা লেগব্রেক বলে স্লিপে ক্যাচ উঠে যায়।

আত্মরক্ষামূলক খেলার সময় ব্যাটটি আলগা করে ধরা থাকে বিশেষতঃ ডান হাতটি খুবই আলগা থাকে, তাহলে বল ব্যাটে লেগে আর বেশী দূরে যেতে পারে না, তার ফলে মাটিঘেঁসা সট না হলে উইকেটের কাছাকাছি ফিল্ডসম্যানের কাছে ক্যাচ চলে যায় না।

আক্রমণাত্মক খেলার প্রধান সট হল, ড্রাইভ, কাট, পুল, হুক এবং গ্লান্স।

ড্রাইভ : ড্রাইভ দু' রকমভাবে মারা যায়, এগিয়ে এবং পিছিয়ে। ড্রাইভ করে বলটি কভার দিয়ে পাঠালে কভার ড্রাইভ বলে। তেমনি একস্ট্রা কভার দিয়ে বল গেলে একস্ট্রা কভার ড্রাইভ, মিড অফ দিয়ে গেলে অফ ড্রাইভ, উইকেটের দু'পাশ দিয়ে সোজা যখন যায় তখন বলে স্ট্রেট ড্রাইভ এবং মিড-অন অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেলে বলে অন-ড্রাইভ।

ফরওয়ার্ড ড্রাইভ ক্রিজে দাঁড়িয়ে পা বাড়িয়ে কিংবা ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়েও করা যায়। দু-রকম সটই ফুলটস বা হাফ-ভলিতে বলটি নিতে হয়। ফরওয়ার্ড ড্রাইভে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সের সবক'টি নিয়মই মানতে হবে, কেবল সেগুলি করতে হবে দ্রুতগতিতে এবং ব্যাটও চালাতে হবে জোরে। আর ব্যাট চালানো শেষ হবে কাঁধের কাছে, এই অবস্থার নাম ফলো থ্রু। যে অঞ্চল দিয়ে ড্রাইভ মারা হচ্ছে বুটের ডগাও থাকবে সেই দিকে মুখ করে; যেমন কভার ড্রাইভে বুটের ডগা থাকবে কভারের দিকে, অন ড্রাইভে—অনের দিকে। ড্রাইভ করার সময় ব্যাটসম্যানের মাথাটি থাকবে সামনের দিকে ঝুঁকে। ব্যাটসম্যানের মাথা উঠে গেলে ক্যাচ উঠে যেতে পারে।

ব্যাকফুট ড্রাইভ, ব্যাক ডিফেন্সের নিয়ম হবে; কেবল বল জোরে মারবার জন্যে ব্যাক-লিফট বেশী হবে।

স্কোয়ার কাট : স্কোয়ার কাট মারও দু'রকম। সামনের পায়ে এবং পেছনের পায়ে ভর করে। স্কোয়ার কাটের পর বল যায় পয়েন্টের সামনে থেকে থার্ড স্লিপ পর্যন্ত এই জায়গাটুকু দিয়ে। জোরের ওপর বেশ সর্টপীচ বলে, বলের লাইনে আড়া-আড়ি পাটি বাড়িয়ে কাঁধের ওপর থেকে ব্যাট চালাতে হয়। ঠিকভাবে ব্যাটে-বলে সংযোগ হলে ফরওয়ার্ড স্কোয়ার কাটে বল কভার এবং পয়েন্টের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে চলে যায়।

পেছনের পায়ে স্কোয়ার কাট মারার সময় ডান পা আসে আড়াআড়িভাবে বলের লাইনে, বুটের ডগা পয়েন্টের দিকে মুখ করে থাকে। উইকেটের দিকে আসছে না এইরকম অফস্টাম্পের বাইরের সর্টপীচ বল স্কোয়ারকাটের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

লেট কাট : লেটকাট মার স্কোয়ার কাটেরই মত। নাম থেকেই বোঝা যায়, এ-ক্ষেত্রে ব্যাটে-বলে সংস্পর্শ হবে দেরীতে। এই মারের সময় ডান-পায়ের বুটের ডগাটা আর একটু স্লিপের দিকে ঘুরে যাবে, আর বল উইকেট পেরিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে ব্যাটটি লাগাতে হয়। লেটকাটে হাতের জোর লাগে না, লাগে কব্জির জোর, তাই জোর বল ছাড়া লেট-কাট মেরে একটার বেশী রাণ পাওয়া দুষ্কর। লেটকাটের পর বল চলে যায় স্লিপের মধ্য দিয়ে।

লেগ গ্লান্স : লেগ গ্লান্স ক্রিকেটে কারুকার্যময় সট। এক সময় এই মার খেলোয়াড়দের খুব প্রিয় ছিল, তখন লেগ-স্লিপ রাখার তত রেওয়াজ ছিল না। বর্তমানে ইনসুইং এবং অফ ব্রেক বোলাররা অন-সাইডে বেশ আঁটসাঁট করে ফিল্ড সাজান; ফলে লেগ-গ্লান্স করা খুব কার্যকরী হয় না, নিরাপদও নয়। তাই ফিল্ড প্লেসিং-এর ওপর গ্লান্স করাটা অনেকখানি নির্ভর করে।

ফরওয়ার্ড এবং ব্যাক ডিফেন্সের পদ্ধতিতেই ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড গ্লান্স করা যায়। তফাৎ এই যে, গ্লান্সের সময় বল ব্যাটের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে কব্জি ঘুরিয়ে ব্যাটটি অন-সাইডে ঘুরিয়ে দিতে হয়। লেগ-স্টাম্প বা লেগ স্টাম্পের বাইরের জোরালো সর্টপীচ বলই লেগ গ্লান্সের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। লেগ-গ্লান্স চলে যায় লেগস্লিপের মধ্য দিয়ে।

হুক : হুক ও পুল সটের পার্থক্য এত সামান্য যে, অনেক সময় কোনটা হুক আর কোনটা পুল তা বলা মুস্কিল হয়ে পড়ে। ডন ব্র্যাডম্যান, জোরের ওপর [illegible] সর্টপীচ বলকে উইকেটের ভেতরে সরে গিয়ে স্কোয়ার লেগের পেছনে মারাকে বলেছেন হুক, আর স্টাম্পের ওপর এমন কি লেগ স্টাম্পের বাইরের বলকে স্কোয়ার লেগের সামনে পাঠিয়ে দেওয়াকে বলেছেন পুল। [illegible] স্লো এবং মিডিয়াম পেস বলকেই পুল করা যায় আর হুক সট প্রধানতঃ দ্রুতগতি বোলিং-এর বিরুদ্ধে মারা হয়।

হুক সট মারবার সময় ডান পাটা [illegible] দিকে চলে যায়, বলটি কাঁধের সমান উঁচু এলেই স্কোয়ার লেগ আর ফাইন লেগের মাঝখান আন্দাজ করে ব্যাট চালাতে হয়। ডান পায়ের ওপর শরীরের ভার পড়ায় বলটি মারার পর শরীরটা স্বভাবতঃই অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে যাবে।

পুল : মিডিয়াম পেস এবং স্লো বোলারের সর্টপীচ বলকে পুল করা হয়। পুল করার সময় ডান পায়ের ওপর ভর রেখে শরীরটা ডান দিকে নিয়ে যেতে হয়। তারপর স্কোয়ার কাটের মত ব্যাট তুলে বলের ওপরে না মেরে পাশে মেরে পাঠাতে হয় মিড-অন আর স্কোয়ার লেগের মাঝামাঝি অর্থাৎ মিড উইকেট অঞ্চলে। ব্যাট বলে সংস্পর্শের সময় কব্জি ঘুরিয়ে বলটি মাটিতে রাখতে হয়।

অফ স্টাম্পের বাইরের বলকে পুল করার সময় বুদ্ধি করে উইকেটের সামনে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে মিস্ হলে বল উইকেটে না লেগে প্যাডে লাগে।

হুক ও পুল সটের সময় শরীরটা ঘুরে যায় তাই হিট উইকেট অর্থাৎ ব্যাট যাতে উইকেটে না লাগে সে বিষয়েও ব্যাটসম্যানকে সচেতন থাকতে হয়।

ক্রিকেটের প্রধান সটগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হোল। এই সটগুলির মধ্যে ফের করে আরও কতকগুলি সট আছে।

বিস্মৃতপ্রায় মহম্মদ নিসার

কমল ভট্টাচার্য

মহম্মদ নিশার

ফাস্ট বোলাররা সাধারণতঃ একটু রুক্ষ মেজাজের হন। হেঁকে জোরে বল করতে পেলেই তাঁদের দুষ্টু বুদ্ধিটা বেশী খেলে। প্রতিটি ব্যাটসম্যানকে আউট করতে গিয়ে তাঁর বম্পার-বীমারের ছররা ছুটিয়ে ছাড়েন। ব্যাটসম্যানরা বেগতিক দেখে যদি ... উইকেট ছাড়েন, তাহলে মারমুখী বোলারদের মুখে বেশী করে হাসি ফোটে। ... লারউড, ভীষণ হল ও গীলক্রীস্ট, ... মিলারও এই প্রকৃতি ... পড়েননি। এর কি ব্যতিক্রম ... আছে। অন্ততঃ দুজনের নাম ... বলতে পারি, যাঁরা বোলিংয়ের ... সেরা হয়েও ক্বচিৎ ব্যাটস-ম্যানদের গায়ে বল মেরেছেন। একজন ... ইংল্যান্ডের কেনেথ ফার্নস। অপরজন ... মহম্মদ নিসার। ফার্নসকে এক-... দেখেছিলাম বৃষ্টি-ভেজা মাঠে বল ...—১৯৩৮ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রে-লিয়ার টেস্ট সিরিজে। ফার্নসের বল ... ভেজা মাঠে ভয়ংকর হয়ে উঠল। ... ফার্নস একবারও বল ঠুকে দেবার ... করেননি। যদি তিনি তা করতেন, ... সেদিন খেলার মাঠ ব্যাটসম্যানদের ... হয়ে যেত। ফাস্ট বোলার হয়েও ... ছিলেন মেজাজে ঠাণ্ডা। তা না হলে ... কি কেউ হাতছাড়া করে?

মহম্মদ নিসারের বিশাল চেহারার সঙ্গে ... কোথাও মিল ছিল না। লম্বায় ... বেশী। মোটা থলথলে চেহারা। ... বাইশ পা ছুটে আসার পর ... হাতের বল যে কি ভয়ংকর অব-স্থাষ্টি করে সে চোখে না দেখলে কথায় ... যায় না।

১৯৩৮ সালে লর্ড টেনিসন দল ভারত সফরে এসেছিল। সেকালেও ইডেনের টেস্ট ম্যাচ কম আকর্ষণের ছিল না। ইডেনে লর্ড টেনিসন দলের বিপক্ষে বে-সরকারী টেস্টে ভারতীয় দলের নির্বা-চিত ষোলজনের মধ্যে আমার জায়গা হোল। বাঙালীর ভাগ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলা আমার পক্ষে কম আনন্দের ছিল না। নেট প্র্যাক-টিসের পর চূড়ান্তভাবে দল গঠন হবে এই ভেবে একটানা বল করে শেষ পর্যন্ত হাঁফিয়ে উঠলাম। তখন অধিনায়ক মার্চেন্ট শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আমাকে ব্যাট করতে ডাকলেন। ব্যস্ত হয়ে তিনি এক এক করে বোলার বেছে নিলেন—মহম্মদ নিসার, অমর সিং, ভিনু মানকড় এবং আমীর ইলাহীকে। বোলারদের হুকুম করলেন—'বোল ইওর বেস্ট প্লীজ।" কথাটা নেটের পেছনে প্যাড পরতে পরতে শুনতে পেলাম। বুঝলাম অধিনায়ক এই ভাঙ্গা আসরে আমার মৃত্যুশয্যার ব্যবস্থা করে রাখছেন। একটু হেসে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম ব্যাট করতে। তখনও বোলাররা সহজ হয়ে উঠতে পারেননি। বিশেষ করে মহম্মদ নিসারকে একটু বিচলিত হতে দেখলাম। আভাসে, ইঙ্গিতে তিনি অমর সিংকে বললেন : এই ভাঙ্গা উইকেটে ঐ একরত্তি ছেলেটাকে জোরে বল দিয়ে কি হবে? —বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন—"কেয়া ভাই, ইসকো মারনেকে লিয়ে হামলোক তৈয়ার হ্যায়!" অমর সিং জবাবে যা বললেন তা আর কানে এল না। ততক্ষণে মহম্মদ নিসার রাগে গর গর করতে করতে লম্বা পা ফেলে বাইশ পা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর একটা বলও আমার ধারে কাছে এল না। বুকের ওপর ওঠা সেই বলগুলি এধার ওধার দিয়ে কামানের গোলার মত ছুটেছিল। তা দেখে ভয়ে আরও আড়ষ্ট হয়েছিলাম। তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচালেন। সেই আমার প্রথম দেখা নিসার। দেখলাম আর জয় করে নিলাম।

ইডেনের সেই বে-সরকারী টেস্ট খেলায় মুস্তাক আলী এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ফিল্ডিং ছেড়ে চলে যান। দ্বাদশ ব্যাটসম্যান ছিলাম আমি। সুতরাং মাঠে আমাকে নামতে হল। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সেকেন্ড স্লিপে দাঁড়ালাম। হাতের নিশানা দিয়ে আন্দাজমত মাপ করে আমার হাত ধরে আরও কাছে টেনে নিয়ে ফাস্ট স্লিপ থেকে মহম্মদ নিশার চাপা স্বরে বললেন : ঘাবড়াও মাত্ বাবু, আপতো শিলপমে আচ্ছি ফিল্ড করতা হায়। ঘনঘন ঘাড় নেড়ে নিসার বললেন : সব ঠিক হো জায়গা। এতক্ষণে আমার ভয় ভাঙ্গল। পায়ের কাঁপুনি থামল। যে নিসারকে পাশে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে-ছিলাম, পরে সাহস পেয়ে নিসারকে মাথা নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম। বোকার মত তাঁকে দেখে একগাল হাসলাম। নিসারও হেসে উঠলেন। শিলপ ফিল্ডিং যে কত দায়িত্বপূর্ণ ও কত কঠিন কাজ সেটা নিসারকে দেখে কল্পনা করা শক্ত। একটু নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি এমন সহজভাবে ক্যাচগুলো ধরেন তা দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অত বড় ভারী শরীর নিয়ে তিনি নড়াচড়া করতে মোটেই দেরী করতেন না। শুধু কি তাই, একটি কঠিন ক্যাচ ধরেই তিনি জোর চিৎকার করে উঠলেন, ওয়েল বেলড—

ওয়েল বোলড। এমন স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে স্বয়ং বোলারও লজ্জায় ঘেমে উঠবেন। কেননা কঠিন ক্যাচ নিয়ে তিনিই বরং কৃতার্থ করেছেন। নিসার গ্যালারীর ভাল বলতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। সে যে অবস্থায়ই হোক।

ম্যাচ ভাঙ্গালে বেশ চালাক চতুর হয়েই তিনটি উইকেটই বগল-দাবা করলাম। এবার আর ভয় কি, পাশে মহম্মদ নিসার, উদার প্রকৃতির মানুষ। নিসার কিন্তু ছাড়লেন না। অনুনয় করে বললেন : আমাকে একটা দেবে না। ইচ্ছে হোল তিনটে উইকেটই তাঁর হাতে তুলে দিই। উনি আব্দার করে চাইছেন। এক ধমকে তিনি তো তিনটে উইকেটই আদায় করে নিতে পারতেন। তখন পালাবার পথ পেতুম না।

আরও এক ঘটনা। দেখিনি, তবে শুনেছি। পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার এক চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় হিন্দু দলের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু দলের শেষ জুটি সুঁটে ব্যানার্জি এবং সি এস নাইডু মাটি কামড়ে থাকলে কি হবে, বিপক্ষ দলের অধিনায়ক ওয়াজীর আলী এই সময়েই মহমদ নিসারকে বল করতে দিলেন। শেষ জুটি ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে অধিনায়ক চুপি চুপি নিসারকে ডেকে বললেন : বাম্পার দাও, দলকে বাঁচাও। নিসার কিন্তু গা করলেন না। এবার অধিনায়ক হুকুম করলেন—যে করেই হোক ব্যাটসম্যানের গায়ে বল মার। এবার নিসার মুখ খুললেন, বিরক্ত হয়ে বল ফেলে দিয়ে বললেন : 'গায়ে বল মারা আমার কাজ নয়।'

শেষ পর্যন্ত এই খেলায় মুশ্লিম দল হেরে যায়।

ইণ্টার কলেজিয়েট টুর্নামেণ্টে ১০৪ রানে ১৮টি উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব দেখে নির্বাচকমণ্ডলী ১৯৩২ সালের ইংল্যাণ্ড সফরের ট্রায়াল ম্যাচে নিসারকে দলভুক্ত করেন। প্রথম খেলাতেই নিসার ৬টি উইকেট পেয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু মাত্র একটি খেলার সাফল্য দেখে নিসারকে ইংল্যাণ্ড সফরে দলভুক্ত করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে দ্বিমত ছিল। শেষ পর্যন্ত নিসার দলভুক্ত হন। সেই ১৯৩২ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে মহম্মদ নিসার প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১,২৮৫ রানে ৭১টি উইকেট পান। নিসারের বোলিং দেখে বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক নেভিল কার্ডাস বলেন : 'নিসারের প্রথম কয়েক ওভার বোলিং দেখবার মত। ব্যাটসম্যানরা স্ট্রোক নেওয়া দূরে থাক, ডিফেন্স করতেও অস্থির হয়ে পড়েন। অনেকেই বলেছেন : 'প্রথম কয়েক ওভার নিসার লারউডের চেয়েও জোরে বল করতেন। ১৯৩২ সালের ইংল্যাণ্ড সফরের প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের বিশ মিনিটে রান উঠেছিল মাত্র ১৯। উইকেট পড়েছিল তিনটি (সাটক্লিফ, হোমস ও উলী)। এই খেলায় নিসার উইকেট পান সাটক্লিফ, হোমস, এমস, রবিন্স এবং ব্রাউনের, মাত্র ৯৩ রানে। উলী অবশ্য রান-আউট হন।

জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে যে বে-সরকারী দলটি ভারত সফরে এসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের টেস্টে নিসার ৭২ রানে ৬টি উইকেট পান। কলকাতায় পান ৩৫ রানে ৬টি। লাহোরে দুটি খেলা হয়। প্রথম খেলায় ৫১ রানে ৫টি এবং ৮০ রানে ৪টি। দ্বিতীয় খেলায় ৫১ রানে ৫টি এবং ৩৬ রানে ৬টি। এই হেন বোলিংয়ের নমুনা দেখে রাইডার দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় চার্লস ম্যাকরটনে নিসার সম্পর্কে বলেছিলেন : 'গোটা সফরটাই নিসার খুব ভাল বল করেছেন। আমাদের ব্যাটসম্যানরা তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তাঁর সুন্দর নিখুঁত বোলিংয়ে কোন ব্যাটসম্যানই সহজ হতে পারেন নি। আমার ধারণা নিসার যদি তাঁর ক্ষমতা অটুট রাখেন তাহলে আগামী সফরে তিনি ইংল্যাণ্ডের ব্যাটস-ম্যানদের বেগ দিবেন।' ১৯৩৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফরের টেস্ট খেলায় নিসার ১২টি উইকেট পান মাত্র ৩৪৩ রানে। প্রথম শ্রেণীর খেলায় নিসার পান ৬৬টি উইকেট ১,৬৫১ রানে। ব্যাটিংয়ে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৪২। ওভাল টেস্টে নিসার একেবারে ক্ষেপে ওঠেন। ইংল্যাণ্ডের চারশ রান করা দেখে নিসার নতুন বল হাতে পেয়ে ৯ ওভারে চারজন ব্যাটসম্যানকে তাঁবুতে ফিরিয়ে দেন। এই ১৯৩৬ সালেই কাউন্টী ম্যাচে নিসার ওরশেস্টারের বিরুদ্ধে ৯টি উইকেট পান ১৩৯ রানে। ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ১১ রানে ৬টি উইকেট। জার্ডিনের নেতৃত্বে য এম সি সি দল ভারত সফরে এসেছি তাদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেই নিসার পেয়ে ছিলেন পাঁচটি উইকেট। নিসারের মারাত্ম বোলিংয়ের ফলেই (১১৭ রানে ৯ উইকেট) ব্রাবানসীতে একবার মাত্র হারাতে হয়েছি জার্ডিন দলকে।

এরপর ১৯৩৮ সালে ইডেনে আম দেখা নিসারের কথা আগেই বলেছি। সে খেলায় নিসারের বোলিংয়ে ভারত কম টেনিশন দলকে হারাতে পেরেছিল। নিস পেয়েছিলেন ৭৯ রানে ৫টি উইকেট।

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কোয়াড্রাঙ্গুলার এবং পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় মুশ্লিম দল হয়ে মহম্মদ নিসার বহু কৃতিত্বের স্বা রেখে গেছেন। ১৯৩৮ সালে পেণ্টাঙ্গুলার একটি খেলায় হিন্দু দলের বিরুদ্ধে মহম্ম নিসার প্রথম ইনিংসে ২০ রানে ৫টি উইক পান। কোয়াড্রাঙ্গুলার ম্যাচে নিসার খে ১৯৩৩ এবং ১৯৩৬ সালে। এই দু ব খেলে তিনি উইকেট পান ২৯টি।

মহম্মদ নিসার তাঁর খেলোয়াড় জীব প্রথম দিকে ওপনিং ব্যাটসম্যান ছিলে বদলী বোলার হিসেবে তিনি মা ইসলামিয়া কলেজে নিয়মিত খেল ১৯২৮ সাল থেকে তিনি জোর বল করেন। নিসারের জন্ম ১২ই মে, ১৯ সালে।

খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২০০ রান (ফ্রেডারিকস ৭৬ রান। ম্যাকেঞ্জি ৭১ রানে ৮ উইকেট)।

ও ২৮০ রান (সেমুর নার্স ৭৪ এবং গ্যারী সোবার্স ৬৭ রান। গ্লিসন ৬১ রানে ৫ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৫১০ রান (বিল লরী ২০৫, ইয়ান চ্যাপেল ১৬৫ এবং ডগ ওয়াল-টার্স ৭৬ রান। সোবার্স ৯৭ রানে ৪ এবং গিবস ১৩৯ রানে ৪ উইকেট)।

মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ৩০ রানে জয়ী হয়ে সাময়িকভাবে ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজের ফলাফল সমান (১—১) হয়। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী হয়েছিল। আলোচ্য মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে প্রধানত জয়যুক্ত করেছেন পাঁচজন খেলোয়াড়—অধিনায়ক বিল লরী (২০৫ রান), ইয়ান চ্যাপেল (১৬৫ রান), ডগ ওয়ালটার্স (৭৬ রান), ম্যাকেঞ্জি (প্রথম ইনিংসে ৭১ রানে ৮ উইকেট) এবং গ্লিসন (দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রানে ৫ উইকেট)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই বিশ্বখ্যাত ফাস্ট বোলার—ওয়েসলী হল এবং চার্লি গ্রিফিথ মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দলভুক্ত হন নি। গত দশ বছরের টেস্ট খেলায় এই দুই দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে অনুপস্থিতি এই প্রথম। দৈহিক অপটুতা এবং শরীরে চোট লাগার কারণে হলফোর্ড এবং ক্লাইভ লয়েড মেলবোর্ণ টেস্টে দলভুক্ত হন নি। লয়েড প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী (১২৯ রান) করেছিলেন। অপর দিকে হাতে চোট লাগার দরুণ অস্ট্রেলিয়ার অতিনির্ভরশীল বোলার অ্যালান কনোলীর পক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে খেলা সম্ভব হয় নি। প্রখ্যাত দুই ফাস্ট বোলারকে বাদ দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে মন্থর স্পিন বোলারদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরাজয়ের কারণ ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতা। অধিনায়ক সোবার্স এই ব্যর্থতা নিজ মুখে স্বীকার করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়ে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। বৃষ্টির ফলে প্রথম দিন পুরো সময় খেলা হয় নি। জোর বৃষ্টি হওয়ায় ৮৩ মিনিট আগে খেলা বন্ধ করতে হয়। প্রথম দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৭৬ রান সংগ্রহ করে। মধ্যাহ্নভোজের সময় তাদের ৩ উইকেট পড়ে ৬৭ রান দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দিন ফ্রেডারিক্স ৭৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ের এই হাঁড়ির হাল করেছিলেন ম্যাকেঞ্জি—৫৭ রানে ৪ উইকেট।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তাদের বাকী ৪ উইকেটে পূর্ব দিনের রানের সঙ্গে (৬ উইকেটে ১৭৬) মাত্র ২৪ রান যোগ হয়।

অপর দিকে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিনের বাকী খেলার সময়ে এক উইকেট খুইয়ে ২৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা কিন্তু ভাল হয় নি—মাত্র ১৪ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু অধিনায়ক বিল লরী (নট-আউট ১১৭ রান) এবং ইয়ান চ্যাপেল (নট-আউট ১৩৩ রান) দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে রেকর্ড ২৪৯ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ছিল—২২৯ রান (বিল পন্সফোর্ড এবং ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০-৩১)। চ্যাপেল ১৯৪ মিনিটে তাঁর সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করেন (বাউণ্ডারী ১০)। লরীর সেঞ্চুরী রান পূর্ণ হয়েছিল ২৩৯ মিনিটে (বাউণ্ডারী ৪ এবং ওভার-বাউণ্ডারী এক)। এখানে উল্লেখ্য, ব্রিসবেনের গত প্রথম টেস্টে লরী এবং চ্যাপেল দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ২১৭ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৫১০ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৩১০ রানে এগিয়ে যায়। এই দিন অস্ট্রেলিয়া তাদের বাকী ৯টা উইকেটে ২৪৭ রান সংগ্রহ করেছিল। তবে চা-পানের পর শেষ ৬টা উইকেট নাটকীয়ভাবে মাত্র ২২ রানে পড়ে যায়। সোবার্স এবং গিবস মাত্র আধ ঘণ্টায় এই ৬টা উইকেট নিয়ে নাটকীয় কাণ্ড করেন। বিল লরী এবং ইয়ান চ্যাপেল শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ২৯৮ রান তুলেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে তাঁরা দ্বিতীয় দিনেই অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে দ্বিতীয় উইকেট জুটির রেকর্ড রান ভাঙেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দ্বিতীয় উইকেট জুটির বিশ্বরেকর্ড রান অস্ট্রেলিয়ান জুটিরই—৪৫১ (বিল পন্সফোর্ড এবং ডন ব্র্যাডম্যান, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ওভাল, ১৯৩৪)। আলোচ্য মেলবোর্ণ টেস্টে বিল লরীর ডাবল সেঞ্চুরী (২০৫ রান) বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে তথা তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে এই নিয়ে তিনি দুটি ডাবল সেঞ্চুরী করলেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড—২১০ রান (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, বার্বাডোজ, ১৯৬৫)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩১০ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের খেলার বাকী সময়ে এক উইকেটে ২৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮০ রানের মাথায় শেষ হলে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ফলে ৫ম দিনটা মাঠে মারা যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে দ্বিতীয় ইনিংসে ঘায়েল করেন গ্লিসন (৬১ রানে ৫টা উইকেট)। দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৫ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চতুর্থ উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দলকে এই শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন পঞ্চম উইকেটের জুটি সেমুর নার্স এবং গ্যারী সোবার্স। তাঁরা ১৬২ মিনিট এক সঙ্গে খেলে দলের ১৩৪ রান তুলেছিলেন। সোবার্সের উইকেট পাওয়ার সূত্রেই গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ২০০টি উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

লর্ড লিয়ারী কনস্টানটাইন

লর্ড লিয়ারী কনস্টানটাইন

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিশ্ববিশ্রুত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার লিয়ারী নিকোলাস কনস্টানটাইনকে ইংরাজি শুভ নববর্ষ (১৯৬৯) উপলক্ষে ইংল্যাণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথ 'ব্যারণ' (লর্ড) সম্মানে ভূষিত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, গত ৫০ বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন অশ্বেতকায় ব্যক্তিকে রাজকীয় 'ব্যারণ' খেতাবে সম্মানিত করা হল। শেষ অশ্বেতকায় হিসাবে ১৯১৯ সালে এই দুর্লভ লর্ড খেতাব পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সিংহ। লর্ড সিংহের পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু লর্ড কনস্টানটাইনের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড উপাধি লাভ করবেন না। তবে তিনি হাউস অব্ লর্ডসে আসন পাবেন এবং ভোটদানের অধিকারীও হচ্ছেন।

স্যার লিয়ারী কনস্টানটাইন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জগতে একজন স্বনামধন্য পুরুষ। অসাধারণ ক্রিকেট খেলার সূত্রেই তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেছেন। এ পর্যন্ত যে কজন ক্রিকেট খেলোয়াড় এই দুর্লভ 'স্যার' উপাধি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মাত্র দু'জন অশ্বেতকায় ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং এ দু'জনই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো খেলোয়াড়—একজন স্যার লিয়ারি কনস্টানটাইন এবং অপরজন স্বর্গীয় স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জগতে লর্ড লিয়ারি কনস্টানটাইনের সমকক্ষ বহুমুখী প্রতিভাবান, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দ্বিতীয় নেই। তেজস্বিতা এবং সদাচার গুণেও তিনি পরম শ্রদ্ধাবান পুরুষ।

এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতায় সাউথ ক্লাবের সবুজ লনে আয়োজিত এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। মিক্সড ডাবলস ছাড়া প্রতিযোগিতার বাকি তিনটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় খেলোয়াড়রা চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। পুরুষদের সিংগলস খেতাব পেয়েছেন জয়দীপ মুখার্জি। এই নিয়ে তিনি দুবার সিংগলস খেতাব পেলেন। প্রথম পান ১৯৬৫-৬৬ সালে, রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করে। এবছরের প্রতিযোগিতার দুটি অনুষ্ঠানে খেতাব পেয়েছেন একমাত্র জয়দীপ মুখার্জি (সিংগলস এবং ডাবলস)।

নিরুপমা বসন্ত

জয়দীপ মুখার্জি
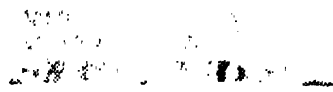
ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : জয়দীপ মুখার্জি ৬-২, ৬-২ ও ৬-০ গেমে বিল টিমকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : নিরুপমা বসন্ত ৬-১, ৩-৬ ও ৬-৩ গেমে শ্রীমতী এ্যালিস টিমকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে এম রিবারজেক এবং ভি নোউইকিকে (পোল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী জুডিথ ডিবর এবং এস স্তোন (রুম্যানিয়া) ৭-৬, ৬-৩ ও ৬-১ গেমে কুমারী সুখনদাস এবং বলরাম সিংকে পরাজিত করেন।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

জব্বলপুরে আয়োজিত ৩০তম জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের দলগত বিভাগে রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে উপর্যুপরি দুবার বার্না-বেল্লাক কাপ জয়ী হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুরুষদের দলগত বিভাগে রানার্স-আপ হয়েছে এবং মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপর্যুপরি ৫ বার জয়লক্ষ্মী কাপ পেয়েছে।

দলগত বিভাগ

পুরুষ বিভাগ (বার্না-বেল্লাক কাপ) : গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে ৫—৪ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছে।

মহিলা বিভাগ (জয়লক্ষ্মী কাপ) : গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র ('এ' দল) ৩-০ খেলায় মহারাষ্ট্র 'বি' দলকে পরাজিত করেছে।

জুনিয়র বিভাগ (রামানুজম কাপ) : গত বছরের চ্যাম্পিয়ান অন্ধ্রপ্রদেশ ৩—০ খেলায় মাদ্রাজকে পরাজিত করেছে।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

অমৃতসরে আয়োজিত ৩৩তম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার মহিলা এবং বালকদের দলগত বিভাগে মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ান হওয়ার দৌলতে যথাক্রমে ছাব্দা কাপ এবং নারাংগা কাপ জয়ী হয়েছে।

দলগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ (রহিমতুল্লা কাপ) : পাঞ্জাব ৪—১ খেলায় রেলওয়েকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ (ছাব্দা কাপ) : মহারাষ্ট্র ২—১ খেলায় উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে।

বালক বিভাগ (নারাংগা কাপ) : মহারাষ্ট্র ৩—০ খেলায় অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : সতীশ ভাটিয়া (মহীশূর) ১৫—৫, ৮—১৫ ও ১৫—৮ পয়েন্টে দীনেশ খান্নাকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : দময়ন্তী সুবেদার (উত্তরপ্রদেশ) প্রথম সেটে ১১—২ পয়েন্টে জয়ী হওয়ার সূত্রে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছেন। কারণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী কুমারী মীনা শাহ (রেলওয়ে) পায়ের যন্ত্রণায় প্রথম সেট খেলার পর খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।

রোভার্স কাপ

১৯৬৮ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মোহনবাগান ৩—০ গোলে হায়দরাবাদ লীডার্স ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মোহনবাগানের পক্ষে নাইম (২টি) এবং কানন গোল দেন। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে মোহনবাগান উপর্যুপরি ৫ বছর রোভার্স কাপের ফাইনালে খেললো এবং এপর্যন্ত রোভার্স কাপ পেয়েছে ৩ বার (১৯৫৫, ১৯৬৬ ও ১৯৬৮)। এ বছর একদিকের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ৫—১ গোলে মফতলাল স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে লীডার্স ফুটবল ক্লাব ৩—১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে (কলকাতা) পরাজিত করে। গত বছরের রোভার্স কাপ বিজয়ী ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে ২— গোলে লীডার্স ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ মিত্র-ঘোষের আসন্নপ্রকাশ গ্রন্থরাজি ॥
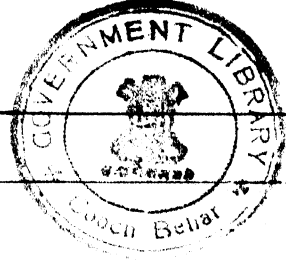
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

অবিস্মরণীয় নূতন উপন্যাস

আমি কান পেতে রই ১২৲

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কলকাতা ও বৃন্দাবনের পৃষ্ঠপটে এক রূপসী কীর্তনওয়ালীর জীবন এই বিপুল উপন্যাসের উপজীব্য। সেই সঙ্গে আরও বহু বিচিত্র জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন প্রবীণ ঔপন্যাসিক—তাঁর লেখনীর জাদুদণ্ড স্পর্শে সেদিনকার রঙ্গ-মঞ্চ, সেদিনকার জাদুকর, সার্কাসওয়ালী, সেদিনকার বিদগ্ধসমাজ ও ধনীসমাজ, সেদিনকার বস্তিঘরের মুখে এরারুট-মাখা দেহজীবিনী সকলে প্রাণবন্ত হয়ে পাঠকদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

॥ এ উপন্যাস একমাত্র এই লেখকই লিখতে পারেন ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
নবতম উপন্যাস
একচামচ গঙ্গা ৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নূতনতম উপন্যাস
স্বয়ংবৃতা ৬,

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
দ্বিধা ৬,

সৈয়দ মুজতবা আলীর
রাজা উজির ৭,

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গৌরাঙ্গ পরিজন ১০,

তারাশংকরের
যোগভ্রষ্ট ৭,

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
যাত্রাগানে রামায়ণ ১০৲

নকুল চট্টোপাধ্যায়ের
চিরকুমারী সভা ৪৲
সত্য ঘটনার আশ্চর্য চমক !

শচীন্দ্রলাল রায়ের
জাহাঙ্গীরনামা ৮৲
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর অনুবাদ

প্রবোধকুমার সান্যালের
মনেরেখো ৮,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
রাত্রির তপস্যা ৮,

নলিনীকান্ত সরকারের
হাসির অন্তরালে ৬,

অনিলেন্দ্রনাথ মিত্রের (মামাবাবুর)
ব্যাডমিণ্টন ৫৲

খেলার বিজ্ঞান ও আঙ্গিক
বহু চিত্রযুক্ত
প্রামাণ্য ও চিত্তাকর্ষক

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২　ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

৮ম বর্ষ

৩য় খণ্ড

৩৬ সংখ্যায়

মূল্য

৪০ পয়সা

Friday, 17th January, 1969. শুক্রবার, ৩রা মাঘ, ১৩৭৫ **40 Paise**

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীর দাশগুপ্ত

চিঠিপত্র

'ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন' প্রসঙ্গে

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়লাম। পড়তে খারাপ লাগল না। ভাষাটি স্বাচ্ছন্দ্য আগাগোড়াই। হয়তো এই কৃতিত্বটুকু উনি দাবী করতে পারেন। এর বেশী নয়।

এক কথায় বলতে গেলে উনি ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির গুণকীর্তন করেছেন। অহেতুক কতগুলো সুন্দর কথা সাজিয়ে ফেডারেশন কিভাবে ছবি আনায়, বিতরণ করে, দূতাবাসগুলো চিঠি দেয়, চিঠিতে ছবির কত মাপ, ফিল্ম সোসাইটিগুলো ফেডারেশনকে কত টাকা করে দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি লিখেছেন। অনস্বীকার্য, ফেডারেশন-এর কার্যাবলী ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। উনি সেই কার্যাবলীর সমালোচনা করেন নি। পাশ কাটিয়ে কিছু কিছু দোষারোপ করেছেন যথাক্রমে ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোক্তাদের এবং দর্শকদের। সর্বশেষে কতগুলো অসত্য তথ্য প্রকাশ করে বিভ্রান্ত করেছেন পাঠকবর্গকে।

দুঃখের বিষয় আমারও সামান্যতম যোগাযোগ রয়েছে এই আন্দোলনের সঙ্গে সুতরাং এ ক্ষেত্রে কয়েকটা অপ্রিয় সত্য তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

(১) শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম স্টাডি গ্রুপ বছরে ছ'টি আলোচনা সভার আয়োজন করেন।

আমার কথা হ'ল ফেডারেশন অথবা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কি প্রমাণ করতে পারেন কোন বছরে তিনটি/চারটির বেশী আলোচনা সভা হয়েছে? উদাহরণ স্বরূপ আটষট্টিতে মাত্র দু'টি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন উল্লিখিত স্টাডি গ্রুপ।

সর্বোপরি এইসব আলোচনা সভা নিয়ে নাকি রীতিমত গবেষণাও হয়। জানি না এত গবেষণার পরও ফিল্ম সোসাইটির চৌদ্দ আনা উদ্যোক্তাই ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলন বলতে উত্তেজক ধরণের একটা আন্দোলনের কথা ভাবেন।

(৩) হঠাৎ করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন। কেন? যখন পাঠকবর্গ এই আন্দোলন সম্পর্কে অতীত/বর্তমান কিছুই বোঝেন নি, সেই সময় এই ধরনের অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণার কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে?

(৩) সবশেষে উনি উদ্যোক্তা এবং দর্শকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন। উদ্যোক্তারা বিদেশী পুস্তক পত্র-পত্রিকা থেকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে উদ্দেশ্য বর্জিত রচনার দ্বারা পত্রিকা অথবা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। দর্শকদের আসল মোহ 'আনসেন্সরড' কথাটির জন্য।

ধরুন আপনি একজন উদ্যোক্তা। আপনার ওপর ভার দেওয়া হ'ল একটি চলচ্চিত্র উৎসবের পুস্তিকা প্রকাশের। অবশ্যই বিদেশী ছবির উৎসব। আপনি সবজান্তা নন অথবা যেসব ছবিগুলির আলোচনা করবেন তা আপনার জানা নেই অথবা জানার সুযোগ নেই। তখন আপনাকে তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। এবং অবশ্যই বিদেশী পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা থেকে। এই ধরনের তথ্যমূলক লেখাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আপনি কি চৌর্যবৃত্তি আখ্যা দেবেন?

যদি ফেডারেশন নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন করেন অথবা গবেষণাও হয় তাহলে এই সংকট থাকবে কেন? বাধ্যতামূলকভাবে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই কেন? ১৯৫৯ সাল থেকে ৬৯ হ'ল। এই দশ বছরে ফেডারেশনের নিজস্ব কোন গ্রন্থাগার হ'ল না কেন? ফেডারেশন কি শুধুমাত্র ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশান অফিস?

দর্শকদের দোষ দিয়ে কি লাভ। ভারতবর্ষের সেন্সার কর্তৃপক্ষের জন্যই দর্শকদের এই আনসেনসার্ড ছবি দেখার ঝোঁক। সেন্সারবোর্ড এর সমালোচনা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কি একবারও করেছেন সম্পূর্ণ লেখাটিতে?

চঞ্চল বসু
সিনে ফোরাম,
কলিকাতা—১৪।

রেভাঃ লালবিহারী দে সম্পর্কে

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ সংখ্যায় 'অমৃতে' প্রকাশিত 'নতুন বই' প্রসঙ্গে রেভাঃ লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের সমালোচনা সময়োচিত হলেও, কয়েকটি তথ্য বিতর্কমূলক এ-কথা অনস্বীকার্য। আমার পত্রখানিতে প্রামাণ্য তথ্য নিবেদন করছি। পত্রখানি প্রকাশ করবেন আশা করি।

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্বলিখিত ও সম্পাদিত বইখানি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিঃসংশয়ে তিনি একটি জাতীয়কৃত্য করেছেন এবং অনুরাগী পাঠক সমাজের ধন্যবাদ তিনি পাবেন।

(১) "বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুর গ্রন্থ সমালোচনা করে তিনি সাময়িকভাবে উভয়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন." (২) "...শিক্ষিতজনের নীরবতা তাঁর সম্ভাবনাকে প্রায় অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল..." **এগুলি তথ্যভিত্তিক নয় এবং যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে।**

বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর অনুরাগের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনার প্রচুর উপকরণ দিতে পারি। ১৮৭২ সালে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আগস্ট মাসে। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রেভাঃ লালবিহারী দে লিখছেন,

> "The above remarks are merely general, and there exist of course bright and notable exceptions, among whom may be mentioned the names of Peary Chand Mittra (the father of Bengali novelists). Bankim Chandra Chatterjee, Ramesh Chandra Dutta, Dinabandhu Mittra......"

১৮৫৮ সালে রেভাঃ লালবিহারী দে লিখছেন—

> (Calcutta Review Vol 31/1858)
> . . . We hail this book "Allaler Gharaer Dulal", as the first novel in the Bengali language. Tekchand Thakoor has written a tale, the like of which is not to be found within the entire range of Bengali literature. . . unlike Dutch painters, he does not indulge in minute delineations, but finishes up his business by a few master strokes. . . ."

প্যারীচাঁদের অনুজ কিশোরীচাঁদ মিত্র 'চৈতন্য' প্রবন্ধ রেভাঃ লালবিহারী দে 'বেঙ্গল' ম্যাগাজিনে' (১৮৭২, সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়। কিশোরীচাঁদের প্রথম নিবন্ধ 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' ১৮৭৩ সেপ্টেম্বরে, 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সালে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনের' নিয়মিত তরুণ লেখক ছিলেন প্যারীচাঁদের সপ্তম সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রলাল মিত্র। স্বয়ং প্যারীচাঁদ মিত্রের শেষ রচনার কিছু অংশ—

> "On the soul its nature and development".

১৮৭৮ সালে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হয়। তৎকালীন শিক্ষানুরাগী মনীষীগণের নিকট রেভাঃ লালবিহারী দের জনপ্রিয়তার এগুলি নিদর্শন।

গোরাচাঁদ মিত্র। কলিকাতা-৬
(টেকচাঁদ ঠাকুর ভবন)

'নতুন ঠগী' প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নতুন ঠগী' সিরিজের ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে অপূর্ব—পুরোটা যেন রুদ্ধশ্বাসে পড়ে যেতে হয়। লেখক এমন সজীব ও সুন্দরভাবে ঘটনাগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। শহরের এই অন্ধকার দিকগুলির হদিস আমরা এতদিন পাইনি এবং এগুলি জেনে সাধারণ ব্যক্তিরাও হয়তো সতর্ক হয়ে যাবেন। লেখকের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ তিনি যেন আরও বেশ কয়েক সংখ্যায় 'নতুন ঠগী' লিখে পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করে রাখেন।

নীলিকা সোম
চার্চ লেন এলাহাবাদ

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের হাওয়া

মধ্যবর্তী নির্বাচনের হাওয়া এই শীতকালেও বেশ উত্তপ্ত। মাদ্রাজের নাগেরকয়েল শ্রীকামরাজকে লোকসভায়
নির্বাচিত করে পাঠাবার পর কংগ্রেস মহলে নিশ্চিতই উল্লাস বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আর অল্প
দিন পরেই, ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত সপ্তাহেই সমস্ত দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র
দাখিল করা হয়ে গেছে। বিধানসভায় মোট আসন ২৮০টি, প্রার্থী সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। হয়তো কিছু প্রার্থী শেষ মুহূর্তে
সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু এবার প্রতিটি কেন্দ্রেই যে জোর লড়াই হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
প্রধান রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে একমাত্র কংগ্রেসই সব কটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং
বিকল্প সরকার গঠনে ইচ্ছুক যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে মোট ২৭৬টি আসনে প্রার্থী
দিয়েছে। বাকী চারটি আসনে পি এস পি পাবে ফ্রন্টের সমর্থন। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির সংখ্যা মোট ২৭টি। অন্তত গোটা
দশেক নতুন দলেরও সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ কত বেশি এ থেকে তার খানিকটা ইঙ্গিত
পাওয়া যায়।

মধ্যবর্তী নির্বাচন পশ্চিম বাংলায় এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাষ্ট্রপতির শাসন এবং অকংগ্রেসী
মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতাও এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ পেল। বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ার বিরাট
অদল-বদল হয়েছে। অনেকগুলো রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। তার অনেকগুলোই দলত্যাগের হিড়িকে
বিদায় নিয়েছে। কতকগুলো বিশেষ করে, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কেরল ও মধ্যপ্রদেশ ভালভাবেই টিঁকে আছে। পশ্চিমবঙ্গে ৯
মাস যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ছিল। দলত্যাগের ফলে মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ায় রাজ্যপাল তাঁদের বরখাস্ত করেন। এই
বিতর্কিত প্রশ্ন নিয়ে সারা দেশ তোলপাড় হয়েছিল। মধ্যবর্তী নির্বাচন অনেকটা তারই পরিণতি।

নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত বিচারের সুযোগ পাওয়া যায়। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে নির্বাচনই জনস্বার্থ রক্ষার
অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এক শ্রেণীর উগ্রপন্থী নির্বাচন বয়কট করার জন্যও এখানে-সেখানে শ্লোগান ও পোস্টার দিচ্ছে।
তাতে জনসাধারণ সায় দেয় নি। নির্বাচনী প্রচার অভিযান পুরোদমেই শুরু হয়ে গেছে। বহু দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে
নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত করে এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। নির্বাচকরা নিশ্চয়ই মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরে এমন
একটি সরকার দেখতে চাইবেন যাঁরা আগামী পাঁচ বছর শাসনকার্য চালাতে সক্ষম। গত নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ
সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ফলেই রাজনৈতিক বিভ্রাট সৃষ্টিতে সুবিধাবাদী দলত্যাগীরা সক্ষম হয়েছিল। দলত্যাগের এমন
একটা হিড়িক সৃষ্টি হয়েছিল যে, জনসাধারণের ভোটের মূল্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছিল। কংগ্রেস এবং অকংগ্রেস সকল দলই
এর জন্য সমান দায়ী। অর্থের লোভে বা গদীর লোভে কিছু নীতিহীন সদস্যকে দলত্যাগ করাতে পারলেই যখন মন্ত্রিসভার
পতন ঘটান যায় তখন এই রাজনৈতিক খেলায় সুযোগ সকল দলই নিতে চাইবেন। কার্যত তাঁরা নিয়েছেনও। এ থেকে
দায়িত্বশীল দলগুলো খানিকটা শিক্ষা পেয়েছেন। সর্বদলীয় সম্মেলন ডেকে দলত্যাগের বিরুদ্ধে তাঁরা স্বেচ্ছায় 'আচরণ বিধি'
প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আশা করা যায়, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর সুযোগসন্ধানী দলত্যাগীদের সংখ্যা কমবে এবং তাঁদের
বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আরও একটি আশঙ্কার কথা এখানে উল্লেখ করে রাখা ভাল। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাঁদের মত
প্রকাশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিচার-বুদ্ধির ওপর আস্থা রেখেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে সকলকে অংশ গ্রহণ
করতে হয়। জনতাকে বিভ্রান্ত করে, ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে ব্যালট বাক্সকে প্রভাবিত করা অত্যন্ত গর্হিত ও অবাঞ্ছিত
কাজ। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে রাজনৈতিক জগৎ থেকে এই সমস্ত অবাঞ্ছিত কর্ম নির্মমভাবে ছাঁটাই করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের
সামনে এখন এক বিরাট সমস্যা। তার অর্থনীতি প্রায় দেউলে, শিক্ষাজগতে নৈরাশ্য এবং জনজীবনেও গভীর হতাশা।
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতির কেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর এক অদ্বিতীয় স্থান। একে বাদ দিয়ে
বাংলা দেশের কথা ভাবাই যায় না। অথচ এই মুখ্য মহানগরীর অবস্থা আজ শোচনীয়। এই শহরকে বাঁচাবার জন্য আজ
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে হতাশা এবং উদ্দেশ্যহীনতা এসেছে তা দূর করতে হবে। আগামী
নির্বাচনের পর স্থায়ী সুদক্ষ সরকার সেই নিশ্চিতি আনতে সমর্থ হবে এই আশা নিয়েই নির্বাচনের প্রতীক্ষা করবে
জনসাধারণ।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

কেন এই নির্বাচন?

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে একযোগে ভারতবর্ষের চারটি রাজ্যে যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হচ্ছে তাকে কেউ কেউ "মিনি-জেনারেল ইলেকশনস্" অর্থাৎ "খুদে সাধারণ নির্বাচন" বলে অভিহিত করেছেন। সত্যি সত্যি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-প্রদেশ ও পাঞ্জাবে একযোগে এই নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এত তাড়াতাড়ি এই দেশের ভোটদাতাদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (বলতে গেলে গোটা উত্তর ভারতের মানুষ) আবার ব্যালট বাক্সের সামনে যাচ্ছেন আজকের ভারতবর্ষের একটা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে। সেই প্রশ্নটা হচ্ছে, আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জনগণের প্রতিনিধিমূলক একটা স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব কিনা।

যদিও এই চারটি রাজ্যেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের গুরুত্ব রয়েছে এবং যদিও চারটি রাজ্যেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রশ্নগুলি কতকটা এক ধরনের তথাপি ঠিকভাবে বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের গুরুত্বই সম্ভবত অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশী। কলকাতার মত শহর ও বন্দর যে রাজ্যে রয়েছে সেই রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল কোন দিকে যায় তার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করবে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মুখ্য শিল্প-প্রধান রাজ্য। এই রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়ার উপর সারা দেশের বৈষয়িক স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে। অন্য যে তিনটি রাজ্যে অন্তবর্তী নির্বাচন হচ্ছে সেগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসী দলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক বেশী জোটবদ্ধ। সেদিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ফলাফলের সম্পর্কে সারা দেশের মানুষের বিশেষ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা যদি পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাব, গত দুই বছরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আঙিনায় যেন ঝড় বয়ে গেছে। এই ঝড়ের ঝাপটায় কে যে কোথায় ছিটকে গেছেন তার ঠিক নেই। দলগুলোর ছক সেদিন যেভাবে সাজান ছিল আজকের সংগে তার কোনরকম মিল খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

যেমন, আজ একথা মনে করা সহজ নয় যে, গত নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের কোন অস্তিত্বই ছিল না। যুক্ত-ফ্রন্ট তৈরী হয়েছিল নির্বাচনের পর যখন পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা পশ্চিমবঙ্গের অকংগ্রেসী দলগুলির হাতে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পসরা তুলে দিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের চতুর্থ বিধানসভায় যেদিন ১৫৩টি আসন সহ যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল আর কংগ্রেস ১২৭ জন সদস্য নিয়ে বিরোধী পক্ষে গিয়ে বসল সেদিন এই রাজ্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল। কদিন আগেই যিনি কংগ্রেসের মন্ত্রী ছিলেন এবং যিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে কংগ্রেস ভবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন সেই শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন মুখ্য-মন্ত্রী ও তাঁর এককালের নেতা শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেনকে ভোটে হারিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসলেন। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা জনতার শুভেচ্ছা ও আশার দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

কিন্তু ঐ মন্ত্রিসভার জন্মলগ্নেই সম্ভবত শনি ছিল। যুক্তফ্রন্টের ১৮ দফা কর্মসূচীর মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেই প্রতিশ্রুতি অকেজো রয়ে গেল প্রধানত ফ্রন্টের ভিতরকার অনৈক্যের জন্য। যে কোয়ালিশনের মধ্যে কম্যুনিস্ট থেকে জন-সংঘ পর্যন্ত নানা ছাপের মানুষ রয়েছেন, যে মন্ত্রিসভায় একদিকে সাধারণ শ্রমিক, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের সমর্থক আছেন এবং অন্যদিকে আছেন জোতদার, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিল্পমালিকদেরও পৃষ্ঠপোষকগণ সেই কোয়ালিশন ও সেই মন্ত্রিসভার ফাটল-গুলি আট মাসের যুক্তফ্রন্ট শাসনে প্রকট হয়ে উঠল। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ৩ জন যুক্তফ্রন্ট সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিলেন। জুলাই মাসে খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অক্টোবর মাসে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসার সব আয়োজন গোপনে পাকা করে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে এলেন। এবং চূড়ান্ত সংকট দেখা দিল যখন ৩ নভেম্বর তারিখে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে ও যুক্তফ্রন্ট থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে দার্জিলিংয়ে রাজ্যপালের কাছে পত্র পাঠালেন ডঃ প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষ। ঐ পত্রে তিনি জানালেন যে, আরও ১৭ জন বিধানসভা সদস্য যুক্তফ্রন্ট থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

এমন কি যে "ঘেরাও" নিয়ে এত কথা হয়েছে সে বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে বলতে গেলে গোড়া থেকেই দ্বিমত ছিল। এই বিষয়ে শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া মন্ত্রী থাকা-কালেই ভিন্ন মত দিয়েছেন। ফ্রন্টের অন্যতম রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন ইউ-টি-ইউ সি পশ্চিমবঙ্গে শ্রমনীতির ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছিল। রাজ্যের শ্রম পরি-স্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি যখন ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে হরতাল ডাকেন তখন তা নিয়ে ফ্রন্টের মধ্যে তীব্র মতান্তর দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে ঐ হরতালের আহ্বান তুলে নেওয়া হয়েছিল। ৩ জুন তারিখে কলকাতা হাইকোর্ট যদি ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী ইঞ্জাংকশন না দিতেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ঘেরাওকে বে-আইনী বলে ঘোষণা না করতেন তাহলে এই মতান্তর যে কতদূর গড়াত বলা যায় না।

ঘেরাও পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক মন্দার কারণ, না, তার পরিণাম, এ বিষয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, ঘটনা এই যে ১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ২৬৯টি কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং তাতে ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে গোলযোগ হয়েছে। আসানসোলের কয়লাখনি এলাকায় এস-এস-পি-র ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীবেনারসীপ্রসাদ ঝার হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে আন্তঃইউনিয়ন কলহ বিশ্রীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে মন্ত্রি-সভার কম্যুনিস্ট সদস্যের মধ্যেও মতান্তর দেখা দিয়েছিল।

যুক্তফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে যে তীব্র খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার জন্য যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার চেষ্টা করেন। এই বিষয়টিও যুক্তফ্রন্টের ভিতর যথেষ্ট

মনোমালিন্যের কারণ হয়েছিল। খাদ্যের দাবীতে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা দিল্লীতে গিয়ে ধর্না দিলেন। এই ধর্নায় কাজ হয়েছে কি হয় নি সে বিষয়ে যুক্তফ্রন্টের সকলে একমত হলেন না। ধর্না দিয়ে মন্ত্রীরা ফিরে এলে পরও হরতাল ডাকা হবে কিনা সেবিষয়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আলোচনায় মতভেদ দেখা দিল। মাত্র একটি দলের মত-গরিষ্ঠতায় ২৪ আগস্ট হরতাল করা হল।

খাদ্য আন্দোলনের নামে যখন জায়গায় জায়গায় ট্রেন আটক করা হচ্ছিল, কলকাতায় পেট্রোল আসতে দেওয়া হচ্ছিল না এবং এই সব ঘটনার সঙ্গে যখন যুক্তফ্রন্টের শরিক বিভিন্ন দলকে যুক্ত থাকতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তখন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা কি হবে সেবিষয়ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে মতভেদ প্রকাশ পায়। এই দিক থেকে সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হল নকশালবাড়ীর ঘটনা। মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত সেখানে ডাকাতি, জবর-দখল, অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদির ৯০টি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এবং একজন পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন নারীসহ ৭ জন স্থানীয় অধিবাসী মারা যাওয়ার পর ৫ জুলাই তারিখে মন্ত্রিসভা সেখানে কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার পরও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থকদের মধ্য থেকেই অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁরই প্রশ্রয়ে পুলিশ বাড়াবাড়ি করছে।

কিন্তু এসব মতভেদ ও অনৈক্য সত্ত্বেও হয়ত পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় সরকারের আশা নির্মূল হয়ে যেত না—যদি না ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা ঐভাবে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতেন এবং যদি না পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক রুলিংয়ের দ্বারা একটা সাংবিধানিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করতেন। প্রকৃতপক্ষে একথা মনে করার কারণ আছে যে, ১৯৬৭ সালের ৩ নভেম্বর তারিখে ডঃ ঘোষ যখন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এলেন তখন ফ্রন্ট আগের চেয়ে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং আগেকার ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করে অনেকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঐ ৩ নভেম্বর তারিখটির পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির হাওয়া অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে উঠল—যার জের এখনও মেটে নি। ডঃ ঘোষ যখন তাঁর ১৪ জন সমর্থককে নিয়ে রাজ্যপালের সামনে হাজির করলেন তখনই বোঝা গেল, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট বিনা যুদ্ধে ক্ষমতা ত্যাগ করতে রাজী হল না। সেখান থেকেই বাধল লড়াই। সে লড়াই যেমন আইন ও সংবিধানের লড়াই তেমনি রাজপথের আন্দোলন। এই লড়াইয়ের এক পক্ষে যুক্তফ্রন্ট, অন্যপক্ষে নয়াদিল্লী, রাজ্যপাল, কংগ্রেস ও ডঃ ঘোষের নবগঠিত পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ওরফে পি-ডি-এফ। রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর যখন অবিলম্বে বিধানসভা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার যাচাই করার জন্য মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করলেন তখন মন্ত্রিসভা বললেন, ১৮ ডিসেম্বরের আগে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা সম্ভব নয়। কংগ্রেস কলকাতার ময়দানে জনসভা করে বলল, হয় তিন দিনের মধ্যে বিধানসভা ডেকে মন্ত্রিসভা তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিচয় দিন, অথবা মন্ত্রিসভাকে বিদায় দেওয়া হোক। রাজ্যপাল নয়াদিল্লীতে পরামর্শ করে ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, এত দেরী না করে ২৩ নভেম্বর বিধানসভার বৈঠক ডাকা হোক। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, ১৮ ডিসেম্বর তারিখটি বদলাবার কোন কারণ নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রাজ্যপালের এক্তিয়ার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রপতিকে পত্র দিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের বক্তব্য অগ্রাহ্য করলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই, ২১ নভেম্বর তারিখে সন্ধ্যাবেলায়, রাজ্যপাল অজয়বাবুর মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে দিয়ে সে জায়গায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভাকে শপথ গ্রহণ করালেন।

পয়লা বাজীতে যুক্তফ্রন্টের হার হল। কিন্তু তখনও জানা ছিল না, দ্বিতীয় বাজীতে তাঁদের জন্য একটা মস্ত বড় জয় অপেক্ষা করছিল। সেই বাজী তাঁরা জিতলেন একটি মাত্র মানুষের জন্য। তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অবৈধভাবে নিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে আহূত বিধানসভার অধিবেশন অবৈধ—এই এক রুলিং দিয়ে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার সম্ভাবনাই তিনি নাকচ করে দিলেন। পরবর্তী কালে স্পীকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যে, সেদিন স্পীকার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ রুলিং যুক্তিযুক্ত হয় নি। কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রুলিং দিয়ে বিধানসভাকে যেভাবে অচল করে দিয়েছিলেন তার প্রতিকারের পথও কেউ বার করতে পারেন নি। বলতে গেলে সেই পথ আজও বার হয় নি। ২৯ নভেম্বর তারিখে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রুলিং দিলেন। ১৯৬৭ সালে ২৯ নভেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী এই ৭৮ দিন কেটে গিয়েছিল ঐ রুলিংয়ের জট ছাড়াবার রাস্তা বার করার চেষ্টায়। ছাড়ান যায় নি। ৭৮ দিন ধরে ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা কাজ চালিয়ে গেলেন বিধানসভার সম্মুখীন না হয়ে। এরই মধ্যে কংগ্রেস পি-ডি-এফ-এর সঙ্গে কোয়ালিশনে যোগ দিল। কংগ্রেসের মন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে দলের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিল। ফলে শ্রীআশুতোষ ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন কংগ্রেস এম-এল-এ দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নিজেরা আলাদা দল করলেন।

বাজেট পেশ করার তাগিদে অবশেষে ডঃ ঘোষকে বিধানসভার সম্মুখীন হতেই হল। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সেও এক মনে রাখার মত তারিখ—১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী। ঐদিন শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুরানো রুলিংয়েরই পুনরাবৃত্তি করলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের বিরুদ্ধে ও পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কলকাতার রাজপথে যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন চলছিলই। লাঠি, গ্যাস, গ্রেপ্তার, এসব ময়দান অঞ্চলে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আন্দোলনকারীদের দাবী, ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাকে সরিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হোক। ছয় দিন বাদে অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সেই আদেশই এল। সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদে মন্ত্রিসভা বাতিল হল, বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল।

সেই ১৪ ফেব্রুয়ারী আবার ঘুরে আসছে। এক বছর আগে যে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় নি আজ কি সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে? পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা কি একটা স্থায়ী, সুসংহত সরকার গঠনের ভিত্তি তৈরী করে দিতে পারবেন?

৯ ফেব্রুয়ারী ব্যালট বাক্সের মধ্যে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।

মহেন্দ্র চক্রবর্তী
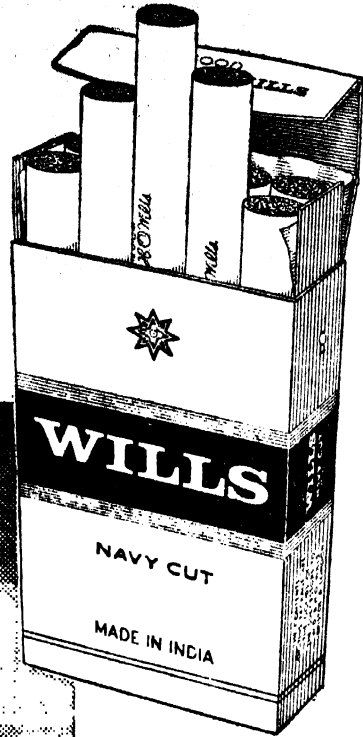
আসন্ন অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তফ্রন্ট নতুন যে 'স্ট্র্যাটিজি'র আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার নজীর ইতিপূর্বে ভারতের অন্য কোন রাজ্যের নির্বাচনে মেলে না।

কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্টের উভয়ের হাবভাগ দেখে পরিষ্কার মনে হচ্ছে, উভয় দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের বিষয়ে সন্দিহান। তাঁরা তাই শুরু থেকেই 'সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্সে'র কৌশল গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ দুই দলের নেতারা প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকার করতে চাইছেন না। প্রশ্ন করা হলে অস্বীকার করেন। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা ঘোষণায় জানান, জয়লাভ করবেনই। কিন্তু আসলে এই রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্র অন্যরূপ।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ছবির দিকে একটু বিশ্লেষণমূলক মনোভাব নিয়ে তাকালে দেখা যাবে, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরে দল ভাঙাভাঙির যে খেলা শুরু হয়েছে, যার কদর্যরূপে পশ্চিমবঙ্গবাসী অহোরাত্র এখনও দগ্ধে মরছে, তার তো অবসান হয়ইনি; বরং এবার নির্বাচনের আগে থেকে সেই খেলা বেশ ভালভাবেই জমে উঠেছে। প্রথমত নতুন গড়ে ওঠা ছোট ছোট দলের কথা ওঠে। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে রাগ বা অভিমান অথবা বিশেষ বিশেষ নেতার রোষবহ্নিতে দগ্ধ হয়ে কেউ কেউ অথবা একদল লোক বেরিয়ে এসে ছোট ছোট দল সৃষ্টি করেছেন। আসলে এই নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে বামপন্থী দলগুলি অন্ততঃ প্রকাশ্যে তাঁদের ঝগড়ার কথা প্রকাশ করছেন না। কংগ্রেসই এই সকল ছোট ছোট দলের তীরধনুকের আঘাতে কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই আক্রমণ বড়ভাবে না আসায় কংগ্রেসকে কাবু করতে পারছে না। তবে একথা সত্য যে, জনমানসে কংগ্রেসের ছবি এবার কিঞ্চিৎ ভাল ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটাই কংগ্রেসসেবী ও সমর্থকদের কাছে সবচেয়ে বেশী আশার কথা। শহরাঞ্চলেও যেখানে প্রতিদিন ধর্মঘট আর লক আউটের হিড়িক, সেখানেও কংগ্রেসপ্রার্থী তাঁদের বক্তব্য রাখতে পারছেন। কিন্তু বিগত নির্বাচনে সেই অবস্থা ছিল না।

এর পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে। বিশেষ করে দেশবাসী যুক্তফ্রন্টের নয় মাস শাসনের পর বুঝতে পেরেছেন যে, স্থায়ী সরকার গঠিত না হলে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, কংগ্রেস একা নয়, যুক্তফ্রন্টও স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারেন। সংখ্যার দিক থেকে এই দ্বিতীয় দলও ২৮০টি আসনে এবার প্রার্থী দিয়েছেন। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আসন বন্টনের ব্যাপারে এখনও তাঁদের মধ্যে মন কষাকষি চলছে। তাই সন্দেহ হচ্ছে, সরকার গঠনের পর যুক্তফ্রন্ট কি দেশবাসীকে আবার অতীতের নয় মাসের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেবেন?

একথাও সত্য যে, আসনগুলিতে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কংগ্রেসের ঘরেও কোঁদল রয়েছে। তবে তা তেমনভাবে বাইরে প্রকাশ পায়নি। নির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা শুধু নয়, সর্বভারতীয় নেতারা বিশেষ নজর দিয়েছেন।

পরিবর্তিত অবস্থায় তাই এবার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ আশা করছেন, কংগ্রেস থেকে সদস্য বেরিয়ে গেছেন এমন কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি হয়তো বা অদূরভবিষ্যতে কংগ্রেস সংগঠনে ফিরে আসতে পারেন। তাঁরা আদর্শের দিক থেকে কম্যুনিজমের বিরোধী এবং কংগ্রেস আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁদের অভিযোগ বা অভিমান মিটিয়ে দিতে পারলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা এই ধরনের প্রতিনিধিরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, দেশের স্বার্থে 'কম্যুনিস্ট-প্রধান যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যুক্তিসংগত নয়।' তার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা ভবিষ্যৎ কর্মসূচী তৈরী করবেন।

এই শ্রেণীর প্রতিনিধি সংখ্যা কম নয়। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদের এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। লোকদল, জাতীয় দল, আই এন ডি এফ-এর নেতারা একটা প্রশ্নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কম্যুনিস্টদের সরকা গঠন করতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজন হবে তাঁরা তো কংগ্রেসে আসতে পারেন।

কিন্তু যুক্তফ্রন্টও সরকার গঠনের শপ নিয়েছেন। তাঁরাও নতুন 'স্ট্র্যাটিজি' গ্রহ করে অপর একটা দলকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে চলেছেন। এবং সংবাদ নি জানা গেছে, যুক্তফ্রন্টের কোন কোন নেতা সমর্থনে প্রগ্রেসিভ মুশ্লিম লীগ জোর প্রচা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার লাইন ধ তারা যেভাবে এগুচ্ছে, তাতে কিছু ভোটা যে প্রভাবান্বিত হবেন, তা বলা চলে সরকার গঠনের ব্যাপারে এদের সাহায্য নিতে ফ্রন্ট কার্পণ্য করবেন কি?

তবে কংগ্রেসে আসতে পারেন, এমন জনপ্রতিনিধিরা যে সহজ ও সরল পথ ধরে কংগ্রেসে আসবেন, ঠিক তত সোজাভাবে মুশ্লিম লীগের সঙ্গে ফ্রন্টের আঁতাত করা চলবে না। কারণ এই স্ট্র্যাটিজির আশ্রয় গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে ফ্রন্টের রাজনীতিতে কিছু জটিলতা অবশ্যই দেখা দেবে। অন্তত তাঁরা এদের সঙ্গে প্রকাশ্যে আঁতাত করলে বাইরের লোকেদের কাছে নিন্দিত হবেন। ফ্রন্টের কোন কোন নেতা এইভাবে আগুন নিয়ে যে খেলা খেলছেন, তাতে বিপদ আসতে পারে।

তবে দুদলই যে 'সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স'এর ওপর জোর দিচ্ছেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এখনই দেখা গেছে।

পঃ বঙ্গে বিগত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী অবস্থা কি ছিল

অপূর্ব সেনগুপ্ত

শহরে গ্রামে প্রস্তুতি

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার একটি ভোটযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল এই পশ্চিম বাংলায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি না ঘটত তবে এতদিনে একটি জনপ্রিয় সরকার হয়ত লাল দিঘীর লালকুঠি আলো করে বসত। কিম্বা দলছুট-দলছুট খেলা সুরু হয়ে অনিশ্চয়তার ঘনঘটায় এই রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশ আবার ছেয়ে যেত। যাই হোক, আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বাংলার আবার ভাগ্যপরীক্ষার দিন। জনতার প্রতিনিধি পুনরায় রাজত্ব চালাবেন, না রাজ্যপালের প্রতিভূ জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবেন তার চূড়ান্ত পরীক্ষা সমাসন্ন।

যে কোন দলের নেতাই পশ্চিম বাংলায় আসুন না কেন তাঁরা প্রত্যেকেই একদফা বাংলার ঐতিহ্যকে কি রাষ্ট্র ক্ষেত্রে, কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে—তারিফ করে যান। আর সেই অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় পশ্চিম বাংলার মানুষকে বিচার করে তাঁদের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রশংসাও করেন। সংগে সংগে অবশ্য এই আশা পোষণ করেন যে এবার বিচারবুদ্ধির পূর্ণ প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটি স্থায়ী সরকার গঠন নিশ্চয়ই করবেন। কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট প্রত্যেকেই এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। তবে স্থায়ী সরকার বা এক দলীয় সরকার হবে না বলে (অবশ্য এখানে ফ্রন্টকেও দলের সমপর্যায়ে গণ্য করতে হবে) তাঁরাই বলছেন যাঁরা সরকার পতনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত অনেক নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের আশা, কোয়ালিশান সরকার নিশ্চিতভাবেই বাংলায় গঠন করতে হবে। কাজেই, যে দলই ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করুন না কেন এই ছোট দলগুলির ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

ছোট দলের নেতারা ইতিমধ্যেই এই মনোভাব সুস্পষ্টভাবে সভাসমিতির মাধ্যমে, সাংবাদিক বৈঠকে এবং বিবৃতি মারফৎ ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য কি যুক্তফ্রন্ট কি কংগ্রেস কেউ এদের বক্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। বরঞ্চ লোকদল নেতা শ্রীহুমায়ুন কবির, যিনি এই কোয়ালিশান প্রশ্নটিকে অত্যন্ত জোরের সংগে উপস্থাপিত করেছেন, তাঁকে কংগ্রেস থেকে কেউ আমল দিতে চান না। অধিকন্তু কংগ্রেস সভাপতি শ্রীএস নিজলিঙ্গাপ্পা যে কোন দলের সংগে কোয়ালিশানের প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে পশ্চিম বাংলায় কোনদিন কোয়ালিশান সরকার গঠনের প্রশ্ন ওঠে নি। কারণ তার আগে তিনটি সাধারণ নির্বাচনেই কংগ্রেস নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস বিরোধীরা নির্বাচনকালের মতদ্বৈধতাকে পরিহার করে নির্বাচনোত্তরকালে একই পতাকাতলে রাতারাতি মিলিত হয়ে কংগ্রেসকে প্রায় বিশ বছর পরে লালদিঘীর কক্ষ থেকে ময়দানে নামিয়ে দিলেন। চতুর্থ নির্বাচনের দিন পর্যন্তও কংগ্রেস একথা ভাবতে পারে নি যে বিজয়ের বরমাল্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

ক্ষমতা হারিয়ে কংগ্রেস নীতিগতভাবে বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তাঁরা যদিও বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তবুও মন্ত্রিসভা গঠন করবেন না। ২৮০টি আসন বিশিষ্ট পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় কংগ্রেস দল এককভাবে ১২৭টি আসন দখল করেছিল। কংগ্রেসের এই ঘোষণার সংগে সংগেই যাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী তাঁরা ঐ সংস্থাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা-লোলুপতা পরিহার করে গঠনাত্মক দৃষ্টিভংগি নিয়ে সত্যিকারের বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। অবশ্য কংগ্রেসের আরও একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল। সেটা হচ্ছে বামপন্থীরা ক্ষমতা পাওয়ার সংগে সংগেই দলীয় শক্তি বৃদ্ধির অপচেষ্টায় মত্ত হয়ে হানাহানিতে প্রবৃত্ত হবে। কাজেই জনসাধারণের বুঝতে কষ্ট হবে না যে ভিন্ন আদর্শের পূজারী চৌদ্দ দলীয় সরকার জনতার কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারবে না। কংগ্রেসের এই নীতিগত সিদ্ধান্তের ফল সবেমাত্র ফলতে সুরু করেছিল, সেই সময় বাংলার রাজনৈতিক আকাশে এক নতুন ঝটিকা দেখা দিয়ে কংগ্রেসীদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাল।

১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবরের কাহিনী আজও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। ফ্রন্ট নায়ক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নিশীথ যাত্রা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সেদিন প্রায় বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। সে রাত্রে ফাঁড়া কাটলেও আখেরে গদী রক্ষা সম্ভব হয় নি। নতুন করে ফ্রন্টে ফাটল ধরেছিল ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে। আর সেই ফাটলই ফ্রন্টের কাল হল। গভর্ণর ধরমবীর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বৃত করলেন।

এই যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন, এটা পশ্চিম বাংলায় সেদিন এক ভীষণ সুবিধাবাদের বীজ বপণ করেছিল। ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাও ঠেকে নি। কংগ্রেস পি ডি এফ-কে নিয়ে সেদিন যে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল তা তখনও সংগঠনের মধ্যে অল্প বিস্তর ক্ষতের সৃষ্টি করে রেখেছে। সেই পরম সুবিধাবাদের মুহূর্তে কংগ্রেসের পদস্খলন ঘটেছিল। যে নীতিকে ভিত্তি করে কংগ্রেস পুনরায় মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল, ক্ষণিকের দুর্বলতায় তার ভিত্তিভূমি ধ্বসে গেল। ক্ষমতার লড়াই কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করল। ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিল 'দলছুট' খেলা। কংগ্রেস পি-ডি-এফ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালো। এলো রাজ্যপালের শাসন। আর তারই পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা হল এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের মহড়ায়। পশ্চিম বাংলা শেষ পর্যন্ত কেরালা, পেপসু ও উড়িষ্যার পথে পা বাড়াল।

কিন্তু যে দল-পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়ে আখেরে গভর্ণর শাসন চালু হল, সেই দলনায়করা আবার হানাহানিতে মত্ত হয়ে উঠলেন। বাংলা কংগ্রেস ভারতীয় ক্রান্তি দলে বিলীন হয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের দুই নায়ক শ্রীহুমায়ুন কবির ও শ্রীজাহাংগীর কবির নতুন দুই দলের পত্তন করলেন। শ্রীহুমায়ুন কবির গঠন করলেন লোকদল, সংগে রইলেন পূর্বতন পি ডি এফ নায়ক ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। কিন্তু কবির-ঘোষ বনিবনা হল না। ডঃ ঘোষ তাঁর একান্ত অনুরক্তদের নিয়ে কংগ্রেসে পাড়ি জমালেন। লোকদল শ্রীহুমায়ুন কবিরের আয়ত্তেই রয়ে গেল।

আবার শুধু বাঙ্গালীয়ানার শ্লোগান তুলে 'বাংলা জাতীয় দল' গঠন করলেন শ্রীজাহাংগীর কবির। তাঁর দলে বাংলা কংগ্রেসের ভগ্নাংশ কিছু ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে থেকেও কিছু আবার বিদায় নিলেন। ফলে যে হাঁকডাক করে পঞ্চাংক নাটকের আশা নিয়ে দল গঠিত হয়েছিল, সেখানে অচিরেই আশাভঙ্গের ফলে একাংকিকা অভিনীত হয়ে গেল।

আর শ্রীআশুতোষ ঘোষ, যিনি নব-নায়করূপে বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উল্কার মত এসে হাজির হয়েছিলেন, এবং সরকার ভাঙাগড়ার খেলায় নিদারুণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও নিশ্চেষ্ট

এবারের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে
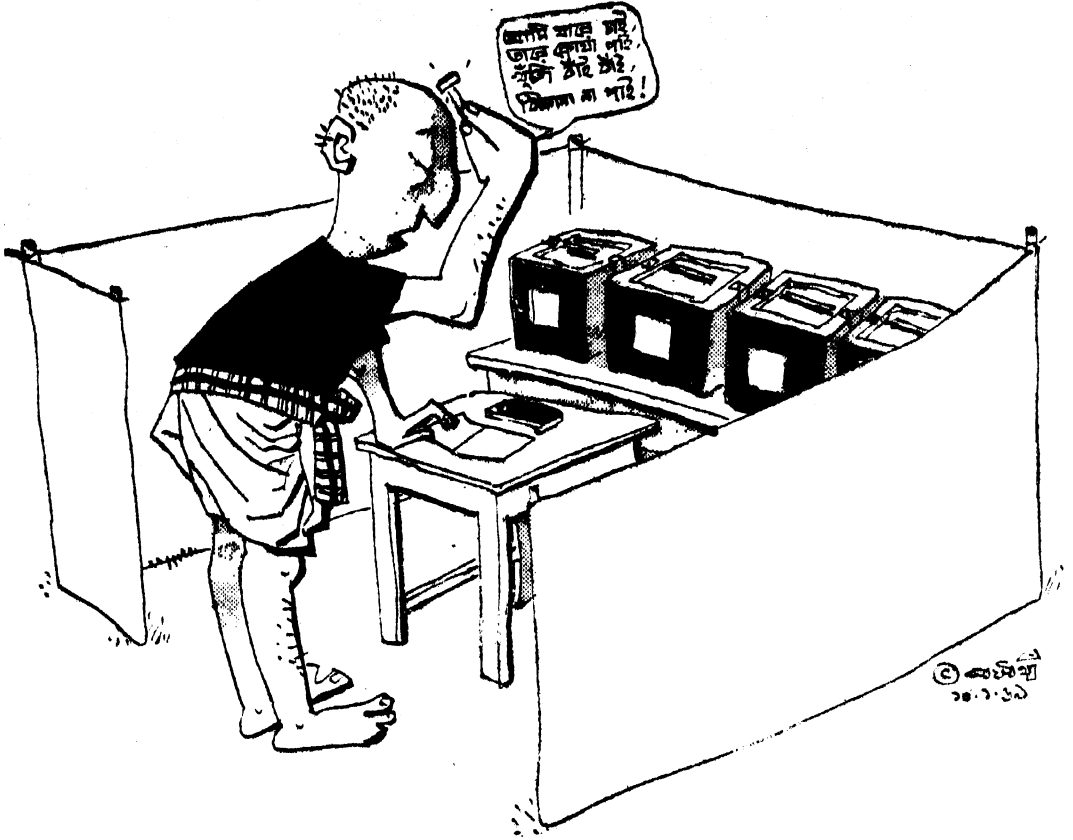
বসে রইলেন না। গঠন করলেন—আই, এন, ডি, এফ অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। কিছু বামপন্থী কিছু কংগ্রেসী তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় করে রাজনীতির আসরে ভিড় করে রইলেন, শুধু চলে গেলেন সেই দুইজন যাঁরা শ্রীঘোষের দলকে রূপ, রস ও রঙে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিলেন। সেই দুইজনের একজন শ্রীকাজেম আলি মীর্জা এখন যুক্তফ্রন্টে আশ্রয়প্রার্থী। আর অন্যজন প্রখ্যাত আইনজীবি শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখন স্বাধীনভাবেই রাজনীতিতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করার অভিলাষী।

ইতিমধ্যেই জন্মলাভ করেছে প্রগ্রেসিভ মুসলীম লীগ। 'কে বা কাহারা' এই দলের পৃষ্ঠপোষক, এদের রাজনৈতিক চরিত্রই বা কি, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য রাজনৈতিক দলগুলিও তখন পর্যন্ত জানে না। তবে মুশ্লিম জনতার প্রতিনিধিত্ব করবার দাবী নিয়েই যে এ'রা আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন, একথা প্রায় সকলেই বলছেন। নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে এই দল যা পেতে চান তাতে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক স্মারক রয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে কংগ্রেসের তরফ থেকে।

'আমরা বাঙালী' বলে আর একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। পুরুলিয়ার আনন্দমার্গীরা নাকি এই দলের পৃষ্ঠপোষক। এমনি করে গভর্ণর শাসনের সময়েই পশ্চিম বাংলায় নতুন করে অনেকগুলি দলের পত্তন হয়েছে এবং এই সমস্ত দলের ধারণা এবারও কংগ্রেস কি ফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। কাজেই তাদের পশ্চিম বাংলায় সরকার গঠনের ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকবে। দলছুট হওয়ার দুর্নামও রটবে না, আবার সমানে সমানে বন্ধুত্ব হলে মর্যাদাও অক্ষুন্ন থাকবে।

এমনি করে পশ্চিম বাংলায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় এই রাজ্যে এবার একটা 'মেরুকরণের' ভাব দেখা দিয়েছে। একটু মনোনিবেশের সঙ্গে অনুধাবন করলেই চিত্রটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

এবারে যত নতুন দল নতুন মুখ অর্থাৎ রাজনীতিতে একেবারে অচেনা, অজানা ও আনকোরা লোকের আমদানী হয়েছে, ইতিপূর্বে কোন নির্বাচনে এমনটি দেখা যায় নি। ১৯৬৭'র নির্বাচনেও প্রায় সে সমস্ত দলই প্রার্থী দিয়েছিলেন, অবশ্য অনেকে এর মধ্যে জীবন্মৃতও বটে, যাঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রদেশে ঝান্ডা উঁচু রাখবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কংগ্রেসকে পরাস্ত করার জন্য গত নির্বাচনেও একটি বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয় গোটা ভারতবর্ষে এই প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই প্রসঙ্গে পরলোকগত সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে শ্লোগান তুলেছিলেন—'কংগ্রেস হটাও, দেশ বাঁচাও' সেই আবেদনে সাড়া

দিয়ে সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট অথবা কেন্দ্র-ভিত্তিক মিত্রতার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। পশ্চিম বাংলায় এ চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু আখেরে প্রায় সমস্ত বামপন্থী দলই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

দুই কম্যুনিষ্ট পার্টি, বাম ও ডান, প্রত্যেকে নিজেদের পার্টির দলীয় শক্তি পরীক্ষায় এত উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত সেবারে এই রাজ্যে একটি ফ্রন্ট গঠন সম্ভব হয় নি। দল ভাগাভাগি হলেও তখনও পর্যন্ত শক্তি পরীক্ষা দুই দলের মধ্যে হওয়ার সুযোগ ছিল না। কাজেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার বাসনা খুবই প্রবল ছিল। দক্ষিণপন্থীরা অবশ্য ওয়াকিবহাল ছিলেন না এমন নয়। কাজেই তাঁদের যাতে বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা কোণঠাসা না করতে পারেন সে জন্য বাংলা কংগ্রেসকে নির্ভর করে আগে থেকেই শক্তি সংহত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। হাজার চেষ্টা ও শত ঠেক করেও একটি ফ্রন্ট হল না। উলফ্ ও পালফ, ইংরেজীতে যথাক্রমে ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট ও প্রগ্রেসিভ লেফট ফ্রন্ট নামে দুটি বামপন্থী সংস্থা কংগ্রেসের মোকাবিলায় আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। উলফ-এর মধ্যে ছিল বাম কম্যুনিষ্ট, এস-এস-পি, আর-এস-পি, ওয়ার্কার্স পার্টি, এস-ইউ-সি, আর সি পি আই ও মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক। আর পালফের সঙ্গে ছিল—দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পার্টি। অবশ্য দুটি ফ্রন্টের কোনটিই গতবারে এককভাবে ২৮০টি কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেন নি। তবে দুটি ফ্রন্টেরই প্রার্থী সমস্ত আসনেই কংগ্রেসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে।

এগারটি দল দুই ফ্রন্টের অংশীদার হলেও পালফের সঙ্গে পি এস পি ও পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘের মধ্যে কিছু কিছু কেন্দ্রে সমঝোতা হয়েছিল। আর দার্জিলিংয়ের গোর্খা লীগের সঙ্গে অবশ্য সেদিন কোন ফ্রন্টেরই মিত্রতা ছিল না।

জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী সেবারও ছিল। তবে সেদিন তারা পশ্চিমবঙ্গে সবেমাত্র আত্মপ্রকাশে ব্রতী হয়েছিল। অবশ্য স্বতন্ত্র দলের প্রতীক নিয়ে যিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তার সেই দলের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। জনসঙ্ঘের প্রার্থীও নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই দল বদল করেছিলেন—একবার নয়, দু দুবার।

কংগ্রেস থেকে শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীহুমায়ুন কবিরের পদত্যাগের ফলে কংগ্রেস সেদিন বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁদের শূন্য স্থান সাংগঠনিক দিক থেকে এখনও পূর্ণ হয়েছে একথা বলা চলে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জী, চারু ভাণ্ডারী, কুমার জানা, অন্নদা চৌধুরীর মত লোক যখন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি করে কংগ্রেসকে ঘায়েল করতে পারে নি, তখন শ্রীঅজয় মুখার্জী আর কী পারবেন। আর শ্রীহুমায়ুন কবিরকে আগে থেকেই কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছিল। কাজেই এই ঐতিহাসিক নজিরবাদিতার ওপর নির্ভর করে স্বপ্নেও কংগ্রেস নেতারা ভাবতে পারে নি যে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে না। ইতিহাস সেদিন নতুন অধ্যায় সংযোজন করে কংগ্রেসকে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

অন্যদিকে উলফ্ ও পালফ্ দুই ফ্রন্টই কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কে বেশী বামপন্থী এ কৌশল অবলম্বন করে নির্বাচনী আসরে বাজী মাৎ করার চেষ্টায় ব্রতী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটল, মেদিনীপুরে তমলুক-দুলাল অজয় মুখার্জীর জনপ্রিয়তা আর ২৪-পরগণায় কবির ভ্রাতৃদ্বয়ের বিশেষ আকর্ষণ পালফকে সর্বসাকুল্যে ৬৪টি আসনে জয়লাভের সাহায্য করল। পালফের—বাংলা কংগ্রেস পেল ৩৪, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট ২৭ ও ফরওয়ার্ড ব্লক ১৩। আর উলফ-এর অংশীদাররা পান যথাক্রমে—বাম কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪৩, এস এস পি ৭, আর এস পি ৬, এস ইউ সি ৪, ওয়ার্কার্স পার্টি ২ ও মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক এক।

দুটি ফ্রন্ট মিলিয়ে গত নির্বাচনে ১২৭টি আসন পেয়েছিল, আর তার সমসংখ্যক আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। বাদবাকী আসন ২৬টির মধ্যে দলগতভাবে পি এস পি পেয়েছিল ৭টি, লোকসেবক সঙ্ঘ চারটি ও গুর্খা লীগ দুটি। অন্যান্য আসন সব নির্দলীয় প্রার্থীরা পেয়েছিলেন। তবে তার মধ্যে দুই ফ্রন্ট সমর্থক প্রার্থীর ছিলেন কয়েকজন। যা হোক, নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ফ্রন্ট অন্যান্য দল নির্দলদের নিয়ে বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে গভর্ণরের কাছে নামের তালিকা পেশ করল, আর দাবী জানাল সরকার গঠনের অনুমতি দেওয়া হোক। এত দ্রুততার সঙ্গে সেদিন যুক্তফ্রন্ট গঠন হয়েছিল যে তার সদস্য সংখ্যাকে উপেক্ষা করে অন্য কোন রাজনৈতিক চিন্তার অবকাশ ছিল না। প্রত্যেক নির্বাচনের পরেই দেখা গেছে কিছু নির্দল কংগ্রেসে চলে যান। কিন্তু ঐ বারেই তার ব্যতিক্রম ঘটে। কারণ অবশ্য অত্যন্ত স্বচ্ছ—কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল।

মন্ত্রিসভা গঠনের ঐ ব্রাহ্ম মুহূর্তেই পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সংগঠনের শুভ জন্মলগ্ন। তার পরের ইতিহাস ভাঙাগড়ার কাহিনী। মন্ত্রিসভা ভাঙার আর দল ভাঙার আলেখ্য। আবার মধ্যবর্তী নির্বাচনের রণ-দামামা বেজে উঠতেই শুরু হয়েছিল মেরুকরণের পালা। কিন্তু শেষ অবধি যুক্তফ্রন্ট সরকারে যাঁরা অংশীদার ছিলেন তার মধ্য থেকে সরে পড়লেন পি এস পি। অবশ্য মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার চারটি আসনে যথা—কাঁথি উত্তর ও দক্ষিণ, এগরা ও রামনগর কেন্দ্রে অনেক টানাপোড়েনের পর যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে, আর পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘ ফ্রন্টের মধ্যে না থাকলেও ফ্রন্টের সঙ্গে কেন্দ্র-ভিত্তিক বোঝাপড়া করেছেন।

গতবারের নির্বাচনী ফলাফলের সমীক্ষা করলে দেখা যায়, দুই ফ্রন্ট পালফ ও উলফ নিজেদের মধ্যে লড়াই-এর ফলে নিদেন পক্ষে ৫৭টি কেন্দ্রে কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়েছে। সেদিক থেকে হিসাব করলে ফ্রন্টের সার্বিক প্রচেষ্টা এবার অনেকখানি ফলবতী হয়েছে। তবে কবির ভ্রাতৃদ্বয়ের ফ্রন্ট বিরোধিতা কিছুটা ক্ষতি সাধন হয়ত করতে পারে। ফ্রন্টের পক্ষে শুধু আশার বাণী এই, তাঁরা কংগ্রেসেরও বিরোধিতা করছেন।

অবশ্য যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কিছু সংখ্যক আসনে গড়মিল রয়ে গেছে। যেমন এস-এস-পি খেজুরী, ঝাড়গ্রাম ও নন্দীগ্রামে ফ্রন্টের অংশীদার বাংলা কংগ্রেসের বিপক্ষে প্রার্থী দিয়েছেন। আবার বাংলা কংগ্রেসও গোপীবল্লভপুর এবং মুর্শিদাবাদে শ্রীকাজেম আলি মীর্জাকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন। এস-এস-পি একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে যদি মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে কাজেম আলি সাহেব সরে দাঁড়ান তবেই মেদিনীপুরে তিনটি কেন্দ্রের এস-এস-পি প্রার্থীরা নিরস্ত থাকবেন, না হলে নয়। আবার অন্য দিকে চারটি আসন ছাড়া যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে পি-এস-পি কমপক্ষে ২২টি আসনে লড়াই চালিয়ে যাবেন।

প্রায় চৌদ্দ শয়ের বেশি প্রার্থীর নাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত এবারে প্রার্থী সংখ্যা ১৩ শ'র কিছু বেশী হতে পারে। তবে গতবার ছিলেন মাত্র ১০২৬ জন প্রার্থী। এবারের প্রার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে নতুন নতুন দলের আবির্ভাব। যেমন লোকদল লড়াই করছেন ৫৮টি আসনে, জাতীয় বাংলা দল করছেন ২৬টি আসনে, প্রগ্রেসিভ মুসলীম লীগও কিছু আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। আবার আমরা বাঙালী দল প্রাউটিস্ট নাম নিয়ে ৪৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, যার নেতা শ্রীআশুতোষ ঘোষ, সেই দল, হিসাব মত দেখা যায় প্রায় ১৯০টি আসনে লড়াই-এর জন্য কোমর বেঁধেছেন। তদুপরি ঝাড়খণ্ড, অনুন্নত লীগ, রিপাবলিকান দল প্রভৃতিও কিছু কিছু আসনে প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন।

কংগ্রেস এককভাবে ২৮০টি আসনের জন্যই লড়াই করছেন। আর ঐ দলের বিকল্প যুক্তফ্রন্টও সমসংখ্যক আসনেই মোকাবিলায় প্রস্তুত। অবশ্য ফ্রন্টের অংশীদারদের মধ্যে চারটি কি পাঁচটি আসনে পরস্পর লড়াই-এর আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে। তবে শরিকদের মধ্যে আগ্রহ দেখে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে এমন কি নির্বাচনের আগের দিনও এ ঝগড়া মিটে যেতে পারে। ফ্রন্ট শরিকরা এবারে কে কত আসনে লড়াই

করছেন তার একটি হিসাব এখানে সংযোজন করা হল। কম্যুনিস্ট (মা) ১৮, বাংলা কংগ্রেস ৪৯, কম্যুনিস্ট (দঃ) ৩৬, ফরওয়ার্ড ব্লক ২৮, আর এস পি ১৭, এস এস পি ১৯, এস ইউ সি ৭, লোক-সেবক সঙ্ঘ ৬, গুর্খা লীগ ৭, ওয়ার্কার্স পার্টি ২, আর সি পি আই ২ এবং ফ-ব (মা) ১। অবশ্য ফ্রন্টের সমর্থিত কয়েকজন নির্দলও আছেন।

প্রার্থী তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাতিল বিধানসভার ৩৩ জন সদস্য এবার নির্বাচন প্রার্থী হন নি। তবে এ'দের মধ্যে তিনজন আর ইহলোকে নেই। আর যাঁরা দলছুট খেলায় পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আকাশ সরগরম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ২১ জন বিভিন্ন দলের প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। অবশ্য প্রায় ত্রিশজন সদস্য দলবদলের পালার সংগে যুক্ত ছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মাত্র নয়জন আর আসরে নামেন নি।

এবারে কালিম্পঙ ও বড়বাজার এই দুটি কেন্দ্রেই প্রার্থী সংখ্যা সর্বাধিক। ১১ জন সদস্য প্রত্যেকটি আসনের জন্য মনোনয়ন-পত্র দাখিল করেছেন। অবশ্য পরীক্ষার পর বড়বাজারে প্রার্থীপদ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ। একজনের মনোনয়ন-পত্র নাকচ হয়ে গেছে। তিনজন প্রার্থী এবার একাধিক আসনে লড়ছেন। তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ঘোষ ও কাজেম আলি মির্জা। তবে এই বিষয়ে শ্রীআশুতোষ ঘোষ সকলের চেয়ে অগ্রণী। তিনি তিনটি জেলায় নির্বাচন প্রার্থী। কলকাতার ইন্টালী, ২৪-পরগণার দে-গঙ্গা আর বাঁকুড়ার ছাতনা কেন্দ্রে লড়াই চালিয়ে যাবেন।

এবারে মহানগরী কলকাতার নির্বাচনী সমীক্ষা চালান যাক। গত নির্বাচনে এই শহর কলকাতায় মোট ৮৮ জন প্রার্থী লড়াই-এর ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এই শহরের ২৩টি আসনেই প্রার্থী দিয়ে জয়লাভ করেছিলেন মাত্র ১১টিতে। বাকী আসন-গুলি পেয়েছিল কংগ্রেস বিরোধীরা। আর বিরোধীদের মধ্যে লড়াই-এর ফলে তাঁরা আরও পাঁচটি আসনে যথাক্রমে কাশীপুর, জোড়াসাঁকো, কবিতীর্থ, কালীঘাট ও শিয়ালদহ কংগ্রেসের কাছে পরাজয় বরণ করেছিলেন। জোড়াসাঁকোর আসনে জনসঙ্ঘ প্রার্থী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। কাজেই যদি শুধু বামপন্থীদের আপনজনের মধ্যে লড়াই-এর কথা ধরা যায় তবে তাঁরা অপর চারটি আসন কংগ্রেসকে থেসারত দিয়েছিলেন।

গতবার তিনটি আসনে কংগ্রেস ও ফ্রন্টের মধ্যে সরাসরি ভোট-যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে কংগ্রেস পেয়েছিলেন বেলেঘাটা দক্ষিণ কেন্দ্রের আসনটি আর অপর দুটি মাণিকতলা ও বড়তলা দুই ফ্রন্টের দুই শরিক ভাগ করে নিয়েছিলেন। এবারে কোলকাতার সাতটি আসনে যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র এবার তাঁর পূর্বতন কেন্দ্র শিয়ালদহ থেকে নির্বাচন প্রার্থী। গতবার ডঃ চন্দ্রের বিরুদ্ধে উল্‌ফ্‌ ও পাল্‌ফের দুইজন প্রার্থীই লড়েছিলেন। এবার ডঃ চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন আর এস পি নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তী। গতবারের দুই ফ্রন্টের প্রার্থী একযোগে পেয়েছিলেন ২৬,৭০০ বেশী ভোট। আর ডঃ চন্দ্র ২০,১১৪ ভোট পেয়ে আসনটি কংগ্রেসের অনুকূলে রেখে দেন।

কলকাতার আর একটি কেন্দ্র রাস-বিহারী। এই আসনটির উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। কারণ, এই কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন বাতিল বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় ব্যানার্জী। অধ্যক্ষ হিসাবে গতবারের রাজ্যের সরকার উত্থান-পতনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভায় তাঁর রুলিং ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। সেই শ্রীব্যানার্জীর পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউ নেই। কংগ্রেসের একজন তরুণ ব্যারিস্টার শ্রীব্যানার্জীকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন।

শ্যামপুকুর কেন্দ্রও একটি আকর্ষণীয় লড়াই-এর ময়দানে পর্যবসিত হবে। এখানে কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে গতবার তাঁর রাজনৈতিক গুরু শ্রীঅমর বসুকে পরাজিত করে আসনটি দখল করেন। এবারেও শ্রীদে এই কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী। এবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্ত বসু। আর একজন প্রার্থীও আছেন, তিনি বেলঘরিয়ার শ্রীইন্দু মিত্র।

চৌরঙ্গী একটি কেন্দ্র যেখানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম বীর নায়ক শ্রীঅনন্তলাল সিংহ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর সংগে লড়বেন দেশবন্ধু-দৌহিত্র কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়। শ্রীরায়ই গতবারে এই আসনে জয়লাভ করেছিলেন।

এবার কলকাতায় দলীয় প্রার্থীর সংখ্যা এই রকম—কম্যুনিষ্ট (মা) ৯, ডান কম্যু-নিষ্ট ৪, ফরওয়ার্ড ব্লক ৪, আর এস পি ২, এস এস পি ১, ওয়ার্কার্স পার্টি এক, আর ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল ২। এইভাবে ফ্রন্টের ২৩ জন প্রার্থীই কংগ্রেসের ২৩ জনের বিরুদ্ধে লড়বেন। এ'রা ছাড়াও দলগত হিসাবে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন জনসঙ্ঘ ৬, পি এস পি ২, আই এন ডি এফ ৪, জাতীয় দল, রিপাব্লিকান ও লোক দল প্রত্যেকে একজন করে, আর আমরা বাঙালী তিনজন।

এই হল আগামী নির্বাচনে কলকাতার লড়াই-এর রাজনৈতিক ভূগোল।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাকী ২৬৭টি আসন ছড়িয়ে আছে কলকাতার শিল্পাঞ্চল ও দূরদূরান্তে পল্লী প্রান্তরে। এই রাজ্যের রাজনৈতিক ভাগ্য গতবার মুখ্যত নিয়ন্ত্রণ করেছিল মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণা জেলা, অবশ্য রাই কুড়িয়েও বেল হয়। কাজেই অন্য জেলার ফলাফলও উপেক্ষণীয় নয়।

২৪ পরগণা জেলায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক আসন। এই জেলার ৫০টি আসনের মধ্যে ৩৮টি কেন্দ্রেই কংগ্রেস বিরোধীরা জয়লাভ করেছিলেন, এবং আরও নয়টি আসনে ফ্রন্ট শরিকরা লড়াই করে নিজেদের কলহের মাশুল দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের এই ভরাডুবির মূলে ছিল বাংলা কংগ্রেসের কবির ভ্রাতৃদ্বয়।

আর মেদিনীপুর জেলার ৩৫টি আসনে কংগ্রেস মাত্র ১২টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। এই ১২টির মধ্যে ৮টি আসনে বামপন্থীরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে কংগ্রেসের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

পুরুলিয়ার ১১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস করায়ত্ত করেছিল মাত্র চারটি আসন। অন্যগুলো বিরোধী প্রার্থীরা ভাগ করে নেন, তার মধ্যেও একটি কংগ্রেসের দখলে আসে কেবলমাত্র বিরোধী দলগুলির হানাহানির জন্য।

বাঁকুড়ার ১৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস বেশি সংখ্যক আসন রাখতে সমর্থ হয়। মোট ৯টি আসন কংগ্রেস দখল করে। অবশ্য এর মধ্যে দুটি বামপন্থীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ লড়াই-এর ঢালি।

বর্ধমানের ২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল ১৩টিতে। তার মধ্যে ৫টি আসন কংগ্রেসের অনুকূলে আসে দুই ফ্রন্টের লড়াই-এর ফলে। বীরভূমের ১২টি আসন কংগ্রেস ও বিরোধীরা সমভাবে ভাগ করে নেন। তবে একটি আসন বাম-পন্থীদের মধ্যে লড়াই-এর ফলে কংগ্রেসের অনুকূলে চলে যায়। হাওড়ার ১৬টি আসনের ৯টি কংগ্রেস দখল করেছিল। তার মধ্যে ৬টি আসনেই বিরোধী দলগুলির ঐক্যমত থাকলে কংগ্রেসের অনুকূলে যেত কিনা সন্দেহ। নদীয়ার ১৪টিতে কংগ্রেস লাভ করেছিল ৪টি। আবার তাতেও দুটিতে কোন্দল ছিল দুই ফ্রন্টের। মুর্শিদাবাদ জেলায় অবশ্য ১৮টির মধ্যে ১৩টিই কংগ্রেস দখল করে নিয়েছিল। অবশ্য ছয়টি আসন লাভে বামপন্থীদের কলহের অবদান ছিল।

তারপর মালদহের ১০টি আসনের ৬টিতে কংগ্রেসপ্রার্থীরা জয়লাভ করেন। অবশ্য এর মধ্যে ৩টি আসনে বামপন্থীদের কলহ কংগ্রেসকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। পশ্চিম দিনাজপুরের ১১টি আসনের মধ্যে ৬টি কংগ্রেস দখল করে নেয়। বাম-পন্থীদের কোন্দলের মধ্যে চারটি আসনে কংগ্রেসকে জয়লাভে সাহায্য করে। আর দার্জিলিং জেলার পাঁচটির মধ্যে কংগ্রেস পায় তিনটি। একটি অবশ্য হানা-হানির ফল। জলপাইগুড়ির ১১টিতে ৩, কুচবিহারের ৮টির মধ্যে ৫টি আসনে কংগ্রেস বিজয়ের বরমাল্য পায়। ঐ দুটি জেলার অবশ্য ৬টি আসন বামপন্থীরা হারান নিজেদের আত্মকলহের জন্য।

কিভাবে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল নির্বাচনী ফলাফলের তথ্য থেকে তার

সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস এককভাবে প্রদত্ত ভোটের মোট ৪১ শতাংশেরও কিছু বেশী ভোট পেয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। অথচ ১৯৬২ সালের কংগ্রেস ৪৭ শতাংশের কিছু বেশী ভোট পেয়ে যাকে ইংরেজীতে brute majority বলে তাই লাভ করে। ১৯৬৭ সালে প্রদত্ত কার্যকর ভোটের সংখ্যা ছিল ৫,২০৭,৯৩০ আর ১৯৬২ সালে ছিল ৪,৫২২,৪৭৬।

এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা কিছু বেড়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতার বৎসরে যে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ভারতের মুক্তাঙ্গনে, এবার সেই তারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

কলকাতা ছাড়াও পল্লী অঞ্চলেও অনেকগুলি আকর্ষণীয় লড়াই-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। সর্বাগ্রে যে কেন্দ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে হুগলী জেলার আরামবাগ। এইখানেই আবার দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন যুক্তফ্রন্ট প্রধান ও পূর্বের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের অন্যতম নায়ক ও একদা এই রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। গতবারের নির্বাচনেও এই দুই প্রধান লড়াই-এর ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ফলাফল কি হয়েছিল তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য তমলুক-দুলালকে তীব্রতর যুদ্ধে নিয়োজিত রাখার জন্য এবার অজয় তমলুককে মেদিনীপুরের আর-এক বীর সন্তান শ্রীকুমার জানাকে রণসাজে সজ্জিত করেছেন। শ্রীজানা দীর্ঘদিন আগে রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে গঠনাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আর একটি লড়াই-এর ময়দান শাল-বনঘেরা ঝাড়গ্রামের প্রান্তর। পশ্চিম বাংলার স্বল্পকালীন দুইবারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এখানে যুক্তফ্রন্ট ও এস এস পি প্রার্থীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। এস এস পি হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রার্থী তুলেও নিতে পারেন। গতবার ডঃ ঘোষ এই কেন্দ্র থেকে উলফ ও পালফ এই দুই ফ্রন্টের সমর্থনেই কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই ডঃ ঘোষই এবারে কংগ্রেসপ্রার্থী।

২৪ পরগণা জেলার বরানগর কেন্দ্র আর একটি নাম। এখানেই শ্রীজ্যোতি বসুকে লড়তে হবে তাঁর পূর্বতন প্রতি-দ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅমর ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বরানগরকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই প্রত্যেক বারই নানা রকম রঙীন আলোচনা চলে। আর তার অবসান ঘটে ফলাফল বের হবার পর। এবার রং-বেরংয়ের আলোচনায় ইতিমধ্যেই বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের হাবড়া কেন্দ্রও আর একটি আকর্ষণীয় লক্ষ্যস্থল। শ্রীঘোষ তাঁর আসন পুনরুদ্ধারের লড়াইতে আবার পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীজয়ন্তী মুখার্জিকে মোকাবিলা করবেন। শ্রীমুখার্জি অবশ্য লোকদলের প্রার্থী। যুক্তফ্রন্টও এ কেন্দ্রে নিজেদের প্রতিনিধি দাঁড় করিয়েছেন।

শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীননী ভট্টাচার্য ও শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র সকলেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন। আবার তাঁরা তাঁদের পূর্বে এলাকা থেকেই নির্বাচন সমরে অবতীর্ণ। অবশ্য শ্রীকাশী-কান্ত মৈত্রকে এবার একদা কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লড়তে হবে। যুক্তফ্রন্টের অন্য সব মন্ত্রী যথা সর্বশ্রী দেওপ্রকাশ রাই, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিভূতি দাশগুপ্ত, সুশীল ধাড়া প্রমুখও স্ব স্ব ক্ষেত্রে যুদ্ধরত। আবার পি ডি এফ আমলের ডঃ আমীর আলী মোল্লা, শ্রীগঙ্গা-ধর প্রামাণিক প্রভৃতিও যুদ্ধে নেমেছেন নিজেদের ক্ষেত্র রক্ষার জন্য। অবশ্য তাঁদের অন্যান্য মন্ত্রী-সহকর্মীরা যথা — সর্বশ্রী দাশরথি তা, জগদানন্দ রায়, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে পূর্বতন কেন্দ্রে ভোটযুদ্ধে সামিল হয়েছেন।

যাই হোক, যদি অঘটন না ঘটে তবে ফেব্রুয়ারী মাসের এমনি মিষ্টিমধুর দিনে আবার সাংবাদিকরা লালদিঘীর লালকুঠির কক্ষে কক্ষে সংবাদ সংগ্রহ ও ফিরি করে বেড়াবেন। কোন রঙের সরকার হবে গণ-দেবতাই তা স্থির করবেন। আগে-ভাগে ভবিষ্যদ্বাণী করে পশ্চিম বাংলার রাজ-নৈতিক প্রজ্ঞার অপমান করা ঠিক হবে না। শুধু এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ডিফেকসানের অন্য নাম ইলেকসান। অর্থাৎ—জনতার হয়রানি।

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়
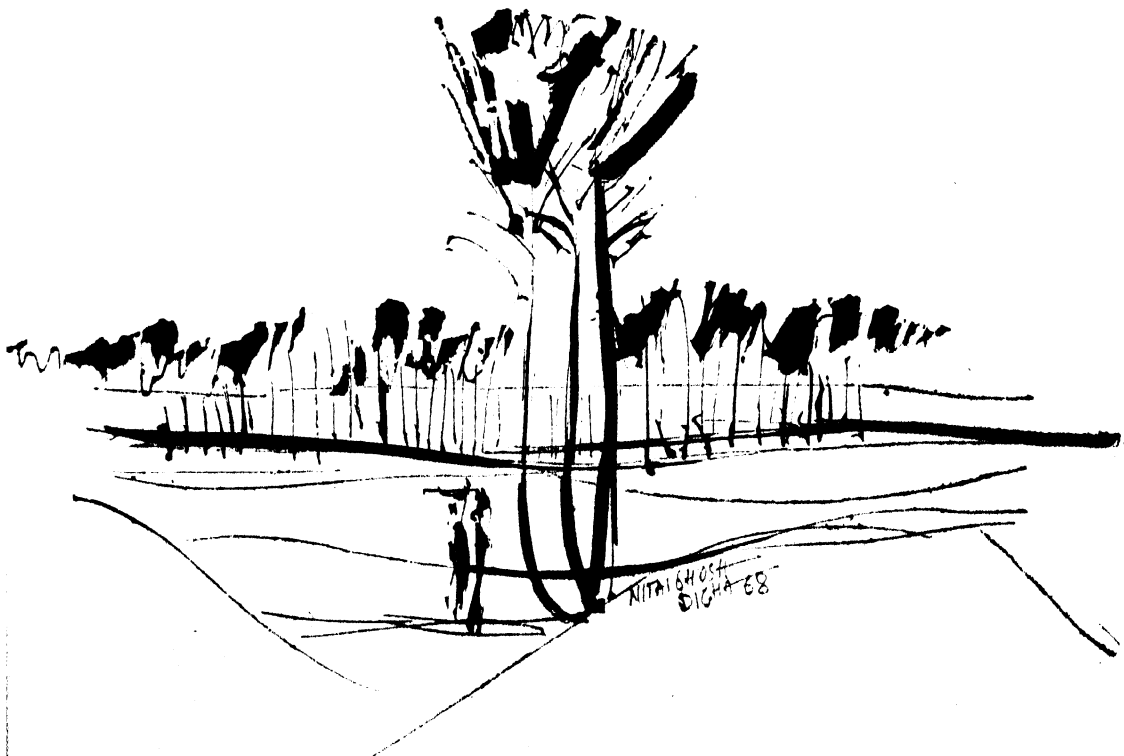
সভামঞ্চ থেকে কে কি বলছেন

পশ্চিমবঙ্গ আবার একটি উত্তপ্ত রাজনৈতিক রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সর্বত্র—অলিতে গলিতে, মাঠে ময়দানে পার্কে রোয়াকে, অফিসে কাছারিতে, স্কুলে কলেজে। দেওয়ালে দেওয়ালে চিত্র বিচিত্র ছবি ও ছড়ার লিখন সেই লড়াইয়েরই স্বাক্ষর বহন করছে। ভোর থেকে বেশ রাত পর্যন্ত চলছে একই আলোচনা—ভোট ফর......।

কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট এবং অন্যান্য দলগুলির নেতারা এখন মহাব্যস্ত। এখন তাঁদের স্নানাহার বা বিশ্রামের ফুরসৎ পর্যন্ত মিলছে না। কারণ এখন প্রতিদিনই তাঁদের একাধিক সভামঞ্চে ডাক পড়ছে। মঞ্চ-থেকে তাঁরা জনগণের কাছে নিজ নিজ দলের বক্তব্য পেশ করছেন, কর্মসূচী বিশ্লেষণ করছেন—তাঁদের সমর্থন চাইছেন।

জনতা এখন শুধু শুনে যাচ্ছেন, সব দলের নেতার কথাই শুনছেন সমান আগ্রহ নিয়ে। এখন তাঁদের শোনার পালা। বলার পালা নির্বাচনের দিন।

এই তো ভোটারদের কথা। আর দলগুলি? ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের মুখপাত্ররা দলীয় প্রতীকশোভিত মঞ্চ থেকে যেসব কথা বলেছেন তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা কে কোন ধারায় প্রচার চালাতে চান। সেই ধারারই কিছুটা পরিচয় মিলবে এই নিবন্ধে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যুক্তফ্রন্টের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, যুক্তফ্রন্ট আসলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির অঙ্গুলী হেলনে ওঠ-বোস করে। ধনিয়াখালির এক জনসভায় শ্রীসেন সে কথাই বলেছেন।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে প্রথম যে কেন্দ্রটির ফলাফল ঘোষিত হয়েছিল সে কেন্দ্রটি এই ধনিয়াখালি। সেদিন এই কেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থীর পরাজয় ঘটেছিল।

সম্ভবত সে কথা মনে রেখেই শ্রীসেন বলেছেন, যুক্তফ্রন্টের বোরখা পরে বাম কম্যুনিস্টরা সারা পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানা, তাকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলা এবং তার জায়গায় দলীয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য।

বেথুয়াডহরির একটি জনসভায় শ্রীসেন আরও বলেছেন, ভারতের মানুষের সঙ্গে, ভারতের মাটির সঙ্গে কংগ্রেসের নাড়ীর সম্পর্ক। কংগ্রেসের দুর্যোগ মানে ভারতের দুর্যোগ। গত ন মাসে অন্তত এই রাজ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ বছর ধরে কংগ্রেস দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যুক্তফ্রন্ট এল ন' মাসের জন্য। তাদের সেই ন মাসের কীর্তি দেশের জনতা কোনদিনই ভুলবেন না।

'সেই দুঃখজনক বেদনাদায়ক ইতিহাসের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়' তার জন্য তিনি আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

পাল্টা প্রচার চালাচ্ছেন যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। গত নির্বাচনে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কংগ্রেসবিরোধী প্রচার অভিযানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন শ্রীহুমায়ুন কবির এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এবার শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁদের দুজনের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত। সম্ভবত তাই শ্রীমুখোপাধ্যায় বোলপুরের এক জনসভায় ডঃ ঘোষ ও শ্রীকবিরকে তীব্রতম ভাষায় সমালোচনাকালে তাঁদের 'দেশদ্রোহী' [illegible] অভিহিত করলেন।

ঐ সভায় তিনি এই আশা ব্যক্ত করেন যে, 'গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলার [illegible] যে রায় দিয়েছিলেন এবার তাঁদের [illegible] জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নির্বাচনে [illegible] কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবলতর রায় দেবেন'

তিনি বলেন, 'গত সাধারণ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তি দ্বিধাবিভক্ত ছিল। এবার তার বদলে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী মোর্চা [illegible] উঠেছে। কাজে কাজেই কংগ্রেস এবার আরও কম আসন লাভ করবে' বলে তাঁর ধারণা।

যুক্তফ্রন্টের ন মাসের শাসনকালের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন [illegible]

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

অতুল্য ঘোষ

তরুণকান্তি ঘোষ

অজয় মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম বাংলাকে অতীতের বহু অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা আন্তরিক চেষ্টা করেছেন এবং সৎ ও জনকল্যাণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার পত্তন করে শ্রমজীবী কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছেন।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির গতবার ছিলেন কংগ্রেসবিরোধী শিবিরের অনতম প্রধান সেনাপতি। এবার তাঁর অবস্থান কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের থেকে সমান দূরে। তিনি এখন লোকদলের প্রতিষ্ঠাতা-নেতা। লোকদল কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এক তৃতীয় শক্তি।

যুক্তফ্রন্টের সরকারের পতন ঘটাবার ব্যাপারে অধ্যাপক কবিরের হাত ছিল অনেকখানি। এর জন্য যুক্তফ্রন্টের নেতারা তাঁর সমালোচনায় মুখর। তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। কারণ তিনি মনে করেন যে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে তিনি সকলের আশীর্বাদ পেয়েছেন।

তিনি সে কথাই বলেছেন বালুরঘাটের এক সভায়। সেখানে শ্রীকবির বলেছেন, 'যুক্তফ্রন্টের আমলে শহরে ঘেরাও ও গ্রামে লুণ্ঠন চলেছিল। নক্সালবাড়ী এবং বাম কম্যুনিস্ট পার্টির কিছু লোক জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে বণ্টন করছিল। তাই সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এই অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে তিনি সকলের আশীর্বাদই পেয়েছেন।'

তিনি আরও জানান, 'গত নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্ট বলে কিছু ছিল না। সুতরাং ফ্রন্টের নির্দেশ বলে কিছু থাকতে পারে না। পরে ফ্রন্টের নেতা অজয়বাবু প্রমুখের দুর্বলতা, দুর্নীতির জন্য সারা রাজ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল।

অধ্যাপক কবির বলেন, সকলের জন্য কাজ, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ ও পাকা রাস্তা, খাদ্যশস্যের খোলা বাজার, চোরাকারবারীদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা লোকদলের কর্মসূচী।

হুমায়ুন কবির

হেমন্ত বসু

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষই বোধ হয় এবার সর্বাধিক সংখ্যক নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করবেন। শ্রীসেনের মতই শ্রীঘোষও মনে করেন, 'পশ্চিম বাঙ্গলায় যুক্তফ্রন্টের শাসন মানে আসলে বাম কম্যুনিস্টদেরই শাসন।'

জঙ্গীপুরের এক জনসভায় ঐ মন্তব্য করে শ্রীঘোষ বলেছেন, 'কম্যুনিস্টরা এমন এক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায়, যেখানে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখরতা তো দূরের কথা, গুঞ্জন পর্যন্ত শোনা যাবে না। এটাই তাদের গণতন্ত্র।

'ন মাসের শাসনকালে তারা পশ্চিমবঙ্গে সেই গণতন্ত্রই চালু করেছিল। তাই বি পি ঝাকে হত্যা করা হলেও এস-এস-পিকে মুখ বুজে থাকতে হয়, বেলেঘাটায় ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিসে হামলা হলেও তাদের চোখ বুজে থাকতে হয়, এমন কি খাস রাইটার্স বিল্ডিংসে খোদ মুখ্যমন্ত্রী লাঞ্ছিত হলেও বাংলা কংগ্রেসকে তা সহ্য করতে হয়।'

শ্রীঘোষ বলেন, পক্ষান্তরে 'কংগ্রেস দেশে এমন এক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়, যেখানে প্রতিটি লোকের মন খুলে কথা বলার স্বাধীনতা থাকবে। তারই নাম গণতন্ত্র এবং কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে সেই গণতন্ত্রই চালু রেখেছিল বলে কংগ্রেস শাসনের আমলে মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত অন্যায়ভাবে ব্যঙ্গ করা যেত।'

জ্যোতি বসু

শ্রীঘোষ বলেন, 'এ দু রকমের শাসনের মধ্যে জনগণ কোনটি চান তা তাঁরা ভোট দিয়ে ঠিক করবেন। তাঁরা যেমনটি চাইবেন তেমনটি পাবেন।' সুতরাং তাঁদের ভেবে চিন্তে ভোট দেওয়ার জন্য শ্রীঘোষ অনুরোধ জানান।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে এবার দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে—কংগ্রেস ও নকসালবাড়ী। সে কথাই শোনা যাচ্ছে ঐ পার্টির মুখ্য প্রবক্তা তথা যুক্ত-ফ্রন্টের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর মুখ থেকে।

শ্রীবসু বলেছেন, 'মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে জনগণেরই জয় হবে—ফলে কারখানায় ক্ষেতে খামারে যাঁরা
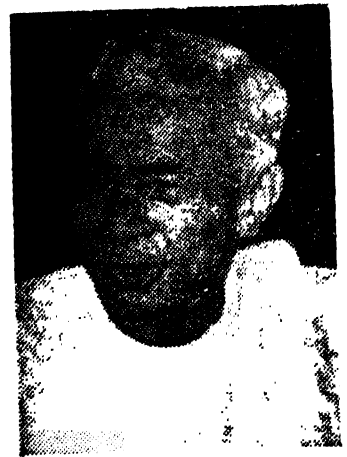
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

লড়াই করছেন আমরা তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবো দাবী আদায়ের জন্য। সরকার হাতে পেলে মানুষকে যতটুকু পারি পরিত্রাণ দেব এবং বাকিটা শ্রমিক কর্মচারী কৃষকদের সংগ্রাম করে আদায় করে নিতে হবে।'

তিনি বলেন, 'কংগ্রেস প্রচার করছে—আমরা (যুক্তফ্রণ্ট) এতগুলি দল নাকি চলতে পারব না। কিন্তু ওদের একটি দল সহস্র উপদলে পরিণত হয়েছে, এক একজন নেতা, এক একটি গ্রুপ, কাজেই ওরা কি করে রাষ্ট্র চালাবে।'

পার্টি থেকে বিতাড়িতদের প্রসঙ্গে কমরেড বসু বলেন, 'রাইফেল, রিভলবার নিয়ে ওরা তৈরী হতে চায়—আসলে কংগ্রেসীদের জিতিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই ওরা করছে। ওরা এত বড় বিপ্লবী যে ওদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নেই। এজন্য কংগ্রেসও ওদের মদত দেবে, পয়সা জোগাবে।'

শ্রীবসু বলেন, 'একটা দুটো নির্বাচনে কিছু হবে না জানি—আর এও জানি, সংগ্রাম ছাড়া কিছু হবে না, তবু নির্বাচনে লড়তে হবে একটা হাতিয়ার হিসাবেই।'

শ্রীবসু তাঁর ভাষণে যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নানারকম ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'বাংলার মেহনতী মানুষ আর গরীবদের প্রিয় সরকারকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারই গদীচ্যুত করেছিল। মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে সাধারণ মানুষ যদি আবার যুক্তফ্রণ্টকে জয়যুক্ত করে তবেই কংগ্রেসীদের উপযুক্ত শাস্তি হবে।'

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ব্যর্থতার কথাগুলি তুলে ধরছেন। বিশেষ করে খাদ্য ও শিল্প সম্পর্কে যুক্তফ্রণ্টের কথা ও কাজের মধ্যে তফাতের কথাই তাঁর ভাষণে প্রাধান্য পাচ্ছে।

হাড়োয়া হাটের এক জনসভায় শ্রীঘোষ বলেছেন, বামপন্থী নেতারা বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁরা সরকার গঠন করতে পারলে সপ্তাহে মাথাপিছু পঁচাত্তর পয়সা কিলো দরে তিন কিলো করে চাল দেবেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে যখন সরকার হাতে পেলেন তখন রেশন এলাকার বাইরে তাঁরা তিনশ গ্রাম চালও

হীরেন মুখোপাধ্যায়

দিতে পারেন নি এবং চালের দামও তাঁদের প্রতিশ্রুত পঁচাত্তর পয়সার জায়গায় পাঁচ টাকা পঁচাত্তর পয়সায় উঠে গেল।

শ্রীঘোষ বলেন, ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৬৫ লক্ষ টন খাদ্য ছিল, ১৯৬৭ সালে ছিল ৬১ লক্ষ টন। অর্থাৎ কংগ্রেস আমলের তুলনায় যুক্তফ্রণ্টের হাতে মাত্র ৪ লক্ষ টন খাদ্য কম ছিল। সে ক্ষেত্রে তাঁরা যদি মাথাপিছু তিন কিলোর জায়গায় আঠাশ শ গ্রাম করে দিতে পারতেন তাহলে বলার কিছু থাকত না। তা ছাড়া খাদ্যের যোগান শতকরা মাত্র ছ ভাগ কম হওয়ার জন্য দাম কেন সাত গুণ বাড়ল তার জবাব কি যুক্তফ্রণ্টের নেতারা দেবেন?

শ্রীঘোষ বলেন, বেকারী ঘুচিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বামপন্থী নেতারা সরকার গঠনের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এমন শ্রমনীতি ও শিল্পনীতি চালু করলেন যে নতুন কেউ তো চাকুরী পেলই না, বরং শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে যাঁরা চাকুরী করছিলেন তাঁদের অনেকেই বেকার হয়ে গেলেন। বেকার ও শ্রমিকদের কল্যাণের নাম করে এত অকল্যাণ বোধ হয় আর কেউই করতে পারতো না বলে শ্রীঘোষ মন্তব্য করেন।

শ্রীঘোষ বলেন, এই নির্বাচন শুধু কংগ্রেসপ্রার্থীকে জয়ী করার সংগ্রাম নয়। এ হচ্ছে ভারতের উন্নয়নের লড়াই এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে শত শত শহীদের জীবনের বিনিময়ে যে ফল অর্জন করা গেছে তা রক্ষা করার সংগ্রাম।

শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার সি-পি-এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এটাই তাঁর পূর্ণ পরিচয় নয়। তিনি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীও ছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার আগে নির্বাচনী প্রচারপর্বে ডান কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি বহুল প্রচারিত হয়েছিল। উক্তিটি ছিল এই : মলমূত্র ত্যাগ করলে মানুষ দুর্বল হয় না, সুস্থ হয়। সি-পি-এম-ও তেমনি শোধনবাদীদের বর্জন করে শক্তিশালী হয়েছে, দুর্বল হয়নি।

এবারও শ্রীকোঙারের একটি উক্তি নানাভাবে শত্রু ও মিত্রপক্ষের বক্তারা উদ্ধৃত করছেন ও আলোচনা করছেন। শ্রীকোঙার বলেছেন, 'যুক্তফ্রণ্ট সরকার গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের কোন উপকার করতে পারেনি। মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় এলেও তাঁদের কোন উপকার করতে পারবে না, কারণ সংবিধানের বেড়াজালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার শোষণের পথগুলিকে কায়েম করে রেখেছে।'

ঐ কারণেই কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি নির্বাচন বয়কটের আওয়াজ তুলেছেন এবং কথার সঙ্গে কাজের সমতা রেখে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীকোঙার এ কথা বেশ ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি বলেছেন, 'মার্ক্সবাদীরা সর্বদাই ভোট বর্জন করতে চান, কিন্তু যেহেতু ভোট সম্পর্কে জনগণের এখনও মোহভঙ্গ হয়নি তাই' তাঁরা ভোটে অংশ নিচ্ছেন। ভোট সম্পর্কে জনগণের মোহভঙ্গ করার জন্যই যে সি-পি-এম ভোটযুদ্ধে অংশ নিচ্ছে সে কথা শ্রীকোঙার এই ভাষণের মধ্যে দিয়ে বেশ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

অনেক দিন পরে বহু বিতর্কের নায়ক ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আবার কংগ্রেসের অন্যতম মুখ্য প্রচারক হিসাবে বাংলার নানাস্থানে ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। শ্যাম-নগর কেন্দ্রে এক জনসভায় তিনি মন্তব্য করেছেন যে, যুক্তফ্রণ্ট শুধু মন্ত্রীত্বের গদী রাখতেই যুক্ত ছিল।

ডঃ ঘোষের মতে যুক্তফ্রণ্ট তাদের রাজত্বকালে জনগণের জন্য কোন কাজ করতে পারেনি তার কারণ তারা তা করতে চায়নি। ডঃ ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যুক্তফ্রণ্টের নেতারা নিজের নিজের দল বাড়াতে ব্যস্ত ছিলেন, দেশের জন্য বা সাধারণ মানুষের জন্য তাঁদের কোন ব্যস্ততাই ছিল না।'

যুক্তফ্রণ্টের শাসনকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে ডঃ ঘোষ বলেন যে ফ্রণ্টের বিভিন্ন দল বাইরে পরস্পরের ওপর দোষারোপ করেছে, মন্ত্রিসভা এবং বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত খাদ্যনীতি কার্যকরী করতে তারাই বাধা দিয়েছে, গণ কমিটির নামে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে, জোর করে ধান কেটে কৃষিক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে, ঘেরাও করে শিল্পে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে।

তাই দেশকে বাঁচাবার জন্য তিনি আবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি পঃ বঃ যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম অংশীদার। অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় এম-পি এই দলের একজন শক্তিশালী বক্তা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলকাতায় এক নির্বাচনী সভায় বলেছেন, জনতার মমতার মধ্য দিয়েই যুক্তফ্রণ্টের জন্ম। সাধারণ মানুষের সংগ্রামের সঙ্গী হিসাবে যুক্তফ্রণ্ট যতই যুক্ত হচ্ছে, কংগ্রেস ততই বিযুক্ত হচ্ছে।

একজন কম্যুনিষ্ট হিসাবে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় নকসালপন্থীদের নির্বাচন-

বিরোধী প্রচারকার্যের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে পারেন নি। এই ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তা সি-পি-এমের বক্তব্যের থেকে ভিন্ন নয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, নির্বাচন বয়কটের কথা যাঁরা আজকে বলছেন তাঁরা নিতান্তই বয়সে তরুণ। তাই তারুণ্যের উত্তেজনায় ওরা এই কথা বলেছেন।'

তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি চাইলেই আজকে বিপ্লব হয় না। আর নির্বাচন বিপ্লবের অন্তরায় নয়, বিপ্লবের ভূমিকা-স্বরূপ। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে বিপ্লবকে এগিয়ে আনার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে চতুর্থ বিধানসভার সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র। একদা কংগ্রেসী, পরবর্তী সময়ে নির্দলীয়, তারপর সি-পি-এম সমর্থিত নির্দলীয় এবং অধুনা যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত নির্দলীয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছেন।

শান্তিপুরের একটি জনসভায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলে আমাদের সামনে যে প্রশ্নগুলি জরুরী হয়ে উঠেছে সেগুলি হোল : গণতন্ত্রে জনমতের স্থান কোথায়, দলত্যাগীদের ভূমিকা কি এবং দলত্যাগ চলতে থাকলে গণতন্ত্র সজীব হতে পারে কিনা; বিধানসভাকে উপেক্ষা করে মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে কি না; বিধানসভার অধিকার রক্ষায় স্পীকারের কর্তব্য কি; কোন নিযুক্ত রাজ্যপাল নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে বাতিল করতে পারেন কিনা ইত্যাদি। নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে।

সারা ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল জনসংঘ। এ পর্যন্ত এই দল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বড়রকমের সাফল্য দেখাতে পারেননি। তাই বলে তাঁরা লড়াই থেকে পিছিয়ে নেই।

মধ্যপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্রকুমার শাকলেচা জনসংঘের পক্ষে প্রচারকার্য চালাবার জন্য সম্প্রতি এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, যদিও পশ্চিমবঙ্গে জনসংঘ এখনও বৃহৎ শক্তিশালী দল হিসাবে গড়ে ওঠেনি তথাপি তাঁর ধারণা এই রাজ্যেও কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের শক্তিজোটের বাইরে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে নির্বাচকমণ্ডলী জনসংঘকে সমর্থন করবেন। কারণ জনসংঘই জনকল্যাণে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভার "সাফল্যের" চিত্রটিও তিনি জনগণের কাছে তুলে ধরেন।

শ্রীজাহাঙ্গীর কবিররা যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে বাংলার জাতীয় দল গড়ে তুলেছেন। নামের মধ্যে দিয়েই দলের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সে পরিচয় পরিষ্কার হচ্ছে সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত গায়েনের কথায়।

একটি জনসভায় শ্রীগায়েন বলেছেন, "বর্তমান অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট বা কংগ্রেস কেউ বাঙালী বা বাংলাদেশকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না। তিনি বলেন, আমাদের পরিচয় প্রথমে বাঙালী পরে ভারতবাসী।

যত দল তত কথা। যত পথ তত মত। তার সম্পূর্ণ বিবরণ তো দূরের কথা, সামান্য পরিমাণে দিতে গেলেও কয়েক টন কাগজ লেগে যাবে। তাই সে চেষ্টা না করে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন পক্ষের নির্বাচনী প্রচারধারার কিছুটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হোল।

সংসদীয় রাজনীতিতে প্রচারকার্যের গুরুত্ব অসামান্য। মৌখিক প্রচারের মধ্যে দিয়েই রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের ঠিক মাঝখানে নিজেদের স্থান করে নেন, তাঁদের মন জয় করার চেষ্টা করেন। সে কাজে এবার কে কতটা সফল হলেন তা আর কয়েক সপ্তাহ পরেই জানা যাবে।

এবারের নির্বাচনে

আসন ২৮০ প্রার্থী ১৪ শ'র বেশী

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ২৮০টি আসনে ১৪ শতাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। কংগ্রেস সব আসনে এবং যুক্তফ্রন্টও (সমর্থিত সহ) সব আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবার নির্বাচনী আসরে বহু নতুন দল ও নতুন প্রার্থীর জোটবন্দীর নতুন নতুন কৌশল মধ্যবর্তী নির্বাচনকে জটিলতর করে তুলেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম প্রোগ্রেসিভ মুশ্লিম লীগের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে প্রার্থী দাঁড় করান হোল। শেষ পর্যন্ত এস এস পি মেদিনীপুর জেলার তিনটি আসনে ফ্রন্টের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছেন।

বাতিল বিধানসভার ২৮০ জন সদস্যের মধ্যে ২৪৭ জন এবার পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন। অন্যান্য প্রার্থীদের এক বিরাট অংশ গত চারটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসন সংখ্যা যেমন এবার বেশী, তেমনি একই কেন্দ্রে গড়ে ৫ থেকে ১৭ জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন এমন কেন্দ্রের সংখ্যাও বেশী। প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায় যে, মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনে গড়ে ছয়জন করে প্রার্থী রয়েছেন।

দলত্যাগী সদস্যের মধ্যে প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ২১ জন পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন।

গত বিধানসভার ১২৭ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ১০৪ জন, বাম কম্যুনিষ্টদের ৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ৩৯ জন পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন। গত বিধানসভার তিনজন সদস্য অবশ্য ইতিমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

নয়জন দলত্যাগী নির্বাচনে দাঁড়াবেন না।

বাতিল বিধানসভার ১৩ জন কংগ্রেস, ৪ জন বাম-কম্যুনিষ্ট সদস্য এবার প্রার্থী হননি।

তিনজন প্রার্থীর একাধিক কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বাতিল বিধানসভার যেসব সদস্য [illegible] নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না তাঁদের মধ্যে এ'রা আছেনঃ শ্রীঈশ্বরদাস জালান (কংগ্রেস — বড়বাজার), শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি (কং—হাওড়া উত্তর), শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কং—লাভপুর), শ্রীজগন্নাথ কোলে (কং—ছাতনা), শ্রীমতী শাকিনা খাতুন (কং—বাসন্তী), শ্রীপতি সিং (কং — ভরতপুর), শ্রীব্রজবিলাস মুখার্জি (কং—আরম্বা), শ্রীশঙ্করনারায়ণ সিং (কং—কাশীপুর), শ্রীদাসুকরণ মুর্মু (কং—গাজোল), মহঃ সৈয়দ মিয়া (কং—মালদহ), শ্রীকৃষ্ণবাহাদুর গুরুং (কং কালিম্পং), শ্রীতেংজিং ওয়াংদি (কং—ফাঁসিদেওয়া), শ্রীভূদেবচন্দ্র মন্ডল (কং—বিষ্ণুপুর), শ্রীহরিদাস মিত্র (বাংলা কংগ্রেস —চাকদহ), শ্রীজগন্নাথ মজুমদার (জাতীয় দল—চাপড়া), মণীন্দ্র মন্ডল (জাতীয় দল—নাকাশিপাড়া)।

পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রাক্তন তিনজন মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রিবৃন্দ, বিভিন্ন দলীয় নেতা ও বিশিষ্ট সদস্যরা কোন্ কোন্ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কে কে তা সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হোলঃ—

আরামবাগঃ দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (কং) ও শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি (বাং কং) আবার এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আরামবাগ কেন্দ্রে আরও দুইজন প্রার্থী আছেন।

বরাহনগরঃ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার উপ-মুখ্যমন্ত্রী মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে পুরান কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীঅমর ভট্টাচার্যের আবার লড়াই হচ্ছে। অবশ্য এই কেন্দ্রে আই এন ডি এফ ও নির্দলীয় প্রার্থীও আছেন।

জলপাইগুড়ি ঃ বাতিল বিধানসভায় কংগ্রেস দলের নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (কং) পুনরায় কম্যুনিষ্ট প্রার্থী শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কেন্দ্রে আরও প্রার্থী আছেন।

ঝাড়গ্রাম ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবার কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রাক্তন কংগ্রেস এম-এল-এ বর্তমানে লোকদলভুক্ত শ্রীমহেন্দ্র মাহাতো এবং বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী অধ্যক্ষ শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রমুখ আছেন।

শিয়ালদহ ঃ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কং) এবার এই কেন্দ্রে আর এস পি নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

রাসবিহারী ঃ বাতিল বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জি (যুক্তফ্রন্ট) কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

শ্যামপুকুর ঃ সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার বসু এবং এই কেন্দ্রে কলকাতার মেয়র কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে'র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত নির্বাচনে শ্রীদে এই কেন্দ্রে নির্বাচিত হন। আর শ্রীবসু গতবার বারাসত কেন্দ্রে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দার্জিলিং ঃ এখানে প্রার্থী হলেন গোর্খা লীগের নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীদেও-প্রকাশ রাই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও পুরান—শ্রীমদন থাপা (কং)। শ্রীথাপা দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

আলিপুরদুয়ার ঃ আর এস পি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে শ্রীধীরেন ভৌমিকের (কং)। এই কেন্দ্রে আরও প্রার্থী আছেন।

রায়গঞ্জ . পশ্চিম দিনাজপুর পি এস পি'র সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু এই কেন্দ্রে এবারও কংগ্রেস ও বাম কম্যুনিষ্টসহ বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন।

রতুয়া ঃ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসৌনীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কং) এই কেন্দ্রে পুনরায় বাম কম্যুনিষ্ট প্রার্থীসহ বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন।

লালগোলা ঃ প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ কাজেমআলি মির্জা (যুক্তফ্রন্ট) ও প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুস সাত্তার (কং)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

করিমপুর ঃ প্রাক্তন দুই মন্ত্রী — ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল (কং) ও শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এই কেন্দ্রে। বাম কম্যুনিষ্টসহ আরও প্রার্থী আছেন।

কালিগঞ্জ : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান (কং) বাংলা কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

হাসখালি : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচারুমিহির সরকার (বাংলা কংগ্রেস) এই কেন্দ্রে কংগ্রেসসহ বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কৃষ্ণনগর পূর্ব : এস-এস-পি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এই কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ ব্যানার্জিসহ কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

হাবড়া : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (কং) বাংলা কংগ্রেস, লোকদলসহ বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

দেগঙ্গা : জাতীয় দলের সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজাহাঙ্গীর কবির এই কেন্দ্রে আই এন ডি এফ নেতা শ্রীআশুতোষ ঘোষসহ কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ভাঙড় : প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ আমির আলি মোল্লা (লোকদল) কংগ্রেসের শ্রী এ কে এম ইসাক সহ বিভিন্ন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জয়নগর : এস-ইউ-সি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি এই কেন্দ্রে কংগ্রেস, আই এন ডি এফ সহ কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বৌবাজার : কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার (কং) এই কেন্দ্রে ফঃ ব্লক, জনসঙ্ঘ প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ঢাকুরিয়া : কম্যুনিস্ট নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী এই কেন্দ্রে কংগ্রেসসহ অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

টালিগঞ্জ : মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত পুনরায় কংগ্রেসপ্রার্থী ডাঃ অরবিন্দ দাশগুপ্ত সহ বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বালীগঞ্জ : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য (ওয়ার্কার্স পার্টি) এবার এই কেন্দ্রে বিখ্যাত আইনজীবী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীরণদেব চৌধুরী ও অন্যান্য প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

চৌরঙ্গী : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় (কং) এবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শ্রীঅনন্ত সিং (যুক্তফ্রন্ট)-সহ কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

গাইঘাটা : পশ্চিমবঙ্গ জনসঙ্ঘের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী (জঃ সঃ) প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচণ্ডীপদ মিত্র (কং)-সহ বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন।

শিবপুর : ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য (ফঃ বঃ), কংগ্রেসের শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জির সঙ্গে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

তমলুক : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি পুনরায় এই কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন। কংগ্রেস-প্রার্থী হলেন গান্ধীবাদী শ্রীকুমারচন্দ্র জানা। অন্য দলীয় প্রার্থী আছেন।

ভগবানপুর : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি (কং) পুনরায় এই কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসসহ কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

পাশকুড়া : প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য (কং) পুনরায় বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীসহ বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ইন্দপুর : প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ বিনোদ মাঝি (কং) এই কেন্দ্রে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

তালডাংরা : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি (কং) পুনরায় এই কেন্দ্রে বাম কম্যুনিস্টসহ কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

পুরুলিয়া : প্রাক্তন মন্ত্রী লোকসেবক সঙ্ঘের নেতা বিভূতি দাশগুপ্ত (লোঃ সঃ) পুনরায় এই কেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থীসহ কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কালনা : প্রাক্তন মন্ত্রী মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার এই কেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থীসহ কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

রায়না : প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীদাশরথি তা (কং) এবার রায়না কেন্দ্রে বাম কম্যুনিস্ট, পি এস পি প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অবশ্য গতবারের বাম

নির্বাচনী সাহিত্য

একটা নতুন কথা শোনা যাচ্ছে আজকাল — নির্বাচনী সাহিত্য। ব্যাপারটা আসলে কী, তা আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন। নির্বাচনের আগে যেসব ছড়া বা শ্লোগান পদ্যাকারে সারা শহরের দেয়াল অধিকার করেছে, তাকেই বলা হচ্ছে নির্বাচনী সাহিত্য। দেয়ালীর আগে বাদলা পোকার মতো এ সাহিত্য নির্বাচনের সময়েই শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে আত্মাহুতি দিয়েই অন্তর্ধান করে। কাজেই নামটা যে সেদিক থেকে বেশ লাগসই তা অস্বীকার করা যাবে না।

তবু কথাটার মধ্যে যে ঈষৎ চাপা হাসি এবং নাক-উঁচুকরা ব্যাপার আছে তাও অনতিগোপনই বলতে হবে। অর্থাৎ সাহিত্য বললেও বিষয়টা ঠিক সাহিত্যের এক্তিয়ারে নয়, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মতো হাস্যকর উচ্চাভিলাষী মাত্র। এবং মুখে না বললেও মনোভাবটা সকলের এই রকম যে, নির্বাচনী সাহিত্য আসলে সাহিত্যই নয়।

সবিনয়ে কবুল করব, আমারও অভিমত অনেকটা এই জাতেরই। তবে তার মধ্যে কিছুটা দ্বিতীয় চিন্তার ফাঁক রয়ে গেছে। কেন, সেই প্রশ্নেই আসা যাক তাহলে।

সকলেই জানেন সাহিত্যের পরিধি খুবই ব্যাপক। মানব-জীবনের এমন কোনো ঘটনা বা প্রসঙ্গ নেই যা সাহিত্যের আওতায় আসে না। কেননা সাহিত্যের আসল কাজ হল যোগাযোগ স্থাপন। তাই সেকালে ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি তো বটেই, এমন কি ধনুর্বিদ্যা পর্যন্ত শ্লোক তৈরি করে প্রচার করা হত। আর শুধু সেকালেই বা কেন, খনার বচন নিশ্চয়ই খুব প্রাচীনকালের ছড়া নয়, আর শুভঙ্করী আর্যার বয়সও কয়েক শ' বছরের মধ্যেই হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে কৃষিবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্র একালেও সাহিত্যের হাত ধরেই সাধারণের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেত চেয়েছে। অতএব নির্বাচনী প্রচারও যদি সেই উদ্দেশ্যেই সাহিত্যের উপর ভর করে তাতে দোষ দেব কী করে?

কথা উঠতে পারে, খনার বচন বা শুভঙ্করীর দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে অচল। হাল আমলে সাহিত্য আগেকার চেয়ে ক্রমেই আরো বিশুদ্ধ হচ্ছে। আমার মনে হয়, এ ধারণাও সর্বাংশে সত্য নয়। আমি জানি, উদাহরণ দিতে গিয়ে 'মেডিক্যাল লিটারেচার'-এর নাম বললে সকলেই অট্টহাস্য করে উঠবেন এবং বলবেন, ওটা নেহাতই কথার ছলনা---'লিটারেচার' সেখানে একে-বারে আলাদা বস্তু। অস্বীকার করব না। কিন্তু একালের ট্রাভেলগ বা ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং রিপোর্টাজ বা সংবাদকাহিনী তো সাহিত্যের নতুন শাখা হিসাবেই সসম্মানে গৃহীত। অথচ বিশুদ্ধ সাহিত্য বলতে যা বোঝান হয়, তার সঙ্গে এর যোগাযোগ কত-টুকু? তারপর ধরুন, ঐতিহাসিক উপন্যাস। তার মধ্যে ইতিহাস যদি যথেচ্ছভাবে বিকৃত হয় তাহলে সমস্ত রচনাই গাঁজাখুরি হয়ে উঠতে পারে। আবার শুধু যদি ইতিহাসকেই বর্ণনা করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তকে নিখাদ সাহিত্য বলা যাবে না। অথচ ঐতিহাসিক উপন্যাসও যে সত্যিই সৎ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্তও তো কম নয়!

এ ধাঁধার একমাত্র উত্তর হল--পরিমিতবোধ। সাহিত্যের বিষয়বস্তু যাই হোক, সাহিত্যিকের পরিমিতবোধ তাকে এমন একটা সীমারেখা দেখিয়ে দেয়, যার মধ্যে বিচরণ করলে রচনা হিসাবে উতরে যায়, আর তা ডিঙোবার চেষ্টা করলেই যাকে বলে পতন ও মূর্চ্ছা!

নির্বাচনী সাহিত্যের আসল দোষ হল—তার মধ্যে ঐ সীমা ছাড়িয়ে যাবার প্রবণতা। কিন্তু যেখানে এই ঝোঁক সংযত, সেখানে তা উতরে যায় বৈকি! বেশি না হলেও এরকম কয়েকটি ছড়া সকলেরই নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে—যা দেখামাত্র মনে ঠাঁই পেয়েছে এবং প্রিয়জনকে শুনিয়ে খুশি হওয়া গেছে। সেগুলির রচয়িতা যিনি বা যাঁরাই হন লেখক হিসাবে তাঁরা যে সার্থক তা অস্বীকার করি কী করে!

(দৈনিক যুগান্তর থেকে উদ্ধৃত।

কম্যুনিষ্ট প্রার্থী এবার ভিন্ন কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন।

মন্তেশ্বর : বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবারও এই কেন্দ্রে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অবশ্য গতবারের বাম কম্যুনিষ্ট প্রার্থী এবার ভিন্ন কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন।

ছাতনা : প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় (কং) এই কেন্দ্রে এবার আই এন ডি এফ নেতা শ্রীআশুতোষ ঘোষ সহ বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য এবার নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না।

বোলপুর : বিপ্লবী নেতা শ্রীপান্না-লাল দাশগুপ্ত (যুক্তফ্রন্ট) এবার এই কেন্দ্রে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ সিংহ (কং) এবং অপর কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কোন দলের কত প্রার্থী

কংগ্রেস—২৮০; কম্যুনিষ্ট (মা)—৯৮; কম্যুনিষ্ট (দ)—৩৬; বাংলা কংগ্রেস—৪৯; ফরোয়ার্ড ব্লক—২৮; আর এস পি—১৭; এস এস পি—১৯; এস ইউ সি—৭; লোকসেবক সঙ্ঘ—৬; গোর্খা লীগ—৪; ওয়ার্কার্স পার্টি—২; আর সি পি—২; ফঃ ব্লক (মা)—১; পি এস পি—২৬; আই এন ডি এফ—১৯০; লোকদল—৫৮; জনসঙ্ঘ—৬১; জাতীয় দল—২৬; আমরা বাঙালী——২৯; রিপাব্লিকান—২৩; হিন্দু মহাসভা—৯; প্রগ্রেসিভ মুশ্লিম লীগ—৫১ (অসমর্থিত); কৃষক সমাজ, অনুন্নত সম্প্রদায়, কম্যুনিষ্ট লীগ, ঠাকুরপন্থী, আর সি পি সহ অন্যান্য দল এবং নির্দলীয় প্রার্থীদের মোট সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত নির্দলীয় সহ ২৭৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আর চারটি আসনে পি এস পি'কে সমর্থন করছেন।

কলকাতার ৭টি কেন্দ্রে কংগ্রেস-ফ্রন্ট সরাসরি লড়াই

কলকাতার ২৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৭টিতে এবার কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। গত-বার মাত্র তিনটিতে সরাসরি প্রতি-দ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। মধ্যবর্তী নির্বাচনে কলকাতায় মোট ৯১ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। ১৯৬৭ সালে ২৩টি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৯ জন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে সরাসরি প্রতি-দ্বন্দ্বিতা যেসব আসনে হবে, তার মধ্যে আছে—শিয়ালদহ, চৌরঙ্গী, কালীঘাট, রাসবিহারী, ঢাকুরিয়া, বড়তলা এবং বেল-গাছিয়া।

এবার কলকাতার ২৩টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের সংখ্যা এরূপ : কংগ্রেস—২৩, কম্যুনিষ্ট (মাঃ)—৯, কম্যুনিষ্ট (দ)—৪, ফরোয়ার্ড ব্লক—৪, জনসঙ্ঘ—৬, আর এস পি—২, এস এস পি—১, ওয়ার্কার্স পার্টি—১, ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দলীয়—২, পি এস পি—২, আই এন ডি এফ—৪, জাতীয় দল—১, লোকদল—১, রিপাব-লিক্যান—১, আমরা বাঙালী—৩।

নির্বাচনী রসিকতা

ভোট ভিক্ষা

১২৯৮ সালের জন্মভূমি পত্রিকায় বের হয়েছিল এই ছবিগুলি। সেকালের নির্বাচনের কয়েকটি সুন্দর চিত্র ভোট ভিক্ষার্থীর অবস্থা এবং জয় সুনিশ্চিত জেনে উল্লাস এর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

●

নেতা—আমি খুবই দুঃখিত—অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের অনেক কথা বলে যাচ্ছি—আমার হাতে ঘড়ি না থাকায়, ঠিকমত সময় বুঝতে পারি নি।

জনৈক শ্রোতা—তাতে কি আছে, আপনার পেছনে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে—সেটার দিকে তাকিয়ে দেখুন

●

রাজনীতিবিদ—আপনার কাগজে আমার সম্পর্কে যা তা লিখেছে?

সম্পাদক—কখনই নয়।

রাজনীতিবিদ—কয়েকটি কাগজে আজ সকালেই দেখলাম।

সম্পাদক—তা হতে পারে। আমরা বাসি খবর ছাপি না।

●

একটি রাজনৈতিক দলের সভা। জনৈক প্রবীণ দলনেতার সম্বর্ধনা। চেয়ারম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, পরের বক্তার ভাষণ আরম্ভের আগে কয়েক মিনিট বিরতি থাকছে। এই সময়ে আপনারা বাইরে গিয়ে একটু পা মেলে আসুন।

জনৈক কর্মী—পরবর্তী বক্তা কে?

চেয়ারম্যান—সে খবর জানাবার আগে পর্যন্ত আপনাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকছি।

●

—তুমি কি করে বুঝলে, আমার ছেলেটি ভবিষ্যতে খুব বড় রাজনীতিবিদ হবে?

আগ্রহের সঙ্গে বন্ধুর কাছে জানতে চাইলেন ছেলের বাবা।

—ও' সেই সব শব্দই উচ্চারণ করে যা খুবই শ্রুতিমধুর কিন্তু অর্থহীন—জানালেন বন্ধু।

ভোট ভিক্ষা

নির্বাচন প্রার্থীরা একালের মত সেকালেও ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ধর্না দিতেন। কিন্তু এক জায়গায় কয়েকজন প্রার্থী মিলিত হলে ভোটারের হোত প্রাণান্তকর অবস্থা। জন্মভূমির চিত্রশিল্পী তাকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

বহুদিনের উদ্দীপনা প্রচার পারস্পরিক রেষারেষির অবশেষে নির্বাচনের ফল বেরোল। একজনের জয় অপরের পরাজয়। জয়ী প্রার্থীর উল্লাস করুণ করে তোলে বিজিত প্রার্থীদের বিলাপ। হতাশায় ভেঙে পড়েন তারা। তারই সুন্দর প্রতিরূপ নীচের ছবিটি।

পরাজয়ের শোক

বক্তৃতা করতে গিয়ে ভদ্রলোকের জ্ঞানই ছিল না কতক্ষণ ধরে তিনি বলে চলেছেন। তিনি বলছিলেন—আমি আপনাদের উন্নতির জন্যই এত কথা বলছি।

বেশ উঁচু স্বরে জনৈক উত্তপ্ত শ্রোতা চেঁচিয়ে উঠল—তা অবশ্যই সত্যি। কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ না করলে, আপনার নিজের কিঞ্চিৎ অবনতি ঘটবে।

ভোটারের প্রাণান্ত

—একজন রাজনীতিবিদ দেশের সব সমস্যাই আন্তরিকভাবে বোঝবার চেষ্টা করবেন।

সে অবশ্য ঠিক—বললেন দলনেতা, কিন্তু সমাধানের কথা বাদ দিয়ে।

●

চেয়ারম্যান—আমরা এমন একজন লোক চাই, যে লেফটিস্ট নয় রাইটিস্টও নয়, রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর চলে, এমন একজন লোককেই নির্বাচনে এই কেন্দ্রে দাঁড় করাতে চাইছি।

দলকর্মী—তাহলে একজন বাসের ড্রাইভারকে দাঁড় করালেই ভাল।

●

ডাক্তার—একটি সুখবর। আপনার স্ত্রীর তিনটি সন্তান হয়েছে।

রাজনীতিবিদ—অসম্ভব। আমি আবার গণনার দাবী জানাচ্ছি।

●

রাজনৈতিক সভা। জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তৃতা করার কথা। অনেক দেরীতে ব্যস্ত হয়ে তিনি মঞ্চে এসে উঠলেন। বক্তৃতা শুরু করবেন, এমন সময় একজন রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করে বসলেন—দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—আমাকে এখন বিরক্ত করবেন না—বলে উঠলেন ব্যস্ত রাজনীতিবিদ। আমি এখানে বক্তৃতা করতে এসেছি। এখন আমার চিন্তা করবার সময় নেই।

●

—জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায় কি?

—প্রতি রাজনৈতিক ভাষণের ওপর কঠোরভাবে কর বসান।

●

নিদারুণ খ্যাতি ছিল ভদ্রলোকের। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে অতুলনীয়। একদিন আবেগময় ভাষণে তিনি বলছিলেন—আমি চাই ল্যান্ড রিফর্ম, আমি চাই হাউজিং রিফর্ম, আমি চাই এডুকেশানাল রিফর্ম, আমি চাই......

আপনি চান ক্লোরোফর্ম—কথা শেষ করার আগেই মন্তব্য করে জনৈক শ্রোতা।

কাছের ও দূরের গান্ধী : প্রশ্নের সৌধ

রম্যাঁ রলাঁ

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব আগামী ২রা অক্টোবর উদ্‌যাপিত হবে। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

—রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরীর মূল ফরাসী থেকে
অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

......তিনি তবে বোধ হয় মুখ্যত আসেন আমার মতামতটা জানার জনাই (ভারত আমার মতামতের কতটা দাম দেয়, তা তো জানিই নিঃসন্দেহে) এবং দরকার পড়লে যদি তাঁরা হিংসাত্মক যুদ্ধে মাতেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, তখন আমি তাঁদের সমর্থন করব কি না, সেটাও জানার ইচ্ছা ছিল তাঁর। আমি যাতে তাঁদের সঙ্গে প্রকাশ্যে সম্বন্ধ ছিন্ন না করি, সে বিষয়ে তাঁকে ব্যগ্র মনে হল। জানি না আমার কোন ফরাসী বন্ধুরা সুভাষ বসুকে জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন (হয়তো ভালো ভেবেই তাঁরা সে কাজ করেন, কিন্তু আমার নামে কথা বলার যোগ্যতা তাঁদের নেই) যে যদি কোনোদিন ভারত গান্ধীর পথ থেকে সরে আসে, তবে ভারতের প্রতি তখন আমি সকল আগ্রহ হারাব। আমি তার ঠিক উল্টোটাই তাঁকে বললাম। এবং বিপ্লব, হিংসা ও অহিংসা নিয়ে তর্কের প্রসঙ্গে আমি তাঁকে অপরের সাহায্যে (কারণ সুভাষ বসু শুধু ইংরেজীই বলেন ও বোঝেন) অনুবাদ করিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমার মনোভাবটা, যে-মনোভাব নিতে আজ আমি বাধ্য হয়েছি ও যার ব্যাখ্যা আমি করেছি 'সংগ্রামের পনের বছর' নামক আমার নতুন গ্রন্থে। গান্ধীর মহান আত্মার প্রতি যথোচিত সম্মান (এবং এ বিষয়ে সুভাষ বসু আমার সঙ্গে একমত) ও স্নেহ জানানোর পরেও বলবই, তাঁর নীতির সঙ্গে আমি নিজেকে কোনো রকমেই জড়িত বলে মনে করতে চাই না—সে-নীতি আমার চোখে এক মহান পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি অপর্যাপ্ত বা অনর্থক ফল সত্ত্বেও তিনি সেই নীতি একগুঁয়ের মত ধরে বসে থাকেন, অথবা যদি বিশেষ করে মূলধন ও শ্রমের অনিবার্য সংঘাতে তিনি বিনা শর্তে ও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শ্রমের পক্ষ না নেন তো তাঁর বিরুদ্ধে যেতে হয়তো হোক, আমি শ্রমের পক্ষই নেব। একথা আমি কোনোদিন গোপন করি নি।

গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে বা তর্ক করে তাঁকে বুঝিয়ে নিজের মতে টানতে সুভাষ বসু যে খুব উৎসুক, তা আমার মনে হল না (এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব গান্ধীর অন্যান্য রাজনৈতিক বিরোধীদের মতই)। (গান্ধীর সাম্প্রতিক লেখায় বা আলোচনায় যদি কোথাও সমাজ-চেতনায় লক্ষণীয় কোনো বিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে, সেটা গান্ধী-বিরোধীরা উপেক্ষার ভাবে দেখেও না দেখতে চান—এবং তাঁদের সেই উপেক্ষার ভাবটা যে এবারই প্রথম দেখাছ, তা নয়। বড্ড দুঃখের কথা যে ভারতে একজন ব্যক্তিও নেই যিনি আমার মত বা যিনি আমার নৈতিক চরিত্র সম্বলিত। গান্ধীকে সামাজিক বিপ্লবে টানতে পারব, এ আশা আমি কিছুতেই হারাতাম না, অবশ্য সেটা অহিংসা বাদ দিয়ে নয়, কারণ অহিংসা তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না। তবে যদিও সুভাষ বসুর মত ব্যক্তিও স্বীকার করবেনই যে গান্ধীকে তাঁদের মধ্যে পেলে সেটা হবে তাঁদের পক্ষে এক প্রচণ্ড সাফল্যের কারণ, আমি তো মনে করি না যে তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য তাঁরা ভিতরে ভিতরে সবিশেষ ব্যগ্র। কারণ তাহলে গান্ধীর সামনে তাঁরা নিজেদের সর্বদাই ছোট মনে করবেন। হয়তো জহরলাল নেহরুর ক্ষেত্রেও এ ধরণের ব্যাপারই হয়েছে—চিন্তাধারায় তিনি বহু দূর গেছেন, একেবারে কমিউনিজমের দরজা পর্যন্ত, অবশ্য তাঁর সে পর্যায় যদি তিনি ইতিমধ্যে অতিক্রম না করে থাকেন। কিন্তু গান্ধীর প্রতি তাঁর অনেকটা পুত্রোচিত শ্রদ্ধা তাঁকে লাজুক করে, তাঁর কর্মে অনিশ্চয়তার ভাব আনে)।

সুভাষ বসুকে দেখে মনে হল, তিনিও কমিউনিজমের প্রায় ধারে-কাছে পৌঁছেছেন। তবে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি শুনতে চান না। হয়তো তাঁর এই বিরুদ্ধ ভাবের পিছনে কিছু ব্যক্তিগত কারণ বিদ্যমান, হয়তো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান প্রতিনিধিদের দেখেই তাঁর এই ভাব জেগেছে। কারণ তিনি স্পষ্টই বললেন, সোভিয়েট রাশিয়া যদি ভারতকে স্বাধীন হতে সাহায্য করে তো তাতে আপত্তির তিনি কিছু দেখেন না। এবং সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর মুখ্য অভিযোগ এই যে জাতীয় এক রাজনীতি গড়ে তোলায় খাতিরে আজ তা বিশ্ব বিপ্লবে আগ্রহ হারাচ্ছে।

এপ্রিল, ১৯৩৫—১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বরে বোম্বাই-এর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী যে-ভাষণ দেন, সেটি 'ইউরোপ' পত্রিকা তার ১৫ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। ভাষণটিতে গান্ধী সমাজবাদ নামঞ্জুর করে দেন। তাঁর এই মনোভাবে স্তম্ভিত হই ও আমার বোনকে সে-কথা জানাই। আমার বোনও আমারই মত দুঃখিত হন ও প্যারীলালকে সে-বিষয়ে লেখেন এই অনুরোধ জানিয়ে যে চিঠিখানি যেন প্যারীলাল গান্ধীকে পড়ে শোনান। গান্ধী যদিও তখন ভারতের গ্রামে গ্রামে কুটীরশিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টায় ঘুরছিলেন তাঁর উত্তর আসে ঝটপট :

"প্রিয় মাদলেন, প্যারীলালকে লেখা আপনার চিঠিটা এইমাত্র পড়লাম। ঈশ্বরের কৃপায় এখন আমার মৌনব্রতের সময়, তাই চিঠিটির উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারছি। হ্যাঁ, ঋষির আগের দীর্ঘ চিঠিটায় জবাব-স্বরূপ আমার কাছ থেকে একটি সম্পূর্ণ উত্তর তাঁর পাওনা আছে। কিন্তু আমার ভয় ঐ 'সম্পূর্ণ' বিশেষণটাতেই। তাঁর সেই চিঠিটির প্রতি যথোচিত সুবিচার করতে পারে, এমন উত্তর চিন্তা করে লেখার সময় আমার নেই। সেটা করবার চেষ্টা করব আমার মৌনব্রতের এই দিনগুলির মধ্যে। আপনার প্রশ্নটি সরল। সমাজবাদকে এখানকার সেই দলীয় কর্মসূচীতে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, আমার আপত্তি সে-সমাজবাদের প্রতিই। সমাজবাদের তত্ত্ব বা দর্শনের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার থাকতে পারে না। এখানে সমাজবাদের যে-কর্মসূচী, তার অর্জন হিংসা ব্যতীত সম্ভব নয়। সব রকম পরিস্থিতিতেই এখানকার সমাজবাদীরা হিংসা প্রয়োগ করতে রাজী—যদি তাঁরা দেখেন যে অস্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ আছে তো অস্ত্র তাঁরা খোলাখুলিভাবেই গ্রহণ করবেন। সেই কর্মসূচীর মধ্যে এমন অনেক খুঁটিনাটি জিনিস আছে, যার আলোচনায় নাই বা গেলাম। যা এখানে বললাম, তাতে আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হল কিনা জানি না—যদি না হয়, ঠিক কী আপনার প্রশ্ন, তা পরিষ্কার করে আমায় জানান। আপনাদের দুজনকে প্রীতি-সম্ভাষণ।

ওয়ার্ধা ২৮।৩।৩৫ বাপু"

(এ-চিঠিটি পাওয়ার আগেই আমার 'বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি' নামক গ্রন্থ

গ্রন্থটির ৭৪ পৃষ্ঠায় প্যারাটিকাটি লিখে শেষ করি। তাতে দেখা যাবে সমাজবাদের বিরুদ্ধে গান্ধীর আপত্তির গভীর কারণগুলি কী, তা আমি ঠিকই অনুমান করি—কিন্তু তাঁর সেই বিরুদ্ধ ভাব হতে তিনি যদি নিজেকে মুক্ত করতে না পারেন তো তা-ই হবে তাঁর রাজনৈতিক কর্মের ব্যর্থতার কারণ, এ-সাবধান বাণীও উচ্চারণ করি টীকাটিতে।)

এপ্রিল ১৯৩৫—তাঁর সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক আলোচনার একটি বৃত্তান্ত লিখেছেন সুভাষচন্দ্র বসু, সেটি প্রকাশ করার বাসনা তাঁর—বৃত্তান্তটি পাঠাচ্ছেন আমাকে। বৃত্তান্তটি মোটামুটি বেশ যথাযথ—কেবল যা তাতে তাঁর নিজের প্রশ্নগুলিরই একটু বেশি প্রাধান্য তিনি দিয়েছেন, আমার উত্তরগুলি সেখানে এত সরলীকৃত যে তা প্রায় শূন্যেই পর্যবসিত। তবে যে-আলোচনায় দুপক্ষের কেউই অন্যের ভাষা বোঝেন না এবং তৃতীয় ব্যক্তির অনূদিত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেন, সে-আলোচনায় এ-ধরনের অসুবিধা জাগতে বাধ্য। প্রত্যক্ষতার যে-ছাপ, তার ধার এমন আলোচনায় ভোঁতা হয়ে যাবেই।

শুধু দুটো জায়গায় আমার মতামতের সংশোধন করলাম (২৭শে এপ্রিলের চিঠির দ্বারা):

"১। আপনি বলছেন যে যদি কখনো ভারতে গান্ধী ও একালের যুব সম্প্রদায়ের ('দ্য ইয়ংগার জেনারেশন') মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তো আমি যুবকদের পক্ষ নেব। এটা কিন্তু ঠিক এভাবে আমি বলিনি। আমার প্রশ্নটা দু' কালের লোকদের মধ্যে বা দুই রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে বাছাবাছি নিয়ে একেবারেই নয় (এবং এখানেও আপনার বৃত্তান্ত তাদের কোনো পরিষ্কার সংজ্ঞা দেয়নি—তাদের কি বলা হবে 'যুবক', না সমাজবাদী, না কমিউনিস্ট, না নির্দলীয়, র‍্যাডিকাল, ইত্যাদি?)। না, আমার প্রশ্নটা আরো বড়, সেটা সম্পর্কিত শ্রমশক্তি নিয়ে। আমি বলি সোজাসুজি: 'দুর্ভাগ্যক্রমে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব যদি হয়ই একদিন যার ফলে গান্ধী (অথবা অন্য কোনো পার্টি) শ্রমিক-মজদুরদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যান, বিরোধিতা করেন তাদের সমাজবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় বিবর্তনের, অথবা যদি তখন গান্ধী (বা অন্য কোনো পার্টি) তাদের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে দূরে সরে যান, তো তা সত্ত্বেও আমি চিরকালই থাকব শ্রমশক্তির পক্ষে, যুক্ত থাকব তাদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার সঙ্গে: কারণ তাদের দিকেই রয়েছে সত্যকারের ন্যায়, মনুষ্য সমাজের আবশ্যক অগ্রগতির ন্যায়সঙ্গত রীতিও তাদের স্বপক্ষে।'

"২। আপনি বলছেন, 'অহিংসা সম্বন্ধে আমার মনোভাব' কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে দশ (বা পনের) বছর 'মানসিক উদ্বেগে' কাটানোর পর তবে আমি সে-বিষয়ে আমার শেষ সিদ্ধান্ত নিই। নিজের অন্তরের সঙ্গে এই যে-যুদ্ধ আমার, আসলে তার কারণ কিন্তু আরো ব্যাপক ও জটিলতর ছিল। যুদ্ধ শেষের পর থেকে আমার সকল সামাজিক চিন্তাধারা, এমন কি আমার সমগ্র ধ্যানধারণারই একটা আমূল পুনরীক্ষণে মাতি। অহিংসার প্রশ্নটা আমার অন্তরগত সেই বিরাট বিতর্কের একটা অংশমাত্র। এবং অহিংসার 'বিরোধী' হওয়ার সিদ্ধান্তও আমি একেবারেই নিইনি। বরং যে-সিদ্ধান্ত নিই, তা হল এই যে 'সকল সামাজিক কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া অহিংসার পক্ষে সম্ভব নয়'। অহিংসা অনেক পথের একটি-মাত্র, বহু প্রস্তাবের একটি, ও আজও তা পরাধীন। 'আমাদের সকল চিন্তার কেন্দ্রে একমাত্র যে-লক্ষ্যটি থাকা উচিত, সেটি হল আরো মানবিক ও আরো ন্যায্য এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা'—এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে লক্ষ্যটাকে আগে জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করা চাই। কারণ প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা আজ নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে গেছে, তবু সেই বাতিল সমাজের কোনো হিংসাত্মক অংশ যাতে আমাদের লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন না করতে পারে, তার জন্য আগে কোমর বেঁধে লড়তে হবে। প্রাচীন অবস্থার ভিত্তিতে ছিল সামাজিক অন্যায়, ক্যাপিটালিস্ট শোষণ ও তার উৎস হতে উৎসারিত সামরিক সাম্রাজ্যবাদ—তার ভিত্তিতে ছিল পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ (কি হয়তো নয়-দশমাংশই) লোকের উপর অত্যাচার। এমন যে-জঘন্য অবস্থা, যা যেন অনড় এক পাপ, আজ সকল শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে যোঝাই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য—এবং কোনো কিছুর অপেক্ষা না করেই (কারণ সেই যে-অনড় রাজচক্রবর্তী পাপ, সে তো কারুর অপেক্ষা করছে না, তার ধ্বংস না ঘটালে সারা মনুষ্য সমাজই ধ্বংস হবে)। তাই তার বিরুদ্ধে আজ না লাগলেই নয়, হিংসা ও অহিংসার সকল সম্ভব অস্ত্র নিয়ে, যাতে লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় যথাশীঘ্র ও একেবারে নিশ্চিন্তভাবে। কোনো অস্ত্র ব্যবহারেই আমার বারণ নেই, তবে শর্ত এই যে সে-অস্ত্র পড়া চাই এমন যোদ্ধার হাতে যে হবে সৎ, সাহসী ও নিঃস্বার্থ। যে-সামাজিক পাপ ও যে-প্রাচীন ব্যবস্থা মানুষকে ক্রীতদাস করে রেখেছে মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সর্বজনীন যুদ্ধে যাতে হিংসা ও অহিংসার সকল বিপ্লবী শক্তিকে একত্র করে কাজে টানতে পারি, সেইটেই গত কয়েক বছর ধরে আমার যথার্থ কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছি। ১৯৩২-এর আগস্টে আমস্টার্ডামে 'ফ্যাশিজম ও যুদ্ধবিরোধী সকল পার্টির বিশ্ব কংগ্রেস'-এর যে-অধিবেশন বসে তাতেও (ও সেই কংগ্রেস থেকে জাত বহু স্থায়ী সমিতিতেও) এইটেই হয় আমার ভূমিকা। অহিংসার ভিতরে যে একটি প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তি নিহিত আছে, এবং তাকে যে শুধু কাজে লাগানো চলেই নয়, কাজে লাগানো উচিতও (চাকরি করতে অস্বীকার করা, অস্ত্রশস্ত্র বা রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানায় সাধারণ ধর্মঘট, যানবাহন কর্মীদের ধর্মঘট, ইত্যাদি), সেইটা আমি আজও বিশ্বাস করি। সুপরিচালিত অহিংসা ও শৃংখলাবদ্ধ বিপ্লবী হিংসার দুইরকমের অস্ত্রের চলা উচিত এক সঙ্গে, একে অন্যের মৈত্র হয়ে—যে যার নিজের বিশিষ্ট রণ-কৌশলটি তারা বজায় রাখবে, শুধু তাদের উভয়ের প্রচেষ্টাকে খাপ খাইয়ে মিলিত করবে সেই একই শত্রুর সঙ্গে যুঝতে, যে-শত্রু শুধু তাদেরই শত্রু নয়, শত্রু সে সমস্ত মনুষ্যসমাজেরও, এবং সে-শত্রু হল যুদ্ধ, সে-শত্রু হল ফ্যাশিজম, সে-শত্রু হল সামরিক ও শিল্পক্ষেত্রের ক্যাপিটালিজম, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক অন্যায়, ইত্যাদি।"

(সুভাষ বসুকে জানালাম আমার নতুন দুটি প্রবন্ধ সংকলনের কথা, যাতে আমার এ-সব চিন্তাধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। শেষে পুনশ্চে যোগ করলাম:

"এটা বলা বাহুল্য হবে যে গান্ধীর প্রতি আমার সস্নেহ শ্রদ্ধার ভাব সমানই বজায় আছে—পরে যদি কোনোদিন সামাজিক কর্ম হতে তাঁকে দূরে সরে যেতে দেখার দুর্ভাগ্যও আমার হয়, তবু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমার যাবে না। সেই সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই আমার কর্তব্য আমায় আদেশ দিচ্ছে—সত্যি বলতে কি, সে-ক্ষেত্রে আমি বিপুল উৎসাহে প্রবেশ করেছি বহু বছর আগেই।")

—সমাপ্ত—

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

রাস্তাটা ক্রমেই অদ্ভুত হয়ে উঠতে লাগল।

এতক্ষণ নতুন-পুরোনো মেশানো বাড়ী-ঘর ছিল, সবুজ পানায় ছাওয়া—কখনো বা তার মধ্যে বুবকাষ্ঠ পোঁতা পুকুর ছিল, রেডিয়োর দোকানে গানের আওয়াজ ছিল, ধুলো-পড়া কাচের আড়ালে ময়রার দোকানে জয়নগরের মোয়া ছিল, কোথাও বা পাইকারী বাজারের লাউ-মুলো-ফুলকপি-বেগুন দুধারে স্তূপাকার ছিল। পথটা পীচের ছিল, সাইকেল-রিক্‌শ, লরী, মোটর আনাগোনা করছিল, বেলা দশটার রোদে জীবন আর মানুষ ঝকমক করছিল। কোথায় যেন একটা রাজনৈতিক সভার কথা কারা ঘোষণা করে যাচ্ছিল।

তাই, নীচের পথ ছেড়ে, ডানদিকের খোয়া আর মাটি মেশানো রাস্তার বাঁক না নেওয়া পর্যন্ত, নিয়োগী-বাড়ী সম্পর্কে আলাদা করে কিছু মনে হয় নি; তখন এপাশে ওপাশে, কোনো মজা পুকুরের ধারে —যে-কোন একটা নতুন কিংবা পুরোনো বাড়ীই অনায়াসে নিয়োগী-বাড়ী হতে পারত। সে বাড়ীর যে-কোনো একটি ছেলে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে আড্ডা দিতে পারত, যে-কোনো একটি মেয়ে হাতে-বোনা স্কার্ফ গায়ে জড়িয়ে—একটি ব্যাগ মুঠোর মধ্যে চেপে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে পারত, যে-কোনো একজন বয়স্ক মানুষ পাইকারী বাজারে এক ডজন ফুলকপি দরাদরি করতে পারতেন। কিন্তু সাইকেল-রিকশটা এই রাস্তায় নামবার পরে, দুর্বিনীত খোয়া আর উঁচু-নীচু মাটিতে গোটা কয়েক ঝাঁকুনি খাওয়ার পরে—এখন অন্য রকম মনে হতে লাগল বিকাশের।

মনে হতে লাগল একটু একটু করে।

প্রথমেই দু পাশ থেকে গাছগুলো যেন অনেকখানি নত হয়ে এল, তাদের মলিন পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল এখানে অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি; একটা ছোট বাঁশের ঝাড়ে হাওয়া লেগে সমুসের করে আওয়াজ হতে লাগল; দেখা গেল পুরোনো একটা অশথের নীচে জড়াজড়ি করে রয়েছে রং জ্বলে-যাওয়া মাটি-বেরিয়ে-আসা গোটা তিনেক শীতলা মূর্তি আর তাদের সামনে কিচির-মিচির রবে গোটা কয়েক ছাতারের জটলা। পিছনের বাজার-গঞ্জ-গাড়ী-মানুষ-রেডিয়োর আওয়াজ হঠাৎ যেন বাঁশবনের আওয়াজে আর ছাতারের ডাকে একশো মাইল পিছিয়ে গেল।

তারও পরে—

ডাইনে বাঁয়ে ইঁটের পাঁজা আর পুরোনো বাড়ীর ধ্বংসশেষ। এক জায়গায় তিনটে থাম শুধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আর কিছুই নেই; একটা মন্দিরগোছের কিছু ছিল এখানে—বটগাছের নাগপাশে প্রায় অদৃশ্য; ওখানে একটা পোড়ো বাড়ীর মতো কী দাঁড়িয়ে—লাল পাড়ের একটা ময়লা শাড়ী শুকোচ্ছে বলে বোঝা যায় ও বাড়ীতে মানুষ আছে।

অস্বস্তিতে একবার নড়ে উঠল বিকাশ। টক্কর বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল রিক্‌শটা, বিকাশ জিজ্ঞেস করল: 'ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো আমরা?'

রিক্‌শওলা বললে, 'রাস্তা ভুল হবে কেন বাবু? এইতো নিয়োগীপাড়া শুরু হল।'

'এইটে নিয়োগীপাড়া?'—সন্দেহ মিটতে চাইল না: 'কিন্তু পাড়া বলে তো মনে হচ্ছে না। চারিদিকে তো পোড়োবাড়ী দেখছি।'

'পোড়োবাড়ী আছে, আবার মানুষজনও থাকে।'

'এর ভেতরে?'

'যেখানে যেটুকু আস্তো আছে, তারই ভেতরে মুখ গুঁজে থাকে বাবু। বাপ-দাদার ভিটে, ছেড়ে যাবে কোথায়, বলুন?'

'হুঁ।'

'দু তিন ঘর কলকাতায় গিয়ে বাড়ী করেছে, তাদের অবস্থা ভালো। দেশে আর তারা আসে না। কথায় মরে শেষ হয়ে গেছে, তাদের ভিটেয় আর বাতি জ্বলে না। বাকী সব আর যাবে কোথায়, এরই ভেতরে পড়ে আছে কোনো রকমে। ওই দু-চারমণ ধান জমি-টমি থেকে পায়, এক-আধটু চাকরী-বাকরী করে—এই যা।'

সাধারণ রিক্‌শওয়ালার চাইতে লোকটি কিছু বেশি আলোকিত দেখা গেল, একটু আশ্চর্য হল বিকাশ।

'তুমি তো অনেক খবর জানো দেখছি।'

'আমি তো এখানকারই ছেলে বাবু, জানব না কেন? বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি এককালে বনেদীয়ানা বলতে নিয়োগী-পাড়াই তো বোঝাত। পালেরা, সামন্তেরা তো হালের বড়লোক, ব্যবসা করে টাকা হল ওদের। আগে ওই পাড়া থেকেই নাকি বেরোতো দশখানা দুগ্‌গা প্রতিমা—মিছিল করে নদীতে নিয়ে যেত—দেখবার জন্যে দশ বিশ মাইল দূরের থেকে মানুষ আসত দঙ্গল বেঁধে। এখন একখানা পুজো হয় কোনো মতে—সব শরিকে মিলে চাঁদা দেয়। তাও হয় তো আর—'

একবারের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল রিক্‌শওয়ালা, মস্ত একটা ঝাঁকুনি লাগল, কথাটা শেষ হল না।

হ্যাঁ, নিয়োগীপাড়ায় মানুষজন আছে এখনো, কথাটা মানতে হল বিকাশকে। এদিকে আধখানা ধসে-পড়া তেমনি একটা জীর্ণ একতলা বাড়ী। তার সামনের একটু ফাঁকা জায়গায়—একটা ইজি-চেয়ার পেতে কে যেন খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজের আড়ালে তাঁর মুখ দেখা যায় না—কিন্তু ধুতির নীচে হলদে হলদে দুখানি শীর্ণ পা—গুলফ পর্যন্ত খয়েরী রঙের পুলওভার আর গায়ের বালাপোশ থেকে বোঝা যায়—মানুষটি বুড়ো। ছিটের ফ্রক পরা আর লাল র‍্যাপার জড়ানো একটি ছোট মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রিক্‌শটার দিকে চেয়ে আছে—ওই বুড়ো মানুষটির নাতনিই হবে খুব সম্ভব।

ডান দিকে আবার বাঁশঝাড় সর সর করছে হাওয়ায়। একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে বিকাশের গায়ে পড়ল। রিক্‌শওলা

বললে, 'আপনি তো যাবেন শশাঙ্কবাবুর বাড়ী?'

'তাই তো বলেছি তোমাকে।'

'কেউ হন নাকি আপনার?'

'না—সে রকম কিছু নয়।'

'আলাপ-সালাপ আছে তো?'

'না, এর আগে আমি কখনো ও'দের দেখি নি।'

'ও'—একটু চুপ করে থেকে রিক্শ-ওয়ালা বললে, 'ও'দের ওখানে থাকবেন নাকি এখন?'

'ঠিক জানি না। থাকতে হতে পারে দু-চারদিন।'—নিজের অজ্ঞাতেই বিকাশ রিক্শওয়ালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল : 'এখানে চাকরি নিয়ে এসেছি। আলাপ না থাকলেও চেনা-জানা বলতে ও'রাই। প্রথমটা দু-একদিন থেকে তারপরে হয়তো একটা বাসা-টাসা ঠিক করে নিতে হবে।'

রিক্শওলা এতক্ষণ জবাব দিচ্ছিল সামনে চোখ রেখেই। হঠাৎ ফিরে তাকালো।

'ও বাড়ীতে দু-চারদিনই থাকা ভালো, বাবু। তার বেশি থাকবেন না।'

লোকটার চোখ, গলার স্বর, বলবার ভঙ্গি—সব কি রকম মনে হল বিকাশের।

'এ কথা বলছ কেন?'

রিক্শওলা তার জবাব দিল না। ডান দিকের একটা ফালি পথে এবার রিক্শাটা ঘুরিয়ে নিলে সে। তার দুধারে সুপুরী গাছের সারি, এক ধারের গাছগুলো আধ-শুকনো একটা পুরোনো পুকুরে ছায়া ফেলেছে। সেই পুকুরের পাড়ে আর একটি বিশাল বাড়ী আধ-খানা ভেঙে দাঁড়িয়ে, তার সামনের অংশটা হোয়াইটওয়াশ করা—সব মিলে যেন বিকট একটা মুখ ভ্যাংচানির মতো দেখাচ্ছিল। রিকশওলা বললে, 'ওইটেই শশাঙ্ক নিয়োগীর বাড়ী বাবু।'

শুধু সামনেটাই চুণকাম করা হয়েছে তা নয়, সিঁড়িটাও বোধ হয় নতুনভাবে করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। তার কিছু অংশে এখনো দগদগে লাল সিমেন্টের রং, কোথাও কোথাও চাপড়া ভেঙে পড়েছে। রিক্শার আওয়াজ কানে যেতেই সেই সিঁড়ির মুখে দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়ালো।

'শশাঙ্ক কাকা আছেন?'

'বাবা আছে—' ঐকতানে জবাব এল। তারপরেই হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল বাচ্চাগুলো।

ট্রাংক আর বিছানাটা রিকশওলাই তুলে দিচ্ছিল বারান্দায়। কেমন একটা অনিশ্চিত অস্বস্তি নিয়ে বিকাশ দাঁড়িয়ে রইল—কথাটা মনের ভেতরে গুণগুণ করছে : 'ও-বাড়ীতে দু-চারদিনই থাকা ভালো, বাবু।' নোনা-লাগা ইট আর পুরোনো মাটির গন্ধ আসছে, সামনে একটা নতুন খড়ের পালা শীতের রোদে জ্বলছে সোনার মতো।

চটির ফটাফট আওয়াজ পাওয়া গেল, বিকাশ সচেতন হয়ে উঠল। হাফ-শার্টের ওপরে সোয়েটার আর ডোরাকাটা লুঙ্গিপরা মাঝ-বয়েসী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন বাইরে। বোধহয় দাড়ি কামাচ্ছিলেন, একটা কানের তলায় খানিকটা সাবানের ফেনা দেখা যাচ্ছে এখনো।

'তুমি বিকাশ? আরে এসো এসো, কালই তোমার চিঠি পেয়েছি।'

'শশাঙ্ক কাকা?'—এগিয়ে গিয়ে বিকাশ পায়ের ধুলো নিলে।

'বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো'—শশাঙ্ক-কাকা আশীর্বাদ করলেন : 'তা চিনে আসতে কষ্ট হয়নি? একবার ভেবেছিলুম আমি নিজেই স্টেশনে যাই, তা সকাল থেকে এত কাজ—'

'তাতে কী হয়েছে কাকা, আমি তো আর পর নই।'—বিকাশ ভদ্রতার চেষ্টা করল : 'তাছাড়া নিয়োগীপাড়া তো নাম-করা—আসতে আর অসুবিধে কিসের।'

'নিয়োগীপাড়ার এখন কেবল নামই আছে হে—' শশাঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : 'বাকী যা দেখছ শ্মশান—সব শ্মশান। অথচ একদিন—থাক সেসব পরে হবে—' শশাঙ্ক কাকা গলা তুলে ডাক ছাড়লেন : 'নিতাই—নিতাই—ওরে নিতাই—'

সিঁড়ির ওপর আবার একটি ছোট মেয়ের আবির্ভাব হল।

'নিতাই তো নেই বাবা, সে সকালে গেছে ধান আনতে।'

'তাই তো, মনেই ছিল না। ওরে—ও রিক্শওলা—কে রে, গণেশ নাকি?'

রিক্শওলা হাসল : 'আজ্ঞে।'

'তুই এসেছিস, ভালোই হল। একটু কষ্ট কর বাবা—এই ট্রাংকটার সঙ্গে যা, বাবুর বাক্স-বিছানাটা ওপরে তুলে দিয়ে আয়। পয়সা দেব এখন।'

গণেশ বাক্স তুলতে গেল। শশাঙ্ক-কাকা বললেন, 'আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কেন, এসো, ভেতরে এসো।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে ছোট ঘর একটা। বাইরে থেকে যতই বিবর্ণ দেখাক, ভেতরটা মোটামুটি ছিমছাম। একটা টেবিল, খানকয়েক পুরোনো কাঠের চেয়ার। পেছনে দেওয়াল আলমারীতে একরাশ খাতাপত্র দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কিসের যেন স্তূপাকার হ্যান্ডবিল—ধুলো জমে আছে তার ওপরে। দেওয়ালের গায়ে মহিষ-মর্দিনীর ছবিওলা ক্যালেন্ডার, তারকেশ্বর আর বিবেকানন্দের বাঁধানো ছবি—বিবেকা-নন্দ একটু হেলে আছেন একধারে। ঘরের আর এক কোনায় অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটা টিনের ড্রাম ওপর-নীচ করে সাজানো, বড়ো একটা দাঁড়িপাল্লা, মরচে-পড়া গোটাকয়েক বাটখারা। বোঝা গেল, এইটেই শশাঙ্ককাকার বসবার ঘর এবং যে-কোনো একটা অফিস।

শশাঙ্ক বললেন, 'একটু বোসো এখানে, আমি দেখি ওদিকে কী হল।'

কী দেখতে গেলেন কে জানে। বিকাশ একটা চেয়ারে চুপ করে বসে রইল। এই ঘরটা ছিমছাম, দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ নোনা ফুটে বেরুলেও মোটের ওপর ধবধবে—তবু কোথায় জীর্ণতার গন্ধ, পুরোনো ইট, খসা-বালি, সয়ে-যাওয়া মাটির চাপা নিশ্বাস। এ-ঘরে নয়, বাইরে কোথায় একটা দেওয়াল-ঘড়ি টিকটিক করছে, তার শব্দটা ক্লান্ত, অদ্ভুত ক্লান্ত। আরো চোখে পড়ল, তারকেশ্বরের ছবির একটা কোনা স্যাঁতা লেগে খেয়ে এসেছে, বিবেকানন্দের ছবির কাচে চিড়-ধরা।

বিকাশ টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে আনল। একটা খবরের কাগজ—কালকের। সেটাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার তলা থেকে একটা হ্যান্ডবিল উঁকি মারল।

পুরোনো হ্যান্ডবিল, কাগজের রঙ হলদে হয়ে এসেছে। এইগুলোই দেওয়াল-আলমারীর ভেতরে রাখা আছে মনে হয়। অলসভাবে চোখ বোলাতে গিয়েও তৎক্ষণাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠল বিকাশ।

'দৈব মাদুলী! দৈব মাদুলী!! দৈব মাদুলী!!! হিমালয় পর্বতের সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রদত্ত। এই মাদুলী ধারণ করিলে'—

বাত সারে, হাঁপানি সারে, যাবতীয় জটিল বৈদ্যের অসাধ্য রোগ সমূলে নির্মূল হয়ে যায়। শুধু লোক-হিতের জন্যে মাত্র এক টাকা পাঁচ আনায় বিতরণ করা হচ্ছে। স্পেশ্যাল শক্তিসম্পন্ন, দু-টাকা দশ আনা। ডাকব্যয়—'

তলায় বিনীতা সুধামুখী দেবী। নিয়োগীপাড়া। পোঃ ও জিলা—'

কে সুধামুখী দেবী? কাকিমা? শশাঙ্ককাকার স্ত্রী? কিংবা তাঁর মা? আর কেউ? হিমালয়ের এইসব সন্ন্যাসীরা প্রায়ই মাদুলী-তাবিজ-ওষুধ বিতরণের জন্যে লোকালয়ে নেমে আসেন, কিন্তু নিয়োগীপাড়ায় সন্ধান তিনি পেলেন কী করে?

প্রশ্নটার জবাব মিলল না। দরজায় রিক্‌শওলা গণেশ দেখা দিল।'

'বাবু, আমার ভাড়াটা—'

বারো আনা ঠিক হয়েছিল। একটা টাকা এগিয়ে দিয়ে বিকাশ বললে, 'রেখে দাও।'

চটির আওয়াজ তুলে শশাঙ্ক এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি শিউরে উঠলেন।

'কিরে, এক টাকা? ডাকাতি পেলি নাকি?'

'আজ্ঞে স্টেশন থেকে আসতে তো বারো আনা রেট। আর চার আনা বাবু বক্‌শিস দিলেন।'

'বারো আনা? ছ-আনায় আসে। মাল তোলবার জন্যে দু আনা। আট আনা ফেরৎ দে।'

'আপনি শুধিয়ে দেখবেন বাবু, বারো আনার কমে কেউ রাজী হবে না। আপনি তো কখনো রিক্‌শয় আসেন না—'

বাধা দিয়ে শশাঙ্ক বললেন, 'কোন্ দুঃখে রিক্‌শয় আসতে যাব সাইকেল থাকতে? কিন্তু তোরা কী হলি বল্ দিকি গণেশ? বিদেশী লোক পেলেই গলা কাটতে হবে? একটা চক্ষুলজ্জাও নেই?'

বিকাশ বললেন, 'ওয়া ওই রকমই নেয় কাকা। স্টেশনে কেউ বারো আনা এক টাকার কমে আসতে চাইল না। ওর দোষ নেই।'

'শুনলেন তো?'—মৃদু হেসে গণেশ বললে, 'আচ্ছা বাবু আসি।'

'এই করেই এ-সব ছোটলোকের লোভ বাড়িয়ে দাও তোমরা।' —শশাঙ্ক গজ্‌গজ করতে লাগলেন: 'যা চায়, চাক না। বাড়ীতে এনে ছ' গণ্ডা পয়সা ফেলে দেবে—ব্যাস, মিটে গেল। আমাদের কাছেই ওরা ঠিক থাকে।'

বিকাশ একটু হাসল।

'এ কলকাতা নয়, বাবাজী—পাড়াগাঁ। এখানকার লোককে বিশ্বাস করলেই ঠকেছ। কেউ একটা সত্যি কথা বলে না এখানে, সবাই আছে কেবল পরকে ফাঁকি দেবার তালে।'

বিকাশ বললে, 'কথাটা উলটো রকম শোনাচ্ছে কাকা। ও অপবাদ তো কলকাতারই। বরং পাড়াগাঁয়ের লোক ঢের ভালো— এইরকমই সবাই বলে।'

'ভুল, একদম ভুল। চিরকাল যা হয়েছে না—পাড়াগাঁ এখন কলকাতার ওপরেও এক কাঠি। কলকাতায় তবু চক্ষুলজ্জা আছে, এখানে মানুষ একেবারে ছিঁচকে হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে ঘেন্না ধরে যায়— জানো? ভাবি, এ-সব বিক্রী-পাট্টা করে দিয়ে ওই কলকাতা-টলকাতাই চলে যাই—একটা দোকান-ফোকান যা হয় খুলি। এ-সব চোর-ছ্যাঁচোড়ের মধ্যে আর বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

'আজ্ঞে সে তো বটেই।'

'একটা খাঁটি মানুষ কোথাও তুমি পাবে না—একটাও না—' শশাঙ্ক বলে চললেন, 'আচ্ছা এখন তো এখানে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে সব। যাক—সে পরে হবে। এখন চলো ভেতরে—হাত-মুখ ধোবে, চা-টা খাবে।'

'আজ্ঞে চা আমি খেয়েই এসেছি। এত বেলায় ও-সমস্ত আর—'

'—আরে চা খেয়ে তো এসেইছ—বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত কি আর বসে থাকবে চায়ের জন্যে? তবে কলকাতার মানুষ তোমরা, দিনে সাতবার চা না হলে কি আর তোমাদের চলে? এখানে তোমার লজ্জার কিছু নেই হে—নিজের বাড়ী বলেই মনে কোরো। তোমার বাবা আমার বড়োভাইয়ের চেয়েও আপন ছিলেন—কী যে ভালো-বাসতেন আমাকে! এসো—এসো—'

বিকাশ পা বাড়ালো শশাঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে। বাইরে একটু রং ফেরানো হয়েছে, কিন্তু বাড়ীর ভেতরে জীর্ণতা আর কোথাও গোপন নেই। আস্তর খসে পড়া দেওয়াল থেকে দাঁত বের করে আছে পুরোনো ইটের সার। মাথার ওপরে নুয়ে এসেছে পুরোনো ছাদ, তাতে শ্যাওলার দাগ, জলের রং। চারদিকে ছায়া-ছায়া আড়ষ্টতা, কোনোদিন আলো না ঢোকার একটা শীতল স্যাঁৎসেঁতে ভাবটা এই শীতের দিনে গা শিউরে আনা একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছে। বাইরে যে ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা হাওয়ায় আলগাভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল, এখানে যেন তা বুকের ওপর চাপ দিতে চাইছে।

ডানদিক দিয়ে একটা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। তার তলার দিকটাতে এই দিনের বেলাতেও সন্ধ্যার অন্ধকার।

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে শশাঙ্ক একবার থেমে দাঁড়ালেন। হয়তো বিকাশের চিন্তার দিকটা আন্দাজ করে নিলেন, হয়তো স্বাভাবিকভাবেই কৈফিয়ৎ দিলেন একটা।

'পুরোনো বাড়ী, বুঝেছ শশাঙ্ক। কর্তারা বড়ো করেই করেছিলেন, তাঁদের তো কোনো অভাব ছিল না—ঘরে বেঁধেই রেখেছিলেন লক্ষ্মীকে। তাঁরা গেছেন—লক্ষ্মীঠাকরুণও ছেড়েছেন। এত বড়ো বাড়ী সামলে রাখব সে ক্ষমতা আর আমাদের নেই। এদিকটায় ঠেকো দিই তো ওদিকটা ভেঙে পড়ে। কী করা বলো, এইভাবেই থাকতে হয় কোনোরকমে।'

'আজ্ঞে হাঁ, সে তো বটেই। এত বড়ো মেনটেন্ করা—'

'প্রাণান্ত—প্রাণান্ত! তারপর চুণ-বালি-সিমেন্টের দাম? যে রাজমিস্ত্রী আগে এক টাকা রোজে কাজ করত, এখন ছ' টাকার নীচে সে কথাই কয় না। তাই তো ভাবি, সমস্ত বিক্রী করে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলে এ-সব ইটের পাঁজা কিনবেই বা কে?'

বলতে বলতে কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েছিলেন শশাঙ্ক, বিকাশও পা বাড়িয়েছিল সিঁড়ির দিকে। ঠিক সেই সময়, ঠিক বিকাশের কানের কাছে একটা অদ্ভুত খ্যাঁসখেঁসে গলা বেজে উঠল: 'এই!'

চমকে বিকাশ ঘুরে দাঁড়াল, একবারের জন্যে কেঁপে উঠল বুকটা। সিঁড়ির তলায় এই দিনের বেলাতেও যেখানে সন্ধ্যার মতো অন্ধকার থমকে আছে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে না থাকলে যার ভেতরে নজর চলে না, সেখান থেকে একখানা মুখ বেরিয়ে এসেছে। তার মাথায় খানিকটা বনা-বিশৃঙ্খল চুল, মুখে কাঁচা পাকা এলো-মেলো দাড়ি, দুটো ছোট ছোট চোখ তার জোনাকির মতো মিটমিট করছে।

লোকটা আবার বললে, 'অ্যাই!'

সিঁড়ির ধাপের ওপর বিকাশ থমকে গেল। মনে হল সে ভূত দেখছে।

অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'কিছু বলছেন আমাকে?'

'হাঁ, তোকেই—তোকেই। কেন এসেছিস এ বাড়ীতে?'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না'

'বুঝলি—' জোনাকির মতো চোখ দুটো দপ-দপ করে উঠল: 'নিয়োগী বাড়ীতে আগে কালীপুজোয় নরবলি দেওয়া হত। তোকেও বলি দেবার জন্যে এনেছে। বাঁচতে চাস তো—'

এ যে একেবারে বঙ্কিমের কপাল-কুণ্ডলা! কিন্তু এই দাড়ি গোঁফওলা মুখখানা কপালকুণ্ডলার নয়, শশাঙ্ক কাকা কাপালিক নন, নিয়োগী বাড়ী সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ীও নয়। তবু উনিশ শো সাতষট্টি সালের এই শীতের দুপুরে—কপাল-কুণ্ডলাকে নিয়ে ঠাট্টা করার চাইতেও—সিঁড়ির তলার ওই অন্ধকার, ওই কদাকার মুখখানা, ওই বলবার অস্বাভাবিক ভঙ্গি, সব মিলে বিকাশের শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল, সিঁড়ির ওপর পা দুটো তার জমে যেতে চাইল।

শশাঙ্ক কাকা খানিকটা উঠে গিয়েছিলেন, পেছনের এই নাটকটা তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু অদ্ভুত লোকটার শেষ কথাগুলো তাঁর কানে গিয়েছিল। প্রায় বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে গোটা দুয়েক ধাপ নেমে এলেন তিনি, গমগমে গলায় ডাকলেন: 'মেজদা—আবার!'

যেন ম্যাজিক ঘটল। চক্ষের পলকে মুখটা মিলিয়ে গেল সিঁড়ির তলায়।

'আবার তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে দেখছি'—শশাঙ্ক কাকার দাঁত কশ্-কশ্ করে উঠল: 'ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

বিকাশ যেখানে ছিল, সেখানেই একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকে সামলে নিয়ে, কাছে এসে শশাঙ্ক কাকা সস্নেহে হাসলেন: 'চলো—চলো, ওপরে চলো। ওসবে কান দিতে নেই, ভাইয়া পাগলের কাণ্ড!'

(ক্রমশঃ)

ছন্নছাড়া

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া—
আঁকাবাঁকা শুকনো কতগুলি কাঠির কঙ্কাল
শূন্যের দিকে এলোমেলো তুলে দেওয়া,
রুক্ষ রুষ্ট রিক্ত জীর্ণ
লতা নেই পাতা নেই ছায়া নেই ছাল-বাকল নেই
নেই কোথাও এক আঁচড় সবুজের প্রতিশ্রুতি
এক বিন্দু সরসের সম্ভাবনা।

ঐ পথ দিয়ে
জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি করে।
ড্রাইভার বললে, ও দিকে যাব না।
দেখছেন না ছন্নছাড়া কটা বেকার ছোকরা
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে—
চোঙা প্যান্ট, চোখা জুতো, রোখা মেজাজ,
ঠোকা কপাল—
ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট চাইবে,
বলবে, হাওয়া খাওয়ান।

কারা ওরা?
চেনেন না ওদের?
ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের—এক
নেই-রাজ্যের বাসিন্দে।
ওদের কিছু নেই
ভিটে নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই
আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই
শ্লীলতা-শালীনতা নেই।
ঘেঁসবেন না ওদের কাছে।

কেন নেই?

ওরা যে নেই-রাজ্যের বাসিন্দে—
ওদের জন্যে কলেজে সিট নেই
অফিসে চাকরি নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে-বাসে জায়গা নেই
মেলায়-খেলায় টিকিট নেই
হাসপাতালে বেড নেই
বাড়িতে ঘর নেই
খেলবার মাঠ নেই
অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই

ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই—
ঘরে-বাইরে উদাহরণ যা আছে
তা ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ নয়,
তা সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ—
শুধু নিজের কোলের দিকে ঝোল-টানা।
এক ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির এক চিলতে
ফালতু একটু রক
তাও দিয়েছে লোপাট করে।
তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে
সড়কের মাঝখানে।
কোত্থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই
বর্তমানের গতি নেই
কোথায় চলেছে নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা।

সেচ-হীন ক্ষেত
মণি-হীন চোখ
চোখ-হীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ।

আমি বললুম, না, ওখান দিয়েই যাব,
ওখান দিয়েই আমার শর্টকাট।

ওদের কাছাকাছি হতেই মুখ বাড়িয়ে
জিজ্ঞেস করলুম,
তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে? লিফট চাই?
আরে এই তো ট্যাক্সি, এই তো ট্যাক্সি, লে হালুয়া,
সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ছোকরারা
সিটি দিয়ে উঠল
পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি, চল পানসি বেলঘরিয়া।
তিন-তিনটে ছোকরা উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে,
একজন ড্রাইভারের পাশে, দুজন পিছনের সিটে।
বললুম, কদ্দুর যাবে?
এই কাছেই। ঐ দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?
সিনেমা না, জলসা না, নয় কোনো
ফিল্মী তারকার অভ্যর্থনা।
একটা নিরীহ লোক গাড়িচাপা পড়েছে,
চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও—
আমাদের দলের কয়েকজন
গাড়িটার পিছে ধাওয়া করেছে
আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি।
কে সে লোক?

একটা বেওয়ারিশ ভিখিরি
রক্তে-মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে।
ওর কেউ নেই কিছু নেই
শোবার জন্যে ফুটপাথ আছে তো
মাথার উপরে ছাদ নেই,
ভিক্ষার জন্যে পাত্র একটা আছে তো
তার মধ্যে প্রকান্ড একটা ফুটো।
রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরিকে
ওরা পাঁজাকোলে করে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে দিল।
চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে—আনন্দে ঝংকৃত হয়ে —
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।

রক্তের দাগ থেকে আমার
ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে গিয়ে
আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি।

তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে-কঠিনে
সিমেন্টে-কংক্রিটে
ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে-দেয়ালে
বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি—
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে,
প্রাণ থাকলেই স্থান আছে মান আছে
সমস্ত বাধা-নিষেধের বাইরেও
আছে অস্তিত্বের অধিকার।

ফিরে আসতেই দেখি
গলির মোড়ে সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে
বেরিয়ে পড়েছে হাজার-হাজার
সোনালি কচি পাতা
মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে,
দেখতে-দেখতে গুচ্ছে-গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল
ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ
উড়ে এসেছে রঙ-বেরঙের পাখি
শুরু করেছে কলকণ্ঠের কাকলি
ধীরে ধীরে ঘন পত্রপুঞ্জে ফেলেছে
স্নেহার্দ্র দীর্ঘছায়া।
যেন কোন শ্যামল আত্মীয়তা।
অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে দেখলুম
কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন।
প্রাণ আছে, প্রাণ আছে—শুধু
প্রাণেই এক আশ্চর্য সম্পদ
এক ক্ষয়হীন আশা
এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।।

একান্ত নির্জনে ॥

অমল ভৌমিক

বুকের দিগন্ত থেকে সমস্ত পাথর
একে একে স'রে যায়

আমি রাত্রি ভোর করি।
উদাসীন আকাশগঙ্গার স্রোতে মুমূর্ষু তারার
দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন

জোছ্নায় মুছে ফেলি।
আমি শিশিরের শব্দে কান পাতি। দিকচক্রবাল
দু'হাতে সরিয়ে নিয়ে সকালবেলার সমারোহ

নিস্পৃহ অবলোকন করি।
দিনের সাম্রাজ্যশেষে অস্তলীন গোধূলির বুকের ঐশ্বর্যে
আমি রাজা হইনি।

আমার ঐহিক পদধূলি
অম্লান গৈরিক।
চন্দনের জীবন্ত-সুবাসে সমাচ্ছন্ন
সারাদিনে পরিশ্রান্ত দেহের-সমুদ্রতীরে আমি যে নিষ্প্রাণ
রাত্রিপ্রপাতের কাছে মুখোমুখি বসে থাকি একান্ত নির্জনে।

কবি মনমোহন

শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়

A hundred years! The very phrase
Unsepultures the million'd dead:

মনমোহনের জন্মশতবর্ষে স্বভাবতই তাঁর এই কথাগুলি মনে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ চিরনিদ্রার মধ্যেও অমরতার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বিস্মৃতির কবর থেকে মুক্তি-লাভ মাত্র কয়েকজনের ভাগ্যেই ঘটে। কবি মনমোহন সেই ভাগ্যবানদেরই একজন।

১৮৯০ সালের কথা। মনমোহনের বয়স তখন একুশ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চার বন্ধু মিলে প্রথম কাব্যসংকলন প্রাইমাভেরা প্রকাশ করলেন। রাতারাতি তরুণ ভারতীয় কবি-খ্যাতি লাভ করলেন সমগ্র ইংল্যাণ্ডে। অস্কার ওয়াইল্ডের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেন। তরুণ কবির প্রথম প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেলেন, ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : ইংরেজী সাহিত্যে মনমোহন একটি স্মরণীয় নাম হয়ে থাকবে। মনমোহনের সংস অব লাভ অ্যাণ্ড ডেথ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লরেন্স বিনিয়ন মন্তব্য করেছিলেন মনমোহনের আগে আর কোন ভারতীয় ইংরেজী ভাষাকে এমন কাব্যগুণ-মণ্ডিত করতে পারেন নি। তাঁর শব্দ-চয়নে এবং নতুন শব্দ প্রয়োগে বিনিয়ন তাঁর মধ্যে ইংরেজ কবির স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করেছিলেন। ইংরেজী গীতিকাব্যে মনমোহন একটি বিশিষ্ট সুর সংযোজন করেছিলেন। ইংরেজ কবিদের প্রতিধ্বনিমাত্র ছিলেন না। জন ড্রিংক্যান তাঁকে ইংরেজ-কবি হিসেবে ইংরেজী কাব্যসংকলনে একটি স্থায়ী আসন দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

তাঁর সমগ্র কাব্য প্রকাশিত হলে কালের বিচারে মনমোহন নিশ্চয়ই তাঁর যোগ্য আসন পাবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর বহু কবিতাই অপ্রকাশিত। মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত : (১) প্রাইমাভেরা, (২) লাভ সংস অ্যাণ্ড এলিজিস, (৩) গারলেণ্ডস, (৪) সংস অব লাভ অ্যাণ্ড ডেথ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের কথা দীর্ঘ ত্রিশ বছরেও বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশনের কাজে বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি। আশা করি মনমোহনের জন্মশতবর্ষে (১৯৬৯) তাঁর রচনার কয়েক খণ্ড অন্তত প্রসন্ন আলোর মুখ দেখতে পাবে। তখন তাঁর কাব্যপাঠের ও মূল্যায়নের সুযোগ আমরা পাব।

যতটুকু পড়ার সুযোগ পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে মনমোহন একজন জাতশিল্পী। জন্ম--রোমান্টিক। বিশুদ্ধ কবি। জীবন তাঁর কাছে ছিল শিল্প। কবিতা ছিল জীবন। সৌন্দর্যের জন্য ছিল আজীবন তৃষ্ণা এবং সৌন্দর্য তাঁর কাব্যের আত্মা। তাঁর কাব্যে রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক সমস্যার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আঠারো বছর বয়সে ইংরেজ শাসনে ভারতের দুরবস্থার কথা ভেবে একটি রাজনীতি-গন্ধী কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু সেটি ছিঁড়ে দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধু বিনিয়নকে লিখেছিলেন :

I shall bury myself in poetry simply and solely

তখন থেকেই বিশুদ্ধ কবিতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অটুট।

ইংল্যাণ্ড তাঁর কাব্যের পটভূমি। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি কাব্যের সৌরভে আমোদিত হয়ে উঠেছিল ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডনে সেন্ট পলস স্কুলে ছাত্রাবস্থায় লরেন্স বিনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাঁর সারা জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়েছিল। যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ, তেমনি মনমোহন-বিনিয়ন। এঁরা দুজনে যেন আরও ঘনিষ্ঠ। বিনিয়ন লিখেছেন :

Manmohan Ghosh and I made friends, and by degrees disclosed to each other our secret ambitions. We had long walks and talks together discussing everything in heaven and earth after the manner of youth but especially poetry and the poets

স্বরচিত কবিতা নিয়েও আলোচনা হতো এবং একের মতামত অন্যের কাছে ছিল অমূল্য। ১৮৮৭ সালে মনমোহন লরেন্স বিনিয়নকে লিখছেন :

You don't know how much I was rejoiced to hear that you liked my poems. You are the only one who gives me any encouragement to write and I am sure it can't be all in vain: for I know you could tolerate nothing but true poetry . I will try to avoid repetition of the same word and also the Matthew Arnoldism you spoke of

আবার বিনিয়নের একটি কবিতা (Psyche) সম্পর্কে তিনি বন্ধুকে তাঁর অনুভূতির কথা জানাচ্ছেন :

The distinctive feature of your poetry is a seraphic air that pervades it — which always reminds me of a sunset or a sunrise in the glow of which the spirit stands with face heavenward and wings strained and half-afloat

এই সব উদ্ধৃতি থেকে দুই কবির পারস্পরিক সম্পর্ক, কবি বিনিয়ন সম্পর্কে মনমোহনের উচ্চ ধারণা, তাঁর কাব্যরীতি ও কবি-সত্তা সুপরিস্ফুট। বিনিয়নও বন্ধুকৃত্য করে-

ছিলেন মনমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্য-গ্রন্থ 'সংগ অব লাভ অ্যান্ড ডেথ' সম্পাদনায় দায়িত্ব পালন করে এবং পাঠক-সমাজে মনমোহন পরিচিতির জন্য সুদীর্ঘ একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখে।

কবি মনমোহনকে জানার জন্য এই একটি গ্রন্থের মূল্য অসামান্য। এর প্রথমাংশে 'আর্লি পোয়েমস' তারপর 'ইমমর্টাল ঈভ', 'অর্ফিক মিস্ট্রি' এবং শেষাংশে 'লেটার লিরিকস' আছে। এটি তাঁর সমগ্র জীবনের একটি গীতিমাল্য। আর্লি পোয়েমস : প্রথম জীবনে প্রবাসে বিদেশিনীর সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। মাইডানি সেই বিদেশিনী 'সেরাফেন্ট অফ মেডেনস', যাকে তিনি অদৃষ্টের টানে ভালবেসে ফেললেন। ভয় হলো বিদেশী বলে উপেক্ষা করবে না তো। তাকে তিনি দেখলেন দিনের উজ্জ্বল আলোয় খোলা জানালার ধারে। তার মুখ ভাবগম্ভীর। দৃষ্টি বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে নিবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক কবির প্রবাসী-মন ছুটে গেল সমুদ্র পেরিয়ে অনেক দূরে তাঁর স্বদেশে—তুষারমৌলি পর্বত-তালবন-ছায়াঘেরা দুরন্ত দুপুরের দেশে। মাইডানিকে আবার তিনি দেখলেন বনের মধ্যে ('মাইডানি ইন দ্য উডস')। ঘন পাতার অন্ধকারে স্নিগ্ধ আলোর দ্যুতির মতো। নিশ্চল গাছের মধ্যে শিহরণ জেগে উঠলো। তারা যেন আপন মনে কথা বলে উঠলো। পাখী গান গাইলো। প্রকৃতির হৃদয় আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলো। মাইডানি যেন অনেক ফুলের মধ্যে বিশেষ একটি ফুল। কবি বসন্ত-ফুলের সৌরভে বিভোর হলেন। শীতের শুষ্কতার উপর যেন আনন্দের বন্যা নেমে এলো। সব দুঃখ ভেসে গেল। প্রকৃতি-প্রেমিক কবি এবার প্রকৃতিকে বিদায় দিয়ে লন্ডন শহরের অজস্র প্রাণের ভিড়ে নিজেকে মিলিয়ে দিলেন ('লণ্ডন')। সবুজ-ক্লান্ত দৃষ্টি ইঁট-রঙে বৈচিত্র্যের স্বাদ পেল। নিঃসঙ্গ কবি বিপুল প্রাণের দরদে জনারণ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে চাইলেন। লণ্ডনের সবকিছু ভালবেসে ফেললেন। এর সঙ্গে পাকে পাকে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। শহরের কোলাহল ছেড়ে আবার নিবিড় নীরবতার (দ্য গ্রুভ সুইট কোয়ায়েট) অন্বেষণ। সে বুঝি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে কোথায় কে জানে!

গীতি-কবিতা থেকে এবার সনেটে সঞ্চরণ। দুটি সনেট। একটি মায়ের উদ্দেশে। অপরটি মাতৃভূমির উদ্দেশে। প্রথমটিতে কবি-কল্পনার ব্যাপকতা দেখে বিস্মিত হই। দ্বিতীয়টিতে মাতৃভূমির প্রতি প্রবাসী কবির আকুতি মর্মস্পর্শী হয়েছে। সনেট থেকে আবার গীতি-কবিতায় (অ্যান এলিজি) ফিরে এলেন। কবি দেখলেন আকাশ সমুদ্র পৃথিবী সবই তো আছে। বসন্তের ফুল আছে। সবুজের সমারোহ আছে। কিন্তু যার জন্য সব, সে কই? কবির সন্ধানের শেষ নেই। স্বপ্নভারে পীড়িত কবি-সত্তা দুঃখে ম্রিয়মাণ। সমগ্র কবিতায় বেদনার সুর ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী কবিতায় (দ্য লাভার অ্যান্ড পেন্টার) দেখি কবি তাঁর মানসসুন্দরীকে হৃদয়ে বেঁধেছেন। এখন মূর্তিতে ধরতে চান। প্রেমিক শিল্পীর সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু শিল্পী কেমন করে অনিন্দ্যসুন্দরী অধরার লাবণ্য-প্রবাহ রঙ ও রেখার মধ্যে রূপায়িত করবে? শিল্পীর অন্তরে যদি থাকে মুগ্ধপ্রাণ প্রেমিকের ভালবাসার উত্তাপ তবেই তার তুলিতে ভাবময়ী সৌন্দর্য মূর্তিমতী হয়ে উঠবে। কথোপকথনের মাধ্যমে শিল্পের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই পর্যায়ের শেষ কবিতায় (স্যাফিকস্) তাঁর সোনালী স্বপনচারিণীকে পাওয়ার জন্য কবির তীব্র আকুতি। প্রসন্ন উজ্জ্বল দিন কাটে তার আসার আশায়। রাত্রির অন্ধকারে হৃদয়ে তার নাম গুঞ্জরিত হয়ে উঠে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে। সুখঘুম ভেঙে যায়। সুন্দরী মাইডানি আকাশের তারার মত দূরেই থাকে। উত্তপ্ত কামনায় থরথর কবি-হৃদয়ের উপর কুমারীর পবিত্র প্রশান্ত হাসি বর্ষিত হয়। স্যাফোর আবিষ্কৃত ছন্দের অনুকরণে লেখা কবিতাটিতে কীট্সের উত্তপ্ত আবেগ ও ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের পবিত্র সংযমের সার্থক সমন্বয় হয়েছে।

দ্বিতীয়াংশে ইমমর্টাল ঈভ; কবি ফিরে গেছেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে। আদিম পুরুষ ঈশ্বরের যাদুস্পর্শে ইডেন উদ্যানে উঠে দাঁড়ালো। নীল আকাশে চোখ মেললো। দৃষ্টিতে বিস্ময় ও আনন্দ। ঈশ্বরের সৃষ্টি কী সুন্দর! তবু কেন দীর্ঘশ্বাস? সে নিঃসঙ্গ। প্রকৃতির স্বর্গে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। তার খোঁজা ঈভের জন্য। পাহাড় অরণ্য নদী মেঘ সর্বত্র তার অনু-সন্ধান। নদীর তরঙ্গে ঐ বুঝি জলদেবী। ভাসমান মেঘের ভেলায় কি মেঘকন্যা? পাহাড়ে কোন অপ্সরা! অরণ্যে বনদেবী। মনমোহনের চোখে গ্রীক-কবির স্বপ্ন-নীল দৃষ্টি। ঈভের কমনীয় আভাস বুঝি আকাশে বাতাসে অরণ্যে? জলদেবী কি সুন্দরী মানবীর মূর্তিতে ধরা দিলেন? প্রত্যেকটি বৃক্ষের অন্তস্তল থেকে শান্ত সলজ্জ দেবী-মূর্তি সব বেরিয়ে এল। আদমের কাছে এগিয়ে গেল। তাদের সুনিবিড় ছায়া বিছিয়ে দিল। এরা সবাই তাকে সঙ্গ দিতে চাইল। কিন্তু দেব-কন্যা বা প্রকৃতি-কন্যা কি ঈভের বিকল্প হতে পারে? ঈভ তো আদমেরই আর এক সত্তা। তার অর্ধাঙ্গিনী। কিন্তু সে কই? প্রকৃতির আত্মা সান্ত্বনা দিতে চাইল। এই আকাশ, এই সবুজ পৃথিবী এর কুমারী রূপ তোমার মনে ধরে না? আদমের প্রশ্ন—কে তুমি? সে তো এই উপত্যকারই স্বর্গীয় সত্তা যে তোমার বধূ হতে চায়। কবি ডাক দেন : তুমি এস। দেখাও আমাকে আমার সেই কল্পলোকের রাণীকে যার উপস্থিতি আমি অনুভব করি আমার কামনা-তপ্ত হৃদয়ের মধ্যে। সেই ঈভ বিধাতার সৃষ্টি-চিন্তার মধ্যে কুঁড়ির মত লুকিয়েছিল। সে পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ফুল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের ফল। আকাশের যেমন তারা, তীরের যেমন ঢেউ, আদমের তেমনি ঈভ। কবি—আদম মালতী—ঈভ দুয়ে এক হলো। দুটি হৃদয় পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে পরিপূর্ণতা পেল। দুজনে দুজনার চোখে স্বপ্ন-স্বর্গ দেখলো। কবি তাঁর মালতীর চোখে ইডেনের প্রশান্তি দেখলেন। রূপসী নায়িকাদের কাহিনী অবশ্যই মনে হয়েছিল। তাদের সর্বনাশা রূপের আগুনে অনেকে মরেছিল। অনেক যুদ্ধ, অনেক রক্তক্ষয় হয়েছিল। তাদের কথা ভেবে তিনি দুঃখ করবেন না। অতীতকে মুছে ফেলবেন,

Though you revive
lost bliss, your heart
Cradles august the pain.
The ancient primal woe of man.
And aches to mother Cain.

নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, অবিচার, ইতিহাসের করুণ কান্না কোনকিছুতেই কবি বিচলিত হবেন না। তিনি বিশ্বাস করেন :

. . there is a power that works
All things to harmonise.

কেননা তিনি তাঁর ঈভের শান্ত চোখের গভীরে লুকানো বিগলিত করুণা দেখেছেন। তার করুণা ও প্রেম কবির দরিদ্র পৃথিবীকে ঐশ্বর্যে ভরে তুলেছে। কবির ঈভ অর্থাৎ মালতী তাঁর কাছে অনন্যা। মালতী নইলে সৌন্দর্যও সুন্দর হতো না। সত্যও বুঝি সত্য থাকতো না। তার তুলনা কোথাও মেলে না। লিলি? গোলাপ?

The lily and the rose of you
No white, no red can show.

হেলেন, ক্লিওপ্যাট্রা, রোজামণ্ড সবার সেরা তাঁর ঈভ। তার সৌন্দর্য কোন কিছুর মধ্যেই সীমিত নয়। এ সৌন্দর্যের রহস্যেরও শেষ নেই। কবি তার মধ্যে দেখেছেন the eternal rose of mystery. আর তার মনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তুলনা করেছেন বাগানের উর্বর মাটির সঙ্গে। যেখানে মহৎ গুণের চারাগুলি পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। আবার সুচারু আত্মার প্রতিও সে মন অনুদার নয়।

তাঁর ঈভ মানবী। হাসি-কান্নায় দোলা তার জীবনে। মানবী দেবীও।

A glory from above
A daughter of Eternal, I . .
had wedded, dared to love.

তার হৃদয়ের মধ্যে কবি দেখেছেন চিরন্তন

ভালবাসার দ্যুতি ও চিরকালের নিষ্ঠা। তাঁর ঈভ নারী-বধূ-মাতা। এই তিন রূপেই তার পরিচয় শেষ হয় না।

Your own sweet mystery
still you are
And God's, His secret life.

সঙ্গীত তার জীবন। তার প্রাণ-সত্তার স্পন্দন। সে মূর্তিমতী সংগীত।

কবি ও তাঁর ঈভ যেন দুটি গ্রহ। যেমন পৃথিবী ও চাঁদ। দুটি গ্রহ ভালবাসার কক্ষ-পথে চলেছে একত্রে। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রহটি মধ্যপথে কক্ষচ্যুত হলো। অসুস্থা বাকশক্তি-হীনা মালতীর জন্য কবির মনে তীব্র বেদনা। তিনি কেঁদে উঠলেন ঃ

My drooping flower, my Maloti

তার শেষশয্যায় নীরব ভাষায় কবির মালতী যে কথা বলেছিল কবির জীবনে তা পরম পাথেয়। কবি করুণা ও ভালবাসার আলোয় পৃথিবীকে দেখতে শিখলেন। অর্ফিক মিস্ট্রিস ঃ মালতী নেই। কবি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ইউরিডিসের জন্য যেমন অর্ফিউসের কান্না। কবি বড় একা। স্মৃতি শুধু সম্বল। সবই আছে। আকাশ আজও নীলিমায় নীল। প্রাণোচ্ছল পৃথিবী আজও সুন্দর। শুধু সে নেই।

Can all things be,
and I and you, —
She nothing, she nowhere?

কবি ভাবছেন কেমন করে তাকে হারালেন। ঝড় উঠলো। বৃষ্টি নামলো। সাদা ঘোড়ায় যমদূত এলো বুঝি (দি রাইডার অন দি হোয়াইট হর্স)। প্লুটোর সহকারী। কেরণ নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। বৃষ্টির মধ্যে দেহটা নিয়ে ওরা কোথায় মিলিয়ে গেল। কত অনুনয় করে ডাকলেন কবি। শুনলেন শুধু বাতাসের গোঙানি। আর দেখলেন বৃষ্টি। গ্রীক চিত্রকল্পের নব-রূপায়ণ। পরবর্তী কবিতাটিও (দি ডিউড্রপস্) বেদনার একটি নিটোল মুক্তা।

Dear, like a trembling drop
of dew I held thee in my hand;
How of a sudden could I so spill
as to lose it in its infinite sand:

কবি-প্রিয়া যেন গোলাপের পাঁপড়ির উপর শিশিরবিন্দু। লোনা সমুদ্রের জলে সে মিলিয়ে গেল। আর কবি সীমাহীন সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে লোনা-জলে ঝাপসা চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। ডাকছেন কাতর-স্বরে। উত্তরে শুনছেন কেবল গম্ভীর জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। প্রতিটি কবিতায় কবির নিঃসঙ্গতাবোধ আমাদের মনে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁর শ্রেষ্ঠ দানের জন্য। কিন্তু ভগবান সেই দান কেড়ে নিলেন এই তাঁর অনুযোগ। ব্রাউনিং-এর অচঞ্চল বিশ্বাস নয়, বেদনা-বিক্ষুব্ধ প্রেমিকের প্রশ্ন ঃ

O master of the pageant,
Maker of night and day,
Is this a theme for glory,—
To give and take away?
— The Eternal Infant.

কবি যখন জানালার ধারে দাঁড়ান তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিতে তাঁর হৃদয় ঝাপসা হয়ে আসে। যখন সিঁড়ি দিয়ে নামেন তাঁর প্রিয়ার হারিয়ে-যাওয়া পায়ের শব্দ তাঁর বুকের মধ্যে বাজে। তিনি যেন পথ-হারা তীর্থযাত্রী যাঁর পথ-চলা শেষ হবে না কোনদিনই। কবির স্মৃতিচারণা অনেক কবিতার মধ্যেই।

দার্জিলিং পাহাড়ে কবি তাঁর কুটীরে একা বসে আছেন। পাশের আসন শূন্য। স্বভাবতই বিগতদিনের কথা তাঁর মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। বাতাসের কান্নায়, পাইনের দীর্ঘশ্বাসে কবি-হৃদয়ের ব্যথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। স্মৃতি আবার পরস্পরের মিলনও ঘটাচ্ছে। কবি-পত্নী মৃত্যুর পরপারে আলোর রাজ্যে। আর কবি অন্ধকারে। তবু বিচ্ছেদ নেই। প্রজাপতির রঙীন পাখায় নীরব প্রেমপত্র বিনিময় হয়।

Across death's bar infrangible
Upon my cheek I feel
Her kiss with touch intangible
All ache of severance heal
— Lines

উজ্জ্বল প্রজাপতি কবির মনের অনেক ধূসর সন্দেহ এবং কালো দুঃখ দূর করে দেয়। অকৃতজ্ঞের মত তিনি তাই ঈশ্বরের সুন্দর জগৎকে শূন্য বলে ভাবতে পারেন না।

Here in the old
sweet home where, still
A guardian spirit, she
Heals, comforts, counsels,
and performs
Her angel ministry.
— The Yellow Butterfly

প্রজাপতির মতোই মৃত কবি-পত্নী ফুল-বাগানের আনন্দময়ী সত্তা হয়ে থাকবে।

. . . You cannot and will not flit
Till the breeze that is God and
morning awake us to soar together
Though other gardens of
unknown time and
God's eternal weather.
Since life is the soul's
vast voyage and death
but a moment's tether.
—The Black Swallow-tail
Butterfly.

কবি মৃত্যুর রহস্য-ভেদ করেছেন। সুতরাং আর কান্না নয়। এবার জীবনের অন্তহীন যাত্রা চলবে। ইমমর্টাল ঈভ এবং অর্ফিক মিস্ট্রিস্-এর কবিতাগুলির মধ্যে জীবন, মৃত্যু এবং মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন সম্পর্কে কবির বিশ্বাস ইউরোপীয় ধর্ম থেকে উৎসারিত হলেও ভারতীয় ধর্মের খাতে স্বাভাবিক-ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর জীবনবোধ কোথায়ও শুষ্কতত্ত্ব হয়ে উঠেনি। হৃদয়ের অনুভূতির মাধ্যমে আমাদের মর্মমূলে প্রবেশ করে। প্রেমের প্রগাঢ়তা ও নিষ্ঠায় কবিতাগুলি অতুলনীয়। শেষের দিকের কয়েকটি কবিতা গভীর বেদনার সংহত রূপে এবং বেদনা থেকে উত্তরণের আভাসে সমুজ্জ্বল হয়েছে।

সব শেষের কবিতাগুলি (লেটার লিরিকস্) প্রধানত প্রকৃতিবিষয়ক। এগুলি কবির প্রকৃতি-প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি ইংল্যাণ্ডের। অতীতের এবং দূরের জিনিস রোমান্টিক কবির কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাই বোধহয় ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার অনেক পরে ইংল্যাণ্ডের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখলেন ভারতবর্ষে বসে। এপ্রিল মাস পশ্চিমের বসন্তের পসরা তুলে ধরে। প্রকৃতির সোনালী মেয়ে শুধু শিশুদের আকর্ষণ করে না। কবিকেও। কবির হৃদয় গুনগুনিয়ে উঠে। নানা ফুলের বাহার। গ্রামে শহরে সর্বত্র। কোন্ ফুলের পর কোন্‌টি সবকিছু কবি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন। পাখীর গান, প্রেমের চমক, শহুরে ফুলবাগানের সোনাবোঝাই ঘড়ি কোন কিছুই তিনি ভোলেন নি। তিনি অনুভব করেছেন বৃক্ষের কাছে বসন্ত আসে তার মৃত্যু-স্বর্গিতের বার্তা বহন করে। পীড়িত যারা তারাও জানালার স্বর্গ থেকে জীবনের গান শুনতে পায় পুষ্পিত কুসুমে ও পাখীর গানে। অজস্র সৌন্দর্যের ঢেউ সব্বার হৃদয়তটে প্রাণের জোয়ার আনে। পরের কয়েকটি কবিতায় কবির বৃক্ষ বন্দনায় মুগ্ধ হই। বিদেশী বৃক্ষ। পপলার, বীচ, ওক, পাইন বার্চ। নমনীয় উইলোও আছে। কেউ পুরুষ। কেউ নারী। প্রত্যেকে বিশিষ্ট। তাদের কাছ থেকে কবি জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করেন। শেষের দিকে হেমন্তের গান ('অটাম')। হেমন্তের বিষণ্ণ ম্লান সৌন্দর্য, তার করুণ সুর ও গভীর প্রশান্তি আমাদের মনে রেখাপাত করে। মার্চ থেকে নভেম্বর প্রতিটি মাস মিছিল করে আমাদের চোখের সামনে আসে। পরিশেষে বৎসরের শীত-ঘুমের জন্য শেষশয্যা রচনা করেন কবি। কবির জীবনেও শেষঘুম নেমে এলো শীতের মধ্যে।

●

মনমোহন ঘোষ জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

শতবর্ষপূর্তি সভা ঃ

স্থান—মহাজাতি সদন, ১৬৬ সেন্ট্রাল এভিনু। সোমবার, ২০শে জানুয়ারী ; সময় সন্ধ্যা ৬টা।

উদ্বোধক—মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীধর্ম-বীর।

সভাপতি—অধ্যাপক ভি কে গোকাক, উপাচার্য। (বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়)।

বক্তা—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এস এন সেন (উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যাপক পি কে গুহ। কবি রচিত 'নল-দময়ন্তী' নাটকের একটি দৃশ্য অভিনয় এবং কবি-কন্যা-পঠিত কবির কবিতাপাঠ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সভা সমাপ্ত।

ইন্দো-ইংরাজী কবিতার আলোচনা চক্র ঃ...

রবিবার, ১৯ জানুয়ারী, সন্ধ্যে ৫টা (কবির জন্মদিন) শ্রীঅরবিন্দ পাঠ-মন্দিরের সহযোগিতায় পাঠ-মন্দির অঙ্গনে (১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, তৃতীয়তল) কবির ইন্দো-ইংরাজী কবিতা থেকে পাঠ। সংক্ষিপ্ত এবং সংহত একটি ধ্যান উদযাপনের সঙ্গে অনুষ্ঠান সমাপ্ত। মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারী সন্ধ্যে ৬টা ৩০ মিনিটে ইন্দো-ইংরাজী কবিতার উপর একটি আলোচনা চক্র শ্রীরামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্কের সহযোগিতায় আহবায়িত হবে। উদ্বোধক—শ্রীভি কে গোকাক, উপা-চার্য, বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়)। সভাপতি—শ্রীভূপতিভূষণ চক্রবর্তী। বক্তা—অধ্যাপক অমলেন্দু বসু, অধ্যাপক পি কে গুহ, শ্রী সুধাংশুমোহন ব্যানার্জী, অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী।

মাছ গান গায়

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হালডর কিলজান লাক্‌-সনেসের নাম আজ পৃথিবীখ্যাত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লাক্‌সনেসের জন্ম আর তিন বছর বয়স থেকে তিনি রেকজাভিকে মানুষ। ষোলো বছর বয়সে এখান থেকে তিনি রেকজাভিকের জিমনাসিয়মে গিয়ে-ছিলেন ব্যায়াম শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং এই-খানেই কয়েকজন তরুণ আইসল্যান্ডীয় কবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। যখন সতের বছর বয়স তখন প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতির দুলাল'। এইকাল থেকে তিনি পৃথিবীর অনেকখানি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং আজো তাঁর পর্যটন প্রবৃত্তি প্রবল। ১৯২২-এ রোমান ক্যাথলিক মতে ধর্মান্তরিত হলেন, ল্যাক্সনেস পরে বামপন্থী হলেন এবং ১৯২৭-এ বিতর্ক-মূলক উপন্যাস "কাশ্মীরের মহৎ তাঁতি" রচনা করেন। এই উপন্যাসে লাক্‌সনেস ধর্ম এবং চার্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছেন। ১৯৩০-এ প্রকাশিত হল লাক্‌-সনেসের সুবৃহৎ উপন্যাস 'সলকা-ভলকা' এবং এই উপন্যাসই য়ুরোপ এবং আমে-রিকায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এই দুখানি গ্রন্থেই লাক্‌সনেস কম্যুনিস্ট জড়বাদের প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন। কিছুকাল আগে লাকসনেসের একটি উপন্যাস 'মাছেরা. গান গায়' ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। এই উপন্যাসটিতে লাকসনেস তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শ্লেষ এবং গীতি-কাব্যধর্মী এই উপন্যাসটি মহৎ শিল্পীর সাহিত্য-রচনায় এক অপরূপ দৃষ্টান্ত।

আলফগ্রিম নামে একটি ছোট ছেলের বাল্যজীবনের চমকপ্রদ কাহিনী এই উপন্যাস। এই ছেলেটি রেকজাভিকের শহরতলীতে মানুষ হয়। তাকে পালন করেছিলেন এক ধীবর দম্পতি। আলফ-গ্রিমের বাসনা ছিল সে বড়ো হয়ে তার পালক পিতামহের মতই মাছের শিকারী হবে। ছেলেটি স্কুলে গেল পড়াশোনা করতে, সেখানে লাতিন আর সঙ্গীত শিক্ষা করল—এতে তার প্রচুর খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি হল। একজন পৃথিবীখ্যাত সঙ্গীতজীবি গায়ক তাকে সাহায্য করলেন মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আর তার পৃষ্ঠপোষক ব্যবসায়ী গডমুন-সেনও সাহায্য করলেন। গডমুনসেন চেয়ে-ছিলেন যে আইসল্যান্ডের মাছ গান করুক—পৃথিবী শুনুক তার সেই গান। কিন্তু মাছ কি গান করে? গান করতে পারে? নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক এই সমস্যাটি তুলে ধরেছেন, তাঁর উপন্যাসে শতাব্দীর প্রারম্ভে আইসল্যান্ডের সমাজ সম্পর্কে সুগভীর শ্লেষের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপন্যাসের কিছু অংশের অনুবাদ পাঠকের সুবিধার জন্য দেওয়া হল—

একজন জ্ঞানী পুরুষ বলেছিলেন মাকে হারাবার পর শিশুর পক্ষে তার পিতাকে হারানোর মত স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই। যদিও আমি এমন একটা উক্তিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি না। আমি কিন্তু সোজাসুজি এই উক্তিকে উড়িয়ে দিতেও চাই না। আমার নিজের দিক থেকেই বল'তে পারি আমার ক্ষেত্রে বাপ-মা দুই-ই ছিল না। সুতরাং বিনা বাপ-মায় আমাকে চালাতে হয়েছে, কিন্তু এই অবস্থাকে আমি দুর্ভাগ্য বলতে পারি না, কারণ এর বদলে আমি একটি ঠাকুর্দা এবং ঠাকুরমা পেয়ে-ছিলাম।

দীর্ঘ কাহিনী সংক্ষেপে বলতে গেলে বলি যে আজ যেখানে ব্যবসায়ী গডমুনড গডমুনসেনের বিরাট প্রাসাদ দাঁড়িয়ে, সেই ভূমিখন্ডের ওপরে রেকজাভিকের দক্ষিণ-প্রান্তে, লেকের শেষ দিকটায় ছিল একটা মাঠ-কোঠা। লেকের দিকে তার প্রান্তদেশ। এই ছোট্ট অঞ্চলকে বলা হত ব্রেককুকট।

আমার পিতামহ এখানেই থাকতেন, ব্রেককুকটের প্রাক্তন জোরুন,—মাঝে মাঝে বসন্তকালে তিনি মৎস শিকারে বেরোতেন, তার সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি ছিলেন তিনি আর যে কোনো স্ত্রীলোকের চেয়ে আমার কাছের মানুষ ছিলেন, অথচ আমি তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না। ইনিই আমার পিতামহী। এই ছোট্ট মাঠ-কোঠাটি ছিল যে-কোনো আশ্রয় প্রার্থী'র কাছে অতিথশালা। যে সময় আমার জন্ম হয় তখন এই মাঠ-কোঠা যাদের ভীড়ে ভারা-ক্রান্ত ছিল তাদের আজকাল বাস্তুহারা বলা হয়। একদিন এলেন একজন তরুণী, তিনি আমেরিকা যাবেন। সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা আইসল্যান্ডের শাসক তাদের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার আশায় পালাচ্ছেন। আমি শুনেছিলাম এ'র পাথেয়র ভার বহন করছেন 'মরমন গোষ্ঠী', আরো জানতাম এই মরমনদের মধ্যে আছেন আমেরিকার মহত্তম মানুষের অনেকে। যাই হোক, এই মহিলাটি যখন আমেরিকা যাত্রার জাহাজের অপেক্ষায় ছিলেন সেই সময় তাঁর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানটিকে দেখে জননী বল্‌লেন—'এই শিশুটির নাম হবে আলফ—'

আমার পিতামহী বল্‌লেন—আমার ইচ্ছা ওর নাম গ্রীম রাখা হোক—আমার মা বল্‌লেন—তাহলে ওকে আমরা আলফগ্রীম বলে ডাকব। এইভাবে এই মহিলাটি আমাকে তাঁর রক্ত-মাংসের অংশ ছাড়া এই একটি মাত্র বস্তু দান করেছেন, সেটি আমার নাম : আলফগ্রীম। আইসল্যান্ডের সব পিতৃহারা সন্তানের মত আমাকে বলা হত 'হানসন'—অর্থাৎ 'হিজ সন', তাঁর সন্তান। তারপর আমার সেই মা আমাকে নগ্নগাত্রে শুধুমাত্র নামের অলংকারে অলংকৃত করে জোরনের হাতে তুলে দিলেন। ব্রেককুকটের সেই ধীবর হলেন আমার রক্ষক, আর উনি চলে গেলেন: অতএব এখন তিনি এই কাহিনীর বহির্ভূত চরিত্র।"

অনুমান করা কঠিন নয় যে লাক-সনেসের এই উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক, এবং সেই কারণে এই উপন্যাসের মধ্যে বাঙালী পাঠক দুজন বাঙালী লেখককে খুঁজে পাবেন যাঁরা প্রায় অনুরূপ আঙ্গিকে আত্মজীবনীমূলক কাহিনী পরিবেশন করে স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁরা হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয় লেখকের রচনার মধ্যে পাওয়া যায় সারল্য ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। লাকসনেসের এই, উপন্যাসে শিশু আলফ-গ্রীমের জীবনের ট্রাজেডি যেভাবে পরি-বেশিত হয়েছে তা অতি সহজে অন্তর স্পর্শ করে।

লাকসনেসের নায়ক বলছেন—

—"ব্রেককুকটের বসবার ঘরে যে প্রাচীন ঘড়িটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিক্‌টিক্ করে তার কথা বলে আমার গল্প শুরু করি। এই ঘড়িটার ভেতর একটা রূপার ঘণ্টা আছে, এই ঘণ্টার আওয়াজ শুধু যে সমস্ত ব্রেককুকটে শোনা যেত তা নয় গির্জাপ্রান্তে পর্যন্ত পৌঁছাত। গির্জায় আর একটি ঘড়ি ছিল, তার ঘণ্টাটি তামার। তার গভীর গম্ভীর সুর আমাদের কুটিরে এসে প্রতিধ্বনিত হত। তাই যখন হাওয়ার জোর থাকত তখন এই দুটি ঘণ্টার ধ্বনি একই

সঙ্গে সোনা যেত, একটি সুরের জাল অন্যটি তামার।"

এই ঘড়িটার কাছ থেকে শিশু আলফগ্রীম 'ইটারনিটি' বা অনন্তকালের কথা শোনে। তার মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ঘড়িটা তাই উপন্যাসে একটি প্রাসঙ্গিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঘড়ির প্রতীক অনন্তকাল নির্দেশ করছে। অনন্তকাল সম্পর্কে শিশুর মনে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে তার অর্থ সুগভীর।

আলফগ্রীম বলছেন—

আমাদের ঘড়িটার সামনেটা অলংকৃত। এই অলংকরণের ভেতর লেখা আছে এডিনবরার মিঃ জেমস কাউ আন ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই ঘড়িটা বানিয়েছেন। ঘড়িটার টিক্‌টিক্‌ আওয়াজ অতি ধীর এবং রাজসিক গতিতে ধ্বনিত হয়, অচিরাৎ আমার মনে একটা ধারণা জন্মাল যে আর কোনো ঘড়িকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্য নয়। আমি মনে মনে ভাবতাম এই ঘড়ির ভিতর একটি অদ্ভুত প্রাণী বিরাজ করে, তার নাম ইটারনিটি বা অনন্ত। আমার কেমন মনে হল টিক্‌টিক্‌ করার সময় যে আওয়াজ শোনা যায় তা হল চার অক্ষর-বিশিষ্ট— "ইট-আরণ-ইট-ই", "ইট-আরণ-ইট-ই" তখন কি জানি এ কথাটি কি? তখন কি জানতাম?

অনন্ত বস্তুটি যে কি তা জানার অনেক আগেই এইভাবে ইটারনিটি বা অনন্তকে আবিষ্কার করা নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যাপার। সব মানুষই মরণশীল—এই কথা জানার আগে আমি ইটারনিটি জেনেছি। যেন মাছ যে জলে সাঁতার কাটে সেই জলকেই সহসা সে আবিষ্কার করে বসেছে। পিতামহ একদিন যখন বসার ঘরে একা বসে তখন তাঁকে বললাম—ঘড়িটা কি বলে ইট-আরণ-ইট-ই, ইট-আরণ-ইট-ই, ইট-আরণ-ইট-ই?

পিতামহ বল্লেন—তুমি দেখছি নানারকম উদ্ভট চিন্তা করছ!

আমি বলি—তাহলে কি অনন্ত বলে কিছু নেই?

পিতামহ বল্লেন—না, রাতের বেলায় তোমার পিতামহীর প্রার্থনায় যা শোনো আর রবিবার আমার কাছে 'বুক অব সারমনসে' যা পাও ঐপর্যন্ত, বুঝলে খোকা?

আমি আবার প্রশ্ন করি—দাদু! আমাদের এই ঘড়ি ছাড়া আর কোনো ঘড়িকে কি গুরুত্ব দেওয়া যায়?

পিতামহ বল্লেন—না, আমাদের ঘড়িটাই ঠিক। তার কারণ আমি ঘড়িওলাদের ওটা হাত দিতে দিই না, এমন কোনো ঘড়িওলা দেখিনি যে এই ঘড়িটা বোঝে। নিজে না পারলে জানা কারিগর ডাকি, ওরা বেশ ভালো।"

বালক আলফগ্রীমের কাছে ঘড়ি অনন্ত রহস্যের সন্ধান এনেছে। তার মনে সৃষ্টি হয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা। পিতামহ আর পিতামহী নিয়ে তার মানসালোক গড়ে উঠেছে। পিতামহ মৎস্য-শিকারী। শুধু সরকারি ভদ্র সম্প্রদায় আর ব্যবসায়ীরা মাংস খেতেন, বাকী সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য মৎস্য। পিতামহ জীবিকার জন্য এই মৎস্য শিকার করাটাই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। একটা ঠেলাগাড়ি করে মাছ ফেরী করতেন, যা বিক্রী হত না তা শুটকী করে টাঙিয়ে রাখতেন। তিনি সৎ মানুষ, যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী নিতেন না, তার জন্য অন্য মৎস্য ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হত। তাঁর নিরন্তর নীরব উপস্থিতি বালক আলফগ্রীম অনুভব করে বিস্ময় বোধ করে। আর তার পিতামহী। আলফগ্রীম বলছেন যে মানুষের দেহের মধ্যে হৃদয় যতক্ষণ সুস্থ থাকে ততক্ষণ আমরা তার কথা চিন্তা করি না। কিন্তু হৃদয় বিকল হলে সব বিফল। পিতামহী ছিলেন এই সংসারের হৃদয়, তিনিই প্রাণকেন্দ্র, সকল কর্মের উৎস। অতি শীর্ণা, ক্ষীণা নারীর অন্তরে কি অনন্য সাধারণ দৃঢ়তা। লাকসনেস এই-ভাবে অতিসাধারণ জীবনকে অসামান্য বৈচিত্র্যে মাধুর্যমণ্ডিত করেছেন।

গ্রন্থটির আরো বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারলে তৃপ্তি হত কিন্তু স্থান সীমিত তাই এইখানেই এই মহাগ্রন্থের পরিচয় শেষ করতে হল।

—অভয়ঙ্কর

THE FISH CAN SING: By Haldor Laxness: Translated from Icelandic by Magnus Magnusson: Published by Methuen & Co: Ltd. London. Price 35 Shillings.

ভারতীয় সাহিত্য

বাংলা দেশে যখন আমরা তথাকথিত কিছু চটকদারী সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত, তখন ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে দুটি সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এক সময়ে সাহিত্য আন্দোলনের তীর্থভূমি ছিল এই বাংলা দেশ। কিন্তু, এখন যেন সেই অবস্থার অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এক ধরণের অগভীর অস্থিরতায় যেন আমরা আচ্ছন্ন। আমাদের সাহিত্যের অগ্রগতিও যেন এই কারণে অনেকটা ব্যাহত। যে দুটি সর্বভারতীয় সাহিত্য সভার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথমটি হচ্ছে ভারতীয় জ্ঞানপীঠের উদ্যোগে ২১-২২ ডিসেম্বর দিল্লীতে পি এন বি হলে। দ্বিতীয়টি হয়েছে পি ই এনের উদ্যোগে আমেদাবাদের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে গত ২৭-৩০ ডিসেম্বর। দিল্লীর সাহিত্যসভাটি হয় বার্ষিক জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার [illegible] ২২ ডিসেম্বর [illegible] বিকেল ৩—৫টা পর্যন্ত এই আলোচনা সভার প্রথম অধিবেশন বসে। এতে পৌরোহিত্য করেন ডঃ কে ভি পুট্টাপ্পা। শেষ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন শ্রীউমাশংকর যোশি। প্রখ্যাত হিন্দি ও অ-হিন্দি ভাষী লেখক এবং সমালোচকরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ডঃ ফারুকী, দিনকর, জগদীশচন্দ্র মাথুর, নীরদ চৌধুরী, ডঃ উত্তর সিং, শ্রীসীতারামাইয়া, শ্রীহরভজন সিং, জৈনেন্দ্রকুমার, ডঃ গোলাপ সিং, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, শ্রী কা-না সুব্রহ্মনিয়ম, শ্রীরমেশ থাপর, শ্রীনাথর সিং, শ্রীরঘুবীর সহায়, শ্রীশ্রীকান্ত বার্মা, ডঃ প্রভাকর মাচওয়ে, শ্রীগিরিজাকুমার মাথুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম অধিবেশনে মূল বিষয়ের প্রস্তাবনা করতে গিয়ে শ্রীনাথর সিং বিষয়টিকে চারটি অংশে বিশ্লেষণ করেন। (১) যন্ত্রবিরোধ, (২) যন্ত্রপূজা, (৩) ভাববোধ বিস্তারে যন্ত্রের প্রভাব, (৪) যন্ত্রের বর্জন। তিনি বলেন, ভাববোধ বিস্তারে যন্ত্র অপরিসীম সাহায্য করেছে। যন্ত্রযুগ [illegible] দিয়েছে মানবীয় চিন্তাধারা। ডঃ গোকাক এই অভিমতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন,—সাহিত্যের কাজ হল, জ্ঞানের ভিতরে ভাবের সঞ্চালন করা। ডঃ ফারুকি এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন—বিজ্ঞান আর কারিগরী বিদ্যার প্রসারই সাহিত্য, শিল্প, মানবতা, সব নষ্ট করেছে। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি উর্দু গজলের অনেক উদ্ধৃতি দেন। দিনকর সাহিত্যের উপর বিজ্ঞানের প্রভাবকে স্বাগত জানান এবং বলেন—নিউটন, ডারউইন, মার্কস, ফ্রয়েড প্রমুখ একে অন্যের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছেন। বিজ্ঞানের প্রভাবেই সাহিত্য গতিশীল হয়। ডঃ দেবরাজের অভিমত হল, বিজ্ঞান ক্রমাগত সমস্ত রহস্যের দুয়ার উন্মোচন করছে। অথচ সাহিত্যের ভিত্তি কল্পনাপ্রবণতা। বিজ্ঞান কল্পনার জগতকে করছে সীমাবদ্ধ। ডঃ পুট্টাপ্পা বলেন, বিজ্ঞান কোনদিনই কবির শেষতম সত্য জিজ্ঞাসার দুয়ার বন্ধ করতে পারবে না। শ্রীনীরদ চৌধুরী বলেন, কল্পনাশীল সাহিত্য রচনা যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন শ্রেষ্ঠ উপায় হল [illegible] সাহিত্যের [illegible]

নিয়ে সাহিত্য রচনা করা। শ্রীমধুবীর সহায়ের মতে আলোচ্য বিষয়টি হল রাজনৈতিক সমস্যা। শ্রীহরভজন সিং বলেন, বিজ্ঞান কখনই সাহিত্যিকের কল্পনা জগতের বিস্তার ঘটাতে পারে না। কল্পনার জগৎ ছিল আদিম সমাজ। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যিকের দৃষ্টির মূলত কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু শ্রী কা-না সুব্রহ্মনিয়ম বলেন—বিজ্ঞান ছাড়াই সাহিত্য রচনা হতে পারে। ডঃ বচ্চনের মতে, সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত হবার মাধ্যম। বিজ্ঞানের প্রভাবেই যেহেতু ব্যক্তি-মানুষ গঠিত, সুতরাং সাহিত্যেও তার প্রভাব অনিবার্য। শ্রীউমাশঙ্কর যোশি বলেন—সাহিত্য রচনা বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়, বিজ্ঞানকে নিয়েই করতে হবে। ব্যক্তি-মানুষ গঠনের পক্ষে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রভাব চিরকালই সমানভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মেলন অর্থাৎ পি ই এনের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীমন নারায়ণ। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকাকাসাহেব কালেলকার। ২৮ ডিসেম্বর সকালে সমকালীন সাহিত্যে আধুনিকতা বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমুল্করাজ আনন্দ। তিনি বিষয়টির প্রস্তাবনা করেন। শ্রীচন্দ্রকান্ত বক্সী, শ্রী এইচ এইচ আনুরা গাওদা এবং শ্রীগুলোবদার রুকার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় আলোচনা সভাটির বিষয় ছিল, ভারতীয় সাহিত্যে অনুবাদ। পৌরোহিত্য করেন শ্রীভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার। অংশ গ্রহণ করেন শ্রী এম এম জাভেরি, শ্রীদীলিপ চিত্রে ও শ্রীনিসিম ইজিকিয়েল। তৃতীয় আলোচনা সভার বিষয় ছিল, স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান দিকসমূহ। পৌরোহিত্য করেন শ্রীখুশবন্ত সিং। অসমীয়া ভাষায় ডঃ প্রফুল্ল-দত্ত গোস্বামী, বাংলার শ্রীগোপাল ভৌমিক, গুজরাটের ডঃ সুরেশ যোশি, হিন্দির ডঃ এস আর জয়সয়াল, ইংরেজির ডঃ কে আর শ্রীনিবাস রাও, কানাড়ার শ্রী জি ভি কুলকার্নি, মৈথিলির ডঃ জয়কান্ত মিশ্র, মালয়ালমের শ্রী এম গোবিন্দম, মারাঠির শ্রী কে বি যোশি, ওড়িশার শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র, পাঞ্জাবীর শ্রীমতী অমৃত প্রিতম, সংস্কৃতের শ্রী জি সি ঝালা, সিন্ধির শ্রীগোবিন্দ মালি, তামিলের শ্রী কে চন্দ্রশেখরণ, তেলুগুর শ্রীপত্তকুচি ও শ্রীসম্পাদির রাও অংশ গ্রহণ করেন। অধিকাংশ আলোচনাই তেমন উল্লেখ্য হয়নি। নাম ভারাক্রান্ত আলোচনাগুলিতে তেমন জানবার কিছু ছিল না। অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল। এর মধ্যে প্রথমেই শ্রীগোপাল ভৌমিকের নাম করতে হয়। তিনি তাঁর আলোচনায় বলেন—সাহিত্যের গতি ক্রমপ্রসারিত এবং এই কারণেই ঐতিহ্য সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সুদীর্ঘ দিনের। রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করেছেন। যাই হোক, দেখা গেল স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের প্রত্যাশা সার্থক হয়নি। বাংলা সাহিত্যে তাই দেখা গেল, সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব। শ্রীভৌমিক সুদীর্ঘ ভাষণে বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতির উপর আলোকপাত করেন।

রিচার্ড হিমেলের দি রিচ অ্যান্ড দি ড্যামনড উপন্যাসের কাহিনী কিছুটা বিচিত্র। তার নায়ক একজন আইনজীবী। কিন্তু তার আচার-ব্যবহার ভয়ংকর রকমের বিশ্রী। বার অ্যাসোসিয়েসনে বসে সে যে রকম আচরণ করে, তা যে কোন সভ্যদেশের পক্ষে লজ্জার বিষয়। তার পারিবারিক অবস্থাও তথৈবচ। সে এবং তার শত্রুরা সকলেই নিম্নশ্রেণীর মানুষ।

স্কট মিচওয়েলের দি ডাবল ব্ল্যাক উপন্যাসটিও প্রায় একই শ্রেণীর। নায়ক একজন স্বার্থপর মানুষ। তারও সমাজ-পরিবেশ ভয়ঙ্কর রকমের নোংরা। কুৎসিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। ঘরের মেঝেতে জমে ওঠে আবর্জনার পাহাড়। অথচ অভিজাতদের সমাজে তার যাতায়াত চলে অবলীলায়।

অবিভক্ত জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আর্নল্ড জুইগ সম্প্রতি মারা গেছেন পূর্ব বার্লিনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একাশি বছর। মানবজীবনের ওপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি মোট বিয়াল্লিশটি গল্প-উপন্যাস ও নাটকের বই লেখেন। দীর্ঘকাল অসুখে ভুগেছিলেন মৃত্যুর আগে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈনিক হিসেবে কাজ করেন। সেই সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত উপন্যাস 'দি কেস অব সার্জেন্ট গ্রিসচা' উপন্যাসে। তারপর দীর্ঘ পনের বছর তিনি প্যালেস্টাইনে কাটান। সেই সময়ে লেখেন জার্মান কূটনীতির ওপর 'দি ক্রাউনিং অব এ কিং' নামে উপন্যাসটি। 'দি এক্স অব ওয়ানডসবেক' উপন্যাসে তুলে ধরেন নাজী জার্মানীর নিখুঁত ছবি। জার্মানীর দ্বিধাবিভক্ত হলে ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব জার্মানীতে ফিরে যান। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেখানকার সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম মধ্যমণি।

মার্কিনী নাট্যকার ও'নীলের দ্বিতীয়া পত্নী অ্যাগনেস বোল্টন কাফম্যান মারা গেছেন পরিণত বয়সে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর। বেশ কিছুকাল ধরেই তিনি ভুগছিলেন। দীর্ঘ এগার বছর বিবাহিত জীবন কাটাবার পর ও'নীল তাঁকে ডিভোর্স করে অন্য একজন ভদ্রমহিলাকে জীবনসঙ্গিনী করেন। অ্যাগনেস বোল্টন তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—সেটি হলো 'দীর্ঘ কাহিনীর একটি অংশ......।' যাই হোক, তাদের জীবন সুখের হয়নি। কেননা, ও'নীল চেয়েছিলেন এমন একজন মহিলা যিনি একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, মা, প্রেমিকা, গৃহিণী ও তত্ত্বাবধায়িকা হবে। সমালোচকের ভাষায়, 'তাঁদের জীবন ছিল রেফ্রিজারেটারের ভিতর একটি যুদ্ধ দৃশ্যের মতো।'

'লাইফ' পত্রিকার অন্যতম প্রাক্তন সম্পাদক উইলিয়াম লংওয়েল সম্প্রতি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল উনসত্তর বছর। তাঁরই চেষ্টায় ও উৎসাহে 'লাইফ' পত্রিকা প্রথম বেরোয়। জনরুচির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল মানুষ। কি ধরণের ছবি ও লেখা দিলে পত্রিকা ভালোভাবে চলে—তা তিনি জানতেন। প্রথম দিকে এর বিক্রয় সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। এখন সেই পত্রিকাই চল্লিশ লক্ষের ওপর বিক্রি হয়ে থাকে। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত লাইফ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

নাউকা প্রেসের পূর্বাঞ্চল সাহিত্যবিভাগ সম্প্রতি একটি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করেছেন। চতুর্থ শতকের প্রখ্যাত চীনা কবি তাও যুয়ান-মিং (৩৬৫-৪২৭)-এর কবিতা কাব্য-বৈশিষ্ট্যের ওপর লিখেছেন লিও ইউলিন। এর আগেও রাশিয়া থেকে তাও-র রচনাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ বেরিয়েছে। যেমন—তার কয়েকটি বইয়ের নাম হলো, 'পীচ ব্লোজম ফাউন্টেন' 'রিটার্নিং হোম' 'দি মাস্টার অব দি ফাইভ উইলোজ' এবং 'ওড টু বিউটি'। লিও ইউলিন' বইটি লেখার আগে বহু বছর গবেষণা করেন। তিনি চু য়ুয়েন, মেং হাও-জ্যাং, লি পো, এবং লি সেন প্রমুখ বহু চীনা কবির কবিতাও অনুবাদ করেছেন।

রবার্ট হায়মেনের লেখা 'এ হিস্টরি অব জার্মানী' বইটিতে আছে আদিযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত জার্মানীর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। বিভিন্ন সময়ের বহু মূল্যবান ছবি ও মানচিত্রে বইটি আকর্ষণীয়। মাত্র কয়েক বছর আগে জার্মানী দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। হয়তো আর কুড়ি বছর পরে একত্র হতে পারবে না—এর চেয়ে

কেমন হবে। বিশেষ করে যারা দেশভাগের পরে জার্মানীতে জন্মালো—তাদের কাছে অতীতদিনের ইতিহাস একটি স্বপ্নের মতো অলৌকিক ঘটনা মনে হবে।

তরুণ আমেরিকান কবিদের মধ্যে জেমস টেটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কবিতায় পাওয়া যায় একটি স্বচ্ছন্দ, সরল এবং মৌলিক চিন্তার খোরাক। 'দি লস্ট পাইলট' নামে তাঁর একটি কবিতার বই বেরিয়েছে কিছুকাল আগে। খুব ছোট ছোট পংক্তিতে তিনি কবিতা লেখেন। সর্বপ্রকার আতিশয্যের তিনি বিরোধী। দ্রুত সুরে বলা করেন অসাধারণ কাব্যিক তাৎপর্য। তাঁর কবিতায় অনেকসময় নাটকীয়তার আমেজ পাওয়া যায়। হালকা সুরের কবিতায়ও তিনি সবচাইতে গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করতে পারেন। এই কাব্য-গ্রন্থের বহু কবিতায় বিদ্রূপের মধ্যে কোমলতা এবং কোমলতার মধ্যে পরিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

খেলাধুলো নিয়ে নানারকম বই বেরুচ্ছে আজকাল—রম্যরচনা, গল্প-উপন্যাসও বাদ যাচ্ছে না। সিরিয়স আলোচনার বই তো আছেই। জর্জ প্লিম্পটন লিখেছেন 'দি বগিম্যান' নামে একটি বই। তিনি নিজেও এককালে খেলোয়াড় ছিলেন। সেজন্যেই খেলাজগতের বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনার কথা তিনি জানেন ভালোভাবেই। এই গ্রন্থে তার হাস্যরসাপ্রিত বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆বইপাড়ায়◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

বইপাড়ায় মেলা বসে গেছে। ভিড়ে পথ চলা দায়। ফুটপাথে তিলেক স্থান নেই। পুস্তক-প্রদর্শনী চলছে সর্বত্র। তবে তা অ-আ-ক-খ শিখি', 'ছড়ায় ছবি' বা ইতিহাস-ভূগোল, নৈব নৈব চ উপন্যাস-গল্প বা ওই জাতীয় বই। এক দোকানে দীর্ঘ লাইন দেখে জনৈক তরুণ সাহিত্যিক বন্ধু বললেন, 'বা! বইয়ের বাজার দেখি দিব্যি জমে উঠেছে, এই যে শুনি—' তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বলি, 'ঠিকই শোনেন, মন্দা! এ ভিড় দেখে পুলকিত হবার কারণ নেই। স্কুল বই-এর লাইন।' বইপাড়ায় যাদের নিয়মিত গতায়াত তাদের কাছে তথ্যটি অজানা নয়। তবে তরুণ বন্ধুটি শহর-তলীর বাসিন্দা। এবং তাঁর দৌড় অফিস-পাড়া আর দু-চারটি পত্রিকা-অফিস পর্যন্ত। তা না হলে তাঁর মুখ থেকে এমন আক্ষেপ বাক্যও? নিঃসৃত হত না, 'আহা, এ ভিড় যদি গল্প-উপন্যাসের জন্যে হতো—তাহলে কলম পিষে আমাদের কিছু রোজগারের আশা থাকত।' তরুণ বন্ধুটির আক্ষেপের উত্তরে বলতে হল, 'ছিল, এমন দিনও এ পাড়ায় ছিল, যখন র‍্যাশন করে বই বিক্রি করতে হতো।' বন্ধুর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে কথাটার ব্যাখ্যা করি। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'অবিশ্বাস্য' বই যখন বেরোয় খদ্দেরের চাহিদা মেটাতে প্রকাশক হিমসিম খেয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে র‍্যাশন করতে হয়েছিল। যার চাহিদা বিশখানের, তাকে দেওয়া হল ৫ খানা। র‍্যাশন করেও নয় দিনে প্রথম মুদ্রণ শেষ। আরও দু-চারজন লেখকের ভাগ্যে এই ধরনের সৌভাগ্য জুটেছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেদিন। আজকাল নামী নামী লেখকের বইও বছরে একটা সংস্করণ বিক্রি হতে চায় না। অথচ মনোজ বসুর ভুলি নাই বইটির তেত্রিশটি সংস্করণ হয়েছে। একটি বিশিষ্ট প্রকাশক সংস্থার কর্ণধার আক্ষেপ করে সেদিন বললেন, 'গল্প-উপন্যাসের বাজারের দিন দিন যা হাল হয়ে আসছে 'ধুকি-বা সেই পুরনো দিনে ফিরে যেতে হয়। হাজারের সংস্করণ আর বেশী দিন রাখা যাবে না।' আজ গল্প-উপন্যাসের বই পরিচয় এডিশন বা সংস্করণ হবে।

সরকার লাইব্রেরীগুলোকে বই কেনার জন্য বছরে কিছু টাকা দেয়। আগে টাকার পরিমাণ বেশীই ছিল। গত কয়েক বছরে তা অনেক কমে গেছে। বইয়ের বাজারের মন্দার অন্যতম কারণ তাই। ওই যা-কিছু বেচাকেনা সেই সময়ই। লাইব্রেরীগুলো বই কিনতে শুরু করলে বাজার একটু উঠবে। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে গল্প-উপন্যাসের বাজার উঠবে। প্রকাশকদের সে-ই যা ভরসা।

প্রকাশকদের মধ্যে হালে আর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিরাট আকারের বই ছাপার দিকেই তাঁদের বেশী ঝোঁক। এই ধরনের বই না হলে প্রকাশক-বিক্রেতা কারুরই বিশেষ-কিছু থাকে না। বিশেষ করে বিক্রেতাদের বড় বই বিক্রির ওপর ঝোঁকটা বেশী। তাই দামী দামী বই বের করার প্রবণতাটা দিন দিন প্রকাশক মহলে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'অচিন্ত্য-গ্রন্থাবলী' (প্রথম খণ্ড) বেরিয়েছে। দাম আঠারো টাকা। এই খণ্ডে আছে কল্লোল যুগের লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের চারটি বিখ্যাত উপন্যাস 'বেদে', 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', 'প্রচ্ছদপট' ও 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'। চারটি উপন্যাসই বিষয়বস্তু ও লিখন রীতিতে অমূল্য সাহিত্যকৃতি। 'বেদে' উপন্যাসটি সম্পর্কে এক সময় অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে-ছিলেন। 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' লেখকের আরও দুঃসাহসিক উপন্যাস। অশ্লীলতার অভিযোগে সরকার এই বই বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিল। পাকাপাকি ঘর না বেঁধেও সাময়িক সাহচর্যে প্রেমের বাসর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। লেখক এই উপন্যাসে তাই দেখিয়েছেন। 'প্রচ্ছদপট' লেখকের শিল্পী-কুশলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাধারণ গ্রামের মানুষের প্রেম-কাহিনীর আর-এক 'শেষের কবিতা' তাঁর 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'। আধুনিক বাংলা উপন্যাস ধারার পরিচয় লাভের জন্যও গ্রন্থটির প্রয়োজ-নীয়তা অনস্বীকার্য।

'আমি সুভাষ বলছি' বইটির দাম পনেরো টাকা। লেখক শৈলেশ দে। লেখক সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবন এবং সেই সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের নানান কথা তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। তিনি নতুন তথ্য সামান্যই পরিবেশন করেছেন। জানা তথ্য আছে অনেক। শুধু লেখনীর গুণে রূপে আর স্বাদে নতুন হয়ে উঠেছে সেকথা। তথ্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে, নেতাজী এবং বিপ্লবীদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই লেখক ঘটনাবলী উপস্থাপনা করেছেন। বইটি নেতাজী এবং বিপ্লববাদের নিরস ইতিহাস নয়। বরং বলা যায়, সত্য ঘটনার ভিত্তিতে রচিত এটি একটি অনন্য সাহিত্য-সৃষ্টি। বইটির আর-একটি সম্পদ, ছবি। এতে বিপ্লবীদের ৬৮ খানা দুষ্প্রাপ্য ছবি রয়েছে।

অমরেন্দ্র ঘোষের 'মহাজীবন' এমনি একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটির দাম আঠারো টাকা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগ্নী নিবেদিতা এবং মীরা-বাঈ-এর জীবনী লেখক মনোজ্ঞ ভাষায় এবং সুন্দর ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য মীরাবাঈ অংশ। এতে মীরাবাঈ-এর ভজনগুলো দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য তার বঙ্গানুবাদও লেখক করে দিয়েছেন। তাছাড়া আছে মীরাবাঈ-এর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি। সত্যি বলতে কি, বইয়ে মীরাবাঈ-এর অংশটুকু সবচেয়ে সুন্দর ও তথ্যনির্ভর হয়েছে।

(৩) [illegible]

ভীম দত্তর পিঙ্গল চোখের মণি কনীনিকাগুলো যেন অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল।

তারপর গাম্ভীর্যের মেঘ সরিয়ে বিগড়ে হাসি হাসলেন। বললেন—"আমার জীবন গান্ধীজীর জীবন নয়। রহস্য সেখানে কিছুটা থাকবেই। তবে ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে। তাই মুঠি ভরে ধূলো তুলে দেখেছি ধুলো কখন সোনা হয়ে গেছে।"

শর্মিষ্ঠা চুপ করে রইল।

ভীম দত্ত আবার গম্ভীর হলেন। বললেন—"অনেক কথা আপনাকে বললাম। বলার দরকার ছিল। না বললে আমার বিজয়োল্লাস সম্পূর্ণ হত না।"

শর্মিষ্ঠা তবুও চুপ করে রইল।

খেমচাঁদ ঘরে ঢুকলেন। হাতে নেকলেস বিক্রির দলিল। টেবিলে কাগজটা রেখে বললেন—"নিন, মিস্টার দত্ত, সই করুন। থ্যাংকিউ।"

'আমার টেলিগ্রাম পাবেন,' কলম পকেটে রেখে বললেন ভীম দত্ত। "মনে থাকে যেন, ডেলিভারী বোম্বাইতে, আর কোথাও নয়। আচ্ছা আসি, নমস্কার।'

শর্মিষ্ঠার দিকে ফিরলেন ভীম দত্ত। চেয়ে রইলেন।

অদ্রীশ বর্ধন

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আর প্রবীণ জহুরী। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তাঁরই দোকানে বেচতে এসেছেন অনন্ত স্মৃতি জড়ানো স্রাজিল থেকে আনা রত্নখচিত কণ্ঠহার। কিনবেন একালেরই বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। ছাঁয়ের দাম উঠল সোয়া সাত লাখ টাকা। সকলেই এক স্মৃতি-লোকের আরোহী। ভীম দত্ত এক সময় আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন শর্মিষ্ঠাকে। সে-ও চল্লিশ বছর আগের কথা।]

শর্মিষ্ঠা উঠে দাঁড়াল। ঝলমলিয়ে ঝলমলিয়ে হাসল। ভাঙা গালে টোল পড়েছে যেন। বলল—"এবার কিন্তু আপনাকে আর অর্থপিশাচের বলে মনে হচ্ছে না। তাই শুধু চোখ দিয়ে না দেখে, মন দিয়েও দেখছি।"

'বলুনতো কি দেখছেন?'

'দেখছি এক প্রচণ্ড অভিমানী মানুষকে। দম্ভ তাঁর সীমাহীন। কিন্তু ভাল লাগে তাঁর ব্যক্তিত্ব। ভাল লাগে তাঁর মনের জোর।'

"ধন্যবাদ। কথাগুলো আমার মনে থাকবে। চললাম।'

বেরিয়ে গেলেন ভীম দত্ত।

চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন খেমচাঁদ। ক্লান্তকণ্ঠে বললেন—"কিরকম দেখলে শর্মিষ্ঠা।'

'তোমার সামনেই তো বললাম।'

এঁরই নাম ভীম দত্ত। তোপের মুখে উড়িয়ে দেবার মত অবস্থা করেন সবার। আমি তো কোন ছার। ভেবেছিলাম, দাঁও মারা যাবে। কিন্তু ভীম দত্তকে ঠেকা মারা যায় না। উনি জিতবেনই।'

"হ্যাঁ, উনি জিতবেনই।" প্রতিধ্বনি করল শর্মিষ্ঠা।

ভুরু কুঁচকোলেন খেমচাঁদ। 'গলাটা যেন কিরকম কিরকম লাগছে? নেকলেস-শোক নাকি?'

"না, না," কাষ্ঠহাসি হাসল শর্মিষ্ঠা "এমনি। এরকম অদ্ভুত মানুষ কখনো দেখিনি তো, তাই।'

"কালকে আমার গুণধর পুত্রটিকে বলেছিলাম, আজ ভীম দত্ত আসতে পারেন। শুনে ও কি বলল জানো?'

"কি?"

'বাঘা রিপোর্টাররাও ভীমদৈত্যকে কব্জায় আনতে পারে না। সুতরাং সাধু সাবধান!'

'ভীম দৈত্য!'

'তাইতো বলল শ্রীমান!'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল শর্মিষ্ঠা—'দৈত্যই বটে! উচিত নাম দিয়েছে রিপোর্টাররা।'

"যাক সেকথা। শেয়ালের মত সেয়ানা দীপেন নন্দীর সামনে যে কথাটা চাপা রেখেছিলাম, এবার সেটা বলো।"

'কি কথা?'

'নেকলেসটা কে আনছে?'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

'সে আবার কে?"

"ডিটেকটিভ।"

"বটে, বটে! সখের নিশ্চয়?"

"সখের গোয়েন্দাগিরি যাদ্দাতার আমলে ছিল। আজকালকার প্রাইভেট ডিটেকটিভরা রেগুলার ব্যবসা করে।'

'করুক। তা এই গিরগিটটিকে কোত্থেকে জোটালে?"

'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। আপদে বিপদে তাই এগিয়ে দিয়ে পড়ে।'

"সে রকম লোক অবশ্য আজকাল বিরল। যাই হোক, তোমার এই ইন্দ্রনাথ রুদ্রাক্ষ কবে আসছেন, কখন আসছেন, কিভাবে আসছেন?"

'রুদ্রাক্ষ নয়, রুদ্র। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। বাকি তিনটে প্রশ্নের উত্তর কাল পরশু দেব। টেলিগ্রাম পেলেই।"

'বিশ্বাসী লোক তো?'

"আমাকেও অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু ইন্দ্রনাথকে পারি না। ও ছেলে অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। দেখলেই বুঝবে।"

'অ।'

ঘটাং করে দরজা খুলে গেল। দোর-গোড়ায় আবির্ভূত হল এক তরুণ। সুপুরুষ। সুদেহী। চোখদুটি যেন সদাই হাসছে। যেন, এই মুহূর্তে আনন্দে নেচে উঠে হেসে গড়িয়ে পড়তে পারে দুচোখের তারা।

এক মাথা স্যাম্পু-করা চুল। ঢেউ খেলানো। বিটল-কায়দায় চুল দিয়ে আধখানা কপাল ঢাকা। রিংগোস্টারের মত ইয়া-লম্বা জুলপি। নবনীত কোমল মুখশ্রী। চোখ-মুখ-চেহারার মধ্যে গ্রীক-গ্রীক ভাব। যেন একটা নিখুঁত প্রস্তরমূর্তি। চোদ্দ ইঞ্চি ঘেরের টাইট ট্রাউজার্স। উলের পুলওভার।

ঠোঁটের কোণে গুপ্তহাসিটি বড়ই কৌতুকময়। এই হাসি দেখেই এইমাত্র দিবা-স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সামনের চেম্বারের মিস আইভি লাহা।

পায়ের তলায় যেন স্প্রিং আছে, ঠিক এমনিভাবে ঝট করে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল তরুণ। বলল সোল্লাসে। 'ডাডি, খুব দেরি করলাম না তো? সরি, চিনি-চিনি মনে হচ্ছে?'

প্রশংসা-উপচোনো চোখে তাকিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল—'নটি বয়! এত তাড়াতাড়ি ভুললে চলবে কেন? মাহাজারের জঙ্গলে পাখী মারতে গিয়ে কার বাংলোয় উঠেছিলি? অত মুর্গি খাওয়ালাম, এর মধ্যে ভুলে গেলি?'

"ও মাই গড আণ্টি," লাফিয়ে এসে শর্মিষ্ঠার গলা জড়িয়ে ধরল তরুণ। কিন্তু তোমার অত চুল পাকলো কেন?'

'পাজী ছেলে! আণ্টির বয়স কি কম হল?"

"তা অবশ্য ঠিক। আজকাল তো কুড়িতেই বুড়িয়ে যাচ্ছে মেয়েরা। মাথার চুলেও পাক ধরেছে।"

"অখণ্ড," তরলকণ্ঠে বলল শর্মিষ্ঠা। "গার্লফ্রেণ্ডের সংখ্যা খুব বাড়িয়ে ফেলেছিস মনে হচ্ছে!'

বাপের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে চোখ গিলল অখণ্ডনারায়ণ।

বলল—"কি যে বলো। কবে ফিরছ? চলো, এবার গিয়ে কিছু হরিণ-টরিণ মারি।'

'হরিণ শিকার ছেড়ে এবার একটা হরিণী শিকার কর, অখণ্ড। উড়ে উড়ে কদ্দিন বেড়াবি?

'দি সেম ওল্ড স্টোরি। বিবাহ নামক কুসংস্কারের বন্ধন।'

"হতভাগা। বিয়ে যদি কুসংস্কার হয়তো হোক। মধুমক্ষিকার চাইতে ভাল।"

অট্টহাস্য করে উঠল অখণ্ডনারায়ণ "ওসব সেকেলে থিওরী আমি মানি না। তাছাড়া, বিয়ের আগে মেয়েগুলোকে যেরকম পরী-পরী মনে হয়, বিয়ের পরেই দেখি তারা কিরকম গিন্নী-গিন্নী হয়ে যায়। ধুৎ, ভাল্লাগে না!"

"বাঁদর ছেলে। শোরুমে সাহানা দত্তকে দেখালি?"

"কদিন ধরেই দেখছি। শহর তো চষে ফেললেন ভদ্রমহিলা। পার্টি, হোটেল আর পিকনিক মানেই এখন সাহানা দত্ত।"

"আই সী! তোর ঐ মাকামারা হাসিটা দেখে ফেলেনি তো?"

'দেখলেই বা কি! ও মেয়ের সঙ্গে আইসবার্গের তফাৎ কোথায়? একটা সচল হিমবাহ! কাছে এলেই গা কনকন করে।'

"শর্মিষ্ঠা, ভীম দত্ত যাবার সময়ে নেকলেসটা কোথায় ডেলিভারী দিতে বলে গেলেন মনে আছে?"

"কেন থাকবে না? বোম্বাইতে।"

"মেয়ে আর সেক্রেটারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বারবার তিনি একই কথা বলেছেন। নেকলেস যেন মরুভূমিতে ডেলিভারী না দিয়ে বোম্বাইতে দেওয়া হয়।"

"ঠিক কথা। কিছু বিভ্রাট ঘটেছে নাকি?"

"কিরকম যেন গোলমাল লাগছে। আজ সকালে ট্রাঙ্ক কল এল রাজস্থান থেকে।"

"ভীম দত্ত?"

"হ্যাঁ। বললেন, উনি মত পালটেছেন। নেকলেস বোম্বাইতে ডেলিভারী দেওয়ার দরকার নেই। মরুভূমির বাংলোয় দিলেই চলবে।"

"সে কী?"

"আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কিন্তু বারবার বলে গেছেন বোম্বাইতে ডেলিভারী দিতে। বলতেই ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন মনে হল। খেঁকিয়ে উঠে বললেন, বলেছি তো হয়েছে কি? এখন যা বলছি তাই শুনুন।"

"তাহলে তাই করো।"

"উঁহু। আমার কেন জানি সন্দেহ হল। মনে হল যেন ভীম দত্ত নয়, অন্য কেউ। তাই সাবধানের মার নেই জেনে ফোন করলাম রাজস্থানে। অনেক কষ্টে টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করলাম আমার এক কারবারী বন্ধুর কাছ থেকে। পি-পি ট্রাঙ্ক কল বুক করলাম। লাইনে ভীম দত্ত আসতেই বললাম একটু আগে টেলিফোনের ব্যাপার। জোচ্চুরি অনেকরকমের হয় তো, তাই যাচাই করার জন্যে—"

"কি বললেন উনি?" সাগ্রহে প্রশ্ন করে শর্মিষ্ঠা।

"হাসতে লাগলেন। তারিফ করলেন হুঁশিয়ারির জন্যে। ফোনটা উনিই করেছিলেন। নেকলেস মরুভূমিতে বসেই পেতে চান।"

"তাহলে তো চুকেই গেল। ভীম দত্ত নিজেই যদি ফোন করেন, তাহলে তো আর মিসট্রি থাকছে না।"

চুপ করে রইলেন খেমচাঁদ। মুচকি হেসে মরিচি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শর্মিষ্ঠা বলল—"প্রাণিমুক্তো ঘেঁটে ঘেঁটে তুমি সন্দেহবাতিক হয়ে উঠেছো।"

মুখ তুললেন খেমচাঁদ। মৃদু কণ্ঠে বললেন—"হয়ত তাই। কিন্তু বহুবার বহু টাকাপো বিল কেস থেকে বেঁচেছি এই প্রিমনিশনের জন্য। ঠিক বলে বোঝাতে পারব না...তবে ভীম দত্তকে আমি চিনি তো ...ওঁর সিদ্ধান্ত বড় একটা পাল্টায় না... ভয়ঙ্কর জেদী...এখানে যা বলে গেলেন, সেটা জেদের বশেই বলেছিলেন। তাই এখন উল্টো কথা শুনে অস্বস্তি লাগছে।"

"কারণ থাকলে মত পালটাবেন না?"

"কারণটা অবশ্য খুলে বললেন না। শুধু বললেন, এসব দামি জিনিসের কেনাবেচা মরুভূমির মত নির্জন জায়গাতেই হওয়া ভাল। আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে নাকি। তাই উনি বোম্বাইয়ের বদলে মরুভূমিতেই নেকলেস চান। শেষের দিকে হুকুমটা মিলিটারী হুকুমের মত শোনালো।"

মরিচি আবার ঘরে ঢুকল।

"কাকাবাবু কি এখনো মনস্থির করতে পারেন নি?" চোখেমুখে তার কৌতুকের হাসি।

হাসি দেখে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল খেমচাঁদের। মুখে বললেন—"নেকলেস আগে হাতে আসুক।"

"দার্জিলিং মেল পৌঁছোলো কিনা টেলিফোন করে দেখা যাক," বলে উঠে গেল মরিচি। ডায়াল করল। "হ্যালো...শিয়ালদা এনকোয়ারী?...দার্জিলিং মেল লেট নাকি? ...কি বললেন? ...পৌঁছে গেছে?... এক ঘণ্টা আগে?... সেকি মশায়!... থ্যাংকিউ।"

রিসিভার নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মরিচি।

বিস্মিত কণ্ঠে খেমচাঁদ বললেন—"এক-ঘণ্টা আগে গাড়ী এসেছে! অথচ এখনো এল না কেন?"

"ট্র্যাফিকের ভীড়ের জন্যে নিশ্চয় শিয়ালদা থেকে মৌলালী আসতেই একঘণ্টা লাগে এ সময়ে," বলল মরিচি বিজ্ঞের মত।

শর্মিষ্ঠা বলল—"ভীম দত্ত যখন নেকলেস হাতে পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছেন, তখন চটপট ডেলিভারী দিয়ে দেওয়াই ভাল।"

"কিন্তু—"

"কিন্তুর কিছু নেই। আমার টাকার দরকার, তাঁর নেকলেস দরকার। শুভ কাজে বিলম্ব না করাই ভাল।"

'শুভ কি অশুভ, তা কে জানছে?'

মরিচি আবার গা-জ্বলানো হাসি হেসে বলল—"এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন কাকাবাবু? নেকলেস দেব, রসিদ নেবো। এক-মাসের মধ্যেই চেক পাবো। রসিদ না দিলে নেকলেসও দেবো না। এতো সোজা হিসেব। তাই না, মা?"

ছেলের বিজ্ঞতায় গর্বের হাসি হাসল শর্মিষ্ঠা। খেমচাঁদও হাসলেন। তবে হাসিটা অন্যধরনের মনে হল।

বললেন—"ধরো, নেকলেস দেওয়ার সময়ে যদি একটা গোলমাল লাগে? মরুভূমি এমনিতেই খাঁ-খাঁ করে। খাস কলকাতায় দিনের আলোয় রাহাজানি আজকাল আকছার হচ্ছে। বন্দুক-পিস্তল নিয়ে দাঙ্গাবাজদের কোনো দল যদি হামা দেয় ভীম দত্তর বাংলাতে, যদি মারপিট করে কেড়ে নিয়ে যায় নেকলেস, যদি গিয়ে দেখা যায় বাংলোয় ভীম দত্ত নেই—রয়েছে খুনে গুণ্ডাদের একটা দল—"

অকস্মাৎ দাঁড়কাকের ডাক শোনা গেল। চমকে উঠলেন খেমচাঁদ। দেখলেন মরিচি হাসছে।

খেমচাঁদের শীতল চাহনি দেখেই দাঁড়-কাক-কাকলি থামিয়ে মরিচি বলল—"কাকাবাবু বুঝি সাংঘোপাঙ্গার রোমাঞ্চ কাহিনী পড়েন?"

মনে মনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেও মুখে কিছু বললেন না খেমচাঁদ।

শর্মিষ্ঠা বললে—"তুমি বরং কাউকে দিয়ে রাজস্থানেই পাঠিয়ে দাও নেকলেস।"

"যথা অভিরুচি। অখণ্ডকেই পাঠাবো ভেবেছি।"

"তাহলে তো কথাই নেই।"

"কিন্তু একলা নয়। সঙ্গে আর একজন যাবে।"

"মরিচি যাক।"

"না," অজান্তেই স্বর কঠিন হয়ে ওঠে খেমচাঁদের।

"তবে কে?"

"নেকলেস যে আনছে, সে।"

"ইন্দ্রনাথ রুদ্র?"

"হ্যাঁ। রুদ্রজটার আভাস যেখানে পাচ্ছি, রুদ্রাক্ষকে সেখানেই দরকার।"

"মন্দ বলোনি। ইন্দ্রনাথকে আমি বললে রাজী হবে।"

"কিন্তু এখনো পর্যন্ত তো টিকি দেখা গেল না তোমার প্রাইভেট ডিটেক-টিভের। হল কী?"

প্রশ্নের জবাবেই যেন ঝনঝন করে বেজে উঠল ঘরের টেলিফোন।

শর্মিষ্ঠা রিসিভার তুলল।

"কে? হ্যাঁ, আমিই শর্মিষ্ঠা বর্মা...... ইন্দ্রনাথ বলছ?... গুড... ভেরি গুড... চিন্তায় ফেলেছিলে...একা এসেছো?...... স্টেশনে রিসিভ করতে কেউ যায়নি?...... সেকী কথা!... ওপরে চলে এসো... তিন-তলায় দুশ এগারো নম্বর সুট...।"

রিসিভার নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শর্মিষ্ঠা।

বলল—"ইন্দ্রনাথ রুদ্র আসছে। একা।"

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল খেমচাঁদের মুখ।

"একা! অখণ্ড কোথায়?"

বলতে বলতে অবশ দেহে বসে পড়লেন সোফায়। (ক্রমশঃ)

(পরের সংখ্যায়—কেউ-রহস্য)

...ষ্ট হয়েছিল বৃটেন ও তার সাম্রাজ্যের ...ন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পুরানো ...র্বের বন্ধুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক ...সংসার মাধ্যমে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে ...ন বলেন যে, কমনওয়েলথ হচ্ছে বিশ্ব-...জের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিশ্ব আজ ...সব সমস্যার দ্বারা পীড়িত সে-সব ...স্যাই কমনওয়েলথের মধ্যে আছে। ...মা আছে, উত্তেজনা আছে, বিপুল সব ...স্যা আছে। এগুলি থেকে দূরে সরে ...য়া উচিত নয়।

তাঁর মতে পৃথিবীতে বহু বিভেদাত্মক ... কাজ করছে, কিন্তু কমনওয়েলথ ...রানো ও নতুন ক্ষত সারিয়ে তোলার ...পারে প্রভাব খাটিয়ে গুরুত্ব অর্জন ...রছে!

যেহেতু শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, কমন-...য়েলথের মধ্যে কোনো বৃহৎ শক্তি নেই ...ই জন্যে তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ...ৎ শক্তিগুলির স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেই কার্যকর হয়ে উঠতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনলে মনে হবে ...নওয়েলথকে তিনি একটি রাজনৈতিক ...ষ্টিভঙ্গী থেকেই দেখতে চান। তাঁর ...রণা এই সমস্যা-সঙ্কুল পৃথিবীতে ...মনওয়েলথ একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবে ...ড়ে উঠে বিশ্ব সমস্যার সমাধানে সাহায্য ...রতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যেই কমন-...য়েলথকে টিঁকিয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী মনে রাখেন নি ...তৃতীয় শক্তি হিসেবে কমনওয়েলথ কোনো ...নই গড়ে উঠতে পারে নি, এবং তাকে ...ইভাবে গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ...মস্ত ধারণা তাঁর পিতার আমলেই ...রিত্যক্ত হয়েছিল। এমন কি কমনওয়েলথ-...র বাইরে ভারত যে একটি জোটনিরপেক্ষ ...ক্ষশক্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিল তা-ও ...আজ বিলুপ্তপ্রায়। তাছাড়া গোটা রাষ্ট্র-...ঙ্ঘই যেখানে বিশ্বসংঘর্ষের অসহায় দর্শক ...সখানে কমনওয়েলথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ...রতে পারবে তেমন আশা করা দুরাশা।

তার ওপর প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যও ...ান্তিমূলক। কমনওয়েলথের মধ্যে কোনো ...হৎ শক্তি নেই একথা ঠিক, কিন্তু বৃহৎ ...ক্তিরূপে চিহ্নিত হবার অভিলাষী বৃটেন ...য়েছে, এবং বৃটেনের রাজনৈতিক গাঁটছড়া ...পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে ...াঁধা, বিশেষত তার অর্থনীতির দৈন্যদশার ...য়। এই বৃটেন হচ্ছে কমনওয়েলথের ...র্ণধার। সুতরাং এই কমনওয়েলথের ...ক্ষে তৃতীয় শক্তি হিসেবে কতখানি ...ার্যকর হওয়া সম্ভব?

কমনওয়েলথের মধ্যে যে-সব দ্বন্দ্ব-...বিরুদ্ধ কাজ হয়ে চলেছে, প্রধানমন্ত্রী ...লেছেন ভারত সেগুলির মোকাবিলা সার্ব-...ভৌম রাষ্ট্র হিসেবে নিজেই করবে। সে-তো ...্রত্যেক রাষ্ট্র সব সময়েই করতে পারে। ...াহলে কমনওয়েলথে থাকার সার্থকতা কি? ...একদিকে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ...রাজনীতিকে প্রভাবিত করার কোনো ...ক্ষমতাই কমনওয়েলথের নেই। অপরদিকে রীতি অনুসারে কোনো দ্বিপাক্ষিক বিরোধও প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিত হতে পারে না। তাহলে কমনওয়েলথ কিম্বা তার বার্ষিক প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের অনুষ্ঠান কি উদ্দেশ্য সাধন করছে?

শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, কমনওয়েলথ পুরানো ও নতুন ক্ষত সারিয়ে তোলার ব্যাপারে প্রভাব খাটিয়ে গুরুত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভিয়েৎ-নাম, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি কোনো আন্তর্জাতিক ক্ষতই কমনওয়েলথ সারাতে পারে নি। কমনওয়েলথের মধ্যেও অনেক নতুন ও পুরানো ক্ষত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের ক্ষত; কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এই ক্ষত সারানোর চেষ্টার গালে কষে চড় লাগিয়ে দিয়ে গেছে। আছে রোডেশিয়ার ক্ষত, অথচ বৃটেন বলছে মিঃ ইয়ান স্মিথের বাটপাড়ির শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। আছে নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের ক্ষত; সেটা নিতান্তই নাইজেরিয়ার ঘরের ব্যাপার, সুতরাং কমনওয়েলথের কিছু করার নেই। আছে সাদা-কালোর ভেদা-ভেদের ক্ষত; স্বয়ং বৃটেন সম্প্রতি কালা-চামড়াদের বিরুদ্ধে আইন জারী করে সেই ক্ষত সারাচ্ছে, এবং এখন কেনিয়া থেকে বিতাড়িত বৃটিশ নাগরিক এশীয়দের ভারতের ঘাড়ে চাপাবার তাল করছে! আছে কমনওয়েলথের অনগ্রসর দেশগুলির আর্থিক দুরবস্থার ক্ষত; এবং বৃটেন সেই ক্ষত সারাতে চায় ইয়োরোপের কমন মার্কেটে যোগ দিয়ে যা কমনওয়েলথের দেশগুলির বৈষয়িক স্বার্থের প্রতিকূল।

গত ৭ জানুয়ারী থেকে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। সকলেই আশা করেছিল রোডেশিয়া, সাদা-কালোর ভেদের প্রশ্ন ও নাইজেরিয়ার গৃহ-যুদ্ধের প্রশ্ন নিয়ে এবারের সম্মেলন হবে খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। কিন্তু দেখা গেল কার্যক্ষেত্রে এই তিনটি প্রশ্নকেই কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে নাইজেরিয়া ও বিয়াফ্রার প্রশ্নটিকে লবীতে আলোচনার জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যার কোনো মূল্যই নেই। রোডেশিয়ার প্রশ্নে মিঃ উইলসনের সেই একই বক্তব্য : বৃটেনের পক্ষে মিঃ স্মিথের পক্ষে জোর খাটানো সম্ভব নয়। আর সাদা-কালোর প্রশ্নে তিনি সমবেত রাষ্ট্রনেতাদের কাছে এই প্রশ্ন করেই তাঁর দায়িত্ব সেরেছেন : বৃটেন যদিও বহিরাগতের আগমন নিয়ন্ত্রণ করে আইন পাশ করেছে তবু তাকে দোষারোপ করা কি উচিত?

এর বাইরে সম্মেলনে যা আলোচনা হয়েছে তা হলো আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতির বিশ্লেষণ।

কমনওয়েলথ তাহলে সদস্য দেশগুলির কোন্ উপকার করছে? শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন ভারত কমনওয়েলথ থেকে বৈষয়িক বা অন্যান্য বাস্তব সুবিধা প্রত্যাশা করে না। তাহলে? কমনওয়েলথ বিশ্বসমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, এই জন্যে? না কি পৃথিবীর যে-সব সমস্যা কমনওয়েলথেরও একই সমস্যা সেই গৌরবে?

প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই বলবেন না যে, একমাত্র এই হাস্যকর কারণে কমনওয়েলথ টিঁকে আছে বা টিঁকে থাকা উচিত। তাহলে কমনওয়েলথকে বজায় রাখবার পক্ষে একটিই কারণ অবশিষ্ট থাকছে : বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী অহমিকায় সুড়সুড়ি দেওয়া। তাতে বৃটেনের খুশি হবার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু ভারত বা কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্য ২৭টি দেশের খুশি হবার কি কারণ আছে?

ধূমপানের আনন্দের জন্যে পানামা...
একটি পানামা ধরিয়ে দেখুন। একেবারে প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা ভার্জিনিয়া অমাকের চমৎকার টাটকা স্বাদগন্ধ। তারপর টানের পর টান আমেজের সঙ্গে টেনে চলুন। একেবারে শেষ টান পর্যন্ত পানামা আপনাকে দেবে ধূমপানের অপূর্ব আনন্দ।
Panama
20
গোল্ডেন টোব্যাকো কোঃ প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে প্রৌঢ়
াক অনুনয় করে বললেন—

: দেখবেন যেন ব্যাপারটা বেশী
জানি না হয়। হলে বড় বিপদে পড়ব।
য় আর বাস করা যাবে না।

সরকারী খাতায় নাম লিখিয়ে এই
র রিকোয়েস্ট অনেকেই করেন। অভ্যস্ত
। সুরটা আদো অনভ্যস্ত নয়। একটা
াফিক হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে
 অফিসর ধরসাহেব দায়িত্বপূর্ণ গলায়
লন—

: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এটা
মদের দায়িত্ব।

বোধ হয় থানা অফিসরের দায়িত্ববোধ
র্কে নিশ্চিন্ত হয়ে বা করার আর কিছু
 বলেই কিছুক্ষণ ধরসাহেবের মুখের
 তাকিয়ে পাশের চেয়ারে বসা
য়েটিকে বললেন—

: চল উর্মি। এবার আমরা যাই।

দরজা পর্যন্ত বাপ ও মেয়েকে এগিয়ে
। নমস্কার জানিয়ে ফিরে আসছিলেন
 অফিসর, হঠাৎ মেয়েটির ডাকে ঘুরে
লেন—

: শুনুন।

প্রশ্নের ভ্রূকুটি কপালে উঠল—

: বলুন।

: ওকে কিছু বলবেন না। ওর কোন
 নেই। দোষ আমার।

একরাশ অনুনয় সদ্যফোটা জাপানী
াপের মধ্যে [illegible] ঝরে

ঝরল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবার কথা যেন মেয়ে ভুলে গেছে। ব্যাপারটা ক্রমশ আন-ম্যানেজেবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অভিযোগ জানাতে এসে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন না নিতে অভিযোগকারিণীর আবেদন যেন কেসটাকে জটিল করে তুলেছে। অনুরোধের গুরুত্ব লঘু করে দেওয়ার জন্য ধরসাহেব সহাস্যে বললেন—

: মহাশয়ের সংগে আগে দেখা হোক। আর আমাদের কাজ ত শুধু ধরা—বাকিটা কোর্টের। ঐ নিয়ে চিন্তা করে মিছামিছি কষ্ট পাবেন না।

মেয়েটি আর একটি কথাও না বলে বাবার হাত ধরে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়িতে গিয়ে উঠল। একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে ছোট্ট বেবি অস্টিনটা চলে গেল।

ডায়েরীর পাতাগুলি ওল্টাতে ওল্টাতে ভাবছিলেন ধরসাহেব। সওদাগরী অফিসে বড় পদেই কাজ করেন ভদ্রলোক। স্বামী, স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ের ছোট্ট সংসার। বছর কুড়ি শহরের এই দক্ষিণ পাড়ার ফ্ল্যাট বাড়িতে আছেন। শহরে আর ভাল লাগছে না। ইচ্ছা আছে সস্তায় জমি পেলে দূরে শহরতলীতে বাড়ি বানিয়ে উঠে যাবেন। গাড়ি আছে, যাতায়াতের কোন অসুবিধা হবে না। মেয়ে বি-এ পড়ছে, আসছে বছর ফাইন্যাল দেবে। সবই বেশ স্বচ্ছলে চলছিল। এমন সময় হঠাৎ এই নতুন ক্যাচাং ওঁদের সমস্ত প্ল্যানটাকে আপসেট করে দিয়েছে।

নতুন ঠগী

ভদ্রলোক কিছুই জানতেন না। দিন দশেক আগে জমির বায়না দেওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে টাকা উঠাতে গিয়ে স্ত্রীর অ্যাকাউণ্টে জমার ঘরের অঙ্কটা তাঁকে বিস্মিত করে। গত এক বছরে যত জমা পড়েছে তার থেকে ওঠানো হয়েছে বেশী। যোগ দিলে টাকার অঙ্ক প্রায় দু হাজারের কাছাকাছি দাঁড়াবে। কারণ জানতে চাওয়ায় স্ত্রী বললেন, মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর। জিজ্ঞাসা করতেই মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলেন। টেবিলে মাথা রেখে মেয়ে তাঁর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলেন একগাদা বইয়ের মাঝে একটা চিঠি পড়ে রয়েছে। চিঠিটা পড়তেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। তারপর সারাটা দিন স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে মেয়েকে জেরা করেছেন। গতকাল রাত্রে ভদ্রলোক থানায় ছুটে আসেন। সব শুনে ধরসাহেব বললেন—

: কাল সকালে আপনার মেয়েকে নিয়ে একবার থানায় আসুন। ওর মুখেই শোনা দরকার।

থানায় মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে শুনে ভদ্রলোক চমকে গিয়েছিলেন।

: কোন ভয় নেই। স্ক্যাণ্ডালের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। সব দায় দায়িত্ব আমার।

ধরসাহেবের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে আজ সকালে মেয়েকে নিয়ে বাবা এসেছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাপ ও মেয়েকে প্রশ্ন করে যা জেনেছেন তাই ভাবছিলেন বসে বসে।

এই নিয়ে তিন তিনটি ডায়েরী হল একই বিষয়ে। অভিযোগের বয়ান হুবহু এক। কিন্তু অভিযুক্তের হদিশ কেউ কিছু দিতে পারেন নি।

কলেজে ঢুকে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কার্ড না-করালে বন্ধুদের কাছে প্রেস্টিজ থাকে না। বি, এ পার্ট ওয়ানের ফাইন্যাল দেওয়ার এক বছর আগে থেকেই রোববার ছুটির দিনে লাইব্রেরী যেত ঊর্মি নোট করতে। সেখানেই আলাপ তাপস রায়ের সঙ্গে। স্কলারদের জন্য রিজার্ভ করা জায়গায় বেতের সোফায় গা এলিয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্সের বই পড়তে পড়তে চোখের পাতা বুজে এসেছিল। হঠাৎ টেবিলে টক টক করে-কলম ঠোকার আওয়াজে চটকা ভেঙে যেতে সামনে তাকিয়ে দেখে ওপাশের সোফায় ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে কলম ঠুকছেন টেবিলে। লজ্জায় ঘেমে নেয়ে উঠল ঊর্মি। কানের লতি গরম হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কোলে গড়িয়ে পড়া বইটা সোজা করে পড়তে গিয়ে শুনতে পেল—

ঃ আপনি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এখানে যাসে বসে ঘুমোবেন না। কখন লাইব্রেরীয়ানের চোখে পড়ে যাবেন—উঠিয়ে দেবে।

যেচে উপদেশ দেওয়ায় মনে মনে অসম্ভব চটে গেল ঊর্মি। মুখে এসে গিয়েছিল, আমি পড়ি, ঘুমোই, জেগে থাকি তাতে আপনার কি? আপনি নিজেও ত পড়াশুনা না করে একটা অপরিচিত মেয়ে পড়ছে কি পড়ছে না তাই দেখছেন বসে বসে। কিন্তু কিছু বলবার আগেই সেই স্পষ্ট ধারালো সুরেলা গলা আবার শুনতে পেল—

ঃ যান। ক্যানটিনে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে আসুন। ঘুম কেটে যাবে।

রাগে দুঃখে অপমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল ঊর্মির। কোন কথা না বলে তক্ষুনি খাতা কলম গুছিয়ে চলে এসেছে লাইব্রেরী থেকে। বন্ধুদের কাউকে বলেনি ঘটনাটা।

পরের রবিবার খুব সকাল সকাল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখল ভদ্রলোক তখনো আসেন নি। ভদ্রলোক রোজই যখন এইখানে বসেন তখন নিশ্চয়ই ওর নাম কার্ডে লেখা আছে। মাথা উঁচু করে দেয়ালে সাঁটা নামটা পড়ল ঊর্মি—তাপস রায়, রিসার্চ স্কলার।

ঃ ওটা আমার নাম।

পেছনে পরিচিত স্বচ্ছন্দ গলার আওয়াজ। শুনে চমকে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে দেখে ভীষণ লজ্জা পেল ঊর্মি। ভদ্রলোক মুখ টিপে হাসছেন।

হাসির হররা বয়ে গেল ক্যানটিনে বন্ধুদের দঙ্গলে। ঊর্মি প্রেমে পড়েছে। ক্যানটিনের সরভর্তি লোকের মাঝে বন্ধুদের হাসির উৎসবে মুখ লুকিয়ে বসে রইল ঊর্মি। একরাশ প্রজাপতি ডানায় ব্যাপারটার আনন্দের সুরে ভুলে উড়ে গেল।

রবিবার আর ছুটির দিনগুলির অপেক্ষায় ক্যালেন্ডারের পাতা দেখে দেখে চোখ ব্যথা হয়ে যেত ঊর্মির। ঐ দিনগুলি ভোরে উঠেই নাকে মুখে দুটি গুঁজে খাতা কলম নিয়ে ছুটত লাইব্রেরীতে। বাবা মেয়ের পড়াশুনার চাড় দেখে মনে মনে খুব খুশী হতেন। বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুলেই মেয়েকে পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়ার মায়ের ইচ্ছাটার প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। মেয়ে যদি পড়াশুনা করতে চায় তাহলে খামোকা বাধা দিয়ে কি হবে। বিয়ে ত সব মেয়েই করে।

লাইব্রেরীর সূর্যমুখী ছাওয়া লনে পাড় বাধানো পুকুরের ঘাটে, পেছনের হাজার ঝুরি নামানো বটগাছটার তলায়, ঘুঘুডাকা দুপুরে মাথা উঁচু আম, জাম, জারুলের ছায়ায় ছায়ায় একটি মধুর সুন্দর ভালোবাসার ভ্রমর তখন ঘুরে ঘুরে চলেছে। আপনি থেকে তুমি, দুজনের মন দেওয়া নেওয়ার পর্ব অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ঊর্মি জানে ঐ চওড়া বুকের শ্যামলা ছেলেটির পৃথিবীতে নিজের বলতে কেউ নেই। ছোটবেলা থেকে মা বাপ হারিয়ে একলা একলা এই পৃথিবীতে বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলে পড়বার সময় এক মেসোমশায়ের আশ্রয়ে ছিল। হিসেবী মেসোমশায় চাকর ছাড়িয়ে হিসাবের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে নিয়েছেন। স্কুল ফাইন্যাল, ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ, এম-এ সবকটা ধাপ ভালভাবে উৎরে এসে এখন দেশবিখ্যাত এক অধ্যাপকের অধীনে জাতীয় অর্থনীতির গোলকধাঁধার রহস্যমোচনে তাপস এখন ব্যস্ত। মাস গেলে আড়াই শ টাকা সরকারি বাঁধা বরাদ্দ। তাতেই মেসের খরচ চলে যায়। দু বছর অবিশ্রান্ত খেটেছে, এবার থিসিস সাবমিট করবে। ইচ্ছা আছে অধ্যাপনা করার। অধ্যাপক ওকে বড় ভালবাসেন। তিনি কথা দিয়েছেন বাংলা দেশের কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ তাপসকে জুটিয়ে দেবেন। কিন্তু চারশ টাকার একজন লেকচারারের ঘরনী হতে কি ঊর্মি রাজি হবে? নির্জন দোয়েল ডাকা দুপুরে লাইব্রেরীর সামনের লনে স্থলপদ্মের বড় গাছটার তলায় বসে চওড়া বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নীরবে ঘাড় দুলিয়ে ঊর্মি জানিয়েছে সে রাজি, রাজি, রাজি। সে এক্ষুনি এই মুহূর্তে রাজি। তক্ষুনি তাপস হয়ত রসিকতা করে বলেছে—

ঃ তোমার মা বাবা, তাঁরা রাজী হবেন ত'। তুমি কি কষ্ট করতে পারবে?

বড়লোকের মেয়ে হওয়াটা যে কতবড় অভিশাপ সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে ঊর্মি। অস্ফুট স্বরে বলেছে—

ঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। সব পারব।

দিনগুলি কাটছিল এইভাবে। রাতগুলি ঊর্মির স্বপ্নমালা। কলেজে বন্ধুরা হাসি-ঠাট্টায় ভরিয়ে রেখেছিল। বাড়িতে কেউ কিছু জানে না। তাপস বলেছে আগামী কনভোকেশনের আগেই ওর থিসিসের রেজাল্ট জানা যাবে। তারপর কোন এক ইউনিভার্সিটিতে—তারপর। আর ভাবতে পারে না ঊর্মি। এক অসহ্য আ… উত্তেজনায় ছোট্ট জাপানী গোলাপ থর … করে কাঁপে।

মাস দশেক আগে তাপস এক… বলল—

ঃ তোমার সঙ্গে একটা জরুরী … আছে।

ঃ কি কথা?

ঃ এখন নয়। পরে বলব।

কিন্তু কি কথা তাপস কিছুতেই … বলতে চায় না। পর পর দুটো … অনেক অনুনয় করেও ঊর্মি জানতে … না। শেষে রেগেমেগে বলল—

ঃ তুমি যদি আমায় না বল, তাহ… কাল থেকে আমায় আর দেখতে পাবে … আমি আর লাইব্রেরীতে আসব না।

তাপস লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে … অনেক বোঝাল ঊর্মিকে, না তেমন … নয়। একটা মুস্কিলে পড়েছে তা ও নিজে … ঠিক করে নেবে।

ঃ ও তাহলে আমি তোমার কেউ ন… শুধু ভালবাসা আর প্রেমের সময় আ… আর তোমার অসুবিধার জন্য অন্য … বুঝি আছে।

অভিমানে ফেটে পড়ে ঊর্মি। কিছুতে… আর সে তাপসের সঙ্গে দেখা করবে … উঠে আসছিল আমগাছের ছায়া বিছা… আসর থেকে। হাত ধরে টেনে নিয়ে পা… বসিয়ে আদরে ভরিয়ে দিয়ে তাপস বলল—

ঃ তোমায় সব বলব। গত মা… স্কলারশিপের টাকা আজও পাইনি। … মুস্কিলে পড়ে গেছি। মেসে বাকি পড়ে… ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কি করব।

ঊর্মিই বুঝিয়ে দিল—

ঃ তোমায় কিছু ভাবতে হবে … আমি সব ঠিক করে দেব। তুমি শুধু প… যাও। টাকাটা নেকসট দিন সঙ্গে … নিয়ে আসব।

ঃ কিন্তু তুমি কোথায় পাবে জাপ… গোলাপ?

তাপস আদর করে ঊর্মিকে জাপ… গোলাপ বলে ডাকে। আদরে, মধুর … উষ্ণ স্বাদে সারাটা মন ভরে উঠে ঊর্মি… একরাশ ঝাকড়া কালো চুলের নীচে উজ্জ্ব… নীলমণির মত চোখদুটির দিকে তা… বলে—

ঃ সে তোমায় ভাবতে হবে না।

তারপর থেকে গত দশমাসে তাপস … কখনো অসুবিধা বোধ করেনি … চাইতে। কখনো দুশ, কখনো … কখনো পঞ্চাশ। কোন কোন মাসে … তিনেক টাকা দিয়েছে ঊর্মি। আদুরে … দুলাল মেটানোর জন্য স্বামীকে লু… কখনো সংসার খরচ থেকে কখনো … থেকে মা টাকা দিয়েছেন। টাকা … গিয়েছেন—জানেন নি কেন এত … প্রয়োজন মেয়ের। বেশী চাপাচাপি … ঠোঁট ফুলিয়ে বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা … সঙ্গে মেয়ে জানিয়েছে, একদিন স…

একসঙ্গে সে ফেরৎ দিয়ে দেবে। মা আর কাড়তে পারেন নি।

পার্ট ওয়ান পাশ করে পার্ট টু-র পড়া শুরু হয়েছে। তাপসের কাজও শেষ হয়ে এসেছে। আগের মত রেগুলার আর দেখা হয় না। থিসিসটা টাইপ করানোয় ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয়। এক আধদিন দেখা হলে তাপস খুব ব্যস্ত ভাবে বলে কিছু টাকার দরকার। ওর স্কলারশিপটা নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছে। সেন্ট্রাল আর স্টেটের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে নাকি দারুণ ঝগড়া চলছে। তাই টাকাটা আটকে আছে। টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো ঊর্মি বোঝে না, শুধু বোঝে এই সহায়সম্বলহীন মানুষটাকে সাহায্য করার কেউ নেই পৃথিবীতে। বেচারা ধারে দেনায় তলিয়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর চেহারা, এত পাণ্ডিত্য নিয়েও কোন দাম পেল না পৃথিবীতে। অথচ ঊর্মি নিজে আজকাল বড় অসহায় বোধ করে। ব্যাপারটা আর বাড়িতে চেপে রাখা যাবে না। মা বলছিলেন বাবা শীগগিরই জমি কিনবেন। বায়নার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হবে। আর তখনই সব ফাঁস হয়ে যাবে। অথচ তাপসের কাছে ঊর্মি মরে গেলেও টাকা চাইতে পারবে না। সে কথা ভাবতেও পারে না। জাপানী গোলাপ ভেতরে ভেতরে চিন্তায় ভাবনায় শুকিয়ে যাচ্ছে। কাউকেই কিছু বলতে পারে না—বন্ধুদেরও না। আজকাল বন্ধুরা ওকে ঊর্মি রায় বলে ডাকে।

সব চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটল দিন দশেক আগে। জমির বায়নার টাকা তুলতে গিয়ে স্ত্রীর এ্যাকাউণ্টে সন্দেহজনক কম জমা পড়ায় জিজ্ঞাসা করলেন স্ত্রীকে। মেয়ের প্রয়োজনে মা গত দশ মাসে দু' হাজার টাকা দিয়েছেন। কিন্তু মেয়ের হঠাৎ এত টাকার দরকার পড়ল কিসে? তাই জানতে মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলেন বাবা। পড়ার টেবিলে মাথা রেখে মেয়ে তাঁর ফুঁপিয়ে কাঁদছে। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলেন একগাদা বইয়ের মাঝে একটা চিঠি পড়ে আছে। চিঠিটা পড়তেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। সম্বোধন সমেত তিন লাইনের ছোট্ট চিঠি।

"জাপানী গোলাপ,
আমার কথা ভুলে যেও। ইতি—
তাপস রায়।"

বাংলায় টাইপ করা। ঠিকানা, তারিখ কিছু নেই।

চিঠিটা গতকাল থেকে অনেকবার পড়েছেন ঘরসাহেব। এরকম তিনটে চিঠি গত একমাসে তাঁর কাছে জমা পড়েছে। সম্বোধনে তিনটি চিঠিতেই লেখা হয়েছে জাপানী গোলাপ। প্রেরকের নাম পাল্টে পাল্টে এসেছে। চেহারার বর্ণনায় তিনজনের রিপোর্ট হুবহু মিলে যাচ্ছে। গত এক বছরে ঊর্মি চৌধুরী, নীলা রায় আর মধুবি মজুমদারের বাবারা মেয়েদের প্রেমের খেসারত বাবদ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন। প্রাপক হচ্ছে হয় একজনই।

কোথাও তিনি রিসার্চ স্কলার, কোথাও ফিল্মের উঠতি হীরো, কোথাও বা নামী কোম্পানীর জুনিয়র অফিসর। গুণিন্দ্রে অভিনেতা গোপনে গোপনে অভিসারের ফাঁকে ফাঁকে প্রেমের ট্যাক্স আদায় করে গেছেন। বিহ্বল নায়িকারা টের পাওয়ার আগেই চিড়িয়া উধাও। ঊর্মির বাবা, খোঁজ নিয়েছিলেন। তাপস রায় নামে সত্যিই একজন রিসার্চ স্কলার আছেন। তিনি নমাসে ছমাসে লাইব্রেরীতে আসেন। নেম-কার্ডের আদত মালিকের অগোচরে গুণ্ড প্রেমিক তাঁর নাম ভাঙিয়ে কাজ উদ্ধার করেছেন। সুন্দর চেহারা আর গোছানো কথার টানে প্রেমের ফাঁদে নানা রঙের প্রজাপতি উড়ে এসে বসে। এই সার সত্যটুকু মূলধন এই ব্যবসায়। জাপানী গোলাপরা এ কথাটি জানে না।

—অশ্বিনীনন্দ

ছায়া কালো কালো
জন এডগার

| লক্ষীন্দরের রাজপ্রাসাদে প্রাণ
নাধিকার পেয়েছিল সমস্ত দেবীর ভরে
; কর্মকারের অবহেলায়—কিন্তু আজলোর
র সাপ...? সাপের এই ভীতিজনক
ন্বতির কথা লিখেছেন জন এন্ডরসন।
হু সাপ সামুদ্রিক সরীসৃপ! সাপের
চাঁত্তিক লীলার কথা লিখেছেন বিখ্যাত
লৌকিক কাহিনী লেখক।

জাহাজের এই স্টুয়ার্ডটি বেশ ভদ্র—
র অঙ্গে শ্বেত-শুভ্র জ্যাকেট আর নেভী-
উজার। নম্র অথচ সপ্রতিভ ভঙ্গী।
য়ার্ড কেবিনের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে
ড়ে সবিনয়ে বলল—এই আপনাদের
বিন মাদাম—স্যার!

কেবিনের দরজার পাশটিতে হাতের
নপত্র নামিয়ে পাশের র‍্যাকে সাজিয়ে
খ বলল—আর কিছু করার আছে স্যার?
য়ে কোনো আদেশ?

—আধ ঘন্টা পরে স্নান করব। সেই
স্থা করতে হবে!

বিনীত ভঙ্গীতে পিছু হটে গিয়ে
কটি বলল—আচ্ছা স্যার। আমি বাথ-
য়ার্ডকে জানিয়ে দিচ্ছি। সে সব
বস্ত করে দেবে।

যাওয়ার সময় লোকটি আস্তে আস্তে
বনের দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

অদ্রে এবং জোনাথন হানিমুনে
য়েছে, যাবে ওয়েসট ইন্ডিজ, গলফ-
সগুলিও দেখবে। উপস্থিত ছয়
হকাল এই রাজসিক জাহাজের বিলাস
। ঘরখানিই ওদের বাড়িঘর।

জোনাথনকে সংক্ষেপে ডাকা হয় জোন।
বিবাহের আগের দিন সন্ধ্যায় ওরা পরস্পর
কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল, তারপর এই সর্বপ্রথম
মিলনের লগ্ন এল। অদ্রী ও জোন দুজনে
নিবিড় আলিঙ্গনে একাত্ম হয়ে গেল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নবদম্পতি যখন
বিচ্ছিন্ন হল তখন অনেকখানি সময় অতি-
ক্রান্ত। প্যাক খুলে সাজান-গোছানো
সুরু হয়। 'কাশী-কুইন্নার' জাহাজটি
ভারী সৌখীন জাহাজ। কেবিনের
গায়ে নানারকম তাক আছে জিনিষপত্র
রাখার জন্য।

হানিমুনে যদি থাকেন তাহলে বুঝবেন
যে কাজ-কর্ম কিছুই তেমন সহজে এগোতে
চায় না, প্যাক খুলে সাজানো তেমন সহজ
ব্যাপার নয়। এ ছাড়া তেমন বেশী জায়গা
না থাকায় অনেক কাপড়-চোপড় সুটকেসেই

রয়ে গেল। ফলে নব-দম্পতির সাজানো-
গোছানোর কাজ দশ মিনিট আগেই শেষ
হল। স্নানের সময় বাঁধা, জাহাজের সকল
যাত্রীর সুবিধার জন্য সব কাজ নির্ধারিত
সময়ে করতে হয়, এদিক-ওদিক হলেই
গোলমাল।

সব নীচেকার ড্রয়ারটি বন্ধ করে জোন
তাকিয়ে রইল একটি আয়নার দিকে। ঘরে
একটা হ্যান্ড বেসিন আছে, তার ওপর
একটা আয়না লাগানো। এই আয়নাটির
ওপর কয়েকবার নজর পড়েছে জোনের।
আয়নাটির বৈচিত্র্য এই যে তার ফ্রেমে
ড্রাগনের ভঙ্গীতে আঁকাবাঁকা এক
সামুদ্রিক সরীসৃপের চিত্র এমনভাবে আঁকা
হয়েছে যে আরসীর যা কাজ অর্থাৎ মুখ
দেখার ব্যাঘাত হয় না, অথচ বেশ নিখুঁত
শিল্পকর্ম হিসাবে এই সামুদ্রিক সাপটি

জীবন্তের মত চক্-চক্ করছে। তরঙ্গের ভিতর থেকে মাথা তুলে মনুষ্য দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, অতঃপর কি খাওয়া যায়, কাকে খাওয়া যায়? ঠিক যেন একটি জীবন্ত সাপ। আয়নার চারপাশে এচিং করে সাপটি খোদাই করা—তরঙ্গ-ভঙ্গ এমনভাবে খোদাই করা যে মনে হবে সাপটা ঢেউ ঠেলে দ্রুত গতিতে চলেছে।

জোন বলে ওঠে—ভারী সুন্দর করেছে কিন্তু।

স্ত্রী একথার জবাবে বলে—করেছে ভালো বটে, তবে আমার তেমন ভালো লাগে না। কেন অবশ্য তা বলতে পারব না, হয়ত অতিমাত্রায় ন্যাচারল বলে। একটা জীবন্ত চিত্র কার ভালো লাগে বল?

জোন হেসে উঠল—তোমার যদি তাই মনে হয়, আয়নাটা না হয় ঢেকে রাখব। তোমার ভালো না লাগে যদি ওটা ঢাকা দেওয়াই ভালো।

—হা ভগবান! আমি তা বলিনি। তবে আমি হলে শোবার ঘরের অলংকরণে এমন একটা ছবি নির্বাচন করতাম না।

—না, আমিও হয়ত তা করতাম না, আমারও পছন্দ নয়। তবে কি জানো আমাদের ত সামুদ্রিক মনোভংগী নেই। হয়ত সেলাররা শোবার ঘরে এই জাতীয় সামুদ্রিক দানব পছন্দ করে। ওদের কথা আমরা কি আর জানি।

—হয়ত তাই। তবে কি জানো ১৩ নম্বর না বলে ১২-এ বলাটা রীতিমত কুসংস্কার...।

অদ্রে কথাটি শেষ করে না, করতে পারে না, কারণ ঠিক এই সময়েই দরজার মৃদু আঘাত পড়ল। যে স্টুয়ার্ডটির ওপর

স্নানের ব্যবস্থার ভার সে জানালো যে স্নানের আয়োজন প্রস্তুত—এখন স্নান করে নিন।

স্নানের জল, সমুদ্রের জল। এমনই জল যে সাবানের ফেনা হয় না, আর সমুদ্রের জলে স্নান সেরে আবার ভালো জলে গা ধুলেও সামুদ্রিক স্পর্শ অঙ্গ থেকে যায় না। ফলে অদ্রে বা জোনের মনে এই সরীসৃপের চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য জাগল না।

ফার্স্ট অফিসরের টেবিলে খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। শেষ পদটি পরি-বেশিত হওয়ার পর আবার এই প্রসঙ্গ উঠল।

আপেলের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কথাটা জোনই তুলল—আমাদের কেবিন যে সামুদ্রিক দানবটার ছবি আয়নার গায়ে খোদাই করা আছে সেটি বেশ বাস্তব।

ফার্স্ট অফিসার বললেন—১২-এ? সত্যি, ভারী চমৎকার নয়! এই জাহাজের জন্য বিখ্যাত আর্টিস্ট এলরয় ম্যাসিন-জারকে কিছু প্যানেল আঁকতে দেওয়া হয়েছিল। মারা যাওয়ার আগে এই একটি মাত্র এচিং তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন।

ফার্স্ট অফিসারের কন্ঠস্বর কেমন কেঁপে গেল, অদ্রে প্লেট থেকে মুখ তুলে অফিসরের মুখের দিকে তাকাল,—আপনার গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনালো, মিঃ ম্যাসিনজার শিল্পী কি আপনার আত্মীয় ছিলেন? ছিলেন নয়?

মৃদু গলায় অফিসার বললেন—মিসেস পেমটর, শিল্পী আমারই সহোদর ছিলেন, আমার ছোট ভাই।

সকলের মুখে একটা সমবেদনার ভাব ফুটে উঠল। অফিসর বলতে লাগলেন—আমার গলাটা কেঁপে উঠল তার একটা কারণ আছে, ওর মৃত্যুর পিছনে একটা রহস্য জড়ানো ছিল। সেই কথা মনে পড়ে গেল।

আরেক জন ভদ্রলোক টেবিলের প্রান্ত থেকে বলে উঠলেন—আমরা শুনতে পারি? ভদ্রলোকটির নাম অদ্রে ঠিক বুঝতে পারল না।

অফিসর বললেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনতে পারেন। তবে বিশেষ তেমন কিছু বলারও নেই। আমার ভাই জামাইকার মন-টেগ বে-র অধিবাসী ছিল। আমরা পরে সেই বন্দরে থামব। এই ঘটনার পর আমি ওখানে কয়েকদিন ছিলাম। তখন অবশ্য কাশী-কুইনার জাহাজটি চালু হয়নি, আমি অন্য জাহাজে কাজ করতাম। সে জাহাজের নাম 'কারারিমানি'। পুরোনো ধরনের চমৎকার জাহাজ—এত আরামদায়ক নয়, এর চেয়ে বয়সেও কুড়ি বছরের বড়ো।

গল্পটি আমার ভাই-এর এক নিগ্রো চাকরের কাছে শোনা, লোকটির নাম জো।

মনে হয় কোনো কিছু জিনিষ কেনার জন্য এলরয় তাকে পাঠিয়েছিল কিংসটনে গাড়ি দিয়ে। একদিনের পথ—আমার ভাই একটু গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপের, সে একা একা একটা জেলে ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। আপনারা হয়ত বলবেন এ আর এমন বোকামি কি? সাধারণ দিক থেকে—হয়ত নয়। কিন্তু দেখুন, ওখানকার আবহাওয়াবিদরা বলেছিলেন সন্ধ্যার দিকে ঝড় উঠতে পারে। তাদের সেই ভবিষ্য বাণী সফল হয়েছিল, আর আমার ভাইটি আর কেউ সন্ধান পায়নি। ডিঙ্গিটা ঝড় উড়ে ডাঙ্গায় আছড়ে পড়ে, খানিকটা তখনও জলে ডোবা, তবে আশ্চর্য ডিঙ্গিটার কিছুই হয়নি। সেটা বেঁ গেছে। অবশ্য হাল ভেঙ্গে গিয়েছিল এলরয়ের কোনো চিহ্ন ছিল না, শু নৌকার ওপর কয়েকটি ফোঁটা রক্ত পাও যায়। মনে হয়, জলে ভেসে যাওয়ার আ তার কোনো রকম জখম হয়ে থাকবে।

অদ্রে মৃদু গলায় জানতে চায়—এ এই পর্যন্ত।

—না, ঠিক এখানেই শেষ ন রহস্যের সুরু এইখান থেকে। ডিঙ্গি কামান রাখার জায়গাটা ভেঙ্গে-চুরে গি ছিল। সেই জায়গাটায় কতকগুলি লা গুল্ম পাওয়া গেল যা সমুদ্রের নীচে থা হালটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, আর তার ফ হয়ত ডিঙ্গিটা ভেসে যায়।

জোন বলল—কথাটা যুক্তিপূর্ণ ব তবে আমরা সবাই ভূচর, জলচর নই, জানি বলুন।

টেবলের আর সবাই মাথা নেড়ে কথায় সমর্থন জানায়। জোন আবার ব আপনি নিশ্চয়ই মৃত্যুর কারণ সম্প নিঃসন্দেহ হন নি। তাহলে নিশ্চয়ই গোল আছে কোথাও।

—আপনি ঠিক বলেছেন! দু-এ এমন গরমিল আছে যা কারো ন পড়েনি, অথচ আমার কাছে একেবারে হয়ে উঠেছিল। ডিঙ্গিটা যেভাবে পড়ে তাতে মনে হয় না ষাট ফিটের বেশী যে কোনো ঝড়ের মুখে ষাট ফিট ওঠা খাওয়া কিছু নয়, কথাটি হয়ত টেকনিক্যাল হয়ে গেল—যা কিছু গোল কামানের জায়গাটায়—

—আচ্ছা আপনি কি বলতে চান না-না, দাঁড়ান এক মিনিট—ডিঙ্গিটা থাকে সাগরের নীচে গিয়েছিল।

—ঠিক বলেছেন, নীচে চলে গিয়ে একেবারে গভীরে। সমুদ্রের তল ভূপৃষ্ঠের সমতলভূমির মতই। ডিঙ্গি যে ধরনের লতা-গুল্ম পাওয়া গেল সমুদ্রের অনেক গভীরের বস্তু। তাই সমুদ্রের নীচে গিয়ে আবার ওপরে কি করে?

—জানি না, সেই ত আমার ভয়। এলরয় ম্যাসিনজর—

—হয়ত বা হয়ত নয় যেভাবে তাঁর ভাই বলছেন সেইভাবে হয়ত মৃত্যু হয়নি, হতেও পারে। তবে এমনও হতে পারে ফার্স্ট অফিসরের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত একটা উদ্ভট কাহিনী মাত্র।

এই কথা বলে আয়নার নীচ থেকে এক খণ্ড সাবান তুলে নিয়ে আয়নায় ঘসতে থাকে। এই কর্ম করার সময় কিন্তু ওর হাতে এক টুকরো কাচ ফুটে গেল, কোনো জায়গায় অসমান ছিল হয়ত। জোন ভাবে এমন একজন বড়দরের শিল্পী এলরয় আঁচ এইটুকু ত্রুটি উকো দিয়ে ঘষে দিতে পারেন নি। আশ্চর্য!

হাত দিয়ে কিন্তু প্রচুর রক্তপাত হল। বেশ একটা গভীর ক্ষত। জোন চেঁচিয়ে উঠে নিজের হাতের দিকে তাকায়। অদ্রে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে ঠিক কোন জায়গায় আঁচড় লেগে জোনের আঙ্গুলটায় এমন গভীর ক্ষত হয়ে গেল। অদ্রে স্পষ্ট দেখল সাপের সরু লকলকে জিভটা যেন জোনের রক্ত পরম পরিতৃপ্তি সহকারে পান করার উদ্দেশ্যে জিভটা ভিতরে টেনে নিল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় জাহাজ জামাইকার দিকে যাত্রা করবে, বারমুডার নিরাপদ আশ্রয় শেষ হল। জোন মুখ-হাত পরিষ্কার করে এক টুকরো ভিজে ফ্লানেল দিয়ে সাবান লাগানো আয়নাটা পরিষ্কার করল।

পরদিন প্রাতে অদ্রে বলল—সাপটা আরো আধ ইঞ্চি সরে গেছে।

জোন হেসে উঠল অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে।

।। তিন ।।

১২-এ নম্বর কেবিনে এরপর কদিন আর তেমন কিছু ঘটেনি।

তাই অদ্রেও ভাবছিল সত্যি ওর ভ্রম হয়ে থাকবে। দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া এ আর কি।

দানবটার আয়নায় অবস্থানের কোনো পরিবর্তন নেই—ব্যবধান আর বাড়েনি বা কমেনি। ছবি—শুধু ছবি মাত্র। সাপটার নড়াচড়া বন্ধ হওয়ায় অদ্রের ভীতিটাও অন্তর্হিত হল। হনিমুনের প্রথম পর্বে ঠিক যেমনটি ছিল এই কেবিনটা আবার সেই মধুরতায় ভরে উঠল।

তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজের পর জাহাজটা সান্টো-ডোমিনগো দ্বীপের সীমানা পার হল—এর পশ্চিম দিকটায় কুখ্যাত হাইটি রিপাবলিক। আরো সব যাত্রীদের মত জোন ও অদ্রে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দ্বীপগুলিতে কোনো মানুষের চিহ্ন পায় কি না তা দেখে। বসতি নেই কোথাও। কূল ঘেঁষে একটা মোটর চলার পথ চলে গেছে মনে হল। নাবিকেরা বলল—যে আগের বার কিন্তু তাল-পাতার ছাউনী ঘেরা দু-একটা কুটির ওরা খালি চোখেই দেখেছে। 'কাশী-কুইয়াঙ্ক' যত অগ্রসর হচ্ছে ততই ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে বেশী করে। ফলে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

অদ্রের কানে কানে জোন বলল—জানো এসব অঞ্চল ভুডু-দের বাসস্থান। একে প্রেতলোক বলা যায়। শুনতে পাচ্ছ ঢাক বাজাচ্ছে, এই ঢাকের আওয়াজের অর্থ মৃত্যুর সংবাদ, কান পেতে শোনো, শুনতে পাবে মৃত্যুর-বাণী।

অদ্রে কাঁপছে, অথচ এই অঞ্চলটা বেশ গরম। সে বলল— আমার ভালো লাগছে না। এ জায়গাটা ভালো নয়। আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার ভয় করছে—

কিছুক্ষণ পরে মৃদু গলায় বলল—আমি বরং নীচে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ি।

—তা ভালো। বড় গরম।

এই বলে জোন কপালের ঘাম মুছে নিল। তারপর বলল—আচ্ছা তুমি বরং যাও শুয়ে পড়ো, পাখাটা খুলে দিও। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

অদ্রে চলে যাওয়ার পর একটা সুন্দর শাদা নৌকা জাহাজের দিকে এগিয়ে এল। জোন একমনে সেটি দেখতে থাকে, এই সময় একটু মধুর হাওয়া বইল। ফলে জোন নীচে নামল প্রায় এক ঘন্টা পরে।

জোন কেবিনে প্রবেশ করে দেখল গ্রীষ্মের উৎপাতে অদ্রে সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। তার নগ্ন গাত্রে ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া লাগছে। এমনই স্তব্ধ ভঙ্গীতে পড়ে আছে অদ্রে যে জোনের মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই মনোমোহকর দৃশ্য দেখতে লাগল। তারপর সে দেখল আয়নাটার দিকে অতিশয় শঙ্কিত দৃষ্টিতে আবিষ্টের মত তাকিয়ে আছে অদ্রে।

জোনের এখনও বিশ্বাস অদ্রের মনে একটা মিথ্যা ভীতি জেগেছে। তবু তার চোখের সেই উদভ্রান্ত দৃষ্টি লোপ করার জন্য একটা তোয়ালে নিয়ে এগিয়ে গেল আয়নায় ঢাকা দিতে, আরেক দিন সে এই চেষ্টাই করেছিল।

কিন্তু এই সময়েই সে যা দেখল তা অবিশ্বাস্য এবং আতংককর। জোন চীৎকার করে ওঠে—হা ভগবান! এ কি! এ জায়গাটা যে খালি—একেবারে ফাঁকা।

অদ্রের চীৎকারে তার চৈতন্য হল। অদ্রে চেঁচাচ্ছে, জোন ঠিক তোমার পিছনে, পালাও, পালাও—পালাও—

সাপটা তার আয়নার আশ্রয় ছেড়ে এখন ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! জাহাজের পোর্ট হোলের মুখে সেই প্রাণীটা বেরিয়ে গেল মনে হল। জোন হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—আদ্রে, আজ আমি বিশ্বাস করছি তোমার কথা। যাই কাপ্তেনকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে—

কথাটি শেষ হয়নি, জোনের কথা শেষ হওয়ার আগেই সেই পোর্ট হোলের ভিতর থেকে বিশাল অজগরের আবির্ভাব—জোনের চীৎকার। একটা ঝটপট শব্দ তারপর আর কিছু নেই—

অদ্রের চীৎকারে ছুটে এসেছিলেন ফার্স্ট অফিসর। দেখলেন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত নগ্নদেহ অদ্রেকে, তার সারা অঙ্গে রক্ত তার হাতে ধরা রয়েছে জোনের মাথার অংশটুকু, গলার কাছ থেকে বাকী অংশটা অন্তর্হিত। অদ্রে চেয়ে আছে সেই আয়নার দিকে। আয়নার ভিতর থেকে সাপটা যেন এদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তার জিভের কাছে তাজা রক্ত চক-চক করছে।

—অমিতাভ মজুমদার অনূদি[ত]
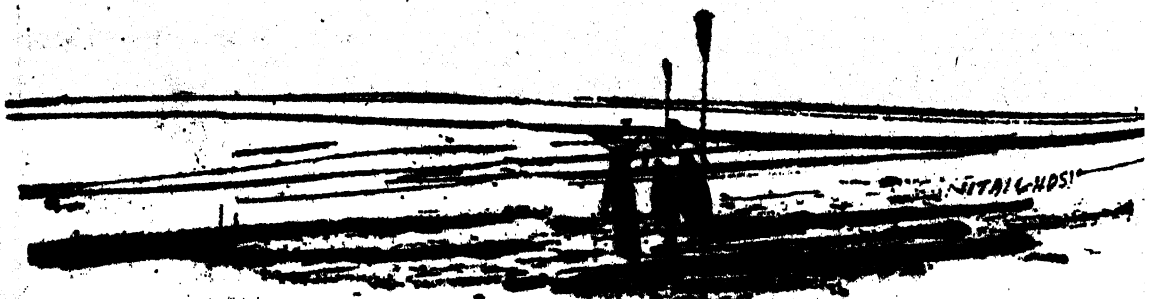
প্রতিমা ঠাকুর

স্মরণে

১৯ জানুয়ারী ভোরে শান্তিনিকেতন-প্রাণ জননী প্রতিমা ঠাকুর পরলোক গমন করেছেন। সমাপ্তি ঘটল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বভারতীর প্রত্যক্ষ যোগের। অবসান হল একটি যুগের।

১৯১১ সালের মাঘ মাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের আর একটি ধারার—স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এবং গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নি বিনয়িনী দেবীর মধ্যমা কন্যা প্রতিমা দেবীর বিবাহ হয়। সাহিত্যের সঙ্গে কলালক্ষ্মীর সংযোগ ঘটেছিল সেদিন।

৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে যাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে, কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় যিনি পড়াশুনো করেছেন, সেই কবিরই পুত্রবধূরূপে ৬নং বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হলেন তিনি। সে কি আজ কম দিনের কথা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এনে স্বহস্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। কবির নাটকের রূপসজ্জায়, নৃত্য-নাট্য পরিকল্পনায়, অভিনেত্রীদের সুসজ্জিতা করে তুলতে তিনি সর্বদাই বিশ্ববিখ্যাত শ্বশুরের পার্শ্বচারিণী শুধু নয়, মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সঙ্গীতেও তাঁর অবদান ছিল অনেক; তিনি নিজে শুধু নৃত্যশিল্পী ছিলেন না, তিনি শিল্পী তৈরীও করতেন। চিত্রাঙ্কনে তিনি মাতুল অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর সুযোগ্যা ছাত্রী ছিলেন। অভিনয়েও তিনি আপন প্রতিভার স্পর্শ দিয়ে গেছেন। বিবাহের পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অভিনীত লক্ষ্মীর পরীক্ষায় তাঁকে ক্ষীরের ভূমিকায় অভিনয় করান।

শান্তিনিকেতনে হস্তশিল্প প্রবর্তনেও তাঁর ভূমিকা কম ছিল না। মেয়েদের একটি সমিতিও তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেখানে। স্বামী রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পসদন প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল।

পরবর্তী জীবনে তিনি শ্বশুর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশে গিয়েছেন বহুবার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্বত্র তিনি তাঁর সংগ্রহকামী মন নিয়ে গেছেন এবং যেখানে যা ভাল লেগেছে সংগ্রহ করে এনেছেন বিশ্বভারতীর জন্যে। সৌন্দর্যের সঙ্গে কলার সংযোগ ঘটিয়ে তিনি অপরূপ করে তুলেছেন।

তাঁর বিবাহের বেশ কিছুকাল আগেই রথীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল। তাই বিবাহের পর থেকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের তিনি সেবিকা, সহায়িকা ও জননী ছিলেন। সুযোগ্যা শিষ্যারূপে কবি-গুরু তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন।

তাঁর আশা, আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে এই মহিলা তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। আপন ছোট্ট সংসারের গণ্ডী পেরিয়ে শান্তিনিকেতনের বৃহৎ সংসারটিতে তিনি সর্বদা সতর্ক কল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে রেখেছিলেন।

তাই ত তিনি বিশ্বভারতীর সবারই প্রিয় 'বৌঠান'। তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে মাঝে মাঝে বাইরে গেলেও বাস করতেন এখানেই। প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। সঙ্গীত ভবনের ডিরেক্টারও

ছিলেন—শ্রীভবনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ জীবিত নেই, কিন্তু প্রতিমা দেবীর স্নেহস্পর্শের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-অনুরাগীরা কবির সে সান্নিধ্য পেতেন, কিন্তু আজ সারা বিশ্বে যেখানে যত কবির অনুরাগীজন আছেন তাঁরা নতুন করে কবিকে হারাবার বেদনা অনুভব করবেন—তাঁদের অশেষ শ্রদ্ধেয়া এই বৌঠানকে হারিয়ে।

—সংবাদদাতা

অঙ্গনা

কার দৌড় কত

যোগ্যতার মাপকাঠি বিচারে এই প্রতিযোগিতায় অনেকেরই অন্তরের সায় ছিল। তাই দশজন মেয়ে ও চারজন পুরুষকে একজন নির্দিষ্ট করতে সবাই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ওঁদের বয়স ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। প্রত্যেককে এক একটা মোটরগাড়ি দিয়ে বলা হলো, এখান থেকে একশো আশী মাইল চালিয়ে আবার সেই দূরত্ব অতিক্রম করে ফিরে আসতে হবে। তাঁদের কাজ ছিল শুধু এইটুকু বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে রাত [illegible] ফিরে আসতে হবে। যোগ্যতার বিচার সবকিছু হবে গাড়িতে। [illegible] গাড়ির বেগ, রক্তের চাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সবই ধরা পড়বে যাতে গাড়িতে ফিট করা যন্ত্রে। নিজের কন্ট বা ক্লান্তিকে যেন [illegible] [illegible] উপর চাপা দিতে পারবে না। [illegible] এবং [illegible] একটা বিরাট পরীক্ষা। নারী এবং পুরুষের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার ফলাফল জানতে সবাই আগ্রহী ছিলেন। গাড়ি-দৌড় শেষ হবার পর প্রত্যেককে আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়। প্রতিযোগিতার আরম্ভ হওয়ার আগেও এই পরীক্ষা হয়েছিল। দু'বারে বোঝা গেল কার ক্লান্তি কতটা। অবশ্য এর উদ্দেশ্য ছিল আরো গভীরে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আজ পর্যন্ত যে তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি তার সমাধানই ছিল এই মোটর-দৌড়ের আসল ঘটনা।

দীর্ঘসময় গাড়ি চালানোর পর মেয়েদের প্রতিক্রিয়া কি পুরুষদের থেকে ভিন্ন হয়? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, নারী-পুরুষে উভয়ে একই অবস্থায় গাড়ি চালানোর পরই এই প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক।

দীর্ঘ গাড়ি চালানোর পর মেয়েদের মানসিক এবং দৈহিক ক্রিয়া কিরকম হয়?

মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে কি না? আর এই ক্লান্তির সঙ্গে তারা কিভাবে মোকাবিলা করেন?

প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরে এই মোটর-দৌড় থেকে জানতে পারা গেছে যে, মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় গাড়ি চালানোর অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যখন তিন

ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর পুরুষদের যোগ্যতায় শতকরা এগার ভাগ এবং মেয়েদের যোগ্যতার শতকরা দশ ভাগ ঘাটতি দেখা যায়।

মেয়েদের উচ্চমান আরো বিশেষভাবে ধরা পড়ে রাত্রিতে গাড়ি চালানোর সময়। দুরত্বের ব্যবধানে মানের তফাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোড়ার অবশ্য পুরুষেরা ভালভাবেই শুরু করেছিলেন এবং মনে হয়েছিল, মেয়েরা সত্যি সত্যি এ'দের সঙ্গে এ'টে উঠতে পারবেন না। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক মাত্র অতিক্রম হওয়ার পর সকলের ভুল ভাঙলো। দেখা গেল, পুরুষদের শুভ সূচনার মান বজায় থাকছে না।

অন্যদিকে মেয়েরা গোড়া থেকেই নিজেদের মান বজায় রেখে চলেছেন। এমনকি মোটর-দৌড় সমাপ্তির মুখে রাত দুটো তিনটে নাগাদ তাঁরা বেশ ধৈর্য দেখিয়েছেন। ক্লান্তির ব্যাপারেও তাঁরা বেশ বিজয়ীর মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

আবার আর একটা ব্যাপারও আসতে পারে, ভুলভ্রান্তির ব্যাপারেও মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন। অহেতুক বিপদকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানাননি। অবশ্য মেয়েরা ঝুঁকিও কম নিয়েছেন। তাই ভুলত্রুটিও তাঁদের কম। যথেচ্ছ গাড়ি চালানোর পক্ষে অবশ্য তাঁদের কোন অসুবিধা ছিল না। পুরুষ প্রতিযোগীরা এর পুরো সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু মেয়েরা পথ চলে অনেক ভেবেচিন্তে। তাই নিরাপত্তার কথাটাই প্রথম চিন্তায় তাঁদের নাড়া দিয়েছিল। সেভাবেই ও'রা চালিয়েছেন এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এতে যে শুধু ঝামেলা কমেছে তাই নয়, অধিকাংশ পুরুষের তুলনায় মেয়েদের দায়িত্ববোধের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য মেয়েদের সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসারও সদুত্তর মিলেছে। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলাই ছিল, বিশেষ কোন কোন সময়ে মেয়েদের যোগ্যতার মান নেমে যায়। অবশ্যই এটা হচ্ছে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। এই সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারলেই তাঁদের যোগ্যতা আবার 'ফর্মে' ফিরে আসে। এই মোটর-দৌড় থেকে এটা বে[শ] বোঝা গেছে। মাসান্তিক শারীরিক দুর্বলতার ঠিক আগে বা পরে[ই] দু' একজন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁরা স্বাভাবি[ক] কারণেই পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েন। এমনকি সহযোগ[ী] মেয়েদের মত তাঁরা যে ফর্মে নেই সেকথা বুঝতে কোন অসুবি[ধা] হয়নি।

একজন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ এই মোটর-দৌড়ের মহি[লা] প্রতিযোগীদের আগাগোড়া লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি তাঁদের স্বাস্[থ্য] পরীক্ষা করে নানাভাবে সাহায্যও করেন। তিনি বলেছেন [যে] মাসান্তিক শারীরিক দুর্বলতার ঠিক এক সপ্তাহ পরে মেয়ে[রা] যোগ্যতার মাপকাঠিতে সবচেয়ে বেশি সজীব থাকেন। কিন্তু এ[ই] সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পূর্বমুহূর্তে মেয়েদের শরীর দুর্বল হ[য়ে] পড়ে। তাই এসময়ে তাঁদের কাছ থেকে কোন উ'চুধরনের ফলাফ[ল] প্রত্যাশা করা অন্যায়। সেক্ষেত্রে এই সময়টুকু অতিক্রান্ত হ[য়ে] যাওয়াই ভাল। কারণ এ ক'দিনের ব্যবধানেই তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি [পু]ষিয়ে যায়। আরো বিশদ করে বলতে হয়, তাঁরা পুরনো অর্থ[াৎ] স্বাভাবিক ফর্মে ফিরে আসেন যখন প্রতিযোগিতায় পুরুষ[দের] পিছনে ফেলে তাঁরা অবহেলে এগিয়ে যেতে পারবেন। তবে এক্ষে[ত্রে] আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার। স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের নজরে [এ] জিনিসটাও পড়ে। এব্যাপারে যাঁদের নিয়ম আছে তাঁ[দের] বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। আর যাঁরা ইরেগুলার [বা] অনিয়মিত তাঁদের কিন্তু খুবই অসুবিধা।

এই অবস্থায় তিনি মহিলাদের পরামর্শ দিয়েছেন দীর্ঘস[ময়] ধরে হাঁটার বা বেড়ানোর। এটা যেন আবার মোটামুটি পরিশ্র[ম] সাপেক্ষ হয়। তবে সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, এটা [বা]দিয়ে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশি বা পুরুষদের মতই কর্মক্ষ[ম]

সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানী ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পদ। এখানে ক্যানিং ও হিমায়িত জমানো পদ্ধতি এই শিল্পে প্রচলিত হয়েছে বহুদিন। কোচিনে প্রতিষ্ঠিত দুটি কেন্দ্রের একটি ইউনিটে মেয়েদের কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

জেমিনি পাবলিকেশন কর্তৃক 'মেহেন্দী' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশন উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়া ভাষণ দিচ্ছেন।

মোটর-দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তো একথা একশো ভাগের ভেতর নব্বুই ভাগ খাঁটি।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা মনে পড়লো যে, সাধারণো একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, মেয়েরা ড্রাইভিং টেস্টে প্রায়ই অকৃতকার্য হয়। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। বরং তাঁরা পুরুষদের চেয়েও বেশি কৃতকার্য হন। আসলে মেয়েদের অকৃতকার্যতার কারণ হলো অন্যত্র। তাঁরা নিয়মিত গাড়ি চালানো অভ্যাস করেন না। ফলে ব্যর্থতা আসতে বাধ্য। হয়ও তাই। তখন মেয়েরা গাল ফুলিয়ে বলে, আসলে আমাদের অকৃতকার্যতা মেয়ে হওয়ার জন্য। কিন্তু একথাটা তাদের মনে রাখতে হবে যে, সবকিছুই শিক্ষানির্ভর। সাফল্যও সেখানেই।

এক সমীক্ষায় জানা গেছে, মহিলারা খুব কমই পারিবারিক গাড়ি ব্যবহার করার সুযোগ পান। এবং অতি অল্প সময়ের জন্য। সপ্তাহান্তেই বেশি। এসময়ও স্বামীমহাশয়রা স্ত্রীর পাশেই বসেন। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে তাঁরা স্ত্রীদের নাকি পরামর্শ দেন। যেটা একান্তই অবাঞ্ছিত। এতে স্বামী স্ত্রীর কোন উপকার করেন না। বরং স্ত্রী বেচারা গাড়ি চালাতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েন।

এদিকটা ধরা পড়েছে আর একজন বিশেষজ্ঞের নজরে। এই মোটর-দৌড় প্রতিযোগিতার শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, স্ত্রীর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দেওয়া অতিরিক্ত আশাবাদেরই নামান্তর। স্বামীরা এতে কিছুটা জিরিয়ে নেবার সুযোগও পান। কিন্তু স্ত্রীর হাতে হুইল ছেড়ে দেওয়া স্বামীদের শুধু জিরিয়ে নেবার সাধই পূর্ণ করবে না সেই সঙ্গে স্ত্রীরাও অভিজ্ঞ চালক হয়ে উঠবেন। সেই সুযোগও তাঁদের দেওয়া উচিত। আর এ সময় স্বামীমহাশয় দয়া করে মুখে কুলুপ এ'টে দিলেই ভাল করবেন। তাহলে আজেবাজে উপদেশে স্ত্রী বেচারা নার্ভাস হয়ে পড়বেন না।

কেউ কেউ নিশ্চয়ই এই পরামর্শে ঘাড় কাত করবেন। নিজের ক্লান্তি অপনোদন করার জন্য স্ত্রীর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক নয়, একথাও তাঁদের জেনে রাখা দরকার। কারণ সহযাত্রী হিসেবে একধরনের ক্লান্তি স্ত্রীকে পেয়ে বসে। তাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো, যাত্রার প্রারম্ভেই গন্তব্যস্থানের বেশ কিছুটা অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাস্তা চালানোর দায়িত্ব স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দেওয়া। কারণ স্ত্রী তখন একেবারেই ফ্রেশ। এরপর স্বামী স্টিয়ারিং তুলে নেবেন নিজের হাতে। তিনি ক্লান্ত হলে তাঁর অভিজ্ঞতা হবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহায়ক। এর ফলে এটুকু তিনি সয়ে নিতে পারবেন এরকম অনুমান করা অনুচিত হবে না।

তবে একটা কথা হচ্ছে যে, ক্লান্ত হয়ে সবাই ঝিমিয়ে পড়েন। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ কোন বাছবিচার নেই। তবে কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কতটা ক্লান্ত হয়েছে। তাই ক্লান্তির প্রশ্নটাকে তাঁরা আমল দিতে চান না। দেখাতে চান যে, যাত্রারম্ভের সময় থেকে একই রকম সজীব এবং প্রাণবন্ত আছেন। আর গাড়ি চালাতেও তাঁদের কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। যদিও প্রতিটি স্নায়ু তখন বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায় ভেঙে পড়ছে এবং অনেকক্ষণ বিশ্রাম তাঁদের দরকার। অন্ততপক্ষে ঘণ্টা দুয়েকের নিরুপদ্রব ঘুম। তারপরই তাঁরা চাঙা হয়ে উঠবেন।

মনোভাবের এই মাপকাঠিতে মেয়ে-পুরুষ অভিন্ন।

—প্রমীলা

কলকাতায় 'মহেন্দী' উৎসব

জেমিনী প্রকাশন রজত-জয়ন্তী কমিটি কলামন্দিরে মেহেন্দী উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়া ও শ্রীমতী ইন্দুবালা সুখাড়িয়া উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী সুখাড়িয়া বলেন, আধুনিক সভ্যতা মেহেন্দী দূরে ঠেলে দিচ্ছে। দু হাজার বছরের পুরনো এই রীতি নষ্ট হয়ে গেলে শুধু এই শিল্প নষ্ট হবে তাই নয়, বহু দরিদ্র শিল্পীর জীবনধারণের পথ বন্ধ হবে। শ্রীমতী লক্ষ্মী চূড়াবাং স্বাগত ভাষণ দেন। কমিটির পক্ষ থেকে ঋষি জেমিনী কৌশিক বরুয়া ভাষণ দেন।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল

উৎসব বন্ধ কর! পুরোহিত আর ওই লোক দুটোকে এখনই গ্রেপ্তার কর। এই মঠের মধ্যেই কালো মুক্তো লুকোনো আছে!

পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গ পথ এক আলোকিত গুহার মুখে শেষ হয়েছে
এখন তোমার হাতে কালো মুক্তো দিলাম··· ও কিন্তু খুব শান্ত
এইটা?

এসো··· এরা তোমার নতুন রক্ষী—
হায় ভগবান! এ কি?
1192

এ জানে, ভাই
কালো মুক্তো হবে একটা ভালুক?

···দুবছর আগে সে এখানে আসে, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল যে সে হল থাকসেনের সপ্তম বড় লামার ভগ্নী

ধ্যানে আমরা জানতে পারি যে এক পবিত্র কর্তব্য সম্পন্ন করতে সে এই নীচ প্রাণী রূপে জন্ম নিয়েছে
তবে ও পবিত্র হয়ে গেল···
1193

চীনা সৈন্যরা ওইসব তোপের দিকে মঠ আক্রমণ করলে···
প্রভু তাকে ধর

আধমাইল দূরে গুহায়
সেন্ট্রি দিয়ে একে নিয়ে ত বেরোনো যাবে না
না··· এ গুহাটা পাহাড়ের অন্য দিকে— চার ঘন্টার মধ্যেই তুমি আমাদের কাছে পৌঁছবে
1194

আগেই জানা ছিল যে থাকসেনের বড় লামার পুনর্জন্ম হলে এই ভল্লুকী তাঁকে চিনবে

তাই তাঁর ভগ্নী এই রূপে আবার জন্ম নিয়েছেন— কালো মুক্তো জানে তাঁর ভাইকে তিনি চিনে নেবেন

চীনেরা এক ভুয়ো লামা খাড়া করতে চায়— একে ধরতে পারলে শেষ করে দেবে— সাবধানে রেখো!
1195

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[উনিশ শো চল্লিশের অক্টোবর। কলকাতার ছেলে বিনু এল দাদু হেমনাথের বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা ও সুনীতি। আশ্চর্য মানুষ হেমনাথ। কাঁধে তাঁর গোটা রাজদিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা। আরো আশ্চর্য তাঁরই বন্ধু লারমোর। সাদাসিধে, প্রাণবন্ত। আয়ারল্যান্ড ছেড়ে খৃস্টধর্মের প্রচারে এসে পূব-বাঙলার মাটি আর মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছেন।

লারমোর বিনুর বিস্ময়, আর যুগলের সঙ্গে তার বন্ধুর ভালোবাসা।

ক'দিন পরের সকাল। ঠাট্টা-মস্করা চলছে। ছোট্ট মেয়ে 'দুঃখী' ঝিনুকও রয়েছে। শিশির এল সপরিবার। ঝুমা একসময় বিনুকে নিয়ে ঘুরে এল। নৌকা-ভ্রমণ করবে বলে সুধা, সুনীতি, আনন্দ মেতে উঠল। নৌকোয় চাপল সুনীতি আর আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর বাঁধন ছিঁড়ে দিল সুধা।]

॥ কুড়ি ॥

পুকুরের মাঝখান থেকে সুনীতি সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে 'পাজি বাঁদর মেয়ে, মাকে বলে তোমার ফাজলামি বার করে ছাড়ব।'

আনন্দ বিব্রত, বিমূঢ়। কী করবে তা যেন ভেবে উঠতে পারছে না। হাতের ইসারায় সুধা তাকে নৌকো নিয়ে দূরে পাড়ি দিতে বলল। তার পর রুমার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছ—'

রুমা বলল, 'এ মা, শুধু শুধু রাগ করব কেন?'

'নৌকো করে বেড়াতে পারলে না বলে।'

'নৌকোয় আমি ঢের চড়েছি। আজ না হয় নাই চড়লাম।' রুমা বলতে লাগল, 'আমি কি ছেলেমানুষ যে এই জন্যে রাগ করব!'

একটু চুপ করে থেকে সুধা বলল, 'ব্যাপারটা কী জানো ভাই—'

'কী?'

'তোমার মামাটি আমার দিদিভাইয়ের—' এই পর্যন্ত বলে সুধা চোখ টিপল।

রুমাও চোখ নাচাল। সুর টেনে বলল, 'সত্যি!'

মাথা অল্প কাত করে হেসে সুধা বলল, 'সত্যি—'

'তাই বুঝি দু'জনকে চান্স করে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মতো দয়ালু মেয়ে আর কক্ষনো দেখি নি।'

'বলছ?'

'হু-উ-উ—'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর রুমা আবার বলল, 'তোমার কথা জানা রইল। দরকার হলে আমাকেও এইরকম চান্স-টান্স করে দিও—'

সকৌতুক রসালো গলায় সুধা বলল, 'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। কবে দরকার হচ্ছে?'

চোখ ছোট করে রুমা বলল, 'এক্ষুনি ঠিক বলতে পারছি না।'

কী বলতে যাচ্ছিল সুধা; হঠাৎ দেখতে পেলে বিনু, ঝুমা আর ঝিনুক পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। সুধা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কী শুনছিস রে তোরা? এ্যাই বাঁদর ছেলে—'

বিনু বলল, 'তোরা যা বলছিস তাই শুনেছি।'

সুধা তাড়া লাগাল 'খুব পাকা হয়েছ, না? যা-যা, এখান থেকে ভাগ্—'

'তোরা ভাগ্—'

সুধা রেগেমেগে উঠতে যাচ্ছিল, রুমা তার আগেই বলে উঠল, 'চল-চল, আমরা ঐ বাগানের দিকটায় যাই—'

উত্তর দিকে বাগানটা যেখানে বেতের লতা আর হলুদ রঙের লটকা ফলের গাছে ঘন হয়ে আছে সুধারা সেদিকে চলে গেল।

বিনুরা দাঁড়িয়েই ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে পুকুরটার দিকে তাকাতে গিয়েই সে অবাক; আনন্দদের নৌকোটার চিহ্নমাত্র নেই; ধান-বনের ভেতর কোথায় কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে কে জানে।

বিনুর দেখাদেখি ঝুমাও পুকুরের দিকে তাকাল। বলল, 'কী খুঁজছ?'

বিনু বলল, 'নৌকোটা কোথায় গেল বল তো—'

ভুরু নাচিয়ে ঠোঁট টিপে চাপা গলায় ঝুমা বলল, 'আমার মামা তোমার দিদিকে নিয়ে হয়তো—'

'কী?'

'আমরা যেখানে গিয়েছিলুম সেখানে প্যালিয়ে গেছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে ভয়ে ভয়ে বিনু বলল, 'জানো, আমার বড়দিটা না আবার সাঁতার জানে না। ফুল তুলতে গিয়ে কি কাউফল পাড়তে গিয়ে যদি জলে পড়ে যায়—'

ঝুমা বলল, 'এই জন্যে তুমি ভয় পাচ্ছ?'

'হুঁ—'

'কোন ভয় নেই। আমার মামাই তো সঙ্গে আছে।'

'তোমার মামা বুঝি সাঁতার জানে—'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মতো?'

'আমার চাইতে ঢের ঢের ভালো। তোমার দিদি যদি জলে পড়ে যায় মামা ঠিক তুলে আনবে।'

আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে খুব আস্তে আস্তে বিনু বলল, 'যেমনি করে তুমি আমায় তুলে এনেছিলে?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে ঝুমা বলল, 'কেমন করে আনবে জানি না। একেকজন একেকরকম করে তুলে আনে। আমি তো তোমার চুলের মুঠি ধরে তুলেছিলাম। কেউ কেউ আবার জড়িয়ে ধরেও তোলে।'

হঠাৎ গলা চড়িয়ে বিনু বলে উঠল, 'কক্ষনো না।'

ঝুমা অবাক, 'কী!'

'তোমার মামা আমার দিদিকে কক্ষনো জড়িয়ে ধরে তুলবে না।'

'যেমন করে পারে তুলুক, তাতে তোমার কী, আমার কী? চল, এখন বাড়ি যাই—'

আগে আগে বিনু আর ঝুমা চলেছে পেছনে ঝিনুক।

যেতে যেতে সরু গলায় ঝুমা ডাকল-'এ্যাই—'

বিনু অন্যমনস্কের মতন হাঁটছিল তাড়াতাড়ি চোখ তুলে পাশের দিকে তাকাল।

ঝুমা বলল, 'সেই কথাটা কিন্তু কাউকে বোলো না।'

'কোন্ কথাটা?'

হাদারাম সিকদার। একটু আগে কাউফ-ল পাড়তে গিয়ে কী হয়েছিল মশাই?'

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে ঝিনুককে দেখে ল বিনু। মেয়েটা গোয়েন্দা চোখে এক-দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি নু বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার মনে ছে।'

সেই কথাটা বললে দুজনেরই কিন্তু—'

'কী?'

কানের কাছে মুখ এনে ঝুমা ফিস-ফিস বল, 'মার হবে।'

সেই অবস্থাতেই বিনু যতখানি পারল, ঘাড় কাঁপিয়ে ঝিনুককে দেখতে চেষ্টা ল। মেয়েটা ঝুমার কথা শুনবার জন্য ন খাড়া করে আছে।

এ সময় তারা বাড়ি এসে গেল।

●

দুপুরের দেউড়ি পেরিয়ে সূর্যটা যখন দিকে অনেকখানি ঢলেছে, রোদের রঙে হলুদ আভা, সেই সময় খাবার ডাক ল।

রান্নাঘরের লম্বা বারান্দায় সারি সারি সন পড়েছে। সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে তে দেওয়া হল।

আনন্দ সুধা-সুনীতি-ঝুমা-রুমা আর বসেছে একদিকে। আরেকদিকে ... শিশির এবং হেমনাথ।

খেতে খেতে আড়ে আড়ে সুধা আর আনন্দ-সুনীতিকে দেখতে লাগল। চোখেমুখে ঝিকমিক সকৌতুক হাসি মাখানো।

সুনীতি চোখ তুলে কারো দিকে তাকাচ্ছে না; ঘাড় গুঁজে পাতের ওপর ঝুঁকে আছে। আর খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়ে যাচ্ছে। ডাল-ভাজা-মাছ দিয়ে সাজানো একখানা কাঁসার থালা ছাড়া তার পাশে সামনে-পেছনে আর কিছুই যেন নেই, সংসার সব মুছে গেছে।

দু-চারবার ডাকাডাকি করে যখন সাড়া পেল না, তখন আনন্দর ফিরল। গলার খুব গভীর থেকে 'এই যে—এই যে মশাই—'

আনন্দ তাকাল। হেসে হেসে বলল, 'কী হল?'

'... কেমন?'

'...।'

তার তারাদুটো খঞ্জনপাখির মতন নেচে বেড়াল সুধার। তারপর সে নৌকোভ্রমণ কেমন লাগল?'

আধবোজা চোখে আধফোটা গলায় বলল, 'ঐ একরকম।'

অবাক হবার মতন করে সুধা বলল, 'কে কি মশাই!'

'... কী রকম?'

'... চমৎকার।'

... খানিক বাঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ, তাই—'

... বলল, 'কি রকম একখানা সুযোগ দিলাম বলুন তো—'

'ধন্যবাদ।'

'শুধু ধন্যবাদে চলবে না।'

'তবে?'

'তার জন্যে পুরস্কার চাই।'

'কী পুরস্কার?'

'সে আপনি জানেন।'

একটু কি ভেবে নিয়ে আনন্দ বলল, 'এক্ষুনি তো আর দেওয়া যাবে না; পুরস্কারের কথাটা মনে থাকল। আমাকে যেরকম সুযোগ করে দিয়েছেন তেমনি একটি সুযোগ-টুযোগ আপনাকেও—'

সরু করে জিভ বার করে দ্রুত ভেংচে দিল সুধা, 'এ-হে-হে।' তারপর সুনীতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নৌকোয় সময়টা বেশ কাটল, না রে দিদি।'

সুনীতি চুপ। পাতের দিকে ঝুঁকেই ছিল সে, আরো অনেকখানি নুয়ে পড়ল।

ওদিকে বারান্দার দূর প্রান্তে আরেকটা খেলা চলছে। বিনু খুব মনোযোগ দিয়ে সুধাদের কথা শুনছিল। আর তার পাশ থেকে একটু পর পরই ফিস-ফিস ডেকে যাচ্ছিল ঝিনুক, 'এ্যাই—এ্যাই—এ্যাই—'

ক'দিন হল বিনুরা রাজদিয়ায় এসেছে; এর ভেতর তার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি ঝিনুক। আজ তাকে ডাকতে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিনু; কিন্তু তার চাইতেও বড় বিস্ময় ছিল সুধাদের দিকে। বিনুর চোখ-কান-মন, সব সুধারাই আকর্ষণ করে রেখেছিল। ফলে ঝিনুকের ডাকটা শুনতে পেলেও সে সাড়া দিচ্ছিল না, অন্যমনস্কের মতন বসে ছিল।

সুধা একটু থামলে ঝিনুকের দিকে ফিরল বিনু। সুধাদের কথা শুনতে শুনতে আবছাভাবে যে বিস্ময়টা সে অনুভব করছিল এবার তা মুখেচোখে খুব স্পষ্ট ফুটে বেরুল।

ঝিনুক তাকিয়েই ছিল। চোখাচোখি হতে বলল, 'কতক্ষণ ধরে তোমায় ডাকছি, শুনতে পাও না?'

বিনু বলল, 'ডাকছ কেন?'

'তখন নৌকোয় করে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?'

'ঐ ধানখেতের ওধারে।'

'কী করতে?'

কী করতে গিয়েছিল, বিনু বলল।

ঝিনুক বলল, 'খুব ফুলটুল তুললে তা হলে।'

'হুঁ—' বিনু ঘাড় কাত করল।

একটু চুপ করে থেকে ঝিনুক বলল, 'কাউফল পাড়তে গিয়ে তোমার কী হয়েছিল?'

বিনু ভীষণ চমকে উঠল। ভীতু চোখে ঝিনুককে দেখতে দেখতে বলল, 'কী আবার হবে! কিচ্ছু হয়নি তো—'

বিনুর চোখের ভেতর তাকিয়ে ঝিনুক বলল, 'নিশ্চয়ই হয়েছে।'

কাঁপা সুরে বিনু বলল, 'সত্যি বলছি হয় নি।'

'তা হলে ও তোমাকে কী একটা কথা বলতে মানা করল কেন?' বলে আড়চোখে ঝুমাকে দেখিয়ে দিল ঝিনুক।

চট করে মনে মনে বানিয়ে নিয়ে বিনু বলল, 'ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। কাউফল পাড়তে যখন যাই একটা কাক আমার মাথায় ঠুকরে দিয়েছিল। সেই কথাটা বলতে মানা করেছে ঝুমা।'

একদৃষ্টে তাকিয়েই ছিল ঝিনুক। খুব আস্তে আস্তে সে মাথা নাড়ল, 'উঁহু—উঁহু—উঁহু—'

'কী?'

'কাক নয়।'

'তবে কী?'

'আর কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ।'

'না-না, আর কিচ্ছু হয় নি।'

'মা কালীর দিব্যি বল।'

'তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'মা কালীর দিব্যি বললে বিশ্বাস হবে।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওধার থেকে হেমনাথ ডেকে উঠলেন, 'আনন্দ—'

সুধা-আনন্দ-সুনীতি আর রুমার মধ্যে সেই মজার খেলাটা চলছিল। চাপা মৃদু গলায় তারা কথা বলছিল, হাসাহাসি করছিল। ডাকটা শুনতে পায় নি সে।

হেমনাথ রগড়ে গলায় আবার ডাকলেন, 'এই যে বাঘ-ভাল্লুক-মারিয়ে—'

চমকে আনন্দ তাকাল, 'আজ্ঞে, আমায় ডাকছেন।'

হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন, ইঙ্গিতময় সুরে বললেন, 'আপনি কি ওদিকে খুব ব্যস্ত?'

আনন্দ হকচকিয়ে গেল। মুখ ঈষৎ নত করে আস্তে আস্তে বলল, 'আজ্ঞে না। এমনি গল্প করছিলাম।'

হেমনাথ বললেন, 'কী গল্প?'

'এই নানারকম, আজে বাজে—'

'যুবক-যুবতীদের কথায় আমাদের থাকতে নেই। সে যাক গে—'

এই সময় সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি দাদু!'

সুধার গলায় এমন একটা সুর ছিল যাতে থতিয়ে গেলেন হেমনাথ। বললেন, 'কী রে?'

'তখন না বললেন আপনি ইয়ং ম্যান একটা দাঁত পড়ে নি, চামড়া কোঁচকায় নি, চশমা ছাড়া দশ মাইল দূরের জিনিস দেখতে পান। আরো কত কী। আমাদের নিয়ে একটা মোগল হারেমও খুলতে চেয়েছিলেন। এখন বলছেন যুবক-যুবতীদের কথায় থাকেন না। তবে কি আপনি বুড়ো?'

'খুব ধরেছিস দিদি, খুব ধরেছিস—' হেমনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন, শরতের দমকা হাওয়ায় তাঁর হাসির শব্দ এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল।

হাসি থামলে আবার আনন্দকে নিয়ে পড়লেন হেমনাথ, 'তুমি ত ইস্টবেঙ্গলে এই প্রথম এলে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—আনন্দ মাথা নাড়ল।

'কেমন লাগছে জায়গাটা?'

'ভাল। তবে বড্ড জল; কোথাও বেরুনো যায় না।'

'এলেই তো বর্ষার সময়; জল থাকবে না?'

'বর্ষা কোথায়, এ তো আশ্বিন মাস—শরৎকাল।'

'আমাদের বর্ষা আরম্ভ হয় আষাঢ়ের গোড়ায়, চলে একটানা কার্তিক মাস পর্যন্ত। অঘ্রাণে কি পৌষে এলে দেখতে মাঠের জল নেই, চারদিক শুকনো খটখটে।'

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, 'জামাইবাবু বলেছিলেন, এ সময় এলে ভাল গেম হবে। আমি ছররা-টররা, কার্তুজ-বন্দুক, সব নিয়ে এসেছিলাম। বাঘটাঘ দূরে থাক, এই জলের ভেতর কোথায় গিয়ে যে দুটো পাখি মারব ভেবে পাচ্ছি না।'

হেমনাথ অবাক। বললেন, 'পাখি শিকারের জায়গাও তোমায় কেউ দেখিয়ে দ্যায় নি!'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক আছে, যুগলের সঙ্গে তোমাকে নিশিন্দার চরে পাঠিয়ে দেব। কত পাখি মারতে পার, একবার দেখব।'

আনন্দ প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'কবে পাঠাবেন?'

'যেদিন বলবে।'

'কাল?'

'বেশ তো।'

এই সময় শিশির বললেন, 'কাল কেমন করে যাবে? কাল বারোড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন আছে না?'

আনন্দ বলল, 'তা হলে পরশুটরশু—' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল, 'এক কাজ করলে কী হয়?'

হেমনাথ, শিশির, অবনীমোহন—সবাই উৎসুক হলেন।

আনন্দ বলতে লাগল, 'একা একা আমি না গিয়ে, সবাই মিলে গেলে কেমন হয়? সকালবেলা খাবার-টাবার নিয়ে বেরিয়ে যাব, পাখি-টাখি শিকার করে ফিরব সেই রাত্তিরে।'

অবনীমোহন বিপুল উৎসাহে সমর্থন জানালেন, 'চমৎকার আইডিয়া। সবাই মিলে একসঙ্গে একটা দিন হৈ-হৈ করে কাটানো যাবে।'

অবনীমোহন সেই মানুষ সব সময় মনোহর কিছুর জন্য যাঁরা উন্মুখ হয়ে আছেন; হাতের কাছে যখন যে স্রোতটি পান তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছোট-বড় যেরকম ঢেউই উঠুক না, তাই তাঁকে দুলিয়ে যায়। তিনি বলতে লাগলেন, 'জানো আনন্দ, কম বয়েসে দু-চারটে পাখি আমিও মেরেছি।'

এবার আনন্দর অবাক হবার পালা, 'তাই নাকি!'

ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার কাছে এক্সটা বন্দুক-টন্দুক আছে?'

'আছে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল। বুড়ো বয়েসে একবার চাঁদমারি করে দেখা যাবে, কেমন হয়।'

সুরমা স্নেহলতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নাক কুঁচকে, চোখের মণিতে আলতো করে কপট তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বললেন, 'তুমি মারবে পাখি, তবেই হয়েছে! গাছের ডালে পাখির মনে পাখি বসেই থাকবে, তোমার গুলি যাবে তিন মাইল দূরে দিয়ে। শুধু শুধু ছররা-টররা নষ্ট।'

হেমনাথ বললেন, 'না পারলেই বা কী। আনন্দ করতে যাওয়া, সেটা হলেই হল।'

স্নেহলতা বললেন, 'আমাকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে নাকি?'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই! সবাই যাবে আর আপনি বাড়ি বসে থাকবেন, তা হতে পারে না। তা হলে আনন্দের অর্ধেকটাই মাটি।'

'আমি কিন্তু পরশুদিন যেতে পারব না।'

হেমনাথ বললেন, 'কেন?'

'আমার সেদিন উপোষ।'

'তা হলে কবে যাবে?'

'এক্ষুনি কি করে বলি? এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে চলে?'

ঠিক হল, কালও না, পরশুও না—পরে সুবিধে মতন একটা দিন ঠিক করে নিশিন্দার চরে শিকারে যাওয়া হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সারা বিকেল গল্প করে সন্ধ্যের আগে আগে শিশিররা চলে গেলেন। তারপরও অনেকক্ষণ ওদের কথা হল, বিশেষ করে আনন্দর।

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ ছেলেটি।'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, খুব স্মার্ট। দেখতেও সুন্দর।'

আনন্দর কথায় শিকার-প্রসঙ্গ উঠল। খুব তাড়াতাড়িই একদিন নিশিন্দার চরে গিয়ে পাখিদের রাজ্যে হানা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অবনীমোহন।

এদিকে একধারে বসে চাপা আধফোটা গলায় সুধা সুনীতিকে বলতে লাগল, 'শুনছিস দিদি, শুনছিস—'

অস্বস্তির গলায় সুনীতি বলল, 'কী আবার শুনব?'

'বাবা কেমন আনন্দবাবুর ভক্ত হয়ে উঠেছে।'

'উঠেছে তো বেশ করেছে।'

'আমার কী মনে হয় জানিস?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুনীতি বলল, 'জানতে চাই না।'

সুনীতির মুখ যেদিকে সেদিকে গিয়ে আঙুলের ডগায় তার চিবুকটা তুলে ধরল সুধা। লঘু কৌতুকের গলায় বলল, 'আনন্দবাবুকে বাবা বোধহয় জামাই করে নেবে।'

সুনীতি ভেংচে ভেংচে বলল, 'তোকে বলেছে।'

'এখনও বলেনি। তবে বাবার ভাবগতিক দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

চট করে কী ভেবে নিয়ে তরল পরিহাসের চোখে বোনের দিকে তাকাল সুনীতি, 'বাবার ভাবগতিক দেখে আমার কিন্তু আরেকটা কথা মনে হয়—'

ঠিক বুঝতে না পেরে সুধা বলল, 'কী?'

'আনন্দবাবুর আগে হিরণবাবুকে [illegible] বাবা জামাই করে নেবে।'

চোখ পাকিয়ে সুধা বলল, 'ভাল হ[illegible] না বলছি দিদি।'

কাছাকাছি বসে শুনতে শুনতে [illegible] টের পাচ্ছিল আনন্দ আর হিরণকে [illegible] দুই দিদির ভেতর এক মজার খেলা শুরু হয়েছে।

●

শিশিররা যখন যান তখনও একটু [illegible] ছিল—শরৎকালের বেলাশেষের [illegible] একটু আলো। দেখতে দেখতে সেটুকু[illegible] আর থাকল না। লাটাইতে সুতো [illegible] মতন গাছপালার মাথা থেকে, ঝকঝকে নীলাকাশ থেকে, তুলোর পাহাড়ের [illegible] ভারহীন মেঘেদের গা থেকে কেউ [illegible] অতি দ্রুত অবেলার রোদ [illegible] লাগল। তারপরেই সমস্ত চরাচর [illegible] একখানা কালচে রঙের অদৃশ্য জাল [illegible] পড়ল। দেখতে দেখতে রোদমাখা [illegible] গাছগাছালি, দূরের জলপূর্ণ প্রান্তর—সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল। [illegible] সন্ধ্যে লম্বা পায়ে নেমে আসতে লাগল।

ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে যেমন জল [illegible] যায় তেমনি করে হৈ-চৈ, হুল্লোড়, [illegible] ছুটির ভেতর দিয়ে দিনটা কখন [illegible] গেছে টের পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যের [illegible] যখন আকাশের দূর প্রান্তে এক [illegible] চাঁদ উঠল, আবছা আলোয় অন্ধকার[illegible] জলো কালির মতন দেখাতে লাগল, [illegible] খেতে জোনাকি জ্বলতে লাগল মিটমিটি [illegible] আর অবনীমোহনদের গল্প, সুধা-সুনী[illegible] লঘু সুরের পরিহাস জমে উঠতে লাগ[illegible] সেই সময় চোখের পাতা জুড়ে এল [illegible] বসে বসেই ঢুলতে লাগল সে

স্নেহলতা দেখতে পেয়েছিলেন [illegible] বললেন, 'এই দাদাভাই—'

চোখ পুরোপুরি মেলে তাকাতে [illegible] করল বিনু, পারল না। আধফোটা [illegible] একবার তাকিয়েই আবার চোখ বুজল।

স্নেহলতা বলল, 'ঘুম পেয়েছে [illegible]'

'হুঁ—' অস্ফুটে উত্তর দিয়ে [illegible] করে মাথা নাড়ল বিনু।

সুরমা বললেন, 'ঘুম পাবে না [illegible] কী, সারা দিনে এক মুহূর্তও [illegible] পেতে বসে! সবসময় খালি [illegible] হুটোপুটি—সন্ধ্যে হলেই আর [illegible] থাকতে পারে না।'

অবনীমোহন বললেন, 'রাজদিয়া [illegible] থেকে তো বইটইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক [illegible] গেছে। পড়া নেই শোনা নেই, ফিরে [illegible] এ্যানুয়েল পরীক্ষাটা তো দিতে [illegible] বলতে বলতে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, '[illegible] থেকে ওদের বই বার করেছ?'

সুরমা বললেন, 'না।'

'আজ রাত্তিরেই বার করে রাখবে [illegible]'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, খালি [illegible] বেড়ালেই চলবে না; পড়াশোনাও [illegible] হবে। চর্চা না থাকলে সব ভুলে [illegible] কাল থেকে সকালবেলাটা শুধু লেখাপ[illegible]

[স্নে]হলতা বললেন, 'কালকের কথা [কা]লকে হবে। আয় রে দাদাভাই, ঝিনুকও [আ]য়—তোদের একেবারে খাইয়ে বিছানায় [শু]ইয়ে দিই।'

[ঘু]মের ঘোরেই খেয়ে নিল বিনু। [অ]স্পষ্টভাবে টের পেল তার পাশে বসে [ঝি]নুকও খাচ্ছে: নিজে খাচ্ছে না, কেউ [খা]ইয়ে দিচ্ছে। কে দিচ্ছে, বোঝা গেল না। [বো]ঝবার চেষ্টা করল না বিনু।

[রা]ত্তিরে বিনু আর ঝিনুক পুবের ঘরে [হে]মনাথের কাছে থাকে। দুজনকে খাইয়ে-[শু]ইয়ে সেখানে দিয়ে গেলেন স্নেহলতা। [হে]মনাথের শুতে এখনও অনেক দেরি। [হা]ত-মুখ ধোবেন, খাবেন, কিছুক্ষণ বইটই [প]ড়বেন। তারপর তো শোওয়া।

[স্নে]হলতার সঙ্গে ঢুলতে ঢুলতে এ [ঘ]রে এসেছিল বিনু। চোখ দুটো জুড়েই [ছি]ল। বিছানায় পড়ামাত্র রাজ্যের ঘুম চার-[দি]ক থেকে তাকে যেন ঘিরে ধরল।

[গা]ঢ় ঘুমে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ [বি]নুর মনে হল, ছোট ছোট হাত দিয়ে [কে]উ তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সমানে বলছে, [এ]াই-এ্যাই-এ্যাই—'

[ঘ]র প্রায় অন্ধকার। মাথার দিকের [টে]বিলে একটা হারিকেন নিবু-নিবু হয়ে [জ্ব]লছে; স্নেহলতা যাবার সময় চাবি [ঘু]রিয়ে ঘুরিয়ে ওটার জোর কমিয়ে দিয়ে [গে]ছেন।

[আ]বছা আলোয় চোখ মেলে একবার [দে]খে নিল বিনু। এমনিতে হেমনাথ মাঝ-[খা]নে শোন; তাঁর দুধারে তারা [দু]জন থাকে। আজও মাঝখানে [হে]মনাথের জায়গা রেখে বিনুরা [শু]য়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে [ঝি]নুকটা অনেকখানি কাছে সরে এসেছে; [দু]ই তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, ডাকাডাকি [ক]রছে।

[চো]খ মেলতেই চোখাচোখি হয়ে গিয়ে-[ছি]ল। ঝিনুক বলল, 'তোমার বড্ড ঘুম; [খা]ট ভোঁস করে খালি নাক ডাকে।'

[বি]রক্ত জড়ানো গলায় বিনু বলল, [ডা]কছ কেন?'

'[ত]খন তো মা কালীর দিব্যি বললে [না]—'

[বি]নু ভুলে গিয়েছিল। বলল, 'মা [কা]লীর দিব্যি বলব কেন?'

[ঝি]নুক অবাক, 'বা রে, মনে নেই!'

'[উ]হু—'

'[তো]মার সঙ্গে কাউফল পাড়তে গিয়ে [ছি]লাম, তখন জিজ্ঞেস করলাম। তুমি [ব]ললে, কিছুই হয় নি। তখন মা কালীর [দি]ব্যি বলতে বললাম। এবার মনে পড়ছে?'

বিনু হতভম্ভ। কী শয়তান মেয়ে রে! কথাটা একদম ভোলে নি; কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ঝিনুক বলল, 'বল, মা কালীর দিব্যি বল—'

মা কালীর নামে দিব্যি করতে বিনুর খুব আপত্তি। দেবতাদের মধ্যে কালীকেই তার সব চাইতে বেশি ভয়। হাতে খঙ্গ, গলায় অসুর মুণ্ডের মালা—এই ভয়ংকরী দেবীটি সম্বন্ধে অনেক সাংঘাতিক সাংঘাতিক গল্প বিনুর জানা। সেই জন্যেই তাঁকে ঘাটাতে চায় না সে।

বিনু বলল, 'শুধু শুধু দিব্যি কাটব কেন? তোমাকে তো বললাম, কাউ পাড়তে গিয়ে কিছু হয় নি।'

চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'বুঝেছি।'

'কী?'

'দিব্যি দিতে ভয় পাচ্ছ। নিশ্চয়ই কাউ পাড়তে গিয়ে কিছু হয়েছে। শিগগির আমাকে বল, নইলে—'

'নইলে কী?'

'আমি তোমার মা-বাবাকে বলে দেব।'

বিনু চমকে উঠল, 'কী বলবে?'

ঝিনুক বলতে লাগল, 'তোমার চুল-গুলো আর জামা-প্যান্ট কেমন দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয়, তুমি জলে পড়ে গিয়েছিলে।'

কাজেই আর গোপন রাখা গেল না। কাউফল পাড়ার সময় যা-যা ঘটেছিল, সব বলে ফেলল বিনু।

সমস্ত শুনে ঝিনুক বলল, 'খুব তো লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলে, পারলে?'

বিনু চুপ।

ঝিনুক আবার বলল, 'জানো, আমায় কেউ ফাঁকি দিতে পারে না।'

কথাটা যে হাজারবার সত্যি মনে মনে বিনুকে তা মানতেই হল।

ঝিনুক বলল, 'আর কখনো আমাকে ফাঁকি দেবে না, বুঝলে?'

'আচ্ছা'—সুবোধ ছেলের মতন ঘাড় কাত করল বিনু।

'দিতে চেষ্টা করলে কিন্তু ঠিক ধরে ফেলব।'

একটু চুপ করে থেকে করুণ অনুনয়ের সুরে বিনু বলল, 'তোমায় সব বললাম, জলে পড়ার কথাটা মা-বাবাকে বোলো না কিন্তু—'

'বললে কী হবে?'

'খুব মারবে।'

'আচ্ছা বলব না। তবে—'

'কী?'

'আমি যা বলব তাই করবে তো?'

যে কোন শর্তেই এখন বিনু রাজী। তক্ষুনি ঘাড় কাত করল সে, 'হ্যাঁ।'

একটু ভেবে ঝিনুক বলল, 'আমার ঘুম পেয়েছে; আর কথা বলতে পারছি না।'

বিনু বলল, 'আমিও।'

'এসো ঘুমিয়ে পড়ি।'

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বিনুর মনে হল, ঝিনুকের কাছে কিছুই গোপন করা যাবে না। যে সিন্দুকেই পুরে রাখুক না, কুলুপ ভেঙে মেয়েটা সেটি ঠিক বার করে নেবেই।

(ক্রমশ)

ভাষার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা জানেন, ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি প্রধান স্তর——প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা আর নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা। ছোটো করে ইংরেজীতে ও-আই-এ, এম-আই-এ, আর এন-আই-এ। অর্থাৎ ভাষার ক্ষেত্রে প্রাচীন আছে, স্বল্প প্রাচীন আছে আর আধুনিক আছে।

কিন্তু লোকসাহিত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা প্রাচীন লোকগীতি, স্বল্প প্রাচীন লোকগীতি আর আধুনিক লোকগীতি বলে তিনটি স্তর পান নি। তাঁদের মতে লোকগীতি কখনও প্রাচীন হয় না, লোকগীতি সব সময়েই আধুনিক। জর্জ হিরজোগ নামে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলেছেন, 'Folk-songs are best defined as songs which are current in the repertory of Folk-group
অর্থাৎ লোকগীতি সব সময়েই আধুনিক।

লোকসাহিত্যের সকল বিষয়ের মতো লোকগীতিও মৌখিক প্রচার লাভ করেছে এবং এই বৈশিষ্ট্যটি অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে। পল্লীর অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও লোকগীতি বহুল প্রচার লাভ করেছে, কিন্তু কখনও তা লিখে রাখার রীতি প্রচলিত হয় নি। শিক্ষিত পল্লীগায়কও কেবল তাঁর স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করে লোকগীতি গাইতেন, লিখিত কোনো পুঁথি কিংবা গ্রন্থ অবলম্বন করে কদাচ তা গীত হ'ত না। সেই কারণে গীতিকা বা অন্য কোনো কোনো বিষয়ে হাতে লেখা পুঁথি কদাচিৎ আবিষ্কৃত হলেও লোকগীতির কোনো লিখিত পরিচয়ের সন্ধান পাবার উপায় নেই। পল্লীবাসীর মুখে মুখেই তার রচনা, মুখে মুখেই তার প্রচার—কেবল স্মৃতির মধ্যেই তার অবস্থান। এই রীতি পুরুষানুক্রমিকভাবে চলে আসছে।

লোকগীতি স্মৃতির জিনিস, স্মৃতিপট থেকে যখন মুছে যায় তখন তা বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যায়। আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রাচীন লোকগীতির সন্ধান মেলে না। লোকসাহিত্যের গবেষকরা অনেক সন্ধান করেছেন, একটি প্রাচীন লোকগীতিও উদ্ধার করতে পারেন নি।

কিন্তু আকাশবাণীর সঙ্গীত বিভাগ পেরেছেন। তাঁরা বহু প্রাচীন লোকগীতি উদ্ধার করেছেন, এবং সেগুলি নিয়মিত প্রচার করে চলেছেন। আকাশবাণীর ঘোষক-ঘোষিকারা অহরহ বলছেন, 'এখন প্রাচীন লোকগীতি গাইছেন...' কিংবা 'এতক্ষণ প্রাচীন লোকগীতি গেয়ে শোনালেন...' ইত্যাদি।

আকাশবাণীর সংগীত বিভাগ কোথা থেকে, কোন্ সূত্রে, কীভাবে এমন অগণিত প্রাচীন লোকগীতি আবিষ্কার করেছেন তা তাঁরা কখনও প্রকাশ করেননি। করলে ভালো হ'ত, লোকসাহিত্যের গবেষকদের মস্ত উপকার হ'ত।

কিন্তু এই উপকার তাঁরা করতে পারবেন না, প্রাচীন লোকগীতির আবিষ্কারস্থল তাঁরা জানাতে পারবেন না। কারণ, তাঁদের কাছে প্রাচীন শব্দের ভিন্ন অর্থ। অভিধানের অর্থ তাঁরা মানেন না। কিংবা তাঁদের কাছে অভিধান নেই, থাকলেও উলটে দেখেন না। যে লোকগীতির রচয়িতার নাম তাঁদের জানা নেই সেই লোকগীতিকে তাঁরা প্রাচীন লোকগীতি বলে ঘোষণা করেন, শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করেন। যে লোকগীতির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না সেই লোকগীতির পরিচয় হিসাবে তাঁরা খাতায় লেখেন ট্র্যাডিশনাল, মাইকে বলেন প্রাচীন। আবার যেসব লোকগীতির রচয়িতার নাম তাঁদের হঠাৎ মনে পড়ে না সেইসব লোকগীতিকেও তাঁরা প্রাচীন লোকগীতি বলে ঘোষণা করেন, তা সে গীতিকার যত বিখ্যাতই হোন না কেন। এমন বহুবার দেখা গেছে যে, বিগত দিনের খ্যাতনামা বহু গীতিকারের রচনাকে তাঁরা প্রাচীন বলে চালিয়েছেন।

প্রাচীনের অর্থবোধ হওয়া দরকার, প্রাচীন লোকগীতির অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। এই বিভাগে লোকসাহিত্য বিষয়ে অবহিত ব্যক্তি না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু লোকগীতি বিষয়ে অবহিত ব্যক্তি থাকা একান্ত দরকার। তা না হলে যে ক্ষতি হবে, সে ক্ষতি কেবল প্রাচীনত্ব আর অর্বাচীনত্বের ক্ষেত্রে নয়, লোকগীতিরই ক্ষেত্রে—লোকগীতির কথার ক্ষেত্রে, সুরের ক্ষেত্রে।

ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। প্রাচীন লোকগীতি বলে যেমন একশ্রেণীর লোকগীতি সৃষ্টি হয়েছে তেমনি লোকগীতির নামে অ-লোকগীতি এসে প্রবেশ করেছে, লোকগীতি বিকৃত হয়েছে। আকাশবাণীর লোকগীতির ক্ষেত্রে বহু অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। লোকজীবনের সঙ্গে আলাপ নেই, লোকপরিবেশের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বহু গায়ক-গায়িকা লোকগীতি গাইবার ছাড়পত্র পেয়ে লোকগীতির অপমৃত্যু ঘটাচ্ছেন। সময় থাকতে এটা রোধ করা দরকার। তার জন্য সংগীত বিভাগে একজন লোকগীতি-বিশেষজ্ঞ থাকা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৫শে ডিসেম্বর রাত সওয়া ১০টায় পূর্বাঞ্চল প্রসংগে কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল। এইদিনকার পূর্বাঞ্চল প্রসংগের বিষয় ছিল দানীবাবু ও মনোমোহন ঘোষের স্মরণোৎসব, একটি সংগীত সম্মেলন ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত হাটেবাজারে চলচ্চিত্রের সংলাপাংশ। শ্রোতাদের কাছে এই হাটেবাজারে চলচ্চিত্রের সংলাপাংশই ছিল সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। আর সবচেয়ে ছোটো আকর্ষণ ছিল দানীবাবুর স্মরণোৎসব, কারণ এই অংশটুকু ১৬ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯টার সংবাদ বিচিত্রায় একবার শোনা গেছে। একই জিনিসের পুনঃশ্রুতিতে আকর্ষণ কমতে বাধ্য। তাছাড়া ঘন ঘন একই জিনিসের পুনঃপ্রচারের অর্থও পরিষ্কার হয় না।

এই দিনকার পূর্বাঞ্চল প্রসংগে বৈচিত্র্য থাকলেও বৈশিষ্ট্য ছিল না। রেকর্ডিং পীড়াদায়ক, গ্রন্থনা ক্লান্তিকর। অনুষ্ঠানটিতে প্রাণ সঞ্চারের জন্য গ্রন্থিকের আর একটু বলিষ্ঠ হওয়া দরকার।

২৫শে ডিসেম্বর সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী স্নিগ্ধা ঘোষের কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত ভালো লাগল। কিন্তু সেই মহিমময়ী প্রাচীনা ঘোষিকা সবটা শুনতে দিলেন না, শেষ হবার আগেই কেটে দিলেন।

এইদিন রাত সওয়া ১০টার সংবাদ বিচিত্রাটি ছিল বড়ো নিরুত্তাপ। শীতের রাত বলেই যে বেশি উত্তাপ অনুভূত হয় নি তা নয়, এর ভিতরে উত্তাপই ছিল কম। এইদিনকার সংবাদ বিচিত্রার বিষয়বস্তু ছিল অ্যাপোলো-৮, টেনিস ও ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ। অনুষ্ঠানটির মধ্যে একটুখানি চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল অ্যাপোলো-৮য়ের চন্দ্রযাত্রা সম্পর্কে ভয়েস অভ আমেরিকার ধারাবিবরণীর পুনঃপ্রচারে। এই চিন্তাটা প্রশংসনীয়—অনুষ্ঠানটার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এই অ্যাপোলো-৮য়ের চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে চিন্তার আর একটু প্রসারতা দেখা গেছে এ বিষয়ে কলকাতার বিজ্ঞানী, ছাত্র-গবেষক ও অফিসযাত্রীর বক্তব্য প্রচারে—যদিও এ'দের কারও বক্তব্যের মধ্যে অভিনবত্ব কিছু ছিল না। উচ্ছ্বাসও না, আগ্রহও না। ছিল শুধু একটা কর্তব্য। সেই শুষ্ক কর্তব্য শ্রোতৃমন্ডলীকে স্পর্শ না-ও করে থাকতে পারে। এই কর্তব্যপালনে প্রযোজকের আর একটু আন্তরিক হওয়া উচিত ছিল।

৩১শে ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টায় লোকগীতি শোনালেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁর কণ্ঠে পল্লীর সুরটি বেশ ফুটে উঠেছিল, পল্লীভাবাপন্ন মনে হয়েছিল।

১লা জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায় দিল্লীর খবরে ঐকামত বলে একটি শব্দ শোনা গেল। স্কুলের ছাত্রদের আগে ঐক্যতান বলে একটি ভুল শব্দ শুদ্ধ করার জন্য দেওয়া হ'ত। এখন দিল্লীর বাংলা সংবাদ বিভাগের কর্মীদের ঐকামত শব্দটি শুদ্ধ করার জন্য দেওয়া উচিত। দিল্লীর বাংলা সংবাদ বিভাগে অভিধান আছে তো? থাকলে ঐকামত বলে কোনো শব্দ আছে কিনা একবার দেখে নেওয়া দরকার।

এইদিন সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীত শোনাচ্ছিলেন শ্রীমতী অদিতি সেনগুপ্ত, বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু ঐ যে এক মহিমময়ী প্রাচীনা ঘোষিকার কথা বলা হয়েছে, তিনিই এই গানের ঘোষিকা ছিলেন এবং তাঁর রীতি অনুযায়ী শেষ গানের শেষটা শুনতে দেন নি, আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই মহিমময়ী প্রাচীনা ঘোষিকার যে কিসের বিদ্বেষ, বোঝা যায় না। কেন যে তিনি এমন করেন, তা-ও না।

১লা জানুয়ারী বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ মাঝে দু-বার কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার জায়গায় দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত শোনা গিয়েছিল। আকাশবাণীর হঠাৎ সংগীতপ্রীতি উথলে উঠেছিল কেন বোঝা গেল না। না কি এটা কন্ট্রোলরুমের কেরামতি? ......রাত সওয়া ১০টায় শ্রীদীনেন্দ্র চৌধুরীর কণ্ঠে লোকগীতি শোনা গেল। এই তরুণ শিল্পীর কণ্ঠে যেমন সুর আছে তেমনি আছে রস।

৩রা জানুয়ারী সকাল সাড়ে ৯টায় শ্রীমতী ঊর্মিলা ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত শুনে আশান্বিত হওয়া গেল। বেশ সুরেলা গলা, উচ্চারণে কৃত্রিমতা নেই, জড়তা নেই। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর।

এইদিন রাত ৮টায় নাটক ছিল 'সুরজিৎ'। রচয়িতা হিসাবে বাংলা 'বেতার জগৎ' আর ইংরেজী 'আকাশবাণী' পত্রিকার নাম ছাপা হয়েছে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কিন্তু নাটকের আগে ও পরে বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে ইন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পরে এফিডেভিট করে ইন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত হয়েছেন কিনা জানা যায়নি। যদি হয়ে থাকেন, নাটক পাঠাবার এবং কনট্র্যাক্ট সই করার পরেই হয়েছেন, কারণ 'বেতার জগৎ' আর 'আকাশবাণী'তে তাঁর পূর্ব-নামই ছাপা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই কনট্র্যাক্ট সই আর নাম ছাপার পরেও কি শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করে নতুন নাম প্রচারিত হতে পারে? না কি এই নামবিভ্রাট নাট্যবিভাগেরই কর্মদক্ষতার ফল?

—শ্রবণক

রা নাম জোকার-এর প্রযোজক পরিচালক রাজকাপুর এবং ছবির অন্যান্য শিল্পীরা সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হন। চিত্রে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়, রাজকাপুর, কাসানা রাবিনকিনাও, হেমন্ত চৌধুরী, হেমেন গঙ্গোপাধ্যায়, সীমি, উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, অরুন্ধতীদেবী, সুখেন সিংহ এবং অসীম দত্ত। ফটোঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি এবং শীর্ষস্থানীয় পরিচালকবৃন্দ ঃ

সংকুচিত ব্যবসাক্ষেত্র, ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী চিত্রনির্মাণ ব্যয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ-সুবিধার ক্রমাবনতি প্রভৃতি কারণে পশ্চিম-বঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের যখন প্রথম শ্বাস অবস্থা উপনীত হয়েছিল, তখন এই শিল্পটি থেকে যাঁদের রুজিরোজগার, তাঁরা ধর্ণা দিয়েছিলেন দেবস্থানে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কোনো স্বপ্নাদ্য দলিল পাবার আশায়। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোটান্ডায় অনুষ্ঠিত জমজমাট সভার চিত্রটি এই '৬৯ সালের জানুয়ারীতেও মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রীর মুখচোখের ভাবখানা এমনই হয়ে উঠেছিল যে, বাঙালীর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন এই মুমূর্ষু চলচ্চিত্র-শিল্পটিকে তখনি কোন-না-কোনো উপায়ে পুনর্জীবিত করে তোলবার ব্যবস্থা করতে না পারলে তাঁদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সরকারীভাবে উপকার করব বললেই তা করা যায় না; সরকারী দারুভূত জগন্নাথের রথ চালু করা কি সহজ কথা? তাই তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় তাঁরা পেরে-ছিলেন ঐ বছর ২৪ অক্টোবর তারিখে পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র-শিল্পের দুরবস্থার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তার উন্নতি-কল্পে সুপারিশ করবার জন্যে একটি চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতি" (ফিল্ম এন-কোয়ারি কমিটি) গঠন করতে। ১৯৬২-র ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৬৩-র জুলাই পর্যন্ত অনুসন্ধান, সমীক্ষা ইত্যাদি চালিয়ে এই সমিতি—যার সভ্য ছিলেন কে, সি, সেন, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৬৩-র ২৮ জুলাই তারিখে তাঁদের রিপোর্টটি তদানীন্তন সরকারের কাছে পেশ করেন। কিন্তু কোনো অনির্দিষ্ট কারণে কিংবা হয়ত অকারণেই এই রিপোর্ট সরকারী দপ্তরে ধামাচাপা থেকে গোটা পাঁচটি বছর। ইতিমধ্যে এ-রাজ্যের চলচ্চিত্র-শিল্প কণ্ঠাগত প্রাণের অবস্থায় পৌঁছোয়; অপর সব সমস্যা ছাড়িয়ে এর আর্থিক সমস্যাটিই প্রধান হয়ে ওঠে। এবং সেই সমস্যার সমাধানকল্পে

১৯৬৬-র ১১ আগস্ট তারিখে পশ্চিম-বঙ্গের বিশিষ্ট সংবাদ প্রযোজক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি (মেমোরান্ডাম) পেশ করেন। এই স্মারকলিপির প্রস্তাব-গুলিকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে মুখ্য-মন্ত্রী তৎকালীন সরকারের সচিব রায়, অজিত বসু এবং অজিত চৌধুরী—এই তিনজন বে-সরকারী সদস্য ও সর্বশ্রী রঞ্জিত গুপ্ত, টি সি দত্ত এবং প্রজানন্দস্বরূপ মাথুর—এই তিনজন সরকারী সদস্যকে নিয়ে একটি 'অ্যাড হক' (তদর্থক) কমিটি নিয়োগ করেন। এই 'অ্যাড হক' কমিটি পশ্চিম-বঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পর্যালোচনা করে ১৯৬৬-র ১১ অক্টোবর তারিখে যে সাতটি সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেন, সংক্ষেপে সেগুলি হচ্ছে :

(১) চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের আর্থিক ঋণ-দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রস্তুত ছবিগুলির প্রদর্শনী-ক্ষেত্র বিস্তৃততর করবার জন্যে নতুন চলচ্চিত্রগৃহ নির্মাণের লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থার শর্তগুলিকে শিথিল করতে হবে।

(৩) প্রতি ২৫,০০০ জনের পরিবর্তে প্রতি ২০,০০০ জনের জন্যে একটি চিত্র-গৃহের লাইসেন্সের প্রবর্তন করতে হবে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম-স্টুডিও ও ল্যাবরেটারীগুলির আধুনিকীকরণ ও সংস্কারসাধনের জন্যে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) গ্রামাঞ্চলে এবং আধা-শহরগুলিতে অন্ধর্ব ৫০০ আসনবিশিষ্ট 'কমিউনিটি থিয়েটার' গড়ে তুলতে হবে। একটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সরকারই এগুলির পরিচালনা করবেন।

(৬) এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রতিটি চিত্র-গৃহে আসন-সংখ্যার তারতম্য অনু-সারে প্রতিটি 'শো'-এর জন্যে একটি চলচ্চিত্র উন্নয়ন শুল্ক (সেস) ধার্য করতে হবে। এই খাতে বছরে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হবে।

(৭) এবং সবশেষে কমিটি সুপারিশ করেছেন, সরকার একটি চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পো-রেশন) গঠন করুন। এই সংস্থা উপরোক্ত চলচ্চিত্র উন্নয়ন-কর থেকে চিত্র-প্রযোজন, নূতন চিত্রগৃহ নির্মাণ ও সংস্কারসাধন, স্টুডিও ও ল্যাবরে-টারীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন প্রভৃতির জন্যে ঋণদান করবেন এবং কমিউনিটি থিয়েটার বা অন্য যে চিত্রগৃহগুলি নির্মিত হবে সেগুলির পরিচালনভার গ্রহণ করবেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই 'এ্যাড-হক' কমিটির সুপারিশসম্বলিত রিপোর্ট-টিও কিন্তু ১৯৬৬-র ১১ অক্টোবর তারিখে সরকারের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৮-র জুলাইয়ের আগে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নি। অথচ এই কমিটি প্রস্তাবিত 'চলচ্চিত্রউন্নয়ন শুল্ক' (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট সেস)-টির নাম পরিবর্তন করে 'প্রদর্শনী কর' বা 'শো-ট্যাক্স' নামে আদায় করবার জন্যে একটি বিশেষ অর্ডি-ন্যান্স জারী করতে সরকারের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গের মৃতকল্প চলচ্চিত্র শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে রাজ্য সরকারের চরম উদাসীন্য ও নিস্পৃহতা লক্ষ্য করেই গেল ১৯৬৮ সালের ৫ এপ্রিল তারিখে চলচ্চিত্র নির্মাণকার্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট বহু প্রযোজক, পরিবেশক, পরি-চালক, শিল্পী, কলাকুশলী, স্টুডিওমালিক রসায়নাগার-মালিক এবং অন্যান্য কর্মী মিলিত হয়ে নিউ থিয়েটার্স-এর ভূতপূর্ব কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে গঠন করেছেন 'পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি'। প্রশ্ন উঠেছিল, পূর্ব ভারতের চিত্র-প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকদের মিলিত প্রতিষ্ঠান 'ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন' সক্রিয়ভাবে বর্তমান থাকতেও এই 'সংরক্ষণ সমিতি'র উদ্ভব কেন? ই আই এম পি-এর দ্বারাই কি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না? সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চার উত্তর শোনা গিয়েছিল : না, হত না। কারণস্বরূপ যে-যুক্তি দেখানো হয়েছিল, তা যথার্থই সমীচীন। ই আই এম পি এ একটি সমগ্র পূর্বভারতীয় সংস্থা বলে এর কর্মক্ষেত্র ব্যাপক; তার ওপর এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রদর্শকদেরই সংখ্যাধিক্য। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রনির্মাণের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি সুবিচার করা সেই কারণেই এই সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়।

সংরক্ষণ সমিতি একটি নির্বাচিত সংগ্রাম পরিষদের (অ্যাকসান কাউন্সিল-এর) ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন সমিতির উদ্দেশ্যাবলী সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাবার কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করবার জন্যে। প্রথমেই সংগ্রাম পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যে-পাঁচটি প্রস্তাব উপ-স্থাপিত করেন, সেগুলি হচ্ছে :

(১) এই রাজ্যের যে-সমস্ত এলাকায় ১৯৬১ সালের লোকগণনার ভিত্তি অনুযায়ী শতকরা ৩০ ও তদূর্ধ্ব বাঙলা ভাষাভাষী লোক থাকেন, সেই সমস্ত এলাকায় নিম্নলিখিত আনু-পাতিক পরিমাণে বাঙলা ছবির প্রদর্শন সময় আবশ্যিকভাবে আইন করে দিতে হবে :

বাঙলা ভাষাভাষী এলাকা	বছরে বাঙলা ছবি দেখানোর সময়
লোকসংখ্যার ৩০ শতাংশ ভাগের কম	০
" ৩০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ	ন্যূনতম ৩০ শতাংশ
" ৫১ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ	" ৫০ শতাংশ
" ৭১ শতাংশ-এর বেশী	" ৭৫ শতাংশ

(২) যে-সকল চিত্রগৃহে ইংরাজী ছাড়া অন্য ছবি দেখানো হয় না, সেই সব চিত্র-গৃহের বাৎসরিক প্রদর্শনী সময়ের অন্তত ৩০ শতাংশ সময় ভারতীয় ছবি দেখানো আইনত আবশ্যিক করতে হবে।

(৩) কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অবিলম্বে সরকারী সাহায্যে নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হোক। এই সমস্ত নতুন প্রেক্ষাগৃহে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত ছবি সেন্সার সার্টিফিকেটের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখানো হোক।

(৪) 'প্রদর্শন কর'কে (শো-ট্যাক্সকে) অবিলম্বে এই শিল্পের সাহায্যে 'উন্নয়ন শুল্ক'-এ (ডেভেলপমেন্ট সেসে) পরিণত করা হোক। এই টাকা যাতে শিল্প নির্মাণের কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে, তার সম্বন্ধে সুষ্ঠু ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র সংস্থা গঠন করা হোক।

(৫) চলচ্চিত্রশিল্পকে সাহায্যের জন্যে এবং তার সর্বাঙ্গীন উপায় খুঁজে বার করবার জন্যে উপযুক্ত প্রতিনিধি সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হোক। এই সংস্থা সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন এবং যে-সমস্যাগুলো আজ এই শিল্পের কণ্ঠ-রোধ করছে, তাদের হাত থেকে একে মুক্ত করবার পথ খুঁজে বার করবেন। বিশেষ করে কিভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব কার্যকরী করা যায়, তার ব্যবস্থা করবেন।

প্রস্তাবগুলিকে সরকারের সামনে উপস্থাপিত করবার সময়েই সংগ্রাম পরিষদ বিলক্ষণভাবে জানতেন যে, সংরক্ষণ সমিতির

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির সাংবাদিক সম্মেলনে বিজয় চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), পিনাকী মুখোপাধ্যায়, অসিত চৌধুরী, অজিত বসু, রঞ্জন মজুমদার, পিযুষ বসু, ক্ষিতিশ ঘোষ, দেলু নাগ, ঋত্বিক ঘটক, অসীমা ভট্টাচার্য, উত্তমকুমার, পঞ্চু সেন, মঞ্জু দে ও সুশীল মজুমদার। ফটো : অমৃত

দ্বারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শিল্প-টিকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে যোদ্ধার মনোভাব নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা না করলে অন্য কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। প্রস্তাব-গুলিকে উপস্থিত করবার পরে বহু তদ্বির-তদারক করবার ফলে সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবকে আংশিকভাবে কার্যকরী করবার জন্যে আইনগত নির্দেশ জারী করলেন : পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহগুলিকে বাৎসরিক প্রদর্শনী সময়ের ২০ শতাংশ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ছবির জন্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

বাঙলা ভাষাভাষী লোকসংখ্যা অনুযায়ী আনুপাতিক ভিত্তিতে বাঙলা ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করার পরবর্তে এইভাবে গালেয়া ২০ শতাংশ সময় নির্দিষ্ট করে সরকার পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির প্রধান সমস্যাটিকে প্রকারান্তরে এড়িয়ে গেলেন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে তার ছবিগুলির মুক্তির পথকে যে বিস্তৃততর করতে হবে, এটা সকলেরই জানা কথা। মাত্র পাঁচটি রিলিজ-চেনের উপর নির্ভর করে যে এই শিল্প বাঁচতে পারে না, এও কারুর অজানা নয়। তাছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজে নির্মিত চটকদার যৌন-আবেদন-পূর্ণ ছবিগুলিকে এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে প্রদর্শনের জন্যে এই সব ছবির প্রযোজক ও পরিবেশকরা প্রদর্শকদের যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন, বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে তা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

মুক্তির সুযোগের তুলনায় ছবির সংখ্যা বেশী, এই তথ্যটি জানা থাকার বাঙলা ছবির রিলিজ-হাউসের মালিকেরা রিলিজ সংক্রান্ত শর্তগুলিকে দিনের পর দিন এমনই 'নিজের-কোলে-ঝোল-টানা' গোছ করে তুলছিলেন যে, ছবি অসাধারণ-ভাবে জনপ্রিয় না হলে প্রযোজকের ভাগ্যে বিশেষ কিছু অর্থ আমদানী ঘটেই ওঠে না। ফলে শতকরা পঁচাত্তরখানি ছবির প্রযোজক-কেই লোকসানের কারবারী হতে হয়। বাঙলা ছবির প্রযোজনায় অর্থ লগ্নী করাকে আজকাল নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর বলা হচ্ছে। কাজেই ছবির সংখ্যা বছরে ৬০।৭০ থেকে কমে ২০।২২টিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রযোজনাশিল্পে বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনকল্পে ই আই এম পি-এর উদ্যোগে অজিত বসু প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের প্রতিনিধিবৃন্দ শ্যাম-লাল জালান প্রমুখ প্রদর্শকবৃন্দের এক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বাঙলা ছবির মুক্তি ব্যাপারটাকে সহজ-সাধ্য করে তোলবার জন্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিকে অবশ্যপালনীয় বলে উপ-স্থাপিত করেন :

(১) বর্তমানের রিলিজ চেনগুলি ছাড়াও অন্তত আরও দুটি রিলিজ চেন নির্দিষ্ট করায় সাহায্য করতে হবে।

(২) 'হাউস প্রোটেকসান' আদায়ের প্রথা অবিলম্বে রহিত করতে হবে।

(৩) টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রমোদ-কর বাদ দিয়ে ৫০ শতাংশ প্রদর্শকের প্রাপ্য এবং ৫০ শতাংশ প্রযোজক পরিবেশকের প্রাপ্য বলে মেনে নিতে হবে। ছবির প্রদর্শন চালু রাখবার জন্যে ইণ্ডিয়ান নিউজ রীল বাবদ যে টাকা প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হয়, তারই ভিত্তিতে 'হোল্ড-ওভার' নির্ণয় করতে হবে।

(৪) ছবির মুক্তির ব্যাপারে একটি ছবি 'রিলিজ চেন' ভুক্ত হাউসের মালিকেরা ঠিক করবেন এবং তার পরেরটি 'সংরক্ষণ সমিতি' ঠিক করবেন। এই-ভাবে পালা করে মুক্তির ব্যবস্থা করলে 'তারকাবিহীন' স্বল্পব্যয়ের ছবি-গুলিও মুক্তি পাবে এবং সমস্ত অন্যায় প্রথার অবসান ঘটবে।

কিন্তু এই সকল প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা না করে প্রদর্শকমণ্ডলী প্রযোজকদের কথা হেসে উড়িয়ে দেন এবং বৈঠকটি ভেঙে দেন। তখন গত্যন্তর না দেখে 'নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মরব, তবু বাঁচবার জন্যে পরের কাছে হাঁটু গাড়ব না' এই পণ করে সংরক্ষণ সমিতির সভ্যরা শান্তিপূর্ণভাবে বাঙলা ছবির রিলিজ হাউসগুলির সামনে ১৯৬৮র ১১ জুলাই থেকে ৪৭ দিনব্যাপী ঐতি-হাসিক সত্যাগ্রহ চালান। অবশ্য সত্যাগ্রহ মাত্র এক সপ্তাহ চলবার পরেই রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী — এই রিলিজ চেনের কর্তৃপক্ষ 'সংরক্ষণ সমিতি'র সঙ্গে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমিতির সাফল্যের সূচনা করেন। ক্রমে ক্রমে সকল রিলিজ চেনই সমিতিকে স্বীকার করে নিয়ে সমিতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঐ সত্যাগ্রহকে জয়যুক্ত করেন।

চলতি রিলিজ চেনগুলির সঙ্গে 'হাউস প্রোটেকসান'-এর প্রথাটি সম্পূর্ণ রহিত করে প্রযোজকদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে চুক্তির ব্যবস্থা করবার পরে সংরক্ষণ সমিতির সংগ্রাম পরিষদ যখন বাঙলা ছবির মুক্তির জন্যে আরও দুটি নতুন রিলিজ চেন গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই অনেকটা আকস্মিকভাবেই সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, বিভূতি লাহা (অগ্রদূত), অজয় কর প্রমুখ পরিচালকবৃন্দ ২৬ ডিসেম্বরে গ্র্যান্ড হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, সংগ্রাম পরিষদ যে-পথে আন্দোলন পরিচালনা করছেন, তার সঙ্গে তাঁরা একমত নন এবং সেই কারণেই তাঁরা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন, সিনেমা-মালিকদের সঙ্গে প্রযোজক-পরিবেশকদের বিরোধ বা মতানৈক্য ছিল, সেটা অনায়াসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারত। তা না হয়ে এক পক্ষের চাপের ফলে অন্য পক্ষের সাময়িক নতিস্বীকার—এতে শুধু নতুন সমস্যারই সৃষ্টি হয়। এ'রা আরও অনুযোগ করেছেন, (১) সংরক্ষণ সমিতি সকলের ওপর নিয়ন্ত্রণের বেড়ি পরাতে চান; (২) সমিতির সভায় স্পষ্টভাবে মত-প্রকাশের সুযোগ থাকে না; (৩) সমিতির সব দাবী লজিক্যাল নয়, (৪) সমিতি রাজনীতিকে ধর্মতলা থেকে টালিগঞ্জে নিয়ে যাচ্ছেন ইত্যাদি।

এই পটভূমিতে বাংলা দেশের সিনেমা-শিল্পের ভবিষৎ কোন খাতে বইবে তা অনুমান করা শক্ত। তবে আমরা চাইব, যাতে নতুন কোনো সংকট না ঘনিয়ে ওঠে।

মঞ্চাভিনয়

আগামী ২৫, ২৬ এবং ২৭ জানুয়ারী গান্ধর্বীর ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে। এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই নাট্যোৎসবে অভিনীত হবে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের কালের যাত্রা, শাপমোচন এবং ফাল্গুনী। গান্ধর্বীর শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন এই নাট্যোৎসবে। গান্ধর্বীর এই ষষ্ঠবার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যোৎসব উদ্বোধন করবেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সম্প্রতি বারাসত পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ জিতেন বসাকের 'বাগদত্ত' নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন স্থানীয় 'রবীন্দ্রভবন' মঞ্চে। নাট্য নির্দেশনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন ববীন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'তুগ্রীল খাঁ' ও 'উজির আমেদ আলী'র ভূমিকায় জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও সুবাসকান্তি বসুর অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন : বেণু দাস, সুবীর মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন ঘোষাল, মোহিতরঞ্জন রায়, অনিল দাস, দুর্গাদাস চট্টরাজ, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপেন দে, ম... দে, বারীন চ্যাটার্জী, ছলনা মুখার্জি, র... ব্যানার্জি, বুলা রায়, মমতা মুখার্জি, ... মুখার্জি। নাট্যানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সভাপতি ছিলেন অ্যাডিসনাল পু... সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাব-ডিভিসনাল পুলিশ অফিসার শ্রী... প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

দেবদারু পরিচালিত উত্তরপাড়া ... প্রাঙ্গন মঞ্চে আগামী ফেব্রুয়ারী হতে ... প্রথম হিন্দী ও বাংলায় নিখিল ভা... পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ... প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ দলকে ভারতের শ্রে... নাট্যদল হিসাবে সম্মানিত করে উপহা... স্বরূপ পাঁচশত টাকা, ২য় ও ৩য় স্থ... অধিকারীকে যথাক্রমে তিনশত ও দুই... টাকা, শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে একশত টাকা, শ্রে... পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীকে পঞ্চা... টাকা দেওয়া হবে।

ভারতের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর না... সংস্থাকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদা... করতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যোগদা... শেষ দিন ২৬শে জানুয়ারী।

বেহালার অহীন্দ্র মঞ্চে গত ২৭... নভেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট না... সংস্থা ভারতীর শিল্পিবৃন্দ ক... শ্রীঅরুণকান্তি সাহার 'লগন এলো' নাটক... মঞ্চস্থ করা হয়।

বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে... পাঁচুগোপাল দাস, দুর্গাপদ ঘোষ, তপনকুমা... গুঁই, হরপ্রসাদ মালিক, নবকুমার বন্দ্যো... পাধ্যায়, শেখরকুমার রক্ষিত, রবীন্দ্রনা... ঘোষ, প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ... ভট্টাচার্য, আলো মজুমদার, শিখা মণ্ডল ও... রীতা মাকাল।

শ্রীপাঁচুগোপাল দাস, আলো মজুমদার ও রীতা মাকালের অভিনয় সমবেত দর্শক... দের বিশেষ আনন্দদান করে। এছাড়া শিখা মণ্ডল, নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপন... কুমার গুঁইয়ের অভিনয়ও বিশেষ আকর্ষণ... যোগ্য হয়ে উঠেছিল। নায়কবেশী শাম... চরিত্রে পরিচালক শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যো... পাধ্যায়ের অভিনয় নাটকটির একটি বড়... রকমের আকর্ষণ ছিল। তাঁর বাচনভঙ্গী ও... অভিব্যক্তি দর্শকদের মনে বিশেষভাবে রেখা... পাত করে। এককথায় তাঁর অভিনয় অপূর্ব... অনবদ্য।

নাটকটির সংগীত-পরিচালনার দায়িত্বে... ছিলেন স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণচ... বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন নাট্যগোষ্ঠী 'লোকায়নের' প্রযো... জনায় আগামী ৩১শে জানুয়ারী মোহি... চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপের রাজা' নাটক অভি... নীত হবে। শক্তিমান অভিনেতা অরুণ রা... নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সঙ্গীত ... মঞ্চ-পরিকল্পনায় আছেন ভূপেন হাজারিক... ও রাজেন তরফদার।

পড়শন/মেহমুদ এবং সায়রা বানু

বোম্বাই থেকে

সম্প্রতি এখানে 'অপেরা হাউস'-এ 'সরস্বতী চন্দ্র' নামে একখানি হিন্দী ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। সরস্বতী চন্দ্র এক বিখ্যাত গুজরাটী উপন্যাসের চিত্ররূপ। যে উপন্যাস-টি পড়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, মর্মস্পর্শী কাহিনী। উনবিংশ শতাব্দীর গুজরাটের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে এক আদর্শবাদী পুরুষ ও রমণীর চরিত্র-চিত্র সুন্দর ধরা হয়েছে।

'সরস্বতী চন্দ্র' ফিল্ম দেখে ফিল্ম-সাংবাদিকেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন এর প্রশংসায়। এমন কি 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মত দুর্মুখ কাগজ—যারা কখনো কোন হিন্দী ছবিকে ভাল বলেন না স্বর্গীয় পরিচালক বিমল রায়ের ছবি-গুলো ছাড়া। তাঁরাও সরস্বতী চন্দ্রের পরি-চালককে সাধুবাদ দিতে কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু কে এর পরিচালক? কাগজের বিজ্ঞা-পনে কোথাও পরিচালকের নাম নেই। কারণ? শোনা যাচ্ছে সরস্বতী চন্দ্রের পরি-চালকের সঙ্গে প্রযোজকের মতান্তরই এর কারণ। মতান্তর কি নিয়ে? সম্ভবত টাকা-পয়সা নিয়ে। এ ধরনের ঘটনা যে এর আগে ঘটেনি, এমন নয়। চুক্তিপত্রে হয়ত পরি-চালকের পাওনা কুড়ি হাজার টাকা। সই করার সময় হাজারখানেক পেয়েছেন। যেহেতু সবসময়ই টাকা পয়সার টানাটানি প্রযোজকের, নতুন পরিচালক চুক্তিপত্র অনু-সারে টাকা পান না। প্রায় সবটাই বাকীর খাতায় জমা থাকে। ছবি শেষ হোক, এক-সঙ্গে পুরো টাকাটাই দিয়ে দেওয়া হবে পরিচালককে—প্রযোজক বলেন। তারপর ছবি শেষ হয়। পরিচালক কি সব টাকা পান? যাঁরা ভাগ্যবান, কিছু টাকা তাঁরা পান বইকি কিন্তু পুরো টাকাটা বোধহয় কেউ-ই পান না। টাকা পয়সা নিয়ে হাঙ্গামা করলে প্রযোজক চটে গিয়ে পরিচালকের পাবলিসিটি বন্ধ করে শোধ তোলেন। এই হল হিন্দী ফিল্ম। এখানে 'ফেয়ার গেম' বলে কিছু নেই।

সরস্বতী চন্দ্রের পরিচালকের নাম শ্রীগোবিন্দ সরাইয়া। নবীন যুবক সরাইয়া ডকুমেন্টারী দিয়ে জীবন সুরু করেন। ইনি দীর্ঘকাল ফিল্ম ডিভিশনের একজন পরি-চালক ছিলেন। কার্টুন-ছবির কলাকৌশল শিখবার জন্য সরকার এঁকে বিদেশে পাঠান। আমেরিকায় ইনি ওয়াল্ট ডিসনের স্টুডিওতে কিছুদিন কাজ শেখেন। ফিল্ম-ডিভিশনে ফিরে আসার পর ইনি গোটা-কয়েক কার্টুন-ছবি পরিচালনা করেন। কিন্তু সবসময়ই ইচ্ছা, বাইরে বড় ছবি করবেন। ইতিমধ্যে কোন একখানি ছবি নিয়ে ফিল্ম ডিভিশনের অন্যতম বড়কর্তার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হল। সরাইয়া পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যাওয়া কি অত সোজা? সরকার শ্রীসরাইয়ার কাছে তিরিশ হাজার টাকা দাবী করলেন—ওঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে যে ট্রেণিং দেওয়া হয়েছে তার পুরো খরচ। সরাইয়ার ক্ষমতা ছিল না তিরিশ হাজার টাকা ফেরত দেন। আর ক্ষমতা থাকলেই বা দেবেন কেন? এ নিয়ে প্রায় দু বছর চলল টানা-হ্যাঁচড়া। অবশেষে ফিল্ম-ডিভিশন ওঁকে মুক্তি দিলেন।

সরস্বতী চন্দ্রের প্রযোজক তখন সবে মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন, রিফিউজী হয়ে। ওদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য যা ছিল, সব গেছে। টাকা-পয়সাও অনেক গেছে। এখানে নতুন করে কিছু সুরু করবার কথা ভাবছেন। যোগাযোগ হল সরাইয়ার সঙ্গে। সুরু হল সরস্বতী চন্দ্র। নতুন প্রযোজক, নবাগত পরিচালক। পদে পদেই বাধা। ছবিখানি শেষ করতে বছর আড়াই লাগল।

(তাও ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি।) পরিচালক সরাইয়াকে অনেক ত্যাগ, অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হল। ছবি শেষ হল। কিন্তু কোন পরিবেশক এ ছবি নিতে চাইল না। কারণ? পরিচিত ফরমুলো নেই এ ছবিতে। তাছাড়া নতুন পরিচালক ও প্রযোজককে কে চায়? প্রযোজক কিন্তু ভেঙে পড়ার পাত্র নন। নিজেই ছবি পরিবেশন করবেন স্থির করলেন। প্রথমে আমেদাবাদে ছবিখানি মুক্তি পেল। তারপর এখন বোম্বাই শহরে। সরস্বতী চন্দ্র আহমেদাবাদে ভালই চলছে। এখন দেখা যাক বোম্বাই শহরে কেমন চলে।

●

১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত নিরঞ্জন পাল যখন বিলেত ছিলেন, Faith of A Child নামে একটা গল্প লেখেন। হুতোম কুতোম নামে পরীস্থানের দুই প্যাঁচা ও একটা ছ বছরের ছেলে এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। অদ্ভুত সুন্দর এই রূপকথার কাহিনী। পড়তে পড়তে মন ভরে ওঠে। উড়ে চলে হুতোম-কুতোমের সংগে আকাশে ফুলের রাজ্যে পেরিয়ে মেঘের দেশের ভেতর দিয়ে ছোট ছেলের মনগড়া এক স্বর্গরাজ্যে। যেখানে খেলনা আর ভাল ভাল খাবারের ছড়াছড়ি। যত চাও নাও, যত চাও খাও।

কিন্তু ছেলেটার কি মন ভরে এতে? সে যে তার বাবাকে খুঁজতে এসেছে স্বর্গে। বাবা তার বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে সংবাদ। আর মারা গেলে সবাই ত স্বর্গে যায়। অতএব তার বাবাও গেছেন স্বর্গে। ছেলেটা স্বর্গে এসেছে হুতোম-কুতোমের সাহায্যে তার বাবাকে দেখতে। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে তার মার কাছে। মা যে বাবার জন্য রাত-দিন কেঁদে মরছে। ছেলেটা কি স্বর্গে তার বাবার দেখা পেয়েছিল?

নিরঞ্জন পাল—ভারতীয় ফিল্ম-শিল্পের যিনি ছিলেন অন্যতম দিকপাল, হিমাংশু রায়ের সংগে যিনি বোম্বে টকিজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,—তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার কাহিনীকার। 'অচ্যুতকন্যা', 'জীবননাইয়া', 'জীবনপ্রভাত' প্রভৃতি বহু ফিল্মের ইনি ছিলেন কাহিনীকার। আজো এ-সব ছবি দেখে দর্শকদের চোখে জল আসে। কাহিনীর কোথাও কিছু অস্বাভাবিক আছে বলে মনে হয় না।

নিরঞ্জন পালের Faith of A Child বিলাতে সে বছর, বড়দিনের সময় মঞ্চস্থ করা হয়েছিল ও ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন লেখক।

১৯৪৫ ইং‌তে আচারিয়া আর্ট-প্রডাকশন গল্পটাকে চিত্রে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম। প্রযোজক এন আর আচারিয়ার মত এমন ভালমানুষ আজকাল চিত্রজগতে বড়একটা দেখা যায় না। নিরঞ্জন পালকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যেহেতু সে-যুগে ছোট-ছেলেকে নায়ক করে ফিল্ম তৈরীর কথাই ভাবা যেত না, আচারিয়া শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হন নি। পরিচালক দুলাল গুহ অবশেষে Faith of A Child এর চিত্ররূপ দিলেন। শোনা যাচ্ছে, স্যুটিং শেষ। বালক-অভিনেতা সূর্য নাকি এতে চমৎকার কাজ করেছে। সংগীতকার এস ডি বর্মন। বাঙালী পরিচালকের হাতে, আশা করি শেষ পর্যন্ত Faith of A Child একখানি রসোত্তীর্ণ শিশু-চিত্র হয়ে উঠবে।

১৯৬৮ ইং‌তে মোট ৮৮খানি কাহিনী-চিত্র বোম্বাই থেকে সেন্সর করা হয়েছে। (১৯৬৭ ই'তে হয়েছিল ৯১খানি।)। এই ৮৮খানির ভেতর হিন্দী ছবি মাত্র ৬২খানি। (গেল বছর হিন্দী ছবি ছিল ৭১খানি।) গুজরাটী ছবি ৩খানি। পাঞ্জাবী ২খানি। ভোজপুরী—১ ও সিন্ধি—১।

এর মধ্যে ৩০খানি ছবি রঙিন ইস্টম্যান কলার।

—শ্রীমতী বিভা

নৃত্যরতা ইন্দিরা বড়ুয়া।

—ফটো : অ

বিবিধ সংবা

৩ জানুয়ারী টেকনিয়ান্স স্টুডি... পম্পি ফিল্ম কর্তৃক শ্রীনিমাই ভ... রচিত 'মেমসাহেব'-র চলচ্চিত্রায়ণের মহরৎ শুরু হয়। অসীম ... প্রযোজিত এই ছবিতে নায়ক হিসাবে ... যাবে জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমারকে।

সম্প্রতি সিঁথিতে সংগীত পরিষ... সভাগণ ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর ... উৎসব পালন করেন। শ্রীমতী কমল... রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনান। গান... ইন্দিরা দেবীর স্বরলিপি অনুযায়ী শ্রী... বসু গান করেন। শ্রীরাজেশ্বর মিত্র ... দেবী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর... সভার শুরুতে সংগীত পরিষদের ছা... ইন্দিরা দেবীর স্বরচিত একটি গান ক... সংগীত পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণ ভট্টা... ইন্দিরা দেবীর সর্বশেষ রচনা 'রবিকথা... সবুজপত্র' পড়ে শোনান। পরিষদ... উদ্দেশ্য বর্ণনা করবার পর শ্রীঅরুণ ভ... চার্য জানান যে, পরিষদ কিছুদিন ... সিঁথি অঞ্চলে একটি সংগীত শিক্ষায়... গড়ে তোলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ... শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লোকালয়ে জনপ্রি... অর্জন করেছে।

গত ১৬ নভেম্বর ইউনিয়ন কারবা... এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস... রবীন্দ্র সদনে বহুপঠিত বাংলা উপন... শংকরের 'চৌরঙ্গী' নাট্যরূপ মঞ্চস্থ ক...

শ্রীমতী ইন্দিরা বড়ুয়া

...শিল্পী শ্রীমতী ইন্দিরা ...রসিক মহলের সংগে পরিচিত ...জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাবেন ...ক্লাবের সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্যাণী ...প্রেসিডেন্ট শ্রীঅদ্রিজা মুখোপাধ্যায় এবং ...আনন্দম। নৃত্যসমাপনান্তে ...মাল্যদানে অভিনন্দিত করার ...ছিল প্রথিতযশা রবীন্দ্রসংগীত শ্রীমতী বাণী ঠাকুর। শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর নৃত্যপ্রতিষ্ঠান ...বিশেষ কৃতিত্বসহ স্নাতকোত্তর ...প্রাপ্তা প্রথম উত্তরভারতীয় ...তাঁর সংগে পরিচয় হয় ...ক্লাবে (ক্যানাল স্ট্রীট)। নৃত্য-...আয়োজিত হয় একাডেমী অফ ফাইন ...রুক্মিণী দেবীর 'স্বপ্নশিশু' ...সুবিখ্যাতা।

...বড়ুয়া নিছক ডিপ্লোমাধারীই ...রসিকচিত্তকে ছন্দময় আনন্দলোকে ...দের মত শিল্পবোধ, নৃত্যদক্ষতা ...তিনি যে অধিকারিণী সেদিনের ...কালব্যাপী নৃত্যই তার প্রত্যক্ষ ...ইন্দিরার পরিবেশিত বস্তু ছিল ...অলারিপু, জয়দেবের গীত-...আঙ্গিনার, নবরস শ্লোকম ...'ভরত' শব্দটি ভাব, রাগ ও ...তিনটি বস্তুর সমন্বয়। 'ভরত ...নৃত্যের প্রতিমূর্তি অতএব ...প্রকাশ হবে সেই ধরতার আত্মার ...ভরতনাট্যমের আলোচনা প্রসঙ্গে ...ভরতনাট্যমের অন্যতম প্রামাণ্য ...রুক্মিণী অরুণ্ডেল।

...দেবীর মর্মভাবকে যোগ্যতার ...ভাষায় জীবন্ত করে তোলেন ...বড়ুয়া। কয়েক বছর আগে ...ইন্দিরার নৃত্য দেখেছি ...সোসাইটিতে। তখন ...সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। ...আঙ্গিকের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ...আবেগের মিলনে ক্রম-...শিল্পীচিত্তের স্পর্শ সত্যিকারের ...আবির্ভাব সম্ভাবনায় কলা-...আনন্দিত করেছে।

...দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। ...সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ...যেন রক্তিম পদ্মকুঁড়ির পুষ্প-...ক্রমউন্মীলন। এ দৃশ্য ...করেছে। অন্তরকে করেছে ...ত্রিপুট, আটোয়া, আদির ...তাঁর লয়দক্ষতা যেন কথা বলে ...বিভিন্ন ভাস্কর্যভঙ্গির ...শিক্ষা, অনুশীলন ও ...ব্যাপ্ত দর্শকচিত্তকে ...করেছে।

উপসংহারীয় 'সাত্রা' নৃত্যে অসমীয়া ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের সংগে পরিচিত হওয়ার তথ্যমূল্য অবশ্যই ছিল কিন্তু ভারত-নাট্যমের উচ্চাংগের ভাবনার সংগে এ নৃত্যের ছন্দের মিল হয়নি। 'কথাকলি'র সারী নৃত্য ইন্দিরার বহুমুখী নৃত্যপটিয়সীতার প্রমাণ। আলোক ও সংগীত আমাদের খুশী করতে পারে নি। তবে সজ্জা পরিকল্পনার সৌন্দর্য সত্যিই মনোহারী।

মনোরঞ্জ মিউজিক সার্কেল

মনোরঞ্জ মিউজিক সার্কেলে এবার দুটি নতুন শিল্পীর অনুষ্ঠান আমাদের আনন্দ দিয়েছে। শ্রীমতী কল্যাণী বসুর কণ্ঠে ইমন রাগের খেয়ালে, নিষ্ঠা, শিক্ষা ও রেওয়াজের স্বাক্ষর ছিল। এ'র সংগে তবলা সংগত ছিলেন সত্যভূষণ ভট্টাচার্য, সারেংগীতে, বাচ্চালাল মিশ্র। শ্রীরঞ্জন গংগোপাধ্যায় সেতার বাজালেন "জয়জয়ন্তী"—তবলায় বনমালী দাস। সর্বশেষে প্রবীর ভট্টাচার্যের তবলাসংগতে শ্রীশিবশংকর মুখোপাধ্যায়ের "বেহাগ"। এর আগে এ'রা মহম্মদ সগীরুদ্দীন ও কেরামৎ খাঁ সাহেবের সারেংগী তবলায় যে পরিণত রাগ রূপ ও স্বরসমন্বয়ের যে স্মরণীয় নিদর্শন পেশ করেছেন। নামী শিল্পীদের সংগে সংগে শিক্ষারত তরুণ শিল্পীদের দিকে এ'রা নজর দিয়ে ভাবী শিল্পীগোষ্ঠী গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এ খবর নিশ্চয় আনন্দের।

—চিত্রাঙ্গদা

ধ্রুব রায়

ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ব্যাটসম্যানদের ঘিরে। সেখানে বোলাররা অনেকটা নাটকের পার্শ্বচরিত্রের মত। চিরকাল লোকে দলে দলে মাঠে এসে ভীড় করেছে তাদের প্রিয় ব্র্যাডম্যান, হবস, হ্যামন্ড, রণজিদের খেলা দেখার জন্যে। সেখানে ও'রিলি, গ্রিমেট, টেট, অমর সিংরা যেন নিতান্ত নগণ্য। জনপ্রিয় ব্যাটসম্যানরা অল্প রানে তাঁবুতে ফিরে গেলে দর্শকরা ব্যথায় ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা ভাল বল করেও যখন কোন বোলার শূন্য হাতে পরিশ্রান্ত দেহে দিনান্তে তাঁবুতে ফিরেছেন, দর্শকমনে তাদের জন্যে সমবেদনা নিতান্তই সামান্য। আবার যখন সুকৌশলে নিপুণ হাতে বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের পরাস্ত করেন তখন তাকে সাধারণত মারাত্মক বোলিং বলে আখ্যা দেওয়া হয়—ভাবটা যেন একটা দানবীয় কিছু ঘটছে। অপরপক্ষে ব্যাটসম্যানরা যখন নির্মমভাবে বল পেটাতে থাকেন তখন দর্শককুল সযত্নে ব্যাকরণের সুমিষ্ট বিশেষণগুলো ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু ক্রিকেট তো একা ব্যাটসম্যানদের খেলা নয়। ক্রিকেটকে বুঝতে হলে, ক্রিকেট থেকে আনন্দ পেতে হলে, ব্যাটিং-বোলিং ইত্যাদি সব কিছুর দক্ষতা ও তার সুকৌশল প্রয়োগ সম্পর্কে পরিচিত হতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। ব্যাটিং করে ম্যাচ জিতিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবে তা নিসন্দেহে বল করে ম্যাচ জেতানর সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। ম্যাচ বাঁচানোর ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্ব অনেক বেশী সন্দেহ নেই। কিন্তু খেলার উদ্দেশ্য তো পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচা নয়—জিততে হবে শেষ পর্যন্ত এই মনোভাব নিয়েই খেলে যেতে হবে।

বোলিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে একথাগুলো এসে পড়ল। কারণ এসব সত্ত্বেও বোলিং-এর একটা আনন্দ আছে। একাগ্র অনুশীলনের সাহায্যে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তে প্রয়োজনীয় বলটা করার দক্ষতা আয়ত্তে আনতে হয়। আর সেই বলটা করে ব্যাটসম্যানকে ঠকানোর আনন্দ বোলার ছাড়া অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা শক্ত। সেই আনন্দের অনুপ্রেরণাতেই ভাল বোলার হবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অনুশীলন করে যেতে হবে। লেকার যেদিন টেস্ট ম্যাচে ১৯টা উইকেট পেয়েছিলেন সেদিন তাঁর আনন্দ, সোবার্সের টেস্টে ৩৬৫ রান করার চেয়ে নিশ্চয়ই কিছু কম নয়। অখ্যাত টাইসন ১৯৫৫ সালের সফরান্তে প্রখ্যাত হয়ে যেদিন স্বদেশে ফিরলেন সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর মনে ব্যাটসম্যান না হওয়ার কোন খেদ ছিল না। এমন অনেক খেলোয়াড় আছেন যারা বোলিং-এর স্বার্থেই তাঁদের ব্যাটিং-এর দক্ষতাকে উপেক্ষা করেছেন। বেডসার ১৯৪৮ সালে লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খুব সুন্দর ব্যাট করে ৬৯ রান করেছিলেন। সেই খেলা দেখে অনেকেই তাকে ব্যাটিংএ বেশী নজর দেবার উপদেশ দিয়েছিলেন। বেডসার সেই উপদেশে কান দেননি—ফলে আজ তিনি মিডিয়াম পেস বোলিং-এর আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

ভাল বোলার হতে হলে যে কয়েকটা নৈপুণ্য আয়ত্তে থাকা দরকার। তার **প্রথম** কথা হোল, লেংথ ও ডিরেকশান অর্থাৎ কোথায় বল ফেলতে হবে আর তা কোন দিকে নির্দিষ্ট হবে। এ দুটো ছাড়া বোলিং-এর সব কৌশল আয়ত্তে এনেও বোলার হওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া থাকবে কোন এক বা একাধিক

বিশ্ববিশ্রুত ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হল

বিশেষ ধরনের বল যার সাহায্যে ব্যাটসম্যানকে ঠকানো যেতে পারে।

লেংথ বলতে সঠিক কোন নির্দিষ্ট একটা জায়গাকে বোঝায় না—সেটার তারতম্য হয় ব্যাটসম্যান অনুসারে। যে বলটা একজন ব্যাটসম্যানের কাছে গুড লেংথ সেটা অন্য আর একজনের কাছে হাফভলি হতে পারে। আবার কারুর কাছে সেটা পিছিয়ে খেলার বল হতে পারে। এটা নির্ভর করে ... ম্যানের রিচের ওপর অর্থাৎ ... জায়গার মধ্যে সে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে ... খেলতে পারে সেই ক্ষমতার ... বোলারকেই ঠিক করে নিতে হবে ... কোন জায়গায় বল করলে বেশী ... হবে—সে ক্ষেত্রে সেইটাই হবে লেংথ।

এর সঙ্গে থাকবে ডিরেকশান ... বলের গতিপথ কোন দিকে নির্দিষ্ট ... ব্যাটসম্যানের পক্ষে ভুল খেলার ... বেশী। এক্ষেত্রেও ব্যাটসম্যান ... ডিরেকশ্যানের তারতম্য হবে। ... গোভার খেলেছেন মিডলসেক্সের ... এক সময় ব্যাট করতে নামলেন ... ড্রেন, উইকেটে আসার পথে ... পেয়ে জানালেন, তাঁর বয়স হয়েছে ... দিয়ে তাকে যেন আঘাত না করা ... থেকে তখন গোভার বল করছিলেন ... মনে ভাবলেন, বুড়ো বাম্পারে ... বাম্পারে আউট করা সহজ ... বাম্পার দিলেন, হেনড্রেন সেটাকে ... সহজেই বাউন্ডারীতে পাঠালেন ... ভাবলেন এটা দৈবাৎ লেগে গেছে ... বাম্পার দিলেন, এবারও একই ঘটনার ... বৃত্তি ঘটল। এইভাবে ... বিস্মিত সারে অধিনায়ক ... এই ধরনের বল করার কারণ ... জানালেন হেনড্রেনের উইকেটে ... কার ঘটনা। তিনি সঙ্গে ... জানালেন যে তিনি খুব ভুল করেছেন ... হেনড্রেনই বাম্পার বলে হুক মারায় ... পারদর্শী।

ডিরেকশান প্রসঙ্গে এই ... করলাম এই কারণে যে, ... ব্যাটসম্যানের আতঙ্কের কারণ ... দাপটে ক্রিকেটের ... আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, সেই ... আর একজনের কাছে নিতান্তই সহজ ... হতে পারে। আর সেই কারণেই ... একান্ত প্রয়োজন।

রান আপ, অর্থাৎ কতটা দৌড়ে ... বল করা উচিত। এ বিষয়ে একটা ... সব সময় মনে রাখা দরকার যে ... দৌড়লে শরীরের প্রয়োজনীয় ... বোলিং-এর সহায়ক হবে ... প্রয়োজন। বেশী বা কম দৌড়ুলে ক্ষতি ... হবে। বেশী দৌড়লে অতিরিক্ত পরি... করার ক্ষমতাকে ক্রমশ কমিয়ে ... বয়সে অনেকেরই আরও বেশী দৌড় ... জোরে বল করার একটা প্রবণতা ... জোরে বল করার ইচ্ছেটাকে উৎসাহ ... উচিত, বিশেষ করে আমাদের ... যেখানে ফাস্ট বোলারের একান্ত ... কিন্তু সব সময় সচেতন থাকা উচিত ... করে এই বেশী দৌড়নো কখনই
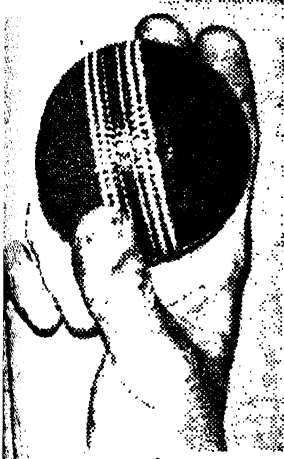
ইন-সুইংগার গ্রিপ

আউট সুইংগার গ্রিপ

লেগ-ব্রেক গ্রিপ (পিছন থেকে নেওয়া ছবি)

...হয়। একজন খেলোয়াড়ের জীবনের ...সময় তার বয়স, ও শরীরের পরি-...রান-আপের পরিবর্তন প্রয়োজন ...পারে। সুতরাং সেদিকেও সব সময় ...উচিত। এক সময়ের রান-আপ ...কার্যকর নাও হতে পারে। রিচি ...১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে এসে তাঁর ...দৈর্ঘ্য কমিয়ে দশ পা'র জায়গায় ...সাড়ে এসে বল করে আশাতীত ...ফল পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে ...টেস্টের আগে পর্যন্ত বেনো ২৪টা ...মোট উইকেট পেয়েছিলেন ...সেই সময়ে তাকে টীমে স্থান ...-এর নজর দিতে হোত। কিন্তু ...টেস্টের পর মোট ২১টা টেস্টে তিনি ...উইকেট পেয়েছেন। এই পর্যায়ে ...ডেভিডসনই প্রধানত অস্ট্রেলিয়ার ...গুরুদায়িত্ব বহন করেন।

...পরে বল দেওয়ার পদ্ধতি ও বল ...কৌশল, ক্রিকেটে যাকে বলা হয় ...ও গ্রিপ। এক একধরনের বল ...ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকশ্যান ও গ্রিপ ...আছে। আবার একই ধরনের বল ...একজনের অ্যাকশ্যান ও গ্রিপের ...একজনের তফাৎ থাকতে পারে। ...ধরনের বলের জন্যেই মোটামুটি ...মূল নীতি আছে শুরুতে ...মেনেই অনুশীলন করতে হবে। ...অনুশীলনের মাধ্যম স্থির করতে ...কতটুকু রদ-বদল প্রয়োজন। ...বল হাত থেকে ছাড়ার আগের ...শরীর ভংগী মোটামুটি সব ...বোলারেতেই এক রকম। ডান হাতের ...দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি, ডান ...পা থাকবে রিটার্ণ ক্রিজের ...। বাঁ পা শূন্যে ব্যাটসম্যানের দিকে ..., বাঁ হাত আকাশের দিকে সোজা ...। দৃষ্টি থাকবে বাঁ হাতের পেছনে ব্যাটসম্যানের দিকে। বল হাত থেকে ...সময় শরীরের ভার ডান পা থেকে ...ওপর এসে পড়বে। আর তখন ...একই গতিপথে সামান্য এগিয়ে ...পায়ের ওপর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে। একে বলে ফলথ্রু। এই সময় দৃষ্টি সব সময়ের জন্য ব্যাটসম্যানের খেলাটাকে লক্ষ্য করবে নয়তো ব্যাট ফেরৎ বল বোলারের দিকে এলে বোলার সে বল ধরতে সমর্থ হবে না। বল হাত থেকে ছাড়ার সময় যতটা সম্ভব ওপর থেকে ছাড়লে বলের কার্যকারিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বোলিং-এর সহায়ক নয় এমন উইকেটে এই হাই অ্যাকশান একান্ত প্রয়োজন।

খেলা শুরু হয় নতুন বলে। সব অধিনায়কই চান যে শুরুতেই আঘাত হেনে বিপক্ষের মনোবল ভেঙে দিতে হবে। নতুন বলে বল শুরু করেন ফাস্ট ও মিডিয়াম ফাস্ট বোলাররা—ওঁরা সাধারণত সুইং ও কাট করান। হাওয়ায় আর্দ্রতা বেশী থাকলে, তৃণাচ্ছাদিত উইকেট সুইং-এর পক্ষে উপযোগী। সুইং দু রকমের, আউট সুইং ও ইন-সুইং। আউট সুইং অর্থাৎ যে বল হাওয়ায় গতিপথ পাল্টে লেগ থেকে অফের দিকে যায়। ইন সুইং ঠিক এর বিপরীত। সুইং-এর মধ্যে আবার রকমফের আছে। কোন বল বোলারের হাত থেকে ছাড়ার প্রায় সংগে সংগেই গতিপথে বৃত্তাকারে বেঁকতে সুরু করে। আবার কোন কোন বল অনেকটা পথ সোজা গিয়ে বেঁকতে শুরু করে, একে বলে লেট সুইং। এই লেট সুইং ব্যাটসম্যানদের কাছে এক ভয়াবহ বল। দেরীতে বাঁক নেবার দরুন ব্যাটসম্যান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বলের লাইনে যেতে পারেন না, ফলে উইকেট হারাতে হয়।

কাট অর্থাৎ সুতোর ওপর আঙুল রেখে বলটাকে ছাড়ার সময় বাঁ বা ডানদিকে ইচ্ছে মত সামান্য ঘুরিয়ে দেওয়া। এর ফলে বল মাটিতে পড়ে বাঁ বা ডানদিকে মোড় ফেরে। একে বলে লেগ কাট বা অফ কাট। অফকাটের চেয়ে লেগকাট ব্যাটসম্যানদের বেশী আতঙ্কিত করে। তার প্রধান কারণ অফকাট করানোর সময় বোলারের হাত দেখে ব্যাটসম্যান বুঝতে পারেন বল কোনদিকে যাবে। কিন্তু লেগকাট করানর সময় হাতের ভংগিকে প্রচ্ছন্ন রাখা সম্ভব, ফলে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় ফেরা বলে ব্যাটসম্যান ঠকতে বাধ্য হন। ব্রাডম্যান এই লেগকাট বলকে ক্রিকেটের সবচেয়ে মারাত্মক বল বলে বিবৃত করেছেন। এমন কি তিনি তাঁর ক্রিকেট জীবনে যে সব বলে আউট হয়েছেন, তার মধ্যে যে বলটাকে সবচেয়ে ভাল বল বলে আখ্যা দিয়েছেন সেটা ছিল বেডসারের একটা লেগকাট। খুব জোরের ওপর কাট করানো শক্ত, তাই যাঁরা মিডিয়াম পেস বোলার তাঁরাই এই বলটাকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগান।
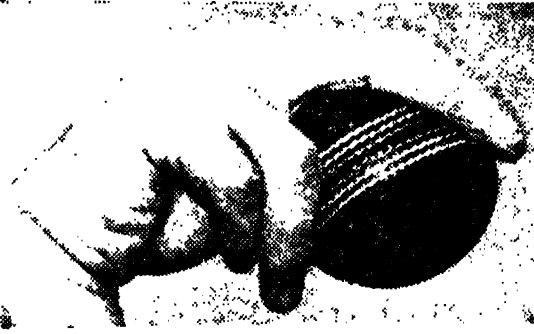
নতুন বলের বোলাররা বাম্পার অর্থাৎ বলকে সজোরে মাটিতে ঠুকে উঁচুতে তোলা ছাড়াও আর এক ধরনের বল করে থাকেন, একে বলে ইয়র্কার। ইয়র্কার বল হোল, যে বল একপিচে ব্যাটসম্যানের ব্যাটের তলায় এসে পড়ে। এই বল খেলতে সাধারণত যে ভুলটা হয় সেটা হোল ব্যাটসম্যানের অনেক সময়ই এক্ষেত্রে বুঝতে ভুল হয় যে বলটা এক পিচে ব্যাটের ওপর আসছে না তার আগেই মাটিতে পড়ছে। এই ভুলে অনেক সময় বল ব্যাটের তলা দিয়ে গলে যায়। বল সুইং করেও অনেক সময় নিচের দিকে নেমে আসে। সেক্ষেত্রেও এই ভুলে ব্যাটসম্যান আউট হন। সাধারণত যে সব ব্যাটসম্যান ড্রাইভ করার সময় ব্যাট পেছন দিকে খুব বেশী তোলেন, অথবা যে সব ব্যাটসম্যান ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে ব্যাট করতে দাঁড়ান, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই বল বিপদ ডেকে আনে।

এবার আসব স্পিন বোলিং-এর কথায়। স্পিন বোলিং প্রধানত দু ধরনের, অফ-স্পিন

অফ্-ব্রেক গ্রিপ

ও লেগ-স্পিন। এই ধরনের বল করা হয় আঙুল ও কব্জির সাহায্যে। অফ-স্পিনের ক্ষেত্রে কব্জির চেয়ে আঙুল কাজ করে বেশী, বিশেষ করে হাতের প্রথম আঙুলটা। আর অফ-স্পিনারদের দৈহিক উচ্চতা বেশী হলে ও হাতের তালু বড় হলে তা বলকে অনেক বেশী কার্যকর করে। লেগ-স্পিনার-দের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকাংশে বিপরীত। লেগ-স্পিনারদের আঙুলের চেয়ে কব্জির কাজ করে বেশী আর দৈহিক গঠন খাটো হলে বলের ফ্লাইট অর্থাৎ উঁচু করে ছাড়া বল ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্ত করতে সাহায্য করে। ক্রিকেটের কৃতী অফ-স্পিনার ও লেগ-স্পিনার বোলারদের দৈহিক গঠন তুলনা-মূলকভাবে বিচার করলেই আমার এ বক্তব্যটা অনেক সহজবোধ্য হবে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে, বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেগ-স্পিন বোলার রিচি বেনো এক দৃষ্টান্ত।

বেনোকে দেখলে মনে হয় তার শরীরটা যেন অফ-স্পিনার হওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে-ছিল, কিন্তু বেনো লেগ-স্পিনকেই বেছে নিয়েছিলেন। বেছে নিয়েছিলেন সম্ভবত তাঁর স্বদেশের মাটির চরিত্রের কথা ভেবেই। বলে প্রয়োজনীয় ফ্লাইট আনার জন্যে বেনোকে বল করার সময় হাঁটু থেকে শরীরটাকে ভেঙে ছোট করে নিতে হোত।

বল করার ভঙ্গির সুবিধের জন্যে অফ-স্পিন লেগ-স্পিনের চেয়ে অনেক সহজে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বল করা সম্ভব হয়। কিন্তু লেগ-স্পিনের বেলায় লেংথ ও ডিরেকশ্যন আয়ত্তে আনা খুব সহজ ব্যাপার নয়। শক্ত মাটির ফাস্ট উইকেটে লেগ-স্পিন খুব কার্যকর হয়। লেগ-স্পিনের কথা এলেই গুগলী বলের কথা এসে পড়ে। লেগ-স্পিনের সঙ্গে লটক বল হিসেবে গুগলী বল হাতে থাকলে ব্যাটসম্যানকে ঠকানোর পক্ষে সহায়ক হয়। গুগলী বল করার সময় বল লেগ-স্পিনের মতন ধরে একই ভঙ্গিতে বলটা ছাড়া হয়। কিন্তু বলটা মাটিতে পড়ার পর লেগ-স্পিন না করে অফ-স্পিনের মতো ভেতর দিকে আসে। লেগ-স্পিন ও গুগলী বল করার সময় কব্জির ভঙ্গির পার্থক্য এমনভাবে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে যাতে করে ব্যাটসম্যান তফাৎটা ধরতে না পারে। গুগলীর আর এক নাম বসি। প্রখ্যাত বোলার বসাঙ্কোয়েটের নামানুসারে এই নামের সৃষ্টি। বসাঙ্কোয়েটই প্রথম এই বিস্ময়কর বলের প্রবর্তন করেন। লেগ-স্পিন ও গুগলী বল করা হয় সাধারণত হাওয়ার বিপক্ষে ও সূর্যের দিক থেকে। এতে হাওয়ার চাপে বল অনেক সময় আগেই মাটিতে নেমে পড়ে। রোদের দিকে দেওয়ার কারণ উঁচু করে ছাড়া বল লক্ষ্য করতে গিয়ে রোদ অনেক সময় ব্যাটসম্যানের অসুবিধে সৃষ্টি করে।

এই তিন ধরনের স্পিন বল ছাড়াও আছে টপ-স্পিন। লেগ-স্পিন, অফ-স্পিন উভয় বোলারই এই বলের ব্যবহার করে থাকেন। বলটা হাত থেকে ছাড়ার সময় সামনের দিকে পাক খাইয়ে ছাড়া হয়, ফলে মাটিতে পড়ার পর বলের গতি বেড়ে যায় ও সামনের দিকে পাক খায় বলে বল পরে সোজা হয়ে যায়। বল কোন দিকে মোড় না ফিরে সোজা হয়ে যাওয়ায় ও গতি বাড়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যানরা এই বল সামলাতে পারেন না।

বর্তমান ক্রিকেটে স্পিন বোলিং এক বিরাট সমস্যার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা হোল স্পিনাররা সংখ্যায় দিন দিন কমে আসছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করলে যা দেখা যায় তা হোল বর্তমান ফাস্ট বোলারদের প্রতিপত্তি ও স্পিনা[রদের] প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সুযোগ অভাব। বর্তমানে ফাস্ট বা নতুন বল বল করেন তাঁদের ওপরেই বেশী করা হয়। এই ফাস্ট বোলারদের প্রয়ে বিশ্রাম ও নতুন বল নেবার অপে[ক্ষার] মধ্যেই যেন বর্তমানে স্পিনারদের সীমাবদ্ধ। তার নয়তো যেখানে অবস্থা খুব খারাপ, কিম্বা স্পি[ন] বোলারদের অনুকূলে নয়, সেখানে সুযোগ মেলে। সাধারণত টেস্ট ম্যা[চ] যে সব মাঠে ক্রিকেট খেলা হয় যেখান থেকে টেস্ট খেলোয়াড় তৈ[রী] সেই সব মাঠ আয়তনে অনেক ছো[ট।] সব ছোট মাঠে খুব কম অধিনায়ক স্পিনারদের হাতে বল করার দায়ি[ত্ব] ভরসা পান।

উদাহরণ হিসেবে কলকাতা[র] ক্রিকেটের দৃষ্টান্ত দিলে বরং আরও হবে। কলকাতার ক্রিকেট বাংলার ও সেই অর্থে জাতীয় দলেরও আনেকটা বলা যেতে পারে। এই লীগ ক্রিকে[ট] মাঠে খেলা হয় তার বেশীর ভাগই ফুটবল মাঠ অর্থাৎ আয়তনে ক্রিকে[ট মাঠের] চেয়ে অর্ধেক বলা যেতে পারে। এ মাঠে অল্পেই মাঠের বাইরে বল চ[লে] যায়। ফলে অধিনায়করা তার স্পিন প্রতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সুবিচার পারেন না। এমন কি দল বাছাই করা এই সব বিচার করে ক্রমশই স্পিন দল থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। কিছু, কম বাঁ-হাতের অফ-স্পিনাররা। তা[র] বেরিয়ে যাওয়া বলকে পিটিয়ে মাঠে[র বাইরে] পাঠানো কিছু শক্ত। তার আগেই অফ-স্পিন অনেক বেশী স্থির লক্ষ্যে করা যায়। তাই আজ কলকাতার ছো[ট] সব টীমেই যে কজন স্পিনার টিকে তাঁদের অধিকাংশই বাঁ-হাতের অফ-স্পি[নার।]

বোলিং সম্পর্কে বলা শেষ করার বলে রাখা দরকার, প্রত্যেক বোল[ারকে] শিখতে হবে, অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে কখন কি ধরনের বোলিং-এ কি। ব্যাটসম্যানের জন্যে কি ধরনের ফি[ল্ডিং] সাজাতে হবে। এই ধারণা থাকলে জন্যেই ব্যাটসম্যান আটকে রাখা যায়, তিন-চার গুণ ফিল্ডার দিয়েও ব্যাটস[ম্যানের] রান আটকানো সম্ভব হবে না।

বোলিং সম্পর্কে শেষ কথা কখনই কোন বড় বোলারকে হুবহু করে বড় বোলার হওয়া যায় না। বড় বোলার যাদের বোলিং-এ এমন আছে যা আর কারুর বোলিং-এ নেই। বোলার হতে গেলে এই সব বোলারদের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে। করতে হবে কতটা গ্রহণীয়। সেই প[র্যন্ত] লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত অন[বরত] করে যেতে হবে। যার মধ্যে যেটুকু আছে, যা করলে তার সম্পূর্ণ বিক[াশ] সেই দিকে অক্লান্ত পরিশ্রম কর[তে] হবে। বোলিং শেখার শেষ নেই।

যৌবনে ব্যাট হাতে লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন

শেষ ওভারের পঞ্চম বলে

অজয় বসু

লর্ড লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন—সংবাদের ...নামটি দেখে ক্রিকেট অনুরাগী মাত্রেই ...হয়েছেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ...লিয়ারিকে লর্ড উপাধি ভূষিত করে ...পাত্রেই যথাযোগ্য সম্মান অর্পণ ...ছেন।

অতিক্রান্ত যৌবনে লর্ড কনস্ট্যানটাইন ...র বহুমুখী প্রতিভার গুণে জীবনে ...প্রতিষ্ঠিত এবং এক সফল মানুষ। কিন্তু ...প্রথম পরিচয়ে তিনি এক সার্থক ক্রিকেটার। ...অশ্বেতকায় নির্ধন পরিবারের সন্তান ...তিনি লর্ডস গেম' ক্রিকেটে 'লর্ডলি' ...নিয়েই ঘোরাফেরা করছেন। এবং ...যৌবনকালে বনেদী লর্ড পরিবারের ...সন্তান-সন্ততিরা লর্ডদের গেমে তাঁর সহ-...জ দক্ষতা দেখে মৌন ও মুক্ত তারিফে ...প্রতি সোচ্চার সেলাম বাজিয়েছেন।

কনস্ট্যানটাইন সত্যিই ক্রিকেটে এক ...সাধারণ চরিত্র। একটি ছোট্ট নিবন্ধে ...ক্রিকেট তাঁর বহুবিধ কীর্তিকলাপকে ধরে ...রা সম্ভব নয়। তাই আজ আমি একটি ...সাধারণ খেলার কথাই শুধু স্মরণ করছি, ...খেলায় ওই অসাধারণ চরিত্রের ভূমিকা ...অবদান ছিল অনন্যসাধারণ। কথা ...ইদিনের যেদিন আজকের লর্ড ছিলেন ...কই এক কমনার।

খেলা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডে। ১৯৩৪-৩৫ মরশুমের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। ...ওয়াটের নেতৃত্বে এম সি সি সেবার ...ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করেছে। দলে রয়েছেন ...মতো খেলোয়াড়—ওয়ালি হ্যামণ্ড, ...এমস, প্যাটসি হেনড্রেন, কেনেথ ফার্ণস, মরিস লেল্যাণ্ড, পার্সি হোমস এবং আরও অনেকে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গ্রান্ট আর ইংলণ্ডের বব ওয়াট বর্ষণ সিক্ত ব্রিজটাউন মাঠে অল্প রাণে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণায় বিরাট ঝুঁকি কাঁধে নিতে এতোটুকু দ্বিধা করেন নি। তাই সেবার প্রথম টেস্টেই আসর জমে উঠেছিল। অল্প রাণের (ওঃ ইণ্ডিজ ১০২ ও ছ উইঃ ৫১ ডিঃ, ইংলণ্ড সাত উইঃ ৭১ ডিঃ ও ছ উইঃ ৮৩) খেলাতে ইংলণ্ডই জেতে চার উইকেটে। তারই পক্ষকাল পর পোর্ট অব স্পেনে কুইন্স পার্ক ওভালে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ।

প্রথম টেস্টে কনস্ট্যানটাইন খেলেন নি। ভারত সফর সেরে দেশে পেঁাছেই তাঁকে ছুটতে হয় কুইন্স পার্ক ওভালে। আগের টেস্টেই ক্রিকেট জমে উঠেছিল। কাজেই এবারে উদ্দীপনারও শেষ নেই যেন। সাজানো মাঠে কাতারে কাতারে লোক। গ্যালারীতে মানুষ, ঘাসের গালচে ভর্তি দর্শক। এই দর্শকদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো ক্রিকেট মাঠের দর্শকদের বড় একটা মিল নেই। সারাক্ষণ বকবক করেন, আর কথায় কথায় বাজী ধরেন। কোন্ ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করবেন, কোনজন শূন্য হাতে ফিরে যাবেন, চলতি ওভারে উইকেট পড়বে বা বাউণ্ডারী হবে কিনা—নানান প্রশ্ন ঘিরে নানা ধরনের বাজী। কিন্তু ক্রিকেটে ওঁদের উৎসাহে কখনো ভাটা পড়ে না: চড়চড়ে রোদ্দুর মাথার তালু ফাটালেও মাঠ ছেড়ে ওঁরা ঘরমুখী হতে চান না। বাউণ্ডারী আর ওভার বাউণ্ডারী দেখতে পেলেই ওঁরা খুসী। আর সমর্থিত দল জিতলে তো কথাই নেই, খাঁচালের কাঁধে নিয়ে নর্দন-কুর্দনে এক কাণ্ডই বাধিয়ে বসেন!

ওঁদের ধরণ-ধারণই আলাদা। বাড়তি প্রাণের উত্তাপে ওঁরা যেন প্রতি মুহূর্তেই ফেটে পড়তে চান। তবে, হ্যাঁ, খেলা যদি খেলার মতো না হয় তাহলে তখন তার সঙ্গে ওঁদের আড়ি। মোক প্রচারের গলা তুলে ডাকাডাকি করলেও ওঁরা কেউ মাঠের দিকে আর ফিরে তাকাবেন না। দর্জীখিটির সাক্ষী সেজে আছে নাকি কর্মকর্তার পরিচালিত আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট দল।

কিন্তু সেকথা থাক। যে কথা বলছিলাম, তাতেই ফিরে আসি।

এক মাঠ দর্শককে সাক্ষী রেখে কুইন্স পার্ক ওভালে দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভের মুখে বব ওয়াট তাঁর পরিকল্পিত পথে হাতের পাশা হাতছাড়া করালেন—টসে জিতেও তাজা পিচে ব্যাট করতে ডাকলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। কেন? ব্রিজটাউনের পরীক্ষার সাফল্যের রেশ ওয়াটের মন থেকে কি তখনো কেটে যায় নি?

কে জানে! বিস্ময়ে অথচ আনন্দে অপরিসীম স্ফূর্তিতে ব্যাট ঘোরালেন সিলি। রীতিমতো সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাট, প্রয়োগ-রীতিতে খোঁচ খাঁচ নেই, কাট, হুক, ড্রাইভের অলংকরণে মাঠকে মাঠ সেজে উঠলো। রাণ করলেন নব্বই।

তারপর কনস্ট্যানটাইনের পালা।

কনস্ট্যানটাইনের ব্যাট সিলির মতো পরিচ্ছন্ন, চিকন নয়। কিন্তু কাজের হিসেবে হাতিয়ার বটে। এক এক ঘায়ে ইংলণ্ডের জারিজুরি থেঁৎলে গেল। চারে-ছয়ে করতো তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে গেলেন সেঞ্চুরীর দোর গোড়ায়। কিন্তু নব্বইয়ের গণ্ডি ডিঙোতে পারলেন না। নব্বইয়ের মাথায় নড়বড়ে ব্যাটের কানা ছুঁয়ে ক্যাচ উঠতেই প্যাটসি হেনড্রেন সেটিকে ধরে ফেললেন। আমুদে হেনড্রেনকে কনস্ট্যানটাইন সাধে কি আর চিরদিন ঘোর শত্রু বলে মনে করতেন। তবে মাঝমাঠে বোলার কনস্ট্যানটাইন আর ব্যাটসম্যান হেনড্রেনে (একবার পুরু গদী-ওয়ালা হেলমেট এঁটে হেনড্রেন কনস্ট্যানটাইনের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমেছিলেন) যতো শত্রুতা, মাঠের বাইরে তাঁদের দুজনে ততোই গলাগলি। তাঁদের শত্রুতার রীতিও স্বতন্ত্র।

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো ৩০২, ইংলণ্ড জবাব দিলো ২৫৮ রাণে। হ্যামণ্ড, হেনড্রেন, এমস, লেল্যাণ্ডের মতো নামী ব্যাটসম্যানেরা সুবিধে করতে পারেন নি। শুধু ঝড় তুফানের মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন পার্সি হোমস (৮৫ নট আউট) আর ইডন (৭০), হোমস সেঞ্চুরী করতে পারতেন। কিন্তু সময় পেলেন না, সব সঙ্গীই তাঁকে একে একে ছেড়ে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে হাল ধরলেন জর্জ হেডলি। হেডলি তখন ক্রিকেট দুনিয়ার

'ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান'। মস্তো সংজ্ঞা তাঁর। আর সেই সংজ্ঞার প্রতি সুবিচার করতেই যেন তিনি ব্যাট নামক আয়ুধটি ইংলণ্ডের বিপক্ষে ব্যবহার করলেন। ফলে রাণ ছুটলো ঝড়ের বেগে, মারে মারে রোদ ঝলসানো মাঠের মেজাজ আরও তেতে উঠলো। খেলার মেয়াদ মাত্র তিন দিন। ফয়সালায় পৌঁছতে হলে কব্জী খুলে ব্যাট ঘোরাতেই হয়। এই মহাসত্যটি এককালে সবদেশের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানেরা জানতেন। জর্জ হেডলি তো সর্বকালের এক ব্যাটসম্যান। কাজেই তিনি যে সেই পরম সত্যের মর্যাদা ধরে রাখায় সনিষ্ঠ ছিলেন, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। পরিত্রাণকর্তা জর্জ হেডলির (১০) পাশে সেদিন সিলি ও কনস্ট্যানটাইনও কিছুক্ষণের জন্যে মানানসই হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তাই দ্বিতীয় ইনিংসে রাণ উঠেছিল ২৮০ ছ উইকেটে। গ্রান্ট ওই মুহূর্তেই থেমে পড়ার নির্দেশ দেন—ইনিংস ডিক্লেয়ার। তখন শেষদিনের মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিরতি।

বিশ্রামান্তে আবার সুরু। এবার ইংলণ্ডের ব্যাটিং। হাতে সময় সাড়ে তিন ঘণ্টা, জেতায় দরকার ৩২৫ রাণ। কিন্তু ইংলণ্ড জেতার চেষ্টা করে নি। বাঁচার তাগিদে আত্মরক্ষারই পথ বেছে নিয়েছিল। সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখে বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। কিন্তু ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পাঁচ-পাঁচজন ব্যাটসম্যান ফিরে যাওয়ায় ইংলণ্ডের নিশ্চিন্ত পরি-কল্পনা যেন অনিশ্চিত হয়ে ওঠলো। এরই ফাঁকে আবার হ্যামণ্ডকে ফিরতে হয়েছে। মারবো কি মারবো না করে কনস্টানটাইনের একটি অফ ব্রেককে সামলে দিতে গিয়ে হ্যামণ্ড নিজেই বেসামাল।

হ্যামণ্ডের পতনে ইংলণ্ডের মূর্চ্ছা আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উত্থান সম্পূর্ণ প্রায়। তবু রুখে দাঁড়ালেন হেনড্রেন ও বব ওয়াট। কাটিয়ে দিলেন চা-বিরতির সময় পর্যন্ত। রাণ তখন পাঁচ উইকেটে পঁচাত্তর। হ্যামণ্ড নেই, হাতি কাদায় পড়ে গিয়েছে। হেনড্রেন-ওয়াটের দু পাটি দাঁত পরস্পরকে চেপে ধরেছে। দুজনের পিঠ দেওয়ালে।

চা-বিরতির পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার মার্টিনডেল মাঠে ফিরলেন৷ প্রথম-দিনেই হাতে আঘাত পেয়ে মার্টিনডেল প্যাভিলিয়নে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর মাঠে নামেন নি। ফিরলেন এখনই, যখন জয়লক্ষ্মী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একেবারে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। শোভনতার প্রশ্ন তুলে ওয়াট মার্টিনডেনের পুনরাগমনে আপত্তি তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ জানান নি।

বিরতির পর মার্টিনডেনের প্রথম ওভারে কোনো রাণ হলো না, উইকেটও পড়লো না। পরের ওভার কনস্ট্যানটাইনের। প্রথম বলটি সোজা, দ্বিতীয়টি আরও জোরে লেগ স্টাম্পের বাইরে, ওয়াট ছোঁবার চেষ্টা করলেন না। তৃতীয়টি অফ স্টাম্পের, ওয়াট ব্যাট বাড়ালেন। বল কানা ধরেই ঊর্ধ্বমুখে ছুটলো, সংগে সংগে জর্জ হেডলিও ডান হাত ছুঁড়ে ঊর্ধ্বাকাশেই ক্যাচটি ধরে নিলেন।

আরও চার রাণ পর শিলপের দিকে বল ঠেলে হেনড্রেন যেই ছুটতে যাবেন, অমনি রানার এমস তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। হেন-ড্রেন ফেরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেল। লেল্যাণ্ড এলেন এবং সময় কাটাবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ একটি বাম্পার তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে পেছন দিকে ছুটলো। উইকেটরক্ষক ও শিলপ ফিল্ড-ম্যানেরা পড়ি মড়ি করে ছুটেও ক্যাচের নাগাল পেলেন না। বল গড়ালো মাটিতে, সংগে সংগে হায় হায় করে উঠলো মাঠের হাজারো কণ্ঠ। ক্যাচ পড়লো, না তাঁদের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি থেমে গেল!

পরের ওভারে অভাবনীয় কাণ্ড। কনস্ট্যানটাইন দু-একটি বাম্পার ঠুকতেই আম্পায়ার জানালেন, এই জাতীয় বল ব্যাটসম্যানদের পক্ষে বিপজ্জনক। আম্পায়ার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় রিচার্ডসন। তাঁর নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। কনস্ট্যানটাইনকে সরিয়ে নিতে হলো গ্রান্টের।

কিন্তু জনতা রিচার্ডসনের রায়ে কান প্যাতলো না। তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে, ভয় দেখালো মাঠে ঢুকে হামলা করার। মিনিট কয়েকের হৈ হট্টগোল, খেলা ভাঙ্গার হুমকির পর গ্রান্ট আবার ফিরিয়ে আনলেন কনস্ট্যানটাইনকে।

ওদিকে লেসলি এমস হিলটনের লোপ্পা ফুলটসের টোপ গিলে সিলি মিড অনে ধরা পড়েছেন, তার আগেই ওই হিলটনই ফিরিয়ে দিয়েছেন ইডনকে। অতএব ইংলণ্ডের ভরসা শুধু শেষ জুটি লেল্যাণ্ড ও হোমস, তাঁরাই শিবরাত্রির সলতে।

ব্যাটসম্যান হিসেবে অবশ্য লেল্যাণ্ড বা হোমস কেউ কমতি যান না। লেল্যাণ্ডের অনমনীয়তা এবং পার্সি হোমসের পরিচ্ছন্ন ব্যাটিং রীতির সামনে তাঁদের কালে বিশ্বের প্রথম সারির সব বোলারকেই সময় সময় মাথা নোয়াতে হয়েছে। পার্সি হোমস প্রথম ইনিংসে পঁচাশীতে অপরাজিত ছিলেন। আংগুলে আঘাত পেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মাঠে নামার আর ইচ্ছেই ছিল না। নামতে হলো বাধ্য হয়েই।

হোমস আসতে গুটিকয়েক অতিরিক্ত রাণ উঠলো। এক আধটি নয়, নয় নয় করে চারটি বাই। কিন্তু রাণ নিয়ে তখন কে মাথা ঘামাচ্ছে। যতো মাথা ব্যথা সময় ঘিরেই। সময় যতো ফুরোচ্ছে কনস্ট্যান-টাইনের মাথা ব্যথা আরও বাড়ছে। দায় তো তাঁরই, তিনি যে দিনের শেষ ওভারে বল হাতে নিয়েছেন।

তখনও মিনিট খানেক বাকী। কিন্তু ওভার আরম্ভ হয়েছে, শেষ করতেই হবে। কি হয়, কি হয় ভাব নিয়ে সারা মাঠ তখন থমথমে, ছুঁচ পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যায় না। একটু আগে রিচার্ডসনের রায় শুনে অতগুলো মানুষ যে প্রচণ্ড হাঁক তুলেছিলেন। তাঁরা সব গেল কোথ আওয়াজ বলতে বুঝি বোলার কনস্টানট আর ব্যাটসম্যান লেল্যাণ্ডের বুকের ভেত ঢিব্ ঢিব্ টিঁকে শব্দটাই রয়েছে।

শেষ ওভারের দ্বিতীয় বল সে জোরের ওপর, পরেরটি লেগের দি তৃতীয়টি পিচ পড়লো অফ স্টাম্প বাইরে—কিন্তু কোনো ফাঁদেই লেল ধরা পড়তে চাইলেন না। তাঁর তো ধৈ পরীক্ষা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় লেল্যান্ড পাশ করতে পারলেন

শেষ ওভারের পঞ্চম বল। সমান বে ছুটে এসে সমান ভঙ্গীতে হাত ঘু কনস্ট্যানটাইন বল হাতছাড়া করে লেল্যাণ্ড ভাবলেন, এবারও ব বল আসবে সমান বেগে। কি তার ঠিকেয় ভুল হয়ে গে কনস্ট্যানটাইন অতো জোরে বল দেন কিঞ্চিৎ আস্তে টোপটিকে ঝুলিয়ে দি বড়শিতে গেঁথে তুললেন তাঁর লক্ষ্যকে।

বলের গতিবেগ আন্দাজে ভুল হ লেল্যাণ্ডের ব্যাট এগোলো আগে, এলো পরে। এসেই জোড়া পায়ে ম ঠুকলো। সংগে সংগে আকাশ কাঁপ চীৎকার উঠলো হাউজ দ্যাট! শব্দ ব বোধহয় পুরোপুরি উচ্চারণও করা হয় তার আগেই আম্পায়ারের অনা ঊর্ধ্বাকাশে মাথা ফুঁড়ে উঠে জা দিলো, লেল্যাণ্ড খতম। ইংলণ্ডও শে শেষ ওভারের পঞ্চম বলে খেলায় ই জয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের, ২১৭ রাণে।

তখনো ব্রিজবনে টাই টেস্ট উপহ নাটকীয় ক্রিকেটের শেষ দৃশ্যের সা পাওয়া যায় নি। তাই ১৯৩৪-৩৫ সা পোর্ট অব স্পেনের এই খেলাটি ক্রিকেট দুনিয়া উত্তেজনায় থরথর কেঁপে উঠছিল। সেদিন কে জানতে এমন একটি রসালো কাণ্ডকে এক ব্রিজবেনের আরও বড় ঘটনা বা অঘট পায়ে মাথা নোয়াতে হবে!

খেলা তো শেষ হলো, কিন্তু পরক্ষ সুরু হয়ে গেল গুণমুগ্ধ দর্শকদের ব পুজোর হৈ-হুল্লোড়। হাজার দশেক দ ওই মুহূর্তে মাঠে ছুটে এসেছিল। তা প্রসারিত বাহুর সস্নেহ আলিংগন এড়াবে এমন সাধ্য ছিল না ওয় ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের। তাঁদের ম আবার কনস্ট্যানটাইনের আপ্যায়নই আ নিবিড়। শেষ ওভারেই তিনি কেল্লা ফ করে দিয়েছেন। অতএব কৃতজ্ঞ জন কাঁধে চড়েই কনস্ট্যানটাইনকে সেদিন থেকে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়েছিল।

সেই কনস্ট্যানটাইন আজও ক্রি দুনিয়ার স্বীকৃতির কাঁধেই চড়ে রয়েছে কবে তিনি খেলা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর জনপ্রিয়তায় টান পড়ে নি। থেকে স্যার, স্যার থেকে লর্ড— স্বীকৃতির মূলেই আছে কিন্তু নি কনস্ট্যানটাইনের ক্রীড়া প্রতিভা। ইংলা রাণীকে ধন্যবাদ যে তিনি একজন ক্রিকেটারের কদর বুঝেছেন।

খেলাধূলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৬৪ রান (লয়েড ৫০ এবং সোবার্স ৪৯ রান। ম্যাকেঞ্জি ৮৫ রানে ৪ এবং ফ্রিম্যান ৫৭ রানে ৩ উইকেট)।

৩২৪ রান (বুচার ১০১ এবং কানহাই ৬৯ রান। গ্লিসন ৯১ রানে ৪ এবং ফ্রিম্যান ৫৯ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৫৪৭ রান (ওয়ালটার্স ১১৮, রেডপাথ ৮০, ফ্রিম্যান ৭৬ এবং স্ট্যাকপোল ৫৮ রান। হল ১১৩ রানে ৩ উইকেট)।

৪২ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

সিডনীর তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে এবং বর্তমানে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে আর দুটি খেলা বাকী। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে জয়লাভের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরবর্তী ২য় এবং ৩য় টেস্ট খেলায় শোচনীয়ভাবে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের মান-সম্মান যথেষ্ট খর্ব হয়েছে। স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছিল বর্তমান দলটি তার ছায়ামাত্র। গত ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুর্বলতা বেশ ধরা পড়েছে। একমাত্র সোবার্স ছাড়া বাকী কেউই তাঁর বিশ্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার দান পেয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। প্রথম দিনের খেলায় তারা আটটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ২১৮ রান সংগ্রহ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা 'ক্যাচ' হাত-ছাড়া না করলে ২০০ রানের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হত। অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকেঞ্জি ৬৩ রানে তিনটে এবং ফ্রিম্যান ৫৭ রানে তিনটে উইকেট পান। সুতরাং প্রথম দিনের খেলায় গৌরবের সিংহ ভাগ ছিল অস্ট্রেলিয়ার।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে খেলা শেষের সময়ে অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৮০ রান তুলে ১৬ রানে অগ্রগামী হয়। তখন তাদের হাতে জমা ছিল ৬টা উইকেট। চা-পানের পর ওয়ালটার্স এবং রেডপাথ নির্মমভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের বল পিটিয়ে খেলেন। সোবার্সেরই দু ওভারের বলে তাঁরা ৩৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন। চা-পানের বিরতির সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ১৫৪ (৩ উইকেটে)। চা-পানের পর ৪র্থ উইকেটের জুটি ওয়াল্টার্স এবং রেডপাথ এমন ঝড়ের বেগে খেলেন যে, মাত্র ১৭ মিনিটের খেলায় দলের রান গিয়ে দাঁড়ায় ২০০তে। তাঁরা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ২৬ মিনিটে ৫০ রান সংগ্রহ করেন। এক ঘন্টার খেলায় ৮২ রান সংগ্রহের পর ৪র্থ উইকেট জুটি ভেঙ্গে যায়। প্রথম উইকেটের জুটি লরী এবং স্ট্যাকপোল ১৪ মিনিটে ৬৮ রান তুলে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলার ভিত বেশ শক্ত করেছিলেন। এই দিন ওয়াল্টার্স ৬৭ রান করে নট-আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৫৪৭ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ২৮৩ রানে অগ্রগামী হয়ে জয়লাভের পথ অনেকটা পরিষ্কার করে নেয়। ওয়াল্টার্স সেঞ্চুরী (১১৮ রান) করেন। অস্ট্রেলিয়ার ল্যাজের দিকের খেলোয়াড়রা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের কোন রকম তোয়াক্কাই করেন নি। অস্ট্রেলিয়ার তিনজন বোলার ফ্রিম্যান (৭৬ রান), গ্লিসন (৪২ রান) এবং কনোলী (৩৭ রান) শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করেছিলেন। তৃতীয় দিনের বাকী ৮৬ মিনিটের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৬৫ রান করেছিল।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৪ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের জন্যে মাত্র ৪২ রানের প্রয়োজন হয়। বেসিল বুচার সেঞ্চুরী (১০১) করেন। ২য় উইকেটের জুটিতে প্রারম্ভিক খেলোয়াড় রয় ফ্রেডারিকস এবং ৩নং খেলোয়াড় রোহন কানহাই ১৩৪ মিনিটে দলের ১০৩ রান যোগ করে প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে দলকে উদ্ধার করেন। কিন্তু এই জুটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর আবার বিপর্যয় দেখা দেয়। ১২৭ রানের মাথায় ৩য় এবং ১৬৮ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। ৫ম উইকেটের জুটিতে বুচার এবং সোবার্স ৬৭ মিনিটে দলের ৭৫ রান তুলে আশার যে আলো দেখিয়েছিলেন তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দলের ২৪৩ রানের মাথায় সোবার্স

ডগ ওয়ালটার্স (অস্ট্রেলিয়া)

(৫ম উইকেট) আউট হন। এর পর দলের ২৬৩ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ এবং ২৬৪ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তখন খুবই সঙ্গীন অবস্থা। অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ দিনেই খেলাটা শেষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ৮ম উইকেটের জুটি বেসিল বুচার এবং উইকেটকিপার জ্যাকি হেণ্ড্রিকসের এক ঘন্টা মাটি কামড়ে অতি মূল্যবান ৫৪ রান করার ফলেই অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ দিনে খেলা শেষ করতে পারে নি। খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ৪২ রান করার প্রয়োজন ছিল। অস্ট্রেলিয়া ৪র্থ দিনে ১৫ মিনিটেরও কম সময়ের খেলায় ১৫ রান সংগ্রহ করেছিল। হাতে দশটা উইকেটই জমা ছিল।

পঞ্চম দিনে ১৭ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকী ২৭ রান তুলে দিয়ে ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

ডুরাণ্ড কাপ

১৯৬৮ সালের প্রখ্যাত ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দল ১—০ গোলে গত বছরের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করেছে। ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের (ভূতপূর্ব পাঞ্জাব পুলিশ) এই প্রথম খেলা। অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল দলের এই খেলা ছিল অষ্টম বারের ফাইনাল খেলা। ইস্টবেঙ্গল দল ইতিপূর্বে ৫ বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে। আলোচ্য ফাইনাল খেলা শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের রাইট আউট সুরজিৎ সিং জয়সূচক গোলটি দেন।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের এই ডুরাণ্ড কাপ জয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। কারণ তাদের একাধিক শক্তিশালী দলের

ডুরাণ্ড কাপ

বিপক্ষে খেলতে হয়েছিল। তারা সেমি-ফাইনালে রোভার্স কাপ বিজয়ী (১৯৬৮) মোহনবাগান এবং ফাইনালে গতবারের (১৯৬৭) ডুরান্ড ও রোভার্স কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেয়।

সেমি-ফাইনালে চারটি দলের মধ্যে ছিল বাংলার দুটি (ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান) এবং জলন্ধরের দুটি (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং লিডার্স ক্লাব)। ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে লিডার্স ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ০-০ ও ২-১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল।

জাতীয় স্কুল গেমস

নয়াদিল্লীর জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৪তম জাতীয় স্কুল গেমস (শীতকালীন) বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়েছে। পাঁচ দিনের এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ১,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছিল। এ্যাথলেটিকসের বালক বিভাগে পাঞ্জাবের ১৭ বছরের ছাত্র আজীব সিং তিনটি দৌড় অনুষ্ঠানে (১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার) প্রথম স্থান লাভ করে ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। অপরদিকে বালিকা বিভাগে ব্যাঙ্গালোরের ১৫ বছরের ছাত্রী নির্মলা উথাইয়া ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান জয়ের সূত্রে শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট আখ্যা লাভ করে।

বিভিন্ন খেলার চূড়ান্ত ফলাফল

এ্যাথলেটিকস্ (বালক): ১ম পাঞ্জাব (৫০ পয়েন্ট), ২য় দিল্লী (৩৩), ৩য় রাজস্থান (১৫)

এ্যাথলেটিকস (বালিকা): ১ম মহীশূর (৪০), ২য় রাজস্থান (১৮), ৩য় দিল্লী (১৭)।

ভলিবল:

বালক বিভাগ : ফাইনালে মধ্যপ্রদেশ ১৫-১১, ৯-১৫, ১৫-৬ ও ১৫-৮ পয়েন্টে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে।

বালিকা বিভাগ: ফাইনালে পাঞ্জাব ১৫-৯, ১৫-৩ ও ১৫-৩ পয়েন্টে কেরালাকে পরাজিত করে।

হকি: দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ (যুগ্ম বিজয়ী)

জিমন্যাসটিক্স:

বালক বিভাগ: ১ম ত্রিপুরা, ২য় পাঞ্জাব, ৩য় দিল্লী।

বালিকা বিভাগ: ১ম বাংলা, ২য় পাঞ্জাব, ৩য় দিল্লী।

বালিকা বিভাগে বাংলার কুমারী আরতি দাস ব্যক্তিগত খেতাব লাভ করে।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

কেরালার কোট্টায়ামে আয়োজিত জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ভারতীয় রেলওয়ে দল গত ১১ বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। মহারাষ্ট্র দুটি খেতাব পেয়েছে—মহিলা এবং বালক বিভাগে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ: রেলওয়ে ৭০-৫১ পয়েন্টে গত ১১ বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ: গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র ৭৩-২৮ পয়েন্ট কেরালাকে পরাজিত করে।

বালক বিভাগ: মহারাষ্ট্র ৭৭-৪১ পয়েন্টে মাদ্রাজকে পরাজিত করে।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

ত্রিবান্দ্রমে আয়োজিত ১৭তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব এবং অন্ধ্র-প্রদেশ পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের ফাইনালে খেলে খেতাব ভাগ করে নিয়েছে—পুরুষদের খেতাব পেয়েছে পাঞ্জাব এবং মহিলাদের খেতাব জয়ী হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ: গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব ৯-১৫, ১৫-১১, ১৭-১৫ ও ১৫-২ পয়েন্টে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ: অন্ধ্রপ্রদেশ ১৫-১২, ১৫-৬, ১০-১৫ ও ১৫-১২ পয়েন্টে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

জব্বলপুরে আয়োজিত ৩০তম জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে অন্ধ্র প্রদেশ তিনটি খেতাব জয়ের সূত্রে সর্বাধিক খেতাব জ[...] গৌরব লাভ করেছে। মহারাষ্ট্র ব্যা[...] বিভাগের ৯টি অনুষ্ঠানের মধ্যে [...] ফাইনালে খেলে শেষ পর্যন্ত দুটি বি[...] খেতাব জয়ী হয়েছে—মহিলাদের ডা[...] এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। অন্ধ্র প্র[...] পেয়েছে তিনটি খেতাব—পুরুষদের সি[...]লস এবং বালকদের সিঙ্গলস ও ডাব[...]

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : মীর ক[...] আলী (অন্ধ্রপ্রদেশ) ২১—১৪, ১৬—২১—১৯, ১৮—২১ ও ২১- পয়েন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ান এবং [...] পুরস্কার বিজয়ী ফারুক খো[...] (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : উষা সু[...] (মহীশূর) ২১—১২, ১০—২১—১৫ ও ২১—১৭ পয়েন্টে রোজারিওকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত ক[...]

পুরুষদের ডাবলস : কে জয়ন্ত [...] বি সইকুমার (মহীশূর) ২১[...] ১৫—২১, ২১—১৬ ও ২১—[...] ফারুক খোদাজী এবং এম এস [...] (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : প্রিকা [...] এবং কে চার্জম্যান (মহারাষ্ট্র) ২১[...] ২১—১৪, ২২—২৪ ও ২১—১১ মঞ্জুলা সিং এবং প্রমীলা মুক্কা[...]কে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ফারুক [...] এবং কে চার্জম্যান (মহারাষ্ট্র) ২[...] ১২—২১, ২১—১৬ ও ২১—১১ প[...] আর চাঁচাদ এবং প্রিকা [...] (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পশ্চিমবংগ রাজ্য এ্যাথলেটিকস

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়ো[...] ১৯তম পশ্চিমবংগ রাজ্য এ্যাথলে[...] প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ইস্টা[...] ক্লাব উপর্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়ান হ[...] গৌরব লাভ করেছে। এরিয়ান্স ক্লাব [...] খেতাব পেয়েছে—মহিলা এবং [...] বিভাগে।

চূড়ান্ত ফলাফল

দলগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : ইস্টবেংগল (১১৫ পয়েন্টে)।

মহিলা বিভাগ : এরিয়ান্স [...] পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ : এরিয়ান্স [...] পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : কে এস স[...] (ইস্টবেঙ্গল)।

মহিলা বিভাগ : জেনি নিস [...]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৭ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 24th January, 1969. শুক্রবার, ১০ই মাঘ, ১৩৭৫ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমিত রায়

চিঠিপত্র

'অমিয় নিমাই চরিত' প্রসঙ্গে

"অমৃত" পত্রিকায় (২৬ পৌষ, ১৩৭৫) শ্রীদীপককুমার সেন সংগৃহীত কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের "অমিয় নিমাই চরিতের" সমালোচনাটি নিঃসন্দেহে একটি সুপ্রাচীন তথ্যের মূল্যবান সংযোজন। প্রসঙ্গতই নবীন সেনের শেষ অসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ "অমৃতাভ" বা চৈতন্যলীলার ইতিহাস অবিস্মরণীয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে কবির তিরোভাবের পরে কবিপুত্র নির্মলচন্দ্র সেন (রেঙ্গুণ ব্রহ্মদেশ) উহা প্রকাশ করেন। দোলপূর্ণিমায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি—৫ই মার্চ ১৯০১ খৃঃ কবি প্রথম সর্গ রচনা আরম্ভ করেন,—অসম্পূর্ণ শেষ সর্গের রচনাকাল ১৯০৮ সাল। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই কাব্যের সুদীর্ঘ ভূমিকায় লিখেছেন—"...১৮৯৩ সালে মদীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের "অমিয় নিমাই চরিত" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে, নবীনবাবু ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া চৈতন্য-লীলার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় ঐ সময়েই চৈতন্য-লীলা বিষয়ক শিশিরবাবুর কয়েকটি মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হয়। উহার ফলে সেই আকর্ষণ আরও বর্ধিত হয়। ১৩০২ সালে বুদ্ধদেবের চরিতকথা "অমিতাভ" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—শিশিরকুমারের 'অমিয়-নিমাই চরিতের' মাধুর্য তাঁহার হৃদয়কে তখন প্লাবিত করিয়াছে—"অমিতাভ" কাব্যের শেষে সেই অভিপ্রায়টি প্রকাশিত—

"...আসিয়া আবার পতিতপাবনী তীরে
পতিতপাবন
পাষাণ করিবে দ্রব প্রেম অশ্রুজলে।
ভাসি প্রেম অশ্রুজলে, বড় সাধ মনে
দেখিবে কাঙাল কবি সে লীলা করুণ :—"

"ফলতঃ, "অমৃতাভের" অনেক স্থলেই "অমিয়-নিমাই চরিতের" প্রভাব লক্ষিত হয়। "অমৃতাভের" ঘটনাসংস্থান ও বাক্য-বিন্যাস বিষয়ে নবীনবাবু স্থানে স্থানে শিশিরবাবুর নিকট ঋণী। কিন্তু সর্বত্রই ভাব-সুললিত কবিত্ব তাঁহার নিজস্ব।...১৩০৭ সালে, কাব্য রচনার সূত্রপাত। তাঁহার একমাত্র স্নেহাস্পদ পুত্র নির্মলচন্দ্র তখন বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিলাত যাত্রার সঙ্কল্প। তাহারই কল্যাণ-কামনায় তিনি "অমৃতাভ" রচনা আরম্ভ করেন... পুত্রের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা আছে।...নির্মলচন্দ্রের প্রবাস-যাত্রা না হইলে হয়তো "অমৃতাভ" রচিতই হইত না।... অসম্পূর্ণ শেষ দুই সর্গ, কৃতী পুত্রের কর্মস্থল রেঙ্গুণে বিরচিত। করুণ-রসের অবতারণায় নবীনবাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের পাঠকমাত্রেই একথার সাক্ষ্য দিবেন। শ্রীচৈতন্যলীলা করুণ রসের খনি। বাঙালী পাঠকের দুর্ভাগ্য যে, সন্ন্যাসের উদ্যোগেই গ্রন্থপাঠ সাঙ্গ করিতে হইতেছে। যদি নবীনবাবুর অনুপম তুলিকায় সেই মহাশোকের দৃশ্য চিত্রিত হইতে পারিত... বাঙালী পাঠক ভক্তিতে গদগদ হইয়া প্রেম অশ্রুজলে হৃদয়ের কালিমা ধৌত করিবার অবসর পাইত..."—

"...আবার জননী কাঁদিলা কাতরে,
দয়া তব সর্বজীবে।
নিমাই! কেবল নিজ জনে তব
এরূপে কি দুঃখ দিবে?
এ বৃদ্ধা জননী কিশোরী ঘরণী,
তাহারা কি জীব নয়?"
(অসম্পূর্ণ শেষ সর্গ "অমৃতাভ")

গোরাচাঁদ মিত্র,
(টেকচাঁদ ঠাকুর ভবন) কলিকাতা-৪

এক লিপি অনেক ভাষা

গত ২০ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃতে' প্রকাশিত আশিস সান্যালের 'এক লিপি অনেক ভাষা' প্রবন্ধটি নানা কারণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য কারণে যখন অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে, জাতীয় সংহতি যখন দারুণভাবে বিপর্যস্ত, তখন অনেক-ভাষার দেশ ভারতবর্ষে একটিমাত্র লিপি প্রবর্তনের চিন্তা—অন্তত এই বিষয়ে আলোচনা নিতান্ত অপরিহার্য।

এই প্রবন্ধে শ্রীসান্যাল মোটামুটিভাবে রোমান হরফকে ভারতবর্ষের ভাষাগুলির সাধারণ লিপি হিসাবে প্রবর্তনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের যুগ্ম পরিচালনায় হওয়া প্রয়োজন, এরূপ মন্তব্য করেছেন।

আজ দুই পাকিস্তানে যখন উর্দু লিপিকে সাধারণ লিপি হিসাবে প্রবর্তনের আয়োজন চলে, তখন ভারতের সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ প্রতিবাদে ভরে যায়। আকাশবাণী মুখর হয়ে ওঠে—সারাক্ষণ নাটকীয় ভঙ্গিতে 'দুই বাঙলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত' বলে একে বর্ণনা করা হয়। অথচ দেবনাগরি লিপিকে যখন ভারতের সাধারণ লিপি হিসাবে চালানোর প্রচেষ্টা হয়, তখন কোথাও কোন হতাশার চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু পাকিস্তানের ভাষা-নীতিকে অগ্রাহ্য ক'রে ভারতে দেবনাগরি লিপির প্রবর্তন দুই বাঙলার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র নিশ্চয়ই অটুট রাখবে না। পাকিস্তানের দুইটি প্রধান ভাষা উর্দু এবং বাংলা। ভারতের সংবিধানে পনেরটি প্রধান ভাষার স্থান আছে।...এই ভাষাগুলির লিপিসমস্যা সমাধানের জন্য ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের যৌথ দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন বলে শ্রীসান্যাল অবশ্যই অভিনন্দিত হবেন।

তবে তিনি কেবল বাঙলা ভাষার দুর্গতির কথা চিন্তা করেই এক[...] বলেছেন। ভারত বা পাকিস্তানের বাই[রে] পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই [...] লিপি প্রধান লিপিরূপে প্রচলিত। সেক্ষে[ত্রে] ভারত বা পাকিস্তানের লিপি সম[স্যা] অন্য দেশের উর্দু ভাষার উপরে প্রভা[ব] সৃষ্টি করবে। অতএব পাকিস্তান[...] ভারতের যুগ্ম উদ্যোগের কথা উঠলে এ[...] দেশের উদ্যোগও একত্রিত করার প্র[...] অযৌক্তিক হবে না।

অপরপক্ষে, পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তি[তে] গঠিত মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। এবং ঐ ধ[র্মের] অনুশাসনের মাধ্যম আরবী ভাষার স[...] পরিচিত হতে গেলে উর্দু লিপি শি[...] তাঁদের অবশ্য করণীয়। এই বাস্তব দিক [...] স্মরণ করলে দেখা যায় পাকিস্তান কখন[ও] উর্দু লিপি ত্যাগ করতে পারবেন ন[া]। তাছাড়া, রাজনৈতিক কারণে ভার[ত ও] পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র দুইটি পৃথক আদ[র্শ] চালচলন, আচার-বিচার অনুসরণ ক[...] চলবেন স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে দুই বাঙলা[র] ভাষা কালের বিবর্তনে দ্বিমুখী এমন[ি] সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়েও [...] অপ্রিয় সত্য মেনে নিতে অবশ্য ব্যথা ল[াগে]। তাই দুই রাষ্ট্রের যুগ্ম উদ্যোগে লি[পি] সমস্যার সমাধান করার প্রস্তাব ক[তটা] কার্যকরী হবে, তা বিবেচ্য। বস্তুত, এভা[বে] ধরে নিলে কালক্রমে সারা পৃথিবী[তে] একলিপি প্রবর্তনের কথা আসে।

প্রকৃতপক্ষে, একলিপি প্রবর্তনের সম[স্যা] কোন বিশেষ একটি রাষ্ট্রের রাজনৈ[তিক] সমস্যা। ভাষা বা সাহিত্যের সমস্যা ন[য়]। তাই একটি রাষ্ট্র এবিষয়ে আপন ঐক্য [ও] সংহতির প্রয়োজনেই অগ্রসর হবেন।

পরিশেষে, একথা বলা যায় ভার[তের] ভাষাসমূহের একলিপি প্রবর্তনের অ[...] একেবারে বাদ দেওয়াই ভাল।

প্রত্যেকটি লিপির বিবর্তনের নি[জস্ব] ইতিহাস আছে। লিপির বিবর্তনের স[ঙ্গে] ভাষার বিবর্তনেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়ে[ছে]। বিশেষ একটি লিপি, বিশেষ ভাষা ও [...] উচ্চারণকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত [করে] এসেছে। এখন হঠাৎ সেই লিপি বাদ [দিয়ে] অন্য লিপিকে ভাষা প্রকাশের বাহন [করে] নেওয়া সকল দিক থেকেই অসম্ভব।

অমল ঘো[ষ]
ঢাকুরিয়া। কলিকাতা-

কমনওয়েলথের মজলিশ

গত সপ্তাহে লন্ডনে কমনওয়েলথের জাতিসমূহের একটি বৈঠক হয়ে গেল। আগে এই ধরনের বৈঠকে বেশ জাঁক-জমক হত। যতই দিন যাচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে, বৃটেনের রক্ষণশীল অংশ কমনওয়েলথ বৈঠক আর পছন্দ করছেন না। এবারেই কোনো কোনো রক্ষণশীল পত্রিকা খোলাখুলি বলে দিয়েছে যে, কমনওয়েলথ একটা পুরনো আইডিয়া। এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আসল কথা হল, এক সময় ছিল যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে 'সূর্য অস্ত যেত না': সেই সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে সৃষ্টি হয়েছে কমনওয়েলথের। জাতি ও বর্ণাভিমানে স্ফীত শ্বেতাঙ্গরা এখন দেখতে পাচ্ছে যে, কমনওয়েলথে অশ্বেতাঙ্গদেরই প্রাধান্য। তারাই এক একটা বেয়াড়া প্রশ্ন নিয়ে কমনওয়েলথ বৈঠকে আসে এবং কমনওয়েলথের মধ্যমণি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেন। কার্যত দেখা গেল যে, এবারের কমনওয়েলথ সম্মেলনে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ২৭টি দেশের প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন লন্ডনে। নয়দিন ধরে তাঁরা কমনওয়েলথের বৃহৎ সমস্যা আলোচনা করলেন। নাইজেরিয়ার গৃহ-বিপ্লব থেকে সুরু করে রোডেশিয়ার বোম্বেটে স্মিথ সরকারের অপসারণের প্রশ্ন যার সঙ্গে বৃটেনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব জড়িত—তার একটিরও সমাধান হয়নি। সম্মেলনের পর যথারীতি সদিচ্ছামূলক এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর বিচার-বিবেচনার ভার বিভিন্ন দেশের সরকারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মৌলিক প্রশ্নগুলোতে যদি একমতই হওয়া না গেল, তাহলে এত হাঁকডাক করে সম্মেলন ডেকে লাভ কী?

বর্ণবিদ্বেষের ভিত্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার গঠিত। বৃটেন তাকে ছুঁতেও পারেনি। কমনওয়েলথ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু কালো মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৃটেন কিছুই করতে পারেনি। বরং দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে রোডেশিয়ায় বর্ণবিদ্বেষী স্মিথ জোর করে ক্ষমতা দখল করে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিগ্রোদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। কমনওয়েলথের মধ্যমণি বৃটেন বহুবার স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছে, আলোচনাও করেছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু ইয়েন স্মিথ বেপরোয়া, তার অবৈধ সরকার সদম্ভে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্র থেকে বৃটিশ পাসপোর্টধারী এশিয়ান তথা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিতাড়ন সুরু হয়েছে। আইনত তাঁরা বৃটেনে চলে যাবার অধিকারী। কিন্তু কমনওয়েলথের শিরোমণি বৃটেন তাঁদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্লজ্জ আইন প্রণয়ন করেছে। তাঁরা বৃটিশ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। নিয়ে কমনওয়েলথ বৈঠকে প্রচন্ড তোলপাড় হয়েছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন তার কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। আফ্রো-এশীয় সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণের মুখে তিনি আমতা আমতা করে যা বলেছেন, তাতে আর যাই হক কমনওয়েলথের ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি আশা করেছিলেন যে, কমনওয়েলথের সামনে বর্ণ-বিদ্বেষগত জটিল সমস্যা চাপা-চাপা দেবার জন্য লন্ডন বৈঠককে তিনি ব্যবহার করতে পারবেন। তিনি তা পারেননি। তাঁর সরকারের রোডেশিয়া নীতি এবং কেনিয়া থেকে বিতাড়িত বৃটিশ পাসপোর্টধারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে অশ্বেতাঙ্গ সদস্যদের দ্বারা। অন্যদিকে আফ্রিকার দেশগুলোকেও ভাবতে হবে যে, তাঁরা একদিকে নিগ্রোদের জন্য মানবিক অধিকার দাবী করবেন এবং অন্যদিকে এশীয়দের নিজের দেশ থেকে বিতাড়ণ করবেন, তা কতখানি সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বহুজাতিভিত্তিক কমনওয়েলথকে সত্যিকারের জাতিসমবায়রূপে বেঁচে থাকতে হলে নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও কমনওয়েলথের অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। সে অনগ্রসরতা দূর করতে হলে উন্নততর রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা চাই। কমনওয়েলথে সেই রকম কোনো সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক সহযোগিতার কর্মসূচীও গৃহীত হয়নি। এসব দেখে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, কমনওয়েলথের প্রয়োজন বাস্তবিকই ফুরিয়ে এসেছে। পরস্পরের মধ্যে যদি আন্তরিক ভাববিনিময় ও সহযোগিতামূলক আদান-প্রদান না হয়, তাহলে এই ধরনের বৈঠকের সার্থকতা কী? ভারতের দিক থেকে তো লাভের কিছুই নেই। তবে মেলামেশা ও প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি-রোমন্থনের ক্ষেত্র হিসেবে যদি একে ধরা হয়, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

যে বছর ফেলে এলাম

সুধীরকুমার সেন

বৈষয়িক ক্ষেত্রে বহু উত্থান-পতন, নিরাশা ও আশার মধ্য দিয়ে আমরা একটা বছরকে পিছনে ফেলে রেখে উনিশ শো উনসত্তরে পা দিলাম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গত বছরটা গেছে বহু ওঠা-নামার, সংকট ও সমস্যার, দেশের অর্থনীতির ওপর যার প্রভাব অল্পাবিস্তর পড়েছে। উভয়ের সম্মিলিত ফল দাঁড়িয়েছে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা, বিশেষভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে, যার ক্ষতিকর পরিণতি আমরা বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করছি। তবু বছরটা একেবারে খারাপ যায় নি। পূর্ব দু বছরের ক্রমাগত খরার পর আমরা পরপর দুটো ভালো বর্ষার মুখ দেখেছি, আমাদের শস্য উৎপাদন পরিমাণের দিক দিয়ে উর্ধমুখী। ১৯৬৭-৬৮ সালে আমাদের ফসল হয়েছিল ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টন, অর্থাৎ পূর্ব বছরের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশী এবং ১৯৬৪-৬৫ সালের রেকর্ড ফসলের (৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন) তুলনায় ৮ শতাংশ বেশী। '৬৮-'৬৯ সাল সম্পর্কে সরকার আরো আশা রাখেন, এ বছর ১০ কোটি টনেরও বেশী ফসল পাওয়া যাবে বলে তাঁরা মনে করছেন।

'কৃষি বিপ্লব'

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, সরকারী মহল থেকে যাকে 'কৃষি বিপ্লব' বলে প্রচার করা হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে প্যাকেজ প্রথা, বেশী ফলনের বীজ সরবরাহ, একই জমিতে একাধিকবার চাষ, বেশী পরিমাণে সারের প্রয়োগ ও শস্যকীট বিনাশের ব্যাপক ব্যবস্থা। কৃষির প্রতি অধিক মনোযোগের ফলে কৃষিজমির পরিমাণ বেড়েছে পূর্ব বছরের তুলনায় ৫·৪ শতাংশ আর উৎপাদন বেড়েছে ২২·২ শতাংশ।

১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য কৃষি বিস্তারের যে পরিকল্পনা তাতে ৮৫ লক্ষ হেকটেয়ার জমিতে উচ্চ ফলনের বীজের চাষ করা হবে। পূর্ব বছরে করা হয়েছিল ৬০ লক্ষ ৭ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে।

শস্য সংগ্রহ

খাদ্যশস্যের দাম যাতে বাড়তে না পারে সেজন্য সরকার দেশের মধ্যে শস্যসংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানী দ্বারা শস্য-ভাণ্ডার গড়ে তুলছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে বিদেশ থেকে শস্য আমদানীর কথা ৭৫ লক্ষ টন। এর ভেতর অকটোবর পর্যন্ত এসেছে ৫২ লক্ষ টন। পূর্ব বছরে আমদানী করা হয়েছিল ৮৭ লক্ষ টন। বর্তমানে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের ভাণ্ডারে যে শস্য মজুত আছে তার পরিমাণ ৪১ লক্ষ টন।

শিল্প উৎপাদন

শিল্প উৎপাদন যেহেতু অনেকাংশে কৃষি-নির্ভর সেহেতু শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন বেড়েছে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী এই বৃদ্ধির হার প্রায় ৬ শতাংশ। পূর্ব বৎসরে বৃদ্ধি ত দূরের কথা প্রায় আধ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া শিল্প উৎপাদনের যে হিসেব প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় যে, গত বৎসরে উৎপাদন বৃদ্ধি ১৬১·০তে পেণছেছে (১৯৬০ সালের উৎপাদনকে ১০০ ধরে) পূর্ব বছর উৎপাদনের হার ছিল ১৪৮·৪।

এই বছর বেশী নজর দেওয়া হয়েছিল কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্পে লগ্নী বৃদ্ধির ব্যাপারে। ফলে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, ডিজেল পাম্প প্রভৃতির উৎপাদন বেড়েছে। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে যেমন তামাক, বস্ত্র, পানীয়, কাগজ, সুতো, মোটর-টায়ার ও টিউবের উৎপাদন বেড়েছে তেমনি শিল্পের প্রয়োজনীয় বহু উপাদানও অধিকমাত্রায় উৎপন্ন হয়েছে যেমন সালফিউরিক এসিড, কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, অ্যালুমিনিয়ম ও তামা। মেশিন টুল ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে অবশ্য মন্দার ভাব এখনো কাটে নি।

রপ্তানি বৃদ্ধি

সরকারের আরো উৎফুল্ল হওয়ার কারণ পূর্ব বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে রপ্তানী বৃদ্ধি। এই বছরের গত এগারো মাসে ভারত থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানী হয়েছে ১,২০৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার, আগের বছরের তুলনায় ১৫৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বেশী। রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানীর আপেক্ষিক হ্রাসের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণও লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। এবং আরো একটা আশার কথা, আমাদের রপ্তানীর চেহারাও আলোচ্য বছর থেকে পালটাতে শুরু করেছে। এর আগে আমাদের রপ্তানীর প্রধান দ্রব্য ছিল পাট আর চা। গতবছর থেকে আমরা মামুলী রপ্তানী ছাড়াও নতুন কতগুলো পণ্য ধরেছি, যেমন আকরিক লোহ, চামড়া, চর্মজাত দ্রব্য, হস্তশিল্প, লোহা, ইস্পাত ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য। ১৯৬৮ সালের প্রথম আট মাসে আ[মা]দের এই জাতীয় পণ্য রপ্তানীর হার ছি[ল] মোট রপ্তানীর ৪২ শতাংশ।

বৈদেশিক মুদ্রা

১৯৬৮ সালের মে থেকে অকটো[বর] পর্যন্ত (এই সময়টাই মন্দার সময়) ভার[তের] সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৩৭ কো[টি] ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। অপর প[ক্ষে] ১৯৬৭ সালের ঐ সময়কালে সঞ্চিত বৈ[দে]শিক অর্থ হ্রাস পেয়েছিল ৪৪ কোটি লক্ষ টাকা।

১৯৬৮র বছর যেভাবে শেষ হয়ে[ছে] তাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও বি[শেষ] আশান্বিত। ১লা জানুয়ারী সাংবা[দিক] বৈঠকে তিনি বলেছেন, গত বছর কেটে[ছে] নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, শেষ হয়ে[ছে] উত্থানে।

পরে আশাবাদের হেতু বিশ্লেষণ ক[রে] তিনি বলেছেন, দেশের অর্থনীতিতে কৃ[ষির] ভূমিকা বিরাট। আমাদের রপ্তানী বাড়[বে] আশা হয় শিল্পোৎপাদনও বাড়বে। অ[র্থ]নীতি যদি আবার আত্মস্থ হতে পারে তাহলে মূল্যবৃদ্ধিতেও সে আবার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে।

অবশ্য বর্ধিত উৎপাদন বাজারের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে আগে থাকতেই সে সম্বন্ধে বেশী আশা পোষণ করা সমীচীন নয়। তবু ভারতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে মূল্যের একটানা উর্ধগতির পর '৬৭-৬৮ সালের উচ্চফলন খাদ্যশস্যের মূল্যে কিছুটা স্থিতি এনেছে এটাও নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়। বৈষয়িক উপদেষ্টার সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যসূচী অনুযায়ী গত আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে (মন্দার সময়) দ্রব্য মূল্য ২২২·১এ ওঠার পর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি তা আবার ২০৮-১এ নেমে এসেছে। নিম্নগতি সামান্য হলেও ভারতীয় অর্থনীতিতে সুসংবাদ বটে।

পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ

কিন্তু পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ এখনো ধূম্রজালের অন্তরালেই রয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে পরিকল্পনার কথাও উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রীর মতে সম্পদ সংকুলানে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধান হয়ে গেছে। তিনি

শিল্পনগরী দুর্গাপুরে
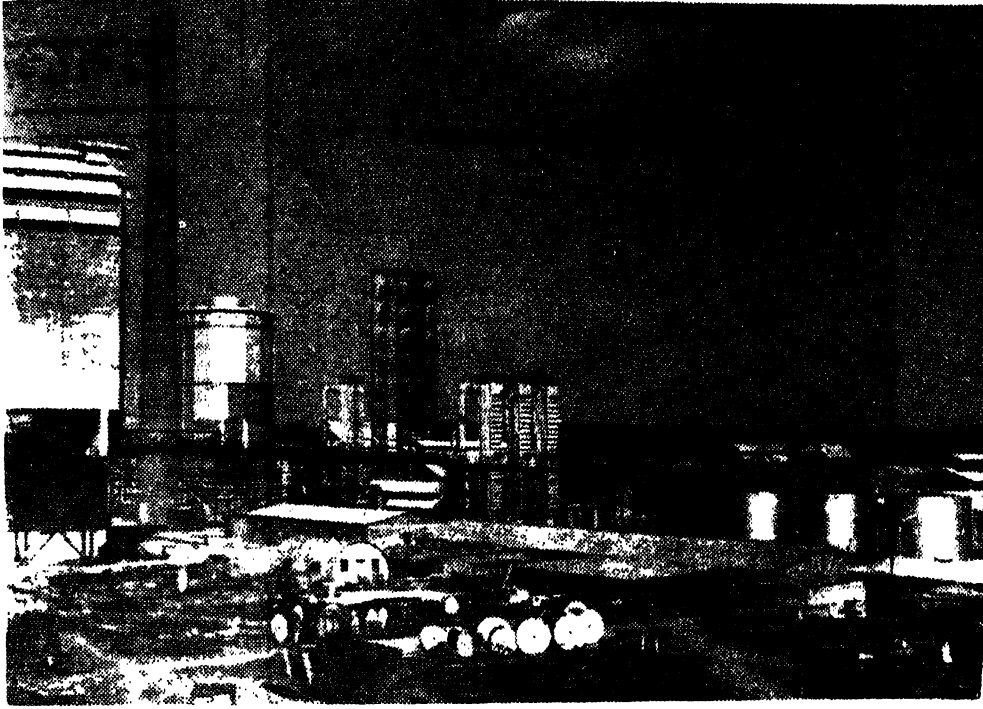
বলেছেন, সম্পদ আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে। কোনো কোনো রাজ্য প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। অন্যান্য পন্থাও খোঁজা হচ্ছে।

তবুও অভিজ্ঞদের অনেকেরই ধারণা যে, পাঁচশালা পরিকল্পনার ইতি ঘটেছে এবং এখন থেকে আমাদের উন্নয়ন কার্য-সূচী বাৎসরিক ছকেই চালু হবে। শ্রীমতী গান্ধীও এই প্রসঙ্গে অস্পষ্টতার আড়ালে রয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের বৈষয়িক পরিকল্পনা সময়ের গণ্ডীতে বাঁধা। ১৯৬৮র বছরে যে আশার আভাস পাওয়া গেছে তা সত্যি হলে কোনো অসুবিধা হবে না বলেই মনে হয়।

তবুও পরিকল্পনা সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তার ভাব রয়ে গেছে সেটা মোটেই অপ্রকাশ নয়। এমন কি, নানারকম নৈরাশ্যময় অবস্থার মধ্যে পড়ে পরিকল্পনা কমিশন গত ডিসেম্বর মাসে এই কথাই বলে ফেলেছেন যে, ভবিষ্যতে পাঁচসালা পরিকল্পনা শুধু লক্ষ্য-নির্দেশকই হবে, আসলে বাৎসরিক পরিকল্পনাই হবে সর্বাকিছু।

কমিশন এই পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী শিল্প-ব্যবসায় খাতে বরাদ্দ ধরেছেন ১৪,৮০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই টাকাও নির্ভর করছে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের ওপর। কিন্তু বেসরকারী শিল্পে সম্ভাবিত বরাদ্দের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। নতুন পরিকল্পনা শুরু হবে আগামী ১লা এপ্রিল থেকে। এই সময়কাল থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কেন্দ্রকে অতিরিক্ত ২৫০০ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলিকে ১৫০০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু এই পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব কিনা এবং রাজ্যগুলোর সহযোগিতা এই ব্যাপারে কতোখানি সুনিশ্চিত সে বিষয়ে কোনো অনুকূল আভাসই নেই।

কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ

অর্থনীতির মতো ভারতের রাজনৈতিক আকাশও অনিশ্চয়তায় ভরা। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফল কংগ্রেসের এতো প্রতিকূলে গেছে যে তার পরিণতিতে দেশে কতকগুলো নতুন রাজনৈতিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছে। নির্বাচনের পরে ভারতের নটি রাজ্য অকংগ্রেসী শাসনে গেছলো, কিন্তু নীতির অমিল ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে চারটি রাজ্যের অকংগ্রেসী কোয়ালিশন ভেঙে গেছে, এখন সেগুলোতে নতুন নির্বাচন হবে। নতুন নির্বাচনে জনমত কোন্ দিকে রায় দেবে তা এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। ইতিমধ্যে কোনো কোনো রাজ্য বিশেষভাবে কেরলের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি কেন্দ্রের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট সরকার যদিও মাঝে মাঝে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের কথা তুলেছেন, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী যদিও কেন্দ্রের অতি-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মুখর, তবুও কেন্দ্রীয় কর্মচারী-দের ধর্মঘটের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর অনুসৃত নীতির সামঞ্জস্য এবং কেরলে ধর্মঘটকালীন শান্তি রক্ষায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ প্রেরণের প্রসঙ্গ নিয়ে নাম্বুদ্রি-পাদের সঙ্গে কেন্দ্রের যে প্রত্যক্ষ সংঘাত দেখা দিয়েছে তা চতুর্থ নির্বাচনের আগে অভাবিত ছিলো। মাদ্রাজের হিন্দী-বিরোধিতা যদিও নতুন নয়, তবুও ডি এম কের আমলে তা যে আরো জোরদার হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ভারতের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। যতদিন নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী ছিলো ততদিন কেন্দ্রের এই কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিশেষ কোনো আশংকা দেখা দিতে পারে নি। কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেসের ক্ষমতা হ্রাসের পটভূমিকায় ভারতের যে নতুন রাজনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে তা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অনুকূল হয়নি। এবং সেই পূর্বাবস্থা ভবিষ্যতে আর কখনো ফিরে আসবে কিনা তা একান্তই অনিশ্চয়তার গর্ভে, না আসাই সম্ভব। ভারতের এই নতুন রাজনৈতিক পটভূমিকায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই জরুরী প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে।

সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে

সুভাষচন্দ্রের চোখে

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে ভারতে রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস বেশ জটিল। ব্রিটিশ শক্তি ভারতে যেভাবে শাসনযন্ত্র দখল করে বসেছিল তাতে তাকে সহজে বিতাড়ন সম্ভবপর ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের একতাবদ্ধ রূপকে বার বার তারা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কম্যুনিষ্ট এবং মুশ্লিম লীগের অভ্যুদয় ভারতীয় রাজনীতির চেহারাটাকে কেমন ঘোলাটে করে তুলেছিল। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিদেশী শক্তি তার সুযোগ নিতে এক বিন্দুও কার্পণ্য করেনি।

১৭৬৫ খৃঃ শাহআলম নামমাত্র মূল্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়েছিলেন। তারপর অনেককাল কেটে গেল। সমস্ত দেশের শাসনভার একে একে তাদের হাতে চলে যায়। তারপর দেশে ঘটে নবজাগরণ। বিন্দু বিন্দু সচেতনাবোধ জাগতে থাকে। কংগ্রেসের অভ্যুদয় ঘটে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসন-ক্ষমতা লাভের যে আন্দোলন শুরু হয়, তা ক্রমে দেশব্যাপী। জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। ইংরেজ শক্তিও তৎপর হয়ে, নানান ছলা-কৌশলে এবং বিভেদনীতি প্রয়োগ করে দেশের মধ্যে একটি অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২ গ্রন্থে বিস্তৃত-ভাবে এই ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য তথ্যনির্ভর এবং পক্ষপাতশূন্য। এই গ্রন্থে এমন কতকগুলি তথ্যের সন্ধান মেলে যা প্রচলিত চিন্তাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। ইংরেজ আগমনের সময় থেকে ভারতে নবজাগরণ, সংগঠন এবং তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রভাব (চিত্তরঞ্জন দাস এবং গান্ধীজী), আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে দেশের তৎকালীন অবস্থা তুলে ধরেছিলেন বাঙালীর প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র। আজও এই গ্রন্থখানির মূল্য রয়েছে।

নেতাজী তখন ইউরোপে নির্বাসিত। এই সময়ে গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন তিনি। ১৯২০ থেকে ১৯৩৪ খৃঃ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এতে। ইউরোপে প্রকাশকালেই ওদেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা গ্রন্থখানি সাদরে বরণ করে নেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ খৃঃ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে ইউরোপে বসে লেখেন। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও অনেকদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল এই বই। পরে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন। বাংলা সংস্করণে গ্রন্থখানি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে ১৯২০ থেকে ১৯৩১ খৃঃ পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ও মুক্তি সংগ্রামের কথা।

রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় দুটি নাম। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র এক অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয়দের চরম প্রতিকূলতা এবং সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিনের ভারতীয় রাজনীতিতে এক যুগ-সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নেতাজীর মতপার্থক্য এবং নানারকম নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে চলারপথে সহযোগিতার আলো দেখিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ।

মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্ব সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময়ে ভারতীয় রাজনীতি বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যে সংকট প্রবল আকার নেয়। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের বামপন্থী এবং প্রগতিশীল মতাবলম্বীদের নিয়ে গণ-সংগ্রামে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের বিরোধে এবং বামপন্থীদের অনৈক্যে তা ব্যর্থ হয়। তারপর মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে যাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাবও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে অনির্দেশ্য পথে পা বাড়ালেন সুভাষ। বিস্ময়কর সে ইতিহাস।

এই সব ঘটনার পটভূমিতে শ্রীনেপাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। কেবলমাত্র এই দুজন মহান ব্যক্তির কথাই নয়, সেকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি রেখাচিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মসাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল তার সুন্দর
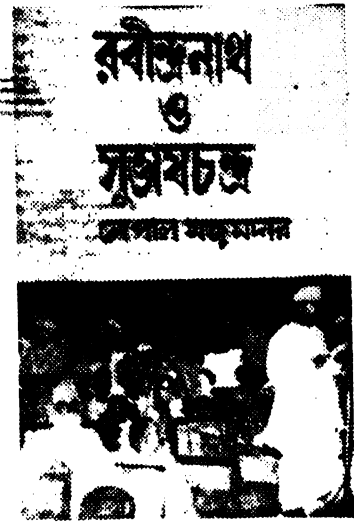
ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন শ্রীমজুমদার। মূল্যবান তথ্য উপকরণে সমৃদ্ধ এই বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেবার সুযোগ অবহেলা করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ একবার তার ভাষণে বলেছিলেনঃ

"ব্যক্তিগতভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি। তাঁর কোন্ অভিপ্রায় কোন্ প্রণালীর সুদূর পরিণতি লক্ষ্য করে চলেছে তা আমি জানিনে, কেননা পলিটিক্স আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। কিন্তু, তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন এবং দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনীতি তিনি চর্চা করেছেন। সেই জন্যেই তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবী করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহ্বরের উপর সেতুবন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভ কামনা।

আর একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্রকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথঃ

"সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে—এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্য পক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এত বড়ো ভুল কিছুতে করো না। তোমার জন্য বলছিনে, দেশের জন্য বলছি।"

এর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে কতখানি আশা করেছিলেন। এই চিঠির শেষে তিনি আরও লিখেছিলেন : "মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান

দৃঢ়ভাবে সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমসি করেন তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে তোমরা পদত্যাগ করতে পারো। তাঁকে বোলো শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে। অতএব আর বিলম্ব সইবে না।' সুভাষচন্দ্রের ওপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এবং আস্থা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

সুভাষচন্দ্রেরও ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের ওপর। একবার তিনি বলে-ছিলেন :

"আপনি জাতিকে—শুধু জাতকে কেন, সমগ্র মানব সমাজকে আদর্শের পথ দেখিয়েছেন, শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, মানুষকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে এসেছেন। তাই বাণীর বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্যবসিত হয় নাই, শুধু ভগবানের উপাসনায় আপনার সাধনা পর্যবসিত হয় নাই, অন্তরের আদর্শকে আপনি বহির্জীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই—এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ, কারণ এটা আমাদের জাতির আদর্শ। আমরা আমাদের জীবনে তা সফল করতে পারি বলে সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি, বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতেও করব।"

বইখানিতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মসাধনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তাঁর বক্তৃতা, ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাদির উধৃতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে চিঠিপত্র, বাণী ও তার-বিনিময় ইত্যাদিও সংকলিত হয়েছে।

বন্যাত্রাণ উপলক্ষে ১৯৩১ সালে যে কমিটি হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে তা নিয়ে তীব্র মতভেদ সৃষ্টি হয়ে-ছিল। সে সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমন গ্রন্থে। তাছাড়া রয়েছে আরও বহু তথ্য।
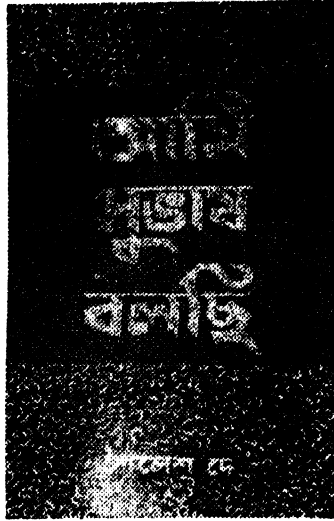
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের প্রথম পর্যায়, চিঠিপত্রে যোগাযোগ, বন্যা-ত্রাণ সুভাষচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক, সুভাষচন্দ্রের ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল রচনা, বন্দী মুক্তি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, বন্দেমাতরম সংগীত বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র, কংগ্রেস সভাপতি সুভাচন্দ্র, শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিগুরু ও নেতাজীর মনের নিকট সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিশিষ্টে দিলীপকুমার রায়কে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র, সংবাদপত্রে পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে সুভাবচন্দ্রের বিবৃতি প্রচারের পূর্ণ বয়ান, বন্যাত্রণ ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের পত্রালাপ, সুভাষ কংগ্রেস ফান্ড, কংগ্রেস ভবন প্রতিষ্ঠা, সুভাষচন্দ্রের আবেদন শ্রীনিকেতন শিল্প-বিপণি উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, মেঘনাদ সাহা, অনিল-কুমার চন্দের পত্রালাপ, শান্তিনিকেতনে ছাত্র-দের প্রতি সুভাষচন্দ্রের ভাষণ, পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয় ও মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি, সুরেন গোস্বামীর ত্রিপুরীর ব্যংগ-বিদ্রূপাত্মক গানটি সংকলিত হয়েছে। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার সম্পর্কে সুভাষ-চন্দ্রের ঐতিহাসিক বিবৃতির পূর্ণাংগ বয়ানটি গ্রন্থখানির মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠা দিবসে সুভাষচন্দ্রের ভাষণে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল :

"যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র আমরা চাই এক নতুন সমাজ ও নতুন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি।" এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করে শ্রীমজুমদার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বাধীনতা এবং বিপ্লব

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুভাষ-চন্দ্রের স্থান কোথায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত হয়নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনায় এবং সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থে বহু অজানা তথ্যের সন্ধান মিললেও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরাধীন ভারতবাসীর অভিশাপ মোচনের জন্য যুব সমাজের সশস্ত্র বিপ্লব নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর এই ঘটনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংযোগ ছিল বহু দূর বিস্তৃত। রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকে অন্তর্ধান কাল পর্যন্ত এক বিরাট প্রতিকূলতার মধ্যে কেটেছে। স্বদেশ-বাসীর সমর্থন তিনি পেয়েছেন, আবার কোনো কোনো কেন্দ্র থেকে অসহযোগিতাও তার মনে নিদারুণ আঘাত করেছিল। কিন্তু দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র তার কাছে হার স্বীকার করেনি। তাই অজানা পথে পাড়ি দিয়ে বিদেশী সাহায্যের আশায় ছুটে-ছিলেন। তারপরের ইতিহাস আমাদের অনেকেরই জানা।

কেবল সুভাষচন্দ্রের কর্মকান্ড নয়, সেই সঙ্গে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের আকর্ষণীয় ইতিহাস সংযোজিত হওয়ায় শৈলেন দে'র 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থখানি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। সুভাষচন্দ্রের কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীদের কর্মপ্রয়াস এবং শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের তথ্য নির্ভর আলেখ্য এই গ্রন্থ জালালাবাদের লড়াই, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান, কলকাতা বোমা মামলা, মেদিনীপুরের রক্তক্ষয়ী অসহযোগ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং

স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সংগে এসেছে দেশের অসংখ্য আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের কথা। অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সুভাষচন্দ্রের চিঠিপত্র

চিঠিপত্রে যে কোন মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেই মানুষ যদি বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হন, তবে সেই চিঠির মূল্য অনেক বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রকাশের পর থেকে পত্র-সাহিত্যের ওপর এদেশের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট মনীষীর পত্র-সংকলন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও জনজীবনের বাস্তব ছবি এবং ব্যক্তি মানসের বিচিত্র দিক এই সমস্বর চিঠির মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত।

সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ খৃঃ। ১৯১২-৩২ খৃঃ মধ্যে লেখা চিঠিপত্রের এই নির্বাচিত সংগ্রহটি বিপুল জনসমাদর লাভ করেছিল। সম্প্রতি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণের একশ সাতান্নখানি চিঠির মধ্যে বেশ কিছু অপ্রকাশিত। তাছাড়া আছে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত বেশ কয়েকটি চিঠি। প্রভাবতী বসু, শরৎচন্দ্র বসু, হেমন্তকুমার সরকার, চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, দিলীপকুমার রায়, হরিচরণ বাগচী, বাসন্তী দেবী, বিভাবতী বসু, এন সি কেলকার, সন্তোষকুমার বসু, অনিলচন্দ্র বিশ্বাস, অমূল্যচন্দ্র উকিল, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত, মতিলাল নেহরু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, গোপাললাল সান্যাল, সুনীলচন্দ্র বসু, জানকীনাথ বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কল্যাণী দেবীকে লেখা চিঠি আছে এই পত্র-সংগ্রহে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে সে সময়ের রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা প্রসঙ্গ এসেছে অনেক চিঠিতে। সাহিত্য-শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার রূপটিও স্পষ্ট। ভারতে থাকাকালে বহু বৎসর তাঁর কেটেছে কারান্তরালে। দিনের পর দিন আত্মীয়-পরিজন সংযোগ শূন্য হয়ে কেটেছে তাঁর। জেলে বসে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন। আর সেই সব চিঠিতে তাঁর দরদী মনের পরিচয়ও স্পষ্ট। মান্দালয় জেল থেকে লেখা একটি চিঠিতে আছেঃ

"সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্ত-গমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্যক মেঘখন্ড রূপান্তর লাভ করে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাংলার আকাশ, বাংলার সূর্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে জানত। বাংলা দেশের জন্য তাঁর মনকে কতখানি উদভ্রান্ত উদগ্রীব হয়ে থাকত তারও নানান রূপ বিভিন্ন চিঠিতে বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

সেকালের রাজনৈতিক অবস্থা এবং নেতাদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অভিমত রয়েছে অনেক চিঠিতে।

কয়েকটি আলোকচিত্র, চিঠিপত্রের প্রতিচিত্র এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদ 'পত্রাবলী'র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থখানি থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান মিলবে। 'পত্রাবলী' প্রকাশ করে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো একটি মূল্যবান কাজ করেছেন।

আলোচিত গ্রন্থ

ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২। সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো। ৩৮।২ লালা লাজপত রায় রোড। কলকাতা-২০। দাম দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—নেপাল মজুমদার। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম দশ টাকা।

'আমি সুভাষ বলছি'—শৈলেশ দে। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ১৫।২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পনের টাকা।

পত্রাবলী—সুভাষচন্দ্র বসু। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

(৪) কেউ রহস্য

থমথম করতে লাগল ঘরের আবহাওয়া। দেওয়ালের ঘড়ি বিদ্যুৎ-চালিত; পেন্ডুলাম থাকলে টিক-টিক আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যেত। মিনিট কয়েক পরেই ডিং-ডিং করে বেজে উঠল জলতরঙ্গ ঘণ্টা। স্ফীতোদর মরিচি অবিশ্বাস্য বেগে দৌড়ে গেল দরজার কাছে।

পাল্লা খুলতেই চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক যুবক।

চাবুক চেহারা, শাণিত নাক, ধারালো চিবুক। দৃষ্টি স্বপ্ন-ছাওয়া। ঠোঁটের কোণে আলগোছে ঝুলছে একটা সিগারেট। পরনে কটসউলের ঘি-রংয়ের ঢিলাহাতা পাঞ্জাবি। চুনোট-করা ধুতির পদ্ম-কোরকের মত কোঁচার প্রান্তভাগ সযত্নে রক্ষিত পাঞ্জাবির পকেটে।

বিস্মিতভাবে তাকিয়েছিলেন খেমচাঁদ। প্রাইভেট ডিটেকটিভের মূর্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অন্যরকম ছিল। কবি-কবি চেহারার এই সুশ্রী যুবককে দেখে তাই বিস্ময় উপচে পড়ল তাঁর চোখেমুখে।

হাসিমুখে শর্মিষ্ঠা আলাপ করিয়ে দিল—'ইন্দ্রনাথ রুদ্র—প্রাইভেট ডিটেকটিভ। খেমচাঁদ রাজকুমার—জহুরী।'

ঝুলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটের কোণেই ঝুলতে লাগল। ধোঁয়ার জাফরির মধ্যে দিয়ে নিষ্পন্দ চোখে তাকাল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। মিষ্টি হেসে বলল ছোট্ট করে—'নমস্কার।'

বিস্ময়টা গিলে ফেললেন খেমচাঁদ। কারবারী হাসি হেসে বললেন—'নমস্কার। এত দেরি কেন? আমরা তো হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।'

'কি করি বলুন। আকাশ-যান থাকলে অবশ্য মৌলালীর ভিড় টপকে আসা যেত।'

'ইয়ে...আমার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'দোষটা তাহলে আমারই। প্ল্যাটফর্মে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। কেউ কাছে এল না। এদিক-ওদিক পায়চারী করলাম। তখনও কেউ এল না। ম্যাগাজিন স্টলে দাঁড়িয়ে কাগজ ওল্টালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। তাই আর দেরি না করে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছি, সপ্রতিভ কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের।

অদ্রীশ বর্ধন

হীরামনের হাহাকার

'নেকলেস এনেছেন?' ভেতরের উদ্বেগ আর বুঝি গোপন রইল না খেমচাঁদের কণ্ঠে।

'অবশ্যই এনেছি,' মৃদু হাসল ইন্দ্রনাথ।

'খাপরুমটা কোনদিকে?'

'বাথরুম!' অস্ফুটকণ্ঠে বললেন খেমচাঁদ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। চোরা-বেল্টে নেকলেস লুকিয়ে রেখেছি তলপেটে। খোলা দরকার তো।' অমায়িক হাসল ইন্দ্রনাথ।

'ও', ঢোক গিললেন খেমচাঁদ, 'শর্মিষ্ঠা।'

শর্মিষ্ঠা সকৌতুকে কথা শুনছিল। এবার ইন্দ্রনাথকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল সে। তারপর এল ইন্দ্রনাথ। এসেই অবহেলাভরে রুমালে মোড়া একটা বস্তু নিক্ষেপ করল টি-পয়ের ওপর।

রুমাল খুলতেই রক্তচ্ছটার একটা ঝলক ক্ষণেকের জন্য যেন চোখ ধাঁধিয়ে দিল। দালান্ড দ্যুতির আড়ালে ঝলসে উঠল রামধনু রোশনাই।

চোখ সয়ে গেলে দেখা গেল সেই আশ্চর্য হীরের নেকলেস। করমচার মত বজ্রমণি সারি সারি হীরে-গাঁথা মালা। বজ্রমণির কন্ঠহার।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে ঘরে চারজনেই তাকিয়ে রইল টি-পয়ের দিকে। হীরে এত সুন্দরও হয়? গোলাপী আভা অনেক হীরেতে দেখা যায়। কিন্তু রক্তাভা? তাও কি সম্ভব?

চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে করতে বজ্রমণির কন্ঠহার যেন মূকভাষায় বলে উঠল—'হ্যাঁগো, হ্যাঁ, সম্ভব! আমিই তো জ্বলন্ত প্রমাণ!'

মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেলেন খেমচাঁদ। দুই চোখে স্মৃতির ছায়া...আবেশে নিমীলিত। হেঁট হয়ে তুলে নিলেন বজ্রমণির কন্ঠহার।

সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলেন সেকেন্ড কয়েক। বললেন আপনমনে—'বিউটিফুল! সত্যি বিউটিফুল! কোহিনুর, গ্রেট মোগল, হ্রদ ডায়মন্ডও বুঝি এর কাছে কিছু নয়। অনেক হীরে ঘেঁটেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। শর্মিষ্ঠা!'

'বলো।'

'আমরা ঠকে গেলাম। ভীম দত্ত আমাদের ঠকিয়ে গেলেন। জলের দাম দিয়ে কিনে নিলেন সাত রাজার ধন এক মানিককে।'

কাঁচাপাকা চুলের খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে শর্মিষ্ঠা বলল—'কে যে কখন ঠকে, তা কি বলা যায়।'

কথাটা যে দ্ব্যর্থক, তা বুঝলেন খেমচাঁদ। চাহনিও তীক্ষ্ণ হল। কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইন্দ্রনাথকে—'কিন্তু আমার ছেলে কোথায়? অখণ্ড কোথায়?'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে ইন্দ্রনাথ বলল—'দোষটা আমারই। একটু অপেক্ষা করলেই—'

'এত ভাববার কি আছে?' মরিচি বলে উঠল। 'কথা বলতে বলতেই দেখবেন এসে যাবেন উনি। কেউ কাউকে না চিনলে এরকম তো হামেহাল ঘটে।'

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আর প্রবীণ জহুরী। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তাঁরই দোকানে বেচতে এসেছেন অনন্ত স্মৃতি জড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কন্ঠহার। কিনবেন একালেরই বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। হীরের দাম উঠল সোয়া সাত লাখ টাকা। সকলেই এক স্মৃতি-নৌকোর আরোহী। ভীম দত্ত এক সময় আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন শর্মিষ্ঠাকে। সে-ও চল্লিশ বছর আগের কথা। নেকলেশটা বোম্বাইতে ডেলিভারী দেবার জন্যে বললেন ভীম দত্ত। জহুরী খেমচাঁদ এতে রাজি। হল পাকা কথা। কিন্তু হঠাৎ ট্রাংক-কল। রাজস্থানেই বজ্রমণির কন্ঠহার দিতে বলছেন ভীম দত্ত। রহস্য ঘনীভূত। কে নিয়ে যাবে সেই হার রাজস্থানে। কেন? শর্মিষ্ঠার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র তো রয়েছেনই। সংগে যাবে তার খেমচাঁদের ছেলে অখণ্ডও।]

শীতল চোখে তাকালেন খেমচাঁদ। বকাটে ছোকরাটার প্রতিটি কথা তাঁর গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু পাকাচুল নিয়ে তো আর ধাঁ করে খাপ্পা হওয়া যায় না। তাই মরিচিকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

শর্মিষ্ঠাকে লক্ষ্য করে বললেন—'শর্মিষ্ঠা, আমি কারবারী মানুস। উদ্বেগ উৎকন্ঠা আমার চব্বিশ ঘন্টার সহচর। তাই আমি সহজে অস্থির হই না।'

'কিন্তু আজকে তুমি স্থির নও। ঘরে ঢোকার সংগে সংগে তোমাকে আমি বলি নি?' বলল শর্মিষ্ঠা।

'ঠিক। আজ আমি স্থির নই। কিন্তু কেন জানো?'

'ভীম দত্তর ফোন পেয়ে?'

'খানিকটা তাই। ভীম দত্তর প্রথম টেলিফোনের রহস্য আমাকে সত্যিই খানিকটা উৎকন্ঠিত করেছে। কিন্তু এইটাই সব নয়।'

'আবার কি?'

চুপ করে রইলেন খেমচাঁদ। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন—'ভীম দত্ত আবার টেলিফোন করেছিলেন। আজই—দুপুরবেলা!'

●

ঘর নিস্তব্ধ।

তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল—'হীরের নেকলেসের পেছনে যে খানিকটা রহস্যও টেনে এনেছি দেখছি। কি ব্যাপার বলুন তো?'

খেমচাঁদ সংক্ষেপে বিবৃত করলেন পূর্বকথা। রাজস্থান থেকে টেলিফোন-কাহিনী শুনে সেই প্রথম প্রখর হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি।

খেমচাঁদ বললেন— 'কিন্তু আসল ব্যাপারটাই এতক্ষণ আমি বলিনি খামোকা তোমরা উদ্বিগ্ন হবে বলে। আজ দুপুরবেলা ট্রাংককলে ভীম দত্তর সংগে কথা বলার পর আবার ফোন এল। আবার ভীম দত্ত!'

'তারপর?' মরিচির চোখদুটো গোঁড়ির চোখের মত প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এল।

'আমার কেমন জানি সন্দেহ হল। গলার স্বর যদিও ভীম দত্তর মতই, সেইরকম ধমক-দেওয়া ভঙ্গিমা, মিলিটারী মেজাজ। অথচ যেন কিরকম!'

'কি বললেন তাই বলুন না,' অসহিষ্ণু কন্ঠ গোঁড়ি-চক্ষু মরিচির।

খেমচাঁদ কিন্তু গোঁড়ির চাইতেও নিকৃষ্ট পোকামাকড়ের মত অবজ্ঞা করে গেলেন মরিচিকে। শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভীম দত্ত একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। বললেন, শুনলাম দার্জিলিং মেলে আজ বিকেলে নেকলেস আসছে। কে আনছে বলুন তো?'

ফস করে একটা আওয়াজ হল। দেশ-লাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা সিগারেটের ডগায় নাড়তে নাড়তে বলল ইন্দ্রনাথ—'আপনি কি বললেন?'

'বললাম, কে আনছে জেনে আপনার দরকার কি? উনি গরম হয়ে বললেন, আমার জিনিস কে আনছে জানার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে? আমি বললাম, তা থাকবে না কেন। কিন্তু কেন জানতে চাইছেন, আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না কি? তাছাড়া, নেকলেস যে আজ আসছে দার্জিলিং মেলে, এখবরই বা পেলেন কোত্থেকে? আমি তো আপনাকে এ সম্বন্ধে একটু আগেও কিছু বলিনি।'

'তারপর?' মস্ত একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল ইন্দ্রনাথ।

'ভীম দত্ত বললেন, তাহলে শুনুন। আপনাকে ফোন করার পর এবং আপনার ফোন পাওয়ার পর অনেক কান্ড ঘটে গেছে। টেলিফোনে অত কথা বলা সম্ভব নয়। তবে জেনে রাখুন, দার্জিলিং মেলের খবরটা আমি যে সূত্রে জেনেছি, সেই সূত্রেই জেনেছি নেকলেসটা নিরাপদ নয়। টেলিফোন তো সাতকান্ড রামায়ণ। বলার জায়গা নয়, নইলে বলতাম বিপদটা কিসের। কে নেকলেস আনছে জানতে পারলে আমি স্বস্তি তো পাবই, উপরন্তু এখান থেকেই কিছু কলকাঠি নাড়তে পারব।'

ইন্দ্রনাথ তখন তন্ময় চিত্তে একটার পর একটা ধূম্র-বলয় রচনা করে চলেছে।

খেমচাঁদ বললেন—'আমি বললাম, বেশ, আপনি যখন জানতে চাইছেন, নিশ্চয় বলব। তবে এখন নয়। কখন—জিজ্ঞেস করলেন ভীম দত্ত। আমি বললাম, দশ মিনিট পরে। আপনি লাইন ছেড়ে দিন। আমি ফোন করব: বলার সংগে সংগে কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর রিসিভার রেখে দিলেন ভীম দত্ত!'

'আপনি কি করলেন?' গোঁড়ি-চক্ষু মরিচির প্রশ্ন।

সেদিকে না তাকিয়েই খেমচাঁদ বললেন—'আমি সংগে সংগে খোঁজ নিলাম, রাজ-

স্থান থেকে এইমাত্র আমার নামে কোনো ট্রাঙ্ককল এসেছে কিনা। শুনলাম, আসেনি। দূরপাল্লার কোনকল অত স্পষ্ট হয় না। তাই অনুমান করলাম, কলকাতা থেকেই কেউ ফোন করেছে।'

শর্মিষ্ঠা বলল—'ভীম দত্ত তাহলে এখন কোথায়? রাজস্থানের মরুভূমিতে না, কলকাতায়?'

'রহস্যসন্ধানী ইন্দ্রনাথ রুদ্রই সে সমস্যার সমাধান করবেন। এবার বুঝেছো তো, অখন্ড উধাও হয়ে যাওয়ায় কেন আমি উদ্বিগ্ন?'

দোরগোড়া থেকে প্রাণোচ্ছল কন্ঠে ভেসে এল জবাবটা—'উধাও আমি হইনি, ড্যাডি। এই দেখুন সশরীরে ফিরে এসেছি।'

●

সচমকে সবাই তাকালো দরজার দিকে। দেখল, নিঃশব্দে কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে অখন্ডনারায়ণ। নেভী ব্লু কালারের টাইট ট্রাউজার্সের ওপর লোহিত বর্ণের পুলওভার। দুটোই ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টিতে কিছু কিছু ভিজেছে। নৃত্যপর দুই চোখে কৌতুক। বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেখে দাঁড়িয়ে যেন গ্রীক ভাস্করের অনুপম সৃষ্টি।

উদ্বেগের পরেই অকস্মাৎ স্বস্তি এলে সব পিতার ক্ষেত্রেই যা হয়, খেমচাঁদের ক্ষেত্রেও ঘটল তাই। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। খেঁকিয়ে উঠে বললেন—'বলা নেই কওয়া নেই, যাওয়া হয়েছিল কোথায়?'

'বাঃ! কি সাদর অভ্যর্থনা! অথচ আপনার কথামত স্টেশনে গিয়ে পড়লাম কিনা এক ফেউয়ের পাল্লায়!'

'ফেউয়ের পাল্লায়!'

'খ্যাঁকশিয়ালও বলতে পারেন।'

'কি হয়েছে খুলে বলা হোক।'

'বলবার জন্যেই তো এত দৌড়ঝাঁপ করে এলাম এখানে। তবে হ্যাঁ, অ্যাদ্দিন বাদে কলকাতাটাকে টেক্সাস-টেক্সাস মনে হচ্ছে।'

'বাজে কথা ছাড়ো, ইনিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এঁর সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বলা হয়েছিল শিয়ালদায়। দেখা করোনি কেন? দায়িত্বজ্ঞান হবে কবে?'

'প্ল্যাড টু মীট ইউ।' ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বাতাসে মাথা ঠুকে 'বো' করল অখন্ড। তারপর খেমচাঁদের দিকে ফিরে—'ড্যাডি, স্টেশনে আমি গিয়েছিলাম। ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে আন্টির দেওয়া ডেসক্রিপসন মত চিনেও ছিলাম। 'কিন্তু দেখা করিনি—ইচ্ছে করেই।'

'হো—হাই?'

'বলব বলেই তো এসেছি। কিন্তু কাহিনীটা একটু লম্বাই হবে। আপনি যদি আপনার অ্যাটাকগুলো কিছুক্ষণ বন্ধ রাখেন, আর আমাকে বসতে পারমিট করেন, তাহলে বলি।'

'সিট ডাউন!' দুটো শব্দের মধ্যে বেশ খানিকটা যতি দিয়ে যেন তোপ দাগলেন খেমচাঁদ।

মুখ টিপে হেসে আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিল অখন্ডনারায়ণ। তারপর বলল—'তাস পিটে ক্লাব থেকে বেরিয়েছিলাম হাতে সময় নিয়েই। বেরিয়েই দেখলাম একটা ট্যাক্সি। যেমন ভাঙা, তেমনি রং-ওঠা। 'অযান্ত্রিক' মার্কা জগদ্দল। আশপাশে ভালো গাড়ী দেখলাম না তাই উঠে বসলাম জগদ্দলের সিটে। দেখতে দেখতে পৌঁছোলাম শিয়ালদায়।

'শিয়ালদায় পৌঁছোনোর আগেই কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। হাসিও পাচ্ছিল দেখে। অনেক কান দেখেছি। কিন্তু এরকম কান আমি কখনো দেখিনি। আমি ড্রাইভারের কানের কথা বলছি।

'ঠিক যেন একজোড়া বাঁধাকপি। উপমাটা হয়ত ঠিক হল না। কিন্তু লোকটার কানদুটো দেখে আমার কেবলি বাঁধাকপির কথাই মনে হচ্ছিল। চিবুকে একটা ইঞ্চি দুয়েক লম্বা কাটা দাগ।

'শিয়ালদায় পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে দিতে যাচ্ছি, বাঁধাকপি বলল, আপনি ফিরবেন নাকি? বলেন তো দাঁড়াই।

'আমি রাজী হলাম। শিয়ালদায় ট্যাক্সি পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। তাই বাঁধাকপির সবিনয় অফার সাগ্রহে গ্রহণ করলাম।

'দার্জিলিং মেল তখনো আসেনি। এদিকে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। তাই যেন স্টেশনের শেডে গিয়ে দাঁড়ালাম। ম্যাগাজিন স্টলে দাঁড়িয়ে 'ইনসাইড ডিটেকটিভ' ম্যাগাজিনটার পাতা ওল্টাচ্ছি। এমন সময়ে মনে হল কভারের দুশমনটাই জ্যান্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে।

'প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু কেন জানি মনে হল, পাশের লোকটা কালো চশমার আড়াল দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। খ্যাঁকশিয়ালের মত ছুঁচোলো মুখ, ঝাঁটা গোঁফ, ঠেলে-ওঠা তেকোণা কন্ঠা, মাথার চুল শজারুর কাঁটার মত খোঁচা-খোঁচা। গায়ে বর্ষাতি—কলার তোলা। চোখে কালো গগলস্। সব মিলিয়ে 'ইনসাইড ডিটেকটিভ'-এর প্রচ্ছদপটের যেন একটা সজীব নমুনা।

'অস্বস্তি লাগল। তাই হাঁটতে হাঁটতে গেলাম প্ল্যাটফর্মের ওদিকে। পেছন ফিরে দেখি, খ্যাঁকশিয়ালটাও পেছন পেছন আসছে। কালো চশমার মধ্যে দিয়ে যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

'আবার ঘুরে এলাম ম্যাগাজিন স্টলের দিকে। দেখি, খ্যাঁকশিয়ালও এসেছে পেছনে।'

থামল অখন্ডনারায়ণ। শৃগাল-নন্দন যে তাকে বিলক্ষণ আনন্দ দিয়েছে, তা বোঝা গেল ওর খুশী-চিকমিকে চোখ দেখে। বলল—'দেখলাম, এ তো মহাজ্বালা! যেখানে যাবো, ফেউয়ের মত পেছনে থাকবে ছুঁচোলোমুখ ছুঁচোটা। তাই, সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। সাধু বাংলায় যাকে বলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—আমার মধ্যে তা দেদার আছে। তাই না ড্যাডি?'

ড্যাডি কোনো জবাব দিলেন না দেখে আবার শুরু করল অখন্ড—'ভেবে দেখলাম, হীরের নেকলেস আমার কাছে নেই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রর কাছে আছে। খবরটা ঐ ছুঁচোকে দিতে যাই কেন? খ্যাঁকশিয়ালের পেছনে হায়নার নেকড়ের দলও তাহলে লাফিয়ে পড়বে মিঃ রুদ্রর ওপর। কাজেই ধাঁ করে বুদ্ধি বের করে ফেললাম। কোথাও না গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম প্ল্যাটফর্মের এক কোণে।

'কিছুক্ষণ পরেই দার্জিলিং মেল এল। আন্টি ইন্দ্রনাথবাবুর খুব ভাল বর্ণনা দিয়েছিল। তাই দূর থেকেই দেখলাম, ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্ট থেকে নামলেন উনি। কিন্তু এক পা-ও নড়লাম না। খুব একটা উৎসাহও দেখালাম না।

'ইন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক করলেন। তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। রেনকোট গায়ে দেওয়া শজারু-চুল ফেউটা কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে। প্ল্যানটা সাকসেসফুল হয়েছে দেখে খুব আনন্দ হল।

'প্ল্যাটফর্মের ভিড় পাতলা হয়ে আসতেই গুটি গুটি এসে দাঁড়ালাম রাস্তায়। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল রঙ-ওঠা ভাঙাচোরা জগদ্দল। বাঁধাকপি-কান সমেত মুখ বার করে ড্রাইভার বলল—আসুন।

'আমি কিন্তু গেলাম না। মিটারের ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। বাঁধাকপি বলল— কেউ আসবে নাকি? বললেন তো দাঁড়িয়ে রই।'

'আমি বললাম, হ্যাঁ, আসবার কথা ছিল ট্যাঁকথালির মহারাজার। এইমাত্র খবর পেলাম তিনি অক্কা পেয়েছেন। কাজেই তুমি যেতে পারো।

'বাঁধাকপি কটমট করে তাকাল। কিছু বলল না। আমি সরে আসতেই হনহন করে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দাঁড়াল থ্যাঁকশিয়াল। দরজা খুলে চট করে উঠে বসল ভেতরে।

'বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হন্টন দিলাম আমি। ট্যাংগস ট্যাংগস করে হাঁটতে হাঁটতে পোঁছোলাম বৌবাজারের মোড়ে। কপাল ভালো একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। উঠে বসে বেলেঘাটার মোড় পর্যন্ত আসতে না আসতেই দেখলাম, পেছনে বাঁধাকপির ট্যাক্সি ধাওয়া করেছে। থ্যাঁকশিয়ালও গোমড়ামুখে বসে ভেতরে।

'ট্যাক্সি হাঁকালাম। নিউ মার্কেটের সাউথ গেটে নামলাম। এক চক্কর ঘুরে এলাম মার্কেটের অলিগলি দিয়ে। দেখি, ছিনেজোঁকের মত পেছনে লেগে রয়েছে শজারু চুল। মার্কেট থেকে বেরিয়ে আবার ট্যাক্সিতে উঠে গেলাম ক্লাবে। পেছনের ট্যাক্সিও পোঁছোলো সেখানে ল্যাংবোটের মত। আমি ক্লাবে ঢুকলাম। থ্যাঁকশিয়াল ফুটপাতে নেমে দাঁড়াল। আমি পেছনের রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চম্পট দিলাম। থ্যাঁক-শিয়াল বোধহয় এখনও দাঁড়িয়ে আছে ক্লাবের সামনে। সংক্ষেপে এই হল আমার রোমাঞ্চকর কাহিনী। পেছনে ফেউ নিয়ে কল-কাতার বুকে লুকোচুরি খেলার লোমহর্ষক রিপোর্ট। ড্যাডি, এখন বুঝছেন তো, কেন আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্রর সঙ্গে দেখা করিনি।'

চোখ কুঁচকে আধা-বিটল পুত্রের জবান-বন্দী শুনছিলেন খেমচাঁদ। অখন্ডনারায়ণ স্তব্ধ হতেই উচ্চহাস্য করে বললেন— 'তোকে যতখানি গবেট ভেবেছিলাম, দেখছি তুই ততখানি নস।'

কাঁকুইয়ের মত একটা মোটাসোটা চিরুনি হিপ-পকেট থেকে বার করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অখন্ড বলল—'দেখবেন, আরো দেখবেন।'

'শর্মিষ্ঠা', বললেন খেমচাঁদ, 'বজ্রমণির কণ্ঠহার খুব বিখ্যাত নয়। এত বছর আসামে পড়েছিল তোমার সিন্দুকে। কাজেই, নেক-লেস একবার খোয়া গেলে তা বিক্রি করা খুব সহজ। আমার কথা যদি শোনো তো বলি। নেকলেস রাজস্থানের মরুভূমিতে পাঠিও না—'

হাঁ—হাঁ করে উঠল মরিচি— 'কেন পাঠাবো না? বরং শহর-টহরের চাইতে মরু-ভূমিই অনেক নিরিবিলি আর নিরাপদ।'

"থেম," বলল শর্মিষ্ঠা, "আমার টাকার দরকার। ভীম দত্ত যদি রাজস্থানের বাংলো-বাড়ীতে থাকেন, নেকলেসটাও যদি তিনি ওখানে বসেই পেতে চান, তাহলে নেকলেস তাঁকে গছিয়ে দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে এলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তারপর নেকলেস থাকুক কি লোপাট হোক—আমার ভেবে দরকার নেই। আমি কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামাতে চাই।"

খেমচাঁদ আর পেড়াপীড়ি করলেন না। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"তথাস্তু। তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তখন তাই হোক। কালকেই অখন্ড বেরিয়ে পড়ুক। তবে একলা নয়। দোকলার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে" বলে তাকালেন ইন্দ্রনাথ রুদ্রর দিকে।

"ইন্দ্রনাথ," বলল শর্মিষ্ঠা।

"আর বলতে হবে না, বুঝে গেছি," সিগারেটের প্যাকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলল ইন্দ্রনাথ।

"ঠাট্টা নয়। তোমার কাজ এখনো ফুরোয় নি।"

"হাওয়া তো সেইরকমই দেখছি।"

"তলপেটে বেল্ট আবার বাঁধতে হবে।"

"বেশ।"

"নেকলেস নিয়ে আবার বেরুতে হবে।"

"জো হুকুম।"

"নেকলেস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমার। নেকলেস ভীম দত্তকে গছিয়ে রসিদ না নেওয়া পর্যন্ত কিন্তু তোমার পেছনে অনেক ছায়া ঘুরবে।"

"ঘুরুক।"

"বী সিরিয়াস, মনে রেখো, নেকলেস পোঁছানোর ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। নেকলেস যদি হারায়, তাহলে...... তাহলে......সে কথা আর না বলাই ভাল," বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শর্মিষ্ঠা।

"আপনি ভাববেন না," গম্ভীর হয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, "আমার জীবন দিয়েও নেক-লেস আগলাবো।"

"তোমার কথার নড়চড় হয় না জানি। কিন্তু নেকলেস আগলাতে গিয়ে যেন সত্যি সত্যি মরণ-পণ করে বসো না। যা ডানপিটে তুমি। নেকলেস যদি যায় তো জানব আমার ভাগ্য।"

নখ দিয়ে জুলপিতে আঁচড় কাটছিল অখন্ডনারায়ণ। জুলজুল করে তাকিয়েছিল শর্মিষ্ঠার দিকে। এবার বলে উঠল— "নেকলেস নেকলেস করেই তুমি পাগল হলে আণ্টি। একবারও তো আমার প্রাণের কথা বললে না। এ প্রাণটা কে আগলাবে শুনি?"

"দুষ্টু ছেলে," স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন শর্মিষ্ঠা—"তুইও কম ডানপিটে নস। নিজেকে তুই ঠিকই আগলাতে পারবি। তাছাড়া, ইন্দ্রনাথ তো রইলই।"

"থ্যাংকিউ ফর দি কমপ্লিমেণ্ট," কুর্ণিশ করার ভঙ্গিতে বলল অখন্ড—"অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। নিজেকে আমি ঠিকই আগলাতে পারব। তবে কি জানো, থ্যাঁক-শিয়ালের মত শজারু-চুল ফেউটা যদি এখানেও ধাওয়া করে, তাহলেই গেছি।"

"না, যাবি না" বললেন খেমচাঁদ। "সোজা যাবি ভীম দত্তর বাংলোয়। গিয়ে যদি দেখিস ভদ্রলোক আছেন, কোনো গোলমাল নেই—"

"গোলমাল থাকলেই বা কি?" বাধা দিয়ে বলে উঠল মরিচি। "ভীম দত্ত থাকলেই হল।"

খেমচাঁদ বিরক্ত হলেন, কিন্তু আমল দিলেন না। কথার জের টেনে নিয়ে বললেন —"যদি দেখিস কোনো গোলমাল নেই, তাহলেই নেকলেস দিবি তাঁর হাতে। রসিদ নিবি। চলে আসবি।"

মরিচি বললে—"গোলমাল দেখার কোনো দরকার নেই। ভীম দত্তর প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলে চলুক। আমাদের বয়ে গেল। আমরা মাল দেব, রশিদ নেবো। ব্যস, ল্যাটা চুকে গেল।"

এবার বোধহয় খেমচাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কেননা, এই প্রথম তিনি মরিচির দিকে চোখ ফেরালেন। সে চাহনি দেখে শিউরে উঠল মরিচি বর্মা।

বিস্মিত হল অখন্ডনারায়ণও। সদা-হাস্যময় পিতৃদেবের এরকম চাহনি তো বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু বরফ-ঠাণ্ডা সেই দৃষ্টির মধ্যে কি দেখল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ঘৃণা? বিদ্বেষ? অবজ্ঞা?

শংকিতা হল শর্মিষ্ঠা। (ক্রমশঃ)

(আগামী সংখ্যায় 'চায়না-টাউন')

গঙ্গাসাগর

তারাপদ মাইতি

গঙ্গাসাগর

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বোধকরি গঙ্গাসাগর ছাড়া আর কোন তীর্থক্ষেত্র নেই যেখানে আসমুদ্র হিমাচলের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এমন কি সুদূর নেপাল ও ব্রহ্মদেশ থেকেও সেকালের পুণ্যলোভীরা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সাগর-সঙ্গমে সমবেত হতেন, এবং আজও নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিকিম, ভুটান, পাকিস্থান বনিতা দিনের পর দিন ঝড় বৃষ্টি, দৈব-রেলপথ ছিল না, যাতায়াতের আধুনিক যানবাহন তখন স্বপ্নাতীত। পথ বলতে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যপথ ও দুর্গম নদীপথ। তথাপি শত, সহস্র, লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দিনের পর দিন ঝড় বৃষ্টি, দৈব-দুর্বিপাক, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, জল-দস্যুর ভয়, মহামারীর বিভীষিকা প্রভৃতি উপেক্ষা করে সাগরদ্বীপে পৌঁছতেন। ভগীরথ কর্তৃক আনীত গঙ্গা ও কপিল মুনির স্মৃতি-বিজড়িত সাগরের পুণ্য-সঙ্গমস্থলে পৌষ সংক্রান্তিতে অবগাহন করে পুণ্যের ঘট ভরে নিতেন—সর্বপ্রকার পাপ হতে তাঁদের ঘটত চিরমুক্তি। তাই সাগরতীর্থের আকর্ষণ সর্বভারতীয়, এর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল প্রয়াগ ও হরিদ্বারের।

মহাভারতে ভগীরথের মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত ও কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধার সাধনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে মহাভারতের যুদ্ধ ঐতিহাসিক। এবং এই যুদ্ধ মোটামুটি ভাবে খৃঃ পূঃ ১০০০ হাজার অব্দে সংঘটিত হয়েছিল। (যদিও মহাভারত পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল গুপ্ত যুগের পূর্বে)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সূর্যবংশীয় রাজা বৃহদ্বল নিহত হন। ভগীরথ ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। উভয়ের মধ্যে বাহান্ন পুরুষের ব্যবধান। বাহান্ন পুরুষে ১৩০০ বৎসর ধরলে ভগীরথ খৃষ্টপূর্ব (১০০০+১৩০০)=২৩০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। গঙ্গাসাগরের ইতিহাস এতদিনের! রামায়ণেও গঙ্গা-সাগরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

তবে সেকালে এই গঙ্গাসাগর বা সাগর-সঙ্গম কোথায় অবস্থিত ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ভূতত্ত্ব-বিদেরা মনে করেন একসময় সাগরের স্রোত রাজমহল অবধি প্রবাহিত হত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে ভগীরথ রাজমহল পর্যন্ত এসে সমুদ্র পেয়েছিলেন। "রাজমহল পাহাড়ে আগ্নেয়গিরি ছিল। এখনও তাহার চিহ্ন আছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড তার এক প্রমাণ। উপাখ্যানে, সেখানেই কপিলমুনির আশ্রম ছিল।" একথা মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে, বর্তমান অবস্থান থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে সাগরসঙ্গম অবস্থিত ছিল ; আর প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে মধ্যবঙ্গ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে গ্রীক-রোমান প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের বর্ণনায় গঙ্গার মোহনায় গঙ্গারিদই নামে এক শক্তিশালী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের রাজধানীর নাম ছিল গাঙ্গী। পেরিপ্লাস (১ম খৃষ্টাব্দ) মসলিনকে গঙ্গরিদইদের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের টলেমির বিবরণে গাঙ্গীর যে অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে তা বর্তমান গঙ্গাসাগর বলেই ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক দেশীয় কোন লেখায় নিম্ন-বঙ্গের এই গঙ্গারিদইদের কোন উল্লেখ দেখি না। বোধহয়, এরা অন্য নামে পরিচিত ছিল। কালিদাসের (চতুর্থ বা পঞ্চম খৃষ্টাব্দ) কাব্যে . এই অঞ্চলে বঙ্গজাতির উল্লেখ করা হয়েছে। "রঘুবংশ"-এর রঘু নৌ-যুদ্ধে বঙ্গদের পরাজিত করেন।

তবে গুপ্ত যুগের পূর্বেই (৩২০ খৃষ্টাব্দ) গঙ্গাসাগর ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চতুর্থ শতকের পূর্বে রচিত বলে অনুমিত মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা ভাগে গঙ্গাসাগরকে অতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন গঙ্গাসাগরের তীর্থ-মাহাত্ম্য আরও প্রাচীন—আর্য-পূর্ব যুগের।

পুরাণগুলিতেও গঙ্গাসাগর-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে গঙ্গায় যেকোন স্থানে দেহ রাখলে মুক্তি লাভ ঘটে। কাশীতে গঙ্গাতীরে দেহ রাখলেও মুক্তি পৌঁছয়। তবে গঙ্গাসাগরে মরলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। গুপ্ত-পরবর্তী যুগের বিষ্ণু-সংহিতাতেও গঙ্গাসাগরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

গৌড়ের ধর্মপালের (খৃীঃ ৭৮০—৮১৫) সঙ্গে গুর্জর-প্রতিহার নৃপতি বৎসরাজের যুদ্ধে তাঁর সামন্তরাজ্য দুর্লভরাজ গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত স্থান অধিকার করেন। তিব্বতীয় রাজকুল পঞ্জীতে তিব্বতের কয়েকজন রাজা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের কোন কোন অংশে রাজত্ব করেন বলে উল্লেখ আছে। তিব্বতীয় নরপতি রল-প-চন্ পূর্বভারতে গঙ্গা-সাগর পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করেছিলেন বলে উক্ত কুলপঞ্জীতে দাবী করা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। পদ্মপুরাণে এক রাজার কাহিনী আছে। তিনি সাগরদ্বীপের নিকটস্থ জনৈক নৃপতির সুলোচনা নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করেন।

একাদশ শতাব্দীতে গঙ্গাসাগরের নাম উত্তর ভারতে সুপরিচিত ছিল। আল-বিরুনি তাঁর 'কিতাব-উল-হিন্দ' (১০৩০ খৃঃ) এ ভারতের নদনদীগুলির উৎস ও গতিপথের বর্ণনা প্রসঙ্গে গঙ্গাসাগর-মাহাত্ম্যের উল্লেখ করেছেন। অতঃপর গঙ্গাসাগরের গৌরব-মাহাত্ম্যে কিছুটা ঘাটতি পড়ে। জনৈক সমালোচকের মতে পদ্মা দিয়ে গঙ্গার প্রধান প্রবাহের গতি-পরিবর্তন ও শক্তিশালী বঙ্গদের শৌর্য ও বীর্যবত্তার ক্রমহ্রাসই এর অন্যতম কারণ। তাছাড়া পুরীর জগন্নাথদেবও এই সময় ধীরে ধীরে সমাদরলাভ করতে থাকেন; ফলে পূর্ব ভারতের 'একমেবাদ্বিতীয়ম' তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। এই সময় নিম্নবঙ্গে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের উৎপাত শুরু হয়। কিন্তু তাহলেও সারা পূর্ব ভারতের স্থানীয় তীর্থস্থান হিসেবে গঙ্গাসাগরের তীর্থ-মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন ছিল। মধ্যযুগের সংস্কৃত ও বাংলা-সাহিত্যে গঙ্গাসাগরের তীর্থমাহাত্ম্য-কথা বার বার বর্ণিত হয়েছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির (১৩৭৫-১৪৫০ খৃঃ) 'গঙ্গাবাক্যাবলি' ও বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-৮০ খৃঃ) 'তীর্থচিন্তামণি'তে গঙ্গা-সাগর তীর্থের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ দেখা যায়। সে সময় বঙ্গে,, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের লোকেদের মধ্যে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়ার প্রথা সুপ্রচলিত ছিল। আত্মবিসর্জনের ত কথাই নেই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ ?) রাধা বিরহবেদনা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাসাগরে গিয়ে বারংবার

আত্মবিসর্জনের সংকল্প করেছেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের নারীরাও গঙ্গাসাগরে মরার বাসনা প্রকাশ করেছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের (১৫৭৯ খৃঃ) নায়ক শ্রীমন্ত সদাগর 'মুক্তিপদ এই স্থানে' স্নান করে সযত্নে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন।

ষোড়শ শতকে সাগরদ্বীপে যশোহরের রাজা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল—একটি সুসজ্জিত নৌবহর তাকে সর্বদা পাহারা দিত। অনেক ঐতিহাসিক প্রতাপাদিত্যের রাজধানী চাঁদখা চককে সাগরদ্বীপ বলে মনে করেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ ও নিশ্চিহ্নপ্রায় পুষ্করিণীর চিহ্নাদি সাগরদ্বীপের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়েরই সাক্ষ্য দেয়। এরপরই গঙ্গাসাগরে লোকবসতি কমতে শুরু করে। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে পাদ্রী সেবাস্টিয়ান মনরিক সাগরদ্বীপকে প্রায় জনশূন্য অবস্থায় দেখেন। কিন্তু তখনও তীর্থযাত্রীদের আগমনের বিরাম ছিল না। সমসাময়িক বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে মনে হয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সাগরদ্বীপের খুবই ক্ষতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী কবি ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার রচিত 'তীর্থসার' থেকে জানা যায়, তখনও সাগরদ্বীপ শহরের বেশ কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল। এবং পিতামহ ব্রহ্মার পাদস্পর্শ ও মন্দাকিনীর জলে স্নানের জন্য তীর্থযাত্রীরা বিপুল সংখ্যায় সাগরদ্বীপে যেতেন। সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক হ্যামিলটনের (১৭২৭) বিবরণীতে এই কথারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি। কিন্তু কালক্রমে সাগরদ্বীপ মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে প্রায় পরিত্যক্ত হয় এবং বন্যজীবজন্তুর বাসস্থানে পরিণত লাভ করে। প্রাচ্যবিদ ইংরেজ কবি জন লেডেন (১৭৭৫-১৮১১) সাগরদ্বীপের এই নির্জনতা এক কবিতার মধ্যে সুন্দরভাবে ধরে রেখেছেন।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই তদানীন্তন ইংরেজ সরকার নির্জনপ্রায় সাগরদ্বীপকে আবার জনবহুল করে তুলতে উদ্যোগী হলেন। সে-সময় এখানে মাত্র কয়েকজন সন্ন্যাসীর বাস ছিল। তারা মেলার সময় তীর্থযাত্রী ও দোকানদারদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করত। ১৮০৮ সালে ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে সাগরদ্বীপে বাতিঘরটি বসান হয়। সরকারী নথিপত্রে দেখা যায়, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সাগরদ্বীপে কৃষি-ব্যবস্থা ও উপনিবেশ গড়ে তোলার এক পরিকল্পনায় সরকার নজর দেন। সম্ভবত সমুদ্রবক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের নাবিকদের আশ্রয়দানের উদ্দেশে এ-পরিকল্পনা। ঐ বছর মিঃ বোমন্ট নামে জনৈক বিদেশী ভদ্রলোক সাগরদ্বীপে মোষের চামড়ার কারখানার জন্য একশ' একর জমির জন্য আবেদন করেন এবং কালেক্টর অফিসে জমা দেবার জন্য আনীত মোষের চামড়াগুলোও তাঁকে দেবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তাঁর আবেদন রাজস্ব-বিভাগ মঞ্জুর করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সরকার থেকে কিছু চাষের জমি সুবিধাজনক সর্তে বিলি করার কথা ঘোষণা করা হলে মিঃ বোমন্ট তারও জন্য আবেদন করেন। কিন্তু এবারে তাঁর আবেদন নাকচ হয়। কেননা, সরকার চাষের জমি কেবল এদেশীয় লোকদের বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এদেশীয় লোকদের তরফ থেকে বহু আবেদনপত্র পড়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সরকারের সে-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত এক সমিতিকে প্রথম তিরিশ বৎসর বিনা খাজনায় ও তারপরে বিঘাপিছু মাত্র চার আনা খাজনায় ঐ জমি লীজ দেওয়া হয়। উক্ত সমিতির সভ্যরা প্রত্যেকে হাজার টাকার শেয়ার কিনে আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। এই সময় এক সরকারী জরিপে সাগরদ্বীপের শুষ্ক জমির পরিমাণ স্থির হয় ১৪৩,২৬৮ একর। ১৮২৯ সালে ২৪ পরগণার কালেক্টর মিঃ ট্রোয়ার একই উদ্দেশে 'সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কিছু কিছু 'দান' তুলত। পরে অবশ্য তা বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে তাড়াহুড়ো করে সাগরদ্বীপে পতিত জমির পুনরুদ্ধার ও উপনিবেশ গড়ে তোলার এক যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়েছে ১৮১৮ সালের এক সংবাদপত্র। পত্রিকাটির মতে—(১) সাগরদ্বীপে উৎকৃষ্ট তুলো জন্মাতে পারে, (২) সেখানে জাহাজ মেরামতের এক কারখানা স্থাপন করলে সমুদ্রবক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলিকে আর কলকাতায় টেনে আনতে হয় না, (৩) বিলাতে যে-সব জীবজন্তু পাঠান হয়, সেগুলিকে কিছু কিছু করে আগেই সাগরদ্বীপে রাখা যেতে পারে, তাহলে কোলকাতা থেকে একসঙ্গে সব নিয়ে যাবার সময় চাপাচাপিতে যে অপচয় ঘটে, তা আর হবে না, এবং (৪) সাগরদ্বীপে জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ বলে সেখানে এক স্বাস্থ্যনিবাসও গড়ে তোলা যেতে পারে।' ফলে এ'রা খুব উদ্যমের সঙ্গে কাজ শুরু করে দেন। কিন্তু ১৮২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেখা গেল মাত্র ৪ বর্গমাইলের বেশী জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। একদিকে জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে, অন্যদিকে সমুদ্র তা আবার গ্রাস করে ফেলছে। (তা সত্ত্বেও ১৮২৯ সালের ২৪শে জানুয়ারীর এক সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের জমি অপেক্ষা 'সাগরদ্বীপের জমির অধিক মূল্য' ধার্য হয়েছে)। এর উপর ১৮৩৩ সালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় তাঁদের সে-চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত হয়। মাত্র সাত ঘণ্টার ঝড়ে প্রায় ৬ হাজার লোক মারা যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক 'নোটে' দেখা যায় যে, সে পর্যন্ত সাগরদ্বীপের উন্নয়নকল্পে মোট খরচ হয়েছিল ঃ—

(১) সরকারের লাইট হাউস নির্মাণে
টা ৬০,০০০

(২) সাগর আইল্যান্ড সোসাইটির ব্যয় ...
টা ৩,২৯,০০০

(৩) ইজারাদারদের খরচ ...
টা ৫,৮১,০০০

মোট সিক্কা টাকা ৯,৭০,০০০

তাছাড়া প্রায় হাজারখানেক লোক ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করতে প্রাণ দিয়েছিল।

যাই হোক পূর্বসূরীদের উক্ত প্রচেষ্টার খেই ধরলেন এবার চারজন ইংরেজ। তাঁরা লবণ তৈরী ও ধানচাষে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদেরও সে-প্রচেষ্টার ইতি ঘটে ১৮৬৪ সালের ঘূর্ণিবার্তায়। এবারের ঝড়ে ৫,৬২৫ জনের মধ্যে মাত্র ১৪৮৮ জন জীবিত ছিলেন। ৭০২২টি গরুবাছুরের প্রাণহানি ঘটে ও ৩৩৬৫টি ঘর ধূলিসাৎ হয়। বোর্ডের সভায় প্রদত্ত

ভাষণে (৬ই অক্টোবর, ১৮৬৪) মিঃ ক্যানিংহাম যে অবস্থায় সাগরদ্বীপের অতীত এক অধ্যায় তিনি তুলে ধরে দিয়েছেন।

১৮৬৩ সালের ২৪ ডিসেম্বরের এক স্টেটমেন্টে সাগরদ্বীপের ভূমি বিলি ব্যবস্থার নিম্নরূপ চিত্র পাই। জনৈক মিঃ হান্টারের অধিকারে ঘোড়াজারা লট, মিঃ ডরিউ ক্যাম্পবেলের অধিকারে মনডাঙ্গা, মিঃ জন ব্যান্টারের অধিকারে বামুনখালি, মিঃ এইচ ফ্রেজার, মিঃ জে মেলটন ও মিঃ এল ফ্রেজারের উত্তরাধিকারীগণের অধিকারে সেগার আইল্যান্ড কোম্পানীর চর, প্রসাদ দাস দত্তের অধিকারে ঘোবিলট বা গঙ্গাসাগর এবং কুলধরীর লট খালি পড়েছিল। অতঃপর গত একশত বৎসর ধরে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সাগরদ্বীপের উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারের কাজ অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। এই পুনরুদ্ধার কার্য চলার সময় বহু পুরোনো অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

কলকাতার দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবার থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরদ্বীপ। বর্তমানে সাগরদ্বীপ ২৪ পরগণা জেলার একটি থানা। কতকগুলি নালি বা খাঁড়ির দ্বারা দ্বীপটি ছোট ছোট লটে বিভক্ত। আয়তন ২২৪ বর্গমাইল। ১৮৭২ সালে প্রথম আদমসুমারির সময় এর লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩৭১। ৩০ বছর পরে ১৯০১ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,০৬৫তে। ১৯৩১ সালে ঐ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়—৩১,৫০৫। বিগত ১৯৬১ সালে ৩৮,৭৩৪ জন পুরুষ ও ৩৪,৮৯৫ জন নারী নিয়ে সাগরদ্বীপের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৩,৬২৯। প্রতি বর্গমাইলে ৩২৮ জন লোকের বাস। প্রায় ১৯ হাজার লোক কৃষিকার্যে ব্যাপৃত।

পবিত্রতায় অন্যকোন তীর্থভূমি গঙ্গাসাগরের সমকক্ষ কিনা সন্দেহ। এর কারণ হয়ত ইতিহাসের সত্য ও পৌরাণিক মাহাত্ম্য সাগরসংগমে মিলিত হয়েছে। গঙ্গার মুখে সাগরদ্বীপই সর্বশেষ ভূখন্ড, যা ঐতিহাসিকের নিকট গঙ্গার প্রাচীন গতিপথ নির্দেশ করছে। প্রসঙ্গক্রমে 'আন-[illegible] ইরিগেশন [illegible]-এ [illegible] সেচবিভাগের বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স বাংলার নদনদী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে—'মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি দেখলে মনের ধারণা হয় যে পুরাকালে এগুলি গঙ্গা থেকে কাটা কৃত্রিম খাল ছিল। কালক্রমে এদের এক একটি ভাগীরথীর ন্যায় বৃহৎ নদীতে পরিণত হয়েছে।' ভগীরথের উপাখ্যান বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে 'সম্ভবতঃ ইনিই ছিলেন সেই সুদক্ষ এঞ্জিনিয়র, যার খনিত কৃত্রিম খালগুলোর সাহায্যে বাংলা সুজলা সুফলা হয়েছিল।' অন্যদিকে পুণ্যতোয়া গঙ্গার পলি দিয়ে সাগরদ্বীপ গঠিত। এমনিতেই আমাদের নিকট সর্বত্রই পবিত্র, বিশেষ করে নদীর উৎস ও মুখ (মোহনা) নদীর অন্য অংশ অপেক্ষা পবিত্রতর বলে গণ্য হয়ে আসছে। গঙ্গার ন্যায় সমুদ্রও আমাদের নিকট পূজ্য। সেজন্য গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থল গঙ্গাসাগরের পবিত্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর উপর কপিলমুনির কঠোর তপশ্চর্যার সিদ্ধিলাভে এস্থান হয়েছে পবিত্র। সর্বশেষে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে গঙ্গাবারি সিঞ্চনে সগররাজার ষাট হাজার সন্তানকে মুক্তি দিয়ে ছিলেন এই গঙ্গাসাগরেই।
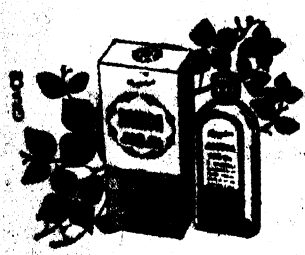
'সগরবংশের এই উদ্ধারলাভ ঘটেছিল পৌষ সংক্রান্তিতে এবং তারই স্মারক হিসেবে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে সাগরমেলা চলে আসছে।' ইতিহাস বলে এমন একসময় ছিল যখন নতুন বৎসর শুরু হত সৌরমাস মাঘের প্রথম দিন থেকে (জন বেন্টলির মতে খৃঃ পূঃ ১১৮১ অব্দ)। হিন্দু পঞ্জিকা মতে সূর্য এদিন মকরক্রান্তিতে প্রবেশ করে। সূর্যের উত্তরায়ণ গতি (মাঘ থেকে আষাঢ়) শুরু হয়। সূর্য তার দক্ষিণায়ণ থেকে উত্তরায়ণে প্রবেশকালে মকরক্রান্তির উপর সামান্য কাল অবস্থান করায় মকর সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি নামেও পরিচিত। নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন হিন্দুদের নিকট এই ঋতু ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—এই ঋতুতে আরামদায়ক সূর্যকিরণ ও উদ্ভিদ জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটত। বৎসরারম্ভের এইত দিন। উত্তরায়ণও, এখন আর বছরের প্রথম দিন থেকে গণনারম্ভ করা হয় না। কিন্তু সেদিনটি এখনও জীব ও উদ্ভিদজগতের পুনরুজ্জীবনের শুভ দিন হিসেবে স্মরণ করা হয়—উৎসবের দিনরূপে উদযাপিত হয়ে আসছে। এই উৎসবানুষ্ঠান পারিবারিক ও সার্বজনীন—দুইরূপেই পালিত হয়ে আসছে। প্রথমটি গৃহপ্রাঙ্গণে কুলপুরোহিতের পৌরোহিত্যে প্রধানতঃ পিতৃপুরুষ ও বাস্তুদেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান করা হয়। এই অর্ঘ্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে তিল; কিংবা খেজুর গুড় ও তিল দিয়ে তৈরী তিলুয়া, চালগুঁড়ি, নারিকেল ও গুড় দিয়ে তৈরি পিষ্টকাদিও নিবেদিত হয়, যার থেকে পিঠাসংক্রান্তি বা তিলুয়া সংক্রান্তি এসেছে। উৎসবে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি সবাই সেদিন নিমন্ত্রিত হতেন এবং কাল্পনিক পিতৃপুরুষ ও মৃত গৃহদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্যাবশিষ্টে (?) সবারই প্রসাদ জুটত। জয়সিংহের শব্দকল্পদ্রুমে সমগ্র মাঘ মাস বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে অবগাহন এবং বিষ্ণু ও সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনোচ্চারণ ও অর্ঘ্য নিবেদন বিধেয়। পুরাণেও একথা বলা হয়েছে, চৈতন্য সমসাময়িক রঘুনন্দনও মাঘ মাসে অবগাহনের সুফল ব্যাখ্যা করেছেন।

গঙ্গাসাগরতীর্থে প্রধান তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির প্রত্যুষে সাগর জলে অবগাহন, গঙ্গাপূজা, সমুদ্রে পঞ্চরত্ন সমর্পণ, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ এবং কপিলমুনির মন্দিরে পূজা নিবেদন করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানেরই প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটে।

উল্লিখিত পূজার্চনার সঙ্গে সেকালে সাগরতীর্থে আর একটি নিষ্ঠুর প্রথা জড়িয়ে ছিল যার বিধান বা সমর্থন কোন হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এটি হল গঙ্গাসাগরে আত্মবিসর্জন। সাগরসঙ্গমে মৃত্যুবরণ করা মানেই অনন্ত মুক্তি—চিরমোক্ষলাভ। আর সাগরতীর্থ থেকে কাউকে যদি বাঘে নিয়ে যায় তাহলে মৃত্যুর পরে তার দিব্যধামে গমন সুনিশ্চিত। এই অন্ধ কুসংস্কার ও মোহের বশে কত যে বৃদ্ধ, অথর্ব, পঙ্গু, জরাগ্রস্ত স্বেচ্ছায় গঙ্গাসাগরে আত্মবিসর্জন দিয়েছে—বাঘ, কুমীর হাঙ্গর প্রভৃতির মুখে কত লোক যে নিজেদের অকুণ্ঠিত চিত্তে ঠেলে দিয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। ১৮০১ সালে প্রায় ৩৯ জন লোক এভাবে আত্মঘাতী হয়েছিল। পরের বছর ইংরেজ সরকার সাগরদ্বীপে পুলিশ প্রেরণ করে তা বন্ধ করতে উদ্যোগী হন। ১৮৪১ সালের ৩০শে জানুয়ারীর ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেটে প্রকাশিত হয় যে ঐ বছর একজন ইউরোপীয় সার্জেন্টের তত্ত্বাবধানে ৫০ জন সিপাহীকে এই ব্যাপারে

মোকাবিলা করার জন্য সাগরদ্বীপে পাঠান হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্ততঃ এক ডজন লোক ঐ ভাবে আত্মঘাতী হয়েছিল। এর চেয়ে আরও হৃদয়বিদারক ছিল শিশুসন্তান বিসর্জন দেওয়ার প্রথা। নিঃসন্তান স্ত্রীলোক সন্তানকামনায় দেবতার উদ্দেশে মানত করত যে পাঁচটি সন্তানের জননী হলে শেষেরটিকে সে সাগরে বিসর্জন দেবে। ওয়াল্টার হ্যামিল্টনের মতে এই প্রথা পূর্ববঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত ছিল। একবার এক দম্পতি পাছে ইংরেজ সরকারের নূতন কোন আইনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের পঞ্চম সন্তানটিকে বিসর্জন দিতে না পারেন এই আশংকায় তাঁদের বার বৎসরের পুত্র সন্তানটিকে সাগরে বিসর্জন দেন। প্রাণভয়ে ভীত বালক সাঁতার কেটে কোন রকমে তীরে উঠলে প্রতিজ্ঞারক্ষাকারী পিতামাতা তাকে ধরে পুনরায় সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করেন। উইলিয়ম কেরীর প্রচেষ্টায় লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে ১৮০২ সালের এক আইন বলে এই নিষ্ঠুর প্রথা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কপিলমুণির নবনির্মিত ক্ষুদ্রকায় মন্দিরটি সমুদ্রতীর থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত। কিছুকাল পূর্বের এক সংবাদে জানা গেছে কপিলমুনির মন্দির ভাঙ্গনের মুখে। ভাঙ্গন প্রতিরোধ না হলে কপিলাশ্রম শীঘ্রই সাগরগর্ভে লুপ্ত হয়ে যাবে। এই ভাবে কপিলমুনির মন্দির পূর্বে বার তিনেক সাগরগর্ভে বিলীন হয়েছে। গত শতকের ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়ার সংবাদদাতা মন্দিরগাত্রে এক লিপি থেকে জানতে পারেন যে, কপিলমুনির আদি মন্দির ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যের গুরুসম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কপিলমুনির এই আদি মন্দির কবে লোপ পেয়েছে তা সঠিক জানা যায় না। ১৮৪১ সালের ৩০শে জানুয়ারী ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেটে কপিলমুনির তৎকালীন মন্দির সম্বন্ধে যে বিবরণী বেরিয়েছিল, তাতে জানা যায় যে তৎকালীন মন্দিরটি পূর্বের এক প্রকাণ্ড মন্দিরের অবশিষ্টাংশ। মন্দিরটি উড়িষ্যা থেকে আনিত শ্বেত পাথরে তৈরী ছিল।

বর্তমান মন্দিরের বারান্দায় ভগীরথ ক্রোড়ে গঙ্গাদেবী, কপিলমুনি ও সগররাজার তিনটি শিলামূর্তি আছে। উইলসন সাহেব তাঁর গ্রন্থে (১৮৬২) মন্দিরের সামনে এক বটবৃক্ষের উল্লেখ করেছেন; বৃক্ষতলে রাম ও হনুমানের মূর্তি ছিল। আর মন্দির মধ্যে প্রমাণ সাইজের কপিলমুনি বিরাজ করতেন। ১৯১৪ সালে ও' ম্যালি সাহেব তাঁর ২৪ পরগণা জেলা গেজেটিয়ারে মন্দিরে আকৃতিবিহীন সিন্দুর-চর্চিত এক প্রস্তরখণ্ডকে কপিলমুনির মূর্তি বলে উল্লেখ করেছেন। মন্দিরের পশ্চাদভাগে সীতাকুণ্ড নামে মিষ্টজলের এক ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল। দর্শনার্থীরা মন্দিরের ম্যানেজারকে কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে ঐ কুণ্ড থেকে এক চুমুক জল পান করতে পারতেন। বর্তমানে অযোধ্যাবাসী এক মোহন্ত মন্দিরের অধিকারী। মেলা উপলক্ষে নগদে ও অলংকারে যে কয়েক লক্ষ টাকা মন্দিরে জমা পড়ে তা সবই অযোধ্যায় চলে যায়।

মেলার সময় সাগরদ্বীপে পুণ্যার্থীদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে বহু অর্থ ব্যয় করে থাকেন। তীর্থযাত্রীদের জন্য পানীয় জল, আলো, আশ্রয়ের জন্য ছাউনি, শৌচাগার প্রভৃতি তৈরী হয়। যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানাদির জন্য ডাক বিভাগ থেকে কলকাতা সাগরদ্বীপ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ব্যবস্থাও করা হয়। কিছুকাল হল সাগরদ্বীপে উত্তরে কচুবেড়ে থেকে দক্ষিণে সাগরমেলা পর্যন্ত প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তাটি প্রভূত অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। চোরডাকাত অপরাধীদের ধরা ও শাস্তিবিধানের জন্য সাময়িক বিচারালয় ও কয়েদখানারও ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে মেলাতে গড়ে সাড়ে তিন ও চার লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। সেকালেও তীর্থযাত্রীর সংখ্যা মোটেই নগণ্য ছিল না। ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত রেল লাইন বসাবার (১৮৮৩ খৃঃ) বহু পূর্বে সাগর মেলায় দু-লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটত। সেকালের পত্র-পত্রিকায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময় কয়েক লক্ষ টাকার পণ্যসামগ্রীও মেলায় কেনাবেচা হত। ১৮৩৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীর একটি বাংলা সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল—"ঐ স্থানে (সাগরমেলায়) এতদ্দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য বার লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বিক্রয় হইয়াছে।" উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে (১৮২৫ সালে) জনৈক মিঃ চেম্বারলেন গঙ্গাসাগর মেলায় গিয়েছিলেন। সেখানকার একটি চিত্রবৎ বর্ণনা তিনি রেখে গেছেন।

'১৩ই জানুয়ারী সকালে গঙ্গাসাগরে পৌঁছলাম। দৃশ্য দেখে যার-পর-নাই আশ্চর্যান্বিত হলাম। যতদূর চোখ যায় উপকূল জুড়ে নৌকো আর নৌকো, নৌকোর উপর দাঁড়, সর্বত্র মানুষ গিজগিজ করছে। বৈঠা দিয়ে তাঁবু খাটানো হয়েছে, দোকান দেওয়া হয়েছে। সে দৃশ্যের বর্ণনা ভাষায় সম্ভবে না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এক বিশাল লোকালয় গড়ে উঠেছে, পথঘাট বাজারহাট সব তৈরী। বড় বড় শহরের মত হৈ-চৈর মধ্যে নানা প্রকারের পণ্যসম্ভারের বেচাকেনা চলছে। অন্যদিকে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ বণিতা সাগরসঙ্গমে অবগাহন করছে, ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে।'

গঙ্গাসাগরের তীর্থমাহাত্ম্য সেদিনও যেমন ছিল আজও তেমনি অটুট আছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানান উন্নয়নমূলক কার্যে হাত দিয়েছেন। স্থানে স্থানে পর্যটন কেন্দ্র, পর্যটন-আবাস নির্মাণ করে স্থানীয় ও বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণের সুব্যবস্থা করেছেন ও করছেন। সাগরদ্বীপে উন্নয়নকার্য চালিয়ে সেখানে যদি একটি পর্যটন কেন্দ্র বা একটি 'স্যানাটোরিয়ম' (স্বাস্থ্যনিবাস) গড়ে তোলা যায়, তাহলে ক্ষতি কি ? দেড়শো বছর আগেই তখনকার লোকের মনে এ কল্পনা অনুভূত হয়েছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বরের একটি সংবাদপত্র আশা প্রকাশ করেছিল যে যদি "সেখানে এক চিকিৎসালয় হয় এখানকার লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয় যেহেতুক সেখানকার সমুদ্রের বায়ু সুখদায়ক। এতদ্দেশীয় লোকেরদের রোগ হইলে জাহাজে অন্যত্র গিয়া আরোগী হইতে পারেন না যেহেতুক তাহারদের এত ধন নাই ও এত অবকাশ নাই।' দেড়শো বছর পরে আজও কি আমরা সে আশা পোষণ করতে পারি না ?

সাহিত্য

ও

সংস্কৃতি

নজরুল কথা

প্রায় আট বছর আগে নজরুল প্রসঙ্গে আলোচনা গ্রন্থ বেশী প্রকাশিত হয়নি। যে দু—একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে ডঃ সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল চরিত মানস' বিশেষ প্রশংসালাভ করে। লেখক এই গ্রন্থে নজরুল জীবনের বিচিত্র তথ্য বিশেষ ক্লেশ সহকারে সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবেশন করেন। কিছুকাল আগে এই গ্রন্থটির পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল জীবনী সম্পর্কে আজ অনেক গবেষণা সুরু হয়েছে এবং অনেক নতুন তথ্য ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু 'নজরুল চরিত মানস' নজরুল জীবনী সাহিত্যের মধ্যে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। নজরুলের জীবন কথা, তাঁর কবি প্রতিভা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান, বাংলার সংস্কৃতি জীবনে নজরুলের অবদান, নজরুলের উত্তর সাধক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের এমন বিস্তারিত আলোচনা আর নেই।

গ্রন্থকার গ্রন্থটির সূচনায় নজরুল-যুগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কাল নজরুলের অভ্যুদয় কাল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন লেখক, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথাও বলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঝড় উঠল, ভারত তার স্বাধীনতা পেল না, মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটল, তাঁর ডাকে ভারতে গণ-আন্দোলন সুরু হল। নানা দল উপদলের খণ্ডিত প্রচেষ্টা একটা অখণ্ডতা লাভ করল গান্ধীজীর আন্দোলনের ফলে এবং সেই আন্দোলনের প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ায় সন্ত্রাসবাদীর দল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিশেষ করে বাংলা দেশে মাথা তুলে দাঁড়ায়। বিদেশীয় হাত থেকে পরাধীন মাতৃভূমিকে উদ্ধার করার জন্য ভারতের জনগণ আকুল হয়ে উঠল। এই শুভ লগ্নে নজরুলের আবির্ভাব ঘটে।

তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সিপাহী হয়ে গিয়েছিলেন করাচী, সেখানে হাবিলদার পদে উন্নীত হন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মেতে উঠলেন এসব তথ্য শৈলজানন্দের অনেক রচনায় পাওয়া যায়। নজরুল কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের চারণ কবির ভূমিকা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'ফণি মনসা' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থগুলি সেকালের বিপ্লবীদের কাছে ছিল বাইবেল সদৃশ। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতির দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবে সূর্য সেন, যতীন দাস প্রভৃতিকে উদ্দীপ্ত করেছিল নজরুলের কবিতা। কারণ তাঁরা নজরুলের আবির্ভাবের অনেক পরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে। নজরুল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন তাঁর উদ্দীপনাভরা সঙ্গীত ও কবিতার মাধ্যমে এবং স্বয়ং সুভাষচন্দ্র আলবার্ট হলে কল্লোলগোষ্ঠী আয়োজিত নজরুল সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দান কালে বলেছিলেন যে আমরা যখন দেশের মুক্তি যুদ্ধে মার্চ করে যাব তখন আমাদের কণ্ঠে থাকবে নজরুলের গান। যতদূর মনে আছে সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিটি নিয়ে শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করা হয়।

নজরুল কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই কালে কম্যুনিজম সম্পর্কে এদেশে একটা নব-চেতনা জাগ্রত হয়েছে ঠিক সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। এবং তখনকার দিনে যে কোনো রকমের আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক এই বিবেচনায় সকলে সমর্থন করতেন, নজরুলের হিতৈষী, অনুরাগী এবং পথপ্রদর্শক ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমেদ। নজরুল প্রতিভার বিকাশে মুজফফর আহমেদ সাহেব এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুজফফর আহমেদ রচিত নজরুল জীবনীও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে সমৃদ্ধ। ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত এই কালের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নজরুল প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারাটি তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর আলোচনা বিস্তারিত এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য। তিনি তাঁর একটি উক্তির সমর্থনে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের রচনা থেকে নিম্নলিখিত উধৃতি দান করেছেন—

"সত্যেন্দ্রনাথ এমনই করিয়া যে ছন্দে সাম্যের গান গাহিলেন, যতীন্দ্রনাথ যে ছন্দে একহাতে শোষণ ও অন্যহাতে তোষণের ভণ্ডামিকে বিদ্রূপের শর-বর্ষণে নির্মম আঘাত করিলেন, কিছু পরে কাজী নজরুল ইসলাম সেই একই সুরে একই ছন্দে সাম্যের গান গাহিয়াছেন।"

এই কিছু পরে কথাটিতে আপত্তি আছে। উভয়েই সমকালীন বলা চলে, তা ছাড়া যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি-খ্যাতি ১৯২৩-এ মরীচিকা প্রকাশের পর প্রচারিত হয় কিন্তু নজরুল ততদিনে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, ১৯২১-এ "বিদ্রোহী" প্রকাশিত হয়, তখন নজরুলের নাম সকলের মুখে মুখে। একই সুরে উভয়ে গলা মিলিয়েছেন [illegible]

হবে না, কারণ, [illegible] এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে [illegible] এবং 'প্রগতি' সম্পাদকদ্বয়কে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৩৪ সালে যা লিখেছিলেন তা অনেকখানি গ্রহণযোগ্য। ধূর্জটিপ্রসাদের চিঠির অংশ বিশেষ যেটুকু লেখক উদ্ধৃত করেছেন তা নীচে দেওয়া গেল—

"কাজী নজরুলের অনুকরণ করতে গিয়ে অনেকে নিজের শক্তির অপমান করেন যেমন কাজী সত্যেন দত্তকে আদর্শ করতে গিয়ে নিজেকেও অবমাননা করেছেন, আদর্শকেও করেছেন।"

(প্রগতি—পৌষ ১৩৩৪)

ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য গ্রহণ যোগ্য। ধূর্জটিপ্রসাদ "আদর্শ" কথাটি ব্যবহার করেছেন, অনুকরণ বলেন নি। নজরুলের সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর একাধিক প্রশস্তি-সূচক কবিতা। অন্তরের শ্রদ্ধা না থাকলে তিনি এমন কবিতা রচনা করতে পারতেন না, যেমন লিখেছেন 'চিত্ত নামা'র কবিতাগুলি বা রবীন্দ্র প্রয়াণের পর 'রবিহারা'।

নজরুলের অগ্রজ কবি মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্য ভাবনার সংগে তাঁর যে মিল বা সমসাময়িকের প্রভাব, সেদিক থেকে তিনি রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তও নন। তথাপি নজরুলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এমনই প্রবল যে তিনি পূর্বসূরীদের অতিক্রম করে অনেক দূর যেতে পেরেছেন। এই গ্রন্থের লেখক বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অনেকাংশে অস্বীকার না করেও তাঁর কাব্য যে সুরে ও স্বরে বিশিষ্ট, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কাব্যভাবনা ও রীতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল (১৮৮৮-১৯৫২) ও রবীন্দ্রনাথ (১৮৮৪-১৯৫৪) নজরুলের পূর্বসূরী হলেও তাঁর কাব্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা নৈরাশ্য ও বিদ্রোহ-বিক্ষোভের যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, একথা না মেনে উপায় নেই। রবীন্দ্র বিরোধিতার ক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ তাঁরই। জনজীবনের দুঃখ আবেগকে সার্থকভাবে মূর্ত করার প্রথম গৌরব বহুলাংশে তিনিই দাবী করতে পারেন। বাংলা কাব্যের বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের অগ্রগণ্য ভাষ্যকারদের মধ্যেও তিনি অন্যতম।"

লেখকের এই মন্তব্যের সংগে আমরা একমত। লেখক যে ভঙ্গীতে নজরুলের জীবনের সংগে মিশিয়ে তাঁর কাব্যভাবনা ও সাহিত্য সাধনার পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সেই ধরনের প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার আর হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই, সেই দিক থেকে তাঁর প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য।

১৩২৯ ইংরাজী ১৯২২ নজরুলের জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এই কালে প্রকাশিত হয়েছে 'অগ্নিবীণা' এবং এই ১৩২৯-এর শ্রাবণ মাসেই 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। নজরুল তখনই যথেষ্ট খ্যাতিমান। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেই যুগের বাংলার সবাই স্নেহ করতেন এবং ধূমকেতু প্রকাশের কালে সকলে আশীর্বাদ করেছেন।

নজরুলের এই জনপ্রিয়তার পিছনে তাঁর কবি প্রতিভা ছাড়াও আর একটি বস্তু বিশেষ সহায়তা করেছে সে তাঁর বৈপ্লবিক মনোভংগী, কাজীকে 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবে বাংলা দেশ সেদিন একান্ত আপন জন বলে গ্রহণ করেছিল।

দুঃখের বিষয় কাজীর যাঁরা সম-সাময়িক তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ আর ইহ-জগতে নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে মুজফ্ফর আহমেদ, শৈলজানন্দ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার, নলিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি আজো সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে আছেন। এঁদের কাছ থেকে অনেক পাওয়া গেছে, এখনও অনেক তথ্য অজানা আছে সেইগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

অনেক উদ্ভট কাহিনী যেমন আগের কথা পরে পরের কথা আগে মিশিয়ে রচিত হয়েছে। যেমন 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা' এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ নজরুলের প্রথম দর্শনে বলেন নি। সম্ভবতঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলতে পারবেন ঠিক কি উপলক্ষ্যে কথাটি বলা হয়েছিল। আমরা মোহিতলালের মুখ থেকে অনেক কথা শুনেছিলাম নজরুল প্রসঙ্গে সেদিন আমাদের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও মোহিতলাল সকাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয়ের যে কাহিনী বলেছিলেন তা অন্যরূপ।

এই গ্রন্থের লেখক ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত যে শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে নজরুলের জীবন, তাঁর প্রতিভার ক্রমবিকাশ, তাঁর রচিত উপন্যাস ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, বিদেশী কাব্যের অনুবাদ ও সাংবাদিকতার ইতিহাস পরিবেশন করেছেন তার জন্য তাঁকে আমরা অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

'নজরুল জীবন' অধ্যায়ে নজরুলের প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টা, তাঁর বিবাহ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত এবং তথ্যনির্ভর বিবরণ আছে, এ ছাড়া 'অনুবাদক নজরুল' অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে 'নজরুলের উত্তর-সাধক' অধ্যায় নজরুল-চিহ্নিত পথরেখার অস্তিত্ব—যে সব বাঙালী কবির রচনায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠায় গ্রন্থটির বিশদ বিবরণ দান করা ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। নজরুল প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমারের এই গ্রন্থটি এক বিশিষ্ট সংযোজন।

—অভয়ঙ্কর

নজরুল চরিত মানস : (জীবন ও সাহিত্য) লেখক : ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত।। প্রকাশক : ভারতী লাইব্রেরী— ৬, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট।। কলিকাতা—১২ ।। দাম-১২·৫০ পয়সা মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বলা বাহুল্য এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠানের অসুবিধা অনেক। তবু 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার উদ্যোক্তারা যে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন, তার জন্য সাহিত্যরসিকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন। গত ১১ জানুয়ারী কলকাতার আকাদমি অব ফাইন আর্টস ভবনে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধন করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে সাময়িক পত্রিকার কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'আজ সাময়িক পত্রিকার লক্ষ্য কেবল সরস পানীয় পরিবেশন করা। তাও সে পানীয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুষ্টিকর নয়, তার উদ্দেশ্য নেশার উদ্দীপন। এর ফলে পাঠকের রুচির পাকযন্ত্রে চিন্তারূপ কঠিন খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবল উত্তেজক তরল নিকষে রুচির পাকস্থলী অদূরকালেই সম্পূর্ণ অসুস্থ হবার আশঙ্কা।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে আমাদের নবজাগরণের কাল থেকে আমাদের চিন্তা ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটেছিল দিনে দিনে। একটি সরল শিশু যেমন দিনে দিনে তার সমস্ত অবয়বে সমান আনুপাতিক বৃদ্ধিলাভ করে, আমাদের চিন্তা ও সংস্কৃতির রাজ্যে তেমনি বৃদ্ধি এবং বিকাশের অভাব আমাদের ঘটে নি। কাব্য, উপন্যাস, কাহিনী যেমন

প্রবন্ধ লেখক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে বসে আছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরা-শঙ্কর সেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও সঞ্জীব বসু।

প্রবল বেগবান ধারার মত আমাদের সংস্কৃতিকে প্লাবিত করেছিল, তেমনি অন্য দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা, দর্শন চিন্তা সমান বেগে বিপুলকায় গিরিশৃঙ্গের মত আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, 'শুধু রসপানে বেঁচে থাকা যায় না। আধুনিক যুগের মানুষ আমরা অথচ আজও আমাদের মন পড়ে আছে মধ্যযুগে। চন্দ্রলোক পরিক্রমা করে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। আমাদের চতুর্দিকে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ছে, তখনও কি মননশীল লেখকবৃন্দ সাধারণের জ্ঞান-পিপাসা মেটাতে অগ্রণী হবেন না?' তিনি প্রাবন্ধিকদের প্রবন্ধ সাহিত্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য আবেদন জানান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বাংলা সংবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, '১৮০০ সালের প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূতিকাগার এবং ১৮১৮ সালে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলি হল প্রবন্ধ সাহিত্যের ধাত্রী।' তিনি দেড়শ বছরের বাংলা সংবাদ সাহিত্যের উপরে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন এবং এই বিভাগের যুগরথীদের অবদান স্মরণ করেন। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী দর্শন, ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলেন। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅলোককুমার সরকার সকলকে স্বাগত জানান এবং একালে অর্থনীতি, সমাজনীতি বা দর্শনের উপর ভাল প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন প্রসঙ্গে আর একটি আলোচনা সভার কথা মনে পড়ে। গত ১২ জানুয়ারী সন্ধ্যায় সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলনের উদ্যোগে বাংলার তরুণতম কবিদের কয়েকজনের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন অমল ভৌমিক, রাণা চট্টোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা পাঠের পর পঠিত কবিতার উপর এবং সাম্প্রতিক কবিতার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। আলোচনা করেন আলোক সরকার, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, মণীন্দ্র রায় ও সতীকান্ত গুহ। আলোক সরকার পঠিত কবিদের দুটো শ্রেণীতে ভাগ করে বলেন, 'ছন্দ সব সময়েই এক। তবু পুরোনো-কালের কবিতার সঙ্গে এ-কালের কবিতার ছন্দের একটা বিরাট পার্থক্য আছে।' তিনি উদ্ধৃতি সহ বিষয়টি বিস্তারিত করেন। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন 'আন্তরিকতা এবং কবিত্ব এক নয়। আন্তরিক না হলেও কবিতা লেখা যায়।' গণেশ বসু একালের কবিতায় জীবনের প্রতিচ্ছবির অভাবের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে জীবনকে না চিনলে কবি হওয়া যায় না। আশিস সান্যাল বলেন, যিনি যথার্থ কবি, তাঁর রচনায় সমকালীন জীবন ও পরিবেশের প্রভাব আসতে বাধ্য। শুধু জীবন চেতনাই নয়, কবিতার মধ্যে আরও কিছু আছে। মণীন্দ্র রায় এ-কালের তরুণ কবিদের আরও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "নতুন কবিদের সামনে কোনও নেতৃত্ব নেই, একথা তরুণ কবিদের নিরাশ হবার পক্ষে মেনে নেওয়া যায় না। তরুণেরা তো সব সময়েই পুরোনোকে স্পর্ধায় অস্বীকার করতে চাইবে।" সতীকান্ত গুহ তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "প্রেরণা ছাড়া কবিতা লেখা সম্ভব নয়।"

এ রকম আর একটি অনুষ্ঠান হয়েছে গত ১১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে। 'সাহিত্য চর্চা' পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে এই সভা আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমণীন্দ্র রায়। তরুণ সান্যাল সমকালীন কবিতার গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—'একালের কবিতায় সমকালীন জীবনের কোন পরিচয় নেই। তরুণ কবিদের কবিতায় তবু জীবন চেতনা লক্ষ্য করা যায়।' শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং ... বসুও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কবিতা পাঠ করে শোনান রাম বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, চিত্ত গুহঠাকুরতা, আশিস সান্যাল, শিশির ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, রবীন সুর, রেবতীভূষণ ঘোষ, দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

পরলোকে কথাশিল্পী মোহনলাল

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র খ্যাতনামা কথাশিল্পী ও পরিসংখ্যানবিদ শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪ই জানুয়ারী বেলঘরিয়ার গুপ্ত নিবাসে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স হয়েছিল উনষাট বছর। প্রবীণ পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে দক্ষ হলেও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান পরিচয় ছিল কথাশিল্পী হিসাবে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের ছায়াতলে 'ভারতী' সম্পাদক মণিলাল ও শোভনলাল বড় হয়ে ওঠেন। এই সময় জোড়াসাঁকো ছিল বাংলা সংস্কৃতির পীঠস্থান ফলে বালককাল থেকেই মোহনলাল সাহিত্যিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে উঠছিলেন। 'দক্ষিণের বারান্দা'র এর উল্লেখ আছে :

'লেখকদের সঙ্গে আর তাঁদের লেখার সঙ্গে পরিচয় আমাদের খুব ছেলেবেলা থেকেই। কত্তাবাবা, দাদামশায়, বাবার কথা ছেড়েই দিলুম, এছাড়া লেখক সমাগম জোড়াসাঁকো বাড়িতে বড় কম হত না। আমাদেরও তাই শখ কেবল লেখার, খুব ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু পারব কোত্থেকে? একে ছেলেমানুষ, তার উপর বিদ্যাবুদ্ধির একান্ত অভাব। দাদামশায়কে দুঃখের কথা জানালুম। গল্প লিখতে গেলে একটা প্লট দরকার। প্লট পাব কোথা থেকে? দাদামশায় বললেন—এর জন্যে ভাবছিস? কেন স্বপ্ন দেখিস না? স্বপ্নগুলো লিখে ফেল, দেখবি গল্প এমনি এসে যাবে।'

হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের পর মোহনলাল বিলেতে যান উচ্চশিক্ষার জন্য। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস থেকে তিনি সংখ্যাতত্ত্বে বি এস-সি পাশ করে ভারতে ফিরে আসেন। বোম্বাই বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছলে মোহনলালকে ডেকে পাঠান অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ। তিনি অনুরোধ করেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করতে। প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি ঘর নিয়ে অধ্যাপক মহালনবীশ সেই সময় সংখ্যাতত্ত্বে গবেষণার কাজ করছিলেন। মোহনলালের প্রথম কর্মজীবন সেইখানেই। প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাকেন্দ্র থেকে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়।

চেক কথাশিল্পী শ্রীমতী মিলাডা সিকোরোভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় তখন ইউরোপে। মৃত্যুর আগে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভের পরিসংখ্যান উপদেষ্টার কাজ করছিলেন।

গগনেন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী, অবনীন্দ্রনাথের রচনা সংগ্রহ এবং সাম্প্রতিক চেক কবিতার অনুবাদের কাজে সম্প্রতি ব্যস্ত ছিলেন মোহনলাল। এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

বিদেশী সাহিত্য

বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সৌন্দর্যকে দেখার ব্যাপারে জন রাস্কিন ছিলেন একজন বিরল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসমালোচক হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন প্রতিবাদী মানুষ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বহু ট্র্যাজিক ঘটনার নায়ক ও উপকথার স্রষ্টা। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল দুঃখময়। ছয় বছর একসঙ্গে ঘর করেও স্ত্রী এফিকে তিনি ত্যাগ করেন অসহায়ভাবে। মা হবার ক্ষমতা ছিল না এফির। পঞ্চাশ বছর বয়সে রোজ লা টাচে নামে একটি নয় বছরের বালিকার প্রেমে পড়েন অপ্রত্যাশিতভাবে। সম্প্রতি মেরী লুটিয়েনস তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। বইটির নাম 'মিলাইস অ্যাণ্ড দি রাস্কিনস'। রাস্কিনের জীবনের একটি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির উদ্ঘাটন করাই বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। মিলাইস ছিলেন রাস্কিনের সমকালীন একজন প্রখ্যাত শিল্পী। রাস্কিন তাঁর স্ত্রী এফিকে ত্যাগ করার পর মিলাইস তাঁকে বিয়ে করেন। সমালোচকেরা বইটিতে অতিরঞ্জনের আভাস পান। বিভিন্ন ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে খুব সন্দেহ না থাকলেও বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে আসল ব্যাপারটি কোথাও কোথাও মূল ঘটনা থেকে সরে গেছে বলে মনে হয়। মিলাইসের আঁকা রাস্কিন ও এফির দুটি মূল্যবান পোর্ট্রেট ছাপা হয়েছে বইটিতে। মিলাইসের একটি আত্মপ্রতিকৃতিও মুদ্রিত হয়েছে।

মার্কিনী শিল্পী ও লেখক অ্যাণ্ডি ওয়ারহোল এগার মাস আগে পপ-আর্ট সম্পর্কে দেশের নানাস্থানে বহু বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। তিনি তখন পপ-আর্টের মাধ্যম কি হবে বা হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছুটা আভাসও আমার চেষ্টা করেন। সমালোচকেরা, তাঁর নতুন পরিবেশনের ভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেলেও একান্তভাবে অ-পূর্ব কোন বস্তুর সন্ধান পান নি। ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম ও ছিলো নকস তৈরীর ব্যাপারে কাঠ ও রঙের যে ব্যবহার-পদ্ধতি আছে—তাঁর এই কর্মগুলো তারই কাছাকাছি। অস্কার ওয়াইলড 'দি পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে'তে যাকে বলেছিলেন 'জগতের আসল রহস্য হলো দৃশ্যমানতা, অদৃশ্য নয়'—অ্যাণ্ডি ওয়ারহোল পপ-আর্টের ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বকেই সমর্থন করেছেন তাঁর সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। তিনি অবশ্য তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেবল ছবি-আঁকার ব্যাপারেই নয়, পারম্পর্যহীন কাহিনী নির্মাণেও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিছুকাল আগে তিনি তৈরী করেন 'এম্পায়ার' নামে একটি চলচ্চিত্র। সম্প্রতি তাঁর একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। উপন্যাসটির নাম 'এ'। ইংরেজী হোটহাতের একটি অক্ষরকে চিহ্নিত করা হয়েছে এর নামকরণ হিসেবে। তাছাড়া প্রচ্ছদের ছবিটিও বিচিত্র ধরনের। সামনের ও পেছনের কভারে ছাপা হয়েছে সাবানের বাক্সের মতো একটি নকশা।

প্রখ্যাত গ্রীক কবি ও ঔপন্যাসিক নিকো

কাজান্‌ৎজাকিস মারা যান ১৯৫৭ সালে। এই পৃথিবীর জল-হাওয়ার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। জীবনের মোলপ্রতারে তিনি ছিলেন আশাবাদী এবং মানুষ সম্পর্কে আবেগপরায়ণ। তাঁর উপন্যাসের ভেতরে এই মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী হেলেন কাজান্‌ৎজাকিস তার একটি জীবনস্মৃতির সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম দিয়েছেন নিকো কাজান্‌ৎজাকিস। আসলে এটি কোন নতুন গ্রন্থ নয়। কাজান্‌ৎজাকিস জীবনের বিভিন্ন পর্বের লেখায় যেখানে যেখানে ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলেছেন—সেসব রচনার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে এই জীবনস্মৃতির কাহিনী। কাজান্‌ৎজাকিসের আত্মজীবনী 'রিপোর্ট টু গ্রেকো'র চাইতেও এই গ্রন্থটি অধিকতর মনোজ্ঞ ও অন্তরঙ্গ বলে সমালোচকের অভিমত।

ডেসমণ্ড ডুইগ সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন কলকাতার ওপরে। বইটির নাম 'ক্যালকাটা : অ্যান আর্টিস্টস ইম্প্রেসন'। জব চার্ণকের আমল থেকে পরবর্তী কয়েক দশকের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় বইটিতে। পুরোনো কন্টিনেন্টাল হোটেলের চিত্রও দেওয়া হয়েছে। এখানে এককালে মার্ক টোয়েন ঘুমিয়েছিলেন। তাছাড়া রয়েছে বহু মূল্যবান ছবি ও আলোচনা। লাটভবনে কার্জনের লিফট-এর একটি দুষ্প্রাপ্য ছবিও এতে আছে। কলকাতার বহু অপরিচিত পথ-ঘাট অতীত দিনের স্মৃতি নিয়ে উপস্থিত।

নরম্যান সেইলারের 'আর্মিজ অব দি নাইট' প্রকাশিত হয়েছে কিছুকাল আগে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাংবাদিক যেমনভাবে খবরের পর খবর পাঠান সংবাদপত্রে—এ-বইটি অনেকটা সেই ভঙ্গিতে লেখা। সমালোচকেরা বইটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ঘটনাকে তিনি দেখেছেন সাংবাদিক ও সৈনিকের চোখ দিয়ে।

আন্দ্রে হিল্টনের সম্পাদনায় 'দিস ইংলণ্ড ১৯৬৫-৬৮' নামে একটি বই বেরিয়েছে সম্প্রতি। কৌতুককর ভঙ্গিতে বইটি লেখা হলেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায় ছত্রে-ছত্রে। উনিশ শ পঁয়ষট্টি থেকে আটষট্টি সাল পর্যন্ত সংবাদপত্রের ফিচার হিসেবে এর বিভিন্ন অধ্যায়গুলি লেখা। নাগরিক জীবনের বহু সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে সহজ পরিহাসের মাধ্যমে। বইটি সচিত্র। ছবি এঁকেছেন আর্থার হর্ণার।

ডোনাল্ড সোয়ান-এর 'দি রোড গোজ এভার অন' নামে একটি বই বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে। এটি একটি গানের বই। টলকিনের কবিতার সঙ্গীতরূপ দিয়েছেন ডোনাল্ড সোয়ান। মূল কবিতার পরিবেশ ও অনুষঙ্গকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুরের মায়াজালে। জিপসী জীবন-চেতনার সঙ্গে কেল্টিক রহস্যময়তার সম্মিলনে এর প্রতিটি কবিতা ও সঙ্গীতরূপ শ্রোতা ও পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। প্রকাশ করেছেন অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন।

নতুন বই

ক্ষুর— (উপন্যাস) গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। প্রাইমা পাব্লিকেশনস। ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু রহস্য উপন্যাস রচনায় একটি মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর ফাঁসির আসামী, নিবারণ মল্লিকের স্বপ্ন, মক্কেলের নাম বেন মোজেস প্রভৃতি উপন্যাসগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'ক্ষুর' কিন্তু ঠিক রহস্য উপন্যাস নয়। এই উপন্যাসের কাহিনীবস্তু বিচিত্র এবং অভিনব। রহস্য অথচ রহস্য নয়—সেইখানেই কাহিনী পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য। লেখক যে রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন তা মানবজীবনের রহস্য, সেই কারণে মনস্তত্ত্বের এক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উপন্যাসের কাহিনীর পরিবেশনের সঙ্গেই লেখক করে গেছেন এবং অসামান্য সার্থকতা লাভ করেছেন। গল্পের নায়ক নীলিমাকে স্বপ্ন দেখছে অনেক দিন পরে, অনেক বছর পরে এই স্বপ্ন, যে স্বপ্নের জন্য কোনো প্রস্তুতি ছিল না মনে। অবচেতন মনে নীলিমা বাসা বেঁধে ছিল সেই ক্রুর নিষ্ঠুরতার আচমকা পুনরাবির্ভাব। যেভাবে নীলিমার ওপর অত্যাচার করেছে অবু। ব্যর্থতার আক্রোশে সে শোধ তুলেছে নীলিমার ওপর তাই তার সদাই ভয় বুঝি নীলিমা হয়ত প্রতিশোধ নিতে কাল রাতে এসেছিল। পুরীর হোটেলের পাশের ঘরের *প্রতিবেশী মদ্যপ দুশ্চরিত্র লোকটি পুরুষ নয়, তারও মুখ ক্ষুরের ধর-প্রভাবে খরখরে, সেখানে দাড়ি গজিয়েছে। সে পুরুষের বেশে নারী, তাকে কিন্তু কে খুন করল—কে পালাল টাকা-কড়ি নিয়ে! এইসব নানান* প্রশ্নের উদ্ভব হবে পাঠকের মনে। লেখকের মুন্সীয়ানায় উপন্যাসটি টানা পড়ে যেতে হবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের সূত্রের সহজ সরল বিশ্লেষণে পাঠক বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে পড়বেন। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু এক নতুন ধরনের রহস্য উপন্যাসের লেখক হিসাবে অভিনন্দিত হবেন। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

●

রত্নাকরের প্রেম [উপন্যাস]—নিমাইকুমার ঘোষ।। মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯।। দাম : ছ'টাকা।।

উচ্চ আদর্শ এবং মহৎ চিন্তা থাকলেই ভালো সাহিত্যিক হওয়া যায় না। এর জন্য উপযুক্ত সংযম এবং শিল্পবোধ থাকা প্রয়োজন। নিমাইকুমার ঘোষ এ উপন্যাসে বহু বাস্তব-সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। খাদ্য সমস্যা, প্রেম, যৌনতা, অসাম্য প্রভৃতি জাগতিক বিষয় নিয়ে তিনি রীতিমত বিব্রত। তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ নানারকম আদর্শবাদী ভাবনাচিন্তার জটিলতায় দিশেহারা। উপন্যাসটির ভাষা ভাল, প্রচ্ছদও ভাল।।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কৃশানু [১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা]—সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সিংহ। ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা ১২।। এক টাকা।।

এ সংখ্যায় লিখেছেন দীনেশ সিংহ, হরিপ্রসাদ ভৌমিক, মল্লি সেন, অতুলরঞ্জন দেব, পূর্ণেন্দু রায়, রামশঙ্কর গিরি, সমীরেন্দ্র সিংহরায়, কানাই ঘোষ, শিবাজী গুপ্ত।

●

শিশুকল্যাণ [১৫ বর্ষ ৫ সংখ্যা]—সম্পাদক এস জি মজুমদার।। ৫৮ মহানির্বাণ রোড, কলকাতা ২৯।। দু টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ শিশুকল্যাণ পরিষদের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে দীর্ঘ পনের বছর ধরে। শিশুদের নানারকম সমস্যা নিয়ে এ সংখ্যায় অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। লিখেছেন ফণীন্দ্র গুহ, সরলা ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, নলিনী দাশ, লীলা মজুমদার, পূর্ণ চক্রবর্তী, শুভেন্দু ঘোষ, শান্তিকুমার মৈত্র, ডঃ অনিলকুমার ভট্টাচার্য, কুঞ্জবিহারী পাল, তপনকুমার ধর, প্রভাতকুমার দত্ত এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সম্পাদক লিখেছেন: "আজকের শিশু যেন কালকের বড় মানুষ হয়ে উঠতে পারে... চরিত্রও যেন তার হয় নির্মল, সে যেন হয়ে ওঠে সার্থক সামাজিক মানুষ। সে যেন পারে পরের দুঃখে কাতর হতে।"

কনে-দেখা-আলোর বেলাটুকু তখনো অতীত নয় এমন সময়—সহসা. বিপ্লবের বজ্র-স্লোগানে আকাশ জুড়ে, দিকবিদিক ছেয়ে, ময়দান-অভিযাত্রী বিপুল-বিরাট মিশ্‌মিশে কালো চুলে ঢাকা মিছিলের মতো দলবদ্ধ, অসংখ্য, অবিচ্ছিন্ন-মাথার একপাল মেঘ বিশ্বচরাচরকে কালো আঁধারে গিলে ফেলল। অকালে নামল রাত। আর সেই সঙ্গে দম্‌কা, ক্ষ্যাপা বৃষ্টি। যদিও শ্রাবণ, যদিও বর্ষণই এখন স্বাভাবিক—তবু অকস্মাৎ এই অযাচিত গায়ে-পড়া বৃষ্টিতে ভিজতে কাজলের বিশ্রী লাগে। এই শ্রাবণ, এই বর্ষণ; সর্বদাই রসসিক্ত, সুন্দরলালের স্যাঁতসেঁতে উপস্থিতির মতোই নিয়ত অস্বস্তিজনক। যেমন ভালো লাগে না এই-ভাবে বাধ্য হয়ে ভিজতে, তেমনি—।

অথচ এমনিতে কাজল, জল পেলে কতই পুলকাপ্লুত হয়। সেই চৈত্র থেকে শুরু হয় ওর সীতা-সায়রে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে, শুধু নাকটুকু জাগিয়ে অবগাহন! যেমন উত্তাপ বাড়ে তেমনি স্নানের সময় লম্বিত হয়। আর যখন প্রথম বর্ষণ,—লাজুকলতার মতো একফোঁটা, দু-ফোঁটা ক'রে, প্রথম বর্ষণের আবির্ভাব ঘটে, তখন, নুয়ে-পড়া বাঁশঝাড়ের বেণীতে চতুর্দিক আবরু-করা সীতা-সায়রে চোখটি বুজে আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে তুলে, (কখনো-বা হাঁ করেও) কাজল ভেজে। জ্বালা জুড়োয়, শীতল করে। এইভাবে বর্ষণের অসংখ্য ধারা-রেখা স্বর্গকে মর্তের সঙ্গে যখন অঙ্গীভূত করে মিলিয়ে দেয়-তখন কাজল বৃষ্টির অমৃতধারায় নিজের ভেতর পর্যন্ত, যেন মনেরও ভেতর অবধি ধুয়ে নির্মল করতে চায়।

দূরে — জগৎপুরের ডিসট্যান্ট সিগ-ন্যালের লাল আলোটা সহসা কিশোরের হাতের সেই আংটির চুনীর মতো জ্বল-জ্বলে হয়ে ঝিকিয়ে উঠল। একদা সুন্দর-লালের আংটির পাথরখানা দেখেই কাজল আকৃষ্ট হয়েছিল। কখন? সেই অবস্থার কথা মনে পড়লে এখনো কাজল শিউরে ওঠে। আসলে সুন্দর এমন একটা কাজের জন্যে হাত বাড়িয়েছিল যেটা কাজলের কাছে অসহ্য। অথচ, অত বড় এবং ওইরকম মানী একটা মানুষকে ভজা বা গোপলার মতো গায়ের বা গলার জোরে হটিয়ে নিজেকে বাঁচানো চলে না। তাই চট করে সুন্দরের হাতখানা, পাকা সাপুড়ের মতো খপ করে বুকের ওপর থেকে ধরে সরিয়ে এনে আত্ম-রক্ষা করেছিল কাজল। আর সারল্য ঢেলে, কৌতূহলে ভান দেখানো গলায় শুধিয়ে-ছিল—'এটা কী পাথর? বাব্বাঃ, আলো ঠিকরে পড়ে এমন, যেন রক্তের ফিনকি!'...

আজ, অনিচ্ছায়ই ভিজছে ও। জগৎ-পুরের ওই দূরের আলোর রক্তিমায় চোখ ফেলে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে কাজল। বারো, না কতো রতির চুনী, 'অনেক রুপেয়া' তার দাম।...হাবাসপুরের ফুল-দোলের মেলায় ঘুরতে ঘুরতে অবিকল অমনি চুনী বসানো একটা আংটি দেখে, ভয়ে ভয়েই কাজল দাম জিগ্যেস করে জবাব শুনে অবাক হয়েছিল। পাছে দোকানদার নিজের ভুল শুধরে পরমুহূর্তে দাম বাড়িয়ে দেয়, বা অন্য খদ্দেরে কিনে নেয়, তাই সাত তাড়াতাড়ি মুঠোর বটুয়া খুলে একটা আধুলি আর সিকি, ব্যস্তভাবে দোকানীর হাতে তুলে দিয়েছিল কাজল। আংটিটা না দিয়ে দোকানী আধুলি ফেরৎ দিয়েছিল। উপরন্তু আরও পনের নয়া! ভয়ে, আতঙ্কে কাজলের হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল। নিশ্চয় দোকানীর মতলব খারাপ। নইলে দশ নয়ার অমন

আংটি কেউ দেয়? কাজলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়েছিল। [illegible] জানতে ধরে, এমন সময়ে [illegible] বলেছিল—মা-জননী। [illegible] ভালো নয়। [illegible] পয়সা-কড়ির হিসেব [illegible]। কী ভুল, কী ভুল। কাজল তো [illegible] হিসেব পর্যন্ত নির্ভুল করতে পারে বোকা লোকটা যদি জানতো!

দশ নম্বর সেই অমূল্য রত্নখচিত আংটি কাজল নিজের আঙুলে পরে নি। কিশোরের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল।...সেই কথাই এমন বিভোর হয়ে ভাবছিল কাজল। ভাবতে ভাবতে সব ভুলে গিয়েছিল। খোলা আকাশের তলায় বৃষ্টির জলে কাপড়, জামা, আঙিয়া সবই ভিজে সারা—সে খবরও রাখছে না ও। আর তাই যখন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে-যাওয়া বেসনবসনের অস্বস্তিকর স্পর্শ পেয়ে সজাগ হল, তখন ভীষণ চটে গেল। বিরক্তি আর ক্রোধ ওকে মরীয়া করে তোলে। কেন যেন মনে হচ্ছে, জল ত নয় জন—আর কেউ ওকে অতর্কিতে জড়িয়ে ধরেছে। ছাড়বে না। স্বতঃই সুন্দরলালের গলে-ঢলে-পড়া স্যাঁত-সেঁতে ব্যক্তিত্বের তাজা স্মৃতি ওর মনে জাগল। যা এড়ানো, যা ছাড়ানোর উপায় কাজলের নেই। যেমন এখন এই ভিজে [illegible] হাত থেকে ইচ্ছে করলেই রেহাই মিলবে না—তেমনি সুন্দরলালও অপরিহার্য। [illegible] সমাজে চলা-ফেরার জন্যে এই ভিজে বেশেই ঘোরাফেরা করতে হবে। বইতে হবে, সইতে হবে। তেমনি কিস্তিওয়ালা সুন্দরলাল না থাকলে—! ভাবাই যায় না, কী দশা কাজল-দের পরিবারের হত। বিরক্ত কাজল নিজের আত্মোপলব্ধিতে চটে যায়। এখানে দাঁড়িয়ে না ভিজে, টিকিটঘরের সামনে পালালেই ত হত। কিন্তু এখন আর গিয়ে কি লাভ। সবই ত ভিজে জবজবে! এখন গেলে যত্তোর দল চোখ দিয়েই কাজলকে চাটবে।

যতো জোরেই জল আসুক কাজল নড়বে না। এইখানে দাঁড়িয়ে ভিজবে। জেদ চেপে গেল। ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণার এই এক অভিব্যক্তি ওর স্বভাবে আছে—যখন নিজের ইচ্ছেটা অবহেলিত হয়, আর রাগ হয় তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে-কাজটার টুঁটি টিপে ধরে। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলে—'নাও তোমার ইচ্ছের কতো দৌড় আছে দেখি।' ট্রেন-খানা যতোক্ষণ না আসছে, যতো-ক্ষণ আংটির চুনীর মতো ওই আলোর রক্তচক্ষু সবুজ না হচ্ছে ততক্ষণ এইখানে থাকবে—কাজল এক চুলও নড়বে না। চুনীর মতো লাল আলোর দিকে তাকালে কেবলই কিশোরের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে।

সে হয়ত এখন টিনের কৌটোর মধ্যে মশলা-মিশিয়ে চামচে দিয়ে চানাচুর খুঁটছে। গায়ের হাফশার্টটা ছিঁড়ে গেছে। কাজল কতোবার বলেছে, নতুন জামা কিনতে—[illegible] বাজারে সুন্দর সুন্দর জামা, দামও এমন কিছু নয়—তা কিনবে না। ওই ছেঁড়া-জামায়, আর খাকী হাফপ্যান্টের কাটা-অংশ দিয়ে [illegible] দেখা যায়—তাকাতে লজ্জা করে কাজলের। গোঁয়ার—ওকে [illegible] না। শুধু গোঁয়ার? বোকা। ওর একার রোজগারেই ত সংসার চলে, ওরই চানাচুর বেচা পয়সায় কুমারের কাপ্তেনী চলছে। কুমারকে দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না যে, ওর দাদা সেই ভোরবেলা চানাচুরের টিন আর ঝুলি কাঁধে করে এ ট্রেন ও ট্রেনে মাল বেচে রাত এগারোটায় বাড়ি ফেরে। অবিশ্যি নিশ্চিন্দিপুর, মসলন্দপাড়া, বেলেডাঙ্গা সব গাঁয়ের মানুষকেই খেটে খেতে হয়। তবু কিশোরের খাটুনীর কোনো সীমে-মুড়ো নেই। সেই যেদিন আংটিটা কিনে মনের আবেগ চাপতে পারে নি কাজল। কখন শ্রান্ত নিশুতি হবে, কখন দশটা সাতাশের গাড়ি আসবে—সবুর সয় নি। কাজল হাবাসপুর থেকে রুদ্ধশ্বাসে স্টেশনে এসেছে। বিকেলের লোক্যালের অপেক্ষায় কুমারও থাকে। কিশোর ডেকে তুলে নেয় ভাইকে গাড়িতে। কল্যাণগড়ের বাজারে পেঁয়াজ, আদা, নারকেল, আর মশলা কেনে—কাজলের নখ-দর্পণে ওদের গতিবিধি। পেয়ে গেল। সেও আজকের মতো এই গাড়িই ছিল। কুমারের পিছু পিছু কাজল যে উঠল তা কিশোর খেয়ালই করে নি।

...গাড়ির মধ্যে অনেক লোক। ও বাবা, এ যে সংসার পেতে বসেছে কিশোর। অন্য-মনস্কভাবে চুলের আস্তরণ ভেদ করে গড়িয়ে-পড়া বৃষ্টিধারা হাত দিয়ে মুছতে মুছতে কাজল শুকনো খটখটে সেই সন্ধ্যার ছবি দেখছিল। কমলালেবু ফিরি-করা মহেন্দর তার চুবড়িটা সীট থেকে নামিয়ে কাজলকে সমাদর দেখিয়েছিল—'বসো বহিন! চললো বুঝি, কলকাতা?' না। তবে? একটু হেসে জবাব দিয়েছিল—তোমাদের সংসার দেখতে আসলাম।...হাঁটু মুড়ে কিশোর পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছিল, চোখ না তুলেই প্রশ্ন করেছিল — 'আজ বুঝি ছুটি?' কিশোরের গালের ওপর কাটা দাগটার দিকে চোখ রেখেছিল কাজল। এখনও যেন সেই কাটা-দাগের ওপরেই ওর দৃষ্টি।

আলোটা কিন্তু এখনো লাল! আচ্ছা, আর যদি রঙ না পাল্টায়। শুধু লাল হয়েই জ্বলতে থাকে। আর জ্বলে-জ্বলে তেল ফুরিয়ে, এক সময়ে সবুজ না হয়ে, নিভে যায়! তাহলে বেশ হয়। ট্রেন তাহলে আসবে না— সুন্দরলালও না। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত ঘটনার সম্ভাবনায়ও ষোল আনা উল্লাস জাগে না। কেন না কিশোরও ত ওই ট্রেনেই থাকবে। 'মুখোরুচি চানাচুর' হাঁক,...মশলার লম্বা শিশিটা...কিশোরের ঝকঝকে হাসি-মাখা দাঁতগুলো জোয়ালের... উঁচু হাড়ের কাঠামো ঢেকে দিয়েছে...নিপুণ শিল্পীর মতো টিনের খোপগুলো থেকে নারকেল কুচো, পেঁয়াজ, আদা আরও কত কী মিশিয়ে, মুখরোচক মশলা ছিটোনো...সৌন্দ

কুমার চানাচুর আর নারকেল মিশিয়ে যখন মশলার শিশিটা নিয়ে ঝাঁকাতে গেল, কিশোর তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে বিশেষ কায়দায় মশলা ছিটোচ্ছিল...কাজলের মনে হচ্ছে, ওই কাজটা দুনিয়ায় আর কারুর হাতে ছেড়ে দিয়ে কিশোর স্বস্তি পায় না। মহাভারত বুঝি অশুদ্ধ হয়ে যাবে। ওটা কাজল ভালো করে বোঝে, জ্বরে গা পুড়ে গেলেও, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে গেলেও, দেয়াল ধরে-ধরে মা ওদের ভাত বেড়ে দিতেন। অথচ ফ্রক-পরা কাজলই ত তখন গেরস্থালির সব কাজ করত।...বৃষ্টির জলের সঙ্গে ওর নিজের চোখের জল মিশে গিয়ে কান্নার অস্বস্তি ঘুচিয়ে দিল। এখনো, মায়ের কথা মনে পড়লেই চোখ ছাপিয়ে জল আসে। আর মায়ের মৃত্যুর কদিন আগেই বা বাবার চোখের দৃষ্টি হারালো। উঃ, সেকথা—সেই নিদারুণ খবরের আঘাতটা মায়ের মৃত্যুকে তত তীব্র হতে দেয় নি। কেননা, তার আগেই কাজল, অনিল, মিলন সবাই—ওদের গোটা পরিবারটাই একসঙ্গে মরে গিয়েছিল যেন। বাবা বললেন—অকালে এবার এমন আঁধার-করা মেঘ নামল!...অথচ তখন কটকটে রোদে সীতা-সায়রের তলার মাটি অবধি ফেটে যাচ্ছে—শুধু মাঝখানটায় কাদা থকথকে কয়েক কলসী জল যেন আছে! বাবার কথা শুনে অবাক হয়েছিল কাজল। হাঁ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আপন মনেই তিনি গজগজ করছিলেন—আজ বিক্কিরির দফা রফা! ট্রেনের প্যাসেঞ্জার অদ্দেক—চাটনী লজেন্সই বলো আর পেয়ারাই বলো, বেশি ত খায় ছেলে-ছ্যামরায়, তা এদিনে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কেউ বেরুবে না।...বাবার গায়ে হাত দিয়ে পরখ করেছিল কাজল—না, জ্বর হয় নি। তবে? আর গায়ে ওর হাত ঠেকতেই বাবা চমকে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—সাপ! আরে, সাপ বুঝি কাজলী। দ্যাখ, দ্যাখ!...

...তখনো কেউ জানতো না বাবা অন্ধ হয়ে আসছেন। কিছুদিন ধরেই এটা অবশ্য টের পাওয়া গিয়েছিল মতিলাল চোখে কম দেখছেন। কিন্তু অতটা গা করে নি কেউ। কে-ই বা করবে—সংসারে বড় বলতে আর কেউ আছে কী! তিন বছর আগের কথা—কাজল বড়-সড় হলেও ফ্রকই পরতো। তা ছাড়া মতিলাল বাইরে-বাইরেই ব্যাপার-বেসাত নিয়ে কাটাতো। আগে-আগে বর্ডারের মাল পাচার করে মোটা আয় ছিল কিন্তু দুর্বল শরীরের অতো হাঁটাহাঁটি আর হয়রাণী সয় না—ছেড়ে দিয়ে ট্রেনে মাল ফিরি করে জোড়াতালি দিয়ে সংসার চলছিল।

...কাজল নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল তাই টের পায় নি বৃষ্টিটা থেমে গেছে! বৃষ্টি থামলেও ভাবনার ঝাপটা থামল না। চকচকে এমু-কোচের পালিশের সঙ্গে যাত্রী-দের পোশাক বা কথার কোনো মিল ছিল না। একজন কানে কানে আর একজনকে বলছিল—কিশোইরা মরছে! শ্যাষে ওই ভালোবাসায় ফেরিয়ালীর খপ্পরে পড়ল!' গায়ে মাখে নি কাজল। ওরকম কান-পাতলা হলে বেঁচে থাকা যায় না। বরং একটু বাড়াবাড়ি করল, কিশোরের হাত থেকে ছুরি আর পেঁয়াজ কেড়ে নিল। বিনা প্রতিবাদে ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে কিশোর প্যান্টের ট্যাঁক থেকে একটা কাগজের মোরক বার করে ছোট ভাইকে ধমকে দাঁড় করালো—ধর! এই সস্তর নয়া এক কে-জি পিঁয়াজ! ঠাকুরের দুকান থেইক্যা নিবি! আর বর দেইখ্যা নাইরক্যাল তর গিয়া—আঃ, মিশাইস ন!

...পেঁয়াজের খোসা বেশি ফেলা হয়ে যাচ্ছে, আড় চোখে লক্ষ্য করে মিষ্টি গলায় বলল—'অ রে আমার কপাল, বাকলা সব ফাললে কারবারের বুকে নি মাটি লাগব। রাখ্, অই কাজলী!' ...তাচ্ছিল্যভরে কুমার এমনই মাতব্বরী হাসি হাসল, দেখে কাজলের গা-জ্বলে গেল। চলতি ট্রেনে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ ছাড়ানো রীতিমত কঠিন কাজ, কাজল হাড়ে-হাড়ে মালুম পাচ্ছিল। তার উপর ময়না-পাড়ার পান-বিড়িওয়ালা ছিকান্ত, সহযাত্রীকে চাপা গলায় যা বলছিল সেদিকেও কান রাখতে হচ্ছে—অই মতি-ফেরিওলার বেটী! কিস্তিঅলার বাঁধা! বাপ ত চোখের মাথা খেয়েছে। মা মরে হাড় জুড়িয়েছে! বাপে ত চোখে দ্যাখে না,—উঠতি বয়েস, খুব খেলে নিচ্ছে!...কিশোর ওর হাত থেকে ছুরিটা টান দিল—দে!...কাজল ছাড়ল না। এদিকে ওর চোখে জল ছল-ছল করছে। পেঁয়াজসুদ্ধ হাতখানা দিয়ে কিশোরের কব্জি চেপে ধরল। কিশোর হাসল—গায়ের জোর বড় বেশি হইছে! আরে চখে জল, মুইছ্যা! উঁহু রও মাগ ওই হাত ঠ্যাকায়ো না, রস আছে!...কিশোরের ধারণা পেঁয়াজের ঝাঁঝ লেগে কাজলের চোখ জ্বালা করে জল গড়াচ্ছে। সন্তর্পণে পকেট থেকে পাট-কার একখানা রুমাল বার করে কাজলের গালটা আলতো-ভাবে তুলে ধরে রুমাল দিয়ে মুছোলো। কাজল বাধা দেয় নি, অস্বস্তি লেগেছিল, সুখকর সেই অস্বস্তির রেশ এখনো মুছে যায় নি। মনে পড়লেই গালের যেখানে টোল খায় সেই জায়গা দুটো কেমন শুড়শুড় করে।

গালে হাত বুলোতে বুলোতে কাজলের হঠাৎ মনে হল ট্রেনখানা আজ বড় বেশি লেট করছে। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের আলোটা বুঝি কোনো গূঢ় ধ্যানে তন্ময়, বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সবুজ হবার কথা ভুলে গেছে। আজ আবার অনিল গিয়েছে বনগাঁয়ে গম ভাঙাতে। ওখানে সস্তা পড়ে। বেচারী ফিরতে পারবে না। হাজার হোক, ছেলেমানুষ ত! মিলন আর বাবা এখন কোন্ ট্রেনে—কোন্ দিকে কে জানে। কাজলের কেমন সন্দেহ হল, সর্-র্-র্ শব্দ একটা কানে আসছে! না, রেল-লাইনে ত নয়, প্ল্যাটফর্মেই! আর খুব কাছে। শব্দটা হাওয়ার চেয়েও লঘু। সাপ! বুকের মধ্যে একটু ধড়ফড়ানি তোলপাড় উঠতে গিয়েছিল, প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে সেটা দাবিয়ে ফেলল। কাজল জানে এখন নড়াচড়া করলেই মনসার বাহন ভয় পেয়ে দংশন করবে। অথচ তুমি যদি পাথরের মতো শক্ত, কিম্বা জলের মতো তরল হয়ে পড়তে পারো, তাহলে বিপদ নেই। ঠিক সুন্দর-লালের প্রথম দিনের আক্রমণে এই রকম একটা মনোভাব দিয়ে কাজল নিজেকে সামলে রেখেছিল। কাজলের সাপকে ভয় নেই, ভয় ওর নিজেকে। কোন্‌দিন বেসামাল হয়ে সুন্দরলালকে বিগড়ে দেবে আর তখন কিস্তিওয়ালা গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে পথে বার করে দেবে—অন্ধ মতিলাল আর নাবালক দুটো ভাইকে নিয়ে তখন দাঁড়াবার ঠাঁই জোটাতে পারবে না কাজল। সাপটা ওর পা বেয়ে উঠল না, ছোবল দিল না, এমনকি থমকে দাঁড়ালও না,—পায়ের পাতার ওপর দিয়ে কালো বিদ্যুতের মতো পলকের চেয়েও কম সময়ে হিমস্পর্শের রেশ রেখে অন্ধকারে ডুবে গেল। খুব ঠান্ডা আর ভীষণ ভারি—কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, অত্যন্ত ক্ষণ-স্থায়ী একটা দড়ির ঝাপটের মতো ওই মারাত্মক জীবটির গতি। কাজল স্থাণুর মতো স্তব্ধ, নিশ্চল! শাণিত তরোয়ালের খোঁচা কেমন জানে না কাজল, নইলে এরপর কোনো নিভৃত, নিবিড় লগ্নে কিশোরের কাছে বলত—'এমনই যমের অরুচি যে, সাপেও কাটে না।' নিজের এই নিষ্কৃতি ওকে তেমন অবাক করল না, উল্লসিত করল না। শুধু নিশ্চিন্ত করল বাস্তু আর বুনো সাপের প্রকৃতি আলাদা নয়।

বলবে, এরকম অভিজ্ঞতার কথা এমনকি সুন্দরলালকেও শোনাবে। সব শুনে হয়ত সুন্দরলাল আফশোস করবে, বলবে—'অলীনটা যে হারামী আছে। নইলে কাজলী তোর ঘরই তো দিব্যি জ্যায়গা ছিল। ও শালা পুঁচকে বোমা মেরে দিতে পারে। ...তা পারে, অনিলের যা রাগ! অথচ পাড়ারাই বলো, আর ট্রেনের প্যাসেঞ্জারই বলো—কেউ সুন্দরলালকে কিছু বলে না।

বলবে কী, টিকি কার বাঁধা নেই কিস্তি-ওয়ালাদের কাছে! অবিশ্যি লোকের সামনে তেমন বেচাল কিছু করে না সে—চোখ বাঁচিয়ে চলে। ওই একটু হাতটাত ধরা—!

বরং সেদিন কাজলই ওই ময়নাপাড়ার ছিকান্তর ওপর আক্রোশবশে কিশোরের চোখ-বোজানো শেষ হতে তার হাত ধরে মেলায়-কেনা আংটিটা পরিয়ে দিয়ে বলেছিল—বিলাতী মতে হ'ল। হি-হি—!

কিশোর আংটির দিকে তাকিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল—এইডা কল্লি কী, এই বাঁদরী!

মুকুন্দ হো-হো দিলখোলা হাসিতে কামরায় সবাইকে সজাগ এবং কৌতূহলী করে বলেছিল—দে, দে, কিশোইর্যা তর হাতের আঙুঠি পরাইয়্যা! আর ভাই চান্দা তুইল্যা পাকস্পর্শের মিষ্টান্ন ভোজ হবে।

ছিকান্ত এবার মুখের রশি ঢিলে করল—হালার ফেরিওয়ালার সংসার মিনিটে বৌ-পাল্টায়, বর-পাল্টায়।

কাজল আংটির দিকে মোহিত দৃষ্টি ফেলে রেখে আস্তে আস্তে বলেছিল—বড় সুন্দর মানিয়েছে। হাত থেকে খুলতে মানা, খুললেই কিন্তু তোমার কাজলী মরে যাবে।

কিশোরের অত ঘোর-প্যাচ নেই। সে শুধু বলল—সেই কিস্তিঅলা যদি দ্যাখে তার দেওয়া আংটি তুই আমায় পরিয়েছিস! সর্বনাশ!

—এ আমার ভালোবাসা। এ কারুর না। মাথা খাও, বিশ্বাস করো—

—বিশ্বাস?

কিশোরের বিস্মিত দৃষ্টিকে উৎকণ্ঠিত করে দিয়ে একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। সংসার ভাঙার পালা—আবার অন্য কামরায় ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সবাই শিকারের সন্ধানে। নামা-ওঠা, হাঁকা-হাঁকি, তাড়া-হুড়ো। কিন্তু কিশোরকে ছাড়েনি কাজল—বসো, বিকিকিনি ত রোজই আছে। অনেক কথা আছে।

কিশোর শুধু সময়ে দিয়েছিল—ভালো-বাসা-বাসি ভালো না। ওতে মন বড় তার হয়। তাছাড়া কিস্তিওয়ালা সুন্দরলাল যদি আজ জানতে পারে কাজল প্রেম করছে তাহলে বড় বিপদ হবে।

কেন? কিশোরকে দশ নয়াপয়সা দিয়ে একটা আংটি পরাবার অধিকার কি কাজলের নেই? সুন্দরলাল যা চায় তা পায় না? তবে? ভালোবাসা আলাদা জিনিস, পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।......

পয়সা দিয়ে যা কেনা যায়, পয়সা পেলে যা দেওয়া যায়—তারই লেনদেন চলছে। আর তার ওপরেই মতিলালের পরিবার টিকে আছে।

গাড়িখানা আসবেই। রোজ আসে। রোজ যা যা ঘটে তা-ই ঘটবে। অনেক রাতে কলকাতার দিক থেকে যে ট্রেনখানা জগৎ-পুরে এসে দাঁড়ায় আজও দাঁড়াবে। লাভের হিসেব আর শ্রান্ত দেহ নিয়ে অনেকগুলি প্রাণী নামবে।

কাজল লক্ষ্য করেছে কিশোরের হাতের আংটিটা কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। ও বলেছিল—ওটা পিতল ফেলে দিও। পয়সা হলে সোনার বানিয়ে দেবো।

কিশোর ধমকায়—ভারি কুটকুটানী। ভালোবাসায় কি পিতল, তামা, সোনা, আলাদা হয় নাকি।

কি সুন্দর কথাটা।

কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল কাজল। ভিজে জামাকাপড়ের ল্যাপটানো স্পর্শ মনে হল বড় সুখকর। যেন—

আলোটা হঠাৎ রং বদল করল। সবুজ হয়েছে।

কাজল নিজেকে প্রস্তুত করে। এমন জায়গায় দাঁড়াতে হবে যাতে, এমনভাবে গাড়িতে উঠতে হবে যাতে অনিলের সংগে মুখোমুখি হয়ে না পড়ে কাজল।

মাথা-জোড়া টাক, গায়ে হাত-কাটা মোটা একটা ফতুয়া, পরনের ময়লা, ছেঁড়া কাপড়খানা এমন যত্নসহকারে পরা হয়েছে যেন গরদ বেনারসী পট্টবস্ত্র। লোকটার হাত ধরে একটি বছর দশ এগারোর সুশ্রী বালক গাড়ির মধ্যে উঠল। বৃদ্ধ লোকটার হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটি একটু তফাতে দাঁড়াল। চাপা গলায় শুধু বলল—এডা ফার্স্ট ক্লাস।

ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ গলা ঝেড়ে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে শুরু করল—আপনাদের কাছে আমার নিবেদন—

বৃদ্ধ ছাতা দিয়ে নিশানা ঠিক করে নিয়ে এগোয়—আমি অন্ধ। জন্মান্ধ নই। ভাগ্যের দয়ায় আমার দৃষ্টি ভগবান ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঘরে তিনটি সন্তান। আমার বড় মা-জননীর জন্য একখানা শাড়ী কেনার বড়ই দরকার। আপনারাও সন্তানের পিতা। তাদের আহার জোগাবার জন্য আপনাদের মতো আমিও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ভগবানের দয়ায় কিছু কম করি নাই। কিন্তু আজ তিন বচ্ছর হয়—মাজননীর জন্যই ভাবনা। আপনাদের দয়ায় অন্ন তবু কষ্টে জুটছে। কিন্তু গিরস্থর দুহিতা ফরক্ পইরা মেমসাহেব— হায় কপাল। আপনাদের দয়ায় য্যান—

ছেলেটা প্রথমে চিনতে পারে নি। মাত্র দুটি যাত্রী ছাড়া গাড়িতে কেউ নেই। ছেলেটা সসংকোচে তফাতে থাকতে চায়, ভিখারীর সঙ্গী নয় যেন সে। গোটা ট্রেন-খানায় শুধু তার বাবার গলা ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

ছেলেটার কী মনে হল একটু এগিয়ে সামনে গিয়ে সন্দেহভঞ্জন করে হাসল। উৎসাহিত হয়ে সে কিছু বলবার আগে কাজল মুখের ওপর তর্জনী তুলে ইশারায় ভাইকে চুপ করতে বলল। সুন্দরলাল ভ্রূকুটি করে পকেটে হাত দিল।

ছেলেটা এবার বড় গলায় বলল—বাবা।

—কী।

—এইখানে কেউ জাগা নেই বাবা সবাই ঘুমায়া পড়ছে!

মতিলাল বক্তৃতায় ব্রেক কষে কপালের ঘাম মুছল। তারপর আপন মনে বলল—ফাস্ট ক্লাসে ক্যান্ যে ওঠা! হারামীর পুত বাবু হইছে। থার ক্লাসের বাচ্চা, থার ক্লাসে চল্!

গাড়ির গতিবেগ ক্রমেই বাড়তে থাকে। আকাশে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে কড়-কড় শব্দে সব কথা ঢেকে দিল।

দেশে বিদেশে

কামরাজের পুনরাবির্ভাব

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীকুমারস্বামী কামরাজের লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে আসার ঘটনাটি আজকের ভারতের রাজনীতিতে একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, যদিও ঐতিহ্যগতভাবে নাগেরকয়েল কংগ্রেসেরই আসন এবং যদিও ঐ নির্বাচন কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক নাডার ভোট শ্রীকামরাজের জয়ী হতে সাহায্য করেছে (শ্রীকামরাজ নিজে নাডার সম্প্রদায়ের মানুষ) তাহলেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক লক্ষাধিক ভোটে হারিয়ে ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট প্রার্থী সহ অন্য পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সকলেরই জমানত জব্দ করিয়ে দিয়ে শ্রীকামরাজ যে জয়লাভ করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষে ও তাঁর দলের পক্ষে একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মনে রাখতে হবে, গত সাধারণ নির্বাচনে শ্রীকামরাজ বিরুধুনগর কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে ডি এম কে দলের একজন অজ্ঞাত, অখ্যাত তরুণ ছাত্রের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। নাগেরকয়েল শ্রীকামরাজের নিজের নির্বাচন কেন্দ্র নয়, তিনি সেখানে বাসও করেন না। কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে শ্রীনিশামণি বরাবরই এই কেন্দ্র থেকে জিতে এসেছেন, সেকথা ঠিক। কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। অন্তত এতদিন তাই জানা ছিল। শ্রীনিশামণির মৃত্যুর পর কংগ্রেস যখন ঐ কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবার জন্য প্রার্থী খুঁজতে আরম্ভ করল তখন প্রথমে শ্রীসি সুব্রহ্মণ্যম এর পরে শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারিকে সেজন্য ঝাজিয়ে দেখা হয়েছিল। কিন্তু দুজনের কেউই সে ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। শেষ পর্যন্ত শ্রীকামরাজ নাগেরকয়েলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং কংগ্রেসের মান রাখলেন।

দ্বিতীয়ত, শ্রীকামরাজ জয়ী হলেন এমন এক সময়ে যখন মাদ্রাজে (এখন নাম বদলে "তামিলনাড়ু" হয়েছে) ডি এম কে দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভাষানীতির জন্য কংগ্রেস সেখানে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। গত দু বছরে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাড়াগাম দল মাদ্রাজের হিন্দী-বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসকে হেয় করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি। নাগেরকয়েল উপ-নির্বাচনের ঠিক আগে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ হিন্দী সংবাদ প্রচারের সময় পরিবর্তন করে একটা ঝামেলা বাধালেন এবং ঐ রাজ্যের ছাত্ররা আর এক দফা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাদের হিন্দী-বিরোধিতার পরিচয় দিলেন। ভাষার প্রশ্নে দক্ষিণ ভারতের এই স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে শ্রীকামরাজ অবহিত ছিলেন। সেইজন্য নাগেরকয়েলে তাঁর হয়ে নির্বাচনী প্রচারকার্যে নামবার জন্য তিনি কোন উত্তর ভারতীয় নেতাকে ডাকেন নি। কিন্তু এই স্পর্শকাতরতা সত্ত্বেও নাগেরকয়েল থেকে শ্রীকামরাজ ডি এম কে কর্তৃক সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাঃ মাথিয়াসকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। এই জয় কংগ্রেসকে তার ভাষানীতি সম্পর্কে আস্থা ফিরে পেতে সাহায্য করবে।

তৃতীয়ত, এই উপ-নির্বাচন উপলক্ষে দেখা গেল, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোট টিকল না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বলেছিল, ডি এম কে যদি নাগেরকয়েলে স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করায় তাহলে তারা সেখানে নিজেদের প্রার্থী দেবে। এই আপত্তির দরুন

গত ২০ জানুয়ারী নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ নিকসন কার্যভার গ্রহণ করেছেন। মিঃ নিকসন তাঁর মন্ত্রি-সভার শীর্ষস্থানীয় তিনজন মন্ত্রীসহ দাঁড়িয়ে আছেন। বাম দিক থেকে—মেলভিন বি লেয়ার্ড (প্রতিরক্ষা), মিঃ নিকসন, উইলিয়ম পি রোজার্স (পররাষ্ট্র) এবং ডেভিড এম কেনেডি (অর্থ)।

নাগেরকয়েলে ডি এম কে-সমর্থিত প্রার্থী ডাঃ মাথিয়াসকে স্বতন্ত্র দলের ছাপ না দিয়ে নির্দলীয় ছাপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীএম এম আলি ঐ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। অবশ্য ভোটের ফলাফল দেখে একথা বলা যায়, না যে, কংগ্রেস-বিরোধী ভোট ভাগ না হলে শ্রীকামরাজ হেরে যেতেন। দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর মোট ভোট সংখ্যার চেয়েও বেশী ভোট পেয়েছেন শ্রীকামরাজ।

চতুর্থত, শ্রীকামরাজের এই জয় প্রকৃত-পক্ষে কংগ্রেসের রাজনীতিতে ও নয়াদিল্লীর রাজনীতিতে তাকে পুনর্বাসন দেবে। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়ে থাকুন জওহরলাল নেহরু তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি করে দিল্লীতে নিয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিতান্তই অখ্যাত ছিলেন। কামরাজ প্ল্যানের জনক হিসাবে তিনি যে খ্যাতি লাভ করেন, সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হিসাবে, একজন শক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যে সুনাম অর্জন করেন সেটা চূড়ায় ওঠে যখন জওহরলালের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর তাঁর গৌরব অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনেক বিষয়ে বনিবনা হচ্ছিল না। কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ করে শ্রীকামরাজ যেদিন নয়াদিল্লীর আলোকিত রাজনীতির মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে যান সেদিন তিনি অনেকটা অবহেলা ও অবমাননার মধ্যেই সরে এসেছিলেন। আজ তাঁর লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে আসা মানে রাজধানীর রাজনীতিতে গৌরবময় প্রত্যাবর্তন।

পঞ্চমত, এই জয় শ্রীকামরাজের একার জয় নয়, "সিন্ডিকেট" নামে পরিচিত কংগ্রেস নেতৃগোষ্ঠীরও হাত শক্ত করবে এই জয়। সংবাদে প্রকাশ যে, এই উপ-নির্বাচনে দাঁড়াতে শ্রীকামরাজকে রাজী করাবার জন্য সিন্ডিকেটের অন্যতম স্তম্ভ শ্রীএস কে পাতিল তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, সিন্ডিকেটের আগ্রহেই শ্রীকামরাজ নাগেরকয়েলে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। সিন্ডিকেটের সদস্যরা জানেন যে, শ্রীকামরাজ লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে এলে নয়াদিল্লীতে তাঁদেরই হাত শক্ত হবে। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীএস কে পাতিলও লোকসভায় ফিরে আসতে পারেন, এমন সম্ভাবনা আছে। জর্জ ফার্নাণ্ডেজের নির্বাচনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে তিনি যে মামলা করছেন তাতে জিতে গেলে ত কথাই নেই। আর তা না হলেও গুজরাটের একটি লোকসভা কেন্দ্র শ্রীপাতিলের জন্য ঠিক হয়েই আছে।

শ্রীকামরাজের নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা এখন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন। একটি অভিমত এই যে, শ্রীকামরাজের এই জয় আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেসকে সাহায্য করবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাই বলেছেন, শ্রীকামরাজ নয়াদিল্লীতে গিয়ে তাঁর সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করবেন। তিনি তা করবেন কি করবেন না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু আরও অনেক প্রশ্ন উঠবে। শ্রীকামরাজের নেতৃত্বে সিন্ডিকেট কি এখনই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামবেন? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যে তিনটি আসন শূন্য রয়েছে সেগুলির কোনটিতে যাবার জন্য শ্রীকামরাজ কি চেষ্টা করবেন? অথবা বৃহত্তর কোন পুরস্কারের আশায় তিনি প্রতীক্ষা করবেন?

এই সব প্রশ্নের উত্তর কি হয় তার উপর ইন্দিরা মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, একটা তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে নাগেরকয়েল উপ-নির্বাচনের জের আরও বেশ কিছুদিন চলবে।

সোভিয়েতের মহাকাশযান সোয়ুজ-৫এর নভশ্চরত্রয় ঃ (বাম থেকে ডানে) কম্যান্ডার বরিস ভলিনভ, এ এলিসিভ এবং ইঞ্জিনীয়ার ও গবেষক খ্রুনভ।

সোয়ুজ ফিরে এসেছে

গত ১৪ জানুয়ারী সোভিয়েত ইউনিয়ন সোয়ুজ-৪ মহাকাশযান প্রেরণ করবার পর সোয়ুজ-৫ মহাকাশে পাঠায়। নভশ্চর ভ্লাডিমির শাটালভ চালিত সোয়ুজ-৪ পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হওয়ার ২৪ ঘন্টা পরে তিনজন নভশ্চরসহ সোয়ুজ-৫ আকাশে ওড়ে এবং পৃথিবীর কক্ষে প্রবেশ করার অত্যল্পকাল পরেই সোয়ুজ-৪-এর সঙ্গে বেতার সংযোগ স্থাপন করে। সোয়ুজ-৫ -উৎক্ষেপণের সময় পর্যন্ত কর্ণেল শাটালভ ১৫ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। সোয়ুজ-৫ মহাকাশযানের কমান্ডার ছিলেন কর্ণেল বোরিস ভলিনভ। অপর দুজন নভশ্চর হলেন ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার আলেক্সিস ইয়েলিসেয়েভ এবং রিসার্চ ইঞ্জিনীয়ার লেঃ কর্ণেল ইয়েভগেনি খ্রুনভ। মহাকাশ পরিক্রমার ক্ষেত্রে তিনজন নভশ্চরেরই এই হাতে-খড়ি।

১৬ জানুয়ারী মহাকাশযান দুটি এবং নভশ্চররা এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করেন। যান দুটি মিলিত হয়ে একত্রে ৪ ঘন্টা ৩৫ মিনিটকাল মহাকাশে ভ্রমণ করে। পরে যান দুটিকে আবার পৃথক করা হয়। মহামিলনের সময় সোয়ুজ-৫-এর নভশ্চর ইয়েভগেনি খ্রুনভ এবং আলেকসাই ইয়েলিসেয়েভ মহাকাশযানের জানালা দিয়ে বের হয়ে শূন্যে পদচারণা করেন এবং এক ঘন্টা পরে সোয়ুজ-৪-এ প্রবেশ করেন। মনে রাখা দরকার, তখন দুটি যানেরই গতিবেগ ছিল ঘন্টায় সাড়ে সতেরো হাজার মাইল। লেফটেনান্ট কর্ণেল বরিস ভলিনভ সোয়ুজ-৫-এ থেকে যান। মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক সোভিয়েত কর্মকাণ্ডের এই নাটকীয় প্রথম সাফল্য সোয়ুজ-৪-এর পরিচালক ব্লাডিমির শাটালভের নিঃসংগতার অবসান হয়।

এই মিলনের পর টাস মহাকাশযানদ্বয়কে পৃথিবীর প্রথম পরীক্ষামূলক মহাকাশ গবেষণাগার বলে বর্ণনা করেছেন। উড্ডীন অবস্থায় মনুষ্যচালিত দুটি মহাকাশযানের মিলনও মহাকাশ বিহারের ইতিহাসে এই প্রথম। দুটি যানের যখন মিলন ঘটে তখন সোয়ুজ-৪এর ৩৪ বার এবং সোয়ুজ-৫-এর ১৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয়েছিল। দুটি যানের পরস্পরের সান্নিধ্যে যাওয়া থেকে শুরু করে শেষ সংযুক্তি পর্যন্ত সমস্ত কাজ ৪৩ মিনিটে শেষ। ১৭ জানুয়ারী সোয়ুজ-৪ ভ্লাডিমির শাটালভ, ইয়েভগেনি খ্রুনভ এবং আলেকসাই ইয়েলিসেয়েভকে নিয়ে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় ধীরে ধীরে নিরাপদে অবতরণ করে।

১৮ জানুয়ারী সোয়ুজ—৫ নভশ্চর লেঃ কঃ বোরিস ভলিনভকে নিয়ে নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে।

পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ স্টেশনের কর্মী বদল কিংবা আপৎকালে কর্মীদের উদ্ধার ইত্যাদি কাজ কিভাবে করা হবে, তার পরীক্ষা হিসাবেই নভশ্চররা মহাকাশে পদচারণা করেন। নভশ্চররা যখন মহাকাশযানের বাইরে ছিলেন, তখন তাঁদের পরিধানে মহাকাশ বিহারের উপযোগী পোশাক ছিল। তাতে পুনরুদ্ধার ও জীবন রক্ষার উপযোগী স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও যুক্ত ছিল। খ্রুনভ এবং ইয়েলিসেয়েভ শূন্যে আলাদা আলাদাভাবে পদচারণা করেন। খ্রুনভ যখন পদচারণা করেন, তখন তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপরে এবং ইয়েলিসেয়েভ যখন পদচারণা করেন তখন তিনি ল্যাটিন আমেরিকার ওপরে ছিলেন। মিলনের পর মহাকাশ স্টেশনের কক্ষগুলির মধ্যে টেলিফোন সংযোগ স্থাপিত হয়। মহাকাশ স্টেশনে ক্রুদের জন্য চারটি কক্ষ ছিল। অনেকরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাবার জন্য এবং কাজের ও বিশ্রামে স্বাচ্ছন্দ্য দানের ব্যবস্থাও এতে রাখা হয়।

কিভাবে দুই যানের মিলন হল, টাস সে সম্বন্ধে বলেন, মস্কো সময় ১০টা ৩৭ মিনিটে (ভারতীয় সময় ১টা ৭ মিনিটে) স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সোয়ুজ—৪ এবং সোয়ুজ—৫ পরস্পর থেকে ১০০ মিটার দূরে উপস্থিত হয়। তখন ভ্লাডিমির শাটালফ এঞ্জিন চালিয়ে সোয়ুজ—৪ এবং সোয়ুজ—৫-এর 'ডকিং' (মিলন) ঘটান। 'ডকিং'-এর পর মহাকাশযান দুটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগও স্থাপিত হয়।

এইভাবে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষে ক্রুদের অবস্থানের জন্য চারটি কক্ষযুক্ত বিশ্বের প্রথম পরীক্ষামূলক মহাকাশ স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল।

সাদা চোখে

ম্যানিফেস্টো—গণদেবতার কাছে রাজনৈতিক দলগুলির একটি হুন্ডীয়ার, এই লিখিত প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দলীয় প্রার্থীরা তাঁদের জন্যে ভোট দেওয়ার দাবী জানান, আমজনতা না হলেও বিশেষ একটি অংশ ম্যানিফেস্টোর বিচার বিবেচনা করেন। অবশ্য এর উপর ভিত্তি করে ভোট প্রদত্ত হয় কি হয় না একথা এখনও প্রায় অজ্ঞাত। গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণে এবং জনসাধারণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করবার জন্য দলীয় কর্মসূচীর ভূমিকা অনেকখানি। তাই রেওয়াজ মত কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়—সভা-সমিতিতে নেতৃবর্গ এর উল্লেখও করেন। তবে যতটুকু জোরের সঙ্গে জনসমক্ষে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন তা অবশ্য এখনও হচ্ছে না। কারণ, জনতার মানসিক প্রস্তুতি এখনও এই পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনেও প্রত্যেক দল তাঁদের স্ব স্ব ম্যানিফেস্টো নিয়ে হাজির হয়েছেন, এবং ইতিমধ্যেই জনসাধারণ প্রাথমিকভাবে সমস্ত পার্টির কর্মসূচী সম্পর্কে অল্প বিস্তর অবহিতও হয়েছেন। কিন্তু মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে প্রায় সমস্ত কিছুই নির্গুণ। কোন দলীয় কর্মসূচীকেই সগুণ বলে জোরের সঙ্গে আখ্যাত করা চলে না। কারণ, কোন দলই জোরের সঙ্গে তাঁদের ম্যানিফেস্টোতে সময়-ভিত্তিক কোন কর্মসূচীর উল্লেখ করেন নি।

অবশ্য এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধান করা যায় না। একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে আরও অনেক প্রশ্ন আছে যা সমাধান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই সফল করা যায়। সময়-ভিত্তিক কর্মসূচী থাকলে জনতা নির্দিষ্টভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে, এবং জবাবদিহি করাবার মত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারে। কাজেই, সময়-ভিত্তিক না হলে কর্মকাণ্ড অনুশীলনের লম্বা ফিরিস্তি নিরাকার প্রতিশ্রুতিই থেকে যায়—সগুণ এবং সাকার হয় না।

আবার কর্মসূচীর মধ্যে প্রত্যেক দলের আদর্শের প্রতিফলনও থাকতে বাধ্য। কারণ, এমন কোন কর্মকাণ্ড কোন দলই অনুসরণ করতে পারে না, যার ফলে অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, কিম্বা আদর্শকে বিপথগামী করতে পারে। কাজেই কর্মসূচী প্রণয়নের সময় প্রত্যেক দলকেই খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে সেটা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন না হয়, অথচ দলীয় আদর্শের বিরুদ্ধভাবও তাতে প্রতিফলিত না হয়।

এই কষ্টিপাথরে বিচার করলে শুধু আদর্শ থেকে বিচ্যুতির প্রশ্নে প্রত্যেক দলই তাঁদের ম্যানিফেস্টোতে সজাগ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কি কংগ্রেস, কি যুক্তফ্রন্ট কেউই সময়-ভিত্তিক কর্মসূচীর নির্দিষ্ট উল্লেখ করেন নি। অন্যান্য দল যাঁরা নির্বাচনীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের কথা উল্লেখ করার অবকাশ অত্যন্ত কম। কারণ কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রার্থীও দাঁড় করান নি, ক্ষমতাও রাখেন না। কাজেই, যে দল এককভাবে ক্ষমতা দখলের শক্তি রাখে না তাঁদের পূর্ণাবয়ব কর্মসূচীর প্রণয়ন সেইদিক থেকে বেমানান বলেই মনে হবে। কিন্তু তবুও দল কি চায়, বা কি কর্মযজ্ঞের অনুশীলন করলে আমজনতার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হতে পারে, সেই সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজন আছে।

একটি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়। সেটা হচ্ছে, যদি কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে তবে কোয়ালিশন সরকারও গঠিত হয়। তখনই কোয়ালিশনের অংশীদারদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময়ের প্রশ্ন অত্যন্ত নির্মমভাবে দেখা দেয়। এবং কর্মসূচীতে ঐক্য না আসতে পারলে কোয়ালিশন গঠন সম্ভব হয় না, হলেও আখেরে তা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। অবশ্য, ব্যক্তিত্বের ঝগড়াও অধুনা একটি বিশেষ কারণ হয়ে উঠেছে।

ইংরেজীতে যাকে প্রায়রিটি বলে সেই অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্নও কর্মসূচীর আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই প্রশ্ন সঠিকভাবে খুবই কম কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছে। গণদেবতা যতই বেশী সংখ্যক হারে শিক্ষিত হতে থাকবে ততই এই সব প্রশ্নের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাবে।

বিভিন্ন দলের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে কংগ্রেস এখনও রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দল, তাঁরা সাধারণত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের কি কি উন্নতি সাধন করতে পেরেছেন তার একটি তালিকা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থেকে সুরু করে প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন দেশের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনের একটি তুলনামূলক চিত্র আঁকবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটু ভিন্ন সুর ধ্বনিত করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে গত বিশ বছরে দেশের সমষ্টিগত উন্নয়নে যা করা সম্ভব কংগ্রেস তাই করেছে, অন্য কোন দল ক্ষমতায় থাকলে এতটুকুও করা সম্ভব হত না।

কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্ল সেন ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই নির্বাচনী লড়াইকে আরও একটু মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা বলছেন এই লড়াই নীতির লড়াই। অর্থাৎ কংগ্রেস যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশের উন্নয়ন যজ্ঞে ব্রতী হয়েছে সেই পথে দেশ চলবে না হিংসাত্মক উপায়ে গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ করে দেশে একটি শ্রেণী বিশেষের রাজত্ব কায়েম হবে? জনতা কোন পথ বেছে নেবে আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচন তার পথ দেখিয়ে দেবে।

ম্যানিফেস্টোর আর একটি অংশ থাকে, সেটা হচ্ছে ভূমিকা। এই ভূমিকায় সংযোজিত হয় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি দেশের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কি কর্মসূচী প্রণয়ন করা দরকার তার ইঙ্গিত। কাজেই ভূমিকা বা মুখবন্ধ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিসাব-নিকাশ বা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে। কাজেই প্রত্যেক দলই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্য যে সমস্ত কারণগুলি সমাজ বিন্যাসের বা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ভূমিকায় নিয়োজিত আছে তার যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করে। অধিকন্তু, মূল লক্ষ্য বা স্বীয় আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমস্ত তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

কংগ্রেস অধুনা গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সমাজের স্তর বিন্যাস করে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সচেষ্ট। আদর্শ হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের রূপরেখা কি তা তখনও সঠিকভাবে পরিস্ফুট নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যখন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম হয় তখনই ভারতবর্ষের সমাজবাদী চিন্তানায়করা—যথা আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, মিনু মাসানী, ইউসুফ মেহের আলী ও অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ—ইউরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেসির আদর্শে-

তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারে এই নতুন আদর্শের একটি সঠিক রূপ দেবার জন্য কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসবাদ লেনিনবাদের কৌশল শ্রেণীসংগ্রামকে গ্রহণ করে এবং গান্ধীবাদের কিছু কিছু বক্তব্য ও সিম্ধান্তকে সংযোজন করে এই নতুন আদর্শবাদের রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা। যদিও একটি সঠিক ও সার্বিক চিত্র তখনও অঙ্কিত হয়নি, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ক্রমশই একটি রূপরেখা স্পষ্ট আকার ধারণ করছে। এই আদর্শবাদের রূপায়ণে যে অর্থনীতির উপর সমাজবাদীরা জোর দেন, কংগ্রেসের বক্তব্যের মধ্যে তার কিন্তু হদিস পাওয়া যায় না। কংগ্রেস যে অর্থনীতি অনুসরণ করছে তাকে মিশ্র অর্থনীতিই বলা যায়।

এই অর্থনীতি অনুসরণের কারণ হচ্ছে কংগ্রেস মনে করে, ক্রমপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিপোষকদের সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পৃষ্ঠপোষক করে তোলা যাবে, এবং আখেরে সমাজ বিবর্তনের প্রশ্নে হানাহানি বা রক্তপাত হবে না। অধিকন্তু, দেশের মধ্যে এখনও সমাজবাদী মানসিকতা প্রস্তুত হয় নি, কাজেই আমূল পরিবর্তনের ধকল দেশ সামলাতে পারবে না।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাই তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে অহিংস উপায়ের উপর জোর দিচ্ছেন, এবং তাঁদের নেতৃত্বে অনুসৃত নীতি ও কার্যকর কর্মসূচীর সাফল্যের কথা উল্লেখ করছেন। এবং তাঁরা বলছেন, যে নীতি তাঁরা অনুসরণ করছেন তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পন্থা। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টকে তাঁরা হিংসাত্মক উপায় অবলম্বনের জন্য দাবী করেছেন। তাঁরা বলছেন ফ্রন্টের বেশীরভাগ দল যে আদর্শের পরিপোষক তা কখনও হিংসা পরিহার করতে পারবে না। অতীতে এজন্যে রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল এবং ক্ষমতায় আসলে ভবিষ্যতেও তা ঘটবে।

রাজনীতির ছাত্র হিসাবে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, যুক্তফ্রন্ট তার ম্যানিফেস্টোতে কোন বিপ্লবী কর্মসূচীই গ্রহণ করেন নি। বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁরা জনতাকে কথঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র। কম্যুনিস্ট অধ্যুষিত ফ্রন্ট যে কর্ম তালিকা পেশ করেছে তাতে কম্যুনিস্টদেরই বলতে গেলে পরাজয় ঘটেছে।

সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির পরিপন্থী কোনো অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই বুনিয়াদী পরিবর্তনের কথা রাজ্য নির্বাচনের পটভূমিকায় জনতার কাছে প্রতিশ্রুতি হিসাবে দেওয়া যায় না। সেইজন্যেই যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা পেলে কিছু কিছু দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকী দিয়েছেন। গতবার ফ্রন্ট সরকার মাত্র ১৮-দফা দাবী সম্বলিত সরকারী কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন ক্ষমতায় আসার পর। এবারে আগে থেকেই ৩২-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। তাতে অগ্রাধিকার প্রশ্ন আছে বটে কিন্তু সময়-ভিত্তিক কোন কর্মসূচীর উল্লেখ নেই। যে যুক্তফ্রন্টকে শ্রেণীসংগ্রামের সংগঠক হিসাবে চিত্রিত করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেহাদ ঘোষণা করেছেন সেই যুক্তফ্রন্টই কলকাতার জমিদারী উচ্ছেদের কথা ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ করতে সাহস করে নি। আবার গ্রামাঞ্চলে যাদের উপর লেভী ধার্যের কথা ঘোষণা করেছেন, সেই চাষীরা অতি বৃহৎ না হলেও বেশ বৃহৎরাই তার আওতার মধ্যে পড়েছেন মাত্র, কাজেই খাদ্য সংগ্রহের নীতির ক্ষেত্রেও সম্পন্ন অবস্থার একটি বিশেষ স্তরকেই আঘাতের কথা বলেছেন, অর্থাৎ ভোট আদায়ের জন্য অনেককেই ছাড়-পত্র মঞ্জুর করেছেন। যে কোন দিক থেকে বিচার করা হোক না কেন, যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীকে একটি সমাজবাদী দলিল বলে উল্লেখ করা চলে না, এই কর্মসূচী বিভিন্ন দলের সমঝোতার একটি স্মারক মাত্র। আদর্শের জন্য মরীয়া হয়ে ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টির অপচেষ্টা কোন দলই করেন নি, বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে প্রত্যেকেই পা বাড়াবার চেষ্টা করেছেন।

কাজেই, কংগ্রেসের আক্রমণের মূল লক্ষ্যস্থল যা হওয়া উচিত তা হচ্ছে না বলেই মনে হয়। কংগ্রেস অবলীলাক্রমে ফ্রন্টের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে ফ্রন্টও যে সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ গঠনে যথপরিকর নয় তা জনসমক্ষে প্রমাণ করতে পারতেন। হয়ত কংগ্রেসীরা মনে করছেন ফ্রন্ট যে কর্মপন্থাই গ্রহণ করুন না কেন জনতা তাকে একটি সাময়িক কৌশল হিসাবেই গ্রহণ করবে। তাঁদের মূল আদর্শে উপনীত হওয়ার মত ও পথ ঠিকই আছে। অবশ্য এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ দলীয় লক্ষ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালে সেটা অবশ্য আরও রাজনৈতিক বলেই মনে হবে।

যা হোক, পশ্চিমবাংলার নির্বাচনী লড়াইয়ের দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর কর্মসূচীতে মূলগত পার্থক্য খুবই কম। যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে তা অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্নে, আর ব্যবহারিক প্রশ্নে। এই ব্যবহারিক প্রশ্ন বা সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কি উপায়ে রূপায়ণের পথে অগ্রসর হবে সেইখানেই কংগ্রেস ও ফ্রন্টের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য ও ভিন্নমুখী চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারী শাসনযন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য শুধু কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল হতে রাজী নয়। গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং তার চাপের মাধ্যমে যে স্পন্দের সৃষ্টি হবে সেই অবস্থার প্রতিই বিশেষ আস্থাবান। ফ্রন্ট মনে করে সবল জনমত রাজরথকে ঠিক পথে এগিয়ে যেতে সব সময়েই সাহায্য করবে। অন্যদিকে কংগ্রেস শাসনযন্ত্রের পূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মসূচীর রূপায়ণের পক্ষপাতী। এই ক্ষেত্রে গণ-আন্দোলনের ব্যবহারিক দিকের মূল্যায়ন যুক্তফ্রন্ট যেভাবে করছে, কংগ্রেস সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে রাজী নয়। কংগ্রেস মনে করেন, তাতে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হবে। এইখানেই ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মূল তফাৎ।

এবারের নির্বাচনী আসরে সরকারে থাকাকালীন দলগুলির ব্যালান্সশীট নিয়ে প্রত্যেকেই আলোচনা করছেন, ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার দিকে ঝোঁক এবারে নাই বললেই চলে। এটা একটি শুভ লক্ষণ। কারণ, গণতন্ত্র এতে শক্তিশালী হবে এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি লোক আস্থাশীল হয়ে উঠবে।

চীনামাটির পুতুল

[জন পীটারস একজন [illegible]। মিঃ পীটারস লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সদস্য, হিস্ট্রি অব আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ [illegible] আছে। এছাড়া তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বৃত্তি লাভ করেন। মিঃ পীটারস নাটক, প্রহসন এবং ছোটদের গল্প লিখেছেন, রহস্য গল্প তিনি একটি লিখেছেন এবং সেই গল্পটির নাম চীনামাটির পুতুল।]

পার্শেলটা ভিজে ব্রাউন পেপারে মোড়া তার ওপর বেশ মোটা দড়ি বাঁধা—এই তার বাহ্য আকৃতি।

আশ্চর্য! টুকরো-টুকরো না হয়ে একেবারে এমন অবস্থায় এই বাড়িতে এসে মালটা পৌঁছালো। এনড্রু আইমেসের হাতে বস্তুত অক্ষত অবস্থায় পড়ল আর আইমেস তৎক্ষণাৎ তার তরুণী স্ত্রী এমিলির কাছে ছুটে গেল।

—জন পীটারস

রান্নাঘরে উনানে একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলছিল আর ঠিক তার সামনে এর্মিলি একটি সেটিতে বসেছিল।

স্বামী ঘরে ঢুকতেই এর্মিলি কৌতূহল-ভরে প্রশ্ন করে—কে এল এত রাতে এনড্রু?

—পোস্ট পিওন। একটা পার্শেল হাতে দ্বারে হাজির। অন্ততঃ সে ত' বলল পার্শেলটা নিন।

—এত রাতে পার্শেল? কোথা থেকে এল? কে পাঠিয়েছে?

—মোড়কের কাগজটা এমনই ভিজে গেছে যে পোস্ট মার্ক দেখতে পারছি না। সত্যি এ একেবারে অদ্ভুত কান্ড। আজকাল যা হচ্ছে সব।

এই কথা বলে এনড্রু ভিজে প্যাকেটটা নিরীক্ষণ করতে থাকে।

—কি লেখা আছে?

—কি জানি, লাল কালিতে কয়েকটা সংখ্যা লেখা। এক, সাত, ছয়-আট-না বোধ হয় নয়। নয় হতেও পারে। ঠিকানার ওপর এই সব লেখা কেন বলো ত?

—হয়ত সর্টিং অফিস থেকে লিখেছে।

—কিন্তু তারাই বা লিখবে কেন?

—তুমি ঠিক জানো যে লোকটা এসেছিল সে পোস্টম্যান?

এই বলে এর্মিলি অগ্নিকুণ্ডের সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল—জানো, এগারোটা বেজে গেছে।

—না, না, লোকটা যে পোস্টম্যান তাতে আর ভুল নেই। আমি ওর চলা দেখে এক মাইল দূরে থেকেও চিনতে পারব।

—লোকটার মুখটা দেখেছিলে?

—না, বারান্দায় বড় অন্ধকার, তবে লোকটা পোস্টম্যান, এ আমি শপথ করতে পারি। তার চেয়ে বরং প্যাকেটটা খোলাই যাক, ভিতরে চিঠিপত্র থাকতে পারে।

ভিজা মোড়ক এবং পার্শেলের ওপরকার দড়িটা তখনই ছিঁড়ে ফেলা হল, ভিতরকার মাল বেরিয়ে পড়ল। একটা চীনা মাটির খেলনা, ভিতরে কোনো চিঠিপত্র নেই, কে পাঠিয়েছে তার নিশানা নেই। চীনা মাটির সুন্দর কাজ, হয়ত দু শ' বছরের প্রাচীন বস্তু। দুটি নর-নারী নিয়ে পুতুলটা গড়া হয়েছে, তাদের অঙ্গে অতি উজ্জ্বল পোষাক। পুরুষটির মাথায় কালো টুপি, গায়ে কোট, তার হাতের কাছে ঝালর বসানো, তার ওপর একটি জারকিন চাপানো, সেই জারকিনে চমৎকার ফুলের কাজ করা। পাতলা ধরনের মোজায় জড়ানো পা, আর সেই পায়ে ফুলদার বগলস আঁটা কালো জুতো।

রমণীর পোষাকটিও পুরুষের পোষাকের চমৎকার অলংকরণের সঙ্গে তাল রেখে তৈরী। তার পোষাকটা নাচের গাউনের মত কাঁধের কাছ পর্যন্ত কাটা এবং কোমর পর্যন্ত এসে পড়েছে, স্কার্টের প্যাটার্নটা দেখানোর জনাই ওপরের অংশটা ছোটো করা হয়েছে। পুতুলটাকে শিল্প-সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শিল্পী তিনটি ছোট ধাপ করেছেন পায়ের তলায়, তার ওপর পুতুল দুটিকে সাজিয়েছেন।

পুরুষটির হাতে একটা ব্যাঞ্জো জাতীয় বাদ্যযন্ত্র আর মেয়েটির হাতে এক গুচ্ছ ফুল। এই অলংকরণই যেন যথেষ্ট নয়, তাই পুরুষের মাথার চারপাশে অজস্র ফুল আর পাতা ছড়ানো। উজ্জ্বল আলোকে পড়ে চীনা মাটির পুতুলটা যেন আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কাপড়ের প্রতিটি ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুটি মূর্তির বহিরেখা সুন্দর ফুটেছে।

এর্মিলি কি ভেবে বলল—ভারী চমৎকার উপহার! কিন্তু কোনখানটায় রাখা যায় বলো ত! আমাদের এমন কোনো কিছু নেই যার সঙ্গে পুতুলটা সাজালে মানায়।

তাহলে ম্যানটেলপীসের ওপর রাখো।

অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার তাকে রাখা বিভিন্ন বস্তুগুলি লক্ষ্য করে এর্মিলি। দুটি ক্রোমিয়ম ফটো ফ্রেম, একটি ত্রিভুজাকৃতি ঘাড়, কাঠের অ্যাসট্রে, একটা স্বয়ংক্রিয় সিগারেট লাইটার, একটা ছোট্ট চিঠিপত্র রাখার র‍্যাক। না—এই ম্যানটেলপীসে একটা প্রাচীন চীনা মাটির পুতুল রাখা যায় না, মোটেই মানাবে না।

অবশেষে এমিলি বলল—আমি না হয় পছন্দের বাড়তি কাটায় এটা রাখি।

এনড্রু পুতুলটা উঠিয়ে নিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে থাকে। সহসা সে বলে ওঠে—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য! ভারী আশ্চর্য ব্যাপার।

—আশ্চর্যটা কি আবার? কি হোলো গো?—এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে এমিলি জানতে চায়।

—যে কারিগর এটা গড়েছে তাদের চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। দেখছ কি ব্যাপার?

এমিলি কাছে এসে ভালো করে দেখে।

—যেন দুটি শিং-এর মাঝখানে একটা বাঁকানো লেজ। তার মুখের কাছে তীর চিহ্ন আঁকা। তোমার কি মনে হয় এতে করে পুতুলটার দাম বেড়েছে?

—সম্ভবতঃ তাই। কয়েকজন মাত্র চীনা মাটি শিল্পী তাদের নিখুঁত শিল্পকর্মে এই জাতীয় চিহ্ন দেয়।

—কিন্তু স্ত্রীলোকটার কাঁধের কাছে আর একটা চিহ্ন আছে!

—সে আবার কি চিহ্ন?

—ঐ যে—একটা লাল দাগের মত।

এমিলি রমণীর সেই পেলব ঘাড়ের বাম পাশটা দেখিয়ে দেয়।

—এই লাল রঙটা কিন্তু অন্য সব লালের চেয়ে বিভিন্ন. এটা একেবারে রক্ত জবার মত লাল টকটকে।

—বোধহয় পোড় দেওয়ার সময় কিছু একটা গড়বড় হয়ে থাকবে, অমন হয়, আমি জানি।

—আহা! এমন জিনিষটায় এই একটু খুঁত রয়ে গেছে। গলার বাহারটা নষ্ট হয়ে গেল।

।। দুই ।।

এনড্রু একটা সাইড টেবলে পুতুলটা রাখল। সেই টেবলের ওপর অতি সূক্ষ্ম ধুলো পড়েছে. উনানের কাঠের আগুনের ধুলো সেই জায়গাটায় বেশ ঘন হয়ে উঠছে।

এনড্রু বলল—এটা এখানেই রাখা যাক, তারপর ঠিক করা যাবে কোথায় এটা সাজানো যাবে।

এই বলে এমিলির সামনে একটা আরাম কেদারায় বসে পড়ে পাইপ ধরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ দুজনের মুখে কথা নেই। সহসা মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে এনড্রু বলে—

কে এই জিনিষটা পাঠাতে পারে বলো ত'? আমি ত' ভেবেই পাই না।

—আমিও ত' ঠিক এই কথাটাই চিন্তা করছি।

—যাক গে, কিছু এসে যায় না। কাল সকালেই হয়ত কোনো চিঠি পাওয়া যাবে। তখন জানা যাবে।

—হাঁ, তা বটে। ভালো কথা, বইটা কতদূর পড়া হোল?

—প্রায় বারো আনা শেষ করেছি, বাকীটা আজ রাতেই শেষ করব। আশ্চর্য! ভেবে দেখো তুমি আর আমি দুজনে এই প্রাচীন গেটহাউসে একা। ভাবতে অবাক লাগে।

—এমন্ড্রু। একথা হঠাৎ বলছ যে? তোমার কী এই গেস্টহাউসটা ভালো লাগে না?

—ভালো লাগে নিশ্চয়ই। তবে সব ব্যাপারটাই মজার। আমরা এই বিরাট বাগানবাড়িতে একা-একা আছি, শহর থেকে, জনমানবের আবাস থেকে দূরে, সব জায়গা থেকেই দূরে।

—না-না, বেশী দূর নয়। কাছাকাছি গ্রামটা ত এক মাইলের মধ্যেই।

—আর তারপর যে বাড়ি, সেই বাড়ির দূরত্ব মাত্র সাড়ে ছ মাইল।

—আর কোথায় এমন সুন্দর বাড়ি বিনা-মূল্যে পাওয়া যেত বলো? জুলিয়া মাসি এই কাজটা খুব ভালোই করেছেন বলতে হয়।

—তা জানি, মাসি আমাদের দিয়েছেন বাড়িটা। আমি শুধু বলছি তুমি আর আমি দুজনে একা, ভাবতে কেমন মজা লাগে। একদম একা, কাছাকাছি কেউ কোথায় নেই।

—এনড্রু—তুমি কি আমার সংগে একা থাকতে চাও না?

—কি বোকা মেয়ে! তুমি বেশ ভালো করেই জানো, আমি কত ভালোবাসি তোমাকে নিয়ে এইভাবে থাকতে।

এই বলে এনড্রু আরাম-কেদারা থেকে উঠে পড়ে এমিলির কপালে একটা চুমা এঁকে দেয়। তারপর ওর পাশের সোটটার বসে পড়ে।

দুজনে মিলে অগ্নিকুণ্ডের আগুনের তেজ বৃদ্ধি হতে দেখে। এই ধরনের জন-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার জন্য দুজনেই খুশী। দেহ-মনের দিক থেকে এ এক পরম প্রশান্তি।

ঘরের এই উষ্ণ পরিবেশে মাথার এক-একটা অলস ভাবনা জাগে—একটা তন্দ্রার ঘোর আসে, যে অবস্থাকে নিদ্রা বলা যায় না আবার ঠিক জাগরণও নয়। একটা আচ্ছন্ন আবেশভরা মুহূর্ত।

এনড্রু এমিলিকে একটু কাছে টেনে নেয়। দুজনেরই চোখ খোলা, দুজনেই বেশ খুশীতে ভরপুর। উভয়ের সান্নিধ্যে উভয়েই প্রীত। সহসা এনড্রু উঠে পড়ে একরকম বিস্মৃত সদ্য প্রাপ্ত উপহারদ্রব্যটির কাছে এগিয়ে যায়।

—আরে! কি আশ্চর্য! পুতুলটার মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু আছে। আমি যতক্ষণ বসে ছিলাম দেখেছি ওর মুখটা আমার দিকে ছিল এখন অন্য রকম—

কথাগুলি শান্ত গলায় বলে—নিজেরই বিশ্বাস হয় না যেন।

এমিলি পুতুলটার দিকে তাকায়। বলে—এই দিকে তাকিয়ে ছিল? কিন্তু এখন যেন কোন সুদূরের দিকে চেয়ে আছে। কেমন যেন অদ্ভুত ব্যাপার! যেন কত দূরে, সূক্ষ্ম কুয়াশার আবরণে ঢাকা। এই রকম একটা ল্যান্ডস্কেপ পেনটিং দেখেছিলাম। আমিও দুটি মুখ দেখেছি মনে পড়ে, এখন আবার অন্যদিকে ফিরে আছে! কিন্তু অন্য রকম ত হতে পারে না—পারে কি?

—আমার ত ধারণা, তা হয় না? কিন্তু মূর্তির মুখ যে অন্যদিকে ছিল এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এনড্রু চিন্তিত ভঙ্গীতে কথাগুলি বলে সেই পুতুলটা বেশ করে লক্ষ্য করে, সোফায় বসেই সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আগুনের আওতা থেকে নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না! তবে মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে হল এমিলি যা বলেছে তাই ঠিক, পুতুলের মূর্তি দুটি যেন বিখ্যাত ল্যান্ডস্কেপের কুয়াশায় ঢাকা।

এনড্রু বলল—এ হল আলোর খেলা বুঝলে? আলো এদিক-ওদিক পড়ার জন্য অমন মনে হয় অনেক সময়!

এই কথা বলে হাতের বইটা মুড়ে রেখে এনড্রু ধীরে ধীরে বইটার ওপর বুড়ো আঙ্গুল ঠোকে।

এমিলি অগ্নিকুণ্ডে আর একটা কাঠ ঠেলে দেয়। বাইরে ঝড় উঠেছে, পাইন গাছের শন-শন আওয়াজ গেটহাউসের উত্তর দিক থেকে ভেসে আসে। রান্নাঘরের দরজার হাওয়ার ধাক্কা লেগে একটা জানলা খড়-খড় করে উঠল।

এমিলি বলল—দরজাটার পাশে পা-পোষটা লাগিয়ে দাও।

এনড্রু উঠে বিরাট ওক কাঠের দরজার নীচে পশমের পা-পোষটা চেপে দেয়। দরজাটা ভেজিয়ে আটকে দিয়ে এমিলির পাশটিতে এসে বসে পড়ে। ধীরে ধীরে ঘরের আলোর তেজ কমতে থাকে।

এমিলি বলল—ইলেকট্রিকটার গন্ডগোল হচ্ছে। এই ভালো, একেবারে নিভে যাক! জুলিয়া মাসি জেনারেটর না বসিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে বিদ্যুৎ নিলে পারতেন।

এনড্রুরও তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু সেই কথা সে বলেনি।

আর একবার সেই চীনা মাটির পুতুলের দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে এমিলির হাঁটুতে মৃদু আঘাত করে। যেদিকে দেখাচ্ছে এনড্রু সেদিকে তাকায় এমিলি। চীনা মাটির পুতুল ধীরে ধীরে নড়ছে। ঘুরছে। এমিলির সহসা মনে হল সে চীৎকার করে ওঠে। মুখের ভেতর রুমালটা গুঁজে দেয়—রুমালটা সজোরে কামড়ে ধরে। দুটি মূর্তি যখন অগ্নিকুণ্ডের

দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে এল তখন যেন একটু থমকে দাঁড়াল, আর বিদ্যুতের আলো যেন সেই মুহূর্তে আরও একটু হ্রাস পেল। একটু আগেও অন্যরকম ছিল।

এনড্রুর মনে এতটুকু কুসংস্কার নেই, সাড়ে ছ' ফুট লম্বা দীর্ঘদেহ মানুষটার মনে কোথাও এতটুকু ভয়-ডর নেই। এনড্রু আইমেস উঠে দাঁড়ানোর উদ্যোগ করে। সে সোজা হয়ে বসে থাকে। হাত থেকে বইটা ফেলে দিয়ে এনড্রু মূর্তির দিকে এগিয়ে যায়। মনে হল চীনা মাটির পুরুষ পুতুলটা তার হাতের বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে মূর্তির পদতলের তিনটি ধাপ অতিক্রম করে সাইড টেবলের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। এনড্রুর অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া—তার পেটের ভিতর নাড়ি যেন গুলিয়ে ওঠে। নিজের হাঁটুর কাছে হাত রেখে কাঁপতে থাকে এনড্রু আর এমিলি চীনা মাটির পুতুলটার দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

সে মৃদু গলায় বলে—এনড্রু, আমার ভয় করছে।

—একদম চুপ করে থাকো। একটুও নড়া-চড়া করো না।

।। তিন ।।

চীনা মাটির মানুষটা তার হাতের ব্যাঞ্জোটা বাজাতে সুরু করে, কোনো আওয়াজ নেই, তবু সেই চীনামাটির রমণী তার স্কার্টের বামদিকের প্রান্ত-দেশ কিঞ্চিৎ উঠিয়ে, মূর্তির সেই তিনটি ধাপ অতিক্রম করে টেবলের উপর এসে দাঁড়ালো।

ম্যানটেলপীসের ওপরকার ঘড়িটা সমস্ত নৈঃশব্দ্য ভেদ করে টিক-টিক করছে। মিনিটের পর মিনিট এনড্রু আর এমিলি সেইভাবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে চীনা মাটির পুতুলের মত। তারপর এনড্রু বোধহয় আর বেশীক্ষণ অমন দম আটকে থাকতে না পেরে হেসে উঠল, দীর্ঘশ্বাস-ভরা হাসি। এ জাতীয় হাসির সঙ্গে এমিলি পরিচিত নয়। তারপর একেবারে অবিশ্বাস্য ভঙ্গীতে টেবলের পাশে তাকিয়ে থাকে। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না দৃষ্টিভ্রম।

কোনোরকম সতর্কবাণী না জানিয়ে চীনা মাটির রমণী তার হাতের পুষ্প-

স্তবকটা পুরুষটার দিকে এগিয়ে দেয়—গোলাকার মুখে একটা ভুবন ভোলানো হাসি। স্কার্টের প্রান্তদেশ আরো একটু ওঠায়. সুঠাম হাঁটুর অংশ মাত্র দেখা যায়।

এটা হল ইঙ্গিত, এই ইঙ্গিতটুকু শেষ হতেই. ব্যাঞ্জোবাদক এই মনোহরার দিকে এগিয়ে যায়, একেবারে তার কাছে গিয়ে তার বগলের নীচে নিজের একটি হাত গলিয়ে দেয়। তারপর তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে—মেয়েটি মুখ টিপে হাসে। পুরুষটিও হাসে। তারপর দুজনে পুতুলের ভঙ্গীতেই ঘুরে-ফিরে নৃত্য সুরু করে। ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে সেই ভঙ্গীতে দুজনে ঘুরে চলে। যখন থামছে, তখন মেয়েটি পুরুষটিকে চুম্বন করার আমন্ত্রণ জানায়। পুরুষটি অবনত হয়ে পড়ে মুখের ওপর—তারপর তার ঈষৎ ফাঁক করা ঠোঁটে চুমা খায়। ঠিক এই সময় দুজনের মধ্যে কৃত্রিম আড়াল রচনা করার জন্য পুষ্পস্তবকটা মুখের কাছে ধরে মেয়েটি।

এনড্রু বলে ওঠে—ঢঙ। কথাটি যে সে উচ্চারণ করেছে তা বুঝতে পারে না। মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে কথাটি।

এমিলি যেন সম্মোহিতের মত চুপ করে বসে আছে।

মেয়েটি এতক্ষণে পিছন ফিরেছে, বাধা পেয়ে ব্যাঞ্জোবাদক তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে, আর মেয়েটি পিছন ফিরে ফুলের তোড়াটি উঠিয়ে যেন পালাবার ভঙ্গী করে। পুরুষটি মেয়েটির বাঁ হাত ধরে ফেলে, তারপর মৃদুগতিতে সেটি ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে। মেয়েটি অতি দ্রুততালে হাতটি সরিয়ে নিয়ে পুরুষের মুখে ফুলের তোড়া দিয়ে আঘাত করে।

এর পূর্বে মুহূর্তের নৃত্যটুকুর মধ্যে যে মাধুর্য ছিল তা এই আঘাতে যেন চূর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে পুরুষটি তিনটি ধাপ ওপরে উঠে যায়, তারপর হাতের বাদ্য-যন্ত্রটা বাজাতে সুরু করে—

অশ্রুত সংগীত নিশ্চয়ই ধ্বনিত হয়েছে, কারণ মেয়েটি তালে তালে নৃত্য সুরু করে। ব্যাঞ্জোবাদকের হাতের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়, নাচের গতিও দ্রুততর হয়ে ওঠে। ঘুরে ঘুরে সেই অপরূপ নৃত্যের লীলা চলে।

এই গতি-বিভঙ্গের মধ্যে এমন একটা সম্মোহক মাদকতা ছিল যে, দুজনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত বসে রইল। গানের সুর নিশ্চয়ই তীব্রতর হয়ে উঠছে কেন না নাচের গতিবেগ বাড়ছে। মেয়েটির দেহের গতি এমন হয়ে উঠেছে যেন সে আর পারছে না, কিন্তু নৃত্যের গতিবেগ এমনই মোহ এনেছে যে থামতেও পারছে না।

।। চার ।।

এরপর যা ঘটে গেল তা এমনই দ্রুত আর আকস্মিক যে এমিলি এবং এনড্রু নেহাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তাই, নইলে দেখতে পেত না কিছুই। ব্যাঞ্জো-বাদক সহসা তার বুকের কাছ থেকে একটি ছুরি বার করে নিয়ে সহসা মেয়েটির গলায় বসিয়ে দিল। মেয়েটির মাথা নত হল, দুটি সুন্দর হাত ওপর দিকে তুলে দিয়ে তার অচৈতন্য দেহটা ব্যাঞ্জোবাদকের পায়ের নীচে গড়িয়ে পড়ল।

এমিলির ঠোঁট থেকে একটা আতংকের ধ্বনি বেরিয়ে গেল। ইলেকট্রিক বালবটা যেন সহসা ফিউজ হয়ে গেল—এনড্রু তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে এমিলিকে জড়িয়ে ধরে। এমিলি পড়ে গেছে সেটির ওপর, তার সুদীর্ঘ কেশপাশের একটা প্রান্ত প্রায় অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ করে আর কি। এমিলিকে তুলতে গিয়ে দেখা গেল তার হাত দুটি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—এনড্রুর কপালে স্বেদ-বিন্দু। এমিলির এই ক্লেশ দেখে যে দৃশ্য এই মাত্র দেখেছে তা সে যেন ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেল। মন থেকে মুছে গেল।

নিজের হাত দিয়ে এমিলির সেই হিম-শীতল হাত ঘষে ঘষে একটু উত্তাপ জাগালো। তারপর তার শুভ্র গালে সোহাগের স্পর্শ এঁকে দেয়—কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

প্রাণপণে সেটিটা ঠেলে জানালার দিকে নিয়ে গেল এনড্রু। তারপর জানালাটা হাট করে খুলে দিল। পাইন গাছের ভিতর দিয়ে ভেসে আসা শীতল বাতাসে কাজ হল, এমিলির চেতনা ফিরে এল। সে এখন অবিশ্বাস্য ভঙ্গীতে কাঁপছে, কিছুতেই সেই কম্পন থামানো যায় না। এনড্রু জানালা বন্ধ করে দিয়ে সেটিটা অগ্নিকুণ্ডের কাছে আবার টেনে আনে।

জানালার কাছে এক বোতল রাম রাখা ছিল, এনড্রু একটা গ্লাসে রাম ঢেলে পান করে আর একটি গ্লাসে কিছু মদ ঢেলে নিয়ে এমিলিকে পান করায়।

এনড্রু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরের টেবল ল্যাম্পের বালবটা খুলে এনে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে আগে ফিউজ হয়ে যাওয়া বালবটা খুলে ফেলে নতুন বালবটা লাগিয়ে নিল। ঘরটা সংগে সংগে আলোয় উদ্ভাসিত হল। এরপর দুজনে সাইড-টেবলের দিকে তাকাল। এনড্রুর লোভ হল পুতুলটা ছুঁয়ে দেখার—

এমিলি চেঁচিয়ে ওঠে—না-না ওটা ছুঁয়ো না এখন।

এনড্রু লোভ সংবরণ করে বলে—তা হলে বরং চলো শুতে যাই।

—তাই চলো বরং, এখানে বড় ঠাণ্ডা।

—চলো, তাহলে দরজাটা বন্ধ করে চলে যাই।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে, এনড্রু বেশ সতর্ক ভঙ্গীতে কিচেন রুমের দরজাটায় তালা লাগাল— তারপর শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

।। পাঁচ ।।

ঘুমটা ভালোই হয়েছিল। কোনো বিঘ্ন হয়নি। ঘুম ভেঙে উঠে দেখা গেল এমব্রস খুড়োর চিঠি এসে পড়ে রয়েছে দরজার গোড়ায় পা-পোষের কাছে। এমব্রস খুড়ো যেমনটি লিখে থাকতেন সেই রকম ছোট্ট চিঠি—এমিলি পড়তে থাকে—

'প্রিয় এমিলি ও এনড্রু,—

আমি একটা সামান্য উপহার পাঠালাম, আশাকরি তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকীর মধ্যে অক্ষত অবস্থায় পেয়ে যাবে। তোমরা জানো ত', আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, এই ধাতের সামগ্রী আর আমার কাছে রেখে লাভ কি। তাই তোমাদের দিলাম। এখন থেকেই দেওয়া ভালো। পরে উইল আর প্রোবেট নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হয়।

এই চীনা মাটির পুতুলের একটা আশ্চর্য ইতিহাস আছে। এই মূর্তি এক ওস্তাদ শিল্পীর তৈরী তবে লোকটা ছিল পিশাচ-সিদ্ধ। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের সময় সে মিড-ল্যান্ডসে থাকত। তার চীনামাটির কারখানা বা পটারি ছিল বিখ্যাত। এই পুতুলের নীচে সেই শিল্পীর অদ্ভুত চিহ্নও খোদিত। এটা সে এক রকম জোর করেই দিত।

এর বেশী আর জানা নেই। তবে শুনেছি লোকটা পাগলাটে ধরনের ছিল আর একটু শয়তান ছিল।

ওর নামই ছিল পিশাচ পটুয়া।'

এনড্রু কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলে, আর কিছু আছে নাকি?

—হাঁ, এই পুনশ্চটুকু শোনো—

আমি তোমাকে যে পুতুলটা পাঠালাম, এটা সম্ভবতঃ ওর শেষ কাজ, কারণ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ওর ফাঁসী হয়। একটি তরুণীর গলায় ছুরি বসিয়ে মেরে ফেলে। লোকে বলে মেয়েটি নাকি—পিশাচ পটুয়াকে তাচ্ছিল্য করেছিল। এই রকম কিংবদন্তী শোনা যায় আজো। যাক গে তোমরা ভালো থেক। আনন্দে থাকো, আমার আশীর্বাদ রইল।'

এমিলি চিঠিখানি রাখল আর এনড্রু কফির পেয়ালার শেষতম বিন্দুটুকু নিঃশেষিত করল। এতটুকু তিক্ততা সে অনুভব করছে না। এমিলির হাত ধরে সেই সাইড টেবলের কাছে নিয়ে গেল এনড্রু তারপর সেই চমৎকার চীনামাটির পুতুলটির দিকে তাকায়, ভারী সুন্দর, যেমন ব্যাঞ্জোবাদক তেমনই তার সহচরী।

টেবলের ওপর গত রজনীর সেই যে ধুলো জমেছিল তা অটুট রয়েছে।

এনড্রু বলল—দেখছ ত' ওরা মোটেই নড়েনি এক বিন্দু।

এমিলি বলল—না, নড়েনি। কি করে নড়তে পারে।

এনড্রু বলে—আমরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত ছিলাম, নয়ত কিঞ্চিৎ ভয় আমাদের মনে গড়ে উঠেছিল, নইলে চীনা মাটির পুতুল দেখে ভয় পাবো কেন।

এমিলি বলল—কিন্তু স্বপ্ন হোক আর মতিভ্রমই হোক পিশাচ পটুয়ার এই পুতুল আমি ঘরে রাখব না, ওটি আমি এখানকার লেকে বিসর্জন দিয়ে আসছি—

এই বলে এমিলি সেই চীনা মাটির পুতুলটি উঠিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল তখনই বিসর্জন দিতে।

—অজিতাভ মজুমদার অনূদিত

ভোলানাথ সত্যিই সার্থকনামা। ভোলার বয়স যখন বারো তখন পন্ডিতমশায়ের পরামর্শে হেডমাস্টারমশাই স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে বাবাজীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বাপ ঝণী উকিল পুত্রের নাম কাটানোর রহস্য উদ্ধার করতে গিয়ে লজ্জায় কান গরম করে বাড়ি ফিরে একটা আস্ত চেলা কাঠ ছেলের পিঠের উপর পিটিয়ে ফাটিয়ে ফেলেন। মা জননী পুত্রের উপর পিতার অমানুষিক অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করেন—

: তুমি কি ওকে মেরে ফেলবে?

ক্রুদ্ধ পিতা ক্ষেপে থামা অসহিষ্ণু উবলা জেকারের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—

: যে ছেলে এই বয়সে ক্লাসে বসে বিড়ি টানে তাকে মেরে ফেলাই উচিত।

ভোলা বারোর ঘরেছিল বিড়ি, অমজুলো ভেরোর মহেশ্বরের প্রসাদ বানানোর হাত পাকিয়ে ফেলে। কৈশোর পেরোবার আগেই বার্নার্ড শর্ম্মিলি ভাইয়ের দোকানে অ্যাকাউন্ট খুলে খলিফা বনে যায়। সাহা-মশাই খাতির করতেন কারণ গন্ডগোলের ভেজাল দেখলে পুলিশ ডাকার হাঙ্গামায় না গিয়ে মস্তান ভোলাকে খবর দিলেই কাজ হাসিল হত।

ভোলা তিনবার ম্যাট্রিক আর একবার স্কুল ফাইন্যাল দেয়। চতুর্থ কখনো পঞ্চম হয় নি কারণ—দুষ্টলোকে বলে বাপের নাকি ব্যাটার অত সুনাম সহ্য হয় নি। তাই রে বয়সে উকিলের পসার জমে সেখানে পৌঁছোনোর আগেই ঝণী উকিল এ পারের পাট চুকিয়ে বিদায় নেন। বাবা মারা যাওয়ার সংগে সংগে দাদারা বাক্স-প্যাটরা বগলদাবা করে সেই যে বাড়ি ছাড়লেন আর কখনো এমুখো হন নি। বিধবা মাকে নিয়ে সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে পাড়ার কাউন্সিলরের পায়ে ধরে এক পাঞ্জাবীর মোটর গ্যারেজে মেকানিকের অ্যাসিসটান্টের একটা কাজ জুটিয়ে নেয় ভোলা। বছরখানেকেই পাকা মিস্ত্রি।

ভোলা যে শুধু মোটর মেকানিক নয় ম্যাজিক জানে এ কথাটা পাড়ায় কারুর জানা ছিল না। পঞ্চ-মকারের সাধনায় সিদ্ধ ভোলা গুরুর সন্ধান পায় রামবাগানের স্ফূর্তির আসরে। হাত সাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে, বশীকরণ তাবিজ, কবচ, সিঁদুর বিক্রি করে ম্যা-লক্ষ্মী-দের পাড়ায় গুরুর তখন দারুণ পসার। এক বোতল পাকা মাল গুরুর পায়ে নিবেদন করে শিষ্যত্ব বরণ করে ভোলা রামবাগান, হাড়কাটাগলি, গোল্ডেন ট্রি পাড়ার বিখ্যাত জ্যোতিষী, ওস্তাদ খেলুড়ে ম্যাজিসিয়ান প্রফেসর সুশীল মুখুজ্যের। নাড়া বাঁধা যে অসার্থক হয় নি পাড়ার বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাত সাফাই-য়ের খেলা দেখিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে ভোলা প্রমাণ করল। মেকানিকের কাজের ফাঁকে ফাঁকে পাড়া বে-পাড়ায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেশ দুটো পয়সা আয় করছিল ভোলা। ফ্যাসাদে পড়ল কলবায় এক ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে খেল দেখাতে গিয়ে। নিজের ম্যাজিক সম্পর্কে পাঁচকাহন করে বলতে গিয়ে বলে ফেলেছিল যে তার কথায় পরলোকের মহাত্মারা উত্তর বলা করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের বিধবা খুড়শাশুড়ি বিশ্বাস করে বসেন ভোলাকে। ম্যাজিক দেখিয়ে যখন ফিরে আসছিল তখন সিঁড়ির গোড়ায় ভোলার হাত জড়িয়ে ধরে বুড়ি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলল—

: বাবা তুমি আমার মেয়েকে বাঁচাও। তুমি যা চাও তাই দেব।

ভোলা রীতিমত ভেবড়ে গেল। ব্যাপারটা কি, কিছু সে জানে না। ম্যাজিক দেখে বুড়ি কি বিশ্বাস করেছে কে জানে। তবু ম্যানেজ দেওয়ার জন্য গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল—

: কি হয়েছে আপনার মেয়ের?

প্রায় একঘন্টা ধরে সবিস্তারে মেয়ের ভূতে পাওয়ার কাহিনী শোনাল বুড়ি। উত্তর কলকাতার বড় রাস্তার উপর নিজের বাড়ি। তিন মেয়ে এক ছেলে। বড় দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এইটি ছোট। বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে পাঁচ বছর আগেই। বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কালো রং ও চাপা নাকের মেয়ের বর জোটানো দুঃসাধ্য। আর যার তার হাতে মেয়েকে দেওয়া যায় না। ঘর বর দুই সমান মত না হলে মেয়ে তাঁর দুঃখ পাবে। বিশেষ করে দিদিদের যখন ভাল বিয়ে হয়েছে। স্কুলের গন্ডী পেরুনোর পর থেকেই মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছেন। চেষ্টা করতে গিয়ে মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। মেয়ে ওঁর খুব শান্ত শিষ্ট। কিন্তু বছর খানেক

নতুন ঠগী

উপন্যাস

আগের ঘটনা

[কলকাতার যুবক বিকাশ চাকরি নিয়ে এল পাড়াগাঁয়। উঠল নিয়োগীপাড়ায়, পরিচিত শশাঙ্ক কাকার বাড়ি। এই নিয়োগীপাড়ায় এক সময় রমরমা ছিল বটে, কিন্তু আজ চারদিকে তার পোড়ো বাড়ির মেলা। শশাঙ্কবাবুর ভাষায়, এখন সব শ্মশান। কেমন রহস্যে ঘেরা মনে হল গোটা বাড়িটা। তার শশাঙ্কবাবুর মেজদার সেই চমকে দেওয়া কণ্ঠস্বর: 'তোকেও বলি দেবার জন্যে এনেছে। বাঁচতে চাস তো—'। এখানে আসবার সময় রিকশওলার কথাও মনে পড়ছে 'ও বাড়িতে দু-চারদিনই থাকা ভালো বাবু। তার বেশি থাকবেন না।']

।। দুই ।।

তা হলে আপাতত এই বাড়ীতেই থাকা যাক দু-একদিন। কাল অফিসে গিয়ে জয়েন করা, তারপর খুঁজে-পেতে দেখা কোথাও একটা ঘরটর ভাড়া নেওয়া যায় কি না। কিংবা কে জানে, যেখানে বাস চলে, ট্র্যানজিস্টার রেডিয়ো নিয়ে লোকের চলা-ফেরা দেখা যায়, বাজারের রাস্তায় পর-পর কয়েকটা হেয়ার-কাটিং সেলুন চোখে পড়ে, পালেরা কুণ্ডুরা ব্যবসা করে বড়ো লোক হয়ে যায়, সেখানে চলনসই এক-আধটা মেসেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে হয়তো।

শশাঙ্ক কাকা বলেছেন, 'তুমি ঘরের ছেলে, থেকেই যাও না এখানে।'

রিকশওলার কথাটা কানে না বাজলে, কিংবা সিঁড়ির তলা থেকে ভূতুড়ে মেজদা একটা রোমাঞ্চকর গল্পের মতো হঠাৎ তার অদ্ভুত মুখটা না বাড়ালে হয়তো এক-আধ মাস থেকে যাওয়ার নিশ্চিন্ত শিথিলতা বিকাশেরও আসত। চিরদিন তার বাড়ীতে থাকাই অভ্যাস। বাসা করে থাকার মধ্যে যদিও বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু ঘর ভাড়া করা, একটা রান্নার লোক রাখা, বাজার করা, হাঁড়ি-কড়াই-তেল-মশলার ভাবনা ভাবা—এগুলো মনে হলেই অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে ওঠে। মেস সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়, কিন্তু এই আধা-শহর আধা-গ্রামে তার চেহারাটা কি রকম দাঁড়াবে, এক ঘরে ক'টি তক্তপোশ এবং কে কে তাতে থাকবেন (তাঁদের কারুর যদি সমস্ত রাত নাক ডাকে!), কী খেতে দেবে এবং তার ছ্যাঁচড়ার গন্ধে প্রাণ চমকে উঠবে কিনা কিংবা তরকারীতে এমন লঙ্কা পড়বে যে ঠোঁটে ছুঁইয়েই লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে কিনা—এ সবও ভাববার দরকার আছে।

তার চেয়ে মন্দ কী একটা পরিবারের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে।

কিন্তু তাও সম্ভব নয়।

রিকশওলার কথায় গুরুত্ব না দিলেও চলে, পাড়াগাঁয়ে নানা রকম দলাদলি থাকেই। তা ছাড়া শশাঙ্ক কাকা বলেছেন, এসব জায়গায় সবাই ঠক, কাউকে বিশ্বাস নেই। অতএব রিকশওলাকে স্বচ্ছন্দে অবিশ্বাস করা যায়। মেজদা অবশ্য সিঁড়ির তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে প্রাণ চমকে দিয়েছিলেন, কিন্তু শশাঙ্ক কাকা বলেছেন—'ওঁর মাথা খারাপ—সে এক হিস্ট্রি বাবাজী, পরে বলব।' সে একটা ক্রমশ প্রকাশ্য গল্প, তার জন্যে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবু—তবু এ বাড়ীতে থাকা যায় না।

প্রথমত থাকতে গেলেই কিছু খরচ দিতে হয়। সে টাকা শশাঙ্ক কাকা নেবেন কিনা সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত কোনো অচেনা বাড়ীতে ঢুকে দু দিনে তাদের আপন করে নেওয়া—ঠিক এই স্বভাবটা বিকাশের নয়, তার পক্ষে এখানে ওভাবে সহজ হওয়া শক্ত। আর তৃতীয়ত—

চিন্তাটা থামল। শশাঙ্ক কাকার গলা ভেসে এল নীচ থেকে।

'কই রে, ওপরে চা দিয়ে এসেছিস বিকাশকে?'

'এই নিয়ে যাচ্ছি, বাবা।'

'এত দেরী হল এক পেয়ালা চা করতে?'

মিষ্টি মেয়েলি গলায় জবাবটা এবার শোনা গেল না। বিকাশ অনুমান করবার চেষ্টা করল। হয়তো মেয়েটি চুপি-চুপি জানালো, ঘরে চা ছিল না কিংবা দোকান থেকে চিনি আনতে হল।

'আচ্ছা—আচ্ছা—' শশাঙ্ক কাকা একটা কিছু বুঝে নিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সেই কানাভাঙা পেয়ালা-গুলোয় আবার দিস নে, একটা ভালো কাপটাপ বের করে দিস। সেসব দু-একটা আছে, না গয়ায় পেঁচেছে?'

এবারেও জবাব পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব, তারা এখনো গয়ায় যায় নি, এখনো যত্ন করে তোলা আছে, নইলে শশাঙ্ক কাকা নিশ্চয় চেঁচিয়ে উঠতেন।

এসব বিকাশের শোনা উচিত নয়, নিতান্ত সাংসারিক আলাপ। তবু না শুনে উপায় ছিল না। যে কোণার ঘরটিতে তার থাকবার ব্যবস্থা, তার সামনের বারান্দাটিতে দাঁড়িয়েই অন্তঃপুরের এসব নেপথ্য সংলাপ তার কানে আসছিল।

▲ শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'তোরা ভাবী সে,

আমি একটু ঘুরে আসছি ছোট্ট কাকার কাছ থেকে।'

আবার একটি মেয়েলি কণ্ঠ—চাপা, সতর্ক স্বর—একটুখানি আওয়াজ পাওয়া গেল, কিন্তু কথা বোঝা গেল না। না, সেই মেয়েটির মিনমিনে গলা নয়, আর কেউ—খুব সম্ভব কাকিমা।

শশাঙ্ক কাকা বললেন,—'না-না, দেরী হবে কেন? বাড়ীতে অতিথি—আমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই আমি আসছি।'

একটা চটির আওয়াজ বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে।

চা একটু পরেই আসবে—একটা ভদ্র রকমের পেয়ালাতেই আসবে খুব সম্ভব। কিন্তু বিকাশের চিন্তা এগিয়ে চলল অন্য দিকে। কিন্তু কোনো একটা চকচকে—হয়তো বা ফুলকাটা চায়ের পেয়ালা—এই বাড়ীতে ঠিক মানাবে? নীচের তলায় শশাঙ্ক কাকার বসবার ঘরটিতে রঙ বদলানো হয়েছে, দোতলায় এই অংশটিতেও বসবাস করবার জন্যে জোড়াতাড়া দেবার চেষ্টা। কিন্তু বিকাশ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তারই নীচে একটা চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংস-স্তূপ। আধকটা দাঁড়িয়ে আছে—বাকি অংশ চুন-সুরকী-ইটের পাহাড় হয়ে রয়েছে, তার ওপর আগাছার জঙ্গল। ওটা সাফ করবারও কারো গরজ নেই। চণ্ডী-মণ্ডপের ওদিকে আর এক সারি ঘর, তার একতলাটা চোখে পড়ে না; দোতলার যে-অংশ মুখোমুখি দেখা যায়, তার আস্তরখসা দেওয়াল, বন্ধ দরজা-জানলার ভাঙা খড়-খড়ি, বারান্দা জুড়ে আধহাত উঁচু হয়ে আছে পায়রার আবর্জনা, ছাতের আধখানা জুড়ে বিরাট এক বটগাছের আবির্ভাব। অন্য কোনো শরিকের অংশ খুব সম্ভব—কিন্তু তারা কেউ আর এ-বাড়ীতে থাকে না।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে সব ভাঙন-লাগা, সব ধসে পড়ার মুখে। নিয়োগীদের যেদিন গেছে, সেদিন আর ফিরবে না। চল্লিশখানা প্রতিমার শোভাযাত্রা বেরুনোর ইতিহাস চিরকালের মতোই শেষ হয়ে গেছে।

বারান্দা থেকে সরে বিকাশ নিজের ঘরটিতে ফিরে এল। আপাতত এইটিই তার থাকবার জায়গা। বোধহয় আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছিলেন শশাঙ্ক কাকা। ছোট্ট ঘরের একধারে একটি তক্তপোশে বেডকভার বিছানো, একটা পুরানো টেবিল, একটা চেয়ার। দেওয়ালে একটি রঙিন ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত। কুলুঙ্গিতে একজোড়া কাচের ফুলদানি, কোনো সময় হয়তো ফুল এনে সাজিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এত আয়োজনেও দেওয়ালটা কালো, ছাতে ঝুল, এখানে-ওখানে নোনার দাগ।

ঐশ্বর্যের ভেতরে দুটি জানলা। তাদের সামনে দাঁড়ালে জংলা বাগান—কয়েকটা নারকেল গাছের ক্লান্ত সজ্জায়। সবুজ। ডানদিকে ভাঙা পাঁচিল আর শ্যাওলা দিয়ে একটা পুকুর—এ-বাড়ীর খিড়কির কাছ চলে গেছে বোধহয়।

আবারও কয়েকটা আম-জামের গাছে একটা শালিক কয়েকটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে চ্যাঁচামেচি করছিল, একজোড়া হলদে পাখি ওড়াউড়ি করছিল, একটা নারকেল গাছে কোটরের ব্যতিব্যস্ত কাঠবেড়ালের ওঠা-নামা চলছিল, টুনটুনির ডাক শোনা যাচ্ছিল। তারই মধ্যে কিছুক্ষণ চোখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিকাশ। ছেলেবেলায় গরমের ছুটিতে মামাবাড়ী বেড়াতে যাওয়া—দুপুরবেলা বাগানে বাগানে আম-জামরুল-গোলাপজামের খোঁজে—

'তোমার চা—'

বিকাশ ফিরে তাকালো। আধঘোমটা-টানা মাঝবয়েসী এক মহিলা। তার সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটির হাতে খাবারের থালা, জলের গ্লাস, মহিলার হাতে চায়ের পেয়ালা।

টেবিলে খাবার নামিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এসো বাবা—চা-টা খেয়ে নাও। একটু দেরী হয়ে গেল, তোমার কষ্ট হল খুব।'

বলে দিতে হল না, ইনিই কাকিমা—শশাঙ্ক কাকার স্ত্রী। বিকাশ এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিলে।

'বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো, সুখী হও—' কাকিমা আশীর্বাদ করলেন। তার-পর আলতোভাবে একটা ধমক দিলেন সঙ্গের মেয়েটিকে।

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন, প্রণাম কর দাদাকে।'

মেয়েটি সংকুচিতভাবে নীচু হয়ে বিকাশের পায়ে হাত ছোঁয়ালো। পাখির পালকের মতো নরম আলতো স্পর্শ লাগল। একটা কিছু আশীর্বাদ করবার কথা ভাবল বিকাশ, কিন্তু কেমন মুখে জোটে গোলমেলে মনে হল তার।

কাকিমা বললেন, 'খেয়ে নাও বাবা, চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'কিন্তু এসব কিছু দরকার ছিল না কাকিমা। আমি পথেই তো—'

'পথে সে কখন খেয়েছ—এত বেলা হয়ে গেল, খিদে পায় না? তাছাড়া রান্নাবান্না হতেও তো দেরী হবে একটু। এসো—লজ্জা কোরো না।'

চায়ের দরকার ছিল না, খাবারেরও না। কিন্তু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

থালায় লুচি - হালুয়া - আলুভাজা। চায়ের পেয়ালা-পিরিচ নতুন। অতিথির সম্মানে বেরিয়ে এসেছে।

জোরাজুরি বসে পড়ল বিকাশ।

'খাবার এখন থাক কাকীমা, চা-ই বরং—'

'তা কি হয়? প্রথম এলে কাকার বাড়ীতে।'

'তাহলে তুলে নিতে বলুন কিছুটা।'

'তুমি যা প্যারো খাও না। ফেলা যাবে না।'

অর্থাৎ যা পড়ে থাকবে তা খাওয়ার লোকের অভাব নেই। আন-হাইজিনিক। কিন্তু এই বাড়ীতে কাকিমাকে সে-কথাটা বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভালো।

বিকাশ খাবারে মন দিলে।

মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়েছিল মায়ের আড়ালে। কাকিমা বললেন, 'তুই যা সুনু। তরকারীটা চাপিয়ে এসেছি, দেখিস ধরে না যায়।'

শাড়ী, কয়েক গাছা চুড়ির আওয়াজ আর হাল্কা পায়ের শব্দ বেরিয়ে গেল বাইরে।

কাকিমা বললেন, 'আমার মেজো মেয়ে। বড়োটির বিয়ে দিয়েছি দু' বছর হল। সুনী এবারে স্কুল-ফাইন্যাল পড়ছে। তোমার কাকাকে বলেছিলুম এরও একটা পাত্র-টাত্র দ্যাখো, কিন্তু ও'র আপত্তি। বললেন, তাড়া কিসের—পাশ করে কলেজে-টলেজে পড়ুক, তখন দেখা যাবে।'

'সে তো ভালোই। এত অল্প বয়েসে কেউ আজকাল আর মেয়েদের বিয়ে দেয় না কাকীমা।'

'অল্প বয়েস কী বলছ—ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পড়তে চলল যে।'

মাথা নামিয়ে বিকাশ একটু হাসল। ষোলো ছাড়িয়ে যে মেয়ে সতেরোর দিকে এগিয়েছে, কলকাতায় সে এখনো ফ্রকের সীমা ছাড়ায় না; এমনকি এখানেও—বাজারের রাস্তায় যেখানে বাস-মোটর-লরী চলে, রেডিয়ো বাজে, দু-তিনটে হেয়ার-কাটিং সেলুন দেখা যায়, সেখানেও বোধহয় এটা বিয়ের বয়স নয়। কিন্তু নিয়োগী-পাড়ায় আসতে হয় পুরোনো গাছের ছায়া নুয়ে-পড়া একটা গর্ত-ওঠা রাস্তা দিয়ে, দু' ধারের সারি-সারি ভাঙা বাড়ী পার হয়ে বালাপোষ গায়ে যে-বুড়ো মানুষটি দুপুরের রোদে বসে আছেন—তাঁকে পাশে রেখে। নিয়োগীপাড়ায় পুরোনো দিনগুলো এখনো একটুকরো দ্বীপের মধ্যে জেগে রয়েছে, জীর্ণ চুন-বালি, ভাঙা ইট আর ভাপসা একটা অতীতের গন্ধের মধ্যে সতেরো বছর এখনো অনেক বয়েস।

কাকিমা এ-বাড়িতে কী বয়েসে এসে-ছিলেন? তেরো, চৌদ্দ? কিংবা আরো কম?

'ওকি, সবই সরিয়ে রাখছ যে!'—কাকিমার ক্ষুণ্ণ প্রতিবাদ শোনা গেল।

'অনেক খেয়েছি কাকিমা, আর পারব না।'

'তুমি লজ্জা করছ বাবা।'

'সত্যি বলছি, আর পারব না।'

'কলকাতায় তোমরা যে কী খেয়ে বেঁচে থাকো, তাই ভাবি।'

বিকাশ হাসল। উত্তর দিল না।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। দুই চুমুকেই শেষ করল বিকাশ।

কাকিমা বললেন, 'তোমরা সেই শ্যাম-পুকুরের বাড়ীতেই তো আছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'—বিকাশ একটু আশ্চর্য হল: 'আপনি গিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, তা কুড়ি-বাইশ বছর হল।'—কাকিমা হাসলেন: 'তখন বোধহয় তোমার বছর চারেক বয়েস ছিল। তোমার দাদা স্কুলে পড়ত। আমরা গিয়েছিলুম গঙ্গা-সাগরের মেলায়—যাওয়া-আসার পথে তিন-চারদিন তোমাদের বাড়ীতে ছিলুম। তোমার মনে থাকবার কথা নয়।'

'না। চার বছরের কথা কারো মনে থাকে না'। —বিকাশও হাসল।

'তোমার দাদা কী করছে?'

'বিলেতে।'

'পড়তে গেছে?'

'গিয়েছিল। সে সাত-আট বছর আগে। এখন আর পড়ে না, পাশ করে ওখানেই চাকরী করছে।'

'সে কি! দেশে আসে না?'

'এসেছিল। সে বছর দুই হল। ছুটি পায় না তো।'

কাকিমার মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়ল।

'এ ঠিক নয়। সবাইকে ফেলে, অত দূরে! তোমার মার কষ্ট হয় না?'

'হলে আর কী করবেন? উপায় তো নেই।'

'তবু ভালো, তুমি বিলেত-টিলেতে যাওনি।'

বিকাশ চুপ করে রইল। দাদার প্রসঙ্গটা অপ্রীতিকর। একথা কাকিমাকে বলা যায় না যে দাদা শুধু বিলেতেই যায় নি, সে ওখানেই সংসার পেতেছে, সে এখন বৃটিশ সিটিজেন। বলা যায় না দাদার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলেকে ওভাবে হারিয়েই বাবার সেকেণ্ড আর থার্ড অ্যাটাকটা অত তাড়া-তাড়ি এগিয়ে এল। আরো বলা যায় না যে বাবার মৃত্যুর পরে পায়ের তলা থেকে যেন মাটি ধসে গেল সংসারটার—তার আর এম-কম পরীক্ষা দেওয়া হল না, যেমন তেমন করে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হল, শ্যামপুকুরের বাড়ীর নীচের তলাটা ভাড়া দিতে হল।

'তোমার বাবার তো এত পশার ছিল, ওকালতি করলে না কেন?'

'সকলের সব কাজ হয় না, কাকিমা।'

'তা বটে।' —কাকিমা কিছু একটা বুঝে নিয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, 'তা হলে তুমি একটু জিরিয়ে নাও এখন—রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুম হয় নি। আমার একটু দেরী আছে এখনো।'

'থাক কাকিমা। এখুনি তো একরাশ খেলুম।'

'কোথায় খেলে?' —খাবারের থালাটা তুলে নিয়ে কাকিমা বললেন, 'এমন লজ্জা করলে তো চলবে না—দেখো তোমার কাকা এসে রাগারাগি করবেন।'

'রাগারাগির দরকার নেই। আমি প্রচুর খেতে পারি। পরে দেখবেন।'

'দেখব এখন।' —মৃদু হেসে কাকিমা বেরিয়ে গেলেন।

রিক্‌শ বাড়ীর সামনে থামবার সময় দু-তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে দেখা গিয়েছিল। তারপর এতক্ষণ আর তাদের সন্ধান মেলে নি। খুব সম্ভব যাতে অতিথির সামনে কোনো অসভ্যতা না করে, সেইজন্যে শশাঙ্ক কাকার সামনে তারা লুকিয়েছিল কোথাও। এতক্ষণে দরজার বাইরে আবার ক'টি মুখ উঁকি মারল।

শশাঙ্ক কাকারই ছেলেমেয়ে—সন্দেহ নেই। ফর্সা রং, টানা-টানা চোখ, মিষ্টি চেহারা। শশাঙ্ক কাকা এককালে রূপবান ছিলেন, কাকিমার রোগা শরীর আর জ্বলে-যাওয়া রং দেখেও বোঝা যায়, দুজনের বিয়ের সময় কোষ্ঠীর সঙ্গে রূপেরও জোড় মেলানো হয়েছিল। ঠাণ্ডায় ফাটা-ফাটা গাল আর নাকের নীচে শুকনো মিউকাসের দাগ সত্ত্বেও বাচ্চাগুলো দেখতে ভালো।

বিকাশ ডাকল : 'এসো—এসো এদিকে।'

একটা হাসির কলরোল উঠল, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ছুটে পালালো। শুধু সব চেয়ে ছোট ছেলেটার বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়ে রইল বসিপুতুলের মতো।

'তোমার নাম কী?'
'বুড়ো?'
'বুড়ো?'

'না—বুড়ো!'—বেশ গম্ভীরভাবে জবাব এল।

'বুড়ো নয়, বুড়ো? মানে বুড়ো?'

'হুঁ।'

'আর ভালো নাম নেই? শুধুই বুড়ো?'

'ভালো নাম আছে।'—বেশ চেষ্টা করেই বলতে হল নামটা : 'পিশান্ত কুমার মিত্তির।'

'পিশান্ত কুমার?'

'না—পিশান্তকুমার।'

এবার মাথা চুলকে রহস্য ভেদ করতে হল বিকাশকে : 'অ—প্রশান্তকুমার?'

আলাপটা আর বেশী দূর এগোল না। দরজায় দেখা দিল সুনন্দ।

পিশান্তকুমার আবার গম্ভীর স্বরে বললে, 'মেজদি।'

বিকাশ হেসে উঠল : 'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার মেজদির সঙ্গে আর পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই—ওটা আগেই হয়ে গেছে।'

খিল-খিল করে হেসে ফেলল সুনন্দ।
'বুড়োর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়ে গেছে দেখছি।'

'হাঁ—বাচ্চাদের মধ্যে ওরই একটু সাহস আছে মনে হল। বাকী সবাই তো ডাক শুনেই ছুটে পালালো।'

সুনন্দ বুড়োর মাথায় একবার আঙুল বুলিয়ে দিলে। উজ্জ্বল মুখে বললে, 'ও খুব কথা বলতে পারে। ওইজন্যেই তো ওর নাম বুড়ো। ও আমো কী বলেছে, জানেন? বলব বুড়ো? বলি? ও বলেছে, বাবার হুঁকোতে করে ও তামাক খাবে।'

'ধ্যেৎ—না—' বিরক্ত হয়ে বুড়ো ছুটে পালালো। আবার খিলখিল করে হেসে উঠল সুনন্দ।

'তোমার সব চেয়ে ছোট ভাই, না?'

'হাঁ। আমরা তিন বোন, দু ভাই।'

সুনন্দ ঘরে পা দিল। একটু আগেই এই মেয়েটি তার মার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘরে এসেছিল, বিকাশের মুখের দিকে চোখ তুলেও সে ভালো করে তাকায়নি। কিন্তু এই বাচ্চাটা এসে সব সহজ করে দিয়েছে—সংকোচের আড়াল সরিয়ে নিয়েছে।

বিকাশ সুনন্দর মুখের দিকে চেয়ে দেখল। মেয়েটি দেখতে ভালো। প্রথম বয়সের লাবণ্য নদীর জলের ওপর এক মুঠো আলোর মতো জেগে আছে। তবু মুখের রেখায় একটা শান্ত বিষণ্ণতা—এই সব পুরোনো বাড়ীতে—যেখানে একটা সমৃদ্ধ অতীত ছিল, সেখানে মেয়েদের চেহারায় হয়তো এই রকম ক্লান্ত করুণতার ছায়া পড়ে।

সুনন্দ চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বললে, 'শুনুন?'

বিকাশ বললে, 'আমার একটা নাম আছে কিন্তু। তার সঙ্গে একটা 'দা' যোগ করে নিলেই চলে যায়।'

সুনন্দ আবার মুখ তুলল : 'আচ্ছা।'
'আচ্ছা নয়, নামটা বলো।'

'বিকাশদা।'—সুনন্দ ফিক করে হেসে ফেলল।

'যাক, পাশ করে গেলে। এবার বলো কী খবর এনেছ।'

'মা জিজ্ঞেস করল আপনি গরম জলে স্নান করবেন তো?'

'না-না—আমার ওসব অভ্যেস নেই।'—বিকাশ ব্যস্ত হয়ে উঠল : তোমরা কোথায় স্নান করো?'

'কেন, পুকুরে। কিন্তু সে তো আপনি পারবেন না।'

'খুব অসাধ্য ব্যাপার নাকি? কিছু ভেবো না—আমি সাঁতার জানি।'

'সে কথা নয়। কলকাতা থেকে এসেছেন, শীতের দিন—আপনার ঠাণ্ডা লাগবে।'

'লাগবে না। আর তা ছাড়া আমাকে নিয়ে এত সমারোহ করলে আমি এখানে টিঁকতেও পারব না—বিকেলেই ছুটে পালাতে হবে এখান থেকে। বুঝেছ?'

সুনন্দ কথা খুঁজে পেল না, চুপ করে রইল।

বিকাশ বললে, 'তোমার ভালো নাম কী? সোনালি, না সুনীতা?'

সুনন্দর চোখ দুটোতে কৌতুক দেখা দিল : 'ওসব কিছু নয়, সুবর্ণা।'

'আমি প্রায় কাছাকাছি এসেছিলুম। সোনালি সুবর্ণা থেকে খুব তফাতে নয়। আমি তোমাকে সোনালি বলে ডাকব।'

মেয়েটির গাল একটু রাঙা হল।
'আপনার যে নামে খুশি ডাকবেন।'
'তুমি রাগ করবে না?'
'না।'

বিকাশ একটু চেয়ে থাকল সুনন্দর দিকে। নদীর জলে এক মুঠো আলো। তবু সেই আলোর ওপরে একটা ছায়া আছে। এই পুরোনো বাড়ীর ছায়া—ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ছায়া, একটা অন্ধকার সিঁড়ির ছায়া। সুনন্দ আবার চোখ নামিয়ে নিল। বিকাশ বললে, 'খুব যদি ব্যস্ত না থাকো, লক্ষ্মী মেয়েটির মতো একটু সাহায্য করো দিকি আমাকে।'

'কী করব বলুন।'
'আমার বেডিং আর ট্রাংকের সঙ্গে ছোট একটা কাঠের বাক্স ছিল, সেটা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না।'

'দেখছি— দাঁড়ান।'—সুনন্দ তক্তপোশের তলায় নীচু হল, তারপর বাক্সটা টেনে বের করে আনল : 'এইটে?'

বিকাশ খুশি হয়ে বললে, 'ঠিক। আমি ভেবেছিলুম, ট্রেনেই ফেলে এসেছি বোধ হয়। পেলে কী করে? ম্যাজিক জানো নাকি?'

'ম্যাজিক জানতে হবে কেন?'—সুনন্দ হাসল : ট্রাংকের পেছনে সরানো ছিল, তাই আপনি দেখতে পান নি।'

পাতলা বাক্সটা খুলে ফেলল বিকাশ। আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুনন্দ : 'বেহালা? আপনি বাজান বুঝি?'

'নইলে কি পরের বাজানোর জন্যে বয়ে বেড়াব?'—বিকাশ হাসল।

অপ্রতিভ হয়ে সুনন্দ বললে, না—তাই বলছিলুম।'
'তুমি কী বাজাও?'

'কিছু না।'—সুনন্দর মৃদু নিঃশ্বাস পড়ল একটা।
'বেহালা শিখবে?'

সেই সময় আবির্ভাব হল বুড়োর। গম্ভীর স্বরে বললে, 'মেজদি, মা তোমার ডাকছে।'

(ক্রমশ)

পুষ্প প্রদর্শনীতে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

রাজধানীতে পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনী

অঙ্গনা

বর্ণবৈচিত্র্যে পুষ্পসজ্জা ভীষণ আকর্ষণীয়। রসিক-অরসিক সকলের কাছেই এর আবেদন। রঙের সুষ্ঠু প্রয়োগে অথবা প্রতীকের সম্পর্কযোগে চিন্তাকল্পনা এবং পৌরাণিক ও আধুনিক রূপকল্প ভাস্বর হয়ে ওঠে। সবকিছু বুঝে নিতে আমাদের কোন অসুবিধাই হয় না। এদিক থেকে পুষ্পসজ্জার আবেদন অনেককে মুগ্ধ করেছে। তাই এ সম্বন্ধে ইদানীং নানা-চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

কিছুদিন আগেও পুষ্পসজ্জা সম্বন্ধে আমদের ধারণা ছিল নেহাতই ঘর সাজানোর আঙ্গিক রুটি। কেশ প্রসাধনে একসময়ে এবং আজও এর কদর সমান অব্যাহত। ঘর সাজানোয় ফুলের ব্যবহার পৃথিবীর সুরুচির পরিচারক। তাই পুষ্পসজ্জা বলতে আমরা সর্বাগ্রে এটিকেই ধরে নিয়েছিলাম। অন্যান্য ব্যবহারের কথা মনে ছিল কিন্তু তাদের প্রকাশের লোভ সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছি এই ভেবে যে, এদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও সুযোগ সঙ্কীর্ণ।

তখনও পুষ্পসজ্জার এবম্বিধ ব্যবহার পরিষ্কার হয় নি। অবশ্য একটা ধারণা গোড়া থেকেই মনে বলবৎ ছিল যে, কোনকিছুরই ব্যবহার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ক্রমেই এই ধারণার সমর্থন মিলেছে পুষ্পসজ্জা সম্পর্কে ক্রমে ওয়াকিবহাল হতে গিয়ে।

দিল্লী-কলকাতা শহরে আজকাল পুষ্পসজ্জার আদর বলছে ক্রমশ। শহরবাসীরাও এ সম্পর্কে উৎসাহী হচ্ছেন। দিল্লীতে পুষ্পসজ্জার আগ্রহ নারীপুরুষ নির্বিশেষে। সবাই এই আর্ট শিখতে চান। কারণ মনের ভাবনা এমনভাবে প্রকাশ করার আর কোন বিকল্প নেই। এছাড়া এ খেলায় নিজেও অনেকক্ষণ মেতে থাকা যায়। একবার ভেঙে আর একবার গড়া। যতবার খুশী। সেই সঙ্গে নতুন চিন্তা আসবে এবং চেতনাও। আর তখনি পুষ্পসজ্জা হবে সার্থক। শিল্পী তখন শিল্পেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

এহেন পুষ্পসজ্জার আয়োজন হয়েছিল রাজধানীতে। দেশের নানা অংশ থেকে শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। রাজধানীর শিল্পীরাও অবশ্য অংশ নেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দর পুষ্পসজ্জা প্রসঙ্গেই এসব কথার অবতারণা।

ডিসেম্বরের শেষে দিল্লী ইকেবানা ইন্টারন্যাশানাল-এর বার্ষিক পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনী রবীন্দ্রভবনে (ললিতকলা একাডেমি) হয়ে গেল। রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

দিল্লীর ইকেবানা ইন্টারন্যাশনাল শ্রীমতী স্টেইন ও শ্রীমতী গুস্তোভিয়ার উদ্যোগে ১৯৬৩ সালে মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দুজনই ভারতের বাইরে চলে যাওয়ায় শ্রীমতী লালকাকার ওপর এই প্রতিষ্ঠানের ভার পড়েছে। পুষ্পরসিক সমাজে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ গভীর। এঁদের বর্তমানের পুষ্পসজ্জা অন্যান্য চারুশিল্পের মত কলারসিক সমাজকে আকৃষ্ট করে।

এবারের প্রদর্শনীর বিষয় ছিল "মুডস অব ইকেবানা", পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে নানাভাবের প্রকাশ। সতেরো কিংবা আঠারজন শিল্পী এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফুল লতাপাতার সাহায্যে রঙ ও রেখার বিচিত্র বিন্যাসে এঁরা রবীন্দ্রভবনের ঘরটিকে সুশোভিত করেছিলেন। বর্তমান জগতের নানা অশান্তি ও গ্লানিকে এখানে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরে ঢুকলেই মনে হয় সুন্দরের রাজ্যে যেন পদার্পণ করলাম। এখানে অন্তত শুধু কাঁটার খোঁচা নেই তার-সঙ্গে গোলাপের সুগন্ধ এবং রূপটিও ধরা দেবে।

এই প্রদর্শনীটি প্রতিযোগিতামূলক নয়, তাই ব্যবস্থাটি খুবই ভাল মনে হল এক্ষেত্রে। প্রতিটি পুষ্পসজ্জা অতি যত্নের সঙ্গে করা হয়েছিল, সেজন্য প্রদর্শনীটির সামগ্রিক চেহারা দর্শকের কাছে প্রীতিপদ হয়েছিল। বহু প্রদর্শনীতে এর অভাব লক্ষ্য করা যায়।

এইরূপ প্রদর্শনীতে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ বলা খুবই কঠিন। দর্শকের দৃষ্টিআকর্ষণকারী পুষ্পসজ্জাগুলির বিষয় এখানে উল্লেখ করি। শ্রীমতী লালকাকার 'পেনসিভ অর ডেকেন্ট থট'-এর পরিকল্পনাটি সুন্দর হয়েছিল। শ্রীমতী ভেরাওয়ালার 'স্যাটার্ড ড্রিম', উষা নারায়ণের 'জয় এ্যান্ড সরো'র পরিকল্পনায় সাজানোর ভাবটি যথাযথ রূপ পেয়েছিল। শ্রীমতী কান্তা ডোগরার 'রাদেভু উইথ ডেস্টিনি' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমতী
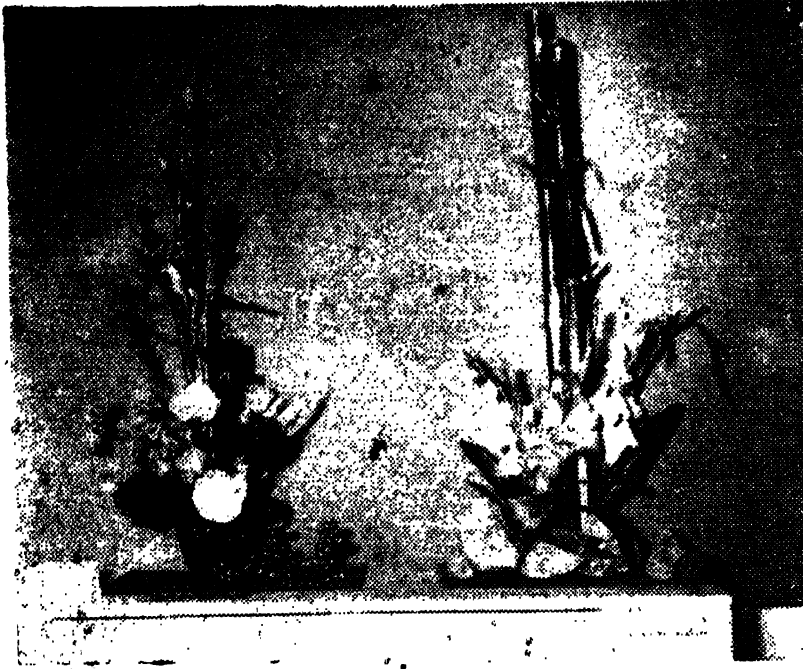
উমা রোও-র 'লনগিং ফর কালী লাইফ' থেকে তার 'সিজন' নামক পুষ্পসজ্জাটি মনোরম হয়েছিল।

এবারকার প্রদর্শনীতে তিনজন বাঙালী মহিলা অংশ নেন। শ্রীমতী শেফালী সেনগুপ্তের 'এভারলাস্টিং জয়' সাদা রঙের ডাল ও হাল্কা পিঙ্ক গোলাপ ফুলে সুন্দর ফুটে উঠেছিল। শ্রীমতী বাণী দাসের বিরাট আলপনার রঙে সাজানো 'স্মাইলস অব আর্থ'এ রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে আরেকটু দৃষ্টি রাখলে ভাল হোত। কলকাতা থেকে এসেছিলেন শ্রীমতী উমা বসু। তাঁর পুষ্পসজ্জার বিষয়বস্তু ছিল 'হোমেজ'। এ সম্পর্কে তিনি পাঁচটি পুষ্পসজ্জার আয়োজন করেন—গান্ধী, নেহরু, আই এন এ, গ্যাগারিন ও কেনেডি-লুথার কিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। গান্ধীজীর শতবর্ষপূর্তী স্মরণ করে 'রিক্কা' স্টাইলে সাজানো খাদিসুতো, লবণ ও জাতীয় পতাকার রঙের ফুল ও পাতার সমাবেশে পুষ্পসজ্জাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আই এন এ'এর উদ্দেশ্যে বাঁশ ও গ্লাডিওলিয়ার —'ডিটারমিনেশান' সাজানোটিতে দৃঢ় ঋজু রেখার ভাবটি ভাল ফুটেছিল। আর আরেকটি সাজানোও অভিনবত্বে সবার প্রশংসা পেয়েছে গ্যাগারিনকে স্মরণ করে 'ডিজায়ার ফর মুন' সামগ্রিকভাবে ভাল হয়েছিল তবে বাঁশের কোয়ার রকেটটি সত্যই সুন্দর।

এই পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনীর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের 'বনসাই' সংগ্রহ। এক কথায় এ সংগ্রহ খুবই চমৎকার। ছোট্ট অশ্বত্থ গাছ, ফলশুদ্ধ ডালিম গাছ, আঙুরলতা, জাকারাণ্ডা গাছ, সবেদা গাছ এবং নানা জাতীয় ক্যাকটাসে রাষ্ট্রপতির বনসাই রসিক মনকে দোলা দেয়। এ ব্যাপারে তাঁর আকর্ষণের কথা প্রায় অজানাই ছিল। এবারকার প্রদর্শ-

পুষ্প প্রদর্শনীতে দুটি বিশেষ নিদর্শন
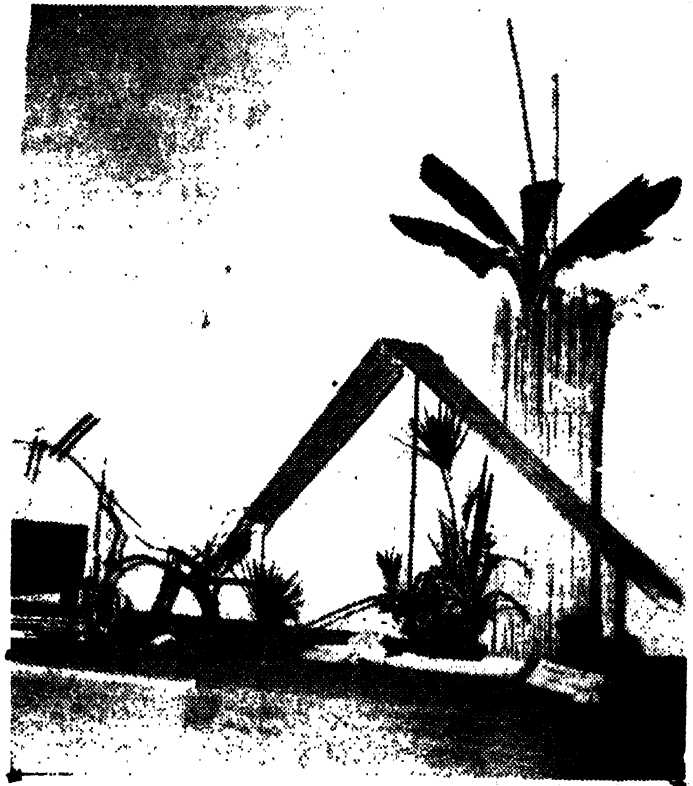
নীকে কেন্দ্র করে দর্শকদের এই উপরি লাভটুকু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তবে লাভ শুধু এইটুকু নয়। যদিও এ স্মৃতি দর্শকদের মনে অনেকদিন জাগরূক থাকবে। কেউ কেউ অনুপ্রেরণাও লাভ করবেন। আবার জাপানী সৌভ্রাতৃত্বের সেই নজীরটিও আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। দেশে দেশে বিদ্বেষবুদ্ধি যেখানে আমাদের চোখের সামনের ঘটনা সেখানে এক দেশের প্রতি অন্য দেশের শুভেচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার মোড় ফেরানোয় সাহায্য করে। এভাবেই দেশে দেশে প্রীতির উত্তপ্ত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়।

এই অভিজ্ঞতাও এই পুষ্প প্রদর্শনীর একটি বড় লাভ। নববর্ষের শুভেচ্ছার আদান-প্রদান আমাদের বাৎসরিক কর্তব্য। কেউ এ ব্যাপারে ত্রুটি করেন না। কিন্তু নববর্ষের মুখোমুখি এই পুষ্পসজ্জার সুযোগ নিয়ে জাপান শুভেচ্ছা জানায় অভিনব পন্থায়। এবং এই শুভেচ্ছা কোন ব্যক্তিবিশেষের সীমায় আবদ্ধ নয়।

জাপানী পাখা, পাইন, ক্রিসেন্থামাম ও গোলাপ দিয়ে জাপানের নিজস্ব ঢঙে রচনা করা হয়েছিল একটি বিরাট পুষ্পসজ্জার। নববর্ষে জাপানের তরফ থেকে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা এই শুভেচ্ছা প্রতীকের নামকরণ করা হয়েছিল 'পিস অ্যান্ড প্রস্পারিটি'। শুভেচ্ছা অভিনব আর রুচিও প্রশংসনীয়।

[অক্টোবর, উনিশ শো চল্লিশ। কলকাতার ছেলে বিনু এল [illegible] হেমনাথের বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। আশ্চর্য লাগল হেমনাথকে। [illegible] রাজদিয়ার [illegible]। আরো আশ্চর্য তাঁরই বন্ধু লারমোর। [illegible], প্রাণবন্ত।

লারমোর বিনুর বিস্ময় আর দুজনের সঙ্গে তার বন্ধুর ভালোবাসা।

পর পর কদিন বেশ ঘুরল বিনু ওরা। পূব বাংলার মাটি আর মানুষের প্রতি জমে গেল গভীর ভালোবাসা। [illegible] ক্লান্ত বিনু [illegible] 'দুঃখী মেয়ে' ঝিনুক।]

।। একুশ ।।

কাল রাত্তিরেই বইটই বার করে রেখেছিলেন, সুরমা।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে হেমনাথ আর ঝিনুকের সঙ্গে প্রথমে স্বস্তিব সেরে নিল বিনু। তারপর পড়তে বসল। পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললেই হাফইয়ার্লি পরীক্ষা। এখন থেকে একটু-আধটু পড়াশোনা না করে গেলে ভারী ফল।

বিনু একাই না, সুধা-সুনীতিও আজ তাড়াতাড়ি উঠে বই নিয়ে বসেছে। কলেজ খুললেই অবশ্য তাদের পরীক্ষা নয়। তবু চোটা রাখা ভাল। নইলে সব ভুলে বসে থাকবে।

পুবের ঘরের বারান্দায় তিন ভাই-বোন পড়তে বসেছিল। দূর প্রান্তে বসে ছিলেন হেমনাথ, তার পাশে ঝিনুক।

পড়ার ফাঁকে বিনুর চোখ বার বার ঝিনুকের দিকে চলে যাচ্ছিল। ঝিনুকও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

বিনু শুনতে পেল, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর নীচু গলায় ঝিনুক হেমনাথকে ডাকল, দাদু'—

হেমনাথ দূরে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী রে—'

'আমি পড়ব।'

'খুব ভাল কথা, পড় না—'

'আমাকে বই দাও—'

'কোথায় তোর বই?'

'আমাদের বাড়িতে।'

'আচ্ছা [illegible] দেখব। তখন পড়িস।'

ঝিনুক [illegible] 'না।' মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বায়না [illegible] দিল, 'এক্ষুনি এনে দাও, এক্ষুনি [illegible] দাও—'

হেমনাথ বললেন 'এক্ষুনি তোদের বাড়ি কে যাবে? ওবেলা এনে দেব।'

'না-না—'

'আরে বাপু, একবেলা না পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

বায়নার সঙ্গে এবার কান্না জুড়ে দিল ঝিনুক, 'বিনুদাদা পড়ছে যে—'

চোখ বড় বড় করে বিস্ময়ের গলায় হেমনাথ বললেন, 'ও, বিনুদাদা পড়ছে বলে পড়তে হবে!'

'হ্যাঁ।' ঝিনুক ঘাড় কাত করল।

'হিংসের জ্বালা কত!' বলেই গলা তুলে ডাকতে লাগলেন হেমনাথ, 'স্নেহ—স্নেহ—'

স্নেহলতা ভেতর-বাড়িতে ছিলেন; ছুটতে ছুটতে এলেন। তাঁর সঙ্গে সুরমা।

স্নেহলতা বললেন, 'এত চেঁচামেচি কেন? হয়েছে কী?'

'তাড়াতাড়ি খেতে দাও, আমি বেরুব।'

'কী রাজকার্য আছে শুনি—'

রাজকার্যটা কী, হেমনাথ বললেন।

শুনে হাসলেন স্নেহলতা, 'তা হলে তো যেতেই হবে।'

কোমল গলায় ওধার থেকে সুরমা বললেন, 'আহা পড়ুক, পড়ুক। বিনুকে হিংসে করে মেয়েটা যদি ভুলে থাকে তো থাক। ওর অন্যমনস্ক হওয়া দরকার।'

সুরমারা চলে গেলেন।

একটু পর সকালবেলার খাবার এসে গেল। একা হেমনাথের জন্যেই না, সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুক সবার জন্যেই।

খাওয়া যখন আধাআধি হয়ে এসেছে সেই সময় বাগানের দিক থেকে অবনীমোহন এলেন।

হেমনাথ বললেন, 'কি ব্যাপার অবনী, ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

অবনীমোহন বললেন, 'ঘুম থেকে উঠে রাস্তা ধরে একা-একা অনেকখানি ঘুরে এলাম। ভারি ভাল লাগছিল। কলকাতার ধোঁয়া নেই, ভিড় নেই, গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি নেই—মনে হয় এখানেই থেকে যাই। কলকাতায় আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

হাল্কা গলায় হেমনাথ বললেন, 'বেশ থেকে যাও না।' তারপরেই কি মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মুখটুখ ধুয়েছ?'

'আজ্ঞে না।'

'চট করে ধুয়ে খেয়ে নাও। তোমাকে নিয়েই বেরুই—'

'কোথায় যাবেন?'

হেমনাথ বললেন।

অবনীমোহন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'ঐ সঙ্গে একবার শিশিরবাবুদের বাড়িটা ঘুরে আসব।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কেন, বল তো?'

'আনন্দর কাছ থেকে একটা বন্দুক চেয়ে আনব। কাল সিন্দিলায় চরে যাবার কথা হল না? অনেকদিন তো প্র্যাকটিস নেই, আগে থেকে একটু মহড়া দিয়ে রাখব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব ভাল।'

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে সকালবেলার খাওয়া যখন শেষ করে এনেছেন অবনীমোহন বিনু পড়াটড়া ছেড়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদু—'

হেমনাথ তার দিকে ফিরে বললেন, 'কী বলছিস দাদাভাই?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'তুই তো এখন পড়-ছিস, আমাদের সঙ্গে গেলে পড়াটা নষ্ট হবে।'

ওধার থেকে অবনীমোহন বললেন, 'এখন যেতে হবে না।'

বিনু বলল, 'ওবেলা ঠিক পড়ব।'

এবার রাগের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'ওবেলা-টোবেলা নয়। পড়তে বলেছ, পড়ে যাও। ক'দিন তো বইটই ছুঁয়ে দ্যাখো নি। আজ যদিও বা বসলে, বাঁদরামি শুরু করে দিয়েছ। বেলা দশটা পর্যন্ত কোনদিকে আর তাকাবে না; মন দিয়ে শুধু পড়া। ছুটির পরেই পরীক্ষা, সে খেয়াল যেন থাকে।'

বিনু এবার লাফালাফি শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে নাকি সুরের একটানা ঘ্যানঘ্যানানি চলল, 'আমি যাব, আমি যাব—'

অবনীমোহন ধমক দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'লাফ-ঝাঁফ আর কান্নাকাটি থামা বাপু—'

'বল, নিয়ে যাবে—'

'যাব। তবে এক শর্তে—'

দাদু যখন ভরসা দিয়েছেন তখন যাওয়া নিশ্চয়ই হবে। তাঁর ওপর আর অবনীমোহন কথা বলবেন না। কিন্তু শর্তটা কী, বোঝা যাচ্ছে না। লাফ-ঝাঁফ থামিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

হেমনাথ বললেন, 'শর্তটা হল, এখন যদি যাও দুপুরে সন্ধ্যে দুবেলাই পড়তে হবে। তখন কিন্তু গোলমাল করতে পারবে না।'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না-না, মোটে গোলমাল করব না। দুপুরবেলা সন্ধ্যেবেলা যতক্ষণ পড়তে বলবে ততক্ষণ পড়ব।'

'এখন তো খুব ভাল ভাল কথা বেরুচ্ছে। ফিরে এসে দেখা যাবে'খন।' হেমনাথ হাসলেন, 'যা, জামা-প্যান্ট বদলে আয়।'

বিনু ভেতর-বাড়ির দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, সেই সময় তীক্ষ্ণ চাপা গলায় ঝিনুক চেঁচিয়ে উঠল, 'ম্‌ না—'

হেমনাথ বললেন, 'তোর আবার কী হল রে?'

ঝিনুক আগের সুরেই বলল, 'বিনুদা যাবে না—'

একে তো অনেক কষ্টে বহু কান্নাকাটির পর বেড়াতে যাবার সনদ মিলেছে আর ঝিনুক কিনা তার পায়ে বেড়ি পরাতে চাইছে! মাথার ঠিক থাকল না বিনুর। গলা ভেংচে চেঁচিয়ে উঠল, 'যাবে না! ইল্লি রে! যাব তো, নিশ্চয়ই যাব।' বলেই আর দাঁড়াল না; লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখের পলকে ভেতর-বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখ কুঁচকে বিনুর যাওয়া দেখল ঝিনুক; তারপর আস্তে আস্তে হেমনাথের পাশ থেকে উঠে ভেতরে চলে গেল।

ঝিনুক যখন বিনুকে খুঁজে বার করল তখন তার প্যান্ট-জামা পরা শেষ; শার্ট মাথায় গলিয়ে সে ফিতে বাঁধছে। সোজা গিয়ে ঝিনুক তার মুখোমুখি দাঁড়াল এবং কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দেখতে লাগল।

ফিতে বাঁধতে বাঁধতে একবার ঝিনুককে দেখে নিল বিনু; তারপর খুব বিরক্তভাবে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

ঝিনুক ডাকল, 'এ্যাই—'

না তাকিয়েই বিনু সাড়া দিল 'কেন?'

'তুমি তা হলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথা শুনবে না?'

'না।'

'বেশ, আমি মাসিমাকে সেই কথাটা তবে বলে দিচ্ছি।'

বিনু শুধলো, 'কোন কথাটা?'

খুব আলতো করে ঝিনুক বলল, 'সেই যে জলে পড়ে গিয়েছিলে—'

বিনু ভয় পেয়ে গেল। অনুনয়ের সুরে বলল, 'না-না, বোলো না।'

'আমার কথা না শুনলে বলবই।'

বিনু এবার বোঝাতে চেষ্টা করল। সে গেলে ঝিনুকের তো কোন ক্ষতি নেই। ঝিনুক কিন্তু বুঝল না। বলল, 'তুমি গিয়ে ঝুমার সঙ্গে খেলা করবে। ওর এয়ার গান আছে, লুডো আছে, কেরম আছে। আমি সব জানি।'

বিনু অবাক। হতভম্বের মতন বলল, 'ঝুমার সঙ্গে খেললে তোমার কী?'

'ন্‌না—'

'কী?'

'তুমি ওর সঙ্গে খেলতে পারবে না।'

পুবের ঘরের বারান্দা থেকে হেমনাথের গলা ভেসে এল, 'কী হল রে দাদাভাই, জামা-প্যান্ট পরতে কতক্ষণ লাগছে? শিগগির আয়—'

ঝিনুক বলল, 'বলে দাও, তুমি যাবে না।'

বিনু বিদ্রোহ করতে যাচ্ছিল। তার চোখ-মুখ লক্ষ্য করে ঝিনুক দ্রুত বলে উঠল, 'না বললে সেই কথাটা কিন্তু—'

বিনু ম্রিয়মান হয়ে গেল। মনে মনে বানিয়ে গলা তুলে বলল, 'আমি যাব না দাদু, বড্ড পেট ব্যথা করছে।' বলে ধীরে ধীরে একে একে জুতো জামা খুলে ফেলতে লাগল। ভাবল, ঝিনুক নামে এই মেয়েটা বয়সে ছোট হলে কী হবে, অত্যন্ত সাংঘাতিক। একটা অমোঘ অস্ত্র পেয়ে গেছে সে। সেটা দেখিয়ে চিরকাল হয়তো ঝিনুক নিজের ইচ্ছে মতো বিনুকে চালিয়ে যাবে।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর বিনু খাঁকিয়ে উঠল, 'যেতে তো দিলে না, এখন আমি কী করব?'

খুব নিরীহের মতন মুখ করে ঝিনুক বলল, 'পড়বে। পড়া হলে আমার সঙ্গে খেলা করবে।'

রাগে বিনুর গা জ্বলতে লাগল। পারলে ঝিনুকের ঝুঁটি ছিঁড়ে দিত। তার বদলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল, যার জোরে এখন পারছে, বলে গেছে তোমার সঙ্গে খেলতে।'

দুপুরবেলা বিনুকের বই আর এক-খানা বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন হেমনাথরা। তারপর বাকি দিনটা বন্দুকের পরিচর্চা করে কাটালেন অবনীমোহন, সেই সঙ্গে সমানে শিকারের গল্প চলল। জিম করবেট থেকে শুরু করে পৃথিবীর বাঘা বাঘা শিকারীর অত্যুগ্র কীর্তিকাহিনী বলে গেলেন। শুনতে শুনতে মনে হল, পশু-পাখির প্রাণ নেওয়া ছাড়া জগতে অন্য কিছু তাঁর জানা নেই। সারা জীবন এই একটা কাজই তিনি করেছেন। মোট কথা, যখন যে স্রোতটি আসে তাই অবনীমোহনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

●

দেখতে দেখতে আরো চার-পাঁচটা দিন রঙীন প্রজাপতি হয়ে চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গেল।

এর ভেতর প্রায় রোজই বিনুরা বেড়াতে বেড়িয়েছে। হেমনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টিমারঘাটা পার হয়ে স্কুল-সেটেলমেন্ট অফিস-থানা-আদালত পেছনে ফেলে নদী-পারের সুদূর ঝাউবন পর্যন্ত একটানা পাড়ি। ফলে রাজদিয়াকে খুব ভাল করেই চেনা হয়ে গেছে। কতটুকুই বা শহর। মেরুদণ্ডের মতন একটা বড় রাস্তার দুধারে সরু সরু শাখা-প্রশাখায় যতখানি সম্ভব তার চাইতে অনেক কমই বেড়েছে রাজদিয়া। এ শহর বড় কুণ্ঠিত, তার স্বভাব অসীম সঙ্কোচ দিয়ে ঘেরা। সবাই যখন বাড়ে, প্রগলভ হয়, তখন আপন ভীরুতার ভেতর সে মূক হয়ে থাকতে ভালবাসে।

শুধু রাজদিয়ার ভূগোলটাকে ভাল করে জেনে নেওয়া নয়, এই চার-পাঁচদিনে আরো একটা মনোরম ব্যাপার ঘটেছে। দল বেঁধে সবাই একদিন নিশিন্দার চরে গিয়ে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এসেছে বিনুরা।

নদীর মাঝমাঝিখানে সুবিশাল ভূখণ্ড জুড়ে শুধু শ্যামল বনানী। এখানে মানুষের বসতি এখনও গড়ে ওঠে নি। মানুষ আসার আগেই—পৃথিবীর আদি সন্তান উদ্ভিদেরা এসে গেছে। হেমনাথ জানিয়েছেন, এখানকার মাটি ফসল ফলানোর যোগ্য হয়ে উঠলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ হানা দেবে।

যাই হোক নিশিন্দার চরের ঝোপঝাড় বনভূমি জুড়ে শুধু পাখি, পাখি আর পাখি। হরিয়াল, ঘুঘু, ডাক, দোয়েল, পাতিবক; মোহনচূড়া—চেনা-অচেনা কত যে পাখি তার হিসেব নেই।

শিকারী বলতে বিনুদের দলে মোটে দুজন—অবনীমোহন আর আনন্দ। অবনী-মোহন তবু দু-চারটে হরিয়াল-টরিয়াল মেরেছেন; আনন্দ কিন্তু একটা গুলিও নিশানায় লাগাতে পারে নি। এই নিয়ে সবাই, বিশেষ করে সুধা আর হেমনাথ আনন্দর পেছনে লেগেছিল।

ঠোঁট টিপে বিদ্রূপের গলায় সুধা বলেছে, 'কি মশাই, আপনি না বাঘ

মেরেছেন, গণ্ডার মেরেছেন, বেন মেরেছেন জেন মেরেছেন—আজ সে একটা পাখিও মারতে পারলেন না!'

হেমনাথ বলেছেন, 'ও কী করবে বল দিদি। পাখিগুলো বা বদমাইস, ওর গুলির সামনে বুক পেতে দিচ্ছে না!'

মুখ লাল হয়ে উঠেছে আনন্দর। বিরক্ত-ভাবে সে জানিয়েছে, কিছুদিন ধরে তার চোখটা ভাল যাচ্ছে না, সব ঝাপসা দেখছে। কাজেই নিশানা ঠিক করতে পারে নি। তুচ্ছ পাখি মেরে কী হবে, সত্যিকারের বাঘ মেরে সে দেখিয়ে দেবে।

সুধা বলেছে, 'এখানে বাঘ কোথায় পাবেন? চারদিকে জল, আপনার হাতে মরবার জন্যে জল সাঁতরে আসতে তাদের বয়ে গেছে।

হেমনাথ সকৌতুকে বলেছেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, একটা বাঘটাঘ যোগাড় করতে পারি কিনা দেখি। বেচারা অত করে বললে, মরবে—'

সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছে। আনন্দ আর মুখ তুলতে পারে নি।

নিশিন্দার চরে আরো একটা ব্যাপার হয়েছে সেটা এই রকম। অবনীমোহন-আনন্দ, হেমনাথ-সুধারা যখন শিকার-টিকার আর ঠাট্টায় ব্যস্ত সেই সময় ঝুমা বিনুকে নিয়ে বালুকাময় প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি হুটোপুটি করে বেড়িয়েছে। ছোটাছুটির ফাঁকে বিনু লক্ষ্য করেছে, যেখানে যেখানে তারা গেছে ঝিনুক ঠিক ছায়ার মতন তাদের পিছু নিয়েছে। কিছুই বলে নি ঝিনুক, শুধু চোখ কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। ফলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছে বিনু।

আজকাল আড়ালে বিনুর সঙ্গে কথা বলে ঝিনুক, কিন্তু ঝুমা কাছে থাকলে সে একেবারে বোবা।

পাখি শিকার, রাজদিয়াকে ভাল করে চেনা—এসব তো হয়েছেই এই ক'দিন, সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি বিনুর জীবনে ঘটেছে তা হল যুগলের কাছে সাঁতার শেখা। ডুব সাঁতার, চিত সাঁতার, বুক সাঁতার—তিন রকম সাঁতার শিখে ফেলেছে বিনু।

চার-পাঁচদিন পর এক সকালবেলায় হঠাৎ হিরণ এসে হাজির। বিনুরা পুবের ঘরের বারান্দায় পড়তে বসেছিল। অবনীমোহন নেই। আজকাল সকাল হলে আর বাড়ি থাকেন না তিনি, বেরিয়ে পড়েন। কোনদিন একা-একাই রাজদিয়ার নিরালা পথে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে হাঁটেন, কোনদিন বা যুগলকে নিয়ে নৌকোয় করে জলমগ্ন প্রান্তরে পাড়ি জমান। পূর্ববাংলা তার রমণীয় আকাশ-বাতাস, ধানবন, আশ্বিনের মেঘ, স্নিগ্ধ দৃশ্যপট নিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

হেমনাথ কোথাও বেরুতে যাচ্ছিলেন, হিরণকে দেখে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'আসুন আসুন, হিজ ম্যাজেস্টির আসতে আজ্ঞা হোক বলেই স্নেহলতাকে ডাকতে লাগলেন, 'ওগো, দেখে যাও কে এসেছে।'

ভেতর-বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন স্নেহলতা। তাঁর পিছু পিছু শিবানী আর সুরমা।

হিরণকে দেখে স্নেহলতা ভারি খুশী, কিছুটা অবাকও। এই মুহূর্তে তাকে প্রত্যাশা করেন নি। বোধহয়। বললেন, বলা নেই কওয়া নেই, কোথায় গিয়েছিলি রে হনুমান?'

হিরণ হাসিমুখে বলল, 'ঢাকা—'

'সে তো জানি। যুগলকে সেদিন তোদের বাড়ি পাঠানো হয়েছিল, সে এসে বলল। ঢাকায় কোন রাজকার্যটা ছিল শুনি—'

'বই কিনতে গিয়েছিলাম।'

'বই কিনতে ক'দিন লাগে? সকালবেলা এখান থেকে বেরুলে সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসা যায়। তুই এলি ক'দিন পর?' স্নেহলতা চোখ পাকালেন।

হাত জোড় করে কাচুমাচু মুখে হিরণ বলল, 'প্রসন্না হও দেবী প্রসন্না হও। অত রাগারাগি করলে আমি কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে যাব।'

তার ভাবভঙ্গি দেখে সবাই হেসে ফেলল।

স্নেহলতাও হেসে ফেললেন, 'তোকে নিয়ে আর পারি না। আমি গুনে রেখেছি, আট দিন তুই ঢাকায় গিয়ে আছিস। কেন?'

'বললাম তো বই কিনতে গিয়েছিলাম। তারপর পড়লাম বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায়, তারা আসতে দিতে চায় না।'

হেমনাথ এই সময় বললেন, 'উনি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করছেন। আমরা এদিকে ভেবে মরছি। হ্যাঁ রে বাঁদর, ঢাকা থেকে কী বই কিনে আনলি?'

'এই যে—' বগলের তলা থেকে দুখানা বই বার করল হিরণ। বলল, 'একটা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র নাট্যরূপ। আরেকটা রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা খণ্ড, এতে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটা আছে।'

'কী হবে এ সব দিয়ে?'

'বা রে, পুজোর সময় নাটক-টাটক হবে না?' হিরণ বলতে লাগল, 'অন্যবার শুধু নাটক হয়, এবার এমন একটা কিছু করব যা রাজদিয়াতে কোনদিন হয় নি।'

হেমনাথ চোখ কুঁচকে শুধোলেন, 'সে বস্তুটা কী?'

'ড্যান্স ড্রামা—'

'সেটা কিরকম?'

রহস্যময় হেসে হিরণ বলল, 'যথা সময়ে দেখতে পাবেন।'

হেমনাথও হাসলেন, 'বেশ, তাই হবে। আমি এখন চলি, তোরা কথাবার্তা বল। এতদিন পর এলি, একেবারে খাওয়া-দাওয়া করেই যাস।'

'খাওয়া-দাওয়ার কথা বলতে হবে না সেটি না করে আমি নড়ছি না। আমি এলাম আর আপনি চললেন কোথায়?'

'লালমোহনের খোঁজে।'

হিরণকে চিন্তিত দেখাল, 'খোঁজ মানে?'

'আর বলিস না, ক'দিন আগে সুজন-গঞ্জের হাট থেকে রুগী দেখতে চরবেউলা গিয়েছিল; বলেছিল পরের দিন ফিরবে। সাত-আট দিন পার হতে চলল, এখনও ফেরে নি।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'রোজ একবার করে খবর নিচ্ছি। আজও যদি না এসে থাকে কারোকে চরবেউলা পাঠাতে হবে।'

'হ্যাঁ পাঠানো তো দরকারই। দেখুন গিয়ে লালমোহনদাদু এসেছেন কিনা—'

হেমনাথ চলে গেলেন। স্নেহলতাও হিরণকে বসতে বলে ভেতর-বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। এখন সুধা-সুনীতি, ঝিনুক, সুরমা এবং হিরণ ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

বারান্দার একধারে বসতে বসতে হিরণ বলল, 'অন্য অন্য বার আমরা ঐতিহাসিক নাটক করি। এবার সুধাদেবী সুনীতিদেবী এসেছেন, তাই বেছে বেছে সামাজিক নাটক আর নৃত্যনাট্য নিয়ে এসেছি। দেখবেন চারদিকে কেমন সাড়া পড়ে যায়। আমি তো ঢাকায় বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন পর্যন্ত করে এসেছি। সপ্তমী আর অষ্টমীর দিন ওরা নাটক দেখতে আসবে। একবার দেখলে বাছাধনদের মাথাটি ঘুরে যাবে।'

বিনুদের পড়াশোনা থেমে গিয়েছিল। সুনীতি আঁতকে ওঠার মতন করে বলল, 'আবার নেমন্তন্নও করে এসেছেন!'

উল্লাসের সুরে হিরণ বলল, 'না রে, করব না! শুধু প্রোগ্রাম ছাপিয়ে বিলি করে এলোমেলো... দাঁতকাদিম-বল্লযোগিনী এই সব জায়গাতেও খবর পাঠাব—'

'আপনার বুঝি ধারণা, আমরা দারুণ নাচতে-গাইতে আর অভিনয় করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাদের নাচও দ্যাখেন নি, গানও শোনেন নি, অভিনয়ও দ্যাখেন নি। তবু কী করে যে এমন ধারণা হল! শেষ পর্যন্ত একটা কেলেংকারি হবে।'

নিরুদ্বেগ গলায় হিরণ বলল, 'শেষ পর্যন্ত কী হবে, আমি জানি। সেজন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। শুধু আমি যা বলি সেইটুকু করে যাবেন।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'ক'দিন ছিলাম না; এর ভেতর কারা কারা কলকাতা থেকে রাজদিয়ায় এসেছে জানি না। আজই খোঁজ নিয়ে এ্যাক্টর অ্যাকট্রেসদের একটা লিস্ট করে ফেলতে হবে। পুজোর আর দেরি নেই। কাল থেকে রিহার্সালে বসতে হবে।'

গান-বাজনা নাটক-টাটকে বিশেষ আগ্রহ ছিল না সুরমার। একটু সুযোগ পেতেই তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাদের বাড়িটা কোনদিকে হিরণ?'

হিরণ সুরমার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আজ্ঞে, স্টিমারঘাটার কাছাকাছি—'

'রাজদিয়া আসার পর অনেকেই তাদের বাড়ি যেতে বলে গেছে; যাওয়া হয় নি। ভেবে রেখেছি আগে তোমাদের বাড়ি যাব, তারপর অন্যদের—' হিরণকে ঘিরে সুরমার মনে রঙীন বাসনায় আভা লেগেছে।

বিব্রত মুখে হিরণ বলল, 'আমাদের বাড়ি যাবেন?'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে আহত হলেন সুরমা। বললেন, 'তোমার আপত্তি থাকলে অবশ্য যাব না।'

হিরণ চকিত হয়ে দু হাত নাড়তে লাগল, 'না-না, আপত্তি নয়। তবে—'

'তবে কী?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু গলায় হিরণ বলল, 'বুড়ো অথর্ব ঠাকুরদা আর এক বিধবা জেঠাইমা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।'

সুরমা চমকে উঠলেন, 'কেন, তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন?'

'আমার জন্মের পরই বাবা-মা মারা গেছেন। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান।' হিরণ বলতে লাগল, 'ঠাকুরদাও আজ দশ-বারো বছর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, জেঠাইমার প্রায়াক্ষম অকথ্যের শুচিবাই; কেউ বাড়ি ঢুকলে গোবর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেন। সেই জন্যে কাউকে নিয়ে যেতে চাই না।'

সহানুভূতিতে সুরমার মুখ আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। কোমল স্বরে তিনি বললেন, 'কিছু মনে কোরো না বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

'বেশ তো করুন না।'

'তুমি তো ঢাকায় থেকে পড়; ঠাকুরদার ঐ অবস্থা। জমিজমা বিষয় সম্পত্তি দেখা-শোনা করে কে?'

হিরণ হাসল, কিছু বলল না।

সুরমা শুধোলেন, 'হাসলে যে?'

'ছোট একখানা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের।'

'তা হলে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুরমা।

'আপনি কী বলতে চান, বুঝেছি। জমিজমা নেই, বিষয়-সম্পত্তি নেই, তবু আমাদের সংসার কেমন করে চলে, এই তো?'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন সুরমা, অর্থাৎ তাই।

গম্ভীর গলায় হিরণ বলল, 'হেমদাদু চালান। আমাদের সংসার, আমার পড়া-শোনা—সব তাঁর দয়ায় চলছে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, এই রাজদিয়ায় কত মানুষকে হেমদাদু বাঁচিয়ে রেখেছেন। উনি না থাকলে আমরা মরে যেতাম। অবশ্য—'

সুধা-সুনীতি আর বিনু হেমনাথের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তারা কিছু বলছিল না, এবারও বলল না। সুরমা বললেন, 'অবশ্য কী?'

সামান্য হেসে হিরণ বলল, 'আমার ব্যাপারে হেমদাদুর একটু স্বার্থ আছে।'

'কিরকম?'

'এম-এটা যদি পাশ করতে পারি রাজদিয়া কলেজে আমাকে পড়াতে হবে। অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'যদি ভাল চাকরি পাও?'

'তবুও না। হেমদাদু বলেন, সবাই যদি টাকা-পয়সার লোভে দেশ ছেড়ে চলে যায়, দেশ চলবে কেমন করে?'

গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে সুরমা বললেন, 'সে তো ঠিকই—'

প্রসঙ্গটা আরো কিছুক্ষণ হয়তো চলত। এই সময় অবনীমোহন ফিরে এলেন। হিরণকে দেখে খুব আনন্দিত। বললেন, 'ঢাকা থেকে কবে এলে?'

হিরণ বলল, 'আজই। সকালবেলা ফিরেছি, ফিরেই আপনাদের বাড়ি এসেছি।'

'বেশ করেছ। ঢাকা গিয়েছিলে কেন?' কেন গিয়েছিল, হিরণ বলল। নাটকের কথা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন অবনীমোহন। হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন, 'অভিনয় দেখেছি বটে শিশির ভাদুড়ি মশায়ের। তারপর একে একে গিরীশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তফি, দানীবাবু, কর্ণার্জুন, মিশরকুমারী, নীলদর্পণ, আলমগীর—উচ্ছ্বসিত সুরে বহু দিগ্বিজয়ী অভিনেতা আর নাটকের নাম করে গেলেন, হিসেব নেই।

এই অবনীমোহনই ক'দিন আগে শিকার ছাড়া আর কিছু জানতেন না। পশু-পাখিদের প্রাণহনন ছাড়া অন্য কোন স্বপ্ন দেখতেন না। এখন সে সবের বিন্দুমাত্র মনে নেই তাঁর। এখন তাঁর চোখ জুড়ে শুধু রঙ্গমঞ্চের মোহচ্ছন্ন জগৎ।

দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে আর বসল না হিরণ, চলে গেল। ফিরে এল রাত্রিরে। জানিয়ে গেল নাটক এবং নৃত্যনাট্যের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী ঠিক হয়ে গেছে। সুনীতি একাই 'শ্যামা'তে শ্যামা, 'দত্তা'র নাটকে 'বিজয়া'তে বিজয়ার ভূমিকা পেয়েছে। দুটো বইয়েরই নামভূমিকা তার। অবনীমোহন পেয়েছেন 'বিজয়া'তে দয়ালের ভূমিকা। সুনীতি করবে বিজয়াতে নলিনী। শ্যামায় তার কোন ভূমিকা নেই। অবশ্য তাকে পশ্চাৎপটে বসে 'শ্যামার গানগুলো' গাইতে হবে। বিনুর ভাগেও ছোটখাট একটা 'রোল' পড়েছে।

'সব শুনে সুধার কানে মুখ গুঁজে দিল সুনীতি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'পক্ষপাতিত্বটা দেখলি? সব মেইন মেইন রোল তোর জন্যে; আমার বেলা ঘুঁটে কুড়ুনির পার্ট।'

সুধা বলল, 'হিংসে হচ্ছে। বলিস তো তোকেও শ্যামা আমার বিজয়ার রোল দুটো দিতে বলি।'

'অত কাঙাল নই আমি।' বলেই গলা আরো অতলে নামিয়ে দিল সুনীতি, 'দেখিস, ও শ্যামাতে বজ্রসেন, বিজয়ার নরেনের রোল নেবে। দুজনে না—'

'কী?'

'জমিয়ে দিবি।'

সুধা বলল, 'হিংসে করিস নি দিদিভাই; আনন্দবাবুকে বলব দুটো বাঘ মেরে যেন বলে একটা তুই মেরেছিস। চারদিকে ধন্য, ধন্য পড়ে যাবে। জমবে ভাল।'

সুনীতি হাসতে হাসতে বলল, 'রঙ্গের মেয়ে—'

দেখতে দেখতে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। রাজদিয়ার প্রবাসী সন্তানেরা প্রায় সবাই পুজোর ছুটিতে দেশে ফিরেছে। শহর এখন জম-জমাট। পোটো-পাড়ায় প্রতিমাগুলোতে এক-মেটে দু-মেটে মেটের পর রঙ্গারঙ শুরু হয়েছে। এদিকে হিরণদের নাটকের রিহার্সাল চলেছে পুরো দমে।

মহালয়ার যখন তিন দিন বাকি সেই সময় দুটো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।

খাসিয়া জাতির কয়েকটি প্রথা

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী

কিছুদিন আগেও খাসিয়া জাতি আজকের দিনের মত আত্মসচেতন ছিল না। কিন্তু ইদানীং খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা নিজেদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বেশ উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁদের প্রতি দেশের বহু লোকের উৎসুক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এদের আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেকেরই হয়ত তেমন কোন ধারণা নেই। এখানে তাঁদের প্রধান প্রধান এমন গোটা-কতক প্রথার উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলো সমতলবাসীদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রথমেই একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, আজ-কালও, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা সৎ, অতিথিবৎসল ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি-সম্পন্ন। এমন দিন ছিল যখন চুরি করা, কাউকে ঠকানো বা এই ধরনের অন্যায় কোন কাজ তাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। আগেকার দিনে খাসিয়া পাহাড়ে যান-বাহনের ব্যবস্থা তেমন কিছু ছিল না; তাই তখন কোথাও যাতায়াত করতে মোট-ঘাট বয়ে নেবার জন্যে খাসিয়া মজুরদের নিযুক্ত করতে হত। এদের হাতে বহুমূল্য দ্রব্যাদিপূর্ণ মোটঘাটও তুলে দিতে এতটুকু ভয়ের কারণ ছিল না। সুদীর্ঘ দুর্গম পাহাড়ের পথে তারা—সারা রাস্তায় তাদের টিকিটুকু পর্যন্ত দেখতে না পাওয়া গেলেও—সেগুলো অটুটভাবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিত। পল্লীবাসীদের ভেতর এখনও খুবই সাধু চরিত্রের লোক দেখতে পাওয়া যায়।

অপূর্ব অতিথি সৎকার

সুদূর পল্লী অঞ্চলের খাসিয়াদের মধ্যে আতিথেয়তার একটা চমৎকার প্রথার কথা শুনতে পাওয়া যায়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ঐ সকল জায়গার অধিবাসীরা কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক সবাই চাষবাসের সময়—আলুর চাষই প্রধান — নিজ নিজ জমিতে কাজ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঐ সময় তারা কোন বাড়ির কোন ঘর-দরজাই তালা লাগিয়ে বন্ধ করে যায় না। তখন গ্রামে কোন অতিথি এসে উপস্থিত হলে অতিথিটি তার পূর্ব-পরিচিত যে কোন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোন বাধা নেই। আর অতিথিরা ঐ বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের যে কোন জিনিস-পত্রাদি নিয়ে ওখানকার বাসনপত্রের সাহায্যেই ইচ্ছে মত রান্নাবান্না করে স্বচ্ছন্দে খাবার-দাবার পাট সেরে নিতে পারেন। তবে এতে সামান্য একটুখানি বাধ্যবাধকতা এই, অতিথিদের চলে যাবার আগে ব্যবহৃত বাসনপত্রগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মেজে-ধুয়ে যেমনটি ছিল তেমনি করে তুলে রেখে যেতে হয়। নিতান্ত অপরিচিত কোন লোক গ্রামে এসে উপস্থিত হলে তাকে যেতে হয় এমন কোন বাড়িতে যে বাড়ির কেউ বেশি বয়েসের জন্যেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক বেরোতে পারেন নি। যথাযথ পরিচয় দেবার পর এই প্রকারের অতিথিরও যথাসম্ভব আতিথ্যের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এই ধরনের অতিথি সৎকারের উদাহরণ অন্য কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। শিলং শহরের অধিবাসী আমাদের বিশেষ পরিচিত ও বিশ্বস্ত কিন্তু তেমন সম্পন্ন নয় এরূপ কোন খাসিয়া ঠিকাদারের পল্লী অঞ্চলে কিছু চাষের জমি রয়েছে। তাকে উল্লিখিত প্রথাটির সত্যতা সম্পর্কে জিগ্যেস করায় ও জবাব দিলে এই ধরনের প্রথা তাদের মধ্যে সত্যি সত্যিই প্রচলিত আছে, তবে সে নিজে যখন তার লোকজন নিয়ে চাষবাসের জন্যে শহর থেকে রওনা হয় তখন নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবার দাবার জিনিসপত্র সব সঙ্গে করেই নিয়ে যায়। আর যাদের ঘরে গিয়ে অতিথি হয় তাদের বাসনপত্রই শুধু ব্যবহার করে থাকে, অন্য কিছুই নয়।

বনের গাছপালা ও পারস্পরিক সহযোগিতা

খাসিয়া পাহাড়ের চার দিকেই বিস্তর গাছপালার জঙ্গল রয়েছে। গ্রামবাসীরাই ঐ সকল জঙ্গলের মালিক। গ্রামের যে কেউ এই সব জঙ্গল থেকে আবশ্যকমত জ্বালানি অথবা ঘর-দরজা তৈরির কাঠ কেটে নিতে পারে। তবে এ সম্পর্কে একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যার যেমন খুশি কেটে নেবে, মোটেই তা নয়। প্রতি গ্রামে দরবার নামে এক-একটা পঞ্চায়েত আছে। চাষ-বাসের কাজ শেষ হয়ে গেলে শীতকাল এসে পড়ে। ঐ সময় ঐ দরবার প্রতি পরি-বারের লোকসংখ্যার অনুপাতে তাদের যথোপযুক্ত জ্বালানি কাঠ কেটে নেবার অনুমতি দেন। কোন পরিবার জঙ্গলের কোন অংশ থেকে তাদের প্রাপ্য কাঠ কেটে নেবে দরবার তারও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। প্রথমে গ্রামবাসীরা যার যার চিহ্নিত অংশে অনুমানিক কতকগুলি গাছপালা কেটে ঐগুলি নির্দিষ্ট মাপমত টুকরো টুকরো করে কাছে কোথাও জমা করে রাখে। এর পর জমা-করা কাঠ সব দরবারের নির্দেশ-মত দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা অনুসারে মেপে দেয় হয়। তারপর গ্রামবাসীরা কাঠগুলো নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। ঐ সময় দলে দলে লোক জঙ্গলে গিয়ে ঐ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। কারু বাড়ি-ঘর তৈরির জন্যে কাঠের দরকার হলে দরবার বিশেষ বিবেচনার পর জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নেবার অনুমতি দেন। ঘর-দরজা তৈরি করার কাজেও গ্রামবাসীরা একে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে; এই সব সাহায্যকারীদের শুধু আহার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে দিলেই চলে। এই ধরনের সহায় সাহায্য পারস্পরিক। বীজ বোনা ও ফসল তোলার সময়ও এই প্রকার পারস্পরিক সাহায্যের প্রথা আছে। গ্রামের কারু মৃত্যু হলে মৃতদেহটি পোড়াবার জন্যে দরবার জঙ্গল থেকে আবশ্যক কাঠ কেটে নেবার অনুমতি দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খাসিয়া পাহাড়ে বহু সংখ্যক খৃস্ট ধর্মাবলম্বী রয়েছেন। যাঁরা খৃস্টান তাঁদের সব কবর দেয়া হয়। আর অন্যদের শব অধিকাংশ স্থলেই দাহ করা হয়।

পরার্থপরতা

খাসিয়াদের কারু ঘর-বাড়ি পুড়ে গেলে বা তাদের যে কেউ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধবেরা ঐরূপ ব্যক্তিকে টাকাকড়ি দিয়ে বা অন্যভাবে সাহায্য করে তার দুঃখ-দুর্দশা যথাসম্ভব লাঘব করতে পারলে তা খুবই গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন। এটা হল নিজেদের মধ্যের কথা। কোন বিদেশীকে পর্যন্ত এই ধরনের সাহায্য করার কথা শোনা গিয়েছে। প্রায় শতক ত্রিশেক আগে মিঃ আর সি উডফোর্ড নামে জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক আসাম কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি শিলং শহর থেকে কিছু দূরে 'আপার শিলং' নামক স্থানে একটি বিরাট বাংলো তৈরি করে সেখানে বসবাস করতেন। ১৯৪৬ সালে এই বাংলোটি হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে যায়। ঐ সময় তাঁর পরিচিত বহু খাসিয়া তাঁকে নিজ অবস্থা অনুযায়ী সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ভদ্রলোক প্রথমে এই ধরনের সাহায্য গ্রহণ করতে অসম্মত হন। কিন্তু তিনি যখন এটা

জানতে ও বুঝতে পারলেন যে, এরকম সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলে তা ঐ সকল শুভানুধ্যায়িগণের বিশেষ মনোকষ্টের কারণ হবে তখন তিনি দ্বিধা না করে ধন্যবাদের সঙ্গে তাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই ধরনের ব্যক্তিগত সাহায্য লোকে কর্তব্য-বুদ্ধিতেই করে থাকে, আর দাতাগণ উপকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন রকম কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্যন্ত আশা করে না। এমন কি, কেউ দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্যে চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় না। এসব বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলেরই কথা।

হাট

দেশের সব জায়গাতেই যারা হাটে জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসে তাদের কাছ থেকে হাটের মালিক শুল্ক বা তোলা আদায় করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়, অনেকে এই দেয়াটা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। বহুদিন আগের কথা নয়, কিছুদিন আগেও খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের কোন কোন হাটের কাছে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় একটি পাত্র রেখে দেয়া হত। কেউ এসে চেয়ে নেবার অপেক্ষায় বসে না থেকে সকলেই ঐ পাত্রে আপন আপন দেয় রেখে দিতে অভ্যস্ত ছিল। পয়সাকড়িগুলি সারা দিন ওখানেই পড়ে থাকত, আর দিনের শেষে মালিকের জনৈক কর্মচারী এসে এগুলি তুলে নিয়ে যেত। দুঃখের বিষয় এই চমৎকার পুরনো প্রথাটি আজকের দিনে আর চালু নেই।

খাসিয়া পাহাড়ের হাটগুলির ব্যবস্থা একটু অভিনব। এখানে হাটের সপ্তাহ সাত দিনের জায়গায় আট দিনে গোনা হয়। প্রধানত ৮টি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দিনে হাট বসে থাকে। আজ কোন স্থানে হাট বসবে, কাল বসবে অন্য জায়গায়, তারপর দিন আবার অন্যত্র এবং ক্রমে অষ্টম স্থানে বসার পর আবার প্রথম জায়গায় ফিরে এসে বসবে। এতে হাটগুলি কোথাও কোন নির্দিষ্ট দিনে না বসে ঘুরে ঘুরে চলতে থাকে। যেমন কোন সোমবার দিন যদি এক স্থানে হাট বসে তাহলে সেখানে পরবর্তী হাট বসবে পরের সপ্তাহের মঙ্গলবার দিন, তার পরের সপ্তাহে বুধবার দিন ইত্যাদি; প্রায় সকল হাটের বেলাতেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগে খাসিয়া পাহাড় গোটাকতক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এগুলি সীয়েমশিপ নামে পরিচিত। এই সকল সীয়েমেরাই হাটের মালিক, যদিও সরকারেরও কিছু কিছু হাট রয়েছে। শিলং শহরে লাইমুখরা নামক অংশে শিলং মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট হাট রোজই বসে থাকে।

জমি-জমার বিলি-ব্যবস্থা

খাসিয়া পাহাড়ে দু রকমের জমি আছে। এক প্রকারের নাম 'রি কিঙ্ভি' বা ব্যক্তিগত জমি, আর দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'রি রেইড' বা জনসাধারণের জমি। যার প্রথমোক্ত ধরনের জমি রয়েছে সে-ই ঐরূপ জমির মালিক। শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই এই সকল জমির মালিকানা পরিবর্তিত হতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিগত জমির জন্যে—তা বাস্তু ভিটে বা চাষবাসের জমি যাই হোক না কেন—কাউকে কোন রাজস্ব বা খাজনা দিতে হয় না, আর এগুলোর মালিকানা চলতে থাকে বংশ-পরম্পরাক্রমে। যে ব্যক্তি বা পরিবারের ব্যক্তিগত জমি নেই তাদের জন্যেই দ্বিতীয় প্রকারের জমির ব্যবস্থা। যে কোন ব্যক্তিগত জমির মালিক অন্য সীয়েমের এলাকায় চলে গেলে নতুন জায়গায় সে একজন ভূমিহীন ব্যক্তি। এই প্রকার লোককেই চাষবাস ও ঘর-বাড়ি তৈরির জন্যে দ্বিতীয় প্রকারের জমি বিলি করা হয়। ঐরূপ ব্যক্তি পূর্ব সীয়েমের এলাকাভুক্ত তার প্রথম প্রকারের জমিও ভোগ করতে থাকে। যদি কেউ তার নতুন বাস-স্থানে এসে নতুন জমি ৩ বৎসর কাল কাজে না লাগিয়ে শুধু শুধু ফেলে রাখে তাহলে তার সঙ্গে সেই জমির বন্দোবস্ত বাতিল করে দেয়া যেতে পারে। এই ধরনের জমির বেলাতেও কাউকে কোন খাজনা দিতে হয় না। তবে এসব ক্ষেত্রে একটিমাত্র পালনীয় শর্ত হচ্ছে — জনসাধারণের কল্যাণকল্পে কোন কার্য বিশেষের প্রয়োজনে এই ধরনের জমির মালিক টাকাকড়ি দিয়ে বা অন্য প্রকারে সহায় সাহায্য করতে বাধ্য।

বর্তমানে শিলং শহরে সমর বিভাগের জন্যে রক্ষিত কতক জায়গা জমি ও অল্প কিছু ব্যক্তিগত জমি ছাড়া অধিকাংশ জমিই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। বহুকাল পূর্বে এই শহরের কিছু অংশের মালিকানা স্বত্ব আসাম সরকার বিশেষ বন্দোবস্তের মাধ্যমে মুল্লিম সীয়েমের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। এই সকল জমি কোনরূপ বন্দোবস্ত নেয়া, বিক্রয় বা হস্তান্তর করায় ব্যাপারে খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি নিতে হয়, আর বার্ষিক খাজনা প্রতি বৎসর স্টেট ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়। শহরের অন্য সব জমির বেলায় উক্ত ডেপুটি কমিশনার মারফৎ মুল্লিম সীয়েমের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়, আর এরূপ জমির বাৎসরিক খাজনা উক্ত সীয়েমের কাছারীতে দাখিল করতে হয়।

উত্তরাধিকার

খাসিয়া জাতির সমাজব্যবস্থা মাতৃ-তান্ত্রিক। এদের মধ্যে মায়েরাই বংশের আদি, সব কিছুতে মায়েদেরই প্রাধান্য এবং উত্তরাধিকার মায়েদের মাধ্যমেই চলে থাকে। বংশের হিসেব মাতা থেকেই শুরু করা হয়, এতে পিতার কোন স্থানই নেই; পিতার একমাত্র পরিচিতি সন্তানের জনক বলেই। বিয়ের পর স্ত্রী নিজ পূর্ব পরিবারেই বসবাস করতে থাকেন, তাকে স্বামীর বাড়ি যেতে হয় না, আর স্বামীই স্ত্রীর গৃহে এসে স্ত্রীর পরিবারভুক্ত হন। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর গৃহে এসেও সেখানকার কোন ধর্ম-কার্যে বা পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় এটা খুবই বিস্ময়কর যে, স্ত্রী স্বামীকে প্রভু (কিনরাড) বলে সম্বোধন করে থাকেন। মনে হয়, এটা যেন প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে কোন ইংরাজি চিঠিপত্রের নীচে লেখা 'আপনার একান্ত বাধ্যভৃত্য' (ইওর মোস্ট অবিডিয়েন্ট সার-ভেন্ট) এর মতো অর্থহীন ভদ্রতার পরি-চায়ক। পারিবারিক সব কিছু ক্রিয়াকর্মাদি সম্পাদন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা কন্যারই কর্তব্য এবং তিনিই ঘর-বাড়ি সমেত পারি বারিক অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তির মালিক হন। অন্যান্য কন্যারা কতক কতক অংশ মাত্র পেয়ে থাকেন। কিন্তু সর্বকনিষ্ঠার পারিবারিক বাসগৃহাদির মালিক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ভগিনীদের সম্মতি না নিয়ে সেই সব ঘর-বাড়ি হস্তান্তর করার ক্ষমতা নেই। যদি সর্বকনিষ্ঠার মৃত্যু হয় বা তিনি ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করেন অথবা গর্হিত কোন অপকর্ম করে বসেন তাহলে তাঁর ঠিক পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এই ধরনের ব্যবস্থাই ক্রমপর্যায়ে চলতে থাকে। কন্যার অধিকার কোন কারণে ব্যাহত হলে ভগ্নী কন্যা, এমন কি মাতার ভগ্নী কন্যাগণও উত্তরাধিকারী হতে পারেন। সর্ব-কনিষ্ঠা বা তাঁর স্থলবর্তী যে কেউ অধি-কাংশ সম্পত্তির মালিক হলেও তিনি অসহায় ভ্রাতা ভগ্নীদের আশ্রয় দিতে, এমন কি, আবশ্যকমত ভরণপোষণ করতেও বাধ্য। সাধারণ জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের স্বামীরা নিজ নিজ ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করে থাকেন। কোন পুরুষ বিয়ের পূর্বে কোন বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করে থাকলে বিয়ের পর তার মাতাই সেই সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকেন। আর বিয়ের পর অর্জিত সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। অবিবাহিত অধিকাংশের মালিক সর্বকনিষ্ঠা কন্যাই হন। যদি কোন পরি বারে নিতান্তই কোন কন্যা সন্তান না থাকে, কেবলমাত্র তখনই পুত্রেরা সমানাংশে মালিক হয়ে থাকেন।

মালাবারের কোন অংশে এখনও মাতৃ-মুখী সমাজ আছে। সেখানে স্ত্রীই কর্ত্রী, সে নিজের স্বামী পছন্দ করে, অপছন্দ হলে তাকে তাড়িয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। সেখানে পুরুষ প্রবাসীরূপে বসবাস করে, ছেলেরা পরিচিত হয় মায়ের নামে। ...

আবিশ্ব মনীষা শুশ্রূষায় ॥

বিষ্ণু দে

...to hope till hope creates
From its own wreck the thing it contemplates.

বুঝি এই অন্ধ মুমূর্ষায়
আছে দুঃস্থ বিশ্বের প্রভাব।
শরীরকে হানে, চেতনাকে
হানে কারা অস্মারবিলাসী,
নিজেদেরই বেঁধে টানে ফাঁসি,
হা হতোস্মি হাঁকে সর্বনেশে
কণ্ঠ থেকে ঢালে রক্তস্রাব।

ভাবি স্থায়ী মানবস্বভাবে
যদি চায় এই দুর্বিপাকে
জীবনের শুশ্রূষাতে নিদান—
যেন নীলরতনের জ্ঞানী
রোগ ও রোগীতে সমধ্যানী—
স্বস্বভাব পাবে দেশে দেশে,
মন পাবে প্রজ্ঞার বিধান।
অবিচ্ছেদ্য পরস্পর ডাকে
শক্তি বাঁচে শক্তির অভাবে.
ডাকে আজ সংলগ্ন বিজ্ঞান.
মূর্তি, ছবি, সঙ্গীত, কবিতা—
আবিশ্ব মনীষা শুশ্রূষার।

সুতরাং দীর্ঘ সভ্যতাকে
বুকে ধরো আপন দরিতা,
চরণে পরাণে বাঁধো ফাঁসি।
অখণ্ড সত্তার শোনো বাঁশি,
চায় সুস্থ স্বাধীন সম্ভাব
ব্যক্তি-বিশ্বে সর্বানুবর্তিতা।।

এখনো সম্রাট ॥

[illegible]

কাছে এসে বলো কি সংবাদ, কি এনেছো দূরে [illegible] থেকে
শেষ দৃশ্যে শেষ অংকে এখনো সম্রাট বসে আছি
এখনো পাঞ্জা দেখে
দু'বার কুর্নিশ ঠুকে, দরোয়াজা খুলে দেবে [illegible]
বলো দেবদূত
বাঁ হাতে মজুত নজরানা ঃ

কি বার্তা এনেছো দূরে থেকে
টুপটাপ শিশিরের মতো ভালবাসা হৃদয়ের বৃন্তে ঝরে যায়
নির্বাসিতা প্রেমিকা পোহায় তাপ
হৃদয়ে হৃদয় জেবলে রেখে
এখনো কি চুল্লির আগুনে
মহুয়া ফলের মতো নরম মধুর ঠোঁট চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে
নাকি কোন অশ্রুত রাগিণী
জানু থেকে নাভিকুণ্ড, নাভি থেকে হৃদপিণ্ডে
বেয়ে ওঠে অমোঘ যন্ত্রণা ঃ

কি সংবাদ এনেছো দেবদূত
শেষ দৃশ্যে এখনো সম্রাট
ডান পাশে তামাম দুনিয়া
বাঁ হাতে মজুত নজরানা।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এবং শেষদিকে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয়ে গেল।

সমকালীন শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পী অনিলবরণ সাহা ১৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনী করলেন। এবারে শ্রীসাহার কাজের মধ্যে জল রঙের ছবির প্রাধান্যই দেখা গেল। লোকশিল্পের প্রভাবই তাঁর কাজের মধ্যে বেশী। কিছু পোড়ামাটির কাজের ধর্ম এবং কিছুটা উপজাতীয় শিল্পের রূপ থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। ফ্ল্যাট ধরনের কাজ—প্যাটার্ন এবং ডিজাইনের পরীক্ষাই প্রধান। কখনো কখনো মোজাইকের চেহারা নিয়েছে। হাল্কা সবুজ, পোড়ামাটির লাল রঙ, বাদামী এবং কালো রঙের প্রাধান্যই বেশী। তাঁর "টেস্টিমনি অব শিভালরী", "এমারজেন্স ফ্রম হিস্টরি", "সেক্রেড বুল ২ নম্বর" প্রমুখ কাজগুলির কম্পোজিশন টেন এবং হাল্কা স্বচ্ছ রঙের প্রয়োগ সুন্দর। তৈলচিত্র কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বড় মাপের এবং নন্‌ফিগারেটিভ কাজের ছাপটাই এখানে প্রধান—এক "রিভীমার" এবং "ফিশার উয়োম্যান" ছবি দুটি ছাড়া। এর মধ্যে দুটি সিটিস্কেপ-এর স্পেস বিভাজন এবং "আনসারটেন ফিউচারের" রঙ উল্লেখযোগ্য।

এই একই সময়ে "ক্যানভাস" নামে অন্য শিল্পীগোষ্ঠী তেরজন তরুণ শিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করেন। গত বছরেও এইখানে তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শিল্পীরা নানা রীতির পরীক্ষা চালিয়েছেন সকলের কাজ খুব যে একটা দানা বেঁধেছে তা বলা যায় না। রঙের পরীক্ষাটাই প্রধান, এবং অনেকেই চড়া পর্দায় রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। অশোক বিশ্বাসের "স্ট্যান্ডিং বুল" ফর্মের দিক দিয়ে ইণ্টারেস্টিং কিন্তু রঙের সূক্ষ্মতার খানিকটা অভাব রয়েছে। অলোক ভট্টাচার্য "লাইফ" এবং "ডেথ" ফিগারেটিভ কাজ কিন্তু একটু ছেলেমানুষী আছে। মানিক তালুকদারের "ব্ল্যাক গার্ডেন" সরলীকৃত গঠন এবং কাঠের অতিসরলীকৃত "টর্সো"টি মন্দ হয়নি। সুধীর ধরের "মাদার অ্যান্ড চাইল্ড"ও মন্দ হয়নি। সুখেন্দু রায়ের "ফ্রুট মার্কেট" ছবির কোমল রঙ এবং সুন্দর টোন ও গোবিন্দ কুণ্ডুর একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশন সুদৃশ্য হয়েছিল।

●

সোসাইটি অব কন্টেম্পরারি আর্টিস্ট্‌-এর দশম বার্ষিক প্রদর্শনী (২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯) বিড়লা অ্যাকাডেমির বর্ষশেষের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান। বারোজন চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের ৫৪টি কাজের অনেকগুলিই দর্শকদের তৃপ্ত করবার ক্ষমতা রাখে। রঙের ও ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকে এটি এই গোষ্ঠীর গত বছরের কাজের চাইতে অনেক সুন্দর লাগল।
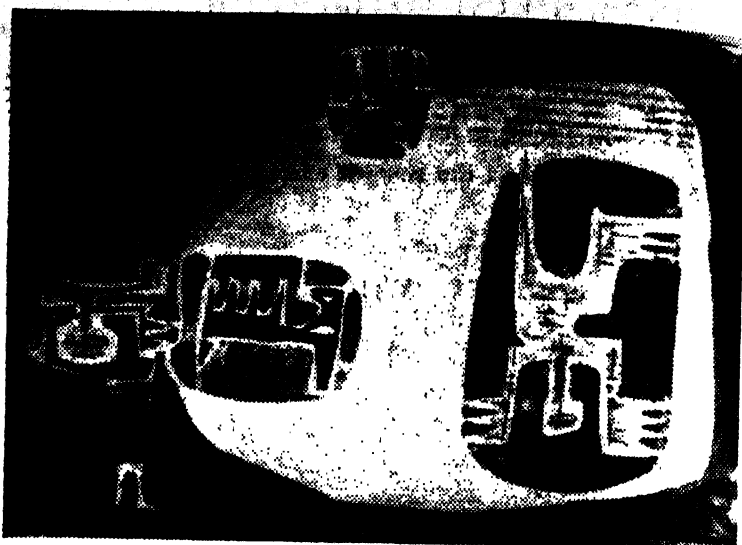
অজিত চক্রবর্তীর ভাস্কর্য কয়টি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন কাজ। তার মধ্যে ব্রোঞ্জের "অ্যান্ট সিটিং অন এগ" এবং কাঠের কাজ "পড অ্যান্ড পী" বিশেষভাবে বিষয়বস্তুর নতুনত্বে এবং আকারের বৈচিত্র্যে মনোহারিত্বের দাবী করে।

অনিল সাহা তাঁর একক প্রদর্শনীর ধরনে উপজাতীয় কাজের নকশা দিয়েছেন। বিকাশ ভট্টাচার্য, গণেশ পাইন এবং সুহাস রায়ের কাজে সুররিয়ালিস্টিক ধরনের ছাপটাই প্রধান। শ্রীভট্টাচার্যের "দি কিং" ছবির রঙের গভীরতা ও বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছে। গণেশ পাইনের টেম্পারাগুলি একটা রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করে। "বিফোর দি পিলার" ছবির স্বচ্ছ বর্ণসুষমা "রাইডার অন দি থ্রেশহোল্ডের" শিশুসুলভ মাধুর্য এবং "ড্রিজল"এর কতকটা বাইজান্টাইন আইকন ঘেঁষা বর্ণাঢ্য নকশা সুন্দর লাগল। সুহাস রায়ের কাজের মধ্যে হেনরীমুরের রঙীন ড্রয়িং ও ডি কিরিকোর কাজের ছাপ বিশেষ নজরে পড়ে। "দি ক্লোট" এবং "ডেথ অব দি ডেড" এই জাতীয় কাজ। সুনীল দাস ও লালুপ্রসাদ

শিল্পী : অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ জন সমকালীন শিল্পীর যৌথ ড্রয়িং

শা শক্তিসাধনা সম্পর্কিত চিত্রাবলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ভিন্ন ধরনের ছবি এ'কেছেন। সুনীল দাসের কাজে তাঁর গত একক প্রদর্শনীর ছবির পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। লালুপ্রসাদের "শিব" "সোনার রথ" এবং বিশেষ করে 'শীতলা'র রক্তবর্ণের প্রয়োগ অতি চমৎকার হয়েছে। শ্যামল দত্ত রায়ের 'রোমান্স' এবং 'অ্যান্টিক'এর জল রঙের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডিজাইনে তাঁর চিরাচরিত সূক্ষ্মতার নজির রয়েছে। তাঁর 'আউট অব ডোরস'এর পেন্টিং খানির উজ্জ্বল লাল এবং আলোকিত হাল্কা রঙের পশ্চাদপট নতুন ধরনের কাজ। সনৎ কর তাঁর সবুজ ধূসর বর্ণের রঙ ও রেখার কয়েকটি ক্যানভাসে একটা বিচিত্র গভীরতা এনেছেন; বিশেষ করে তাঁর 'টর্সো'র অত্যন্ত সরল ও গভীরতাপূর্ণ কাজ মনে রাখার মত। শৈলেন মিত্রের ছোট অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং নং ৪ ও দীপক ব্যানার্জির ১ নম্বরের কম্পোজিশনের রং ও রেখার প্যাটার্ণ সুদৃশ্য। মনু পারেখের উজ্জ্বল কলার ও ক্যানভাসের মধ্যে 'হোলি স্টিল লাইফ' সুসংবদ্ধ ছবি।

বারোজন শিল্পীর করা যৌথ ড্রয়িংটি বিশেষ ইন্টারেস্টিং হয়েছিল।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত সাতজন চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের ৩৬ খানি চিত্র ও ভাস্কর্যের যে ছোট প্রদর্শনী হয়ে গেল তাতে কিছু ফিগারেটিভ ঘেঁষা কাজের পরিণত ধরনের ছবির নিদর্শন পাওয়া গেল।

বেণীমাধব লাহিড়ীর ছোট ক্যানভাসগুলির মধ্যে পাহাড়ী জীবনের কয়েকটি রঙ ও টোনে ভরপুর সুগঠিত ছবির নমুনা দেখা যায়। বিশেষ করে 'তাস খেলা' এবং 'গ্রুপ'এর মধ্যে তাঁর চিত্র নির্মাণ রীতির কুশলতা লক্ষ্য করার মত।

অজিতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জোরালো রং এবং সূক্ষ্ম ভাঙা রেখায় খানিকটা এক্সপ্রেশনিস্ট ধাঁচের সুগঠিত ছবি উপহার দিয়েছেন 'উওম্যান অব দি ভ্যালী' এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ-নিবেদনের ... তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

শ্যামল বসু আলো ও আবহাওয়ার বিভিন্ন মুড নিয়ে কাজ করেছেন—রঙ তাঁর কাছে গৌণ। 'অ্যাট লিজার' ছবির বিশ্রামরত সাইকেল রিকশার ছবিটি সবচেয়ে চোখে পড়ে। অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর 'বোটস'এ নকশা ও রঙের প্যাটার্ণটাই মুখ্য বলে মনে হয়। বারিদ গোস্বামীর 'ট্রান্সেসডেনটাল মেডিটেশন' ছোট ছোট মূর্তির আভাষ নিয়ে উজ্জ্বল রঙে আঁকা ছবি। সন্তোষ রোহাতগী ফর্মকে অনেক সরল করে এনেছেন। তাঁর 'টু' এবং 'ট্রায়ো' কতকটা পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট ধর্মী বর্ণাঢ্য কাজ যার মধ্যে একটা বিশেষ মুড ধরা পড়েছে। প্রদর্শনীর একমাত্র ভাস্কর শঙ্কর ঘোষ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেছেন। তাঁর ১ ও ৪ নম্বরের কম্পোজিশনের নিটোল রেখা এবং ৩ ও ৬ নম্বরের ফিগারের কাজগুলি ছোট হলেও বড় কাজের মাপে এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

●

শিল্প বিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়ে শঙ্কর গুহ পার্ক হোটেলে ১৪ খানি পেন্টিং-এর একটি সুদৃশ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। প্রথম একক প্রদর্শনী হিসাবে এই তরুণ শিল্পীর এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

শ্রীগুহর কাজে আধুনিক শিল্পরীতির প্রভাব বেশী তবে পুরো অ্যাবস্ট্র্যাকশনের দিকে তিনি ঝোঁকেন নি। তেল রঙের ব্যবহারে তাঁর অনেকখানি দক্ষতা দেখা গেল। অনেকখানি সমতলক্ষেত্র জুড়ে ফ্ল্যাট রঙের মধ্যে গভীরতা আনবার দক্ষতা তাঁর কাজে দেখা গেল। 'ফরচুন টেলার' 'ইক্লিপস্' 'রথযাত্রা' এবং 'প্যাশন'এর কম্পোজিশন ও রঙের বাহার লক্ষণীয়।

প্রদর্শনী ১ থেকে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত খোলা ছিল।

●

২৮ ডিসেম্বর থেকে ৬ই জানুয়ারী ধর্মতলা স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটসম্যানশিপ-এর ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল। চারুশিল্প, বিজ্ঞাপন শিল্প ও ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে আড়াইশোর উপর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছিল।

গতবারের মত জলরঙের কাজে এবারেও কতকগুলি সুদৃশ্য নিদর্শন দেখা গেল। ছাত্ররা এই মাধ্যমে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বড় মাপের কাজ করবার চেষ্টা করেছে। তার মধ্যে একটি বুদ্ধের প্রতিকৃতি এবং কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য ও রেলওয়ে ইয়ার্ডের ছবি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত হয়েছিল। এই বিভাগে গোবর্ধন মণ্ডল, বিশ্বনাথ মণ্ডল, বিপুল গুহ, জ্যোতির্ময় দত্ত, তপনকুমার বিশ্বাস, গোবিন্দচন্দ্র পাল ও তপতী বসু প্রমুখ কয়েকজনের কাজ উল্লেখ করবার মতন।

তেল রঙের কাজে কয়েকটি সযত্ন অংকিত ছবির প্রশংসা করতে হয়। অতিরিক্ত আধুনিক পরীক্ষানিরীক্ষার দিকে না গিয়ে কতকটা অনুশীলনের দিকে মন দেওয়ায় শরদিন্দু অধিকারীর প্রভাতের আলোয় রেলিং-এ বসা তিনটি কাগের সরল ছবি এবং সুভাষচন্দ্র সোমের লাইফ স্টাডি প্রতিকৃতিটি সুঅংকিত করবার কাজ হয়েছে। এঁদের রঙ ব্যবহারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। কল্যাণকুমার ধরের স্টিল লাইফটি কম্পোজিশন ও রঙের দিক দিয়ে উল্লেখ করবার মত।

প্রেমতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের অনুকরণে রেলওয়ে লোকো শেড আঁকবার চেষ্টা করছেন। তবে আরো একটু দক্ষতা আহরণ করলে ভালো হত। বিমান বিশ্বাসের 'বোটস' এবং বিমল দাসের ছোট প্রতিকৃতিটি সুদৃশ্য কাজ। এঁর 'ওরা কাজ করে' লিনোকাটটি সূক্ষ্ম কাজ তবে সোভিয়েট বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের ছাপ বড় প্রকট। সরল ঘোষের 'আফটার ওয়ার' ছবির প্রতীকধর্মীতা একটু মামুলী তবে অঙ্কনরীতি প্রশংসনীয়।

পরমানন্দ চক্রবর্তীর পোড়ামাটির মা ও ছেলে সরল ঘোষের সিমেন্টে গড়া একটি ... প্রতিকৃতি এবং পরমানন্দ চক্রবর্তীর অন্য একটি কাজ আইসক্রীমওয়ালা সুগঠিত ভাস্কর্যের নিদর্শন। অন্যান্য কাজগুলি প্রতি সাধারণ ঠেকল।

—চিত্ররসিক

হাসির মজলিস

অভিনেতা—এই ছবিতে আমার কি কাজ স্যার?
পরিচালক—তিনতলার ছাদের ঐ কোনা থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে।
অভিনেতা—পড়ে যাওয়ার পর কি বেঁচে থাকব না মারা যাব?
পরিচালক—মারা গেলেও ক্ষতি নেই। কারণ ওটাই আমাদের শেষ দৃশ্য কিনা।

●

স্বামী—তোমাকে টেলিগ্রামে জানিয়েছিলাম যে, তোমার মাকে সঙ্গে এনো না।
স্ত্রী—হ্যাঁ, আমি টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু উনি দেখতে এসেছেন তোমার কিছু হয়েছে কিনা।

●

—গণেশচন্দ্রের মত বক্তা দুর্লভ। উনি যখন বলেন, তখন রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে যায়।

—উনি কোন্ দলের?—একজন জিজ্ঞাসা করলেন।
—কোন দলের নন ভাই। ও রেডিওর ভাষ্যকার।

●

—হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে যাওয়ার সহজ উপায়?
—যে কোন রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

●

পাঞ্জাবের এক কৃষিক্ষেত্রের ঘটনা।
এক কৃষকের স্ত্রী ঘোড়ার পায়ের আঘাতে মারা যায়। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় প্রায় শ পাঁচেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিল।

মহিলার এক আত্মীয় বলছিলেন তার স্বামীকে—তোমার স্ত্রী তো বেশ জনপ্রিয় ছিল দেখছি?

—না ও তো ঘর থেকেই বেরোত না। এরা সব এসেছে খবর পেয়ে ঘোড়াটা কিনতে।

●

—আপনার ফটো তোলবার চার্জ কত?
—তিন কপির জন্য তিন টাকা—তিন কপির বেশী কপির জন্য চার্জ লাগে না।

—তাহলে আমায় দয়া করে ঐ বেশীটাই দিন।

দুই বন্ধুতে দেখা অনেক কাল পরে। উভয়ের সংসার নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা চলছিল।

১ম বন্ধু—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া কি এখনও চলছে?
২য় বন্ধু—না।
১ম বন্ধু—কি করে সেটা সম্ভব হলো?
২য় বন্ধু—ও একটি গাড়ী চাপা পড়ে এবং তারপর মারা যায়।

●

একবার উইনস্টান চার্চিল গিয়েছিলেন একটি মানসিক হাসপাতাল দেখতে। সব ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। হঠাৎ একটা ঘেরা জায়গায় একটি লোককে দেখে এগিয়ে গেলেন।

সেই লোকটি বলল—তুমি কে?

—আমাকে চেন না। আমি উইনস্টন চার্চিল।
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বৈকি। দেখুন আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন লোকে আমাকে নেপোলিয়ান বলেই জানত।

●

স্কুলেকার শিক্ষয়িত্রী ক্লাসে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন—বল তো দেখি আমি কি কাজ করতে পারি না?

একজন উত্তর দিল—আপনি চৌবাচ্চার জল তুলে চান করতে পারেন না। বাসে উঠতে পারেন না। লেট হয়ে গেলেও ট্রেন ধরতে পারেন না।

●

—আমার শ্বশুর বোধহয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলস ব্যক্তি। তুমি কি তাকে দেখেছ?

—না, আমি দেখিনি। তিনি কত লম্বা?

—আমি জানি না। কারণ আমি তাকে কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি নি।

●

রোগী—আর ভাল লাগে না স্যার। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেকে মেরে ফেলি।
ডাক্তার—খবরদার ওটি করবেন না। ওটা তো আমারই কাজ।

মন বুঝে দেখুন
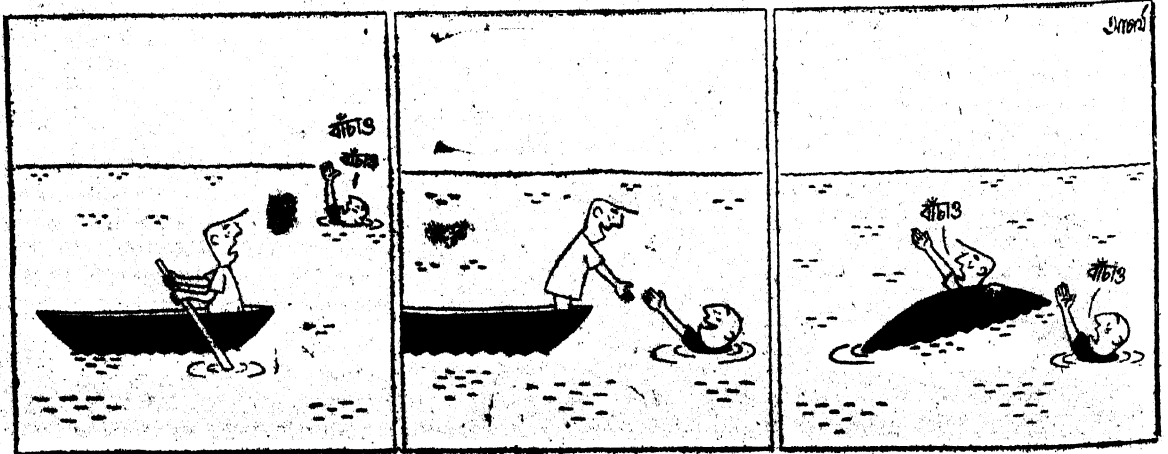
আপনি কি তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে পড়েন ?

মন অসুস্থ থাকলে আমরা অনেক অন্যায় কাজ করে ফেলি। কখন মানুষের মনের মধ্যে আবেগ-প্রক্ষোভ টগবগ করে ফুটতে থাকে, তা যদি বোঝা যেতো, তাহলে বোধহয় আগে থাকতে অনেক অন্যায় কাজের প্রতিবিধান করা সম্ভব হতে পারতো। মনের আবেগ-প্রক্ষোভ হঠাৎ তেতে উঠলে শুধু যে মারাত্মক সব ভুল কাজ করে বসি, তাই নয়, নানারকম পেটের গোলমালও ডেকে আনি।

মনোবিদ্‌রা এইজন্যেই বিরক্তির প্রকাশ নিয়ে খুব গবেষণা করেছেন এবং হাজার হাজার লোকের বিরক্তি লক্ষ্য করে আবেগ-প্রক্ষোভের স্ফুটনাঙ্ক পরিমাপ করবার চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানীরা বাছাই-করা কতকগুলি প্রশ্ন তৈরী করেছেন যা দিয়ে যে কোনো লোকের বিরক্তি-অবতারণার একটা স্বরূপ ধরা যেতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ধরনের জবাবে বিরক্তি-প্রবণতার কমবেশি পয়েণ্ট ধরা হয়। জবাবগুলি যে চারটি শ্রেণীতে ফেলা হয়, সেগুলি হলো :

(ক) মহা রেগে ছুটে যান বেগে
(খ) রুদ্ধ রাগে ফুলতে থাকেন
(গ) মেজাজ বিগড়ে ফেলেন
(ঘ) শান্ত হয়ে থাকেন

নীচের প্রত্যেকটি ঘটনা-পরিস্থিতি পড়বেন এবং ওরকম অবস্থায় আপনি ওপরে ক, খ, গ বা ঘ কোন্‌ আচরণটি করবেন বলে মনে হয়, তা বুঝে নিয়ে জবাব দেবেন।

১। স্নান সেরে সবেমাত্র আপনি বাথ-রুম থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময়ে দরজায় কলিং বেল বেজে উঠলো। আপনি চেঁচিয়ে সাড়া দিলেন, তবুও একনাগাড়ে পাগলা-ঘণ্টির মতো কলিং বেলটি বেজেই চললো।

আপনি কি তখন মহা রেগে ছুটে যান বেগে (ক—তিন পয়েণ্ট), রুদ্ধ রাগে ফুলতে থাকেন (খ—দু' পয়েণ্ট), মেজাজ বিগড়ে ফেলেন (গ—এক পয়েণ্ট), না কি, শান্ত হয়ে থাকেন (ঘ—শূন্য পয়েণ্ট)?

২ আপনি সিনেমার টিকিট কিনতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আস্তে আস্তে একটি লোক আপনাকে গুঁতোগুঁতি করে সামনে জায়গা নেবার চেষ্টা করছে।

এই অভব্য স্বার্থপরতা লক্ষ্য করে আপনি কি করবেন? ক— তিন পয়েণ্ট, খ—দু' পয়েণ্ট, গ—এক পয়েণ্ট, না, ঘ—শূন্য পয়েণ্ট?

৩। ঠিক পাশের বাড়ীতে একটি নতুন ভাড়াটে এসেছেন। তাদের একটি মেয়ে রোজ গ্রামোফোন বাজায়, কিন্তু রেকর্ড মাত্র একখানি—সেইটাই বারেবার সে বাজিয়ে চলে, আপনার মনে কি ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে, তা সে ভাবেও না। দিনের পর দিন ঐ রেকর্ডখানি তীক্ষ্ণ বেসুরো কোলাহল ছড়াতে থাকে। আপনার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া জাগবে? ক—তিন পয়েণ্ট, খ—দু' পয়েণ্ট, গ—এক পয়েণ্ট, না, ঘ—শূন্য পয়েণ্ট?

৪। আপনাকে খুব একটা খুব দরকারী বিষয়ে টেলিফোন করতে হবে। আপনাদের বাড়ীর নীচের তলায় যাঁদের টেলিফোনে কথা বলবেন, তাঁদের ঘরে অনেকদিন পরে দূর থেকে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এসে পড়েছেন, জোর গল্পগুজব চলেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে। এদিকে আপনার ধৈর্য থাকছে না। তখন কি করবেন? ক—তিন পয়েণ্ট, খ— দু' পয়েণ্ট, গ—এক পয়েণ্ট, না, ঘ—শূন্য পয়েণ্ট?

৫। একটি দোকানে কিছু কেনাকাটা করতে ঢুকে দেখলেন, দোকানদার দুজন নিজেদের মধ্যে আড্ডা মারছে, আপনার দিকে ফিরেই তাকাচ্ছে না। খানিক পরে একজন দোকানদার হেলতে দুলতে উঠে এসে আপনাকে শুধালো, 'বলুন, দাদা, আপনার কি?' আপনি এমন তাচ্ছিল্যকর অবস্থায় পড়ে কি করবেন? ক—তিন পয়েণ্ট, খ—দু' পয়েণ্ট, গ—এক পয়েণ্ট, কিংবা, ঘ—শূন্য পয়েণ্ট?

৬। 'ধূমপান নিষেধ' লেখা বাসের মধ্যে কেউ বিড়ি বা সিগারেট ধরালো এবং ধোঁয়া ছেড়ে দিলো ঠিক আপনারই মুখের ওপর। আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া জাগবে? ওপরের মতো চারটি শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীতে আপনার জবাব পড়বে (পয়েণ্ট একই রকম পাবেন)?

৭। দেখতে পেলেন, একটা লোক একটা ঘোড়াকে নির্মমভাবে মারছে, অথচ ঘোড়াটা অত্যন্ত ক্লান্ত, হাঁপাচ্ছে, কাঁপছে, মুখে ফেনা, হয়তো যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ দেখে আপনার অনুভূতির ওপর কেমন প্রভাব হবে? ক, খ, গ, কিংবা ঘ।

৮। আপনি কোনো আত্মীয়ের বাড়ীতে অথবা ছুটিতে বাইরে গিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনের আগেই হঠাৎ ফিরে এসে বাড়ীতে কতকগুলি সন্দেহজনক জিনিস লক্ষ্য করলেন—জলের গ্লাসে লিপস্টিকের দাগ বিছানার চাদরে রুজের দাগ। কিংবা আপনি যদি পুরুষ হন, এবং কোনো কাজ-কর্মে কদিন বাইরে যেতে হয়েছিল; বাড়ী ফিরে এসে এমন কতকগুলি ব্যাপারে চোখ পড়লো যার ফলে মন অশান্তিতে ভরে গেল—যেমন, দাড়ি কামাবার আয়নার সামনে ব্যবহার-করা ব্লেড এবং অন্য একটা লোকের শার্ট। তাহলে আপনার কেমন ভাবনা জাগবে? ক শ্রেণীর—তিন পয়েণ্ট, খ—দু' পয়েণ্ট, গ—এক পয়েণ্ট কিংবা, ঘ শূন্য পয়েণ্ট?

প্রশ্ন এই কটিই, এবং আপনি বেশ বুঝতে পারবেন, মনোবিশেষজ্ঞরা কতো যত্ন করে-বাছাই করে সাজিয়েছেন এগুলি। এবার আপনি কতো পয়েণ্ট পেলেন দেখতে হবে। এই টেস্টে আপনি যদি আন্তরিক-ভাবে সততার সংগে জবাব দিয়ে থাকেন, তবেই কিন্তু আপনার বিরক্তি-প্রবণতার সঠিক স্বরূপ বুঝতে পারা সম্ভব হবে।

বারো থেকে বেশি পয়েণ্ট যদি পেয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে স্বাভাবিক। আপনার আবেগ-প্রক্ষোভের ব্যালান্স রেখে চলতে পারেন এবং খুব একটা মারাত্মক ভুল করে বসেন না।

যাঁরা তিন থেকে আটের মধ্যে পয়েণ্ট পাবেন, তাঁরা প্রশান্ত মনে খুশি হয়ে থাকতে জানেন, সবার মধ্যে মেলামেশা করে সুখী হতে পারেন। সহজেই তাঁরা লোকের সংগে আলাপ জমিয়ে নিতে পারেন। বিশেষ কারুর সংগে বনিবনা হচ্ছে না বলে তাঁরা কখনো নিজের কাজ বা চাকরী বদল করে অন্য কোনোখানে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত নন।

যাঁরা মোট কুড়ি পয়েণ্টেরও বেশি পেয়েছেন, প্রধানতঃ তাঁদের নিয়েই মনো-চিকিৎসকদের চিন্তায় পড়তে হয়। এইসব লোকেরাই একটুতে সহজেই ক্ষেপে ওঠেন। এঁরা যেখানে কাজ করেন, সেখানে সহকর্মী-দের সঙ্গে মিলেমিশে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারেন না বলেই বারে বারে কাজ বদল করেন, চাকরী পছন্দ হয় না। এই ধরনের লোক নিজে একলা যখন কাজ করেন, তখন বেশ ভালোই করেন।

ওদিকে আবার যাঁরা কেউ তিন পয়েণ্টেরও কম পান, তাহলে বিপদ। চারি-পাশে কি ঘটছে সেদিকে তাঁরা খুব কম নজর রাখেন এবং চাপা স্বভাবের আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েন।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই মনে করেন, প্রত্যেক লোকের পক্ষেই মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ানো দরকার, যাতে তার রুদ্ধ আবেগ-প্রক্ষোভগুলি স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে যাবার একটা পথ খুঁজে পায়।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল
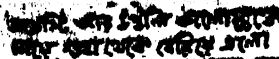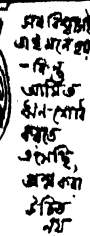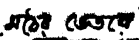
বেতার শ্রুতি

সেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে খাঁচায় পোরা একটি ময়না দেখতে পেলাম। অসাধারণ কিছু পক্ষিপ্রীতি আমার নেই। আমার কাছে কাকও যা কোকিলও তা। পার্থক্য শুধু আকারে আর স্বরে।

শুধু খাঁচায় পোরা ময়নাটিকে দেখে আমার মায়া হ'ল। সে ঐ খাঁচায় পোরা বলে, মুক্ত বিহঙ্গ নয় বলে। মনে হ'ল—আহা, কী কষ্ট বেচারার! ঐ আলসের দাঁড়ানো ছাই-রঙা রুক্ষ-স্বরা কাকটারও যে স্বাধীনতা আছে, যে খুশি আছে তা এর নেই।

অসীম করুণাপরবশ হয়ে ময়নাটির দিকে এগিয়ে গেলাম। খাঁচার কাছে যেতেই ময়না বলে উঠল 'খাবার দাও।' একেবারে মানুষের মতো। বড়ো কৌতুক বোধ হ'ল। ময়না কথা বলে জানি, কিন্তু স্বকর্ণে শুনিনি কখনও।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ময়নাটা কথা বলতে পারে বুঝি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক কথা জানে।'
ময়না আবার বলে উঠল 'খাবার দাও।'

আমি বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, 'আজ তো আনি নি, পরের দিন নিয়ে আসব।'
ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, 'ওকি সত্যি সত্যি আপনার কাছে খাবার চেয়েছে!'

'তাই তো চাইল।'
'ও অমন সকলের কাছেই চায়। যে কাছে আসে তার কাছে। আপনার লজ্জা পাবার কিছু নেই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ময়নাটা কি নতুন এনেছেন?'
ভদ্রলোক বললেন, 'না, অনেক দিন থেকে আছে। তাই অনেক কথা শিখেছে।'

হঠাৎ ময়নাটা সুর করে গেয়ে উঠল, 'রুখবে মোদের কে, রুখবে মোদের কে—?'

আমি তাজ্জব। বিস্ময়াভিভূত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার ময়না গানও গাইতে পারে?'

ভদ্রলোক কিছু বলার সুযোগ পেলেন না, ময়না আবার গাইল, 'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল রে—।'

আমি অবাক! ভদ্রলোক বললেন, 'ও আরও অনেক গান জানে।'
সঙ্গে সঙ্গে ময়না গেয়ে উঠল, 'ভারতের এই পুণ্যভূমিতে—।'

আমি নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ময়নাটি আমার সমস্ত বাক্য হরণ করে নিয়েছে। এমন বাক্‌হারা আমি আর কখনও হয়েছি বলে মনে পড়ে না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব তো রেডিওর দেশবন্দনার গান, ও শিখল কোত্থেকে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'রেডিও থেকেই শিখেছে। দেশবন্দনায় রোজই তো প্রায় একই গান বাজে, আমার ছোটো মেয়ে গানগুলো মুখস্থ করার জন্য সকালে উঠেই আগে রেডিও খুলে দেয়। আর জানলার ধারে খাঁচাটা থাকে বলে ময়নাটারও সব মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'বলেন কী! সব গান মুখস্থ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। খানিকক্ষণ থাকলে সবই শুনিয়ে দেবে। তাছাড়া ক'খানাই বা গান!'

প্রথম প্রথম দেশবন্দনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুলগীতি প্রভৃতি শোনানো হ'ত। তাতে দেশভক্তি জাগুক বা না জাগুক, গানগুলো শুনতে ভালো লাগত। তাই দেশবন্দনা অনুষ্ঠানটির একটি আকর্ষণ ছিল। তারপর কর্তারা আধুনিক গীতিকারদের দিয়ে কয়েকখানি গান লেখালেন। তার কতকগুলো একেবারে অখাদ্য। তার মধ্যে না আছে দেশাত্মবোধ জাগানোর মতো বাণী, না আছে সঙ্গীতরস, না সুস্বর। প্রয়োজনের তাগিদে সেইসব অখাদ্যও খাদিত হয়েছে। পাছে দেশদ্রোহী বলে আখ্যাত হতে হয় তাই বোধহয় কেউ আপত্তি জানায় নি।

কিন্তু এখন আপত্তি জানাবার সময় এসেছে। প্রথম, ফরমায়েশে লেখা বহুশ্রুত, শ্রুতিতে শ্রুতিতে ময়নারও মুখস্থ, গানগুলি বাতিল করে দিতে হবে। এর মধ্যে যে অল্প ক'খানি গান সুশ্রাব্য সে ক'খানি অবশ্য দূর ভবিষ্যতে বাজাবার জন্য তুলে রেখে দেওয়া যেতে পারে। আন্ডারলাইন—'দূর ভবিষ্যতে বাজানোর জন্য।' বহুশ্রুত সুশ্রাব্য গানও আর নিকট ভবিষ্যতে বাজানো চলবে না, কারণ ঐ ভদ্রলোকেরই কথায়—অরুচি ধরে গেছে।

দ্বিতীয়, আধুনিক গীতিকারদের দিয়ে নতুন নতুন দেশাত্মবোধক গান লেখাতে হবে। দেশাত্মবোধক গানের লেখকের অভাব, এ কৈফিয়ত টিকবে না। আধুনিক গানের লেখকের অভাব নেই, রম্য-গীতির লেখকের অভাব নেই, লোকগীতির লেখকের অভাব নেই, শ্যামাসঙ্গীতের লেখকের অভাব নেই, রাগপ্রধান গানের লেখকের অভাব নেই, যত অভাব কেবল দেশাত্মবোধক গানের লেখকের? না কি আসল কারণ, অন্য গানের লেখকদের যে মর্যাদা, দেশাত্মবোধক গানের লেখকের সে মর্যাদা নেই? তা না হলে কেন এই গানের প্রতি এত উদাসীনতা? তা-ই যদি হয় তাহলে এই গানের অনুষ্ঠান তুলে দেওয়া উচিত। কিংবা কেবল রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল এ'দের গান বাজানো উচিত।

আমাদের দেশের পাঠকদের ছাপার ভুলের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় আছে। তাঁরা জানেন, ছাপাখানায় ভূত থাকে। সেই ভূত ক্ষেপলে সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারে। মাঝেমধ্যে যখন দু-চারটে ঢিল ছোঁড়ে তখন তা সহ্য করা যায় কিন্তু যখন ঘাড় মটকাতে উদ্যত হয় তখন শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না।

ওরা জানুয়ারির বেতারশ্রুতিতে বেশ গোটাকয়েক ঢিল ছোঁড়া ছাড়াও প্রাকৃত 'পৈঙ্গল' কবিতাটিতে দুটো ঘাড় মটকানোর ঘটনা ঘটেছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে '[illegible] পন্থা'র জায়গায় '[illegible] পন্থা' আর সপ্তম পংক্তিতে '[illegible] কত্তা'র জায়গায় '[illegible] কত্তা' ছাপা হয়েছে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৪ঠা জানুয়ারি বেলা ৩টের নাটক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'কালিন্দী'। প্রযোজনা—প্রফুল্ল রায়।

'কালিন্দী' একটি বহুপঠিত উপন্যাস এবং বহুদৃষ্ট নাটক। কাহিনীটি চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। সুতরাং এর আখ্যানভাগ অনেকেরই জানা। এককালে 'কালিন্দী' নাটকটি বাংলাদেশে নাট্যামোদীদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলার বাইরেও বাঙালীদের দ্বারা এ নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে। এর গল্পের মধ্যে এমন একটা রস আছে যা মানবমনকে শুধু স্পর্শই করে না, গভীরভাবে নাড়াও দেয়। তাই এই নাটকের এত আকর্ষণ।

"কালিন্দী"র বেতার রূপটি যে জমেনি তার জন্য অনায়াসেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দায়ী করা যেতে পারে। এই নাটকে সুনীতি আর অহীন ছাড়া আর কারও অভিনয় মনে রেখাপাত করতে পারে নি। সুনীতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বনানী চৌধুরী আর অহীনের ভূমিকায় নবগোপাল লাহিড়ী। অন্যতম প্রধান চরিত্র রামেশ্বরের ভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্ত শ্রোতাদের হতাশ করেছেন। তাঁর অভিনয় আগাগোড়া কৃত্রিম ঐতিহাসিক ঢঙের। এমন কি, শেষভাগে সুনীতির কাছে রাধারানী-হত্যাকাহিনী বর্ণনার সময়েও তাঁর অভিনয় মনের কোথাও দাগ কাটে নি। ইন্দ্রর ভূমিকায় সৌরীন ঘোষও অসফল। তাঁর কণ্ঠস্বরই বোধহয় এই ভূমিকা রূপায়ণে প্রধান অন্তরায় হয়েছিল। সারীর চরিত্রে শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোই অভিনয় করেছেন। উমার ভূমিকায় ভারতী দত্তকে মানায় নি। মিস্টার মুখার্জির চরিত্রে তরুণ মিত্র বৈশিষ্ট্য আনার চেষ্টা করলেও মঞ্চের মিস্টার মুখার্জির ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারেন নি। তাছাড়া বেতার নাটকে চরিত্রটি অত্যন্ত খণ্ডিত।

শব্দ সংযোজনার কাজও প্রশংসনীয় নয়। বাস্তববোধের অভাব আছে।

মোট কথা বেতারের 'কালিন্দী' শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে পারে নি।

৫ই জানুয়ারি বেলা ১টার নাটক 'জমি', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কাহিনী অবলম্বনে শ্রীধর ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত ও প্রযোজিত।

এই নাটকে দেখানো হয়েছে কেমন করে এক অবস্থাপন্ন খল-চরিত্রের চক্রান্তে এক দরিদ্র জমি-প্রাণ, পত্নী-বৎসল কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। সোনামুন্সি তার সামান্য কিছু জমি আর স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখেই ছিল। ঐ জমিটুকু তার আর তার স্ত্রী আমিরণের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু ধনীর শনির দৃষ্টি পড়ল ঐ জমির উপর। সরল-মন সোনামুন্সির সঙ্গে মামলা করে, হাইকোর্টের ভয় দেখিয়ে, ছল-চাতুরী করে আমিরণের অজ্ঞাতে এমনভাবে গ্রাস করে নিল যে, আমিরণ দূরের কথা, সোনামুন্সি নিজেও সর্বনাশ হওয়ার আগে বুঝতে পারল না। সর্বনাশের মুখে আমিরণ যখন ক্ষিপ্ত হয়ে সোনামুন্সিকে অভিযুক্ত করছে, সোনামুন্সি তখন রাগের মাথায় দিশাহারা হয়ে বলে উঠল, 'জমি গেছে, এবার তুইও যা। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক।'

তিন তালাকের পর যখন সে আত্মস্থ হ'ল তখন দেখল সর্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল, তা সে নিজেই সম্পন্ন করেছে। সে এখন পুরোপুরি নিঃস্ব। আমিরণকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না? যায়, যদি কেউ তাকে এখন বিয়ে করে নির্দিষ্ট সময়ান্তে তালাক দেয়, তবেই সোনামুন্সি তাকে আবার নিকাহ্ করে ঘরে তুলতে পারে। তার আগে নয়। কিন্তু এই ঠিকা বিয়ে করতে কে রাজী হবে? আবারও সেই ধূর্ত ধনী খল জলিল মিঞা এগিয়ে এল। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায় জলিল মিঞা আর আমিরণকে তালাক দেয় না। শেষে একদিন আমিরণ গোপনে সোনামুন্সির সঙ্গে দেখা করে জমির দলিলটা ফেরত দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে গেল, জলিল মিঞা আর তাকে তালাক দেবে না।

সোনামুন্সির শেষ আশাটুকুও নির্মূল হয়ে গেল। সে হাহাকার করে উঠল।

এই হাহাকার শুভেন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সুন্দর মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আমিরণের যে দীর্ঘনিশ্বাস তা-ও ব্যথায় ব্যঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল মিতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রের অভিনয় যথাযথ।

৭ই জানুয়ারি রাত সওয়া ১০টার মিনিট দুই পরে রেডিও খুলতেই একটি গান ভেসে এল। আরম্ভটা শোনা হয় নি, তাই কী গান জানা যায় নি। কিন্তু কথাগুলো খুব পরিচিত মনে হচ্ছিল, সুরটা অপরিচিত। সুরটা কখনও আধুনিক গানের ধার ঘেঁষে যাচ্ছিল, কখনও বা রাগপ্রধানের পাড় ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ একটা মস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকার পর গানখানি শেষ হ'ল। ঘোষণা শোনা গেল, 'অতুলপ্রসাদের গান শোনাচ্ছেন শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্ত...।' চমকে উঠলাম, অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে এমন সুর কবে দিয়েছিলেন? ভাবতে ভাবতে দ্বিতীয় গানটিও শেষ হয়ে গেল। না, শেষ হবার আগেই ঘোষক থামিয়ে দিলেন। বোধহয় ঘোষকও আমার মতো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হচ্ছিলেন।

৮ই জানুয়ারি রাত সওয়া ১০টার পনের মিনিটের 'পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গে' মাত্র দুটি অনুষ্ঠান শোনা গেল—বড়োদিনের দিন কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত একটি বিশেষ সঙ্গীতালেখ্যর একখানি গান আর হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্সটিটিউটের বার্ষিক উৎসব।

'প্রসঙ্গ'টি শুনে মনে হ'ল আর কোনো উপকরণ ছিল না বলেই দুটি অনুষ্ঠানকে অকারণে দীর্ঘায়িত করে সময় পূরণ করা হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ভারতের এই সুবৃহৎ পূর্বাঞ্চলে এক সপ্তাহে দুটির বেশি অনুষ্ঠান হয় নি।

তাছাড়া 'প্রসঙ্গ'টিতে কোথাও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল না। হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্সটিটিউটের বার্ষিক উৎসবের রেকর্ডিং মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়।

৯ই জানুয়ারি বেলা আড়াইটের বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে 'বাংলাভাষায় বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ' বিষয়ে বললেন শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিষয়টি ছাত্রদের পক্ষে নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়, এবং কৌতূহলদ্দীপকও বটে। কিন্তু বলার ধরনে কৌতূহল বিশেষ জাগ্রত হয়েছে বলে মনে হ'ল না। এইসব নীরস জিনিসকে কৌতূহলোদ্দীপক করার জন্য বলার ভঙ্গিতে কিছুটা রস সঞ্চার করতে হয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তা এমন কতকগুলি কথা বললেন যা এম-এ ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানো হয়। এম-এ ক্লাসের ছাত্রদের পঠনীয় জিনিস যদি ক্লাস নাইনের ছাত্রদের কাছে পেশ করতে হয়, তাহলে তার মধ্যে রস সঞ্চার করা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

—শ্রবণক

অগ্রদূত পরিচালিত অনিমা চিত্রমন্দিরের সংগীতবহুল চিত্র চিরদিনের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

সাবরমতী (বাঙলা): শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দির-এর নিবেদন; ৩,৯৮৩-০৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনাঃ দেবেশ ঘোষ; পরিচালনাঃ হীরেন নাগ; কাহিনী ও চিত্রনাট্যঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত পরিচালনাঃ গোপেন মল্লিক; গীতরচনাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণঃ বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখনঃ বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দু অধিকারী; সঙ্গীতানুলেখনঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শব্দপুনর্যোজনাঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প নির্দেশনাঃ কার্তিক বসু; সম্পাদনাঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; নেপথ্য কন্ঠসঙ্গীত: কিশোরকুমার, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইলা বসু; রূপায়ণঃ উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, রূপক মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, মাস্টার অরিন্দম গাঙ্গুলী, সুপ্রিয়া দেবী, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ৩ জানুয়ারী শুক্রবার থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

সাবরমতী নামটির একটি নিজস্ব আকর্ষণ আছে আমাদের মতো সেকেলে লোকের কাছে। আজকের দিনের লোকের অজানা বলেই কথাটা জানিয়ে দিতে চাই। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাবরমতী আশ্রমের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সাবরমতী একটি নদীর নাম; পুণ্যতোয়া এই নদীর তীরভূমিস্থ এক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েই "সাবরমতী" চিত্রের নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগে ভরে উঠেছে। কাহিনীর ঘটনাস্থল যেমন শিল্পনগরী আমেদাবাদ ও গুজরাট রাজ্যের আরও কোনো কোনো জায়গা, কাহিনীর চরিত্রগুলিকে তেমনই ওই গুজরাট রাজ্যের অধিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ নায়কের নাম শঙ্কর সারাভাই, নায়িকা যশোমতী পাঠক, নায়িকার মা-বাবা ও দাদা যথাক্রমে কমলাদেবী, চন্দ্রশেখর ও কান্তিলাল পাঠক। অপরাপর চরিত্র হচ্ছে বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক, বীরেন্দ্র যোশী, প্রেমসুন্দর প্যাটেল প্রভৃতি। ছবিতে দেখা গেছে আমেদাবাদ শিল্পনগরী, গুজরাট রাজ্যমধ্যে ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ী, পাত্র-পাত্রীদের কারুর কারুর গুজরাটী পোষাক এবং গুজরাটী ধরনের খাদ্য গ্রহণের পাত্র। কিন্তু ইহো বাহ্য। এই বহিরাবরণ সরিয়ে নিলে 'সাবরমতী' হচ্ছে খাঁটি বাংলা গল্প—চরিত্র-চিত্রণে, চিন্তায়, ভাবনায়, সামগ্রিক মেজাজে। কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা পরিষ্কার বাংলায় কথাবার্তা বলেছে, বাংলা গান গেয়েছে; কোথাও বুঝতে দেয়নি যে, তারা অ-বাঙালী।

ধনী শিল্পপতির মেয়ে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, সে যোগ্যতা তার নেই। অথচ তার পক্ষে বাড়ী ফেরা অসম্ভব। এমন অবস্থায় তার পরিচয় হল এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে, যার অর্থ না থাকলেও আছে উচ্চাশা এবং বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ যোগ্যতা। মেয়েটি নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে চাইল; কিন্তু ছেলেটি তা নিয়ে

নিজেকে ছোট করতে চাইল না। হঠাৎ পুরোনো এক খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে মেয়েটির পরিচয় জানল ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে ধনীর বিদুষী কন্যাকে সে পৌঁছে দিল তার বাপের কাছে। বিজ্ঞাপনে অঙ্গীকৃত অর্থ চেকের আকারে মেয়েটিই তুলে দিল তার হাতে এবং এরই মারফৎ বুঝিয়ে দিল, ছেলেটি তার চোখে কত ছোট হয়ে গেছে। মেয়েটির উষ্মা দেখে ছেলেটি মনে মনে হাসল এবং পরে সুযোগ বুঝে মেয়েটির বাপের হাতে চেকখান প্রত্যার্পণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এরপর কেমনভাবে দুজনের ভুল বোঝা-বুঝির অবসান হয়ে কাহিনীটি মিলনান্তক সুখ-পরিণতির পথে এগিয়ে গেল, তাই নিয়েই ছবির শেষ কটি দৃশ্য রচিত হয়েছে। ঝরঝরে চিত্রনাট্যের মাধ্যমে এই চিরন্তন প্রেমকাহিনীটি দর্শকজনের কাছে পরম উপ-ভোগ্যভাবে বলা হয়েছে; ছবির সংলাপ এই উপভোগ্যতা সৃষ্টিতে কম সাহায্য করেনি।

ছবির অভিনয়ভাগে প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ হচ্ছেন নায়ক শংকর সারাভাইয়ের চরিত্রে উত্তমকুমার। মোলা স্টেশনে নায়িকা যশোমতীকে সাইকেল রিকসায় চাপিয়ে দিয়ে শংকর নিজে পদব্রজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে নায়িকা যখন আর একখানি যান ভাড়া করবার প্রস্তাব করে এবং তদুত্তরে শংকর-বেশী উত্তমকুমার ভঙ্গী সহকারে বলেন, ক্যাশটা কে দেবে? ক্যাশ?, তখনই তিনি দর্শকদের হাতের মুঠোয় করে ফেলেন এবং সে-মুঠো আর কোনো সময়েই শিথিল তো হয় না, বরং অধিকতর দৃঢ়ই হতে থাকে। ওঁর সঙ্গে প্রায় সমান পাল্লা দিয়ে নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দেন সুপ্রিয়া দেবী নায়িকা যশোমতীর ভূমিকায়। বিভিন্ন পাণিপ্রার্থীর সঙ্গে নায়িকার ব্যঙ্গ ও করুণামিশ্রিত ব্যবহার যেমন অবিস্মরণীয়-তেমনই তার মনের মধ্যে নায়কের প্রতি ধীরে ধীরে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, সহানুভূতি থেকে নিরুচ্চার ভালো-বাসার ভাব জাগরূক হওয়াও মুগ্ধচিত্তে লক্ষণীয়। অন্যান্য ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল (নায়কের মেসো মহাদেব), কমল মিত্র (নায়িকার পিতা চন্দ্রশেখর), দীপ্তি রায় (নায়কের দিদি), তরুণকুমার (নায়িকার দাদা কান্তিলাল), ছায়া দেবী (নায়িকার মা কমলা দেবী), পদ্মা দেবী (নায়কের মাসী), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (চাকর বেহারী), বঙ্কিম ঘোষ (নায়িকার রূপমুগ্ধ গ্রাম্য মহাজন প্রেমসুন্দর প্যাটেল), রূপক মজুমদার (বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক), প্রশান্তকুমার (নায়িকার পাণিপ্রার্থী), মাস্টার অরিন্দম (নায়কের ভাগ্নে) প্রভৃতি যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আলোক চিত্র গ্রহণে ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও কার্তিক বসু চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিতে গান আছে চারটি। প্রতিটি সুগীত

উত্তর কলকাতা যুব সংঘের বিচিত্রানুষ্ঠানে বিকাশ রায়কে দুই শতাধিক চিত্রে অভিনয় করার জন্য সংবর্ধনা জানাচ্ছেন মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।

হলেও সবগুলিই নাটকের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ওরই মধ্যে নায়কের মুখে "দেখনি কি পাথরেও ফোটে ফুল" গানটি কিছুটা সুপ্রযুক্ত। সঙ্গীতে গুজরাটী আবহ সৃষ্টির চেষ্টা করার কোনোই সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি—এমন কি, সাবরমতীর তীরস্থ মন্দিরের সামনেও।

রোমান্টিক ছবি হিসেবে শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দির-এর 'সাবরমতী' উত্তম-সুপ্রিয়া অভিনয়দীপ্ত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করবে অবশ্যই।

সাথী (হিন্দী): ভেনাস পিকচার্স-এর নিবেদন; ৪,৫৪৮-২১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা: এস কৃষ্ণ-মূর্তি; পরিচালনা: শ্রীধর; সংলাপ: আগার আলভি; সংগীত পরিচালনা: নৌশাদ; গীতরচনা: মজরু সুলতানপুরী; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা: মার্কাস বার্টলে; শব্দানুলেখন: ডাবল্যু নরসিংহ মূর্তী; সংগীতানুলেখন: মীনু কাত্রাক, শব্দপুনর্যোজনা: মঙ্গেশ দেশাই; শিল্পনির্দেশনা: এস কৃষ্ণ রাও এবং এইচ এম মহাদ্রিয়; সম্পাদনা: এন এম শংকর; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত: লতা মঙ্গেশকর, সুমন কল্যাণপুর ও মুকেশ; রূপায়ণ: রাজেন্দ্রকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, ডেভিড, সঞ্জীবকুমার, সপ্রু, রামমোহন, বৈজয়ন্তী-মালা, সিম্মী, বীণা, নন্দিনী, শবনাম, প্রতিমা দেবী প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিচালনায় গেল ১০ জানুয়ারী, শুক্রবার থেকে প্যারাডাইস, বসুশ্রী, বীণা, গণেশ, খান্না আলোছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

একজন কর্তব্যপরায়ণা নার্সের মাকে অপারেশন করেও ক্যান্সার রোগ থেকে বাঁচাতে অসমর্থ হয়ে আমেরিকা ফেরত ডাক্তার রবি ক্যান্সারের গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করলে তার সাহায্যকারী হিসেবে পেল ঐ কর্তব্যপরায়ণা নার্স শান্তিকেই। ছায়ার মতো অনুগামিনী শান্তিকেই জীবন-সঙ্গিনী করতে মনস্থ করে যখন রবি তার সংকল্পের কথা তার প্রতিপালক দয়ানন্দকে জানাল, তখন সস্ত্রীক দয়ানন্দ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের অনূঢ়া কন্যা রজনী হল মর্মাহত। কারণ ওঁরা মনে মনে স্থির করেছিলেন রজনীর সঙ্গেই রবির বিবাহ হবে। শেষ পর্যন্ত দয়ানন্দ নিজেকে সামলে নিয়ে বরকে আশীর্বাদ করলেন তার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে। শান্তিকে বিবাহ করবার পরে রবি কিন্তু তার কর্তব্যে অবহেলা করছিল দেখে তার শুভানুধ্যায়ী হাসপাতাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শান্তিকে অনুরোধ করেন, রবির মনকে তার কাজের দিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

শান্তি তাঁর আদেশ পালন করে রবিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে সে নিজে হঠাৎ পড়ে এমনই অসুস্থ যে, রবি তার [illegible] কাজ [illegible] রেখে [illegible] সেবা করতে শুরু করে। রবির কর্তব্যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, এই চিন্তা শান্তিকে অস্থির করে তোলে এবং সে রবিকে মুক্তি দেবার জন্যে একদিন অসুস্থ শরীর নিয়েই নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে। কিছুদিন বাদে প্রকাশ পায়, শান্তি ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। তাই রবি শোক প্রশমনের জন্যে দয়ানন্দের কাছে যায় এবং সেখানে রজনী দ্বারা প্রায় উৎপীড়িত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বিবাহ করে। কিন্তু শান্তিকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না এবং এই নিয়েই রজনীর সঙ্গে তার প্রায়ই খিটিমিটি লেগে থাকে। এর ফলে একদিন ল্যাবরেটারীতে বিস্ফোরণ ঘটে এবং রবির চোখ দুটি নষ্ট হয়ে যায়।......দুর্ঘটনায় ফলে শান্তির মৃত্যুর সংবাদ কিন্তু সত্য নয়। দৈবক্রমে তার হাসপাতালের এক পূর্বতন রোগীর সঙ্গে পথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সেই রোগী তাকে সুইজারল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে তার রোগের চিকিৎসা করিয়ে তাকে সুস্থ করে। রবি যখন তার চোখের দৃষ্টি হারায়, তখন সে ভারতবর্ষে ফিরে এসেছে এবং আশ্চর্যভাবে রবির বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ছদ্মনামে তার শুশ্রূষার ভার নেয়। এরপর বিশেষজ্ঞের অস্ত্রোপচারের ফলে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে পেয়ে রবি কি ভাবে শান্তির সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত হয়েছে।

নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে রাজেন্দ্রকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা তাঁদের স্বাভাবিক নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে চরিত্র দুটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বহুদিন বাদে পাহাড়ী সান্যালকে হিন্দী ছবিতে দেখে ভালো লাগল। তিনি দয়ানন্দের চরিত্রটিকে যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন। ব্যর্থ প্রণয়িনী রজনীর ভূমিকায় সিমী সু-অভিনয় করেছেন। ডাঃ অশোক রূপে সঞ্জীবকুমারকে কিছুটা অ-তুষ্ট বলে বোধহয়। অপরাপর ভূমিকায় ডেভিড, মুকরি ও ধুমল প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেতু ভেঙে ট্রেনটি নদী গর্ভে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি কিন্তু অবাস্তব ও হাস্যকর। ছবির আটখানি গানের মধ্যে ‘মুকেশের গাওয়া ঈশ্বর জা' এবং 'জো চলা গায়া উসে ভুল জা' গান দুখানি অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে পারত। সব চেয়ে ভালো হয়েছে 'মেরা প্যারভী তু হৈ' এবং 'মেরে জীবন সাথী' গান দুখানি।

জেমিনি পিকচার্স'-এর "সাথী" অভিনয় ও কাহিনী গুণে জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বি এফ জে-এর উদ্যোগে আয়োজিত উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণের সাহায্যার্থে প্যারাডাইস প্রেক্ষাগৃহে সাথী চিত্রের প্রিমিয়ার শো-এ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর, সিমি, ভি কৃষ্ণমূর্তি ওরাজেন্দ্রকুমার। ফটো : অমৃত

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে এণ্টনী কবিয়াল নাটকের ৬০০ রজনীর স্মারকোৎসবে প্রধান অতিথি শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন। পার্শ্বে রয়েছেন মদন দত্ত, কেতকী দত্ত, তরুণ ঘোষাল, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফিল্ম সোসাইটি খবর

কর্মচঞ্চল সিনে সেন্ট্রাল

এখন যে-কটি ফিল্ম সোসাইটি এই কলকাতা শহরে চালু রয়েছে, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে "সিনে সেন্ট্রাল" সবচেয়ে বেশী কর্মচঞ্চল। বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক'রে কখনও বা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং কখনও বা ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে ও সহায়তায় সিনে সেন্ট্রাল সভ্যাগণের জন্যে ঘন ঘন বৈদেশিক ছবির প্রদর্শনী এবং উৎসবের আয়োজন ক'রে থাকেন। সম্প্রতি পর পর "জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব" এবং "সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব"-এর ব্যবস্থা ক'রে "সিনে সেন্ট্রাল"-এর কর্তৃপক্ষ এ'দের সভ্যবৃন্দের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। এ'দের প্রকাশিত তথ্য-পুস্তিকাগুলিও এ'দের তথ্যানুসন্ধানী মন ও শিল্পবোধের পরিচায়ক।

জাপানী চিত্রনির্মাতাদের যে-বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে, সেটি হচ্ছে তাদের পরিচ্ছন্নতা বোধ। যে বিষয়বস্তু ও কাহিনী অবলম্বন ক'রেই ও'রা ছবি তরী করুন না কেন, এই পরিচ্ছন্নতা বোধকে ও'রা কখনই বিসর্জন দেন না। আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, ও'রা কখনও ছবির মধ্যে অবাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেন না। আমাদের দেশের চিত্র-নির্মাতার—বিশেষ ক'রে হিন্দী ছবির নির্মাতারা জাপানী ছবির এই দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছবি নির্মাণ করলে ভারতীয় ছবিকে পরিচ্ছন্ন হতে সাহায্য করবেন।

যে-চারখানি জাপানী ছবি এবারের উৎসবে দেখানো হ'ল, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আকিরা কুরোসাওয়ার "রেড বেয়ার্ড"। যখন টোকিওর নাম ছিল এডো, সেই যুগে একটি বস্তি অঞ্চলের হাসপাতালে গরীব রোগীদের প্রতি উৎসর্গিত-প্রাণ এক বর্ষীয়ান চিকিৎসকের বলিষ্ঠ প্রভাবে এক-জন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক ডাক্তারের জীবনে যে-কল্যাণধর্মী পরিবর্তন এল, বহু বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে তারই এক জীবন্ত আলেখ্য উপস্থিত করেছেন কুরো-সাওয়া। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যই মানুষের শতকরা নব্বই ভাগ রোগের কারণ, এই বক্তব্যকে তিনি সোচ্চারে ব্যক্ত করেছেন এই ছবির মাধ্যমে। ওতপ্রোতভাবে এমন মানবিক সহানুভূতিপূর্ণ ছবি পৃথিবীতে আর একটি হয়েছে কিনা সন্দেহ, এ-কথা বলার পরেও বলব, "রেড বেয়ার্ড" ছবিটিতে ছবির চেয়ে বক্তব্য বড়ো হয়ে উঠেছে।

বরং চলচ্চিত্র হিসেবে আমরা সেইজি হিসামাসু পরিচালিত "অ্যাংরি সী" (চিনো হাতেনি ইকিরুমোনো)-কে সার্থকতার শিল্পসৃষ্টি ব'লে অভিনন্দিত করব। জাপানের উত্তরাঞ্চলের একটি নির্জন দ্বীপে জনৈক ধীবরের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে এই রঙীন ছবিটিকে গ'ড়ে তোলা হয়েছে। পিতার অনুসরণে প্রথম যৌবনে ধীবরটির মৎস্য-শিকার বৃত্তি গ্রহণ, তার প্রেম ও বিবাহ, তার তিন পুত্রের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরণে মৃত্যু, তার স্ত্রীর মৃত্যু এবং শেষ পর্যন্ত তার নিজের মৃত্যু—এই ঘটনা-গুলিকে চলচ্চিত্র-শৈলীর মাধ্যমে এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীডি এন সিংহ সোসাইটি সিনেমায় 'মহাত্মা' ছবি এবং সপ্তাহব্যাপী সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন। ছবিতে (বা দিক থেকে ডানে) শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ, কলকাতাস্থ সোভিয়েট কনসাল প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

"দীদ ডাকসে" (জিপ্সোগি) ছবিটি একটি পরিবারকেন্দ্রিক চারটি অনূঢ়া সুন্দরী কন্যার বিবাহ-বৃত্তান্তকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে। ছবির আরম্ভভাগেই তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যার বিবাহ অতি সহজেই সমাধা হয়ে যায়। গোল বাধে প্রথম দুজনকে নিয়ে। প্রথম মেয়ে কিকুকো (ত্রিগ্রান্ থেমায়) তার পর-লোকগত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দন্ত চিকিৎসকের কাজ করে। দ্বিতীয় উমেকো (শোয়ে রসম) তার সাহায্যকারী। পুরুষ দন্তরোগীদের হাঁ করিয়ে দাঁতের চিকিৎসা ও প্রায়ই দাঁত তোলার কাজ করে বলে কিকুকো পুরুষ মানুষ মাত্রকেই মনে করে বোকা, হাঁ-করা জলহস্তী। কাজেই পুরুষ মানুষে তার বিতৃষ্ণা। কি ক'রে এই বিতৃষ্ণা দূর হ'ল এবং প্রথম দু'টি মেয়ে শেষ পর্যন্ত বিবাহিত হ'ল, তাই হচ্ছে এই কৌতুকপ্রদ এবং উপভোগ্য ছবিটির আসল উপাদান। কোথাও বিকৃতি নেই, কুরুচি নেই, সম্পূর্ণভাবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও যে হাসির ছবি তৈরী হ'তে পারে তার সার্থক নিদর্শন হচ্ছে রঙীন ছবি "দি ডাকসে"।

"আওয়ার সাইলেন্ট রাজ্য"- ছবিখানি আমরা দেখে উঠতে পারিনি।

*

১২ থেকে ১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত "সিনে সেন্ট্রাল"-এর উদ্যোগে সোসাইটি সিনেমায় সোবিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব উপ-লক্ষ্যে যে পাঁচখানি রুশ ছবি দেখানো হ'ল, তার মধ্যে "আই বট্ এ ড্যাডি" এবং 'আইভ্যানস চাইল্ডহুড" আমরা অন্তত বছর তিনেক আগে দেখেছি এবং সেই কারণে এ-দুটিকে আমরা খুব আধুনিক চলচ্চিত্র বলতে পারছি না। একটি পিতৃহারা বালক তার মনের অতৃপ্তি ও শূন্যতাকে ভরাবার জন্যে এক রুবল খরচ করে কি ভাবে একটি বাবাকে কিনে এনে তার মায়ের কাছে হাজির করেছিল, সেই অনবদ্য কাহিনী অবলম্বন ক'রে অবিস্মরণীয় চিত্র "আই বট্ এ ড্যাডি" গ'ড়ে উঠেছে।

"আইভ্যানস্ চাইল্ডহুড"-ও বালক-অভিনেতার ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় আইভ্যান নামে একটি বালক কিভাবে যুদ্ধের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল এবং শত্রুহস্তে বন্দী হয়ে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছিল, তার করুণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে ছবিটির মাধ্যমে।

আধুনিকতর ছবি তিনখানি হচ্ছে : (১) সাডেন এনকাউন্টার্স, (২) কিডন্যাপিং ককেসান স্টাইল এবং (৩) থ্রী প্লাস টু। মস্কোতে প্রথমদিন ট্যাক্সিচালকরূপে জনৈক যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে 'সাডেন্ এনকাউন্টার্স' নামে কিছুটা বাস্তব তথ্যচিত্রের ধাঁচে নির্মিত এই কাহিনী-চিত্রটি তৈরী হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গী ও গঠন পারিপাট্যে, ছবিটি নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু অপর দুখানি রঙীন চিত্র সোজাসুজি প্রহসনের পর্যায়ে পড়ে। গাধা এবং মোটর ভ্যান—দুই-ই কিছুতেই চলতে চাইছে না; কিন্তু যেই মাত্র একজন সুন্দরী তাদের অতিক্রম করে এগিয়ে গেল, অমনি তারাও তার পিছু পিছু চলতে শুরু করল—এই কৌতুককর পরিস্থিতি বোম্বাইয়ের চিত্রনির্মাতাদের হয়ত প্রলুব্ধ করবে, যেমন প্রলুব্ধ করবে ছবিদুখানির আরও বহু ঘটনা।

ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেয়ার

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেয়ারের দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সাড়ম্বর উদ্বোধন ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক মধু বসু। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীবসু জোরের সঙ্গেই বলেন যে, এই ধরনের বেসরকারী চলচ্চিত্র মেলার অনুষ্ঠান ভারতবর্ষে এই প্রথম—সেদিক থেকে বিচার করলে নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির কর্মকর্তারা কৃতিত্বের দাবী

বিবাহ বিভ্রাট অনুপকুমার ও রবি ঘোষ

করতে পারেন। দেশ-বিদেশের রসোত্তীর্ণ ছবিগুলির প্রদর্শনী নামমাত্র চাঁদার বিনিময়ে প্রতিদিন দুটি করে অনুষ্ঠানে ৮০০০ হাজার দর্শক জনতার উপস্থিতিতে সত্যই উল্লেখ করার মত। সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার যাতে সহজলভ্য হয় সেজন্যেই এই চলচ্চিত্র মেলার অনুষ্ঠান। সাধারণ সম্পাদক কল্পতরু সেনগুপ্ত বলেন :— সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, ইতিপূর্বে বিদেশী ছবি সাধারণত ফিল্ম সোসাইটি-গুলির চার দেওয়ালের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতো। অবশ্য সরকারী উদ্যোগে যে অনুষ্ঠানগুলি হয়েছে, তার টিকিট সংগ্রহ করা সাধনার ব্যাপার ছিল এবং সেজন্যই বিদেশী ফিল্ম জন্ম ধারণের কাছে একটা কৌতূহল সৃষ্টি করে রেখেছে।

সুবার্বন ফিল্ম ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ পদ্মশ্রী সিনেমা হলে সুবার্বন ফিল্ম ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকল্যাণ সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের ও ক্লাবের সভাপতি শ্রীঅজয় কর ক্রমবর্ধমান শিল্প প্রসারের যুগে ফিল্ম সোসাইটিজ-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দর্শকবৃন্দকে সচেতন করেন। প্রধান অতিথি শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত তাঁর সারগর্ভ আলোচনায় চলচ্চিত্রশিল্প প্রসারের ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ করে ফিল্ম সোসাইটির মুভমেন্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও প্রয়োজনের কথা বলেন। চিত্রপরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটক বাংলাদেশের ছবির বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে ফিল্ম সোসাইটিজ-এর সভ্যবৃন্দের কাছে সচেতন ও পরিণত দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী রাখেন। ক্লাবের অন্যতম সহসভাপতি শ্রীবিজন দে বর্তমান বাংলা ছবির প্রয়োজনার কথা বিবৃত করে অকপটে জানান যে দর্শক-সমাজের মধ্যে ভালো ছবির জন্য নির্দিষ্ট চাহিদা না গড়ে উঠলে ভালো ছবি প্রযোজনা সম্ভব নয়। সে দায়িত্ব একান্ত-ভাবে ফিল্ম সোসাইটিজ-এর সভ্যরাই পালন করতে পারে। এতে সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র আন্দোলন প্রসারিত হবে। আলোচনা শেষে শ্রীঋত্বিককুমার ঘটকের "কোমল গান্ধার" প্রদর্শিত হয়।

মঞ্চাভিনয়

১৯৬৭-র বিশ্বরূপা পুরস্কার :

গেল ৪ জানুয়ারী, শনিবার বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবীকে ১৯৬৭র "বিশ্বরূপা পুরস্কার" দ্বারা সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানপত্রটি পাঠ করেন পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক, বিশ্বরূপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকার।

স্টার থিয়েটারে ইউ কে ব্যাঙ্ক প্রযোজিত 'চৌরঙ্গী' গত পক্ষকালীন নাট্যানুষ্ঠানের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, এখানে সৌখিন শিল্পিগোষ্ঠীর অনেকেই পেশাদারী অভিনয়-দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। শংকরের ভূমিকায় নির্মল মালাকারের অভিনয় আগম যোগ্যতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উত্তমকুমারের পৌর সম্বর্ধনা

১১ জানুয়ারী এক অনুষ্ঠানে সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এ মেয়র প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমারের হাতে কাসকেট ও মানপত্র দিচ্ছেন।

নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে শাহ্‌জাহান হোটেলের অধিবাসীদের চারিদিকের জীবনযন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাদের জীবনে জীবনযোগ না করেও সমবেদনার কারুণ্যে এই জীবনদর্শনের প্রতি সুধাম আপন নৈপুণ্যের সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন শ্রীমালাকার। স্যাটা বোসের অভিনয়ে প্রশান্ত দাশগুপ্ত চলনসই। করবীর ভূমিকায় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করেছেন শ্রীমতী দীপিকা দাস। অনিন্দ্যর ভূমিকায় প্রদীপ মুখোপাধ্যায় মোটামুটি ভূমিকাই দেখিয়েছেন, তবে একটু যেন প্রাণের অভাব। শঙ্কর ও অনিন্দ্যর মুখে কবিতাগুলি অনাবশ্যক। মিসেস পাকড়াশীর ভূমিকায় গীতা দে, সুজাতার ভূমিকায় রমা দাস, মিসেস বায়রণের ভূমিকায় মায়া রায়, সুকুমার সিংহ (রোজি), নারায়ণ ভট্টাচার্য, সন্তোষ মজুমদার, ত্রিদিব চৌধুরী, মানস বোস, বিমল মিত্র, অমল ব্যানার্জি সমবেতভাবে নাটকটি উৎরে দিয়েছেন। আবহসংগীত ভাল, আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা আশানুরূপ নয়। নাট্যকার শিরীন চক্রবর্তী ও পরিচালক ভবেশ পাল ধন্যবাদার্হ।

'কল্লোল' আয়োজিত ৩য় বার্ষিক চুঁচুড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৪র্থ সপ্তাহে আরম্ভ হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু সংস্থা সম্পাদক, 'কল্লোল' খ:ড়ুম্বরতলা, চুঁচুড়া যোগাযোগ করতে পারেন। শেষ তারিখ ২৬শে জানুয়ারী।

শ্রীলতা ইনস্টিটিউট, চিত্তরঞ্জন আয়োজিত একাদশ বার্ষিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা গত ৫ জানুয়ারী শেষ হয়েছে। এবছর আঠারোটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রতিযোগিতায় চিত্তরঞ্জনের নাট্যরূপা ও মাইথনের মাইথন ক্লাব যথাক্রমে 'নিশাদ' ও 'সমাধান' নাটক মঞ্চস্থ করে যুগ্মভাবে তুলসী লাহিড়ী স্মৃতি পরস্কার লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রীগিরিজা দত্ত ও শ্রীঅসীম বোস। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীগৌতম বাগচী ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী মায়া ঘোষ পুরস্কৃত হয়েছেন।

বিবিধ সংবাদ

চিত্রপট-এর উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসব :

আজ থেকে সাতদিনব্যাপী সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব সোসাইটি সিনেমায় আরম্ভ হচ্ছে। উদ্যোক্তারা এই উৎসবের সংগে প্রতিদিন ভারতীয় তথ্যচিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গান্ধী শতবার্ষিকীর জন্য নির্মিত 'মহাত্মা' এই প্রথম-উদ্বোধনী উৎসবে 'লাইফ অফ টলস্টয়'-এর সংগে দেখানো হবে। ২৩ জানুয়ারী নেতাজীর জন্ম-দিবস উপলক্ষে শিশু উৎসবে 'সোর্ড অফ নেতাজী' ও মহাত্মা প্রদর্শিত হবে। এই চলচ্চিত্র উৎসবে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের একটা সম্যক রূপ যাতে দর্শকরা পেতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে উদ্যোক্তারা চিত্র নির্বাচন করেছেন। এর মধ্যে 'লাভ এ্যান্ড ওয়ার' রোমান্টিক কমেডি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে গুরু-গম্ভীর বিষয়বস্তু নিয়ে নির্মিত 'ম্যানস ডেস্টিনিং'। 'ক্রাইম আন্ডার ওয়াটার' হচ্ছে মুক্তাসংগ্রহকারী বোম্বেটেদের সংগে সমুদ্রের নীচে লড়াই। এই থ্রীল-ক্রাইম ধরনের ছবি সোভিয়েত চলচ্চিত্রে অভিনব; তেমনি আবার রয়েছে ক্যানে গ্রান্ড প্রিক্স পাওয়া সার্গেই বন্দরচুকের 'ওথেলো', মানবতার জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ব্যালাড অফ এ সোলজার' শিশুদের জন্যেও রয়েছে 'দি গ্রেট রাশিয়ান সার্কাস'।

যাদুকর প্রীতি সম্মেলন

গত ২২ ডিসেম্বর রবিবার চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে যাদুকর চক্রের উদ্যোগে যাদুকর প্রীতি সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের প্রীতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চন্দননগরের মেয়র শ্রীঅংশুভূষণ মিত্র। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীহলধর পটল। যাদুবিদ্যার আসরে অংশগ্রহণ করেন যাদুকর দি গ্রেট সুশীল। গত তিন মাস ধরে ইনি আসাম, নেফা, এবং নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সঙ্গে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে গত ৫ই ডিসেম্বর কলকাতায় ফিরেছেন। তিন মাস পরে গ্রেট সুশীলের পশ্চিমবঙ্গে এইটে প্রথম যাদু প্রদর্শনী। গ্রেট সুশীল ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

ইনি যাদুকর চক্রের একজন সভ্য। সুন্দর প্রদর্শনভঙ্গীর জন্য আজ সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি। এ ছাড়াও তারক দে, শশাঙ্ক ব্যানার্জি, অবনী ব্যানার্জি, জটীরাম দাস, কে কুমার, শৈলেশ্বর, দীপক ভট্টাচার্য, কুমারী অঞ্জলি সরকার, জি বি অধিকারী, বিকাশ মিত্র প্রমুখ যাদুকর যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন।

পরলোকে প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সুখ্যাত অভিনেতা শ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৪ জানুয়ারী কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি এবং মৃত্যুকালেও অঙ্গে ছিল তাঁর অভিনেতার সাজ। ঐদিন রাত্রে বেলেটা নাট্য-সম্মেলনে 'কাবুলিওয়ালা' নাটকে মিনির বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন তিনি—এমন সময় ওই ব্যাধিতে আক্রান্ত

হন শ্রীমুখোপাধ্যায়। সুখলাল করনানি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

চলচ্চিত্রে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব দীর্ঘদিনের নয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরেই অভিনেতা হিসেবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন তিনি। শ্রীমুখোপাধ্যায় যে-সব ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসালাভ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'গল্প হলেও সত্যি', 'গৃহদাহ', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ'।

পরলোকে শেখর রায়

চিত্র ও সংগীত জগতে খ্যাতনামা শ্রীশেখর রায় কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীদেবকী বসুর সঙ্গে কাজ করে তিনি চিত্র-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বহু চিত্রে অভিনয় এবং সংলাপ রচনা করেছিলেন। একটি বাঙলা ছবি আরম্ভ করেও শ্রীরায় তা শেষ করে যেতে পারেন নি।

দিলীপ বসু পরিচালিত এবং আর এস প্রীতম প্রযোজিত নির্মীয়মান হিন্দী ছবি **শুভা কাঁহি শাম কাঁহি-র একটি দৃশ্যে মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণী ঘোষ।**

ডি. ভি. সি বোকারো ক্লাবের উদ্যোগে বিহার এবং বাংলা বন্যাত্রাণ তহবিলে সাহায্যকল্পে গত ৪—৬ জানুয়ারী তিনটি অনুষ্ঠান বোকারো ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দিনে আসানসোলের 'মোহিনী মোহন সঙ্গীত বিদ্যালয়'-এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করে। দ্বিতীয় দিনে দুর্গাপুর-এর 'দরবারী' সংঘ 'অলীকবাবু' এবং 'নব হট্টমালা' এ দু'টি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ ক'রে। তৃতীয় দিনে গিরিডির প্রখ্যাত যাদুকর দেবরাজ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ-এর উদ্যোগে বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাগবাজারের গিরিশ ভবনে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচনা সভায় বাংলা দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্র ও গিরিশানুরাগীরা উপস্থিত থাকবেন।

একক অভিনয়ে তরুণ শিল্পী শ্রীসাহাদাৎ হোসেন বহু অনুষ্ঠানে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অঙ্গভঙ্গি ও বাচনভঙ্গির দিক থেকে সিরাজদ্দৌলা, কলকাতার বুকে ও বৌদির প্রেম ইত্যাদি ফিচার আকর্ষণীয়।

গত ২৩ নভেম্বর জে-কে নগর অফিসার্স' ক্লাব রঙ্গমঞ্চে অ্যালুকয়েন ক্লাবের উদ্যোগে লেডীজ নাইট' উপলক্ষে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে কুলটির জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংস্থা 'উদয়চক্র' সম্পাদক সমীপেন্দ্র লাহিড়ীর সুযোগ্য পরিচালনায় মূকাভিনয় ও সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুশান্ত ঘোষ, অরুণ গুপ্ত, বাদল দাস, অশোক ঘোষ, তপেশ রায় ও সমীপেন্দ্র লাহিড়ী।

গত ১৪ ডিসেম্বর ত্রিসপ্তকের শীতকালীন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে একটি সুন্দর সন্ধ্যা উপহার পাওয়া গেছে। কুড়িটি রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে 'বিরহ-মিলন' নৃত্যনাট্য উপহার দিয়েছেন ত্রিসপ্তক ঐ সন্ধ্যায়। গ্রন্থনায় ছিলেন শ্রীমতী মিত্র ও আশীষ মজুমদার। কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন প্রিয়াঙ্ক মৈত্র, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কল্পনা সিংহ ও বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী। নৃত্যে আকর্ষণীয় দক্ষতার নজির রাখেন ভদ্রা মিত্র ও দেবী মুখোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইডেন উদ্যানে চিত্রতারকা

বন্যাত্রাণে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের চিত্রতারকারা মাঠে নেমেছিলেন বারই জানুয়ারী। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মিস ব্যালেরিন-কাসানা রাবিনা কিনাও ও বিদূষক সারিদা এডওয়ার্ড। বাংলাদলের অধিনায়ক ছিলেন উত্তমকুমার এবং বোম্বাইয়ের রাজকাপুর।

দুই অধিনায়ক : রাজকাপুর ও উত্তমকুমার

অনিল চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, শশীকাপুর, মধুমতী এবং বিশ্বজিৎ

সাধনা
মালা সিনহা
পাহাড়ী সান্যাল
অঞ্জনা ভৌমিক
সিমি
দিলীপ মুখোপাধ্যায়
রাজকাপুর
শশীকাপুর
উত্তমকুমার
কাসানা রাবিনাকিনাও
পার্থ মুখোপাধ্যায়

ফটো : সুকুমার রায়
অমৃত

জলসা

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি

সঙ্গীত - কলা - মন্দিরের উদ্যোক্তাদের সৌজন্যে শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি'র নৃত্য-উদ্ভাসিত কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্তকে আস্বাদ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বপ্নময় ঘন নীল যবনিকার পট-ভূমিকায় নৃত্যরতা শ্রীমতী যামিনী যেন সমুদ্রোত্থিতা নৃত্যপরীর মত ছন্দের তরঙ্গে রসিকচিত্তকে উদ্বেল করে তুলেছিলেন। নৃত্য শুরু হয় ভারতনাট্যমের কয়েকটি অঙ্গ দিয়ে। সাধক শিল্পী ত্যাগরাজের রচিত 'কীর্তন'-ভিত্তিক একটি সুন্দর শ্লোকের নৃত্য বিশ্লেষণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদিতাল ও 'আরোহী' রাগের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর সৃজন-প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন এই অঙ্গ। পর পর জয়দেবের অষ্টপদী গীতিকাব্যের সরস মাধুর্য ওড়িষী নৃত্যে, এবং কুচিপুরী নৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরনৃত্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতনাট্যম প্রাচীনকালে ধর্মজীবনের সঙ্গে এক ও অবিচ্ছিন্ন হয়েছিল। যুগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। কিন্তু নৃত্যের আধ্যাত্মিক শুচিতা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। শ্রীমতী যামিনীর নৃত্যে লাস্য ছিল, ছিল মধুর রসবিহ্বলতা, লীলায়িত রঙ্গের উচ্ছল সমারোহ, কিন্তু রাগের বাদীসুরের মত এ নৃত্যের ঊর্ধ্বমুখী আকৃতি ভাব শিল্পীর নৃত্যে প্রথম থেকে শেষ অবধি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান ছিল—মূল ভাবের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও সৃষ্টিপ্রেরণার কারুকার্যে আপন শিল্পী-ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর যেন মুদ্রিত। এইখানেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কৃতিত্ব।

নৃত্যের সঙ্গীতসঙ্গত উচ্চমানের। তবে শ্রীমতী জ্যোতিষ্মতীর কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য উৎসুক মন তাঁর অনুপস্থিতির অভাবে একটু যেন নিরাশ হয়েছে। 'পাণ্ডুনাত্য' রীতির সজ্জা দৃষ্টিকে যেন সৌন্দর্য-মাদকতায় এক নিমেষে আকর্ষণ করে নিয়েছে।

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি —ফটো : গণেশ সিংহ

ওরিয়েন্ট অ্যাট্রাকশনের নিবেদন

ওরিয়েন্ট অ্যাট্রাকশনের পক্ষ থেকে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চট্টোপাধ্যায় পরিবেশিত 'রামলীলা' ও 'মীরাবাঈ' শীত-কালের উৎসব সমারোহের অন্যতম আকর্ষণ হয়। স্থান—রঞ্জি স্টেডিয়াম, রূপদানে ছিলেন দিল্লীর ভারতীয় কলামন্দিরের শিল্পীরা। দুটি নৃত্যনাট্য—দুটি ভাবের আধার। 'রামায়ণ'-ভিত্তিক রামলীলায় মহা-কাব্যের বিপুল বিস্তার ও বিশালতা, মহা-নায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে ঘিরে মানুষের মহত্ত্বের কল্পনা ও দৃষ্টিবৈভব কতদূর পৌঁছতে পারে—জীবনের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব ও শান্তির উজ্জ্বল চিত্র। অপরটি গীতি-কাব্যের ক্ষুদ্র পক্ষপুটে ভক্তিভাবের অশ্রু-সজল কারুণ্য ও মধুরতা—সাধিকা মীরা-বাঈর সর্বত্যাগী বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম—বিভিন্ন ছন্দসুষমা তথা নৃত্যের ভাষায় ভাবের উদ্বেল, উচ্ছল প্রকাশ, নয়নাভিরাম সজ্জা, ভারতীয় কলামন্দিরের সার্থক শিল্পসাধনার দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করে। সবার ওপর নৃত্য-পরিচালক কৃষ্ণান নাম্বুদরির কল্পনা-সমৃদ্ধ নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা। রামায়ণের নাট্য-ঐশ্বর্য বর্ণনায় কথাকলির বৃহৎ পটভূমিকায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্যের স্পর্শে অনুভাবের নানারঙা আবেগ ব্যাপ্ত। আবার মীরাবাঈ-এর ভাববস্তু মণিপুরীর পেলব সুষমায় যেন কথা বলে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণান নাম্বুদরির সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল দক্ষিণ ভারতেরই এক অভিজাত জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। রক্ষণশীল পরিবারের অভিভাবকবৃন্দ স্বাভাবিক নিয়মে নৃত্য গীতকে নিম্নস্তরের আমোদ বলেই মনে করতেন। কিন্তু শিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল কৃষ্ণানের সহজাত প্রবণতা। এই অর্থ হীন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ

করে নৃত্যকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পি এস চালিপ্পা ও গুরু গোপীনাথের শিষ্যরূপে নৃত্যের প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি উদয়-শঙ্করের সংস্পর্শে আসেন এবং শঙ্করের সৃষ্টিশীল বৈভবের বৈচিত্র্য ও বর্ণসমারোহে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই নটরাজের প্রতিভূরূপে মেনে নিলেন। "দাদার সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর কোরিওগ্রাফিতে আত্মনিয়োগের প্রেরণায় নৃত্যরচনায় মন দিলাম। প্রথম মঞ্চরূপ 'নবজীবন-কী' দিল্লীর কলারসিক-দের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন ধন্য হয়েছে।" ১৯৫৮তে ইন্দ্রাণী রহমানের সঙ্গে আমেরিকার সংস্কৃতি সফরে ইনি অংশগ্রহণ করেছেন। পরে বিরজু মহারাজের সঙ্গে রাশিয়াতেও গেছেন। ১৯৬৭তে ভারতীয় কলামন্দিরের শিল্পীরূপে 'মীরাবাঈ'-ই তাঁর প্রথম সৃষ্টি। এরপর মানুষের দৈনন্দিন জীবন-বেদ তথা হাসি, অশ্রু, আনন্দ-বেদনার কাহিনীই হবে তাঁর 'ব্যালে'র বিষয়-বস্তু। এই বিষয়ে জাপানের আদর্শই তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছে বলে শ্রীনাম্বুদিরি জানালেন। ভবিষ্যতে শ্রীশঙ্করণের পরিণত-তর সৃষ্টি দেখবার আশায় রইলাম। সত্যি-কারের এক তরুণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিভাকে রসিক-সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাবেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ এবং যুগ্ম-সম্পাদক সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব জার্মানীতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল

ইস্ট বার্লিন পত্রিকার **১লা** ডিসেম্বর প্রকাশ —'কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর প্রেরিত এক ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল আজ ইস্ট বার্লিনের এক অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যোদ্দীপ্ত এক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এই সাংস্কৃতিক দলটি সোভিয়েত রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, পোলান্ড সফরশেষে ড্রেসডেন, ওয়াইমার হল প্রভৃতি ইস্ট জার্মানীর বিশিষ্ট শহরে এবং ইস্ট বার্লিনে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে পশ্চিম জার্মানী রওনা হচ্ছেন।

এই সাংস্কৃতিক দলের অন্যতমা শিল্পী রবিশঙ্করের সুযোগ্য শিষ্য শিল্পী শ্রীমতী জয়া বিশ্বাস (বসু) ও শ্যামল বসুর সেতার ও তবলাবাদন পূর্ব জার্মানীর বিভিন্ন শহরের শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করেছে। শ্রীমতী পদ্মা পরিবেশিত ভারত-নাট্যম এবং শ্রীমতী সোনাল মানসিং পরি-বেশিত ওড়িষী নৃত্যও সমাদৃত হয়েছে কিন্তু তাঁরা অধিকতর উল্লসিত হয়েছেন সেতারে বিভিন্ন রাগরূপের রসবর্ণনা এবং শ্যামল বসুর তালবৈচিত্র্যে।

সেতারবাদিকা ছাড়াও lecture demonstrater রূপে ড্রেসডেন ও ওয়াইমারে শ্রীমতী বিশ্বাস আমন্ত্রিত হন। তাঁর রাগসম্বন্ধীয় বক্তৃতায় ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত

জয়া বসু

হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য তথ্য হোলো এই যে পোলান্ড ও পূর্ব জার্মানীতে শ্রীমতী জয়া বিশ্বাসই হোলেন প্রথম সার্থক মহিলা-শিল্পী।

১লা ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের পর সংস্কৃতিমন্ত্রী ভারতীয় শিল্পীদের অভি-নন্দন জানান এবং এক সাংবাদিক সম্মে-লনের আমন্ত্রণে শ্রীমতী জয়া বিশ্বাস বিশেষ অনুরোধে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। বক্তৃতা শেষে শ্রীমতী বিশ্বাস পূর্ব জার্মানের সরকারের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এই সাংস্কৃতিক দল শুধুমাত্র ভার-তীয় নৃত্যগীত পরিবেশনার্থেই আসেন নি ভারত ও পূর্ব জার্মানীর মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করবার প্রয়াসেই এই সাংস্কৃতিক সফরের পটভূমিকা।

'চিরকালের' সঙ্গীতে ছন্দের সার্বজনীন আবেদন

"সুরের মত ছন্দেরও একটা নিজস্ব আবেদন আছে, যা সকল দেশের সকল মানুষকে আকর্ষণ করবেই—'চিরকালের' সঙ্গীতে এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছি"—'চিরকালের' সঙ্গীতপ্রসঙ্গে বল-লেন সঙ্গীত-পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। টেপ-রেকর্ড বিধৃত সঙ্গীত শুনলাম। কণ্ঠ এবং যন্ত্র মিলিয়ে প্রায় ৪৮টি পিস্। নতুনত্বই শুধু নয়, অনেক চমকপ্রদ আকর্ষণ আছে যা এর আগে কোনো ছবিতে শোনা যায়নি। যেমন শান্তাপ্রসাদ ও রোজাভিক অ্যান্টনিক উভয় গ্রুপের তবলা ও ইউ-রোপীয় তালবাদ্য বাজানো। এ-প্রসঙ্গে নচিকেতাবাবু বললেন—"আমার ধারণা একই ছন্দ যেমন ৩+৫ অথবা ৫+৫ রাস্তায় গান গেয়ে যাওয়া ঢোল-বাজিয়েও বাজান, শান্তা-প্রসাদও বাজাবেন, অথচ রোজাভিক্

এ্যান্টনিও গ্রুপও বাজাবেন—তবে দেশ ও কালে পটভূমিকার পার্থক্যের দরুন প্রকাশ-ভঙ্গীর তফাৎ থাকলেও, ছন্দের যে চিরন্তন আবেদন প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতা ছাপিয়েও মনকে স্পর্শ করবে। এখানে আছে রোম্যান্টিক আন্টনিও ও শান্তাপ্রসাদ উভয় সম্প্রদায়ই—আপনাপন বৈশিষ্ট্যে বাজিয়ে চলেছেন, অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করছেন উত্তমকুমার। এ-জিনিস এর আগে কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্রে হয়নি। আর একটা নতুন জিনিস হোল—পিতা-পুত্রের দ্বৈত পিয়ানো বাদন—এ-বস্তুও এর আগে ছবিতে দেখা যায়নি। উত্তম এ-সংগীত শুনে আমায় উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছে। দর্শকেরা কিভাবে নেবেন উপস্থিত সেই দেখার আশায় আছি।"

পরলোকে সংগীত সাধক রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সংগীত জগতের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু-কলা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৮) রামকৃষ্ণ মিশন সেবা হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার জনপ্রিয়তম বাঙালী শিল্পী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সংগীত, ধ্রুপদ, ধামার ও বাংলা খেয়াল গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের তিনি কাছের মানুষ ছিলেন। পঃ বঃ সংগীত নাটক একাডেমির প্রথম সংগীত অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি বিখ্যাত সংগীতশিল্পী স্বর্গত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংগীত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থটি সম্প্রতি সম্পাদনা করেছেন। তিনি স্ত্রী পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা খবর শুনে হাসপাতালে যান।

শিশু রংমহলের উৎসব-সভায়

কলকাতার অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠান শিশু রংমহলের পক্ষকালব্যাপী উৎসব সমাপ্ত হয় কয়েকদিন আগে। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী উৎসব উদ্বোধনকালে প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ সমর চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহকারী অসিত মৈত্র এবং প্রভাত ঘোষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিশুদের মানস-প্রবণতাকে খেলাঘরের খেলার মাঝ দিয়ে পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে আত্মনিয়োগ করে এঁরা দেশের কল্যাণ-সাধনই করছেন। প্রতিটি সন্ধ্যা রমণীয় হয়ে উঠেছে শিশু-শিল্পীদের নৃত্য, গীত ও হাস্যকলরবে। সুবিখ্যাত মিঠুয়া, লালুন-পুর, বুড়ো আংলা, সং অফ ইন্ডিয়া ছাড়াও এবারের নতুন অবদান হোলো টিন-এজারস রূপায়িত 'রামায়ণ' এবং 'তাসের দেশ'। বালকৃষ্ণ মেননের নৃত্য-পরিচালনায় রামায়ণের প্রতিটি চরিত্রের ভাবরূপ সহৃদয়-হৃদয়-সঞ্চারী হয়ে উঠেছে। তিমিরবরণকে বহুদিন বাদে সংগীত-পরিচালনার কাজে পাওয়া গেল এবং তিনি যে আজও ফুরিয়ে যাননি, তারই উজ্জ্বল প্রমাণ চিত্তস্পর্শী সংগীতের পটভূমিকা, কখনও যোগিয়া, কখনও ভৈরবী, কখনও মালকোষের রাগরূপে বিধৃত। 'তাসের দেশ'-এ কবিগুরুর অনন্য ভাবনার ছবি—প্রাণহীন প্রথার বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহকে বর্তমান সামাজিক পটভূমিকার আলোকপাতে এক নতুন রসরূপ দান করেছেন সমর চট্টোপাধ্যায়। কবিগুরুর ভাবনায় লেগেছে এ-যুগের মননশীলতার ছোঁয়া—অর প্রাণের আনন্দে যেন [illegible] উঠেছে অন্তর্নিহিত বক্তব্য। নৃত্য-পরিচালনা করেছেন কেলু নায়ার। রেবা রায়চৌধুরী সুযোগ্য পরিচালনায় 'ডাকঘর'ও প্রতি মুহূর্তে উপভোগ্য হয়েছে। এর সঙ্গে সার্থক সংগীত-সংগত করেছেন প্রিয়[illegible] চৌধুরী। সি এল টি-তে উপস্থিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা একমত—এ শুধু শিশুদেরই নয়, পরিণত মানুষের অন্তরস্থিত শিশুদের জাগিয়ে তোলে।

শিশু রঙমহলের একটি অনুষ্ঠান। ফটো : অমৃত

সংগীতাচার্য 'সুরেন্দ্রলাল [illegible] ঐকতানিক যন্ত্রসংগীতে রাগরাগিণীর [illegible] রচনা ও সুর-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য ছিল যে অভিনব, তাল ও সংস্কৃতের দুরূহ ছন্দ সংগীতের মধ্যে নূতন পরিকল্পনায় প্র[illegible] করার পদ্ধতিও ছিল তেমনি নৈপুণ্য[illegible] শাস্ত্রীয় সংগীতের যথাযথ রূপ বজায় রে[illegible] পাশ্চাত্য ভাবধারায় এবং সু[illegible] পদ্ধতিতে রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধ বি[illegible] সাধন ও রাগ অর্কেস্ট্রা রচনা করা সম্ভব, তা সুরেন্দ্রলাল প্রমাণ করে গে[illegible] তাঁর অভূতপূর্ব রচনার মাধ্যমে। 'আ[illegible] অর্কেস্ট্রাই সর্বপ্রথম ভারতীয় য[illegible] সমন্বয়ে, ভারতীয় রাগ-অর্কেস্ট্রার প্রচা[illegible] সৌখিন গোষ্ঠী। বিভিন্ন ভারতীয় য[illegible] সমাবেশে ঐক্যতানিক যন্ত্রসংগীত [illegible] কণ্ঠে ও যন্ত্রে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর বিশ[illegible] বিকাশ যে কতদূর শ্রীমণ্ডিত হতে প[illegible] তা নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা [illegible] বৎসরান্তে এই সংঘ একটি করে সাংস্কৃ[illegible] অনুষ্ঠান আজ ত্রিশ বছর ধরে করে আ[illegible] এখানকারই ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা, বাই[illegible] কোনও শিল্পীর সাহায্য না নিয়ে।

খেলাধুলায় বিজ্ঞানের ভূমিকা

অময় বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টার্টিং ব্লক

বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন খেলাধুলোর বিভিন্ন বিভাগে বিশ্বরেকর্ডগুলি খুবই পলকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে কি, প্রতিদিন রেকর্ড ভাঙছে; এমন কি সকালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড দুপুরে বাসি হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় এবং সাজসরঞ্জামের ব্যবহারে এই যে বিশ্বরেকর্ড ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে এতে রেকর্ডস্রষ্টা ক্রীড়াবিদের কৃতিত্ব সম্পর্কে অনেক সমীক্ষকের মনে কিন্তু প্রশ্ন জাগছে, এসব রেকর্ডকে ক্রীড়াবিদের দক্ষতার প্রমাণ না বলে বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বই বলা সংগত কিনা? বর্তমানের ক্রীড়াবিদরা উত্তরোত্তর বিজ্ঞানীদের সজীব 'রবটে' পরিণত হচ্ছেন কি—না? কথাটা ভাববার বিষয়। বিশশতকে পাভো নুর্মি, রিটোলা, ওয়াইড, পেলজার বা লাডুমেগের বিশ্বজোড়া কৃতিত্বের মূলধন ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য এবং ক্রীড়াপ্রতিভা। সেখানে নিজেদের স্বাভাবিক প্রতিভাকে কোন বিজ্ঞানীর ল্যাবর‍্যাটরিতে গড়ে তুলতে হয়নি; অথবা বর্তমান সময়ের উন্নত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের সাহায্যে তাঁরা স্বীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। সে সুযোগই তাঁরা পাননি।

স্বল্প পাল্লার দৌড়বীদদের জন্য যে 'স্টার্টিং ব্লকের' ব্যবস্থা হয়েছে তার দ্বারা দৌড়বিদ দৌড়ের সুরুতে যে অতিরিক্ত ঝাঁকি পান, তার দ্বারা দৌড়ের সময় অনেকখানি প্রভাবিত হয়। অথচ আগেকার দিনে দৌড়প্রতিযোগীদের মাটিতে গোড়ালির সাহায্যে গর্ত করে নিয়ে দৌড় সুরু করতে হত।

আগে কেউ বিশ্বরেকর্ড ম্লান করলে বা স্পর্শ করলে তাঁর নাম সংবাদ শিরোনামায় স্থান পেত, কিন্তু বর্তমানে জিম রিয়ানের মত দৌড়কুশলী ৩ মিনিট ৩৩-১ সেকেণ্ডে ১৫,০০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড সৃষ্টি করলেও তাঁর নাম সংবাদপত্রের নীচের দিকেই স্থান পায়। হরদম রেকর্ড ভাঙ্গার ফলেই এরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

উপরন্তু এখন কয়েকটি দেশের ক্রীড়াকর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষকদের প্রধান লক্ষ্য— বিশ্বরেকর্ড ভাঙার উদ্দেশ্যে সব রকম ব্যবস্থা করা। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের রিলে চতুষ্টয় একনাগাড়ে অনুশীলন করে ১০০ মিটার রিলে দৌড় মাত্র ৩৯ সেকেণ্ডে শেষ করে বিশ্বরিকর্ড করেন। কিন্তু ওদেশের কর্তারা এতেও সন্তুষ্ট নন, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলে চতুষ্টয় ৩৮-৬ সেকেন্ড সময়ে যে আগের বিশ্বরেকর্ড ভাঙে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু এই সাফল্যের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের দৌড়কুশলীদের মরশুমের পর মরশুম একসঙ্গে একটানা অনুশীলন করতে হয়েছে নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এক দলের মতে, এভাবে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টির গৌরব কার?

বৈজ্ঞানিক কারিগরীর ফল খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তাতে সাফল্যের গৌরব ক্রীড়াবিদকে স্পর্শ তো করছেই না, উপরন্তু বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়ার ফলে ক্রীড়াকুশলীর প্রতিভাকেই তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। যেমন, খ-গতিবিজ্ঞানের নিয়মে বর্শার আকার ও ওজন নির্ধারণ করে তা নিয়োগ করলে আগের তুলনায় বেশী দূরত্বেই যায়। কিংবা ডিসকাস ও হ্যামার ছোঁড়ার ট্র্যাক পাথরের মত শক্ত হওয়ার ফলে প্রতিযোগীদের আগের মত পদস্খলন হয় না, তা ছাড়া ছোঁড়ার সময় তাঁরা জমি থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পান। এদিক থেকে বিচার করলে র‍্যান্ডি ম্যাটসনের (যুক্তরাষ্ট্র) ৭১ ফুট ৪½ ইঞ্চি দূরত্বে সটপুট ছোঁড়ার ঘটনা তত চমকপ্রদ মনে হবে না।

পোলভল্টে নয়া রেকর্ডের ঘটনাকে সব চেয়ে বাজে মনে করার কারণ আছে, কাঁচ তন্তু নির্মিত পোলের সাহায্যে ১৭ ফিটের বেশী উচ্চতা অতিক্রম করার কৃতিত্ব প্রতিযোগীর যতখানি, তার চেয়ে বেশী রাসায়নিক এবং ইঞ্জিনীয়ারদের, যাঁরা ঐ পদার্থ কাজে লাগিয়েছেন। এর তুলনায় বাঁশের বা অ্যালুমিনিয়াম পোলের সাহায্যে যাঁরা ১৫ ফিট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করেছেন তাঁদের কৃতিত্ব অনেক বেশী। এর ওপর যদি কৃত্রিম রাবারের পোল ব্যবহার করা হয়, তাহলে পোলভল্টের বর্তমান বিশ্বরেকর্ড ভাঙতে বা ১৮ ফিট উচ্চতা অতিক্রম করতে বেশী দেরী হবে না।

কৃত্রিম রাবার ট্র্যাক তৈরী হলে বর্তমানের অনেকগুলি স্বল্প এবং দূর পাল্লার রেকর্ড ভেঙে খান খান হয়ে যাবে এ কথা জোর করেই বলা যায়।

বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াপ্রতিভূরা এ্যাথলেটিক, সাঁতার, জিমন্যাস্টিক, ভারোত্তোলন প্রভৃতির ক্রীড়ামান উন্নয়নে যেভাবে উত্তরোত্তর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে চলেছেন তার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত কুশলতা এবং প্রতিভাকেই গৌণ করা হচ্ছে। এসব কান্ডকারখানা দেখে সতঃই মনে হয়, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের মত খেলাধুলোর আসরও বিজ্ঞানের দাপটে স্বকীয়তা হারিয়ে যন্ত্রভিত্তিক হয়ে দাঁড়াবে।

শরীর, স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, দক্ষতা এবং ক্রীড়াপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশেই মানব সমাজে খেলাধুলোর চর্চা। কিন্তু ক্রমাগত যদি এই আসরকে বিজ্ঞানভিত্তিক করার চেষ্টা করা হয় তাহলে এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ নগণ্য দর্শক হিসাবে 'রোবট'দের ওলিম্পিক খেলা দেখবার জন্যেই মাঠে উপস্থিত থাকবে, নিজেরা খেলাধুলোর আসরে প্রত্যক্ষভাবে আর নামবে না। খেলাধুলোর আসরে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের একটা সীমানা চিহ্নিত না করে দিলে, বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে নতুন সমস্যা দেখা দেবে, যা মানব সভ্যতার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে।

খেলাধুলোর মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পশ্চিমী দেশগুলিতে ভেষজ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অতীতে কেবলমাত্র অক্ষম বা অশক্ত এ্যাথলীট অথবা খেলোয়াড়দের ব্যায়াম এবং পেশী সংবর্ধক চিকিৎসার যেসব ব্যবস্থা প্রচলন ছিল এখন সেগুলি আর প্রাধান্য পায়

[illegible] খেলাধুলোর আসোয়মনে ভেষজবিজ্ঞানকে যথেষ্ট পরিমাণে লাগান হচ্ছে। এ বিষয়ে [illegible] চিকিৎসক গড়ে তোলা হচ্ছে এবং [illegible] আধুনিক ভেষজ শাস্ত্রের নতুন নতুন শাখারও সৃষ্টি হচ্ছে। এ [illegible] এ্যাথলীট, জিমন্যাস্ট, [illegible] মুষ্টিযোদ্ধা, ভারোত্তোলকদের [illegible] হচ্ছে। এঁদের দৈহিক গঠন, [illegible] প্রভৃতি বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভেষজ সংস্থা গড়ে উঠেছে। ক্রীড়াভেষজ বিজ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে ক্রীড়াবিষয়ক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এইদিকে বিশেষভাবে নজরও দিয়েছেন।

জার্মাণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। এ দেশে ১৯৫৬ সালে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভেষজ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। মূলতঃ এই জার্মাণ সংস্থার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩০। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫০। এই সংস্থা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা সংস্থা। এদের প্রচারিত চিকিৎসা পত্রিকার বর্তমান প্রচার সংখ্যা ১৭০০। এই সংস্থা ক্রীড়া সম্পর্কে আগ্রহী তরুণ চিকিৎসকদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। হাতে-কলমে একজন শিক্ষার্থীকে মোট ছ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এ পর্যন্ত ৩২০ জন শিক্ষার্থী সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সার্টিফিকেট লাভ করেছেন। এঁরা প্রায় সকলেই খেলাধুলার ক্লাব বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

১৯৬৩ সালে পূর্ব জার্মাণ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর ক্রীড়াভেষজ বিশেষজ্ঞ উপাধি প্রচলন করায় এ দেশে ক্রীড়াভেষজ বিজ্ঞান এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখায় পরিণত হয়েছে। পাঠক্রমের মেয়াদ চার বছর। এই সময়েই শিক্ষার্থীরা ক্রীড়াভেষজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন, ফলে তাঁরা সহজেই আহত বা অসুস্থ খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য এবং ক্রীড়াযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করাতে সক্ষম হন। লিপজিগের কলেজ অব ফিজিকাল কালচার এ্যান্ড স্পোর্টস প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াচিকিৎসকদের বিশেষজ্ঞ হওয়ার উপযোগী বাস্তব ও কেতাবী শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এখানে ক্রীড়াভেষজ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৬০ জন। ১৯৭০ সালের মধ্যে আরও ৭৭ জন শিক্ষার্থী পরিণত জ্ঞানের সার্টিফিকেট লাভ করবেন। পূর্ব জার্মাণ সরকার ক্রীড়াভেষজ ও চিকিৎসাকে কেবল স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু এই বিভাগে স্পোর্টস মেডিক্যাল সার্ভিস নামে এক বিশেষ কর্মসংগঠন সৃষ্টি করেছে। এই সংগঠনই এখন ক্রীড়াভেষজ ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগের সমস্যা নিরসনে সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এই সংগঠনের সর্বময় পরিচালন ভার আছে এই রাষ্ট্রের শারীরশিক্ষণ ও ক্রীড়া কমিটির হাতে। কমিটির কাজ হল শারীর চর্চা এবং খেলাধুলোর চিকিৎসা সংক্রান্ত সব রকম সমস্যার পর্যালোচনা করে সমাধানের পথ স্থির করা। ক্রীড়া কমিটিই দেশের সমস্ত পুরুষ এবং মহিলা ক্রীড়াবিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসানুগ পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক চিকিৎসা সংস্থা গড়ে তুলেছে। স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়—কিছুই এই পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়েনি। যে সব তরুণ-তরুণী সক্রিয়ভাবে ক্রীড়াচর্চা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন, এই সব চিকিৎসা সংস্থাই তাঁদের সার্টিফিকেট দেয়।

আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মাণী, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধ দেশগুলিতে খেলাধুলা এখন উন্নত বিজ্ঞাতসম্মত পদ্ধতিতে উন্নতির সোপান ধরে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শারীরবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন এ্যাথলীট বা ক্রীড়াবিদদের পেশীর গুণাগুণ নিয়ে। মানব দেহের পেশীর বিভিন্ন ধর্মের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু, মস্তিষ্ক এবং হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন গতি পরিণতি নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। এবং সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে প্রশিক্ষণের সহজ প্রকল্প তৈরী হচ্ছে। প্রগতিশীল দেশগুলিতে রাসায়নিক, পদার্থ বিজ্ঞানী, শারীরবিজ্ঞানী, স্নায়ু-বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল দিয়ে খেলাধুলোর আসরে যুগান্তর এনে দিয়েছেন।

মানুষের পেশীর ক্রিয়াকলাপ নিয়ে রাশিয়ার শারীরবিজ্ঞানী ইভান সেবেনভ যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানী প্যাভলভ শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, তা এখন রাশিয়ার ক্রীড়া-প্রশিক্ষকরা কাজে লাগিয়ে এথলীট, ভারোত্তোলক জিমন্যাস্ট এবং সাঁতারুদের ক্রীড়ামান প্রভূত উন্নত করেছেন। বিজ্ঞানের কল্যাণে একদিকে যেমন মানুষ সুস্থ, সবল এবং দীর্ঘজীবী হয়েছে, অন্যদিকে প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়রা সহজে আগের তুলনায় কম পরিশ্রমে ক্রীড়ামান উন্নত করেছেন।

পদার্থবিজ্ঞানীরা এমন সব যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্য ছাড়া অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের পক্ষেও শিক্ষার্থীর ভুল ধরা সম্ভব নয়। দৌড়বিদ, ভারোত্তোলক, বর্শা, হ্যামার বা ডিসকাস নিক্ষেপকারী কিংবা সাঁতারুর প্রক্রিয়ার ত্রুটি ধরার জন্য ফিল্ম তোলার ব্যবস্থা তো আছেই উপরন্তু ইলেকট্রনিক যন্ত্রে খেলোয়াড়দের অতিসূক্ষ্ম ত্রুটিও ধরা পড়েছে। তার যথার্থ কারণ আজ বলে দিচ্ছে কম্পুটার যন্ত্রটি। দীর্ঘ লম্ফনবিদ বার বার কেন অকৃতকার্য হচ্ছেন বা দৌড়বীদ কি কারণে পিছিয়ে পড়ছেন তার যথার্থ কারণ আজ বলে দিচ্ছে কম্পুটার যন্ত্রটি। এ্যাথলীটদের বিশেষ জুতো পায়ে দৌড়ের অনুশীলন করতে দেওয়া হয়। তাঁর প্রতিটি নির্ভুল পদক্ষেপে ঐ জুতোয় লাগান যন্ত্রটি শব্দ করে। সুতরাং তাঁর পদক্ষেপে সহজেই ভুল ধরা পড়ে। জিমন্যাস্টের দেহচালনা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য ইলেকট্রনিক চোখের সাহায্য নেওয়া হয়। এই যন্ত্রে পরিষ্কারভাবে জিমন্যাস্টের ভুলত্রুটি এবং অসুবিধাগুলি ধরা পড়ে যায়। পদার্থ-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে খেলাধুলো সম্পর্কে অনেক কিছুর হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়েছে, যেমন—স্বল্প পাল্লার দৌড়ে এ্যাথলীট স্টার্ট থেকে কত জোরে পা-চালান শুরু করে, দীর্ঘ লম্ফনের সময় এ্যাথলীটের কতখানি শক্তির দরকার হয়, মুষ্টিযোদ্ধার ঘুসির ওজন এবং টেনিস বলের গতি কি রকম দাঁড়ায়—এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজ পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ক্রীড়া-কুশলতার উন্নতিবিধানে রসায়ন বিজ্ঞানের অবদানও কম নয়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বর্তমান কালের স্টেডিয়াম এবং জলাধার থেকে সুরু করে টার্টার ট্র্যাক, টেবল টেনিস ব্যাটের আচ্ছাদন এবং বলটি পর্যন্ত রসায়ন বিজ্ঞানের মহার্ঘ অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে ফুটবল এবং হকি খেলা বৃষ্টির মধ্যেও অব্যাহতগতিতে চলবে। তার জন্য কৃত্রিম বর্ষাতি ঢাকা বল, মাঠ, স্টিক প্রভৃতি তৈরী হয়েছে।

তুষার ক্রীড়ায় অনুশীলনের সুবিধার জন্য জার্মাণ গণতন্ত্রের প্রশিক্ষক হান্স রেনার এক রকম কৃত্রিম তুষার আবিষ্কার করেছেন, যা গলবেই না। ইনি রসায়ন বিজ্ঞানীদের সাহায্যে এক কৃত্রিম তুষার তৈরী করেছেন। বাস্তব প্রকৃতিতেও এ ধরণের তুষার নেই। এর ফলে চির তুষারের দেশ না হলেও জার্মাণদের পক্ষে স্কী বা স্কেটিং অনুশীলন সহজ হয়ে উঠেছে। ক্রীড়াকুশলতা অর্জনে বিজ্ঞান যেমন একদিকে সাহায্য করছে, তেমনি অন্যদিকে প্রতিভাধরদের মাননোন্নয়নেও সহযোগিতা করে চলেছে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত পলিথিনের সোল তৈরী রানিং সু এবং পোলভল্টের জন্য কাচ-তন্তুর পোল বা দণ্ডের কথা উল্লেখযোগ্য।

রাসায়নিকরা যেভাবে ট্র্যাক সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে অদূর ভবিষ্যতে স্পাইক দেওয়া জুতোর চলনই উঠে যাবে। রবার ও এ্যাসফল্টের সংমিশ্রণে এমন ধরণের ট্র্যাক তৈরী হচ্ছে যার ওপর এ্যাথলীটদের পা মোটে পিছলে যাবে না। এ ধরণের ট্র্যাক তৈরী করতে পুরনো টায়ার এবং রবার শিল্পের বাতিল জিনিষই যথেষ্ট, ফলে খরচও কম। গরম বা শীতে এ ট্র্যাকের কোন তারতম্য দেখা যায় না।

এখন কোন এ্যাথলীট খেলাধুলার আসরে কোন বিস্ময়কর নজীর সৃষ্টি করলে তিনি বা তাঁর প্রশিক্ষকই কেবল খ্যাতির অধিকারী হন না, লোকচক্ষুর অগোচরে যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে বসে টেস্ট-টিউব নাড়ছেন বা গতিস্পন্দন নিয়ে অঙ্কপাত করছেন তাঁরাও এই সাফল্যের সমান অধিকারী। আজ বিশ্বের প্রগতিশীল এবং প্রগতিকামী দেশগুলি খেলাধুলায় বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাকে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে।

অস্তমিত চ্যাম্পিয়ান

শঙ্করবিজয় মিত্র

উজ্জ্বল ক্রীড়াকৃতিকে জয়মাল্য দিয়ে বরণ করে গৌরবান্বিত করাই হল ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এতে সারা বিশ্বব্যাপী আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। কিন্তু আজকের জয়মাল্যধারী চ্যাম্পিয়ানকে কাল যখন বিদায় নিতে হয়, তখনকার বেদনা কোন অংশে কম নয়। অবশ্য প্রতিভা বা নৈপুণ্য চিরস্থায়ী নয়। প্রতিনিয়তই মানুষের এই প্রতিভা ক্ষীয়মাণ হয়ে চলেছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা যায় একদা যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, পরবর্তীকালে তাঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা ঘটে নীরবে এবং বেশ কিছুটা সময় নিয়ে। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এটা ঘটে বেশ দ্রুত এবং তা বড্ড বেশী চোখে পড়ে।

মেক্সিকোর ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে চার বছর আগের অনেক চ্যাম্পিয়ানকেই দেখা যায়নি। টোকিওতে যাঁরা গৌরবের শীর্ষে উঠে বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের তারিফ কুড়িয়েছেন, তাঁরা কোথায় গেলেন! এথলেটিকে স্বর্ণপদক জয়ী চোখে পড়ার মত ক্রীড়াবিদদের খেলাধুলোর জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। স্মৃতিচারণে দেখা যায় টোকিওর শতাধিক চ্যাম্পিয়ানের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে ডজনখানেক মেক্সিকোর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। সাঁতারে তারও কম। এই অস্তমিত চ্যাম্পিয়ানদের অনেকে হয়ত পেশাদার হয়ে ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনের দ্বার নিজেদের হাতেই রুদ্ধ করেছেন। আবার অনেকের থেকে পূর্বের প্রতিভা ও শক্তি অন্তর্হিত হয়েছে।

ওলিম্পিকে দশ হাজার মিটারের দৌড় একটা চাঞ্চল্যকর প্রতিযোগিতা এবং এ-দৌড়ের প্রতিযোগীরা সকলেরই চিত্ত জয়ে সমর্থ হন। এতে শারীরিক সামর্থ্য সহনশীলতা, গতি ও দক্ষতা সমানভাবে প্রয়োজন। এবারকার ওলিম্পিকে কেনিয়ার তেমু এই দৌড় জয় করে খ্যাতির চূড়ায় সহজেই আরোহণ করেছেন। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে বিলি মিলস অপ্রত্যাশিতভাবে দশ হাজার মিটার দৌড়ে জয়ী হয়ে এমনি খ্যাতির আসনেই বসেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো ওলিম্পিক অঙ্গনে তাঁকে আর দেখা গেল না। দূরপাল্লা দৌড়ের দুরূহ ধাপ অতিক্রম করে যে-যশ একদিন সহজভাবে তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁকে চার বছরের ব্যবধানে সরে যেতে হল। গত সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় সাউথ লেক তাহোতে প্রাক-ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় মার্কিন দল থেকে তিনি বাদ পড়েন। বড় বেদনায় তাই তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন—"কালকের দিনটি হবে আমার বাকি জীবনের প্রথম দিন" অর্থাৎ খেলাধুলোর জগৎ থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

ঐ সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেনেও একটি প্রখ্যাতা নারী এথলেটিকের খেলাধুলোয় জীবনের অবসান ঘটে। এ-নামটি বৃটেন কেন সারা বিশ্বের বিশেষ পরিচিত ছিল—মেরি র‍্যান্ড বেশ কয়েক বছর ধরে বৃটেনের সেরা মহিলা এথলেটিক। টোকিওতে দীর্ঘ লম্ফনে ২২ ফুট সওয়া দুই ইঞ্চি লাফিয়ে তিনি বিশ্ব-রেকর্ড করেন। এথলেটিকসের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর দক্ষতা বৃটেনে তাঁকে আদরের আসন দিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল তিনি এই সম্মান ভোগ করেছেন। দক্ষতা বজায় রাখার জন্য তাঁর চেষ্টারও অন্ত ছিল না এবং মেক্সিকো ওলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতির সময় তিনি এক দুর্ঘটনায় পড়েন। ১৯৬৮ সালের ৩০শে আগস্ট ক্রিস্টাল প্যালেসে পেন্টাথলনে যোগ্যতার পরীক্ষার সময় মেরী পড়ে গিয়ে আঘাত পান। এই আঘাতই তাঁর সমস্ত যোগ্যতা হরণ করে এবং তিনি এথলেটিকের জীবন থেকে সরে দাঁড়ান। ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশানে ক্রীড়া সমালোচকের চাকরী গ্রহণ করে পেশাদারী বৃত্তি অবলম্বন করেন। এই মেক্সিকো ওলিম্পিকে তাঁকে আর বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়নি।

ক্রিস্টাল প্যালেসে মেরী র‍্যান্ড যেদিন দুর্ঘটনায় আহত হলেন, সেদিন সেখানে বৃটেনের আর একজন নামকরা মহিলা এ্যাথলীট সখেদে বলেছিলেন—"এইভাবে ক্রীড়া-জগৎ থেকে মেরীর বিদায় অত্যন্ত বেদনাদায়ক। খ্যাতির শীর্ষে থাকতে থাকতেই অবসর নেওয়া বা প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে পরাজিত হওয়া অনেক ভাল। কিন্তু শারীরিক আঘাতের দরুণ বিদায় নিতে বাধ্য হওয়ার মত দুঃখের আর কিছু নেই।" —এই মহিলা এ্যাথলীটটি হলেন য়্যান প্যাকার। টোকিওতে বৃটেনের জন্য তিনি ৮০০ মিটারের স্বর্ণপদক জিনে এনেছিলেন। টোকিওতে তিনি যশের মুকুট পরে যে দুর্লভ সম্মান পেয়েছিলেন তাকেই মূলধন করে তিনি পরবর্তী জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাই টোকিও ওলিম্পিকের পর ওসাকাতে আর একবার মাত্র তাঁকে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতে দেখা যায় এবং তারপরই শুরু হয় তাঁর অন্য জীবন। তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের কাজে এবং মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মহিলা এ্যাথলীটদের অবসর গ্রহণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিবাহ ও পরিবার প্রতিপালন। প্যাকারের ক্ষেত্রেও অবশ্য সেটাও একটা কারণ। তিনি বিয়ে করেছেন বৃটেনের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন রবি ব্রাইটওয়েলকে এবং তিনি এখন দু' সন্তানের জননী।

জীবিকার জন্যও অনেক খ্যাতনামা এ্যাথলীটকে তাঁদের ক্রীড়াকৃতি বিসর্জন দিতে দেখা যায়। আমেরিকার নিগ্রো দৌড়বীর বব হেইস জীবিকার জন্য দৌড়ে তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে বিক্রী করেছেন। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে একশো মিটার দৌড়ে সমস্ত প্রতিযোগীকে অনেক পেছনে ফেলে স্বর্ণপদক জয় করেন তিনি। অপেশাদার ক্রীড়াকৃতিতে পেট ভরে না, তাই হেইস তাঁর প্রতিভাকে জীবিকা অর্জনের কাজে লাগালেন। ডালাসে তিনি পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করছেন। টোকিও ওলিম্পিকের স্বর্ণ স্বীকৃতি তাঁকে রুজিরোজগারের পথ দেখিয়ে দেয়। অবশ্য পেশাদার হয়েও সকলের ভাগ্যে অর্থ রোজগার করা সহজে হয় না। তেমনি ঘটেছে টোকিওর অপর এক চ্যাম্পিয়ানের ভাগ্যে। ইনি হলেন টোকিও ওলিম্পিকের দুশো মিটার বিজয়ী হেনরি কার। ববের দেখাদেখি তিনিও পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়ের খাতায় নাম লেখান। কিন্তু ফুটবলের ধস্তাধস্তি সহ্য করতে পারার মত দৈহিক সামর্থ্য তাঁর নেই। কাজেই অর্থ উপার্জনের আশাও তাঁকে ছাড়তে হয়।

টোকিও ওলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণপদক বিজয়ী মাইক ল্যারাবি-কেও মেকসিকোর ওলিম্পিক আসরে দেখা যায় নি। ল্যারাবি টোকিওতে এই দৌড়ে ৪৪·৯ সেঃ সময়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। বৃটেনের প্রখ্যাত দৌড়বীর ও বৃটিশ ওলিম্পিক দলের ক্যাপ্টেন ব্রাইটওয়েল চারশো মিটারে বিজয়ী হবেন বলে সকলেরই ধারণা

ছিল। মাইক ক্রীড়ানুরাগীদের ধারণা চূর্ণ করে স্বর্ণপদক নিয়েছিলেন। স্বর্ণশিখরে উঠতে তাঁকে দশ বছরের সাধনা করতে হয়েছে এবং তখন তাঁর বয়স হয়ে গেছে একত্রিশ। কিন্তু তিনি বেশী দিন তাঁর এ গৌরব রক্ষা করতে পারেন নি। ১৯৬৫ তিনি এথলেটিকস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যেদিন তিনি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, মাত্র তার কয়েক সপ্তাহ আগেই তিনি এ্যামেচার এথলেটিক এসোসিয়েশন থেকে ৪৪০ গজ দৌড়ের চ্যাম্পিয়ান খেতাব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি নিজের প্রতি আস্থা রাখতে পারলেন না—কারণ চারশো মিটার দৌড়ে সেদিন তিনি মাইক ফিটজেরাল্ডের কাছে হেরে গেছেন। হেরে যাওয়াটা কিছু অসম্ভব নয়, তবে দৌড় শেষ করতে সেদিন তিনি যে সময় নিয়েছিলেন তাতেই তাঁর নিজের ওপর থেকে আস্থা চলে যায়। সেদিন তাঁর সময় লেগেছিল ৪৭·৮ সেঃ। কোথায় ৪৪·৯ সেঃ আর কোথায় ৪৭-৮ সেঃ। কাজেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর পূর্বের দক্ষতা তিরোহিত হয়েছে। অতএব বিদায়।

এদের চাইতেও করুণ হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের দৌড়বীর পিটার স্নেলের বিদায়। ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকে স্নেল ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে দুটো স্বর্ণপদক জয় করে রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। তাঁর এই খ্যাতির কারণ ১৯২০ সালের পর একই সঙ্গে এই দুটো দূরপাল্লায় অর কোন এ্যাথলীট সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর এই সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। পরের বছরেই বিশ্ব পর্যটনে বেরিয়ে তিনি বিপর্যস্ত হন। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ভ্যাঙ্কুবারে ১৯৬৫ সালের জুন মাসে। এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি সকলের পেছনে দৌড় শেষ করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। সংজ্ঞা ফিরে এলে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে থাকে এবং তিনি বলতে থাকেন—'এই লজ্জা থেকে নিজেকে তুলে আনতে আমার অনেক দিন সময় লাগবে।' পরে তিনি মাইকে জনতাকে সম্বোধন করে বলেন 'আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি এতটুকু গাফিলতি করিনি, প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। অবশ্য এর কারণ হিসাবে পেটের গোলমালের কথাও উল্লেখ করেন।

এরপরে খবরের কাগজে যখন হেডলাইন বেরোল 'যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ানশিপের দৌড় প্রতিযোগিতায় স্নেল স্কুলের ছাত্রের কাছে হেরে গিয়েছে।' এই ছাত্রটি অবশ্য আর কেউ নয়, প্রতিশ্রুতিপূর্ণ জিম রিউন। তবুও পিটারের মনোবল এই সকল ঘটনায় বেশ হ্রাস পায়। যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষ করে স্নেল যখন লণ্ডনে আসেন তখন তাঁকে ক্লান্ত ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। হোটেলে যখন তিনি জানতে পারলেন ডাবলিনে এক আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতাতেও তাঁর যোগদানের ব্যবস্থা হয়েছে তখন তিনি মনে মনে বিরক্তই হন। লণ্ডনে হোয়াইট সিটিতে এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি সপ্তম স্থান পেলেন। যে ছজন তাঁর আগে আগে প্রান্তিক ফিতে স্পর্শ করলেন তাঁরা কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তবুও সপ্তম হলেন তিনি, এমনিই হয়। এর দুদিন পরে ডাবলিনের দৌড়ে তিনি তৃতীয় হলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন প্রতিভার স্পর্শ ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে, তাঁর বিজয় গৌরবের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি জার্মানী পর্যটন বাতিল করে দিলেন এবং ১৯৬৫ সালের ২৬শে জুলাই তিনি এথলেটিকস থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

নিজের এই অক্ষমতা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন—'বিশ্ব পর্যায়ের এ্যাথলীটদের মান রক্ষা করা বড় শক্ত ব্যাপার। তার জন্য অক্লান্ত সাধনা ও অবসর প্রয়োজন। তাছাড়া বিদেশ পর্যটন করতে করতে বুঝতে পারা গেল অন্যান্য দেশের মান বেশ উন্নত হয়েছে। টোকিওতে আমি যে সফল হয়েছিলাম তার মূলে ছিল কঠোর সাধনা ও অনুশীলন। টোকিওর পরেই অবসর নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ৩ মিঃ ৫০ সেঃ-এর কাছাকাছি সময়ে এক মাইল দৌড় সম্পন্ন করতে পারা যায় কিনা দেখবার জন্যই আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামি। ভেবেছিলাম সাময়িক অসাফল্যের পর আবার পূর্বের সামর্থ্য ফিরে পাবো। কিন্তু তা আর হল না। বুঝলাম থামবার সময় হয়েছে—থেমে গেলাম।'

পিটারের বিদায় সত্যিই করুণ। কিন্তু এর চেয়েও মর্মস্পর্শী সোভিয়েট ক্রীড়াবিদ ব্রুমেলের বিদায়। সোভিয়েট হাইজাম্পার ভ্যালেরি নিকোলাইভিচ ব্রুমেল টোকিও ওলিম্পিকে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। সোভিয়েট এথলেটিক দলের তিনি ছিলেন গৌরবস্থল। তিনি ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন—ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক ছিল তাঁর করতলগত। ব্রুমেল যে সহজ ও অনবদ্য ভঙ্গিতে উচ্চলম্ফন করতেন তাতে কি সোভিয়েট ইউনিয়ন, কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সকল দেশের দর্শকই তাঁর তারিফ করত।

কিন্তু এক আকস্মিক দুর্ঘটনা তাঁর এই গৌরবদীপ্ত জীবনে ছেদ টেনে দেয়। ১৯৬৫ সালের অকটোবর মাসে মোটর সাইকেলে এক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তাঁর পা ভেঙ্গে যায়। তাঁর শিক্ষক ও অন্যান্য এথলীটরা আশা ছেড়ে দেন—ব্রুমেলের পা কোন দিন ঠিক হবে না এবং সে আর প্রতিযোগিতার আসরে নামতে পারবে না। কিন্তু ব্রুমেল নিজে আশা ছাড়েন নি। তিনি আবার প্রতিযোগিতায় নেমে স্বর্ণ-স্বীকৃতি আদায় করবেন বলে স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য তাঁকে অনুসরণ করে চলে, কয়েক মাস পরে বাড়ীতে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আবার এক দুর্ঘটনায় পড়েন। তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

এমনি করেই কত গৌরবদীপ্ত এথলীটের জীবনে ক্রীড়াকৃতিতে ছেদ পড়ে। টোকিও ওলিম্পিকে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী বব সুলকেও এমনিভাবে বিদায় নিতে হয়েছে। মেকসিকো অঙ্গনে তাঁর সুদৃঢ় পদক্ষেপ আর পড়ে নি। টোকিও দৌড়ে বিজয়ী হবার পর বব সুল তাঁর প্রতিযোগী মিরেল যাজি সম্পর্কে বলেছিলেন তিনি পরাজিত ব্যক্তিটিকে পেছনে দেখতে দেখতে এগিয়েছিলেন।

তারপর—। ১৯৬৮ সালে মেকসিকো ওলিম্পিকে প্রতিযোগী নির্বাচনের দৌড়ে সুল যখন দৌড়ালেন তখন তাঁকে আর পুরোভাগে দেখা যায় নি, সকলের পেছনেই তিনি স্থান পেয়েছিলেন। এমনিই ঘটে। চ্যাম্পিয়ানও অস্ত যায়।

একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত : বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের সংগে আলাপরত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জি (বাঁ দিকে) এবং সহ-অধিনায়ক লক্ষ্মণ সিং (ডানদিকে)।

খেলাধূলা

দর্শক

দলীপ ট্রফি

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীপ ট্রফির তিনদিনব্যাপী সেমি-ফাইনাল খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দল ১২৭ রানে পূর্বাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

পূর্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক অম্বর রায় টসে জয়ী হয়ে দক্ষিণাঞ্চল দলকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। শক্তিশালী দক্ষিণাঞ্চল দল কিন্তু তাদের সুনাম অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারেনি। তারা গত দু'বারের দলীপ ট্রফি বিজয়ী। জয়সীমার নেতৃত্বে বর্তমান দলে সাতজন টেস্ট খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস মাত্র ১৮৮ রানের মাথায় শেষ হয়। তাদের এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড় করিয়েছিলেন পূর্বাঞ্চলের পেস বোলার সুব্রত গুহ এবং স্পিন বোলার দিলীপ দোশী। গুহ ৬৮ রানে ৪টে এবং দোশী ১৪ রানে ৩টে উইকেট নিয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চল দলের ৪৩ রানের মাথায় ২য় ও ৩য় উইকেট এবং ১৭২ রানের মাথায় ৭ম ও ৮ম উইকেট পড়েছিল। ৫ম উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৭১ রানের মাথায়। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পতৌদির নবাব ইডেনের দর্শকদের সব থেকে বেশী হতাশ করেছিলেন। সুব্রত গুহের বল খেলে তিনি উইকেটকিপার দলজিৎ সিংহের হাতে 'ক্যাচ' দেন। তখন নবাবের রানের ঘরে ছিল 'শূন্য'। প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় পূর্বাঞ্চল দল ১ উইকেটের বিনিময়ে ৬১ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় উভয় দলের বোলাররা প্রাধান্য বিস্তার করে। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে এইদিন ১৫টা উইকেট পড়ে যায়—পূর্বাঞ্চল দলের ৯টা এবং দক্ষিণাঞ্চল দলের ৬টা।

পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হওয়া সত্ত্বেও (৬১ রান ১ উইকেটে) তারা দ্বিতীয় দিনের খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দল তাদের বাকি ৯টা উইকেটে পূর্বদিনের ৬১ রানের (১ উইকেটে) সংগে মাত্র ৯২ রান যোগ করে—মোট ১৫৩ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। দলের ১০৪ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়া থেকেই পূর্বাঞ্চল দলের ভাঙন শুরু হয়। লাঞ্চের সময় ছিল ১৩৯ রান (৮ উইকেটে)। পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন—অফ-স্পিনার প্রসন্ন (৪৫ রানে ৪ উইকেট) এবং ভেংকটরাঘবন (৬২ রানে ৪ উইকেট)। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮১ রান সংগ্রহ করেছিল। মাত্র ৩০ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট এবং ৪০ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। সুব্রত গুহ ৩৪ রানে ২ উইকেট এবং দিলীপ দোশী ১৫ রানে ২ উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, দক্ষিণাঞ্চল দল ১১৬ রানে অগ্রগামী এবং হাতে জমা ২য় ইনিংসের ৪টে উইকেট। অপরদিকে পূর্বাঞ্চল দলের ২য় ইনিংসের খেলা বাকি।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস মাত্র ১৪০ রানের মাথায় শেষ হয়। এবার আর পতৌদির নবাব দর্শকদের হতাশ করেননি—তিনি ৫০ রান করেছিলেন। ২য় ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট পান দোশী—২৬ রানে ৪টে। গুহ পান ২টো উইকেট ৫৭ রানে।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৬ রান তুলতে পূর্বাঞ্চল দল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলার সময় ছিল ২২৫ মিনিট। যথেষ্ট সময়। কিন্তু তিনদিনের খেলায় উভয় দলের ব্যাটিংয়ের বহর দেখে কেউই ভরসা পাননি। শেষ পর্যন্ত বোলারদেরই জয়জয়কার হল। ১১৫ মিনিটে পূর্বাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস শেষ হয়ে যায়—রান মাত্র ৪৮। ভেংকটরাঘবন (৬ রানে ৪) এবং আবিদ আলি (২১ রানে ৩) পূর্বাঞ্চলের কাল হয়ে দাঁড়ান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণাঞ্চল : ১৮৮ রান (এম এল জয়সীমা ৬৯ এবং জি আর বিশ্বনাথ ৩৬ রান। সুব্রত গুহ ৬৮ রানে ৪ এবং দিলীপ দোশী ১৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৪০ রান (পতৌদি ৫০ রান। দোশী ২৬ রানে ৪ এবং গুহ ৫৭ রানে ২ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ১৫৩ রান (ছত্রপাল সিং ৪২ এবং রমেশ সাকসেনা ৩২ রান। প্রসন্ন ৪৫ রানে ৪ এবং ভেংকটরাঘবন ৬২ রানে ৪ উইকেট)

ও ৪৮ রান (শুক্লা ১৪ রান। ভেংকটরাঘবন ৬ রানে ৪ এবং আবিদ আলি ২১ রানে ৩ উইকেট)

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

দিল্লী ইউনিভারসিটি মাঠে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লী ২১০ রানে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে এই নিয়ে তিনবার রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি

জয়ী হন। প্রথম ইনিংসের খেলায় দিল্লী দল আমান্য ২ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়লেও দ্বিতীয় ইনিংসে তারা যে বিপুল সংখ্যক রান তুলেছিল (৩৯৭ রান, ৬ উইকেটে ডিক্লেঃ) তা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে অতিক্রম করা মোটেই সম্ভব হয়নি। খেলায় জয়লাভের জন্যে যেখানে ওসমানিয়া দলের ২য় ইনিংসে ৩৯৬ রান করার প্রয়োজন ছিল সেখানে তাদের ২য় ইনিংস ১৮৫ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়।

প্রথম দিনের খেলায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় দল ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৫২ রান তুলেছিল। বিনয় লাম্বা ২৪০ মিনিটে তাঁর ১১১ রান (বাউন্ডারী ১৪) করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে দিল্লীর ১ম ইনিংস ৩০২ রানের মাথায় শেষ হয়। অর্থাৎ এই দিনে তারা ৮০ মিনিটের খেলায় বাকি ২টো উইকেটে ৫০ রান যোগ করেছিল। এর পর ওসমানিয়া প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২১৪ রান তুলেছিল। মহেশ্বর সিং নিজ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৫ রান করেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ওসমানিয়া দলের ১ম ইনিংস ৩০৪ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র ২ রানে অগ্রগামী হয়। অপরদিকে দিল্লী ২য় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১৫২ রান সংগ্রহ করে। তাদের সুনীল দেব ৬৯ রান করে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিনে দিল্লী দল বীরবিক্রমে ওসমানিয়া দলের বোলিং তছনছ করে দেয়। দিল্লী এইদিন আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৭৫ মিনিটে ২৪৫ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের পর ৫৫ মিনিট খেলে ৩৯৭ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) দিল্লী তাদের ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। সুনীল দেব ৩৯৭ মিনিট খেলে ১২২ রান (১২টা বাউন্ডারী) করেন। তাঁর পরই অশোক গান্ধোত্রের ৭১ রান (বাউন্ডারী ৯) এবং রাজনারায়ণের ৬৩ রান (বাউন্ডারী ৫) উল্লেখযোগ্য।

৩য় উইকেটের জুটিতে সুনীল দেব এবং অশোক গান্ধোত্র দলের ১৩৫ রান তুলে জয়লাভের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। ওসমানিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় বিরাট ৩৯৬ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং এইদিন ৫ উইকেট খুইয়ে মাত্র ১১০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ওসমানিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৫ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়। বিনায়ক আনন্দের মারাত্মক বোলিংয়ে (৫৮ রানে ৮ উইকেট) ওসমানিয়া দলের এই শোচনীয় হাল দাঁড়ায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দিল্লী : ৩০২ রান (বিনয় লাম্বা ১১১ এবং ভেংকট সুন্দরম নট আউট ৪৫ রান। কে নয়িমুদ্দিন ৮০ রানে ৫ উইকেট)

ও ৩৯৭ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেঃ। সুনীল দেব ১২২, এ গান্ধোত্র ৭১ এবং রাজনারায়ণ ৬৩ রান)

ওসমানিয়া : ৩০৪ রান (মহেশ্বর সিং ৬৫ এবং ইসাক কাদার ৫৬ রান। বিনায়ক আনন্দ ৬০ রানে ৪ এবং আর শুক্ল ৯৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮৫ রান (জয়ন্তীলাল ৬৯ রান। বিনায়ক আনন্দ ৫৮ রানে ৮ উইকেট)

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলটি সম্প্রতি স্বদেশে ফিরে এসেছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের ১৯টি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : জয় ৪, পরাজয় ১, ড্র ১২ এবং বৃষ্টির দরুণ খেলা পরিত্যক্ত ২। অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছেন লক্ষ্মণ সিং—মোট রান ৮৯১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ১৪৭ এবং গড় ৪৬-৮৯। দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জির ব্যাটিং পরিসংখ্যান : মোট রান ৭০১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ১৪৪ এবং গড় ৪১-২৩। বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন মহীন্দর অমরনাথ—৪০টি উইকেট (গড় ১৪-১০)। তবে সর্বাধিক উইকেট লাভ করেছেন দীপঙ্কর সরকার ৮৭১ রানে ৫৩টি উইকেট (গড় ১৬-৪৩)।

পরলোকে শ্রীজে কে শীল

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ এবং মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীজগৎকান্ত শীল (শ্রী জে কে শীল) জব্বলপুরে অবস্থানকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। তিনি জব্বলপুরে আয়োজিত জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় পরিচালনার কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর।

জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

নিউ দিল্লীর জিমখানা ক্লাব কোর্টে আয়োজিত জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় রুমানিয়ার খেলোয়াড়রা সর্বাধিক খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন। রুমানিয়ার ইলাই নাস্তাসে পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন।

অপ্রত্যাশিত ফলাফল

এবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ মুখার্জির ৪র্থ রাউণ্ডে সুইডেনের এম কার্লস্টেইনের কাছে এবং মহিলা বিভাগের সেমি-ফাইনালে রুমানিয়ার কুমারী জুডিথ দিবারের কাছে এবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই কুমারী নিরুপমা বসন্তের পরাজয় রীতিমত অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস : নাস্তাসে (রুমানিয়া) ৬—৪, ৬—২, ৪—৬ ও ৬—৪ গেমে গত দু'বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : কুমারী জুডিথ দিবার (রুমানিয়া) ৬—২ ও ৬—১ গেমে শ্রীমতী এ্যালিস টিমকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নাস্তাসে এবং ম্যারেরিউ (রুমানিয়া) ৪—৬, ৬—৩, ৬—৩, ৭—৯ ও ৬—৩ গেমে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী নিরুপমা বসন্ত এবং নাস্তাসে ৬—৪, ৪—৬ ও ৯—৭ গেমে এস ড্রোন এবং কুমারী জুডিথ দিবারকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক এ্যাথলেটিকসের ছাত্র বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ) এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজের মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি।

দলগত ফলাফল

ছাত্র বিভাগ : ১ম বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ)—৫৭ পয়েন্ট, ২য় গতবারের চ্যাম্পিয়ান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ—৩৬ পয়েন্ট, ৩য় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ—১৬ পয়েন্ট।

ছাত্রী বিভাগ : ১ম লরেটো (৩৬½ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত ফলাফল

ছাত্র বিভাগ : চ্যাম্পিয়ান—মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি —১৪ পয়েন্ট

ছাত্রী বিভাগ : চ্যাম্পিয়ান—এডউইনা সামুয়েলস (লরেটো)—১৬ পয়েন্ট

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বিদ্যোদয়ের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস ও গল্প

ময়ূরপঙ্খী ৬·০০

গল্প আর গল্প ২·২৫

শুক্রে যারা গিয়েছিল ৩·০০

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস ২·২৫

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ভয়ংকরের জীবন-কথা ২·২৫

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দুটি বড় গল্প

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা ২·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভ্রমণের গল্প

সুন্দরবনের চিঠি ১·৬২

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন ২.৫০

মণীন্দ্র দত্তের উপন্যাস

দারুমূর্তির রহস্য ১·৬২

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে আর্সেনিভের অমর অরণ্য-কাহিনী

সাইবিরিয়ার শেষ মানুষ ২·০০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

আনন্দমঠ [ছোটদের] ২·০০

সুশীল জানার গল্প-সংকলন

গল্পময় ভারত

[প্রথম খণ্ড ৩·০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ৩·০০]

স্বপনবুড়োর গল্প-সংকলন

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী ২·৮০

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প-সংকলন

আমার ভালুক শিকার ৩·০০

চোরের পাল্লায় চকরবরতি ৩·০০

আমাদের এখানে পাওয়া যায়

কিশোর ও তরুণ জগতের সচিত্র মাসিক মুখপত্র

কিশোর ভারতী

আন্তর্জাতিক নববর্ষের শুভেচ্ছা উপহার-স্বরূপ মূল্যবান পকেট-ক্যালেণ্ডার সংযোজিত প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা (জানুয়ারী ১৯৬৯/পৌষ ১৩৭৫) প্রকাশিত হয়েছে। দাম ৭৫ পয়সা॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৪-৩১৫৭

৮ম বর্ষ

৩য় খণ্ড

৪০ পয়সা

মূল্য

৩৮ সংখ্যা

Friday, 31st January, 1969. শুক্রবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৭৫ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : নির্মলকুমার দত্ত

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ **দি হাউস অফ্ দি টেগোরস**

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০ **পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ**

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০ **সংগীতচন্দ্রিকা ...**

ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ৮·৫০ **টেগোর অন্ লিটারেচার এণ্ড এস্থেটিক্স্**
১০·০০ **স্টাডিজ ইন এস্থেটিক্স্**

রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার ১২·০০ **রবীন্দ্র-সুভাষিত**

ডক্টর ননীলাল সেন ১৫·০০ **এ ক্রিটিক্ অফ্ দি থিওরিজ্ অফ্ বিপর্যয়**

শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫·০০ **ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্সেস্**

ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০ **রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু**

ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫·০০ **স্টাডিজ ইন্ আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি**

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬·৫০ **রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেসন ইন বেঙ্গল**

ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪·৫০ **সোসিওলজি অফ্ প্ল্যানিং**

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

'তিমির খুলি' প্রসঙ্গে

'ক্রীড়া ও বিনোদন' সংখ্যায় শ্রীঅদ্রীশ বর্ধনের লেখা 'তিমির খুলি' নামক রহস্য গল্পটি পড়লাম। শ্রীবর্ধন গল্পের শেষে পাদটিকায় লিখেছেন—'অপরাধবিজ্ঞানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ এ যাবৎ হয়েছে বলে শোনা যায় নি।'

এর উত্তরে আমি সবিনয়ে জানাতে চাই যে, অপরাধীদের অসাধ্য কিছুই নেই। অপরাধবিজ্ঞানে এ ধরনের বহু অপরাধ লিপিবদ্ধ আছে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল 'পিল্টডাউন ম্যানের' ঘটনাটা। সমীক্ষা করে দেখা গেছে, অপরাধীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্রীবর্ধনের বর্ণিত উপায়ে ধাপ্পা দিয়ে মোটা টাকা কামিয়েছে তিরুমালাই-এর মত বড়লোকদের কাছ থেকে। কিন্তু আমি যে ঘটনাটা লিখছি সেক্ষেত্রে অপরাধী ধাপ্পা দিয়েছিল বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীদের এবং তার বদলে পেয়েছিল মান-সম্মান ও শ্রদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের ভারতবর্ষে নয়—খাস ইংল্যাণ্ডে।

'পিল্টডাউন ম্যান'এর কথা অনেকেই হয়ত শুনেছেন। 'পিল্টডাউন ম্যান' বলতে বোঝায় আমাদের পূর্বপুরুষ আদিমযুগের মানুষ, যারা ৫।৬ লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীতে বিচরণ করত। বৈজ্ঞানিকরা এদের নাম দিয়েছেন 'ইয়োআনথ্রোপাস" অর্থাৎ 'ভোরবেলার মানুষ'।এরা হঠাৎ 'পিল্টডাউন ম্যান' নামে পরিচিত হলেন কেন?

ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স জেলায় একটি ছোট গ্রামের নাম পিল্টডাউন। প্রায় ৫৪ বছর আগে সেখানে কী জন্যে যেন মাটি খোঁড়া হচ্ছিল। অনেকখানি খোঁড়ার পর দেখা গেল মাটির সঙ্গে ছোট ছোট পাথর জাতীয় কী কী যেন বের হচ্ছে। সেই গ্রামে মিঃ ডাসোন নামে একজন উকিল ছিলেন। ভদ্রলোকের নেশা হল নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা। খবর পেয়ে তিনি এসে ঐসব পাথরের মত জিনিসগুলো কিনে নিলেন বেশ মোটা দাম দিয়ে। নগদ টাকা দিয়ে ঐসব বাজে জিনিস কিনতে দেখে অন্যান্যরা তাঁকে পাগল ভেবে হেসেই অস্থির। কিন্তু ঐসব তথাকথিত বাজে জিনিস ঘেঁটে মিঃ ডাসোন এমন এক সংবাদ প্রচার করলেন যাতে বিজ্ঞানজগতে রীতিমতো হুলস্থুল পড়ে গেল। মিঃ ডাসোন প্রচার করতে লাগলেন ওগুলো পাথর নয়। ওগুলো হচ্ছে ফসিল—প্রাচীন জীবজন্তুর চিহ্ন। তিনি নাকি ওর মধ্যে এমন এক আদিম মানুষের খুলি পেয়েছেন, যার তুলনীয় কোন মানুষের খুলি এখনও পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় নি।

খবর পেয়ে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা তাঁর কাছে এলেন। তাঁরা দেখলেন মাথার খুলিটা আকারে খুব বড়—কোন বানর বা বনমানুষের অমন খুলি হয় না। তাছাড়া দাঁত আর চোয়ালের হাড়ও এমন যা থেকে ওটাকে বানরজাতীয় মানুষ বলেই মনে হয়। চারিদিকে ডাসোনের জয়-জয়াকার পড়ে গেল। তিনি জগৎজোড়া সম্মান পেলেন। ঐ খুলিটা ব্রিটিশ সরকার জিয়ামে' সাজিয়ে রাখলেন। বিজ্ঞানীরা ঐ নিয়ে সযত্নে লণ্ডনের বিখ্যাত 'ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামে' সাজিয়ে রাখলেন। বজ্ঞানীরা ঐ মানুষের নাম দিলেন 'ইয়োআনথ্রোপাস ডাসোনি' যা চলতি কথায় 'পিল্টডাউন ম্যান' নামে পরিচিত।

ঐ একটি আবিষ্কার করেই মিঃ ডাসোন অমর হয়ে গেলেন। বিশ্বজোড়া সম্মান ও খ্যাতিলাভ করে এক সময় তিনি মারা গেলেন। পিল্টডাউন গ্রামে তাঁর সমাধির পাশে প্রকাণ্ড একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হল। এইভাবে মিঃ ডাসোনের সঙ্গে অখ্যাত গ্রাম পিল্টডাউনও ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিল।

এরপর কেটে গেছে সুদীর্ঘ ৪০ বছর। 'পিল্টডাউন ম্যান' বা 'ইয়োআনথ্রোপাস ডাসোনি' ব্রিটিশ মিউজিয়ামে থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের বিস্ময় ও কৌতূহল জুগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বাদ সাধল নতুন যুগের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা তাঁদের সর্বশেষ অস্ত্র 'কার্বন—১৪' নিয়ে এগিয়ে এলেন 'পিল্টডাউন ম্যান'কে পরীক্ষা করতে। দীর্ঘ পরীক্ষার পর তাঁরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে নিলেন—"ঐ খুলিটা মোটেই ৫।৬ লক্ষ বছর পুরনো নয়। ওটা বড়োজোর ৫০ হাজার বছর আগের।"

আরো পরীক্ষার পর তাঁরা যা বললেন, তা শুনে সমস্ত বিশ্ব বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। তাঁরা বললেন, "ওর চোয়ালটা হল ওরাং-ওটানের চোয়াল, যা কৌশলে ঐ খুলিটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। চোয়ালটা মাত্র ১০০ বছর পুরনো। চোয়ালের কয়েকটি দাঁত সেই ওরাংওটানের আর বাকিগুলো কতকটা মানুষের মত যা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী—মানে নকল দাঁত। কিন্তু চোয়ালও দাঁতগুলির ওপর এক অজ্ঞাত রকমের রাসায়নিক প্রলেপ দিয়ে সেগুলোকে হুবহু খুলির মত রং করে ফেলা হয়েছে।"

অতএব দেখা যাচ্ছে ইয়োআনথ্রোপাসের চিহ্ন বলে যেটা এত বছর অবধি পরম শ্রদ্ধা কুড়াচ্ছিল, তা আসলে ফাঁকি। মিঃ ডাসোন এতকাল স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে অত সম্মান পেয়ে এসেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত এই ধাপ্পার গল্প এখানেই শেষ হল। কিন্তু এবার প্রশ্ন জাগতে পারে কী সেই কার্বন—১৪, যার সাহায্যে অতবড় ধাপ্পা ধরা পড়ল।

প্রাচীন যুগে, জিনিস কত পুরনো; এ-সম্বন্ধে স্রেফ আন্দাজ করাটাই ছিল নিয়ম। পরবর্তী যুগ থেকে আরম্ভ করে ১৯৪১ সাল অবধি পদার্থের বয়স অনুমান করা অর্ধ বৈজ্ঞানিক ও অর্ধ অবৈজ্ঞানিক উপায়ে। বিজ্ঞানীরা এক জায়গায় পাওয়া জিনিসের সঙ্গে অন্য জায়গায় পাওয়া একই ধরনের জিনিসের সঙ্গে তুলনা করতেন। এর সাহায্যেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করতেন কোন্ জিনিসগুলি প্রাচীনতর। এইভাবেই পুরনো জিনিসের বছর ঠিক করা হত।

এরপর ১৯৪১ সালে এক তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কার্বন—১৪ আবিষ্কৃত হল।

মহাশূন্যের বিস্তৃতির মধ্যে দিয়ে সঞ্চরমান রশ্মিগুলো পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডল ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ মাইল উঁচুতে এই শক্তিশালী রশ্মিগুলো ধাক্কা খায় নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে এবং তেজস্ক্রিয় কার্বন—১৪ পরমাণু সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর বায়ুবেষ্টনীতে সৃষ্ট কার্বন-১৪ অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ু থেকে বেশী ভারী বলে ভাসতে ভাসতে নেমে আসে মাটির দিকে। পৃথিবীর প্রতিটি উদ্ভিদ টেনে নিচ্ছে ঐ কার্বন-ডাই-অক্সাইড তাদের শরীরে। আর আমরা, মানুষেরা, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজাত দুটো খাদ্যের সঙ্গেই গ্রহণ করছি এ কার্বন—১৪।

কোন প্রাণী মারা গেলে তার কার্বন-১৪ গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সে শরীরস্থিত কার্বন—১৪ ভেঙে পড়তে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেপে বের করতে পারে যে কতটা কার্বন—১৪ অন্তর্হিত হয়ে আর কতটাই বা রয়ে গেছে উক্ত বস্তুটি মধ্যে। ১৯৪৮ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ডাঃ উইলা এফ লিব্বি ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী মিলে এমন একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি বে করলেন যা দিয়ে যে-কোন জিনিসের ম কতটা কার্বন—১৪ আছে, তা মাপা যা পরিমাপক যন্ত্রটি দিয়ে জানা যাবে কোন পুরনো পদার্থে কতটা কার্বন—১ নিঃশেষ হয়েছে, আর কতটাই বা তখন রয়ে গেছে। তাদের এই অসাধারণ সাফল্যে ফলে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হল। আ এই যন্ত্রগুলির সাহায্যেই হাজার হাজ বছর আগেকার জিনিসগুলোর প্রায় সঠি বয়স বলা সম্ভব হয়েছে।

এই হল কার্বন—১৪-র অতি সংক্ষি পরিচয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে পর থেকে অপরাধীরাও সাবধান হয়ে গে কারণ, তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরে কার্বন—১৪-কে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

অনিলকুমার ে
বরিষা, কলকাতা

সম্পাদকীয়

উজ্জ্বল দিন

উজ্জ্বল দিনের দ্বারা চিহ্নিত যে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত হল তাকে নিয়ে দেশের মানুষ আনন্দের উৎসবে মেতেছিল। ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস উদযাপিত হয়েছে সারা দেশে। ২৬শে জানুয়ারী পালিত হয়েছে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে। সুভাষচন্দ্র আজ রূপকথার বীরের মতো। তাঁর নামে লক্ষ মানুষের মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। নতুন যুগের নতুন মানুষের কাছে তিনি একটি অগ্নিশপথের মতো দীপ্যমান। ভারতবর্ষের মানুষের সামনে তিনি ঐতিহাসিক এক সংগ্রামের ঐতিহ্য রেখে গেছেন। তরুণমনকে তিনি নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁর কর্মে, তাঁর আদর্শে। তিনি আমাদের মধ্যে চিরজাগ্রত সত্তা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বরণীয় পুরুষ তিনি। তাঁর জন্মদিন নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় আমাদের অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদনের সংকল্পের কথা। সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনে ও কর্মে সেই সংকল্পের অনির্বাণ আলোক শিখার মতো চিরকাল জাগরূক থাকবেন ভারতবাসীর মনে।

সাধারণতন্ত্র দিবসও আমাদের সংকল্পেরই দিন। ভারতের সাধারণতন্ত্রের উনিশ বছর পূর্ণ হল। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের অনেক কিছুই করণীয় ছিল, অনেক কিছুই করা হয়নি। সাফল্যের খতিয়ান নিলে দেখা যাবে সাধারণতন্ত্রী ভারত অবিচল নিষ্ঠায় তার সংবিধানকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। এশিয়ার ও আফ্রিকার বহু দেশ থেকে এই উনিশ বছরে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তার স্থান দখল করেছে সামরিক একনায়কত্ব। ভারতবর্ষের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, নানাবিধ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষায় তার আগ্রহ কখনো কমেনি এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করা হয়েছে।

একান্ন কোটি লোকের দেশে ভারতবর্ষ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে চারটি সাধারণ নির্বাচন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে পেরেছে। নানান ধরনের নানান আদর্শের দল আছে ভারতে। তারা সকলেই যে নৈষ্ঠিক পার্লামেণ্টারি প্রথায় বিশ্বাসী তাও নয়। তা সত্ত্বেও ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো এত সুদৃঢ় এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক বুদ্ধি এতটা পরিণত যে, বিভিন্ন মত ও পথের দলকে নিয়ে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পরীক্ষা সার্থকভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কখনো কখনো উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, উগ্র বিচ্ছিন্নতাকামী, উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বিপ্লববাদী গোষ্ঠির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়েছে। এটা উল্লেখযোগ্য যে, কোনো রাজনৈতিক দলকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে। এমন কি বিচ্ছিন্নতাকামী কাশ্মীর গণভোট ফ্রন্ট অথবা আত্মগোপনকারী নাগাদের সঙ্গেও রাজনৈতিক স্তরেই মোকাবিলা করা হচ্ছে, সামরিক বা পুলিশী স্তরে নয়। এটা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের আত্মিক শক্তি। এই শক্তি বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করা হয়েছে। গণতন্ত্রের সার্থকতা হয় গণসম্মতির মাধ্যমে। এই সম্মতির ভিত্তিতেই ভারতের সাধারণতন্ত্র প্রায় দুই দশক অতিক্রম করতে চলেছে।

অবশ্য এখনও অনেক প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। সংবিধানের নীতিনির্দেশক অনুচ্ছেদে বহুঘোষিত সংকল্প এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেবার যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম আমরা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্রের সনদ ঘোষিত হবার সময় তা দেশের বহু অংশেই এখনও কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। শিক্ষার প্রসার ছাড়া গণতন্ত্র কখনো কার্যকর হতে পারে না। এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন, যে-হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সে-হারে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। এই কাজটি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সাধারণতন্ত্র দিবস যতবারই আসে ততবারই তা আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে যায়। দ্রুত শিল্পায়ন, খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনও আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ মোটা ভাত, মোটা কাপড়, ন্যূনতম শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা পেলেই মানুষ গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য সন্তুষ্ট মনে কাজে হাত লাগাবে। নতুবা নানা বিড়ম্বনায় তার প্রচেষ্টা হবে ব্যাহত।

আমরা আশা করে আছি আর মাত্র তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে ভারতের সাধারণতন্ত্র তার নাগরিকদের ন্যূনতম সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। গোটা দুনিয়ার পক্ষেই ভারতের গণতন্ত্রের এই ন্যূনতম গ্যারাণ্টি অর্জন প্রয়োজন। এর জন্য আমাদের আরও অনেক বেশী পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। অন্য দেশের কাছ থেকে দান বা সাহায্য পাবার আশায় থাকলে ভারতবর্ষকে আরও বহু বৎসর এই দুর্ভোগ ভুগতে হবে। আজ দেশের ভিতরে যে নানারকমের উচ্ছৃংখলা ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার ফলে ভারতের মহত্তম গণতান্ত্রিক পরীক্ষা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। উৎসবের আনন্দে তা যেন আমরা না ভুলি। ভারতকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তার সাধারণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য চাই জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা। তাহলেই আমাদের সামনের দিনগুলো হয়ে উঠবে সার্থকতায় উজ্জ্বল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হুইটম্যান

সবুজ কাপড়ে বাঁধানো মলাট, তার ওপর সেকেলে সস্তা ফুল-লতা-পাতার নকসা ছাপা। এই চেহারায় পঁচানব্বই পাতার চটি একটি কবিতার বই বার হয়েছিল আজ থেকে একশ' চোদ্দ বছর আগে নিউইয়র্ক শহরে। বইটির মলাটে না প্রকাশক, না লেখক—কারুর নাম ছিল না। শুধু বইটির নামটা ছিল ওপরে ছাপা, আর *নীচে ছিল এই বিজ্ঞপ্তিটুকু—ব্রুকলিন নিউইয়র্ক, ১৮৫৫।*

১৮৫৫! সিপাহী বিদ্রোহের তখনও দু'বছর বাকি। ভারতবর্ষের বুকে একটা চাপা বিক্ষোভের গুমরানি তখন সুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়।

সে ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশ কিন্তু বছরের হিসাবের চেয়েও যেন অনেক বেশী-দূর কালের আর সেখান থেকে আমেরিকা তখন সত্যিই অনেক দূরের পৃথিবীর উল্টো পিঠের দেশ। পরস্পরের কাছে এ-দুই দেশ তখন প্রায় অচেনা বললেই হয়।

তাই পৃথিবীর উল্টো পিঠের দেশের একটি চটি কবিতার বই-এর খবর ভারত কি বাংলাদেশ তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। যেখানে বইটি প্রথম বার হয়েছিল, সেই আমেরিকাতেও কি সাড়া পড়েছিল একটু?

বিন্দুমাত্র না। হাজার কপি বই ছাপা হয়েছিল, তার দু-একটাও বিক্রী হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বিক্রী ত হয়নি, কবি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে নিজে থেকে যাদের বইটি পাঠিয়েছিলেন, সেইসব বিখ্যাত সমালোচকদের কারুর কারুর মতামতের নমুনা 'লণ্ডন ক্রিটিকের' মন্তব্যে পাওয়া যাবে।

যে-কবির সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর দেশে আজ সাগ্রহে উদ্‌যাপিত হচ্ছে তাঁর সম্বন্ধে উক্ত সমালোচক রায় দিয়ে বলেছিলেন, অঙ্কশাস্ত্রে একটা শুয়োর যত পণ্ডিত, কাব্যকলায় এই লেখকও তাই।

বইটির নাম যে "Leaves of Grass" আর কবি হলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান, তা বলা নিশ্চয় বাহুল্য।

প্রথম প্রকাশের সময় ওয়াল্ট হুইটম্যানের এই বইটি যে ব্যাপক অবহেলা ঔদাসীন্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ওই রকম নির্মম বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'ঘাসের পাতা' *নামেও যেমন, রচনাতেও তেমনি সে-যুগের অভিজাত কাব্যের সাজানো ফুলের বাগানে একেবারে অপাংক্তেয় অবাঞ্ছিত আগাছার সামিল বলে গণ্য হওয়ারই কথা।*

ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রথম কবিতার বই প্রকাশের বছরেই আতলান্তিকের এপার-ওপারের ইংরেজী সাহিত্যে টেনিসন-এর মড আর লংফেলো-র 'হিয়াওয়াথা' প্রকাশিত হয়েছে। সে-সব কাব্যের পাশে কবিতা বলতে যা-কিছু বোঝা যায় 'ঘাসের পাতা' যেন তার বর্বর বাতুল প্রতিবাদ।

প্রথমত কবিতা বলে চালানো রচনাগুলি মিল দেওয়া ছন্দে নয়, নির্লজ্জভাবে কবিতার চিরন্তন রীতি লঙ্ঘন করে সাধারণ গদ্যে লেখা। আর কি তার বিষয়বস্তু?

'ঘাসের পাতার' প্রথম সংস্করণের প্রথম কবিতার নাম ছিল 'আমাকে নিয়ে গান'। সে-কবিতার প্রথম ক'টি লাইন হল—

'নিজেকে নিয়ে আমি উৎসব করি,
আর আমি যা বুঝি তোমাকেও তা
বুঝতে হবে,
কারণ আমার প্রতি অণুপরমাণু
তোমারও বলতে পারো।'

এ-রচনাকে কবিতা বলে স্বীকার করা সাহিত্যের সনাতন ঐতিহ্যে লালিত কারুর পক্ষে কি সম্ভব?

প্রথমটি ছাড়া এইরকম আরো এগারটি কবিতা ছিল বইটিতে। সে-সব কবিতার নামগুলিই লক্ষ্য করবার মত। যেমন ১। পেশার নাম, ২। সময়-ভাবনা, ৩। যারা ঘুমোচ্ছে, ৪। গান গাই বিদ্যুদ্‌গর্ভ কায়ার, ৫। মুখচ্ছবি, ৬। উত্তরদাতার গান, ৭। ইওরোপ, ৮। বোস্টন-এর পালাগান, ৯। শিশু এক যেত টহলে, ১০। আমার পাঠ পুরো কে নেবে? একাদশ কবিতাটির নাম ছিল, 'পুরাণ সব মহান'। সে-কবিতাটি পরে হুইটম্যান তাঁর বই থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই প্রথম সংস্করণে ছাড়া সেটি আর পাওয়া যায় না।

'ঘাসের পাতা'র বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য শুধু কবিতাগুলির বিষয়-বক্তব্য আর রচনা-পদ্ধতিতেই নয়, আরো এমন একটি নূতনত্ব তাতে ছিল যা তখনকার দিনে কবিতার বই-এ অকল্পিত।

জর্জ বার্নার্ড শ' নাট্যকার হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যে পদার্পণ করে তাঁর প্রথম নাটকেই বেয়াড়া বিপ্লবী চিন্তাধারায় যেমন চমক লাগিয়েছিলেন তেমনি নাটকের যা প্রতিপাদ্য তা সুদীর্ঘ ভূমিকায় বিশদ করে নাট্য-সাহিত্যের প্রচলিত ধারা উল্টে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'উইডোয়ার্স হাউস'-এই নাটকের চেয়ে ছাপার অক্ষরে ভূমিকা ছিল অনেক বেশী লম্বা।

বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির মত রচনার আগে তার চেয়ে বড় আলোচনা জুড়ে দেওয়ার এ-রীতি প্রবর্তনের বাহাদুরী কিন্তু বার্নার্ড শ'-এর নয়। বার্নার্ড শ'র প্রথম প্রকাশিত নাটকের প্রায় চল্লিশ বছর আগে ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁর পঁচানব্বই পাতার কবিতার বই একটি অত্যন্ত দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। সে-ভূমিকা কবিতাগুলির চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এই ভূমিকাতেই আমরা 'আমেরিকা নিজেই আসলে এক অতুলন মহাকাব্য'-এর মত লাইন পাই। সেই সঙ্গে শুনি—"মহান কবি যিনি তাঁর মধ্যে নেই তুচ্ছতা সংকীর্ণতা। যা নগণ্য তাও তাঁর স্পর্শে নিখিল বিশ্বের প্রাণস্পন্দন আর মহিমা পায়। তিনি ঋষি... তিনি স্বতন্ত্র আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ... অন্যেরা নিকৃষ্ট কেউ নয়, শুধু তাদের যা

অগোচর তা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দেয়।" আর "যেখানে থাকে মানুষ, নারী ও পুরুষ সেখানেই বীরেদের আরাধ্য স্বাধীনতা... আরাধ্য সবচেয়ে বেশী কবিদের। তাঁরাই স্বাধীনতার কণ্ঠ আর বাণী...কবিদের কাছে দুসহ লাঞ্ছিতেরা পায় মুক্তির প্রেরণা আর জালিমরা দেখে বিভীষিকা...স্বাধীনতা স্বয়ম্ভর, কাউকে সে ডাকে না, আশ্বাস দেয় না কিছুর, স্থির ধীর দীপ্ত সে থাকে আসীন, আত্মবিশ্বাসে অটল, সব হতাশার অতীত। সংগ্রাম চলে প্রচণ্ড বেগে, কখনো এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে...জয় হয় বিপক্ষের ...কারাগার, হাত পা আর গলার শৃঙ্খল, ফাঁসির মঞ্চ, কণ্ঠরোধের ফাঁস, আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি স্বকার্যসাধন করে...ঝিমিয়ে পড়ে আন্দোলন, বলিষ্ঠ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় নিজেদের শোণিতে, তরুণরা লজ্জা গ্লানিতে নতমুখে পরস্পরের পাশ কাটিয়ে যায়, আর স্বাধীনতা কি নেয় বিদায়? না, কখনো নয়।"

উচ্ছ্বাস আছে সন্দেহ নেই। ভাবাবেগের প্রাবল্যে ভাষার স্বচ্ছতা হয়ত একটু কম। কিন্তু ১৮৫৫ সালে পৃথিবীর অন্য পিঠ থেকে এই বিদ্যুদ্গর্ভ বাণী-তরঙ্গ এসে পৌঁছোন সম্ভব হলে ভারত তার সেদিনকার আকুল অস্থির কিন্তু অস্পষ্ট নবযুগ প্রত্যাশার একটা সুদূর অথচ বলিষ্ঠ সমর্থন কি পেত না।

'লীভস অফ গ্রাস'-এ তন্ময় হয়ে শোনবার মত আরো অনেক কিছু ছিল। 'ইওরোপ' নামে কবিতা লিখতে গিয়ে 'স্বাধীনতা'কে মূর্তরূপে দেখেছেন হুইটম্যান—

ভাপসা মরণতন্দ্র-জড়ানো খোপের,
গোলামদের গহ্বর থেকে
নিজেই নিজেকে দেখে চমকে
বিদ্যুৎ-শিখার মত সে লাফ দিয়ে
বেরিয়ে এল
সব ছাই আর ছেঁড়া কাঁথা পায়ে দলে
হাত চেপে ধরে রাজেশ্বরদের কণ্ঠে।
কোথায় আশা আর বিশ্বাস?
হায়, নির্বাসিত দেশপ্রেমিকদের
জীবনের করুণ সমাপ্তি।
হায়, কাতর সব হৃদয়!
ফেরো এই দিনটিতে,
নিজেদের করো সঞ্জীবিত।

... ...

স্বাধীনতার জন্যে যারাই প্রাণ দিয়েছে
তাদের সবারই সমাধি থেকে
মুক্তির বীজ হবে অঙ্কুরিত,
আরও নূতন বীজ ছড়াতে ভবিষ্যতে,
বাতাস যা বয়ে নিয়ে যাবে
দূর-দূরান্তে বপন করতে,
বৃষ্টি আর তুষার হবে যার ধাত্রী।
... ...

স্বাধীনতা—হতাশ যারা হয় হোক
আমি আশা ছাড়ি না কখনও।"

সস্তা চমক দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে ওয়াল্ট হুইটম্যান অবশ্য চাননি।

'তোমরা কি ভাবো আমি
চমকে দিতে চাই?
দিনের আলো কি চমকে দেয়?
না, চমকে দেয় ভোরের বেলা বনের মধ্যে
গান গেয়ে ফেরা লাল পাখিটা?

কিন্তু চমকে না দিক, ভাষায় ভঙ্গিতে বিষয়ে-বক্তব্যে সম্পূর্ণ বিপ্লব আনা এসব কবিতায় সাহিত্য-সমাজে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবার কথা। তা-ও হয়েছে বলে মনে হয় না। 'ঘাসের পাতা' প্রথম প্রকাশের সময় নিন্দা-বিদ্রূপ যতটুকু পেয়েছে তার চেয়ে বেশী পেয়েছে অনাদর-অবহেলা।

সে-যুগে যে-দেশের জীবন্ত ইতিহাস-প্রবাহের বিশাল দুরন্ত বেগকে তিনি কাব্যরূপ দিতে চেয়েছিলেন সেই আমেরিকাতেই তাঁর সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বুঝি ছিল সবচেয়ে বেশী।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে প্রকাশিত হুইটম্যানের একটি কাব্য-সংগ্রহে সম্পাদকের ভূমিকায় অন্তত পড়ি, "হুইটম্যানের কবি-সত্তা যে কত বিরাট ও তাঁর তাৎপর্য যে কি, তাঁর নিজের দেশে তার পরিচিতি এখনো তেমন ব্যাপক নয়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন, হুইটম্যান নিজের দেশবাসীর এমন নিখুঁত সমষ্টিগত মূর্ত প্রতীক যে তাদের ওপর কোনো ছাপই রাখতে পারেননি। আমেরিকায় অতখানি মার্কিনী হওয়া স্পষ্টই বাহুল্য হয়েছে।"

ইংরেজ সমালোচকের এ-মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য অবশ্য নয়। 'লীভস অফ গ্রাস' প্রথম প্রকাশের সময় সাধারণভাবে অবহেলিত হলেও এমন কারুর কারুর অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে সাহিত্য-শিল্পের জগতে যাঁরা একাই একশ' নয়, এক সহস্র। তেমনি একজন হলেন রালফ ওয়াল্ডো ইমার্সন। 'লীভস্ অফ গ্রাস' পড়ে ২১শে জুলাই ১৮৫৫তে হুইটম্যানকে তিনি যে-চিঠি লেখেন, তার কয়েকটি লাইন হল :—

"I find it the most extraordinary price of wit and wisdom that America has yet contributed... I find incomparable things said incomparably well as they must be.

শতাধিক বর্ষ আগে ইমার্সন যা বলেছিলেন, শুধু আমেরিকার নয় আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অভিমত তা থেকে ভিন্ন নয়। কাব্যকলার নানা বিচার আছে কিন্তু মানবতার মহাচারণ হিসাবে তিনি আদি ও অনন্য বলে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ইওরোপে যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশেও তেমনি এ-শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি কবি হিসাবে হুইটম্যান সম্বন্ধে প্রথম ব্যাপক ঔৎসুক্য ও উৎসাহ জাগে। বাংলায় গদ্যছন্দ প্রবর্তনের পেছনে হুইটম্যানের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুব বেশী থাক বা না থাক, তাঁর নব-মানব-সমাজের দীপ্ত সুস্থ বলিষ্ঠতা, যথাসময়ে কাব্যে রুগ্ন তথাকথিত ফরাসী বিকৃতি-বিলাসের অব্যর্থ প্রতিষেধকের কাজ যে করেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শুধু অসামান্য কবি নয়, হুইটম্যান যে তার চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন, সে-উপলব্ধির কথা বাংলাদেশে প্রথম যাঁর কণ্ঠে শোনা যায় তিনি কিন্তু নিজেও কবি নন। তিনি ইতিহাসের আর এক ক্ষণজন্মা পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দ।

সেই ১৮৯৭-এ 'লীভস অফ গ্রাস' পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হুইটম্যান আমেরিকার সন্ন্যাসী।'

বিবেকানন্দের যা আদর্শ সে সন্ন্যাসীর সম্মান হুইটম্যানের মত কবি-ই পেতে পারেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কাহিনী

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী — খেমচাঁদ। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তাঁরই দোকানে বেচতে এসেছেন অনন্ত স্মৃতি জড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কণ্ঠহার। কিনবেন একালেরই বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। হীরের দাম উঠল সোয়া সাত লাখ। সকলেই এক স্মৃতি-নৌকোর আরোহী। ভীম দত্ত এক সময় আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন শর্মিষ্ঠাকে। সে-ও চল্লিশ বছর আগের কথা। নেকলেশটা বোম্বাইতে ডেলিভারি দেবারই কথা হল। হঠাৎ ট্রাঙ্ক কল। রাজস্থানেই বজ্রমণির কণ্ঠহার ডেলিভারি দিতে হবে বলে মত বদলেছেন মিঃ দত্ত। সব কিছুই রহস্যময় ঠেকল। বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। তবু ইন্দ্রনাথ রুদ্র-ই ভার নিলেন। তিনিই হার ডেলিভারি দেবেন রাজস্থানে। সঙ্গে যাবে খেমচাঁদের ছেলে অখণ্ড।]

হীরামনের হাহাকার

অদ্রীশ বর্ধন

ঘণ্টাখানেক পরের কথা।...

ঝিরঝিরে বাদলা আর নেই। তবে রাস্তায় কাদা আছে। বাতাসে স্যাঁতসেঁতে ভাব আছে। আর আছে হিমঠাণ্ডা। যেন দার্জিলিংয়ের মেঘলা রাত।

মেসে গিয়ে ধড়াচূড়া পালটে নিল ইন্দ্রনাথ। নড়বড়ে চেয়ারে বসে ভাঙা তক্তপোশে পা তুলে দিল। সিগারেট ধরিয়ে শিবনেত্র হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। শরীরের ওপর দিয়ে ধকল তো কম যায়নি। তার ওপর, গুরুপাক হীরের নেকলেস আবার ফিরে এসেছে তলপেটের বেল্টে। তাই বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে বসল এ কাহিনীর প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

হীরের নেকলেস তো নয়, যেন সাক্ষাৎ বিষবৃক্ষ; এত বছর লালন করার পর এখন সর্বনাশের দুন্দুভি বাজাতে বসেছে। তবে বিসমিল্লায় গলদ আছে বলে মনে হল ইন্দ্রনাথের; ত্রুটি গোড়াতেই রয়ে গেছে—তাই এত বিঘ্ন।

মরিচ ছোকরা বুদ্ধির ঢেঁকি সন্দেহ নেই; কিন্তু শুধুই কি তাই? ভক্ত বিটেল ভণ্ড তপস্বী হওয়াও বিচিত্র নয়। ও রকম ঢ্যাপসা চেহারায় সব সম্ভব।

কিন্তু আশ্চর্য মহিলা এই শর্মিষ্ঠা। মণিহারা ফণী হয়েও নির্বিকার; বোলবোলাও গেছে, কিন্তু এখনো ভেঙে পড়েনি।

অখণ্ডনারায়ণ তো ময়ূর-ছাড়া কার্তিক; তার মনে বিষ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বড়ই রাশপাতলা। বাপের ঠিক বিপরীত।

আর খেমচাঁদ? যেন মাথায় ওপর শকুন উড়ছে; আসন্ন বিপদ তিনি দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু কি সেই বিপদ? শনি কি রন্ধ্রগত? ইন্দ্রনাথ জানে না। না জেনেই ম্যাও সামলানোর ভার নিতে হয়েছে তাকে। যোটপাট করারও সময় নেই। রওনা হতে হবে কালকেই।

অখণ্ড ছোকরাকে মিথ্যের জাহাজ বলে মনে হয় না। স্টেশনে গিয়ে হাড়েহাড়ে বুঝেছে পেছনে পেছনে ফেউ লাগার জ্বালাটা কি। কিন্তু খ্যাঁকশিয়ালটি কে?

খেমচাঁদকে টেলিফোন করা হয়েছিল দুবার। একবার ভীম দত্ত ক'রেছেন—রাজস্থান থেকে। আর একবার ভীমদত্তের নাম নিয়ে কেউ করেছে কলকাতা থেকে।

কলকাতা থেকে! !

চোখ কুঁচকে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। সিগারেট পুড়তে পুড়তে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই চমক ভাঙল। বুদ্ধির গোড়া অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। তাই অন্ধকারের মাঝে পথের হদিশ বোধ হয় পাওয়া গেল।

উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। চায়না-টাউনে এখুনি যাওয়া দরকার।

●

চায়না-টাউন!

গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোপ-ছোপ ধোঁয়াশা; অর্থাৎ কুয়াশাতে ধোঁয়া মেশানো। তবে বিলিতি স্মগের মত নয়। ইংরেজি স্মগ নামলে মোটরের হেড-লাইটকে মনে হয় এক-ব্যাটারির টর্চ-লাইট।

চায়না-টাউনের সে হাঁকডাক আর নেই। সি-এম-পি-ও'র প্লানের কাঁচি কুখ্যাত চীনা-পল্লীকে কাটতে কাটতে অনেক ছোট করে এনেছে। এককালে যে-গলিতে দিনের বেলা ঢুকতে বাঘা পুলিশ-অফিসারেরও বুক কাঁপত, এখন সে-সব গলির জায়গায় ইমারত উঠেছে; রাস্তা গেছে; আলো জ্বলছে।

কিন্তু এখনও কিছু আছে। চায়না-টাউন গিয়ে-গিয়েও এখনও ঠেকে রয়েছে অনেক জায়গায়। এখনও সেখানে চীনা-লণ্ঠন ঝোলে, নিশাচর ঘোরে, আফিং আর চণ্ডুর আড্ডা বসে, জুয়া চলে নারী-মাংসের ব্যবসা হয়।

এই শহর কলকাতারই বুকে নিশুতি রাতে এখনও চায়না-টাউন জেগে ওঠে; চৈনিক ছুরি ঝলসে ওঠে, তেরচা চোখে আগুন জ্বলে, রক্তের ফিনকি ছোটে—পুলিশ কিছু টের পায় না।

ধোঁয়াশা-ঢাকা এমনি এক গলির মধ্য এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথরুদ্র!

●

চায়না-টাউনের বাতাসে সেদিন উৎসবের আমেজ। কারণ সেদিন বারোই ফেব্রুয়ারী—চীনা-পল্লীর নিউ-ইয়ার্স ইভ।

তাই যেন কার্ণিভ্যালের হাওয়া বইছে চীনেপাড়ার অলিতে-গলিতে। আলোর মালা দুলছে বাড়ীর কার্ণিশ ঘিরে। ধোঁয়াশার মধ্যে হলুদরত্নের মত জ্বলছে শ'য়ে শ'য়ে আলো। মাঝে মাঝে ফাটছে চীনে-পটকা, পুড়ছে তুবড়ি, উড়ছে হাউই।

পথঘাট ইন্দ্রনাথের নখদর্পণে। তাই অচিরে এসে দাঁড়াল একটা দোতলা বাড়ীর সামনে। আলো সেখানে কম; তাই সিঁড়িও অন্ধকার। দরজার ওপর সজোরে কয়েকবার 'নক' করল ইন্দ্রনাথ।

পাল্লা খুলে গেল। ভেতরের আলোর পটভূমিকায় দেখা গেল এক চীনা বৃদ্ধকে। দীর্ঘ এবং ঈষৎ নুব্জ। লম্বা সাদা দাড়ি। পরনে ঢিলাঢালা আলখাল্লা কালো কুচকুচে সাটিনের ওপর লালসুতো দিয়ে ড্রাগন আঁকা। মাথায় ছোট্ট গোলাকার টুপি।

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে হাসিমুখে বলল ইন্দ্রনাথ—"নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে এলাম, মিস্টার চ্যান লিম্।" বলল খাঁটি বাংলায়। "ব্যাপার কী? ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথকে আপনি চেনেন না মনে হচ্ছে?"

চ্যান লিমের চেরা চোখে হলুদ আলো জ্বলে উঠল—"ইউ—ইদিয়ত! হোয়াই কাম ইন ইংলিশ দ্রেস? হোয়াই নক অন দোর লাইক ইংলিশ দেভিল? তাই তো চিনতে পারিনি।"

সহাস্যে নিজের কোট-প্যান্টের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করল ইন্দ্রনাথ—"সত্যিই তো, খুব অন্যায় হয়েছে।"

'ইয়েস, পাঞ্জাবী পরবে; আই লাইক পাঞ্জাবী; বাঙ্গালী বাঙ্গালী থাকবে। লুক অ্যাত্ মি—সত্তর বছর বয়সে এখনও আমি পিওর চীনেম্যান। কাম ইন, ডিতেকতিভ ইন্দ্রোনাথ রুদ্দ্রো, কাম ইন। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।'

ঠোঁটের কোণে হাসিটা সেলাই করে নিয়ে চৌকাঠ পেরোলো ইন্দ্রনাথ। চীনে প্রথায় সাজানো ঘর। ঝলমল করছে হাঙ-চু শিল্কের মূল্যবান ট্যাপেস্ট্রি; ক্রিসানথিমাম আঁকা তাঙ আমলের পোর্সিলেন-ফুলদানী; মিঙগ যুগের মদ্য-পাত্র; দেওয়ালজোড়া রেশমী চাদরে চিঙগ-ইংগ-রের অনুকরণে আঁকা রাজসভা-দৃশ্য। এককোণে কনফিউসিয়াসের একটা বিরাট মূর্তি; অর এক-কোণে গৌতমবুদ্ধের। দুটোই কাঠে খোদাই। চৈনিক সাজসজ্জার সঙ্গে খাপ-খায়নি শুধু একটা জিনিস। একটা মার্কিন ঘড়ি।

"সিত্ ডাউন, মাই বয়," বলল বৃদ্ধ, "ভাদ্দর মাসের বর্ষার মত তুমি দুম করে এসেছ আজ।" বলে হাততালি দিতেই রুদ্রমূর্তি ড্রাগনের ছবি ছাপা পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল একা চীনে বুড়ি। "চ্যান সো, চালের পিঠে আনো, গরম চা আনো। ইন্দ্রোনাথ রুদ্দ্রো এসেছে।"

ইন্দ্রোনাথ রুদ্দ্রো যে এ বাড়ীতে বিলক্ষণ পরিচিত, তা বুড়ির মিটি-মিটি হাসি দেখেই বোঝা গেল। নরুন-চেরা চোখে হাসি নিয়েই পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হল বৃদ্ধা।

নিস্তব্ধ ঘরে শুধু খুশী প্রকাশ করতে লাগল আমেরিকান ঘড়িটা।

পাশের দরজার মাদুরের পর্দা দুলে উঠল, সরে গেল। ঘরে এল একটি চীনা তরুণী। পুতুল-পুতুল মুখশ্রী। যেন মোম দিয়ে গড়া। লংকার মত টুকটুকে রাঙা ঠোঁট আর ফুলধনুর মত কুচকুচে কালো ভুরুতে প্রসাধনের আভাস। ববছাট চুল। কিন্তু পরনে শিল্কের ফুলদার কিমোনো, পায়জামা—সনাতনী চীনা পোশাক।

ঘাড়ছাটা চুল দুলিয়ে ঝকঝকে চোখে তির্যক চাহনি হেনে বলল তরুণী—"গুড ইভনিং, ইন্দ্রোনাথ রুদ্র!"

"গুড ইভনিং, মাই নটি ডালিয়া" সোল্লাসে বলল ইন্দ্রনাথ। "ব্যাপার কী মিঃ লিম, আপনার মেয়ের বিলিতি পোশাক গেল কোথায়?"

জবাবটা ডালিয়াই দিল। বলল—"উৎসবে তোমরা বিলিতি পোশাক পরো? পরো না। আমিও পরিনি।"

চীনে বুড়ি ট্রে ভর্তি চালের পিঠে আর গরম চা রেখে গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা প্লেট টেনে নিল ইন্দ্রনাথ। পিঠে চিবুতে চিবুতে বলল—"ডালিয়া, আমি তোমার কাছে এসেছি। কাজ আছে।"

"আমার কাছে? আমি সামান্য টেলিফোন গার্ল,—"

"সেই জন্যেই তো এসেছি। টেলিফোন ভবনে তুমি কাজ করো। তাই খবরটা তুমিই দিতে পারবে।"

"কি খবর?"

"আজকে কাজে গেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"রাজস্থান থেকে ট্রাংককল এসেছিল?"

চোখ বেঁকিয়ে ভেবে নিল ডালিয়া। বলল—"এসেছিল। কে যেন ফোন করছিল জুয়েলার্স খেমচাঁদ রাজকুমারকে। পি পি কল তো, তাই মনে আছে।"

"ক'বার?"

"ক'বার মানে?"

"মানে, একবার, না দুবার?"

"একবার। সকালের দিকে।"

'গুড। এছাড়া আর কোনো কল পাওনি রাজস্থান থেকে?"

"না। তবে এখান থেকে বিকানীরে একটা পি পি কল গেছিল? কিন্তু আজ নয়।"

"কবে?"

"দুদিন আগে।"

"কোথায়, মানে, কোন ঠিকানায়?"

"বাংলোবাড়ী...নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।"

"ভীম দত্তর বাংলো বাড়ী?"

"দ্যাটস্ রাইট। ভীম দত্তর বাংলো-বাড়ী। টেলিফোন নাম্বারটা মনে নেই। কিন্তু কথাবার্তা বড়ই অদ্ভুত।"

"কলকাতার কোন জায়গা থেকে কল বুক করা হয়েছিল?"

"চায়না-টাউন থেকে।"

শিস দিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ।

"এক্সেলেন্ট। ঠিকানাটা মনে আছে।"

"আছে। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ গেলেই তিন রাস্তার মোড় পাবে। মোড়ের মাথায় চুন সুরকির দোকান থেকে ফোন করছিল আসমান আলি। ভীম দত্তর বাংলোবাড়ীর কেয়ারটেকার মেহের খান তার আত্মীয়।"

ইন্দ্রনাথের বুক উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু নিরীহমুখে বলে—"কি কথা হয়েছিল, আড়ি পেতে শুনেছিলে নিশ্চয়।"

ফিক করে হেসে মোমের পুতুল বলল—"তা শুনেছি। আসমান আলি বলছিল, মেহের খান যেন এক্ষুনি কলকাতায় চলে আসে। মোটা মাইনের একটা কাজ পাওয়া গেছে। বহাল তবিয়তে থাকা যাবে—"

"হেই!" বাধা দিল বৃদ্ধ চ্যান লিম। "ইউ নটি ডালিয়া, সিক্রেট খবর তুমি বলছ কেন?"

"ঠিক কথা," সায় দিল ইন্দ্রনাথ। "সিক্রেট খবর কাউকে বলা উচিত নয়। মিঃ লিম।"

"ইয়েস, মাই বয়।"

"আপনার ঐ আমেরিকান ঘড়িটা সত্যি কথা বলে তো?"

"ফরেন ক্রক—গ্রেট মিথ্যুক।"

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ। মণিবন্ধের ঘড়ি দেখল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"আজ আর নয়। গোছগাছ করতে হবে।"

"কেন?"

"কাল রওনা হচ্ছি। রাজস্থান।"

"আই সী!" বলে স্থির চোখে তাকাল বৃদ্ধ চ্যান লিম।

ইন্দ্রনাথ বিদায় নিল। চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিঁড়িতে। খুট খুট করে পেছনে এল মোমের পুতুলের মত সুন্দরী ডালিয়া। রাস্তার চীনালণ্ঠনের হলুদ আলোয় ঝিকমিক করে উঠল তার কালো হীরের মত চোখ।

ইন্দ্রনাথ ফিরে দাঁড়াল। বলল—"কিছু বলবে?"

ডালিয়া কিছু বলল না। শুধু অপলকে চেয়ে রইল। ছায়ামায়ার মধ্যে জেগে রইল তার মোমের আলোর মত স্নিগ্ধ মুখখানি।

ইন্দ্রনাথ সাবধান হল। বলল মৃদু কণ্ঠে—"ডালিয়া, অনেক দিন পরে দেখা। তাই কিছু বলতে চাও, কেমন?"

ডালিয়ার রাঙা ঠোঁট ঈষৎ নড়ে উঠল। বলল বিড় বিড় করে—"আমি জন্মেছিলাম হংকং-এ, কিন্তু মানুষ হয়েছি শান্তিনিকেতনে। তাই সব কথা সবাইকে বলতে পারি না। তুমি কি সত্যিই তা বোঝো না?"

কালোমণিতে হলুদ দ্যুতি দেখল ইন্দ্রনাথ। আর দেখল জোয়ারের দুরোভাস। তাই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—"আজ আসি ডালিয়া। পারি তো বিকানীর থেকে ফোন করব। নইলে ফিরে এসে দেখা করব।"

নিজের কানেই কথাগুলো রূঢ় শোনালো ইন্দ্রনাথের। কিন্তু এছাড়া আর উপায়ই বা কী?

●

রাস্তায় নেমে ইন্দ্রনাথ এগোলো তেমাথার দিকে। মাথার মধ্যে এক চিন্তা—আসমান আলি ট্রাঙ্ককল করে ফিরিয়ে আনছে মেহের খান্-কে। কিন্তু কেন?

পঞ্চাশ গজ বেশি পথ নয়। তেমাথায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। চুন-সুরকির দোকানে সাইনবোর্ড একটা ঝুলছে বটে, কিন্তু চুন-সুরকির কল্যাণেই বোধ হয় তার মর্মোদ্ঘাটন সহজে সম্ভব নয়। দরজা বন্ধ। রাত্ত বেশি হয়নি। অথচ এর মধ্যে দোকান বন্ধ হল? ইন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কড়া নাড়ল। একবার... দুবার... তিনবার।

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। তেমাথায় চীনা ছেলেমেয়েদের হুল্লোড় আর পটকার আওয়াজ ছাপিয়ে কি কড়াঘাত ভেতরে পৌঁছোলো না?

আর একবার খটাখট করলে হয় না?

না। মন স্থির করে ফেলল ইন্দ্রনাথ। রাস্তা পেরিয়ে একটা ঘুপসি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। ধূসর কোট-প্যাণ্টের দৌলতে অন্ধকারে মিশে গেল তার মূর্তি।

ঠিক বিপরীত দিকেই রইল আসমান আলির চুন-সুরকির দোকান।

রেডিয়াম জ্বলজ্বলে রিস্টওয়াচে সময় গুনতে লাগল ইন্দ্রনাথ। এক মিনিট, দু মিনিট করে পুরো দশটা মিনিট গেল। তারপরেই খুট করে একটা শব্দ হল।

আসমান আলির দোকানের দরজা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড পরে পাল্লা আরও একটু খুলল। বাইরে এসে দাঁড়াল এক বিচিত্র মূর্তি।

সর্বাঙ্গ রেনকোটে আবৃত। কলার ঘাড় পর্যন্ত তোলা। চোখে কালো চশমা—ছদ্মবেশধারণের যা কি না সুলভ ব্যবস্থা। মাথায় শজারুর কাঁটার মত খাড়া-খাড়া চুল। আর মুখখানা ঠিক খ্যাঁকশিয়ালের মত!

●

দুই হাত বর্ষাতির পকেটে ঢুকিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল শৃগাল-নন্দন। এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর টুপ করে নেমে পড়ল রাস্তায়। বাড়ী ঘেঁসে পথের ধার দিয়ে নেউলের মত ক্ষিপ্রচরণে এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে।

ইন্দ্রনাথ কোটের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে দেখে নিল, বাহুসন্ধির ফাঁকে চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা নিকষ অটোমেটিকটা। তারপর পা বাড়ালো।

পিছু নেওয়া একটা আর্ট। এ আর্টে পাকা আর্টিস্ট ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কিন্তু শীতের রাতে, কুয়াশা আর ধোঁয়াশা ঢাকা গলি-ঘুঁজিতে পিছু নেওয়া নেহাতই ছেলে-খেলা।

তাই কিছুক্ষণ পরেই সাঙ্গ হল শৃগাল-নন্দনের পথ-পরিক্রমা।

একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল শজারু-চুল। সুট করে অন্তর্হিত হল ভেতরে।

হোটেলের বাইরের চেহারা অতিদীন। সস্তার হোটেল সন্দেহ নেই। সাইন বোর্ডে ইংরাজী এবং চীনা ভাষায় বড় বড় হরফে লেখা:

'মংগোলিয়া লজ'

●

পরের দিন।

সকালবেলা ঝকঝকে 'ফ্যালকন' গাড়ীটা এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথের মেসের সামনে। উর্দিপরা সোফার ওপরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই পায়জামার ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি চড়িয়ে নেমে এল ইন্দ্রনাথ। বলল সোল্লাসে—"কী সৌভাগ্য কী সৌভাগ্য! গরীবের গৃহে জহুরীর আবির্ভাব—অনেক পুণ্যের ফল।"

দরজাটা খুলে ধরে খেমচাঁদ শুধু বললেন—"উঠে আসুন।"

ভারী গলা শুনেই ইন্দ্রনাথ সচকিত হল। দ্বিরুক্তি না করে উঠে বসল 'ফ্যালকন'-এর গদীমোড়া কুশানে। দেখল, শুধু জহুরী নন, জহুরী-নন্দনও হাজির।

খেমচাঁদ বললেন—"মেসের দেওয়ালের কান থাকে, তাই আপনাকে গাড়ীতে নামিয়ে আনলাম। কিছু মনে করলেন না তো?"

"বিলক্ষণ না। কিন্তু—"

"খবর আছে। হীরেমণিমুক্তা নিয়ে কারবার করি। কাজেই অষ্টপ্রহর আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হয়। বিশেষ করে—"

'পার্ক স্ট্রীটে আর সদর স্ট্রীটে রাহাজানি হয়ে যাবার পর", কথাটা লুফে নিয়ে শেষ করল ইন্দ্রনাথ।

"সত্যিই তাই", গম্ভীর মুখে বললেন খেমচাঁদ। "তাই লোকদেখানো সশস্ত্র পাহারা ছাড়াও অন্য ব্যবস্থা আমাকে রাখতে হয়।"

"অর্থাৎ?"

"আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ব্যুরোর কথা বলছি।"

"আই সী", এবার গম্ভীর হল ইন্দ্রনাথ।

"আপনি 'এক্স-রে' ব্যুরোর নাম শুনেছেন?"

"প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।" নীরস কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের।

"এগজ্যাক্টলি। আমি ওদের মক্কেল। আমার ইন্টারেস্ট দেখার পারিশ্রমিক স্বরূপ

মাসে হাজার টাকা ওদের আমি দিই। গতকাল অখণ্ডর অ্যাডভেঞ্চার বৃত্তান্ত শোনবার পর 'এক্স-রে'র কথা মনে হল। গোড়া থেকেই গাড়িক সুবিধের মনে হচ্ছিল না। তারপর কিনা আমারই ছেলের পেছনে চর লাগানো। তাই 'এক্স রে' কে বলেছিলাম, এতবড় বুকের পাটা কার, তা আমাকে রাতারাতি জানাতে হবে।"

"তারপর?" ইন্দ্রনাথ নির্লিপ্ত।

"লোকগুলো শুধু টাকাই নেয় না, কাজ করে। আজ ভোরবেলাই খবর পেলাম। শিয়ালদায় যে পাছু নিয়েছিল, নাম তার বাসুকি। বাসুকি ব্রহ্ম।। নিচের মহলে সবাই ওকে ঢোঁড়া বাসুকি বলে ডাকে। কেননা, পেটের রোগে ভুগে ভুগে বাসুকির চেহারা দাঁড়িয়েছে তালপাতার সেপাইয়ের মত। লিকপিকে বলেই মারপিটের মধ্যে যেতে চায় না। তাই ঢোঁড়া বাসুকি নাম হয়েছে। ওর আস্তানা—"

"চায়না টাউনের মঙ্গোলিয়া লজে", যেন আকাশকে উদ্দেশ করে বলল ইন্দ্রনাথ।

আঁতকে উঠলেন খেমচাঁদ "আপনি জানলেন কি করে?"

"সব ডিটেকটিভেরই কিছু কিছু মন্ত্রগুপ্তি থাকে তো", বলে অমায়িক হাসল ইন্দ্রনাথ।

ঢোঁক গিলে খেমচাঁদ বললেন—"আশ্চর্য! আপনি তো সাধারণ মানুষ নন।"

"অসাধারণও নই। তাই আর একটা বম্বশেল নিউজ জেনে ফেলেছি।"

"কি?" খেমচাঁদ উদগ্রীব।

"রাজস্থানে ভীম দত্তর বাংলোবাড়ীতে কেয়ারটেকারের নাম মেহের খান। দুদিন আগে তাকে ট্রাঙ্ক কল করে ডাকা হয়েছে কলকাতা থেকে। মোটা মাইনের চাকরীর লোভ দেখানো হয়েছে।"

"এটাও কি আপনার মন্ত্রগুপ্তি দিয়ে জানা খবর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," স্যাকারিন-হাসি হাসল ইন্দ্রনাথ। এবং ভাগ্যলক্ষ্মীকে মনে মনে সাধুবাদ দিল সহায় হওয়ার জন্য। "মেহের খান এতক্ষণে কলকাতার পথে।" বলে সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়াতে গিয়ে দেখল প্যাকেট মেসে ফেলে এসেছে। কিন্তু হাতে ঠেকলো আর একটা প্যাকেট। অখণ্ডনারায়ণ বাপের চোখের আড়ালে ফিলটার-টিপের মোড়ক এগিয়ে দিয়েছে।

কিং-সাইজের ফিল্টার টিপটা ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ইন্দ্রনাথ। মন্দ-মন্দ গতিতে 'ফ্যালকন' তখন রেড রোডের ওপর এসে পড়েছে। লাভার্স লেনে গাড়ী দাঁড়াল। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর নেমে দাঁড়ালেন সপুত্র জহুরী। পেছনেই ইন্দ্রনাথ।

থমথমে মুখে খেমচাঁদ বললেন—"আমার উদ্বেগ আরো বাড়ল। মেহের খানকে বাংলো থেকে সরিয়ে নেওয়ার পেছনে নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে। কে জানে আমরা হয়তো নেকলেস নিয়ে নরককুণ্ডে হাজির হব।"

"আপনি দারুণ নার্ভাস," খণ্ড খণ্ড হেসে বলল অখণ্ডনারায়ণ। "আমার তো বেশ মজাই লাগছে।"

"তুই থাক। ঢোঁড়া বাসুকিদের আমি চিনি। সদর স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীটের ডাকাতদের মত এরা রিভলবার উঁচিয়ে গুণ্ডামি করে না। এরা মাথা খাটায়। বুদ্ধি বেচে খায়। পুলিশ তাই এদের সমীহ করে। শর্মিষ্ঠা নেকলেস রাজস্থানে না পাঠালেই ভাল করত। কিন্তু ঐ মাথামোটা ছোঁড়া মরিচি টাকা-টাকা করে এমন খেপে উঠেছে...কি করি? অন্য কেউ হলে আমি এ ব্যাপারে নাক গলাতাম না। কিন্তু শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আজকের নয়। ইন্দ্রনাথবাবু, পুরোপুরি অনিচ্ছা নিয়েও আপনাদের আমি রাজস্থান পাঠাচ্ছি—"

"ডাডি, ঘাবড়াবেন না। অ্যাডভেঞ্চারের বরাত সবার থাকে না। লোমহর্ষক মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। অবশ্য দর্শক হিসেবে।"

"কি বলতে চাও তুমি?" কড়া গলায় বললেন খেমচাঁদ।

'আপনি তো ডিটেকটিভ নভেল একদম পড়েন না। পড়লে জানতেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ যেখানেই যায়, সেখানেই এক-আধটা খুন হয়। তার ওপর আমরা যাচ্ছি কিনা কোটিপতি ভীম দৈত্যের বাড়ীতে। ইণ্ডিয়ার নটোরিয়াস শিল্পপতি ভীম দৈত্য। সুতরাং বাংলোবাড়ীতে আমি আর প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র ঢুকেই দেখব হয়ত সোফায় মরে পড়ে আছেন ভীম দৈত্য। বুকে একটা ছোরা, আর—"

"বাচালতার একটা সময় আছে." ধমক দিয়ে বললেন খেমচাঁদ। "মিঃ রুদ্র, আপনার বুদ্ধির ওপর একটু-একটু করে আমার আস্থা জন্মাচ্ছে। বলুন দিকি, কারও পিণ্ড-দানপর্বর জন্যে আমাদের রাজস্থানে যাওয়া উচিত কিনা?"

ফিলটার-টিপে সুখটান দিল ইন্দ্রনাথ—"আমার একটা সবিনয় নিবেদন আছে।"

"বেশ তো, পেশ করুন।"

"যেতে আমাদের হবেই—কারণ আপনার ওপর চাপ পড়ছে। কিন্তু যাবো কিভাবে, সেইটাই হল প্রশ্ন।"

"যাবেন কিভাবে মানে?"

"মানে, আমি আর আপনার ছেলে যদি সুটেড বুটেড ঝকঝকে বেশে বিকানীরে নামি, হাত ধরাধরি করে মরুভূমির বাংলো-বাড়ীতে যাই, তাহলে দর্শকসাধারণ বলবে, এই তো এরাই হীরের নেকলেস এনেছে। এদের সঙ্গেই পাঞ্জা কষা যাক।"

"ঠিক, ঠিক," সায় দিলেন খেমচাঁদ।

"কাজেই মানিকজোড়ের মত ট্র্যাভেল করায় বিপদ। আমার প্রস্তাব এই: অখণ্ডবাবু—"

'এক্সকিউজ মি, ঐ বাবু-টাবু বাদ দিয়ে সম্বোধনটাকে ছোট করে ফেলুন, স্মার্টলি বলল অখণ্ডনারায়ণ।

"গুড। অখণ্ড একাই বাংলোবাড়ীতে যাক। গেলেই কয়েক পশলা প্রশ্নবৃষ্টি হবে ওর ওপর। কিন্তু সব কিছুরই জবাবে অখণ্ড জানাবে, নেকলেস ওর কাছে নেই—; সঙ্গে আনে নি। কারণ, অনেক সন্দেহজনক ব্যাপার ঘটায় বাবা নেকলেস পাঠান নি। খবর শুভ জানলে, অখণ্ড টেলিগ্রাম করবে। তবেই নেকলেস আসবে।"

"গুড আইডিয়া," বললেন খেমচাঁদ ইতিমধ্যে—"

"ইতিমধ্যে," স্বপ্নালু চোখে বলল ইন্দ্রনাথ, "কোনো এক সময়ে মরুভূমির বাংলো-বাড়ীতে হাজির হবে এক কুঁজো মুসলমান, মাথায় ফেজটুপি, গালে লালচে দাড়ি। চোখে ভাঙা চশমা। জামাকাপড় ছেঁড়া কাঁথার মতই শতচ্ছিন্ন—ভবঘুরের চেহারা যেরকম হয় আর কি। দীনহীন চেহারা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, তলপেটের বেল্টে বাঁধা আছে লাখ লাখ টাকা দামের রক্তরাঙা মণিহার।"

'থ্রিলিং! হাউ থ্রিলিং!' বলেই দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত করে ফেলল অখণ্ডনারায়ণ রাজকুমার। (ক্রমশঃ)

(আগামী সংখ্যায় 'নরককুণ্ডের পথে')

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (বামদিক থেকে) রাজ্যপাল ডাঃ চেরিয়ান, মূল-সভাপতি ডঃ এ পি যোশী, শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন প্রমুখ

বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বছরের মতো এবছরও জানুয়ারি মাসের ৩—৯ তারিখে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। এ বছর ছিল বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৬তম অধিবেশন। এবারকার অধিবেশন আয়োজিত হয়েছিল বোম্বাই থেকে কিছু দূরে পাওয়াই-এ অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজির মনোরম পরিবেশে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

বোম্বাই-এ বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম নয়, ইতিপূর্বে আরও পাঁচবার সেখানে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে আই-আই-টির আহ্বানে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতের মধ্যে বোম্বাই-এ এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল। তেসরা জানুয়ারী সূর্যকরোজ্জ্বল মনোরম প্রভাতে পাওয়াই-এর সুসজ্জিত মণ্ডপে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ডাঃ পি ভি চেরিয়ানের সভাপতিত্বে এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই অধিবেশন উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কাজের জন্যে তিনি উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মাঙ্গলিক-গীতির পর স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং আই-আই-টির অধিকর্তা অধ্যাপক এস কে বসু সমবেত প্রতিনিধিদের এবং বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানান। এর পর অধিবেশনের পৃষ্ঠপোষক শ্রী জি এল মেহতা এবং রাজ্যপাল ডাঃ চেরিয়ান তাঁদের ভাষণ প্রদান করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সেন।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, আমাদের শহরে ও গ্রামে নীরবে ও অপ্রতিহতভাবে এক বিপ্লব ঘটে চলেছে। আমাদের জনসাধারণ শতাব্দীব্যাপী দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে অর্থনীতিক প্রগতির আকাঙ্ক্ষায় পরিবর্তন চাইছে। তারা নতুন কর্মকৌশল শেখার জন্যে এবং নতুন নতুন পদ্ধতির সংগে পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবুও এদেশে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রাচীন রীতি-নীতি অনুসরণের অভ্যাস এখনও সুদৃঢ় রয়েছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের দ্বারা ভারত শাসিত হয় না, বিরাট জনসাধারণই হচ্ছে এ দেশের আসল শাসক। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি কুসংস্কার ও প্রাচীন ঐতিহ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে থাকে, তা হলে দেশের প্রশাসন ও রীতিনীতিতে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে আমাদের রাজনীতিজ্ঞ প্রশাসক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং বিজ্ঞানী সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলা একান্ত দরকার। কেবল আমাদের বীক্ষণাগার, ক্লাশে ও অফিসে এই মনোভাব জাগিয়ে তুললে চলবে না, হাটেবাজারে এবং গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত বিজ্ঞানকে নিয়ে যেতে হবে।

এদেশে বৈজ্ঞানিক পরিবেশ আলোচনা প্রসংগে তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও গবেষণায় প্রবীণদের একাধিপত্য সম্পর্কে বহু বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও সেই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। আমি শুনেছি, তরুণ বিজ্ঞানীরা অনেক সময় তাঁদের

গবেষণা করার বা গবেষণাপত্র প্রকাশের সুযোগ পান না। তরুণ গবেষকদের মনে আস্থাভাব জাগিয়ে তোলার এবং তাঁদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে প্রবীণ বিজ্ঞানীদের। আমাদের বহু প্রতিভাধর তরুণ বিজ্ঞানী বিদেশে গবেষণার জন্যে চলে যান। উন্নত দেশগুলির মতো যথোপযুক্ত অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। কিন্তু উৎসাহ ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধার অভাব এই অবস্থাকে আরও বেদনাদায়ক করে তোলে। আমাদের তরুণ বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের বাদ দিয়ে আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারি না। কাজেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে।

উপসংহারে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, জ্ঞানানুসন্ধানের জন্যে বিজ্ঞানচর্চা ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে কাম্য হতে পারে, কিন্তু দেশের মানুষের অবস্থা উন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ তা সর্বসাধারণের কাম্য। আমাদের দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের আশু প্রয়োজন উপেক্ষা করে আমরা ভারতে বিজ্ঞানচর্চা করতে চাই না এবং পারিও না।

এবারকার অধিবেশনে মূল সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ অমরচাঁদ যোশী। তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে 'মানবকল্যাণে উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি কৃষি-উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার ওপরই গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ১৯৭৫ সালে ১৫ কোটি টন এবং ১৯৮৫ সালে ২০ কোটি টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হবে। কিন্তু চেষ্টা করলে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করা কঠিন নয়। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারেও একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করা দরকার। অতীতে মানুষ যেমন বহু বিপর্যয় অতিক্রম করে এসেছে তেমনি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাজনিত সংকটও মানুষ অতিক্রম করতে পারবে, যদি সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রয়োগবিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করে।

মূল সভাপতির ভাষণের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচয় প্রদান করেন। এবার আফগানিস্থান থেকে এসেছিলেন ডঃ আবদুল গফুর কুইজানি, বুলগেরিয়া থেকে অধ্যাপক আই জুলটেভ, সিংহল থেকে অধ্যাপক কে এম জেলেভিরত্ন, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে অধ্যাপক জে কাচেক, হাঙ্গেরী থেকে অধ্যাপক বি এস নেগি, জাপান থেকে মিঃ সাকাস ওয়াদা এবং অধ্যাপক টি নাকাজিমা, পোল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক টি উরবানস্কি, রুমানিয়া থেকে অধ্যাপক অ্যালেকজেণ্ডার রোসেতি, যুক্তরাজ্য থেকে মিঃ পি বি সীমেনস্, ডঃ জি এল ওয়াকার এবং ডঃ কে জি ককস্, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক এম এইচ প্যেটেল, সোভিয়েত রাশিয়া থেকে অ্যাকাডেমিসিয়ান এন ভি তিৎসিন্ এবং ডঃ পি এল লাপিন, ডেনমার্ক থেকে ডঃ পল নীয়ার গার্ড এবং কানাডা থেকে ডঃ এইচ ই জনস্। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বিদেশাগত বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল কম।

উদ্বোধনী দিনের অপরাহ্ণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং বিজ্ঞান পুস্তকের একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। গত বছর বেনারস অধিবেশনের তুলনায় এবারকার প্রদর্শনী অনেক বড় ও আকর্ষণীয় হয়েছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ভাবা পরমাণু-গবেষণা কেন্দ্র আয়োজিত একটি বিরাট প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে 'অপ্সরা' এবং 'সাইরাস' পরমাণু-চুল্লীর মডেল দেখানো হয় এবং কিভাবে ইউরেনিয়াম খনিজ থেকে পরমাণু-শক্তির বিকাশ ঘটে তা সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ছিল আই-আই-টির ছাত্র ও অধ্যাপকদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও মডেল।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তেরটি বিভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন হয়। এবার গণিত শাখায় সভাপতিত্ব করেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ব্রিজমোহন, সংখ্যায়ন শাখায় পুনার অধ্যাপক এ আর কামাথ, পদার্থবিজ্ঞান শাখায় টাটা ইনস্টিট্যুট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ-এর অধ্যাপক বি ভি থোসার, রসায়ন শাখায় বরোদার অধ্যাপক সুরেশ সেথনা, ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখায় লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর সি মিশ্র, উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখায় গৌহাটির অধ্যাপক এইচ কে বড়ুয়া, প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি কে মান্না, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দ্রপাল সিং, ভেষজ ও পশুবিজ্ঞান শাখায় কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালের অধ্যাপক ডঃ ডি পি বসু, কৃষিবিজ্ঞান শাখায় পুসার অধ্যাপক উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শারীরতত্ত্ব শাখায় জম্মু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক পি ব্রহ্মচারী, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখায় পাটনার ডঃ বিমলেশ্বর দে এবং যন্ত্রবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যা শাখায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ। এই সঙ্গে বিভিন্ন শাখায় আলোচনা-চক্র ও বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। এবার যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক নীলরতন ধর, ডঃ পি ভি রাও, অধ্যাপক কে পি রাও, অধ্যাপিকা ইরাবতী কার্ভে, ডঃ আর এস ভারমা, ডঃ আর এস কাপিল, অধ্যাপক উরবানস্কি, ডঃ হরি শংকর, অধ্যাপক এস এন সরকার, অধ্যাপক পি কে সেন প্রমুখ। এ বছর লোকরঞ্জন বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি, ডঃ বি ডি নাগচৌধুরী, ডঃ বি মুখার্জি, অধ্যাপক নীলরতন ধর, অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসু, ডঃ পি ভি সুখাত্মে, ডঃ কে ভেংকটরমন, ডঃ সনৎ বিশ্বাস এবং ডঃ পি জে ডোয়ার্স। ভারতীয় বিজ্ঞান লেখক সংস্থার উদ্যোগে এবার একটি মূল্যবান আলোচনা-চক্র হয়। তাতে কলকাতার ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকজন বিজ্ঞান-লেখক পত্রপত্রিকায় সাধারণের উপযোগী বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার নানা দিক দিয়ে আলোচনা করেন।

এবার শ্রীনিবাস রামানুজন স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ফিলিপ হোয়াইট স্মারক বক্তৃতা ডঃ বি মুখার্জি, মুস্তফর স্মারক বক্তৃতা অধ্যাপক এস এন দাশগুপ্ত, মেণ্ডেল স্মারক বক্তৃতা ডঃ ও সিদ্দিকি এবং বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা দেন ডঃ বিক্রম সরাভাই।

প্রতি বছরের মতো এবারও অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় কয়েকটি গবেষণা-কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সুযোগ আমাদের হয়। ট্রম্বেতে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। মানবকল্যাণে পরমাণুশক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণায় ভারত যে কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা এই কেন্দ্রটি দেখে উপলব্ধি করা যায় এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশ সম্পর্কে একটা আস্থার ভাবও জেগে ওঠে। এই গবেষণা কেন্দ্রটি ছাড়া টাটা ইনস্টিট্যুট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, সীবা গবেষণা কেন্দ্র, হিন্দুস্থান লেভার, জাতীয় জৈব রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিরা দেখেছিলেন।

কয়েক দিন সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদের জন্যে আনন্দানুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিলেন। শ্রীমতী মৃণালিনী সরাভাই ও সম্প্রদায় পরিবেশন করেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন শ্রীমতী লক্ষ্মীশংকর ও কুমারী প্রভা আত্রে, নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন শ্রীশচীনশংকর সম্প্রদায় এবং ভারতের লোকনৃত্য বালকরাম ওয়ালেলিকর ও যোগেন্দ্র দেশাই সম্প্রদায় এবং আই-আই-টির ছাত্রসংস্থা পরিবেশন করেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীত এবং ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-এর নাট্যরূপ। শ্রী এ কে রায়ের পরিচালনায় এই নাট্যাভিনয় তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নি, যদিও ছাত্রদের তৈরী রূপসজ্জা আর ইংরাজি উচ্চারণ প্রশংসনীয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মীরজা গালিব

মীরজা আসাদুল্লা বেগ গালিব বিগত শতাব্দীকালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। কয়েকদিন পরে মীরজা গালিবের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে বিশ্বব্যাপী। ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গালিবের মৃত্যু হয়, তাঁর জন্ম ১৭৯৭-এর ২৭ ডিসেম্বর। গালিব যে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি—এই বিষয়ে দ্বিমত নেই, অনেকে ডাঃ মুহম্মদ ইকবালের নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু সাম্প্রতিক বিচারে গালিবকেই অধিকতর মর্যাদায় আসন দান করা হয়েছে।

গালিবের পিতামহ ছিলেন মুঘল। তাঁরা ভারতে এসেছিলেন সমরখন্দ থেকে, এবং রাজবংশে তাঁদের জন্ম। এই পরিবার মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দিল্লীতে এসেছিলেন। গালিবের পিতামহ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ, তাই সহজেই মুঘল সরকারের দরবারে নিযুক্ত হলেন। গালিবের পিতৃব্য মীরজা নাসরুল্লা বেগ বিবাহ করেছিলেন মীরজা আরিফ জানের কন্যাকে, আরিফ জানের ভাই নওয়াব আহমদ বক্‌স খান ছিলেন ব্রিটিশ কমাণ্ডার-ইন-চীফ লর্ড লেকের ব্যক্তিগত বন্ধু এবং এঁর চেষ্টায় মীরজা নাসরুল্লা বেগ ব্রিটিশ সৈন্য দলে চারশো ঘোড়ার অধিনায়ক হয়েছিলেন।

গালিবের পিতৃবিয়োগ হয় অতি শৈশবে। তখন এই মীরজা নাসরুল্লাই ছিলেন তাঁর অভিভাবক, কিন্তু যখন তাঁর মাত্র ন' বছর বয়স, তখন নাসরুল্লার মৃত্যু হল। তখন মাতামহের আশ্রয় পেলেন গালিব, দিল্লীতে এলেন যখন তখন তাঁর বয়স পনের বছর। এর দু' বছর আগে তিনি নওয়াব আহমদ বক্‌স খানের ছোট ভাই মীরজা এলাহী বক্‌সের কন্যা উমরাও বেগমকে বিবাহ করেন। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সূত্র গড়ে ওঠে। গালিব এবং লোহারু পরিবারের এই প্রীতির সম্পর্ক গালিবের সমগ্র জীবনকালে অক্ষুণ্ণ ছিল।

গালিব যখন দিল্লী এলেন (সম্ভবত ১৮১২ খৃঃ), তখন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ নিশ্বাসের কাল। কিন্তু এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও সেই কালের দিল্লী এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

বালখ, বুখারা, সমরখন্দ, আফগানিস্তান, ইরাণ প্রভৃতি অঞ্চলের জ্ঞানী এবং গুণীদের সমাবেশে দিল্লী শহর তখন স্পন্দিত। মোমিন, জাউক এবং শাহ নাসের প্রভৃতির মত কবি এবং হাকিম মাহমুদ খান, মৌলানা ফজল হক প্রভৃতির মত বিদগ্ধ মনীষীদের সমাবেশে দিল্লীর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ছিল উজ্জ্বল। মনে হয় মুঘল শাসক সম্প্রদায় তাঁদের সেই অন্তিম অবস্থায় রাজ্য শাসনের ভারমুক্ত হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ঢেলে দিয়েছিলেন। সুতরাং এই যুগ-পরিচিত রেনেসাঁসের কাল, ও সংস্কারের কাল হিসাবে। লোহারু পরিবারের বিশেষ যোগ ছিল রাজ-দরবারে এবং সম্ভ্রান্ত মহলে, তাঁরাই মীরজা গালিবকে এই বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে পরিচিত করান।

গালিব তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনার জন্য এই পরিবেশ অতি সহজে লাভ করে পরমানন্দে কবিতা লিখতে থাকেন। তাঁর শ্বশুর মীরজা ইলাহী বক্‌স স্বয়ং ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, 'মারুফ' এই নামে তাঁর প্রসিদ্ধি।

গালিবের ছিল সূক্ষ্ম রসবোধ। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল এবং সহানুভূতিশীল। জাগতিক বহু উত্থান-পতন এবং পারিবারিক উদ্বেগের মুহূর্তে তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহ' ছিলেন গালিব। আর্থিক অনটনের জ্বালায় তাঁর রসবোধ ব্যাহত হয়নি। সাতটি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন গালিব, কিন্তু তারা কেউ বেশীদিন বাঁচেনি। তিনি তাঁর শ্যালিকার কন্যা বুনিয়াদী বেগমকে দত্তক গ্রহণ করেন। বুনিয়াদী বেগমের বিবাহ হয়েছিল নিজেদের আত্মীয় পরিধির মধ্যে এবং সেই ছেলেটি ছিল প্রতিভাধর কবি, তার ছদ্মনাম ছিল আরিফ। তাঁর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত গালিব যে শোকগাথা লিখেছিলেন, তা বিখ্যাত হয়ে আছে, তিনি লিখেছিলেন—

'লাজিম থা কে দেখো মেরা রাস্তা
কৈ দিন ঔর
তনহা গয়ে কিউ? আব রহো তনহ
কৈ দিন ঔর।।

অর্থাৎ তোমার আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। একা গেলে কেন? এখ ওখানে আর কিছুদিন একা একাই থাকো

হান আয়ে ফালাকে পীয়র,
জওয়ান থা আভি আরিফ।
কিয়া তেরা বিগড়াতা জো না মরতা
কৈ দিন ঔর।।

অর্থাৎ হায় প্রাচীনা স্বর্গভূমি! আরি ছিল তরুণ, আর কিছুদিন সে যদি না মর তাহলে কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হত?

সেই কালে দিল্লীতে অনেক মুসায়ে এবং জলসা হত, গালিব কিন্তু নির্বাচি কয়েকটি জায়গায় যেতেন মাত্র, সর্বত্র যে না। এই রকম একটা মুসায়েরা অনুষ্ঠি হয়েছিল বাহাদুর শাহ জাফরের কা সেই মুসায়েরা বসেছিল সাদরুস-স মুফতী সদরুদ্দীন খান 'আজুরদা ভবনে। নায়র রখসান (নওয়াব জী উদ্দীন) হাতিতে চড়ে এসেছিলেন তা মুসায়েরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। মজলিসে বহু সম্ভ্রান্ত রসিকমণ্ডলী উ স্থিত ছিলেন, লাল কেল্লা থেকে কয়েক শাহজাদা এসেছিলেন, তাঁদের সকা আকৃতি ও পোষাক ছিল এক রকম প্রত্যেকের হাতে ছিল পালকের কল সেকালের সকল প্রসিদ্ধ কবি যথা, জাউ দাগ, জাহীর, মুহম্মদ হুসেন আজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এই মুসায়ের কিন্তু গালিবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে ত সামনে বাতিদান দেওয়া হয়েছিল।

গালিব সিপাহী বিদ্রোহের সময় ছি দিল্লী শহরে। তিনি অনেক লুঠতরাজ, খ জখম স্বচক্ষে দেখেছেন, এমন কি তাঁকে ইংরাজ সৈন্য ধরে নিয়ে যায়। ব্রি কমান্ডান্ট কর্নেল 'ব্রাউনের সামনে করাতে তিনি প্রশ্ন করলেন—তুমি মুসলমান?

গালিব হেসে বললেন—অ মুসলমান?

কর্নেল ব্রাউন জানতে চাইলেন—এক অর্থ কি?

গালিব উত্তরে বললেন—আমি সুরা পান করি বটে তবে শূকর ভক্ষণ করি না। তাই আমি আধা-মুসলিম। বৃটিশ জেলের মশা নিয়ে রচিত তাঁর ব্যঙ্গকবিতা আজো বিখ্যাত।

এই সময়েই ব্রিটিশ নগর অবরোধ করল। নওয়াব আমিনউদ্দীন আহমেদ খান এবং তাঁর ভাই নওয়াব জীয়াউদ্দীন আহমেদ খান লোহারুতে যাওয়ার জন্য দিল্লী ত্যাগ করলেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। কিন্তু মেহরৌলির কাছে পেঁাছাতে তাঁদের সমস্ত ব্রিটিশ সৈনিকরা লুঠতরাজ করে নিল। গালিব এই সংবাদে মর্মাহত হয়েছিলেন, কারণ, তাঁর অনেক কবিতা জীয়াউদ্দীন আহমেদের কাছে ছিল, সেইগুলিও নষ্ট হয়ে গেল। তা আর পাওয়া যায়নি।

গালিবের কোমরবন্ধে একদিন নটি গাঁট দেখা গেল। সকালে তাঁর বন্ধুরা সেই গাঁট দেখে প্রশ্ন করলেন এর অর্থ কি, গাঁট কিসের?

গালিব বললেন,—কাল রাতের বেলায় একটি কবিতা মনে এল, প্রতিটি লাইন গাঁট দিয়ে রেখেছি, অত রাতে উঠে কাগজ কলম নিয়ে বসতে আলস্য হল, তাই মনেই রেখেছি সব—

এই বলে তিনি এক একটি লাইন আবৃত্তি করলেন এবং একে একে গাঁট খুললেন তাঁর কোমরবন্ধের।

আম খেতে ভালোবাসতেন গালিব। একেবারে এককুড়ি আম খেতেন। বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় আর আম খেতে পারতেন না, তখন যৌবনের কাহিনী বলতেন।

একটি বর্ষণসিক্ত প্রভাতের কথা—

একটু আগে বৃষ্টি থেমেছে, বাতাসে তখনও বৃষ্টি বৃষ্টি গন্ধ লেগে আছে। আম গাছে অসংখ্য আম ঝুলছে। কবি গালিব আর মুঘল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফর লালকেল্লার সন্নিহিত একটি আম্রকুঞ্জে বেড়াচ্ছেন। কবি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর আম গাছের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাদশা প্রশ্ন করলেন—কি কবি, হল কি তোমার? এতক্ষণ ধরে কি দেখছ?

গালিব বললেন—শাহান শা, আমি সেই আমটি খুঁজছি যেটিতে আমার নাম লেখা আছে।

উর্দু কবিতায় বলে প্রতিটি আমের গায়ে যে তার সম্ভাব্য খাদক তার নাম লেখা থাকে, গালিব সেই ইঙ্গিত করলেন। বাদশাহ হেসে উঠলেন, গালিবের জন্য তৎক্ষণাৎ এক ঝুড়ি আমের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এমনই অনেক গল্প আছে গালিবের আম্রপ্রীতির।

গালিব ছিলেন বিষণ্ন এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। অনেকদিনের অনেক ব্যথা-বেদনার যন্ত্রণায় তিনি জর্জরিত ছিলেন। তথাপি তিনি হেসে সব উড়িয়ে দিতে পারতেন, যেন তাঁর জীবনের গতি মসৃণ। তাঁর চিত্তে এতটুকু প্রতিশোধস্পৃহা ছিল না। গালিব মদ্যপান করতেন দুঃখকে ঢাকার জন্য নয়, দুঃখকে অগ্রাহ্য করে তাঁর মানসিক স্থৈর্যকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে। একজন মৌলভী তাঁকে মদ্যপান থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করায় গালিব বলেছিলেন—

"পানপাত্র ভাসিয়ে দেওয়ার মত প্রচুর সুরা আছে—তবে, প্রার্থনায় কি প্রয়োজন?"

কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মাচার না করলেও গালিব অন্তরে অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। গালিবের ঈশ্বরস্তুতিমূলক কবিতাও বিশেষ জনপ্রিয়।

গালিবের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইরাণ, আফগানিস্থান এবং ইউনেসকোর উদ্যোগে স্মরণোৎসব পালিত হবে সেই উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে গালিবকে স্মরণ করা হল, এই সূত্রে তাঁরই একটি উক্তি মনে জাগে—

"কিস্ সে মেহরুমিস ইয়ে কি
সিকায়েৎ কী—যে
হম নে চাহা থা কি মর যাঁযে,
ওভি না হুয়া।।"

আমার অদৃষ্টের জন্য কার কাছে অনুযোগ করব—মরতে বাসনা হয়, হায়রে তাও হবার নয়।

এই প্রবন্ধের কিছু তথ্যের জন্য আমি বেগম কুদসিয়া আইজাবা রসুলের কাছে ঋণী।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

গুজরাটি লেখক চুণিলাল সাদিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি আমেদাবাদে এসেছিলেন পি. ই. এন সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখান থেকেই ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যান। তিনি একাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা। সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য তিনি রণজিৎরাম স্বর্ণপদক লাভ করেন।

কবিতায় সুরারোপ কতদূর সম্ভব, তা নিয়ে বাংলায় নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। সম্প্রতি গুজরাট থেকেও এ রকম একটি প্রচেষ্টার কথা শোনা গেছে। প্রখ্যাত গীতিকার শ্রীঅজিত শেঠের পরিচালনায় প্রায় ১৪ জন প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করেন। এঁরা বর্তমান গুজরাটি কবিদের কবিতা সুরারোপ সহযোগে পরিবেশন করেন। কবিতা নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সকলের প্রশংসা অর্জন করবে বলে আশা করি।

এই সপ্তাহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল, মনোমোহন ঘোষের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। 'অমৃতে' তাঁর কাব্য-প্রতিভা এবং জীবন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বিগত যুগে যে কয়জন ভারতীয় কবি ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনা করে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, মনোমোহন ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। গত ১৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় কলকাতায় মহাজাতি সদনে এক সভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ভি. কে. গোকক। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোমোহন ঘোষের সমগ্র সাহিত্যের উপর গবেষণার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, "ভারতীয় পুনর্জাগৃতির ইতিহাসে মনোমোহনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।" এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। তিনি বলেন, "মনোমোহন ভারতীয় কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি কাব্যের সত্য এবং জীবনের সত্যকে সার্থকভাবে যুক্ত করেছিলেন।" ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একসময়ে মনোমোহনের ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, "তাঁকে শিক্ষাগুরু হিসেবে পাওয়া এক পরম সৌভাগ্যের কথা। ইংরেজির অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এই কারণে প্রতীচ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রথম জীবনের রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও জানান যে, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় শীঘ্রই তাঁর সমগ্র রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করবেন। কবিকন্যা অধ্যাপিকা লতিকা ঘোষ কবির কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনান। অধ্যাপক পি কে গুহ সকলকে ধন্যবাদ জানান। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে 'ইলিয়ট রোড'কে

কবি মনোমোহন ঘোষ রোড রাখার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি অনুষ্ঠানের কথাও উল্লেখ করতে হয়। গত ১৮ জানুয়ারী, অরবিন্দ পাঠমন্দিরে আর এক সভায়ও কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মণিমোহন বসু। তিনি ভারতীয়দের রচিত ইংরেজি কবিতার উপর একটি দীর্ঘ আলোচনা করে বলেন—"ভারতীয়দের রচিত ইংরেজি কবিতার বৈশিষ্ট্য ইংরেজের অনুকরণে লেখার জন্য নয়, ভারতীয় চেতনায় আলোকে কাব্য রচনার জন্যই।" ডঃ ভি, কে, গোকাকও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনোমোহনের জীবনে অরবিন্দের দর্শনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। মনোমোহন হলেন অরবিন্দের অগ্রজ। মনোমোহন যখন লণ্ডনে ছিলেন, তখন মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তাঁর জীবনে এই পরিবর্তন আসে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল ভারতীয়দের রচিত ইংরেজি কবিতার পাঠ। তরু দত্ত, মনোমোহন, অরবিন্দ, সরোজিনী নাইডু, হারীন চট্টোপাধ্যায়, ডোম মোরেস প্রমুখের কবিতা পাঠ করে শোনান কাজল সেনগুপ্ত, মিতা চক্রবর্তী, মধুচ্ছন্দা বসু, অসিত গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য ও মিতা চৌধুরী।

কলকাতা যে ভারতের সাহিত্যতীর্থ, সে বিষয়ে বোধকরি সকলেই একমত হবেন। কেবল বাঙালী সাহিত্যিকদের নিয়েই নয়, ভারতীয় ও অ-ভারতীয় লেখকদের লেখার উপর আলোচনা বা অনুষ্ঠান এখানে যত হয়, তার একাংশও অন্যান্য স্থানে হয় না। শেক্সপীয়রের ৪০০তম জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানটির কথা এখনও মনে পড়ে। এত সুন্দর অনুষ্ঠান ইংলণ্ডের বাইরে আর কোথাও হয়নি। অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথের প্রতি একমাত্র এই শহরেই দুটি সভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। গালিবের মৃত্যুশতবার্ষিকীও এখানে পালিত হবে। কথাগুলো মনে পড়ল, ওয়াল্ট হুইটম্যানের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে। গত ১৪ জানুয়ারী থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত কলকাতার আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ৩-৩০ মিঃ ইউ-এস-আই-এস এর সাংস্কৃতিক অধিকর্তা মিঃ রবার্ট জে, বয়লান এর উদ্বোধন করেন। আলোচনা চক্র, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে এই স্মরণানুষ্ঠান পালিত হয়।

গত ২৩ ডিসেম্বর লেখক অধ্যাপক বিভূপদ কীর্তি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। হার্ভার্ড আকাদমি অব ইংলিশের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষির জীবনী ও তিব্বতের প্রাণপুরুষ 'মিলারেপার' জীবনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জব্বলপুরের 'বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের' উদ্যোগও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে বসে বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির এঁরা যেভাবে সেবা করে যাচ্ছেন, তার জন্য সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন বলেই আশা করা যায়। গত ১ নভেম্বর এই আসরের একটি মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীদুর্গাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন রাধাগোবিন্দ সেনগুপ্ত, শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প পাঠ করেন হেনা হালদার, অশ্রু রায় ও সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ পাঠ করেন ডাঃ অশোককুমার গুপ্ত ও সুমিতা দত্ত। অন্যান্য রচনা পাঠ করেন ইন্দুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা দত্ত, ডলি রায় ও ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক কুসুমবিহারী চৌধুরী বাইরে থেকে আসা প্রশংসাপত্র পাঠ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দক্ষিণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় গান্ধিজি সম্পর্কে একটি নাটক রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে ৪,৫০০ ডলার।

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগ এবং গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে এ বছর ২ অকটোবর যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এই নাট্যরচনা প্রতিযোগিতা তার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

যে কোন দেশের নাট্যকার এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তবে নাটকের পাণ্ডুলিপি ইংরেজীতে হওয়া চাই। আর একটি শর্ত এই যে নাটকটি প্রকাশিত হয়ে থাকলে বা পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয়ে থাকলে প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

নীচের ঠিকানায় এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে :

আর্চিবল্ড ম্যাকলাউড, চেয়ারম্যান, থিয়েটার ডিপার্টমেন্ট, সাদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটি, কারবনডেল, ইলিনয়, ইউ এস এ, ৬২৯০১।

প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৯৬৯ সালের ১ আগস্ট। ২ অকটোবর বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।

বিচারকের আসনে থাকবেন বিশিষ্ট মঞ্চ ও চলচ্চিত্র প্রযোজক ও নাট্যকার ডোরে শ্যারী, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতবিজ্ঞানের অধ্যাপক আস্টিশের লোবো, গান্ধিজি সম্পর্কে লেখক ও দক্ষিণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যমঞ্চ বিষয়ের অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান এইচ মো এবং ব্রিটিশ প্রযোজক, পরিচালক ও ভারতবিদ পণ্ডিত হারবার্ট মার্শাল।

আকাশ পর্যটনের স্বপ্ন মানুষের মনে দীর্ঘকাল নানা অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করেছে। সেই আদিকাল থেকে মানুষ জয় করতে চেয়েছে নক্ষত্রলোকের ব্যবধান। সম্প্রতি রাসেল ফ্রিডম্যান টু থাউজেণ্ড ইয়ার্স অব স্পেস ট্রাভেল গ্রন্থে মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বহু কাহিনী শুনিয়েছেন মনোরম ভাষায়। বিভিন্ন সময়ে মানুষ কিভাবে আকাশ জয়ের কথা ভেবেছে তার সুন্দর পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মানুষের নানা কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অলৌকিক কল্পনা ও অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাসের কথাও আলোচনা করেছেন।

রুশ সাহিত্যিক য়ুরি গেরমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন কিশোর বয়সে। মাত্র ষোল বৎসর বয়সের সময় তাঁর প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়। আর একুশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস। গোর্কি তাঁর লেখার খুব প্রশংসা করতেন। সম্প্রতি তাঁর 'আই অ্যানসার ফর এভরিথিং' নামে একটি উপন্যাস বেরিয়েছে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম- 'পুওর হেনরিক (১৯৩৪), আওয়ার একোইনটেন্স (১৯৩৪-৩৬), ইয়ং রাশিয়া (১৯৫২), ওয়ান ইয়ার (১৯৬০), দি স্টার এণ্ড দি ট্রু (১৯৬১) ইত্যাদি।

দেস অ্যান্ড জেন বার্টলেট-এর একটি মূল্যবান ছবির বইয়ের নাম গ্রোয়িং আপ উইথ অ্যানিমেলস। পশুপাখির ছবি সংগ্রহ ও ফটো তোলার ব্যাপারে লেখক একজন পৃথিবীখ্যাত মানুষ। আফ্রিকায় তাঁর ছোট মেয়ে শৈশবকালে যেসব বিচিত্র প্রাণীর ভাব ছিল তাদের বহু ছবি ছাপা হয়েছে এই বইতে।

সাত বছর অনুসন্ধান, পরিশ্রম গবেষণার পর দি র‍্যানডম হাউস ডিকশনার

জব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নামে একটি অভিধান রচিত হয়েছে সম্প্রতি। প্রকাশকের মতে, এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিধান হিসেবে একটি বইটির মর্যাদা পাবার যোগ্য। এক মিলিয়ন স্টার্লিং মুদ্রা ব্যয় করে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আছে প্রায় তিন লক্ষ শব্দের অর্থ ও পরিচয়, দু হাজার ছবি ও মানচিত্র, চারশ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট, ইংরেজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরিচয়, ও উল্লেখযোগ্য ফিচার।

জর্জ মার্টেলির কার্ড হার নেম উইথ প্রাইড নামে একটি গল্পসংকলন বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে। মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার পটভূমিতে প্রতিটি গল্পই লেখা। সমালোচকের মতে, প্রথম শ্রেণীর এই গল্পগুলিতে রয়েছে বীরত্ব, সাহস, ও অভিযানের নিপুণ আলেখ্য। প্রায় প্রতিটি গল্পই সচিত্র।

হংকংয়ের বাসিন্দা দুটি ছোট ছেলে-মেয়ের গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে লি ল্যান ফ্লাইজ দি ড্রাগন কাইট নামে বইটির কাহিনী। লিখেছেন রালফ হেরমানস। ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন এডমান্ড ব্রাণ্ডেন। বইটির পাতায় পাতায় ছবি। ছোট ছেলেমেয়েরা খুশি হবে বইটি হাতে পেলে।

ইন্দো-আমেরিকান প্রকাশকদের যুগ্ম উদ্যোগে প্রকাশিত মার্কিনী বইয়ের প্রদর্শনী হয়ে গেলো ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। ভারত সরকার কর্তৃক বইগুলি এদেশে প্রকাশ ও বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত। দামের দিক থেকে বইগুলি সুলভ মূল্যের। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের রেফারেন্স ও পাঠ্যবই হিসেবেই এগুলি পরিচিত। শিল্প, সাহিত্য, মানব-বিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানাধরনের বই দেখানো হয় প্রদর্শনীটিতে।

নিজেল বাকসটন সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন ভ্রমণপিপাসুদের জন্য। এগারোশ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থে ছুটি উপভোগের জন্য নানারকম আকর্ষণীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালে যে সকল সফল ভ্রমণের ঘটনা ঘটেছে তারও পরিচয় উল্লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বইটির নাম ট্রাভেল ১৯৬৮।

এ ধরনের আরেকটি বই লিখেছেন জা রবার্টসন। ভ্রমণের সংগে চাই উপযুক্ত খাদ্য এবং পানীয়। রবার্টসন তাঁর মেনু রিডার্স নামে একটি বইতে পর্যটকরা কোথায় কি ধরনের খাদ্য ও মদ্য পাবেন তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

সি, ডি, ক্রয়েসডেল লিখেছেন স্যান্ডস অ্যাক্রস দি সি নামে একটি মূল্যবান বই। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই বইটিতে পাওয়া যায় বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলের বর্ণনা ও পরিচয়। অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সেসব অঞ্চলের যে সকল পরিবর্তন হয়েছে তারও কথা বলা হয়েছে সুন্দরভাবে। বিশেষ করে, কোন অঞ্চলে কি ধরনের হোটেল, থাকা-খাওয়া এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা আছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভ্রমণপিপাসুদের জন্য এ বইটিও মূল্যবান।

মেয়েদের জীবনে পনেরো এবং ষোল— এই দুটি বছর একটি বয়ঃসন্ধির সময়। বালিকা বয়সের স্বাভাবিকতা এ সময়ে অনেকটা হারিয়ে গিয়ে যৌবনের উত্তাপ স্পর্শ করে। ম্যারী গ্রীভ সম্প্রতি তাঁর সম্পাদিত দুটি গ্রন্থে এ বয়সের কিশোরী মেয়েদের নানা সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বই দুটির নাম, যথাক্রমে—ফিফটিন ও সিক্সটিন।

ফরাসী খানাপিনার খবরাখবর জানতে হলে এইচ, পি, পেলাপ্রাত-এর লা আর্ট কালিনেয়ার মডার্নে বইটি অবশ্যই পড়তে হবে। পৃথিবীর পাঁচটি সমৃদ্ধ ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে। এবং বিক্রী হয়েছে নয় কোটির ওপর। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে রান্না করার যেসব নিয়মকানুন প্রচলিত তার মধ্যে প্রায় তিন হাজার রন্ধনপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায় এই বইটিতে।

বই পাড়ায়

সত্যি বলতে কি, শিল্পের বিচারে উন্নতমানের উপন্যাস বা গল্পগ্রন্থ আজকাল খুব কমই প্রকাশিত হচ্ছে। উপন্যাসের একঘেয়েমি দূরীকরণের জন্য বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নতুনত্বের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করছেন। ভালো উপন্যাসের অভাবে পাঠকেরা আজকাল নানা জাতীয় রচনার প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন। এইসব রচনার মুখ্য উপাদান রাজনীতি এবং নানা রোমহর্ষক ঘটনা। এইসবের সাহিত্য মূল্য সামান্য, কিন্তু সাময়িক তৃপ্তি ও নানা তথ্য লাভের জন্য পাঠকদের কাছে এইসব বইয়ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হালে প্রকাশিত এই ধরণের কয়েকটি বিশিষ্ট বইয়ের কথা এবারে আলোচনা করছি।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে সালজারের ঘাতকরা যে লুণ্ঠন, রক্তপাত আর অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়েছে এক ভিয়েৎনাম ছাড়া সারা বিশ্বে তার বুঝি আর নজির নেই। ভিয়েৎনামের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস পঁচিশ বছরের আর অ্যাঙ্গোলার কয়েকশ বছরের। তাদের এই সংগ্রাম পর্তুগীজ শাসকের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ লক্ষ অ্যাঙ্গোলাবাসীর সে-সংগ্রাম আত্মত্যাগ আর অনমনীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁদের কথা পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় ভিয়েৎকংদের কথা, বাংলার সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন প্রমুখের কথা। অ্যাঙ্গোলার বিপ্লবের নায়ক হোল্ডেন রবার্টো বলেছেন, যতদিন না অ্যাঙ্গোলা থেকে প্রতিটি পর্তুগীজ বিতাড়িত হচ্ছে, ততদিন আমাদের এই লড়াই থামবে না। অ্যাঙ্গোলা-বাসীদের সেই লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন বরুণ রায় তাঁর 'অ্যাঙ্গোলা : আফ্রিকার ভিয়েৎনাম' গ্রন্থে। বইটি তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুখপাঠ্য।

ভারতে আজকে যে অস্থিরতা তার কারণ এবং তা নিরসন করার পথ নির্দেশ করেছেন অম্লান দত্ত তাঁর 'প্রগতির পথে' গ্রন্থে। বইটি একটু স্বতন্ত্র গোত্রের। চতুর্থ নির্বাচনের পর ভারতবর্ষ এক অদ্ভুত মান সিকতায় ভুগছে। নানা মতবাদের নানা রকম কৌশলী ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক দলগুলির আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা রকম অপপ্রচারই এই অস্থিরতার কারণ। এই অস্থিরতার ফলে সমগ্র দেশ এবং জাতি প্রগতির দিক থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। লেখকের মতে, হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষের আশু কর্তব্য হচ্ছে, অস্থিরতার প্রশ্রয় না দিয়ে স্থিরবুদ্ধি দিয়ে উন্নতির পথটি আবিষ্কার এবং অনুসরণ করা। আর তার জন্য প্রয়োজন আমাদের দেশের উন্নতির মূলে শর্তগুলি নিয়ে ব্যাপক এবং সতর্ক আলোচনা করা। গ্রন্থের প্রতিটি নিবন্ধই যুক্তি-নির্ভর এবং তথ্য-সমৃদ্ধ।

সব শেষে যে বইটি নিয়ে আলোচনা করছি তাতে রাজনীতির নামগন্ধ নেই, খেলাধুলা সম্পর্কিত। আমাদের দেশে খেলাধুলা সম্পর্কিত শিক্ষনীয় গ্রন্থের অভাব খুবই। যা বেরিয়েছে তার বেশির ভাগই খেলা বা খেলোয়াড়দের নানান কথা নিয়ে। এদিক থেকে মতি নন্দীর 'ক্রিকেটের আইন-কানুন' সেই অভাব খানিকটা দূর করবে। ক্রিকেট-শিক্ষার্থীদের পক্ষে বইটি বিশেষ মূল্যবান। এই গ্রন্থে ক্রিকেট খেলার মূলে আন্তর্জাতিক আইন এবং প্রত্যেকটি আইন সম্বন্ধে নানা মন্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বোঝবার সুবিধার জন্য অনেক নকসা এতে এঁকে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে ক্রিকেট আইনের বিবর্তনের ইতিহাস।

সরকারী লটারী

সরকার যখন লটারি খেলার প্রচলন করেন তখন নিশ্চয়ই সেটি মুনাফা লোটবার জন্য নয়। তার মধ্যে অবশ্যই একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। লটারি খেলা বলা যেতে পারে প্রকাশ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে 'লুটেরার' খেলা। কমের বদলে বেশী দেওয়ার এবং বেশী পাওয়ার ইচ্ছা। সরকারও এমনি 'লুটেরা' খেলার প্রচলন করে 'কিঞ্চিৎ' লোককে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চান। উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু যদি লাড্ডুর গুড় পিঁপড়েতে না খায়! সুতরাং দেখা যায় লটারি খেলায় সুরু অভাব থেকেই। 'টাকা নেই—টাকা চাই' এই চিন্তাই মানুষকে লটারি কিম্বা রেস অথবা জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত করে। আর তখনই মানুষ কম টাকার বিনিময়ে বেশী টাকার লোভে এইদিকে পা বাড়ায়। যদিও লটারি খেলায় জুয়া বা রেস খেলার অনুপাতে টাকাটা কম যায় এবং পাওয়ার ইচ্ছাটা বেশী থাকে।

সরকারী লটারি খেলার সবটাই জনস্বার্থে ব্যয়িত হবে এইটাই উদ্দেশ্য—অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না—থাকা উচিতও নয়। গভর্ণমেণ্ট যখন টাকার অভাবে দেশের কোন কাজ করতে বাধা পাচ্ছেন তখনই এটি প্রচলিত হচ্ছে (যদিও চিরস্থায়ী হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়)। তাই আমরা দেখি একালের মত সেকালেও টাকার অভাবে অনেক কাজ হতে পারছিল না।

সেকালের কলকাতার দুরবস্থা যখন চরমে তখন সরকারের তহবিলে টাকার অভাব প্রচুর। টাকার জন্য কলকাতার অবস্থার কোন পরিবর্তন করা যাচ্ছে না। পথঘাটগুলো সমস্তই কাঁচা আর ময়লা আবর্জনায় পূর্ণ, জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই নেই। নালা-নর্দমারও কোন সুরাহা হয়নি। এহেন অবস্থায় টাকা কি করে সংগ্রহ করা যাবে তাই নিয়ে সরকারী মহলে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। বোঝা গেল প্রশস্ত রাস্তা আর উপযুক্ত পয়ঃ-প্রণালীর ব্যবস্থা না হলে শহরের কোন স্থায়ী উন্নতিই সম্ভবপর নয়। এই কাজগুলি প্রচুর ব্যয়সাধ্য ছিল।

এ অবস্থায় ১৮০৩ খৃঃ বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আর অভাব-অভিযোগের কথা উল্লেখ করে কলকাতাবাসী ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে একটি শহর সংস্কারক কমিটি (টাউন ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি) গঠন করেছিলেন।

তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল, যে তিনি কলকাতাকে প্রাচ্যদেশের সবচেয়ে উন্নত শহর করবেন। সেই জন্যই তিনি শহরের ড্রেন, রাস্তা আর বাড়ীঘরের উন্নতির জন্যে এই ধরনের কয়েকটি কমিটি গঠন করেন। যদিও সব কল্পনা তার কার্যকালে সম্পূর্ণ হতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তী শাসনকর্তারা সেই আদর্শ অনুসরণ করে সাধ্য ও সুবিধা অনুসারে প্রত্যেকেই কলকাতা নগরীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। ফলে ১৯১১ খৃঃ পর্যন্ত কলকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানীর গৌরব অর্জন করেছিল। কারণ কলকাতা তখন ছিল পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর। লণ্ডনের পরেই কলকাতার স্থান। ১৯১২ খৃঃ থেকে কলকাতা মহানগরী বাংলা দেশের রাজধানী হয় এবং দিল্লীতে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

ঐ কমিটির ওপর কলকাতা শহরের প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধানের ভার দেওয়া হয়। ১৭৯৪ খৃঃ থেকে সাধারণের মধ্যে লটারি খেলার ব্যবস্থা ছিল। এই লটারি থেকে সংগৃহীত অর্থের এক দশমাংশ কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হত। যতদিন পর্যন্ত শহর সংস্কারক কমিটির অস্তিত্ব ছিল ততদিন পর্যন্ত লটারির টাকা ঐ কমিটির হাতে দেওয়া হত। ১৭৯৫ খৃঃ লটারির টাকায় একটি 'দাতব্য ভাণ্ডার' খোলা হয়—সাধারণতঃ আনন্দ এবং উৎসবের দিনে গরীব খৃষ্টানদের মধ্যে এই টাকা বিলানো হত। ১৮০৯ খৃঃ ২ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় বিরাট আকারের লটারি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'প্রায় তিন লক্ষ টাকার মত পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা।

লটারি কমিটি যখন দেখলেন, এইভাবে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে সমস্যা জর্জরিত শহর কলকাতাকে সুন্দর করা সম্ভব তখন নতুন উদ্যমে সরকারী ব্যবস্থাপনায় লটারি খেলার প্রচলন হয়। '১৮১৪ খৃঃ কলকাতা অধিবাসীদের অর্থে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্তমান টাউন হল নির্মিত হয়। পর বৎসর আরও ৪০,০০০ টাকার ব্যয়ে কিছু পরিবর্তন করা হয়। উল্লিখিত অর্থের মধ্যে পাঁচ লক্ষ সিক্কা টাকা লটারির দ্বারা তোলা হয়। এই লটারির জন্য ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন।' ১৮১৭ সালে একটি নতুন লটারি কমিটি গঠন করা হয়। এবং সেই থেকে ২০ বছরের জন্য শহর সংস্কারের ভার এই কমিটি গ্রহণ করে। ফলে এই সময় থেকেই কলকাতা শহরের প্রচুর উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

লটারি খেলার ফলে যে টাকা সংগৃহীত হয় তাতে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে টাউন হল ছাড়াও মারাঠা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বেলেঘাটার খাল কাটা হয়। এছাড়া স্ট্র্যান্ড রোড (প্রিন্সেপ ঘাট থেকে হাটখোলা পর্যন্ত), উড স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, হেস্টিংস স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, ময়রা স্ট্রীট, লাউডন স্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট, মির্জাপুর স্ট্রীট কলুটোলা স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট প্রভৃতি বড় বড় রাস্তা তৈরী হয়। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটকে এই সময় চওড়া ও সোজা করা হয়। এই সব কাজে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচ পড়েছিল।

সাধারণ মানুষদের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি পুকুরও কাটা হয় বা কিছু কিছু সংস্কার করা হয়। এই সমস্ত পুকুর থেকে শহরবাসীদের পানীয় জল সরবরাহ করা হত। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ওয়েলেসলি স্কোয়ার, মির্জাপুর, সুতিবাগান ও সর্টবাজারে এই পুকুরগুলি কাটা হয়েছিল।

১৮২০ খৃঃ একটি ছোট পাম্প চাঁদপাল ঘাটে বসানো হয়। ঐ পাম্প দিয়ে গঙ্গার জল তুলে এনে রাস্তার পাশে খোলা পাকা ড্রেন দিয়ে ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, চিৎপুর রোড, লালবাজার ও বৌবাজারে সরবরাহ হত। লোকে ড্রেন থেকে জল তুলে নিয়ে যেত কলসী করে। প্রত্যেক বছরই ২৫,০০০ হাজার টাকা খরচ করে কাঁচা রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা হয় আর রাস্তার ধুলো ওড়া বন্ধ করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রথমে মশকে করে ভিস্তি দিয়ে রাস্তায় জল দেওয়া হত। পরে গরুর গাড়িতে করে জল দেওয়া সুরু হয়।

'মেডিক্যাল কলেজ ভবন লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৪ (১৮৩৫ ?) খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং পর বৎসর নির্মাণ কার্য শেষ হয়। হাসপাতাল পরে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ও নূতন জ্বরের হাসপাতালের ও লটারি কমিটির তহবিলের বাকি টাকা ও রাজা প্রতাপ সিংহের ৫০,০০০ টাকা চাঁদা হইতে প্রধানতঃ নির্মিত হয়।'

এইভাবে যখন লটারির টাকার কলকাতার নানাবিধ সমস্যা সমাধানের পথে ঠিক তখনই বিলেত থেকে লটারি রূপে টাকা ওঠানো নিন্দনীয় ব্যাপার বলে মন্তব্য ওঠে। ফলে ১৮৩৬ খৃঃ লটারি কমিটি ভেঙে দিয়ে লটারি খেলা উঠিয়ে দেওয়া হয়।

অসময়

শান্তি লাহিড়ী

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে আজ পনের বছর পরে সমরেশের হঠাৎ মনে হল ফুলশয্যায় বৌকে যেমন করে আদর করা উচিত ছিল তেমন করে আদর করা হয়নি।

ফুলশয্যায় আঠারো বছরের রিণা এখন তেত্রিশ। সমরেশ পঁয়তাল্লিশ ডিঙোতে চলেছে। রিণার তুলনায় সমরেশ একটু বেশী বয়সী, অন্যান্য আর পাঁচজন দম্পতির তুলনায় অন্তত। ধীর শান্ত সমরেশ আজ রাত্রে একা ঘরে নিঃসঙ্গ বিছানায় যখন বালিশে মাথা রাখল তখন ওর নিজেকে আরো ধীর আরো শান্ত মনে হল। আবার মনে হল সেদিন ত্রিশের উন্মাদনায় যাকে অত্যন্ত নম্রতায় আহ্লাদে মাথায় তুলে নিয়েছিল, তাকে উত্তেজনায় পৌরুষে যদি পাগল করে রাখতে পারত তবে এমন হত না, এমনটি ঘটত না। ফুলশয্যার রাত্রে নানা গন্ধ, নানান আলোর সমারোহে রিণা নিঃশেষ হতে চেয়েছিল, ফুরিয়ে যেতে চেয়েছিল। রিণা চেয়েছিল সমরেশের বুকের আড়ালে বিপুল পৃথিবী, তার মাথায় প্রণামের আর্তি নয়। আজ সেই কথাই সমরেশের মনে হল।

কিন্তু ঘুম এল না। দেয়ালের ছবিতে রিণা, আয়নার কাচের ভিতরে রিণা, আলনার ব্লাউজে-শাড়িতে রিণা। রেডিওর ঢাকনায় রিণা, ঘরের কোনে দাঁড় করানো তারছেঁড়া ধুলোমাখা তানপুরায় রিণা। রিণা-রিণা-রিণা। সমরেশের মনে হল রিণা বাঁচুক আর নাই বাঁচুক সমরেশের মৃত্যু অনিবার্য। একা ঘরে, শূন্যঘরে, সমরেশের খুব কান্না পেল। সামনে কেউ না থাকলে একা একা কাঁদতেও খুব একটা ভালো লাগে না বলে সমরেশ কাঁদল না। টাইমপিসের শব্দ খুব সাবধানভাবে সময় অতিক্রম করে চলছে ধীরে ধীরে। বিছানা থেকে নামল সমরেশ।

শেষ পর্যন্ত রিণা ধরা পড়ল। সমরেশ এইবার কেঁদে উঠল হাউ হাউ করে। তারপর এক সময় খেয়াল হতেই ব্রেক কষে গাড়ী যেমন থামে, তেমনি থেমে গেল। গলার মধ্যে কণ্ঠের ভিতরে একটা ক' শব্দ উঠল। সমরেশ আবার ফিরে গেল বিছানায়।

কিন্তু সে রাতে কিছুতেই ঘুম এলো না। ঘুম আসতে পারে না সমরেশের।

ভোরের কিছু আগে সমরেশ দরজার খিল খুলল। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে থেকে দরজার পাল্লা টেনে দিয়ে ডান দিক ধরে এগিয়ে গেল।

বিয়ের রাত্রে বৌকে কাছে পেয়েছিল সমরেশ। সব বিবাহিতরা প্রথম রাত্রেই

...াকে কাছে পায় না, সমরেশ পেয়েছিল। কিন্তু অন্যান্যরা না পেলেও টেনে কেড়ে নিতে পারে, সমরেশ পেয়েও নিতে পারেনি। রিণাকে ডাকতে হয়নি। একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পরেই রিণা বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, আমাকে আদর করছ না যে?

—সমরেশ বিয়ের আগেই শুনেছিল রিণাদের বাপেরবাড়ীর পাশের বাসার একটি ছেলের কাছ থেকে। সমরেশের অফিসেই সে কাজ করে। বলেছিল, তুই সেই বিয়ে-পাগলা মেয়েটাকে বিয়ে করছিস। আরে, ও আমাদের পাড়ার তিন ডজন ছেলেকে বিয়ে করবে বলে চিঠি লিখেছে। কিন্তু সমরেশ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়ী ফিরে আপন মনে একটা অজ্ঞ গন্ধে বিভোর হয়েছিল। বিয়েই যদি করতে হয় তবে বিয়ে-পাগলা মেয়েই সবচেয়ে ভালো। কারণ, সে সত্যি বিয়ে করতে চেয়েছিল।

আমাকে আদর করছ না যে?

সমরেশ রিণাকে আদর করেছিল। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, তুমি এমন সুন্দর দেখতে! তবে কেন বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলে?

ওরা বুঝি বলেছে? রিণা ওরা অর্থে কাদের কথা বলেছিল সমরেশ বুঝতে পারেনি। শুধু বলেছিল, ওদের কথায় আমার কিছু যায় আসে না, শুধুই ভাবছি তোমার পাগলামি কমেছে কি না?

সমরেশ রিণার ঠোঁটে একটা চুমু খেয়েছিল। খেতে গিয়ে দ্বিধায়-বিহ্বল হয়েছিল ভাবতে চেয়েছিল চুমু কেন খেলাম। রিণাকে এখনই চুমু খাওয়া যায় কিনা। কিন্তু রিণা সমরেশকে ভাববার কোন সুযোগ দেয়নি। একের বদলে একশোটাই হবে বোধহয়—সমরেশ রক্তিম হওয় হয়ে শেষে হয়ত ঘুরে গিয়েছিল... শেষ পর্যন্ত রিণা যখন সমরেশকে নিঃশ্বাসে বন্ধ করে জড়িয়ে ধরেছিল, তখন সমরেশ কেঁদেও ফেলেছিল। সমরেশের মনে হয়েছিল, তার এই বিবাহ-পূর্ব জীবনের অভিলাষ এত দ্রুত, এত অপ্রস্তুতভাবে খোয়ানো বোধহয় ভালো হল না।

রিণা তখন চোখ বুজে ছিল।

সমরেশের উত্তাপ ছিল না... তা নয়, কিন্তু দাহ ছিল না। সমরেশ রিণাকে আকণ্ঠ পান করতে চায়নি, সমস্ত জীবন দিয়ে তার সকল বোধের সঙ্গে একাত্ম করে দিতে চেয়েছিল। আর রিণা? সমরেশের মনে হয় রিণা চেয়েছিল এক লহমায় সর্বাকিছু ফুরিয়ে ফেলতে। বিসর্জনের মধ্যে মুহূর্তে যেমন একটি মূর্তি জলের অতলে ডুবে যায়, হারিয়ে যায় তার বেশ কিছুদিনের আয়োজন আর আনন্দ, রিণা চেয়েছিল তেমনিভাবে। হয়তো মুঠোয় যা আছে সমস্ত জীবনের পাথেয়, তা এক দিনের উত্তেজনায় উড়িয়ে দিতে। সমরেশ কেন রিণার মত হতে পারে নি? তাহলে সমরেশ কি ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবেসেছিল? রিণাকে ঘিরে যে নতুন একটা পৃথিবী অন্ধকার থেকে আলোয় দিকে এগিয়ে চলেছিল সমরেশ অনুধাবন করেছিল তাকে। তার দায়িত্বের কথা ভেবে সে তাই চটুল হতে পারে নি। চপল হবার চেয়ে সে এই সব কিছু, এই দিনগুলি এবং আগামীকালের সফল দিনগুলি সমেত একটি নিটোল অস্তিত্বে বাঁধা পড়তে চেয়েছিল।

কিন্তু এক গভীর অতলে সমরেশের যে উত্তাপ, যে চেতনা ঋষির মত ধ্যান করত সেখানে, সেই যৌবনের বাস্তব চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে সমরেশও আর পাঁচজনের একজন হতে ভালো বাসত। কিন্তু চেষ্টা করে, বার বার চেষ্টা করেও সে তা হতে পারত না। ট্রামে-বাসে রাস্তায় রেস্তোরাঁয়, কত যুবক-যুবতীর উদ্বেল হৃদয়াবেগ সমরেশকে অভিভূত করে তুলত, কিন্তু নিজের জীবনে তার কোন সম্ভাবনা সে দেখতে পেত না বলে দুঃখিত ছিল। রিণা একদিন পথ চলতে চলতে হাত ধরে ফেলেছিল সমরেশের। ওর বেশ মনে পড়ে, বিদ্যুৎ-পৃষ্ঠের মত সে হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সমরেশের আচমকা এগিয়ে যাওয়ায় সেদিন রিণা হাসি চাপতে পারেনি। ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসাতেই ওর এমনি একটা অস্বস্তি। ওর এই ব্যবহারগুলি রিণার কৌতুক করবার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

সমরেশের মনে হয় রিণা বুঝি শেষ পর্যন্ত ওকে নিয়ে কৌতুকই করেছিল। কারণ, বিয়ের এক বছরের মধ্যে রিণা যে আচরণ শুরু করেছিল, সমরেশ সেগুলোকে তার জীবনের চরম কৌতুক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। কারণ সমরেশ এটা বোঝে যে তার যাতে প্রয়োজন নেই, আনন্দও নেই, অন্যের তাতে প্রয়োজনও থাকতে পারে। আর তা তার আনন্দের কারণও হতে পারে, কিন্তু মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। যে জিনিস মানুষের হাতের মুঠো উপচে পড়ে, একটু মন দিলে যত্ন করলে যাকে পাওয়া যায়, তার জন্য সে অহেতুক শ্রম আর যন্ত্রণা মাথায় নেয় কেন?

হ্যাঁ, রিণার কথাই, রিণার ভাবনাই সমরেশের একমাত্র সমস্যা এখন। ভাবতে ভাবতে রিণা একসময় সমরেশের কাছ থেকে হাতের নাগাল ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায়। ভাবনার দোলায় এক এক সময় একেবারে সমরেশের লোমশ বুকের মধ্যে চলে আসে, যেখানে এলে রিণাকে আর দেখা যায় না।

সেদিন রিণা বলছিল, বিমলকে তো তুমি চেনই। আজকাল ও আসায় তবু দুপুরটা একটু কাটে গল্প কোরে আর বই পড়ে।

বই পড়তে আবার বিমলকে লাগে নাকি?

না, না, মানে ওই আমার পছন্দমত বই-গুলো ঠিক বেছে নিয়ে আসে লাইব্রেরি থেকে কিনা!

ওঃ! সমরেশ কিছু না ভেবেই অন্যমনস্ক হয়েছিল। রাত্রে রিণা যখন কাছে এল, তখন হঠাৎ সমরেশের ফের নিজেকে সমরেশ বলে মনে হল না। একবার চোখ বুঝতে চাইল, কিন্তু রিণা চোখ বুঝতে দিল না, সমরেশ বিছানায় উঠে বসতে চাইল কিন্তু রিণা ওকে বসতে দিল না। সমরেশ দেখতে দেখতে বিমল বা সত্যেন বা অজয়ের দলের কেউ একজন হয়ে দাঁড়াল। রিণাকে বিব্রত করল, বিরক্ত করল, তারপর সময়ের স্রোতে অল্পক্ষণের মধ্যে আপন মনে ভাবতে ভাবতে মনে হল রিণার প্রেমে এখন ভাঁটা চলেছে। যে সময় বয়ে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার। সমরেশ নিজের বুকে হাত দিয়ে অনুভব করল সে আর সমরেশ নেই। আলো জ্বালিয়ে মশারীর মধ্যে রিণাকে দেখল কয়েকবার, তারপর চোরের মত, না-না চোরের মত না দস্যুর মত রিণার গায়ে ঝাঁকুনি দিয়েছিল। কিন্তু কেন অমন করেছিল, তা সে জানে না।

তারপর থেকে বিমলকে আর মনে রাখে না সমরেশ। বাইশ বছরের বিমল সমরেশকে ভক্তি করে, ভয়ও করে, সমরেশ সেটা টের পায়। রিণা বিমলের উপস্থিতিতে পুলকিত হয়, রক্তিম হয়, সমরেশ সেটাও টের পায়। তারপর দুপুরের গল্প আর লাইব্রেরির বই-এর আড়ালে রিণা আর বিমল অনিবার্য নৈকট্যে এসে পড়ল একদিন। বিমল টের পেল তা দেখল। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। সমরেশ বুঝল, বিমল এখন রিণার সন্ধ্যারও সঙ্গী। কিন্তু এ কেমন করে হল? সমরেশ চোখ দিয়ে দেখে চোখ দিয়ে বিশ্বাস করে, কিন্তু মনের বিশ্বাস নেই। সমরেশ মানতে পারে না, বিশ্বাস করতে চায় না, বিমলের এই বুকের মধ্যে রিণার অস্তিত্ব-বোধ-যৌবন ভাঙতে ভাঙতে কেমন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে রিণা কিছু বলেনি

কোনদিন, কিন্তু সমরেশ বুঝতে পেরেছে যে রিণা নিশ্চয় নিশ্চয় যে সমরেশ বিমল সংক্রান্ত সকল বিষয়েই ওয়াকিবহাল।

সমরেশ পাল্টাতে লাগল নিজেকে। অফিসের কাজের মধ্যে, বাইরের আর পাঁচটা কাজের মধ্যে রিণা ভেসে আসে ওর কাছে। সমরেশ ছটফট করে। যতই রিণা সম্পর্কে বিভিন্ন নোংরা চিন্তা তাকে ঘিরে ধরতে লাগল সে যেন রিণার মধ্যেই ফিরে আশ্রয় চাইল এইসব আক্রমণ থেকে। রিণার ওপর রাগ করে, ঘৃণা করে রিণার বুকের সান্ত্বনা খুঁজতে হবে সমরেশকে। কখনো মনে হয়, বাড়ী চলে যায়, দুটো কথা বলে, দুদণ্ড গল্প করে। কিন্তু ভয় পায় সমরেশ। গিয়ে যদি রিণাকে অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখে! সমরেশ মনের দিক থেকে পিছিয়ে আসে। অবোধ কষ্ট হাড়ের মধ্যে ঘুর ঘুর করে ঘুরতে থাকে। ও তখন বিশাল কলকাতায় নিজের জায়গা খোঁজে। বার, হোটেল, বা আরো অনেক কিছু—এসবে সমরেশ এক-এক সময় তাগিদ বোধ করে না, তেমন নয়, কিন্তু ঠিক যে কারণে রিণাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারেনি, যে কারণে বিমলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নি, ঠিক সেই কারণেই বারে বা অন্য কোথাও যায়নি। কি হবে গিয়ে? দ্রুত নিঃশেষ করলে ফুরিয়ে ফেললে চলবে না। ওকে তিল তিল করে অনুভব করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, এবং গোটা জীবনটার একটি মাত্র অস্তিত্বের সফলতা খুঁজতে হবে।

সব কিছুকে যেমন উড়িয়ে দিতে চায়, সেদিন রাত্রের ঘটনাও তেমনি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সমরেশ। অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল সরকারী পক্ষে আদালতের সাক্ষী হয়ে। কথা ছিল সেদিন ফিরবে না। ওপারের মাসীমা মানে এক বয়স্কা ভাড়াটে রিণার কাছে থাকবে। কিন্তু শেষ ট্রেনে ফিরে এসেছে সমরেশ। ফিরে আসতে চায়নি, মন থেকেই বার বার দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ভেবেছিল আজ রাত্রে ফেরা বোধহয় হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যান্যদের অনুরোধে সমরেশও ফিরে এসেছে।

ভয় ছিল সমরেশের। মনের মধ্যে একটা পরিচিত ভয় পদচারণা করছিল ট্রেনে ওঠার সময় থেকেই। বাড়ীর সামনে এসে পাথর হয়ে গেল সে। একটা বেদনা গলা পর্যন্ত উঠে আসে। তারপর দম বন্ধ হয়ে আসে তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘরের মধ্যে ওদের কথা শোনে। ওরা দুজন। তারপর ওখান থেকে টাল সামলাতে সামলাতে সরে আসে সমরেশ। নেমে যায় রাস্তায়।

কতক্ষণ ঘুরে বেরিয়েছে পথে পথে ঠিক জানে না, তারপর বাড়ীর দরজার সামনে মূর্তির মত—যেন সমরেশের মৃত্যুর পরে তারই ব্রোঞ্জমূর্তি ওর স্মৃতি রক্ষা করছে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যখন তার মনে হল সে মরে যাবে তখনই গিয়ে কড়া নাড়ল।

চোখ মুছতে মুছতে রিণা উঠে এল দরজা খুলতে। সমরেশ স্বাভাবিক, যতটা স্বাভাবিক হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব, ততটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। যেন এই মাত্র ধ্বসে যাওয়া প্রাসাদের পরেও সে একটা পাতার ছাউনি অন্তত তুলতে পারে।

তারপরেও আরও কথা থেকে যায়। সমরেশ ক্রমশ একদিকে রিণার প্রতি যেমন দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে তেমনি সে অনুভব করে অন্যদিক থেকে একটা গ্রন্থি যেন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। এখন সমরেশের সঙ্কোচ হয় না। এখন সমরেশের লজ্জা করে না। সমস্ত দিনের স্পন্দন দুঃখ রাত্রের গভীর অন্ধকারে আড়াল হয়ে যায়।

সমরেশ আর রিণার দিন কাটে এমনি করে। অথচ সমরেশ সেদিন রাত্রের পরে আরও বেশী সজাগ হয়েছে। আরও বেশী আন্তরিক হয়েছে রিণার প্রতি। উদাসীন থাকতে চেয়েছে সবকিছু থেকে। আর রিণা? মনে হয় যেন নিছক প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি দিনের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

শেষ ঘটনাটা যেদিন ঘটল সেদিন সকাল থেকেই সমরেশ খুব ব্যস্ত ছিল ওর অফিসের কাজ নিয়ে। দুপুরের দিকে রিণা একবার ফোন করেছিল অফিসে, এখন অবসর আছে কিনা সমরেশের। যদি অবসর থাকে তবে আজ একটা সিনেমায় যাবে ওরা। ব্যাকুল হয়ে উঠলেও উপায় ছিল না সমরেশের। অফিস থেকে দুপুরে বেরোনোর কোন পথ ছিলনা সেদিন। ফোন ছেড়ে দিয়ে সমরেশের মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চেয়ারে বসে কাজে আর মন দিতে পারেনি। একটা অস্থিরতার ক্ষীণ যন্ত্রণা ওকে বার বার ওঠ-বস করাতে লাগল। পরতাল্লিশের সমরেশ ছিটকে পনের বছর পিছনে চলে গেল পলকে। সেই অষ্টাদশী রিণা—চোখের সামনে ভেসে উঠল বাসরের ফুলেভরা বিছানা। রিণার সুসজ্জিত দেহ, সমরেশের সেই দেহভরা চেতনা। সমরেশ চেয়ারে বসতে পারল না। ক্রমশ চেয়ারটা দুলতে লাগল, জরুরী ফাইলগুলো দেখতে দেখতে অর্থহীন হয়ে উঠল। দেহে হাত বুলোতে গিয়ে দেহের স্থূলতায় একবার সম্বিৎ ফিরে পেল, পরক্ষণেই সম্মোহনে ডুবে গেল। সামনে যে রূপসী স্টেনোগ্রাফার বসে পেন্সিলের উল্টো দিক দাঁতে কাটছে তার সঙ্গে রিণাকে মনে মনে একবার কল্পনা করে নিল সমরেশ। তারপর আলমারীতে চাবি, ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করে, রূপসী স্টেনকে যখন খুশী বাড়ী চলে যাবার অনুমতি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প'য়তাল্লিশের সমরেশ আজ

[illegible] ফিরে গেছে। আজ আর সে [illegible] বাসে ফিরে ভাজে চলতে পারে না। আজ একটা ট্যাক্সী চাই অন্তত।

রিণা বলেছেন, সময়। চলতে চলতে সমরেশের মনে হল যেন জীবনে আরও কিছুর একটা প্রয়োজন ছিল। যৌবন, অর্থ, [illegible], [illegible], এসবের বাইরে একটা আলাদা কিছু প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন হল নিজেকে খুঁজে পাওয়া। সকলের জীবনে এই খুঁজে পাওয়া আছে কিনা সমরেশ জানে না, কিন্তু যদি কখনো কাউকে পথ চলতে বাদামের খোলা ছাড়িয়ে মুখে ফেলতে অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চৌরঙ্গীতে বিজ্ঞাপনের আলো-গুলো জ্বলতে নিবতে দেখেছে তখন ওর মনে হয়েছে সমরেশের জীবনে অন্তত এই বাদাম-খাওয়া অথবা নিয়নের জ্বলা-নেভা দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

ট্যাক্সিতে চলতে চলতে সমরেশের মনে হল এতো সে কোনদিন চায় নি। সে এতটুকু বাসা করেছিল আশা, অথচ কেমন করে যেন চোরাবালির প্রান্তরে ডুবতে বসেছে। একটা জটিল মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তের মধ্যে সে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

সমরেশ কি একটা কংকাল মাত্র? একটা মানুষের কাঠামো মাত্র? না না সমরেশ তা নয়। সে রিণার একমাত্র আশ্রয়, যার ওপর দাঁড়িয়ে রিণা তার জীবন কোরকের একটি একটি করে পাপড়ি মেলেছে। সমরেশ না থাকলে রিণা অর্থহীন অবাস্তব। সমরেশ না থাকলে রিণা কেউ নয়।
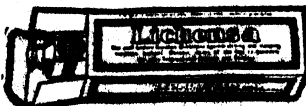
ট্যাক্সি অনেক দূরে চলে এসেছে। বাড়ী এখনও বেশ কিছু দূরে। দু দুটো বাঁক পেরোতে হবে। রিণা ডেকেছে পনের বছর পরে। সমরেশের মনে হল পনের বছর তো নয় যেন পনের যুগ। তবু তো রিণা ডেকেছে। ঘড়ি দেখল সমরেশ, দুপুরের সিনেমায় নাও যায় তবে আর কোথাও, আর কোনোখানে চলে যাবে ওরা দুজনে রাস্তার লোকারণ্যে, গংগার ধারে আউট্রাম ঘাটে। কিংবা ছুটে ট্যাক্সিতে সে আর রিণা একদিন রিণার হাত ধরে পথে চলতে পারে নি। আজ ধরবে। একদিন ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসতে পারে নি। আজ বসবে। একদিন সমসাময়িক যুবক-যুবতীদের মতো যা-যা করতে পারে নি আজ সমরেশ তাই তাই করবে। পিছনের সিটে বসেও ঝুঁকে ট্যাক্সির সামনের দিকের আয়নায় সমরেশের মুখ ভেসে উঠল, চোখে-মুখে হাত ঢাকল সমরেশ। সমসাময়িক বলতে যাঁদের বোঝাতে চাইছে সমরেশ, তারা এখন আর কেউ পথে-ঘাটে উছলে পড়ে না। কিংবা আজকের সমসাময়িক তারা কেউ সমরেশের মত বয়সী হয়ে যায় নি। পিছনের গদীতে মাথাটা হেলিয়ে দিল সমরেশ। তাহলে সর্বদিক থেকেই কি দেরী হয়ে গেল, এখন আর কোনমতেই রিণাকে ধরা যায় না? সত্যিই কি আজ অসময়?

কিন্তু বাড়ীর সামনে আসতেই সমরেশের চমক ভাঙল। অনেক লোকজন ওর বাড়ীর সামনে। কিছু লোক সমরেশের ঘরে। কোলাহল, চীৎকার, গালাগালি, ভয় আতংক সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা বিভীষিকা। সমরেশ ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এলো স্খলিত পায়ে। আজ সমরেশ এভাবে বাড়ী আসতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল রিণার নিশ্চল দেহ মেঝেয় লুটিয়ে রয়েছে। মুখে ফেনা। কে বা কারা যেন ওর মাথায় মুখে জল ঢেলেছে। লোকজন, কোলাহল, ট্যাক্সি, হাসপাতাল, তারপর আর কিছু ভাবতে পারে না সমরেশ, ভাবতে ভালো লাগে না।

হাসপাতালে যতক্ষণ ছিল পলকহীন চোখে রিণার ফ্যাকাশে মুখের দিকে কেন তাকিয়েছিল সমরেশ জানে না। হাসপাতাল থেকে ফিরতে অনেক রাত হল। ডাক্তার বলেছে রিস্ক নেই। বিষাক্ত ওষুধের শিশিটা সংগে করেই নিয়ে গিয়েছিল সমরেশ যাতে ডাক্তারের সুবিধে হয়। সুবিধেও হয়েছে। নো রিস্ক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সমরেশ। কিন্তু যদি রিণা না বাঁচত? হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল সমরেশ, ছি-ছি এসব কি ভাবছে সমরেশ। রিণা বাঁচবে, রিণা ওর বুকের ওপর পরম আস্থাতে বাঁচবে। লোকে হাসবে হাসুক, লোকেরা তো হাসবার জন্যই থাকে; ওরা কখনো কাঁদে না। লোকেদের কী?

বিশ্বাস করতে পারে না লোকেদের কথা। এই পনের বছর ধরে এবং আজ শেষবারের মত বিশ্বাস করতে চেয়েছিল সমরেশ যে রিণা খারাপ। কিন্তু কিছুতেই সে কথা সে মানতে পারল না। না, না অসম্ভব, রিণা যা রিণা তাই রিণা সমরেশের বৌ, রিণা একটি মেয়ে। রিণা এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে বড় হয়ে ওঠা একটা দেহ একটা মন। রিণা খারাপ নয়, রিণা শুধুমাত্রই দেহবাদী নয়। হাসপাতালের পথটা যেন দীর্ঘ মনে হল সমরেশের, যেন শেষ হতে চায় না। আবার মনে হল শেষ না হওয়াই ভাল। ফুরিয়ে গেলেই শূন্য ঘর, শূন্য শয্যা। রিণা নেই ঘরে, রিণা নেই সমরেশের নির্দিষ্ট আশ্রয়বিন্দুতে। আসলে বিশ্বাস করল না সমরেশ। কারণ বিশ্বাস করলেই ওর সেই পুরোনো মন্দিরের প্রবীণ ভিতটুকু ধ্বসে যাবে। এই পৃথিবীর মাটি, যার ওপর সে এই সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর বাস করছে তা এক নিমেষে সরে যাবে পায়ের তলা থেকে।

সবাই যা দেখেছে শুনেছে, সমরেশ সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলবে না। কেমন করে পাশের বাড়ির বন্ধুর সংগে রিণার ঘনিষ্ঠতা হল, কেমন করে তারই অন্য একটি মেয়ের প্রণয়ব্যাকুল সন্দিগ্ধ মন সে-কথা জানতে পারল এবং কেমন করে আজ বিকেলের নাটক অনায়াসে ঘটে গেল সে-কথা নিয়ে কিছুই ভাববে না সমরেশ। শুধু একটা কথাই ভাববে সে আজ রিণার ফোন করার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমরেশের ফিরে আসার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া। রিণা ঠিকই জানত সমরেশের পক্ষে অফিস থেকে এ-সময় আসা অসম্ভব, তবু রিণা আবদার করে ফোন করেছিল। দুঃখ হল সমরেশের। রিণা আর যাকে নিয়েই ভাবুক সমরেশকে নিয়ে না ভাবলেই পারত। পাগল, রিণা পাগল! সমরেশের বুকের ভিতরটা যেন একেবারে শুকিয়ে উঠেছে। রিণা এখন হাসপাতালে কে জানে ওর চেতনা আবার ফিরে এসেছে কিনা। সমরেশ চেয়েছিল দুটো কথা বলতে, কিন্তু ডাক্তার দেয় নি।

ফিরতি পথে নিজের বাড়িতে নয়, পাশের বাড়িতে গেল সমরেশ। বারান্দায় উঠে ডাকল নাম ধরে। বন্ধু বেরিয়ে এলো। সমরেশ তার মুখের দিকে তাকাল না, মুখোমুখি আবছা-ভোরের আলোআঁধারিতে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর যেন জোর করে, যেন তার সমস্ত শক্তি, একত্রিত করা শক্তি দিয়ে ঝড়ের মত নিজেকে সামনে ঠেলে দিয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, তুমি বলো রিণা কি সত্যি খারাপ? ওরা বলে। কিন্তু ওরা তো জানে না রিণাকে। আমি বিশ্বাস করি না ওদের তুমি বল, বল। —সমরেশ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে শিকড়হীন গাছের মত টলতে থাকে।

দেশে বিদেশে

তেলেঙ্গানায় আন্দোলন

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে চাকরীবাকরীতে স্থানীয় লোকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। সরকারী চাকরীতে, এমনকি বেসরকারী চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, এই নিয়ম বিভিন্ন রাজ্যে চালু আছে।

অন্ধ্র রাজ্যের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে যে আন্দোলন হয়ে গেল তার মূলেও একই ধরনের প্রশ্ন—'সনস অব দি সয়েল' অর্থাৎ স্থানীয় লোকদের (সেখানকার ভাষায় "মুল্কী"দের) চাকরীর অধিকার। কিন্তু তফাৎ এই যে, তেলেঙ্গানা ভারতবর্ষের আলাদা কোন রাজ্য নয়— একটি রাজ্যের অংশ—যার অর্থ হল, মুল্কীদের জন্য চাকরী সংরক্ষণের দাবী হচ্ছে আসলে রাজ্যের চেয়েও নিম্নতর স্তরের আঞ্চলিকতার দাবী।

এই দাবীর পিছনে অবশ্য ঐতিহাসিক কারণ আছে। তেলেঙ্গানার মানুষ যদিও অন্ধ্রের অবশিষ্ট অঞ্চলের মতই তেলেগু-ভাষী তথাপি এটা হচ্ছে অন্ধ্রের অনগ্রসর অঞ্চল। তের বছর আগে পর্যন্ত তেলেঙ্গানা এককালের নিজাম-শাসিত হায়দরাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অন্তর্ভুক্তি ঘটান হয়েছিল ১৯৫৫ সালের রাজ্যের পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা করে। যদিও তেলেগু-ভাষী অন্ধ্রের সঙ্গে তেলেঙ্গানার সংযুক্তির পক্ষে কমিশনের সামনে কয়েকটি জোরালো যুক্তি দেওয়া হয়েছিল তবুও তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের আকাঙ্ক্ষা মেনে নিয়ে কমিশন তেলেঙ্গানাকে হায়দরাবাদের মধ্যে রাখারই সুপারিশ করেছিলেন। তেলেগুভাষী রাজ্য গঠিত হওয়া তেলেঙ্গানাকে আলাদা রাখার যুক্তি নেই—এটাই ছিল কমিশনের সামনে তেলেঙ্গানার অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে প্রধান যুক্তি। তাছাড়াও একথা বলা হয়েছিল এই অন্তর্ভুক্তিতে তেলেঙ্গানার কয়লা ও বনসম্পদ এবং অন্ধ্রের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পরস্পরের সামগ্রিক উন্নতিতে সাহায্য করবে। অপরদিকে তেলেঙ্গানায় আশঙ্কা ছিল, অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে 'বড় ভাই' ছোট ভাইকে' শোষণ করবে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের, রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর 'বিশাল অন্ধ্র' গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু হল। সেই আন্দোলনে নয়াদিল্লী নীতি স্বীকার করল। আলাদা রাজ্য হিসাবে হায়দরাবাদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ১৯৫৬ সালে পূর্বতন হায়দরাবাদের আটটি জেলা ও অন্য পাঁচটির জেলার কিছু কিছু অংশ অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হল। হায়দরাবাদে অন্ধ্রের রাজধানী স্থাপিত হল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তেলেঙ্গানা অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হল। ঠিক হল যে, তেলেঙ্গানায় সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হবে 'মুল্কী'দের মধ্য থেকে। অর্থাৎ যাঁরা অন্তত পনের বছর যাবৎ ঐ অঞ্চলে বাস করছেন বলে সার্টিফিকেট দেখাতে পারবেন কেবল তাঁরাই সেখানে সরকারী চাকরী করতে পারবেন। এই প্রতিশ্রুতিকে একটা আইনের আকারে বিধিবদ্ধও করা হয়েছিল। আর ঠিক করা হয়েছিল যে রাজস্ব খাতে তেলেঙ্গানা থেকে আদায়ীকৃত উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ অঞ্চলের উন্নয়নেই ব্যয় করা হবে।

'মুল্কী'দের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত আইনের মেয়াদ এই বছর শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। আইনের মেয়াদ যখন আরও বাড়াবার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছিল ঠিক তখনই তেলেঙ্গানায় আন্দোলনের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। বলা হল যে, চাকরী সংরক্ষণ ও তেলেঙ্গানা থেকে সংগৃহীত টাকা সেখানেই ব্যয় করার নীতি কোনটাই কার্যকর হয়নি।

তাছাড়া, বলা হল যে, আইনের ত্রুটির জন্য এই আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। (সম্প্রতি অন্ধ্র হাইকোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছে, যেহেতু স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা সেহেতু বোর্ডের চাকরীগুলি সম্পর্কে আইনের বিধান প্রযোজ্য নয়।) এইসব অভিযোগের উপর ভিত্তি করে যে আন্দোলন গড়ে উঠল সেই আন্দোলন কিছুদিনের মধ্যে দুটি পৃথক ধারায় ভাগ হয়ে গেল। একদল চাইলেন, "মুল্কী"দের স্বার্থরক্ষার আইনের দোষত্রুটিগুলি দূর করে সেই আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ করা হোক এবং তেলেঙ্গানার উন্নয়নের জন্য রাজ্য পুনর্গঠনের সময়কার প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করা হোক। অন্য একদল বললেন, রক্ষাকবচের উপর তাঁদের আর আস্থা নেই। তাঁরা বুঝেছেন, অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অতএব এই চরমপন্থীদের দাবী হচ্ছে পৃথক তেলেঙ্গানার রাজ্য গঠন করতে হবে।

দুই দলই তাঁদের দাবী নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। রেললাইনে আক্রান্ত হয়েছে, রেলওয়ে ওয়াগানে আগুন লাগান হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্ররা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। অন্তত দু'জায়গায় ছাত্রদের উপরে

পুলিশের গুলী চলেছে। হায়দরাবাদে নিজাম কলেজের প্রাঙ্গণে ঢুকে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলী চালিয়েছে।

তেলেঙ্গানায় স্বার্থরক্ষার বিশেষ দাবী মেনে নিয়েও অন্ধ্র সরকারের এই আন্দোলন ঠেকাতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল। আন্দোলনের মুখে অন্ধ্র বিধানসভার বিভিন্ন দলভুক্ত এবং অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা, দুই অঞ্চলেরই প্রতিনিধিস্থানীয় ৪৫জন সদস্য মিলিত হয়ে একটি চুক্তি করেছিলেন। চুক্তিতে স্থির হয়েছিল যে, তেলেঙ্গানার কর্মরত যেসব সরকারী কর্মচারী সেখানকার অধিবাসী নয় তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাঁদের পদগুলি 'মুল্কী'দের দ্বারা পূরণ করা হবে। যদি উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মুল্কী না পাওয়া যায় তাহলে পদগুলি খালি রাখা হবে। আর যাঁদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাঁদের অন্য অঞ্চলে কাজ দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন হলে বাড়তি সরকারী চাকরী সৃষ্টি করা হবে। এই বদলীর নিয়ম স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বাদে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত স্বয়ংশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে। তেলেঙ্গানার উদ্বৃত্ত রাজস্ব সম্বন্ধে ঐ চুক্তিতে স্থির করেছিল যে, এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ স্থির করার জন্য অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল পর্যায়ের একজন অফিসারকে পাঠাতে বলে অডিটর-জেনারেলকে অনুরোধ করা হবে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঐ হিসাব সম্পূর্ণ করা হবে। ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্বের টাকা রাজ্য সরকার তেলেঙ্গানার উন্নতির জন্য ব্যয় করবেন।

সব দলের সদস্যরা মিলিতভাবে এই স্বাক্ষর করার পরও আন্দোলন থামেনি। যাঁরা তেলেঙ্গানার রক্ষাকবচের জন্য আন্দোলন করছিলেন তাঁরা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আপাতত ক্ষান্ত হতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পৃথক তেলেঙ্গানার দাবীদাররা এই চুক্তির পরও তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যান।

সর্বশেষে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, পৃথক তেলেঙ্গানা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অশান্তির অবসান ঘটেছে, এমন নিশ্চয়তা এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। স্পষ্টতই অন্ধ্র সরকারের নীতিতে তেলেঙ্গানার মানুষ বঞ্চিত বোধ করছেন এবং এ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব অত্যন্ত তীব্র। যেভাবে কোন দলের সুস্পষ্ট সাহায্য বা সমর্থন ছাড়াই তেলেঙ্গানার ছাত্ররা আন্দোলন করছেন তাতে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে অন্য কোন ছুতায় আবার যদি সেখানে বিস্ফোরণ হয় তাহলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

৩৭তম মার্কিণ রাষ্ট্রপতি

রিপাবলিকান নেতা রিচার্ড মিলহাউস নিকসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম প্রেসিডেন্টরূপে শপথ গ্রহণ করে যে ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে বিশ্বশান্তির জন্য এমন একটা আকুতি প্রকাশ পেয়েছে যা ইদানীংকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে কদাচিৎ শোনা গেছে এবং বিশেষ করে নিকসনের মত একজন কট্টর রিপাবলিকানের কাছ থেকে প্রায় অপ্রত্যাশিত ছিল।

নিকসনের এই উদ্বোধন ভাষণের মাত্র একটি জায়গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিমত্তার উল্লেখ ছিল—যেখানে তিনি বলেছেন 'দুর্বলতার দ্বারা যাঁরা প্রলুব্ধ হন তাঁদের জন্য আমরা সংশয়ের কোন অবকাশ না রেখেই বলব, আমরা যতখানি প্রয়োজন, যতদিন প্রয়োজন শক্তির সাধনা করব।" মাত্র এই একটি বাক্য ছাড়া নিকসনের বক্তৃতার আর কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাক্রম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিন্দুমাত্র দম্ভের কোন প্রকাশ নেই। তাঁর বক্তৃতার কোথাও নিকসন তাঁর পূর্ববর্তীদের মত একথা বলেন নি যে, সে দেশের শক্তি ও স্বাচ্ছল্যতা তাকে পৃথিবীর অভিভাবকত্ব করার অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছে। ভিয়েৎনামে বা অন্য কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আদর্শের জন্য অথবা মানবজাতির কল্যাণের জন্য লড়াই করছে—এমন ইঙ্গিত দেবারও কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, 'যুদ্ধের সংগে জড়িত হয়ে আমরা শান্তি চাইছি।'

প্রকৃতপক্ষে নিকসনের গোটা বক্তৃতা থেকে আপাতবিচারে মনে হওয়া সম্ভব যে, এটা যেন একটা পরাভূত, ক্লান্ত, বিড়ম্বিত, দিশাহারা জাতির কন্ঠস্বর। যে জাতি "বিষয়সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও আত্মায় দীন, যে জাতি হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরে, কিন্তু মাটির উপর হাত রাখতে গিয়ে টাল খায়, সে জাতির পক্ষে শক্তির ঔদ্ধত্য দেখান সম্ভব নয়।

কিন্তু আজকের দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষেই এই ধারণা হতে দেওয়া সম্ভব নয় যে, সে দেশ তার হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজের খোলসের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করবে। আজকের আমেরিকা কখনই পুরোপুরি ভিতরমুখী হতে পারে না। আজকের আমেরিকা কখনই নিজেকে দুর্বল, হতাশ, ক্লান্ত বা বিড়ম্বিত দেখাতে পারে না। রিচার্ড নিকসন তা জানেন বলেই আমেরিকার জন্য তিনি নতুন ভূমিকার কথা বলেছেন। আমেরিকার ঘরের সমস্যার উপর তিনি নিশ্চয় জোর দিয়েছেন। সকলের জন্য কর্মসংস্থান করতে হবে, বাসগৃহের ব্যবস্থা ভাল করতে হবে, শিক্ষার উৎকর্ষ আনতে হবে, শহরগুলির পুনর্নির্মাণ করতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন করতে হবে, শাদায় কালোতে ভেদ দূর করতে হবে—

এসব লক্ষ্য তিনি ঘোষণা করেছেন। একথাও তিনি বলেছেন যে, 'আমরা সেই দিনের জন্য এখন থেকে পরিকল্পনা করব যেদিন আমাদের সম্পদ বিদেশে যুদ্ধে অপচয় না হয়ে স্বদেশে আমাদের জনগণের প্রয়োজন মেটাবার কাজে ব্যবহার করতে পারব।' কিন্তু সংগে সংগে তিনি আমেরিকার জন্য এই পৃথিবীতে একটি নতুন ভূমিকাও দেখেছেন। সেই ভূমিকা হচ্ছে মানুষের জীবনকে ধন্য করার জন্য, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করার জন্য অন্যান্য দেশের সংগে সহযোগিতার ভূমিকা। অ্যাপোলো—৮ এর চন্দ্রযাত্রা উপলক্ষে মার্কিন কবি ম্যাকলীনের কথাগুলি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, 'চিরনীরবতার বিস্তারের মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্র, নীল, সুন্দর এই পৃথিবীকে তার সত্যস্বরূপে দেখার অর্থই হচ্ছে একথা উপলব্ধি করা যে, আমরা এই একই ধরিত্রীর যাত্রী, অনন্ত শীতলতার মধ্যে বিরাজমান সেই এক টুকরো উজ্জ্বল মাধুর্যের কোলে আমরা পরস্পরের ভাই—যারা জানে না,—তারা একে অন্যের ভাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরূপে কর্মভার গ্রহণ করার প্রাক্কালে নিকসন শপথ করেছেন, 'জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আমার পদ, আমার শক্তি ও আমার সকল বুদ্ধিবিবেচনা নিয়োগ করব।'

যদিও একথা ঠিক যে, চার বছর বাদে নিকসনের কর্মকালের বিচার হবে তাঁর কাজের দ্বারা, তাঁর এই কথাগুলির দ্বারা নয়, তথাপি তাঁর এই কথাগুলি ঐতিহাসিক।

'আমরা মোকাবেলার যুগ পার হয়ে আলোচনার যুগে প্রবেশ করছি—' নিকসনের এই কথাগুলির যদি কোন যথার্থ তাৎপর্য থাকে তাহলে সেটা প্রকাশ পেতে কিছু বিলম্ব ঘটবে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার তরফ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেছে। নিকসনের কার্যকাল আরম্ভের দিনেই মস্কোর এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা হ্রাস করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে আলোচনা আরম্ভ করতে সোভিয়েট রাশিয়া সম্মত আছে। গত জুলাই মাসে প্রথম দুদেশের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা করার কথা উঠেছিল। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ায় ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সৈন্য প্রেরণের ঘটনার পর ঐ প্রস্তাব ফেঁসে যায়। নিকসনের বক্তৃতায় যে শান্তির আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে যেভাবে কথা বলা হচ্ছে তাতে মনে করা যেতে পারে যে, নিকসনের আমলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দুই দেশ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণের পথে নতুন [illegible] করতে [illegible]

প্রচার একটি শাণিত হাতিয়ার। কায়দা করে প্রচার করতে পারলে অনেক মেকীকে আসল বলে চালান যায়। অনেক নিরক্ষরকে পন্ডিতরূপে আখ্যাত করে বাজার সর-গরম করা কিছুই কঠিন নয়। যুগ যুগ ধরে প্রচারের মহিমা সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। প্রচারের ফলেই ব্রাহ্মণ পন্ডিত নধর ছাগশিশুকে কুকুরছানা ভ্রমে বুদ্ধিমান মূর্খের কাছে মূর্খত্বর প্রমাণিত হয়েছেন। আবার গোয়েবলসের প্রচার কাহিনীর কলাকৌশলের কথা এখনও মুখে মুখে চালু আছে। অবশ্য, মিথ্যা প্রচারে ফল স্থায়ী হয় না। কিন্তু আপাতলাভে যে তা অনেক সাহায্য করে, ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে, এবং পরে যে সংশয়ের সৃষ্টি হয় তা সত্যকেও স্বীকৃতি দিতে চায় না। মিথ্যা প্রচারকের প্রতি এমন তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয় যা পরে বিক্ষোভে রূপায়িত হয়ে অসন্তোষের বহ্নি সৃষ্টি করে। প্রচারের সুফল ও কুফল দুয়ের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রচার হয়। প্রচার চলে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যে এখন উত্তাল উদ্দাম প্রচার চলছে। নতুন নতুন কৌশলের মাধ্যমে প্রচার চলছে। কোন ধারাবাহিক গতানুগতিকতার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা হচ্ছে এমন নয়। ক্ষেত্র বিশেষে রূপ বদলাচ্ছে, কৌশল পাল্টাচ্ছে। এই প্রচারে অনেক ক্ষেত্রেই নীতির বালাই নেই, আদর্শের কশাঘাত নেই। আপাত লাভের চেষ্টাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিপক্ষকে যেন-তেন-প্রকারেণ ঘায়েল করতে পারলেই হল।

নির্বাচনে প্রচারের প্রয়োজন সমধিক। এই প্রচারকে কেন্দ্র করে চিন্তাশক্তির [illegible] নব উন্মেষ ঘটে। সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। প্রজ্ঞার ছোঁয়াচ মেলে। কিন্তু প্রচার যখন বিপথগামী হয় তখনই অনর্থ ঘটে। বিশেষ করে গণতন্ত্রে প্রচারের স্থান সর্বাধিক রাজনীতিক অভিধানে অনেকে বলেন এথিক্স বলে কোন শব্দ নেই। এই বক্তব্যের সংগে সহমত হওয়া কঠিন। গণ-তন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে প্রচারের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। সুস্থ মানসিকতা গঠনের জন্য সত্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, গণদেবতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য থেকে এবং তাঁদের কর্মকান্ড বিচার করে তবে মত ও পথ ঠিক করবেন। নিতান্ত দলীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তখন অবশ্য সেকথা ওঠে না। দলীয় প্রভাবের আওতায় আসার নামই মেরুকরণ। কিন্তু এতবড় বৃহৎ রাজ্যে সম্পূর্ণ মেরুকরণ সম্ভব নয়। চিন্তার স্বাধীনতা আছে বলেই সম্পূর্ণ-ভাবে সকল মানুষের দলীয় চিন্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সেই জন্যই আরো বেশি। এবং সেই প্রচার অবাস্তব, মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যেখানে এখনও শিক্ষার হার অত্যন্ত কম, যেদেশে মানুষের মধ্যে এখনও অন্ধ ভক্তি বিশ্বাস অটেল সেই দেশে রাজনীতিক দলের দায়িত্ব অনেক বেশী। কাজেই প্রচারের কৌশল ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে নেতৃত্বের সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। নতুবা, বিরূপ ফল ফলতে পারে।

যে প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য এই ভূমিকা সংযোজিত হল তা হচ্ছে এবারকার মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি প্রচারকার্যের নমুনা গণসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম একটি কেন্দ্র। যেখানে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে নির্বাচন সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। গতবারে বিরোধী দলের সদস্য হিসাবেই তিনি এই আসনে জয়ী হয়ে-ছিলেন। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্যে রয়েছে ফ্রন্ট মনোনীত বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীযুত পাঁচকড়ি দে আর লোকদল প্রার্থী শ্রীযুত মহেন্দ্র মাহাতো।

ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে বিরাট সংখ্যক মাহাতো সম্প্রদায়ের ভোট আছে। ডঃ ঘোষের আগে শ্রীযুত মহেন্দ্র মাহাতোই এই আসনে জয়ী হয়ে আসছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেসে সামিল হওয়ার পর গত নির্বাচনে আর প্রার্থী হন নি। সেই ফাঁকেই ডঃ ঘোষ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। বাংলা কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে দল ভাঙাভাঙির ফলে ডঃ ঘোষ, যিনি প্রথমে নির্দলীয় ছিলেন, তিনি লোকদলের অংশীদার হলেন। আর শ্রীমাহাতোও একই পথের পথিক হয়ে লোকদলে ডঃ ঘোষের সহকর্মী হলেন। অবশ্য পরে, ডঃ ঘোষ কংগ্রেসেই চলে গেলেন। আর শ্রীমাহাতো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন কি করবেন না এই সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান হয়ে অবশেষে সমরে অবতীর্ণ হলেন, এবং সেই ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রেই।

কংগ্রেসী হিসাবে ডঃ ঘোষের নির্বাচনী প্রতীক জোড়া বলদ—আর তাঁর অন্য প্রতি-দ্বন্দ্বী শ্রীযুত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লাঙল। মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েদের অনেকের মধ্যে শোনা যায় সংস্কার চালু আছে যে লাঙল ছুঁলে তাঁদের শুধু পাপ হয় না, অধিকন্তু ব্রাহ্মণভোজন, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করে তবে সে পাপ থেকে মুক্তি পেতে হয়। নাহলে লাঙল ছোঁয়ার পাপের ফলে তাদের কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে স্বয়ং ভগবানও নাকি পূর্বাহ্ণে তার হদিশ দিতে পারেন না। এ হেন সরল, ভক্তিমতি মাহাতো কুলবালাদের কাছে প্রচার হয়েছে খবরদার লাঙল ছুঁয়ো না। অর্থাৎ লাঙল প্রতীকে ঢেঁড়া কেটে ভোট দেওয়ার অর্থ লাঙল ছোঁয়া আর পরিণামে সেই বিধাতা-পুরুষের অজানিত শাস্তির বোঝা মাথায় তুলে নেওয়া। অতএব, এ হেন পাপ-কাজ থেকে শতহাত দূরে থাকাই ভাল। এই প্রচার এত জোর হয়েছে যে গ্রামে গেলেই এর হদিশ যেকোন লোক পাবে।

কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। অন্য-রকমের প্রচারও আবার হয়েছে। যেমন, সেই মাহাতো কুলবালাদের মুখেই শুনতে পাবেন, তারা বলবেন—"এঁড়েতেও দাগ কাটব নি।" হিন্দু তো? এঁড়েতেও দাগ কাটা অতএব চলবে না। এটা সম্পূর্ণ নতুন প্রচার। লাঙলের অভ্যুদয়ের ফলেই জোড়া বলদও এঁড়ে হয়ে গেল। ঐ এঁড়েতে

আছেন যে ভোট পাচ্ছেন নি এমন নয়। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত সরল মানুষের ভক্তিবিশ্বাসকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগানো কোনমতেই ঠিক নয়। যে দল বা যাঁরাই এই মিথ্যা প্রচার করুন না কেন তাঁরা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের মিত্র নন। অনেকে অবশ্য তার জন্য বাহাদুরী নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু আপাতমধুর হলেও পরিণামে এটা বিষ হতে বাধ্য। কারণ, এই ধোঁকার কথা একদিন এই সরলমতি মানুষগুলির কাছে ধরা পড়বেই। এই প্রচার অত্যন্ত নিম্নস্তরের। রাজনীতিক গন্ডীর বাইরে। এতে জনসাধারণকে শিক্ষিত হতে তো সাহায্য করবেই না অধিকন্তু অধিকতর শোষণের সুযোগ করে দেবে।

আবার সম্প্রদায়গত প্রচারও চলছে। চারটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সাধারণভাবে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে পরিষদীয় গণতন্ত্র এদেশে পল্লবিত হতে চলেছে। কিন্তু সম্প্রদায়গত এবং জাতি-ভেদগত কুপ্রচারের বিষবাষ্পে মানুষের মন যদি ক্রমশই দূষিত হতে থাকে তবে রাষ্ট্র-কাঠামোর উপর যে চরম আঘাত আসতে পারে সেই সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ খুব কমই আছে। সম্প্রদায়গত প্রচার শুধু যে মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে এমন নয়। ঝাড়খন্ড দল বিহার সংলগ্ন পশ্চিম-বঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় প্রার্থী দাঁড় করিয়ে এ প্রচার চালাচ্ছে। পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্যের শ্লোগান কিছু কিছু মানুষের মনকে যে আকৃষ্ট করছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

আবার কোন কেন্দ্রে সাঁওতাল প্রার্থী থাকলে সেখানে প্রচার চলছে সাঁওতালকে বাঁচাতে হবে। কাজেই সাঁওতালদের পবিত্র কর্তব্য হবে সাঁওতাল প্রার্থীকে ভোট দেওয়া। তেমনি বাউড়িকে বাঁচাবার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বাউড়ি কম্যুনিটির উপর ন্যস্ত হয়ে গেছে। অতএব, মাহাতোরাও বাদ যায় কেন, তাঁদের মধ্যেও জাত বাঁচাও-এর ধ্বনি কার্যকর করবার অক্লান্ত চেষ্টা চলছে। ফলে, অন্য সম্প্রদায়ের প্রার্থী থাকলে এই জাতিভেদ প্রবণতামূলক ধ্বনির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের মধ্যেও যে উদারতা ছিল তা সীমিত হতে সুরু করেছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরু-লিয়ার অনেকাংশে এই ভিন্নমুখী দুষ্ট প্রচারের কিছু কিছু প্রভাব যে পড়ছে তা একটু ঘোরাঘুরি করলে স্পষ্টতই ধরা পড়বে। এই অসুস্থ সৃষ্টির জন্য অনেক রাজনৈতিক দলকেই প্রত্যক্ষ দায়ী করা চলে। কারণ, সাংগঠনিক শক্তি কম হওয়ার ফলে আর আদর্শগতভাবে কর্মী-দের শিক্ষিত করা যায় নি বলেই এই অশুভ পন্থার সাহায্যে কিস্তি মাৎ করবার প্রচেষ্টায় অনেকেই মত্ত হয়ে উঠেছেন। দেশের কি দুর্দশা হবে আর ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের যে বীজ রোপিত করা হচ্ছে তা যখন মহীরুহের আকার ধারণ করে জনারণ্যের আগুনে চারদিক ছারখার করতে থাকবে—তখন কি হবে সেই সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করছেন কিনা সমূহ সন্দেহ আছে।

অবশ্য, এই অশুভ দিক ছাড়া উজ্জ্বলতর প্রয়াসও আছে। সম্পূর্ণ রাজ-নীতিক পর্যায়েও এবার প্রচার চলছে। আর কলকাতার আশে-পাশেই যে শুধু এ হেন প্রচার সীমাবদ্ধ তা নয়। পুরু-লিয়ায় দেখা যাবে লোকসেবক সংঘ নির্বাচনী লড়াইকে একটি সুষ্ঠু স্তরে উন্নীত করেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই, কাজেই কংগ্রেসী শাসনের যে দুর্বলতা তাকে জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য লোকসেবক সংঘ জোর প্রয়াস পাচ্ছেন। মানভূমের টুসু সংগীত এখানকার জনগণের জীবনবেদ। এই টুসু সংগীত গেয়েই পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তির আওয়াজ তুলে সহস্র মানুষ একদিন কোলকাতার দিকে স্বর্গত অতুল ঘোষ ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে দৃপ্ত মিছিল পরিচালনা করেছিলেন। সেই টুসুর মাধ্যমে কংগ্রেসের "অপকীর্তি" আজ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকসেবক সংঘের কর্মীরা রাতেদিনে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

ঢোল, মাদল, দামামা আর নাগাড়া নিয়ে কনকনে শীতের হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে প্রত্যন্ত গ্রামে ও দলে দলে মানুষ এই ভোটের টুসু গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এটা নিছক রাজনীতিক প্রচার। শুধু ধ্বংসাত্মক প্রচারের পর্যায়ে এই টুসু সংগীতকে ফেলা যায় না, কারণ এর মধ্যে গঠনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কংগ্রেস বক্তৃতার মাধ্যমে এই প্রচারের পাল্টা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে তা খুবই ক্ষীণ। যদি ফ্রন্ট আমলের কর্মকান্ডকে ফুল্লরার বারমাস্যা বা সীতার দশ মাসের কাহিনীর ঢঙে রচনা করে জন-সমক্ষে উপস্থাপিত করতে পারত তবে হয়ত টুসুর পাল্টা জবাব হত। কাজেই, টুসু আজ রাজনৈতিক প্রচারের পর্যায় থেকে উন্নীত হয়ে লোকসাহিত্যের দরবারে আসন নিয়েছে।

কোলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে যেমন পোস্টারের ছড়ার ছড়াছড়ি গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ায় তার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। পুরুলিয়া শহরে একজন প্রার্থী যিনি নির্বাচনে জয়লাভ করবেন বলে শহরবাসীরা অকুন্ঠচিত্তে স্বীকার করছেন তাঁর একখানি পোস্টারও চোখে পড়বে না। কিন্তু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানে তাঁর নির্বাচনী প্রতীক কি এবং কিভাবে ভোট দিতে হবে, মানে হল এটা সংগঠনের ম্যাজিক। কাজেই পোস্টার না থাকলেই প্রচার হচ্ছে না এ ধরনের চিন্তাধারা কোলকাতা বা শিল্পাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আর্থিক অনটনই যে পোস্টার না দেওয়ার কারণ একথা স্বীকার করা চলে না। কারণ পোস্টার আছে। আর নির্বাচনের টাকা, কথায় আছে ভূতে যোগায়। কাজেই আর্থিক টানাটানি থাকলেও আখেরে তা খুব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

গ্রামে প্রচারের কৌশল ভিন্ন রকমের। এমন অনেক প্রার্থী আছেন যাঁরা দিনের বেলায় অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আর সূর্যদেব অস্তাচলগামী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের প্রচারের অভিযান সুরু হয়। সারারাত ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গুপ্ত বৈঠক আর মন দেওয়া নেওয়া চলে। ভোর হবার আগেই আবার ডেরায় ফিরে আসেন। গ্রামে নাকি এই ধরনের প্রচারই সবচেয়ে ফলদায়ক। তাই মাইক্রোফোনের কর্ণপটাহবিদারী "ভোট ফর" আওয়াজ পল্লীবালার কাঁকনের শব্দকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। অবশ্য কখনও কখনও যে হয় না এমন নয়। যখন কলকাতার নেতা আসেন তখন এমন হয়। নয়তো রাতের অন্ধকারে প্রচার চলে, সিদ্ধান্ত হয়—রাজ্য টলে।

এরকম জোর প্রচারের মাঝেও আর এক প্রচার চলছে। আওয়াজ অবশ্য খুবই ক্ষীণ। তবুও চেষ্টা হচ্ছে। করছেন নকশালপন্থীরা। বক্তব্য—ভোট দিও না। পোস্টার—নির্বাচনে মন্ত্রী বদলায়, শাসন বদলায় না। মেদিনীপুর শহর আর বাঁকুড়া শহরে কিছু হাতে লেখা এই ধরনের পোস্টার পড়েছে। এঁরা আবার মিছিলও করছেন। অবশ্য কোথাও দশজনে, কোথাও বা ২০ জনে। জনতা দেখেন এঁদের ক্ষমা-সুন্দর চোখে। কারণ, ভোট না দিয়ে তারা "পারবেক নাই"। ভোট না দিলে "মোদের সরকার হবেক কি করে"। সকলেই যেখানে ভোটের পক্ষে দুই-একজন বিপক্ষে থেকে "কি হবেক"। তবে নকশালপন্থীরা তাঁদের রাস্তায় তাঁরা ঠিকভাবেই চলেছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা যেখানেই আছেন তাঁদের ভগ্নাংশ নকশালবাড়ীরা সেখানেই অল্পবিস্তর সক্রিয় আছেন।

এই প্রচারও রাজনীতিক। এক বিশেষ রাজনীতিক দর্শনের প্রতিফলন। সম্প্রদায়-গত বা জাতিভেদগত প্রচারের মত নিম্ন-মানের প্রচার এ নয়। গণতন্ত্রে নকশালবাদী মতেরও স্থান আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত ভেদবুদ্ধিমূলক প্রচারের স্থান নেই। স্বীকৃতিও পেতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উচিত অবিলম্বে এই দুষ্ট প্রচারের অবসান ঘটাবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া। নয়তো গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে। নকশালপন্থী প্রচারে কয়েকজন যুবক হয়ত রোমান্টি-কতার শিকার হতে পারে বা হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু অন্ধ সম্প্রদায়গত ও জাতিভেদগত প্ররোচনা বিরাট অংশকে জড়িয়ে ফেলে হানাহানিতে প্রবৃত্ত করতে পারে। এই আশঙ্কা অমূলক হোক এটাই সকলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবেন। কিন্তু সতর্কতা অব সকলেরই প্রয়োজন। সাবধানের মার নেই।

—সমদর্শী

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

আগের ঘটনা

[চাকরিতে প্রমোশন নিয়েই বিকাশ এল পাড়াগাঁয়ে। উঠল নিয়োগীপাড়ায় শশাঙ্ক-কাকার বাড়ি। নিয়োগীপাড়া আজ মৃত ম্লান হলেও এক সময় বেশ জমজমাটি ছিল। শশাঙ্কবাবু সেই নিয়োগীপাড়ার হারিয়ে-যাওয়া গৌরবের স্মৃতিই বয়ে বেড়াচ্ছেন। গোটা বাড়িতে তার জীর্ণতার গন্ধ, পুরনো ইট, ধসা-বালি, সরে-যাওয়া মাটির চাপা নিশ্বাস। হাওয়া বড়ো রহস্যময়, রোমাঞ্চকর। প্রথম সকালটা বিকাশের বেশ আয়েসেই কাটল। বাড়ির সকলের সঙ্গেই আলাপ হল, জমিয়ে নিল ছোটদেরও। শশাঙ্কবাবুর মেজ মেয়ে সুবর্ণাও বাদ পড়ল না। সুবর্ণার সঙ্গেই কথা হচ্ছিল বিকাশের। এমন সময় ছোট ভাই বুড়ো বলল, 'মেজদি, মা তোমায় ডাকছে।']

—তিন—

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, শশাঙ্ককাকার আতিথেয়তা আর কাকিমার উদ্যমে দুপুরের খাওয়া এমনিতেই বেশি হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন বিকেলে. সুনু অর্থাৎ সুবর্ণা অর্থাৎ বিকাশের সোনালি এক থালা লুচি-তরকারী নিয়ে এল, তখন বিদ্রোহ ছাড়া উপায় রইল না।

'মাপ করতে হবে, অসম্ভব।'

জমি থেকে ধান এসেছে, তাই মাপাবার জন্যে শশাঙ্ককাকা চশমা পরে একখানা খাতা হাতে নেমে যাচ্ছিলেন। বিকাশের প্রতিবাদ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, চশমাটাকে ঠেলে তুলে দিলেন কপালের ওপর।

'তার মানে? বিকেলে জলখাবার খাও না?'

'খাই, কিন্তু দুপুরে যা খাওয়া হয়েছে—'

তারপরে চিরাচরিত বাক্যালাপ। কলকাতার ছেলেরা কিছুই খেতে পারে না দেখে শশাঙ্ক বিক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত, কাকিমা কিঞ্চিৎ ব্যথিত এবং বিকাশের প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা। ঠোঁটে একটুকরো কৌতুকের হাসি নিয়ে সুনুর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা—অদূরে কয়েকটি বালক-বালিকার কৌতূহলী সন্দর্শন।

লুচির থালাকে কোনোমতে প্রতিরোধ করে বিকাশ উঠে পড়ল। শেষপর্যন্ত বললে, 'খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না কাকা, রাত্রেই হবে এখন। আমি বরং একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসি আপাতত।'

নিষ্কৃতির এইটিই উপায়। তাছাড়া দুপুর, দিনের আলো, গাছপালার ছায়া, বাগানের পাখিরা এরা চোখ কান জুড়িয়ে দিচ্ছিল বটে, কিন্তু বেলা-শেষের ছায়া নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে কেমন বিষণ্ণতা নেমে আসছিল একটা, নীচের চণ্ডীমণ্ডপটা তার ইটের পাঁজা আর ঝোপ-জঙ্গল নিয়ে আরো ক্লান্ত হয়ে উঠছিল, ওদিকের পোড়ো মহলটায় এক ঝাঁক পায়রার সঙ্গে রাশি রাশি চামচিকে উড়ে ভুতুড়ে আবহাওয়া তৈরি করছিল, পুরোনো ঠান্ডা দেওয়ালগুলোতে শীত শিউরে উঠছিল, বাগানটা অরণ্যের মতো জটিল হয়ে যাচ্ছিল, বাতাস ছিল না, আর বহুদিনের শ্রান্ত মাটি থেকে একটা সোঁদা গন্ধ—বেলা-শেষের গন্ধ, যেন স্নায়ুর ওপরে চাপ দিচ্ছিল। পাড়াগাঁয়ের পুরোনো বাড়ি পড়ন্ত বেলায় এত বিষণ্ণ, এত ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, এর আগে তা সে কখনো জানত না।

দোতলার সিঁড়ি এর মধ্যেই আবছা অন্ধকার। নীচের ধাপটায় পা দিয়ে বিকাশ একবার থমকে দাঁড়ালো। সিঁড়ির তলাটায় এখন প্রায় নিকষ-কালো রাত্রি—তা থেকে অসংখ্য মশার ক্রুদ্ধ গর্জন উঠছে। ওখানে সেই অদ্ভুত মেজদা এখনো বসে আছে নাকি? আশ্চর্য, তারপর থেকে লোকটাকে সে আর দেখতে পায়নি, কোনো সাড়াশব্দ পর্যন্ত না—কোন মুছে গেছে সে। ওই সিঁড়ির নীচেই সে থাকে কিংবা—এ-সব বনেদী পুরোনো বাড়ির কথা কিছুই বলা যায় না, হয়তো ওর আড়ালে পাতাল-কুঠুরির মতো কিছু একটা আছে কোথাও, তার একটা রহস্যময় 'হিস্যি' (শশাঙ্ককাকার ভাষায়) নিয়ে সেইখানেই লুকিয়ে রয়েছে সে।

মরুক গে। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে বিকাশ বেরিয়ে এল।

বাইরে শশাঙ্ককাকা ধান মাপাচ্ছিলেন। এখানে এখনো রোদের আভা। সেই আভায় চিকচিক করছিল দুটো ধানের স্তূপ—একটা থেকে মাপা হচ্ছে, আর একটায় সাজানো হচ্ছে। বিরাট একটা দাঁড়িপাল্লায় ধান তুলে মাপছিল কৃষাণ জাতের দু'জন লোক, একজন সমানে বলে যাচ্ছিল : 'সাত—সাত—সাত—আট—' আর চশমা চোখে শশাঙ্ক খরদৃষ্টিতে তা লক্ষ করছিলেন।

বিকাশকে দেখে শশাঙ্ককাকার মনোযোগ ব্যাহত হল একটু।

'বেরুচ্ছ তাহলে?'

'আজ্ঞে।'

'বেশি দূরে-টুরে যাবে নাকি?'

'না—এই বাজারের রাস্তায় একটু ঘুরে আসব একটু। ব্যাঙ্কটাও দেখে আসব।'

'তোমার ব্যাঙ্ক কালীবাড়ির উল্টো-দিকে—মানে বাজারের রাস্তায় পা দিয়ে একটু ডান দিকে ঘুরলেই। রাত কোরো না বাবাজী।'

'আজ্ঞে না, রাত হবে না।'

'কত হল, এই কত হল? দশ?'—শশাঙ্ককাকা একবার ধানের দিকে মন

নিজেই আবার বিকাশের দিকে তাকালেন : 'ভালো কথা, একটা টর্চ-ফর্চ নিয়ে যাও। এদিকে আবার ইলেকট্রিক নেই, তাই মেঠো রাস্তা—'

'আজ্ঞে টর্চ আমার কাছে আছে, অসুবিধে হবে না।'

বিকাশ বেরিয়ে এল রাস্তাটায়। সেই পুকুরটার ওপরে নুয়ে-পড়া নারকেল গাছ-গুলোর ছায়া—জলে একটা মাছের লাফ। আশপাশ থেকে ঝি'ঝির ডাক। সেখান থেকে বাজারে যাওয়ার টানা পথ—দুধারে নিয়োগীপাড়া, কোথাও জঙ্গল, কোথাও অবশেষ, কোথাও ওরই মধ্যে এক-আধটা নতুন বাড়ির আকস্মিকতা। আর সব মিলে জীর্ণতা-জীর্ণতা — ক্লান্তি-ক্লান্তি—নুয়ে-পড়া গাছের ডালগুলো ধুলোয় মলিন, সোঁদা গন্ধ—মাথার ওপর বাদুড়ের ডানার শব্দ, শ্রান্ত কাকের ডাক আর প্রায় শরীর ছুঁয়ে দু-একটা চামচিকের উড়ে-যাওয়া।

হয়তো এই কারণেই রিক্শওলা বলে-ছিল, 'এখানে বেশি দিন না থাকাই ভালো বাবু।' দিনের বেলা এমন কিছু মনে হয় না, কিন্তু বিকেল এলে, ছায়া পড়লে, এই-সব পুরোনো জায়গা, পুরোনো মাটি অচেনা হয়ে যায়—ভয় করে, মনের ওপর ভার পড়তে থাকে।

অন্ধকার নামলে, দুটো একটা আলো জ্বলে উঠলে, তখন এটা থাকবে না। তখন একটি রাত্রি— নির্বিশেষ, যে-কোনো পাড়া-গাঁয়ের পথ, জোনাকি, শেয়াল, কুকুরের ডাক। কিন্তু দিন আর রাতের মাঝখানে, এইসব ভাঙা বাড়ি আর পুরোনো গাছপালা আর সোঁদা গন্ধ যেন ঠিক সত্য আর মিথ্যের একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়—ভয় করে, অস্বস্তি লাগে, বুকের ওপরে একটা ভার নেমে আসে। হয়তো এইজন্যেই সেকালে কোনো শহর জীর্ণ হয়ে গেলে লোকে তা থেকে সরে এসে অন্য জায়গায় শহর গড়ত—এই অস্বস্তি, এই ভার সইতে পারত না তারা।

বিকাশ পা চালিয়ে আধ-মাইলটাক এই পথটা পেরিয়ে এল। এর মধ্যে শীতের সন্ধ্যাটা যেন হঠাৎ ঘনিয়ে এল, দপ দপ করে উঠল গোটাকয়েক ইলেকট্রিকের আলো।

বাজার। পাঁচের বড়ো রাস্তাটা। দোকান। লোকজন। গাড়ি-রিকশর যাওয়া-আসা। রেডিয়োর শব্দ। সামনের হেয়ার-কাটিং সেলুনে কাঁচি চলার আওয়াজ। নতুন মাটি, প্রচণ্ড জীবন।

এক ভদ্রলোক পাশের পানের দোকান থেকে সিগারেট কিনছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] হাতে-বোনা [illegible] পুলওভার, [illegible] [illegible] [illegible]। মনে হল, ডাক্তার। সঙ্গে একটা সাইকেল, তাতে কালো ব্যাগ ঝুলছে।

বিকাশ বললে, 'এখানকার কালীবাড়িটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?'

'কালীবাড়ি?'—ভদ্রলোক মুখ ফেরা-লেন : 'এই দিকে মিনিট-তিনেক এগিয়ে—' বলতে বলতে তিনি থামলেন : 'আপনাকে যেন চেনা-চেনা ঠেকছে।'

তৎক্ষণাৎ বিকাশের মনে হল, এ-লোকটিও তার অচেনা নয়।

'আমিও আপনাকে—আগে কোথায়—'

ভদ্রলোকের স্মৃতিই দ্রুত কাজ করল : 'হেয়ার স্কুলের বিকাশ না?'

'আপনি—তুমি—'

'দূর গর্দভ!'—এইবার লোকটি সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিলে বিকাশের পিঠে : 'স্কুল-টিমের ওপনিং ব্যাটসম্যান হয়ে উইকেট-কীপারকে ভুলে গেলি?'

'প্রভাকর!'

'সার্টেনলি। দ্যাট সেম ওলড্ রোগ।'—খুশিতে আর বিস্ময়ে ভরে উঠল প্রভা-করের মুখ : 'তা এতকাল পরে তুই এখানে উড়ে পড়লি কী করে? এই বিশ্ব-সংসারে এত জায়গা পড়ে থাকতে? আর কালী-বাড়িই বা খুঁজছিস কেন? কলকাতা থেকে ভক্তির টানে লোক ছুটে আসে—এখানকার কালীর যে এত মাহাত্ম্য আছে সে তো আমি জানতুম না।'

বিকাশ চুপ করে প্রভাকরের দিকে চেয়ে রইল।

'কিরে, কথা বলছিস না কেন?'

'কী বলব? কেস্ক্রুলেশন তুই-ই শুরু করেছিস, শেষ করে নে, তারপরে যা বলবার বলব।'

প্রভাকর হেসে উঠল। বললে, 'না—ঠাট্টা নয়। টেল এ সারপ্রাইজ। কী করে এলি এখানে?'

'ও-কথাটা তো তোকেও জিজ্ঞেস করতে পারি।'

'আরে, সরকারী চাকরী। আমি এখান-কার হেল্থ সেন্টারের ডাক্তার।'

'আর এখানে আমাদের ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ খুলেছে। আমি এসেছি তারই অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে।'

'খোলা দেখা!'—প্রভাকর একটা সিগা-রেট বার করে দিলে : 'নে।'

'থ্যাঙ্কস—খাই না।'

'এখনো সেই ভীষ্মদেব?'—প্রভাকরের মুখে স্ফূর্তির প্রগল্ভতা ফুটে উঠল : 'ক্লাস এইট থেকে চেষ্টা করছি, কলেজেও তোকে বিগড়ে করতে পারিনি। দেখছি এখনো অবিচল হয়ে আছিস। পান খাবি?'

'ওটাও অভ্যেস নেই।'

প্রভাকর বললে, 'উজবুক!'

প্রায় দশ বছর পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, আর এই ভাষায় তার অভ্যর্থনা!'—পানওলা সকৌতুকে তাকাচ্ছিল, বিকাশ তাকে বললে, 'একটা মিঠে পানই দাও তা হলে। জরদা-টরদা মিশিয়ো না—মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

'না—না, জরদা মেশাব কেন?'

'সবরকম মিশিট মশলা—' প্রভাকর পানওলাকে মনে করিয়ে দিলে। তারপর জিজ্ঞেস করল : 'সত্যি—এমন করে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি। আছিস কেমন?'

'দেখতেই পাচ্ছিস।'

বন্ধুত্ব আর ডাক্তারী—দুটো দৃষ্টি একসঙ্গে মিশিয়ে কিছুক্ষণ বিকাশকে লক্ষ করল প্রভাকর। বললে, 'তোর মুখচোখের সে ব্রাইটনেসটা আর সে-রকম নেই, যেন একটু বুড়োটে হয়ে যাচ্ছিস।'

'স্টুপিড ফুল—'

'রেখে দে স্টুপিড!'—থাবা দিয়ে কথাটা প্রায় কেড়ে নিলে প্রভাকর। : 'বয়েস কত হল? ছাব্বিশ? সাতাশ? এর মধ্যেই একে-বারে পঞ্চাশ বছরের বুড়োর বুলি ধরলি যে! ক্রিকেট খেলিস এখনো?'

'না।'

'আমি কিন্তু এখনো খেলি। চান্স পেলেই।'

'খুব ভালো।'

'পান বাবু—'

বিকাশ পান নিয়ে মুখে পুরল। নানা মশলায় সেটা প্রায় সিঙাড়ার মতো বিরাট।

প্রভাকর বললে, 'কালীবাড়ি খুঁজ-ছিলি কেন? ধর্মে মতি হয়েছে বুঝি?'

অতিকায় পানটাকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল।

'না, তা নয়। শুনেছি আমাদের ম্যানেজার ওখানেই। দেখতে ডেকেছিলেন।'

'শুনেছি, আমি চিনি সে-ব্যাঙ্ক!'—প্রভাকর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল : 'তা সে এমন মারাত্মক কিছু নয় যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। যা কালই দেখবি।

ভালো কথা, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুই আজই এখানে পৌঁছেছিস এসে।'

'হুঁ। নির্ভুল অনুমান।'

'উঠেছিস কোথায়?'

'নিয়োগীপাড়া।'

'নিয়োগীপাড়া? কোন্ বাড়ি?'—প্রভাকর একটু কৌতূহলী হল।

'আমি শশাঙ্ক নিয়োগীর ওখানে উঠেছি।'

'শশাঙ্ক নিয়োগী? অ।'

বিকাশ ঠিক বুঝতে পারল না, হয়তো এমনিই মনে হল, শশাঙ্কর নামে যেন একটা ছায়া পড়ল প্রভাকরের কপালে।

'চিনিস নিশ্চয়?'

'কেন চিনব না? শশাঙ্কবাবু বিখ্যাত লোক। তাছাড়া আমি ডাক্তার—সোস্যাল-ম্যান, সবাইকেই চিনতে হয় আমাদের। তোর আত্মীয় হন নাকি?'

'খুঁজলে মা-র মাসীবাড়ির পিস-শ্বশুর বংশ-টংশের সঙ্গে একটা কিছু বেরুতে পারে বোধহয়। তা নয়। ও'রা আমার বাবার মক্কেল। শুনেছি, সেই সূত্রেই খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, ও'রা আমাদের ওখানে আসা-যাওয়াও করতেন। তবে সেও আমার ছেলেবেলায়, মনে পড়ে না।'

'অ।'—যেন একটু অন্যমনস্ক হল প্রভাকর : 'ওখানেই থাকবি?'

'না—সেটা ঠিক হবে না। ও'রা অবশ্য তাই বলছেন, কিন্তু আমি ভাবছি দু-চারদিন পরে যেখানে হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব।'

প্রভাকর তার শেষ কথাগুলো ভালো করে শুনল কিনা বোঝা গেল না। উদাস-ভঙ্গিতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল একটু, পানওলাকে পয়সা মিটিয়ে দিলে, তারপর বললে, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবে বক-বক করে কী হবে, চল, আমার বাসায়। এতদিন পরে দেখা হল, গল্প করা যাবে প্রাণ খুলে।'

'তোর বাসায়?'

'কাছেই। মিনিট দশ-বারোর রাস্তা হেঁটে গেলে। কলকাতার বাবুর যদি কষ্ট হয়, একটা রিকশ ডেকে নিচ্ছি—আমার সাইকেল তো আছেই।'

'রিকশর দরকার নেই, আমি হাঁটতেই বেরিয়েছি।'

'চল্ তবে। আর—আর, কোনো ভাবনা নেই, ব্যাচেলার্স ডেন নয়, ঘরে গিন্নী আছেন। আমাকে স্টোভ ধরিয়ে তোর জন্যে চা করতে হবে না। ভালো কথা, তোর বউ-টউ—'

'এখনো এসে পৌঁছোননি।'

'এখানে?'

'না—স্কন্ধে।'

প্রভাকর আবার বললে, 'উজবুক!'

বাজার পেরিয়ে একটু ডান দিকে এগিয়ে ছোট মাঠ একটা। সেইখানেই হেলথ সেন্টার, প্রভাকরের কোয়ার্টার।

এ-ধরনের কোয়ার্টার যেমন হয়। বাড়তির ভেতরে সামনে ছোট একটা বাগান। বারান্দার ইলেকট্রিকের আলোয় তাতে কতগুলো নানা রঙের মরশুমী ফুল ঝিকমিক করছিল, কয়েকটা ব্ল্যাক-প্রিন্স ফুটেছিল চাপবাঁধা রক্তের মতো, আর মস্ত একটা হেনার ঝাড় গন্ধে একেবারে উতরোল হয়ে গিয়েছিল। এ নিয়োগীপাড়া নয়, বাজারের রাস্তাও নয়—শহরের ভিড় থেকে পালিয়ে এসে নিশ্বাস ফেলবার মতো—হাত-পা মেলে বসবার মতো জায়গা।

সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজে চাকর বেরিয়ে এল। সাইকেলটা তাকে ধরিয়ে দিয়ে প্রভাকর বললে, 'তোর মা-কে একটু আসতে বল—আর আমাদের চা দে।'

'আচ্ছা।'

বারান্দায় তুলোর কুশন পাতা কয়েকটা বেতের চেয়ার। প্রভাকর বললে, 'ঘরের ভেতরে বসবি, না বারান্দায়?'

'তোর বারান্দাটাই আমার ভালো লাগছে। চমৎকার।'

'শীত করবে না?'

'শীতের দিনে ঘরে বসলেও শীত করবে। এখানে একটা বাড়তি পাওনা আছে—হাসনুহানার গন্ধ।'

'কবি!'—প্রভাকর হাসল : 'আচ্ছা, বোস দু-মিনিট, আমি এই জামা-কাপড়-গুলো ছেড়েই আসছি।'

বিকাশ একা বসে রইল। হেনার সঙ্গে গোলাপেরও গন্ধ মিশেছে—বাতাস নেই, নেশার মতো থমে আছে এখানে। সামনের মাঠটায় আলো-অন্ধকার জড়ানো ঘাস ভিজে উঠছে শিশিরে। মাঠের ওপারে বড়ো রাস্তাটা, রিকশ চলেছে তা দিয়ে, মোটর যাচ্ছে। এদিকে হাসপাতালের গোটা-তিনেক কাচের জানলায় ঝলমল করছে শাদা আলো। বিকাশের নিয়োগীপাড়ার কথা মনে পড়তে লাগল। সেখানে এখন জমাট ছায়া—ভিউরে ভিউরে উঠছে পুরানো ক্লান্ত মাটি, অন্ধকারে বাড়ীগুলোর ধ্বংস-স্তূপ ভুতুড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইতস্তত। একটু পরে আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে—এই চিন্তাটা তার ভালো লাগল না।

দু' মিনিট নয়—আর একটু দেরী হল প্রভাকরের আসতে। একার সঙ্গে এল তার বউ। যথারীতি চা এবং প্লেটে কিছু খাবার।

প্রভাকর বললে, 'আমার মিসেস। অমলা।'

লম্বা ধাঁচের শ্যামবর্ণা মেয়েটি। মুখে শান্ত উজ্জ্বলতা। দেখলেই বোঝা যায়, বিয়ে করে সুখী হয়েছে প্রভাকর। নমস্কার পর্ব মিটিয়ে বিকাশ বললে, 'চা-টা থাক, কিন্তু খাবার চলবে না। দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার প্রভাকর জোর করল না। প্লেট নিয়ে ফিরে যেতে যেতে অমলা বললে, 'আজ ফাঁকি দিলেন, কিন্তু কাল দুপুরে খেতে হবে এখানে।'

'দুপুরে তো সম্ভব নয়। কাল দশটায় অফিস।'

'বেশ, তাহলে কাল রাত্রে।'

প্রভাকর বললে, 'আমি কিছু বলছি না, এগুলো মিসেসের ডিপার্টমেন্ট।'

প্রতিশ্রুতি আদায় করে অমলা ভেতরে চলে গেল। চায়ে চুমুক দিতে লাগল দুজনে। একটু পরে খেয়াল হল প্রভাকরের।

'বিকাশ, তুই তো কবিতা লিখতিস।'

'আর লিখি না। দলে পড়ে চেষ্টা করেছিলুম, দেখলুম ও হবার নয় আমার।'

'তা ঠিক, কবি-টবি হওয়া খুব ঝামেলা।' —ডাক্তার প্রভাকর নিজের ধরনে মোটা রসিকতা করল একটা : 'একটু নিউরোসিস না থাকলে ও লাইনে শাইন করা যায় না। তুই তো যেন কার কাছে বেহালাও শিখতিস।'

'ওটা পৈতৃক। বাবা বাজাতেন, ঠাকুরদা নামকরা সেতারী ছিলেন। ওটা ছাড়িনি।'

'তুমিও বাজাও। বেহালা শোনাস একদিন?'

'আচ্ছা, সে হবে'—বিকাশ হাসল। প্রভাকর রসিকতা করছে। বন্ধু ভাইয়ের বেহালা শোনার সময় হয়তো কোনোদিনই হবে না। কিন্তু হঠাৎ—অনেকক্ষণ পরে বিকাশের সুনুর কথা মনে পড়ে গেল। এই হেনার গন্ধের নেশায়, নিয়োগীপাড়া থেকে দূরে বসে—কথা ভাবতে লাগল মেয়েটি তার কাছে বেহালা শিখতে চেয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রভাকর বললে, 'কী ভাবছিস?'

'কিছু না।'

'বিয়ে করিসনি কেন?'

'সময় পাই নি।'

'বিয়ের সময় কোনোদিনই পাওয়া যায় না—ঝাঁ করে, চোখ-কান বুজে একদিন ঝুলে পড়তে হয়।'

'তুইও তাই করেছিলি?'

'আমি, মানে—' প্রভাকর একটু দ্বিধা করল : 'মানে—অমলাকে আগেই পছন্দ করে ফেলেছিলুম। একটু লাভ্-টাভ্ বলতে পারিস আর কি! তুই যদি বিয়ে করতে চাস—বল্—পাত্রী দেখি।'

'তুই-ই লাভ্ করতে পারিস, আমার কি সে যোগ্যতা নেই?'

তৎক্ষণাৎ দারুণ উৎসাহিত হল প্রভাকর।

'ও—তা হলে আছেন কেউ? তাই বল্! কে তিনি?'—অন্যের প্রেমকাহিনী শোনবার আকুলতায় প্রভাকরের মুখে একটা তেল-তেলে কৌতূহল দেখা দিল : 'একটু শুনি ব্যাপারটা।'

'একদিনে সব শুনলে চলে? হবে আস্তে আস্তে।'

'দেখতে কেমন? সুন্দরী তো?'

আবার সেই উদ্ভট কৌতূহল। বিকাশ একটু হাসল।

'বললুম তো, হবে আস্তে আস্তে।'

'গার্ড!' —নিরাশভাবে নিশ্বাস ফেলল প্রভাকর।

হেনার গন্ধটা সুনুকে ছাড়িয়ে তার বৃত্তটাকে আরো দূরে নিয়ে যাচ্ছিল। কলকাতায় বেলা দশটার রোদ। সার্কুলার রোডের বাস-স্টপের সামনে ব্যাগ কাঁধে মনীষা, অফিসে বেরিয়েছে।

['কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে তোমায়?'

'কী করি, বলো। চাকরিতে এক ধাপ প্রোমোশন।'

মনীষা চুপ। জোর করে বলতে পারছে না—'তুমি যেয়ো না, তুমি গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

মনীষার চাকরিতে বাইরে ট্রান্সফারের সুযোগ থাকলে তাকেও যেতে হত। বাবা রিটায়ার করেছেন, দুটো ভাই স্কুল-কলেজে পড়ে, চাকরি মনীষার খুব দরকার, প্রোমোশন আরো দরকার।

'দু-একটা চিঠি লিখবে তো?']

বৃত্তটা মিলিয়ে গেল। প্রভাকর কথা বলছে।

'এই, কাল বিছানা-পত্তর নিয়ে আমার এখানে চলে আয় না। এ বাড়ীতে একটা ঘর তো পড়েই থাকে, তোর কোনো অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ, দরকার হলে আসব। কিন্তু—' বিকাশ এবার তার সংশয়ের মধ্যে ফিরে এল : 'ব্যাপার কী বল্ তো? আমার সন্দেহ হচ্ছে, এখানকার লোকে শশাঙ্ক কাকাকে বোধ হয় খুব পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করবে কী!' —সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রভাকর বললে, 'ও'কে লোকে ভয় পায়।'

'ভয় পায়—? কেন?'

'মানে—এস্কিউজ মী—তোর সেণ্টি-মেণ্টে হয়তো ঘা লাগবে—'

'না—লাগবে না। শশাঙ্ক কাকা এত ভীতিকর কেন?'

প্রভাকর একটু রহস্যময়ভাবে হাসল : 'আমার পদবীটা মনে আছে? নিয়োগী।'

'তা থেকে কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মানে, নিয়োগীপাড়ায় যে-সব ভাঙা-চুরো বাড়ী দেখেছিস তাদের কোনোটায় আমার পিতৃপুরুষও থাকতেন। হয়তো এখনো খোঁজ করলে দু'একটা আমবাগানের শেয়ার-টেয়ার পেতে পারি। কিন্তু বাবা কেন

হেক্টেয়ারের ওই সাবেক নিয়োগীদের উদ্যানে। কী যে জমিদারি, ভাবতে পারবি না। আমরা এককালে থেকে ইলেক্-শনের পার্টি—সবাইকে নিমন্ত্রণ। অন্যান্য শরিকদের ঠকিয়ে তাদের কত জমি-জমা যে পেটে পুরেছেন ঠিক নেই। সবচেয়ে ইণ্টরেস্টিং—' প্রভাকর থামল : 'ও বাড়ীতে একটা পাগল আছে, দেখে থাকবি বোধ হয়।'

বিকাশের মুখে কথাকে বেরিয়ে এল : 'মেজদা!'

'হুঁ, মেজদা। লোকে বলে, তাকে গাঁজার সঙ্গে ধুতরো বীজ খাইয়ে—'

'প্রভাকর!'

প্রভাকর বললে, 'ড্রপ ইট। হয়তো সবই শোনা কথা। তবু যা রটে তার সবটাই মিথ্যে হয় না। আমিও টের পেয়েছি। আসবার পরে এমনভাবে আমার পেছনে লেগেছিলেন যে চাকরি যায়-যায়! অনেক কষ্টে সামলেছি। জানিস, লোকটা এমন রুট যে এখনো স্ত্রীকে মারে। একবার সিঁড়ি থেকে লাথি মেরে—'

চমকে উঠে বিকাশ বললে, 'থাক—থাক।'

প্রভাকর তিক্তস্বরে বললে, 'হাঁ, এ-সব আলোচনা না করাই ভালো। টু অগ্লি। সেইজন্যেই বলছিলুম, ও বাড়ীটা কার্সড্—ওখানে তুই থাকিস নি। তারপরে গত বছর সেই সুইসাইডটা—'

চমকটা আরো প্রচণ্ড হয়ে লাগল বিকাশের : 'কার সুইসাইড?'

বলতে বলতে নিজেই বোধ হয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল প্রভাকর। তেমনি বিস্বাদ ভঙ্গিতে বললে, 'থাক আজ, নিজেই সব শুনতে পাবি এর পরে। তবে চটাসনে লোকটাকে। ভালো করতে না পারে, বসিয়ে দিতে ঠিক পারবে।'

'আমার সঙ্গে শত্রুতা হবে কেন?'

'যারা শত্রুতা তৈরি করতে জানে তাদের কেন-র দরকার হয় না রে, আকাশ থেকে টেনে নামাতে পারে। ড্রপ ইট। চা খাবি একটু?'

ঠোঁটে দাঁত চেপে ধরে বিকাশ বললে, 'না।'

বাইরে হেনার গন্ধটা বিস্বাদ হয়ে উঠছিল। নিয়োগীবাড়ীর ঠান্ডা ছায়া-গুলো ক্রমশ নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর আর বীভৎস রূপ ধরছে। কিন্তু এর মধ্যে ওই মেয়েটিকে—সুনুকে—যার নাম দিয়েছে সে সোনালি—তাকে কোথাও মিলিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, কোথাও না!

(ক্রমশ)

ইন্দাস

বনশ্রী রায়

বর্ধমান জেলার ক্ষুদ্র এক গ্রামের নাম লোছ্না। এ গ্রামটি আবার বাঁকুড়া জেলার একেবারে গা ঘেঁষে বলা যায়। অনেক চাষিবাসি দরিদ্রের বাস। ধনী একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পার্শ্ববর্তী গ্রামটিই হল 'ইন্দাস'। এখানেও দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের বাস। এক সূত্রধর বৃদ্ধা 'ফুলকুমারীর' কুঁড়ে ছিল সে গ্রামে। বৃদ্ধার তিন ছেলে, সকলেই যা-হোক কাজ-কর্ম করে তবু ফুলকুমারী কিছু না কিছু কাজ করবেই। বসে থাকা তার পক্ষে মুস্কিল। একদিন বৃদ্ধা কোন দরকারে বার হয়েছিল ভর-দুপুরেই—ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। পথের মাটিও তখন তেতে আগুন। লোছ্না গাঁয়ের উত্তর দিকে 'উদয় সায়র' নামের যে দীঘি, তারই কাছাকাছি পোঁছে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধা বসে পড়েছিল বিশ্রামের আশায়। নিমগাছের ছায়ায় ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাণটা শীতল হল বৃদ্ধার। শরীর জুড়িয়ে গেল। এবার ওঠার কথা ভাবছে ফুলকুমারী, এমন সময় দেখতে পেলে কোথা থেকে একটি অপূর্ব সুন্দর শিশু ছুটে এল সেই নির্জন স্থানে। স্থানটি যেন হেসে উঠল মুহূর্তে। শ্যাম-গায়ের রং, কিন্তু রূপের যেন হাট বসেছে সর্বাঙ্গে! গায়ে সোনার অলংকার ঝলমল করছে! পায়ে নূপুর বাজছে ঝুম্-ঝুম্ শব্দে! বৃদ্ধার কাছে ছুটে এসেই আধো-আধো আব্দারের মিষ্ট গলায় বালক বললে 'ও বুড়িমা, আমায় তুলে নাওনা...... নাওনা গো তোমার ঝাঁকায় চড়িয়ে......'

বুড়ি তো অবাক! ঝাঁকায় উঠবে কি? এই দুপুর রোদ, কাঠ ফাটছে আর কোন পাষাণী মা এমন করে কোলের শিশুকে পথে ছেড়ে দিয়েছে গো? আবার গায়ে এত গয়না শুদ্ধ! কে তুই যাপধন? ঘর কোথা তোর? একমুখ হাসে শিশু; বলে 'অনাথ বালক আমি ফিরি পথে পথে, যে ডাকে আমারে আমি চলি তার সাথে।' বুড়ি ভাবলে বোধহয় মা বকেছে, তাই রাগ হয়েছে ছেলের। পালিয়ে এসেছে ঘর থেকে ছুটে—তাই আদর করে বললে—'যা যাপ-ধন! ফিরে যা ঘরে! মার আঁচলের নিধি কেন ঘুরেছিস পথে পথে বাছা?' একথায় শিশু হেসে কুটিকুটি। বুড়ি তো এবার চোখ রাঙাতে যাচ্ছিল কিন্তু সহসা বালকটি নিজ মূর্তি গ্রহণ করলেন। অতি ভীষণ ও আশ্চর্য সেই ভুবন-মোহন স্বরূপ। ফুলকুমারী মূর্ছিতা হল। চেতনা ফিরলে তাকে নারায়ণ বললেন—

অনাদি অব্যয় আমি, নাহি মোর সীমা
অব্যক্ত অচিন্ত্য আমি অনন্ত মহিমা
দেখা দিনু তোরে আজি নরদেহ ধরে
নিয়ে চ আমারে বুড়ি তোর হরিপুরে
'বাঁকুড়া' আমার নাম সর্বঘটে স্থিতি
বহুকাল হতে মোর হেথা অবস্থিতি!

বৃদ্ধা ফিরে এল নিজ গ্রামে আচ্ছন্নের মতো। সময় নেই অসময় নেই কেবলই কাঁদে, কখনও কখনও কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়ে! ইন্দাস হরিপুরে তার তিন ছেলেরই বাস। তারা জড়ো হয়ে একদিন মাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, 'কি হল তোমার মা? কেন কাঁদো দিনরাত তুমি? তোমার এই ভাবান্তর তো আর সহ্য করতে পারি না গো!' কিছুতেই কিছু বলে না বৃদ্ধা। অবশেষে অনেক অনুনয় বিনয় করল ছেলেরা (রাজ, কৃষ্ণ আর নীলু) তখন ফুলকুমারী বললে, 'বাবা, ঠাকুর পেলুম, তিনি আসতে চাইলেন এই গ্রামে—আমি আজও আনতে পারিনি।' সে আবার কি? বুড়ি তখন আস্তে আস্তে উদয় সায়রের পাড়ে লোছ্না গ্রামের ঘটনা ছেলেদের কাছে বর্ণনা করে শোনান। আশ্চর্য ঘটনাই বটে। ছেলেরাও আশ্চর্য হল কিন্তু অবিশ্বাস করলে না কেউ। সাত-পাঁচ পরামর্শ করে মাকে প্রবোধ দিয়ে তারা বার হল গ্রামের যাঁরা গণ্যমান্য তাঁদের শরণ নিতে। সমস্ত শুনে সবাই বিস্মিত। যারা অবিশ্বাসী তারা কৌতুক করতে আরম্ভ করলে, যারা ধর্মভীরু তারা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। যাই হোক, তবু জোগাড় হয়ে গেল ঘট, আসন ও পুজোর নানাবিধ উপকরণ। সবাই মিলে তা নিয়ে গেল সেই নিমগাছের গোড়ায়। মিথ্যা প্রবঞ্চনা কিনা তা পরীক্ষা করতে অসংখ্য মানুষজন গিয়ে দাঁড়াল গাছের আর পুকুরের চারদিকে। কিন্তু হায় কোথায় ঠাকুর? ভুবন-মোহন রূপ তো নয়, কোন কিছু রূপেই দেখা গেল না ভগবানকে! তবে রে বুড়ি? এত মিথ্যাবাদী তুই? গ্রামবাসীরা হৈ-হৈ করে উঠল। কেউ হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে আরম্ভ করলে ফুলকুমারীকে। কেউ কেউ বললে, 'দাও বলিদান দাও ঐ বেটিকে।' ব্যাস! সবায়েরই বেশ মনে ধরল কথাটি। ঠিক কথা; যেমন ঠাকুর-দেবতা নিয়ে মিছে কথা বলেছে তেমনি শাস্তি হোক ওর—দাও, বলি দাও ওকে।

বৃদ্ধার তিন ছেলেই একথা শুনে হাহাকার করে কেঁদে উঠল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তাদের অনুনয়-বিনয়ে আরো উন্মত্ত হয়ে উঠল জনতা। কিসের ছাড়াছাড়ি? শাস্তি দোবোই আমরা। ঠিক এই সময় শোনা গেল দৈববাণী। আদেশ হল বৃদ্ধাকে উদয় সায়রের জলে নেমে ডুব দেবার জন্য। তাই করলে ফুলকুমারী। আর মাথা তুলতেই সকলে স্তম্ভিত হয়ে দর্শন করলে—

সিংহাসন সুন্দর ডাইনে বামে যোড়া
যাহার উপরে শোভে আপনি 'বাঁকুড়া'
দশ অবতার প্রভুর কচ্ছপ মূরতি
নাভিপদ্মে শোভে ব্রহ্মা প্রভু সৃষ্টিপতি।

এই 'বাঁকুড়া-রায়েরই' প্রতিষ্ঠা হল ইন্দাস গ্রামে। তদবধি এইস্থানেই এঁর বাস। বিষ্ণুপুর-রাজ নিজে থেকে বহু ভূ-সম্পত্তি দিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রধর-দের দিয়েছিলেম শিবের সমান সম্মান ও আসন। আর বাঁকুড়া-রায়ের বিষয়ে পুঁথি-খানি লিখেছিলেন কবি সীতারাম দাস। ইনি কায়স্থ সন্তান ছিলেন। মাতুলালয় ছিল ইন্দাসে। একদিন ইনি জামকুরি গ্রামের পথে চলেছেন, পথের মাঝে দেখা দিলেন এসে স্বয়ং বাঁকুড়া রায়। আদেশ হল পুঁথি রচনার। শিহরিত কবি সজল নেত্রে প্রার্থনা করলেন 'মূর্খ আমি কেমন করে তোমার মহিমা বর্ণনা করবো প্রভু?

ভয় নেই, আমিই তোমার অন্তরে জেগে থাকবো লেখবার সময়। এরপর কিছুকালের জন্য পাগল হয়ে গেলেন কবি। গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়াতে লাগলেন অস্থির পায়ে। অবশেষে বাগ্‌দেবী সহায় হলেন তাঁর। সহায় হলেন আরো একজন, এঁর নাম নারায়ণ পণ্ডিত। চল্লিশ দিন লাগল পুঁথিখানির সমস্ত অধ্যায় কয়টির রচনা সমাপ্ত হতে। এক হাজার চার সালে শেষ হয়েছিল পুঁথির রচনা। প্রভুর এই লীলা-গ্রন্থখানি আজ অবশ্য আর ইন্দাসে নেই। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় এই পুঁথিখানি সংগ্রহ করে এনে রেখে দিয়ে-ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে। এই বইখানি সাড়ে তিনশো বছরের পুরোন গ্রন্থ—কবি সীতারামের রচনা।

সাড়ে তিনশত বছরের মঙ্গল-গাথার কিছু কিছু অবলম্বন করে ফের আবার একখানি পুণ্য-গীতিকাব্য রচিত হয়েছিল শ্রীফকিরচন্দ্র বেজ মহাশয়ের দ্বারা। ইনি অবশ্য জাতিতে ছিলেন পরামানিক। এ পুস্তক আজও বিদ্যমান রয়েছে।

পৌষ সংক্রান্তিতে আজও মেলা বসে। ভক্ত সমাগমও হয়ে থাকে। জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে শূন্য প্রান্তর এবং উদয় সায়রের পুণ্য-বারি আজও বহন করে নিয়ে আসে ভক্তরা। আজও বিশ্বাস করে বাংলাদেশের অনেক মানুষ যে বাঁকুড়া রায় আছেন, এই পৃথিবীর এক অতি নগণ্য গ্রামে মানুষের ইচ্ছা পূরণের জন্য অহেতুক কৃপা পরবশ হয়ে অবস্থান করছেন এখনও। আকুল প্রাণে ডাকলে আজও তাঁকে শিশুর রূপেই দেখা যায়।

তবেই আবার আলো ॥

দীক্ষিতরঞ্জন বসু

এ আমার অভিজ্ঞতা :
আমি এক অনভিজ্ঞ প্রবাস-পথিক
সুবিশাল ইতিহাস সমুদ্র-সৈকতে।
ইচ্ছের আবর্তগুলি রক্তের বুদ্‌বুদ্‌,
মুহূর্তে অনেক হত্যা কঠোর শাসন;
আমি, তুমি হন্তারক, প্রতিদিন আমাদের
প্রত্যেকেই নিয়মিত ফাঁসির আসামী।

অনুভবে শৃঙ্খলিত সব ক্রীতদাস,
ক্রমে ক্রমে সকলেরই সাহারা শরীর।
কোনোই সান্ত্বনা নেই, শুধুই আক্ষেপ;
বন্ধনের যন্ত্রণার শুধু বেড়াজাল!
বিক্ষত সমস্ত চোখ পিপাসা-আকুল,
একে একে একদিন সবাই মরুভূমি;
সহসা ভাষার যাদু নিস্তব্ধ সেখানে,
যখন নিশ্চিহ্ন আশা শূন্যতা আড়াল;
তখনই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঘোর অন্ধকার,
অখণ্ড আলস্যে পিণ্ড সমগ্র পৃথিবী।
সেখানে মৃত্যুর ছায়া, সেই ছায়া কেটে
তবেই আবার আলো হঠাৎ কখনো
ঘটে যদি অকস্মাৎ সূর্য-বিস্ফোরণ।

সব সময় আমার সময় ॥

কবিরুল ইসলাম

এক বুক ভালোবাসা নিয়ে তুমি কোথা যাচ্ছ একা-একা
    এই সাতসকালে
        আমাদের এ-পাড়া আসবে না?

তোমার দেশলাই আছে? স্টোভ ধরাবার সরঞ্জাম
তুমি এলে করতে পারি, চেয়ে-চিন্তে কিছু প্রাতরাশও
        আনতে পারি, কিছু খড়কুটো...
        তাহলে দুপুর-সন্ধ্যা ভালো কাটতে পারে
        এবং আমার রাত্রি
                পৌষ মাস।

কোথা তুমি যাচ্ছ একা-একা
এই সকালের অকূল রোদ্দুরে
        আমাদের এ-ঘরে আসবে না?

এক বুক ভালোবাসা নিয়ে কোথা যাচ্ছ একা-একা
    এই সাতসকালে
        আমার এ-ঘরে বসবে না?

এখন না এলে এসো অবকাশ-মতো
সব সময় আমার সময়।

নতুন ঠগী

সেই থেকে নির্মলদা চেঞ্জ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। নেহাৎ খুব পরিচিত বা বহুদিনের চেনা খদ্দের না হলে সরাসরি মুখের উপর স্পষ্ট বলে দেন—নেই, বা হবে না। ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য। সিনেমা হলের লাগোয়া টি মার্টের মালিক নির্মল চাটুজ্যে এ-পাড়ার গেজেট কাম স্ট্রীট ডাইরেক্টরী। বেপাড়ার লোক পাড়ায় এসে ঠিকানার সন্ধান যখন পোস্ট অফিসে গিয়েও পায় না, জনশ্রুতি, পিওন তাকে নির্মলদার দোকানেই পাঠিয়ে দেয়। চা বিক্রির ফাঁকে ফাঁকে কবে কখন যে নির্মলদা গোটা পাড়াটার মন কিনে ফেলেছেন, সুনু তা বলতে পারবে না। সেই স্কুল-লাইফ থেকে নির্মলদার দোকানে আড্ডা মেরে আসছে। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে ছাত্র-ঠেঙানোর চাকরীতে ঢুকে আজো ছুটির দিনে বা সন্ধ্যেবেলায় একবার নির্মলদার দোকানে দু' দণ্ড সময় কাটিয়ে না এলে মনে হয় সারাদিনের কাজের মধ্যেও কি যেন বাকি পড়ে আছে।

সাতদিনে নিয়মমত দেড়দিন নির্মলদা তার দোকান বন্ধ রাখেন। বাকি ক'টা দিন দুপুরের খাবার সময়টুকু ছাড়া সকাল আটটা থেকে রাত আটটা টি মার্টের পাল্লা-দেওয়া দরজা দু' পাশের দেওয়ালে ঠেসানো থাকে। কাউন্টারের সামনে ফুট-তিনেক ফাঁকা জায়গাটার দুপাশে গোটা-দুয়েক চেয়ার আর খালি চায়ের পেটিতে বসে পাড়া-বেপাড়ার ছোঁড়া-বুড়ো, কাচ্চা-বাচ্চা সবাই যে-যার সময়মত পাজামা গেরুয়া পাঞ্জাবীর উপর কালো জহর কোট চাপানো কাউন্টারের ও-পাশের লোকটির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান, উত্তম-সুচিত্রা, মায় অ্যাপোলো-সোয়ুজ নিয়ে আলোচনা করে যান। খোস গল্পের ফাঁকে ফাঁকে নির্মলদা একগাল হাসি নিয়ে খদ্দেরের চাহিদা অনুযায়ী, পেটি থেকে চা বার করে মিনিটখানেক ধরে মিশিয়ে, ওজন করে, দোকানের লেবেল-আঁটা ঠোঙায় ভরে, রবারের ফিতে দিয়ে বেঁধে হাতে তুলে দিয়ে পয়সা বুঝে নিতে নিতে ক্রেতার শারীরিক, পারিবারিক সংবাদ নেন। সংবাদ খারাপ হলে সদাহাস্যময় মুখটা কালো হয়ে যায়। আড্ডার তুফান নির্মলদার মুখের রংয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। সুনুরা জানে কখন থামতে হবে। কারণ, এই লোকটাকে সুনুরা ভালবেসে ফেলেছে।

পাঁচ, দশ, একশ' টাকার নোট ভাঙাতে হরবখত লোক আসে নির্মলদার দোকানে। অন্য দোকানে না পেয়ে সবাই এখানে আসে। দাদা কাউকে ফেরাতে জানেন না। সুনু দেখেছে—একশ' টাকার নোট ভাঙাতে লোক এসেছে। ক্যাশে অত টাকা নেই। নির্মলদা তক্ষুনি পাশের সিনেমা হলে ছুটলেন টাকা ভাঙাতে। অথচ যার জন্য নির্মলদা দোকান ছেড়ে ছুটে গেলেন, তাকে সুনু দেখেছে নির্মলদার গুনে-দেওয়া চেঞ্জ হাতে নিয়ে প্রতিটি নোট আলোর দিকে ধরে আঙুলে বাজিয়ে বারকয়েক গুনে মিলিয়ে নিতে। একদিন সুনু রীতিমত রেগে গেল। দুপুরবেলা—হল তখন বন্ধ। দোকানে টাকা না থাকায় নির্মলদা প্রায় এক স্টপেজ দূরে কুণ্ডুদের হার্ডওয়ারের দোকানে গিয়েছিলেন টাকা ভাঙিয়ে আনতে। টাকার চেঞ্জ নিয়ে ভদ্রলোক চলে যেতে সুনু একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল—

: এটা অত্যন্ত অন্যায় রকম বাড়াবাড়ি নির্মলদা।

: কোন্‌টা রে?

: এই যে এত কষ্ট করে নোট ভাঙিয়ে এনে দিলেন, তার জন্য কি একটা থ্যাঙ্কস আপনি পেলেন? আর আপনার এই ভালো-মানুষীর সুযোগ নিয়ে সবাই আসে আপনার কাছে, আপনাকে খাটিয়ে নিতে। কই যাক দেখি অন্য কোন দোকানে—একশ' টাকা ছেড়ে দিলাম, পাঁচ টাকার চেঞ্জ পাবে?

সারাটা মুখে হাসির ঝলক তুলে নির্মলদা বললেন—

: কী যে বলিস। আমরা দোকানদার। খদ্দেরের ফাই-ফরমাস না খাটলে তারাই বা আসবে কেন।

: এরাও কি আপনার খদ্দের নাকি? স্পষ্ট বিদ্রূপের সুর সুনুর গলায়।

: আজ না হলেও, কাল ত' হতে পারেন। তুই কি ভাবিস এমনি এমনি

অঙ্গনা

নারী সমিতি, প্রদর্শনী, ফ্যাশান শো

ফটো : অমৃত

সমাজসেবার সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি নিজের আসন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উন্নতির কথা ভেবে গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তন করেছিলেন ব্রতচারী আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর স্ত্রী সরোজনলিনীর উপরও কর্তব্যের গুরুভার এসে পড়েছিল। শিক্ষাবিহীন এবং অসহায় নারী-সমাজের আর্তি তাঁকে বেদনাতুর করেছিল। এঁদের উন্নতির চিন্তায় তিনি একান্ত ব্যাকুল। গ্রামীণ নারীদের শিক্ষা এবং কর্মের সহায়ক হিসাবে তিনি ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন প্রথম মহিলা সমিতি। যে-কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, তা অসমাপ্ত রইলো। মৃত্যু এসে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেল নিতান্ত অকালে।

স্ত্রীর আরম্ভ-করা কাজ এবার হাতে নিলেন গুরুসদয় দত্ত এবং তাঁর গুণমুগ্ধের দল। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা হলো সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির। তারপর থেকে বছরের পর বছর যত পার হয়ে গ্যাছে ততই সমিতি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সমিতির নিজস্ব ভবনে পরিচালিত হয় শিল্পশিক্ষা বিভাগ। এখানে নানা বিভাগে মেয়েরা কাজ শিখে ভবিষ্যতের অর্থ-

সমিতির স্বনির্ভর গড়ে তোলেন। শুধু শিল্পশিক্ষায় কাজ শেষ হয় না। মেয়েদের শিক্ষার কথাও ভাবতে হবে। তাই আছে প্রাইমারী শিক্ষার বন্দোবস্ত, বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র পরিচালনা আরেকটা সমিতির অন্যতম পর্বের অঙ্গ। শুধু শহর কেন্দ্রেই নয়, গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষার আসর বসে। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে অনেকে আসেন। অশিক্ষার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য এঁদের আগ্রহ এবং সমিতির উদ্যম সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু সমিতির বিরাট কর্মসূচীর তালিকায় আরো অনেক তথ্য লুকিয়ে আছে। একটু খোঁজ নিলে আমরা জানতে পারবো, এখানে টিচার্স ট্রেনিংয়েরও বন্দোবস্ত আছে (সিনিয়র)। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের সুযোগ কম। অথচ নিয়ম যে, ট্রেনিং ছাড়া যথার্থ শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। সেদিক থেকে সিনিয়র টিচার্স ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে সমিতি অনেকের প্রশংসাভাজন হয়েছে। [illegible] আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমিতির আসল লক্ষ্য বিশেষ করে দেশকে অশিক্ষা মুক্ত করা। তাই গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনার পরও এঁদের কিছুটা দায়িত্ব থেকে যায় আর তা, অস্বীকার করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই মূল কেন্দ্রে পরিচালিত হয় বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়। সন্ধ্যাবেলা এই বিদ্যালয়-কেন্দ্রে শিক্ষাদান করা হয়।

এই স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যেই সমিতি নিজেকে আটকে রাখেনি। এরপরেও আছে অনেক কথা। সমিতির নিজস্ব হ্যান্ড-লুম প্রোডাকসন ইউনিট আছে। শিল্প-বিভাগের কথা তো আগেই বলেছি। তাই এঁরা নিজেদের শিল্প-বিভাগের জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবস্থা করেন নানা জায়গায় প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

সমিতিতে মেয়েদের থাকবার বন্দোবস্ত আছে। এই হোস্টেলে স্থান পান সাধারণত বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার এবং শিল্প-বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তাছাড়া সমিতি সবসময়েই যুগের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে চায়। তাই এঁদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে একটি সুসংগঠিত ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্ল্যানিং সেন্টার। দেশ গড়ার কাজে সরকারী আহ্বানেই এই ব্যবস্থা। তাছাড়া আছে ক্লিনিক ফর মাদার্স অ্যান্ড বেবীজ। এই দুটি উদ্যোগ গ্রামেও পরিচালিত হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত প্রদেশে সমিতির রিলিফ ওয়ার্ক বিশেষ প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে সমিতি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে বারবার। অন্য নানা ব্যাপারে সমিতি এগিয়ে এসেছে পূর্ণ শক্তি নিয়ে। নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতায় তাঁরা সকলের নজর কেড়েছেন।

সমিতির ক্যান্টিন আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এখান থেকে নানা জায়গায় নিয়মিত টিফিন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

এবার আসা যাক বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের কথায়। এই সমিতিটি পূর্ণাঙ্গ। প্রাইমারী ও জুনিয়র হাই স্কুলসহ সমিতির একটি শিল্প-বিভাগও আছে। এই আশ্রম অংশতঃ আবাসিক।

ক্যাপশান লেখা ঃ

বেশ কিছুদিন আগে তাসখন্দে এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। দেশবিদেশের বহু অভিনেতা অভিনেত্রী এবং পরিচালকরা এখানে মিলিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত সোভিয়েত অভিনেত্রী আল্লা [illegible] এবং সেনেগালের অভিনেত্রী সাইরা এন দিয়াই।

যদিও বিধবাদের আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যেই এই আশ্রমের সৃষ্টি, তবুও বর্তমানে বিধবাদের সঙ্গে অবিবাহিত মেয়েদেরও আশ্রয় দেওয়া হয়।

এই বিধবা আশ্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আবাসিক ছিলেন হেমলতা ঠাকুর, সাধারণ্যে যিনি 'বড়মা' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর আশ্রম তাঁর সস্নেহ ছায়ায় বেড়ে উঠেছে। এ-সময়ে আশ্রমের দায়িত্বও ছিল তাঁরই উপর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে-কাজ তিনি নিষ্ঠাভরে পালন করে এক অপূর্ব নজীর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সমিতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। সেই সঙ্গে পুরনো যুগের সঙ্গেও আমাদের যোগসূত্র একরকম ছিন্ন হয়ে গেল।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্যতম গর্ব এর অন্তর্ভুক্ত [illegible] নারী সমিতি। দূর গ্রাম এবং শহরে এসব সমিতির অবস্থান। এরা নিজেদের পরিচালনভার তুলে দিয়েছে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির হাতে। যথেষ্ট দায়িত্বসহ সমিতি এই গুরুভার বহন করে চলেছে।

সম্প্রতি এক বিরাট কর্মসূচীর মধ্যে উদ্‌যাপিত হলো সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির ৪৪তম বার্ষিক উৎসব। উৎসবে সভাপতির আসন নেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। তিনি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, সমাজসেবায় এই সমিতির নিষ্ঠা এবং প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ [illegible]। অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ় করে তোলায় এ-ধরনের কর্মকাণ্ড যত বিস্তৃত হয় ততই মঙ্গল। তিনি সরোজনলিনী [illegible] প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, নিজের [illegible] দিয়ে তিনি দেশের মেয়েদের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধির ফল এখন আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি। [illegible] শ্রীমতী [illegible] গুহ এবং শ্রীমতী রেণুকা রায়ও বক্তৃতা করেন। এঁরা দুজনেই সমিতির প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এঁদের ভাষণে সমিতির বিরাট উদ্দেশ্য ও বিস্তৃত কর্মসূচী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা সকলকে আকর্ষণ করে।

সমিতির তৈরি সামগ্রী বিক্রির জন্য এঁদের আন্তরিকতা স্বাভাবিক। এজন্য বাৎসরিক প্রদর্শনী ছাড়াও এঁরা [illegible] বিক্রয়-কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেন। এবার আয়োজন করেছিলেন একটি অভিনব ব্যবস্থায়, বিশেষভাবে মহিলা সমিতির পক্ষে। সমিতির তৈরি সামগ্রী দিয়ে এঁরা আয়োজন করেছিলেন ফ্যাশান শো-র। নানারকম পোশাকে এবং বিচিত্র সাজে মঞ্চের উপর দিয়ে মেয়েদের ঘনঘন আনাগোনা এবং ঘোষিকার কণ্ঠস্বর সকলকে প্রায় [illegible] করে রেখেছিল।

সেই বাচ্চা মেয়েটি যখন ফ্রক পরে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ায়, সেখান থেকেই ফ্যাশান শো-র শুরু। তারপর সান্ধ্য পোশাক, প্রাত্যহিক পোশাক এবং বিভিন্ন সাজপোশাক। [illegible] মোটামুটিভাবে জমে ওঠে। বাটিক এবং [illegible] [illegible] সত্যি বৈচিত্র্যে মনোরম হয়েছিল। [illegible] [illegible] বেশ মানানসই সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। কিন্তু শাড়ি বা স্কার্টের সঙ্গে জামার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এতে অবশ্য ফ্যাশান শো-র আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি।

জানতে ইচ্ছে হয়েছিল এঁদের ফ্যাশান শো-র। [illegible] করেছিলাম। উত্তরে জানতে পারলাম, আমাদের সমিতির তৈরি পোশাকের আরো প্রচারের জন্যই এই ব্যবস্থা। [illegible] আর কোন প্রচারের উপায় নেই। বাৎসরিক প্রদর্শনী ও বিক্রয়-কেন্দ্রে মোটামুটি এসব জিনিসপত্র প্রচারলাভ করে। তবু বাৎসরিক উৎসবে এত লোকের সমাবেশের হাতছাড়া না করে [illegible] সবচেয়ে উপায় হলো ফ্যাশান শো। তাই এই [illegible]।

—[illegible]

পাহাড়ে মেয়েরা

ক্যারাবিনারে আর দেওয়ালে ক্র্যাম্পন আটকে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে পিটন গাঁথা
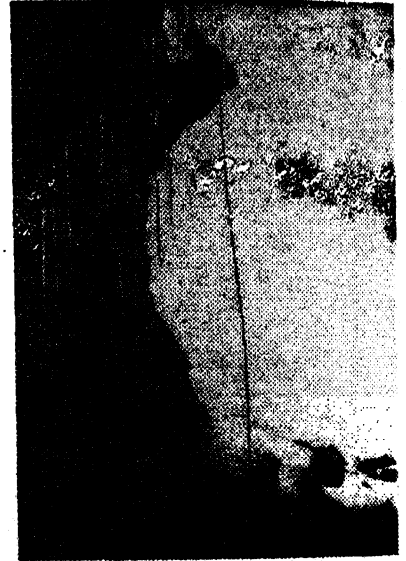
বরফের পাহাড় বেয়ে নামা

সুজয়া গুহ

"সুইং দিয়ে চল। সারা শরীর দুলিয়ে মনরো সুইং দাও।" শুধু হুকুম দিয়ে ক্ষান্ত হবার পাত্র নয়। নাকের সামনে নেচে নেচে এগিয়ে গেলেন। "দেখ এই-ভাবে—ডান পা যখন এগোবে, তখন ডান কাঁধ সামনে ঘুরিয়ে আনবে। আর বাঁ-পায়ের বেলা বাঁ কাঁধ। তাহলে ভারী বোঝা পিঠে নিলে একটুও পরিশ্রম হবে না।"

শ্রমে আমাদের কথা ফুরিয়ে গেছে। আমরা এগারোজন মেয়ে তাই নীরবে অনুসরণ করি। চীরবাসা থেকে একটি চড়াই এক নিঃশ্বাসে উঠতে হয়েছে। একটুও থামতে দেয়নি। অবসন্ন শরীর চাইছে একটু বিশ্রাম। আর এখন কিনা ক্লান্ত শরীরে মোচড় দিয়ে মনরো মার্কা হণ্টন প্রদর্শন করতে হবে?

শীর্ণ পথরেখা—তাও জায়গায় জায়গায় বিচ্ছিন্ন। কোথাও আবার পথের ওপর ক্ষীণ জলধারা বয়ে চলেছে—জায়গায় জায়গায় কাদাহীন শ্যাওলার আস্তরণ। পা পিছলে আর রক্ষে নেই, "আর এ পথে কী নিদারুণ পায়ের নৃত্য।" অবশ্য চিত্ত ... ভাবনাহীন নয়। সাবধানে এগিয়ে

চলেছি ভুজবাসের দিকে। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন মেজর সুরৎ সিং—ত্রিমংয়ের অস্থায়ী অধ্যক্ষ। উনি উত্তরকাশী থেকে আমাদের সঙ্গে এসেছেন। গতকাল তিনি গোমুখে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে এতদিন ধরে ছেলেদের বেসিক কোর্স চলছিল। আজ তারা নেমে যাবে নিচে। মেজর তাই সদ্য আগত ডাক্তারকে তার প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন। সেই ডাক্তারই এখন চলেছেন আমাদের সঙ্গে।

ডাক্তার মানিকটালা, পাঞ্জাবী চৌখস তরুণ। সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে ওর চোখ দুটি—সারাক্ষণ খুশিতে ভরে আছে। সবসময় কি করি, কি করি ভাব।

কাল মেজর গোমুখে যেতেই ভেবে-ছিলাম স্বরাজ। এমন কি উইন্ডপ্রুফ চাপিয়ে ইভনিং ওয়াকের তোড়জোড় করছি। এমন সময় শুনি ডাক্তারের পরোয়ানা, "খাও খাতা কলম নিয়ে এসো ক্লাস নেবো।"

চীরবাসার এই মনোরম অপরাহ্ন। নদীর গর্জন, চীড়ের ছায়া, পাথরের বৈচিত্র্য আর জুনিপারের জঙ্গল—সব মিলে এক অপরূপ পরিবেশ। সারাদিন আজ কেন

অবসর পাইনি গুলজার করার। মেজাজ বেজায় বিগড়ে গেল। মনের ভাব গোপন রেখে তুরুক চালি, "মেজর সাবের কাছে শুনেছিলাম কৃপাল স্বামীর কথা। ভাবছিলাম একটু দেখা করে আসি।" মেজর সাবের সাধুভক্তি সুপ্রচারিত। তাই আপত্তি উঠলো না, তবে পাহারায় চললেন।

এত কাছেই সাধুর কুঠিয়া। ভেবেছিলাম যাতায়াতে অনেকটা সময় কাটবে। দুটি ছোট ছোট কাঠের কুঠুরী। একটি কাঠ বোঝাই অপরটিতে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন সাধুজী। সকালে ওকে দেখেছিলাম। মেজর সাবের কাছে ওষুধ নিতে এসেছিলেন। খড়ম পায়ে ঠুক ঠুক করে এসে দাঁড়ালেন ঠিক যেন কৃষ্ণ ঠাকুর। কৃশ তনু, শ্যামলা রঙ, কিশোর বালক। সর্বাঙ্গে বিভূতি, পরনে কৌপীন, মুখে নবজাত শ্মশ্রু।

আমরা গিয়েছিলাম গান শোনার লোভে—রামায়ণ-মহাভারতের দোহা শুনতে। বলি, "আমাদের একটু গান শোনান।"

কুমে কুমে দাঁত মেলে হাসলেন, "আরে পাগলী মায়ী। তোরা কলকাতার কত খানদানী ঘরের মেয়ে। তোদের আমি

কি গান শোনাবেন?' বিস্ময় মিশ্রিত সুরে ডাক্তারের কথা বললেন। সুরেলা কণ্ঠ বাইরে ফেলে দিয়ে এলেন, পাহাড়ের চৌকাঠ বন্ধ কণ্ঠ হচ্ছে না তো? তা কোন অধ্যায় থেকে শুনবি বল?'

"মহাপর্ব প্রবেশ"।

স্নিগ্ধ চোখ বুজে তিনি শুরু করলেন,

"উদীচ্যাং দিশায়ামেব দিব্যং তিষ্ঠতি বীর্যবান।
মহামেরুর্মহাভাগ শিবো ব্রহ্মবিদাং গতিঃ।।
ময্যামেরুতমহাভাগ ব্রহ্মমুখ্যমব্যয়ম।
ঈশ্বরস্য সদা হ্যেতত্ প্রণমাত্র
যুধিষ্ঠির।।..."

কি অপূর্ব গলা। উদারাতেও গলার কি কারুকার্য, তারাতেও কি দরদ। পরে শুনেছি উনি বর্ধমানের ছেলে। মাত্র তিন বছর এখানে আছেন। কিন্তু তিনি বাংলায় কথা বললেন না। ধীরে ধীরে চীরের ছায়া লম্বা হয়ে এল। তিনি থামলেন। কিন্তু তার সুরের রেশ লেগে রইল আমাদের সবার মনে। মনে হল মহামেরুর শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বুঝি ফিরে এল এই ছোট কুড়ে ঘরে।

কারও মুখে কোন কথা নেই। কৃপাল স্বামীই নীরবতাভঙ্গ করলেন।

'ডাক্তার সাব, আমার হাঁটুর কি হবে? ব্যথা যে কমছে না।' স্বামীজী হাঁটুতে হাত বোলান।

'যাবে কি করে? আপনি যখন আমার কথা শোনেন না, তখন আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।' সাফ্ উত্তর।

কুণ্ঠিত হাসেন স্বামীজী, 'কি করব বল, আমার যে রোজ গঙ্গায় নাইতে যেতে হবে। আর হাঁটুতে কাপড় জড়ানো আমার চলবে না। ও সব আমাদের ছুঁতে নেই।'

'তাহলে ভুগুন।'

'অদৃষ্ট কে ঠেকাবে বল্। শোন মাঈরা। একটি দিনের ঘটনা বলি। সে গত অক্টোবর মাসের কথা। আমি তো প্রায়ই গুরু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমার জীবনের মোক্ষ হল গুরুসঙ্গ আর গুরু-সেবা। তিনি থাকেন আবার গঙ্গার ওপারে, দু' মাইল দূরে। সেদিন তার কুঠিয়া থেকে যখন ফিরছি, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বরফ আর পাথরে হোঁচট খেতে খেতে কোন-মতে গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছলাম। জলের সে কি স্রোত। এদিকে পা ডুবোলেই তলার পাথর সরে যাচ্ছে। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর ভারসাম্য বজায় রেখে কিছুতেই এগোতে পারছি না। জলের ওপর বরফের সরু—ছুরির মতো দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছে। তবে ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। কারণ ঠাণ্ডায় আমার নিম্নাঙ্গ প্রায় অসাড় অবশ।

'শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে উঠে এলাম। ইতিমধ্যে চারিদিকে ঘন আঁধার নেমে এসেছে। অমাবস্যার রাত। দু' মাইল পথ ভেঙে গুরুজীর কুঠিয়ায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পথের কোন নিশানা নেই। কোথায় যেতে কোথায় যাবো। তাই কোন-মতে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে উঠলাম। হিমেল হাওয়া, উন্মুক্ত প্রান্তর আর আমার নিরাবরণ সিক্ত দেহ। কোথায় আশ্রয়? বুঝলাম, এ দেহ আজ আমাকে পরিত্যাগ করে যাবে।

'তবে এগিয়ে চলি। হঠাৎ দেখি পায়ের নিচে ফুল—চারিদিকে ফুল। ব্রহ্ম-কমল, ফেনকমল, হেমকমল, আরও কতো রকমারী রঙবেরঙের ফুল। অন্ধকারে সব ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। আমি একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে, ফুল দিয়ে এই দেহকে ঘিরে ফেললাম। হেমকমল ও ফেন-কমল বেশী করে তোলার চেষ্টা করলাম। এরা মাটি বা বরফের ওপর ফুটে থাকে। গাছ নেই, শুধু পাতা আর ফুল। মৃণালের ওপর বড় বড় পাপড়ির ফুল—জলপদ্মের মতো। হেম-কমল ও ব্রহ্ম-কমলের চারিদিকে তুলোর মতো আঁশ। কিছুটা আরাম লাগল, তবে হাওয়া আটকানো কি এতই সোজা? হাওয়া হয়তো, ছুঁচ। যেখানে লাগছে, যেন রক্ত বেরোচ্ছে। জীবনের অবসান আসন্ন ভেবে নামজপ করতে লাগলাম।

'কিচির মিচির, কু কু, পাখীর কলরোল। দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসছে। পাথরের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে পাখা ঝাপটিয়ে আরাম করে, ওরা রাতের আশ্রয় নিল। বহু পাখী ফুল দেখে, আমার ওপর এসে বসলো। চারিপাশে আরও পাখী, কবোষ্ণ পাখী। ধীরে ধীরে ফিরে পেলাম শরীরের উত্তাপ। জীবনের স্পন্দন ফিরে এল। মনে হল আমি কুঠিয়ার সামনে ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছি। ছোট্ট পাখী, ছোট্ট দেহ। কিন্তু যৌথভাবে কতখানি ওদের শক্তি!'

'একেই বলে, রাখে ঠাকুর মারে কে? তা না হলে ওই হিমশীতল প্রান্তরে কোন মানুষের পক্ষে কি রাত কাটানো সম্ভব? ভোরে পাখীরা কুলা ছাড়লে আমিও কুঠিয়ায় ফিরলাম।'

আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই, 'গান করুন, সেই গান......'

শেষ করতে পারি না। জলদগম্ভীর নির্দেশ আসে, 'ব্যস, আর নয়। শিবিরে ফিরে চল। ক্লাস শুরু হবে এক্ষুনি।' ডাক্তার উঠে বেরিয়ে গেলেন।

বিদায়ক্ষণে সাধুজী প্রসাদ দিলেন, মিছরী ও লাড্ডু। এক ভক্ত দিয়েছিলেন তাঁকে। বারো তেরো জনকে প্রসাদ দিয়ে তাঁর ভাণ্ডার শূন্য। আমরা সংকুচিত হই, 'আপনার জন্যে তো কিছুই রইল না।'

'তোদের দিতে পারলাম, এই তো আমার তৃপ্তি। আচ্ছা তোদের কোলকাতার রসো-গোল্লা থেকে আমার না হয় কিছু ভাগ দিয়ে যাস।' সাধুজী বাংলা ভুলেছেন, কিন্তু বাংলার মিষ্টির স্বাদ ভোলেন নি। ফিরে এসেই সেফালী তাকে একটিন রসোগোল্লা পাঠিয়েছে।

'ক্লাস শুরু করার আগে তোমাদের লেখাপড়ার দৌড় জেনে নিতে চাই। সেই বুঝে তোমাদের ডাক্তারী বিজ্ঞান বোঝাবো।'

'উঃ ডাক্তারের আর শেষ নেই। প্রিন্সি-প্যাল, ডাক্তার—সবার ওপর টেক্কা দিয়ে চলেছেন।' ফিসফিসিয়ে সুজাতা বলে।

সুদীপ্তা সেন। একে একে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেন, অপর্ণা নন্দী ও কমলা সাহা এ বছর বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, শেফালী চক্রবর্তী কেমিস্ট্রিতে এম-এস সি, পারুল দে প্রাইভেটে ইংরেজীতে এম-এ দিচ্ছে, মিলু ঘোষ বাংলায় এম-এ, সুতপা সেনগুপ্ত শারীরতত্ত্বে গবেষণারত—তিন বছর বিদেশে গবেষণা করেছে, সুজয়া গুহ ইতিহাসে এম-এ, কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন, সুজাতা মজুমদার ভূতত্ত্বে এম-এস-সি, কল্পনা রায়চৌধুরী ও আমি ভূতত্ত্বে গবেষণারত।'

"বাবাঃ" ডাক্তার যেন চুপসে যান। "পড়াশুনোয় ভাল না হলে বুঝি তোমাদের অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সদস্য হওয়া যায় না? যাক্ আমার পক্ষে সুবিধেই হল। সংক্ষেপে কোর্স শেষ করতে পারবো।" ম্রিয়মাণ-গলা।

আমাদের সবারই ছিল ছুটির সমস্যা। তাই একুশ দিনের ট্রেনিংয়ে এসেছি। এদিকে নিয়মিত কোর্স আটাশ দিনের। তাই অনেককিছু অল্পসময়ে আয়ত্ত করতে হচ্ছে। খাটুনি পড়ছে অনেক বেশী। ডাক্তার একটানা তিন ঘন্টা ক্লাশ নিলেন। শরীরের সঙ্গে উচ্চতার সম্পর্ক সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

সমুদ্র-সমতা থেকে আট ন' হাজার ফুট উঠলেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে থাকে। বাতাসের চাপ কমে। ধূলিকণা মুক্ত পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায়, সূর্যের উত্তাপ বেশী অনুভূত হয়। আর সেই পরিমাণে আল্ট্রা-ভায়োলেট্ ও ইনফ্রা রেড্ রশ্মির তীব্রতা বাড়ে, বাতাসের জলীয় অংশ কমে, গতি বাড়ে। আবহাওয়ার এইসব পরিবর্তন শরীরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। অক্সিজেনের ঘাটতির জন্যে শরীরের কোষে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ হয় না। ফলে মাথাধরা, হাঁফধরা, বমিভাব, নিদ্রাহীনতা, স্মৃতিহীনতা, বদহজম ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিতে চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়, ইনফ্রা-রেড রশ্মিতে চোখ দিয়ে জল পড়ে আর শরীরের চামড়া কালো হয়ে যায়। শুষ্ক আবহাওয়া ও তীব্র বাতাসের দরুন শরীরের জলীয় অংশ কমে যায়। ফলে সবসময় তেষ্টা পায় আর তুষার-ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে। জলীয় অংশ কমে গেলে রক্ত গাঢ় হয়। ফলে শিরা নাড়ীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না—

নরম তুষারে দড়ির রেলিং ধরে এগিয়ে চলা

আঙ্গুলের ডগায়, নাকের ডগায়, কানের লতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত যায় না। ঐ অংশগুলো খাদ্য ও উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাতাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কোষগুলোর জীবনীশক্তি লোপ পায়, বিবর্ণ হয়ে ফুলে ওঠে, চামড়া ওঠে পচে যায়। তখন আহত অংশ কেটে বাদ না দিলে, সেই পচা অংশ ক্রমশঃ ছড়িয়ে-পড়তে থাকে।

তারপর পড়ানো হল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রাথমিক নিয়ম হল, যথেষ্ট পরিশ্রম করা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে শরীরকে বাঁচানো। তুষার-ক্ষত হলে সেঁক বা মালিশ করা কখনও উচিত নয়। সহনীয় গরম জলে, অর্থাৎ মোটামুটি ৪০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড, গরম জলে কয়েক ফোঁটা ডেটল দিয়ে আক্রান্ত অংশ ডুবিয়ে রাখতে হবে আধ ঘণ্টা ধরে—দিনে তিনবার। প্রতিবার তোয়ালে দিয়ে আলতো করে জল শুষে নিয়ে সেন্ডাসাল্‌ফ্‌ পাউডার মাখাতে হবে। প্রয়োজন হলে রাত্রে ঢিলেঢালা ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে রাখতে হবে। নিচের ক্যাম্পে নামিয়ে আনলে সবসময়েই সুফল পাওয়া যায়। নিচে অক্সিজেন বেশী—এর ওপরই শরীরের অনেকখানি নির্ভর করে।

তৃতীয় বিষয় হোল, অজ্ঞান হলে, আহত হলে বা হাত-পা ভাঙলে পাহাড়ে কি প্রাথমিক চিকিৎসা করা উচিত। আমরা নীরবে লেকচার শুনি। মনশ্চক্ষে ভাসছে অনুমানের সবকে যাই তুষারে। রাত ঝুটা।

পরিষ্কার ইঙ্গিত। ডাক্তার থামেন। তাকিয়ে থাকেন কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর আবার শুরু করেন। পড়ানো নয়, পড়া ধরা।

"এতে ঘুম নিশ্চয় ছেড়ে যাবে।" স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। আমরা নিরুপায় হয়ে, কটমট করে অনুরাধার দিকে তাকাই।

ভূজবাসে এসে গেলাম নাকি? গত রাতের স্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন ছিলাম এতক্ষণ। ঐ তো ঝরণা পেরিয়ে এগিয়ে এসেছেন মেজর সুব্রত্‌ সিং, "কি ব্যাপার? এত দেরী কেন?"

"রওয়ানাই হয়েছি ন'টার পর। তার আগে পুরো শিবির এলাকা পরিষ্কার করেছি। কাগজ, টিন, আবর্জনা সব জড়ো করে মাটি চাপা দিয়েছি।"

"আমার বেসিক কোর্সের ছেলেরা অপেক্ষা করছে। তোমাদের সঙ্গে চা খাবে। তারপর ডাক্তার ওদের নিয়ে যাবেন নিচে, আর তোমরা যাবে গোমুখ।"

মোড় ঘুরতেই দেখি ওঁরা আছেন পথের ধারে, পাহাড়ের গায়ে। পথের কেন্দ্রবিন্দুতে অতিকায় এক সসপেনে চা হচ্ছে। পথ বন্ধ।

সংখ্যায় ওরা পঁয়ত্রিশজন—প্রায় সব প্রদেশের লোকই আছে। অনেকেই চাকুরে। সবারই রণক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। আসানসোল থেকে একটি বাঙালী ছেলে এসেছে। ও এক কাঁকে বলে, "ঐ যে ডাক্তার, সারাটা কোর্স আমাদের জ্বালিয়ে খেয়েছে!"

"তাই নাকি। আমাদের তো খুব ভাল মানুষ বলে মনে হল।" ভালমানুষের জন্যে দুঃখ করে স্বপ্না বলে।

"তা ভালো তো হবেই। মেয়েদের কাছে অনেকেই স্বরূপ পাল্টায়।" ছেলেটি রাগে ফুঁসছে।

একজন মারাঠী উকিল আছেন দলে। প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি বললেন, "ক্লাব থেকে সাধারণত অভিযান পরিচালনা করে। তা আপনাদের পথিকৃৎ ক্লাব হঠাৎ এই ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রোগ্রাম করল কেন?"

"যাতে অনেক নতুন মেয়ে পাহাড়ে আসার সুযোগ পায়।"

"আর আপনিই বলুন তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে দুজন বা চারজন শিখরে উঠলে এর সার্থকতাই বা-কি? সেই শেরপার সাহায্য তো নিতেই হয়।" সুদীপ্তা যোগ দেয়।

"সত্যিই কি এতো খরচ হওয়া উচিত?" ওদের ক্যাপ্টেন, সেই হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি মন্তব্য করে। "শুনেছি ইন্দো-জাপানী মেয়েদের অভিযানে নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু তারা করেছে কি? একটি মাত্র সাড়ে আঠারো হাজার ফুটের শিখরে উঠেছে আর একটি শেরপা মরেছে। আর আপনাদের রৌন্টির কথা না হয় নাই বললাম।"

"মেয়েরা কিছু করলেই আপনাদের তা সহ্য হয় না?" আমি প্রতিবাদ করি।

এদিকে উকিলবাবুর জেরা চলেছে সমানে। "আপনাদের টাকা-পয়সা উঠলো কি করে?"

"আই এম এফ তিন হাজার দেবেন বলে কথা আছে। আর আমরা প্রত্যেকেই সমর্থ অনুযায়ী পঞ্চাশ থেকে দুশো পর্যন্ত দিয়েছি। তাছাড়া আমরা বাটার হাণ্টার জুতো, বৃটানিয়া বিস্কুট, নেসল্‌সের কনডেন্সড্‌ মিল্ক, বন্‌ কফি, সাইক্লোস্যাক ট্যাবলেট পেয়েছি। তাতে পথের খরচ অনেক সাশ্রয় হয়েছে। তাছাড়াও সহযোগিতা করেছেন সতীকান্ত গুহ, অসীম দত্ত, প্রণবকুমার সেন।"

"কিন্তু একটা দুঃখ রয়ে গেল। বাংলা দেশে এমন কাগজ আছে যারা আমাদের কোন খবর পর্যন্ত ছাপেনি। এরকম আরও অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করেই আমাদের এগোতে হয়েছে।" সুজাতা রাগ চাপতে পারে না।

"আপনাদের চেষ্টা সফল হোক।" ওরা সবাই মিলে আমাদের উৎসাহিত করে।

ওরা রুকস্যাক তুলে বেল্ট আটকায়। আমরাও। তারপর বিপরীত মুখে চলতে শুরু করি। আমাদের সঙ্গে মেজর আর ওদের সুদেশ ডাক্তার। ...

ভুজবাস থেকে গোমুখ মাত্র তিন মাইল। মনোরম পরিবেশ। ডাইনে কল্লোলিনী গঙ্গা, বাঁয়ে ভূর্জবন। ভূর্জ গাছের ডালগুলো সুন্দর দেখতে—ঝকঝকে চকচকে আর রঙ বাদামী বা সাদা। এই ভূর্জ গাছের ছালই হোল ভূর্জপত্র—কাগজের মতোই পাতলা। সাইজ মতো কেটে নিলেই লেখার কাজ চলে।

আরেক রকমের গাছ দেখেছি। ডালিমের মতো ছোট ছোট, আর লাল লঙ্কার মতো লম্বাটে ফুল ধরেছে। কিছু ফল আবার গোলাকৃতি। শুনেছি, ভালুকের পরম প্রিয় খাদ্য এই ফল।

ভূর্জবাসা থেকে মাইল দেড়েক এসেছি। গাছের সীমানা শেষ। তবে জুনিপারের ঝোপ এখনও আছে। পথের পাশের গাছ-গুলো জীর্ণ রিক্ত বিবর্ণ। আগুন ধরিয়ে পাতা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এখন গাছ কেটে নেবে আগুন জ্বালাবার জন্যে। পাতা না থাকায় ধোঁয়া হবে না।

মেজর বন্দুক কাঁধে এগিয়ে চলেন আর ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকান। চন্দ্র সূর্য তো যেখানে থাকার সেখানেই আছে। জিজ্ঞেস করতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হোল "কাল এখানে পাহাড়ী ছাগল দেখেছিলাম। দল বেঁধে ছিল। এদের শিকার করতে যেমন মজা, খেতে নাকি ততোধিক সুস্বাদু।" উনি পশু হত্যায় উৎসাহী অথচ নিরামিষাশী। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

এই সেই গোমুখ (১২৭৭০)। স্বপ্নে দেখা কল্পলোকের সেই অতিপরিচিত গোমুখ। কিন্তু প্রকৃতি এতো অপ্রসন্ন কেন? আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, বর্ষণ আসন্ন। অতএব বিশ্রাম নেই, আহার নেই, প্রাণভরে গোমুখ দেখা—তাও নেই। মালপত্র নামিয়ে তাঁবু টাঙাতে শুরু করি। পাশাপাশি পাঁচটি তাঁবু পড়লো। বস্তু তাঁবু নিয়ে জটিল সমস্যা। একটি তাঁবুতে দুজন কুলোয়। আমরা এগারোজন। কাজেই একজনকে একেলা শুতে হয়। কিন্তু কেউ রাজী নয়, এমনকি পারুদিদি পর্যন্ত নয়। নিরিবিলি থাকা ওর খুব পছন্দ। আমাদের হৈ-হট্টগোল থেকে শতহস্ত না হলেও দশ হস্ত দূরে থাকে সব সময়েই। কিন্তু রাতে তাঁবুতে একা, প্রাণ থাকতে নয়।

সমস্যার সমাধান করে জ্যোতি। "মেম্বাররা একলা শোয়ার জন্য কেউ তাঁবু পাবে না। এ অধিকার আছে একমাত্র লীডারের, আর এ-ক্ষেত্রে সেক্রেটারীর।"

"সে তো ঠিকই। একমাত্রের ঠিক।" মেয়েরা ভয় না পায়।

সুদীপ্তা ও আমি করুণভাবে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করি। শেষ পর্যন্ত সুদীপ্তা বুদ্ধি দেয়। "ঐ তাঁবু সাজানো থাক। আমরা বরং আর কারও তাঁবুতে কায়েম হই।"

কমলা একে সর্বকনিষ্ঠা, তার স্বল্প-ভাষী। কাজেই ওর অনুপস্থিতিতে রুকস্যাক সমেত গুটি গুটি ঢুকে পড়লাম ওর তাঁবুতে। ফিট ব্যাগ পড়ে রইল খালি তাঁবুতে। দুজনের জায়গায় তিনজন আঁটানো কি সোজা ব্যাপার? আড়াআড়ি ভাবে হাওয়া-তোষক পাতলাম। ওদের যদিও বা কোনমতে হোল, আমার আবার পায়ে ও মাথায় তাঁবুর ভেজা কাপড়টা লাগছে। তাই গুটি-সুটি মেরে শুই। অসুবিধে হলেও কি আরাম। তিনজনে শোয়ায় শীতও অনেক কম লাগছে। এই হোল আমাদের মূল শিবির।

কমলা বলে, "সুজয়াদি, ভাবো একবার দার্জিলিংয়ের মূল শিবিরে পৌঁছনোর কথা। পথ যেমন দীর্ঘ তেমন কষ্টকর।" দার্জিলিং থেকে উতরাই বেয়ে ঋষি বা লেক্‌শীপ, আবার চড়াই ভেঙে তাসিডিং, ইয়োকসাম্, যাকিম জোংরিগাঁও হয়ে ১৪,৬০০ ফুটে চৌরিকিয়াং বা মূল শিবির। প্রতিদিন অন্তত একটি হাজার ফুটের চড়াই ভাঙতে হয়েছে। মূল শিবিরের আগে শেষ চড়াইটি তো মারাত্মক। পাথর কাদা ধ্বস, নালা—এসব তো প্রতি পদক্ষেপে। তাছাড়া আছে ইয়োকসাম ও যাকিমের বিখ্যাত জোঁক। সিকিমের আবহাওয়া জোলো। ইয়োকসাম থেকে আকাশ সব সময়েই মেঘলা। তাই বোধহয় ক্লান্তি আসে। নয়তো সিকিম সৌন্দর্যে কারও থেকে কম নয়। ছায়া সুনিবিড় ঘন বনানী। যাকিম থেকে জোংরিগাঁও রোডোডেনড্রনের মেলা। মে মাসে দেখেছি প্রতিটি গাছ ফুলে ভরা, ঝরা ফুলের পাপড়িতে পথ ঢাকা।

ফুলের যে কতো রঙ—লাল, হলুদ, সাদা, ফিকে বেগুনী, গোলাপী।

গোমুখ গঙ্গোত্রী হিমবাহের সীমানা। এখানেই হিমবাহ থেকে মুক্ত হয়েছে গঙ্গা—যে গঙ্গা ধরে গেছে পথে—ভগবানের। তবে জন্মলগ্নে গঙ্গার প্রথম পদক্ষেপ পশ্চিমে। এখন সে শিশুর মতোই চঞ্চলমতি। ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে গিয়ে দক্ষিণে মোড় নিয়েছে। তারপর উত্তরকাশী ও টিহরীর মধ্য দিয়ে আরও ১৪৩ কিলোমিটার অতিক্রম করে দেবপ্রয়াগে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বদ্রীনাথ থেকে নেমে এসেছে অলকানন্দা, সঙ্গে এনেছে ধৌলিগঙ্গা, বিরেহীগঙ্গা, মন্দাকিনী, কর্ণ-গঙ্গা ও মন্দাকিনীর মিলিত জলধারা। ধৌলি সঙ্গমে বিষ্ণুপ্রয়াগ, মন্দাকিনী সঙ্গমে নন্দপ্রয়াগ, কর্ণগঙ্গা সঙ্গমে কর্ণপ্রয়াগ ও মন্দাকিনী সঙ্গমে রুদ্রপ্রয়াগ। হিমালয়ের পঞ্চপ্রয়াগের শেষ প্রয়াগ দেবপ্রয়াগ। যমুনা ছাড়া গাড়োয়ালের সব জলধারা মিলিত হয়েছে এখানে, এক মহাযজ্ঞের পরম লগ্নে, আর্যাবর্তকে সঞ্জীবিত করতে। তাই অনেকে বলেন গঙ্গা সার্থকনামা এখানে।

দেবপ্রয়াগ থেকে ৭০ কিলোমিটার নেমে এসে শিবালিক গিরিশ্রেণী ছিন্ন করে গঙ্গা এসেছে হরিদ্বারের সমতলে। সেখান থেকে অযোধ্যা হয়ে প্রয়াগ—যেখানে গঙ্গা-যমুনা মিলে এক হয়ে গেছে। তারপর কাশী পাটনা হয়ে রাজমহল। এখান থেকে একটি শাখা গেছে পাকিস্থান আর প্রধান জলধারা কলকাতার মধ্য দিয়ে গিয়ে সাগরে মিলেছে। যমুনা ছাড়াও হিমালয়ের আরও তিনটি প্রধান নদী গঙ্গায় এসে মিশেছে—ঘর্ঘরা, গন্ডক ও কোশী।

নদীর পারেই শিবির। তীব্র ঠান্ডা হাওয়া। বাইরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। তাঁবু বদ্ধ এলাকা—সেখানে অক্সিজেনের চেয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশী—অনেকক্ষণ থাকলে শরীর খারাপ হবার সম্ভাবনা। কিচেন হোল সিমিয়ার পোর্টার ও ইন্‌স-ট্রাকটারদের আস্তানা। সেখানে থাকা চলবে না। আমাদের স্থান খোলা আকাশের নীচে, আগুনের চারপাশে। মাঝে মাঝে নিজীব আগুনকে চাঙা করা হচ্ছে, রক্তিম শিখাটি সর্পিল ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বে উঠে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, কালো ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে, ওপাশের মেয়েদের দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে সব ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে গেল। গনগনে আগুনে আবার সবাইকে চেনা যাচ্ছে। শিশু-গঙ্গার গর্জন আর মেয়েদের কলকাকলি পাল্লা দিয়ে চলেছে। দূরে পাথরের আড়ালে আগুনের বিন্দু, কুলিদের দু'একটি অবোধ্য কথা ভেসে আসছে সেদিক থেকে।

সার বেঁধে চলেছি গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপর দিয়ে। বেলা প্রায় আটটা। বরফে হাঁটা-চলা অভ্যাসের ট্রেনিং হবে আজ। প্রায় দেড় মাইল হেঁটে পৌঁছলাম আমাদের শিক্ষণ এলাকায়। নরম তুষারে চলায় বিশেষ কোনো কৌশল নেই। হাল্কা পায়ে হাঁটতে হবে। পা ফেলতে হবে পুরোগামীর পায়ের ছাপের ওপর। পায়ের চাপে ক্রমে ক্রমে নরম তুষার শক্ত হয়ে আসে। তখন আর পা বেশী নীচে ডুবে যায় না।

বহু বছরের সঞ্চিত তুষার রোদে ও চাপে কঠিন বরফে পরিণত হয়। শক্ত বরফ

দুটো দড়ির সাহায্যে বরফের দেওয়াল অতিক্রম

কাচের মত মসৃণ আর শ্যাওলার মত পেছল। তাই জুতোর তলায় ক্রাম্পন, অর্থাৎ আট দশটি কাঁটাওয়ালা লোহার ফ্রেম লাগিয়ে নিতে হয়। আর হাঁটতে হয় জোরে জোরে। নইলে ক্রাম্পন কি আর শক্ত বরফে গাঁথে? এছাড়া টাল সামলাবার জন্যে তুষার-গাঁইতি তো থাকেই।

এবারে অপেক্ষাকৃত খাড়া ঢাল। ক্রাম্পন স্লিপ করলে অনেকটা গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এখানে পা রাখার মত ব্যবস্থা করে নিতে হবে। তাই বরফের গা কেটে সিঁড়ি বানাচ্ছি। তুষার গাঁইতি দিয়ে বরফ কেটে সমান দূরত্ব রেখে ধাপ তৈরী হচ্ছে। সেই ধাপে জুতোর অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ আটা চাই। জুতো মানে তো পেল্লাই ব্যাপার। গোটা সতেরো ধাপ কেটে হাতের তালুতে ফোস্কা আর বাহুমূলে ব্যথা। বারোটা বাজে। হিমেল হাওয়ার চাবুক আর ছিটকে আসা তুষারকণার দংশনে আমরা কাবু। এবার থামলে হয় না? নামতে শুরু করি। এ যে দেখছি আরও শক্ত। নামতে হচ্ছে নতুন করে ধাপ কেটে। এটাও শিক্ষার একটা অংশ। হাঁটু সোজা রেখে, নিচের দিকে ঝুঁকে ধাপ কাটি। গাঁইতির প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে মাথায় জোর ঝাঁকুনি লাগছে। সবাই দেখছি নাকের জলে চোখের জলে একাকার।

আমরা আরও কয়েকটি কঠিন কৌশল আয়ত্ত করেছিলাম দার্জিলিংয়ে। বিশেষ করে কৃত্রিম আরোহণ। এর প্রয়োজনীয়তা নব্বই ডিগ্রি খাড়া, ও সুদীর্ঘ শিলা বা হিমগাত্রে। লেবং রোডের ওপর তেনজিং রকের পিছনে প্রথমে এই পদ্ধতিতে আরোহণ করি। রাস্তা থেকে অনেক নিচে নেমে গেলাম। দেখি রকের গা একেবারে খাড়া, জায়গায় জায়গায় শ্যাওলার আস্তর। তবে ওপরের দিকে কিছু খাঁজ আছে। খানিকটা খালি হাতে উঠে দেখি পিটন্ লাগানো আছে। ওখানে নিয়মিত শিক্ষা দেয়া হয়। পিটনের (মাথায় ফুটোযুক্ত লোহার গোজা) মধ্যে ক্যারাবিনার (এ্যালুমিনিয়ামের ক্লিপ, চাপলে মুখ খোলে) ঝুলিয়ে দিলাম। তার মধ্যে আটকে দিলাম কোমরের দড়ি। এই পিটনের ওপর ভর করেই ওপরের পিটনের দিকে এগিয়ে গেলাম। এইভাবে পরপর পাঁচ-ছটি ক্যারাবিনারের মধ্যে দড়ি আটকে, উঠে এলাম ওপরে। এইভাবে দড়ি আটকানোকে বলে রানিং বিলে। এই পদ্ধতির সুবিধা হল—কৃত্রিম অবলম্বন পাওয়া গেল আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা অনেক ভাল। পা ফসকালেও আমি খুব বেশী নিচে যেতে পারতাম না। কারণ কোমরের দড়ি তো ক্যারাবিনারের সঙ্গে আটকানো আছে।

ফিক্সড রোপও একইভাবে লাগানো হয়। এটা হল দড়ির রেলিং। তফাৎ এই যে, ক্যারাবিনারের সঙ্গে আটকাবার সময় একটা ফাঁস লাগিয়ে নিতে হয়। এই দড়ি বা রেলিং ধরে পরবর্তী আরোহীরা সহজে উঠতে পারে।

যেখানে পাহাড় একেবারে মসৃণ, সেখানে উপায় হল দড়ির মই এবং যৌথ দড়ি। পিটনের সঙ্গে ক্যারাবিনার আটকে, তার সঙ্গে দড়ির মই ঝুলিয়ে দিতে হয়। তিন ধাপে দুটি মই লাগে। ক্রমাগত নিচেরটি খুলে ওপরে লাগাতে হয়। আমরা যখন দার্জিলিংয়ের গোম্বু রকে আরোহণ শুরু করলাম, তখন কোমর থেকে ঝুলছে দুটি মই, পাঁচ-ছটি ক্যারাবিনার ও হাতুড়ি। পিটন লাগানোই ছিল তা হলেও সে এক এলাহী ব্যাপার।

যৌথ দড়ির কৌশল সহজ কথায় পুলী প্রথা। কোমরের দড়ি আরোহী লাগিয়ে দেবে ওপরের ক্যারাবিনারে। আর সেই দড়ি নিচের লোক আকর্ষণ করবে সঙ্গে সঙ্গে আরোহী পিটন্ আঁকড়ে ধরে উঠতে থাকবে। এইভাবে আমরা সিকিমের বাথং হিমবাহের একটি বরফের দেয়াল অতিক্রম করেছিলাম। দেয়ালটি খুব বেশী উঁচু ছিল না। পিটন আমাদের গেঁথে নিতে হচ্ছিল। সে যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম। এক পায়ের আঙুল কোনমতে পিটনের মাথায়, আর অন্য পায়ের ক্রাম্পন খাড়া দেয়ালে গেঁথে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছি। এই অবস্থায় ঐ নিরেট কঠিন দেয়ালে পিটন গাঁথা...! উচ্চতা ষোল হাজার ফুট। কর্মক্ষমতা এখানে এমনিতেই কমে আসে। তার ওপর কি প্রচণ্ড শীত। জন্দ আমাদের ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল।

এ ছাড়া শিখতে হয়েছে এলুমিনিয়ামের মই ফেলে তুষার-গহ্বর পেরোন, আর তুষার-গহ্বর থেকে মানুষ তোলা।

"সুদীপ্তে, এমন সব খেল দেখাতে হবে তা তো বলনি। বেশ ছিলুম বাপু ইউনিভার্সিটি আর কফি হাউস। তারপর গাঁড়ুয়াহাটার সান্ধ্য-বিহার!" অনুরাধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

"সত্যি, রংটা যে এমন আমন্দে পেড় নেবে তা-তো বলনি। মা বারবার বলে দিয়েছে, ফেরার কদিনের মধ্যেই জিন্টার বাসুর আমেরিকা ফেরৎ ছোট ছেলে আসবে। সে পরীক্ষার উত্তরোতে তবে না... কল্পনা আর শেষ করতে পারে না। বোধহয় কান্নায় গলা বুজে আসে।

ফটো তুলেছেন সুজাতা গুহ ও সুদীপ্তা সেনগুপ্ত।

উৎপীড়িত করে সহজে পার পেতে পারে না।

ছাত্রদের মধ্যে তার সামান্য কিছু পরিচিতজন আছে, আর এই সামান্যসংখ্যক বন্ধুরাও প্রতিজ্ঞা করেছে যে তারা ওকে রাতের বেলায় বিরক্ত করে পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটাবে না। কারণ সবাই জেনে গেছে ম্যারিয়ট প্রাণ দিয়ে পড়ছে। সুতরাং দরজার ঘণ্টা বেজে উঠতে মনের ভাব যে শুধু কঠোর হয়েছে তা নয়, বিস্মিত হয়েছে ম্যারিয়ট। অন্য কেউ হলে ঘণ্টার আওয়াজে কান দিত না—চুপচাপ নিজের কাজ করে যেত, কিন্তু ম্যারিয়টের প্রকৃতি বিভিন্ন। সে নার্ভাস হয়ে পড়ে অতি সহজে। কারণ, সাড়া না দিলে সারারাত সে ঘুমাতে পারত না, কে সে এই রাতের অতিথি তাই চিন্তা করত। সুতরাং একমাত্র পথ হল—লোকটিকে আসতে দেওয়া এবং পত্র পাঠ বিদায় করা।

বাড়িওয়ালী বুড়ি ঠিক দশটায় শুতে যায়, তারপর বজ্রপাত হলেও সে আর উঠবে না। সে যে কিছু শুনতে পেয়েছে তা বলবে না। সুতরাং ম্যারিয়ট পরীক্ষার কেতাব ছেড়ে দিয়ে অচেনা অতিথির জন্য দরজা খুলতে গেল।

এডিনবরা শহরের পথঘাট এখন শান্ত, অনেক রাত হয়েছে তাই সব চুপচাপ। আর এই এক-স্ট্রীটের যে বাড়িতে ম্যারিয়ট থাকে এখানে কোনো শব্দই পৌঁছায় না। এ মোহল্লা আড্ডার মত কিছু নেই। নীচে নাড়তে নাড়তে ঘণ্টা আর একবার বেজে উঠল। আগন্তুকের এই অধীরতায় অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হল ম্যারিয়ট। লোকটার যার দেরী সইছে না—সে বলে ওঠে—

—সবাই জানে আমি পরীক্ষার পড়া পড়ছি। এমন অসময় কারো এইভাবে এসে জ্বালাতন করাটা উচিত হয়?

এই বাড়ির আর সব বাসিন্দারা তার মতই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, সাধারণ ছাত্র, দরিদ্র লেখক কিংবা এই রকম বৃত্তিধারী। বাড়িটার আলোর ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এইসব ব্যবস্থা বাড়িওয়ালীর রুচিমাফিক। তার ওপর নির্ভর করে সব কিছু।

অন্ধকার সিঁড়ির মধ্যে ধ্বনিতরঙ্গ প্রবাহিত হয় অদ্ভুত ভাবে। ম্যারিয়ট বই হাতে দরজা খুলে দাঁড়ায়। মনে ভাবে নিশ্চয়ই রাতের অতিথি সামনে এসে হাজির হয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে অতি কাছে, অসমান পদক্ষেপ। লোকটা কে হতে পারে। যেই হোক তাকে বেশ দুকথা শোনাবার জন্য ম্যারিয়ট তৈরী। কিন্তু লোকটি এল না। পদধ্বনি যেন একেবারে মুখের ওপর, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। কাউকে দেখা যায় না।

সহসা আতংকে শিউরে ওঠে ম্যারিয়ট। তার সারা অঙ্গে কাঁপন লাগে, তবে তা ক্ষণিকের অনুভূতি। যেমন তার উদ্ভব তেমনই দ্রুতগতিতে তার লয়। ম্যারিয়ট ভাবে কি করবে, অদৃশ্য অতিথিকে হাঁক দিয়ে ডাকবে, না দরজা বন্ধ করে ওপরে উঠে যাবে। এমন সময় ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার ভেদকারি সেই মানুষটিকে দেখা গেল।

অচেনা মানুষ। অল্প বয়স—মাথায় খাটো, দেহটা প্রশস্ত। মুখখানা এক খণ্ড সাদা খড়ির মত সাদা। চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল তবে তার নীচে কালো দাগ পড়েছে। দাড়ি কামান হয়নি, পোশাক-পরিচ্ছদও তেমন পরিষ্কার নয় তবু এই আগন্তুক ভদ্রলোক, তাঁর অঙ্গে মূল্যবান পোশাক এবং তাঁর ভাব-ভঙ্গীতে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। আশ্চর্য, ভদ্রলোকের মাথায় টুপী নেই, হাতেও ধরা নেই। যদিও সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, ভদ্রলোকের গায়ে ওভারকোট বা হাতে ছাতা নেই।

ম্যারিটের মনে একগাদা প্রশ্ন জাগে। তার মধ্যে সর্বাগ্রে মনে হয়—কে তুমি! কি উদ্দেশ্যে আগমন?

কিন্তু এই দুটি প্রশ্নের একটিও করতে হল না। আগন্তুক ঠিক সেই সময় মাথাটা ঘোরালেন, এবং হলের ম্লান গ্যাসের আলো তার মুখের ওপর পড়ায় মুখখানি পরিচিত হয়ে উঠল। ম্যারিয়ট সেই মুহূর্তে চিনতে পারল, সে চীৎকার করে ওঠে—

—আরে ফিল্ড! ফোর্থ ইয়ার! এতদিনে এলি ভাই।

ম্যারিয়ট কথা শেষ করল হাঁপিয়ে।

ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র নির্বোধ নয়, সে বুঝেছিল, একটা কিছু ব্যাপার হয়েছে। এখন অতি সূক্ষ্মভাবে ফিল্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে মনে মনে ভাবল যা এতকাল ভেবেছে তাই হয়েছে হয়ত, ফিল্ডের বাবা নিশ্চয়ই ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক বছর আগে দুজনে এক প্রাইভেট স্কুলে একসঙ্গে পড়ত। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ওদের সংবাদ কিন্তু পাওয়া যেত, কারণ, ওদের বাড়ি ম্যারিয়টদের গ্রামেই এবং ওর বোনদের সঙ্গে ম্যারিয়টের বোনদের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফিল্ড বেশ বখে গেছল, আফিং খেত, একটা বাজে স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়েছিল, আরো অনেক রকম আজেবাজে ব্যাপার—সব ঠিক মনে নেই।

রাগ মুছে গেল। আন্তরিকতার সঙ্গে ম্যারিয়ট বলল—এসো ভাই, ভেতরে এসো।

হয়ত তাড়াতাড়ি খোলা কাড়িতে ঢুকিয়ে ছিল।

যাই হোক, ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। তবু ও ত' কিছুই বলছে না। আর ম্যারিয়টও স্থির করে ফেলেছে যে কিছুতেই কিছু বলবে না। কোনো প্রশ্ন করবে না। ও আগে খেয়ে নিক, ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর হোক, তারপর দেখা যাবে।

দুজনে খেতে বসেছে। গৃহকর্তা নিজেই একতরফা কথা বলে যায়—আর অতিথি নীরব। ম্যারিয়টের গল্পও বুড়ো বিড়ালকে নিয়েই। বুড়ো বিড়াল হল বাড়িউলী। ম্যারিয়ট খাচ্ছে না, সে হাত-নাড়ছে। অতিথি কিন্তু গোগ্রাসে খাচ্ছে। ক্ষুধার্ত মানুষকে এইভাবে খেতে দেখলে কার না আনন্দ হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার খাওয়া লক্ষ্য করে ম্যারিয়ট। বুভুক্ষা যে কি বস্তু তা অন্ততঃ তার জানা নেই।

ফিল্ড কিন্তু শুধু যে ক্ষুধার্ত তা নয়; ঘুমে তার চোখ ভরে আছে। সে ঘুমাতে পারলে যেন বাঁচে। খেতে খেতেই যেন ঘুমিয়ে পড়ছে, মুখের খাবার চিবাতে পারছে না। ম্যারিয়ট তাকে ঠেলে উঠিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিক বুভুক্ষিত মানুষের খাওয়া দেখতে কি ভালো লাগে—মানে শান্তি হয়। ফিল্ড খেল যেন জন্তুর মত। একেবারে গিলে এবং গো-গ্রাসে। ম্যারিয়ট পড়ার কথা ভুলে গেল—তার যেন গলার কাছে কিছু একটা আটকে গেছে।

সে অতিকষ্টে বলল—তেমন বেশী কিছু ঘরে নেই ভাই, আর কিছু দিতে পারলাম না। ফিল্ড জবাব দেয় না, সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শেষ গ্রাসটুকু ফিল্ড মুখে তোলার পর ম্যারিয়ট এই কথা বলল। তারপর সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে—এখন তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও—নইলে শরীর ভেঙে পড়বে। আমাকে এখন পরীক্ষার জন্য জেগে থাকতেই হবে। পড়তে হবে এখন। কাল সকালে একটু দেরী করে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাবে বরং। তারপর যা হয় একটা প্ল্যান ঠাউরে নেব। জানো, আমি খুব ভালো প্ল্যান করতে পারি।

বিষয়টিকে একটু লঘু করার উদ্দেশ্যে শেষের কথাগুলি উচ্চারিত হল। ফিল্ড সেই নিদ্রালু স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। শোবার জায়গা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ম্যারিয়ট ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। ফিল্ডের বাবা বড় জমিদার। জমিদারের অনশনক্লিষ্ট সন্তানের পরিচর্যা করেও পরিতৃপ্ত নয় ম্যারিয়ট। ক্লান্ত অতিথি কিন্তু কোনো কথা, বলে না—ধন্যবাদ দেওয়ার চেষ্টাও করে না।

ফিল্ড শুয়ে পড়ার পর কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে ম্যারিয়ট। প্রার্থনা করে তার নিজের অদৃষ্টে যেন এই দুর্ঘটনা না ঘটে।

পাশের ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ম্যারিয়ট তার 'মেটিরিয়া মেডিকার' নোট মুখস্ত করতে বসে। ঘন্টা বাজার শব্দ যেখানে থেমেছিল সেইখানেই আবার শুরু করে। কিন্তু কিছুক্ষণ মনস্থির করা যায় না। বারবার পাংশু মুখ, অদ্ভুত চক্ষু, শীর্ণ, বুভুক্ষিত বন্ধুটির কথা মনে জাগে। ময়লা জামা এবং বুট জুতো পরেই সে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। ছাড়াছাড়ি হবার আগে স্কুলের দিনগুলির কথা মনে পড়ে—ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল কোনোদিন ওদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটবে না। সারাজীবন ওরা বন্ধু থাকবে। আর এখন? কি ভীষণ অবস্থাই না হয়েছে। কি করে মানুষ এত নীচে নামতে পারে?

একটা প্রতিজ্ঞার কথা ম্যারিয়টের মনে জাগেনি। অন্ততঃ এই মুহূর্তে আর সে কথা মনে জাগেনি।

শোবার ঘরের দরজা ভেদ করে নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আছে—ক্লান্ত মানুষের গভীর দীর্ঘশ্বাস। ম্যারিয়টও ক্লান্ত, তার ঘুম পাচ্ছে। ম্যারিয়ট শুয়ে পড়ে। তারও ঘুমের প্রয়োজন।

ম্যারিয়ট ভাবে—আহা! ওর ঘুমের প্রয়োজন। হয়ত ঠিক সময়েই এসে পড়েছে।

হয়ত তাই। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি। তীব্র ঠান্ডা। পথঘাট জনহীন। পড়তে পড়তে ম্যারিয়ট সেই নিঃশ্বাস শুনেছে।

ঘন্টা দুই পরে হাই তুলে বই বন্ধ করে দেয় ম্যারিয়ট। পা টিপে টিপে ফিল্ডের বিছানার কাছে গেল ম্যারিয়ট। প্রথমটা অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল ফিল্ডের আকৃতি। সে একবিন্দুও নড়ে চড়েনি। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টান টান হয়ে। সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেইদিকে। এই রাত ঝড়ের শনশনে আওয়াজে ভরা। ফিল্ডের শ্বাস গ্রহণের শব্দও শোনা যাচ্ছে সেই সঙ্গে। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি—ভিতরে স্তব্ধতা।

পড়ছে ম্যারিয়ট, পড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য কিছু নেই, তবে মাঝে মাঝে ঝড়ের শব্দ আর বাঁ হাতে কিসের একটা মৃদু যন্ত্রণা তাকে আকুল করে তুলছে। কি জানি কিভাবে হয়ত লেগেটেগে গেছে। কি যে হতে পারে ভাবার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই ভেবে পায় না।

ক্রমে বই-এর পাতা ধূসর হয়ে আসে। বাড়ির নীচে রাজপথে কিছু কিছু কলরব শোনা যায়। ভোর হচ্ছে। এখন চারটে বেজেছে। জানলার পরদা সরিয়ে দিল—ঝড় থেমেছে—চারদিক কুয়াশায় ভরা। জানলার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে ম্যারিয়ট শোবার উদ্যোগ করে। ফিল্ড এখনও যেন ঘুমোচ্ছে, ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত বাকী চার ঘন্টা সোফায় ঘুমিয়ে কাটাবে ম্যারিয়ট।

ফিল্ড কি করছে দেখতে ইচ্ছা হয়। শোবার ঘরে গিয়ে ভালো করে দেখে ম্যারিয়ট, কিন্তু একি এ যে শূন্য ঘর। সে ভাববার চেষ্টা করে। তার আপাদমস্তক কাঁপছে।

বিছানায় যে শুয়েছিল তার দেহের ছাপ আছে—বালিশে যেখানে মাথা রেখেছিল সেখানে গর্ত আছে—আর যেন সেই নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে?

অনেক চেষ্টা করে ম্যারিয়ট চেঁচিয়ে ওঠে—ফিল্ড—কোথায় তুমি? কোথায়—?

কোনো জবাব নেই। নিঃশ্বাস কিন্তু বিছানা থেকেই ত' আসছে। সব কিছু উঠিয়ে নিল বিছানা থেকে—কিন্তু শুধু নিঃশ্বাস শোনা যায়—

ম্যারিয়ট সেই শীতের সকালেও ঘামতে থাকে। তার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে।

এর পর সে একটা অদ্ভুত কান্ড করে, ঠিক যেখানটিতে ফিল্ড শুয়েছিল সেইখানে শোবার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সম্ভব হল না। ভীষণ যেন ঘেঁষাঘেঁষি, কিসের যেন চাপ। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ম্যারিয়ট। ওর গায়ে যেন কার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে।

রাতের প্রতিটি ঘটনা ভাবার চেষ্টা করে ম্যারিয়ট। প্রতিটি খুঁটিনাটি। বেশ শান্তভাবে এক এক করে ভাবে। সত্যি কোনো হিসাব পাওয়া যায় না।

সহসা ম্যারিয়টের মনে হয়—ফিল্ড কিন্তু একটাও কথা বলেনি। এ যেন অবিশ্বাস্য। এ কি আশ্চর্য কান্ড।

এ কি স্বপ্ন! না বিভীষিকা!

ম্যারিয়টের মনে হয় সে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি তার বইগুলো নিয়ে মাথায় টুপি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রভাতী হাওয়ায় হয়ত তার মানসিক অবসাদ দূরে যাবে।

।। দুই ।।

অনেক পরে ফিরল যখন ঘিঞ্জি ঘড়ি জ্বলছে। বাড়ি ঢুকে দেখে গ্রীন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। গ্রীনও ওর সঙ্গে পরীক্ষা দেবে।

ম্যারিয়টকে দেখে সে বলে ওঠে—খুব পড়েছ বুঝি সারারাত? ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু নোট মিলিয়ে নেব আর সেই সঙ্গে একটু ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেব। তুমি এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?

ম্যারিয়ট বলল—মাথাটা ধরেছিল, ভাবলাম একটু বেড়িয়ে নিই। তারপর টেবিলে ব্রেকফাস্টের দ্রব্যাদি এসে পড়তে গ্রীন প্রশ্ন করে—তোমার আবার কোন বন্ধু এসেছিল, একত্রে মদ্যপান করেছ দেখছি। (কে যেন ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে—কে হে?)

ম্যারিয়ট বলে—তুমিও শুনেছ তাহলে! হা ভগবান! ...

—নিশ্চয়ই শুনেছি। দরজা ত' খোলাই রয়েছে। তবে হয়ত অন্যায় করলাম।

—না, তা বলিনি। তবে তোমার কথা শুনে অবিশ্বাস করছি। আমার এত ভয় হচ্ছিল যে তোমাকে আগে বলতে পারিনি ব্যাপারটা। হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম—

—কি সব আজেবাজে বকছ?

ম্যারিয়ট বলে—গ্রীন, আমার কথা শুনে যাও, বাধা দিও না।

এই বলে ম্যারিয়ট গত রাতের সমস্ত ঘটনা বলে যায়। এমন কি হাতের ব্যথার কথাটাও। তারপর বলে—নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছ এখনও?

—হাঁ, স্পষ্ট শুনেছি।

ওরা দুজনে সারা ঘর খুঁজল। কিছুই পাওয়া গেল না। এমন সময় ম্যারিয়ট বলল—কি বিশ্রী যে যন্ত্রণা হচ্ছে হাতটার। কি যে হল কে জানে?

—দেখি। আমি কিন্তু হাড় সম্পর্কে এক্সপার্ট, পরীক্ষায় যাই নম্বর দিক না—আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। দেখি কি হয়েছে?

জামাটা খুলে ফেলে দেখা গেল কাঁধের নীচে একটা গভীর কাটা দাগ—তার ওপর টাটকা রক্তের দাগ।

গ্রীন বলল—তুমি নিশ্চয়ই অজানতে কিছু করে বসেছ।

—না, কি জানি ভারী আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি।

গ্রীন বলল—কোনো রকমে হয়ত কেটে ফেলেছ, টের পাওনি। তবে এটা একটা পুরোন ক্ষত বলে মনে হয়—

ম্যারিয়টের মুখ শাদা হয়ে গেল—সে বলল—দেখো—একটা লম্বা দাগ দেখতে পেলে না?

—পুরোন ক্ষত, তার নীচে দাগ।

—এখন সব মনে পড়ছে। এটা পুরোন ক্ষতই বটে।

—কি সব মনে পড়ছে?

—চুপ করো, আমি তোমাকে সব বলছি। এই দাগটা ফিল্ডই করেছিল।

কিছুক্ষণ দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ম্যারিয়ট বলে—ফিল্ডই করেছিল এই দাগ।

গ্রীন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—কাল রাতে?

—না, কাল রাতে নয়, অনেক বছর আগের ব্যাপার। অনেক পুরোন ব্যাপার, আমরা তখন স্কুলে পড়ি। আমি ওর হাতে একটা ক্ষত করি, ও আমার হাতে।

ম্যারিয়ট অতি দ্রুতগতিতে বলে যায়।

—এইভাবে আমরা পরস্পর রক্ত বিনিময় করি—

—কিন্তু কেন? এই পাগলামির অর্থ কি?

—ছেলেমানুষী। নিছক ছেলেমানুষী। আমরা পবিত্র শপথ নিয়েছিলাম—এখন সব মনে পড়ছে। আমরা একটা ভয়ংকর বই পড়েছিলাম, সেই বই পড়ে আমরা স্থির করি যে আগে মারা যাবে সে অপরকে দেখা দেবে—সাত বছর আগের কথা—তারপর আর ভাবিনি এসব কথা।

গ্রীন তোতলার মত ভঙ্গীতে বলে—তাহলে কি—

ম্যারিয়ট জবাব দেয় না।

গ্রীন বলে, ম্যারিয়ট এত উতলা হয়ো না। যা হবার হয়েছে। হয়ত একটা দুঃস্বপ্নও হতে পারে। আচ্ছা ওকে যা খেতে দিয়েছিলে খেয়েছে সব?

ম্যারিয়ট বলল—সে সব পাত্র ত' আলমারিতে রেখেছি—

গ্রীন আলমারি খুলে দেখে চলে এল, বলল—যা ভেবেছি তাই। দেখো কিছুই স্পর্শ করেনি কেউ। সবই ঠিক আছে। এ তোমার চোখের ভ্রম। এসো দেখে যাও।

দুজনে একত্রে সব পরীক্ষা করল। ঠিক আছে।

গ্রীন বলল—তুমি কিছুই কাউ খাওয়াও নি। তোমার মনের ভ্রম।

—কিন্তু ঐ যে নিঃশ্বাসের শব্দ?

গ্রীন এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। দূ থেকেই আবার সেই শব্দ শোনা যায়।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল বাড়িতে চি লেখা যাক।

তাই হল এবং এক সপ্তাহ পরে চি জবাব এল।

গ্রীনকে চিঠিটার অংশ পড়ে শো ম্যারিয়ট। তার বোন লিখছে—

—আশ্চর্য! তোমার চিঠিতে ফিল কথা লিখেছ। অতি ভয়ংকর বিশ্রী ব্যাপা তবে স্যার জনের সহ্যের সীমা অত হয়েছিল। তিনি ওকে বাড়ি থেকে তাড়ি দেন। তারপর কি হল জানো—ফি আত্মহত্যা করেছে। অন্ততঃ তাই ত' হয়। বাড়ি থেকে চলে না গিয়ে নিচে চে কুঠুরির ভেতর ঢুকে না খেয়ে অন মরেছে ফিল্ড...ওরা চাপা দেওয়ার চে করছে ব্যাপারটা। তবে বাড়ির দা চাকরের মারফৎ সব প্রকাশ পেয়েছে। চে তারিখে ওর দেহটা আবিষ্কৃত হয়। ডা বলছেন যে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আ মৃত্যু হয়েছে। অতিশয় রোগা হয়ে গি ছেলেটা......

গ্রীন বলল—তাহলে ১৩ই ফিল মৃত্যু হয়েছে।

ম্যারিয়ট মাথা নাড়ে।

গ্রীন বলে—ঠিক সেই রাতেই তো কাছে এসেছিল।

ম্যারিয়ট আবার মাথা নেড়ে সায় দে ফিল্ড শপথ পালন করেছে স নেই।

—অমিতাভ মজুমদার অনূদি

উত্তরসাধিকা কোরেটা
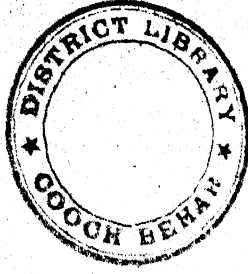
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

[নেহরু পুরস্কার গ্রহণের জন্য পরলোকগত মার্কিন নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং-এর স্ত্রী শ্রীমতী কোরেটা কিং নয়াদিল্লীতে এসেছিলেন। লুথার কিং-কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই নিবন্ধে শ্রীমতী কিং-এর জীবন কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।]

মার্টিন লুথার কিং স্বপ্ন দেখতেন, বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকার অতীত কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে এবং উত্তর ও দক্ষিণে আর কোন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখা অবস্থায়ই আতাতায়ীর গুলি তাঁকে হরণ করে নিয়ে যায়। স্বামীর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিয়ে এবার এগিয়ে এসেছেন পত্নী শ্রীমতী কোরেটা কিং। নয়াদিল্লী পোঁছেই তিনি ঘোষণা করেছেন, আমার স্বামী যে মহৎ কার্যের সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ আমি আমার নিজের মত করে সম্পাদনের চেষ্টা করছি।

লুথার কিং পত্নী কোরেটা সম্বন্ধে প্রায়ই বলতেন, দি কারেজ বাই মাই সাইড। বাস্তবেও তাই। সিভিল রাইট আন্দোলনে তিনি ছিলেন স্বামীর সহগামী। শান্ত মেজাজের ধর্মচেতা কোরেটা কিন্তু স্বামী, সংসার এবং সন্তানদের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন সবকিছুর ওপরে। এদিক থেকে তিনি ছিলেন পুরোপুরি গৃহমুখী। এভাবেই তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। সন্তানদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো বেশি করে ডঃ কিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। এর মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি থাকতো আবার কবে তাঁরা আটলান্টায় নিজের বাড়িতে মুখোমুখি বসবেন। এরকম সুযোগ অবশ্য খুব কমই ঘটতো। ডঃ কিং প্রায়ই নিজের কাজে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকতেন।

ডঃ কিং-এর মৃত্যু সময়েও তাঁরা এভাবেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সেদিন শ্রীমতী কোরেটা ছেলেদের নিয়ে আটলান্টা বিমান-বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। উদ্দেশ্য মেম্ফিসে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবেন। এমনি সময়ে এলো সেই চরম দুঃসংবাদ ঃ আতাতয়ীর গুলি ডঃ কিং-এর প্রাণ হরণ করেছে।

তারপর শোকসন্তপ্ত জাতি সবিস্ময়ে টেলিভিসন এবং খবরের কাগজের পাতায় প্রত্যক্ষ করলো, সংহত-শোক শ্রীমতী কোরেটার এক অপরূপ মূর্তি। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি বিচলিত এবং একই সঙ্গে দায়িত্বের গুরুত্বেও বলিষ্ঠ। তাঁর প্রতিটি আচার-আচরণে সেদিন স্বামীর আরব্ধ কর্মের সাফল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় মনোভাব ব্যক্ত হচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা অবাক হচ্ছিলেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, এই মর্মান্তিক মুহূর্তে এবং সারাদিনব্যাপী শব সৎকার্যের [illegible] দিয়ে ডঃ কিং-এর মুক্ত আত্মা নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। স্বামীর মতই দৃঢ়তা, আত্মোৎসর্গ এবং প্রতিজ্ঞাকঠোর মনোভাব সেদিন তাঁর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শ্রীমতী কোরেটা সম্পর্কে একটি কথার প্রচলন আছে। তাঁর শান্তশিষ্ট মনোভাব লক্ষ্য করে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে, অ্যান আইল্যান্ড অফ সিরিনিটি ইন দি সেন্টার অফ হারিকেন। তিনি এই প্রশংসা বাক্য-অনুযায়ী স্থৈর্য ও সাহসের চরম পরিচয় দিয়েছেন শবদেহ সমাহিত করার পূর্বদিন। তিনটি সন্তানের হাত ধরে তিনি স্বামীর মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে হাজির হন। সন্তানেরাও এই প্রথম মৃত পিতাকে দেখেন। তারপর শুরু হয় শব শোভাযাত্রা। বিশ হাজার শোকগ্রস্ত নরনারী এই শোভাযাত্রায় সামিল হন। আর সকলের আগে সন্তানদের হাত ধরে চলেন শ্রীমতী কোরেটা। এতে শুধু ডঃ কিং-এর স্মৃতি এবং উদ্দেশ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়নি, সেইসঙ্গে এও পরিষ্কার বোঝা গেল, ডঃ কিং-এর বিধবা শ্রীমতী কোরেটার সেনাপত্যে সিভিল রাইট আন্দোলন এবার নতুন এবং অধিকতর বলিষ্ঠ পথে অগ্রসর হবে। সমবেত শবযাত্রীদের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী কোরেটা বক্তৃতা করেন। তার মধ্যে কোথাও আবেগের স্থান ছিল না। বরং ছিল নতুন কর্তব্যের দুরন্ত আহ্বান। আবেগবিহীন সংযতকণ্ঠে তিনি সমবেত

জনতাকে বলেন, আপনারা সকলেই মনে-প্রাণে ডঃ কিং-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আস্থাবান। তাই আপনারা মনে রাখবেন, তাঁর আত্মা অমর। এবং বার বার জনতার মাঝে তাঁর আত্মাই আমাদের পরিচালিত করবে।

শ্রীমতী কোরেটার মেম্ফিসে আসা মূলতই স্বামী সমর্থন নয়। বরং ডঃ কিং চেয়েছিলেন যেন তিনি এখানে এসে কাজ-কর্মে তাঁকে সাহায্য করেন। একজন্যেই তিনি মেম্ফিসে আসছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার বরাবরের চিন্তা ছিল তাঁর কাজের ভারকে কিছুটা হালকা করা। আমার জীবনের সেটাই শ্রেষ্ঠ কাজ। এবং এটাই তাঁর প্রতি আমার বৃহৎ কর্তব্যের অনুমায়। আমার চার সন্তানের তিনজন এই শোকযাত্রায় আপনাদের অংশীদার। তাদের আন্তরিক ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়েছে। আমরা তাঁকে (ডঃ কিং) মনেপ্রাণে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। তাই বিশ্বাস করি, তাঁর আত্মা মৃত্যুহীন।

পনেরো বৎসরের বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী কোরেটা প্রতিবার নতুনভাবে স্বামীর স্থৈর্য ও অহিংসা নীতিতে নিজের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। এমন কি তাঁর ধর্মীয় উপলব্ধিতে শ্রীমতী কিং অংশ নিতেন নিয়মিত। এসম্পর্কে তাঁর এক বোন মন্তব্য করেছেন, মোটামুটিভাবে যিনি গভীরভাবে ধর্মে আস্থাবান নন, তাঁদের পক্ষে এটা উপলব্ধি করা কষ্টকর যে কি ভাবে এই পরিবার স্নেহময় স্বামী এবং পিতার অপূরণীয় ক্ষতিকে শান্তভাবে গ্রহণ করেছে।

ডঃ কিং-এর মরদেহ সমাহিত হবার পর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সিভিল রাইটস অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে শ্রীমতী কিং-কে এই সংস্থার অন্যতম ডিরেকটর পদে নিযুক্ত করে এক ঘোষণাপত্র জারী করা হয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ, তিনি ভবিষ্যতে আন্দোলনের আরো বলিষ্ঠতর পথ দেখাতে সক্ষম হবেন। কারণ স্ত্রী হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন ডঃ কিং-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি মানবতার প্রতি ডঃ কিং-এর নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শেই নিজেকে গড়ে তুলেছেন। শ্রীমতী কোরেটা মনে করেন, সেবাই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। যতদূর তাঁর মনে পড়ে তাতে অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

তাঁর এই ধারণার অনেকখানি ছায়াপাত ঘটে যখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন, অশ্বেত-কায় দরিদ্রদের জন্যই আমাদের ভাবনা সীমিত নয়। আমেরিকার দরিদ্র মানুষ এবং পৃথিবীর সকল দরিদ্রদের নিয়েই আমাদের চিন্তা পরিব্যাপ্ত। প্রত্যেক মানুষকে সুখী জীবনের নির্দেশ দেবার অঙ্গীকারপত্রে আমরা স্বাক্ষর করেছি। তাই প্রত্যেকের যোগ্যতানুসারে জীবিকার ব্যবস্থা থাকা চাই। এটা হবে তার জীবনের সংস্থান। এভাবেই প্রতিটি মানুষ গড়ে তুলবে স্বাধীন ও সুখী জীবনধারা।

স্বামীর মতই শ্রীকোরেটার জন্ম 'ডিপ সাউথ'-এ। এবং তাঁরই মত সমান দক্ষতায় তিনি যেকোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন। মেরিয়নের লিঙ্কন হাই স্কুল থেকে তিনি স্নাতক হন। স্কলারশিপ নিয়ে তিনি পড়তে যান আন্টিয়ক কলেজে। এখানে তিনি সাফল্যের সঙ্গে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন। স্বাভাবিক পাঠক্রম শেষ করে তিনি ফিরে আসেন সঙ্গীত-রাজ্যের। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আসক্তি নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই। ভর্তি হলেন বোস্টনের নিউ ইংল্যান্ড কনসার্ভেটরী অফ মিউ-জিক-এ। এখানে তিনি শুধু সঙ্গীত সম্পর্কেই পাঠ গ্রহণ করলেন না, গলার স্বর সম্বন্ধে শিক্ষা নিলেন। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ডঃ কিং-এর।

এই সাক্ষাৎ পরবর্তীকালে গভীর ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। তবু শ্রীমতী কোরেটা নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে উঠতে পারতেন না। বিশেষ ডঃ কিং-এর তরফ থেকে যখন বিয়ের প্রস্তাব এলো তখন তো তিনি রীতিমত মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন। কারণ তিনি মনেকরতেন, উপার্জিত শিক্ষার যথার্থ প্রয়োগই হচ্ছে মানুষের যোগ্য কাজ। তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। আর এই বোধ তাঁর গোড়া থেকেই ছিল যে তাঁর মধ্যে কিছু অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। এসব কথা ভেবে তাঁর ভয় হতো, বিয়ের পর আর কোনকিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

তাছাড়া সংশয়ের আরো কারণ ছিল। তিনি ভেবে উঠতে পারতেন না যে, একজন মন্ত্রীর যোগ্য সহধর্মিণী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা। অন্য কাউকে বিয়ে করলে হয়তো সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ বজায় থাকবে। কিন্তু মন্ত্রীর ঘরণী হয়ে তা কি সম্ভব? এরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে তিনি ভুগতে লাগলেন প্রতিনিয়ত।

অবশেষে সব সংশয়ের ঊর্ধ্বে জয়ী হলো ভালবাসা। আঠার মাস কোর্টশিপের পর তাঁরা বিয়ে করলেন ১৯৫৪ সালে।

বিয়ের পর শ্রীমতী কোরেটা দেখলেন, তাঁর আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। ছেলেরা বড় হওয়ার পর তিনি কোন বন্ধুর তত্ত্বাবধানে তাদের দায়িত্বভার দিয়ে স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন। স্বাধীনতা-উৎসাহী সমাবেশে মাঝেমধ্যে তিনি বক্তৃতাও করতেন। আবার কোন সময় স্বামীর অনুপস্থিতি তিনি নিজেই পূরণ করে দিতেন।

শান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আন্তর্জাতিক সংস্থা 'উইমেন্স স্ট্রাইক ফর পীস'-এ তিনি যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি নিজ এবং দলে সুর-
কালীন আলোচনায় হোয়াইট হাউসে অন
প্রতিনিধি ছিলেন।

এভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্র
ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে এবং ১৯৬
গ্যালপ পোলে দেখা যায় তিনি বৎ
সর্বাধিক প্রশংসিত নারী।

এত কাজের মধ্যেও তিনি কিন্তু গ
জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নে
আটলান্টার চার্চে তিনি দীর্ঘদিন গায়ক
প্রধান ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি
ইয়র্ক টাউন হলে প্রথম সর্বসমক্ষে
প্রকাশ করেন। শ্রীমতী কোরেটার
এই কনসার্ট, এক্সপ্রেসিং ইন মিউজিক
সেন্টিমেন্টস হুইচ মোস্ট স্ট্রংগলি
জুয়েল্স মি......মাই লাইফ ইজ আ
দি চার্চ অর দি স্ট্রাগল ফর সি
রাইটস।

এই কনসার্টে শ্রীমতী কিং যুক্তরা
জাতীয় সংহতি আন্দোলনের কা
বর্ণনা করেছেন। তার সফল আত্মপ্রক
পর দেশের সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়ান
কনসার্ট নিয়ে। উদ্দেশ্য সাউথ ক্রিশ
লিডারশিপ কনফারেন্স-এর (সি
রাইটস অর্গানাইজেশন) সাফল্যের
অর্থ সংগ্রহ।

কিং-দম্পতি খুব ভাল করেই জান
সিভিল রাইট সংক্রান্ত আন্দোলন
কিং-এর জীবন বিপন্ন করে তুলতে
যেকোন মুহূর্তে। তিন বছর আগে এ
প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়ে
শ্রীমতী কোরেটাকে। সাংবাদিকরা
করেছিলেন, যদি আততায়ীর হাতে
কিং-কে প্রাণ হারাতে হয়, ত
আপনাদের এই আধুনিক ক্রুসেডের
হবে?

আমার চোখে জলের ধারা ন
নিশ্চয়ই। কিন্তু আন্দোলন অব
থাকবে। নিঃশঙ্ক শ্রীমতী কোরেটা।

তারপরেও তিনি বলেছেন, আ
মিলনে সবকিছু ছাড়িয়ে ভগবানের
জয়যুক্ত হয়েছে। এখন আমরা এক
কাজ করছি। এখানে স্বার্থপরতার
নেই। আমাদের সংগ্রাম ব্যক্তিস্বার্থের
ঊর্ধ্বে। তার চেয়ে বড়কথা, শুধু আমে
নয় সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মান
জন্যই আমাদের সংগ্রাম। তাই
অবস্থারই এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে

তিন বছর আগে শ্রীমতী কোরেট
কথা বলেছিলেন, আজ তাঁর প্রতিটি
সেকথার প্রমাণ মিলছে। আত্মোৎসর্গে
অপরিবর্তনীয়—বরং দিনে দিনে
থাকলে তাঁর মনোবল আরও দৃঢ় হ

[উপন্যাস]

আগের ঘটনা

[উনিশ শ চল্লিশের অকটোবর। কলকাতার ছেলে বিনু এল দাদু হেমনাথের বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। আশ্চর্য লাগল হেমনাথকে। কাঁধে তাঁর গোটা রাজদিয়ার ঝামেলা। আরো আশ্চর্য তাঁরই বন্ধু লারমোর। সাদাসিধে প্রাণবন্ত।

লারমোর বিনুর বিস্ময় আর যুগলের সঙ্গে তার বন্ধুর ভালোবাসা।

পর পর কদিন বেশ ঘুরে-ফিরে বেড়াল বিনু। পুব বাঙলার মাটি আর মানুষের ভালোবাসা তার চোখের সামনে এনে দিল নতুন জগতের আলো। শহর জমজমাট। পুজোর ছুটিতে সবাই দেশে গিয়েছে। ওদিকে হিরণদের নাটকের রিহার্সাল চলেছে। বিনুর দিদি সুধা পেয়েছে 'শ্যামা' আর বিজয়া নাটকের নামভূমিকা। হিরণই পরিচালক। এমন সময় দুটো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।]

।। বাইশ ।।

আগে প্রথম ঘটনাটির কথা।

সেদিন অধর সাহা যা বলেছিল শেষ পর্যন্ত তা-ই করে ছাড়ল। মহালয়ার দিন-কয়েক আগে স্বয়ং সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শ্রাদ্ধ চুকিয়ে ফেলল। যেমন তেমন করে নয়, রীতিমত ধুমধাম করে দানসাগর শ্রাদ্ধ। এই কাজটা আর ভরসা করে ছেলেদের জন্য ফেলে রাখল না সে।

রাজদিয়ার হেন মানুষ নেই যাকে নেমন্তন্ন করে নি অধর সাহা। শুধু রাজদিয়া কেন, আশেপাশের আট-দশটা গ্রাম-গঞ্জের তাবত বাসিন্দাকে নেমন্তন্ন করে এসেছিল সে।

একজন জীবন্ত মানুষ তিন-তিনটে ছেলে বেঁচে থাকতে এই মর্তলোকেই নিজের পারলৌকিক কাজ সেরে যাচ্ছে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা রাজদিয়াতে আর কখনও ঘটেনি। নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত চেনা-অচেনা—এই শ্রাদ্ধের খবর যার কানে গেছে সে-ই অধর সাহার বাড়ি ছুটেছে।

বিনুরাও হেমনাথের সঙ্গে গিয়ে শ্রাদ্ধের নেতন্তন্ন সেরে এসেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো মজার।

মহালয়ার ঠিক আগের দিন দুপুর-বেলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। স্নেহলতা এবং শিবানী ছিলেন ভেতরে। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; বাকিটুকু দুজনে ক্ষিপ্রহাতে সেরে ফেলছিলেন।

বিনু জানতে এসেছিল, কখন খেতে দেওয়া হবে। এর আগে ঘন্টাদুয়েকের মতন পড়ে ছিল; লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চারদিক উথল-পাথল করে তুলেছে। চোখদুটো এখন টক-টকে লাল। এত পরিশ্রমের পর খিদে পেয়ে গিয়েছিল খুব।

বিনু কিছু বলবার আগেই বাগানের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে যুগল এসে হাজির। ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে চাপা উত্তেজিত গলায় সে ডাকতে লাগল, 'ঠাকুরমা—ঠাকুরমা—'

বিনু চমকে ঘুরে দাঁড়াল। শিবানী এবং স্নেহলতাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যুগলের পরণে একটা নেংটি মতন; এ ছাড়া আর কিছুই নেই। সারা গায়ে পচা ভিজে পাটের ফেঁসো লেগে আছে, ফলে দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। আশ্বিনের শুরুতে রাজদিয়ায় এসে বিনু দেখেছিল, পচা পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে যুগল। এখনও তা শেষ হয় নি।

চোখের পলকে কাছে এসে পড়ল যুগল। আগের সুরেই বলল, 'সব্বনাশ হইয়া গেছে ঠাকুরমা, সব্বনাশ হইয়া গেছে—'

স্নেহলতা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'অরা (ওরা) আইসা গেছে। অখন আমি কী করি—'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'কারা এসেছে রে?'

যুগল মুখ নামিয়ে ফিসফিস করল, 'টুনি বইনের (বোনের) জামাই আর—'

'আর কে রে?'

'গোপাল দাস।'

ভুরু কুঁচকে স্নেহলতা একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'কোন গোপাল দাস রে?'

নতমুখেই যুগল বলল, 'উই যে ভাটির দ্যাশের। 'গেরামের নাম গিরিগঞ্জ—'

'বুঝেছি—' চোখের তারায় কৌতুক ঝিকমিকিয়ে উঠল স্নেহলতার, 'পাখির বাপ তো?'

'হু।' আস্তে করে ঘাড় কাত করল যুগল।

বোঝা গেল, পাখির ব্যাপারটা জানেন স্নেহলতা। বললেন, 'গোপাল দাস, গোপাল দাস বলিস যে! শ্বশুরমশাই বলতে বুঝি লজ্জা লাগে!'

যুগল পারলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায়। সে বলল, 'অখনও তো হয় নাই।'

'কী হয় নি?'

'হউর (শ্বশুর)।'

'ও—' কন্ঠস্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'পাখির সঙ্গে বিয়ে না হলে বুঝি শ্বশুর বলবি না?'

'হেই (তাই) কী কওন যায়?' বলতে বলতে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে যেতে যুগল অত্যন্ত করুণ আর বিপন্ন হয়ে উঠল, 'অখন আমি কী করি ঠাকুরমা?'

'কেন, তোর আবার কী হল?'

'ওনাগো (ওদের) কাছে কেমনে গিয়া খাড়ামু?'

'ছোঁড়া তো লজ্জায় গেলি! পুরুষমানুষ না তুই!' বলেই হাসতে শুরু করলেন স্নেহ-লতা। হাসতে হাসতেই ডাকাডাকি শুরু করলেন, 'ওগো এদিকে একটু শুনে যাও—'

হেমনাথ-অবনীমোহন উত্তরের ঘরে ছিলেন। সুধা-সুনীতিরা কোথায় কে জানে। উত্তরের ঘর থেকে হেমনাথ সাড়া দিলেন, 'যাই—'

যুগল চকিত হল, 'ঠাকুরদা আহে, আমি পলাই—'

'পালাবি কেন, দাঁড়া—'

যুগল দাঁড়াল না; ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির পেছন দিকে ছুট লাগাল। স্নেহলতা এবং শিবানী হাসতে লাগলেন।

বিনু খিদের কথা ভুলে গিয়েছিল। জলের মাঝমধ্যিখানে দ্বীপের মতন টুনিদের বাড়িটা তার চোখের সামনে ভাসছিল। বার বার পাখির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। দরজার ফ্রেমে ছবির মতন পাখির দাঁড়িয়ে

তুই গোপাল দাসের [illegible] কি আর লাগব না? [illegible] চাষার (মেয়ে চাষা) [illegible] (সে) কী বোঝে!'

বিনু মাথা নাড়ল, 'সে তো ঠিকই।'

একটু ভেবে নিয়ে যুগল এবার বলল, 'আরেকখান কথা ছুটোবাবু—'

'কী?'

'এই যে গোন্ধসাবান গোন্ধতেল মাখছি এই সকল কথা কারোরে কইবেন না কিন্তুক। ভগবানের কিরা (দিব্যি)।'

'বললে কী হবে?'

'সকলে আমার পিছে লাগব, আলঠাইব। আমারে একেরে পাগল কইরা মারব।'

মনে মনে ভেবে দেখল বিনু, কথাটা মিথ্যে নয়। ব্যাপারটা একবার সুধা বা সুনীতির কানে তুলে দিলে দেখতে হবে না, যুগলকে খাড়িছাড়া করে দেবে। তার চাইতেও বড় কথা যে যুগল বিনুকে এত সম্মান দেয়, এত বিশ্বাস করে, যত্ন করে যে তাকে সাঁতার শিখিয়েছে, নৌকোয় চড়িয়ে দিগ্বিদিকে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে, জলবাংলার পাখি-পতঙ্গ গাছপালা পাখি-সরীসৃপ চিনিয়েছে, তার দুর্বল গোপন খবর ঢাক বাজিয়ে অন্যকে জানানো উচিত নয়। এতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি তো কারোকে বলব না। কিন্তু—'

দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল যুগল।

বিনু বলতে লাগল, 'ফুলেল তেল আর সাবান মেখেছ, তার গন্ধ ঢাকবে কী করে?'

যুগলকে চিন্তিত দেখাল, 'হেই কথা তো ভাবি নাই ছুটোবাবু—'

সমস্যাটার কোন সমাধানই যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই সময় স্নেহলতার গলা শোনা গেল, 'বিনু কোথায় রে, বিনু। এ্যাই দাদাভাই, শিগ্‌গির খেতে আয়। ভাত বাড়া হয়ে গেছে।'

বিনু ছুটল। ভেতর-বাড়িতে এসে দেখল, রান্নাঘরের দাওয়ায় সারি সারি আসন পড়েছে। হেমনাথরা খেতে বসে গেছেন। একধারে আরো দুটো পাতা পড়েছে, সেখানে বসেছে দুজন অচেনা মধ্যবয়সী লোক। দেখেই বোঝা যায় চাষী শ্রেণীর মানুষ। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। পরণে [illegible] ধুতি এবং ফতুয়া। চুলে চিরুনি চালিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো এমন দুর্বিনীত যে সভ্যভব্য হয়ে হেলে পড়ে নি, আকাশের দিকে খাড়া খাড়া হয়ে আছে। [illegible] যুগলের বোনাই এবং ভাবী [illegible]। কে বোনাই আর কে [illegible] তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

বিনু লক্ষ্য করল, সুধা সুনীতি লোকদুটিকে আড়ে আড়ে দেখছে আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে। এমন কি সুরমা-স্নেহলতা-শিবানীরাও মুখ আড়াল করে হাসছেন। হাসির কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল বিনু।

গোপাল দাসের দিকে চোখ রেখে সুধা-সুনীতির পাশের খালি আসনটায় গিয়ে বসে পড়ল বিনু।

অবনীমোহন হেমনাথের পাশে বসেছিলেন। বললেন, 'কোথায় ছিলি রে? ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না।'

বিনু বলল, 'যুগলের ঘরে ছিলাম।'

অবনীমোহন কিছু বলবার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'যুগল কী করছে রে দাদাভাই?'

সাজসজ্জার কথা বলেই ফেলত বিনু, এই সময় যুগলের করুণ অনুরোধ মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'বসে আছে।'

'চান-টান করেছে?'
'হ্যাঁ।'

হেমনাথ এবার স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'যুগলকেও না হয় আমাদের সঙ্গেই দিয়ে দাও। শ্বশুর-জামাই এক আসরে বসে খাক।'

স্নেহলতা বললেন, 'খুব ভাল কথা।'

গলা চড়িয়ে হেমনাথ ডাকতে লাগলেন, 'যুগল—যুগল—'

যুগল সহজে এল না, অনেক ডাকাডাকির পর চোখ নামিয়ে জড়সড় হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তেল এবং সাবানটা যদিও সস্তা তাদের গন্ধটা কিন্তু উগ্র। যুগল এসে দাঁড়াতেই চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

প্রথমটা কেউ কোন কথা বলতে পারল না। সবাই চোখ বড় বড় করে অবাক বিস্ময়ে যুগলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হেমনাথই সুর টেনে টেনে বলে উঠলেন, 'করেছিস কি যুগলা, এ্যাঁ! মাথায় টেরি, গায়ে ফুল-হাতা জামা, নতুন কাপড়, ভুরভুরে তেল-সাবানের গন্ধ—একেবারে রাজবেশ যে রে ব্যাটা!'

দুরন্ত হাসির একটা স্রোত এতক্ষণ পাথরের আড়ালে আটকে ছিল যেন, হঠাৎ আড়ালটা সরে গিয়ে চারদিক থেকে কলকল করে ফেনায়িত উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এল।

সবাই হেসে হেসে গলে পড়তে লাগল। তার ভেতরেই হেমনাথের গলা আবার শোনা গেল, 'শ্বশুরকে দেখেই এই রকম সেজেছিস যুগলা, শ্বশুরের মেয়েকে দেখলে কী যে তুই করবি!'

যুগল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি [illegible] লাগলেন, 'যুগল—যুগল—যুগল—'

যুগলের [illegible] সে। [illegible] এবং [illegible] হয়ে এলে হেমনাথ [illegible] দিকে ফিরে তাকালেন, 'গোপাল—'

দুজনের মধ্যে যে একটু [illegible] সে তাকাল। বোঝা গেল, এ-ই [illegible] এবং হেমনাথ তাকে ডেকেছেন।

হেমনাথ বললেন, 'তারপর [illegible] কথা হচ্ছিল, যুগলের বিয়ের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে আসতে গেলে কেন? [illegible] বাপ-ভাই তো আছে।'

বিনুর মনে হল, যুগলের বিয়ের ব্যাপারে নিয়ে দুজনের ভেতর আগেই কিছু কথা হয়েছে। ভূমিকা করেই রাখা হয়েছিল, এখন তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে।

গোপাল দাস বলল, 'যুগলের বাপের কাছে গেছিলাম। হ্যায় (সে) কইল, আপনের কাছে আসতে। আপনে যা কইবেন, তা-ই হইব। আপনের কথার উপুর তার কোন কথা নাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যুগলের সঙ্গে তোমার মেয়ের কবে বিয়ে দিতে চাও?'

গোপাল দাস তৎক্ষণাৎ বলল, 'আপনে যেইদিন কইবেন।'

হেমনাথ হাসলেন, 'তোমরা দেখি দুজনেই আমার ঘাড়ে দায় চাপাতে চাও!'

দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ যুগলের বোনাই বলল, 'আপনে ছাড়া আমাগো আর আছে কে? আপনের উপুর সকল দায় দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'আমার কথা যদি শোন, তাড়াতাড়ি কিন্তু বিয়ে হবে না।'

গোপাল দাস বলল, 'তাড়াতাড়ির ঠেকা নাই। তবু কী মাস তরি (পর্যন্ত) হইব যদি কন—'

হেমনাথ বললেন, 'সেই মাঘ-ফাল্গুন মাসে, ধান-টান উঠবার পর।'

'এইটা হইল আশ্বিন মাস, হেইর পর কার্ত্তিক-অঘ্রান-পৌষ। মধ্যখানে তিনটা মোটে মাস। দেখতে দেখতে কাটাা যাইব। মাঘ-ফাগুনে আমার আপত্তি নাই।'

'তিন চার মাস সময় নিলাম কেন জানো?'

'ক্যান?'

'যুগল তো বৌ নিয়ে আমার কাছেই থাকবে। নতুন বৌর জন্য নতুন ঘরদোর তুলতে হবে। তা ছাড়া আমার একখণ্ড [illegible] কানি ধানজমি আছে। মাঝখানে মোটে একটা

কোনারকের সূর্য-মন্দির

মাস, তারপরেই ধান উঠবে। ধান ওঠার সময় আমি কোন দিকে নজর দিতে পারব না। ধানের ঝঞ্ঝাট কাটবার পর নিশ্চিন্ত হতে হবে সেই মাঘ-ফাল্গুনে।'

একটু নীরবতা।

তারপর হেমনাথই আবার শুরু করলেন, 'তোমার মেয়ের জন্যে পণ দিতে হবে তো?'

গোপাল দাস এক গাল হাসল, 'হ, হে তো দিতেই হইব।'

'কি রকম পণ চাইছ?'

সে-জাসুজি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে গোপাল দাস বলল, 'বাপ হইয়া আমি তো কইতে পারি না। তবে পাচজনে কয়, মাইয়া আমার সোন্দরী। কথাখান ঠিক কি বেঠিক, তুমিই কও—' বলে সঙ্গীর দিকে তাকাল।

যুগলের বোনাই সায় দিয়ে বলল, 'ঠিকই।'

হেমনাথ বললেন, 'সুন্দরী যে আগেই বুঝেছি।'

গোপাল দাস বলল, 'আপনি দেখছেন?'

'না।'

'তয়?'

রহস্যময় হেসে হেমনাথ বললেন, 'তোমার মেয়ে ঐ ওর বাড়ি এসে আছে তো?' বলে যুগলের বোনাইকে দেখিয়ে দিলেন।

গোপাল দাস ঘাড় কাত করল, 'হ—'

'খবর পাই, আমাদের যুগল ঘুরে-ফিরে রোজই একবার ওখানে যায়। তোমার মেয়েকে দেখে মাথাখানা না ঘুরে গেলে কি রোজ যাওয়াটা যেত? সে যাক, কত পণ চাও বল—'

'হে আপনে বিচার কইরা দিবেন।'

হেমনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'দেনা-পাওনার কথা পরে হবে। তার জন্যে আটকাবে না। তুমি বরং পৌষ মাসের শেষ দিকে একবার এসো।'

গোপাল দাস বলল, 'সেই ভাল। আমি কিন্তুক আপনের ভরসায় থাকুম বড়কত্তা—'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার কথা নড়চড় হবে না।'

দ্রুত জিভ কেটে গোপাল দাস বলল, 'হে তো আমি জানিই।'

হেমনাথ কিছু বললেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আর বসল না গোপাল দাস। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যুগলের বোনাইকে নিয়ে চলে গেল।

তারপর বাকি দিনটা যুগলকে এ বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখা গেল না।

●

মহালয়ার পর থেকেই পড়াশোনা একরকম বন্ধ করে দিল বিনুরা। যে বইগুলো বাকস থেকে বার করা হয়েছিল সেগুলো আবার বাকসে গিয়ে ঢুকল না অবশ্য, সারি সারি তাকের ওপর গিয়ে জমা হল। তাদের ওপর আশ্বিনের ধুলো জমতে লাগল।

মহালয়ার দিন থেকেই রাজদিয়ার রঙ গেছে বদলে। বর্ষায় নতুন জলের মতন দিগ্বিদিক থেকে প্রবাসী সন্তানেরা সবাই ফিরে এসেছে।

রাজদিয়ার এপাড়া-সেপাড়া থেকে এখন ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসে। আশ্বিনের শেষাশেষি বাতাস যেন সানাই হয়ে উঠেছে। আর রোদটা যেন সারা গায়ে কাঁচা হলুদ মেখে এসে দাঁড়ায়। শিউলিগাছগুলোর পাতা আর দেখা যায় না, ফুলে ফুলে সেগুলো ছেয়ে গেছে। নদী তীরে খালের পারে কাশের বন তাদের শেষ ফুলটিও ফুটিয়ে দিয়েছে। আকাশের নীল এখন আরো ঝকমকে, আরো উজ্জ্বল। পেঁজা তুলোর মতন মেঘগুলো আরো শুভ্র আরো ভারহীন মনে হয়। হলদিমনা আর মোহনচূড়া পাখিগুলো, হরিয়াল-টুনি-বুটেকলি এবং দানিভোলার ঝাঁক নিতান্ত অকারণেই নেশা-প্রমত্তের মতন আকাশময় উড়ে উড়ে বেড়ায়।

এ সময় বইয়ের পাতায় কারো মন বসে।

তা ছাড়া নাটকের ব্যাপার আছে। বেশির ভাগ দিনই রিহার্সালের আসর বসে হেমনাথের বাড়িতে। বিকেলবেলা রাজ্যের মানুষ জুটিয়ে এনে হিরণ নাটকের মহড়া শুরু করে দেয়। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি উৎসাহ অবনীমোহনের, হেমনাথও কম মাতেন নি। হৈ-চৈ—চিৎকার—হাসাহাসি এবং পরিহাসে আসর সরগরম হয়ে ওঠে, সেটা ভাঙতে রাতদুপুর।

এত হুল্লোড়ে পড়াশোনা হবার কথা নয়। বিনুর আজকাল সারাদিনই ছুটি। 'বিজয়া' নাটকে ছোট একটা রোল পেয়েছে সে। সেটুকু রিহার্সাল দিতে কতক্ষণ আর লাগে! নইলে বাকি দিনটা যুগলের সঙ্গে কিংবা একা একাই ঘুরে বেড়ায়। ছোট্ট নগণ্য রাজদিয়া শহরের সবকিছুই চিনে ফেলেছে বিনু। নদীতীর, চিত্রবিচিত্র পালতোলা অসংখ্য নৌকো, ইলসেডিঙি, স্টিমারঘাটা, কাশফুলে-শিউলি বনে আশ্বিনের মোহিনী-মায়া—এ সবের আকর্ষণ তো আছে। সবচাইতে বড় আকর্ষণ যেটা তা হল প্রতিমা।

রাজদিয়ায় মোট সাতখানা পুজো হচ্ছে। দুটো বারোয়ারি, বাকিগুলো বংশপরম্পরায় বাড়ির পুজো।

পটুয়াদের এখন আর ব্যস্ততার শেষ নেই। সারাদিনই প্রতিমার গায়ে রং লাগাচ্ছে, সোলা দিয়ে জরি দিয়ে ডাকের সাজ তৈরি করছে। সারা রাজদিয়া টহল দিয়ে প্রায় সমস্ত দিনই প্রতিমা দেখে বেড়ায় বিনু।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা স্নেহলতা হেমনাথকে বললেন, 'তুমি কী বল তো!'

হেমনাথ হকচকিয়ে গেলেন।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'একটু হুঁস-টুঁসও যদি তোমার থাকে। পুজো এসে গেল, এখনও নতুন কাপড়-চোপড় কিছুই কেনা হল না। ওর এই প্রথম দাদু-দিদার কাছে এল, ষষ্ঠীর দিনে ওদের হাতে একটু নতুন সুতো দিতে হবে!'

অপরাধীর মতন মুখ করে হেমনাথ বললেন, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আজই কমলাঘাটের বাজারে গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।'

'দাদাভাই দিদিভাই জামাই-মেয়ের জন্যে তো কিনবেই। অন্য অন্য বছর যাদের দেওয়া হয় তাদের জন্যও নিয়ে আসবে।'

'নিশ্চয়ই।'

বেলা একটু চড়লে অবনীমোহনকে নিয়ে কমলাঘাট রওনা হলেন হেমনাথ। বিনুকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, রাজদিয়ার মনোরম প্রতিমাগুলি ছেড়ে সে যেতে রাজী হল না। (ক্রমশঃ)

উপকারের জাত বিচার

দুর্লভ চক্রবর্তী

রচনা লিখতে শেখা বাল্যশিক্ষার একটি অনিবার্য অংশ। সব ইস্কুলের পুস্তক-তালিকাতেই সেজন্যে নিচের দিকের ক্লাসে রচনার বই দেখতে পাওয়া যায়। আর, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রায় সমস্ত রচনার বইয়েই গরুর বিষয়ে একটি নিবন্ধ থাকে। এবং বেশির ভাগ নিবন্ধেরই প্রথম বাক্যটি হল—গরু একটি উপকারী প্রাণী।

কথাটা মিথ্যা নয়। অন্তত তার সারাংশ তো বটেই। সত্যিই গরু থেকে আমরা অনেক উপকার পাই। কিন্তু তাই বলে 'গরু উপকারী প্রাণী' একথা বলা চলে কি?

আচ্ছা, 'উপকারী' কথাটা মানে কী? নিশ্চয়ই—যিনি বা যে আমাদের উপকার করেন বা করে। যেমন বলা যায়, শ্যামবাবু একজন উপকারী মানুষ। অর্থাৎ তিনি অন্য লোকের উপকার করে থাকেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, উপকার করার জন্যে শ্যামবাবুর ওপর কোনো চাপ নেই। নিজেই তিনি উপকার করে থাকেন। একেবারে স্বেচ্ছায়, বাধ্যবাধকতাহীনভাবে। কিন্তু এই অর্থে গরু নামক প্রাণীটিকে কি উপকারী বলা চলে? নৈব নৈব চ। গরু কক্ষনো নিজে থেকে কোনো উপকার করে না। পৃথিবীর কোনো গরুকেই কখনো স্বেচ্ছায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে দুধের জোগান দিতে দেখা যায়নি।

অথচ, আগেই বলেছি, গরু থেকে যে আমাদের উপকার হয় এও অতি সত্যি কথা। স্বেচ্ছায় না হলেও পরের ইচ্ছায় তো বটেই।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, উপকার আসলে দুই রকম। এবং উপকারের এই দ্বিবিধ রূপ, অর্থাৎ অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ, এ দুটিকে ফুটিয়ে তোলাই বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য।

অ্যাকটিভ বা সক্রিয় উপকারের নিদর্শন পাওয়া যাবে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী রচিত 'মহাস্থবির' জাতকের একটা ঘটনায়। 'স্থবির' নামক বালকটির পিতা খুবই কর্তব্যবান ব্যক্তি ছিলেন। সদাচার সুনীতি ইত্যাদির দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল মজ্জাগত। তিনি চাইতেন, তাঁর ছেলেও যাতে সৎপ্রকৃতির হয় এবং সুশীলভাবে বেড়ে ওঠে। সেজন্যে তিনি ছেলেকে যথেষ্টই তাড়না করতেন, এবং শারীরিক শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। একবার, যদ্দুর মনে পড়ে, স্থবির লাট্টু ঘোরাচ্ছিল, তার হাত ফসকে লাট্টুটা লেগেছিল গিয়ে বাসনমাজা ঝিয়ের গায়ে, এবং সেখান থেকে গড়িয়ে এসে লেগেছিল স্থবিরের মায়ের পায়ে। আপিস থেকে বাড়ি ফিরে একথা স্থবিরের পিতৃদেব শুনলেন, এবং নিজে তো ছেলেকে তাড়না করলেনই, উপরন্তু ছেলের চরিত্রগঠনের পক্ষে উপকারী হবে মনে করে তার ইস্কুলের নোটবইয়ে লিখে দিলেন, (ভাষাটা হুবহু মনে নেই, তবে এই রকম) এই বালক ভয়ানক রকম আত্মসুখী। আত্মসুখের জন্যে এ নারীহত্যা, এমনকি মাতৃহত্যাতেও কুণ্ঠিত নয়।... পাঠক মনে রাখবেন, নারীহত্যা মানে ঝিয়ের গায়ে লাট্টু লাগা এবং মাতৃহত্যা মানে মায়ের পায়ে লাগা। আপনারা হয়তো কেউ কেউ মনে করছেন, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা মনে রাখবেন, সক্রিয় উপকারের ধারণাটাই এইরকম। এবং সেদিন যে স্থবির ইস্কুলে যারপরনাই তিরস্কৃত হয়েছিল, সেটাও ঐ সক্রিয় উপকারেরই অন্যতম করোলারী।

কিন্তু যতো তাড়নাই লাভ করে থাকুক স্থবির, পিতা-পুত্রের ব্যাপারটা তবু আন্দাজ করা যায় কিছু পরিমাণে। উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ছিল সেখানে শতকরা একশ' ভাগ। কিন্তু এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন।

পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' গল্পটি সকলেরই পড়া আছে। তার প্রধান চরিত্র নন্দবাবুর কথা ভাবুন। নন্দবাবু বাড়ি ফেরার পথে ট্রাম থেকে নামবার সময় পায়ে কোঁচার কাপড় আটকে পড়ে গিয়েছিলেন। অবিশ্যি পড়ে গিয়ে তাঁর কিছু হয়নি, দিব্যি অক্ষত শরীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু সে কথা কেউই মানতে চাইলেন না। নন্দবাবু নিরীহ প্রকৃতির ধনীসন্তান এবং বিপত্নীক, সেজন্যে বন্ধুরা তাঁকে প্রায় পেয়ে বসেছিলেন। তাঁদের নিয়মিত উপদেশ এবং সক্রিয় উপকারের শিকার হয়ে নন্দ ক্রমে ক্রমে অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ এবং হেকিম দেখিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লেন, অবশেষে নেমপ্লেট না পড়েই ঢুকে পড়লেন এক লেডী ডাক্তারের চেম্বারে। এবং ডাঃ বিপুলাও নন্দবাবুকে অসহায় দেখে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে অগ্রসর হলেন। অর্থাৎ সারাজীবনের জন্যে তিনি নন্দবাবুর ভার নিয়ে অন্দরমহল আলো করে বসলেন। সক্রিয় উপকার যাকে বলে ষোল কলায় পূর্ণ হল।

এরপর ধরুন নিষ্ক্রিয় উপকারের দৃষ্টান্ত। শ্রীকান্তের সেই নতুনদার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? সেই 'ঠুনঠুন পেয়ালা' গানের নতুনদা? কিন্তু সে-সব তো পরের ঘটনা। আগের কথা ভাবুন।

শীতের রাতে নতুনদার তামাক সাজা দিয়ে শ্রীকান্তর নিষ্ক্রিয় উপকারের প্রথম পাঠ শুরু হল।

শ্রীকান্ত তামাক সেজে হুঁকোটা নতুনদার হাতে দিতেই তিনি বললেন....তোর গায়ে ওটা কালপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুটচে—পেতে দে দেখি, বসি!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কিছুক্ষণ পরেই বাতাস পড়ে গেল। পালে আর হাওয়া লাগল না। নৌকো আর এগোতে চায় না। তখন নতুনদা প্রথমে বললেন, 'এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।' কিন্তু ইন্দ্র যখন বলল যে, উজান বয়ে দাঁড় টানা অসম্ভব, এবং শ্রীকান্ত যখন ইন্দ্রের কাছে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করল যে, 'গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?' তখন তার কথা শেষ না হতেই নতুনদা দাঁতমুখ ভেংচে বলে উঠলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন?

নিষ্ক্রিয় উপকারের সিং-দরজা খুলে গেল। এরপর শ্রীকান্তের ভাষায়—'একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল।'

নিষ্ক্রিয় উপকারের একটি মোক্ষম দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে!

আমাদের নিজের জীবনেও কি উপকারের এরকম সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় দৃষ্টান্ত অনেকগুলোই খুঁজে পাওয়া যাবে না? কিন্তু এ নিয়ে হা-হুতাশ করা বৃথা। কেননা, 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' এবং গন্ধ ও ধূপের মধ্যেই ফিরে যেতে চায়। অর্থাৎ উপকারী ব্যক্তি উপকার করার জন্যে চেষ্টা করে যাবেনই, এবং কোনো কোনো ব্যক্তিকে অন্যের উপকৃত হবার বাসনাকেও চরিতার্থ করতে হবে। এই 'গিভ অ্যান্ড টেক' নিয়েই তো সংসার। এ নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ কি।

হাসির মজলিস

— তুমি আমার জন্যে এই প্ল্যাস্টিকের ফুল নিয়ে এলে কেন?
— তোমার অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে আসল ফুল যে শুকিয়ে ঝরে যায়।

●

একজন নির্বোধ মহিলা যে-কোন চালাক পুরুষকে বশ করতে পারে, কিন্তু নির্বোধ পুরুষকে হাতে আনতে নিদারুণ চালাক মহিলার প্রয়োজন।

●

স্বামী—এই ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দেব। ও উন্মাদের মত গাড়ি চালিয়ে আমাকে বার-দুয়েক প্রায় মেরেই ফেলেছিল।
স্ত্রী—না, না, এখনই ছাড়িও না। ওকে আর একবার চান্স দেওয়া উচিত।

●

দুই বন্ধুর সংলাপ।
— আমার স্ত্রী ভাই প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখে, সে কোন এক কোটিপতিকে বিয়ে করেছে।
— তোমার স্ত্রী দেখে রাতে। আর আমার স্ত্রীর ওটা দিবাস্বপ্ন, তাই রক্ষে।

●

অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা চাকরি করতে করতে প্রেমে পড়লেন। তাঁর লাইফ ইন্সিওর করা ছিল। একদিন তাদের অফিসে গিয়ে তিনি টাকা দাবী করলেন। কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে জানান হোল : পলিসি অনুযায়ী কোন অ্যাকসিডেন্ট হলে বা মারাত্মক অসুস্থ হলেই আমরা টাকা দিয়ে থাকি।

মহিলা জানালেন, তাঁর যেটা হয়েছে, তাও নিশ্চয় একটা একসিডেন্ট।

●

কনস্টেবল একটি পকেটমার ধরে থানায় নিয়ে এল। পুলিশ অফিসার তাকে দেখেই বললেন—অনেকদিন পরে একজন পকেটমার ধরতে পারলে দেখছি।

— কি করব স্যার। মার্চ শেষ না হলে তো ওদের সিজিন শুরু হয় না। শীতের চোটে সবাই যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখে।।

ম্যানেজার—এবার আপনার সার্টিফিকেটগুলো দেখি।
কর্মপ্রার্থী—সেগুলো দেখাতে আমি লজ্জাবোধ করি। কারণ আমার চেহারার মত সেগুলোও আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে।

●

বিশ্বজিৎ ঘোষ, পুরুলিয়া পলিটেকনিক।

আমার এক বন্ধু সেদিন হোস্টেলে এসে বলল, জানিস বিশু, আমার বাবা সেদিন দেখালেন, একটা ছাত্র পরীক্ষার খাতায় 'আমি তাকে হাড়ে হাড়ে 'চিনি'-র ইংরেজি লিখেছে 'আই সুগার হিম বোন টু বোন'।

●

মামা—খোকা, তোমার তো প্রতি বিষয়ের মাস্টার রেখেছিলাম, তবু তুমি ফেল করলে?
খোকা—বাবা, আমি যে এগ্রিগেটে ফেল করেছি।
মামা—সেকি, 'এগ্রিগেটে'র মাস্টার ছিল না বুঝি? এবার অবশ্যই রেখে দিও।

●

ভদ্রমহিলা ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে ভদ্রলোক পাশে বসে পাইপ টেনে চলেছেন। পৃথিবীর কোন জিনিসেই তাঁর যেন আগ্রহ নেই, একমাত্র ধূমপান ছাড়া। থাকতে না পেরে হঠাৎ ভদ্রমহিলা বলেই ফেললেন : ধূমপান কি আপনার আয়ু বাড়িয়েছে?

নিশ্চয়ই—বলেই ধূমপানরত ভদ্রলোক মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। তাতে ভদ্রমহিলা আরও রেগে গেলেন। —জানেন আমি ষোল বছর বয়স থেকে ধূমপান করছি।—ভদ্রলোক বললেন আবার —কোনদিন আমার জ্বর কেন, সর্দি-কাশি পর্যন্ত হয়নি। এখন আমার বয়স আশি। এরপর আপনি কি বলবেন?

বেশ কড়া গলার বলে উঠলেন মহিলা—আপনি যদি ধূমপান না করতেন, আমার মনে হয় তাহলে এখন আপনার বয়স নিশ্চয়ই নব্বই হোত।

আপনি কি যথার্থ সহানুভূতি সম্পন্ন ?

আপনি হয়তো মনে মনে ভেবে থাকেন, পনার মতো সহানুভূতি বুঝি আর রো নেই। কিন্তু হয়তো আপনি নিজেকে না করছেন এই কথাটি ভেবে।

মানুষের দুঃখ অসুবিধায় সহানুভূতি ধ করা, বিপদ-আপদে করুণাভরা মন য়ে সাহায্য করা, বিব্রত দুর্গতদের দয়া-ক্ষিণ্য করার মহৎ গুণগুলি সকলেরই কা দরকার। কেবল নিজেকে বাঁচিয়ে খে-স্বচ্ছন্দে টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা রলে সত্যি সত্যি সুখে থাকা যায় না। র্গণত মানুষ যে মিলেমিশে সমাজ গড়ে লছে, এর মূল কথাই হলো সহানুভূতি, হযোগিতা, করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্য।

আজ আমরা প্রচন্ড লড়াই-এর তাগিদে য়ই নিজেকে নিয়ে বড়ো বেশি ব্যস্ত য়ে পড়ি, তাই ব্যক্তিমনা অর্থাৎ ইনডিভি-য়ালিস্ট হয়ে পড়ছি। এইভাবে ব্যক্তিমনা য়ে পড়াটা কিন্তু সমাজকে টিঁকিয়ে খতে পারে না, আর সমাজ টিঁকে কার কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হলে ব্যক্তি-ত্রই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হারাবে। ব্যাপারটা মনিই অঙ্গাঙ্গীবন্ধ।

আপনি সৎ সুন্দর মহান ভাল-নুষটি হয়ে থাকার জন্যেই সহানুভূতি, রুণা, দয়া, দাক্ষিণ্যের চর্চা করবেন, এমন থা কিন্তু বলছি না। আপনি সহানুভূতি-স্পন্ন হবেন, আপনার চারিপাশের সমাজ-ঠামোটাকে খাড়া রাখার জন্যেই ; সে-ঠামোর কোথাও যদি অপলকা দুর্বল য়ে থাকে, তাহলে চোখ ফিরিয়ে চললে একদিন সেটি আপনারই ঘাড়ে ভেঙে পড়তে পারে। তাই নয় কি ?

সেইজন্যেই বলছি, আপনার চারি-পাশের জনমানুষের মধ্যে কারুর মধ্যে কোনো ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখলে তৎক্ষণাৎ সহানুভূতি সহযোগিতা দিয়ে মেরামত করে ফেলার জন্যে এগিয়ে আসুন। তাতে আপনারই ভবিষ্যৎ শক্ত হবে, মন প্রফুল্ল হবে, ভয়-ভাবনা কমবে অনেক।

এসব তো উপদেশের মতোই শোনালো। এবার নিশ্চয়ই যাচাই করতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মধ্যে সহানুভূতি বোধ আছে কতোখানি ? বেশ, নিচের প্রশ্নগুলিতে একটি-একটি করে আন্তরিক ভাবে জবাব দিতে থাকুন। সত্যি কথা বলবেন কিন্তু। আর তৈরী থাকবেন, সব জবাব মিলিয়ে যে হিসেব পাবেন, তাতে মনে মনে একটু আঘাত পেতেও পারেন।

আপনার পছন্দ-মতো (ক) কিংবা (খ)-তে টিক্ চিহ্ন দিয়ে যান। সব নীচে পয়েন্ট হিসাবের নিয়ম দেওয়া আছে, মিলিয়ে নিন।

১। (ক) ট্রামে, বাসে, ট্রেণে আপনি কি সব সময়ে বয়স্ক বৃদ্ধদের সীট ছেড়ে দেন ?

(খ) আপনি কি মনে করেন অন্য সবায়ের মতো আপনারও বিশ্রাম করার দরকার আছে ?

২। (ক) সত্যি সত্যি খুব ধড়ফড় করে কোথাও যাচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন আপনি যেদিকে যেতে চান ঠিক তার উলটো দিকে রাস্তা পার হতে চাইছেন একটি অন্ধ লোক ; আপনি কি তখন নিজের কাজেই চলে যাবেন এই কথা ভেবে যে, আরও অনেক লোক তো রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই লোকটাকে সাহায্য করতে পেলে খুশি হবে ?

(খ) আপনি কি নিজেই খানিকটা সময় নষ্ট করে লোকটিকে রাস্তা পার করিয়ে দেবেন ?

৩। (ক) আপনি যদি দেখেন কোনো ছেলে হারিয়ে গেছে, তাহলে তার বাবা-মাকে খুঁজে বার করে তাঁদের কাছে ছেলেটিকে পৌঁছে দেবার জন্যে আপনি কি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ?

(খ) আপনি কি ছেলেটিকে পুলিশের জিম্মায় দিয়ে আসবেন ?

(৪) (ক) আপনি কি কেবল পুজো-পার্বণের দিনেই গরীব-দুঃখীদের দান করেন ?

(খ) অর্থসাহায্য করা কি আপনার নিয়মিত স্বভাব ?

৫।(ক) আপনি কি পথের কুকুর-বেড়ালকে খেতে দেন ?

(খ) দেখলেই ওদের তাড়িয়ে দেন ?

৬। (ক) বেশ রাত হয়েছে, আপনি ক্লান্ত, যত শিগগীর পারেন বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ; এমন সময়ে আপনার গাড়ী চালাতে চালাতে আর এক-খানি বিগড়ে-যাওয়া গাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি কি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামিয়ে অকেজো গাড়ীটির বিপন্ন ভদ্র-লোকটিকে সাহায্য করতে চাইবেন ?

(খ) এরকম পরিস্থিতিতে আপনি কি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবেন নিজের গাড়ী চালিয়ে ?

৭। (ক) আপনার প্রতিবেশী এক ভদ্র-লোক এমন ধরণের যে তাঁর সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে চলা যায় না, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আপনি কি তাঁর জন্যে কিছু করে দিতে চাইবেন ?

(খ) এক্ষেত্রে আপনি কি মনে ভাববেন ভদ্রলোকটির আত্মীয়-স্বজনরাই যা করবার করবেন ?

৮। (ক) আপনি যখন কাউকে কোনো সাহায্য করেন, তখন কি এমন ভাবে পাকা ব্যবস্থা করেন যাতে সবাই আপনার বদান্যতার দিকে তাকিয়ে দেখে ?

(খ) যতোদূর সম্ভব সবার অজান্তে ভালো কাজ করাই কি আপনার অভ্যাস ?

৯। (ক) আপনি যখন জানতে পারেন কোনো মা-বাবা শাসনের নামে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাস্তবিক কোনোরকমে কোনো অনিষ্ট করছেন, তখন কি আপনি খুব রেগে ওঠেন ?

(খ) এসব শুনলে আপনি কি মনে করেন, কতকগুলি ছেলে-মেয়ের ঐ ধরণের শাসনই দরকার ?

সঠিক জবাব হিসেব করার নিয়ম :

প্রত্যেকটি সঠিক জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন।

সঠিক জবাব হলো :—১(ক), ২ (খ), ৩ (ক), ৪ (খ), ৫ (ক), ৬ (ক), ৭(ক), ৮ (খ), ৯ (ক)।

সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ৪৫।

যদি আপনি সত্যি কথা বলে আন্তরিক ভাবে জবাব দিয়ে ৩৫ থেকে ৪৫ পয়েন্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে বাস্তবিকই আপনার অন্তরটা মানবিক দয়া-দাক্ষিণ্যের অমৃতরসে পরিপূর্ণ।

২০ থেকে ৩০ পয়েন্ট পেয়েছেন ? তাহলে আপনি মাঝে মাঝে একটু স্বার্থ-পর হয়ে পড়েন বুঝতে হবে—অবশ্য, আমরা সকলেই একটু-আধটু হই আর কী।

২০ পয়েন্টেরও কম যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার মধ্যে সহানুভূতি বলে বস্তুটি কমই আছে বলতে হবে।

কালো মুক্তো

পিটার ওডোনেল
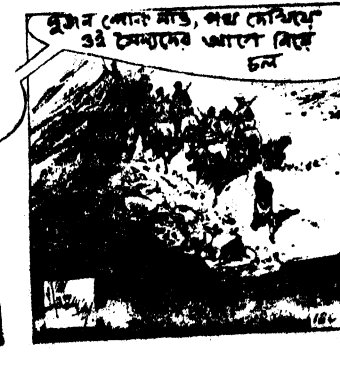
প্রদর্শনী পরিক্রমা

মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ থেকে ১২ জানুয়ারী কলকাতার সরকারী মহাবিদ্যালয়ে একটি মনোজ্ঞ চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আধুনিক আমেরিকান শিল্পীরা কিভাবে শিল্পের মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করেছেন তার যৎসামান্য নিদর্শন দেখা গেল। এই শিল্পীদের অনেকেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করে-ছেন এবং আধুনিক বিমূর্ত শিল্পরীতির আবহাওয়াতেই গড়ে উঠেছেন। কিন্তু সারা প্রদর্শনীতে বিমূর্তরীতির নিদর্শন অতি অল্পই দেখা গেল; যদিও তাতে শিল্পীদের আধুনিকত্ব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হল না। সব রকমের শিল্পরীতির অবাধ-চর্চার সুযোগ পেয়ে এ'রা যে ধরনের শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা করছেন তাতে আধুনিক রীতির আঙ্গিক পুরোমাত্রায় বজায় রেখে সর্বজনবোধ্য ভাষায় শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। তাই প্রদর্শনীর 'কমিউ-নিকেশন থ্রু আর্ট" নামটি অনেকখানি সার্থকতা লাভ করেছে বলে মনে হয়।

আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে ছবি-গুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। সবগুলিই কাগজের ওপর আঁকা। শিল্পীরা জল রং, তেল রং, এচিং, এনগ্রেভিং সিল্কস্ক্রীণ ও বিভিন্ন মিশ্রমাধ্যমের সাহায্যে কাগজের ওপর যত রকম শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তার অনেকগুলি নিদর্শন দেখা গেল। এই শিল্পীদের মধ্যে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষই রয়েছেন। শিল্পশিক্ষক, এঞ্জিনী-য়ার, গৃহিণী এমনকি শ্রমিক পর্যন্ত। হয়ত বা সেই জন্যেই অধিকাংশ ছবির মধ্যেই একটা সার্বজনীন আবেদন দেখা গেল।

শিল্পীদের প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে নিয়মিত শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ-গ্রহণ করেছেন। এ'দের আঙ্গিকের মান খুবই উঁচু। ফিগারেটিভ কাজগুলির মধ্যে একটা সাবলীল ঝরঝরে ভাব এবং গভীর অনুভূতির প্রকাশ দেখা গেল।

গ্রাফিকের কাজের মধ্যে হ্যারল্ড আল্ট-ম্যানের 'স্ট্যান্ডিং উয়োম্যান' একরঙের লিথোগ্রাফির সুন্দর নিদর্শন। রবার্ট মুর্কটিএর 'চ্যাপলিন' কতকটা পোস্টার ধর্মী, অনেকগুলি, ছবির সমষ্টি—সিল্ক স্ক্রীণে ছাপা, বহুবর্ণ ছবি। জোসেফ হির্শের সিল্ক স্ক্রীণ 'নিদ্রিত মুখ' বহু রেখা ও রঙের মাধ্যমে করা সমবেদনাময় ছবি। আরেকটি বলিষ্ঠ কাজ হল ডীন মীকারের 'লাক অব দি ডার্ট", ক্রীড়াঙ্গণে আহত ষাঁড়ের রঙে রেখায় গতিময় মূর্তি। জন রসের বড় কাঠখোদাই 'এক্সপালশন' এবং বেথ ভান হোজেনের 'সিন্থিয়া' কতকটা সাবেকী ধরনের—কিন্তু পাকা হাতের কাজ। নন ফিগারেটিভ কাজের মধ্যে ক্যারল সামার্সের 'স্ট্রম্বোলি ইন কসর্' এবং নোরিও আজুমার 'দি টাউন' উল্লেখযোগ্য।

জলরঙের কাজে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা গেল তার মধ্যে রিচার্ড আর্ণল্ডের 'হেড অব এ ম্যান' খুব খুঁটিয়ে আঁকা গভীর অনুভূতিপূর্ণ কাজ। ক্যাথারিণ বারিক্যের 'লেডি অব দি প্ল্যান্টস' আর জুন ফেল্টারের 'ড্রেপড উয়োম্যান ইন রুম' জোরালো নির্ভুল স্ট্রোকে আঁকা ইম্প্রেশনিস্ট ধর্মী ছবি। জন, সি, মোনিহানের 'ট্রি' রঙের আবেগ-ময় ছোপ দিয়ে করা কতকটা এক্সপ্রেসানিস্ট ধর্মী কাজ। আরেকটি নিখুঁত জলরঙের কাজ দেখা গেল জন, সি, ওয়েনরিচের 'প্যাটার্ণ" ছবিতে। রেলের গুদাম ও মাল-গাড়ি নিয়ে অতি সরল একটি জ্যামিতিক নকশা তৈরী করা হয়েছে। জর্জ সুয়োকার কালিকলমের ড্রইং 'ক্যাটস' এলেন ল্যানি-য়নের পেন্সিলের কাজ 'ফার্স্ট ফ্লোরা' এবং রবার্ট এ গাফএর আরেকটি নিখুঁত পেন্সিল ড্রইং 'ওয়্যার ফেন্স' আধুনিক ড্রয়িংএর চমৎকার নিদর্শন।

কাগজের ওপর তেল রঙের আধা ফিগারেটিভ কাজ হিসেবে টমাস স্পৌবেলের বাদামীরঙের ছোট ছবি 'ল্যান্ডস্কেপ, স্পেন", ভারগিসের 'স্টিল লাইফ' ও মিশ্রমাধ্যমে করা জ্যাক উলান্সকর জ্যামি[illegible] ভঙ্গির 'অরিজিন অব স্পেসিজ' চমৎ[illegible] কাজ। প্রদর্শনীটি আমেরিকার মিউজি[illegible] ও গ্যালারি পরিচালক কয়েক[illegible] বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনা করেন।

●

বারিদ গোস্বামী ছোট মা[illegible] ১৭ খানি ড্রয়িং ও ডিজাইনের [illegible] প্রদর্শন করলেন ৮ থেকে ১৪ জানুয়া[illegible] মধ্যে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি' হাউ[illegible] পার্ক হোটেলের সংলগ্ন এই প্রদশ[illegible] গৃহটি রাস্তার পেছনে পড়ে যাও[illegible] বর্তমানে লোকচক্ষুর অগোচরে [illegible] গিয়েছে। হোটেলের কর্তৃপক্ষ এটি সাম[illegible] দিকে নিয়ে আসতে পারলে ভাল হত।

শ্রীগোস্বামীর নবতম শিল্প প্রদর্শন[illegible] হাল্কা স্বচ্ছন্দ রেখা ও ড্রাই ব্রাশে অ[illegible] কয়েকটি পরিচ্ছন্ন ড্রয়িং দেখা গে[illegible] দ্বিতীয় প্রকারের কাজের মধ্যে 'বাফে[illegible] এবং 'ফেস অব অ্যান ইনসেন' উ[illegible] যোগ্য। নিছক ক্যালিগ্রাফির দিক থে[illegible] 'জীসাস' ও 'সিটিস্কেপ'এর নাম [illegible] যায়।

তাঁর ডিজাইনগুলি জ্যামিতিক অ্যা[illegible] স্ট্রাক্ট ঘেঁষা হলেও একেবারে বিষ[illegible] বহির্ভূত চিত্র নয়। বিভিন্ন বর্ণের কা[illegible] কেটে এবং সরু কার্ডবোর্ডের ফালি জ[illegible] অধিকাংশ ডিজাইন সৃষ্টি করা হয়ে[illegible] কখনো দেশলাই কাঠি বা সিগারে[illegible] টুকরোও বেশ সুচিন্তিতভাবে ব্যব[illegible]

বাফেলো : শিল্পী—বারিদ গোস্বামী

ছেন তিনি। এই ডিজাইনগুলির মধ্যে ধরনের হাল্কা পরিহাসের ভাব আছে ভালই লাগে—যেমন "মডার্ণ হনুতোম" "ফেস অব এ সিটি ক্যাট" কাজ। ড়া "ডিজাইন ইন এ রেকটাঙ্গল", ট্রেট অব মাই গার্ল ফ্রেন্ড" বা াকার" উল্লেখনীয় কাজ। পরিচ্ছন্ন র্শনী—তবে কোথাও কোথাও একটু াপন চিত্রের গন্ধ আছে।

●

বৈজয়ন্তী ভিডে নাগপুরের শিল্পী। কর্মের অবকাশে শিল্পসাধনা করতে ছে। বোম্বাই ও নাগপুরে তিনি শিল্প-া লাভ করেন। স্বামী ভারতীয় রিক বিভাগে কাজ করেন বলে নিত্য-বর্তনশীল কর্মস্থলে তাঁকে ঘুরতে ছে—ফলে একনাগাড়ে শিল্পসাধনা ব হয়নি। কিন্তু শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত হওয় পর্যন্ত তিনি প্রদর্শনী করতে ত হননি। গত বছর বোম্বাইয়ের জে. স্কুল থেকে তাঁর শিল্পশিক্ষা শেষ য়ার পর তিনি গত ৭ থেকে ১২ য়োরী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২৪ খানি জল ও তেল রঙের প্রথম ক চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন।

তাঁর দীর্ঘকাল অপেক্ষার ফল একদিক য় ভালই হয়েছে। কারণ প্রথম একক র্শনীতে অনেকখানি পরিণত ভঙ্গীর জ সহজে চোখে পড়ে না। শ্রীমতী ভিডে গারেটিভ ও নন-ফিগারেটিভ উভয় তিতেই অনেকখানি পারদর্শিতা লাভ রছেন। তবে আমার কাছে এই দুয়ের মাঝামাঝি ধরনের কাজগুলিই সবচেয়ে দৃশ্য মনে হল; ডিজাইন ও বক্তব্য এসব ত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। জল এবং তেল -এর কাজে তাঁর সমান পারদর্শিতা দেখা ল। তাঁর ছোট মাপের তেল রঙের কাজ ম দি র‍্যামপার্ট" এবং "হানাবাড়ি" র্জনতা এবং বিশেষ একটি মুড সৃষ্টির জে সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁর জল ঙের "বিদায়" ছবির মধ্যেও বিচিত্র ডজাইন ও আলোকসম্পাতে একটা নদৃষ্ট চিত্রের রূপ ফুটে উঠতে দেখা য়। জলরঙের অন্যান্য কাজের মধ্যে রুইনস ইন মুনলাইট" এবং "রকস্" ডজাইন ও রঙের দিক থেকে প্রশংসনীয় াজ।

●

শঙ্কর গুহ তরুণ শিল্পী। সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়েছেন। আর্টিস্ট্রি হাউসে ১ থেকে জানুয়ারী তাঁর ১৫খানি তৈলচিত্র প্রদর্শিত হল।

শ্রীগুহের কাজে তাঁর তেলরঙের ব্যব-হারের দক্ষতা এবং রঙের বাহারের নিদর্শন লক্ষ্য করা গেল। মূলতঃ আধা ফিগারেটিভ ও নন্-ফিগারেটিভ কাজ উপস্থিত করে-ছেন তিনি। ব্যক্তিগত প্রতীকের ব্যবহারও আছে, তবে বেশী নয়। চিত্রপটকে তিনি নানাভাবে বিভক্ত করে ছবিতে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। লাল, নীল, বেগুনী ও কালো রঙের ব্যবহার তাঁর কাজে বেশী

আওয়ার কালচার : শিল্পী : বৈজয়ন্তী ভিডে

দেখা গেল। অত্যন্ত সরল গঠনের 'পেনসিভ আউল' এবং বেশ সুচিন্তিত কম্পো-জিশনের 'প্যাশন', 'ফরচুন টেলার', 'রথ-যাত্রা', 'লেজী নুন' ও 'শু শাইনারস' তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ। রঙের হাত তাঁর মিষ্ট হলেও গভীরতা অর্জনের ইঙ্গিত তাতে আছে।

●

গত ৯ই জানুয়ারী বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচারের প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন হল। এই উপলক্ষে এখানে সমকালীন শিল্পকলার একটি সুসজ্জিত প্রদর্শনী ২০ জানুয়ারী অবধি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

৪০ জন আধুনিক শিল্পীর ৬১খানি চিত্র ও ভাস্কর্য নিয়ে সজ্জিত এই প্রদর্শনীতে একান্তভাবেই তরুণ শিল্পী-দের কাজ দেখান হয়েছিল। প্রবীণদের মধ্যে এক গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব সেন ও পরিতোষ সেনের নাম করা যায়। প্রদর্শনীর অনেকগুলি দ্রষ্টব্য অবশ্য ইতি-পূর্বেই এখানে অনুষ্ঠিত কোন-না-কোন যৌথ বা একক প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে।

সুনীলমাধব সেনের সর্বাধুনিক রীতির দু'খানি কাজ 'সরস্বতী' ও 'হয়-নারী' বিশেষভাবে নজরে পড়ে। দ্বিতীয় রিলিফ কাজটির গোলাকৃতি কম্পোজিশন ও রক্ত-বর্ণের ব্যবহারে একটা আকর্ষণীয় বিশিষ্টতা আছে। পরিতোষ সেনের 'ফিগার ইন ব্লু অ্যান্ড রেড'-এ ফিগার খুঁজে পাওয়া শক্ত, তবে ব্লু অ্যান্ড রেডের প্রাচুর্য অনস্বীকার্য। মহিম রুদ্রের দু'খানি ছবির মধ্যে 'ভিউ আউট অব দি উইন্ডো'র মাতিস-ঘেঁষা উজ্জ্বল ফ্ল্যাট রঙের প্রয়োগ বেশ তৃপ্তিকর। গণেশ হালোই-এর 'দি ফেন্স অ্যান্ড দি বয়' ধূসর বর্ণের কাজ কিন্তু শিশুর মুখের অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুহাস রায়ের এচিং 'আউল' এবং শ্যামল দত্তরায়ের অ্যাবস্ট্রাক্ট এচিং 'উইন্ডো' সংযত বর্ণ এবং টোনের বাহারের নিদর্শন। সনৎ করের দু'খানি তৈলচিত্রের মধ্যে দু'নম্বর কম্পোজিশনটির কমলা, নীল ও সবুজের বাহার বেশ পাকা হাতে সাজানো। গণেশ পাইনের সূক্ষ্ম ড্রইংটি তাঁর সুপরিচিত ভঙ্গীর স্বাক্ষর। এছাড়া অনিল সাহা, শৈলেন মিত্র, বীণা ভার্গব, সুনীল দাস ও নির্মল দত্তের কাজ-গুলি সুদৃশ্য লাগল।

ভাস্কর্যের মধ্যে রঘুনাথ সিংহের 'মাস্ক' এবং প্রভাস সেনের 'রিক্লাইনিং ফিগার' বেশ বলিষ্ঠ কাজ। শর্বরী রায়-চৌধুরীর দুটি ছোট কাজ এবং সুবল সাহার 'পেঁচা' বেশ সুরুচিসম্পন্ন। স্টুয়ার্ট ল্যামলের দুটি বর্ণাঢ্য কাঁচের কাজের মধ্যে 'স্টার বার্স্ট' কাজটির একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

●

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে মোক্ষমূলর ভবন আর এক তরুণ শিল্পীর প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। শিল্পী বাণীপ্রসন্ন তাঁর কবিতা ও চিত্র নিয়ে সবশুদ্ধ প্রায় আশীটি দ্রষ্টব্য ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এখানে প্রদর্শন করলেন। প্রদর্শনীর এক কোণে তিন-চার পাতা ধরে তাঁর শিল্পসম্পর্কীয় বাণী ও ক্রমবর্ধমান বিশ্বের নকশাও সুধী-জনের অনুধাবনের অপেক্ষায় রক্ষিত ছিল।

জলরঙ ও তেলরঙে আঁকা ছবিগুলির মধ্যে গোলাপী, সবুজ, কমলা ও নীলের প্রাচুর্য ও কালো রেখায় ক্ষিপ্র নকশা প্রচুর চোখে পড়ল। ছবির মধ্যে নানা মূর্তি ও মূর্তাভাস আসা-যাওয়া করে। মানুষ, পাখি, ঘোড়া, গরু, ফুল পাতা কিছুই বাদ যায়নি। ক্যানভাসের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত জুড়ে আছে। ছবির বিষয়-বস্তু 'ঘোড়া আর গরু', 'মনুষ্য কর্তৃক প্রকৃতির রহস্য ধ্যান', 'গরু আর বাঁদর', 'পৃথিবীর মধ্যে সূর্য', 'পক্ষীর প্রাঙ্গণ'।

তবে ছবিগুলি সবই প্রায় এক মাপের হওয়ায় এবং প্রায় একই ধরনের আঁকা হওয়ায় একটু একঘেঁয়ে লাগল। তাঁর বৃহত্তম ছবি 'ম্যান দি সেলেস্টিয়াল প্লাজমা অ্যান্ড দি হিউম্যান রিপ্রোডাকটরী প্রসেস' বোধহয় এক মহাজাগতিক ছবি। বহু বর্ণ ও প্রতীকের হুড়োহুড়ি—তার মধ্যে সৃষ্টি-কর্মের প্রতীক বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর লম্বা ক্যানভাস 'মাদার'-এর সর্বাঙ্গে মা-ষষ্ঠীর দয়া অপরিকল্পিত পরিবারের মত উপ্‌চে পড়ছে। সর্বত্র নবজাতকের আনাগোনা। তাই বোধহয় একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন : আসছে যাচ্ছে। আসছে যাচ্ছে। আসছে আসছে। যাচ্ছে যাচ্ছে। আসছে যাচ্ছে। আসছে যাচ্ছে। আনা গোনা। আনা গোনা। চার কোণা। পৃথিবী। কবি-শিল্পী বাণীপ্রসন্নের প্রতিভার মূলকে মোক্ষ দেবার জন্যে মোক্ষমূলের তখন সুধীজনের অপরি-সীম কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৩ থেকে ১৯ জানুয়ারী মমতা দের বাটিক-শিল্প এবং ১৬ থেকে ২২ জানুয়ারী মৃন্ময় মুখার্জির জলরঙের ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল।

শ্রীমতী মমতা দে বাটিকের মাধ্যমে সুরুচিসম্পন্ন অনেকগুলি কাপড়, রুমাল, স্কার্ফ, ব্যাগ ছাড়া ১৭।১৮খানি ছবি প্রদর্শিত করেন। ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ছবি, অজন্তার কতকগুলি বিখ্যাত ছবির কপি ও একটি নিসর্গদৃশ্য উপস্থিত করা হয়। ছবিগুলির মধ্যে টোনের ভাব ফোটাবার কাজে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কয়েকটি কাজে রঙের গভীরতাও লক্ষণীয়। 'কনক', 'বিশ্বভারতী', 'প্রহরী' 'বুদ্ধ' ও 'চামরধারিণী' উল্লেখযোগ্য ছবি।

মৃন্ময় মুখার্জি তরুণ শিল্পী। অ্যাকাডেমির শিশু-বিভাগের গোড়ার দিকের ছাত্র এবং বর্তমানে ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ড্রাফ্‌টসম্যানসিপের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে শিল্প শিক্ষালাভ করছেন।

কুড়িখানি স্টিল লাইফ ও নিসর্গ চিত্রের মধ্যে তাঁর জলরঙের পরিচ্ছন্ন ব্যবহারের নিদর্শন দেখা গেল। একটু ছাত্রসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী হলেও ১৬ এবং ১৮নং স্টিল লাইফের অনাড়ম্বর কম্পোজিশন এবং 'রাস্তা' ও 'বস্তি' ছবির বর্ণ ও আলোছায়ার কাজ প্রশংসনীয়। তাছাড়া কুটির ও বৃক্ষশ্রেণী নিয়ে তৈরী কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য সুন্দর হয়েছে।

●

১৮ থেকে ২৪ জানুয়ারী অবধি দিলীপ ভট্টাচার্য ও পি. টি. রেড্ডির দুটি একক প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

শ্রীভট্টাচার্য দিল্লীর তরুণ শিল্পী। সেখানেই শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। তেল রঙের ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা লক্ষ্য করবার মত। ছোট, বড় উভয় রকম ক্যানভাসকেই তিনি সুসজ্জিত করবার ক্ষমতা রাখেন। রঙের ব্যবহারে একটা বিস্তার আছে। ছোট ক্যানভাসেও অনেক-খানি স্পেস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। টোনের সূক্ষ্ম প্রয়োগে অনেক সময় একটা স্বপ্নজাল সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর আছে। ফিগারেটিভ বা নন-ফিগারেটিভ উভয় রীতিতেই তাঁর হাত সমান চলে। তাঁর "প্রফেট" কাজের মনুমেণ্টালিটি এবং "হ্যালুসিনেশনের" স্বপ্নময়তা সুন্দর লাগল।

পি, টি. রেড্ডি হায়দরাবাদের শিল্পী। তাঁর ২৭ খানি ছোট মাপের ক্যানভাসে রঙ ও রেখার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার এবং ডিজাইনের বৈচিত্র্যটাই চোখে পড়ে। মোটামুটি নন্-ফিগারেটিভ রীতির কাজই বেশী। ডিজাইন কখনো কখনো জ্যামিতিক রূপ নিয়েছে। রঙের ব্যবহারে প্রায় অনেক-গুলি ক্যানভাসেই তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন। "ড্রয়িংরুম"এর রেখাধর্মী ও বর্ণাশ্রয়ী ডিজাইন "ফর্মস ইন ব্লু", "ইয়োলো ল্যান্ডস্কেপ" ও "রেড ল্যান্ডস্কেপ"এর জ্যামিতিক নকশা এবং "গুলমোর ট্রি"র স্টেনসিল ঘেঁষা ডিজাইন ও উজ্জ্বল বর্ণ বিশেষ তৃপ্তিকর কাজ হয়েছে।

শিল্পী : শংকর ঘোষ

জানালা

দিলীপ সেনগুপ্ত

হাত ঝাড়া দিয়ে পেছনে সরে এল। দিবাকর। দড়িটা যুৎসই লাগান হল কি না, ঘাড় উঁচু করে দেখল বারকয়েক। তারপর চৌকির ওপর বসল। মাথা নীচু করে। একবার মাথা উঁচু করেই দেখতে পেল, দড়িটা মৃদু দুলছে। একটু অবাক হল। হাওয়া তেমন নেই অথচ দড়ি নড়ছে কেমন করে? যেখানে এসে দড়িটা বৃত্ত রচনা করেছে, তার ডানদিকের জানালা অবশ্য খোলা। কিন্তু ওই মোটা দড়ি দোলাতে পারে, গুমোট হাওয়ার এত জোর আছে বলে মনে হল না।

যাক গে, দুলছে না কি করছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এটা নয়। দিবাকর তো চলেছে অন্যত্র। পৃথিবী ছাড়িয়ে। তারই আয়োজনে এই ঝুলন্ত রজ্জুর ব্যবস্থা।

শূন্যে ঝুলবে দিবাকর। কেউ কাঁদবে না। কারণ তেমন কেউ নেই। মা-বাবাকে ভালো করে মনে করতেই পারে না। যে দু'একজন আত্মীয়স্বজন আছে, তারা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলবে। বলবে, আঃ। বাঁচলাম। জ্বালিয়ে মারছিল ছেলেটা।

ঠিক তখনই রজ্জুব্যাসের মধ্য-বিন্দুর প্রান্তভাগে একটি চড়াই এসে বসল। হাততালি দিয়ে মুখে 'হুস' 'হুস' শব্দ করে চড়াইটাকে তাড়িয়ে দিল দিবাকর। দড়ি আবার দুলছে। এবার বুঝল, চড়াইটা আরও একবার লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে গেছে। দড়ি দুলিয়ে দিয়ে গেছে।

আর দেরী নয়। এবার গলা গলিয়ে দেবে দিবাকর। তড়িৎবেগে দড়িটার কাছা-কাছি এসে হঠাৎ থেমে পড়ল। চোখ দুটো কপালে তুলে কি যেন দেখল কিছুক্ষণ। দোলন তখনও সম্পূর্ণ থামে নি। দড়ির ফাঁসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি যেন চিন্তা করল। তারপর হাত বাড়িয়ে দড়িটাকে নিশ্চল করার জন্যে স্পর্শ করেই অকস্মাৎ অনেক জোরে দুলিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল দিবাকর। ছোট্ট ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে দড়ি দুলতে লাগল।

সেদিকে তাকিয়ে দিবাকর ভাবল, থাক্‌ক

না! অত তাড়াতাড়ির কি আছে? কেউ তো আর ওকে বাধা দিতে আসছে না। আহা দিবাকর—এই অমূল্য জীবন তুমি নষ্ট করো না। লক্ষ্মী-সোনা!

আর বাধা দিলেই বা শুনছে কে? ভালো করে বসল দিবাকর। দড়ি দুলছে।

দিবাকরের বেঁচে থাকার আর কোন মানেই হয় না। এর আগে অনেকবার ভেবেছে, দি জীবনটাকে শেষ করে! হয়ে ওঠে নি। তেমন চেষ্টাও ছিল না। তাই বোধ হয় সকলের ধারণা, আসলে মরবার সাহস দিবাকরের নেই। এবারে দেখাবে—কি করে জীবনপাত করতে হয়। কাকে দেখাবে দিবাকর?

জয়ন্তীকে। জয়ন্তী ওকে বলেছে, ওর মত ছেলের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।

—কোন মুখে আসো এখনে? জয়ন্তীর কথাটা মনে পড়তেই ঠোঁটে ঠোঁট চাপল দিবাকর।

ভেতরে ভেতরে ভয়ানক একটা জ্বালা অনুভব করছে। আবার চড়াইটা এসে বসেছে দড়ির ওপর। একটা 'হুস' শব্দ করেই থেমে গেল দিবাকর। থাক। বসুক। কিন্তু ওর সামান্য হুংকারেই চড়াইটা পালিয়েছে।

হঠাৎ দিবাকর মনে মনে বলল, ভাল রে ভালো। মরণ বড়ো খেটেখুটে যা তৈরী করলাম, তা তোমার খেলার জিনিস হল, না? এসো আর একবার, খেলা ঘুচিয়ে দেব।

উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, চড়াইটা কোথাও নেই। মনে মনে হেসে আবার এসে বসল।

এইবার, এইবার দিবাকরের অন্তিম কাল আগত। জয়ন্তীকে ও সারাজীবন জ্বালাবে। ওর মৃত্যুতে সারাজীবন অনুতাপে জ্বলুক এবার। বড় মুখ করে যা বলেছে, তাই সত্যি হোক। এগিয়ে এল দিবাকর। দেখল, দড়ির ফাঁসটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। চেয়ারটা টেনে এগিয়ে এল দিবাকর। দেখল, দড়ির ফাঁসটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। চেয়ারটা টেনে তার ওপর দাঁড়াল। তাই তো! এত কম পরিধিতে তো মাথাই গলবে না। দড়ির যে জায়গায় গিঁট দিয়ে ফাঁস তৈরী করা হয়েছে, সেই গিঁটটা নীচে নেমে আসার ফলে ব্যাসের ব্যাপ্তি সংকুচিত হয়েছে। নির্ঘাৎ ওই চড়াইটার কান্ড! আগের মত ঠিক করে নিল ফাঁসটা। তারপর পা দিয়ে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল। মুহূর্ত পরে টের পেল, গলা জায়গামত পড়েনি, কখন যে হাত বাড়িয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়েছে টের পায় নি।

দিবাকর ঝুলছে।

মুখখানা বিকৃত করে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। পড়ার শব্দে ভয়ানক চমকে উঠল দিবাকর। ওর ঘরখানা মাঠের এক কোণে। কাছাকাছি হাত পঞ্চাশের মধ্যে আর কোন ঘর নেই। এই নির্জনতার মধ্যে শব্দটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। আগে কখনও এরকম শব্দ ও যেন শোনে নি। বড় নিঃসঙ্গ আর অসহায় বোধ করল। তাড়াতাড়ি জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। সম্ভবত চড়াইটাকে খুঁজল অনেকক্ষণ ধরে। পেল না। আবার এসে বসল নিজের জায়গায়। কাঁদছে দিবাকর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কেন আজ ও নিঃসঙ্গ? জয়ন্তী না ওর বিবাহিতা স্ত্রী? ওকে সঙ্গ দিতে পারত না? আর পাঁচজন স্ত্রী যেমন করে।

কিন্তু জয়ন্তী স্বতন্ত্র। কারণ, দিবাকর নীতিভ্রষ্ট। বেশ। কথাটা না হয় সত্যি। কিন্তু জয়ন্তী ওকে পথে আনার তো চেষ্টা করতে পারত। তা তো নয়-ই। কেবল দূর দূর করে। কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে দেয় না। জয়ন্তী ওর মা আর ভাইবোনদের সামনে যথেচ্ছ অপমান করে।

বল। যা খুশি বল। ভাবছে দিবাকর। তোমার অধিকার আছে বলার। তা, সকলের সামনে? ওরা মজা পায়, বোকা মেয়েটা তা বোঝে না। সত্যি বোকা। তা না হলে কেউ স্বামী ছেড়ে বাপের বাড়ী বাস করে? দুঃখ থাক, অভাব থাক, ঘেন্না থাক—এ কাজ ভালো করে নি জয়ন্তী।

জয়ন্তীর এই আচরণের জন্যে দিবাকরকে আজ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হল। আর একটু পরে দিবাকর থাকবে না। খবর হয়তো পৌঁছে যাবে জয়ন্তীর কানে। উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে আসবে জয়ন্তী। এসে কি দেখবে? তখন তো সব শেষ। সময় থাকতে বোঝে নি। সম্মান ও মমতা দেখায় নি। নরকের কীট ভেবে শুধু অবহেলাই করছে।

একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। ঢাকুরিয়া যাচ্ছিল দিবাকর আর জয়ন্তী। জয়ন্তীর মামাবাড়ী নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

শিয়ালদা পেরিয়ে জয়ন্তী বলল, এই শোন! একটা ট্যাকসী কর না।

—ট্যাকসী কেন? বাসেই চল না। পকেটে অর্থের স্বল্পতায় বিচলিত হল দিবাকর। কিন্তু সে কথা স্ত্রীর কাছে খুলে বলতে পারল না। কেমন যেন সংকোচ বোধ করল। সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে তখন।

জয়ন্তী চুপ করে গেল। এবং এই নীরবতায় অধীর হল দিবাকর। বলল, রাগ করলে নাকি?

—না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে থেমে গেল জয়ন্তী। পথে আর একটি কথাও বলেনি। সেদিন রাত্রে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলল জয়ন্তী। কম্পিত স্বরে বলেছিল, জানো—অল্পবয়সে বাবা চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমাদের কখনও সচ্ছলতা আসেনি। মামাবাড়ীর কৃপায় চলতে হয়েছে আমাদের।

দিবাকর বেদনা বোধ করেছিল। জয়ন্তী বলে চলল, একটু বড় হয়েই ভেবেছি, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তাকে দিয়ে সব শূন্যতা, সব অভাব ভরিয়ে নেব। তারপর দিবাকরের বুকের ওপর মাথা রেখে আরও বলেছিল, তুমি আমায় কথা দাও, আমার কাছে কখনও কিছু লুকোবে না!

—একথা কেন বলছ জয়ন্তী? দিবাকর জড়িত কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল।

—আমি বুঝেছি, তোমার অবস্থা ভা[illegible] নয়। তবু তুমি আমায় মিথ্যে আশ্বাস দ[illegible] কেন? লক্ষ্মীটি যা সত্যি, তাই ব[illegible] আমায়,—কেমন?

মনে মনে জয়ন্তীর বুদ্ধির প্রশংসা ক[illegible] দিবাকর। সত্যিই জয়ন্তীকে ও কা[illegible] গল্প শুনিয়েছে। সেই কল্পনার কাছাক[illegible] বিপথে না চললে দিবাকর হয়তো পৌঁছ[illegible] পারত। আর জয়ন্তী সরল মনে তা বিশ্ব[illegible] করে স্বামীর সচ্ছলতায় মনে মনে খু[illegible] হয়েছিল।

কিন্তু দিবাকর কথা রাখতে পারে নি[illegible] পাছে জয়ন্তী ওকে ছেড়ে যায়, সেই [illegible] ওর মসীলিপ্ত সত্যগুলো লুকিয়ে রে[illegible] ছিল। তারপর জয়ন্তী একসময় জান[illegible] পেরে গেল, ওর স্বামী বিপথগামী, মিথ[illegible] চারী—প্রতারক।

ওকে ত্যাগ করে চলে গেল।

অফিসের তহবিল তছরুপের ব্যাপা[illegible] ফাঁস হয়ে গেল বিয়ের ঠিক দুমাস পর[illegible] যদিও টাকার অংক তেমন বিরাট কিছু [illegible] না। বিয়ের অল্প কয়েকদিন আগে কান্ড[illegible] ঘটিয়েছিল দিবাকর।

এই প্রথম নয়। এর আগেও দু[illegible] করে চাকরী খুইয়েছিল। এবারে কর্তৃপ[illegible] দিবাকরের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নি[illegible] বদ্ধপরিকর হলেন। জয়ন্তী সে কথা জে[illegible] বাপের বাড়ী ফিরে যাবার পথে অফিসা[illegible] কাছে চোখের জল ফেলে গিয়েছিল। মঞ্জু[illegible] হয়েছিল জয়ন্তীর কাতর প্রার্থনা। কর্তৃপ[illegible] দিবাকরের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশ করে[illegible] না বটে, তবে ওকে বরখাস্ত করা হল।

এর পরে থাকতে না পেরে দু'একব[illegible] জয়ন্তীকে দেখতে গেছে দিবাকর। কি[illegible] জয়ন্তী প্রশ্রয় দেয় নি। শেষে একদিন গি[illegible] জয়ন্তীকে বলল, চাকরি পেয়েছি জয়ন্ত[illegible] তোমার খরচটা সামনের মাস থেকে আমি[illegible] দেব। উদ্দেশ্য জয়ন্তীকে কাছে পাওয়া[illegible]

জয়ন্তী বিশ্বাস করে নি। তবু [illegible] ভাবটা লুকিয়ে রেখে বলেছিল, তা য[illegible] হয় তো ভালোই।

অথচ দিবাকর বেকার।

মাসের এক তারিখে এক ভদ্রলোকে[illegible] কাছ থেকে সুদে কিছু টাকা ধার ক[illegible] জয়ন্তীর হাতে গুঁজে দিল দিবাকর। আস্থ[illegible] অনাস্থায় দোলায়মানা জয়ন্তী মন্দটা চিন[illegible] করতে পারল না।

সেদিন দিবাকর রাত কাটাল শ্বশু[illegible] বাড়ীতে। জয়ন্তীর সঙ্গে। জয়ন্তীর বুকে[illegible] মধ্যে। তারপর একসময় অঙ্গীকার মত টাক[illegible] শোধ করার সময় এসে গেল। দিবাকর [illegible] ঢাকা দিয়ে রইল। পাওনাদার কোত্থে[illegible] ঠিকানা যোগাড় করে জয়ন্তীকে সব জানি[illegible] এল। অপমানিতা জয়ন্তী তারপর থে[illegible] স্বামীকে দূরে দূরে করছে। গলায় দড়ি দি[illegible] বলেছে।

তাই আজ আত্মহত্যা করবে দিবাকর পৃথিবীর কোন শক্তি ওর গতিরোধ করত[illegible] পারবে না।

দড়িটা অল্প দুলছে। এবার অবশ্য[illegible] দিবাকর ঝুলে পড়বে। আবার সেই চড়াইট[illegible]

এসে বসল। এবার তাড়িয়ে দিল না দিবাকর। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাখীটার দিকে। একটু পরে মেঝেতে নেমে লাফাতে লাফাতে জানালা দিয়ে সুড়ুত করে অদৃশ্য হয়ে গেল চড়াইটা।

তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল দিবাকর। চড়াইটা দেখা যাচ্ছে না। অকস্মাৎ ভয়ানক একটা কিছু দেখার মত চোখ দুটো প্রাণপণে বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল দিবাকর।

বাইরে একটা শালিক ঘুরঘুর করছে। এক শালিক।

এক শালিক দেখলেই জয়ন্তী আর এক শালিক খুঁজে মরত। যতক্ষণ না দেখতে পেত, মুখখানা কালো হয়ে থাকত ওর।

দিবাকর কিছুতেই আর এক শালিক খুঁজে পায় না। মনটা দমে গেল।

—ওই তো! ওই তো! হঠাৎ চীৎকার করে উঠল দিবাকর।

আসছে। গুটি গুটি আর এক শালিক এগিয়ে এসে সঙ্গীটির পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কি চমৎকার লাগছে দেখতে! পরিচ্ছন্ন! মনোরম!

সহসা ঘুরেই দড়িটা টান মেরে ফেলার জন্যে হাত বাড়িয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল দিবাকর। জয়ন্তীর মলিন মুখখানাকে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভাবল কিছুক্ষণ।

অনেক পরে চোখ মুছে আপন মনে বলল, মরব কেন? দেখি না—বাঁচতে পারি কি না!

প্রেক্ষাগৃহ

চলচ্চিত্র নির্মাণ কি প্রযুক্তি বিদ্যা ?

ভারত সরকার নিয়োজিত চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতির (ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির) ১৯৫১ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে বহু সুপারিশের মধ্যে একটি সুপারিশ ছিল, চলচ্চিত্রের কলা-কুশলীদের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করা এবং এই কাজের জন্যে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। এই সুপারিশটিকে কার্যকরী করবার জন্যে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগ পুণার প্রভাত স্টুডিওটি কিনে নেন এবং ১৯৬১ সাল থেকে ফিল্ম ইনস্টিটিউট মারফত চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত ছ' টি বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু করেন : (১) পরিচালনা, (২) চিত্রনাট্য লিখন, (৩) চলচ্চিত্র গ্রহণ, (৪) শব্দ ও সঙ্গীতানু-লেখন ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রবিদ্যা বা ইঞ্জিনীয়ারিং, (৫) সম্পাদনা ও (৬) চিত্রাভিনয়। প্রথম চারটি বিষয়ের যে-কোনো একটি শিক্ষা দিতে তিন বৎসর লাগে এবং শেষের দু'টির প্রত্যেকটির জন্যে লাগে দু' বৎসর। তত্ত্বীয় বা পুঁথিগত ও ফলিত বা ব্যবহারিক —উভয়বিধ শিক্ষা দানের পরে নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা অনুসারে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। যোগ্যতার অন্যতম পরিচয় স্বরূপ প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীকে নিজের অধীত বিষয়ে একটি ছোট ছবিতে স্বাধীন-ভাবে কাজ করতে হয়।

চিত্র-সাংবাদিক হিসেবে কখনও সখনও ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী এক-আধখানি ছবি দেখে থাকলেও ওদের দ্বারা একটি বিশেষ বছরে নির্মিত বেশ কয়েকখানি ছবি পরপর দেখার সুযোগ আমরা মাত্র এই সেদিন—১৯শে জানুয়ারী পেয়েছিলুম। পরিচালনা বিষয়ক পরীক্ষোত্তীর্ণ দশজন ছাত্র দ্বারা ১৯৬৮ সালে নির্মিত দশখানি স্বল্প দৈর্ঘ্যের (গড়পড়তা প্রতিটি ১,৬২০ ফুট দীর্ঘ) কাহিনী-চিত্র সেদিন প্রদর্শিত হয়েছিল। চিত্র-নির্মাণের কলাকৌশলের প্রতিটি বিভাগের কাজ—এমনকি অভিনয় পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরাই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করেছেন, এমন কথা সংস্থার অধ্যক্ষের মুখ থেকে শোনা গেল।

ছবি দশটি দেখে নিঃসংশয়ে বলতে পারা যায়, চলচ্চিত্র নির্মাণবিদ্যার যতখানি প্রযুক্তিবিদ্যা, ততখানি নিশ্চয়ই যথোচিত-ভাবে শেখানো যায় এবং তা' ইনস্টিটিউটে ভালোভাবেই শেখানো হয়ে থাকে। চিত্র-গ্রহণ, শব্দানুলিখন ও সম্পাদনার কাজ ছাড়া এই বিরাট শিল্পে কর্তৃত্বরত অভিজ্ঞ

কলাকুশলীদের মতোই আয়ত্ত করেছে। কিন্তু যেখানে কল্পনাশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, সূক্ষ্ম রসজ্ঞান অপরিহার্য, সেই পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় কোনো ছাত্রই যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেননি। মাত্র 'ফোর্টিন অ্যান্ড হাফ' (সাড়ে চোদ্দ) চিত্রটিতে পরিচালনার সৌকর্য দেখা যায়। অভিনয়েও তেমন যোগ্যতা দেখা গেল না। মাত্র নবীন নিকল ও পুণ্য দাসকেই সার্থক অভিনেতার সম্মান দেওয়া যায়।

কিন্তু চলচ্চিত্র-নির্মাণ মাত্রই কি প্রযুক্তি-বিদ্যা? তার বেশী নয়?

চিত্র-সমালোচনা

আওলাদ (হিন্দী) : কুন্দন ফিল্মস্‌-এর নিবেদন; ৪,৩৭৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রয়োজনা ও পরিচালনা : কুন্দনকুমার; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : রঞ্জন বসু; সংলাপ : বিশ্বনাথ পান্ডে; কৌতুকাত্মক অতিরিক্ত সংলাপ : রফি আজমীরা; সংগীত-পরিচালনা : চিত্রগুপ্ত; গীতরচনা : মজরুহ সুলতানপুরী; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : ভি, দুর্গাপ্রসাদ; চিত্রগ্রহণ : শ্যাম রাও; শব্দানুলেখন : পি সি বলুর; সংগীতানুলেখন : রবীন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : গণেশ বসাক, সম্পাদনা : কমলাকর, নেপথ্য-কণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুর, মোহম্মদ রফী ও মান্না দে; রূপায়ণ : জিতেন্দ্র, সুজিতকুমার, মোহম্মদ, নাজির হোসেন, মনমোহন কৃষ্ণ, মনমোহন, হরি শিবদাসনী, অমল সেন, জীবন, ববিতা, অচলা সচদেব, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, হেলেন, মাস্টার মঞ্জু এবং মাস্টার অনিল। মিতা ফিল্মস্‌-এর পরিবেশনায় ১৭ই জানুয়ারী, শুক্রবার থেকে হিন্দ, প্রিয়া, দর্পণা, নাজ, মেনকা, লিবার্টি, ছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

তীর্থস্থানে নিজের একমাত্র শিশু-সন্তান দৈবাৎ নিরুদ্দিষ্ট হবার পরে কোনো মা যদি অন্যের শিশুসন্তানকে বুকে পেয়ে নিজের শোক প্রশমিত করতে পারেন এবং দীর্ঘদিন ধ'রে অপত্য স্নেহে লালিত-পালিত ক'রে পূর্ণ যৌবনাবস্থা পর্যন্ত তাকে আত্মজের আসনে অধিষ্ঠিত রাখেন, তাহ'লে তারপরে নিজের হারিয়ে-যাওয়া সন্তানকে অভাবিতভাবে ফিরিয়ে পেয়ে তিনি কি ঐ পালিত পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হ'তে পারেন?—এই প্রশ্নটিই আমাদের মনে জেগেছে কুন্দন ফিল্মস্‌ নিবেদিত ইস্টম্যানকলার-রঞ্জিত 'আওলাদ' ছবিটি দেখবার পরে।

ধনী কামতাপ্রসাদের স্ত্রী সারদাদেবী তীর্থস্থান পশুপতিনাথে তাঁদের একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে যখন শোকে মুহ্যমান, তখন তাঁদের অনুগত কর্মচারী দীনু তাঁর স্ত্রী মমতাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিজেদের ছোট ছেলে সোহনকে তাঁর কোলে তুলে দিলেন।

কলাকুশলীদের সঙ্গে কলাকুশলীর দ্বিতীয় দফা: কলাঙ্কিত নায়ক ছবির মহরতে ক্ল্যাপ দিচ্ছেন শ্রী ডি, এন, ভট্টাচার্য ও নীচে রয়েছেন অঞ্জনা ভৌমিক, অর্পনা সেন, পরিচালক সলিল দত্ত ও নায়ক উত্তমকুমার

সোহনকে পেয়ে সারদাদেবী শান্ত হলেন। কিছুদিন বাদে গুরুতরভাবে তিরস্কৃত হয়ে দীনু-মমতার বড়ো ছেলে—যার বয়েস দশ কি বারোর বেশী নয়—মোহন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এতে মমতা একেবারে ভেঙে পড়ে। এর পর দীর্ঘ সতেরো বছর কেটে যায়। অরুণ—কামতাপ্রসাদের গৃহে সোহন ঐ নামেই পরিচিত—এখন যুবক এবং সে নিজেকে কামতাপ্রসাদ ও সারদার আত্মজ ব'লেই জানে। ধনীকন্যা ভারতীর সঙ্গে বিবাহ হয় হয়, এমন সময়ে সারদা দৈবের যোগাযোগে ফিরিয়ে পেলেন তাঁর হারামণি সুরযকে। প্রকাশ হয়ে পড়ল, অরুণ ওদের পালিত পুত্র মাত্র। সুরয দাম্ভিক, মদ্যপ, লম্পট; তবু তো সুরয সারদার নিজের ছেলে। কাজেই সারদার টান সুরযের প্রতিই বেশী; অরুণ এখন তাঁর কাছে পর বৈতো নয়! বেচারা অরুণ! তার স্বপ্নের প্রাসাদ তাসের বাড়ীর মতো ভেঙে পড়েছে। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার আপন বাপ-মাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বহু দুঃখের অবসান ঘটল। প্রমাণিত হ'ল সুরয কামতাপ্রসাদ-সারদার আসল ছেলে নয়। কাজেই নিজের আসল পরিচয় জানা সত্ত্বেও অরুণ আবার কামতাপ্রসাদের গৃহে স্নেহের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

বলা বাহুল্য, কাহিনীটি ঘটনাপ্রধান এবং হাসিকান্না ও প্রেমের উপাদানপূর্ণ ব'লে সাধারণ দর্শকচিত্ত-বিনোদনে সক্ষম।

নায়ক-নায়িকা রূপে জীতেন্দ্র ও ববিতার মধ্যে ববিতাই অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছেন। ডাক্তার মোহনের চরিত্রে সুজিতকুমারের বাচন হৃদয়গ্রাহী হলেও ভাবাভিব্যক্তির দিক দিয়ে তিনি কিছুটা নিরেস। জাল সুরযবেশে মনমোহন চলনসৈ। কাহিনীটির চিত্রায়ণে মূল চরিত্রগুলি অপেক্ষা পার্শ্বচরিত্রগুলি যে কোথাও কোথাও বেশী সুযোগ পেয়েছে, তার প্রমাণ হচ্ছে দীনু ও চিমনলাল চার্লি সিপ্পাপুরী। দীনুর চরিত্রের দুঃখ-বেদনা এবং সর্বশেষ আনন্দ আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশিত করেছেন নাজির হোসেন। জায়গায় জায়গায় এ'র অভিব্যক্তি অবিস্মরণীয় এবং চিমনলাল চার্লি সিপ্পাপুরীর ভূমিকায় মেহমুদ কিছুটা বাড়াবাড়ি করলেও কম উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেননি। কাহিনীর জট ছড়ানোয় তাঁর গৃহীত ভূমিকাটির অবদান অনস্বীকার্য। অপরাপর ভূমিকার

আছে ও'দের, এক্জিবিউটরদের কাছ থেকে
রলিজ গ্যারান্টিও পাচ্ছেন, দেশে বিদেশে
যথেষ্ট খ্যাতি আছে, তাই বোধহয়
আমাদের সংগে এক পংক্তিতে বসতে ও'দের
আত্ম-সম্মানে লাগছে—এ ছাড়া তো আর
কোনো কারণ বোঝা যাচ্ছে না।'

না তা নয়।

—'হয়ত নয়, কিন্তু এ ছাড়া ও'দের
ব্যবহার তো কথাবার্তা তো অন্য কিছু
ভাবাতে পারছে না।'

যাই হোক, সংরক্ষণ সমিতিও যে এক-
বারে নির্দোষ তা তারাও বলছেন না।'
সুতরাং এ অবস্থার অবসান ঘটুক তাই
সবাই চান। তার জন্য উভয় পক্ষকেই
আগ্রহী হতে হবে, উভয় পক্ষকেই এগিয়ে
আসতে হবে। কেন কাকে, কবে, কখন,
কিভাবে কথা বলেছিলেন তা মনে রেখে
সরে থাকলে অসুবিধে সবারই। অযথা কাদা
ছোঁড়াছুড়ি করে কি লাভ, সবাইকে যখন
এক সংগে এক জায়গাতেই কাজ করতে
হবে! এতে তো সুযোগ-সন্ধানী মুনাফা-
শিকারীদেরই সুযোগের পথ খুলে দেওয়া
হচ্ছে।

বিদেশী ছবির খবর

ইতালীর অ্যাপেনিন পার্বত্য অঞ্চলে
বহুদিন এমন কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায় নি;
চারিদিকে এক ভীষণ ব্যস্ততা, লাইট
ক্যামেরা, সাউণ্ডের তার এদিক-ওদিক
ছড়ানো। মাউণ্ট এটনা বা ভিসুভিয়াস
দেখার জন্য আসে অনেকেই প্রতি বছরে।
তখন মেলা বসে অ্যাপেনিন-এর চারিদিকে।
কিন্তু সম্প্রতি সেখানে যে কর্মব্যস্ততা
নজরে পড়েছিল সকলের তা ট্যুরিস্ট সমা-
গমে নয়, অ্যান্থনি কুইন, অ্যানা মাগ-
নানিকে দেখার জন্য।

নর্ম্যানদের এ গ্রাম এ পর্যন্ত তিনবার
বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রথমবার
ম্যারাকানদের হাতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার
জার্মানদের হাতে দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময়,
সম্প্রতি আবার কয়েকজন অ্যামেরিকানের
হাতে লাঞ্ছিত হল। তবে এ লাঞ্ছনায়
অপমান নেই, সম্মান আছে। পৃথিবী-
বিখ্যাত পরিচালক স্ট্যানলী ক্র্যামার তাঁর
ইউনিট নিয়ে নতুন ছবি 'দি সিক্রেট অফ
সান্ত ভিকটোরিও'র স্যুটিং করতে এসে-
ছিলেন। তাই এই সোরগোল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুজন
স্ত্রী-পুরুষ মিলে কিভাবে জার্মান সৈনা-
দের নিজেদের গ্রাম থেকে হটিয়ে দিয়েছিল
সে কাহিনী বিধৃত হয়েছে। পরিচালক
ক্র্যামার রবার্ট ক্রিচটনের লেখা ওই নামের
উপন্যাস থেকেই চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন।
ক্র্যামার এ ছবির জন্য যে সকল অভিনেতা
অভিনেত্রীদের স্থির করেছেন তাঁদের মধ্যে

বনি এন্ড ক্লাইড/ফে ডানওয়ে

আছেন ভার্না লিসি, মার্জিও ফ্রাঞ্চি,
অ্যান্থনি কুইন, হার্ডি ক্রুজার, রেনাতো
র.সকেল, এডওয়ার্ড সিয়ান্নেলি, জিয়ান-
কার্লো জিয়ান্নি, প্যাট্রিসিয়া ভ্যালতুরি,
ভ্যালেন্তিনা কর্টেজ ও আরও অনেকে।
এতগুলো বিশিষ্ট চরিত্র ছাড়াও ক্র্যামার
আরও প্রায় বারোশো একস্ট্রা জোগাড় করে-
ছেন বিভিন্ন গ্রামবাসীর চরিত্রে অভিনয়ের
জন্য।

একটা দৃশ্য আছে যেখানে প্রায় লক্ষা-
ধিক মদের বোতল হাতে হাতে পাচার
হবে গ্রামবাসীদের মধ্যে। সেখানেই এই
প্রায় বারোশো একস্ট্রাকে কাজে লাগাবেন
পরিচালক। ওঃ আরেকজনের নাম বাদ
গেছে। অথচ বাদ দেওয়া উচিত হয় নি।
নামটা হল অ্যানা ম্যাগনানি। বহুদিন
বাদে আবার ইংরেজী ছবিতে অভিনয়
করেছেন। এতদিন চুপচাপ থাকার কারণ
জিজ্ঞেস করায় উনি জানিয়েছিলেন—
'আমার মনে হয়েছিল সবাই বুঝি আমাকে
ভুলেই গেছে, কেউই আর খবরের কাগজে
আমাকে নিয়ে লেখে না। হয়ত সত্যিই
আমি ব্যাকডেটেড।' তাহলে আবার ফিরে
এলেন কেন প্রশ্ন করায় উনি বলেছিলেন,
'ইচ্ছে না হলে তো আর আমাকে কেউ
জোর করে কাজ করাতে পারে না।
ক্র্যামারের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে,
ও'র ছবি আমার খুব ভালো লাগে। তাই
উনি যখন রেজোর রোলের অফার নিয়ে
এলেন তখন তা ফেলতে পারি নি। তাছাড়া
চরিত্রটা ছোট হলেও খুব সুন্দর। ক্র্যামারের
ওপর আমার বিশ্বাস আছে, উনি যা করেন
তাতেও আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, আমার
প্রতি নিশ্চয়ই সুবিচার করবেন—এই
আশায় রোলটা নিয়েছি।'

অ্যান্থনি কুইন যে চরিত্রটা করছেন তার
নাম বোম্বোলিনি। এক চাষীর কাউন্সিল
চরিত্র। কুইন বলছেন, 'ক্র্যামারের সংগে কাজ
করতে পেরে আমি খুব খুশী। এ পর্যন্ত
প্রায় একশো ছবিতে কাজ করেছি আমি।
তার মধ্যে এক ডজন ছবিতে মাত্র আমি
পরিচালিত হয়েছি। ক্র্যামারের এ ছবি
নিয়ে তেরোখানা হোল। আমি যেন
অনেকটা রেসের ঘোড়া। আমি চাই একজন
ভালো জকি। ক্র্যামারের মত জকি আমার
বিশেষ পছন্দ। কারণ আমার চরিত্র একজন
ইতালীয়ান চাষীর, অথচ আমি নিজে
অ্যামেরিকান, সুতরাং আমাকে ঠিকমত
চালাতে গেলে ঠিক পরিচালকের প্রয়োজন।'

পরিচালক ইতালীর যে জায়গাটা
লোকেশন হিসাবে বেছে নিয়েছেন সেটা
এই প্রথম নয়—এর আগেও বনেৎ, রোডিন,
কোরেৎ কোকোম্বা ইত্যাদি খ্যাতনামা
অভিনেতারা এখানে কাজ করে গেছেন!
ইতালীর এই ছোট্ট গ্রাম অ্যান্তিকোলি
কোয়োর্দো তাই আজ আন্তর্জাতিক গ্রাম।
পরিচালক ক্র্যামার ছবির কাহিনীকে যথা-
সাধ্য মাটির কাছাকাছি টেনে আনার জন্যই
এ গ্রামকে বেছে নিয়েছেন।

ইউনাইটেড আর্টিস্টের পরিবেশনায়
এ ছবির মুক্তি পেতে এখনও বেশ দেরী
থাকলেও কাজ প্রায় শেষ।

গ্রীসের তৃতীয় বৃহত্তম শহর থেসালো
নিকিতে কিছুদিন আগে সাতটি কাহিনী
চিত্র ও আটটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি নিয়ে
এক বিশেষ উৎসব হয়ে গেল। এক আন্ত-
র্জাতিক সংস্থা এর উদ্যোক্তা হলেও
উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রীসের
সিনেমা শিল্পে উৎসাহ দান। উৎসবের
শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্রের পুরস্কারটি দুটো
ছবির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ
স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয়
'২৫০০০ ইয়ার্স ইন দিস ল্যান্ড'। যে-
দুটো ছবি প্রধান পুরস্কার পেয়েছে তা হল
'গার্লস আন্ডার দি সান' ও 'প্যারোস্থিসিস'।
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার
পেয়েছেন বোস্তাম পার্কাস ও হেলেনা
নাথানিয়েল যথাক্রমে 'এ ডেট উইথ এ
স্ট্রেঞ্জার' ও 'দি ব্যান এন্ড দি নাইটিঙ্গল'
ছবির জন্য।

সম্প্রতি সমাপ্ত ভার্নায় অনু-
ষ্ঠিত বুলগেরিয়ার চিত্র উৎসবে মেত্তোদি
আন্দনভের 'দি হোয়াইট রুম' শ্রেষ্ঠ
কাহিনী চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। এ-
ছাড়াও এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য নায়ক ও
নায়িকা দুজনেই পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভি-
নেতা অভিনেত্রীর পুরস্কার। তাঁরা হলেন
অ্যাপস্টল কার্মিতেভ ও দার্সিয়া ভনচেভা।
শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে বিশেষ পুরস্কার
দেওয়া হয়েছে ভাসিল মির্চেভকে 'দি
চাবেগো' ছবির জন্য ও সমালোচকদের পুর-
স্কারটি গেছে 'পেইনালেড' ছবিতে।
এছাড়া স্বল্প দৈর্ঘ্যের বিভাগে গ্রান্ড প্রিক্স
পেয়েছে ট্রুস্টো কোভাচেভের 'স্ট্যান্ডস ফ্রম
দি রেইনবো' আর 'এ থাউজ্যান্ড হেরনস'
ছবি দুটো।

২৩ জানুয়ারী সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান হয় নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে

মঞ্চাভিনয় :

থিয়েটার ইউনিটের জন্মভূমি

সীমাহীন অত্যাচারের নিষ্পেষিত, অদৃষ্টবাদী গ্রাম্য চাষীদের করুণ জীবনযাত্রা ও অসহায় মৃত্যু — এই সহজ সরল পটভূমিকায় রচিত শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ 'জন্মভূমি' থিয়েটার ইউনিটের শিল্পীদের অভিনয়-নৈপুণ্যে কয়েকটি রসোত্তীর্ণ মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিলো সেদিন 'মিনার্ভা' থিয়েটারে।

কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব হয়ত ছিল না—কিন্তু ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে উপস্থাপনার কৃতিত্ব নাট্যকার ও পরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্য প্রাপ্য। সংবেদনশীলতার অনবদ্য মাধুর্যে শ্রীচট্টোপাধ্যায় দর্শকচিত্তকে আন্দোলিত করতে পেরেছেন, পরিবেশিত বক্তব্যকে সুষ্ঠু সুন্দর রূপ দিয়েছেন বিনা আড়ম্বরে, অভাবনীয় সরলতায়, এইটেই হয়ত তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। মাস্টার ও গ্রাম্য-পরিদর্শনাথী লেখকের কথোপকথনের ইঙ্গিতে জ্বলে ওঠে এক একটি চরিত্র—জব্বর, বাদলা, প্যানা, সতীশ, হাজি, গঙ্গা, জামাল, আজিজ—আরও কত চরিত্র আপনাপন দুঃখ, সমস্যা ও জীবনবেদনার কাতরতা-ছন্দে দোলায়িত এবং স্বাভাবিক গতিতে স্ব স্ব পরিণতিতে বিলীয়মান। সমবেত এবং পৃথকভাবে শিল্পীদের অসাধারণ অভিনয়কুশলতা যেন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। রূপসজ্জা ও অভিনয়ে এক নিমেষেই যিনি প্রতিটি দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন তিনি হলেন হাজির ভূমিকার উদ্দীর দেব। অর্থগৃধ্নু চরিত্রের সর্বগ্রাসী লোভ, অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মমতাকে সুদক্ষ চিত্রকরের মত ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্দীর দেব।

প্যানার ভূমিকায় মন্টু ঘোষের অভিনয় ভোলবার নয়। অত্যাচারিত চাষীর বঞ্চিত জীবনের চাপা কান্না, বিদ্রোহ ও অভিমানাহত চিত্তে দেশত্যাগের বেদনা চিত্তস্পর্শী রূপ নিয়েছে তাঁর প্রাণঢালা অভিনয়ে।

বি ডি ও-র বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সত্যদৃপ্ত উন্নত চরিত্র স্বচ্ছ করে তুলেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। গঙ্গা চরিত্রের সঙ্গে আপনাকে এক ও অভিন্ন করে তুলেছেন সাধনা রায় চৌধুরী। আপাত কঠিন বাক্যের অন্তরালে গঙ্গার মতই নির্মল এবং স্নেহময়ী মাতৃমূর্তির প্রতিচ্ছবি গঙ্গার অন্তরকে তিনি অনায়াস দক্ষতায় দর্শকদের গোচরে আনতে পেরেছেন এইখানেই তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ। এঁরা ছাড়া সমবেত অভিনয়-কুশলতায় নাটককে যাঁরা সার্থক করে তুলেছেন তাঁরা হলেন সুজিত সরকার, সুশীল রায়, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত পোদ্দার, বাবলু গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত রায়চৌধুরী, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গনাথ দে, গৌর গোস্বামী, শিবপ্রসাদ পাইন, আলোক রায় চৌধুরী, প্রদীপ নিয়োগী, নবেন্দু গুপ্ত, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রদ্যুৎ দাস দিলীপ ভট্টাচার্য, দেবী চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ঘোষ এবং অন্যান্য সবাই। এঁদের কারো অভিনয়ই তুচ্ছ নয়।

মঞ্চসজ্জা ও সঙ্গীতের ইঙ্গিতে গ্রামীন জীবনযাত্রার অত্যন্ত স্বাভাবিক পটভূমিকা রচনা করার গৌরব পাবেন খালেদ চৌধুরী—ঘটনা ও চরিত্রের ভাব-পরিক্রমায় যথা আলোকপাত করেছেন তাপস সেন।

শেখর চট্টোপাধ্যায়ের সংলাপরচনায় এবং শিল্পীদের নিখুঁত উচ্চারণে ম হয়েছিল আমরা যেন পূর্ববঙ্গের কোন ও গ্রামেই রয়েছি। কল্পনা বাস্তবের এ শিল্পসম্মত মিলনই নাটক চিত্তগ্রাহী হ উঠেছে।

গত ২৪ জানুয়ারী শম্ভুনাথ পণ্ডি হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রকুমার প্রণীত 'রক্ততিলক' যাত্রাভিনয় করেন হা পাতাল প্রাঙ্গনে। অভিনয়ে অনিলকুম মণ্ডল, শিশির মণ্ডল, অনিল মাইতি, মুকু কর, শ্রীপতি সেন, দেবীদাস গাংগু নির্মলকুমার মন্ডল, সুনীলকুমার দা গোপালচন্দ্র দাস, পঙ্কজকুমার পাল, সুধ কুমার দাস, অনন্তকুমার দাস, কাশীন সাহা, রণজিৎকুমার বোস, মণিমোহন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র দাস, শ্রীম সেন, কালীপদ চক্রবর্তী প্রশংসনী শ্রীহিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থ পনায় অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

গত ১১ জানুয়ারী রঙ্গরঞ্জনীর সভ্য শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে শ্রীশুভ্রাভরণ মুখো পাধ্যায়ের লেখা 'রামপ্রসাদ' বিশে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। বিশি সাংবাদিক পদ্মশ্রী কেদার ঘোষ অনুষ্ঠা পৌরোহিত্য করেন এবং সুরসাগর পঙ্কজ কুমার মল্লিক প্রধান অতিথির আসন গ্রহ করেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী বিমলভূষ রামপ্রসাদের ভূমিকায় এবং প্রভাতভূষ আজু গোঁসাই-এর ভূমিকায় অভিনয়ে গানে দর্শকদের অভিভূত করেন। অন্যা ভূমিকায় পবিত্রকুমার ঘোষ, সত্যরঞ্জন চক্র বর্তী, বেরতীভূষণ, বুদ্ধদেব সরকার, বিজ ভূষণ, প্রবোধভূষণ, মুরারী মুখার্জি ধীরেন মুখার্জি, বিশ্বনাথ চৌধুরী গোরাচাঁদ রায়, স্বপ্না ও রত্না চৌধুরী চন্দ্রা গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রোপযোগী অভিন করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কুমারী মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন সঙ্গীত করেন শ্রীযুক্ত শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ধন্যবা জ্ঞাপনের পর অভিনয় আরম্ভ হয়।

আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ও অসম্ভ বলে যা মনে হয় তাই হয়তো কখনো কখনে গভীরতর কোন অর্থে দ্যুতিময় ও সীমা হীন সম্ভাবনায় প্রাণময় হয়ে ওঠে। বিশ্লে ষণ আর উপলব্ধির প্রহরে পাওয়া এই সত্যবোধকেই হয়তো অ্যাবসার্ড নাটব সংলাপ, চরিত্র ও পরিবেশনের মেলবন্ধনে ভাষা দিতে চেয়েছে। ইউরোপের নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে সমতা রেখে আজকের বাংলা নাট্যচর্চায় অ্যাবসার্ড নাটকের প্রযোজনা বিশেষ একটা ভূমিকা নিয়েছে। সম্প্রতি 'রঙমহলে' 'অনুকার' পরিবেশিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাট্যাভিনয়ে এই ধরনের নাট্যান্দো-

শীলনে শিল্পীদের আবেগ আর আন্তরিকতা ধরা পড়েছে।

প্রবহমান কালের আঘাতে রাজতন্ত্রের গাম্ভীর্য আর অহংকার স্তব্ধ হয়ে গেছে, চূর্ণ হয়েছে সাম্রাজ্য নিয়ে নিরঙ্কুশ মুখরতা। কিন্তু রাজদণ্ডের মৃত্যু হয় নি, সিংহাসনের দীপ্তি কমলেও প্রচ্ছন্নভাবে এখনো একে ঘিরে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ শোষণ আর পীড়নের আবর্ত রচনা করে নতুন এক রাজনীতির খেলা খেলছে। সাধারণ মানুষ আজ এ সম্পর্কে সচেতন, এই সচেতনতাকে লক্ষ্য করে স্বার্থান্ধ লোভীগোষ্ঠী এ দুর্গ থেকে সে দুর্গে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু সংগ্রামী জনতার অগ্রসরমানতার কল্লোলে এরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তবু এদের শেষ পরাজয়ের দিন এখনো আসে নি। আসবে একদিন. পৃথিবী সেদিন নতুন করে জন্ম নেবে; এই স্বপ্নসফলতার প্রেক্ষাপটেই 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকের সার্থকতা। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রাণী'র মধ্যে যন্ত্রণা আনা হয়েছে—রাণীর পোশাকী সাজের সঙ্গে সাধারণ মানবসত্তার যে সংঘর্ষ তাতেই প্রমাণিত হয়েছে তাঁর হৃদয়ে ক্লান্ত ঝড়ের কান্না। জনতার আন্দোলনই জয়ী হয়েছে নাটকে, কিন্তু শেষে দুর্গশাসক ও রাণীর চলে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারি নি। 'চিত্রকর' চরিত্রের আরো একটু মানসিক ব্যাপ্তির প্রয়োজন ছিল না কি?

নাট্য প্রযোজনায় সুগভীর কল্পনাশক্তির পরিচয় রাখেন নির্দেশক দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। গতানুগতিক রীতি থেকে মুক্ত হয়ে যে মৌলিক চিন্তা তিনি সূক্ষ্মভাবে প্রযুক্ত করেছেন, মঞ্চে তা আরো সুগভীর অর্থে প্রাণময় হয়ে উঠেছে খালেদ চৌধুরীর ও তাপস সেনের শিল্পসম্মত মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে। নাটকের টিমওয়ার্কে শৈথিল্য চোখে পড়ে নি, কম্পোজিসন সুন্দর। শিল্পীদের আন্তরিকতা গুণে নাটকের আপাতঃ দুরূহতা স্বচ্ছ হোতে পেরেছে। 'রাণী'র ভূমিকায় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন মায়া ঘোষ, মানসিক যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি ভোলার নয়। 'দুর্গশাসক' হিসাবে তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর পোশাকটা একটু বিসদৃশ লেগেছে। নিশীথ মণ্ডলের 'জীবনলাল' ও মন্দিরা দাসের 'চিত্রলেখা' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রচিত্রণ না হোলেও তা সামগ্রিক অভিনয় ধারাকে উদ্দাম রাখতে পেরেছে। 'চিত্রকর' চরিত্রে তাপস দত্তগুপ্তের অভিনয়ে মাঝে মাঝে উপলব্ধির অনুপস্থিতি পরিস্ফুট হয়েছে। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন—শান্তজিত সেনগুপ্ত (বৈজ্ঞানিক), অসীম ভাদুড়ী (বার্তা অধিকর্তা), সোনালাল কুণ্ডু (পল্লীসেবক), বিবেক সেনগুপ্ত (সৈনাধ্যক্ষ)।

'আমার বাড়ীর নাম রাখবো 'মুক্ত-অঙ্গন'। বাংলাদেশ আমাকে সব সময় প্রেরণা

যোধপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে অনুষ্ঠিত 'বাদুর বন্তানা' নাটকের একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত।

জোগায়। এই বাংলাদেশে এসে কতো সংস্থার মহড়া কক্ষে আমি ঘুরলাম। যে ঘরে তিনজন একসঙ্গে চলাফেরা করতে পারে না তাদের নাটক যখন মঞ্চস্থ হয় তখন আমার চোখে জল আসে। কতো স্বার্থ ত্যাগ, কি বিপুল সংগ্রাম অথচ তার মধ্যেও কি আশ্চর্য প্রযোজনা। এই মুক্তঅঙ্গনে সাজঘরের মধ্যে যখন আমাকে পণ করে নিতে হয় তখন আমার পরিচিত পরিমণ্ডলই প্রতিভাত হয়। এই মঞ্চ আর দর্শক মিলে যে পরিবেশ সেই পরিবেশই প্রেরণা জোগায়, উদ্যম আনে। রাজকীয় পরিবেশ সুসজ্জিত সাজঘরের মধ্যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে—এখানে এই যে খোলা জায়গায় দারিদ্র্যের চিহ্ন অথচ শিল্পসৃষ্টিতে প্রাণের সাড়া, এতেই উন্মোচিত হোচ্ছে নতুন দিগন্ত।'

গত ২৯শে ডিসেম্বর 'মুক্ত অঙ্গনে' 'শৌভনিক' আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় শ্রীপি এল দেশপাণ্ডে এই কথাগুলো বলেন। 'শৌভনিকের' পক্ষে সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু শ্রীদেশপাণ্ডেকে মানপত্র দান করেন এবং প্রধান অতিথি শ্রীচারু রায় পুষ্পস্তবক তুলে দেন। সম্বর্ধনা শেষে শ্রীদেশপাণ্ডে 'নোনা জল মিঠে মাটি' নাটকের অভিনয় দেখেন।

সম্প্রতি 'এয়ার লাইনস' ট্রাফিক এ্যামেচার্স'এর শিল্পীবৃন্দ রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। নাট্যরূপ দেন শ্রীমণি দত্ত এবং নির্দেশনার দায়িত্বও ছিল তাঁর। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন—দিলীপ রায়চৌধুরী, ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী, নিতাইপদ বোস, হরিদাস গাঙ্গুলী, সুব্রত রায়, রমাপদ ভট্টাচার্য, অলক বাগচী, অশোক ঘটক, মিতা চ্যাটার্জি, লতিকা দাশগুপ্ত, পুতুল চক্রবর্তী।

গত ১২ জানুয়ারী স্থানীয় নাট্য সংস্থা হৈ চৈ-এর আসরের শিল্পীরা স্থানীয় শ্রীভবন মঞ্চে শ্রীনিখিল দে পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকটি অভিনয় করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী রথীন্দ্রনাথ রায়, নিখিল দে, সুব্রত রায়, অসীম মুখার্জি, হিমাংশু ভট্টাচার্য স্বাধীন

পাণ্ডে, মাঃ তাপস গাঙ্গুলী, নির্মলেন্দু সিংহ, সত্যরঞ্জন গাংগুলি, দীপেন্দু সেন, মিন্টু চক্রবর্তী, অলোক দাস, শৈলেন কর্মকার, প্রবীর রায়, দিলীপ তালুকদার, সমর মজুমদার, গৌরী বিশ্বাস, দীপালী চৌধুরী, বেবী মুখার্জি, শিপ্রা রায়, রঞ্জনা মুখার্জি। পরিচালকের সার্থক সৃষ্টি সাজাহান।

ছোটখাট ত্রুটি ছাড়া পরিচালক শ্রীনিখিল দে নাটকটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন।

বিবিধ সংবাদ

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা কলিকাতাস্থ চেক দূতাবাসের সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী এক চেক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছে গত সোমবার থেকে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে। বহু আলোচিত জিরি ম্যানজেলের 'ইণ্ডিয়ান সামার' ও ইভাল্ড স্কর্মের 'ফ্লাইট' ও 'লেফট উইথ দি ফাইভ গার্লস' ছবি দুটি ছাড়া আর যে কটি ছবি দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে 'রিপোর্ট ফ্রম দি পার্টি এন্ড দি গেস্ট', 'ধোশেফ কিলিয়ান', 'সাপ অন দি মেইন স্ট্রীট', 'সিলিং', 'স্কেপ' ও 'স্ট্রিক্টলি সিক্রেট পারফরমেন্স'।

যোধপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে ছাত্রীবৃন্দ অনুষ্ঠিত 'দাদুর দস্তানা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে 'দাদুর দস্তানা'। নাটবস্তুর কৌতুক ও বক্তব্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল শিশুদের অভিনয়ে। গানের সুর দেন এবং পরিচালনা করেন শ্রীমতী পুতুল রায়। এই উপলক্ষে হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনীও পরিদর্শিত হয়। রাজ্যপাল ধর্মবীর উপস্থিতি এই উৎসবে আনন্দের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি আসানসোলে টি আর সি আয়োজনে আন্তঃ ডাক তার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রসের নাটক এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার নজির রেখেছিল। বিচারকের বিচারে টি আর সি আসানসোল প্রযোজিত 'কুয়াশা' ও টি আর সি পুরুলিয়া প্রযোজিত 'কালো মাটির কান্না' প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পায়। 'এক চিলতে' নাটক পরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান শ্রীশুভব্রত গুপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান শিবেন বাগচি 'কুয়াশা'র প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য।

সত্যজিৎ রায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের একমেবাদ্বিতীয়ম্ এস এফ সিনে ক্লাব ১৯৬৮ সনে বাছাই করা মোট ১২টি ফিল্ম দেখিয়েছে। নতুন বছরে নির্বাক যুগের একটি জার্মাণ ফ্যানটাসি ফিল্ম (দি গোলেম) দেখানো হয়েছে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহে গত ১২ জানুয়ারী রবিবার সকাল সাড়ে দশটায়। স্ট্যানলি কুব্রিক পরিচালিত বিস্ময়কর নতুন সায়ান্স-ফিকশ্যান ফিল্মস "২০০১ : এ স্পেশ অডিসী" প্রথম প্রদর্শনীকালে ক্লাবের সদস্যদের বিশেষ প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে মেট্রো অথবা এলিট সিনেমায়। সত্যজিৎ রায়ের 'গোপী গায়েন বাঘা বায়েন' সম্পর্কেও এইরূপ আলোচনা চলছে। কিছু নতুন সদস্য নেওয়া হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ সেক্রেটারী অদ্রীশ বর্ধনের সংগে ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা—১৪ (ফোন ৩৪-৭২৭৪) এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।
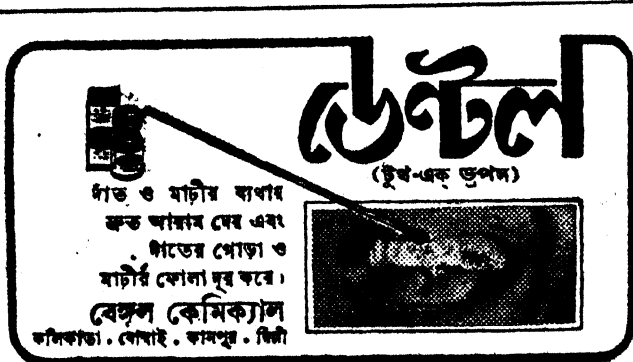
যুগযাত্রীর সংস্থা তাদের অষ্টাদশ বার্ষিকী সম্মেলন উপলক্ষে একটি সারারাতব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীতের খোলা-আসর সর্বসাধারণ্যে উপহার দেবেন রবিবার ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮। অংশ গ্রহণ করবেন—সুনন্দা পটনায়ক, মুনওয়ার আলী খাঁ, ভি জি যোগ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কেরামৎ খান, আফাক হোসেন খান, বিশ্বনাথ বসু, সগীরুদ্দীন, লচ্ছন খান ও অন্যান্য। নৃত্যে সুমিত্রা মিত্র।

গত ৫ জানুয়ারী বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সুনামী নাট্যসংস্থা 'চক্রধরপুর সংস্কৃতি পরিষদ' কর্তৃক চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে স্থানীয় সাউথ ওয়েস্ট ইনস্টিটিউটে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রী এ সহায়। কল্যাণী সাহা, গোবিন্দ দে রমা চক্রবর্তী, অচিন্ত্য মিত্র, মিলন চক্রবর্তী গানে অংশ নেন। নাচে অংশ গ্রহণ করে সুপ্রকাশ সরকার ও তাঁর সম্প্রদায়। এরপর অভিনীত নয় নীলোৎপল দে রচিত সামাজিক নাটক 'প্রতিচ্ছবি'। নাটকের প্রয়োজনুযায়ী চরিত্রাবলী রূপায়নে সদস্যবৃন্দের অভিনয় ঐক্যে স্বাভাবিকভাবেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। গতি হয়েছে স্বচ্ছন্দ। অভিনয়াংশে তীর্থ মুখার্জি, নিত্যরঞ্জন সাহা, সুনীল দে এবং রমাপদ দত্ত তাঁদের নৈপুণ্যে নজির রাখেন। এছাড়াও ছিলেন পানু ঘোষ, সমর বসু, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অশোক ঘোষ, নূপুর সাহা ও নরেন্দ্রনাথ আচার্য। নারী চরিত্রে শিপ্রা চক্রবর্তী ও কল্যাণী দাসের অভিনয় স্বচ্ছন্দ।

২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে ন্যাশনাল কোম্পানি স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নীমু ভৌমিকের পরিচালনায় অফিসের কর্মীরা 'লঘু-গুরু' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। নাট্যাভিনয়ের পর বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নাগা নৃত্যে চৈতালী সেন ও অরুনিণমা সেন, পাঞ্জাবী ভাংড়া নৃত্যে অনুপশংকর, সুতপা দত্ত, অরুণিমা সেন, চৈতালী সেন এবং রাজস্থানী লোকনৃত্যে পূর্ণিমা হালদার ও কৃষ্ণা হালদার দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন। চুমকি ও ঝুমকি দর্শকদের আনন্দ দান করেন। সংগীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, মীরা বিশ্বাস যন্ত্রসংগীতে ভি বালসারা প্রমুখ খ্যাতনাম শিল্পিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন হীমু ভৌমিক।

১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কুমারটুলি পার্ক প্রাঙ্গণে ৯-এর পল্লী বিবিধানুষ্ঠান সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সমিতির সভাপতি শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে সমিতির পক্ষ থেকে ২০১ টাকা সংস্থার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠান সভাপতি ডাঃ সুনীল বসু, সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীনেপাল রায়, শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ বক্তৃতা করেন। সভান্তে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরী, নির্মলা মিশ্র, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী বসু, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বেতার শ্রুতি
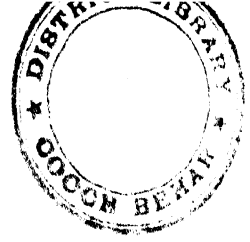
কলকাতা কেন্দ্র থেকে অসমাপ্ত গান শোনাবার অর্থাৎ গান শেষ হবার আগেই গান কেটে দেবার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বহু সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। হবে বলেও মনে হচ্ছে না। সমালোচনার পর ইদানীং অসমাপ্ত গান শোনাবার দিকেই যেন বেশি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এমন দিন যাচ্ছে না, যেদিন দু-পাঁচটা গান কাটা পড়ছে না। হিসাব নিলে দেখা যাবে, সারা ভারতবর্ষে প্রতিদিন যে-কটা প্রাণ রেলে কাটা পড়ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গান কাটা পড়ছে কলকাতা বেতারে।

রেলে যে মানুষ-জন গোরু-ছাগল-ভেড়া কাটা পড়ে, তা অনেক সময় কাটা পড়ার প্রাক্কালে জানা যায়, কিন্তু কলকাতা বেতারে কখন কোন্ গান কাটা পড়বে তা বোঝা শক্ত। তবে মোটামুটিভাবে দেখা গেছে, খবরের আগের গানই কাটা পড়ে বেশি। বিশেষ করে দিল্লী থেকে প্রচারিত খবরের আগের গান। কখনও কখনও মিটার আলাদা করার জন্যও গান কাটা পড়ে! অনেক সময় কলকাতা—'ক' ও 'খ'-য়ে একই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, আবার অনেক সময় ভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। অভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে ভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করার সময় 'ক' ও 'খ' মিটারকে আলাদা করে নিতে হয় এবং তা নির্দিষ্ট সময়েই করতে হয়। পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান যদি সেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ না হয়, তাহলে সেই অনুষ্ঠান কাটা পড়ে। দিল্লী থেকে প্রচারিত ও কলকাতা থেকে রিলে-করা খবরের আগের অনুষ্ঠান কাটা পড়ে, কারণ দিল্লী থেকে যখন খবর প্রচার হবার কথা, তার কয়েক সেকেণ্ড আগেই কলকাতাকে লাইন ছেড়ে দিতে হয়। যদি কোনো ঘোষক কিংবা ঘোষিকা পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান শেষ হতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে অনুষ্ঠানটির প্রতি অসীম করুণাবশে কাটতে দ্বিধাবোধ করেন, তাহলে কণ্ট্রোল-রুম সে-কর্ম সমাধা করে দেয়। আবার কোনো শিল্পী যদি তাঁর বরাদ্দ সময়ের বেশি নিয়ে ফেলেন, তাহলেও কাটতে হয়, কারণ তা না হলে পরবর্তী অনুষ্ঠানের সময়ে টান পড়ে যাবে এবং এটা ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে, কারণ এখন সবই টেপ-রেকর্ডের অনুষ্ঠান। অবশ্য পাঁচ-দশ সেকেণ্ড বেশি নিলে অনেক সময় অসুবিধা না-ও হতে পারে এবং সেটা ঘোষক-ঘোষিকাদের সময় থেকে পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু খবরের আগে হলে এই সুবিধাটুকু দেওয়া যায় না। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব অনুষ্ঠান শেষ করা দরকার। এবং যখন এই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে যায় তখনই বিপত্তি ঘটে।

কিন্তু এর কি প্রতিকার নেই? নিশ্চয়ই আছে। কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিকার করেন না এবং করার জন্য সচেষ্ট হন না বলেই বিরূপ সমালোচনা। দু-একদিন অনিবার্য কারণে এই রকম বিপত্তি ঘটলে সেটা সহ্য করা যায়, কিন্তু বিপত্তিটা যখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং তা দূর হবার পরিবর্তে উদ্ধতভাবে বৃদ্ধি পায়, তখনই আপত্তি সোচ্চার হয়ে ওঠে। অবশ্য কানে তুলো দিয়ে রাখলে আপত্তি কানে প্রবেশ করতে পারে না।

একবার এক ঘোষকের সঙ্গে এই গান কাটা নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল। ঘোষকমশাই গান কাটার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং দোষটা গায়ক-গায়িকা আর দিল্লীর উপর চাপিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শিল্পীরা কখনও কখনও তাঁদের বরাদ্দ সময়ের বেশি গেয়ে ফেলেন, দিল্লীর খবরও কোনো কোনো সময় নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে যায়। ফলে গান কাটতে হয়। কোনো শিল্পী যদি তাঁর বরাদ্দ সময়ের বেশি নিয়ে ফেলেন এবং তাঁর পরে যদি খবর থাকে, তাহলে তাঁর গান কেটে দিতে হয়। আবার খবর যদি নির্দিষ্ট সময়ের পরেও প্রচারিত হতে থাকে, তাহলে পরবর্তী গানের সময়ে টান পড়ে যায় এবং তখন সেই গান শেষ হবার আগেই শেষ করে দিতে হয়।

এখন কথা হচ্ছে, এটা যখন জানা যে, দিল্লীর খবর কলকাতার অনুষ্ঠান শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করবে না এবং তা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে যেতে পারে, তখন পূর্বেই সতর্ক হওয়া যেতে পারে ও সেই অনুসারে রেকর্ড-করা যেতে পারে।

আর শিল্পীদের ঘাড়ে যে-দোষ চাপানো হয়েছে, সেটা ধোপে টেকে না। শিল্পীদের কন্ট্রাক্টে স্পষ্ট করে তাঁদের বরাদ্দ সময়ের উল্লেখ থাকে। শিল্পীরা আইনত কখনই সেই সময় অতিক্রম করে যেতে পারেন না। যদি কখনও কোনো কারণে অতিক্রম করে যান, তাহলে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্তমানে কোনো গানই 'লাইভ' ব্রডকাস্ট হয় না, সব আগে থেকে টেপ রেকর্ড করে রাখা হয়। সুতরাং কোনো শিল্পী তাঁর বরাদ্দ সময়ের বেশি গেয়ে ফেললে তাঁকে দিয়ে আবার গাওয়ানো যেতে পারে এবং তিনি তাতে আপত্তি করতে পারেন না—ভদ্রতার খাতিরেও না, আইনের খাতিরেও না।

দ্বিতীয়ত, খবরের আগের ও পরের শিল্পীদের প্রোগ্রাম পনের মিনিটের না করে কিছু কম করা যেতে পারে। খবর আরম্ভ হবার দশ সেকেণ্ড আগে লাইন ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট হয়, আর খবর নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করলে কখনও পনের-কুড়ি সেকেণ্ডের বেশি করে না—সুতরাং এটা হিসাবে ধরে খবরের আগের ও পরের অনুষ্ঠান পনের মিনিটের না করে সওয়া চোদ্দ মিনিট করলে কোনো বিপত্তি ঘটতে পারে না। এই কম সময় রেকর্ড করার ফলে কখনও কখনও উল্টো বিপত্তি ঘটতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়ে কিছুটা সময় শূন্য থেকে যেতে পারে—এ-যুক্তিও খণ্ডন করা যেতে পারে। ঘোষক-ঘোষিকারাই খণ্ডন করতে পারেন। যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়ে কিছুটা সময় থেকে যায়,

তাহলে ঘোষক-ঘোষিকারা অনায়াসেই থেকে-যাওয়া সময়টা ঘোষণার কারুকার্য দিয়ে খাওয়াতে পারেন। ঘোষক-ঘোষিকারা এমন অনেকই খাইয়ে থাকেন।

তৃতীয়তঃ, গানের লাইন বলা প্রয়োজনবোধে বন্ধ রাখা যেতে পারে, প্রয়োজনবোধে তাড়াতাড়ি বলা যেতে পারে, আবার প্রয়োজনবোধে ধীরেও বলা যেতে পারে।

মোট কথা, সমস্যাটার প্রতি আন্তরিক হলে অনায়াসেই তার সমাধান করা যেতে পারে।

কলকাতা বেতার থেকে শুধু গান কেটে দেওয়াই হয় না, কাটা রেকর্ডও বাজানো হয়। ৩রা জানুয়ারি রাত্র সাড়ে ৯টায় গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধের আসরে শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের রেকর্ডটি কাটা ছিল—এক জায়গায় নয়, দু' জায়গায়। গানটির প্রচারে দু-দুবার বাধা সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ঘোষককে গানটি অসমাপ্ত রেখেই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে এক সপ্তাহ পরে ১০ই জানুয়ারি ঐ সময়ে ঐ আসরে ঐ ঘোষকের হাতে শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের রেকর্ডের বেলায়। ৩রা জানুয়ারি আসরের শেষে ঘোষক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, ১০ই জানুয়ারি করেননি। পরপর দু' সপ্তাহ একই সময়ে একই আসরে একই ঘোষকের হাতে একই কাণ্ড ঘটায় বেতার কর্তৃপক্ষ লজ্জা পেয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি পেয়েছি এবং সেজন্য তার পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারি ঐ সময় আর রেডিও খুলিনি।

এই রকম কাটা আর ঘষা রেকর্ড কী করে বাজতে পারে, ভেবে বিস্মিত হতে হয়। প্রচারের আগে রেকর্ডগুলো বাজিয়ে দেখে নেবার রীতি কী উঠে গেছে রেডিও থেকে? না কি ঐ রীতি চালুই হয়নি কোনো দিন?

ইতমদ্দৌলা : আগ্রা। ফটো : অসিতকুমার সাহা

• • • অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৯ই জানুয়ারি বেলা আড়াইটেয় বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে 'শিল্প ও বিজ্ঞান' পর্যায়ে আলকাতরা থেকে রং উৎপাদন সম্পর্কে শ্রীসত্যেন ঘোষের একটি কথিকা শোনা গেল। বেশ তথ্যপূর্ণ কথিকা, বক্তার বলার ভঙ্গিটিও ভালো। সব মিলিয়ে কথিকাটি মনোজ্ঞ হয়েছিল। অনেক কিছু জানা গিয়েছিল।

ঐদিন রাত সাড়ে ৯টায় অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে 'আকবর' নামে একটি রূপক প্রচারিত হ'ল। এটি হিন্দী থেকে বাংলায় অনুবাদ। কিন্তু এটাকে রূপক না বলে গল্প বললেই বোধ হয় ভালো হয়—একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীর কাছে মাস্টারমশাইয়ের গল্প বলা। মাস্টারমশাই ছাত্রছাত্রী দুজনের কাছে আকবরের গল্প বলেছেন আর তারা মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ফ্ল্যাশ ব্যাকে একটুখানি করে হুমায়ুন, আকবর ও তাঁদের পার্শ্বচরদের দেখা গেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ওজস্বিতা কোথাও পাওয়া যায়নি। তাঁরাও ঐ মাস্টারমশাই আর ছাত্র-ছাত্রী দুজনের মতো লঘু পদক্ষেপে বিচরণ করেছেন। তবে গল্পটির তথ্যের সমাবেশ ছিল মন্দ না।

ঐদিন যেভাবে শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের পরলোকগমনের খবর প্রচারিত হয়েছে তাতে কলকাতা বেতারের কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। তাঁরা যে নির্দিষ্ট সময়ের সংবাদের জন্য অপেক্ষা না করে অন্য অনুষ্ঠানের মাঝে আগেই এই খবরটি প্রচার করেছেন এটা কম কথা নয়।

১২ই জানুয়ারি রাত সওয়া ১০টার সংবাদ বিচিত্রাটির জন্যও কর্তৃপক্ষ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। এই সংবাদ বিচিত্রায় তাঁরা প্রতিমা দেবীর কণ্ঠস্বর শুনিয়েছেন—গত পৌষমেলায় প্রতিমা দেবী তাঁর সংবর্ধনার উত্তরে যে ভাষণ দিয়েছিলেন কিয়দংশ। প্রতিমা দেবীর সেই বার্ধক্য-কম্পিত কণ্ঠস্বর এখনও যেন বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে, শিহরন জাগাচ্ছে।

এই সংবাদ বিচিত্রার আর একটি আকর্ষণ ছিল ইডেন উদ্যানে চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে তাঁদের কণ্ঠস্বর প্রচার। সিনেমার বাইরে কলকাতা-বোম্বাইয়ের অনেক খ্যাতনামা চিত্রতারকার কণ্ঠস্বর শুনে বিরাট এক শ্রেণীর শ্রোতা নিঃসন্দেহে খুশি হয়েছেন।

১৪ই জানুয়ারি রাত সওয়া ১০টায় শ্রীমতী পূরবী চট্টোপাধ্যায় লোকগীতি শোনালেন। কণ্ঠ তরল হলেও মাধুর্য আছে, লোকগীতির প্রতি টান আছে। রাত সাড়ে ১০টায় শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গান কিন্তু মন খুশি করতে পারেনি।

—শ্রবণক

গ্রামোফোন কোম্পানীর উদ্যোগে আনন্দ উৎস নামে প্রদর্শনীতে মি জে জে স্টনফোরডকে (বাঁদিকে) প্রদর্শনী দেখাচ্ছেন শ্রী পি দে। (নীচে) 'বসন্ত বন্দনা' রেকর্ডের শিল্পী প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় সনৎ সিংহ সংগীত পরিবেশন করছেন।

ফটো : অমৃত

জলসা

গ্রামোফোন কোম্পানীর উৎসব সপ্তাহ

সম্প্রতি ভারতীয় গ্রামোফোন কোম্পানীর কার্যকলাপ, শিল্পী ও অন্যান্য নানান বিভাগের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এসেছিলেন আন্তর্জাতিক ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ লয়েড ডান (হলিউড) এবং ই এম আই (ইলেকট্রিক এ্যান্ড মিউজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি) গ্রুপ-ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে জি স্ট্যানফোর্ড (ইংল্যান্ড)। ই এম আই-এর বিশিষ্ট এই কর্মীযুগলকে উপলক্ষ্য করে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ। শিল্পী, সাংবাদিক, ডিলারস সাধারণ শ্রোতা কেউই এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন ন। এই ব্যাপক উৎসবের জন্য ধন্যবাদার্হ, মিঃ ভাস্কর মেনন, সর্বশ্রী এ সি সেন, প্রসেনজিৎ দে, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ রায়চৌধুরী, সন্তোষ দে এবং মালেক। ২২ জানুয়ারী ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে 'দি ইন্ডাস্ট্রি অফ হিউমেন হ্যাপিনেস'র প্রদর্শনী শুরু হয়। প্রদর্শনীটি শুধু নয়নাভিরামই নয়— এখানে চিত্র ও সাঙ্গীতিক বস্তুসম্ভারের মাধ্যমেই যেন গ্রামোফোন কোম্পানীর ইতিহাস উপাখ্যান কাব্যের মতই বর্ণিত।

দীর্ঘ ৬৮ বৎসরব্যাপী জাতির নেতা, কবি, শিল্পীদের সম্মিলিত শিল্পকৃতিকে রেকর্ড করে গ্রামোফোন কোম্পানী দেশ ও জাতির সেবা করে চলেছেন।। গান্ধীজী, নেহরু, বড়ে গোলাম আলি, বিলায়েৎ খাঁ, বিসমিল্লা খাঁ, আলি আকবর রবিশঙ্কর, শুভলক্ষ্মী, গাঙ্গুবাঈ, হীরাবাঈ, পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, কানন দেবী, হেমন্ত মুখার্জি, লতা মুঙ্গেশকার, মহম্মদ রফি, মুকেশ সবার কণ্ঠ ও বাণীকে চিরন্তন সম্পদ করে রাখা হয়েছে। প্রদর্শনী কক্ষে রেকর্ডকভারে এ'দের মনোজ্ঞ রঙীন ছবি একনিমিষেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

যন্ত্রের দিকে গ্রামোফোন এবং রেডিও ছাড়াও, ট্রানজিস্টার রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ারের প্রথম শ্রেণীর কোয়ালিটির প্রোডিউস সব।

এরপর ইনফরমেশন সেন্টারের মঞ্চে গ্রামোফোন কোম্পানীর সদ্যপ্রকাশিত বসন্তবন্দনা রেকর্ডের কয়েকজন শিল্পী প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর সেনগুপ্ত, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রজত নন্দী সঙ্গীত উপহার দেন। নৃত্য পরিবেশন করেন অলকানন্দা ঘোষ।

২৩ তারিখ গ্র্যান্ড হোটেলে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিঃ স্ট্যানফোর্ড ও মিঃ ডান-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন মিঃ প্রসেনজিৎ দে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাস্কর মেনন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভাস্কর মেনন জানান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং ইউ কে'তে সম্ভবতঃ নানান দেশের অধিবাসীদের আগমন হেতুই হিন্দুস্থানী ফিল্ম . সং-এর চাহিদা খুব বেশী। আমেরিকায় উত্তর-ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। টেলিভিশন সেটের প্রসঙ্গে শ্রীমেনন জানান এ বিষয়ে সরকারী সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তা যদি পাওয়া যায় ১২৫০.য় গ্রামোফোন কোম্পানী হয়ত এ সেট সরবরাহ করতে .পারবেন।

—চিত্রাঙ্গদা

ব্রিসবেনের ঐতিহাসিক প্রথম টেস্টের শেষ ওভারে উভয় দলের সমান ৭৩৭ রানের মাথায় মেকিফের রান আউট—এইখানেই খেলা শেষ।

অবিস্মরণীয় টেষ্ট সিরিজ

ক্ষেত্রনাথ রায়

রোমাঞ্চ কাহিনীকে সার্থকভাবে টেক্কা দিতে পারে ক্রিকেট খেলা। উত্তেজনা, শিহরণ, উৎকণ্ঠা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তৃপ্তির সমন্বয়ে ক্রিকেট আন্তর্জাতিক খেলাধুলার দরবারে রাজসিংহাসনে বসে আছে। ক্রিকেট যথার্থই 'কিংস গেম'। অনিশ্চয়তা ক্রিকেট খেলার আর এক বিশেষ ভূষণ। ক্রিকেটের বড় আসর হল টেস্ট ম্যাচ। পৃথিবীর মাত্র ৭টি দেশের মধ্যে এই টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ সীমাবদ্ধ হলেও তার প্রভাব সারা পৃথিবী জুড়ে। বিশ্বের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসেছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ—খেলা হয়েছিল ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান—এই সাতটি দেশ যেসব টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি অসাধারণ গৌরবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই টেস্ট খেলাই টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে 'প্রথম এবং একমাত্র 'টাই ম্যাচ'—অর্থাৎ খেলায় দুই দলেরই সমান সংখ্যক রান।

ব্রিসবেন মাঠে এই ঐতিহাসিক 'টাই-ম্যাচ' শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালের ৯ই ডিসেম্বর। অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে এই খেলাটি ছিল প্রথম টেস্ট অপর দিকে বিশ্বের ৪৯৮তম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোকে টসের বাজিতে হারিয়ে দিয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। খেলা এইভাবে এগিয়েছিল : প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংসে ৩৫৯ রান (৭ উইকেটে), দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংস ৪৫৩ রানের মাথায় শেষ এবং অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রান ১৯৬ (৩ উইকেটে), তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৫০৫ রানের মাথায় শেষ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংসে রানের ঘর শূন্য (কোন উইকেট না পড়ে) এবং চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংসের রান ২৫৯ (৯ উইকেটে)—হল এবং ভ্যালেনটাইন শূন্য রান করে অপরাজিত।

নাটকীয় ঘটনার সমস্ত উপাদান পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের জন্যেই যেন তোলা ছিল। পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪০ মিনিট খেলেছিল। ২৮৪ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। ১০ম উইকেটের জুটি হল এবং ভ্যালেনটাইন এই দিন দলের অতি মূল্যবান ২৫ রান যোগ করেন। খেলার বাকি ৩১০ মিনিট সময়ে ২৩৩ রান তুলতে পারলেই অস্ট্রেলিয়ার জয়—খেলার এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা শুরু করে। কিন্তু সূচনা থেকেই খুব খারাপ অবস্থা। উইকেট পতনের হিসাব—১ম ১ রানে, ২য় ৭ রানে, ৩য় ও ৪র্থ ৪৯ রানে, ৫ম ৫৭ রানে এবং ৬ষ্ঠ ৯২ রানে। দলের এই অতি শোচনীয় অ পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন ৭ম উইকে জুটি ডেভিডসন এবং অধিনায়ক বেনো। চা-পানের সময় অস্ট্রেলিয়ার দাঁড়ায় ১০৯ (৬ উইকেটে)। অর্থাৎ লাভের জন্যে বাকি ২ ঘণ্টার খেলায় অ লিয়ার আরও ১২৪ রানের প্রয়ো ডেভিডসন-বেনোর ৭ম উইকেটের জু ১০০ রান উঠেছিল ৯৪ মিনিটে—শেষ রান ৪০ মিনিট সময়ে। তাঁরা ঘড়ির ক পেছনে ফেলে রান তুলতে থাকেন। জয়ের মুখ থেকে দলকে টেনে তুলে উইকেটের জুটি ডেভিডসন এবং যখন জয়ের সিংহদ্বারের সামনে উপ হয়েছেন—জয়লাভের জন্যে আর ম রানের প্রয়োজন এমন সময় দলের রানের মাথায় ডেভিডসন সর্ট রান গিয়ে সলোমনের অব্যর্থ লক্ষ্যে রান-আ হলেন।

আর মাত্র এক ওভার খেলা হবে। জ জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ৬ রানের প্রয়োজ অস্ট্রেলিয়ার হাতে জমা ৩টে উইকে খেলোয়াড় আছেন চারজন—বেনো, গ্র মেকিফ এবং ক্লাইন। সুতরাং এক ও খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৬ রান স করা এমন শক্ত কথা কি?

কিন্তু এই শেষ ওভারটাই অস্ট্রেলি কাছে শক্ত গেরো হয়ে দাঁড়ালো। জয়লা প্রয়োজনীয় ৬ রান উঠল না—একটা তুলতে বাকি থেকে গেল—খেলায় হার-জি হল না—দুই দলের সমান ৭৩৭ রা মাথায় খেলা শেষ হল—টেস্ট ক্রিকেট খে ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রাণখ ক্রিকেটঅনুরাগীরা ক্রিকেটের মহিমা কী করলেন।

প্রথম টেস্টের শেষ ওভারে বল হ পেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুর্ধর্ষ বো ওয়েসলি হল। অধিনায়ক ওরেল বেছে হলকেই শেষ ওভারে বল দি ডেকেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জাত মর্যাদা তুলে ধরে রাখার গুরুদায়িত্ব হ হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হল মরণ-কে বল দিতে লাগলেন। ওয়েস্ট ইন্ডি বাকি খেলোয়াড়রা ঈগলের দৃষ্টি নি সতর্ক রইলেন। জয়লাভের জন্যে অ লিয়ার ৬ রান দরকার—উইকেটে অ গ্রাউট এবং বেনো। হলের প্রথম বল গ্রাউটের প্যাডে লেগে বলটা বেরিয়ে গেল সেই সুযোগে গ্রাউট এবং বেনো প্রাণ দৌড় দিয়ে এক রান সংগ্রহ করলেন। জ লাভের জন্য আর ৫ রান প্রয়োজন। হ দ্বিতীয় বল—বেনো তাঁর ৫২ রানের মা আলেকজান্ডারের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে বিদ নিলেন। হলের তৃতীয় বল—মেকিফ ঠেকালেন, কোন রান উঠল না। হ চতুর্থ বল—অস্ট্রেলিয়ার একটা বাই-র যোগ হল। হলের পঞ্চম বল—গ্রাউট স্কো লেগে বলটা তুললে কানহাই সেই সহ

ক্যাচটা ধরতে যান। হল উত্তেজনাবশে কানহাইকে ধাক্কা দিলে বলটা মাটিতে পড়ে যায়। এই সুযোগে অস্ট্রেলিয়ার ১ রান বেড়ে যায়। হলের ৬ষ্ঠ বল—মেক্‌কিফ খুব জোরে স্কোয়ার-বাউন্ডারী সীমানায় বলটা পাঠালেন। হান্ট হটবার পাত্র নন, বলের পিছনে প্রাণপণ দৌড়ে আলেক-জান্ডারের হাতে বলটা পৌঁছে দেন। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার ২ রান যোগ হয়েছে; ফলে উভয় দলেরই সমান ৭৩৭ রান দাঁড়াল। গ্রাউট দলের ২৩২ রানের মাথায় তৃতীয় অর্থাৎ জয়সূচক রান নিতে গিয়ে আলেকজাণ্ডারের হাতে রানআউট হলেন। গ্রাউটের পরিত্যক্ত উইকেটে খেলতে নামলেন অস্ট্রেলিয়ার শেষ খেলোয়াড় ক্লাইন। অস্ট্রে-লিয়ার জয়লাভের জন্যে মাত্র ১ রান দরকার। বল আছে দুটি—৭ম ও ৮ম। হলের সপ্তম বল—ক্লাইন স্কোয়ার লেগে বলটা মেরেই দৌড় দিলেন। অপরদিকের উইকেট থেকে মেকিফের পৌঁছানোর আগেই সলোমন একটা উইকেট টিপ করে বল মারলেন—ক্লাইনের পরিত্যক্ত উইকেট ভেঙে গেল—মেকিফ রান-আউট হলেন। খেলা এখানেই শেষ হল। কিন্তু এভাবে খেলা শেষ হওয়ার নজির আর দ্বিতীয় নেই। এই খেলা সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব-বিশ্রুত খেলোয়াড় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাড-ম্যানের মন্তব্য, 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টেস্ট খেলা'। ক্রিকেটসমালোচকরা একবাক্যে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজকে 'করোনারী সিরিজ' আখ্যা দিয়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সিরিজ বলেছেন। সিরিজের প্রতিটি টেস্ট খেলাই প্রবল উত্তেজনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে শেষ হয়েছে।

আলোচ্য টেস্ট সিরিজের ২য় টেস্টে (তথা বিশ্বের ৫০০তম টেস্টে) অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী হয়ে ১—০ খেলায় এগিয়ে যায়। পাঁচ দিনের বরাদ্দ খেলা চার দিনে শেষ করে অস্ট্রেলিয়া তার শক্তির পরিচয় দেয়। সিডনির ৩য় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২২ রানে জয়ী হলে সাময়িকভাবে খেলার ফলাফল সমান (১—১) দাঁড়ায়। এডিলেডের ৪র্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই জয়লাভের সম্ভাবনা ষোল আনা ছিল। ৪র্থ টেস্টের ৪র্থ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫টা ১৫ মিনিটে তাদের ৪৩২ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে হিসাব নিয়ে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়াকে খেলায় জয়লাভ করতে হলে বাকি ৩৯৫ মিনিটে ৪৬০ রান তুলতে হবে। অস্ট্রেলিয়া ৪র্থ দিনেই ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩১ রান সংগ্রহ করেছিল। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয় দাঁড়ায়—২০৭ রানের মাথায় ৯ম উইকেটের পতন। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার কপালে নির্ঘাৎ হার রেখা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো'। অস্ট্রেলিয়ার শেষ খেলোয়াড় ক্লাইন

ওয়েসলী হলের আগুনে বোলিং : ব্রিসবেনের ঐতিহাসিক 'টাই' টেস্ট খেলার শেষ ওভার

খেলতে নেমেই ওরেলের বল যেমন মাটির উপর তুললেন অমনি চার গজ দূরে দাঁড়ানো সোবার্স দু'হাত দিয়ে তা ধরে ফেললেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়দের আনন্দধ্বনিতে দর্শকেরা বুঝলেন ক্লাইন আউট হয়েছেন—খেলা শেষ—ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়। কিন্তু আম্পায়ার আকাশে আঙুল তুললেন না। ফলে ক্লাইন খেলায় থেকে গেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলো-য়াড়দের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে যে ভাবান্তর দেখা গেল তা শুধু বিস্ময়ের। তাঁরা এতটুকু ক্ষোভ বা প্রতিবাদ করলেন না। ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর স্বার্থে তাঁরা হাসিমুখে খেলায় মন দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার শেষ ১০ম উইকেট জুটি ম্যাককে এবং ক্লাইন দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ

এডিলেডের ঐতিহাসিক চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ ১০ম উইকেটের জুটি ম্যাককে এবং ক্লাইনের চারদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বজ্র-আটুনী। শেষ পর্যন্ত ম্যাককে এবং ক্লাইন ৭৫ মিনিটের খেলায় অপরাজিত থেকে নিশ্চিত পরাজয় থেকে দলকে রক্ষা করেন।

দলের সমস্ত রকমের আক্রমণ দৃঢ়তার সংগে প্রতিহত করেন এবং ১০০ মিনিটের খেলায় ৬৬ যোগ করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। খেলার ফলাফল ড্র রেখে অস্ট্রেলিয়াকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে তাঁরাই বাঁচান।

মেলবোর্ণের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করার সূত্রে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে ২—১ খেলায় রাবার এবং সেই সংগে ফ্রাঙ্ক ওরেলের নামে উৎসর্গীত 'ওরেল ট্রফি' জয়ের প্রথম গৌরব লাভ করে। কিন্তু এই ৫ম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয় সহজভাবে হয় নি। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের শেষ দিকে ২৫৪ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় আম্পায়ারদের এক বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তে অস্ট্রেলিয়াই লাভবান হয়। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৫৮ রান তুলে ২ উইকেটে জয়ী হয়। এই জয়ের সূত্রেই তাদের ঐতিহাসিক রবার জয়—যার তুলনা আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নেই।

টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্তসার

রানের হিসাব

অস্ট্রেলিয়া : ২,৮৫১ রান (৯০ উইকেটে) ৮৯৩·৪ ওভারের খেলায়। প্রতি উইকেটে গড় ৩১·৬৭ রান এবং প্রতি ১০০ বলে ৩৯ রান।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩,২৫৪ রান (৯৬ উইকেটে) ৮৯৩·৭ ওভারের খেলায়। প্রতি উইকেটে গড় ৩৩·৮৯ রান এবং প্রতি ১০০ বলে ৪৫ রান।

সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৬টি)

রান	খেলোয়াড়	মাঠ	টেস্ট
১৩২	জি সোবার্স	ব্রিসবেন	১ম
১১০	সি সি হাণ্ট	মেলবোর্ন	২য়
১০৮	আলেকজাণ্ডার	সিডনি	৩য়
১৬৮	জি সোবার্স	সিডনি	৩য়
১১৭	রোহন কানহাই	এডিলেড	৪র্থ
১১৫	"	"	"

অস্ট্রেলিয়া (১টি)

রান	খেলোয়াড়	মাঠ	টেস্ট
১৮১	নর্ম্যান ও'নীল	ব্রিসবেন	১ম

এক ইনিংসে পাঁচটি উইকেট

অস্ট্রেলিয়া (৬টি)

৬টি ১৩৫ রানে এ কে ডেভিডসন ব্রিসবেন (১ম)
৬টি ৮৭ রানে " ব্রিসবেন (১ম)
৬টি ৫৩ রানে এ কে ডেভিডসন মেলবোর্ণ (২য়)
৫টি ৮০ রানে এ কে ডেভিডসন সিডনি (৩য়)
৫টি ৯৬ রানে রিচি বেনো এডিলেড (৪র্থ)
৫টি ৮৪ রানে এ কে ডেভিডসন মেলবোর্ণ (৫ম)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৪টি)

৫টি ৬৩ রানে ওয়েসলী হল ব্রিসবেন (১ম)
৫টি ৬৬ রানে এল গিবস সিডনি (৩য়)
৫টি ৯৭ রানে এল গিবস এডিলেড (৪র্থ)
৫টি ১২০ রানে জি সোবার্স মেলবোর্ণ (৫ম)

প্রতি টেস্টের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

প্রথম টেস্ট ব্রিসবেন :

উভয় দলেরই মোট রান দাঁড়ায় সমান—৭৩৭ রান (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৫৩ ও ২৮৪, অস্ট্রেলিয়া : ৫০৫ ও ২৩২)। ফলে খেলাটি 'টাই' হিসাবে শেষ হয়। আজও আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে 'টাই ম্যাচের' নজির মাত্র এই খেলাটিই।

এ কে ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া) ১২৪ রান (৪৪ ও ৮০) করেন এবং ১১টি উইকেট (১৩৫ রানে ৫ ও ৮৭ রানে ৬) পান—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথম 'ম্যাচ ডাবল'-এর নজির—অর্থাৎ একটি খেলায় একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে মোট ১০০ রান এবং মোট ১০টি উইকেট পাওয়ার গৌরব।

গারফিল্ড সোবার্স প্রথম দিনে ৭৮ রাণ করার সূত্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ৩,০০০ রান করার গৌরব লাভ করেন।

প্রথম ইনিংসে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং ওরেল যে ১৭৪ রান করেন তা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪র্থ উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান।

এ ডবলিউ গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া) সাতজনকে (কট ৬ ও স্টাম্পড ১) খেলা থেকে বিদায় করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ম উইকেটের জুটি এ কে ডেভিডসন এবং রিচি বেনো যে ১৩৪ রান করেন তা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ৭ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান।

দ্বিতীয় টেস্ট, মেলবোর্ণ :

মেলবোর্ণ মাঠের অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি ছিল সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ৫০০তম টেস্ট ম্যাচ। বিশ্বের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসেছিল এই মেলবোর্ণ মাঠেই—১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ এবং সে খেলা হয়েছিল ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে।

দ্বিতীয় ইনিংসে জে সলোমন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) তাঁর ৪ রানের মাথায় 'হিট উইকেট' আইনে আউট হন। রিচি বেনোর বল খেলার পর তাঁর মাথা থেকে টুপিটা উইকেটে পড়ে বেল স্থানচ্যুত করে।

দ্বিতীয় ইনিংসে জে মার্টিন (অস্ট্রেলিয়া) উপর্যুপরি চার বলে ৩ জনকে আউট করেন (কানহাই, সোবার্স এবং ওরেল)।

প্রথম ইনিংসে কে ম্যাককে এবং জে মার্টিন ৯৭ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ৯ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান করেন।

তৃতীয় টেস্ট, সিডনি :

ল্যান্স গিবস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) প্রথম ইনিংসে উপর্যুপরি চারটি বল দিয়ে ৩ জনকে আউট করেন (ম্যাককে, মার্টিন এবং গ্রাউট)।

রিচি বেনো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় একনাগাড়ে ৮ ওভার বল করেন (৮ বলের ওভার)।

আর বি সিম্পসন (অস্ট্রেলিয়া) ৫টা 'ক্যাচ' ধরেন (১ম ইনিংসে ৪টে)।

প্রথম ইনিংসে সোবার্স এবং নার্স দলের ১২৮ রান সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান করেন।

চতুর্থ টেস্ট, এডিলেড:

ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোহন কানহাই উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১১৭ ও ১১৫ রান) করার দুর্লভ গৌরব লাভ করেন—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এইটি ছিল ২০তম নজির। এই ২০টি টেস্ট নজিরের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রাই করেন ৬ বার—জর্জ হেডলি ২ বার, ক্লাইড ওয়ালকট ২-বার, এভার্টন উইকস ১-বার এবং রোহন কানহাই ১-বার।

ল্যান্স গিবস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ম্যাককে গ্রাউট এবং মিশনকে উপর্যুপরি ৩ বলে আউট করে দুর্লভ 'হ্যাট-ট্রিক' সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে 'হ্যাট-ট্রিক' করার নজির ছিল মাত্র ১৬টি।

পঞ্চম টেস্ট, মেলবোর্ণ:

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো টসে জয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। টসে জিতে এই নিয়ে তিনি তিনবার বিপক্ষ দলকে ব্যাট করার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে তিনবারই খেলায় জয়লাভ করেন। টসে জেতার পর ভাল উইকেট পেয়েও বিপক্ষ দলকে প্রথম ব্যাট করতে দেওয়ার অর্থ সাধ করে বিরাট ঝুঁকি ঘাড় পেতে নেওয়া—জুয়া খেলার সামিল আর কি!

পঞ্চম টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে দর্শক সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০,৮০০—এই সংখ্যা টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যে-কোন একদিনের দর্শক সমাগমের বিশ্বরেকর্ড।

গারফিল্ড সোবার্স অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় এক নাগাড়ে ৪১ ওভার বল দেন। আর বি সিম্পসন দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হলের এক ওভারের খেলায় এই-ভাবে তাঁর ১৮ রান সংগ্রহ করেন: ৪-২-৪-০-৪-০-৪-০। এবং পরবর্তী ওভারের প্রথম ও দ্বিতীয় বল থেকে ৬ রান করেন।

এই টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার এ ডবলিউ গ্রাউট ২৩ জন খেলোয়াড়কে বিদায় করেন (কট ২০ ও ষ্টাম্পড ৩)—যা এক সিরিজে সর্বাধিক খেলোয়াড়কে বিদায় করার পূর্ব বিশ্ব-রেকর্ড স্পর্শ করে।

এই টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার এ কে ডেভিডসন ৩৩টি উইকেট পান—ফলে তিনি ১৯৩০-৩১ সালের টেস্ট সিরিজে সি ভি গ্রিমেট প্রতিষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে একটি সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড স্পর্শ করেন।

এই টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার নর্ম্যান ও'নীলের মোট রান দাঁড়ায় ৫২২—অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের নতুন রেকর্ড।

এই টেস্ট সিরিজে রোহন কানহাইয়ের মোট রান দাঁড়ায় ৫০৩—অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের পক্ষে এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের নতুন রেকর্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

প্রথম টেস্ট, ব্রিসবেন: ডিসেম্বর ৯, ১০, ১২, ১৩ ও ১৪

খেলার ফল: 'টাই' (উভয় দলের রান সমান)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৪৫৩ রান (সোবার্স ১৩২, ওরেল ৬৫, সলোমন ৬৫, আলেকজান্ডার ৬০ ও হল ৫০ রান। ডেভিডসন ১৩৫ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৮৪ রান (ওরেল ৬৫ এবং কানহাই ৫৪ রান। ডেভিডসন ৮৭ রানে ৬ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া: ৫০৫ রান (ও'নীল ১৮১, সিম্পসন ৯২ এবং ম্যাকডোনাল্ড ৫৭ রান। হল ১৪০ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৩২ রান (ডেভিডসন ৮০ এবং বেনো ৫২ রান। হল ৬৩ রানে ৫ উইকেট)

দ্বিতীয় টেস্ট, মেলবোর্ণ: ডিসেম্বর ৩০ ও ৩১ (১৯৬০), জানুয়ারী ২ ও ৩।

খেলার ফল: অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া: ৩৪৮ রান (ম্যাককে ৭৪ মার্টিন ৫৫ এবং ফ্যাভেল ৫১ রান। হল ৫১ রানে ৪ উইকেট)

ও ৭০ রান (৩ উইকেটে। সিম্পসন নট আউট ২৭, এবং ফ্যাভেল নট আউট ২৪ রান। হল ৩২ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১৮১ রান (কানহাই ৮৪ এবং নার্স ৭০ রান। ডেভিডসন ৫৩ রানে ৬ উইকেট)

ও ২৩৩ রান (হান্ট ১১০ এবং আলেকজান্ডার ৭২ রান। ডেভিডসন ৫১ রানে এবং মার্টিন ৫৬ রানে ৩ উইকেট)

তৃতীয় টেস্ট, সিডনি: জানুয়ারী ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮

খেলার ফল: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২২ রানে জয়ী

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৩৩৯ রান (সোবার্স ১৬৮ এবং নার্স ৪৩ রান। ডেভিডসন ৮০ রানে ৫ এবং বেনো ৮৬ রানে ৪ উইকেট)

ও ৩২৬ রান (আলেকজান্ডার ১০৮, ওরেল ৮২ এবং স্মিথ ৫৫ রান। বেনো ১১৩ রানে ৪, ডেভিডসন ৩৩ রানে ৩ এবং ম্যাককে ৭৫ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া: ২০২ রান (ও'নীল ৭১ রান। ভ্যালেনটাইন ৬৭ রানে ৪ এবং গিবস ৪৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৪১ রান (হার্ভে ৮৫ এবং ও'নীল ৭০ রান। গিবস ৬৬ রানে ৫ এবং ভ্যালেনটাইন ৮৬ রানে ৪ উইকেট)

চতুর্থ টেস্ট, এডিলেড: জানুয়ারী ২৭, ২৮, ৩০, ৩১ ও ফেব্রুয়ারী ১

খেলার ফল: ড্র

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৩৯৩ রান (কানহাই ১১৭, ওরেল ৭১ এবং আলেকজান্ডার নট আউট ৬৩ রান। বেনো ৯৬ রানে ৫ এবং মিশন ৭৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪৩২ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেঃ। কানহাই ১১৫, আলেকজান্ডার নট আউট ৮৭, হান্ট ৭৯ এবং ওরেল ৫৩ রান: বেনো ১০৭ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া: ৩৬৬ রান (সিম্পসন ৮৫, বেনো ৭৭ এবং ম্যাকডোনাল্ড ৭১ রান। গিবস ৯৭ রানে ৫ এবং সোবার্স ৬৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৭৩ রান (৯ উইকেটে। ও'নীল ৬৫ এবং ম্যাককে নট আউট ৬২ রান। ওরেল ২৭ রানে ৩ উইকেট)

পঞ্চম টেস্ট, মেলবোর্ণ: ফেব্রুয়ারী ১০, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৫

খেলার ফল: অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে জয়ী

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২৯২ রান (সোবার্স ৬৪ এবং সলোমন ৪৫ রান। মিশন ৫৮ রানে ৪ উইকেট)

ও ৩২১ রান (আলেকজান্ডার ৭৩ এবং হান্ট ৫২ রান। ডেভিডসন ৮৪ রানে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া: ৩৫৬ রান (ম্যাকডোনাল্ড ৯১, সিম্পসন ৭৫ এবং বার্জ ৬৮ রান। সোবার্স ১২০ রানে ৫ এবং গিবস ৭৪ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৫৮ রান (৮ উইকেটে। সিম্পসন ৯২ এবং বার্জ ৫৩ রান। ওরেল ৪৩ রানে ৩ এবং ভ্যালেনটাইন ৬০ রানে ৩ উইকেট)

ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়

ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষ-স্থান: ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে এফ সি এম আলেকজান্ডার (মোট রান ৪৮৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৮ এবং গড় ৬০.৫০) এবং অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে পিটার বার্জ (মোট রান ২১৩ এবং গড় ৫৩.২৫)।

সর্বাধিক মোট রান করেন: অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নর্ম্যান ও'নীল—৫২২ রান (এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৮১ এবং গড় ৫২.২০) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে রোহন কানহাই—৫০৩ রান (এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১৭ এবং গড় ৫০.৩০)

বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষ-স্থান: অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ কে ডেভিডসন (মোট উইকেট ৩৩ এবং গড় ১৮.৫৫) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ল্যান্স গিবস (মোট উইকেট ১৯ এবং গড় ২০.৭৮)

সর্বাধিক মোট উইকেট পান: অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে—এ কে ডেভিডসন (৩৩টি উইকেট) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ওয়েসলী হল (২১টি উইকেট)

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব টেবল টেনিস আসর

মিউনিখে আসন্ন ১৯৬৯ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসছে। এই ৩০তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে জাপানের যে ১৮ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই তিনজন খেলোয়াড় গতবার (১৯৬৭) বিশ্ব খেতাব জয় করেছিলেন—নোবুহিকো হাসিগাওয়া (বয়স ২২), সাচিকো মোরিসাওয়া (বয়স ২৫) এবং সাইকো হিরোতা (বয়স ২২)। গতবার হাসিগাওয়া ২টি (পুরুষদের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস), মোরিসাওয়া ২টি (মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস) এবং হিরোতা ১টি খেতাব (মহিলাদের ডাবলস) জয়ী হয়েছিলেন। গতবার (১৯৬৭) প্রতিযোগিতার মোট ৭টি খেতাবের মধ্যে জাপানই ৬টি খেতাব জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বার নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের নজির সৃষ্টি করেন। ১৯৫৯ সালেও জাপানের খেলোয়াড়রা অনুরূপ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একই বছরের আসরে সর্বাধিক ৬টি খেতাব জয়ের রেকর্ড আছে একমাত্র জাপানেরই।

জাপানের সাফল্য

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের প্রথম যোগদান ১৯৫২ সালে। ১৯৫৩ সালে তারা যোগদান করেনি। ১৯৫৭ সালের পর এক বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসছে। এ পর্যন্ত জাপান ১০টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ৭০টি খেতাবের মধ্যে ৩৯টি খেতাব (শতকরা ৫৫.৫৫) জয়ী হয়েছে।

১৯৫২ : ৪টি খেতাব। দলগত বিভাগ : মার্শেল কোর্বিলোন কাপ; **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের ডাবলস।

১৯৫৩ : জাপান রাজনৈতিক কারণে যোগদান করেনি।

১৯৫৪ : ৩টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ; **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৫ : ২টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং কাপ; **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৬ : ৪টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং কাপ। **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস।

১৯৫৭ : ৫টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগ : পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৫৯ : ৬টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং কাপ (উপর্যুপরি ৫ বার—হাঙ্গেরী এবং জাপানের রেকর্ড) এবং কোর্বিলোন কাপ। **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬১ : ৩টি খেতাব। দলগত বিভাগ : কোর্বিলোন কাপ। **ব্যক্তিগত বিভাগ : পুরুষদের ডাবলস** এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬৩ : ৪টি খেতাব। দলগত বিভাগ : কোর্বিলোন কাপ (উপর্যুপরি ৪ বার জয়লাভের সূত্রে প্রতিযোগিতায় রেকর্ড)। **ব্যক্তিগত বিভাগ :** মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬৫ : ২টি খেতাব। ব্যক্তিগত বিভাগ : মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকসড ডাবলস।

১৯৬৭ : ৬টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ। **ব্যক্তিগত বিভাগ : পুরুষদের সিঙ্গলস** মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস।

চান্দু বোরদে

ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৬৯ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় চান্দু বোরদেকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ

পাটনার রাজেন্দ্রনগর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সর্বভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দেরাদুনের গোর্খা ব্রিগেড দল ২—১ গোলে কলকাতার ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল।

প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে গোর্খা ব্রিগেড দল ৩-০ গোলে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি পরাজিত করেছিল। অপরদিকের ফাইনালে ইস্টার্ণ রেল দল কলকা[illegible] রাজস্থান ক্লাবকে ৩-২ গোলে [illegible] ফাইনালে উঠেছিল।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযো[illegible]

জব্বলপুরে আয়োজিত ১৫তম [illegible] মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস সমস্ত বিভাগের খেতাব (মোট ১[illegible] জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি ৬ বার [illegible] চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ ক[illegible] পনের বারের প্রতিযোগিতায় এই সার্ভিসেস দল মোট ১১ বার [illegible] চ্যাম্পিয়ান হল।

দলগত ফলাফল

১ম সার্ভিসেস (৫৫ পয়েন্ট), [illegible] রেলওয়ে (২০ পয়েন্ট) এবং ৩য় মহা[illegible] (১০ পয়েন্ট)

বিভিন্ন বিভাগের চ্যাম্পিয়ান

ওয়েট		চ্যাম্পিয়ান
হেভী	:	হাওয়া সিং (সার্ভি[illegible]
লাইট ফ্লাই	:	মোহন সিং (সার্ভি[illegible]
ফ্লাই	:	এম বি থাপা (সার্ভি[illegible]
ফেদার	:	ডি স্বামী (সার্ভি[illegible]
লাইট	:	কে রমন (সার্ভি[illegible]
লাইট ওয়েল্টার	:	এম কে রাই (সার্ভি[illegible]
ওয়েল্টার	:	এস ভোস (সার্ভি[illegible]
লাইট-মিডল	:	ভবন সিং (সার্ভি[illegible]
ব্যান্টম	:	পি যাদব (সার্ভি[illegible]
মিডল	:	হাকাম সিং (সার্ভি[illegible]
লাইট হেভী	:	সদারা সিং (সার্ভি[illegible]
শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা	:	ডি স্বামী (সার্ভি[illegible]

নেহরু হকি প্রতিযোগিতা

নিউ দিল্লীর শিবাজী স্টেডিয়া[illegible] আয়োজিত জহরলাল নেহরু হকি প্র[illegible] যোগিতায় ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স [illegible] অল ইন্ডিয়া পুলিশ দলকে যুগ্ম-বি[illegible] ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ দু'দি[illegible] ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় হয়েছিল।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা

ব্যাংককে আয়োজিত দ্বিতীয় এশি[illegible] চ্যাম্পিয়ান দলগুলির ফুটবল প্রতিযোগি[illegible] বর্তমানে সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে [illegible] গেছে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত [illegible] গুলির কেবল জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পি[illegible] দলগুলিই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্র[illegible] অধিকারী।

ভারতবর্ষ থেকে গতবারের জা[illegible] ফুটবল চ্যাম্পিয়ান অর্থাৎ সন্তোষ বিজয়ী মহীশূর দল আলোচ্য [illegible] যোগিতায় 'ক' বিভাগে অংশ গ্রহণ ক[illegible] সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা [illegible] করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।